"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

“ঈহুদী-কি-লেড়্‌কী”
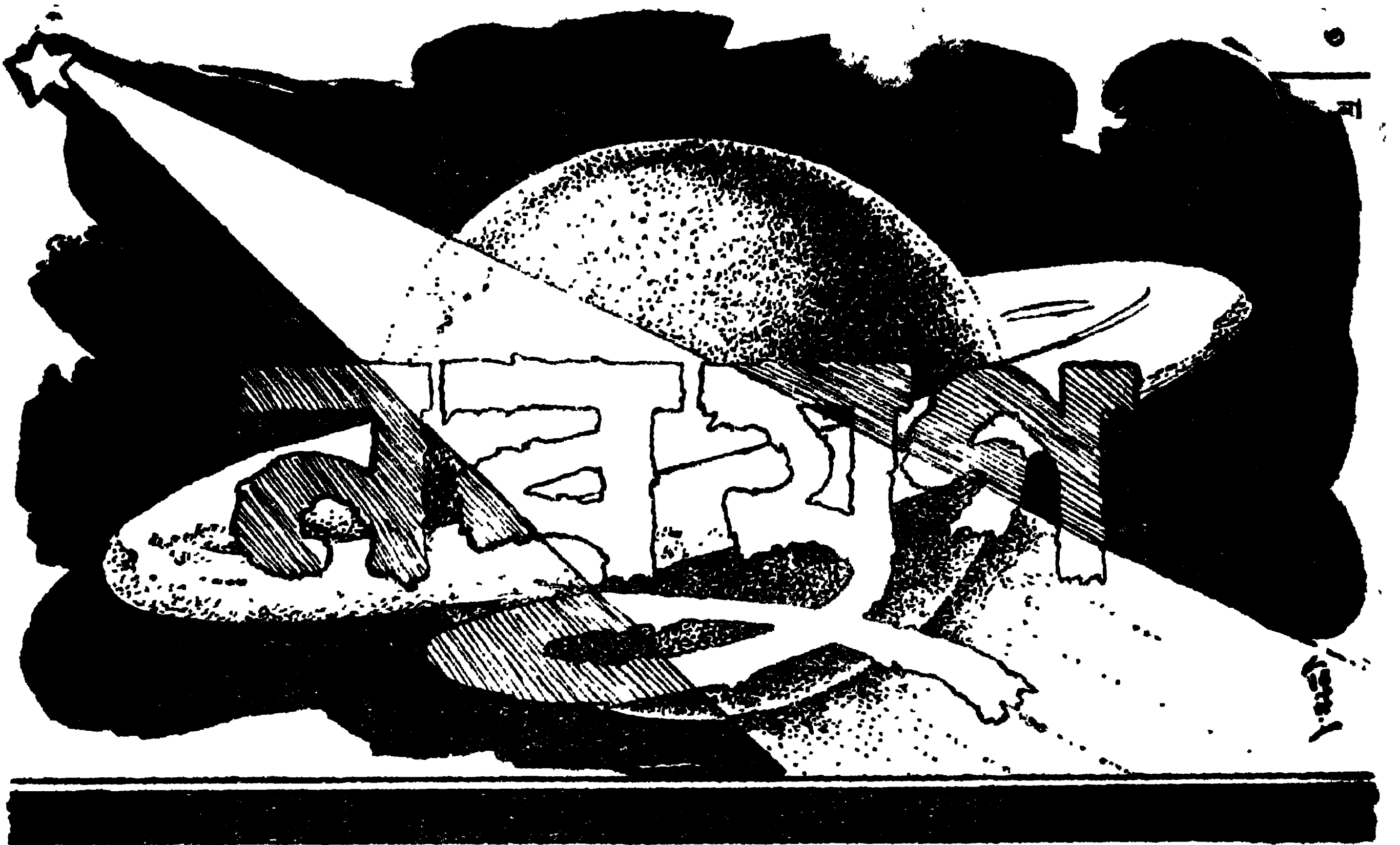
১ম বর্ষ] ৩রা শ্রাবণ শনিবার ১৩৩১, ইং ১৯ জুলাই। [১ম সংখ্যা

নবযুগ

বেশ মনে আছে, অনেক দিন পূর্ব্বে 'নবযুগ' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন বাঙ্গালাদেশে নবযুগের সূচনা হইয়াছে, তখন বাঙ্গালার সুসন্তানগণ দেশমাতার আহ্বান শুনিতে পাইয়াছিলেন, তখন চারিদিকে একটা চেতনার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁহারা সে সময় সেই 'নবযুগ' পত্রিকার আবাহন করিয়াছিলেন, তাঁহারা নবযুগের সে বাণী শুনিতে পান নাই; তাঁহারা তখন পত্রিকাখানিকে যেভাবে পরিচালিত করিয়াছিলেন, সে কথা আর এতদিন পরে বলিব না; যাঁহারা বিগত চল্লিশ বৎসরের সংবাদ পত্রের ইতিহাস লিখিবেন, তাঁহারাই সে কথা লিপিবদ্ধ করিবেন। তবে, এইমাত্র বলিতে পারি যে, ঐ শ্রেণীর সংবাদ-পত্রের যাহা অবশ্যম্ভাবী নিয়তি,'নবযুগ'ও সে নিয়তি অতিক্রম করিতে পারে নাই—পত্রিকাখানির অস্তিত্ব অল্পদিনের মধ্যেই লোপ পাইয়াছিল।

তাই, সেদিন যখন শুনিলাম যে, কয়েকজন নবীন যুবক 'নবযুগ' নাম দিয়া একখানি সংবাদ-পত্র নহে—সাময়িক সাপ্তাহিক-পত্র প্রচারে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন হর্ষ-বিষাদ দুইই হইল;—হর্ষ এই জন্য যে এইত নবযুগের বার্ত্তা ঘরে ঘরে প্রচার করিবার সময়। এখন গণদেবতা জাগ্রত হইয়াছেন, এখন তাঁহার পূজার সম্ভার লইয়া নবযুগের নবীন পূজারী দিগের অগ্রসর হইবারই সময়। বিষাদের কারণ এই যে, সেই বিলুপ্ত 'নবযুগে'র প্রেতাত্মা আসিয়া এই 'নবযুগে'র স্কন্ধে ভর না করেন; সেই সেকালের দ্বন্দ্ব, কোলাহল, ব্যক্তিগত আক্রমণ, নিন্দা কুৎসা এই 'নবযুগ'ও প্রচার না করেন।

কিন্তু, যখন দেখিলাম যাঁহারা এই 'নবযুগ' প্রচারে অগ্রসর তাঁহারা সর্ব্বাংশে গণদেবতার পূজার ভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত; তাঁহাদের চেষ্টা আছে, যত্ন আছে, ঐকান্তিকতা আছে, দেশের ও দশের প্রতি মমত্ব-জ্ঞানই তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছে, তখন তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা যাহাতে সফল হয়, তাঁহাদের সাধনা যাহাতে সিদ্ধিলাভ করে তাহার জন্য সকল মঙ্গলালয় বিশ্ব দেবতার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য

মহতের বেদনা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রভাস-তীর্থে সুরাপানোন্মত্ত যদুকুল সহসা আত্মঘাতী কলহে প্রবৃত্ত হইয়া যখন পরস্পরকে হনন করিতেছিল, তখন করুণাজলভারস্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সে শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। বক্ষে হস্তার্পণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান সেই মহামানবের প্রশান্ত দৃঢ়তায় বেদনা-কাতর গাম্ভীর্য্য—নীরব ভঙ্গীতে প্রাণপ্রিয় স্বজনগণের অনিবার্য্য আত্মহত্যাকে ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনের নিশ্চিত প্রয়োজনরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। অবাধ্য, আত্মাভিমানী যদুকুলের অবিবেকী দম্ভ দেখিয়া গীতা-সিংহনাদকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কথা কহেন নাই।

আহাম্মদাবাদ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে সমবেত আত্মাভিমানদৃপ্ত প্রতিষ্ঠা লোভী ভারত-সন্তানগণের উদ্ধত অবিমৃষ্যকারিতার সম্মুখে রুদ্ধ-বাক্ মহাত্মা গান্ধি যেন সেই সব স্বরাজ-লাভের আকাঙ্ক্ষার সহিত সামঞ্জস্যহীন, অসংলগ্ন, উগ্র ও প্রচণ্ড উক্তির মধ্য দিয়া ভগবানের বাণী শুনিলেন,—"অসম্ভব, ইহার মধ্যে শৃঙ্খলা-স্থাপন করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে।

"আমি কাহাকে ক্ষমা করিব, আমার প্রতি তো কেহ কোন অন্যায় করে নাই, বরং সকলেই আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছেন?"—তথাপি চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল কেন? কোন মহাবেদনায় মহাত্মা গান্ধি বিচলিত হইলেন? যিনি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও দৈন্য, গ্লানি ও অপমান, পরাজয় ও ব্যর্থতার আঘাত অপ্রতিবাদে অকাতরে হাস্যমুখে সহ্য করাই সুনিশ্চিত সাফল্য বলিয়া আজীবন বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন, যিনি অকম্পিত-চিত্তে স্মিতমুখে সুদীর্ঘ কারাদণ্ড গ্রহণ করিয়া বিচারককে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, সেদিনও হাঁসপাতালে নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও যিনি লেশমাত্র বিচলিত হন নাই—সহসা সেই অটল হিমাদ্রি কেন অশ্রুজলে গলিয়া পড়িল? ইহাই মহতের বেদনা। ইহা মমতার অশ্রু নহে—ইহা কল্যাণের আশীষ ধারা? ক্রুশবিদ্ধ যীশুর নেত্রও এই বেদনায় জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল; এই বেদনায় আলোড়িত স্বধর্ম লইয়া এক করুণাকাতর সন্ন্যাসী এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখিয়া, ছাগশিশুর জন্য নীরবে প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে মানবধর্ম্মের কি শোচনীয় অধঃপতন! এই সমুন্নত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস,—কিছুদিন পূর্ব্বে আমরাই একযোগে ইহাকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নবকলেবর দিয়াছিলাম, মহাত্মা গান্ধি প্রদত্ত বিশিষ্ট আদর্শ লইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের অনুগামী থাকিয়া অনুকূল আচরণ করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; পার তিন বৎসর ব্যবধানে বাক্যানুযায়ী কর্ম্ম করিবার অক্ষমতা নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহি। সত্যের বিনিময়ে শাঠ্য, অহিংসার বিনিময়ে অক্ষমের ঈর্ষা—আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের অস্ত্র—এত দীনাত্মা আমরা—অথচ একটা জাতির প্রতিনিধি সাজিয়া অভিনয় করিতেছি! বাক্যচাতুর্য্যের মোহজাল ছিন্ন করিয়া ছুটিয়া বাহির হইবার জন্য মহাত্মাজী আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিক্ষোভিত দুর্ম্মতির আস্ফালন ও অহঙ্কারের কাপট্য প্রবলরূপ পরিগ্রহ করিয়া রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে যে উচ্ছৃঙ্খলতা আনিয়াছে, তাহার মধ্যে থাকিয়া এই মতিচ্ছন্ন জাতির পরিচালনভার গ্রহণ করা বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব কিনা, এই সন্দেহে তাঁহার বেদনা গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। বড় বড় রাষ্ট্রবীরগণের সত্য-ভ্রংশতার যে দুঃখ, তাহা নানা আকারে এই পরাধীনতার বেদনায় মুমূর্ষু জাতিকেই বহণ করিতে হইবে—এতবড় অভিশাপের ঐকান্তিক মূর্ত্তি দেখিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে পীড়িত মহাত্মা ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন—আমি পরাজিত, গৌরবহীন!

কোথায় অহিংসা আর কোথায় অসহযোগ—কোথায় স্বরাজলাভের জন্য সেই দুর্দ্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষা,—অজ্ঞাত-সারে এক দায়ীত্বজ্ঞানহীনতা ও আদর্শের প্রতি অবজ্ঞা,—রাজনৈতিক সুবিধাবাদ গ্রহণপ্রয়াসী বড় বড় রাষ্ট্রীয় কর্ম্মবীরগণের চিত্ত নিত্য কলুষিত করিতেছে, চক্ষের সম্মুখে এই বিস্ময়কর বৈপরীত্য দেখিয়া, একবার মহাত্মা গান্ধির মনে হইল, কংগ্রেস ছাড়িয়া চলিয়া যাই; কিন্তু সে ক্ষণিকের দৌর্ব্বল্য। সত্যাগ্রহী বীর তাহা পারিলেন

না। প্রবল ঝটিকায় আলোড়িত সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গ-মালা বাহিরের দিক্‌টাকে বিক্ষুব্ধ করিলেও, উহার গভীরতম প্রদেশে অনন্ত স্থিরতা বিরাজমান। সেই চির প্রশান্ত তপঃশুদ্ধ মর্ম্মের নিভৃত কন্দর হইতে অমৃতবাণী উৎসারিত হইল,—"আমিতো অহিংস অসহযোগে বিশ্বাস হারাই নাই। আমি যে জানি, ভগবান আমাকে কল্যাণের পথে পরিচালন করিবেন; আমি আরও জানি মনুষ্যের জ্ঞান-গরিমার তুচ্ছ অভিমানের চেয়ে সত্য অনেক বড় জিনিষ!"

সেই সত্যের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া শুদ্ধ-সত্ব মহাত্মা গান্ধি কিছুতেই ভাবিতে পারিলেন না, সমগ্র ভারতবর্ষ বাক্যানুযায়ী কর্ম্ম করিবার অসামর্থ্য মিথ্যা আড়ম্বরে ঢাকিয়া মনে ও মুখে ভণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের অপমানিত পৌরুষকে অসহায় ভাবে জাতীয় জীবনের অশ্রান্ত নির্দ্দয় অপব্যয়ের মধ্যে রাখিয়া তিনি কোথায় গিয়া শান্তি পাইবেন? সঙ্কল্প স্থির হইল, অপমানে তিনি ব্যথিত হইবেন না, পরাজয়ে তিনি ব্যহত হইবেন না। কংগ্রেস-কর্ম্মের পূর্ণ দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম করিবেন এবং যে পর্য্যন্ত না কংগ্রেস তাঁহাকে অনুপযুক্ত, অযোগ্য-জ্ঞানে বহিষ্কৃত না করিয়া দেয়, ততদিন কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়াই দেশসেবা করিবেন। এইরূপে সম্পূর্ণ অভিমানশূন্য হইয়া কর্ম্ম করা সত্যাগ্রহীর ক্ষমতাবহির্ভূত নহে। তাঁহার সুশৃঙ্খল কর্ম্মপটুতা ভারতবর্ষের সেবায় নিযুক্ত করিয়া দেশবাসীর চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিবেন, প্রাণকে সঞ্জীবিত করিবেন, ভয়ের জড়ত্ব ও সংশয়ের দৌরাত্ম্য হইতে ভারতীয় মনকে মুক্ত করিয়া কংগ্রেসকে শক্তিশালী ও জীবন্ত করিয়া তুলিবেন। ভারতবর্ষ তথা জগতের সম্মুখে ইহাই মহাত্মাজীর ঘোষণা!

বাক্যানুযায়ী কর্ম্ম করিবার দায়ীত্ব যিনি অটলোন্নত শিরে চিরদিন বহন করিতেছেন, তাঁহার একথা বলিবার অধিকার আছে, যে স্বরাজ লাভ করিতে হইলে জাতিকে বাক্যানুযায়ী কর্ম্ম করিতে হইবে। ইংরাজ আমলাতন্ত্র নির্দ্ধারিত নিয়মতন্ত্রমূলক রাজনৈতিক শাঠ্য সহায়ে রাজনৈতিক অধিকার লাভের চেষ্টার পরিবর্ত্তে, কংগ্রেস যদি সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত আত্মোৎসর্গ ও দুঃখের দ্বারা স্বরাজ লাভের আদর্শ জাতির সম্মুখে স্থাপন না করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের বিভিন্নমুখীন বিক্ষিপ্ত চেষ্টার দ্বারা ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে, এই তত্ত্ব মহাত্মাজী দেশবাসীকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই আদর্শকে মানব-সাধ্যাতীত উচ্চাঙ্গের ভাবরাজ্যের কথা বলিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য যে অশোভন উৎকণ্ঠা মহাত্মা গান্ধীকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হইতে সরাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই ভীরুস্বভাবের নির্দ্দয়তার সমুচিত প্রত্যুত্তর ভারতবর্ষ দিবে, এ ভরসা আমরা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

ভারতবর্ষের ইতিহাস কি কোন উন্নত উদার আদর্শকে অতীতকালে জাতীয়-জীবনে জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই? যেদিন ধর্ম্মকে পার্থিব স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া ধিক্কার দিতে আমরা শিখি নাই, সেদিন জীবনের সমস্ত কর্ম্মকেই ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতার মধ্যে নিঃশেষে সঁপিয়া দিবার মত শক্তি ভারতবর্ষের ছিল,—আর আজ আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি পার্থিব-জগতে কার্য্য করিতে গিয়া পদে পদে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয় কেন? ধর্ম্মকে আমরা সঙ্কীর্ণতম করিয়া ফেলিয়াছি—নানা খণ্ডতার কলুষিত ক্ষত লইয়া ধর্ম্ম আজ আমাদের নিকট দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে, ধর্ম্ম আর আমাদিগকে ধারণ করিতে পারে না, আমরাও ধর্ম্মকে ধারণ করিতে পারিতেছি না। জাতীয় চরিত্রের এই প্রগলভ বিকৃতি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে—এই অস্বাস্থ্যকর মানসিক দৌর্ব্বল্যের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভারতবর্ষ যে বিপুল প্রয়াসে আলোড়িত হইতেছে—সেই আলোড়নে মথিত জাতির জঠর হইতেই মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয়। ইতিহাসের ধারায় ভারতীয় আদর্শের নব রূপান্তরের অন্যতম জীবন্ত-বিগ্রহ মহাত্মা গান্ধীর বাণী—ভারতবর্ষের ইতিহাসেরই বাণী; ইহা এক বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত নৈতিক প্রলাপ নহে; ইহা দুঃসহ তপস্যার সুনিশ্চিত সিদ্ধি!

একটা অস্ফুট প্রশ্ন উঠিয়াছে, বাঙ্গলাদেশ মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ গ্রহণ করিবে কি না? কেন না, 'বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য' এক নূতন সুরে রাষ্ট্রক্ষেত্রেও কয়েকদিন যাবৎ শোনা যাইতেছে। এবং এই ধুয়া ধরিয়া, ক্ষীত ক্ষুদ্রত্বের

সুলভ অভিমানে, নিজেদের সকলের চেয়ে বড় করিয়া দেখিবার যে ভ্রান্ত-ভাবপ্রবণতা—অপরিপক্ব মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইতেছে, যাহা হয়তো পরিণামে দেশ-কালপাত্র নির্ব্বিশেষে মহত্ত্বের নিকট অবনত হইবার মত বিনয় লাভ করিবার অবসর পাইবে না—সেই প্রচ্ছন্ন মহত্ত্ব-অসহিষ্ণুতার আপাতপ্রসার দেখিয়া কেহ কেহ বৃথা সন্দেহে আকুল হইতেছেন। এমন অবিনয়ী অপদার্থ বাঙ্গলাদেশকে ভুল করিয়া ভাবিতে আমরা ক্লেশ অনুভব করি। কোন ক্ষুদ্র অহঙ্কারে বাঙ্গালী সুনিশ্চিত কল্যাণকে উপেক্ষা করে নাই, করিবে না। ভারতবর্ষের সেবায় বাঙ্গালী তাহার বিধিনির্দ্দিষ্ট স্থান, মহাত্মা গান্ধীর পতাকা-তলে গ্রহণ করিবেই। যে মহাভাবসংঘাতসমুত্থ কর্ম্মপ্রেরণা নানাদিকে নানাভাবে জাতীয় জীবনকে সুনিশ্চিত অভ্যুদয়ের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, বাঙ্গালী এমন মূঢ় নহে যে, তাহার কল্যাণ-শক্তিকে অন্ধের মত চক্ষু বুজিয়া অস্বীকার করিবে!

সমস্ত স্বদেশী ও বিজাতীয় বিঘ্নের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের পতাকাখানি বহন করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী পুনরায় প্রস্তুত হইলেন। মনুষ্যত্ব দ্বারা মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষকে তাহার সত্য অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার অপূর্ব্ব কর্ম্মকৌশল যাঁহার আবিষ্কার, কোন অস্থায়ী ক্ষণিক ফল লাভের প্রত্যাশায় যাঁহার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য কেবল বর্ত্তমানের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায় না, যাঁহার আশ্চর্য্য উদার হৃদয় ও অভ্রান্ত বুদ্ধি এক অবিচলিত উদ্দেশ্যকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকেও উন্নত করিয়া তুলিয়াছে, সেই স্বাতন্ত্র্য-গৌরব-সমুন্নত মনুষ্যত্বের কল্যাণ-অভিযানকে বাঙ্গালী যে অর্ঘ্য দিয়া সমুচিত মর্য্যাদা দেখাইবে, তাহার সযত্ন সংগ্রহ চেষ্টায় বাঙ্গলার জনবিরল নিস্তব্ধ কর্ম্মভূমি পুনরায় মুখরিত হইয়া উঠুক।

নবযুগ

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী গঙ্গোপাধ্যায়

নূতন যুগের রঙীন আলোয় চিনে নেরে আপন পথ,
ওরে জ্ঞানী, ওরে ধনী, ওরে মহান্, ওরে সৎ;
কেউতো তোরা নহিস্ ছোট, তোল্‌রে সবে উচ্চ শির।
বাঙ্গলা আজি কিসের কাঙ্গাল? কিসের অভাব বাঙ্গালীর?
মান অভিমান ডুবিয়ে দেরে, ভুলে যারে আত্মপর;
উড়িয়ে নিশান বাজিয়ে বিষাণ সবাই হ'রে অগ্রসর।

রক্ষাকবচ

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী

(১)

সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া সাতদিন পরে সতীশ কলিকাতায় আপনার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া আসিল।

বাসার দরজায় গাড়ী হইতে নামিয়া সরাসরি উপরে তাহার শুইবার ঘরে চলিয়া গেল। কিন্তু ঘরের দরজার সম্মুখে পৌছিয়া তাহার যেন বিভ্রম উপস্থিত হইল। হঠাৎ তাহার দরজা খুলিতে সাহস হইল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, নলিনী যেন ঐ ঘরের মধ্যে তাহার অপেক্ষায় সাগ্রহে বসিয়া আছে! যেন সে ঘরে ঢুকিতেই চুড়ির শিঞ্জনে ঘর মুখরিত করিয়া তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে এবং কঠিন বাহুপাশে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে তাহাকে অভিভূত করিয়া দিবে!

সে সকম্প বুকে ঘরে ঢুকিল। দুইটা ইন্দুর ভয় পাইয়া কিচ্ মিচ্ শব্দ করিতে করিতে তাহার পায়ের কাছ দিয়া ছুটিয়া পালাইয়া গেল। তাহার বুকের থিক থিক শব্দটা যেন দেয়ালে টাঙ্গান ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দের সঙ্গে জেদ করিয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সে রুদ্ধ নিশ্বাসে একটা মূঢ় আশার মোহে চারিদিকে চাহিল। শয্যা শূন্য, গৃহ শূন্য! সে নাই, নাই, নাই!

তখন তাহার বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া বিদীর্ণ করিয়া একটা বিরাট আর্ত্তনাদ যেন বাহিরে আসিতে চাহিল। সে সবলে দুইবাহু বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া একবার শুধু বলিল, ওঃ। তারপর মাথায় হাত দিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

এই প্রথম শোকের বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে সে ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া দিল। তারপর দিবালোকে চারিদিকে একবার চাহিল। দেখিল, চারিদিকে সব ঠিক রহিয়াছে,—ঐ আলনার উপর নলিনীর হাতে বোতাম লাগান কতগুলি জামা; ঐ আলনার নীচে নলিনীর হাতে বোনা একজোড়া কার্পেটের জুতা; ঐ র‍্যাকের উপর নলিনীর হাতে তৈরী গলাবন্ধ, রুমাল। ঐ শেলফের উপর নলিনীর হাতে মলাট দেওয়া, নলিনীর হাতে সতীশের নাম লেখা কয়েকখানা বই; ঐ এক পাশে তাহাদের কতদিনের বিশ্রম্ভ ব্যাপারের সাক্ষী মোম বাতীর সেজটা, ঐ কাচের আলমারীর ভিতর নলিনীর হাতে কোঁচান কয়খানা শাড়ী ও কাপড়; ঐ দেয়ালের গায়ে টাঙ্গান শুকনো বকুল ফুলের মালায় ঘেরা সতীশের একখানা ফটো;—সবই ঠিক তেমনি রহিয়াছে, শুধু নাই কেবল তাহাতে প্রাণ! সব যেন ক্ষয় রোগীর মত তলে তলে অন্তঃসার শূন্য হইয়া গিয়াও কোনও মতে বাহিরের আকার বজায় রাখিয়াছে, যেন স্পর্শ মাত্রেই তাহা খসিয়া পড়িবে—শতখান হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে।

সে শোকে, ক্লান্তিতে, অবসাদে নির্জ্জীবের মত বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। তখন তার বিবাহিত জীবনের অজস্র স্মৃতি বাঁধভাঙ্গা জলের মত হু হু করিয়া তাহার চিত্ত প্লাবিত করিয়া ফেলিল। মাত্র দুইটী বৎসর তাদের বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা পুলিশে সতীশের চাকরী হয়। বিবাহের কিছু দিন পরই সতীশ নলিনীকে কলিকাতায় লইয়া আসিল। তারপর এই দেড় বৎসরের জীবন,—সে যেন একটা অবিচ্ছিন্ন মধুমাস, একটা আনন্দস্রোতে একটানা ভাসিয়া যাওয়া একটা অফুরন্ত মধুর স্বপ্ন।

তিন মাস আগে নলিনী পিত্রালয়ে গিয়াছিল। যেদিন সতীশ তাহাকে হাওড়া ষ্টেশনে তুলিয়া দিয়া আসিল সেদিনকার কথা আজ একখানা চিত্রের মত তাহার চোখের সুমুখে ভাসিতে লাগিল। নলিনীকে লইতে যে লোক আসিয়াছিল তাহাকে নানা ছুতায় সাত আট দিন রাখিয়া অবশেষে যখন তাহার যাত্রার দিন আসিল, নলিনীর সেদিনকার জলভারাবনত মেঘের মত বড় বড় চোখ দু'টার কথা সতীশের মনের মধ্যে শেলের মত বিঁধিতে লাগিল। যাত্রার দিন সন্ধ্যা হইতে রাত নয়টা পর্য্যন্ত দুইজনে পাশাপাশি বসিয়াছিল,—চোখে চোখে চাহিতে পারে নাই, পাছে চোখের জল ধরা পড়ে—কথা কহিতে পারে নাই পাছে অবাধ্য ক্রন্দন বাধা না মানে। হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী ছাড়িবার সময় সতীশ লোকের

অলক্ষিতে নলিনীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া একবার নিবিড় ভাবে পেষণ করিয়াছিল। তাহার হাতখানা যেন ওষ্ঠ হইয়া অজস্র চুম্বনজালে নলিনীকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, বক্ষ হইয়া নিবিড় আলিঙ্গন পাশে তাহাকে বদ্ধ করিয়াছিল। ওঃ তখনকার সমস্ত শরীর ব্যাপী সেই আলামরী উন্মাদনা এখনও যেন সে অনুভব করিতেছে।

গাড়ী ছাড়িবার শেষ মুহূর্ত্তে নলিনী শুধু অস্ফুটস্বরে একবার বলিয়াছিল, "তুমি একবার ওখানে এসো।" সে যাইতে পারে নাই। সাত দিন আগে সে টেলিগ্রাম পাইয়া পাগলের মত ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যখন সে পৌঁছিল তখন প্রায় সব শেষ হইয়া গিয়াছে। মৃত সন্তান প্রসব করিয়া সুতিকার জ্বরে নলিনী জীবনের শেষপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিল। এবার এই শেষ বিদায়ের দিনে নলিনীই সতীশের হাতখানা নিজের মৃত্যু শীতল হাতের মধ্যে লইয়া তেমনই অস্ফুটস্বরে বলিয়াছিল, "আমার মরতে ইচ্ছা হচ্ছে না।" সতীশ আর স্থির থাকিতে পারিল না। বালিশের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া আকুলভাবে রোদন করিতে লাগিল।

এমন সময় বাহির হইতে ডাক আসিল, "হুজুর।"

সতীশ একটু সামলাইয়া লইয়া উত্তর করিল, "কোন্ ?"

"বেয়ারা।"

সতীশ উঠিয়া বসিল। চোখের জল মুছিয়া একটু স্থির হইয়া বলিল, "আও।"

বেয়ারা ঘরে ঢুকিয়া সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর, কল বোলাতা হায়।"

সতীশ নীচে নামিয়া গেল। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়া শুনিল টেলিফোঁর ঘণ্টা বাজিতেছে।

কিন্তু হঠাৎ সে টেলিফোঁর রিসিভারে হাত দিতে পারিল না। আজ তাহার মনে পড়িয়া গেল, সে দুপুর বেলা আফিসে চলিয়া গেলে নলিনী প্রত্যহ দরকারে এবং অদরকারে তাহাকে ডাকিত, কত তুচ্ছ কথা লইয়া আলাপ করিত। সে একদিন সতীশ মনে করিয়া তাহার আফিসের এক কেরাণীকে কি একটা কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা লইয়া ঠাট্টা করিয়া সতীশ তাহাকে কাঁদাইয়াছিল; মনে পড়িল একদিন সে অন্তের অলক্ষিতে টেলিফোঁর ভিতর দিয়া চুম্বন পাঠাইয়াছিল! বাড়ীর প্রত্যেক খুঁটিনাটি জিনিষে, প্রত্যেক ধূলিকণায়, প্রত্যেক অণু পরমাণুতে যে তাহার স্মৃতি ওতপ্রোত হইয়া জড়াইয়া আছে! সতীশ আবার অধীর হইয়া উঠিল।

টেলিফোঁর ঘণ্টা একটু থামিয়া গিয়াছিল। আবার বাজিয়া উঠিল। রিসিভার হাতে লইয়া সতীশ আবার থামিয়া গেল। তাহার মনে আবার সেই একটা গূঢ় আনন্দ মিশ্রিত আশঙ্কার উদয় হইল। যদি টেলিফোঁর মধ্যে নলিনীর সেই চির-পরিচিত কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠে! যদি সে শুনিতে পায়, দূর, সুদূর হইতে, নগর, গ্রাম, মাঠ, গিরি নদী, সাগর অতিক্রম করিয়া, ইহলোক ছাড়াইয়া, পরলোকের শেষ সীমান্ত প্রান্ত হইতে নলিনী তাহাকে ডাকিতেছে, "ওগো এস গো, এস আমার তৃষিত বক্ষে, তাপিত হৃদয়ে এস।"

সতীশের হাত কাঁপিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে রিসিভারে কাণ লাগাইতে পারিল না। টেলিফোঁর ঘণ্টা যেন পাগল হইয়া উঠিল। সে কতকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মনকে একটু শান্ত করিয়া রিসিভারে কাণ দিল।

হেড আফিস হইতে ডাক আসিয়াছে। মেছুয়া-বাজারে কোথায় একটা বোমার আড্ডা ধরা পড়িয়াছে। সার্চ্চ করিবার জন্য তাহাকে এখনই যাইতে হইবে।

সতীশ ক্লান্তভাবে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। চাকরীর প্রতি, দাসত্বের প্রতি একটা বিরাট তিক্ততায় তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কিন্তু উপায় নাই। যাইতে হইবে এবং এখনই। সে বেয়ারাকে ট্যাক্সি ডাকিতে বলিয়া ইউনিফরম পরিবার জন্য অবসন্নভাবে উপরে চলিয়া গেল।

(২)

যে বাসায় বোমার আড্ডা বাহির হইয়াছে তাহা মেছুয়াবাজারের একটা গলিতে অবস্থিত। বড় রাস্তা হইতে কয়েকখানা বাসা ছাড়াইলেই একখানা ছোট পুরাণ দোতালা বাসা। এই বাসায় কয়েকটী বিপ্লববাদী যুবক মেস করিয়া থাকিত। প্রতিবেশীরা প্রথমে উহাকে অজ্ঞাত মেসের মত ছাত্রদের মেস বলিয়াই জানিত। হঠাৎ

কোনও কারণে তাহাদের উপর সন্দেহ হওয়ায় তাহাদের একজন পুলিসে খবর দেয়। কিন্তু পুলিশ আসিবার আগেই বিপ্লববাদীরা কোনও ক্রমে খোঁজ পাইয়া উধাও হইয়াছে। তবে বোধ হয় সময় না পাওয়ায় বাসার জিনিষ পত্র সরাইতে পারে নাই।

বাসাটীর আশে পাশে ভিতরে বাহিরে সশস্ত্র পুলিশের ঘাঁটি বসিয়াছে। বাসার ভিতর হইতে একতিল পরিমাণ জিনিষও বাহিরে আসিবার জো নাই। বাসার বাহিরে রাস্তার একস্থানে কয়জন কৌতূহলী নিষ্কর্ম্মা লোক দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছে আর এক একবার আড়চোখে পাহারাওয়ালাদের দিকে চাহিতেছে। গলির অপর পার্শ্বের একখানা বাড়ী হইতে কয়েক জোড়া কালো সকৌতূহলদৃষ্টি চিকের অন্তরালে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। বাসার মধ্যে নীচতলায় একখানা ঘরে কলিকাতা পুলিশের দারোগা হীরালাল সার্চ্চের সাক্ষী ভদ্রবেশী দুই জন লোকের সঙ্গে আলাপ করিতেছিল। আজকার সার্চ্চ পরিচালনার ভার ছিল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সতীশচন্দ্রের উপর। সকলে তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে গলির মোড়ে মটরের শব্দ ও হর্ণের ভোঁ ভোঁ ডাক শোনা গেল। পাহারাওয়ালারা টান হইয়া দাঁড়াইল; হীরালাল ঘরের বাহিরে আসিল। পর মুহূর্ত্তেই সতীশ আসিয়া বাসার মধ্যে ঢুকিল। তাহার চোখ জ্যোতিহীন, মুখ বিবর্ণ, কামান গোঁফদাড়ী খোঁচা খোঁচা হইয়া উঠিয়াছে, চুলগুলি উস্কোখুস্কো।

হীরালাল সতীশের পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা শুনিয়াছিল। সে সহানুভূতিপূর্ণ মুখে তাহাকে অভিবাদন করিয়া নিঃশব্দে বাসার মধ্যে ঢুকিল। সতীশ মন্ত্রচালিতের মত তাহার অনুসরণ করিল। ঘরে ঢুকিয়া হীরালাল সংক্ষেপে দুই একটা কথায় ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল। তারপর সার্চ্চের সাক্ষী ভদ্রলোক দুইটীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতেই সতীশ বলিল, হীরালালবাবু, তুমিই যা হয় কর, আমি আর পাচ্ছি না।" বলিয়া ঘরের এক কোণা হইতে একখানা পুরাতন ভাঙ্গা চেয়ার টানিয়া বাহির করিয়া তাহার উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বাহিরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এই বিরাট কলিকাতা সহর তাহার অজস্র গাড়ীঘোড়া লোকজন, কল কারখানা লইয়া সতীশের চোখের সুমুখ হইতে মুছিয়া গেল; তাহার মন এই পুলিশ পাহারাওয়ালা সিপাই শাস্ত্রীর রাজ্য হইতে উধাও হইয়া কোন্ এক কল্পনার রাজ্যে স্মৃতির সৌধ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল।

সার্চ্চ চলিতে লাগিল। দেখা গেল, পলায়নের তাড়াতাড়ীতে বিপ্লববাদীরা নেহাৎ দরকারী অথবা ছোট ছোট জিনিষ ব্যতীত আর কোনও জিনিষই সরাইতে পারে নাই। প্রথমেই বাহির হইল এক বাক্স বই। তার মধ্যে বর্ত্তমান ভারত, দেশের কথা, বর্ত্তমান রণনীতি, মুক্তি কোন্ পথে প্রভৃতি রাজদ্রোহকর বই আর সেই সঙ্গে গীতা উপনিষদ প্রভৃতি কয়েকখানা ধর্ম্মগ্রন্থ ছাড়া আর সবই পাশ্চাত্য বিপ্লবপন্থীদের বিস্ফোরক দ্রব্য নির্ম্মাণ প্রণালীর পুস্তক। হীরালাল সমস্ত বইয়ের একখানা একখানা করিয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু কোনও বইয়েই একটা নাম অথবা একটা ঠিকানা অথবা এই দলকে অনুসরণ করিবার মত কোনও সূত্র পাওয়া গেল না।

এক ঘরে নানারকম বিস্ফোরক জিনিষ প্রস্তুত করিবার দ্রব্যসামগ্রী এবং কতগুলি ভীষণ ভীষণ বোমা রহিয়াছে। একটা কয়লা ও ছাইএর গাদার তলে একটা বড় কাঠের প্যাক বাক্স পাওয়া গেল। সেটা খুলিয়া দেখা গেল তাহার মধ্যে কতগুলি বন্দুক রহিয়াছে। কিন্তু সমস্ত ঘর বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও এমন একটা সূত্র পাওয়া গেল না যাহাতে নির্ভর করিয়া দলের কাহারও খোঁজ হইতে পারে।

অবশেষে হেড কনেষ্টবল বরজনাথ ক্লান্ত হইয়া হীরালালকে কহিল, "আশ্চর্য্য, হীরালালবাবু, সবটা বাসায় একটুকরো কাগজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। শুনচি এরা এ বাসায় তিন চার মাস ছিল। এই সময়ের মধ্যে এরা কি কারও একখানা চিঠিও পায় নাই।"

হীরালাল উত্তর করিল,"পেলেই বা কি। ওদের নিয়ম যে কেউ কোনও চিঠি পেলেই তৎক্ষণাৎ সেটা পড়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ওদের নিয়ম বড় কড়া, নড়চড় হলে আর রক্ষা নেই।"

বাসার মধ্যে কাপড়-চোপড় কিছুই পাওয়া যায় নাই। শুধু সিঁড়ির উপর একটা ছেঁড়া আধময়লা টুইলের সার্ট পাওয়া গিয়াছিল। বোধহয় পলাইবার সময় সার্টটা পড়িয়া যাওয়ায় তাহা আর কারও চোখে পড়ে নাই।

সার্চলিষ্ট তৈরী হইতেছিল। হীরালাল সার্টটা লইয়া সতীশ যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে একখানা চৌকির উপর বসিয়া নিবিষ্টভাবে ধোপার দাগ পরীক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ তাহার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সার্টটা বুকের উপর যেখানে কাপড় ভাঁজ করিয়া সেলাই করা আছে সেখানে একজায়গায় তাহার হাতে শক্ত একটা কি লাগিল। সে তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া সেই জায়গাটা সন্তর্পণে কাটিয়া ফেলিল। মুহূর্তমধ্যে তাহার মধ্য হইতে একখানা ভাঁজকরা লেখা ডাক কাগজ বাহির হইয়া আসিল।

সফলতার আনন্দে হীরালাল একটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া উঠিয়াছিল। সতীশ একটু চমকিয়া উঠিয়া তাহার দিকে চাহিল। হীরালাল তৎক্ষণাৎ তাহার হাতে চিঠিখানা দিয়া সগর্বোল্লাসে বলিল, "দেখুন ত', একখানা চিঠি পাওয়া গেছে, সার্টটার বুকের কাছে সেলাই করা ছিল। দেখা যাক্ এর ভিতরে কি লেখা আছে। সতীশ নিঃশব্দে চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিল। রুলকরা ডাক কাগজের উপর মেয়েলী ছাদের কাঁচা লেখা। উপরে ঠিকানা লেখা রহিয়াছে, পোঃ আরামপুর, হুগলী। সতীশ চিঠিখানা খুলিয়া নিবিষ্টমনে পড়িতে লাগিল। হীরালাল সকৌতুহলনেত্রে অদূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

চিঠিখানায় লেখা ছিল—

প্রিয়তম,

তুমি যে সেই দুই বচ্ছর আগে বাড়ী ছেড়ে গিয়েছ, এতদিনেও ফিরে এলে না। বিয়ের পর একটা মাস না যেতেই তোমার সঙ্গ হারিয়েছি; এতদিন কেটে গেল, একখানা চিঠিও ত লিখ্‌লে না। তুমি যে এত নিষ্ঠুর হ'তে পার তাত আগে ভাব্‌তেও পারি নি। মা তোমার জন্য শুধু কাঁদেন, আর বাবা বলেন, তুমি নাকি দলে মিশে উচ্ছন্নে গিয়েছ। তোমার দিব্যি করে বলছি, আমি কিন্তু তা বিশ্বাস করি না। আমি জানি, তুমি দেশের কাজেই গিয়েছ আর তাই কচ্ছ। কিন্তু দেশের কাজে গেলে কি আমাদের ত্যাগ কর্ত্তে হয়? লক্ষ্মীটী আমার, তুমি শুধু একটীবার এসে দেখা দিয়ে যেও, আমি দিব্যি করে বল্‌ছি, আমি তোমাকে বাধা দেব না। তোমায় এতদিন না দেখে আমার চারিদিক অন্ধকার বোধ হচ্ছে। ওগো তোমায় অনুনয় কচ্ছি, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ছি, শুধু একটীবার এসো, এসো, এসো। ইতি—

তোমার চরণাশ্রিতা—প্রভা—

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে সতীশের সুপ্ত বেদনা যেন নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। তার চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। পাছে হীরালাল সেই জল দেখিতে পায় সেই ভয়ে পড়া শেষ হইয়া গেলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে চিঠি হইতে মুখ তুলিতে পারিল না।

কোন্ অভাগিনী নারী আপনার বুক চিরিয়া, প্রতি অক্ষরে আপনার হৃদয় নিঙড়াইয়া দিয়া এ চিঠি লিখিয়াছে! আর কোন্ দুঃসাহসী পুরুষ এ, যে তার দলের কঠোর শাসন উপেক্ষা করিয়া, কারাবাসের ভয় তুচ্ছ করিয়া নিজের ধরা পড়িবার এমন অমোঘ সূত্র সযত্নে রক্ষা করিয়াছে! কে এ হতভাগ্য, সংসারে যার এমন স্থানটুকু নাই যেখানে আপনার প্রিয়তমার পত্রখানা রাখিয়া শান্তি পায়! নাকি সে ইচ্ছা করিয়াই এই আদরের পোষাপাখীটিকে বুকের কাছে তার নীড় রচনা করিয়া দিয়াছিল! সেকি উহার মধ্যে তার প্রিয়ার সান্নিধ্য উপভোগ করিত। তার কোমল স্পর্শ অনুভব করিত, তার বুকের স্পন্দনের একটু রেশ, তার গভীর অনুরাগের একটু অংশ, হৃদয়ের একটু মধুরতা, রক্তের একটু উষ্ণতা,—যাহা এই পত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, বুক দিয়া তাহা অহর্নিশ অনুভব করিবার জন্যই বুকের মধ্যে উহা ধারণ করিয়াছিল?

সতীশ সেই অজ্ঞাত কুলশীলা তরুণীর বিরহ ব্যথা নিজের মর্ম্মের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া উতলা হইয়া উঠিল। তার মনে হইতে লাগিল—আজ যেন সারা বিশ্ব, বিরহীর বেশে দুই হাত প্রসারিত করিয়া ডাকিতেছে—ওগো, এসো, এসো, ফিরে এসো, আমার চির বাঞ্ছিত, চির ঈপ্সিত ধন, আমার তাপিতচিত্তে ফিরে এস, আমার

তৃষিত হৃদয়ে ফিরে এস, আমার ভুজবন্ধনে, আলিঙ্গন পাশে ফিরে এস।

কতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া সতীশ বলিল, "হীরালাল-বাবু, আমায় একটা ভিক্ষা দিতে হবে।"

হীরালাল তাহার উপরওয়ালার মুখে এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

সতীশ কহিল, 'এই চিঠিখানা আমায় ভিক্ষা দিতে হবে। সার্চ্চলিষ্টে তুমি এর উল্লেখ কর্ত্তে পারবে না।"

হীরালালের মনে মুহূর্ত্তের জন্য একটু ঈর্ষ্যার উদয় হইল। সে ভাবিল সতীশ বুঝি এই সূত্রটুকু ধরিয়া এই পলায়িত দলের অনুসন্ধান করিয়া সমস্তটুকু বাহাদুরী একাই লইতে চায়।

সে অপ্রসন্নমুখে কহিল "আচ্ছা।"

সতীশ হীরালালের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিল, তুমি আর কিছু ভেবো না, হীরালালবাবু। আমি আজকের দিনে এই হতভাগিনী নারীর সর্ব্বনাশ করতে পারব না।"

বলিয়া পকেট হইতে ম্যাচ বাহির করিয়া চিঠিখানায় আগুন ধরাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে চিঠিখানা ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

সতীশ ছাইগুলি গুঁড়া করিয়া জানালা দিয়া বাহিরে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

শুধু এই দুইটী প্রাণী ব্যতীত এই সংসারে আর কেহই জানিল না যে প্রেম কেমন করিয়া রক্ষাকবচের মত এই দম্পতিকে কি এক ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা করিল।

ব্যথিতের ঠাঁই।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ

মানবেরে যবে করিল সৃষ্টি দয়াময় ভগবান্,
স্বর্গ উজাড়ি একে একে তারে করিতে লাগিল দান—
ঋদ্ধি, শক্তি, কান্তি, বুদ্ধি, কাম্য বিভবচয় ;
অকাতরে সব বিতরিয়া প্রভু সহসা থমকি রয়।
দেখিলেন চাহি দেব-সম্পদ্ হ'ল নিঃশেষ প্রায়,
শান্তি শুধুই রয়েছে অদেয় ;—থাকুক এ অমরায়।
পুণ্যলোকের দুর্লভ সুধা মানবে করিলে দান,
আমারে ভুলিয়া দানেরই কেবল করিবেক সম্মান।

দহন-জ্বালায় দহিয়া দহিয়া ক্লান্ত হইবে যবে,
কে তারে শীতল পরশ বুলায়ে বেদনা হরিয়া লবে ?
দুর্দ্দিনে যবে চারিদিক্ রবে নিবিড় অন্ধকার,
দুষ্কর হবে জীবন-যাত্রা, কে হবে সহায় তার ?
আমি হব তার বন্ধু তখন—দাঁড়াইব পাশে এসে,
নন্দন-ফুলরথে নিয়ে যাব মৃত্যুবিহীন দেশে।
সঞ্চারি চিতে শান্তির রস লুণ্ঠিব ব্যথাভার,
জনক-জননী দুই হয়ে আমি রক্ষিব অনিবার।

ম্যালেরিয়া নিবারণ

প্রতি বৎসর বাংলা দেশে ১২ লক্ষ লোকের ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হয়। নিবারণের উপায় কি? প্রথমত দেখিতে হইবে যাহাদের মৃত্যু হয় তাহাদের মধ্যে ধনী কত, আর দরিদ্র কত। আমরা ত শুনিয়াছি নিয়মিতরূপে ঔষধ সেবন করিলে প্রায় সমস্ত ম্যালেরিয়ার রোগীই ভাল হয়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ম্যালেরিয়ায় যাহাদের মৃত্যু হয় তাহাদের অনেকেরই ঔষধ কিনিবার ক্ষমতা নাই নচেৎ কে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে চায়? দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইলে, মৃত্যুর হাত হইতে অসহায় দরিদ্র দেশবাসীকে বাঁচাইতে হইলে দুইটি প্রশ্নের মীমাংসা দরকার। এই যে প্রতিবৎসর ১২ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয় এটা হ্রাস করা আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য, না অনিশ্চিত ভাবে মশককুল ধ্বংস করিয়া ম্যালেরিয়া দূর হয় কি না তার পরীক্ষা করা উচিত? পরীক্ষার ফল ভাল হইতেও পারে আবার নাও হইতে পারে, কারণ অনেক জায়গায় দেখা যায় মশকের প্রকোপ যখন অধিক ছিল তখন ম্যালেরিয়া ছিল না কিন্তু এখন মশক অপেক্ষাকৃত কম আছে অথচ ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এদেশের অধিকাংশ লোক এত গরীব যে তাহাদের ঔষধ কিনিয়া খাইবার ক্ষমতা নাই, কাজেই ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক তাহাদের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয়। ম্যালেরিয়া নিবারণার্থ কো-অপারেটিভ সোসাইটী গঠন করা আধুনিক স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তাদের কাহারও কাহারও মস্তকে বিশেষ ভাবে ঢুকিয়াছে। তাঁহারা নিজেদের মত বজায় রাখিবার জন্য হৃদয়হীন ভাবে অগ্রসর হইতেছেন। পরিণামে সমস্ত বাংলা দেশে এই নীতি অবলম্বনে কাজ করা সম্ভব হইবে কি না তাঁহারাও বোধ হয় তাহা জানেন না অথবা অক্ষম দরিদ্র লোকগুলি মরিয়া গেলে যদি দেশ হইতে তাদের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া দূর হয় এই আশায় বুক বাঁধিয়া আছেন। কো-অপারেটিভ সোসাইটীর নিয়ম—যাহারা নিয়মিতরূপে চাঁদা দিবে তাহারা কুইনাইন পাইবে এবং সকলপ্রকার সহানুভূতিও পাইবে। মধ্যবিত্ত লোক ছাড়া নিয়মিতরূপে চাঁদা দেওয়া সকলের সম্ভব নহে, এই মধ্যবিত্ত লোকদের সাহায্য করিতে পারিলে, ইহারা ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবে আর যাহারা একান্ত গরীব, যাহারা ঔষধ কিনিয়া খাইতে পারে না তাহাদিগকে যদি কোনও রকম সাহায্য করা না যায়—তাহা হইলে তাহারা ত মরিবেই—সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়াকেও দেশ হইতে লইয়া যাইবে। এই উপায় অবলম্বনে দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করা মন্দ নহে তবে দোষের মধ্যে আদম স্নুমারীর রিপোর্টে লোক সংখ্যা কমিয়া যাইবে। তাতেই বা ক্ষতি কি জগতশুদ্ধ লোক দেখিবে বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ায় মরিবার আর লোক নাই—ভুল হইল বাংলা দেশে আর ম্যালেরিয়া নাই।

প্রেম।

(অথ তৃতীয় পক্ষ)

শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়

প্রিয়ে আমার প্রাণের চেয়ে
তোমায় ভালবাসি'
সময় পেলে, তাইত ছুটে,
তোমার কাছে আসি।
ভরসা আছে তোমার দ্বারে
শরণ নিলে, কাড়তে নারে
যম কারে ও প্রমাণ আছে
শাস্ত্র মাঝে শত—
মরণ পাছে আসে তেড়ে,
তাইত পাকা দাড়ি নেড়ে
তোমার পাশে বসতে চাহি—
ঘেঁসে ঘেঁসেই অত!
চক্ষে লাগে বড়ই ভাল,
তোমার ও রূপ রাশি,
পাগল হয়ে যাই আমি যে,
তোমার হেরি হাসি।
আঁধার ঘরে আলো আমার,
তুমি যে মোর প্রিয়ে,
চিত্ত চকোর বাঁচে মম,
ও রূপ তব পিয়ে।
অদেয় মোর কি আছে আর,
তুমিই মম সাধনা সার,
রাজীব তব চরণ মূলে
তাইত বিকাই দেহ;—

কণ্ঠে তব ঝরছে সুধা
নিবারি মোর সকল ক্ষুধা,—
তরুণ চোখে দৃষ্টি মধুর
ধন্য করে গেহ।
তোমার শুধু আয়ত জোরে,
আজও আছি জীয়ে,—
মরুর মাঝে বহাও নদী
প্রেমের ধারা দিয়ে।
আমার প্রিয়ে, শুষ্ক বুকে
জাগাও তুমি গান
হর্ষ অতুল, কর তুমি
আমার প্রাণে দান।
যৌবনেতে সব তেয়াগী
প্রিয়ে তুমি আমার লাগি'—
কেমন করে শুধবো বল
তোমার আমি ঋণ;
সত্যি ভালো বাসি তোমায়,
তাইত হিয়া ভরে ব্যথায়,—
তোমাব কাছে করুণা তাই
চাইছি আমি দীন!
প্রিয়ে আমার শুষ্ক বুকে
বহাও তুমি বাণ—
তুমিই মম পরম গতি—
তুমিই মম প্রাণ!

———

নাট্যশালা

(১)

জনরব আর্ট থিয়েটারের নাট্যরথীবৃন্দের মধ্যে শীঘ্রই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিবে। গৈরিশ যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা দানীবাবু শীঘ্রই আর্ট থিয়েটারে চাণক্যের ভূমিকায় প্রথম দর্শন দিবেন। শুনিতেছি আর্টের শীর্ষস্থানীয় জনৈক অভিনেতা নাকি দুর্ব্বহ অভিনয় ভার নিয়মিত বহনে অসমর্থ হইয়া অবসর গ্রহণ করিতেছেন। এ জনরব অমূলক হউক ইহাই আমাদের কামনা। কারণ আধুনিক চালচলনে গঠিত এই সম্প্রদায় কলা-কৌশলে যৎপরোনাস্তি কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহারা অভগ্ন অক্ষত থাকিয়া দিন দিন নাট্যকলার উন্নতি বিধানে সক্ষম হইলে বাঙ্গলার নাম নাট্যশালার ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

(২)

বর্ত্তমান যুগের ভাবব্যঞ্জক অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয় আলফ্রেড ত্যাগ করিয়া তাঁহার নবাধিকৃত মনমোহন রঙ্গমঞ্চে সীতা অভিনয়ের বিপুল আয়োজন করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সকল উদ্যম সার্থক করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বাঙ্গলার একদল লব্ধপ্রতিষ্ঠ তরুণ সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী—তবে শুনিলাম এ 'সীতা' দ্বিজেন্দ্রলালের সে 'সীতা' নহে যাহার অভিনয়ে ভাদুড়ী মহাশয় বিগত কলিকাতা একজিবিশনে অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আর্ট থিয়েটার তাঁহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়াতেই তাঁহাকে অগত্যা নূতন 'সীতা' সৃজন করিয়া লইতে হইয়াছে তবে আমাদের ভরসা আছে যে তাঁহার চেষ্টায় ফল খারাপ হইবে না এবং অপাত্রে তিনি শ্রম, সময় ও অর্থের অপব্যয় করিবেন না—নূতন সীতা পুরাতনের মত সাধারণের মনোজ্ঞ হউক তাঁহার শ্রম সার্থক হউক বাঙ্গলার দর্শক-বৃন্দ উপযুক্ত কলাবিদের কৃতিত্বের মধুর রস পানে বিভোর হউন ইহাই বাঞ্ছনীয়।

(৩)

স্বনামধন্য অভিনেতা শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মনমোহন, মিনার্ভার পুরাতন অভিনেতা অভিনেতৃ-বর্গের সহযোগে নাকি একটি নূতন নাট্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে অভিনয় আরম্ভ করিবেন। কলিকাতার জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ধনী তাঁহার পৃষ্ঠপোষকরূপে দণ্ডায়মান হইতেছেন—তাঁহার উদ্যম সার্থক হউক জয়যুক্ত হউক। রাধিকা বাবু নিজে একজন নবযুগের প্রসিদ্ধ অভিনেতা, এবং তাঁহার অভিনয়ে এমন একটা নৈপুণ্য আছে যাহা তাঁহাপেক্ষা নামজাদা অভিনেতাদেরও নাই। তবে সম্প্রদায় গঠন ও পরিচালন সম্বন্ধে তাঁহার কৃতীত্বের কোন পরিচয় এ যাবৎ দর্শকবৃন্দ পান নাই এইবার তাঁহার কঠিন পরীক্ষা; পরীক্ষায় তিনি জয়যুক্ত হইয়া বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া সার্থক হউন ইহাই প্রার্থনা। আরও একটা সুখের বিষয় যে তাঁহার সঙ্গে বাঙলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও তদীয় বন্ধু ও প্রসিদ্ধ চিত্রকলাবিৎ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় মহাশয় যোগ দিতেছেন সুতরাং আশা করা যায় যে এই সম্প্রদায়ের দৃশ্যপটাদির বিশেষ বৈচিত্র্য ও দেশকাল পাত্রোপযোগী হইবে।

(৪)

উচ্চশ্রেণীর নাটক গীতি নাট্য ও প্রহসনাদির অভাবই গত ১৪।১৫ বৎসর বাঙলার নাট্যশালাকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর খাসদখল অভিনয়ের পর উচ্চশ্রেণীর কোন নাটকাদির অভিনয় দেখা যায় নাই। কর্ণার্জ্জুন 'চমকপ্রদ' নাটক হিসাবে পৌরাণিক বলিয়া এবং অভিনয় কৌশলে দীর্ঘকাল অভিনীত হইবার গৌরব লাভ করিলেও নাটক হিসাবে তাহাকে পাণ্ডব গৌরব, জনা, বিল্বমঙ্গল কি পূর্ণচন্দ্রের মত উচ্চ শ্রেণীর বলা যায় না। ক্ষীরোদ বাবুর আলমগীর, তাঁহার প্রতাপাদিত্য, নন্দকুমার, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত,

প্রবৃত্তির সহিত তুলনীয় নহে। ফল কথা, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের একান্তই অভাব পড়িয়া গিয়াছে—ক্ষীরোদ বাবুর শ্রান্ত লেখনী আর নূতন প্রাণময় নাটক প্রসবে অসমর্থ। এখন নাট্যশালাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য হয় পুরাতন প্রতিষ্ঠ নাটকের পুনরাভিনয় করা নয় উৎকৃষ্ট উপন্যাসকে নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় করা। এবিষয়ে সকলকে মনোযোগী হইতে দেখিলে আমরা পরম আহ্লাদিত হইব। রাম শ্যামের যা' তা' নাটক অভিনয় করিয়া পরিশ্রম ও অর্থ নষ্ট করাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটকের পুনরাভিনয় সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। ইহাতে নাট্যশালার মান লাঘব হয় যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা ভ্রান্ত—উৎকৃষ্ট নাটকের পুনরাভিনয়ে নবীন নাট্যশিল্পীর শক্তি পরীক্ষা হয় ও উত্তম অভিনয়ে সক্ষম হইলে সেই সম্প্রদায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়।

(৫)

আশাকরা যায় আগামী ৺শারদীয়া পূজার সময় মিনার্ভা থিয়েটার সম্প্রদায় তাঁহাদেব জন্য নব নির্ম্মিত সুদৃশ্য হর্ম্মে নব উদ্যমে অভিনয় আরম্ভ করিবেন—পুরাতন যুগের নাট্যশালার মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট এই নাট্য সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক নতুবা পুরাতন যুগের নাম অকস্মাৎ লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। এককালে এই মিনার্ভায় গিরিশবাবুর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ নাটকাবলী অভিনীত হইয়া লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে অপূর্ব্ব আনন্দ দান করিয়াছিল—জানি সে যুগ চলিয়া যাইতেছে কিন্তু তবুও বলিতে হয় তোমাদের আধুনিক যুগে কি বলিদান, শঙ্করাচার্য্য, সিরাজদ্দৌলা, দুর্গাদাস, মেবারপতন, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্তের মতন নাটক জন্মাইতেছে না সেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় হইতেছে? একখানা নাটকে ২।১টী অভিনেতা উৎকৃষ্ট অভিনয় করিলে তাহাতে সম্প্রদায়ের কৃতীত্ব প্রকাশ পায় না কিন্তু পুরাতন যুগের মত নাট্য শিক্ষক যে এ যুগে এখনও জন্মায় নাই তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এ যুগের অভিনেতারা স্ব স্ব প্রধান সকলেই অথরিটী—কিছু বলিলেই বিলাতী নাট্য শাস্ত্রের ২।৪ ছত্র ইংরাজী আওড়াইয়া প্রশ্নকারীকে 'থ' মারিয়া দেন—কেহ শিখিতে চাহেন না—সকলেই মাষ্টারী করিতে চান। ইহাতেই শঙ্কা হয় যে হয়ত শীঘ্রই এই কারণেই নবীন নাট্যরথীগণ ততদূর সফল হইতে পারিতেছেন না। আমরা বলি এখনও নটগুরু অমৃতলাল আছেন তাহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া লওয়া দরকার।

সিনেমা বা চলচ্চিত্র প্রদর্শন।

ক্রাউন থিয়েটার—বাঙালীর একমাত্র প্রতিষ্ঠান আজিও কোনমতে যে অস্তিত্ব রাখিতে সক্ষম হইয়াছে ইহা কেবল মাত্র আনন্দ সংবাদ নহে বাঙ্গলায় ও বাঙ্গালীর গৌরবের কথা। ম্যাডানের মত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে এতকাল দাঁড়াইয়া থাকা যে কি কঠিন শক্তির পরিচায়ক তাহা বুঝান বড় কঠিন। এটা কেবল কলিকাতার দক্ষিণাংশের বাঙ্গালীগণের স্বজাতি প্রীতি ও প্রগাঢ় সৌহৃদ্যের পরিচয়—এই প্রীতিতে বঙ্গদেশ প্রণোদিত হউক—জাতি উদ্বুদ্ধ হউক। সে দিন ইহাঁদের Robinson Cruso নামক ঘটনাবহুল সুন্দর চিত্রের প্রদর্শন ও তৎসহ বেবী পেগীর একখানি হাস্যরস প্রধান চিত্র দেখিয়া আমরা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীবৃন্দও অতীব ভদ্র ও শান্ত ব্যবহারে দর্শকগণকে আপ্যায়ন করেন দেখিয়া বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি। যদিও ইহাঁরা ম্যাডান কোম্পানীর মত প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া ঢাক পিটাইতে পারেন না তথাপি ইহাঁদের চিত্র নির্ব্বাচন বেশ সুরুচি সঙ্গত ও মনোরম এবং প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রাবলীর মধ্যে হীন নহে। তবে বিশ্রাম সময়ে ইহাঁরা যে চিত্র বিজ্ঞাপন দেখান তাহার প্রদর্শন [illegible] Condenser নামক কাঁচ ফাটিয়া সমস্ত বিজ্ঞাপনগুলিকেই বিকৃত করিয়া দিয়াছে দেখিলাম। বিজ্ঞাপন কোম্পানীর একটী আয়ের পন্থা এবং সর্ব্বাংশেই লজ্জাজনক সুতরাং আশাকরি উক্ত সম্প্রদায় বিজ্ঞাপন দাতাগণের হিতার্থে ঐ Condenser বদল করিয়া বিজ্ঞাপনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি

করিবেন। বিজ্ঞাপন উপেক্ষণীয় নহে আধুনিক বাণিজ্য জগতে বিজ্ঞাপন অতি উচ্চদরের বিজ্ঞান বলিয়া গণিত হইতেছে।

"Wages of Sin" বা পাপের মূল্য—নামক সু-বিজ্ঞাপিত চলচ্চিত্রখানি আমরা Elphinstone Picture Palaceএ দেখিয়া আসিয়াছি। এই পুস্তকখানির জন্য ম্যাডান কোম্পানী অনেক অর্থব্যয় করিয়াছেন—কিন্তু দুঃখের বিষয় বেশীর ভাগ দর্শকই ইহা দর্শনে প্রীতি লাভ করিতে পারেন নাই। অসম্বদ্ধতাই ইহার মূল কারণ তদ্ভিন্ন title (চিত্র পাঠ) লেখার দোষেও অধিকাংশ দর্শকই ঘটনাবলী বুঝিতে পারেন নাই। তবে চিত্রের সৌন্দর্য্য বা প্রদর্শন উভয়ই অত্যুৎকৃষ্ট। এই স্থলে ম্যাডান কোম্পানীর বন্দোবস্তের একটী বিশেষ ত্রুটী লক্ষ্য করিলাম, ।০ চারি আনা ও ॥০ আট আনা আসনের টিকেট্ নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্ব্বে তাঁহারা স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে বিক্রয় করিয়া রাখেন—ঐ সকল লোক ঐ সমস্ত টিকিট ।০ স্থলে ।৵০ ও ॥০ স্থলে ৸০ আনায় প্রদর্শন সময়ে বিক্রয় করে। ম্যাডান কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকগণের শত করা ৯০ জন বাঙ্গালী তন্মধ্যে শতকরা ৭৫ জনই অফিস ফেরৎ কেরাণী সুতরাং তাঁহারা ন্যায্য মূল্যে টিকিট কিনিবার জন্য চাকুরী বাকুরী ছাড়িয়া বেলা ৩টার সময় গিয়া ম্যাডান কোম্পানীর দুয়ারে ধরণা দিতে পারেন না। সম্ভবতঃ টিকিট বিক্রয়কারিগণের সহিত ঐ নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের একটা ভিতর ভিতর বন্দোবস্ত আছে নতুবা পাঁচটা বাজিবা মাত্র ।০ আনা ও ॥০ আনার টিকিট সমস্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে এই মর্ম্মে নোটীশ টাঙ্গাইয়া তাঁহারা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকেন কেন? ইহার প্রতিবিধান তাঁহাদের করা আবশ্যক যদি তাঁহারা ইহা না করেন তবে বাঙলার ও বাঙালীর মর্য্যাদা রক্ষার্থ প্রত্যেক বাঙালীর উচিত কোম্পানীর অফিসে টিকিট না পাইলে বাড়ী ফিরিয়া আসা এবং কোন কারণেই বাহিরের লোকের নিকট বেশী মূল্যে টিকিট ক্রয় না করা—একদিন মাত্র যদি ঐ সকল নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা টিকিট বিক্রয় করিতে না পারে তাহা হইলেই তাহাদের চৈতন্য হইবে। একদিন বায়স্কোপ না দেখিলে যদি গৃহে গিয়া অন্ন পরিপাকে বাধা হয় তবে সে সকল লোকের মনুষ্য হিসাবে মূল্য অতি অল্প এবং তাঁহারা বাঙলা ও বাঙালীর কলঙ্ক বই আর কিছু নহেন।

আশাকরি ম্যাডান কোম্পানীর সুদক্ষ ম্যানেজার মিঃ রুস্তমজী এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন—কারণ এখন বাঙলা নিদ্রিত নয় বাঙালী মৃত নয় এখন একটা বিরাট সংঘবদ্ধ আত্মজ্ঞান সম্পন্ন জাতি বাঙলায় মাথা তুলিতেছে—এখন কোনরূপ কুব্যবহার উপেক্ষিত হইবে না।

বিখ্যাত অভিনেত্রী

বিলেতী অভিনেত্রীদের মধ্যে কে আজকাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ইহা জানিবার জন্য লণ্ডনের 'বাইষ্টাণ্ডার' পুরস্কার ঘোষণা করেন। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রায় দু'লক্ষ নর নারী অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জ্ঞাপন করেন। পর্য্যায়ক্রমে দশজন অভিনেত্রী ভোট গণনায় প্রথম হইতে দশম স্থান অধিকার করিয়াছেন। নিম্নে ইহাঁদের নাম দেওয়া হইল—১, কুমারী গ্লাডিস্ কুপার, ২, কুমারী ফে কম্‌টন, ৩, কুমারী জোসী কলিন্স, ৪, কুমারী মেরী লোর, ৫, কুমারী আইরিণ ভ্যানব্রো, ৬, কুমারী সিবিল থরণ্ডাইক, ৭, কুমারী ফিলিস ডেয়ার, ৮, কুমারী পেগি ও নেল, ৯, কুমারী ফিলিস নেলসন টেরী, ১০, কুমারী ফিলিস মন্‌ক্‌ম্যান। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের মধ্যে মাত্র হাজার ভোটের পার্থক্য আছে। ইহা হইতেই বোঝা যায় ইহারা কত জনপ্রিয়। এই দু'লক্ষ ভোটারের মধ্যে একজনও কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে ইহাদের এমন ভাবে সাজাইয়া ভোট দেন নাই। ভোট গণনার সময় ইহারা এই স্থান পাইয়াছেন। ইহারা সকলেই বিখ্যাত অভিনেত্রী—দেশ বিদেশে ইহাঁদের অভিনয় কৃতিত্ব সুপরিজ্ঞাত।

কাজের কথা

নবযুগের আবির্ভাবের একটা কৈফিয়ৎ আবশ্যক, কারণ বাংলায় আজ সংবাদ পত্রের অভাবতো নাইই—বরং পত্র আবশ্যকের অতিরিক্ত আছে। তবে সুলভে সুন্দর সচিত্র কাগজ এখনও বাহির হয় নাই, হইবার দিনও বোধহয় আসে নাই—কারণ এসকল ক্ষতিজনক উদ্যম শীঘ্রই বিনষ্ট হয়, জানিনা আমাদের অকাল বোধন সার্থক হইবে কিনা—কর্ত্তা শ্রীভগবান—আর আমাদের বাংলার ভাই বোনেরা।

গালাগালি ছাড়া কাগজ বিকায় না—একথাটা একজন সুদীর্ঘ অভিজ্ঞ সংবাদপত্রের সম্পাদকের কথা—কিন্তু ভদ্র ভাবে সমালোচনা বা ব্যঙ্গ কৌতুক করিয়া কাগজ চলিবার সময় আসিয়াছে কিনা—সেটা বাজাইয়া দেখাও আবশ্যক—নবযুগের আবির্ভাবের এও একটা হেতু। যদি কখন আমরা উদ্দেশ্য পথ হইতে স্খলিত হই আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগীবা ও পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের সাবধান করিয়া দিবেন ইহাই প্রার্থনা।

আধুনিক সংবাদপত্রের অধিকাংশ এক একটী দল বিশেষের মতামত ব্যক্ত করিবার মুখপত্র মাত্র। আমরা একটু স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবার ভরসা করি। বাংলার গণদেবতা আজি জাগিতেছেন, সারা বাংলার নিস্পিষ্ট নিস্পন্দ বিশাল জনসঙ্ঘ ধীরে ধীরে তন্দ্রালস নেত্র উন্মীলিত করিয়া বিরাট্‌ ব্রহ্মাণ্ডের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে আর ভাবিতেছে,—কত নিম্নে তাঁহারা পড়িয়া আছে—কি অধঃপতন তাঁহাদের হইয়াছে—তাঁহাদের মনের কথা বলিবার জন্য নবযুগের আবির্ভাব।

বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময় একটা পরিবর্ত্তিত যুগ আসিয়াছিল তখন একবার ক্ষণিকের জন্য চাহিয়া এই বিশাল জাতি আবার কাহার মৃদু করস্পর্শে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—সে প্রতীচ্যের সম্মোহন হস্ত। আবার ঘুম ভাঙিল—জালিয়ানওয়ালাবাগের অগ্নিসদৃশ জলন্ত দৃশ্যে রক্তবর্ণের চিত্র সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, আবার জনসঙ্ঘ চঞ্চল হইল চৌরীচৌরার কাণ্ডে—বরদোলির সিদ্ধান্তে চাঞ্চল্য দূর হইল অহিফেন সেবীর মত জাতির শরীরে একটা বেশ ঝিমঝিমি ভাব দেখা দিল—তারপর বাংলার রাজনৈতিকদলে দুইভাগে বিভক্ত হইলেন আর ঈর্ষ্যা দ্বেষ পরশ্রী কাতরতা আসিয়া আত্মকলহ সূচিত করিল, এর পরিণাম কি হইবে—স্বয়ং মহাত্মা গান্ধিই যখন এই যুধ্যমানদলের মধ্যে শান্তি আনিতে পারেন নাই—তখন পরিণামের কথা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে—মন একটা ক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদে ভরিয়া যায় আর ভাবি আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি।

দেশের কাজে কোন দলেরই মন নাই—সংগঠন কার্য্যের কথা বক্তৃতায় ও খবরের কাগজে মুদ্রিত ভাবে দেখা যায়—উভয় দলই চান প্রতিষ্ঠা—সম্মান সম্পদ! সম্মানের এত মোহ যে লোকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও সম্মানের মোহ ভুলিতে পারে না—বোধহয় ঐ প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করা রক্ত মাংসের শরীরে সম্ভব নয়।

দলপতিরা স্বার্থপর সুকৌশলী তোষামোদপটু গ্রহ-উপগ্রহে পরিবৃত থাকিয়া তাহাদের চাটুবাক্য শুনেন আর মনে মনে ভাবেন আমার দল যাহা করিতেছে তাহাই কাজ আর ওরা—ছ্যাঃ! খালি নিন্দা কর্ত্তে জানে। দেশের পক্ষে ফল উভয় পক্ষ হইতেই সমান ভয়াবহ হইতেছে। বাংলায় জল বায়ুর একটী দোষ আছে এখানে সবাই কর্ত্তা হতে চায় কেউ মানতে চায় না।

নবযুগের বাণী এখনো ধ্বনিত হইবার সময় হয় নাই—দূরে কাল সাগরের তীর হইতে তাহার মৃদু মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি শুনা যাইতেছে মাত্র—সে বাণী ভাষায় ব্যক্ত করার শক্তি আমাদের নেই—তবে কালচক্রের যেরূপ দ্রুত ঘূর্ণন আরম্ভ হইতেছে, অচিরে ঐ বাণী ভারতে বিঘোষিত

হইবে—সেইদিন স্বরাজ্যের স্নিগ্ধ আকাশতলে নবযুগ তাহার বাণী ধ্বনিত করিবে—মায়ের দুয়ারে মঙ্গল শঙ্খ বাজিবে—আনন্দের ধূপধুনায় ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সুরভিত করিবে—মৃত নির্জ্জীব ক্ষুণ্ণ ভারত-বাসীর রক্তহীন শুষ্ক পাণ্ডুর আস্য হাস্যে উদ্ভাসিত হইবে। ধরায় শান্তি আসিবে—শাসক ও শাসিত হৃদয় বিনিময় করিবে—আবার উভয়ের মধ্য প্রীতির আদান প্রদান হইবে এখনকার দাসত্ব ঘুচিয়া বন্ধুত্বে পরিণত হইবে। সেইদিনের প্রতীক্ষায় সারা ভারত উৎকণ্ঠিত। এস! দিন—সুদিন এসো—সত্বর এসো—স্বাগতম্।

নিষ্করুণ নিষ্পীড়ন—বিলাসলালসা ও ভোগ-বিলাসে হিন্দুর তীর্থস্থান আজ মগ্ন—সেই কলুষসাগর হইতে অন্যতম তীর্থ ৺তারকেশ্বর ধামকে উদ্ধার করিবার জন্য দেশবাসীর আগ্রহ জন্মিয়াছে—কিন্তু যে ব্রাহ্মণ নৈবেদ্যের সন্দেশের মত নিশিদিন হিন্দুসমাজের চূড়ায় আরোহণ করিয়া থাকিতে অভিলাষী, কৈ তাঁহারা অগ্রণী হইতেছেন কি? কেন ব্রাহ্মণ তুমি কি চাও দেবতার মাহাত্ম্য অর্থের ওজনে বিক্রয় হউক—কেন ব্রাহ্মণ তুমি কি চাও তোমার দেশবাসিনী জননী স্বরূপিনী রমণীগণকে একটা বিদেশী ধর্ম্মধ্বজীর বিলাস অনলে আহুতি দেওয়া হোক্—তোমার গৃহে কি জননী ভগিনী কন্যা নাই—তাঁহাদের কি সম্মান দিতে চাও না? তবে আজ নীরব কেন ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ বলিয়া আমরা কাহাদের ডাকিতেছি ভারতে ব্রাহ্মণ কি আছে! ব্রাহ্মণের দেহাবরণে আবৃত রহিয়াছে মৃত গলিত শবরাশি—কৈ সে ত্যাগী-ব্রাহ্মণ যিনি পরহিতার্থে অস্থি দান করিয়া বজ্র নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণের পুরুষত্বহীনতা দেখিয়া সেই জ্বলন্ত বজ্র আজ তাহাদের শিরে পড়িয়া তাহাদের দম্ভ—ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছে।

কায়স্থ—তোমরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দাওনা, অনেকে উপবীত ধারণ কর, কিন্তু ধর্ম্মে আস্থা কৈ—ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তোমরাও জাগিতে অক্ষম তবে বৃথা চিনির বলদের মত সুতার বোঝা বহিয়া কি করিয়া মনকে বুঝাইবে যে তোমরা যজ্ঞসূত্র ধারণের অধিকারী! এ যে বিরাট আত্ম প্রবঞ্চনা।

আর কাহাকে ডাকিব—কাহাকে অনুরোধ করিব

"কাদের উচ্চে ডাকিতেছি আমি
শশ্মান হয়েছে এ ভারত ভূমি

কবির বাণী অতীতেও সত্য ভবিষ্যতেও দেখিতেছি তাই। নিজেদের যদি একাগ্রতা না থাকে, চেষ্টা না থাকে বিদেশী গভর্ণমেন্ট তোমাদের ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন—এ দুরাশা। ও তোমরা কারা গো?—উচ্চ শিক্ষিত বাবুরা না—তোমরা কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব পছন্দ কর না—বেশত শক্তি থাকেতো দলবদ্ধ হইয়া আত্মদান কর—তাতো পারিবে না—তোমরা নিজেরাও খাইবে না—পরকেও খাইতে দিবে না—এমনি স্বদেশ ভক্ত তোমরা!

একজন বহুদর্শী বাঙ্গালী সম্পাদক তারকেশ্বর সম্পত্তির রিসিভার রাখাই ভাল মনে করেন—অবশ্য হিন্দুধর্ম্মের ব্যাপারে যিনি হিন্দু নহেন তাঁহার দৃঢ় মতামত প্রকাশ শোভন নয়।

"ও দুই-ই এক"
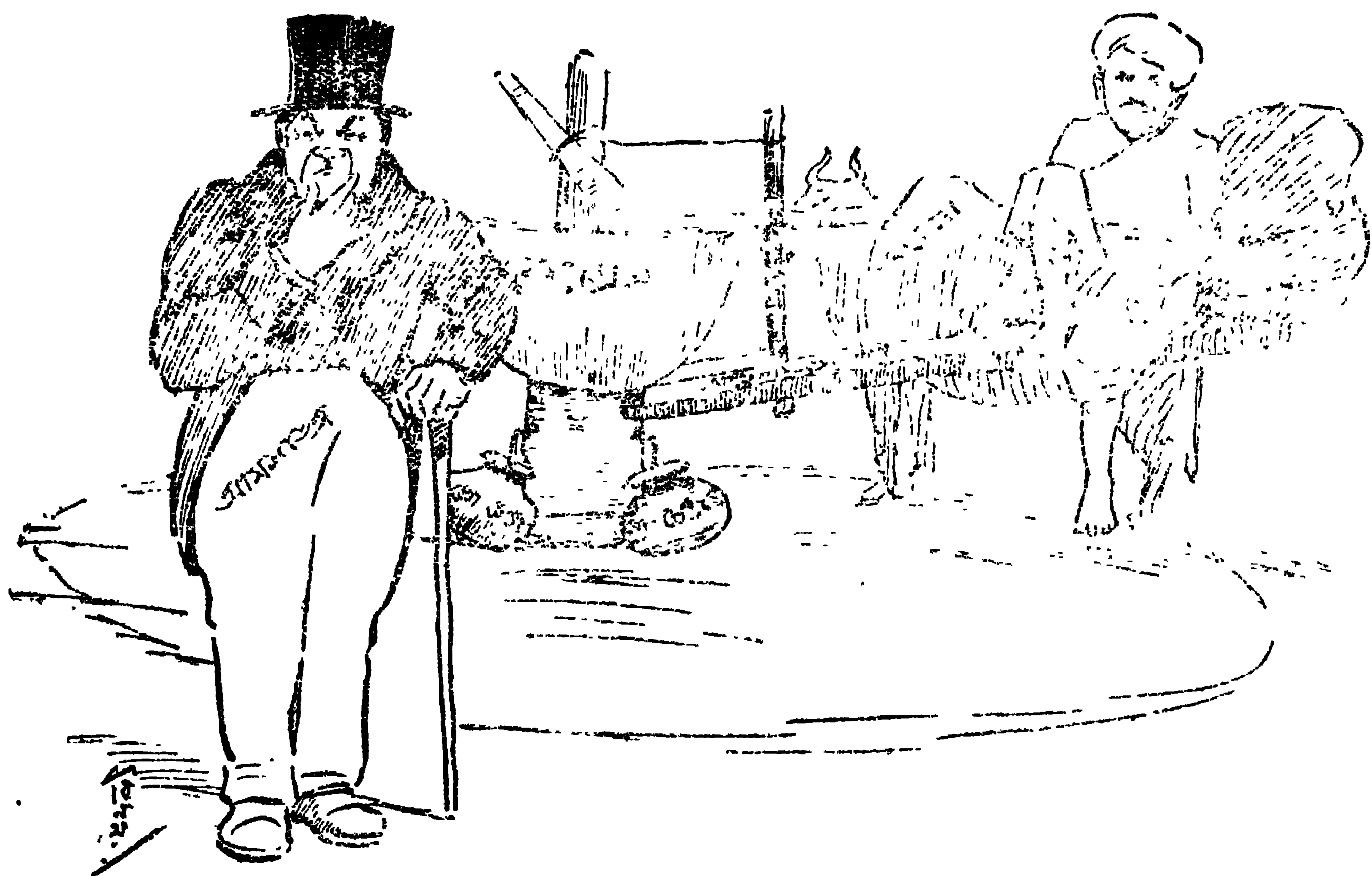
আমলাতন্ত্র—ভাবলাম দুটো ভাঁড়ে দু'রকম ঝাঁজ হবে
কিন্তু তফাৎ ঐ ভাঁড়ে—ফলে ও দুই-ই এক।
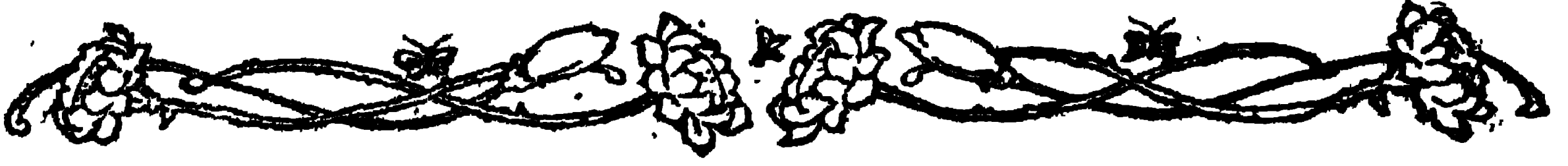
নগণ্যের নিবেদন

সম্পাদক মহাশয়—

আমার ন্যায় অজ্ঞ, অধম নগণ্যকে আপনাদের নবজাত পত্রিকাতে যে লিখিতে সুযোগ দিয়াছেন সেইজন্য বঙ্গদেশের অগণনীয় নগণ্যদের পক্ষ হইতে আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। চির প্রচলিত প্রথা অনুসারে আপনি যে গণ্য মান্য ধন্যদের ভক্ত ও সভাসদপূর্ণ বৈঠকখানায় দুছত্র লেখার জন্য উমেদারের ন্যায় দিন দিন যাতায়াত না করিয়া মাদৃশ নগণ্যকে দুই চারিটা অপ্রিয় স্পষ্ট কথা বলিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ হইলেও আপনার ব্যবসায় বুদ্ধি ও সাংসারিক অভিজ্ঞতার প্রশংসা করিতে পারিলাম না। কারণ সত্য কথাটা কেবল তাহাদেরই কাছে আদৃত হয় যাহারা মিথ্যার অত্যাচারে জর্জ্জরিত, যাহাদের মুখ চাহিবার কেহ নাই, যাহাদের নাম লইয়া তাহাদেরই মত নগণ্যেরা চাতুর্য্যবলে গণ্যমান্যের দলে মিশিয়া নিজেদের নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা ও দেশ হিতৈষীতার আদর হইল না বলিয়া আক্ষেপ করে।

পাশ্চাত্য জগতে সমাজ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক দলের নাম—আছে (Haves) অর্থাৎ পৃথিবীর যাহা কিছু লোভনীয়, উপভোগ্য সবই তাহাদের আয়ত্তাধীন; আর একদলের নাম নাই (Havenot's) অর্থাৎ যাহারা পূর্ব্বোক্তদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিন্তু কোন অধিকার বা দাবী বলিয়া যাহাদের কিছুই নাই। "আছে"র দলই প্রভু; "নেই"এর দল আজ্ঞাবহ মাত্র। "আছের" দল যুদ্ধ বাধাইবেন; "নেই"এর দল দলে দলে কামানের খাদ্য হইয়া চরিতার্থ হইবেন। "আছে"র দল মুষ্টিমেয়; "নেই"এর দল অসংখ্য। "নেই"এর দলের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িলেই "আছে"র দলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। শান্তি ও শৃঙ্খলার নাকি আর অস্তিত্ব থাকে না, তখন নাকি বিরাট বিপ্লব হয়, তাহাতে নাকি "নেই"এর দলেরই দোষ বেশী। সুতরাং জনকয়েক "নেই"এর দ্বারা বিরাট নেইএর দলকে "স্তব্ধ" রাখা "আছে"র দলের বুদ্ধির পরিচয়। "কণ্টকে নৈব কণ্টকং" চাণক্যের এই রাজনীতি পাশ্চাত্য জগতেও সুপ্রচলিত।

তুমি একজন ভক্ত। তুমি তীর্থস্থানে তোমার দেবতার নিকট পূজা দিতে আসিয়াছ; কিন্তু তুমিও তোমার দেবতার মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে দেখিয়াছ কি? ঐ এক স্থূলকায় স্তিমিত নেত্র শিখা-শোভিত পুরুষ বসিয়া রহিয়াছে—ওই তো এ যুগের জীবন্ত দেবতা। দেখিতেছ না তোমার মত কত নগণ্য উহার চরণধূলি স্পর্শ করিয়া ধন্য হইতেছে। আর এত মূর্খ তুমি যে তোমার দেবতা ছাড়া কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিবে না। তোমার দেবতার তুষ্টির জন্য তুমি প্রণামীর পরিমাণ অপেক্ষা অন্তরের ভক্তিকেই বড় ভাব—নির্ব্বোধ তুমি! ঐ দেখ তোমারই মত একজন নগণ্য যে ঐ তোমার দেবতার মধ্যস্থিত দ্বারবান, সে তোমায় অর্দ্ধচন্দ্র দানে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিল। এত ভক্ত আসা যাওয়া করিতেছে, কেহ কি তোমার অশ্রুপাতে সহানুভূতি করিল? তোমার মত অনেক নগণ্য ভক্তই আবার তোমারই ধৃষ্টতার নিন্দা করিল আর মনে মনে ভাবিল যে তোমার ভক্তির স্বল্পতাই তোমার দুর্ভোগের মূল—তজ্জন্য মূলতঃ তুমিই দায়ী।

ঐ দেখ বিশাল অট্টালিকা শোভিত ক্লাইভষ্ট্রীট—ঐ দেখ গৌরবর্ণ পুরুষপুঙ্গবেরা কেমন সদর্পে তথায় বিচরণ করিতেছে। তোমার আমার মত নগণ্যেরা ভোর হইতে গৃহিনীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সকাল সকাল চারিটি অন্ন কোন প্রকারে "নাকে মুখে গুঁজিয়া" তোমারই ন্যায় অফিসযাত্রীপূর্ণ ট্রামের পাদানীতে "বাদুড় ঝোলা" হইয়া ঠিক বেলা ১০টার সময় আফিস যাইবে আর সন্ধ্যা ৬টার সময় কর্ম্মক্লান্ত দেহ লইয়া পদব্রজে অথবা সেই যাত্রা কালীন দৃশ্যের পুনরভিনয় করিতে করিতে গৃহে ফিরিবে। তোমাদের এই "রক্ত জল করা" পরিশ্রমে লাভ কাহার হয় জান? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝিবে যে তিন সহস্র ক্রোশ দূরে বসিয়া বিদেশী অংশীদার তোমার পরিশ্রমলব্ধ অর্থ লভ্যাংশরূপে

পাইয়া তদ্দ্বারা বিলাসিতা চরিতার্থ করিতেছে। তোমার বড় সাহেব, মেজ সাহেব, সেজ সাহেব, প্রভৃতি কলিকাতায় কেবলমাত্র তোমাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরম সুখে বাস করিতেছে। তাহারা অফিস হইতে জলখাবার পায়, তাহাদের জন্ত অফিসের কার্য্যে যাতায়াতের জন্ত গাড়ি বা মটর সর্ব্বদা মোতায়েন থাকে; মাঝে মাঝে Homeএ যাইবার বন্দোবস্ত আছে এবং অনেক স্থলে বাড়ি ভাড়া বাবদ allowance ও ধার্য্য থাকে। কিন্তু তোমার বড় সাহেব, মেজ সাহেব বা ছোট সাহেবের কখনও সাধ্য হইত না তোমাদের মত বিদেশীয় নগণ্যদের লইয়া অতি অল্প বেতন দিয়া office manage করা যদি না তোমারই মত একজন নগণ্য প্রভু অনুগ্রহ পুষ্ট হইয়া তোমাদের মধ্যে বড়বাবু রূপে বিরাজ করিতেন। তোমাদের মাহিনা বৃদ্ধি করিবার হার যে বড় বাবুর পরামর্শ মতই নির্দ্ধারিত হয়। তিনি জানেন যে ভাল করিয়া নিজের কোলে "ঝোল টানিতে" হইলে স্বজাতীয়দের কাছে অল্প বেতনে বেশী কাজ আদায় করিয়া দিতে হইবে।

তুমি এম-এ পাশ করিয়াছ—করিলেই বা? তুমি তো জমিদারের ছেলে নও? তোমার বাবা কি রাজ সরকারের উচ্চ কর্ম্মচারী? যদি নয় তবে তোমার গতি কি করিয়া হইবে। যদি তুমি নামজাদা উকীল বা ব্যারিষ্টার; বা ন্যূন পক্ষে তাহাদের মুহুরি বা "বাবুর" পুত্র হইতে তাহা হইলে কতকটা আশা করিতে পারিতে। তা যখন নয় তখন তোমার দুঃখে যে শিয়াল কুকুর কাঁদিবে? তাতে বিচিত্র কি? যদি মুরুব্বির জোর থাকিত বা "পুঁথিগত" বিদ্যার উচ্চ আদর্শ প্রয়োজন মত পকেটেস্থ করিয়া "তৈলদান" রূপ সর্ব্বসিদ্ধি বিধায়িণী বিদ্যার অনুশীলন করিতে পারিতে হয়তো একটা মাষ্টারী কি প্রফেসরী কি যদি বরাতের খুব জোর হয় তো কোন Government অফিসে চাকরি পাইতেও পার। বৎসর কয়েক চাকরি করিবার পর যদি কোন দিন তোমার অতীতের কথা স্মরণ কর তো জানিতে পারিবে যে তুমি আর সে তুমি নাই তোমার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। Mill এর Liberty যাহার কণ্ঠস্থ ছিল, Hampden এর অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে যাহার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিত সে আজ নির্বীর্য্য বিষহীন সর্পের মত নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে—কোন উত্তেজনায় জাগে না—এখন সে মুদির তাগাদায়, গোয়ালার জলের দাম দিবার দুশ্চিন্তায় রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারে না, মাছের ঝোল ভাত খাইয়াও অম্বল হয়—মানে মানে কোনরূপে মনিবের মন জোগাইয়া "পদ্মপত্রের জলের ন্যায় চপল ও অনিশ্চিত চাকরিটুকু" বজায় রাখিয়া কোনরূপে নিজের ও পরিবারবর্গের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিলেই ধন্য হয়। হায় যদি বাল্যাবস্থায় শুভঙ্করী শিখিয়া তামাকের দোকান বা হাঁড়ীর দোকান খুলিতে তা হইলে পুস্তক পঠিত স্বাধীনতার মুল নীতি শিখিবার জন্ত তোমার পিতামাতা যে কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ অপব্যয় করিয়াছেন সেটা বাঁচিয়া যাইত আর তুমিও হাতে কলমে স্বাধীন কাজের কথঞ্চিৎ আস্বাদন পাইতে। কিন্তু হাঁড়ির দোকানে তো কেদারায় বসা চলে না, আর খুব বড় দোকান না হইলে বিজলী বাতী জ্বলে না বা বিজলী পাখাও ঘোরে না।

তুমি কৃষক? তোমারই পরিশ্রমের ফলে জমি হইতে শস্য উৎপন্ন হয়? তোমার এত দুর্দ্দশা কেন? ঐ দেখ সুদুর মারবাড়ের প্রস্তর মরুভূমি অতিক্রম করিয়া মহাজন আসিয়া বসিয়া আছে। তোমার উৎপন্ন ফসলে তোমার কোন অধিকার নাই। অজন্মার বৎসরে যে ঋণ করিয়াছিলে তাহা সুদে আসলে শোধ দিতে এখন তোমার জীবন কাটিয়া যাইবে! তোমার সম্বৎসরের খোরাকও বুঝি থাকে না। ঐ দেখ জমিদারের পেয়াদা আসিয়াছে। তোমাকে খাজনা দিতে হইবে, নায়েব গোমস্তা, পেয়াদা ইত্যাদি নগণ্যের দল যাহারা জমিদারের আওতায় থাকিয়া জমিদার অপেক্ষা প্রবল প্রতাপান্বিত তাহাদেরও তো কিছু "উপরি" চাই। পাগলের ন্যায় কোথায় ছুটিতেছ? জমিদারের কাছে? জমিদার কৈ কোথায় পাইবে? তিনি তো "দেশে থাকেন না। তিনি তো তোমাদের সঙ্গে পড়িয়া ম্যালেরিয়া রোগে মরিতে পারেন না! যাও কালকাতা—দেখিবে তাঁহার কত কাজ কত, খরচ! ডিনারপার্টি ক্লাবের চাঁদা দিতে যানেওয়ালা লাটসাহেবের মর্ম্মর মুর্ত্তির চাঁদা দিতে, রাজনৈতিক সভা বা কমিটিতে যাইতে বা মাঝে মাঝে কাউন্সিলে গিয়া মোটা মাহিনার প্রাইভেট

সেক্রেটারীর লিখিত গরম গরম বা নরম গরম বক্তৃতা আবৃত্তি করিতে তাঁহাদের সমস্ত সময় ও প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। তাঁহাদের ন্যায় গণ্যমান্য দেশের natural leaders দের পক্ষে তোমার মত নগণ্যের অভাব অভিযোগ শুনিবার সময় কৈ? আর তুমিই বা কি হিসাবে "সরাসর" একেবারে জমিদারের কাছে উপস্থিত হও? আবেদন কর—দস্তুর মত হাত ফিরিয়া ফিরিয়া তাহা যখন প্রভুর কাছে পৌছিবে তখন নায়েব তাহার বক্তব্য বলিবে। তাহার উপর ম্যানেজার বাবু মন্তব্য ছাড়িবেন তবে তো তাহা জমিদার বাবুর নেত্র গোচর হইবে—কিন্তু দেখিয়াই বা করিবেন কি! তাঁহার তো অর্থ চাই সে অর্থ কে দিবে তাহা আদায় করিতে কার্য্যক্ষম কর্ম্মচারী অপরিহার্য্য। কার্য্যক্ষমের কার্য্য প্রণালীতে বাধা দিয়া নিজের সুখের পথের কে কাঁটা হইবে—আমলাতন্ত্রও নয় জমীদার তন্ত্রও নয়। কিন্তু জমিদারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে কে শুনিবে তাতে যে class war এর গন্ধ আছে, দেশের লোকেও শুনিবে না, আর আমলাতন্ত্রও তাহাতে বলশেভিজমের গন্ধ পাইয়া থাকেন। অতএব ওগো নগণ্য "চাষাব" দল—দেশীয় ও বিদেশীয় গণ্য-মান্যের দল তোমার কান্নাকে মায়া কান্না ছাড়া আর কিছুই মনে করেন না। বল তোমার দুঃখ কি? মুক্ত বায়ু আহার কর, চরকায় সুতা বোন আর যুক্ত করে মহাজন, নায়েব, গোমস্তা, দারোগা, পেয়াদা ও চৌকিদারের মন জুগাইয়া চল। তুমি তো আব লিখিতে জান না। শাসন যন্ত্র ঠিকমত চালাইবার ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া তোমাদের শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা এই দেড়শত বছরের ভিতর সম্ভব হয় নাই! তোমার natural leadersরাও তাঁদের Natural প্রভুদের মনস্তুষ্টির খরচ ও কলিকাতার বাজে খরচ যোগাইতে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন—তোমাদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা naturally তাঁরা করিতে পারেন না। তোমরা টাকা দাও আর গণ্যমান্যেরা যা বলেন তা শোন। তোমাদেব non-violent হইতে উপদেশ দেবার বিশেষ প্রয়োজন নাই কারণ তুমি creed এ সই না করিলেও non-violent তোমার মজ্জাগত।

তবে তোমাদের থাকাটাও আবশ্যক কারণ তোমরা আছ বলিয়া আমলাতন্ত্র তোমাদের Dumb million এর দোহাই দিয়া স্বরাজ দিতে পারিতেছেন না—তোমরা আছ তাই কংগ্রেসে বা তিলক ফণ্ডে চাঁদা উঠে, তোমরা আছ তাই কাউন্সিলে মেম্বর আছে, তোমাদের প্রতিনিধি বলিয়া গৌরব করিবার তাঁহাদের অধিকার আছে। অতএব দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়া আর রোগে জর্জ্জরিত হইয়াই হোক তোমাদের থাকিতেই হইবে—তোমরা যে সর্ব্ব দলেরই সহায়ক। তোমরা গণ্যমান্যদের উঠিবার "মই" ছাড়া কিছু নও। তোমাদের সাহায্যে তোমাদের মত নগণ্যেরা—তা দেশীয়ই হোক্ বা বিদেশীয়ই হোক সম্মান ও ঐশ্বর্য্যের শিখরে আরোহণ করেন ও কার্য্যোদ্ধারের পর "মই" খানিকে পদাঘাতে ফেলিয়া দেন। কেহ ইচ্ছা করিয়া পদাঘাত করেন আর কাহারও বা অন্যমনস্কতা অনবধানতা বশতঃ "পা লাগিয়া" মই পড়িয়া যায়। কেহ বা সৎ কেহ বা অসৎ—কিন্তু "মই"এর পক্ষে উভয়ই সমান।

রাষ্ট্রপতি হার্ডিংএর আদর্শ

আমার সীমা আমি জানি, মহত্ত্বের কত দূরে পড়ে আছি আমি তাও জানি। কিন্তু যাই হোক—সকল সমস্যাই আমি বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে সু-ইচ্ছা লইয়া মীমাংসা করিতে অগ্রসর হই। অনেক সমস্যা যাহা অস্ত্রধারী সৈন্য দ্বারা মীমাংসা করা হয় তাহা কখনই স্থায়ী মীমাংসা নহে। প্রতিবেশীর সদিচ্ছা লইয়া কার্য্য করিলেই শুধু সমস্যার মূল মীমাংসা হইতে পারে।

লোকে আমার সম্বন্ধে যাহা খুসী ভাবিতে পারে কিন্তু আমি যেমন ওয়ারেন জি হার্ডিং আছি এবং ভগবান আমাকে যেমন তৈরী করিয়াছেন তেমনি থাকিব। যুগ যুগ হইতে যে বিপরীত পদ্ধতির কার্য্য চলিয়া জগতের সুখ শান্তি নষ্ট করিতেছে আমি সেই ধারা বদলাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছি।
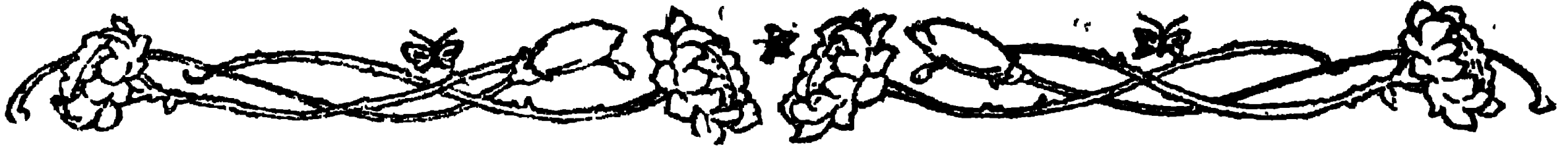
সদানন্দের পত্র

সম্পাদক কুলধুরন্ধরেষু—

বলিহারী ভায়া! এত লোক থাকতে বাদা বন হাটকে আমায় ঘাঁটিয়ে তুলেছ কেন? আমি নির্ব্বিবাদী লোক আমার নীরস কচ কচি তোমাদের সংবাদপত্রে শোভন হবে কি?

বাঙলায় কাগজের অবস্থা তো কারো অবিদিত নেই, কাগজ তো রোজই এক আধখানা বেরোয় কিন্তু ধোপে টেকে কয়টা? সচিত্র বিচিত্র কুচিত্র কত রকমের কাগজই দেখলুম কিন্তু দাদা টেঁকতে দেখলুম খুব কম কাগজকে—এর কারণটা কি! তোমরা শুনিতেছি আবার গোপাল অতি সুবোধ বালকের মত কখন কাহাকেও কুবাক্য বলিবেনা বলিয়া বদ্ধ পরিকর হয়ে যখন আবার অবতীর্ণ হইতেছে তখন ভবিষ্যৎটা কি হইবে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? জানি না তোমাদের অদৃষ্টে বিধাতা কি লিখিয়াছেন কিন্তু ভায়া আমার তো বড়ই আশঙ্কা হয়। বিশ্বনিন্দুকেরা বলেন বাঙালীরা বড়ই পরনিন্দুক—কিন্তু নিন্দার কোন মাপকাটী নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। (আদালতের মানহানিতে যে গজে নিন্দার মাপ করা হয় হয় তাহা উকীলের বক্তৃতা অনুসারে কমে বাড়ে বলিয়া তাহাকেও পাকাগজ বলিতে পারিলাম না) সেই জন্যই সহজে যাহাকে তাহাকে নিন্দুক বলিয়া অব্যাহতি লাভ করা যায় কিন্তু অনেক সময় সত্য এত অপ্রিয় হয় যে সত্য ঘটনাও নিন্দা বলিয়া পরিগণিত হয়।

আমার পরমারাধ্য গুরুদেব কমলাকান্ত অহিফেন প্রসাদাৎ দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া অনেক নূতন কথা শুনাইতেন। প্রজাহিতৈষী সরকার বাহাদুর পাছে প্রজারা অহিফেনের মাত্রা বাড়াইয়া জাহান্নমে যায় সেই আশঙ্কায় উক্ত অমৃতোপম দ্রব্যের মূল্য এত বাড়াইয়া দিয়াছেন যে আমার মত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের আর ও মৌতাতে অধিকার নাই—অগত্যা সনাতন প্রথা অনুসারে স্বল্প ব্যয়ে গঞ্জিকা সেবন আরম্ভ করিয়াছি কিন্তু তাতেও দেখছি বিধি বাদ সাধিতে সুরু করিয়াছেন। সাধু সন্ন্যাসীর একমাত্র অবলম্বন গঞ্জিকা পরমধনও দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। অশ্বিনী কুমার যুগলের বংশধরগণ এই অপবিত্র ধরাধামে কবিরাজরূপে অবতীর্ণ হইয়া অধুনা যে 'মদনানন্দ মোদক' ফেরীওলার মারফৎ বিক্রয় করাইতেছেন—তাহাতে নাকি এই পরম পদার্থ ভর্জ্জিত ও চূর্ণীকৃত করিয়া মিশ্রিত করা হইতেছে কারণ এই মহৌষধটী মহাদেব কর্ত্তৃক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রদত্ত হইলেও এবং ইহা আইনকে ফাঁকি দিবার জন্য ডিস্পেপসিয়া অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির ঔষধ বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইলেও অতি শিশুতেও জানে যে উহা ভদ্রভাবে নেশা করিবার একমাত্র সহজ পন্থা এবং গুরুজনের সম্মুখে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অন্তরালে তাম্র কূট সেবনের ন্যায় ইহাও পরমানন্দে সেবন করিলে নেশা করিয়াও নেশাখোর বদ নাম রটে না। সিদ্ধির মূল্য (অহিফেনের একই কারণে) বাড়িয়া যাওয়ায় কবিরাজমহাশয় যা তা পাতা গুঁড়াইয়া তাহার সহিত এই মৌতাত জগতের কৌস্তভ মণি গঞ্জিকা চূর্ণের মিশ্রণে তাঁহাদের ক্রেতাগণের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সবিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। সুতরাং গঞ্জিকা ধূমায়িত নেত্রে যে কোন দিব্যদৃশ্য দেখিব তাহার উপায় নাই কারণ টীপ্ ক্রমশঃই কমিতেছে।

এ অবস্থায় আমার মত মনুষ্যত্বহীন মানুষের দ্বারা তোমাদের কোন বিশেষ সাহায্য হওয়া একরূপ অসম্ভব। তার উপর দেশের অবস্থার কথা লিখিতে বলিয়াছ—দেশের অবস্থা কি তোমরা জাননা তা জানিবেই বা কি করিয়া, থাক সহরে—সহরে থাকিয়া দেশ বলিলে যাহা বুঝায় সেই পল্লী গ্রামের কথা জানা সম্ভব নয় কারণ পাড়াগাঁর লোকেরা কলিকাতার বাবুদিগকে একেবারেই দেশ ছাড়া মানুষ ভাবে—তাঁদের সঙ্গে পল্লীবাসীদের জীবন যাত্রার পথের কোন সামঞ্জস্য নাই কারণ যাঁরা একবার চাকরী বা ব্যবসার দৌলতে দেশ ছাড়া হন তাঁরা দেশের সম্পর্ক তুলিয়াই দেন—এমন কি সেই দেশ ছাড়া মানুষদের

সমাজে দেশের নামটী করিতেও লজ্জা বোধ করেন। ধনী শিক্ষিত বাবুরা যেমন পল্লাবাসী বৃদ্ধ পিতাকে পিতা বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হন তেমনি এই নব্য সহুরেদের—যাঁহারা অতি কষ্টে কলিকাতার ভাড়া বাড়ীতে কোনরূপে মাথা গুঁজিয়া থাকেন তাঁদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় মহাশয়ের নিবাস ?" মহাশয় অমনি একগাল হাসিয়া পানের ছোপ রঞ্জিত দন্ত পাটি বিকাশ করিয়া বলেন "কোলকাতা" কোলকাতার কেতা দুরস্ত বাবুদের শতকরা ৯৯টী জীব যে এই ধুলা কাদা মাখা পল্লীরাণীর সন্তান সে পরিচয়টা দিতেও তাদের মাথা কাটা যায়। সুতরাং পল্লীবাসীর অভাব অভিযোগ তাঁহারা বুঝিবেন কিরূপে। বুঝিবার মত হৃদয় কি সে সহানুভূতি সে ঔদার্য্য সে সমপ্রাণতা আছে—সহরের মোহে সভ্যতার মায়াজালে বিলাসিতার গ্রাসে সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—তবে সে কথা শুনিতে চাও কেন? তোমরা প্রাতে উঠিয়া বাটী বাটী চা সেবন কর আমরা ধামা ধামা মুড়ি খাই তোমরা সিগারেট ফুঁকিয়া ফুঁকিয়া অবিরত ধুঁকিতেছ আমরা ফুড়ুক ফুড়ুক করিয়া গুড়ুক খাই। তোমরা ৮.৯টায় দুটী যা তা পেটে গুঁজে অফিসে ছোট আমরা সারাদিন মাঠে মাঠে লাঙ্গল গরু লইয়া ঘুরি—তোমরা যখন বিজলী পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে গৌরাঙ্গ প্রভুদের সেবা কর—আমরা তখন দেশের জমী চাষ করি। বেলা ১টা ১॥০টায় আসিয়া যখন আমরা দুটী শাকান্ন মুখে দি তোমরা তখন অফিসের নিকটস্থ "কেক্" বা "রেস্তোরাঁয়" বসিয়া গরম গরম বাসী চপ্ কাটলেট গ্রাস কর। সন্ধ্যার পর তোমরা যখন একটু গোলাপী ভাবাপন্ন হইয়া আর্টের জন্য আর্ট চর্চ্চা করণোদ্দেশে বার নারীর কুঞ্জে হাজির হও আমরা তখন চণ্ডীমণ্ডপে বসে পরচর্চ্চা করি—যিনি তেজারতী করেন তিনি সুদের হিসাব করেন আর শকুনি নেত্রে কার ভিটেটা বা জমিটা সুদে আসলে লইবার মত হইয়াছে তার খোঁজ করেন—আর দেশ বলিতে যাদের বোঝায় তারা তো ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ দুর্ভিক্ষে শীর্ণ অন্নাভাবে ক্লিষ্ট তাদের জন্য কাদের প্রাণ কাঁদে ? সরকার বাহাদুর তাদের কষ্ট শুনেই আকুল হয়ে পড়েন প্রবোধ দিয়ে বলেন বাছারা তোদের অভাব কিসের * * *

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা কানন কুন্তলা বঙ্গ মাতার সন্তান—তোদের জন্য তোদের স্নেহময়ী মা ডোবাভরা পচা পোকাপড়া জল (যাতে এনোফেলিস নামক ম্যালেরিয়া মশক জন্মে) গাছভরা ফল (সম্ভবতঃ মাকালফল দেখিয়া তাহার বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে তাঁহাদের নয়ন ধাঁধিয়া গিয়াছিল।) আর নদীভরা মাছ রাখিয়াছেন যাও বাছারা পাড় আর খাও ধর আর খাও। এইতো দেশের অবস্থা রোগ তো লেগেই আছে ঔষধের উপায় কি? পুরাকালে টোটকা টাটকী জড়ী বুটীতে রোগ সারতো এখন এই বৈজ্ঞানিক যুগের ব্যাধি তো সেরূপ ছোটখাট নয় এখন জ্বর হলেই টাইফায়েড, নয় ইনফ্লুয়েঞ্জা সর্দ্দি কাসি হলেই হয় নুমোনিয়া আর টুব্যাকুলাসিসে দাঁড়ায়, কলেরা এতো এত প্রবল হয়েছে যে তার সময় অসময় নেই, আর মা শীতলার অনুগ্রহ পূর্ব্বে এক বসন্তের আরম্ভে দেখা যাইত এখন আর শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কোন ঋতু ভেদের বালাই নাই—মা এখন সারা বছরই অনুগ্রহ কর্চ্ছেন। তোমাদের কলেজের ডাক্তারদের রসদ জোগান পল্লীবাসীরা, কবিরাজ মশায়রা আর পল্লীতে থাকিয়া চিকিৎসা করিতে ভালবাসেন না—সকলেই কলকেতায় গিয়া ক্যাটলগ ছাপাইয়া বড় কারবার করিতে চাহেন। একটী ধাতু ক্ষীণতার ঔষধ একটী বাহ্যিক প্রয়োগের বিশেষ ঔষধ, একটী প্রমেহের ঔষধ একটী 'সর্ব্ববিধ' (?) ক্ষত রোগের ঔষধ—আর কেমন ঔষধ—সকলের সব ঔষধগুলিই একেবারে অব্যর্থ আবার সকলগুলিই রাজা মহারাজাদের প্রশংসাপত্রে মোড়া—আবার সে কেমন প্রশংসা "আমার জনৈক বন্ধুর জন্য আপনার......ঔষধ আনাইয়া একদিনে আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি।

আবার এই প্রচণ্ড মিথ্যার উপর আমাদের কি গভীর আস্থা থাক্— তাঁদের ভাল হউক। দেশটা যদি তাতে একধাপ নীচে নামে ক্ষতি কি—এইতো ভায়া স্বদেশ প্রীতি।

তোমরা গণ-বাণী প্রচার করিবে বলিতেছে কিন্তু তার প্রেরণা পাবে কোথা হইতে—এক একটা আন্দোলন হচ্ছে আর নিদ্রিত জনগণকে একটা ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে, তাদের পায়ে তো জোর নেই তাই সে ধাক্কায় তারা উল্টে পড়ে যাচ্ছে। গণদেবতাকে জাগাতে হলে তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার আবশ্যক সেটা কেউ কি কর্চ্ছেন ? শুধু অস্পৃশ্যতা

পরিহার কর, শ্রমিককে উন্নত কর বলে চেঁচালে কি হবে? অস্পৃশ্যকে শিক্ষা দাও, দিয়ে তাদের যে সব দোষে তারা খাটো হয়ে আছে তা দূর করে দাও—তারা আপনি সমান হবে। পায়ে না জোর হলে দাঁড়াবে কি করে—ঠেসান দিয়ে চিরদিন দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না। এক জায়গায় শুনলুম অনেক নমঃশূদ্র নাকি অস্পৃশ্যতার গ্লানি পরিহার করবার জন্য ক্রীশ্চান হবে বলেছে—এটা কেন হয় জান—শিক্ষার অভাবে চোরের উপর রাগ করে মাটীতে ভাত খেলে চোরের কি ক্ষতি হয়? যারা অস্পৃশ্য থাকে বলে ক্রীশ্চান হতে যায় তাদের কি হিন্দু বলা যায়—হিন্দুধর্ম্মের যদি কোন আস্বাদ তারা পেয়ে থাকে তবে কি আর অস্পৃশ্য থাকে? বুঝতে হবে তাদের হিন্দুধর্ম্মে কোন আস্থা ছিল না বা নেই সুতরাং তাদের পক্ষে ক্রীশ্চান বা মুসলমান হওয়া একই কথা। অন্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা মনে মনে উপলব্ধি না করিয়া যখন তাহারা সেই ধর্ম্ম কোন চালে পড়িয়া বা একটু সুবিধার জন্য গ্রহণ কর্চ্ছে তখন ধর্ম্ম হিসাবে তাদের সব ধর্ম্মই সমান। ক্রীশ্চান হয়েও কি তারা অস্পৃশ্যতার হাত থেকে অব্যাহতি পাবে? এখানে যেমন জাতিভেদ ক্রীশ্চান সমাজে তেমনি বর্ণভেদ আর কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীশ্চান কোন কালে শ্বেতাঙ্গ ক্রীশ্চানের পাশে স্থান পায় না—এমন কি মৃত্যুর পরও নয়—আমাদের তবু মরণের সময় সাম্য দেখা যায়। সাম্য জিনিষটা একেবারেই কাল্পনিক—ভেদ থাকবেই। ভেদ আছে বলেই জগৎ চলছে, আমাদের দেশে জাতিভেদ, আমাদের সাকার দেবতা, গৌরাঙ্গ প্রভুদের শ্রেণীভেদ, তবে সে ভেদটা অর্থের উপর ঐশ্বর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এইটুকুই যা প্রভেদ। অস্বীকৃত না হন তবে আবার কিছু বলবো! কিন্তু তারা রাগ করোনা—হয়ত বুড়োর সব কথা তোমাদের সাইকলজি বা লজিক সম্মত হবে না কারণ ওসব আমি কখন পড়িনি—আমার মনে যা উঠে পঞ্জিকা দেবীর অনুগ্রহে মাথায় যা জাগে তাই বলি—এতে রাগ করো না—এবং আমার মত যে কাউকে মানতে হবে এ কথা আমি বলি না—তবে যারা এসব সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত আছেন—সমস্যার কতকগুলি জটীলতা দেখানই আমার উদ্দেশ্য।

ইতি, তোমাদের সদানন্দ।

পুষ্প-পরাগ *

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

ফুল রেণুর মতই পুষ্প-পরাগ অমিয় আধার। সত্যি-কারের কবিতা আজকাল কম দেখতে পাওয়া যায় তাই যখন তার আস্বাদন পাওয়া যায় তখন মন ভরে ওঠে। বইখানির অনেকগুলি কবিতা তুলে দিতে ইচ্ছে করচে, কিন্তু সে লোভ নানা কারণে সম্বরণ করতে হোলো।

কবির ত্যাগের দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল। সংসারীর কাম্যবস্তু যাতে তার চিরদিন ব'সে খাওয়া চলবে, কবি বলচেন তাতে তাঁর কাজ নেই

"নিত্য যেথায় দুর্ব্বাশিরে
পড়ে তোমার পায়ের ধুলো
সেইত আমার দেহের ভূষণ
কাজ কি রতন ভূষণগুলো।"

নিজের জাতের সম্বন্ধে বলবার তিনি অধিকারিণী। তাই তিনি অন্তরের সঙ্গে বলেচেন :—

"নারীরে ফেলিয়া অন্ধকারেতে, তোমরা যতই হওগো উচ্চ
ততই পিছনে টানিয়া রাখিবে অশিক্ষিতা সে রমণী তুচ্ছ।"

দেশের আধখানা পঙ্গু হ'য়ে থাকলে, দেশ যে উন্নত হবে না কবি তা বোধ ক'রেচেন। এই দেশাত্মবোধই কবিকে বলিয়েছে দেশের যুবক বৃন্দকে

"দেশেরে যদি জাগাতে চাও মানুষ গড়হে
জীবন রণে মরণপণে ঝাঁপায়ে পড়হে"

প্রেমাস্পদের প্রতি যার আকর্ষণ আছে তার কতখানি বুকের পাটা কবি তা বোঝেন। দুর্য্যোগে যে তার দরজা বন্ধ থাকে না—বা মিলনের পথ অচল হয়না তাই জেনে কবি ব'লেচেন

ঝঞ্ঝা নয়রে বাদল নয়রে
ওই যে মহোৎসব!
নূপুর রুণু ডুবাবে মোর
দেয়ার গুরুরব
আকাশভরা ওই যে কাহার
নীলাম্বরীর জরীর বাহার
সাড়ীর সাথে মিশবে রে মোর
নিশির অন্ধকার।"

বইয়ের দাম একটাকা কিছু বেশী হ'য়েচে। ভালো জিনিস সকলেরই সুলভ হওয়া উচিত নয় কি?

* শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী রচিত—মূল্য এক টাকা—প্রকাশঃ শ্রীজিতেন্দ্রশঙ্কর দাসগুপ্ত বি, এল, ১০ বি গৌরবোষের লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

নেপোলিয়ানের জীবন নীতি

মা যাই করুন না কেন সন্তানের তাঁকে তিরস্কার করবার কোন অধিকার নাই।

সব চেয়ে বড় নারী কে? যে সব চেয়ে বেশী সন্তান পেটে ধরেছে।

সুন্দরী নারী চোখের তৃপ্তি দেয়, ভাল নারী হৃদয়ের তৃপ্তি দেয়। এক রত্ন, আর এক হৃদয়ের আনন্দ।

প্রেম আনন্দই দেবে, অত্যাচার করবে না।

সত্যি প্রেমই সত্যি সুখ।

বিবাহেই ভালবাসার পরিণতি।

যে স্বামী স্ত্রীর কথা মত চালিত হবার দুর্ভাগ্য ভোগ করে তাকে আমি অতি হীন চক্ষে দেখি।

প্রেম ভাবের আতিশয্য মাত্র।

প্রেম সমাজের ও ব্যক্তিগত সুখের হানিকর। প্রেম ভালর চেয়ে ক্ষতিই বেশী করে।

এক সঙ্গে দু'জনকে সমান ভাবে ভালবাসা যায় না।

আমি দেশও জয় করেছি—হৃদয়ও জয় করেছি।

জন্মভূমির উন্নতির জন্য সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন সুপুত্রের জননী।

পিতামাতার কাছ থেকে ছেলেপিলে যা শেখে, মায়ের দুধ খাবার সময় তাদের যা ধারণা জন্মে তা কখনো তাদের মন থেকে যায় না।

বাক্য দিয়ে কাজ করার চেয়ে সুঁচ দিয়ে কাজ করাই নারীদের পক্ষে ভাল। বিশেষতঃ রাজনীতিতে তো তাদের যেতেই নাই। মেয়েরা সাধারণের কার্য্যে গেলে রাজ্য নষ্ট হয়ে যায়। তারা ছেলেপিলে, ঘর সংসার দেখবে—যা দিয়ে তাদের কোন দরকার নাই তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে না।

নানা কথা

এবারকার ঈদ্ পর্ব্বে এক দিল্লী ও নাগপুর ভিন্ন আর কোথাও হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় নাই। স্থানীয় নেতাদের ও দেশের সংবাদপত্রের চেষ্টায় সে হাঙ্গামাও অল্পেই মিটিয়া গিয়াছে। ইহা সুখের বিষয়, শুভ লক্ষণ।

বাংলার মেয়ে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছেন। মহাত্মা শ্রীমতী সরোজিনীর নিকট অনেক আশা করেন—আগামী বেলগাঁও কংগ্রেসের সভানেত্রী বোধহয় শ্রীমতী সরোজিনীই হইবেন।

জগৎ বরেণ্য কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ চীন, ব্রহ্ম ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছেন। স্বদেশে কিছুদিন থাকিয়া আবার তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যাইবেন শুনিতেছি।

ভারতবাসীর জন্য মহাত্মা গান্ধী খদ্দর, হিন্দু মুসলমান প্রীতি ও ছুঁৎমার্গ পরিহার ইহাই বর্ত্তমানের কার্য্য পদ্ধতি স্থির করিয়াছেন। মুক্তির জন্য, বাঁচিবার জন্য এই তিন বিষয়ে দেশবাসীকে প্রাণপণ করিতে হইবে।

মিশরের জননায়ক জগলুলপাশাকে কে গুপ্ত হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, জগলুল আহত হইয়াছিলেন তবে ক্রমে তিনি সুস্থ হইতেছেন।

লেবার পার্টির প্রাধান্যে নির্য্যাতিতেরা আশা করিতেছিল তাহাদের কিছু সুবিধা হইবে। কিন্তু ভারত সম্বন্ধে ও সুদান সম্বন্ধে লেবার মন্ত্রীদের বাণী ও ব্যবস্থা দেখিয়া তাহারা বোধহয় ক্রমেই নিরাশ হইতেছে।

নায়ার ও ডায়ার মামলায় বিলেতের জজ ম্যাককার্ডি যে রায় দিয়াছেন তাহাতে বৃটিশ ন্যায় বিচারের উপর অনেকের ভক্তি নাকি লোপ পাইতেছে। অনেক বিখ্যাত ইউরোপীয়ও এই বিচারের নিন্দা করিতেছেন। ন্যায় শংকরণের দণ্ডের টাকা ও মোকর্দ্দমার খরচ হয়তো কোন ইউরোপীয় বা ভারতীয়েরা দিতে পারে কিন্তু বিচারের দণ্ড তো

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ এখনো চলিতেছে। এখনো দলে দলে স্বেচ্ছাব্রতী সত্যাগ্রহীরা কারাবরণ করিতেছে। কলিকাতায় ও মফঃস্বলে সত্যাগ্রহের অনেক সভাও হইতেছে।

স্বরাজ্যদল কাউন্সিলের মন্ত্রীদের বেতন রদ্ করিবার জন্য হাইকোর্টের সাহায্য লইয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ মোকদ্দমা আবার প্রত্যাহৃত হইয়াছে বলিয়া শুনা গেল। ততঃ কিম্?

বড় লাট, লাটসাহেবদের ছুটির বিল মঞ্জুর হইলে অনেকেই "হোমে" যাইবার আয়োজন করিবেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। ছুটির সময় লাটদের স্থান কে অধিকার করিবে তাহা লইয়া আবার কিছুদিন গুজব চলিবে।

জাপানীরা তাহাদের দেশে পাশ্চাত্য বিলাস দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করিবার জন্য বিশেষ আন্দোলন করিতেছে। ক্রমেই নাকি তাহারা বিদেশী মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে—ইহা জাতীয় উন্নতির বিঘ্ন—তাই জাপানীদের এ চেষ্টা।

বিলেতে ওয়েম্বলি একজিবিশনে এড্ভারটাইজিং এক্সপার্টদের এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় বিভিন্ন দেশের পাঁচ হাজার বিজ্ঞাপনবিদ্ যোগ দিয়াছেন—প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ সভার উদ্বোধন করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনের জোরেই ইউরোপীয়েরা তাহাদের পণ্যে জগত ছাইয়া ফেলিতেছে। আর ভারত কি এখন নীরব থাকিবে—এখানেও বিজ্ঞাপনের প্রচার ও প্রসার কল্পে একটা সভা সমিতি গঠিত হয় না কেন—বড় বড় বিজ্ঞাপন দাতাদের এ বিষয়ে আমরা বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি—এবং এ বিষয়ে পত্রাদি প্রকাশ করিতে আমার বিশেষ ইচ্ছুক।

গত বৎসর ভারতে বিদেশজাত তামাক দ্রব্যের আমদানি হয় ২২৬ লাখ টাকা—তাহার মধ্যে ১৫৭ লাখ টাকার সিগারেটই আমদানী

লোকমান্য তিলক

শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের সৌজন্যে
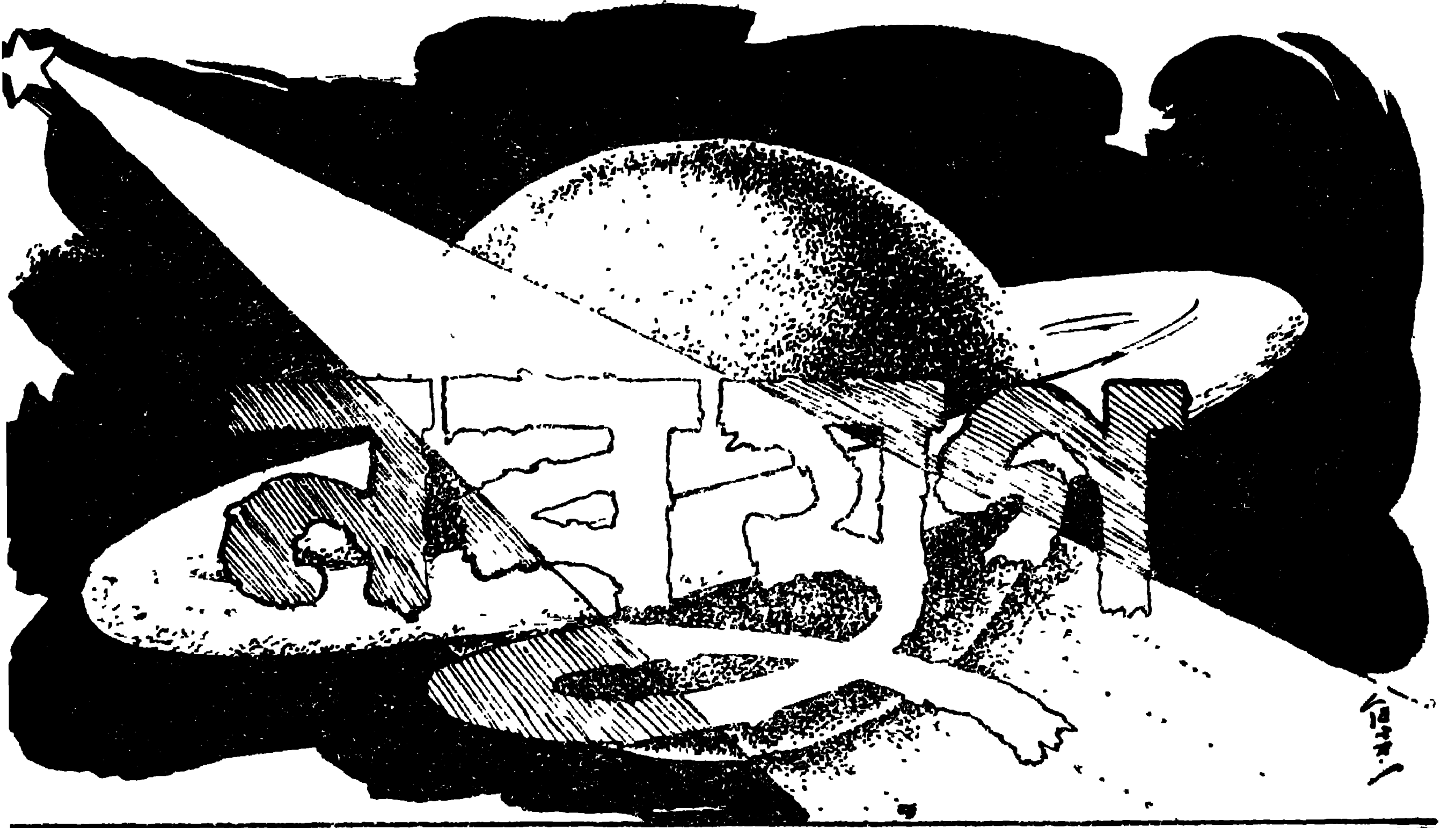
ম বর্ষ] ১৭ই শ্রাবণ শনিবার ১৩৩১, ইং ২রা আগষ্ট। [৩য় সংখ্যা

লোকমান্য তিলকের স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীপঙ্কজিনী দেবী

ভারত ললাটে তুমি বিজয়-তিলক
হিন্দুত্বের ছিলে তুমি সুদৃঢ় কীলক
কারো কাছে নত নহ, কারে নাহি ডর,
স্বার্থ সিদ্ধি তরে নাহি তোষামোদ কর।

অচল অটল দৃঢ় হিমাদ্রির মত
তোমা হেরে শত্রু মিত্র হ'তো ভক্তি নত।
রাজনীতি ক্ষেত্রে ছিলে স্বমতে চালিত
অনুরোধে উপরোধে নহে বিচলিত।

মাতৃভূমি তরে তব কাঁদিত হে প্রাণ
আর কে শোনাবে বল—সে করুণ গান
আজিগো তোমার স্মৃতি-বাসরের দিনে
অবলা বাঙ্গালী নারী ভক্তি-অর্ঘ্য বিনে

কি দানিবে ও চরণে—কি যোগ্য তোমার
হে তিলক! দয়া করে লহ নমস্কার।

লোকমান্য তিলক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

১৭৯১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসের শেষদিন ফরাসীদেশে মিরাবো মরিয়াছিলেন, ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষদিন ভারতবর্ষে তিলক মরিয়াছেন! এই দুই শক্তিশালী রাষ্ট্র বীরের চরিত্রগত পার্থক্য, দেশ, কাল ও জাতীয় বিভিন্নতা স্মরণ করিয়াও, তবুও ভাবিতেছি—মিরাবো ও তিলক!

মিরাবো মরিলেন,—ফ্রান্সের রাজা ও ভিক্ষুক একসঙ্গে কাঁদিয়া উঠিল। কহিল, "মিরাবো তুমি আমাদের, তুমি ফরাসী জাতির।—তুমি জীবিতকালে লক্ষবাহু বাড়াইয়া দিয়া সমগ্র ফরাসীজাতিকে বুকে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলে, আজ তোমার মৃত্যুদিনে এই দেখ আমরা ফ্রান্সের লক্ষ নরনারী তোমার চারিপাশে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছি।"—ব্যক্তি ও জাতির কি অদ্ভুত মিলন, কি অন্যোন্য-সম্বন্ধ! মহাপুরুষের জন্য তাহার জাতির শোক কি গম্ভীর, কি পবিত্র, কি মহান দৃশ্য।

ফরাসীদেশে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা অত্যন্ত কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছিল—অনেকগুলি জীর্ণবাঁধ জাতির জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল, সেই বাঁধের অন্তরালে শতাব্দীর অন্ধকার কুসংস্কার কুব্যবস্থার বিভীষিকা ছড়াইতেছিল। মিরাবো কহিলেন, "আমি আলোক চাই। তোমাদের জীর্ণবাঁধ আমি গ্রাহ্য করি না! কোথায় রাজদন্ত, কোথায় আভিজাত্য দূর হও! মিরাবো বড় জোরে পদাঘাত করিলেন, ফ্রান্সের প্রাচীন-ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িল! নূতন করিয়া গড়িবার জন্য ধ্বংসের এই রুদ্র দেবতার দিকে চাহিয়া মনীষী কার্লাইল বলিয়াছেন, মিরাবো কি সামান্য মানুষ!

তিলক মরিলেন,—সমগ্র ভারতবর্ষ কাঁদিয়া উঠিল। বোম্বাইএর সরদার-গৃহের চত্বরে সেই রাষ্ট্রবীরের গতপ্রাণ দেহ ঘেরিয়া, কারখানা হইতে সহস্র সহস্র শ্রমজীবি আসিয়া দাঁড়াইল, মাড়োয়ারী ভাটিয়া বণিক, তাহার হিসাবের খাতা বন্ধ করিয়া ছুটিয়া আসিল, হিন্দু মুসলমান পার্শী, খৃষ্টান, দুর্দ্দিনে দিনের কাজ ভুলিয়া মহাপুরুষের মহাপ্রস্থান দেখিতে আসিল! মহাত্মা গান্ধি, মৌলানা সৌকত আলী, ডাক্তার কিচলু প্রভৃতি জন-নায়কগণ বীরের পবিত্র দেহ ও তাঁহার অসমাপ্ত কর্ম্মের দায়ীত্ব স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন;—দুইলক্ষ লোক চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া শোকযাত্রায় যোগদান করিল! বোম্বাইএর সমুদ্রতীরে, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষের চিতানল নির্ব্বাপিত হইল।

ক্ষাত্রবীর্য্য ও ব্রহ্মতেজে দেদীপ্যমান মনুষ্যত্বের পরমাশ্চর্য্য প্রকাশ লোকমান্য তিলক যেদিন রাষ্ট্রীয় মহাসভায় আসিয়া নবজাতীয়তার ভেরী নিনাদ করিলেন,—সেদিন ভারতের শাসক-সম্প্রদায় ও তাহাদের অনুগামী ধীরপন্থী ভিক্ষুকদল একসঙ্গে কাঁপিয়া উঠিল! তিলক আসিয়া কহিলেন, আমি ইংরাজদত্ত মুষ্টিভিক্ষা চাহি না, রাজসভার চাটুকার ও পারিষদ হওয়াকেই ভারতীয় জীবনের চরম সার্থকতা মনে করি না, দুই একটি উচ্চপদ বা উপাধি লাভ দেশের কল্যাণকর মনে করি না—আমি চাহি স্বরাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির নামে কেরঙ্গ বিষ দ্বারা ধীরে ধীরে জাতি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, আমি ইহার গতিরোধ করিতে চাই, জাতীয় জীবনের জড়ত্ব দূর করিতে চাই, রাষ্ট্রক্ষেত্রে বাক্য ছাড়িয়া কর্ম্ম চাই। দাসসুলভ ক্রন্দন ও ভিক্ষা করিবার অভ্যস্থ চিন্তার জড়ত্বের উপর লোকমান্য তিলক অতি নির্ম্মম পদাঘাত করিলেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যে জীর্ণ দৌর্ব্বল্য ছিল, তাহা এক মুহূর্ত্তেই ধ্বসিয়া পড়িল। দরিদ্র শিক্ষক ও সংবাদপত্র সম্পাদক তিলক, ইংরাজসৃষ্ট কৃত্রিম শিক্ষা ও পদমর্য্যাদার আভিজাত্যের বাধা ডিঙ্গাইয়া শাসকগণের রক্তভ্রুকুটী অগ্রাহ্য করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মহারাষ্ট্র-সূর্য্যের প্রখর প্রতিভার প্রচণ্ড আলোকে সমগ্র ভারত ঝলসিয়া উঠিল। কারাগারের অন্ধকার তিন তিন বার তাঁহাকে আবৃত করিল, দুঃখ, দৈন্য, অপমান, অপবাদ নানা নিদারুণ দংশন করিয়া ফণা অবনত করিল—মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠ জাতীয় জীবনের সমস্ত হলাহল পান করিয়া, স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রবল সচেষ্ট যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। গতানুগতিক পন্থা পরিহার করিয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে

অগ্রাহ্য করিয়া এই মিত-সংযম আত্মজয়ী পুরুষ-সিংহের গম্ভীর-গর্জ্জনে রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে মুক্তির বাণী ঘোষণা করিয়াছিল,—তাহা অপূর্ব্ব, তাহা অনন্য-সাধারণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের ফরাসীদেশ ও মিরাবো এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহরের ভারতবর্ষ ও তিলক এই দুইটীর সহিত তুলনা করিলে, কোন কোন দিকে যোগ থাকিলেও, সাধারণ জনের অবস্থার সৌসাদৃশ্য থাকিলেও, ইহাকে এক বস্তু বলিতে পারা যায় না। ফরাসীজাতি জাগিয়াছিল, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল, অতি নির্ম্মম অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ইন্ধন প্রস্তুত ছিল—মিরাবো তাহা অনল ফুৎকারে জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। শতাব্দী সঞ্চিত সমস্ত আবর্জ্জনা ভস্মসাৎ করিয়া, নর-শোণিত সমুদ্রে স্নান করিয়া, ফরাসীজাতি নূতন রাষ্ট্র, নূতন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

আর ভারতবর্ষের সমস্যা অন্যরূপ। লক্ষ কোটী জীবন্ত নরকঙ্কাল অজ্ঞতা, মূর্খতা, কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত, দাসত্বে অরুচি নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, মনুষ্যত্বের কোন ধারণা নাই। নানা সম্প্রদায় ও জাতিতে বিভক্ত ভারতবাসী অতি কৃত্রিম সমাজ বিন্যাসের চাপে পড়িয়া ছত্রভঙ্গ, বিক্ষিপ্ত। মানুষে মানুষে অতি বিস্ময়কর ব্যবধান। এই ভারতবর্ষের সভ্যতা ও শিক্ষার অতি মাত্রায় রক্ষণশীল নীতির ফলে একদিকে মুষ্টিমেয় উন্নত-চরিত্র সভ্য-মানব, অপরদিকে পশু অপেক্ষাও নৃশংস মানব তাহার আদিম বর্ব্বরতার মধ্যে অতি জঘন্য জীবনযাপন করিতেছে। এই মর্ম্মান্তিক পার্থক্য দূর করিয়া মানুষের সহিত মানুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ ও সমচিন্তার যোগসূত্র স্থাপন করিয়া জাতীয়-জীবন প্রতিষ্ঠা কি সম্ভবপর? এই সমস্যার সমাধানে রামমোহন প্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন; তারপর সুদীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া এই সমস্যার সমাধানে কত সংস্কার আন্দোলন আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার বিফলতা ও সার্থকতা দেখিয়াছি। শতাব্দীর শেষভাগে এই সমস্যার দ্বারাই প্রচণ্ড ঝড়ে বটবৃক্ষের মত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আলোড়িত হইয়াছিলেন। আর এই জীবন্ত স্রোতধারার এক অতি শক্তিশালী তরঙ্গ—লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক।

সমাজ-সংস্কার, ধর্ম্ম-সংস্কার হউক, আপত্তি নাই—কিন্তু এই দুই মহান চেষ্টার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, পরাধীনতার পাষাণ-প্রাচীর। অতএব এমন একদল কর্ম্মী চাই, যাহারা সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, সর্ব্ব সহায় ছাড়িয়া, একাগ্রলক্ষ্য হইয়া কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয়-মুক্তির সাধনা করিবে। এই আদর্শ তিলক তাঁহার জীবনের বিকাশের পথে স্তরে স্তরে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি আশু ফললাভ করিতে পারেন নাই—কেন না সৈন্যদলহীন কোন সেনাপতি তা'তিনি যতই রণপণ্ডিত হউন না কেন, যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন না। তথাপি অসাধ্য সাধনের ব্রত লইয়া লোকমান্য তিলক এক হস্তে শাসক-সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারী প্রভুত্বকে বাধা দিয়াছেন, অপর হস্তে সমগ্র জাতিকে আকর্ষণ করিয়া ভূমিশয্যা হইতে তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল এই সুমহান প্রয়াস, কোন ব্যর্থতায় ক্লান্ত হয় নাই, কোন বাধায় ভগ্নোদ্যম হয় নাই, কোন আঘাতে ম্রিয়মান হয় নাই—কি ব্যক্তির জীবনে কি জাতির জীবনে ইহা কি কম কথা! ব্যক্তির চেষ্টাকে জাতির চেষ্টায় পরিণত করিবার অতি দুর্দ্ধর্ষ দুরাকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত-বিগ্রহ তিলকের পুণ্যস্মৃতি সেই কারণেই ভারতবর্ষ মস্তকে বহন করিয়া চলিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকটী রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম ও চিন্তা

— লোকমান্য তিলকের মর্ম্মবাণী —

"আমলাতন্ত্রের ধ্বংসসাধন ব্যতীত রাজনৈতিক উন্নতি লাভ অসম্ভব।"

"যে রাজতন্ত্র আমাদিগকে বিশ্বাস করে না—উচ্চ পদে নিয়োগ করিতে ভয় পায় ও তাহাদের সঙ্গে রাজ্যশাসনে সমভাবে দায়িত্ব লইতে দেয় না, তাহাদের সাহায্যার্থে সংগঠন কার্য্যের উপায় উদ্ভাবন করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।"

"যাহারা রাজ্যশাসন করিবে সংগঠন কার্য্য করা উন্নতি করা তাহাদেরই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।"

এই কারণেই তিলকের অসামান্য প্রভাবের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

কোন জাগ্রত, স্বাধীন জাতির মধ্যে তিলক জন্মগ্রহণ করেন নাই। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, পরশাসন, রোগ, শোক ব্যাধি ও দারিদ্র্য ইত্যাদি মৃত্যুর নখদন্তের আঘাতে জীবন্মৃত জাতির মধ্যে তিনি আসিয়া বলিয়াছিলেন,—'বাঁচিতে হইলে আমাদিগকে স্বরাজ পাইতে হইবে।' আর মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বেও ২৯ জুলাই রাত্রি একটার সময়, তাঁহার শেষ বাণী ইহাই—"স্বরাজ না পাইলে ভারতের উন্নতি অসম্ভব। আমাদের অস্তিত্বরক্ষার জন্যই ইহার একান্ত প্রয়োজন।"

বিদ্যুৎ চমকিয়া নিভিবার সঙ্গে সঙ্গেই বজ্র গর্জ্জিয়া উঠে। তাই তিলকের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মা গান্ধির অভ্যুত্থান। তিল তিল হৃদয়ের শোণিতের বিনিময়ে, বহুবর্ষের বহু চেষ্টায়, লোকমান্য তিলক যে হৃদয়ের সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে স্থাপন করিয়াছিলেন, চরিত্রে উন্নত, ত্যাগে পবিত্র কটীমাত্র বস্ত্রাবৃত মহাত্মা গান্ধি আসিয়া সেই সিংহাসন অধিকার করিলেন। অপহৃত সাম্রাজ্য সম্রাট হুমায়ুন দেশান্তরে, নির্ব্বাসনে থাকিয়াও যেমন দুঃসহ দুঃখসাধনায় সিদ্ধকাম হইয়া হৃত-সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই অপূর্ব্ব তিতিক্ষা ও ধৈর্য্যই, পরবর্ত্তী সম্রাট আকবরের বিজয়-গরিমার কীর্ত্তিধ্বজা নিখাদ করিবার সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করিয়াছিল, ঠিক তেমনি কংগ্রেস ও দেশ হইতে দেশান্তরে নির্ব্বাসিত লোকমান্য তিলক অতি আশ্চর্য্য তপস্যায় সিদ্ধকাম হইয়া পুনরায় দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, অপহৃত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হইতে মিথ্যা ও ভণ্ডামী দূর করিয়া পুনরায় তাহা প্রজাশক্তির পীঠভূমিতে পরিণত করিয়া মহাত্মা গান্ধির প্রতিষ্ঠার পথ সহজসাধ্য করিয়া দিয়াছিলেন। হুমায়ুন ও আকবর—তিলক ও গান্ধি!

লোকমান্য তিলকের চিন্তা ও কর্ম্মের ধারায় মহাত্মা গান্ধির চিন্তা ও কর্ম্মের বিকাশ ও পরিপুষ্টি! আজিকার ভারতবর্ষের রাষ্ট্র চৈতন্য তিলকের দান। ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনার উদ্বোধনবেদী তিলকের রচনা! আর এই বেদীর নিম্নে, জাতীয়তার পুরোহিত রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধির সম্মুখে—ভারতবর্ষের মনুষ্যত্বের আত্মবলিদানের পরীক্ষা! এই পরীক্ষা দিবার জন্য রাষ্ট্রীয় মহাসভা জাতিকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতেছেন! লোকমান্য তিলকের পুণ্যচরিত স্মরণ করিয়া এসো ভারতবাসী—তোমার স্বরাজ লাভের আকাঙ্ক্ষা লইয়া এসো। এসো কর্ম্মী,—তোমার সাহস, বীর্য্য, শৌর্য্য ধৈর্য্য লইয়া এসো,—এসো বক্তা—তোমার কম্বুকণ্ঠে জাতীয়তার বাণী লইয়া এসো—এসো লেখক, তোমার লেখনীমুখের স্বাদেশিকতার অনল লইয়া এস, এসো কবি—তোমার জননী জন্মভূমির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের উন্মাদনা লইয়া এসো—সর্ব্বোপরি এসো, সর্ব্বত্যাগী সাধক, তিলকের অসমাপ্ত সাধনাকে সিদ্ধির সম্পদে ভরিয়া তুলিবার জন্য।

লোকমান্য তিলকের স্মৃতি-পূজা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের পোড়া ভালে রাজটীকা সম—
দিলে তুমি হে মহাপুরুষ!
তেজস্বী পুরুষসিংহ—
যীশু সম হাসিমুখে আলিঙ্গিয়া ক্রশ
স্বদেশের তরে করি হেসে আত্মদান
তোমার তুলনা কোথা—ওহে মহাভাগ।
মাতৃভূমি তরে কাঁদে কার এত প্রাণ—
দেশবাসী' পরে কার হেন অনুরাগ?
নত হতে শিখ নাই—ভিক্ষা, তোষামোদ
ছিল না তোমার নীতি, আত্মমর্য্যাদায়
ছিলে তুমি অবতার—তব ঋণ শোধ
কি দিয়া শুধিবে হিন্দু—কি আছে তাহার
হে পূজ্য বরেণ্য সুত ভারত মাতার
শ্রীচরণে বঙ্গ কবি করে নমস্কার।

"কোথা যাই ?"

নিপীড়িতা নারী হিন্দু সমাজের প্রতীক কে কহিতেছেন—"প্রভু আমি স্বেচ্ছায় তো পাপাচারিণী নয়, আমাকে স্থান দিন্" "তা হয় না বাছা—হিন্দু সমাজের বেড়ার মধ্যে আর তোমার জায়গা নাই—বাহিরে থাক্‌তে চাও সে অন্তকথা।"

পাদ্‌রী সাহেব—এস ভগ্নি। পরমপিতার আশ্রয় গ্রহণ করিবে আইস—মেষপালক যীশুর কোলে আইস।

মৌলবী—আইয়ে বিবি কল্‌মা পড়িয়ে, সব বন্দবস্ত হো যায়েঙ্গে।

গল্প

হার চুরি

(বড় গল্প—শেষাংশ)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী গঙ্গোপাধ্যায়

(৩)

ইডেন গার্ডেনে অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্তা কুসুম মোহিতকে বলিল, "চল, একটু নিরিবিলিতে বসে গল্প করিগে।"

মোহিত বলিল, "চল, কিন্তু এখন বেঞ্চ কি খালি পাওয়া যাবে?"

"এতগুলো বেঞ্চ, একখানিও খালি নেই?"

"বোধ হয় না; আচ্ছা, চলতো দেখি।"

মোহিত কুসুমকে লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া উদ্যান মধ্যস্থ বেঞ্চগুলি দেখিতে লাগিল। অধিকাংশই প্রেমিক যুগলের লীলাক্ষেত্র; অবশিষ্ট যে কয়খানি আছে তাহাও কোন সাহেব অথবা স্কুল কলেজের ছাত্র দ্বারা অধিকৃত। ঘুরিতে ঘুরিতে মোহিত একটা কৃত্রিম হ্রদের নিকট উপস্থিত হইল; সেখানে একটা যুঁই বনের অন্তরালে একখানা বেঞ্চ খালি ছিল। মোহিত কুসুমের হাত ধরিয়া সেখানে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "বেশ নিরিবিলি জায়গাটা, নয়?"

কুসুম বলিল, "হ্যাঁ, বেশ জায়গাটা, দিব্যি যুঁই ফুলের গন্ধ আসছে।"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "আর তুমি তো আসতেই চাইছিলে না! আজকে আমাদের অ্যাডভেনচারটা কেমন হোচ্ছে বল তো?"

কুসুম হাসিয়া বলিল, "তাতো হোচ্ছে, কিন্তু আমার তো বাপু ভয় করে।"

"কেন? এখন আবার ভয়টা কিসের শুনি?"

"গার্ডেনের ভেতর এতগুলো সাহেব মেম রয়েছে, যদি হঠাৎ কেউ নাম জিজ্ঞেস ক'রে বসে?"

"দূর্‌ তা করে না, ওটা ওদের এটিকেট নয়। এও জান না? বি-এ পাশ কল্লে কি করে?"

কুসুম হাসিয়া বলিল, "তাতো জানি, কিন্তু যদি করে?"

"তাহ'লে তুমি কুসুম মিষ্টার কুল্‌সম্‌, আর আমি মোহিত মিষ্টার ম্যানহিট বাস্‌, একেবারে খাঁটি বিলিতি নাম।"

কুসুম হাসিয়া বলিল, "আমি শ্রীমতী কুসুমলতা বুঝি হ'লুম মিষ্টার কুল্‌সম্‌? বাঃ, বেশ নামটী তো!"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "চালাকি নয়, নামটা লণ্ডনের আমদানী, তা জানো? আমার এক সাহেব বন্ধুর নাম।"

কুসুম হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি বুঝি তারই মত দেখতে?"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "দূর্‌, তা কেন? তোমাকে তার চেয়ে ঢের ছোট আর সুন্দর দেখাচ্ছে।"

কুসুম ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, "ইস্‌!"

"সত্যি বলছি, এটা যদি লণ্ডন হোতো তবে এতক্ষণ অন্ততঃ দ্বী খানেক লেডি তোমার প্রেমে পড়ে যেতো।

কুসুম হাসিয়া বলিল, "সত্যি? তোমার প্রেমে কেউ পড়েছিল নাকি?"

মোহিত মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, "পড়েছিল বৈকি দু চার জন।"

"তারপর ?"

তারপর যখন তারা শুনলে ভারতবর্ষে আমার শ্রীমতী কুসুমলতা দেবী আছেন, তখন যে যার মত সরে প'ড়লো।"

কুসুম হাসিয়া বলিল, "ওরা বুঝি সতীন হ'তে নেহাত নারাজ, নয় ?"

"হ্যাঃ, তবে অনেকে ইচ্ছে সত্বেও আইনের জন্যে পারে না।"

কুসুম চিন্তিতা ভাবে বলিল, "আচ্ছা, তোমার দু চার জন প্রণয়িনীর নাম কব দেখি, কেমন নাম শুনি ?"

"মিস্ ম্যানিং, মিস্ সেরিণা, মিস্ এলিস্, মিস্ ভিনেলা, মিস্ ক্রীপার।"

কুসুম হাসিয়া বলিল, "কি সব নামের ছিরি! আমার সাথে বিয়ে না হ'লে এদের ভেতর কাউকে বে কোত্তে বুঝি ?"

মোহিত চিন্তিত ভাবে বলিল, "কোরতুম বোধ হয়।"

"কাকে ?"

মোহিত গম্ভীর হইয়া বলিল, "মিস্ ক্রীপারকে।"

কুসুম ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "হুঁ তা বুঝেছি!" তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

মোহিত হাসিয়া বলিল, "কিগো সুন্দরী, রাগ কোত্তে নাকি ?"

কুসুম মুখ ভারী করিয়া বলিল, "যাও!"......

মোহিত হাসিয়া বলিল, "আরে রামঃ, এটুকুও বুঝ্‌তে পাল্লে না? মিস্ ক্রীপারকে বে কোত্তুম। ক্রীপার মানে কি জান তো? লতা, অর্থাৎ কুসুমলতা, অর্থাৎ তুমি; তোমাকেই বে কত্তুম। বুঝ্‌লে ?"

কুসুম স্বামীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "ওঃ! সব দুষ্টুমী তোমার!"

মোহিত ও কুসুম এইরূপে হাসাহাসি করিতেছে, এমন সময় সম্মুখে কিছু দূরে একটা ঝোপের আড়াল হইতে একজন পুলিশ আসিয়া মিষ্টার কুস্‌সম ওরফে কুসুমের হাত চাপিয়া ধরিল। কুসুম বিবর্ণ মুখে মোহিতের দিকে চাহিল। পুলিশটার বেয়াদবী দেখিয়া মোহিতের মুখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পুলিশটার ঘাড়ে সবলে ঘুষি মারিল। তাহার জিমন্যাসটিক পুষ্ট হস্তের প্রচণ্ড ঘুষি সহ্য করিতে না পারিয়া ছাতুখোরটা কুসুমের হাত ছাড়িয়া দিয়া মাটীর উপর হুমড়ী খাইয়া পড়িল। মোহিত তাহাকে আবার মারিবার জন্য ঘুষি তুলিয়াছে, এমন সময় মুহূর্ত্ত মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ঝোপের আড়াল হইতে একজন সবইন্‌স্‌পেক্টার কয়েকজন কনেষ্টবল সহ দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে বাধা দিয়া ইংরাজীতে বলিলেন—'ক্ষমা করুন, বেচারা না বুঝে বেয়াদবী ক'রে ফেলেছে।" তারপর কুসুমের দিকে চাহিয়া বলিল, "স্যার্, আপনার গলার হারছড়া দেখতে পারি কি ?"

মোহিত চাহিয়া দেখিল নেকলেসটার কিয়দংশ কুসুমের কলারের উপর উপর দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে; তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া মোহিত কুসুমকে ইংরাজীতে বলিল —দেখতে দাও"

কুসুম হারছড়া টানিয়া বাহির করিয়া একটা ক্ষুদ্র সোণার স্প্রিংএ চাপ দিতেই তাহার একটা মুখ আপনা হইতেই খুলিয়া গেল; তারপর সেটি সব-ইন্‌স্‌পেক্টরের হাতে দিয়া কুসুম নীরবে মোহিতের দিকে চাহিয়া রহিল; মোহিত চোখ ঠারিয়া বলিল, "ভয় নেই।"

সবইন্‌স্‌পেক্টার নেক্‌লেস ছড়া কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া আপনার নোট বুক খুলিয়া কি দেখিলেন, তারপর মোহিতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ক্ষমা কোর্ব্বেন, আমি আপনাদের গ্রেফতার কোত্তে বাধ্য হোচ্ছি।"

মোহিত বলিল, "কি অপরাধে শুনতে পারি কি ?"

"নিশ্চয়ই পারেন। প্রথমতঃ :—এই নেক্‌লেস্‌ছড়া জষ্টিস্ সি, কে, ব্যানার্জ্জির বাড়ী থেকে অপহৃত হার বোলে বোধ হোচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ পুরুষের গলায় হার থাকে না, কাজেই এটা চোরাই মাল বোলেই সন্দেহ হোচ্ছে।'

মোহিত হাসিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ কুসুমের দিকে দৃষ্টি পড়ায় থামিয়া গেল।

সবইন্‌স্‌পেক্টর বলিলেন, "আপনাদের নাম শুনতে পারি কি ?"

মোহিত বলিল, "আমার নাম মিঃ ম্যান্‌হিট।" তারপর কুসুমের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "আর

ইনি আমার শ্যালক মিঃ কুল্‌সম্‌। কুসুম মৃদু হাসিয়া অন্তের অলক্ষিতে মোহিতকে কিল দেখাইল।

সবইন্‌স্‌পেক্‌টর নাম দুইটি নোটবুকে টুকিয়া লইয়া বলিলেন, "আপনাদের ঠিকানা?

"বোলে লাভ?"

"লাভ? নিশ্চয়ই আছে। আপনাদের দেখে ভদ্র-লোক বোলে বোধ হোচ্ছে, কাজেই ঠিকানাটা বোল্লে আমি আপনাদের শুধু নজরবন্দী রেখে ছেড়ে দিতে পারবো। অবশ্য আমিই গিয়ে বাড়ী পৌঁছে দোবো আপনাদের। তারপর নেক্‌লেস্‌টা যদি চোরাই বোলে প্রমাণিত হয়—"

মোহিত বাধা দিয়া বলিল, "থাক্‌, ঠিকানা বোলবো না।"

"সে আপনাদের ইচ্ছে। যাক্‌, তাহলে আমার সাথে চলুন।"

"কোথায়?"

"থানায়।"

"যদি না যাই?"

"তাহ'লে জোর ক'রে নিয়ে যেতে বাধ্য হব।"

মোহিত সশস্ত্র কনেষ্টবল্‌দিগের পানে একবার চাহিল, তারপর কুসুমের হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, "চল।"

পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল :—

নেক্‌লেস্‌ চোর ধৃত হইয়াছে! নেক্‌লেস্‌ চোর ধৃত হইয়াছে!!

পাঠকগণ অবগত আছেন যে জষ্টিস্‌ চন্দ্রকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহ হইতে ৫০০০৲ টাকা মূল্যের একছড়া হার অপহৃত হইয়াছিল। সব ইন্‌স্‌পেক্‌টর শ্রীযুক্ত নরহরি সিংহ উক্ত নেক্‌লেস্‌ চোরকে অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত সমাল গ্রেপ্তার করিয়াছেন। এরূপ প্রকাশ যে গতকল্য মিষ্টার কুল্‌সম্‌ ও মিষ্টার ম্যান্‌হিট্‌ নামক দুইজন ইউরোপীয় ইডেন গার্ডেনে একখানি বেঞ্চে বসিয়া গল্প করিতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে সব ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া উক্ত মিঃ কুল্‌সম্‌ নামক যুবকটীর কণ্ঠদেশে কোটের নীচে লুক্কায়িত একছড়া হার দেখিতে পান। সাহেবের গলায় নেক্‌লেস্‌ দেখিয়া তাহার সন্দেহ হয়, তিনি কয়েক-জন কনেষ্টবল সহ তাহাদের নিকট গমন করিয়া উক্ত হার দেখিতে চান। মিঃ কুল্‌সম্‌ নেক্‌লেস্‌টী বাহির করিয়া দিলে, তিনি দেখিবামাত্র উহা পূর্ব্বোক্ত অপহৃত হার বলিয়া চিনিতে পারেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। চোরের সঙ্গে থাকা এবং গ্রেপ্তারকালীন একজন কনেষ্টবলকে আহত করা অপরাধে মিঃ ম্যান্‌হিটও গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তস্করদ্বয় তাহাদের নাম ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করে নাই; তাহারা অলঙ্কারটী তাহাদের নিজস্ব বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। হারছড়া মাননীয় বিচারপতি মহাশয়ের নিকট লইয়া যাওয়া হইয়াছিল কিন্তু তিনি গৃহে না থাকা বশতঃ তাঁহার পুত্রবধূ উক্ত দ্রব্য সনাক্ত করিয়াছেন; বিখ্যাত জুয়েলার্স হীরালাল পান্নালালও উহা সনাক্ত করিয়াছেন। আগামী কল্য অপরাধীদ্বয়ের বিচার হইবে। আমরা আশা করি ভগবানের রাজ্যে পাপীর শাস্তি পাপের অনুযায়ীই হইবে।

(৪)

আলিপুর জেলের একটী ক্ষুদ্র কক্ষে দুইখানি জীর্ণ বেতের চেয়ারে বসিয়া মোহিত ও কুসুম বাক্যালাপ করিতেছিল।……

কুসুম বলিল, "ইস্‌! হাতকড়িটা এম্‌নি এঁটে দিয়েছে!"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "তবুতো তোমার লোহার না হোক্‌ সোণার হাতকড়ি প'রে অভ্যেস আছে; আমার যে তাও নেই!"

কুসুম হাসিয়া বলিল, "বেশ হয়েছে; কেমন, আমায় সাহেব সাজাবে আর?"

কেন? সাজানটা কি মন্দ হোয়েছে? দেখো, এখনো কেউ ধ'র্ত্তে পারেনি যে তুমি মিষ্টার নও মিসেস্‌।"

কুসুম হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ তোমার বিদ্যেটার বাহাদুরী আছে বটে! কিন্তু এখন যে বাহাদুরী বেরুচ্ছে?"

"তাইতো দেখ্‌ছি, শেষে জেলেও থাক্‌তে হলো!"

কুসুম একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "এক কাজ করো না কেন?"

"কি?"

"এদের কাছে সব খুলে বলো না কেন?"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "তোমার লজ্জা কোর্‌বে না?"

কুসুম গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা কোরে আর কি কোচ্ছি? তোমার কষ্ট হোচ্ছে যে।"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "আর তোমার বুঝি সুখ হোচ্ছে?"

কুসুম রাগিয়া বলিল, "তাতো হোচ্ছে না, কিন্তু চোখের উপর তোমার এমন কষ্ট পেতে দেখি কি করে!"

"তা কি কোর্‌বে, অদৃষ্টের দোষ।"

"না অদৃষ্টের দোষ নয়, তুমি না বল আমিই এদের বলে দেবো সব।"

মোহিত জিব্‌ কাটিয়া বলিল, "না না খবর্দ্দার, এমন কাজও কোরো না।"

"কেন?"

"তাহ'লে কালই কোল্‌কাতা সহরে একটা ঢিঢি প'ড়ে যাবে। বাবা আর দাদামশাইর গালে চুণ কালি পড়্‌বে। খবরের কাগজওয়ালারা লিখ্‌বে, জষ্টিস্‌ চন্দ্রকিশোর বন্দোপাধ্যায়ের পৌত্রী ব্যারিষ্টার হরমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ শ্রীমতী কুসুমলতা দেবী বি-এ নেক্‌লেস্‌ চুরির অপরাধে ইডেন গার্ডেনে সাহেব বোলে ধৃত হইয়া জেলে গিয়াছেন। তাহার স্বামী শ্রীযুক্ত মোহিত মোহন মুখার্জ্জি এম এ, আই-সি-এস্‌ ও স্ত্রীর সহিত ধৃত হইয়াছেন।"

কুসুম হতাশ হইয়া বলিল, "তাহ'লে কি কোর্‌বে?"

"কুল্‌সম্‌ আর ম্যান্‌চিট্টু নামই বজায় থাক্‌বে।"

"তার পর আদালতে? বিচারে?"

মোহিত চিন্তিতভাবে বলিল, "দাদামশাই যদি বিচার কোত্তেন তাহ'লে তো কোন কথাই ছিল না। কিন্তু এখানে তো দাদামশাই নেই। আর এটা হাইকোর্ট হ'লেও তিনি বিচার কোত্তেন না, কারণ তাঁরই হার কিনা? যাহোক বিচারটা এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেটই কোর্‌বে, আর তাহলে নিশ্চয় জেল।"

কুসুম মলিন মুখে বলিল, "জেল!"

"তা বৈকি! অন্ততঃ পাঁচ বছরের সশ্রম কারাবাস।"

কুসুমের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "পাঁচ বছর!"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "তা নয়তো কি, নেক্‌লেস্‌ চুরি কোরেছিলে কেন? এখন বোঝো মজাটা।"

কুসুম ছল ছল নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমারও জেল হবে?"

"হবে না? তোমার সাথে ধরা প'ড়ে গেছি যে। তবে পাঁচ বছর নয়, দু-এক বছরের হ'তে পারে।"

কুসুম চিন্তিতভাবে বলিল, "আচ্ছা, আমি যদি নেক্‌লেস্‌ চুরি স্বীকার করি? তোমাকে নির্দ্দোষ বলি?"

"তাহ'লে আমি খালাস পাবো, আর তোমার পাঁচ বছরের জায়গায় সাত বছর জেল হবে।"

"তা হয় হোক্‌, আমি তাই বোলবো।"

"তোমায় বোল্‌তে দোবো কেন?"

"যদি বলি?"

"তবে আমিও বোলবো যে হার চোর আমি, তুমি নির্দ্দোষ।" কুসুম স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "না, না, তা কোবো না, তাহ'লে আমি বিষ খাবো বোল্‌ছি।"

মোহিত হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "বিষ খাবে? থাক্‌ তা আর খেতে হবে না, কাল বাড়ী গিয়ে দুজনে মিলে দুধ ভাত খাওয়া যাবে বরং।"

"কেন? জেল হবে না?"

মোহিত হাসিতে হাসিতে বলিল, "দুর্‌ পাগ্‌লী, নিজের হার নিজে চুরি কোরে জেল?"

কুসুম বলিল, "কিন্তু এরাতো তা জানে না!"

"এরা নাই বা জান্‌লে, বাবা আব দাদামশাই তো জানেন?"

"তারা কি করে জান্‌লেন? চিঠি লিখেছো তাদের?"

মোহিত চিন্তিতভাবে বলিল, "না, তা লেখ্‌বার যো নেই যে!"

"কেন? এরা পৌঁছে দেবে না চিঠি?"

"তা দেবে, কিন্তু খুলে দেখ্‌বে যে?"

"দেখলেই বা।"

মোহিত স্ত্রীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "তাহ'লেই তো সব প্রকাশ হয়ে গেল। তোমার দেখ্‌ছি একটুও বুদ্ধি নেই, শুধু ফাঁকি দিয়ে পাশ কোরেছো।"

কুসুম বলিল, "তাহ'লে কি ক'রে জান্‌বেন বল না?"

"চাকর-বাকরগুলো হয়ত বোলে দিয়েছে; আর

তা যদি আমার ভয়ে না দিয়ে থাকে, বাবা আর দাদমশাই নাও জেনে থাকেন, তবু আমরা খালাস পাবো।"

"কি কোরে ?"

মোহিত বলিতে লাগিল, "কাল বিচারের সময় কোর্টে বাবা আর দাদামশাই আস্‌বেন; দাদামশাইর হার তিনি তো আস্‌বেনই। এলেই আমাদের চিন্‌তে পার্ব্বেন, আর তাহ'লেই একটা ব্যবস্থা কোর্ব্বেন নিশ্চয়।"

কুসুম এতক্ষণ পরে আসিয়া বলিল, "আমিতো ভেবে-ছিলুম সত্যি জেল হোলো বুঝি! যাক্, বাঁচা গেল।"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "বাঁচাতো গেল কিন্তু দাদা-মশাইকে জব্দ কোত্তে গিয়ে উল্‌টে নিজেরাই তার কাছে জব্দ!"

কুসুম হাসিয়া বলিল, শেষে তাইতো দেখ্‌ছি। আচ্ছা, কাল বাবা আর দাদামশাই আমাদের যখন আসামীর কাটগড়ায় দাঁড়াতে দেখ্‌বেন, তখন কি ভাব্‌বেন ?"

"কি আর ভাব্‌বেন ?"

"খুব আশ্চর্য্যি হয়ে যাবেন, নয় ?"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আর তোমার মুখখানি রাঙা হ'য়ে যাবে।"

"ছি—ছি! আমার তো এখনি কেমন লাগছে, বাবার সাম্‌নে এই বেশে দাঁড়াবো!"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "তা বোলে কি আর কোর্‌চো ?"

"কুসুম হাসিয়া বলিল, শুধু তোমার জন্যইতো এইটে হোলো।"

"আমার জন্যে কি ?"

"তুমি জেদ্ না কোল্লে আমি কক্ষনো সাহেব সাজ্‌তে যেতুম না।"

মোহিত হাসিয়া বলিল, "এখনতো আমারই দোষ হবে! চুরি কর্‌বার বেলা মনে ছিল না বুঝি ? থাক্ বাপু, ঘাট হ'য়েছে আমার; আর যদি তাতেও খুসী না হও, হাজিরই তো আছি, দাও কাণ ম'লে!"

কুসুম হাসিয়া বলিল, "তাই দেয়া উচিত তোমার।"

(৫)

পরদিন আলিপুর কোর্টের প্রাঙ্গন লোকে লোকারণ্য। আজ নেক্‌লেস্ চুরির অপরাধে অভিযুক্ত মিষ্টার কুলসন ও মিষ্টার ম্যানহিট্ নামক ফিরিঙ্গি অপরাধীদ্বয়ের বিচার হইবে কাজেই হুজুগপ্রিয় কলিকাতার অধিবাসীরা ব্যাপারটা কি হয় দেখিবার জন্য যে মাতিয়া উঠিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। পুলিশ বেটনের গুতা মারিয়া ভীড় কমাইবার চেষ্টা করিতেছিল বটে কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিয়াও কতকগুলি কৌতূহলী লোক ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল; কয়েকজন সংবাদ পত্রের রিপোর্টারও ইহার ভিতর ছিলেন। বিচারকের আসনে রায় তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বাহাদুর গম্ভীর মুখে বসিয়া একখানি কাগজ পড়িতে-ছিলেন; তাহার সম্মুখে টেবিলের উপর একছড়া বহুমূল্য নেক্‌লেস্। নিবটে একজন মুন্সি নীরবে কি লিখিতে-ছিলেন। সম্মুখে চেয়ারে কয়েকজন এসেসর ব্যাপারটা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়াছিলেন; তাহাদের পার্শ্বে জষ্টিস্ চন্দ্রকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় বসিয়াছিলেন এবং পশ্চাতে কয়েকজন ব্যারিষ্টার ও উকিল; প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার হরমোহন মুখোপাধ্যায়ও ইহার মধ্যে ছিলেন।

পাব্‌লিক্ প্রসিকিউটার (সরকারী উকিল) সংক্ষেপে ঘটনাটা সকলকে বুঝাইয়া দিলে, কয়েকজন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল; ইন্‌স্‌পেক্টর নরহরি সিং ও কনেষ্টবলগণ তাহাদের অন্যতম। তাহাদের সাক্ষ্য শেষ হইলে বিচারক টেবিলের উপর হইতে হারছড়া তুলিয়া লইয়া চন্দ্রকিশোর বাবুকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই নেক্‌লেস্ ছড়া চেনেন ?"

চন্দ্রকিশোরবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, ওটা আমার।"

"আপ্‌নি এটা কোথায় পেয়েছিলেন ?"

"গত বুধবার বিকেলে জুয়েলারস্ হীরালাল পান্নালালের দোকান থেকে আমি ওটা আমার নাত্‌নীর জন্য কিনে আনি।"

"তারপর বোলে যান।"

চন্দ্রকিশোরবাবু তারপর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত বলিলে বিচারক হীরালাল ও পান্নালালের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপ্‌নারা কি এই নেক্‌লেস্ চন্দ্রকিশোরবাবুর কাছে বেচেছিলেন ?"

উভয়ে বলিলেন, "হ্যা।"

"কে বেচেছিলেন ?"

হীরালাল বলিলেন, "আমি, ৫০০০৲ টাকায়।

বিচারক নত মস্তকে লিখিতে লিখিতে মৃদুস্বরে বলিলেন, "আসামীদের আনা হোক্।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে কনেষ্টবল পরিবেষ্টিত হইয়া মিঃ কুল্‌সম্ ও ম্যান্‌হিট্ট আসামীর কাটগড়ায় আসিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইলেন। সকলেরই উৎসুক দৃষ্টি অপরাধী-দ্বয়ের দিকে পড়িল; একবার চাহিয়াই ব্যারিষ্টার হরমোহনবাবু ও জষ্টিস্ চন্দ্রকিশোরবাবু চম্‌কিয়া উঠিলেন। হরমোহনবাবু দেখিলেন পুত্র এবং পুত্রবধূ! চন্দ্রকিশোর বাবু দেখিলেন মোহিত ও কুসুম! উভয়ে বিবর্ণ মুখে নীরবে দৃষ্টি বিনিময় করিলেন।

বিচারক ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপ্‌নাদের নাম ?"

মিঃ ম্যান্‌হিট্ট মাথা তুলিতেই পিতা এবং দাদাশ্বশুরের সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল; তাহার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া মোহিত বলিল, "আমার নাম ম্যানহিট্ট আর ইনি মিঃ কুল্‌সম্।" মিঃ কুল্‌সম্ বহুপূর্ব্বেই পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি নত মস্তকেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপ্‌নারা এই হার কোথায় পেলেন ?"

"ওটা আমাদের; আমাদের দাদামশাই দিয়েছেন।"

"আপনাদের দাদামশাই কে ? তার নাম কি ?"

"বোল্‌বো না।"

"আপ্‌নাদের দুজনেরই দাদামশাই ? তবে কি উনি আপনার—"

বাধা দিয়া মিঃ ম্যান্‌হিট্ট বলিলেন (না, কখন না।)

"তবে মিষ্টার কুল্‌সম্ আপনার কে হন ?"

মিষ্টার ম্যান্‌হিট্ট একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "বোল্‌বো না।"

বিচারক একটু চিন্তা করিয়া মিঃ কুল্‌সমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিঃ কুল্‌সম্, নেকলেসটা আপনার গলায় ছিল ?"

মোহিত কুসুমের গা টিপিয়া বলিল, বল"

কুসুম বিচারকের মুখের দিকে মুহূর্ত্তমাত্র চাহিয়া আবার মস্তক নত করিল।

বিচারক আবার বলিলেন, "নেক্‌লেস্‌টা আপনার গলায় ছিল ?"

সাহেববেশী কুসুম বলিল, "হ্যা।"

"পুরুষেতো নেক্‌লেস্ পরে না, আপ্‌নি পরেছিলেন কেন ?"

"সখ্ হয়েছিল।"

"এমন অদ্ভুত সখ কেন হোলো ?"

মিষ্টার কুল্‌সম্ নীরবে নতমুখে রহিলেন।

বিচারক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আসামী-দের পক্ষে বল্‌বার কেউ আছেন ?" প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার হরমোহন মুখোপাধ্যায় ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিচারক হরমোহনবাবুর দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপ্‌নি কিছু বোল্‌তে ইচ্ছে কোল্লে বোল্‌তে পারেন।" হাসিটুকুর অর্থ এই যে পুত্রবধূর নেক্‌লেস্ চোরের পক্ষে ওকালতী করিবেন শ্বশুরমহাশয়; ব্যাপার মন্দ নয়।

ব্যারিষ্টার হরমোহনবাবু বলিলেন, "আমি জষ্টিস্ চন্দ্রকিশোরবাবুকে এবং জুয়েলার হীরালালবাবুকে জেরা কোর্‌তে ইচ্ছে করি।"

বিচারক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে।"

সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে প্রায় সকলেই অবগত যে চন্দ্রকিশোরবাবুর পৌত্রী হরমোহনবাবুর পুত্রবধূ; কাজেই সকলে আশ্চর্য্য হইয়া উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং কিরূপ জেরা করা হয় শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। আদালতের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি উঠিল; মোহিত একবার পিতার দিকে চাহিয়া মুখ নামাইল।

ব্যারিষ্টার চন্দ্রকিশোরবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঐ নেক্‌লেস্‌টা আপ্‌নার বোললেন না ?"

চন্দ্রকিশোরবাবু বলিলেন, "হ্যা আমার।"

"আপনি ঠিক বোল্‌তে পারেন ঐ নেক্‌লেস্‌টাই আপনার, ওটা ছাড়া দ্বিতীয় নেক্‌লেস্ নয় ?"

চন্দ্রকিশোরবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না তা বোল্‌তে পারি না; তবে আমার নেক্‌লেস্ অবিকল ঐরূপ বটে।"

ব্যারিষ্টার হীরালালের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপ্‌নি ঐ নেক্‌লেস্ চন্দ্রকিশোরবাবুর কাছে বেচে-ছিলেন?"

হীরালাল বলিলেন, "হ্যা।"

"ঠিক্ ঐ হার?"

"হ্যা।"

"আপ্‌নি ঐ রকম হার আজ অবধি কছড়া বেচেছেন?"

"ঐ এক ছড়া।"

"ঐ রকম হার আপ্‌নার দোকান ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না?"

"না।"

বিলাতে?

"যেতে পারে, জানি না।"

"তাহ'লে আপ্‌নি কি ক'রে বলেন এইটেই সেই হার?"

হীরালাল থতমত খাইয়া বলিলেন, "না—হ্যা, তবে অবিকল এই রকম।"

ব্যারিষ্টার হরমোহনবাবু ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ নীরবে গত হইলে বিচারক এসেসরগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপ্‌নারা সব শুন্‌লেন। আসামী পক্ষীয় ব্যারিষ্টার প্রমাণ কোত্তে চেয়েছেন যে এই নেক্‌লেস্ অপহৃত নেক্‌লেস্ নাও হোতে পারে; কিন্তু আসামীরা নেক্‌লেস্ কোথায় এবং কার কাছে পেয়েছে তা স্পষ্টতঃ কিছু বোল্‌তে চায় না; বিশেষতঃ পুরুষের গলায় নেক্‌লেস্ থাকাও সন্দেহজনক বোলে ধরা যেতে পারে। এখন আপ্‌নারা পরামর্শ করুন।"

এসেসরগণের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন উত্থিত হইল। জষ্টিস্ চন্দ্রকিশোরবাবু একবার নীরবে বিচারকের মুখের দিকে চাহিলেন, একবার এসেসরগণের মুখের দিকে চাহিলেন, তারপর স্থিরভাবে উঠিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পর বিচারক এসেসরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপ্‌নারা একমত হয়েছেন?"

সকলে উৎসুক নয়নে এসেসরগণের দিকে চাহিলেন। এসেসরদিগের মধ্যে একজন বলিলে, "হ্যাঁ, আমরা একমত, আসামীরা দোষী।"

মিষ্টার 'ম্যান্‌হিট্'এর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, মিষ্টার কুল্‌সম্ মড়ার মত সাদা হইয়া গেলেন। বিচারক কি রায় দেন শুনিবার জন্য সকলে উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

বিচারক একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আসামীদ্বয়ের একবৎসর কোরে সশ্রম কারাদণ্ড হওয়াই আইন অনুসারে উচিত, কিন্তু তাদের অল্প বয়সের দরুণ এবং এই প্রথম অপরাধ বোলে আমি ছ মাস কোরে—" এমন সময় একজন চাপ্‌রাশী ত্বরিতপদে গিয়া বিচারকের পার্শ্বে দাঁড়াইল। বিচারক ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কি?" চাপরাশী সেলাম বাজাইয়া একখানি ক্ষুদ্র পত্র টেবিলের উপর রাখিয়া পুনরায় সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। পত্রখানির দিকে চাহিয়া বিচারক শান্ত হইলেন। তাহাতে লেখা ছিল:—

রায় দেবেন না। মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত বিশেষ জরুরী কথা আছে, বিশ্রাম কক্ষে আসুন।

চন্দ্রকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্রখানির দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে বিচারক বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি ছ মাস কোরে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়াই উচিত মনে করি; কিন্তু শেষ রায় (Final Judgment) দেবার আগে আমি একবার বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে এ বিষয়ে চিন্তা কোরে দেখ্‌বো।"

বিচারক ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন; আদালতে পুনরায় একটা মৃদু কোলাহল উত্থিত হইল। মোহিত ও কুসুমের মুখ একটু প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে আসিয়া রায় তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বাহাদুর বিচারকের আসন গ্রহণ করিলেন; মুহূর্ত্তে আদালত নীরব হইয়া গেল। বিচারক একবার এসেসর-গণের দিকে ও একবার আসামীদের দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; তারপর বলিলেন, "আমি ভেবে দেখ্‌লুম আসামীদের দেখে ভদ্রলোক বোলেই মনে হয়,

তাদের মুখ দেখ্‌লেও নির্দোষ বোলে বোধ হয়। অসামীরা কোন কারণ বশতঃ হয়তঃ বিশেষ কিছু বোল্‌তে চান না, কিন্তু তাই বোলে যে তারা দোষী এবং এই নেক্‌লেস্‌ তাদের নয় তা বলা যায় না; কারণ জষ্টিস্‌ চন্দ্রকিশোর বাবু ও জুয়েলার হীরালাল নেক্‌লেস্‌ ভাল করে সনাক্ত কোত্তে পারেন নি। বিশেষতঃ যাদের সঙ্গে চন্দ্রকিশোর বাবুর কোন সম্পর্ক নেই এমন দুজন অপরিচিত ইয়োরোপীয়ান রাত্রে তার বাড়ী ঢুকে তার কোমর থেকে চাবি নিয়ে হাতবাক্স খুলে নেক্‌লেস্‌ চুরি কোরে বেরিয়ে গেল, অথচ কেউ দেখ্‌লে না, জান্‌লে না, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব বোলে মনে হয়। হার কেনার সময় এবং হাতবাক্সে রাখার সময় আসামীরা দেখেছিল, অথবা কোন দাস দাসী তাদের সে সব খবর দিয়েছিল, অথবা নিজেই চুরি করে তাদের দিয়েছিল, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এখন শুধু পুরুষের গলায় নেক্‌লেস্‌ থাকা সন্দেহ জনক। কিন্তু কোন কার্য্য বশতঃ নেক্‌লেস্‌ তখন আসামীদের কাছে ছিল এবং হারিয়ে যাবার অথবা চুরি যাবার ভয়ে মিঃ কুল্‌সম্‌ তা নিজের গলায় পরেছিলেন, এটা সম্পূর্ণ সম্ভব; যদিও আসামীদ্বয় নিজেদের কোন গোপনীয় অথচ সৎ কারণ থাকা বশতঃ আমি তাদের Benefit of Doubt (সন্দেহের সুবিধা) উপভোগ কোত্তে দিলুম তাঁরা সসম্মানে অব্যাহতি পেলেন।"

কোর্টের ভিতর একটা কোলাহল উত্থিত হইল। মোহিত ও কুসুমের মুখমণ্ডল হর্ষোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। একজন কনেষ্টবল ত্বরিতপদে গিয়া আসামীদের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। বিচারপতি তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মিষ্টার ম্যান্‌হিট্‌ ও মিষ্টার কুল্‌সম্‌ আপনারা মুক্ত, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন।"

মোহিত কুসুমের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে আদালতের বাহিরে আসিল। তথায় মোহিতের নিজস্ব মোটরখানা নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল; মোহিত কুসুমকে লইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিবামাত্র মোটরখানি বায়ুবেগে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল:—গতকল্য নেক্‌লেস্‌ চুরির অপবাধে অভিযুক্ত মিঃ ম্যান্‌হিট্‌ ও মিঃ কুল্‌সম্‌নামক অপরাধীদ্বয়েব বিচার হইয়া গিয়াছে। উপযুক্ত প্রমাণের অভাব বশতঃ রায় তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বাহাদুর তাহাদিগকে সসম্মানে অব্যাহতি দিয়াছেন। নির্দোষের উপর এরূপ নির্দোষ বিচার আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু আসামী ফিরিঙ্গি হইলেই হঠাৎ প্রমাণেব অভাব হইয়া পড়ে কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক জষ্টিস্‌ চন্দ্রকিশোর মুখোপাধ্যায় ইন্‌স্‌পেক্টর নরহরি সিংহকে পূর্ব্ব ঘোষণা মত ১০০্‌ টাকা পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্‌!

ইন্দ্রধনু

(ভাবানুবাদ)

শ্রীকালিদাস রায়

বিজ্ঞানের 'স্থূল হস্ত অবলেপ' লভি'
মিলাইছে একে একে বিশ্ব হতে মাধুরীর ছবি,
গগনে আছিল রামধনু
জানিতাম কল্প-স্বর্গ সুষমায় গড়া তার তনু,
আজি সে যে রাজে,
অবজ্ঞাত প্রাকৃতিক বিকারের তালিকার মাঝে।
বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ কাঁচিখানি,
ছেঁটে দিবে পাখাগুলি স্বর্গদূতগণে টেনে আনি'।
বিজ্ঞানের বিধান নিদেশ
সকল রহস্য স্বপ্নে একে একে করিছে নিঃশেষ।
ধরিত্রীর কোষাগার খুলি'
মণি-কোটা ভেঙে চুরে প্রস্তু ত করি চূর্ণ ধূলি
নিখিল জীবনময় পবনেরে শূন্য করে' তুলি'
বিশ্লেষিছে হায়
আখণ্ডল ধনুখানি-খণ্ড খণ্ড তুচ্ছ ক্ষুদ্রতায়।
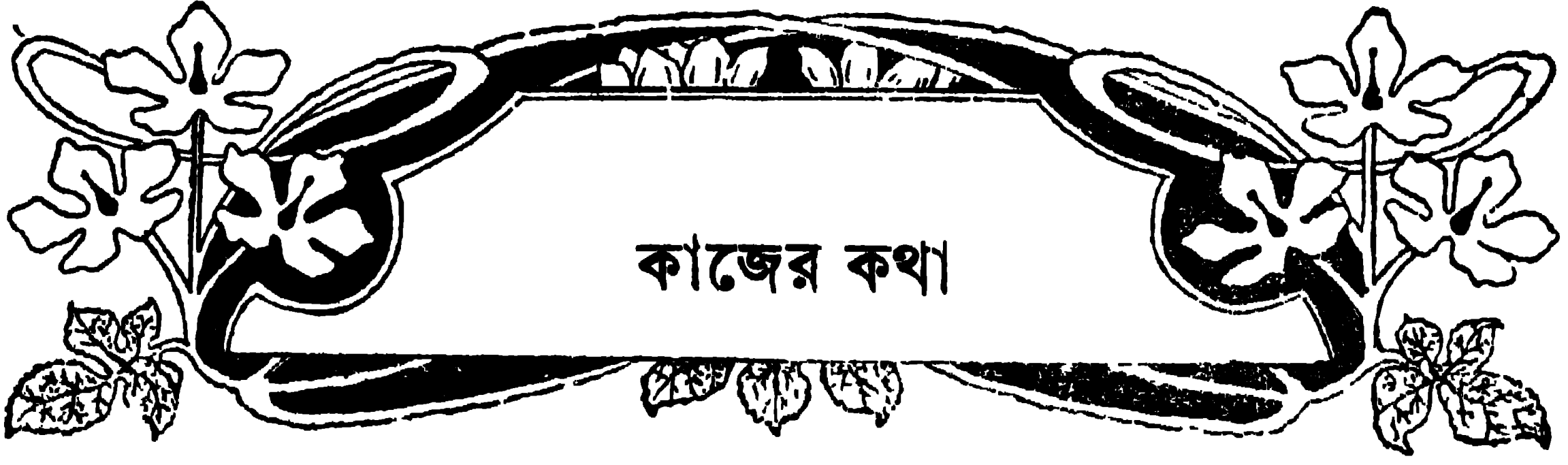
কাজের কথা

হাইকোর্টের জজ মিঃ পেজ, হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ শরৎ বসুর প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন— এবং মিঃ বসু সেজন্য উক্ত জজের এজলাস ছাড়িতে বাধ্য হন। হাইকোর্টের ব্যবহারজীবিগণ জজের এই অসৌজন্যে নিজেদের অপমানিত বোধ করিয়াছেন। প্রতিবাদ স্বরূপ জনসাধারণের পক্ষ হইতে গত রবিবার টাউনহলে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সাধারণের অনুষ্ঠিত এই সভায় হাইকোর্টের দেশী বা বিদেশী কোনরূপ ব্যবহারজীবিরই প্রাচুর্য্য দেখা যায় নাই। সাধারণের সঙ্গে ইঁহাদেরও সহানুভূতি দেখাইলে ভাল হইত না কি? হাইকোর্টের কোন বিচারকের ব্যবহারের প্রতিবাদ হাইকোর্টের ব্যবহারজীবিরাই সহজে করিতে পারেন—যদি আত্মমর্য্যাদার উপরে ইঁহাদের আস্থা থাকে। বর্ত্তমান ব্যাপারে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। সাধারণের আবেদন নিবেদন মহামান্য সম্রাট পর্য্যন্ত পৌছিতে কতকাল লাগিবে কে জানে? সম্মানিত ব্যবসায়ের তৌলদণ্ড, ব্যবসায়ী ও দ্রব্যের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক থাকিলেই ব্যবসায় ভাল চলে—আড়া-আড়িতে তিনের কে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কে জানে?

পেজসাহেবের সহিত ব্যারিষ্টার শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের যে ঝামেলা বাধিয়াছে সেই প্রসঙ্গে এ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ এস্ আর দাশ ন্যায়ের পক্ষে যেভাবে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা শত্রু মিত্র নির্ব্বিচারে প্রশংসনীয়— কর্ত্তব্য যত কঠোর হউক তাহা অকুণ্ঠিতভাবে যিনি পালন করিবেন তিনিই দেশবাসীর হৃদয় জয়ে সমর্থ হইবেন। কাউন্সিল ইলেক্‌সানের পর তিনি একরকম আন্দোলনের বাহিরে পড়িয়াছিলেন—এই ঘটনায় আবার সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন—এই পথে চলিলে অদূর ভবিষ্যতে আবার হয়তো দেশবাসীর 'আপনার' হইয়া দাঁড়াইতে পারেন—ব্যবহারেই আপন পর হয় এবং পর আপন হয়। তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা বনলতা দাস মহাশয়াও একটু একটু করিয়া সাধারণের হিতজনক কার্য্যে নামিতেছেন—সেদিন ফরওয়ার্ডে দেখিলাম দেশবন্ধুর পত্নী শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর সহিত তিনি শ্রীমতী লতিকা ঘোষের (পরলোকগত কবি, শ্রীঅরবিন্দের ভ্রাতা ও প্রেসিডেন্সীর প্রফেসর মনমোহন ঘোষের কন্যা) পিতার লিখিত ইংরাজী কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রচারিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, এইরূপ চেষ্টা যখন তাঁহাদের সামাজিক গণ্ডীর বাহিরে ছাপাইয়া পড়িবে তখনি মহিমার অম্লান সুন্দর দীপশিখাপাতে তিনি আবার সত্য সত্যই মহীয়সী হইয়া দাঁড়াইবেন—এই বন্ধন দৃঢ় হউক—এ সকল চেষ্টা সফল হউক—দেশের ছেলেমেয়েরা আবার দেশের কোলে ফিরিয়া আসুন।

এঁদের ভাল কাজ করিলে ভাল বলাও দায় কারণ আমাদের সহযোগীগণের মধ্যে কেহ কেহ, সরকারী কর্ম্মচারী ভাল হইতে পারে না, ইহা রাজনীতির একতন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ ভাবিয়া কার্য্য নির্ব্বিচারে গালি পাড়েন—আমরা তাহা না করিয়া প্রশংসা করিলাম তজ্জন্য বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলাই নবযুগের নীতি।

পুলিশ রিপোর্ট—গত বৎসরের পুলিশের বাৎসরিক রিপোর্ট যথারীতি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে এবং নিয়মিত প্রথানুসারে উহাতে পুলিশেরও গোয়েন্দা বিভাগের কৃতিত্বের কথা ও পুলিশের অদ্ভুত কার্য্যকারিতার কথা উল্লেখ করিয়া পুলিশ কর্ম্মচারীদের বাসস্থানের পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হইয়াছে। পুলিশ বাহবা লইয়াছেন সেই গোপীনাথ সাহার মামলায় ও আলিপুর ষড়যন্ত্রের মামলায়। গোপীনাথ

সাহাকে পুলিশে ধৃত করে নাই সুতরাং সে প্রশংসা তাহাদের প্রাপ্য নহে এবং ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিশের আচরণ একেবারে নির্দ্দোষ ও আলোচনার বহির্ভূত নহে। গুণ্ডাদমন জাল-নোট ধরার মামলাটীতে অবশ্যই তাঁহারা প্রশংসার অধিকারী। গোপীনাথের বা এরূপ শ্রেণীর লোকেদের মতে টেগার্ট সাহেব শত্রু বিবেচিত হইলেও আমরা তাহা মনে করি না; পরন্তু তাঁহাকে কর্ত্তব্যপরায়ণ দক্ষ ও সুযোগ্য ব্যক্তি বলিয়া প্রশংসা করা যায়। গুণ্ডা-দমনে তিনি নিজে যেরূপ যত্ন ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ তাহার ষোড়াশাংস যত্ন লইলে—কলিকাতায় আজ গুণ্ডার উপদ্রব থাকিত না। তাহারা যেটুকু করিয়াছে, তাহা অতি সামান্য ও টেগার্টসাহেবের ভয়ে অর্থাৎ চাকরী বজায় রাখিবার জন্য সুতরাং তাঁহাদের কোনরূপেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বলা যায় না। তবে সহরের শোভাবর্দ্ধনার্থ ও গৌরাঙ্গদেবদের সুবিধার্থ পুলিশ থাকা আবশ্যক। সুতরাং তাহাদের ভাড়া বাড়ীতে রাখিয়া ব্যয়বাহুল্য না করিয়া উহাদের জন্য বাটী নির্ম্মাণ অর্থ-নৈতিক হিসাবে অনুমোদন করা উচিত। আমাদের কাউন্সিল মেম্বরদেব এবিষয়ে বিবেচনা করিয়া ভোট দিবার জন্য আমরা অনুরোধ করি। তবে এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলিবার আছে—বাঙ্গলার সমস্ত কনষ্টেবলই বাঙলার বাহিরের লোক এবং অশিক্ষিত বলিয়া ক্ষমতা হাতে পাইলে তাহাদের সহজেই মেজাজ বাঁকিয়া বসে এমন কি ভদ্রলোকের সহিত কথা পর্য্যন্ত তাহারা কহিতে জানে না অধিকন্তু গুণ্ডা প্রভৃতি জীবগণ তাহাদের স্বদেশীয় বলিয়া তাহারা উহাদের উচ্ছেদকরণে সবিশেষ চেষ্টা পায় না, কারণ অশিক্ষিত লোকের স্বজাতি-প্রীতি অতি স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলার কনেষ্টবল বাঙালী—হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিচারে লওয়া উচিত কারণ আধুনিক পুলিশের কার্য্যে শারীরিক শক্তির কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না; আবশ্যক—বুদ্ধির ও সৎসাহসের। বাঙলার লোকে অশিক্ষিত অবাঙালীদের চেয়ে বুদ্ধিতে ও সৎসাহসে অনেক শ্রেষ্ঠ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দুচারপয়সা পাইবার লোভেই এই শ্রেণীর লোকেরা উপরস্থ কর্ম্মচারীদের ভৃত্যের ন্যায় সেবা করে এমন কি জুতাও ঝাড়িয়া দেয়—বাঙালী কনষ্টেবল অবশ্য চাকরীর খাতিরে তাহা কখন করিবে না—একদিন ছিল যখন তাহা হয় তো সম্ভব হইত—তবে এখন বাঙলার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান হইয়াছে এখন ঐরূপ সর্ত্তে কেহ চাকরী লইবে না; তবে পুলিশের কাজ যে তাহাদের দ্বারা অধিকতর সুসম্পন্ন হইতে পারে তাহা প্রমাণ করিতে কেবল পরীক্ষার যা অভাব। কাউন্সিলের মেম্বরগণ এবিষয় একটু মাথা ঘামাইলে বাঙলার অনেক উপকার হইতে পারে।

সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘ। গত রবিবার অপরাহ্ণে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়ান গৃহে উক্ত সমিতির সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি ছিলেন প্রবীণ সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। এই সভার বিগত বর্ষের বার্ষিক রিপোর্ট, আয় ব্যয়ের হিসাব পঠিত ও গৃহীত হইলে সভাপতি, সেক্রেটারী, তাঁহাব সহকারী এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন হয়। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এরূপ সমিতির আবশ্যকতা ও উপকারিতা বুঝাইয়াছেন ও অল্প দিনে এই সভা যে কত কার্য্যকরী ও শক্তিশালী হইয়াছে, তাহার কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দান করা হয় ও সভা ভঙ্গ হয়। সভা ভঙ্গের পূর্ব্বেই শ্রীমান অজিতকুমার ঘোষ নামক একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশু মধুর সঙ্গীতে সকলকে তৃপ্ত করেন। শ্রীযুক্ত ভবতোষ রায় মহাশয় ও বিদূষক সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কয়েকটী অনুকৃতি কৌতুক সাফল্যের সহিত অভিনয় করিয়া বিশুদ্ধ নির্ম্মল হাস্যরসে সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে পরিতৃপ্ত করেন। আমরা এই সভার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি ও ইহার প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু মহাশয়কে তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রমের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি; কারণ তাঁহার উদ্যোগ ব্যতীত এ সভা আজ এ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত কিনা সন্দেহস্থল।

আড়াই বৎসর পূর্ব্বে চার্লাস ডায়গন্ধর (ইণ্ডিয়া) লিঃ নামক একটী ভূয়া কারবারের চাল দিয়া হরিসত্য বিষ্ণু, তস্য ভ্রাতা ও চার্লস ইভান্স নামক এক সাহেব সাধারণকে প্রতারিত করিবার অভিযোগে সাত বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক নিরীহ ব্যক্তি ও ব্যবসা-

দারকে প্রবঞ্চিত করাই ইহাদের ব্যবসা ছিল। হঠাৎ সেদিন শুনিলাম যে তাহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রত্যাহৃত করিয়া দণ্ড নামঞ্জুর করা হইয়াছে, কি জন্য এমন করা হইল তাহার কোন উল্লেখ নাই—এরূপ একজন 'ধুরন্ধর ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গগণ' বাহিরে আসিলে আবার নূতন কৌশল জাল পাতিয়া যে সাধারণের সর্ব্বনাশ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে যদি শ্বেতাঙ্গের সংলিপ্ততারূপ পুণ্য ফলে তাহারা ছাড়া পাইয়া থাকে তাহাতে আমরা মোটেই বিস্মিত হইব না। এসম্বন্ধে সাধারণে সব কথা খোলসারূপ জানিতে চাহে কারণ রহস্যাবৃত থাকিলে 'মন্দ লোকে সন্দ করে কি জানি কি বলবে ছাই।"

চিকিৎসা-বিদ্যালয়। মেডিকেল কলেজ কারমাইকেল কলেজ, ক্যাম্পবেল স্কুল প্রভৃতিতে স্থানাভাব হেতু অনেক ছাত্রই ডাক্তারী শিখিবার আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য একদল-লোক বড় বড় নাম দিয়া নূতন নূতন মেডিকল কলেজের বিজ্ঞাপন ছাড়িতেছেন। এই সকল কলেজের বিজ্ঞাপন পুস্তিকাগুলি দ্বৈত ভাবপূর্ণ ভাষায় লিখিত। তাঁহাদের কলেজ "শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক "এফিলিয়েটেড" হইবে—বড় বড় হাঁসপাতালের নাম দিয়া সেখানে হাতে কলমে ডাক্তারী শিখিবার ব্যবস্থা করা হইবে। এমন কি অনেকে বোর্ডের মধ্যে মন্ত্রী মহাশয়ের নাম ও সংযুক্ত করিয়াছেন অথচ মন্ত্রীমহাশয় এক কমুনিকে জানাইতেছেন যে তিনি এবিষয়ে বিন্দু বিসর্গ ও জানেন না। আবার মফঃস্বলের ছেলেদের ধাঁধা লাগাইবার জন্য বিজ্ঞাপন পুস্তিকার প্রচ্ছদ পটে রাজকীয় চিহ্ন (Royal court of arms) ইহারা ব্যবহার করিয়া ইহাকে সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাদৃশ্য দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চিকিৎসা-বিদ্যার্থীগণকে খুব সাবধানে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে আমরা অনুরোধ করি। প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়া অর্থ ও ভবিষ্যৎ উভয়ই যেন নষ্ট না করেন। সরকার হইতে এই সকল প্রতারণার প্রতিবিধান করিবার মত কি কোন পন্থা নাই—যাহারা দরিদ্র ছাত্রদের অর্থ অপহরণে ইতস্ততঃ করে না—তাহারা সাধারণ ফৌজদারী আসামী অপেক্ষা কিসে দয়ার পাত্র?

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ ঃ—স্বরাজ্যদলের হস্তে কর্পোরেশনের কর্ত্তৃত্ব আসাতে সহরের স্বাস্থ্য ও বসবাসের সুবিধা ও উন্নতি হইবে ইহা সহরবাসীরা সকলেই আশা করিয়াছিল—কিন্তু এবিষয়ে এপর্য্যন্ত তাঁহাদের লক্ষ্য ও চেষ্টার কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই— এত তাড়াতাড়ি অবশ্য বেশী কিছু আশা করা যায় না—তবে অন্ততঃ কিছু কিছু দেখিতে পাইলেও লোকে আশ্বস্ত হইতে পারে। কুল্পী বরফ খাইতে নিষেধ করিবার বিজ্ঞাপন প্রচার অবশ্য করিয়াছেন—ইহা স্বাস্থ্যের দিক দিয়া কার্য্যকরী—কিন্তু কুল্পী বরফ সাধারণতঃ ছোট ছোট ছেলেরাই বেশী খাইয়া থাকে এবং বিজ্ঞাপন পড়িবার বা বুঝিবার চেষ্টা বা সামর্থ্য তাহাদের নাই—এর চেয়ে কুল্পী বরফওলাদের খারাপ বরফ বেচার জন্য দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিলে বোধহয় বেশী উপকার হইত। এরূপ করা হইয়াছে কিনা তাহার সঠিক সম্বাদ আমরা জানি না, কারণ সংবাদ-পত্রে এরূপ কিছু দেখি নাই।

অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ভোজনে সেদিন ভবানীপুরে বিষম অনর্থ ঘটিয়া গিয়াছে তাহা সকলেই জানেন—অনেকেই অনুমান করেন যে ইহা পচা ইলিশমাছ খাওয়ার ফল। পচা মাছ বাজারে কেন বিক্রয় হয়? মৎস্যাদি পরীক্ষা করিবার জন্য কর্পোরেশনকে অনেকগুলি ডাক্তারকে মোটা বেতন দিয়া পুষিতে হয়, তাঁহারা কি এই-রূপে তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালন করেন? তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্য নিয়মিত করিতেছেন কিনা তাহা পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা—এবং যদি থাকে তো পরীক্ষক মহাশয় কি করেন—যদি এইসকল লোক থাকা সত্ত্বেও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য বাজারে বিক্রীত হয়—তবে এগুলিকে অনর্থক রাখা কেন? নূতন একজিকিউটিভ অফিসার 'তাজা রক্তে'র পক্ষপাতী তিনি এসকল বিষয়ে একটু তাজাত্ব আনিবার চেষ্টা করিলে বোধহয় বিস্তর সহরবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীগণ যে সকলেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নহেন তাহার উদাহরণের অভাব নাই, নূতনবাজার, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট—যাহাতে মিউনি-সিপ্যালিটীর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে—প্রভৃতিতে প্রত্যহ রাশি রাশি পচা মাছ অবাধে বিক্রয় হইতেছে—নূতনবাজার

না হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি উহার কর্ত্তারা সাধারণের জন্য এসব অন্যায় বন্ধ করিলে পাছে তাঁহাদের দোকানদার কমিয়া আয় কমিয়া যায়—নাও বন্ধ করিতে পারেন, কিন্তু খোদ মিউনিসিপ্যালিটীর বাজারে এসব কি করিয়া চলিতে পারে তাহা বুঝা যায় না—এতে যদি লোকে পর্য্যবেক্ষকগণের উপর সন্দিগ্ধ হয় তো তা খুব অন্যায় হয় না—এসকলের প্রতিকার তরুণ কর্ম্মী সুভাষবাবু সহজেই করিতে পারেন।

কলিকাতার প্রবেশ দ্বার স্বরূপ হাওড়ার পুলের মুখে ৬০নং ক্লাইভষ্ট্রীট ও ৪৩নং ষ্ট্রাণ্ড রোডের মধ্যে একটী খোলা নর্দ্দামা আছে। উহা হইতে অবিরত পচা দুর্গন্ধ ও ময়লা জল বাহির হইয়া প্রত্যহ পথিকদের ও পার্শ্বস্থ দোকানদারগণের বিরক্তি উৎপাদন করে ও স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়। তত্রস্থ ব্যবসায়ীরা উহা নিবারণ করে বহুদিন যাবৎ কর্পোরেশনের মালিকদের নিকট লেখালিখি করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া লোকজন সহ দিন রাত ঐ পুতিগন্ধ উপভোগ করিতেছেন, এটির প্রতিকার বিশেষ আবশ্যক কারণ উহাতে জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। আর এরূপ স্থানে এরূপ খোলা পয়ঃপ্রণালী রাখিতে দেওয়াও মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষে একান্ত গর্হিত। কোন ধনী বাড়ীওয়ালার সুবিধার জন্য সাধারণকে অসুবিধা ভোগ করান গণতন্ত্রের নীতিবহির্ভূত, এখন গণতন্ত্রবাদীরা সিংহাসনে বসিয়া এসবের প্রশ্রয় যেন আর না দেন।

বিবিধ সংবাদ

লোকমান্য তিলকের প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।

গত ২২শে জুলাই পুণা মিউনিসিপালিটীর রিয়াই মার্কেটের সম্মুখে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু লোকমান্য তিলকের পূর্ণাবয়ব মর্ম্মরমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচনোৎসব সম্পন্ন করেন। উক্ত সহরের সর্ব্বসম্প্রদায়ভুক্ত দশ সহস্রাধিক লোক সমবেত হইয়াছিলেন। সমবেত জনতা বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে পণ্ডিতজীকে অভ্যর্থনা করে। অভ্যর্থনা সমাপনান্তে পুণা মিউসিপালিটীর প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত কেলকার পণ্ডিতজিকে, মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচনের জন্য অনুরোধ করেন। এই উপলক্ষে পণ্ডিতজী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন যে, পুণা সহরে এরূপ মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা নূতন। মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে পুণা মিউনিসিপ্যালিটীর বেসরকারী সদস্যেরা সকলেই একমত এই সম্পর্কে তাহারা গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হইয়াছেন সরকার তাঁহাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা রুজু করিয়াছেন "কেশরী" এবং "মারহাট্টা" পত্রিকার ট্রষ্টিগণ সদস্যদিগকে এই বিপদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য ৯ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। লোকমান্য তিলক জীবিতাবস্থায় স্বদেশের হিতার্থ যখনই কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখনই বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সকল বাধা অতিক্রম করিয়া পরিণামে তিনি জয়যুক্তও হইয়াছেন। তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাতেও সেই ব্যপারের পুনরভিনয় পরদৃষ্ট হইল। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ট্যাক্স আদায় করাই একমাত্র কর্ত্তব্য নহে। নগরবাসী-দিগের সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং আর্থিক উন্নতি বিধানে সাহায্য করাও তাহার প্রধান কর্ত্তব্য। পণ্ডিতজী মূর্ত্তিনির্ম্মাতা ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে এবং শ্রীযুত কেলকারকে ধন্যবাদ দিয়া লোকমান্য তিলকের স্মরণার্থ তদীয় মর্ম্মমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচিত করিয়াছেন।

খলিপা নিয়োজনে মহাত্মা গান্ধী

ইরাক্ থেকে এখানে একদল মুসলমান ডেপুটেশান আসিতেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য রাজা হুসেনকে খালিফ্ করা, সেজন্য ভারতবর্ষীয় মুসলমান সমাজে অন্দোলন করা, তাঁরা মুরুব্বী পাক্ড়াবেন মহাত্মা গান্ধীকে। মহাত্মা অবশ্য আলী ভ্রাতৃদ্বয়, ডাঃ আনসারি, মৌলানা আজাদ প্রভৃতির মত না লইয়া কোন কার্য্য করিবেন—আমাদের বোধ মনে হয় না। এরূপ আন্দোলন চালান হইবে কি না, তাহার ভার পড়া উচিত খালিফৎ কমিটীর উপর; কারণ যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত পড়া উচিত।

দেশবন্ধুর বিলাত যাত্রা।

দেশবন্ধু দাশ নাকি শীঘ্রই বিলাতে যাইবেন উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যলাভ ও রাজনৈতিক আন্দোলন—তাঁহার পত্নী ও তাঁহার সঙ্গে যাইবেন শুনিতেছি। তিনি যে লেবার পার্টী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যাইতেছেন না, একথা সেদিন কর্ণেল ওয়েজউডের কথায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যাহাই করুন তবে "স্বরাজ" ভিক্ষা করিয়া আনিবেন না—এ বিশ্বাসটুকু তাঁর মনুষ্যত্বের উপর আমাদের আছে। তবে এ সম্বন্ধে তাঁহার ফরওয়ার্ডে এ যাবৎ কিছুই প্রকাশিত হয় নাই।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

মিঃ সি, ভোরাইস্বামী আয়েঙ্গার নামক ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের জনৈক সদস্য নাকি আগামী অধিবেশনে "ওডায়ার বনাম নায়ার" নামক মামলার বিচার বিভ্রাট সম্বন্ধে উক্ত ডায়ার সাহেবের কার্য্যের নিন্দাসূচক একটী প্রস্তাব উত্থাপিত করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। ডায়ার সাহেব পৃথিবীর বিচারে বর্ণোৎকর্ষতার দাবীতে জিতিলেও উপরের বিচারে অধুনা মৃতকল্প, তাঁহার নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাশ করাইয়া আর ফল কি? আর আমাদের নিন্দায় যখন তাহাদের স্বজাতীয়েরা কর্ণপাত করে না—তখন বৃথা পুরাতন কাসন্দী চটকান কেন?

কলিকাতার হিরণ্যকশিপু

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কোন ডাক্তার নাকি হরিনাম শুনিয়া হরিধ্বনি নিবারণকল্পে পুলিশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। রমানাথ কবিরাজের লেনের কতিপয় ভদ্রলোক উষাকালে হরিনাম করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে যান, সারানিশি রুগ্নে কাটাইয়া ডাক্তার তখন সবে বোধ হয় ঘুমে 'বসেন' কাজেই বিরক্তি হওয়াটা স্বাভাবিক। হিরণ্যকশিপু সফলকাম হইয়াছেন—পুলিশে ঐ ভদ্রলোকেদের হরি নাম করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। অতঃপর তাঁহারা মনে মনে "জয় গৌরাং" "জয়গৌরাং" বলিতে বলিতে যাইবেন, আশাকরি। এ প্রসঙ্গে শুনিলাম উক্ত ডাক্তার নাকি একজন স্বদেশ-হিতৈষী, তাহা যদি সত্য হয় তবে ভবিষ্যতে দেশবাসী ঐরূপ ব্যক্তির সংস্রবে আসিবার সময় বিশেষ বিবেচনা করিবেন ইহাই অনুরোধ।

কলিকাতা এডভারটাইজিং ক্লাব স্থাপিত হইয়া পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের বিজ্ঞাপনদাতাগণ উক্ত কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিগত ২৮শে জুলাই শুক্রবারে ১১নং গ্রসভেনর হাউসে উক্ত ক্লাবের পুনরায় একটী সভা হইয়াছে। বিজ্ঞাপন দাতাগণকে সকল বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্য এই সভার সুযোগ্য সভ্যগণ নানা প্রকার বিজ্ঞাপন ও উৎকৃষ্ট মুদ্রণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। ষ্টেট্‌স ম্যান সংবাদ পত্রের মিষ্টার ফিল্ড এই সভায় বিজ্ঞাপন সাজান বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। আজকাল ভারতবাসীরাও বিজ্ঞাপনে বহু অর্থব্যয় করিতেছেন এই সভায় তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে উভয় সম্প্রদায়েরই মঙ্গলকর হইবে।

শিল্প জগৎ

প্রবাসী। 'শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে'—শ্রীযুক্ত সারদা উকীল অঙ্কিত। চিত্রে কোমলাঙ্গের অধিক বাড়াবাড়ি হইয়াছে, সঙ্গতির অভাব—বেশ-বিন্যাস অসম্ভব রকমে চিত্রিত হইয়াছে—এ চিত্রে প্রবাসীর বা চিত্রকরের কাহারও গৌরব বৃদ্ধি হইবে না।

সিদ্ধ নাগার্জ্জুন—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন অঙ্কিত। চিত্রখানি প্রাণময়—বর্ণের সঙ্গতি আছে, অঙ্কনচাতুর্য্যও আছে তবে দেহযষ্টিগুলিতে দৈবাৎ কোথাও একটু জড়তা আসিয়াছে এতগুলি গুণের সঙ্গে তাহা সহজেই ভুলা যায়।

আলাদীন—শ্রীযুক্ত গগণেন্দ্র নাথ ঠাকুর অঙ্কিত। এ চিত্রখানার ছাপা দেখিয়া বর্ত্তমান ইউরোপীয় ওস্তাদীতে তৈরী মনে হয়—ইহাতে 'ওরিয়াণ্টাল' নাই।

বসুমতী। জালকুলে—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ঘোষ অঙ্কিত। মোটামুটি বেশ লাগে। সাজ পোষাকের বা 'লাইট সেডের' অভাব হয় নাই। অভাব হইয়াছে বড় জিনিষের ভাবের, এই ভাব Motion অর্থাৎ গতি জিনিষটার অভাবে অনেক সুন্দর চিত্রও নষ্ট হয়। সব চিত্রেই গতির প্রাবল্য সর্ব্বপ্রথম দরকার। গতি অর্থে ইহা নয় যে সব চিত্রেই হাঁটিয়া যাওয়া এইরূপ কিছু আঁকা। যেমন একটা চিত্রে আছে কোন লোক একখানা বই পড়িতেছে অনধিকারীর অঙ্কিত হইলেই দেখা যাইবে যেন বইখানা হাতে লইয়া পড়িবার ভঙ্গী করিয়া বইএর দিকে তাকাইয়া আছে—স্বাভাবিক তন্ময়তার সহিত পড়িয়া যাইতেছে না। চুলের খোঁপা বাঁধিতেছে, যেন গোছাটায় হাত দিয়া শিল্পীর হুকুম মান্য করিতেছে, যথার্থ নিজমনে খোঁপা বাঁধা হইতেছে এভাব ফুটান থাকিলেই তাহাকে বলে চিত্রের গতি বা প্রাণ আছে। এদেশের বহু শিল্পীর চিত্রেই এ অভাব বিদ্যমান।

কাল বৈশাখী—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র গুপ্ত অঙ্কিত।

চিত্রখানায় উপরোক্ত গতি জিনিষটার প্রাবল্য আছে বলিয়াই মনে হয়, বেশ ব্যস্তভাবে হাঁটিয়া চলিয়াছে চিত্রটীর প্রাণ আছে। তবে কাল বৈশাখীর সঙ্গে সম্পর্ক কোথায়? এ দোষ মুদ্রাকরের না শিল্পীর তাহা বিচার করা সুকঠিন।

অপরিচিতা—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার অঙ্কিত। চিত্রটীর একটু বিশেষত্ব এই যে দেহের সামান্য একটু অংশ আঁকিয়াই শিল্পী সমস্ত দেহ ও মনের ভাবটা বলিয়া দিয়াছেন। 'অপরিচিত' স্থলে 'অপরিচিতা' ছাপা হইয়াছে ইহাতে সমস্ত চিত্রের অর্থ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে কারণ অবগুণ্ঠণবতীর পথের মাঝে অজানা কে একজন পড়িয়াছে তাই শিল্পী বলিয়াছেন 'অপরিচিত'। যদি অপরিচিতা (স্ত্রী লিঙ্গ) পথের মাঝে পড়িতেন তবে ঘোমটা টানিয়া এত ভীতা হইবার দরকার ছিল না। 'চশমা চটক' কতগুলি ব্যঙ্গ চিত্র—শিল্পী শ্রীযুক্ত জ্যোতীশ সিংহ। ১৪ খানা কার্টুনের ভিতর "করতলগত" ও "ভাটপাড়া" ব্যতীত সর্ব্বৈব বৃথা অঙ্কিত হইয়াছে। তবে মক্স করার হিসাবে মন্দ নয় সেটা বসুমতীর পৃষ্ঠায় না করিয়া ঘরে বসিয়া করিলেই পাঠক বর্গের সুবিধা হইত।

ভারতবর্ষ। রথাগ্রে শ্রীচৈতন্য। চিত্রকর শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিল্পাচার্য্য অন্ধ্ জাতীয়, কলাশালা ইহা রথাগ্রে শ্রীচৈতন্য না আচার্য্যদেবের তুলির চাপে চৈতন্যহীন শ্রীদেব? চৈতন্যদেবের হাত পাগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা! শিল্পচার্য্যই বটে, এইরূপ আচার্য্যের আবির্ভাবে বাঙলার চিত্রশিল্পের অবস্থা কি হইবে? ভারতবর্ষের এ দুরবস্থা ত পূর্ব্বে ছিল না। জানিতাম প্রবাসী একাই এই অপূর্ব্ব কলার পৃষ্ঠপোষক। এ শ্রেণীর চিত্রগুলির সমজদারী করিবার জন্য র‍্যাফেল টিসিয়ান কে ডাকিয়া আনিতে হইবে তবে ফলাফল কি হইবে বলা যায় না। মাসিকপত্রের প্রাবল্যে শিল্পীদের বড় সুবিধা হইয়াছে তাই এ সব ছাপা হয় শিল্পীর পরিচয়ের দরকার হয় না। ক' বছর ধরে আঁকছ বা কত দিন চেষ্টা করিয়াছ এসব প্রশ্ন ও নাই মীমাংসাও নাই, গুরুও নাই শিষ্যও নাই, অকৃতকার্য্যতার জন্য শিল্পীর প্রাণে আপশোষও নাই কারণ সকলই স্বকৃতবিদ্য! আর আমারাও বলি এ রোগও অনারোগ্য। দুঃখ কেবল আর্টপেপারগুলির জন্য।

নিস্তব্ধ নিশীথে—শ্রীযুক্ত আব্বার রহমান চঘ্‌তাই অঙ্কিত। চিত্রের প্রথম দোষ Horizontal Lineটী মাথার উপর উঠিয়াছে এবং স্ত্রীলোকটীর সর্ব্বদেহ অপেক্ষা মাথাটী বিশেষ বড় হইয়াছে, পাগুলি অস্বাভাবিক খর্ব্বতায় ঢাকা। কোলের শিশুটীর মাথাটী বড় ছোট হইয়াছে—সাধারণতঃ ছেলেদের দেহ হইতে মাথা অনেক বড় থাকে। এগুলি লক্ষ্য রাখা শিল্পীর দরকার। নিস্তব্ধ নিশীথে এত আলোক আসিল কোথা হইতে—প্রদীপতো পশ্চাৎভাগে, জ্যোৎস্না হইলে তাহা স্তিমিত (deffused) হইত। কেবল রং ফলান হইলে শিল্পী হয় না—পটুয়া বলা যায়।

জলবালা—শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী অঙ্কিত। প্রথম দেখিয়াই মনে হইল চিত্রটী বৈদেশিক শিল্পী 'ডুল্যাক'এর অঙ্কিত। নীচে নাম দেখিয়া বুঝিলাম তাহা নয়। জলবালার ভাবভঙ্গীতে বিন্দুমাত্রও হিন্দুস্থানের বাতাস নাই। যেন বিলাতের Sea Nymph। চৌধুরী মহাশয় ইংরাজী শিক্ষিত কাজেই রুচিও তদ্রূপ। এরূপ জলবালা না আঁকিয়া রামায়ণ মহাভারতের চিত্র আঁকিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত। তাছাড়া অঙ্কণ ভঙ্গীও অদ্ভুত। সারাচিত্রেই বসন্তের দাগের মত ছোট বড় দানা দেখা দিয়াছে। কোনটা গাছ কোনটা মাছ বা জল আর কোনটাই বা ফল কে বলিবে? আর কিছু হউক আর নাই হউক নামসহটীতে শিল্প প্রতিভার চরম বিকাশ দেখা যাইল!

সন্ধ্যাপ্রদীপ—শ্রীযুক্ত সারদা উকীল অঙ্কিত। বলিতেছেন "আমাদের এ আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জালো। আমরাও বলি দীপ জ্বালো ভালই, তবে অগ্রে এক ডোজ ম্যালেরিয়া টনিক খাও নইলে ঘর চিরদিনের জন্য আঁধার হইয়া যাইবে।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—পূজারিণী শ্রীযুক্ত বিভূতি রায় অঙ্কিত। চিত্রখানা কি হিসাবে সম্পাদক ছাপিলেন তাই চিন্তার বিষয়। চিত্রখানার সর্ব্বস্বই শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনের। তাহার রেখা-চিত্রকে একটু বর্ণ মাখাইয়া বিভূতিবাবুর নাম ছাপান হইয়াছে এ দোষ অমার্জ্জনীয়, এ শ্রেণীর কার্য্য অনুকরণ বলিয়া তো পার পাইতে পারে না। চিত্রখানা পূজারই বটে তবে দেবতার নয় শয়তানের "পক্ক কদলী"—

মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া

পত্রিকার সার সঙ্কলন

শিক্ষকদের দুরবস্থা—যে জেলায় ১৪টা জাতীয় স্কুলের ৭টা উঠিয়া গিয়াছে এবং বাকি ৭টী মৃতকল্প এবং যেখানে ২০০০ স্থলে মাত্র ৫ শত ছাত্র বর্ত্তমান সেই জেলার কোন একটী জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাত্মা গান্ধীকে ভিতরের অবস্থা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে এখন তাঁহাদের কি করা উচিত—পেটে না খাইয়া পোষ্যবর্গকে অর্দ্ধভুক্ত রাখিয়া ঋণজালে জড়িত হইয়া ঐ কার্য্যই করা না অন্য কোন উপায়ে দেশ সেবা করা। অনেক শিক্ষক ভাল ভাল পদ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ত্যাগ করিয়াও এ কাজে লাগিয়াছিলেন—তাঁহাদের পরিণাম কি হইবে। মহাত্মা ইহাতে বিচলিত হন নাই তিনি বলেন দুঃখভোগই জাতি গঠনের একমাত্র পন্থা—বিদ্রোহ করিলে যখন দলে দলে মরিতে হইবে এবং স্বরাজ বা স্বাধীনতায় কোন আশা থাকিবে না তখন এইরূপে নীরবে কষ্ট সহ্য করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়া একটা আত্ম-মর্য্যাদা সম্পন্ন জাতি গড়িলে তাহারাই স্বায়ত্বশাসনের যোগ্য হইবে। ইহাই স্বরাজ সাধনার পন্থা। জাতীয় স্কুলের ছেলেরা যে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছে তাহাতে তাহাদের পিতামাতা বা অভিভাবকগণকে দোষ দিবার কিছু নাই কারণ এখনও আমরা আপদ বিপদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে শিখি নাই। জাতি গঠনের মূল হচ্ছেন শিক্ষকেরা, তাঁহাদের পশ্চাৎপদ হইলে বুঝিতে হইবে তাঁহাদের মনে প্রকৃত দেশ সেবায় আগ্রহ, উৎসাহ ও একাগ্রতা ছিল না। গড়ে তোলবার ক্ষমতা, কেন্দ্রীভূত করার শক্তি, পবিত্রতা রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই—তাঁহারা নানা বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়া কোন বিষয়েই বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই সেই জন্যই কোন কাজটাই তাঁরা নিখুঁতভাবে কর্ত্তে পারেন নি—এটা তাঁদেরও সম্পূর্ণ দোষ নয় আমাদের রাজতন্ত্র আমাদের কেবল দাসত্ব করবার মত শিক্ষা দিয়াছেন গড়ে তোলবার ক্ষমতা কি করে লাভ কর্ত্তে হয় তা শেখাননি সেই জন্য প্রতি কাজেই বাগড়া পড়ছে ও আমাদের ফল লাভে বিলম্ব হচ্ছে। কিন্তু সে দিনও চলে যাচ্ছে—আগে লোকে ঝোঁকে উন্মত্ত হয়েছিল—এখন সে ঝোঁক কেটে গেছে কাজেই সেই ভাবপ্রবণদের সহানুভূতি শুকিয়ে গেছে। এখন যে স্কুলকটী আছে বা তার অর্দ্ধাহারী শিক্ষকেরা টেঁকে আছেন সেগুলি যদি খাঁটি হয় তবে তাদের মার নেই। স্কুল মাষ্টারদের ভরণ পোষণ জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাও লজ্জার কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য সৎ ও তাঁরা সত্য কাজের লোক। উক্ত শিক্ষকের কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বলেছেন যে এই দুঃখ কষ্টে মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত শিক্ষকগণ যেন তাদের কাজকে আঁকড়ে ধরে থাকেন—সৈনিকেরাও যুদ্ধ ক্ষেত্রে হয় জিতে ফেরে নয় দাঁড়িয়ে মরে। দেশের লোকেরা যেখানে জাতীয় বিদ্যালয়ে যায় না সেখানে সে রকম স্কুল এক মিনিটও রাখবার আবশ্যক নেই কিন্তু লোকে যেখানে স্কুল স্থাপনা করেছিল সেটা হয় আবশ্যকের জন্য নয় ভাবের আতিশয্যে এখন যদি তারা সেখানে আর না যায় তবে বুঝতে হবে যে ঐ কারণ লোপ পেয়েছে এবং তার জন্য সেখানকার স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষরাই দোষী—তাঁরা জিনিষটাকে হয় অনাবশ্যকীয় করে ফেলেছেন নয় সেখানকার লোকেদের ঝোঁককে বেঁধে রাখতে পারেন নি। যাঁরা আজ তিন চার বছর আপদ বিপদ সহ্য করে আত্মোৎসর্গ করে এসেছেন এখন তাঁরা আরও ত্রিশ বছর আবার ঠিক ঐ রকম সব সহ্য করে থাকতে পারেন—

কারণ ঐ সকলে তাঁরা অভ্যস্ত আছেন। জাতীয় স্কুল কোন জায়গায় না থাকলেই যে সেখানকার ছেলেদের শিক্ষা হবে না এমন কথা নেই- যাদের আবশ্যক হবে তারা উপযুক্ত উপায় স্থির করে নেবেন—বর্ত্তমানে সুতা-কাটা তাঁত বোনা প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় শিক্ষা মনে করা যাইতে পারে। তাছাড়া ভারতের বহু গ্রামেই কোন প্রকার বিদ্যালয়ই নেই সেটাও মনে করা দরকার। মুখে প্রস্তাব গ্রহণ তৎপক্ষে ভোট দান পরে উহা লাঞ্ছনা করা একটা বিরাট ভণ্ডামী। আমি আমেদাবাদে উহার বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়েছিলাম—লোকেরা যেটা প্রাণের সঙ্গে চাইবে না—সেটা ভোটে পাশ করবার অধিকার তাদের একমিনিটও থাকা উচিত নয়। জাতীয় শিক্ষায় যাদের বিশ্বাস নেই তাদের তার সম্পর্কে আসা উচিত নয় এবং যাদের আছে তারা ঐ নিয়ে থাক্‌লে উহা স্থায়ী হবে এবং সুফলপ্রদ হইবে। বিশ্বাসের শক্তি অদ্ভুত।

সুদূর প্রাচ্য ও ভারতবর্ষ—সম্বন্ধে মহামতি এণ্ড্রুজ এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে জারমানীর সঙ্গে চীনের নাকি গাঢ় হৃদ্যতা আছে। মালয় ষ্টেটে সিঙ্গাপুর, পেনাং, কুয়ালা লম্পুর নামক স্থানে ভারতবাসীদের সমিতিতে চৈনিক সভ্য আছেন ও ভারতবাসীর সকল কাজেই তাঁহারা সহানুভূতি ও সাহায্য করেন। প্রথম দর্শনেই এই দুই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে হৃদ্যতা স্থাপিত হয়। এই সমস্ত চীনবাসীদের সহৃদয় অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি ভারতের গৌতম বুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া উভয় দেশের প্রাচীন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন—চীনবাসীদের এই ভারত প্রীতি ভারতের পক্ষে একটা গৌরব ও সৌভাগ্যের চিহ্ন মনে কর্ত্তে হবে, ভাবতে হবে যে এটা ভগবানদত্ত দান। বিশ্ব-মানবদের শান্তি বন্ধনে বদ্ধ রাখবার পক্ষে এই উভয় দেশের প্রীতি বন্ধনে সাহায্য কর্ব্বে। কবি রবীন্দ্রের জাপান গমন সম্বন্ধে মহামতি এণ্ড্রুজ বলেন যে তিনি প্রথমে জাপানের মিৎসুরু তোয়ামার সহিত যখন সাক্ষাৎ করেন তখন দুই দেশের বিরাট্ দার্শনিক ক্ষণেকের জন্য নীরব ছিলেন—পরে তোয়ামা মহাশয় জাপানী প্রথায় মাথা নত করিয়া অভিবাদন করিলেন এবং ঠাকুর নিমীলিতনেত্রে যেন তন্ময় হইয়াছিলেন সে দৃশ্য দেখিলে মনে হইবে যেন এই দুই দেশের বন্ধুত্ব সেইখানেই চির দৃঢ় হইয়া গেল। দিন কয়েক আগে বক্তৃতা দিবার সময় কবীন্দ্র বিশ্বজগত হইতে এশিয়াবাসীর বিতাড়ন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিবা মাত্র শ্রোতৃবৃন্দ অদ্ভুত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ঐ বিষয়ে আরও কিছু শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিলে তিনি তাহাদিগকে শান্ত ও সংযত হইয়া আত্মার উৎসর্গ সাধনে উপদেশ দিলেন। সভাপতি বলিলেন "আপনার উপস্থিতি আজ আমাদের প্রভূত আনন্দের কারণ হইয়াছে। শ্বেতজাতিকৃত অপমানে আত্মহারা হইয়া আমরা প্রতিশোধের জন্য বড়ই উত্তেজিত হইয়াছিলাম কিন্তু আপনার শান্তির বাণী আমাদের দেশবাসীদের মর্ম্মস্থলে পৌঁছিয়াছে। ভারত পূর্ব্বেও জাপানকে যথেষ্ট জ্ঞান দান করিয়াছে আজও আপনার বাণী দিয়া তাহাই করিল। আপনাদের আরও ভাল ভাল দার্শনিক পণ্ডিতদের এখানে পাঠাইয়া দিলে আমরা ভারতের নিকট চিরঋণী রহিব। উত্তরে কবীন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বে জাপানে আগমন ও তৎকালীন জাপানের অবস্থা দেখিয়া জাপানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহা উচাটিত হওয়ার কথা বলিলে তাঁহারা যে আধ্যাত্ম ব্যাপারে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি করিয়াছেন এবং সেদেশেও যথেষ্ট পণ্ডিত ও গুণী জ্ঞানী রহিয়াছেন—পূর্ব্বে প্রতীচ্যের মোহে তাঁহারা যেমন উপেক্ষিত হইয়াছিলেন এখন যেন তাঁহাদের আর তদ্রূপ না করা হয়। আধ্যাত্ম জাগরণ অন্তরের জিনিস তাহা বাহির হইতে আসে না—ধনোপার্জ্জন আজকাল জীবনের চরম লক্ষ্য নয়—হইতেও পারে না জীবনের পূর্ণতা হইবে তৃপ্তি শান্তির দ্যোতক। এই হচ্চে তৃপ্তি এই শান্তি আর তৃপ্তিই প্রাচ্য দর্শনের মূল—তোমাদের ও আমাদের সমস্ত এশিয়ার এই আকাঙ্ক্ষা। তারপর তিনি আত্মা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পর বলেন যে দুই দেশের মিলন করিতে কেবল দুই দেশের বড় লোকদের মেলামেশার পরে দুই দেশের জন সাধারণের মধ্যে মেশামেশির বেশী আবশ্যক।

পরিশেষে তিনি বলেন যে নিজের জন্য সম্মান পাইবার লোভ তাঁহাকে দেশ ভ্রমণে বাহির করে নাই তাঁর জীবনের সঙ্কল্প সমস্ত জগতে ভ্রাতৃত্বের বীজ বপন করা। আমেরিকার

ব্যবহার জনিত উত্তেজনায় ফলে জাপানের অধিবাসীরা এই সব শুনিয়া অনেক শান্ত হইয়াছেন। ভারতের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি ও প্রীতির উদ্রেক হইয়াছে পূর্ব্বে জাপানে আসিয়া তিনি অভ্যর্থনা পান নাই; নববলদৃপ্ত জাপান তখন শান্তির বাণী শুনিতে চাহে নাই আত্মাসম্বন্ধে তাহারা কিছুই শুনিতে রাজী ছিল না এমনকি সংবাদ পত্রেও পরাধীন জাতির কবি বলিয়া ব্যঙ্গ করা হইয়াছিল— যাহা হউক এক্ষণে জাপান শান্ত হইয়াছে এবং পরপদানত হইলেও ভারতের বাণীকে সে উপযুক্ত অভ্যর্থনা দান করিয়াছে। টোকিওতে কবীন্দ্র আবার পৃথিবী ভ্রমণের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। তিনি প্রথমে ইটালী যাইবেন ও পরে তথা হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় যাইবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন। যাঁহারা কবীন্দ্রের চীন ও জাপান ভ্রমণের সম্পূর্ণ বিবরণ ও সম্পূর্ণ বক্তৃতা পাঠ করিতে চাহেন মহাত্মা তাঁহাদিগকে বিশ্বভারতী পত্র পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

সুতা লইয়া কি করা হইবে। কংগ্রেস সভ্যগণ যে সুতা প্রতিমাসে কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক কাটা হয় তাহা লইয়া কি করা হইবে এ সম্বন্ধে খাদি বোর্ডে অনেক পত্র আসিয়াছে। অনেক প্রশ্ন উঠিয়াছে। কোন কোন সভ্য ঐ সুতা নিজেরা রাখিয়া নিজেদের পরিধেয় প্রস্তুত করাইতে চাহেন। ইহা উত্তম প্রস্তাব হইলেও উপস্থিত মহাত্মা তাহাদিগকে উহা পরিহার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কারণ কোন বন্দোবস্তের কার্য্যকারিতা— তাহার ব্যবস্থা অনুরূপ নিয়মিত ভাবে, এক ভাবে প্রচুর পরিমাণ কাজ হইতেছে কি না—তাহার উপর নির্ভর করে। বেশী কাজ দেখিলে অনেক অকেজো লোক উৎসাহিত হইয়া কাজে লাগিয়া যায় কিন্তু ঐ সুতা যদি এক কেন্দ্রে একত্রিত না হয় তবে তাহার সাফল্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায় না। সুতা পাঠাইলে অনেক খরচ হইবার আশঙ্কা নাই কারণ এক প্রদেশের সমস্ত সুতা জড় করিয়া ঐ প্রদেশের খাদি বিভাগ কর্ত্তৃক প্রধান খাদিবোর্ডে প্রেরিত হইবে ইহাতে খরচও কম পড়িবে এবং নিম্নলিখিত সুফল পাওয়া যাইবে (১) মাসে কত সুতা প্রস্তুত হইল তাহার আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

(২) মাসে মাসে সুতার উন্নতি হইতেছে কি না সে বিষয়ে লক্ষ্য করা যাইবে এবং উন্নত করিবার পন্থা নির্দ্ধারণ ও সুবিধা জনক ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে।

(৩) সুতা প্রস্তুতে সভ্যগণ গাফেলি করিতেছেন কি না সেটা ঠিক বুঝা যাইবে অর্থাৎ কথায় ও কাজে ঠিক থাকিতেছে কিনা তাহা বুঝা যাইবে।

(৪) বিভিন্ন প্রদেশের সভ্যগণের মধ্যে উত্তম ও অধিক পরিমাণে সুতা পাঠাইবার একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা জন্মাইয়া সুফল উৎপাদন করিবে।

(৫) চরকা চালান ও সুতা বুনার প্রস্তাবটী ঠিকমত কার্য্যে পরিণত হইলে পরিণামে খদ্দর সুলভ ও উৎকৃষ্ট করিবার উপায় স্থিরীকৃত হইবে।

খদ্দরবোর্ড গুলির নিকট আমার অনুরোধ যে তাঁহারা এই সুতা দ্বারা যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা কম খরচে বস্ত্র বুনাইয়া লওয়া চলিবে সেখানেই তাহা করাইবেন। এই সমস্ত খদ্দর সুলভে দরিদ্রগণকে বিক্রয় করা উচিত। যদি সূত্র-বয়নকারীগণ কম মূল্যে ঐ বস্ত্র চাহেন তবে তাঁহারাও পাইতে পারেন সূত্রের পরিমাণের আধিক্যের উপর তাহার ব্যবস্থা নির্ভর করে এখন সুতা লইয়া কি করা হইবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যাইবে না। নিজেদের বুনা সুতা নিম্মাণ করায় একটু স্বার্থ থাকে সেজন্য উহা করা এক্ষণে সঙ্গত নহে। প্রস্তাব অনুযায়ী কোন সভ্য ২০০০ গজের অধিক সুতা পাঠাইতে বাধ্য নহেন—যিনি প্রত্যহ এক ঘণ্টা পরিশ্রম করিবেন তিনি অর্দ্ধঘণ্টা পরিশ্রমের ফল খাদিবোর্ডে দান করিয়া বাকি অর্দ্ধ ঘণ্টার সুতা নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিতে পারেন। যাহারা আবার সময়-টুকু নষ্ট না করিয়া চরকা চালান তাঁহারা মাসে ১০,০০০ গজ সুতা জন্মাইতে পারেন। অবশ্য মানবের নির্দ্দিষ্ট কোন পন্থাই একেবারে নির্দ্দোষ হওয়া সম্ভব নহে—কিন্তু সহানুভূতি দ্বারা পন্থাকে সফল করাই উচিত—বিবেকের দোহাই দিয়া তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করা সঙ্গত নহে। কাজ আরম্ভ হইলেই বাদানুবাদ থামিয়া যাইবে তখন কার্য্যের ফল লইয়া সহজেই সুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে।

নৈরাশ্য ব্যঞ্জক চিত্র—হিন্দু মুসলমান

সংঘর্ষ লইয়া জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক মহাত্মাকে জানাইয়াছেন যে তথায় নাকি নিয়তই হিন্দু মুসলমানে মারামারি হইতেছে এবং উহা সমাধান করিবার জন্য তাঁহাকে পাঞ্জাবে যাইতে বলিয়াছেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে এই সংঘর্ষের জন্য সেখানে খদ্দরের প্রচলন বন্ধ হইয়া গিয়াছে দুইলক্ষ অধিবাসীদের মধ্যে বড় জোর কজন (যাঁহারা কংগ্রেসের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লিপ্ত) তাঁহারা ব্যতীত কেহই খদ্দর পরেন না—এবং 'সংগঠন' আন্দোলনই নাকি ইহার মূল কারণ।" মহাত্মা অবশ্য ইহাকে অতিরঞ্জিত মনে করেন—হিন্দু মুসলমানে সেখানে যদি নিত্য মারামারি হইত তবে সেখানে লোকের বাস করা অসম্ভব হইত—এবং যন্দূর জানা যায় তদ্রূপ অশান্তি পাঞ্জাবে এক্ষণে নাই। সংগঠন যে এই বিরোধের মূল তাহা মহাত্মা ঠিক মনে করেন না—তবে সংগঠন আন্দোলনে এই আত্মবিবাদের মাত্রা কিছু বাড়িয়া গিয়াছে তাহা ঠিক। উভয় দলেরই এখন মাথার যে ঠিক্ নাই তাহা নিঃসন্দেহ। যদি উভয় সম্প্রদায়ের মনোমালিন্য হেতু পাঞ্জাবীরা খদ্দর ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের দেশের প্রতি মমতা ও খদ্দর-অনুরাগ বাহ্যিক বলিতে হইবে। কিন্তু মহাত্মা তাঁহাদের স্বদেশ ভক্তিকে অন্য প্রদেশবাসীদের চেয়ে হীন মনে করেন না—সুতরাং খদ্দর ত্যাগের কারণ কি তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সমস্ত প্রদেশের মধ্যে পাঞ্জাবই বিদেশী বস্ত্র সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া খদ্দর ধারণের সমধিক উপযোগী—কিন্তু তাহা হইতেছে না কেন? এরূপ শুনা যায় যে হিন্দুরা মুসলমানের বুনা খদ্দর পরিতে অনিচ্ছুক মুসলমানদেরও সেই কারণ তাহারা এক্ষণে স্বরাজ চাহে না—তাহার বর্ত্তমান রাজতন্ত্রের অপসারণ চাহে, পুরাতন মুসলমান রাজত্ব স্থাপন উদ্দেশ্যে—এবং চরকা ও খদ্দর যদি উভয় জাতিকে এক করিয়া ফেলে তবে মুসলমান রাজত্ব স্থাপনে বিঘ্ন হইবে। এসমস্ত বাজে লোকের কথা—এবং এসকল কথায় মহাত্মাজী কোন আস্থা প্রদর্শন করেন না—এবং আশা করেন যে কোন বুদ্ধিমান হিন্দু ও মুসলমান যেন এসকল গুজবে কর্ণপাত না করেন। সাধারণ হিন্দু মুসলমানদের এসব চিন্তার সময় নাই—সূতা বুনিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিলে তাহাদের সুবিধাই হইবে। অবশ্য খদ্দরের অপ্রচলন ও হিন্দু মুসলমানের বিরোধ এ দুটী ঘটনাই সত্য—দিল্লীতে নেতাগণের শান্তিস্থাপনে অক্ষমতা তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে; কিন্তু এততেও মহাত্মা নিরাশ হইতে প্রস্তুত নহেন। জাঠগণ ও কসাইগণ পরস্পরের বিরোধের বিষময় ফল উপলব্ধি করিয়া এক্ষণে ক্ষান্ত হইয়াছে নিজেদের নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়াছে—যেখানে উদ্দাম দাঙ্গাকারীরা মারামারি করিয়াছে সেখানে উভয় শ্রেণীর ধীর প্রকৃতির লোক আহতের সেবা—উৎপীড়িতকে সাহায্য করিয়াছেন এমন প্রচুর ঘটনা মহাত্মা শুনিয়াছেন—এমন একটী দুটী নয় এমন অনেক ঘটনার কথা শুনিয়া মহাত্মা বুঝিয়াছেন যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন উচ্ছৃখল বাড়িয়াছে তেমনি শান্তিকামী ব্যক্তিরও অভাব নাই। ইহাই শুভ মঙ্গলের চিহ্ন। বিরোধের ভাবটা দুষ্ট ক্ষতের মত অস্বাভাবিক। শান্তি ও শৃঙ্খলা স্বাভাবিক এবং প্রত্যেক ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

উভয় সম্প্রদায় যদি পরস্পরের ধর্ম্ম ও আচারে হস্তক্ষেপ না করেন তবে তাঁহাদের মিলনও সহজে স্থায়ী হইবে। পাঞ্জাব যাইবার সম্বন্ধে মহাত্মা বলেন যে তাঁর প্রাণ তথায় ছুটিয়া যাইবার জন্য আকুল অধীর হইয়া আছে কেবল দুর্ব্বল দেহই তাঁহাকে নিরস্ত রাখিয়াছে তিনি ভ্রমণের উপযোগী হইবামাত্র মৌলানা শওকৎ আলির সহিত সিন্ধু ও পাঞ্জাবে যাইবেন।

বিপন্ন দক্ষিণ ভারত—উত্তর ভারতে বৃষ্টির জন্য হাহাকার পড়িয়াছে আর দক্ষিণ ভারতে বৃষ্টির প্রাবল্যে ও প্লাবনের প্রকোপে সকলে পরিত্রাহি ডাকিতেছে—প্রকৃতির কি রহস্যময়ী লীলা! অসংখ্য লোক গৃহহীন ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলাইতেছে। ভলাণ্টিয়ারগণ গত বৎসরের বন্যায় যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন—এ বৎসরও তদ্রূপ করিয়া যথা সম্ভব রক্ষা করিবেন স্থির করিয়াছেন--কিন্তু এ বৎসর তাহা কতদূর হইবে তাহা বুঝা যায় না। প্রকৃতির উৎপীড়নে পীড়িতদের পরিণাম ভাবিয়া মহাত্মা বড় ব্যথিত হইয়াছেন। মিঃ সদাশিব রাও তথা হইতে সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন—মহাত্মা

আশা করেন যে সত্য সত্যই দক্ষিণের অবস্থা এত ভয়াবহ না হউক এবং তিনি আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন।

অহিফেন-ব্যবহার বন্ধ করিবার চেষ্টা—সমস্ত পৃথিবীতে যাহাতে অহিফেন ও তৎবীর্য্য মরফিন, এবং হেরয়েন নামক অনিষ্টকর মাদক দ্রব্যাদির প্রচলন রহিত করিবার জন্ত আমেরিকার ওয়াশিংটন নগরে এক সমিতি আছে—উক্ত সভার সভাপতি ভারতে অহিফেন-ব্যবহার-নিবারণ কল্পে মহাত্মা গান্ধীর সাহায্য ও পরামর্শ চাহিয়াছিল। জেনেভাতে আগামী নভেম্বর মাসে ইহার জন্ত একটী আন্তর্জাতিক সম্মিলন হইবে—সেখানে ভারতের প্রকৃত বাণী বলিবার জন্ত উপযুক্ত প্রতিনিধি পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। মহাত্মা প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সহানুভূতি জানাইয়াছেন এবং এসম্বন্ধে সমগ্র ভারতীয় কংগ্রেস কমিটী যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তবে এসকল সম্মিলনের প্রতিনিধি, বিদেশী গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন—ঐ অনুগৃহীত প্রতিনিধি দ্বারা ভারতবাসীর স্বাধীন মত ব্যক্ত হওয়া সম্ভবপর নহে সুতরাং মহামতি এণ্ড্রুজের ন্যায় ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সাধারণের প্রতিনিধিরূপে স্বতন্ত্রভাবে পাঠাইলে ভাল হয় কিনা তাহা বিচার করিতে কংগ্রেসকে অনুরোধ করিয়াছেন। মিস্ লা মোত্তে নামক জনৈকা হৃদয়বতী রমণী হিসাব দাখিল করিয়া দেখাইয়াছেন—যে চিকিৎসা ও বিজ্ঞানের ন্যায্য আবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশী এই শ্রেণীর মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হয় ও তাহার অধিকাংশই মানবকে নিস্তেজ পশুবৎ করিয়া রাখিবার জন্ত এবং শ্রেণী-বিশেষের প্রচুর অর্থাগমের জন্ত ব্যবহৃত হয়। ভারতের রাজতন্ত্র, ইহা নিবারণের পথে অনেকবার ফ্যাকড়া তুলিয়াছেন কারণ ভারতবাসীরা একান্ত অসহায়।

PRINTED & PUBLISHED BY B. K. DAS AT THE LAKSHMIBILAS PRESS, 14, JAGANNATH DUTT LANE, CALCUTTA.

লীলা

"শিল্পী—হেমেন্দ্রনাথ"

কেন বাজাও কাঁকন কণ্ কণ্, কত ছল ভরে।
ওগো ঘরে ফিরে চল, কনক কলসে জল ভরে'।—রবীন্দ্রনাথ

সচিত্র সাপ্তাহিক

১ম বর্ষ] ২৪শে শ্রাবণ শনিবার ১৩৩১, ইং ৯ই আগষ্ট। [৪র্থ সংখ্যা

প্রেমের মহাভারত
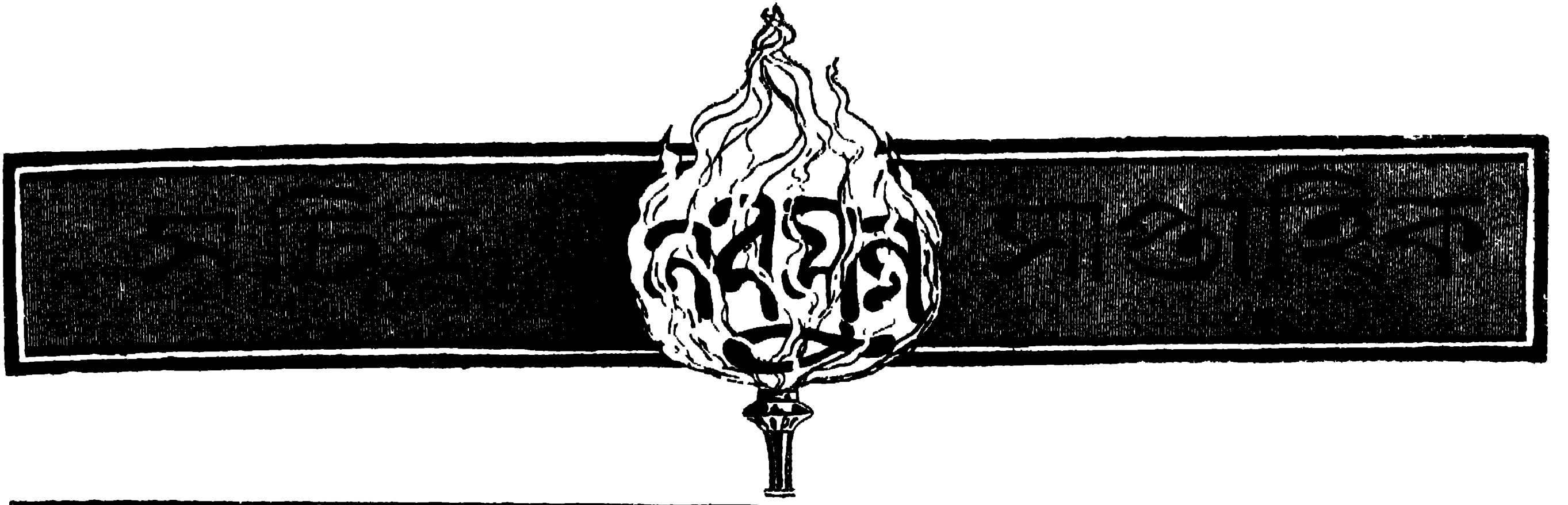
(ছয় পর্ব্বেই সমাপ্ত)

শিল্পী— শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু

১। তন্ময় পর্ব্ব—

বারাণ্ডায় জরীপেড়ে নীলাম্বরী শুকাইতেছে—কলেজ যাইবার পথে প্রেমাক্রান্ত তরুণ তাহা স্বপ্ন-নেত্রে দেখিতেছেন – আর ভাবছেন ভিজে সাড়ী থেকে যে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে তাই তো। মূর্ত্তিমতী কবিতা—এর চেয়ে মহাকাব্য মানবজীবনে আর কি হতে পারে। . .
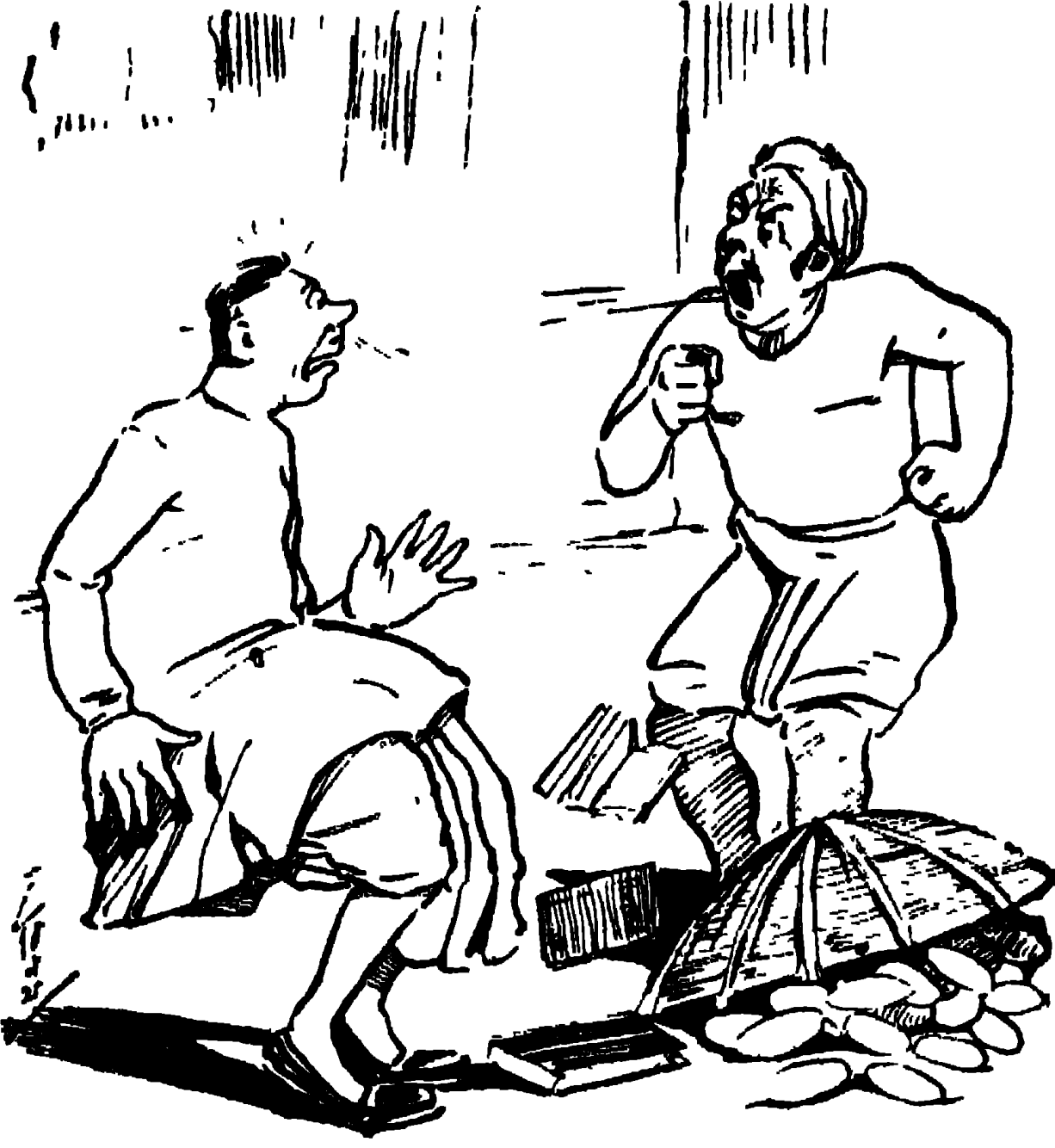
২। বাস্তব পর্ব্ব—

কাব্যামৃত রসাস্বাদে বিভোর তরুণ পিছু হটিতে হটিতে এক ঝাঁকামুটের ঘাড়ে পড়িলেন—দোষ স্বীকার করা দূরে যাক্ মেজাজ দেখাইয়া বলিলেন "কেঁওরে অন্ধা, দেখ্‌তা নেহি।"

৩। প্রস্থান পর্ব্ব—

মুটে অবাঙালী, কবিত্বের ধার ধারে না, একে মাল নষ্ট হইয়াছে তদুপরি বাবুর কড়া কথা বরদাস্ত করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ—বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করিয়া বলিল "কেয়া—হাম অন্ধা—না তু অন্ধা রে বদমাস্।" ঘুসির বহর দেখিয়া তরুণ ভাবিলেন "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।"
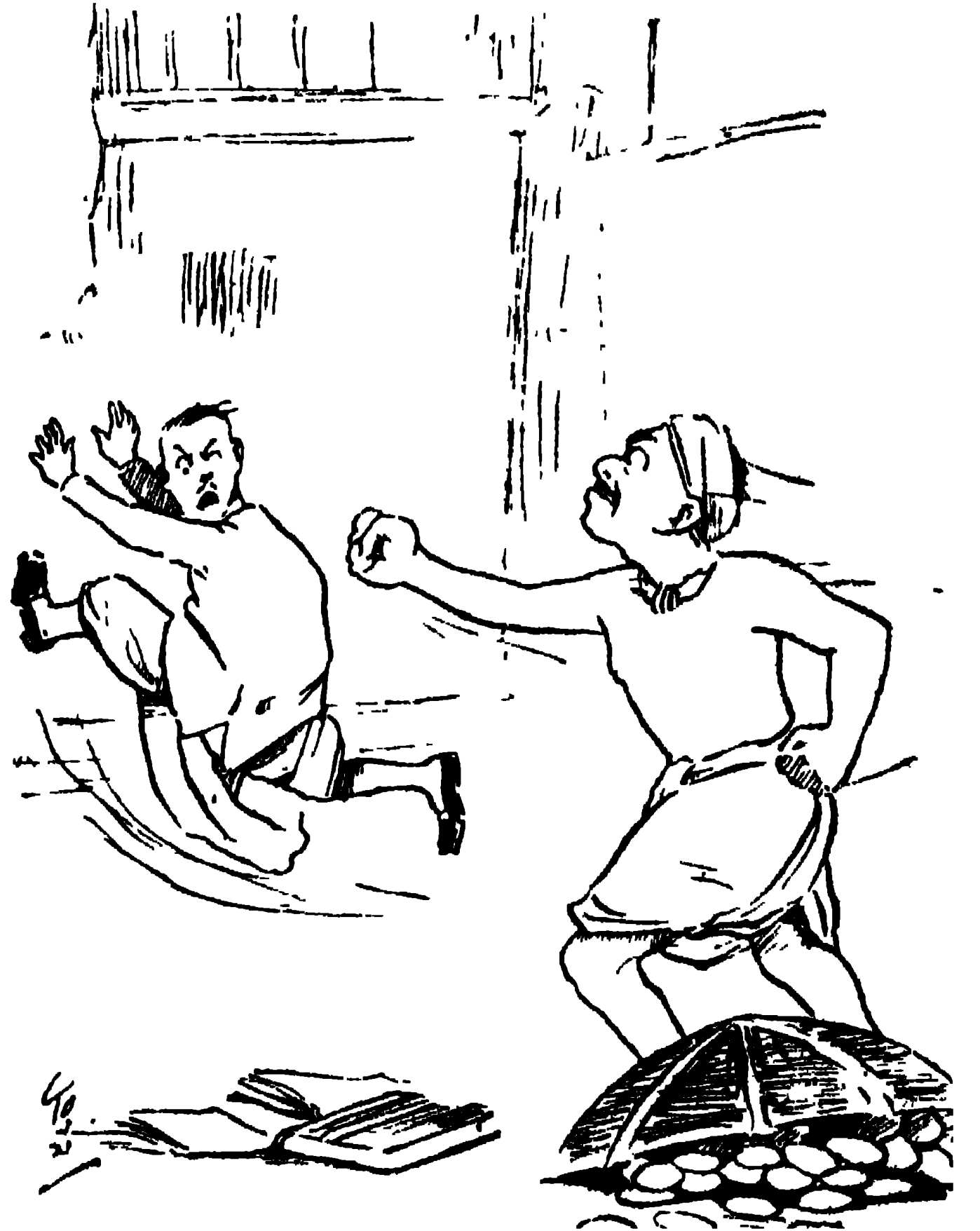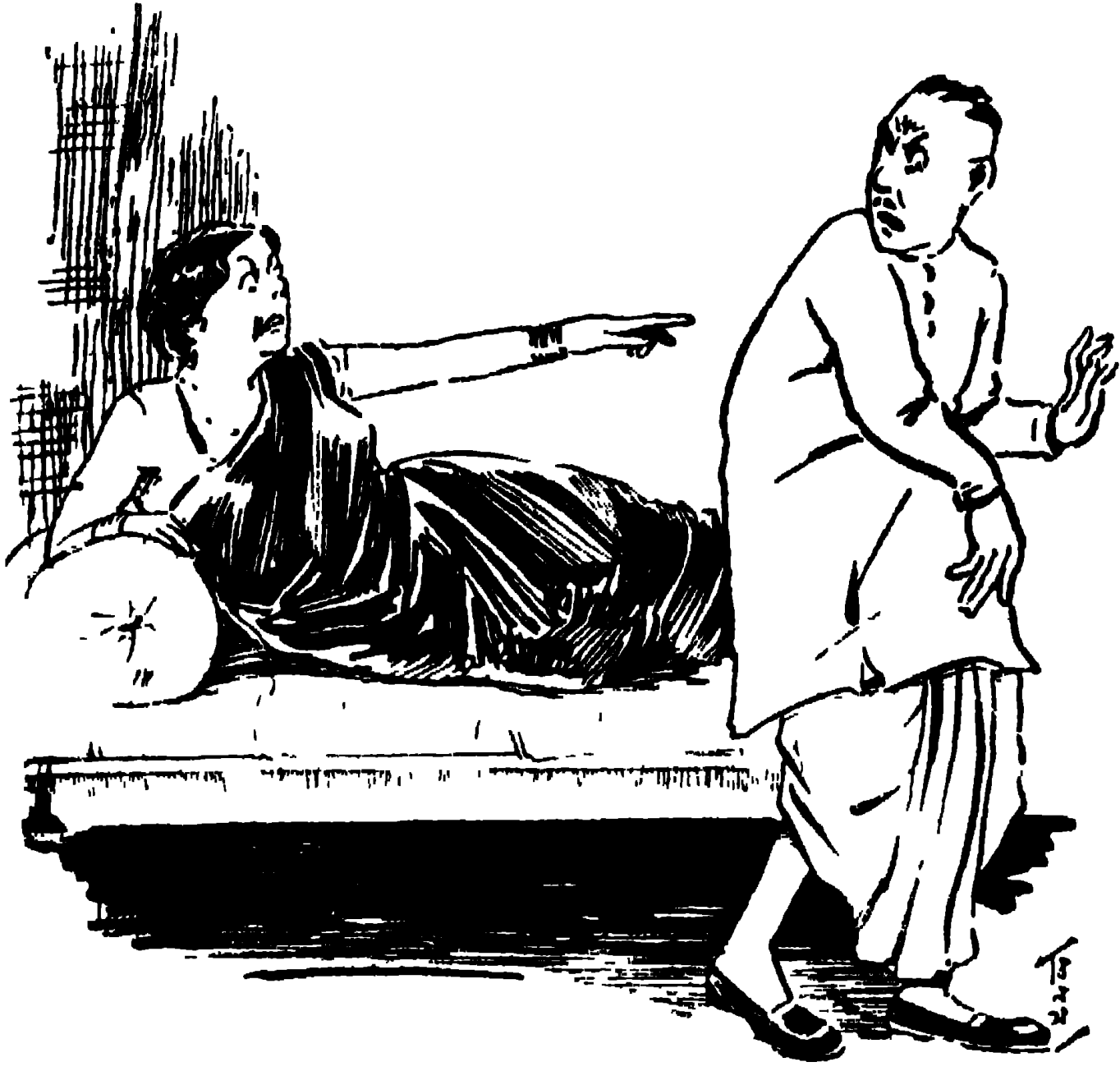
৪। উদ্যোগ পর্ব্ব—

কয়দিন বারান্দার নীচে বৃথা ঘোরাঘুরি করিয়া—একদিন প্রেমের বাস্তব দর্শন করিতে বাবু দ্বিতলে উঠিলেন। কলেজের ছেলে ও ট্যাঁক গড়েরমাঠ বুঝিয়া বিনোদিনী তাহাকে এমন সম্ভাষণ করিলেন যে তরুণ প্রাণ হাতে করিয়া কোন রকমে অক্ষত দেহে ঘরে ফিরিলেন।

৫। উল্লাস পর্ব্ব—

হঠাৎ বাবা মারা যাওয়ায় প্রেমচর্চ্চা করিবার সুবিধা হইল, কারণ বাবা 'কিছু' রাখিয়া গিয়াছিলেন। রঙ্গ-ন্তের শুভ্রকান্তিতে বিমুগ্ধা বিনোদিনী তাহার "মাইডিয়ার বাবু"কে লইয়া মোটরে বায়ু সেবন করিতে চলিলেন! তরুণ বলিলেন "বিন্নু, বাবা আমার, মরে কি উপকারটাই করে গেছেন—নইলে কি তোমায় পেতুম—না এত প্রেম যে তোমার আছে তা জানতে পারতুম, এস তোমার হেল্‌থ পান করি" বিন্নু বাবুকে পরম প্রেমে জড়িয়ে মদের গ্লাস উঁচু করে বল্লেন "এস—বল, থ্রী চিয়ার্স ফর মরা-বাবা—"

৬। শাস্তি পর্ব্ব—

তরুণ এক প্রভাতে উঠিয়া হঠাৎ শুনিলেন যে, যে ব্যাঙ্কে তাঁহার যা কিছু সঞ্চিত ধন রক্ষিত ছিল তাহা ফেল হইয়াছে —বিনুকে গিয়া সংবাদ দিবামাত্র সে মুখ ভার করিয়া বলিল "তবে আর কেন মায়া বাড়াও যাদের ব্যাঙ্ক ফেল হয়নি এমন লোক-দের আস্‌তে দাও।" বাবু দয়া-ভিক্ষা করিলেন, বিনোদিনী পাষাণীর মত কহিল "দয়া করা আমাদের ব্যবসা নয়।"

ওঁ শান্তি

শিল্পাচার্য্য—

নিরস্ত পাদপ দেশে
এরণ্ডবৎ আশ্চর্য্য
অন্ধ দেশ এই বঙ্গ মাঝে
আমিই শিল্প আচার্য্য
হাত পাগুলো হোক্‌না স্থূলো
আঙ্গুলগুলো সাপের মত
ওরিয়ান্ট্যাল থাকুক সুখে
মাসিক-পৃষ্ঠায় অবিরত
পাঠক ভায়া রাগ করো না
সহ্য এটা কর্ত্তেই হবে
বেঁচে থাকুক ভারতবর্ষ
পৃষ্ঠা তাহার দিব ভরি—
বিচিত্র এই চিত্র কলার
কিম্ভুত কিমাকার মাধুরী
নইলে 'ইন আর্টিষ্টিক' বলে তোমায়
ভক্তেরা মোর গালি দিবে।

নব দূর্ব্বা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাম না আসতে রামায়ণ লেখা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সত্যিকার রাম কখন এসেছিলেন বা কখন গিয়েছিলেন অথবা একেবারেই এসেছিলেন কিনা তার একটুখানিও নিশানা দেশের কোথাও ধরা নেই! এর মধ্যে কবির কাছে নবদূর্ব্বাদল শ্যাম রাম এসেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে রাম আমাদের কাছে এলেন এইটুকুই সত্যি। এইভাবে নবযুগ সত্যি সত্যি যখন এসে পৌছয় তখন তার আসার ও যাওয়ার নিদর্শন একেবারেই থাকে না! নবযুগ এবং নতুন এই দুটো শব্দ ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি কিন্তু সত্যিই ঐ দুটি আমাদের মধ্যে এসেছে কিনা তা বিচার করতে গেলে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। যদি এসে থাকে তো এসেছে কিম্বা আসবার হয় তো আসবে—আমাদের সকলের অজ্ঞাতে—যেমন করে ওরা চিরকাল এসেছে সেইভাবেই আসবে এবং যাবেও! এই হল আসল নবযুগ ও নূতনের আসা যাওয়ার ধরণ ধারণ—হঠাৎ বেদনা বাজে বুকের মধ্যে, নতুনের আসার সময় হঠাৎ নতুন সুরে বেজে ওঠে বুকের বাঁশী, প্রাণ-পিঁজরার পাখী হঠাৎ-গেয়ে ওঠে ঘুমের ঘোরে, ফুল ফুটে ওঠে আপনা আপনি অদ্ভুত রং অপূর্ব্ব সুবাস নিয়ে। নবযুগের নূতনের আসা নববধূর মতো অনেকের ঘরের মধ্যে কিন্তু বিশেষ করে একটি লোকের কাছে এই বিশেষ লোকগুলিকেই বলা হয় কবিরসিক। নূতনের আসার উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে পাড়াপড়সীর কাছে তার আসাটা অনেক পুরোণো হয়ে যায় শুধু ঐ বিশেষ লোকটির কাছে সে থাকে চিরনূতন এবং চিরপুরাতন। নতুন আবার যখন যায় তখনও ঠিক তার আসার ছন্দ ধরে যায়—বেদনা বাজে একমুহূর্ত্ত সংসারে, তারপর সবাই তাকে ভোলে শুধু একটি লোক ছাড়া, এদেরই কথা হল—যেমনটি গেল তেমনটি আর মিলবে না—গান থেমে গেলে যেমন তার রেশ তেমনি ভাবে নতুন বিদ্যমান থাকে এই সব কবিদের বলা কওয়ার মধ্যে। নতুন যে এসেছিল তার প্রমাণ কবিদের কাছেই ধরা থাকে। কোন্ যুগে আষাঢ়ের প্রথম দিন নতুন মেঘ এনে দিয়েছিল তার খবর কে রাখতো যদি না কালিদাস থাকতেন, আর এই যে আষাঢ় শ্রাবণের ধারা বছরে বছরে দেশের বুকটা নতুন পাতায় নবদূর্ব্বাদলে সবুজ করে দিয়ে যাচ্ছে—সেই বর্ষা যে কালিদাস ও চণ্ডিদাসের আমলের পুরোণো বর্ষা, পুরোণো মদকে নতুনকালের বোতলের মধ্যে ধরে আমরা অনেকেই যে সেটিকে আমাদের নতুন ধারা এল বলে চালাতে চাচ্ছি এর অসত্যটা ধরে দিতেও কবি ছাড়া আর কে এমন আছে? দেশে নূতনকে এবং নবযুগকে আনার চেষ্টার তো অন্ত দেখিনে—খদ্দড় যেটা বহুকাল হল এদেশের মানুষরাই গরমে এবং সভ্য সমাজে অসহনীয় বলে পরিত্যাগ করেছিল সেইটেরই পুনরাবৃত্তি, ওস্তাদি গান যেটা আকবরের আমলের, ছবি যেটা বৌদ্ধ যুগের, ধর্ম্ম যেটা সেই ব্রহ্মার পিতামহের পিতামহের; সব পুরোণোকে নতুন গেলাসে ধরে এনে ভাবছি আমরা নতুন যুগ আনছি! পুরোণো কাসুন্দি নতুন ভাঁড়ে—'ভাঁড়ও ভারি পুরোণো গঠনের'—দিয়ে নতুন খাদ্য নতুন যুগের বলে তো চলে না কিন্তু কাযে ঘটছে তাই, খুব যারা নতুন করতে চাচ্ছে তারা বিলাতে যেটা অনেকটা পুরোণো এদেশে যেটা অজ্ঞাত সেটা বাজারে এনে বাহবা নিতে চলেছে এইতো দেখছি বয়েস হয়ে অবধি! নবযুগ এবং নূতন কচিৎ আসে হঠাৎ বজ্রাঘাতে সবাইকে চমকে দিয়ে দিক-বিদিক অন্ধকার করে, কিন্তু সচরাচর আসে সে গোপন অভিসারে নিঃশব্দ অনির্দিষ্ট পদসঞ্চারে, মানুষের ও দেশের মনের অন্তঃপুরে, উপবনে, কুঞ্জকাননে তার যাওয়া আসার খেলা কচিৎ কেউ দেখে রাত জেগে।

গল্প

অকাল বাদলে

শ্রীসুধাংশুকুমার চক্রবর্ত্তী

এক

শীতের সন্ধ্যা। আবার সকাল থেকেই আকাশ মেঘে ভরা। সূর্য্যদেব কৃপা করে দর্শন দেওয়াতে ও তদুপরি গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে দিনটা যে নেহাৎ অকাজে কেটে গেল একথা আমরা পরস্পর বলাবলি করছিলুম। তার ওপর শীত যা বেড়ে গিয়েছিল সে আর কহতব্য নয়। প্রত্যেকেই আমরা শীতবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে জবুথবু হয়ে বসেছিলুম। হাত পা বের করাও বিষম বিপদ!

এমন অকাল বাদলে কবিত্বের পরিবর্ত্তে যে নিছক বিরক্তি মনটা দখল করে বসেছে—একথা বন্ধুবর চন্দ্রচূলাল তাঁর চিরপ্রসিদ্ধ কর্কশকণ্ঠে যখন তরুণচন্দ্রকে জানালেন, এবং তদুত্তরে উদীয়মান কবি তরুণচন্দ্র, আকাঙ্ক্ষিত মানসপ্রতিমার ধ্যানে ভঙ্গ দিয়ে তাঁর কোকিলনিন্দিত বামাকণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন; তখন আমাদের আড্ডার একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কোলাহলে আন্দোলিত হয়ে উঠল।

আমাদের আড্ডাটায় আর কিছু থাকুক্ না থাকুক্ অনেকগুলি ভুয়ো তার্কিক যে ছিল একথা পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই একবাক্যে স্বীকার করত।

প্রতিবাদ শুনে চন্দ্রচূলাল তরুণচন্দ্রের কূর্মাবরণের ফ্রেমে সজ্জিত চশমার ওপর তীব্র দৃষ্টিপাত করে বল্লেন—"তুমি যে আমার কথার প্রতিবাদ করছ তার যুক্তি কই?"

"প্রতি কথায় যে যুক্তি থাকা চাই-ই, তার যুক্তি কই?"

"এরূপ তর্কের যুক্তি থাকলেও আমি তোমায় বলব না। তুমি কবি যুক্তির কি ধার ধার?"

"বেশত আমিও বলছি আজকে সন্ধ্যায় বিরক্তি ছাড়া কবিত্ব যে নেই একথা আমি মানি না; কারণ এই অকাল বাদলের ভেতর যথেষ্ট কবিত্ব আছে এবং যেহেতু কবিত্ব জিনিসটা 'ইথিরিয়াল' কিনা ধোঁয়াটে এবং তা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায় না ও সর্ব্বোপরি তুমি একজন বিখ্যাত অকবি ও অরসিক সেইহেতু আমি আমার প্রতিবাদে কর্ণপাতও করব না। কবিত্বের তুমি ছাই বোঝ?"

তর্ক তখন বেশ ঘোরালো হয়ে এল। মধুরকান্তি চীৎকার করে বল্লেন "অসঙ্গত কথা কও কেন চন্দ্রচূলাল? অকাল বাদলে কবিত্ব না থাকলে কবিরা ওটাকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করতেন না। তোমার ওকথা আমরা বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করতে পারি না, তা তুমি হাজার যুক্তিই দাও না কেন। আমি বলি তুমি ভালয় ভালয় তোমার মত প্রত্যাহার করে নাও।"

মধুরকান্তির প্রস্তাব সমর্থন করে নিয়ে সকলে একটা কোলাহল সৃজন করে ফেল্লে। সেই ভীষণ কোলাহল ক্রমে ভীষণতর হয়ে পথসঞ্চারী পথিকদের নিশ্চয়ই চুম্বুকের মত আকর্ষণ করত যদি না দলপতি ত্রিনয়লোচন প্রচণ্ড হুঙ্কারে তা না থামাতেন।

"তোমরা করছ কি অ্যাঁ—আমার সামনেই একটা তুচ্ছ কথায় এতটা বাড়াবাড়ি। বলি আমি কাণে তুলো দিয়ে নেই এটা কি জান না।"

এরূপ ধ্রুব সত্য যে কেউ ভুল্‌তে পারে, তা প্রত্যেকেরই কল্পনাতীত। আমি বল্লুম "তুমি নিশ্চয়ই তাহলে—"

"থাক্ থাক্ হয়েছে। তোমরা সকলেই তরুণচন্দ্রের পক্ষ নিয়ে চন্দ্রদুলালের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছ—থুড়ি, বসেছ। আমিও তোমাদের দলে, তবে চন্দ্রদুলাল যদি কোনও যুক্তিযুক্ত গল্পের দ্বারা স্বমত প্রমাণ করে তাহ্‌লে অন্ততঃ আমি আজকের দিনটার তরে মেনে নিতে রাজী যে অকালবাদল বিরক্তিপূর্ণ।"

সমস্বরে রব উঠ্‌ল "বেশ, বেশ। একথা মন্দ নয়।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম "কিহে চন্দ্রদুলাল বলতে পার্ব্বে তো?"

"নিশ্চয়। জগতে মহাত্মারা স্ব স্ব মতের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়ে গেছেন আর আমি একটা সামান্য গল্প বলতে পারব না!"

ঘরের ভেতর পুনরায় ধ্বনিত হ'ল "সাধু, সাধু, সাধু।" চেয়ে দেখি তরুণচন্দ্রের মুখখানি মলিন ও নিষ্প্রভ। তখন ঝর্ ঝর্ করে জল পড়ছে। আকাশভরা অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে। রাস্তার গ্যাসগুলোর কতক জ্বালা হয়েছে, কতক হয়নি। অফিস প্রত্যাগত শ্রান্ত কেরাণীর দল ছাতা মাথায় দিয়ে কোঁচার কাপড় গুটিয়ে, ডিঙ্গি মেরে কোন রকমে বাড়ী পানে চ'লেছে। অতিমিশুক প্রকৃতি বন্ধুবর 'প্রেমবিহ্বল' গান ধর্‌লেন—

"সাধের তরণী আমা—র
কে দিল ত—রঙ্গে
কে আছে কাণ্ডারী হেন
কে যাইবে স—ঙ্গ—অঙ্গে।"

বিরক্তিপূর্ণস্বরে মধুরকান্তি বলে উঠ্‌লেন "আরে কর কি, ভরা আসর মাটি কচ্ছ! কোথায় গল্প আরম্ভ হবে তা নয় গান—বীভৎস!"

"বুঝ্‌ছ না চন্দ্রদুলালকে ভাবতে সময় দিচ্চি আর তা ছাড়া এগানটাও যে বাদ্‌লে বলে আমরা জানি।"

"গগনে গরজে ঘন—বহে ঘোর সমীরণ—"

"তোমার মাথা, সমীরণ এখন কোথায়? দারুণ গুমোট্। তুমি থামো। গল্প আরম্ভ হোক্—ওহে চন্দ্রদুলাল আর দেরী নয়।"

স্নিগ্ধলোচনের এ আদেশ অমান্য করতে প্রেমবিহ্বলের সাহস হল না। ক্ষুণ্ণমনে তিনি চুপ করলেন। চন্দ্রদুলাল তিন চারবার গলা খাঁকারী দিয়ে আরম্ভ করলেন।

দুই

তোমরা জান না কতবড় নূতনত্ব আমি আমার জীবনে গতবছর পেয়েছিলুম; এবং এই পাওয়াতে আমি এক শিক্ষা লাভ করেছি যে কাকেও বিশ্বাস করতে নেই। সদা-সন্দিগ্ধমনা লোকেরা অসুখী হোক্ আর যাই হোক্, তারা যে চট্ করে ঠকে না একথা খাঁটী সত্য এবং এই না-ঠকার দরুণ যে আনন্দ তারা উপভোগ করে তা ঐ সদাবিশ্বাসী লোকেরা করতে পায় না, এ আমি হলফ্ করে বল্‌তে পারি। এই মহাশিক্ষা লাভের পর থেকে আমি আওরংজেবকে আমার আদর্শ ঠিক করেছি তাতে আমার মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসই হোক্ আর থাক্। এখন কি করে এটা হল তাই বলি।

সেদিনটা ছিল আজকের মতই বাদলমুখর। একে পৌষ মাস, তায় বৃষ্টি সুতরাং শীতটা যা পড়েছিল তা আন্দাজ করে নাও। বাটি বাটি চা, ছোলাভাজা, গরম কাট্‌লেট, কত কি উদরস্থ হয়ে গেল—দু' তিনখানা মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকাও শেষ হয়ে গেল কিন্তু বৃষ্টি ছাড়বার নামটীও করে না। মহা বিরক্ত! অবশেষে বিকেলবেলায় জল একটু কমে এল। অলষ্টারে দেহ মুড়ে, শাল দিয়ে মাথা ও কাণ ঢেকে এক ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়্‌লুম। এদিক ওদিক করে নানা রাস্তা ঘুরে, ঠাণ্ডা বাতাসে হি হি করতে করতে লালদীঘিতে এসে হাজির। বাগান খালি বল্লেই হয়। ক্বচিৎ একটা দুটো লোক ছাতা মাথায় দিয়ে চলে যাচ্চে। কারও সঙ্গে যে কথা কয়ে, গল্প করে সময় কাটাবো তার উপায় নেই। অগত্যা আপন মনে গান ধরলুম—

এ ভরা বাদর এ মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

তোমরা রাগ করতে পার পৌষমাসে আমি ভাদ্দরে গান গেয়েছিলুম বলে; কিন্তু এটা ঠিক জেন সে সময় আমার ঋতুজ্ঞান ছিল না আর তাই যদি থাক্‌ত তা'হলে তরুণ-চন্দ্রের মত কবি হতুম এবং কত মহাকাব্য রচনা করে

তোমাদের উপহার দিতুম। যাই হোক্ আমার গানে মুগ্ধ হয়েই বল কিংবা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে মাথা ভিজে যাবার আশঙ্কাতেই বল একটী মোটাসোটা নাদুশনুদুশ প্রৌঢ় ব্যক্তি আমার পাশে এসে বসলেন। চোখের উপরস্থিত নিকেলের চশমাটার ভেতর দিয়ে তিনি আমার মুখের ওপর ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। আমি ত অবাক! কে এ লোকটা? কি অভিপ্রায় এর? গান আমার থেমে গেল। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনার কি কলকাতাতেই বাস?" "আজ্ঞে না।" বলেই হাউ মাউ করে বিকটরবে তিনি কেঁদে উঠলেন। অদ্ভুত! অদ্ভুত! আমার বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে গেল। এ কি পাগল? যখন সত্যসত্যই পাগল ভেবে পুলিশ ডাকবার উপক্রম করছিলুম; তখন লোকটী আমার পা দুটী গভীর ভক্তিভরে মাথায় ধারণ করে দ্বিগুণ জোরে কান্না সুরু করে দিলেন।

"আহা করেন কি?" বলে ত অতি কষ্টে পা ছাড়িয়ে নিলুম; কিন্তু সে কি নিরস্ত হয়? বাধা পেয়ে তাঁর কান্নার উচ্ছ্বাস সমুদ্রের মত ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। মহাসঙ্কটেই তখন পড়ে গেলুম। কি করা যায়? কোথায় এলুম বেড়িয়ে মাথা ঠাণ্ডা করতে তা নয় পড়ে গেলুম এক ছিঁচকাঁদুনে বুড়ো মিন্‌সের পাল্লায়! অবশেষে তাঁর কান্না থামাতে অক্ষম হয়ে বল্লুম "হয়েছে কি?" আমার মুখের সাম্‌নে হাত নাড়তে চাড়তে বিষাদমাখা সুরে তিনি বল্লেন "সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ—ডাহা সর্ব্বনাশ।"

অবাক হয়ে বল্লুম "কি রকম সর্ব্বনাশ?"

"সর্ব্বনাশের কি আর রকম আছে মশাই?"

"তবে কি আছে?"

"কিছু নেই।"

বিষম রাগে গর্ গর্ করতে করতে বল্লুম "তবে হয় আপনি উঠে যান নয় ত আমি উঠি।" কিন্তু আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই তাঁর হাত দুটী আমার পায়ের দিকে আবার অগ্রসর হতে লাগল এবং পুনরায় আর একপ্রস্থ মানভঞ্জনের দৃশ্য অভিনীত হবে ভেবে আমি তাড়াতাড়ি তাঁর হাত দুটী ধরে ফেল্লুম। আমার মুখের ওপর করুণ নয়নে তাকিয়ে থেকে তিনি জড়িতকণ্ঠে বল্লেন "আপনিও শেষটা আমার ওপর রাগ করলেন, হায়! হতভাগ্যের ওপর সমস্ত পৃথিবী ক্রুদ্ধ; অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।" দরদর ধারে প্রবহমান অশ্রু তাঁর সার্টের কলার ভিজিয়ে দিচ্ছিল। এবার আমার মনটা যথার্থই সমবেদনায় ভিজে গেল। মনে হল নিশ্চয়ই এঁর কোনও দুঃখের কাহিনী আছে যা আমার কাছে ব্যক্ত করে সহানুভূতি পেতে চান। যথাসাধ্য কোমলকণ্ঠে বল্লুম "আমার রূঢ়তার জন্যে আমি অনুতপ্ত। আপনার যদি কিছু বলবার থাকে ত নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন।"

"ধন্যবাদ! শত ধন্যবাদ তোমাকে ভগবান! তোমার রাজ্যে এখনও দু'একটী মহৎপ্রাণ ব্যক্তি বর্ত্তমান। কি আর শুনবেন বলুন সে দুঃখের কথা! আমার বাড়ী হল নয়নপুরে। ছাপোষা গেরস্থ লোক মশাই। ক্ষেতটা খামারটা আছে তাইতেই কোনও রকমে সংসারটী চলে যায় কিন্তু ঐ যে বলেছে লক্ষ্মীর কৃপা না হলে ষষ্ঠীর কৃপা বিলক্ষণ হয় আমারও হয়েছে তাই। বলব কি মশাই তিন মেয়ে। ভাবতে গেলে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়! দিনরাত ভাবনা কি করে বড়টীকে পার করি? কারণ সেইটীর বিবাহের বয়স উত্তীর্ণপ্রায়। যাই হোক্ মশাই পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে পাত্রও একটী পাওয়া গেল। বিয়ের জিনিষপত্র কিনতে কলকাতায় আসা দরকার তাই বাড়ী থেকে রওনা হয়েছিলুম কিন্তু কে তখন জানত কপালে আমার এই সর্ব্বনাশ লেখা আছে। হায়—হায়—হায়!"

তিন

পুনরায় কান্না সুরু হল। অনেক কষ্টে, নানা সান্ত্বনার কথা কয়ে তা থামালুম। দুঃখের কাহিনী শুনতে-আমার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল কারণ তখনও সেটী অসম্পূর্ণ রয়েছে। গলার স্বরটা যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে তাই বল্লুম "কি হল তারপর? বিয়ে ভেঙ্গে গেল?"

"তা কেন।"

"তবে, কন্যাটীর মৃত্যু সংবাদ এল আপনার কাছে?"

"তা হলে ত বাঁচতুম।"

"তবে কি?"

"আন্দাজ করুন।"

নানা সম্ভব অসম্ভব দৈবদুর্বিপাক কল্পনা করতে লাগলুম এবং ভদ্রলোককে তাই বলতে লাগলুম কিন্তু প্রত্যেকবারেই উত্তর--"না"। হতাশ হয়ে বল্লুম "তবে কি আপনিই বলুন। এ আন্দাজ করা আমার সাধ্য নয়।"

একগাল হেসে তিনি বল্লেন "সে ত পারবেনই না মশাই কারণ এমন সর্বনাশ কখনও কারুর হয়নি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি অতিবড় শত্রুরও যেন এমন দশা না হয়। বলব কি পঞ্চাশটী টাকা এনেছিলুম বরের জামা, কাপড়, জুতো প্রভৃতি বরাভরণ কিনতে। আজ তাই দুপুরে বৌবাজারে এসেছিলুম ; কিন্তু পোড়া কপাল আমার নিতান্ত পুড়েছিল, তাই জামা কাপড় পছন্দ করে, দর ঠিক করে পকেট থেকে টাকা বার করতে গিয়ে শতেক লোকের মাঝে অপ্রস্তুত। হায়—হায়। হা ভগবান।"

এবার শুধু কান্না নয় সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডে চপেটা-ঘাত সুরু হল। আত্ম-নিগ্রহ হতে তাঁকে নিরস্ত করে বল্লুম "কি দেখলেন—টাকা ছিলনা" "আজ্ঞে হ্যাঁ।" খানিকক্ষণ কান্না পুরোদমে চল্‌ল। আমি বল্লুম "এ তা'হলে পকেটকাটার কাজ বলতে হবে।" এত দুঃখের মাঝখানেও তাঁর দাঁতের পাটি বিস্তীর্ণ হল—বল্লেন "তা ছাড়া কোন্ মহৎব্যক্তির কাজ বলে অনুমান করেন।" "তাইত এখন উপায় কি" বলে তাঁর দিকে চাইলুম। "আছে বৈকি—আপনার মত মহোদয়ের কাছেই এর উপায় থাকে।" বলে তিনি আমার মুখের ওপর অর্থপূর্ণ তীব্র-দৃষ্টিপাত করলেন। আমি বল্লুম "কি রকম?" যোড়হাত করে তিনি বল্লেন "যদি অনুমতি দেন ত বলি।" অবাক হয়ে বল্লুম "স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।" মনে মনে ভাবলুম আমার দ্বারা কি উপকার ভদ্রলোকের হতে পারে? মেয়েটীকে কি বিবাহ কর্ত্তে বলবে নাকি? দেখা যাক্ কি বলে?

চোখদুটী মুছে আমার মুখের পানে কাতরভাবে তাকিয়ে তিনি বল্লেন—"দেখুন এ মাসের আর তিনটী দিন আছে; বিবাহ ও মাসে, এর মধ্যে যদি একদিন বাড়ী যেতে পারি ত পরিবারের গয়না বিক্রী করে হোক কিংবা ধারকর্জ্জ করে হোক্ টাকাটা যোগাড় করে আনতে পারি। এইবার অর্থটা সহজে বোধগম্য হল। ভদ্রলোকের ইচ্ছা ট্রেণভাড়াটা আমি দিই। মনে মনে ভাবতে লাগলুম দেওয়া উচিত কি—না। না দিলে লোকটীর সর্বনাশ হয়ে যায়, এবং দিলে আমার মনুষ্যত্ব বজায় থাকে। আজ-কালকার বাজারে গরীবের মেয়ের বিবাহসঙ্কট কিছুমাত্র অজানা ছিল না—স্নেহলতার কথা মনে পড়্‌ল। যদি এই মেয়েটির বিবাহ না হয় এবং অবশেষে স্নেহলতার পন্থা অনুসরণ করে তাহলে আমি কি কতক পরিমাণে সেজন্য দায়ী হব না? শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। জিজ্ঞাসা করলুম "গাড়ীভাড়া কত?" আমার কথায় যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গদ্‌গদ্ স্বরে তিনি উত্তর দিলেন—"দুটাকা।" তাড়াতাড়ি পকেট থেকে মণিব্যাগ বের করে পাঁচ টাকার একখানা নোট হাতে দিয়ে বল্লুম "এই নিন্। বেশীই দিলুম—যদি আবার কোনও দুর্ঘটনা ঘটে। নমস্কার! আমি চল্লুম।" আমার পা দুটী মাথায় ধারণ করে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে ও আমার চেষ্টায় সে কার্য্যে বিফল হয়ে ভদ্রলোক অশ্রুবিগলিত নেত্রে যা বল্লেন তার সারার্থ এই—পূর্ব্বজন্মে আমি নিশ্চয়ই তাঁর পিতা ছিলুম নচেৎ তাঁর প্রতি আমার দয়ার উদ্রেক সম্পূর্ণ অসম্ভব ইত্যাদি, ইত্যাদি।"

চার

খানিকক্ষণ নীরব থেকে চন্দ্রদুলাল ধীরে ধীরে আবার আরম্ভ করলেন—তোমরা হয়ত ভাব্‌ছ আমার মত কৃপণ কিনা, নিছক্ দয়ায় ও ভাবপ্রবণতায় আকুল হয়ে পাঁচটা টাকা দান করে ফেল্‌লে; দোহাই তোমাদের। তা যদি ভেবে থাক ত ভুলে যাও। এর মধ্যে আমার চিরকেলে পুলিশী বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল অর্থাৎ টাকা পেয়ে তিনি কি করেন না করেন তা দেখবার আমার ষোলআনা লোভ ছিল। তাই একটু তফাৎ থেকে আমি তাঁর অনুসরণ করলুম। লালদিঘি থেকে বেরিয়ে তিনি বরাবর বৌবাজারের দিকে চল্‌লেন; আমিও চল্‌লুম। নেবুতলার মোড় বরাবর এসে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে তিনি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের দিকে ছুট্‌লেন আমি ত অবাক! ভদ্রলোক শিয়ালদহ ষ্টেশনে না গিয়ে ওদিকে কোথা চল্‌লেন? কিন্তু অধিকক্ষণ

পড়বে মনে হল; কারণ পায়ে হেঁটে মোটরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা এই বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানোজ্জল দিনে একান্ত অসম্ভব। সুতরাং আমিও এক ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে সেই মোটরখানা দেখিয়ে বল্লুম উসকো পাকড়ানে হোগা।" পাঞ্জাবী ড্রাইভারটা বোধহয় দুচারটে মোটর ডাকাতির বিবরণ শুনেছিল; তাই আমার অস্থিরতা ও অদ্ভুত আচরণ দেখে এবং অপূর্ব্ব আদেশ শুনে, এটাও সেই ধরণের একটা কিছু হবে সন্দেহ করে অম্লান বদনে উত্তর দিলে—"নেহি যায়েগা।" কিন্তু আমি তাতে নিবৃত্ত হলেম না। বিকট সিংহনাদ করে যখন জানালুম যে আমি একজন পুলিশের লোক, ঐ আসামীকে ধরতে বেরিয়েছি সে যদি সাহায্য না কোরে আসামীকে পালাতে অবসর দেয় তাহলে তাকে আইনের প্যাঁচে পড়তে হবে, যার ফল পাঁচ বছরের জন্য কারাবাস; তখন সে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত মোটর চালিয়ে দিলে। হু হু শব্দে ঝড়ের মত বেগে মোটর ছুটল। মাণিকতলার মোড়ের কাছে এসে প্রৌঢ় ভদ্রলোক মোটর হতে নেমে গেলেন। আমি তদ্দর্শনে নেমে পড়্লুম। ড্রাইভারকে বল্লুম "গাড়ী ইঁহাপর রাখ্খো, হাম আতা হ্যায়।"

তারপর—তারপর অবাক হয়ো না, পেছন পেছন গিয়ে দেখ্লুম আমার সেই বিপদগ্রস্ত, পকেটকাটা কর্ত্তৃক প্রপীড়িত, দুঃস্থ, কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক "হুর্‌রে" বলে এক মদের দোকানে ঢুকে পড়্লেন।

সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে এসেছে। রাস্তার দুধারে সারি সারি গ্যাস জ্বলছে। বৃষ্টি থেমে যাওয়াতে ঠাণ্ডা হাওয়া ধীরে ধীরে বইতে সুরু করেছে। প্রকৃতির লীলামাধুরী আমার মনের দুয়ারে আঘাত করবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগ্ল। সেদিনকার সেই পৌষমাসের বাদল-সন্ধ্যা যেন মূর্ত্তি ধারণ করে আমায় তীব্র উপহাস করতে সুরু করলে। দাঁড়াতে পারলুম না। ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল তাইতে চড়ে মনভরা বিরক্তি নিয়ে বাড়ী ফিরে এলুম। তারপর থেকে অকালবাদল দেখলেই আমার সেদিনকার কথা মনে পড়ে এবং সে সময় যে জিনিষটা আমার চিত্ত দখল করে বসে সেটা কবিত্ব নয়, বিরক্তি—নিছক্ বিরক্তি।"

* * * *

চন্দ্রদুলালের গল্প শেষ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ আড্ডাগৃহ স্তম্ভিত হয়ে রইল। অকস্মাৎ সেই নীরবতা ভঙ্গ করে সর্ব্বাগ্রেই স্নিগ্ধলোচন বলে উঠ্লেন "আমি আমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে মেনে নিচ্ছি যে আজকের অকাল বাদল বিরক্তিপূর্ণ, কবিত্বপূর্ণ নয়।" প্রত্যুত্তরে একটা ভীষণ কোলাহল উঠ্ল এবং তরুণচন্দ্র ছাড়া সকলেই স্ব স্ব কণ্ঠশক্তির দ্বারা জানিয়ে দিলেন যে তাঁদেরও ঠিক ঐ মত। পূর্ব্ব মত তাঁরা পরিবর্ত্তন করেছেন। তারপর সকলে হৈ হৈ কর্‌তে কর্‌তে বাড়ী চল্লুম কারণ 'বাড়ী পানে মন—ছুটেছে তখন।' এবং রাতও যথেষ্ট বেশী হয়ে গিয়েছিল।

কয়লার গুঁড়া ও তাহার প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেশে বহুদিন হইতে মেয়েরা কয়লার গুঁড়াগুলি ত্যাগ না করিয়া তাহার সহিত গোবর মিশ্রিত করিয়া একরূপ "গুল" প্রস্তুত করেন এবং তাহা দ্বারা ইন্ধন কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু ইউরোপে এতকাল উক্ত চূর্ণগুলি কোন কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত না বরং ত্যক্তই হইত। সম্প্রতি সেখানকার ইন্ধন-বিশারদেরা আবিষ্কার করিয়াছেন যে কয়লা চূর্ণের গুণ আগুনের আঁচ বৃদ্ধি করিবার পক্ষে গোটা কয়লার অপেক্ষা কোনও অংশে সপ্রমাণ হইয়াছে। সেই জন্য এখন ঐ দেশে কয়লার খনি হইতে গুঁড়া কয়লা পাইপের সাহায্যে একেবারে ইঞ্জিনের ভিতর লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কয়লার দামের চেয়ে গুঁড়া খুব শস্তা এবং বায়ুচাপের সাহায্যে উহাকে পাইপের ভিতর দিয়া তরল পদার্থের ন্যায় আকর্ষণ করিয়া লওয়া যাইবে বলিয়া অতিরিক্ত রেল ভাড়াটা আর লাগিবে না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া সেখানকার অনেক কল কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ গুঁড়ো কয়লা ব্যবহার করিবার

নারী

হে অনন্ত রহস্তময়ী! তোমায় নমস্কার—হে প্রকৃতি-রূপিনী তোমায় নমস্কার, তুমি সৃষ্টির আদি হইতে অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে অসংখ্যরূপধরা হইয়া বিরাজিত আছ। তোমায় জননী, ভগিনী, সহধর্ম্মিনী, কন্যারূপে দেখিতে পাই, আবার কামকলুষরূপিণী বেশ্যারূপেও দেখিতে পাই—তোমার লীলা প্রকৃতিরই মত উদ্দাম চঞ্চল-গম্ভীর ভয়াবহ। তুমিই জীবের জন্মদায়িনী, তুমিই পুরুষ ও নারী প্রসবিনী, তুমিই ধাত্রী তুমিই মাতৃ তুমিই কন্যা—তোমা বিনা সৃষ্টি রক্ষা হইত না—শিশুপালন হইত না, গৃহ অরণ্য হইত, সংসারে শৃঙ্খলা থাকিত না—সমাজের বন্ধন থাকিত না, তোমার অনন্ত সত্বা—অসংখ্য রূপ—অদ্ভুত প্রেরণা—তুমি অনন্ত শক্তিময়ী, অনৈসর্গিক রহস্তময়ী, বিচিত্র লীলাময়ী—তোমার চরণে নমস্কার।

তোমরা আছ, তাই আমরা আছি—তোমরা না থাকিলে গৃহ নির্ম্মিত হইত না, জগতের উন্নতি হইত না মানব অরণ্যে পশুর মত বাস করিত, আর স্বচ্ছন্দবনজাত ফলমূলে জীবনধারণ করিত ও প্রকৃতির জলাশয়ে জল পান করিত, কোন কিছুরই আবশ্যক হইত না—পুরুষ আজ অবধি যাহা করিয়াছে বা করিতেছে দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য সবের মূলেই তুমি—অথচ তুমি বল তুমি কেউ নয়—তুমি দাসী মাত্র। দুর্জ্ঞেয় রহস্তময়ী! এ ধারণা তোমায় কে দিল? ঘড়ির ছোট চাকাখানি ঘড়ির ভিতরে বন্ধ থাকে কিন্তু সেটা না চলিলে যে বড় চাকা চলে না—ফলে ঘড়ি বন্ধ হয়। ছোট চাকাখানি যদি বাহিরে রাখা যায়, তাহা হইলে ঘড়ির চলিবার শক্তি থাকে না, তেমনি তুমি যদি তোমার নির্দ্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে চাও, ফলে তাহাই হইবে—নিজের জায়গায় থাকিয়া তুমি শক্ত হও মজবুত হও ঘড়ি চালাও কিন্তু 'টাইম' বন্ধ করিয়া দিও না—আবার স্থানচ্যুত ছোট চাকা যেমন মূল্যহীন হয় তেমনি তোমার স্বস্থানে তুমি ঘরণী, লক্ষ্মীরূপিনী, রাজরাণী—বাহিরে তোমার মূল্য কত কমিয়া যাইবে তাহা ভাবিয়া, বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিও। তুমি স্বাধীনতা চাও—কিন্তু কোথায় তাহার স্থান—স্বাধীনতা থাকে মনে, আর বাহিরে যেটা উদ্দাম অসঙ্গত ভাবে প্রকাশিত হয় সেটা কি ঠিক স্বাধীনতা—তাহা স্বেচ্ছাচারিতা। স্বাধীনতা শৃঙ্খলার অনুবর্ত্তী, সে সব বিধিবিধান ধ্বংস করিয়া বহিয়া যায় না, সেটা প্লাবন নয়; মন্দগামিনী প্রবাহিনীর মত সে ধীরে ধীরে আপনমনে বহিয়া যায়; সে বন্যার মত—হিংস্র পশুর মত—ধ্বংসবাদ প্রচার করে না—তাই বলি হে চঞ্চলা! স্থির হও—ভাবিয়া দেখ কত উচ্চে, কত সম্মানের মাঝে তোমার স্থান—তুমি গৃহিণী, তুমি জননী, তুমি কামিনী; স্বগৃহে তুমি একাধিপত্য-কারিণী, সে আধিপত্য যেখানে নষ্ট হয় তাহা নারীর অযোগ্যতায়, সেটা পুরুষের দোষ নয়। পুরুষ উদ্দাম চঞ্চল তাহাকে কখন স্নেহের বাঁধনে, কখন প্রেমের বেষ্টনে, কখন ভৎর্সনার গানে স্তব্ধ, কখন অশ্রু নির্ঝরে সিক্ত করিতে হয়। তাতেও যদি অত্যাচার করে, তোমার অপমান করে সে কি পুরুষ—সে কাপুরুষ—কাপুরুষের উপর অভিমান করিয়া সোণার সংসার যাঁরা জ্বালাইয়া দেন, তাঁদের কেমন করিয়া জননী বলিব—কেমন করিয়া লক্ষ্মী ভাবিব—দুই শ্রেণীর মধ্যেই সৎ অসৎ আছে; অসতের জন্য সতের উপর অত্যাচার কি সঙ্গত?

যে স্বাধীনতার মদিরা পানে এক শ্রেণীর নারী অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছেন সেটা যে দেশ হইতে আনীত তথায় আজ কি সামাজিক বিশৃঙ্খলতা, কি ভীষণ নৈতিক অধোগতি তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ—না বুঝিয়া না ভাবিয়া তপ্তমস্তিষ্কা সভ্যাদের বিদ্রোহে যোগদান করিও না—তাঁরা দু-চারটে পাশ করিতে পারেন বা জুতামোজা পরিয়া বেড়াইতে পারেন কিন্তু বাহিরের বন্য প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা কর্ব্বার শক্তি ক'জনার আছে। পাশ্চাত্য বিলাস-সাগরে যাঁরা মগ্ন, তাঁদের সংযম শিক্ষা হবে কোথা থেকে—সে দেশের মূল নীতি হচ্ছে ভোগ—ত্যাগের নামও সেখানে নাই। ভোগে কোন মহৎ জিনিষের প্রতিষ্ঠা হয় না, ভোগে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের বিকাশ হয়—সেটা সাধনার পন্থা নয়, সেটা

মায়ার প্রলোভন, জড়ের আকর্ষণ, পাপের আকুল আহ্বান, তা থেকে আত্মরক্ষা কর; হিন্দুর সমাজকে সংস্কৃত করে তাতে নূতন জীবন এনে দাও, পুরাকালের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন করে দেশকালপাত্রোপযোগী আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তন কর—সংসারকে উজ্জ্বল, আনন্দের আধার কর,গৃহকে শুদ্ধ কর, পুরুষকে পুত কর। মহিমময়ী! তোমাদের বিরাট ভ্রূভঙ্গে শাসিত হয় না এমন কে আছে—কোন অত্যাচারীর দণ্ড তোমাদের রোষদীপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া খসিয়া না পড়ে; তোমরা যে কোমলে কঠোরে, মধুরে উজ্জলে গ্রথিত। ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিও না—ধর্ম্মকে সংস্কৃত কর কিন্তু দেখো যেন কোন পরিবর্ত্তনের মূলে কামনা না থাকে—কর্ম্ম কর, কর্ম্মের ফল ধর্ম্মের হস্তে সমর্পণ কর।

বিধাতা কোন জিনিষই সম্পূর্ণ করিতে পারেন না—কারণ সম্পূর্ণ একটী জিনিস হইতে পারে, আর বাকী অসম্পূর্ণগুলি ঐ সম্পূর্ণের অংশমাত্র, সেইজন্য একেবারে নির্দ্দোষ বস্তু পৃথিবীতে পাওয়া যায় না—সম্পূর্ণ তিনি নিজে স্বয়ং। প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ হতে চেষ্টা রাখা উচিত কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণ বা দোষের অতীত মনে করিয়া আত্মতৃপ্তির প্রশ্রয় দিতে নাই। তোমারও সম্পূর্ণতার মাঝে অভাব আছে, দোষ আছে, ত্রুটী আছে সেটার কথাও ভাবিও; কেবল পুরুষের দোষ দেখিয়া নিন্দা করিলে চলিবে না। হাতের আঙুলে ফোড়া হইলে, সেটা প্রথমেই কাটিয়া না ফেলিয়া চিকিৎসা করাই বুদ্ধিমানের কাজ—তুমি বুদ্ধিমতী, সৃজনকারিণী—ধ্বংস তো তোমার প্রকৃতিগত রীতি নয়, তবে কেন এ অযথা বিদ্রোহ ঘোষণা, আর কার সঙ্গে বিসম্বাদ? নারীশক্তি ও পুরুষশক্তির একত্রীকরণেই পূর্ণশক্তির বিকাশ হয়—আত্মকলহ সৃজনে লাভ নাই, হইলে কথামালার উদর ও অন্য অবয়বের কলহের মত ফল হইবে। তাই বলি নারী জাগো, ভাবো, যা কিছু কর, স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে স্বেচ্ছাচারিণী হতে যেও না—নিজেদের মাহাত্ম্য ও মর্য্যাদা নষ্ট করো না। —পুরুষ

সাহিত্যের অলঙ্কার

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

এখনকার দিনে আমাদের মাতৃভাষায় সাহিত্যের দোহাই দিয়া অনেকে জীর্ণ বা অজীর্ণ অনেক কথাই চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহার নাম সাহিত্যের 'আর্ট।' আর্ট কথাটার তর্জ্জমা বাংলা ভাষায় চলে কি না তাহা কেহ বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই, অথচ সকল বিষয়েই সাহিত্যিক আর্টের দোহাইয়ের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। নাট্য সাহিত্য বা অভিনয়, রসসাহিত্য বা গল্প-কাব্য সকল বিষয়েই বর্ত্তমান বা পুরাতন পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে লজ্জাজনক অনুকরণ এখনকার দিনে জনপ্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার কোন সমালোচনা করিতে গেলেই উত্তর পক্ষ বলিয়া থাকেন যে Art for art's sake.

সাহিত্যের আর্ট জিনিসটা কি তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার সময় অনেকদিন পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু সে বিশ্লেষণ কেহ ভরসা করিয়া আরম্ভ করেন নাই। প্রথমেই একটা কথা বলিয়া রাখি, আমাদের দেশে সমাজে বা ভাষায় যে সমস্ত প্রাচীন রীতি, নীতি বা ব্যবস্থা আছে আমার নিজের মতে তাহার আমূল সংস্কার হওয়া প্রয়োজন, অনেক সময়ে আমি প্রাচীনের পক্ষপাতী হইলেও বর্ত্তমানে সাহিত্যে, সমাজে বা ধর্ম্মে প্রাচীনের নাম দিয়া যে কৃত্রিমতা চালান হইতেছে আমি তাহার পক্ষপাতী নহি। পক্ষান্তরে আমরা পাশ্চাত্য জগতের সাহিত্যের, সমাজের এবং ধর্ম্মের যে পরিমাণ অনুকরণ করিতে যাইতেছি অথবা করিয়া ফেলিয়াছি তাহাও আমাদের দেশে চলিবে কি না এবং কতদুর চলা উচিত সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আরম্ভেই নিজের মতের কথাটা জানাইয়া রাখিলাম, কারণ প্রাচীন বা পুরাতনের নাম করিলেই এক শ্রেণীর

পাঠক, লেখক ও সমালোচকগণ বুঝিবার পূর্ব্বে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। আমার ব্যক্তিগত মত কতদূর গ্রাহ্য হইবে তাহা আমি বলিতে পারি না এবং স্থান বিশেষে ভ্রান্ত হইলেও হইতে পারে কিন্তু আমি নিজে যতদূর বুঝিয়াছি তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইতে চাহি। সাহিত্য সভ্য জাতির সভ্যতার নিদর্শন। কোন একটা জাতি, ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমাজের মধ্যে সভ্যতার কোন স্তর অধিকার করিয়া আছে সেই জাতির যুগ বিশেষের সাহিত্য তাহারই পরিচয় দিয়া থাকে। প্রাচীন মূর্ত্তি, প্রাচীন মুদ্রা বা প্রাচীন শিলালেখ হইতে কোনও প্রাচীন জাতির প্রাচীন ইতিহাসের কঙ্কাল সৃষ্টি হইতে পারে। মূর্ত্তি দেখিয়া ভাস্করের শিল্পের উৎকর্ষ বুঝিতে পারা যায় কিন্তু সেই জাতির সমাজের প্রকৃত অবস্থা সাহিত্যের অভাবে কোন কালেই বুঝিতে পারা যায় না।

বর্ত্তমানে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সাহিত্য, জাতীয় সভ্যতার উৎকর্ষের প্রধান নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষ আয়নায় যেমন নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, মানব সমাজ তেমনি যুগ বিশেষের সাহিত্যে নিজের সর্ব্বাঙ্গের পরিপুষ্টি লক্ষ্য করিতে পারে। যে জাতি চক্ষু মেলিয়া চলে তাহারা এই পুষ্টির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সামাজিক বা জাতীয় প্রগতি নিয়ন্ত্রিত করে কিন্তু সকলে তাহা পারে না অনেকে চক্ষু মুদিয়াই চলে।

ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের চেষ্টায় জাতীয় সাহিত্যের গতি নির্দ্ধারণ করা করা যায় কি না, যেখানে সংযমের অভাব আছে সেখানে চেষ্টা করিলে সংযম আনা যায় কিনা সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে কিন্তু বর্ত্তমান মধ্যযুগের সমাজে অনেকবার দেখা গিয়াছে যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের চেষ্টায় সাহিত্যের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর হইতে পারে। ১৯১৪ খৃঃ যে ভীষণ যুদ্ধ পাশ্চাত্য জগৎকে প্রায় ধ্বংস করিয়া গিয়াছে তাহার ফল পাশ্চাত্য সমাজের ও সাহিত্যের বর্ত্তমান স্তরে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য বণিক সম্প্রদায় সমস্ত জগতের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া ইউরোপের কয়েকটী দেশে যে অর্থরাশি সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার ফলে নারীসমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা, বিলাস ব্যসন আসিয়া পড়িয়াছিল চারি বৎসরের মহাযুদ্ধে তাহা প্রায় দূর হইয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডের মত যে দেশে যুদ্ধ হয় নাই, অথবা স্পেন বা নরওয়ের মত যে সমস্ত দেশ যুদ্ধে বিশেষ কষ্ট সহ্য করে নাই তাহারাও ফরাসী ও জার্ম্মান জাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া কতক পরিমাণে জাগরিত হইয়াছে এবং সমস্ত পাশ্চাত্য জগতে সাহিত্যিক ও সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। অবস্থা যতদিন স্বচ্ছল ছিল, অর্থ যতদিন অনায়াসে আসিত, ততদিন এই সমস্ত জাতি সামাজিক ও সাহিত্যিক আদর্শ হিসাবে ফরাসী জাতিকে মানিয়া চলিত। বিগত মহাযুদ্ধে ফরাসী জাতি যে পরিমাণ কষ্ট সহ্য করিয়াছে ইওরোপের অন্য কোন জাতিকে সে পরিমাণ কষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই। প্যারি, বিএন (ভিয়েনা) ও বার্লিন আর বিলাসের কেন্দ্র নাই। ফরাসী সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নূতন আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, সে আদর্শের প্রভাব পাশ্চাত্য জগতে বিস্তৃত হইলেও এখনও আমাদের দেশে আসিয়া পৌঁছায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ সাহিত্যিক সমাজের যে আদর্শ Mid Victorian বলিয়া উপেক্ষা করিত ক্রমে ক্রমে ক্রুর অদৃষ্টের কঠিন তাড়নায় আবার সেই আদর্শে ফিরিয়া আসিতেছে। যে অসংযম, অশ্লীলতা ও অশিষ্টাচার অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী জাতীয় বিদ্রোহের ফলে পাশ্চাত্য জগতে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল তাহা আমূল পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে।

সাহিত্য কেমন করিয়া জাতীয় আদর্শের পরিবর্ত্তন করে তাহা ফরাসী সাহিত্যের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষ মনে করিতে পারেন যে তুলনায় ফরাসী সাহিত্যের উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের আদর্শ অপেক্ষা বিংশ শতাব্দীর আদর্শ উপেক্ষণীয় কিন্তু তাহা রুচির উপরে নির্ভর করে। যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের রুচি এক জাতীয় আদর্শের ছায়ায় গঠিত হইয়াছে তাহা সহজে পরিবর্ত্তিত হওয়া কঠিন কিন্তু যাহারা নিস্পৃহভাবে তুলনা করিতে পারে এবং করিয়াছে তাহারা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী জাতীয় সাহিত্যের আদর্শকে উচ্চাসন প্রদান করে না। বিংশ শতাব্দীর ফরাসী জাতীয়-সাহিত্যের আদর্শ মনোরম কি না তাহা ভবিষ্যতের উপরে,

গঠন প্রণালীর উপরে এবং ফরাসী জাতির মর্য্যাদা রক্ষার স্পৃহার উপরে নির্ভর করে।

সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য রস সৃষ্টি। আমাদের দেশে যখন জাতীয় সাহিত্য বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ ছিল তখন সর্ব্ববিধ রসের অভাব ছিল না। সেই জাতীয় সাহিত্যের এক কণামাত্র আমরা পাইয়াছি এবং সেই কণার তুলনায় আমাদের জাতীয় সাহিত্য আমাদিগের কাছে বিশেষ পরিপুষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। তবে চর্চ্চা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যে সময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল সে সময়ে সকল দিকে রস সৃষ্টির চেষ্টা চলিত এবং সে চেষ্টা ব্যাকরণ বা অলঙ্কার শাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। কাব্য রচনা করিতে হইলেই যে আমাকে দণ্ডী এবং ভামহের সমস্ত নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে একথা কেবল ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হারাইবার পরেই প্রচারিত হইয়াছে।

যাহারা চর্চ্চা করিয়া দেখিয়াছেন যে মূর্ত্তি গঠনে ভাস্করের রস সৃষ্টি যেমন তাহার ব্যক্তিত্বের উপরে নির্ভর করে, কাব্য বা রস সৃষ্টিতে উন্নতি সেই পরিমাণে কবির আত্মশক্তির উপরে নির্ভর করে। মূর্ত্তি গঠন করিতে গেলে কেবল শিল্প শাস্ত্রের উপর নির্ভর করা চলে না, শাস্ত্র শিক্ষানবীশের জন্য,সাধনমালা বা দেবপ্রতিমা লক্ষণম্ কোন বিশেষ দেবতার মূর্ত্তিতে কি কি লক্ষণ থাকা প্রয়োজন সেই বিষয়ে সাধারণ উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে মাত্র, মানবীকে দেবীমূর্ত্তি করিয়া তুলিতে তাহার সৌন্দর্য্যের প্রকৃত বিকাশ পাষাণ হইতে বাহির করিতে যে শক্তির প্রয়োজন তাহা শিল্পীর নিজস্ব, শাস্ত্র বা গুরু সে আদর্শের স্বরূপ শিল্পীর মস্তিষ্কের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারে না বা শিল্পীর বাহুতে সে দক্ষতা আনিয়া দিতে পারে না। রচনা মাত্রেই কাব্য এবং সাহিত্যসেবী মাত্রেই কবি। শিক্ষাকালে অলঙ্কার সাহায্য করে বটে কিন্তু উপমার উৎকর্ষ কবির ব্যক্তিত্বের উপরে নির্ভর করে, কাব্যাদর্শ বা কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি বর্ণনার উজ্জ্বলতা বা উপমার সৌন্দর্য্য যোগাইয়া দিতে পারে না, তাহা কবির আত্মশক্তি ও আদর্শের উৎকর্ষের উপরে নির্ভর করে।

আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যে দৈন্যের প্রধান কারণ আমাদের আত্মশক্তির অভাব, বিদেশীয় সাহিত্যের উপর নির্ভরশীলতা এবং সঙ্গে সঙ্গে মাত্রাহীনতা। বিদেশীয় সাহিত্যের কোন উপকরণ কি পরিমাণে আমাদের জাতীয় সাহিত্যে আত্মসাৎ করা যাইতে পারে এবং সে উপকরণ কি পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে চিন্তাহীনতা এবং স্থানে স্থানে শক্তির অভাব আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদর্শকে বিকৃত করিয়াছে ও করিতেছে।

আমরা যাহাকে আর্ট বলি সাহিত্যে তাহার প্রকৃত নাম অলঙ্কার। কিন্তু আমাদিগের সাহিত্যিকদিগের মনে অলঙ্কার বলিলেই একটা বিভীষিকা আসিয়া উপস্থিত হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্র এতদূর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে স্বতন্ত্রভাবে অলঙ্কার শাস্ত্রের পরিকল্পনা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে অনেক মনস্বী লেখক অতি সুন্দরভাবে বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ছন্দ ও অনুপ্রাসে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনুযায়ী। প্রাচীন অলঙ্কার কেমন করিয়া নূতন অবয়বে সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রচুর প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারা যায় কিন্তু তাহাকে জীবিত ভাষায় ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইতে হয়।

বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা 'সাহিত্যে আর্ট' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন তাঁহারা আর্ট শব্দটি পরিত্যাগ করিয়া অলঙ্কার শব্দটি ব্যবহার করিলে মাতৃভাষার প্রতি সুবিচার করা হইবে। অলঙ্কার সাহিত্যের রসসৃষ্টির প্রধান উপাদান। রচনা করিতে গেলে, ঘটনা সংযোজন, ভাষার ধ্বনি, উপমার সৃষ্টি প্রভৃতি যে সমস্ত উপায় আছে তাহার সমস্তগুলিকে অলঙ্কার বলা উচিত। পাশ্চাত্য সাহিত্যের মতানুসারে এইগুলি Art of Literature.

রসসৃষ্টি সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। সকল দেশে প্রাচীনেরা ইহা বুঝিতেন এবং তদনুসারে রসের বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রের রসের বিভাগ পরিবর্ত্তন করা বর্ত্তমান যুগেও সম্ভব নহে। আদি, করুণ, বীর, বীভৎস প্রভৃতি যে সমস্ত রস বিভাগ আছে তাহার মধ্যে আমাদের দেশের কবিরাও আদিরসের প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন কারণ শৃঙ্গার বা আদিরস সমাজবদ্ধ মানবের সমাজবন্ধনীর প্রধান বন্ধন।

সদানন্দের পত্র

সম্পাদক ভায়া—

উপন্যাসের কথা আলোচনা কর্ত্তে বলেছ—ভায়া কি আমায় সব্যসাচী ঠাউরেছ—আমি কি তোমার সেকালের অর্জ্জুনের মত ক্লীববেশে বৃহন্নলারূপে রাজবাড়ীর অন্দরে আত্মগোপন করেছিলাম—যে ভবসংসারের সব গুপ্ত-কথাই ব্যক্ত করব, আর দেশের লোকের গালাগাল খাব—না ভায়া, আমার পরিপাক যন্ত্রও তত সবল নয় এবং পাকস্থলীতেও স্থানাভাব। শেষটা তোমার বুদ্ধিতে চলে স্তার আশুতোষের মত Inflation of the stomach হয়ে ভব সংসারের মায়া কাটিয়ে কি অকূলের উদ্দেশে পাড়ী দেব? বুড়ো হলেও—সংসারের কোন বাঁধন না থাকলেও এই ভবধুরের ভবের ভাবে বড় মায়া—ভবধাম ত্যাগ করবার কথা মনে হলে ভয় হয়। মরবার পর লোক কোথায় যায় তা এখনও যখন নির্দ্ধারিত হয় নাই, তখন বেগানা জায়গায় হানা দিতে সাহসে কুলায় কৈ! সেকালে লোকে বিশ্বাস কর্ত্তো, পাপ কর্ল্লে লোক নরকে যায়—আর পুণ্য কর্ল্লে দেবলোক, ঋষিলোক, চন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি গোলকধামের বহুবিধ লোকে যাওয়া যায়, যেমন জেলে গেলে সিভিল জেল, রয়েল জেল (R. I.) সলিটারী জেল, অন্ধকার সেল প্রভৃতি বহুবিধ খেল্ খেলতে হয়। সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক গন্তব্যস্থানের একটা আকার প্রকার সেকালের লোকেরা মনে মনে গড়ে রাখত—সুতরাং পরম সুখে মর্ত্তে পার্ত্ত। এখন চশমা আর সিগারেটের ধোঁয়াতে সে সব দৃশ্য ঝাপসা হয়ে হয়ে ক্রমশঃ হাফ্‌সে গেছে (অর্দ্ধেক হয়ে গেছে—শিক্ষিতদের গেছে এবং মূর্খদের আছে ইতি ভাবঃ) সুতরাং আমরা উভয় দলের মধ্যবর্ত্তী, আমাদের অবস্থা রামায়ণোক্ত মহারাজ ত্রিশঙ্কুর মত 'ন যযৌ ন তস্থৌ'।

যোগ শাস্ত্রে অনেক রকম ন্যাসের কথা শুনেছি যথা অঙ্গন্যাস করন্যাস প্রভৃতি। এগুলো আধুনিক মতে যোগী-দের কসরৎ বই আর কিছু নয়। আমার মতে আধুনিক ইহা যোগীগণের ন্যাস না হইয়া উপ অর্থাৎ উপদেবতা-গণের ন্যাস কিনা কসরৎ। বাংলায় আজকাল "উপ" শ্রেণীর বড়ই সমাদর—পত্নী অপেক্ষা উপপত্নীর সম্মান বেশী—পতি অপেক্ষা উপপতি বেশী আদর যত্ন পান—দেবতারা উপদেবতার অত্যাচারে অনেকে বিগ্রহ ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন। কাগজের সম্পাদক কাগজে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিলে উপপাদক (কিনা মালিক) রক্তচক্ষু দেখাইয়া বলেন আত্মশক্তি বাহিরে গিয়া দেখাও—সভাস্থলে সভাপতিকে হট্টগোল করিয়া নির্ব্বাক করিয়া দিয়া আর একজন উপ-সভাপতি আসিয়া সভা চালাইতে চান্; সেই-জন্য বাংলার সাহিত্য, আজ এই উপদেবতাদের ন্যাসে সন্ত্রস্ত—ধ্রুবতারা স্তিমিত হইয়া মিট্ মিট্ করে আর-'হীনের' জ্যোতিতে গৃহস্থের অন্তঃপুর আলোকিত করিয়া কিরণময়ীরা কিরণধারা বর্ষণ করেন। কোথায় গেলে 'সুমতি' কোন পথ দিয়ে পথ ভুলে এসেছিলে, আবার কেন বা আঁধার বনে প্রবেশ করিলে জানি না। মনে পড়িলে বলিতে হয়—

"পথহারা শুকতারা তুমি মধু যামিনী ফুল,
কোন বাতাসে এসেছ ভেসে প্রাণমন করিয়া আকুল"

নাম-মাহাত্ম্যও আজ আর নাই, নইলে 'সাবিত্রীরা' সত্য-বানকে ছাড়িয়া সত্যহীনদের জন্য আকুল হইয়া উঠেন কেন? বুদ্ধদেবের গোপা স্বদেশ উদ্ধার করিতে আসিয়া 'অপবিত্র দেহে' 'বিশুদ্ধ মন' লইয়া ঘরে ফিরেন কোন মুখে? আবার কোন্ মহাস্বামী সেই উচ্ছিষ্ট, দেবতার ভোগে স্থান করিতে কুণ্ঠিত না হন? ভায়া এসব অলৌকিক ব্যাপার—এসব অসম্ভব সম্ভবে কিরূপে জান—এর মূল ঘরে ও বাহিরে—দেখ না ঘরের সীতারা বাহিরের রাবণদের নিকট কাঁচা সঙ্কোচ ঘুচাইয়া কেমন নির্ব্বিঘ্নে, নির্ব্বিকার-চিত্তে অশুদ্ধ দেহ (নশ্বর জিনিষ অশুদ্ধ হইলে কিবা ক্ষতি তায়?) ও পরম পরিশুদ্ধ মন লইয়া আবার বাহির হইতে ঘরে ফেরেন। এসব জিনিষ দেখাইবার

জিনিষটা মুনি ঋষিদের নিকট অজ্ঞাত ছিল কারণ দধীচির মতন একটা শুক্‌নো মুনির পর-হিতার্থে দেহ দানকে কি কেহ আজকালের দিনে মরালকারেজ বলিতে পারে, বরং সেটাকে সেই ভণ্ড যোগীর নাম কিনিবার একটা কৌশল বলা যায়। তখন কি কেউ সেক্সোলজী জানিত,না নারী হৃদয় কেউ টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতো, না বুকে ষ্টেথস্‌কোপ বসিয়ে তাদের মর্ম্মকথা শুন্‌তো ? সে অন্ধকারযুগের কথা ছেড়ে দাও। বি,এ পাশ করেও বঙ্কিমবাবু রোহিনীর মত যুবতী রূপবতী সাধ্বী সতীকে কলঙ্কিনী করে দণ্ডভাগিনী করেন এটা কি কম লজ্জার কথা। তিনি বেঁচে থাকলে আধুনিক ন্যাস-বিশারদ উপ'গণ তাঁর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে হয় তো কাঁটাল পাড়া থেকে নির্ব্বাসিত কর্ত্তেন। বড় সৌভাগ্য লোকটা ঝড়ের আগেই পালিয়েছে, নইলে কি যে হোত তা বলা যায় না। সিংহাসনটা শূন্য ছিল তাই অবিসম্বাদী অধিকারী মশাই ঝপ্‌ করে তাতে বসে পড়ে লেখনীরূপ অসি সঞ্চালন করিয়া সাহিত্য সাম্রাজ্য সুশাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নতুবা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত কর্ত্তে হয়তো French Revolution বা Russian revolution করে, এর সলিউসন কর্ত্তে হোত। উপদেবতাগ্রস্থ পাঠকেরা এখনও উপদেবতার ভর পেয়েই আছেন সুতরাং তাঁরা নির্ব্বিকার, তাই বলছিলাম যে ন্যাসের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

এই উপন্যাস স্কুলের ছেলেদের মস্তক চর্ব্বণে প্রভূত সহায়ত করে—বেকার উমেদারদের Hand to mouth করিবার উপায় করিয়া দেয়—ছাপাখানার ভূতেদের পোষণ করে—মাসিক পত্রিকার কলেবরে বিজ্ঞাপিত হইয়া তাহাদের আয়ুর্বৃদ্ধি করে—প্রকাশকের উদর স্ফীত ও কাঁসনোন্মুখ করিয়া দেয়, নাট্যাকার ধরিয়া অনেক নাট্যশালার অস্তিত্ব রক্ষা করে। নেশাখোর বয়াটেই হোক্‌ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারাই হোক্‌—অভিনেতাদের মাননীয় করে তোলে—পতিতা নারী, যাদের নিষ্ঠুর হিন্দু-সমাজ আশ্রয় দেয় না তাদের সদ্গতি করে—যুবকদের সময় কাটাইবার কারণ হয়—ডেলী প্যাসেঞ্জারের যাতায়াতের সহায় হয়, ট্রামগাড়ীতে ভিড়ের ঠেলা অনুভব করিতে দেয় না—বালিকার চক্ষের সম্মুখে রকমারী প্রেমের বিমোহিনী চিত্র স্থাপন করে,যুবতীদের মধ্যাহ্ন ঘুম পাড়ায়, তরুণীদের মনরঙ্গে সাহায্য করে, প্রৌঢ়ার দীর্ঘশ্বাস উৎপন্ন করিয়া তাহাদের ব্যায়ামের সুফল প্রদান করে—দুপুর বেলায় মুদীকে ক্রেতার অভাব বুঝিতে দেয় না—ষ্টেশনারী দোকান খুলিয়া যে ছোকরা বাবুদের দুপুর বেলায় ঘুম ধরে, তাদের সজাগ রাখে, প্রৌঢ়দের অতীত স্মৃতি জাগাইয়া, হারান-যৌবন ফিরাইবার বাসনা জাগায় ; বৃদ্ধের তাম্রকূট সেবন সুখকর করে—এমন যে সর্ব্বসন্তাপহারী উপন্যাস তাহার মহিমা বর্ণন কে করিবে ? বেদব্যাসের মত অক্লান্ত লেখক যদি ভারতমাতা কখন প্রসব করেন, তবেই উপন্যাসের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ পাইবার আশা করিতে পার নতুবা ভায়া আমার নিকট সে আশা বৃথা। ছাগ দ্বারা যব-পেষণের মত, উদ্বাহু বামনের প্রাংশুলভ্য ফল গ্রহণা-কাঙ্ক্ষার মত, পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনবৎ তাহা একেবারেই অসম্ভব। তবে উপন্যাস পাঠের বৈজ্ঞানিক ও যৌগিক ফল লাভ বর্ণনা করিয়া অদ্য বিদায় গ্রহণ করিব। উপন্যাস পাঠে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয় অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি বা উপদৃষ্টি লাভ হয়, মস্তিষ্ক কুলালচক্রবৎ সর্ব্বদা ঘূর্ণ্যমান থাকে অর্থাৎ মাথায় খুব প্ল্যানের ঝলক্‌ মারে, হস্ত কম্পায়িত হয় কি না লিখিবার জন্য Fountain pen হাতড়াইতে যায়, পদ কম্পিত হয় কিনা উঠিয়া বসিতে পারা যায় না। শুইয়া থাকিতেই ভাল লাগে, চিত্ত ভ্রান্ত হয় কিনা নির্ব্বিকারত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন মন্দকে আর মন্দ বলিয়া বোধ হয় না অর্থাৎ ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা লোপ পায় ; আর হয় মুক্তি ; কারণ উপন্যাসে দুচারটা গীতার শ্লোক ছিটাইয়া দিয়া অনেক ন্যাস-বিশারদ--যোগ, সাধন, দর্শন, প্রভৃতি কষ্টকর ব্যাপারকে উপন্যাসের দুপাতায় পুরিয়া করিয়া পাঠককে সিদ্ধি লাভ করাইতেছেন। উপন্যাস পাঠে মানবের আয়ুর্বৃদ্ধি হয় না হইলে অধিক উপন্যাস ক্রয় করিয়া পাঠ করিবার সময়ে কুলাইয়া উঠে না। ইহা চিত্রশিল্পীগণের প্রতিভার বিকাশের একটা এমন আস্তাবল স্বরূপ হয় যেখানে পিটাইতে পিটাইতে গাধা ঘোড়া হইয়া যায় এবং ঘোড়া গাধা হয় অর্থাৎ উপন্যাস আর চিত্রহীন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না এবং চিত্রশিল্পই প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের বিক্রয় কারক হয়।

ইতি তোমাদের সদানন্দ
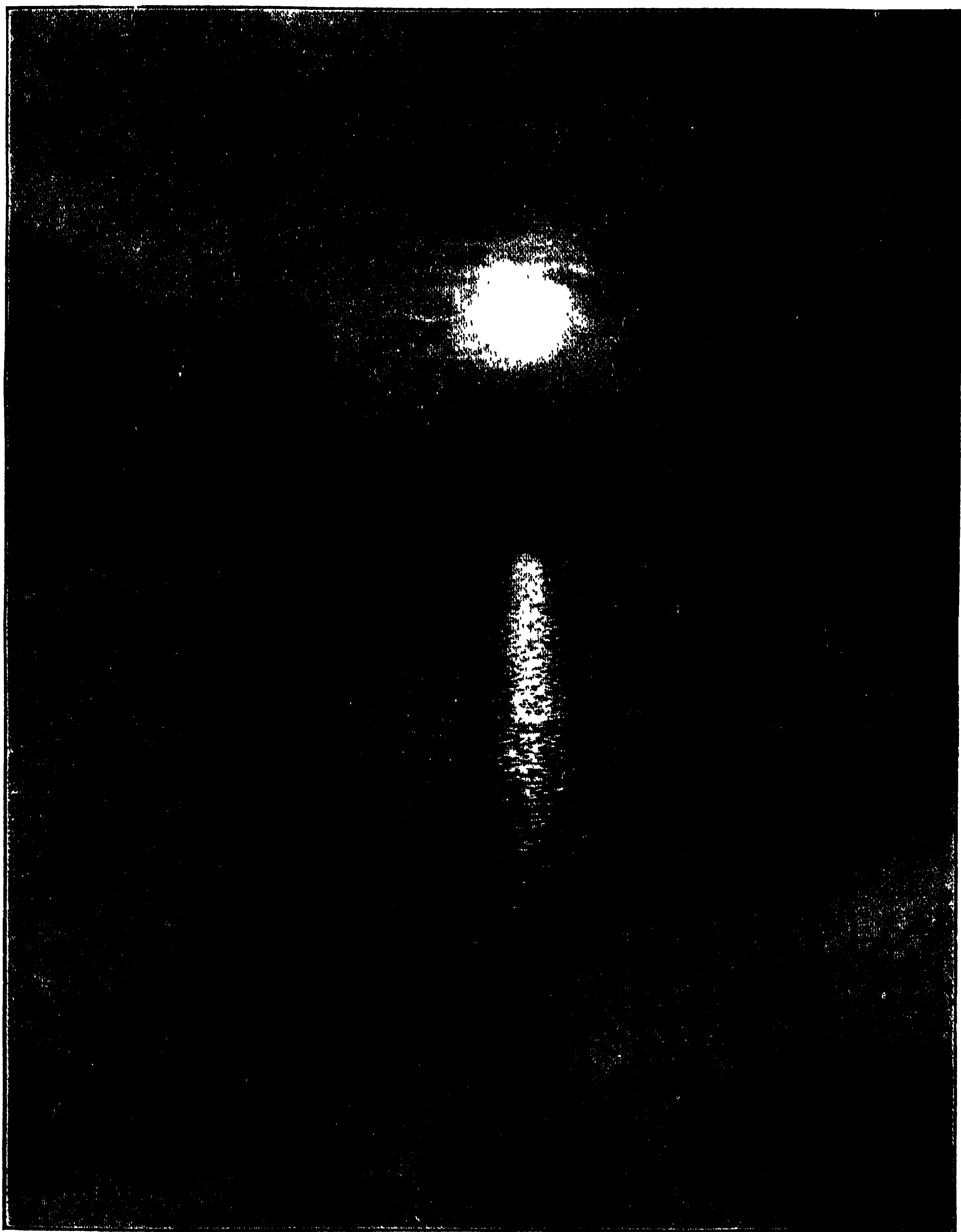
“মাধবী নিশীথে”

মহাত্মা গান্ধীর
ইয়ং ইণ্ডিয়ার সার-সঙ্কলন

(প্রতি সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে)

সঙ্কলয়িতা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি,এস,সি

লোকমান্য স্মৃতিউৎসব—মহাত্মা বলেন যে লোকমান্যের তিরোধানে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে কারণ তিলকপন্থী মহারাষ্ট্রবাসীগণ তাঁহার উপর ও অহিংসা অসহযোগের উপর অযথা আক্রমণ করিতেছেন—তাঁহাদের লেখা পড়িয়া তাঁহাদের মনের ভাব মহাত্মা অবগত আছেন সুতরাং তাহার প্রত্যুত্তর দিয়া কলহাগ্নিতে তিনি ঘৃতাহুতি দিতে প্রস্তুত নহেন। লোকমান্যের উদ্দেশে শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলি দান মহাত্মার মনোগত বাসনা ছিল কিন্তু তিলক পন্থীগণের বিরাগ ভাজন হইয়া তিনি কেমন করিয়া লোকমান্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশে গমন করিবেন? লোকমান্যের অবর্তমানে তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছেন কারণ তাঁহার সহিত মতানৈক্য তিনি সসম্ভ্রমে বলিতে পারিতেন এবং অনৈক্যসত্ত্বেও কেহ কাহাকেও ভুল বুঝিতেন না; কিন্তু তাঁহার অনুগামীগণের সহিত তাহা সম্ভব নহে। তিলকপন্থী দলের মধ্যে বিভিন্নতা আনয়ন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে কারণ এই দল একই নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেন, তাঁহারা শক্তিশালী সেইজন্য তিনি এই দলের হৃদয় অধিকার করিতে চান। লোকমান্য জীবিত থাকিলে তাহা অসম্ভব হইত না কারণ লোকমান্য বলিতেন জনগণ যদি তাঁহার (মহাত্মার) নীতি অনুসরণ করেন তিনিও (তিলক) মহাত্মার অনুগামী হইবেন। সুতরাং লোকমান্য জীবিত থাকিলে মাত্র তাঁহার হৃদয় জয় করিতে পারিলে সমস্ত মহারাষ্ট্র মহাত্মার নীতি অনুসরণ করিত কিন্তু এই দলের সর্ব্বজনমান্য নেতার অবর্তমানে তাহা আর সুসাধ্য নহে। তবে তিনি এখনও আশা ছাড়েন নাই তিনি অহিংস অসহযোগী মারাহাট্টাগণের সাহায্যে সমস্ত মহারাষ্ট্রের মন জয় করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, কিন্তু **অসহযোগীগণ যেন পরিবর্ত্তন প্রয়াসীগণের কার্য্যের সমালোচনা না করেন। তাঁহাদের সহিত মতভেদ থাকিলেও তাঁহাদের সঙ্গে কথায় ও কাজে ভালবাসা দেখান উচিত। পরস্পর মত লইয়া বিরোধ না করিয়াও অন্য যথেষ্ট কাজ আছে যাহা স্বচ্ছন্দে করা যাইতে পারে।**

পক্ষপাতিত্ব না ন্যায় বিচার?—কলিকাতা কর্পোরেশনে চিফ্ এক্সিকিউটীভ অফিসার ৩৩টী কর্ম্মচারী নিয়োগকালীন ২৫ জন মুসলমানকে নিযুক্ত করায় তাঁহার উপর চতুর্দ্দিক হইতে বিদ্রূপ ও বিরুদ্ধ সমালোচনা বর্ষিত হইয়াছে। ঐ সকল সমালোচনা আমি পাঠ করি নাই—তবে আমি তাঁহার উত্তরটী পাঠ করিয়াছি। আমার মতে ইহা প্রশংসাযোগ্য কার্য্য হইয়াছে। পূর্ব্বে সমস্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ কালীন ইয়ুরোপীয় বা ভারতবর্ষীয় কর্ম্মকর্ত্তাগণ ও অপক্ষপাত ছিলেন বলিয়া আমার বোধ হয় না। অনেক স্থলে হিন্দুরা অধিক মাত্রায় চাকরীর সুবিধা গ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং এক্ষণে মুসলমান নিয়োগে কলহ সৃষ্টি করা সুশোভন নহে। অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন যে ইহা দলের স্বার্থ রক্ষার্থ করা হইয়াছে—ইহা সত্য হইলেও তাহাতে কোন দোষ হয় না যদি অন্য দিক দিয়া ইহার কোন সার্থকতা থাকে তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমি যোগ্যতার পক্ষপাতী এবং সেই হিসাবে সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জিত ব্যক্তিবৃন্দ দ্বারা—বোর্ড দ্বারা নির্ব্বাচন হওয়া উচিত। হিন্দুরা যদি ভারতকে স্বাধীন দেখিতে চায় তবে মুসলমান বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টির জন্য কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করা তাহাদের কর্ত্তব্য। আমি প্রধান কার্য্যকারী কর্ম্মচারীর নিম্নলিখিত কথাগুলি পূর্ণভাবে অনুমোদন করি—

"সামান্য কয়টা চাকরী দিয়া সহস্র সহস্র শিক্ষিত চাকরী প্রার্থী বুভুক্ষু যুবকবৃন্দের মনস্তুষ্টি করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, আমি যে ভাবেই কাজ করি না কেন বেশীর ভাগ কর্ম্ম-প্রার্থীগণকে আমায় নিরাশ করিতে হইবে। চাকরী দিয়া এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয় তবে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থাই ইহার একমাত্র সমাধান—এ সম্বন্ধে কর্পোরেশন অনেক সাহায্য করিতে পারে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।"

সত্যই চাকরীর সংখ্যা এত অল্প যে অতি অল্প লোকেই তাহা পাইতে পারে। সুতরাং শিক্ষিত লোকেরা কারীকর ফেরীওয়ালা ও ঐরূপ কার্য্যের উপযোগী হইতে চেষ্টা করুন।

প্রতিজ্ঞা পালন—মিঃ গান্ধীর নামে শিরো-নামাঙ্কিত, মিঃ এম্ কে আচার্য্যের খোলা চিঠির উত্তর দিবেন বলিয়া মহাত্মা স্বীকৃত ছিলেন এক্ষণে তিনি তাহার উত্তর দিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে মিঃ আচার্য্যের পত্র উত্তমরূপে পাঠ করিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গে নিজের মতের বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পান নাই—তাঁহার সৌভাগ্য যে তিনি বিরোধীর দিক দিয়া তাঁহার মতামত দেখেন এবং যতদূর পারেন তাঁহার সঙ্গে একমত হয়েন তবে বিরোধীদিগকে তিনি নিজের দিক দিয়া তাঁহার মত দেখিতে রাজী করিতে অপারগ হন সেটা তাঁর মস্ত দুর্ভাগ্য। জাতীয় বিরোধিতার মধ্যেও কতকাংশে আনন্দজনক সামঞ্জস্যের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব নয়। অসহযোগ আন্দোলনের মূল ও কারণ সম্বন্ধে মিঃ আচার্য্যের সহিত তাঁহার মতান্তর নাই তবে কংগ্রেসের প্রস্তাব, সংস্কারের ও গঠন সম্বন্ধে পার্থক্য আছে ও মহাত্মা নানা যুক্তি প্রয়োগে নিজের মত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রস্তাবের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে মহাত্মা বলেন যে সাধারণ জনগণের পক্ষে স্বরাজ পাওয়া, সূতা-বোনা ও চরকা-কাটার ঘরে ঘরে প্রচলন না হইলে সম্ভব হইবে না। বিদেশী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে চরকার প্রচলন ছিল তা সত্ত্বেও বিদেশী-গণের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়া হইতে, চরকার কোন উপকারিত্ব নাই এটা প্রমাণ হয় না; কারণ তখন চরকা আমাদের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করণের জন্য নিত্য আবশ্যকীয় ছিল—সেটা জাতীয় আবশ্যক ছিল না—এখন যে উহা আমাদের জাতীয় প্রয়োজন হইবে তাহা আমরাও জানিতাম না। আমরা অনেক সময় সুস্থ ফুসফুসকে দূষিত বায়ু গ্রহণে দুষ্ট করি—যখন তাহা ব্যাধিতে পরিণত হয় তখন আবার তাহাকে সুস্থ করিবার জন্য বায়ু পরিবর্ত্তনে যাই। প্রত্যেক জিনিষের দেশ কাল পাত্রোপযোগী আবশ্যকতা আছে, চরকা সম্বন্ধেও তাই—আমি উহাকে সর্ব্বদেশে, সর্ব্বজাতির স্বরাজ লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া ঘোষিত করি নাই। মিঃ আচার্য্যের তর্কের ধারা ঠিক সুসম্বদ্ধ নহে, কারণ মহাত্মা যাহা কখনও বলেন নাই তিনি তাহা স্বীকৃত অনুমান করিয়া তর্কজাল বুনিয়াছেন। কাউন্সিলের কিছু উপকারিতা আছে, মহাত্মা তাহা অস্বীকার করেন না—তবে তাঁহার মতে উহা জনসাধারণের পক্ষে কোনরূপ ফলপ্রদ নহে; এবং কংগ্রেস জনসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়াই কংগ্রেস পন্থীগণের কাউন্সিল বর্জ্জনই বিধেয়। তাঁহার বক্তব্য যে ভিত্তিহীন নয়, তাহা যে পরিমাণে কাউন্সিল-প্রয়াসীরা সাধারণের সহিত মিশিবেন সেই পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। উকীলগণও সেইরূপ কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য না হইয়াও এবম্বিধ উপায়ে জনগণের হিতসাধন করিয়া কংগ্রেসে থাকিতে পারেন। ভুলটা ব্যবস্থার নয়—ভুলটা রক্তমাংসের—পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর করিবার ক্ষমতার অভাব ও পদমর্য্যাদার প্রলোভনেই সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে। যদি সত্যই নেতাদের মনে দীন দরিদ্র স্বজাতির সেবা ও উপকার করার ইচ্ছা থাকিত, তবে কার্য্য পদ্ধতি লইয়া কোন বাদ বিসম্বাদ হইত না—এবং অসহযোগের ব্যবস্থাই সকল শ্রেণীর পন্থা বলিয়া পরিগণিত হইত। ব্যক্তিগত ক্ষমতার লোভেই সব মাটী হইয়া যাইতেছে। ভারতে এখনও রেল হইতে বহুদূরে অবস্থিত এমন অসংখ্য গ্রাম আছে যেখানের অধিবাসীরা আইন আদালতের ধার ধারে না—স্কুল কলেজের নামও জানে না। যদি রাজতন্ত্রের প্রভাব হইতে নেতারা মুক্ত হইতে পারেন তবেই এই শ্রেণীর অসংখ্য জীবের উপকার হওয়া সম্ভব। মহাত্মা বলেন তিনি নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ও দীন হীন মনে করেন এবং তাঁহার অদৃষ্টসূত্র ঐ দরিদ্র দীনহীনদের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে জড়িত।

খাদি বিক্রয়ের অভাব—ক্রেতার অভাব হেতু কেবল বাংলায় নহে, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, অন্ধ্র প্রভৃতি

সকল প্রদেশেই খাদি জমিয়া যাইতেছে। সমস্ত ভারতের অবিক্রীত খদ্দরের মূল্য আনুমানিক কুড়ি লক্ষ টাকা হইবে—ভারতে যে ক্রোর ক্রোর টাকার বিলাতী কাপড় মজুত থাকে তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নহে—ইচ্ছা করিলে যে কোন একজন ধনী ইহা খরিদ করিয়া কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া খাদি প্রচারে সহায়তা করিতে পারেন; কোন মিলের মালিকও যদি ঐরূপ খাদি প্রচারে সাহায্য করেন তাহাতেও তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হইবে না। এক একটা মিটিংএ যে লোক জড় হয়, সকলে এক একখানি খাদি কিনিলে অল্প দিনেই উহা নিঃশেষিত হইতে পারে, বোম্বের দুই লক্ষ লোক ইচ্ছা করিলে একদিনে উহার গতি করিতে পারেন। এ সকল কথা লইয়া মহাত্মা আক্ষেপ করিতে চাহেন না—কারণ ইহা বিক্রয়ের জন্য যে যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে এমন প্রমাণ তিনি এখনও পান নাই সুতরাং ইহাতে কর্ম্মীদের ক্রটী আছে মনে করেন। কর্ম্মীরা কেবল খাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিলে চলিবে না—প্রত্যেক প্রদেশে যতদূর বেশী সম্ভব খাদি প্রস্তুত করেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। মহাত্মা মনে করেন যে কংগ্রেসের প্রস্তাবটী লোকে মন খুলিয়া পালন করিলে আপনা হইতে সকল অসুবিধা দূর হইয়া যাইবে।

মহাত্মার মন্তব্য—খদ্দরকে বাঁচাইবার জন্য মহাত্মা বিদেশী কাপড়ে অধিক শুল্ক বসাইবার পক্ষপাতী এমনকি মিলের বস্ত্রেও শুল্ক বসাইয়া খদ্দরকে বাঁচান তাঁহার মতে আবশ্যক। বিদেশের মূলধন বা বিদেশী বণিকের আগমনে মহাত্মা ভীত নন, যদি তাহারা বিশেষ রাজকীয় অনুগ্রহ বা সুবিধা না পায়, নিরপেক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবাসী সহজে দাঁড়াইতে পারে এ বিশ্বাস মহাত্মার আছে। বড় বড় কলকারখানা বা বড় যৌথ কারবার বা কতক গুলি কারবার সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরিচালন, তিনি ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ করেন না; কারণ ঐরূপ সমবায় সমূহ দ্বারাই ভারতবর্ষ দারিদ্র্যগ্রস্ত হইতেছে। জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আবশ্যকীয় যন্ত্রাদির সাহায্য লওয়া তাঁহার মতবিরুদ্ধ নহে।

আচার্য্য গিদ্‌বাণী—শ্রীমতি গিদ্বাণী তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে সম্প্রতি যে দুই পৃষ্ঠা পত্র পাইয়াছেন মহাত্মা ইয়ংইণ্ডিয়ায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন উহাতে জানা যায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভালই আছে, তৎসম্বন্ধে বিরুদ্ধ জনরব অমূলক। তিনি নিয়মিত ভাবে তিনঘণ্টা সূতা বুনিতেছেন ও পুস্তক পত্রিকাদি পাঠ করিতে পাইতেছেন। তিনি পত্নীকে হিন্দি শিক্ষা করিতে ও নিয়মিত চরকা কাটিতে বলিয়া দিয়াছেন।

খাদি প্রচার—মিঃ বি, এফ ভারুচা নামক প্রসিদ্ধ কর্ম্মী ও অসহযোগী বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিয়া তথায় খাদি প্রচার কিরূপ চলিতেছে তাহা মহাত্মাকে জানাইয়াছেন। আচার্য্য রায় ও তদীয় সহকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় খাদি প্রচারের জন্য যে অমানুষিক পরিশ্রম, সময় ও আর্থিক ত্যাগস্বীকার করিতেছেন তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তবে খদ্দর প্রস্তুতকারীদিগের পরিধানে বিলাতী বস্ত্র দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইয়াছেন এবং তাহাদিগকে খদ্দর পরিধানে প্রতিশ্রুত করিয়াছেন। তবে যে পরিমাণ খদ্দর প্রস্তুত হইতেছে তাহা নিয়মিত বিক্রয় না হওয়ায় প্রচার কার্য্যে অর্থাভাব জনিত কষ্ট হইতেছে। হিন্দুমুসলমানে একতা বৃদ্ধি করিতে চরকার ক্ষমতা তিনি বাংলায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তাঁহার বিশ্বাস চরকার সাহায্যেই এই দুই শ্রেণীর মধ্যে স্থায়ী সদ্ভাব স্থাপিত হইতে পারে।

দলাদলি অনাবশ্যক—খাদি প্রচার সম্বন্ধে রাজনৈতিক মতের পার্থক্য বা দলাদলি না করিয়া যে কোন ব্যক্তি উহাতে যোগদান করিতে পারেন এবং সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি থাকিলে অচিরে খাদি ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দারিদ্র্য ক্লেশ নিবারিত হইবে ইহাই মহাত্মার ধারণা।

কাহাকে রক্ষা করা আবশ্যক—কাপড় না লৌহ? এসম্বন্ধে ডাক্তারের পত্র মহাত্মা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে লৌহ ব্যবসায় যাহাতে ভারতবাসীর স্বার্থ অল্পই জড়িত—রক্ষার জন্য যদি দেড় ক্রোর টাকার দায়ীত্ব ভারতবাসীর স্কন্ধে থাকে তবে খাদি প্রচার জন্য আরও অনেক বেশী টাকা ব্যয়িত হওয়া উচিত।

আসামে অহিফেন নিবারণ—আসামের কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক অহিফেন নিবারণার্থ একটী কমিটী গঠিত হইয়া উপস্থিত শিবসাগরে

সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন—অনেকে সাক্ষীই একেবারে অহিফেন তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। অহিফেন সেবনে কালাজ্বর ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নিবারিত হয় বলিয়া যে ধারণা আছে, এই সকল সাক্ষ্যে তাহা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে কারণ অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে অহিফেনসেবীদের মধ্যেই এই সকল রোগে মৃত্যুসংখ্যা অধিক। মহাত্মা এই কমিটীকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা যেন কেবল সাধারণ লোকের সাক্ষ্য লইয়াই ক্ষান্ত না থাকেন। আসামবাসীগণের সাধারণ স্বাস্থ্যের উপর অহিফেন কি ক্রিয়া করিয়াছে তাহার ডাক্তারী সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক এবং অহিফেন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আলোচনা যেন করা হয়।

নিখিল ভারত খাদি বোর্ডের অভিযোগ—খাদি প্রচারের সাফল্য জনসাধারণে নিয়মিত প্রকাশ আবশ্যক—কিন্তু খাদি বোর্ড প্রাদেশিক সমিতি হইতে নিয়মিত সংবাদ পান না বলিয়া অভিযোগ করেন। তামিলনাড়ু, উৎকল, পাঞ্জাব, বিহার এবং মহারাষ্ট্র নিয়মিত সম্বাদ দেন। কেরল প্রদেশ সম্প্রতি সংবাদদান আরম্ভ করিয়াছেন। দিল্লী ও বর্ম্মায় এযাবৎ খাদি বোর্ড স্থাপিত হয় নাই। মহারাষ্ট্রের রিপোর্ট অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। এসমস্ত বড় দুঃখের বিষয়। প্রত্যেক প্রদেশে কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে কত খাদি প্রস্তুত হয় এবং বাহিরের লোক দ্বারা কতখানি প্রস্তুত হয় তাহা জানা আবশ্যক এবং খাদি ঐ প্রদেশে কত বিক্রয় হয় ও কত অন্য প্রদেশে বিক্রীত হয় তাহাও জানা আবশ্যক। ইহার জন্য নিখিল ভারত বোর্ডকে যেন সকলকে তাগাদা করিতে না হয়। তাগাদা করিতে হইলে বুঝিতে হইবে কার্য্য বিশৃঙ্খল অবস্থায় হইতেছে। প্রত্যেক প্রদেশ যাহাতে সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া নিয়মিত রিপোর্ট দেন সেজন্য মহাত্মা সকল প্রদেশের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন।

রাসভায়ণ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

রাসভ রে আমার !
তোমার পিঠে বোঝাই দিলাম
কাপাস তুলার ভার।
নয় কো এটা লবণ চিনি
ঘোল ত এবার দিইনি কিনি,
চলবেনাকো ছিনি মিনি
সেই জল-বিহার।

(২)

নালার সলিলে,
পড়লে মিছে নিছক তুমি
গাধা বনিলে।
আর্দ্র তুলা উঠলো কাঁপি,
বসলো জোরে পৃষ্ঠে চাপি,
পালান এবার সকই খাপি
কার্য্য চমৎকার।

(৩)

রে যাদুমণি,
এবার তুমি ঘোল খেয়েছ
খেতে নবনী।
পড়লো এবার ছিঁড়লো ভুঁড়ি,
গোঁৎকা খেলে ঘোঁৎকা ঘুড়ি,
কোঁৎকা হলো সিন্নি উঁড়ি
দিব উপহার।
ময়দা ঘি ত নয়,
নাদন ঘাটের কাঁদন ওরা
সওদা সুনিশ্চয়।
পড়লে খানায় খাম্‌কা পাশের
তুলা এটা রাম কাপাসের
ডুব্‌বে নাক উপ্‌বে নাক
নিজেই নিশেনদার।
রাসভ রে আমার !

কাজের কথা

অশ্লীলতা নিবারণ—কলিকাতার নানাস্থানে খানাতল্লাসী, তিনজন লোক গ্রেপ্তার। গত বৃহস্পতিবার দিন কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ ১৬ এবং ২৯ নম্বর গ্রে ষ্ট্রীট, ৪ নং চৌরঙ্গী রোড ও ১২ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীটে পি, সি, দে এণ্ড কোম্পানীর দোকান সমূহে এবং বাড়ীতে একই সময়ে খানাতল্লাসে কতকগুলি অশ্লীল পুস্তক লইয়া গিয়াছে। এই সঙ্গে পি, সি, দে এবং আর দুইজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যথাসময়ে ইহাদিগকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইবে।

এই পাপটী আমাদের সহরে অতিমাত্রায় বাড়িয়া যাইতেছে এমন কি ট্রামের ধারে কলেজ ষ্ট্রীট, এসপ্লানেড প্রভৃতি যায়গায় ফেরীওয়ালারা "আসলি ফ্রেঞ্চকার্ড" "বাবু-নেকেড্ পিক্‌চার" বলিয়া হাঁকে দেখিয়াছি—এবং আশ্চর্য্য হইয়া যাই যে কেন পুলিশে ইহাদের ধরে না। অনেক ট্রামের প্রথমশ্রেণীতে শিক্ষিতা বাঙ্গালী মহিলাগণ ও এংলো ইণ্ডিয়ান, ইউরোপীয়ান স্ত্রীলোকগণও যাতায়াত করেন—তাঁহাদের সম্মুখে এরূপ একটা ব্যাপার হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এযাবৎ ইহার বিরুদ্ধে কাহাকেও কথা কহিতে দেখি নাই—না আরোহীগণ, না ট্রামের কর্ম্মচারীগণ। আশা করি এই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এইরূপ ফেরীওয়ালাদেরও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন। সমাজকে কলুষিত করা, দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা যুবকগণের চিত্ত-চপলতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে নৈতিক অধঃপতনের পথে পাঠান, যে কত গুরুতর পাপ তাহা বলা যায় না। এই শ্রেণীর অপরাধীদের কঠোর দণ্ডের আবশ্যক—জরিমানায় ইহাদের চৈতন্য হয় না কারণ ইহারা এই সব গুপ্ত ব্যবসায়ে অত্যধিক লাভ পাইয়া থাকে। এরূপ কাজের মূলে একজন বাঙালীর নাম শুনাও যে লজ্জার কথা—সমস্ত জাতিটার মনুষ্যত্ব যে কত নীচু হইয়া পড়ে তাহা বলা যায় না। এই গ্রেপ্তার করার মূলে টেগার্ট সাহেবের হস্তে আছে বলিয়া মনে হয় নতুবা সকল বিষয়ে এত তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা একজন সাধারণ কর্ম্মচারীর পক্ষে সম্ভব নয়—যিনিই ইহার উদ্যোক্তা হউন, তিনি পুলিশ কর্ম্মচারী হইলেও আমাদের ধন্যবাদার্হ এবং প্রকৃত হিতার্থী বন্ধু। পুলিশ যদি অলীক ব্যাপারের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া এই শ্রেণীর—সহরের উন্নতি বিষয়ক কার্য্য করেন ত জনসাধারণকে রক্তচক্ষু না দেখাইয়া এই পুলিশই আবার দেশবাসীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারেন।

ভারতে নারী মর্য্যাদা

গত ২৫শে জুলাই শুক্রবার বিলাতের প্রদর্শনী ভারতবর্ষের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সে দিন রাণী মেরীর এক বাণী তথায় পঠিত হয়:—"আমি যে দুইবার ভারতবর্ষে গিয়াছি, তাহাতে ভারতে নারীদিগের মানসিক উচ্চতা, করুণা ও সারল্যের অনেক সুখস্মৃতি আমার স্মৃতিগত হইয়া আছে। আমি সর্ব্বদাই ভারতের নারীদিগের কথা ভাবি এবং তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করি। দুই বারই আমি স্ত্রীলোকের মহান্ কর্ম্মক্ষেত্র—গৃহসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে আমার কথা জানাইয়াছি। গৃহ হইতেই জাতি ও সাম্রাজ্য গঠিত হয়। ভারতবর্ষে গৃহই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারতে এখন স্বাস্থ্যসম্পন্ন—শক্তিশালী সন্তানের প্রয়োজন। তাহাদের ধারণা ও আদর্শ যেন সুবুদ্ধির পরিচায়ক ও শান্ত হয়। পৃথিবীর আর কোন দেশে গৃহ, ভারতের মত পবিত্র নয়—কোথাও গৃহ হইতে এত অধিক কাজ হয় না; কারণ ভারতে গৃহের প্রতি লোকের মমতা ও পরিজনের প্রতি আকর্ষণ জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলা যায়। আমার বিশ্বাস, জগতে কোথাও স্ত্রীলোকের ক্ষমতা ভারতের মত অধিক নহে।"

সাম্রাজ্ঞী মেরীর বাণী যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা কে অস্বীকার করিবে? ভারতের গৃহের পবিত্রতা এখন

অভাব দুঃখ দৈন্য, শিক্ষার অভাবে নিস্পিষ্ট হইয়া যাইতেছে—এই সব অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কোন ব্যবস্থা তিনি করিতে পারিলে উপদেশ সত্যই মঙ্গলে পরিণত হইতে পারে।

——

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

গত সপ্তাহে কলিকাতা কর্পোরেশন সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহা কর্ত্তাদের কর্ণগোচর হইয়াছে কিনা জানি না—কারণ প্রভুত্বের সঙ্গে সঙ্গে বধিরতা আপনি আসিয়া পড়ে তবে কাউন্সিল নির্ব্বাচনের সময়ে তাঁহাদেরই প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির প্রতি আমরা তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি—দাশ মহাশয় তাঁহার ভক্তগণকে খাড়া করিবার জন্য বলিয়াছিলেন কলিকাতার উত্তর দক্ষিণ দুদিকই চৌরঙ্গীর মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাইব—এখনও সে সব রাস্তার তারতম্য যে অধিকভাবে প্রকটিত হইতেছে।

ঝাড়ুদারগণের ধর্ম্মঘট মিটিবার পর হইতে তাহাদিগকে কর্ত্তব্যপালনে বিশেষ উদাসীন দেখা যাইতেছে, বিশেষতঃ সহরের উত্তরাংশে ময়লা নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়ায় ঐ সঞ্চিত ময়লার দুর্গন্ধে নিকটস্থ অধিবাসীগণের ও পথচারী ভদ্রলোকদের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে—গলি ঘুঁজির অবস্থা আরও শোচনীয়। এই সকল ঝাড়ুদারদের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবার জন্য জমাদার, ওভারসিয়ার প্রভৃতি কর্ম্মচারী থাকেন—তাঁহারা কি নিম্নশ্রেণীদের বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায় কিছু বলেন না—না নিজেদের কর্ত্তব্যই করেন না—কর্পোরেশনের বড় কর্ত্তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের আশঙ্কা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে, এ বিষয়ে তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয়।

——

কর্পোরেশনের একজন পাবলিসিটী অফিসার নিযুক্ত হইবে শুনিয়া স্বদেশী ও অ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ান কাগজগুলি চীৎকার সুরু করিয়াছেন। এই অফিসার নিযুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাঁহার দ্বারা সত্যই সাধারণের কোন উপকার হয় কিনা দেখিয়া পরে মন্তব্য প্রকাশ করাই উচিত।

——

লর্ড অলিভিয়ার দেশবন্ধুর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আলোচনা করিতে গিয়া আগষ্ট মাসের মডার্ণরিভিউ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে "মিঃ দাশ পুনঃ পুনঃ অহিংসার উপর তাঁহার আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন—তবে অবশ্য গোপীনাথ সাহার প্রস্তাব সমর্থন করায় তাঁহার বিপক্ষগণ তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন সুতরাং লর্ড অলিভিয়ারের উক্তি ন্যায়সঙ্গত কিনা তাহা ঠিক বুঝা যায় না। অহিংসা বা হিংসার সমর্থন সম্বন্ধে দাশ মহাশয়ের স্থির ধারণা দাশ মহাশয়ই জানেন—যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে এরূপ কোন ধারণা তাঁর আছে।"—যেমন বৃশ্চিকের পুচ্ছ দেশেই হুল থাকে তেমনি দাশ-বিরাগী মডার্ণরিভিউ শেষকালে একটু চিম্‌টী কাটিয়া জানাইয়াছেন যে দাশ মহাশয়ের কোন স্থির ধারণা নাই। বহুৎ আচ্ছা অপক্ষপাত বিচার!

——

লাল বাংলা—বিদ্রোহবাদীগণ এক লাল ইস্তাহার দাগিয়া চতুর্দ্দিকে মারিয়াছেন এরূপ গুজব চৌরঙ্গীর ইংরেজ কাগজওলারা বলিতেছেন আর সরকার বাহাদুর ঐ ইস্তাহারকে বিদ্রোহজনক বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। বাঙালীদের মধ্যে কাহাকেও ঐরূপ ইস্তাহার দেখিয়াছেন বলিয়া বলিতে শুনি নাই—কেবল চৌরঙ্গীবাসী বেঙ্গলী নাকি ডাকযোগে একখানা পাইয়াছেন। ইহা সত্যই বিদ্রোহীদের কাজ, না দেশে বিদ্রোহের ভাব থাকিলে যাহাদের সুবিধা হয় তাহাদের একটা কৌশল তাহা কে নিশ্চয় বলিতে পারে! লাল রঙ হইলে ইহাকে সহজে বোলশেভিজমের সঙ্গে সংযুক্ত করা যাইতে পারে—তাই কি উহাকে লাল বলা হইয়াছে?

রিভলবার ও টোটাসহ একটী বাঙ্গালী যুবক মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে ধৃত হইয়াছিল—গত সপ্তাহে নবযুগ ছাপা আরম্ভ হইয়া গেলে আমরা এ সংবাদ পাই তজ্জন্য ইহার উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ করা যায় নাই। ইহার ফলে স্বদেশী এজেন্সী ও পটুয়াটোলার বীণাপাণি বোর্ডিংএ খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে—এই ব্যাপারে বাঙ্গালার সমস্ত অধিবাসীর দুঃখে ও লজ্জায় ম্লান হওয়া উচিত। কি জন্য যে এই উন্মার্গগামী কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকেরা এই

রূপে জাতির সম্মান ও আত্মমর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছে তাহা বুঝা কঠিন। হত্যা, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতিতে যে দেশমাতৃকা তৃপ্ত হন না তাহা কি ইহারা কোন দিন বুঝিবে না—ইহাদের উন্মাদ ভিন্ন অন্য কোন আখ্যা দেওয়া যায় না। সরকার হইতে যে বিদ্রোহীদলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বারংবার বলা হইয়াছে ক্রমশঃ দেশের লোকেরও তাহাতে বিশ্বাস জন্মিতেছে; এখন আর তাহাকে অলীক বলা যায় না। এই বিশৃঙ্খল যুবকগণের কার্য্যের জন্য আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির আশা সুদূরপরাহত হইবে। নেতারা যতই চেষ্টা করুন না কেন কোন সুফল হওয়া অসম্ভব। এই কি মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ পন্থা অবলম্বন! এইরূপে জিঘাংসা চরিতার্থ করিলে দেশ যে কোন কালে স্বায়ত্ত শাসন পাইবে না। এই সব কার্য্যের ফলে দেশবাসীকে সমগ্র জগতের কাছে কত হেয় হইতে হইবে তাহা কি মস্তিষ্কহীন তরুণেরা ভাবিয়া দেখিয়াছেন। সকল কাজ ফেলিয়া এই জিঘাংসা-বৃত্তি রোধ করিবার জন্য সকল শ্রেণীর নেতাব একত্র হইয়া কাজ করা কর্ত্তব্য। এ সকল জাতীয় জীবনের শুভ লক্ষণ নহে—ইহা দুষ্ট স্ফোটক (Carbuncle) ইহার দমন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

ত্রুটি স্বীকার—মুদ্রাকর প্রমাদে বিগত তিন সংখ্যাই পরিপূর্ণ ছিল—তাড়াতাড়ির জন্য কিছুতেই উহার প্রতিকার করিতে পারি নাই অতঃপর ঐ বিষয়ে আরও সাবধানতা অবলম্বন করিব। এই সকল ত্রুটীর জন্য পাঠক ও লেখক বর্গের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিতেছি।

আমাদের নিয়মাবলীতে লেখা ছিল প্রতি মাসে চতুর্থ সংখ্যা Special Issue অর্থাৎ বিশিষ্ট সংখ্যা হইবে। উহা লিখিবার সময় আমাদের উদ্দেশ্য ছিল মাসের শেষ সংখ্যা বিশিষ্ট আকারে বাহির করা, কিন্তু এই শ্রাবণ মাসেই পাঁচ সংখ্যা নবযুগ বাহির করিতে হইবে। উদ্দেশ্য অনুযায়ী পঞ্চমসংখ্যাই বিশিষ্ট সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন অনুসারে চতুর্থ সংখ্যাই বিশিষ্ট সংখ্যা করা হইল। অতঃপর নিয়মাবলী উদ্দেশ্যানুযায়ী পরিবর্ত্তিত করা হইল।

চার সপ্তাহের শিশু নবযুগ দেশবাসীর সেবা করিতে পারিবে কিনা সে সম্বন্ধে আমরা পাঠক পাঠিকা, সাহিত্য-সেবী সমালোচক প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর বঙ্গবাসীর মতামত চাহি তদনুযায়ী আমরা ইহার পরিচালনা, উদ্দেশ্য-সাধন, মুদ্রণ ও অঙ্গ-সৌষ্ঠবের পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন বা পরিবর্দ্ধন করিব।

সাধারণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে পত্রাদি আসিলে তাহার উপযোগিতা অনুসারে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। বাঙলা ও বাঙালীর কথা জোর গলায় বলিবার জন্যই ইহার জন্ম সুতরাং যে কোন স্থানে তাহার ব্যত্যয় হইবে তথায় নবযুগের বাণী সর্ব্বাগ্রে ধ্বনিত হইবে।

মুখর বীণা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

(১)

হঠাৎ সেদিন সকালবেলা
নদীর তীরে দেখনু যেয়ে।
যাচ্ছে গো এক বীণা-বাদক
বাজিয়ে বীণা, তরী বেয়ে॥

(২)

নীরব বীণা পড়েছিল
তারেতে কে আঘাত দিল;
জানি না সে কি হরষে
হঠাৎ এত মুখর হ'ল॥

(৩)

সেই প্রভাতী সুর লেগে মোর
নীরব বীণা উঠল বেজে।
সেই থেকে সে বাজ্‌ছে আজও
কিছুতে আর থামছে না যে॥

(৪)

বাজ'ল বীণা, নূতন যুগে,
নূতন প্রাণে নূতন সুরে।
শ্রাবণ ধারা পড়'ল নেমে
আকাশ ভেঙ্গে দেশটী জুড়ে।

অব্রাহ্মণ

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রায়

তখন আমি সবেমাত্র ডাক্তারি পাশ করেছি, কিছুমাত্র পসার কর্ত্তে পারিনি; নিরুপায় হয়ে রেলওয়ে হাঁসপাতালে চাকরী নিলাম—বেতন হল ৭০৲ টাকা। গৃহে স্ত্রী ও দুই পুত্র; পুত্র দুইটী তখন নিতান্ত ছোট।

আমি যে সময়কার কথা বলছি তাহা খুব বেশীদিনের নয়; তখনও ইংরেজ জার্ম্মাণীর যুদ্ধ পুরাদমে চলিতেছিল। তখনকার দিনে ৭০৲ টাকায় পরিবার নিয়ে বাস করা কতটা স্বচ্ছল তা পাঠকেরা অনায়াসেই উপলব্ধি কর্ত্তে পারবেন, বিশেষতঃ একজন ডাক্তারের পক্ষে।

সেদিন ছিল মঙ্গলবার। সকালবেলা অলসভাবে একখানা চেয়ারের ওপর বসে অদৃষ্ট চিন্তা করছিলাম, এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। টেলিফোন কথাটা শুনে আপনারা হয়ত উপহাস করে বলবেন যে যার আয় মাত্র ৭০৲ টাকা, তার ঘরে আবার টেলিফোন! তদুত্তরে বলি যে আমি রেলওয়ে কোম্পানি থেকেই বাড়ী পেয়েছিলাম এবং সেই ঘরেই টেলিফোন ছিল।

তাড়াতাড়ি উঠে টেলিফোন ধরলাম, টেলিফোন্ আফিস্ হতে আসছিল। আদেশ হল আমায় এখুনি একবার আফিস যেতে হবে। আমি তখনই আফিস অভিমুখে যাত্রা করলাম।

আফিস যেতেই বড় সাহেব বল্লেন কাল যে লোকটা ট্রেণের তলায় চাপা পড়েছিল, তার অবস্থা এখন বড় খারাপ। তুমি একবার গিয়ে দেখে এস।

তার কাছে গিয়ে দেখলাম সে মুমূর্ষু-যন্ত্রণা ভোগ করছে। আমার পায়ের শব্দে চমকে উঠে সে জিজ্ঞাসা করল—কে? আমি আত্ম পরিচয় দিলাম।

সে একটু উত্তেজিত হয়ে বল্লে বাবু আপনি কি ডাক্তার? বলুন দেখি আমি বাঁচব কিনা? আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লাম বাঁচবে বৈকি, আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম। সে তাড়াতাড়ি আমার ডান হাতখানা তার বুকে রেখে বল্লে আঃ বেশ ঠাণ্ডা। তাকে দেখে আমি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। সে একটু ম্লান হাসি হেসে বল্ল, আমার পরিচয়? একজন চোরের আবার পরিচয় কি বাবু? চোরকে লোকে চোর বলেই জানে। তারপর একটু জিরিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে বাবু আপনি কি ব্রাহ্মণ? বলে উৎসুক দৃষ্টিতে আমার মুখপানে চেয়ে রইল।

আমি তার উত্তরে ও প্রশ্নে খুব বিস্মিত হলাম, একটু ঢোঁক গিলে বল্লাম—হ্যাঁ আমি ব্রাহ্মণ। তখন সে যেন একটু উত্তেজিত হয়ে বল্লে "ভগবান আমায় ক্ষমা কোরো—আমি সব দোষ ব্রাহ্মণের কাছে বলে যাচ্ছি। তারপর আমার দিকে ফিরে বল্লে বাবু আমি আমার সব দোষ আপনার চরণে নিবেদন কচ্ছি; আপনি ক্ষমা করলে ভগবানও হয়তো ক্ষমা করবেন, ব্রাহ্মণ নারায়ণ!

উপর্য্যুপরি তিন বোনের পর যখন আমার জন্ম হল, তখন হতে আমি মা বাবার মাথার মণি হলাম। তারপর আবার যখন দু বোন মারা গেল, তখন হতে আমার আদর দ্বিগুণ বাড়ল। আমি যখন যা চাইতাম তা তখনই পেতাম। পাড়ার লোকরা আমার অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। অনেকে বাবার কাছে এসে নালিস্ কত, কিন্তু বাবা তাদের কথা কাণেই তুলতেন না। এমনি আদর আব্দারের মধ্য দিয়ে বাড়তে বাড়তে আমি দশ বছরে পা দিলুম। তখন বাবা আমায় স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। কয়েক বছর বেশ মন দিয়ে পড়ে আমি ফোর্থ ক্লাস অবধি উঠলাম; তারপর কি জানি কেন আমার পড়তে আর মোটেই ভাল লাগল না। আমি একথা বাবাকে জানালাম। বাবা শুনে খুব বকলেন; তারপর আবার আমায় কাছে ডেকে আদর করে অনেক বোঝালেন; কিন্তু আমার পড়াশুনায় আর মন গেল না।

আমি প্রত্যহ স্কুলে যাবার ছল করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। বিকালবেলা ছুটীর সময়ে ঠিক বাড়ী যেতাম—বাড়ীর কেউ সন্দেহ কর্ত্ত না।

কয়েক বছরের মধ্যে আমি একজন পাকা বদমায়েস হয়ে উঠলাম। আমার সঙ্গী অনেক জুটেছিল; এদের

সঙ্গে মিশে আমার চরিত্র যতদূর অপবিত্র হতে হয় ততদূর হয়েছিল। ইতিমধ্যে আমার বাবা মারা গেলেন, কয়েক মাস পর মাও বাবার অনুগামিনী হলেন। আমার তিন বোনের মধ্যে দু বোন স্বামীর ঝাঁটা লাথির হাত হতে পরিত্রাণ অনেকদিন আগেই পেয়েছিলেন। সকলের ছোট বোনটাকে বাবা খুব সৎপাত্রে দিয়েছিলেন, কিন্তু সে অভাগিনী কিছুদিনের মধ্যেই হাতের নোয়া ও মাথার সিঁদুর ঘুচিয়ে আমার কাছে এল। রইলাম খালি আমি, আর আমার ছোট বোন।

এতখানি বলে সে যেন হাঁফিয়ে উঠল। বলল—বাবু তেষ্টায় বুক্ ফেটে যাচ্ছে এক গ্লাস জল দেওয়াতে পারেন—তার কাহিনী শুনতে শুনতে আমি ভয়ানক কষ্ট অনুভব করলাম, "বল্লাম থাক, তোমায় আর বলতে হবে না—তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে; কিন্তু বাকীটুকু শোনবার জন্যে আমার খুব আগ্রহ ছিল। এক গ্লাস জল ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে সে একটু সুস্থ হয়ে বল্লে না বাবু বাকীটুকু আপনাকে শুন্‌তেই হবে—তা না হলে যে আমার মুক্তি হবে না। হ্যাঁ, আমার বাবা অনেক টাকা রেখে গিয়েছিলেন; আমারও খুব সুবিধে হল; নিত্য দু'বেলা ঘরে আড্ডা বসতে লাগল, তার সঙ্গে মদও খুব চলতে লাগল। আমার মাথার ওপর তখন কেউ ছিল না; দু' হাতে পৈতৃক সম্পত্তি ওড়াতে লাগলাম; জীবন তরীটাকে সুখ সাগরে ভাসিয়ে দিলুম। ছোট বোনটী আমায় কত বারণ করেছিল, কত কাঁদাকাটা কর্ত্তো কিন্তু তখন আমি যৌবন মদে উন্মত্ত—তার কথায় তখন কাণ দেয় কে? বাবা এত বেশী টাকা রেখে যান নি, যাতে এত অপচয় করে দীর্ঘ দিন সুখভোগ কর্ত্তে পারা যেত। আয় এক পয়সাও ছিল না, ব্যয় অপরিমেয়—কাজেই এক বৎসরের মধ্যেই সব টাকা ফুরিয়ে গেল। শেষে মোসাহেবরাও যে যার পথ দেখলেন—আমি পথের ভিখারী হলাম। সম্পত্তির মধ্যে রইল খালি বাড়ীখানি। কিন্তু বাড়ীখানাকেও বেশীদিন রাখতে পারলাম না। ইতিমধ্যে আমার অনেক দেনা হয়ে গিয়েছিল, দেনার দায়ে বাড়ীখানাকে বেচে ফেল্লাম। কাজেই একখানা ছোট ঘর ভাড়া করে আমরা বাস কর্ত্তে লাগলাম। বাড়ী বেচার টাকাও ফুরিয়ে শেষ হয়ে গেল, তখন আমি চাকরীর সন্ধানে বার হলাম, কিন্তু আমি চাকরীর কিছুই জানতাম না; কাজেই কোথাও চাকরী মিলল না।

একদিন আমার জ্বর হয়েছিল, চুপ করে শুয়েছিলাম। বাড়ীর দরোয়ান এসে বাড়ীভাড়া চাইল। বলতে ভুলে গেছি আমার বাড়ীভাড়াও তিন মাসের বাকী পড়েছিল। আমার বোন কাছেই ছিল; সে বলল এখনও কিছু যোগাড় হয় নি; আরও কিছুদিন পরে দেব।

দরোয়ান খুব চটে গেল। সে আমার বোনকে কুকথায় অপমান করলে।

আমি এক পাশে শুয়ে সবই শুনছিলাম, আমি যতই বদমায়েস হই, ভগ্নীর অপমান সহ্য কর্ত্তে পারলাম না। উঠে গিয়ে তার মুখে সজোরে দুই ঘুসি মারলাম। রাগের মাথায় ঘুসি দুটোর মাত্রা খুব প্রবল হয়েছিল—সে ঘুসি হজম কর্ত্তে পারল না—মাটীতে পড়ে গেল এবং সেই পড়াই তার শেষ, আর উঠতে হল না।

খুনের দায়ে আমার বিচার হল। বিচারে অনেক কষ্টে ফাঁসীকাঠে ঝোলা হতে বাঁচলাম বটে কিন্তু দশ বছর জেল খাটবার আদেশ পেলাম।

দু' বছর জেল খাটার পর আমার আর ভাল লাগল না। পৃথিবীর মুক্ত বাতাসের জন্য আমার প্রাণের ভিতর হা হা কর্ত্তে লাগল। তারপর একদিন রাত্রে কি করলাম জানেন বাবু? আবার খুন করলাম। যে লোকটা রাত্রে আমায় খাবার দিয়ে যেত তাকে শ্বাসবন্ধ করে মেরে ফেললাম। তারপর তার জামা কাপড় পরে জেল হতে বেরিয়ে পড়লাম। সারা রাত্রি খালি ছুটলাম, ঝোপ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে—পাছে আবার ধরা পড়ি বলে আমি একটা ঝোপের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছি এমন সময় একটা লোক ধাঁ করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে আমায় ধরে ফেলল। তারপর আমার হাত পা বেঁধে পিঠে করে নিয়ে চলল। আমি বুঝলাম আবার বোধহয় আমাকে জেলে নিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু সে লোকটা আমায় জেলে নিয়ে গেল না; খানিকদূরে একটা ভাঙ্গা বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেল। সেখানে একদল লোকের মাঝখানে আমাকে এনে রাখল। আমি এতক্ষণে বুঝলাম তারা ডাকাত। সে লোকটা বোধহয় তাদের দলপতিকে কাণে কাণে কি বলল। দলপতি আমায় চোখ রাঙিয়ে জিজ্ঞেস

করল কোথায় পালাচ্ছিলি? আমি তার প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে বললাম "জেল থেকে।" তারা তখন খুব আশ্চর্য্য হয়ে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল; তারপর তারা বুঝলে যে লোককে তারা ধরতে চেয়েছিল আমি সে লোক নই। আমি তখন তাদের দলপতিকে সমস্ত কথা বললাম। দলপতি আমায় জিজ্ঞেস করল—তুই এখন কি করতে চাস্? আমি প্রাণ ভয়ে বললাম—আপনাদের দলে ভর্ত্তি হতে চাই। সেদিন হতে আমি তাদের দলে মিশলাম এবং কার্য্যদক্ষতায় কয়েকদিনের মধ্যেই একজন শ্রেষ্ঠ ডাকাত হয়ে উঠলাম। তখন দলপতি আমায় কয়েকজন ডাকাতের সর্দ্দার করে দিলেন।

একদিন আমাদের দলপতি কয়েকজন ডাকাতকে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—আজকের রাত্তিরে ট্রেণে একজন বড় লোক কলকাতায় যাচ্ছেন, তার সঙ্গে প্রায় ১৫০০০ টাকা আছে আমি খোঁজ নিয়েছি। এই লোক টিমায় সব লুঠ করে আনতে হবে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি অপর ডাকাতগুলোকে সঙ্গে নিয়ে রেলওয়ে লাইনের পাশে ঝোপে লুকিয়ে রইলাম। ট্রেণ সেখানে আসবা মাত্র আমরা চলন্ত ট্রেণে উঠে পড়লাম এবং কামরা অনুসন্ধান করতে লাগলাম।

তখন রাত খুব গভীর, সকলেই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে সেইজন্য আমরা যখন গাড়ীর পাদানীর ওপর দিয়ে যাতায়াত করছিলাম তখন কেউ আমাদের দেখতে পায়নি। খুঁজতে খুঁজতে একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমার মনিবর্ণিত লোকটীকে দেখতে পেলাম। দেখে বোধ হয় লোকটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আমি জানালা দিয়ে গাড়ীর ভেতর উঠবার চেষ্টা করলাম; কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পারলাম না। লোকটী কিন্তু জেগে জেগে আমার কাজ দেখছিল। জানালায় যখন মাথা গলাচ্ছি তখন লোকটা উঠে এসে ধাক্কা দিয়ে আমায় ফেলে দিল। ট্রেণ হতে লাইনে পড়ে আমার মাথায় ও গায়ে চোট্ লাগল আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। জ্ঞান হলে দেখি এখানে পড়ে রয়েছি।

এতখানি বলেই সে চুপ করল।

কিছুক্ষণ পর উত্তেজিতকণ্ঠে বলল বাবু আমি আর বাঁচবনা তা বেশ বুঝতে পারছি। এখন আপনাকে আর একটা কথা বলে যাই। ডাকাতি করে আমি অনেক টাকা উপার্জ্জন করেছিলাম। সে সব টাকা আমি একটা যায়গায় পুঁতে রেখেছি। সে টাকা ভোগ করবার আর কেউ নেই। খোঁজ নিয়েছিলাম—বোনটা কোথায় পালিয়ে গেছে। সে সব টাকা আমি আপনাকে দিয়ে যেতে চাই; আপনি ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণকে আমি সব দান করে যাব একটা থলে আমার হাতে দিয়ে বললে বাবু এর ভেতর ঠিকানা লেখা ভাঁজ করা কাগজ আছে। আমি এ কাগজটা সঙ্গে নিয়ে বেড়াতাম, কি জানি কেউ যদি সন্ধান পায়।

তারপর সব শেষ হয়ে গেল।

কাগজের লেখানুসারে মাটী হতে সব টাকা তুলে নিয়ে এসে আমি এখন বড় মানুষ; প্রায় লাখ টাকার মালিক। কিন্তু এ অর্থ নিয়ে আমিত সুখী হতে পারিনি। আমি যে তার কাছে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলাম। হায়! কেন তখন আমি কৌতূহল দমন কর্ত্তে পারিনি? আমি কেন ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়েছিলাম, আমিত ব্রাহ্মণ নই আমি কায়স্থ। তাহার বিপুল অর্থরাশি আমায় সুখী কর্ত্তে পারেনি—দিবারাত্রি তুষানলে দগ্ধ কচ্ছে।

মনোমোহন নাট্য-মন্দিরে "সীতা"

বাঙলায় নাট্যশালার ইতিহাসে বিগত ২১শে শ্রাবণের অভিনয় রজনী একটী স্মরণীয় দিন হইয়া থাকিবে। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা, শিক্ষক ও অভিনয়ে স্বাভাবিকতার প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের অধিনায়কতায় ভূতপূর্ব্ব এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে সীতা নামক ভারতীয় মহানাটকের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। প্রথমে বাংলা থিয়েটারের অন্যতম স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু আসিয়া তাঁহার স্বভাব-সুলভ হাস্যোদ্দীপক ভাবে এই নাট্য মন্দিরের শুভ কামনা করিয়াছিলেন—তবে সে হাস্যের মধ্যে তাঁহাদের জীবনের সমস্ত কষ্টের একটা প্রচ্ছন্ন করুণ কাহিনীও ধ্বনিত হইয়াছিল। কত কষ্টে, কত যত্নে, কি অভাব ও কি লাঞ্ছনার মাঝে তাঁহারা নাট্যকলার প্রচার করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস; সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের এই নাট্যশালার প্রতি সহানুভূতির অভাবের কথাও ফুটিয়া উঠিয়াছিল—শিশিরকুমারের অভিনয় গৌরবে, নাট্যশালার এই একমাত্র জীবিত পিতামহ, নিজেকে ও নিজের প্রাণপ্রিয় কলাশিল্পকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া এই প্রয়াস—এই প্রতিষ্ঠানকে অন্তরের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তারপর দেশবন্ধু দাশ মহাশয় এই শিল্প-কলার মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন; তৎপরে অভিনয় আরম্ভ হয়। অভিনয় যে সর্ব্বরকমেই সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। দৃশ্যপটগুলি সমস্তই সে কালের যুগের করিয়া তুলিতে, শিল্পী চারুচন্দ্র তাঁহার প্রতিভা ও তুলিকাকে মুহূর্ত্তেরও অবসর দেন নাই। বেশভূষাও সমস্তই সময়োপযোগী হইয়াছিল এবং নাটকীয় পোষাক পরা রাজা ও বেনারসী যোড়া সীতা বোধ হয় চিরতরে রঙ্গমঞ্চ হইতে নির্ব্বাসিত হইল।

এ সীতা, এ রাম কেহই বাল্মীকির কল্পনা সৃজিত নয়। এ সীতা এ রাম অভিনেতা শিশির কুমারের মস্তিষ্ক প্রসূত—বহুদিন যে কল্পনা তাঁহার মস্তিষ্কে বাস করিয়াছিল, মানসে প্রতিফলিত ছিল—অক্লান্ত পরিশ্রমে, অদ্ভুত সাধনায় শিশিরকুমার আজ তাহাকে মূর্ত্ত করিয়া বাঙ্গালীকে নাট্য-সম্পদের এই লুক্কায়িত রত্নাগারের দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। রামের অংশে শিশিরকুমারের অভিনয় কেবল বাঙ্গালায় নয় সমস্ত জগতে অতুলনীয়। হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাতগুলি, কণ্ঠের স্বর-বৈচিত্র্যে ও মুখমণ্ডলের ভাববৈচিত্র্যে ফুটাইয়া তোলা যে কত বড় হৃদয়বানের কাজ তাহা বলা কঠিন। অভিনয়ে শিশিরকুমার আপনাকে হারাইয়া, তাঁহার মস্তিষ্কপ্রসূত রাম চরিত্রে মিশিয়া গিয়াছেন তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী ছিল না। নারী চরিত্রের মধ্যে শ্রীমতী প্রভা "সীতা" রূপে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন—পরলোক-গত অভিনেত্রী শ্রীমতী সুশীলার ক্ষতি পূরণ করিবার ইনিই একমাত্র যোগ্য। ভরত ও লক্ষ্মণের অংশে শিশির বাবুর ভ্রাতাদ্বয় তাঁহার সম্মান রক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়েন নাই। ভরতের অভিনয়ে দু এক স্থলে দোষ ছিল তাহা ক্রমশঃ সংশোধিত হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। আশ্চর্য্য হইলাম শত্রুঘ্নের অভিনয়ে, পূর্ব্বে ষ্টারে কর্ণার্জ্জুনে যখন ইনি দুঃশাসনের অংশ অভিনয় করিতেন—তখন ইঁহার অভিনয় দেখিলে মনে হইত যেন আবুহোসেনের একজন ইয়ার আসিয়াছেন, কিন্তু শিশির কুমারের অপূর্ব্ব

গাম্ভীর্য্য (dignity) দেখিতে পাইলাম। দুর্ম্মুখের অংশও অতি সুন্দর হইয়াছিল। মহর্ষি বাল্মীকির অভিনয়ে অভিনেতা নিজের ক্ষমতা ও শান্ত স্বাভাবিকতার পরিচয় দিয়াছেন। বশিষ্ঠের অংশ অত্যুত্তম না হইলেও তজ্জন্য নাট্যসৌন্দর্য্যের কোন ক্ষতি হয় নাই। লবকুশের অভিনয় কেবল যে স্বাভাবিক হইয়াছিল তাহা নহে—অদ্ভুত অপ্রত্যাশিতরূপে প্রতিভালোক দীপ্ত হইয়া মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল। এই দুটী তরুণ যে কালে অতি দক্ষ অভিনেতা হইবেন তাহা নিঃসন্দেহ। তবে কুশের কণ্ঠস্বর একটু মিষ্ট করিতে পারিলে ভাল হয় কারণ কণ্ঠস্বর প্রকৃতিদত্ত বা উহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব, পুরাকালের এই অসার স্বতঃসিদ্ধে আমরা বিশ্বাস করিনা; সাধনায় সব হয়, এমন কি অসম্ভবও যে সম্ভব হয় তাহা এই সম্প্রদায়ের নায়কের অভিনয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। তমসা তীরে অশ্বরক্ষকদ্বয়ের মধ্যে একজন তোৎলাম করিয়া যে হাস্যরসের অভিনয় করিয়াছেন উহা আমরা পছন্দ করি না, কারণ উহা অত্যন্ত খেলো হাস্যরস। পুরাতন কালের অভিনয়ে খাপ খাইতে পারিত এ যুগের শিল্প প্রতিভারসঙ্গে উহা অত্যন্ত অসংলগ্ন বোধ হয়। আদর্শ নৃপতি রামচন্দ্রের অশ্বরক্ষকদ্বয় এত কাপুরুষ ও হেয় হইতে পারে না—এই শ্রেণীর অভিনয় যদি সাধারণ দর্শকের মনস্তুষ্টির জন্য করা হইয়া থাকে তবে তাহা নিষ্প্রয়োজন। এখনকার দর্শক শিক্ষিত ও মার্জ্জিত রুচি তাহারা রসপিপাসু Vulgarity দেখিতে চাহে না। দৃশ্যপটে চাতুর্য্য না থাকিলেও মাধুর্য্যের অভাব ছিল না—তবে সীতার পাতাল প্রবেশ দৃশ্যটী খুব মনোজ্ঞ হয় নাই এইখানে সকলেই একটা অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু তাহা না হইয়া ষ্টেজ অন্ধকার করিয়া সীতাকে একটী Trap door এর মধ্য দিয়া নামাইয়া দেওয়াতে দৃশ্যটী অনেকটা অধম হইয়া পড়িয়াছে; এখানে ভীষণ শব্দে ধরণী বিদীর্ণ হইয়া ও বসুমতী আবির্ভূতা হইয়া সীতাকে লইয়া অন্তর্হিতা হইলে দৃশ্যটী বড়ই মনোজ্ঞ হইত; আশাকরি অধ্যক্ষ শিশির কুমার এই দৃশ্যের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া শেষাংশে অভিনয় যেমন উজ্জ্বল হইয়াছে দৃশ্য সৌন্দর্য্যও তাহার উপযোগী করিয়া দিবেন।

নৃত্য গীত সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক—প্রস্তাবনায় গীতখানি কি জানি কেন ভাল হয় নাই অথচ সেই গায়কমহাশয়, পরে তাঁহার অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর ও সুরতানলয়ে আমাদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন; এটা দৈবদুর্ব্বিপাক বলিতে হইবে। পুরাতন যুগের অভিনয়ের মত ইহাতে নৃত্য গীতের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও দুইখানি নৃত্যগীত অতীব সুন্দর হইয়াছিল। নৃত্য প্রবর্ত্তনায় শিল্পী এমন একটা ললিতভাবের সন্নিবেশ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার নৃত্যজ্ঞানের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাঁদের নৃত্যশিক্ষককে আমরা জানি না তবে এই শ্রেণীর নৃত্যই যে শিক্ষিত দর্শকের রুচিসঙ্গত হইবে তাহা শিল্পী ধরিয়া ফেলিয়াছেন। বেদগানের প্রবর্ত্তনে অভিনয়ে একটা গাম্ভীর্য্যের বিস্মিত-সৌন্দর্য্য দিয়াছিল—অভিনয় দর্শনে যে আমরা পরম পরিতৃপ্ত ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিতেছি তাহা বলা বাহুল্য। তবে অন্যান্য বিষয়ে এখন কিছু বলিবার আছে—দর্শকবৃন্দের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ভালরূপ দৃষ্টি রাখা হয় নাই; পাখার সুবন্দোবস্ত নাই ও কাষ্ঠাসনগুলি এই শ্রেণীর নাট্যমন্দিরের যোগ্য হয় নাই। শিশিরবাবু অভিনয়-কলা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন এদিকে হয়তো দৃষ্টি রাখিবার অবকাশ পান নাই বা সময়ের স্বল্পতার জন্য সব করিয়া উঠিতে পারেন নাই—যাহা হউক অতঃপর এ সকল বিষয়ে মনোযোগী হইলে আমরা সুখী হইব; কারণ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যশালায় এসকল বিষয়ে অতীব আরামপ্রদ ব্যবস্থা আছে—কষ্ট করিয়া অভিনয় দর্শন এযুগে চলিবে না—লোকে অভিনয় দেখিতে যায় আনন্দের জন্য, সেই আনন্দের মাত্রা এই সকল ছোটখাটো অসুবিধায় কমিয়া যায়। আর একটা কথা কর্ম্মচারী নিয়োগে কর্ত্তৃপক্ষের একটু সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য কারণ দেখিলাম জনৈক তপ্ত মস্তিষ্ক কর্ম্মচারী দর্শকবৃন্দের সহিত তুমুল কলহ বাধাইয়া ছিলেন; দর্শক তাহার অসুবিধার প্রতিবাদ করিবেই, তজ্জন্য মেজাজ গরম করা কর্ম্মচারীদের অকর্ত্তব্য।

সাহিত্য সমালোচনা

ব্যতিক্রম—উপন্যাস ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ২১ ফর্ম্মা মূল্য ২৲। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বহুপূর্ব্বে বাসন্তীতে ইহা প্রকাশ্য ভাবে বাহির হইতেছিল—তখন উহার কতকাংশ পাঠ করিয়াই বুঝিয়াছিলাম যে ইহা সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডারে এক অপূর্ব্ব রত্ন সঞ্চিত হইবে। এই পুস্তকখানির ভিতর দিয়া মানব হৃদয়ের প্রকৃতির ঘাত প্রতিঘাত, কর্ত্তব্য ও প্রেমের সংঘর্ষণের একটা সূত্র বরাবর বহিয়া গিয়াছে। চরিত্রগুলি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল কোনটাই দুর্ব্বল বা প্রাণহীন নহে। বিনয় ও নির্ম্মলেন্দুর গৃহত্যাগের কথা পড়িতে পড়িতে প্রভাতকুমারের নবীন সন্ন্যাসীর ছবি মনে পড়িল। সারদার রসিকতাগুলি আমাদের তত মুখরোচক হইল না। ইন্দুর চরিত্র অতিমাত্রায় মধুর ও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। মিসেস্ ঘোষাল, মিস মঞ্জরী একেবারে ফটোগ্রাফের মত। নৃত্যকালী ওরফে ঠানদির তুলনা নাই, প্রাচীন হিন্দু সমাজে এখনও এরূপ হৃদয়বতী মহিলা কয়েকটী আছেন বলিয়া বোধহয় তাহা এখনও ধসিয়া পড়ে নাই। মোটের উপর উপন্যাসখানি চিত্তাকর্ষক ও সুপাঠ্য হইয়াছে। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক পাণ্ডিত্যে রাখাল বাবুর অপরিসীম প্রতিষ্ঠা তাঁহার ঔপন্যাসিক প্রতিভাকে কখন বড় হইতে দিবে না জানি তথাপি উপন্যাস রসিকগণ ইহা পাঠে শিক্ষা আমোদ ও কৌতূহল-তৃপ্তির আনন্দ পাইবেন। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই উত্তম, মূল্যটা কিন্তু বেশী বলিয়াই বোধহয় এবং ছাপার ভুলে পুস্তকখানি এত কণ্টকিত যে উহা পাঠ-সুখের সত্যই ব্যাঘাত উৎপাদন করে।

যৌবনের গান *

গানের যদিও ঠিক কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় ও বয়স নেই, তবু মানুষের জীবনের গান যৌবনেই। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক সুলেখক ও সুকবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, নব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়েছেন "যৌবনের গান।" যৌবনের গানের এই কবিকে আমরা ঘনিষ্ঠ-ভাবে জানি। তিনি যৌবনের পূজারী, সেই যৌবনের জয়গান গেয়েই তিনি তাঁর অন্তরের সাধনাকে আজ সাধারণের কাছে ব্যক্ত ক'রেছেন। তাঁর কাব্যের এই নামকরণ তাই যেমন সুন্দর হয়েছে, তেমনি সার্থক হয়েছে।

যৌবনের গানের প্রত্যেক কবিতাটীতে অতুলনীয় শব্দ মাধুর্য্য, অপূর্ব্ব ছন্দ-চাতুর্য্য, মিলের অসাধারণ নৈপুণ্য এবং ভাবের অভাবনীয় লীলা, কবির অদ্ভুত রচনাশক্তির পরিচয় পাঠককে বিস্মিত ও মুগ্ধ ক'রে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের একটা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা প্রচণ্ড উল্লাসে দেহ মন আলোড়িত করে দেয়। নূতনের জন্য একটা অসীম আগ্রহ, তরুণের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা, যৌবনের গানের প্রত্যেকটি সুরের সঙ্গে ওতোপ্রোতঃভাবে জড়িত হ'য়ে যৌবনের ধর্ম্মকে উদার মহান ও বরণীয় ক'রে তুলেছে।

যৌবনের গান কেবলই নিছক কাব্যের ফাঁকা আওয়াজ নয়, কেবলই কতকগুলি ক্ষণভঙ্গুর ভাবের বুদ্বুদ নয়। এর মধ্যে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত আছে, যৌবন ধর্ম্মের যোগ্য সাধনার অনুপ্রেরণা আছে। যা কিছু অসত্য, যা কিছু কৃত্রিম, যা কিছু অন্যায়, যা কিছু অসঙ্গত, এ সকলেরই বিরুদ্ধে কবির তীব্র লেখনী তীক্ষ্ণ অসির মতোই বিদ্যুৎবেগে আঘাত করে গেছে। কু সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করে, ধর্ম্মের ভণ্ডামীকে পদদলিত করে, ছদ্মবেশের মুখোস টেনে ছিঁড়ে দিয়ে,—জরাজীর্ণ পুঁথির শাসনের শাস্ত্রশৃঙ্খল চূর্ণ করে দৃপ্তযৌবন তার মুক্তির বিজয়োৎসব ঘোষণা ক'রে চলেছে এই কাব্যের মধ্যে মহানন্দে গান গেয়ে!

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অভাবে বাংলা কাব্য সাহিত্যের যে দিকটা অন্ধকার হয়ে যাবার আশঙ্কা হয়েছিল কবি হেমেন্দ্রকুমারের যৌবনের গান শুনে আবার সে আশঙ্কা অনেকটা দূর হ'য়েছে। যৌবনের গানের একাধিক সুরে আমি সেই স্বর্গীয় কবির প্রবল দেশাত্মবোধ

* শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত কাব্যগ্রন্থ। মূল্য ১৷৹ প্রাপ্তিস্থান

দেহ-মনের, অন্তর-বাহিরের সেই মুক্তিভেরী নিনাদিত হ'তে শুনেছি ! দেশ কাল ও বয়সোচিত গান গেয়ে কবি হেমেন্দ্র কুমার যে তাঁর দেশবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছেন এ কথা নিঃসন্দেহ বলা যেতে পারে।

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

ভাদুরে—রঙ্গরসের কবিতার বই। লেখক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু অবতারের পূজারীরূপে রসিক সমাজে পরিচিত—তাঁহার ব্যঙ্গ কৌতুকগুলি দোধারী তলওয়ারের মত আঘাতও করে শিক্ষাও দেয়—বাঙ্গলার রসলিপ্সু পাঠক-পাঠিকা ইহা পাঠে প্রচুর মুখরোচক দ্রব্যের আস্বাদন পাইবেন। কয়েকটী অনুকৃতি কৌতুকও আছে। ব্যঙ্গের রুচি জিনিসটা সকলের একরূপ নয়, তজ্জন্য দু'এক স্থলে আমরা অবশ্য গ্রন্থকারের সহিত একমত হইতে না পারিলেও তাঁহার রচনার আমরা বিশেষ অনুরক্ত।

অপ্নের শক্রভাবী—উপন্যাস—উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। গল্পের ঘটনাংশ পাঠে বিলাতী উপন্যাস হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হয় তবে সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই বলিয়া স্থির-নিশ্চয় হইতে পারিলাম না। আজকাল যে 'এ্যাডভেঞ্চার' সর্ব্বত্র কর্তৃত্ব করিতেছে ইহা সেই শ্রেণীর উপন্যাস—লেখা বেশ সহজ, ভাষা লঘু ও স্বচ্ছন্দগামিনী—উপন্যাসখানি এই উপন্যাস-প্লাবনের যুগেও আদরণীয় হইবে—তবে ছাপা-কাগজ একটু ভাল ও হাল ফ্যাসান অনুযায়ী চিত্র সংযুক্ত হইলে বিক্রয় বেশী ও সহজে হইত বলিয়া বোধহয়।

মহিলা—১৬ সংখ্যা। এঁরা প্রচ্ছদপটে বিচিত্র পরিবর্ত্তন করে একটু চিত্তাকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এঁদের পেটেন্ট কভারিং কাগজেই এঁদের সর্ব্বনাশ করেছে—এ কাগজে যে কভার ভাল হয় না তা ছাপাখানার মালিক হয়েও যদি এঁরা না বুঝেন তো উপায় কি? ঢেঁকিরে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে"। প্রথমেই এক গ্রাজুয়েট বিবাহ নিয়ে পড়েছেন—বাবাজীবন বিবাহিত কি অবিবাহিত তা ঠিক বোঝা যায় না তবে যৌবমোদগমের পর ইনি বিবাহের পরিপন্থী—এযুগে সকলেই তাই সুতরাং বাহবা দেবার মত কোন কথা গোড়া পত্তি নাই সুতরাং আগায় জলঢালা উচিত নয় বিবেচনায় নিরুত্তর রহিলাম তবে all's well that ends well. তারপর পার্ল হোয়াইট এক ম্যাডান কোম্পানীর বিজ্ঞাপন চিত্র শোভিত মহিলায় প্রিয়তম কাঞ্চন মুখোপাধ্যায় লিখিত। মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহিলার পাতাগুলি এরূপে আগাছায় ভরাইতেছেন কেন? পাঠকবৃন্দ নিরুপায়; তবে চিত্র-বাহুল্যের গৌরব কোন প্রকারে রক্ষিত হইতেছে—ইহার পূর্ব্ব সংখ্যায় দেখিলাম ভাব-অভিব্যক্তি চিত্রে মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বশরীরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন অবশ্য ভাবগুলি ধীরেন গাঙ্গুলির এবং অভিব্যক্তিটা অস্ফুট তরুণের অভিনয়, একরূপ শেষ হইল কি এখনও চলিবে বুঝা গেল না। ছেলের মা—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর ছোট গল্প। গল্পটী রস ও উদ্দীপনা দুটী রসেই ভরপুর, তাঁর সাধারণ লেখার চেয়ে বেশ একটু উঁচু ধরণের। তার পরই বেহুলা—শ্রীসুধীর রায় লিখিত একটী প্রবন্ধ (না কবন্ধ ?) কেবল কাগজ খানিতে ম্যাডান কোম্পানির বিজ্ঞাপন চিত্রগুলি প্রকাশ করিবার জন্য অনর্থক রচিত। কার্য্য-পরম্পরায় বোধ হয় ইনি একটী জুনিয়ার কাঞ্চন। বাংলা ফিল্ম কোম্পানীর ফিল্মগুলির চেয়ে ম্যাডান কোম্পানীর চিত্রগুলি যে বিফল হয়েছে তা সেগুলি অকালে বন্ধ হওয়াতেই প্রমাণিত হয়েছে—এমন কোন মেম সাহেব জন্মিয়াছেন যিনি বেহুলা কি সীতা, কি সাবিত্রীর অংশ অভিনয় কর্ত্তে পারেন এবং বাংলার স্ত্রী চরিত্রগুলি ম্যাডানের ইটালিয়ান অভিনেত্রী যে অতি কদর্য্য ভাবে অভিনয় করে সেগুলিকে নিষ্ফল করে দিয়েছেন তা সকলেই জানেন—তবে এ অকারণ স্তুতিবাদ করাটা কাকে ভোলাবার জন্য—ম্যাডান কোম্পানীকে ? তা অবশ্য অসম্ভব নয় কিন্তু পাঠকেরা এরূপ অযোগ্য স্তবস্তুতিকে কি চক্ষে দেখবেন তাহা সহজেই অনুমেয়। গৃহহারা—গল্প রামেন্দু দত্ত রচিত কায়দার অভাব না থাকিলেও লেখকের প্রতিভার কোন লক্ষণই পরিস্ফুট নয়। আধুনিক সাহিত্যিকদের দোষ টোষগুলি বেশ নিখুঁতরূপেই অনুকৃত হয়েছে তবে ভালর দিক অনুকরণ করিতে কসরতার আবশ্যক বলিয়া বোধহয় পারিয়া উঠেন

কতরকম পতিতা আছে তাহাদের রসাল বিবরণ দিয়েছেন—তবে পতিতাদের সংখ্যাবৃদ্ধি নিবারণ করে তিনি কিছুই বলিতে পারেন নাই—সেইজন্য এই প্রবন্ধ কেবল নিষ্ফল নহে বরং কুফলপ্রদ হইয়াছে, কারণ ইহাতে কয়েক শ্রেণীর নূতন নূতন দেহ-ব্যবসায়িনীর সন্ধান দেওয়া হইয়াছে যাহা সাধারণে জানেন না—এবং ঐ সব রসের রসিকেরা এই সমস্ত নূতন রাস্তার সন্ধান করিয়া অধোগতির পথটা আরও প্রশস্ত করিয়া লইতে পারিবে। চিত্র সম্বন্ধে বলিবার মত কিছু নাই কারণ সচিত্র মহিলা সত্যই—চিত্র সত্বেও বিচিত্র মনে করিলে দোষ হইবে না—বরং এ শ্রেণীর চিত্র না থাকিলেই ভাল হইত।

বাক্য ও কার্য্যের সামঞ্জস্য

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের ছেলেরা কিছুদিন পূর্ব্বে সমবেত হ'য়ে এই প্রস্তাবের অনুমোদন ক'রেছেন যে মেয়েদের আর আটকে রাখ্‌লে চল্‌বে না, মেয়েদের বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে কেন না আজকাল চতুর্দ্দিকেই নারী নিপীড়ন হচ্ছে। এটা হচ্চে, তারা ভীরু ও দুর্ব্বল ব'লে, পুরুষ দেখ্‌লেই ভয়ে জড়সর হয়ে পড়ে বলে। খুব ভাল প্রস্তাব, আর এ অনুমোদন করা শিক্ষিত ছাত্রদের যোগ্যই হ'য়েছে। আমি উদ্দেশে তাঁদের অভিবাদন করছি।

এখন কাজে এর সমর্থন করলে তবেই তাঁদের প্রস্তাব ফলবান হবে কারণ আমাদের জাতির নামে "কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ" বলে একটা কলঙ্ক আছে—তাই সময় সময় ভয় হয়। নিজের চক্ষে দেখেছি তের চোদ্দ বছর বয়েসের মেয়ে তাদের নিজের বাড়ীর ঘেরা ছাতে কানামাছি খেলছিল এবং সেই খেলার সময় একটু জোরে চ'লেছিল ব'লে তার দিদিমা বাঙ্গালা দেশেরই আজ কি অধঃপতন হলো বলে অশ্রুমোচন ক'রেছিলেন, আমার একজন বালিকা আত্মীয়া—বার বছর তার বয়েস—তার কোন আপনার লোকের বাড়ীতে যখন দিন কয়েকের জন্য থাকতে গেছ্‌লো তার ওপর তিনটী হুকুম জারি হ'য়েছিল ;—

(১) বারাণ্ডার ত্রিসীমায় যাইবে না

(২) বন্ধ জানালার খড়্‌খড়ির ভিতর দিয়া জিব বাহিরে চাহিবে না

(৩) প্রাণ খুলিয়া হাসিবে না।

এই বিষয়ে প্রবর্ত্তক আবার মেয়েরা নিজে; সুতরাং গতানুগতিক প্রথার পরিবর্ত্তন কর্ত্তে হলে তাদের মা, দিদিমা, মাসিমা প্রভৃতিকে বলতে হবে আমাদের স্ত্রী ভগিনী বা কন্যাকে এ রকম ক'রে রাখলে চলবে না যখন চলতো সেদিন চলে গেছে, এখন আর চলবে না। আলো হাওয়া বা স্বচ্ছন্দ আনন্দ ভোগ থেকে তাদের বঞ্চিত রাখবার কোন আবশ্যকতা নেই।

সমস্ত জগত আজ মুক্তিপথের পথিক, বিনিময়ের আকাঙ্ক্ষী, সমতার অভিলাষী। আমরা যদি আজও অচলায়তন আঁকড়ে ব'সে থাকিতো আমরা ডুববো; এ ভরাডুবি থেকে সমগ্র জাতিকে রক্ষা করবার ভার তরুণদের উপর। শুধু বয়সে তরুণদের কথা বল্‌ছি না, প্রাণে যাঁরা তরুণ, যাঁদের বাধা বন্ধন ভয় নেই সেই পুরুষসিংহদের কথা বল্‌ছি।

সমস্ত ছাত্রাবাসের তরুণেরা, সকল শিক্ষালয়ের ছাত্রেরা সকল শ্রেণীর উন্নতিকামীরাও এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করুন। মেয়েদের বিদ্যায়তনে, বাড়ীতেও মেয়েদের শরীরকে পটু ও মনকে সবল কর্ব্বার ব্যবস্থা যতদিন না হয় ততদিন এ বিষয়ে অক্লান্ত আন্দোলন চলা চাই। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গাতে প্রচণ্ড কলরব কর্ত্তে হবে—যাতে স্থবির বধির জীর্ণ শীর্ণও জেগে ওঠে সে প্রস্তাব হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের ছেলেদের দ্বারা অনুমোদিত হ'য়েছে, তা সং ও সঙ্গত বলে আমাদের এই করতেই হবে।

টুক্‌রা-টাক্‌রা

চোখের ভাষা ধূসর বর্ণের চোখ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। জগতের অনেক চিন্তাশীল লোকদের চোখই ধূসর বর্ণ। নারীর এমন চোখের রং থাকলে বোঝা যায় তাঁদের হৃদয়ের চেয়ে মস্তিষ্কের ক্ষমতাই বেশী! সত্যি ধূসর চোখ বড় বেশী দেখা যায় না—যাঁদের আছে তাঁদের মাথা খুব স্থির প্রকৃতি খুব দৃঢ় হয়। তাঁরা আত্মসম্বরণ করতে পারেন কিন্তু অন্যায় অবিচার দেখলে তাঁরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা স্নেহপ্রবণ কিন্তু অনাবশ্যক ভাবপ্রবণ নন। ধূসর চোখ যাদের তারা প্রায়ই বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ হয়ে থাকেন।

চোখের রং গাঢ় নীল হলে সে লোক সদাশয় বন্ধু, সাহসী ও আনন্দিত চিত্ত হয়। তাঁদের রস জ্ঞান যথেষ্ট থাকে—এমন লোক প্রায়ই নিরস হন না। চোখের রং যাদের হাল্কা নীল প্রেম ব্যাপারে তারা প্রায়ই চপল হয়—ঈর্ষার ভাবও থাকে তাদের মনে। মেয়েদের চোখের রংএর চেয়ে পুরুষদের চোখের রংই হাল্কা হয় বেশী, নীল চোখের দৃষ্টিশক্তি বেশী হয়, আর সে দৃষ্টি অনেক দূর পর্য্যন্ত যায়।

সাদা চোখ যে সব মেয়েদের তাদের ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। তারা একটু আরামপ্রিয় বিলাসী হয়—কিন্তু তারা নিজের চেয়ে স্বামীর সুখ সুবিধার দিকেই লক্ষ্য রাখে বেশী, তাদের স্বভাবও বেশ মধুর প্রিয় হয়।

বাদামী রংএর চোখই সব চেয়ে সুন্দর। কিন্তু এ চোখের দৃষ্টিশক্তি তেমন ভাল থাকে না। চশমা যারা নেন তাদের অনেকের চোখই গাঢ় বাদামী রংএর। এমনি চোখ যাদের তাঁরা খুব ভাবপ্রবণ ও সাহসী হন—আত্মত্যাগ করতেও এঁরা কখনো পেছপা হন না। বাদামী চোখের চাহনীতে অনেক সময়ই একটা মোহিনী-শক্তি থাকে এ চোখে মানুষের চিত্ত ভুলিয়ে দেয়। এই রংএর চোখই নাকি সব চেয়ে রহস্যপূর্ণ।

রক্তের চলাচল বন্ধ হয়ে গেলেই জীবনীশক্তি স্তব্ধ হয়ে যায়। জীবনীশক্তি স্তব্ধ হবার সময় রক্তের বেগ আবার ঠিক করবার জন্য এ্যাড্রিন্যালিন্ ক্রীষ্টাল নামে একটা জিনিষ ডাক্তারী মতে চলেছে। এই জিনিষটির এক পাউণ্ড তৈরী করতে ৫০,০০০ ষাঁড় দরকার হয়। ষাঁড়ের কিডনীর পাশের ছোট্ট একটী শিরা থেকেই এর উপাদান তৈরী হয়। টাকামিন নামে একজন জাপানী ডাক্তার এ ঔষধ আবিষ্কার করেন।

একজন হাঙ্গেরিয়ান ইঞ্জিনিয়ার একটা গ্রামোফন আবিষ্কার করেছেন, সে গ্রামোফন ট্যাঁক ঘড়ির চেয়ে বড় নয়। তার মধ্যে দশখানা প্লেট থাকতে পারে ও কুড়িটি গান চলতে পারে। একটা স্যাম্পেনের গ্লাসের ওপর যন্ত্রটি রেখে বাজালে এক ঘর লোকে সে গান বেশ শুনতে পারে।

লণ্ডনের লোকসংখ্যা বেলজিয়ামের সমান। অষ্ট্রে-লিয়ার চেয়ে অনেক বেশী! লণ্ডনের রাজপথগুলো যদি পর পর সাজিয়ে রাখা যায় তবে কনষ্টাণ্টিনোপল পর্য্যন্ত পৌঁছবে। লণ্ডনের টেলিফোঁর তারের দাম হবে ৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড। লণ্ডনে ২১,০০০ পুলিশ আছে।

ভূমিকম্পের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৪৭০ ফিট হতে ৫৩০ ফিট পর্য্যন্ত যায়।

লণ্ডনের ২,২২৩ মাইল রাস্তায় আলো দেবার খরচ পড়ে বৎসরে ৩৩১,০০০ পাউণ্ড।

“মনের হরষে হংস যথা হংসী সাথে করে বিচরণ”

প্রথমবর্ষ] ৭ই ভাদ্র শনিবার ১৩৩১, সন। ইংরাজী ২৩শে আগষ্ট। [৬ষ্ঠ সংখ্যা

সীতা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ধরণীর আদরিণী মেয়ে! শ্রীরামের
শ্যামরূপে ভুলে—পতিত্ব-গৌরব দানি
কৃতার্থ করিলে তায়। সীতা! ভারতের
আবালবৃদ্ধ-বন্দিতা—নয়নের মণি
জনকের—শ্রেষ্ঠ ভাবি বংশমর্য্যাদায়
বনবাসে পাঠালে রাঘব—অবিচারে,
চূর্ণ করি নিজ হৃদি—বিরহ-ধারায়,
গোপনে ভাসায়ে বক্ষ—তুষিতে প্রজারে।
হে অন্তর্য্যামিনী সতি! ছিলে অবগত
সব। পতির অবস্থা মনে অনুভবি
ক্ষমা করি তায়—ছিলে নীরব, সংযত—
তা না হলে—অস্ত যেত রঘু-কুল-রবি
তব দীর্ঘশ্বাসে—এ অপূর্ব্ব ক্ষমা, নারী!
চিরদিন গাবে কীর্ত্তি ভারতে তোমারি।

নারী-বিদ্রোহ

শিক্ষিতা নারীসমাজে পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার, সুখ ও সুবিধা ভোগ কর্বার জন্ত যে একটা অধীর আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে তা আর অস্বীকার কর্বার উপায় নেই। বাংলার মাসিক ও সাপ্তাহিকের পাতার ব্যাত্যাসহযোগে এই বিদ্রোহের বীজ বাঙলার গৃহলক্ষ্মীদের কাণেও পৌঁছুচ্ছে এই অভিযানের ফল যা হবে—তার একটা মোহকর উন্মাদনা-পূর্ণ চিত্র সঙ্গে সঙ্গে এঁকে দিয়ে—এঁরা হিন্দুর অন্তঃপুরও বিষাক্ত করে তুলেছেন—এটা ভাল কি মন্দ, হওয়া উচিত কি অনুচিত সে সমস্তা সমাধানে আজ আমি নিযুক্ত নই আমার উদ্দেশ্য— আমাদের সামাজিক সাংসারিক ও ধর্ম-নীতি সম্বন্ধীয় পারিপার্শ্বিক ব্যাপারের অনুসন্ধান করা; যার ফলে বাংলার কুললক্ষ্মীরা আজ বিদ্রোহিনীর মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছেন। এ ব্যাপার এত বৃহৎ, যে ছোট্ট এই সাপ্তাহিকখানির, নির্দ্দিষ্ট তুই তিন পৃষ্ঠা স্থানের ভেতর এর সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নয়। নারীরা কি চান তা এখনো স্পষ্ট বলেন নি—যা বলেছেন তা ভাসাভাসা তা থেকে তাঁদের উদ্দেশ্য বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় না। যে জিনিষের সম্পূর্ণ ধারণা করার পক্ষে অসুবিধা থাকে তার সন্তোষজনক নিষ্পত্তি হওয়া কঠিন। তাঁরা যদি অনুগ্রহ করে তাঁদের দাবীর একটা তালিকা ছাপান এবং সেই নির্দ্দিষ্ট দাবী নিয়ে আন্দোলন করেন তা হলে উভয় পক্ষের একটা বোঝা-পড়া হওয়া অসম্ভব নয়।

প্রাচীন ভারতে নারীর যা অধিকার ছিল, এঁরা সে অধিকারে সন্তুষ্ট নন—যুগধর্ম্মের এই রীতি—এটা অন্তায় নয়—"অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টা সন্তুষ্টা ইব পার্থিবঃ।" সে মান্ধাতার আমলের নীতি নবযুগে চলবে না—কারণ নবযুগের তরুণ সম্প্রদায় অতীতের উপর মর্ম্মান্তিক বিদ্বিষ্ট এবং পুরাতনের ধ্বংস সাধনে কৃতসঙ্কল্প—এঁরা বোধহয়—ভুলে যান যে অতীতের গৌরবময় গর্ভ হইতে বর্ত্তমানের জন্ম—অস্তগামী সূর্য্যের ক্ষীণাত অনুক্রমমান রশ্মিই নবোদিত সূর্য্যের বালার্ক কিরণের জনয়িতা, পুরাতনই নব আভরণে সজ্জিত হইয়া নূতন বলে গৃহীত হয়। ভগবানের রাজ্যে নূতন কিছু নাই সব সেই পুরাতন—পরিবর্ত্তিত পুরাতন। দেশকাল পাত্রোপযোগী পরিবর্ত্তন করে পুরাতনকে নিজেদের মত, পন্থা ও জীবনযাত্রার অনুকূল করে গড়ে নিতে হবে। চেঁচামেচি কর্লে কাজ হয় না—নীরবে কাজ কর্লেই কাজের ফল দেখ্তে পাওয়া যায়। নিজের বক্তব্য বিশবার চেঁচিয়ে বল্লে যা ফল হয় সেটা নিজে করে কাজে দেখালে লোকে সেটা সমধিক আগ্রহে গ্রহণ করে ও সত্যই তাহা কার্য্যকর হয়। এসব আন্দোলন যাঁরা কর্চ্চেন তাঁদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতির অভাব নেই—তফাৎ হচ্ছে পন্থা নিয়ে তাঁরা যা চান সেটা নিজেদের জীবনে গ্রহণ করে তার সুফল আমাদের দেখিয়ে দিন আমরা সসম্মানে সমস্ত পথগুলি ছেড়ে দেব—উন্নতির কোন দ্বারই রুদ্ধ রহিবে না।

বিলাতের স্ত্রী স্বাধীনতা দেখে বিলাতী প্রথায় যাঁরা শিক্ষিতা, তাঁরা যে স্বতঃই সে পন্থার অনুমোদন কর্ব্বেন তাহা বেশী আশ্চর্য্যের কথা নহে। সেই সমাজে নারী সমাজের অত্যধিক স্বাধীনতার ফলে যে সকল বিষময় ফল ফলিতেছে ও যে নৈতিক অধঃপতন ঘটিতেছে তাহাব প্রমাণ— war babiesদের অস্তিত্ব ও বিলাতের বিবাহ-বিচ্ছেদের মা মলায় উত্তমরূপে প্রকটিত হইতেছে—এঁরা সে সকল অসুবিধার কথা ভাবেন কি? এঁরা হয় তো ভাবেন যে আমরা সে সকল অসুবিধায় পড়ব না—খালি স্বাধীনতা-টুকু ভোগ কর্ব্ব, কিন্তু স্বাধীনতার কুফলগুলির প্রলোভন এড়িয়ে যাওয়া কি সম্ভব? কণ্টকফুলের মধুপান কর্ত্তে হলে কণ্টকাঘাত ব্যতীত তাহা কি সিদ্ধ হয়—কখন না। বিলাতী স্বাধীনতার একটা প্রধান অঙ্গ স্বেচ্ছায় পতি-নির্ব্বাচন—এটা অধিকাংশ স্থলেই বাহ্যিক। টাকার জন্ত বড়লোকের পত্নী হইয়া বেশভূষা ভোগলালসা বিলাস-বাসনা মিটাইবার জন্ত বা দুঃস্থ পিতৃকুলের আভিজাত্য গৌরব বা বাহ্যিক আর্থিক অবস্থা বজায় রাখিবার জন্ত বিলাতের সুন্দরী, সংকুলোদ্ভবা কিশোরীদের বৃদ্ধ বিপত্নীক-দের লালসায় ইন্ধনস্বরূপ হইতে হয় ইহা সর্ব্বজনবিশ্রুত

প্রমাণিত সত্য। আমাদের দেশের শিক্ষিত ও ধনী সমাজেও এ পাপ আছে যেমন অশিক্ষিত ও দরিদ্রদের মধ্যে আছে। এ পাপ নিবারণে পৃথিবীর কোন সমাজ কোন মানবজাতি আজও সক্ষম হয়েন নাই। স্ত্রীস্বাধীনতা এক্ষণে উপকার না করিয়া অপকারই করে—কারণ প্রোস্থিতযৌবনা সংসারজ্ঞানাভিজ্ঞা যুবতী সরলচিত্তে স্ত্রীস্বাধীনতার অধিকারে নিজের রুচি অনুযায়ী কোন যুবককে ভালবাসিলেন তৎপরে পিতামাতার প্ররোচনায় বা পারিবারিক কারণবশতঃ এক বৃদ্ধ বিপত্নীককে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন; এ বিবাহেও কোর্টসিপ বা পতি-নির্ব্বাচনরূপ প্রসঙ্গের আভনয় হয় এবং প্রকাশ্যতঃ তাহা ভালবাসাজনিত স্বাধীন বিবাহ বলিয়া জানান হয়; কিন্তু স্ত্রী স্বাধীনতায় নারীর প্রবৃত্তিকে যে চাঞ্চল্য ও উদ্দামভাবে পূর্ণ করে তাহার ক্রিয়া কি বন্ধ থাকে? অন্তঃসলিলা নদীর মত এই প্রবাহ ঈপ্সিতকে না পাইলে অন্য ঘৃণ্য উপায়ে প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধন করে, পরিণামে প্রকাশ্য আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তখন হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া যায়। তারপর স্বেচ্ছায় পতিনির্ব্বাচন প্রথাতেও অনেক অসুবিধা আছে এবং তাহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলই বেশী দেখা যায়। বিলাতে সাধারণতঃ কিশোরী ও তরুণীরা ১৭।১৮ হইতে ২২।২৩ বৎসরে বিবাহিতা হয়েন—নবীন যৌবন তখন তাহাদের দেহলতাকে হিল্লোলিত করে শিরায় শিরায় যৌবনের মাদকতা ঢালিয়া দেয়, তখন তাহাদের পক্ষে সুপতি নির্ব্বাচন অসম্ভব; কারণ রূপজ মোহে তখন নয়ন অন্ধ হইয়া পড়ে সুতরাং এই কিশোরী বা তরুণীরা যৌবনের ঝোঁকে যা করে বসেন পরিণামে অনেক অশ্রুজল ব্যয় করিয়া সেই অপরিণামদর্শিতার পাপ ক্ষালন করিতে হয় এই সকল স্বেচ্ছাকৃত বিবাহের পরিণামও অধিকাংশস্থলে আদালতেই নির্দ্ধারিত হয়। তারপর মানবমানবীর মন নদী জলের মত চঞ্চল, আজ যাহাকে ভাল লাগে দুদিনে সে পুরাতন হয়—অধীত গ্রন্থের ন্যায় সে অনাদৃত হয়; রূপজ মোহের ঘোর কাটিলেই মনোমালিন্য জন্মে। নারী নিগ্রহের যদি হিসাব পাওয়া যাইত তো বোধহয় আমরা সহজেই প্রমাণ করিতে পারিতাম যে এই স্ত্রীস্বাধীনতার দেশেই স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীর লাঞ্ছনা আমাদের দেশের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এমন কি বড় বড় ঘরেও বিবাহিতা পত্নী নামে গৃহিণী থাকেন দুশ্চরিত্র সুরাপায়ী পরনারীরত স্বামী হেলায় তাহাকে দলিত করে। শ্রমজীবিশ্রেণীর মধ্যে সুরাপানরত স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীর লাঞ্ছনার মামলা ছোট ছোট বিলাতী কাগজে অসংখ্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাদের পত্নীদের বাধ্য হইয়া শৌণ্ডিকালয়ে (সে দেশে সুরার দোকান বুঝিতে হইবে) গিয়া স্বামীর বেতন কাড়িয়াকুড়িয়া আনিয়া কত কষ্টে সংসার চালাইতে হয়। নারীর লাঞ্ছনা সব দেশেই আছে কারণ কাপুরুষ সব দেশে, জাতিতে ও সমাজে বিদ্যমান থাকে। এই শ্রেণীর পুরুষদের আদর্শ লইয়া কোন জাতি বা সমাজকে বিচার করা একান্ত অকর্ত্তব্য। আমাদের উষ্ণপ্রধান দেশে বিবাহের বয়স খুব বেশী ধরিলেও ১৫।১৬র অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। বিলাতের শিক্ষিতা নারীরা যদি ২০।২২ বয়সেও অভ্রান্ত ভাবে জীবনসঙ্গী নির্ব্বাচনে অক্ষমা হন তবে এদেশের অল্পশিক্ষিতা নারীর পক্ষে এরূপ নির্ব্বাচন যে ভ্রম-সঙ্কুল হইবে তাহা বলা বাহুল্য। ইহার প্রমাণ এদেশেরই শিক্ষিতশিক্ষিতা সমাজেও প্রচুর পাওয়া যায়। পুরাকালে আমাদের দেশে স্বয়ংবরা হইবার প্রথা ছিল কালে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে কারণ সে প্রথার দোষ বুঝিতে পারিয়া সমাজপরিচালকগণ সেই প্রথা পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কৌলিন্য প্রথার প্রারম্ভে উচ্চ-প্রজনন উদ্দেশ্যই মূল ছিল, পরে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিলে কৌলিন্যপ্রথা ধীরে ধীরে তিরোহিত হইয়াছে সুতরাং আমাদের সমাজে যে পরিবর্ত্তন করা চলে না—এ উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে তবে পরিবর্ত্তনের প্রারম্ভে অল্প বিস্তর বাধাবিঘ্ন আসে। সর্ব্বদোষ-হারক কালই তাহার ঔষধ, কালচক্রে সকল বাধা তিরোহিত হয়, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা ঘটেই। সর্ব্বদেশেই আদিম যুগে নারীগণ পুরুষদের সম্পত্তি রূপে গণ্য হইত এবং পত্নীকে দান, বিক্রয়, বা বন্ধক দানের অধিকার স্বামীর ছিল—কালের প্রভাবে এই কুপ্রথা অতি অসভ্য বর্ব্বর-জাতি ভিন্ন অন্যান্য সকল জাতি হইতে লুপ্ত হইয়াছে—আমাদের দেশেও নারীগণের অবস্থা যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উন্নত হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে যাঁহারা একেবারে সমস্ত ওলট পালট করিয়া স্বেচ্ছা-চারিতার পরিচয় দিতে চান তাঁহারা যে সফলকামী হইবেন না তাহা বলা অধিকন্তু। নারীসমাজের কল্যাণকর যাহা কিছু আবশ্যকীয়, তাহা তাঁহাদের শক্তি অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতে স্বাভাবিক ভাবেই আসিবে—তজ্জন্য ব্যস্ত হইলে চলিবে না। তাই বলি নারী ধীরে—ধীরে—ধীরে!

— "পুরুষ"

সদানন্দের পত্র

সম্পাদক ভায়া

সেদিন বসে বসে ভাবছিলাম যে সব গণ্ডগোলের মূল কোথা? ভাবতে ভাবতে মনে হল "ব-ফলাটাই" হচ্ছে সকল দুঃখের মূল—বিদ্যাসাগর মশাই ঐ ব-ফলা দিয়েই সংযুক্ত বর্ণের কেতাব সুরু করেছিলেন—দয়ার সাগর হয়ে তিনি নির্দ্দয়ের মত নদয় হয়ে কেন যে এ ব-ফলার বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন তা জানি না। দ্বিতীয়ভাগ আরম্ভ হয়েছে ঐ ব-ফলা নিয়ে, আর দেখ প্রথমভাগে কোন গোল ছিল না তাতে যা পড়েছি তার মধ্যে "গোপাল অতি সুবোধ বালক, সে যাহা পায় তাই খায় যাহা পায় তাহাই পরে" ঐ অবধি লিখে যদি পণ্ডিতমশাই ক্ষান্ত হতেন তবে হয়তো সমস্ত বাঙালী জাতটাই গোপাল অতি সুবোধ বালকের মতই থাকতো—কিন্তু তিনি কাল কল্লেন ঐ দ্বিতীয়ভাগ লিখে একে যুক্তঅক্ষরের কটমট ধ্বনি তার উপর ঐ ব-ফলার অত্যাচার। প্রথমেই বৃদ্ধ লিখলেন "ঐক্য"—ঐক্য যে ভারতবর্ষের জলবায়ুতে নাই তাকি এই বহুদর্শী পণ্ডিত জানতেন না—লোকে ঐক্য পড়েই বুঝলে এটা সবই ভুয়া—পণ্ডিতমশায় এবার মোয়া দিয়ে ছেলে ভুলাচ্ছেন—তারপর বল্লেন "বাক্য", বাক্যে অবশ্য বাঙ্গালী চিরদিনই দুরন্ধর, বাক্যে হঠান এ জাতটাকে বড় সোজা নয় দাদা। এ জগন্নাথতর্কালঙ্কারের দেশে বাক্যি যখন ছোটে, তোমার বিলাতী ফিলজফি তার তোড়ে টানের মুখে খড়ের মত উধাও হয়ে যায়। একবার এদেশের এক লীডার পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বিলাতী 'লজিক' চালাতে গিছলেন তাঁর পরিণাম বাবাজীর এখনও মনে আছে ফলে তিনি গোষ্ঠচ্যুত গাভীর ন্যায় জনারণ্যে এতদিন হাম্বা হাম্বা করে বেড়িয়ে শেষটা সরকারের অনুগ্রহে মাড়োয়ারী ধনীর অর্দ্ধ-সুশীতল ছায়ায় বসে বিজলী পাখার হাওয়া খাচ্ছেন। ভায়া হে! বাঙালার সনাতন লজিক "মূর্খত লাটৌষধি" তবে বাঙালীর পোড়াকপাল যে তারা লাঠি চালাতে ভুলে গিয়েছে। গেল কেন জান? পাশ্চাত্য কায়দা বরদাস্ত কর্ত্তে গিয়ে—তারা ব্যায়াম কর্ত্তে হলে ফুটবল খেলে, ক্রীকেট খেলে, লাঠী—কি সর্ব্বনাশ! অসভ্য লাঠী এযুগে কখন চলে? এই সেদিনও নদে শান্তিপুরের গোড়ো গোয়ালাদের লাঠীর দাপে ভুবন কাঁপিত, ব্রাহ্মণ আশানন্দ, ঢেঁকীকেই লাঠীর মত ঘুরাইতে পারিতেন—আর আজ ফুটবল খেলা শিখিয়া বাঙালীর ছেলেরা নির্য্যাতিতা রমণীদের রক্ষার জন্যে কাতরে পুলিশের করুণা ভিখারী হইয়া বসিয়া আছে। সাহেবদের বৈজ্ঞানিক রণ নীতির অতি নিম্নস্তর হচ্ছে ফুটবল খেলা--সেটা তাদের কাজে লাগে—তুমি বাঙালী তুমি তা শিখে কি কর্ব্বে—সেটা কেউ ভাবে না। কথাটা হচ্ছে ওরা করে, তবে আমাদেরও করা দরকার। ওদের মত একতা, ওদের মত আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান ওদের মত স্বজাতিপ্রিয়তা, ওদের মত আত্মোৎসর্গ এগুলা করা দরকার মনে করো না কেন? ভায়া হে চটো না—দেশের লোকের নিন্দে কর্চ্ছি; ভাবছ তা নয় চটে লাভ নেই, চটলে নিজের মেজাজই খারাপ হয় পরের তাতে কিছু এসে যায় না।

হ্যাঁ বাক্যের কথা বলছিলেম না—এটাকে যদি বিদ্যাসাগরমশাই গোড়ায় ঠাঁই দিতেন তো ভালই হোত—তবে বুড়ো বামুন বড় চালাক কিনা ভেবে দেখলেন যে বাক্যের মত কার্য্য করবার শক্তি যখন জাতটার নেই তখন দাও বাক্যকে পিছিয়ে; তাই বাক্য এলেন পরে। তারপর লিখলেন মুখ্য কিনা 'আসল' আমাদের শেষ কামনা বা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মোক্ষলাভ আর জীবনে আমাদের বাক্যই হচ্ছে মুখ্য অর্থাৎ আমরা যা কিছু করি ঐ বাক্যে, কার্য্যে করা সব সময় সুবিধাজনক হয় না বলে। মুখ্যের পর অখ্যাতি এটা কর্ত্তে যতটা আমরা মজবুত এত আর কিছুতেই নই, অবশ্য নিজের ছাড়া; কারণ আমাদের জাতির একটা গুণ হচ্ছে নিজেকে মনে করা সর্ব্বগুণের আকর ও সর্ব্বদোষের অতীত। পরের অখ্যাতি তো করেই থাকি তাছাড়া নিজেদের বন্ধুবান্ধবদের এবং স্বজাতির অখ্যাতি করাও বাঙালী জীবনের একটা অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্য। তার পর হচ্ছেন উপাখ্যান কিনা ভুয়ো গল্প—

আজগুবী খবর এটা উপভোগে ও প্রচারে আমাদের সদাই আগ্রহ দেখা যায় এবং লোকে বলে বাগবাজারই নাকি এর পীঠস্থান। তা হলে দেখছ তারা বুড়ো পণ্ডিত এক য-ফলা লাগিয়ে আমাদের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কালা কালা করে দেখিয়ে গেছেন। হোমিওপ্যাথিক মতে "বিষস্য বিষমৌষধম্" এখন আমাদের এসব কদ্‌ভী দূর কর্ত্তে হলে আলস্য পরিহার করে অনৈক্য দূর করে কার্য্যে যোগদান করা। ইহাতে বিবেচ্য কিছু নাই পরশ্রীকাতরতারূপে রোগ আরোগ্য হইলে স্বরাজ বা স্বাধীনতা অচিরে আমাদের ভোগ্য হইবে, তবে অযোগ্যের তাহা লভ্য হইতে পারে না। স্বরাজের মূল্য মাণিক্যের মত তাহা বিভাজ্য বা বিচার্য্য নহে। এখন দেখিলে যে আবার য-ফলা দিয়া য-ফলার অত্যাচার নিবারণ করা যায় এইজন্যই পণ্ডিত চাণক্য বলেছেন "কণ্টকে নৈব কণ্টকং" কিনা কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা আর সেই চাণক্যের ভবিষ্যপুরুষ আমরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা না তুলে নিজের ভাইদের পিছনেই কাঁটা ফোটাচ্ছি হয়তো কোনদিন নিজের পায়েই ফুটবে তার কোন ঠিকানা নেই—অতএব হয় ভাই তোমরা য-ফলার সবটা নাড়াচাড়া কর আর নয় ওটা সম্পূর্ণ বর্জ্জন কর, আখাখেঁচড়া করে জনসাধারণকে পথভ্রষ্ট করে তুলো না।

সেদিন হালী ছোকরাবাবুদের একটা বই পড়ে বাঙ্গালার বানানের দুর্দ্দশা দেখে চোখে জল এল—এঁরা একে আলোকপ্রাপ্ত, তার উপর চশমাচ্ছাদিত আবার কারু কারু গায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কা মারা কাজেই তাঁদের কাছে ব্যাকরণ গো-টু-হেল নভেল পড়েই তাঁদের বাঙলা শেখা ও বিলাতীভাবে বাঙলা লেখা তাঁদের বিশেষত্ব তাঁরা বানান, সন্ধি, সমাস, প্রত্যয় প্রভৃতির ধার তো ধারেনই না উল্টে কেউ কিছু বল্লে গাল দেন—কি? জান কত বড় সাহিত্যিক আমি। এঁদের মুরুব্বী পাকড়ালে তাঁদের অদ্ভুত বা কিম্ভুত ব্যাকরণের আইনঅনুযায়ী য-ফলাকে সমূলে লোপাট কর্ত্তে পারেন সাকারকে নিরাকার কর্ব্বার ক্ষমতা এঁদের অত্যদ্ভুত। এঁরা ঐক্য লিখবেন ঐ ক্ ক, মু খ্ খ, অ খ্ খাতি, উপা-আ-খান্, ভো-গ্-গ ইত্যাদি। কনেটিক্সের জয় হউক—বাঙলা ভাষার আত্মশ্রাদ্ধ নিকটবর্ত্তী—বাঙলা জাগো।

তোমাদের
সদানন্দ।

বাদল রাতে

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

মেঘ জমেছে আজকে আমার মনে,
শ্রাবণ ধারা ঝরে ছনয়ন-কোণে,—
বান্ ডেকেছে 'ফল্গুনদীর' নীরে,
তাই দেখে 'সে' এল আমার ঘরে।

মোর, ভাঙ্গা ঘরে দিতে তারে স্থান,
আজ, ওগো, কেমন করে প্রাণ;
আমি, এই বাদলে ছাড়্‌ব কোথায় তারে
না—না, বুকের মাঝেই রাখব' চেপে ধরে।

আজ শুনাব', আমার প্রাণের কথা,
আজ বুঝাব' কোথায় হিয়ার ব্যথা;
এসেছে 'সে,' আজকে অভিসারে,
চুপি চুপি, আমার ভাঙ্গা ঘরে।

রুদ্ধ দুয়ার এ ঘোর বাদলরাতে,
কেউ খোলেনি তার মৃদু করাঘাতে
শুধু খোলা ছিল, আমার আগড় খানি,
সে, কেমন ক'রে জান্‌লে নাহি জানি?

গল্প

সংস্কারের সন্ধি

শ্রীপ্রভাবতী দেবী গঙ্গোপাধ্যায়

(১)

অব্যবস্থিতচিত্তা ও চঞ্চলা বলিয়া স্ত্রীলোকের একটা বিশ্ববিশ্রুত বদনাম আছে। কথাটা সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্ব-বিষয়ে প্রযোজ্য না হইলেও যে অন্ততঃ কতকাংশে যে সত্য তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ যখন দুইটী অভিন্নহৃদয়া সমবয়স্কা সুমসুখদুঃখকাতরা সখী নিভৃত প্রকোষ্ঠে মিলিতা হয়; তখন বহুদিনের সাঞ্চত অনেক গুহ্যকথা বিবেকের নিষেধ সত্ত্বেও যে হৃদয় কপাট ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়ে একথা সর্ব্বজন বিদিত, কিন্তু ইহাতে লজ্জিতা হইবার কিছুই নাই কারণ প্রবাদটী প্রকারান্তরে স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ও মধুর হৃদয়বৃত্তিগুলির কোমলতার পরিচায়ক মাত্র।

তাই দুইটী নববিবাহিতা কিশোরীবন্ধু নিভা ও সুরভি বহুদিন অদর্শনের পর আজ যখন শয়নকক্ষের দ্বারে অর্গল-বদ্ধ করিয়া দিয়া নিজেদের বিবাহিত জীবনের সুখ-দুঃখের গল্প করিতে বসিল, তখন এমন অনেকগুলি কথা তাহাদের অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া পড়িল যাহা এ জীবনে প্রকাশ করিবে না বলিয়া তাহারা স্বামীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধা ছিল এবং যাহা প্রকাশিত হইয়াছে জানিতে পারিলে তাহাদের পতিদেবতারা অন্ততঃ এক সপ্তাহকাল স্ত্রীর সহিত পত্রালাপ বন্ধ করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইতেন না।

দেবরের প্রীতি স্নেহ, স্বামীর ভালবাসা শ্বশুর শাশুড়ীর আদর যত্ন প্রভৃতির প্রত্যেক খুটিনাটিগুলি বিচক্ষণা মনোবিজ্ঞানবেত্তার মত বিশ্লেষণ করিয়া সহসা নিভাননী বলিল, "তোর বরের চিঠি পেয়েছিস ভাই?"

অধরের কোনে একটু আনন্দের হাসি খেলাইয়া সুরভি উত্তর দিল, পেয়েছি বৈকি, দেখ্‌বি?

"বল্‌ না ভাই। ক'খানা?"

দু-দুখানা। একখানা সেই পরশুদিন এয়েছে, আর আজ এই একখানা এলো। তুই পাস্‌নি?" নিভা হাসিয়া বলিল, "বারে! আমিতো সবে আজ এসে পৌছলুম ভাই! এখনি পাবো কোত্থেকে? দুটো দিন যাক্‌।"

"এলে দেখাস্‌ কিন্তু ভাই!"

নিভা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, দেখাইবে। অতঃপর সুরভি বরেরচিঠি লইয়া আসিলে উভয়ে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল, যদিও প্রত্যেক চিঠি খানিরই শেষছত্রে আর কাহাকেও না দেখাইবার একটা নিষেধাজ্ঞা যে বেশ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল, এ কথা ধ্রুব সত্য।

চিঠিখানি পড়া হইলে নিভা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোর বর তোকে খুব ভালবাসে কিন্তু ভাই।"

প্রেমগর্ব্বে গর্ব্বিতা সুরভির ফুলশয্যা হইতে এ পর্য্যন্ত স্বামীপ্রেমের অনেক কাহিনী মনে পড়িয়া গেল। একটু অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন ভাবিতে ভাবিতে সে হাসিমুখে বলিল, "তোকেও তো বাসে।"

হাসিমাখা ভ্রুকুটী করিয়া নিভাননী বলিল, "ধেৎ—এরই কি হোচ্ছে ?"

"বাইরি না, সত্যি। আমার প্রায়ই কি বলে জানিস্ ?"

"কি ?"

"বলে যে তোমার সইটীতো বেশ সুন্দর দেখতে ! ছেলে হলে তার একটী মেয়েকে বৌ করে এনো আমি এক পয়সা ও নোবো না।"

"বেশতো, তা এখন থেকেই ঘট্‌কালি কোত্তে যাবো কেন লো ? তুই মেয়ের মা, তুই ঘট্‌কালি কোর্‌বি।"

নিভা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা বেশ, আমিই কোর্‌ছি। সত্যি ভাই ! আমার মেয়ে হলে তোর বৌ কোর্‌বি তো ?"

সুরভি বলিল, "নিশ্চয়ই কোর্‌বো; কিন্তু আমার মেয়ের সাথেও তোর ছেলের বে দিতে হবে তা বলে দিচ্ছি।"

নিভা পুলকের হাসি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা গো বেয়ান্ ঠাকৃরুণ, তাই হবে। কিন্তু তোমার কি শীগ্‌গিরই হোচ্ছে নাকি ?"

নিভার গাল টিপিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে সুরভি বলিল, "দেখ্, অমন করিস তো বেয়ান হবনা বল্‌ছি।"

সেইদিন হইতে এই দুইটী আবাল্য সখির মধ্যে বন্ধুত্ব বন্ধন ছাড়াও যে একটা নূতন প্রীতিরবন্ধন গোপনে স্থাপিত হইয়া গেল, তাহা দুইচারিটী সমবয়স্কা ভিন্ন আর বিশেষ কেহ জানিতে পারিল না।

(২)

দুই বৎসর পরে যখন মাত্র কয়েকদিন অগ্রপশ্চাতে নিভার একটী পুত্র ও সুরভির একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল তখন কিছুদিনের জন্য সখিদ্বয়ের মধ্যে সেই পূর্ব্বকৃত স্নেহের বন্ধনটা আরও দৃঢ়তর হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইল না; তিন মাসের মধ্যেই অদৃষ্ট, নিষ্ঠুর হস্তে সুরভির কন্যাটীকে হরণ করিয়া লইলেন; তারপর একটা জন্মগত কুসংস্কারের অভিশপ্ত দৌর্ব্বল্যে একদিন উভয়ের বন্ধুত্ব বন্ধনটাকে একেবারে শতছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

সুরভি সন্তান শোক পাইবার অব্যবহিত পরে নিভা যখন একদিন তাহার হৃষ্টপুষ্ট সুশ্রী শিশুটীকে লইয়া তাহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিল, তখন শোকাতুরা সুরভির ভাগ্যহীন বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়টা তুমুল ব্যথার ঝটিকায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। হায়! তাহারও বক্ষ সরসীতে নিজের রক্তমাংসে গড়া অমনি একটী সোণার পদ্ম ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহারও তরুণ কোমল মুখখানি অমনি স্নিগ্ধ লাবণ্যে দেদীপ্যমান ছিল; কত যত্নে, কত আদরে, কত আশা আকাঙ্ক্ষায় সে তাহার মায়ার পুতলীটীকে হৃদয়-কুলায় মধ্যে স্নেহের বর্ম্মে ঘিরিয়া লুকাইয়া রাখিত; কিন্তু তবুও মৃত্যুর বিষাক্ত তীর হইতে তাহাকে রক্ষণ করিতে পারে নাই; এমনি নিষ্ঠুর, এমনি নির্ম্মম সেই বিধাতার বিচার! চোখের জল মুছিতে মুছিতে দুই হাত বাড়াইয়া সুরভি বলিল, "খোকাকে একটু দে ভাই! আমারটীতো রইল না, ঈশ্বর বাঁচিয়ে রাখুন, তোরটী কোলে নিয়েই বুক জুড়াবো।"

কি একটা অজ্ঞাত ত্রাসে চম্‌কিয়া উঠিয়া নিভা বলিল, "অচেনা মানুষের কোলে গেলে বড্ড কাঁদে ভাই।"

"না না, কাঁদবে না, তুই দে; কাঁদে তো ফিরিয়ে নিস'খন।"

তাড়াতাড়ি বিষন্ন মুখ খান ফিরাইয়া লইয়া নিভা বলিল, "এখন থাক্ ভাই, ওর দুধ খাবার সময় হয়ে গেছে, এখনি ফির্‌তে হবে আমায়।"

নিভার মুখের পানে চাহিয়া সুরভি বলিল, "দুধ নিয়ে আস্‌বো ? খাওয়াবি ?"

বাধা দিয়া নিভা বলিল, না না, থাক্‌গে, ওর দুধ রয়েছেতো। বাড়ী গিয়েই খাওয়াবো'খন। তাহলে আসি ভাই ?"

সুরভির সম্মুখ হইতে খোকাকে লইয়া যাইবার জন্য নিভা যে কেন অত্যধিক পরিমাণ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রকৃত কারণটা সে ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিল না। তাহার একবার ও সন্দেহ হইল না যে ইহার মধ্যে অন্য কোন অর্থ আছে। তা আগ্রহাতিশয্যে সুরভি বলিল. "দুধ খাইয়ে আবার নিয়ে আসিস কিন্তু ভাই।"

অস্ফুটস্বরে "আচ্ছা" বলিয়া নিভা শিশুটাকে লইয়া ত্বরিত পদে বাহির হইয়া গেল।

নিভা চলিয়া গেলে মৃতাকন্যার কচিমুখ খানির সদ্য-জাগ্রতস্মৃতি সুরভির আহত, ক্ষুধিত মনটাকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিল; তাহার নবোন্মেষিত মাতৃহৃদয় একটা কিছু ব্যাকুল ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্ত করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সুরভি ভাবিল, নিভার ক্ষুদ্র শিশুটুকুর মাতৃত্বের অধিকার তাহারা দুই সখী ভাগাভাগি করিয়া লইবে; তাহার বক্ষ মধ্যে যে স্নিগ্ধ অমিয় প্রবাহ-ধারা দিনে দিনে পলে পলে বৎসরাধিক কাল সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহাকে বিধাতার নিষ্ঠুর ইচ্ছা ব্যর্থ করিতে চাহিলেও সে কখনও ব্যর্থ হইতে দিবেনা।

আশা উদ্বেলিত হৃদয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর ও যখন নিভা ফিরিয়া আসিল না, তখন তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় সুরভি আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না। মাকে ডাকিয়া সুরভি বলিল, "আমি একটু বেড়াতে যাচ্ছি মা, তুমি রান্না চড়াওগে।"

সুরভি বাড়ী থাকিলে কিছুতেই জননীকে রান্নাঘরে যাইতে দিত না। কন্যার বিষাদক্লিষ্ট মুখখানির দিকে চাহিয়া মাতা তাহাকে প্রায়ই সাংসারিক কাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া একটু বেড়াইবার পরমর্শ দিতেন, কিন্তু সুরভি প্রত্যুত্তরে একটু শুষ্ক হাসি হাসিত। আজ সেই প্রাত্যাহিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন "বেশ তো, যানা মা, রান্না আমিই কোর্‌বো'খন। কোথায় যাবি মা?"

"এই সইয়ের বাড়ী। হ্যাঁমা, সইয়ের খোকটী বেশ দেখ্‌তে, না?" কোনমতে পতনোন্মুখ অশ্রুপ্রবাহকে রোধ করিয়া মাতা বলিলেন, "হুঁ-বেশ।"

সুরভি কথা কহিল না, ক্ষণমাত্র নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্নেহক্ষুধিত হৃদয়ে সে নিভাদের বাড়ীতে ছুটিয়া চলিল। বহির্দ্বারের নিকট আসিয়া সহসা সুরভি থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, কারণ পার্শ্বস্থ কক্ষে নিভা ও নিভার মাতা তাহার সম্বন্ধেই বাক্যালাপ করিতেছিলেন। কৌতুহলোদ্দীপ্ত কর্ণে সুরভি শুনিল, নিভা বলিতেছে, "আজ সুরভি খোকাকে কোলে নিতে চাইছিল মা।"

ব্যস্ততার সহিত মাতা বলিলেন, "দিস্‌নি তো নিভি? দিস্‌নি তো?"

"না দিইনি।"

"খবর্দ্দার, দিস্‌নি যেন, বাছার আমার অকল্যাণ হবে। তিনমাস গেলনা, রাক্ষসী নিজেরটাকে চিবিয়ে খেলে, আবার পরের ছেলে নিয়ে টানাটানি কেন গা! ওমা! এমন তো দেখিনি বাবু!"

সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় তরুণী মাতার স্নেহপ্রবণ হৃদয়টা বুঝি কাঁপিয়া উঠিল, আর তাই বোধহয় শিশুটাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া নিভা বলিল, "না মা, দেবনা ওকে, কক্ষনো দেবনা। কেমনরে মাণিক! তুই সুরভির কোলে কিছুতেই যাস্‌নি যেন, বুঝ্‌লি? কি? হাস্‌ছিস্ যে বড়। ওরে দুষ্টু—"

মর্ম্মাহতা শোককাতরা সুরভি আর শুনিতে পারিল না টলিতে টলিতে সে নিজেদের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দালানে লুটাইয়া পড়িয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। হায়রে! তাহার ক্রোড়শূন্য করিয়া দিয়া বিধাতা তাহাকে শোকের সাগরে ভাসাইলেন, সেওকি তাহার অপরাধ? আর ঐ নিভা যাহাকে সে শিশুকাল হইতে সহোদরাধিক ভালবাসিয়া আসিয়াছে, সেও তাহাকে সেই অজ্ঞাত অপরাধে অপরাধিনী করিতে চায়। মানুষের বিচার এমনি হয় বটে!

(৩)

সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ লইয়াই মানুষের জীবন। জন্ম ও মৃত্যুর বেলাভূমির মধ্যে সুখ বা দুঃখের একটানা স্রোত কখনও বহিয়া যায়না; তাই কবি বলিয়া ছিলেন, 'চক্রবৎ পরিঘুর্ণন্তে সুখানিচ দুঃখানিচ। দুঃখের পর সুখ যেমন মনোরম, সুখের পর দুঃখ তেমনি ভীষণ; আবার একের আগমনে অন্যের স্মৃতিটুকুও বর্ত্তমানেরই পরিপোষণ করে। নিভা ও সুরভির সুখ-দুঃখের চক্রটীও কালের মাহাত্ম্যে সহসা ঘুরিয়া গিয়াছিল।

দুই বৎসরের পরে যেদিন নিভার পুত্রটী কোন এক অজ্ঞাত স্বপ্নরাজ্যের উদ্দেশে চিরদিনের মত প্রস্থান করিল, ঠিক্ তাহার পরদিবসই সুরভির একটী শিশুপুত্র জন্মগ্রহণ করিল; একজনের গৃহে বিসর্জ্জনের করুণক্রন্দন মিলাইতে

না মিলাইতে অন্যের গৃহে অধিবাসের মঙ্গল বাদ্য মহানন্দে বাজিয়া উঠিল। বন্ধুর দুঃখে সুরভির হৃদয়টাও একটা নীরবব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, কারণ পুত্রশোকের ভীষণতা উপলব্ধি করিবার মত সুযোগ ঈশ্বর তাহাকে যথেষ্ট দিয়াছিলেন। তাই সে আঁতুড় হইতে বাহির হইয়াই নিভাকে সান্ত্বনা দিতে ছুটিয়া গেল, সখীর নিষ্ঠুর ব্যবহারের সুস্পষ্ট স্মৃতিটাও তাহাকে আর বাধা দিয়া রাখিতে পারিল না।

সুরভির অপ্রত্যাশিত আগমন নিভাননীকে বিস্মিত করিয়া ফেলিয়াছিল, কারণ বাল্যের সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব দুই সখীর মধ্য হইতে বহুদিন পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল, এটা দারুণ ক্ষোভ ও ঘৃণা।

নিভাননীকে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সুরভি মৃদু হাসিয়া বলিল, "ভাল আছিস্ ভাই ?"

দুঃখের দিনে সুরভির মৃদু হাস্য ও মঙ্গল প্রশ্নটা নিভাননীর বক্ষে ঠিক্ বিদ্রূপের বিষাক্ত তীরের মত নিষ্ঠুর হইয়া বিঁধিল। রক্তচক্ষুতে চাহিয়া সে উত্তর দিল, "হুঁ—তুই এবার খুব খুসী হয়েছিস্ তো ?"

ব্যগ্রহস্তে নিভার হাত ধরিয়া বিষণ্ণবদনে সুরভি বলিল, "আমায় ভুল বুঝিস্নি ভাই !" নিভা সুরভির মুখের পানে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া নীরবে মুখ ফিরাইল।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সুরভি বলিল, "তোর ছেলে কি আমার কেউ ছিলনা রে ! মনে করে দেখ্ ভাই সেই ছেলে-বেলার কথা, তুই আমায় বেয়ান্ বলে যখন ডাক্‌তিস্ !" নিভা চঞ্চল হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে বলিল, "তুই এতদিন পরে কেন এসেছিস্ শুনি ?"

"আমি ? আমি এয়েছি ফের্ তোর সাথে ভাব কোত্তে।"

"তা আর হবে না।"

"হবে না ! কেন ?"

সজল চক্ষে নিভা বলিল, "আমার খোকা যে আর নেই ভাই ! কি দিয়ে আমি তোর বেয়ান হব ? খোকা যে আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছেরে।—" নিভা উচ্ছ্বসিতা হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সুরভির চক্ষুও অশ্রুশূন্য ছিল না, সখীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া সেও নীরবে আঁচলপ্রান্তে চোখের জল মুছিতে লাগিল; কিন্তু সান্ত্বনার একটী ক্ষুদ্রবাণীও তাহার অধরোষ্ঠে স্ফুরিত হইল না। হায়রে ! কি বলিয়া সে অভাগিনীকে সান্ত্বনা দিবে ? সন্তান-শোকের দারুণ দুঃখ, তাহার মাতৃ-হৃদয়ের নিকট অবিদিত নয় ! সহসা কি ভাবিয়া সুরভির চক্ষু দুটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সখীর হাত ছাড়িয়া দিয়া সে বলিল, "তুই একটু দাঁড়া নিভা, আমি এক্ষুনি আস্‌ছি।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই সুরভি আবার ফিরিয়া আসিল; কিন্তু একা নয়, তাহার বক্ষের আড়ালে মল্লিকার কুঁড়িটীর মত একটী অস্ফুটস্ত অপোগণ্ড শিশু মিটিমিটি চাহিতেছিল।

শিশুটীকে ধীরে ধীরে নিভার ক্রোড়ে শোয়াইয়া দিয়া সুরভি বলিল, "কাঁদিস্নি ভাই, এই যে তোর ছেলে। তোর খোকা কোথাও যায় নি ভাই ! আবার ছোট হ'য়ে কেমন তোর কোলে ফিরে এসেছে দেখ্।"

অশ্রুসজল চক্ষে শিশুটীর পানে চাহিয়া নিভা চম্‌কিয়া উঠিল; সবিস্ময়ে দুরু দুরু বক্ষে চাকিতে চাহিয়া দেখিল, ঠিক তেমনি—তেমনি সুন্দর সেই মুখখানি !—সেই নাক ! সেই চোখ ! সেই ভ্রূদুটী ! গালের পাশে তিলটী পর্য্যন্ত ঠিক তেমনি সুবিন্যস্ত ! এযে তাহারই ! এযে তাহারই হারানিধি ! তাহারই বুকের ধন !

অনেকক্ষণ নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া শিশুটীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া নিভা উচ্ছ্বসিত আবেগে চুম্বন করিল; তাহার পর চোখের জল মুছিতে মুছিতে সুরভির দিকে চাহিয়া বলিল, "আমায় মাফ্ কর ভাই !"

সবিস্ময়ে সুরভি বলিল, "সে কিরে ! আমিতো তোর ওপোর রাগিনি নিভা।"

"করিস্নি ? কিন্তু যদি জান্‌তিস্—"

বাধা দিয়া সুরভি বলিল, "তা আমি জানি।"

"জানিস ? না, জানিস নি। আমি একদিন ইচ্ছে করে, মিথ্যা অমঙ্গলের ভয়ে আমার খোকাকে তোর কোলে দিইনি ভাই ! তাই বোধহয় বাছা আমার অভিমানে আমার কোল ছেড়ে তোর কোলে ফিরে এসেছে। আমি মাতৃত্বের বৃথাগর্ব্বে গর্ব্বিতা হয়ে তোর দুঃখ তখন একটুও বুঝতে পারিনি ভাই ! আজ বুঝেছি বেশ ভাল করে বুঝেছি, কেন ঈশ্বর আমার সে দর্প ভেঙ্গে দিয়েছেন।" কাঁদিতে কাঁদিতে শিশুটীকে পুনরায় চুম্বন করিয়া নিভা বলিল, "দেখ্‌ছিস্ ? সেই নাক, সেই মুখ, সেই চোখ-দুটী; ঠিক্—ঠিক যেন আমার সেই সোণার পুতুলটী।

সুরভি তাড়াতাড়ি বলিল, "তোকেই দিলুম ভাই, তুইই আজ থেকে ওর মা।"
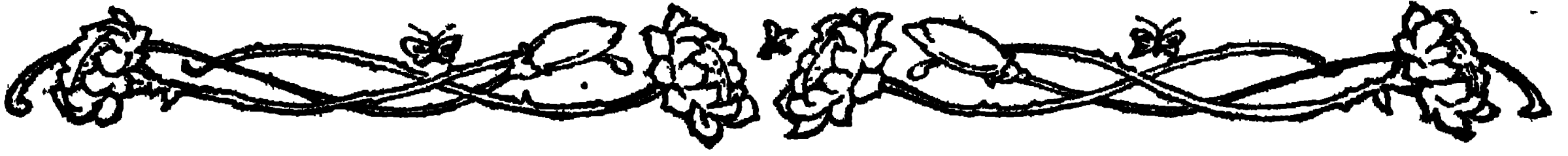
সাহিত্যে অলঙ্কার

আদি-রস

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

আদিরস কথাটা এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যে যে দোষণীয় সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে, সংস্কৃত সাহিত্যে সে কলঙ্ক তাহার কোন দিনই ছিল না। আদিরস বলিতে এখন আমরা কেবল অশ্লীলতাই বুঝি, জগতে যাহা কিছু অশ্লীল এবং শিষ্টতা বহির্ভূত বাঙ্গালায় তাহাই আদিরস। স্ত্রী ও পুরুষের যে আদিমসম্পর্ক, তাহা লইয়াই সমাজের সৃষ্টি, আদিম মানব সম্পত্তি ও স্ত্রীর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সমাজবদ্ধ হইয়াছিল, তখন স্ত্রী সম্পত্তির মধ্যেই গণ্য ছিল, অন্যরূপ ধন সম্পত্তির ন্যায় স্ত্রীরূপ ধন যাহাতে প্রবলের অত্যাচারে দুর্ব্বলের হস্তচ্যুত হইতে না পারে তাহারই জন্য পুরুষেরা দল বাঁধিয়া সমাজের সৃষ্টি করিয়াছিল। সভ্যতা বিকাশের পরে জগতের সমস্ত দেশে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধই সমাজের দৃঢ়তর বন্ধন রহিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও বিবাহপ্রথাই সমাজবন্ধন, মেলবন্ধন বা কৌলিন্যপ্রথার মূল সূত্র। স্ত্রী ও পুরুষের যৌনসম্পর্কঘটিত ব্যাপার লইয়া সকল যুগের, সকল দেশের কবিরা যে রস সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা মানবের সমাজের আদি বা মূল সূত্র বলিয়াই সেই রসের নাম আদিরস।

শ্লীলতা বা অশ্লীলতার কোন মাত্রা বা মাপ নাই, তাহা সমাজের মানসিকশক্তি বিকাশের উপরে নির্ভর করে। ইউরোপের বর্ত্তমান সমাজের মহিলারা সান্ধ্যভোজন বা নাচের জন্য যেভাবে সজ্জিতা হইয়া থাকেন তাহা আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে এবং ইউরোপের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত অত্যন্ত অশ্লীল বিবেচিত হইত ও হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা এককালে অশ্লীল ছিল তাহা এখন শ্লীল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জগতের সকল সময়ে সর্ব্বত্র অশ্লীলতার মাপ যুগে যুগে এইভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান ইউরোপের দীক্ষাগুরু প্রাচীন গ্রীস্ সুন্দরীনারীর নগ্নসৌন্দর্য্যকে অশ্লীল মনে করিত না। গ্রীস্ দেশের স্পার্টা প্রদেশের অতি প্রাচীন যুগের স্মৃতিকার যে সমস্ত নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাহা মধ্যযুগের বা বর্ত্তমান কালের কোনও যুগের কোনও দেশের ইতিহাসেই শ্লীল বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। লাইকুরগস্ (Lycurgus) অবিবাহিতা যুবতীদিগকে পর্ব্ব উপলক্ষে উলঙ্গ হইয়া উলঙ্গ যুবকদিগের সম্মুখে নৃত্য করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে স্পার্টা দেশে কোন কুফল ফলে নাই। লাইকরগস যীশুখৃষ্ট জন্মিবার নয় শত বৎসর পূর্ব্বে এই সমস্ত আইন প্রচলন করিয়াছিলেন। অবিবাহিতা যুবতীরা প্রকাশ্যে উলঙ্গ হইয়া নাচিত বলিয়া স্পার্টা দেশের যুবকেরা কখনও দুশ্চরিত্র হইতে পায় নাই। যুবতীদের উলঙ্গ অবস্থায়ও ব্যবহার অত্যন্ত সংযত ছিল, যুবকেরা কুৎসিত হাবভাব প্রকাশ করিলে দণ্ড পাইত। এই সমস্ত নৃত্যের ফলে বিবাহবন্ধনের অনেক সুবিধা হইত। যাহারা বিবাহ করিত না বা যৌনগতি সংযত রাখিতে পারিত না, তাহারা সমাজে ঘৃণ্য হইয়া থাকিত। যাহারা দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকিত তাহারা পর্ব্ব বা উৎসব উপলক্ষে অবিবাহিত যুবতীদের উলঙ্গ নৃত্য দেখিতে পাইত না। তিনহাজার বৎসর পূর্ব্বে, বিচার করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্যই লাইকরগস্ প্রকাশ্যে উলঙ্গ কুমারীদিগের নৃত্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কখনও কেবল পুরুষের মনে কামভাবের উদ্দীপন, পুরুষের চিত্তবৃত্তির অসংযম অথবা অবাধ যৌনসম্পর্কের প্রশ্রয় দেন নাই। পরবর্ত্তী মানব সমাজে লাইকরগসের এই প্রথা বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যে শ্লীলতা এবং অশ্লীলতা বিচার করিয়া স্পার্টা দেশে কুমারী-দিগের উলঙ্গ নৃত্যের পদ্ধতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অশ্লীলতা কি তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে মানবজাতির কোনও শাখা বিশেষ যে মূলসূত্রে সমাজ বদ্ধ হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধবাদী আচার বা ব্যবহার অশ্লীল। সমাজবন্ধের মূল সূত্রগুলি

সকল দেশে সমান নহে, সেইজন্যই আমাদের দেশে যাহা অশ্লীল ইউরোপে তাহা শ্লীল এবং আমাদের দেশে যাহা শ্লীল তাহা ইউরোপে অশ্লীল। শ্লীলতা ও অশ্লীলতার "ভাব" (Denotation) ভিন্ন ভিন্ন দেশে সাহিত্যের আদিরসের সহিত এইরূপ ভাবে জড়িত যে তাহা বিশ্লেষণ না করিলে রসসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় আদিরসের কোন অংশ অশ্লীল তাহা বিচার করা যাইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উদ্বাহতত্ত্ব মানবের সমাজ বন্ধনের প্রধান মূল সূত্র। কোন সমাজে কি আচার, কি ব্যবহার অশ্লীল তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে উদ্বাহ তত্ত্বের বিশ্লেষণ আবশ্যক। সকল দেশে বিবাহ প্রথা এক প্রকার নহে। অনুমান হয় যে আদিম মানব সমাজে প্রথম বিবাহ প্রথা ছিল না। যে পুরুষ যে নারীকে কামনা করিত নারীর ইচ্ছানুসারে তাহার সহিত সঙ্গত হইতে পারিত। স্বভাবতঃ পুরুষ, স্ত্রী অপেক্ষা অধিক বলশালী সুতরাং অনেক সময়ে নারী কোন পুরুষবিশেষের সহিত সংযোগের অভিলাষিণী না হইলেও পুরুষ তাহাকে সঙ্গত হইতে বাধ্য করিত। স্ত্রীর প্রতি পুরুষের এইরূপ বলপ্রয়োগ এখনও মানব সমাজে বিরল নহে। সময়ে সময়ে একাধিক পুরুষ এক নারীর সাহচর্য্য কামনা করিলে পুরুষের মধ্যে বিবাদ বাধিত। পুরুষসঙ্ঘের মধ্যে যে যুদ্ধে জয়ী হইত, নারী সেই পুরুষের অঙ্কশায়িনী হইত। সময়ে সময়ে দলবদ্ধ হইয়া পুরুষেরা নারী অপহরণ করিয়া আনিত। যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে পুরুষের এই বিবাদ সমাজবন্ধনের প্রধান কারণ। নারীঅপহরণ করিতে আসিলে পুরুষ মাতা, ভগিনী বা কন্যার রক্ষায় দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিত। এই সমস্ত বিবাদের ফলে আদিমমানবসমাজে বিবাহ প্রথা আরম্ভ হইয়াছিল। আমি দুর্ব্বল বলিয়া, আমার স্ত্রী, মাতা, ভগ্নী বা কন্যাকে বলশালী পুরুষ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে এই ভয় মানবের সমাজবন্ধনের প্রধান কারণ। এই ভয় হইতে মানব ইচ্ছা করিয়া দুইটী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল, প্রথমটী সমাজ ও দ্বিতীয়টী বিবাহ। আদিম-মানব বিবাহের সম্পর্কটা যতদূর সম্ভব কঠিন করিয়া তুলিয়াছিল। প্রথমে নিজের সমাজের দেবতাকে সাক্ষী রাখিয়া, পরে কন্যাপক্ষকে দিয়া রীতিমত দান করাইয়া অথবা কন্যাকে দিয়া শপথ করাইয়া তাহারা এই অপ্রাকৃত সম্বন্ধকে মানব সমাজের চক্ষে অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়া প্রমাণ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; তাহার একমাত্র কারণ মানুষের সম্পত্তিরক্ষার চেষ্টা।

বিবাহ প্রথা চলিলে পরে শ্লীল বা অশ্লীলতা সংস্কার জন্মিয়াছিল। খ্রীষ্টান বা য়ীহুদীগণের ধর্ম্মশাস্ত্রে আদিম পিতা আদম ও আদিম মাতা হবা (Eve) সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অবশ্য সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। খ্রীষ্টান ও য়ীহুদীরা বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আস্বাদন করিয়াই আদিম মানব ও মানবী প্রথম লজ্জা অনুভব করিয়াছিলেন। শিক্ষিত ইউরোপীয় সমাজে এখন আর অধিকাংশ লোকে আদম ও হবার কথা বিশ্বাস করে না তবে এই উপাখ্যান হইতে বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীন য়ীহুদীজাতি জননেন্দ্রিয়ের আবরণ, শ্লীলতা বলিয়া মনে করিত। অনেকদিন হইতে মানব-সমাজে পুরুষ ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে আবরণের অভাব অশ্লীলতা বলিয়া বিবেচিত হইত এবং এখনও নিম্নতর মানব সমাজে লজ্জা বা অশ্লীলতা রক্ষা সম্বন্ধে এই মতই প্রচলিত আছে। নিতম্ব বা বক্ষোদেশ আবরণ করিবার প্রথা প্রাচীন মিশর বা গ্রীস দেশে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

পরবর্ত্তী চিন্তাশীল মানব সমাজে নারীদেহের যে যে অংশ জননেন্দ্রিয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ, সেই সেই অংশেই আবরণের প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। নারীর স্তনদ্বয় যে ভাবে জরায়ু ও জননেন্দ্রিয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট, নরের স্তন সেরূপে সংশ্লিষ্ট নহে। নারীর নিতম্ব গর্ভস্থিত ভ্রূণের নিষ্ক্রামনের পথ বলিয়া যৌবন কালে অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। সেই জন্য পরবর্ত্তী সভ্যতর মানব সমাজে রিরংসার উদ্বোতক বলিয়া নারীদেহের এই দুই অংশে আবরণের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। দেশভেদে ও যুগভেদে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বের বিশ্লেষণ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে নর বা নারীদেহের যে অংশ অনাবৃত থাকিলে বা আবরণের মধ্যেও সুস্পষ্ট থাকিলে অপর পুরুষ বা নারীর মনে রিরংসা উদ্বোতনের কারণ হয় তাহাই সাধারণতঃ অশ্লীল বলিয়া

পরিগণিত হইয়া থাকে। যে সমাজে বিবাহপ্রণালীর প্রচলন আছে সেই সমাজে শিল্পে বা সাহিত্যে অশ্লীলতা ও সামাজিক উৎকর্ষের (culture) পরিচায়ক। সমাজ বিশেষে শ্লীলতা বা অশ্লীলতার আদর্শ আর দুইটী আদর্শের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এ দুইটী আদর্শ যথা ক্রমে সতীত্ব (chastity) ও অগম্যাবাদ (incest) বলিয়া কোন জিনিষ ছিল না। আমাদের ভারতবর্ষের আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষেরা সতীত্বের নাম গন্ধ জানিতেন না। পূর্ব্বে বিবাহবন্ধন ছিলনা এবং যে কোন পথিক ঋষিপত্নীগণের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলে তাহার সঙ্গতি কামনা করিতে পারিতেন। বিবাহবন্ধন আর্য্য ও বর্ব্বরগণের সমাজে প্রচলিত হইলে সতীত্বভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল। আর্য্যজাতি ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিবার বহুপূর্ব্বে সভ্যতর দ্রাবিড়জাতি আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিত, তাহাদিগের মধ্যে সতীত্বভাবের অস্তিত্ব ছিল না, কারণ দ্রাবিড়জাতি বিবাহ-প্রথা প্রচলন করেন নাই। তাহাদিগের মধ্যে নারীজাতি সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হয় নাই। দ্রাবিড় সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রাধান্য অধিক ছিল সেইজন্য নারী সম্পত্তির অধিকারিণী হইত। মাতার সম্পত্তি পুত্রে পাইত না, কন্যায় পাইত। কন্যা পিতৃগৃহে বাস করিয়া যথেষ্ট পুরুষবিশেষে এবং পরে পুরুষান্তরে অনুগামিনী হইত এবং পুত্র কন্যা কখনও পিতৃগৃহে গমন করিত না। দ্রাবিড়জাতির এই বিবাহ এবং উত্তরাধিকার প্রথা এখনও মলয় উপকূলে (Malabar coast) প্রচলিত আছে। যে জাতি ও যে আদর্শ স্ত্রীর প্রাধান্যে (Matriarchy) সমাজ গঠন করে তাহাদিগের মধ্যে সতীত্বের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। প্রাচীন দ্রাবিড়জাতি ব্যতীত বহুদেশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল এখন সে সব প্রথা লোপ পাইয়াছে।

সতীত্বের প্রকৃত অর্থ নারীর একপতিত্ব। বিবাহ বন্ধনের দৃঢ়ীকরণের একমাত্র উপায় পতিত্বের উচ্চ আদর্শ স্থাপন। বিবাহ বন্ধনের ব্যতিক্রম ঘটিলে মানবের গার্হস্থ্য জীবনে বিপ্লব ঘটিয়া থাকে, সে বিপ্লবের ফলে রক্তপাত ও নরহত্যা নিত্য ঘটনা। সমাজবদ্ধ মানবের জীবনে সতীত্ব-রূপ আদর্শের অনুশীলন, বিবাহের মর্য্যাদারক্ষা করিবার প্রধান উপায়। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা সতীত্বের যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন তাহা অতিউচ্চ এবং এরূপ উচ্চ আদর্শ অন্যদেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্যদেশের সতীত্ব আংশিক একপতিত্ব মাত্র, কারণ পতির অবর্ত্তমানে পত্যন্তর গ্রহণ যে দেশে নিষিদ্ধ নহে; সে দেশে সম্পূর্ণ সতীত্বের আদর্শ প্রতিপালন অসম্ভব। এই জন্যই সতীত্বের বিলাতী আদর্শের সহিত ভারতীয় সতীত্বের আদর্শের তুলনা হইতে পারে না, কারণ বিলাতী সতী ইচ্ছা করিলে বহুবার পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন সুতরাং বিলাতী সতীত্ব সময় বিশেষে, যৌন সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভাব মাত্র। ভারতবর্ষের সতী 'কায়েনমনসা বাচা' সতী কিন্তু দেশান্তরের সতী কেবল ক্ষণকালের জন্য একপতিত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্লীলতা, আদর্শের সহিত ওতপ্রোতরূপে জড়িত। অগম্যাবাদ। মানবেতর জীবসমাজে পুত্র মাতৃগমন করিয়া থাকে, ছাগ ও কুক্কুরদের মধ্যে ইহা নিত্য দেখিতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর বানর সমাজে, প্রাণীতত্ত্ব-বিদ্‌গণ মাতৃগমনের অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন সুতরাং মানবসমাজে কতদিন ধরিয়া অগম্যাবাদ প্রচলিত হইয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না। মানব সমাজের ইতিহাস যতদূর পাওয়া যায় তাহাতে সভ্য বা অসভ্য সমাজে মাতৃগমনের দৃষ্টান্ত বিরল। যে দেহ হইতে সন্তান উৎপন্ন সেই দেহের সহিত যৌনসম্পর্ক অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানব সমাজে নিন্দনীয়। পুত্রের সহিত মাতার রতিলালসা, পিতার সহিত কন্যার সঙ্গম সর্ব্বত্র নিন্দনীয়। প্রাচীন য়ীহুদী জাতির ইতিহাসে বংশরক্ষা করিবার জন্য পিতাকর্ত্তৃক কন্যার গর্ভোৎপাদনের কথা শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু কখনও কোন স্থানে ইচ্ছাকৃত পুত্র কর্ত্তৃক গর্ভ-ধারিণীর গর্ভোৎপাদনের কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। পিতৃমাতৃসম্পর্কের-উপরেই অগম্যাবাদ স্থাপিত, মাতার সমস্থানীয়া বলিয়া বিমাতা অগম্যা কিন্তু বিমাতৃগমন প্রাচীন পারস্য মিশর ও অন্যান্য দেশে প্রচলিত ছিল। সতীত্ব ও অগম্যাবাদ ব্যবহারের দোষে আদিরসাশ্রিত কাব্যে বীভৎস রসের সৃষ্টি করিয়া থাকে। নিপুণ কবির হস্তে আদিরস করুণ স্নিগ্ধ ও মধুর হইয়া উঠে, মার্জ্জিত-রুচি অথবা ক্ষমতার অভাবে আদিরসের নিবেদন বাঙ্গালীর নিকটে অশ্লীল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"যারে দেখ্‌তে নারি তার চলন বাঁকা"

মহাত্মা—নিজের কাজ কর—পরে কি কর্চ্ছে না কর্চ্ছে দেখবার কোন আবশ্যক নাই।

অপরিবর্ত্তন-প্রয়াসী—(দূরবীক্ষণ দ্বারা স্বরাজ্যদলের নৃত্যভঙ্গী দেখিতে দেখিতে) প্রভু, ওদের ঐ নাচাকোঁদা আর ঢলাঢলি আমি সইতে পারি না—কাজ কর্ব্বো কি—ওদের কথা মনে পড়লে—অহিংস-রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠে।

মহাত্মা গন্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সার সঙ্কলন

(প্রতি সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে)

সঙ্কলয়িতা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি,এস,সি

উত্তেজনার প্রয়োজন। জাতীয় আন্দোলনের জন্য যিনি ওকালতী ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং নানাবিধ স্বার্থত্যাগে জীবনকে ধন্য করিয়াছিলেন এমন একজন উকীল মর্ম্মপীড়নে ব্যথিত হইয়া মহাত্মাকে এক পত্র লিখেছেন—তাতে জানিয়েছেন যে তাঁর মন এত বেদনায় ভরে উঠেছে যে, তা না প্রকাশ করে তিনি ধৈর্য্য রাখতে পার্চ্ছেন না তাঁর কথা যদি কেউ না শুনে তাতে তাঁর ক্ষতি নাই, সেইজন্য তিনি তাঁহাকে অন্তরব্যথা নিবেদন করেছেন। মহাত্মা পাকা জহুরীর মত খাঁটী জিনিষের আদর জানেন, তিনি সেটীকে উত্তমরূপে আলোচনা করে তার শাঁসটুকু ইয়ংইণ্ডিয়ার পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। যে কটা কথা আলোচনার যোগ্য তাহা এই :—

লেখক বলেছেন "চরকা, হিন্দুমুসলমানে একতা, এবং অস্পৃশ্যতার পরিহার গত দুইবৎসরে সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ কর্ত্তে পারেনি কারণ কোন পরিবর্ত্তনের লক্ষণ তাদের জীবনের পরিলক্ষিত হয়নি। খাঁটী অহিংস-অসহযোগীদের মানব জীবনের যোগ্য কার্য্যতালিকা প্রস্তুত করা আবশ্যক। তাঁদের জানা উচিত যে সমস্ত ভারতে সাড়া পড়ে এমন একটা উত্তেজনা চাই—জনগণের মধ্যে উত্তেজনা চাই। সত্যাগ্রহই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর উত্তেজনা, তবে স্বদেশবাসীদের বিরুদ্ধে ইহা প্রযুক্ত না হয়ে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘোষিত হওয়া চাই, কারণ রাজতন্ত্রের সঙ্গে সত্যাগ্রহ সংগ্রামে দেশবাসীর আরও বেশী সহানুভূতি থাকে এবং স্বদেশবাসীর সঙ্গে সংগ্রামে, রাজতন্ত্র গুপ্তভাবে একপক্ষের অন্তরালে দাঁড়িয়ে সেই অন্যায়পক্ষকে সাহায্য করেন, সমস্ত জনসাধারণকে পরাস্ত কর্ত্তে। তাতে জাতীয় শক্তির অপচয় হয়, গভরমেণ্টের সুবিধা হয়; গভরমেণ্টের সঙ্গে সত্যাগ্রহ কর্ত্তে হলে নিম্নে উল্লিখিত তিনটী পন্থার মধ্যে যে কোন একটী অবলম্বন কর্লেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে।

(১) আদালত বর্জ্জন এবং গ্রাম পল্লী সহর প্রভৃতি স্থানে দলিলাদি রেজেষ্ট্রী জন্য সালিসী আদালত স্থাপন।

(২) রাজকীয় মুদ্রা ব্যবহার বর্জ্জন করে হুণ্ডী পদ্ধতির প্রচলন

(৩) সুরা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার বর্জ্জন।

মহাত্মা বলেন যে জাতীয় আন্দোলনের তিনটী আবশ্যকীয় বিষয় যথা চরকা, হিন্দুমুসলমানের একতা ও অস্পৃশ্যতাপরিহারকল্পে আমরা এখনও যথেষ্ট চেষ্টা করিতে পারি নাই যাহা হইয়াছে তাহা অতি সামান্য সুতরাং তার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যগুলিকে নিস্ফল বলা চলে না। জনসাধারণ বলিতে যাহাদের বুঝায় তাহাদের সম্বন্ধে সত্যই আমরা কতটুকু জানি? তাহাদের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় কর্ত্তে হলে সহর ত্যাগ করে—দূরে অতিদূরে জনকোলাহলশূন্য শান্ত পল্লীর ভিতর যাইতে হইবে। চরকা গ্রামের লোকেরা পছন্দই করে, তবে সেটা চালাবার একটা রীতিমত বন্দোবস্ত করা চাই—লেখক এখনও গণদেবতার স্বরূপ দেখ্‌তে পাননি, পেলে তিনি বুঝতেন যে সাধারণ হিন্দুমুসলমান পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে না। দিল্লী একটা

পল্লীগ্রাম নয়—আর তা ছাড়া সেখানে সাধারণ দরিদ্র লোকেরা কলহে যোগদান করেনি—ভ্রাতৃরক্তপাতে তারা উত্তেজিত হয়েছিল মাত্র নতুবা সাধারণ অবস্থায় তারা কলহ-প্রিয় নয়। অশিক্ষিত জনগণের মাঝে অস্পৃশ্যতাপরিহার-প্রচার অবশ্য কঠিন, কারণ তাদের পুরুষানুক্রমে উপভুক্ত সুখসুবিধা ও শ্রেণীভেদ, তাহাদের মজ্জাগত, সেটা তাদের মস্তিষ্ক থেকে বার করা বড় কঠিন কথা। যদি আমাদের শুচিতা, নিঃস্বার্থতা এবং ধৈর্য্য দ্বারা তাদের হৃদয় পরিবর্ত্তিত করে এ ব্যাধি আরোগ্য কর্ত্তে না পারি তবে সমস্ত জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। আমরা এ চেষ্টা কোন কারণেই বন্ধ কর্ত্তে পারি না, বা স্বরাজ না আসা পর্য্যন্ত স্থগিত রাখতে পারি না এই তিনটী জিনিসই স্বরাজ্যের প্রতীক, স্বরাজের মর্ম্মস্থল, স্বরাজের জীবন। এগুলি ত্যাগ করে স্বরাজের চেষ্টা যেমন হাস্যকর তেমনি অসম্ভব। যাঁদের মনে ধারণা আছে এসকল ছোট ছোট জিনিস স্বরাজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনাহতে এসে যাবে তাঁদের ধারণা ভ্রমাত্মক, শ্বাসরজ্জু উৎপাটন করে ফেলে দিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করবার মত অতি অসম্ভব। এই তিনটীই স্বরাজের পীঠস্থান—এর বেদীতেই স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হবে। অনেকে অধৈর্য্য হয়ে নিরাশ হয়ে পড়ছেন তাঁদের জানা উচিত একাজ কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।

পত্রপ্রেরক উত্তেজনার কথা বলেছেন—মহাত্মা বলেন উত্তেজনা জিনিসটী কিন্তু কি তা আমি আজও বুঝতে পারি নাই যে প্রকৃত কর্ম্মী তার উৎসাহই তার উত্তেজনা—সে তার কাজের মাঝেই উত্তেজনার আনন্দ শিরায় শিরায় অনুভব করে। এক রকম উত্তেজনা, সৃষ্টি করে আর একরকম উত্তেজনা, ধ্বংস করে—এই ধ্বংসকারী উত্তেজনা, ক্ষণিক আনন্দে আত্মহারা করে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য করে আত্মবিরোধ সৃষ্টি করে এ উত্তেজনা কখন স্বরাজ আনতে পারে না। যুদ্ধব্রতাবলম্বী জাতি যখন কাহারো নিকট হইতে ক্ষমতা বা অধিকার কেড়ে নিতে চায় তখন হয়তো এই কৃত্রিম উত্তেজনা কার্য্যকর হয়—কিন্তু ভারতের সমস্যা তত সহজ নয়—আমরা নিজেরা এখনো প্রস্তুত হইনি আর তা ছাড়া আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংগ্রাম কর্ত্তে যাচ্ছি না। ইংরাজেরাও কেবল অস্ত্রশক্তির দ্বারা রাজ্যশাসন করেন না, তাঁরাও রাজ্যরক্ষার জন্য প্রলোভনের ফাঁদ পাতেন। কোমল সুন্দর উজ্জ্বল আবরণের অভ্যন্তরে শাসকের বজ্রমুষ্টি গোপন করে রাখতে তাঁরা সুকৌশলী। যে মুহূর্ত্তে আমরা—সৎ অথচ অদমনীয় আকাঙ্ক্ষা, সম্পূর্ণ একতা, এবং সুশৃঙ্খল কার্য্যপন্থা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবো সেই মুহূর্ত্তে তারা বিনা-দ্বন্দ্বে, বিনাবাক্যব্যয়ে রাজ্যভার আমাদের দিয়ে—আমাদের আদেশ অনুযায়ী আমাদের কার্য্যে সহায়তা কর্ব্বেন যেমন আজ আমরা তাদের শৃঙ্খলা, শক্তি, ও যুক্তির সামনে ক্রীতদাসের মত নত হয়ে আজ আজ্ঞাপালন কর্চ্ছি।

সত্যাগ্রহ সংগঠনাত্মক উত্তেজনা—ধ্বংসবাদের সংস্পর্শে সত্যাগ্রহ ক্ষুণ্ণ হয়, হিংসার উত্তাপে শুষ্ক হয়, স্বার্থপরতার কালিমায় ইহা ম্লান হয় এতে সেই শান্তভাব, স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন যা অপরাজেয় এবং যা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে দমন করে রাখতে পারে। সত্যাগ্রহ যদি প্রকৃত এইরূপ হয় তবে তাহা স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইলেও অনিষ্টকর হয় না বরং জাতীয় জীবনের পক্ষে বলকারকের মত কার্য্য করে। স্বদেশবাসীর মধ্যে সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আমি দুইটী ঘটনার কথা শুনিয়াছি একটী ভাইকমে অপরটী তারকেশ্বরে। ভাইকমের সত্যাগ্রহে অনেকে আমায় পরিচালক ভাবেন—কিন্তু এই সত্যাগ্রহীরা যদি ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারেন তবে তাঁরা সফলকাম হবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনে ঐক্য আনয়ন করে তাকে শক্তিশালী কর্ব্বেন তখন এই গোঁড়া হিন্দুরাই হয়ত আবার তাদের আশীর্ব্বাদ করবেন।

পত্রপ্রেরক সত্যাগ্রহসম্বন্ধে ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে উত্তেজনার আবশ্যক ভেবেছেন। কারন যদি সালিশী আদালতে দলীল রেজেষ্ট্রীপ্রথা জোর করে চালাতে হয় তবে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। আর আপোষে যদি সব নিষ্পত্তি হয় তবে দলীলাদি রেজেষ্ট্রী কর্ব্বার কোন আবশ্যকতাই থাকবে না। সরকারী মুদ্রাবর্জ্জনেও কোন উত্তেজনা থাকতে পারে না তবে মদ্যপান ও মাদকদ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাবার ইচ্ছা মহাত্মার আছে যদি তিনি চতুর্দ্দিকে তেমন শান্তভাবের অস্তিত্ব দেখেন। ১৯২১ সালের পিকেটিংয়ের কথা মনে হওয়ায়

তিনি এ কাজে আর হাত দিতে পার্চ্ছেন না কারণ সেটা ঠিক শান্তভাবের বা অহিংস ভাবের ছিল না।

প্রকৃত উত্তর আসে অন্তর থেকে। আমরা মনেকরি জনগণ আন্দোলনে বিশ্বাস হারিয়েছে তা নয় আমরাই সেটা হারিয়েছি—এক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি জানিয়েছেন যে তাঁর কাছে প্রত্যহ অজস্র পদত্যাগ-পত্র আসছে কারণ বর্ত্তমান কার্য্যতালিকায় ঐ সকল সভ্যদের আস্থা নাই। এতে দুঃখিত হবার কিছু নাই বরং এটা শুভলক্ষণ; কারণ এথেকে মনেকরা যেতে পারে যে এত দিন তাঁরা জাতির শুভাশুভ নিয়ে খেলাকর্চ্ছিলেন এখন সেটাকে কঠিন কর্ত্তব্য—যা তাঁরা সম্পন্ন কর্ত্তে অক্ষম, তাই জেনে পদত্যাগ কর্চ্ছেন। মহাত্মা বলেন যে এতে সাধারণে নিজেদের মনোমত কার্য্যক্রম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত কর্ত্তে পারবে এবং হয়ত এরফলে মাত্র ঐ সভাপতিটী ছাড়া আর কোন লোকই পাওয়া যাবে না কিন্তু তাতেও দুঃখ নেই যদি ঐ একটী লোকেরই কার্য্যতালিকায় আস্থা থাকে এবং তিনি ঐকান্তিকতার সহিত কাজ করেন এবং সমস্ত সময়ও চেষ্টা সুতাবুনিতে নিয়োগ করেন। কর্ম্মে অনুরাগই হচ্ছে সাফল্যের একমাত্র পন্থা। একহাজার বাজে লোকের চেয়ে তিনি একটা কাজের লোকের মূল্য অনেক বেশী মনে করেন।

বোধন

শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়

(১)

আজকে ও কি হৃদয় তোদের
একটুখানি টল্‌বে না?
পাষাণ বুকের ব্যথা কিরে
অশ্রু হয়ে গল্‌বে না?
আজকে তোরও নয়ন দুটি,
উঠ্‌বে নাকো আজও ফুটি,—
আঁধার ঘেরা চিত্ত মাঝে
দীপ কি আজো জল্‌বে না?

(২)

বিশ্ব আজি মত্ত হের
বিপুল মহোৎসবে,—
ঘরের কোণে, লাজহারা, তুই,
রইবি একাই তবে?
রাজবেশে সব চলছে যেথা
একটুকু ঠাঁই পেতে সেথা
অবশ তোর ও চরণ দুটি
একটু ফিরে চল্‌বে না?

কাজের কথা

স্বাগতম্—স্বরাজ্যদলের নেতৃবৃন্দের শুভপদার্পণে বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মিঃ জয়াকর, শেরওয়ানী, আসফআলী মিঃ পানিকার ও পাঠক প্রভৃতি সমগ্র ভারতের নেতাদের আজ আমার সানন্দে অভিনন্দিত করিতেছি কারণ আমরা কোন দলের নহি—দেশহিতকরকার্য্যে যিনি ব্রতী তিনিই আমাদের পূজনীয় এবং সম্মানযোগ্য। আমাদের সকলের লক্ষ্য যদি সত্যই দেশের মঙ্গলকামনা হয়, তো কার্য্যপন্থা লইয়া বিবাদ বিসম্বাদের কোন প্রয়োজন নাই—যে যার পথে চলুক, গন্তব্য স্থানে এক শুভপ্রভাতে নবরবির কিরণোদ্ভাসিত আলোকে আবার আমরা স্বরাজ্যের পতাকাতলে একত্রিত হইব।

চন্দ্রগ্রহণে স্বেচ্ছাসেবকগণের জনসেবা—স্বদেশপ্রাণ বঙ্গযুবকগণের এই অপূর্ব্ব নিঃস্বার্থ দেশপ্রীতির নিদর্শনে কোন বাঙ্গালীর বুক না আনন্দে ফুলিয়া উঠে। এবারে যদিও অধিকরাত্রিতে স্নানদান ব্যাপার হওয়ায় মহিলা যাত্রীর সংখ্যা আশানুরূপ হয় নাই তথাপি বন্দোবস্ত অতীব সুন্দর হইয়াছিল। এরূপ সেবাব্রত এক বাংলায়ই সম্ভব এবং বাঙ্গালীই করিতে পারে। এরূপ ব্যবস্থার কথা জানিয়াও এক লম্পট নারীবেশে জনৈক মহিলার অনুসরণ করিতে সাহস করিয়াছিল, এক পাপিষ্ঠ পকেট কাটিতে আসিয়াছিল। দুস্কৃতকারীরা ধরা পড়িয়া পুলিশের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। এদের জানা উচিত, বাংলা এখন নিদ্রিত নাই, জাগ্রত বাংলার সদাসতর্ক চক্ষু উন্মুক্ত রয়েছে আর এখানে পশুপ্রকৃতি লোকেদের সুবিধা হইবে না। অবাঙালীর অত্যাচারে বাঙলা দিন দিন বিব্রত—এতদিনে এই অসহ্য ঔদ্ধত্যের প্রতিবিধান হওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের আলোকের সুব্যবস্থা প্রভৃতির কথাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—ইহা নবীন কর্ত্তাদের দেশবাসীর সহিত গাঢ় সহানুভূতির পরিচায়ক। পুলিশ, পোর্ট পুলিশের ব্যবস্থা ও নিন্দার অতীত ছিল এই সহানুভূতিতেই কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাধারণের হৃদ্যতা জন্মে।

অদ্ভুত বিচার

গত সপ্তাহের হিতবাদীতে হাইকোর্টের এক অদ্ভুত বিচার ফল প্রকাশিত হয়েছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

সম্প্রতি হাইকোর্টে হিন্দুসমাজ বিধান সংক্রান্ত একটী মোকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী গৌরীবালা দেবী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের বিবাহিতা পত্নী। কিন্তু স্বামীর সহিত পত্নীর মনোমালিন্য ঘটায় পত্নী গত ২০ বৎসর স্বামীর নিকটে বাস না করিয়া স্বতন্ত্রস্থানে বাস করিয়া আসিতেছেন। শ্রীমতী গৌরীবালা ভিন্ন স্থানে বাস করিলে এবং স্বামীর সহিত কোনও সম্বন্ধ না রাখিলেও তিনি স্বামীর নিকট হইতে খোরপোষবাবদ নিয়মিত ভাবে মাসহারা পাইয়া আসিতেছেন। গত ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীমতী একটী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, স্বামীর ঔরসে এই সন্তানটীর জন্ম হয় নাই। সন্তানটীর জন্ম হইবার পরেই স্বামী স্ত্রীর মাসহারা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই মাসহারা পাইবার জন্যই হাইকোর্টে মাননীয় প্রধান বিচারপতির ও মাননীয় জজ মিঃ চোজনারের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়। গত ৮ই আগষ্ট শুক্রবারে এই মামলার রায় বাহির হইয়াছে। জজেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, একটী মাত্র জারজ সন্তানের জন্ম হইতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে—পত্নী ব্যাভিচারিণী। অতএব মাননীয় বিচারপতিগণের বিচারে জারজ সন্তানের জননীর মাসহারা বহাল রহিল।

এ সম্বন্ধে যে কি বলা যায় আর কি বলা না যায়, তাহা

স্থির করা কঠিন। যদি হিন্দু আইন অনুসারে এই বিচার হইয়া থাকে তবে সে আইন পরিবর্তন করা এখনি আবশ্যক নতুবা সে আইন সমগ্র দেশ কর্তৃক উল্লজ্ঘিত হইবে। কি হিন্দু কি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী কোন সমাজই ব্যভিচারের এরূপ প্রশ্রয় দিতে পারে না। আইনের প্রণেতার নামটী জানিবার বড় কৌতুহল হচ্ছে। আর বিচারকেরা যদি বিলাতী আচার ব্যবহারের কথা স্মরণ করে এরূপ বিচার করে থাকেন তবে সেটা ভাল করেন নি, কারণ লর্ডলিটনের মতে এদেশের নারী সমাজ হীন হলেও, এদেশের লোকেরা এখনও বিলাতী-নারীমর্য্যাদার চেয়ে এদেশের মর্য্যাদাকেই বেশী সম্মান দেয়।

নারীর প্রতিহিংসা—আমেরিকা হইতে নারীর প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির সম্বন্ধে একটা ভীষণ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একজন স্ত্রীলোকের স্বামী অন্য একটী অবিবাহিতা যুবতীর প্রতি কিঞ্চিৎ বেশী পরিমাণে মনোযোগ দিত। একদিন যুবতীটী একটী নির্জ্জন রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ মোটর গাড়ীতে করিয়া বিবাহিতা রমণীটী কয়েকজন পুরুষবন্ধুসহ আসিয়া উপস্থিত হয়। পুরুষবন্ধুরা অসহায়া যুবতীটিকে পোষাক ছিঁড়িয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ করিয়া ফেলে এবং বিবাহিতা রমণী তখন তপ্ত আল্‌কাতরা দিয়া কুমারীর সর্ব্বাঙ্গ লেপিয়া দেয় এবং তাহার উপর পাখীর পালক লাগাইয়া দেয়। যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে উলঙ্গ রমণী বনভূমির দিকে দৌড়াইতে থাকে। তখন গ্রামবাসীরা আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করে। সভ্যদেশের শিক্ষিতানারীর রুচি ও প্রবৃত্তি দেখিয়া সভ্যতার ধিক্কার দিতে ইচ্ছাহয় এবং মনে হয় আমরা যেন চিরদিন অসভ্যই থাকি।

শান্তিরক্ষার বিচিত্র উপায়—অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত মোহনলালগঞ্জের সবডিভিসনের অফিসার মিঃ ম্যামমুন হাসান এক ইস্তাহার জারী করিয়া মুন্না হালওয়াই ও জানকীপ্রসাদকে তাহাদের ঠাকুরবাড়ীর (দেবমন্দির) ২রা আগষ্ট হইতে ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কারণ উক্ত দেবমন্দির দুইটী মুসলমান পল্লীতে ও মসজিদের সন্নিকটে স্থাপিত। মহরমের সময় হিন্দুগণ পূজা করিতে আসিলে মুসলমানগণের সহিত দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতে পারে, সেইজন্য ত্রয়োদশ দিবস পূজা বন্ধ রাখিবার আদেশ হইয়াছে। স্থানীয় হিন্দুগণ এই আদেশের প্রতিবাদ করিয়া বিগত ৯ই তারিখে সত্যাগ্রহ করিয়া সেই মন্দিরে পূজা করিবার নিমিত্ত চারিজন পূজককে প্রেরণ করিয়াছেন। এই চারিজন সত্যাগ্রহীর মধ্যে, দুইজন কাউন্সিলের, সদস্য আছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের উদ্দেশ্য হয়তো ভালই ছিল কিন্তু তাঁহার নাম শুনিয়া বোধ হয় তিনিও একজন মুসলমান সুতরাং তাঁহার এই আদেশে স্বভাবতঃই পক্ষপাতিত্বের ছায়া পড়ে, তিনি যদি মিটমাটের উদ্দেশ্যে, আপোষে ইহা নিষ্পত্তি করিতেন তো বড়ই ভাল হইত। ইহার প্রতিবাদ করিলে হয় তো মুসলমান ভ্রাতাগণ আমাদিগকে স্বার্থপর ভাবিবেন কিন্তু এরূপ সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব কোন কারণেই অনুমোদন করা যায় না। সমস্ত হিন্দু সমাজ তাহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ জন্য ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিবে।

বিষের বাঁশী—একনিষ্ঠ দেশসেবক, হিন্দুমুসলমান প্রীতির জীবন্ত নিদর্শন বঙ্গের বিদ্রোহীকবি কাজীনজরুল ইসলাম এই নামে একখানি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। জেল হইতে মুক্ত হইবার পর অনেকদিন কাজীসাহেবের কবিতা পাঠের সুখভোগে আমরা বঞ্চিত ছিলাম—সম্প্রতি দুএকখানি কাগজে তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়াছি। তাঁহার এ বাঁশী কেবল রুদ্রের ভৈরব হুঙ্কার নয়, এতে নবীন প্রেমের কোমল মাধুর্য্যের ও বিকাশ আছে। আগামী সংখ্যায় যদি সম্ভব হয় আমরা পুস্তক খানির সমালোচনা করিব।

অর্দ্ধেন্দু নাট্যপাঠাগার—বাংলার অদ্বিতীয় অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখরের স্মৃতি নাট্যমোদীর বুকে জড়াইয়া আছে জানি, কিন্তু নাট্যশালা সৃজনে তাঁর অসাধারণনৈপুণ্যের স্মৃতিচিহ্ন জীবন্ত রাখিবার চেষ্টা কাহারও দেখিনা। নাট্যশালার অধিকারীগণ তাঁহাদের উপজীবিকার পথপ্রদর্শককে বিস্মৃত হইতে পারেন কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালীজাতির নীরব নিশ্চেষ্টতা কি তাহাদের অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক নয়? আমাদের 'নলিনীদা' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত) কিন্তু নিজের প্রাণপণ শক্তিতে এই অভিনেতাকে বিস্মৃত হইবার পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। নিঃসম্পর্কীয় দরিদ্র ব্রাহ্মণের এই প্রচেষ্টার মূল্য আজ নির্দ্ধারিত না হইতে পারে কিন্তু কালে তাহা অমূল্য হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অর্দ্ধেন্দু নাট্যপাঠাগার আজ জাতির সহানুভূতি বঞ্চিত এবং মাত্র তাঁহারই উদ্যমে কোনরূপে অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে কিন্তু কালে ইহা অভিনেতা ও নাট্যশিল্পামোদীর পুণ্যতীর্থে পরিণত হইবে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত "অর্দ্ধেন্দু-স্মৃতি-উৎসবে" সকলে যোগদান করিয়া ও সহানুভূতি দেখাইয়া জাতীয় কলঙ্ক মোচন করিবেন ইহা আশাকরা বোধহয় অন্যায় হইবে না।
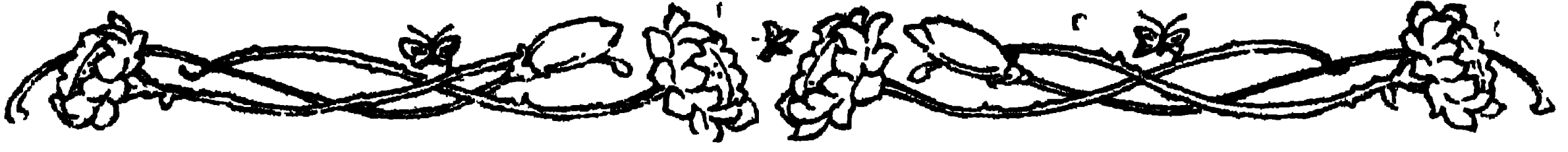
সাহিত্য সমালোচনা

সীতা—নাটক শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। মনোমোহনে এই নাটকখানি মহাসমারোহে ও অপূর্ব্ব সাফল্যের সহিত অভিনীত হইতেছে। অভিনয় দর্শনে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অভিনেতার প্রতিভা-বিকাশ—গ্রন্থপাঠে নাট্যকারের পরিচয় পাওয়া যায়। সেইজন্য অভিনয় ও নাটক একসঙ্গে সমালোচনা করিলে হয় নটকে অযথা প্রশংসা দিতে হয় নয় নাট্যকারকে তাঁহার প্রাপ্য প্রশংসার অধিক ভাগ দিতে হয়। নাটকখানিকে আমরা উচ্চাঙ্গের বলিতে পারিলাম না ইহার ভাব, ভাষা, ছন্দ, দৃশ্যসংযোজন, ঘাতপ্রতিঘাত কোথাও একটু বৈচিত্র্য পাইলাম না—তবে নাট্যকার নবীন এপথের নূতন পথিক এবং বোধহয় বাইরের প্রয়োজনেই নাটক লিখ্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন এবং নাটকখানি অভিনয় করাইবার সুযোগও পেয়েছিলেন তাই যেন নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্বেই ইহা লিখিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন যে "আমার অন্তরের কোনও প্রেরণারদ্বারা অণুপ্রাণিত হয়ে আমি এ নাটক লিখ্‌তে অগ্রসর হইনি"—কথাটা অতি সত্য এবং এই সত্যস্বীকারে যথেষ্ট মহত্ব আছে। তার পর লিখেছেন "লিখ্‌তে আরম্ভকরে আমি 'রামসীতার বিরহের নির্ঝরিণী ধারা' আমার প্রাণের ভিতর অনুভব করেছি এবং বাইরে তার রূপ ফুটিয়ে তোলবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছি, কৃতকার্য্য হয়েছি কি না জানি না।" হয়ত নবীন নাট্যকার প্রাণে সত্যই সীতার বিরহের ব্যথা অনুভব করেছেন এবং তা ফোটাবার চেষ্টাও করেছেন কিন্তু তাঁর নাটক পড়ে পাঠকেরা সেটী কিছুতেই বুঝতে পারেন না—সেটা তাঁর ক্ষমতার অল্পতাহেতু। বাল্মিকীর রামচরিত্র ত্যাগকরে তিনি রামচরিত্র নূতন করে গঠন করেছেন—এতে কতকটা ভবভূতি কোমলহৃদয় স্ত্রীস্বভাব রাম আছে—আর আছে দ্বিজেন্দ্রলালের 'মানুষ-রাম' বাল্মিকীর রাম 'রাজা—রাম' সে রামের চক্ষে বংশমর্য্যাদাই বড়, রাজার কর্ত্তব্যই বড়—সে নিজের সুখদুঃখের চেয়ে কর্ত্তব্য এবং বংশমর্য্যাদাকে বড় দেখে আর রাজা যদি সাধারণ মানুষের মত শোকদুঃখে বিহ্বল হয়ে ভেঙ্গে পড়ে তবে সে তো অতি সাধারণ মানুষ, রাজার রাজকীয়লক্ষণ তাতে থাকে কি?সাধারণ মানুষে রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ থাকে না—খালি হৃদয় নিয়ে রাজত্ব চলেনা ; রাজাকে অনেক প্রিয় কার্য্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ত্তে হয়—সেকালেও হতো এখনও হয়। যে যত বড় হয় তার দায়িত্ব তত বেশী সুতরাং বাল্মিকীর চরিত্রকে পুনর্গঠিত কর্ত্তে গিয়ে গ্রন্থকার ভাল করেন নি। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রামকে মানুষ করেছিলেন তার কারণ, তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে বাল্মিকী রামের প্রতি সুবিচার করেন নি—এবং তাঁর নিজের মতকে দাঁড় করাবার মত তাঁর কলমের জোর ছিল সুতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থকার তাঁর প্রভাব অতিক্রম কর্ব্বার চেষ্টা করিয়াও নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁর পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মত জোরে মত প্রকাশ কর্ব্বার উপযুক্ত ভাষা বা চরিত্র সৃষ্টি তাঁর ক্ষমতার বাইরে। প্রথম অঙ্কে তিনি ভবভূতির কাছেই সম্পূর্ণরূপে ঋণী। তারপর তিনি আধুনিক দিনের আবহাওয়াকে রামায়ণের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে গিয়াছেন—শূদ্রককে এত বড় করে তুলেছেন যে তার দণ্ডদাতা রামকে একটা গুপ্তঘাতকের মত দেখায়। বাল্মিকীর রাম ধর্ম্মদ্রোহী শূদ্রককে হত্যা করেন—যোগেশবাবুর বেচারা রাম শূদ্রকের মুখ থেকে আজ কালের অনুন্নতের উন্নতীকরণ সম্বন্ধে দীর্ঘ লেক্‌চার শুনে একেবারে এমন হতভম্ব হয়ে গেলেন যে বিনা উত্তেজনায় কলের পুতুলের মত তাকে অনিচ্ছাসত্বে হত্যা করে রাজধর্ম্ম পালন কর্ল্লেন। তখনকার দিনে শূদ্রদের কিরূপ শিক্ষা, ধর্ম্মজ্ঞান, বা আচার ব্যবহার ছিল তার সম্পূর্ণ প্রমাণ নেই, সুতরাং এখনকার দিনের শূদ্রদের দেখে তারা যে তখন অন্যায় ভাবে উৎপীড়িত হত একথা জোর গলায় বলা চলে না—তারা হয়ত তখন এমন আচরণ কর্ত্তো যাতে তাদের দমনে না রাখলে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা থাকতো না, সুতরাং এসব ব্যাপারে ভালমন্দ বিচার-করা আধুনিক সভ্যতার চশমা পরে ঠিক করা যায় না। প্রত্যেক জিনিষই সেই সময়ের দেশকাল পাত্র ও পারি-পার্শ্বিক অবস্থানুসারে বিচার্য্য। সুতরাং আমাদের মতে

এবিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের অনুসরণ করা গ্রন্থকারের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। হিন্দুমাত্রেই আদর্শ রাজা হিসাবে রামচন্দ্রকে জানে, এইজন্যই কথায় বলে 'রামরাজত্ব'—আদর্শ মানব হিসাবে রামের খ্যাতি নয় তারপর আজকাল জাতিভেদ তুলে দেবার ও ব্রাহ্মণকে স্বার্থপর বলে প্রতিপন্ন কর্ব্বার জন্য যে চেষ্টা চলছে তাহাও এই নাটকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা হয়েছে ; কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের যুগের চিত্রে এই প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। রঘুকুলের কুলপুরোহিতকে রামচন্দ্র যে ভাবে মধ্যে মধ্যে সম্ভাষণ করেছেন তাতে তাঁকে সম্মান দেখান তো হয়ই নি অধিকন্তু তাহা, আধুনিক যুগের কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকের মুখেও কায়ক্লেশে মানাতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলাল ও বশিষ্ঠকে এত খাটো করেন নি তারপর সীতা চরিত্র—সীতার অনুপম চরিত্রের পূর্ণমর্য্যাদা গ্রন্থকার কোথাও রক্ষা করিতে পারেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল সীতাদেবীর প্রতি অসীম ভক্তি ও কারুণ্য অনুভব করিয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিবার অভিপ্রায়ে বশিষ্ঠ এমনকি রামকে পর্য্যন্ত খাটো করিয়া ছিলেন কিন্তু বর্ত্তমান নাটকে সীতার চরিত্র মাহাত্ম্যও বিকশিত হয় নাই। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে লবকুশকে রাঘবের সহিত রণে আদেশ দিবার সময় সীতা রামের উদ্দেশে পথ দেখাইয়া দিবার আবেদন করিয়াছেন কিন্তু পরক্ষণেই যেন সমস্যার কোন সমাধান না পাইয়া "যা হবার হবে ক্ষত্রিয় রমণী আমি তনয়ের ক্ষত্রোচিত গৌরব ইচ্ছায় বাধাদান কভু না করিব।" বলিয়াছেন এতে সীতার প্রধান গুণ পতিভক্তি জিনিষটার বিকাশ মোটেই হয় নাই—অবশ্য সীতাকে গ্রন্থকার যদি আধুনিক বিদ্রোহিনী নারীর মত 'dont-care' ভাবে চিত্রিত করিতেন তাহা হইলে বলিবার কথা কিছু ছিলনা—কিন্তু যে সীতা রামের নির্ব্বাসন দণ্ড স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছিলেন সে কি এই সীতা? ইহাতে সীতা চরিত্রের সামঞ্জস্য আদৌ রক্ষিত হয় নাই—আবার তাঁহাকে কিছু পূর্ব্বেই রাজসূয় যজ্ঞবার্ত্তা শুনিয়া "নব পরিণীতা পত্নী রাঘবের কথাও" বলিতে শুনিয়াছি এটা যদি সেই কাল্পনিক সপত্নীবিদ্বেষের পরিবর্ত্তে বেচারা রামচন্দ্রকে খাটো করিবার উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে তাহলে আবালবৃদ্ধবনিতার চিরবন্দিতা সীতা যে তিনি নন তাহা বেশ জোর করে বলা যায়। কিন্তু কবি দ্বিজেন্দ্রলাল কি অপূর্ব্ব কৌশলে এই যুদ্ধ সংঘটনটী দৈবদুর্ঘটনার মত করিয়া আঁকিয়াছেন তাহা বর্ণনারও অতীত। গ্রন্থকার এই সর্ব্বোত্তম অংশেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অতিক্রম কর্ত্তে পেরেছেন যার জন্য তাঁর নায়িকার চরিত্র তিনি অতি হীন করে ফেলেছেন।

তারপর পাতাল প্রবেশের দৃশ্যেও কবি সীতাকে সীতার মত সহিষ্ণু রাখিতে পারেন নাই—বশিষ্ট শপথ করিতে বলায় সীতা মুখ তুলিয়া বলিলেন "আবার শপথ"—শপথের কথা শুনিয়া, বাল্মিকী, লব, রামচন্দ্র তাহাতে আপত্তি করিতে তিনি সকলকে শান্ত ও সংযত করিয়া তারপর হঠাৎ না জানি কেন, মা ধরিত্রীর কোলে যাইবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন এতে চরিত্রটী বড় নীচু হয়ে পড়েছে। এই দৃশ্যে গ্রন্থকার অভিনয়কৌশল ব্যক্তকালীন লিখিয়াছেন "কৌশল্যা অন্তরীক্ষ হইতে ছুটিয়া আসিয়া লবকুশকে কোলে লইলেন।" কৌশল্যা যে অন্তরীক্ষে বাস করিতেন তাহা আমরা জানিতাম না—শিশির বাবু কিন্তু রাজসভায় তাঁহাকে উপস্থিত রাখিয়াছিলেন। সীতা নাটকের কবির যদি অন্তরীক্ষ শব্দের অর্থজ্ঞান না থাকে তবে তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের শোচনীয় অবস্থাই জানাইয়া দেয়। ছন্দের কথা নিষ্প্রয়োজন কারণ নাট্যকার ছন্দে সঙ্গতি রাখিতে পারেন নাই—গৈরিশী অমৃতাক্ষরে রচিত হইলেও দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্টতা তাঁহার সহিত মিশাইতে গিয়া ছন্দ অধিকাংশ স্থলে শ্রুতিকটু হইয়াছে স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের ছাপও যথেষ্ট বুঝা যায়। ইহাতে গৈরিশী ছন্দের কোমল ঝঙ্কার নাই—দ্বিজেন্দ্রলালের সে দীপ্ত ভাব নাই রবীন্দ্রনাথের সে অন্তরস্পর্শী মাধুর্য্য নাই—এ, ছন্দের অপূর্ব্ব জগাখিচুড়ী। কোন প্রয়োজনেই এরূপ নাটকের সমর্থন করা যায় না—গ্রন্থকার প্রথমেই রাম সীতার কাহিনীতে হস্তক্ষেপ না করিলেই ভাল করিতেন। সমগ্র ভারতবন্দিত চরিত্র চিত্রণে নিপুণ শিল্পীর আবশ্যক। গ্রন্থকার অবশ্য নবীন সুতরাং আমাদের অনুরোধ ভবিষ্যত তিনি অন্যান্য সহজ বিষয় লইয়া আলোচনা করিবেন ও কালে পরিপক্কতা লাভ করিলে তখন এইরূপ দুরূহ কার্য্যে যেন আত্মনিয়োগ করেন। পুস্তকখানি অভিনয়ে অবশ্য অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে তাহার কারণ অভিনেতা ও শিল্পীর অসাধারণ ক্ষমতা। শিশির বাবু ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষমতায় গ্রন্থকারের রামচরিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব আর শিশির বাবুর অভিনয়ের সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে দৃশ্যপটের অলৌকিক পরিকল্পনা। সর্ব্ব রকমে এমন একটা অতীত যুগের স্বপ্নজাল রচনা করা, শিল্পী চারুচন্দ্রেই সম্ভবে। কোথাও একটু খুঁত নাই—বেশভূষা দৃশ্যপট ঠিক যেন দর্শকের চিত্তে সহস্র সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের স্বপ্নালোকে লইয়া যায়—এমন Oriental atmosphere এমন বেশভূষা ও দৃশ্যপটের Harmony বাংলার রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম দেখিলাম। চারুচন্দ্রের ঐন্দ্রজালিক তুলিকা বাণী-মন্দিরের আশীর্ব্বাদে পুত হউক। মোট কথা অভিনয় কৌশল ও দৃশ্যপটাদির সমন্বয় ব্যতীত এ নাটক এক রাত্রি অভিনীত হইবারও অযোগ্য।

স্বরাজসেব্রী—তিন অঙ্কে সমাপ্ত নাটক, ভিক্ষু অকিঞ্চন প্রণীত। অকিঞ্চন মহাশয়ের সাহিত্যক্ষেত্রে সুনাম আছে এবং তাহার লেখার ক্ষমতাও আছে। নাটকখানি বর্ত্তমান বাঙলার রাজনৈতিক আন্দোলনের একাংশের চিত্র। সর্ব্বত্র গ্রন্থকার মহাশয়ের সহিত একমত না হইলেও আমরা তাঁহার ভাষা, রচনাভঙ্গীরও ঘটনার ক্রমবিকাশের প্রশংসা করি। আধুনিক নারীদের সম্বন্ধে তিনি যে অতি প্রকৃত চিত্র দেখিয়েছেন তা অতি সত্য।

রূপোপজীবিনী—ছোট গল্পের বই, শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত ১২৪ পৃঃ মূল্য ১৲ সাতটী ছোট গল্প লইয়া এই ছোট গল্পের বইটী সম্পূর্ণ। ইহার মধ্যে ছয়টী পূর্ব্বে প্রবাসী, বাসন্তী ও আনন্দবাজারে প্রকাশিত হইয়াছিল। রূপোপজীবিনী নামক শেষ গল্পটীই নূতন রচিত। গল্পগুলি আজ কালের মাথামুণ্ডহীন ধোঁয়াভরা ছোট গল্প নয়, যাতে কেবল ধোঁয়াটে ভাব আর ঝঙ্কারময়ী ভাষা ছাড়া আর কিছু নেই—যা পড়লে মনে থাকে না—হৃদয়ে একটা দাগও পড়ে না। প্রত্যেক গল্পটিই এক একটা উদ্দেশ্য লইয়া রচিত, অল্পের মধ্যে চরিত্রবিকাশও ভাল হইয়াছে। আমরা নবীন গ্রন্থকারকে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিলে পরমানন্দ লাভ করিব।

সমালোচনার সমালোচনা

সখী বৈকালী এক সুপকার (বোধহয় সম্প্রতি বেকার) ধরে এনে সাহিত্য-মন্দিরে পাঁচফোড়ন ছড়াচ্ছেন। সুপকারদের কার্য্যক্ষেত্র হচ্ছে রান্নাঘর, তাঁদের আয়ুধ হচ্ছে হাতা-বেড়ী-খুন্তী—হাতা-বেড়ী দিয়ে সাহিত্য চর্চ্চা পূর্ব্বে চল্‌তো না—এখন তাও চলতি হচ্ছে কারণ আজকাল সাহিত্যে লাঠি পর্য্যন্ত চলিত হয়ে গেছে।

এই অসাধারণ প্রতিভান্বিত সুপকার মহাশয় সমস্ত কাগজেরই উদ্দেশ্য বা মিশন জেনে ফেলেছেন কেবল জান্‌তে পারেন নি তার মিশন, যে তাকে এতদূর প্রশ্রয় দিয়েছে—সুপকার মহাশয় বোধহয় জ্যোতিষেও সুপণ্ডিত নতুবা এ টন্‌টনে জ্ঞান পাবেন কোথা থেকে? চালুনী নিজের ছিদ্র দেখিতে পায়না কিন্তু সুচকে তাহার ছিদ্র দেখাইয়া দেয় এটা চিরকালের চলিত প্রথা। সুপকার মশাইকে তাঁর অবগতির জন্য লিখছি যে সকল কাগজের মিশনই খারাপ, কেবল তাঁর সখীর ষ্টার থিয়েটারের ঢাক পিটান মিশনটীই সর্ব্বোত্তম। কারণ এ কাজটা হাতের ও গলার জোরেই সম্পন্ন হয় এত মত নিয়ে ও পথ নিয়ে কোন গোল নাই, কলা বিদ্যার বিন্দুমাত্র জ্ঞানেরও আবশ্যক নাই।

চতুর্থ সপ্তাহে আমরা পথে হাটে ফ্রেঞ্চকার্ড বিক্রয়ের প্রথা দমনের জন্য লেখাতে, সুপকার মহাশয় আমাদের গল্প নামক আখ্যানচিত্রটীকে ফ্রেঞ্চকার্ডের অনুকরণ ঠাউরেছেন—তাঁর বোঝা উচিত যে সরিষার তৈল নাড়াচাড়া করিয়া যাহাকে জীবিকার্জ্জন করিতে হয় রুচি বা কলার সূক্ষ্মসৌন্দর্য্য অনুভব করিবার মত রসজ্ঞান তাহার থাকে না। নটনটীদের মনোরঞ্জন করা ও সাহিত্যসেবীকে মধুর রস দান করা এক পদার্থ নহে। তিনি তাঁহার 'মিশনে' কৃতকার্য্য হউন এই আমাদের প্রার্থনা। তবে অনধিকার চর্চ্চা সকল সময় শোভন নহে, কথায় বলে "যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্যের মাথায় লাঠী বাজে।"

'সীতা'—গত সপ্তাহে কয়েকখানি কাগজে সীতা অভিনয়ের বিরুদ্ধে কয়েকটী টিপ্পনী দেখিয়া ভাবিলাম আমরা প্রথম রজনীতে এগুলি হয়তো লক্ষ্য করি নাই তজ্জন্য সন্দেহ ভঞ্জনার্থ গত শনিবার পুনরায় সীতা অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা চর্ম্মচক্ষে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ঈর্ষ্যাবিদ্বিষ্ট দিব্যনেত্রে যা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সাধারণের নয়নগোচর হয় না। মনোমোহন নাট্যমন্দিরে Set Scene বা সাজান দৃশ্যের প্রবর্ত্তন করাতে—অন্যান্য থিয়েটারেরা নিজেদের অক্ষমতা স্মরণ করে এই চেষ্টাকে খাটো কর্‌বার জন্য তাঁদের অনুগতদের দ্বারা লিখেছেন যে Set Scene-এর ব্যবধান সময় বড় বেশী হয়েছে তাতে সকলে যে হাঁফিয়ে উঠেছেন এমন বোধহয় না; তবে নূতন জিনিস প্রবর্ত্তন করিতে হইলে প্রথম প্রথম একটু আধটু গোলযোগ

হওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু শীঘ্রই ঐ ব্যবধান হ্রাস হইতে পারে।

ফুটলাইট না থাকায় কেহ কেহ রুষ্ট হয়েছেন কিন্তু আলোকের মাধুর্য্য অনেক রক্ষিত হয়েছে ফুটলাইট তুলে দিয়ে। Painting সম্বন্ধে অনুযোগ একেবারে ভিত্তিহীন—ভরতের মুখে চকোলেট রং আমরা পোড়া চক্ষে দেখিতে পাই নাই লেখকমহাশয় স্বপ্ন দেখেন নাই ত? রাম লক্ষ্মণের হস্ত ধারণপূর্ব্বক সম্বর্দ্ধনা করেছিলেন সেটা ইংরাজী স্থাণ্ডসেকের নকল নয় সেটা সম্পূর্ণ এদেশীয় এবং স্নেহ ও আগ্রহের পরিচায়ক। লবকুশের পোষাক মৃগচর্ম্মের হলে বোধহয় ভাল হইত এবং এ পোষাকটা সমস্ত নাটকের Oriental atmosphereটাকে নষ্ট করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

রাজসভার দৃশ্যে লোকাভাব আমরা বোধ করি নাই—সপ্তর্ষিমণ্ডল কয়জন লইয়া তাহার বিচার অনাবশ্যক। দেবতা দেখাইতে হইলেই যে তেত্রিশকোটী লোককে রঙ্গমঞ্চে আনিতে হইবে তাহা এক উন্মাদেই কল্পনা করিতে পারে। একজিবিসনের সীতার সহিত এ সীতার নাটক হিসাবে তুলনা করা যায় না পুস্তকস্থ চরিত্র হিসাবে সীতার অভিনয় অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। গ্রন্থকার সীতা চরিত্রে শোকের উচ্ছ্বাস দেখান নাই তজ্জন্য অভিনেত্রীকে অপরাধিনী করা যুক্তিসঙ্গত নয়। দুর্ম্মুখের অভিনয় সর্ব্বত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট না হইলে অনেক স্থানে ভাল দু একস্থানে চলনসই, তাঁহাকে 'হনুমান' বলিয়া উপহাস করায় লেখকের জঘন্য রুচি প্রকাশিত হইয়াছে। লবের ভিতর Tarzanian ভাব ছিল সেটা স্বাভাবিক—আজন্ম বনপালিত শিশুর সহরের সভ্যতা ও আদব কায়দা দুরস্ত থাকা স্বাভাবিক। ভাষার জোরের অভাবের জন্য নাট্যকার অবশ্য অপরাধী। এ রজনীর অভিনয়ে পুস্তকের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে দেখিলাম। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক শম্বুকের অভিনয় ও বশিষ্ঠের অভিনয় এখনও অন্যান্য অভিনয়ের মত উৎকৃষ্ট হয় নাই তবে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল বলিয়া বোধ হইল এবং ক্রমে আরও ভাল দাঁড়ান সম্ভব। তুঙ্গভদ্রার অভিনয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে এবং বসিবার স্থানের ব্যবস্থা, পাখার বন্দোবস্ত ও কর্ম্মচারীদের ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যে সকল অভিযোগ করিয়াছিলাম তৎসমুদায়ের প্রতীকার হইয়াছে দেখিয়া ও সাধারণের অভিযোগে শিশিরবাবুকে মনোযোগী দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলাম। ব্যবসার প্রতিষ্ঠার ইহাই মূল ইহাও একরূপ "প্রজানুরঞ্জন"। শিল্পী চারুচন্দ্র ও নৃত্য-শিক্ষকগণের কৃতিত্বের প্রশংসা করা অনাবশ্যক কারণ তাঁহারা স্বতঃই প্রথিতনামা। অন্ধ-গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের সঙ্গীত নৈপুণ্যে এবারে আমাদের সকল ক্ষোভ বিদূরিত হইয়াছে।

ইঁহাদের বন্দনাগীতি যথারীতি গেয়ে সখী 'বৈকালী' সীতার সম্বন্ধে টিপ্পনী কেটেছেন—সীতার নৃত্যগীত যে অতি উন্নতরুচি ও সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানের পরিচায়ক এবং তা যে সাধারণের মনোরঞ্জন করেছে তা জেনে সখী আক্রমণ করেছেন কবি হেমেন্দ্রলালকে ও ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মণিলালবাবুকে। এ সেই জলপানরত ছাগশিশুর প্রতি ব্যাঘ্রের অদ্ভুত যুক্তি সহকারে আক্রমণের মত সুন্দর। নাচটা একজন পেশাদার নাচিয়ে দিলে আরও ভাল হোত তা মনে কর্ব্বার কি কারণ আছে তা আমরা বুঝতে পারি না। এতে কবি হেমেন্দ্রলাল ও নাট্যরসিক মণিলাবুর অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়েছে। ইনি শূদ্রকের সভায় নারীগণের মাথায় মুকুট কোথায় দেখতে পেলেন তা জানি না, ঘোমটা অবশ্য ছিল সেটা থাকাতে অনেকের হয়তো অসুবিধা হয়েছিল তবে বৈকালী ও যে সে অসুবিধা বোধ কর্ব্বেন এটা আমরা ভাবিনাই—শূদ্রকপত্নী, রাজমহিষী, সুতরাং তাঁর বেশভূষা উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত তবে সেটা ঠিক বাইজীধরণের কিনা বলতে পারি না তবে, বাইজীরাও ভালরূপ বেশভূষা করে এ একটা অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বটে! শূদ্রকের রাজসভা অতি স্বাভাবিক ভাবেই সাজান হয়েছিল, তাতে সখী রাগকরে বলেছেন যে সেটাকে কোণঠাসা করে সাজান উচিত ছিল। আর্ট নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেই যে আর্টের জ্ঞান হয় না সেটা বলা বাহুল্য।

শিশির বাবুর আর্টকে দেশের লোকে যে কি ভাবে অভিনন্দিত করেছে তা যিনি সীতা অভিনয় দেখেছেন তিনিই জানেন। সুতরাং এ আর্টের ঔজ্জ্বল্য কাদের সহ্য হয় না তা বুঝা বেশী কঠিন নয়, গাত্রদাহ এমনি জিনিস যে তাতে পরের ভাল সহ্য হয় না। এর ঔষধ হচ্ছে আর্ট গুণকীর্ত্তন, আর্ট নাম জপন ও আর্টের পদধূলি ভক্ষণ।

রৈবতক সমালোচনা

মডার্ণ থিয়েটার সম্বন্ধে গত সপ্তাহের মন্তব্য প্রেসে দিবার পর শুনিলাম শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ী ও সুপ্রসিদ্ধ শিল্পীদ্বয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় উক্ত থিয়েটারের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধেই মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ সুলোচনা' স্থলে "রাধারাণী" মুদ্রিত হইয়াছিল। এই অশুভসংবাদ-শ্রবণে আমরা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। পর্ব্বতের মূষিকপ্রসবের মত, রঙ বেরঙের প্লাকার্ডে সহর গুলজার করিয়া আনন্দ-পরিষদের সভ্যগণ এমন এক অভিনয় করিয়াছেন যাহাকে অভিনয়ই বলা চলে না—এমন কি সুদূর পল্লীগ্রামের একটী চতুর্থ শ্রেণীর অবৈতনিক সম্প্রদায়ও আজকাল এরূপ অভিনয় করিতে লজ্জাবোধ করে। কায়দা কারণ কিন্তু ঠিক লেফাপা-দুরস্ত ছিল। প্রথমেই এক ক্ষীণকণ্ঠ যুবক আসিয়া কাহার একখানি কি 'পত্র যে পাঠ করিলেন তাহা কেহই কিছু বুঝিতে পারিলেন না—অনুভবে বোঝা গেল কোন স্বনামধন্য পুরুষকে এই অভিনয়ের উদ্বোধন করিবার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল তিনি আসিতে না পারিয়া একটু দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র পাঠাইয়াছেন, ভদ্রলোক যে সুবুদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। তৎপরে এক প্রবীণ, ইহাদের পৃষ্ঠপোষক স্বর্গীয় কীর্ত্তিচন্দ্র দাঁ মহাশয়ের গুণকীর্ত্তন করিয়া মডার্ণ থিয়েটারের অভিনয় পন্থা সম্বন্ধে একটী প্রশংসাপত্র দিলেন আমরা আশ্বস্ত হইলাম—ভাবিলাম না জানি কি দেখিব। অভিনয় আরম্ভ হইবামাত্রই সে আশা একেবারে ধূলিসাৎ হইল। 'কৃষ্ণ'বেশী ভদ্রলোকটী যেন বহুদিনের অনাহার-জনিত ক্ষীণকণ্ঠে যে কি বলিলেন তাহা রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে বসিয়াও যখন শ্রবণগোচর হইল না তখন দর্শকবৃন্দ একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন—দুর্ব্বাসারূপী মহাত্মার কণ্ঠস্বর মন্দ ছিল না কিন্তু ক্ষীণকায় (তপঃকৃশ বোধহয়) এই মহাপুরুষের ক্ষুদ্রমুখখানি, পিঙ্গলবর্ণের শ্মশ্রুগুম্ফে এমনি আচ্ছন্ন ছিল যে সে ব্যূহভেদ করা কণ্ঠস্বরের সাধ্যাতীত হইয়াছিল। তারপর বায়স্কোপের অঙ্গভঙ্গীকে প্রাধান্য দিতে যাইয়া ইনি ক্রমাগত গত এমন কুঁজো হইয়া পড়িতে লাগিলেন যে তাঁহাকে আমরা 'অষ্টাবক্র' ভিন্ন অন্য কিছুই ভাবিতে পারি নাই। ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি, মহর্ষি দুর্ব্বাসা যে modernized হইয়া এত কুব্জ হইয়া পড়িয়াছেন তাহা আমরা জানিতাম না। কোন অংশের অভিনয়ই উল্লেখযোগ্য নয়—না পুরুষ, না স্ত্রীচরিত্র। কোন অভিনেতারই উচ্চারণ স্পষ্ট নহে, তার উপর এত তাড়াতাড়ি আবৃত্তি করা হইয়াছিল যে তাহা আধুনিক যুগের কোন অভিনয়-নীতিরই অনুমোদিত নহে। দানীবাবুর ও শিশিরবাবুর ব্যর্থ অনুকরণ ও বায়স্কোপের অঙ্গভঙ্গীর যত কিছু কদর্য্যতা যেন পুঞ্জীভূত হইয়া কলাশিল্পের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছিল। দৃশ্যপট একেবারেই মনোজ্ঞ নহে এবং পুস্তকের অনুযায়ী অঙ্কিত বলিয়াও বোধ হইল না। যিনি light effect করিতেছিলেন তিনি প্রতিপদে তাঁহার বিপুল অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া দর্শকবৃন্দকে এমনি উত্যক্ত করিয়াছিলেন যে পরিশেষে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে হইয়াছিল। দৃশ্যপটাদির সজ্জা, পট নিক্ষেপ প্রভৃতিতেও প্রচুর অসামঞ্জস্য বর্ত্তমান ছিল। নৃত্যগীত সেকালের পেসাদারী যাত্রাদলকেও লজ্জা দিতে পারিত—বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত দর্শকবৃন্দের সম্মুখে আনন্দ পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ

গণ যে কিরূপে এই কদর্য্য অভিনয় প্রদর্শন করিতে সাহসী হইলেন তাহা কল্পনায় ও আনা যায় না। প্রশংসার যোগ্য হইয়াছিল বেশভূষা। তবে অঙ্গরাগের Painting) বর্ণ শিল্পী যে অপরিণত ও আধুনিকতায় অনভিজ্ঞ তাহা বেশ বুঝা গিয়াছিল। ইহাঁদের কর্ত্তব্য আরও কিছুদিন মহলা দেওয়া—নতুবা এরূপ অভিনয়ে যে দর্শকবৃন্দ ক্রমশঃ দুর্লভ হইবেন তাহা স্বাভাবিক। নাটক সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই, নাট্যকার কবি নবীনচন্দ্রের সপিণ্ডকরণ করিয়াছেন। কবি নবীনচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি তাঁহার হাতে পড়িয়া জীববিশেষের কণ্ঠে মুক্তার মালার মত আদৃত হইয়াছে। আনন্দপরিষদের পূর্ব্বকালের অভিনয়ে যে সুনাম ছিল অভিনয় দেখিয়া তাহা কিছুতেই ধারণা করিতে পারা গেল না। ইহাঁরা যে পল্লীসমাজ, দেবদাস, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। অভিনয় দর্শনে এরূপ অসন্তোষ বহুদিন পাওয়া যায় নাই মডার্ণ থিয়েটারের যাহা গত অভিনয়ে পাওয়া গিয়াছে। আশা করি আনন্দপরিষদের সভ্যগণ অতঃপর এইরূপ অভিনয় স্থগিত রাখিয়া অভিনয় শিক্ষায় মনোযোগী হইবেন—নতুবা দর্শকবৃন্দের নিকট তাঁহাদের অভিনয় 'দিল্লীকা লাড্ডু বং' হইয়া দাঁড়াইবে অর্থাৎ দেখিলেই পস্তাইতে হইবে। অভিনয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে অন্য অভিনেতার অনুকরণ করিলে চলিবে না—স্ব স্ব ক্ষমতা ও কণ্ঠস্বরের উন্নতি করা আবশ্যক। বাধিকানন্দ বাবু আজ এই সম্প্রদায়ে থাকিলে এই সমস্ত অকৃতকার্য্যতার দোষ তাঁহারই স্কন্ধে পড়িত—তিনি কি তাই বুঝিয়া 'যঃ পলায়তি স জীবতি' নামক মহাজন-প্রদর্শিত-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এই তো অভিনয়, তাহাতে আবার হাততালি দিবার জন্য কয়েকটী ভাড়াটিয়া দর্শকও ছিলেন কিন্তু তাঁহারাও এমন বেখাপ ভাবে হাততালি দিয়াছেন যে সাধারণ দর্শকগণ তাহাতে কেবল কৌতুকই অনুভব করিয়াছিলেন এবং এই অক্ষম অভিনেতাদের উপর তাঁহাদের করুণার ভাবই জাগিয়াছিল। রঙ্গমঞ্চের সম্মুখেই আবার দুইটী সুসজ্জিতা নারীকে বসান হইয়াছিল, তাঁহারা বোধহয় অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের বান্ধবী—বহু পুরুষদর্শকের মধ্যে এরূপভাবে তাঁহাদের বসান কর্তৃপক্ষের রুচির পরিচায়ক হয় নাই। দর্শক সংখ্যা অতি অল্পই হইয়াছিল, এবং তন্মধ্যে অনেকেই অল্পক্ষণ অভিনয় দর্শন করিয়াই গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

নারী নিগ্রহ

হাবড়া-উলুবেড়িয়ার পুলিসের নিকট এই মর্ম্মে এক অভিযোগ আসিয়াছে যে, স্থানীয় বাহিরতকা গ্রামে একটি ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক এক সাত বৎসরের বালিকার উপর বলাৎকার করিয়াছে। সরকারী ডাক্তার পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু বালিকার উপর বলাৎকারের সমস্ত প্রমাণ তিনি বিশ্বাস করেন নাই।

কর্পোরেশন ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা

কলিকাতা কর্পোরেশনের গত (বুধবারের) অধিবেশনে সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগ সম্পর্কীয় ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটীর উপদেশানুসারে আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজ ও চিকিৎসা-প্রণালীর আরও প্রসার করা কর্তব্য কি না, সেই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। শেষে ঐ প্রশ্ন মীমাংসার ভার এক সাব-কমিটীর উপর অর্পণ করাই সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে।

দ্বারবঙ্গে বন্যা

দ্বারবঙ্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, যে মধুবাণীর কিয়দংশ বন্যায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। ট্রেণ যাতায়াত বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। দ্বারবঙ্গ জিলা বোর্ডের সভাপতি স্বয়ং ঘটনাস্থলে গমন করিয়াছেন। স্থানীয় অধিবাসিগণ ভীষণ কষ্টভোগ করিতেছেন।

মিঃ সভারকারকে উপহার দান

বার হাজার টাকার তোড়া

ডাঃ মুঞ্জে প্রমুখ পুণার অধিবাসীগণ আগামী ২৪শে আগষ্ট তারিখে মিঃ সভারকারকে নাসিক সহরে একটি বার হাজার টাকার তোড়া উপহার দিবেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পুত্র মিঃ ম্যাল্কম ম্যাকডোনাল্ড অক্সফোর্ড ইউনিয়নের দুইজন সদস্যের সহিত ভারত-ভ্রমণে আগমন করিবেন।

মহীশূরে মেডিক্যাল কলেজ

নূতন অধ্যক্ষ নিয়োগ

মহীশূর রাজ্যের সিনিয়র সার্জ্জেন ডাক্তার মাইল ভাগানাম এফ, আর, সি, এস, (লণ্ডন) বাঙ্গালোরে নব প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। ডাক্তার মহম্মদ হোসেন সার্জ্জেন ছিলেন, তাঁহাকে সিনিয়ার সার্জ্জেনের পদে উন্নীত করা হইল।

মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি দেবদাসের দ্বিতীয় কন্যা কুমারী সীতা দেবদাস ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য বিলাত যাইতেছেন।

Printed & Published by Jnanendra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
14 Jaggannath Dutta Lane Garpar, Calcutta.

সাপ্তাহিক

প্রথমবর্ষ]   ১৪ই ভাদ্র শনিবার, ১৩৩১ সন।   ইংরাজী ৩০শে আগষ্ট।   [৭ম সংখ্যা

"ভারতের কালিদাস—জগতের আমি"

গল্প

"সৎসাহসের পুরস্কার।"

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী
রত্নপ্রভা সাহিত্যভারতী

খেলার মাঠ হইতে বাহির হইয়া শ্রান্ত ক্লান্ত মণীশ গায়ের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল "বাপ্! বাপ্! এর নাম খেলা? আধমরা হয়ে গেছি মশাই।—"

পিছনের দলের ভিতর হইতে পুণ্যব্রত বলিল "আর কিছু নয় ত? ভাল করে ভেবে ত্যাখ্ মণি—"

মণীশ একা নয়,—দলের বাইশ জন খেলওয়াড়ই এই কথায় সমস্বরে হাসিল।

হাসি থামিলে মণীশ বলিল "না বাপু খেল্‌তে হয় তো শান্তি-প্রিয় খেলা খেলো—না! তা নয় একটা মাত্র 'বল্' নিয়ে বাইশ জনের কাড়াকাড়ি মারামারি, ছুটোছুটি হুটোপাটি—এ কি ভদ্রলোকের ধাতে সয়?—"

দলের মধ্যে সবিদ্রূপে উচ্চ হাসির রোল পড়িল পুণ্যব্রত পেশী সবল হাতের আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে বলিল "ত্যাখ্ যাকে বলে পাক্কা—সেন্টিমেণ্টাল, তুই হচ্ছিস তাই—শান্তিপ্রিয় খেলা বল্‌তে কি বোঝায় বল দেখি? অশ্বডিম্ব গোছের কিছু?"

খেলার প্রতিক্রিয়ায় মণীশের দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড তখনও সবলে ধ্বক্ ধ্বক্ করিতেছিল। হাঁপাইয়া নিঃশ্বাস টানিয়া সে বলিল "তোমার মত গুণ্ডা—প্রাকটিক্যাল লোকে তাই বুঝ্‌বে বটে। কিন্তু শান্তি-প্রিয় খেলা কি কিছুই নাই?

পুণ্যব্রত হাসিয়া বলিল "আছে। হাত পা গুটিয়ে চুপ্-মেরে চোখ বুজে পড়ে থাকা। সাধ্য থাক্‌লে শ্বাস-প্রশ্বাসটাও বন্ধ করা।—"

মণীশ এ কথার কোন যুক্তিযুক্ত জবাব খুঁজিয়া পাইল না। অপ্রতিভ হইয়া বলিল "তা বল্‌ছিনে। তবে আমি চেঁচামেচির চেয়ে নীরবতাই ভাল বাসি; আমার পক্ষে চুপ-চাপ কবিতা লেখাই মঙ্গল। আমি কোন দিনই বল খেল্‌তে আসি না। আজ তোদের সবাইকে একসঙ্গে সেজে গুজে আসতে দেখে কি রকম ঝোঁক চেপে গিয়েছিল তাই এসেছিলাম। আর আস্‌ছি নে।"

পুণ্যব্রত সবলে তাহার কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিল "সেটি হচ্ছে না ভাই। আজ তোর হাতে-খড়ি দিলাম, এবার থেকে "বিশেষ কারণ-ব্যতীত" রোজ রোজ ধরে আন্‌ব।

মণীশ বলিল "বাপ্! তাহলে মরে যাব।"

পুণ্যব্রত বলিল "আধমরা হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে পুরোপুরি বাঁচার চেষ্টায় যদি পুরোপুরি মরে যাস,—তাহলে বিশেষ লোকসান হবে মনে করি না। কিন্তু তোমার সেই হেলে দুলে, অশেষবিধ মুদ্রাদোষ সহকারে তারস্বরে হরদম কবিতা কপ্‌চানো,—ওটি একান্ত অসহনীয়!—ব্যাটাছেলে ব্যাটা-ছেলের মত হ' তবে ত বুঝি।—"

মণীশ কোন কথা না বলিয়া হঠাৎ রাস্তার বাঁ পাশে পুকুরের বাঁধা ঘাটে গিয়া দাঁড়াইল। দলশুদ্ধ ছেলে রাস্তায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "ব্যাপার কি?"

মণীশ ক্লান্ত মলিন হাসি হাসিয়া বলিল "এইখানে মাটী নেব। তোমরা যে-করে চল্‌ছ, ও চলা তোমাদের

পোষায়। আমি খানিকটা না জিরিয়ে চল্‌তে পারব্‌ না। তোমরা চলে যাও,—শুধু সতীশ এস।"

পুণ্যব্রত হাসিয়া বলিল "অর্থাৎ সতীশ এবার গান গাইবে, আর তুমি শুয়ে শুয়ে শুনবে? হতেই পারে না এসব অনাচার! চলে এস ভাই সব, এ ছোক্‌রার ঘাড় থেকে শান্তিপ্রিয়—সেন্টিমেন্টালিটির ভূত নাবাবার জন্যে, তালঠুকে চ্যালেঞ্জ করা যাক!"

দল শুদ্ধ সবাই মহোৎসাহে হল্লা করিয়া ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। মণীশ হতাশ ভাবে শয়ন করিল। সকলে তাহাকে ঘিরিয়া বসিল।

একজন বলিল "আচ্ছা মণীশ, তুমি খেলাধূলাকে এত ডরাও কেন?"

মনীশ বলিল "বাজে সময় নষ্ট করা হুড়োহুড়ি, হল্লা আমার ভাল লাগে না। অনর্থক animal force বাড়িয়ে লাভ কি?"

পুণ্যব্রত বলিল "তুমি নেহাৎ নিষ্ঠাবান বাঙালী, তাই ও কথা বললে। আমার ইচ্ছে হয় তোমার মত গোটা-কতক শান্তিপ্রিয় জীবকে খাঁচায় পুরে পশ্চিমের সহর-গুলোয় ঘুরিয়ে আনি। তাহলে তোমায় দেখে তারাও হাস্‌বে, আর তাদের দেখে তোমারও চৈতন্য হবে। অন্ততঃ দোহাই তোর একবার পাঞ্জাবের রাস্তাগুলো ঘুরে আসিস্‌। সে পুণ্যতীর্থটা দেখলেও চোখের পাপ কেটে যাবে। তোরা ফাঁকি দিয়ে পুরোহিত ঠাকুরের মার্ফৎ শক্তি সাধনা করিস; সেখানে দেখবি সে দেশের ছেলেমেয়েরা রীতিমত প্রত্যেকে শক্তি চর্চ্চা করে,—সত্যিকার শক্তির সাধনা করে। আমার দিব্যি মণীশ একবার যাস্‌।—"

মণীশ বলিল "বল্‌ছি তো animae force এর ওপর আমার কোন লোভ নেই।—"

পুণ্যব্রত বলিল "ওরে, তোরা লোভের দাসত্বটা বড় করে দেখেছিস বলেই, তোরা গোল্লায় যেতে বসেছিস—না মাপ কর আমায়,—একদিন আমিও ঠিক তোর মত, না তোর চেয়েও দশগুণ বেশী শান্তিপ্রিয় জীব ছিলাম, এবং শান্তিপ্রিয়তা বজায় রাখ্‌বার জন্যে প্রাণপণেই—সর্ব্বত্যাগী হয়েছিলাম। সর্ব্বত্যাগ মানে গেরুয়াটেরুয়া বলছি নি অবশ্য। আমার সে বয়সের সর্ব্বত্যাগ বল্‌তে, যা বোঝায়—অর্থাৎ প্রাণপণে ভাল মানুষ সেজে, সকল রকমে সকল সবলজনের পশু-শক্তি অর্থাৎ animal force এর পদাঘাতে বিনা দ্বিধায় ধরাশায়ী হওয়াই পরম পৌরুষ ভেবে চল্‌তাম। সকলে বল্‌ত আমার মুখে যখন টুঁ শব্দটি নেই, তখন আমার মত ভালছেলে ভূভারতেই নেই। কিন্তু হায়রে তখন যদি জানতাম, ভালত্বের বালাই কত;—"

পুণ্যব্রত একটু হাসিয়া বলিল "পথে, ঘাটে, ঘরে, সর্ব্বত্রই—যার আলস্য নাই, সেই আমার ওপর উপদ্রব কর্‌ত। সব চেয়ে জ্বালাত—ক্লাশের ছেলেরা। কেউ আমার কাণের কাছে মুখ এনে বিকট চীৎকারে টু দিত, কেউ সামনে দাঁড়িয়ে ভ্যাংচাত, কেউ—কথা নাই বার্ত্তা নাই,—গালে হঠাৎ ঠাস্‌ করে চড় বসাত। যেদিন মাষ্টারদের চোখে পড়্‌ত সেদিন তারা সাজা পেত। নচেৎ আমার তরফ থেকে কোন হাঙ্গামাই নাই। আমি ভাবতুম আমার এই সাত্বিক সহনশীলতার মত পুণ্য আর নাই! কিন্তু এর উল্টো পিঠেই যে—অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেওয়ার মত পাপ নাই—সত্যটা রয়েছে, তা জানতুম না। আমি এত বড় সূক্ষ্ম ধাঁচের বেকুব-সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছিলাম, যে কেউ যদি কোন অন্যায়ের জন্য অপর কাউকে আমার সামনে বক্‌ত, তবে আড়ালে গিয়ে আমি কেঁদেই অস্থির হতাম। আর—অর্দ্ধেক রাজ্য, রাজ কন্যাগুলা খুব সস্তা নয় তাই রক্ষা,—নচেৎ প্রত্যেক তিরস্কৃতের মনোবেদনা দূর করবার জন্য, তাই পুরস্কারের ব্যবস্থা কর্‌তাম!"

পুণ্যব্রত জোরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া থামিল।

সতীশ বলিল "তারপর? পুণ্যব্রতের গুণ্ডাব্রত গ্রহণের কারণ?"

পুণ্যব্রত বলিল "একদিন হঠাৎ একটা ঘটনায় মতি পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। আমার কোষ্ঠির ধামা চাপা মঙ্গলগ্রহ সেদিন অকস্মাৎ ক্ষেপে উঠে,—তুঙ্গে চড়ে বস্‌লেন বোধহয়, কারণ সেইদিন থেকে ক্ষাত্র শক্তিকে পূজা করতে শিখ্‌লাম।—ব্যাপারটা খুলে বলি শোন।"

(দুই)

একটু থামিয়া—দূরদিগন্তের দিকে চাহিয়া পুণ্যব্রত

বলিতে সুরু করিল:—"বাবা তখন ফার্লো নিয়ে পঞ্জাবের ওদিকে বেড়াতে গেছেন। আমার এক মামা লাহোরের কলেজথেকে পড়াশোনা শেষ করে তখন অমৃতসরে পুলিসে ঢুকেছেন। দাদামশাই লাহোরের বাসিন্দা হয়েছিলেন, সুতরাং মামার বাড়ীর সবকটি মানুষের ধরণ-ধারণ পঞ্জাবীদের মতই হয়ে গিয়েছিল।

অমৃতসরের শহরের ধারে এক নাশপাতি বাগানের মধ্যে পুলিস ইনস্পেক্টর মামার বাংলো। বাবা আমাদের নিয়ে সেইখানে গিয়ে উঠ্লেন।

খুব ছোটবেলায় কখন মামারবাড়ী গিয়েছিলাম মনে নাই। জ্ঞান হবার পর এই প্রথম আমার মাতুলালয় দর্শন। আমার বয়স তখন বারো বছর।

আগেই বলেছি,—আমি ছোটবেলায় খুব শান্তিপ্রিয় জীব ছিলাম। সুতরাং পঞ্জাবে ঢুকেই মনে হল, এখানকার কুলি মজুর, ঘোড়া, মানুষ এমনকি গাধাগুলা পর্য্যন্ত —দুষ্টের একশেষ! কারণ—এখানকার সকলের চেহারাই অসাধারণ বলিষ্ঠ তেজস্বিতাপূর্ণ। এমনকি রান্নাঘরের বিড়াল এবং শোবার ঘরের দেয়ালের টিকটিকিগুলা পর্য্যন্ত অসাধারণ হৃষ্টপুষ্ট। রাস্তাদিয়ে দুম্বামেষের পাল যেত, আমি ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে ভাবতাম—এগুলাও গুণ্ডাভিন্ন অন্য কিছু নয়। আর সে দেশের মেয়েদের দেখলেই আমার মার শোবার ঘরের মহিষমর্দ্দিনীর ছবিখানা মনে পড়ত। বাংলার ঘরের কোণ, যাদের চোখে খুব অভ্যস্ত হয়ে আছে;—তারা হঠাৎ পঞ্জাবে গিয়ে পড়লে —প্রথমটা তাদের চোখে এমনিই ধাঁধা লাগে।

রাস্তায় বেরুলে পাছে মানুষ-গুণ্ডা, কি জানোয়ার-গুণ্ডার ধাক্কা খেতে হয়, সেইভয়ে অধিকাংশ সময় বাড়ীর মধ্যেই থাকতাম। সকলে বিকালে নাশপাতি বাগানের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতাম; গাছে নাশপাতি-ফলগুলি ঝুলত, সেগুলি দেখতে আমার বড় ভাল-লাগ্ত। মাঝে মাঝে দু-পাঁচটা ফল পেড়ে এনে বাড়ীতে ছোট ভাই বোনদের হাতে দিতাম। কিন্তু নিজে খেতে তত ভাল বাসতাম না, যতটা ভালবাসতাম—দেখ্তে।

সেদিন বৈকালে বেড়াতে বেড়াতে বাগানের ধারে বেড়ার কাছে এসে পড়েছিলাম। পাশেই সদররাস্তা, সে রাস্তায় বড় একটা লোক চলাচল নাই, অন্ততঃ বৈকালের দিকে কাউকেই বড় দেখতে পেতামনা। সেজন্য এক-আধদিন বেড়া টপ্কে রাস্তায় নেমে পড়ে একটু এদিক ওদিক পায়চারি কর্তাম। কিন্তু লোক দেখ্লেই সত্বর এসে বাগানে ঢুক্তাম। কি জানি যদি ধাক্কা লাগে!

সেদিনও এদিক ওদিক চেয়ে রাস্তায় নাম্লাম। রাস্তার যেদিকটা শহরের অভিমুখে গেছে, সেই দিকটায় অগ্রসর হ'লাম। এ পথের দু-পাশে দু-মাইলের মধ্যে কোথাও লোকালয় নেই। পথের দু-পাশে শুধু সারবন্দি নাশপাতির গাছ।—তারপর দু-একটা বাগান, ঝোপ-ঝাড়, —আর খোলা মাঠ। সে মহানির্জ্জনতার মাঝখান-দিয়ে চল্তে চল্তে এক একবার মনে হয়,—সত্যি যেন 'হারিয়ে গেছি আমি!'

খানিকদূর গিয়ে গোটা দুই মোড় ফিরে আর অগ্রসর হব কি না ভাব্ছি, হঠাৎ পাশের ঝোপের আড়াল থেকে আটজন গুণ্ডাচেহারার লোক বেরিয়ে পড়্ল। তাদের দেখে পাঞ্জাবীবলে মনে হোল না, অন্যদেশের লোক বলেই মনে হোল। কারণ তারা বলিষ্ঠতায় পাঞ্জাবীদের মত হলেও দৈর্ঘ্যে তাদের চেয়ে ঢের ছোট। রং'টাও ময়লা। তাছাড়া চক্ষের নিমেষে আরও কি-যেন-সব পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলাম।

তাদের দেখেই আমি থতমত খেয়ে, পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলাম। তারা আমার পথরোধ করে দাঁড়াল। পরস্পরের মুখচেয়ে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কি বলাবলি করলে বুঝ্তে পার্লাম না। একজন আমার মুখের কাছে ঝুঁকে ভাঙ্গা হিন্দীতে বল্লে "কোথেকে আস্ছ?"

কি রূঢ় কর্কশ,—সে মুখ! আর কি উৎকট সে মুখে মদের গন্ধ! ভয়ে কণ্ঠতালু শুখিয়ে গেল! পঞ্জাবীদের মধ্যে অনেক ষণ্ডামার্ক দেখেছি,—কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটাও মাতাল দেখি নি।—ওদের মধ্যে মদের প্রচলন বোধহয় তেমন নেই।

ভয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। মাতাল গুণ্ডাটা আমার ঘাড়ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বল্লে "পিন্ডি কৈড়ে?"

প্রশ্নটার অর্থ কিছুই বুঝ্লাম না, কিন্তু তার শক্ত

হাতের কব্জা চাপে মনে হল, ঘাড়টা ভেঙে গেল!—যন্ত্রণায় চোখে জল এল, কোন জবাব দিতে পার্‌লাম না।

তারা আমার যন্ত্রণার্ত্ত অবস্থার দিকে দৃকপাত করলে না। একজন বিনাদ্বিধায় পদাঘাতে আমায় ধরাশায়ী করে কুৎসিত দুর্ব্বাক্য বললে, তারপর পুনশ্চ আমার পিঠে পদাঘাত করে সদলে চলে গেল।—আমি যে পথ ধরে এতক্ষণ আসছিলাম, তারা সেই পথ ধরেই চল্‌ল।—অর্থাৎ আমার বাড়ী ফেরবার পথ তারা দখল করলে।

স্তম্ভিত নির্ব্বাক হয়ে বসে রইলাম। অকারণে মানুষের ওপর মানুষ যে এমন্ পশুবৎ আচরণ করতে পারে, তা কেবল কেতাবেই পড়েছি। নিজে কখনও এমন পশুদের পাল্লায় পড়িনি!—দৈত্যশক্তি দেখেই আমার ভয় হোত,—কিন্তু সে দৈত্যশক্তি যে একদিন স্বচ্ছন্দেই আমার পিঠে চড়াও হবে, তা কখন কল্পনাও করি নি!

পিঠের যন্ত্রণায় কাবু হয়ে পড়েছিলাম। তবুও হাসি এল!—এরা একে দৈত্যশক্তির অধিকারী, তায় মাতাল।—ওরা ওদের উপযুক্ত কাজই করেছে। কিন্তু আমি কি?—আমি একে ক্ষীণশক্তি, তায় কাণ্ডজ্ঞানহীন বালক! নইলে কোন সাহসে একেলা এই বিপজ্জনক পথে চলেছিলাম? যারা দস্যু, যারা চোর, যারা মাতাল,—তাদের কাছে গায়ের জোর ছাড়া আর কিছুর দাবীই গ্রাহ্য হয় না। অথচ আমার দৈন্য—সেইখানেই! সুতরাং এই আঘাতটাই আমার পক্ষে ন্যায্য প্রাপ্য। এর বিরুদ্ধাচরণই অর্থাৎ আত্মরক্ষার চেষ্টা আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা। পাল্টে প্রহার দেওয়া ত—শাস্ত্র-বিধি বহির্ভূত কল্পনা!

খানিকপরে দূরে রাস্তায় খপ্ খপ্ ঘোড়ার পায়ের আওয়াজের সঙ্গে রবার টায়ারের গাড়ীর গুরু-গম্ভীর আওয়াজ শুন্‌তে পেলাম। এই রে!—...মামা বোধহয় পুলিশষ্টেশন থেকে ফিরছেন! এই ত তাঁর ফেরবার সময়!—

চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে, কাপড় চোপড়ের ধুলো ঝেড়ে ফেল্‌লাম। ঘাড় ফিরিয়ে বার বার নিজের পিঠের দিকে চেয়ে জামা ঝাড়লাম। কতকগুলা দস্যুর কাছে ভদ্র-ব্যবহার পাইনি, এটা দুঃখের বিষয় হলেও নিজের আত্মীয় স্বজনের কাছে সে দুঃখ প্রকাশ করা ভাল বোধ হয় না। বিশেষ করে দস্যুগুলা যখন হাতের বাইরে চলে গেছে।

...কিন্তু যদি তাদের রাস্তায় দেখ্‌তে পাই?—ওই ত সহরের দিক থেকে মামার 'টাঙা' ছুটে আস্‌ছে,—ওঃ! কি উর্দ্ধশ্বাসে ছুট! ও তো এখনি গিয়ে নাশপাতি বাগানে পৌঁছাবে!...ইতিমধ্যেই যদি তাদের পথের মাঝখানেই দেখ্‌তে পাই!...

উৎসাহে বুক ফুলে উঠ্‌ল!...দাঁড়া কাপুরুষগুলো! যে পাল্টে আঘাত করতে পারবে না, তাকে আঘাত করা কত বড় কাপুরুষতা, সেটা জানা তোদের কোষ্ঠিতে লেখে নাই। কিন্তু এবার মামার মত একজন জবরদস্ত লোকের কাছে, কতটা চর্ফ্‌টি জাহির করতে পারো কর দেখি!—

(তিন)

দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ীখানা কাছে এসে পড়্‌ল। বিকালের আলো নিভে এসেছিল, গাড়ীর পিছনের সিটে মামাকে স্পষ্ট করে দেখ্‌তে পেলাম না, আব্‌ছায়ার মত একটি মানুষ শুধু দেখ্‌লাম। সামনে পাঞ্জাবী গাড়োয়ান একা। অর্থাৎ অন্যদিন মামাকে যেমন ভাবে আসতে দেখি, আজও তেমনি দেখ্‌লাম। সুতরাং পিছনের লোকটি যে মামা ছাড়া আর কেউ হতে পারেন, এ সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্যও মনে এল না। কারণ প্রতিশোধ স্পৃহো-দৃপ্ত মন তখন মামার সাহায্য লাভের জন্য একান্ত ব্যাকুল!—

গাড়ী কাছে আস্‌তেই চীৎকার করে থামালাম। অধিকতর উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে বল্‌লাম "মামা, এই রাস্তায় কতকগুলো গুণ্ডা গেছে।

কিন্তু এ কি! মামা কই? চমৎকৃত হয়ে দেখ্‌লাম একটি সুন্দরী ভদ্র মহিলা! সাধারণ পাঞ্জাবী মহিলাদের মতই তাঁর ওড়্‌না পেশোয়াজ। গলায় হাতে কি সব মূল্যবান গহনাও রহিয়াছে। আর সকলের চেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে, গলার ক্ষুদ্র রুদ্রাক্ষের মালা ছড়াটি। মেয়েটির বয়স বাইশ চব্বিশের বেশী বোধ হোল না।

পাঞ্জাবে ভদ্র মহিলাদের এ রকম একা বেরুতে দেখা আশ্চর্য্য নয়। সে দেশে কাপুরুষদের চেয়ে সত্যকার জীবন্ত পুরুষদের সংখ্যা বেশী। সুতরাং নারী-বিষয়ক

সম্মান ও শিষ্টাচার রক্ষা করবার মত বীরত্ব ও মনুষ্যত্ব সে দেশে আছে। সেজন্য সে দেশের ভদ্রঘরের মেয়েরা পরিচ্ছদে আব্রু রক্ষা করে, নির্ভয়ে রাস্তা ঘাটে চলা ফেরা করে। তা নিয়ে হাসি, কাশি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ করবার মত সাহস বা প্রবৃত্তি সে দেশের অতি বড় কাপুরুষেরও দেখিনি।

মহিলাটি মুখ বাড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে চাইলেন। তারপর সুমিষ্ট স্নেহময় স্বরে বল্লেন "কি চাও বাবু?—"

আরে! এ যে বাংলা-বুলি! পাঞ্জাবে এ বস্তু যে একান্তই দুষ্প্রাপ্য! এমন কি আমার মামারাও যে অর্দ্ধেক বাংলা কথা বল্‌তে পারেন না!...ইনি কি তাহলে খাস বাঙালীর মেয়ে!

অত্যন্ত আনন্দ বোধ হোল! কিন্তু এই অপরিচিতা মহিলাকে 'মামা' বলে যা ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছি, তাতে লজ্জা ও সঙ্কোচে মুখ তুলতে পারাও দুষ্কর! অনেক কষ্টে কুণ্ঠাজড়িতস্বরে জানালাম, "তাঁকে বিরক্ত করা আমার অপরাধ হয়েছে। আমার কোন আত্মীয়ের গাড়ী ভেবেই, গাড়ী থামিয়েছিলাম।—"

গাড়োয়ানটা সহাস্যে আমার বিপন্ন অবস্থা লক্ষ্য করছিল। সে এই সময় বল্লে "পিন্‌ডি কেঁড়ে?"

এই সেরেছে! আবার সেই ডাকাতি-বোল্!—সভয়ে বল্লাম "কি?"

ভদ্রমহিলা স্মিতমুখে বাংলায় বল্লেন "বাড়ী কোথা?"

বাংলার "বাড়ী কোথা" প্রশ্নের পাঞ্জাবী অনুবাদ "পিণ্ডি কেঁড়ে?"—মনে মনে "পিণ্ডি কেঁড়ে" শব্দটি মুখস্ত করতে করতে—সংক্ষেপেই মামার বাড়ীর ঠিকানা ও মামার নাম বল্লাম।

ভদ্র মহিলা গাড়োয়ানকে কি প্রশ্ন করলেন। মুহূর্ত্তে গাড়োয়ানটি অতিমাত্রায় সম্ভ্রম-চকিত ভাব প্রকাশ করে সামনের রাস্তার দিকে ইশারা করে,—কি বল্লে।

ভদ্র মহিলা বললেন "বাবুজি, তুমি বাড়ী যাবে? এই গাড়ীতে যাবে তাহলে? তোমার বাড়ী ত ওই নাশপাতি বাগানে?"

অভ্যাসবশে এরূপ সাহায্য গ্রহণে মনে একটু দ্বিধা জাগল। কিন্তু অনভ্যাসের পদাঘাতে পিঠের দাঁড়া তখনও টন্ টন্ করছে। সুতরাং দ্বিধার বাধা গ্রাহ্য না করে, তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে উঠে গাড়োয়ানের পাশে বসলাম। সে দেশের টাঙাগুলা হাল্কা, আর ঘোড়াগুলা তেজী; পিছল-পথে পা-হড়কানোর মত গাড়ী ক্ষিপ্র-লঘু গতিতে ছুটল! ভদ্র মহিলা গাড়ীর পিঠে ঠেস দিয়ে চোখ বুজলেন। আর কথা বল্লেন না।

খানিক দূর গিয়ে, হঠাৎ গাড়োয়ান রাশ টেনে গাড়ী থামাল। চেয়ে দেখলাম, সেই আট জন দুর্ব্বৃত্ত রাস্তার এ পাশ ও পাশ ছেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।—রাস্তার মাঝখানে ক্রীড়াচ্ছলে দুজন লাঠি খেলছে।—অভিপ্রায় যেন পথরোধ করা!

গাড়োয়ান ঘোড়া থামাতে না থামাতে সেই লাঠি খেলওয়াড় দুটি মুহূর্ত্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ঘোড়ার লাগাম-জোৎ ছিঁড়ে দিলে! ঘোড়া ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল। সশব্দে বোম্ মাটী-স্পর্শ করলে। গাড়োয়ান পাঞ্জাবী বীর, অত্যাচারীকে ক্ষমা করা তাদের জাতীয়-প্রথা নয়! মুহূর্ত্তে লাফিয়ে পড়ে হুঙ্কার করে সে লোক দুটাকে চাবুক পেটাতে সুরু দিলে, লোক দুটাও লাঠি তুলে তাকে আক্রমণ করলে। সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

আমি আতঙ্ক-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে, স্তম্ভিত! বোম্ পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ীর হুডের দাণ্ডায় আমার মাথা ঠুকে গিয়েছিল, চারদিক যেন ঝাপ্সা দেখছিলাম, তার ওপর এই দৃশ্যসৌন্দর্য্য!...মনে হোল, পাতাল ফুঁড়ে হঠাৎ একদল দানব উঠে, দাঙ্গা জুড়েছে!...আমার চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল!...উঃ, কি ভীষণ সে মারামারি!—

দু মিনিট পরেই একটা বিকট আর্ত্তনাদ করে পাঞ্জাবী গাড়োয়ান মাটীতে মুখ গুঁজে পড়ল! একটা বীভৎস গম্ভীর গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া, তার জীবনী-শক্তির কোন লক্ষণ আর দেখা গেল না! তার হাতপাগুলা সব এলিয়ে পড়েছিল।

তারপর ক্ষণকালের মধ্যে কি ঘটেছিল, কিছু মনে নেই। আমি যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিলাম!...তারপর শুনলাম, হঠাৎ সব চুপ্!...

তীক্ষ্ণ-তীব্র কণ্ঠের আওয়াজ কাণে গেল "মঙ্গল সিং।"

সভয়ে চোখ চেয়ে দেখ্‌লাম, গাড়ীর সামনে দিক—সব ফর্শা! শুধু গাড়োয়ানটা পড়ে গোঙাচ্ছে! দৈত্য-গুলা নিশ্চিহ্ন!

গেল কোথা সব? ঘাড় ফিরিয়ে অতিকষ্টে পিছন দিকে চাইলাম,—দেখলাম,—অপূর্ব্ব, অতি ভয়াবহ দৃশ্য!

(চার)

আটজন দৈত্যাকৃতি দুর্ব্বৃত্ত একদিকে জড় হয়ে মার-মুখি—উদ্ধত ভাবে দাঁড়িয়েছে। তাদের হাতে লাঠিও আছে, অস্ত্রও আছে, কেউ কেউ রিক্তহস্ত। আর তাদের সামনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে,—সেই গাড়ীর ভদ্র মহিলা। তাঁর হাতে শুধু একটি—সুদীর্ঘ মজবুত চাবুক!

মহিলার সমস্ত দেহ ঋজু, স্থির, নিস্পন্দ! কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্যের আভাস নাই। শুধু—চক্ষু দুটি দিয়ে, আগুনের ঝলক্ ছুটে বেরুচ্ছে! সে কি অস্বাভাবিক ভীষণ দৃষ্টি! বাঘের চোখ দেখেছি, সিংহের চোখ দেখেছি, ওই খুনে দুর্ব্বৃত্তগুলার হিংস্র-ভীষণ চোখ দেখেছি, কিন্তু—না, না! কারুর সঙ্গে এ চোখের দৃষ্টির তুলনা হয় না। এ দৃষ্টির ভীষণতার সঙ্গে, আরও কি এক—অসাধারণ-বিশেষত্বের যোগ আছে!—সে বিশেষত্বের সঙ্গে কিসের উপমা দেব, আমি আজও বুঝে উঠ্‌তে পারি নি।

মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলাম!

লোকগুলা নিজেদের মধ্যে বিড় বিড় করে কি বলা-বলি করলে। তার একটা কথা কাণে গেল,—"আভি তলব!"

ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন "ম্যানেজার সাহাবকো পাশ যাও।—"

উত্তর হোল "আপ দে-দিজিয়ে।"

প্রত্যুত্তর হোল "মেরা পাশ কুচ নেহিন্।"

দলের পিছনে মুখ লুকিয়ে, কে একজন কি একটা দুর্ব্বোধ্য উক্তি উচ্চারণ করলে। তার ভাষা বুঝলাম না—কিন্তু অভিপ্রায় বুঝ্‌লাম।......এই নরপশুগুলা এবার নারকীয় দুরভিসন্ধির আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়।—বীভৎস, কুৎসিত সে প্রস্তাব!—

চনচন্ করে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল! চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছিলুম, তবুও লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালুম! "বালক আমির" ভেতর, "মানুষ আমি"র শিশু শক্তি ঘুমিয়ে ছিল,—বুঝি এই আঘাতে সে "আমি" হঠাৎ উন্মাদ-বেদনায় আর্ত্তনাদ করে জেগে উঠ্‌ল। তার আত্ম-রক্ষার শক্তি নাই, তবু সে—পশুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উন্মুখ!

আমি উন্মত্তের মত—তাদের দিকে ছুটলাম।

তারা তখন আটজনে আক্রমণোদ্যত হয়ে অগ্রসর হয়েছে।—আমার মনে হোল সমস্ত পৃথিবীটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পে দুলছে। লাখ লাখ আগ্নেয়গিরি ফেটে, সমস্ত পৃথিবীর ওপর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে! অসহ্য, অসহ্য, সে উত্তাপ!—

এতটুকু মানুষের এতটুকু ক্ষীণ কণ্ঠ-ধ্বনির মাঝে বজ্রের ডাক লুকানো থাকে, কখনো শুনেছ? আমি সেদিন শুনেছিলাম। ভদ্রমহিলা চাবুকটি তুলে আক্রমণোদ্যত আততায়ীদের দিকে চেয়ে বজ্রদৃপ্তকণ্ঠে বল্লেন, "এখনো সাবধান—!"

তারা কাণ্ডজ্ঞানরহিত—পশু, প্রেত কিম্বা ততোধিক কিছুতে তখন পরিণত হয়েছে। কিন্তু তবুও এ আদেশ তাদের মুহূর্ত্তের জন্য, যেন বিমূঢ় করে দিলে! তারা বিচলিত হয়ে নতশিরে একবার দাঁড়াল! তারপর পরস্পরের গা ঘেঁসে একটা বিরাট মাংসপিণ্ডের গড়িয়ে চলার মত,—আবার চল্‌ল—সামনে ভদ্রমহিলার অভিমুখে!

আমি ফুটবল খেলার কল্যাণে যোড়া পায়ের লাথি অভ্যাস করেছিলাম। বিদ্যুদ্বেগে লাফিয়ে গিয়ে দলের একটার পাঁজরে লাথি ঝাড়্‌লুম! কোথায় শক্তি পেয়ে-ছিলাম জানি না, কিন্তু এত বড় জোয়ানটা সেই লাথিতেই মাটী নিলে।

শক্তির অতিরিক্ত শক্তি-খরচ করে, আমিও সেই ধাক্কার বেগে ছিট্‌কে পড়লুম,—একটু দূরে।

মুহূর্ত্তে শব্দ শুন্‌লাম শপাশপ্—শপাশপ্—শপাশপ্! সঙ্গে সঙ্গে দলের অগ্রবর্ত্তী দুজন অব্যক্ত যন্ত্রণায় গর্জ্জন করে মাটীতে লুটিয়ে পড়ল!—

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। কি যে হোল বুঝ্‌তে পারলাম না। চেয়ে দেখ্‌লাম ভদ্রমহিলার চাবুক

ধৃত হাতখানি বিদ্যুদ্বেগে ঘুরছে, একটা হিস্ হিস্ শপ্ শপ্ শব্দ উঠছে,—আর ধড়াধড় মাটীতে পড়ে একে একে সবকটাই লুটোপুটি খেয়ে অব্যক্ত কাতর শব্দে গজরাচ্ছে!—

ঐন্দ্রজালিক দৃশ্য বোধহয় এর চেয়ে সহজ! দু' মিনিটে চোখের ওপর এমনি চমৎকার অদ্ভুত দৃশ্য বিপর্য্যয় দেখ্‌লাম! তাদের লাঠি, তাদের অস্ত্র—সমস্ত ছিট্‌কে গিয়ে দূরে পড়েছিল—তারা একবার গিয়ে সেগুলো কুড়িয়ে এনে তার সদ্ব্যবহার করে, এতটুকু অবকাশের ফাঁক নাই!—প্রহার, প্রহার, প্রহার,—বেদম প্রহার! কশাঘাতের মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ-চুম্বনে তাদের সর্ব্বাঙ্গ আশীবিষের দংশন জানাচ্ছে!—যন্ত্রণার চোটে ছট্‌ফটিয়ে তারা ধূলোয় পড়ে জড়াজড়ি কর্‌ছে! চোখে, মুখে, নাকে, কাণে ধূলো ঢুকে তাদের যা অবস্থা হয়েছে, তা অবর্ণনীয়!

নিজের চোখে দেখেও সে অদ্ভুত ব্যাপার যেন সত্যি বলে বিশ্বাস হোল না। কি করে বিশ্বাস করি? পাঞ্জাবী মেয়েদের বীরপ্রসবিনী মূর্ত্তি দেখেছি, তাঁদের কণ্ঠে শঙ্খ-নিনাদের গম্ভীর-ধ্বনি শুনেছি, রাস্তার ভিস্তি-ওয়ালী থেকে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যের অনেক পরিচয় অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি।—কিন্তু এই রুদ্রাক্ষ-ধারিণী মায়ের চেহারায় যে তার কোন লক্ষণই দেখি নি!······এ মায়ের পরিচ্ছদে পশ্চিম দেশের পরিচয় না থাকলে, এঁকে যে আমাদের নিজের ঘরের বাঙালী-মা, কিম্বা মারাঠি-মা বলেই মনে হোত। শান্ত নম্রতার সুগঠিত তরুণ মূর্ত্তি, তেমনি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, তেমনি স্নেহ-সৌজন্য-মণ্ডিত মধুর ব্যবহারই এঁর দেখেছি। মায়ের ভিতর এমন রুদ্রাণী রূপ, এমন দানব-দলনী শক্তি অকস্মাৎ বিকশিত হতে দেখা,—এ যে অদ্ভুত-কল্পনা! অসম্ভব-ঘটনা!

বাস্তবের রাজ্যে এ ব্যাপার, একান্ত অবাস্তবিক! কিন্তু চোখের ওপর সত্যই তাই দেখলাম!······শুধু চাবুকের জোরে, আটজন সশস্ত্র দৈত্যাকৃতি-গুণ্ডার একি দুর্দ্দশা?—ওই গুণ্ডাদের ব্যবহারে স্তম্ভিত হয়েছিলাম, কিন্তু এঁর ব্যবহারে যে কি রকম হলাম, তা আজ আমার মনে পড়ে না! আমি শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়েই রইলাম।

শপাশপ্—শপাশপ্—শপাশপ্—অবিশ্রান্ত চাবুক চল্‌তে লাগ্‌ল! সে চলার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই! প্রহৃত গুণ্ডা-গুলার যন্ত্রণা গর্জ্জন ক্রমশঃ পরিত্রাহি আর্ত্তনাদে পরিণত হোল!

সে চীৎকার আমার কাণে অসহনীয়-বোধ হোল! আমি বাঙালীর ছেলে, সুতরাং আমার স্নায়ুগুলি স্বভাবতঃই বঙ্গভূমির আবহাওয়ার অনুকূল। অত্যাচারীর হাতে লাঞ্ছিত হলে আমাদের দুঃখ বোধকর্‌বার শক্তি খুব তীব্র, কিন্তু অত্যাচারকে দমন কর্‌বার প্রকৃতি আমাদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। চোখের সামনে কোন দুর্ব্বলকে নির্য্যাতিত হতে দেখ্‌লে আমাদের সহানুভূতির সীমা নাই, এবং তার ব্যথিত পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে দুটো মোলায়েম সান্ত্বনার বচন ঝাড়তে, আর অন্তরালের নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে অত্যাচারীর উদ্দেশে অজস্র নিন্দাবাদ ঘোষণায় আমাদের সাহসের কসুর-কমতি ও কিছুমাত্র নাই। কিন্তু অত্যাচারের সামনে দাঁড়িয়ে অত্যাচারকে পদাঘাত করলে, আমাদের জাতীয় গৌরবের মানহানি ঘটে! সুতরাং বাংলাদেশের ষষ্ঠীঠাকুরাণীর যেটের-বাছা আমি, একজন অত্যাচার—আক্রান্তের হাতে অত্যাচারীদের এতখানি নিগ্রহভোগ দেখায় আর স্বস্তি পেলাম না। চীৎকার করে বললাম "আর নয়। এবার থামুন, মানুষগুলো মরে গেল যে!—"

অনুরোধ নিষ্ফল হোল, চাবুক থামল না। শূন্যে আস্ফালিত চাবুকের সটাং সটাং শব্দের সঙ্গে বেদনা-ক্ষিপ্ত কণ্ঠে উত্তর হোল,—মানুষগুলো অনেক আগেই মরে গেছে! এরা প্রেত!—"

একথার উত্তর কি জান্‌তাম না। হতাশ-ব্যাকুল কণ্ঠে বল্‌লাম "তবু ওদের প্রাণ আছে।—"

উত্তর হোল "আছে, শুধু নীচাশয়তায়! দেখি, উচ্চস্তরের কাণ্ডজ্ঞান জাগানো যায় কি না!—"চাবুক অধিকতর তীব্রবেগে আবার চলতে লাগ্‌ল!

বেদম্ প্রহার!···গুণ্ডাগুলা নির্দ্দম হয়ে গেল!······ আমার মনে হোল এ নিষ্ঠুর-দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে হয় তো আমার শ্বাসরোধ হয়ে যাবে!······

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সদানন্দের পত্র

সম্পাদক ভায়া—

তোমায় হাজার সেলাম ছুশো তারিফ! তোমার পেটে পেটে এত তা জানিতাম না। বলি আমায় পুলিশের কথা আলোচনা কর্ত্তে বলার মানেটা কি? পুলিসী-প্রেমে মজিয়া জেলকুঞ্জবনে হাতকড়িরূপ আয়ত-চিহ্ন পরিয়া লৌহগরাদের গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ থাকিব এই কি তোমায় মনোবাঞ্ছা? ভায়া স্পষ্ট বললেই পার্ত্তে যে তোমার গাঁজার বুকনী, আমার কাগজে চলবে না—আমি নিরস্ত থাকতুম—তোমার কাগজে না লিখলে কি আমার শাকান্ন জীর্ণ হইবে না—দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপর এ অত্যাচার কেন? তোমারই বা দোষ কি দরিদ্র-পীড়ন যে একালের ধর্ম্ম—দরিদ্রকে পীড়ন করিবার জন্মই পুলিশের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বাপরে কৃষ্ণচন্দ্র যেমন গোপবালক ও গোপবধূদিগকে পীড়ন করিয়া কৌতুক অনুভব করিতেন, আমাদের পুলিস ও তেমনি দরিদ্র-পীড়নে পরম কৌতুক অনুভব করিয়া থাকেন—কৃষ্ণচন্দ্রের অত্যাচারে নিপীড়িতা গোপিনীগণ মা যশোদার কাছে অভিযোগ করিতে গেলে, মা হেসে বলতেন "বাছারা এমন কথা মুখে এনোনা, কানাই কি আমার তেমনি ছেলে, পুলিসের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রের কাছে অভিযোগ করিলে তাঁরাও তাঁদের নন্দদুলালদের কোন দোষ দেখ্‌তে পান না। স্নেহপ্রেম প্রভৃতি স্বার্থপরপ্রবৃত্তিগুলি স্বভাবতই অন্ধ, সুতরাং 'মা যশোদার, দোষ কি? যদি বল, তবে পুলিশের দরকার কি? পুলিশ প্রথা তুলে দাও, তাতেও আপত্তি আছে। কানাই অত্যাচারী হলেও কালীয়দমন করে গোপিনীদের উপকার করেছেন, গোবর্দ্ধনধারণ করে গোপালদিগকে রক্ষা করেছেন, শ্রীরাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন করেছেন; তেমনি পুলিস সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগত বিরোধের দমন করেছে, গুণ্ডাদমন করে শক্তিহীন বাবুগণের ধন ও প্রাণ রক্ষা করেছে। কোন জিনিসই একেবারে কাজের বার বা ষোলআনা কাজের হয় না, কলিযুগে খাঁটী সোণা পাওয়া যায় না, বা পেলেও লোকে তা চায় না। দেখ নাই, সুবর্ণপ্রিয়া কামিনীকুল অলঙ্কারগঠনসময়ে পাকাসোণায় না গড়াইয়া কর্ত্তাকে নথ নাড়িয়া বলেন "ওগো সেক্‌রা এলে চন্দ্রহারটা গিনির গড়তে বলো"—কেন না গিনি খাঁটী নয়, তাতে কিছু তামার খাদ থাকে, তাতে স্বর্ণের বর্ণ বর্দ্ধিত হয়, ঔজ্জ্বল্য বাড়ে, পালিশ খোলে, গড়ন ভাল হয় ইত্যাদি; খাদ না থাকলে ভেৎ ভেৎ করে যেন 'মরা', আবার খাদের মাত্রা যত বাড়তে থাকে ততই সেটা কাজের বাহিরে যেতে থাকে তবে শেষ পর্য্যন্ত মেকীর চেয়ে কিছু ভাল দাঁড়ায়। পুলিশের গুণকীর্ত্তন কর্ত্তে আমি অবশ্য কলম ধরিনি সে কাজের ভার নিয়েছেন স্বয়ং লাট লীটন বাহাদুর। পুলিশের গুণ গাইতে গাইতে তিনি এমনি তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন যে কি বলছেন তা হুঁস ছিল না, নইলে সমস্ত নারী জাতিকে এমন কলঙ্কিনী বলা কি কোন বুদ্ধিমান বলে। এঘটনা যদি বাংলায় না হয়ে তাঁর নিজের দেশে ঘটত সেখানে ও তাঁর অবস্থা ঈর্ষ্যাতীত হতো না। নরম মাটীতে নখাঘাত অতি সহজ এবং সকলেই তা করে বাহাদুরী নিতে পারে। কিন্তু ভায়া আমি আশ্চর্য্য হয়েছি আমাদের দেশীয় পুলিসের আচরণে, তারা এত মতিচ্ছন্ন হয়েছে যে তাদের জননী, ভগিনী, পত্নী যে নারীজাতির মধ্যে আছেন, সেই সমস্ত নারীজাতির অপমান নীরবে পরিপাক কর্ল্লে। এটা হয়তো প্রভুভক্তির একটা বিরাট দৃষ্টান্ত হতে পারে কিন্তু মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নয়। Slave mentality একেই বলে, আর আমরা শাসিত হই এই mentalityরই জোরে। এর যোগ্য প্রত্যুত্তর হতো সেই সভাতেই তীব্রকণ্ঠে এই উক্তির প্রতিবাদে; কিন্তু পরপদলেহী, পরান্নভোজী একান্ত অক্ষম অকর্ম্মণ্য এই পুলিসকর্ম্মচারীরা জানে যে প্রতিবাদের যোগ্যতা তাদের নেই, তারা সাধারণ মনুষ্যত্বের অনেক নীচে পড়ে গিয়েছে। অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর ধাঙড় মেথর মুর্দ্দাফরাসে ও নারীর অবমাননা সহ্য করে না কিন্তু এই পুলিসেরা করে, তার কারণ এই কাপুরুষেরাই নারীর উপর অত্যাচারের জন্য দায়ী এবং নিজেদের

অত্যাচারের দোষ খণ্ডন জন্ত তাহারা নিজেদের মা-বহিনের মর্য্যাদা বলি দিতে পারে। লাটসাহেব হয় তো সমস্ত নারীজাতির অবমাননার উদ্দেশ্যে একথা বলেন নাই কিন্তু যাঁর হাতে এতবড় একটা জাতির শাসনভার ন্যস্ত করা আছে তাঁর প্রত্যেক পদক্ষেপে, প্রত্যেক বাক্য উচ্চারণে কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত নয়। সকলের চেয়ে পরম কৌতুককর ব্যাপার সেদিন দেখলুম এক পুলিস কর্ম্মচারীর ষ্টেটস্‌ম্যানে প্রেরিত পত্রে এই কায়মনোবাক্যে ক্রীতদাস—লীটন সাহেবের উক্তির প্রতিবাদে অধৈর্য্য হয়ে এই দারুণ ঘৃণ্য উক্তিকে সমর্থন করবার জন্ত কত আবল তাবল বকেছেন। যে দেশে এমন জীব জন্মগ্রহণ করে সে দেশে স্বরাজের আগমন এখনও বহুদূরে। বেতনভোগী ভৃত্য হইলেই যে আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই—এবং যে ভৃত্য একাজ করে তার প্রভু তাকে অন্তরে অন্তরে হীন কাপুরুষ বিবেচনায় ঘৃণা করেন। রাজতন্ত্রকে ত পুলীশের মনোরঞ্জন কর্ত্তে হয়, রাজনীতিপালনজন্ত, কারণ তাঁরা জানেন যে প্রজাবর্গকে দমন কর্ত্তে হলে যা কিছু অন্যায় উৎপীড়ন কর্ত্তে হয় সব এই পুলিশেই করে সুতরাং মধ্যে মধ্যে তাহাদের পিঠ না চাপড়াইলে ক্রমাগত দেশবাসীর গালি খাইয়া তাহারা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে। রাজশক্তি যেখানে ভক্তিপ্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যে দেশের প্রজা রাজতন্ত্রকে অনুরাগের চক্ষে দেখে না সেখানে পুলীশ জনপ্রিয় হইতে পারে না—হওয়া অসম্ভব সুতরাং পুলীশকে জনসাধারণে সাহায্য করে না বলিয়া তাঁহারা যে অভিযোগ করেন তাহার ভিত্তি কোথায়? তোমার সঙ্গে যে আমি সাহচর্য্য করিব, তোমাকে যে সহানুভূতি দেখাইব তাহার যোগ্য কাজ কি করিয়াছ কিসের প্রতিদানে তুমি আমায় সাহায্য চাও। রাস্তায় পাহারায় দাঁড়াও তার জন্ত তুমি বেতন পাও আমাকে তজ্জন্ত কর দিতে হয়। আমাদের হৃদয়ের কোমলস্থান কি কখনও স্পর্শ করিয়াছ—কখনও দেশবাসীর যাহাদের কষ্টোপার্জ্জিত শোণিতসম অর্থে তোমরা পুষ্ট তাহাদের প্রতি কি তোমরা সম্মান দেখাইয়াছ? তোমরা জান যে গভরমেণ্টই তোমাদের প্রভু, তাহাদের বাক্যই তোমাদের বেদবাণী, তাহাদের যে কোন আদেশ অবিচারে প্রতিপালন কর কারণ তাহার কাছ থেকে তুমি অর্থ পাও। তোমরা কারণ দেখনা, উপলক্ষ্যের মুখাপেক্ষী থাক এবং এই গভরমেণ্ট তোমাদের হাতে যে ক্ষমতা, শাসন জন্ত, ন্যায়রক্ষা জন্ত, দুর্ব্বলকে সাহায্যের জন্ত দিয়াছেন; সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া তোমরা ব্যক্তিগত বৈর-নির্য্যাতন কর, উৎকোচ গ্রহণ কর, ন্যায়কে পদদলিত কর, দুর্ব্বলকে প্রপীড়িতকর—তোমরা দেশবাসীর চেয়ে বিদেশী শ্বেতাঙ্গকে অন্যায় সম্মান দেখাও, ধনীর তোষামোদ কর, রাজকর্ম্মচারীদের মনোরঞ্জনার্থ কত না অত্যাচার কর—এতে সেই অবমানিত, দলিত, ঘৃণ্য দেশবাসীর সহানুভূতি কি জাগে? সহ-অনুভূতি, এক-তরফা জিনিস নয়—তুমি যদি আমার ব্যথায় ব্যথী হও আমার মানরক্ষায় অগ্রসর হও, দুষ্টকে দমন কর, শিষ্টকে সম্মান কর তখন আমাদের হৃদয় কি স্বতঃই তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হইবে না—নিশ্চয়। প্রকৃতির রীতি অব্যর্থ, অলঙ্ঘ্য। পুলিসের জনসাধারণের বিরাগভাজন হওয়ার আর একটা কারণ আছে। এদেশের পুলিশের নিম্নতন কর্ম্মচারীরা সবই অবাঙালী, অশিক্ষিত। তাহারা বাঙালীর অন্তরকথা জানে না, বিরাট বপু ও পাশবিক শক্তির মোহে তাহারা এত উদ্ধত হয় যে তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতেও সম্মানহানির আশঙ্কা হয়। প্রথমতঃ এই অবাঙালীরা বাঙলার অর্থ ছাড়া অন্য কিছু ভালবাসে না, দ্বিতীয়তঃ বাঙালী তাহাদের স্বজাতি নয় বলিয়া ও সাধারণতঃ তাহারা বাঙালী অপেক্ষা শিক্ষায়, সভ্যতায় হীন বলিয়া, হাতে ক্ষমতা পাইলেই তাহারা এই হীনতার ক্ষতিপূরণ জন্ত বাঙালীকে পাকেপ্রকারে প্রতি সুযোগে অবমানিত করে—তারপর এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ হীনবুদ্ধি—পশুপ্রকৃতির, ইহারা অন্যায় আচরণ করিলে যদি কেহ তাহার প্রতিবাদ করে, তবে ইহারা তাহা ব্যক্তিগত অবমান বলিয়া বিবেচনা করে ও হাতে ক্ষমতা থাকায় অন্যায়রূপে প্রতিবাদকারীকে অব-মানিত, বিপদগ্রস্ত ও নিষ্পীড়িত করে। বাঙলার পুলিশ হইতে এই অবাঙালীদের সরাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে বাঙালী পুলিশের প্রবর্ত্তন না হইলে পুলিশের সহিত জনসাধারণের সহানুভূতি কখন জাগিবে না। পুলিশ অত্যাচারীই থাকিবে এবং সাধারণে পুলিশকে চোর ডাকাতের মত ভয় করিবে—তাহাদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিবে। অত্যাচার উৎপীড়নে সহানুভূতি জাগে না, জগতে কোথাও কখন জাগে নাই আজও জাগিবে না। ভায়া হে কিছু বে-আইনী বলে ফেলিনি তো—দেখো, না থাক, আজ আসি।

তোমাদের

সদানন্দ।

महात्मा गान्धीর

ইয়ং ইণ্ডিয়া

পত্রিকার সার সঙ্কলন

(প্রতি সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে)

সঙ্কলয়িতা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বি,এস,সি

শক্তির অপব্যয় ঃ—মিঃ এম, এন, রায়, আচার্য্য রায়ের কোকনদের খদ্দর প্রদর্শনীর অভিভাষণের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বুঝিলাম যে মিঃ রায় চরকাকাটাকে কার্য্যকরী শক্তির অপব্যয় মনে করেন। তিনি বলেন কৃষকেরা ছয়মাস পরিশ্রম করিয়া যে চারমাস বিশ্রাম করে সে বিশ্রামটুকু তাহাদের আবশ্যক ইহাতে বোঝা যায় মিঃ রায় এদেশের কৃষকগণের বিষয়ে অনভিজ্ঞ। এসম্বন্ধে আমার বক্তব্য, এই যে চরকা কাটা তাহাদের পরিশ্রমের মধ্যে গণ্য হইতে পারে কিন্তু চরকা কাটায় যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা বিশ্রামকালে অন্য কোন উপায়ে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। অথচ অন্য উপায়ে সময়কাটানোর চেয়ে চরকা কাটিলে কিছু উপার্জ্জনও হয়, যাহা হয় তাহা এই দরিদ্রদেশের পক্ষে যথেষ্ট। চরকাআন্দোলন এখনও অকৃতকার্য্য হয় নাই, হইয়াছেন কেবল আন্দোলনকারীরা; এখনও পাঞ্জাব কর্ণাট ও অন্ধ্রদেশে আন্দোলন পূর্ণ বেগে চলিতেছে সেথায় কিরূপ কার্য্য হইতেছে তাহা প্রকৃতই দেখিবার যোগ্য।

চরকায় সমস্তই লাভ, লোকসান কিছুই নয়। এতভিন্ন চরকা যে আজ চলে না তাহার একমাত্র কারণ লোকের মনে দৃঢ়বিশ্বাস নাই এবং বিশ্বাসহীন হয়ে কার্য্য করা আর না করা সমান। মিঃ রায় কি বলেন যে আমাদের অর্দ্ধভুক্ত, অভুক্ত ও অর্দ্ধনগ্ন দেশবাসীর কল্যাণের জন্য যদি যুবকেরা অর্দ্ধঘণ্টা কাল চরকা কাটেন তাহা পরিশ্রমের অপব্যয়? তিনি কি বলেন যে আমাদের দরিদ্রা ভগ্নীগণ যদি অবসর-কালে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতে পারেন তাহা পরিশ্রমের অপব্যয়? চরকায় আমাদের লোকসান কিছুই নাই যতটুকু কাটা যায় ততটুকুই লাভ।

(১) চরকা দরিদ্রের জীবিকার্জ্জনের সহজ উপায়

(২) ইহার শিক্ষাপ্রণালী অতি সহজ

(৩) মূলধন লাগে না বলিলেও চলে কারণ ইচ্ছা করিলে সকলে তৈয়ারী করিতে পারে

(৪) দুর্ভিক্ষের সময় ইহা অত্যন্ত কার্য্যকারী

(৫) বিদেশে যে অর্থ যায় তাহা বন্ধ হইলে দুর্ভিক্ষ নিবারণ হয়

(৬) দেশের লোকের মধ্যে একতা স্থাপনের ইহা অতি সুন্দর ভিত্তি।

বিবেকের দোহাই—জনৈক পত্র লেখক আমায় লিখিয়াছেন—"আপনি কি জানেন যে আপনি পুনঃপুনঃ বিবেকের দোহাই দিয়ে কত ক্ষতি করিতেছেন। যার যা' ইচ্ছা সে বিনা দ্বিধায় তাহাই করিতেছে আর বিবেকের দোহাই দিতেছে। এমন কি পুত্র পিতার বিরুদ্ধাচারী হইয়া বিবেকের দোহাই দিতেছে আপনি যদি এ সমস্ত অনাচার বন্ধ করিতে না পারেন তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া বিবেক কথাটা ছাড়িয়া দিন। সকলেরই কি বিবেক আছে? বিড়াল যখন ইঁদুরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তখন সেও কি বিবেকের আজ্ঞায় সেইরূপ করে?"

আমি পত্র লেখকের অভিযোগ যে মিথ্যা এমন কথা বলিতে পারি না। তবে তিনি খারাপ দিকটাই বড় করে দেখেছেন, সব বিষয়েরই ভাল মন্দ দুই দিকই আছে। বিবেক জিনিষটা সকলেরই যে জাগ্রত আছে এমন কথা বলা যায় না। সত্য বিবেক লাভ করিতে হইলে সাধনার দরকার,

কারণ স্বেচ্ছাচারিতা, বিবেক নয়। হুজুগে পড়ে কাজ করা, আর বিবেকের অনুবর্ত্তী হয়ে কাজ করা এক কথা নয়। বিবেকের বাসভূমি পবিত্রহৃদয়ে, সুতরাং দলের বিবেক এবং ব্যক্তিগত বিবেক বলে কিছু নাই। যাঁরা কেবল 'বিবেকের পরিচালনায় এই কার্য্য করিয়াছি' এইরূপ বলিয়া দায়ে খালাস হতে চান তাঁহারাই বিবেকশূন্য কারণ সুবিবেচক ব্যক্তি কখনও নিজেকে জাহির করিতে চান না এবং তাঁরা কখনও দোষ স্বীকারে ভয় পান না। অতএব পত্রলেখক মহাশয়ের ভয় পাইবার কিছুই নাই কারণ লোকে সত্য বিবেক আর বিবেকের ভণ্ডামি এ টুকু চিনতে পারে। যাহারা ভণ্ডামি করে বেড়ায় তারা বিবেকের দোহাই দিয়ে যা' কর্চ্ছে তা না দিয়েও তাই কর্ত্ত, লাভের বিষয় যে যাঁরা প্রকৃত সুবিবেচক তাঁরা যা কর্চ্ছেন চিরকাল আমাদের মনে সেটা জাজ্জ্বল্যমান থাকবে।

ছুঁৎমার্গ পরিহারে বাধা—একজন কর্ম্মী লিখিয়াছেন—"আমরা, একটী পঞ্চম সভা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে অন্যান্য গ্রামবাসীগণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহাদের কথার ভাবে বুঝা গেল যে তাহারা এই ছুঁৎমার্গ পরিহার- আন্দোলন ভাল চক্ষে দেখে না, এবং এই গ্রামে ইহার প্রচলনের চেষ্টায় ফলে খদ্দর প্রস্তুত বন্ধ হইয়া যাইতে পারে—" ছুঁৎমার্গ পরিহার প্রচলন করা শক্ত এবং ইহার প্রচলন করিতে হইলে ছুঁৎমার্গ পরিহার অর্থে আমরা নিজেরা কি বুঝি তাহা জানাও আবশ্যক। ছুঁৎমার্গ পরিহার অর্থে আন্তর্জাতিক, বা অসবর্ণ বিবাহ এবং আহার বিহার নয় কিম্বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিলুপ্ত করাও ইহার উদ্দেশ্য নয়। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য—হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন—আমাদের যে ভুল ধারণা আছে যে জাতি বিশেষের লোককে স্পর্শ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হয় সেই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করাই এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।—ইহার প্রচলনে আমাদের গোঁড়ারদলের সহিত যে মনোমালিন্য হয় তাহা দূর হওয়া সম্ভব কারণ যুক্তি দ্বারা ঐ পার্থক্য দূরীভূত করাই উত্তম জোর দেখাইয়া কোন কার্য্যই সফল হইবে না—আমাদের উদ্দেশ্যের অতিরিক্ত কার্য্য বা সেজন্য চেষ্টা আমরা করিব না ইহা তাঁহাদের দেখাইতে হইবে নতুবা তাঁহারা মিথ্যা আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া আমাদের নির্দ্দিষ্ট ফল লাভ সুদূরপরাহত করিয়া তুলিবেন তাহাতে মনোমালিন্য বাড়িয়া যাইবে—উদ্দেশ্যও সফল হইবে না।

পথের গান

(ভিক্ষু-অকিঞ্চন লিখিত)

আমি পথিক-কবি মালাটি মোর গেঁথেছি আজ পথের গানে!
উদাস আমার আঁখি দুটি, মেলেছি তাই অশেষ পানে।
আমি রইব না আর প্রাণের-ঘেরা অন্ধকারে,
আমি আলোর পরশে পথ চিনেছি পর-পারে,
হাঠ ছেড়ে তাই মাঠের পথে চলেছি আজ উধাও প্রাণে—
ওই পথের সনে অপার যথা মিলেছে এক মহান্ ধ্যানে!

আমি নগর ছেড়ে দাঁড়িয়েছি আজ বনের পথে,
নদী তটের বটছায়ায় ব্যথা যত ঢেলে দিতে,
আমি মানুষ ছেড়ে, চেয়ে আছি দরদী ওই তরুর দানে!
তীর ছেড়ে আজ তরী আমার ভেসেছে এক উজান-বানে!
আমি পথ পেয়েচি অচেনা ওই পাহাড়-গায়ে,
রোদন যথা ঝর্ণা হয়ে বেদনায় এক যাচ্ছে বয়ে।
উদার বুকের ব্যাকুলতা বিজনে ওই বীণার তানে—
নিবিড় নীড়ে পাখির কুজন স্বরে যথা প্রাণের টানে!

নারীবিদ্রোহের মূল

পূর্ব্ব প্রবন্ধে নারীস্বাধীনতার দেশে স্বাধীনতার নামে নারীজাতির উপর কত অত্যাচার সম্ভব তাহা ও স্বাধীনতার দোহাই দিয়া নারীগণ কি স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দেন সে সমস্ত কথাই বলিয়াছি। পুরুষের বিপক্ষে নারীর বিদ্রোহ আজ নূতন নহে, চিরকাল পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া এই সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে তবে পুরাকালে এ সকল চেষ্টা তত সাফল্য লাভ করিত না তাহার কারণ নারীগণকে গ্রাসাচ্ছাদন, ও স্বীয় ধর্ম্মরক্ষার জন্য পুরুষের উপরও নির্ভর করিতে হইত বলিয়া পূর্ব্বে তখন রাজ্য সাধারণতঃ সুশাসিত ছিল না এবং জীবিকা অর্জ্জনের সমস্যা ও কঠিন ছিল; তারপর সকল নারী ততদূর শিক্ষিতাও ছিলেন না, এই সমস্ত কারণে নারীগণকে স্বাধীনতালাভের জন্য ততদূর চেষ্টাবতী হইতে দেখা যায় নাই। ঠিক কোন কোন সময়ে কোন কোন দেশে যে এই প্রচেষ্টা প্রথম ফলবতী হইয়াছিল তাহার ঠিক সময় নির্দ্ধারণ করাও আজ সম্ভবপর নহে। তবে এই সমস্যার মূলে প্রকৃতির যে অনেকখানি হাত আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। দৈহিক গঠন প্রণালীর বিভিন্নতা হেতু ও সাধারণতঃ নারীগণ পুরুষাপেক্ষা শারীরিক শক্তিতে দুর্ব্বলা বলিয়া এই বিদ্রোহ এখনও সার্ব্বজনীন হয় নাই; নতুবা এতদিন এই গার্হস্থ্য প্রশ্নের সমাধানে প্রত্যেক নরনারীকে এত ব্যস্ত রহিতে হইত যে অন্য কোনরূপ পার্থিব উন্নতি সংসাধিত হইতে পারিত না।

অনুকরণ-প্রকৃতিই মূলতঃ এই সমস্যার সৃষ্টিকারক, জীবমাত্রেই অনুকরণপ্রিয় এবং এই অনুকরণপ্রিয়তা হইতেই জীব রাজ্যে সমস্ত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। অন্যে যাহা করে, যাহা সচরাচর দেখা যায় সেইরূপ করিতে স্বতঃই জীবপ্রবৃত্ত হয়। এই জন্যই সংসর্গদোষ ও গুণ অতিরিক্তরূপে কার্য্যকর। এই প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া মানবও অন্যান্য জীবগণের ন্যায় সৎ বা অসৎ আচরণ করিয়া থাকে—নারীদিগের পুরুষযোগ্য অধিকার ও স্বাধীনতা কামনার মূলে এই. অনুকরণ প্রবৃত্তি নিহিত আছে। প্রকৃতিই ইহার শিক্ষক। অনুকরণ করা অভ্যস্ত হইলে তখন তাহা স্বাভাবিক হয় এইজন্যই ইংরাজীতে একটী প্রবচন আছে Habit is secend nature. নারীপ্রকৃতি ও অভ্যাসহেতু পুরুষপ্রকৃতির সুন্দর অনুকরণে সক্ষম হয় সুতরাং তখন তাহারা পুরুষের সমকক্ষতা যে দাবী করিবে তাহা অসম্ভব নহে।

পুরুষ ও প্রকৃতি অর্থাৎ নারী, এই উভয় শ্রেণীর সহানুভূতিতেই বিশ্ব সৃজিত, চালিত ও অনুপ্রাণিত; কিন্তু বাস্তবজগতে যে সমস্ত নরনারী আমরা দেখি তন্মধ্যে আদর্শ নর বা আদর্শ নারীর অস্তিত্ব এত অল্প যে তাহা গণনার বহির্ভূত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণতঃ আমরা যে সমস্ত নরনারী দেখিতে পাই তাহার মধ্যে নরচরিত্রে ও কিছু কিছু নারী-স্বভাব-সুলভ গুণ থাকে এবং নারী-চরিত্রেও পুরুষযোগ্য গুণ থাকে এবং এই উভয় গুণের সংমিশ্রণের মাত্রানুযায়ী বিভিন্ন নরনারী চরিত্রের বিকাশ দেখা যায়। মনে করুন, আদর্শ পুরুষের গুণের সংখ্যা ১০০ ও আদর্শ নারীর গুণের সংখ্যা ১০০। এখন কোন পুরুষ চরিত্রে যদি ৭৫ ভাগ পুরুষ-গুণ ও ২৫ ভাগ নারী-গুণ বিদ্যমান থাকে তাহার সহিত ৫০ ভাগ পুরুষ গুণ ৫০ভাগ নারী-গুণ সম্বলিত পুরুষচরিত্রের অনেক পার্থক্য থাকে—এই কারণেই কোন পুরুষ কোমল, কেহ কঠোর, কেহ সদয়, কেহ নির্দ্দয়, কেহ বীর, কেহ কাপুরুষ কেহ নারীপ্রিয়, কেহ নারীদের বিরাগভাজন হয়েন। যেহেতু সম্পূর্ণ নর বা সম্পূর্ণা নারীর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া দুর্লভ, সেইহেতু উভয় শ্রেণীর প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করাও অসম্ভব। যে সকল পুরুষে স্ত্রী ভাবের বেশী আধিক্য থাকে তাহারা স্ত্রৈণ হয় আবার যে নারী সমধিক পুরুষ-ভাবাপন্না হয়, সে কলহপ্রিয়তা, স্বেচ্ছাচারিতা, নিষ্ঠুরতা, বাচালতা প্রভৃতি দোষে দুষিতা হয় এই পুংভাবাপন্ন নারী-দিগকে হিন্দুশাস্ত্রকারগণ প্রগল্‌ভা শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে নারীজাতির বহুবিধ বিভাগের উল্লেখ আছে, তাহার সহিত আধুনিক জননবিজ্ঞানোক্ত নারীদিগের শ্রেণীবিভাগের অতি অল্পই পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ নারীদিগকে মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা নামক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। মুগ্ধা নারীরের পূর্ণ প্রতীক—ইহারা পুরুষের উপর পূর্ণনির্ভরশীল, পুরুষের আনুগত্য স্বীকার

করে,তাহার গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী হয়, সন্তানের জননী হইয়া শান্তি ও সুখদায়িনীরূপে বিরাজমানা থাকেন। মধ্যা—ইহাঁরা মুগ্ধাচরিত্রের সহিত কিঞ্চিৎ পুরুষভাব মিশ্রণে গঠিতা ইহারা স্বল্প ক্রোধবতী, গীতানুরক্তা, সহচরীসংসর্গকামিনী, কথোপকথনাভিলাষিণী অথচ পুরুষের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীলা এবং তাহারা সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার না করিলেও প্রায়শঃই পুরুষের বিরুদ্ধাচারিণী নহেন। প্রগ্‌লভা—কলহপ্রিয়া, কর্কশভাষিণী, কঠিনহৃদয়া, পুরুষভাবাপন্না বহুভাষিণী, পুরুষের প্রতিকূলা-চারিণী এই শ্রেণীর নারীরা স্বভাবতঃই স্বাধীনতাকামিনী হইয়া থাকেন এবং স্ত্রীস্বভাবাপন্ন পুরুষগণ ইহাদের সেই প্রবৃত্তির অনলে ইন্ধন যোগাইতে থাকেন।

নারী-স্বাধীনতার আন্দোলনে একদল পুরুষস্বভাবা নারীর আবির্ভাব হইতে পারে কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা সমগ্র নারীজাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর নহে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বা আন্দোলনে পাওয়া যায় না উহা ব্যক্তিগত উন্নতিরফল। একদল উন্মত্ত আন্দোলনকারীদের দ্বারা প্রকৃত উন্নতি লাভ কখন সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ নারীস্বাধীনতা-সমস্যার কারণ এই সমস্যায় পুরুষেরা নারীদের প্রতিকূল, বা প্রতিবন্ধকতার কারণ নহেন—নারীজাতির মধ্যে যাঁহারা মুগ্ধা অর্থাৎ পূর্ণনারীভাববিশিষ্টা তাহারাই এই আন্দোলনের প্রকাশ্যতঃ বিরুদ্ধাচারিণী না হইলেও প্রতিবন্ধকতার মূল। আবার মধ্যাশ্রেণীরাও এ আন্দোলনে উৎসাহবতী নহেন সুতরাং মাত্র প্রগ্‌লভা শ্রেণীর দ্বারা—যাঁহাদের সংখ্যা নারীজাতির তুলনায় অতি স্বল্প ভগ্নাংশ মাত্র—এ আন্দোলন সফলকাম হওয়া সম্ভবপর নহে।

যাঁরা এই আন্দোলনে উৎসাহী, তাঁহারা কি পুরুষ কি নারী—সকলেই ভাবেন যে এই মহৎ আন্দোলনের তাঁহারাই প্রবর্ত্তক। তাঁরা ভাবেন এই যে নারীদের জবরদস্তী দাবিয়ে রাখা হয়েছে তাদের ক্রীতদাসীর মত খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে এর তুল্য অমানুষিক অত্যাচার বুঝি কখনও হয় নাই—এটা কিন্তু সত্য নয়; এ আন্দোলন সনাতন। এবং এটাও সত্য নয় যে নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের অধীন করে রাখা হয়েছে কারণ সেটা সম্ভবপর ব্যাপার নয়। সমস্ত নারীজাতির প্রাণে যদি এই স্বেচ্ছাচারের ভাব জাগ্রত থাক্‌তো তা হলে এমন কোন শক্তি নেই যা তাহাদের অধীন করে রাখ্‌তে পার্ত্তো। নারী ভিতরে সংসারের কর্ত্তৃত্ব পেয়েছেন সেইটুকু পরিচালন কর্ত্তেই তাঁর সমস্ত সময় ব্যয়িত হয়, বাইরের দিকে তাঁদের নজর দেবার সময় নাই বা প্রবৃত্তি নাই। ইংরাজীতে Division of Labour অর্থাৎ শ্রমবিভাগ বলে যে একটা নীতি আছে নারীর অধীনতা ঠিক সেই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। পুরাকালে কৃষি, বাণিজ্য বা অন্য কোন সঙ্গত উপায়ে পুরুষ অর্থো-পার্জ্জন কর্ত্তে ব্যস্ত, থাকত সমস্ত সংসারের ভার থাক্‌তো নারীর উপর—সংসার সম্বন্ধীয় যে কোন কাজে নারী পুরুষের উপর আদেশ কর্ত্তেন পুরুষ তা নতমস্তকে পালন কর্ত্তেন এবং অনেকস্থলে এখনও তা করেন। বাইরের সব ভার কাঁধে নিয়ে থাক্‌তো পুরুষ, সে তো মনে কর্ত্তে পার্ত্তো যে সে কেন নারীর দাসত্ব কর্ব্বে। নারী যদি আজ সংসারের কাজ করাকে দাসীর কাজ মনে করেন (দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকালকার নারীদের মধ্যে কতকাংশ আবার ঝি-চাকর বা রসুইয়া ব্রাহ্মণের উপরে সংসারের চৌদ্দ আনা ভার দিয়া কেবল শুষ্ককর্ত্তৃত্ব করেন।) তবে পুরুষের এটা মনে ভাবা কি অস্বাভাবিক? আমার মনে হয় আজকাল অন্ততঃ সহর অঞ্চলে, নারীরা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা ভোগ কর্চ্ছেন এবং আজকালের পুরুষরা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী কায়িক পরিশ্রম, মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যতা ও সাংসারিক অশান্তির ভারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং নারীস্বাধীনতার মূল এসকল বাহ্যিক অবস্থা লইয়া নহে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পুরুষেরা কেবল এক বিষয়ে নারীদের চেয়ে বেশী স্বাধীনতা ভোগ করেন, সেটা হচ্ছে বহু নারীসংসর্গ সেটা অবশ্য গর্হিত; কিন্তু নারীরা একপতিত্বে আজিও বাধ্য। যদিও অন্যান্য দেশে এই একপতিত্ব চিরস্থায়ী না হইয়া সাময়িকভাবে প্রযুক্ত হয়। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝা যায় যে আধুনিক নারীবিদ্রোহের কারণ হচ্ছে এই আজীবন একপতিত্বব্রত পালন করা ও পতির বহুনারী সংসর্গে বাধা দিবার ক্ষমতাহীনতা। আঘাতের প্রত্যুত্তরে আঘাত দিবার উপায় না থাকায় সমগ্র নারীজাতির মধ্যে আজ বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে—বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশের হিন্দু-সমাজ যেখানে বিধবাবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণের রীতি এখনও সুপ্রচলিত হয় নাই।——পুরুষ।

কাজের কথা
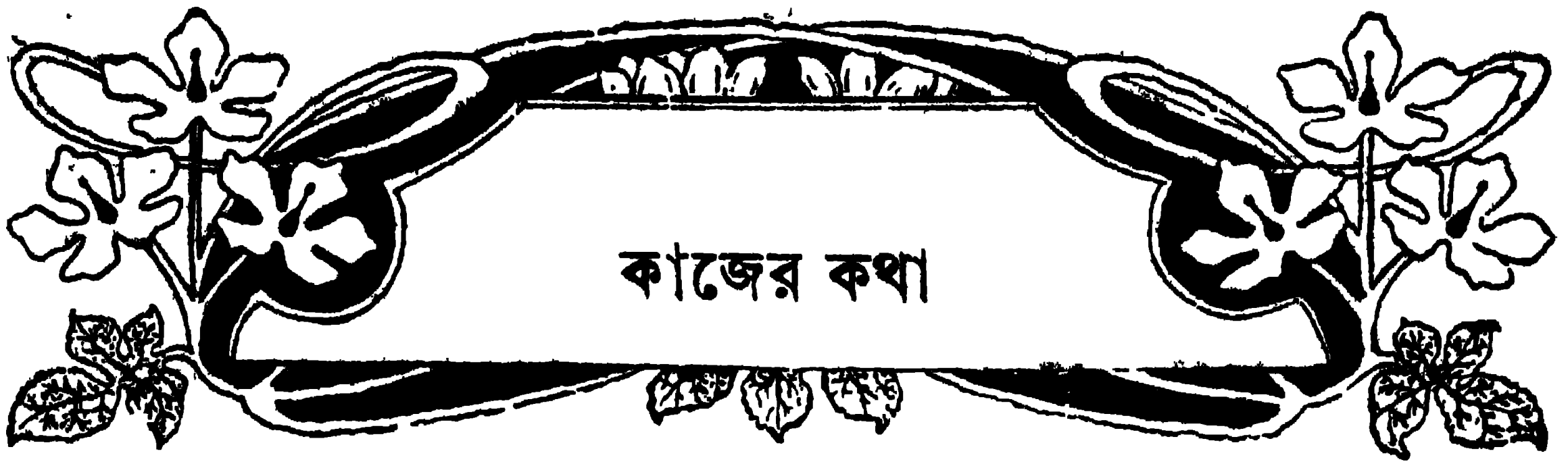
"উইমেন" ও "লেডী"

লর্ড লিটনের উক্তির যে সমস্ত প্রতিবাদ হচ্ছে ঢাকায় তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ সভা হয়ে গেছে বলে ইংলিশম্যান সংবাদ দিয়েছেন—এ সভার সভাপতি ছিলেন এক বাবু মাধুরীমোহন মুখার্জ্জি—ইনি নন্-কো-অপারেশনের প্রারম্ভে এণ্টিনন্-কো-অপারেশন নামক সমিতি গড়ে তাঁর দলস্থ স্বল্পসংখ্যক সভ্য নিয়ে বক্তৃতাদি দিয়ে নাম কেন্‌বার ও সরকারের সুনজরে পড়বার চেষ্টা করেছিলেন—তারপর কীড্ সাহেবের সহিত সার্জ্জেণ্টের মামলায় সরকারী সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এঁর স্বরূপ জেরায় বেরিয়ে পড়ে সে কথা বোধহয় পাঠক এখনও ভোলেন নি। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে এত করেও এঁর একটা খেতাব জোটে নাই সেই M. R. A. S. ছাড়া নামের আগে বা পিছে আর কিছু লিখ্‌তে পান না—গভর্ণমেণ্টের এই অবিচারেও ইনি উদ্যমহীন হন নাই, আশায় প্রাণ ধারণ করে আছেন এবং "যে মাটীতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে" নামক মহানীতির অনুসরণে এখনও বরাত ফিরাইবার চেষ্টায় আছেন। ঢাকার এই সভায় ইনি একা যান নাই, সঙ্গে ছিলেন এক মিস্ লীলা মুখার্জ্জী। ফরওয়ার্ড, নামের সামঞ্জস্য দেখে অনুমান করেছেন ইনি নাকি মুখার্জ্জী বাবুর কন্যা- ঠিক কি না অবশ্য তা বলা যায় না। তবে এই মিসিবাবার বক্তৃতা পড়লে মনে হয় যে তাঁর সঙ্গে এঁর মনোবৃত্তির অপূর্ব্ব সাদৃশ্য আছে। ইনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইউরোপীয়ানদের 'শিভালরী'র ঐতিহাসিক সুখ্যাতি ও স্বরাজীদের শয়তানীর কথা বলেছেন। আরও বলেছেন এই সব প্রতিবাদ সভাগুলি—যা সমস্ত বাংলা জুড়ে হচ্ছে—নাকি অশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত লোকদের দ্বারা পরিচালিত। এটা খুব সত্য, কারণ সভাপতি মুখার্জ্জী বাবুর মতন শিক্ষা এখনও সব দেশের লোকে পায় নি। ইনি বলেন যে লর্ড লিটনের উক্তি নাকি "Women"দের বিরুদ্ধে উক্ত এবং সেটা তাঁর মতন "লেডী"দের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। যাক বাঙলায় সমস্ত নারী যে এ শ্রেণীর "লেডী" নয় তা আমরা বুঝেছি, প্রতিবাদের সর্ব্বজনীন প্রকাশ দেখে। বাংলার সৌভাগ্য যে সমস্ত নারী, সমগ্র নারী জাতির বিরুদ্ধে প্রচারিত এই হীন উক্তির হাত এড়াবার জন্য নিজেদের "লেডী" বলে জাহির করেন নাই। এই "লেডী মিস্ মুখার্জ্জির জয় হউক" তিনি তাঁহার লেডীত্ব নিয়ে সুখে থাকুন—বাঙলার নারী সমাজের সহিত এরকম লেডীদের কোন সম্পর্ক যেন কোন কালে যেন না থাকে। এর পরও কি মুখার্জ্জি বাবু রাজভক্তির উৎকট প্রকাশের জন্য কিছু প্রতিদান পাবেন না!

রবীন্দ্র লীটন

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে নারীর অপমানে কোন প্রতিবাদ কর্ত্তে না দেখে তাঁর ভক্তবৃন্দ তাঁকে নাকি বড় উত্যক্ত করে তুলেছিল—তাই তিনি বিশ্বপ্রেম-ধ্যানে মগ্ন নেত্র উন্মীলিত করে লর্ড লিটনকে পত্রে জিজ্ঞাসা করেছেন যে তিনি যা বলেছেন তা সত্য কি না? উত্তরে লর্ড লিটন অবশ্য 'না'ই বলেছেন—তাতেই বিশ্বপ্রেমিক ভারী সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি কি আশা করেছিলেন যে লর্ড লিটন তাঁর উত্তরে স্বীকার কর্‌বেন "যে হাঁ তিনি নারীজাতির অপমান করেছেন"—এ দুরাশা তাঁর কি করে হল এবং তাঁর পত্রের উত্তর যা আসবে তা যে কোন লোক বলে দিতে পার্ত্তো এর জন্য এত পত্র লেখালেখি ও চলাচলির কি আবশ্যক ছিল? বয়সের আধিক্যে বুদ্ধিভ্রংশ হয় বলে একটা প্রবাদ আছে—সেটা যে অতি সত্য তা আজ প্রমাণিত হল। নারী-সম্মান রক্ষার এই অপূর্ব্ব কৌশলের জন্য তাঁকে একটা অভিনন্দন দেওয়া উচিত। বিলাতের ডেলি টেলিগ্রাফ্ নামক পত্র

লিখেছেন যে লর্ড লিটনকে এখন ঘরে ফিরে আসতে বলাই ভাল। এরকম রাষ্ট্রিজ্ঞানহীন শাসন কর্ত্তার হাতে বাংলার মত রাজনৈতিক-আন্দোলনে-স্পন্দিত দেশের ভার রাখা উচিত নয়। সত্য অনুভব কর্ব্বার এবং প্রকাশ কর্ব্বার সাহস এঁদের আছে। কিন্তু সখী আনন্দবাজার এসম্বন্ধে নীরব কেন? কবীন্দ্রের আচরণের প্রতিবাদ কর্ত্তে "কেমন কেমন করে আমার মন" হয়েছে নাকি?

জার্নালিষ্ট এশোসিয়েশন—গত শনিবার অপরাহ্ন ৫ঘটীকার সময় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভ্যশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অনেক গণ্যমান্য সংবাদপত্রসেবীর শুভাগমনে সভা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। ষ্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের অনেকগুলি শ্বেতাঙ্গ সংবাদ-পত্রসেবী ও এই সভায় যোগদান করিয়া সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছিলেন। এমন কি সভাতে ক্ষণেকের জন্য মিঃ এস আর দাশকেও দেখা গিয়াছিল বক্তা শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার সম্পাদকীয় জীবনকথা আবৃত্ত করেন—সেগুলি সংবাদপত্রের ইতিহাস হিসাবে বেশ মূল্যবান ও সারগর্ভ। সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় বক্তা ও সমাগত সভ্যদের ধন্যবাদ দান করিলে সভাভঙ্গ হয়। সৌহৃদের প্রতীক সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুমহাশয় ও তাঁহার সহকারীদ্বয়ের সাদর অভ্যর্থনায় সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন—সভায় জলযোগের ও সুব্যবস্থা ছিল। এইরূপ সম্মিলনে সভার কার্য্যশক্তি যে শীঘ্রই প্রসারিত হইবে ও সমস্ত সম্পাদক-মণ্ডলীর মধ্যে যে একটা প্রীতির আদান প্রদান চলিবে তাহাতে সংবাদপত্রের স্থান গভরমেণ্টের ও সাধারণের চক্ষে অনেক উন্নত হইবে।

সোজাবানান—ইংরাজী বানানকে সোজা করিয়া চলিয়া সাজিবার জন্য প্রায় দশহাজার লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন বোর্ড অব এডুকেশনের নিকট মিঃ সি, বি, ট্রীভ্‌লীন, এম্ পির মারফত পাঠান হইয়াছে। এবং বোধহয় এ সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় একটী কমিশন বসাইবেন কারণ স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে সার রবার্ট-বেডেন পাওয়েল, ম্যাকনামরা আর্থর হেণ্ডারসান প্রভৃতি নামজাদা লোক আছেন। বাংলায় 'কী'রদল এইসঙ্গে একটা আন্দোলন জুড়িয়া দিলে ভাল হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে "ব্যাকরণ দুষ্ট" বলিয়া সমালোচকগণ আর তাঁহাদের ভয় দেখাইতে পারিবেন না।

তারকেশ্বর—যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে। হিন্দুর পুণ্যতীর্থ তারকেশ্বরে গুলি চলিয়াছে—গুলি চালানোয় সত্যাগ্রহ প্রশমিত হয় না—তবে জনগণকে উত্তেজিত করিয়া তাহাদিগকে দাঙ্গাহাঙ্গামে বাধ্য করিয়া এই সত্যাগ্রহ ভাঙ্গিয়া দিবার ইহা একটা কৌশল হইতে পারে। তবে এখানে ইহা ফলদায়ক হইবে কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ। গভরমেণ্ট অবশ্যই একটী কাম্যুনিক বাহির করিয়া নিরীহ পুলিশ যে তাহাদের প্রাণরক্ষার্থ ফাঁকা আওয়াজ করিয়াছিল ইহাই বলিবেন। দেশবাসীর এখন কি করা উচিত তাঁহারা ঠিক করুন, কারণ অনেক সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মাচারহীন বিলাসব্যসনরত মোহন্তকে সরকারের এরূপ-ভাবে সাহায্য করিবার তাৎপর্য্য কি? ইহা কি জনগণের বিরুদ্ধে—ধনবানের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে করা হইতেছে? লেবার গভরমেণ্ট কি এইরূপ নীতিতে রাজ্যশাসন করাইবেন নাকি?

মন্ত্রী বিসর্জ্জন—বহু চেষ্টা যত্ন যোগাড়, প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াও মন্ত্রীদ্বয় বেতনের টাকা পাশ করাইতে পারিলেন না। এইবার নিরুপায় হইয়া তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে হইবে। প্রথমবার বেতন প্রত্যাখানের পর পদত্যাগ করিলে তাঁহাদিগকে সাধারণের চক্ষে এতটা অপদস্থ হইতে হইত না। মল যদি খসাইতেই হয় তবে লোক হাসিবার পূর্ব্বে তাহা খসাইলেই ভাল হইত। তাঁহাদের এই কম্বলী নেহি ছোড়তা ভাবটা তাঁহাদের পরাজয় কল্পে স্বরাজ্যদলের প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।

সাহিত্য-সমালোচনা

ভারতবর্ষ, ভাদ্র—এ মাসের ভারতবর্ষের প্রথম প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'আত্ম-সংযম'। ইনি বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বসন্তকুমার, কারণ এর পরেই যে কবিতাটি আছে সেটি কবি বসন্তকুমারের অর্থাৎ পোষ্টাফিসের বসন্তদাদার। আত্ম-সংযম প্রবন্ধটী সুলিখিত হলেও অপাঠ্য কারণ এর মধ্যে দু' ঝুড়ি সংস্কৃত শ্লোক আর তার তর্জ্জমা থাকায় দেখতে ঠিক শঙ্কারুর মত। এই জাতীয় প্রবন্ধ যত না লেখা হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের ততই উন্নতি হবে। কবি বসন্তকুমারের জন্মাষ্টমী কবিতাটী রবীন্দ্রনাথের Old Schoolএর সুতরাং মন্দ নয়। শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর দানের মর্য্যাদা ও ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'রাজগী' ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। মাঝখানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার "ভারতীয় সংবাদপত্রের" মস্তকে একটা পদাঘাত করেছেন, তাঁর এই জ্যাঠামো ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে, কিন্তু ভারতবর্ষ বা প্রবাসীর মত অতিকায় মাসিকপত্র বিনয়কুমারের মত লেখা না পেলে কোলে না। বীরভূমের ঐতিহাসিক, সাহিত্যরত্ন শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় "চণ্ডীদাসের নূতন গান" প্রবন্ধে পুরাণো রাগের ঝাল ঝেড়েছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন বইখানি বাহির হওয়ায়, তাঁহার বীরভূমমাতার মান একটু খাটো হয়েছে। এই শ্রেণীর লেখক চণ্ডীদাস বা রবীন্দ্রনাথকে সমস্ত বাঙ্গালাদেশের সম্পত্তি বলে মান্‌তে চান না। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কাল নির্ণয় বোঝবার ক্ষমতা তাঁর নেই অথচ কামড়াতে ছাড়েন না। এই জাতের লেখা ভারতবর্ষে শোভা পায় না। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোষ্ঠির ফলাফল ক্রমশঃ প্রকাশ্য লেখা। এবারকার ভারতবর্ষে বিবিধ প্রসঙ্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্রের "রাজর্ষি রামমোহনের রচনা রীতি" নিবন্ধটী বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী ঘোষের "ছানী" ও শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষের "সোনার তরী" সহ্য করা যায় কিন্তু শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল রুদ্রের "ইংলণ্ডীয় শাসন-পদ্ধতি" একেবারে অসহ্য। রুদ্র মশায় না জানেন বাংলা, না আছে তাঁর বিষয়ের জ্ঞান। তিনি ইংরেজী বই থেকে তর্জ্জমা করে এই অপাঠ্য প্রবন্ধটী লিখে সময় নষ্ট করেছেন, পাঠকদের এবং তাঁর নিজের। শ্রীসুজননাথ মিত্রমুস্তৌফীর "গঙ্গাতীরে" প্রবন্ধটী বেশ ভাল লেখা, এমন সরল ভ্রমণের কথা সকল মাসিকের ছাপা উচিত। শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ দাসের "চিঠি" গল্পটী Plot শূন্য। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের পরকীয়াবাদের চরম পরিণতি। গল্পটীতে মাথামুণ্ড কিছুই পাওয়া গেল না। ভারতবর্ষের প্রবীণ সম্পাদক এ জিনিষ যে কেন ছাপ্‌তে গেলেন তা' বুঝতে পারা গেল না। "বিজ্ঞান ও সভ্যতা" নামক প্রবন্ধের রচয়িতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ সাহিত্যে একটা বড় রকমের 'খাঁসা' যা' তা' লিখতে তাঁরা কিছুমাত্র বাধে না। তিনি লিখেছেন এই Phoenician জাতির পতনের পর য়ুরোপে "ভেনিস্" দেশবাসী ইতালীয়রাই বড় ব্যবসাদার জাতি হইয়া উঠিয়াছিল।" লেখক মশায়কে ভূমধ্য সাগরের গ্রীক উপনিবেশের ইতিহাস একখানি কিনে পড়তে অনুরোধ করি। তিনি আবার লিখেছেন "সেই কারণ তাহারা ভেনিসে আসিয়া পড়াতে দেখিল যে, তথায় কোন বন জঙ্গল নাই'—ঘোষ মশায়কে একখানি ভূগোল কিনে পাঠান উচিৎ। ভিনিসের দ্বীপপুঞ্জ ইতালি দেশ থেকে কত দূরে অবস্থিত এবং হুনরাজ Attilaর মৃত্যুর পরে ইতালি দেশে কয়জন বিশুদ্ধ রোমান বা লাতিন ভিনিসে গিয়া বাস করিয়াছিল? ঘোষ মশায় এই রকমের বাজে প্রবন্ধ লিখে অতিকায় মাসিকের লম্বোদর পোরাবার চেষ্টা না করে একটু বুঝে সুঝে লিখলেই পারেন।

এ মাসের ভারতবর্ষের দ্বিতীয় গল্প শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "বাজীকর"। গল্পটী ভাল। নিতান্ত ছোট বটে কিন্তু করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্তের "ভাদরে" কবিতাটি ছন্দঃ শূন্য, দ্বিতীয় লাইনেই গরমিল। ভারতবর্ষের নিখিল প্রবাহ এবারে শ্রীনরেন্দ্র-

দেবের কোথা থেকে ভেসে সৌরেন্দ্রচন্দ্র দেবের কোথায় উঠেছে। অনুবাদক বদ্‌লে ভারতবর্ষের সম্পাদক বিশেষ কিছুই সুবিধে করতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসুর "পায়ের ইঙ্গিত" কবিতাটী নেহাৎ পাদপূরণের কবিতা, জায়গায় জায়গায় অর্থহীন যথা :—

"তোমার তাঁতের শাড়ীর খয়ের রঙে চওড়া পা'ড়ের বুকে
আমার নয়ন তারার দৃষ্টি হারায় কোন মাধুরীর মুখে।"

ভিক্ষু অকিঞ্চনের লেখা "মাতৃমঙ্গল" সুলিখিত সন্দর্ভ। আমাদের দেশে নারী সমস্যা উপস্থিত হয়নি। অনেক-দিন ধরে যে পুরুষ সমস্যাটা আছে সেইটেই ভীষণ রকম আকার ধারণ করেছে। এখনও বাঙ্গালা দেশের মা, স্ত্রী ও ভগিনী নারীই আছেন। শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশীর মতে তাঁরা যে সকলেই দশ বৎসরের মধ্যে বেশ্যা হয়ে দাঁড়াবেন তা বোধ হচ্ছে না। আমাদের দেশে পুরুষ জাগরণের প্রয়োজন, তা না' হলে সত্যি সত্যিই নারীরা বিদ্রোহী হবেন। শ্রীনরেন্দ্রদেবের "পুষ্পবাণ" নামক কবিতা বইখানির সমালোচনা ভালই হয়েছে। শ্রীশচীন্দ্রকুমার সরকারের "বর্ত্তমান ভারতের ক্ষাত্রশক্তি" নামক দু পাতা প্রবন্ধটী একেবারে অপাঠ্য। চয়নের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চীন ও জাপান ভ্রমণের অজুহাত দেখিয়েছেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার ভাদুড়ী "দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যে প্রেম" লেখাটী কেবল স্তুতিবাদ। লেখক দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাতী প্রেমের প্রশংসা করিতে গিয়া কেবল সত্য গোপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষের "মাতৃবাণী" কবিতাটি সুন্দর।

এ মাসের ভারতবর্ষের তৃতীয় গল্প শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "অজানার ডাক" একটী অসম্ভব বেশ্যা বাড়ীর অসম্ভব গল্প। দেখে বোধহয় কোন বিলাতী গল্পের অনুকরণ। এখনকার দিনে বারনারী সমাজ নিয়ে গল্প বা প্রবন্ধ লেখাটা বড় Fashionable হয়ে পড়েছে সুতরাং যাঁরা বেশ্যার বাস্তব জীবন দেখেন নি তাঁরাও বেশ্যা নিয়ে গল্প লিখতে আরম্ভ করেছেন। হায় আচার্য্য শরৎচন্দ্র, বাঙ্গলক্ষ্মীর দেশীচরিত্রের এই কি পরিণাম? এ মাসে ভারতবর্ষের সতের পাতা জুড়ে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব আস্ট্রেলিয়ার পরিবর্ত্তে "ফিলিপাইন" চালিয়েছেন। অনেক স্ত্রীলোকের ছবি আছে সুতরাং চল্‌বে ভাল। শ্রীপ্রবোধ-নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চির তরুণ" কবিতাটি নেহাৎ মন্দ নয়, শ্রীযুক্ত মহম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরীর "বাদলে" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের অজীর্ণ অনুকরণ, সেরদরের জিনিষ। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "কেষ্ট পাওয়ার ফল" গল্পটী সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী। এইরূপ গল্পেই কথা সাহিত্যের উন্নতি হয়।

শ্রীবজ্রাঙ্কুশ

প্রার্থনা

শ্রীমুরারিমোহন ভূইঞা বি,এ

চাহি না প্রভো (আমি) বিশাল বক্ষঃ শান্ত গভীর বারিধির।
হিমালয় দেব, চাহি নাই আমি, সদা উন্নত যার শির।

নির্জ্জন প্রদেশ চাহি না'ক আমি ধ্যান ধারণার ক্ষেত্র।
সরসীর তীর, ছল্ ছল্ নীর, জুড়ায় দেখিলে নেত্র।

মুক্ত আকাশ মলয় বাতাস, অথবা শ্যামলা ধরণী।
হৃদয়ের ধন—শুধু চাহি আমি তোমার চরণ-তরণী।

সমালোচনার মূল্য—গত সংখ্যায় আমরা মডার্ণ থিয়েটারের 'রৈবতক' সমালোচনা করিয়াছিলাম যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি ; কিন্তু কয়েকটী সংবাদপত্রে এই অযোগ্য অভিনয়টীকে নানা স্তুতিবাদে অলঙ্কৃত করা হইয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। এক প্রৌঢ়া দৈনিক এই পৌরাণিক নাটক অভিনয়ের মধ্যেও Back to the Vedas রূপ মহাত্মা গান্ধীর উপদেশের গন্ধ পাইয়াছেন। মহাত্মার দোহাই দিয়ে কাগজ কাটে তা জানি, কিন্তু সেটাকে যেখানে সেখানে এমন ভাবে তালি মারিয়া দেওয়াটা হাস্তকর তা কি এই অভিজ্ঞা সহযোগিনী জানেন না। এ ব্যাপারে মহাত্মার কোন হাত নাই ইহার কারণ উপযুক্ত সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকের অভাব। পৌরাণিক যুগের নাটক খুব জমকালো দৃশ্যপটে ও সাজসজ্জায় সহজে জমিয়া যায় বলিয়া ইহার প্রবর্ত্তন হইতেছে। অভিনেতৃবর্গের কণ্ঠস্বর রঙ্গমঞ্চের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও এই গরীয়সী সেই অভিনয়ে প্রতিভার বিকাশ দেখিয়াছিলেন (ভাগ্যে শোনেন নাই) এবং এই নাটকের কোন দৃশ্যে সখী প্রাচীন যুগের আদর্শ দেখিয়াছেন তাহাও স্পষ্ট বলেন নাই। পাশাঞ্জন চক্ষে দিয়া অনেক এমন জিনিস দেখা যায় যাহা সাধারণের চক্ষে পড়ে না তবে এরূপ সমালোচনা করিলে দর্শকগণকে অযথা প্রলুব্ধ করা হয় সেটা সখীর জানা উচিত ছিল। একখানি কেবল রঙ্গালয় সম্পর্কীয় সাপ্তাহিকের বেচারা সম্পাদক অভিনয় দেখিতে দেখিতে মধ্য পথে রণে ভঙ্গ দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তথাপি সমালোচনা মুলতুবী রাখিয়াছেন—কারণ অসত্য লিখিতে মনে বাধে, সত্য লিখিলে থিয়েটারের বিজ্ঞাপনটী হাত ছাড়া হয়—সেইজন্য শ্যামও কুল দুইই রাখিয়াছেন। সত্য সমালোচনার স্পর্দ্ধাকারী পত্রিকার ইহা যোগ্য আচরণ হয় নাই। আর একখানি থিয়েটারের গাঁয়ে-মানেনা-আপনি-মোড়লরূপ সাপ্তাহিক ও ঐরূপ বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে লুব্ধ হয়ে বড় মুস্কিলে পড়ে গেছেন। তাঁরা দুকলম বিজ্ঞাপনের বাধ্য-বাধকতায় দুকলম সমালোচনা করবার পর উপসংহারে লিখেছেন আজ আর কিছু বলিতে পারিলাম না—আবার ভবিষ্যতে বলিব। এঁরা সকলেই আশা কর্চ্ছেন যদি অভিনেতারা কোন রকমে সামলে নিতে পারেন তাহলে একটু ভাল লিখে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করবেন—কিন্তু আমরা বলি যে সে দুরাশা মাত্র। আমরা যে অশ্রুত পত্রপাঠের কথা পূর্ব্বসংখ্যায় বলেছিলাম সেটা শুনছি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর এবং প্রৌঢ় ভদ্র লোকটীর নাম হচ্ছে প্রফেসার মন্মথমোহন বসু। ইনি সখের উপর সব জায়গায় নাট্যাচার্য্য রূপে ফোড়ন দিয়া থাকেন তা আমরা জানি—কিন্তু অভিনয়ের দৌড়ের কথা না জানিয়া ঐরূপ সার্টিফিকেট দেওয়ায় সাধারণ দর্শকদের তাঁর নাট্যজ্ঞানের উপর সন্দেহ জন্মিয়াছে। এঁদের নৃত্যের সহিত সীতার নৃত্যের তুলনা এক উন্মাদ ভিন্ন অপরে করিতে পারে না। এই অযোগ্য অসামঞ্জস্য দৃশ্য-পটের মাঝেও এঁরা উন্নত রুচির ও রঙ্গনাট্য জগতে নববসন্তের আভাষ পাইয়াছেন। বিজ্ঞাপন হে! তুমি বিচিত্র শক্তিশালিনী, ক্রিপাস হে! তুমি যাদুকরী, তোমাদের মোহিনী মায়া সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করিবে ইহা আশ্চর্য্য নয় ; কারণ "অখণ্ড মণ্ডলাকারং"

রৌপ্যদেবতা তুমিই জগতের সর্ব্বকর্ম্মের নিয়ামক। এঁরাও দ্বিতীয় অঙ্কের বেশী সহ্য করিতে পারেন নাই তাও লিখিয়াছেন তবে সেটাকে একটু কোমল করে, আবরণ দিয়ে এবং সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টির চেষ্টা তাতে যথেষ্ট বিদ্যমান।

একদল নূতন উঠেছেন যাঁরা প্রাচীনযুগের কিছুই মানতে চান না তাঁদের চক্ষে পুরাতনের সবই খারাপ ভাল যা কিছু সব 'নূতন' অর্থাৎ তাঁরা। যাঁরা অতীতের কিছু দেখেননি, অতীতের কথা পড়েননি, তাঁদের মুখে একথা অশোভন নয়—কারণ তাঁরা জানেন না যে অতীতই বর্ত্তমানের জনক, বর্ত্তমানটা তাঁদের মত ভুঁইফোড় নয়—এঁদের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় স্বল্প হলেও সে অভাবটা এঁরা পূর্ণ করে রাখেন সবজান্তাগিরীতে।

এঁরা রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত নাটক রক্তকরবী নাকি কবির মুখে শুনে ভাবসমুদ্রে পড়ে খাবি খাচ্ছেন আর বলছেন যে তার তুলনায় আমাদের দেশের নাটক যে কী (?) তুচ্ছ ইত্যাদি। এই কীএর দল নাকি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠকবিদের রচিত নাটক পড়ে ভাবেন যে আমাদের দেশের রঙ্গালয়ের বিখ্যাত নাট্যকারগণ কি ছেলেখেলাই না করেছেন। যাক্ ভাগ্যিস এঁরা করুণা করে শ্রেষ্ঠ কবিদের নাটকগুলো পড়েছেন নতুবা গিরীশবাবু, ক্ষীরোদবাবু, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারগুলি ছেলেখেলা করেই আমাদের ভুলিয়ে রাখতেন। হে নাট্যজগতের কলম্বস তোমার অপূর্ব্ব আবিষ্কারে বাংলার নাট্যজীবনে আজ একটা ভূমিকম্প ঘটিল।

এ ভূমিকাটুকু কলম্বস মহাশয় করেছেন রবীন্দ্রনাথের এখনও অপ্রস্ফুটিত নাটকের পরিচয় দেবার জন্য—এ নাটকে নাকি বিরহ, ঈর্ষ্যা, শোকদুঃখ বা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ব্যাপার নাই এটা নাকি আধুনিক সভ্যতার স্তূপীকৃত নানা জটীল সমস্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটা ভয়ানক রকম বিরাট কল্পনা প্রসূত ও বিচিত্ররূপে গঠিত। কলম্বস শেষে অনেক বক্তিমে করে বলেছেন, এ বিশ্বের সামগ্রী; এটা আর বেশী অন্যায় কথা কি—বিশ্বপ্রেমের কবি যে বিশ্বের জন্য ছাড়া নাটক লিখবেন না, তা তো জানা কথাই। তারপর নাট্য-কলম্বস আক্ষেপ করে বলেছেন এ নাটককে গ্রহণ সমস্ত পৃথিবীর করতে বিলম্ব হবে না কেবল তার জন্মভূমির কোনো নাট্যশালার এখনও সে রকম শক্তি অর্জ্জিত হয় নাই এবং তাকে বরণ কর্ব্বার মত রসগ্রাহিতা আমাদের জনসাধারণের নাই। যদিও এই কলম্বসই বলেন যে পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সমকক্ষ অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় এই বাংলাদেশেই সশরীরে বিরাজ কর্চ্ছেন। আর দেশের লোক—সে সব বদরসিকদের কথা ছেড়ে দাও—কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে আর সারকুলার রোডের কাছে কয়েকটা কাব্যরসিক ভাগ্যে পাওয়া যায় নতুবা কবীন্দ্রকে যে এই অরসিক দেশের লোকদের নিয়ে কি (না, না—কী) জ্বালাতন হতে হত তা বলা যায় না—সেই পুরাকালের, স্বপ্ন অতীতের একটা কথা ছিল "অরসিকেষু রসস্য নিবেদন শিরসি মা'লিখ মা'লিখ।"

যোগ্যতার প্রশংসা কর্ত্তে হয় সেটা সর্ব্ববাদী সম্মত। শিশিরবাবুর অভিনয়ে অনেকেই সুখ্যাতি করেছেন কিন্তু সুখ্যাতিরও একটা সীমা আছে। নাট্য-কলম্বস প্রথমে দেশবন্ধুর এক লিখিত প্রশংসাপত্র মুদ্রিত করলেন তারপর অবনীন্দ্র ঠাকুরের সার্টিফিকেট ছাপিয়েছেন; শিশিরবাবুর অভিনয় পূজনীয় রবীন্দ্রনাথকে দেখাইয়াছেন এবং লিখিত কিছু আদায় কর্ত্তে না পার্লেও তিনি যে প্রশংসা করে গেছেন সেটা জাহির করেছেন। আবার ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্তশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী প্রশংসাপত্র ছাপান হল—এগুলো তাঁরা কেন করেন? এটা কি সত্যই নিঃস্বার্থ প্রশংসা—অন্য কাগজেই বা এরকম নিঃস্বার্থ প্রশংসা ব্যক্ত হয় না কেন—এতে সত্যই মনে হয় এঁরা শিশির বাবুর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নন—এই গুপ্ত সম্পর্ককেই সাধারণে 'ধামাধরা' বলে।

তারপর আমরা আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম শরৎবাবুর পত্রখানি পাঠ করে, তিনি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন এবং বসুমতীর বিজ্ঞাপন কলমের "সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের শূন্য সিংহাসনের অবিসম্বাদী অধিকারী" হয়েছেন—কিন্তু সেটা এখনও প্রমাণিত হয় নাই এবং নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর কথা যে দেশের লোকে বেদবাক্য বলে গ্রহণ করবে তার ও কোন নিশ্চয়তা নাই। জানি একদল স্তাবক তরুণ, তাঁর অসংলগ্ন উচ্ছৃঙ্খল

শ্রীচরিত্রের নাস্তে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মনস্তত্বের অবতার ভাবে ও পূজা করে কিন্তু সেটা সার্বজনীন নয়। বাংলার সমস্ত লোক যে স্তাবক নয় কথাটা বুঝবার মত বয়স চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অবশ্য হয়েছে। তিনি কোন সাহসে বলেন "শিশিরবাবুর অভিনয় দেখবার সময় বহুবারই মনে হয়েছে যে বাঙলা দেশের সমস্ত অভিনেতাই যে সবিনয়ে ইঁহার কাছে আপনাদের শিশু বলিয়া মনে করেন—তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই" সমস্ত অভিনেতারা যে এমন একটা মহাপাতক করেছেন তা তিনি কিসে বুঝলেন—তাঁর নিজের কথা তিনি বলতে পারেন কিন্তু সমস্ত অভিনেতাদের তরফ থেকে এমন একটা কথা বলা ধৃষ্টতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর জানা উচিত যে এ উপন্যাস রচনা নয় যে, যা' তা' মনস্তত্বের দোহাই দিয়ে চলে যাবে, এ বাস্তব প্রত্যক্ষ ঘটনা এরূপ কল্পনা বা ঐরূপ উদ্‌ভ্রান্ত মনস্তত্ব আলোচনার স্থান —কলম্বস মহাশয় যা বিশী মহাশয়ের সম্বন্ধে বলেছেন অর্থাৎ—বহরমপুর।

আমাদের সমালোচনার সমলোচনা এক নবীনা সহযোগিনীর মনঃপুত হয় নি কারণ তার মধ্যে তাঁহাদের দ্বারা নিন্দিত কয়েকটা কথার প্রতিবাদ ছিল। প্রতিবাদ অসঙ্গতই হউক আর ন্যায়সঙ্গতই হউক কাহারও মুখরোচক হয় না—এ যুগের নীতিই হচ্ছে ছলে বলে কৌশলে স্বমতের প্রতিষ্ঠা। Set Scene সম্বন্ধে সখী বলেন যে যাঁরা পয়সা দিয়ে দেখ্‌তে গিছলেন তাঁরা সকলেই হাঁকিয়ে উঠেছেন—সখীর জ্ঞাতার্থ আমরা নিবেদন করছি যে আমরাও পয়সা দিয়ে গেছ্‌লাম আমাদের আশে পাশে অনেক ভদ্রলোকও পয়সা দিয়ে গিয়ে বসেছিলেন কিন্তু কাকেও আমরা হাঁকাতে দেখিনি। এ থেকে অনুমান কর্ত্তে হয়, যে সখী যেদিন 'সীতা' দেখ্‌তে গিছলেন তাঁর আশে পাশে কয়েকটী হাঁকানীর রুগী এসে বসেছিলেন আর নয় এঁদের অভিনয়ের সাফল্য দেখে সখী গাত্রদাহে হাঁফিয়েছিলেন। Set Sceneর ব্যবধান সময়ের দীর্ঘতা আমরা অস্বীকার করিনি এবং তা ক্রমশঃ শুধরে যাবে এই কথাই বলেছি। একটা উৎকৃষ্ট অভিনয়ের এরূপ ত্রুটী পয়সা দিয়ে দেখলেও ধর্ত্তে নেই একটু আধটু ক্ষমা করাও অভদ্রোচিত নয়। এতে আমাদের 'মাসী' বলে সখী ঠাট্টা কর্চ্ছেন প্রত্যুত্তরে আমরা যদি তাঁকে 'রাঙা ঠানদি' বলি তাহলে সেটা বড় অসভ্যতা প্রকাশ করা হয় কারণ সখীকে রোজ বিকেলে সেজে গুজে মাণিকতলা থেকে বেরুতে হয়। অভিনয়ে যা পরিবর্ত্তন হয়েছে সে কথাও আমরা স্বীকার করেছি এবং সেটা ভাল হয়েছেই বলেছি তবে সেটা সখীর ইঙ্গিত মত হয় নি। দু একটী দৃশ্য বাদ দেওয়া হয়েছে—কৌশল্যাকে যথা সম্ভব কম দেখাবার জন্য, কারণ এই অভিনেত্রীকে রাজমাতা রূপে বড়ই বিসদৃশ দেখিয়েছিল সুতরাং নেহাৎ অত্যাবশ্যকীয় দৃশ্য ব্যতীত শিশিরবাবু এঁকে সর্ব্বত্রই অন্তহিত রাখতে চেষ্টা করেছেন এটা শিশিরবাবুর যোগ্য আচরণ হয়েছে। তবে এ পরিবর্ত্তনের জন্য বাহাদুরী নেবার চেষ্টা, সখী না করলেই ভাল কর্ত্তেন; কারণ তাঁর ইঙ্গিত মত শিশিরবাবু শূদ্রক সভার পরিবর্ত্তন করেন নি এবং এসব পরিবর্ত্তন Set Scene দেখান জনিত হাঁকানিকমানর জন্যও করা হয় নি। এতে আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ কিছু নেই এবং সখীরও কেরামত দেখাবার মত কিছু ঘটেনি।

নৃত্য সম্বন্ধে হ্যাণ্ডবিলে কি লেখা ছিল সেটা অবশ্য আমরা দেখিনি—এবং দেখবার কোন আবশ্যকতাও হয় নি। কারণ আমরা অভিনয় সমালোচনা কর্ত্তে বসে হ্যাণ্ডবিল সমালোচনা করি না। সখীর কাছে হ্যাণ্ডবিলের কদর বেশী কারণ তাঁর পৃষ্ঠে ষ্টার থিয়েটারের সচিত্র হ্যাণ্ডবিল মাঝে মাঝে দেখা যায়। প্রথম সমালোচনায় আমরা নৃত্যেরই প্রশংসা করেছিলাম কারণ কে নৃত্য দিয়েছেন তা আমরা জানিতাম না—পরে সখীর মুখেই শুনেছি যে "নাচিয়ে হেমেন্দ্রলাল" ও "ভারতী সম্পাদক মণি বাবু" এ নৃত্য দিয়েছেন—ভাল নৃত্য যিনি দিতে পেরেছেন তিনি অবশ্য সুখ্যাতির যোগ্য তা তিনি কবিই হোন বা সম্পাদকই হোন।

তারপর শূদ্রক সভায় শূদ্রনারীগণের সম্বন্ধে সখী প্রথমে নটুকের কথা লিখেছিলেন বাস্তবিক সেটা ছিল না তাই সখী এখন সেটা প্রত্যাহার করে সুর পাল্টে অন্যান্য দোষের কথা বলেছেন—সখীরে তার চেয়ে বল না কেন "তুই জল ঘোলা করিস্‌নি বটে তবে তোর বাপ জল ঘোলা করেছিল।"

Stage Craft নামক ভীষণ জিনিষটার সঙ্গে আমরা অবশ্যই পরিচিত নই কারণ বিলাতী আইনে এদেশের সাজসজ্জা, উঠাবসা, কিছুই চল্‌তে পারে না বলে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের দেশের আবহাওয়ার যা কিছু অনুকূল তাই আমরা স্বাভাবিক মনে করি এবং সেটার প্রশংসা করে থাকি। সখীকে অবশ্য এসব কেতাব পড়তে হয় কারণ থিয়েটারের বিশেষের ওকালতনামা নিয়েই তিনি আসরে নেমেছেন। কোন থিয়েটারের প্রশংসা ও নিন্দায় আমাদের কিছু যায় আসে না, আমরা ভাল দেখিলে ভাল বলি ও মন্দ দেখিলে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার খাতিরেও তাকে ভাল বলি না। স্তাবকের দল মানুষকে বড় কর্ত্তে পারে না ছোটই করে, এ জ্ঞান আমাদের আছে; সেই জন্যই আমাদের সমালোচনায় স্তাবকতা নাই। তবে নিন্দুকের নিন্দায় মহৎকেও ক্ষুণ্ণ করে,উৎসাহহীন করে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেয় সেইজন্যই প্রতিবাদ করেছিলাম। সখীর মত বিশিষ্ট থিয়েটারের স্তাবকতায় পারদর্শিনীর মুখে এসব কথা ভাল মানায় না। শিশিরবাবুর হিতাকাঙ্ক্ষিণী তিনি হতে পারেন না কারণ তাঁর স্বার্থ অন্যত্র বিজড়িত এবং সেটা তাঁর সর্ব্বাঙ্গেই প্রকটিত।

এই প্রবন্ধেই দেখতে পাবেন যে প্রকৃত স্তাবকদের আমরা ছাড়ি নাই। আমরা চাই উৎকৃষ্ট অভিনয়, উৎকৃষ্ট দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা—উৎকৃষ্ট আবৃত্তি উৎকৃষ্ট ভাবাভিব্যক্তি। সাধারণকে চোখ্‌ঠারা আমাদের উদ্দেশ্য নয় তাদের চোখ্ খুলে দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। সখী তোমার প্রিয়তমদের অভিনয় ভাল হইলে আমরা ভাল বলিব এবং মন্দ হইলে খারাপ বলিয়া তোমার শ্রীমুখের গালি খাইয়া জীবন ধন্য করিব। বাজে বকা আমাদের পেষা নয় কারণ আমাদের স্থানাভাব বড় বেশী; কি করি দায়ে পড়ে তোমার বাজে কথার জবাব দিতে এই স্থানটুকু নষ্ট করিতে হইল।

মনোমোহন নাট্যমন্দির—অধিকারী শিশিরবাবু শীঘ্রই 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় কর্ব্বেন ও "রক্তকরবী"র অভিনয়ের অনুমতি পেয়েছেন বলে পত্রান্তরে প্রকাশ। চিরকুমার সভাকে তিনি নাকি তাহার, মহারাজ ত্রিশঙ্কুর মত না স্বর্গে না মর্ত্তে অবস্থান থেকে নামিয়ে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করে নেবেন। ভাল কথা, তবে একটা কথা হচ্ছে কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা নাট্যকার হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠাকে বাড়াতে পারেনি—সেটা বাঙ্গলার কোন রঙ্গমঞ্চে তাঁর কোন নাটকেরই কৃতকার্য্যতার অভাব, প্রমাণ করে দিয়েছে—সুতরাং এরকম একটা অনিশ্চিত কৃতকার্য্যতা পরীক্ষা করে সময়, অর্থ ও শক্তি নষ্ট না করে তাঁহার উচিত ছিল একখানি পুরাতন ভাল নাটকের পুনরভিনয় করা। গিরিশবাবুর বলিদান নূতন ভাবে ঢেলে অভিনয় কর্লে, তিনি বর্ত্তমান ষ্টারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন। এরকম একটা নিশ্চিত কিছু না করে অধ্রুবের পশ্চাদ্ধাবমান করবার মত এখন তাঁর সময় নয়। তাঁর একদল বন্ধুর হেঁকায় পড়ে যদি তিনি নিজের প্রতিষ্ঠানটীকে ঠাকুরবাড়ীর নাট্য-প্রতিভার পরীক্ষাক্ষেত্র কর্ত্তে যান তবে আমাদের একথা বলবার অধিকার আছে; কারণ সম্প্রদায় তাঁর হতে পারে কিন্তু অভিনেতা হিসাবে তিনি যে জাতির সম্পত্তি।

ষ্টারে—"প্রফুল্ল"—সমালোচনা

"ষ্টারে প্রফুল্ল"। স্বর্গীয় গিরিশবাবুর এই অতিপরিচিত—বহুবার দৃষ্ট সামাজিক নাটকখানি গত পরশ্ব রাত্রে আর্ট থিয়েটার কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছে। নাটক হিসাবে প্রফুল্ল কি, এবং তাহার স্থান সাহিত্যে—সমাজে ও বাঙ্গালীর মনে কোথায়, তাহা আজ বলিবার আবশ্যকতা নাই। পুরাতন ও নূতন যুগের মধ্যবর্ত্তী কালের এই সমাজচিত্রখানি যে সেই সময়ের বাস্তবতার অপূর্ব্ব চিত্র এবং তাহা যে বাঙালী নরনারীর মর্ম্মকোষের রুদ্ধ-বেদনা সঞ্জাত, তাহা তাহার বহু অভিনয়েই প্রমাণিত। অধুনা আমাদের বিচার্য্য এই, যে এই পুস্তকখানির অভিনয়ে আর্ট থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং তাঁহাদের অভিনেতৃবর্গ কি নৈপুণ্য বা অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা। প্রফুল্ল-নাটক-অভিনয় পূর্ব্ব যুগে আমরা এতবার দেখিয়াছি ও

একই অংশ এত অধিকসংখ্যক অভিনেতার দ্বারা অভিনীত হইতে দেখিয়াছি ও প্রতি অংশই এত বিচিত্র ব্যাখ্যায় অভিব্যক্ত হইতে দেখিয়াছি—যে প্রতি অংশে এক অভিনেতার ব্যাখ্যার সহিত অপরের ব্যাখ্যার তুলনা করিয়া তাঁদের মধ্যে কে বড় কে ছোট তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য বলিয়া মনে করি। কারণ এরূপ তুলনা পাশাপাশি এক সঙ্গে দুটী অভিনেতার অভিনয় না দেখিলে ঠিক বুঝা যায় না। অভিনয়ের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারিত করিবার আর একটী পন্থা আমাদের মনে লাগে—সেটী হচ্ছে, সময়; এক দীর্ঘ ব্যবধানের পর একই সময়ে দৃষ্ট দুইটী বিভিন্ন অভিনেতার অভিনয় স্মরণ করিলে যাঁহার অভিনয়ের কথা মনে স্বতঃই জাগ্রত হয় তিনিই তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব পাইবার যোগ্য। যে অভিনয় হৃদয়ে একটা দীর্ঘস্থায়ী রেখাপাত করিতে পারে এবং ঐ রেখাপাত (Impression) যত গভীর হয় তাহাই তত উৎকৃষ্ট অভিনয় বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। প্রফুল্ল নাটকের অভিনয় বিচারে এই পন্থাটী বিশেষ কার্য্যকর। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তনের সময় অর্থাৎ পুরাতন যুগে—সুরাপান, শিক্ষিত বাঙালী সমাজে প্রবেশ করে ও ক্রমশঃ তাহা সমাজের নানা স্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, আবার সেই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পরবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ নূতন যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ যখন তাহার প্রচার রোধ করিতে চেষ্টা করেন এই উভয় যুগের সংঘর্ষণের ফল মহানাটক "প্রফুল্ল"। আর্ট থিয়েটার কোম্পানী এই নাটক অভিনয় কালীন পুরাতন ও নবীন, উভয় যুগের অভিনয় কৌশলের সংমিশ্রণ করিয়া অতীব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দান করিয়াছেন। যাঁহারা পুরাতন-বিদ্বেষী তাঁহাদের আমরা এই অভিনয় দর্শনে, পুরাতনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে বলি—অতীতকে সম্যক্ অবগত না হইয়া তাহার বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ এ যুগের একটা রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার তীব্রতা নাশকল্পে এই পুরাতনের প্রত্যাবর্ত্তন অতিমাত্রায় সাহায্য করিবে। বহুদিন হইতে দানীবাবুকে আমরা প্রফুল্ল নাটকে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছি—সুরেশের অংশ অভিনয়ে তাঁহার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ছিল এবং যোগেশের অংশ ও তিনি বহুবার অভিনয় করিয়াছেন এবং গতরাত্রে তিনি যে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন তাতে পুরাতন যুগের অভিব্যক্তি যে আধুনিক যুগের চেয়ে হীন নয় তা বেশ সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে আর 'জগার' অংশ যে পুরাতন যুগের অশিক্ষিতা অভিনেত্রী অভিনয় করিয়াছেন তিনি আমাদের মনে এক বিষম সমস্যা জাগাইয়া দিয়াছেন যে নব্যতন্ত্রের কোন অভিনেত্রী আজ এ ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে পুরাতনের সমকক্ষ কি না? নূতন যুগের দুইটী অভিনেতা মিঃ অহীন্দ্র চৌধুরী ও ইন্দুবাবু রমেশ ও সুরেশের অভিনয়ে আমাদিগকে আশাতীত আনন্দ দানে পুলকিত করিয়াছেন; তবে প্রফুল্লর হত্যা-দৃশ্যে অহীন্দ্রবাবুর মুখের পৈশাচিক ভাবটা আরও একটু পূর্ব্বে সূচিত হইয়া হত্যার সময় ঘোরতর বীভৎস হইলে আরও চমৎকার হইত। পীতাম্বরের অংশ অতি সুচারুরূপে অভিনীত হইয়াছিল তবে বোধহয় এই ভূমিকায় নরেশ বাবুকে যোগ্যতর দেখাইত। কাঙ্গালীচরণের অভিনয় খারাপ হয় নাই তবে অন্যান্য অংশ যে শ্রেণীর অভিনয় পর্য্যায়ে ভুক্ত ছিল, ইহা তাহার কিছু নিম্নে পড়িয়াছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়—এঁর অভিনয়ে একটু কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য ছিল, যাহা তাঁহাকে চরিত্রটীকে উত্তম ফুটাইতে দেয় নাই—তবে অভিনয় বেশ বজায় ছিল এবং কোন স্থানে খারাপ হয় নাই। বেশী মহলা দিলে ইহাঁর অভিনয় আরও অনেক উপভোগ্য হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। মদন ঘোষের অংশে অপরেশ বাবুর অভিনয় পরশ্রী-কাতরকেও মুগ্ধ করিতে পারে এবং এই অংশটীতে তাঁহাকে বেশ মানাইয়া ছিল। শিবনাথের অংশে দুর্গাদাসবাবুর অভিনয় বড়ই স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল তবে দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে পুলিশ কোর্টে তাঁহার অভিনয়টী কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হয়, কারণ এখানে তাঁহার কণ্ঠস্বরের অভাব তাঁহাকে সুরেশের সহিত সমান ভাবে পর্দ্দায় পর্দ্দায় গলা চড়াইতে দেয় নাই। ভজহরির অভিনয়েও বেশ একটা স্ফূর্ত্তিবাজের বেপরওয়া ভাব বজায় ছিল না—এবং তাঁহার অভিনয় কোনরূপে খারাপ না হইলেও আরো ভাল করা যাইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, আমাদের মনে

হয় দুই চারি রাত্রি অভিনয়ের পর এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটী আপনা হইতেই ঝরিয়া পড়িবে। অভিনেত্রীদের মধ্যে শ্রীমতী কুসুমকুমারীর 'জ্ঞানদা' অভিনয়—অতীব মর্ম্মস্পর্শী এবং ইহাও পুরাতন যুগের একটা বিরাট কীর্ত্তি। তারাসুন্দরীর অভিনয়ও অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল, চমৎকৃত হইয়াছিলাম শ্রীমতী নীহারবালার 'প্রফুল্ল' অভিনয়ে—এই নবীনা অভিনেত্রী প্রফুল্লের অংশে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া আমাদের সত্যই মুগ্ধ করিয়াছেন কারণ ইতিপূর্ব্বে শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী সুশীলা ও শ্রীমতী কুসুমকুমারীকে আমরা এই ভূমিকায় দেখিয়াছিলাম। এবারে একটু বিশেষত্ব দেখিলাম প্রফুল্লর সরলতাটুকু যেন মধুরভাবে চারিদিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে—হাবভাব, উঠাবসা, চলাফেরা এ সমস্ত এত স্বাভাবিক হইয়াছিল, যে তাহাতে সত্যই আনন্দিত না হইয়া থাকিবার উপায় ছিল না। ছোট ছোট ভূমিকাগুলির প্রতিও পরিচালকগণের বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং সেই গুলি যেরূপ নিখুঁতভাবে অভিনীত হইয়াছিল সেটাও একটা দেখিবার বিষয় কারণ এগুলিতে সাধারণতঃ কর্ত্তৃপক্ষের লক্ষ্য থাকে না। কর্ত্তাদের কৃতীত্ব এই ছোট জিনিসেই ধরা পড়ে; কারণ বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা নিজেদের প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছেন—ছোটদের সামলান যে কি ভীষণ ব্যাপার তা যাঁরা অবৈতনিক অভিনয় করেছেন তা তাঁরা উত্তমরূপে জানেন। নূতন যুগের ছাপটা এঁরা ফুটিয়া তুলেছেন বইখানির mountingএ অর্থাৎ দৃশ্যপট, পোষাকপরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, ঘরদোরসাজান ইত্যাদিতে—যদিও এঁদের রঙ্গমঞ্চ-সজ্জাকর কোন নামজাদা শিল্পী নন্ তবুও তাঁহার খুঁটিনাটীতে এমন সতর্ক দৃষ্টিছিল, যা দর্শকদের মুগ্ধ না করে পারে নি—এঁর নৈপুণ্যে প্রীত হয়ে এঁর নামটী জানবার কৌতুহল হল—অনেক অনুসন্ধান করে জান্‌লাম এঁর নাম শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে। এই প্রতিভাশালী রঙ্গমঞ্চ-সজ্জাকরকে আমরা আমাদের অভিবাদন দিচ্ছি। একটা কথা, শিশু যাদবের অভিনয়টী তাহার শিক্ষক ও তাহার নিজের কৃতিত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—এ দেখে মনে হয় কালে এ দেশে যেবী পেলী জন্মান অসম্ভব নয়। ভাঁড়িখানার দৃশ্যে একটী অনুল্লিখিত চানাচুরওয়ালার অধিষ্ঠান ও ক্রেতাদের সহিত ক্রয়বিক্রয় দৃশ্য একটা অপূর্ব্ব স্বাভাবিকতায় দৃশ্যটীকে মনোজ্ঞ করে তুলেছিল। এই দৃশ্যে একপাল সাজা মাতালের দলে পড়িয়া দানীবাবু প্রকৃত মাতালের লক্ষণগুলি অভিনয়ে এমন অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা ব্যক্ত করেছিলেন যাহাতে বাকী লোকগুলি যে নেহাৎ মাতাল সেজে অভিনয় কর্‌ছে এবং তিনিই যে সত্যিকারের মাতাল সেইটা খুব ফুটে উঠেছিল—"উকীল কি চীজ" "সাজান বাগান শুকিয়ে গেল" "ওহে একটা পয়সা দাও ত" প্রভৃতি স্থানে তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতার যশঃসৌরভ যে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। নব্যতান্ত্রিকরা কি বলেন তা অবশ্য আমরা জানি না তবে মোটের উপর এই অভিনয় দর্শনে আমরা পরম পরিতৃপ্তি পাইয়াছি এবং নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রণ, আমাদের নিকট পরম উপভোগ্য হইয়াছিল। দস্তুরে অতীতকে ছেঁটে না ফেলে, তার প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাকে কাজে লাগানতে যে নাট্যশিল্পের কি মহান্ উন্নতির পথ উন্মুক্ত হল তা আর্ট থিয়েটার কোম্পানী আজ সাধারণকে বুঝিয়ে দিয়ে পরম উপকার কর্‌লেন। কারণ আজকালের অনেক দর্শক—স্কুল কলেজের ছেলেরা যাঁরা অতীতের অভিনয় না দেখেই শুধু নব্যতন্ত্রের চিত্রাভিনয়ের অনুকরণে অত্যধিক হাত-পা-নাড়ায় মজিয়া পুরাতনকে অমর্য্যাদা করিতেন ও স্বাধীন বিচার বিসর্জ্জন দিয়া নূতনের অন্ধস্তাবক হইয়া পড়িতেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর অভিনয়ে উভয়যুগের অভিনয় পন্থার সম্যক্ মর্য্যাদা বুঝিয়া প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। যে অল্প সময়ের মধ্যে 'প্রফুল্ল'র প্রাকার্জ্জ বাহির হইয়া অভিনয় হইল, তাহাতে অতি কর্ম্মকুশল ব্যক্তির সুযোগ্য তত্ত্বাবধান ব্যতীত যে তাহা হওয়া সম্ভব নয়—এইরূপই আমাদের ধারণা। আমরা এই সংমিশ্রিত সম্প্রদায়কে বাংলার নাট্যরসিকদের তরফ থেকে আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছি।

Printed & Published by Jnanendra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
14 Jaggannath Dutta Lane Garpar, Calcutta.

"অনুরাগ ও 'বিরাগ'"

সংহতি

প্রথমবর্ষ] ২১শে ভাদ্র শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ৬ই সেপ্টেম্বর। [৮ম সংখ্যা

রাম কানাইএর স্বাদেশিকতা

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক।

কলেজ ছাড়িয়া কানাই যেদিন
গ্রামেতে আসিল মায়ের ডাকে,
আমরা সেদিন মুক্ত হৃদয়ে
শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলাম তাকে।
বলিলাম—'ভাই কানাই আজিকে
আমাদের তুমি মানালে হার,
মায়ের জন্য প্রাণ দিতে রাজি—
ধন্য, ধন্য, জয় তোমার!'
হাঁটুর উপর খদ্দর প'রে
লইয়া রুক্ষ কেশের রাশি,
নগ্ন চরণে, খাতা বগলেতে
যখন সে গ্রামে দাঁড়াল আসি;
বিদ্যালয়ের বিরাট মাঠেতে
বক্তৃতা দিল সে এক মস্ত!
বলাবলি মোরা করিনু সেদিন—
'কানাই কর্ম্মী জবরদস্ত।'
তারপর যবে স্বেচ্ছাসেবক
বাহিনী সহিত পড়িল ধরা,
উচ্চকণ্ঠে বলিল—'ভেবোনা,
আবার আমরা আসিব ত্বরা।'

সেদিনও আমরা বিপুল পুলকে
কুসুম-মাল্য দিলাম তাকে,
কানাই মোদের গ্রামেরই পুত্র,
দিয়াছে যে সাড়া মায়ের ডাকে।
তিনমাস পরে একদা কানাই
ফিরিয়া আসিল গ্রামের বুকে,
কিন্তু ওকি গো! সে কানাই কোথা!
'স্বদেশী' তাহার গেল কি ফুঁকে?
পরণে নাহিক খদ্দর আর
সেথায় বিরাজে চিকণ ধুতি,
গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে
বিংশ মুদ্রার বিলাতি 'জুতি'।
রুক্ষ চুলের বদলে মাথায়
ঢেউ খেলে যায় 'জাপান' তৈরী,
কাঁচি সিগারেট চাঁদমুখে চলে
হাতেতে নভেল 'প্রেমের ভেরী'।
তাজ্জব মোরা হ'লেও সেদিন
ধন্যবাদ যে দিলাম তাকে,
এই কানাই তো দিয়েছিল সাড়া
তিনমাস আগে মায়ের ডাকে।

গল্প

সৎসাহসের পুরস্কার

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া সরস্বতী রত্নপ্রভা সাহিত্যভারতী

(৫)

থামাতেই হবে! এ নৃশংসতার-উন্মাদনাকে আর অগ্রসর হতে দেওয়া নয়!……কিন্তু কি করে থামাই?… দিই ওই চাবুকের সামনে বুক পেতে!

ছুটে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালুম। উদ্যত চাবুক সপাং করে গায়ে পড়্‌ল! কোটের ওপরই পড়্‌ল বটে, উঃ! তবু সে কি জলন্!……জল-বিছুটি কখনো গায়ে পড়েনি, ছুরির ঘা'ও কেউ কখনো মারেনি,……কিন্তু মনে হোল,—এ চাবুক সবাইকার সেরা! বুঝ্‌লাম আট-জন গুণ্ডা কেন ধূলিস্যাৎ হতে বাধ্য হয়েছে!

আমি ঘুরে পড়্‌লাম!

মুহূর্ত্তে চাবুক থামিয়ে, তিনি হেঁট হয়ে আমার হাত ধরে তুল্‌লেন। সুতীব্র ভৎর্সনার স্বরে বল্‌লেন "মূর্খ বালক! এ তোমার দোষ!—"

আমার দোষ? অভিমানে চোখে জল এল। কম্পিতকণ্ঠে বল্‌লাম "আপনি রাগের মাথায় বড্ড চাবুক চালাচ্ছেন! ওদের যে লঘুপাপে গুরুদণ্ড হচ্ছে!"

"ওদের পাপ লঘু? তোমার বুদ্ধি অপরিপক্ক! তোমার কাণ্ডজ্ঞান সচেতন থাকুলে—ওই ছাখো!—"

চক্ষের নিমেষে তিনজন বেড়ে উঠে,—হঠাৎ হুড় মুড়িয়ে আমাদের ওপর পড়্‌ল! তাদের একজনের লাথিতে আমি ছিট্‌কে পড়লুম! দুজন তাঁর চাবুক কেড়ে নেবার জন্তে টানাটানি কর্‌তে লাগ্‌ল। একজন তাঁর ঘাড় চেপে ধর্‌ল।—

বাঃ! কি বুদ্ধিমান আমি!……ভাল অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছি ত! অত্যাচারীদের রক্ষা কর্‌তে গিয়ে অত্যাচারকে পূর্ণবিক্রমে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ দিলাম! মূর্খ, মূর্খ, আমি! আমারি দোষে এই দুর্ঘটনা!—

ক্রোধে ক্ষোভে অন্ধ হয়ে, তাদের ওপর গিয়ে পড়লুম। যে তাঁর ঘাড় চেপে ধরেছিল, তার মুখে সজোরে ঘুসি মেরে, হাতে কামড়ে দিলাম। সে আর্ত্তনাদ করে ঘাড় ছেড়ে পরমুহূর্ত্তে পায়ে প্যাঁচ মেরে আমায় মাটীতে ফেলে আমার বুকে চেপে বস্‌ল।

মনে হোল, বুকের ওপর জগদ্দল-পাথর চাপা পড়েছে! আমার দম বন্ধ হয়ে এল!……বাহ্‌বা রে পৃথিবী! নির্ব্বিচারে সাধু অসাধু সকল লোকের উপকার চেষ্টার পুরস্কার কি চমৎকার জিনিস! দুর্জ্জনকে রক্ষা কর্‌তে গিয়ে এবার নিজে সশরীরে স্বর্গের পথেই চল্‌লাম যে!

বুকের হাড় কখানা পিষে গুঁড়ো হবার যোগাড় হোল! লোকটা আমার শ্বাসনালী কঠোরহস্তে চেপে ধর্‌ল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, কাণে ভোঁ ভোঁ করে মৃত্যুর আহ্বান-ভেরী বেজে উঠ্‌ল! যাঃ! আমার পৃথিবীর বাস উঠ্‌ল!

ক্ষণমধ্যে একটা অস্পষ্ট শব্দ কাণে পৌছাল,—চাবুক চলছে—শপাশপ—শপাশপ্! আর মাটীতে মানুষ পড়্‌ছে—ধপাধপ! ধপাধপ!

হঠাৎ জগদ্দল-পাথরটা আমার বুকের ওপর থেকে ছিট্‌কে মাটীতে পড়ল "বালক!" করে একটা গর্জ্জন

কালে গেল !······তারপর ?······ তারপর আর কিছু মনে পড়ে না ! আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌লাম !

(৬)

তারপর কি হোল, সব কথা মনে পড়ে না। একটা অস্পষ্ট স্মৃতি মনে পড়ে,—যেন খুব নিদ্রাতুর অবস্থার ভেতর দিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেকটা সময় কেটে গিয়েছিল। কত লোক যেন আমার কাছে এসেছিল, কত কথাই যেন তারা বলাবলি করেছিল, কতবার যেন—কত কি নামে আমায় ডেকেছিল। আমি তাদের ডাক শুনেছিলাম, কিন্তু চেষ্টা করেও কোন উত্তর দিতে পারিনি। আমার বাহ্যিক শক্তি সব যেন হাত-ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। আমি অচেতন ভাবেই সব শুন-ছিলাম, অচেতনভাবেই কত কি অনুভব কর্‌ছিলাম—তারপর আর কিছু মনে থাক্‌ছিল না। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সব ভুলে যাচ্ছিলাম।

কতক্ষণ পরে মনে নাই যখন পূর্ণজ্ঞান ফিরে এল, দেখলাম একটা সুন্দর বাংলোর বারেণ্ডায় খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছি। পাশে একটা চেয়ারে বসে একটী অল্প বয়স্কা মেম শুশ্রূষা কর্‌ছেন। আমি জল চাইলাম, মেম জল দিয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর অনুচ্চকণ্ঠে কাকে ডাক্‌লেন।

দেখলাম বাংলোর সামনে জ্যোৎস্নালোকিত বাগানে দুজন বৃদ্ধা মেম পায়চারি করছিলেন, ডাক শুনে তাঁরা এগিয়ে এলেন। আমি অবাক হয়ে তাঁদের দিকে চেয়ে রইলাম! দেখলাম দুজন বৃদ্ধার মধ্যে একজন মেমের মুখাবয়ব সেই—পাঞ্জাবী ভদ্রমহিলার মত এবং আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁর গলায় সেই রুদ্রাক্ষের মালা দুল্‌ছে।

আমি সবিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সাহস হোল না।

সেই রুদ্রাক্ষধারিণী মেম আমার কাছে এসে স্নেহময়-কণ্ঠে বাংলা ভাষায় কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলাম, "কোন যন্ত্রণা নাই,—শুধু শারীরিক অবসন্নতা মাত্র অনুভব কর্‌ছি।"

তিনি নোটবহি খুলে কি লিখিতে লিখ্‌তে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "তোমার নাম কি ?"

নাম বল্‌লাম।

আবার প্রশ্ন হোল, "অভিভাবকের নাম ও ঠিকানা বল।"

তাও বল্‌লাম। তিনি লিখে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

অল্পক্ষণ পরে তিনি আবার ফিরে এলেন। বারেণ্ডার উপর জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে পড়েছিল, তিনি প্রশান্ত গম্ভীরভাবে সেইখানে পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধা মেমের সঙ্গে ইংরেজিতে কি আলোচনা কর্‌তে লাগলেন। তার সমস্ত কথা আমি বুঝ্‌তে পারলুম না,—শুধু বুঝ্‌লাম—ধর্ম্ম সম্বন্ধে তারা কি বলাবলি কর্‌ছেন। তাঁদের কথার তিনটা শব্দ আমার আজও মনে আছে—"ঈশ্বর—দর্শনশাস্ত্র—আর মনোবিজ্ঞান।"

তাঁর কণ্ঠস্বর শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মনে পড়্‌ল—সেই কণ্ঠস্বরই বটে। কিন্তু বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়ে চল্‌ল ! আগে তাঁকে অল্প বয়স্কা পাঞ্জাবী মহিলা দেখেছি,—এখন তিনি বৃদ্ধা মেম হলেন কি করে ? একি অদ্ভুত ?

ইংরেজিতে কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ তিনি পরিষ্কার হিন্দীতে বল্‌লেন—"জ্যোৎস্নার এই স্নিগ্ধ-বিমল প্রশান্ত-রূপের সঙ্গে কোন জিনিসের তুলনা কর্‌তে তোমার ভাল লাগে মাদাম্ ?"

অন্য বৃদ্ধা মেমটি তখন আমার বিছানার অদূরে আর একটী চেয়ার নিয়ে বসেছিলেন। রুদ্রাক্ষধারিণী মেমকে দেখে আমি এতদূর হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে অন্য বুড়া মেমটির উপর আদৌ মনোযোগ দিই নি। এবার তাঁর দিকে নজর পড়্‌ল। দেখলাম,—তিনি মুগ্ধচক্ষে, বারেণ্ডার জ্যোৎস্নালোকে পাদচারণারত সেই রুদ্রাক্ষ-ধারিণীর প্রসন্ন সুন্দর স্বর্গীয় ভাবমগ্ন মূর্ত্তিটির দিকে চেয়ে আছেন।

রুদ্রাক্ষধারিণীর প্রশ্ন শুনে তিনি স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে,—ধীর—গম্ভীরকণ্ঠে বল্‌লেন "দুষ্পূরণীয় কামনা-বর্জ্জিত প্রশান্ত পবিত্র—উচ্চ জীবনের।"

রুদ্রাক্ষধারিণী স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লেন "সুন্দর !" তারপর নিজমনে পূর্ব্ববৎ পায়চারি কর্‌তে লাগলেন। আমি শ্রান্ত—মুগ্ধদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। ভাব্‌তে

লাগ্‌লাম ; ইনি কি সত্যিই সেই দানবদলনী, রুদ্রাণী দেবী ? না আমার চোখের ভুল ? সেই যে পথের মাঝে যে কাণ্ড দেখেছিলাম, সে কি স্বপ্ন ? না, এখন যা দেখ্‌ছি এটা স্বপ্ন ?

আমার সুপ্তি জড়তাক্রান্ত মগজ ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে আস্‌ছিল। নিজের ঘরদুয়ার আত্মীয়-স্বজন সকলের কথা মনে পড়তে লাগ্‌ল। সে সব ছেড়ে, এখানে,—এই অপরিচিত মেয়েগুলির কাছে কি করে এলাম, ভাব্‌তে লাগ্‌লাম।

রুদ্রাক্ষধারিণী কয়েক চক্র ঘুরে আমাদের নিকটে এসে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধা মেমের উদ্দেশে বল্‌লেন 'আরব মরুভূমির রুক্ষ-রুদ্র রৌদ্রতাপের মাঝখান দিয়ে আমাদের সেই ভ্রমণ মনে পড়ে কি ? মনে পড়ে, সে কি দুঃসহ উত্তাপ ? দুষ্পুরণীয় কামনার উত্তাপ তার চেয়েও কঠোর ক্লেশাবহ নয় কি ?......মাদাম, কাল আমি বহুকালের পর নূতন করে আশ্চর্য্য হয়েছিলাম!—ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়েছিলাম! আমার হতভাগা শিষ্য—আমার পরম স্নেহের সন্তান যারা, তাদের এত বড় পরিবর্ত্তন, বাস্তবিকই আমায় ব্যথিত করে তুলেছিল। তোমায় বল্‌ব কি মাদাম,—মদের ঝোঁকে তারা এতদূর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে আমার দেহ-আক্রমণের প্রস্তাব জানাতেও দ্বিধা করেনি। সত্যই আমি কিছুক্ষণের জন্য আত্মবিস্মৃত—শান্তিহীন হয়ে পড়েছিলাম। কেন এমনটা হোল, এ প্রশ্নের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ আমি কাল থেকে কেবল ভাব্‌ছি, কোলাহলময় জগতের সহস্র সংঘর্ষের মাঝে তার কোন সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না।—কিন্তু এই জ্যোৎস্নার আলোয় তোমার বাগানে একলা বেড়াতে বেড়াতে আমার বিক্ষিপ্ত মন সহসা সংযত, স্থির হয়ে গেল।' জ্যোৎস্নার আলোর ভিতর আমি বিনা চেষ্টায় হঠাৎ একটা সদুত্তরের পথ দেখ্‌তে পেলাম,—সুন্দর, শান্তিময় ?"

বৃদ্ধা মেম প্রশান্ত কোমলকণ্ঠে বলিলেন, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের মন অসতর্ক হয়ে অনেক আদরের জিনিস হারিয়ে ফেলে। আবার অনুকূল অবস্থা ও চেষ্টা করবার সুযোগ পেলে এই মনই এক নিমিষে অনেক মূল্যবান জিনিস আবিষ্কার করতেও পারে ; সন্ন্যাসিনী,—আত্মবিস্মৃতিই আসল দুঃখ !

চিন্তাশীল ভাবুকের কাছে তাঁদের আলোচনা সমাদৃত হতে পারে, কিন্তু আমার মত অপোগণ্ড মূঢ় বালকের ক্ষুদ্র সংস্কারবদ্ধ মন এসব জটিল তত্ত্ব কি ভাবে উপলব্ধি করছিল, তা না বলাই ভাল। আমি কি করে এখানে এলুম,—আর কি করে এখান থেকে যাব, এই চিন্তাটা আমায় তখন ক্রমশঃ চঞ্চল করে তুলছিল। কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে আমি ধীরে ধীরে উঠে বস্‌লাম।

(৭)

আমায় উঠ্‌তে দেখে তিনজনেই হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন। রুদ্রাক্ষ-ধারিণী মা পরিষ্কার বাংলায় স্নেহময় কণ্ঠে বল্‌লেন "উঠ্‌ছ কেন বাবা ? কি চাই ?"

সেই স্নেহময় কণ্ঠধ্বনির মাঝে হঠাৎ যেন আমার মার কণ্ঠধ্বনি শুন্‌তে পেলাম।—অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লাম "আমায় আমার মার কাছে পাঠিয়ে দেন, মার জন্যে মন কেমন কর্‌ছে।"

আমার মাথাটি নিজের বুকে চেপে ধরে তিনি স্নেহময় কণ্ঠে বল্‌লেন "তার জন্যে ভাবনা কি? তোমার অভিভাবকদের খবর পাঠিয়েছি, তাঁরা এখনি এসে তোমায় নিয়ে যাবেন।"

মনটা আশ্বস্ত হোল। জিজ্ঞাসা করলুম "আমি কতক্ষণ এখানে আছি ?"

তিনি উত্তর দিলেন "ছাব্বিশ ঘণ্টা।"

আমি বিস্মৃত ঘটনা স্মরণের চেষ্টা করে দেখলুম, তাহলে গতকল্য সন্ধ্যার ঝোঁকে সেই কাণ্ড ঘটেছিল। সে ভয়াবহ ঘটনার কথা মনে হতে,—মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করে উঠ্‌ল, আমি আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লুম।

ভিতর থেকে একজন দেশী আয়া এসে বল্লে "আপনার নিজের পোষাকগুলো শুখিয়েছে, এবার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করবেন কি ?"

"হাঁ—বলে রুদ্রাক্ষধারিণী উঠে গেলেন। অল্পক্ষণ পরে তিনি আবার ফিরে এলেন—অধিকতর বিস্মিত হয়ে দেখলাম মেমের পোষাক ছেড়ে তিনি কালকের সেই পাঞ্জাবী মহিলার মত পোষাক পরেছেন। কিন্তু আজ

তাঁকে বালকের মত অল্পবয়স্কা দেখাচ্ছে না, অনেক বেশী বয়সের মত দেখাচ্ছে!

বিস্ময়দমন করতে পারলুম না। দ্বিধাভরে বলে উঠলাম—"মা, আপনিই কি কাল সেই লোকগুলাকে চাবুকপেটা করেছিলেন?"

ব্যথিতভাবে ঈষৎ হেসে তিনি বললেন "হাঁ। দুর্ভাগ্য-বশে কাল আমাকে তাই করতে হয়েছিল।"

বললাম "তারা কোথায়?"

সংক্ষেপে উত্তর হোল "কয়েদখানায়।"

মনে মনে প্রতিহিংসা-তৃপ্তির একটা আনন্দ বোধ হোল। সাহ্লাদে বললাম "ঠিক হয়েছে, পুলিশের হাতে তারা উপযুক্ত শাস্তি পাবে।—"

তিনি অন্যমনস্কভাবে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন "পুলিশের হাতে?......না তাদের অন্য কয়েদখানায় পাঠানো হয়েছে। সেখানে তারা উপযুক্ত শিক্ষকের শাসনে সংশোধিত হবে। জীবনে আর কখনো এরকম দুর্বৃত্ততা প্রকাশ করতে সাহসী হবে না।"

সবিস্ময়ে বললাম "কোথায়, কোন কয়েদখানায়?"—

ঈষৎ হেসে তিনি বললেন "সে পরিচয় জেনে তোমার লাভ নেই। শুধু তোমার অভিভাবকদের এই অনুরোধটা জানিও, তাঁরা যেন সে লোকগুলার সন্ধানে না ঘোরেন, বা তাদের অনুরূপ শাস্তি দিতে চেষ্টা না করেন।"

আমি হতবুদ্ধি হয়ে বললাম "কেন একথা বলছেন?"

তিনি ধীরকণ্ঠে বললেন "কারণ তাদের শাস্তি দেবার এবং সংশোধন করবার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হয়ে গেছে। চেষ্টা করলেও আর কেউ তাঁদের সন্ধান পাবেন না।"

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

তিনি একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, তুমি বালক, তবুও তোমার সাহস দেখে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার সাহসের পুরস্কার স্বরূপ সামান্য কিছু উপহার এই মেম সাহেবের কাছে রেখে চললাম, যাবার সময় অনুগ্রহ করে নিও। আর আশীর্বাদ করছি তোমার এই সাহস যেন সময়ে উপযুক্ত শক্তি ও সামর্থ্যযুক্ত হয়ে, পৃথিবীর কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হতে পারে। শক্তি, সাহস, ও জ্ঞানচর্চ্চায় কখনো নিরস্ত বা নিরুদ্যম থেকো না—মানুষ হয়ে জন্মেছ,—জীবনে সত্যিকার মানুষ হবার জন্য সর্ব্বদা সাধন-রত থেকো।"

তাঁর আশীর্ব্বচনে, যে কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি ছিল জানি না, কিন্তু তাতে আমার দুকাণ ভরে গিয়ে,— প্রাণের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত যেন আলোড়িত করে তুললে। আমার দুচোখ ভিজে উঠল, আমি নতশিরে স্তব্ধ নির্ব্বাক হয়ে রইলাম!

মিনিট দুই পরে মাথা তুলে কি বলতে উদ্যত হলাম—দেখলাম তিনি চলে গেছেন। বুড়া মেম সাহেবের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করলাম "তিনি কোথায়?"

কোন উত্তর পেলাম না। বিস্মিত হয়ে দেখলাম দুই মেম সাহেবেরই আসন খালি। তিনজনেই নিঃশব্দে প্রস্থান করেছেন। শুধু একজন খানসামা—বোধহয় আমার তদারক করবার জন্যই—অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে অনেকগুলা প্রশ্ন করে যা উত্তর পেলাম, তার অর্থ—সন্ন্যাসিনী মায়িকে মোটরে তুলে দেবার জন্য মেম সাহেবদ্বয় ফটকের কাছে গেছেন। সন্ন্যাসিনী মায়ি কোথায় গেলেন, কখন আসবেন, আদৌ আসবেন কি না, সে সম্বন্ধে কোন খবর চাকরটি জানে না। সন্ন্যাসিনী মায়ির ঘরদুয়ার কোথায়, তিনি কোন জিলার লোক সে সম্বন্ধে কোন সংবাদই চাকরটি বলতে পারলে না। সে কোনওদিন তাঁকে দেখেনি, কাল রাতে মাত্র প্রথম দেখেছে বললে।

হতাশ হয়ে শুয়ে পড়লাম।

মিনিট পনের পরে বাবা ও মামাকে সঙ্গে করে মেম সাহেব দুজন ফিরে এলেন। শুনলাম কাল থেকে আমার সংবাদ না পেয়ে বাবা ও মামা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে চারিদিকে খোঁজ করছিলেন। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে মেম সাহেবের ভৃত্য গিয়ে সংবাদ দেওয়াতে তাঁরা ছুটে এসেছেন। মেম সাহেবরা বললেন আমার চৈতন্য হবার পর আমার কাছে ঠিকানা জেনে নিয়ে লোক পাঠানো হয়েছিল।

সন্ন্যাসিনী সম্বন্ধে তাঁরা কোন পরিচয় দিতে পারলেন না। শুধু বললেন দেশ ভ্রমণ উপলক্ষ্যে একবার সেই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে তাঁদের আলাপ হয়েছিল, সন্ন্যাসিনী অনেকগুলি অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী—মহিয়সী মহিলা এই মাত্র তাঁরা জানেন। কাল রাত্রে সন্ন্যাসিনী আমার মূর্চ্ছিত দেহ বহন করে তাঁদের বাংলোয় আসেন

এবং শুশ্রূষা ও সাহায্য প্রার্থনা করেন বলে তাঁরা আশ্রয় দিয়েছিলেন। সন্ন্যাসিনী বলেছিলেন কতকগুলি মণ্ডপের প্রহারে আমি পথিমধ্যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলাম তাই সন্ন্যাসিনী আমায় পথ থেকে তুলে এনেছিলেন। ব্যস্,—আর কোন সংবাদ তাঁরা জানেন না।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমরা বিদায় নিলাম। আসবার সময় সন্ন্যাসিনীর উপহার বলে মেম সাহেব আঙুর, বেদানা, কিস্‌মিস্, বাদাম, পেস্তা, আপেল, নাসপাতি, ও সর্দ্দা-ভরা একটি বৃহৎ ফলের ঝুড়ি ও কাগজে মোড়া কি একটি ক্ষুদ্র জিনিষ আমার হাতে দিলেন। কাগজ খুলে দেখলাম,—তাতে একটি একমুখো রুদ্রাক্ষ রয়েছে, কাগজের পিঠে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে—"সৎসাহসের পুরস্কার।"—

* * * *

ডান হাতের আস্তিন গুটাইয়া পুণ্যব্রত বলিল "সে রুদ্রাক্ষটি আমি আজও হাতে ধারণ করে রেখেছি। এটি ধারণ করবার পর থেকে জীবনে নানা বিষয়ে আমি উন্নতিলাভ করেছি। অনেকবার অনেক মৃত্যুসঙ্কট ও বিপদ থেকে অভাবনীয় উপায়ে পরিত্রাণ পেয়েছি। বাস্তব ঘটনা হলেও সেগুলো এত অদ্ভুত ব্যাপার যে কারুর কাছে প্রকাশ করতে সাহস হয় না। কিন্তু সেইদিন থেকে আমার প্রকৃতির মধ্যে একটা বিপুল পরিবর্ত্তন এসেছে, এটা আমি মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করছি!—"

সকলে নীরব রহিল। মনীশ অনেকক্ষণ পরে ধীরে ডাকিল—"পুণ্যব্রত,—ভাই—"

পুণ্যব্রত অন্যমনে কি ভাবিতে ভাবিতে উত্তর দিল, কেন ভাই—?"

মনীশ উঠিয়া বসিল। পরিষ্কার, ধীর কণ্ঠে বলিল—"যদি বাঁচতেই হয়, তাহলে পরিপূর্ণ সজীব শক্তিশালী মানুষ হয়েই বাঁচা উচিত,—কি বল? সৎসাহস-ভীরু, মনুষ্যত্বহীন, কাপুরুষ হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে, পৃথিবীর খানিকটা অত্যাচার গ্লানি উচ্ছেদ করে মরাই,—সত্যিকার শান্তি নয়?"

দলের ভিতর হইতে প্রমথ হাসিয়া বলিল "শান্তিপ্রিয় কবিবর, ক্ষান্ত হও। তুমি আর বিপ্লববাদের দিকে এগিও না। দেখ্‌ছ ত পুণ্যব্রতের অবস্থা, একটি মাত্র ঘটনা-সংঘাতেই বেচারার মধ্যে যুগান্ত প্রলয় এসে পড়েছে!—সে ঘটনার স্মৃতি-সংঘাতে কি শেষে তোমার মধ্যেও—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া, মনীশ বলিল "নবযুগ উদয় হয়েছে বন্ধু! যুগান্ত শুধু প্রলয় মাত্র নয়!—কিছু ভেবো না। ভাই পুণ্যব্রত,—আজ থেকে আমায় তোমার মন্ত্রশিষ্য করে নাও। অকর্ম্মণ্য শান্তিপ্রিয় আমির মধ্যে যে,—অসত্য-বিদ্রোহী, অনাচার-বিদ্রোহী, সত্যশক্তির উপাসক,—'মানুষ-আমি' নিদ্রিত হয়ে আছে, তীব্র কশাঘাতে তার সুপ্তি-জড়তা দূর কর! মনুষ্যত্বের অপমানকর সমস্ত গুণ্ডামী ষণ্ডামীর বিরুদ্ধে আমাদের বজ্রের মত দৃপ্ত, উন্নত কর। ভগবানের রাজ্যে এসেছি—শয়তানির বিরুদ্ধে এক হাত লড়ে যাওয়া চাই ভাই,—নইলে আমাদের মানুষ নামই মিথ্যে!—"

জোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, পুণ্যব্রত তার স্বাভাবিক সতেজ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল "নবযুগ তার নিজের পথে চল্‌বেই! তার অদম্য প্রভাব, পিছনের হাজার পিছটানেও আট্‌কাতে পার্‌বে না। মনীশ ভাই, যুগধর্ম্ম আমাদের সামনে বহুৎ কালের দাবী নিয়ে হাজির হয়েছে,—দেশের বুকে চারিদিকেই যত অত্যাচার অবিচারের তাণ্ডব নৃত্য চল্‌ছে, আমার বুকের রক্ত ততই আনন্দে আগুন হয়ে টগ্‌বগিয়ে ফুটছে! বুঝ্‌ছি, হাঁ,—এমন শক্ত আঘাত ভিন্ন রক্ত-পাগল চেতনা জাগ্‌বার নয়! কেবল দৈবের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে, বসে থেকে আলস্য মূর্খতা দারিদ্র, দৌর্ব্বল্য, রোগ, অশান্তি যোগাড় করেছ,—অত্যাচার দানবের হাতে বহু ঋণ সংগ্রহ করেছ! এবার দেনা শোধ করবার জন্যে যুগধর্ম্মের ডাক এসেছে। তার তাগাদা আজ যিনি অগ্রাহ্য করবেন, তাঁর অস্তিত্ব আজ ধূলার সঙ্গে মিশে যাবেই, চির দুঃখের কারাবাস তাঁর কপালে অনিবার্য্য হবেই! ইন্দ্রিয় জয়ে অকাতর,—শক্তি সাধনায় উৎসাহী,—মহৎ দুঃখ বরণে দৃঢ় নির্ভীক,—ভগবানে স্থির বিশ্বাসী, সৎসাহসী প্রাণ নিয়ে তোরা একবার জাগ ভাই! নিজেদের ছোট ছোট সুখের অন্বেষণ ছেড়ে,—বহুজনের সুখ, বহুজনের হিতের চেষ্টায় একবার কাজের মত কাজের পথে তোরা দাঁড়া ভাই,—

তোদের সাধনাতেই দেশের ভাগ্যগতি ফিরে যাবে।"

সতীশ এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া দীন-করুণ কণ্ঠে বলিল "পুণ্যব্রত ভাই,—তোমাদের পুণ্যব্রত সাধনার পথে এই অকর্ম্মণ্য জন্তুটার একটু ঠাঁই হবে কি ?—"

পুণ্যব্রত সস্নেহে সতীশের হাত ধরিয়া বলিল "যতক্ষণ কাজের পথে নিজেদের মনুষ্যত্ব সপ্রমাণ কর্‌তে পারছি নে, ততক্ষণ অকর্ম্মণ্য জন্তু আমরা ত সবাই ভাই! কোন সঙ্কোচ নেই, এগিয়ে এস।—"

প্রমথ উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে দলের বাকী আঠারো জন খেলোয়াড় উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রমথ বলিল "ওকি—?"

গোলকিপার শাহজাদা হাসিমুখে বলিল "জলন্ত উনুনে এক কেট্‌লী জল চড়ালে, প্রথমে একটা বুদ্বুদ উঠে।—তারপর আর একটা, তারপর আর একটা, ক্রমে সব জলটাই বুদ্বুদ হয়ে ফুটতে বাধ্য হয়! পুণ্যব্রত ভাই,—প্রমথ ভূতের সঙ্গে সব কটা নিষ্কর্ম্মা ফাজিল ভূত, তোমার হাতে আজ হাত মেলাবার জন্যে হাজির! এদের ভোঁতা বুদ্ধিকে শাণ দিয়ে কাজের যোগ্য করে গড়ে নাও ভাই!—

দুহাত বাড়াইয়া এক যোগে প্রমথ ও শাহজাদাকে বুকে টানিয়া লইয়া, পুণ্যব্রত আর্দ্র-কোমল কণ্ঠে বলিল "চলে এস ভাই, বীরভদ্র ভূতের দল! তোমরাই ত অত্যাচারের দক্ষ-যজ্ঞ ধ্বংস করবার মালিক! তবে শুধু ভূত হলে চল্‌বে না ভাই, কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথ ধরে সত্যকার বীর ও ভদ্রভূত হয়ে কাজ কর্‌তে হবে, তবেই আমাদের সাধনা সার্থক হবে।"

শুক্লা ষষ্ঠীর সন্ধ্যার আঁধার কাটিয়া, তখন নবোদিত চন্দ্রালোকে চারিদিক হাসিয়া উঠিয়াছিল। সতীশ অগ্রবর্ত্তী হইয়া আনন্দভরে গান ধরিল, দলের সবগুলি তরুণ কণ্ঠ তাহাতে যোগ দিয়া সমস্বরে গাহিল :—

"নিশি দিন ভরসা রাখিস্
হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস্
সে পণ তোমার রবেই রবে।"

যৌবন-ভাদরে

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যা সমাগত ভরা নদী জো'য়ারে,
যৌবন ঢল ঢল লাবণি আবরে—
জল নিয়া ফিরে নারী, কাঁখে শোভে গাগ্‌রি
প্রতি পদবিক্ষেপে, নাচে জল আ'মরি ?
আনমনে পথ চলে, ডাকে পাখী কাননে—
'বউ কথা কও' শুনে হাসি ফুটে আননে,
ভাদরের ভরা নদী সেই কথা বুকে করে—
লয়ে যায় নাহি জানি কত দেশে, কত দূরে ?

ঝাউবনে হাওয়া লেগে উঠে সুর সাঁই সাঁই,
উড়ু উড়ু বধূ-মন, পথে লোক কেহ নাই ;
দূরাগত বাঁশী শুনে কলসী -পড়ি গেল,
ননদিনী বলে, বউ আজ তোর একি হলো ?
জল নিয়ে নিতি যাস, আজ তোর একি ছল ?
কবি বলে দোষ নাই, পথ আজ কি পিছল,
কলসী ভেঙ্গে যেতে অনেকেরি দেখা গেছে,
কেউ হেসে ফিরে যায়, কেউ কেঁদে মরে ম'রেছে।

অভিনেত্রী

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ পাল

অগণিত আলোককিরণে উদ্‌ভাসিত নাট্যশালা, বিপুল জনতায় পরিপূর্ণ;—সকলেরই মুখ আনন্দ, উল্লাস ও অধীরতায় পরিপূর্ণ। আজ এক নূতন অভিনেত্রীর হাস্য, লাস্য, কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গিমার বৈচিত্র্য আস্বাদনের জন্য যেন তারা সকলেই উদ্‌গ্রীব—কেবল দূরে নীরবে একান্ত বিরলে বসেছিল সন্দিগ্ধমনে অতীত দিনের গৌরবের, যশের পশরাবাহিনী অভিনেত্রী। নিজ ভূমিকায় প্রতিদ্বন্দ্বী নূতন অভিনেত্রীর অভিনয় দর্শনে, তারতম্য বিচারের প্রতীক্ষায়।

ধীরে ধীরে যবনিকা উঠে গেল। ধীর পদক্ষেপে তন্বী তরুণী আপন রূপের কিরণ ছড়িয়ে দেহের লীলায়িত গতির তালে তালে মধুর সঙ্গীতের স্বর-মূর্চ্ছনায় যখন সেই অধীর জনতার সামনে এসে দাঁড়াল তখন মৌন মূকের মত নিষ্পলক স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার পানে সকলে তাকিয়ে ছিল। সঙ্গীত শেষ হলে সেই বিপুল জনতা করতালি দিয়ে তাকে তাদের হৃদয়ের অফুরন্ত আনন্দ ও উল্লাস জানাল। অভিনেত্রীও নয়নের করুণ-মিনতিভরা দৃষ্টি, অধরে সফলতার আনন্দ, উজ্জ্বল হাসি, বুকের শ্রদ্ধার কৃতাঞ্জলির অর্ঘ্যভার দিয়ে তাদের সকলের কাছে আপনার অপরিসীম আনন্দ জানাল।

কেবল লোকচক্ষুর অন্তরালে আপন বুকের দুঃসহ বেদনা ভরে নিয়ে অতীত দিনের আনন্দ ও সফলতায় ভরা দিনগুলির চিন্তায় চিন্তিত ছিল সেই বৃদ্ধা অভিনেত্রী। একদিন এমনিভাবে সবার কাছ থেকে সেও সমান উৎসাহ পেয়েছিল; কিন্তু আজ—উঃ! সে কথা মনে করতে তার বুকখানা যেন ফেটে যায়, আজ সে অজ্ঞাত, অখ্যাত সে আজ সকলের চিন্তারও অতীত। তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে চোখের মুক্তাধারাদিয়ে বেরিয়ে আসবার জন্য তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করে উঠেছে—চোখে সে যেন আঁধার দেখ্‌ছে, সঙ্গীত তার কাছে চীৎকার বলে মনে হচ্ছে, সমস্ত পৃথিবী যেন তার সঙ্গে শত্রুতা করছে, সেখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে যাবে তাই ভেবে ধীরে ধীরে গোপন অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে পিছনদিক দিয়ে সেই রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাচ্ছিল—দূর হতে পদধ্বনি শুনে সে ফিরে তাকাল, দেখলে একটী বৃদ্ধ আস্‌ছে, সে দাঁড়াল তারই নাম করে। বৃদ্ধ বল্লে—হ্যাঁ তার অভিনয় ছিল এর চেয়েও সুন্দর ছিঃ ছিঃ এ কি অভিনয়—তুমি কি তার অভিনয় দেখেছ? চোখে একটু দীপ্তউল্লাস ফুটিয়ে বুকচাপা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সেই বৃদ্ধা অভিনেত্রী বল্লে, "আমিই সে নমস্কার" বৃদ্ধ থমকে ফিরে দেখলে কেউ কোথাও দাঁড়িয়ে নাই।

কামমুক্তি

(কবীর)

শ্রীকালিদাস রায়

অমৃতাক্তিতে লভি বিহারের স্বাদ
ঘুচেছে বালাই, মিটেছে চাওয়ার সাধ,
বীজ হতে মহীরুহের প্রসার সম,
চাওয়াতেই জাগে যত রোগ দুর্দ্দমতম।
চাওয়াতেই পাপ বীজাণু বিস্তার
চাওয়া হ'তে আজ পেয়েছি নিস্তার।

শব ও শিব

(কবীর)

শ্রীকালিদাস রায়

ভ্রান্তি ভাঙেনা শুধু ভক্তির ভাগে,
দেবতা আসেনা ভুয়ো ভক্তির টানে।
ব্রহ্মের নামে ভ্রান্তিরে পূজে যারা,
রচে তারা শুধু কায়ার ভিতর কারা।
জীবিতেরে কেটে পূজে যারা নির্জ্জীবে,
শবে পূজে তারা, পূজেনাক কভু শিবে।

ম্যাজিক ও লজিক
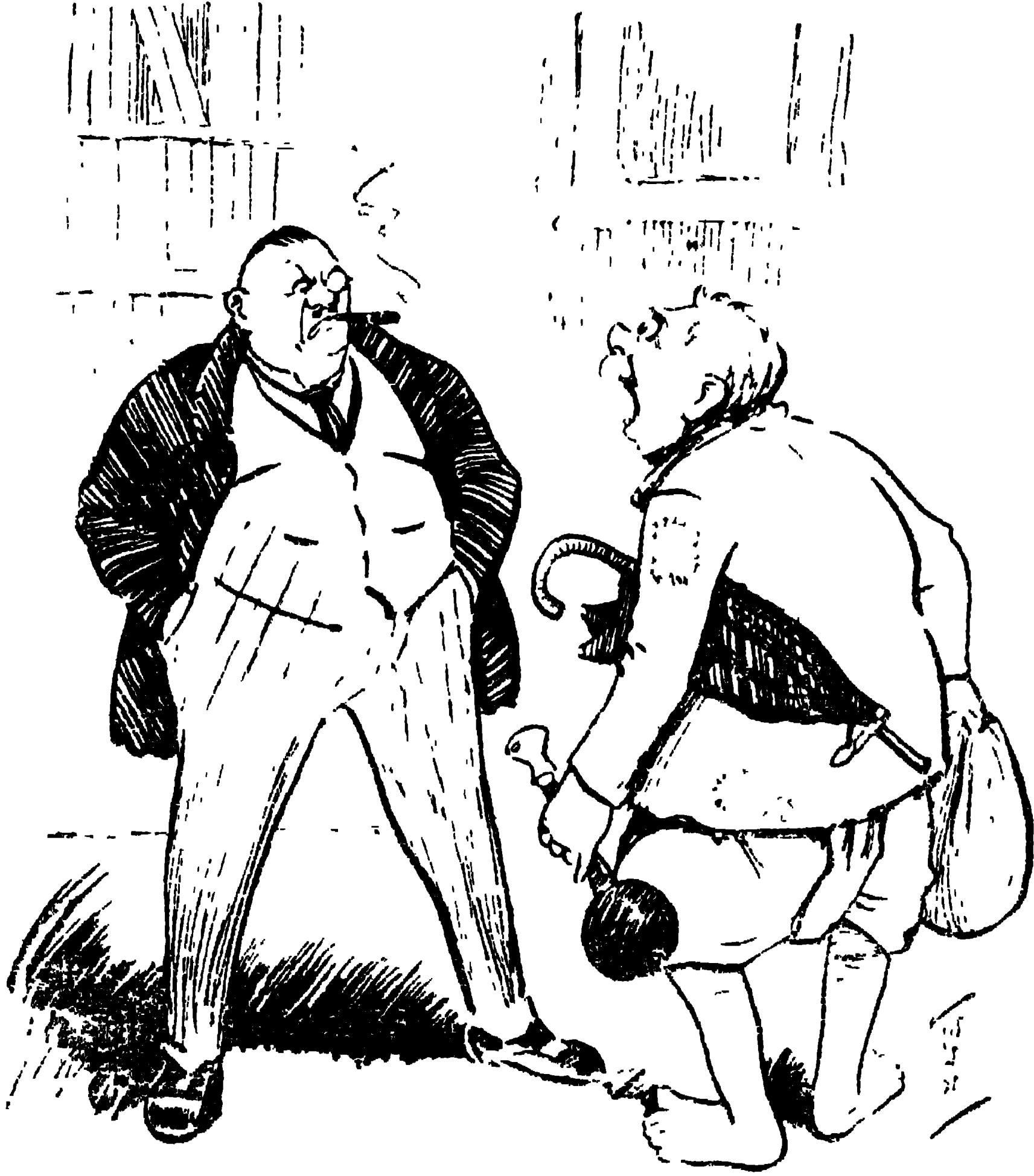
পিতৃ-সম্বর্দ্ধনা।

বহুদিন পরে সহরবাসী কৃতীপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষে, বৃদ্ধ পল্লীবাসী পিতা, ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ, ভাঙ্গা ছাতা, থেলো হুঁকা লইয়া—পুত্রের ড্রয়িং রুমে হাজির—অসভ্য বৃদ্ধকে দেখিয়া বিস্মিত পুত্র বলিল—"কে তুমি ওল্ডম্যান্"

"বাবা বিশু আমায় চিন্‌তে পার্চ্ছোনা—আমি যে তোমার বাবা।"

"হ্যাঁ বাবা বল্লেই বাবা—একি ম্যাজিক নাকি? লজিক্যালি প্রমাণ কর্ত্তে পার—"

"কঠিন কথা হলো বাবা—তোমার মা-ঠাকুরুণ বেঁচে থাকলে হয় তো পার্ত্তুম——"

মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সার সঙ্কলন

(প্রতি সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে)

সঙ্কলয়িতা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বি,এস,সি

লর্ড লীটনের কৈফিয়ৎ :—কবি রবীন্দ্রনাথের পত্রোত্তর অজুহাতে লর্ড লীটন ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে তাঁর উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। তাহাতে কয়েকটী ব্যাকরণের সূত্রের দোহাই দিলেও প্রকৃত অর্থের কোন ইতর বিশেষ হয় নাই, প্রত্যুত অবমাননা হ্রাস না করিয়া বরং তিনি তাহা বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি যে ভারতের সমগ্র নারীজাতির অবমাননা উদ্দেশ্যে ঐসকল কথা বলেন নাই তাহা সকলেই জানে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর এটুকু মনে রাখা উচিত যে তিনি যাহা বলিবেন তাহা সকলেই বড় করিয়া দেখিবে। পুলিশের সংগৃহীত প্রমাণ ব্যতীত তিনি কি অন্য কোন উপায়ে লোকের চক্ষে, এমন কি কবীন্দ্রের চক্ষেও, তাঁহার অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করিতে পারেন? তাঁহার জানা উচিত যে সাধারণে পুলিশকে আদৌ বিশ্বাস করে না। যদি কোন পদস্থ ভারতবাসী 'কয়েকটী' ইংরাজের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিতেন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইত যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি দোষী এবং সমগ্র সমাজের প্রতি এইরূপ দোষ আরোপ করার ফলে তাঁহাকে ধর্ম্মাধিকরণে গিয়া জনসাধারণের সমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইত। যদি সত্যই লীটন বাহাদুর 'কয়েকটী' দুর্নীতিপরায়ণ নরনারীর বিরুদ্ধে ঐসকল অভিযোগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার উচিত, বাজে কৈফিয়তে কালক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বসমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাহাতে তাঁহার পদগৌরব অক্ষুন্ন থাকিবে। আর যদি তিনি তাঁহার উক্তির সমর্থন করিতে চান তবে তিনি সর্ব্বসমক্ষে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করা উচিত যে তাঁহার কথা সত্য!

অধীনতার নিদর্শন :—ভারতের প্রায় প্রত্যেক কর্ম্মীই জানেন যে ল্যাঙ্কাশায়ারের কারখানা-ওয়ালাদের সুবিধার জন্য বিদেশ হইতে আনীত তুলার প্রস্তুত দ্রব্যাদির উপর যে শুল্ক বসান হয় এদেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদির উপরও তদ্রূপ কর ধার্য্য করা হয়—এবং বহু অনুযোগ অভিযোগ সত্ত্বেও এখনও উহা উঠাইয়া দেওয়া হয় নাই—এই স্থলেই আমাদের স্বার্থকে ইংরাজদের স্বার্থের নিকট বলি দিতে হইয়াছে এবং এই স্থলেই আমাদের অধীনতা—এই সমস্ত কারণে ভারত হইতে বিদেশী বস্ত্র দূর করিবার জন্য আমি দেশীকলওয়ালাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে ইচ্ছা করি; কিন্তু তাহাতেও মাত্র একটী কারণে দরিদ্রজনসাধারণের অসুবিধা হইতে পারে—যদি কল-ওয়ালারা সুবিধা বুঝিয়া দেশী কলের কাপড়ের দাম বাড়াইয়া দেন। যদি বিদেশী বস্ত্র এদেশ হইতে দূরীভূত হয় তাহা হইলে খদ্দর প্রচলন করার বিশেষ সুবিধা হয়, তবে খদ্দর-প্রচারকদিগকে কলের কাপড়ের বিরুদ্ধেও বক্তৃতা দিতে হইবে নতুবা খদ্দর প্রচলনে অসুবিধা হইবে। কোন কোন লোক বলেন যে মিলওয়ালারা নকল খদ্দর চালাইয়া আমাদের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে সুতরাং তাহাদের পৃষ্ঠপোষণ করা উচিত নয়—কিন্তু তাঁহারা দোষ করিতেছেন বলিয়াও যে আমাদেরও দোষ করিতে হইবে, বা

প্রতিহিংসা লইতে হইবে ইহা সত্যাগ্রহ ধর্ম্মের বহির্ভূত। তবে মিলওয়ালারা এইরূপ হীনতার পরিচয় না দিলেও তাঁহাদের ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি হইত না। যদি খাদির প্রতি আমাদের সত্যই আন্তরিক সহানুভূতি থাকে তবে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহা ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

* * * *

গুলবর্গে পাগলামী ঃ—ইহার পূর্ব্বে আমি লিখিয়াছি যে এই মন্দির ধ্বংস ব্যাপারের মধ্যে একটী সুগঠিত দল আছে যাহারা এই কার্য্যেই লিপ্ত আছে। গুলবর্গের ব্যাপার আমার এই উক্তির সমর্থন করিতেছে—উত্তেজনা যে জন্যেই হউক একটী দেবমন্দির ধ্বংস করা কোন কারণেই উচিত হয় নাই; মুসলমান-নেতারা এই ব্যাপারে মর্ম্মাহত হইয়াছেন—অনেকে বলেন যে ইহার জন্য আমিই দায়ী কারণ আমিই অশিক্ষিতদিগকে জাগাইয়াছি; তাহা অবশ্য আমার স্বীকার না করার পথ নাই, এবং যাহা করিয়াছি তজ্জন্য বিন্দুমাত্র অনুতাপ আমার হয় নাই—এবং এই নৃশংস ব্যাপারে আমি সকলের চেয়ে বেশী দুঃখিত। আমি নিজে প্রতিমা পূজার পক্ষপাতী এবং বিরোধী দুই-ই—প্রতিমা পূজায় অতি সহজেই মানবকে উচ্চ আদর্শের দিকে উন্নত করে—আমাদের দেশকে, যে সহস্র সহস্র মন্দির, এখনও পবিত্র রাখিয়াছে সেইগুলি রক্ষা করিবার যদি আমার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে সত্যই আমি সুখী হইতাম। আমি অন্যভাবে প্রতিমা পূজার বিরোধী—কোন কোন প্রতিমাপূজক ভাবেন যে তাঁহার ইষ্টদেবের প্রতিমা ভিন্ন আর কোন প্রতিমায় দেবতার অধিষ্ঠান অসম্ভব—সেইরূপ অন্ধ প্রতিমা পূজনের আমি বিরোধী।

হিন্দুমুসলমানের একতাস্থাপন করিতে হইলে মুসলমানদিগকে হিন্দু-ধর্ম্ম-বিদ্বেষ ভুলিতে হইবে তাহা তাঁহাদের যতই অরুচিকর হউক না কেন। হিন্দুদিগকেও ধীরভাবে সমস্ত সহ্য করিতে হইবে—মন্দির ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা মসজিদ ধ্বংসে অগ্রসর হইবেন না, সহস্র মন্দির ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিলেও মসজিদে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, তাঁহারা ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে জীবন দান করিতে পারেন কিন্তু প্রতিহিংসা লইবেন না।

আর, আমার মুসলমান ভাইদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে তোমাদের ইসলামধর্ম্মের পবিত্রতা তোমাদের চরিত্রের পবিত্রতা দ্বারা প্রমাণিত হইবে—যদি তোমাদের আরাধনায় হিন্দুরা ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া থাকে তাহাতে তাহাদের মন্দির ধ্বংস করা তোমাদের উচিত নয়, কারণ প্রতিহিংসারও সীমা আছে। এই ব্যাপার আমার হৃদয়ে গভীর আঘাত করিতেছে এবং তাহাতে আমি অসহ্য যন্ত্রণা ও দারুণ মনস্তাপ ভোগ করিতেছি।

দিল্লী নিবাসী মুসলমানদের প্রতি আমার এই অনুরোধ যে তাঁহারা যেন এই বিরোধে তাঁহাদের মহানুভবতা প্রকাশ করেন—সমগ্র মুসলমান সমাজ তাঁহাদের পথপ্রদর্শক বলিয়া স্বীকার করেন সেই জন্য তাঁহারা ডাক্তার আনসারী ও হাকিম আজমল খাঁকে মুখপত্র করিয়া এই বিরোধ মিটাইয়া ফেলুন। যদি তাঁহারা আমাকে চান তবে আমি এই দণ্ডে পুনরায় দিল্লী যাত্রা করিতে প্রস্তুত—তাঁহারা যেন শীঘ্রই মন স্থির করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হয়েন।

কুসুমে পাষাণ

(কালিদাস হইতে)

শ্রীজ্ঞানরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় বি, এস্‌ সি

সুন্দরীগো! গ'ড়লো তব নয়ন দুটি ইন্দীবরে;
বয়ানখানি পদ্ম দিয়া, পদ্মযোনি উল্লাস ভরে।
দন্তরুচি কুন্দফুলে, অধর নবপল্লবেতে,
তনুলতা গ'ড়লো ধাতা, পেলব স্বর্ণ-চম্পকেতে
সকল চারু কোমলতায় তোমায় গড়ি হায়রে প্রিয়া!
হিয়াটীরে গড়লো কেন নিঠুর বিধি পাষাণ দিয়া?

রুলির কথা

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমি ছিলাম গিনি সোনায় গড়া—একটী ছোট মেয়ের সরু সরু মৃণাল হাতের দুগাছি রুলি! সে মেয়েটীর জন্মদিনে তার বাপের এক বন্ধু আমাকে মেয়েটীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে তার নরম হাত-দুটীতে আমায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে আজ অনেক দিন হ'ল আমি আমার সেই ছোট সাথীটির সঙ্গে আছি।

একদিন মেয়েটী তাদের বাগানে ফুল তুলে মালা গাঁথছিল, আমি মহা আনন্দে তার মালা গাঁথা দেখছিলেম আর ঠুন্ ঠুন্ শব্দ ক'রে তার সুখ্যাতি করেছিলেম এই সময় একটা কাল মতন লোক হঠাৎ কোথা থেকে বাঘের মত লাফিয়ে এসে নিঠুর ভাবে মেয়েটীর মুখ টিপে ধরল্। মেয়েটী চেঁচাতে গেল। সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বল্ল "চুপ কর, চেঁচাবি ত গলা টিপে মেরে ফেলব।" মেয়েটী ভয়ে আধমরা হয়ে ফুলের ওপর ঢলে পড়ল। চোরটা তার পাথরের মতন হাতে মেয়েটীর কোমল করে ব্যথা দিয়ে আমাকে তার হাত থেকে খুলে নিলে। আমি কেঁদে উঠলুম। আমার চির সঙ্গিনীর সঙ্গ হারা হবার ভয়ে কিছুতেই তার সঙ্গে যেতে চাইলাম না। তার হাত থেকে গড়িয়ে বড় বড় ঘাসের ভেতর গিয়ে পড়লাম। সে আমাকে খুঁজে তার জামার পকেটে রেখে দিলে। তার পর মেয়েটীর ফুলের মত গালে একটী চড় মেরে বাগানের পাঁচিল লাফিয়ে বাহিরে পড়ল। উঃ লোকটার প্রাণ কি কঠোর! অনেক দূরে গিয়েও আমি আমার সঙ্গিনীর কান্না শুনতে পেলাম। দুঃখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল!

চোরটা আমাকে একটা ভাঙাচোরা দুর্গন্ধ ময় কুঁড়ে ঘরে নিয়ে এল। সেখানে না আছে একটু ফুলের গন্ধ, না আছে এতটুকু কোমলতা। আলো হাওয়ার সঙ্গে সেখানে চিরবিবাদ। পকেট থেকে আমাকে বার করে চোরটা একটা মেয়ে মানুষের শক্ত হাতের ওপর আমাকে রাখলো সে হাতখানা কি গরম আর কালো ভয়ে শরীর শিউরে উঠল। এক গাল হেসে চোরের বউটা বল্লে "খুব ভাল জিনিষ কাল বাজারে বিক্রি করে এসো, অনেক গুলো টাকা হবে।" "আমিও তাই ঠিক করে রেখেছি।" বলে চোরটা একটা ময়লা ন্যাকড়া জড়িয়ে আমাকে মাটীর গর্ত্তের ভিতরে রেখে দিলে। সেখানে থেকে সারা রাত আমি কাঁদলাম। প্রাণ ভরে ভগবানকে ডাক্‌তে ডাকতে বল্লাম "হে ঠাকুর তুমি আমার সেই ছোট্ট সঙ্গিনীকে ফিরিয়ে দাও। তার কমল বাহু দুটী ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না।"

পরের দিন চোর আমাকে নিয়ে বাজারে বেচতে বেরুল। ভগবান আমার করুণ প্রার্থনা শুনেছিলেন একটা পোদ্দারের দোকানে গিয়ে আমাকে বেচবার চেষ্টা করায় চোরটা ধরা পড়ে গেল। পুলিশ তার হাতে হাতকড়া আর কোমরে দ'ড়ি বেঁধে তাকে থানায় নিয়ে চল্ল। মেয়েটীর বাপ আমার জন্যে থানায় ডাইরি ক'রে গিয়েছিলেন সেই জন্যই এত তাড়াতাড়ি আমার উদ্ধার হ'ল। উঃ নরক থেকে আমি আবার স্বর্গে ফিরে এলাম।

আমি সেই কচি মেয়েটীর দেখা পেলেম। সে আমাকে দেখে প্রথম খুব হাস্‌লে তারপর বড় কাঁদতে লাগল। আমি আবার চুরি যাই এই ভয়ে মেয়েটীর বাবা আমাকে আল্‌মারিতে তুলে রাখবেন, মেয়েটী আর আমাকে হাতে পরতে পাবেনা এই জন্যই তার কষ্ট হ'ল। আমারও বুকে ব্যথা লাগল। আল্‌মারির ভেতর দিয়ে সে যখন জলভরা চোখে ব্যাকুল ভাবে আমার দিকে চেয়ে থাকৃত আমার মনটাও তখন তার হাতে উঠবার জন্য আকুল হ'য়ে উঠত।

পূজো এল—নতুন জামা কাপড় পরেও মেয়েটী হাসে না। কেবল সেই আলমারির কাছে ঘোরে আর কাঁদে। তার মা তখন সব বুঝতে পেরে আমাকে বার করে তার হাতে পরিয়ে দিলেন আর বাইরে যেতে মানা করলেন। অনেক দিন পরে তার মুখে হাসি ফুটল। আমিও আনন্দে বললাম্ "ঠুন্ ঠুন্—ঠুন্।"
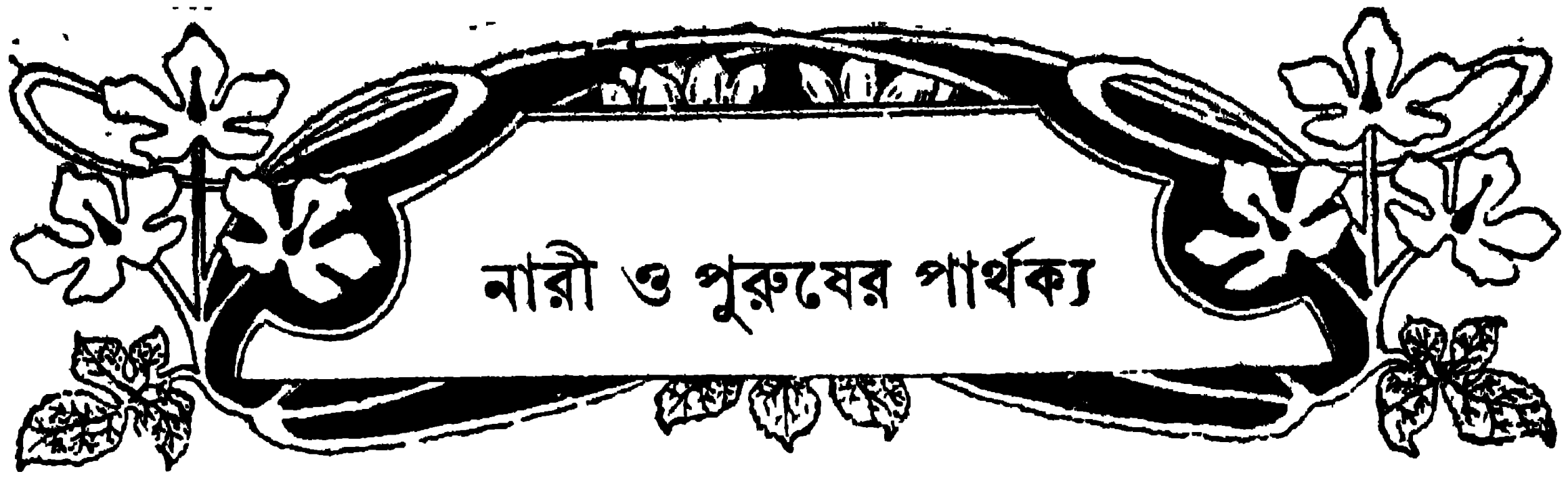
নারী ও পুরুষের পার্থক্য

নারী সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আমি যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে অনেকেই আমাকে একজন নারী-বিদ্বেষী ও নারী-শিক্ষার বিরুদ্ধাচারী অনুমান করিয়াছেন—এ সম্বন্ধে আমার শেষ কথা বলিবার এখনও সময় আসে নাই তবে সাধারণের জ্ঞাতার্থ এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে সমগ্র নারী জাতির উপর আমার অপরিসীম ভক্তি আছে এবং আমি প্রকৃতই তাঁহাদের 'সু'শিক্ষার পক্ষপাতী। এই শিক্ষা কথাটী বড় গোলমেলে—অনেকেই শিক্ষা বলিলেই কেবল স্কুলের পাঠ্য পুস্তক পড়া বুঝেন কিন্তু তাহাকেই সুশিক্ষা বলা যায় না—কেবল স্কুলের পাঠ্য পুস্তক বা খানকতক উপন্যাস পড়িলেই যে নারীশিক্ষা সম্পূর্ণ হইল এ কথা আমি মানি না। নারীর প্রধান কার্য্যক্ষেত্র গৃহ, তাহাকে সুশৃঙ্খলে পরিচালিত করিতে যাহা কিছু শিক্ষার আবশ্যক তৎসমুদায়ই নারী শিক্ষার অন্তর্গত ; গৃহকর্ম্ম, রন্ধন, সীবন, শিশুপালন, বাংলাভাষা শিক্ষা ও পুস্তকাদি পাঠ করা এবং চিঠিপত্রাদি সহজে লিখিতে পারা, এইগুলিই নারীদের অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। এইগুলি উত্তমরূপে আয়ত্তাধীন হইলে তৎপরে ইংরাজী-শিক্ষা, গীতবাদ্যশিক্ষা প্রভৃতি অতিরিক্ত গুণের অধি-কারিণী হওয়াও আবশ্যক। ইহাপেক্ষা উচ্চস্তরের শিক্ষা অবাঞ্ছনীয় না হইলেও নারী, শিক্ষিতা বলিয়া পুরুষের কাছে গর্ব্বভরে অনাধ্য দাবী করিলে ঈপ্সিত ফল লাভে বঞ্চিতা হইবেন—কারণ এ যুগটাই শিক্ষার—ক্রমশঃই শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, উভয় শ্রেণী ও সকল জাতির মধ্যেই দিন দিন শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ হইতেছে।

নারী ও পুরুষ দুইশ্রেণীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, নারীর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই নারীত্ব বিদ্যমান এবং পুরুষের সম্বন্ধেও তাহাই। নারীর কথার স্বর পুরুষ হইতে বিভিন্ন, নারীর হাস্য পুরুষের হাস্য হইতে পৃথক—নারীর দেখাতে ও পুরুষের দেখাতে অনেক বিভিন্নতা আছে, নারীর চলাফেরা, উঠাবসা, দাঁড়ান-শোয়া প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনে পুরুষ হইতে একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। পুরুষ যত সম্পূর্ণ পুরুষ হয়, সম্পূর্ণা নারী হইতে তাহার প্রকৃতিগত বিভিন্নতা তত অধিক পরিলক্ষিত হয়। তারপর বিপরীত দুই সম্পূর্ণ আদর্শের মধ্যে বহুবিধ মধ্যবর্ত্তী স্তরের পুরুষ ও নারী উভয় বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন পরিমাণে গঠিত হইয়া থাকে—এই মধ্যবর্ত্তী স্তরের নরনারীর মধ্যেই যা কিছু আন্দোলন উৎপন্ন হয় কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি আদর্শ পুরুষ বা আদর্শ নারী কচিৎ দৃষ্টিপথে পতিত হন। নারীশিক্ষাকে তাহা হইলে তিনটী স্তরে বিভক্ত করা যায় তবে প্রাথমিক শিক্ষা না শিখিয়া কেবল যদি নারী, উপন্যাস বা ইংরাজী কাব্য-পাঠে বা নৃত্যগীতে নিপুণা হন, তবে সে শিক্ষাকে আমরা সুশিক্ষা বলিতে পারি না। পুরুষও তেমনি যদি লেখাপড়া না শিখিয়া অর্থোপার্জ্জনের পন্থা না শিখিয়া কেবল বাটনা-বাটা কুটনা কোটা শিখে, সেটাও তাহার পক্ষে সুশিক্ষা নয়—নিজেদের কার্য্যক্ষেত্রের উপযোগী শিক্ষার পরে যিনি যত অতিরিক্ত বিষয়, তাহা যাহাই হউক না কেন, শিখিবেন তাঁহাকে তত বেশী গুণবান্ বা গুণবতী বলা যাইবে। এই প্রথায় শিক্ষার আমরা পক্ষপাতী, আর একটা কথা—সঙ্গে সঙ্গে উভয় শ্রেণীর পরস্পরের প্রতি বাধ্য-বাধকতা অনুশীলন করাও আবশ্যক তাহা না হইলে স্ত্রী ও পুরুষ যতই শিক্ষিত হউন না কেন পরস্পরের অনুগত না হইলে শিক্ষিত দম্পতীর মধ্যেও কলহ মনোমালিন্য প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া যৎপরোনাস্তি অশান্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে। নারী ও পুরুষের শিক্ষা একভাবে বা এক পন্থা অবলম্বনে সাফল্য লাভ করিতে পারে না, কারণ এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি তত্ত্বের মূলে দুইটী বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে। নারীর কর্ত্তব্যে ও পুরুষের কর্ত্তব্যে প্রভেদ আছে উভয়ের

কার্য্যক্ষেত্রও বিভিন্ন—এবং দুই শ্রেণীর সহযোগিতায় সকল কার্য্য ও উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করে—সুতরাং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে—এবং উভয় শ্রেণীর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও অনুবর্ত্তিতা সর্ব্বদাই বাঞ্ছনীয়। নারীদের কতক বিষয়ে পুরুষদের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয় বটে, তেমনি পুরুষকেও অনেক বিষয়ে নারীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়—তবে পরস্পরের প্রতি এই দাবী থাকিলেও তাহা আদায় করিবার পন্থাটা পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত—পুরুষ তাহার প্রাপ্যের জন্য জোর-জবরদস্তী বা প্রভুত্ব প্রকাশ করিলে নারী কখন তাহা সহ্য করিবে না—এবং করাও উচিত নয় এবং নারীও জোর করিয়া পুরুষের নিকট দাবী মিটাইয়া লইতে পারেন না—এই অপ্রীতিকর সংঘর্ষণ যাহা অধুনা ধূমায়িত ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা নিবারণের উপায় হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় করা—পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা—পুরুষ যদি শক্তির সহিত নারীকে দাসী জ্ঞানে অবজ্ঞা করেন তবে প্রত্যুত্তরে নারীও অবজ্ঞা, অমর্য্যাদা প্রকাশ করিবে। নারী ও পুরুষ কোন কালেই এক পদার্থ নহে এবং হইবেও না এসম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় নারী বা পুরুষের দেহের কোন একটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভাব বা বিদ্যমানতা তাহাদের শ্রেণী বিভাগের কারণ নয়, তাহাদের সমস্ত শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনকি দেহ ও মন সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন। অবশ্য যে মুহূর্ত্তে দুই বিপরীত শ্রেণীর মিলনে জীবের জন্ম হয় তখন হইতে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে তাহার কোন শ্রেণী নির্দ্দেশ থাকে না—এবং ঐ সময় হইতে পাঁচ মাসের মধ্যে ভ্রূণ, পুরুষ কি নারী হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয়—ইহা হইতে অনেকে হয়ত অনুমান করিবেন যে জন্ম সময়ে যখন নারী পুরুষের কোন বিভিন্নতা থাকে না তখন নারী ও পুরুষের জন্মগত কোন পার্থক্য নাই যাহা পরে ঘটে তাহা প্রকৃতির ক্রিয়া, বস্তুতঃ তাহা নহে; প্রথম পাঁচ সপ্তাহে ভ্রূণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অতি অপূর্ণাবস্থায় থাকে বলিয়া কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না বটে কিন্তু তাহার প্রত্যেক শোণিত বিন্দু, এমনকি তাহার স্নায়ুতেও পুরুষ বা নারী ভাবের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে—শারীরিক বিভিন্নতা ঐ ভাবের বিকাশ মাত্র। যে জীব শরীরে পুরুষভাবের অস্তিত্ব থাকে তাহা পরিণতিকালে পুরুষোচিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যধিক পরিপুষ্ট হয়—এবং বিপরীত শ্রেণীর চিহ্নগুলি অপরিণত অবস্থায় নামমাত্র অবস্থান করে—মোটের উপর এই দুই বিপরীত ভাবের কম ও বেশী মাত্রায় অস্তিত্ব প্রত্যেক জীব শরীরেই বিদ্যমান থাকে—এবং এই ভাবের অভিব্যক্তি দ্বারাই পুরুষ ও নারী এই দুই শ্রেণীতে তাহারা বিভক্ত হয়। এই পুরুষ ও নারী ভাবের অল্পতা বা আধিক্যই তাহাদের চরিত্র গঠন করে এবং ইহার উপরই তাহাদের শিক্ষার ফলাফল নির্ভর করে। যৌন-মনস্তত্ত্বের একজন গবেষণাকারী মিঃ হ্যাভলক এলিস এসম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান, প্রমাণ সংগ্রহ ও তৎসমুদায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে জীব শরীরে প্রত্যেক অংশ এমন কি শিরা উপশিরা ও তন্ত্রীগুলি পর্য্যন্ত যৌন শ্রেণী বিভাগের বিশ্বব্যাপী অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এই বিভিন্ন শ্রেণী দুইটীর, শোণিত, চর্ম্ম, কেশ এবং রক্তের লালকণিকাগুলিতে পর্য্যন্ত পুরুষ বা স্ত্রীভাব স্পষ্টভাবে বিদ্যমান থাকে। বিস্কফ, রুডিনিগার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মস্তিষ্কের ওজনে পুরুষ ও নারীর পার্থক্য দেখিতে পাইয়াছেন। মিষ্টার এলিস প্রভৃতি যৌনতত্ত্ববিদ্গণ প্লীহা, লিভার ও ফুসফুসেও যৌনপার্থক্য উপলব্ধি করিয়াছেন। এবং একশ্রেণীর প্রত্যেক শারীরিক অংশ যে বিপরীত শ্রেণীকে আকর্ষণ করিতে পারে তাহাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। যৌন বিভাগ কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নহে এই বিভিন্নতা সমস্ত শরীর ও মন ব্যাপিয়া থাকে—পুরুষ শরীরের সমস্তই পুরুষত্বজ্ঞাপক ও নারী শরীরের সমস্ত অংশই নারীভাবদ্যোতক হইয়া থাকে; সুতরাং এই দুইটী শ্রেণীকে এক বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নয়। দুইটী প্রকৃতিই বিভিন্ন, তবে এই বিভিন্ন প্রকৃতি দুইটী বিরুদ্ধ নয় বরং আকর্ষক এবং এই আকর্ষণ বা মিলনে প্রকৃতির উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় বিরুদ্ধাচরণে প্রকৃতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়—বিরুদ্ধাচরণ অস্বাভাবিক সুতরাং এই দুইয়ের মধ্যে কে বড়, কে ছোট এই লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদে কোন লাভ হওয়া সম্ভব নহে।

নারায়ণ ভারতী

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, বি, টি

নদীয়া জেলার অন্তর্গত আমলা সদরপুর পোষ্টের অধীন আবুরী নামক গ্রামে শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ঔরসে শ্রীমতী ত্রিলোকতারিণী দেবীর গর্ভে নারায়ণ ভারতী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁর জীবন ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে "ব্রহ্মচর্য্য" প্রচারের জন্যই উৎসর্গীকৃত। পণপ্রথার বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম এবং ছাত্রদের তেজস্বিতার অভাব ইত্যাদি নানা বিষয়ে সমাজের চোখ ফুটিয়ে দিতে গিয়ে ইনি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছেন। আজও সমান ভাবেই সমাজের ব্যাধিগুলির উপর অস্ত্রাঘাত ও সত্য সুন্দরের জাগরণ কল্পে এঁর সদা জাগ্রত মন কর্ম্মলিপ্ত। সংবাদ পত্রের দ্বারা এঁর কর্ম্ম প্রণালী লোকরম্য ভাষায় সাধারণে প্রচার হয়না সত্য কিন্তু প্রচ্ছন্ন ভাবে এই নিরলস লোকটী যে কর্ম্ম প্রয়াস ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে এঁর অসাধারণত্ব অস্বীকার্য্য নয়।

ইনি বলেন,—

"সহজ সত্যের প্রতি লোকের আস্থা নেই, তাই ক্রুর কুটীল নানা পথে তাদের অভিসার। ব্রহ্মচর্য্য, পণপ্রথার উচ্ছেদ, অশিক্ষার দূরীকরণ এগুলি তো খুবই সেকেলে মান ব্যাপার, এদিকে বিশ্ব-পণ্ডিতের দল দৃষ্টি দেননা, রাজনীতির ফাঁকা আলোচনায় তাঁদের আসর জমজমাট! মনুষ্যত্ব কি আর এদেশে আছে? দেশের জাজ্বল্যমান দুরবস্থা যাদের চোখের ঘুম দূর না করতে পারে, দু'পাঁচ-খানা ইংরাজী বইয়ের গল্প বা কবিতা তাদের জাগাবে এও কি বিশ্বাস্য? আজ চাই একদল ছন্নছাড়া অকূলে-পড়া অকুতোভয় বন্ধনহীন মানুষ। সত্যের জন্য যাদের প্রাণ কাঁদে, দেশের দুর্গতি যাদের চোখে তপ্তশলাকার মত বিদ্ধ হয়, প্রতিকূল অবস্থাকে যারা উদ্দাম হর্ষে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে পারে, "অসম্ভব" শব্দটীকে যারা ঘৃণা করতে জানে, এমনি একদল ভগবৎ প্রেরিত শুদ্ধসত্ত্ব তরুণ প্রাণ জগত্তারণ ব্রতধারী হ'য়ে কর্ম্মের পথে ধেয়ে আসুক। তারা সহজ সত্যগুলি লোকের মনে মুদ্রিত করে, মরা দেশটার অর্দ্ধমৃত অসাড় জীবগুলোকে কশাতাড়িত অশ্বের মত উত্তেজিত ও সংক্ষুব্ধ ক'রে তুলুক। ভয়ই মৃত্যু, অভয়ই জীবন। অভয় চরণ শরণ করতে জানলে মানুষের প্রাণের অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না, আশার কিরণ দ্রৌপদীর বস্ত্রের মতই অনন্ত হয়। পণ প্রথা আমাদের কি কম সর্ব্বনাশ করছে? আবার ব্রহ্মচর্য্যহীনতা আমাদের পশুরও নীচে নামিয়ে দিয়েছে, অশিক্ষার জীর্ণ যবনিকা কোটী কোটী মানুষের অন্তরদ্বারে লটপট্ ক'রছে,—এ দেখেও কি অচেতন দেশবাসীর অন্তর ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে না? চাইনা, বাগাড়ম্বর, চাই না তর্কবিতর্ক বিপ্লব, চাইনা নপুংসকের তুচ্ছ আস্ফালন! ধ্যান, ভগবন্নির্ভর, জ্ঞান-নিষ্ঠা চাই,—অজেয় ইচ্ছাশক্তি চাই। মানুষ হ'তে হ'লে যার উপর দাঁড়াতে হয় সেই ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, তপস্যা আত্মশক্তিতে স্থিরনির্ভর চাই। এ দেহ তো যাবেই, এই অনিত্য কঙ্কাল পিঞ্জর এর তো ধ্বংস আছেই, এর দ্বারাই সত্য লাভ করতে হবে। এস, জগতের সমস্ত নারী-নর সত্যব্রত হও। আচার বিচার জাতিভেদ দূর ক'রে দাও। একমাত্র প্রণব-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্মে চিত্ত ন্যস্ত কর, মনের আঁধার ও পাপ তাপ তমোরাশি দূরে পালাবে। চল, পুণ্য পাপের মধ্য দিয়ে সেই বন্ধনভয়হারী পরম শরণের অভয় তোরণে পৌঁছাই। পুণ্য বা পাপ নিয়ে যারা তর্ক বিচার করবে তারা তো ঠাকুরকে জানে না। সেই দয়াল ঠাকুর যে পাপীর উপরই বেশী সদয়, পুণ্য-গর্ব্বীর দল সে কথা মানে কই? পাপের নিথর নীল অতল তলেই যে পুণ্য পদ্মের মূল! পুণ্যও মাথায় থাকুন, পাপও চুলোয় যান্,—এস জগৎশিল্পী ভগবানের কর-কমলে মুরলী হ'য়ে বাঁধা পড়ি, সে আমাদের এই জীবন বংশীতে অভিনব স্বরগ্রাম ফুটিয়ে তুলুক।"

নারায়ণ ভারতী দুইশতজন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টারের ও কয়েকজন পোষ্ট গ্রাজুয়েটের সহায়তায় ব্রহ্মচর্য্য প্রচার ও পণপ্রথা উৎসাদনে যত্নবান হ'য়েছেন আশাকরি দেশের সকলেই তাঁকে প্রচার বিষয়ে সাহায্য ক'রবেন।

মুসলমান কবির হিন্দুভাব প্রবণতা

শ্রীরমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, কাব্যবিনোদ

আমাদের বঙ্গদেশের অধিকাংশ মুসলমানগণের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। দক্ষিণদেশে কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ-পরগণা,—পূর্ব্ববঙ্গে, ঢাকা, মৈমনসিং, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি উত্তরে, রাজসাহী হইতে বগুড়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলাস্থ সমস্ত মুসলমানগণই হিন্দুদের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাতেই কথোপকথন করিয়া থাকেন, এবং কোন বিষয় লিখিতে হইলে (যাঁহারা ইংরাজী জানেন না) সচরাচর তাঁহারা বাঙ্গালাতেই লিখিয়া থাকেন। মুসলমান-দিগের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ আরবী ভাষায় লিখিত হইলেও ইঁহারা বাঙ্গালাদেশের জলহাওয়ায় পরিপুষ্ট হইয়া এবং সেই আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া বঙ্গভাষাকে বাদ দিতে পারেন নাই। অনেকে আবার মুসলমানদিগের আরবী, পারসী ও উর্দ্দু, এই ৩টী প্রধান কথ্য ভাষার একটীও জানেন না, বরং তদপেক্ষা বঙ্গভাষা ইঁহারা ভাল জানেন। আমাদের দেশের মুসলমানগণের আচার ব্যবহার অনেকটা হিন্দুদিগের ন্যায়। ভারতের অন্য প্রদেশের মুসলমান-দিগের সহিত তাঁহাদের কোন প্রকারেই তুলনা করা যায় না। বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগের হিন্দুভাবপ্রবণতা এই প্রবন্ধের মুখীভূত বিষয়। পূর্ব্বকালেও যে মুসলমানদিগের মধ্যে যথেষ্ট হিন্দুভাব পরিলক্ষিত হইত, তাহার প্রমাণ চেষ্টা করিলেই পাওয়া যায়।

মোগল বাদশাহ আকবর হিন্দুদিগের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। হিন্দুদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন। মোটের উপর হিন্দুদের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ও আনুরক্তি ছিল। মোগল সম্রাট সাজাহানের পুত্র দারা হিন্দুর উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া যে অনেকটা উন্নত হৃদয় হইয়াছিলেন, তাহা সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। নানা প্রকারে হিন্দুদিগের সহিত একত্র থাকিয়া হিন্দুদের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছিল ; এমন কি হিন্দুধর্ম্মেও অনেকে আস্থাবান্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন্ কোন্ ঐতিহাসিক দারাকে একপ্রকার হিন্দু বলিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন। কাশ্মীর প্রদেশে মুসলমানগণের আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতি, প্রভৃতি এখনও হিন্দু-সমাজের অনুরূপেই চলিতেছে। প্রায় ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের মুসমলমানেরা হিন্দুই ছিল, তাহা জানা যায়। এক্ষণে ইঁহারা নামে মুসলমান হইলেও অনেক স্থলে—বিশেষতঃ ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কারাদিতে ইঁহাদিগকে যথেষ্ট হিন্দুভাবাপন্ন দেখা যায়।

আমাদের বঙ্গদেশে মুসলমান বংশজাত হরিদাস বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ভক্তির প্রবল বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ গঙ্গাভক্ত দরাফ খাঁর পবিত্র নাম আজিও সমস্ত হিন্দুদের মুখে মুখে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার কৃত গঙ্গাস্তোত্র পাঠে বাস্তবিকই তাঁহার যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রবল বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে মুসলমান সাহিত্যিক, কবি, এমন কি বঙ্গভাষায় সাধারণ-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের অস্তিত্বও দৃষ্ট হইত। কিন্তু এক্ষণে কয়েকজন বঙ্গদেশীয় মুসলমান সাহিত্যিক ও কবি মুসলমান সমাজের গৌরব তদপেক্ষা বর্দ্ধন করিয়াছেন। কাজী নজরুল ইসলাম ইঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী বলিলেও সম্ভবতঃ অত্যুক্তি করা হয় না। তাঁহার কবিতাগুলি পাঠে অনেক স্থানে বিশেষ হিন্দুভাবপ্রবণতার পরিচয় পাইয়াছি, তাহা ক্রমে বিবৃত করিতেছি। হিন্দুদেবদেবীর নাম ও কাহিনী অধিকাংশ কবিতায় বিষয়রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

কবি "রক্তাম্বরধারিণী মা" শীর্ষক কবিতায় যে কয়েক ছত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে হৃদয়ে পবিত্র ভাবের উদ্দীপনা হয়।

"রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্বলে পুড়ে যাক্ শ্বেত-বসন।
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন্ ঝন্।"

নেরায় অন্তস্থলে লিখিয়াছেন।—

'নিদ্রিত শিবে লাথি মারি আজ—
ভাঙো মা ভোলার ভাঙ্ নেশা,
পিয়াও এবার অশিব গরল
নীলের সঙ্গে লাল মেশা,
দেখা মা আবার দনুজ দলনী
অশিব নাশিনী চণ্ডীরূপ,
দেখাও মা ঐ কল্যাণকরেই
আনিতে পারে কি বিনাশ স্তূপ।'

'আগমনী' কবিতায় কবি জগজ্জননী দশভূজার মূর্ত্তি র্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন।

'আজ রণরঙ্গিনী জগত মাতার দেখ্ মহারণ,
দশদিকে তাঁর দশহাতে বাজে দশ প্রহরণ!
পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা ঐ সিংহবাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে
শাশ্বত নহে দানবশক্তি, পায়ে পিশে যায় শির পশুর।"

কবি নজরুল ইস্‌লাম "ধূমকেতু" শীর্ষক কবিতায় অনেক স্থলে হিন্দুদেবদেবীর নামোল্লেখ করিয়াছেন।

'আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি, মহাকাল ধূমকেতু!
ঐ ঈশ্বর শির উল্লঙ্ঘিতে আমি আগুনের সিঁড়ি
আমি বসিব বলিয়া পেতেছে ভবানী ব্রহ্মার বুকে পিঁড়ি!
ক্ষ্যাপা মহেশের বিক্ষিপ্ত পিনাক দেবরাজ দম্ভোলি
লোকে বলে মোরে শুনে হাসি আমি, আর নাচি বব বম্
বম্ বলি।"
ইত্যাদি—

ইহা ভিন্ন "বিদ্রোহী" নামক কবিতারও মধ্যে মধ্যে হিন্দুভাব বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা পাঠে কবির মনোভাব বেশ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

"ঐ অট্ট হাসিছে রণচামুণ্ডা হাহা হাহা হাহা হিহি হিহি,"
"নরমুণ্ডমালিনী চণ্ডী হাসিছে হাহা হিহি,"

অন্তস্থলে—

বাজে মৃত সুরাসুর পাঁজরে ঝাঁঝর ঝম্ ঝম্
নাচে ধূর্জ্জটী সাথে প্রমথ ব-বব বম্ বম্।
লাল লালে-লাল্ ওড়ে ঈশানে ঈশান যুদ্ধের,
ওঠে ওঙ্কার রণডঙ্কার,
নাদে ওম্ ওম্ মহাশঙ্খ বিষাণ রুদ্রের।" ইত্যাদি

ইহা পাঠে বাস্তবিকই কবির হিন্দুভাবপ্রবণতার প্রভূত আভাস পাওয়া যায়। আমার কোন সাহিত্যিক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম, এক সময় কবি নজরুল ইস্‌লাম কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের সমীপে বলিয়াছিলেন, "আপনার বর্ষামঙ্গল" আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। তদুত্তরে তিনি বলেন—"তুমি যে, বিদ্রোহীর আগুণ জ্বালিয়া দিয়াছ—তাহা আমার বর্ষণে নিভাতে পারিবে না।" বাস্তবিক যদি ইহা প্রকৃত হয়, তবে বড়ই গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। আজকাল মহাত্মা গান্ধীর যুগে হিন্দুমুসলমান উভয় জাতির মধ্যে মিলনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের আশীর্ব্বাদে আশা করা যায় এই হিন্দুমুসলমানপ্রীতি ক্রমেই দৃঢ় হইবে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধিও দূরীভূত হইবে। কবি নজরুল ইস্‌লামের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দুমুসলমান ভ্রাতাগণ কার্য্য করিবেন, এবং ছুঁৎমার্গ যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতে আমাদের হিন্দুর হিন্দুত্ব কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হইবে না মুসলমানের ধর্ম্মে ব্যাঘাৎ ঘটিবে না। এই প্রতিবাসী দুই সম্প্রদায়ের—এইবার মুখাপেক্ষিনী জননীর দুই উদ্‌ভ্রান্ত সন্তানের হৃদয় বিনিময়ে সৃজিত হইবে একটা বিরাটশক্তি স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারে—স্বরাজের ভিত্তি স্থাপনা করিতে পারে—সমস্ত জগতের চক্ষে ভারতকে আবার সম্মানের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। এ স্বপ্ন কি সত্য হইবে না?

"পল্লীসংস্কার"

চারিদিকে রব উঠিয়াছে পল্লীর সংস্কার কর নচেৎ এ দেশ হইতে কালাজ্বর ম্যালেরিয়া ও দুর্ভিক্ষ যাইবে না। সংস্কার সম্বন্ধে সরকারী ও বে-সরকারী অনেক আলোচনা হই তেছে, বঙ্গীয় কাউন্সিলের সদস্যগণ এই উদ্দেশ্যে অনেক টাকাও মঞ্জুর করিয়াছেন—এত চেষ্টার ফলেও আমাদের পল্লীগুলির অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখনও তদ্রূপই আছে, অন্ততঃ আমাদের চক্ষে ইহার কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ কি? কারণ বিচার করিতে গেলে অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে হয় এবং অনেকের হয়ত সেটা মনঃপূত নাও হইতে পারে—অনেকের হয়ত ইহাতে অন্তদাহও হইতে পারে। কাহারও ভাল লাগুক বা না লাগুক তাহাতে আমাদের কিছু যায় আসে না—ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালী জাতির কল্যাণের জন্ম সত্য প্রচারে আমরা ক্ষান্ত রহিব না।

কাগজে কলমে ও কল্পনায় পল্লী-সংস্কারের অনেক পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় কিন্তু দরিদ্র বাঙ্গালা দেশে তাহা কতটুকু কার্য্যকরী হইতে পারে সে বিষয়ে অনেকেই অনভিজ্ঞ। জাভা ও পানামায় যে উপায়ে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হইয়াছে, কেহ কেহ তাহা অনুসরণেচ্ছু। যাঁহারা উক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক তাহাদের মধ্যে কেহ কি পানামা ও জাভাদ্বীপে কি উপায়ে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? তাঁহারা কি নিশ্চিত বলিতে পারেন যে ঐ সকল উপায় অবলম্বনেই বাঙ্গালা দেশ ম্যালেরিয়ার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবে? যদি তাহা না পারেন তবে একটা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া দরিদ্রদেশের ভাণ্ডার হইতে অযথা অজস্র অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা কি? একে এ দেশের লোক উদর পুরিয়া দুইবেলা আহার করিতে পায় না, তদুপরি যদি এই দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকগুলির নিকট হইতে ম্যালেরিয়া বিতাড়ন জন্ম চাঁদা সংগ্রহে প্রয়াস পাওয়া যায় তবে কি এ ভাবে তাহাদের আরও পীড়িত করা হইবে না?

এতক্ষণ ত দুঃখের কাহিনী গাহিলাম এ সব কথার আলোচনা যত করিব ততই মনোকষ্ট বাড়িয়া চলিবে, সংস্কারের কোন সহায়তা হইবে না। পল্লী সংস্কার করিতে হইলে পল্লীর অবস্থা, লোকের শিক্ষা, জল বায়ু ও আর্থিক অবস্থা, সমস্ত পৃথক ভাবে বিচার করিতে হইবে। আমরা এমন অনেক গ্রামের কথা জানি যেখানে শিক্ষিত লোক নাই বলিলেই চলে; এমন একজনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না যে নাম সহি করিতে পারে। কিসে নিজেদের ভাল হইবে সে বিচার শক্তিও তাদের নেই। এমন লোকও দেখা যায় যাহাকে দুই এক দাগ ঔষধ খাইতে বলিলে শিশির গায়ে যে কাগজের দাগ থাকে তাহাই গুলিয়া খাইয়া বসে ও শিশির ঔষধ শিশিতেই থাকিয়া যায়। এইরূপ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা প্রতি পল্লীর ঘরে ঘরে বিদ্যমান। খবরের কাগজের গালাগালি বা প্রশংসা, সংস্কার-বিষয়ক-পুস্তিকা, ইহাদের কোন কাজে আসে না। কাজেই সহরে বসিয়া বৈদ্যুতিক পাখার বাতাসে ক্লান্তি দূর করিতে করিতে সংস্কারের পন্থা আবিষ্কার করিলেই প্রকৃত সংস্কার করা যায় না। প্রকৃত-সংস্কার-প্রয়াসীকে পল্লীতে যাইয়া সেই দরিদ্রভ্রাতাদের দরিদ্রতা ও দুঃখের ভাগ সমভাবে তাহাদের সহিত মিলিয়া বহন করিতে পারিলেই তাদের কষ্টের পরিমাণ উপলব্ধি করিতে হইবে, তবে প্রকৃত সংস্কারের উপায় নির্দ্দেশ করিতে তাঁহারা সক্ষম হইবেন। ভুক্তভোগী না হইলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। কুইনাইন যে তিতা তাহা যে কুইনাইন না খাইয়াছে সে কেমন করিয়া বুঝিবে? বাংলা এমন বিচিত্র দেশ যে এর এক পল্লীর সহিত অন্য পল্লীর জল বায়ুর কোন সাদৃশ্য নাই। কোথাও বা বর্ষায় ঘর বাড়ী জলে ডুবিয়া যায় আবার কোথাও বা সেই সময়েই জলের লেশ মাত্র দৃষ্ট হয় না। এইরূপ বিচিত্র দেশে সংস্কারের জন্ম একই নিয়ম সমস্ত স্থানের জন্ম চলিতে পারে না। স্থানবিশেষে সংস্কারবিধিরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

কাজের কথা

নিজেদের কথা—নবযুগের মূল্য অল্প করা হয়েছে বলে সমশ্রেণীর কাগজওয়ালাদের আমরা বড় বিষদৃষ্টিতে পড়ে গেছি—এতে কারুর কারুর নাকি কাট্‌তী কম হয়ে যাওয়াতে তাঁরা আমাদের উচ্ছেদ-কামনায় হরিরলুট মানসিক কর্চ্ছেন। গত সপ্তাহে নবযুগ শুক্রবার অপরাহ্নে না বেরিয়ে শনিবারের কাগজ শনিবার প্রাতেই বেরিয়েছিল—সেজন্য প্রধান অপরাধী আমাদের দাক্‌তারী মিঞা। আরও একটী কারণ ছিল—ষ্টারের 'প্রফুল্ল' অভিনয়ের সমালোচনা বের করা; কারণ ষ্টারের কোন নূতন অভিনয় সমালোচনা কর্ব্বার আমরা এ যাবৎ সুযোগ পাইনি। গত সপ্তাহে কোন কাগজেই এ জিনিষটা বেরোয়নি, তার কারণ হচ্ছে কেউ কোন্ যত্ন নেন্‌নি—আর কেউ কেউ অন্যে কি রকম লেখে তাই দেখে, মত দেবার জন্য অপেক্ষা কচ্ছিলেন। নবযুগ কোনদিনই পরের মুখে ঝাল খায়না—সে নিজের স্বাধীন মত জোরে প্রকাশ করে এবং সেটাকে খাড়া রাখবার জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়ায়; কারণ তার মত, কারু সন্তোষ বা বিরাগের উপর নির্ভর করে'না। বৃহস্পতিবার রাত্রে অভিনয় দেখে শুক্রবার প্রাতে সমালোচনা করে সেটা কম্পোজ করিয়ে ছাপাতে কিছু বিলম্ব হয় তার উপর দাক্‌তারী মিঞা গা-ঢিলে দেওয়ায় শনিবার প্রাতের পূর্ব্বে নবযুগের আত্মপ্রকাশ কর্ব্বার উপায় ছিল না। এই স্বল্প-বিলম্বের সুযোগ নিয়ে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁদের পেটাও হকারদের দিয়ে বাজারে রাষ্ট্র করেন যে "নবযুগ উঠে গেছে"—এটা সত্যি হলে অবশ্যই তাঁহারা "হরিরলুঠ" দিতেন কিন্তু নবযুগের পেছনে যে জনমতের, সত্যের একটা বিরাট শক্তি, দেশবাসীর সহানুভূতির আশীর্ব্বাদ, বাংলায় মা-বোনেদের কল্যাণ কামনা সর্ব্বদা জাগ্রত রয়েছে তা তাঁরা জানেন না; তাই মরীচিকা-প্রলুব্ধের মত তাঁরা ভেবেছিলেন "নবযুগ" সস্তায় বেচে লোকসান খেয়ে উঠে গেল। শনিবার প্রভাতে "নবযুগ" দেখে তাঁরা বুঝলেন্ যে এর অক্লান্ত-কর্ম্মী পরিচালকেরা মেরুদণ্ডহীন নন্—এদের প্রত্যেক কার্য্য বাঙালীর হৃদয়ের পবিত্র আশীর্ব্বাদে অনুপ্রাণিত—এবং এদের বিলম্বটা এরা সার্থক করেছিল "প্রফুল্ল" অভিনয়ের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে বার করে; যা করবার শক্তি কোন কাগজের ছিল না। ঢোঁক গেলা, ইতস্ততঃ করা নবযুগের কোষ্ঠীর বহির্ভূত—সে যে সত্যের তেজে বলীয়ান—সে যে বাংলার ভাই-বোনের অন্তরের স্নেহ-ধারার অভিষেকে অমর। আমাদের অগ্রণীদের তাই সবিনয়ে বলি আমাদের মৃত্যুকামনা করে হতাশ্বাসের ব্যর্থ অভিশাপে নিজেরা দগ্ধ হবেন না—নবযুগ অজর, অমর, চির-নবীন—সত্যসুন্দরের উপাসক; সে ভ্রুকুটীতে বিচলিত হয় না—তোষামোদে লুব্ধ হয় না—উৎকোচে বশীভূত হয় না। সত্যের অমৃতাস্বাদ যে পেয়েছে সে কি মরে?

—

দেশবন্ধুর ফরোওয়ার্ড পত্রে বয়কট্ ঘোষণা দেখে অহিংস বাবাজীদের পিলে চম্‌কে উঠেছে তাঁরা মস্তবড় "হুঁ" করে ভাবছেন তাইত আবার ১৯০৫ সালের পুনরভিনয়—একি ভাল? এঁরা পরের রায়ে রায় দিতে পারেন কিন্তু নিজের দেশের কর্ম্মীর ঈর্ষ্যায় অহোরহ দগ্ধ হন—বলি কলিজা যদি না থাকে তবে অহিংস-আবরণে দুর্ব্বলতার প্রকাশ করায় কোন ফল নেই চরকা কাটা যতক্ষণ না লাভবান্ বলে বোধ হবে ততক্ষণ কেউ তাতে আন্তরিক অনুরাগের সঙ্গে হাত দেবে না আর আন্তরিক না হলেও লোকদেখান চরকাকাটায় কোন ফলই হবে না। কেবল বক্তৃতায় যে চরকা চলবে না তার চলন বন্ধ হওয়াই সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে। খদ্দর সস্তা

ও টেঁকসই না হলে দেশের লোকে নেবে না তারা মিলের কাপড় কিনবে—পৌণে-ছটাকা জোড়া খদ্দরের ধুতি কিনে লোকে আজীবন দেশভক্তি দেখাতে পারে না—এটা তাঁরা কবে বুঝবেন। আচার্য্য রায়মহাশয়ের প্রতি আমাদের সবিশেষ শ্রদ্ধা আছে, বৈজ্ঞানিক হিসাবে তিনি জগতের কোন বৈজ্ঞানিকের ছোট নন্ তা আমরা জানি, তবু ৩॥০—৪৲ টাকা জোড়া মিলের ধুতীর বদলে তাঁর খাতিরে আজীবন পৌণে ছ'টাকায় খদ্দর পরা যে চলে না এটা ২০।২৫৲ মাইনে পাওয়া বাঙ্গালীরা জানে। বাঙালী শারীরিক শক্তিতে হয়ত দুর্ব্বল, তবে বুদ্ধিতে সে আজও দেউলিয়া হয় নাই।

এ থেকে কেউ কেউ হয় তো আমাদের খদ্দর ও চরকার শত্রু ঠাউরাবেন—বস্তুতঃ আমরা উভয়েরই অনুরাগী তবে এই দুইটীর অন্তরালে যে প্রকাণ্ড ভণ্ডামীর লীলা চল্‌ছে সেইটায় আমরা বিরোধী। এই "সংগঠন" "সংগঠন" রবে আর্ত্তনাদকারীগণ বলতে পারেন যে বিলাতী ও মিলের কাপড়ের দাম এত কমে যাওয়ার পরও খদ্দরের দাম না কমে খালি বাড়ছে কেন? দেশবন্ধুর আশে পাশে যেমন কতকগুলি উপগ্রহ জুটে তাঁকে সাধারণের নিকট ক্রমশঃ অপ্রিয় করেছে যাদের কুপরামর্শের প্রভাবে শাসমল আজ রাজনীতি ক্ষেত্র ত্যাগ কর্ল্লেন সেই শ্রেণীর একদল লোক আচার্য্য রায়ের স্কন্ধে ভর করেছে—হে সৌম্য হে ধীমান ইহাদের জাল ছিন্ন করে একবার তোমার স্বরূপে কাঙ্গালিনী বাঙ্গলা মায়ের পদপ্রান্তে দাঁড়াও সারা বঙ্গ তোমার ললাট প্রীতিচন্দনে চর্চ্চিত করুক।

তৃতীয় মন্ত্রী নির্ব্বাচনের ও দুইটী মন্ত্রীর প্রাণধারণের প্রহসন অভিনয় সমাপ্ত হয়েছে। চাণক্যের মত কূটবুদ্ধি—কর্ণের মত ত্যাগী—দেশের অকৃত্রিম সেবক দেশবন্ধুর কূটরাজনৈতিক চালের ফলে মন্ত্রী মহাশয়ের ও তাঁহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা পরাভূত—সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। একজন তো দেশ ছেড়ে বিলাতে ছুটেছেন সেখানকার কর্ত্তাদের আসল মনের ভাব জান্‌তে। বলি সাহেবভজা বাঙালী! এ বৃথা চেষ্টা কেন? দেশের গণদেবতা আজ যে জাগ্রত তা কি তুমি জান না? অনেকবার তো বড় টিপে চাল দিয়েছো, কখনো কি কৃতকার্য্য হয়েছ তবে আর চলাচলি কেন? মিত্তিরজার মত, যদি চৈতন্ত জেগে থাকে তবে পুরোপুরি না হয় আধাআধি ভাবেও দেশের লোকের সঙ্গে মিশে লেগে যাও—দেশটাকে বাঁচাও, নিজেকে বাঁচাও—বাংলার মুখ উজ্জল কর।

কাগজের শুল্ক—বড় বড় কাগজওয়ালারা যাঁদের জাহাজ জাহাজ বিলাতী কাগজ এনে খবর বেচ্‌তে হয় তাঁহারা ভারতীয় কাগজশিল্পের সাহায্যার্থ বিদেশী কাগজের উপর রক্ষণ শুল্কের প্রবর্ত্তনে আঁৎকাইয়া উঠিয়াছেন। সকলেই এই শুল্কের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন কিন্তু আমরা এ প্রতিবাদের সমর্থন করি না। কারণ আমরা বরাবরই টীটাগড় মিলের ১নং কাগজে নবযুগের পাঠ্যাংশ ছাপিতেছে ক্বচিৎ ছবি টবি ছাপিতে হইলে বিলাতী কাগজ ব্যবহার করিতেছি। দেশী মিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে সেগুলি শ্বেতাঙ্গ বণিকদের দ্বারা চালিত কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্মচারীর শতকরা ৯০ জন ভারতবাসী এবং এক একটী কোম্পানীতে ভারতীয় অংশীদারের সংখ্যা বড় অল্প নহে। এ সকল না জানিয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যার্থ অগ্রসর না হইয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। ইহা মাত্র শ্বেতাঙ্গ বিদ্বেষ প্রদর্শন ইহার সহিত স্বরাজ বা নন্-কো-অপারেশনের কোন সম্পর্ক নাই। দেশীয় কাগজের মিলগুলি দাঁড়াইতে পারিলে ভবিষ্যতে এদেশবাসীদেরও ক্রমে ঐ সকল ব্যবসায়ে অনুরাগ জন্মিবে। চা বাগান প্রথমে সাহেবেরা করেন কিন্তু চা'র কাজ আজ লভ্যজনক বলে কত ভারতবাসী চা-বাগান খুলেছেন তাহা সকলেই জানেন। ভারতবাসী আমরা রাজতন্ত্রের সকল আচরণ সমর্থন না কল্লেও তাঁদের সমস্ত জাতিটাকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখি না কারণ তাঁদের কাছেও আমাদের অনেক জিনিস শেখবার রয়েছে—অবশ্য বক্তৃতাটা ছাড়া, কারণ ওটায় আমরা আজ খুব পরিপক্ব।

আর্ট

(নক্সা)
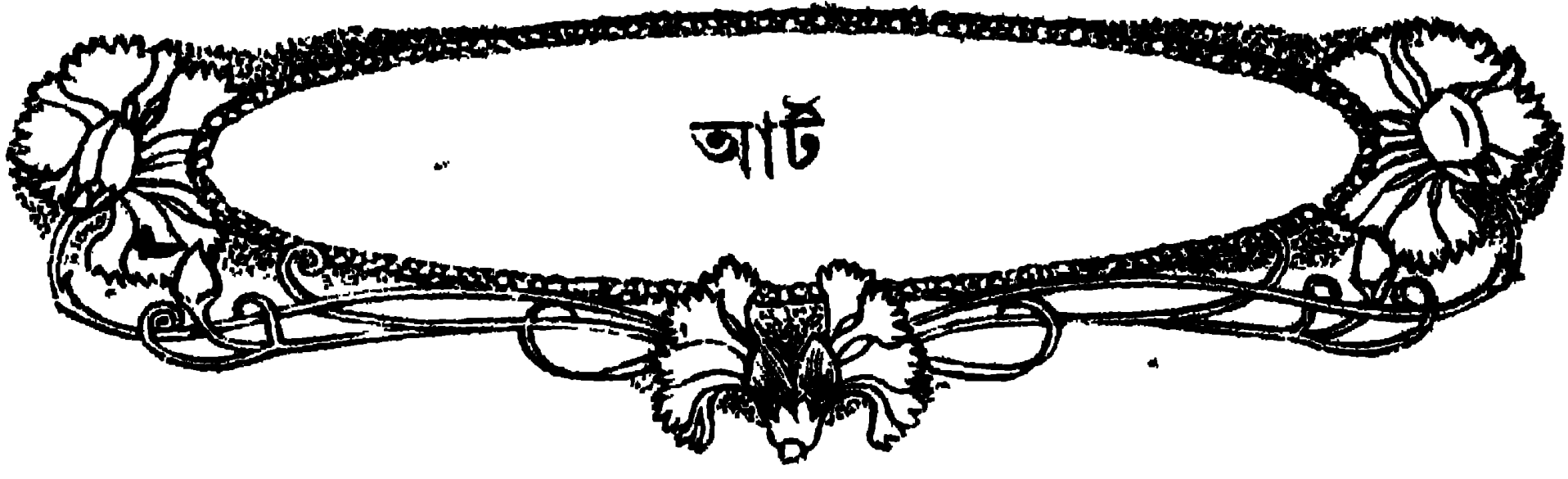
শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

অপ্রকাশ নামের অর্থ হয় কি না ইহা লইয়া অপ্রকাশের সহিত ছেলেবেলায় অনেকবার তর্ক বিতর্ক হইয়াছে এবং প্রতিবারই সে জানাইয়াছে যে প্রকাশ নামের যদি অর্থ হয় তাহা হইলে অপ্রকাশ নামেরও অর্থ হয়। কিন্তু সেদিন অপ্রকাশের চিত্রশালা দেখিতে গিয়া স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম যে অপ্রকাশ নামের অর্থ হউক আর না হউক তাহার নাম অপ্রকাশ রাখা সার্থক হইয়াছিল।

সে ছিল একজন কলাবিদ্ শিল্পী। চিত্রাঙ্কনে তাহার নাকি খুব যশ হইয়াছিল। সেইজন্য দীর্ঘপ্রবাসের পর কলিকাতা আসিয়া প্রথম সুযোগেই তাহার চিত্রশালা পরিদর্শনে গিয়াছিলাম। তাহার চিত্রশালায় প্রবেশ করিবার পুর্ব্বেই সম্মুখে দৃষ্টি পড়িল একখানি বৃহৎ সোণালি ফ্রেমে বাঁধা একটী আঁকা বাঁকা রেখার প্রতি। ধব্ধবে সাদা কাগজে একটী আঁকাবাঁকা রেখা ভিন্ন দৃশ্য বস্তু তাহাতে আর কিছু না থাকা সত্ত্বেও সেখানি মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধাইয়া রাখিবার তাৎপর্য্য কি তাহাই ভাবিতেছি এমন সময় অপ্রকাশ আসিয়া আমায় অভিবাদন করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি দেখ্ছ? কিছু বুঝ্তে পার্চ্ছ?"

আমি বলিলাম—"দেখ্ছি নে ত কিছুই—কিন্তু এটাকে এ রকম করে' বাঁধিয়ে রাখবার তাৎপর্য্য কি তাই ভাবছি।

অপ্রকাশ আবার হাসিয়া বলিল—"মামলার কূট প্রশ্নের মীমাংসা করা আর আর্ট বোঝা এক জিনিষ নয় হে! মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় এক চিত্রকর এক আঁচোড়ে একটা লাইন টেনে পুরস্কার পেয়েছিল শুনেছিলে ত?"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ, কিন্তু সে ত একখান মিহি কাপড়ের একটী মাত্র সুতোর ওপর দিয়ে তুলি টেনেছিল; —তার লাইন অন্য সুতো স্পর্শ করেনি তাই পুরস্কার পেয়েছিল। কিন্তু এটা ত একটা আঁকা বাঁকা লাইন।"

অপ্রকাশ মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল—"এইখানা আমি আস্চে বছর ওরিয়েণ্টাল আর্ট একজিবিসনে পাঠিয়ে দেব পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্যে।" তারপর গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা এই ছবিখানা দেখে অতীতের কোন কথা তোমার মনে পড়ছে না?"

আমি উত্তর না দিয়া তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে কি না ভাবিতে লাগিলাম। উত্তর না পাইয়া সে বলিল—"কি হে, কথা কইছ না যে?"

আমি বলিলাম—"আমি হচ্ছি ভায়া সেই দলের গাধা যারা চিত্রপরিচয় না শুন্লে বা প'ড়লে চিত্রের ভাব গ্রহণ ক'র্ত্তে পারে না।"

হো হো করিয়া হাসিয়া অপ্রকাশ বলিল—"তবে শোন—এখানি হচ্ছে রামের বনবাসের চিত্র।"

আমি সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলাম—"রামের বনবাস? তা হ'লে রাম কোথায়?"

গম্ভীরভাবে অপ্রকাশ উত্তর দিল—"মায়ামৃগ ধ'র্ত্তে চলে' গেছেন।"

"লক্ষণ?"

"সীতার ভৎর্সনায় রামের সন্ধানে গেছে।"

"সীতা?"

"রাবণ হরণ করে নিয়ে গেছে।"

"তা হ'লে ঐ রেখাটা কি?"

"লক্ষণের গণ্ডির একটা অংশ।"

"তা হ'লে বনই বা কোথায় গেল?"

অপ্রকাশ পূর্ব্ববৎ অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর দিল—"পেছনে আছে। অনেকটা জায়গা ঘিরে লক্ষণ গণ্ডি দিয়ে গিয়েছিল,—এ অংশটায় কোন গাছপালা ছিল না।"

আমি আর তার চিত্রশালার ভিতরে না গিয়া তার চিত্রের প্রশংসা করিতে করিতে বাটী ফিরিলাম।

উইংসের

মনোমোহন নাট্যমন্দির—জনরব জনৈক প্রত্যর্থীর এক মহানাটকের এখানে অধিষ্ঠান হবে। কিছুদিন পূর্ব্বে ঔপন্যাসিক শরচ্চন্দ্র তাঁহার প্রতিভার Search Light নাটকে ফেলে মনোমোহনের মন মোহন কর্ব্বেন বলেও শুনেছি। যে খুশী সেই যদি নাটক লিখ্‌তে পার্ত্ত, তাহলে অবশ্য চিন্তার কোন কারণ ছিল না এবং নাট্যকারের অযোগ্যতার জন্য অভিনেতা শিশিরকুমারকে যে অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে তাহা সকলেই তাঁহার সীতা দেখিয়া অনুভব করিয়াছেন। নিজের যোগ্যতায় তিনি অবশ্য সীতায় অভিনয়সৌন্দর্য্যে দর্শকবৃন্দকে আজও আকৃষ্ট করিতেছেন—কিন্তু প্রতিবারেই তাঁহার নিজের শক্তিতে নাট্যকারেরা অযোগ্যতা পূর্ণ করিতে হইলে সে শক্তির অপব্যয় হওয়াই সম্ভব।

ষ্টার থিয়েটার—এঁরা বিরহ ঘোষণা করে বসে আছেন। চাকরীজীবি বাঙালী বিরহের ব্যথা বোঝে, তার মাহাত্ম্য হাড়ে হাড়ে জানে। তাদের কর্ম্মক্লান্ত জীবনে বিরহের রস একটা নূতনত্ব আনিয়ে দিতে পারিবে, বলিয়া আশা হয়। গোবিন্দের অংশে তিনকড়িবাবু নামিবেন বলিয়া প্লাকার্ড মারা হইয়াছে—অংশনির্ব্বাচন উত্তম হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস—অভিনয় না দেখিয়া পূর্ব্বে কোন মন্তব্য প্রকাশ আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। তবে কি না বিরহের প্লাকার্ডটা লাল রঙে ছাপা উচিত হয় নাই কারণ লাল রংটা মিলন ও আনন্দের প্রতীক বলিয়া পরিজ্ঞাত।

মডার্ণ থিয়েটার—"এ্যাং যায়, বেঙ যায়, খলসে পুঁটী বলে আমিও যাই"—মনোমোহনে শিশির বাবুর অভিনয় দেখিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গিয়াছিলেন, সেই দেখাদেখি গত সপ্তাহে মর্ডানওয়ালারাও তাঁহাকে আনাইয়াছিলেন—তাঁহার মূল্যবান সময় এরূপভাবে নষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন ছিলনা; কারণ ইঁহাদের অভিনয় নৈপুণ্যের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেশবন্ধু আসিলে দর্শকেরা তাঁহার মুখ দেখিয়া কতকটা সন্তুষ্ট হইবেন এই ভরসায় যদি তাঁহাকে আনানো হইয়া থাকে তবে অবশ্য আমাদের কিছু বলবার নেই। গত সপ্তাহে এঁরা কয়েকটী অভিনেতার নামও ছাপিয়েছিলেন তাতেও যে বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে আমরা এমন মনে করিনা। রৈবতকের আয়ু বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে, সেটা এঁরা বুঝতে পেরেছেন; তাই সঙ্গে সঙ্গে "চন্দ্রনাথের" ঘোষণা করা হইয়াছে। সামাজিক নাটকে এঁদের ক্ষমতা দেখতে পেলে আমরা সত্যই আনন্দিত হইব, কারণ পূর্ব্বে এই সকল পুস্তকের অভিনয়ে নাকি ইঁহারা যশস্বী ছিলেন। তবে অবশ্য "না আঁচালে বিশ্বাস নাই"। মোটের উপর এঁরা যদি সত্যই অভিনয়কে ব্যবসাহিসাবে অবলম্বন করিতে চান, তাহাহইলে ইঁহাদের অভিনেতৃবৃন্দের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও যোগ্যশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

ত্রুটী স্বীকার—গত সংখ্যায় প্রফুল্ল সমালোচনা কালীন প্রফুল্লের অংশে যে সকল অভিনেত্রী পূর্ব্বে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ কালীন ভ্রমক্রমে শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরীর নাম মুদ্রিত হইয়াছে ঐস্থলে তাঁহার নামের পরিবর্ত্তে শ্রীমতী চারুশীলার নাম হওয়া উচিত ছিল। শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরী 'জানকী'র অংশে চিরদিনই প্রথিতনামা।

"ভরত" নাট্য-সূত্র

পরিব্রাজক ভিক্ষু অকিঞ্চন লিখিত

ভরত সম্বন্ধে অনেক কথা কাটাকাটি আজকাল আমরা বাঙ্গলা থিয়েটার সংক্রান্ত দুইটি কাগজের মারফত অনেক শুনিতেছি বটে, কিন্তু ভরত-নাট্যসূত্র নামক কোন পুঁথি তাঁহাদের নিকট আছে কি না, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। Asiatio Researches ও Theatre of the Hindus অন্বেষণ করিয়া যতদূর বোঝা যায়, তাহাতে মনে হয় যে সমগ্র ভারতবর্ষেও ভরত-নাট্যসূত্রে বইখানি নাই। সঙ্গীত সম্বন্ধে অধিকাংশ পুরাতন পুঁথি এখন বিদেশীদের হস্তে। এই হৃতসর্ব্বস্ব জাতির, সঙ্গীত সম্বন্ধেও আজ পরিচয় দিবার কিছুই আত্মাধিকারে নাই। Theodor Aufrecht এর Catalogus Catalogorum অনুসন্ধানে জানা যায় যে সর্ব্ব শুদ্ধ চুয়াল্লিশটি পুঁথি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া ফরাসী জার্ম্মাণি ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের পাঠাগার সমূহে চলিয়া গিয়াছে। আর এখানে আমরা ভরতনাট্যসূত্রের কথা কোন Art সম্বন্ধীয় পুস্তকে সম্ভবতঃ কুমারস্বামীর কিম্বা পিংলের Indian Music নামক গ্রন্থে কেবলমাত্র শুনিয়া নিজেদের বিজ্ঞবত্তার অহমিকা প্রকাশ করিতেছি। আমার যতদূর বিশ্বাস ও জ্ঞান, ভরতনাট্যসূত্র বইখানি আজ পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নাই কারণ তাহাতে প্রক্ষিপ্ত ও গলদ অনেক। ভারতবর্ষের সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই ভরতের নাম করিতে বিশেষ পটু, যদিও তাঁহার লিখিত কোন অস্তিত্ব এখন খুঁজিয়া পাওয়া দায়। শুধু ভরত নহে আরও কতকগুলি মহাপুরুষের নাম সঙ্গীতবিদ্‌দিগের মুখ হইতে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে যথা নারদ, শিব, হনুমান এবং বৈশেষিক দর্শনকার কণাদ। ইঁহারা স্বর এবং সুর সম্বন্ধে প্রথম উদ্ভাবক বলিয়া খ্যাত। শিব, হনুমত, ভরতী ও মার্গী এই চারি প্রকার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কথা ও সঙ্গীতজ্ঞগণের মুখে আবহমানকাল হইতে প্রচলিত।

সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই ভরতমুনিকে আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি আর্য্যদিগের রঙ্গালয়েরও প্রথম গুরু। ভরতমুনি সর্ব্বাগ্রে থিয়েটারকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন, যথা নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত; তাহার পর শ্মশানেশ্বর শিব আসিয়া তাণ্ডব ও লাস্য সংযোজনা করিয়াছেন। তাণ্ডব হইতেছেন শিবের একজন শিষ্য—শিব তাঁহাকে অগ্রে তাণ্ডব পদ্ধতিতে ওস্তাদ করিয়া তুলেন, আর পার্ব্বতীদেবী বাণনন্দিনী উষাকে লাস্যবিদ্যায় প্রথমে পারদর্শিনী করিয়া তুলেন। উষা দ্বারকার গোপীদের এবং গোপীরা সৌরাষ্ট্রের নারীদের এই নৃত্যে পাকা করেন—তাহার পর লাস্য নৃত্য ভারতের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

ভরত সম্বন্ধে H H Wilson তাঁহার Theatre of Hindus Vol I pp xx এ বলেন—The attribution of dramatic performances to Bharat is, no doubt, founded upon his having been one of the earliest writers, by whom the art was reduced to a system His Sutras are constantly cited by Commentators of different plays and suggest the doctrines which are taught by later authors, but, as far as has been ascertained, the work of Bharata has no existence in an entire shape, and it may be sometimes doubted whether the rules attributed to him are not fabricated for the occasion."

উইলসন সাহেব তাঁহার Theatres of the Hindus Vol I ২০১ পৃষ্ঠায় ভরতমুনির সম্বন্ধে আরও বলেন—The names of the airs and measures are not current in the present day, nor known to the public, the explanations of them in the "Tika" are quoted usually from Bharat, whose rules no longer exist in a collective form. The manuscript, however being full of errors, little assistance has been derived in this respect from the annotator; but his

...nitions of the airs seem to be extracted ...ly from the Sangit-Ratnakara.

...কেই পাঠক বুঝিতেছেন যে যাঁহারা ভরত নাট্য-... দোহাই দিতেছেন—তাঁহারা ভরত নাট্যসূত্রের ...মা য় শুনিয়াই বাজারে নাম জাহির করিতেছেন—...তের "ভ"ও তাঁহাদের জানা নাই।

সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিতে হইলে—সঙ্গীত-...াকর" গ্রন্থটির একান্ত প্রয়োজন। সারঙ্গদেব হইতেছেন ...হার গ্রন্থকার—বিজয়নগরের রাজা প্রতাপদেব ...নাথকে দিয়া সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকা প্রস্তুত করান। ...লসন সাহেবের মতে সারঙ্গদেব হয় দ্বাদশ শতাব্দী নয় ...দশ শতাব্দীর লোক। তিনি কাশ্মীরীয় পণ্ডিতের পৌত্র ...লেন—দাক্ষিণাত্যে তিনি সঙ্গীতবিদ্যা আলোচনা ...রিতে যান।

তাহার গ্রন্থ ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছে তন্মধ্য (১) স্বরগতাধ্যায় (oxford) (২) রাগ বিবেকাধ্যায় (oxford) (৩) প্রকীর্ণকাধ্যায় (Tule) (৪) ... (oxford) (৫) তাল (oxford) (৬) বাদ্য (Bengal N. L.) ৭ নৃত্য। (Catalogus Catalogorum Ph. 685 to 687 দ্রষ্টব্য)

উইলসন সাহেব তাঁহার হিন্দুর থিয়েটার গ্রন্থের প্রথম ভাগের XXII পৃষ্ঠায় সঙ্গীত রত্নাকর সম্বন্ধে বলেন—

"The Sangit Ratnakar treats more especially of singing and dancing than that of dramatic literature. It furnishes, however, some curious notices of the theatrical representation and gesture."

যাঁহারা নাচ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিতে চান তাঁহারা নিম্ন পুস্তকগুলি সারঙ্গদেবকৃত সঙ্গীত রত্নাকরের সহিত ভারতবর্ষের বাহিরে গিয়া অনুসন্ধান করিতে পারেন :—

(১) দামোদর কৃত সঙ্গীতদর্পণ এবং সঙ্গীত-দামোদর (প্যারিস)
(২) বিঠল কৃত সঙ্গীত-নৃত্যরত্নাকর
(৩) ভট্টাচার্য্য কৃত সঙ্গীত নৃত্যাকর
(৪) দেবেন্দ্র কৃত সঙ্গীত-মুক্তাবলী (নৃত্যাধ্যায়)
(৫) সঙ্গীত-বিনোদন নৃত্যাধ্যায় (বিকানীর)
(৬) সঙ্গীত স্বরমূর্ত্ত—তানজোরের তুলাজীরাজকৃত
(৭) সঙ্গীত রাগ বিরোধ (সোমকৃত)

অবশ্য এই সব গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা অতি কঠিন। সঙ্গীতের ধারার কথা হয়ত আমরা নির্ণয় করিতে সক্ষম হইতে পারি কিন্তু সঙ্গীতের উৎস কোথায় এবং কোন যুগ হইতে এই ভারতবর্ষের জ্ঞানগৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল, তাহা ওই চিরতুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের মতই অপদার্পিত ও সুদুর্গম! আমরা বর্ত্তমানে পরের মুখে ঝাল খাইয়া আত্মগরিমা প্রকাশ করি—রঙ্গালয়ে প্রেতের নৃত্যে আনন্দ উপভোগ করি কিন্তু আমাদের কি ছিল, তাহার সম্বন্ধে অন্বেষণ করিতেও আজ আমরা অধম হইতেও অধম।

Amongst Hindus of early ages music appears to have attained a theoretical precision at a period when even Greece was little removed from barbarism মহামতি কর্ণেল টডের এই কথাগুলি এই রঙ্গালয়ে অনুকরণ-প্রাবল্য যুগে আমরা ভাবিয়া দেখিব কি?

Printed & Published by Jnanendra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
14 Jagganath Dutta Lane Garpar, Calcutta.

পসারিণী

শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ

প্রথমবর্ষ] ২৮শে ভাদ্র শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ১৩ই সেপ্টেম্বর। [৯ম সংখ্যা

নবগ্রহের রস-পরিচয়

গ্রহদেবতা বিরূপ হইলে মানবের অশেষ দুর্গতি ঘটে ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য। তাহাদের প্রভাব সমাজে সকলের সম্মুখে অনেকে অস্বীকার করিলেও অন্তঃপুরে এই দেবতাগণকে প্রসন্ন করিবার জন্য বহুবিধ পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। নবগ্রহের উৎপাত যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মাঝে প্রত্যক্ষভাবে দেখা দেয়, তাহা অনেকেই জানেন। আমাদের জীবনযাত্রার পথে তাঁহারা কোন্ কোন্ বিভিন্ন বেশে দেখা দেন তাহা ব্যঙ্গশিল্পী শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসুর নিপুণ তুলিকায় চিত্রিত হইল।

প্রথমগ্রহ—রবি, বিকল্পে কাঞ্চন

রবিই মত জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং—রবি যে কাঞ্চনবর্ণ তাহার যে মহানদ্যুতি আছে তাহা যে সর্ব্ব-পাপঘ্ন এবং তাঁহাকে দেখিলে যে স্বতঃই প্রণাম কর্ত্তে ইচ্ছা হয় তাহা কোন্ মূঢ়ের অবিদিত ?

দ্বিতীয় গ্রহ—সোম—

সোম অবশ্য জগতে দুর্ল্লভ—যদিও কবিরাজ মশাইরা তার নাম জুড়ে সালসা ও রসায়ণ রূপে এখনও তার অস্তিত্ব ক্যাটলগে প্রমানীকৃত করে রেখেছেন—তবে সোমরসটা সুলভ এবং প্রায়ই তার দোকান দেখতে পাওয়া যায়—অধুনা সোমরস আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে বিলাতী ও দেশী আকার ধারণ করেছেন এবং তাঁর প্রচারক্ষেত্র হচ্ছে কুপল্লীর মাঝে, সময় ৮টা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও নিশার কৃষ্ণযবনিকার অন্তরালে তার কার্য্য লীলায়িত হয়ে নানাছন্দে বেজে ওঠে—তার পুরশ্চরণ করেন একশ্রেণীর নারী যারা সকল সীমার বাহিরে বাস করে—সোমরসের ক্রিয়ায় মানুষে মানুষে কেমন ভাবের বিকাশ হয়—তাহা পার্শ্বেই প্রত্যক্ষ।
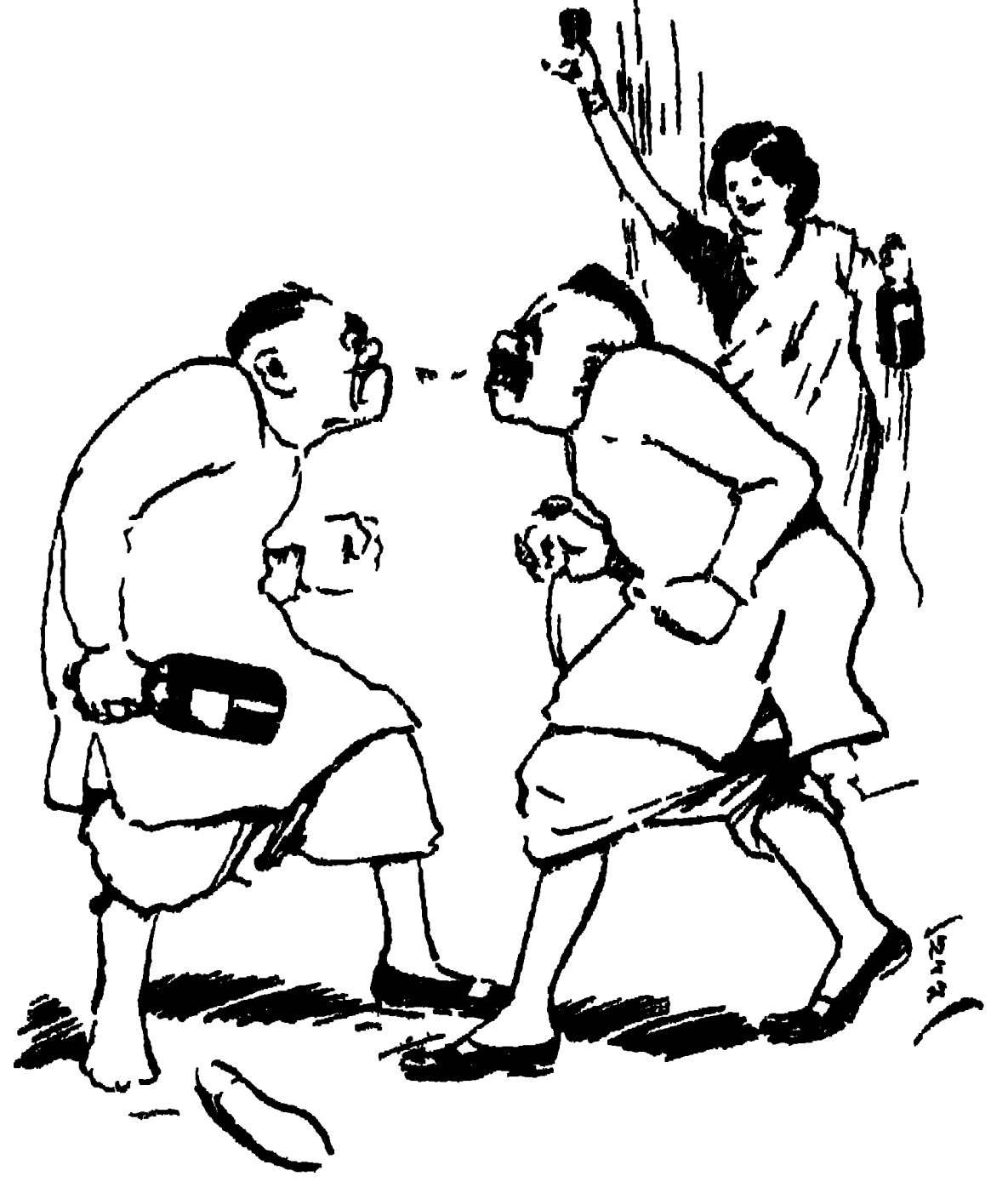
মঙ্গল—

ইহাকে "ধর" নামে অভিহিত করা হয়—অর্থাৎ কিনা ধরস্বভাব বিশিষ্ট মঙ্গলকর জীবেরাই মঙ্গলের প্রতীক্। পাহারাওলা মশাইরা হচ্ছেন এর উদাহরণ; এঁরা খুব ধরস্বভাব অথচ মঙ্গলকার্য্যের জন্ত নিয়োজিত থাকেন বলিয়াই বিদিত।

বুধ—

অর্থাৎ কিনা সৌম্যমূর্ত্তি বুদ্ধিমান ব্যক্তি—আমাদের পুরোহিত মশাইরাই হচ্ছেন বুধাবতার—মিষ্ট কথায় অন্তঃপুরিকার মনোরঞ্জন করে দুপয়সা সংগ্রহ কর্ত্তে এঁরা অসীম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন।

বৃহস্পতি—
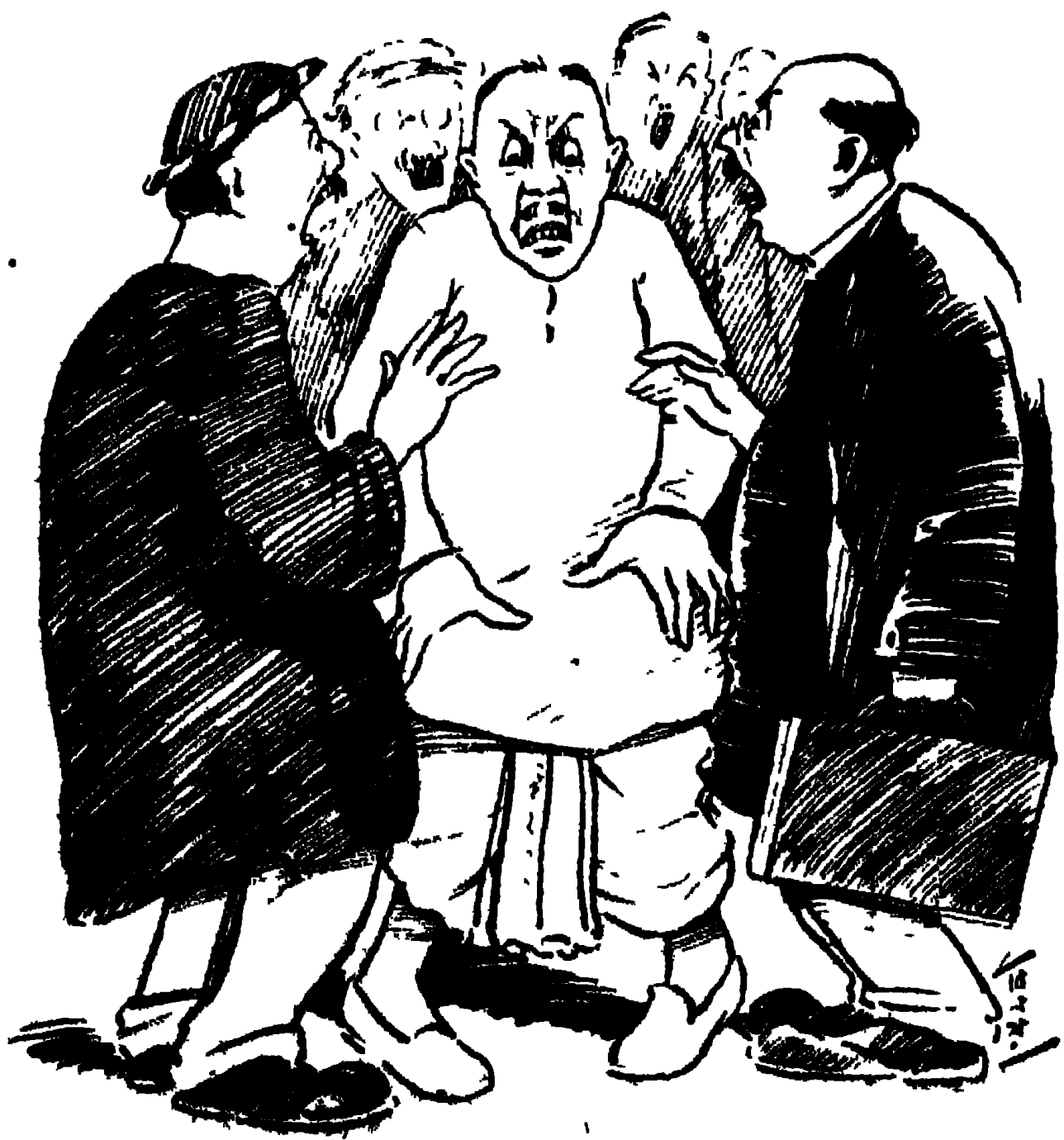
দেবগুরু—বুদ্ধিমত্তার জন্য সুবিখ্যাত; এই গ্রহের মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন বাঙলার উকীল সম্প্রদায়, এঁরা বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান বিশেষতঃ মক্কেলকে যখন এঁরা ফাঁসির হুকুম শুনিয়ে ও বলেন "ভয় কি দুর্গা বলে ঝুলে পড় আপীলে নির্ঘাৎ খালাস কর্ব্ব।" মক্কেলকে ছাড় করবার সময় এঁদের প্রতিভা বৃহস্পতিকেও নিষ্প্রভ করে দেয়।

শুক্র—

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য অলৌকিক বিদ্যাপ্রভাবে মৃতজীবকে প্রাণদান কর্ত্তেন এ বিদ্যার উপর টেক্কা দিয়েছেন আধুনিক ডাক্তারেরা—এঁরা মরামানুষের কিছু কর্ত্তে না পারলেও জীয়ন্তকে মারতে খুব পটু।

শনি—

ভারতের ইনিই এক্ষণে অধিষ্ঠাতা দেবতা—এঁর লীলানিকেতন হচ্ছে রেসকোর্সে, এখানে এই সাক্ষাৎ দেবতার অনুগ্রহ না হলে কাহারও আগমন অসম্ভব, এঁর অনুগ্রহের ফলও হাতে হাতে পাওয়া যায়—ইনি ধনীকে দরিদ্র করেন—বিদ্বানকে মূঢ় করেন যত রকম অধঃপতন আছে তাতে সহজে পরিচালিত কর্ত্তে এঁর মত পথপ্রদর্শক আর নাই।

রাহু—

চন্দ্রসূর্য্যকে ইনিই গ্রাস করে গ্রহণ লাগান—বাঙ্গালায় ইনি বরের বাপরূপে অবতীর্ণ হয়ে হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মকে পূর্ণ গ্রাস করে বসে আছেন—কিছুতেই এঁর দগ্ধোদর পূর্ণ হয় না—স্নেহলতার সময় থেকে ইনি বালিকাদের জীবন্তে গ্রাস কর্চ্ছেন—গ্রহ রাহুর কোপ স্বস্ত্যয়নে প্রশমিত হয় কিন্তু এই জীবন্ত রাহু, কন্যার পিতার যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াও তৃপ্ত হয় না।

কেতু—

এঁর ক্ষুধা কম নয় ইনি হচ্ছেন সর্ব্বদাই অতৃপ্ত—আজ দুর্ভিক্ষের চাঁদা, কাল কংগ্রেসের চাঁদা, পরশু স'মিতির চাঁদা কখন বা মনিবদের বিদায় ভোজের চাঁদা—জলপ্লাবনের চাঁদা প্রভৃতি নানারূপ চাঁদাভিক্ষার আকারে ইনি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত। এঁর কবলে পড়লে কোনরূপেই নিস্তার নেই—এই অবতারকে কেউ কখন খুসী কর্ত্তে পেরেছেন বলে শোনা যায় না।
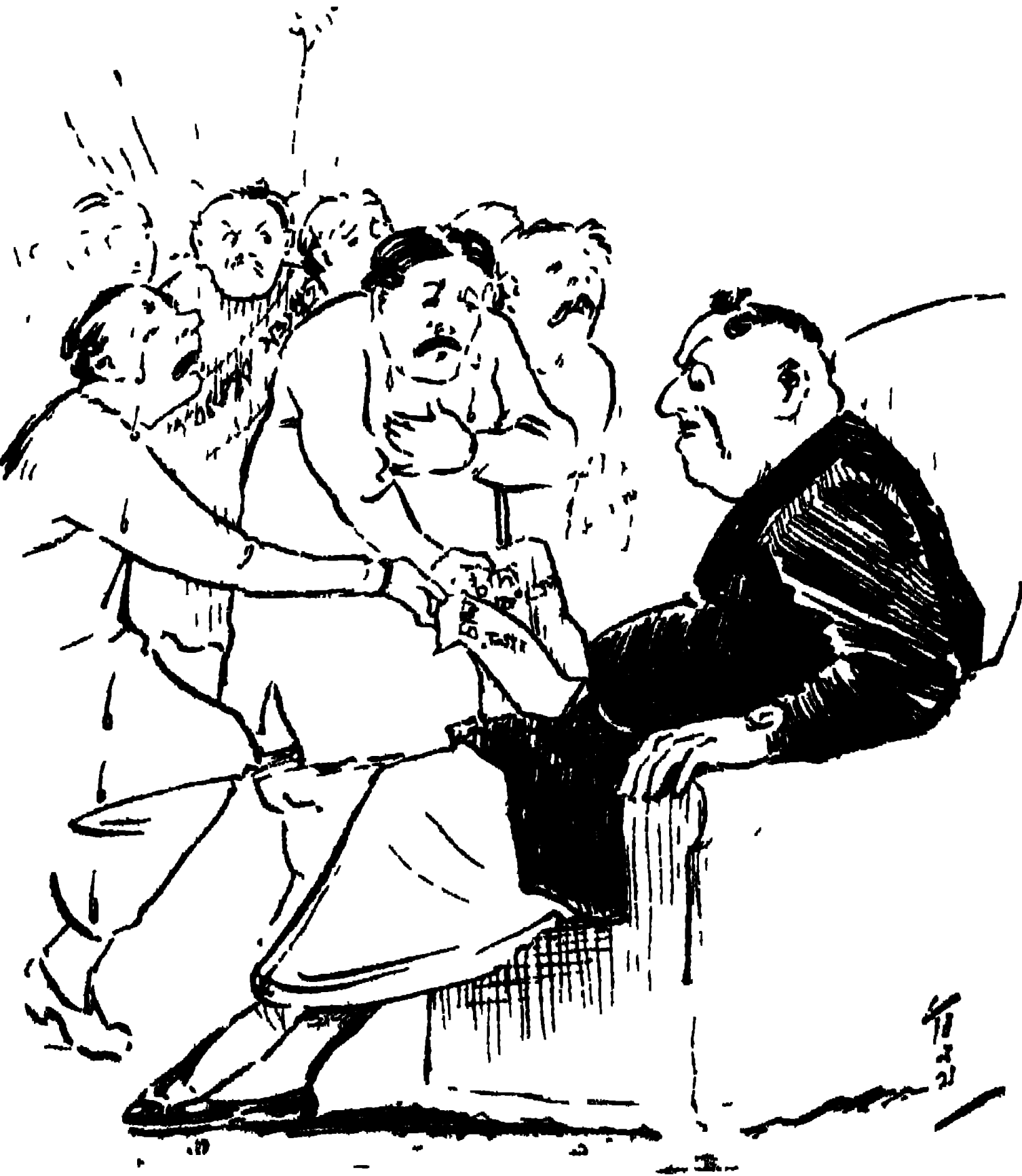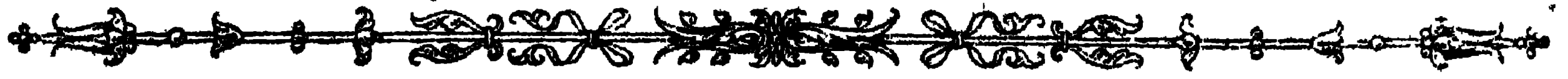
"স্মৃতি"

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়

আসমানের বুক চিরে তখন বর্ষার বাদলধারা ঝরছিল ঝম্ ঝম্ ঝম্।—প্রলয়-সহচরী ঝঞ্ঝা তখন সমস্ত গাছপালাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল সোঁ, সোঁ, সোঁ। সেই সময় নরেন মেসে একা বসে সেই আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে কি ভাব্‌ছিল আর তার গণ্ড বয়ে অশ্রুর ধারা নেমে আস্‌ছিল। এমন সময় নরেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু অরুণ সেই ঘরে ঢুকে নরেনকে সেই অবস্থায় দেখে ধীরে ধীরে তার পাশে গিয়ে বস্‌ল—তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে "ভাই নরেন—তোকে এত করে জিজ্ঞাসা করেছি যে কি মহাব্যথায় তোকে মাঝে মাঝে পাগল করে' তোলে, কতবার তোকে বিবাহ কর্ত্তে অনুরোধ করেছি—কিন্তু তার উত্তরে জানিয়েছিস শুধু যে এ জীবনে আর বিবাহ কর্ব্বিনে—আজীবন এইরকম লক্ষ্মীছাড়ার মতই কাটাবি।—আজ তোকে বলতেই হবে যে কি ব্যথায় অহর্নিশি বেদনা পাস—বল ভাই, তোর দুঃখের ভাগ আমাকে কিছু বহন কর্ত্তে দে।"

অরুণের এই আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশে নরেন তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে চোখ বুজিয়ে বল্লে "তবে শোন ভাই, সে এক মর্ম্মন্তুদ করুণকাহিনী"—এই বলে নরেন আরম্ভ কর্‌লে—

মনে পড়ে সেদিন হোলিখেলার মাতামাতি, ফাগের রংএ ধরা রঙীন্—সকলের প্রাণ আনন্দে মাতোয়ারা—মন পুলকে ভরপুর। সেই হোলির দিনে পিচকারি হাতে নিয়ে আমিও মাতোয়ারা হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এমন সময়—ওপর থেকে গায়ে এসে প'ল কুমকুম্। চমকে উঠে ওপরে চাইতেই দেখি একটী অট্টালিকার জানালায় এক হাস্যময়ী সুন্দরী। কিশোরী যেন সৌন্দর্য্যের খনি—মুখের কাছে চন্দ্রমা হারমেনে যায়—চোখে তার বিদ্যুৎ চাহনি। চোখোচোখি হতেই ফিক্ করে হেসে সরে গেল! ধীরে, অতি ধীরে ঘরে ফিরলাম। মন যেন কি চায়, কাকে চায়। বাইরের লোককে রঙাতে গিয়ে আমার ভিতরটা কি এক অজানা রঙে কে যেন রঙিয়ে দিয়ে গেল। পরদিন থেকে সেই পথে নিত্য যাওয়া আসা কর্ত্তুম; ক্রমশঃ গবাক্ষপানে চেয়ে থাকা আরম্ভ হ'ল।

সেদিন তখন প্রভাতের তরুণ অরুণ আকাশপথে উদীয়মান—পূর্ব্বদিকটা রক্তরাগে রাঙা—আকাশের ভালে বিদায়বাণীটি তখনও অস্পষ্টভাবে লেখা, জগৎ তখন কি এক সোণার কাঠির পরশে সবেমাত্র জেগেছে—সেই সময় আশা ও নিরাশার মাঝামাঝি কোন্ এক আনন্দের দোল্‌নায় দুল্‌তে দুল্‌তে আমার মানসীর মূর্ত্তরূপ দেখ্‌বার প্রয়াসে ধীরে ধীরে তাদেরই গৃহের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলাম। হঠাৎ এতদিন পরে সেই গবাক্ষপথে আমার মানসী প্রতিমার দেখা পেলাম। আমাকে দেখে প্রথম সে একটু মুচ্‌কি হাসিল। আমি আমার প্রাণে একটা উন্মাদনা, বক্ষে একটা স্পন্দন, শরীরে একটা শিহরণ অনুভব কর্‌লাম। খানিকপরে ছোট্ট একটা কাগজের টুকরা ফেলে দিয়ে চোখের সম্মুখ থেকে সরে গেল। কাগজটা কুড়িয়ে দেখি একটা ছোট্ট চিঠি—তাতে লেখা—

প্রিয় নরেন,

তুমি আমাকে ভালবাস, আমিও তোমাকে ভালবাসি। তুমি এখানে রোজ আস তাও আমি জানি। তুমি আমার স্বজাতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তুমি দরিদ্র, বাবা কিছুতেই সম্মত হবে না। কাজেই যতদিন না তুমি বাবার মনোমত ধনোপার্জ্জন কর্ত্তে পার ততদিন আমাকে পাবার আশা নেই।

ইতি—

দুর্ভাগিনী

'রেণুকা'

একটা নৈরাশ্য, সমস্ত হৃদয়টাকে ঘিরে অট্টহাস্য করে উঠ্‌ল। নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরলাম। কতকবার ব্যর্থ প্রয়াস

করেছি তার সমস্ত চিন্তা মন থেকে দূর করে দিতে, তার সেই মুখখানি হৃদয়পট থেকে মুছে ফেল্‌তে—তার যা কিছু স্মৃতি তা বিস্মৃতির অন্তলগর্ভে ডুবিয়ে দিতে—কিন্তু সফলকাম হইনি।

তারপর থেকে এই ব্যর্থজীবনটাকে ছ্যাকরাগাড়ীর মত একটানা একঘেয়ে ভাবে টেনে নিয়ে যেতে লাগলাম। প্রাণে স্ফুর্ত্তি নেই, মনে আনন্দ নেই—হৃদয়ে উৎসাহ নেই—আছে শুধু একটা ব্যর্থতা—একটা হতাশ—একটা বুকফাটা হাহাকার। যে দারিদ্র্যের মধ্যে জন্ম, যার সঙ্গে আজীবন সখ্যতা, সেই দারিদ্র্যের সঙ্গেই কটা বছর কেটে গেল।

সেদিনকার কথাটা আজও মনে আঁকা আছে। তখন দশদিক আঁধার করে বর্ষা নেমে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে এল মেঘের গর্জ্জন—বিদ্যুতের হাসি আর বজ্রের নিনাদ। সেদিনও সন্ধ্যাবেলা এমনি বাদলধারা ঝর্‌ছিল। আমি নিজের ঘরে বসে বর্ষার ঘন মেঘের দিকে চেয়ে ছিলাম আর মনে পড়্‌ছিল সেই তিন বছর আগেকার কথা সেই ফাগের দিন। যৌবন তখন প্রৌঢ়ত্বকে স্থান ছেড়ে দিবার জন্য বিদায় নিচ্ছিল। যৌবনের এই শেষ সীমায় পৌঁছে সেদিনকার উদ্দাম যৌবনের মাঝামাঝিতে সেই প্রেমোন্মাদনা মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। বাদলসাঁঝে মনটা সেই অতীতের স্মৃতিটা নিয়েই নাড়াচাড়া কর্চ্ছিল। এমন সময় বর্ষার বাদল মাথায় নিয়ে ডাকপিয়ন এসে একখানি খাম দিয়ে চলে গেল। খামের উপরের লেখাটা যেন পরিচিত—অথচ ঠিক যেন মনে পড়ে না। স্মৃতি-বিস্মৃতির একটা লড়াই বেধে গেল। শেষে স্মৃতিরই জয়। মনে পড়্‌ল সেদিনকার সেই হতাশাময় লেখা অক্ষরকটা, এযে তারই হস্তাক্ষর। কি জানি কি বার্ত্তা বয়ে এনেছে এই ছোট্ট খামখানি। বুকটা কি এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠ্‌ল। বুকের স্পন্দন অতি দ্রুত চল্‌তে লাগল। ত্রস্তে খামখানি খুলে দেখলাম ৫।৬ লাইন লেখা—

প্রিয়তম নরেন,

যে ব্যবধান এতদিন তোমাকে আমাকে পৃথক করে রেখেছিল আজ তা সরে গেছে। আমার পিতা তাঁর একমাত্র মাতৃহারা কন্যাকে এ সংসারে একাকী ফেলে জীবন-সাগরের পরপারে চলে গেছেন। আমাদের অন্ত সরিক বাবার মৃত্যুতে সুবিধা পেয়ে মামলা করে আমায় পথে বসিয়েছে। আজ আমি দরিদ্র—আজ আমি তোমার। এতদিন লজ্জায় জানাতে পারিনি—কিন্তু আজ মৃত্যু আমার শিয়রে। একবার এস প্রিয়তম ১০২নং… লেনে।

ইতি—তোমারই
"রেণুকা"

চিঠিটার প্রথম কয়টা লাইন প্রাণে একটা আনন্দের হিল্লোল তুলে দিল। তাকে পাওয়ার আশাটা প্রাণের ভেতর একটা উদ্দাম আবেগের সৃষ্টি কর্‌ল; কিন্তু শেষের লাইনটা আমার হৃদয়টাকে কি একটা—অজানা, অসহ্য, বেদনায় ভরিয়ে দিল। একই সঙ্গে আশা ও নৈরাশ্য, প্রাপ্তি ও বিচ্ছেদ উল্লাস ও ব্যথা, সুখ ও দুঃখ মিলন ও বিরহ আমার মস্তিষ্কের ধূমায়িত রঙ্গমঞ্চে হাত ধরাধরি করে নৃত্যকর্ত্তে লাগ্‌ল।

তখনই বার হয়ে পড়্‌লাম আমার প্রিয়ার উদ্দেশ্যে। মাথার উপর থেকে থেকে চপলা একটা ব্যর্থতার হাসি হেসে চলে যাচ্ছিল। উক্ত ঠিকানায় গিয়ে দেখলাম ছোট্ট একটী খোলার ঘরে আমার রেণুকা মৃত্যুশয্যায় শুয়ে—সে যেন আমারই আশাপথ চেয়ে তখনও পড়ে আছে। দেখলাম তার সেই লাবণ্যময় দেহ বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে গেছে—জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। আমাকে দেখেই তার মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠ্‌ল—শুধু ক্ষীণকণ্ঠে বল্ল—"প্রিয়তম, মৃত্যুর পরপারে যাবার জন্য মরণের ডাক এসেছে অনেকক্ষণ—শুধু তোমারই আশে এতক্ষণ ভেলা ভাসাতে পারিনি—আমি তোমারই—ওগো আমি তোমারই।" আবেগে তার ক্ষীণ দেহলতাটাকে আমার বুকের মাঝে তুলে নিলাম—কোন কথা কইতে পার্‌লাম না শুধু ধীরে তার ভালে একটা বিদায় চুম্বন এঁকে দিলাম। দেখলাম তার চোখে এক তৃপ্ত চাহনী। যাকে এই কয়বৎসর বুকের মাঝে পা'বার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম তাকেও পেলাম—কিন্তু হায় সে যে ক্ষণিকের জন্য। চীৎকার করে কেঁদে

উঠ্লাম—তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম যে এরই মধ্যে কখন সে ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছে—তার মুখে মৃত্যুর করাল মুদ্রাঙ্কন। বুকের মাঝে করে নিয়ে তাকে শ্মশানে পৌঁছিলাম। তারপর তার লেলিহান চিতা শতবুভুক্ষু জিহ্বা প্রসারিত করে দাউ দাউ করে জলে উঠ্‌ল—তারপর শেষ। তার স্মৃতিটাকে আমার চিরকালের সঙ্গী করে ঘরে ফিরলাম—ফিরবার সময় শুন্‌লাম কে এক উদাসীন গাইছে—

"পেয়ে মাণিক হারালাম মা
আমি অতি লক্ষ্মীছাড়া—"

সেই থেকেই সেই স্মৃতিটাকে বুকে ধরে—লক্ষ্মীছাড়ার মতন জীবন কাটাচ্ছি আর—শেষ পর্য্যন্ত তাই কাটাব ঠিক করেছি……"

এই বলে নরেন চুপ কর্‌ল। অরুণের চোখ জলে ভরে উঠেছিল। নরেনের চোখের জলও বাঁধা মানলে না—অশ্রুর বন্যা নেমে এল। বাইরে মত্ত প্রকৃতি তখনও সেই রকম মাতলামি কচ্ছিল আর তাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে পাগলা হাওয়া কেঁদে যাচ্ছিল "হু, হু, হু…।"

ভাদ্র-প্লাবন

শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বজ্ররথে ভাদ্র এল রুদ্রতালে নৃত্য করে',
ঘূর্ণী ঘোরে, ঝঞ্ঝা ফেরে, গর্জ্জে প্রলয় পৃথ্বী'পরে,
দীপ্ত আকাশ রক্ত-রাগে,
ক্ষিপ্ত বায়ু ছুট্‌ছে বেগে,
মত্ত রাতে লক্ষ্যহারা লক্ষনরের অশ্রু ঝরে।

চতুর্দ্দিকে প্রলয়-প্লাবন ছুট্‌লো ধেয়ে তুফান তুলি',
স্বপ্নে বিভোর যুগ্ম প্রাণের ঘুচ্‌লো প্রেমের স্বপ্নগুলি,
লক্ষ মাতার বক্ষ ছিঁড়ে
পুত্রে তাদের নিচ্ছে কেড়ে,
পুষ্পে ছাওয়া জীবনভেলা ডুব্‌লো স্নেহের বাঁধন খুলি'।

মৃত্যু এল সত্যরূপে মুণ্ডশিরে বজ্রহানি'
স্বপ্ন টুটে, বক্ষ কাটে, ছুটছে অভিশপ্ত প্রাণী,
উচ্চে ওঠে অট্টহাসি,
তীব্র বাজে রুদ্র বাঁশী,
রক্ত বুকের শুষ্ক করে' মৃত্যুতটে আন্‌ছে টানি'।

মৃত্যু ফেরে করাল মুখে দুঃখ দৈন্য ছুট্‌ছে সাথে,
নৃত্য করে তালবেতালে অট্ট হা হা উঠ্‌ছে তাতে,
মত্ত গ্রহের নিষ্পেষণে
রক্ত ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
বক্ষ মাঝে হাহাধ্বনি ফিরছে কেঁদে দিবস রাতে।

মৃত্যু পথের যাত্রীরা সব ছুট্‌ছে বেগে মুক্তি আশে,
মুক্তি কোথা অন্ধ নরের, আস্‌ছে ফিরে মৃত্যুবাসে;
সপ্তরথীর বৃহ মাঝে
বদ্ধ যারা নিজের কাজে
মুক্তি পারের বার্ত্তা তারা শুন্‌বে কোথা, কাহার পাশে!

মুক্তি কোথা তাদের যারা সুখেরঘোরে মগ্ন থাকে?
অশ্রু যারা সুখের গানের সুরটী দিয়া ঢেকে রাখে
দেবদানবের খাম-খেয়ালে
সইতে হ'বে সাঁঝ সকালে;
ক্ষুব্ধ বুকে রুদ্ধশ্বাসে সইতে হ'বে সব নীরবে!
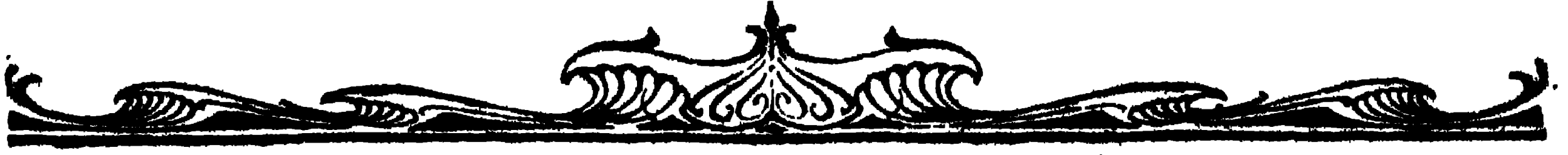
নায়িকা

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি গদ্যে বা পদ্যে যে রস রচনা করেন তাহার আধার নায়ক ও নায়িকা। সকল রকমের Permutation ও combination করিয়া দেখা গিয়াছে যে পুরাতন সংস্কৃত ভাষার লেখকেরা নায়কনায়িকার যে শ্রেণী বিভাগ করিয়া গিয়াছেন তাহার পরিবর্ত্তন করা কঠিন। নায়িকা তিন প্রকারের :—

১। স্বকীয়া ২। পরকীয়া ও ৩। বেশ্যা। ইহাদের মধ্যে নায়িকা হিসাবে স্বকীয়াই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু রস সৃষ্টির প্রধান উপদান পরকীয়া। আমাদের দেশে যত সংস্কৃত নাটক বা কাব্য আছে তাহাতে স্বকীয়া নায়িকার প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। শকুন্তলা ও মালবিকাগ্নিমিত্র এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে প্রধান। বৈষ্ণব কাব্যেই পরকীয়া নায়িকার প্রধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। বেশ্যা বা বৈশিকার কথা কদাচ কখনও দেখা যায়, যেমন ভাষের চারুদত্তের বসন্তসেনা। এই যে তিনটী বিভাগ ইহা আমাদের দেশের সকল লেখকই অরবিস্তর মানিয়া আসিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষ অথবা কৃষ্ণকান্তের-উইল রচনা করিবার পূর্ব্বে বৈষ্ণব কাব্যের অনুকরণে বিদ্যাসুন্দর রচয়িতারা একবার বিদ্যাকে পরকীয়া নায়িকা করিয়া অনেক দিন অনেক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এই শ্রেণীর কবিরাও ধর্ম্মের খাতিরে আদর্শ ঠিক রাখিবার জন্য বিদ্যাকে স্বকীয়া করিতে বাধ্য হইয়াছেন। স্বকীয়ার প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্রকেও কুন্দের সহিত নগেন্দ্র নাথের বিবাহ দিতে হইয়াছিল এবং গোবিন্দলালকে আবার ভ্রমরের মন্দিরে ফিরাইয়া আনিতে হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যের পরকীয়া, কুন্দ ও রোহিণী পরস্ত্রী কিন্তু বিধবা। তাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অপরের সম্পত্তি সুতরাং পরকীয়া। যে দেশে বিধবার বিবাহ প্রচলিত আছে সে দেশের হিসাবে ইহারা পরকীয়া নহে। আমাদিগের দেশে মুসলমান সমাজে পুরুষের বহু বিবাহ এবং বিধবা-বিবাহ উভয়ই প্রচলিত আছে সুতরাং নগেন্দ্র নাথ ও গোবিন্দলাল যদি মুসলমান হইতেন তাহা হইলে সূর্য্যমুখী ও ভ্রমরের অস্তিত্ব সত্বেও কুন্দ এবং রোহিণীকে স্বকীয়া ধরিয়া লওয়া যাইত। এই যে ধর্ম্মশাস্ত্রানুগত স্বকীয়া নায়িকার প্রভাবের প্রাধান্য ভারতীয় সাহিত্যে চলিয়া আসিয়াছিল, তাহা ভঙ্গ করেন প্রথম আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ এবং তাহার আরম্ভ "নষ্টনীড়ে"।

রবীন্দ্র নাথের সুনিপুন রচনায় স্বকীয়া নায়িকার অবনতি ও প্রচ্ছন্না বা প্রখ্যাতা পরকীয়া প্রাধান্য বিকাশের ক্রমোন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। "নষ্টনীড়ের" পর "নৌকা ডুবি" ও তাহার পরে "ঘরে বাহিরে" প্রখ্যাতা পরকীয়ার সাহিত্যিক ক্রমবিকাশ পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে পরকীয়াবাদের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহার বিশ্লেষণ আবশ্যক। পরকীয়া দুই শ্রেণীর। প্রখ্যাতা পরকীয়া, ভয়বিরহিতা, তিনি সর্ব্বদা লোলুপ। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরকীয়া প্রচ্ছন্না, তিনি পতি কর্ত্তৃক সযত্নরক্ষিতা এবং অনায়াসসাধ্যা নহেন। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে বিধবা এই দুই শ্রেণীর পরকীয়া নায়িকার মধ্যে গণ্য ছিলেন না। বাৎস্যায়ন বিধবাদিগকে স্বকীয়া নায়িকার মধ্যে ধরিয়া গিয়াছেন :—

"যেমন কন্যা ভার্য্যা হইবে, সেইরূপ পুনর্ভূ ও ভার্য্যা হইতে পারে; সুতরাং পুনর্ভূ বৃত্তপ্রকরণ আরম্ভ করা যাইতেছে। তার মধ্যে পুনর্ভূ দ্বিবিধ;—ক্ষত যোনি ও অক্ষতযোনি। তন্মধ্যে অক্ষতযোনি সংস্কারার্হ বলিয়া কন্যার মধ্যেই অন্তর্ভূতা। এ সম্বন্ধে স্মৃতিকার ইহা বলিয়াছেন—অক্ষতযোনি বলিয়া সে আবার যথাবিধি বিবাহ করিতে পারে। দ্বিতীয়ার আর সংস্কার নাই, কেবল স্বীকার। লোকে তাহাকে অপরুদ্ধিকা বলে এবং দ্বিধা সেই অপরুদ্ধিকা শাস্ত্রে অনুজ্ঞাতা হইয়াছে। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—মনোদত্তা, বচোদত্তা, কৃতকৌতুকমঙ্গলা

(মাতাপিত্রাদি আদানপ্রদান দ্বারা নিষ্পাদিতা), উদকস্পর্শিকা, পাণিগৃহীতিকা এবং অগ্নিপরিগতা, আর ক্ষতযোনি পুনর্ভূ। ইহার পূর্ব্ব দুইটি অক্ষত যোনি এবং পুনর্ভূ ক্ষতযোনি, সেই ক্ষতযোনি পুনর্ভূকে অধিকার করিয়া তাহার কর্ত্তব্য কি, তাহাই বলিতেছেন; যে স্ত্রী ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যবশতঃ কামার্ত্ত হইয়া ভোগী গুণসম্পন্ন পুরুষকে দ্বিতীয়বার পতিত্বে বরণ করে, তাহাকে পুনর্ভূ বলে।"

সুতরাং শাস্ত্রানুসারে কুন্দ ও রোহিণী ক্ষতযোনি-পুনর্ভূ কিন্তু পরকীয়া নহে। আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালীর হিন্দু সমাজে আমরা কিন্তু রোহিণী ও কুন্দকে পরকীয়ার মতই দেখিয়া থাকি, তাহার কারণ সমাজে ধর্ম্মশাস্ত্রে ও কাব্যে সপ্তশতাব্দীব্যাপী স্বকীয়া প্রাধান্য। মানুষের মন যে ভাবে গড়িয়া উঠে, দেশাচার, লোকাচার, রুচি এবং আদর্শ তাহার জন্য দায়ী। সাধারণতঃ সর্ব্বত্র দেশাচার এবং লোকাচার, রুচির প্রধান উপাদান কিন্তু আদর্শ সকল সময়ে দেশাচার ও লোকাচারের মতের জন্য অপেক্ষা করে না। আদর্শ মানুষের মনেই থাকে, বাস্তব জীবনে যত উৎকর্ষের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মানুষের মানসিক আদর্শ অপেক্ষা একটা না একটা বিষয়ে হীন থাকিয়া যায়। বাস্তব জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তের সহিত মানসিক আদর্শের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে দৃষ্টান্ত আদর্শের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে।

শেষ হিন্দুরাজার অধঃপতনের পরে এই সাত শত বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মণজাতি স্মৃতিকার আমাদের দেশের লোকের মনের সম্মুখে একটা আদর্শ ধরিয়া আসিতেছেন। হিন্দুধর্ম্মটা ও হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহার সেই আদর্শ-মূলক কিন্তু বাস্তব নহে। স্মৃতিকার বা দার্শনিক যে আদর্শ গড়িয়া গিয়াছেন, কোনও দেশের হিন্দুজাতিই সর্ব্বদা সে ভাবে চলিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আদর্শের দ্বন্দের যুগে স্মৃতিকার গোঁড়া হিন্দু বলিতে যাহা বুঝাইতে চাহেন, তাহা আমাদের দেশে বাস্তব জীবনে কখনও ছিল না; তাহা কেবল স্মৃতিকারের মানস পটের আদর্শ। সকল যুগেই সকল সমাজে স্তরবিভাগ ছিল এবং আছে। ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশে এইরূপ স্তর বিভাগ ছিল এবং তাহার উচ্চতম স্তরের মানুষ সর্ব্বদা আদর্শের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিত কিন্তু পারিত না। দেখিতে পাওয়া যায় যে মুসলমানের বাঙ্গলাদেশ অধিকার করিবার চারিশত বৎসর পরেও আমাদের দেশে অনেকে বৌদ্ধ ছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে উৎসাহের অভাবে বৌদ্ধাচারভ্রষ্ট হইয়া হিন্দুসমাজে মিশিয়া গিয়াছে। চৈতন্যের অনুগামী বৈষ্ণবসমাজে এবং দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক সমাজে প্রচুর পরিমাণে বৌদ্ধাচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এখন শাস্ত্র সম্মত হিন্দু আচার।

সাতশত বৎসরে আমরা পরাধীন হইয়া প্রাচীন আদর্শ হারাইয়াছি। হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান আদর্শ ভাল কি মন্দ তাহা পরের যুগের লোক বিচার করিবে কিন্তু শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে সাতশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী কুন্দ বা রোহিণীকে পরকীয়া নায়িকা বলিত না, স্বকীয়া নায়িকা বলিয়াই স্বীকার করিত। এখনকার দিনে আমরা তাহাদিগকে পরকীয়া বলি কেন। বিবাহের পরে স্ত্রী ভারতবর্ষে অনেক দিন ধরিয়া পুরুষবিশেষের পুত্রোৎপাদনের ক্ষেত্র বলিয়াই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন ভারতে কানীন, সহোঢ, ক্ষেত্রজ প্রভৃতি যে সকল পুত্রের নাম পাওয়া যায় তাহারা এখন আর পুত্ররূপে পরিগণিত নহে। প্রাচীন সমাজে পুত্রোৎপাদনের ক্ষমতাবিহীন পুরুষ যে পরপুরুষের সাহায্যে নিজের ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করাইত তাহা এখন নিষিদ্ধ। স্ত্রীর স্বামী বর্ত্তমানে বা অবর্ত্তমানে পুরুষান্তর গ্রহণের যে ক্ষমতা ছিল এবং পুরুষের শাস্ত্রানুসারে অসবর্ণা বিবাহের (অনুলোম,ও প্রতিলোম) যে অধিকার ছিল শাস্ত্রকার তাহা ক্রমে ক্রমে অপহরণ করিয়াছেন। স্ত্রী ক্রমশঃ এক পুরুষের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং পুরুষ মরিয়া গেলেও বিধবার উপর তাহার সে অধিকার বর্ত্তমানের শাস্ত্রকার অক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানে এবং অতীতে একটু প্রভেদ আছে। আধুনিক স্মৃতিকারের বিধি নিষেধের পরিবর্ত্তনের উপায় নাই, কিন্তু প্রাচীনকালে তাহা ছিল। রাজা স্বয়ং, তাঁহার অধীনে মহাধর্ম্মাধিকার ও মহা-

দণ্ডনায়ক (Chief Justice ও Chief Magistrate) ব্যক্তি বিশেষের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিতেন। রঘুনন্দনের মত ক্ষমতাশালী স্মৃতিকারের বিরুদ্ধে অনেক প্রাচীন রাজা বিচার ও প্রতীকার করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান স্মৃতি এবং স্মার্ত্ত বিচারের প্রথা মালবদেশের রাজা প্রথম ভোজদেব খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ধর্ম্মাধিকরণে বাস্তবের বিচার চলিত, আদর্শের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল না। আমাদের দেশের এখনকার কালের সতীত্ব প্রাচীনকালে একচারিণীব্রত নামে পরিচিত ছিল। হিন্দু রাজার অভাবে সমাজে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে আদর্শের অপ্রতিহত প্রভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। হিন্দু শাস্ত্রকার যাহা প্রাচীন ও নবীন স্মৃতির মত বলিয়া প্রচার করিতেন, মুসলমান রাজা তাহাই প্রকৃত আচার ও হিন্দু আইন বলিয়া গ্রহণ করিতেন এবং ইংরাজ তাহারই অনুকরণ করিয়া আসিতেছেন। আদর্শবাদী ব্রাহ্মণ স্মৃতিকার সপ্তশতাব্দী-ব্যাপী অপ্রতিহত অধিকার কালে নারীজাতির স্বভাব-জাত অধিকার এইরূপে লোপ করিয়া প্রাচীন আদর্শ ও আইনের পরিবর্ত্তে নিজের কল্পিত আদর্শ চালাইয়া গিয়াছেন। সেইজন্ত খ্রীষ্টিয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালী হিন্দু মনে করিত যে বিবাহ হইলেই নারী পুরুষ বিশেষের সম্পত্তি হইয়া যায় এবং পুরুষের মৃত্যুর পরেও তাহার সে অধিকার নারীর উপরে অক্ষুন্ন থাকে। এই পরিবর্ত্তিত লোকাচার ও মনোবৃত্তির ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র, কুন্দ ও রোহিণীকে পরকীয়া নায়িকারূপে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন।

বিংশ শতাব্দী রবীন্দ্রনাথের যুগ ও বিপ্লবের যুগ। বাঙ্গালী হিন্দুর সমাজ যে ভাবে সাতশত বৎসর চলিয়া আসিয়াছে এখন যে আর সেভাবে চলিবে না চিন্তাশীল বাঙ্গালী মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও উৎকর্ষ, প্রাচীন প্রাচ্যের আদর্শ ধ্বংস করিয়া সমস্ত প্রাচ্যজগতে যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ফলে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণের প্রাধান্য লুপ্ত হইয়াছে। আমরা প্রাচীন প্রাচ্য আদর্শ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি অথবা ধীরে ধীরে করিতেছি কিন্তু আমরা কি করিব, কোন পথে চলিব কোন আদর্শের অনুকরণ করিব তাহা এখনও স্থির করি নাই। এই বিপ্লবের এবং অস্থিরমতির যুগ সকল দেশেই বিপদ সঙ্কুল। মানুষ যাহা করিতে চাহে অথচ করিতে পারে না, তাহার মনের যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেশাচার ও লোকাচারের ভয়ে চেষ্টায় পরিণত হইতে পারে না তাহা সেই যুগের সাময়িক সাহিত্যে ফুটিয়া উঠে। এক যুগের যে আদর্শ সাহিত্যের ছায়ায় ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠে সেই সমাজের সেই আদর্শ পরবর্ত্তী যুগে লোকাচার হইয়া দাঁড়ায়। মানব জাতির ইতিহাসের প্রতিপত্রে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেইজন্যই কবি সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া সমাজের শিক্ষাগুরু হইয়া থাকেন।

বর্ত্তমান সমাজে স্বকীয়া নায়িকা, কবিকুলের মানস-রাজ্যের সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন, পরকীয়া ও বেশ্যা সেইস্থান অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ, মনস্বী শরৎচন্দ্র ও স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ সুপণ্ডিত ডাক্তার নরেশচন্দ্র বাঙ্গালাসাহিত্যের এই বিপ্লববাদী যুগের প্রধান নেতা।

ছোট গল্প

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়

আজ আমার বিদায় নে'বার শেষ দিন। তাই সকাল থেকে কি একটা অস্ফুট যন্ত্রণা সারা মনটাকে আলোড়িত কর্চ্ছিল,—আর তারই আঘাতে ভিতরে বিদায়-কান্নার বিকট প্রতিধ্বনি হইতেছিল। আজ আমার শেষ দিন। আর আমার বোধ হয় এ স্থানে আসা হবে না, তাই আমার এতদিনের পুরাণো ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম সমস্ত দ্রব্যই ঠিক যথাস্থানেই আছে; আর আজ হ'তে থাক্‌বো না শুধু আমি। সেই সব পরিচিত মুখ আজ আমারই মুখের উপর বিস্ময়ে চেয়ে আছে, আর আমার হঠাৎ চ'লে যাওয়ার কারণ জানবার জন্য আমায় ব্যস্ত ক'রে তুলছে। কেন যে'তে চাই, তা' কেউ জানে না, কাহাকেও জান্‌তে দেওয়াও উচিত নয়। জানে শুধু জগতে একজন—সে জ্যোৎস্না। আমার সঙ্গে লইবার জন্য এনেছি শুধু একটা চামড়ার ব্যাগ; আর কিছুই নয়। নিজের ঘরে বসেই বাক্সটা ও নিজের প্রয়োজনীয় দু'এক-খানা কাপড় ঠিক করিয়া লইব, এমন সময় জ্যোৎস্না আমার ঘরে প্রবেশ করিল। এরূপ অনধিকার প্রবেশ সে আগেও করিত, আজও করিল। আমি সেদিকে লক্ষ্য না ক'রে আপন মনে বিদায়ের আয়োজনে অধিকতর মনোযোগ করিলাম। আমাকে কোন কথা বল্‌তে না দেখে সে বল্লে, "একি পাগলামি অমুদ।'; আমি বলিলাম "পাগলামি নয় জ্যোৎস্না, এটা আমার কর্ত্তব্য।" "তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য হ'তে পারে, কিন্তু আমার কর্ত্তব্য তোমায় যেতে দিতে পারে না।" আমি একটু গম্ভীর ভাবেই বলিলাম "আমার উপর তুমি এমন কি দাবী রেখেছো জ্যোৎস্না যা'তে আমার যে'তে বারণ করতে পার।" জ্যোৎস্নার মুখটা ঠিক মেঘাচ্ছন্ন জ্যোৎস্নার মত ম্লান হয়ে গেল। তার এই লজ্জানত মুখের সকরুণ অপ্রতিভতা স্পষ্ট হয়েই ফুটে উঠেছিল আর সেটা আমি যেন উপভোগ করেছিলাম। ক্ষণেক পরে বলিলাম, "জ্যোৎস্না, এখন আর বিদায়ের সময় ওসব বাজে কথায় কেন মন খারাপ করবে, চিরকালই ত' জান আমি কত বড় একগুঁয়ে।" জ্যোৎস্না কাপড়ের একটা সুতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বল্লে 'বাবা কিন্তু বলেছেন যে আমার বিয়ের দিন পর্য্যন্ত অন্ততঃ থাকা চাই" বলিয়া জ্যোৎস্না মুখ অবনত করিল। আমি তখন হৃদয়ের মধ্যে তীব্রজ্বালার এক দুর্ব্বিসহ তীব্রতা অনুভব কর্চ্ছিলাম; তাই আজ এই বড় দুঃখের দিনেও হাসি পাইল। আমি বলিলাম, "জ্যোৎস্না তোমার বাবাকে বলো যে নিতান্ত একটা হতভাগার এখানে থাকাতে হয়ত শুভকর্ম্মের কোন শুভই হবে না, আর তার থাকাতে হয়ত এই মাঙ্গলিক কার্য্যে অশুভ ঘটিতে পারে।" সারাদিনটা ধরেই চোখের কোনে জলের ঝারা ঝরছে আর মনের ভিতরকার ভারী বোঝাটা ক্রমশই যেন চাপিয়া চাপিয়া বসিতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলা জ্যোৎস্নার পিতার কাছে যাইলাম—বিদায়েরজন্য; চোখের জল তখন শত-ধারার মুখ চোখ ভাসিয়ে দিচ্ছিল। ভাবিলাম এতজল! এতদিন ছিল কোথায়! মূর্খ আমি, তাইবুঝি নাই এ অশ্রুনয়,—এ ভিতরকার দাবানলে বুকের জমাট রক্ত গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে। জ্যোৎস্নার সঙ্গে দেখাক'রে বলিলাম তোমায় আমায় এই শেষ দেখাশুনা; স্রোতের-মুখে একজন অপরিচিত হয়ে এসেছিলাম, আর আজ স্রোতের মুখে অপরিচিত হয়ে ভেসে চল্লাম।" উত্তরের অপেক্ষা না রেখে একেবারে গাড়ী করিয়া ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিলাম। অভিমানে তখন সারাবুকখানা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম, চাঁদ তখন কোথায় ডুবে গেছে। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার চন্দ্রতারকাহীন মেঘের বুক, আমার অন্তরের মত কালো নিবিড় মেঘরাশিতে পরিপূর্ণ।

ভালোবাসার জয়

শ্রী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

সেদিন ছিল থিয়েটারে গিরীশবাবুর রচিত "শাস্তি কি শাস্তির" অভিনয়। সীতা সেদিন সাজিয়াছিল নির্ম্মলা।

যতবারই সে ষ্টেজে আসিতেছিল তাহার চোখ পড়িতেছিল একটি অল্প বয়স্ক সুশ্রী যুবকের উপর। এই যুবকটী একেবারে সম্মুখেই একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছিল। তাহার আকৃতি প্রকৃতিতে বেশ বুঝা যাইতেছিল সে সদ্বংশজাত। সে চোখে যে দৃষ্টি সীতা দেখিয়াছিল, সেরূপ দৃষ্টি সে তাহার এই দীর্ঘ জীবনে দেখে নাই।

সে চোখে যে কি ছিল তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়, তাহা শুধু অন্তরেই অনুভব করিবার। দর্শকবৃন্দ কতবার হাততালি দিয়াছিল, কতবার তাহাকে উৎসাহিত করিয়াছিল, কিন্তু এই যুবকটীকে সে একটীও বাক্য উচ্চারণ করিতে বা একবার হাত তুলিতে দেখে নাই; সে যেন আপনাকে হারাইয়া এই বিখ্যাত অভিনেত্রীর পানে চাহিয়াছিল। তাহার চোখে তখন সে রঙ্গালয় জাগিয়াছিল না; জাগিয়াছিল শুধু এই অভিনেত্রীর রূপখানা।

সীতা সেবার ফিরিয়া গিয়া ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিল "সামনের বক্সে যে ছেলেটী বসে আছে ও কে তা জানেন ?"

ম্যানেজার একটু হাসিলেন, তখনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন "জানব না কেন, ছেলেটী আমাদের হেমবাবুর দৌহিত্র পুণ্যোদয়।

সীতা মুখখানা অত্যন্ত অন্ধকার করিয়া বলিল "হেমবাবুর নাতি ? কই, কোনও দিনই তো একে দেখি নি।"

ম্যানেজার বলিলেন "তোমরা দেখতে পাবে কি ? হেমবাবু যেরকম কড়া প্রকৃতির লোক তাতে এসব দিকে তাঁর আত্মীয় ছেলেছোকরা বড় একটা ঘেঁসতে পাবে না। হতে পারে তাঁর চরিত্র খারাপ কিন্তু তা বলে তাঁর বিষয়ের উত্তরাধিকারী এই নাতিটীর একটু অনিষ্ট তিনি সইতে পারবেন না। তোমাদের চোখের সামনে এই সুন্দর ছেলেটীকে রাখা তাঁর মোটেই ইচ্ছা নয় বলেই একে এতকাল এর কাকার কাছে বাঁকিপুরে রেখেছিলেন। তাঁর থিয়েটার তাঁকে হরদম থিয়েটারে আসতে যেতে হয়, তোমাদের সঙ্গে সংস্রব খুবই বেশী তা বলে তিনি চান না তাঁর নাতি এই সূত্রে তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়। কিছু মনে করো না সীতা তোমাদেরকে বিশ্বাস করতে কেউই পারে না, হেমবাবু নিজেকে দিয়ে দেখেছেন বলেই এত সতর্ক হয়েছেন। অভিনেত্রীর আয়ত চোখ দুইটা একথায় জ্বলিয়া উঠিল, সে শুধু বলিল "বটে ? কথাটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত বাহির হইল।

ম্যানেজার বলিলেন "তাতে তাঁকে দোষ দেওয়া অন্যায়। সংসারে সকল লোকেরই এই মত, এই কথা। তোমাদের শুধু তিনিই যে ঘৃণা করেন তা নয়, সংসারে সবাই ঘৃণা করে।"

ঘৃণা কথাটা ধক করিয়া সীতার বক্ষে বাজিল। এমন স্পষ্ট কথা কোনও দিনই সে শুনিতে পায় নাই। পাংশু মুখে সে বলিল "আমি একাজ ছেড়ে দেব। আজকার দিনটা যখন কথা দিয়েছি অবশ্যই অভিনয় করে যাব, কিন্তু কাল হতে আমি আর এ থিয়েটারে কাজ করতে আসব না, যেখানে এত ঘৃণা বহন করে আসতে হয়—ছিঃ।"

ম্যানেজার বলিলেন এটা তোমার রাগের কথা সীতা। এ থিয়েটারে কাজ না কর অন্য থিয়েটারে কাজ নেবে। সেখানে না পোষায়, তুমি অন্য কিছু করবে। যাই কর নিজের ব্যবসা তোমার যখন থাকবেই তখন এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া অন্যায়।"

"সে দেখা যাবে"

ইহার পর সীতা আবার যখন ষ্টেজে নামিল তখন

তাহার মধ্যে সে স্ফূর্তির বিকাশ দেখা গেল না, তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে স্বভাবতঃ সে হাসির রেখাটুকু বিলীন হইয়া গিয়াছিল।

(২)

বিস্তীর্ণ সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে সীতা একা বসিয়া হারমোনিয়মে সুর দিতেছিল। আজ তাহার বেশভূষা সাধারণ। তাহার গায়ে একটা সাদা সেমিজ, একখানি সরু কালাফিতা সাড়ী, হাতে গাছকতক চুড়ি, কাণে দুটি ছোট ইয়ারিং, গলায় সরু হার। থিয়েটারের বেশভূষা চেয়ে তাহার ঘরের সাধারণ বেশই আরও ভাল দেখায়।

বেহারা আসিয়া খবর দিল একটী বাবু দেখা করতে চান।

সীতা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল "আবি নেহি মুলাকাৎ হোগা, যানে কহো।"

বেহারা জানাইল বাবুকে সে বলিয়াছিল আর সীতা কাহারও সহিত দেখা করিবে না; তথাপি সে যাইতে চায় না, বলিতেছে একটীবার মাত্র দেখা করিয়াই সে চলিয়া যাইবে।

সীতা একটু ভাবিয়া বলিল "আনে দেও।"

বেহারা চলিয়া গেল, সীতা নিজের মনে হারমোনিয়মে সুর দিতে লাগিল।

দ্বার হইতে বেহারা ডাকিল "মাজি, বাবু আয়া।"

মুখ তুলিয়া চাহিয়াই সীতা আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সেই যুবকটী দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া। যেন কত কালের হারা জিনিস সে খুঁজিয়া পাইয়াছে এমনই তাহার মুখ চোখের ভাবখানা, আনন্দ সে যেন বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, কতকটা ছুটিয়া আসিয়া বাহির হইয়া পড়িয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

মাত্র গুম্ফের একটু রেখা উঠিয়াছে, বয়স তাহার বোধ হয় উনিশ কুড়ি। অপরিণত বয়স্ক যুবক এখনও শেষ ফল ধারণা করিতে পারে নাই, এই রূপসী নারীর পিছনে যে কে দাঁড়াইয়া ভ্রুকুটী হানিতেছে তাহা এখনও চাহিয়া দেখে নাই। অপরিণামদর্শী বুঝিতে শেখে নাই কি হইবে ইহার পরে। সে মুগ্ধ হইয়াছে, সে সব ভুলিয়া তাই এই নরকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে আসিয়াছে।

বেদনার রেখা সীতার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল। সেই কি এ সহজ জ্ঞান পাইয়াছিল, সেও কি জানিয়াছিল কি ভীষণ অভিশপ্ত জীবন তাহার? সে মাথায় বিজয় মুকুট পরিয়াছে ভাবিয়া গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়াছিল, কত বক্ষকে সে নিমেষে জয় করিয়াছিল ভাবিয়া আনন্দে ভাসিয়াছিল। কাল থিয়েটার শেষে বাড়ী আসিয়া তাহার এই চব্বিশ বর্ষের দীর্ঘ জীবনখানার কথা আগা গোড়া আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছে, সব ভুল। সে বিজয়ের পথ ধরিয়া চলে নাই, জীবনব্যাপী সে পরাজিতা হইয়াই আসিয়াছে। আপনার নারীত্বকে পদদলিত করিয়া, পুরুষের বিলাস পুত্তলী রূপে পরিগণিত হইয়া, অর্থ বিনিময়ে দেহ বিক্রয় করিয়া—হায়রে, কেমন করিয়া সে ভাবিয়াছে সে জয়ী হইয়াছে? তাহার নারীত্ব নাই, তাহার আত্মমর্য্যাদা নাই, পুরুষ তাহাকে দেখিবে কোন চোখে? যাহা থাকিলে জয়ী হওয়া যায়—কই, তাহার নাই তো! সে যে স্পর্শমণি, তাহা স্পর্শে সবই যে সোণা হইয়া যায়, কামনা লোলুপ পুরুষও যে তাহার স্পর্শে নিস্পৃহ হইয়া পড়ে, হায়, কই তাহার সে রত্ন? জ্ঞানের প্রারম্ভে সে তাহা হারাইয়াছে।

তবু—তবু হে অপরিণামদর্শী যুবা, এই পতিতা যদি তোমাকে তাহার নরকের দ্বার হইতে ফিরাইয়া দিতে পারে, সে তাহার জীবনে যথার্থ একটা সৎকাজ হইবে বলিয়া মনে করিবে।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া বেশ সহজ সুরেই সে বলিল "এস, এই চেয়ারখানায় বস।" বেহারার পানে তাকাইয়া চোখ পাকাইয়া বলিল "আউর বাবু ঘুসনে মৎ দেও, সমঝায়া হামরা বাৎ?"

"বহুৎ সমঝায়া মাঈ।" সে চলিয়া গেল।

সম্মুখের চেয়ারখানা টানিয়া তফাতে লইয়া গিয়া তাহাতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সীতা জিজ্ঞাসা করিল "তারপর, এখানে কি মনে করে বন্ধু?"

পুণ্যোদয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে আকুল চোখে সেই মুখখানা দেখিতেছিল, কি রূপ, কি সুন্দর মুখ, দেখিয়া দেখিয়া আশা মিটে না। তরুণ যৌবন যাহা প্রার্থনা করিতেছিল তাহা এই।

সীতা আবার জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি চাও? শুধু আমার মুখপানে এমনি করে আত্মহারা ভাবে তাকিয়ে থাকতে এসেছ কি?"

তাহার কণ্ঠে বেদনা মিশ্রিত ঘৃণার ভাবটাই ফুটিতেছিল।

যুবক মাথা নাড়িল।

সীতা বলিল তবে কি চাও, আমায় পেতে?"

অস্ফুট কণ্ঠে পুণ্যোদয় উত্তর দিল "হ্যাঁ, তাই চাই।"

সীতা একটু হাসিল "আমায় পেতে চাও? নির্বোধ যুবক, আমায় পাওয়া রিক্ত হস্তে হয় না তা জানো? আমি ভালবাসা প্রেম প্রণয় এ সবের ধার ধারি নে—কারণ—

"মাপ কর, আমি কিছু দিতে পারব না, আমি তোমায় ভালবসি, শুধু এই অকৃত্রিম ভালবাসা ভিন্ন আর কিছু দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার এ ভালবাসা ফিরিয়ে দিয়ো না, তোমার পায়ে পড়ি—

সত্যই সে তাহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।"

সীতা তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল, কঠোর স্বরে বলিল "এ ভালবাসার অধিকার স্ত্রীর কাছে সাজে বন্ধু, অভিনেত্রীর কাছে সাজে না। অভিনেত্রী চেনে রূপ আর রূপেয়া। রূপ আছে, রূপেয়া লে আও, তবে আমায় পাবে, নচেৎ পাবে না।"

এই মিথ্যার অভিনয় করিতে তাহার যথার্থই কষ্ট হইতেছিল।

পুণ্যোদয় তাহার মুখের পানে হতাশ নেত্রে নিস্তব্ধে খানিক চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল আচ্ছা, যদি আমি টাকা আনতে পারি তুমি একেবারে চিরজন্মের মতই আমার হবে তো, কখনও আমায় ছাড়বে না?

সীতা বলিল "থাকব, কখনও তোমায় ছাড়ব না, কিন্তু কি করে টাকা আনবে তুমি? তোমার দাদামশাইয়ের সিন্দুক হতে অথবা তোমার মায়ের যা কিছু আছে চুরি করে এনে আমায় দেবে তো?"

(৩)

তাহার মুখে কি একটা জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এইবার তাহার দিকে পুণ্যোদয়ের চোখ পড়িল, এইবার তাহার কণ্ঠস্বরে যে শুধু উগ্রতা শুধু ছলনা নাই তাহাও সে লক্ষ্য করিল। পুণ্যোদয় থতমত খাইয়া গেল, তাহার পর বলিল "আমি যেমন করেই পারি তোমায় এনে দেব। মোট কথা আমি তোমায় পেতে চাই, একেবারে পেতে চাই।"

"পেতে চাও, একেবারেই পেতে চাও? বেশ কথা বলেছ তুমি, আমায় পাবার জন্যে, আমার বাসনা মিটানোর জন্যে তুমি সব করতেই প্রস্তুত। প্রথম যখন এসেছিলে তখন প্রাণের টানে এসেছিলে ভাবনি ভালবাসার চেয়ে বেশী হচ্ছে অর্থ। জাননি বন্ধু এখানে নিক্তি ধরে সব জিনিসেরই ওজন হয়, কিছু বাদ যায় না।

সীতা একটু থামিল, তাহার পর অগ্রসর হইয়া হাতখানা পুণ্যোদয়ের স্কন্ধে রাখিয়া কোমল স্বরে বলিল "কিন্তু কিসের লোভে তুমি এগিয়েছ তা কি একবার ভেবে দেখেছ? কি পাবার জন্যে যে তুমি এই হেয় চৌর্য্যবৃত্তি পর্য্যন্ত স্বীকার করছ তা জানছ? এই তুচ্ছ দেহটা, মরে গেলেই যার সব শেষ, দেহের অবশিষ্ট যার শুধু ছাই, একে পাবার জন্যে এ কি বাসনা তোমার? শেষ দিন কখনও ভেবেছ কি বন্ধু? সব কাজেরই একটা শেষ আছে, তোমার এ সব কাজেরও কি শেষ হবে না ভাবছ? একবার চাও, ভাল করে চেয়ে দেখ আমার পানে—"

সে মুখখানা পুণ্যোদয়ের মুখের সামনে নত করিল "দেখ, এ মুখে কি আছে, এ চোখে কি আছে, এ দেহে কি আছে? আমায় স্পর্শ কর, দেখ এতে কিছু নেই, সবার যেমন আমারও তেমনি। ভ্রান্ত তুমি, কিসের মোহে মজেছ বল?"

পুণ্যোদয় বিহ্বলের মত তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার আকাঙ্ক্ষিতা তাহার বড় কাছে, তবু তাহার সাহস হইল না সে দেহকে সে স্পর্শ করে।

বিষণ্ণ স্বরে সীতা বলিল "পারছ না, স্পর্শ করতে পারলে না আমাকে? অথচ আমার জন্যেই তো ইহকাল পরকাল হারাতে বসেছিলে?"

রুদ্ধ কণ্ঠে পুণ্যোদয় বলিল "আমি তোমায় ভালবাসি তাই তোমায় স্পর্শ করতে পারছি নে সীতা।"

সীতার চোখে দুইবিন্দু জল ছল ছল করিতে লাগিল,

তাহার হাত দুইখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল বুলবুল—যথার্থই ভালবেসেছ। তোমার এই ভালবাসা যথার্থ আমার বুকে একটা প্রলয়ের তুফান এনে ফেলেছে। তোমার ভালবাসা আমায় উঁচুতে তুলে দেবে, আমায় আর নামাবে না, আমার পথ আর কণ্টকাকীর্ণ করে তুলবে না। যদি যথার্থই এই পাপিনীকে ভালবেসে থাক বন্ধু তবে ফিরে যাও; আমায় যে উদ্ধার করতে পেরেছ এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমার কাজকে ঘৃণা কর, আমায় ভালবেসো, কিন্তু কাছে এস না, স্পর্শ করো না, তাহলে পাপ তোমায় ছুঁয়ে ফেলবে। যাও—ফিরে ঘরে যাও। আবার দেখা হবে, তখন দেখতে পাবে তোমার এই যথার্থ ভালবাসাই আমায় নূতন পথের সন্ধান বলে দেছে।

পুণ্যোদয় কথা কহিতে পারিল না, তাহার চোখের অশ্রু উপছাইয়া অজ্ঞাতে সীতার হাতে পড়িয়া গেল, সে সীতার পানে বিহ্বল নয়নে তাকাইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সীতার গৃহের দ্বার সেদিন হইতে চিরতরে সাধারণের পক্ষে রুদ্ধ হইয়া গেল।

(৪)

বহুকাল পরে আবার দেখা হইল।

পুণ্যোদয় সন্ন্যাসিনীকে চিনিতে পারে নাই, সে খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া সরিয়া যাইতেছিল, সন্ন্যাসিনী একটু হাসিল মাত্র। আমায় চিনতে পারছ না তুমি—?

বিস্মিত পুণ্যোদয় বলিল না, কে তুমি ?"

সন্ন্যাসিনী আবার হাসিল, নত হইয়া বলিল "তুমি আমার সত্যপথের গুরু, পায়ের ধুলা দাও আমি ধন্য হয়ে যাই। গুরুর পায়ের ধুলা না নিলে কিছু হয় না। দীক্ষা দিয়ে গেছলে, কিন্তু পায়ের ধুলা দাও নি।"

পুণ্যোদয় সরিয়া যাইবার আগেই সে পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল—"আমায় চিনতে পারছ না, আমি সীতা।"

"সীতা, সীতা—আমার সীতা—"

আনন্দে অস্ফুট চীৎকার করিয়া পুণ্যোদয় অগ্রসর হইল।

সীতা সরিয়া গেল, বলিল "স্পর্শ করো না যদি প্রকৃত ভালবেসে থাকো তবে কখনই আমায় স্পর্শ করতে পারবে না। প্রকৃত ভালবাসায় কামনা বাসনা থাকে না, অতৃপ্তি থাকে না, কারণ ভালবাসা পেতে চায় না দিতে চায়। দেওয়ার মধ্যে সে নিজের সার্থকতা অনুভব করে, সে ধন্য হয়ে যায়। আমায় যদি ভালবেসে থাকো তবে এগিয়ো না, যেখানে আছ সেখানে দাঁড়াও।"

পুণ্যোদয় দাঁড়াইল, উচ্ছ্বসনেত্রে ডাকিল "সীতা—"

সীতা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল অভিনেত্রীকে আজও ভুলতে পার নি দেখছি। অভিনেত্রী যে মরে গ্যাছে পুণ্য, আজ আছি আমি, আমি সন্ন্যাসিনী। আমার সকল বাসনা কামনার তৃপ্তি হয়ে গেছে; বুকে যে আগুন জলছিল তাতে আমার ভোগ বিলাস সব পুড়িয়ে ফেলেছি। আমার যে যজ্ঞ আমি আবাহন করেছিলুম, তার হোতা হলে তুমি, তাই বিনাড়ম্বরে নির্ব্বিবাদে সে যজ্ঞ সমাপ্ত হয়ে গ্যাছে। আমার বন্ধু, আমার প্রিয়, আমার গুরু, আজ আমার সব শেষ হয়ে গ্যাছে। তুমি ভালবেসে বিশ্ব জয় করেছ।"

সীতার মুখখানা যেন জলিতেছিল, পুণ্যোদয় আনন্দ-বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া রহিল।

দরদী
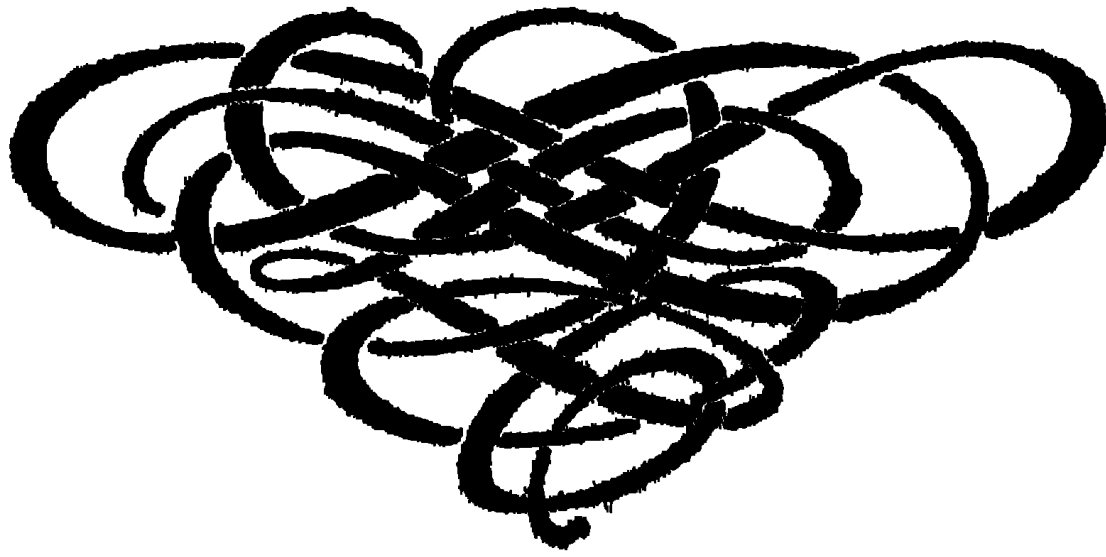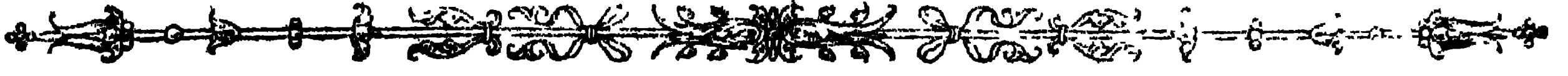
শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এ উপকারটী তোমায় কর্ত্তেই হবে।

অত্যন্ত ব্যাকুলতাপূর্ণ করুণকণ্ঠে সজলনয়নে সুরেশ, নরেন্দ্রনাথকে উপরি উক্ত প্রার্থনা নিবেদন করিয়া ভিখারীর মত উত্তরের প্রত্যাশায় তাহার মুখের প্রতি চাহিল।

নরেন্দ্রনাথ গভীর বিস্ময়ে সুরেশের মুখের প্রতি একবার তাকাইয়া তখনি চক্ষু নত করিয়া ধীরে ধীরে সহানুভূতি সূচক মধুরস্বরে বলিল "ছি? আমার কাছে তোমার অমন করে বলা কি ঠিক হচ্চে সুরেশ? তুমি কার সঙ্গে কথা বলচ বোধহয় ভুলে গেছ। বলিয়া নরেন্দ্র সুরেশের হাতখানি প্রীতি-সহকারে নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া পাশের চেয়ারে তাহাকে সাদরে বসাইয়া পুনরায় বলিল—দেখছি মনটা খুবই খারাপ হয়েছে। আজ এখানে থাক—এখন বেলা হয়ে গেছে, রাত্রে সব ব্যাবস্থা করা যাবে। ইতিমধ্যে বেহারা চা আনিয়া উপস্থিত করিল—উভয়ে মিলিয়া চা পান করিতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে অনতিদূরে শিবপুর নামক একটি পল্লীগ্রামে সুরেশের মামার বাড়ী। সুরেশের পিতা আজ প্রায় পনর বৎসর হইল ইহধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। স্বামীর সংসারে কেহ না থাকায় সুরেশের জননী অনন্যোপায় হইয়া অপগণ্ড শিশুপুত্র তিনটিকে লইয়া নিজ পিত্রালয়ে আসিয়া সেই পর্য্যন্ত অবস্থান করিতেছেন। সুরেশের মাতুল যথাসাধ্য ভাগিনেয় তিনটিকে গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তী করিয়া লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সুরেশ বড় ছেলে। আজ দুই বৎসর হইল আই, এস, সি পাশ করিয়া জননীর দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে একটি চাকরী অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছে। এমনি দুর্ভাগ্য,যে সহস্র চেষ্টায়ও সামান্য একটি পনর টাকা বেতনে চাকরী তাহার জুটিল না। কলিকাতা ও পশ্চিমে তাহার স্বর্গীয় পিতার বন্ধু, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ছিল। সুরেশ যাহার নিকট চাওয়া সম্ভব ছিল তাহার নিকট বহুবার হাঁটিয়াছে—নিজেদের অবস্থার কথা অকপটে বলিয়াছে—এমন কি তাহাকে পড়াইবার জন্য তার মা সমস্ত অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন এমন পয়সা নাই যে তার কনিষ্ঠ ভাই দুটীর লেখাপড়া হয়। যেখানে যাওয়া অসম্ভব, ব্যয় সাপেক্ষ—সেখানে চিঠির পর চিঠি দিয়াছে—দশবারখানি চিঠি লিখার পর কেহ কেহ দুই ছত্র উত্তর দিয়াছেন "এখন এদিকে বড় সুবিধা দেখিতেছি না সুবিধা হইলে জানাইব।" মৌখিক নিরর্থক উৎসাহ বাক্য সুরেশ অনেকের নিকট হইতে রাশি রাশি পাইয়াছিল। অকারণ রেলভাড়া খরচ করাইয়া তাহাকে বহুবার হাঁটাইয়াছে। একটি পয়সা দিয়া কেহ সাহায্য করেন নাই। বরং তাহার দৈন্যের পশ্চাতে দীর্ঘহাস্যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছে।

গ্রীষ্মের দীর্ঘদিন পথে পথে ঘুরিয়া বিফল মনোরথ হইয়া সংসার অনভিজ্ঞ নবীন যুবক যখন বাড়ী ফিরিবার নিমিত্ত শুষ্কমুখে ষ্টেশনে আসিয়া ধুঁকিয়া পড়িত, ক্ষুধায় যখন তাহার নাড়ী চুঁইয়া যাইবার উপক্রম করিত, চক্ষে যখন সে বিশ্বসংসার ধূমায়মান দেখিত, নৈরাশ্যে যখন তার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পথের ধূলি-কণার সঙ্গে মিশিয়া যাইত, তখন তার উদ্বেলিত বক্ষ মথিত করিয়া রক্ত অশ্রুকণা দুই নয়নপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিত। তাহার সমস্ত শরীর সোলার মত হাল্কা মনে হইত। মায়ের নিকট গিয়া কি বলিবে—ছোট ভাই দুটী যখন আনন্দে ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দিয়া তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে দাদা তোমার চাকরী হয়েছে, চাকরী হলে যে আমাদের কত কি কিনে দেবে বলেছ কবে দেবে দাদা? এমন সময় গাড়ীর ঘণ্টা হইয়া গেল। সুরেশ মাতালের মত টলিতে টলিতে তাড়াতাড়ি গিয়া একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আর ভাবিতে পারিল না। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। ডেলিপ্যাসেঞ্জারের দল সারাদিনের দাসত্ব কেমন সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিয়াছে সাহেবকে কেমন দুই কথা মুখের উপর শুনাইয়া দিয়াছে তাহার আস্ফালন

করিতে করিতে মহা হর্ষে তাস খেলিতে বসিয়া গেল। কেহ পুঁটুলি খুলিয়া সন্তাপহারী তামাক সাজিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। দরিদ্র নিপীড়িত, চাকুরী অন্বেষী সুরেশের সহিত কেহ কোন কথা কহিল না—সে চুপ করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

(২)

যেমন করে পার আমাকে কলম্ব পর্য্যন্ত পরিচয় দেবার ব্যবস্থা কর। নরেনবাবু এ উপকার আমি জীবনে কোন দিন ভুলব না।

সন্ধ্যার পর নরেন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় বসিয়া এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল। নরেন্দ্রনাথ বলিল—তোমার সমস্ত যুক্তি খুব ভাল করে ভেবে দেখেচি একাজে তোমার মায়ের প্রাণে যথেষ্ট আঘাত লাগবে। হয় ত বা তোমার শোকে তিনি মারাও যেতে পারেন।

আমি এসব কথা অনেকবার ভেবেচি। কিন্তু শুধু ভেবেত কোন ফল নেই। এখানে এমন অবস্থা আর কিছু দিন থাকলে হয়ত মার সামনে আমাকেই মরতে হ'বে, সেটা কি মার পক্ষে আরো ভীষণ নয়?

নরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আমাদের অপিসে লোক ছাড়িয়ে দিচ্ছে, কাজকর্ম্ম বড্ড কমে গেছে, সাহেবকে অনেক করে বল্লাম, কিছুতে রাজি হ'লেন না! আমার মনে হয় সুরেশ তুমি আরো কিছুদিন চেষ্টা করে দেখ। ভগবান কি এমনই করবেন, যে এতবড় দেশটায় তোমার একটা কাজ জুটবে না?

নরেন্দ্র নাথের শ্বশুরালয় সুরেশের মামার বাড়ীর দেশে। সেই সূত্রে সুরেশের সহিত নরেন্দ্রের পরিচয়।

সুরেশ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে, তার শতছিদ্র বিশিষ্ট মলিন ছত্রটি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং ধীরে ধীরে বলিল—এই একই উত্তর ক্রমান্বয়ে আজ দুইবৎসর ধরিয়া সকলে নিকট পাইয়া আসিয়াছে; সুতরাং ইহাতে আর নূতন কিছু নাই। নরেন তোমাকে কষ্ট দিলাম, সেজন্য আমার অপরাধ নিও না ভাই। বড় দুঃখে পড়ে একাজ কর্ত্তেও বাধ্য হয়েছি। আমি চল্লাম। কারো অপরাধ নাই, সবই আমার অদৃষ্ট!

নরেন্দ্রের ব্যথিত অন্তর এ কথায় আরো পীড়িত হইয়া উঠিল সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, সুরেশ আমি যে কোনো উপায়ে পারি তোমাকে 'কলম্ব' পর্য্যন্ত পৌছে দেবার ব্যবস্থা করবো, কিন্তু তুমি অবোঝ নও, ভেবে দেখ, কি ভীষণ দুরাকাঙ্ক্ষার মধ্যে ঝাপিয়ে পড়্‌তে চলেছ। বিদেশের খরচ প্রথমতঃ তোমার নাই, এখানে কেউ যে তোমার দুরবস্থার কথা শুনে একটী পয়সাও সাহায্য করবে না—সে আশা যে দুরাশা, তা তুমি নিজে হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছ সুতরাং সেখানে ঈশ্বর করুণ তোমার মঙ্গলই হোক্। কিন্তু ভালর দিকটা যেমন ভাবতে খুব আশাপ্রদ, তেমনি মন্দ দিকটা মনে করতে শরীর শিহরিয়া উঠে যে ভাই! আমার ভয় হয়, পাছে আমার দ্বারা তোমার ভাল না হ'য়ে মন্দ হ'য়ে পড়ে।

এখানে না খেতে পেয়ে অনাহারে শুকিয়ে মরবো, মা, ভাইদের অনাহার ক্লিষ্ট কাতর মুখের প্রতি, নিরুপায়ের মত ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া জড়ের মত বসিয়া শুষ্ক চিন্তাভারে রহিয়া রহিয়া মরিব, সেটা কি এতই বাঞ্ছনীয় মৃত্যু! এতই কর্ত্তব্য নিষ্ঠা! না, তাদের রক্ষা করবার জন্য বীরের মত সংসার যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া ধর্ম্ম। অসহায়, নিরুপায় এমন কথাটা ভেবে ভেবে আমরা যে দিন দিন কোথায় গিয়ে পৌছেচি, তাহা একবার ভাবলে তুমি আর আমাকে বারণ করবে না। পার যদি আমাকে কলম্ব পর্য্যন্ত পাঠিয়ে দাও! একটা সংসারকে ধ্বংসের মুখ হ'তে বাঁচাও। আমি বিদেশে মুটেগিরি করেও পয়সা উপার্জ্জন করলে কেউ দেখ্‌তে যাবে না। উপহাসের ঘৃণায় তীব্র হুল ফোটাতে পারবে না।

তোমার জননীর কথা ভেবেচ! বিধবা যখন তোমার কোন সংবাদ পাবে না, তোমার ছোট ভাইদুটি যখন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অশ্রুসিক্ত কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করবে "দাদা কোথা?" তিনি কি উত্তর দিবেন। তাঁর হৃদয় যে শতধা চুর্ণ হ'য়ে যাবে। হয়ত তিনি মারাও যেতে পারেন। এ পাপের যে অংশ আমায় নিতে হবে ভাই।

আমি শপথ করে বলচি এতে তোমার কোন পাপ লাগবে না। বরং পুণ্যই হবে। না খেতে পেয়ে যদি চখের সামনে লোক মরে যায় তাতে পাপ হয় না? আর

তাদের খাবার পথ দেখিয়ে দিতে যদি কেউ সাহায্য করে অমনি যত সব পাপ তাল পাকিয়ে তার ঘাড়ের উপর এসে পড়বে, এ যদি ধর্ম্ম হয়, তবে তেমন ধর্ম্মে আমার ত প্রয়োজন নাই, আর তোমাকেও অনুরোধ এমন যুক্তি দ্বারা যে ধর্ম্ম, তাকে না মানলে বড় বিশেষ অধর্ম্ম ত দূরের কথা কোন ক্ষতি হবে না। আমি মাকে বুঝিয়ে পত্র দেব। তিনি মা, আমার উপর অভিমান একদিন করলেও করতে পারেন, কিন্তু রাগ করবেন না সে বিশ্বাস আমার আছে। দয়া করে কলম্ব পর্য্যন্ত পাঠিয়ে দাও ভগবান তোমার নিশ্চয় মঙ্গল করিবেন।

(৩)

নরেন্দ্র বেঙ্গল-নাগ-পুর রেলের বড় বাবু ছিলেন। কোনরূপ যোগাড় করে সুরেশকে কলম্ব পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। তার অবস্থা তত ভাল না হ'লেও হাওড়া ষ্টেশনে সুরেশকে গাড়ীতে তুলে দিতে এসে অনেক সদুপদেশ দিয়েছিল। সেখানে পৌঁছেই যেন তাকে পত্র দেয়। সুরেশের মার ও ভাইএদের, তার দ্বারা যতদূর সম্ভব ও সামর্থ্যে কুলায় ততদূর সংবাদ রাখিতে প্রতিশ্রুতি নরেন্দ্র সুরেশকে দিল। এত বড় ভার নরেন্দ্রনাথ সেদিন যে কেন স্বীকার করিল, তাহা বোধহয় সব বিচার, যুক্তি, তর্ক ছাপিয়ে গিয়েছিল। সুরেশ শত চেষ্টা করিয়া অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারে নাই। গাড়ীর ঘণ্টা হইয়া গেল, নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি পকেট হইতে একটা ১০০৲ টাকার নোটের তোড়া সুরেশের হাতে দিয়ে সজল নয়নে বলিল, টাকা নেই সর্ব্বদা মনে করো। নিতান্ত অভাবে পড়লে তবে এতে হাত দিও। কিছু বেশী দেবো মনে করেছিনু, কিন্তু কোন রকমেও যোগাড় করে উঠতে পারলাম না।

সুরেশ যেন কি বলিতে গিয়া কিছুই বলিতে পারিল না। কৃতজ্ঞতা ভারাবনত অন্তরটি তার করুণ কাতর অশ্রুসমাচ্ছন্ন দৃষ্টির মধ্যেই সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল। সে আজ দুই বৎসর হইয়া গিয়াছে। তারপর সুরেশ বিলাত হইতে সুখ-দুঃখের অনেক ইতিহাস লিখিয়াছে। মাঝে প্রথম প্রথম তিন চারবার ৭৫৲ ১০৫৲ করিয়া টাকা পাঠাইয়াছিল। তারপর সে পীড়িত হইয়া লেখে যে আমি হাঁসপাতালে চলিলাম। সেখানে গিয়া সে একটা কিছু করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু নিজে পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিদেশে লেখাপড়া কতদূর সম্ভবপর তাহা দূরে বসিয়া বিচার করা চলে না। সুরেশ হাঁসপাতাল হইতে একদিন একখানি পত্র দেয়, আজ একটী শুভ-সংবাদ তোমাকে না দিয়া পারিলাম না। সকলের আত্মীয়স্বজন হাঁসপাতালে তাদের পীড়িতজনের জন্য প্রতিদিন সকালে বৈকালে কত রকম ফল, ফুল নানাবিধ পথ্য, বই, ইত্যাদি লইয়া আসে, এ দৃশ্য অপূর্ব্ব। স্বর্গ বলিয়া মনে হয়। যে হাঁসপাতালের নামে আমরা শিহরিয়া উঠি, যে হাঁসপাতালে যাইতে হইবে, মাত্র এই কল্পনায়, হাঁসপাতালে নীত হইবার পূর্ব্বেই অনেক সময় পথেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা গিয়াছে—সেও হাঁসপাতাল, এও হাঁসপাতাল, প্রভেদ পরাধীন দেশের হাঁসপাতাল, আর এ হচ্ছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্বাধীন জাতির হাঁসপাতাল। দুয়ের বিচার এখান থেকে ঠিক করতে না পারলেও মনে হয় অনেক তফাৎ। হাঁসপাতালে যে আমি কি সুখে আছি তা লিখে জানান যায় না। একথা শুনে হয়ত তুমি মনে মনে খুবই হাসবে, মনে করবে আমি তোমাকে মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ভোলাচ্ছি তা নয়। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো! এর একটী বর্ণও অতিরঞ্জিত নয়। যাক্ যে কথা বলব মনে করেছিলাম, দেখ্‌ছি তার একটী বর্ণও এখন বলা হয় নাই।

সেদিন, সকালে একটী প্রৌঢ়া রমণী, অনেক ফল, ফুল, বই লইয়া তার একটী ছেলেকে দেখ্‌তে এসেছিল। তাঁর অন্তরটি স্বচ্ছ বারির মত নির্ম্মল ও পবিত্র। তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে বসে বসে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গল্প করছিলেন, হঠাৎ তাঁর মাতৃ-হৃদয়ের করুণ দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইলে চারি চক্ষুর মিলন হইয়া গেল। যতক্ষণ তিনি তার ছেলে সঙ্গে গল্প করছিলেন, ততক্ষণ আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার প্রতি তাকিয়ে স্বর্গীয় সুখের অনির্ব্বচনীয় রসস্বাদ করছিলাম। তাঁহার মাতৃ হৃদয়ের স্নেহধারা যেন সহস্র দিক দিয়া তার পীড়িত পুত্রের উপর কল্যাণ আশীর্ব্বাদের মত ঝরিয়া পড়িতেছে। জানি না,

আমার চক্ষের উপর তখন বুঝি আমার মায়ের করুণা ভরা মুখখানি ভাসিয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজ—মার দৃষ্টি হয়ত সে ছবি কেমন করিয়া দেখিতে পাইয়াছিল, তিনি তাড়াতাড়ি পুত্রের শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া আমার খাটের পার্শ্বে আসিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। বলিলেন "আমি আপনার অপরিচিত হইলেও আমাকে অনুগ্রহ করে আপনার পার্শ্বে বস্‌তে অনুমতি করুন। আমি কি বলিব, এমন কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সেই শান্ত, মহিমান্বিত নারী রুমাল দিয়া আমার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া দয়াদ্রকাতর মধুর স্নেহ সম্ভাষণে বলিলেন, কাঁদবেন না। আপনি দেখ্‌চি ভারতবাসী। এখানে নিশ্চয় আপনার কেহ নাই। শীঘ্রই আরাম হ'য়ে যাবেন। কোন ভয় নাই। মনে রাখবেন, আজ হ'তে, আপনি একজন ইংরাজ মহিলা মা পেলেন।

বলিয়া তিনি নিজ পুত্রের শয্যা-পার্শ্ব হইতে ফল, ফুল, ও বই আনিয়া আমাকে দিলেন আর বলিলেন "বিকালে তিনি আসবেন, এবং তার জন্য অনেক জিনিষ আনবেন। তারপর আমার ডাক্তারের ও নর্সের সহিত কি কথা-বার্ত্তা বলিয়া আমার পায়ে হাত বুলাইয়া স্নেহ সম্ভাষণ করিয়া পুনরায় বৈকালে আসিবার আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম—একটী কথা বলিয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সত্যই আমি একজন সত্যিকার দরদী আজ সমুদ্র পারে লাভ করেছি। বিকালে আসিয়া তিনি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলেন। কথায় কথায় আমার বাড়ীর সমস্ত অবস্থাটা জানিয়া লইলেন, এবং এমন কি মার নাম,বাড়ীর ঠিকানা। তাহার সরল অন্তরের কাছে আমি কোন কথাই গোপন করতে পারি নাই। দুই দিন পরে তার ছেলে হাঁসপাতাল হতে খালাস পেলেন। তাকে নিয়ে যাবার সময় পুত্রের আরোগ্যে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু, আমার নিকট এসে বল্লেন, আজ তোমার ভাইকে নিয়ে যাচ্ছি আর তিনদিন পরে তোমাকে নিয়ে যাব। তোমার কোন চিন্তা নাই আমি রোজ তোমাকে দেখতে আসব। সে দিন, তার সঙ্গে আঠার, উনিশ বর্ষের একটী সুন্দরী যুবতী ছিলেন। তিনি তাকে মারগ্রেট বলিয়া সম্বোধন করিলেন। আমাকে দেখিয়া বল্লেন "মারগ্রেট আজ থেকে তোমার একটী ভাই বেড়ে গেল। এবং সেই ভাই তোমার ভারতবর্ষের ভাই। মেয়েটি একগাল হেসে আনন্দে আমার করপীড়ন করে বল্লেন" ছোট বোনকে আশা করি ভুলবেন না। আমার সমস্ত ব্যাধি যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে দূর হইয়া গেল। আমার নয়ন বহিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ভাই নরেন্দ্র, আমার এই সব, বোনের অনেক কথা, চিঠিতে লিখে সুখ হবে না। দেশে গিয়া সাতদিন, সাতরাত্রি ধরে বল্লেও ফুরাবে না।

এখন আর আমি হাঁসপাতালে নাই। মার বাড়ীতে এসেছি শরীর বড়ই দুর্ব্বল। মাকে লুকিয়ে তোমাকে এই চিঠি দিলাম। তিনি বা মারগ্রেট কোন রকম একটু পরিশ্রম করিতে দেখিলে বড় বকেন। রাগ করেন, মারগ্রেট আবার অভিমান করে কথা কন না। সেজন্য লুকিয়ে পত্র দিলাম। এতদিনে বেশ বুঝিয়াছি অন্তঃকরণ জিনিষটা বড়ই দুর্ল্লভ এর কোন জাতি নাই তাই আজ কোথায় ভারত—আর কোথায় ইংলণ্ড মধ্যে সহস্র যোজন সমুদ্রের ব্যবধান বিদ্যমান স্বত্বেও আমি দরদী মা পেয়েছি। ভগবানের এ পবিত্র দান, যতদিন বাঁচিব, ততদিন আন্তরিক কৃতজ্ঞতার প্রেমাশ্রু দিয়া পূজা করিব।

(৪)

আজ দুইদিন হইল সুরেশ কলিকাতা আসিয়াছে। তাঁর দরদী বিলাতী মা সুরেশের মায়ের নিকট হতে চিঠি পেয়ে নিজে যাবার আসবার return passage কিনে সুরেশকে তার ভারতবর্ষীয় মার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়েছেন। সুরেশের মা বুঝিয়া লিখিয়াছিলেন, যে সুরেশ নিশ্চয় বাঁচিয়া নাই। সেজন্য বিদেশী মায়ের হৃদয় ভারতবর্ষীয় মায়ের অন্তরে দারুণ ব্যথা অনুভব করিয়া সামর্থ্যের অতীত হইলেও সুরেশের যাবার আসার জাহাজের টিকিট কিনে দিয়েছিলেন।

সুরেশকে জাহাজে তুলে দিতে, তাঁরা সপরিবারে ষ্টীমার ঘাটে আসিয়াছিলেন। সে বিদায় দৃশ্য মনে করিতে সুরেশের নয়ন সজল হইয়া আসে। এত স্নেহ, এত করুণা, সে যে, আজ পর্য্যন্ত তার জন্মভূমিতে কোন দিন পায় নাই। জাহাজ ছাড়িবার অল্প পূর্ব্বে মা বল্লেন প্রিয় সুরেশ, তোমার নিজের মাকে পেয়ে কি আর আমার কথা তোমার স্মরণ থাকবে?

আমি কোন উত্তর না দিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। তাঁহার চক্ষু শুষ্ক ছিলনা। তিনি রুমালে চক্ষু মুছিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলিলেন "শুনেছি, এদেশে এ'লে তোমাদের নাকি জাতি যায়?" নিজের বাড়ীতে, এমন কি আর কাছেও থাকতে অধিকার পায় না। তোমাকে যদি, তারা বাড়ীতে স্থান না দেয়, একথা যদি সত্য হয়, সেজন্য দুঃখ করো না। বলিয়া তিনি আমার হাতে তাঁর নিজের একখানি নূতন তোলা ফটোগ্রাফ্ দিয়া বলিলেন, এখানি তোমার মাকে, আমার বোন-কে দিবে। তিনি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে তার বোন, তার ছেলের ভার নিতে কুণ্ঠিত হবে না।"

বলিয়া তিনি চক্ষের উপর রুমাল চাপিয়া অশ্রুবেগ সম্বরণ করিলেন। একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—যদি তোমার আত্মীয়স্বজন তোমাকে সাদরে গ্রহণ করতে আপত্তি করেন, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ করো না। সমুদ্র পারের পশ্চিমের মার কথা স্মরণ করে এখানে আসতে বোধহয় তুমি ইতস্ততঃ করবে না।

মা, আমি যতদিন বাঁচব ততদিন আপনাকে যদি কোন কারণে ভুলি এ অসম্ভব যদি কোনদিন সম্ভবপর হয়—আশীর্ব্বাদ করুন তখনি যেন আমার মৃত্যু হয়।

মারগ্রেট আসিয়া আগ্রহভরে আমার হাতখানি ধরিয়া চুম্বন করিল এবং বলিল—দেখ ভাই, দেশে গিয়ে যেন ছোট বোনটির কথা একেবারে ভুলে যেও না। প্রতি মেলে যেন তোমার চিঠি পাই। তারপর একটী সুটকেস্ দিয়ে সে বল্লে, এর ভেতর আমার ছোট ভাইদের জন্য কিছু উপহার রইল, তাদের আমার কথা বলে, দিতে যেন ভুল না হয়। বলিয়া রুমাল দিয়া নয়ন মুছিল। জাহাজ ছাড়িবার অল্প পূর্ব্বে মা আমার মস্তক চুম্বন করিলেন। তারপর সকলে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া জেটির উপর গিয়া, জাহাজ ছাড়ার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

জোয়ারের মুখে জাহাজ ছাড়িয়া দিল। তাহারা সকলে সজলনয়নে, আমাকে বিদায় অভিবাদন করিলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, বেশ স্মরণ আছে; তাঁহারা জাহাজের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিলেন। আমার দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল, তাহাদের স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া আসিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। তাঁহাদের সুমিষ্ট আলাপ, প্রাণস্পর্শী স্নেহ, মধুর সৌজন্য, এ পৃথিবীর মানুষ যে এমন করিয়া দিতে পারে, তাহা কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় নাই।

(৫)

আজ দুই বৎসর পরে নিজ গ্রামে প্রবেশ করিয়া হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। এক সঙ্গে বাল্যের ছোট বড় সহস্র অতীত স্মৃতি জাগিয়া, প্রাণ উল্লাসে বিভোর করিয়া তুলিল। সেই সব চির পরিচিত তরু-লতা, বাগান পুষ্করিণী, সেই সব সংস্কার অভাব জীর্ণ পুরাতন বাড়ীগুলি যেন আমাকে সাদর আহ্বান করিল। মহা আনন্দে চলিয়াছি, কতদিন পরে মাকে দেখিব, ছোট ভাই দুটিকে দেখিব, বিলম্ব যেন আর সহ্য হইতেছে না। বাল্য সাথী দুই এক জনের সহিত পথে সাক্ষাৎ হইল। তাহারা সহস্র প্রশ্নে আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গ্রামের বৃদ্ধেরা কিন্তু শুধু 'কবে আসিলাম' মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়া দূরে দূরে চলিয়া গেলেন। কোন প্রকার কুশল প্রশ্ন বা মুখে কোনরূপ আনন্দের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বরং একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা তাহাদের মুখে প্রকটিত হইতেছিল। তাহাদের এ আচরণ সত্যই আমার প্রাণে বড়ই ব্যথা দিল। আমাদের বাড়ীর পার্শ্বে হরিশদের বাড়ী। হরিশ আমার বাল্যবন্ধু। আজ তার ছেলের অন্নপ্রাশনের ব্রাহ্মণ ভোজন। শুনিলাম, মহা সমারোহ। হরিশ বেশ দুপয়সা করিয়াছে। সুতরাং গ্রামের সকলেই তাহাকে খাতির করে। কেবল মনে হইতেছিল, এতক্ষণ কি মা, বা মামা আমার আসার কথা জানতে পারেন নাই। তাহা হ'লে নিশ্চয় আমার ভাইয়া

ছুটে এগিয়ে আসত। ঠিক এমনি সময় কালীপদ বাবু মামার একজন আত্মীয় তিনি এসে অকস্মাৎ আমাকে সম্বোধন করে বল্লেন, বাবা সুরেশ তুমি এসেছ শুনে, তোমার মামার মাথা ঘুরে গিয়েছে, তোমার মা শয্যা নিয়েছেন। ভাল বল্‌ছিলাম, তোমার আর বাড়ী গিয়ে কাজ নাই। তুমি তার বাড়ীতে গেলে, গ্রামের সকলে তোমার মামাকে ত্যাগ করবেন। কারণ, তোমার ত বাবা আর জাত নেই, ম্লেচ্ছের সংস্পর্শে তোমার জাত গিয়াছে। তোমার সকল সম্বন্ধ আমাদের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে।

একথা শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া গেলাম। তাঁহার মুখের দিকে বিস্মিত হইয়া একবার চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, সে মুখে চক্ষে কি ভীষণ হৃদয়হীনতার নিষ্ঠুর ছবি। করুণার কণামাত্র, জাতীয়তায় আত্ম-সম্মান গর্ব্বিত ব্রাহ্মণের কথায়, দৃষ্টিতে, বা আচরণে মোটেই পরিলক্ষিত হইতেছিল না। আমি ভূমিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে যাইলে, তিনি সভয়ে সাত হাত পশ্চাৎপদ হইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, কি কর! কি কর! এই অবেলায় আমাকে স্নান করতে হবে। ছুঁয়ো না।

লজ্জায় ঘৃণায়, অপমানে প্রসারিত হস্ত টানিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে, বলিলাম, তা'হ'লে আমার মার সঙ্গেও দেখা হবে না? তিনিও কি আমাকে ত্যাগ করেছেন?

কালীপদবাবু অসঙ্কোচে অনায়াসে বলিলেন, তা কেমন করে হ'তে পারে বল? তোমার মা তোমাকে দেখাবার জন্য বাড়ীতে আর একটু হ'লে বেরিয়ে প'ড়েছিলেন এমন সময় তোমার মামা তাকে বল্লেন, যদি সুরেশের সঙ্গে দেখা করতে তোমার ইচ্ছা হয়, সাদা কথা বোন তুমি একবারে ছেলেপুলে নিয়ে তোমার বিলাত ফেরৎ সাহেব ছেলের কাছে যাও। আমার বাড়ীতে আর প্রবেশ করতে পারবে না। তোমার জন্য ত আমি এক-ঘরে হয়ে থাকতে পারব না? সেখানে যারা যারা, গ্রামের প্রাচীন লোকেরা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই একবাক্যে বল্লেন, এতে রসিকের কোন অপরাধ নাই। তার বোনের জন্যত আর সে জাত ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে পারে না। একথা শুনে, তোমার মা শুধু বল্লেন, একবার যদি সুরেশকে—অনেকদিন দেখি নাই, চখে দেখে আসি, তার মুখখানা দেখবার জন্য যে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, তাতে কি আমাদের জাত যাবে? তাতে কি আমরা সমাজচ্যুত হবো? দুটো কথা ছেলের সঙ্গে যদি তার অভাগিনী মা বলে তাহলে কি এতবড় হিন্দু-সমাজ ভেঙ্গে পড়ে যাবে? সমাজের কর্ত্তাদেরও ত ছেলেমেয়ে আছে? তারা দয়া করে, এ অনুগ্রহটুকু অসহায়া বিধবাকে দেখালে নিশ্চয় পুণ্য হবে।

কিন্তু সে কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। কেমন করিয়া এতবড় অন্যায়টা করে বল? এখনো দিনরাত হচ্ছে, চন্দ্র সূর্য্য উঠছে, একবারে ধর্ম্ম লোপ পায় নাই—তারা কি অনুমতি দিতে পারেন? এতবড় বুকের পাটা কার আছে বল?

আমার মাথা ঘুরিতেছিল। একমুহূর্ত্তে সারা বিশ্ব আমার চক্ষে আঁধারে ডুবিয়া গেল। মায়ের অবস্থা ভাবিয়া আমার মন শিহরিয়া উঠিল। মার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিতে, সম্মত হইতে পারিলাম না। সে কোন উত্তর না দিয়া কলিকাতা ফিরিতে উদ্যত হইল। এমন সময়, হরিশ ছুটিয়া সেখানে আসিল। সুরেশকে দুই বাহু বেষ্টনে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। উভয় বন্ধুর বক্ষের স্পন্দন যেন এক সূত্রে ঘন ঘন স্পন্দিত হইল।

রসিক বলিল "বেশ লোক যাহোক আমার ছেলের ভাত আজ, আর তুই নাকি শুনে চলে যাচ্ছিস? তা হ'বে না। আজ আমার বাড়ী তোর নেমন্তন্ন। চল বলিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। আনন্দে সুরেশের দুইচক্ষু অশ্রু ধারায় প্লাবিত হইয়া যাইতেছিল। সে ধীরে ধীরে বাষ্প গদগদ কণ্ঠে বলিল, রসিক, আমি গেলে তোর সব কাজ পণ্ড হ'য়ে যাবে। কেউ তোর বাড়ী খাবে না—আমাকে আজ ছেড়েদে ভাই। তুই আজ সত্যই বন্ধুত্ব, সৎসাহস দেখিয়ে আমার ব্যথিত অন্তরে যে কি শান্তি দিয়েছিস্ তা বুঝি মুখে বলা যায় না।

রসিক কিছুতেই ছাড়িল না। কোন যুক্তি শুনিল না। সে বলিল, তুই যে সময় দেশ ছেড়ে চলে যাস্ তখন আমি আসামে চাকরী কর্ত্তে গিয়েছিলাম। সব কথা শুনেচি। দুঃখের জ্বালায়, মা, ভাইএর জীবনরক্ষার জন্য যখন এদেশে পনর টাকায় একটী চাকরী জোটে নাই তখন তাঁদের জন্য যে মানুষ নিজের জীবন তুচ্ছ করে অজানা দেশে নিঃসম্বলে যেতে পারে, তার সৎসাহস যে কতখানি, তার মাতৃভক্তি যে কত গভীর কত মহান তা

ভাববার মত লোক খুব কম আছে—ভাল, সেজন্য অভিমান করিস্‌নে সুরেশ।

নরেন্দ্র সব কথা আমাকে বলেছে। নরেন্দ্র ধন্য! যে সে, তোকে সাহায্য করবার মত ভাগ্য পেয়েছিল। দুই বন্ধুতে গিয়া কর্ম্ম বাড়ীতে প্রবেশ করিল। এই, অসম্ভব অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে গ্রামের মধ্যে আবো একটা ভীষণ সাড়া পড়িয়া গেল। নানা প্রকার জল্পনা পরামর্শ বিদিত নির্নীত হইতে লাগিল। এখন উপায় কি? রসিককে পরিত্যাগ করিবার অত সাহস গ্রামে অনেক বৃদ্ধের ছিল না। অনেকের বিষয় সম্পত্তি রসিকের নিকট বন্ধক, অনেকে নিয়মিতরূপে রসিকের নিকট মাসে মাসে সাহায্য পাইয়া আসিতেছে সে এখন গ্রামের একরূপ মাথা বললে অত্যুক্তি হয় না। ঠিক হইল রসিককে একবার বুঝাইয়া বলই দেখি, সে ছেলে মানুষ না বুঝিয়া একটা কাজ করিয়া বসিয়াছে—ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলে কখনই সাহস পাবে না। রসিক কিন্তু তাহাদের কোন যুক্তিই শুনিল না। সুরেশকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল না।

রসিকের ভয়ে অনেকেই সুরেশ তাহার বাড়ী থাকা সত্ত্বে যথারীতি ভোজনাদি করিতে বাধ্য হইল। সুরেশের মামা ম্লানমুখে আহারাদি সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। প্রবলের নিকট দুর্ব্বল চিরদিনই এমনি করিয়া মান ইজ্জতে কালি দিয়া আসিতেছে। অথচ অকারণ আস্ফালন করিতে ছাড়ে না, ইহাই বিড়ম্বনা।

সুরেশের দুইজন ভাই নিমন্ত্রণে আসিয়া বড় ভাইকে দেখিয়া তাহার নিকট ছুটিয়া গেল। এ অপূর্ব্ব মিলন, অভ্যাগত সকলেরি নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত করিয়াছিল।

ভগবান বুঝি সুরেশের মাতার মর্ম্মবেদনা বুঝিয়াছিলেন। তাই রসিককে দিয়া জননীর সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। সুরেশের মাতা ছুটিয়া আসিয়া রসিককে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইয়া আকুল আগ্রহে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, বাবা আজ তুমি আমার হারানিধি সুরেশকে ফিরিয়ে দিলে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। সুরেশ ছুটিয়া গিয়া মায়ের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সে শুধু বলিল, মা আমি ফিরে এসেছি সত্য, কিন্তু, তোমার আশীর্ব্বাদে সেখানেও তোমার মত দরদী মা পেয়েছিনু—সেই মা আমাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে।

নিমন্ত্রিত বাড়ীশুদ্ধ লোক নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। কেবল রসিকের মা একখানি রেকাবীতে জলখাবার লইয়া আসিলেন, এবং সুরেশ মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এতদিন পরে ছেলে এল আগে তাকে খেতে দাও—আজ নারায়ণ সত্যসত্যই রসিকের ছেলের অন্নপ্রাশন সার্থক করেছেন।

মিশরে নারী জাগরণ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

মুক্তির সূচনা

বিভিন্ন দেশে মানব-সমাজে নারী বর্ত্তমানে যে অবস্থায় রহিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে একটা প্রবল আপত্তি নানাভাবে দেখা দিয়াছে। মনুষ্যত্বের অধিকার ও দায়ীত্ব আজ নারী তাঁহার নিরপেক্ষ বুদ্ধি দ্বারা বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে চাহেন। ইউরোপ হইতে এই ঢেউ আসিয়া প্রাচ্যদেশকে আঘাত করিয়াছে। প্রাচ্যের নারী-শক্তি ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিতেছেন। নব্য তুর্কী এই আন্দোলনে সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক অগ্রসর। তুর্কী মহিলারা যে ভাবে সমাজে আত্মনিয়ন্ত্রনের জন্য উদ্যম প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে 'হারেম' শব্দটী শীঘ্রই কেবলমাত্র আভিধানিক সত্ত্বায় পর্য্যবসিত হইবে। তুরস্কের মহিলাগণ যেমন অতিমাত্রায় পাশ্চাত্য প্রথার অনুসরণ করিয়া নিজেদের মুক্তি অর্জ্জন করিতেছেন, মিশরের অবস্থা সেরূপ নহে, অন্ততঃ এখনো আসে নাই। মিশরে স্ত্রী শিক্ষা এখনো অতি অল্পসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে এবং ইঁহাদের হস্তেই ভবিষ্যতের নারী-স্বাধীনতা নির্ভর করিতেছে। মিশরে অধিকাংশ স্থানেই দেখা যায়, অনেক উচ্চহৃদয়া শিক্ষিতা মহিলা অন্তঃপুরের বিধি নিষেধ ও জাতীয় আচার ব্যবহার স্বেচ্ছায় মানিয়া চলেন। যদিও তাঁহারা বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পুরুষের অনুরূপ দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা মনে করেন, মুষ্টিমেয় নারীর মুক্তি তাঁহাদের লক্ষ্য নহে। মিশরের সমগ্র নারী জাতিকে শিক্ষিত করিয়া স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিতে হইলে, ধীরে ধীরে কার্য্য করিতে হইবে। স্থায়ী উন্নতি সাধনের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। কোন অস্বাভাবিক উত্তেজনায়, যদি এই সদিচ্ছার অপব্যবহার হয়, তাহা হইলে যে সমস্ত নারী এখনো শিক্ষা ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন দ্বারা স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করেন নাই বা এখনো স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই তাঁহারা অর্থহীন উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী পরিণামে অবসাদগ্রস্ত হইয়া ইতঃনষ্টস্ততঃ ভ্রষ্ট হইবেন। এবং ক্রমোন্নতির পথ অধিকতর বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিবে।

মিশরের অভিজাত বংশীয়া নারীগণ, পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং প্রস্তুত হইয়াছেন; তথাপি কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের অনেক কাজ করিতে হইবে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নস্তরের নারীদিগের চিত্তে স্বাধীনতার স্পৃহা ও সাতন্ত্র্যবোধ জাগাইতে হইবে এবং ইহার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ও অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সহজ কার্য্য নহে।

সম্ভ্রান্তবংশীয়া বালিকাগণ

মিশরের সম্ভ্রান্তবংশীয়া বালিকাগণ ইউরোপীয় বালিকাদের অনুরূপ শিক্ষাই লাভ করিয়া থাকে। ইংরাজ কিংবা ফরাসী শিক্ষয়িত্রীগণের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহারা ইউরোপে বালিকাদিগের 'বোর্ডিং স্কুলে' গিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এইরূপ শিক্ষিতা মিশরীয় বালিকাগণের মধ্যে প্রাচ্যের সৌন্দর্য্য, সুরুচি এবং রমণীয়তার সহিত পাশ্চাত্যের মার্জ্জিত বহিরাচারের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। এই বালিকাগণ বিবাহের পর, তাঁহার সমস্ত যোগ্যতা ও শক্তি স্বামী এবং পরিবারের উন্নতি সাধনে নিয়োজিত করেন। ইঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র প্রধানতঃ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তথাপি রাজনীতি, সাহিত্য, জনহিতকর কার্য্য অথবা বাহিরের সামাজিকতার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ।

রাষ্ট্রীয় চিন্তায় মিশরীয় শিক্ষিতা মহিলা অনেকক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষাও অগ্রগামী এবং তাঁহারা সাহস ও গভীর বিশ্বাসের সহিত স্বমত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। রাজনৈতিক সভা-সমিতি প্রচার কার্য্য, পুস্তিকা প্রচার আজ মিশরে কেবলমাত্র পুরুষের একচেটিয়া নহে। কায়রো সহরে কয়েক বৎসর হইল যে বাৎসরিক চিত্র-প্রদর্শনী হইতেছে, তাহা অন্তঃপুরবাসিনীদের চেষ্টাতেই হইতেছে এবং নব্য-মিশরের এই চিত্রকলার নব-রূপান্তর বহু মহিলা-শিল্পীর অপূর্ব্ব প্রতিভার ফল। অবৈতনিক বিদ্যালয়, শিল্প-বিদ্যালয় এবং জনহিতকর সমিতিগুলি অধিকাংশই উৎসাহী মিশরী-মহিলাদের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সুশৃঙ্খল সুব্যবস্থার মধ্যে নারীসুলভ ধৈর্য্য ও সংযমের সুন্দর আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। কার্য্য পরিচালনে নারীর স্বাভাবিক দক্ষতা জাতীয় উন্নতি সাধনের কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া মিশরে এক নবোৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছে।

এখনো মিশরীয় মহিলারা স্বামীর সহিত একত্র ভ্রমণ, ভোজন, সামাজিক-সম্মিলন ইত্যাদিতে যোগ দিতে পুরা-

মাত্রায় বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া উঠেন নাই। থিয়েটার, বায়স্কোপ, ইত্যাদিতে তাঁহারা গমন করেন বটে, কিন্তু সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইবার সময় অবগুণ্ঠন ব্যবহার করেন। তবে পূর্ব্বের মত চলন্ত মশারী সাজিয়া বাহির হন না। মুখের সম্মুখে অতি সূক্ষ্ম আবরণ মাত্র রাখেন। ইহাতে তাঁহাদের অবগুণ্ঠনের কার্য্যও হয়, আবার তাঁহাদের মুখলাবণ্যের উপর এই সূক্ষ্ম আবরণের রমণীয়তা উহা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলে। মিশরীয় মহিলারা তাঁহাদের বাহিরে ভ্রমণ করিবার পোষাকের মধ্যে এক সাধারণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই কাটা ছাঁটা কৃষ্ণবর্ণের রেশমের পোষাক পরিধান করেন, এই পোষাক তাঁহাদের পেলব বল্লরীর ন্যায় কমনীয় দেহলতার সৌন্দর্য্য আবৃত না করিয়া বরং উজ্জ্বলরূপে বিকশিত করিয়া তোলে। কিন্তু তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া আসিবামাত্র সে পোষাক বর্জ্জন করেন। এবং নানা দেশের উৎকৃষ্ট বিলাস সম্ভারে দেহ সজ্জিত করিয়া বর্ণ-বৈচিত্র্যে গৃহ আলোকিত করিয়া তোলেন। পাশ্চাত্যের যে সমস্ত পোষাক ও অলঙ্কার তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও প্রাচ্য মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ফরাসী দেশের বিলাসিনীদের কোন কোন অংশ নকল করিলেও, উজ্জ্বলবর্ণ ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার প্রিয়তা তাঁহারা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের বেশভূষায় প্রাচ্যভাবাপন্ন থাকিবার জন্য একটা সবত্ন আগ্রহ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বালিকাদের মধ্যে বিদ্যালয়ে যাইবার আগ্রহ দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে। মিশর গবর্ণমেণ্ট নানাস্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে আধুনিক প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বালিকাদের মনে উচ্চ শিক্ষার প্রবৃত্তি ও আত্ম-নির্ভরতার ভাব জাগ্রত করিবার জন্য শিক্ষয়িত্রীরা সবিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন। পোষাক পরিচ্ছদ, আদব কায়দায় এই সমস্ত বালিকাকে এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়, যাহাতে তাহারা শিক্ষান্তে বিবাহিত হইলে, সচরাচর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাংসারিক অবস্থার অনুপাতে চলিতে অসুবিধা বোধ না করে। সুশিক্ষিত শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ পাঠ্য পুস্তক সহায়ে সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে—গৃহকর্ম্মে একান্ত আবশ্যক স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সংসারের আয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হিসাবী হইয়া চলা, সন্তান প্রতিপালন ও শিক্ষাদান, জড়বিজ্ঞানের মোটামুটি তত্ত্বগুলির শিক্ষা দেওয়া হয়। ইউরোপের প্রধান প্রধান নারীশিক্ষাকেন্দ্রগুলিও মিশরের এই শিক্ষাদান প্রণালী হইতে অনেক বিষয় গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের দেশে যাঁহারা শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা নারী-জাতির বর্ত্তমান অসহায় পঙ্গুত্ব ঘুচাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা মিশরীয় সরকারী বালিকা বিদ্যালয়গুলির সম্যক পরিচয় গ্রহণ করিলে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। মিশরীয় মধ্যশ্রেণীর বালিকারা বুদ্ধিমত্তা, ক্রীড়াচঞ্চল ও মধুর নম্র ব্যবহারে সহজেই চিত্ত জয় করিয়া লয়। ইহারা সুশিক্ষিত হইয়া ভবিষ্যৎ মিশরের ভাগ্য পরিবর্ত্তনে এক অপূর্ব্ব প্রেরণা যোগাইতেছে ও যোগাইবে। এই নবশিক্ষালয়ে মিশরের মধ্যশ্রেণীর পিতামাতারা অতি আগ্রহের সহিত স্ব স্ব কন্যাগণকে প্রেরণ করিতেছেন এবং সুশিক্ষা লাভ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন। রাজনৈতিক পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টায় নারীর উন্নতি অপরিহার্য্য, জাতিদেহের একাংশ পঙ্গু থাকিলে যে মুক্তি অসম্ভব তাহা তাঁহারা বুঝিয়াছেন। মিশর গবর্ণমেণ্টও যে এই উদ্দেশ্যে নারী-শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছেন, সকৃতজ্ঞচিত্তে মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকেরা তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন।

সমাজের নিম্নস্তরে শিক্ষাবিস্তার

এখনো মিশরে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মিশর সরকার সমাজের নিম্নস্তরে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে সহস্র সহস্র কৃষক বালক অধ্যয়ন করিতেছে।

কৃষকদিগের মধ্যে এখনোও একাধিক পত্নী গ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে। সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার বৈচিত্র্যেই এই প্রথা এখনো বিদ্যমান। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ব্যতীত, এই প্রথা দূর করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও চলে। মিশরের বর্ত্তমান জননীরা গৃহের কর্ত্রীরূপে সকল কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, সন্তানদিগের প্রাথমিক শিক্ষার ভার নারীরা গ্রহণ করিয়াছেন। অতীতের কুসংস্কারবর্জ্জিত সুশিক্ষিতা মিশর-রমণীগণের অক্লান্ত চেষ্টায় ভবিষ্যতের নবজাতি মিশরকে আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যেই নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়ার সার সঙ্কলন

(প্রতি সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে)

সঙ্কলয়িতা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এস,সি

ভুলিবার নয়:—গত রবিবারে যখন আমি এক্সেলশিয়ার থিয়েটারে বসিয়া আমার স্তুতিবাদ শুনিতেছিলাম তখন আমি ভাবিলাম যে মিঃ বারুচা দক্ষিণ জনপদের প্রপীড়িত জনবর্গের হিতার্থে সাহায্য বণ্টনী দিয়াছেন কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার সন্দেহ ভঞ্জন হইল—দেখিলাম মিঃ বারুচা বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক সুধীগণকে একত্র সমাবেশ করিয়াছেন—এইসূত্রে মিঃ যমুনাদাসও উপস্থিত আছেন দেখিলাম। তিনি বক্তৃতাকালে আমাকে মহাত্মাজী না বলিয়া গান্ধীজী বলিয়া সম্বোধন করাতে শ্রোতৃবর্গ বিলক্ষণ কুপিত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিতে থাকেন, যমুনদাস বলেন যে তিনি আমায় গান্ধীজী বলিলেও আমার সম্মানের কোন হানি করেন নাই—আমি বুঝিলাম যে আমার ভক্তবর্গ অপেক্ষা তিনি আমায় ভালরূপে চিনেন—আমি তখন সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম যে শ্রোতৃবর্গের বক্তৃতা-স্থলে আরও বেশী ধৈর্য্যশালী হওয়া কর্ত্তব্য এবং সভাস্থলে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীকে নিজের বন্ধুর চেয়ে বেশী সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য—আমি যে মহাত্মা সম্বোধন ভালবাসি না এবং আশ্রমে ঐ সম্বোধন একেবারে নিষিদ্ধ ইহা জানিয়া মিঃ যমুনা দাস আমার মনের মত কার্য্যই করিয়াছেন—ইহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ প্রকৃত উদারচেতার মত যুক্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, সে দৃশ্য কখন ভুলিবার নয় সে দৃশ্যে মনে করিলাম স্বরাজ্যলাভ নিকটবর্ত্তী। এই দৃশ্যই আমাকে মিঃ দেবধরকে প্রশংসা করিতে প্রণোদিত করিল। যদিও রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের মত বিভিন্ন পথগামী, তথাপি তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা কর্ত্তব্য প্রিয়তা এবং আত্মোৎসর্গ তাঁহাকে আমার চক্ষে শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছে।

তৎপরে আমি চরকা সম্বন্ধে কিছু বলিলাম—বক্তৃতায় এখন আর চলিবে না পরদুঃখকাতরতা দেখাইলেও চলিবে না সেই দুঃখ বিমোচনের চেষ্টা করাই এখন উচিত। এই যে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী, নিরন্ন নিবস্ত্র অবস্থায় কেবল হতাশার ছবি দেখিতেছে তাহাদের দুঃখ বিমোচনের একমাত্র উপায় চরকা। তাহারা আজ আমাদের ও নিজেদের শক্তির উপরে বিশ্বাসহারা—আজ তাহাদের আত্মসম্মান জ্ঞান নাই তাই ভিক্ষায় উদর পূর্ত্তি করিতেও কুণ্ঠিত হয়—কার্য্যে তাহাদের রুচি নাই পশুর চেয়ে হীনচেতা হইয়া জীবন্মৃতভাবে থাকিতে লজ্জাবোধ হয় না—আজ যদি আমরা তাহাদের চরকা ধরাই তাহা হইলে সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। কৃষকেরা আমাদের প্রাণরক্ষক তাহার বিনিময়ে আমাদের উচিত নিজ হাতে বস্ত্রবয়ন করিয়া তাহাদের দিয়া আমাদের ঋণ ভার লঘু করা—আমরা চরকা ধরিলে তাহারাও ধরিবে। আমরাই তাহাদের পথপ্রদর্শক তাহাদের চক্ষে আমরা মহাজন তাহারা জানে "মহাজনো যেন গতোঽস পন্থা।"

আমাদের নিজের মধ্যে বিচ্ছেদের ছায়া পড়িয়াছে তাহা অপসারণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু সত্যাগ্রহ ভিন্ন কোন সদুপায় ভাবিয়া পাইলাম না। পণ্ডিত মতিলালের সহিত এবিষয়ে পত্রে আলোচনা করিয়াছি—এতদিন পর্য্যন্ত কেবল সত্যাগ্রহ অসহযোগ এবং আইন অমান্যরূপ বিভীষিকা দেখাইয়াছে এখন তাহার সার এবং সুন্দর দিকটাকে বড় করিয়া দেখাইবার ইচ্ছা রহিল। এমন উপায় করিতে হইবে যে সেই স্থলে সকলেই একমত। উপায়টী সার্ব্বজনীন হইয়াই অভিপ্রেত—মনে হয় চরকাই শ্রেষ্ঠ উপায় বিভিন্ন দলের মধ্যে একতা স্থাপন ছুঁৎমার্গ পরিহার এবং হিন্দু-মুসলমানে মিলন সবই চরকায় সম্ভব। আমি মিসেস্ বেশান্তের নিকট আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি এবং অন্যান্য নেতাদের নিকটও করিব।—সত্যাগ্রহের সুন্দর রূপের কেবল আত্মোৎসর্গেই পূর্ণ বিকাশ।—যদি কোন কার্য্যবিবরণীর অনুযায়ী কার্য্য আমার মতাবলম্বী না হয় তবে তাহাতে বাধা না দিয়া নিজেকে অপসারিত করাই শ্রেয়ঃ।—সত্যাগ্রহের নব বিকশিত রূপের সাংসারিক অভিজ্ঞতায় উৎপত্তি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ।—ইংরাজের সহিত আমার বিরোধ ছিল না বরং অনেক বন্ধু ছিল কিন্তু এমন সময় আসিল যখন আমি তাহাদের বলিতে বাধ্য হইলাম যে তোমরা আমাদের দেশের রক্ত শোষণকারী, তোমরা আমাদের সভ্যতার আলোকে আনার ছলে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর—এখন হইতে আর তাহা চলিবে না—ফলে —আইন অমান্যের বিভীষিকা দেখা দিল—ইহাতে স্বকার্য্য সাধন হইল না যাহা হইল তাহা নিজেদের বিচ্ছেদ তাই আজ আমাদের পুনর্মিলনের চেষ্টায় আমার সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইবে।—আমি জানি আমি মহাত্মা নয়—আমি অল্পাত্মা আমি এক্ষণে আত্ম জয় করিতে চেষ্টা করিব তা না হইলে আমাদের বিরোধ ঘুচিবে না—ভগবানের শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা যেন তিনি আমার আত্মজয় করিবার মত শক্তি দেন।

কাজের কথা

দেশের অবস্থা—জল প্লাবনে এবাব বাংলাব অনেক স্থানেব ধান ডুবিয়া গিয়াছে। বর্ষাব জল আগে আসায় আউস ধানের অবস্থা কোন স্থানেই ভাল নহে। ধান চালের দাম এর মধ্যেই অনেক বাড়িয়া গিয়াছে বাজার গুজব বর্ষাব জল বেশী হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ নহে—বাহিরে বেশী পরিমাণে চালান হইতেছে বলিয়াই ধান চালের দর এত বেশী হইয়াছে। এবাব পাটের দর একটু চড়া আছে তাই বক্ষা নতুবা এব মধ্যেই হাহাকার পড়িয়া যাইত। সকল রকম খাদ্য দ্রব্যই অগ্নি-মূল্য—অর্থাভাবে কদর্য্য আহার, একবেলা আহাব কিম্বা একেবারে অনাহারই দেশের অধিকাংশ লোক সম্বল করিয়া আছে। অনবস্ত্রের চিন্তায় ভীষণ দুরবস্থায় দেশের লোক মরণাপন্ন হইয়া দিনাতিপাত করিতেছে। ছয় ঋতুতে নানা ব্যাধি নূতন নূতন উপসর্গ লইয়া আসিয়া দেশবাসীকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে—জীবনে অর্দ্ধাহাব অনাহাব—তাহাব উপব নানা ব্যাধি—কি সুখেব জীবন কি সুখের সংসার! এমন অবস্থা এদেশে কদাচ কখনো আসে না—এ অবস্থা দেশ জীবনের উপর যমদণ্ড লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাই দেশে স্ফূর্ত্তি চাঞ্চল্যের একান্ত অভাব; মনের শান্তি, মুখের হাসি এত বিরল। দেশের লোক দিশেহারা হইয়া পন্থা খুঁজিতেছে—পথ নাই! কাহাব যাদুমন্ত্রে দেশের সব প্রায় ঘুমন্ত—জাগ্রত যাহারা তাহারাও একটু অগ্রসর হইয়াই এলাইয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে—দুশ্চিন্তাভরা তন্দ্রা হইতে কে এ দেশবাসীকে জীবনের অমৃত সন্ধান দিবে! জীবনেও যাহারা মরণাপন্ন তাহারা এ মরণ যাতনা হইতে জীবনের আনন্দ চাহিতেছে!

—

মর্ম্মভেদী অভাব—চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যেই জীবনের নানা আনন্দ বিকশিত হইয়া ওঠে। জীবনের পক্ষে যাহা নিত্য প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য্য—ক্রমাগত চাহিয়া চাহিয়াও লোকে যদি তাহা না পায় তবে লোকের মতি গতি স্থির থাকিতে পারে না। এ দেশে আহার্য্যের অভাব নাই—এ দেশের সম্পদে অন্যান্য দেশ সৌভাগ্যশালী, অথচ এ দেশেব ভাগ্যে চিব দারিদ্র্য আর শুধু হাহাকার! আমার দেশ—আমার চেষ্টায় ইহাব সম্পদ—অথচ অধিকার আমার কিছুতেই নাই—এমনি একটা নিদারুণ পরিহাস স্রোত দেশের উপর দিয়া অবিশ্রান্ত বহিয়া দেশের রক্ত জল করিতেছে। দেশের এই অবস্থা দিনেব দিন ভীষণ হইতেছে। স্বাধীনতা বা মুক্তির বড় বড় তত্ত্বকথা দেশেব সকলে সম্যক বুঝিতে না পারিলেও জীবনঘাতী অভাবেব বেদনা সকলেই বুঝিতে পারে—কারণ দেশের জীবনেব উপর দিয়া যে খেলা চলিতেছে তাহা যে প্রাণে প্রাণে না বুঝিয়া উপায় নাই—সে যে বড় মর্ম্মভেদী।

—

জীবননীতি ও রাজনীতি:—জীবন নীতিব সঙ্গে রাজনীতিব অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিশ্বের নীতি বিকাশের পব হইতে ক্রমেই নিবিড় হইতেছে। রাজ-নীতিক অধিকার বর্জ্জিত জীবননীতিব অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হয় তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশ্বের লোভনীয় এই সুজলা সুফলা ভাবতবর্ষ। আমার দেশ—অথচ দেশের বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নে, জীবন যাত্রার প্রণালী নির্দ্ধারণে—শাসনে, বাণিজ্যে আমাব কোনই হাত নাই! দেশের রাজনীতি ও জীবননীতি এ অবস্থায় থাকা পর্য্যন্ত দেশের মঙ্গল নাই। তাই রাজনীতিব সঙ্গে জীবননীতির একটা সংঘর্ষ দেশে চলিয়াছে। রাজনীতি দেশের সর্ব্ব সাধারণে না বুঝিলেও জীবনের অভাব সকলেই বুঝিতেছে—তাই জীবন রাখিবার জন্য ইহারা জীবননীতির অনুসরণ করিবে। রাজনীতিক বোধ তাহা হইতেই আসিবে।

—

আন্দোলনে আশা—দেশের এই জীবন মরণ আন্দোলনে অগণিত, দেশবাসীকে পথ দেখাইবার ভার লইয়া যাঁহারা অগ্রণী হইয়া চলিয়াছেন দেশবাসী তাঁহাদের মুখ চাহিয়া এই দুর্দ্দিনেও আশাহীন হইতে পারিতেছে না। আন্দোলনের স্রোত যে দিকে প্রবাহিত হইতেছে দেশবাসী সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু জীবন সংগ্রামে আজ দেশের লোক এত বিব্রত যে কোন দিকেই তাহারা কূল দেখিতে পাইতেছে না। দেশের সর্ব্বস্ব উজার করিয়া দিয়াও দেশবাসী নিজেদের অন্ন বস্ত্রের অভাব ঘুচাইতে পারিতেছে না। হাটে বাজারে, ঘর বাহিরে আমার দেশী কিছুই আর দেখিতে পাইতেছি না—বিদেশী মোহকেই জীবনের অতি প্রয়োজনীয় করিয়া লইয়াছে দেশবাসী। এমন অবস্থা যে দেশের হইয়াছে—তাহাদের জীবন ধারার পরিবর্ত্তন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। নিজেদের অন্ন বস্ত্রের বিনিময়ে পাশ্চাত্য বিলাস ব্যসন ক্রয় করার যে মোহ তাহা ত্যাগের আন্দোলনই আজ সমগ্র দেশময় ছড়াইয়া পড়িলে দেশবাসী আবার আত্মশক্তিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া জীবন নীতিতে বলীয়ান হইয়া রাজনীতি আয়ত্বে আনিতে পারিবে।

—

মহাত্মা পরাজিত না দেশ বিভ্রান্ত—মহাত্মা গান্ধী বারবার বলিতেছেন—তিনি পরাজিত হইয়াছেন, দেশবাসীর নিকট পরাজিত—দেশের হিন্দু-মুসলমানের নিকট পরাজিত হইয়াছেন। আত্মশক্তি অর্জ্জন করিবার জন্য নিজ দেশী বস্ত্রের ব্যবস্থা, হিন্দুমুসলমান মিলন দেশবাসী এত ভুগিয়াও এখনো করিতে শিখিল না—ইহাতে মহাত্মা আপনাকে পরাজিত মনে করিয়াছেন। নিখিল ভারতের রাষ্ট্র চেতনার বেদনা ভরা পরাজয় মহাত্মার এই হৃদয়বাণীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশের কাজে—দেশবাসীর বাঁচিবার প্রচেষ্টায় তিনি দেশের সকল মতাবলম্বীদলের একতা চাহিতেছেন। আমাদের বুক ভরা আশা এখনও আছে মহাত্মার নেতৃত্বে বেলগাঁও কংগ্রেসে নেতৃবর্গ কার্য্যধারা নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন।

বয়কট—বিদেশী বর্জ্জন—বয়কট বা বিদেশী বর্জ্জনের কার্য্য আবার আরম্ভ হইল। স্বদেশী যুগের প্রারম্ভ হইতে বিদেশী বর্জ্জনের প্রস্তাব চলিতেছে। নানা পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন ছাড়া যে আর জাতীয় মুক্তির পথ নাই বার বার তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। তবু কিন্তু আমরা এই পরম সত্যটিকে জীবনে কার্য্যকরী করিতে পারিতেছি না। স্বদেশী বলিতে আজ আমাদের বিশেষ কিছুই নাই—বিদেশী বর্জ্জন করিতে গেলে স্বদেশী তেমন প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপন্ন করিতে হইবে। দেশবাসীর মধ্যে সেই বোধ জন্মিলে তবে বিদেশী বর্জ্জন টিকিতে পারিবে—নতুবা বিদেশী বর্জ্জন আবার কি ভাবে পর্য্যবসিত হইবে কে জানে? বিদেশী বর্জ্জন করিতে গেলেই আমরা বুঝিতে পারিব জীবনযাত্রার পথে আমরা কত নিঃস্ব কত রিক্ত। এ বহিরাবরণ সভ্যতা, এ বিলাস ভরা তা কিছুই যে আমাদের নিজস্ব নহে, সব ধার করা, নিজের অন্নবস্ত্রের বিনিময়ে আমরা এত পরদস্ত বিলাসতার স্তূপে সমাধি লাভ করিতেছি।

—

বয়কটের সফলতা কোন পথে—পূজার অতি অল্পদিন মাত্র পূর্ব্বে বাংলার নেতাগণ বয়কট প্রস্তাব কার্য্যকরী করিতে চাহিতেছেন—আরো কিছুদিন পূর্ব্বে আরম্ভ হইলে ভাল হইত। কারণ বিদেশী মাল এখন পূজার বাজারে দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ক্রেতা ও বিক্রেতা দুয়েরই আত্মসম্মান জ্ঞান থাকিলে বিদেশী বর্জ্জন সহজেই সফল হইবে। কিন্তু এই বিদেশী বর্জ্জন ব্যাপারেই শান্তি ও শৃঙ্খলার ধারাও অনুসৃত হইতে পারে। তাই নেতৃবৃন্দ যাঁহারা ইহা চালাইবেন তাঁহাদের বিশেষ বিবেচনা ও ধীরতার সঙ্গে এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। খদ্দর ও চরকার সঞ্জীবনী মন্ত্র আবার দেশবাসীর প্রাণের ভিতর তেমন ভাবে প্রবেশ করাইতে না পারিলে এ বিদেশী বর্জ্জন কোন পথে সফলতা অর্জ্জন করিবে?

—

দেশে স্বদেশীর অবস্থা—মাঝে দিনকত

বিদেশী বস্ত্র, বিদেশী নূন যেমন বাজার হইতে একরকম উঠিয়া গিয়াছিল এখন আবার তাহা তেমনি জোর চলিতেছে। বাংলার অনেক পল্লীতে এখন স্বদেশী বস্ত্র বা কর্কচ লবণ মেলে না। দোকানীরা বলে কর্কচের ও স্বদেশী বস্ত্রের খদ্দের নাই, খদ্দেররা অনুযোগ করে স্বদেশী মেলে না তাই বাধ্য হইয়া বিদেশী ব্যবহার করিতে হইতেছে। দোষ দোকানীর না খদ্দেরের তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কাহার দোষে এমন হইতেছে এবং ইহার প্রতিকার কি তাহা দেখিতে হইবে।

——

কমিশনে সুবিধা কাহার—যে দেশের লোক অর্থাভাবে জীবনধারণের উপযোগী অতি সাধারণ রকম খাইবার পরিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিতে পারে না সেই দেশে কিন্তু মোটা মাহিয়ানার সংখ্যা সব দেশের চেয়ে বেশী। আবার এই মোটা মাহিয়ানাওয়ালাদের সুখ সুবিধা বৃদ্ধির জন্যই যখন কমিশনের উপর কমিশন বসে—দেশের লোকের ক্ষীণ প্রতিবাদের গলা চাপিয়া আমলাতন্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির নির্লজ্জ অভিযান চলে তখন দেশের লোকে আর বোঝার উপর শাকের আঁটি ভাবিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারে না। ভারতের উপকারার্থে যে কোন রকম কমিশনের আগমন দেখিলেই বিচলিত না হইয়া উপায় নাই—কারণ প্রথমতঃ কমিশনের সভ্যদের ভ্রমণ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভারতের ভাণ্ডার হইতে অপরিমিত অর্থ দিতে হয় আর তাহার বিনিময়ে ভারত লাভ করে তাহাকে দোহনের আরও নূতন উপদ্রব। বর্ত্তমান চাকুরী কমিশনের নির্দ্ধারণেও সেই ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ইহার সমর্থন প্রহসন চলিবে। কিন্তু দেশের লোকে যাহা চায় না—তাহা লইয়া এ প্রহসনের আবশ্যকতা কি! এ কথা দেশবাসী বলিবে বটে—কিন্তু আমলাতন্ত্র যাহাদের সুবিধার জন্য এত তাহারা ইহার আবশ্যকতা চিরদিনই বোধ করিতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

——

চা-বাগানের কুলী—চা কুলীদের উপর নির্য্যাতনের কাহিনী এ দেশে নূতন নহে। অশিক্ষিত অনাহার প্রপীড়িত নরনারী নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া চা বাগানে মজুর খাটিতে যায়—কিন্তু নির্য্যাতনে অতিষ্ঠ হইয়া কিছুদিন পরেই ইহারা দেখে অনাহার মৃত্যুও ইহার চেয়ে ভাল। কিন্তু পলাইয়া বাঁচিবার পক্ষেও ইহাদের নানা অন্তরায়। চা বাগানের সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে রক্ত মাংসের মানুষের উপর এই ঘৃণ্য অত্যাচার শোনা যাইতেছে—অথচ ইহার একটা অনুসন্ধান বা প্রতিকার ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই চা বাগানের মালিক ও মজুর দু'দলেরই ইহাতে উপকার হইবে—দেশের ব্যবস্থাপরিষদ হইতে ইহার ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

——

ভুয়ো সংস্কার শেষ—না মন্ত্রী বদল?—বাংলায় মন্ত্রীর বেতন রদ হইয়াছে—কৌন্সিল অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ আছে। সবই হইয়াছে কিন্তু দ্বৈতশাসন বা ভুয়ো সংস্কারের কি সত্যই অবসান হইল! কৌন্সিলরূপী উত্তেজনার ক্ষেত্র এখন শুষ্ক—কোন কোন এম-এল-সি শুনিতেছি ইতিমধ্যেই আবার মন্ত্রীত্ব গঠনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। যাঁহারা এ ভাবে বর্ত্তমান অবস্থায় শাসন সংস্কার রাখিবার জন্য ব্যাকুল তাঁহাদের ভাগ্যেও ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীদের দশা হইতে পারে—কিম্বা বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থায় দু'এক ভোটে মন্ত্রীত্ব বজায় রাখিলেও দেশের কাছে তাহারা শ্রদ্ধার পাত্র কোন দিনই হইতে পারিবেন না।

——

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—বাজার গুজব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তারকেশ্বরের মোহান্তের সত্যাগ্রহ মিট মাটের কথা চলিতেছে। দেশবন্ধু নাকি মোহান্তের নিকট হইতে বিপুল অর্থ লইয়া দেশের পক্ষে অপমানকর নিষ্পত্তি করিয়া সত্যাগ্রহ উঠাইয়া লইবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় সত্যাগ্রহের প্রবর্ত্তক স্বামী সচ্চিদানন্দও সংবাদ পত্রে দেশবন্ধুর সম্বন্ধে এইরূপ অভিযোগ আরোপ করিয়াছেন। এদিকে চিত্তরঞ্জন সংবাদপত্রে জানাইয়াছেন—'মোহান্তের সঙ্গে মিটমাটের কথা চলিতেছে বটে কিন্তু আমি যে ঘোষণা

করিয়া সত্যাগ্রহে যোগ দিয়াছিলাম সেই সর্ত্ত পূরণ না করিলে মিটমাট হইবে না। মিটমাটের সর্ত্ত দেশবাসীর সম্মুখে অনুমোদনের জন্ত উপস্থিত করা হইবে। স্বরাজ্য-দলের জন্ত মোহান্তের নিকট হইতে টাকা লইয়া সত্যাগ্রহ উঠাইয়া লইবার গুজবে কোন সত্য নাই। সাধারণের অজ্ঞাতে কোন কাজই হইবে না।' সত্যাগ্রহ পরিচালনে হয়তো অনেক গলদ ছিল। কিন্তু জনসাধারণ বড় আশা করিয়া আছে এই সত্যাগ্রহে তারকেশ্বর তীর্থের চিরন্তন মোহান্ত গ্লানির অবসান হইবে। দেশবন্ধুও এই গ্লানি দূর করিবার জন্ত প্রাণ উৎসর্গ করিব ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই গ্লানির কোনরূপ কারণ বর্ত্তমান রাখিয়াই যদি আপোষ ব্যবস্থা হয় সে দেশবাসীর পরম লজ্জার কথা হইবে। আশা আছে দেশবন্ধু দ্বারা তেমন কার্য্য হইবে না। বাহির হইতে আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি—যে স্বামী সচ্চিদানন্দ সত্যাগ্রহ প্রবর্ত্তন করিয়া দেশবন্ধুকে তাহার নেতৃত্ব দিলেন তিনিই আজ কেন দেশবন্ধুর দ্বারা আতঙ্ক অনুভব করিতেছেন! ভিতরের রহস্য সময়ে অবশ্যই ভেদ হইবে!

ব্যঙ্গচিত্র ও অসম্মান—ব্যঙ্গচিত্র অসম্মান-কর নহে। রক্ত মাংসের একটা দুর্ব্বলতা থাকে কারণ শুধু গুণাবলীতে ভূষিত ও সম্পূর্ণরূপে দোষ শূন্য মানব আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। সেইজন্যই সমধিক গুণ বিশিষ্ট জনপ্রিয় মানবের দুর্ব্বলতাকে ব্যঙ্গ করিয়া নির্দ্দোষ পরিহাসরস উপভোগ করিবার জন্যই ব্যঙ্গ চিত্র হয়। পাশ্চাত্যে মহামান্যগণকে ব্যঙ্গচিত্রে আঁকিয়া আমোদ উপভোগ করিবার প্রথা বিশেষ চলিত। যশস্বী ব্যতীত কর্টুনে অঙ্কিত হইবার সৌভাগ্য সকলে পায় না।

শিল্প জগৎ

(চিত্র সমালোচনা)

(প্রবাসী) **রাগিণী মেঘমল্লার**—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিং অঙ্কিত মেঘমল্লার বা ঝিঁঝিট খাম্বাজ যাই বল তা মানিয়া লইতেই হইবে; কারণ বাঙ্গলাদেশের মস্তিষ্কের যে অপব্যবহার হয় তাহাতে এ বিষয়ে আর ভেবে মাথা খারাপ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে সাধারণের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইত যদি শিল্পী দয়া করিয়া কাছেই একটা তেঁতুলগাছ অঙ্কিত করিয়া দিতেন এবং ছবির নীচে লিখিতেন কৃষ্ণপক্ষ ও শনিবার। এ দারুণ শিল্পরোগের যে কি চিকিৎসা তাই ভাবিয়া আকুল হইতেছি। এদের চিত্রবিদ্যার যে দৌড় কালেভদ্রে ইহারা Japan Blackএ একখণ্ড কাগজ চুবাইয়া নীচে লিখিয়া দিবে—"ঘোর অমাবস্যা!"

নিশীথ রাতের বাদল-ধারা—শিল্পী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বিশী। এও পূর্ব্ববৎ! কোথায় বা বাদল-ধারা আর কোথায়ই বা নিশীথরাত! এদের জ্বালায় গ্রহ উপগ্রহ, ঘড়ি, ঘণ্টা কিছুই যে ঠিক থাকিবে না! চিত্রখানা যেন আয়ুর্ব্বেদের মকরধ্বজ; অনুপান বিশেষে কার্য্যকরী, অর্থাৎ যাহার যেমন মন সেইরূপ বুঝিবেন, আমাদেরও কোন ক্ষতি নাই যদি বার্ষিক ৬৷৹ টাকা থাকে। আমাদের মনে হয় সম্পাদক মহাশয়ের কাজের তাড়ায় একটা কিছু লিখিয়া দিয়াছেন, তা নিশীথ-রাতের বাদলধারাই হউক বা "কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসাই" হউক। একটা সুবিধা আছে চিত্রের জন্য অন্য কাগজের মতন এঁদের পয়সা খরচাও নাই 'অনটন' শব্দটাও নাই—আমাদেরও কোন আপত্তি নাই যদি কাগজের দাম না চড়ে!

(মানসী ও মর্ম্মবাণী) **সাজাহান ও তাহার কন্যা জাহানারা**—শিল্পী যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। চিত্রে কিছুই উল্লেখযোগ্য নাই—নিতান্ত চলনসই—তা ছাড়া জাহানারা আয়তনে অতি ছোট। এ সব দোষের সর্ব্বাগ্রে প্রতিকার করা দরকার।

মাসিক বসুমতী—মুখচিত্রে সেই পুনরাবৃত্তির চরম—একত্রিংশৎ সংস্করণের 'সিক্ত-বস্ত্র' এ আর ভাল লাগে না—কি কুক্ষণে 'হেমেন্দ্রনাথ' সিক্ত বস্ত্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন জানি না। ভিজা কাপড়ের ভাব যতটুকু না হইয়াছে—তার বেশী হইয়াছে দেহ গঠনে ভুল। যুবতীর নিম্নাংশ অতি খর্ব্ব ও বিকৃত হইয়াছে।

মনোমোহন নাট্যমন্দির—ইঁহারা বুধবার অভিনয় করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন—কিন্তু কি যেন কেন তৎপরিবর্ত্তে বৃহস্পতিবার 'আলমগীর' অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। আলমগীরে শিশিরবাবুর অসামান্য কৃতীত্ব সর্ব্বজনবিদিত। সেদিন ইহাঁদের বিজ্ঞাপনে দেখিলাম বশিষ্ঠের অংশে ইহাঁরা নাকি অভিনেতা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। অধুনা শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত এই অংশে অবতীর্ণ হইবেন। ষ্টারের পুরাতন জনপ্রিয় অভিনেতা হীরালালবাবু বিবিধ বিচিত্র ভূমিকায় গম্ভীর হাস্য রসের অবতারণায় সিদ্ধহস্ত। পুরাতনকে এইভাবে নূতনের সঙ্গে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিশিরবাবু যে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিতেছেন তাহাতে যাঁহারা তাঁহাকে পুরাতন বিদ্বেষী বলিয়া প্রচার করেন তাঁহাদের মত ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। জনরব পুরাতন যুগের প্রিয়দর্শন অভিনেতা শ্রীযুক্ত গোপালদাস ভট্টাচার্য্যও নাকি এই সম্প্রদায়ে যোগদান করিবেন। আরও ২।১টী সঙ্গীত ও অভিনয় নিপুণা অভিনেত্রী সংগ্রহ করিতে পারিলে শিশিরবাবুর সম্প্রদায় প্রভূত পরিমাণে শক্তিশালী হইয়া দাড়াইবে।

মিনার্ভা থিয়েটার:—গ্রহবৈগুণ্যে স্থানচ্যুত হইয়াও বাঙলার এই একমাত্র পুরাতন প্রতিষ্ঠানটী অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব রাখিতে পারিয়াছেন—এমন কি এত দুর্দ্দৈবের মধ্যেও যে তাঁহারা দর্শক ও সম্প্রদায়স্থ অভিনেতৃবৃন্দের সহানুভূতিতে বঞ্চিত হয়েন নাই ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। যোগ্য রঙ্গমঞ্চের অভাবে ইহাঁরা এ যাবৎ কোন নূতন নাটক অভিনয় করিবার সুযোগ পান নাই। ৺পূজা নিকটবর্ত্তী অথচ এখনও তাঁহাদের পুরাতন রঙ্গমঞ্চের গঠন কার্য্য সমাপ্ত হইতে বিলম্ব আছে তজ্জন্য ইহাঁরা সুবিখ্যাত আনন্দ ব্যবসায়ী ম্যাডান কোম্পানীর এলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে জীবন যুদ্ধের অভিনয় করিবেন। ইহা সুবিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগোর "লা মিজারেবল" নামক বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে রিজিয়া, ঐন্দ্রিলা প্রভৃতি নাটক প্রণেতা শ্রীযুক্ত মনমোহন রায় বি-এল কর্ত্তৃক রচিত সুতরাং নাটকখানি ভালই হইবে আশা করা যাইতে পারে। নিজেদের জীবন যুদ্ধের দারুণ সংগ্রামে জয়ী এই সম্প্রদায়ের "জীবন যুদ্ধ" অভিনয়ও সাফল্যের বরমাল্যে বিভূষিত হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা। বর্ত্তমান যুগে যে "নূতন পন্থার অভিনয়" লইয়া এত হৈ চৈ চলিতেছে মিনার্ভার সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়ই তাহার প্রথম প্রবর্ত্তক ইনিই প্রথমে নরেশ বাবু, রাধিকা বাবু প্রভৃতিকে সাধারণ দর্শকবৃন্দের নিকট পরিচিত করাইয়া দেন। অনুমান করি জীবন যুদ্ধ অভিনয়ে পুরাতন ও নূতন উভয়বিধ অভিনয় প্রণালীর সম্মিলনের সুফলই আমরা দেখিতে পাইব। নূতনের উদ্দাম চাঞ্চল্যের সহিত পুরাতনের স্থির ধীর ভাব মিশিয়া একটা বিচিত্র রসের সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

ষ্টারে 'বিরহ'—বহুদিন পরে বাঙলার রঙ্গমঞ্চে হাসি ফুটিল—হাস্যরসপ্রিয় কৌতুকামোদী বাঙালী যে এই দীর্ঘকাল হাস্যরস উপভোগে বঞ্চিত থাকিয়া কি করিয়া

স্থিরভাবে কেবল বাম্মস্তরূপে হাত পা নাড়া দেখিয়া মজিয়া ছিল তাহাই আশ্চর্য্য। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের এই হাস্যরস প্রধান পুস্তকখানির পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া আর্ট থিয়েটার কোম্পানী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। তবে ইহার জন্য যতটা যত্ন লওয়া ও পরিশ্রম করা উচিত ছিল সম্প্রদায় তাহা না করিয়া পুস্তকখানির অভিনয় আগা গোড়া সুন্দর করিতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে অভিনয় অত্যন্ত নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ অংশগুলি উত্তমরূপে আয়ত্ব না করিয়াই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া দর্শকগণের প্রীতি উৎপাদনে সক্ষম হয়েন নাই—ইহার একমাত্র কারণ উপযুক্ত মহলা অভাব। অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ স্ব স্ব ক্ষমতার উপর অযথা বিশ্বাস করিয়াই এই ত্রুটীর কারণ হইয়াছেন। অভিনয় প্রণালী অবশ্য সুন্দর ছিল কিন্তু তাহা উত্তমরূপে অভ্যস্ত না করিয়া পুস্তকের অভিনয় করা এই সম্প্রদায়ের যোগ্য হয় নাই। গোবিন্দের অভিনয়াংশে তিনকড়িবাবু কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য অবলম্বনে হাস্যরসটী বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সঙ্গীতগুলি অত্যধিক পরিমাণে ওস্তাদী ভাবে গীত হওয়ায় তাহার মধ্যে হাস্যরসের বেশী আস্বাদন পাওয়া যায় নাই। রামকান্ত ভৃত্যের অংশ অতি উত্তমরূপে অভিনীত হইলেও তাহার সঙ্গীত ভাল হয় নাই। বোধহয় সঙ্গীতে তাঁহার তেমন পারদর্শিতা না থাকায় তিনি উহা সুরে আবৃত্তি করিয়াছিলেন—সে আবৃত্তিও ভাল হয় নাই। তাঁহার সহিত ঐ দৃশ্যে দুটী অপরিপক্ক অভিনেতা অবতীর্ণ হওয়ায় Chorusটীর যথাসময়ে আবৃত্তি হয় নাই ও এই দুটী অভিনেতার প্রবেশ ও বহির্গমনকালীন ইতস্ততঃ ভাবটী তাঁহাদের রঙ্গমঞ্চ নীতির অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিল। গোলাপীর অংশ যতটা উজ্জ্বল ও পরিহাস মুখর হওয়া উচিত তাহা হয় নাই ইহা কোন যোগ্যতর অভিনেত্রীকে দেওয়া উচিত ছিল। ইন্দুভূষণের অংশে নির্ম্মলেন্দুবাবুর অভিনয়ে কোন বিশেষত্বই দেখা যায় নাই—রঙ্গমঞ্চে তাঁহার যে নামটুকু আছে এইরূপ অভিনয়ে তাহা বাড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই—এরূপ অভিনয় যে কোন একজন তৃতীয় শ্রেণীর অভিনেতার যোগ্য। সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল "চপলার" অভিনয়। অভিনেত্রী নীহারবালা এই অংশে শিক্ষিতা রমণীর হাবভাব গতিবিধি স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি বিশেষত্বগুলি অতিমাত্রায় স্বাভাবিক হইয়াছিল। তবে এত অধিক মাত্রায় তাম্বুল চর্ব্বণ কথাটা অভিনেত্রী সমাজে চলিত থাকিলেও শিক্ষিতা সমাজে আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না কারণ তাম্বুল চর্ব্বণটা শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে আজকাল অতি কুণ্ঠার সহিত অবস্থিতি করিতেছে। এইটুকুতে একটু সংযমের অভাব ব্যতীত তাঁহার অভিনয়ই বিরহের তালিকায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাভাবিক ও হাস্যরসোজ্জ্বল হইয়াছিল।

Printed & Published by Jnanendra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
14 Jaggannath Dutta Lane Garpar, Calcutta.

ভিখারিণী]   [নবচেতনের সৌজন্যে

"ভিক্ষা দাও গো পুরবাসী!"
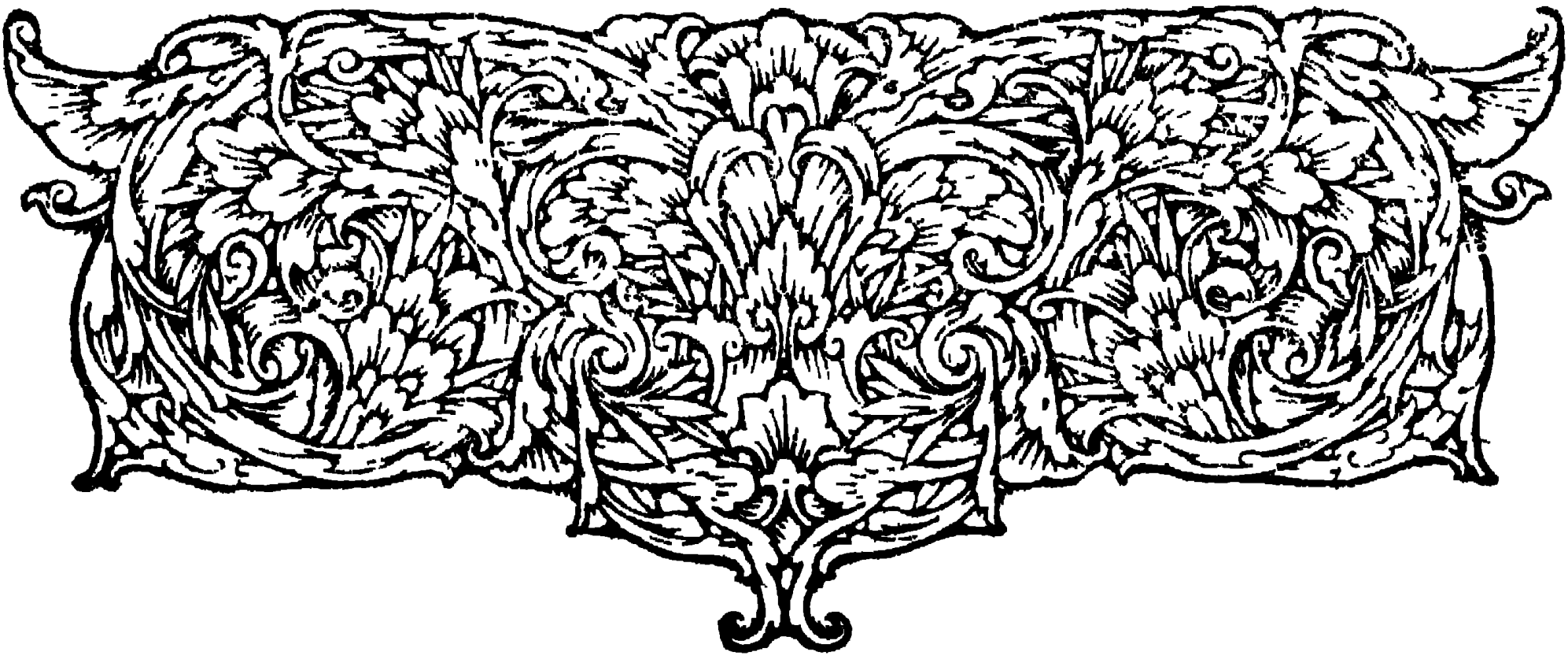
প্রথমবর্ষ]   ৪ঠা আশ্বিন শনিবার, ১৩৩১ সন।   ইংরাজী ২০শে সেপ্টেম্বর।   [১০ম সংখ্যা

শারদীয়া আব-হাওয়া

'দেবদাস'

শ্রীনরেন চক্রবর্ত্তী

হরিধন এক মধুর প্রভাতে ঘুম ভাঙিতেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে সে ভালবাসিয়াছে, এবং ভালবাসিয়াছে তাহাদের পাশের বাড়ীর বুধিকে, বুধির বয়স নয় বছর, আর হরিধন বুধির চেয়ে বছর তিনেকের বড়, দু'জনে এক সঙ্গে খেলা করে, গল্প করে, রাতে জোনাকী পোকা ধরে, এবং সকালে কুলতলা কুলতলা ঘুরিয়া বেড়ায়।

এতদিন তাহারা একসঙ্গে বেড়াইয়াও হরিধন কখন ভাবে নাই যে ভালবাসা নামে একটা পদার্থ পৃথিবীতে আছে, এবং তাহা দান করিতে হইবে, সঙ্গিনী বুধিকে।

কাল রাতে হরিধন তাহার দাদার টেবিলের উপর একখানা বই দেখিতে পাইল, এবং চুপি চুপি সেখানি কাপড়ের মধ্যে লইয়া শোবার ঘরে চলিয়া গেল। মাথার কাছে আলোটি রাখিয়া পাশে জিয়োগ্রাফী খুলিয়া হরিধন একমনে বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিল, এর আগে হরিধন কখনও উপন্যাস পড়ে নাই, সুতরাং যতই সে পাতার পর পাতা উল্টাইতে লাগিল ততই তন্ময় হইতে লাগিল। মা ডাকিলেন হরে, খাবি আয় রাত হ'য়েছে।

হরিধন প্রথমে শুনিতে পাইল না, পরে যখন দরজার গায় গোটাকতক ধাক্কা পড়িল তখন তাহার চমক ভাঙিল এবং মার ডাক কাণে গেল। হরিধনের তখন বই ছাড়িয়া উঠিতে আদৌ ইচ্ছা ছিল না, বলিল মা আমি খাব না আজ—বড্ড পেট্ কন্ কন্ করছে।

ঘণ্টা দুই পরে মা যখন সকল কাজ সারিয়া শুইতে আসিলেন তখন হরিধন তাড়াতাড়ি বইখানি মাথার বালিশের তলায় রাখিয়া দরজা খুলিয়া দিল, এবং চেঁচাইয়া পড়িতে লাগিল Ocean is a vast sea of land.

মা বলিলেন—তোর যখন অসুখ করেছে, কেন এত রাত জেগে পড়্ছিস্!

হরিধন বলিল—কি বল মা, আজ বাদে কাল এক্জামিন, না পড়লে পাশ ক'রতে পারব কেন?

মা বলিলেন—না—না ঢের রাত হ'য়েছে, শুয়ে পড়।

হরিধন তখনই মার আদেশ পালন করিল, কারণ ইচ্ছা থাকিলেও এখন সে কিছুতেই বালিশের তলা হইতে বইখানি বাহির করিয়া আবার পড়িতে পারিবে না।

বইখানির নাম 'দেবদাস'। হরিধন দেখিল দেবদাস পার্ব্বতীর সঙ্গে খেলা করে, উভয়ে মাছ ধরে, স্কুল পালায়, এবং উভয়ে উভয়কে খুবই ভালবাসে, অতএব সেও যখন বুধির সঙ্গে খেলা করে, তখন তাহারও বুধিকে ভালবাসা উচিত।

পরদিন ঘুম ভাঙিতেই হরিধন বুধিদের বাড়ী ছুটিল, এবং তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া একটা পুকুরের পাড়ে গিয়া বসিল। একথা, সেকথার পর হরিধন বলিল—দেখ বুধি আমি তোকে ভালবাসি।

বুধি বলিল—সে আমি জানি।

আনন্দে হরিধন লাফাইয়া উঠিল, বলিল—একথা আগে আমায় বলিস্‌নি কেন্ বুধি? তুই ভালবাসা শিখ্‌লি কোথা? দেবদাস পড়েছিস্ বুঝি?

বুধি চোখ্ দুটো কপালে তুলিয়া বলিল—পোড়া-কপাল, দেবদাস ফেবদাস্ পড়্‌বো কেন? বই পড়ে বুঝি কেউ ভালবাসা বোঝে?

তবে তুই বুঝ্‌লি কি করে?

কেন? তুমি যে কত কুল পেড়ে দাও আমাকে।

হরিধন বিশ্বাস করিল বুধির তুলনায় তাহার বুদ্ধি নিতান্তই কম, নইলে এত আগেই সে ভালবাসা শিখিল কেমন করিয়া।

হরিধন জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা বুধি তুই আমায় ভালবাসিস্?

বুধি ভাবিল হরিধন বোধহয় রাগ করিয়াছে নইলে এত কথা সে জিজ্ঞাসা করিতেছে কেন! তাহার ভয় হইল যদি সে আর তাহাকে কুল পাড়িয়া না দেয়।

ভয়ে ভয়ে বুধি বলিল—কেন বাস্‌বো না হরিদা' আমি তোমায় খুব ভালবাসি, দেখ্‌লে না সেদিন মার ঘর থেকে তোমায় একটা সন্দেশ লুকিয়ে এনে দিলুম।

হরিধন নিশ্চিন্তের হাসি হাসিল। যাক্ পার্ব্বতী দেবদাসকে ভালবাসিত, বুধিও তাহাকে ভালবাসে।

হরিধনের মুখে হাসি দেখিয়া বুধির ভাবনা অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল ; ধীরে হরিধনের কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমায় তাহ'লে ফুল পেড়ে দেবে হরিদা'।

হরিধন তখন ভাবিতেছিল সবই ত' একরকম হইল, এখন একটা তামাক খাবার জায়গা খুঁজিয়া লইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। অনেক চিন্তার পর হরিধন স্থির করিল নন্দীদের মাঠটা বেশ নিরিবিলি গোছের, সেইখানে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করিয়া লইলেই সুন্দর হইবে।

কিন্তু প্রস্তাবটি বুধির কাছে প্রকাশ করিতেই সে চোখ দুটো কপালে তুলিয়া বলিল—ওমা, বলকি হরিদা' তামাক খাবে কি গো? কাকা এ কথা শুন্‌লে যে তোমায় মেরে ফেল্‌বে।

হরিধন প্রথমটা একটু ঘাবড়াইয়া গেল বুধির কথা শুনিয়া ; পরে খানিক ভাবিয়া বলিল—কিন্তু তাতে দোষ কি বুধি? বলিস্ নি ভাই কাকেও, খুব কম করে খাব না হয়।

বুধি দেখিল এক মহা সুযোগ উপস্থিত, এই অবসরে হরিদা'কে ভয় দেখাইয়া সে বেশ কিছু আদায় করিতে পারিবে। এ সুযোগ ছাড়া নেহাৎ বোকামী স্থির করিয়া বুধি বলিল—আচ্ছা আমি বল্‌বো না, তুমি যত ইচ্ছে তামাক খেও—কিন্তু আমাকে কি দেবে বল?

হরিধন পকেট হইতে একটা লাট্টু বাহির করিয়া বলিল তোকে এইটে দেব।

বুধি বলিল—চাইনা ও ছায়ের জিনিষ ; একটা রবারের মানুস্ দেবে কিনে?

হরিধন দিবে প্রতিজ্ঞা করিল এবং বুধির অভয় পাইয়া নিশ্চিন্ত হইল।

এই রকমে কিছুদিন যায়। হরিধন এখন অনেকটা দেবদাস হইয়াছে, অর্থাৎ বুধির সঙ্গে মাছ ধরে, খেলা করে, ছবির বই হইতে ছবি দেখে এবং দেবদাস যখন তামাক সাজে বুধি তখন তাহার ঠিকুরে জোগাড় করিয়া দেয়। তাহারা আর জোনাকী পোকা ধরে না, ফুল পাড়ে না কারণ দেবদাস ও পার্ব্বতী এরূপ কিছু করিত কিনা বইএ লিখা নাই। বুধি ফুল না পাওয়ায় প্রথম প্রথম বড়ই রাগ করিত, কিন্তু তাহার বদলে হরিধন যখন আমসত্ব, লেবুর আচার আনিয়া দিত তখন রাগ ঘুচিয়া গিয়া স্ফুর্ত্তিই দেখা দিয়াছিল।

একদিন সেদিন সকাল হইতে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল হরিধন একটা ভেজা রকে বসিয়া ছুরি দিয়া একটা কঞ্চি চাঁচিতেছিল, এমন সময় বুধি দৌড়াইয়া তাহার কাছে আসিল। হরিধন তখন আপনমনে কঞ্চি চাঁচিতেছিল- সুতরাং বুধির আগমন লক্ষ্য করে নাই। বুধি প্রায় মিনিট তিনেক চুপ করিয়া থাকিবার পরও যখন দেখিল হরিধন তাহাকে দেখিতে পাইল না, তখন সে তাহার চোখদুটো টিপিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

হঠাৎ নাড়া পাওয়ার হরিধন চমকিয়া উঠিল এবং ছুরিটা পিছলাইয়া আঙ্গুলে লাগায় একটু কাটিয়া গেল। অন্য সময় হইলে হরিধন আদৌ গ্রাহ্য করিত না, কিন্তু এখন ইহাতে সে বুঝিল দেবদাসের সেই পার্ব্বতীকে বেত মারা ব্যাপারটা এইস্থলে ঠিক খাটান যাইতে পারে। তখনই হরিধন কঞ্চিটা ঘুরাইয়া বুধির কপালে সপাং করিয়া একটা বসাইয়া দিল ও বলিল—এই তোকে চিহ্ন করে দিলুম।

বুধির এই আঘাতে রক্তপাত না হইলেও বেশ লাগিল এবং ফুলিয়া উঠিল। সে কিন্তু পার্ব্বতীর মত প্রেমের মর্য্যাদা রাখিতে পারিল না, উপরন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে হরিধনের দাদার কাছে নালিশ করিল। হরিধন অনেক বারণ করিল—বলিল দেবদাস পার্ব্বতীকে এর চেয়ে ঢের জোরে মারিয়াছিল এবং তাহাতে অনেক রক্ত পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল, কিন্তু পার্ব্বতী কাহারও কাছে তাহার নাম করে নাই, ভালবাসা হইলে এরূপ করিতে হয় ইত্যাদি। বুধি কিন্তু ভালবাসার এসব দার্শনিক যুক্তি না শুনিয়া তাহাকে দাদার কাছে মার খাওয়াইয়া মজাটা দেখাইবে বলিয়া শাসাইয়া গেল।

হরিধনের দাদা বুধির নালিস শুনিলেন ও কপালে লাল দাগ দেখিয়া বাড়ীর চাকর গদাধরকে বলিলেন হরিধনকে ধরিয়া আনিতে। গদাধর ছোটদাদাবাবুকে

ধরিয়া আনিতে গেল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে তোকে হ'রে মারলে কেন?

বুধি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—শুধু শুধু; সে খালি বলে আমি দেবদাস, তুই পার্ব্বতী; আরও কত কি। আবার লুকিয়ে লুকিয়ে তামাক খায়।

হরিধনের দাদা বলিলেন—ওঃ, তাই দেবদাসখানা খুঁজে পাচ্ছি না, হতভাগা সেটা লুকিয়ে পড়্ছে। আবার তামাক খাওয়া। দাঁড়াও, হতভাগার দেবদাসগিরি বার করছি।

দাদার হাতে বেদম্ মার খাইয়া হরিধনের দেবদাস হইবার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইল এবং প্রেম নামক পরম পদার্থটীর শত হস্ত দূর দিয়া চলিত। বুধির বিবাহের রাত্রে যখন সে লুচি পরিবেশন করিতেছিল তখন তার বাল্য জীবনের এই রহস্য কথাটুকু তার মনে পড়িল এবং সে ভাবিল "ছ্যা কি পাগলামোই করেছি।"

"সাধ"

শ্রীললিত মারাক

আমি যদি হতেম শিশু
সরলতায় ভরা।
থাকৃত নাকো দুঃখ মোটে,
খেলি সুখে নদীর তটে
ক্ষুদ্র নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে
রচিতাম্ আমার গেহ;
সারা বেলায় ধূলাখেলায়
হইত মলিন দেহ।
বিশ্বরাজা সাজিতাম আমি
যা দেখিনি ধরা,
আমি যদি হতেম শিশু
সরলতায় ভরা॥

(২)

ফিরে যদি হতেম মায়ের
আদুরে কচি খোকা।
অমি সুখে সবার কোলে
স্নেহের চুমো লুটবো বলে,
মোহন হাসি রাশি রাশি
ফুটিত কচি ঠোঁটে,
মায়ের কোলে খেতাম দোল
নাইক চিন্তা মোটে॥
নিত্য আমার সঙ্গী হতো
পাখী-ফড়িঙ্-পোকা;
ফিরে যদি হতেম মায়ের
আদুরে কচি খোকা।

(৩)

হতেম্ যদি আবার শিশু
লজ্জাসরমহীন।
মায়ের কণ্ঠ সুখে আঁকড়ি
বল্না মাগো, পরী রাণী
রাতে আসে আমার পাশে
গালে খেতে চুমো?'
বলিত মা—হাঁ রে বোকা
আগেত তুই ঘুমো।
কল্পনাতে পরী ঘেরি মোরে
রইতো নিশিদিন
হতেম্ যদি আবার শিশু
লজ্জা সরম হীন।

(৪)

হতেম্ আবার যদি সবার
ভালো খুকুমণি।
সারা বিশ্বের হয়ে আপন
সবার হিতে হয়ে মগনে
সবার দুয়ার রইতো আবার
আমার তরে খোলা;
বাসি' ভালো শাদা কালো
হতাম্ আপনভোলা।
জয় ভাবনার সীমা পারে
যেতাম পথ চিনি।
হতেম্ আবার যদি সবার
ভালো খুকুমণি।

(৫)

ভায়ের বোনের হতেম্ যদি
আবার ছোট খোকা।
চড়িতাম্ পিঠে কাঁধে মাথে,
"হেট্ ঘোড়া" বলি চাবুক হাতে
মারামারি ঝগ্‌ড়াঝাঁটী
হত নানান্ ঢং;
স্নেহ-বাঁধন হত কঠিন
করি বিবাদ-সং।
ভালবাসার হ্রাস হ'তনা
হলেও রাগী রোখা;
ভায়ের বোনের হতেম্ যদি
আবার ছোট খোকা।

(৬)

মায়ের কোলের হতেম্ যদি
আবার ছোট শিশু।
গগনের ঐ তারাগুলি
কইতো কাণে মোহন বুলি,
আলোর মেলা করিত খেলা
আমার শয়ন ঘরে।
বকুল দিত ফুলের রাশি
নিত্য আমার তরে।
আরাম করে শুয়ে থাকি
যেমন 'পি-পু-ফি-সু'
মায়ের কোলের হতেম্ যদি
আবার ছোট শিশু।

সাম্যের উদ্দেশে

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ

ওগো ফরাসী বিপ্লবের কাম্য সন্তান সাম্য! তুমি কবে কোন শুভক্ষণে কবিত্বের কল্পনা রাজ্য ত্যাগ করিয়া কঠোর বাস্তবতার বাস-ভূমে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইবে বলিয়া দাও। সেদিন কি কখন আসিবে না, সে শুভলগ্ন চিরদিনই গ্রীক পঞ্জিকার (Greek Calender) কুক্ষিগত রহিয়া "ক্ষুদে মঙ্গলবারের" পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া থাকিবে?

কবিত্বের স্বপ্নরাজ্যের মায়া ত্যাগ করিয়া যদি কোন-দিন কর্কশ বাস্তবতার শিলাকঙ্করময় এ মর্ত্তভূমে তোমার আবির্ভাব সত্যই সম্ভব হয় তবে সেদিন এ দুনিয়ার হালচাল কিরূপ হইবে বলিয়া দাও।

সেদিন কি ধরিত্রীর অবস্থা উদ্ভিদে 'অনন্তকায় শূন্য ধরাতল' হইবে? অথবা নৈশ নীল আকাশের ন্যায় বসুন্ধরার দূর্ব্বাঢাকা সবুজ বুকেও তারার দ্যুতি ফুটিয়া উঠিবে? সেদিন কি হিমালয়ের ও বল্মীকের উচ্চতা সমান হইয়া যাইবে, অথবা সাহারায় ও সাগরে উভয়ত্রই এক সঙ্গে পাশাপাশি উষ্ট্র ও জাহাজ পাড়ি দিবে?

সেদিন কি ফলে-ফুলে বর্ণে-গন্ধে সমস্ত বিচিত্রতা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? সেদিন কি সর্ষপ আকারে কুষ্মাণ্ডের আয়তন লাভ করিবে,—অথবা কুষ্মাণ্ড-নিষ্পেষণে সর্ষপতৈল নির্গত হইবে?

সেদিন কি মানবের পঞ্চ-ইন্দ্রিয় একত্বে বিলীন হইবে, অথবা প্রতি ইন্দ্রিয় পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্য সমাধা করিয়া 'পঞ্চতীর্থ' উপাধি লাভ করিবে? অথবা সেদিন মানব বলিয়া কোন বিশেষ জীবের অস্তিত্ব থাকিবে না—খেচর, জলচর, স্থলচর ও শাখাচরের সংমিশ্রণে খেচরান্নধর্ম্মী এক অদৃষ্টচর জীবের উদ্ভব হইবে?

অথবা যদি সৃষ্টিকর্ত্তার অনুরোধে তাঁহার ছাঁচে-গড়া সৃষ্টির-সার মানবজাতির অস্তিত্ব একান্ত বজায় রাখ তবে সেই জাতি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবে?—তখন কি স্ত্রীপুরুষে কোন ভেদ থাকিবে না,—উভয়কেই কি এক যোড়া করিয়া শ্মশ্রু-গুম্ফ উপহার দিবে, অথবা পুরুষ-জাতিকে শ্মশ্রু-গুম্ফের উৎপাত হইতে অব্যাহতি দান করিবে? তখন কি নরনারী উভয়কেই গর্ভযাতনা ভোগ করিতে হইবে অথবা মানসপুত্র সৃষ্টি-শক্তি সাহায্যে জগতের প্রজাপুষ্টি সাধিত হইবে?

সেদিন কি জনকজননী ও সন্তানের মধ্যে আশীর্ব্বাদ ও প্রণামের বিনিময় ঘুচিয়া গিয়া আশীর্ব্বাদের বিনিময়ে আশীর্ব্বাদ ও প্রণামের প্রতিদানে প্রণামই প্রচলিত হইবে?

সেদিন কি প্রজাপীড়ক রোমসম্রাট নীরো আর প্রজারঞ্জক রামচন্দ্র বিশ্ববাসীর হৃদয়ে সমান আসন গ্রহণ করিবেন? সেদিন কি মানসিংহ ও রাণাপ্রতাপ বিশ্বের নিকট সমান শ্রদ্ধালাভে সমর্থ হইবেন? সেদিন কি বীর শ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ান আর ভীরু শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণসেনে কোন পার্থক্য থাকিবে না? সেদিন কি বাল্মীকি আর বটতলার কবি এক শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন? অথবা সেদিন বিশ্বহিত-প্রাণ বশিষ্ঠের ন্যায় ব্রাহ্মণের মত 'ব্রহ্মণোব নির্ব্বিষখোলস'—উপবীত-সার আচারসর্ব্বস্ব স্বার্থান্ধ কলির 'বামুন' সমাজের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিবে?

সেদিন কি 'জাতের বিড়ম্বনা'র সঙ্গে সঙ্গে পদ-পার্থক্যের আপদ ঘুচিয়া যাইবে……এক কথায়, সেদিন কি রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাসে গঠিত 'অচলায়তন' ভূমিসাৎ হইয়া অমৃতলালের 'একাকার'কে স্থান ছাড়িয়া দিবে?

তা যদি না হয় তবে হে সাম্য! তোমার অগ্রদূতেরা তোমার নামে জগতে যে অকল্যাণ, অত্যাচার অশান্তি করিতেছে তাহার প্রতীকার কিসে হইবে? কে তোমার অগ্রদূতদিগকে বুঝাইয়া দিবে যে, বিচিত্রতাই জগতের ধর্ম্ম বৈশিষ্ট্য? কে তাহাদিগের বধির কর্ণে শুনাইবে যে বৈচিত্র্যজনিত বৈষম্যের বিষ যে দূর করিবে সে সাম্য তুমি নও—সে হইতেছে প্রেমময় ভগবানের প্রিয় কন্যা—সহানুভূতি!

গম্ভীর-রেখা

শ্রী অখিল নিয়োগী

বংশীর ঘর ছিল ঠিক মনুয়াদের ঘরের সাম্‌নে, দুই বাড়ীর মাঝখান দিয়ে ছোট্ট একটি খাল ঝির ঝির করে ব'য়ে গিয়ে একটা গম্ভীর রেখা টেনে দিয়েছিল বাড়ী দুটীর মাঝখানে।

বংশীদের জাত্ ব্যবসা পুতুলগড়া, আর মনুয়া ছিল মেছুয়াদের মেয়ে।

বংশীর হাতের পুতুলগুলি সব যেন একই ছাঁচে গড়ে উঠ্‌ত। মেছোদের মেয়ে মনুয়াও সারাদিন বংশীর সঙ্গে হেসেখেলে কাটিয়ে দিত আর তারই মত স্বভাব পেয়েছিল।

রোজ সকালে এক আঁচল মুড়ি নিয়ে এসে মনুয়া বংশীর কাছে বস্‌তো, আর সময়ে অসময়ে তার রংয়ের তুলি, জলের ঘটী এগিয়ে দিয়ে নিজেকে খুব কাজের লোক মনে কর্ত্ত।

এর জন্যে মনুয়ার ওপর তার বাপ মা কড়া শাসনের ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু "স্বভাব যায় না মলে"—এতে তার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি।

এমন অনেকদিন গেছে—মনুয়ার মা না খেতে দিয়ে মনুয়াকে তালা বন্ধ করে রাখ্‌তো। আর প্রায়ই গজগজ করে বল্‌তো এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় বেড়ান একটু সরম নেই? কেন—দাদাদের সঙ্গে মাছ ধরতে যেতে পারিস না?

...কিন্তু কে কার কথা শোনে? ছাড়া পেলেই আবার যা সেই!

* * * *

একদিন মনুয়া বল্লে "বংশীদা পুতুলগুলোয় কি যে ধ্যাবড়া করে রং দাও—ভাল করে দিতে পার না?

—"ভাল ক'রে রং দিলেই কি দু'পয়সার বেশী কেউ দেবে রে?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মনুয়া হঠাৎ বলে উঠ্‌ল—আচ্ছা, দিয়েই কেন ছাখ না?—আমি হ'লে কিন্তু দিতুম।" সকলেই যদি তোর মত আমায় ভালবাস্‌তো তাহ'লে—

সে কথায় বাধা দিয়ে হঠাৎ মনুয়া বলে উঠ্‌ল "আজ তোমায় কিন্তু একটা ভাল পুতুল গড়তে হ'বে।

বংশী বল্লে "তোর মত একটী টুক্‌টুকে মেয়ে নাকি রে?"

"যাও—আমি বুঝি তাই বল্‌ছি?"

লজ্জায় মুখটা লাল করে মনুয়া ছুটে পালিয়ে গেল। মনুয়ার ফরমাস মত বংশী তার সমস্ত কারীগরি দিয়ে একটি টুক্‌টুকে মেয়ে গড়তে আরম্ভ কর্ল্লে।

তারপর দিন মায়ের কড়া শাসনে মনুয়া বংশীর চিত্রশালায় ঠিক হাজির দিতে পার্ল্লে না।

মনুয়া সারাদিন ছট্‌ফট্ ক'রে কাটালে।

পরদিন ভোরে এসে দেখে সেই টুক্‌টুকে মেয়েটি টুকরো—টুকরো হ'য়ে পড়ে আছে?

মনুয়া দেখে কেঁদে ফেল্লে, অভিমান রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে—এ পুতুল কে ভাঙ্গলে?

বংশী চোখ না তুলেই বল্লে "আমি—কাল্‌কে কেমন মন খারাপ হয়ে গিছল কিছু ভাল লাগ্‌ছিল না—তাই রাগ করে ভেঙ্গে ফেল্লুম।"

ওঃ বুঝেছি বংশীদা আমি আসিনি তাই এ রাগ, না—মনুয়ার চোখে কান্নার জোয়ার ছল ছল করে উঠ্‌লো।

এমনি করে দু'টি প্রাণে যেভাবে আদানপ্রদান আরম্ভ হল তা ক্রমশঃ তাদের মধ্যে একটা সোজা শক্ত বাঁধনের মত হয়ে দাঁড়াল।

ধীরে ধীরে সঙ্গোপনে কিশোরী মনুয়ার প্রাণে যে "প্রেমের কমল ফুটে" উঠ্‌ল তা তাদের মধ্যে কেউ দেখ্‌তে পায়নি কিন্তু তার সৌরভে দুজনেই মুগ্ধ আচ্ছন্ন হয়ে ছিল।

মনুয়ার বাপ, মেয়ের জন্য বর দেখ্‌তে আরম্ভ কল্লে, তার ভায়েরা চারিদিকে তল্লাস করতে লাগল।

বাড়ীর একটিমাত্র মেয়ে—তার বিয়েটা যাতে ভাল ঘরেই হয়—

একদিন মহুয়া বসে বসে রং গুল্‌ছে—তার বড়দা এসে বল্লে "এই বাড়ীচ"—

মহুয়া ধীরে উঠে গেল—প্রদীপটা সেখানে রেখে, জড়দেহখানাকে যেন কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাড়ীর দিকে নিয়ে চল্‌লো।

বংশী কতক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল—তারপর হঠাৎ পাগলের মত চারিদিকে রং তুলি ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে ঘরে গেল—একটা বাঁশী এনে গাছতলায় বসে তাতে ফুঁ দিলে—বাঁশী বাজল না, ধরা-গলায় মত একটা রুদ্ধ আওয়াজ করে নীরব হলো। বাঁশীটা মাটীতে আছড়ে সে একটা পাথরের উপর উপুড় হয়ে পড়লো—নিস্পন্দ মৃতের মত মুহ্যমান অবস্থায় কতক্ষণ পড়েছিল তা জানি না।

* * * *

পরদিন প্রভাতে বংশী তার মাকে হঠাৎ বল্লে—মা আমার বিয়ে দিবি না?

মা এত বড় ছেলেটার হঠাৎ নূতন আবদার শুনে হেসে বল্লেন, তুই-ই তো বলেছিলি বিয়ে কর্‌বিনে—তাইত এদ্দিন কিছু বলতে পারিনি বাবা, আমার কি আর সাধ এতে অসাধ?—একটা বৌ ঘরে আনবো—তা তুই তো বাদ সেধেছিলি—এখন বলিস তো ঘটকীকে কনে দেখ্‌তে বলি।

বংশী বল্লে, "আমি মহুয়াকে বিয়ে করব।"

মা শিউরে উঠে তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—সে কি হয় বাবা ও যে মেছোদের মেয়ে—?

বংশী ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল।

মা—মেছুনির মেয়ে তার ছেলেকে যাদু করেছে ভেবে উদ্দেশে অনেক গাল পেড়ে, তারপর ঘরের কাজে মন দিলেন।

* * * *

একদিন সানাইয়ের সুর ও চোখের জলের ভেতর দিয়ে মহুয়া তার শ্বশুর ঘরে গেল।

সেদিন থেকে হাটে আর বংশী পুতুল বেচ্‌তে যেত না। খদ্দেররা জিজ্ঞাসা করলে হেটোরা বলতো আহা সে রকম পুতুল আর কে গড়বে বাবু বংশী পটুয়া পাগল হয়ে গেছে।

বংশীর পাতায় ঘেরা পুতুল-গড়ার ঘরের দ্বার রুদ্ধ; বংশী এখন পাহাড়ে বনে বাদাড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত বাঁশী বাজিয়ে বেড়ায়—তার মা কত কান্নাকাটী করেন, তবুও বংশী আর কাজে বসতে পারে না—দুঃখ এসে একটা বিকট দৈত্যের মত হাত মুচড়ে দেয়—হতাশা এসে তাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায়।

একদিন তাদের দু'বাড়ীর মাঝে গণ্ডী দিয়েছিল—ছোট্ট খালটি, আজ তাদের দুটি প্রাণের আনাগোনার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে তাদের অদৃষ্টে দেবতা এক চির দুর্ভেদ্য গণ্ডীর রেখা টেনে দিলেন। যা এ জীবনে মোছবার শক্তি কারু রইল না।
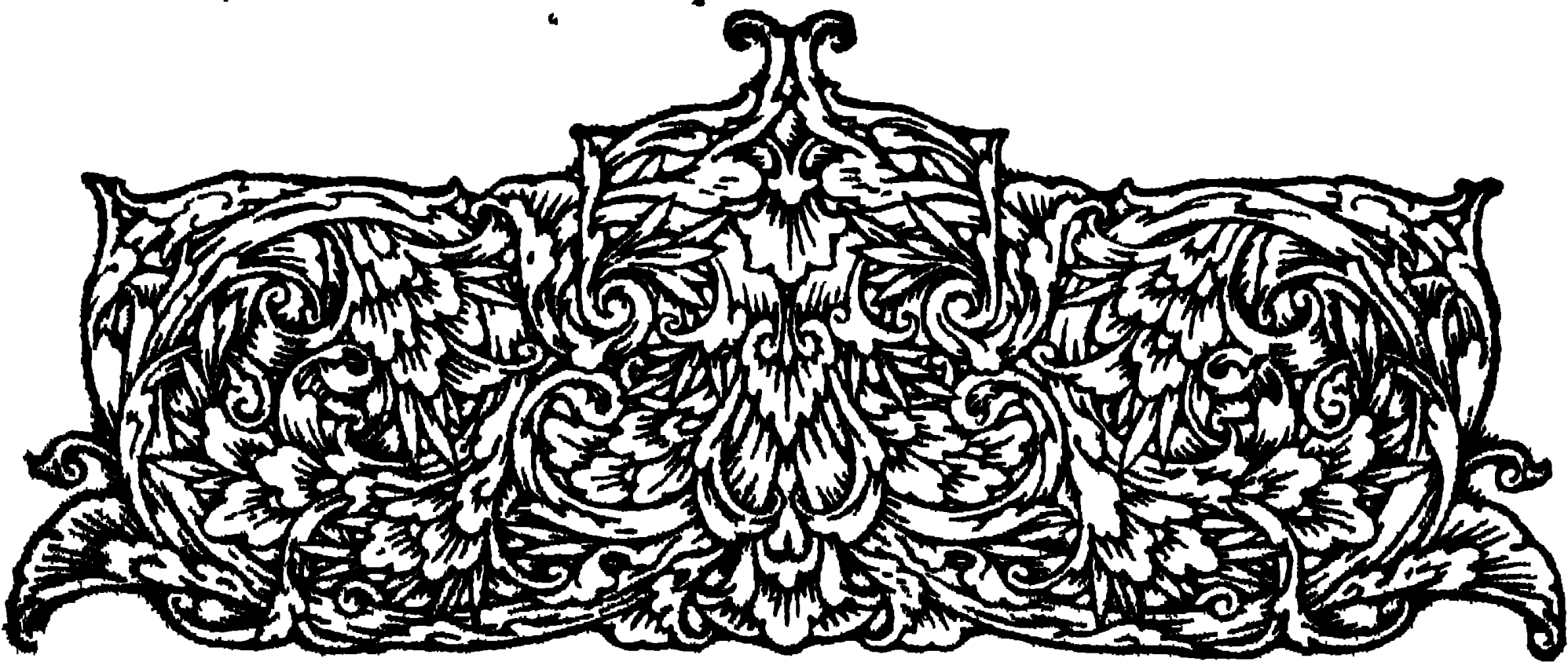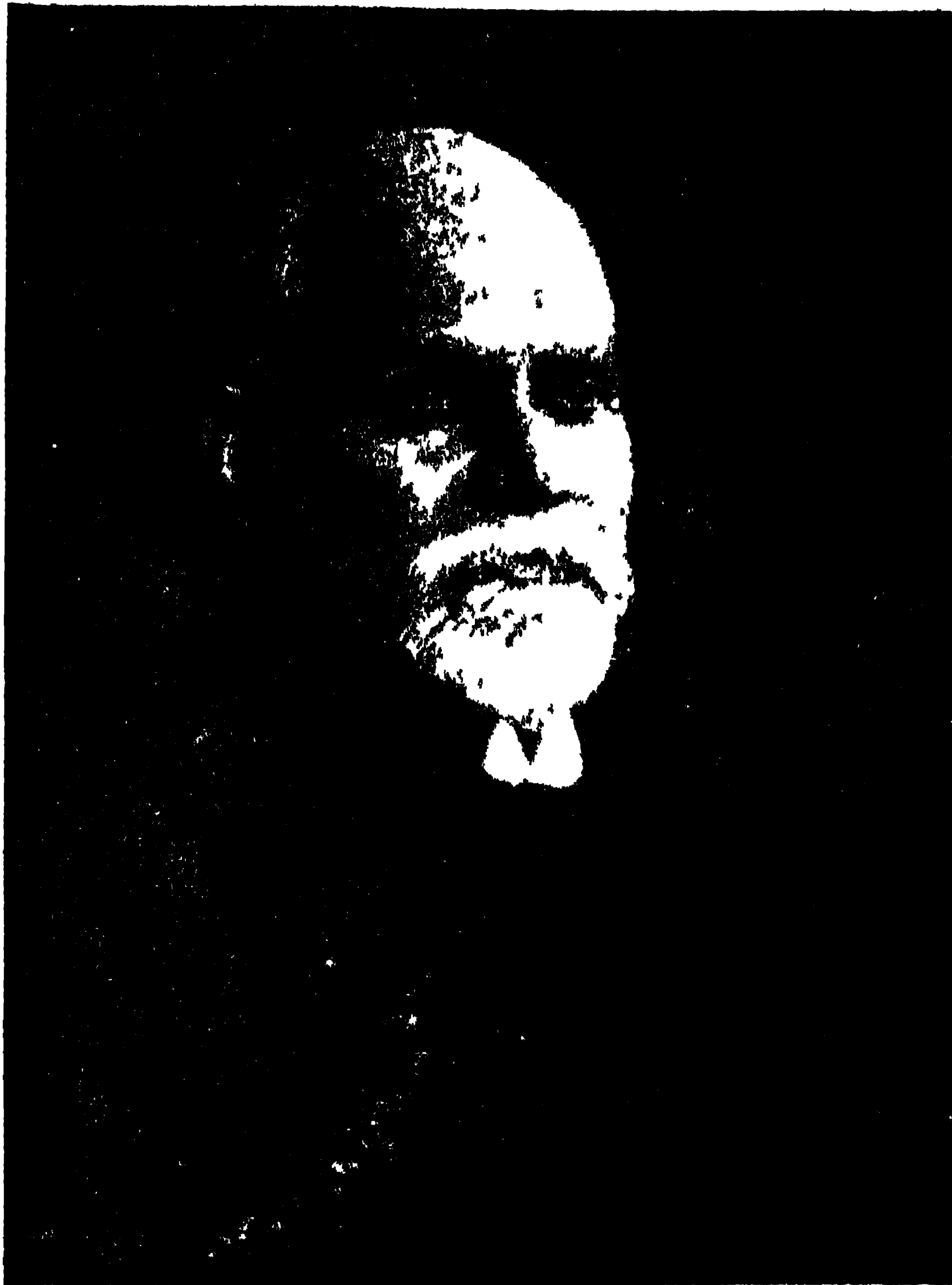
ভূপেন্দ্রনাথ বসু

জন্ম—১৮৫৯ সাল।   । মৃত্যু—১৯২৪ সাল

১৬ই সেপ্টেম্বর বেলা ১-১৫ মিনিট।

নারীর অধিকার

(প্রতিবাদ)

সফিয়া খাতুন বি-এ

৩১শে শ্রাবণ সংখ্যার নবযুগে "পুরুষ" নামদেয় অজ্ঞাত কুলশীলের "নারীর অধিকার" নামক প্রবন্ধে লেখকের অনধিকার চর্চ্চার চেষ্টা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে লেখকটি যে পুরুষ, তিনি যে স্ত্রীলোক নহেন তা তাঁর লেখা হতেই ত বেশ বুঝা যায়; তবে আর পুরুষ নাম দেবার কি দরকার ছিল? বোধহয় নিজ নাম ছাপবার সাহস তাঁর নেই। প্রবন্ধটীতে যে যুক্তিতর্কহীন কতকগুলি অবান্তর কথার সমাবেশ ছিল তা এখানে প্রমাণ করতে চেষ্টা করব।

তিনি লিখছেন—তাঁদের (নারীর) অধিকার যে কোথা নেই কিসে নেই তা বলতে পারিনা। নেই বলে কে? কোন পুরুষে বলেন কি? লেখকটির কথায় বুঝা যায় মেয়েদের অভাব অভিযোগ পুরুষ ঠিক করে দেবে। পুরুষ যেন তা জানেন। যেহেতু পুরুষ কোন প্রতিবাদ করছেন না কাজেই মেয়েদের প্রতিবাদ করবারও কোন দরকার নেই। আমিও বলি ইংরেজ ত "মণ্টেগু রিফর্ম স্কিম" দয়েছে—আর ত স্বরাজ স্বরাজ করবার কোন দরকার দেখি না। কারণ কোন ইংরেজত ভারত-বাসীকে স্বাধীন করে দিবার কথা বলছে না। জানতে চাই লেখক মশাই এতে সন্তুষ্ট থাকবেন কি? লেখকের মনে হচ্ছে পুরুষরা নাকি সদাই মেয়েদের ভয়ে সন্ত্রস্ত আছেন। জানিনা তিনি এসব ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন কি না। পুরুষ নারীকে ভয় করে চলছে তার দুএকটা প্রমাণ তিনি দিতে পারেন কি? নারী নির্য্যাতন বিষয়ে তিনি বড় গলায় মেয়েদেরে দোষ দিচ্ছেন যে বদমাস্‌রা যখন মেয়েটীর সতীত্ব নষ্ট করে তখন নারী দৃপ্তাসিংহীর মত তেজ দেখাতে পারেন না। [illegible] করতে চাই—যে বাড়ীর মেয়ে এমনি [illegible] সে বাড়ীর বা সে গ্রামের প্রতিবাসী [illegible]নরী হয়ে পড়েন নাকি? তারা তখন না আর কিছু হয়ে পড়েন। লেখক যে নারীকে দৃপ্তাসিংহীর মত দেখতে চান—বলি সেরকম ট্রেনীং তিনি আপন মা বোন কে দিয়েছিলেন কি?

দুঃখের বিষয় লেখক যে সব মেয়েদের উপর তেলে বেগুন হয়ে ঝাল ঝাড়তে চেয়েছেন তাদের একটিও গুণ্ডা কর্ত্তৃক আজ পর্য্যন্ত নির্য্যাতিত হয় নাই। কারণ সে সব মেয়েদের আত্মসম্মান বজায় রাখবার ক্ষমতা আছে। তারা জুতা মোজা এঁটে ললিতলবঙ্গলতার মত দেহলতা দুলিয়ে গমন করেও অত্যাচারী বদমাস্ পুরুষের গালে পায়ের জুতা খুলে জুতার বাড়ী মারতে বেশ জানে। লেখক নিজের কথায়ই ধরা পড়ছেন যে যাদেরে অসূর্য্য-মপশ্যা করে রেখেছেন—একমাত্র তারাই গুণ্ডা কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হচ্ছে। শুধু নাকে কাঁদলে বা জোরে চেঁচালে যে বদমাস্‌কে জব্দ করা যায় না তা ঠিক কিন্তু এ সব ও যারা বুনে বো তারাই করে থাকে। লেখকটি যে সমাজের বা যে সার্কেলের সে সমাজ বা সে সার্কেলের মেয়েরাও লাঞ্ছিতা হচ্ছে। কোন খৃষ্টান কি ব্রাহ্ম মেয়েরা এভাবে লাঞ্ছিত হয় নাই বা তা হওয়া অসম্ভব। লাঞ্ছিত হচ্ছি আমরা যারা ব্রাহ্মও নই খৃষ্টান ও নই লাঞ্ছিত হচ্ছি আমরা যারা বেশ্যাশক্ত মদ্যপায়ি স্বামীর কথায় উঠছি আর বসছি, যাদের স্বামীর অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করবার জো নেই এবং প্রতিবাদ করতে গেলেই পায়ের লাথি খেতে হয়—তারা। লেখকটির লেখা পড়লে মনে হয় যেন তিনি পঞ্চমজর্জ্জ আর তাঁর মা বোনরা ভারতবাসী। তাই বড় গর্ব্বিত হয়ে বলছেন—ভিক্ষায় বা রক্তচক্ষু দেখিয়ে বা চোখে জল প্লাবন করে কেউ কখনও অধিকার পায়নি। সহৃদয় পাঠক! হয়ত বুঝতেই পারছেন যে একথা তিনি মেয়েদেরই লক্ষ্য করে বলছেন। কাজেই বুঝতে পাবেন যে তিনি নারীজাতিকে কতটুকু সম্মান করতে শিখেছেন। তিনি তাঁর আপন মা বোন কে অপর দুটী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে ভয় পান। তাই লিখছেন "যে স্ত্রী স্বামীর হৃদয় অধিকার

করে থাকে সে তো বিশ্বের আধিকারিণী বাইরের দুটী অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করে সে কি এমন বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইবে?" লেখকের বিশ্বাস স্ত্রীলোক যদি স্বামী ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে কথা বলে তাহলে সে স্ত্রী সেই লোকটীর প্রেমে পড়ে যেতে পারে। আপন মা বোনের উপর তাঁর এই শ্রদ্ধা। জানিনা এত বড় অভিজ্ঞ সম্পাদক হয়ে জ্ঞান বাবু এ প্রবন্ধ ছাপলেন কি করে! সম্পাদকত আর আজ নূতন সম্পাদকি করতে বসেন নাই। তাঁর অপক্ষপাতি সম্পাদকতার সঙ্গে আমরা অনেক দিন হতেই পরিচিত ছিলাম বাসন্তী পত্রিকা হতে। যে লোকটা বিশ্বাস করে যে তাঁর মা বোন অপর একটী লোকের সঙ্গে আলাপ করলেই অসচ্চরিত্রা হয়ে যেতে পারেন— তার লেখা বিশেষত নারীর অধিকার নাম দেওয়া প্রবন্ধ যে কি করে ছাপলেন তা বুঝতে পারছি না।

লেখকটী কোন দিন যে শিক্ষিত সমাজ বা শিক্ষিত মহিলাদের সঙ্গে মিশেন নি তার প্রমাণ দিচ্ছি। তিনি লিখছেন "আর এক কথা. অধিকারের ও ক্ষেত্র আছে পুরুষ যদি বন্ধনশালা অধিকার করে বসেন, ফলে স্বল্লাহার ক্রমশঃ অনাহার—পরিণামে নিরাকার হইতে হইবে। আর নারী যদি হাটবাজার করিতে যান তবে বিক্রেতাদের হিসাবে ভুল হইবে তারা হিসাব মিলাইতে পারিবেন না—যদি কলেজে প্রফেসারী করেন তো ছাত্রদের পাঠে ব্যাঘাত ঘটিবে—ডাক্তার হইলে রোগীর পরিবারস্থ রমণীরা—রোগী দেখাইতে আপত্তি করিবেন —উকীল বা বারিষ্টার হইলে জজসাহেবের রায় লেখার ব্যাঘাত ঘটিবে কারণ চাঁদমুখের জয় সর্ব্বত্র। পাঠক। ভেবে দেখুন লেখকটি আপন মা বোনকে কতটুকু শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন। এই কথা কটিতে কি এই ইঙ্গিত হয়না যে যদি লেখকের মা বোন হাট-বাজার করতে যান, যদি প্রোফেসারী করতে যান যদি ডাক্তারী কি উকীল বারিষ্টারী করতে জান তবে তাদের চাঁদমুখ দেখে দোকানদার, ছাত্র ও জজসাহেব তাদের প্রেমে পড়ে গিয়ে মাথা বিগড়ে যাবে। ঠিক মত কাজ করতে পারবেন না। লেখকের মা বোন যদি ডাক্তার হয়ে রোগী দেখতে যান তবে রোগীর বাড়ীর রমণীরা রোগী দেখাইতে নাকি আপত্তি করিবেন পাছে রোগী দেখতে গিয়ে যদি সে বাড়ীর পুরুষদেরে নিয়ে পালিয়ে যান। পাঠক। একবার ভেবে দেখুন লেখকটি তার আপন মা বোনকে কি চোখে দেখে থাকেন। তিনি আপন মা বোনকে যেন মনে করেন আম কাটালের মত লোভে নেওয়া জিনিষ। যেই দেখবে সে-ই খেতে চাইবে।

আমরা লেখককে জানাচ্ছি যে বাংলা দেশের ছেলেদের এখনও লেখকের অবস্থা প্রাপ্ত হয়নি যে সে তার শিক্ষয়িত্রীকে অপমান করতে পারে। পাঠে সে সব ছাত্রদেরই ব্যাঘাত করে যাদের স্বভাব চরিত্র ভাল নয়। যারা আপন মা বোনকে দিয়ে বিশ্বাস করতে পারে না। যারা পরের মা বোনকে আপন মা বোনের মত দেখতে পারে না।

লেখক রামের "দেবি বিজ্ঞায়" উক্তির তুলনা দিয়ে বলতে চান যে হিন্দু পূর্ব্বে নারীকে কত সম্মান করত। কিন্তু লেখক নিজেই সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তিনি আবার শাস্ত্র বচন আওড়াতে গিয়েছেন। আর এক জায়গায় লিখেছেন "যাঁহারা এই আন্দোলন করিতেছেন বা হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মনীতি এবং পুরুষদিগকে বিনা বিচারে আক্রমণ করিতেছেন তাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্র পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ পাঠ করেন নাই এবং নিজেদের পরিচিত নারীবৎ ভীরু ও কয়েকটী কাপুরুষের চরিত্র দেখাইয়া সাধারণ পুরুষ চরিত্রের একটা আদর্শ ঠিক করিয়া লইয়াছেন।"

লেখকের কথায় বুঝা যায় তিনি যেন অনেক প্রাচীন গ্রন্থাদি পড়েছেন এবং পড়ে নিজের মা বোনকে সন্দেহ করতে শিখেছেন। তিনি যাঁদেরে নারীবৎ ভীরু ও কাপুরুষ বলেছেন তারা লেখকের মত আপন মা বোনকে সন্দেহ করতে পারে না, কি উঠতে বসতে লাথি ঝাটা মারতে পারে না বলেকি ভীরু ও কাপুরুষ বলেছেন? আমার ত মনে হয় লেখকটীর মত ভীরু কাপুরুষ বিশ্বপ্রভুর সৃষ্ট দুনিয়ায় আর দুটী নাই।

আর শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের নিকটও নিবেদন এই যে এ সব বাজে মার্কা বটতলার প্রবন্ধ ছেপে পত্রিকার আত্মসম্মান নষ্ট করা বোধহয় উচিত নয়! আর লেখকটি-কেও উপসংহারে এই বলতে চাই যে তিনি তাঁর আংবড়াই ভাব ত্যাগ করুন। তাঁকে শিক্ষা দিতে পারে এমন মেয়ে বাংলাদেশে যথেষ্ট আছে। তিনি যেন ভুলে যান না যে একদিন তিনিও এই জাতির একটীর হাতে লালিত পালিত হয়েছিলেন। আমি সাহেবিয়ানা সভ্যতার পক্ষপাতী নই তবে নিজেকে সাধারণ পুরুষের চাইতে নীচ মনে করতে কোন মতেই রাজী নই পুরুষের কাছে আমাদের যথেষ্ট শিখবার আছে এবং আমাদের কাছেও পুরুষের শিখবার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। এ কথা যেন লেখক কোন দিন ভুলে না যান। প্রবন্ধ লিখবার পূর্ব্বে নিজ মা বোনকে শ্রদ্ধা কি করে করতে হয় তা শিক্ষা করা দরকার মনে করি।

প্রতিবাদের কৈফিয়ৎ

শ্রীযুক্তা সকিনা খাতুন বি, এ, মহোদয়া আমার লিখিত নারীর অধিকার শীর্ষক একটী প্রবন্ধের প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন এবং উহা আমাকে পাঠ করিতে দিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমার কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগ দিয়া নবযুগের সম্পাদক মহাশয় আমাকে অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রবন্ধগুলি আমি পুরুষ নাম দিয়া লিখিয়াছি, নিজের নাম দিই নাই; এথেকেই প্রতিবাদ অনুমান করে নিয়েছেন যে আমার নাম দেবার সাহস নাই। আমি কেন নাম দেই নাই সে কৈফিয়ৎ প্রথমেই সম্পাদক মহাশয়কে দিয়েছি তিনি সেটা যুক্তিসঙ্গত মনে করে প্রবন্ধ প্রকাশের সুযোগ আমায় দিয়েছেন সুতরাং এ সম্বন্ধে এরূপ আনুমানিক টিপ্পনী কাটিয়া সম্পাদককেও অপমানিত করাটা সঙ্গত নহে তাহা বলা বাহুল্য। নামটী দিলেই যে সকলেই জ্ঞাত কুলশীল হইতে পারেন এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই, নামের পেছনে ইউনিভারসিটীর ডিগ্রীর ছাপ পড়িলেই তাহা দ্বারা জ্ঞাতকুলশীল হওয়া যায় না; কারণ এ ছাপটীর আজকাল বিশেষ কোন মূল্য নাই। কবীন্দ্র রবীন্দ্রের নামের পশ্চাদ্ভাগে বহুকাল কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রীর ছাপ ছিল না তার জন্যে তিনি জনসমাজে অজ্ঞাত ছিলেন না এবং কত বি, এ পাশ আজও যে অজ্ঞাত আছেন তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। আমার এ প্রবন্ধগুলি নারী পুরুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মতামত সংগ্রহ করিয়া তাহার আলোচনা ও বিচার করার উদ্দেশ্যে অবতারণা করা হইয়াছে—এগুলি এখনও অসম্পূর্ণ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত (অর্থাৎ পরের পর সাজান হয় নাই) এবং কাগজের স্থানানুযায়ী প্রকাশিত অর্থাৎ অনেক প্রবন্ধ মূল রচনা হইতে অধিকাংশ পরিবর্জ্জিত, হ্রস্বীকরণকল্পে অসম্বদ্ধরূপে প্রকাশিত। এই পর্য্যায়ভুক্ত সমস্ত প্রবন্ধগুলির প্রকাশ ও বিশেষে তাহার শেষ আলোচনা ও নিষ্পত্তি না হওয়া [illegible] প্রতিবাদ করাটা শোভন নহে তবে সকলের হয়তো [illegible] নাই, অনেক নারী হয়ত তাঁহাদের সম্বন্ধে [illegible] ভিন্ন আর কোন কথা শুনিলেই প্রস্তুত [illegible] প্রতিবাদের আগমন অবশ্যম্ভাবী। তবে এ সময় হইতেই এইরূপ বাদ প্রতিবাদ করিতে হইলে মূল প্রবন্ধের স্থান পাওয়া দুষ্কর হয়। একেতো এ সম্বন্ধে মাত্র দুই পৃষ্ঠা ব্যতীত স্থান আমাকে দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এই প্রবন্ধগুলি অবতারণ করিবার আমার অবশ্য একটা উদ্দেশ্য আছে। মনে হয় দুএক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ও তৎকালীন বিজলী প্রভৃতি পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটা আন্দোলন চলিতেছিল পরে হঠাৎ জানি না কেন তাহা থামিয়া যায়। আন্দোলনকারিণীরা ছিলেন নারী এবং দুএকজন পুরুষ ও দুএকজন নারী তাহার প্রতিবাদ করিতেছিলেন। ঐ সময় হইতেই ঐ বিষয়টী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও নারী জাতির উন্নতিকল্পে এরূপ আলোচনা (আন্দোলন নহে—আলোচনা ও আন্দোলনে অনেক পার্থক্য আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আলোচনা হয় তাদের মধ্যে যারা সংযত হয়ে বিপরীত মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে যুক্তি দ্বারা তর্ক সমাধান করেন আর আন্দোলন সৃষ্টি করে দুচারজন তথাকথিত শিক্ষিত লোক বিশেষ কোন উদ্দেশ্য লইয়া এবং অধিকাংশ অবুঝ কিছুমাত্র না বুঝিয়া গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় তাহাতে গা ঢালিয়া দেয় তাহারা যুক্তিতর্কের ধার ধারে না তাহারা দাদার রায়ে রায় দিয়া যায়) আবশ্যক—কারণ সংযতভাবে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা না হইলে সত্যই বর্ত্তমান নারী সমাজের উন্নতি হওয়া সম্ভবপর নহে। তদবধি বিলাতী যৌন মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের কয়েকখানি পুস্তক পাঠ করিয়াছি (হয়ত বি, এ পাশ নয় বলিয়া তাহার সব কথা বুঝিতে না পারিয়া এই সব গণ্ডগোল বাধাইবার কারণ হইয়াছি) এবং দেশীয় গ্রন্থাদি যৎসামান্য যাহা পাইয়াছি তাহাও পাঠ করিয়াছি; কারণ যৌন মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিলাতী পুস্তকগুলি কষ্টপ্রাপ্য হইলেও পাওয়া যায়, দেশী বইগুলি অশ্লীল বলিয়া রাজতন্ত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইবার সুবিধা পায় নাই। তবে নরনারী সম্বন্ধে যে বহুতর পুস্তক এদেশে ছিল তাহা এ সম্বন্ধে যাঁহারা অনুশীলন করেন তাঁহারা উত্তমরূপে অবগত আছেন) এইগুলি পাঠকালীন আমি অনেক বিষয় ব্যস্তসমস্তভাবে টুকিয়া রাখিয়াছিলাম এবং তাহা নবযুগ সম্পাদকের দৃষ্টিগোচর হওয়াতে তিনি আমাকে ইহা

প্রকাশের সুযোগ দিয়াছিলেন—আমি অবশ্য রীতিমত সাহিত্যসেবী নই অর্থাৎ ইহা আমার পেশা নয় এবং এগুলিকে সুসম্বদ্ধ সুসজ্জিত ও সুসংস্কৃত করিয়া দিবার আমার সময় ছিল না এবং আকারঅনুযায়ী পরিবর্জ্জন করাতে অনেক সময় অনেক কথা সুস্পষ্ট না হইয়া বিপরীত অর্থেও প্রযুক্ত হইবার মত আকার ধারণ করিয়াছে। আমার প্রবন্ধটী যে যুক্তিতর্কহীন তাহা প্রমাণ কর্ত্তে শ্রদ্ধেয়া বলেছেন "লেখকটীর কথায় বুঝা যায় মেয়েদের অভাব অভিযোগ ঠিক করে দেবে পুরুষেরা—যেন পুরুষ তা জানেন—"ইত্যাদি তারপর তিনি এ ব্যাপারটাকে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিফর্ম্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমি লিখে-ছিলাম "নারীর অধিকার যে কোথা নেই—কিসে নাই তা বলতে পারি না—নেই বলে কে? কোন পুরুষে বলে কি?" ইহার অর্থ হচ্ছে তাঁদের অধিকার সর্ব্বত্রই আছে এবং কোন পুরুষে তা অস্বীকার করে না। এটা থেকে তিনি কি করে বুঝলেন যে মেয়েদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে পুরুষরাই সব ঠিক করে দেবেন এই আমার মত; অর্থাৎ তার মতে পুরুষদের পক্ষে এরূপ একটা কিছু করা যেন মহাপাতক এবং মেয়েরা নিজেরাই হচ্ছে যে তার যোগ্য-পক্ষ। উত্তম, "অধিকার" এবং "অভাব অভিযোগ" কথা দুটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন পুরুষেরা যদি তাঁদের সব বিষয়ে অধিকার মেনে নেন্‌ তাহলে এরকম অর্থ টেনে আনবার কি যুক্তি আছে আমি বুঝতে পার্‌লাম না। এই 'অধিকার' কথাটী তিনি ঠিক ভাবে না লওয়াতে এত গণ্ড-গোলের সৃষ্টি করে এমন একটা উপমা দিয়েছেন যা এখানে মোটেই খাপ্‌ খায় না। সুতরাং তাঁহার জিজ্ঞাস্য রাজনৈতিক প্রশ্নটীর উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। তারপর নারী নির্য্যাতন সম্বন্ধে আমি যা বলেছি তার উত্তরে তিনি বলেছেন যে বাড়ীর মেয়ে এমনি নির্য্যাতিত হয় সে বাড়ীর বা সে গ্রামের প্রতিবাসী পুরুষ তখন "কুনে বৌ" হয়ে পড়েন নাকি, তারা তখন ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হন না আর কিছু হয়ে পড়েন" এ সকল মন্তব্যগুলি নারীজনোচিত নহে এবং উত্তরে ঐ শ্রেণীর ভাষার প্রয়োগে আমি লেখিকার অমর্য্যাদা কর্ত্তে অক্ষম তবে প্রথম কথা হচ্ছে তিনি মেয়েদের নির্য্যাতিত বলে ধরে নিচ্ছেন আমি সেটা স্বীকার করি নাই এবং কাগজপত্রে এমন কিছু পড়ি নাই যাতে, সমস্ত নারীদের নির্য্যাতিতা মনে করবার কোন কারণ আছে। আর পুরুষদের সামনে এরকম ঘটতে পারে বলেও আমি বিশ্বাস করি না—কোন হিন্দু পুরুষ তার স্ত্রীকে চক্ষের সামনে নির্য্যাতিতা হতে দিতে পারে, তা বাঙালী পুরুষ যতই ভীরু হউক না কেন—আমার বিশ্বাস হয় না—এটা লেখিকার পুরুষের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার একটা চিহ্নমাত্র। তার পরই তিনি কয়েকটী কথা বলেছেন যা আমারই মা-বহিনের উল্লেখ করে; কোন শিক্ষিতা নারী শিক্ষার গর্ব্বে এত মদান্ধ হতে পারেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল না। এরকম কদর্য্য উক্তি এখন দেখছি যে কোন কোন নারীর মুখ দিয়েও বেরুতে পারে—তবে ঐ ভাবে আমি প্রত্যুত্তর দিতে অপারগ, কারণ লেখিকা নারী—আমি তাঁকে মাতৃস্থানীয়া মনে করি তিনি হয়ত নিজের মর্য্যাদা রাখতে জানেন না—তা বলে আমি কি তাঁর অমর্য্যাদা করিতে পারি। তারপর লেখিকা খুব জোর করে বলেছেন যে শিক্ষিতা মেয়েরা আজ অবধি নাকি নির্য্যাতিতা হন নাই এবং হলেও বদমায়েসদের মুখে জুতার বাড়ী মারতে জানেন। শিক্ষিতাদের নির্য্যাতিতা না হবার সৌভাগ্যটা যে কেবল তাঁদের জুতার বাড়ী মারবার ক্ষমতা থাকার জন্য তা বোধহয় ঠিক নয়। শিক্ষিতা মহিলারা, কোন খৃষ্টান বা ব্রাহ্মমেয়েরা লাঞ্ছিতা কেন হয়েন নাই তার কারণ আমি পূর্ব্বেই বলেছি এবং আরও বলি যে কোন ধনীর পুরস্ত্রীও লাঞ্ছিত হন নাই, হয়েছে যারা দরিদ্র—এই লাঞ্ছনার কারণ শিক্ষার অভাব জনিত নয় এটা হচ্ছে তাঁরা সুরক্ষিত—দরিদ্রের পত্নী ও কন্যা অরক্ষিত বলে। সাধারণতঃ ধনী গৃহের গৃহলক্ষ্মী সুরক্ষিত থাকেন বলে, যে সব গুণ্ডা বদমায়েস এরূপ অত্যাচার করে বেড়ায় তাদের লক্ষ্যীভূত হন না। ঈশ্বর না করুন এরূপ হলে তাঁরা কতটা সাহসের পরিচয় দিতে পার্ব্বেন তাহা কার্য্যক্ষেত্রে খুব সন্দেহজনক। কয়েকদিন পূর্ব্বে দৈনিক বসুমতীতে এরূপ একটী ঘটনা পড়েছি বলে মনে হয় ইডেন গার্ডেনে একটী মহিলা বেড়াতে গিয়া এক শ্বেতাঙ্গ সৈনিক কর্ত্তৃক এইরূপ ভাবেই আক্রান্ত হন তখন তিনি চীৎকার করায় বেশী কিছু কর্ত্তে পারেন নি; দুটী বাঙালী যুবক তা

শুনে এসে গোরাটাকে উত্তমমধ্যম দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন—এরও কিছুদিন আগে শিয়ালদহ ষ্টেশনে এইরূপই আর একটী ঘটনা ঘটে তাতেও একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক গিয়ে আক্রান্তা মহিলার সম্মান রক্ষা করেন। মহিলাদের আত্মরক্ষায় অসামর্থ্যতার জন্ম আমি অনুযোগ করি নাই—আমি বলেছি পূর্ব্বকালে অশিক্ষিতা নারীদের মধ্যে যে তেজ-টুকু ছিল আজকাল সেটা কমে গিয়েছে এবং সে কথাটাতে বিশিষ্টভাবে শিক্ষিতাদের সম্বন্ধে বলি নাই। এর কারণ শুধু মনের ও দেহের শক্তির অভাব এটা বলবার উদ্দেশ্য নারী-দের মধ্যে গৃহের মধ্যে সহজ ব্যায়াম করার কথা বলা—এবং তদুদ্দেশ্যে আমি "নারীর ব্যায়াম" শীর্ষক একটী সচিত্র প্রবন্ধ রচনা করেছি যাহা পাঠ করিলে পুরস্ত্রীগণও স্বগৃহে শরীরকে ও সঙ্গে সঙ্গে মনকে সবল কর্ত্তে পার্বেন। সে প্রবন্ধটী এই সংখ্যায়ই প্রকাশিত হত কিন্তু এই প্রতিবাদ-গুলির উত্তর দিতে অনেকটা স্থান অধিকৃত হওয়ায় তাহা হইল না—উহা আগামী পূজার বিশিষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। কোন বিষয়ের আলোচনা করতে বসলে তার ভালমন্দ দুদিক নিয়েই করা হচ্ছে প্রথা এবং নারীদের সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেই যদি তাঁরা এরূপ অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন যাতে যুক্তি তর্ক হারিয়ে কেবল গলাবাজী ও গালিবাজী কর্ত্তে হয় তবে কোন কথা বলাই বড় কঠিন হয়ে পড়ে। আমার মতের সঙ্গে সকলেরই যে মতের মিল হবে এ দুরাশা আমি রাখি না তবে প্রতিবাদের মাঝেও আমি একটু ভদ্রতা প্রত্যাশা করি—আমায় গালি দিলে যদি তাঁর ক্ষোভ মিটে তবে আমি সসম্মানে সে গালি মাথা পাতিয়া লইব। তবে শেষ পর্য্যন্ত দেখে মতামত দিলে তাঁদের ও আমার উভয় পক্ষের সুবিধা হয়। তারপর তিনি লিখেছেন লেখকের মনে হয় যে পুরুষেরা নাকি সদাই মেয়েদের ভয়ে সন্ত্রস্ত আছেন জানি না তিনি এসব ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন যে নারী পুরুষকে জয় করে চলেছে তার একটা প্রমাণ তিনি দিতে পারেন কি ?" এটা সত্য বলে এখনও আমার বিশ্বাস এবং স্ত্রীর ভয়ে সন্ত্রস্ত পুরুষ জীবনে আমি যথেষ্ট দেখেছি। লেখিকার যে দেখবার সুযোগ হয় নি একথা আমিও বিশ্বাস কর্ত্তে পারি না তবে এর প্রমাণ দিতে যাওয়া এবং পাওয়া দুটোই সমান বিপজ্জনক। যাঁদের নাম প্রকাশ কর্ব্ব তাঁরা আমার উপর অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন না এর অভাব বাংলাদেশে নাই একথা আমি এখনও জোর গলায় বলছি। সব জিনিষই অবশ্য প্রমাণ সাপেক্ষ নয়, স্ত্রৈণ পুরুষ দেখবার সুযোগ যে লেখিকার হয় নাই তাঁহার উচিত নরনারী চরিত্র কিছুদিন অধ্যয়ন করা নতুবা এ রকম বাজে তর্ক করে কোন লাভ হওয়া সম্ভবপর নহে। প্রতিবাদকারিণী বলেছেন" লেখকটী যে সমাজের বা যে সার্কেলের সে সমাজ বা সে সার্কেলের মেয়েরা এভাবে বাহির হয় নাই ⋯ তারা" লেখিকা কি করে জানলেন যে খৃষ্টান বা ব্রাহ্মসমাজে বেশ্যাশক্ত, মদ্যপায়ী স্বামী নাই এবং তারা কঠোর শাসনে স্ত্রীকে দাবিয়ে রাখে না—অত্যাচারী, বিবেকহীন বা কামাসক্ত পুরুষ সর্ব্বজাতিতে ও সর্ব্বসম্প্রদায়েই আছে শিক্ষিতের মধ্যেও আছে অশিক্ষিতের মধ্যেও আছে। তারপর তিনি আমাকে পঞ্চম জর্জ্জের সঙ্গে তুলনা করেছেন (তাঁর মুখে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক) "ভিক্ষায় বা রক্তচক্ষু দেখাইয়া⋯⋯" একথাটী সার্ব্বজনীন সত্য এবং যদিও ইহা আমি কেবল নারীদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রয়োগ করি নাই—করিলেও ইহা সত্য এবং অসম্মানকর নহে। তারপর লেখিকা বলেছেন—"তিনি তাঁর মা বোনকে⋯⋯শ্রদ্ধা" এসম্বন্ধে প্রেমে পড়ে যাওয়া বা আমার নিজের মা বহিনের কথা তুলিয়া লেখিকা যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সেগুলি তাঁর নিজের কল্পনা-প্রসূত সম্পূর্ণ "বাইরের অপরিচিত লোক" কথা কয়েকটী তিনি লক্ষ্য করেন নাই— বেশী রাগ হলে এরকম হয়েই থাকে যেখানে স্বামী বা আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিচিত লোকের সঙ্গে তাঁরা আলাপ করেন সেখানে আপত্তির কথা বলি নাই তবে আমি যে আপত্তির কথা তুলেছি সেটা বিলাতে চলে বলে এদেশেও যে চলতে পার্ব্বে তা মনে করি না এবং লেখিকা তার বিরুদ্ধে কোন যুক্তি না দিয়ে কেবল গালিই দিয়া-ছেন—গালি আর সমালোচনা বা প্রতিবাদ এক পদার্থ নহে। তারপরই তিনি সম্পাদক মহাশয়কেও একটু কড়কে নিয়েছেন এবং সাহস থাকলে বোধহয় গালিও দিতেন তবে তিনি সম্পাদক বলেই—বোধহয় এ যাত্রা বেঁচে গেলেন তার পরেই আমার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন "যে লোকটা" ইত্যাদি, এটা প্রতিবাদ করিবার একটা

নূতন ভঙ্গী এবং অপূর্ব্ব ভদ্রতা এবং শিক্ষিতার কতদূর যোগ্য তা আমি জানি না। তারপর তিনি লিখেছেন—"লেখকটী কোনদিন যে"—আমি শিক্ষিতা সমাজে মিশেছি কিনা—সেটা প্রবন্ধের বিবেচ্য নহে এবং ধরুন যদি নাই মিশে থাকি তাহলেও শিক্ষিতার লেখনীর এই অপূর্ব্ব ভদ্রতার নমুনা দেখে মেশবার ইচ্ছাটা যে তিরোহিত হয়ে যাবে সেটা স্বাভাবিক। শিক্ষিতা সমাজের যে দোষ ক্রটী একেবারেই নাই তা নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে না। "চাঁদমুখের জয় সর্ব্বত্র" কথাটী আমার নিজস্ব নহে, এটী শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমবাবুর এবং ওকালতী ডাক্তারী বা প্রফেসারীর কথাটা ঐ কথাটীর প্রসঙ্গক্রমে উক্ত হইয়াছে—এর সঙ্গে লেখিকার যুক্তির কোন সামঞ্জস্য নাই। "আমরা লেখককে জানাচ্ছি ইত্যাদি"—লেখিকা সম্ভবতঃ জানেন না যে একবার প্রেসিডেন্সী কলেজে এইরূপ দুটী নারী ছাত্র অধ্যয়ন করিতে যাওয়ায় কত গণ্ডগোল বাধিয়াছিল এবং তখন হইতেই পুরুষ ছাত্র ও নারী ছাত্র শিক্ষার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র হয়। মেডিকেল কলেজে ছাত্রীদের নৈতিক অধঃপতনের অনেক দৃষ্টান্ত আছে তবে ব্যক্তিগত ভাবে নাম ধাম বলিয়া সে সকল উল্লেখ করা যায় না—ভাল যে কেহ নাই এককথাও বলি না তবে অধিকাংশ স্থলে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই বলিয়াছি এবং লেখিকার মনোমত না হইলেও সত্য; এবং নবযুগের পাঠকগণের অনেকে এইশ্রেণীর ঘটনার অস্তিত্ব জ্ঞাত থাকিতে পারেন। তারপর নারীর প্রতি শ্রদ্ধার কথা তুলে তিনি বলেছেন যে লেখক অনভিজ্ঞ এমন কি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্লোকটী উদ্ধৃত করাতে তাঁর আপত্তি রয়েছে। তিনি লিখেছেন লেখক প্রাচীন গ্রন্থ পড়ে লেখক "মা বোনকে…… ..." এটা তিনি আমার লেখা থেকে প্রমাণ কর্ত্তে পারেননি অনুমান করেছেন মাত্র তারপর তিনি আমাকে ভীরু ও কাপুরুষ বলে অনেকটা রাগ সামলে নিয়ে বলেছেন "তাঁকে শিক্ষা দিতে পারে এমন অনেক মেয়ে বাংলা দেশে যথেষ্ট আছে।"—একথা আমি অস্বীকার করি না কারণ তাঁর প্রবন্ধ থেকেই কয়েকটী নূতন কথা আমি শিখ্‌বার সুযোগ পেয়েছি—যথা নাম দেয় (নামধেয়) নির্জ্জাতন (নির্য্যাতন) লাঞ্চিত (লাঞ্ছিত) লক্ষ (লক্ষ্য) অপক্ষপাতি (অপক্ষপাতী) এসব জিনিষ প্রবন্ধে না থাকিলে তা যে বটতলার প্রবন্ধ হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রতিবাদকারিণীকে আমার সবিনয় নিবেদন ভবিষ্যতে তিনি যে নারীজাতিকে মাতৃজাতি মনে করেন প্রতিবাদকালীন পুরুষদিগের প্রতি সেই মাতৃজাতিযোগ্য সংযত ভাষা, যুক্তি ও বিচার প্রয়োগ কর্ব্বেন। সম্মান এক তরফা জিনিষ নয় অপরকে অসম্মান করে তাদের কাছে সব সময় সম্মান প্রত্যাশা করা যায় না। ক্রোধের বেগ মন্দীভূত হলে ধীর চিত্তে প্রতিবাদ কর্ত্তে হয় কারণ গালিগালাজ দ্বারা কোন মতের প্রতিষ্ঠা হয় না।

পুরুষ—
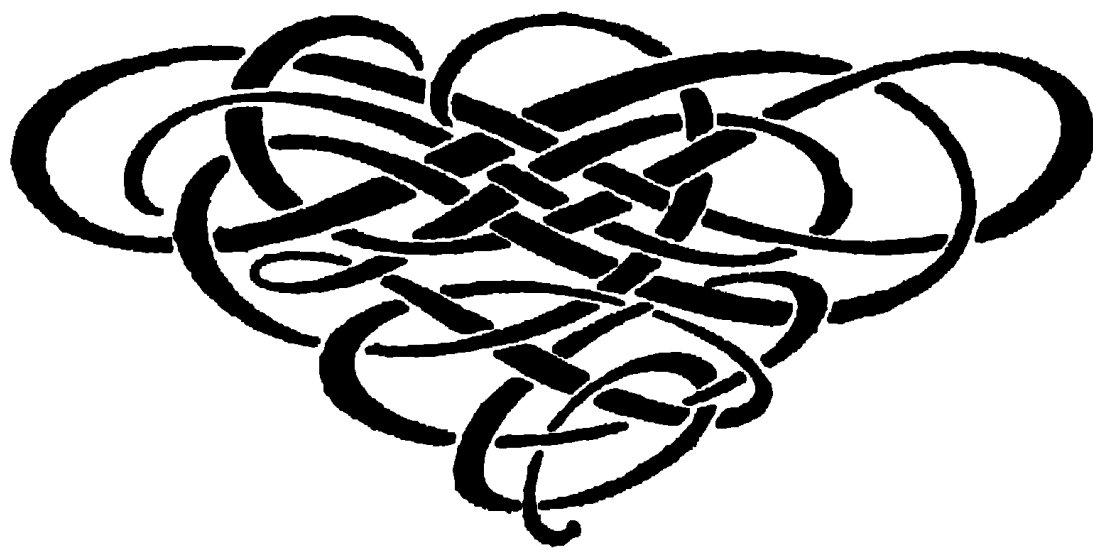
মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা

প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩১। আমাদের দেশের অতিকায় মাসিকপত্রদের মধ্যে একটা ভয়ানক পাল্লা চলেছে, ছবি দেওয়া নিয়ে। প্রবাসী, ভারতবর্ষ আর মাসিক বসুমতী যেরকম ভাবে ছবি ছাপ্‌তে আরম্ভ করেছেন তাতে ছোট-খাটো কাগজের পক্ষে টিঁকে দাঁড়ানই এক প্রকার অসম্ভব। এমাসের প্রবাসীতে মোট চারখানি বড় রঙিন ছবি আছে, তার মধ্যে দুখানি তিন রংয়ের আর দুখানি এক রংয়ের।

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের দুটী কবিতা। প্রথমটী বধূমঙ্গল, অনেকটা আমাদের বাঙ্গালা দেশের বিয়ের কবিতার মত। এতে রবীন্দ্রনাথের ছাপ কেবল শেষের চরণে পাওয়া যায়।

"তব আঁখি পল্লবে
দিনু আঁখি বল্লভে
গগনের নব নীল স্বপনের অঞ্জন"

শেষের কবিতাটি রবীন্দ্রনাথেরই মত, ছোট হলেও সুন্দর ঝরঝরে'

"তবু তৃষায় মরে আঁখি
তোমার লাগি চেয়ে থাকি
বুকের পরে পাব না কি
চোখের পরে নাই বলে"

এই জাতীয় কবিতাই রবীন্দ্রনাথকে অমর করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষের "গৌতমের সাধনা ও সিদ্ধি" অখাদ্য ও অপাঠ্য। লেখক হয়ত জানেন কিন্তু তাঁর অন্তরের জ্ঞান বাইরের লোককে বুঝিয়ে দেবার শক্তি তাঁর একেবারেই নেই। যেভাবে তিনি বইখানা লিখ্‌ছেন তা' লেখার দোষে এবং সাজানর দোষে কখনই ভাল হতে পারবে না। শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়ের "আর্টে ধর্ম্ম ও নীতির স্থান" প্রবন্ধটী মন্দ নয়। শিল্পের সৌন্দর্য্য আ[illegible] যথেষ্ট দে[illegible] বীভৎস, শান্ত ও স্থির চার রকম হতে পারে, একথা আমি[illegible] দিক দিয়ে স্থির ও শান্ত সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি দিতে যাওয়া [illegible]ছেন। এই লেখকের কথা কিন্তু এখনকার-[illegible]ত চিত্রকর বা শিল্পপ্রেমিকের একেবারেই মনঃপূত হবে না। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শিল্প-প্রেমটা অসভ্য বর্ব্বরের শিল্প প্রেমই থেকে যাবে, কারণ অবনীন্দ্রনাথের শিল্পায়তনের প্রচেষ্টা অর্দ্ধশিক্ষিত দেশী সমাজের রিরংসার বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। শ্রীযুক্তজুড়নজীবন মুখোপাধ্যায়ের "নিষ্কণ্টক" গল্পটী মন্দ নয়, তবে শেষের দিকটা বড় তাড়াতাড়ি শেষ করা হয়েছে। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "দৃষ্টিহীনের আহ্বান ও অনুরোধ" অন্ধ বালকদের শিক্ষার জন্য চাঁদার দরখাস্ত। উদ্দেশ্যটী ভাল কিন্তু দেশের লোকের পেটে যখন অন্নের অভাব তখন চাঁদা উঠ্‌বে কি না সন্দেহ। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "রোমান্স" গল্পটী ভাবে ও ভাষায় অদ্ভুত। লেখক বোধহয় ভাল ইংরেজী জানেন কিন্তু বাংলা লিখ্‌তে এখনও শেখেন নি। গল্পের Plotটি অসাধারণ। আমার এক বন্ধু দশ বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়িকা ৺পান্নাসুন্দরীর গলার আওয়াজে মুগ্ধ হয়ে সদর থেকে অন্দরে ছুটে গিয়েছিলেন কিন্তু পান্নাময়ী দাসীর চেহারা দেখে ভয়ে আর আতঙ্কে তাঁর মূর্চ্ছা হবার উপক্রম হয়েছিল। এ গল্পের Plotটি ও ঠিক তাই। নায়ক মুকুলিকা দেবীর কবিতা পড়ে মনে করেছিলেন যে তিনি "মুকুলিকা বালিকাবয়সা অনন্তযৌবনা উর্ব্বশী" কিন্তু গিয়ে দেখ্‌লেন যে মুকুলিকা ঘোর কালো পঁয়তাল্লিশ বছরের বুড়ী। যেমন Plot তেমনি ভাষা।

"একি কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনব্যাপী দর-বিগলিত অশ্রু, না এই থমকে-থাকা অশ্রু?" প্রবাসীর কি গল্প জোটে না? এমন গল্প ছাপা বন্ধ করলেও প্রবাসীর কোন ক্ষতি হবে না। শ্রীরমেন্দু দত্তের "শাওনের ধারা" কবিতাটি ছোট হলেও মন্দ নয়। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "কারাগারে" গল্পটি Fantasia শ্রেণীর, এই জাতীয় ভাব বাংলা ভাষায় ও বাংলাদেশে একেবারেই খাপ খায় না। শ্রীমণীন্দ্রলাল বসুর "ফাঁকি" গল্পটী কেবল লেখকের শক্তির অভাবের পরিচয় দিচ্ছে, লেখক এমন করুণ বিষয়টী নিজের শক্তির

অভাবে শ্রীউৎস করে তুলেছেন। শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তের "বর্ষ" নামক কবিতাটি বাংলার অমিত্রাক্ষরের গুরু মাইকেল মধুসূদনের মস্তক চর্ব্বণ, যুক্ত মিত্রাক্ষর-ছন্দে অমিত্রাক্ষরের অনুপ্রাসীন অন্ধ অনুকরণ এখন কি আর চলে? অধ্যাপক শ্রীযুক্তবিনয়কুমার সরকার এক পয়সার পোষ্টকার্ড দিয়ে "সুইস্ নরনারীর ধরণ ধারণ" নামে এ মাসের প্রবাসীর পনের পৃষ্ঠা অধিকার করেছেন। প্রবন্ধটা না লিখ্‌লেই ভাল হত, নেহাৎ যদি লিখ্‌লেন তাহলে অনুগ্রহ করে কখানা ভাল ছবি পাঠালেও পারতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ "কবি-প্রশস্তি" নাম দিয়ে অতি প্রশস্ত রবীন্দ্রনাথের চিনাবতার সূত্র রচনা করেছেন। কবিতাটির নাম সন্ধ্যাকর নন্দীর "আত্মপরিচয়" থেকে চুরি করা, কিন্তু কবিতা একেবারে ঐতিহাসিকের কবিতা অর্থাৎ পাষাণ। শ্রীযুক্ত প্রভাত সান্যালের "শিশির মেলা" প্রবন্ধটী ভাল কিন্তু নেহাৎ ছোট। বিনয় কুমারের "সুইস্ নরনারী" বাদ দিয়ে এইটাকে একটু ভাল করে লেখালে প্রবাসীর উন্নতি হত।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অলফঁস্‌দোদের একটী ছোট গল্প অনুবাদ করেছেন। সুন্দর হয়েছে। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়ের "অহিফেন ব্যবসায়ী ব্রিটিশ বাজ" নামক সুদীর্ঘ সন্দর্ভটি প্রবাসীর যোগ্য হয়েছে, খ্রীষ্টান মিশনারী ও খ্রীষ্টান বণিকের মন্ত্রশিষ্য খ্রীষ্টান রাজা এই রকম করেই প্রজার মঙ্গল সাধন করে থাকেন। চীনাগুলিখোর চোখ খুলেছে কিন্তু আমাদের চোখ খোলবার ইচ্ছা থাকলেও শক্তি নেই;—"সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়—"বেনামা লেখকের "আমাদের কার্য্যকরী শিক্ষা" অত্যন্ত ছোট অচিন্তিত প্রবন্ধ। বোধ হয় প্রবাসীর পাতা ভরাবার জন্যে লেখা। শ্রীপুলিন বিহারী দাস এইবার লাঠিখেলা ছেড়ে ছুরিখেলা ধরেছেন, প্রবন্ধটী ক্রমশঃ প্রকাশ্য, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী "মেকের ডাক" নামক কবিতাটিতে নূতন ধরণের হেঁয়ালী সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু রাবীন্দ্রিক হেঁয়ালীর জন্যে যতটা ভাষার উপরে দখলের প্রয়োজন তা তাঁর নেই। আর দুটো বড় বড় অতিকায় মাসিকের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতেও প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় যে একখানার বেশী ক্রমশঃ উপন্যাস ছাপেন না সেটা তাঁর সুরুচির পরিচয়। শ্রীমতী দেবীর "মহিলার প্রগতি ও শ্রীগোলাম মোস্তফার "নূতন চন্দ" উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধ নয়। দেশ বিদেশের কথার মধ্যে ৬৮৩ আর ৬৮৫ পাতের ছবির টাইটল দুটী উল্টে গেছে। কাবেরী নদীর ভাঙ্গা পুলের তলায় লেখা আছে "লোকমান্য তিলক মহোদয়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার উৎসব" শ্রীহীন চারুর অভাবে প্রবাসী কিন্তু ক্রমশঃ শ্রীহীন হয়ে পড়েছে।

শ্রীবজ্রাঙ্কুশ

মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া

পত্রিকার সার সঙ্কলন

(প্রতি সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে)

সঙ্কলয়িতা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এস,সি

অসহযোগ অপেক্ষা অহিংসা নীতি বেশী কার্য্যকরী, অহিংস না হইয়া অসহযোগ করিলে পাপ হয়। এখন আন্দোলনের আড়ালে কি ব্যাপার চলিতেছে তাহা অনেকেই জানেন না, তাই এখন "ক্ষেত্রকর্ম্ম, বিধীয়তে" নীতির প্রবর্ত্তন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমাদের নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। প্রত্যেক বিভিন্ন দল বিভিন্ন কার্য্যবিবরণী অনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহাদের দল সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে স্বরাজের পথে চালিত করিবে, ফলে গবর্ণমেণ্টের সহিত না হউক নিজেদের মধ্যে অসহযোগ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘরোয়া বিবাদে নিজেদের পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছি। অসহযোগ অহিংস হইয়া পাশবিক শক্তি দমন করিবে ইহাই আমাদের ইচ্ছা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, অসহযোগ এখনও অহিংস হয় নাই সেইজন্যই আজ আমরা ব্যর্থকাম; এবং যদি এখনও সাবধান না হই তাহা হইলে সেই ব্যর্থ শক্তি আজ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আমাদের ধ্বংস করিবে। আমার নিজের পাঁচটী বর্জ্জন বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস আছে কিন্তু সেইগুলির যে আজ পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা আমি বেশ অনুভব করিতেছি—আমরা যতক্ষণ বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত ততক্ষণ আমাদের শত্রু শক্তি সঞ্চয়ে সচেষ্ট। সেইজন্য আমি প্রস্তাব করি যে, সকল রাজনৈতিক দল যে বিষয়ে সকলেই এক মত সেই বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া সকলে একত্রিত শক্তি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া। সুতরাং অতঃপর কেবল মাত্র বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন বহাল রহিল অন্যান্য বিষয় গুলি মুলতবী রহিল; ইহা কেবল আভ্যন্তরীণ শক্তি বর্দ্ধনের জন্য করা হইল। ভিতরে দৃঢ় না হইয়া বাহিরের কার্য্য করিতে গিয়াই আজ অহিংস নীতির পরাজয়। আমরা আমাদের অশিক্ষিত দেশবাসীর প্রতিনিধি স্বরূপ; অথচ তাহারা রাজনীতির কোন ধার ধারে না নিজেদের অন্ন চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত, কি করিয়া দুবেলা দুমুঠা মুখে দিবে তাই ভাবিয়াই তাহারা আকুল। তাহাদের দুর্দ্দশা চোখে না দেখিয়া কেবল শোনা কথায় জোর দিয়া একটা আন্দোলন চলে না, যদি কথা মত কার্য্য করিতে হয় তবে তাহাদের সহিত কিছুদিন বাস করিয়া, নিজের হৃদয় দিয়া তাহাদের দুঃখ অনুভব করিয়া তবে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করা এবং দুঃখ দূর করা, তাহাদিগকে অহিংস অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত করা খুবই সম্ভব; কিন্তু শুধু কথায় কাজ আর হইবে না। হিন্দু মুসলমান বিরোধের মীমাংসা এক সমস্যা হইয়াছে অথচ এই বিরোধ না মিটিলে আমাদের কার্য্যে সফলকাম হওয়া দুষ্কর।—

উপরোক্ত বিষয়ে আমার প্রস্তাব এই—

(১) পাঁচটী গৃহীত বর্জ্জনের মধ্যে এখন বিদেশী বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্যগুলি মকুব করা হউক।

(২) কংগ্রেস কর্ম্মীগণ এখন হইতে খদ্দর প্রচলনে সচেষ্ট হউন এবং চরকা প্রচলন করুন।

(৩) দেশীয় বিদ্যামন্দির ও কলাপীঠগুলিকে কংগ্রেস

সাহায্য করুন এবং যাহাতে সরকারের সংস্রব বর্জ্জিত হয় তাহাই করুন।

সদস্যগণের নিকট চারি আনা ধার্য্য চাঁদা গ্রহণ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে স্বহস্তে প্রস্তুত ৪০০০ হস্ত পরিমিত সুতা আদায় করা হউক এবং দরিদ্র সদস্যকে বিনামূল্যে তূলা প্রাদেশিক সমিতি দিবার ব্যবস্থা করুন।

কংগ্রেসের এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক কারণ কংগ্রেসের বর্ত্তমান গঠন প্রণালীর জন্য আমার অধিক দায়ীত্ব আছে। ইহাকে সম্পূর্ণভাবে গণতন্ত্র মূলক করিয়া গঠন করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু উত্তম সৎ কর্ম্মীর অভাবে ইহা নির্দ্দোষ ভাবে পরিচালিত হয় নাই। ইহা উদ্দেশ্যের অনুবর্ত্তী না হইয়া বিরুদ্ধভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিলেও অন্যায় হয় না। এক কোটী সভ্য কংগ্রেসে এ যাবৎ হয় নাই—ঊর্দ্ধ সংখ্যায় দুইলক্ষ সভ্যের বেশী আমরা পাই নাই এবং এই দুই লক্ষ সভ্যের মধ্যে অধিকাংশই কেবল চারি আনা চাঁদা ও ভোট দেওয়া ব্যতীত কংগ্রেসের কার্য্যে বিশেষ কোন সহানুভূতি দেখান নাই। এরূপ মাথা গুণতি সভ্যের দ্বারা কোন কার্য্যই কৃত-কার্য্য হয় না। আমরা সত্যই চাই একটী সত্যই কার্য্যকরী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান যাহার সভ্যের মধ্যে অনৈক্য থাকিবে না—যাঁহারা সকলে সমভাবে উৎসাহী ও প্রকৃত কর্ম্মী হইবেন—এইরূপ প্রকৃত কার্য্যক্ষম সভ্য সংখ্যায় অল্পই হইলেও কোন ক্ষতি নাই। বর্জ্জন সম্বন্ধে একমাত্র বিদেশী বস্ত্র পরিবর্জ্জনই বর্ত্তমানে বহাল রহিল এবং এই বর্জ্জন সার্থক হইতে পারে যদি আমরা প্রকৃতই কংগ্রেসটাকে একটী বিরাট্ সুতা বুনিবার কেন্দ্র করিয়া গড়িতে পারি। খদ্দরকে জাতীয় কৃতকার্য্যতার চিহ্ন স্বরূপ করিতে হইলে চরকাই তাহার একমাত্র পথ। গণ জনের মধ্যে জাতীয় ভাব জাগাইতে, দেশের দারিদ্র্য সম্পূর্ণ ভাবে দূর করিবার জন্য চরকাই একমাত্র পন্থা।

আমার প্রস্তাবটী সংক্ষেপে এইরূপ :—

১। কংগ্রেস বা পরিবর্ত্তন বিরোধীদের দ্বারা স্বরাজ্যদল কোন বাধা না পাইয়া নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিতে পাইবেন।

২। অন্যান্য রাজনৈতিক মতাবলম্বীদিগকেও কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে ও অনুরোধ করিতে হইবে।

৩। পরিবর্ত্তন-বিরোধীগণ কাউন্সিল প্রবেশ ব্যাপারে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে কোন বাধা দিতে পারিবেন না।

৪। যাঁহারা চতুর্ব্বিধ বর্জ্জনে আস্থাবান নহেন তাঁহারাও কংগ্রেসে যোগদান করিবেন এবং এই বর্জ্জন জন্য কোন অসুবিধা ভোগ করিবেন না সুতরাং আদালত-গামী উকীল, পদবীধারী ব্যক্তিগণ, স্কুলের শিক্ষকগণ সকলেই অতঃপর কংগ্রেসে যোগদান করিয়া স্ব স্ব সাধ্যানু-সারে দেশহিতে আত্ম নিয়োগ করিতে পারিবেন।

কাজের কথা
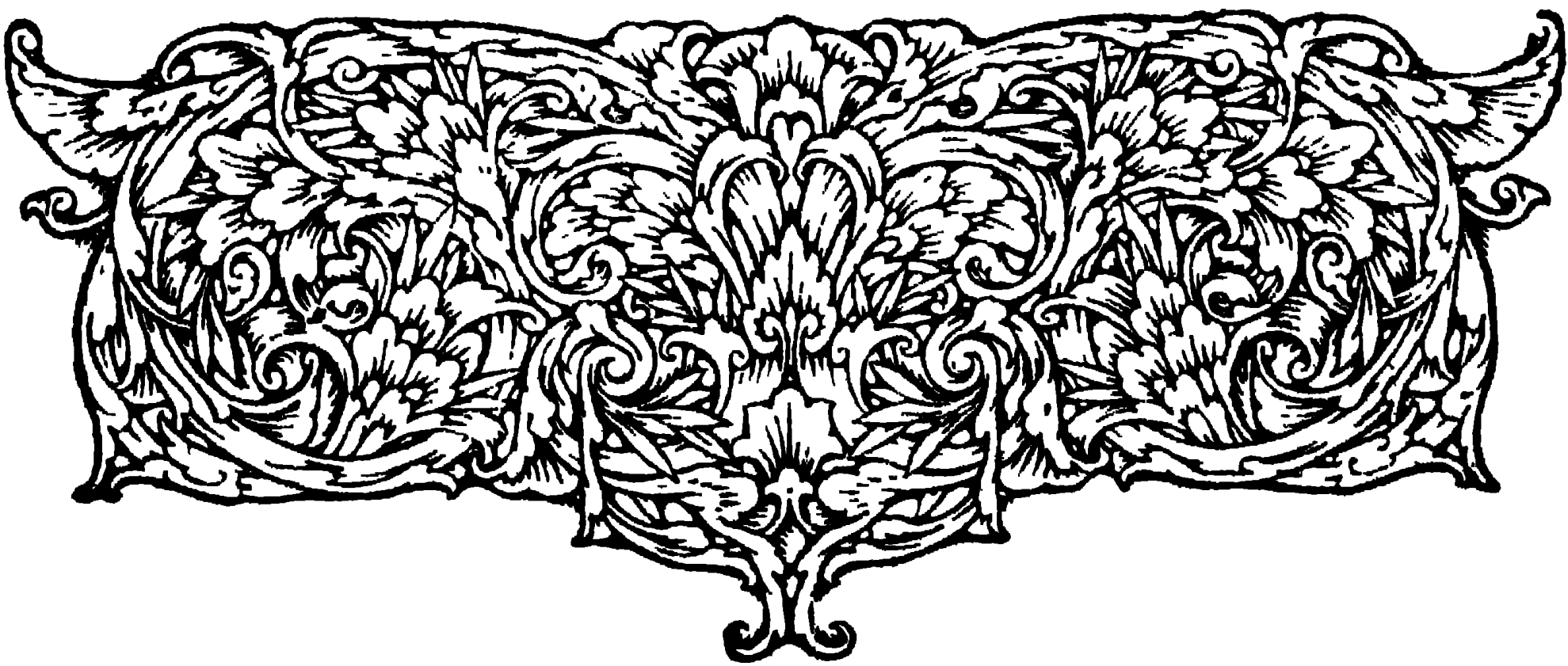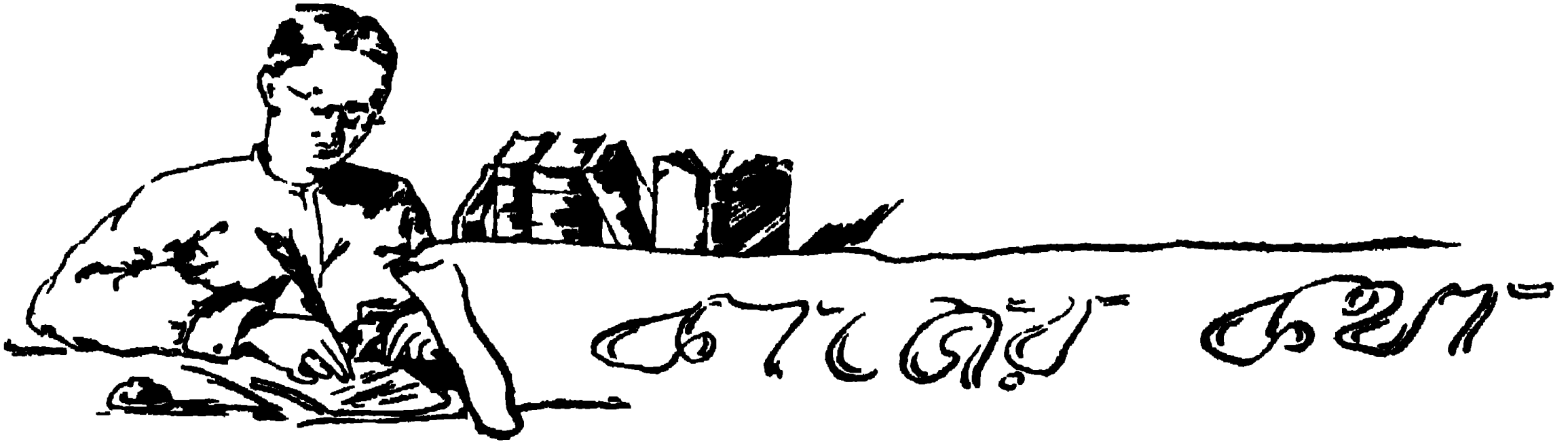
ভুপেন্দ্রনাথ পরলোক—গত মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে বাংলার জাতীয় জীবন হইতে আরও একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে। প্রিয়দর্শন সৌম্যকান্তি বাংলার ভুপেন্দ্রনাথ বসু আর নাই। অর্দ্ধ শতাব্দী কাল দেশের ও দশের উপর ইহার অসামান্য প্রভাব ছিল। বাঙ্গালী হইয়াও যাঁহারা নিখিল ভারতে ও ভারতের বাহিরে খ্যাতিমান হইয়াছিলেন ভুপেন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই অন্যতম। বাংলার দুর্ভাগ্য যেমন মানুষ যাইতেছে তেমন আর আসিতেছে না। কংগ্রেস, কনফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট রূপে, শাসন পরিষদে, ভারত সচিবের মন্ত্রণাগারে সর্ব্বত্র তিনি দেশসেবকরূপেই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। নাম ও খ্যাতির মোহ অপেক্ষা নিজ স্বাধীন মতকেই ভুপেন্দ্রনাথ বরাবর প্রাধান্য দিয়া আসিয়াছেন। বুদ্ধিমত্তায় ও কৌশলে ভুপেন্দ্রনাথ অপারাজেয় ছিলেন। আমরা জীবন-পথে চলিবার কত বড় একজন মানুষ হারাইলাম ভুপেন্দ্রনাথকে হারাইয়া তাহাই ভাবিতেছি। ভুপেন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বজনকে নবযুগ তাহার সমবেদনা জানাইতেছে।

মহাত্মার পথ—মহাত্মা গান্ধীর নূতন কার্য্যধারা বাহির হইয়াছে। কংগ্রেস সভ্য যাহারা হইবেন।০ আনা চাঁদার স্থলে তাঁহাদের দু'হাজার গজ চরকা কাটা সুতো দিতে হইবে। নিখিল ভারতের বিরাট জনসঙ্ঘের যোগসূত্র চরকার সূত্রে বাঁধিতে পারিবে কি? শ্রীযুক্তা বেশান্ত, শাস্ত্রী, জয়াকর সকলেই চরকা কাটিতেছেন। বড় ছোট, ধনী নির্ধন সকলেরই ইহাতে সমান অধিকার আছে। জাতীয় জীবনে ও দেশ জীবনে অধিকার লাভের যোগ্যতা দেশবাসীকে দেখাইতে হইবে—তবে আকা[illegible]সাধারণের স্বরাজ মিলিবে—এই কি পথ?

তারকেশ্বরের আপোষ পর্দ্দার আড়ালে কেন?—তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের একটা আপোষের কথা চলিয়াছে—গত সপ্তাহে আমরা এ সংবাদ দিয়াছি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে মোহান্তের আপোষ মিটমাটের কথার গুজব রটিবার পর হইতে নানা সংবাদ পত্রে ও দেশবাসীর মুখে মুখে সত্যাগ্রহের রফা বন্দোবস্ত লইয়া নানা কথা চলিতেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সংবাদ-পত্রে সত্যাগ্রহের রফা সম্বন্ধে যতটুকু যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেশবাসী সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। সন্তুষ্ট না হইবার কারণ আছে—সত্যাগ্রহ গোপনে কাহারও মুখ চাহিয়া আরম্ভ করা হয় নাই। এই তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের জন্যই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একাধিকবার নিজ প্রাণ দিবেন বলিয়াছেন—তাহা সঙ্গোপনে বলা হয় নাই—প্রকাশ্যভাবে সত্যাগ্রহের নামে তিনি এই ঘোষণা করিয়া দেশবাসীকে সত্যাগ্রহে যোগ দিতে আহ্বান করিয়াছেন। এ সবই প্রকাশ্য ভাবে হইয়াছে—সব প্রকাশ্য ভাবে হইয়া তবে আপোষের কথার বেলায়ই বা এত গোপনতা আসে কেন? এসব প্রকাশ্য কার্য্যে এত গোপনতার আবরণ দেখিলে লোকের মনে নানা সন্দেহ জাগে। এ সন্দেহ আর বেশী বাড়িতে দেওয়া দেশবন্ধুর ভাল হইতেছে কি?

সত্যাগ্রহ চালান অসম্ভব বলিয়া কি আপোষ প্রস্তাব?—সত্যাগ্রহ এতদিন চালাইয়া যে জন্য সত্যাগ্রহ করা তাহার মূল কারণ যদি দূর না হয় এবং সেইজন্যই যদি অনাচারী মোহান্ত-চেলাকে রাজগীর ভার পূর্ব্বের মত সমর্পণ করিয়া সরিয়া আসার ব্যবস্থা হয় তবে দেশবাসীকে সে সম্বন্ধে সকল কথা সকল অবস্থা বিশদভাবে জানান কর্ত্তব্য। যে তীর্থক্ষেত্রের অনাচার নিবারণের জন্য চিত্তরঞ্জনের প্রাণ দিবার

প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা সামান্য নহে। তাহার আপোষে কোনরূপ গুপ্তভাব রাখিবার প্রয়োজন আমরা বোধ করি না। দেশবন্ধু তাহার কথামত প্রাণ দিবার জন্য অগ্রসর হইয়া দেখুন—অসম্ভব সত্যাগ্রহে কিছু নাই। তাহা তিনি না পাবেন গোপন সন্ধির আবশ্যক নাই, সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ান—দেশ তাহা পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবে—না পারে ছাড়িয়া দিবে।

সত্যাগ্রহের পরিণাম জানিবার উৎকণ্ঠা।—দেশবাসী প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্ত্তের ঘটনা জানিতে চাহিতেছে। দেশের নামে যাহার আরম্ভ দেশবাসীকে তাহা লইয়া ধাঁধায় ও আঁধারে ফেলিয়া রাখিতে নাই। দেশবন্ধু নিজে ফরওয়ার্ডের সম্পাদক—সংবাদপত্র সঙ্ঘের সভ্য, সংবাদপত্র সঙ্ঘ হইতেও তারকেশ্বরের ব্যাপারের জন্য কমিটি গঠিত হইয়া আছে দেশবন্ধু সহজেই সেই সভায় সহজ সরল ভাবে এই আপোষ নিষ্পত্তির সব তথ্য ব্যক্ত করিতে পারেন। সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইল একটা বিরাট অন্যায়ের প্রতিবিধানার্থে—এখন তাহার বিধি ব্যবস্থা হইতে না হইতেই নিজেদের মধ্যে রেশারেশিই প্রবল হইয়া উঠিতেছে ইহা লজ্জার কথা দেশের কলঙ্কের কথা! ইহা বাড়িতে দেওয়া দেশবন্ধুরই গ্লানিকর।

স্বামী সচ্চিদানন্দের কারাদণ্ড—সত্যাগ্রহের প্রবর্ত্তক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্বামী সচ্চিদানন্দের ছয় মাসের জেল হইয়াছে। তিনি জামীনে মুক্ত আছেন। অনাচারী মোহান্ত বা তার চেলাকে মোহান্তগীতে রাখিয়া তিনি দেশবাসীকে লজ্জাকর আপোষ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। দেশবাসীও তাহা করিবে না। যে ভাবেই হোক দেশের নামে যখন সত্যাগ্রহ চলিয়াছে তখন দেশ তাহার কোনরূপ লজ্জাকর মীমাংসায় সায় দিবে না। তাই দেশবাসী সব কথা খোলা-খুলি জানিতে চাহিতেছে। ধর্ম্মের নামে—রাজনৈতিক 'রাখি ঢাকি ছাপি ছাপি' নীতি চালাইবার সমর্থন কেহই করিবে না। সন্ন্যাসী স্বামী সচ্চিদানন্দ রাজনীতির ধার না ধারিয়াও সত্যাগ্রহ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—প্রয়োজন হইলে তেমন লোকের এ দেশে আরও আবির্ভাব হইবে। স্বামীজীর কারাদণ্ডে দুঃখ নাই—তাঁহার আরব্ধ কার্য্য গৌরবের সহিত সম্পূর্ণ না হইলেই দুঃখ।

দেশবন্ধুর বিপদ আশঙ্কা ঃ—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে আবদ্ধ করিবার ষড়যন্ত্র চলিয়াছে—ফরওয়ার্ডে এই মর্ম্মে পত্র দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। সরকার পক্ষ হইতে কোন উত্তর বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছি না। চিত্তরঞ্জন শাসক ও শাসিত, রাজা ও প্রজার মধ্যে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাহেন। স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে চিত্তরঞ্জন বিশ্বের রাজনীতির ধারা ওলট পালটে সক্ষম হইতেন। দেশবন্ধুকে দেশ পরম সহায় বলিয়া জানে। তাই দেশবন্ধুকে আমাদের মধ্যে রাখা হইবে না এ কথা মনে হইলেও প্রাণ কাঁপিয়া ওঠে।

কমিশনের জের—লি কমিশনের রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য অনুগ্রহ করিয়া এসেম্বিলীতে ধরা হইয়াছিল। এ অনুগ্রহের সম্মান এসেম্বিলীর সভ্যগণ রাখিতে পারেন নাই। বেশী ২২ ভোটে এ অনুগ্রহের প্রতি অসম্মান দেখানো হইয়াছে। কিন্তু এ সব রয়াল কমিশন নাকি ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদনের ধার ধারে না। সুতরাং এ ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রেরই জয় জয়াকার।

কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট—গুজব হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু এই গেজেটের সম্পাদক হইবেন। আমরা এই বহু বিতর্কিত গেজেটখানির কে সম্পাদক হন দেখিবার আশায় উদ্গ্রীব হইয়া আছি।

সাহায্য রজনী—গত মঙ্গলবার ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউটে স্যার প্রফুল্লরায়ের অধিনায়কত্বে একটা সান্ধ্য-মিলন হইয়া গিয়াছে। উদ্দেশ্য—দক্ষিণ ভারতের বন্যা-পীড়িতদের সাহায্য কল্পে কিছু অর্থ সংগ্রহ। প্রোগ্রামে স্ত্রী-পুরুষ অনেক বিজ্ঞ ও গুণীলোকের কসরতের কথা লিখা ছিল। আমাদের মনে হয় বিপন্নদের সাহায্য করিতে যে ব্যক্তি অর্থদান করিবে তাহাকে থিয়েটার বায়স্কোপ, গান বাজনার লোভ দেখাইয়া তাহা আদায় করিলে সে দানের মাহাত্ম্য থাকে না। সঙ্গীতকারিণী-দের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্তা সাহনা বোস, শ্রীযুক্তা মোহিনী সেনগুপ্তা, শ্রীযুক্তা সবিতা পারেখ ও অন্যান্য মেয়েদের দল, আর সঙ্গীতকারীদের ভিতর ছিলেন শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় ও অন্যান্য ছেলেদের দল। সঙ্গীত জিনিষটা খেয়ালে হয় না। আমরা জানি জীবনের ২৫।৩০ বৎসর অবিশ্রান্ত সাধনা করিলে নাকি ওস্তাদ হয় কিন্তু বাঙ্গালার আধুনিক মহলে সকলই অদ্ভুত! কয়েকটা রাগরাগিণীর নাম ও গোটা কয়েক "হাতের-চেয়ে-আম-বড়" যন্ত্র ও দু'চারটি ভক্ত জুটাইয়া অঙ্গ বিকৃতি ও হাত পা নাড়িলেই ওস্তাদজি বন্ গিয়া! স্ত্রীলোকদের ভিতর শ্রীযুক্তা সবিতা পারেখ (ইনি বাঙ্গালী নন্) তানলয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া মধুরকণ্ঠে ২খানা গান করেন, আর সবই বাজে। পুরুষদের ভিতর শ্রীমান হরিদাস গোস্বামীর সঙ্গীত অতি মধুর ও উপভোগ্য হইয়াছিল। যথার্থ ইহা প্রশংসার যোগ্য। কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার পাশ্চাত্য জগৎ ঘুরিয়া একটা কিছু বড়দরের দিক্‌পাল হইয়া আসিয়াছেন। তাহার সঙ্গীত নাকি অপূর্ব্ব জিনিষ। এবং ইহাও শুনিলাম তিনি নাকি Music এর একটা University প্রতিষ্ঠা করিবেন ও তাহার আয়োজন স্বরূপ কিছুদিন হইতে ভাল ভাল ছাত্রীদের লইয়া একটা আখড়া করিয়াছেন। এবার তাঁহার গান শুনিয়া সত্যই নিরাশ হইয়াছি। বুঝিলাম আশুতোষ মারা গিয়ে একটা পুরুষ পুঙ্গব রাখিয়া গিয়াছেন। হায়রে বাঙ্গলা দেশ সাধে তোমাদের ভাত জোটে না? এখনও আমাদের দেশের গৌরব রাধিকা গোঁসাই মরে নাই—কেন তার কাছে শিখলে কি হয়? বুড়ো হয়েছে বলে? শুনিলাম দিলীপকুমার D. M. কি না Doctor of music হয়েছেন আমরা বলি তিনি Destructor of music হইয়া কালাপাহাড় সাজিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের বোনেরা, এরকম গান বাজনা ছেড়ে একবার চরকা কাটতে পার?

শ্রীপাহারাওয়ালা

মিনার্ভা থিয়েটার (এলফ্রেড রঙ্গ-মঞ্চে) জীবনযুদ্ধ।—বহু দুর্দ্দৈবের মধ্যেও এই অদৃষ্টলাঞ্ছিত সম্প্রদায় একখানি পঞ্চাঙ্কনাটকের অভিনয়ে সমর্থ হইয়াছেন ইহা বড়ই আনন্দের কথা। গত শুক্র-বার আমরা এই নাটকের অভিনয় সন্দর্শন করিয়াছি, অভিনয় অবশ্য সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট না হইলেও মোটের উপর মন্দ হয় নাই। নাটকখানিকে আমরা উচ্চ শ্রেণীর বলিতে পারিলাম না—যদিও ইহার মূলগ্রন্থে (Victor Hugoর Les Miserables) নাটকীয় উপাদান যথেষ্ট বিদ্যমান আছে। মনমোহন বাবুর নিকট আমরা আরও ভাল নাটক আশা করিয়াছিলাম। পুস্তকখানি অনেকস্থানে অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হইয়াছে আর এই ঘটনাবহুল চিত্তোত্তেজক উপাদানে পরিপূর্ণ

নাটকের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সংগীত সংযোজিত হইয়া গ্রন্থখানির নাটকত্বে বড়ই আঘাত করিয়াছে। ভাষাও অনেক স্থলে অভিনয়ের অনুকূল হয় নাই—নাটকখানি এই সকল বিষয়ে ভাল হইলে বোধহয় অভিনয় আরও অনেক ভাল হইত। মেঘনাদের অংশে কার্ত্তিক বাবুর অভিনয় স্থানে স্থানে খুবই ভাল হইয়াছে বিশেষতঃ প্রথমদৃশ্য পাড়াগায়ের মেঠো পথহাঁটা মেঠো ধুলা-মাখা পা দুখানি তাঁহার বেশ-ভূষার সঙ্গে বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। কয়েকস্থলে ভাবাভিব্যক্তিও সুন্দর দেখাইয়াছেন তবে সকলস্থানে প্রয়োজন মত কণ্ঠস্বরের উচ্চতার অভাব তাঁহাকে ততটা সাফল্য দেয় নাই যতটা অন্যদিক দিয়া তাঁহার পাওয়া উচিত ছিল। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য আদালত হইতে বহির্গমনকালীন অভিব্যক্তি আরও সুস্পষ্ট তেজোময় হওয়া উচিত—তা না হওয়াতে তিনি একটা বড় রকমের 'বাহবা' পাওয়াতে বঞ্চিত হইয়াছেন। অনাথনাথ ও অযোধ্যা প্রসাদের অংশে কুঞ্জবাবুর অভিনয় ভাল হইয়াছিল তবে দুইটী অংশ একই অভিনেতা গ্রহণ করিলে, দুইটী বিভিন্ন স্বরে তাহা অভিনয় করিলেই ভাল হয় নতুবা একটা সুরে অভিনয় করিলে তাহা ভাল হইলেও একঘেয়ে বলিয়া বিরক্তিকর হয়। 'রমানাথ' হোটেলওয়ালার অংশে হাবুবাবুর অভিনয় সর্ব্বোত্তম হইয়াছিল। গ্রন্থকর্ত্তা ইঁহার মুখে আবদালা মরাজনাব অনুকরণে হোটেলওয়ালীর সহিত একটী দ্বৈত সঙ্গীত দিয়া ভাল করেন নাই—কারণ আধুনিক দর্শক আর ঠিক ঐ শ্রেণীর রসের পিপাসু নহে। প্রতাপ চাঁদের অংশ নিখুঁত হইয়াছিল পুরাতন যুগের শেষাংশের অভিনেতা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ দে এই অংশে ভাবাভিব্যক্তি করিয়াছিলেন অতি সুন্দর ইহাতে সত্যই 'পুলিশী' ভাবটা ষোলআনা ফুটিয়াছিল। তারপর 'হীরা-লালে'র অংশে একটী নবীন অভিনেতাকে দেখিলাম—ইঁহার ভবিষ্যত উজ্জ্বল বলিয়াই বোধ হইল। স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে 'মাধুরী'র অংশে শ্রীমতী চারুশীলার অভিনয় উৎকৃষ্ট হইয়াছিল আর বেলার (প্রথম অংশে) ভূমিকায় একটী বালিকার অভিনয় সত্যই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। রেবতীর অভিনয় সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছিল। চুণীর অংশে (শেষাংশে) যে অভিনেত্রী অভিনয় করিয়াছিলেন, এত গানের বানের মাঝে একমাত্র তাঁহারই গান উপভোগ্য হইয়াছিল। সম্প্রদায় এই পুস্তকখানির অভিনয়ে যে যথেষ্ট পরিশ্রম, চেষ্টা, যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের অভিনয়ে পরিস্ফুট; তবে দর্শকবৃন্দের মনো রঞ্জনার্থ অত্যধিক গানের অবতারণা, চরকার গান দেওয়া, হোটেলওয়ালা ও তস্য পত্নীর দ্বৈত সঙ্গীত প্রভৃতি জিনিসগুলির প্রবর্ত্তনে তাঁহারা সেকালের দোষগুলি আনিয়া ফেলিয়াছেন—এইগুলি পরিত্যক্ত ও নাটকখানি আবশ্যকানুযায়ী পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলে নাটক খানি সত্যই একটা দেখিবার জিনিষ হইবে। পরের ষ্টেজে অভিনয় করায় যে সকল অসুবিধা হয় তাহার হাত হইতে ইঁহারা অব্যাহতি পান নাই বরং উহার মধ্যে যতদূর সম্ভব দৃশ্যপটাদির সৌন্দর্য্য দেখাইয়া ছিলেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে এসকল ত্রুটি উল্লেখযোগ্য নহে। ইঁহারা ভগবানের কৃপায় নিজেদের স্থায়ী রঙ্গ মঞ্চে অধিষ্ঠিত হইলে অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের মত ইঁহারা নাট্যরসিকদের তৃপ্তিদানে সমর্থ হইবেন তাহা নিঃসন্দেহ, কারণ দর্শক বৃন্দ যে কি চান তাহা অধ্যয়ন ও তাঁহাদের তৃপ্তিসাধনে ইঁহারা বিশেষ মনোযোগী। আমরা এই সম্প্রদায়ের স্থায়ীত্ব প্রার্থনা করি।

মনোমোহন নাট্যমন্দির—অধ্যক্ষ শিশিরবাবু "পাষাণী" অভিনয় ঘোষণা করিয়াছেন। এই সর্ব্বরঙ্গমঞ্চ উপেক্ষিত দৃশ্যকাব্যখানি বহুদিন উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার কারণ ইহা নাকি তেমন 'জমাটী' বই নহে। এক্ষণে শিশিরবাবু যদি ইহাকে জমাইতে পারেন তবে সত্যই একদিক্ দিয়া তাঁহার কৃতিত্ব অনন্য সাধারণতার যশঃ লাভ করিবে। শুনিয়াছি কোন এক শিল্পী নাকি স্বহস্ত রচিত পাষাণ মূর্ত্তিকে কেবল আগ্রহের প্রভাবে জীবন্ত করিয়াছিল সুতরাং নাট্যশিল্পী শিশিরবাবুর পক্ষে পাষাণীকে প্রাণদান করা বিচিত্র বা অসম্ভব নহে। আমরা সোৎকণ্ঠে পাষাণীর জীবনলাভের তারিখের অপেক্ষা করিতেছি।

ষ্টার থিয়েটার—ইঁহারাও 'সাজাহান' ঘোষণা করিয়াছেন। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাটক বহুবার অভিনীত হইলেও নাট্য-সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। সম্ভবতঃ সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা দানীবাবুই ঔরংজেবের অংশে অবতীর্ণ হইবেন এবং সাজাহানরূপে অপরেশবাবুকে দেখিতে পাইব। দারার অংশে অহীন্দ্রবাবু, সুজার অংশে দুর্গাদাস-বাবু আর মোরাদরূপে নির্ম্মলেন্দুবাবু কি ইন্দুবাবুর অবতরণও খুব অসম্ভব নহে তবে এই নাটক অভিনয়ে যে দৃশ্যপট সাজসজ্জা প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েই ষ্টার থিয়েটারের বিশিষ্টতার উজ্জ্বল ছাপ দেখিতে পাইব তাহা খুবই আশা করি।

শিল্প-জগৎ

চিত্র সমালোচনা

(ভারতবর্ষ) **শোক সন্তাপ**—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র অঙ্কিত। চিত্রখানার বৈশিষ্ট্য বিন্দুমাত্রও নাই। প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র গুপ্তের প্রকাশিত বিধবা চিত্রেরই পুনরাবৃত্তি। হাতে বোধ হয় মৃত স্বামীর একখানা চিত্র; কিন্তু দেহের অন্য কোথাও শোকের প্রকাশ নাই। ভাবহীন চিত্র ও প্রাণহীন দেহ উভয়েই এক অর্থাৎ অপদার্থ।

চনাব তীরে সন্ধ্যা—রহমান চাঘতাই কর্ত্তৃক অঙ্কিত। চিত্রখানা ওরিয়্যাণ্টাল হইলেও মুদ্রাদোষে অপেক্ষাকৃত কম দোষী। বর্ণের সমাবেশ রুচি সম্পন্নই হইয়াছে।

ডালহ্রদে কাশ্মিরী মাঝিয়াল—শিল্পী শ্রীযুক্ত সারদা উকীল। উকীল মহাশয়ের শরীর তত্ত্বের উপর প্রভাব অতি ক্ষীণ, তাই ভাব জাগিলেও দর্শে বোঝে না। কবিত্ব ঠিকই প্রাণে আসিয়াছে তবে তুলি যে অবাধ্য, কোলের শিশুটী মানুষ না পুতুল? মায়ের অনুপাতে ছেলে অত্যধিক ছোট হইয়াছে এ দোষ বহু চিত্রে দেখা যায়।

রাধিকারমণ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাগচী অঙ্কিত। চিত্রখানা সেকালের যাত্রারদলের নায়ক নায়িকার অনুকরণে অঙ্কিত মনে হয়। যুগল মূর্ত্তিটি দেখিলে মনে হয় কদম তলায় বিরাজ না করিয়া বটতলায় করিলেই ভাল হইত। এ যুগের চিত্রে যে সব গুণ দেখা যায় বাগচী মহাশয়ের এ চিত্রে তাহার বিন্দু বিসর্গও নাই। রাধার দেহ-লতার উপমা দিতে হইলে তাকিয়ার কথা মনে পড়িয়া যায়।

(সচিত্র শিশির ৪২ সংখ্যা) **নর্ত্তক**—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন অঙ্কিত। ইহা যতীন্দ্রবাবুর মত শিল্পীর যোগ্য হয় নাই। বড়ই সাজান ভাব দেখা দিয়াছে। দণ্ডায়মান স্ত্রীলোকটীর দেহ-ভঙ্গী অস্বাভাবিক ও অঙ্গুলী যেন হস্তিনী শ্রেণীর। রেখা চিত্রটীর বর্ণ সামঞ্জস্য অত্যন্ত কদর্য্য ও অর্থশূন্য হইয়াছে। আকাশ জমি সবই একটা অস্বাভাবিক লাল রংএর প্রলেপ দেওয়া। এটা বিশেষ দোষনীয়।

বাহিরে ও অন্দরে—ব্যঙ্গচিত্র, শিল্পী বিনয়বাবু। বিনয়বাবুর রেখাচিত্রে যথেষ্ট প্রভাব আছে কিন্তু জানিনা পত্রিকা সম্পাদকদের দোষেই হউক আর শিল্পীর অনবধানতার নিমিত্তই হউক ব্যঙ্গচিত্রগুলি উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে চলিয়াছে। Cartoon বা ব্যঙ্গচিত্রগুলির উদ্দেশ্য 'সমাজ শিক্ষা—কিন্তু দুঃখ এই শিল্পীগণের বা সম্পাদকগণের রুচি ক্রমশঃই অধোগামী হইতে চলিয়াছে কোন এক সংখ্যায় শিশিরে মুখপত্রেই অভিনয়ের নায়ক নায়িকাগণের আলোচনা দেখিলাম। এতবড় উদ্দেশ্য লইয়া যে সব পত্রিকা বাহির হয় তাহা যদি রঙ্গালয়কেই প্রথম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে তবে বুঝিতে হইবে জাতির পতনের আদর্শ দেখান হচ্ছে কারণ সাধারণের আগ্রহ, না থাকিলে সম্পাদক তা সর্ব্বপ্রথমেই স্থাপন করিতে সাহসী হন কি প্রকারে? কাগজই বা চলে কেন? তা ছাড়া অভিনয়ের চিত্র ও তদ্রূপ। প্রারম্ভেই চন্দ্রগুপ্ত অভিনয়ের চিত্রাবলী, হাতে একখানা তলোয়ার লইয়া চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায় কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান, যেন বলিতেছেন—"ওগো ফটো তুলিয়া নিতে হয় নাও" মুখে একবিন্দুও ভাব নাই। এগুলি পত্রিকার প্রারম্ভে বসাইবার কি যোগ্য? অহীন্দ্রবাবুরও কয়েকটী প্রতিকৃতি মুদ্রিত আছে। সমালোচনায় ইহাঁরা দানীবাবুর প্রশংসায় শতমুখ হইয়াছিলেন কিন্তু এত চিত্র সম্পর্কীয় সম্পাদকীয় মন্তব্যে ইহাঁরা বলিয়াছেন চন্দ্রগুপ্তের যে যে স্থান উঁহাদের ভাল লাগিয়াছিল সেই সেই অংশের চিত্র মুদ্রিত হইল—তবে কি বুঝিব যে দানীবাবুর চাণক্য ইহাঁদের ভাল লাগে নাই—একথা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে বাস্তবিক তাহাই দাঁড়াইয়াছে।

(বাঁশরী)—'বন্দনা' শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতারাও অঙ্কিত—। চিত্রটী বেশ হইয়াছে। বালিকার মুখে 'বন্দনা'র সারল্যটুকু মধুর হইয়াছে একথা অকুণ্ঠ চিত্তে বলা যাইতে পারে, স্ত্রীলোকের অঙ্কিত এই চিত্রটী অনেক পুরুষ শিল্পীকেও লজ্জা দিয়েছে। আশা করি রাও মহাশয়া তাঁহার প্রতিভার আরও পরিচয় শীঘ্রই দিবেন

পক-কালী

Printed & Published by Jnanendra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
14 Jaggannath Dutta Lane Garpar, Calcutta.

কমলোত্তলনকারিণী

শিল্পী—শ্রীভোলানাথ দাস

না —ওরা কি মানুষ? ওদের মধ্যে মাংস-মজ্জা, মনোপ্রাণ আধিপত্য
কিছু কোনদিন ছিল না কি? হয়ত' ছিল, এখন গেল
কোথায়? তারা যক্ষপুরীর রাজার শক্তির জ
ইন্ধন যুগিয়ে শিখাটাকে আরও বড় কো
ছাই হয়ে গেছে। এই
তত্ত্ব।

প্রথমবর্ষ] ৮ই আশ্বিন শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ২৫শে অক্টোবর। [১৩শ সংখ্যা।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর বর্ত্তমান অবস্থা

বিদেশী ধনিক ও অবাঙালা শ্রমিকের ঐক্যতান-নিষ্পেষণে মধ্যবিত্ত বাঙালীর অবস্থা উপলব্ধি করিতে বাঙালী পাঠকের বেশী কষ্ট না হওয়াই সম্ভব।
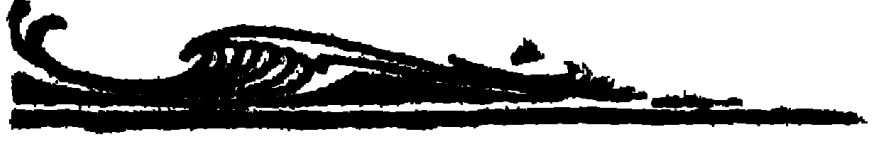
"রক্ত-

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বি, এ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনা-কাননের সদ্যোবিকশিত মানস-কুসুম "রক্ত-করবী" দিয়ে বাণীপূজার নবঅর্ঘ্য রচনা করেছেন। রক্ত-করবীর আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বে কোন কোন সংবাদপত্র, পাঠকগণের মধ্যে বেশ একটু কৌতূহল জাগিয়ে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন। ইহার প্রকাশের পর, সাহিত্যরসপিপাসুগণ ইহাকে কি ভাবে গ্রহণ কর্লেন, তার কোন সাড়াশব্দ আর পাওয়া গেল না। এই নাটকখানিতে কবি যা বল্‌তে চেয়েছেন, পাঠ করে তা আমরা বুঝ্‌লাম কিনা বল্‌তে পারি না, তবে যে ভাবে বুঝেছি তা' নিয়ে প্রকাশ কচ্ছি। কবিবর নাটকের পরিচয় প্রসঙ্গে (Introductory notes এ) আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন—নাট্যব্যাপারের ঘটনাস্থল যক্ষপুরী, পাত্র-পাত্রী,—খনি থেকে সোনা তোল্‌বার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদল; এখানকার রাজা একটা জটিল জালের আবরণের আড়ালে বাস করে, সেই আবরণের বাইরে নাটকীয় ঘটনা ঘটছে। রাজা বড় একটা বাহিরে আসেন না; বাহিরের সঙ্গে তাঁর যোগ নাই সহানুভূতি নাই;—তিনি 'আপন-রচিত জালে আপনি জড়িত'। নন্দিনী সুড়ঙ্গখননকারী বালক কিশোরের সহচরী; তার ডানহাতে রক্ত-করবীর কঙ্কন,—'যৌবনের ভালবাসার রঙে রাঙা', সে রুদ্ধ অন্ধ যক্ষপুরের "আচম্‌কা আলো"; সে চায় ঐ অদ্ভুত জালের আবরণ ছিন্ন করে, অন্ধকারময় পুরীর কক্ষ থেকে রাজাকে উদ্ধার করে;—আর চায় সে, তার প্রাণের প্রাণ রঞ্জনের সঙ্গে মিলন—যে মিলন সে নিশ্চয় ঘট্‌বে জেনেছে। রাজা জালের বাহিরে আস্‌তে চান্ না? নন্দিনী তাঁকে ডাকচে,—এস রাজা তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই, মাঠের বাঁশি শুনে খুসী হ'বে। রাজা প্রতিবার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বল্‌ছেন, "না, না; সময় নেই, যাও।" নন্দিনী রাজাকে বুঝিয়ে বলছে,—"দেখ্‌বে এস, ধরার বুকে পৌষের পাকা ফসলের সোণার ছড়াছড়ি—পৃথিবী আপন প্রাণের জিনিষ খুসী হয়ে দিয়েছে; কিন্তু ঐ যে ধরণীর বুক চিরে মড়া হাড়গুলো (সোণার তাল) ঐশ্বর্য্য বলে ছিনিয়ে নিচ্চ

রাক্ষসের অভিসম্পাৎ নিয়ে আসছো,—

কাড়াকাড়ি খুনোখুনীর অভিসম্পাৎ।" নেপথ্যবাসী রাজা একথা বেশ বুঝেছিলেন, পৃথিবীর নীচে যে তাল তাল পাথর, লোহা, সোণা—সেখানে কেবল পাশববলের ভয়ঙ্কর খেলা,—আর পৃথিবীর উপরে কাচা মাটিতে যে ঘাস উঠ্‌ছে, ফুল ফুট্‌ছে, সেখানে রয়েচে যাদুর খেলা। রাজা তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়েও সে প্রাণের যাদুটুকু কেড়ে আন্‌তে পারেন না। রাজা বুঝেছেন এই সব হীরা, মাণিক, সোণা তাঁর বুকে বোঝা হয়ে আছে। সোণাকে জমিয়ে তুলে আর আনন্দের "পরশমণি" হয় না। শক্তি যতই বাড়াও না কেন, সে ত যৌবনকে ধর্ত্তে পারে না,—তাই রাজা পাহারা বসিয়ে নন্দিনীকে বাধ্‌তে চা'ন; সে'ত পাহারাওয়ালার হাঁকডাকে বাঁধা পড়ে না! রঞ্জনের মত যৌবন থাক্‌লে রাজা ছাড়া রেখেই নন্দিনীকে বাধ্‌তে পার্ত্তেন। কিন্তু শক্তিতে আর সব বাধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাধা পড়ে না। তাকে বাঁধ্‌তে পারে একমাত্র 'বন্ধন'। কবি তারপর খনির শ্রমিকদের সঙ্গে পরিচয় কোরে দিয়েছেন। গ্রামে ছিল তা'রা মানুষ এ যক্ষপুরে তারা কেবল সংখ্যা। ফাগুলাল—৪৭ ফ; বিশু—৬৯ঙ; ইত্যাদি। পল্লীর সে শ্রুতিমোহন নামের পরিবর্ত্তে অক্ষরে পাড়ার পরিচয়; যেমন ট-পাড়া; ঠ-পাড়া। (পাঠক টাটানগরের পল্লীর নাম-করণের কথাটা স্মরণ কর্বেন)। এখানে সবই আছে, বস্তুতত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক আছেন, দলের সর্দ্দার আছেন, পাড়ার মোড়ল আছেন, এমন কি ধর্ম্মশিক্ষাদাতা গোঁসাই আছেন—যাঁর এক পিঠে গোঁসাই এক পিঠে সর্দ্দার, নামাবলী ফাঁস্‌লেই সর্দ্দারের চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে। এই যক্ষপুরীতে মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে। শ্রমিকদল, যা'রা এককালে তাদের নিজ নিজ গ্রাম মনোপ্রাণবান্ শক্তিমান, স্নেহ-প্রেম-দয়া-মায়া-ময় মানুষ ছিল তারা এখানে প্রেতলোকের ছায়া-মূর্ত্তির মত কর্ম্মশালা হ'তে বেরিয়ে আসছে;—চেনা যায়

না—ওরা কি মানুষ? ওদের মধ্যে মাংস-মজ্জা, মনোপ্রাণ কিছু কোনদিন ছিল না কি? হয়ত' ছিল; এখন গেল কোথায়? তারা যক্ষপুরীর রাজার শক্তির জলন্ত শিখায় ইন্ধন যুগিয়ে শিখাটাকে আরও বড় কোরে তুলে নিজেরা ছাই হয়ে গেছে। **এই হচ্ছে বড় হ'বার তত্ত্ব।**

এমন একদিন এল যেদিন রাজা নিজের পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠ্লেন। এ রোগ বাইরের নয় ভিতরের এর প্রতীকার একটা বড় রকমের ধাক্কা—হয় অন্য রাজ্যের সঙ্গে, নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে উৎপাত বাধিয়ে তোলা। প্রভুত্বের ও ক্ষমতার অত্যুচ্চ শিখরে উঠে রাজা বড় ক্লান্ত। এমন সময়ে নন্দিনী রাজার রুদ্ধ জানালায় ঘা দিয়ে বল্‌লে—"সময় হোয়েচে, দরজা খোল।" রাজা নন্দিনীকে নানা-ছলে ফিরাতে চান। নন্দিনী তাতে ভুলিল না। রাজা ভয় দেখালেন, নন্দিনী তাতে কম্পিত নয়। শেষে নন্দিনীর জয় হ'ল—রাজা দ্বার উদ্ঘাটন কল্লেন। ও কি? কে ও প'ড়ে। ঐ রঞ্জন না? রঞ্জনই ত বটে! রঞ্জনের মৃত দেহ!! সখী নন্দিনীর আহ্বানেও রঞ্জন জাগ্‌লো না। রাজা নিজের অকীর্ত্তি বুঝ্‌লেন, অনুশোচনা এল,—"আমি যৌবনকে মেরেছি; এতদিন ধ'রে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি! মরা যৌবনের অভিশাপ আমার লেগেছে!" রাজা ধ্বজ দণ্ড ভাঙ্‌লেন, কেতন ছিঁড়লেন, শ্রমিকদলের সঙ্গে মিলে নিজেরই বন্দীশালা ভেঙে ফেল্‌লেন, —এবং এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন।—এইটুকু হ'ল "রক্ত-করবীর" আখ্যান-বস্তু। এই নাটকে কেহ কেহ Soviet, Communist দলের বিদ্রোহের আন্দোলনের ইঙ্গিত পেতে পারেন অথবা Labour ও Capital এর চিরন্তন বিরোধ ও তাহার পরিণামের আভাস পেতে পারেন, সত্য বটে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে যে সত্যের আলোচনা ক'রেছেন তা' সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রযোজ্য; কেননা, সত্য সর্ব্বত্রই সত্য। তাঁহার জাপানযাত্রীর পত্রে, রবীন্দ্রনাথ বাণিজ্য-রাক্ষসীর Commercialism এর যে ভীষণ পরিচয় আমাদের দিয়েছিলেন, এবার রক্ত করবীতে সে রাক্ষসীটার আর একদিকের পরিচয় তিনি নূতন ভাবে ও ভাষায় দিয়েছেন। Materialism, Commereialism, Problem of capital & labor—একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন দিক প্রকাশ করে। প্রত্যেকের আধিপত্য মানব মনকে সঙ্কুচিত করে; দুইজনের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করে—প্রাণের যৌবন, আনন্দ ও অনুরাগকে নির্ব্বাসিত করে—প্রকৃতির বক্ষ হ'তে মানব মনকে ছিনিয়ে এনে বাসনার শতজালে তাকে জড়িত কোরে তোলে;—কাঞ্চনকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান ক'রে কাঞ্চনের উপাসনায় প্রমত্ত মানব আনন্দময়ী প্রকৃতির আহ্বানে উপেক্ষা করে;—তাই, নন্দিনী আসিয়া তার মনের দুয়ারে করাঘাত কল্লে'ও দরজা খোলে না—নন্দিনী তাকে ধরার বুকে পৌষের পাকা ফসলে সোণার ছড়াছড়ি দেখ্‌তে নিমন্ত্রণ কল্লে সে তাতে কর্ণপাত করে না। নিজের শক্তির মদে মাতাল হয়ে রঞ্জনকে গলা টিপে মেরে ফেলে রাখে। অবশেষে যেমন প্রকৃতির নিয়মে ঘাতের পর প্রতিঘাত আসে, সেইরূপ শক্তি ও প্রভুত্বের মত্ততার পর যখন অবসাদ আসে, তখন যক্ষপুরীর রাজা নিজের অবস্থাটা বুঝিতে পারে, আর বুঝ্‌তে পারে যে, সোণার তালের অভিসম্পাৎ তাকে লেগেছে, নিজের হাতে-গড়া যন্ত্র তাকে আর মানছে না,—তখন সত্য সত্যই মনে অনুশোচনা আসে এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে রাজা ধ্বজ-দণ্ড ভেঙ্গে, কেতন ছিঁড়ে ফেলে—আর আর যা' কিছু ভাঙ্‌বার আছে সে সব ভেঙে,—নন্দিনীর হাত ধ'রে জয় যাত্রার পথে বেরিয়ে পড়িলেন।

এই হ'ল "রক্তকরবী" নাটকের বিষয়। ধনী ও শ্রমিকের সম্বন্ধ নিয়ে বর্ত্তমান যুগে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার আভাস এ নাটকে পাঠক অনেক পাবেন। মাত্র চিত্ত-বিনোদনের জন্য এ নাটকখানি যিনি পড়্‌তে ব'সবেন তিনি ঠক্‌বেন। 'রক্তকরবী' সে শ্রেণীর লঘুপাঠ্য নয়। এটা একটা Serious Study এতে যত মন দেবেন, তত নূতন রসের আস্বাদ নূতন ভাবের সন্ধান পেয়ে পাঠক আনন্দ লাভ কর্ব্বেন? রূপকের সকল ব্যাখ্যায় সকল সমালোচক যে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, সেটা আশা করা যায় না। 'রাজা'—কে? তিনি কি ধনীর প্রতীক্ না, materialism এর জটিল জালে জড়িত মানব-আত্মা? 'নন্দিনী' আনন্দের সাকার বিগ্রহ না, চিরন্তন মানব-মনের অপাপবিদ্ধ বিবেক? 'রঞ্জন প্রাণের যৌবন, না বিশ্বপ্রেমের Symbol এ সব প্রশ্নের বিচারে সকলে একমত হ'বেন না এবং এ প্রবন্ধের তাহা প্রতিপাদ্য নহে। তবে এ কথা বলা যায় যে যিনি যে-ভাবেই রূপকের ব্যাখ্যা করুন না কেন, রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' যে রবীন্দ্র-প্রতিভার উপযুক্তই হয়েছে—এ কথা সকল সাহিত্য-রসরসিক মেনে নেবেন।

গল্প

পূজার পোষাক

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি. এ

সুবোধবাবু মধ্যবিত্ত অবস্থার ঘরের ছেলে। তাঁহার পিতা বহুকষ্টে তাঁহাকে এম্. এ পাশ করাইয়াছিলেন, তারপর নিজের গুণে সুবোধবাবু কিছুকাল হইল ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিয়াছেন। তিনি এখন পূর্ব্ববঙ্গে ভগবানগঞ্জ মহকুমাতে আছেন। সুবোধবাবু যে বেতন পান তাহাতে স্বীয় পদমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া সংসারের খরচপত্র কুলান করাই কঠিন তার উপর তাঁহাকে স্বীয় পিতামাতা, বিধবা ভগ্নী এবং তাঁহার তিনটি ছেলেমেয়ে, নিজের ছোট দুটি ভাই ও এক অবিবাহিতা ভগ্নীর ভরণপোষণাদির ব্যবস্থাও করিতে হয়। তাঁহার বিবাহ বি. এ. পাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছিল, নিজেরও দুই বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র আর দুই মাসের একটি কন্যা।

ভগবান্‌গঞ্জের বাসাতে তাঁহার স্ত্রী, ছোট দুটি ভাই আর বিধবা ভগ্নী তাঁর ছেলেমেয়েসহ আছেন। পল্লীভবনে তাঁহার অবিবাহিতা ভগ্নীটি ও পিতামাতা আছেন।

সুবোধবাবুর স্বভাবটি ঠিক নামেরই উপযুক্ত। লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার মাথা বিগড়াইয়া যায় নাই, তিনি পত্নী-সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন নাই। পিতামাতা ভাইভগ্নী প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্যগুলি তিনি অতি সুন্দর ভাবেই পালন করিয়া থাকেন। তাঁহার দাম্পত্যজীবন যে খুব সুখময় তাহা বলিতে পারি না কারণ তাঁহার স্ত্রীর প্রকৃতি তাঁহার অপেক্ষা বিভিন্ন। স্ত্রীর ইচ্ছা যে স্বামী কেবল তাঁহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসব্যসনের উপাদান যোগাইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন; সুতরাং বিধবা ননদের তাঁহাদের সঙ্গে অবস্থিতি তাঁহার মনঃপূত হয় নাই,—তাহার স্বাধীনভাবে সংসার করার পক্ষে এটা একটা বিষম অন্তরায় বলিয়াই তিনি মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহার ননদ সুশীলা দেবীর হৃদয় সঙ্কীর্ণতামুক্ত। ভাল ঘরে ভাল বরেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এবং বিবাহিতা জীবনের দ্বাদশ বৎসর তিনি অতি সুখে স্বামীর ও শ্বশুরকুলের সকলের স্নেহভাগিনী হইয়া কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীর মাসিক আয় ৪।৫ শত টাকা ছিল কিন্তু তিনি বিলাসব্যসনের প্রশ্রয় দিতেন না, সুশীলাও বিলাসব্যসনাদি অনাবশ্যকীয় ব্যয় অপেক্ষা পরদুঃখমোচন, দুঃস্থকে সাহায্য দান, ইত্যাদি কার্য্যেই বেশী অনুরক্তি প্রকাশ করিতেন। নিজে বেশ সুশিক্ষিতা হইয়াও তিনি নিরাভিমানিনী ছিলেন, গর্ব্ব অহঙ্কার তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তার এই সব গুণে সকলেই তাঁকে ভালবাসিত। কি জানি কোন কর্ম্ম ফলে তাঁহার এ সুখ বিধাতার সহিল না, একই বৎসরের মধ্যে প্রথমে স্বামী ও তারপর শ্বশুরশ্বাশুড়ী হারাইয়া তিনি একেবারে অনাথা হইয়া পড়িলেন। একাকী স্বামীর ভিটায় থাকা তাঁহার পক্ষে নানা কারণে অসম্ভব হইয়া উঠিল বলিয়া তিনি সেখানকার সম্পত্তি আদির একটা বিলি ব্যবস্থা করাইয়া নগদ টাকাকড়ি একটা ভাল ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া পিতামাতার কোলে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। এই সব দুর্ঘটনার পর তিনি একেবারে বিষাদ-প্রতিমা হইয়া গিয়াছিলেন। কাহারও সহিত বড় একটা মিশিতেন না। নিজে যৌবনে যোগিনী সাজিয়া পূজা পাঠ আদিতেই অধিকাংশ সময় ক্ষয় করিতেন। তবে পরের

দুঃখমোচনে চেষ্টাটা তাঁকে ছাড়ে নাই। সেদিকে তিনি সর্ব্বদা অবহিত থাকিতেন। নিজের ছেলেটাটি এবং মেয়েটিকেও তিনি নিজ প্রকৃতি অনুসারেই গঠন করিয়া তুলিতেছিলেন। বড় ছেলেটির বয়স ১০ বৎসর ২য়টি ৭ বৎসর, আর কন্যাটিকে কোলে লইয়াই তিনি দুঃখের সাগরে পতিত হন, তাহার বয়স এখন ৪ বৎসর। নিজের ছেলে-মেয়েদের ভরণপোষণের চাপ তিনি ভ্রাতা বা পিতামাতার স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন, এবং দাতার নিকটে উহাদের খরচপত্র বাবদ অর্থ প্রদানের প্রস্তাবও তিনি একাধিকবার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে সুবোধবাবু এরূপ ব্যথিতভাবে দিদির মুখের দিকে তাকাইতেন যে অগত্যা সে সংকল্প তাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

সুবোধবাবু দিদিকে বুঝাইলেন যে যাহা কিছু ছেলেদের জন্য ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে তাহাতে হাত দেওয়া কখন সুবুদ্ধির কাজ নহে। ভবিষ্যতে কখন কিরূপভাবে কি প্রয়োজন আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা কিছুই বলা যায় না। এখন তো ঐ টাকা না লইয়াও একরূপ চলিয়া যাইতে পারে সুতরাং উহা ভাঙ্গিবার প্রয়োজন নাই। যদি তেমন কোন দরকার পড়ে তখন দেখা যাইবে।

সুশীলাও তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "তুই বুঝিস্ না সুবোধ, তুই যে সামান্য ২৫০৲ টাকা পাস্, তাতে নিজের পদগৌরব বাঁচাইয়া চলাই যে দুষ্কর। তার উপর আমার এই হতভাগাগুলোর চাপ্ পড়লে কি করে পারবি তাই শুনি? শান্তির (সুবোধের স্ত্রীর নাম শান্তিবালা) দিকেও তো দেখ্‌তেই হয়, ও বেচারীর সাধ আহ্লাদও তো পূর্ণ কর্ত্তে হবে।"

সুবোধবাবু উত্তর দিলেন "ছি, দিদি, কি বল তার ঠিক নাই। তার সাধ আহ্লাদ সাধ্যমত পূরণ করা কি হচ্ছে না। তবে মানুষের আকাঙ্ক্ষা যদি অমানুষের মত হয় তাহলে উপায় কি! তোমার মত দিদির ভাইবৌ হবার যোগ্যতা পাওয়া যে দরকার দিদি। সে এখনও হয়ত বুঝ্‌তে পারে না কিন্তু তা বলে তার খেয়াল পূর্ণ কর্ত্তে গিয়ে আমাকে মনুষ্যত্ব হারাতে বোলো না দিদি।" এই বলে সুবোধবাবু ছল ছল নয়নে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া থপ্ করিয়া পা দুটি জড়াইয়া ধরিলেন। দিদিও সজল নয়নে "ছি! কি ছেলেমানুষি করিস্" বলিয়া পা টানিয়া লইয়া ভাইএর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া সেই হাতে চুম্বন করিলেন। ইহার পর আর এ সম্বন্ধে সুশীলা কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার ছেলেমেয়েরা মাতুলালয়েই শরীর পুষ্ট করিতেছে।

সুবোধবাবুর স্ত্রী শান্তিবালা এ কারণেও মনে মনে বড় অসুখী হতভাগা ভাগিনেয়দের ভরণপোষণের ভার স্বামী এইরূপে নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লওয়াতে শান্তির মন বড়ই অশান্তিপূর্ণ হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সুযোগ পাইলে এ বিষয়ে পরোক্ষভাবে কখনও বা প্রত্যক্ষভাবে স্বামীর সহিত আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইয়াছে কিন্তু তাহাতে বড় একটা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। সুশীলা শান্তি অপেক্ষা প্রায় ১০।১১ বৎসরের বড়, সুবোধ অপেক্ষা প্রায় ৩ বছরের বড়। তিনি শান্তিকে নিজ কনিষ্ঠ ভগ্নীর মতই স্নেহ যত্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু শান্তি সেটা সাদরে গ্রহণ করিতে চায় না তাহা বুঝিতে পারিয়া নিজেই মনে মনে ক্ষুব্ধা হন, আর ইচ্ছা থাকিলেও তাহার বিরক্তি উৎপাদনের ভয়ে যতটা সম্ভব নিজ মনের ভাব মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখেন। শান্তির ছেলেমেয়ে দুটিকে তিনি সন্তানের মতই দেখেন, বড় ছেলেটি ত পিসিমাকে বড়ই ভালবাসে।

ভগবানগঞ্জের প্রৌঢ় আনন্দমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রাণপাত চেষ্টার ফলে সেখানে একটি অনাথালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানে মাতাপিতাহীন দীন বালকবালিকাগণকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের ভরণপোষণ করা হয়, কিছু কিছু লেখাপড়া শেখান হয় আর কিছু কিছু কার্য্যকরী শিক্ষাও দেওয়া হয়। বালিকাদের জন্য সেলাই, কাপড়ে ফুল তোলা, বন্ধন, সিকা, পাখা প্রভৃতি প্রস্তুত করা, মাটির খেলনা তৈয়ার করা ইত্যাদি কাজ শেখানর ব্যবস্থা আছে, আর ছেলেদের জন্য বেতের কাজ, ঝুড়ি বোনা, বই বাঁধা, দড়ি ও সুতলি পাকান, বাঁশের সাহায্যে নানারূপ ব্যবহার্য্য বস্তু প্রস্তুত ইত্যাদি শেখান হয়, স্থানীয় লৌহকারের কাছে এবং সূত্রধরের কাছে তাহাদের কাজ শেখানর জন্য কাহাকে কাহাকে পাঠান হয়।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে এই অনাথালয়ে ৫টি বালিকা এবং ৭টি বালক পালিত হইত। মেয়ে পাঁচটির একটি দেড় কি দুবছরের, ১টি ৬ বছরের; দুটি ৮ বছরের, আর একটি প্রায় দশ বছরের। ছেলেদের তিনটি ৬ বছরের, চারটি ৭।৮ বছরের একটি ১০।১১ বছরের, সকলেই নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুজাতীয়। জল-আচরণীয় ও অনাচরণীয় দুই রকমই আছে তাই আনন্দবাবু নিজে অনেকটা নিষ্ঠাবান হিন্দু বলিয়া অনাচরণীয় ও আচরণীয়দের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগ করিয়া রাখিয়াছেন, আহারাদির সময়ে সকলে নিজ নিজ বিভাগে পৃথক ভাবে ভোজন ব্যাপার নির্ব্বাহ করে। স্পর্শ দোষ যথাসম্ভব বাচাইয়া চলিতে চেষ্টা করা হয়। তবে আহারাদির সম্বন্ধে কোনরূপ তারতম্য নাই. অন্যান্য বিষয়েও সকলের সম্বন্ধেই ঠিক একরূপ ব্যবস্থা। পোষাক পরিচ্ছদ আদর যত্ন সবই ঠিক একই প্রকারের। আনন্দ বাবুর পুত্র সন্তান নাই। একমাত্র কন্যা অনেকদিন বিবাহিতা হইয়া শ্বশুরালয়েই নিজ সংসার লইয়া ব্যস্ত। সময় সময় পিত্রালয়ে অল্পদিনের জন্য আসে আনন্দবাবুর নিজ বাড়ীর সন্নিকটে একটি বাগান আছে, তাহার মধ্যে দুতিনখানি ঘর ছিল, এই বাগান বাড়ীতেই আজ কয়েক বৎসর তিনি এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী উভয়েই এই আশ্রমের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। আনন্দবাবুর ওকালতির আয় বর্ত্তমান সময়ে অনেক কমিয়া গিয়াছে। নিজ সংসার খরচ নির্ব্বাহ করিয়া আশ্রমের জন্য আর এখন বেশী কিছু উদ্বৃত্ত রাখিতে পারেন না, সুতরাং সাধারণের দয়ার উপর তাঁহাকে অনেক সময়ই নির্ভর করিতে হয়। আনন্দবাবুর স্ত্রী বৎসরের মধ্যে দুতিনবার স্থানীয় সম্ভ্রান্ত কুলমহিলাগণকে আমন্ত্রণ করিয়া অনাথাশ্রমে আনিয়া থাকেন এবং তত্রত্য বালক বালিকাগণের শিক্ষিত বিষয় সমূহের নিদর্শন তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করলে, আর এই সব অনাথদিগের প্রতি তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সুশীলাদেবী ও শান্তি যখন ভগবানগঞ্জে আসিয়াছেন তখন হইতে এপর্য্যন্ত তাঁহাদের এরূপ পরিদর্শনের কোন সুযোগ ঘটে নাই, তবে সুশীলাদেবী ঐ আশ্রমের বিষয় প্রতিবেশিনীগণের নিকট অবগত হইয়া মধ্যে মধ্যে ঐ অনাথদের জন্য নিজ হস্তে প্রস্তুত জামা, পুরাতন কাপড়, আর খাদ্যাদি পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। অর্থ সাহায্যও কখন কখন না করেন তাহা নহে তবে এই সব কার্য্য তিনি অতি গোপনে নিজকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াই করিয়া থাকেন, এমন কি শান্তি পর্য্যন্তও তাঁহার এই সব কার্য্যের খোঁজ খবর বিশেষ কিছু জানেনা। শান্তির মন নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেই সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকাতে এই সব অনাথ-দিগের দিকে একবার ফিরিয়া দেখিবার অবকাশ পায় না। সুতরাং কখন কোন প্রতিবেশিনী তাহার নিকট অনাথালয়ের জন্য কিছু অর্থ সাহায্যের কথা উত্থাপন করিলেও তাহার উত্তরে সমবেদনার কোন আভাস বড় একটা পায় না। সুবোধবাবু নিজে ঐ আশ্রমের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইলেও স্ত্রীর নিকট সে সব প্রসঙ্গে কোনও আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন নাই কারণ তিনি তাহাকে কেশবেশ পরায়ণ, আত্মসুখান্বেষিনী স্বার্থান্ধা সঙ্কীর্ণচিত্তা বলিয়াই জানেন, নারীত্বের প্রধান গৌরব পরদুঃখাসহিষ্ণুতা তাঁহার স্ত্রীর হৃদয়ে স্থান পায় না, অন্যের শত কষ্টসত্বেও নিজের একটু অসুবিধার কারণ ঘটতে দেওয়া তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ এইরূপই সুবোধবাবুর ধারণা। অবশ্য স্ত্রীর প্রাত্যাহিক ব্যবহারেই তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এজন্য সুবোধ বাবু নিজ মনে মনে বড় কষ্ট অনুভব করিয়া আর যাহাতে এইরূপ কোন অপ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া আরও বাহ্যিক অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে সেই আশঙ্কায় এইরূপ সব আলোচনা তিনি স্ত্রীর সহিত করিতেই ইচ্ছা করেন না, বরং যথা সম্ভব তাহা হইতে নিজকে বাঁচাইয়া চলেন। সুতরাং স্ত্রীর অন্তর্নিহিত সুপ্ত নারীত্বকে জাগাইয়া তুলিয়া কাজে লাগানের কোন চেষ্টাও তিনি করেন নাই, পাছে তাহাতে 'উলটা বুঝলি রাম' হইয়া যাহা একটু বাহ্যিক শান্তি আছে তাও বা নষ্ট হইয়া যায়।

এই ভাবেই তাঁহাদের প্রবাসের দিনগুলি কোনরূপে কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এই দুই দুইটি তরুণ হৃদয়ের মধ্যে আন্তরিক ঘনিষ্ঠ যোগ হইবার অন্তরায় টুকু বোধহয় অন্তর্যামী ভগবানের চক্ষে ভাল লাগে নাই, তাই এটা দূর করিবার জন্য তিনি এক খেলা খেলিলেন।

(২)

আশ্বিনমাস সমাগত। শরৎ তাহার মেঘমুক্ত তারকা-খচিত আকাশ হইতে মায়ের আগমনীগীতি মৃদঙ্গের গুরু-গম্ভীর তালে তালে গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেফালি স্বীয় শুভ্র দৃশ্য ছটায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্নিগ্ধ সুরভি-সম্ভার পূর্ণ হৃদয় খানি আস্তরণরূপে শ্যামাধরণীর বক্ষে বিছাইয়া দিয়া মায়ের চরণরজঃ স্পর্শের প্রতীক্ষা করিতেছে, স্থলপদ্ম এবং কমল উভয়ে জলেস্থলে মায়ের মধুর হাসি ছড়াইয়া দিতেছে। কাসকুসুম মায়ের শ্রমাপনোদনের জন্য চামররূপে উর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বঙ্গদেশের প্রকৃতিও যেন আজ জগজ্জননীর আগমন সূচনাতে আনন্দে আত্মহারা।

এই আশ্বিনের দ্বিতীয় তৃতীয় দিবসের রাত্রিতে আহারাদি সমাধা করিয়া শান্তি স্বামী গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, স্বামী টেবিলের নিকট বসিয়া কি লিখিতেছেন। আস্তে আস্তে কবাট বন্ধ করিয়া স্বামীর পার্শ্বস্থ অন্য একখানি চেয়ারে সে বসিয়া পড়িল। এই সময়টাই তাহার স্বামীর সহিত নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা বলিবার প্রধান অবসর। কাছারির দিনে, দিনের বেলায় স্বামী বৈঠকখানাতেই নিজ দাসত্বজীবনের কর্ত্তব্য পালন করেন; বৈকালে কাছারি হইতে আসিয়া শ্রান্তি দূর হইবার পর একটু সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হন; তথা হইতে যদি সকাল সকাল ফেরেন তাহা হইলেও হয় বৈঠক খানাতে না হয় দিদির অবসর থাকিলে তাহার কাছে গিয়া বসেন, অথবা আফিসের কাগজপত্র লইয়া কোন অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন। যদিই বা কখন অবসর থাকে তাহা হইলেও দিদির সম্মুখের উপর স্ত্রীর সঙ্গে নির্জ্জনে প্রেমালাপ করিতে সুবোধবাবু বড় সঙ্কুচিত হন, তাঁরা তাতে বড় লজ্জা করে, যে দিদি কি ভাবিবেন।

সুতরাং রাত্রিতে দিদি স্বীয় গৃহে কবাট বন্ধ করিলে পর শান্তি স্বামী গৃহে আসিয়া থাকে। সেই সময়ই যাহা কিছু কথাবার্ত্তা। তাও কখন বা আসিয়া দেখে স্বামী নিদ্রিত। সেও তখন অগত্যা শুইয়া পড়িতেই বাধ্য হয়। যাহা হউক আজ চেয়ারে বসিয়াই শান্তি জিজ্ঞাসা করিল "বলি বড় যে মনোযোগ্! কি লেখা হচ্ছে!"

সুবোধ মুখ তুলিয়া শান্তির দিকে তাকাইয়া বলিলেন "কেন? এই একটা হিসাব একটু দেখ্‌ছিলাম!" বলিয়া কলম নামাইয়া রাখিয়া স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বসিলেন। স্ত্রীর মুখখানা আজ যেন প্রসন্ন দেখাইতেছিল, তাই তাঁহারও প্রাণটা আশ্বস্ত হইল। কারণ সবদিন এটা পাওয়াও তাঁর ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। শান্তি মনোমোহিনী হাস্যচ্ছটাতে মুখখানি আলোকিত করিয়া বলিল, "তবু ভাগ্যি যে আজ সতীনের কাছ থেকে এত সহজে তোমাকে ফিরে পেলুম।" "সতীন কি রকম"? সুবোধ বাবু একটু বিস্ময়ের হাসির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। শান্তি টেবলের দিকে একটি তীক্ষ্ণ মধুর কটাক্ষ হানিয়া বলিল "ওই যে গো, টেবলের উপর পড়ে আছেন! সতীন্ কি আমার একটা! এক তো ওই কাগজ, দোয়াত কলমগুলো, অর্থাৎ কি না তোমার লেখাপড়া, হর জটাতে গঙ্গার স্থান ওরা তো সব সময়েই তোমার মাথায়, ঘুমও এক সতীন্, সেও বাগ পেলে ছাড়ে না। আজ তাদের হাত থেকে তোমাকে যে পেলাম, এটা ভাগ্যি না।" সুবোধ মুক্ত প্রাণে হাসিয়া "তা বটে বইকি!" বলিয়া স্ত্রীর চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া আদর করিলেন।

শান্তি তারপর দু'এক কথার পর বলিল "পুজো তো এসে পড়লো। কাপড় চোপড়ের কি রকম কি করলে!"

সুবোধ বলিলেন, "এই তো তোমার সতীনের সঙ্গে সেই পরামর্শই কচ্ছিলাম। যা মাগ্‌গি গণ্ডার দিন পড়েছে, আর টাকার যে টানাটানি—"

সমাপ্ত করিতে না দিয়া শান্তি একটু হাসিয়া বলিল "ও কথা তো শুনতে শুনতে কাণে তালা লেগে গেল। টাকার টানাটানির কথা তোমার মুখ থেকে কখনো যাবে না। টানাটানি করাই যার ইচ্ছে, তার সুরাহা কি করে হয়! তা যাক্, এখন কি করবে স্থির করলে তাই বল দেখি শুনি।" খোঁচাটা নীরবে পরিপাক করিয়া সুবোধ বলিলেন, "দেখ্‌তেই তো পাচ্ছ, মাসে যা পাই, তাতে কি করে বাহিরের ঠাট বজায় রেখে ভিতর বাহির চালাতে হয়। সুতরাং নিতান্ত যা না হলে নয় তেমনই করতে হবে। তুমি কি বল, একবার তাই শুনি দেখি!

শান্তি মুখখানা একটু আঁধার করে বললে "আমার কথা তো তুমি চিরকালই শুনে এলে! তা হলে আর ভাবনা

ছিল কি! সে যা হোক এবার পূজোতে আমাদের পাশের বাড়ীর বড় বাবুর মেয়ের যেমন ব্লাউজ আর শাড়ী এসেছে সেই রকম আমাকে দিতে হবে। আর খোকার জন্য একটা জরি দেওয়া—সাঁচ্চা জরি—ঝুটো নয়, ভেলভেটের সুট, খুকীর জন্য জরির কাজ করা ভাল একটা পেনিফ্রক, আর টুপি দিও। লবঙ্গলতার ছেলেটির সুটটি বড় সুন্দর হয়েছে। খোকারও ঐ রকমটি চাই।"

সুবোধবাবু একটু দম লইয়া বলিলেন, বড়বাবু হলেন রেলের আপিসের লোক, তিনি মাসে বোধহয় ৪।৭শো টাকা উপরি পান, লবঙ্গলতার বাপও মস্ত জমিদার, শ্বশুরও হাইকোর্টের বড় উকীল, স্বামীটিও বুঝি উড়িষ্যার কোন রাজার ম্যানেজার ৪।৬শো টাকা পায়! তাদের দেওয়াটা আর আশ্চর্য্যি কি!

শান্তি একটু কটাক্ষ করিয়া বলিল "আর তুমিই বা তাদের চেয়ে কম কিসে! এতবড় একটা হাকিম, ২০০৲ টাকা মাইনে পাও, এত মান সম্মান কি তাদের! আর শুনতে পাই যে উপরি টাকা ইচ্ছে করলে তোমরাও তো ঢের বেশীই নিতে পার।

সুবোধবাবু চমকিত হইয়া বলিলেন ছি! কি যে বল তার ঠিক নাই! ওসব কথা আর কখনো মুখে এনো না। এমন কথা কি করে বললে বল দেখি! যাক এসব কাপড় চোপড়ের দাম জান কি?

শান্তি স্বামীর তিরস্কারে একটু অপ্রতিভ হইয়াছিল, সে উত্তর করিল "হাঁ, দাম তেমন বেশী কিছু নয়। শাড়ী, ব্লাউজ আর সিল্কের সেমিজ এই ৭০৲ টাকার মধ্যেই হতে পারে। খোকা খুকাদের দুজনের জামা, জুতা, মোজা, টুপি ইত্যাদিতে ত্রিশ টাকার মধ্যেই হতে পারে, বড় জোর ৪০৲ লাগবে। বেশী টাকা খরচ করিয়ে আর কি লাভ! তবে তোমার মানমর্য্যাদা তো আছে—দশ জনের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে তোমার ছেলেমেয়ে। তোমার স্ত্রী সেই পরিচয়ই তো লোকে দেবে! তখন যে মাথা নীচু করে থাকতে হলে মাথা কাটা যায়!

সুবোধ বলিলেন হাঁ! তাই কাপড় চোপড় আর গয়না গাটি দিয়ে মাথাটা উঁচু করে রেখে দিতে হয়, যেমন চারা গাছ লতিয়ে পড়লে লোকে কাঠি দিয়ে কি বাঁশ দিয়ে তুলে দেয়!

শান্তি খোঁচাটা নীরবে পরিপাক করিল না, তার ভ্রূদ্বয়ে এবং ওষ্ঠাধরে তার যন্ত্রণাটা প্রকট হইয়া উঠিল, তবে কথায় কেবল বলিল—তোমার তো কেবল ঠাট্টা! বুঝতাম যদি দেখতে পেতে যে যারা সাধারণ সাজপোষাক যায় তাদের কি হেলা ফেলা সব্বাই করে!

সুবোধ বলিলেন "তা যাক্, কম করে হলেও তোমাদের জন্য অন্ততঃ ১০০৲ টাকার দরকার দেখছি! তারপর সুধীর আর সুশান্ত (দুই ছোট ভাই) আছে, সুকুমারী (ভগ্নি) আছে, দিদির ছেলে দুটি আর মেয়েটিও আছে। তাদের কিরূপ কি দেওয়া যায়?—

শান্তি বলিল ঠাকুরপোরা তো এখন একটু বড়সড়ই হয়েছে, তাদের কলের বেশ ধোয়া ইস্তিরী করা ধুতি, আর এক একটা বেশ মোটা ভাল ডিজাইনের ছিটের কোট হলেই হবে। চাদর তো এখন কেউ ব্যবহারও করে না, তার কথাই নাই। এক একখানা ভাল রং চংএ রুমাল দিলে আরো খুসী হবে। ঠাকুরঝির তো বিয়েও শীগগিরই হবে, তখন ভাল কাপড় জামা দিতেই হবে, এখন পূজোর পোষাক বলে ভাল একখানা রেশমী চেক দেওয়া ডুরে আর পাকা রংএর সুন্দর ছিটের একটা ব্লাউজ কি বডিস কিনে দাও, একটা গোলাপি রঙ্গের সেমিজও দাও; বেশ মানাবে। দিদির মেয়েটির জন্য একটা ভাল পাকা ছিটের ফ্রক আর একটা পালক দেওয়া ফুল দেওয়া টুপি! কি বল!

সুবোধ অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন হাঁ! তাঁর বুকের মধ্যে ঢেঁকি পাড়িতেছিল, পাছে সে শব্দ শান্তির কাণ পর্য্যন্ত পৌছে, এই আশঙ্কায় তিনি একটু দূরে সরিয়া বসিলেন। আর উদাসীন দৃষ্টিতে টেবলের আলোর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শান্তি মনে মনে বুঝিল যে স্বামী অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু বাহিরে তাহার কোন আভাষ না দিয়া বলিল "কি চুপ করে রইলে যে! মনের মত কথা হয়নি কি? খুলে বল না কেন! কিছু অন্যায় বলেছি নাকি।"

সুবোধ বলিলেন "না! অন্যায় আবার তুমি করবে! অসম্ভব! তবে যা হিসাব দিলে তাতেও তো অন্ততঃ দেড়শ টাকার দরকার! উহার অর্দ্ধেক টাকাও তো আমার হাতে নাই! এখন পাই কোথা!"

শান্তি বলিল "কেন, দিদিকে বলনা কেন! তিনি এখন টাকাটা দিয়া দেন, পরে সুবিধা মত তুমি তাঁকে দিও!

সুবোধ কিছু রুক্ষ স্বরে বলিলেন "চুপ! খবরদার! দিদিকে এসব কথার কিছুমাত্র জানতে দিও না! তাঁকে আমি কখন বলতে পারবো না, তোমাকেও দিব্যি দিচ্ছি তুমি যেন তাঁকে কিছু বলো না, যা হোক্, তোমার নিজেরও ছেলেমেয়েদের ঐ রকম না হলে চল্‌বেই না নাকি! না হলে মাথাকাটাই যাবে?

শান্তি বলিল "যাবে বইকি! আমি ওসব না হলে কোথাও গিয়ে অপমান হতে পারবো না। তুমি না দাও, না দেবে কিন্তু আমার কথা এই যে কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষে করতে আমাকে যেতে বোলো না!

সুবোধ কিছুক্ষণ কি ভাবিল, তারপর বলিল, আচ্ছা! তাই হবে, যেমন করে হোক আমি তোমাকে ১০০৲ টাকা কালই দিতেছি, তুমি নিজ পছন্দ মত জিনিস তোমার দের সাজানো আনিয়ে নিও। আমার নিজের ওসব পছন্দ নাই, তা তুমি জান। আমার আনা জিনিস তোমার পছন্দ হয় না। কি বল।"

শান্তির মুখখানি কতকটা প্রফুল্ল হইল, সে বলিল, তা বেশ, আমাকে টাকা দিলে আমি জিনিস আনিয়ে নিতে পারবো, দোকানের বিল তোমাকে দিলেই বুঝ্‌তে পারবে যে আমি সে টাকা বাজে খরচ করি নাই কি নিজের সিন্দুকে এক কিছু রাখি নাই। তা শুধু আমারই কেন, আর সকলের কাপড় চোপড়ের টাকাও যা দেবে তাও আমাকেই দিও, আমিই সব কিনিয়ে নোবো। আর ফ্রেণ্ডস্ কাম্পানীদের কাছে একখানা পত্র দিও যে আমার দরকার মত কাপড় চোপড় জাঁকোড়ে চাকরাণীর মারফৎ পাঠায়, যা লওয়া হইবে নগদ দাম দেওয়া যাবে—বাকি ফেরৎ যাবে। দেখো, আমি পছন্দ করে জিনিষ কিনতে জানি কি না।

সুবোধ বলিলেন "ব্যবস্থা বেশ, সেই ভাল! কাল আমি টাকা জোগাড় করে দিবই। তারপর তোমার যেমন ইচ্ছে কোরো!"

ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিলেন রাত্রি প্রায় একটা বাজে! "ও! এতরাত হয়ে গেছে, আর না," এইবলিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, শান্তিও তাঁহার অনুসরণ করিল। সে সত্বরই নিদ্রিতা হইয়া পড়িল, কোলের মেয়েটিকে দুধ খাওয়াইতেও আজ মনে ছিলনা। সুবোধ বাবু তার পরও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নীরবে স্বীয় পত্নীর পোষাকের তালিকার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অস্থির হইয়া উঠিলেন। শেষ রাত্রির শীতল বায়ুতে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হইলে নিজের অজ্ঞাত সারেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

(৩)

আজ আনন্দ মোহন বাবুর অনাথালয়ে শারদীয়া পূজা উপলক্ষে বিশেষ উৎসব। তদুপলক্ষে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের সকলমহিলাকেই সাদরে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে ডেপুটি, মুনসেফ, সবডিপুটি, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার ও অন্যান্য আমলাবর্গ এবং আর ভদ্রঘরের মহিলাগণ বৈকালে এখানে সমবেত হইয়াছেন। পূজায় আর চারিদিন বাকি আছে। পূজা উপলক্ষে সকল পরিবারের ছেলে মেয়েরাই অবস্থানুরূপ নববস্ত্রাদি পরিধান করিয়া আনন্দ-উপভোগ করিবে, অনাথালয়ের বালকবালিকারাই কি কেবল বিষণ্ন বদনে থাকিবে, তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য কি কোন উপায় কেহ করিবেন না? আনন্দ-মোহন বাবুর গৃহিণী সেই নিবেদন সকলের নিকট আজ বিশেষ ভাবে জানাইবার জন্য এই আবাহন করিয়াছেন। কয়েকদিন হইল তাঁহার এক ভগিনীকন্যা তাঁর বাটীতে আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ ধনী মিত্র পরিবারের বধূ, নিজেও বেশ সুশিক্ষিতা, বি, এ, পর্য্যন্ত পাঠসাঙ্গ করিয়াছেন। বয়স ২৪।২৫ বৎসর হইবে নাম সুমিত্রা। ইঁহার স্বামীও এম্, এ, বি-এল, হাইকোর্টে ওকালতি করেন। এই মেয়েটি লক্ষপতির ঘরেরবধূ হইয়াও পোষাক পরিচ্ছদে আড়ম্বর শূন্য, একখানি সাদা দেশী সাড়ী, একটা সাদা সেমিজ আর দেশী কাপড়ের একটি জামা, এই তাঁর পোষাক। হাতে লৌহও শঙ্খের সহিত কয়েকগাছি চুড়ী, গলায় একটি সাধারণ নেক্‌লেস্। আর স্বভাবে বিনয় ও নম্রতার আধার। দেখিলে বোধহয় না যে মেয়েটি এত লেখাপড়া জানেন। তিনি আজ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অনাথঅনাথাদিগকে উন্মুক্ত আকাশতলে

খাওয়াইয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছেন এবং তাহাদের বয়সোপযোগী পুতুল, খেলনা, বলপ্রভৃতি দিয়াছেন।

সুবোধবাবুর ভগ্নী সুশীলাদেবী এবং স্ত্রী শান্তিবালাও এখানে আসিয়াছেন। সুশীলা একখানি সাদা থানধুতি আর একটা সাদা মোটা চাদরে নিজ দেহ আবৃত করিয়া আসিয়াছেন, শান্তিবালার সাজ-সজ্জার বিশেষ একটু পারিপাট্য ছিল, আজকালকার প্রাচুর্য্যও যে নাছিল তাহা নহে।

সুশীলা চাদরে মুখের অধোভাগ আচ্ছাদিত করিয়া এক কোণে বসিয়াছিলেন; সুমিত্রা বারবার তাহার দিকে অনুসন্ধিৎসুভাবে তাকাইতে ছিলেন, অথচ স্পষ্ট করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিতে ছিলেন না ইতিমধ্যে সুশীলার চার বৎসরের মেয়েটি তাঁর কাছে আসিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতে মুখের কাপর ফেলিয়া তিনি তাহার কথার উত্তর দিলেন; আর অমনি সুমিত্রা "দিদি! আপনি এখানে!" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হইয়া দুইহাতে তাঁহার পায়ের ধুলো মাথায় তুলিয়া লইয়া তাঁর মুখের দিকে তাকাইলেন। সুশীলা তখন ছল ছল চক্ষে সুমিত্রাকে দুই বাহু বেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইলেন, আবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। সুমিত্রাও দিদির বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া অশ্রুজল মোচন করিলেন।

সমবেত রমণীবৃন্দ এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্যে কিছু বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। আনন্দবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন "সুমি, তুই কি ওঁকে চিনতিস্!" সুমিত্রা মুখ তুলিয়া বলিল "মাসিমা, বলেন কি! চিনতুম্ কি! উনি যে আমার দিদি, সুধু কি দিদি, উনি আমার গুরু—উনি আমার—" সুশীলা তাড়াতাড়ি নিজ হাতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "ছি! বোন্, ছেলেমানুসি করিস্ না!—আমাকে আর লজ্জা দিস্ না।"

সুমিত্রা বিনীত ভাবে তাঁর হাত থেকে নিজের মুখকে মুক্ত করিয়া হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "না দিদি! আপনার আদেশ আর গুরুর আদেশ তুল্য! কিন্তু আজ আমাকে মাপ করবেন! আপনার পায়ে ধরি আমাকে মাপ করবেন; কারণ আমি যেন বুঝতে পাচ্ছি যে এখানকার এঁরা জানেন না যে আপনি কি! সেটা এঁদের একটু বুঝিয়ে দিই।" সুশীলা আবার অতি কাতরভাবে তাঁকে নিবারণ করিলেন, তখন সুমিত্রা তাঁর পা ধরিয়া বলিল, "না, তা হবে না আজ আমার অবাধ্যতা আপনি স্নেহ গুণেমাপ করবেন—করতেই হবে—আমার এ আবদার রাখতেই হবে। বলুন, রাগ করবেন না।" সুশীলা সুমিত্রার মুখ ধরিয়া চুম্বন করিলেন, তারপর বললেন "সুমিত্রা বি-এ পাশ হলে কি হয়, ও একটা পাগ্‌লী, আপনারা ওর কথার প্রায় ষোলআনাই বাদ দিয়ে গ্রহণ করবেন। সুমি, বোন, এই দেখ, আমার ভাই সুবোধের স্ত্রী, শান্তিবালা। ওর সঙ্গে আলাপ কর। বড় ভাল ভাজ পেয়েছি ভাই, বড় লক্ষ্মীমেয়ে।" এই বলিয়া সুশীলা সেখান হইতে উঠিয়া যেখানে তাঁর মেয়েটি অনাথদের ধুলাখেলা দেখ্‌ছিল সেই দিকে চলে গেলেন।

সুমিত্রা তখন বল্‌লেন "দেখ্‌লেন আপনারা, দিদি কেমন সুড় সুড় করে সরে পড়্‌লেন। নিজের প্রশংসা মোটেই উনি শুনতে চান্‌না, অথচ নীরবে যত প্রশংসার কাজ তাই উনি করে যাবেন। উনি যে কি ধাতুতে গঠিত আমি তা ভেবেই পাইনা। মাসিমা, আপনি বোধহয় ওঁর সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, কেবল ওঁর ভাইএর পরিচয়েই ওঁকে জানেন। কিন্তু আমি বলছি যে ওঁর ভাই যদি ওঁর পরিচয়ে পরিচিত হবার যোগ্য হয়ে থাকেন তবে তিনি ধন্য হয়ে যাবেন। শুনুন আপনারা, ওঁরা তখন হাজারিবাগে থাক্‌তেন, ওঁরস্বামী সেখানে ব্যবসাতে ৫।৬শো টাকা রোজগার কর্ত্তেন, ওঁদের বাড়ীর অবস্থাও বেশ ভাল। আমার সে সময় বড় অসুখ হয়, তাই হাজারিবাগে হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাওয়া হয়, আমার সৌভাগ্য যে ওঁর বাসার গায়েই আমাদের বাড়ী ছিল; সেই সূত্রে ওঁর সঙ্গে পরিচিত হই।

ওঁর স্বামী দেবতুল্য ব্যক্তি ছিলেন, হাজারিবাগের লোকে সকলেই তাঁকে বড় সন্মান কোর্ত্তো আর ওঁকে তো সকলে দেবীই বোলতো! দেবীর মতই ভক্তি কোর্ত্তো ওঁকে সকলেই। আমি প্রথম প্রথম দেখতাম যে যত গরীব দুঃখী, অনাথ, আতুর, সে ছেলেই কি আর বুড়োই কি, সারাদিন, ওঁর বাড়ীতে ভিড় লাগিয়েই রয়েছে। সেই সব নোংরা হিন্দুস্থানী ছোটলোক, কাছে গেলে গন্ধে বমি আসে, বুঝতে

পারতাম না যে এই বড়লোকের বাড়ী ওরা সারাদিন কি করে। তারপর ক্রমে জানতে পারলাম এই দেবী তাদের সর্ব্বপ্রকার অভাব পূরণ করেন, নূতন কেহ গেলেই তিনি নিজের লোক দিয়ে তার প্রকৃত অবস্থা জেনে নেন, সত্যি সত্যিই অনাথ গরীব হলে তাদের নানারূপে সাহায্য করেন, আর কি মিষ্ট কথা! সেই মিষ্ট কথাতেই তাদের প্রাণ ভরে যায়।

হোমিওপাথি চিকিৎসাও ওঁর জানা আছে, দরকার মত ঔষধাদিও দেন। ওঁর স্বামীটিও এসব কাজে ওঁর যথেষ্ট সাহায্য কর্ত্তেন আর উৎসাহ দিতেন। আমি এখন স্বীকার কর্ত্তে আর লজ্জাবোধ করিনা যে আমি প্রথম বয়সে বড় গর্ব্বিতাই ছিলাম। পিতার অবস্থাও ভালই ছিল, আর বিয়ে হোলো বনিয়াদী ধনীর ঘরে, সুতরাং ধনগর্ব্বে আমি তখন যেন মাটিতে পা দিতাম না ধনকেই সুখ জ্ঞান করতাম, নিজের সুখ বিলাসেই আমি মত্ত ছিলাম। কঠিন রোগে সর্ব্বদা বিছানায় পড়ে থাকতাম আর দিদির সব কার্য্যকলাপ শুয়েশুয়েই যেন দেখতে পেতাম, শুনতে তো পেতামই। বড় ইচ্ছা হোতো এই মানুষটির সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে। কিন্তু নিজে তো যেতে পারি না, শক্তি নাই; ওঁকে আসতে বলতেও সাহসে কুলাতো না। এই রকমে ৪।৫ দিন গেল। তারপর একদিন আমার অসুখ এত বেড়ে উঠলো যে যাঁরা আমার সঙ্গে ছিলেন তাঁরা বড় ভীত হয়ে পড়লেন যে পরের দিনের সূর্য্যের মুখ বুঝি আমি আমিদেখতে পাব না। সঙ্গে কেবল স্বামী ছিলেন আর আমার এক ননদ ছিল, আর ৪।৫ জন ঝি চাকর। ননদটি তো আমার অবস্থা দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো। তাই শুনতেই দিদির স্বামী বেরিয়ে এসে এঁদের কাছে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করলেন, তার পরই দিদিকে সঙ্গে করে এবাড়ীতে দিয়ে গেলেন। আমি তো তখন অজ্ঞান অচৈতন্য। যখন প্রথম জ্ঞান হোলো তখন চোখ চাইতেই দেখি এই দেবীর কোলে মাথা দিয়ে আছি, আর, তিনি কি স্নেহের চোখেই আমার দিকে চেয়ে আছেন! সে মিষ্ট চাহনিতেই যেন আমার অর্দ্ধেক রোগ সেরে গেল। সেই যে আমাকে নিয়ে পড়লেন ক্রমাগত ১২।১৪ দিন পর্য্যন্ত যমে মানুষে লড়াই চললো! কেউ তাঁকে আমার কাছ থেকে ওঠাতে পারেনি। কেবল স্নানাহারাদি একান্ত প্রয়োজনের জন্য যে উঠতেন সেও সুবিধা বুঝে। এমন সেবা এমন যত্ন, এমন শুশ্রূষা পদ্ধতির জ্ঞান নার্শদেরও নাই, থাকতে পারেনা। প্রথম প্রথম আমাদের এঁরা সঙ্কোচে আমাকে দেখতে আসতে পারতেন না তাই দেখে দিদি আমার ননদকে বললেন তোমার দাদাকে বোলো যখন ইচ্ছা তিনি দেখে যেতে পারেন, কোন সঙ্কোচের দরকার নাই তবে অধীরতা প্রকাশ না করেন, আর বেশীক্ষণ না থাকেন! যাক্! সে আর কত বোলবো আপনাদের কাছে। দিদির সেই প্রাণপণ চেষ্টাতেই আমি বেঁচে গেলাম। এঁরা তো দিদি আর তাঁর স্বামীর জিম্মাতে আমাকে রেখে প্রয়োজন পড়িলেই কলকাতা চলে আসতেন, কখন ১০।১২ দিনও দেরী হোতো কিন্তু তাতে আমি কিছু অসুবিধা বুঝিতে পারি নাই। শেষে আমি ভাল হইয়া উঠিয়া দেখিলাম যে এই স্পর্শমণির গুণে আমার শরীরের রোগ যেমন ভাল হোলো, সেই সঙ্গে আমার মনের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা সব যেন কোথায় পালিয়ে গেল, আর দুঃখী আতুর দেখলে ঘৃণা হোতো না—নিজের ক্ষুদ্রতাতেই ক্রমে নিজে লজ্জিত হতাম ক্রমে আমি এবং পাড়ার আরও কয়েকটা মেয়ে তার মধ্য দুজন হিন্দুস্থানী মেয়েও ছিল, দিদির শিষ্যা হইয়া তাঁর ব্রত আমাদের মাথাতেও তুলে নিলাম আর যথাসাধ্য দরিদ্র নারায়ণের সেবা কর্ত্তে লাগলাম। কিন্তু দিদির সে মহত্ত্ব সে দেবীভাব সে মধুর স্বভাব সে মিষ্ট কথার শান্তিময় প্রলেপ আমরা কোথায় পাইব? ভাই শান্তিবালা, তুমি ধন্য বড় সৌভাগ্যবতী যে এমন দেবীকে দিদিরূপে পেয়েছ, আর দিনরাত তাঁর কাছে আছ। দিদিকে চিনতে চেষ্টা কোরো ভাই, দেখবে কি রত্ন তিনি। এক বৎসর দিদির কাছে ছিলাম সে যে কি সুখে তা কি বললো। হাজারিবাগে দেবীজি বলিলে দিদি ভিন্ন আর কাকেও বুঝাত না এখনো তাই আছে।

ভগবান্ যখন দিদিকে এতবড় বিপদের মধ্যে ফেলিলেন তখনও দিদি সে প্রহার বুক পেতেই সয়ে নিয়েছিলেন, সে সময়কার দিদির চিঠিগুলো আমি দেবতার নির্ম্মাল্যের মত করে তুলে রেখেছি। তারপর তাঁর শ্বশুর শাশুড়ীরাও ছেলের কাছে চলে যাবার পর আজ তিন বৎসর দিদির

খবর আমি পাইনি। দিদি পত্রাদি দেওয়া তারপর থেকে বন্ধ করেছেন। মাসীমা, আপনার দয়াতেই আজ আমার ভাগ্যে আবার দেবীদর্শন হোলো" এই বলিয়া সুমিত্রা মাসীমার পদধূলি গ্রহণ করিবে এবং সমবেত বয়োজ্যেষ্ঠাগণকেও প্রণাম করিল। সকলে সুমিত্রার কাহিনী স্তম্ভিত ভাবে শুনিতেছিলেন, তাঁহা যেন দেশকালপাত্র সবই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এখন তাহাদের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল, তখন সকলে এই অসাধারণ রমণীটিকে পুনরায় ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু আর সেখানে দেখিতে পাওয়া গেল না। সুমিত্রা বলিলেন "তিনি নিশ্চয় বাসাতে চলিয়া গিয়াছেন। সে আমি আগেই বুঝেছিলাম। তাঁর ভাব তো জানি! কিন্তু আমি যে না বলে পারলামনা। মাসিমা, আপনার অনাথালয়ের একজন প্রকৃত কর্ম্মী আপনি ওঁর মধ্যে পাবেন, যেমন বহিরে শাদা তেমনি ভিতরটিও শাদা। সে দিনেও তাঁকে সাজ পোষাক কর্ত্তে কখনো দেখিনি, অলঙ্কারবাহুল্যও ছিলনা কিন্তু তিনি যেখানে যেতেন লক্ষ লক্ষ টাকার অলঙ্কার গর্ব্বিতারাও সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁকে সম্মান কোর্ত্তো। এদিকে এমন ওদিকে আবার কারো খোসামোদ করা অভ্যাস নাই চাটুবাক্যে ভুলালোনোরও চালবাজি নাই! দেবী! দেবী!"

সুশীলাকে না পাইয়া সকলেই বড় অতৃপ্ত বোধ করিতে লাগিলেন; শান্তিবালাতো প্রাণের মধ্যে কেমন একটা অস্থিরতাই বোধ করিতে লাগিল আর ঘন ঘন চোখদুটি সজল হইয়া উঠিতে লাগিল! আজ প্রথম তাহার বস্ত্রালঙ্কার তাহাকে পীড়াদিতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রহিয়া রহিয়া যেন তার প্রাণ ডুকরিয়া কাঁদিতে লাগিল! সে কাকে কি মনে করিয়াছে! উঃ! কি ভ্রম! কি পরিতাপ! এদিকে বেলা শেষ হইয়া আসিল। অনাথ বালকবালিকাগণ সুশীলা কর্ত্তৃক শিক্ষিত অমর কবি রবীন্দ্রনাথের "ভিখারিণী মেয়ে"র কবিতাটি সমস্বরে সকলের সমক্ষে অতি সুন্দর ভাবে আবৃত্তি করিল! সকলেরই প্রাণে কবিতার ভাবটি প্রগাঢ়ভাব স্পর্শ করিল, সত্যইতো আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে দেশ ছাইয়া গিয়াছে অথবা দ্বারে ভিখারিণীমেয়ে বিরস বদনে দাঁড়াইয়া থাকিবে? কেহ তাহাকে ডাকিয়া দুটি মিষ্ট কথা বলিবেনা কেহ তার ছিন্ন অঞ্চলে দুই মুষ্টি অন্ন দিবেনা, পরিবার একখানি বস্ত্র দিবেনা! তবে কি হবে এই সব মঙ্গল কলসে, আর মায়ের পূজার আড়ম্বরে—সেখানে কি মা থাকিতে পারেন যেখানে তাঁর গরীব মেয়ের মুখ বিষাদ মাখা।

শান্তিবালা তো কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, সুশীলা ছল ছল চক্ষে বলিল "তুমি ভাই দিদির উপযুক্ত লক্ষ্মী ভাজই বটে!" শান্তিবালা একথাতে আরও কাঁদিয়া উঠিল উঃ! একি অদৃষ্টের পরিহাস! একি বাহ্যআচরণ ভ্রান্তি!"

ইতিমধ্যে শান্তিবালার দেবর এবং ভাগিনেয় আসিয়া তাহাকে বলিল, সন্ধ্যা হয়ে গেল এখন যেতে হবে। শান্তিবালা কোনরূপে সকলের কাছে বিদায় লইয়া সুশীলাকে আলিঙ্গন করিয়া ছেলেদের সঙ্গে পদব্রজেই চলিয়া গেল। আনন্দবাবুর স্ত্রী পাল্কী ডাকিতে পাঠাইলে শান্তি করজোড়ে তাহাকে নিবারণ করিল—পথতো তেমন বেশী নয়, সে হাঁটিয়াই বেশ যাইতে পারিবে।

পথে যাইতে যাইতে সে ছেলেদের সঙ্গে একটা কথাও বলিতে পারিলনা। সঙ্গিনী পরিচারিকার কোল হইতে কোলের মেয়েটিকে নিজের বুকে তুলিয়া লইয়া তাহাকে এমন করিয়া সময় সময় চাপিতে লাগিল যে সে যেন ব্যথা পাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। তবু যে হৃদয়ের আবেগ শান্ত হয় না।

(৮)

পরদিন শান্তিবালা স্থানীয় ফ্রেণ্ড কোম্পানীতে স্বামীর পূর্ব্বপ্রদত্ত পত্রসহ একখানি ফর্দ্দ পাঠাইয়া পূজার কাপড়-চোপড় আনাইয়া লইল, এবং তাহা নিজের ঘরের মধ্যে পরিচারিকার দ্বারা আনাইয়া লইয়া ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া দিল। তারপর সেই সব কাপড়, জামা প্রভৃতি একএক ভাগে গোছাইয়া বাধিল। সকলের চেয়ে বড় ভাগটিতে ৪খানি বালিকাদের উপযুক্ত মিলের ধোয়া সাড়ী, আর ঐমাপের ৪টি মোটাকাপড়ের সেমিজ, একটি মোটা ছিটের ফ্রক, আর ছেলেদের উপযুক্ত ৭খানি ধুতি এবং ৭টি ঐমাপের মোটা ছিটের কোট এইগুলি একত্রে একবস্তাতে বাঁধিয়া একখানি খামের মধ্যে ৫৲ টাকার

একখানি মোট আর তার সঙ্গে একখানি কাগজে "ছেলে মেয়েদের পূজার পোষাক এবং মিষ্ট ভোজনের জন্য দীনার উপহার" এই লিখিয়া খামখানি বন্ধ করিয়া দিল। তারপর চাপরাসীকে ডাকিয়া চুপে চুপে তাহাকে বলিয়া দিল যে ঐ কাপড়ের বস্তা ও পত্রখানি সে আনন্দ বাবুর স্ত্রীর নিকট পৌছাইয়া দিবে। কিন্তু নিজের উর্দ্দি, চাপকান সমস্ত খুলিয়া রাখিয়া যাইবে, আর এমন ভাবে দিবে যেন তাকে কেহ চিনিতে না পারে, তাহার নাম যেন সে কিছুতে না বলে। চাপরাসী সে আজ্ঞা বলিয়া চলিয়া গেল।

তারপর দুই দেবর ও দুই ভাগিনেয়ের জন্য ও ঐরূপ দেশী ধোয়া ধুতি এবং ভাল ছিটের জামা ও কোট, ভাগিনেয়ীটীর জন্য সুন্দর একটি ছিটের ফ্রক মোজা ও জুতা ছোট ননদটির জন্য রেশমী চুলে কাটা সুন্দর নীলাম্বরী সাড়ী, একটি গোলাপী রঙ্গের সেমিজ ও একটি কলকাটা সুতি ব্রাউজ, শাশুড়ীর জন্য একখানি দেশী ধোয়া শাড়ী, দিদির জন্য একখানি সাদা ধোয়া ধুতি, আর নিজের ছেলের জন্য ছিটেরই একটি নিকারবকার মোজা, আর গোড়ালীহীন অল্পদামের জুতা মেয়ের জন্য ছিটের একটি পেনি এই সব বাছিয়া রাখিল। বাকি কাপড়চোপড় আবার বস্তাবন্দী করিয়া ফর্দ্দের সঙ্গে মিলাইয়া অন্য লোক দ্বারা দোকানে ফেরৎ পাঠাইয়া দিল, মূল্যের টাকা বৈকালে পাঠাইয়া দিবে তাহাও লিখিয়া দিল।

তারপর সে দিদির ঘরের দিকে গেল। গতকল্য আনন্দ বাবুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া সে দিদির সম্মুখে যাইতেই পারে নাই, নিজের ঘরেই চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল, আর কাঁদিয়াছিল। দিদি তার খোঁজ নিতে দুবার এসেছিলেন কিন্তু কবাট খোলাইতে পারেন নাই। সুতরাং ব্যথিত ভাবেই তিনি ফিরে গিয়েছিলেন। প্রাতঃকাল হইতেও এপর্য্যন্ত সে নিজের খেয়াল লইয়াই মগ্ন ছিল। দিদির সম্মুখে ও যায় নাই। দিদি তাহার গতিবিধি সবই লক্ষ্য করছিলেন কিন্তু কোন কথা বলেন নাই।

এখন সে সাহস করিয়া দিদির ঘরের দিকে গেল বটে, কিন্তু যতই সে ঘরের নিকটবর্ত্তিনী হইতে লাগিল ততই যেন তার পা কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, দ্বারের নিকটে গিয়া সে থমকিয়া দাড়াইল, কিছুতেই পাদুটিকে চৌকাটের ওপরে পৌছাইতে পারিলনা, দুই তিনবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সেবৃথা। সুতরাং আবার অতি সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া সে নিজের ঘরে ফিরিতে যাইতেছে এমন সময় অত সাবধানতা সত্ত্বেও কেমন করিয়া আঁচলটা কবাটের শিকলে লাগিয়া গিয়া "ঝন্—ঝনাৎ" শব্দ হইল, আর অমনি দিদি চমকিয়া বলিলেন "কে রে!" আর কে, রে, শান্তি তখন পা টিপিয়া চলা ছাড়িয়া ছুটিয়া নিজ ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। "তবে রে চোর, দেখাচ্ছি দাঁড়া" এই কথা কয়টি অতি মধুর স্নেহমাখা স্বরে উচ্চারণ করিয়া তার পশ্চাৎ পশ্চাতই দিদি তার ঘরে আসিয়া পৌছিলেন। দিদির ঐ কথা কয়টি শান্তির কানে আসিয়াই পৌছিয়া তাহার প্রাণের উপর কিযে এক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কথাকয়টির মধ্যে শান্তি কি যে এত দিনের অজানা স্নেহের মিষ্টত্বের সন্ধান পাইয়া ছিল, তাহা সে বলিতে পারেনা, কিন্তু সে একেবারে গলিয়া গিয়াছিল। সে নিজের ঘরের তক্তপোষের উপরে উবু হইয়া কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, দিদি আসিয়াই যেমন দুইহাতে তাহার মুখখানি খুলিতে চেষ্টা করিলেন, অমনি সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। "একি শান্তি, একিবোন, আজ আমার যে বড় আনন্দের দিন, আমি যে আজ আমার চোরকে সাজা দিতে এসেছি লক্ষ্মী দিদি আমার, আর তুই নাকি কাঁদছিস" এই বলিয়া জোর করিয়া তার মুখ তুলিয়া ধরিয়া তাতে আজ এক নূতন শোভা দেখিলেন যাহা সে মুখে তিনি পূর্ব্বে দেখেন নাই, প্রভাতশিশিরস্নাত কমলকলিকার মত সে মুখের পবিত্রভাবে দিদি মোহিত হইয়া চুম্বনে চুম্বনে সে মুখ ছাইয়া ফেলিলেন, আর শান্তি তাঁর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। দিদিরও চোখ দুটি স্বর্গের আশীষ ধারার মত অশ্রুধারায় শান্তির আনত মস্তকসিক্ত করিতে লাগিল—মুখে অনাবিল মৃদুহাস্য রেখা এ অশ্রু আনন্দের—স্নেহের!

"ছি বোন, কাঁদছিস কেন! আজ কি কাঁদবার দিন!" আঁচল দিয়া মুখ মুছাইয়া আবার চুম্বন দিয়া দিদি বলিলেন। সে চুম্বনে স্নেহ ধারা যেন উথলিয়া পড়িয়া শান্তির প্রাণের

জ্বালায় শান্তি করিয়া দিল। সে মুখ নত করিয়া তখনো কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "দিদি, আমি যে বড় অপরাধী! আমায় যে মার্জ্জনা নাই আমি যে দিদি দেবীপ্রতিমা পা দিয়া ঠেলিয়া দিয়াছি।" এই বলিয়াই ধপ্ করিয়া দিদির পায়ের উপরে পড়িয়া গেল!

দিদি আবার তাকে স্নেহাদবে কোলে তুলে নিয়ে অতি মিষ্টভাবে বলছেন "ছি! ছি! ওকি কথা শান্তি! আমার আজ আনন্দ ধরছে না যে বোন্! আমার বোনকে আমি আজ নিবিড় ভাবে কোলে পাব বলে যে কালরাত থেকেই আমি প্রত্যাশায় বসে আছি ভাই। দুবার রাতে তোর খোঁজে গেছি, দুবারই দরজা খোলা পেলুম না। সুবোধ যদি কাল মফঃস্বল থেকে ফিরে আস্তো, তবে কালই দেখ্তাম চোব পালায় কি করে!"

শান্তি বিস্মিতা হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে "তা হলে তুমি জান্তে দিদি! কি করে জান্লে যে আমি পুড়ে মরছি! আর চোরই বা কিসে হলুম?

দিদি হেসে বল্লেন, "আমার মনই জানিয়ে দেয়রে! চুরী করেছিস আমার মন। আমাব প্রাণ, আমার স্নেহ, আমার মায়া। কতদিন লুকিয়ে রাখবি! তুই যা কচ্ছিস্, সব জানি! অনাথাশ্রমে যা গেল তাও জানি। এসব এত কাপড় চোপড় কিসের!

শান্তি বলিল, সকলের পূজার কাপড় দিদি তুমি দেখ, কেমন হোলো! দিদি বলিলেন "তোর সাড়ী আর ব্লাউজ কইরে! সেই ৭০৲ টাকা দামের। শান্তি দিদিব পায়েব ধূলো সর্ব্বাঙ্গে মেখে বললো এই আমার সে শাড়ী দিদি, আর এই আমার সে ব্লাউজ" বলে মুখখানা দিদির মুখের কাছে নিয়ে গেল, দিদি তাতেও চুম্বন আঁকিয়া দিলেন। "আর লজ্জা দিওনা দিদি, আমি এখন বুঝেছি সুমিত্রাদি কেন তোমাকে স্পর্শমণি বলে। তোমার বোন বলে পরিচয় দিতে পারি তাই করো।"

"যা, যা শান্তি, ওঘরে যা, সুবোধ এই ফিরে এল, যা—যা—মা লজ্জা কি! যা আজ তোর নতুন পোষাকে কেমন দেখাচ্ছে, সুবোধ দেখেই বুঝ্তে পারবে।" শান্তি নতমুখী হইয়া মুচ্কি হাসিতে লাগিল, পরক্ষণেই হঠাৎ দিদির জন্য আনান কাপড়খানি নিয়ে দিদির পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করিল!

"এ কিরে! এ আবার কি!" দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তোমার জন্যে এনেছি দিদি।"

"আমার জন্যে! পুজোর কাপড়! ছি! ছি! তুই কি পাগল নাকি!"

"না দিদি, তোমাকে পরতেই হবে। আমি যে সাধ করে এনেছি তুমি পরবে বলে দিদি। তুমি কি তা রাখ্বে না!" শান্তি আবাব কাঁদিয়া উঠিল। "ছি! আজকার দিন আমার বড় সুখের! তুই কেঁদে আমাকে কষ্ট দিস্নে বোন্! আচ্ছা! আচ্ছা! আমার জন্য এনেছিস পববো বইকি! পরবো! দে আমাকে। দিদি হাত বাড়াইয়া দিলেন, শান্তি বড় আনন্দও আগ্রহেব সঙ্গে দিদির হাতে কাপড় দিয়া আবার তাঁর গলা জড়াইয়া ধরিল, তিনি আবার সে মুখখানি চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন।

তারপর বলিলেন "না! তুই তো গেলিনে ওঘরে আচ্ছা, ভাই, আমি ঘবে যাচ্ছি। সুবোধ এঘরের দিকেই আসছে!" এই বলিয়া দিদি তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সুবোধ একটু পবেই শান্তির ঘরে প্রবেশ কবিল এবং মেজেতে মাদুবেব উপব বিছান কাপড় চোপড় দেখিল আর একবাব স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। শান্তিও চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, ওমা! ওকি চাহনি! আজ প্রায় সাত বছর বিয়ে হয়েছে, এমন চাহনি তো কখনো দেখিনি গো! অমন কবে চাইলে যে আমি সইতে পারিনা আমার বুকের মধ্যে যে কেমন করে! মানুষের চাহনি কি কখন এমন মিষ্টি হয়! এঁ্যা! কি ছার এর কাছে অমৃতের প্রলেপ! মুহূর্ত্ত মধ্যে এই চিন্তায় পুলক কণ্টকিত দেহ, বেপথুমতী শান্তি ধীরে ধীরে উঠিয়া স্বামীর চরণে প্রণাম করিতে গেল, অমনি সুবোধবাবু উভয় হস্তে তাহাকে আলিঙ্গন বদ্ধ করিয়া তাহার রক্ত কপোল এবং ওষ্ঠাধরে প্রেমের প্রবল প্রবাহের তরঙ্গরেখা অঙ্কিত করিয়া দিলেন। উঃ! একি হইল গো! শরীরের মধ্য দিয়া একি এক অননুভূত পূর্ব্ব তড়িৎ প্রবাহের শিহরণ বহিয়া গেল! এ যে সেই বিনিশ্চেতুংশক্যো ন সুখ মিতি দুঃখ মিতিবা! সত্যই যে তোমার এ স্পর্শে আমার ইন্দ্রিয় প্রায় অচল হইয়া গেল না বিকারগ্রস্থ হইল।

বিবাহকাল হইতে চুম্বন তো তোমার কাছে কত লইয়াছি কিন্তু আজ দুই সন্তানের জননী হইয়াও আমি যে সুখ ইহাতে বুঝিলাম, উদ্ভিন্নযৌবনাবস্থাতে বুঝি এমনটি পাই নাই! আজ তোমার একি করুণা! তবে কি তুমি ও সব জেনেছ!

সুবোধ বলিলেন "শান্তি, আজ তুমি সত্যই আমার শান্তি; আমার ঘরের শান্তি, আমার প্রাণের শান্তি! মফস্বল থেকে ফিরবার সময় ফ্রেণ্ডদের দোকানে একটু বসেছিলাম, তাদের কাছে তোমার ফেরৎফর্দ্দ দেখে এসেছি! আনন্দবাবুর স্ত্রীকে যা পাঠিয়ে ছিলে তার রসিদও এই আমার কাছে নাও।

এখন তোমার পূজার পোষাকটা কি আমলে সেইটা একবার দেখাও দেখি। চোখ সার্থক হোক।"

হৃদয়ে পূর্ণ প্রেমের তরঙ্গ চক্ষে খেলাইয়া শান্তি স্বামীর পদধুলি দুহাতে সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে বলিল এই আমার পূজার পোষাক, এই একটু আগেই তো আমাকে অমূল্য পোষাক সাজিয়েছ তুমি! স্বামীর সত্য প্রেম যে কি তা আমি আজ পেয়েছি—সেই আমার অমূল্য পূজার পোষাক—আর দিদির আশীর্ব্বাদ এবং স্নেহধারাও পেয়েছি সেওআমার পবিত্র পোষাক। ইহাই যেন জন্ম জন্ম বজায় থাকে।

সুবোধ আবার প্রিয়তমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া নিমীলিত নয়নে অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

বিষ্যুৎবারের বারবেলায়।

শ্রীঅপ্রকাশ মজুমদার।

কেলো যখন জন্ম নিল বিষ্যুৎবারের বারবেলায়,
বল্লে সবাই,—সৃষ্টিছাড়া অলক্ষ্মী এ খাবে বাপ-মায়।
কাটতে লাগল ক্রমেই দিন মলোনা বাপ-মা,
বল্লে সবাই—দেখ্‌বে শেষে, এখন কিন্তু দেখ্‌ছনা।
পাঁচ বছরে কেলো যখন গেল পাঠশালায়,
বল্লে সবাই,—হবেনা কিছু, জন্মেছে যে বারবেলায়।
শাস্ত্রে যে কয় এমন ছেলে হতেই হবে অলক্ষণে,
বিষ্যুৎবারের বারবেলায় যে জন্মেছে দুর্দ্দিনে।

(২)

সত্যিই যখন দেখা গেল বৎসর কয়েক পরে,
কেলো হল কালীবাবু বিদ্যাবুদ্ধির জোরে,
সরস্বতীর বরপুত্র, ছড়িয়ে গেল খ্যাতি,
দেশ-বিদেশে বেজায় তার হল প্রতিপত্তি,
আনতে লাগল বেজায় টাকা বিদেশ থেকে ঘরে,
বল্লে সবাই—কচ্ছে চুরি পড়বে ধরা পরে।
শাস্ত্রে যে কয় এমন ছেলে হতেই হবে অলক্ষণে,
বিষ্যুৎবারের বারবেলায় যে জন্মেছে দুর্দ্দিনে।

(৩)

ধরা কিন্তু পড়ল না সে দেখা গেল পরে
বয়স বেড়ে পেন্সন নিয়ে এল যখন ঘরে।
দালান কোটা উঠল বেজায় সারা বাড়ী ভরে
বল্লে সবাই তাইত এমন হবে কেমন করে।
শাস্ত্রে যে কয় এমন ছেলে হতেই হবে অলক্ষণে,
বিষ্যুৎবারের বারবেলায় যে জন্মেছে দুর্দ্দিনে॥

(৪)

তিনটীদিনের জ্বরে ভুগে মল্লো কালী যবে,
সবাই তখন বল্লে হেসে—সেকি, শাস্ত্র মিথ্যা হবে?
না হলে কি মরেরে কেউ তিনটি দিনের জ্বরে,
দু'এক মাস ত কেটেই যায় এমনি জ্বরের ঘোরে।
শাস্ত্রে যে কয় এমন ছেলে হতেই হবে অলক্ষণে,
বিষ্যুৎবারের বারবেলায় যে জন্মেছে দুর্দ্দিনে।
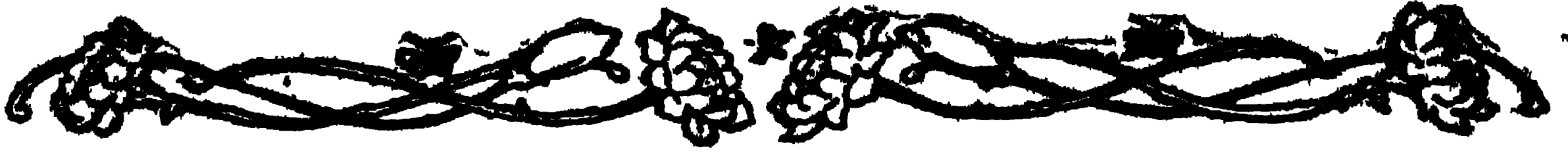
নারীর আকর্ষণ

পুরুষ ও স্ত্রী এই দুইটী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণী শক্তি আছে, তবে এই আকর্ষণের প্রভাব নারীর অধিক আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে পূর্ণিমা অমাবস্যায় যেমন নদীতে জোয়ার ভাঁটার আবির্ভাব হয় নারীর জীবনে তেমনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে জোয়ার নামিয়া ঋতুনিরোধ (Menopause) সময়ে ভাটা পড়িয়া থাকে—অর্থাৎ যৌবনোন্মেষের সঙ্গে তাহার আকর্ষণাশক্তি বাড়িতে থাকে ও ক্রমশঃ প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে উহা অবসান প্রাপ্ত হয়। সুতরাং নারীর এই আকর্ষণকে কেবলমাত্র নারীর মানসিক আকর্ষণ বলা চলে না উহার সঙ্গে যৌবনের দৈহিক সম্মোহনও অনেক পরিমাণে থাকে। এই আকর্ষণের মলে সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় উদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে এবং এই যৌন আকর্ষণ কেবল মানব সমাজের একচেটিয়া নহে ইহা জীব জগতে ও উদ্ভিদজগতেও পরিব্যাপ্ত। বিশ্বের সৃজন শক্তির মহা আয়ুধ হচ্ছে এই আকর্ষণ পুরুষ নারীদিগকে আকর্ষণ করে তবে তাহার ফল তত সহজে লক্ষ্যীভূত হয় না কারণ নারীর আকর্ষণ অধিকতর প্রবল। পুরুষের স্বভাব উদ্দাম, সে আকর্ষণের মুখে সহজেই গা ঢালিয়া দেয় কিন্তু নারী থাকেন দৃঢ় অচঞ্চল— অবশ্য আকর্ষণে বা যৌবনের মদির রস পানে কেহ যে স্থানচ্যুত হয়েন না এমন কথা বলা চলে না তবে নারী প্রকৃতিতে সংযম জিনিসটা যতটা বিদ্যমান আছে পুরুষ চরিত্রে ততখানি আত্মদমন শক্তি নাই। এই আকর্ষণ উভয় শ্রেণীতেই বিদ্যমান থাকে তবে একে তাহা প্রস্ফুট অন্যে তাহা প্রচ্ছন্ন। তবে সকল নর সকল নারীকে আকৃষ্ট করিতে পারে না এবং সকল স্ত্রী সকল পুরুষকে টানিয়া রাখিতে পারে না, এই আকর্ষণের মধ্যেও অনেক নিয়মকানুন আছে যে সকলের অস্তিত্ব হেতু এই আকর্ষণ সার্ব্বজনীন না হইয়া বিশিষ্ট ভাব ধারণ করে। পুরুষ ও প্রকৃতির সম্মিলনই পূর্ণত্ব ; মিলনের ফলে একটী সম্পূর্ণ পুরুষ ও একটী সম্পূর্ণ স্ত্রী থাকা চাই। যে পুরুষের চরিত্রের এক চতুর্থাংশ নারী-ভাব ও যে নারীর চরিত্রের এক চতুর্থাংশ পুরুষভাব তাহাদের মিলনকে পূর্ণ মিলন বলা যায় এবং এই মিলনই প্রকৃত মনের মিলন, ইহার ব্যতিক্রম হইলেই সে মিলনের মধ্যে অনেক অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে যাহার ফলে ঐ মিলন বিচ্ছিন্ন হয় ও মনোভঙ্গ জনিত অসুখে দুইটী বিভিন্ন জীবন হৃতসুখ হইয়া পড়ে। একজন পুরুষ ও একজন নারীর মিলনে যে মনোমিলন হয় দুইটী অন্তরঙ্গ পুরুষের বন্ধুত্ব বা দুইজন নারীর আন্তরিকতা সে শ্রেণীর মিলন ঘটাইতে পারে না। স্বামী স্ত্রীর 'মিলন' বড় কি বন্ধুত্বের মিলন বড় সে কথার বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয় তবে বন্ধুত্ব আর যৌনপ্রেম দুটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিস। সমশ্রেণীর মধ্যের মিলনকে বন্ধুত্ব বলা যায় বিপরীত শ্রেণীর মিলন 'যৌনপ্রেম" এই প্রেম ও আকর্ষণের আবরণে কামনার বাস—'নিষ্কাম প্রেম' ব্যতীত থাকিতে পারে তবে যৌনপ্রেম নিষ্কাম হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। Platonic Love অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেম অর্থাৎ বন্ধুভাব বিলাতী সভ্যতার একটা ফল কিন্তু বাস্তবে যে উহা কতটুকু পাওয়া যায় এবং সত্যই উহার মধ্যে যে কামনা থাকে না একথা হলফ করিয়া বলা বড় কঠিন। এই Platonic Loveটা বিলাতী সমাজের বুকে একটা বিরাট দুঃস্বপ্নের মত জুড়িয়া বসিয়া তাহার শ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখিতেছে —তাহা সেই সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের লেখনীর মুখে ধরা পড়িতেছে।

এই যৌন আকর্ষণের একটা শক্তি আছে সেটা আকর্ষক ও আকৃষ্টের প্রকৃতির বৈপরীত্যানুসারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এই পরস্পর বিপরীত দুই বস্তুর আকর্ষণ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। এই রীতি অনুসারে অল্পবয়স্ক পুরুষ বর্ষীয়সী গণের প্রীতিভাজন হয়েন এবং যুবতী নারীর প্রতি বৃদ্ধের সাগ্রহ লোলুপ দৃষ্টি নিপতিত হয়। চতুর পুরুষ বুদ্ধিহীনা নারীকে পছন্দ করে, চতুরা স্ত্রী নির্ব্বোধ স্বামীতে আনন্দ পায়, প্রখরা রমণীরা মূঢ় স্বামী গ্রহণ করিতে চায় আর শান্ত প্রকৃতি নারীদের স্বামী প্রখর ও চঞ্চল হইয়া থাকে। পুরুষ ও নারীর মিলন একেবারে দৈব ঘটনা বা আকস্মিক

সংঘটন নহে ইহা প্রকৃতির পূর্ব্ব নিয়ন্ত্রিত অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। এই যৌন আকর্ষণের চলিত নাম 'প্রেম'—প্রেম সাধারণতঃ দুই প্রকার এক দৈহিক (organic need) যাহা পাশবিক নামেও অভিহিত হয় আর একপ্রকার মানসিক (Psychologic) ইহাই নিষ্কাম প্রেম Platonic love, বন্ধুত্ব প্রভৃতি বহুবিধ আখ্যায় অভিব্যক্ত হইয়া থাকে তবে এই দুই প্রকার প্রেমের মধ্যেও সংমিশ্রণ আছে দৈবাৎ একবারে এক শ্রেণীর organic বা Psychological প্রেম দেখিতে পাওয়া যায়। রজকিনী রামীর প্রতি চণ্ডীদাসের প্রেম শেষোক্ত প্রকারের, "কামগন্ধ" নাহি তায়, ভারতবর্ষে প্রথম প্রকারের প্রেমকে 'কাম' ও দ্বিতীয় প্রকারের প্রেমকেই প্রেম বলাহয়। প্রতীচ্য দেশে love কথাটিই প্রেমের জ্ঞাপক উহাদের মধ্যে Pysochological love টা বেশী চলিত না থাকায় তাহার কোন স্বতন্ত্র সংজ্ঞানাই। ত্যাগের দেশ ভারতবর্ষ, প্রেম ও কাম এই দুইটী বিভিন্ন শব্দ দ্বারা চিরদিনই যৌন আকর্ষণকে বিভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভোগের দেশে কামই প্রেম সুতরাং তথায় উহার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই। অসভ্য সমাজে পুরুষকেই নারী আকর্ষণের জন্য ফাঁদ পাতিতে এবং তজ্জন্য নিজেকে যথাসাধ্য সুবেশ ও সুন্দর করিতে চেষ্টা করিতে হয়। সভ্য সমাজে কিন্তু ইহার বিপরীত এখানে নারীই পুরুষবিমোহন জন্য সৌন্দর্য্যের ফাঁদ পাতেন যেসমস্ত বেশভূষা নারী সমাজে ব্যবহৃত হয় তৎ সমুদয়ের গূঢ় উদ্দেশ্যই সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিয়া বিপরীত শ্রেণীকে আকর্ষণকরা। "The opposite takes place with civilized people, amongst whom the female displays greater activity with the same fire it in view—Wastermarck History of the Human marriage 1891. P 185. "In the most advance societies the woman evince a remarkable tendency to display their sexual characteristics The corset, which gives prominence to the breasts and the hips, is a striking example of it"—Ch: Fere Sexual Instinct (1900) P. 17. আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষিতাসমাজে যে বিলাতী সভ্যতার আবহাওয়া-আনীত এই শ্রেণীর পোষাক পরিচ্ছদ ও চালচলন দেখা যায় তাহার ফল যে কতদূর গড়াইবে তাহা ইহা হইতেই অনুমান করিয়া লওয়া খুব কষ্টকর নয়। এদেশের মেয়েদের মধ্যে যাঁরা সত্যই সুশিক্ষা না পেয়ে স্কুলকলেজে পড়তে গিয়ে ,চশমা, উঁচুগোড়ালীজুতা ও করসেট প্রভৃতি ব্যবহার করেন তাঁহাদের মধ্যে যৌন আকর্ষণের ইচ্ছা যে অতীব প্রবল তাহা কি বলা যাইতে পারে না। ফ্যাসান বলে যে জিনিষটা চলিত আছে সেটিও এই উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। এক ধরণের কাপড় জামা, বা গহনা কিছুদিন ধরিয়া ব্যবহৃত হইলে উহার আকর্ষণশক্তি কমিয়া যায় অর্থাৎ তখন উহা সাধারণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং লোকের লক্ষ্যীভূত হইতে পারে না সেইজন্য তখন উহা পরিত্যাগ করিয়া আবার নূতন ছন্দের বেশ ভূষায় প্রচলন হয় ইহাকে change of fashion বা ছন্দ পরিবর্ত্তন বলে, তবে সৌভাগ্যবশতঃ ইহা আমাদের দেশে এখনও তত ঘন ঘন ঘটেনা যতটা ঘটে ইহার উৎপত্তি ক্ষেত্র প্রতীচ্যে, যেখানে বেচারা স্বামীদের এই ছন্দ-পরিবর্ত্তন জনিত নূতন নূতন বেশভূষা সংগ্রহ করিতে প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া পড়ে। এই বেশভূষা অলঙ্কার ও প্রসাধন সাহায্যে নারী তাহার যৌনআকর্ষণশক্তি বৃদ্ধি করিতে যে চেষ্টা পান ইহার মূলে দুইটী সত্য পাওয়া যায় প্রথম পুরুষ নূতনের ভক্ত'—সে নিত্যনূতন সৌন্দর্য্য আকাঙ্ক্ষা করে দ্বিতীয়—নারীগণ তাঁহাদের মানসিক অমূল্য সম্পদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া বেশী নির্ভর করেন দৈহিক ঐশ্বর্য্যের উপর, যাহা ক্ষণস্থায়ী, যাহা নশ্বর তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিবার ও তাহার সাহায্যে গৌরব ও আধিপত্য প্রচার যে কত আত্মজ্ঞানশূন্যতার নিদর্শন তাহা বলা যায় না। যে দেশের নারীগণকে নিজেদের পদগৌরব বাড়াইবার জন্য দেহের উপর যত্ন করতে হয়, সে দেশের পুরুষেরা নারীর সত্যকার মর্য্যাদা কতটুকু রক্ষাকর্ত্তে জানেন তা বলতে পারিনা--এদেশের নারী'মাতৃত্ব গৌরবে'র অধিকারিণী নন—সে দেশে নারী কেবল ভোগ ও বিলাসের উপাদান—তাহাদিগকে যে স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা দেওয়া হয় তাহা কেবল বৈচিত্র্যেরজন্য, প্রকৃত তাহা অন্তঃ-সারশূন্য। মাতৃত্বগৌরব অধিকার করিয়া আছেন ভারতের নারী—এঁদের অশিক্ষিতাই বল আর নির্য্যাতিতাই বল যে কোন বিশেষণ প্রয়োগেই তাদের খাটো করিবার চেষ্টা করনা কেন, তাঁদের হৃদয় মাতৃত্বের অমিয় ধারায়পূর্ণ আর সেই অমৃতপানে ভারতবাসী আজও এই প্রচণ্ড উচ্ছৃঙ্খলতা, এই বিদেশী ব্যভিচারের মধ্যেও অচল অটল আছে, এসব ঝড়ে ভারতের অন্তঃস্থল কখনও আন্দোলিত হয়নাই সেইজন্য এখনও ভারত হতাশ হয় নাই। পুরুষ।

সদানন্দের পত্র

সম্পাদক ভায়া,—

বহুদিন পরে বিজয়ার আলিঙ্গন জানাতে এসেছি—আশা করি এত দিন চুপকরে থাকবার অপরাধটা বিজয়ার দিনে ভুলেযাবে ও পরমস্নেহে এ দীন বৃদ্ধকে প্রত্যালিঙ্গন দিতে কাতর হবে না। এতদিন চুপকরে ছিলাম কেন জান—গোলমালের ভয়ে তোমার কাগজে দুরকমের গোলমাল বেধেছে দেখেই 'দূরমপসর' পন্থা অবলম্বন কর্ত্তে বাধ্য হলুম, কারণ জান তো—পরের হাঁড়িতে কাটীদিয়ে অযথা অপ্রীতিকর হওয়া পণ্ডিতেরা অনুমোদন করেন না। প্রথম নম্বর গোলমাল দেখলাম তোমার কাগজের 'নারী' নিয়ে বাদপ্রতিবাদ, তারপর রঙ্গালয় নিয়ে টানা হেঁচড়া ব্যাপার। তোমরা বলেছ নিরপেক্ষ থাক্‌বে কিন্তু সত্যই তা পারবে কি? এ টানা-হ্যাঁচড়ার দেশে নিরপেক্ষ থাকা চলেনা—নিরপেক্ষ থেকে সকলকে খুসী করবে মনে করেছ সেটী হবার যো নাই দাদা ইংরাজী একটা প্রবাদ আছে 'He who tries to please everybody pleases nobody' তোমাদের সহযোগী ভায়ারা কি তোমাদের নিরপেক্ষ থাক্‌তে দেবেন? তাঁদের দলের মধ্যে তোমাদের টেনে এনে সাহিত্যের নামে ও সংবাদপত্রের আবরণে যে পচাঘেউড় চলছে সেই পাঁকের মধ্যে তোমাদের এনে না ফেলতে পারলে তাঁদের উদ্দেশ্যসিদ্ধ হবেনা! জানি না সাহিত্যের নামে এ মেছুনীলীলা বাঙ্গালীপাঠক আর কতদিন সহ্য করবেন। সে কালের তর্জ্জা ও কবির লড়াই আধুনিক রুচির পক্ষে অশ্লীল ও ঘৃণ্য বলে তাকে শিক্ষিত সমাজের বার করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আবার শিক্ষিত সমাজেই সেই সব পুরাতন রুচি সাহিত্যের পোষাকপরে দিব্যি ছাপার অক্ষরে আত্ম-প্রকাশ কর্চ্ছে আর বাঙালার 'গোপাল অতি সুবোধ বালকে'র মত বাঙালী পাঠক সে গুলি পকেটের পয়সা দিয়ে কিনে নীরবে স্বচ্ছন্দে গলাধঃকরণ কর্চ্ছেন; [illegible] দেখে মনে হয় বাঙলার পাঠকের রুচি অত্যন্ত বিকৃত হয়েছে—এ রুচিহীনতার জন্য দায়ী কে পাঠক না লেখক। তোমাদের একটা জরণালিষ্ট এসোশিয়েন আছে না? তাঁরা বোধ হয় এ সব খবর রাখেন—না? সংবাদপত্রের রীতি-নীতি এরূপ ভদ্রতার নীচে পড়ে গেলে, তা যদি তাঁরা শোধরাতে না পারেন তবে তাঁরা কি কাজ কর্চ্ছেন। মোটের উপর যতদিন না বাংলার পাঠকেরা জেগে উঠবেন ততদিন এ তাণ্ডবলীলা চলবেই। এ থেকে একটা কথা ভায়া আমরা বুঝতে পারি, যে শ্লীল বা অশ্লীল, রুচি বা অরুচি বলে কোন জিনিষ নাই সাহিত্যের বেওয়ারিস ক্ষেত্রে যা চালাবে তাই চলবে, যদি অতি কদর্য্য অশ্লীল কথাকে সাধু ভাষায় পোষাকটা পরিয়ে দিতে পারলে সেসাহিত্যের আসরে নেচেকুঁদে বেশ বাহবা নিয়ে ফিরে আসবে—তাকেই লোকে আবার 'মনস্তত্ত্ব বলে অভিবাদন করবে। চাই কি জান, এই সব নোংরা জিনিস বেপরোয়া হয়ে ছেড়ে দেবার বাহাদুরী। তোমাদের 'নারী' প্রবন্ধ নিয়ে যে বাদ প্রতিবাদ হচ্ছে তাও দেখেছি এবং যতটুকু বুঝতে পেরেছি যে নারীরা তাঁদের সম্বন্ধ কোন আলোচনা চান না—চান কেবল বিশুদ্ধ বন্দনা গান, এ যদি গাইতে পার তো তোমার কাগজের ভাবনা থাকবে না—আর যদি নির্ব্বোধের মত সত্যরূপ আগুন নিয়ে খেলা কর্ত্তে যাও তবে তোমাদের শীঘ্রই দগ্ধ হতে হবে। আর দেখলুম তোমাদের রঙ্গালয় সমালোচনা কিন্তু এই হিমাচলের মত গা-ঢালা দেশের লোক তা নেবে কি? তোমরা যদি কোন একটা দলে ঢুকতে পার্ত্তে, তাহলে এতদিন সেই দলের অনুগ্রহ, নানারূপ অভিনেতা অভিনেত্রীর ছবির আকারে তোমাদের সর্ব্বাঙ্গে মার অনুগ্রহের মত কণ্টকিত হয়ে উঠত; তাদের পাতা পাতা বিজ্ঞাপনে তোমার রুগ্ন দুর্ব্বল কাগজখানি ফুলে উঠত—সত্যবলতে গিয়ে তোমরা যে সকলদলেরই শত্রু হয়েছ, তাহা আমি খুব জোর করে বলতে পারি। এ যুগে লোকে নাটকের কি দেখে জান বাহ্যাড়ম্বর, কি শোনে জান—অভিনেতার আত্মকথা; অভিনেতারা কি চান জান 'নাম'—তবে অভিনয়করে কেউ নাম চান না, সেটাও কাগজের মারফৎ ঢাক পিটিয়ে কাকতাড়ুয়ার যে 'নাম'

পাওয়া যায় [illegible]। অভিনয় কেউ সমালোচনা করে না—অনেকের সে সমালোচনা কর্ব্বার মত ক্ষমতাই নাই এখন রাম শ্যাম হাবু প্রভৃতি অভিনেতা ও খেঁদী পাঁচী পুঁটী প্রভৃতি অভিনেত্রীরা সকলেই ভাবাভিব্যক্তি বিশারদ, নৃত্যগীত পটীয়সী ইত্যাদি। এঁদের কেউ এক সম্প্রদায় ছেড়ে অপর সম্প্রদায়ে যোগদিলেই সমস্ত সহরের বক্ষ প্লাকার্ডের তুমুল স্পন্দনে কম্পিত হয়ে উঠে—এসব হচ্ছে নামজাহির করার বিলাতী কায়দা। আধুনিক অবৈতনিক সম্প্রদায়ের অনেকেই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন এরচেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে বলতে পার? এখন কতক গুলি কাগজ কেবল এই অভিনয় সংক্রান্ত খবর বেচে ও গালিগালাজ করে জীবনধারণ কর্চ্ছেন—কিন্তু এইসব কাগজের মতের উপর সাধারণের কতটুকু শ্রদ্ধা আছে। ক্রমশঃ দেখবে তারা এ্যাক্‌ট্রেস্‌ এ্যাক্টেসরা সমস্তদিন কি করেন কি দিয়ে ভাতখান, ক খিলি পানখান—কেমনকরে হাঁচেন, কেমন করে কাশেন এসব খবরও খবরের কাগজে বিক্রীহবে। বিলাতে কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর হাফ্‌পেনী ও পেনী কাগজ ঠিক এইরকম করে টিকে আছে এগুলা সাহিত্য নয়—সাহিত্যসমাজের বেশ্যা; কেবল ঠাট-ঠমকে আসর গুলজার রাখিবার জন্যই এদের আবির্ভাব। এখন অভিনয় বিচারহয়, কত দর্শক সমাগম হয়েছে তাইদেখে—তাতে নাটকের বিচার ও নেই অভিনয় বিচারও নাই—যদি দেড়শোরাত একখানা নাটকে 'ফুল-হাউস' (হাউস অফ ফুলস্‌ বলতেও পার) হয় তবে আর কি মার দিয়া কেল্লা। এইজন্যেই একনাটকের ভিন্ন ভিন্ন কাগজে ভিন্ন ভিন্ন সমালোচনা দেখতে পাওয়া যায়। আমার ছাপাখানায় অমুক থিয়েটারের প্লাকার্ড ছাপা হয়, তাতে আমি দুপয়সা পাই, তার উপর মোটাদামে চকলম বিজ্ঞাপন পাচ্ছি একটা বক্সের ফ্রিপাশ আছে, আবার কাগজকে সচিত্র করবার জন্য থিয়েটার কোম্পানীর ছবির ব্লকগুলি বিনাখরচে পাচ্ছি এবং ছাপছি বলে আর ও নগদ কিছু পাচ্ছি এত রকম ভাবে রৌপ্যশৃঙ্খলে যে থিয়েটারের সঙ্গে আমি আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে আছি তাহাকে প্রশংসা করা ও তাহার প্রতিদ্বন্দীর [illegible] উদ্ধার করা যে আমার কর্ত্তব্য তাহা কি আমি জানিনা।—এইসব কারণের উপর যে সমালোচনা হয় তা কতটুকু নিরপেক্ষ হতে পারে তা খুব অল্পবুদ্ধিলোকের ও বুঝতে কষ্ট হয় না। তারপর ব্যক্তিগত কারণ ও গায়ের-জ্বালা-জনিত একরূপ ঝাল সমালোচনাও বাহির হয় সেটা ও মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়—তারপর বন্ধু বা আত্মীয়স্বজনে আপনার অকর্ম্মণ্য আত্মীয় বা প্রিয়পাত্র অভিনেতাটীকে বাজারে জাহির করিবার জন্য খবরের কাগজে 'প্রেরিত পত্র' পাঠাইয়া তাহার মাথা তো খানই, উপরও নাট্যকলার সর্ব্বনাশ করণের ও বেশ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সুন্দরী অভিনেত্রী প্রকৃত সুন্দরী অভিনেত্রী এ দেশে বিরল সুতরাং সুন্দরী অর্থে পাউডারমাখা সুন্দরীই বুঝিতে হইবে, তিনি একটু মিষ্টিকরে চাইতে পারেন বা দেহলতায় একটু ললিত তরঙ্গ তুলে ষ্টেজে গমনাগমন কর্ত্তে পারেন—নাট্যসমালোচক মহলে এমন কাপুরুষ কমই দেখতে পাওয়াযায় যে তাঁর ধামা আনন্দে মাথায় করে ধরে বেড়াতে পরাঙ্মুখ! এইসব বিবিধ গোপনীয় ও জটীল কারণে সমস্তকাগজে যা নাট্যসমালোচনা বাহির হয় তুমি সে গণ্ডীর বাহিরে বসে কড়াকড়া সত্যি কথা বলতে আরম্ভ করলে তোমার কাগজ যে কেউ ছোঁবে তা আমার বোধ হয় না। যদি প্রকৃত উন্নতি অর্থাৎ কিনা আত্মোন্নতি কর্ত্তে চাও তবে দলকর্ত্তার পিছনে মৃদঙ্গরূপ নবযুগে চাটী দিতে দিতে "জয় গৌরাং" "জয় গৌরাং" বলে কীর্ত্তন ধর, তারা ও সত্য এবং শক্তেরযুগ চলে গেছে এখন এসেছে অর্থ ও ভক্তের যুগ। রঙ্গালয় সংক্রান্ত কাগজগুলি যদি পাঠকরে থাক তবে এ অপূর্ব্বসত্যের বিরাট মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারবে। এযুগের নীতি কি জান—

সত্য কথা বলিওনা ভুখে মারা যাবে
বড় যদি হতে চাও ভক্ত হও তবে।

তোমার—

সদানন্দ

কাজের কথা
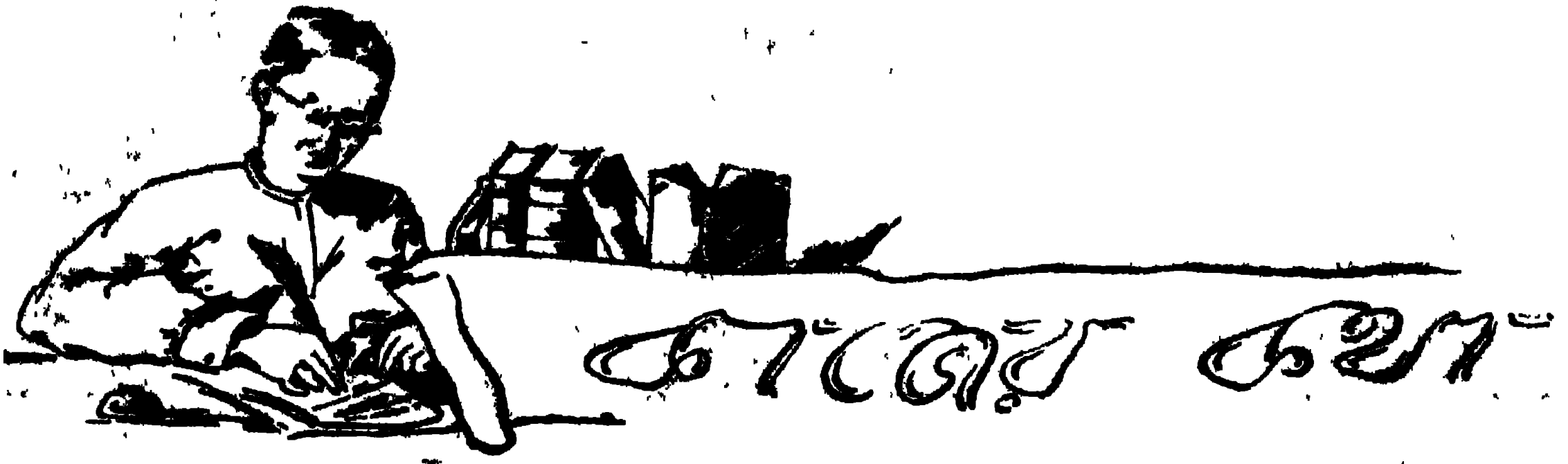
নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার, আমাদের ৺বিজয়ার অভিবাদন গ্রহণকরুণ—দুই সপ্তাহের অবকাশাবসানে আপনাদের স্নেহ আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদের মধ্যদিয়া আবার আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি—আমার দেশের ভাইবোনদের সেবার পুণ্যব্রতে ব্রতী হইতে পারিতেছি এরচেয়ে নবযুগের পক্ষে আনন্দকর আর কিছুই নাই।

মহাত্মা গান্ধীর অনশন ব্রত—

মুসলমান প্রধান দিল্লী নগরীতে মুসলমান নেতা আলি ভ্রাতার গৃহে, হিন্দুমুসলমান-মিলন প্রয়াসী মহাত্মাজী একবিংশতি দিবসব্যাপী অনশন সঙ্কল্প করিয়া ব্রতে বসিলেন—অম্বু মাত্র আহারের উপর নির্ভর করিয়া এই লোকোত্তর মহাপুরুষ অনশন ব্রত পালন করিতে লাগিলেন—সমগ্র ভারতে—শুধু ভারত বলি কেন, সমস্ত জগৎ—স্তব্ধ হৃদয়ে এই মহাযোগীর অদ্ভুত কার্য্য লক্ষ্য করিতে লাগিল—ক্রমে হিন্দুমুসলমান নেতৃগণের তথা দেশবাসীগণের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল—রোগ জীর্ণ-দেহে এই বার্দ্ধক্যে মহাত্মার এই কঠোর ব্রতের পরিণাম চিন্তা করিয়া শঙ্কাকুল হইয়া উঠিল—দেশবাসীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁহার সঙ্কল্পকে টলাইতে পারিল না—শরীরের এমন অবস্থাতেও মহাত্মাজী একদিনের জন্যও স্বদেশের শুভ চিন্তা হইতে বিরত হয়েন নাই—তাঁর লেখনী সতেজে সমানভাবে চলিতে লাগিল—তাঁর রসনা সমানভাবে উপদেশ বাণী বর্ষণ করিতে লাগিল অবশেষে—একবিংশতি দিবসে মহাত্মাজী আরব্ধ ব্রত শেষ করিলেন—কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনা—এই অলৌকিক মহাপুরুষের অলৌকিক ব্রতের উদ্‌যাপন হইল কিনা হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিরোধের রক্তপাতে!—ইহাকে irony of fate বলিব কি—দুর্ভাগ্য ভারতের অদৃষ্টের পরিহাস বলিব এ কলঙ্ক কাহিনী লিখিতে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে হয়। ভারতবাসী—তুমি "স্বরাজ" "স্বরাজ" বলিয়া [illegible] স্বরে চীৎকার করিতেছ কিন্তু স্বরাজ কোথায়। কতদূর! তোমার চিরআকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ যে—মরুভূমে মরীচিকার মত ক্রমশঃ তোমার পিপাসু নয়নের সম্মুখ হইতে দূরে অতি দূরে চলিয়া যাইতেছে।

হিন্দুমুসলমানের এ বিরোধের মূল কোথায়! উভয় জাতির মধ্যে প্রকৃত মিলন কি ঘটিবে না?—কোন্ কর্ণেজপা দৈত্যের কুমন্ত্রণায় ভ্রাতায় ভ্রাতায় এই কলহ? সাম্প্রদায়িক গোড়ামী, অন্ধ অজ্ঞানতা, নীচ স্বার্থপরতা কবে দূর হইবে? ক'বে ভারতবাসীর অন্ধ আঁখি ফুটিবে এর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভুলিয়া মঙ্গলকে বরণ করিয়া লইবে? সে কবে! সে কবে!!

বিলাতের মন্ত্রী পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। নূতন নির্ব্বাচন জন্য তিনদলই প্রভূত আয়োজন কর্চ্ছেন শ্রমিকদের উপর কনজারভেটিব ও লিবারেল দুইটী দলই বিশেষ নারাজ। তাহাদের উৎখাত করিবার জন্য সকলে আড়েহাতে লাগিয়া গিয়াছেন—সম্ভবতঃ লিবারেল ও কনজারভেটিভ পরস্পর মিলিত হইয়া উহাদিগকে পরাভূত করিবেন তাহাহইলেই লয়েডজর্জ্জের আমলে যাহা ঘটিয়াছিল পুনরায় তাহারই অভিনয় হইবে। আমাদের পক্ষে যিনিই মন্ত্রী হউন একই কথা আমাদের ভাগ্যে যে লঙ্কায় যাইবে সেই রাবণ হইবে ও এঁরকাছেও ঘাসজল তাঁর কাছেও ঘাসজল।

গত মঙ্গল বারের ইংলিস ম্যান "মদনানন্দমোদক" বনাম এলোধাপাড়ী সিদ্ধি বিক্রয়ের বিরুদ্ধে একদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন উহার প্রত্যেক কথার আমরা বর্ণে বর্ণে সমর্থন করে—এক শ্রেণীর কবিরাজ নামধারী অর্থলোলুপ নরপশুগণ দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল যুবকবৃন্দের সম্মুখে এই লোভনীয় নেশার জিনিস ধরিয়া দেশের যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহা বলা যায়না। বড় দুঃখের বিষয় যে কোন বাঙালী বা প্রতিষ্ঠিত বাঙলা কাগজ ইহার দমনে অগ্রসর হইতে পারিলেন না—এদেশের লোকেরা আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান জাগাইবে ইংলিসম্যান—কতলজ্জা ও পরিতাপের বিষয়! বিজ্ঞাপন খোয়াইবার ভয়ে বাঙলা কাগজ সত্যকথা বলিতে ও আজ পশ্চাৎপদ।

ষ্টার থিয়েটার

বিল্বমঙ্গল— বহুদিন পরে ইহারা 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের পুনরভিনয় উপলক্ষে 'বিশেষ অভিনয়' করিয়াছিলেন— কিন্তু অভিনয় দেখিয়া আমরা একেবারেই হতাশ হইয়াছি। বিল্বমঙ্গলের ভূমিকায় দানীবাবুর অভিনয় আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি তত্তুলনায় এই বারের অভিনয় যে কত হীন, তাহা বলা যায় না। তবে নবেল বা কাপ্তেন নব অভিনেতা এরূপ অভিনয় করিলে তাহাকে স্বর্ণপদক দিবার ব্যবস্থা না করিলেও হয়তো হাততালি দিতে পারিতাম কিন্তু গিরিশবাবুর পুত্র নাট্যাচার্য্য সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের পক্ষে এ অভিনয় কেবল যেন উপহাসের মত বোধ হইতেছিল এ অভিনয়ে অভিনেতার মনঃসংযোগের অভাব পদে পদক্ষেপেই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল এবং সমস্ত অভিনয়টাই যেন প্রাণহীন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ হইয়াছিল তাহা সূক্ষ্মদর্শী মাত্রেই বুঝিয়াছিলেন দুইটী স্থলে মাত্র তাহার পুরাতন সত্তা দেখিয়াছিলাম তাহা "চিন্তামণি তুমি অতি সুন্দর" ও শেষ দৃশ্যে চিন্তামণিকে যথায় বিল্বমঙ্গল নিজের গুরু বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন তথায়। 'চিন্তামণি'র অংশে শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারীর অভিনয় ও তাহার পুরাতন যশকে ম্লান মথিত করিয়া দিয়াছিল, এমন কি নবীনা অভিনেত্রীদের ন্যায় তাঁহার কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত অনেক স্থলে শোনা যায় নাই—তাঁহার বৈরাগ্যের সময় তিনি যখন কাল সাড়ী গাছ কোমর বাঁধিয়া পরিয়া, সযত্নবিন্যস্তভাবে সুসম্বদ্ধ কেশরে আলুলায়িত করিয়া আসিলেন তখন হাস্যসম্বরণ করা কঠিন হইল—পাউডার মাখিয়া কাল সাড়ী পরিলে তার একটা effect হয় জানি তবে চিন্তামণির তখনকার অবস্থায় সেরূপ effectএর কি কোন দরকার ছিল? ইহাই যদি ষ্টারের পরিচালক আর্ট থিয়েটারের আর্ট হয় তবে অমন আর্টের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয় আর কুসুমকুমারীর মত প্রবীণা অভিনেত্রীর এই রকম "ঠসক" করা পোষাকে বৈরাগ্যের দৃশ্য অভিনয় করা কি সঙ্গত হইয়াছিল? আর্টের দোহাই দিয়া সাহিত্যে গণিকাবিলাস চলিতেছে নাটকে অভিনয়েও কি সেই আর্টের আমদানী সুরু হইল নাকি। তারপর পাগলিনীরূপে শ্রীযুক্তা সুবাসিনীর অভিনয় কোন রকমেই প্রশংসার যোগ্য মনে করিতে পারিলাম না। গানে ইহার খুব নাম শুনিয়াছি বড় আশা হইয়াছিল যে আর কিছু না হউক দুখানা ভাল গানও শুনিতে পাওয়া যাইবে কিন্তু সে আশাও পূর্ণ হয় নাই, কারণ কোন গানেই ইনি গলা তুলিতে পারে নাই অতিকষ্টে যেন কোন রকমে গানগুলি গাহিয়া দর্শকবৃন্দকে বাধিত করিয়া গিয়াছিলেন। তারপর অভিনয় ও আবৃত্তি এত নিম্ন যে মেগাফোনের সাহায্যে বলিলে হয়ত শুনিতে পাওয়া যাইত। সেকালের নামে যারা নাক সিঁটকে তোলেন তাঁদের জিজ্ঞাস্য যে শ্রীমতী নরসুন্দরী শ্রীমতী তিনকড়ি ও শ্রীমতী সুশীলার এই অংশ অভিনয়ের সামনে দাঁড়াইতে পারে এমন কে আজ নূতন দলের আর্টিষ্ট আছে। বায়স্কোপের অনুকরণে কিছু ঘন ঘন হাত পা নাড়িলেও আলো পোষাকের চটকে বাজীমাৎ করা সম্ভব, কিন্তু তাতে সেই পুণ্যস্মৃতিময় অতীতের অভিনয়কীর্ত্তিকে নষ্ট করা যায় না নূতনের সঙ্গে পুরাতনের তুলনা— প্রদীপ দ্বারা চন্দ্র প্রদর্শন। নূতন অভিনয় আপাতঃমনোহর হইলেও যে কত অন্তঃসারশূন্য তাহা এই বিল্বমঙ্গলেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

ভিক্ষুক—প্রসিদ্ধ অভিনেতা তিনকড়িবাবু এই অংশটী চিরাচরিত প্রথার [illegible] করিয়া একটু গম্ভীরভাবে করিয়া-

ছিলেন এবং গানগুলিও একটু কালোয়াতী ঢংএ গাহিয়া ছিলেন—তাঁহার ধারণা অনুযায়ী অভিনয় খুব ভালই হইয়াছিল তবে বক্তব্য এই যে এই পরিবর্ত্তনের কোন আবশ্যকতা ছিল না, কারণ ভিক্ষুক চরিত্রটাই Frivolous to serious করিয়া আঁকা—এই লঘুতা জিনিসটা তিনকড়িবাবুর আসে না, তাঁহার স্বভাব একটু গম্ভীর তাই তিনি অংশটিকে নিজের প্রকৃতির অনুবর্ত্তী করিয়া Serio-comic ভাবে অভিনয় করিয়াছেন ইহাও যে খুব সঙ্গত হইয়াছে তাহা মনে করি না, কারণ অভিনেতার কর্ত্তব্য নিজের কথা ভুলিয়া যাওয়া, যে অংশ অভিনয় করিতেছেন তাহাতেই নিজের সত্তা নিমজ্জিত করা—কারণ অংশকে নিজের অনুবর্ত্তী করিলে অনেক সময়ে আমরা তা অক্ষমতার চিহ্ন বলিয়া ভ্রম করতে পারি।

সাধক—এই অংশটী যিনি অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহার স্থূলবপুখানি ব্যতীত তাঁহার দেখাইবার মত কিছুই ছিল না এবং এটী নেহাৎই কদর্য্য নিম্নশ্রেণীর ঢংএ অভিনীত হইয়াছিল। কণ্ঠস্বর বিকৃত করিলে বা লাফাইলেই যদি হাস্যরস অভিনয় করা যাইত তাহা হইলে ভাবনা ছিল না। সাধক এর অংশ যে ভাঁড়ের অংশ নয় তাহা এই ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিবার কি কেহ আর্ট থিয়েটারে ছিল না—এর অভিনয় দেখে মনে হচ্ছিল যেন বারোয়ারীর সং দেখছি—হা মুস্তাফী সাহেব! তোমার প্রিয় অংশ 'সাধক' রূপ মুক্তামালা আজ কাহার কণ্ঠশোভা বর্দ্ধন করিতেছে দেখ।

থাক—প্রাচীনা অভিনেত্রী কুমুদিনী লইয়া ছিলেন অভিনয় ও উত্তম হইয়াছিল তবে অত্যধিক বয়স হওয়ার দরুণ কণ্ঠস্বরে একটা বিশ্রী জড়তা আসিয়াছিল—এ জড়তাটুকু তাঁহার প্রকৃতির 'জগার' অংশে বেশ খাপ খাইয়াছিল। কিন্তু 'থাক'র অংশে যে একটা প্রচ্ছন্ন রস আছে, সেটুকু অভিব্যক্ত হইতে পারে নাই। ইঁহাকে এসকল অংশে নামাইয়া কষ্ট দেওয়া উচিত নয় এরূপ অভিনেত্রীদের কালেভদ্রে একটু খাপখাওয়া অংশে নামান উচিত। পুরাতনের কৃতীত্ব দেখাইবার জন্য বসাইয়া লইবার জন্য নয়। বণিক চরিত্র অভিনয়ে কিছুই বলিবার নাই কারণ অভিনেতা কিছুই দেখাইতে পারেন নাই; বণিক পত্নী ও স্বামীর যোগ্যা হইয়াছিলেন বিষ্ণুমঙ্গল আহ্বান করিবার সময় তিনি বেশ সহজ ভাবেই বলিলেন "কে এ মহাজন" যেন বেহারাকে তামাক সাজিতে বলিলেন—এখানের দৃশ্য যে একটা ঘাতপ্রতিঘাত ময় ঘটনা ঘটিতেছে তাহা যেন তাঁহার দৃষ্টি গোচরই হয় হয় নাই—এরূপ বাহির যদি 'আর্ট' হয় তবে "বলম্মা তারা দাঁড়াই কোথা?" সোমগিরি বেচারার কণ্ঠস্বর ভালছিল, তবে যাত্রার দলের নারদের মত লাল দাড়ীচুলে তাঁহাকে এমন বীভৎস দেখাইতেছিল যে তাঁর তত্ত্বকথার ব্যাখ্যার সময় মুখ হইতে সৌম্যভাব অন্তর্হিত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে ছিল বিরক্তি তার উপর পার্ট মুখস্থ নাই খালি উইংসে প্রম্পটারের নিকট কাণ উঁচু করিয়া অভিনয় করিলে তাহা দর্শকবৃন্দকে কখন সন্তোষদানে সমর্থ হয় না। "কামিনী কাঞ্চন এক মায়া দুইরূপে করে আকর্ষণ" বলিবার সময় তাঁহার অঙ্গুলিতে কাঞ্চনাঙ্গুরী প্রদর্শন বড়ই বিসদৃশ ঠেকিল—প্রত্যেক অভিনেতার এসকল বিষয়ে অবহিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। ভালকথা, আর্ট থিয়েটারের Producer মহাশয় এ গোপদাড়ী আনাইলেন কোথা হইতে, ইহা আজকাল যাত্রাওলারাও যে ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করে। অভিনয়ের মধ্যে ক্ষুদে রাখাল বালকটীই একমাত্র উল্লেখযোগ্য। দৃশ্যপটাদির কোন বৈচিত্র্য ছিল না—বরং অসামঞ্জস্য ও বিসদৃশ্য ছিল প্রচুর, তবে এসকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইঁহারা করিতে গিয়াছিলেন কয়েকটী Set scene বা সাজান দৃশ্যের সমাবেশে, তবে সেগুলিতেও একটা বিশেষ কিছু ফল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় নাই। নদীতীরস্থ শ্মশান দৃশ্যে বিদ্যুৎ দেখান হইতেছিল Gate wings হইতে উহা নদী তীরের দৃশ্যপটের মেঘমালার ঝলসিত হওয়া উচিৎ ছিল। বজ্রনাদ তাল মাফিক হয় নাই—বজ্রের উল্লেখের অনেক পরে বজ্রনাদ শোনা গেল—তারপর বিল্বমঙ্গলের প্রাচীর টপকিয়ে পড়ার দৃশ্যও ঠিক হয় নাই কারণ বিল্বমঙ্গল নদীপার হইয়া আসিলেন বেশ শুকনা কাপড়ে জলঝড়ের মধ্যদিয়া এরূপ কাপড়ে আসিতে পারা খুব অলৌকিকশক্তিসম্পন্নপুরুষ ভিন্ন অপরে পারে কিনা সন্দেহ—আচার্য্য মহাশয়ের অভিনয়ে এ ত্রুটী একেবারেই যে বাঞ্ছনীয় নহে শুধু তাহাই নহে, ইহা অতীব অসংলগ্ন ও অসম্ভব। তারপর সর্প দেখাইবার দৃশ্যটাও ঠিক হয় নাই—সাপটা প্রাচীলের বাহির দেয়ালের ফাঁকে মুখ গুঁজিয়া ঝুলিতেছিল—দোতালার বর্দ্ধায়ার নয়

এটা producer মহাশয়ের মাথায় লাগে নাই কেন বুঝিলাম না। আর কতক গুলা ছেঁড়া চুল ঝুলাইয়া সর্প দেখান যায় না—সর্পে রজ্জু ভ্রম হয় তবে কেশে সর্প ভ্রমের কথা, এক কবি ভারতচন্দ্রেই বলিয়াছেন "বিনোনিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়—সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়" উপমাটা আর্ট থিয়েটারের কাজে লাগিয়া গিয়াছে। তার পরের দৃশ্যে নদীতীরে উষার দৃশ্য দেখান উচিত ছিল—কেবল নদীর সিন ফেলিয়া ও আলো কম করিলে তাহা দেখান যায় না—তার সঙ্গে পূর্ব্ব গগণে নবোদিত অরুণের অরুণিমা টুকু দেখাইলে দৃশ্যটী আরও মনোজ্ঞ হইত। বিল্বমঙ্গলের সাধনকালীন—ক্ষৌরাভাব জনিত শ্মশ্রু দেখান উচিত ছিল, কিছু Crepe Hair খরচ করিলে এ সকলস্থলে অভিনেতার অভিনয় বেশ মর্ম্মস্পর্শী হইত এ সব ক্রটী ছোট হইলে ও এই সকল স্থলে সাবধানতা অবলম্বনে অভিনয় সৌন্দর্য্য অনেকে বৃদ্ধি পায়। ইহা অবৈতনিক সম্প্রদায়ে উপেক্ষিত হইলে মার্জ্জনীয় হয় কিন্তু আর্ট থিয়েটারের এইসব ছোট খাট ক্রটী থাকাও আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না কারণ আমরা চাই আর্টথিয়েটার দেশের নাট্যামোদীকে প্রকৃত আর্টের সৌন্দর্য্য দেখাইতে সক্ষম হউন। আশাকরি পরিচালক গণ আমাদের অনুযোগগুলি ভালাভবে গ্রহণ করিবেন ও ভবিষ্যতে পুস্তক অভিনয়ে উত্তম মহলা দিবার ও অভিনেতা অভিনেত্রীগণ কর্ত্তৃক অংশগুলি আয়ত্ত করাইবার সুবন্দোবস্ত করিবেন। আর্টের উন্নতিকল্পে তাঁহাদের অনুরাগ ও চেষ্টা দেখিতে পাইলে আমরা সত্যই আনন্দিত হইব কারণ বাংলার প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চকে আমরা ক্রটীবর্জ্জিত হইতে দেখিতে চাই।

স্টার থিয়েটার—রাজা বাহাদুর—এই প্রহসনের অভিনয় ভালই হইয়াছিল তন্মধ্যে গাণিক্যধন ও ফিস্ সাহেবের অংশ উল্লেখযোগ্য। বিল্বমঙ্গলের সাধক বেণী অভিনেতাই গাণিক্যধনের অংশ লইয়াছিলেন ও এই অংশে বিশেষ কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন—তবে এই অংশ ও সাধকের অংশ যে এক ভাবের নয় তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তৃপক্ষের উচিত ছিল নাকি? ফিস্ সাহেবের অংশ লইয়াছিলেন ইন্দুবাবু এবং তাঁহার অভিনয় বেশ স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছিল। শ্রীমতী নীহারবালা ধোপানীর গানটী ভালই গাহিয়াছিলেন কিন্তু মেথরাণীরূপে সেই বেশেই ঘুরিয়া আসাটা বড় অস্বাভাবিক হইয়াছিল; কারণ ধোপানী ও মেথরাণীর ভিতর যে পার্থক্য টুকু আছে তাহা এভাবে দেখান যায় না—ছিটের জামা ও নীল বা খয়ের রংয়ের চওড়াপেড়ে শাড়ী আজকালকার মেথরাণীদের পোষাক এটা জিনিষের ষ্টোরের বেশাগারে কিছু অভাব ছিলনা—প্রথমে বোধহয় তাড়াতাড়ি বশতঃ ঝাড়ুটা পর্য্যন্ত না লইয়া শুধু হাতেই অবতীর্ণ হযেন, পরে একগাছা ঝাড়ু দেওয়া হইলেও তাঁহার ঝাড়ু সঞ্চালন অনেকটা লাঠীখেলার মতই হইয়াছিল। এইসব অংশ ক্ষুদ্র হইলেও স্বাভাবিক ভাবে অভিনয় করিতে পারিলে বেশ কৃতীত্ব দেখান যাইতে পারে তাহা কোন অভিনেত্রীরই বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। Ballet girlদের chorus এ সুরের Harmony এর বড় অভাব ছিল—এগুলিতে যাকে তাকে নামাইয়া দেওয়া ঠিক হয় নাই এসবেও Training চাই বণিকের অংশটা দুর্গাদাসবাবু বা নির্ম্মলেন্দুবাবু লইলে বোধহয় রক্ষা পাইত বণিকপত্নীর অংশটা শ্রীমতী নীহারবালা বা কৃষ্ণভামিনী গ্রহণ করিলে বোধহয় খুবই সুন্দর হইত। সাধকের অংশ তিনকড়িবাবু লইলে বোধহয় পুরাতন যুগের মতই সুন্দর হইত কারণ ভিক্ষুকের অংশ রাধাচরণ বাবু বা অন্য যে কোন লোক চালাইয়া লইতে পারিত।

অতঃপর আমরা আশাকরি 'বন্দিনী' 'সাজাহান' বা অযোধ্যার বেগম' অভিনয়কালীন কর্ত্তৃপক্ষ অধিকতর মনোযোগী হইবেন ও তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় (Producer) দর্শকবৃন্দের অস্তিত্বের কথা মনে রাখিবেন আর্টের নামে আজকালকার দর্শক যে যা তা গলাধঃকরণ করিতে প্রস্তুত নহে সেটা সর্ব্বদা সর্ব্বোতভাবে স্মরণ রাখা উচিত।

এম্পায়ারে—'শকুন্তলা' দুইজন নাট্যানুরাগী বাঙ্গালী যুবকের চেষ্টায় বিলাতী অভিনেতা অভিনেত্রী দ্বারা মহাকবি কালিদাসের এই সুমধুর নাটক ইংরাজীতে এম্পায়ার থিয়েটারে অভিনয় হইয়াছিল। পুস্তকখানি খুব সংক্ষেপে রচিত হইলেও নাটকীয় সৌন্দর্য্যের কোন ক্ষতি হয় নাই। রচয়িতা শ্রীযুক্ত ডি, এন, মিত্র ও Producer শ্রীযুক্ত অতুল সেনকে এই সাফল্যের জন্য আমরা অভিনন্দন করিতেছি পূর্ব্বকালের উপযোগী হাবভাব চালচলন ও বেশভূষার সমন্বয় করিতে ইহাঁরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তবে কণ্বমুনিকে চর্ম্মপাদুকাবৃত পদে অবতীর্ণ করা বা ব্রাহ্মণ বয়স্য মাধব্যকে ঢিলা ইজার পরাণ যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে পারি না। মোটের উপর মাধব্যের অংশ সুন্দর অভিনীত হইলেও তাহাতে যেন clown এর ভাবটাই বেশী ফুটিয়াছিল। দৃশ্যপটাদি অবশ্য এই পুস্তকের জন্য বিশিষ্ট ভাবে প্রস্তুত হয় নাই তজ্জন্য ২।১ স্থলে অসংলগ্ন হইলেও মোটের উপর দৃশ্যাবলী যে সুন্দর হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ

নাই। বর্ত্তমান যুগে এ সকল চেষ্টার একটা বিশেষ আবশ্যকতা আছে এবং তাহা উপলব্ধি করিয়া যাঁহারা নিজ্জা-যশের মুখাপেক্ষী না হইয়া এইরূপ উদ্যমে আত্মনিয়োগ করেন তাঁহারা দেশবাসীর প্রকৃতই ধন্যবাদার্হ।

মিনার্ভা থিয়েটার। ৺শারদীয়া পূজার অবকাশে ইঁহারা বহু পুরাতন নাটক নাটিকার পুনরভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দানে সক্ষম হইয়াছিলেন। গীতিনাট্য ও হাস্যরস প্রধান পুস্তকাদির অভিনয়ে যে ইঁহারা পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন তাহা সত্যই বড় আনন্দের বিষয়। জীবনযুদ্ধ—নাটকেও ইঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন তাহার কারণ ইঁহাদের অনন্যসাধারণ চেষ্টা ও দর্শকবৃন্দের প্রীতি উৎপাদনে সাগ্রহ সতর্ক দৃষ্টি। অন্যান্য রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তারা এই দুইটা জিনিষই বড় কম নজর দেন—ইহাতে ব্যবসার দিক দিয়া তাঁরা যে কতবড় একটা ভুল করেন তাহা বলা যায় না। জীবনযুদ্ধে ইঁহারা আবশ্যকমত পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমানে নাটকখানিকে অনেকটা মানাজ্ঞ করিয়া লইয়াছেন। জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যশোমাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া ইঁহারা আবার নিজেদের পুরাতন স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নব নির্ম্মিত সৌধে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হউন বাঙ্গলার দর্শক এই চায়।

মনোমোহন নাট্যমন্দির—গত সপ্তাহে 'আলমগীরে' শিশিরবাবু বাদশাহী মসনদ ত্যাগ করিয়া একেবারে গরীব হইয়া পড়িয়াছেন শুনিলাম। গরীবকে বড় করিতে গেলে বাদশাহকে যে খাটো হইতে হয় তাহা তো তাঁহার অজানা নাই—তিনি গরীব হয়েও ছোট হবেন না তা সকলেই জানে, তবে বাদশা বেচারীর কি অবস্থা হবে? আমরা সাগ্রহে তাঁহার 'পাষাণী'র প্রাণপ্রতিষ্ঠার অপেক্ষা কর্চ্চি। শুনিয়াছিলাম তিনি 'রক্তকরবী' 'চির কুমার সভা' প্রভৃতির মহলা দিতেছেন কিন্তু এখনও প্লাকার্ডে পড়ে নাই দেখিয়া সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না।

রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়—একদিন অৰ্দ্ধেন্দু স্মৃতি অভিনয়ে ও একদিন জলপ্লাবন সাহায্য রজনীতে মাত্র এই দুইদিন রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়া ইনি সম্প্রতি অজ্ঞাতবাসে আছেন। পরম্পরায় শুনা গেল ইনি নিশ্চেষ্ট নাই কলিকাতার উত্তরাংশে আধুনিকতম এক রঙ্গমঞ্চ স্থাপনে তিনি নাকি বিশেষ ব্যস্ত আছেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সহানুভূতি ও সাহচর্য্য পাইবার প্রতিশ্রুতিও পাইয়াছেন। তাঁহার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক ও নাট্যকলার প্রকৃত উন্নতি সাধনে তিনি সক্ষম হউন ইহাই আমাদের কামনা।

Printed & Published by Jnanendra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works.

মুক্তার-মুক্তি

(নিরুপমা বর্ষস্মৃতি হইতে)

প্রথমবর্ষ] ১৫ই কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ১লা নভেম্বর [১৪শ সংখ্যা

অনাদৃতা।

শ্রীসত্যকাম সেন।

(Woidsworth এর 'She dwelt among the untrodden ways" নামক কবিতাব অনুবাদ)।

নিবালা ঐ পথেব মাঝে, ঝবণা পাশে
ছিল তাহার ঘর,
কেউ ছিল না, ভাল বলে, ভালবাসে,
আপন কিবা পব।

শেওলা ঢাকা পথেব পাশে আধ ঢাকা
বনেব কুসুম সে।
মনোলোভা তারা হেন, একলা-ফোটা
সান্ধ্য আকাশে।

অজানা সে থাকত সেথা, জানেও না কেউ
কখন ঝরে গেল,
এখন সে তার সমাধিতে, কিন্তু আমার
একি দশা হোল।

পরশ।

শ্রীমতী নিরুপমা ঘোষ।

আমি যখন শূন্য মনে ডালা ভ'রে তুলতে ছিলাম ফুল,
পথ-হারা এই যাত্রিটিরে
পাগল করা বাঁশীর সুরে,
স্বপ্নে গড়া মোহনরূপে তুমিইত' গো লাগালে মোর ভুল!
অ'জানা এই জীবন-পথে, জানি নাইত' কেমন ক'রে,
কখন আমার সকল ধ্যানে
আমার গোপন মনের কোণে
হৃদয় আমার ভ'বিয়ে দিলে, তোমার আগমনীর সুরে।
ফুল তোলা আর হলো না মোব, রিক্ত প'ড়েই রইল' ডালা,
বিভল আকুল পরাণটিরে,
ওগো নিলে তুমি, নিলে কেড়ে,—
কেঁপে শুধু উঠল অধর; কোন কথাই হলো নাত' বলা!
মধুর মৃদু দখিন্ হাওয়ায়, নীরব তোমার আঁখির ভাষায়,
পুলক আমার হিয়ায় হিয়ায়
ছড়িয়ে দিলে সকল শিরায়,
ছুঁইয়ে দিলে প্রেমের-পরশ, আমার আশায়, ভালবাসায়।

গল্প

শ্বশুরালয়ে বধূ

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

প্রিয় সু,—

তোমার পত্রখানি আজ একমাসের উপর পেয়েছি, তারপর দিনই জবাব দেবার কথা, কিন্তু কেন যে হয় নি তা আজ মন খুলে তোমায় লিখে যাচ্ছি।

সেবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল একটা দিনের জন্যে যখন আমি বাপের বাড়ী গিয়েছিলুম, তখন তুমি আমার দেখেই বিস্ময়ে বলে উঠেছিলে একি বীণা, তোকে এরকম দেখছি কেন ভাই, তোর তো এমন চেহারা ছিল না।

কোনদিনই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিয়ের পরে নিজের চেহারা আর দেখি নি, তোমার কথা শুনে সেদিন সকলকে লুকিয়ে আয়নায় একবার নিজের চেহারা দেখতে গেলুম, নিজের মুখখানা দেখেই চমকে উঠলুম—একি বিশ বাইশটা বছর আমার মাথার পর দিয়ে বয়ে গেছে, তারই চিহ্ন আমার মুখে জেগে উঠেছে? কবে যে এতগুলো বছর কেটে গেল আমি তা তো একটু জানতেও পারি নি। হায় রে, বিয়ের সময় আমার বয়েস ছিল পনের বছর, বিয়ের পর সাতটা বছরও যে যায় নি বোন, এর মধ্যে আমার বয়স যেন পঞ্চাশের কাছাকাছি এসেছে!

সত্যিই ভাই। চেহারাতেই শুধু বার্দ্ধক্য জাগে নি, মনে আমার জরা এসেছে, তারই আভাস দেহে ফুটে উঠেছে ভাই আমার মুখ এমন শুকনো, যৌবনের বিকাশ নেই।

তুমি আমি এক সঙ্গেই পড়তুম—না? দুজনে তখ[ন] ভবিষ্যতের ছবি কি রকমভাবে আঁকতুম, তাতে কি রক[ম] উজ্জ্বল রং ফলিয়ে দিতুম তা কি মনে পড়ে আজ? বিয়ে[র] পরশ পেয়ে আমার সে ছবি জীর্ণ হয়ে গেছে, সে উজ্জ্ব[ল] রং তার বিবর্ণ হয়ে গেছে, হতভাগিনী আমি, সব হারিয়ে[ও] ছায়া হয়ে বেঁচে রয়েছি।

ফুরিয়ে গেল সুখের বেলা। হ্যাঁ সত্যিই ফুরিয়ে গেল কিন্তু ফুরাল কি রকমে তা তুমি তো জানো না। আমি সে সব কথা কাউকে জানাই নি, মাকে পর্য্যন্ত বলি নি মা আমার চেহারা দেখে ধরেছিলেন "তোর বি[য়ে] হয়েছে বীণা, সেখানে তোকে সবাই আদর যত্ন করে ভালবাসে তো?"

বুকের ব্যথা বুকে চেপে জোর করে হাসি টেনে এনে বলেছিলুম বাঃ, ভালবাসে না? "আমি তাঁদের খুব আদর পেয়েছি।"

কত বড় সত্যটাকে চেপে রেখে এই মিথ্যা কথাট[া] বলেছিলুম। কি হবে মাকে সে কথা জানিয়ে, মাকে কাঁদিয়ে কি লাভটা হবে আমার? মা তো আমার ব্যথা দূর করতে পারবেন না, আমার চোখের জল মুছাতে পারবেন না।

মা তবু বললেন "বড্ড চেহারা খারাপ হয়ে গ্যাছে তোর, বল, না হয় ডাক্তার এনে দেখাই।"

ডাক্তার? ডাক্তারের নাম শুনেই প্রাণ আমার কেঁদে উঠল, ডাক্তার যে সব জেনে ফেলবে। আমি তাড়াতাড়ি বললুম "না মা ডাক্তার দেখাতে হবে না, আমি সেখানে ওষুধ খাই।"

মা ভাবলেন সত্যি কথা। কেমন করে আমার কথা অবিশ্বাস করবেন তিনি? মেয়েরা শ্বশুর বাড়ীতে এতটুকু ব্যথা পেলেও তা যে মায়ের কাছে জানায়, আমি যে এত বড় ব্যথা তাঁর কাছে গোপন করে যাব তা মায়ের ভাবনারও অতীত।

যে রাত্রে আমার বিয়ে হল, গোলমাল বাধল সেই রাত্রে, তুমি সে কথা শুনেছ নিশ্চয়ই। শ্বশুরের বি এ পাশ ছেলে, তিনি কম দামে ছেলে ছাড়বেন না ন্যায্য দাম আগেই নির্দ্দেশ করে দিয়েছিলেন আমার বিধবা মা প্রাণপণে দাম সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। গোলমাল বাধল সামান্য আংটী নিয়ে, স্বামী বেঁকে বসলেন বিয়ে করবেন না আংটী খারাপ হয়েছে। সে রাত্রে বিয়ে হতো না না হওয়াই ছিল ভাল কিন্তু নিলমণি জ্যেঠামশাই মাঝখানে পড়ে সব মিটিয়ে দিলেন মাকে তাঁর গহনা বন্ধক রেখে আংটীর দরুণ দেড়শো টাকা বরকর্ত্তার হাতে গুণে দিতে হলো।

ভাবছি কেন দিলেন? ভগবান কেন সে সময় মায়ের হাতছড়াটা সামনে ধরে দিলেন না এমন আমার বিয়ে তো হতো না, আমি যথার্থই বাঁচতুম যে।

শ্বশুর বাড়ী গেলুম।

কালো বউ— কথাটা আমি বাড়ী থাকতেই রাষ্ট্র হয়ে গেল। শাশুড়ি বরণডালা ফেলে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে গেলেন। তাঁর এমন বি এ পাশ ছেলের কি না এই বউ। স্বামীও তখন টাটকা বি এ পাশ করে বেরিয়েছেন, অন্তরটা তাঁর অর্দ্ধ রাজত্বসহ এক অনুপম সুন্দরী রাজকন্যার স্বপ্নেই ভরে ছিল, তার পরিবর্ত্তে কালো বউ, অর্দ্ধেক রাজত্ব সঙ্গে নেই, এতে ভয়ানক দমে গেছলেন, তাঁর যতটা আক্রোশ সব এসে পড়েছিল আমার পর।

যেমন তেমন এক রকম করে বরণের কাজটা সেরে নেওয়া হলো, বাড়ীশুদ্ধ সকলের মুখ অন্ধকার, কারও মুখে হাসি ছিল না। আমার 'পরে সকলের আক্রোশ পড়ল, কেন, আমি কালো মেয়ে, আমার এই সুন্দরের বাড়ীতে প্রবেশের অধিকার ছিল না যে।— স্বর্গের নন্দনে চুরি করে ঢুকে পড়েছি,— এদের এমনি ভাব, এমনি রাগ, আবার মনে হয় তারা এমনি ব্যবহারই করতে লাগলেন।

দোষ আমার? হায় রে, কে বলবে দোষ আমার নয় দোষ সৃষ্টিকর্ত্তার? এই গৃহের বধূ নির্ব্বাচন করেই পাঠিয়েছেন, আমি তো চুরি করে আসি নি। আমায় দেখে শুনেই তো গ্রহণ করেছে, আমি তো ফাঁকি দেই নি।

তোমরা যা চাও তা পাওনি, সে দোষ কি আমার? ওগো, বাহ্যিকটা ছেড়ে দিয়ে অন্তরটা দেখ, সেখানে সুন্দরও যা কালোও তাই। বাহ্যিক তার চেহারা কালো বলে তার অন্তর তো কালো করে গড়েন নি, সুন্দরও যেমন ব্যথা পায়, কালোও তো তেমনি ব্যথা পায়, তবে কেন কালো বলে ঘৃণা?

বাংলার মেয়ের দোষ বাংলার মাটির দোষ। বাংলা দেশে কালোর সংখ্যাই বেশী, সুন্দর কয়জন আছে? তবু এখানে সবাই সুন্দর চায়, কালো কেউই চায় না। আরও যদি হতো আমার মায়ের টাকা থাকলেও দোষটা ঢেকে যেত, কিন্তু বিধবা মা যে আমার দরিদ্রা, আমায় বিয়ে দিয়ে তিনি যে পথের ভিখারিণী হয়েছেন।

কি পাপে মেয়েরা এদেশে জন্মায়? মেয়ের এদেশে সম্মান নেই মেয়ে জন্মেছে ঠিক নয় কি? মেয়ে জন্মালে আত্মীয় স্বজনের তো কথাই নেই, মায়ের মনটা পর্য্যন্ত খুঁত খুঁত করে—মেয়েকে পরের বাড়ী দিতে হবে, হয়তো কত কথাই শুনতে হবে, হয়তো আর তাকে দেখতেই পাওয়া যাবে না। দেশের সকল মা বাপের মন যদি এক সমান হতো তাহলে কোনও মেয়ের জন্মের জন্যেও তার মা বাপের মন কি এ রকমভাবে ব্যথিয়ে উঠতে পারত? এই যে দেশ জোড়া আন্দোলন চলেছে কিন্তু এতে কোনও ফল হয়েছে কি? কিছু না বোন, কিছু না। কথাটা বলতে ভাল—বাহাদুরি পাওয়া যায়, শুনতে ভাল, কিন্তু সব সাময়িক মাত্র, তারপর আবার যা তাই। শুনলুম আমার শ্বশুর ননদের বিয়ের কিছুদিন আগে হতে খুব বক্তৃতা করে বেড়িয়েছিলেন, দেশের মধ্যে তাঁর খুব নাম বার হয়ে পড়েছিল। আমার স্বামী তখন কলেজে পড়তেন, ছেলেদের কাছে খুব আস্ফালন করেছিলেন; বাংলার

অভাগিনী মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে তাঁর দুচোখ ফেটে নাকি জলও বেরিয়ে পড়েছিল। আমার স্বামীর বক্তৃতার আকৃষ্ট হয়ে কয়েকজন ছেলে নাকি বিনা পণে কয়েকটী দরিদ্রকে কন্যাদায় হতে রক্ষা করেছে।

মেয়ের বিয়ের পরেই শ্বশুরের সে উঁচু গলা ক্রমে খাদে নেমে গেল, শেষে একেবারেই রইল না। স্বামীর ও উৎসাহ একেবারে গেল, তিনি অন্যদিকে মাথা দিলেন।

যেদিক দিয়ে যেমন করেই হোক—মাঝখানে এসে পড়লুম যে আমি, লাঞ্ছনার চূড়ান্ত আমারই হতে লাগল।

দেখ, আমাদের দেশের মা বাপেরা এটা বোঝেন না যে নূতন একটী লোক তাঁদের সংসারে আসে, প্রথমটায় তাকে নিজেদের সংসারের উপযুক্ত করে নিতে গেলে অনেক দোষ তার ক্ষমা করতে হয়। যে মেয়েটী আসে বিয়ে হয়ে, সে যে কতটা লজ্জা, কতটা ভয় নিয়ে এসে প্রবেশ করে সেটা ভাবতে তাঁরা ভুলে যান মেয়েদের জীবনে এ রকম ঘটবেই। আবাল্য পরিচিতদের ছেড়ে অপরিচিতের মাঝে একা তাকে যেতে হবে, নিজের অভ্যাস সব তাকে ছাড়তে হবে, নিজেকে সেই অপরিচিত সংসারের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে নইলে তার জীবনটাই বৃথা হয়ে যায়। এই যে প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাওয়া এটাকে বড় সহজ মনে করো না ভাই, তাকে এ সময় কতটা ভাঙতে হয়, কতটা গড়তে হয় সেটা একবার ভেবে দেখো। এটা বড় কম সাধনা নয় মেয়েরা এই সাধনায় সিদ্ধ হয়ে তবে সংসারের গৃহিণী সন্তানের মা হতে পারে।

আমার শ্বশুর শাশুড়ী এটা ভাবেন নি, আমার দিক তাঁরা চেয়ে দেখেন নি, তাঁরা দেখলেন নিজেদের দিকটা। স্নেহে যেখানে কাজ চলে যায়, সেখানে তাঁরা করেন শাসন। আমার একটা ত্রুটি তাঁরা ক্ষমার চোখে দেখলেন না, স্নেহে তাঁরা আমায় বশ করতে চাইলেন না, শাসন দিয়ে চোখ রাঙিয়ে প্রথম বেলাতেই দাঁড়ালেন।

ছোট বেলা হতে মায়ের মুখে সকলের মুখে শুনেছি শ্বশুর শাশুড়ীকে ভক্তি করতে হয়, কিন্তু হায়, কথাটা বলা যায়, করতে পারাই যে শক্ত যদি শ্বশুর শাশুড়ী ভক্তি নেবার যোগ্য পাত্র না হন। পরের একটী মেয়ে যে তাঁদের আশ্রয়েই এসেছে তার মুখের দিকে তাঁরা যদি না চান, সে ভক্তি দিতে পারে কতটুকু? সত্যের দিক দিয়ে বলতে গেলে এতে ভক্তি একটু আসে না, মনের মধ্যে বরাবর বিদ্রোহ ভাবটাই জেগে থাকে; তবে যে ভক্তিটুকু দেখানো হয়—সেটা কেবল ভয়ে। তাই বলি মিথ্যার পরে যার ভিত্তি সেই ইমারত কখনও টেঁকতে পারবে না, সে ভেঙে পড়বেই যে।

আমি পাপিষ্ঠা তাই সব নিয়ম পালন করতে পারলুম না। তাও জিজ্ঞাসা করি—আমায় এ রকম করলে কে? এ দোষ কি আমার—?

স্বামীর কথা—হায় রে, তাই বা বলব কি করে? সেই যে প্রথম স্বামীর বিষ চোখে পড়েছিলুম, শান্তদৃষ্টি সে চোখে তো কখনই দেখতে পেলুম না। বেশ হাসছেন, কথা বলছেন, আমায় দেখবামাত্র তাঁর মুখ অমনি ভার হয়ে ওঠে।"

ইচ্ছা হয়—পায়ের তলায় আছড়ে পড়ে বলে উঠি—ওগো—দোষ কি আমারই? তুমি আমায় বরণ করে নিয়ে এসে আমায় একেবারে নষ্ট করে দিলে, আমার মনুষ্য জন্মটাকে ব্যর্থ করে দিলে? আমার এ সংসারে এসে কোনও সাধ মিটল না যে গো, কোন সাধ মিটল না।

কিন্তু না, মুখ ফুটে তা বলতে পারি নি। তার কাছে বলাও যা, পাষাণের কাছে বলাও তাই। সে নিজের পুরুষত্বের অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে গেছে, বধির হয়ে গেছে, নারীর কোন কথা কাণে নেবে না।

বিশাল সংসার, কিন্তু এখানে আমার স্থান কোথায় গো, আমার স্থান কোথায়? মা টাকা দিতে পারেন নি, উপযুক্ত তত্ত্ব করতে পারেন নি তাই বাপের বাড়ী যাওয়া আমার বন্ধ। আমার সামনে আমার মাকে উদ্দেশ করে শাশুড়ীর কি গালাগালি, শ্বশুরের কি ব্যঙ্গোক্তি, তবু সব সয়ে যেতে হবে, মুখ ফুটে একটী কথা বলবার যো নেই, কারণ আমি যে বউ। দুর্ভাগিনী মা আমার, চোখের জলে ভিজিয়ে পত্র দিতেন, সে পত্র কি আমি পেতুম? একদিন একখানা পত্র চার পাঁচ টুকরো হয়ে পড়েছিল, মায়ের হাতের লেখা দেখে কুড়িয়ে নিয়ে মিলিয়ে দেখছিলুম ননদ এসে কেড়ে নিয়ে যা তা কথা শুনিয়ে দিলে। নীরবে চোখের জল ফেললুম। চোখের জল—হাঁ, তাই যে আমাদের সম্বল,

আর আমাদের—এই অধঃপতিত বাংলা দেশের মেয়েদের কি আছে ?

একদিন মাকে পত্র লিখব বলে মুখ ফুটে একখানা পোষ্টকার্ড চেয়েছিলুম, শ্বাশুড়ী আমায় শুনিয়ে দিলেন যে মা মেয়ের শ্বশুরবাড়ী তত্ব দিতে পারে না তার সঙ্গে মেয়ের কোনও সম্পর্ক নেই।

সম্পর্ক নেই —এ কথা কেমন করে বললে মা ? তুমিও তো নারী, তুমিও তো মা। একদিন তুমিও তো প্রথম বধূ হয়েই এসেছিলে, মায়ের জন্যে মেয়ের বুকের মধ্যে কেমন করে, মেয়ের জন্যে মায়ের বুকে যে কতটা ব্যথা বেজে ওঠে—তা কি তুমি জান না নারী ?

চোখের জল ক্রমেই শুকিয়ে এলো। আর না, এখানে কিছুতেই চোখের জল ফেলা হবে না। যেখানে চোখের জলের মূল্য নেই, প্রাণের ব্যথা কেউ বোঝে না, সেখানে প্রাণের ব্যথা চোখের জল প্রকাশ করে কেবল উপহাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র সার।

কেবল কাজ কর—কেবল কাজ কর। একদণ্ড এরা আমায় ছুটী দিতে রাজি নয়, বুকে বাঁশ ডলে খাটিয়ে নেবে। বড় দুঃখ বাজে প্রাণে—শুধু কি খাটবার জন্যেই আমি এসেছি ? ওদের সুখের জন্যে আমি প্রাণপাত করে যাব কিন্তু আমার সুখের জন্যে ওরা এতটুকু সময় আমায় ছাড়বে না ?

বিয়ের সময়েই বি এ পাশের আদর, কিন্তু বাজারে বি এ পাশের ছড়াছড়ি ব্যাপার তো আমার অজানা নেই। বি এ পাস স্বামী আমার সামান্য বেতনের একটা কাজের জন্যে লালায়িত হয়ে বেড়াচ্ছিলেন, শ্বাশুড়ী দুঃখ করছিলেন -- এমন অপয়া অলক্ষুণে বউ এসেছে যে বাছার আমার কাজ জুটেও জুটছে না।

এত দুঃখেও পোড়া মুখে হাসি আসত—অপয়া বউটারই অপরাধ বটে। আমি যদি আর হাজার খানেক টাকাও এখনি দিতে পারতুম তা হলে নিশ্চয়ই যে "পয়মন্ত" হতুম তাতে একটু সন্দেহ ছিল না।

কথায় কথায় শ্বশুর শ্বাশুড়ী ননদিনী, স্বামী সকলের কাছ হতে লাঞ্ছনা ভোগ, মানুষে আর কত সইতে পারে ভাই ? লেখাপড়া একেবারেই তো ছেড়ে দিয়েছিলুম, এ বাড়ীতে মেয়েরা লেখাপড়া করবে—শ্বশুর তো চটেই আগুণ। ছবি আঁকাতুম ভাল—তা তো জানো, শ্বাশুড়ী মুখ টিপে হেসে শ্বশুরকে লক্ষ্য করে বললেন "ওগো, তোমার বউমা এবার ছবি আঁকিয়ে রোজগার করে খাওয়াবে'।" লজ্জায় অপমানে রাঙ্গা হয়ে উঠে কাগজ ছিঁড়ে—রং ফেলে দিয়ে সেদিকেও নিশ্চিন্ততা লাভ করলুম।

মা কি বুঝতে পারেন নি কেন এঁরা আমায় পাঠাচ্ছেন না ? তিনি বোধ হয়—মেয়েটীকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে ভিক্ষে করে পঞ্চাশটী টাকা যোগাড় করে পাঠালেন -- এবং একটী দিনের জন্যে আমায় নিয়ে যাবার প্রার্থনা করলেন। সেই বারই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়। একটী দিন থেকেই আমি আবার ফিরে আসি, তারপর আর না।

আজকালকার অনেক ছেলের স্বভাব চরিত্র যেমন অনিন্দনীয় আমার স্বামীরও ঠিক তেমনই ছিল। বাইরে যা করতেন সে শুনতে পেতুম না, কিন্তু একটী ভদ্রলোকের মেয়েকে তিনি যে পত্রখানা লুকিয়ে দিয়েছিলেন, সেই পত্রখানা আবার আমারই কাছে আসে। আমি খানিক হাঁ করে বসে থেকে সেখানা আমার শ্বাশুড়ীকে দিলুম।

শ্বাশুড়ী তেলে বেগুণে জ্বলে উঠলেন যত রাগ পড়ল আমার ওপরে। ছেলের দোষ তিনি একটুও দেখলেন না সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপালেন। নির্ব্বাকে সব সয়ে গেলুম, উল্টো বিচার দেখে অবাক হয়ে গেছলুম। শ্বাশুড়ী কথাটা শ্বশুরের কাণেও তুললেন, শ্বশুর গম্ভীর মুখে বললেন এরকম বয়সে ওরকম ঢের হয়ে থাকে, সব কথা কাণে তুলতে গেলে কি চলে ? দেশের সব ছেলেই যদি এক পথে চলে ওই বা কেন চলবে না ?

বাঃ—সুন্দর কথা পিতামাতারই উপযুক্ত কথা বটে। যে পিতামাতার আদর্শ নিয়ে সন্তানের চরিত্র গঠিত হবে এ সেই পিতামাতা। এঁরা সন্তানের নৈতিক শিক্ষার দিকে চান না, স্কুল কলেজের শিক্ষাকে পর্য্যাপ্ত শিক্ষা বলে মনে করেন। যেমন তেমন করে মানুষ করে তুলতে পারলেই হলো—কিন্তু তাকে যে প্রকৃত মানুষ করতে হবে তা ভাবেন না।

ক্রমেই উন্নতি দেখা যেতে লাগল, আমার স্বামী ক্রমে

...চরিত্র ... উঠে পিতামাতার সামনেই যা তা কথা বলতে লাগলেন। তাঁরা ছেলেকে কিছু বলতে সাহস করলেন না, এসে চেপে ধরলেন আমাকে। আমি কারো ... আমার স্বামী—তাদের ছেলে এমনি করে ... গেল।

সে দিন আর সহ্য করতে পারলুম না, অনেক সয়ে ছিলুম; আর কত সওয়া যায়? মুখ ফুটে বললুম আপনারা না ... আবার ছেলের বিয়ে দিন যাতে সে শুধরায় তাই ...।"

কথাটা রাগের সঙ্গেই বলেছিলুম, কিন্তু দেখলুম সেই কথাটার পরেই নির্ভর করে তাঁরা সত্যই বিয়েব সম্বন্ধ করতে লাগলেন।

মা পত্র লিখলেন বীণা আমার কাছে আয়, সবাই তোকে ত্যাগ করেছে, আমি তোকে বুকেব মধ্যে লুকিয়ে রাখব।

শ্বশুর মাথা দুলিয়ে বললেন "ঠিক কথা, এ সময়ে মা তোমার মায়ের কাছেই যাওয়া উচিত। স্বামীকে সংশোধন করবার জন্যে তুমি যে ভাবপর হতে তোমার সর্ত্ত ফিরিয়ে নিলে এ যথার্থ সতী সাবিত্রীর মতই কাজ হলো—কিন্তু মা, চোখে দেখতে পারবে না। তুমি সেখানেই থাক গিয়ে আমি মাসে মাসে তোমার কিছু করে খরচ পাঠিয়ে দেব।"

আমি স্পষ্ট উত্তর দিলুম—"আমি যাব না। আপনাব সে পুত্র বধূর জন্যে আপনাদের সেবার জন্যে একটা ঝিয়ের দরকার আছে তো, আমি সেই ঝি হয়েই এখানে পড়ে থাকব, তবু মায়ের কাছে যাব না।

আমার কথার মধ্যে যে কতটা ব্যথা ছিল তা তিনি দেখলেন না, কেউই দেখলেন না।

তীব্র বেগে চেয়ে দেখতে লাগলুম স্বামীর আনন্দ, সে আনন্দ তিনি আর চেপে রাখতে পারছিলেন না।

সুখী করতে যাচ্ছো আজ কাকে, বরণ করে আনতে যাচ্ছো আজ কাকে? আমার জীবন কতখানি অপূর্ণ রেখে গেলে তা তো দেখলে না নিষ্ঠুর পিশাচ?

ছিঃ, একেই হিন্দু শাস্ত্রে দেবতা বলে, এমনি স্বামীকেই নাকি স্ত্রী তার ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম উপহার দেবে? আমার নৈবেদ্য সে পদাঘাতে ফেলে দিলে আমি তাকে ভক্তি করব? আমার সর্ব্বস্ব খেয়েছে যে সে—আমার সুখ শান্তি, সাধ আহ্লাদ, আমার অটুট স্বাস্থ্য, সবই যে সে নষ্ট করেছে। তার পাপের ফল ভোগ করছি আমি, তার পাপ মাথায় করেছি আমি। আমি লুন্ঠিতা, লাঞ্ছিতা, অপমানিতা আমার বুকে ব্যারাম, আমার সারাগায় ব্যারাম, আমি সুস্থ কে বলে? নিদারুণ যন্ত্রণা যে আমায় দেছে তাকে আমি এখনও বলব দেবতা—এখনও পূজা করব? না, পারব না তা, তাকে দেবতা বলব না, তাকে হত্যাকারী পিশাচ বলব। সে আমার মধ্যে কিছু রাখেনি সে আমায় একেবারে হত্যা করে নি, তিলে তিলে হত্যা করছে। আমার এই অল্প বয়সে দৃষ্টি হীনতা, কাণে কম শোনা—হায় ভগবান—হায় হিন্দু শাস্ত্র কেন তোমরা নারীকে পুরুষের স্ত্রী করে পাঠিয়েছ, কেন তাকে এমন শক্তি দাওনি পুরুষের বিপক্ষে যাতে সে দাঁড়াতে পারে?

বিয়ে হয়ে গেছে। তোমার পত্র যখন পেয়েছিলুম বাড়ীতে তখনও বিয়েব ব্যাপার আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। নূতন বউকে দেখলুম, সত্যই সুন্দরী সে, যথার্থ স্বাস্থ্য আছে তার। একবার তার দিকে তাকালুম, একবাব নিজেব দিকে তাকালুম, দু চোখ ভরে জল এলো, কে বে অভাগিনী মেয়েটা, তোকে সতর্ক করে দেবার জন্যেই তো আমি এ বাড়ী ছেড়ে গেলুম না, কিন্তু তুই তো সতর্ক হতে পারলিনে তুই যে এই ঘরেই ওই চরিত্রহীন বর্ব্বরকে বরণ করে এলি। শুধু বি-এ পাশ শুনে ভুলে গেলি, চরিত্র দেখলিনে? ওরই আড়ালে কতটা বর্ব্বরতার, কতটা চরিত্র হীনতা, কতটা ব্যাধি লুকানো আছে তা তোর অভিভাবক দেখলে না? এমনি করে নিজের সর্ব্বস্ব দিতে এলি বে হতভাগি তোর জীবনও যে বৃথা হয়ে গেল।

সত্য হলো ও তাই, মাস দু তিন না যেতে যেতে দেখলুম সেই আধ ফোটা ফুলটী শুকিয়ে ঝরে উঠল। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললুম।

আজ ও আছি এই বাড়ীতে। আর এখানে থাকব না বড় যন্ত্রনা, সহ্যের ও অতীত, আমার সঙ্গে এখানকার সব সম্পর্কই ফুরিয়ে গেছে, আর কেন; এখন এ জাল গুটিয়ে উঠবার যোগাড়ে আছি, ওখানে গেলে একবার দেখতে আসিস ভাই, আর বেশীদিন বাঁচব না বুঝতে পারছি, আমার আয়ুক্ষয় হয়ে এসেছে। মরবার সময়টা মায়ের কোলে মাথা দিয়ে মরব বড় ইচ্ছা আছে তাই যাচ্ছি।

এখন তবে আসি ভাই।

ইতি

তোর বীণা

বৈজ্ঞানিক সঙ্গীতাচার্য্য
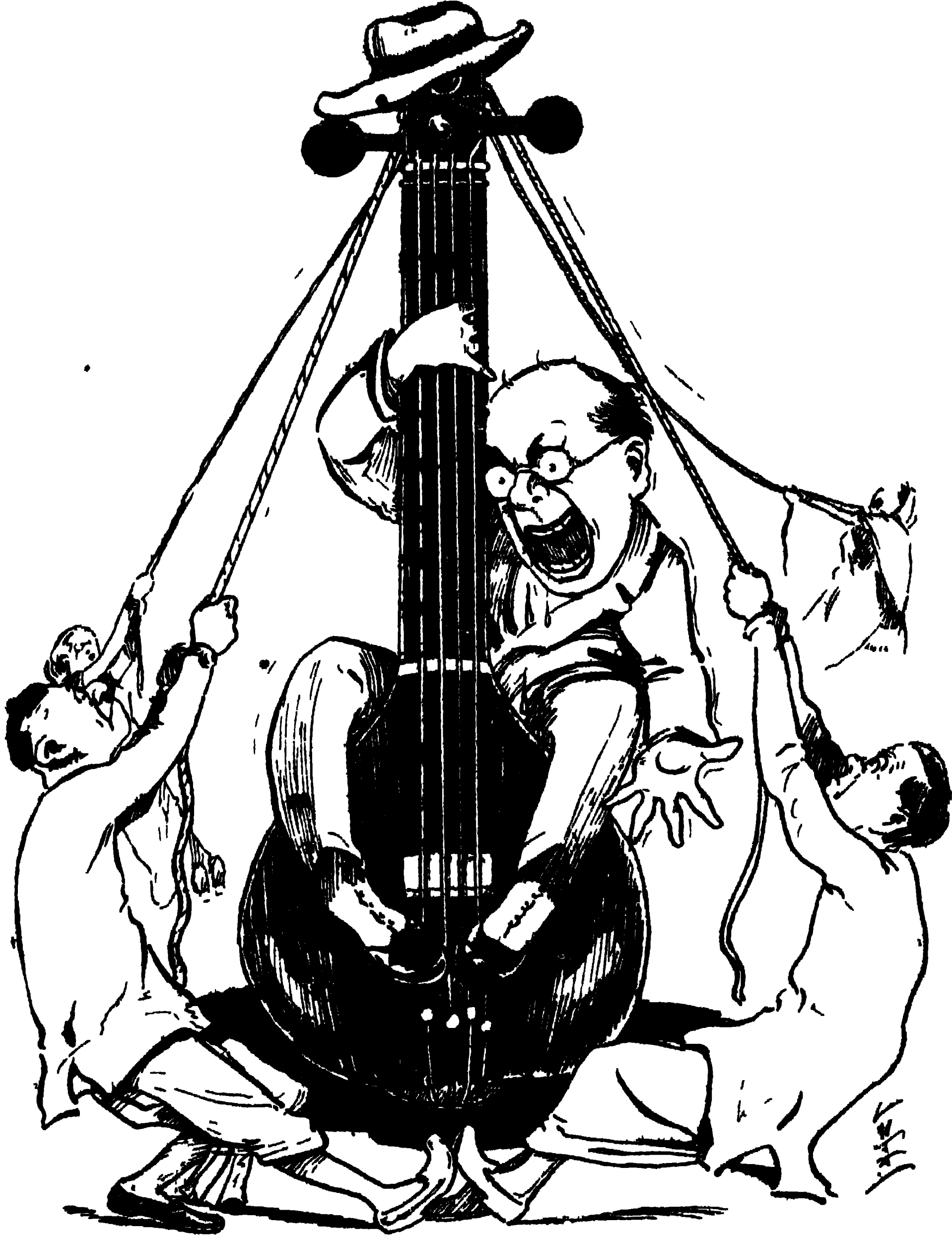
আজীবন ভারতবর্ষে বসে বুড়ো বুড়ো ওস্তাদরা যা পায় নাই আমি কিছুদিন ইউরোপ ঘুরে এসে তার চেয়ে ঢের বেশী সম্মান পেয়েছি—সঙ্গীত শিখলেই কি সঙ্গীতাচার্য্য হয়—তা হয় শুধু যোগাড়ে, ভক্তের দল আর চাল-বাজীতে আজ বাংলা টলমল।

ইয়ং ইণ্ডিয়া

মহাত্মা গান্ধীর

পত্রিকার সার সঙ্কলন

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ,

প্রেমের আইন :—

কোন বন্ধু বলিতেছিলেন আমি স্বরাজ্য, উদার এবং অপর সকলের সঙ্গে সখ্যতা করিতে গিয়া পরিবর্ত্তন বিরোধীদের ভুলিতেছি এবং আমার এই পরিবর্ত্তনে তাঁহারা বিভ্রান্ত হইয়া পরিয়াছেন। আমার নিজের মতের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই প্রথমেই এই বলিয়া আমি কথাটা পরিস্কার করিতে চাই। অহিংস অসহযোগ এবং ইহাতে যে সব বর্জ্জন করিতে হইবে তাহাতে আমি স্থির আছি। কিন্তু আমি স্পষ্ট দিবালোকের মত দেখিতেছি দেশ সমগ্র ভাবে অহিংসা বুঝিতে পারে নাই তাই অসহযোগ যেভাবে তাহার সম্মুখে ধরা হইয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারে নাই। আমি দেখিতেছি অসহযোগের কার্য্যকরী নীতি অহিংসা ত্যাগ করিয়া অসহযোগ রাখিতে গেলে দেশের অমঙ্গলই হইবে। ইতিমধ্যেই ইহা অনেক ক্ষতি করিয়াছে নানা বিরোধী দলে দেশ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় অসহযোগকে জাতীয় কর্ম্ম তালিকা হইতে কিছু সময়ের জন্য বর্জ্জিত রাখিতে হইবে। সত্যাগ্রহই অসহযোগের মূল—ইহাই প্রেম। প্রেমের আইন—আকর্ষণ, দৃঢ়তা যাহাই বল, জগৎ শাসন করিতেছে। মৃত্যুর মুখেও জীবন চলিয়াছে। অনবরত ধ্বংসের মধ্যেও বিশ্ব রহিয়াছে। অসত্যের উপর সত্য জয়লাভ করিতেছে। প্রেম ঘৃণাকে জয় করিতেছে। ভগবান চিরকাল শয়তানকে জয় করিতেছেন।

অসহযোগকে আমি মিলন-শক্তি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম। কংগ্রেসে বিচ্ছেদ, হিন্দুমুসলমানে মতবাদ এ সবে দেখা যাইতেছে আমাদের অসহযোগ বিচ্ছেদেরই হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই ইহা স্থগিত রাখিয়া এবং সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিয়া আমি ইহার শুভকরী দিকটা দেখাইতে চাই। ইহা করিতে পরিবর্ত্তন বিরোধীদের তুষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। অহিংসার অর্থ তাঁহারা জানেন বলিয়া দাবী করেন। সব ছাড়িয়া গঠন কার্য্যের দিকেই তাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা হইতে এক তিলও আমি বিচ্যুত হইতেছি না। বরং যাহা আমি করিতেছি তাহাতে উহাতেই জোর দেওয়া হইতেছে। হিন্দুমুসলমান সমস্যা একটা মস্ত বড় কথা। সমস্ত দেশের মতামতের জোর ইহাতে আমরা চাই। জয়ী হইবার জন্যই আমাদের থামিতে হইবে। আমাদের অসহযোগ স্থির রাখিয়া যাহারা ইহাতে বিশ্বাস করে না তাহাদেরও পথে আনিয়া গঠন কার্য্যে দেশের মতি আনিতে হইবে। গত চার বৎসর আমাদের পথ দেখাইয়াছে। আমরা অনেক পাইয়াছি, কিন্তু আবার অনেক হারাইয়াছিও। যাহা পাইয়াছি তাহা রক্ষা করিয়া হারাণো জিনিস উদ্ধার করিতে হইবে। সধারণের জাগরণই সব চেয়ে বড় লাভ। ইহা রাখিতেই হইবে। নিজেদের বিবাদ বড় ক্ষতি, ত্বরিৎ আমাদের ইহার সংশোধন করিতে হইবে। অসহযোগের ভীষণ দিকটা আমরা না ছাড়িলে কেহ ইহা সাধন করিতে পারিবে না। পরিবর্ত্তন বিরোধীদের কোন মূল্য থাকিলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে আত্মত্যাগ করিয়া নীরব কর্ম্ম। তাঁহারা ক্ষমতা, পদ ও নামের জন্য

কোন কাজ করিবেন না। যুদ্ধ হউক বা না হউক নীরবে তাঁহারা কর্ম করিয়া যাইবেন।

এভাবে চলিবার পথ কি তাহা আমি নিজেই দেখাইতেছি। স্বরাজী এবং উদার মতাবলম্বীদের নিকট যতটা বশ্যতা স্বীকার করা যায় তাহা আমি করিতেছি। পরিবর্ত্তন বিরোধীদের নিকট বশ্যতার কিছু আমার নাই—কারণ তাঁহাদের সহিত আমার মত বিরোধও বোধহয় কিছু নাই।

কোন দলভুক্ত হইয়া পরিবর্ত্তন বিরোধীদের এরূপ করিবার অনুরোধ করিতে বিরত রহিলাম।

স্বরাজ্যদলের কার্য্যের বিরোধী আমরা অবশ্যই হইব না। পরিবর্ত্তন বিরোধীদের যেখানে সংঘর্ষের মধ্য দিয়া আধিপত্য স্থাপিত করিতে হইবে সেখানে তাঁহারা সানন্দে, ইচ্ছাপূর্ব্বক, হাসিমুখে স্বরাজ্যদলের অনুগামী হইবেন। ক্ষমতা বা পদ কার্য্যগুণে হইলে ভাল ভোট বিজয়ে না হইলেই ভাল। ভোট থাকিবে সন্দেহ নাই কিন্তু আসিতে হইলে ইহা বিনা জিজ্ঞাসায়ই আসিবে। কার্য্য—ক্ষমতা, পদ বা মর্য্যাদার অপেক্ষা না করিয়াও করা যায়। আবার ইহা আমাদের সকলেই জাতির সেবক হইবে।

স্বরাজ্য, উদার এবং অপরাপর সকলের নিকট যা চাই পরিবর্ত্তনবিরোধীরা তাহাই করিবেন ইহা আমি আশা করি। কিন্তু তাঁহারা তাহা করুন বা না করুন আমি আমার বিশ্বাস মত চলিব। গত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে ভগবান আমায় ওজন করিয়া আমার অভাব দেখিয়াছেন। আমার অহংকার তখনও আমার স্বরাজীদের সঙ্গে বিবাদ করিতে বলিয়াছিল। কিন্তু আমার চিরপিপাসিত কর্ম্মশক্তি আমায় স্বরাজ্য, উদার বা ইংরেজ কাহারও সহিত বিবাদ করিতে নিষেধ করিয়াছে। আমি যাহা হইতে চাই আমি যে তাহাই ইহা সকলের নিকট প্রমাণ করিব - আমি তাহাদের বন্ধু ও সেবক। আমার ধর্ম্ম ভগবানের সেবা – তাই মানুষেরও সেবা। ভারতবাসী হিসাবে ভারতের সেবা এবং হিন্দু হিসাবে ভারতীয় মুসলমানের সেবা করিতে না পারিলে আমি ভগবান বা মানুষ কাহারও সেবা করিতে পারিব না। স্বেচ্ছায় সেবা অর্থই বিশুদ্ধ প্রেম। কত প্রেমে আমি সমর্থ তাহা আমার প্রতি ক্ষুদ্র কার্য্যেই সাধ্য মত দেখাইবার চেষ্টা করিব।

"নীলমণি"

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

নীল গগনে লুকিয়ে আছ লাজুক নীলমণি!
দুলছে চূড়া, তুলছে নূপুর মৃদুল রণ্‌রণি!
ফাগুন বাগে আগুন লাগে আবীর কুঙ্কুমে!
সাজাও শিমূল, অশোক, পারুল, বাজাও খঞ্জনী!

অলির গানে কলির প্রাণে তোমার বন্দনা!
শ্যামের বাঁশী বাজায় শ্যামা, দোয়েল, চন্দনা!
গুঞ্জাফুলের মঞ্জু রাখী নয়ন রঞ্জিছে!
তোমার চলন-ভঙ্গী দেখায় ছোট্ট খঞ্জনা!

লক্ষ দানব করলে দলন হেলায় অক্ষ-ধর!
সখ্য করি ধরলে নিখিল বিপুল বক্ষ 'পর!
আজকে শুনি কাল-বোশেখীর করাল ঝঞ্জনা!
তোমার চরণ করছে বরণ আবার লক্ষ নর!

অভয় দিয়ে হাসছ তুমি ঈশান অম্বরে!
চক্র তোমার ঘূর্ণি-বায়ে ঐ যে সঞ্চরে!
বাহন তোমার দন্ত-হারা কর্‌ল দম্ভোলী!
হাস্যে তোমার, নিষ্ঠুরতা কাঁপছে অন্তরে!

শ্রাবণ শেষে ফির্‌লে হেসে মোহন ভঙ্গীতে!
ময়ূর-মাতন বন্ধ হ'ল নয়ন ইঙ্গিতে!
তোমার চূড়া দেখ্‌তে পেলাম——ইন্দ্র-ধনু গো!
মুগ্ধ হ'লাম কানাই, শারদ-সানাই সঙ্গীতে!

ইন্দ্রনীলের বরণ ঢালা বক্ষে কেমনে
নন্দদুলাল, কৌস্তভটি রাখ্‌বে গোপনে?
সুনীল আকাশ ঐ দিল সব প্রকাশ করে যে!
চন্দ্র হ'য়ে বুকের রতন দুল্‌ল গগনে!

চোখের কথা
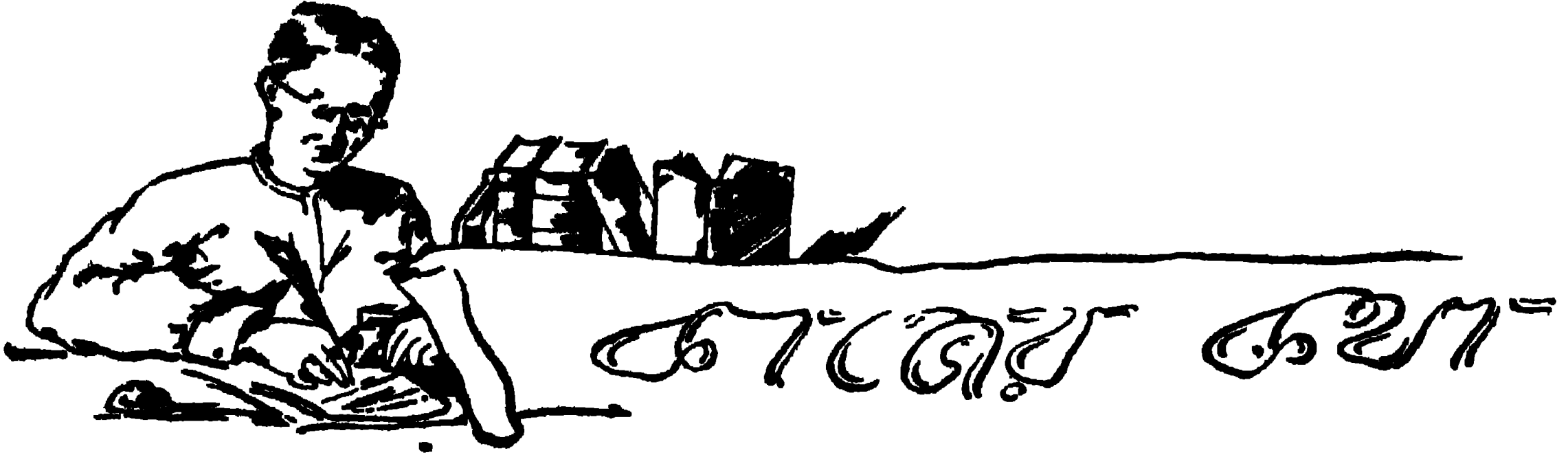
তিনআইন ও অসাধারণ বিধানের জাল ঃ—তিন আইন ও বড়লাটের অসাধারণ বিধান বলে গত শনিবার হইতে বাংলা দেশে আবার ধরপাকড় আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতায়ই ধর পাকড় হইয়াছে বেশী মফস্বলেরও অনেক স্থান হইতে দু'চার জন করিয়া ধরা হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে দেশবাসীর পরিচিত খ্যাতনামা দেশকর্ম্মীও কয়েকজন আছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান শ্রীযুক্ত সুভাস চন্দ্র বসু, কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের সেক্রেটারী প্রভৃতিও ধৃত হইয়াছেন। সামরিক আইনের মতই এই আইন এমন ভাবে আবার চলিতে থাকায় দেশবাসীর মন অশান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। দোষী বলিয়া যাহাকে ধরা হইল তাহাকে নিজ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার সুযোগ পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে না ইহাতে ধৃত ব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রকার আইন ও শৃঙ্খলার সুযোগ বঞ্চিত করা হয়। সভ্য আইন ও শৃঙ্খলার দেশে এমন ব্যবস্থা মনুষ্যত্বের অপমানকর। সরকারপক্ষ বলিতেছেন যে নির্দ্দোষ তাহার ভয় নাই—নির্দ্দোষকে এ আইনে ফেলা হইবে না। যাহারা ভীতি প্রদর্শক তাহাদেরই ইহাতে ধরা হইবে। ভীতি প্রদর্শক কে বা কাহারা তাহা সরকারী পুলিশ স্থির নিশ্চিত জানিতে পারেন কিন্তু দেশের লোকে সে সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। যেমন ধরা হয় উপযুক্ত বিচারে দোষ প্রমাণিত হইলে দেশবাসীর বলিবার আর কিছু থাকে না। দেশ প্রচলিত আইন ও বিচারের মর্য্যাদাই দেশবাসী রাখিতে চাহিতেছে। বিচারে কে সত্য দোষী কে নির্দ্দোষ তাহাই জানিতে চাহিতেছে—অবিচার চাহিতেছে না।

—:*:—

স্বরাজ্যদল ও বর্ত্তমান নির্য্যাতন নীতি ঃ—স্বরাজ্যদলের অনেকে এই নির্য্যাতনের পেষন চক্রে পড়িয়াছেন। রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য স্বরাজ্যদল মসিযুদ্ধ ও বাকযুদ্ধ করিতেছিলেন বলিয়া দেশের লোকে জানে, সে স্থলে তাহাদেরই কেহ কেহ যে বিপ্লববাদী ও ভীতি উৎপাদক হইয়া উঠিয়া একেবারে তিন আইনের ফাঁদে গিয়া পড়িবেন তাহা কেহ ভাবে নাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রের ধর পাকড় তাহা যখন হইতেছে তখন স্বরাজ্যদলের বৈধ আইন অনুমোদিত আন্দোলনে সরকার বিপর্য্যস্ত হইয়াই এই কাণ্ড করিতেছেন ইহা দেশের লোকে ভাবিতে পারে। ধৃত ব্যক্তি বিশেষেরা সত্যই যদি আইন ভঙ্গ করিয়া দোষী হইয়া থাকেন তবে আইনের বিচারে তাহাদের দোষ প্রমাণ করিলে এ অপবাদের দায়ী হইতে সরকার মুক্ত হইতে পারিবেন। নতুবা হাজার সদুদ্দেশ্য কিম্বা প্রকাশ্য বিচারের অসুবিধা জানাইলেও দেশের সন্দেহ দূরিভূত হইবে না।

—*—

বর্ত্তমান অবস্থায় কর্ত্তব্য কি ? ঃ—দেশের অবস্থা ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেশের উচ্চ শাসক যখন এই বিধানই স্থির করিয়াছেন তখন দেশবাসীর পক্ষেও ইহার প্রতিবাদের ইচ্ছা স্বাভাবিক। রাজা ও প্রজা, শাসক ও শাসিতের সদ্ভাব ও আদান প্রদানের ব্যবস্থা

স্থান পরিবর্ত্তন

আগামী ১লা নভেম্বর হইতে নবযুগ কার্য্যালয় নিম্নলিখিত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইবে। অতঃপর টাকাকড়ি চিঠিপত্র, পরিবর্ত্তন পত্রিকা নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৮৩নং দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

না থাকিলে দেশে শান্তি থাকিতে পারে না। অশান্তির আগুন এমনি করিয়া বাড়িতে দেওয়া কোন পক্ষেরই সঙ্গত নহে। সমগ্রদেশের উপর এই মনুষ্যত্বের অপমানকর আইন প্রয়োগ করিয়া রাখা কেন দেশ এই কথারই মীমাংসা চাহে।

:

কত অসহায় দেশবাসী ঃ—ক্ষমতা, পদমর্য্যাদা, চরিত্রগৌরব ইহার মূল্য কতটুকু এ অবস্থায় দেশবাসী তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছে না। এমন অবস্থায়ও রাজনৈতিক বিবাদ ও আত্মকলহ লইয়া দেশ যে কি করিয়া মত্ত থাকে তাহাই আশ্চর্য্য। বর্ত্তমান বজ্রবাণে দেশের হারানো চৈতন্য যদি আবার ফিরিয়া আসে- দেশবাসী যদি আবার এক মনে প্রাণে দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে তবে দেশের বিপদেও মঙ্গল আসিবে,—অপমানের মধ্য দিয়াই সম্মান পাইবে। অবস্থা আকস্মিক বা নূতন নহে, ক্রমশঃ কঠোর ভাবে ইহা আসিতেছে। কঠোর বিধান শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হইতে পারে না রাজপক্ষ হইতেও নহে, প্রজা সাধারণ বা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষ হইতেও নহে।

:০

দেশের অবস্থা ঃ—দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এমনি নৈরাশ্যপূর্ণ—অন্যদিকে দেশের অবস্থা একেবারে অন্তঃসার শূন্য। দশটাকা এগারটাকা মণ চাউল বিক্রয় হইতেছে—খাবার আর আর সব জিনিষই অগ্নিমূল্য। অন্নচিন্তায় দেশের লোকে পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া অন্ন যোগাইয়া নিজের ও পরিবার পরিজনের প্রাণ রক্ষা করিবে ইহা ভাবিতেই চক্ষুস্থির। দেখিতে দেখিতে ক্রম বর্দ্ধিত অভাব অমাদের এমন ভাবে মরণ যাতনা সওয়াইয়া মরণের পথে লইয়া যাইতেছে। রক্ষার উপায় কি! হে দেশের শাসক, হে দেশের নেতৃবৃন্দ তোমরা দেশকে বাঁচিবার উপায় বলিয়া দাও—কি করিয়া দু'বেলা দু'মোঠো খাইয়া তাহারা বাঁচিতে পারে তাহারই বিধান আগে দাও। সব বিধানের বড় যে জীবন ধারণের বিধান তাহাতে বড় বেশী গোলমাল চলাতেই আজ কোন বিধানেই দেশের শান্তি আনিতে পারিতেছে না।

দেশবাসীর যাতায়াতের সুবিধা ঃ—যুদ্ধের সময় রেল ষ্টীমারের ভাড়া বাড়িয়াছিল—আশা ছিল যুদ্ধ অবসানে তাহা আবার কমিবে, কিন্তু তাহাতো কমেই নাই যুদ্ধের পরেও ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। মাল পত্রের ভাড়াও দ্বিগুণ হইয়াছে। রেল ষ্টীমারে না চলিয়া এখন কাহারও উপায় নাই—ক্রমশঃ চলাচল বাড়িতেছে মাল পত্রের আমদানী রপ্তানীও বাড়িয়াছে। সকল সভ্যদেশেই ব্যবস্থা আছে এ বিষয়ে যথাসম্ভব সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু এ দেশে সব দিক হইতেই জগদ্দল পাষাণ যাহা চাপান হয় তাহাতো উঠানো হয়ই না বরং ক্রমশঃ বোঝার উপর শকের আঁটি বাড়িয়াই চলে। দেশবাসীর এ অভাবের নিবেদন শুনিয়া তাহার প্রতিকার করিবার ব্যবস্থার ক্ষমতা কাহারও আছে কি-না ইহার প্রতিকার কোনও দিন হইবে না?

—:—

চিঠিপত্রের সুবিধা ঃ-খাম, পোষ্টকার্ড, মনিঅর্ডার কমিশন, টেলিগ্রাফ খরচা সবই দ্বিগুণ হইয়া আছে। অল্প খরচে চিঠিপত্র লিখিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া সভ্যজগতের সর্ব্বত্র পরিচালিত। এ দেশে সে সুবিধা যাহা ছিল তাহা এখন নাই। ব্যয় বাড়িয়াছে এ অজুহাতেও এ সব বিভাগের জিনিসের মূল্য বাড়াইয়া রাখা সঙ্গত নহে।

ফরওয়ার্ডের উৎসব ঃ—গত রবিবার ফরওয়ার্ড পত্রের দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ উৎসব হইয়াছে। সুভাসচন্দ্র ও ফরওয়ার্ডের আরও উদ্যোক্তারা আজ রাজবন্দী তাই আনন্দ উৎসব কতকটা নিরানন্দেই হইয়াছে। তবু এমন মিলনের আনন্দ বড় মধুর।

—০—

রেলে সোডা লেমনেড ঃ—পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের ঢাকা লাইনে খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থার ভার সোরাবজী কোম্পানীর উপর। গরমের দিনে এই রেলে সোরবজী কোম্পানী নিজ তত্ত্বাবধানে সোডা লেমনেড, বরফ প্রভৃতি সরবরাহ করেন। ইহাদের সোডা লেমনেড ভাল বলিয়া খ্যাত ও

সেজন্য ইহারা বাজার অপেক্ষা মূল্যও বেশী লইয়া থাকেন। কিন্তু এই সোডা লেমনেডেও এখন ভেজাল চলিতেছে। বোতলে সোরাবজীর লেবেল মারা থাকে কিন্তু মাল অনেকসময় বাজারের অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এই নিকৃষ্ট দু'পয়সার জিনিসের দু'আনা মূল্য লওয়া হয় তাহাও অৰ্দ্ধবোতল পূর্ণ বোতল বলিয়া চালাইয়া ভেণ্ডারেরা বলে আপিস হইতে তাহাদের ওই মালই দেওয়া হয় ক্রেতাদের প্রতিবাদ জানাইয়াও আপিস হইতে তাহারা কোন ফল পায় না। সোরাবজী কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করিলেই ব্যাপারের সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। খদ্দেরের উপর এ ভাবের জুলুম হইলে সোরাবজীর খ্যাতি থাকিবে না এমন বিশ্রী জিনিস বেচে চালাইবার অধিকারও বোধহয় তাহাদের নাই। এই অভিযোগের কি তদন্ত সোরাবজী কোম্পানী করেন তাহা জানিলে আমরা সুখী হইব।

—:—

সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের বিজয়া সম্মিলন :—আগামী কল্য ভারত সভাগৃহে সংবাদপত্র সেবী সঙ্ঘের বিজয়া সম্মিলন। আশাকরি সকল সংবাদ পত্র সেবীই বিজয়া সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া প্রীতি আলিঙ্গন করিবেন। ইহার পর হইতে আর পত্রে পত্রে গালিগালাজ ও নিজেদের কুৎসা নিন্দা যাহাতে একেবারে বাহির না হয় সে সম্বন্ধেও তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন আশা করিতে পারি।

নারীর লজ্জা

লজ্জা নারীর শিরোভূষণ। লজ্জাহীনা রমণীকে সংসারে বা সমাজে কেহই আদর করে না—তবে লজ্জার মাত্রা সম্বন্ধে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন মত বা ধারণা প্রচলিত আছে। অসভ্য সমাজের অপর্য্যাপ্ত পরিধেয় সভ্য সমাজে লজ্জাহীনতা বলিয়া বিবেচিত হয়। হিন্দুসমাজের নারীর লজ্জা শিক্ষিতা সমাজে বা ইয়ুরোপীয় সমাজে অসঙ্গত ও মাত্রাধিক্য বলিয়া গণ্য করা হয় আবার ইয়ুরোপীয় নারীর লজ্জা ও হিন্দু নারীর চক্ষে লজ্জাহীনতা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে—সুতরাং এক সমাজের ধারণা, আচার ও দৃষ্টি লইয়া অন্য সমাজকে বিবেচনা করা সুযুক্তি সঙ্গত নহে।

নাগোজী ভট্টের মতে ইহা "অকৰ্ত্তব্যে কর্ম্মণি পর জ্ঞান ভয়ম্" অর্থাৎ যে কাজ করা কর্ত্তব্য নহে তাহা পরে জানিতে পারিলে যে ভয় হয় তাহা যদ্দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহাই লজ্জা। লজ্জার এই সংজ্ঞা উভয় শ্রেণীর পক্ষেই প্রয়োজ্য কারণ পুরুষেরও লজ্জা আছে তবে অবশ্য নারীর তুলনায় অতি অল্প। নারীরা যেমন পুরুষ সকাশে লজ্জাশীলতা প্রকাশ করেন পুরুষেরাও তেমনি অপরিচিতা নারী সকাশে লজ্জানুভব করিয়া থাকেন। নারীর লজ্জাকে ইংরাজীতে "Modesty" বলা হয় আর পুরুষের লজ্জা "shame" Havelock Ellis মহোদয় বলেন "Modesty which may be provisionally defined as an almost instinctive fear prompting to concealment and usually around the sexual process" অতএব তাঁহার মতে ইহা প্রধানতঃ যৌন ভয় জ্ঞাপক চিহ্ন! লজ্জা যৌন আকর্ষণের একটী প্রধান সহায় এবং লজ্জাহীনা নারী পুরুষকে (সাধারণ পুরুষ) প্রলুব্ধ করে না। এইজন্য পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীপুরুষের অবাধ মেলামেশায় প্রচলন আছে—তাহার মূল উদ্দেশ্য নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌন আকর্ষণের শক্তি সংহত করা—তবে ঐ উদ্দেশ্য যে সর্ব্বথা সফল হয় না তাহার ও কতকগুলি কারণ আছে। লজ্জা সম্পূর্ণ স্ত্রীস্বভাবজ গুণ, পুরুষচরিত্রে উহার অস্তিত্বদ্বারা পুরুষ চরিত্রে কিছু অংশ নারী প্রকৃতির অস্তিত্ব জ্ঞাপক সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মানুসারে লজ্জাহীনা নারী স্বতঃই লজ্জাশীল পুরুষকে আকৃষ্ট করে—এই দুই বিপরীত প্রকৃতির নরনারীর অবাধমিশ্রণে সভ্যসমাজেও এই অবাধ মেলামেশার সুফল কে সম্পূর্ণ হইতে দেয় না। Havelock Ellis বলেন "The woman who is lacking in this kind of fear is lacking also in sexual attractiveness to the normal and average man. The apparent exceptions seem to prove this rule, for it will generally be found that the women who are, not immodest (for immodesty is more closely related to modesty than mere negative absence of the sense of modesty—আমরা লজ্জাশীলা, অল্প লজ্জাবতী বা লজ্জাবিহীনা এই তিন শ্রেণীর অবস্থা কল্পনা করিতে পারি। কিন্তু লজ্জাহীনা বলিলে তাহা যে কিরূপে লজ্জার অভাব জ্ঞাপক হইয়াও নির্লজ্জ ভাবাত্মক না হইতে পারে তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিনা) but without that fear which implies the complete emotional feminine organisation to defend, only make a strong sexual appeal to men who are themselves lacking in complementary masculine qualities P. 2

The Evolution of modesty (Paris Edition 1900)

আদিম যুগে নরনারীগণ অনাচ্ছাদিত দেহে পরস্পরের সম্মুখে বিচরণ করিতে লজ্জানুভব করিতেন না—কারণ তখনও তাহাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় নাই 'জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া' তখনও তাঁহাদের মনে কোন ভাব উন্মেষিত হয় নাই তখন অরণ্যবাসী পশুদিগের মতই তাঁহারা জীবন ধারণ করিতেন। আদম ইভের চিত্রেও এই নির্ব্বিকার ভাব প্রস্ফুটিত তারপর যখন শয়তানরূপী সর্প আসিয়া নারীকে কুপরামর্শ দিল—তখন হইতেই বৃক্ষপত্র যৌন চিহ্নাবরণরূপে প্রথম ব্যবহৃত হইল ইহা হইতে অনুমান হয় এই জ্ঞানের প্রতীক আপেল ভক্ষণটা যৌন মিলনের জ্ঞান নতুবা তাহাতে সঙ্কোচের সৃষ্টি হইবে কেন। সার্জ্জি প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতে বস্ত্র (আবরণ) হইতেই লজ্জার উৎপত্তি। নারীর লজ্জার সহিত দৈহিক অবস্থারও গুরুতর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। যৌন জ্ঞান উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার আবির্ভাব হয়—ছোট মেয়েরা উলঙ্গ হইয়া খেলা করে তখন তাহারা লজ্জা করে না কিন্তু ক্রমশঃ তাহারা বড় হইয়া কুমারী হইয়া বালিকা অবস্থায় উপনীত হয় তখন লজ্জা জাগিয়া উঠে এবং কিশোরীর শরীরে লজ্জার মধুর তরঙ্গ সদাই প্রবাহমান থাকে—এই লজ্জা বাহির হইতে বড় মধুর দেখায় তাহার জ্ঞান তখন পূর্ণ নহে অথচ লজ্জা করিবার অনেক কারণ আছে এই জ্ঞানটুকু তাহাকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত রাখে। তাহার ফলে সে সর্ব্বদা বন হরিণীর ন্যায় চকিতা হইয়া থাকে—তারপর আসে যৌবন, নিবিড় লজ্জা তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া এক মহিমময় মাধুরীর সৃষ্টি করে—এ লজ্জার সৌন্দর্য্য যে দেখে নাই সে লজ্জাশীলতার প্রতিবাদ করে করুক কিন্তু সে যে অতি হতভাগ্য তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। লজ্জার এই অনুপম সৌন্দর্য্য—যৌবনের বহ্নিকে প্রদীপ্ত রাখে -আকর্ষণ বৃদ্ধি করে নারীকে নারীত্বের অধিকারিণী * করে। যৌবনের এই সলজ্জ অভিবাদন নারীর রূপ বিকশিত করে—অর্দ্ধস্ফুট কমলের মত মনোহর করে তাই যৌবন এত মধুময় বলিয়া বোধহয়। লজ্জাহীনা নারী এ মদির মধুর ভাব জাগাইতে পারে না। লজ্জা অর্থে আমাদের দেশে "মন্দাক্ষ, হ্রী, ত্রপা, ব্রীড়া, প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ইংরাজীতেও তেমনি Shame. Bashfulness, timidity, Shyness, প্রভৃতি শব্দ চলিত আছে। ফরাসী ভাসায় Modestie ও Pudeur নামক দুইটী ভিন্ন শব্দ ব্যবহার হয় উহার মধ্যে প্রথমটী "outcome of knowledge or reflection or graceful calm virtue of maturity অর্থাৎ পুরুষের লজ্জা সূচক আর দ্বিতীয়টী" has special connection with sex or woman" অর্থাৎ নারীর লজ্জা ব্যঞ্জক। যৌবনের আগমন সূচনা করে লজ্জা ইহা পুরুষ প্রকৃতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়, এমনকি অকালে যৌবনোদ্ভব হইলেও লজ্জা জন্মে Perez নামক সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী যৌনতত্ত্ববিদের মতে "that modesty may appear at a very early age, If sexual desire appears early. কলিনস্কট modesty সম্বন্ধে বলেন 'A feeling of shame is made to be overcome"—ইহাকে কিন্তু বিশুদ্ধ লজ্জা বলিয়া পরিগণিত করা যায় না—ইহা প্রচ্ছন্ন কামনা বরং ইংরাজীতে যাহাকে coquetry বলে এ তাহাই। পুরুষের ভোগের আকাঙ্খা হইতে নারীর যৌবনাত্মক ভাবকে রক্ষা করিবার চেষ্টাই লজ্জা, coquetry কে নারীর লীলা বলা অধিকতর যোগ্য। শ্রুজ নামক জার্ম্মান পণ্ডিত 'লজ্জা' প্রসঙ্গে এইরূপই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন coquetry সম্বন্ধে তিনি বলেন "So far from being the mere heartless play by which a woman shows her power over a man, it posseses' high Biological and Psychological significance being rooted in the antagonism between the sexual instinct and inborn modesty. He refers to the doe who runs away from the buck but in a circle. তবে যৌন সম্পর্ক কারণ ভিন্ন অন্যান্য অনেক কারণেও লজ্জার উৎপত্তি হয় সে কথা আগামীবারে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব।

পুরুষ—

গ্রন্থ সমালোচনা

শ্যাবলা—উপন্যাস—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। উপন্যাস আজকাল সকলেই লেখে তবে সকলের লেখা পড়া চলেনা—অনেক উপন্যাসেই সেই চর্ব্বিত চর্ব্বণ পরস্বাপহরণ আর বীভৎসতার নগ্নছবি থাকে বলিয়া আজকালের উপন্যাসে হাত দিতে ভয় করে তবে সৌরীন্দ্রবাবুর নামই পুস্তকখানি পাঠ করিবার কৌতুহল জাগাইয়া দেয় এবং দুএক পাতা পড়িবার পরই ঘাড় ধরিয়া শেষপর্য্যন্ত পড়াইয়া লয়। উপন্যাসখানি খুব সহজ ছোট ছোট কথায় বেশ বড়বড় গভীর ভাবের প্রকাশক হইয়াছে -ঘটনা খুব জমকালো নয় তবে বড় করুণ মর্ম্মস্পর্শী, কলিকাতার বাইরে প্রকৃতির যে স্নিগ্ধ শ্যামল সবুজছবির রাজত্ব আছে সেইরাজ্যের অনেক জীবন্ত বারতা বইখানির ভিতর পাওয়া যায়—অবশ্য শিক্ষিতা সমাজের একটা যে বাস্তব ছবি আঁকিয়াছেন তাহাতে তিনি তথা হইতে পুষ্পচন্দন পাইবেন না তবুও সত্যকে যে নির্ভীক ভাবে ফুটাইবার তাঁহার সাহস আছে সেজন্য তিনি ধন্যবাদাহ। মূল্য ১৷৷০ টাকা প্রাপ্তিস্থান এম সি সরকার এণ্ডসন্স ৯০।২ এ হ্যারিসন রোড কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ ব্যবহার বিজ্ঞান—শ্রীদেব প্রসাদ সান্যাল এল, এম, এস প্রণীত ৪৬৮ পৃঃ মূল্য ৩৷৷০ প্রকাশক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ২৯নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট কলিকাতা। সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম এ এম বি এম এ আর এস মহাশয় গ্রন্থের একটী মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়া পুস্তকখানিকে অলঙ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি আয়ুর্ব্বেদীয় বলিয়া ঘোষিত হইলেও আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব ইহাতে অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয় বরং অনেক স্থলেই ইংরাজী মেডিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স ও দৈবদুর্ঘটনার চিকিৎসার পুস্তকগুলি অনুসরণ করা হইয়াছে। কবিরাজ যামিনীভূষণ সত্যই বলিয়াছেন যে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের যুগে এ শ্রেণীর অপরাধ করিতে এ দেশের লোক রত হয় নাই সুতরাং সেকালে এ শ্রেণীর পুস্তকের কোন আবশ্যকতা না থাকায় কেহ এই সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। অধিকাংশ পাপই সভ্যতার আনুসঙ্গিক সুতরাং সভ্যদেশের গ্রন্থকারগণ তাহার দমনের ব্যবস্থায় যে অধিকতর মনোযোগী হইবেন ইহা স্বাভাবিক। পুস্তকখানি সুলিখিত, গ্রন্থকারের চেষ্টা ও বহু গ্রন্থ পাঠের ফল রচিত ইহা ব্যবহারাজীব ও চিকিৎসক উভয় শ্রেণীর উপকারে আসিবে। এবং ইহা তাঁহাদের অবশ্যপাঠ্য বলিলেও খুব বেশী বলা হয় না।

চিন্তামণি—সামাজিক নাটক। শ্রীচণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ১৲ টাকা। গিরিশবাবু বলিদান নাটকের আভাসে রচিত একখানি বাঙ্গলার সামাজিক নাটক। গ্রন্থকার ইহাকে উপন্যাসাকারে নাটক বলিতে চাহেন—আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই তবে উপন্যাস হউক বা নাটকই হউক বা যুগ্ম লক্ষণাক্রান্ত রচনাই হউক কোন বৈচিত্র্য না থাকিলে উহার আদর হইতে পারে না। গ্রন্থকার কোন বিষয়েই বিশেষ কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারেন নাই। ভাষার মধ্যে স্থানে স্থানে ছড়াকাটার ভাব আনিয়া পুস্তকখানিকে আরও নিম্নশ্রেণীতে নামাইয়া ফেলিয়াছেন। গ্রন্থকারের প্রধান চরিত্র চিন্তামণি মোটেই ফুটিতে পায় না। এ শ্রেণীর নাটকের প্রকাশ বা প্রচার আমরা সমর্থন করি না।

প্রতিমা -সামাজিক নাটক। একটী হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যস্থ নানাবিধ ব্যাপার লইয়া রচিত। গ্রন্থকারের ক্ষমতা আছে বলিয়া বোধহয় তবে বর্ত্তমান নাটকে তিনি বিশেষ কিছু দেখাইতে পারেন নাই। কোন একটীও এমন চরিত্র তিনি গড়িতে পারেন নাই, যাহা মনের উপর একটা রেখাপাত করিতে পারে—ভাষাও সকল স্থানে ভাবের উপযোগী হয় নাই। দৃশ্য সংযোজনাও আধুনিক নাট্যশাস্ত্র সঙ্গত হয় নাই। প্রথম শিক্ষার্থী অবৈতনিক সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহার অভিনয় অবশ্য সহজসাধ্য হইতে পারে।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী—শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রণীত মূল্য ৵০ নূতনত্ব বা বিশেষত্ব কিছু নাই।

শাসর পাঁচালী—তথৈবচ।

লিওনিদাস—শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রণীত মূল্য।০ আনা মাত্র। প্রকাশ ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী—২৫।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। বর্ত্তমান দেশভক্তির যুগে ইহা বালকবৃন্দের সম্মুখে একটা আদর্শ বীর চরিত্রের চিত্র—ইহা পাঠে বালকবৃন্দের যথেষ্ট উপকার হইবে গ্রন্থের ভাষাও বেশ সহজ স্বচ্ছ তবে মধ্যে মধ্যে মুদ্রাকর প্রমাদ আছে।

ভারতের বীরাঙ্গনা—শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক প্রণীত পদ্মিনী, তারাবাই, পৃথ্বীরাজ মহিষী, যশোবন্ত মহিষী, লক্ষ্মীবাই, কস্তুরীবাই গান্ধী প্রভৃতি ছয়টী মনস্বিনী ভারত রমণীর সংক্ষিপ্ত জীবন কথায় পূর্ণ। ভূমিকায় গ্রন্থকার বাংলার নারীদের 'বন্ধন শৃঙ্খল' ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে জাগিতে অনুরোধ করিয়াছেন এটা আমাদের মতে সুবিচার হয় নাই—দেশাত্মবোধ যে নারীজাতি হইতে পুরুষে সংক্রামিত হয় তাহা ঠিক নয়, যে দেশের পুরুষদের মধ্যে অধিকাংশের দেশাত্মবোধ জ্ঞান নাই, শিক্ষা নাই, ত্যাগ নাই, সংযম নাই—সে দেশের নারীসমাজ দেশাত্মবোধে পূর্ণ উদ্বুদ্ধ হইতে পারে না। এজন্য নারী জাতিই দায়ী নহেন সুতরাং তাহাদিগকে স্বার্থপর বা উন্নতির অন্তরায় মনে করা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। পুস্তকের বাঁধাই উত্তম, তবে আকারের তুলনায় মূল্য অত্যন্ত বেশী বলিয়া মনে হইল।

গোঁপ খেজুরে—বসুমতীর সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রণীত। ৭৬ পৃঃ মূল্য আট আনা। হেমেন্দ্র-বাবুর রচনার পরিচয়ের কোন আবশ্যক আছে বলিয়া মনে করি না কারণ ছোট ছেলেমেয়েরা যে কি পাইলে 'সন্দেশ' খাওয়াও ভুলিয়া যাইতে পারে তাহা তিনি জানেন—তাঁহার ভাষা বিষয়োপযোগী লঘু স্বচ্ছ সুন্দর, বলিবার ভঙ্গী মনোহর, ভাব পরিষ্কার পবিত্র। এ বই পাঠে বাঙলার 'ভবিষ্যৎ'গণ যে আনন্দ ও শিক্ষা দুই এক সঙ্গে পাইয়া পরমানন্দের স্বাদ পাইবে তাহা নিঃসন্দেহ।

পুষ্প-খ্যান—হিন্দী হইতে অনুবাদিত মনোহর পুস্তক। পুস্তকখানি হিন্দীভাষীদের মধ্যে খুব সমাদর পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশকগণ ইহার বাঙালা অনুবাদ চিত্র যোগে সরস করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য ভাষা বা ভাবপরিস্ফুটনার পন্থা যে দোষশূন্য নহে তাহা বলা যায় না। তবে আখ্যানভাগ রহস্য পূর্ণ বলিয়া আনন্দ দিতে পারে। অনুবাদকের অনেকস্থলে সংযত ভাষা ব্যবহার করা উচিত ছিল কারণ কতকটা এমন ব্যাপার ইহাতে আছে যাহা আধুনিক সভ্যসমাজের রুচিবিগর্হিত। আশাকরি প্রকাশকগণ ভবিষ্যতে কোনও অনুবাদ কালীন যে সম্প্রদায়ের জন্য উহা প্রকাশ করিবেন তাহাদের রুচির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।
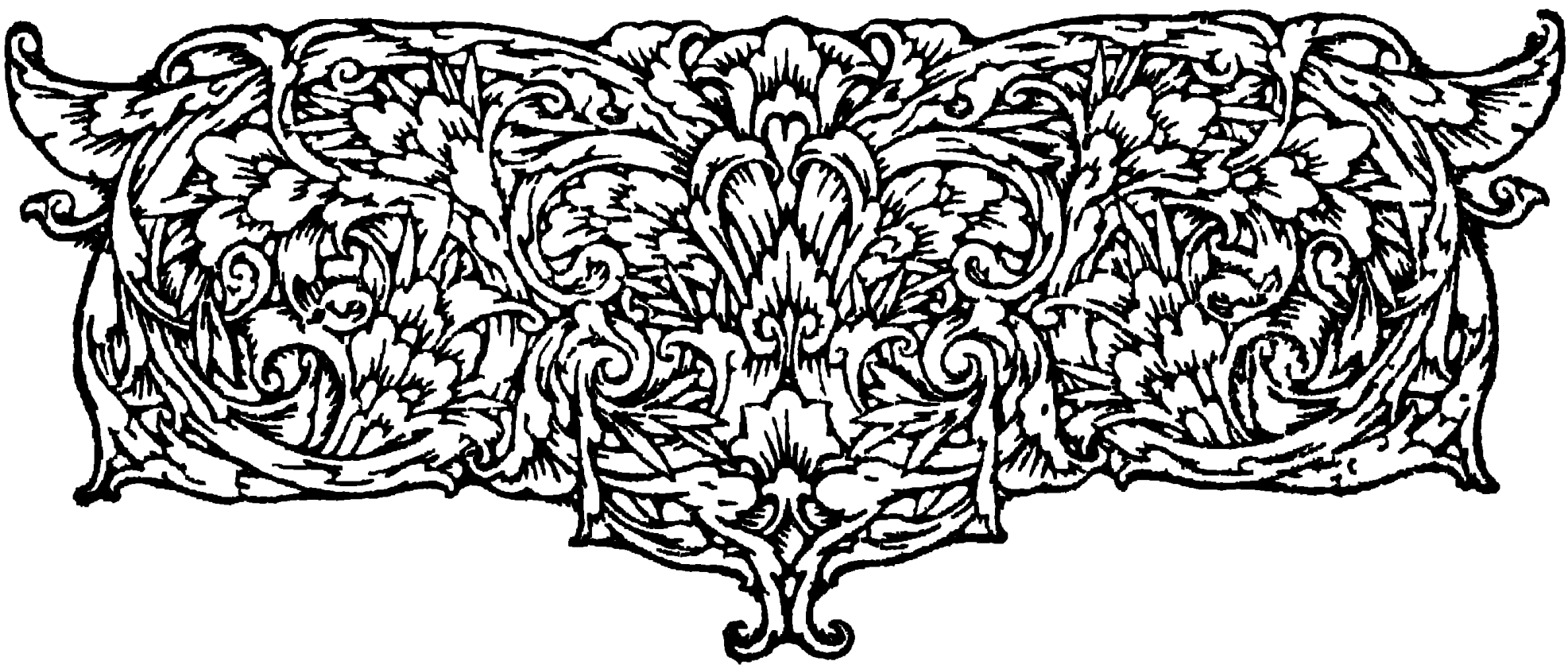
আর্ট থিয়েটার্স কোম্পানী ষ্টার রঙ্গমঞ্চে ইহার পুনরভিনয় করিয়াছেন। সাধারণ হিসাবে অভিনয় মোটামুটি ভালই হইয়াছে কারণ প্রহসনের অভিনয় হাস্যরসের উপভোগ এবং অভিনেতাগণ তাহা প্রচুর পরিমাণে দিতে পারিয়াছিলেন সাধারণ দর্শকবৃন্দ অবশ্যই তৃপ্ত হইয়াছেন--কিন্তু আর্ট থিয়েটারের অভিনেতাগণ কতটুকু বিশেষত্ব ইহাতে দেখাইতে পারিয়াছেন বিচার করিতে বসিলে বেশী কিছু পাওয়া যায় না। কৃপণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র। তিনি শিক্ষিত এবং অভিনেতা হিসাবে সুনামও তাঁর আছে তথাপি তিনি এমন কিছুই দেখাইতে পারেন নাই যাহাতে তাঁহার নিজস্ব একটা কিছু এই অংশটীতে দিতে পারিয়াছেন—কৃপণ হিসাবে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র নির্ব্বাচন ঠিক হয় নাই—পুস্তকে বস্ত্র সম্বন্ধে মাত্র উল্লেখ আছে যে তাহাতে কাছা দিবার উপায় ছিল না—কিন্তু কৃপণেরা সাধারণতঃ বিশেষতঃ বাড়ীতে যে কাপড় পরে তাহা ময়লা ও হাঁটুর উপরে উঠিয়া থাকা উচিত যাহা দেখিলেই মনে স্বতঃই উদিত হইবে বেটা কি কঞ্জুষ! তারপর কৃপণের চোখে সর্ব্বদাই একটা সন্দিগ্ধ ভাব, মুখে সকলকে অবিশ্বাসের চিহ্ন থাকা উচিত সে সব কিছুই তিনি দেখাইতে পারেন নাই—সন্ন্যাসী রূপী মধু খুড়ো যখন তাঁহার হাতের সিকিকে গিনি করিয়া দিলেন বা তৎপূর্ব্বে সোণার বাটি দিলেন—তখন অর্থগৃধ্নুর লোলুপ-দৃষ্টি ও সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ পাইয়া সন্তোষের ভাব তিনি মোটেই ফুটাইতে পারেন নাই। তারপর অভিনয় কালে তিনি অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন যাহা পুস্তকে নাই এসব Over doing অন্য পুস্তকে চলে—অমৃতবাবুর প্রহসনগুলির বাক্য বিন্যাস পাকা গাঁথুনীর মত সুনির্ব্বাচিত কথায় গ্রথিত তার একটু ওলট পালট করিলে সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় তাহা নরেশ বাবুর জানা উচিত।

মধুখুড়ো—অভিনেতা শ্রীননীগোপাল মল্লিক। প্রথম দৃশ্যপটে ইনি মাতলামী ঢংএ কেন অভিনয় করিলেন—প্রাতঃকালে যে ব্যক্তি গচ্ছিত ধনের তাগাদায় হলধর হালদার (শ্রীদুর্গা) হালদার মহাশয়ের বাটী গিয়াছিল তাহার মদ্য পান করিয়া যাইবার কোন বিশেষ হেতু ছিল মনে করি না—শেষাংশ অবশ্য মন্দ হয় নাই তবে ইহার কণ্ঠস্বর অতীব কর্কশ উহারও সাধনা করা উচিত। রঙ্গমঞ্চে নামিয়া কেবল চেঁচাইলে বা হেলিলে ছুলিলে অভিনেতা হওয়া যায় না—অংশটীকে হৃদয়ঙ্গম করা, তাহার সাধনা করা ও তাহার মধ্যে বৈচিত্র্য প্রদর্শনে যত্নবান হওয়া প্রত্যেক সু-অভিনেতার উচিত।

মন্মথ—অভিনেতা শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়—সাদামাটা অভিনয় হইয়াছে কোথাও কিছু বৈচিত্র্য নাই এই অংশে শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দবাবুর অভিনয় যে কত উচ্চশ্রেণীর হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান অভিনেতার জানা থাকা সম্ভব এবং সেই ধরণে অভিনয় করিতে চেষ্টা করা উচিত ছিল। বিশেষতঃ কুণ্ডলার অংশ খুব উজ্জ্বল স্বচ্ছ ও সুন্দর হওয়াই ইহার যা কিছু কৃতীত্ব যেন একেবারে নিবিয়া গিয়াছিল।

ইচ্ছু—বেশভূষা চালচলন অতি কদর্য্য হইয়াছিল ইনি যে অংশ অভিনয় করিতে আসিয়াছিলেন তাহা না পারিয়া নিজের স্বরূপেই দেখা দিয়াছেন এ সকল অভিনেত্রীকে উত্তমরূপে না শিখাইয়া ষ্টেজে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। এঁরা অভিনয় ব্যাপারকে যেন তামাসা মনে করেন অভিনয় তত সোজা জিনিস নয়।

দক্ষামঙ্গী—অভিনয়কে চলনসইও বলা চলে না অংশের মর্য্যাদা রাখিতে ইনি সম্পূর্ণ শক্তি-হীনা। দেখিয়াই বোধহয় কিছুই শিখান হয় নাই নিজের ইচ্ছামত যা-তা বলিয়া যাইতেছেন।

হাবা—হাউ হাউ করিয়া চেঁচাইলে হাত পা ছুড়িলে বা নৈবেদ্যের কলা চুরি করিয়া খাইলে হাস্যরসের উৎপত্তি হয়—সেটা বীভৎসতা ব্যঞ্জক। হাবারা প্রত্যেক কথা কিরূপ ইঙ্গিতে ও ভঙ্গীতে প্রকাশ করে তাহা একটী মস্ত শিখিবার বিষয়—ইনি সে রাস্তায় না গিয়া খুব সোজা রাস্তায় নাম কিনিতে গিয়াছেন তবে অভিনয় হিসাবে ইনি 'হাবা'র হাবাত্ব দেখাইতে পারেন নাই তাহার মনে রাখা উচিত যে প্রভু ও প্রভুপত্নীর সমক্ষে ওরূপ বেলেল্লাগিরি অমার্জ্জনীয়—বেলেল্লাগিরিতে লোকে হাসে বলিয়া তাহা প্রকৃত অভিনেতা করে না—সে করে রাস্তায় বহুরূপী বা যাত্রায় সং। ইনি যে অংশটী প্রণিধান না করিয়াই "ওঃ আর কি ও ঠিক করে নেব" বলে রিহারশ্যাল না দিয়াই নিজের ক্ষমতার উপর অতি বিশ্বাস নিয়ে নেমে পড়েছেন তা বেশ বোঝা যায়—এর ফলে এঁর যেটুকু ক্ষমতা ছিল সেটুকু শীঘ্রই লোপ পাওয়া সম্ভব। অভিনয় একটা দস্তর মত সাধনা হাবরড়া লোকদের কাজ নয় অভিনেতা হওয়া।

কুণ্ডলা—শ্রীমতী নীহার বালা। একমাত্র ইনিই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে এটা সত্যই আর্টথিয়েটার। এমন সহজ স্বাভাবিক অভিনয় আর কোন অংশই হয় নাই এঁর চলাফেরা ওঠাবসা চালচলন সবই যেন সত্য সত্যই গ্রন্থকারের অঙ্কিত চরিত্রকে সজীব ও মূর্ত্তিমতী করে তুলেছিল। কণ্ঠস্বরে ও যেন একটা লঘু চঞ্চল সুন্দর সলীল ভাব বিদ্যমান ছিল। এঁর অভিনয় দেখলেই বেশ বোঝা যায় যে এ অংশটীকে আয়ত্ত কর্ত্তে যত্ন ও পরিশ্রমে কার্পণ্য করেন নি। বর্ত্তমান যুগে এই শ্রেণীর অভিনেত্রী না হলে আর অভিনয় করা চলবে না—কেবল নাম মাহাত্ম্যে আর দর্শক ভোলেনা।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বাঙ্গালীর জীবন-কথা

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা প্রাচীন কবিদিগের কাব্যগ্রন্থ হইতে অনেকগুলি বিষয়ের সন্ধান পাই। ঐ সকল বর্ণনা মধ্যে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কিরূপ খাদ্য ভোজন করিতেন, তাহার বিস্তৃত তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে ঐ সমস্ত দ্রব্য সংক্ষেপে বিবৃত করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

সেকালে কি ধনী, কি নির্ধন কোনও গৃহস্বামী বেতনভোগী পাচক বা পাচিকা রাখিতেন না, গৃহিণী স্বয়ং তাঁহার পুত্রবধূ বা আত্মীয়াগণ সাংসারিক সমস্ত রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এই কার্য্য তাঁহারা অপমানজনক মনে করিতেন না কিম্বা স্বাস্থ্যভঙ্গ বা সৌন্দর্য্য নাশ হইবে বলিয়া ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। বরং উহা তাঁহাদের পক্ষে গৌরবজনক কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। তখন একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিল—তখন "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" রব একটা ছিল না। সমগ্র পরিবার একত্রে এক অন্নে থাকিয়া পরস্পর সুখ-স্বাচ্ছন্দে বাস করিত। সুতরাং পরিবার যতই বৃহৎ হউক, রন্ধনের জন্য স্ত্রীলোকের অভাব হইত না। বর্ষীয়সী রমণীরাও রন্ধনকার্য্যে সুনিপুণ ছিলেন, তাঁহারা বড় বড় ভোজেও সমস্ত দ্রব্য অনায়াসে রন্ধন করিয়া ফেলিতেন। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। আর এখন সামান্য ২।১০ জন লোক খাওয়াইতেও বামুন ঠাকুরের প্রয়োজন হয়—কারণ বাটীর স্ত্রীলোকের 'আগুন তাত' সহ্য হয় না—গৃহিণী বা বধূ হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্থ ইত্যাদি।

সেকালে গৃহিণী বা তাঁহার আত্মীয়ারা স্নান পূজা সমাপনান্তে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিতেন এবং যতক্ষণ রন্ধন শেষ না হইত ততক্ষণ তথায় অবস্থান করিতেন। সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের গৃহে হাট-বাজার, বাটনাবাটা, কুটনা কুটা প্রভৃতি রন্ধনের আয়োজন করিবার জন্য পরিচারিকা থাকিত। ধনপতির গৃহে দাসী দুর্ব্বলার বেসাতি বর্ণনায় কবি মুকুন্দরাম যে সকল দ্রব্যের নাম করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্টভোজী ছিলেন না, বরং তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্যই উদর পুরিয়া ভোজন করিতে পাইতেন, তখন তৈল, ঘৃত ও দুগ্ধ খাঁটী ও যথেষ্ট পরিমাণে মিলিত। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের শাক-সব্জী প্রিয়তারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা যেমন মিষ্ট ও অম্লরসের পক্ষপাতী ছিলেন, তিক্ত ও ঝাল খাইতেও সেইরূপ ভালবাসিতেন। সেকালে সুক্তারও বিশেষ আদর ছিল। ভিন্ন ভিন্ন শাক ভাজিবার প্রণালীও স্বতন্ত্র ছিল। কবি কঙ্কণের সমকালে মুগের দাউলে ইক্ষু রস ও মসুরীর দাউলে লেবুর রস ও গুড় দেওয়া হইত। ফুলবড়ি চিনি দিয়া পাক করা হইত। মাণিক গাঙ্গুলির সময়ে নানাবিধ বড়ি দুগ্ধ ও গুড় দিয়া ভাজা হইত এবং কবি ভারতচন্দ্র রায়ের সমকালে কাঁঠালের বীজ চিনিতে পাক করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের সময় "কোমল নিম্বপত্রসহ ভাজা বার্ত্তাকী" বাঙ্গালীর মুখরোচক ছিল, এখনও সেইরূপই আছে। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাসের সময়ে যেরূপ লাউ দুগ্ধে সিদ্ধ করা হইত, এখন সেইরূপ আছে, তবে তখন লঙ্কা, মরিচের ঝালের প্রাদুর্ভাব ছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণে ঝাল-লাড়ুর কথা লিখিত আছে। পাঁঠার মাংসে পিঠালিবাটা দিবার প্রথা ছিল—

> "রাঁধিছে পাঠার মাংস দিয়া খরজ্বাল !
> পিঠালী বাটিয়া দিল মরিচ মিশাল ॥"
>
> (বংশীদাস)

সেকালের লোকেরা যে সকল মৎস্য বিশেষ আদরের

[illegible] ভোজন করিতেন, তন্মধ্যে কতকগুলির এখন আর সেরূপ আদর নাই। কবিকঙ্কণ সময়ে—

"বোদালি হেলাঞ্চাশাক, কাঠি দিয়া কৈল পাক
ঘন বেসার সম্ভোলন তৈলে।"

কিন্তু এখন আর কে হিঞ্চাশাক দিয়া বোয়াল মাছ খাইতে ভালবাসে? এইরূপ আরও বহুবিধ মৎস্য ভক্ষণের প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সেকালে ভদ্রসমাজে যে কাঁকড়া বা হাঁসের ডিম খাওয়ার প্রথা ছিল, এরূপ বোধ হয় না। তবে কবিকঙ্কণ কেবলমাত্র ব্যাধপত্নী নিদয়ার সাধ-বর্ণনায় হংস ডিম্বের উল্লেখ করিয়াছেন—হংস ডিমে কিছু তোল বড়া।" মৃগ-মাংস চিরকালই পবিত্র মাংস বলিয়া পরিগণিত। ধনপতির পরিচারিকা দুর্ব্বলা ভোজনের জন্য বাজার হইতে খরগোস ও খাসী কিনিয়াছিল, অতএব সে সময়ে যে উহার মাংস সচরাচর ভক্ষিত হইত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কবিবংশীদাস কচ্ছপ ও কপোত মাংস বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র কাছিমের মাংসকে "অমৃত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গুণাকর ভারতচন্দ্র বর্ণিত মাংস রাঁধিবার প্রণালীটা নবাবী ধরণের। পূর্ব্বকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অম্লরসের বিশেষ আদর করিতেন। এখনও তাহার বড় একটা ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এখনও আহারের শেষে অম্ল দ্রব্য বড়ই মুখ রোচক। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও কয়েক প্রকার নিরামিষ ও কয়েক প্রকার মৎস্যের অম্বলের বর্ণনা দেখিতে পাই। কবিবংশীদাস কৃত পদ্মাপুরাণেও নানাবিধ অম্ল রন্ধনের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, ধর্ম্মমঙ্গলকার ঘনরাম ও আম্রের অম্বল দধি ও চিনি দিয়া রাঁধিবার কথা লিখিয়াছেন—"আম্রের অম্বল রাঁধে দিয়া দধি চিনি।" ভারতচন্দ্র সর্ব্ববিধ অম্ল রন্ধনের ব্যবস্থা স্বল্প কথায় বর্ণনা করিয়াছেন।

বৈদ্যকগ্রন্থ সুশ্রুত সংহিতায় ভোজনের প্রারম্ভেই মধুর রসযুক্ত দ্রব্য ব্যবস্থা আছে; কিন্তু এদেশে ভোজনের শেষে মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ চিরন্তন প্রথা। শাস্ত্রেও বলে মধুরেণ সমাপয়েৎ। এখন যেমন আমরা আহারে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে শুক্তা, শাকের ঘণ্ট প্রভৃতি [illegible]মিষ ব্যঞ্জন ভক্ষণ করিয়া তৎপরে আমিষ ও অম্ল ভক্ষণ করিয়া সর্ব্বশেষে পায়স-পিষ্টক ও বিবিধ মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া ভোজন সমাপন করি, পূর্ব্বকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাহাই করিতেন। তবে সেকাল অপেক্ষা একালে বহুবিধ নূতন মিষ্টান্নের সৃষ্টি হইয়াছে এবং মিষ্টান্ন পাকও অনেকটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। তবে ঘৃতাদি দ্রব্যে নানাপ্রকার ভেজাল মিশ্রিত হওয়াতে মিষ্টান্নগুলি বিশেষ উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধহয় না। এদিকে আমরা নূতন নূতন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিখিয়া পূর্ব্বকালের অনেক খাদ্যদ্রব্যে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিযাছি। পূর্ব্বকালে প্রত্যেক সামাজিক ভোজে নানা-প্রকার পিঠাপুলি, মুগসাউলি ও বড়া প্রস্তুত হইত।

পায়স ও মোদক অতি প্রাচীনকালেও প্রস্তুত হইত। রামায়ণে পায়সের উল্লেখ আছে। ক্ষীরখণ্ড বা ক্ষীরের মিষ্টান্ন, সন্দেশ, ছানাবড়া প্রভৃতি ছানার মিষ্টান্ন অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধহয়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে "ছেলে ঘুমপাড়ান" গীতিকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়;—

"খাওয়াব ক্ষীরখণ্ড মাথাব চুয়া"

বঙ্গদেশ যে সন্দেশের জন্মভূমি একথা বলা বাহুল্য। এখন বঙ্গদেশ হইতে কোন কোন স্থানে উহার আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্বে এদেশে যেরূপ নানাবিধ সন্দেশ প্রস্তুত হইত, তাহা অপেক্ষা এখন যে উহা অনেক উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃন্দাবনদাসের সময়ে সন্দেশে চিনি মাখান হইত,—"বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করা ম্রক্ষিত।

কবি কৃত্তিবাস ভরদ্বাজের আশ্রমে বানর ভোজনের বর্ণনাচ্ছলে তৎকাল প্রচলিত বহুবিধ মিষ্টান্ন ও পিষ্টকাদির উল্লেখ করিয়াছেন। এদেশে লুচির অনেক পূর্ব্বে রুটির প্রচলন হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোপাল মন্দিরের অন্নকূট বর্ণনায় রুটির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু লুচির কোনও উল্লেখ করেন নাই—

"নববস্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত॥
তার পাশে রুটি-রাশি পর্ব্বত হৈল।
সূপ ব্যঞ্জনভাণ্ড সব চৌদিকে ধরিল॥"

কবিকঙ্কণ 'পরুটার' উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু লুচির কথা বলেন নাই।

"বিকালে ব্যঞ্জন দশ, প্রয়েটি টাবার রস
ভোজন করিল কলাবতী।"

কবি ভারতচন্দ্র লুচির বর্ণনা করিয়াছেন—"সুয়ারুচি মুচমুচি লুচি কতগুলি।" কবিকঙ্কণ পিষ্টকাদির অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মিঠাদধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তাহা এখনকার মত চিনিপাতা দধি কিনা বলা যায় না। বোধহয় দধিতে ফেনী বা বাতাসা দিয়া মিষ্ট করা হইত।

"দধি খায় ফেনী তথি করে মটমটী

সেকালে পিঠা প্রস্তুত করিবার প্রধান উপকরণ ছিল চাউলের গুঁড়া বা পিঠালি, আটা বা ময়দা, গুড় ও নারিকেল এখনও তাহাই আছে। তবে তখন যেমন পিঠাপুলির ভিতর নানাবিধ পুর দেওয়া হইত, এখনও সেইরূপ দেওয়া হইয়া থাকে। তখন নানাপ্রকার বড়া প্রস্তুত হইত, এখনও সেই সমুদয়ই প্রায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। তিলখাজা ও বহুবিধ লাড়ুর প্রচলন বহুকাল হইতেই আছে। ঝাল-লাড়ু প্রচলন বহুকাল হইতেই আছে। কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ, কবিকঙ্কণ ও বংশীদাস গঙ্গাজলী লাড়ুর কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে কয়েকপ্রকার লাড়ু প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। * কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে যে সকল মিষ্টান্নের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রসাদ বর্ণনায় বহুবিধ মিষ্টান্নের নাম পাওয়া যায়।

ভারতচন্দ্রের অন্নদা মঙ্গলে খেচরান্নের উল্লেখ আছে,—"পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।" কিন্তু তৎপূর্ব্বে কোনও গ্রন্থে খেচরান্নের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ উহা নবাবী খাদ্য। মুসলমান রাজত্ব সময়ে উহা এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। অন্যান্য যাবনিক আহার্য্যেরও প্রচলন ঘটিয়াছিল।

রন্ধন সমাপ্ত হইবার কিছু পূর্ব্বে স্নানের আয়োজন হইত, এখনও যে উহা স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় না, এরূপ নহে। সে সময়ে জলের ঘটীর পরিবর্ত্তে 'গাড়ু' দিবার প্রথা ছিল।

"থাল গাড়ু পীড়ি দিল ভোজন করিতে।"

বংশীদাস।

ব্রাহ্মণেতর জাতিরাও ভোজনের পূর্ব্বে স্তব পাঠ ও পূজা সমাপ্ত না করিয়া ভোজন করিতেন না। গৃহে আত্মীয় আসিলে অগ্রে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া ভোজন করিতেন। ভোজনের পূর্ব্বে 'শ্রীবিষ্ণু' বলিয়া গণ্ডুষ করিবার প্রথা ছিল—

"জল হস্তে লক্ষ্মীধর শ্রীবিষ্ণু বলিয়া।
পঞ্চগ্রাসী কৈল অন্ন গণ্ডুষ করিয়া॥"

বংশীদাস।

ভোজন শেষ হইলে আচমনান্তেও লোক "শ্রীবিষ্ণু" বলিয়া পান মুখে দিত। মুখ শুদ্ধির নিমিত্তি পানের সহিত কর্পূরও ব্যবহার হইত। কেহ কেহ পানের পরিবর্ত্তে হরিতকী ব্যবহার করিতেন। সন্ন্যাসী বৈষ্ণবেরা হরিতকীই ব্যবহার করিতেন। পূর্ব্বকালে তামাক খাওয়ার প্রচলন ছিল না। উহা নবাবী আমলের আমদানী বলিয়া বোধহয়।

* মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে চন্দ্রলাড়ুর নাম পাওয়া যায়;—
"কেহ দেয় চন্দ্রলাড়ু, চিনি চাঁপা কলা
ধর্ম্মমঙ্গল।
"চতুর্ব্বিধ চন্দ্রলাড়ু, চিনি চাঁপা কলা।"
ধর্ম্মমঙ্গল।

রঙ্গমঞ্চের দায়ীত্ব ও বাংলার নাট্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

ভিক্ষু অকিঞ্চন

সকল দেশের নাট্য সাহিত্য তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করে। পৌরাণিক স্তর ঐতিহাসিক স্তর ও সামাজিক স্তর। আমাদের বাংলাদেশ বোধকরি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক স্তরকে এতদিনে অতিক্রম করিয়াছে। এখন বিভিন্ন দিক হইতে আমাদিগের নাট্য সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ সামাজিক স্তরের অপেক্ষা করিতেছে। স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায় ও গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহোদয় পৌরাণিক স্তরের সম্পূর্ণতা সাধন করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক নাটক অনেকেই লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, কাহার নাম করিব, ঐতিহাসিক উপাদান ও যেন নাট্য সাহিত্যের বিকাশসাধনে শেষ হইতেই বসিয়াছে। আর যে ইতিহাসের খোরাক যোগাইবার এতদিন হইতে দারুণ চেষ্টা চলিতেছে তাহা আমাদের বাঙ্গালী জীবনের উপর খুব অল্পই রেখাপাত করিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি মুষ্টিমেয় নাটক ব্যতীত বাংলার জলবায়ুর সঙ্গে কোনটাই সংশ্লিষ্ট নহে—সবই রাজপুত মহারাষ্ট্রীয় ও মোগলগণের বীরত্ব বিক্রম ও অত্যাচার কাহিনীই প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে' বাংলার কোন চরিত্র কথাই সে সব নাটকে স্থান পায় নাই। গীতিনাট্য ও প্রহসনের ভিতরেও আমরা হয় পারস্য, নয় আরব্য রজনীর দিকে মুখ তাকাইয়া আছি—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ও স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র ব্যতীত বাংলার এই সরস দিকটাও কেহ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারেন নাই। এক কথায় আমি বলিব বাংলার সঠিক নাট্য-সাহিত্যের আজিও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সেই বিশেষত্বের সম্যক পরিচয় লাভ ঘটিবে বাঙ্গালী জীবনের সামাজিক স্তরের মধ্য দিয়া।

. আজ উপন্যাস রাজ্যে বাংলার প্রাণের কথার অভাব নাই কিন্তু তাহাও যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে অপ্রয়োজনীয় বিলাতী আবহাওয়ার মধ্য দিয়া, সেখানেও যেন আসল বাঙালীর বিশেষত্ব ও সজীবত্বে ফুটিয়া উঠে নাই। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বৈকুণ্ঠের উইল" প্রভৃতি সামাজিক চিত্রে হৃত সর্ব্বস্ব বাঙ্গালী জাতিটাকে অনেকটা জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

এক কথায় আমি বলিতে চাই, কি নাট্য সাহিত্যে কি কাব্য ও উপন্যাস জগতে আমরা এতদিন ধরিয়া একটা অবাস্তব ছায়াবাজির পশ্চাতে পশ্চাতেই লুব্ধ মৃগের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি—বাঙালীর প্রাণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করি নাই। যে কতিপয় ব্যক্তি প্রাণের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারাই কেবল আমাদিগের উত্তর সাধকদিগের চিত্তে স্থান পাইবেন। বঙ্কিম বহু উপন্যাস রচনা করিয়াছেন কিন্তু আনন্দ মঠই বাঙ্গালীর চক্ষে চির নূতন ও চিরকাম্য হইয়া বিরাজ করিবে—বাঙালীর উত্তর পুরুষ বাছাই করিয়া লইবে বাঙ্গালী জাতির বনিয়াদ ওই আনন্দ মঠ। এই বাছাই করিতে গিয়া আমি তাঁহার অপরগুলির নিন্দা করিতেছি না, যদিও অখণ্ডকাল সেগুলিকে আনন্দ মঠের কাছে নিষ্প্রভ করিয়া তুলিবে। রস সৃষ্টির অর্থে জীবন সৃষ্টি একথা বাঙালীকে ভুলিলে চলিবে না—সে জীবন সিংহাসনোপবিষ্ট নবরত্ন-পরিবেষ্টিত সহস্র সুন্দরীসেবিত রাজজীবন নহে, সে জীবন বাংলার মাটির মানুষের ভিতর হইতে প্রকাশিত হইবে। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে "স্বপন পসারীর "ত" আজ অভাব নাই, চাঁদ ফুল ও রং ত অনেক ফলিয়াছে কিন্তু আসল জীবন পসারী আজ কোথায় যিনি দরিদ্রের ক্রন্দনের সঙ্গে সুর মিলাইতে পারিবেন।

বাংলার নবযুগের নাট্য-সাহিত্যকেও এই জীবন বিষয়ে পরিপুষ্টি লাভ করিতে হইবে। বাংলার রঙ্গমঞ্চের উৎকর্ষ

সাধন করিতে গিয়া আমরা অনেক রোগ ও আবর্জ্জনা আনিয়া ফেলিয়াছি। আজ স্রোত ফিরাইবার ও দর্শক সৃষ্টি করিবার দিন আসিয়াছে। আজ বাংলার নাট্যকার ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদিগের স্ব স্ব মার্জ্জিত রুচির দ্বারা দর্শকের চিন্তাক্ষেত্রকে পরিমার্জ্জিত করিতে হইবে। সাহিত্যের সংস্কার সাধন করিতে হইবে উন্নত রুচির মধ্য দিয়া কারণ আসল রুচিতেই যে গোল বাধিয়াছে। কথায় কথায় আমরা আজিও চায়ের পেয়ালা ও রঙ্গীন সিরাজীর সম্ভার লইয়া নৃত্য-গীতের বাহুল্যে ভুলিয়া থাকিতে ভালবাসি তাহা না হইলে না কি দর্শক জমে না, পাঠক পড়ে না। আমি রঙ্গাধ্যক্ষের এই ব্যবসাদারী কথায় বিশ্বাস করিতে নারাজ। ভাল নাটকের কখনই দর্শকের অভাব হয় না "আলিবাবার" অপেক্ষা "বলিদান" কিম্বা "প্রফুল্লে" কি কোনও দিনও দর্শক সংখ্যার অপ্রতুল ঘটিয়াছে? আসল কথা হইতেছে বাংলার নাট্য-সাহিত্যে এখন নাট্যকারের প্রতিভার অভাব কিম্বা প্রচ্ছন্নতা! নানাকারণে নাট্যকারের প্রতিভা বিকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না। তন্মধ্যে একটি বড় কারণ এই যে অনেক নাট্যকারকে রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষেরা কিছুতেই আমল দিতে চাহেন না—তাঁহারা নিজেদের দলের লোক ছাড়া অন্য কাহারও নাটক অভিনয় করিতে চাহেন না—এ দোষ পুরাতন দলেও ছিল নূতন দলেও যথেষ্ট আছে। কাহার ভিতর কিরূপ প্রতিভা নিহিত আছে তাহার ত তাহারা অন্বেষী নয়ই পরন্তু যাহাতে নাট্যকার নিরুৎসাহিত হয় তাহার জন্য ও বিধিমতে চেষ্টা করা হয় এবং নাট্যজীবিগণের আত্মম্ভরিতাই নাট্যকারের সকল উৎসাহকেই উত্থানের পূর্ব্বে ভঙ্গ করিয়া দেয়। আসল কথা রঙ্গালয়ের সহানুভূতি না পাইলে প্রাণবন্ত নাটকের সৃষ্টি অসম্ভব, তাই নাট্যকারকে নাট্যের মোহ ছাড়িয়া উপন্যাসের জগতে হতাশ হইয়া প্রবেশ করিতে হয়।

কেবল প্রতিভাশালী হইয়াই নাট্যকর হওয়া যায় না—রঙ্গমঞ্চের ব্যবহারিক অনুশীলন ব্যতীত রঙ্গমঞ্চের অনুযায়ী নাটক প্রণয়ন কেবল কবির কল্পনা বলে হয় না। নাট্যকারের পুঁথিগত বিদ্যা অভিনয় ক্ষেত্রে কোন কার্য্যেই আসে না। আর এই জন্যই রঙ্গমঞ্চের নেকনজর বঞ্চিত নাটক গুলি হয় ত পাঠকের অধ্যয়নকালে ভাল লাগিতে পারে, কিন্তু অভিনয়ের পরীক্ষা-ক্ষেত্রে দর্শকের সমক্ষে ফেল মারিয়া যায়। নাট্যকারের বিপদ ও দায়ীত্ব সব দিকেই। সকলেই কিছু গিরীশ ঘোষ কিম্বা অমৃতলাল বোস হইবার সৌভাগ্য পায় না—অনেক কাঠখড় পুড়াইয়া তবে নাট্যকার রঙ্গমঞ্চের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে। নাট্যকারের প্রথম অবস্থা পথের কুকুরের অপেক্ষাও হীন! শুধু আমাদের প্রাণহীন পরাধীন দেশেই নহে, ও সব দেশেও নাট্যকারের প্রথম জীবনে দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। অতি নির্লজ্জ ও আত্মমর্য্যাদাহীন নাছোড় বান্দা না হইলে কখনই নাট্যকার হওয়া যায় না—অনেক অপমান সহ্য করিয়া তবে তাহাকে সুচাগ্র মেদিনী দখল করিতে হয়। ইংরাজের রঙ্গভূমি হইতেই উদীয়মান নাট্যকারের বাধা বিপত্তির ব্যাপার দেখাইব।

ইংলণ্ডের কবি গোল্ডস্মিথ তাঁহার The present state of polite Learning নামক গ্রন্থে রঙ্গালয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া নাট্যকারের দুর্ভাগ্যকে স্মরণ করাইয়া বলিতেছেন:—Our poets' performance must undergo a process truely chemical before it is presented to the public. It must be tried in the Manager's, fire, strained through a licenser, suffer from repeated corrections, till it may be a mere caput mortuum when it arrives before the public"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নাট্যকার একটি হাস্যস্পদ জীব! তাহার নিজস্বকে বলি দিয়া তবে নাট্য মন্দিরের সোপানে উঠিতে হয়! নিন্দার ভাগী সে সকলের কাছেই। কাট ছাঁট করিতে করিতে তাহার নিজের বলিতে কিছুই থাকে না—ম্যানেজারের অগ্নি সংস্কারে নাট্যকার কোনরূপ অব্যাহতি পাইলেও সমালোচক ও সাধারণের কাছে তাহার নির্য্যাতনের অভাব নাই ম্যানেজারের সঙ্গে হুঁ দিতে stage pomp অর্থাৎ রঙ্গালয়ের জাঁকজমক বাড়াইয়া তুলিতে গিয়া তাঁহাকে সমালোচকের হাতে সম্মার্জ্জনী খাইতে হয় আবার যদি সারল্যের দিকে তিনি দৃষ্টি রাখিতে যান, তাহা হইলে বিভবের প্রকাশ সাধিত হয় না—শ্রোতা চায় অভিনেতার বাক চাতুর্য্যকে, নাট্যকার তাহাদের মনের নয়নে তিলমাত্রও রেখাপাত করিতে পারেন না—পদে পদে অভিনেতাই

দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কিন্তু নিন্দাব ভাগী নাট্য-কারকেই হইতে হয়।

রঙ্গাধ্যক্ষের লক্ষ্য দর্শক-বৃদ্ধি ও অর্থ সমাগমেব উপব তাহার কাছে নাট্যকারেব সহানুভূতি অর্জ্জন নিছক অর্থেব শ্রীবৃদ্ধির উপব—নাট্যকাবকে তাহাব মনুষ্যত্বেব সকল উচ্চাশাকে বলি দিয়া কিসে বঙ্গালযেব আয় বাড়ে এইরূপ যোগাযোগেব দিকেই লক্ষ্য বাখিযা চলিতে হয়। কিসে নাচ গান দুইটা বাড়ে, কিসে dramatic surprise অক্ষুণ্ণ থাকে সেই দিকেই ক্রীতদাসেব ন্যায় নাট্যকাবেব বিদ্যা বুদ্ধিকে সমর্পণ কবিতে হয় ক্রমশঃই বঙ্গালযেব সান্নিধ্যে আসিয়া তিনি ভাড়াটিয়া গাড়ীব ঘোড়া হইতেও অধম হইযা পড়েন।

এই অতি সঙ্গীন অবস্থায় বঙ্গালযেব উৎকর্ষসাধন ও নাট্যের প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? বঙ্গবাজ্যেব সংস্কার সেই দিনই সম্ভব, যেদিন এই বাজ্যেব অধিবাসীগণ দায়ীত্ব কথাটিকে দূর দর্শিতাব সহিত উপলব্ধি কবিতে পারিবে যেদিন রঙ্গমঞ্চকে নিজেব দেশ বলিযা ভাবিতে শিখিবে, সেই শুভক্ষণ হইতেই রুচিব পবিবর্ত্তন সাধিত হইবে, দর্শকেব বিকাব ঘুচিবে ও দেশেব প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে তাহা না হইলে আলিবাবাব আবদাল্লা ও মর্জ্জিনাকে লইযাই আমবা মৃত্যুব ছায়াতীবে গিয়া দণ্ডায়মান হইব। নীলদর্পণ প্রভৃতি প্রাণবন্ত নাটক লইয়া যে বাঙ্গালাব রঙ্গপীঠের জন্ম, সে দেশ কি আবুহোসেন আব আলিবাবায় সন্তুষ্ট থাকিয়া কেবল স্বপ্নই দেখিবে জীবনেব বনিয়াদ গড়িয়া তুলিবে না। আশা হয় অচিবকাল মধ্যেই বাঙালী তাহাব নিজের ভুল বুঝিতে পাবিবে।

রঙ্গালয়ের প্রকৃত উন্নতি সাধন কবিতে হইলে তিনটি সমাজকে অগ্রে জাগ্রত কবিয়া তুলিতে হইবে ১ম দর্শক সমাজ (spectators' association) ২য় নাট্যকাব সমাজ Dramatists' Association) ৩য় অভিনেতা ও অভিনেত্রী সমাজ (Actors' & actress's assocaition, সংহতি বদ্ধ হইয়া কায না কবিতে পাবিলে অহমিকাব সমতা স্থাপন হইবে না। রঙ্গালয়ের বর্ত্তমান ইতিহাস স্বার্থান্ধতা ও যথেচ্ছাচারিতার ইতিহাস। বঙ্গালয়েব অভিনেত্রীগণেব অন্ধকার দিকটাও অবহেলা করিলে চলিবে না। এমন কি তাহাদেব চরিত্রের উন্নতিসাধন ও প্রসাদগুণের বিকাশ সাধনও ঘটাইতে হইবে—তাহারা কেবল বিভবের গরিমায় যথেচ্ছাচারিণী ও রূপোপজীবিনী হইলেই চলিবে না—তাহাদেব পতিত হৃদয়েব অনুশীলন ব্যতীত রঙ্গালয়ের প্রকৃত উন্নতি কোন দিনও সাধিত হইবে না। তাঁহাবা এখন যে হৃদয় লইয়া মাতাব অভিনয় করেন, তাহাতে মাতৃমূর্ত্তির প্রকৃত পবিস্ফুটন অসম্ভব। সীতা, দময়ন্তী, সাবিত্রী প্রভৃতি চবিত্র অভিনয় কবিতে গিযা তাঁহাবা artifice দেখাইতে পাবেন কিন্তু art এব সৃষ্টি সে কুরুচিপূর্ণ হৃদয লইয়া এক বাবেই অসম্ভব। বলা বাহুল্য চরিত্রহীন অভিনেতাগণেব সম্বন্ধেও আমাব এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে খাটে।

সর্ব্বাগ্রে Art for Arts' sake কথাটিকে আজ বাঙ্গালীব সাহিত্যক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত কবিতে হইবে, এই ভুল ধাবণাতেই ত যত সর্ব্বনাশ ও কুরুচিব প্রশ্রয়। Art for life's sake এই সুমহান কথাটিকে ববণ কবিয়া লইয়া সবস্বতীব সভাস্থলে সাধককে দীক্ষিত হইতে হইবে। বঙ্গালয় বলিতে বাঙ্গালীব প্রথমেই একটা লজ্জাব জনক নাসিকা কুঞ্চন আসে কেন?—একটা মদ্যপায়ী বেশ্যাদাস পূর্ণ অসৎ সঙ্গ মনে জাগিযা উঠে কেন?—তাহার কাবণ আজও তথায় মার্জ্জিত সুরুচিব অভাব ও নাবকীয় লীলাব প্রশয়। ভদ্র দর্শক সমাজেব আনন্দ দানের জন্য অভিনেতা ও অভিনেতৃগণকেও সমধিক সৌজন্যে ভূষিত হইতে হইবে। তাহাদেব হাব ভাব বিলাস কটাক্ষে যেন কোনরূপ জঘন্যতা প্রকাশ না পায় এবং যাহা স্বাভাবিক তাহাব যেন তাহাবা একান্ত সাধক সাধিকা হয়। কারণ একটা জাতিব উন্নতি ও অবনতিব পক্ষে বঙ্গালয় কম সহায়তা করে না। বঙ্গালয় একটা জাতিব প্রত্যক্ষ আলেক্ষ্য বিশেষ। একমাত্র বঙ্গালয় হইতেই একটা জাতীয় চরিত্রেব ভাল মন্দ অতি শীঘ্র ধবা পড়ে! সজীবতা দেখাইতে না পারিলে রস সৃষ্টি হয় না—এবং রঙ্গালয়ে যতটা সজীবতা দেখান যায় এমন আর কোন উপায়ে কোন ক্ষেত্রেই দেখাইবাব সুবিধা নাই—কাব্য উপন্যাস ও চিত্র সৌন্দর্য্য রঙ্গালয়েব উপবেই ত অতি জীবন্ত ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে—তাহাতে দর্শকেব মনে যে রেখাপাত করিয়া যায় তাহা বাস্তবিকই ভুলিবার নয়। কিন্তু সুরুচিকে সতত

জাগ্রত করিয়া রাখিতে না পারিলে এই রঙ্গালয় হইতেই জাতীয় অধঃপতন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে—একটা জাতির গোড়ার কথা হইতেছে সুরুচি! এই সুরুচি জন্মায় সমবেদনা হইতে! পতিতোদ্ধার করিতে হইলে অগ্রে প্রতিভার সংস্কারের প্রয়োজন। জাতির প্রতিভাশীলগণ যদি স্বার্থান্ধ ও অনুদার হন, তাহা হইলে পতিতের উন্নতির আশা কোথায়? এই অধঃপতিতগণকে আশ্রয় করিয়া, তাহাদের সেবার ভিখারী হইয়াই ত রাজা ও ব্রাহ্মণ আজ মাথার মণি রূপে বিরাজ করিতেছেন। একমাত্র প্রতিভাশালীর সমবেদনাই এই নিগৃহীত, অপমানিত, আশা শূন্য, উদ্দেশ্যহীন জীবনগুলিকে ভগবানের বাধাহীন রাজপথে চলিবার অধিকার দিতে পারে!

তাই বলিতেছি, রঙ্গালয়ের সমক্ষে আজ অনেক দায়ীত্বের কাজ—সমস্ত জীবন গঠনের মহদুদ্দেশ্য পড়িয়া রহিয়াছে—অনেক দেবতার গলার মালা বেশ্যার কবরীতে শোভা পাইতেছে, সুপবিত্র গঙ্গাজলে অনেক বিষ্ঠা ভাসিয়া চলিয়াছে—প্রতিভাশালীকে অবগাহন করিতে হইবে সেই দেব-নিবেদিত ফুল সমূহের উদ্ধার সাধন করিয়া—অনেক বিষ্ঠা ও জঘন্যতা দুই হাতে সরাইয়া! জীবন পণ করিয়া এই সব অসহায় মৃতের ভিতর সঞ্জীবনী সঞ্চার করিতে পারিবে কি রঙ্গালয়ের অভিভাবকগণ? আজ অভাব হইতেছে উপদেশের নহে, আদর্শের। আদর্শের কাছে অনেক আত্মবলিই আজ তোমাদিগকে দিতে হইবে তবে যদি রঙ্গালয়ের দ্বারা এই পরাধীন দেশের কোন উপকার হয়। প্রত্যেক রঙ্গাধ্যক্ষকেই এই কথা পুনঃ পুনঃ ভাবিতে হইবে যে আমাদের মা বোন কন্যাদের কাছেই নাট্যরূপ জাতীয় আলেখ্য ধরিতে চলিয়াছি—সেই স্বচ্ছ সলিল যেন সমাজের পাঁক আর পানাতেই আমরা না ভরাইয়া তুলি। সমাজের কু-দিকটা দেখাইতে হইবে কিন্তু যেন কু চরিত্রের উপর ঘৃণার উদ্রেক করাইয়া—তাহার দিকে আকর্ষণ করাইয়া নহে! ভাল আলেখ্য ধরিতে পারিলে দর্শকের কোন দিনও অভাব ঘটে না, সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরও রুচির সংশোধন সাধিত হয়। কিন্তু আলেখ্যকে জীবন্ত করিতে হইবে নাট্যকারকে আমাদের বর্ত্তমান জীবনের দৈনন্দিন বাস্তবতার মধ্য দিয়া। আলেখ্যের নামে আমরা এতদিন শব ব্যবচ্ছেদাগারের কল্পনাই রঙ্গালয়ে দেখিয়া আসিতেছি—বর্ত্তমানের সঙ্গে তাহার কোনই যোগ নাই—পথিবর্ত্তিনী নারী, অনাথ শিশু বা অসহায় বৃদ্ধের কোনরূপ করুণ রসসৃষ্টি নাই—ওই পথের মাঝেই ত যত কাজ—ওই বিপদের ঝড় ঝাপটার মধ্যেই ত লোকশিক্ষা! কেবল নবাবী চালে একটা কুহক বা স্বপ্ন রাজ্যের সৃষ্টি করিয়া, কতকগুলি অপ্সরী বা পরীর সৃষ্টি করিয়া অর্থের আমদানী হইতে পারে বটে কিন্তু রঙ্গালয়ের মর্য্যাদার লাঘব হয়, দেশকে প্রতারিত করিতে হয় এবং সর্ব্বোপরি আত্মপ্রতারণার ভাগী হইতে হয়।

স্বাধীন দেশ মাত্রেই আজ স্ব স্ব জাতীয় রঙ্গমঞ্চের প্রবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, রঙ্গমঞ্চের উন্নতি অবনতিতে যে জাতীয় চরিত্রেরও ক্ষতিবৃদ্ধি হয়, আজ সকলেই এ কথা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, কেবল বাংলাদেশই কি এই জাতীয় জাগরণের দিনে রঙ্গমঞ্চের উন্নতি বিষয়ে নিদ্রিত থাকিবে? কলা দেখাইতে গিয়া আমরা ছলাই দেখাইয়া থাকি। সর্ব্বাগ্রে আমাদের ম্যানেজার মহাশয়েরা রঙ্গমঞ্চের দায়ীত্বটা উপলব্ধি করিতে শিখুন—তাঁহারা স্বীকার করুন—"It is the reconstruction of the national conscience that is at stake. The theatre is the gate house of the soul. To reconstruct the theatre we must revive its priesthood. We must convert it from a shop into a place where God is."—Sydney carroll's some Dramatic opinions.

এই প্রসঙ্গে দেশীয় রঙ্গমঞ্চের আর একটী ঘৃণ্য দোষের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক—অনেক স্থলে এমন ঘটে যে নবীন নাট্যকার নামজাদা থিয়েটারের ম্যানেজারের নিকট সুরচিত নাটকের পাণ্ডুলিপি মনোনয়নার্থ রাখিয়া আসিলে তিনি একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া ও কয়েকটী নাম বদলাইয়া নিজস্ব বলিয়া অভিনয় করেন ও অনেক দিন পরে পাণ্ডুলিপি প্রত্যর্পণ করেন—এরূপ ঘটনা নাট্যজগতে বিরল নহে।

জগতের সাহিত্য গগন হইতে একটী অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িল। আনাতোল ফ্রাঁস শুধু ফ্রাঁন্সের নহে, সমগ্র জগতের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই এপ্রিল তারিখে প্যারী নগরীতে ইঁহার জন্ম হয়। গত ১২ই অক্টোবর অশীতিবর্ষ বয়সে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ফ্রান্স দেশ রত্নপ্রসবা। বহু জগদ্বরেণ্য কবি ও সাহিত্যিক সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ভলটেয়ার, ভিক্টর হিউগো, জোলা, ব্যালজ্যাক্, রোমঁ্যা রোলাঁ প্রভৃতি সাহিত্যিক গণের নাম প্রত্যেক দেশের লোকের কাছেই সুপরিচিত।

"গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না" আনাতোল ফ্রাঁন্সের সম্বন্ধে একথা খুব খাটে। স্বদেশ ছাড়া অন্য সব দেশেই তাঁর নাম। বিশেষতঃ শেষ জীবনে ইঁহার ঠিক বায়রণের মতই হ'য়েছিল। আর ঠিক বায়রণের মতই তাঁর সম্বন্ধে বলা যায় যে তাঁর নাম কখনো লোপ পাবে না।

তাঁর কতকগুলি উক্তি :—

"বই থেকে নানারকমের ছবি বেরোয়, আর মানুষের মনের পরিবর্ত্তন করে।

"বই আমাদের মেরে ফেল্‌ছে। খুব বেশী রকমের খুব বেশী বইই হয়েছে। মানুষ যুগের পর যুগ ধ'রে কিছু না প'ড়েও বেঁচে ছিল এবং এই সময়েই সে সব চেয়ে বড় ও দরকারী কাজগুলো করেছিল।

"এখন কি ভয়ানক উন্নতিই না আমরা ক'রেছি! ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভেতর বইয়ের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। এখন ঠিক তার একশ গুণ বেড়েছে। এক প্যারীতেই রোজ পঞ্চাশখানা ক'রে বই বেরোয়। খবরের কাগজের কথা ছেড়েই দিলুম। শেষকালে দেখ্‌ছি মানুষকে বইয়েতেই পাগল ক'রবে।

"মানুষ প্রকৃতির (Natuie) চেয়ে ভাল। এই সান্ত্বনা দায়ক প্রীতিকর কথাটী ব'লতে আমি কখনো ক্ষান্ত হব না।"

"যখন প্রকৃতি প্রেম ও মৃত্যুকে পাশাপাশি রেখে দেখায় তখন সে দৃশ্য আমাদের হৃদয়কে বড়ই আঘাত করে।"

তাঁর এই কথা থেকেই একটুখানি আভাস পাবেন যে কত বড় দরের সাহিত্যিক তিনি ছিলেন।

ইনি নোবেল প্রাইজ পান ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। আর শুনা যায় তিনি উক্ত পুরস্কারের সমস্ত টাকা রুসিয়ার দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য দান করেন।

তাঁর দেহের মৃত্যু হ'লেও তাঁর যে মৃত্যু হয়নি একথা খুব বলা যায়। সেক্সপীয়ার, কালিদাসের মৃত্যু হয়নি। জগতের যারা সাহিত্যিক তাঁদের কখনো মৃত্যু হয় না।
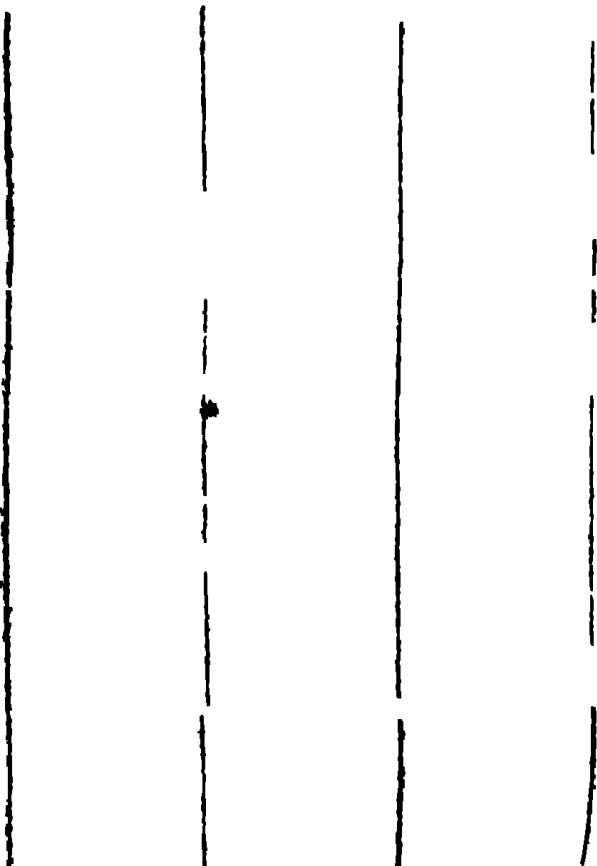
Printed & Published by Jnanendra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
14 Jaggannath DuttaLane Garpar, Calcutta.

বিজয়িনী

'নকশা-বসুমতির সৌজন্যে

প্রথমবর্ষ] ২২শে কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ৮ই নভেম্বর [১৫শ সংখ্যা

জম্বুপ্রিয়ার উচ্ছ্বাস

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

(সুর —"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম"

সই, কেবা আনাইল কালজাম।
গালের ভিতর দিয়া কণ্ঠেরে পশিল গো
শীতল করিল গলধাম।

না জানি কতেক মজা কাল জামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে,
চুষিতে চুষিতে আঁঠি অলস করিল গো
কেমনে থাইব এন্‌তারে !

নূন সহকারে যার ঐছন করিল গো
লঙ্কার মিশনে কিবা হয়,
যে গাছে ফলতি তার নয়নে হেরিয়া গো
নোলাটি নীরস কৈছে রয় ?

পাসারিতে কার মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়,
হোক্ চির-খণ্ডিতা সে জামে যে না ভালবাসে
শতবার গৌরব বাথায়।

গল্প

প্রতিফল

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী গঙ্গোপাধ্যায়

(১)

স্বামীর পাতে খেতে ব'সে লহরী তাদের পুরোণো ঝির কাছে শ্বশুর শাশুড়ীর গল্প শুনছিল।

মাত্র ছ মাস হ'ল তার বিয়ে হ'য়েছে, আর সে স্বামীর ঘর কোত্তে এসেছে এই প্রথম। শ্বশুর শাশুড়ীকে সে কখন চোখেও দেখেনি তার বিয়ের আগেই তারা মারা গেছলেন। তাদের আদর যত্ন পাবার মত ভাগ্যি তার কোন দিন হয়নি, তাই বুঝি তাদের সামান্য কথাটুকু শোনবার জন্যও তার এতখানি আকাঙ্ক্ষা এতখানি আগ্রহ জেগে উঠ্‌তো। বাড়ীতে তার দুটো কথা কইবার সঙ্গিনী আর কেউ ছিল না শুধু এই বৃদ্ধা ঝিটী ছাড়া। ঝিটী অনেক কালের, তার শ্বশুরের আমল থেকে সে এ বাড়ীতে কাজ কোচ্চে,—তার স্বামীকে হাতে ধ'রে মানুষ কোরেছে তাই লহরী তাকে ঝি ব'লে ডাকতে পারে নি, দিদি ব'লেই ডাকতো। আর স্বামী যখন কাজে বেরিয়ে যেতেন তখন সেই সময় অবসরটুকু সে দিদির সাথে গল্প করে কিম্বা বই টই প'ড়ে কোন রকমে কাটিয়ে দিত।

মাছের বাটীর ঢাকনাটা তুলে লহরী সবিস্ময়ে বোল্লে, "হ্যা দিদি। একি!"

বৃদ্ধা ঝি কৌতূহলী হ'য়ে বোল্লে, কি হয়েছে বৌদিমণি?"

"মাছের মুড়োটা ওঁকে দেয়া হয়নি বুঝি?"

"না—তা কেন,! বামুন আমার সামনেই দিলে তো!"

"তবে খাননি যে!"

"তা কি কোরবো বল, আমি কত ক'রে বোল্লুম কিছুতেই খেলে না, বোল্লে অসুখ কোরেছে।"

লহরী চিন্তিতা হ'য়ে বোল্লে 'অসুখ কোরেছে। কই আমি শুনিনি তো কিছু।"

বৃদ্ধা ঝি মৃদু হেসে বোল্লে, "তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না বৌদিমণি, আমি দাদাবাবুকে বেশ জানি, ওসব অসুখ বিসুখ কিচ্ছু নয়।"

সবিস্ময়ে লহরী বোল্লে, "তবে কি।"

বৃদ্ধা ঝি হাসতে হাসতে বোল্লে, "আসল কথা কি জান ওটা তোমার জন্যে রেখে গেছে। দাদাবাবু কিন্তু তোমা বড্ড ভালবাসে বৌদিমণি। নৈলে দেখ্‌ছ না? নিজে না খেয়ে—

কলেজে পড়া মেয়ে হ'লেও লহরীর স্ত্রীসুলভ স্বাভাবি বৃত্তিগুলির কোন ব্যতিক্রম হয়নি, তার সারা মুখখা সদ্য ফোটা পদ্ম ফুলটীর মত রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌লো। মাছে মুড়োটা এক পাশে ঠেলে রাখ্‌তে রাখ্‌তে সে বোল্লে, "ইঁ আমি খাচ্ছি কিনা। আমার ওসব ভাল লাগে না দি তুমি খেয়ো'খন বরং।"

বৃদ্ধা ঝি ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো, "না না বৌদিমণি রেখো না—রেখো না বলছি, আমার মাথার দিব্যি খা না খাও। আমি বুড়ো মানুষ, দাঁতও তো ছাই নেই স পারবো কেন অত বড় মুড়োটা! নষ্ট হবে বৈত নয়?"

বৃদ্ধার অনুনয় বিনয়ে লহরীকে অগত্যা খেতেই হ'লো কিন্তু এমনি ক'রে পাঁচজনের কাছে (?) লজ্জা দেয়া? বি

প্রিয়তমের গভীর ভালবাসার এই নিদর্শনটুকু পেয়ে রাগের আড়াল থেকে তার অনেকটা আনন্দও যে হচ্ছিল না এমন নয়। কোন রকমে নাকে মুখে চারটী গুঁজে লহরী উঠে পড়লো; মনে মনে ভাবলে, "দাঁড়াও, জব্দ করছি; আজ কিছুতেই বিকেলে জলখাবার করে রাখ্‌বো না তো। এক্ষুনি গিয়ে এমনি ঘুমোবো—কিন্তু না না ছিঃ! বেচারা সেই কোন সকালে চারটী খেয়ে গেছে, আর আস্‌বে সেই তো পাঁচটায়, মুখখানা শুকিয়ে যাবে না তার? আর আমি জলখাবারটুকও ক'রে রাখ্‌বো না বুঝি। আমি হ'য়েছি কি।—ছিঃ!"

পান চিবুতে চিবুতে লহরী বোল্লে, "আমি শোবার ঘরে চল্লুম দিদি, যদি ঘুমিয়ে পড়ি ঠিক চারটের সময় ডেকে দিও কিন্তু। দেখো, ভুলো না যেন।"

ঝি বোল্লে "সে কি বৌদিমণি! ভুলবো কেন গা? তুমি নিশ্চিন্দি হ'য়ে ঘুমোও গে যাও না।"

শোবার ঘরে গিয়ে লহরী বিছানায় এলিয়ে প'ড়ে একখানা উপন্যাসের পাতা ওলটাতে লাগ্‌লো। কিন্তু মনটা উপন্যাসের খাঁচার ভেতর কিছুতেই বসতে চাইল না, একটু ফাঁক পেলেই কোথায় উড়ে যেতে লাগ্‌লো। বিরক্তি ভরে উপন্যাসখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লহরী বোল্লে, "ছাই, শুধু প্রেম আর বিয়ে, বিয়ে আর প্রেম, সব নভেলগুলোই যেন এক ছাঁচে ঢালা। আচ্ছা, বিয়ের আগে তো এ সব গুলো বেশ লাগ্‌তো! এখন আর তত ভাল লাগে না কেন? দেয়ালে আঁটা ঘড়িটার পানে চেয়ে লহরী ভাবতে লাগ্‌লো।

হঠাৎ সে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে বস্‌লো। "ঐ যা! যার চিঠিখানার উত্তর দেয়া হয়নি যে! এক্ষুনি না লিখ্‌লে চারটের ডাকে আজ আর যাবে না তো।" লহরী তাড়াতাড়ি চেয়ারটা টেনে নিয়ে টেবলের কাছে গিয়ে বস্‌লো, তারপর ড্রয়ার খুলে কাগজের প্যাডটা টেনে বের কোত্তেই একখানা খোলা খামের চিঠি মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়্‌লো। চিঠি-খানা কুড়িয়ে নিয়ে লহরী দেখ্‌লে, খামটা এসেন্সের গন্ধে ভরপুর, আর তার ওপর মেয়েলী হাতে তারই স্বামীর নাম লেখা? এ চিঠি কখন এলো আবার? কই সে দেখেনি তো! মেয়েলী লেখা দেখে তার কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। সবিস্ময়ে চিঠিখানা টেনে নিয়ে বের কোরে সে পড়্‌তে লাগ্‌লো:—

১৫ই অগ্রহায়ণ
১০৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

প্রিয়তম!

আজ কদিন আস্‌চো না কেন বল দেখি? আমি রোজ কতখানি আশা নিয়ে তোমার আশাপথ চেয়ে থাকি তা যদি জানতে তা'লে বোধহয় আমায় এমন ক'রে কষ্ট দিতে পারতে না। তুমি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন; তাই আমায় রোজ কাঁদাও। কিন্তু আমি তো কাঁদাতে পারিনে তোমায়! তাতে আমার বুকও বাজে যে। তুমি কোন দিনও এমন ছিলে না তো! অভাগিনীর কি দোষে অমন হ'য়ে গেলে বুঝতে পাচ্ছি নে। যদি অজ্ঞানতে কোন দোষ ক'রে থাকি, লক্ষ্মীটী! পায়ে ধরছি, ক্ষমা কোরো আমায়! আর যত শীগ্‌গির পারো এসে একবার চোখের দেখা দিয়ে যেয়ো, ভুলো না।

কোন অসুখ বিসুখ করেনি তো? কি জানি ভয় হয় বড্ড। পত্রপাঠ কেমন আছো লিখো, আর কবে আস্‌বে জানিয়ো। ইতি

পুঃ—তোমার লহরী কেমন আছে? তাকে পেয়েই আমায় ক্রমে ভুলে যাচ্ছো বুঝি?

তোমারই চিরদিনের
পুষি

ঢুক ঢুক বুকে এক নিশ্বাসে লহরী চিঠিখানা পড়ে ফেল্লো। তার সদাপ্রফুল্ল মুখখানা শুকনো ঝরা গোলাপ ফুলটির মতই ম্লান হ'য়ে উঠ্‌লো। একি! এ যে কোন দিন কল্পনাও কোর্‌তে পারে নি সে! কিন্তু লহরীর মনের কোণে সন্দেহটাও উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল, সে ভাবলে, চিঠিখানি কখনো তার স্বামীর নয়—হ'তে পারে না, নিশ্চয়ই তার দেখ্‌বার ভুল হ'য়ে থাকবে। কিন্তু না! এই যে খামের ওপোর তার স্বামীরই তো নাম লেখা র'য়েছে! আর তারিখটা—লহরী এনভেলপটা উলটে দেখ্‌লে নিজে সেদিনেরই ইংরিজি তারিখ স্পষ্ট জল্ জল্ কোর্‌ছে।

হঠাৎ লহরীর মনে প'ড়ে গেল সকালে সে স্বামীকে

প্যাডে কি লিখ্‌তে দেখেছিল তো! এই চিঠিখানারই উত্তর নয় তো? কম্পিত সন্দেহাকুল হাতখানা দিয়ে সে প্যাডের কভারটা উলটে ফেলতেই তার বুকের ভেতর আবার ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে উঠ্‌লো। সত্যি যে তাই! এ যে তার স্বামীরই লেখা ঐ চিঠিখানার উত্তর! চিঠিখানা তখনো সম্পূর্ণ লেখা হয়নি; লহরী নিশ্বাস বন্ধ ক'রে পড়্‌তে লাগ্‌লো:—

কলিকাতা।
১৬ই অগ্রহায়ণ।

মালা আমার,

এই মাত্তর তোমার সুধামাখা লিপিখানা পেয়ে যে কত খুসী হয়েছি তা জানাবার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি আমায় মিথ্যে অপবাদ দিয়েছো; আমি তোমায় ভুলিনি, কোনদিন ভুলতেও পারবো না। এ ক'দিন কাজের ভীড়ে যেতে পারিনি সেজন্য আমায় ক্ষমা কোরো। কালকে ৫টার সময় নিশ্চয়ই আমি—

লহরীর চোখ দুটো জলে ভ'রে এলো। এই তার স্বামী। এরই ভালবাসার মিথ্যে অভিনয়ে বিশ্বেস ক'রে সে নিজের সবটুকু বিলিয়ে দিয়ে ব'সেছে! স্বামীকে যে সে দেবতা ভেবে হৃদয় নৈবিদ্যি সাজিয়ে দিয়েছিল, এই সেই দেবতা। সে যে মনে মনে কত সাধ কত আশার সৌধ গ'ড়ে তুলেছিল! আর তুমি—নিষ্ঠুর তুমি আজ এক আঘাতে সব ভেঙ্গে চুরে দিলে!

(২)

মিষ্টার এ কে মৈত্র অর্থাৎ শ্রীমান অর্ণবকুমার মৈত্র একজন উদীয়মান তরুণ ব্যারিষ্টার। পয়সা মন্দ পেতেন না, তা ছাড়া বাপের অনেক বিষয় সম্পত্তি পেয়েছিলেন। লোকটী বেশ সচ্চরিত্র এবং সদা প্রফুল্ল। তিনি কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন না; কোন মাসিকে বা সাপ্তাহিকে তার কবিতা বা প্রবন্ধ দেখা যায় নি। কিন্তু বড় রহস্যপ্রিয় ছিলেন এবং এই রহস্যের খাতিরে অনেক উদ্ভট কল্পনা তার মাথায় সর্ব্বদা খেলে বেড়াতো; তাই তার বন্ধুবর্গ তাকে 'নীরব কবি' আখ্যা দিয়েছিলেন।

বেলা প্রায় পাঁচটার সময় একখানা মিনার্ভা মোটর এসে গাড়ীবারান্দায় দাঁড়াতেই মিষ্টার অর্ণবকুমার তার ভেতর থেকে তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে নেমে পড়্‌লেন; তারপর আস্তে আস্তে একটা ইংরিজি সুরে শিষ্ দিতে দিতে দোতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপোরে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। ড্রেসিং রুমে পোষাকটা তাড়াতাড়ি বদলে ফেলে অর্ণবকুমার শয়ন কক্ষে গিয়ে ডাক্‌লেন, "লরী!"

লহরী তখনো বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই ভাব্‌ছিলো। স্বামী ডাকতেই সে চমকে উঠে তার মুখের পানে চেয়ে একটু কাষ্ঠ হাসি হাস্‌লে। এই হাসিটুকু দিয়ে সে প্রতিদিনই স্বামীর অভ্যর্থনা কোরতো, তাই আজ তার প্রাণটা হাসতে না চাইলেও সে ওটুকু থেকে স্বামীকে হঠাৎ বঞ্চিত কোত্তে পাল্লে না।

লহরীর মধুর মুখখানার দিকে চাইতে চাইতে অর্ণবকুমার ধীরে ধীরে কাছে এসে বোল্লেন, "তোমার মুখখান অমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন লরী?"

লহরী আনত মুখে বোল্লে, "ও কিছু নয়।"

"কিছু নয়! সত্যি? কই কোনদিন তোমায় এমন মুখ ভার ক'রে থাকতে দেখিনি তো!"

"কি জানি! তুমি কত রকমই দেখ আমাকে।"

অর্ণবকুমার হেসে লহরীকে কাছে টেনে নিয়ে বোল্লেন- "সত্যি তোমায় আমি অনেক রকম দেখি ভাই। এই ধরনা কেন, তুমি আমার প্রাণের ভেতর আনন্দ সাগরের লহরী, আমার গলায় পদ্ম ফুলের মালা, আমার ভবমরু পার হবার মোটর লরী, আমার—"

বাধা দিয়ে ম্লান হাসি হেসে লহরী বোল্লে, "থাক, হয়েছে গো হয়েছে, আর আদর দেখিয়ে কাজ নেই।"

অর্ণবকুমার হেসে বোল্লেন, "কাজ নেই? তবে থাক্। কিন্তু তুমি আমায় লুকুচ্ছো লক্ষ্মীটী! মাইরী। বলনা ভাই কি হ'য়েছে?"

"আঃ। তুমি বড্ড বিরক্ত কর কিন্তু! ব'লছি তো, শরীরটা একটু কেমন যেন ম্যাল ম্যাল—"

"কই বোল্‌ছো?"

"এই তো বোল্লুম।"

অর্ণবকুমার হেসে বোল্লেন, "তা বটে! আমারই ঘাট হ'য়েছে লরী। খুব অসুখ করেনি তো তোমার?"

"না গো না, ঐ অমনি একটু।"

"তা হোক্, ডাক্তারকে একবার হাতটা দেখান ভাল; আমি এক্ষুনি নিয়ে আস্‌ছি তাকে। তুমি চটপট খাবারটা নিয়ে এসো তো, ক্ষিদে পাচ্ছে বড্ড।"

লহরী অপ্রস্তুত হ'য়ে বোল্লে, "হ্যাঁ তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও। কিন্তু ঐ যা! আজ খাবার করে রাখ্‌তে ভুলে গেছি তো!"

"তা আর কি হবে, বাজারের খাবার আনতে দাও গে।

লহরী তাড়াতাড়ি বোল্লে, "না না, তুমি বসো, আমি এক্ষুনি ক'রে নিয়ে আসছি।"

"থাক্ না, তোমার অসুখ যে।"

"না না, ও কিছু নয়, তুমি বোসো এই এলুম ব'লে।"

খাবারের রেকাবীখানা হাতে করে ঘরে ঢুকতেই লহরী দেখ্‌লে, তার স্বামী একখানা খামে আঁটা চিঠির ওপোর ঠিকানা লিখ্‌ছেন, আর তাকে দেখেই সেটা খস্ কোরে ব্লটিং পেপারের নীচে লুকিয়ে ফেল্লেন। লহরীর বুকটা আবার ধড়াস্ কোরে উঠ্‌লো, আস্তে আস্তে রেকাবীখানা টেব্‌লের ওপোর নামিয়ে রেখে সে কম্পিতস্বরে বোল্লে "তুমি খেতে আরম্ভ কর, আমি চা ক'রে নিয়ে আস্‌ছি।"

লহরী চা নিয়ে এলো। জলযোগ করে অর্ণবকুমার পোষাক বদলে লহরীর সামনে দিয়ে মস্ মস্ করে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু লহরীর মনে হ'ল যেন তিনি তার বুকটাকে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে অস্থি পঞ্জরগুলো ভেঙ্গেচুরে দিয়ে চলে গেলেন, কারণ সে বেশ বুঝ্‌তে পারছিলো এই যাওয়ার উদ্দেশ্যটা শুধু ডাক্তার ডাকা নয়, সেই 'পুষির' কাছে লেখা চিঠিখানা ডাকে ফেলে দেওয়াটাই প্রধান উদ্দেশ্য।

স্বামীর আদরমাখা কথাগুলো লহরীর আজ মোটেই ভাল লাগ্‌ছিল না, কারণ তার স্বরূপ আজ সে টের পেয়েছে। বাইরের চাকচিক্য সে তো চায় না! সে চায় ভেতরের জিনিষ। কিন্তু যথাসর্ব্বস্ব পণ স্বরূপ নিয়ে তার স্বামী আসল ব'লে নকল জিনিষ দিয়ে ঠকিয়েছেন। সেকথা ভাব্‌তেও তার চোখদুটো জলে ভ'রে যায়; ঘৃণায় রাগে, অপমানে তার তরুণ বুকটা ফুলে ফুলে ওঠে। লহরী ভাব্‌লে, "তিনি যাকে ভালবাসেন তাকেই তার জীবন সঙ্গিনী কোর্‌লেন না কেন? আমায় বিয়ে ক'রে, ভালবাসার মিথ্যে অভিনয় দেখিয়ে, আমার সারা জীবনটাকে ব্যর্থ করে দিয়ে কি লাভ হ'ল তার? লহরীর চোখদুটো আবার জলে ভ'রে এলো, আঁচল দিয়ে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে সে ভাব্‌লে, কিন্তু এর কি কোন প্রতিকার নেই? কই—কিছুই মনে আস্‌ছে না তো! সে যে একান্তই নিরুপায়!

রাত্রে নিদ্রিত স্বামীর পাশে শুয়ে লহরী ঘুমুতে চেষ্টা কোরছিলো। কিন্তু হতভাগিনী সে! ঘুমের শান্তিটুকুনও বুঝি তার চোখ্ থেকে কর্পূরের মত উবে গেছ্‌লো। লহরীর মনে পড়ছিল সেই চণ্ডীদাসের কবিতাটা, সেই যে—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল,
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।

সেও বিয়ের পর এই প্রথম এসে সুখের ঘরটীকে মনের মত করে গড়ে তুলছিল, কিন্তু অদৃষ্ট যে পেছনে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছিলেন, তা সে টের পায়নি, একটা বিকটা রাক্ষসী যে আড়াল থেকে তার সব সুখ, সাধ, আশা অনেক আগেই গিলে বসেছিল, তা সে লক্ষ্য করেনি। "কিন্তু না—না," লহরী ভাব্‌লে, "তারই বা দোষ দি কেন? প্রবঞ্চককে বিশ্বাস নেই, সেও হয়ত আমারই মত অভাগিনী, আমারি মত প্রতারিতা, আমারি মত নকলের মোহে ভুলে সব খুইয়েছে। কি জানি! তাকে ভালও বাস্‌তে পারেন হয়ত!"

আচ্ছা, তার নামটা কি? চিঠিতে তো দেখ্‌লুম 'পুষি'। 'পুষি' কি নাম? পুষ্প? তাই হবে। পুষ্পরাণী—পুষ্পলতা, না—না নিশ্চয়ই পুষ্পমালা; তাই উনি লিখ্‌ছিলেন, 'মালা আমার,' আর তাই বুঝি আমায়ও মাঝে মাঝে 'মালা মালা' আদর করা হয়!···পুষ্পমালা বেশ নামটী কিন্তু, বোধহয় খুব সুন্দরী,—আমার চেয়েও; তাই আমাকে পেয়েও উনি তাকে একটুও ভুলতে পারেন নি।"

লহরী ভাব্‌তে লাগলো, "আচ্ছা, এক কাজ কোল্লে হয় না? কাল ৫টায় তো উনি সেখানে যাবেন লিখেছেন, আমি যদি তার যাবার আগেই পুষ্পমালার কাছে গিয়ে বলি, 'ওগো, তুমি ওর সাথে দেখা কোরো না, আমার স্বামীকে আমায় ভিক্ষে দাও। আমি যে আমার স্বামীকে

বড় ভালবাসি গো তাকে নিয়ে আমি কত সুখের স্বপ্ন রচেছি! তুমি নিষ্ঠুরার মত সে সব ভেঙ্গে-চুরে দিও না; আমায় স্বামী ফিরিয়ে দাও, নারী হ'য়ে নারীর ব্যথা বোঝো তোমার কোন লাভ নেই এতে। উনি যে বিবাহিত! তবে কেন তুমি আমার সুখের পথে এমন করে কাঁটা ছড়িয়ে দেবে?'...তাহ'লে হবে না? তাহ'লেও সে আমার জিনিষ আমায় ফিরিয়ে দেবে না? যদি তার পায়ে ধরে কাঁদি—তাও না? দেবে, নিশ্চয় দেবে; নারী হ'য়ে এতদূর হৃদয় হীনা হ'তে পার্ব্বে না সে, তার হৃদয়ও আমার ব্যথায় কেঁদে উঠ্‌বে। কেন কাঁদ্‌বে না? অনেক উপন্যাসেই এমন হ'তে দেখেছি তো!"

অনেকটা আশ্বস্ত হ'য়ে লহরী যখন পাশ ফিরে শুলো, তখন জানলার ফাঁকে ভোরের আলো উঁকি দিচ্ছিল।

(৩)

পরদিন দুপুর বেলা লহরার নিজস্ব ফোর্ড কারখানা ১০৭ নং বহুবাজারের মস্ত বাড়ীটার কাছে এসে দাঁড়াতেই একজন দরোয়ান সসব্যস্তে ফটক খুলে দিলে। মোটরখানা সুদিককার কেয়ারী করা বাগানের মাঝ দিয়ে লাল রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে গাড়ী বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়ে পড়্‌লো।

লহরী নেমে ইতস্ততঃ কোরছিল, কেমন কোরে সে এই মস্ত বাড়ীটার ভেতর সবাসর ঢুকে পড়বে, সে যে এদের কাছে একান্তই, অপরিচিতা! কিন্তু তাকে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হোলো না, মোটরের শব্দ পেয়ে বাহিরের ঘর থেকে একটী সুন্দর তরুণ যুবক বেরিয়ে এলেন। লহরীর সঙ্কোচ-ভরা মুখখানির পানে খানিকক্ষণ কৌতূহলী চোখে চেয়ে থেকে তিনি বোল্লেন, "আপনি কাকে চান?"

অবনত মুখে লহরী বোল্লে, "পুষ্প—পুষ্পমালা এখানেই থাকেন না কি?"

"পুষ্প? 'পুষি'র কাছে এয়েছেন আপনি? তা বেশ তো, যান না, বাড়ীতেই আছে সে। ওই ওপোরের ঘরেই পাবেন খন।"

পুষ্প! পুষ্প! পুষি! তাহ'লে এই ঠিক! মিথ্যে নয় একটুও! লহরীর বুকটা আবার কেঁপে উঠ্‌লো; যে সামান্য সন্দেহের আলোটুকু তার মনে তখনো মিটি মিটি জ্বলছিল তাও দপ্ করে নিভে গেল; তার মুখখানা আরো কালো হয়ে উঠ্‌লো।

তাকে ইতস্ততঃ কোরতে দেখে যুবকটী আবার বোল্লেন "আচ্ছা, আপনি একটু দাঁড়ান, নয় এই বাইরের ঘরে এসে বসুন বরং; আমি ডেকে দিচ্ছি তাকে।"

দরোয়ানটাকে বাড়ীর ভেতর ডাক্‌তে পাঠিয়ে দিয়ে যুবকটী আবার বোল্লেন, "আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না এসে?"

লহরী হাত জোড় ক'রে বোল্লে, "না, মাফ করুন; এই বেশ আছি আমি। কোন কষ্ট হোচ্ছেনা তো!"

একটু পরেই বাড়ীর ভেতর থেকে একটী সুন্দরী যুবতী ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে বোল্লে, "দাদা আমায় ডেকেছ?

"হ্যাঁ বোন, এই ইনি খুঁজছেন যে তোমায়।"

'পুষি' একবার কৌতূহল ভরা চোখে, লহরীর পানে চাইল, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে তার হাতখানা ধ'রে বোল্লে, "এস ভাই, ভেতরে যাবে চল।"

লহরীর মনের ভেতর তখন অনেকগুলো কথা তোলপাড় কোচ্ছিল। এই এই তার স্বামীর ভালবাসার পাত্রী। তার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই তার সুখের পথে পদ্মের কাঁটা! এত সরলা সে।

যেতে যেতে পুষি বোল্লে, "কিন্তু তোমায় তো চিন্‌তে পাল্লুম না ভাই। কলেজে তোমায় দেখেছি কি?"

লহরী মৃদুস্বরে বোল্লে, "কি জানি। দেখে থাক্‌বে হয়ত।"

"তোমার নামটী কি ভাই?

"লহরী মালা। ...আর তোমার? তোমার নাম পুষ্পমালা নয়কি?"

'পুষি' সরলতার হাসি হেসে বোল্লে, "পুষ্পমালা। তাহ'লে মালায় মালায় বেশ মিল হ'ত, না? কিন্তু আমার নামতো তা নয় ভাই। আমার নাম পুষ্পিকা।

লহরীর হাত ধরে নিয়ে এসে পুষি তাকে তার শোবার ঘরে বিছানার ওপোর বসালো; তারপর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে বোল্লে, "আমায় খুঁজ্‌ছিলে কেন ভাই?"

এক মুহূর্ত্ত নীরবে থেকে লহরী বোল্লে, "আমি তোমার কাছে একটা ভিক্ষে চাইতে এসেছি।"

সবিস্ময়ে 'পুষি' বোল্লে, "ভিক্ষে !"

'পুষির' হাতখানা চেপে ধ'রে লহরী বোল্লে, হ্যা ভাই, ভিক্ষে। আমার স্বামীকে ভিক্ষে দাও, আমায় স্বামীকে ফিরিয়ে দাও আমায়।"

"স্বামীকে !"

"হ্যা ভাই, আমার স্বামী—আমারই স্বামী তিনি। তোমারও তো সিঁথিতে সিঁদুর রয়েছে ভাই। তোমারও তো স্বামী আছেন! তবে কেন আমার স্বামীকে তুমি কেড়ে নেবে? আমায় সুখী হ'তে দেবে না? আমায় আত্মহত্যা করাবে?"

লহরীর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো।

'পুষি' ব্যস্ত হ'য়ে বোল্লে, "ওকি! কাঁদছ কেন ভাই? তুমি কি সব বোল্‌ছো আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না যে।"

ম্লান মুখে লহরী বোল্লে, "আমায় মিছে কথায় ভুলিয়ো না ভাই, আমি সব জানতে পেরেছি। আমায় স্বামীকে নিয়ে সুখী হ'তে দাও ভাই, তোমার পায়ে ধরে ভিক্ষে চাইছি।"

তাড়াতাড়ি লহরীর হাতখানা ধরে ফেলে 'পুষি' বোল্লে, "ছি! ছি! কোর্‌ছো কি ভাই? ওঠোনা, ছিঃ। পাগল হ'লে নাকি।"

লহরী উঠে দাঁড়িয়ে বোল্লে, তবে বল, আমার জিনিষ আমারি থাক্‌বে, তুমি কেড়ে নেবে না।"

'পুষি' লহরীকে ধরে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বোল্লে, "তুমি একটু শুয়ে থাকো দিকিন্ ভাই! আমি পাখা ক'রছি। তারপর মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হলে যা বলবার আমায় সব গুছিয়ে বোলো'খন।"

খানিক্ষণ চুপ করে থেকে লহরী বোল্লে, "সত্যি কিছু বুঝতে পারছো না তুমি?"

কিছু না, একটুও না। স্বামী! ভিক্ষে! আত্মহত্যা কি সব বোল্‌ছ তুমি? তোমার কি কোন অসুখ কোরেছে ভাই?"

"না অসুখ করেনি। আচ্ছা তোমার নাম কি 'পুষি' নয়?"

"হ্যা, 'পুষি' আমার ডাক নাম!"

"এ বাড়ীর নম্বর ১০৭ তো বটে?"

"হাঁ, ১০৭; কেন বল দেখি! এসব জিজ্ঞেস কোর্‌ছো কেন?"

"একটু কাজ আছে ভাই। তুমি আমার স্বামীকে চেনো?"

"তোমার স্বামী! নাম কি তার?"

"অর্ণব কুমার মৈত্র।"

"অর্ণব কুমার। কই? না! কোন দিন শুনেছি ব'লে মনে হোচ্ছেনা তো।"

লহরী আস্তে আস্তে তার শাড়ীর আড়াল থেকে একখানা চিঠি বার কোরে পুষির হাতে দিয়ে বোল্লে, "কিন্তু এটাও কি তোমার লেখা নয় ভাই?"

পুষি কিছুক্ষণ নীরবে চিঠিখানায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বোল্লে, "আশ্চর্য্য! একই নাম—একই ঠিকানা! কিন্তু এতো আমার হাতের লেখা নয় ভাই।"

"তোমার নয়? ঠিক্ বোল্‌ছো?"

"কক্ষনো না, তোমার গা ছুঁয়ে বোল্‌ছি ভাই। আমার হাতের লেখা তো আরো র'য়েছে, তুমি মিলিয়ে দেখ্‌তে পারো বরং।"

সবিস্ময়ে লহরী বোল্লে, তাইতো! তা'হলে এটা কি রকম হ'ল।"

পুষি চিঠিখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোল্লে, "আমায় সব ব্যাপারটা খুলে বলবে ভাই? এ চিঠিটা কোথায় কি করে পেলে তুমি?"

লহরীর কাছ থেকে সব ঘটনাটা শুনে নিয়ে পুষি বোল্লে, "আশ্চর্য্য তো! কিন্তু আমার বোধ হয় ঠিকানাটা লিখতে ভুল হ'য়েছে ভাই, কাছেই কোন বাড়ীতে অন্য কোন পুষি থাক্‌তে পারে হয়ত।"

অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে লহরী বোল্লে, "কি জানি কি!"

"না ভাই, তোমার যদি এখনো আমার কথায় সন্দেহ থাকে, তুমি ৫টা অবধি এখানেই থাকো বরং; ছাখো, তোমার স্বামী সত্যি আমার কাছে আসেন কিনা।"

বাধা দিয়ে লহরী বোল্লে, "না না তা বোল্‌ছিনে ভাই! কিন্তু কি করা যায় বল দেখি?"

"তাইতো! কি কোর্‌বে? আচ্ছা, এক কাজ কোরো দিকিন্। সত্যি যদি, তোমার স্বামী 'পুষি' ব'লে

স্বামীকে ভাল বেসে থাকেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই 'পুষিব' লেখা আরো চিঠি আছে তার কাছে, তুমি সেগুলো খুঁজে নিয়ে এসো দিকিন্ কালকে। তাহ'লে বোধ হয় ব্যাপারটা ভাল করে বোঝা যাবে।"

লহরী দাঁড়িয়ে উঠে বোলে, হাঁ ভাই, ঠিক্ বোলেছো, তুমি, তাই কোরবোখন। তাহ'লে আজ আসি ভাই?"

"এক্ষুনি উঠবে? জলটল খেয়ে যাবে না? তোমার স্বামীর তো ফেরবার দেরী আছে এখনো।"

"তা থাক, আমার অনেক কাজ আছে ভাই কালকে আস্‌বো আবার, আসি তাহ'লে?"

'হাঁ এসো, না চল, এগিয়ে দিচ্ছি তোমার।"

বাড়ী এসে লহরী স্বামীর দেরাজটা অনেক কষ্টে খুলে ফেলে চিঠিগুলো ওলোট পালট কোরতে লাগলো, কিন্তু পুষিব লেখা আর একখানি চিঠিও সে খুঁজে পেলে না পেলে শুধু একটা ছোট বাঁধান খাতা। আনমনে তার পাতাগুলো উলটাতে উলটাতে হঠাৎ কি দেখে তার চোখ দুটো উজ্জল হ'য়ে উঠ্‌লো, মুখখানা হাসির আলোয় ভরে গেল। মৃদুস্বরে আপন মনে সে বোল্লে বটে। আচ্ছা দাঁড়াও মজাটা দেখাচ্ছি তোমাকে।"

৪

পরদিন ভোর বেলা অর্ণবকুমার ঘুম থেকে উঠে পাসে লহরীকে দেখ্‌তে না পেয়ে একটু আশ্চর্য্য হলেন। লহরী আগেই উঠে গেছে, কই তার এত সকালে কোনদিন ঘুম ভাঙ্গেনা তো। বোধহয় তাকে ডেকে দিতে হয় যে। অর্ণকুমারের ঠোঁটে একটু মৃদু হাসি খেলে গেল, হাসিটুকুন বোধ হয় স্ত্রীর হঠাৎ এই ভাবে ওঠ্‌বার স্মমতি দেখে।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন কোরে অর্ণবকুমার চেয়ারটা টেব্‌লের কাছে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে বসে পড়্‌লেন — চায়ের প্রতীক্ষায়। ঠিক এই সময়টীতে লহরী রোজই নিজের হাতে চা করে এনে তাকে পরিবেশন কোত্তো। চাকর বাকর কেউ চা কোত্তে গেলে তার মন উঠ্‌তোনা, কারণ স্বামীর তত্বতালাসের ভার অন্য কারো হাতে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত থাকুতে পাত্তো না। অর্ণবকুমার অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন, কিন্তু কই? লহরী চা নিয়ে এলনাতো! আজ এত দেরী হ'চ্ছে কেন তার? অর্ণবকুমার আদর মাখা স্বরে ডাক্‌লেন, "লহরী!"

কেউ উত্তর দিল না।

অর্ণবকুমার আবার ডাক্‌লেন, "লহরী! ও লহরী!' কিন্তু কি আশ্চর্য্য! লহরী গেল কোথায়! শুন্‌তে পাচ্ছে না নাকি? অর্ণবকুমার চেয়ার ছেড়ে উঠে আস্তে আস্তে বাহিরে এলেন তারপর রেলিং ধরে নীচে ঝুঁকে পড়ে ডাক্‌লেন 'লহরী। ওগো লহরী মালা। শুন্‌ছো চা টা করা হ'ল?"

রান্না ঘরের বরের পাশ্চমে বামুনটা বসে বসে তরকারী কুট্‌ছিল, মনিবের দিকে চেয়ে সসম্ভ্রমে সে বোল্লে, "মা-জি তো আভি তক্ উপরসে নেহি আয়া হুজুর।"

নেহি হায উধার? দেখ্‌খোতো বস্তুহয়া মে।"

বামুন ভেতরে উঁকি মেরে বোলে, "নেহি হুজুর।"

কেধার গিযা তব "

হামতো দেখখা নেহি হুজুর। উপপরমে হোগা দোখয়েতো আপ।'

অর্ণবকুমার রেগে বোল্লেন, 'দুর বেটা ছাতুখোর,' উপর মে হোগা! আমি ওপোর থেকে খুঁজ্‌ছি, দেখ্‌তে পাচ্ছিনে ও বেটা বলে উপরমে হোগা।'

সমস্ত বাড়ীটা পাতি পাতি ক'রে খুঁজেও লহরীকে পাওয়া গেলনা। তাইতো। লহরী গেল কোথায়? বিরস মুখে অর্ণবকুমার দরোয়ানকে ডেকে পাঠালেন। দরোয়ান এলে তাকে চোখ রাঙ্গিয়ে বোল্লেন, 'তোমকো মা জি কেধার গিযা?"

দরোয়ান নভয়ে বোল্লে মা জি তো দরিয়ামে নাহনে গিয়াথা হুজুর।"

'কেত্তা আগারি?"

"ফজির মে হুজুর। আভি আধা ঘন্টি হোগা তো।"

"জল্‌দি, জল্‌দি বোলাও।"

দরোয়ান চলে গেলে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে অর্ণবকুমার শয়নকক্ষে ফিরে এলেন। তারপর চেয়ারে বসে ড্রয়ারের ভেতর সিগারেট কেস্‌টা খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেন, কিন্তু জিনিষটা সেখানে পাওয়া গেলনা, কারণ কেস্‌টা তিনি রাত্তিরে বালিসের পাশে রেখে শুতেন। মনে পড়্‌তেই বিছানা

থেকে অর্ণবকুমার দেশালাই ও সিগারেট কেস্ নিয়ে এলেন তারপর আবার চেয়ারে বসে একটা সিগারেট বার্ করবার উদ্দেশ্যে কেস্টার স্প্রিং টিপ্‌তেই—"একি!

একখানা চিঠি যে! লহরীর লেখা চিঠি এখানে কেন! তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলে অর্ণবকুমার পড়্‌তে লাগলেন :—

কালি ঘাট।

১৭ই অগ্রহায়ণ।

প্রিয়তম আমার—

তুমি আমায় একটুও ভাল বাসনা, শুধু মিছে অভিনয়ে এতদিন ভুলিয়ে রেখেছ—তা আমি টের পেয়েছি। পুষির লেখা চিঠিখানা ও তোমার আদ্দেক লেখা চিঠিটা পরশু দিন দেখে ফেলেছি। তুমি পুষিকে ভালবাস, আমায় বাসনা, সেজন্য আমি তোমায় একটুও দোষ দোবো না, তুমি তাকে নিয়েই সুখী হ'য়ো, আমি চল্লুম। মা বাবার সাথে দেখা হ'লনা এই যা দুঃখ। গঙ্গার ঘাটে যদি ম'রে ভেসে উঠি তাহ'লে হয়তঃ আমায় দেখ্‌তে পাবে, তা নৈলে এই শেষ। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কোচ্ছি পরজন্মে যেন তোমায়ই স্বামী পাই। ক্ষমা কোরো। ইতি—

তোমারই প্রবঞ্চিতা

লরী

অর্ণবকুমার চম্‌কে লাফিয়ে উঠ্‌লেন। অ্যা! লরী নেই! তার লরী—তার লহরী মালা আর নেই! সত্যি গঙ্গায় ডুবে মরেচে সে? না—না, এখনো হয়তো বেঁচে আছে, এখনো হয়তো গেলে বাচাতে পারবেন তাকে এখনো হয়তো—

উন্মত্তের মত অর্ণবকুমার গঙ্গার ঘাটে ছুটলেন। গঙ্গার ঘাট তার বাড়ী থেকে এক মিনিটের পথও নয়। ঘাটে গিয়ে অর্ণবকুমার দেখলেন, দরোয়ানটা লহরীর বেনারসী শাড়ীখানা নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখ্‌ছে। তাকে দেখ্‌তেই সে বোল্লে,

'ই কাপ্‌ড়া তো ইধার পা হুজুর! মা-জি কা মালুম হোতা।"

অর্ণবকুমার দরোয়ানটাকে একটা ধাক্কা মেরে পাশে ফেলে দিয়ে সবেগে জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেন।

ছেলেবেলা থেকে অর্ণবকুমার 'ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবের একজন মেম্বর ছিলেন; কিন্তু অনেক ডুবাডুবি কোরেও লহরীকে খুঁজে পেলেন না। দরোয়ানটা দাঁড়িয়ে হঠাৎ তার মনিব 'পাগ্‌লা হো গিয়া কিনা তাই পরখ্ কোর্‌ছিল; হাঁফাতে হাঁফাতে অর্ণবকুমার তাকে বোল্লেন, "জল্‌দি বোলাও—দুনো সোফারকো; দৌড়ো জল্‌দি।"

সোফার দুজন এলে তাদের একজনকে মোটর নিয়ে 'সুইমিং ক্লাবে' ও আর একজনকে ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠিয়ে দিয়ে মিঃ অর্ণবকুমার আবার পাগলের মত জলের নীচে হাত্‌ড়িয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন, আশা যদি লহরীকে পাওয়া যায়।

খানিক পরে সুইমিং ক্লাবের মেম্বাররা এসে ঘাটের কাছে গঙ্গার অনেকটা জায়গা তোলপাড় ক'রে ঘুলিয়ে ফেল্লেন; কিন্তু লহরীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। হতাশ হ'য়ে তারা বোল্লেন, বোধহয় স্রোতে দূরে ভেসে গেছে। মিঃ অর্ণবকুমারের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে বাজ প'ড়্‌লো মরার মত পাংশুমুখে তিনি আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে এলেন।

অর্ণবকুমারের সে দিন খাওয়া হ'ল না, কোর্টে যাওয়াও হ'ল না। শোবার ঘরে দোর বন্ধ কোরে তিনি ঠিক্ লহরী যেখানে শুয়েছিল সেই জায়গাটীতে শুয়ে চোখের জলে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন। সত্যি যে লহরী শেষে তার ওপোর এম্‌নি কোরে প্রতিশোধ নিলে? তাকে এম্‌নি কোরে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল? মা বাপ হারিয়ে—মার স্নেহ, বাপের আদর হারিয়ে, তিনি নিজের অশান্ত, শোকাকুল মনটাকে লহরীর– তার বড আদরের লরীর অগাধ ভালবাসার বাঁধনে বেঁধে রেখেছিলেন, আর সেই লহরীমালা তার স্বেচ্ছায় নিজের হাতে বাধন কেটে দিয়ে, তাকে অকূল সাগরে ঠেলে ফেলে উধাও হ'য়ে চ'লে গেল! এ সংসারে আর কি নিয়ে—কিসের আশায় থাক্‌বেন তিনি?

অর্ণবকুমার ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, "কিন্তু লরীর—আমার লরীর কোন দোষ নেই তো! আমি—আমিই তো তার বুকে তুষের আগুন জেলে দিয়েছি! আমিই তো তাকে মরণের পথে টেনে নিয়ে গেছি! প্রাণে যে নিরম আঘাত

পেয়ে সে চ'লে গেছে, সে আঘাত আমিই তো স্বেচ্ছায় দিয়েছি তাকে! তার জন্ত তো দায়ী আমিই!"

অর্ণবকুমারের চোখদুটো আবার জলে ভ'রে গেল। "মা বাপের শুধু একটী মাত্তর মেয়ে লহরী, কি বলে তাদের প্রবোধ দোবো আমি? কি ক'রে তাদের কাছে গিয়ে বোল্‌বে, "ওগো, তোমাদের মেয়ে আমার দোষেই—আমিই তোমাদের মেয়েকে মেরে ফেলেছি? আমায় ধ'রে তোমরা জেলে দাও, আমায় ফাঁসী দাও—"

অনেকক্ষণ কেঁদে একটু শান্ত হ'য়ে অর্ণবকুমার সন্ধ্যেবেলা দোর খুলে বেরিয়ে আসতেই দরোয়ান একটা চিঠি এনে তার হাতে দিয়ে, বোল্লে, হুজুরের শ্বশুর বাড়ী থেকে একজন লোক এসে সেটা দিয়ে গেছে। চিঠিটা নিয়ে কম্পিতস্বরে অর্ণবকুমার বোল্লেন "উসকো বোলা হায় কুছ্?"

দরোয়ান অনেকদিনের পাকা লোক। মনিবের হুকুম ছাড়া ভেতরের একটী খবরও বলবার মত 'আদমী নয়। মাথা নেড়ে বোল্লে, "নেহি হুজুর,—হুকুম নেহি মিলাথা।"

চিঠিটা পড়ে অর্ণবকুমার দেখ্‌লেন, শাশুড়ী যাবার নেমন্তন্ন ক'রে পাঠিয়াছেন। চিঠিটা এই রকম:—

কলিকাতা।

১৭ই অগ্রহায়ণ।

বাবা অর্ণব,

আশা করি তুমি ভালই আছ। তোমার সাথে বিশেষ কথা আছে, পত্রপাঠ এখানে চলে আসবে। আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। এখানে সব ভাল।

তোমার মা

অর্ণবকুমার ভাব্‌লেন "আজ হোক কাল হোক এই বিষম খবরটা তাদের দিতেই হবে যখন, আজ্‌কে এই সুযোগেই জানিয়ে আসা যাক্‌। কিন্তু কি ক'রে—কি বোলে তাদের বোল্‌বো আমি?"

(৫)

অর্ণবকুমার ভেবেছিলেন, শ্বশুর বাড়ী যাবার পর শাশুড়ীঠাকরুণ যখন লহরীর কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস কোরবেন, ঠিক সেই সময়টায় তিনি চোখ কাণ বুজে দুঃসংবাদটা কোন রকমে ব্যক্ত করে ফেল্‌বেন, তাই নিশ্বেস বন্ধ ক'রে তিনি সেই অশুভ সুযোগটারই প্রতীক্ষা কোরছিলেন। কিন্তু শাশুড়ীকে প্রণাম করবার পরও যখন তিনি আশীর্ব্বাদ করা ছাড়া আর কোন রকম প্রশ্ন কোরলেন না অধিকন্তু তার বিষাদমাখা ম্লান মুখখানির পানে চেয়ে শীগ্‌গীর পানাহার ও নিদ্রার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন, তখন অর্ণবকুমার একটু বিশেষ আশ্চর্য্য ও চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে অমন নিদারুণ সংবাদটা জানাতে তার মোটেই মন স'রছিল না, তাই অনেকক্ষণ ভেবে তিনি ঠিক কোরলেন কালকে যাবার সময় কোন চাকরটাকরের হাতে একখানা চিঠি লিখে রেখে যাবেন।

আহারে অর্ণবকুমারের মোটেই রুচি ছিল না শাশুড়ীর অনুরোধে কোন রকমে নিয়ম রক্ষে ক'রে তিনি শোবার ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। দেয়ালের গায় লহরী মালার একখানা ফটো আঁটা ছিল সেই দিকে চেয়ে চেয়ে তার দুটী চোখ জলে ভরে এলো। হায়! এই নিশ্চল প্রাণহীন ছবিটী ছাড়া সেই হাসিমাখা সজীব ছবিটী আর দেখতে পাবেন না তো তিনি! আরতো সে এসে তার প্রাণে তেমনি ক'রে কথার মধু ছড়িয়ে দেবেনা। তার লরী—তার বড় আদরের বড় ভালবাসার লরী আরতো ফিরে আসবেনা! হয়ত দুদিন পরে শুনবেন তার সাধের লহরীর সেই কুসুম কোমল দেহটী ফুলে, বিকৃত হ'য়ে কোনখানে ভেসে উঠেছে, আর দলে দলে কাক শকুন এসে তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে! সে কি বীভৎস দৃশ্য। ভাব্‌তেও অর্ণবকুমারের পা থেকে মাথা অবধি শিউরে উঠ্‌লো।

কিন্তু কে—কে এ দশা ক'রেছে তার? কে তার হৃদয়ের ধনকে মাথার মাণিককে জলে ডুবিয়ে মেরেছে? তিনি নিজে—তিনি নিজেই তার তরুণ প্রাণে যাতনার শেল বিঁধিয়ে দিয়েছেন—তার কোমল বুকে মরণের ছুরী বসিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজে! উঃ!

হঠাৎ খট্ খট্ শব্দে চম্‌কে উঠে অর্ণবকুমার চেয়ে দেখ্‌লেন, কে যেন পেছন্ ফিরে ভেতর থেকে দোরে খিল এঁটে দিচ্ছে! কে—কেও! লরী—লহরীর মত দেখাচ্ছেনা? অর্ণবকুমারের সমস্ত শরীরটা থর্ থর্ করে কেঁপে উঠ্‌লো।

„লহরী মুখ ফিরিয়ে হেসে বোল্লে, “কিগো! চিন্‌তে পাচ্ছো?”

সবিস্ময়ে অস্ফুটস্বরে অর্ণবকুমার বোল্লে, “লবী!”

খিল্ খিল্ ক’রে হেসে এগিয়ে আস্‌তে আস্‌তে লহরী বাল্লে, “হ্যা—গো—হ্যা, তোমার লরী; ভয় নেই ম’রে ভূত হ’য়ে আসিনিকো।

“তুমি—তুমি মরনি?”

“ইস্, মর্‌বো! সত্যি মরলে ভারী মজা হ’ত, না? দিব্য আবার বিয়ে করা যেতো। এবার বোধ হয় পুষিকেই বে কোর্ত্তে?”

বিস্ময়ে আনন্দে অর্ণব কুমারের মুখ থেকে একটীও কথা ফুট বেরুলো না। ভাবছো বুঝি এ আপদটা আবার এলো কোত্থেকে না? 'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।”

লহরীকে কাছে টেনে নিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে অর্ণব কুমার বোল্লেন “কিন্তু আমিতো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে লবী।”

খিল খিল করে হেসে লহরী বোল্লে, “কেমন জব্দ! ঠিক প্রতিফলটী পেয়েছ তো? আর ঠাট্টা কোর্ত্তে যাবেন মশাই? পুষির সাথে ভাল বাসাবাসি কোর্ত্তে যাবে আর?”

লহরীর হাসি মাখা ঠোঁট দুটীতে চুমু খেয়ে অর্ণবকুমার বোল্লেন, “কিন্তু তুমি আমায় বড্ড কষ্ট দিয়েছো লবী! তোমায় সত্যি হারিয়েছি ভেবে আমার বুকটা ভেঙ্গে যাচ্ছিল।”

“আর তুমি আমায় কম কষ্টটা দিয়েছ না? আমায় কম নাকাল টা কোরেছ তুমি?”

মৃদু হেসে অর্ণব কুমার বোল্লেন, “কেন! কি করেছি?”

“বটে! কি ক’রেছো! প্যাডের ভেতর পুষির লেখা সেই চিঠিখানা আর তোমার লেখা সেই উত্তরটা পেয়ে আমার মনের অবস্থাটা যে কি রকম হ’ল, তা আমি নিজে কিছু বোল্‌বো না, তোমার নিজের মন দিয়েই বুঝে নিও। যাহোক্ আমি সেই ১০৭ নং বহুবাজার গিয়েছিলুম।”

“গিয়েছিলে!”

“হাঁ, গিয়েছিলুম বৈকি! সে বাড়ীতে সত্যি এক পুষির দেখা পেলুম!”

“সত্যি পুষি!”

“সত্যি পুষি! তার নাম পুষি ব’লে কেউ আছে আমি কস্মিনকালেও জান্‌তুম না!”

“কিন্তু সত্যি আছে। তার সাথে কথাবার্ত্তা ক’য়ে, অনেক কাঁদাকাটি ক’রে বুঝলুম, এ পুষি তোমার পুষি নয়। সে বোল্লে, বোধ হয় চিঠির ঠিকানাটা ভুল হ’য়ে থাক্‌বে।”

“কিন্তু চিঠিটা যে একেবারে মিথ্যে তা জান্‌লে কি ক’রে?”

“বাড়ী এসে পুষির আরো চিঠি আছে কিনা খুঁজতে গিয়ে তোমার দেরাজের ভেতর একখানা ছোট ডায়েরীর খাতা পেলুম। তা থেকে আমি খানিকটা কেমন নকল রেখেছি দেখনা? একটুখানি হেসে লহরী একটা কাগজ স্বামীর চোখের সামনে খুলে ধ’রলো, তাতে লেখা ছিল—

“আজ ভারী মজা কোরেছি। অরুণের বৌকে দিয়ে আমার নামে একখানা চিঠি লিখিয়েছি। চিঠিটার নীচে নাম দিইয়েছি 'পুষি—যেন ১০৭ নং বৌবাজার থেকে 'পুষি' নামে কেউ আমায় লিখছে। চিঠির ওপরের খামটায় বৌবাজার আর এই কালিঘাট দুজায়গা থেকে 'সিল' দিইয়ে নিয়ে এসে প্যাডের ভেতর রেখে দিয়েছি। চিঠিটার দুকলম উত্তর ও লিখে রেখেছি। লহরী আজ তার মার চিঠির উত্তর দিতে এসে যখন সেগুলো দেখ্‌বে, তখন কি মজাই হবে। নিশ্চয় ভাববে সত্যি।”

অর্ণব কুমার হেসে বোল্লেন তুমি সব টের পেয়েছিলে বল?”

লহরী হেসে বোল্লে শুধু তা নয়, তারপর তোমার শাস্তির ব্যবস্থা কোল্লুম। তোমার সিগারেট কেসের ভেতর একখানা চিঠি রেখে দিলুম, জানতুম, তুমি ভোরে উঠেই সিগারেট খাও। আর তারপর দরোয়ানের কাছে গঙ্গায় নাইতে যাবার নাম করে ভাড়াটে ট্যাকসি চড়ে এখানে চলে এলুম। বাড়ির বাস কাপড়টা তোমায় ভয় দেখাবার জন্যে গঙ্গার ঘাটে রেখে এলুম। কেমন জব্দ! আর চালাকী কোর্‌বে?”

অর্ণব কুমার হেসে বোল্লেন, “না, খুব শিক্ষা হ’য়েছে লরী, আর নয়; সত্যি তোমার কাছে হেরে গেছি”

নিজের নাকাল কাহিনীটা আগা গোড়া বর্ণনা কোরে

অর্ণব কুমার বোল্লেন, "কিন্তু মা একটা দরকারী কথা আছে ব'লে চিঠি লিখলেন কেন? তুমি এখানে এসেছো তা লিখলেন না তো! টিপে দিয়েছিলে বুঝি?"

লহরী হেসে বোল্লে, "না—না, মাকে কিছু বলিনিতো। মাকে শুধু বলেছি, যে তোমার অসুখ তাই দেখতে এলুম। কিন্তু অত ভোরে হঠাৎ আসতে দেখে মার মনে সন্দেহ হয়েছিল, মা ভাবলে তোমার সাথে ঝগড়া টগড়া করেছি বুঝি। তাই তোমায় আসতে লিখে দিলে, ভাবলে, তুমি এলেই মিটমাট হয়ে যাবে। সে যাক, তুমি এখন খাবে চল।"

অর্ণব কুমার বোল্লেন "খাবো!"

"হ্যা, খাবে বৈকি। ওবেলাতো খাওনি, এ বেলাও বসেই উঠে এসেছ, আড়াল থেকে দেখেছি আমি আগের জানতুম তাই তোমার খাবার এনে রেখে দিয়েছি। চল—ওঠো, আমি ঠাঁই ক'রে দিচ্ছি।"

পরম তৃপ্তির সঙ্গে লুচি আর কোপির ডালনা খেতে খেতে অর্ণব কুমার বোল্লেন, কিন্তু কথাটা যদি সত্যি সত্যি হ'ত লবী?"

"কি সত্যি হতো?"

"সত্যি যদি আমি 'পুষি' নামে কাউকে ভালবাসতুম?" মৃদু হেসে লহরী বোলে, "ইস্! হ'লেই হ'ল কিনা! জানন অর্ণবের বুকে লহরীই শুধু শোভা পায়, সেখানে পুষ্পের স্থান নেইতো। পুষ্প কোন রকমে এসে পড়লেও লহরী তাকে দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে যে!"
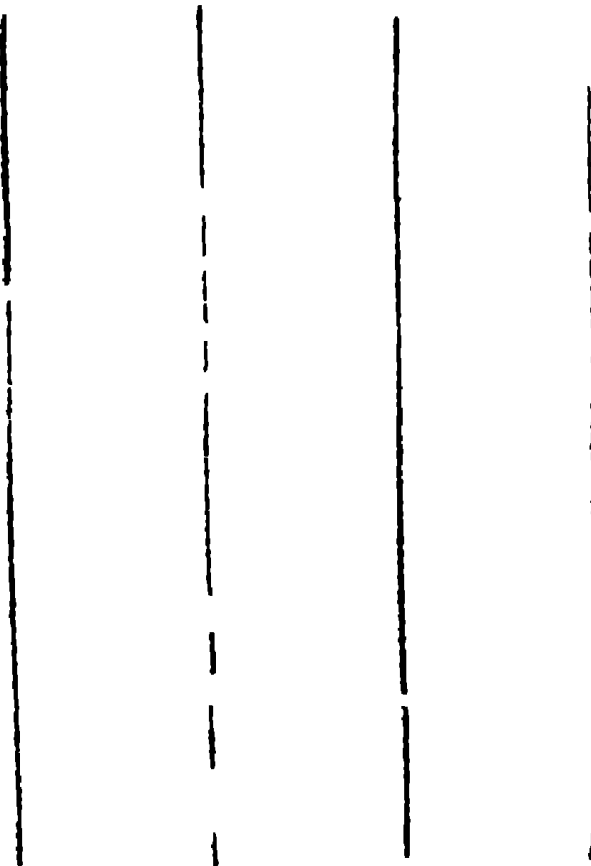
বিবাহ বৈচিত্র্য

বৃদ্ধস্য তরুণী—"

এদেশে যা আখ্‌চার দেখা যায়।

বৃদ্ধার বিবাহ

ওদেশে যা হামেসাই

হয়ে থাকে।
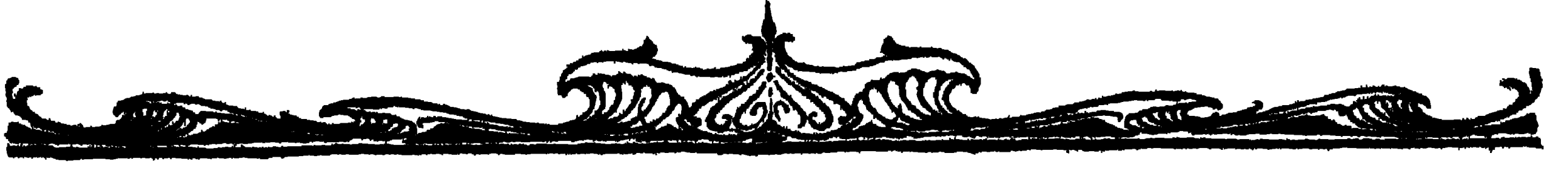
নারীর লজ্জা।

(২)

Coquetry বা লীলার কথা বলিতে ছিলাম—এ ভাবটা পুরুষের যৌন আকাঙ্ক্ষার একটা পরিপূরক—অর্থাৎ তাহার নিবৃত্তি তবে এই নিবৃত্তিটা যদি পুরুষের সহজ লভ্য হইত তবে সে স্পৃহাটাও স্বতঃই মন্দীভূত হইয়া পড়িত তাই তাহাকে জীবিত রাখিবার জন্য নারী চরিত্রে এই লীলার ভাবটুকু আছে। এ লীলা প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে বিরাজিত পশু জগতে ও এই Coquetry বা লীলা আছে এই জন্যই বোধহয় কবি গাহিয়াছেন

"তুমি কি বহ্নি আমি পতঙ্গ
তুমি কি বংশী আমি কুরঙ্গ
জ্বল জ্বল এ জীবনে অগ্নি উজ্জ্বলদাহিকা।

এ লীলাটুকু নিছক ছলনা নহে ইহা ক্রীড়া, কৌতুকের পর্য্যায়ভুক্ত অর্থাৎ ইংরাজী Sport ভাবাত্মক। ইহা ঠিক বঞ্চনা নহে উদ্দীপনা মাত্র—যৌন জীবনে ইহার আর স্বার্থকতা আছে। তবে ইহার সঙ্গে সহৃদয়তার অভাব থাকিলে তাহা মারাত্মক হইতে পারে। নারীর জীবনে যৌনস্পৃহা একটানা বহেনা উচ্চ তরঙ্গের মত উদ্বেলিত অর্থাৎ কখন উচ্চ কখন নিম্ন ভাবে প্রবহমানা এই তরঙ্গের সহিত এই লীলার একটু ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে সুতরাং লজ্জার সঙ্গে ইহার ও সম্বন্ধ নিকট। পশুদিগের মধ্যে লজ্জা নাই কারণ তাহাদের আচ্ছাদন নাই অনেক দেশে এখন৹ দিগম্বর নরনারী আছে তাহাদের মধ্যে অনাচ্ছাদিত দেহজনিত লজ্জা নাই তাহারা বস্ত্রাবৃত মানুষ দেখিলে হাসিয়া উঠে যেন তাহা এক অদ্ভুত জীব। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের মধ্যে অশ্লীলতা নাই—তাহিতী দ্বীপের অধিবাসীগণ সম্বন্ধে কুক* বলেন যে তাহাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের একত্র বসিয়া আহার মহা লজ্জার বিষয় স্বামী স্ত্রীর কথা দূরে থাকুক ভাইভগ্নী ও স্বতন্ত্রভাবে পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরাইয়া দূরে দূরে বসিয়া ভোজন করে। ব্রাজীলের অধিবাসীগণ সম্বন্ধে কার্ল ভনডেন ষ্টেনীম ও ঠিক এইভাবের কথা বলিয়াছেন বঙ্গদেশে ও স্ত্রী পুরুষের একত্র আহার নীতিবিরুদ্ধ কিন্তু পাশ্চত্য জগতে এই প্রথার ব্যতিক্রমই লজ্জার কারণ। ইহার কারণ কি ভোজনের মধ্যে লোভ নামক প্রবৃত্তির স্ফুরণ হয় কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য্য এই কয়টী প্রবৃত্তি বা রিপুর বিকাশ আহারের বিরক্তি উৎপাদন করে সেইজন্যই আহারের মধ্যে এই লোভের বিকাশ থাকায় তাহা লজ্জার কারণ বলিয়া গণ্য হয় পাশ্চাত্য দেশ ভোগের দেশ—লোভ ভোজনের অঙ্গ সেইজন্যই লোভের বিকাশ সে দেশে বিষদৃশ্য বা বিরক্তি জনক নহে সুতরাং ভোগ প্রধান দেশে স্ত্রী পুরুষের একত্রে আহার দূষনীয় নহে। বিপদে লজ্জা থাকে না—তাহার কারণ বিপদের সময় বিপন্ন তাহার অবস্থার জন্য বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া সহানুভূতির আকর্ষণ করে তজ্জন্য কেবল মাত্র ঐ অবস্থার জন্যই সে লজ্জার হাত হইতে মুক্তি পায়—অসূর্য্যম্পশ্যা নারীদের ও প্রসবের সময় ধাত্রী এমন কি পুরুষ চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া হয় কিন্তু তখন তাহাতে কাহার৹ মনে কোন দ্বিধা আসে না—সেই বিপন্ন অবস্থা মাত্র এক সহানুভূতির উদ্রেক করে। বিপদে পড়িলে লজ্জা ত্যাগ করা স্বাভাবিক কিন্তু যদি বিপদ আসে সেই ভাবিয়া নারী যদি পূর্ব্ব হইতেই লজ্জা ত্যাগ করিয়া ফেলেন তবে তিনি সহানুভূতি না পাইয়া বিদ্রূপ ভাজনা হইবেন। তবে লজ্জার সংজ্ঞা স্থির করিবার সময় একটী কথা বলিয়াছি যে "অকর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রকাশজনিত ভয়ই লজ্জা"—এখন এই অকর্ত্তব্য কথাটাই বিশেষ ভাবে প্রণিধান করা উচিত কারণ সকল দেশে সকল সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের বিভিন্ন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে হিন্দুমহিলার যাহা অকর্ত্তব্য তাহা হয়ত ব্রাহ্মমহিলার

---

* অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবী পরিভ্রমণকারী Drake, Cook এর Cook তবে ইহার বিরুদ্ধে বা স্বপক্ষে কোন প্রমাণই নাই।

পক্ষে অকর্ত্তব্য নয় সুতরাং তাঁহারা সেবিষয়ে অসাবধান হইলে লজ্জার কোনকারণ নাই এবং তাহার জন্য একসমাজ অন্য সমাজকে দোষী ভাবিতে পারেন না। সামাজিক আচার ব্যবহার বিভিন্ন সমাজে স্বতন্ত্র হইবেই সুতরাং একসমাজ তাহার নিজের আচরণকেই অভ্রান্ত ভাবিয়া অন্য সমাজের আচার ব্যবহারের নিন্দা করিতে পারেন না। এবং এই পরের মতকে অশ্রদ্ধার সহিত দেখার জন্যই অকারণ বিবাদ বিসংবাদ বাধিয়া উভয় সমাজকেই দুর্ব্বল করিয়া ফেলে—ভাল যে কোন সমাজই ভাল। মুসলমান সমাজেও লজ্জাশীলতার অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় হিন্দুসমাজ নারীর অবগুণ্ঠন প্রথামত তাঁহাদের ও নারীদের মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত থাকে। Letului মতে এই প্রথা মুসলমান সমাজের সৃষ্ট নহে—মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারের পূর্ব্বে আরব দেশে উহা প্রচলিত ছিল তবে উহার আদি উদ্দেশ্য উপদেবতার কুদৃষ্টি হইতে সুন্দর মুখের রক্ষা এক্ষণে উহা আবার অপদেবতার কুদৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার্থ ব্যবহার হয়। এই অবগুণ্ঠনের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি ও তর্ক উঠিয়াছে কিন্তু তাহাতেও উহা আজও উঠিয়া যায় নাই অনেকে বলেন যে মুসলমানদের আমল থেকে বঙ্গনারীদের মধ্যে গুণ্ঠনপ্রথা চলিত হয় এটা কতদূর সত্য জানি না—তবে অবগুণ্ঠনের আবশ্যকতা যখন হইয়াছে তখন ইহা চলিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয় তবে সে কোন সময় তাহা ঐতিহাসিকগণের বিচার্য্য। লজ্জাসম্বন্ধে Westermenck বলেন "That ornament and clothing are in large pant due to the desire to give not concealment but prominence, to the sexual organs and that modesty is a result rather a cause of the use of clothes" এ উক্তিটী সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও অনেকাংশে সত্য তাহা অলঙ্কারের বিন্যাস দেখিলে বুঝাযায় নিতম্বে চন্দ্রহার, বেল্ট, গোট প্রভৃতি অলঙ্কার ঐ অঙ্গকে প্রচ্ছন্ন না করিয়া প্রকট করে বক্ষে দর্শনীয় বেশের জন্য কাঁচুলী পাশ্চাত্যদেশের corset প্রাকান্তে বলয় এসমস্ত যৌনভাবোদ্দীপক। নগ্নদেহ এদেশ বাসীর পক্ষে বিরক্তিজনক এবং ঘৃণোৎপাদক এই বিরক্তি উৎপাদন জনিত ভয়ই লজ্জা এইজন্য দেহ ও যৌনভাব প্রকাশক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রচ্ছন্নরাখার রীতিই প্রচলিত এবং এই আচ্ছাদন বঞ্চিত হওয়া বড় লজ্জার বিষয় হয়। পাশ্চাত্য দেশে ও নগ্নতা লজ্জার বিষয় তবে সেটা নগ্নতার জন্য নহে ভোগের দেশের অধিবাসীগণ নগ্নদেহে কদর্য্যতা দেখিতে পাননা বা তাহা তাঁহাদের বিরক্তি উৎপাদন করেনা এসম্বন্ধে Havelock Ellis বলেন "when a civilised European woman is naked in the presence of others her fundamental feeling seems usually to be not I am ashamed because I am naked but "I am ashamed because I am unadorned" She feels not that she is revealing her beauty, but that she is revealing herself deprived of her weapons of seduction" ইহার উপর টিকা অনাবশ্যক। এই আচরণপদ্ধতিই নারী স্বাধীনতার বিষম অনিষ্ট করিয়াছে কারণ ইহাই নারীকে পুরুষের সম্পত্তিরূপে ক্রমে ক্রমে দাঁড় করিয়াছে অসভ্যসমাজে নারীর যে অধিকার ক্ষমতা এমনকি স্বামী নির্ব্বাচন অধিকার দিয়াছিল সভ্যতার আবির্ভাবে তাহা আবার লুপ্ত হইয়াছে Wurtz Schutz Letourneau, Diderot প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে স্বামীর সন্দেহ ও ঈর্ষা হইতেই নারীর দেহ আবরণের সূত্রপাত হয়—বস্ত্র প্রচারের প্রচলনের ইহাই মূল। অনেকদেশে বয়স্কা নারীরা বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত বস্ত্রহীন ভাবে বিচরণ করে কিন্তু বিবাহের পর হইতেই বস্ত্রব্যবহার অপরিহার্য্য হয়—অনেকদেশে সতীধর্ম্ম বিবাহের পর হইতেই পালনীয় কিন্তু তৎপূর্ব্বে নহে—অনূঢ়াকালে সহবাস দোষে ঐ সমস্ত দেশে সতীধর্ম্মে আঘাত লাগেনা। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে নারী বিবাহের পর যখন সে পুরুষের সম্পত্তিরূপে গণ্য হয় তখন ঐ সতীত্ব রক্ষার জন্য সে বস্ত্র ব্যবহার করে অর্থাৎ লজ্জাশীলা হয়। নারীর লজ্জা সতী ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিহ্ন সুতরাং যে সমস্ত দেশে নারীরা সতী ধর্ম্মকে প্রাধান্য দেন তাঁহারা স্বভাবতঃই লজ্জাবতী হয়েন। পুরুষের প্রলোভন বা উচ্ছ্বাস প্রভৃতি হইতে আত্মরক্ষা করা ও লজ্জার একটী উদ্দেশ্য—সভ্যতার সঙ্গে এই লজ্জার প্রাদুর্ভাব বেশী হইতে থাকে ১৭শ শতাব্দীর ফরাসী সমাজ

[illegible] শতাব্দীর ইংরাজ সমাজে লজ্জার খুব প্রাধান্য ছিল—[illegible] সাহিত্যের মধ্যেও লজ্জার প্রাধান্য ছিল আধুনিক [illegible] সাহিত্যে অতি সভ্যতার ফলজাত যে সমস্ত ব্যাপার [illegible] হয় দুই শতাব্দী পূর্বে তদ্রূপ লেখা চলিত না। এই পরিবর্তন বাংলার সাহিত্যে ও দেখা যায় যেরূপ চরিত্র অঙ্কণ করিতে স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর লেখনী নিবৃত্ত হইয়াছে তাহাপেক্ষা অনেক কদর্য্য চরিত্র আধুনিক উপন্যাসিকগণের লেখনী নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করিতেছে—ইহাও যে পাশ্চাত্যের প্রভাবজাত তাহা বলা বাহুল্য ভারত চন্দ্রের রচনা ও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট ছিল কিন্তু তাহা অশ্লীল বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল এবং কোথাও সেই অশ্লীল ভাবটাকে ভাষার ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে প্রচ্ছন্ন করা হয় নাই—আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ তদ্রূপ অশ্লীল ব্যাপারই বর্ণনা করিয়াছেন তবে সেটা সভ্যভব্য মার্জ্জিত ভাষায় করিয়া—তাহা অনেকটা Suggestive—অর্থাৎ পুস্তকে যে ব্যাপারটুকু ইঙ্গিতে ব্যক্ত থাকে পাঠকের মন বাকীটুকু কল্পনা করিয়া লয়—বলা বাহুল্য যে ইহাতে পাঠকের মন আরও বেশী পরিমাণে কলুষিত হইয়া থাকে। শ্লীলতার (decency) উৎপত্তি ও লজ্জা হইতে—প্রত্যেক সমাজে নর নারীর কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া যে আচার ব্যবহার পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাই এ সম্বন্ধে শ্লীলতার পরিচায়ক। ইহা দ্বারাই আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান বিজ্ঞাপ্ত হয়। অতি সভ্যতার ফলে অনেক লজ্জার ব্যাপার আজকাল সমাজে চলিত হইতেছে তাহার কারণ মানুষের জ্ঞান যত উৎকর্ষ হইতে থাকে ততই তাহার বিবক্তির কারণ থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার প্রাধান্যও কমিতে থাকে Richet বলেন "Disgust is a sort of synthesis which attaches to the total form of objects and which must diminish and disappear as scientific analysis separates in to parts what as a whole is so repugnant" ইহার উদাহরণ স্বরূপ ডাক্তারদের কথা বলা যাইতে পারে—আজ যে পুরুষ বা যে নারী—ডাক্তার বা ধাত্রী হইয়া যৌন [illegible] সম্বন্ধে লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন না—ঐ জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে যখন তাঁহারা স্কুল কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন তাঁহারা ঐ সব ব্যাপার তত অসঙ্কোচে বলিতে পারিতেন না। এ সম্বন্ধে Havelock Ellis বলেন "In the same way the social Economic factor of modesty belongs to a stage of Human development which is wholly alien to an advanced civilisation Even the most fundamental impulse of all the gesture of sexual refusal is normally only imperative among animal and savages Thus civilisation tends to subordinate if not to minimise modesty to render it a grace of life rather than a fundamental social law of life But an essential grace of life it still remain and whatever delicate variation it may assume we can scarcely conceive of its disappearance. Evolution of modesty (Psychology of Sex) P. 49 1900 Ed বিলাতে স্ত্রী লাভ বা বিবাহ বন্ধন তুলিয়া দিবার জন্য অর্থাৎ নারী পুরুষের স্বাধীন ইচ্ছামত যৌন সম্মিলনের যে একটা আন্দোলন চলিতেছে তাহাও এই অতি সভ্যতার ফল—তবে তাহার ভবিষ্যৎ কি ও তাহা সমাজ বন্ধনকে চূর্ণ করিয়া একটা ভীষণ পাশবিক প্রবৃত্তি ও ভোগের আবর্ত্ত সৃষ্টি করিবে কিনা তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ প্রণিধান করিবেন। ভারতের পুরাতন সভ্যতা বিশেষতঃ বাঙ্গালায় হিন্দুর নিজস্ব সভ্যতা ও যেকালে এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তিজনক সভ্যতার অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইবে না তাহাও বলা যায় না—পাশ্চত্য সভ্যতার মোহে আকৃষ্ট পাশ্চত্য শিক্ষিত নরনারী অন্ধের মতন এই দানবের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া কোথায় ভবিষ্যতের কোন অন্ধতমসাচ্ছন্ন গহ্বরে গিয়া পড়িবে তাহা জানেন অন্তর্যামী।

পুরুষ

মহাত্মা গন্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সার সঙ্কলন

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এস-সি

স্বার্থের দ্বন্দ্ব

যাহা আশা করা যাইতেছিল তাহাই ঘটিয়াছে। ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি আমাদের জন্য বড় লাটের বোমার পূর্ব্বাভাস দিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালার এবং পাঞ্জাবের নানাক্ষেত্রে ভারতের উপর হিন্দু নববর্ষের উপহার। এ অবস্থায় আমাদের আশ্চর্য্য বা ভীত হওয়া উচিত নয়। রোলাট আইন মৃত বটে কিন্তু যে ভাব হইতে তাহার উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা এখনো তেমান জীবন্তই আছে। ইংরেজদের স্বার্থ যতদিন ভারতীয়ের স্বার্থের বিরুদ্ধাচারী ততদিন রাজদ্রোহের অপরাধ অথবা তাহার ভীতি থাকিবে এবং উত্তরে রোলাট আইনেরও নূতন সংস্করণ আসিবে। অহিংস অ-সহযোগই ছিল পথ। কিন্তু ইহা বেশী দূর ও বেশী দিন পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিবার ধৈর্য্য আমাদের ছিল না। ইংরেজের স্বার্থ ভারতীয়ের স্বার্থের বিরোধী কি করিয়া তাহা দেখা যাক্। ভারতের আর্থিক উন্নতির মহা অন্তরায় ল্যাঙ্কাশয়ারের কলগুলি। ল্যাঙ্কাশয়ার বা অপর কোন ভিন্ন দেশের এক গজ কাপড়ও না লওয়া ভারতের মহা স্বার্থের কাজ। কিন্তু এই নীতিহীন ব্যবসায় ল্যাঙ্কাশয়ারের কলওয়ালারাও স্বেচ্ছায় বা বিনা দ্বন্দ্বে ছাড়িবে না। আমি এই ব্যবসায়কে দুর্নীতি বলি কারণ ইহা ভারতীয় কৃষককুল ধ্বংশ করিয়াছে এবং তাহাদের অনাহারের মুখে লইয়া গিয়াছে। ভারত তাহার জন্যই বিরাট মাহিয়ানার ইংরেজ সিভিলসার্ভিস পোষণ করিতেছে। এই সার্ভিস যত কর্ম্মকুশলই হোক না কেন ভারতের স্বার্থের জন্য ইহার বদলে ভারতীয় হইবে তা যত অকুশলই হোক না কেন। ধার করা ফুস ফুস লইয়া মানুষ নিশ্বাস ফেলিতে পারে না। ইংরেজ সৈন্যদের যুদ্ধ শিক্ষার স্থান জোগায় ভারতবর্ষ—এই সামরিক বাজেটে অর্থ জোগাইতে ট্যাক্সের ভারে ভারতের মুখে রক্ত উঠিতেছে। ভারতের অর্দ্ধেক রাজস্বের বেশী শোষণ করিতেছে এই সামরিক বাজেট। আত্মরক্ষা করাও ভারতের দরকার তাহাও তাহার স্বার্থ, যদিও এখনকার মত তেমন মন দিয়া কেহ ইহা দেখিতেছে না। বাহিরে বা ভিতরে আত্মরক্ষার জন্য তাহার বাহিরের অধীনতা লইয়া থাকা—তা যতই কর্ম্মদক্ষতা আর শুভ ইচ্ছা থাকুক না কেন, ইহাতে ভারতকে তাহার বারো আনা মনুষ্যত্ব হারাইতে হয়।

ঠিক কাজ করিবার সুবিধা ইংরেজদেরই আছে বেশী। কারণ তাহারা শাসক জাতি। যাহারা সিভিল সার্ভিসে নাই—তেমন বহু সংখ্যক ইংরেজ নরনারীর বৃটিশ প্রাধান্যের বিষময় ফল বোঝা উচিত। তথাকথিত বৃটিশ মৈত্রী স্বাধীনতা বঞ্চিত রাখা এবং নিত্য বর্দ্ধমান দারিদ্র্যের ক্ষতিপূরক নহে। বড়লাটের নানা যুক্তি সত্ত্বেও আমি সবিনয়ে জানাইতেছি যে তাঁহার যথেচ্ছ পন্থা অবলম্বনের কোন হেতু তিনি দেখাইতে পারেন নাই।

অত্যাচারকে সর্ব্বপ্রকারে শাস্তি দেওয়া হোক। আমি রাজদ্রোহের পোষক নহি। আমি জানি ইহা দেশের কোন উপকার করিতে পারে না। কিন্তু অপরাধ যাহা করা হইয়াছে কিম্বা করিবার চেষ্টা হইয়াছে তাহাকে শাস্তি দেওয়া এক কথা—আর কেবল সন্দেহের বশেই কর্ত্তৃপক্ষকে গ্রেপ্তার করিবার যথেচ্ছ ক্ষমতা দেওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। এখন যাহাদের সন্দেহ করা হইয়াছে তাহাদেরই ভীতি প্রদর্শন চলিয়াছে। অতীতের অভিজ্ঞতায়

যায় গবর্ণমেণ্ট ভয়ের বশীভূত হইলে দোষী অপেক্ষা াষই শাস্তি পায়। ১৯১৮ অব্দে পঞ্জাবে যাহাদের ন্ত হয়—তাহাদের অনেকেই কি অপরাধে শাস্তি হইল া জানিত না। কোন গবর্ণমেণ্ট যখন যথেচ্ছ ক্ষমতা াইতে চান তখন সত্যই বোঝা যায় যে তাহার সঙ্গে ক মত নাই।

দেশবন্ধু দাশ বাংলা কৌন্সিলে তাঁহার কার্য্য দ্বারা াইয়াছেন যে লোক মত বাংলা সরকারের সহিত নাই। ন্তি প্রদর্শনের একটা পন্থা তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন কথার কোন মূল্য নাই। এ অভিযোগ সমর্থন করিতে .র এমন কোন সাক্ষ্য নাই। ভয় দেখাইয়া জননির্ব্বাচনে া হওয়া যায় না কিম্বা কোন বড় দলও সঙ্ঘবদ্ধ রাখা । না। দেশবন্ধুর মধ্যে এমন কিছু প্রশংসনীয় আছে াঁতে তিনি অত বড় দলের অবিসম্বাদী নেতা হইতে রিয়াছেন। কারণ সহজেই বোঝা যায়। তিনি জন-ধারণের জন্য ক্ষমতা চাহেন। তিনি শাসকদের নিকট জানু হন না। তিনি তিনটি ভার হইতে বাংলা তথা রতকে মুক্ত করিতে চাহেন। অন্য সুরে তিনি গাহিলে—নসাধারণের জন্য স্বাধীনতা না চাহিলে যে ভীতি প্রদর্শন হার উপর আরোপ করা হইয়াছে তাহা সত্বেও তিনি জ প্রভাব হারাইবেন। দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার মতানৈক্য াছে—কিন্তু তাই আমি তাঁহার অনন্ত দেশভক্তি ও স্বার্থ াগ সম্বন্ধে অন্ধ নহি। দেশভক্তিতে তিনি কাহারও অপেক্ষা ম নহেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ লোকদের তাঁহার কেট হইতে ছিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই াজে প্রতিষ্ঠাবান, সাধারণে তাঁহাদের বিশ্বাস করেন। প্রকাশ্য আদালতে তাঁহাদের ন্যায় বিচার উচিত নহে কি? অতিরিক্ত ক্ষমতার এরূপ লোকদের গ্রেপ্তার করায় বর্ত্তমান শাসন প্রথারই নিন্দা করা হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে মুষ্টিমেয় জন কয়েকের বেয়নেট, গোলা বারুদ ও যথেচ্ছ ক্ষমতার বলে বাস করা অন্যায়—অসভ্যতা মূলক। তাহাদের অপেক্ষা বেশী সংখ্যক জনসমাজের উপর তাহাদের কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতা আছে ইহাতে তাহাও যেমন দেখান হয় আবার ক্ষীণ সভ্যতার আবরণের নীচে কতটা বর্ব্বরতা তাহাও ইহাতে তেমনি দেখান হয়।

যে সব বাঙ্গালী এই সঙ্কটে পড়িয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আমার সসম্মান নিবেদন—যদি আপনারা নির্দ্দোষ হন আমি আপনাদের অনেককেই তাই ভাবি তবে এই নিগ্রহে দেশের ও আপনাদের মঙ্গলই হইবে। অবশ্য যদি আপনারা ইহা ঠিকভাবে গ্রহণ করেন। নিগ্রহ ভিন্ন স্বাধীনতা লাভ আমরা করিতে পারিব না। যদি কেহ অত্যাচার ও রাজদ্রোহে সত্য বিশ্বাসী থাকেন তাহাদের প্রতি আমার নিবেদন তোমাদের দেশ প্রীতি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে কিন্তু ইহা অন্ধ ভালবাসা। আমার মতে ভারতের স্বাধীনতা অত্যাচারে অর্জ্জিত হইবে না। প্রতিহিংসা বর্জ্জিত কষ্ট ভোগেই ইহা অর্জ্জিত হইবে। ইহাই নিশ্চিত ও ধ্রুব উপায়, কিন্তু তবু যদি অত্যাচারেই তাহাদের মতি হয় তবে সাহসীভাবে স্বীকার করুন এবং সাহসীর মত মৃত্যু পর্য্যন্ত নির্য্যাতন সহ্য করুন। তাহাতে তোমাদেরও সাহস সাধুতা দেখান হইবে বহু নির্দ্দোষ নির্য্যাতন হইতে বাঁচিবে।
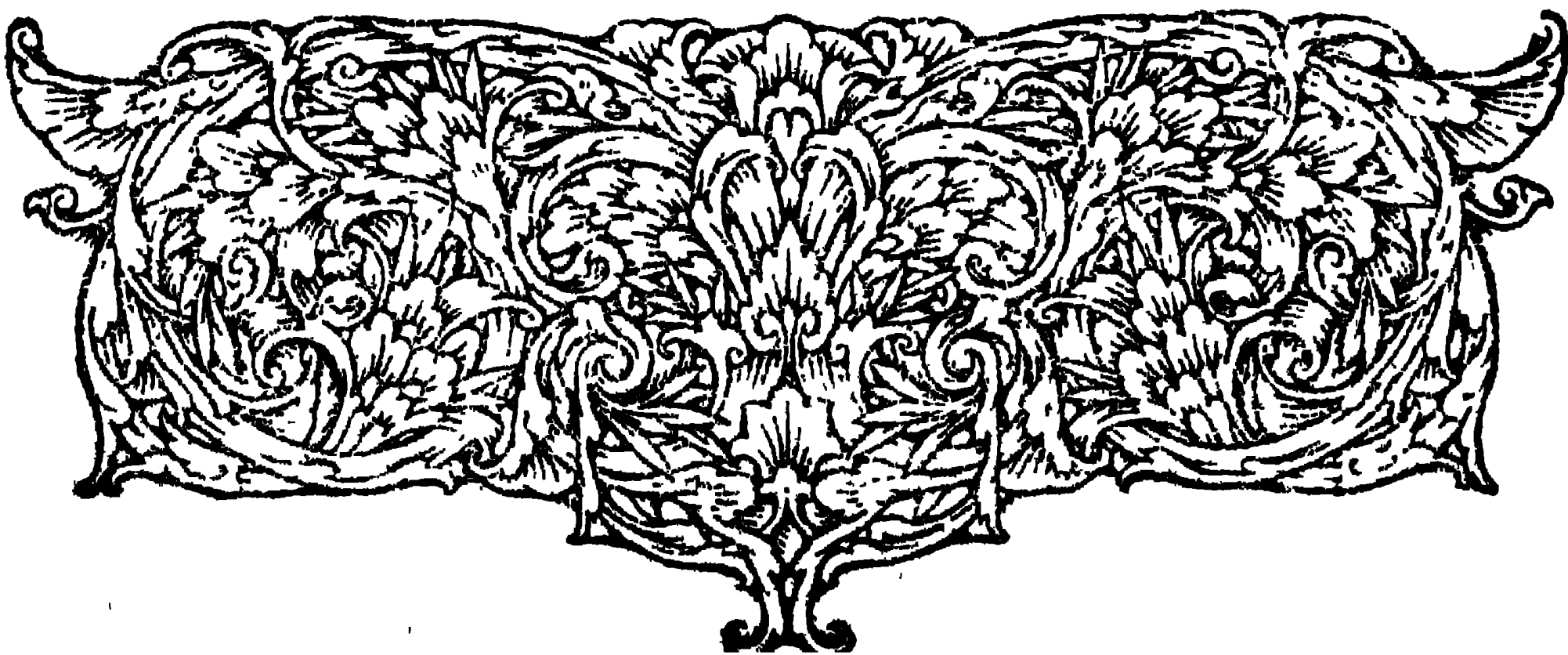
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বাঙ্গালীর জীবনকথা

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমভাগে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের কার্য্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে তখনকার সমাজের সামাজিক আচার ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই সমস্ত আচার ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ দৃষ্ট হয়। আজ যাহা সদাচার বলিয়া সমাজে আদৃত ছিল, কালক্রমে তাহাই রূপান্তরিত হইয়া বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছিল। সকল দেশের সামাজিক আচার ব্যবহারে এই প্রথা দৃষ্ট হয়। কাল মাহাত্ম্যে ইহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, নচেৎ সমাজের শৃঙ্খলা থাকে না। ধর্ম্মের সহিত সমাজের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এক যুগে যে সমস্ত আচার ব্যবহার, রীতিনীতি সমাজের পক্ষে হিতকর, অন্যযুগে তাহা সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর। এইজন্য সামাজিক রীতি নীতি সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, নচেৎ সমাজের ভদ্রস্থতা থাকে না। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন ;—

> যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮
>
> শ্রীমদ্ভাগবত গীতা—৪র্থ অঃ।

হে ভারত, যখন যখনই ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হই। সাধুবৃত্তি সংরক্ষার জন্য, দুষ্কর্ম্ম নাশের জন্য এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ (প্রকাশিত) হই।

তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়া সামাজিক ময়লা মাটি বিদূরিত করিয়া সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছেন। সেই জন্যই আমরা বৈদিক যুগে একরূপ, পৌরাণিক যুগে অন্যরূপ, তৎপরে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রাধান্যের যুগে অন্যরূপ—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপ সামাজিক নিয়মকানুন দেখিতে পাই।

আমরা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে যে সমস্ত হিন্দু আচার-ব্যবহারের আলোচনা করিব, তাহাকে চারিটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা :—

১ম—বৌদ্ধযুগ।
২য়—গৌড়ীয় যুগ।
৩য়—বৈষ্ণব যুগ।
৪র্থ—কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ।

এই চারি যুগের সামাজিক আচার-ব্যবহার কতকটা ভিন্ন ভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়। আমরা একে একে তৎ সমুদয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমতঃ বৌদ্ধযুগের আচার-ব্যবহার

আর্য্য সভ্যতার প্রারম্ভ হইতে মহাত্মা শাক্যসিংহের ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। শাক্য মুনির আবির্ভাবে ধর্ম্ম-জগতে এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল। তিনি পূজা ও যজ্ঞ পশুহিংসা নিষেধ করিলেন এবং প্রত্যেক মানবকেই জগতের হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের ৫০৭ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হন। তিনি অশীতি (৮০) বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার জীবৎকালে যদিও সমগ্র ভারত তদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, কিন্তু তিনি যে 'সঙ্ঘ' অর্থাৎ প্রচার সমিতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে বুদ্ধধর্ম্মের বহু উন্নতি হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের ২৫০ বৎসর পরে মহারাজ অশোক ভারত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি ঐ ধর্ম্ম পরিগ্রহ করায় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম 'রাজকীয় ধর্ম্ম' বলিয়া পরিগণিত হয়।

মহারাজ অশোকের সময় হইতে বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। পরবর্ত্তী কালে নানা কারণে ইহা বিকৃত হইয়া 'নষ্টজ্ঞান' আখ্যায় অভিহিত হয়। এই সময়ে দেশের সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়া যায়; বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে জাতি মধ্যে উচ্চনীচভেদ একেবারে তিরোহিত হয় এবং বেদ পুরাণোক্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সমধিক অবনতি দৃষ্ট হয়।

এই সময়ে রচিত মাণিকচাঁদের গানে দেখা যায়, বৌদ্ধযুগে রাজারা সোণার খাটে বসিয়া রূপার খাটে পদস্থাপন ও স্বর্ণথালে ৫০ ব্যঞ্জনসহ অন্ন আহার করিতেন। 'হিঙ্গুল কম্বল' 'দন্তপাখা' ও 'পাটের সাড়ী' বিলাসের দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। বংশ হুরির গুয়া খাইয়া দন্ত শুভ্র হইয়াছে বলিয়া গোপীচন্দ্র স্ত্রীর মুখের প্রশংসা করিতেছেন।

মাণিকচাঁদের গানে এবং ডাক ও খনা'র বচনে দৃষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকগণও কৃষিকর্ম্ম করিতেন এবং স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত অক্ষক্রীড়াসক্তা ছিলেন। স্ত্রীলোকগণের অক্ষক্রীড়াশক্তি কবিকঙ্কণের সময়েও বিদ্যমান ছিল।

সন্তান ভূমিষ্ট হইলে সাত দিন পরে 'সাদিনা' দশদিন পরে 'দশা' ত্রিশদিন পরে 'ত্রিশা' নামক উৎসব হইত।

শূন্যপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি নানারূপ ধান্যের ভাণ্ডার স্বরূপ ছিল। (১) কৃষকগণ তাহাদিগকে আদর করিয়া 'খেজুরছড়া' 'মহীপাল' 'মাধবলতা 'মুক্তাহার' সোণাথড়কি প্রভৃতি নামে অভিহিত করিত।

(১) বহু গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু (দেশজ শব্দাদি সম্বলিত) অভিধানে এদেশ উৎপন্ন ধান্যের নামের অনেক পরিচয় পওয়া যায়। কেবল তাহাই নহে, প্রাচীন সাহিত্য আলোচনায় বিভিন্ন বাক্যের উৎপত্তি ও অর্থজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে। আমরা এই প্রবন্ধে প্রাচীন সাহিত্যোদ্ধৃত বাক্যের অর্থজ্ঞান জন্য উক্ত গ্রন্থখানির সাহায্যে গ্রহণ করিতে পাঠককে অনুরোধ করি। কালক্রমে যখন মহাত্মা শঙ্কর আবির্ভূত হন, তখন বৌদ্ধধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অবস্থা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল। জৈনদিগের অবস্থাও তদ্রূপ। দক্ষিণাপথে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও তন্ত্রিকেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। কাপালিকগণ নানাবিধ অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক অশিক্ষিত লোকদিগকে বশ করিয়া নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছিল। ইহাদ্বারা বৈদিক আচার সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট ও নানা কুৎসিত আচারের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন পূর্ব্বক সমগ্র ভারতবর্ষকে অদ্বৈতবাদের সুশীতল ছায়ায় সমবেত করাই শঙ্করের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ঐ উদ্দেশ্যে তিনি [illegible] সংশোধনও করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই [illegible] শঙ্করের [illegible] মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য [illegible] নানা জনপদে গমন পূর্ব্বক তত্তৎস্থানের বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সেইসকল দেশে অদ্বৈত বিদ্যার সমুজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করেন। তিনি নানা দেশে বৌদ্ধগণের পরাজয় ও অদ্বৈত মত প্রতিষ্ঠিত হইলে বঙ্গ দেশে আগমন করেন। তখন বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রচার। প্রতিগ্রামে ও প্রতিনগরে বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধমঠ বিরাজিত। তিনি বঙ্গদেশে কয়েকদিন অবস্থান পূর্ব্বক অদ্বৈতমতের কীর্ত্তি পতাকা প্রোথিত করিয়া ভাগীরথী প্রবাহ পরিপূত গৌড়দেশে উপনীত হন। এইরূপে মহাত্মা শঙ্করের বিদ্যাপ্রভাবে বঙ্গদেশ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হইতে উদ্ধার লাভ করিলেও এখনও পর্য্যন্ত আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের ক্ষীণস্মৃতি ধর্ম্মপূজার প্রচলন বঙ্গের স্থানে স্থানে দেখিতে পাইতেছি। এইপূজায় ডোম, হাড়ি বা বাইতি জাতি পৌরোহিত্য করে। ইহাদিগকে আমরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া মনে করে।

(২) বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বে 'ময়নাপুর' নামক গ্রামে যাত্রাসিদ্ধি নামক ধর্ম্মঠাকুর বিরাজমান। (ব, সা, পরিষদ সংস্করণ শূণ্যপুরাণ মুখবন্ধ)

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী রাণাঘাট মহকুমার অধীন 'কায়েতপাড়া' গ্রামের কার্ত্তিকী সংক্রান্তির দিন ধর্ম্মের গাজন বা চড়কপ্রসঙ্গ শুনিয়াছি, পূর্ব্বে এখানে শূকর বলি হইত। এখন এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

হুগলী জেলায় বলাগড় থানার অধীন 'নাটাগড়' গ্রামে বুগীজাতির বাটী, তিলডাঙ্গা গ্রামে ডোম বাটী, মুগুখোলা গ্রামে এবং গুড়োপ গ্রামে জেলিয়া বাটী, এবং পারুল গ্রামে জেলিয়া বাটী ধর্ম্মরাজ ঠাকুর আছেন।

২য়—গৌড়ীয় যুগের আচার-ব্যবহার

অতঃপর হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী গৌড়েশ্বর মহারাজ আদিশূর বাঙ্গালাদেশকে পূর্ব্বোক্ত ভয়ঙ্কর অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন। তিনি কান্যকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দর নামক পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আসিয়া এদেশের নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি সাধনে চেষ্টা করেন। এই পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন অনুচর আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের আদি পুরুষ। কালক্রমে আদিশূরবংশীয় নৃপতিগণের পরাক্রম খর্ব্ব হইলে পালবংশীয়েরা প্রবল হইয়া উঠেন। ইহার কিছুদিন পরেই সেনরাজগণের অভ্যুদয়। এই সেনবংশীয় সুবিখ্যাত বল্লাল সেন নবদ্বীপে রীতিমত রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বংশাবলী বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ায় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই আচার ব্যবহার কলুষিত হইয়া পড়ে।

বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময়ে এদেশে স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যাভিচার প্রভৃতি দ্বারা সমাজ বন্ধন অতিশয় শিথিল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। বামাচারী বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ যে সমস্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা নীতি ও ধর্ম্ম বিধ্বংসী। এইকালে ভৈরবীচক্র প্রভৃতি দ্বারা পুরুষ ও রমণীগণ নৈতিক আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অপরদিকে তান্ত্রিকগণের খাদ্যদ্রব্যের কিছুমাত্র বিচার ছিল না। তাহারা গলিত জীবের মাংস, মদ্য মূত্রাদি পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না। বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে এইরূপ তান্ত্রিক দীক্ষা প্রচারিত হইয়া সমাজকে বিভৎস করিয়া তুলিয়াছিল হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে সর্ব্ববিষয়ে এতদ্রূপ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। ব্যাভিচারের সংশোধন জন্য যে সংস্কার কার্য্য আরব্ধ হইল, তাহাতে আচারই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিল। হিন্দু সমাজে এখনও খাদ্যাখাদ্যের যে আঁটাআঁটি ও নিত্য নৈমিত্তিক নিয়মের প্রতি একাগ্রনিষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তাহা বৌদ্ধযুগের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিক্রিয়া। এ সময়ে আচার অনেকটা গুণহীন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক সময়ে শিথিল সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন জন্য আচার বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যা, বিনয়, যশঃ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ গুণের অগ্রে বল্লাল সেন এই আচারের স্থান দিয়াছিলেন। কৌলিন্যের ইহাই প্রথম গুণ। এই আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্থাপন জন্য যে সময়ে বিশৃঙ্খল সমাজ পুনঃ গঠনের প্রয়োজন হয়। সে কারণ, বল্লাল সেন পণ্ডিত মণ্ডলীর জ্ঞানী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধির জন্য 'কৌলিন্য মর্য্যাদা' সৃষ্টি করেন এবং আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ, দান এই নয়টী গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে 'কুলীন' আখ্যা প্রদান করেন। যদি পঞ্চ ব্রাহ্মণের বর্ত্তমান বংশাবলী এই সময়ে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে বিস্তীর্ণ হওয়ায় তাহাদের সমষ্টি গ্রহণ করিয়া মোট ৫৬ গ্রামে বাস করিতে দেখা যায়। এই সকল গ্রামের নাম হইতে বিভিন্ন গাঁইয়ের (গ্রামীন) সৃষ্টি হয় এবং বল্লালের পুত্র লক্ষণ সেন কর্ত্তৃক কায়স্থ-সমাজে 'পর্য্যায়' নির্দ্দিষ্ট হইয়া সমপর্য্যায়ে বিবাহাদি নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়।

মহারাজ আদিশূর, বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেন প্রভৃতি খাটি বাঙ্গালী রাজার অধীনে দেশে সংস্কৃত কাব্যাদি, দর্শন, স্মৃতি ও জ্যোতিষাদি নানা শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হয় এবং তৎ সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়।

১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে গৌড়ে মুসলমান প্রভাব কালের আরম্ভ। এই সময় হইতে মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত মুসলমান-গণের সংস্পর্শে ও অত্যাচারে হিন্দুর সমাজ বন্ধন শিথিল হইয়া আইসে। এই সময় হইতেই বহু হিন্দু নিদারুণ অত্যাচারে অনিচ্ছায় মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। এই অত্যাচার সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার বহু ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন।

চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, বিজয় গুপ্তের পদ্ম পুরাণ, সীতারাম দাসের মনসামঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থেও ইহার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, অনাবশ্যক বোধে তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না।

যাহা হউক এই সময়ের লিখিত কাব্যাদিতে তৎকাল প্রচলিত রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের অনেক আভাস পাওয়া যায়। এই সময়ে দেশের লোককে ডিঙ্গা সাজাইয়া বহুবিধ বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে দেখা যায়। ব্যবসাদিতে বট, বুড়ি, কাহন প্রভৃতি সংখ্যাক, কড়ির দ্বারা বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল।

এই সময়ে জ্যোতিঃশাস্ত্রে লোকের অকৃত্রিম বিশ্বাস দেখা যায়। এমন কি হাচি-টিকটিকী, কাক শৃগাল প্রভৃতির শব্দানুযায়ী শুভাশুভ নির্দ্দিষ্ট হইত। হিন্দুর ভূমিষ্ঠকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিষয়ের গণনার উপর শুভাশুভ নির্দ্দিষ্ট হইত। এখনও পর্য্যন্ত সেই প্রথা অক্ষুণ্ণ আছে।

চৈতন্য ভাগবতে জ্যোতির্ব্বিদ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিষ্ট হইবার পর তাঁহার কোষ্ঠী গণনা করিয়া যে ফল নির্ণয় করিয়াছেন,

"এনন্দন যার তারে রহুক প্রণাম।
হেন কোষ্ঠী গণিলাম আমি ভাগ্যবান্॥"

* * * *

"দিব্য কোষ্ঠী শুনি যত বান্ধব সকল।
জয় জয় দিয়া সবে করেন মঙ্গল॥"

আমরা রামায়ণ রচনার কাল হইতে এই প্রথার বিশেষ সমাদর দেখিতে পাই। এক্ষণে আমরা রামায়ণ ও মহাভারত রচনাকালে বঙ্গের সামাজিক আচার-ব্যবহার কিরূপ ছিল, সংক্ষেপে তাহা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব।

অভিনয় ও অভিনেতা

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধুনা অভিনয় প্রথা সম্বন্ধে মত বিরোধের আবির্ভাব হইয়াছে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণ অভিনয়ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া অবধি তাঁহারা পূর্ব্বকালের প্রথা হইতে যতদূর সম্ভব দূরে দাঁড়াইয়া নূতন প্রণালীতে অভিনয় করিতেছেন—তাঁহাদের এই নূতনত্ব দেখিয়া তাঁহাদের ভক্তবৃন্দ অতীতযুগের অভিনয় প্রথার উপর বিশেষতঃ বর্ত্তমানে যে কয়জন অভিনেতা অতীত প্রথায় এখনও অভিনয় করেন তাঁহাদের কুৎসাকীর্ত্তনে শতমুখ হইয়াছেন। ভক্তি জিনিসটা পবিত্র ভাবসম্ভূত বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল কিন্তু ভক্তির আচরণে যে এত বিদ্বেষ প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে তাহা ধারণাতীত পূর্ব্বযুগের অভিনয়ে একটা বিশেষত্ব ছিল সেটা নাম লইবার চেষ্টার অভাব তখন সাধারণতঃ অভিনয় বিবরণীতে H.b.d.l. অভিনেতার নাম প্রকাশিত হইত না এটা মধ্যযুগে পরলোকগত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সময় প্রবর্ত্তিত হয় তাহার কারণ তিনি অভিনয় সম্বন্ধে বিদেশী পুস্তকাদি পাঠ করিতেন ও বিজ্ঞাপনের উপকারিতা বেশী বুঝিতেন। বং বের যে বিজ্ঞাপন রঞ্জিত প্লাকার্ডে সহর ছাইয়া ফেলা তাঁহার সময় প্রবর্ত্তিত হয় এবং অধুনা উহার যতদূর অপব্যবহার সম্ভব তাহা হইতেছে। তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া তৎকালীন ষ্টার ও মিনার্ভা এমন কি সেকেলে বেঙ্গল থিয়েটারকেও এইরূপ নাম ছাপান সুরু করিতে হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে এই সমস্ত রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নাম ছাপাইবার স্পৃহা এত বলবতী ছিলনা। উপরন্তু অভিনয় ব্যাপারটাকে সাধারণ দর্শকমণ্ডলির নিকট বিশেষ প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টাই থাকিত কোন অংশ বিশেষের অভিনেতার নাম জানিবার আবশ্যক হইলে কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট অনুসন্ধান না করিলে জানা যাইত না- তখন দর্শক 'অভিনয়' দেখিতে যাইতেন এবং অভিনেতারাও অভিনয় দেখাইয়া যশ লইবার চেষ্টা করিতেন কিন্তু নাম বাহির কারটা তখনও আবশ্যক হয় নাই। তখন অবশ্য অভিনেতাদের বেতন ও আধুনিক যুগের তুলনায় যৎসামান্য ছিল এই বেতন বৃদ্ধি করিবার পথ প্রদর্শক হইয়াছিলেন পূর্ব্বোক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার আমলেই অধিক বেতনের লোভ দেখাইয়া অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ভাঙানর প্রথা সাধারণ প্রবর্ত্তিত হয় এবং হ্যাণ্ডবিলে তাঁহাদের চিত্র মুদ্রণ আরম্ভ হয় এমন কি একটু নামজাদা অভিনেতা অভিনেত্রীর এক সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের যোগদান ব্যাপার প্লাকার্ড ঘোষিত হইতে থাকে ইহার পর দাদন দেওয়া বিধি প্রবর্ত্তিত হয় এবং ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধি পাইয়া লভ্যাংশ অধিকারী (Profitsharing) হিসাবে ও অভিনেতা নিযোগ আরম্ভ হয়। এই সমস্ত প্রবর্ত্তনের কারণ যে সুযোগ্য অভিনেতার অভাব তাহা ঠিক বলা যায় না বর এই Booming System বা ঢক্কানিনাদ প্রথাই ইহার জন্য মূলতঃ দায়ী বলা যাইতে পারে। আধুনিক যুগে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর জাহির করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। তখনকার যুগে সংবাদপত্রে অভিনয় আলোচনা যে না হইত তাহা নহে তবে যাহা হইত তাহা নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে এখনকার কাগজে যাহা দেখা যায় তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত তাহাতে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর আত্মপ্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই শ্রেণীর সমালোচনায় অভিনয় বা নাটকের সম্পূর্ণ পরিচয় পওয়া অসম্ভব তাহা যে তাহার ফলে প্রশংসা বা বিদ্বেষ ভরা তাহা নিঃসন্দেহ। ইহার ফল হইয়াছে এই যে এখন দর্শকগণ মতিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহাদের স্বাধীন বিচার করিবার স্পৃহা ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইয়া আসিতেছে তাঁহারা পরের মুখে ঝাল খাইয়া এখন সন্তুষ্ট থাকিতে চাহেন। সমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বাধীন বিচারের পথ প্রদর্শন—যুক্তি সহকারে বিচার ও মূল্য নির্দ্ধারণ এখনকার সমালোচনা সে পথ দিয়া যায় না। ইহার ফল রঙ্গালয়াধ্যক্ষদিগের পক্ষে আপাতঃ মধুর হইলেও ইহার পরিণাম তাঁহাদের পক্ষে শুভ জনক হইবে না।

কারণ তাঁহাদের হাঁড়ীর খবর আগেই হাটে ভাঙ্গা হইয়া গেল অভিনয় রজনীতে আর সে কৌতূহল জাগাইতে পারিবে না এবং ক্রমশঃ তাহা ঔদাসীন্যের সৃষ্টি করিবে এবং ফলে রঙ্গালয়ের ভাগ্যফল গিয়া দাঁড়াইবে সংবাদ পত্রের লেখনীর মুখে।

পূর্ব্ব যুগের অভিনেতাদের মধ্যে যেমন আত্ম প্রকাশ প্রবৃত্তি ছিল না বা কম ছিল এযুগের অভিনেতারা সেটা সুদ সমেত পোষাইয়া লইতেছেন এখনকার অভিনেতাদের প্রধান চিহ্ন হচ্চে কথায় কথায় বিলাতী অভিনয় সম্বন্ধীয় পুস্তক ও অভিনেতাদের মতামতের উল্লেখ—তাহাই যেন অকাট্য ধ্রুব সত্য—ইহাঁরা একটুও চিন্তা করিয়া দেখেন না যে একদেশ বাসীরা যে প্রকার আকার ইঙ্গিতে একটা ভাব প্রকাশ করেন সেটা সার্ব্বজনীন নহে অর্থাৎ অন্য দেশের অধিবাসীরা ঠিক তাহা অনুকরণ করেন না- পিতৃশোকের বা পতি শোকের সময় ভারতবাসী যে ভাব প্রকাশ করে ইংরাজের চক্ষে তাহা আতিশয্য বলিয়া বোধ হইবে আবার দম্পতীর প্রেমালাপের সময় ইংরাজ যাহা করেন ভারতবাসীর পক্ষ তাহা নির্ল্লজ্জ হইবে—স্ত্রীলোকের বিরক্তি ভাব প্রকাশ কালীন বিদেশী নারীরা যেমন অধিক মাত্রায় হাত পা নাড়েন—বাংলার নায়িকা মাত্র চোখের চাহনীতেই বা স্থল বিশেষে মুখ ঘুরাইয়া বা পরিশেষে নথ নাড়িয়া সেটুকু দেখান এইরূপ প্রত্যেক জাতির স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে একটা বিশিষ্টরূপ স্বাতন্ত্র্য আছে তাহা পরিবর্জ্জন করিয়া বায়স্কোপের অন্য দেশের অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অঙ্গভঙ্গী করাটা যে অস্বাভাবিক তাহা বলাই বাহুল্য তবে বর্ত্তমান অভিনয় পন্থা যে ক্রমশঃ এই নীতিতে পরিচালিত হইতেছে তাহা বুঝিতে বেশী কষ্ট হয় না—এবং দর্শক ও তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছে। এ মুগ্ধভাবের কারণ আছে সেটা হচ্ছে বৈচিত্র্য—নূতনত্বের মোহ বা আকর্ষণ তাহা হইতে এটা বোঝায় না যে পাশ্চাত্য অভিনয় প্রণালীর এ অনুকরণ এদেশীয় অভিনয় প্রথার চেয়ে উৎকৃষ্ট। বেশভূষার আড়ম্বর বর্জ্জিতা সুন্দরী পল্লীতে আকৃষ্ট না হইয়া অনেক মানুষ পোষাকে সাজান ও গহনায় মোড়া কুৎসিৎ বারনারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহা হইতে এটা অনুমান করা চলে না যে ঐ বারনারী ঐ কুলবধূ অপেক্ষা অধিক গুণবতী। তারপর গত ১৯ বৎসর হইতে এদেশের দর্শক ক্রমাগত চলচ্চিত্রের অভিনয় দেখিয়া দেখিয়া এমন অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহাদের চক্ষে অভিনয়েও ঐ সব আতিশয্য অত্যাবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে। চলচ্চিত্রের অভিনয় ভাব প্রকাশের প্রধান উপায় ভাষার সাহায্য পাইবার উপায় না থাকায় উহার অন্যতম উপায় আকার ইঙ্গিতের সাহায্যে সম্পন্ন করিতে হয় এবং ভাষার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য ঐ আকার ইঙ্গিতকে প্রাধান্য দিতে হয় ও স্থল বিশেষে উহার বিকৃতি করিয়াও প্রকাশ—চেষ্টা পূর্ণ করিতে হয়। পরে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার রহিল।

ষ্টার থিয়েটার—"ইরাণের রাণী"—গত বুধবারের অভিনয়ে একটু বিচিত্র্য ছিল শ্রীমতী সুবাসিনী অনুপস্থিত থাকায় গুলরুখের অংশ লইয়াছিলেন উদীয়মানা অভিনেত্রী শ্রীমতী নীহার—এবং এই অংশটীর অভিনয়ে তিনি বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাঁহার সম্মানার্থ কর্ত্তৃপক্ষেরা এতদিন পরে একটী বেশ সুদৃশ্য নূতন পোষাক পরাইয়া দিয়াছিলেন—যাহা লাভে পূর্ব্বের অভিনেত্রীরা বঞ্চিত ছিল—গানগুলি বেশ ভাব প্রবণ ভাবে গীত হইয়াছিল ও দর্শকবৃন্দের সম্পূর্ণ তৃপ্তি সাধনে সক্ষম হইয়াছিল। দাউদশার অংশে তিনকড়ি বাবুর অভিনয়ও বেশ সুন্দর হইয়াছিল—এমন কি সময়ে সময়ে যেন পরলোকগত অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় দেখিতেছি বলিয়া ভ্রম হইতেছে। অহীন্দ্র বাবু দারার অভিনয় মন্দ হয় নাই তবে তাহাতে আবৃত্তির চেয়ে আকার ইঙ্গিতের আধিক্য বড় বেশী ছিল বলিয়া তাহা সম্পূর্ণ সুন্দর হইতে পায় নাই।

ম্যাডান কোম্পানীর সাবিত্রী- কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে ইটালীর এই চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে তবে এ সেই মহাভারতের সাবিত্রী নহে এ সাবিত্রী সামান্য বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া নৃত্য করে—বাথিং সুট পরিয়া জলে সাঁতার কাটে—এ এক অদ্ভুত সাবিত্রী আখ্যানাংশও যতদূর কদর্য্যীকৃত করিতে পারা যায় তাহা করিয়া তৎসঙ্গে অতি অসম্ভব চিত্তোত্তেজক ঘটনা ও জমকাল দৃশ্য সন্নিবেশিত করিয়া ইহার director মহাশয় হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থের ও তদ্বর্ণিত চরিত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন—এই সমস্ত অর্ব্বাচীনের দৌরাত্ম্যে হিন্দুর ধর্ম্মভাব রক্ষা করা কঠিন হইবে—আর ধন্য নির্ল্লজ্জ বাঙ্গালী তোমাদের দেব দেবীর পুণ্য চরিত্রের এই অধোগতির চিত্রে ঘরের পয়সা ব্যয় করে তোমায় দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতেছে। বাঙালী নির্জ্জীব ধর্ম্মজ্ঞানহীন স্ফূর্ত্তিপ্রিয় তাই ম্যাডান কোম্পানী এই সব ব্যাপার এমন ভাবে চিত্রে দেখাইতে সাহস করিতেছেন কিন্তু এ সব যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ঘটিত ব্যাপার হইত তবে বোধহয় এ চিত্র আর তাঁহাদের প্রদর্শন করিতে হইত না। বাঙলা! চিরদিন ঘুমিয়ে মাথা নীচু করে অপমান সহ্য করছে—আত্মসম্মান জ্ঞান কত দিনে জাগবে—ব্যাধি বড় কঠিন—আরোগ্যের আশা আছে কি?

কাজের কথা

সর্ব্ববঙ্গব্যাপী হবতাল—

গত শনিবারেব হবতালে ফুটে উঠেছিল—আত্মসম্মান জ্ঞান বিশিষ্ট—রাজনৈতিক জীবনেব নব স্পন্দনে স্পন্দিত বাঙালী জাতিব দারুণ মনোবেদনা—বিরাগ—অভিমান। এই সংক্ষুব্ধ জাতিব মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের বার্ত্তা সাগব পাবে শ্বেতদ্বীপাধিপতির সিংহাসন প্রান্তে আজ পৌছিবে কি না জানি না—তবে অন্তর ব্যাপাব এই করুণ কাহিনী অভিমানেব এই অশ্রুজল জানিযে দিতে পাববে যে অস্ত্র শস্ত্র সৈন্য আব আর বর্ব্ববতামূলক আইনেব সাহায্যে কখন কোন জাতিব উন্নতির পথ রুদ্ধ হয নাই হইবে না। এই সংক্ষুব্ধ মর্ম্মপীডিত জাতির মনোবেদনা, অকাবণ লাঞ্ছনা খুব জোবেব সঙ্গেই প্রতিবাদ কবেছে এই বিবাট হবতাল এ হবতালে অনুবোধ উপরোধ, ভয় প্রদর্শন কিছুই ছিল না।

হরতাল দেখিতে বাহির হইযা শনিবার একটা অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম একটা বাড়ীব বোয়াকে তুটী মেযে বসে খেলা কর্চ্ছিল একটী ছোট আব একটী তাব চেযে তুবছবের বড—ছোটটী তাব দিদিকে বলছে হ্যাঁ দিদি আজ দোকান দোকান খেলবিনে—দিদি তাব ফোটা ফুলেব মতন মুখখানিকে গম্ভীর কবে বল্লে তুব আজ কি বেচা কেনা কর্ত্তে আছে আজ যে "হবতাল"—এই কথা কয়টী মনে যে কি আনন্দ রসের বন্যা প্রবাহিত কবিল তা বলতে পাবি না—ভগবানের উদ্দেশে বলিলাম—ভগবান তোমাব দযা ভিন্ন এই ছোট্ট মেযেটীব মুখে একথা কি শুনতে পেতুম—যে জাতির কন্যাব মুখে এ অপূর্ব্ব বাণী দৈববাণীব ন্যায বাহিব হয সে জাতি অচিরে আত্মপ্রতিষ্ঠায যে সফল হইবে তাহা আজ নিশ্চয় বলিতে ইতস্ততঃ কবিতে হয় না।

আর একটী ঘটনা - একটী ছোট ছেলে বাইবের ঘরে যেখানে তাব বাপ আহাবাদির পব কাপড় চোপড ছাড়ছিলেন অর্থাৎ আফিস যাবার জন্য তৈবী হচ্ছিলেন এসে বল্লে হ্যাঁ বাবা আজ তুমি কোথায যাবে—বাবা গম্ভীর মুখে বলিলেন "আফিস যাব—বাবা" ছেলেটী বাপের হাতখানি ধরে বল্লে "আজ আফিস যেও না বাবা আজ যে হরতাল" বাবার বুকে খোঁচার মত কি একটা বিঁধিল পবক্ষণে টাল সামলাইয়া বিরস মুখে বল্লেন "না গেলে যে চাকরী যাবে বাবা—তোদের কি খাওয়াব" ছেলে বল্লে "আমি আজ না খেয়ে থাকব বাবা—তুমি আফিস যেও না।" হতভাগ্য পিতার মর্ম্মবেদনা—অনিচ্ছায় আফিসে যাওয়া—আর ছোট ছেলেটীর এই অস্ফুট সরল সোজা যুক্তি প্রাণটার ভেত একটা গর্ব্বের স্পন্দন তুললে—হৃদয়েব রুদ্ধ কপাটে কে যে ঘা মেবে বললে ওবে আর ভয় নাই বাংলায আজ আত্ম শক্তিব প্রতিষ্ঠা হযেছে।

কেবাণী ভ্রাতাদেব মর্ম্মব্যথা

এই ভাবেব প্রতিধ্বনি হতে দেখেছি একখানা হ্যাণ্ডবিলে তাতে আমাদেব ভাযেবা জানিযাছেন যে উদবান্নেব জন্য দাস্য বৃত্তি অবলম্বন কবে তাহাবা হবতালে প্রকাশ্যে যো দিতে না পেযে কি মনোকষ্ট পাইতেছেন—তাঁহাদে অনিচ্ছুক মন বিদ্রোহী হৃদয় আব জড দেহখানাকে আফি পানে ঠেলে নিযে গেছে তাঁহাদেব অসহায অবস্থা উদবে চিন্তা। একথা নূতন নয এ সত্য—এ হতভাগ্য দরি দেশেব বুকে দুঃস্বপ্নেব মত এ চিবদিন জেগে আছে ভাইএদেব এই আন্তবিক সহানুভূতির মূল্যও আমবা জানি এবং বিলাতী সভ্যতা ও শিক্ষাই যে তাঁদেব এই দাসত্ব শৃঙ্খল পবিযেছে তাও জানি কিন্তু তাঁরা যদি আত্মস্থ হযে এখনও এই দাসত্বেব মূল কাবণ অপসাবিত কর্ত্তে চেষ্টা না কবেন ছেলে পুলেদেব এই পৈতৃক সম্পত্তিব অধিকাবী না কবে যান তবেই দেশে আবাব উন্নতির শঙ্খনাদ শুনতে পাওযা যাবে নতুবা বাঙ্গালীব জীবন এই দাসত্ব দুর্ব্বিসহ অভিশাপেব মত চিরদিন পীড়া দায়ক হযে থাকবে।

কনজাবভেটীবদেব জয়—বিলাতেব নির্ব্বাচন ফল বাহি হইযাছে—সাম্রাজ্যবাদী আভিজাত্য ও ব্যবসায়ী ধনী সম্প্রদাযেব প্রতিষ্ঠাই তাহাতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হযেছে—হাওয়া কোন দিকে বইছে তা এখন বেশ বুঝা গেল—লেবার দল এখন শক্তিতে উহাদের অর্দ্ধেকেরও কম সম্ভবতঃ বল্ডউইন সাহেবই মন্ত্রীর গদি পাইবেন। যাব এতদিন ভিক্ষা, আবেদন ও নিবেদনে স্বরাজ পাইবার আশা পোষণ করিতেছিলেন তাঁহাদের আশা এখন মিটিয়া যাওয়া উচিত। এদিকে মহাত্মা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয় করণার্থ তাঁহাব পূর্ব্বেকার কঠোর অসহযোগ নীতিও প্রায় পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন—দেশকালপাত্রানুসারে এই পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা তাঁহার হৃদয়ে আছে তাই আজ জগতে তিনিই মাত্র মহাত্মা। দেখা যাউক চণ্ডনীতির পরিপন্থী কনজারভেটিবদল ভারতের ভাগ্য কিরূপে নিয়ন্ত্রণ করেন আর দেশের সর্ব্বদলের একত্রীকৃত শক্তি মহাত্মার স্বরূপে কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহার প্রতিরোধে সমর্থ হয় কি না।

Printed & Published by Jnanendra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works

শিল্পী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস

মন্দির-পথে

নিরুপমা বর্ষ-স্মৃতি হইতে

Printed by Lakshmibilas Color Studio, Calcutta.

নবযুগ সাপ্তাহিক

প্রথমবর্ষ] ২৯শে কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ১৫ই নভেম্বর [১৬শ সংখ্যা

স্বাগত

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

স্বাগত হে নর দেব স্বাগত স্বাগত
এ মহা নগরী মাঝে—হে উদারব্রত
মহাত্মা গান্ধীজি ! তুমি মূর্ত্ত প্রীতি প্রেম
মূর্ত্ত স্বাধীনতা, ক্ষমা তপঃ শান্তি ক্ষেম
শৃঙ্খলা কল্যাণ !—তোমা' করিছে আহ্বান—
হিন্দু বৌদ্ধ জৈন আদি মোস্লেম সন্তান
খৃষ্টান, ইংরাজ—যারা গুণের আদর
করিতে কাতর নহে—হ'যে একত্তর
প্রকৃত মহত্ত্ব তব স্মরিয়া অন্তরে—
এস বন্ধু দাও বান্ধি আত্মীয়তা ডোরে
সকল জাতিরে আজ, গলে গলে গলে
তব যাদুমন্ত্র—তব প্রীতি মন্ত্র বলে
আবার শিখাও সবে' করায়ে স্মরণ
সব সাধনার মূলে প্রীতির সাধন।

চাণক্য শ্লোকের আধুনিক ব্যাখ্যা

মল্লিনাথ—শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

“লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি”

(বিশেষতঃ যদি তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর পুত্র হয়)
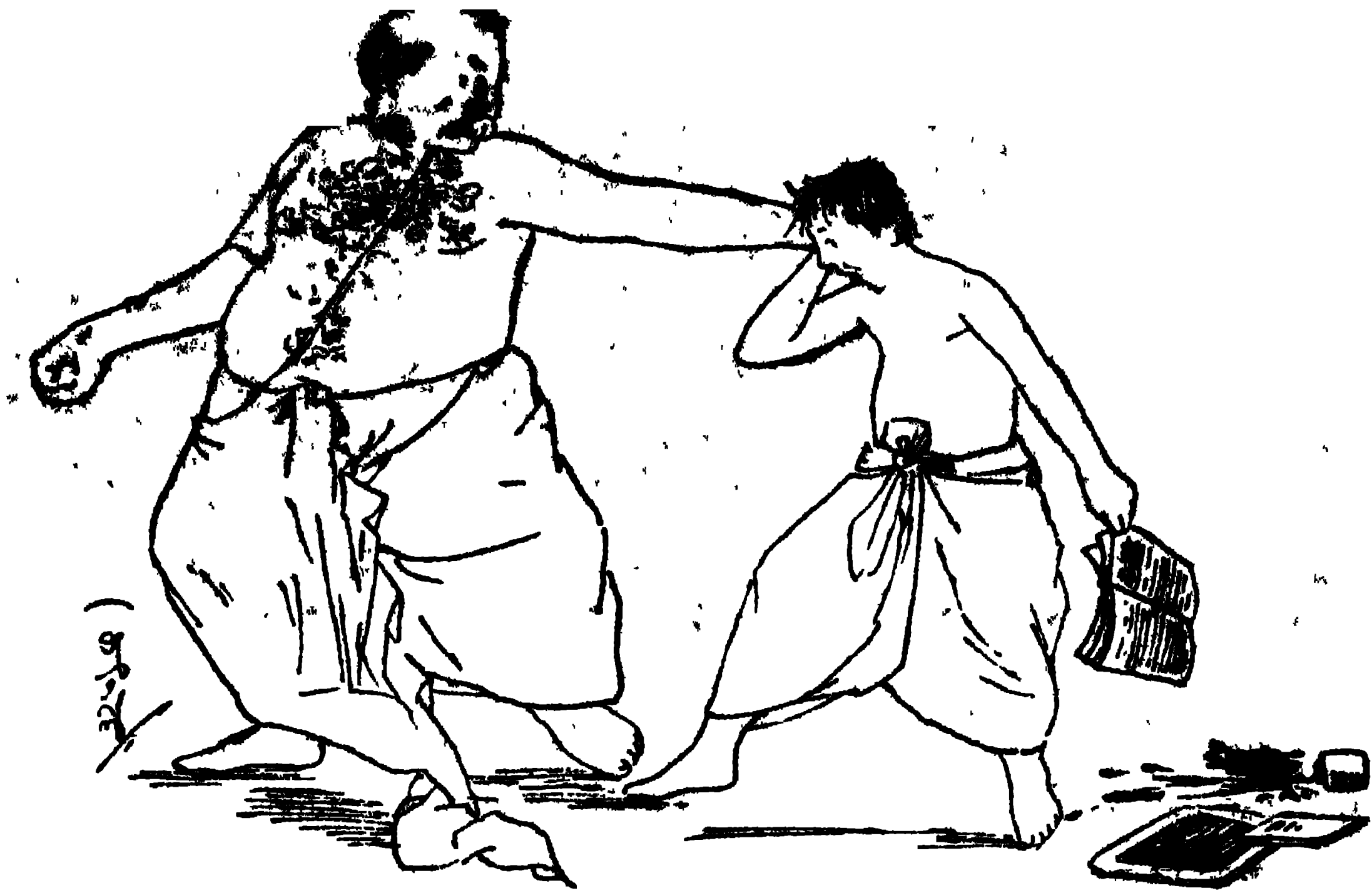
"দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ"

যদি পুত্রের জননী পরলোকগতা হন এবং গৃহে বিমাতা বিদ্যমানা থাকেন।

"প্রাপ্তেতু ষোড়শ বর্ষে পুত্র মিত্রবদাচরেৎ"

ছেলে যদি [illegible] ছেলে হয় তো মিত্রবৎ আচরণ না করিলে অপঘাত হইবার সম্ভাবনা।

গল্প

পাগল

শ্রীগিরিবালা দেবী রত্নপ্রভা সরস্বতী

বন্ধু পুত্রের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ সারিয়া গভীর রজনীতে গৃহে ফিরিতেছিলাম। কলিকাতা নগরীর কোলাহলে-মুখরিত রাস্তাটা কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দোকানপসার বন্ধ, ধনীর অট্টালিকার দ্বার রুদ্ধ। কোথায়ও জনপ্রাণীর সমাগম নাই। কেবল নির্জ্জন পথে পথে গ্যাসের আলোগুলি তীব্রজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া—এই ঘুমন্ত পুরীটাকে যেন স্বপ্নরাজ্যে রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীগুলির মাথার উপরে শরতের নির্ম্মল নীলাকাশে অযুত নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্য হইতে চন্দ্রদেব রজতকিরণ ধারায় জগৎ প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই শান্তিপূর্ণ মৌনতা ভঙ্গ করিয়া কে যেন অকস্মাৎ আমার পশ্চাৎ হইতে সকরুণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল "টুপ্ টাপ্ কাবুল কাবুল।"

চমকিয়া ঘাড় ফিরাইলাম। "ফুটপাথে" বসিয়া রুক্ষ-কেশ—রুক্ষমূর্ত্তি উন্মাদ আকাশের পানে চাহিয়া আকুল রোদনে বক্ষস্থল সিক্ত করিতেছিল "টুপ্ টাপ্ কাবুল কাবুল।"

এ পাগলের পরিচয় আমি না জানিলেও পাগল এ আমার অপরিচিত নহে। কত সকাল সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নে এই পথেই পাগলকে আমি বিচরণ করিতে দেখিয়াছি, ইহার অর্থহীন প্রলাপ "টুপ্ টাপ্ কাবুল কাবুল" একাধিকবার আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু তাহা একদিনও মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে পারে নাই। নিজেদের অভাব অনটনের চিন্তা লইয়াই নিজেরা বিব্রত, অপরের বিষয় চিন্তা করিবার অবকাশ কোথায়? আজও অবকাশ ছিল না, কিন্তু চলিতে লইয়া পা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। পাগলের সন্নিকটে একটি বিষাদময়ী তরুণীকে দেখিয়া আমার অন্তরের কৌতুক প্রবাহ উছলিয়া উঠিল। অন্য সময় হইলে উহার পানে আমি ফিরিয়া চাহিতাম কিনা সন্দেহ, কিন্তু এ নিভৃত নির্জ্জন পথে জ্যোৎস্নালোকিত নিশীথে একটি আপনা ভোলা উন্মাদের পাশে ম্লানমূর্ত্তি তরুণীকে আমার তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল না। আমি একবার ইতস্ততঃ করিয়া তরুণীর নিকটে গিয়া কহিলাম "এত রাতে তুমি কোন সাহসে পাগলের কাছে বসে আছ? তোমার বয়স অল্প, এ জায়গা তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়।"

মেয়েটি প্রথমে আমার সহিত কথা কহিল না। সজল-নেত্রে আমার পানে চাহিয়া মুখ অবনত করিল। আমি পুনরায় কহিলাম "তুমি এমনভাবে এখানে বসে রয়েছ কেন, বল? দরকার হলে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, আমাকে তোমার কিছু ভয় নেই।" সে মলিন মুখখানি তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল "কিছুতেই আমার ভয় নেই বাবু, ভয় ডরের মাথা অনেকদিন আগেই আমার খাওয়া হয়ে গেছে। বাবা আমার যে পথের পথিক হ'য়েছে ঘরের চেয়ে সেই পথই আমার ভাল লাগে; তাই আমি রাতের সবখানিই প্রায় বাবার কাছে এই পথেই কাটিয়ে দিই।" তরুণী একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইল। আমি অনুমানে বুঝিলাম মেয়েটি পাগলের কন্যা। নিকটেই ইহাদের বাড়ী, পিতার সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিতে না পারিয়া সে বাপের কাছে আসিয়া বসিয়াছে।

ইহার মধ্যে বিচিত্রতার কিছুই নাই ; এ রোগ শোকসঙ্কুল সংসারে ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ভাবিলাম নিরর্থক প্রশ্ন করিয়া কি হইবে? রাত্রি বাড়িতেছে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাই। অন্যের বিষয় আলোচনা করিয়া আমার লাভ কি? জগতে কে কাহার।

ভাবিলাম, কিন্তু যাইতে পারিলাম না, অবশেষে আমার কৌতূহলেরই জয় হইল।

আমি তরুণীর অদূরে রকের কোণটা কোঁচার খুঁট দিয়া ঝাড়িয়া বসিয়া পড়িলাম। পকেট হইতে দিয়াশালাইটা লইয়া, চুরট ধরাইয়া সদয় কোমল স্বরে তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমাদের বাসা কাছেই বুঝি? নিজে সমস্ত রাত পথে না কাটিয়ে তোমার বাপকে বেঁধে ছেঁদে ঘরে রাখ্‌লেই ভাল হয়। কলকাতার পথ ঘাট গুণ্ডা বদমায়েসে ভরা, দশ দিন এভাবে থাকতে থাকতে একদিন হয় তো বিপদে পড়বে।"

মেয়েটি স্থির ভাবে আমার পানে চাহিয়া বুকের কাপড়ের মধ্য হইতে একখানি ধারালো ছুরি বাহির করিয়া সংক্ষেপে উত্তর করিল "চোর, ডাকাত, গুণ্ডার হাত থেকে ভগবানই আমায় রক্ষা করেন বাবু; তাঁর দয়ায় এই ছুরিখানা বুকে লুকিয়ে—আমিও আমাকে রক্ষা করতে জানি। ঘরের কথা বলছেন, ঘর থাকলে কি বাবার এমন দুর্দ্দশা হত!"

আমি বিস্মিত কণ্ঠে কহিলাম "ঘর ছাড়া কি মানুষ হয়! তোমার বাবা যেন পথে পথে থাকে, তুমি থাক কোথায়? তোমার আর কে আছে?"

তরুণী বলিতে লাগিল "একদিন আমাদের সব ছিল বাবু, এখন কেউ নেই, এখন বাবার আমি আছি। আমার নামে বাবা আছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে বস্তু নেই।—যিনি দেবার মালিক, তিনি ধন, দৌলত সুখ, শান্তি সব দিয়ে কেড়ে নিয়েছেন। দুঃখের বানে আমরা বাপবেটি এখানে ভেসে আস্‌লেও আমরা এখানকার বাসীন্দা নই। পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ী ছিল, ধান, কলাইয়ের ক্ষেত ছিল, গোয়াল ভরা গরু, মরাই ভরা শস্য ছিল। যে বাবা আমার আজ পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—সেই বাবা শক্তিতে, স্বাস্থ্যে, মানে, চাষা মহলে বরাবর সম্মান পেয়ে এসেছে। [illegible] উদ্দেশে [illegible] নইলে কারুর চলতো না। বাবার রোগে শোকে বাবা ছাড়া গাঁয়ের লোকের উপায় ছিল না। আমার মাকেও ভগবান বাবার মত করেই গড়েছিলেন, যেমন দয়া মায়া, তেমনি মিষ্টি স্বভাব। চাষার ঘরে মাকে যেন কিছুতেই মানাত না। কারুর অভাবের কথা শুন্‌লে মা স্থির থাকতে পারতেন না। নিজের ভাবনা না ভেবে ঘরের দ্রব্যজাত পাড়াপড়সীদের বিলিয়ে দিতেন। কোন দরদী যদি ভবিষ্যতের কথা তুলে মাকে সাবধান ক'রে দিত, তাহলে মা হেসে বল্‌তেন "কেউ উপোসী আছে জানলে আমার যে মুখে ভাত রোচে না। আমি খাচ্ছি, আমি পরছি অথচ আমারি আপনার জন, আমারি কুটুম্ব ভাত বিনে শুকুচ্ছে শুনলে কেমন করে থাকতে পারি বল। এর পর কি হবে আমি সে ভাবনা ভাবি না। আমার পাঁচও নয়, সাতও নয়, একটি ছেলে, একটি মেয়ে, পার্ব্বতী বড় হচ্ছে শীগ্‌গির তার বিয়ে হবে, আপনার ঘর চিনে দুদিন পর সে চলে যাবে। এক চরণ—সে একটু বড় হলে বাপের সাথে ক্ষেতের কাজ ক'রবে। দুই বাপ ব্যাটায় রোজগার ক'রলে ওদের ভাত কে খাবে দিদি। কিসের দুঃখে আমি সকলকে বঞ্চিত ক'রে টাকার মরাই বাঁধতে বস্‌বো।"

মা'র বিলি ব্যবস্থায় বাবা ভ্রমেও আপত্তি করেন নাই। তিনি কাজের মানুষ ছিলেন, কাজ নিয়েই মেতে থাক্‌তেন। মা'র অতিরিক্ত দানের উল্লেখ করে কেউ তাঁকে লাগাতে গেলে তিনি বল্‌তেন "কার জিনিস কে দেয় গা, ভগবানই যে একমাত্র দেবার মালিক। তাঁর ইচ্ছা না থাক্‌লে মানুষের কি ক্ষমতা যে সে খুদকণা দান করবে। আমার এত জমি, এত ধান চাল, একি একলা আমার, সকলকার জন্যেই এসব তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন। পার্ব্বতীর মা যা করছে সে মন্দ কাজ নয়। তার কাজে দোষ থাক্‌তে পারে না। দুঃখ হতে পারে না।"

সত্যি, মা'র কাজে দোষ ছিল না, দুঃখ ছিল না। হাসি, গানে আমাদের বাড়ীখানা রাতদিনই ভরে থাকত, গাঁ শুদ্ধ সকলেই আমাদের আত্মীয়, সকলেই কুটুম্ব। সকলের মুখেই বাবার কথা, মার সুখ্যাতি, কিন্তু আমাদের

ভাগ্যে এ সুখ বেশীদিন স্থায়ী হল না। আমাদের শান্তির আকাশে অশান্তির মেঘ জমাট হতে লাগ্‌লো। আমার বিয়ের বছরখানেক পর একদিন অতর্কিতভাবে মা বিছানায় পড়লেন, সামান্য রোগ, ডাক্তার ডেকে দেখাতে না দেখাতেই মা আমার অজানা রাজ্যে চলে গেলেন। সুখদের মা ডাকা জন্মের মত শেষ হল। ঘরের লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে সুখ সূর্য্যও অস্ত গেল।

লোকে বলে বিপদ একলা আসে না, তার দোসর থাকে। আমাদের বিপদও একলা এল না, তার সর্ব্বনেশে সাথী নিয়ে দেখা দিলে—

সেবার বর্ষা সূচনাতে আমাদের শান্ত নদীটা হঠাৎ ক্ষেপে উঠ্‌লো। বাবার আশা ভরসার ধন, বুকের রক্ত ভরা ক্ষেতগুলি একখানির পর একখানি করে নদীর তলে লুকোতে লাগ্‌লো। যাঁর বাড়ীতে অন্নপূর্ণার আসন পাতা ছিল ভাগ্যের নিষ্ঠুর বিধানে তিনিই পথের ভিখারী হ'য়ে গেলেন। যারা এতকাল আপনার জনটি হয়েছিল, তারাই বেশী করে বাবাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আনন্দের হাট ভেঙ্গে দুঃখের ঝড়ে আমার মায়ের বড় সাধের সাজানো সংসার তাসের ঘরের মত চূর্ণ হ'য়ে গেল।

একে মার শোক, তারপর সচ্ছল অবস্থা থেকে কষ্টের ভিতর পড়ে বাবা যেন কেমন হ'য়ে গেলেন। যে হাসিটি একদণ্ডও বাবার মুখ ছাড়া হ'ত না, সে হাসিটি চিরকালের মত বাবার মুখ থেকে মুছে গেল। কথা নাই, বার্ত্তা নাই, আশা নাই, উৎসাহ নাই, চরণকে কোলে নিয়ে বাবা ঘরের কোণে আশ্রয় নিলেন। তা—ছাড়া তাঁর উপায় ও ছিল না। চাবার দুটি কাজ এক চাষ আবাদ করা, আর জন' খাটা। যার কাছে একদিন পাঁচটা লোকজন খেটেছে সে কি সহজে অন্যের বাড়ীর জন হ'তে পারে? বাবা জন' খাটতে পারলেন না। চরণকে ফেলে দূর দেশে যাবার উপায় তাঁর ছিল না। আমাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে, ঘরদুয়ার বিক্রি করে বাবা চরণের আর নিজের পেট চালাতে লাগ্‌লেন। মা'র সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাজ করবার শক্তি, বল সামর্থ্য সবি চলে গিয়েছিল। তাই চুপচাপ ঘরে বসে বসে তাঁর দুঃখ দারিদ্র্যতাকে তিনি বেশী করে যেন টেনে আনতে লাগ্‌লেন।

বসে খেলে রাজার সম্পদ ফুরায়; বাবা তো দীন কৃষক! আস্তে আস্তে বাবার বাসন কোসন যা ছিল সব ফুরিয়ে আসতে লাগ্‌লো। সময়ের ফেরে চরণকেও রোগে ধরে বসলো। চরণের সুখের শরীর, দুঃখে অনাহারে, রোগে ঝলসা ফুলের মত সে বিছানায় নেতিয়ে পড়লো।

চরণের ব্যারাম—সেবা যত্নের লোক চাই। চরণ দিদি দিদি বলে পাগল! বাবা আমার আনতে গেলেন, শাশুড়ী বাবাকে ফিরিয়ে দিলেন; স্বামী অমত করলেন। আমার শ্বশুরবাড়ীতে বাবার একটুও আদর ছিল না। তাঁর কাকুতি মিনতিতে কারুর দয়া হল না। বাবার অবস্থা ভাল জেনে অনেক আশা ক'রে আমার শাশুড়ী আমার ঘরে এনে-ছিলেন। তাঁদের আশা ভাঙ্গার অপরাধকে কিছুতেই তাঁরা মাপ করতে পারতেন না। আকার ইঙ্গিতে তাঁরা সব সময় প্রকাশ করতেন—বাবা যেন ইচ্ছা করে তাঁদের মস্ত একটা অনিষ্ট করেছেন। ফাঁকি দিয়ে তাঁদের আশার বাতি নিবিয়ে দিয়েছেন। বাবা ভয়ানক অপরাধে অপরাধী, আমিও তাঁর সঙ্গে অপরাধিনী; কিন্তু আমাদের সে অপরাধ যে কি কেউ তা ভেবে দেখা দরকার বোধ করতেন না।

দুই দিকে দুইখানি গাঁ মধ্যে একখানা বড় মাঠ, সেই মাঠের একদিকে চরণ বিছানায় পড়ে 'দিদি দিদি' বলে দিদির প্রতীক্ষায় চেয়ে থাক্‌তো, আবার মাঠের অন্য দিকে দিদি ছোট ভাইটির জন্যে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিত, কিন্তু বাধা ছিল সেই প্রকাণ্ড মাঠটা; সেটুকু পেরিয়ে কেউ কারও কাছে আসতে পারতো না।

এম্‌নি করে কিছুদিন কেটে গেল। বাবার বহু সাধ্য সাধনায় আমার চোখের জলে অবশেষে তিন দিনের কড়াড়ে আমার শাশুড়ী চরণকে দেখ্‌তে যাবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তখন তার দেখ্‌বার মত কিছুই ছিল না। শিকড় ছেঁড়া চারা গাছটির মত চরণ আমার শুকিয়ে কঙ্কাল মূর্ত্তি হয়েছিল। দিদিকে দেখে হাসির পরিবর্ত্তে তার দুটি চোখ জলে ভরে গেল। সে জল যে অভিমানের, ব্যথার ভরা তা বুঝ্‌তে আমার দেরী হ'ল না। আমি তাকে একটিও সান্ত্বনার কথা বল্‌তে পারলেম না। লোপার ভাই আমার বলে একটু আদর করাও হল না। তার চোখের জলের সাথে আমার চোখের জল মিশিয়ে আমি তাকে বুকের

কাটিয়ে দিতাম। শুধু কান্না, কান্নাতেই আমার ছুটির একদিন ফুরিয়ে গেল।

পরদিন সকাল বেলা থেকে আকাশটা মেঘে ঢেকে ফেলেছিল। মেঘের পর মেঘ, তার পর মেঘ, কোথাও একটু ফাঁক ছিল না। সন্ধ্যা বেলা এমন বেগে বৃষ্টি সুরু হল যে বৃষ্টির শব্দে মানুষের কানে তালা লেগে যায়। সেই জল বৃষ্টিতে টিনের চালা ঘরের দোর বন্ধ করে আমরা তিনটি প্রাণী শুয়েছিলাম। চরণের এক পাশে আমি এক পাশে বাবা; চিমনী ভাঙ্গা লণ্ঠনটা আমাদের শিয়রে মিট্ মিট্ করে জ্বলছিল।

চুপ করে শুয়ে থাক্তে থাক্তে আমি ঘুমের মত হয়েছিলাম, গোলমালে যখন আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, তখন আমি ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখ্লাম—দরজা ভেঙ্গে চার পাঁচ জনা কাবুলী ওয়ালা ঘরে ঢুকেছে। তাদের সব্বারি হাতে এক একখানা লাঠি। সেই বড় বড় লাঠি দিয়ে তারা নির্দয় ভাবে বাবাকে প্রহার করছে। মার খেয়ে, বাবা নরম হয়েই বলছেন "আমি তোমাদের টাকা ফাঁকি দেব না ভাই সব, তোমাদের সে ভয় নেই। আমার ছেলে একটু ভাল হলে আমি তোমাদের পঞ্চাশ টাকা সুদে আসলে শোধ করে দেব। আজ আমার ঘরে তামার আধ্লাটা পর্য্যন্ত নেই, ডাক্তারকে দিতে সব ফুরিয়ে গেছে। তোমরা এখন চলে যাও, তোমাদের দেখে ছেলে আমার বড্ড ভয় পেয়েছে। যাও ভাই আজ সব ঘরে যাও।"

বাবার কাতর অনুনয়ে সে যমদূতদের পাষাণ প্রাণ একটুও নরম হলো না। তারা বাবার পিঠে লাঠির খোঁচা দিয়া আমাকে দেখিয়ে কি যেন ইঙ্গিত করলে। আমার সর্ব্বশরীর আতঙ্কে শিউরে উঠ্লো, চোখে অন্ধকার দেখ্তে লাগ্লেম। এখানকার মত ঘা খেয়ে খেয়ে তখন আমার মন এমন শক্ত হয়েছিল না। প'নেরো বছর বয়সে আমি দশ বছরের মেয়ের মত নরম ছিলাম। না ছিল আমার সাহস, না ছিল আমার বল বুদ্ধি।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাবা অকস্মাৎ আহত সিংহের মতন গর্জ্জে উঠে, একজনার হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে যখন রুখে দাঁড়ালেন সেই সুযোগে আমি এক ছুটে ঘর ছেড়ে ঝোপের ভেতর লুকালেম। বাবার পরিণাম আমার মনে হল না। ভাইয়ের কথা মনে হ'ল না। নিজেকে লুকোতেই আমি ব্যস্ত হয়ে উঠ্লাম। দূর হতে এক একবার লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ, টিনের ঝন্ঝনি, করুণ আর্ত্তনাদ আমার কাণে আস্তে লাগ্লো, কিন্তু তাতে আমি বিচলিত হলেম না। যে নিবিড় জঙ্গলে মানুষ দিনের আলোতে ঢুকতে সাহস করত না, মানুষের ভয়ে সেই বনের মধ্যে আমার রাত কেটে গেল।

ধূসর আকাশের বুক চিরে যখন সোণালী রোদ গাছের মাথায় লুটিয়ে পড়লো, পাখীর গানে বনে বনে সাড়া পড়ে গেল সেই সময় আমি ঝোপ থেকে বেরিয়ে বাড়ী ঢুকলাম। কিন্তু দেখ্লাম কি? বাড়ী বলতে মাথা গুজবার যে টিনের চালাটা ছিল, তার চিহ্নও নেই। তৈজস পত্র কিছুই নেই। বাবার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, কাটা কপাল বেয়ে বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। চরণকে বুকে আগ্লে বাবা চুপ করে বসে আছেন।

আমি বাবার সামনে গিয়ে ডাক্লাম "বাবা," বাবা কথা না বলে আমার মুখের দিকে চাইলেন, উঃ সে কি দৃষ্টি, সে চোখের পানে আমি চাইতে পারলেম না। সে চোখের আগুনে আমার বুক যেন পুড়ে জ্বলে গেল। আমি বাবার কাছ থেকে সরে চরণের গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে ডাক্লাম "চরণ, ভাই," উত্তর দেবে কে? উত্তর দেবার অনেক আগেই চরণের প্রাণপাখীটি এখানকার দেনা পাওনা চুকিয়ে মার কাছে উড়ে গিয়েছিল। যে ক্ষুদ্র প্রাণ পৃথিবীর বুকে আরো ক'দিন আঁকড়ে থাকৃতে পারত—পাষাণ্ডদের অমানুষিক অত্যাচারে আতঙ্কে তার গতি হঠাৎ বন্ধ হয়েছিল।

আমার চীৎকারে পাড়ার লোক জড় হয়ে, কাঠ কেটে, খাটুলি বানিয়ে চরণের শেষ কাজটুকু শেষ করতে নিয়ে গেল। বাবাও নিরুত্তরে হেঁট মুখে তাদের সঙ্গী হলেন। তাঁর চোখে এক ফোঁটা জল ঝরল না, মুখে একটা কথা ফুটল না। পাড়ার লোকে বলে অল্প শোকে কাতর, বেশী শোকে পাথর, তাই এত শোকেও স্থির থাকৃতে পেরেছে। আমিও ভাবলাম বাবা বোধহয় নিজে নিজেই মনকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, যার প্রতীকার নেই, সেখানে শোক প্রকাশ করে লাভ কি? কিন্তু তখনো জানৃতাম না, বাইরে বাবা শান্ত

থাকলেও তাঁর অন্তরটিতে অশান্তির প্রলয়াগ্নি জ্বলে উঠেছে। বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান সেই আগুনে ভস্মীভূত হচ্ছে!

বিকাল বেলা বাবা শ্মশান হতে ফিরে আস্‌লে পাড়ার মুক্তা পিসি এসে বল্লেন "তুই আমার বাড়ীতে চল ভাই, সেখানেই এঁটো মুখ করবি। ভগবানের নাম কর, হরি হরি বল, তিনিই তোর বুকে বল দেবেন। এতো মানুষের হাত নয়, এখানে দুঃখু করে লাভ নেই।" বলা বাহুল্য বাবা দুঃখও করলেন না শোকও দেখালেন না। চাল শূন্য ভিটের ওপর নীরবে বসে রইলেন।

পিসি বল্লেন "আমি বলি কি খাওয়া দাওয়া হলে পার্ব্বতীকে শ্বশুরবাড়ী রেখে আসি, কাল রাতে যে কাণ্ড হয়ে গেছে তার পর সোমত্ত মেয়েকে এখানে আর রাখা চলে না। তারাও ভাল মানুষ নয়, শেষকালে কিসের থেকে কি হবে তার ঠিক কি?" এবারেও বাবা কথা বল্লেন না, পিসির পানে চোখ তুলে ঘাড় নাড়লেন।

আমি কেঁদে বল্লাম "আজ আমি যাব না, বাবাকে এভাবে ফেলে রেখে আমি যেতে পারব না।"

পিসি বল্লেন তা হয় না পার্ব্বতী, তোকে আজকেই যেতে হবে, বাবার জন্যে চিন্তা নেই মা, আমি আছি দেখবো। তুমি আজ সেখানে গেলে তোমার শ্বাশুড়ী হয়তো খুসী হয়ে তোমার বাবাকেও কাছে নিয়ে যাবে। তোমার সংসারে কিছুরি তো অভাব নেই, দিনকতক যত্ন আত্যিতে থাকলে তোমার বাবার শরীরও সেরে উঠ্‌বে। কিন্তু আজ না গেলে তারা হয়তো রাগ করবে। তাদের ঘরের বৌ অন্যের বাড়ীতে রাত বাস করছে শুন্‌লে তাদের মানের হানি হবে। সেই সব কথা ভেবেই আমি তোমায় রেখে আস্‌তে চাচ্ছি, নইলে পিসির ঘরে তুই এক রাতের জন্যে তোমার জায়গার অভাব হ'ত না।"

পিসির যুক্তি আমি অবহেলা ক'রতে পারলাম না। এখন গেলে স্বামীও শ্বাশুড়ী খুসী হয়ে যে বাবাকে আমার কাছে নিয়ে যাবেন এই আনন্দে আমার সমস্ত আপত্তি ভেসে গেল।

মুক্তাপিসির সঙ্গে যখন শ্বশুর বাড়ী পৌছিলাম তখন রাত হয়েছে। মেঘ ভাঙ্গা চাঁদের আলো পাতার উপর পড়ে ঝক ঝক করছে। স্বামী বারান্দায় বসে একতারা বাজাচ্ছেন, শ্বাশুড়ী হরিনামের মালা নিয়ে ছেলের পাশে বসে আছেন। আমাদের দেখে স্বামীর একতারার তার আর বাজ্‌ল না। শ্বাশুড়ীর হাতের মালা হাতেই রয়ে গেল। তাঁরা ফ্যাল ফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকাতে লাগ্‌লেন।

পিসি আমার শ্বাশুড়ীর কাছে গিয়ে বল্লেন "পার্ব্বতীর বাপের কথা তো শুনেছ বেয়ান, কাল রাতে চরণ ছোঁরাও চলে গেছে, কাবুলির কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে ছেলের ডাক্তার লাগিয়েছিল, কাবলিওয়ালারা মাথা রাখ্‌বার চালাখানাও ভেঙ্গে নিয়ে গেছে। এখন পার্ব্বতীর বাপকে তোমরা একটু কাছে এনে যত্ন আত্যি না করলে চলে না। এক পার্ব্বতী ছাড়া আপনার বল্‌তে পৃথিবীতে কেউ তার রইল না।"

শ্বাশুড়ী ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন "কথা শুনে আর বাঁচিনে, তুমি কোন সাহসে ও পোড়ারমুখীকে আমার বাড়ীতে নিয়ে এসেছ? আপনি শুতে পাই না ঠাঁই, শঙ্করাকে মধ্যে শোয়াই। মেয়ে যাবে কোথায় তার ঠিক নেই, তার আবার বাপ! তোমরা যে পথে এসেছ, সেই পথে ভালয় ভালয় বিদায় হয়ে যাও। আমাদের কাণে সব কথাই এসেছো গো কিছু বাকী নেই। রাত দুপুরে পাঁচ পাঁচটা কাবুলিওয়ালা যার ঘরে ঢুকেছে, আমার ছেলে সেই বৌ নিয়ে ঘর করবে। মাগো ঘেন্নায় মরি, লজ্জায় মরি।"

পিসি ধীরে বল্লেন "টাকার তাগাদায় কাবুলি এসে ঘর ভেঙ্গে নিয়ে গেছে তাতে তোমাদের বৌয়ের কি হয়েছে গা? বৌ তো পালিয়ে জঙ্গলে গিয়েই লুকিয়েছিল, বৌয়ের বাপের সাথে তাদের লাঠালাঠি রক্তারক্তি হয়েছে, তাতে বৌ কেন দোষী হতে যাবে? লোকের মুখে তোমরা যা শুনেছ তা মিছে কথা, লোক রক্ষা করতে পারে না, বিপদের সময় এগুতে পারে না, শুধু শুধু নিন্দা রটাতে মজ্‌বুদ। তোমরা কি শুনেছ জানি না, যা শুনে থাক্ শোনগে তা বলে ঘরের বৌ ফেল্‌তে পারবে না।"

শ্বাশুড়ী মুখ বাঁকিয়ে ভেড়ে উঠ্‌লেন "যে ঘরে রাখার যুগ্যি নয়, তাকে কি মাথায় করে রাখবো? নিশীথ রাতে পাঁচটা ব্যাটাছেলে যার ঘরে গিয়েছিল তাকে আমি ঘরে ঠাঁই দিতে পারি নে। ওর যে চুলোয় ইচ্ছে এখুনি চলে যাক্, ছেলের আমি আবার বিয়ে দেব।"

শাশুড়ীর কথায় আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, পায়ের তলার মাটী কাঁপ্তে লাগ্‌ল। আমি শাশুড়ীর পায়ের উপর আছ্‌ড়ে পড়ে কেঁদে বল্‌লাম "মা, আমায় তোমরা তাড়িয়ে দিও না। তোমাদের বাড়ীর এক কোণে একটু জায়গা দাও। আমি কোথায় যাব, আমার কে আছে?"

শাশুড়ী পা টেনে নিয়ে বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন "কোথায় যাবে, কি করবে তার আমরা কি জানি! বাপের কাছে গিয়ে পরামর্শ করে যেখানে ভাল লাগে যাও। এখানে থাক্‌বার মতলব থাক্‌লে ভাই' 'ভাই করে পাগল হয়ে অমন হয়ে যেতে না। দেনা শোধের জন্যে বাপ তোমায় নিয়ে গিয়েছিল, বাপের কাছে গিয়ে তার দেনাই শোধ করগে। দূর হয়ে যাও।" বলে রাগে গর গর করে শাশুড়ী উঠে গেলেন।

আমি স্বামীর পা চোখের জলে ভিজিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা চাইলাম। কুলটা অসতী বলে স্বামীও আমায় দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন। আমার কোন কথা তাঁরা শুন্‌লেন না, যা শুন্‌লেন তাও বিশ্বাস করতে পারলেন না।

আমি কুকুর বিড়ালের মত বিতাড়িত হয়ে, শ্বশুর বাড়ীর ডোবার ধারে সারারাত কেঁদে কাটিয়ে ভোরবেলা পিসির সাথে ফিরে এলাম। জন্মের মত শ্বশুর বাড়ীর পথে আমার কাঁটা পড়ে গেল।

বাবা আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন "সেখান থেকে ফিরে এলি কেন পার্ব্বতী? কাকে দেখ্‌তে এলি? চরণ তো আর নেই, কাবুলিওয়ালা তাকে নিয়ে গেছে। যখন টুপটাপ বৃষ্টি পড়্‌ছিল সেই সময় তাকে নিয়ে গেছে।"

পিসি বাবার কথা ভাল করে না শুনেই বলে উঠ্‌লো "কাবুলিওয়ালা ঘরে ঢুকেছিল বলে তারা পার্ব্বতীকে ঘরে নিলে না, তাড়িয়ে দিলে।"

"তাড়িয়ে দিলে! পার্ব্বতীর মা নেই, ভাই নেই, বাপও নাই বল্লেই চলে, ঘরও রইল না। মা আমার, তোর আমি এ কি করলাম? তোর কি দশা হবে?" বলে বাবা চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন।

আঘাতের পর আঘাতে আঘাতে বাবার মাথার গোলমাল হয়ে গেল। জ্ঞান বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে লোপ পেতে লাগ্‌লো। সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধ করে বাবা এক বুলি ধরলেন 'টুপটাপ কাবুল কাবুল।

ঘরে কাবুলিওয়ালা ঢোকার অপরাধে শ্বশুর বাড়ীতে স্বামীর কাছে যার জায়গা হল না, তার জায়গা কোথায় হবে? বিশেষতঃ কপর্দ্দক হীন পাগলকে নিয়ে।

বেশীদিন গাঁয়ে বাস করতে পারলাম না। দুঃখের চরম দুঃখ পেয়ে, অপমানের চূড়ান্ত অপমান স'য়ে বাবার হাত ধরে একদিন এই অজানা পথেই আমার পা বাড়াতে হল।

মুক্তাপিসির জামাইয়ের এখানে দোকান আছে। তিনি সপরিবারে বাসা করে থাকেন। আমি তাদের কাছেই থাকি, কিন্তু তাদের খাই না। যাঁতায় গম ভেঙ্গে, ভাল করে যা রোজগার করি তাতেই আমাদের বাপ বেটির স্বচ্ছন্দে চলে যায়। বাবা ঘরে থাক্‌তে পারেন না, নিজের ঘর হারিয়ে পথকেই তিনি ঘর করে নিয়েছেন। সমস্ত দিন নানান পথে পথে ঘুরে রোজ রাতে বাবা এখানে আসেন, এইখানেই শুয়ে থাকেন। দিনে তাঁকে কিছু খাওয়াতে পারি না; রাতে খেতে তাঁর আপত্তি হয় না। এখানেই খাবার এনে দিই। বলিয়া তরুণী সযত্নে আনীত খাদ্যদ্রব্যের ঢাকাটি খুলিয়া আমাকে দেখাইল।

আমি করুণায় বিগলিত হৃদয়ে মণিব্যাগের মধ্য হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া আস্তে আস্তে কহিলাম "এই সামান্য কিছু নাও, এ'তে দিন দুই তোমাদের খাওয়া চল্‌বে। আজ আমার সঙ্গে বেশী কিছু নেই, দিতে পারলাম না।"

তরুণী শশব্যস্তে হাতখানা সরাইয়া ধরা গলায় বলিল "বাবু আপনার দয়ার শরীর এ দয়া আমার চিরকাল মনে থাক্‌বে। আপনি আমার অপরাধ নেবেন না, দোষ ধরবেন না। আমি কিছু নিতে পারব না, আমার জো অভাব নেই। বাবা দিনে খান না বলে আমিও দিনের বেলা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমি যা রোজগার করি তাতে একবেলার খাওয়া আমাদের ভাল ভাবেই হয়। আপনার কাছে আমার একটি ভিক্ষা—বাবা যদি কখনো আপনাদের পাড়ায় যান, আপনি দয়া করে বাবাকে একটু দেখ্‌বেন, দুপুরে রোদে একটু জল খেতে দেবেন।"

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম। আমার মানস চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল শ্যামল বৃক্ষশ্রেণী বেষ্টিত একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহারই অভ্যন্তরে একটি মৃণ্ময় কুটীর, রোগশয্যায় শায়িত রুগ্ন বালকের মলিন মুখ, ভীতা ত্রস্তা কিশোরীর আপনাকে লুকাইবার ব্যগ্রতা। আর দ্বারে আগত পাঁচটা নর রাক্ষসের সহিত একটি নিরুপায় হতভাগ্য পিতার প্রাণপণ যুদ্ধ।

মোড় ঘুরিতে একবার পশ্চাতে চাহিলাম, ভাল করিয়া কিছুই দেখা গেল না। আমার ভারাক্রান্ত হৃদয়টাকে আরও ভারাক্রান্ত করিয়া, নৈশ পবনে ভাসিয়া আসিল "টুপটাপ্ কাবুল কাবুল।"

ভিজিয়ানাগ্রাম

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কিছুদিন হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বেড়ানর নেশা বাঙ্গালীর বেশ মজ্জাগত হইয়া পড়িতেছে। এখন কোন একটা ছুটী উপলক্ষে তাহারা সব ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িবার মত সাহস করিয়াছে। এখন আর মনে হয় না বিদেশবিভূঁই স্থান পরিচিত লোক নাই—কোথায় গিয়া উঠিব? কোথায় থাকিব—আহারাদির কি ব্যবস্থা হইবে? এই সকল অনভিজ্ঞ অজ্ঞাতগুলিকে সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। এখন আর চালচিঁড়া বাঁধিয়া বিষয় সম্পত্তি উইল করিয়া ঘরের বাহির হইবার কুসংস্কার ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালীর নিকট হইতে একরূপ বিদায় লইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

জ্ঞানই মানুষকে সত্যের অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। মানুষের অন্তর্নিহিত অজ্ঞাত চেষ্টা অহরহ সেই সত্যের সন্ধানে প্রেরণা দিয়া আসিতেছে। সেই নিমিত্ত বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়, ঘরের বাহিরে যখন মানুষ প্রকৃতির সম্পদের মধ্যে গিয়া পড়ে তখনই সে তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিত সত্যের বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া পড়ে তাই সে তার বাহিরের সহিত প্রথম পরিচয়ে, প্রবাসকে, প্রকৃতিকে চিরপরিচিত পরম আত্মীয়ের মত পরম সমাদর করিয়া থাকে; তাই তার মন অনুক্ষণ প্রবাসের প্রিয়সঙ্গকে পরিপূর্ণভাবে পাইবার জন্য অন্তরে অধীর হইয়া "বেড়ানর নেশাটাকে" ছুটী বা অবসরের অপেক্ষায় জাগাইয়া রাখে। এই নিমিত্ত আজকাল বঙ্গসাহিত্যের ভিতর দিয়া ভ্রমণ কাহিনী পড়িবার জন্য বিশেষ আনন্দে উদ্গ্রীব হইয়া থাকি কিন্তু সত্যসত্যই ভ্রমণকাহিনী পড়িয়া তৃপ্তির পরিবর্ত্তে অতৃপ্তি লাভ করিয়া হতাশ হইয়া পড়ি।

এখন পদব্রজে ভ্রমণ বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ ভ্রমণ যদি একটা মাত্র মাসিকের কলেবর সুশোভন করিয়া থাকে তাহা সহজে দেখিবার বা যাইবার মত স্থান গৃহী বাঙ্গালীর সাধ্যাতীত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সাধুসন্ন্যাসীর মুখের কথা বা বচা কথা বলিয়া অনেক সময় ভ্রম যে উৎপাদন করে না একথা সহজে অস্বীকার করা অসাধ্য। যাহা হউক বর্ত্তমান সভ্যতার উন্নত যুগে নানাবিধ যানবাহনের ভ্রমণ কাহিনীর অশেষ মর্য্যাদা বাড়িয়া গিয়াছে। তাহা ভ্রমণ কাহিনী বা যে কাহিনী হোক, তেমনি ভ্রমণের নৈকট্য বা দূরত্ব লইয়া বড় একটা আসে যায় না। সহরের বাহিরের দুইটা কথা হইলেই হইল। তেমন কথা সহস্রবার শ্রুত হইলেও সৌখীন সহর-বাসীর পক্ষে এবং তাহাদের অন্তঃপুরবাসিনীগণের নিকট বড়ই মুখরোচক হইয়া থাকে।

যাক, আপনাদের যে কথা বলিতে বসিয়াছি সেই সংবাদ দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য। ঠিক স্মরণ নাই সেবার সঙ্গীহারা হইয়া মনটা বড় খারাপ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং একাই বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের মান্দ্রাজ মেলে গিয়া উঠিয়া বসিলাম। গন্তব্য স্থানের কোন ঠিকঠিকানা ছিল না। টিকিট কিনিয়াছিলাম বহরমপুর পর্য্যন্ত। বহরমপুরের বিষয় যদিও আমার তেমন কিছু জানা ছিল না তবে শুনিয়াছিলাম উহা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান আর মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির ভিতর। বহরমপুরের নিকটেই সমুদ্রের উপর গোপালপুর বন্দর সেখানকার জলহাওয়া খুবই স্বাস্থ্যকর। স্থানটার প্রাকৃতিক দৃশ্যও নাকি অতি মনোরম। সেই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সেখানকার টিকিট কিনিয়াছিলাম। ভোরের সময় একদল যাত্রী পুত্র-পরিবার লইয়া মহা উৎসাহে নামিয়া গেল খুরদারোড ষ্টেশনে। মা যশোদার মত গোপালের বাল্যভোগ লইয়া কেলনার কোম্পানীর নিমকের খানসামাগুলি মাখম ও রুটী লইয়া গাড়ীর দ্বারে দ্বারে যাত্রীগোপালের অনুসন্ধানে যথারীতি ঘুরিয়া গেল।

যাহারা খুরদারোডে নামিয়াছিল, তাহারা ছিল জগন্নাথ ও সমুদ্রদর্শন প্রয়াসী। গাড়ী এখানে একরূপ খালি হইয়া গেল। বাঙ্গালী যাত্রী আমার কামরায় ত শূন্য হইযাইছিল, সমগ্র ট্রেণখানিতে যে আর একজনও ছিল না তাহা ততক্ষণ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রম্ভা ষ্টেশনে গাড়ী থামিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি একা সঙ্গীহারা— এবার দেখিতেছি বাঙ্গালীজাতিহারা। তন্নতন্ন করিয়া প্রত্যেক গাড়ীখানি অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম সবেধন নীলমনি একা আমি ছাড়া দ্বিতীয়মের নাস্তি। মনে মনে খুব হাসি পাইল। কতবার কত স্থানে কত বেশে ভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয় করার মত এমন নিঃবাঙ্গালী যাত্রীগাড়ীতে জীবনে আর কখন বুঝি আরোহণ করি নাই। যাহারা আমার সহযাত্রী ছিলেন তাহাদের বাক্যালাপ করা বা তাহাদের কথার রসাস্বাদ গ্রহণ করা বড়ই সুকঠিন ব্যাপার। তাহাদের মধ্যে অনেকেই চতুঃসীমা মুণ্ডিত মস্তক মাদ্রাজী আর ছিল কতকগুলি বাঙ্গালী বিহার উড়িষ্যার আর একটা অপূর্ব্ব সংমিশ্রিত জাতি বলিলে বোধহয় অন্যায় বলা হইবে না; কারণ তাহাদের কথোপকথনের ভিতর এই তিনটি বিভিন্ন প্রদেশের ভাষার সংমিশ্রণ যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছিল। আর একদল লোক ছিল তাহাদের পরিচয়ে জানিলাম, তাহারা তেলুগু। ইহাদের সহিত আলাপ করিতে এবং ইহাদের পরস্পরের কথাবার্ত্তা শুনিতে বিশেষ আনন্দ আছে। উহারা যখন নিজেদের মধ্যে তাড়াতাড়ি কথা বলে, যদিও তাড়াতাড়ি কথা বলাই তাহাদের স্বাভাবিক অভ্যাস তথাপি আমাদের নিকট বড়ই হাস্যোদ্দীপক। তাহাদের ভাষার নমুনা দিবার শক্তি আমার না থাকিলেও তবু তাহার একটা খুব কাছাকাছির আভাষ দিতেছি। একটি শূন্য কেরাসিনের টীনের ভিতর কেহ যদি কতকগুলি পাথরের টুকরা রাখিয়া ঐ টীনটি ক্রমাগত নাড়েন, তাহা হইলে টীনের অভ্যন্তর হইতে যে তীব্র শ্রুতিকর্কশ এক অপূর্ব্ব শব্দ উত্থিত হয় তাহার সহিত ইহাদের ভাষার সম্পর্ক বিদ্যমান আছে বুঝিবেন, এবং সে শব্দ উপলব্ধির জন্য পাঠকের বিশেষ চিন্তা বা গবেষণা করিবার মোটেই প্রয়োজন হইবে না। এখন ভাবিয়া দেখুন—অবশ্য আমার সহযাত্রীগণের নিন্দা করিতেছি না—তাহাদের সহিত আলাপ করার লোভ আমার কতখানি থাকা সম্ভব! সুতরাং আমার পক্ষে মুখ বুজিয়া থাকাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল।

বেলা আন্দাজ আটটার সময় পবনগতি মাদ্রাজ মেল, রম্ভা ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। রম্ভা চিল্কাহ্রদের উপর, চিল্কা হ্রদের সৌন্দর্য্য নয়ন মনোমুগ্ধকর। খুরদা-রোড হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর সহসা প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। খুরদা পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সেই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা শ্যামায়মান সবুজ শোভা যেন সারা পথ সঙ্গে সঙ্গে চলে কিন্তু "গঞ্জামের" মধ্যে গাড়ী যেমন প্রবেশ করে অমনই যেন বাঙ্গালার মন্থরগতি, লজ্জানম্র সদা প্রসন্ন-আনন, লাবণ্যময়ী কুলবধূর মত প্রকৃতি সতী ধীরে ধীরে অকস্মাৎ লুকাইয়া পড়েন। সম্মুখে ভাসিয়া উঠে যেন প্রবলা নারীর অবজ্ঞা সঞ্জাত একটি অনুগত চিত্তের মত প্রকৃতির তীব্র, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অকরুণ মূর্ত্তি। সে দৃশ্য সহসা যেন বাঙ্গালার মানুষের কোমল মনের মধ্যে একটা ঔদাস্যের নিবিড় অবসাদ টানিয়া আনে।

খুরদা হইতে আসিতে পথে চিল্কা হ্রদ পড়ে। এই সুবিশাল হ্রদটী উড়িষ্যা ও গঞ্জামের মধ্যে দুইটী দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। চিল্কা হ্রদ অনেক মাইল ধরিয়া মান্দ্রাজ মেলের সঙ্গে সঙ্গে রেল লাইনের পাশে পাশে ছুটিয়া চলিয়াছে। অনেক সময় মনের মধ্যে আশঙ্কা হয় যদি সামান্য তরঙ্গ উত্থিত হয় তাহা হইলে লাইন ডুবিয়া যাইবে। গাড়ীর জানলা দিয়া মুখ বাহির করিয়া চিল্কাকে বেশ দেখিতে দেখিতে যাওয়া যায়। চিল্কার মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ। তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত ঐ দ্বীপপুঞ্জের চতুর্দ্দিক জলতরঙ্গ পরিখা পরিবেষ্টিত। দ্বীপগুলিকে শ্যামল বনরাজী পরিবেষ্টন করিয়া আছে। চিল্কার দিগন্তব্যাপী নীল জলরাশি চক্রবালে আকাশের কোলে সোহাগ উচ্ছ্বাসে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তাহার বক্ষের উপর যেন ভাসমান দ্বীপপুঞ্জগুলি কোন এক সুনিপুণ চিত্রকরের মোহিনী তুলিকার অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি বলিয়া ভ্রম হয়। বিশ্বশিল্পীর বিচিত্র লীলার বিভূতিময়ী প্রকৃতি

সতী এখানে যেন তার সকল সৌন্দর্য্য, সকল সম্পদ, সকল ঐশ্বর্য্য রিক্ত হইয়া বিলাইয়া দিয়া এক নূতন ভুবন-ভোলান রূপে আপনাকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে।

যাঁহারা চিল্কা হ্রদ দেখিতে আসেন তাহারা রম্ভায় নামিয়া চিল্কা হ্রদ দেখিয়া থাকেন। ষ্টেশনের নিকটেই একটি সুন্দর ডাকবাঙ্গলা আছে। এই বাঙ্গলাটি কালিকোটের রাজার যত্নে সংরক্ষিত। রম্ভায় কালিকোটের রাজার চিল্কা হ্রদের উপর একটি সুরম্য প্রমোদভবন আছে। রাজা মাঝে মাঝে সপরিবারে এখানে আসিয়া অবস্থান করেন—হ্রদের উপর তাঁহার একখানি ষ্টীমলঞ্চ সর্ব্বদা ভাসমান দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিলাম তাঁহারা গ্রীষ্মকালে উক্ত লঞ্চে আরোহণ করিয়া হ্রদে ভ্রমণ করেন এবং রজনী যাপন করেন। রম্ভা ষ্টেশনে সুপক্ক রম্ভার যথেষ্ট আমদানী দেখিলাম।

বেলা ১১টার সময় বহরমপুরে আসিয়া পৌছিলাম। ষ্টেশনে নামিয়া দেখিলাম জনকয়েক বাঙ্গালী ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে প্লাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের দেখিয়া আমার যথেষ্ট আনন্দ হইল। কথা কহিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাচিব ভাবিয়া অনেকটা সুস্থ হইলাম। এখানে যে বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ পাইব এমন আশা কল্পনায়ও আনিতে পারি নাই—সুতরাং তাহাদের দেখিয়া আমার যে কতখানি আনন্দ হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না সুদূর প্রবাসে বাঙ্গালীকে দেখিয়া বাঙ্গালীর প্রাণে যে কি উল্লাস ও উৎসাহ জাগিয়া উঠে তাহার শতাংশের একাংশও বুঝি বাংলার মাটীতে বসিয়া বোঝা যায় না। মুহূর্ত্তের দর্শনে তাহারা যেন কতদিনের পরিচিত আত্মীয় বলিয়া মনে হয়—তাহারাও যেন সমাগত অপরিচিত অতিথিকে আকুল আগ্রহে পরম উৎসাহে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া দেয়। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই আমার নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং কোথায় আসিয়াছি কোথায় যাইব কোথায় থাকিব বহু প্রশ্নে অস্থির করিয়া তুলিলেন। আমার জিনিসপত্র নামাইবার ব্যবস্থা করিয়া পূর্ব্বেই তাঁহারা কুলি দিয়া সমস্ত নামাইয়া লইলেন, শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন দেখুন সব জিনিস নামান হইয়াছে কি না। এইসময় আর একজন বাঙ্গালী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে দূর হইতে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন, আমি এতক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। তিনি আসিয়া একেবারে ছেলেমানুষের মত একেবারে আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং প্রবল উৎসাহে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "কি বাবা তুমি যে এমন টিকিওয়ালা ইণ্ডিল-বিণ্ডিলের দেশে সহসা উদয় হবে তাত কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নি।" সেই বাঙ্গালীটি আমার বাল্যবন্ধু শরতচন্দ্র তাহা জানিয়া, আমিও তাহার গলা ধরিয়া বলিলাম আমি ত সবে পদার্পণ করেছি টিকিওয়ালার দেশে, তুই দেখছি ত একেবারে এখানে পুরোণো হয়ে গেছিস—ব্যাপার কি বল দিকি তুই কতদিন—তুইও কি আমার মত দেশ ভ্রমণ করতে বেরিয়ে পড়েছিস নাকি? শরত হাসিয়া উত্তর করিল পয়সা খরচ করে দেশভ্রমণট্রমণ আমার কুষ্ঠীতে লেখে নি—সখ টখ নয় পেটের দায়ে পড়ে, বুঝলে কি না—নাকে দড়ি দিয়ে টেনে এনেছে। যদিও কখন তেমন দুর্ব্বুদ্ধি হয় তবে বাবা এমন কাছাওলা মেয়েমানুষের দেশে যেন আসতে না হয়। খুঁজে খুঁজে তুই বুঝি আর দেশ পেলি না—তাই এই পাগল বালির দেশে এসে হাজির হলি। যাক্ সে সব কথা তখন পরে হবে এখন আমার বাসায় চল।

শরতের সহিত আমার পরিচয় আছে জানিয়া অন্য অন্য বাঙ্গালীরা বিশেষ আনন্দিত হইয়া সকলেই আমাদের অনুসরণ করিলেন। শরৎ রেলের চাকরী লইয়া এখানে আসিয়াছে। ষ্টেশনের নিকটেই রেলকোম্পানী-প্রদত্ত বাসা, বাসাটী খুব সুন্দর। বাহিরে বৈঠকখানা। ভিতরে তিনখানি ঘর এবং বাড়ীর সংলগ্ন একটুখানি জমীর উপর শরতের ও তার স্ত্রীর স্বহস্ত রোপিত সব্জীর ক্ষুদ্র বাগান। শরৎ পরিবার লইয়াই বাস করিতেছিল; সুতরাং যত্ন আদরের কোন ত্রুটী হইল না—আমারও মনে হইল যেন আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া আবার ঘরে আসিয়া উঠিলাম। সারা দিনের মধ্যে সকল বাঙ্গালীর সহিতই আমার বন্ধুত্ব হইয়া গেল—একদিনেই যেন কতদিনের পরিচিত হইয়া পড়িলাম। সারাদিন ধরিয়া রেলের মালগুদাম, ষ্টেশন, কেলনার কোম্পানীর হোটেল, টিকিট অফিস্, চেক অফিস্ যেখানে সেখানে বাঙ্গালী ছিল সমস্ত স্থানে আড্ডা দিয়া ফিরিলাম। পিঞ্জরমুক্ত পাখীর মত উড়িয়া বেড়াইবার আকাঙ্ক্ষা আমার মনের মধ্যে গুমরিয়া উঠিতেছিল। সেদিন

সন্ধ্যার সময় শরতের বাসায় আর আহারাদি হইল না। অডিট ইন্সপেক্টার পূর্ণবাবু শরতকে শুদ্ধ তাহার বাসায় সান্ধ্য ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। বহরমপুরে যে কজন বাঙ্গালী ছিল—সন্ধ্যার সময় পূর্ণ বাবুর বাসায় আসিয়া সকলে সমবেত হইলেন। গানবাজনা গল্পগুজবে ও হাস্যকোলাহলে সুদূর বহরমপুরকে বাঙ্গালা দেশে পরিণত করিয়া ফেলা হইল। আমি যে সময় বহরমপুর গিয়াছিলাম—সে বৎসর সেখানে সমস্ত বাঙ্গালী মিলিয়া কালীপূজার উদ্যোগ করিতেছিলেন। আমাকে পাইয়া পূজার উদ্যোগআয়োজন আমারই উপর ন্যস্ত করিলেন। কারণ মধ্যাহ্নে তাঁহারা কাজ কর্ম্মের জন্য অফিসে যান এবং আমার কোন কাজ না থাকায় আমাকেই তাহারা এই নূতন কাজে নিযুক্ত করিল। আমিও মহা উৎসাহে কালীপূজার ব্যবস্থায় লাগিয়া গেলাম। কোথায় আসর হইবে, কেমন করিয়া আসর সাজাইতে হইবে, লোকজন বসিবার কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, ম্যারাপ কতবড় বাধিতে হইবে— কোথা হইতে কতবড় প্রতিমা আনা হইবে, আহারাদির কিরূপ ব্যবস্থা করা হইবে—আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা কিরূপ করা যাইবে এই সকল লইয়া আমি বিব্রত হইয়া পড়িলাম। প্রবাসে আসিয়া এই কাজগুলি আমাকে এক অভিনব আনন্দের আস্বাদ প্রদান করিল।

তখনও কালী পূজার ১০।১৫ দিন বাকি ছিল। উদ্যোক্তাগণের আদেশ মত পরিচয় পত্র লইয়া দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য টঙ্গা চাপিয়া মহাউৎসাহে যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিলাম। এই উপলক্ষে সারা বহরমপুর সহরটীর সহিত আমার পরিচয় হইয়া গেল। ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় দুই মাইল ব্যবধান। সহরটী পুরাতন। বহু লোকের বাস। অনেক পুরাতন অট্টালিকা দেখিয়া ইহার প্রাচীনত্ব অনুভব করা যায়। সন্ধ্যার পর শরতের বাসায় কালী পূজার পরামর্শ বৈঠক বসিতে আরম্ভ করিল। বৈঠকে স্থির হইল কালীপূজা করিতে হইবে আমাদের বাঙ্গালা দেশের রীতিনীতি বজায় রাখিয়া এবং আহারাদির ব্যবস্থাও হইবে খাঁটি বাংলা দেশের মত। এদেশের লোককে এই পূজা উপলক্ষে আমাদের দেশের আচার ব্যবহারের সহিত একটা পরিচয় করাইয়া দেওয়া যাইবে। কলিকাতা হইতে পুরোহিত লইয়া যাইবার জন্য পত্র দেওয়া হইল। কটকে মায়ের প্রতিমা গড়াইতে দেওয়া হইল। ভীমনাগের দোকান হইতে সন্দেশ এবং নবীনময়রার দোকান হইতে রসগোল্লা লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হইল।

রেলওয়ের যত সাহেবেরাও এই কালীপূজায় যোগদান করিলেন। রেলওয়ের কণ্ট্রাক্টার আসিয়া মেরাপ বাধিবে স্থির হইল। কোন জিনিসেরই অভাব রহিল না। শত শত অর্থব্যয় করিয়া যাহা করা দুঃসাধ্য রেলকোম্পানীর বাবু ও সাহেবদের উৎসাহে ও উদ্যোগে চক্ষের নিমিষে তাহা সম্পাদিত হইতে লাগিল। সে কি উৎসাহ, কি আনন্দ কি সহানুভূতি! প্রবাসিনী বাঙ্গালীর মেয়েরা পূজার খুঁটিনাটি আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। এই পূজা উপলক্ষে সকলের প্রাণ ও মন এক হইয়া গেল। এ দৃশ্য জীবনে আর কখন দেখিব কিনা জানি না।—সে দিনের কথা মনে হইলে এখনও আমার নয়ন আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। অন্তরের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা দেয়।

বহরমপুরে এক দিকে অনন্ত জলধি, অপর তিন দিকে পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত। রাত্রিতে শয্যায় শুইয়া সমুদ্রের তরঙ্গগর্জ্জন খুব সুস্পষ্ট শ্রুতি গোচর হয়। মনে হয়, বুঝি এখনি ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। প্রথম রাত্রিতে আমি ভয় পাইয়াছিলাম। এখানে রেশমের ব্যবসা বেশ একটা বড় ব্যবসা। এ অঞ্চলেও ঘৃত খুব উৎকৃষ্ট। মাড়োয়ারী ভ্রাতাগণ এখানে রীতিমত ব্যবসা করিয়া থাকেন। এই স্থানটি বর্ত্তমান সীমা অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি রাজা ও জমিদার বাস করেন। শুনিলাম তাঁহাদের আয় ও যথেষ্ট। ইঁহারা কলিকাতার বড় বড় ইংরাজ ব্যবসায়ী-গণের পৃষ্টপোষক। তাহাদের অর্থেই এই সকল ব্যবসায়ী গণের উন্নতি। কালীপূজা উপলক্ষে প্রায় ২৫০০৲ টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছিল। অনেকগুলি রাজা নিজ নিজ নাম অপ্রকাশ রাখিয়া চাঁদা দিয়াছিলেন। তাঁহারা নাম দিতে ভয় পাইয়াছিলেন। কারণ কালীপূজা, শক্তিপূজা এবং তাহা বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হইতেছিল, সে এই 'ধর পাকাড়ের' দিনে; কি জানি, এই পূজার ভিতর কোনরূপ রাজনৈতিক গন্ধ কোন দিক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ত আর রক্ষা থাকিবে না। কৈফিয়তের তাড়নায় যে অস্থির হইয়া উঠিতে হইবে।

পূজার তিন দিন থাকিতে পরামর্শ বৈঠক হইতে স্থির হইল আমোদ প্রমোদের জন্য আমাকে ভিজিয়ানাগ্রামে নর্ত্তকী নির্ব্বাচন করিয়া আনিতে হইবে। আর একজন কটক হইতে নর্ত্তকী আনিতে চলিয়া গেলেন। ব্রেকে অতি যত্নে গার্ডসাহেব প্রতিমা আনিয়া হাজির করিলেন। রেলওয়ের কন্‌ট্রাকটার বৃহৎ পাণ্ডাল প্রস্তুত করিল, সারা বহরমপুর এই নূতন আনন্দ আয়োজনে সজীব হইয়া উঠিল। দলে দলে লোক আসিয়া পাণ্ডালের চতুর্দ্দিকে ভিড় করিয়া কি হইবে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। রেলওয়ে প্লাটফরম হইতে ২ মিনিটের পথ যেখানে পাণ্ডাল প্রস্তুত হইয়াছিল, রেলযাত্রীরা গাড়িতে বসিয়া তাহা দেখিতে পাইতেন।

আমার মত অনভিজ্ঞ লোকের উপর নর্ত্তকী নির্ব্বাচনের ভার পড়ায় দুর্ভাবনা রাখিবার স্থান রহিল না। আমি ভারতবর্ষে প্রধান সহর কলিকাতাবাসী, আমি নর্ত্তকী নির্ব্বাচনে অক্ষম একথা কি জানি, কেন তখন প্রকাশ করিতে লজ্জা যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া আমার মাথার উপর চাপিয়া পড়িল। আমি এ প্রস্তাবে কোনরূপ আপত্তি করিবার সুযোগ খুঁজিয়া পাইলাম না। ষ্টেসন মাষ্টার তখন একজন সাহেব ছিলেন। তিনি আমাকে নর্ত্তকী নির্ব্বাচন কার্য্যে একজন পারদর্শী ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করিলেন এবং সেজন্য অনুরোধ করিতে ও ছাড়িলেন না।

সেই দিনই সেকেণ্ড ক্লাস পাস ইস্যু করা হইল এবং মান্দ্রাজ মেলে আমি ভিজিয়ানাগ্রামে যাত্রা করিলাম। ভিজিয়ানাগ্রামের হেড মাষ্টার ছিলেন বাঙ্গালী এবং বহরম পুরের একজন উকিলের জামাতা। তাঁহারই উপর আমাকে এইমর্ম্মে একখানি পরিচয় পত্র দেওয়া হইল যে তিনি আমাকে নর্ত্তকী মহলে লইয়া যাইবেন এবং আমি নির্ব্বাচন করিব। যেদিন আমি ভিজিয়ানাগ্রাম যাত্রা করি, তাহার পূর্ব্বদিন "ইচ্ছাপুরম" ষ্টেশনে নামিয়া সুরঙ্গীর রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। রাজা তেলুগু হইলেও বেশ বাংলা জানেন। তিনি যথেষ্ট সমাদর করিয়া তাঁহার রাজভবন আমায় দেখাইলেন। আহারাদির পর তিনি তাঁহার ফটোগ্রাফী ডিপার্টমেণ্টে, টেলিফোন ডিপার্টমেণ্টে, ইলেক্‌ট্রিক ডিপার্টমেণ্ট সব সঙ্গে করিয়া লইয়া দেখাইলেন। রাজা খুব সাধাসিধে লোক হইলেও তিনি যে একজন সৌখীন ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শেষে তাঁহার লাইব্রেরী কক্ষে গিয়া নানাবিধ গল্প গুজব চলিতে লাগিল। তিনি যে বাংলা পড়েন সেজন্য বেশ আগ্রহ করিয়া তাঁহার বাংলা বইগুলি আমাকে দেখাইলেন। দেখিলাম তিনি বাংলা কাগজ পত্রের তত বেশী সংবাদ রাখেন না—একমাত্র বঙ্গবাসী কাগজের তিনি গ্রাহক—এই বঙ্গবাসী কাগজখানি তাঁহার বাংলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার পরিচয়। যে বাংলা বইগুলি তাঁহার আছে প্রায় সমস্তগুলি বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ের প্রকাশিত। বঙ্গবাসীর বিজ্ঞাপন দেখিয়া পুস্তকগুলি কিনিয়াছেন বুঝিলাম। পরে জানিলাম রাজা বেশ সুরসিক এবং কবি, কারণ তিনি তাঁহার কবিতার খাতা বাহির করিয়া উৎকল ভাষায় রচিত অনেকগুলি ত্রিপদী ছন্দের কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইলাম। কবিতাগুলি আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। তিনি এমন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ কবিতাগুলি যদি বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইবেন। তাঁহার সৌজন্য মিষ্টকথা ও অতিথি সৎকার আজও আমার স্মৃতিপথ হইতে মুছিয়া যায় নাই।

মান্দ্রাজ মেলে বেলের ৪টার সময় ভিজিয়ানা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বহরমপুর হইতে ভিজিয়ানা গ্রাম পথটা একা একটি কামরার মধ্যে মুখ বুজিয়া কয়েদি আসামীর মত আসিতে যে কি কষ্ট হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। পালাসা ষ্টেশন হইতে দূরে সমুদ্র দেখা যায়—সেখানটা বরং একরূপ ভাল লাগিয়াছিল—কিন্তু তাহার পর হইতে ১৫।২০ মাইল অন্তর এক একটি ষ্টেশন এবং ষ্টেশনে তেলুগু বা মান্দ্রাজী ষ্টেশন মাষ্টার। প্যাসেঞ্জারের তত ভিড় নাই—দু-একজন উঠিতেছে নামিতেছে। কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই—যাহা ক্ষণকালের জন্য বিদ্রোহী মনকে শান্ত করিতে পারে। ষ্টেশনে কোন প্রকার খাদ্যাদি পাওয়া যায় না। কেবল দুধ আর কলা—সারা পথ জুড়িয়াই আছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে—কেবল ধূ ধূ প্রান্তর—তরুলতাবিহীন কঠিন কর্কশ পর্ব্বত শ্রেণী। এই কয় ঘণ্টা দেখিতে দেখিতে একেবারে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম—তখন বুঝিলাম বাংলা দেশ কত সুন্দর তাহার

কমনীয় ছবি নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া ক্লান্ত মনকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল।

ভিজিয়ানা গ্রামে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একটী ছোট্ট ষ্টেশনের নিকট দিয়া একটি ক্ষুদ্র তটিনী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার স্বচ্ছ সলিলের দিকে দৃষ্টি পড়ায় এবং অদূরবর্ত্তী তরুলতা সমাচ্ছন্ন একটী পর্ব্বতের পার্শ্বে কয়েকটি ইষ্টক নির্ম্মিত সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়া সেই স্থানটীর মনোরম দৃশ্যাবলী এতক্ষণ পরে একটা নূতন জীবন সঞ্চার করিল। এই নির্জ্জন পাহাড়ের কোলে সহর হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে কোন সুরসিক রসজ্ঞ কবি যে তাঁহার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা জানিবার আগ্রহ অধীর উৎসাহে জাগিয়া উঠিল।

ভিজিয়ানাগ্রামে আসিয়া প্রথমেই সেই স্থানটীর অনুসন্ধান লইয়াছিলাম এবং জানিয়াছিলাম ঐ পর্ব্বত হইতে একটি নির্ঝর নামিয়াছে। এবং সেই নির্ঝর হইতে সারা ভিজিয়ানা গ্রামে জল সরবরাহ করা হয়।

উক্ত স্থানেই ভিজিয়ানাগ্রামের ওয়াটার ওয়ার্কস্ স্থাপিত এবং তাহাও একজন বাঙ্গালী যুবকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ভিজিয়ানাগ্রাম ষ্টেশনটি দেখিতে খুব সুন্দর। সারা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ষ্টেশনগুলির মধ্যে ইহাকে তৃতীয় স্থান দিলে বোধহয় অন্যায় করা হয় না। ষ্টেশন হইতে অল্প দূরেই সহর। এখানে সকল প্রকার গাড়ী পাওয়া যায়। সহরটী ছোট হইলেও খুব সুন্দর। নানাবিধ ব্যবসা বাণিজ্যে সুশোভিত। একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া হেড মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া সহর দেখিতে বাহির হইলাম। চক বাজার সন্ধ্যাবাজার যতদূর সাধ্য ঘুরিয়া সেদিন ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন সকালে তাঁহার সহিত প্রাতভ্রমণে বাহির হইলাম। পথের দুই ধারে দোকানগুলি তখন খুলিতেছে। রাস্তা ঘাট বেশ সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তিনি আমাকে ভদ্র পল্লীর পথে লইয়া চলিলেন কিন্তু সেখানে গিয়া যাহা দেখিলাম—তাহা আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যেক বাড়ীর মেয়েরা নৃত্য এবং গান শিক্ষা করিতেছে। প্রভাতে এই বিচিত্র দৃশ্য আমার মনের মধ্যে এক অভাবনীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হইল। মনে হইল প্রাতঃকালেই কি হেড-মাষ্টার মহাশয় আমাকে বেশ্যাপল্লীতে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আবার সন্দেহ হইল এই সকল বাড়ীর অধিবাসীদের মধ্যে ছেলে মেয়ে পুরুষ স্ত্রীলোক সকলেই বেশ গৃহস্থের মতই সংযত। তবে কি ইহারা বেশ্যা নয়? হেড-মাষ্টার মহাশয়কে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—এগুলি কিসব ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী? তিনি হাসিয়া বলিলেন হাঁ, এখানকার রীতি অনুসারে প্রত্যেক বাড়ীতে প্রাতঃকালে মেয়েরা সঙ্গীত ও নৃত্য চর্চ্চা করিয়া থাকে। যে সব মেয়েরা নৃত্যগীতে অপারদর্শিনী তাহাদের বিবাহের সময় বিশেষ গোল বাধিয়া থাকে। বুঝিলাম এখনও ভারতবর্ষ হইতে নৃত্যগীতের অনুশীলন নষ্ট হইয়া যায় নাই। ইহা এখনও হিন্দু ভারতবাসীর নিকট পবিত্র কলাবিদ্যা বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে। এই দৃশ্য যদি বাংলার কোনও ভদ্র পরিবারে দেখিতাম তাহা হইলে হয় তো তাহাদের ম্লেচ্ছ ও নানাবিধ কটুবাক্যে বিভূষিত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইতাম না।

সেদিন মধ্যাহ্নে ভিজিয়ানাগ্রামের রাজপ্রাসাদ দেখিয়া আসিলাম। প্রাসাদটী কেল্লার অভ্যন্তরে। এই কেল্লাটী ছোট হইলেও সুদৃঢ় সুরক্ষিত এবং প্রস্তরনির্ম্মিত। কেল্লার মধ্যে এখনও ভিজিয়ানাগ্রামের রাজার কিছু ফৌজ আছে। কেল্লাটী পরিখা পরিবেষ্টিত। ভিজিয়ানাগ্রাম সহর হইতে চার মাইল দূরে মহারাজার আধুনিক ফ্যাসানে নূতন রাজভবন প্রস্তুত হইতেছিল। ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার এই কার্য্যের ভার পাইয়াছিলেন। বৈকালে পুসপুস চাপিয়া নব নির্ম্মিত রাজভবন দেখিতে যাইলাম। সে এক বিরাট ব্যাপার। কত লক্ষ টাকা যে ইতিমধ্যে ব্যয় হইয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। নব নির্ম্মিত রাজভবন দেখিতে যাইবার পথের দুইধারে বৃহৎ বৃহৎ আম্রের বাগান। আমরা কলিকাতায় বসিয়া যে সমস্ত মাদ্রাজী আম খাইয়া থাকি তাহা এখান হইতেই রপ্তানী হইয়া থাকে। এক একটী আমের বাগান দীর্ঘে প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধ মাইল করিয়া। প্রত্যেক বাগানেই কলমের গাছ, একটিও বড় গাছ নাই দেখিতে সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোথাও নূতন কলম বসান হইতেছে কোথাও

পুরাতন গাছ কাটিয়া নূতনের স্থান করা হইতেছে। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই সকল আমের বাগানগুলি ইতিমধ্যে মাড়োয়ারীরা গিয়া পত্তনী লইয়া বসিয়াছে। এবং সেখান হইতে আম, চালানের ব্যবসা চালাইতেছে। দুঃখের বিষয় একজন বাঙ্গালীর দৃষ্টিও এদিকে পড়ে নাই। তাহারাও এখানে চাকরী উপলক্ষ্যে আসিয়া চাকরীই করিতেছে। এখান হইতে নাখোদারা হাজার হাজার মণ চীনের বাদাম রপ্তানী করিয়া থাকে। এখানে চীনের বাদামের চাষ প্রচুর হইয়া থাকে।

সন্ধ্যার পর নর্ত্তকী নির্ব্বাচনে নির্গত হওয়া যাইল। অনেকগুলি বাড়ী ঘুরিয়া দুইজন নর্ত্তকী স্থির করা হইল। এই নর্ত্তকী নির্ব্বাচন কাজটা আমার পক্ষে একটা অভিনব ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাদের নির্ব্বাচন করিয়া আনিতে গিয়াছি তাহাদের কোন কথা আমি বুঝি না এবং আমার কোন কথা তিনি বোঝেন না। এ এক অপূর্ব্ব অভিনয়। ইসারা ইঙ্গিতে, মূকের মত ভাব প্রকাশ করিয়া আমার বক্তব্য জানাইতে চেষ্টা করিলাম। আমার তদবস্থা দেখিয়া সুন্দরী নর্ত্তকী মৃদু মধুর হাস্যে আমার অক্ষমতাকে অসম্মানিত না করিয়া বিস্ময়ের আনন্দে অভিভূত করিয়া দিয়াছিল। যাহারা ওয়ালটিয়ার গিয়াছেন তাঁহারা ভিজিয়ানাগ্রামকে পথে ফেলিয়া গিয়াছেন। ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে কয়েকটি ষ্টেশন upএ গিয়া শিম্ভাচলম্ যাইতে হয়। কথিত আছে শিম্ভাচলম পর্ব্বতের উপর হইতে প্রহ্লাদকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। এ যাত্রায় আমায় শিম্ভাচলম যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না। কারণ আমায় নর্ত্তকী লইয়া পরদিনই ফিরিতে হইবে। পরদিন মান্দ্রাজ মেলে উর্ব্বশী, মেনকা না হইলেও দুইজন পরমাসুন্দরী নর্ত্তকী লইয়া বহরমপুরে আসিয়া পৌছিলাম। যথাসময়ে মহা আনন্দের মধ্যে কালীপূজা সমাপ্ত হইয়া গেল আমিও কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। এই কালীপূজা সম্বন্ধে যথেষ্ট বলিবার আছে ভবিষ্যতে তাহা লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

সোজা কথা

শ্রীমতী নলিনী দেবী

সে আমারে ভালবাসে, আমি ভালবাসি তায়,
আমি তারে পেতে চাই, সে আমারে পেতে চায় ;
এর পরেতে কিছু আরো, হয়তো পেলে পেতে পারো,
আমি কিন্তু এর বেশী, ভাই, জানিনা কি পাওয়া যায় !
আমি যখন ব'সে লিখি, প্রিয়া পাশে ব'সে থাকে,
চাইলে পরে কলম ছেড়ে, হাস্যমুখী দেখি তাকে ;
একটুখানি মুচ্‌কে হেসে, যাই যদি তার কাছে ঘেঁসে,
"যাও !" ব'লে সে স'রে, বেশী কাছে আনে আপনাকে !
ব'কি যখন, মাথা নীচু, যা বলি তা শুনে যায়,
যখন বলি 'দূর হয়ে যাও', ঝাঁপিয়ে বুকে এসে হায়—
ঠোঁট ফুলিয়ে বলে "মোরে ব'কলে তো গো অনেক ক'রে
তাড়িয়োনা গো ! ক'রবনা আর, এবার তুমি ক্ষম আমায়'
লজ্জা পেয়ে, বুকে চেপে, অনুতাপে, ভুলাই তায়
মুখ লুকিয়ে আমার বুকে, কাঁদতে থাকে থামান দায় !
দুজনারি চক্ষু জলে, অমর করা সুধা ঝলে,
পেটে যদি ভাত না জোটে, এ প্রেম তবু নাহি যায় !
সে আমারে ভালবাসে আমি ভালবাসি তায়
এটা অতি সোজা কথা, খুব সহজেই বুঝা যায় ॥

শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র

শিল্পী—শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়

লক্ষ্মীবিলাসের সৌজন্যে

Printed by Lakshmibilas Color Studio, Calcutta

মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া

পত্রিকার সার সঙ্কলন

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. বি-এস-সি

সময়ের জ্ঞান--জাতি হিসাবে আমাদের উপর একটা অভিযোগ আছে যে আমরা সময়ের মূল্য বুঝি না--সময়ের পেছনে পড়িয়া থাকাই আমাদের নিয়ম হইয়াছে। যে খুব বেশী দেরী করে সে অবশ্যই সময় হারায় কিন্তু যে চার ঘণ্টা আগে আসে সেও যে তেমনিই সময় হারায় তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। সময়ের চার ঘণ্টা আগে আসিবার জন্য তাহাকে বহু কাজ অবহেলা করিতে হয়। গ্রামের লোক যখন রেলগাড়ী ধরিতে আসে তখন সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই আসে। সে রেলগাড়ী ধরিতে পারে বটে কিন্তু এই জন্য আরো অনেক দরকারী কাজ তাহাকে অবহেলা করিতে হয়। আমরা শিক্ষিত সমাজ সব কাজেই বড় দেরী করিয়া ফেলি। আমাদের সভা সমিতি সময় মত আরম্ভ হয় না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভার কার্য্য আরম্ভ না করাই সাধারণ নিয়ম। একজনের অনুপস্থিতির জন্য শ' শ', হাজার হাজার লোককে অপেক্ষায় থাকিতে হয়। এমনিভাবে যে জাতি অপেক্ষা করিতে পারে তাহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অনেক সুখ্যাতিই করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে তাহার উন্নতির পথে কাঁটা দেওয়া হয়।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব মত সুতা কাটিবার কার্য্যেও আমাদের এই সময় জ্ঞানের অভাবই পরিলক্ষিত হইতেছে। পাঠ করিবার সময় প্রস্তাবটি বেশ সহজ ও সরল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ইহা নিখিল ভারত খাদি প্রতিষ্ঠানের সমস্ত বলাবল পরীক্ষা করিতেছে। সুতার সংগ্রহ, যথাস্থানে প্রেরণ, শ্রেণী নির্ব্বাচন এই ব্যাপারের প্রতিষ্ঠান খুব বড় হওয়া চাই এবং তাহা গঠনেরও খুব যোগ্যতা চাই। ইহার অসুবিধা আরও দশগুণ বাড়ে যদি কর্ম্মীরা সময় মত কর্ম্ম না করে। প্রতি মাসের ১৫ই তারিখ সূতা দিবার শেষ দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বুননকারীদের বেশী সময় দিবার জন্য এ তারিখ ঠিক করা হয় নাই বিভিন্ন কমিটির সেক্রেটারীদের প্রচুর সময় দিবার জন্যই এইদিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নির্দ্ধারিত দিনে যদি বুননকারীরা সূতা দেয় অথবা কর্ম্মীরা তাহা সংগ্রহ করে তাহা হইলে সমস্ত কাজই ভাল ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে। প্রত্যেক প্রদেশই নিজ নিজ দিন ঠিক করিয়া যথাসময়ে নিখিলভারত খাদি প্রতিষ্ঠানে সূতা পাঠাইতে পারেন। বার বার কিছু কিছু না পাঠাইয়া প্রতিমাসে একবার করিয়া পাঠানোই ভাল। ঘড়ির কাটার মত কাজ করিয়া না গেলে ইহা পূর্ণভাবে গড়িয়া তোলা অসম্ভব। বহু কাজে যখন মন দেওয়ার আবশ্যক হয় তখন সময়ের মূল্য বড় বেশী। রেলওয়েতে সামান্য সময় দৃষ্টি এড়াইয়া গেলে যেমন সাংঘাতিক ফল হইতে পারে তেমনি খাদি প্রতিষ্ঠানের সময়ের দিকে দৃষ্টি না দিলে সর্ব্বসাধারণের চরকা চালানোর পক্ষে পরম বিঘ্ন আনা হইবে। বস্তুত সময় জ্ঞান না থাকিলে কোন প্রতিষ্ঠানই গড়া সম্ভব নয়। ভরসা করি বয়ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীরা তাঁহাদের নির্দ্ধারিত সময়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

কাজের কথা
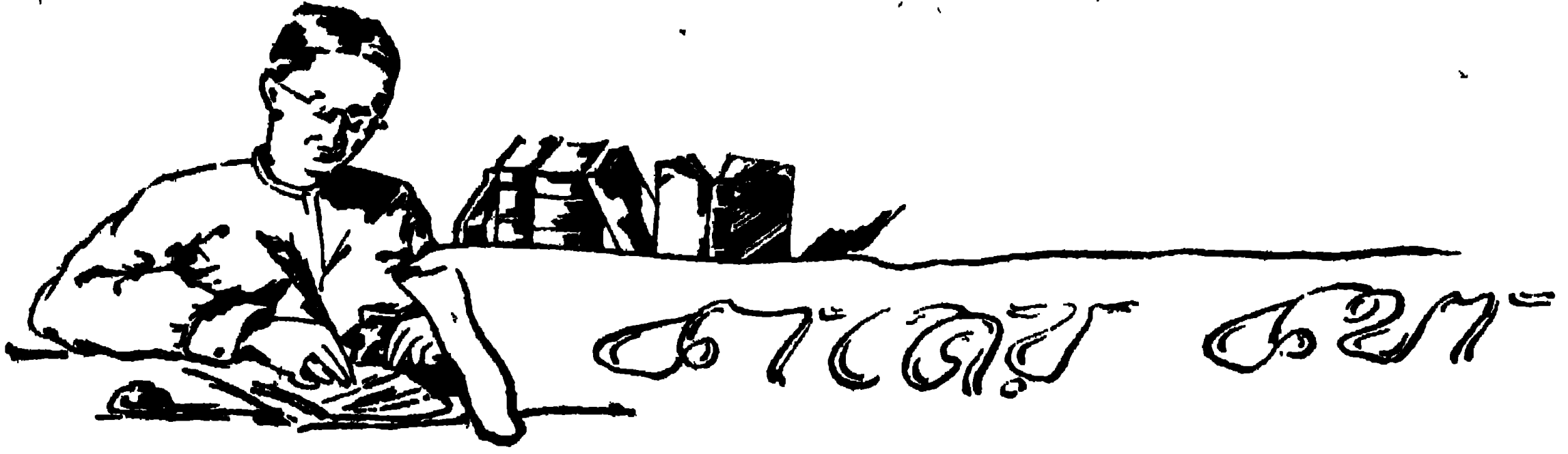
সঙ্কটকালে মহাত্মা :—মাহাত্মা গান্ধী গত পূর্ব্ব মঙ্গলবার কলিকাতায় আসিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অতিথি হইয়া দুই দিন ছিলেন। বাংলার এই সঙ্কটকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে নিতান্ত অসুস্থ শরীরেও মহাত্মা না আসিয়া পারেন নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কোন রকম অব্যবস্থা যখন চরমে উঠিতেছে তখনি সেখানকার কাতর হৃদয়-নিবেদন মহাত্মার মর্ম্ম স্পর্শ করিতেছে। এই সত্যের দেশে মহাত্মা আবার সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন। মিথ্যার প্রভাবে নানা মতবাদ, বিভিন্নতা, নিগ্রহ, নির্য্যাতন গবলশ্বাসে দেশ ছারখারে দিতেছে। সত্য আজ ভাস্বর হইতে চাহিতেছে—তাই মিথ্যা নানারূপে প্রাণপণ শক্তিতে তাহাকে বাধা দিতেছে। সত্য ও মিথ্যার সংগ্রামে হার-জিত কাহার হয় বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য থাকিবে। স্বার্থের দ্বন্দ্বে নির্য্যাতন বা প্রলোভন দুই-ই প্রচুর আসিতে পারে, ক্ষমতার অপব্যবহার যথেচ্ছ হইতে পারে—ইহাতে বিভ্রান্ত হইলে জাতির মুক্তি, সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। মুক্তিকামী ভারতীয় নেতাদের সত্য পথের নির্দ্দেশ করিবার জন্যই এই সঙ্কটকালে মহাত্মার বাংলায় আগমন। নেতৃবৃন্দ যাঁহারা জননায়ক হইয়া জনগণকে পরিচালিত করিবার আশা রাখেন তাঁহারা এখন কি ভাবে চলিয়া দেশকে চালাইতে চাহেন তাহা দেখিবার বিষয়। দেখিতে দেখিতে, নানা ভাবের নানা পরীক্ষা চলিতে চলিতে দেশের সঙ্কট ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। আরো কতকাল এই পরীক্ষা চলিবে?

মহাত্মা দর্শন :—শত নির্য্যাতনেও যে মহাপুরুষ অটল হিমাদ্রির মত প্রশান্ত ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার বীজমন্ত্রে দেশকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন—তাঁহাকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখিবার আশায় লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর কি অপরিসীম হৃদয় ব্যাকুলতা! মুক্তিমন্ত্রের ঋষি, মহামানবতার বাণীর প্রচারক, বাংলাকে তাঁহার কল্যাণ আশীষে পূতঃ করিতে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালী—বাঙ্গালীর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের ভারতীয় নেতৃবৃন্দও তাহা মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। এইবার সে দেব-আশীর্ব্বাদের মর্য্যাদা আমরা রাখিতে পারিব কি না সেই পচেষ্টাই প্রাণপণে করিতে হইবে। তবে মহাত্মা দর্শনের এই ব্যাকুল চাঞ্চল্য জাতীয় হিসাবে সার্থক হইবে।

সঙ্কটকালে দেশের কর্ম্মপন্থা :—মহাত্মা ও স্বরাজপন্থীদের কর্ম্মপন্থা প্রকাশিত হইয়াছে। অহিংস অ-সহযোগ সাময়িক ভাবে মহাত্মা উঠাইয়া লইয়াছেন। কংগ্রেস সভ্যদের ইচ্ছাপূর্ব্বক দৈনিক অর্দ্ধ ঘণ্টা চরকা চালাইতে হইবে। দু'হাজার গজ সূতা প্রতি সভ্যকে মাসান্তে দিতে হইবে। বিভিন্ন দল গঠন না করিয়া এক যোগে এই ভাবে কর্ম্ম চালাইতে হইবে। মহাত্মার বিধানের কঠোরতা হ্রাস পাইয়াছে, দেশের এই বিপদের সময়ে নেতৃত্বের অধিকার প্রয়াসীরা যদি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই কর্ম্মপ্রবৃত্তিও জাগাইতে পারেন তবে দেশের কার্য্য অনেক হইতে পারিবে।

দেশের আর্থিক অবস্থা :—মহাত্মা বলিয়াছেন আর্থিক ভাবে দেশের অবস্থা একটু উন্নত স্বাধীন না করিতে পারিলে জাতির কোন কর্ম্ম প্রচেষ্টাই সফল হইতে পারে না। চরকা দেশকে সেই অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা দিবে। আর্থিক কষ্টে ও পরাধীনতায় দেশ মরিতে বসিয়াছে। তাই ক্রমেই আমরা অধিকারচ্যুত ও হতাশ হইয়া পড়িতেছি। মহাত্মা চরকা দ্বারা জাতির আত্ম প্রতিষ্ঠার গোড়া-পত্তন করিতে চাহেন।

যথেচ্ছাচার ও অসাধারণ বিধান :—মহাত্মা প্রজাশক্তির যথেচ্ছাচার কিম্বা রাজশক্তির অসাধারণ বিধান দু'য়েরই তুল্য নিন্দা করিয়াছেন। ইহার কোনটিতেই দেশের কিছুমাত্র উপকার করিতে পারিবে না এই মহাত্মার ধারণা।

কর্পোরেশনের কর্ত্তব্য:—কলিকাতা কর্পোরেশনের অভিনন্দনের উত্তরে মহাত্মা বলিয়াছেন 'ভাল জল, ভাল বায়ু, ভাল দুধ, ফল, ও সর্ব্বসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাই কর্পোরেশনের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। নবযুগের কর্পোরেশনও সব দিক দিয়া সেই চেষ্টা করিলেই আমরা সুখী হইব। কর্পোরেশনের প্রধান শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে গবর্ণমেণ্ট অসাধারণ বিধানে বিনা বিচারে আটক রাখিয়াছেন ইহাতে মহাত্মা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রকে নিজ কার্য্যে সুপ্রতিষ্ঠ দেখিলেই তিনি সুখী হইবেন।

হিন্দুদের দেবোত্তর ও মুসলমানের ওয়াকফ্ সম্পত্তি—দেশের বড় বড় হিন্দু ও মুসলমান ঘর যাহা ছিল ক্রমেই তাহার পতন হইতেছে। এই সব বড় বড় ঘরের দান ধ্যান, পাল পার্ব্বণ অনেক স্থানেই বন্ধ, অনেক স্থলে এইসব বংশের বংশধরদের অবস্থা চরম শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। অপরিমিত বিলাস ব্যসনে, ঋণে, বিপুল সম্পত্তি, বসতবাটীখানি পর্য্যন্ত বাধা পড়িয়াছে বা একেবারেই হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। একের ভোগে বা যথেচ্ছাচারীতায় এত বড এক একটা বংশের সমৃদ্ধি, লক্ষ্মীশ্রী, গরীমা সব ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এমনি সকল সম্ভ্রান্ত ঘর দেশের আশা ভরসার স্থল ছিল, দেশের লোকে নানা দিকে ইহাদের উপর নির্ভর করিতে পারিত। এখন আর তাহা পারে না। কিন্তু যে যে স্থানে এই সব সম্পত্তির অধিকাংশ বা কিছু অংশ দেবোত্তর কিম্বা ওয়াকফ্ ভাবে বাধা হইয়াছে তাহার ধ্বংস এখনও হয় নাই—কারণ দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তিতে নিলাম চলে না। এই সব সম্পত্তি বংশের নাম তো রক্ষা করিতেছেই তাহার উপর বংশধরদের জীবন ও মান সম্ভ্রমও কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতেছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও যে অনাচার বা একের যথেচ্ছাচার না চলিতেছে তাহা নহে। এমন দু'চারটা অব্যবস্থার বিচার ভার বিচারালয়েও আসিয়াছে। দেশের উন্নত ঘর যাহা ছিল বা এখনও আছে তাহা নিজ বংশের সুনাম রক্ষা করিয়া চলিলে নিজেরাও ধন্য হইবেন দেশও উপকৃত হইবে।

দেশীয় শিল্পের রক্ষা—দেশের কুটীর শিল্প যাহা ছিল অনেক ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে, যাহা কিছু এখনো আছে তাহাও উৎসাহের অভাবে মরণোন্মুখ। নিজেদের শিল্পনীতি আমরা বর্জ্জন করিতেছি তাহার স্থানে কলকারখানারও ব্যবস্থা তেমন কিছু করিতে পারিতেছি না। এ অসুবিধাকে আমরা জাতীয় পরাধীনতার অঙ্গ করিয়া লইয়াছি। ইহার উপর ভারতের সঙ্গে বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতার যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে ভারতীয় শিল্প তাহাতে ক্রমেই বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। এই সব অসুবিধার জন্যই ভারত কাঁচা মালে যথেষ্ট ধনী হইয়াও প্রস্তুত দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী। তাই তাহার কাঁচা মাল লইয়া জগতের ব্যবসায়ীগণ ব্যাপার চালাইতেছে আর ভারত মূল জিনিস জোগাইয়াও ক্রমশঃ নির্ধন ও অন্নবস্ত্রের অভাবে হাহাকার করিতেছে। আধুনিক ট্যারিফ্ প্রথার পরিবর্ত্তন না করিলে দেশীয় শিল্পের উত্থান সম্ভবপর নয়। আমাদের দেশের কলকারখানা যদি বিদেশীয় প্রভাবে টিঁকিয়া থাকিতে না পারে তবে তাহাতে আমাদের ক্ষতি, বিদেশের ষোল আনা লাভ। ফিস্ক্যাল কমিশনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ট্যারিফ্ বোর্ডের সৃষ্টি হইবার পর হইতে ভারতীয় লৌহ শিল্প ট্যারিফের সুবিধা পাইয়াছে। ভারতীয় কাগজ শিল্পের সম্বন্ধে ট্যারিফ বোর্ড সাক্ষ্য লইতেছেন ভারতীয় কাগজের কলওয়ালাদেরও ট্যারিফের সে সুবিধা পাওয়া উচিত। বিদেশী কাগজের আমদানীকারক কিম্বা বিদেশী কলওয়ালাদের ইহার প্রতিবাদী হওয়া সম্ভব কিন্তু এ প্রতিবাদে ভারতীয়েরই ক্ষতি হইবে।

বিদেশী পণ্য যাহা বহুদূর বিদেশ হইতে আসে তাহার ভাড়া যত পড়ে ভারতের একস্থান হইতে অন্যস্থানে তেমন মাল যাইতে তার চেয়ে বেশী ভাড়া লাগে। কিন্তু ট্যারিফ যদি শুধু এইটুকু করিয়া ক্ষান্ত থাকে তাহাতেও দেশীয় শিল্পের তেমন উপকার হইবে না। দেশের শিল্প দ্রব্যাদির উপর অতিমাত্রায় ভাড়া চাপাইয়া রাখা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। ভারতীয় রেলের ষ্টীমারের এমন কি পোষ্টাফিসের ভাড়া পর্য্যন্ত এত বাড়িয়াছে যে তাহাতে ভারতীয় শিল্প উন্নতিতে বিশেষ বাধা পড়িতেছে। ট্যারিফের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থাটি হইলে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি হইবে।

দেশ কর্ম্মীর অসহায় পরিবার পরিজন:—প্রসিদ্ধ নেপালী দেশকর্ম্মী দলবাহাদুর গিরি নানা ক্লেশ ও রোগ ভোগ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। দলবাহাদুর নিজে সারাজীবন কষ্ট সহিয়াছেন, পরিবার পরিজন সহ অনাহারে কাটাইয়াছেন। দেশকর্ম্মীর অনাহারে খাদ্য জোটে নাই—রোগে চিকিৎসা হয় নাই। দলবাহাদুরের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবার পরিজন আজ পরম দুর্দ্দশায় পতিত। দেশের মুখ চাহিয়া সারাজীবন যিনি সহিয়াছেন—তাঁহার পত্নী, পুত্র কন্যা কি আজ অনাহারে মরিবে? দেশবাসী ইহাঁদের অনাহারে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাও—দেশসেবকের মর্য্যাদা দাও!
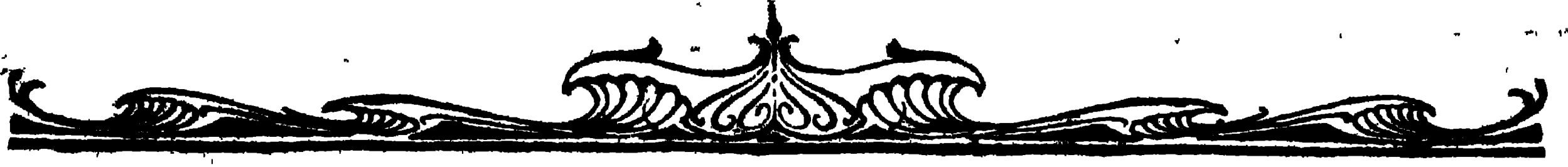
কবিবর

শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

(নক্সা)

ছাত্রজীবনে বিনয়ভূষণ কিছু কিছু কবিতা লিখিতে পারিত সেইজন্য ক্লাসে কেহ কেহ তাহাকে কবি বলিয়া সম্বোধন করিত। কিন্তু মেসে আমরা কেহই তাহাকে কবি বলিয়া আমল দিতাম না এবং ইহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ কলহ-বচসা এমন কি সময় সময় মারপিট পর্য্যন্ত হইয়া যাইত। তাহার পর যে ঘটনায় বিনয় আমাদের মেস ছাড়িয়া চলিয়া গেল তাহাই এখানে বলিতেছি।

পড়াশুনায় ইচ্ছা না থাকিলে এবং অন্য মুখরোচক পরচর্চ্চা খুঁজিয়া না পাইলেই আমরা বিনয়ের কবিতার সমালোচনা করিতে বসিতাম, এবং বিশেষতঃ বিনয় উপস্থিত থাকিলে তাহার নিজেরও চেহারা বেশভূষা চাল-চলন প্রভৃতির কোথায় কবিত্বপূর্ণ ও কোথায় কবিত্বের অভাব তাহার আলোচনা করিতাম। বলা বাহুল্য বিনয়কে উত্যক্ত করাই ছিল আমাদের আলোচনা ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সে দিনও সেইরূপ আমরা সকলে বিনয়কে লইয়া পড়িয়াছিলাম। শশধর বিনয়কে একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিল—"কবিতা লেখা আর কবি হওয়া এক নয়—বুঝলে হে বিনয়?"

বিনয় বুঝুক আর না বুঝুক উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অমরেশ বলিল—'তা হ'লে তর্জ্জাওয়ালারাও কবি হ'ত—বুঝলে?

বিনয় একটু হাসিয়া বলিল "সে ত বরাবরই বোঝবার চেষ্টা কর্চ্ছি। আমি ত বলি নি যে আমি কবি।"

অমরেশ সে কথা গায়ে না লইয়া বলিল—"বলিনে ব'ল্লেই ত হ'ল না,—তোমার Satellite রা যে তোমায় কবি হবার জন্যে ক্ষেপিয়ে তুল্লে।"

বিনয় বলিল—"তারা ক্ষেপিয়ে তুলুক আর না তুলুক তোমরা যে তুলছ তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।"

শশধর অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিল—"তা হ'লে তুমি স্বীকার কর্চ্ছ যে তুমি কবি নও এবং কবি হ'বার যোগ্যতা তোমরা নেই?"

বিনয় বলিল—"কবি আমি নই এ কথা আমি স্বীকার কবি কিন্তু কখনও হ'তে পারব না এ কথা আমি স্বীকার করি নে।"

লাফাইয়া উঠিয়া শচীনাথ চীৎকার করিয়া উঠিল—There you are—ঐ হচ্ছে তোমার দাম্ভিকতা।"

বিনয় বলিল—'Versifier হ'তে Poetaster হয়, Poetaster হ'তে Poet হয়। সুতরাং আমিই বা কেন হ'তে পারব না বুঝতে পার্চ্ছি নে। কবি না হই—কবিতা লেখক ত আমি বটে?

বিনয়কে চটানই যখন উদ্দেশ্য তখন আর যুক্তির বাধা মানে কে! সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"তুমি কিছুই নও, কিছুই নও,—তুমি কপি।"

বিনয় এ আখ্যায় বহুদিন হইতেই অভিনন্দিত হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং মনে মনে চটিলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাঁধা না ফুল?"

অমরেশ চীৎকার করিয়া বলিল - "ফুল কিন্তু F-O-O-L"

চীৎকার শুনিয়া নীচের ঘর হইতে মেসের ম্যানেজার হরিবাবু আসিয়া বলিলেন—"তোমাদের জন্যে যে পাড়ার লোক সব পালাবার জোগাড় কর্চ্ছে,—ব্যাপার কি বলত?

হরিবাবু বরাবরই বিনয়ের পক্ষ লইতেন সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া সাহস পাইয়া বিনয় বলিল—"আর কেউ পালাবার জোগাড় করুক আর না করুক আমাকে যে শীগ্গির পালাতে হ'বে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।"

মজা জমিয়া আসিয়াছে দেখিয়া শশধর হরিবাবুকে মধ্যস্থ মানিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা আপনিই নিরপেক্ষ ভাবে বলুন বিনয় কবিপদবাচ্য না কপিপদবাচ্য?"

ঈষৎ হাসিয়া হরিবাবু বলিলেন—কবিপদবাচ্য তাতে আর কোন সন্দেহই নেই।"

বিপিন এতক্ষণ বেশী কথা কহে নাই—সে বলিয়া উঠিল—Interested party ! Interested party বিনয় হরিবাবুর হিসেব লিখে দেয়। হরিবাবুকে impartial witness বলা যেতে পাবে না।"

বাধা দিয়া হরিবাবু বলিলেন—"জবানবন্দীর আগেই রায় বেরিয়ে যায় তা এই তোমাদের কাছেই প্রথম দেখছি। আমার কথা আগে শেষ অবধি শোনই!"

আমি বলিলাম—হ্যা হ্যা হরিবাবুর বক্তব্য ব'লতে দাও গোল করো না।"

তখন হরিবাবু বলিতে লাগিলেন—কবিতা লিখতে পারলেই তাকে কবি বলা যেতে পারে। তারপর কবিত্ব ওজন করে শ্রেণীবিভাগ ক'রতে হয়। রবীন্দ্রনাথের মত কবিরা কবি সম্রাট, কালিদাস রায়ের মত কবিরা কবিশেখর, চন্দ্রমিগুলির কবিরা কবিরাজ, আর বিনয়ের মত কবিরা কবিবর।

সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—"বিনয়কে আমরা কবি ব'লতেই চাইনে—তার ওপর কবিবর? কখনই না, আপনি শেখান সাক্ষী।

হাসিতে হাসিতে হরিবাবু বলিলেন—"বিনয়কে কবি ব'লতে আমারও আপত্তি আছে,—কিন্তু কবিবর বলতে কোনই আপত্তি নেই।"

আমরা সকলেই বিস্ময়ে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া ভাবিতেছি দেখিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "কলেজে সব প'ড়ছ কবি বরের মানে জান না!" ততোধিক বিস্ময় হইতে অব্যাহতি দিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন গো-বরের মানে কি?"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া ঘর ফাটাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিলাম। এবং বিনয় "হরিবাবুও আপনিও" বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল ও পরদিবস আমাদের সকলের সনির্ব্বন্ধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া মেস ত্যাগ করিয়া গেল। তাহার পর সে আর কখনও কবিতা লিখিয়াছিল কি না খবর রাখি নাই।

সাহিত্যে জাতিভেদ

শ্রীরেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

মন
- ভাব
- কলম × কালি
  - ʌ — ভাষা (১) — ×
    - সাহিত্য
      - আর্য্য
        যথা :—বেদ ও পুরাণ
      - অনার্য্য (২)
        - গদ্য
          - ব্রাহ্মণ (৩) (সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়) যথা—"কথা"
            - নিকষ কুলীন যথা :—বিজ্ঞান
            - ভঙ্গ যথা :—ইতিহাস
            - বংশজ যথা : পৌরাণিক কথা
          - ক্ষত্রিয় (৬) (প্রেমিক ও যোদ্ধা) যথা—"কাহিনী"
            - গল্প উপন্যাস
            - না—টক (না মিষ্টি)
              - ঐতিহাসিক
              - হাসি—ক
              - বেরসিক
          - বৈশ্য (পল্লবগ্রাহী) যথা—"পঞ্চশস্য" 'চয়ন' 'রঙ্গরস' 'কাজের কথা'
          - শূদ্র (ভৃত্য) যথা—বিজ্ঞাপন
        - গদ্য কবিতা
          যথা :—উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম
        - কবিতা
          - বেতাল (৪)
          - তাল
            - অসুর
            - সুর
              - পেশাদারী (৫)
              - সখের
    - শ্বাহিত্য
- অ-ভাব

টীকা

১। ভার্যা ঃ—
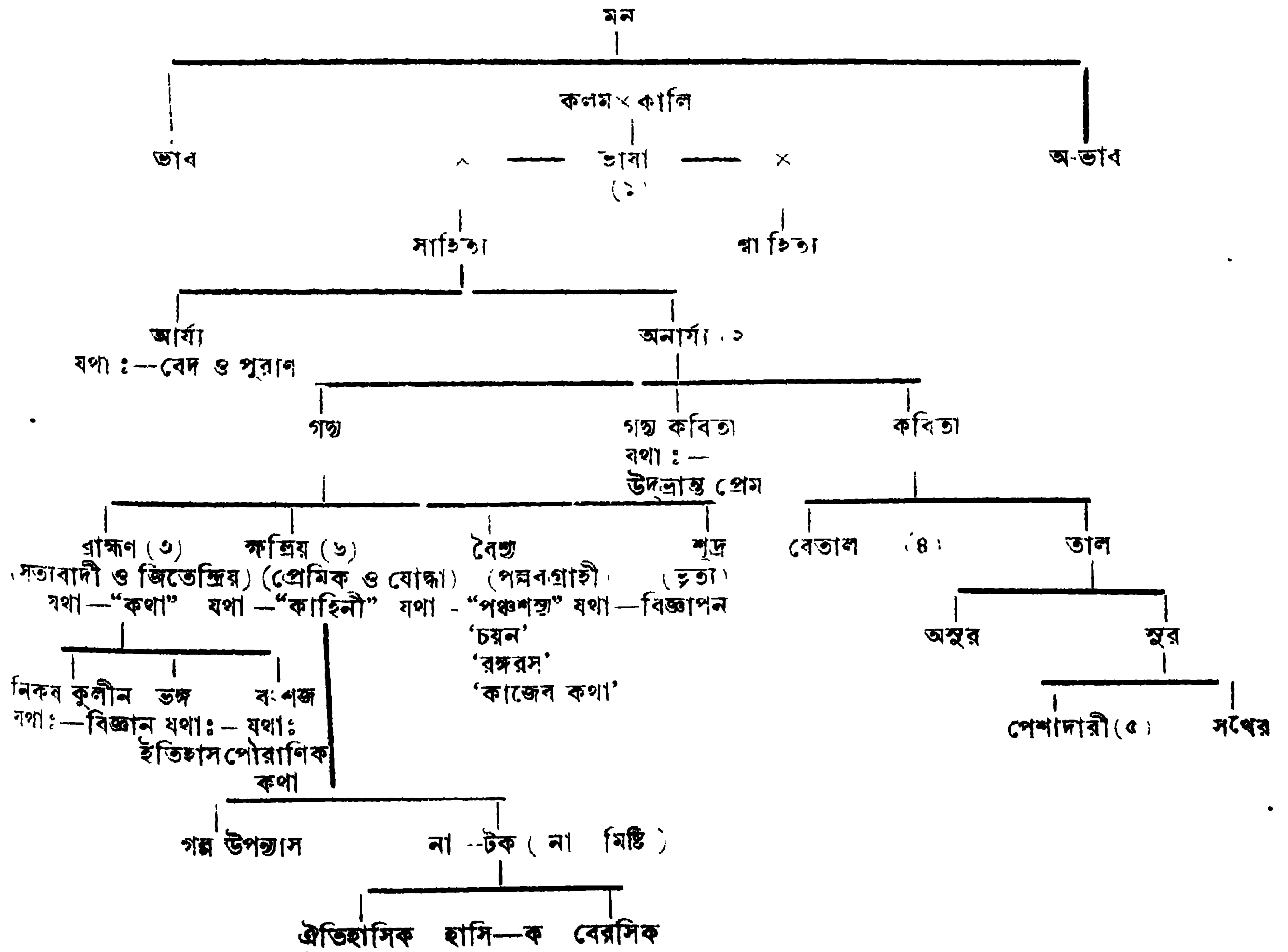
ভাষাবাণীব ডাইনে ও বামে স্বামীব নাম শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন না। বর্ত্তমানে আমাদেব সম্বন্ধে এখন আব এরূপ ব্যাপাবেব সমর্থন না কবিলেও আমাদেব মনে বাখিতে হইবে এ সেই আদিম সমাজেব কথা। তখন এক নাবীব বহু স্বামীত্ব বিশেষ দোষেব ছিল না। প্রমাণ—দ্রৌপদী।

২। আর্য্য ও অনার্য্য ঃ—

আর্য্য হইতেছে বেদ ও পুবাণ। বেদ ও পুবাণে যা নেই তা সমস্তই আনার্য্য। বাঙালী আমবা, মঙ্গল ও দ্রাবিডেব সংকর্ষ হইতে উৎপন্ন শঙ্কব জাতি বিশেষ। অন্ততঃ সাহেবেবা যখন একথা বলিয়াছেন তখন আমরা মানিতে বাধ্য। কাজেই আমাদেব বর্ত্তমানে জাতীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিও অনার্য্য শ্রেণীভুক্ত।

৩। ব্রাহ্মণ ঃ—

বাহ্মণেবা সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। বিজ্ঞান ইতিহাস ও পৌবাণিক কথার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই তবে স্থান বিশেষে কেহ কেহ আদর্শ হইতে স্খলিত হইতেছেন। তাহাতেই ভঙ্গকুলীন ও বংশজেব সৃষ্টি।

ক্ষত্রিয় ঃ—

ক্ষত্রিযেবা প্রেমিক ও যোদ্ধা। উপন্যাস নাটকে প্রেম ও যুদ্ধের ছডাছডিব কথা পুনরুল্লেখ না কবিলেও চলিবে।

বৈশ্য ঃ—

বৈশ্যেবা কৃষিজীবি। তাঁবা গাছেব পাতা (পল্লব) স গ্রহণ কবেন বলিযা কেহ কেহ তাঁহাদিকে পল্লবগ্রাহী নাম দিয়াছে। পল্লবগ্রাহীব অন্য অর্থ—অসাব বাজে জিনিষ ফেলিযা যাহাবা সাব সংগ্রহ কবেন।

শূদ্র ঃ

শূদ্র উপবোক্ত তিনবর্ণেব সেবা কবে। তথা বিজ্ঞাপনও নির্ব্বিচাবে বিজ্ঞান ইতিহাস নাটক নভেল সকলকাবই সেব কবে ও বাজাবে কাটতি বাড়ায়।

৪। বেতাল ঃ

বেতাল ভট্ট? অথবা বে'ব পদ্য? বিযেব পনেব দিন আগে থাকতে ভবিষ্য বিজ্ঞানেব' মাবফত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যাদিব সভাষ্য ব্যাখ্যা।

৫। পেশাদাবী ও সখেব কবিতা ঃ—

প্রেমেব কবিতাকে পেশাদারী বলিব। কেন না তাহাতে কেবলি প্রেমেব হা হুতাশ, 'বুক গেল—বুক গেল' ইত্যাকাব সবব বিলাপ প্রভৃতি ছাড়া আব কিছু নাই। ইহাবা সবীসৃপ শ্রেণীব অন্তর্গত। ইহাদেব মাথা নেই মুণ্ডও নেই, কেবল বুকে হাঁটে।

সখেব কবিবা অপ্রেমিক ও অবসিক। ইহাদেব মাথা সর্ব্বস্ব বুক নেই।

৬। বিশেষ দ্রষ্টব্য অতিবিক্ত।

ক্ষত্রিযেবা ব্রাহ্মণদেব মত পাচটী অন্তজাতিব সৃষ্টি কবিযাছে, যথা—(ক) আলালী (খ) বিদ্যাসাগবী (গ বঙ্কিমী ঘ) বাবিন্দ্রীক (ঙ সাধাবণা খিচুডী)।
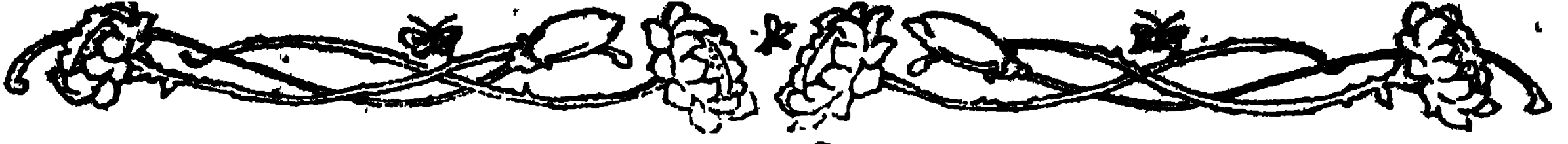
সারথি

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্ম গোপ্তা
সনাতনস্তং পুরুষোমতো মে॥
সারথ্যমর্জ্জুন স্তাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকয়োপ করায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥

হে ত্রিলোক হিতকারী অর্জ্জুন রথ পরিচালনে সর্ব্ব প্রথম গীতারূপ অমৃতদানকারী অক্ষর পরব্রহ্ম জ্ঞাতব্য বিশ্বের আশ্রয় নিত্য ও সনাতনধর্ম্মের পালক চিরন্তন-পুরুষ তোমায় ইহা জানিয়া তোমায় নমস্কার করিতেছি।

প্রভো! এ বিশ্বে তুমিই সারথি হইয়া আমাদের পরিচালন করিতেছ—আমরা দেখিতেছি উপলব্ধি করিতেছি, তবু তোমায় ভুলিয়া যাই কেন? ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র তোমার শক্তি বিদ্যমান কিন্তু সে দিব্য শক্তির উন্মাদনা কই প্রভু? নর স্ব স্ব অনাবিল প্রভুত্বের গন্ধে মাতিয়া উঠি কেন? যখন সবই তোমার—সৃষ্টি সংহার, সৃজন পালন—পিতা মাতা সখা স্বামী, সবই যখন তুমি তবে আমাদের মস্তিষ্ক এত স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা কল্পে আলোড়িত হয় কেন? সবই ত তুমি করিবে তবে আমার কর্ত্তা সাজিবার কোন কারণ'ত নাই!—কেন ভূতের বোঝা বহিয়া মরি, ঘর ছাড়িয়া পরের বোঝা বহিবার জন্য মাথা পাতিয়া দিতে প্রস্তুত হই! আপনার আত্মীয়দের স্বজনের শত অভাব দৈন্য দুঃখ দেখিয়াও দেখিনা, কেবল পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পাত করিতেও দ্বিধা বোধ করিনা—একি প্রগলভতা, একি অনাসৃষ্টি কাণ্ড।

সমস্তই তুমি করিবে ও করিতেছ তখন আমি? জগতের যত কিছুতেই আপনার তৃপ্তি হয় তাই করি না কেন?—এভিন্ন আর আমার কি কাজ আছে! না তা হয় না।—আমিও যে তিনি-সোঽহং, অহং সঃ। সেই অনাদি অনন্ত শক্তি ও যে আমার মধ্যে বর্ত্তমান। সেই শক্তিই যে আমাদের কর্ম্মে প্রবুদ্ধ করিতেছে। এই কর্ম্মের জন্যই যে আমাদের এ হস্ত পদ চক্ষু মন ও বিবেক ইত্যাদি। কর্ম্ম না করিলে এ হস্ত পদগুলির গতি কি হইবে? এবং কি উদ্দেশ্যেই বা ভগবান এ জীব দেহের সৃজন করিয়াছেন? তাঁহার কর্ম্ম সমষ্টির সংসাধনই যে এ সৃজনের উদ্দেশ্য। সেইজন্যই ভগবান মানবকে শ্রেষ্ঠ জীবরূপে না সৃজন করিয়াছেন? নতুবা পশুতে আর মানবে পার্থক্য কোথায়? সেই শ্রেষ্ঠজীবোচিত কর্ম্ম সংসাধন না করিলে যে তোমারই কর্ম্মের ত্রুটী হইবে। তাহার ফল? কর্ম্মানুসারে উত্তম ও অধম নহে কি? আর সেই কর্ম্ম বশেই যে তোমার জন্ম ও মুক্তি নির্ভর করিতেছে, ইহা'ত চক্ষের সম্মুখেই সতত দেখিতেছ না কি তোমরা?—কেহ ধনী কেহ নির্ধন, কেহ অন্ধ কেহ চক্ষুহীন ইত্যাদি। এ সকল কি?—কৃত কর্ম্মের ফলাফল। সেই জন্যই হে অনন্ত শক্তিমান্ সারথি! তুমি বলিয়াছ—কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে; কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে, কিন্তু 'মা ফলেষু কদাচন' কর্ম্মের ফ'ল প্রত্যাশী হইও না!

কেন না ফলাশী হইলেই তুমি আবদ্ধ হইবে, তোমার সোঽহং ত্ব নষ্ট হইবে। এই জন্য হে সাম্যবাদীজীব তোমরা স্বকৃত কর্ম্মের ফল—'শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু বলিয়া আত্ম-স্বাধীনতা লাভ করিতেছ! এ ব্যাপার আর কোথাও দেখিবেনা দেখিবে সেই ভগবৎপ্রাণ হিন্দুর অন্তরে! তাই জগতে তাঁরা আজও জ্ঞান গুরু!

যেখানে ফলাকাঙ্ক্ষা সেখানেই ইন্দ্রিয় সংযোগ—কাম ক্রোধাদির আবির্ভাব আর তাহাতেই আসক্তি ও মোহের উদয় এবং অধঃপতন—সোঽহংত্বের নাশ! সেই জন্য হে সারথি! তুমি বলিয়াছ—কৃপণাঃফলহেতবঃ, কর্ম্মফলকামী ব্যক্তি কৃপণ অর্থাৎ হেয়!

এই কর্ম্ম সাধন দ্বারাই জ্ঞানের বিকাশ—বিবেকের উন্মেষ ও মোহের নাশ—মায়ারূপ কুচক্র জালের ছেদন। সেই জন্য হে সারথি! তুমি বলিয়াছ—দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধি যোগাৎ ধনঞ্জয়। বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ—" জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কাম্যকর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট অতএব তুমি কর্ম্মযোগ দ্বারা জ্ঞানলাভ কর। আর এই জ্ঞান বলেই জীব জগতে মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। যেখানে ইহা নাই সেখানে পশুত্ব বিদ্যমান।

ঐ পশুত্ব নাশের জন্যই মাতৃ শক্তির আবাহন মায়ের বিরাট মূর্ত্তি—মহিষাসুরাদি দলন!—

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥

তুমি অতি দুরধিগম্য বস্তু শরণাগতের সঙ্কটে ত্রাণকর্ত্রী সর্ব্বজননী, শ্রেষ্ঠবস্তু, প্রতিষ্ঠারূপা, কৃষ্ণবর্ণা কভু বা ধূম্রবর্ণা, তোমায় সতত নমস্কার।

সেই জাত শক্তির উন্মেষ করিতে হইবে, কর্ম্মে তাহার বুদ্ধি, বিবেকে তাহা পরিচালন করিয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করাই সেই ধনঞ্জয় সারথির উদ্দেশ্য, নিস্পৃহ ফলাকাঙ্ক্ষ রহিত কর্ম্ম সাধনেই প্রকৃত আত্মতৃপ্তি ও মুক্তি! আসক্তিময় কর্ম্মে তৃপ্তি কোথায়—ক্রমে রাজা মহারাজা লক্ষপতি হইবার অতৃপ্ত তৃষ্ণার উন্মেষ বই আর কিছু নাই।

যখন দূর প্রবাসে সামরিক কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম, তখন তদ্দেশীয় একব্যক্তি আমাকে বলেন যে, আমাদের ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রাম তোমাদের সঙ্গে নহে তবে তোমরা এখানে আসিয়াছ কেন? অবশ্য সে কথার এ উত্তরটী ঠিক হইয়াছিল কিনা জানিনা তবে বলিয়াছিলাম—কর্ত্তা ইংরাজ আমরা উপলক্ষ মাত্র। তোমাদের দেশের অবস্থা ও দেশ ভ্রমণে কিছু জ্ঞান লাভের আশায় তোমাদের দেশে আসিয়াছি—অন্যপথে আপনাব খরচ নাই অথচ উপায় ও আছে, মন্দ কি! অনিষ্ট'ত কাহারও কিছু করিতেছি না।

আমাদের এ জাগরণের দিনেও আজ দেশের মাঝে যে মাতৃশক্তির সাড়া পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের সেই সোহহং জ্ঞানের সহায়তায় কর্ম্ম সংসাধন করিতে হইবে, মনে রাখিতে হইবে—সেই অনন্ত শক্তিময় জগতপালক ধনঞ্জয় সারথি আমাদের কর্ম্মে প্রবুদ্ধ করিতেছেন, আর আমরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছি - এখানে আত্মম্ভরিতা নাই।

নব্য প্রণয়

শ্রীজ্ঞানরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

(১)

শয়ন ঘরে শয়ন পরি শুয়ে—
তাহার আশে রোমাঞ্চিত তনু,
এমন কালে দ্বারের পাশে ভুঁয়ে
বাজ্‌লো মৃদু মলের রুনু ঝুনু।
প্রাণে যেন ঢেলে দিল কে সুরা,
হৃদয়-বীণের তার হ'ল সব বে-সুরা।

(২)

ব'লেছিলাম কর লয়ে তাব করে,
"মোদের এযে দুখের মিলন প্রিয়ে!
যবো চ'লে আজ্‌কে নিশার পরে
শুধু তোমাব স্মৃতির জ্বালা নিয়ে।"
সাথে সাথে জল এলো তাব লোচনে,
হ'লেম বত প্রণয় ভরে মোচনে।

(৩)

পরাণে তার বাজ্‌লো বড় ব্যথা,
বলিল যে যাবে সে সেই দেশ,
বলেছিলাম, "থাক্‌বে তুমি কোথা?
আমি থাকি প্রবাসেতে মেসে।"
বলিল সে হাতদুটী মোব ধরিয়া,
"নিয়ে চল, নৈলে যাবো মরিয়া।"

(৪)

বৌব আদর হয়না বইয়েব সাথে;
বলেছিলাম, "লিখবো রোজই চিঠি,
সঙ্গে যাওয়া? কাজ নেইকো তাতে;
আস্‌বো আবার আস্‌ছে পূজাব ছুটি।"
কোব্‌লো কেঁদে আঁখিদুটী জবা সে
প্রভাত বেলা গেলাম চলে প্রবাসে।

(৫)

দুদিন পরে 'অসুখ' চিঠি পেয়ে,
গেলাম যেন হারিয়ে আমি দিশে;
দেখি তারে গৃহে ছুটে যেয়ে
রোগে গেছে বিছানাতে মিশে।
বলিল সে, "ফেলেছিলে মারিয়া,
এবাব দেখো উঠ্‌বো আবার সারিয়া।"

(৬)

শুনে আমার বিষাদ মাখা আঁখি
সিক্ত হোলো আনন্দাশ্রু ধারে;
মাথাটী তার বুকের পরে রাখি,
প্রণয় ভরে ব'লেছিলাম তারে,
"বিদ্যা না পাই তাও আমার শ্রেয়সী,
তোমায় ফেলে যাবোনা আর প্রেয়সী।"

ষ্টার থিয়েটার

সাজাহান—ষ্টার থিয়েটারের পরিচালনায় 'দ্বিতীয়' অভিনয় রজনী ২০শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার। দর্শক সমাগম প্রচুর হইয়াছিল, সেটা অবশ্যই দানীবাবুর নামের গুণে কিন্তু এ অভিনয় পূর্ব্বগের অভিনয় অপেক্ষা যে কোন অংশে বিশেষ বিচিত্র বা উন্নত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। মোটামুটি অভিনয় সন্তোষজনক হইয়াছে বলিতে পারা যায়। দৃশ্যপটাদি, বেশভূষা পূর্ব্বাপেক্ষা বহুতর উন্নত ও প্রযোজক (Producer) মহাশয়ের রূপ-রসজ্ঞতার পরিচায়ক। সম্প্রদায়ও অর্থব্যয়ে কোনরূপ কার্পণ্য করেন নাই ইহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য।

সাজাহানের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন প্রিয়দর্শন অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়-তিনি এই অংশটীকে উজ্জ্বল করিতে যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় এবং যতটা রটান হইতেছে ঠিক ততটা না হইলেও তিনি এক দিক দিয়া অনেকটা কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন—ভাবাভিব্যক্তি বেশ সুন্দরই হইয়াছিল, তবে কণ্ঠস্বরে বার্দ্ধক্য ও রোগজীর্ণতার ভাব প্রস্ফুট হয় নাই এবং সাজাহানের উক্তির অধিকাংশ বাদ দেওয়াতে অংশটীকে একটু বেখাপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—ইতিপূর্ব্বে তাহার "কর্ণার্জ্জুনে" 'অর্জ্জুন' "প্রফুল্লতে" 'রমেশ' ও "ইরাণের রাণীতে" 'দারা জোবেরার' অংশ দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তোষলাভ করিতে পারি নাই, কিন্তু বর্ত্তমান অভিনয়ে আমরা কতকটা সন্তুষ্ট হইয়াছি—আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি, তবে তিনি ভাবাভিব্যক্তিতে যেরূপ যত্নবান তাঁহার আবৃত্তি ও কণ্ঠস্বরের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সমধিক যত্ন লইলে তিনি শীঘ্রই পরন্ত উনি যেদিন অভিনেতার স্থান লাভ করিবেন তখন আর তাঁহার নাম নাচাইবার জন্য কাগজওয়ালাদের তাঁহার সংখ্যা ছাপিতে হইবে না।

ঔরঙ্গজেব—অভিনেতা সর্ব্বজনবিদিত "দানী-বাবু"—দানীবাবুর এ ভূমিকার অবতরণ আজ নূতন নয়—এ ভূমিকায় তাঁর খ্যাতি বঙ্গব্যাপী—তবে তাঁহাকে আর এ ভূমিকায় মানায় না-তাহাতে খব বেশী টিকিট বিক্রয় হইলেও এটা ঠিক আর্টের উপর সুবিচার করা নয়. তাঁকে দারা, সুজার ছোট ভাই বলে মনে করা একান্ত অসম্ভব। পূর্ব্বের হিসাবে এ অভিনয়ে তিনি বিশেষ কিছু নূতনত্ব দেখাইতে পারেন নাই এবং তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যেখানে রণক্ষেত্রের মানচিত্রে তিনি কল্পনায় 'কিস্তী' দিতেছিলেন সে দৃশ্যটীতে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু অবনতিই দেখিলাম-শেষ দৃশ্যেও ক্ষমাপ্রার্থনার সময় তাহার আবৃত্তি একঘেয়ে সুরে হওয়ায় তেমন হৃদয়স্পর্শী হয় নাই। দারার প্রাণদণ্ডাজ্ঞার দৃশ্যটীই সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল—অধুনা তাঁহার শরীরও স্থূল হইয়াছে তজ্জন্য তাহার চলাফেরা করাতেও বেশ একটু জড়তা আসিয়াছে—অতঃপর তাঁহাকে পরিণত-বয়স্কের ভূমিকায় (যথা বলিদানে 'করুণাময়' ভ্রান্তিতে 'রঙ্গলাল') অবতীর্ণ করানই উচিত।

দিলদার—অভিনেতা শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অভিনয় বেশীর ভাগ দর্শকের ভাল লাগে নাই; কারণ তিনি দারাকে তাহার প্রকৃত চরিত্রে প্রতিভাত করিয়াছিলেন। দারা মৃদুস্বভাব, তাহার চরিত্রে ঔদ্ধত্য, ক্রোধ, চক্রান্তেচ্ছা প্রভৃতি অভিব্যক্তির সহায়ক উত্তেজক

ভাব নাই। আধুনিক দর্শকেরা চান প্রচণ্ড দাঁতমুখ খিঁচান ও উচ্চ চীৎকার এই দুইটী তাঁহার শান্ত সংযত স্নিগ্ধ অভিনয়ে না থাকায়, অনেক অসংযত দর্শক তাঁহার প্রতি অভদ্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অনেক দর্শক হয়তো মনে করেন অভিনেতা তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ অভিনয় করিতে বাধ্য—কিন্তু প্রকৃত অভিনেতা নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও অভিনয়কলার দাস মাত্র। এই সমস্ত রসজ্ঞানহীন দর্শকগণের জন্যই, অভিনেতাগণকে দায়ে পড়িয়া অনেক সময় চেঁচাইতে হয় ও অনিচ্ছাসত্বে মুখ ও হস্তপদের বিকৃতি করিয়া প্রতিভাকে ধ্বংশ করিতে হয়। তবে আধুনিক দর্শকের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনকড়িবাবু এই নূতন কল্পনায় দারার চরিত্র প্রতিভাত করিতে চেষ্টা না করিয়া গতানুগতিক প্রথায় অভিনয় করিলে এই শ্রেণীর দর্শকবৃন্দের অন্ততঃ মনস্তুষ্টি হইত।

দিলদার—অভিনেতা শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, সত্যের মর্য্যাদার রক্ষার্থ পূর্ব্বে কয়েকবার ইহাঁর অভিনয়ের অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইয়াছিল—কিন্তু এই ভূমিকায় ইহাঁর প্রশংসা করিবার সুযোগ পাইয়া আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি—এই ভূমিকায় তিনি বেশ একটী শান্ত সংযত পর দুঃখ কাতর দার্শনিকের প্রতিচ্ছবি ফুটাইয়াছিলেন এবং অভিনয় প্রাণবন্ত হইয়াছিল মধ্যে মধ্যে শিশিরবাবুর স্বর ও ভঙ্গী অনুকরণটুকু না থাকিলে তিনি মেঘমুক্তশশধরের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেন—আমরা তাঁহাকে আত্মনির্ভরশীল হইতে অনুরোধ করি কারণ তাঁহার সৌম্যদর্শন ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর উপযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হইলে তাঁহাকে কালে উচ্চ আসন দান করিবে—অনুকরণে যেন প্রতিভা ও প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা তিনি নষ্ট না করেন ইহাই আমাদের অনুরোধ।

মহম্মদ—এ অংশটী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লইবার কথা ছিল তৎপরিবর্ত্তে হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য। ইনি হাস্যরসের অভিনয় চলন সই করিতে পারেন কিন্তু এরূপ অংশের দায়ীত্ব বহন করিবার শক্তি ইহাঁর নাই সেটা কি কর্ম্মকর্ত্তারা জানেন না! আর্টথিয়েটারে কি সত্যই অভিনেতার অভাব পড়িয়াছে। পূর্ব্বযুগের অভিনয়ে মিনার্ভায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দে এই অংশটী যে কত সুন্দর অভিনয় করিতেন তাহা আজ বেশ বুঝা যাইতেছে। তখন নামে আর্ট না থাকিলেও কাজে আর্ট দেখিতে পাওয়া যাইত, অধুনা দেখিতেছি 'আর্ট' কথাটি মাত্র নামেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সোলেমান—ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়। ইন্দুবাবুর অভিনয় ক্রমেই নীরস বৈচিত্রহীন ও একঘেয়ে হয়ে আসছে আর কিছু দিন এভাবে চললেই তিনি দর্শকবৃন্দের বিরক্তি-ভাজন হয়ে পড়বেন। কর্ত্তারা তাঁকে খাড়া করবার জন্য খুব সচেষ্ট তা বেশ বুঝতে পারা যায় কিন্তু খাড়া থাকবার ক্ষমতা না থাকলে দিন রাত কাঁধ দিয়ে খাড়া রাখা যায় না।

সুজা—ইনি পূর্ব্বতন অভিনেতা হীরালালবাবুর অভিনয় অনুকরণ করিতে গিয়া বড় দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাঁর অভিনয় করিবার ক্ষমতা আছে -শেষ দৃশ্যে তাহা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল—ইনি চেষ্টা করিলে অনুকরণ না করিয়াও উত্তম অভিনেতা হইতে পারিবেন। অনুকরণ কখনও মানুষকে বড় কর্ত্তে পারে না—অনুকৃতের সব গুণ তাতে পাওয়া যায় না কিন্তু দোষগুলি ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া বিরাজমান হয়।

যশোবন্তসিংহ—শ্রীননীগোপাল মল্লিক ; এঁর অভিনয়ের দোষের কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি, দর্শকবৃন্দ ও ইহাঁর অস্বাভাবিক চীৎকারে সন্তুষ্ট হন না—তথাপি এই 'বীববর'কে কেন যে জবরদস্তী চালাইবার চেষ্টা কর্ত্তৃপক্ষ করেন তাহা বুঝিতে পারি না।

জয়সিংহ—অভিনয় চলন সই।

পৃথ্বীসিংহ ও মোরাদ—একই অভিনেতার অভিনয় - সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

জিহান খাঁ।—একটু মানুষের মত লোক পাইলেই ইহাঁকে সর্ব্বাগ্রে বদলান উচিত—এই ছোট পার্টটি যে কত মূল্যবান সে ধারণাও এ ব্যক্তির নাই।

মারজুমলা দিলীর খাঁ।—উল্লেখযোগ্য নহে।

জাহানারা:—কণ্ঠস্বরের দুর্ব্বলতা জন্য চরিত্রটীর তেজ, দীপ্তি ও গর্ব্ব পরিস্ফুট হয় নাই—দরবার দৃশ্যে চকিতের মত পূর্ব্ব প্রতিভার বিকাশ ক্ষণিকের জন্য দেখাগিয়াছিল ; "নির্ব্বাত দীপে কিমু তৈলদানম্ ?"

পিয়ারা—গানগুলি অতি উত্তম—অভিনয় প্রাণহীন, কলের পুতুল মত আকৃতিতে রাজমহিষী সাজিবার অযোগ্য। এ অংশ অভিনয় করিবার এক মাত্র অভিনেত্রী নীহারবালা তবে তাঁর গান ব্যাকরণসঙ্গত হবে কিনা তা জানি না তবে অভিনয়টা তাঁর হাতে পড়লে মাঠে মারা যেত না এটা ঠিক।

মহামায়া—এঁর পানের মতন মুখখানি ছাড় দেখিবার কিছু ছিলনা; কণ্ঠস্বর বীর রমণীর অংশ অভিনয়ের মুখে চোখে হাতে পায়ে কোথাও বীরত্ব ফুটে নাই—এঁকে তেজস্বিনী রমণীর ভূমিকায় না নামানই ভাল—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী বোধহয় এই অংশ এঁর চেয়ে ঢের ভাল অভিনয় কর্ত্তে পার্ত্তেন।

জহরৎউন্নিসা—অভিনেত্রী এই অংশে অভিনয়ের সম্পূর্ণ অযোগ্য শ্রীমতী নীহারকে অন্ততঃ এই অংশটী দিলে একটা স্ত্রীচরিত্রেও নিখুঁত ভাবে অভিনীত হইত।

নাদিরা—অতি জঘন্য অভিনয়।

সিপার—একটু বড় হইলেই ভাল হইত, অভিনয় অতি সুন্দর ও উপভোগ্য।

পৃথ্বীরাজের রক্ষিতা নারীরূপে যে অভিনেত্রীটিকে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা ধন্যবাদ দিতে পারি না; কাশ্মীর রমণীগণ স্বভাবতঃই পরমা সুন্দরী, তদুপরি রাজার রক্ষিতা রমণীর সৌন্দর্য্য আরও বেশী হওয়া উচিত সুতরাং একটু দেখিয়া শুনিয়া এমন অভিনেত্রী নির্ব্বাচিত করা উচিত ছিল যাঁহার অন্ততঃ সামনের দাঁত দুটী সর্ব্বদাই মুখের বাহিরে আত্মপ্রকাশ না করে।

সাজসজ্জার দিকটাই খুব সুন্দর হইয়াছিল তবে চারণবালকগণকে ব্যাজ পরাণটা সঙ্গত হয় নাই। গানের মধ্যে মাত্র "আজি এসেছি এসেছি বধু হে নিয়ে এই হাসি রূপ গান" শীর্ষক গানটী ও তাহার আনুষঙ্গিক নৃত্য পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও কলাসম্মত বলিয়া বোধ হইল, বাকী গানগুলি চলনসহি। দৃশ্যপটগুলি সুনির্ব্বাচিত ও সুন্দর হইয়াছিল তন্মধ্যে প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে 'যোধপুরের দুর্গের' দৃশ্যপটখানি অঙ্কণপ্রতিভার চরমোৎকর্ষ বলা যাইতে পারে। ময়ূরসিংহাসনখানি শুনিলাম ঐতিহাসিক দলীল-পত্রাদি অবলম্বনে নির্ম্মিত হইয়াছিল কিন্তু সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া জগৎবিখ্যাত ময়ূরসিংহাসনের বিশেষ কিছু বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া গেল না—উপরের আবরণটী (রাজছত্র কি?) শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হইল কোন দলিলে? দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে মুঙ্গের দুর্গপ্রাসাদমঞ্চ ও আরাকানের রাজপ্রাসাদ একই দৃশ্যপটে দেখানটাও যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। আর্ট থিয়েটারের মত বড় ক্ষমতাশালী অভিনেতা ও অসংখ্য অভিনেত্রী বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের নিকট আমরা অন্যান্য রঙ্গালয় অপেক্ষা বেশী কিছু চাই কারণ এই সম্প্রদায়টীকে আমরা সকল সম্প্রদায়ের উপরেই স্থান দিয়া থাকি তাই তাঁহাদের অভিনয়ের আমরা এত খুঁটীনাটীর আলোচনা করি—আশাকরি তাঁহারা ইহা অপ্রীতিকর ভাবিবেন না—কারণ অন্য থিয়েটারের অভিনয়ের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করায় কোন ফল নাই; ইহাঁদের ত্রুটী সংশোধনের ক্ষমতা আছে বলিয়াই ইহাঁদের ত্রুটী প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য মনে করি। সাজাহান যে এখনও বহু রাত্রি পূর্ণদর্শক সংখ্যা আকর্ষণ করিবে তাহা নিঃসন্দেহ।

মিনার্ভার "জোরবরাৎ"—মিনার্ভার জোরবরাৎ লিখিলেই ভাল করিতাম, এই টিপ্ টিপ্‌নি বৃষ্টি ও হাড় ভাঙা শীতের মাঝখানে যখন জোরবরাৎ দেখিবার জন্য যাইতে ছিলাম—তখন ভাবিনাই যে এত দুর্য্যোগেও, এই পুরাতন সম্প্রদায়ের একখানি ক্ষুদ্র প্রহসনের প্রথমাভিনয় রজনীতে এত দর্শকসমাগম দেখিব—সুতরাং মিনার্ভার জোরবরাৎ লেখাই উচিত ছিল। বহুদিন পরে বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে নূতন প্রহসনের অভিনয় হইলে, কারণ নূতন দলে হাস্যরসের প্রবেশ নিষেধ। নূতন প্রথায় শিক্ষিত কোন শিল্পীকেই (ষ্টারের তিনকড়িবাবু মাত্র গম্ভীর-হাস্যরসে কুশলী) এ রসটীর আলোচনা করিতে দেখি নাই বা মনমোহন ও ষ্টারের অভিনয়ে হাস্যরসের অংশ কৃতকার্য্যতার সহিত অভিনীত হইতে দেখি নাই। অভিনয়ের উদ্দেশ্য মনোবৃত্তির স্ফুর্ত্তিদান ও রূপরসের আনন্দ দান; বীররসে উত্তেজনা আনে, করুণরসে হৃদয় দ্রবীভূত হয় শান্তরসে প্রাণ স্নিগ্ধ—তৃপ্ত হয়; কিন্তু অনাবিল আনন্দ দান করিতে পারে হাস্যরস। নূতন দল এই রসটীর প্রতি এই নিষ্ঠুর অসহযোগ করিতেছেন কেন জানি না—ক্ষমতার অভাব

কি? বোধহয় না; কারণ তাঁহাদের আমরা প্রতিভান্বিত বলিয়াই বিবেচনা করি। আমাদের অনুমান, শিক্ষার অভাব স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখরের মত মত সর্ব্বতোমুখী প্রতিভান্বিত শিক্ষক আজ বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নাই—যাঁরা আছেন তাঁদের অভিনেতা বলা চলে কিন্তু শিক্ষক বলা যায় না। নূতন স্কুলের শিক্ষার একটা কুফল আমরা লক্ষ্য করিতেছি—শিক্ষকের অনুকরণ এমন কি কণ্ঠস্বর ও হাত-পা-নাড়াটী পর্য্যন্ত অনুকরণ করান হয়, এ শিক্ষায় শিক্ষিতের কলাজ্ঞান স্ফুর্ত্তি লাভ করিতে পারে না ও ভবিষ্যতে তাঁহার স্বাধীনভাবে অভিনয় করিবার ক্ষমতা লোপ পায়। মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষগণ এই প্রহসনখানিতে নূতন দলের অভিনয় প্রথার মুদ্রাদোষগুলির অনুকৃতি কৌতুক দেখাইয়াছেন—ইহা খুব দোষনীয় নহে কারণ কুত্রাপি নূতন অভিনয়ের প্রতি শ্লেষ বা বিদ্বেষজাত বিদ্রূপোক্তি নাই—কৌতুক চিত্রের মত ইহা নির্দ্দোষ এবং কিছু পরিমাণে শিক্ষাপ্রদও বটে। অভিনয় আগাগোড়া উত্তম হইয়াছিল কোন অংশ একেবারেই খারাপ হয় নাই কার্ত্তিকবাবুর ঘটক সাহেবের অভিনয় বেশ সংযত ও স্বাভাবিক হইয়াছিল—বাস্তবিকই ইঁহার হাস্যরসাভিনয় উপভোগ করিবার জিনিস। কুঞ্জবাবুর "জমীদার জয়শঙ্কর রায়ের" ভূমিকা উজ্জ্বল হইয়াছিল তবে তাহাতে এক আধ জায়গায় একটু সংযমের আবশ্যক, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়ের পটলচাঁদের ভূমিকায় বিবিধ অভিনেতার মুদ্রাদোষের অনুকৃতি কৌতুক সমস্ত দর্শকবৃন্দকে বিমল হাস্যরসে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। সন্তোষবাবুর "আমোদকুমারের" অংশে সামান্য আড়ষ্টভাবটুকু মিলাইয়া গেলে অতি সুন্দর দেখাইবে, রামকালী বন্দ্যোপাধ্যের "গুল্ম্‌খলালের" অংশটী ক্ষুদ্র হইলেও বেশ স্বাভাবিক ও ব্যবসায়ী মাবোয়াড়ীর মতই চালচলন হইয়াছিল। নৃত্যের নূতন ভঙ্গী ও ছন্দ এই প্রহসনটীর কৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ, মনমোহনে সীতার পর এরূপ সুন্দর নৃত্যের পরিকল্পনা অন্যত্র দেখি নাই এবং নর্ত্তকীগণের কণ্ঠের ঐক্যতানভাব প্রশংসনীয়। স্ত্রীচরিত্র গুলিতে ঘটকিনীরূপে প্রকাশমণি, বট্‌ঠাকুরমার ভূমিকায় নগেন্দ্রবালা, দনুজদলনীর অংশে শশীমুখী, প্রভারূপিণী ননীবালার অভিনয় বিশেষ কৃতীত্ব ও শক্তির পরিচায়ক। মোটের উপর স্ত্রীচরিত্র অভিনয়ের যোগ্যা অভিনেত্রী এখন একমাত্র এই সম্প্রদায়েই আছে তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে, তাহার কারণ ইহারা নামের মোহে "শ্বেত-হস্তী" পোষণ করেন না। পুস্তকখানি স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও অসংলগ্নতা পরিবর্জ্জিত হইলে দ্বিতীয় রজনীতে ইহা নিখুঁতভাবে উপভোগ্য হইবে তাহা নিঃসন্দেহ; প্রত্যেক হাস্যরস রসিকের এ অভিনয় উপভোগ করা কর্ত্তব্য।

গত ১লা নভেম্বরের "বেঙ্গলী"র Night Bird (নিশাচর পক্ষী(?)) এই ছদ্ম নামধারী সমালোচক মহাশয় রঙ্গমঞ্চ সংবাদ-স্তম্ভে লিখিতেছেন The late Mr. D. L. Roy's *widely read novel* "Pashani" is shortly to be representeed by Mr. Sishir Kumar Bhaduri. Those who have read the book can alone understand what a difficult thing it must be to dramatise it ...." সমালোচক মহাশয় নিশ্চয়ই ডি. এল, রায়ের "পাষানী" "উপন্যাসখানি" পড়িয়াছেন—নহিলে সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না আর বিশেষ যখন পুস্তকখানি "widely read"। জিজ্ঞাসা করি সমালোচক মহাশয়ের বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিদ্যার দৌড় কতদূর? পাষাণী "উপন্যাস," কি নাটক, তাহা বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গে সামান্য পরিচয় যাহার আছে, তিনিও জানেন। সাহিত্যের আসরে এরূপ অনধিকার প্রবেশ-কারীকে অর্দ্ধচন্দ্র দানে বিদায়ের ব্যবস্থা নাই ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। এমন বিদ্যাদিগ্‌গজ সমালোচকের দ্বারা থিয়েটার প্রসঙ্গ "বেঙ্গলীর" মত কাগজকে লেখাইতেই হইবে! রঙ্গালয়ের সংবাদ না থাকিলে কাগজ আজকাল যে বিকায় না জানি কিন্তু এরূপ ধাপ্পাবাজী যে চলিবার দিন চলিয়া গিয়াছে তাহা কি বেঙ্গলীর পরিচালক ও সম্পাদকের অজ্ঞাত?

চোর

শ্রীমণীন্দ্ররঞ্জন মজুমদার

রাত্তিরে খেতে বসেছি, এমন সময় হঠাৎ মনে হ'ল মনিব্যাগটা ভুলে বইরে টেবলের ওপর ফেলে এসেছি। তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে আসতেই দেখলুম যেন ঘর থেকে একটা লোক বেরিয়ে গেল : টেবলের দিকে চেয়ে দেখি—ব্যাগটা নেই! চীৎকার করে উঠলুম, "চোর" "চোর"। চীৎকার শুনে বাড়ীর চাকরটা ছুটে এসে বাঘের মত শক্ত করে চোরটাকে চেপে ধরলে, মাথার ওপর বেশ দু'ঘা বসিয়েও দিলে তারপর আমার কাছে তাকে টেনে নিয়ে এল, দেখলুম ১৪।১৫ বছরের একটা ছেলে, ছোট ঘরের মত নয়—যেন ভদ্রলোকের ছেলে বলে বোধহল, মাথাটা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে অন্যাবস্থায় দেখলে হয়তো দয়া হতো কিন্তু এতটুকু ছেলের চুরিবিদ্যা দেখে গাটা যেন জ্বলে উঠল, বললুম "পাজী বদমায়েস এই বয়সেই এই। এর পরে ডাকাত হয়ে দাঁড়াবে!" চাকরকে বললুম "যা নিয়ে যা একে থানায়।"

ছেলেটা আমার পানে তাকিয়ে বল্লে "আমায় এবারের মত মাফ করুণ বাবু" আমি ধমকে মুখটা বিকৃত করে বলে উঠলুম "মাফ করবে বৈকি চুরি করার মজাটা একবার দেখে এস, যাতো একে থানায় নিয়ে যা!" রতন তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল যাবার সময় ছেলেটা তার জলভরা চোক দুটা আমার পানে কাতর করুণভাবে রেখে বল্লে "বাবু আমি গরীব : বাবা আমার বড় অসুখে ভুগছেন। আমায় জেলে দিন তাতে ক্ষতি নেই তবে দেখবেন তিনি যেন বিনাচিকিৎসায় মারা না যান, তিনি আছেন সিমলাষ্ট্রীটে—নম্বরে। বুকটা একবার ছ্যাৎ করে উঠল, একবার মনে হ'ল, কাজ নেই ছেলেটাকে ছেড়েই দি! কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলুম না তা হয় না, সে যে চোর! এখন তাকে শাস্তি না দিলে তারই ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়া হবে চাকরটা যখন তার হাতটা ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখন দেখলুম তার ঘাড়ের ওপর কাঁচা রক্তের দাগ টক্ টক্ করছে। রাত্তিরে খেতে বসে ভাল খেতে পারলেন না; ঘুমও হ'ল না ভাল, শুধু মনে পড়তে লাগল, সেই চোর ছেলেটার জলভরা চোখ দু'টো আর তার করুণ স্বর বাবার আমার বড় অসুখ। মনটা যেন অশান্তিতে ভরে গেল ভাবলুম ভোর হ'লেই তাকে থানা থেকে জামিনে খালাস ক'রে নিয়ে আসব।

সকালে উঠে মনের সে ভাবটা আর ছিল না—তবে সে ছেলেটার কথা সত্য কিনা দেখবার জন্য সেই ঠিকানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম। সিমলা ষ্ট্রীটে—নং বাড়ীর সামনে এসে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম; নাঃ! ছেলেটার বাপের নামটাই যে জানিনে ছাই। কি করে তার খোঁজ করি।... এসেছি যখন তখন একেবারে ফেরাটা ঠিক নয় ভেবে বাড়ীর দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে বল্লুম—বাড়ীতে কে আছেন? একটা লোক বেরিয়ে এসে বল্লে, "কাকে খোঁজেন মশাই?" বললুম, "এখানে একটা লোক খুব অসুখে ভুগছে কি তাকেই আমি দেখতে এসেছি," লোকটার অন্ধকার মুখখানা যেন প্রসন্নতার আলোক-সম্পাতে একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল বললে "ওঃ নিবুর বাপ্‌কে দেখতে এসেছেন "আহা বেচারীর বড় কষ্ট মশাই—ঐ একমাত্র ছেলে দুধের বাছা বল্লেই হয় হাতে এক পয়সা নেই—সম্প্রতি নিবুর মাটা মারা গেছেন—আবার কাল সন্ধ্যে থেকে ছেলেটা যে কোথায় গেছে"—আমি যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—মনে হল আমার বুকের উপর কে যেন সজোরে একটা হাতুড়ীর ঘা মেরে দিয়েছে—তবু সংযতভাবেই বল্লাম "তিনি আমার আত্মীয় চলুন, আমায় নিয়ে তাঁর কাছে" লোকটা আমায় বাড়ীর ভেতরে কোণের একটা স্যাঁৎস্যাতে অন্ধকার কোঠায় নিয়ে বল্লে "এই যে এখানে," মেঝের ওপর ছেঁড়া মাদুরে চোখ বুজে একটা লোক পড়ে আছে দেখলুম, কাছে এসে তার মুখের দিকে তাকাতেই বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে গেলুম, এ'যে আমার যৌবনের সহপাঠী সত্যেন! অতীতের মধুময় স্মৃতির জেগে বুকটা আমার ভরে গেল, সেই সত্যেন! উঃ, তা'র আজ এই অবস্থা!! ডাকলুম, "সত্যেন!"

সত্যেন চোখ মেলে আমার পানে তাকিয়েই হাতখানা

আমায় চেপে ধবে' বল্লে, "নীরোদ! আমি এখানে—কেমন করে জান্‌লে?" আব এতদিন কোথায় ছিলে?

সব কথা চাপা দিয়ে অন্য কথা পেড়ে বল্লুম্, "ভাই, কি অসুখ হযেছে তোমার?"

সত্যেন বল্লে, "বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জা, বড্ড Serious বোধ হয় বাঁচব না।"

বললুম, "ডাক্তাব ডেকেছ?"

সত্যেন একটা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, "পযসা নেই ভাই, ঘবে একটা ও পয়সা নেই। ডাক্তাব ডাকব কি দিয়ে। ছেলেটা কাল বেবিযেছ ডাক্তাব আনতে, হাতে তা'ব একটা পযসা নেই। ডাক্তাব পাবে কোথায়? ডাক্তাব আনা চুলোয় যাব, ছেলেটাবই যে এখন পর্য্যন্ত খোঁজ নেই।"

চন্ চন্ ক'বে বুকেব ভেতব থেকে সমস্ত বক্ত যেন আমাব মাথাব দিকে ছুটে চল্‌ল। উঃ! পাষণ্ড আমি, কি কর্বেছি!

সত্যেন বল্‌তে লাগ্‌ল, "এই কলকাতা সহবে কোথায় গাড়ী চাপা পড়ে শেষে—নাঃ, আব ভাব্‌তে পারিনে। ভাব্‌তে ভাব্‌তে মাথা খাবাপ হ'য়ে গেছে, পাঁচদিন হ'ল এই ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে তাব মা মারা গেছে, পযসাব অভাবে এক ফোঁটা ওষুধ তাব মুখে দিতে পারি নি, সে আর আমি নির্জ্জীবেব মত ব'সে ব'সে তা'ব মা'ব মরণ দেখেছি। তাই আমার অসুখ দেখে সে ছুটে গেছে ডাক্তার আন্‌বাব জন্যে। একটুখানি ছেলে সে, পযসা নেই হাতে

উঃ। দুঃসহ অনুশোচনায আমি আমাব মাথাটা আব খাড়া ক'বে বাখ্‌তে পাবছিলুম না, বেদনাব 'চা যেন তা' নুইযে পড়্‌ছিল। সে চোব,—চোব সে ঘাড়েব ওপব তাব বক্তেব দাগ চোখেব সামনে আম পষ্ট হযে ফুটে উঠ্‌ল। উঃ॥

তাড়াতাড়ি পকেট হ'তে দু'খানা দশ টাকাব নো বেব ক'বে সেই লোকটীকে আস্থন বললুম, "ডাক্তা বলেই টলতে টলতে বেবিযে পড়্‌লুম, থানাব দি ছুটে চলুম দিগ্বিদিক জ্ঞান হাবা হযে। কাণেব ভেত এ'সে বা'জছিল তখন শুধু বালকেব সেই করুণ মর্ম্মভেদ স্বব—"বাবু আমি গবীব, বাবা আমাব অসুখে ভুগ্‌ছেন
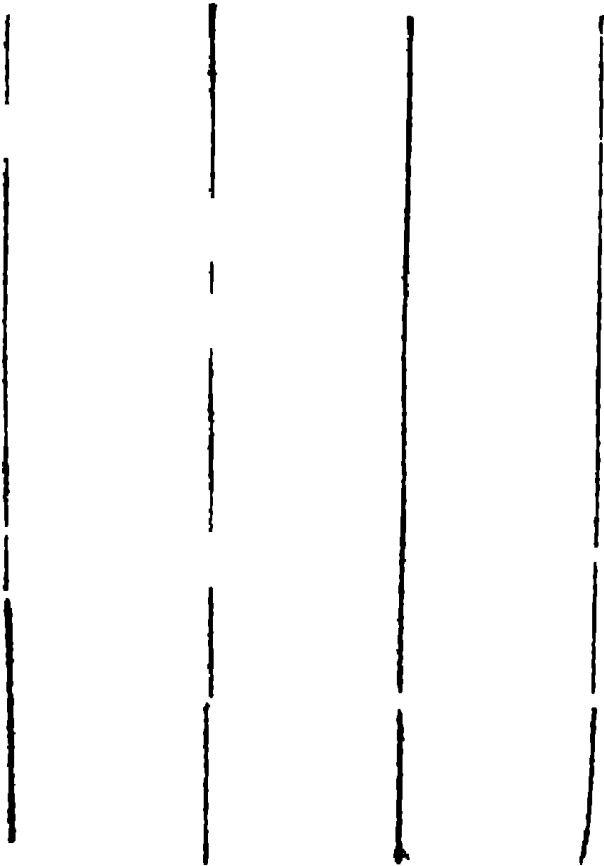
মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

সারদা—ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা। ৬।১ দ্বারকনাথ ...র লেন হইতে শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথঠাকুরের সম্পাদকতায় ...ব হইতেছে। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "ঠাকুরবাড়ী" ...পানির লীলানিকেতন। সংসাহিত্য ও সংশিল্পের ...বা এই ঠাকুরবাড়ীর চির-নির্ঝর হইতে বাহির ...া বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রকে সরস ও চিরশ্যামল করিয়া ...খয়াছে। তাই ঠাকুরবাড়ী হইতে নূতন কিছু বাহির ...লেই সাহিত্যসেবীবৃন্দের কৌতূহলের উদ্রেক হয়। ...লোচ্য মাসিকখানি পাঠে হতাশ হইয়াছি। তবে ইহা ...ন উদ্যম এবং যোগ্যস্থানে ইহার আবির্ভাব, এব ...যোগ্যহস্তে ইহার সম্পাদন ভার এই কারণে ভবিষ্যতে ...র উন্নতির আশা করা যায়। প্রথমেই রসময় ...ন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাব্যের প্রাণ' ইহাতে প্রাণের সন্ধান ...ইলাম না। 'পীড়নের পরিণাম' 'বেহাগ' ও 'রূপসী' ...ে তিনটী ছোট গল্প- নিতান্তই মামুলী ও ব্যর্থ রচনা। ...রদেব' শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা এব ...ং "ক্যাবলার কলপ্" তাহারই হস্তের রস রচনা মোটের ...পর মন্দ নয়। আত্মাহুতি ক্রমশঃ প্রকাশ্য গল্প। সমগ্র ...পড়িয়া কিছু বলা উচিত নহে। 'বিশপের পাচক' ...যুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনূদিত স্পেনীয় লেখকের ...টি গল্প। বেশ উপভোগ্য সরস-রচনা। "সোমলতা" ...সতীশচন্দ্র ঘটকের ক্রমশ প্রকাশ্য গবেষণামূলক ...বন্ধ। ইদানীন্তন মাসিক সাহিত্যের মধ্যে ১৩২৮ সালে ...রতবর্ষে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ...বং গত সাত বৎসরের প্রবাসী এবং ভারতবর্ষেও ...সম্বন্ধে প্রবন্ধ দেখিয়াছি। প্রবন্ধ লেখক এখনও নূতন ...কছু বলিতে পারেন নাই। 'ভারতমাতার স্বর-সাধনায়' ...এবং 'উৎসবের আবশ্যকতায়' সম্পাদক মহাশয় মৌলিক ...চন্তার পরিচয় দিয়াছেন। 'আত্মা' শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ...বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দার্শনিক নিবন্ধ, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ...বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। 'মীরাবাঈ' মন্মথনাথ গুপ্তের ...ক্রমশঃ প্রকাশ্য সুলিখিত রচনা। এই পুণ্যশ্লোক নারীর ...পুণ্যময় জীবন্ যতই আলোচিত হয় ততই ভাল; পত্রান্তরেও প্রকাশিত হইয়াছে। "বৈষ্ণবকাব্যে যন্ত্র সঙ্গীতের প্রভাব" শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল দাসের রচনা। প্রবন্ধের নামের সহিত আলোচ্য বিষয়ের সামঞ্জস্য নাই। স্বর্গীয় বড়াল কবির এবার সমালোচনা শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকুমারের ক্রমশঃ প্রকাশ্য রচনা। নূতন কথা লেখক কিছু বলেন নাই। স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। এই মাসিকখানিতে ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রবন্ধের আধিক্য ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। তিনখানি বহুবর্ণ রঞ্জিত চিত্র তাহার মধ্যে দুইখানি "কমলিনী সাহিত্য মন্দিরের" নিকট ধার করা। ঠাকুরবাড়ীকে অন্যের দ্বারস্থ হইতে দেখিলে দুঃখ হয়।

অর্চ্চনা—কার্ত্তিক সংখ্যা।—একবিংশতি বৎসর যাবৎ "অর্চ্চনা" নীরবে বাণীর পূজা করিয়া আসিতেছে। প্রবন্ধ গৌরবে "অর্চ্চনা" প্রথম শ্রেণীর মাসিকের সহিত একাসনে বসিবার উপযুক্ত। আলোচ্য সংখ্যায় উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধের দীনতা প্রকাশ পাইতেছে। একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত রাম সহায় বেদান্তশাস্ত্রীর "কপাল-কুণ্ডলার" সমালোচনা। যদিও কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে গিরিজাবাবু, অধ্যাপক অক্ষয়বাবু এবং সর্ব্বোপরি ললিত-বাবু অনেক কথা অতি সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন, তথাপি বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ও কপালকুণ্ডলা চরিত্রে নূতন আলোক-সম্পাত করিয়া কপালকুণ্ডলাকে নূতনভাবে দেখাইয়াছেন। প্রবন্ধটী পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। দুইটী প্রবন্ধে ভ্রমণকাহিনী; একটী 'দেরাদুন' ও অপরটী 'প্রয়াগে কুম্ভ-মেলা'। মাসিকের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতে ভ্রমণকাহিনী উপযুক্তই বটে। 'জ্যোতিষী' ছোট গল্প Oscar Wilder গল্পানুসরণে লেখা—ইতঃপূর্ব্বে উক্ত গল্প অবলম্বনে পত্রান্তরে গল্প বাহির হইয়া গিয়াছে। "প্যারিচাঁদ মিত্র"—"বঙ্গবাসীর" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺বিহারীলাল সরকারের রচনা। পুরাতন "বঙ্গবাসী" হইতে পুনর্মুদ্রিত। এই প্রবন্ধে বিহারীবাবু তাঁহার নিজস্ব লিখন ভঙ্গীতে প্যারীচাঁদ মিত্রের জীবন কথার আলোচনা, ও তাহার লেখার সমালোচনা করিয়াছিলেন প্রবন্ধটী স্থায়ী ভাবে রক্ষা করিবার জন্য সম্পাদক

পূজন অর্চনার অন্তর্ভূত করিলেন। উদ্দেশ্য সাধু, তাহাতে সন্দেহ নাই। "বহুরূপী" সুলেখক শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ক্রমশঃ প্রকাশ্য গল্প; সুতরাং সমালোচনা অশোভনীয়। 'ভুলবীর' শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল দাস এম-এ বি, এল মহাশয়ের লিখিত একটী 'গল্প'। "প্লটে" বিশেষত্ব নাই লেখায় 'আর্ট' নাই। 'কন্যা—বিয়োগে' কবিগুণাকর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ রচিত কবিতা। সমালোচনা না করাই ভাল। প্রবন্ধ সংগ্রহে ও নির্ব্বাচনে অর্চনা সম্পাদক মহাশয় অবহিত না হইলে পত্রিকার বহুদিনার্জ্জিত যশোরাশি অক্ষুন্ন থাকিবেনা।

সন্ধ্যারহস্য—শ্রীচন্দ্রকুমারদেবশর্ম্মা চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত ও ১১ নং বেলভেডিয়ার রোড, আলিপুর কলিকাতা হইতে শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত বর্ত্তমান যুগের একখানি অতি অবশ্য পাঠ্য পুস্তক অধুনা বঙ্গদেশে বিশেষতঃ সহরে এবং তাহার উপকণ্ঠস্থ সমৃদ্ধ গ্রামসমূহে ব্রাহ্মণগণ আর ত্রিসন্ধ্যা করেন না তাহার কারণ আলস্য ও মন্ত্রশক্তিতে অবিশ্বাস। এ ছুটীও পাশ্চাত্য শিক্ষার মুখ্য না হউক গৌণ ফল। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন "সন্ধ্যা উপাসনা নিত্য বা আশু কর্ম্ম ইহার ফলশ্রুতি নাই অর্থাৎ ইহা দ্বারা বিষয় প্রাপ্তি ঘটে না-- ইহার একমাত্র ফল চিত্তের সমতা। বর্ত্তমান যগে মানব বিষয়পরায়ণ হইয়া বদ্দারা বিষয়প্রাপ্তি ঘটে না, তাহাতে স্বভাবতঃই উদাসীন থাকে—সুতরাং মাত্র চিত্তসমতা লাভ জন্য কেহ উপাসনাদি কার্য্যে সময় নষ্ট করেন না— যদিও বহু ব্রাহ্মণ খোসগল্পে পরচর্চ্চায় তদপেক্ষা অনেক সময় নষ্ট করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ কর্ত্তব্যে অনাস্থা প্রদর্শন করাতে নিম্নবর্ণে মুরোও ধর্ম্মে অবিশ্বাস জাগিয়াছে তদুপরি পাশ্চাত্য শিক্ষার ভোগপ্রধানভাব-শিক্ষা দ্বারা মনে স্থান পাইয়া অর্থ ও বাহু বলকে আত্মোন্নতির (spiritual culture) উপরে স্থান দিয়াছে। এই সকল বিবিধ কারণে চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ প্রকাশ হইতেছে। অধুনা ব্রাহ্মণ সত্যই হৃতসর্ব্বস্ব—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের

> স্কন্ধে শুধু আছে পড়ে পৈতাখান।
> তেজহীন ব্রহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলস,

অত্যুক্তি নয়। ব্রাহ্মণগণ এখনও স্বধর্ম্মপরায়ণ হইলে এই বর্ণবিপ্লব অনেকটা শান্ত হইতে পারে। অনেকে সংস্কৃত ভাষা না জানায় সন্ধ্যা আরাধনার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে না পারাতে ঐ গতানুগতিক আরাধনা করেন না এই সকল অসুবিধাটা দূরীকরণার্থ সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ গ্রন্থকার মহাশয় অতি সরল ভাষায় সন্ধ্যারধনার সমুদায় মন্ত্রাদি সহজ বাঙ্গালায় অনূদিত করিয়া উহা সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেরও আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়া হিন্দুসমাজের মহা উপকার করিয়াছেন—ব্রাহ্মণগণ ইহা পাঠে স্বধর্ম্ম নিরত হইলে হিন্দুসমাজেব প্রভূত কল্যাণ হইবে ও গ্রন্থকারের ব্রাহ্মণ জাতির কল্যাণ কামনা সার্থক হইবে। শুনিলাম তিনি নিঃস্বার্থভাবে উক্তগ্রন্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন আজকালের দিনে ধর্ম্মের উন্নতির জন্য এরূপ কাজ একান্ত বিরল সুতরাং ইহার যোগ্য প্রশংসা দান করিবার শক্তি মানবের সাধ্যাতীত—যে ধর্ম্মের রক্ষণার্থ তিনি এই অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন সেই ধর্ম্মের বিমলানন্দে তাঁহার চিত্ত অহরহ আপ্লুত থাকুক ইহাই প্রার্থনা।

Printed & Published by Jnanendra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
14 Jaggannath Datta Lane Calcutta.
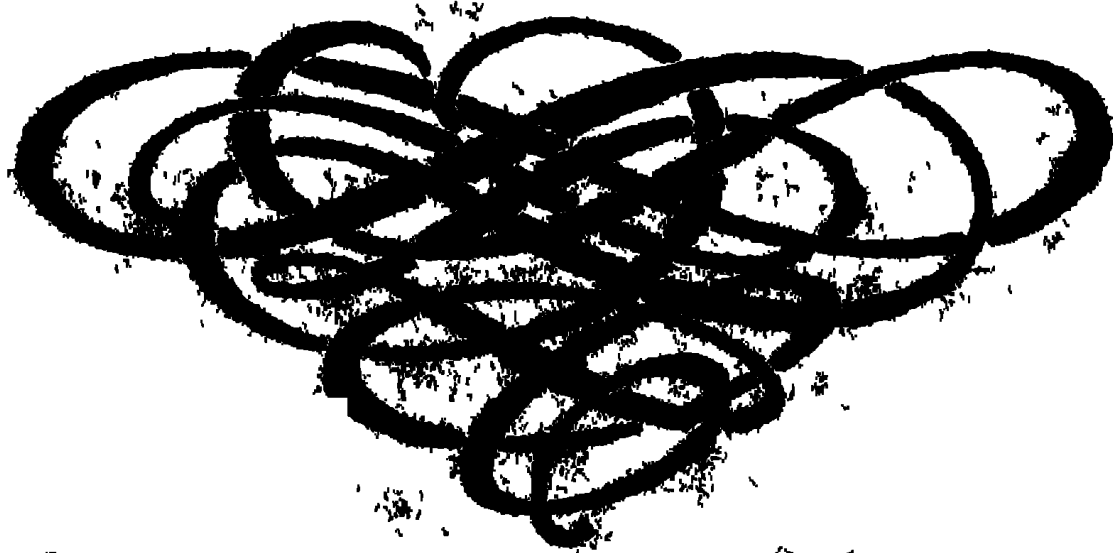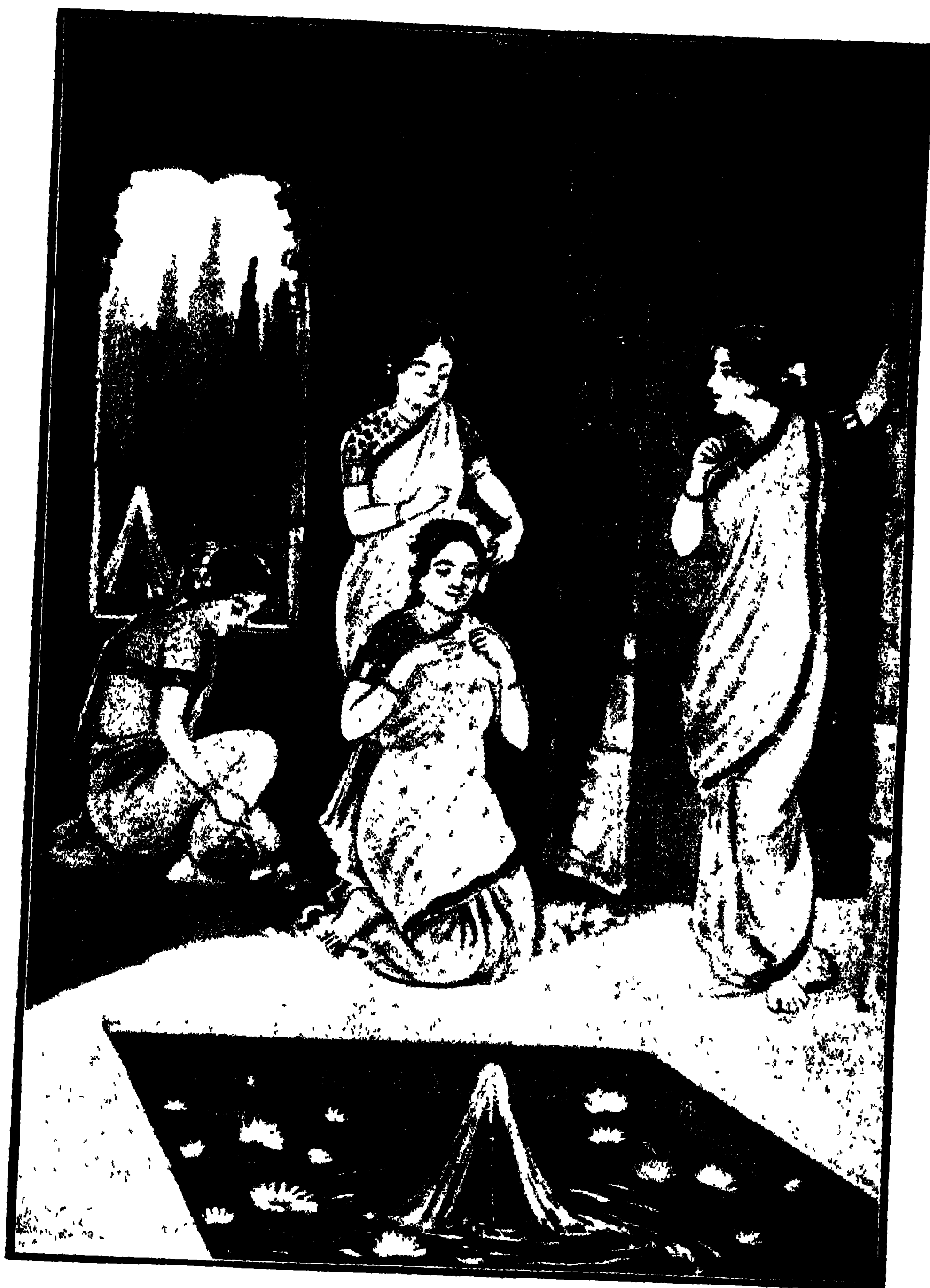
সখীগণ সঙ্গে—

গোপাল তোমার দিব বকুলমালা
গন্ধে ভুলে যাবে হৃদয় জ্বালা

প্রথমবর্ষ] ৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ২২শে নভেম্বর [১৭শ সংখ্যা

স্তব্ধ বাঁশী

জনৈক বঙ্গ-নারী

বাঁশীতে যা বেজেছিল গিয়েছে তা' ছড়িয়ে
সকলের মনে প্রাণে গিয়েছে তা জড়িয়ে।
ঘুমন্ত সাগর তাও বাঁশী শুনে জেগেছে
কাঁচা ঘুমভাঙ্গা চোখে এ কি আলো লেগেছে।
বাঁশীতে যা বেজেছিল দীপকের রাগিনী
শুনেছে তা তুলে মাথা কত নাগ নাগিনী
তালে তালে দোলে ফণা উঠে শির আকাশে
নিঃশ্বাসে ঝড় বয় এ বনের বাতাসে।
বাঁশীতে যা ভরা ছিল পিয়েছে তা সকলে
ধরে গেছে নেশা তার কি হবে তা সামালে
গান থামে সুর থাকে চেতনায় আভাসে
মূর্ত্তি হারায় যার অরূপে সে প্রকাশে।
ফিরায়ে বাজাও পুনঃ থামায়োনা বাঁশরী
ছুটে যায় কত প্রাণ সব বাধা পাসরি
কত ভাই কত বোন কত আপনার জন
কত স্নেহ শুভাশীষ ফিরে তোমা আবরি
দাও নব জীবনের পথে আলো বিতরি

ছলনার প্রতি

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ

অয়ি সুন্দরী ছলনা—হৃদয়ের রাণী মোর
আমরি কি গাঢ় প্রেম—অগাধ করুণা তোর
আমা প্রতি নিত্য নব। কি কৌশলে অপরূপ
রাখিতেছ নিত্য ঢাকি কালিমাখা কালোরূপ
বীভৎস কুৎসিত মোর।
শোভন স্বর্গীয় যাহা
নহেরে মোহন শত সত্যের আলোকে তাহা
তব গুণে হে সুন্দরী আমি সে সুন্দর বড়
অন্ধ জগতের চোখে।
কণ্ঠ নম্র, দৃষ্টি নত
ললাটে চন্দন লেখা হরিনাম রসনায়
অধরে মধুর হাসি আধ ম্লান বেদনায়
পুণ্য প্রতি অনুরাগ, পরদুঃখে দীর্ঘশ্বাস
ভোগের মাঝারে হায় ঘোর বৈরাগ্য-বিকাশ—
সত্য কি স্বরূপ মোর?
মূঢ় বিশ্ব ভাবে তাই!
আ মরি কি লীলা তোর—জগতে তুলনা নাই।

ভাই-ফোঁটা

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বি, এল

"কত রাত্রি, চারু!"

"রাত, আর বেশী নেই ; পূব্‌দিকে আলো দেখা যাচ্ছে, পাখী ডাকচে।"

কাশীর উপকণ্ঠে বরুণার ধারে একটী ছোট বাগান-বাড়ীর দ্বিতলে একটী ঘরে দুইজনে কথা হইতেছে। প্রশ্নকর্ত্তা একজন বাঙ্গালী যুবক নাম—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যুবক বটে, কিন্তু যৌবনের কোন চিহ্ন সে দেহে নাই। আজ বৎসরাবধি সুরেশ রোগ শয্যায়। কাল ব্যাধি তাহার দেহের যৌবন ও স্বাস্থ্যের সব চিহ্ন মুছিয়া লইয়াছে। অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট দেহখানিকে সমস্ত চেষ্টা ও সেবা দ্বারা স্ত্রী চারুবালা কোন রকমে বজায় রাখিয়াছে মাত্র।

"সারা রাতটী জেগে বসে আছ? তোমার চোখে কি ঘুম আসে না চারু—থাক্, পাখা রেখে দাও, আর বাতাস কর্ত্তে হ'বে না ;—ঝির ঝির্ কোরে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে ; তুমি একটু ঘুমোও—।"

"আমি তোমার অষুধ পথ্য দিয়ে, তারপর ঘুমুব অখন।"

"চারু, পূবের জানালাটা ভাল কোরে খুলে দাও, দেখি। সূর্য্যোদয় দেখবার জন্যে বড় ইচ্ছা হ'য়েছে।"

চারু উঠিল, পূর্ব্বের জানালাটা খুলিয়া দিয়া নিশার প্রদীপ নিভাইয়া দিল। সুরেশ একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। চারু তাড়াতাড়ি রুগ্ন স্বামীর কাছে আসিয়া, তাহার পিঠের দিকে দুই তিনটা বালিশ উপরি উপরি রাখিয়া স্বামীর স্বচ্ছন্দে বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

তারপর কপালে হাত দিয়া উল্লসিত কণ্ঠে বলিল—"এই যে! জ্বর ছেড়েছে দেখছি।"

সুরেশ তাহার শীর্ণ হাত দিয়া চারুর শীতল ও কোমল হাতখানি নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া উদাস দৃষ্টিতে পূর্ব্বাকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

চারু স্নিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "গায়ে হাত বুলিয়ে দেব কি?"

"না, থাক্।" একটী দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত এই কয়টী কথা বলিয়া সুরেশ চুপ করিয়া রহিল।

মিনিট দুই পরে সুরেশ ডাকিল—"চারু!" কণ্ঠস্বর প্রগাঢ়,—বেদনা মিশ্রিত।

"কি বল'বে?"

"বাড়ী থেকে বেরিয়েচি, আজ কতদিন হ'ল।"

"পাঁচ মাস ;—তাতে কি? যতদিন না অসুখ ভাল হয় ততদিন এখানে থাকতে হবে ; ডাক্তার ব'লেছে আর পনেরটা ইংজেকসন কল্লেই ভাল হ'য়ে উঠ্‌বে—পীলেটা খুব কমেছে।"

"আর ভাল হোয়ে উঠ্‌বো। এ কালাজ্বর নয়,—এ কাল-জ্বর। এ মুমূর্ষুকে নিয়ে কতদিন আর ভেসে ভেসে বেড়াবে! মরণ হলেই সব দিকে মঙ্গল!"

চারু খপ্ করিয়া সুরেশের মুখে হাত চাপা দিয়া ব্যথিত স্বরে কহিল,—"ছিঃ, ও কথা বলতে নেই।"

"মাইনে বন্ধ ; তোমার গায়ের গহনা, একে একখান কোরে সব ঘোচালুম, হাতের কটি টাকা [illegible] তারপর উপায়?"

"[illegible] তুমি ভাব কেন? শিল্পদায়ের উপায় তিনি" এই বলিয়া চারু ঊর্দ্ধদিকে দেখাইল। ক্ষণ পরে বলিল—"তুমি যে আমাকে এত যত্ন ক'রে, এত পয়সা খরচ কোরে লেখাপড়া গান-বাজনা শেখালে, তা' কি এ দুর্দ্দিনে আমাদের কোন কাজে আস্‌বে না?—যদি কোন ভদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের—"

প্রস্তাবটা সুরেশের বড় তিক্ত লাগিতেছিল। সে কথাটাকে অন্য কথা দিয়া চাপা দিবার চেষ্টা করিল।

মঙ্গলময়ের এই আনন্দ-কাননে দুইটী অসহায় প্রাণী—তার মধ্যে একটী মরণের পথের যাত্রী—বর্ত্তমান চিন্তা করিয়া নিরাশ হইতেছে এবং ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বিভীষিকা দেখিতেছে।

দিনের পর দিন, যাইতেছে আসিতেছে—কিন্তু প্রভাতের আলোর সঙ্গে সঙ্গে দিনমণি আশার আলোক আনিতেছে না। তাহাদের ভবিষ্যৎ গাঢ় তমসাময়।

টাকা ছিদ্র কলসের জলের মত ক্রমশই ফুরাইয়া আসিতেছে। তবে কি সুরেশকে শেষটা হাসপাতালে আশ্রয় লইতে হইবে?

২

একদিন অপরাহ্ণে চারু একখানি খবরের কাগজ পড়িয়া শুনাইতেছিল। পড়িতে পড়িতে সহসা দৃষ্টিতে পড়ে এমন একটী স্থলে একটী বিজ্ঞাপন চারুর নজরে পড়িল। সেটী চারু মনে মনেই পড়িল—

বিজ্ঞাপন

একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় উচ্চ শিক্ষিত তরুণ শিল্পীর চিত্রাঙ্কণে "আদর্শের" (model) কার্য্য করিবার জন্য একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভদ্র্যা যুবতীর আবশ্যক। সামান্য সময়ের জন্য প্রতিদিন বা যেদিন আবশ্যক হইবে, তাঁহাকে চিত্রশালায় আসিতে হইবে। কোনরূপে সম্ভ্রম বা মর্য্যাদা হানির আশঙ্কা নাই। ফটো থাকিলে তৎসহ, নতুবা স্বয়ং আসিয়া নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে। মনোনীত হইলে পারিশ্রমিক সম্বন্ধে কথা হইবে। C/o ম্যানেজার, পোষ্ট বক্স, ২৩৪৫।

বিজ্ঞাপনটী মনে মনে পড়িয়াই, চারু হঠাৎ উঠিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল এবং বারান্দায় দাঁড়াইয়া সুদূর শূন্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

[illegible] উত্তরের [illegible] পর [illegible] প্রত্যহই [illegible] আগ্রহে বায়-বিলম্বিত চিঠির বার্ত্তা [illegible] কাহার চিঠির জন্য সে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছে। অবশেষে একদিন প্রত্যাশিত চিঠিখানি সে পাইল।

নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম স্বাক্ষরে কোন ভদ্রলোক —হইতে লিখিতেছেন—"আপনার ফটো দেখিয়া [illegible] আপনার দ্বারা আমার কার্য্য হইবে। তবে ফটো দেখিয়া অনেক সময়ে গঠনের দোষগুণ ধরা পড়ে না। আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। আমার বাড়ীতে, কি আপনার বাড়ীতে কোন সময়ে দেখা হইতে পারে লিখিলে অনুগৃহীত হইব।" চিঠি পড়িয়া চারু তাহার উত্তর লিখিয়া পাঠাইল।

৩

আজ তাহার স্বামীকে সকাল সকাল ঔষধ পথ্য দিয়া পরে ঝিকে সঙ্গে লইয়া একখানি গাড়ীভাড়া করিয়া গঙ্গাস্নান ও বিশেশ্বর দর্শনে বাহির হইল। দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান সারিয়া চারু বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিল। গঙ্গাজল ফুল বিল্বপত্রে দেব পূজা সারিয়া করযোড়ে বিশ্বনাথকে প্রাণের বেদনা জানাইল, স্বামীর আরোগ্য কামনায় পূজা মানসিক করিল। চারু যখন মন্দির হইতে বাহির হইল তখন তাহার দুইটী আয়ত চক্ষু অশ্রুবারিতে ভাসিতেছে। গঙ্গাজলের সঙ্গে নয়ন জল মিশাইয়া কি অভাগিনী দেবতাকে স্নান করাইল?

অন্নপূর্ণার দ্বারে আসিয়া চারু দাঁড়াইল। চঞ্চল নয়নে সে কাহারে খুঁজিতেছে? মন্দির চত্বরের একপ্রান্তে, কিছু দূরে দৃষ্টি পড়িতে চারু দেখিল, পট্টবস্ত্র-উত্তরীয় পরিহিত একজন সুপুরুষ যুবক তাহার দিকে চাহিয়া আছে। চারুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্রই যুবক হাত তুলিয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল—অপরিচিতের নিকট থেকে এই সম্মান পাইয়া চারুর সোনা স্নিগ্ধ মুখখানিতে লজ্জার রক্তিম-রাগ ছড়াইয়া পড়িল। যুবক তখন একটু কাছে আসিয়া অতি নিপুণ ও সাবধান দৃষ্টিতে চারুর আপাদ মস্তক একবার ভালরূপে দেখিয়াই মন্দিরের বাহিরে গেল।

ঝি বলিল,—"দেবী কাঁদছ কেন, মা। বেলা হ'ল; চল, বাড়ী যাই।"

ঝির কণ্ঠস্বরে চারু যেন চমকাইয়া উঠিল। পরে নিজেকে সামলাইয়া বলিল,—"হ্যাঁ, চল যাই।"

চারু দ্রুতপদে মন্দির ত্যাগ করিয়া রাস্তায় আসিয়া গাড়ীতে উঠিল।

এই ঘটনার একদিন পরে, চারু সেই বিজ্ঞাপনদাতা চিত্রকরের চিঠি পাইল। তাহার মর্ম্ম এই, পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত, ৺অন্নপূর্ণা মন্দিরে চারুকে তিনি দেখিয়াছেন। তাহার মুখশ্রী ও গঠন তাহার মনোনীত হইয়াছে। দ্বিপ্রহরে দুই ঘণ্টা করিয়া অঙ্কণের জন্য বসিতে হইবে। প্রতিবারে দশ টাকা করিয়া দিতে পারেন। যে যে দিন প্রয়োজন হইবে আনিবার জন্য চিত্রকরের ঝি মোটর সহ যাইবে। সম্মতি থাকিলে ফেরৎ ডাকে যেন উত্তর লেখা হয়।

(৭)

সেইদিন দ্বিপ্রহরে চারু সুরেশের কাছে অতি কুণ্ঠিত ভাবে কথাটা পাড়িল। সব কথা না বলিয়া কিছু কিছু গোপন করিল। কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে মেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্য একটী চাকুরী জুটিয়াছে। সে চাকুরী আবার প্রত্যহ দুই ঘণ্টার জন্য। সুরেশ বিস্তর আপত্তি করিল। কিন্তু চারুর সেবাস্পৃহতা ও কাতরতার কাছে শেষে তার মানিতে হইল। সুরেশ অবশেষে অনুমতি দিল, বটে,—কিন্তু তাহার হৃদয় যেন তাহাতে ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তারপর, দুইজনে বহুক্ষণ নীরবে রহিল।

নগরীর উপকণ্ঠে, শিবপুরের জমীদার রমেন্দ্রনাথ রায়ের সুদৃশ্য সুরক্ষিত বাগান বাটীর ফটকের মধ্যে একখানি মোটর গাড়ী চারুলতাকে লইয়া প্রবেশ করিল। ঝি তাহাকে সঙ্গে করিয়া দ্বিতলের একটী সুসজ্জিত ঘরে বসাইল। এইটী রমেন্দ্রবাবুর "ষ্টুডিও" চিত্রশালা। দেশী ও বিলাতী নানা ছবিতে ঘরখানি সুশোভিত। কোথাও বা ক্যানভ্যাসের উপর দু একখানি অসমাপ্ত ছবির রেখাঙ্কন। চারু মুগ্ধ নেত্রে ছবিগুলি দেখিতেছে এমন সময়ে শিল্পী রমেন্দ্রনাথ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সসম্ভ্রমে চারুকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "এই যে আপনি এসেছেন! আপনি অনুগ্রহ কোরে সম্মত হোয়েছেন দেখে বড়ই আনন্দিত হয়েছি। দেখুন, দু' একদিন আপনাকে বসবার প্রণালীটা শিক্ষা ও অভ্যাস কর্ত্তে হবে। তার পরে আঁকা আরম্ভ কর্ব্ব। একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি?" চারু মৃদুস্বর উত্তর করিল "কি, বলুন?" অপরিচিত যুবকের সঙ্গে এই দু'টী কথা বলিতে চারু বড়ই লজ্জাবোধ করিল। "আপনি কালিদাসের শকুন্তলা পড়েছেন কি?" 'পড়েছি। কিন্তু মূল সংস্কৃতে পড়ি নাই, অতদূর লেখা-পড়া শিখি নাই, তবে বাংলা অনুবাদ প'ড়েছি।"

"বেশ, বেশ, তা'তেই কাজ চলবে। আমি শকুন্তলা নাটকের দৃশ্যগুলি চিত্রে পরিকল্পনা কর্ত্তে চাই।" তারপর কোন কোন ঘটনা ও দৃশ্যগুলি রমেন্দ্র ছবিতে ফুটাইবার মনস্থ করিয়াছে, তাহা সে চারুকে অল্প কথায় বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে বসিবার কায়দা করণ অভ্যাস করাইতে লাগিল।

সেদিনের মত কার্য্য শেষ হইলে, রমেন্দ্র চারুর হাতে দশ টাকার একখানি নোট গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। তাহার পর নিজের ঘরে আসিয়া আরাম কেদারায় গা ঢালিয়া দিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে ভাবিতে লাগিল—"হ্যাঁ এইবার মনের মত একটী "মডেল' পেয়েছি কি সুন্দর মুখশ্রী। কি চোখ। কি করুণ দৃষ্টি। কি সুন্দর গড়ন। কালিদাসের কল্পিত ছবির অনুরূপই বটে। কিন্তু মুখে যেন একটা বিষাদের ভাব মাথা। ঐটা দূর ক'রে সারল্যের ভাব আনাতে হ'বে। তা' হ'লেই ঠিক হ'বে। ভদ্রঘরের মেয়ে বোধহয়? সীঁথিতে সিন্দুর বিন্দু আছে কি? সেটা লক্ষ্য করি নাই। কিন্তু দূর হ'কগে আমার সে খোঁজে দরকার কি?

সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া রমেন্দ্র গুণ গুণ স্বরে রবী বাবুর কোন গানের একটী কলি গাহিতে গাহিতে ঘরের বাহিরে গেল।

বেলা দুইটা, রমেন্দ্রের তুলিকা নিপুণ হস্তে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। ইহার আগে রমেন্দ্র দুইখানি ছবি আঁকি যাছে। চারুলতার সুঠাম দেহলতাকে আশ্রয় করিয়া তরুণ শিল্পীর অন্তরের অশরীরী ভাবসম্পদ বিচিত্র বর্ণ বিন্যাসে পটের উপরে মনোমদ মূর্ত্তিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ এই নূতন ছবিখানি আঁকিতে প্রকাশের আনন্দ শিল্পীর ভাব-প্রবণ হৃদয়কে ভরপূর করিয়া তুলিয়াছে। শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের প্রথম মিলনের দৃশ্যটী আঁকা হইতেছে।

বসনাঞ্চল কাঁটাগাছে বাধাইয়া তাহা মুক্ত করিবার ছলে ব্যাবৃত্তমুখে, সপ্রেম দৃষ্টিতে, শকুন্তলা রাজাকে একটীবার অপাঙ্গে দেখিয়া লইতেছেন।

রমেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ঘাড় বাঁকানটী আর অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপটী আপনি ঠিক মাথায় আন্‌তে পাচ্ছেন না।" বাস্তবিক চারু বার বার চেষ্টা করিতেছে আর ব্যর্থ হইতেছে। রমেন্দ্রের কথায় চারু শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিল। রমেন্দ্র হাসিয়া বলিল—ও,—তোলো না। ঘাড় বড্ড বেঁকে গেল!"

রমেন্দ্র তুলি ফেলিয়া পুনরায় চারুর কাছে গেল। তখন সে এক ভাবে মগ্ন হইয়া আছে। কোনরূপ দ্বিধা বোধ না করিয়া রমেন্দ্র চারুর চিবুকটা ধরিয়া একটু ঘুরাইয়া দিয়া নিজের আসনে ফিরিয়া আসিল। কাজটা করিয়াই রমেন্দ্রের বুকের মধ্যে কিসের যেন একটা ধাক্কা লাগিল। চারুও নারী প্রকৃতির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিল না, যুবকের করস্পর্শে তার শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল; লজ্জায় তার সুন্দর মুখখানি আরক্তিম হইয়া উঠিল—।

রমেন্দ্র সোৎসাহে বলিয়া উঠিল "বাঃ। এইবার অতি সুন্দর হয়েছে—।" বাক্য তাহার অন্তরের ভাবেরই প্রতিধ্বনি করিল—চারুর সেই লজ্জা রাগ-রঞ্জিত মুখখানির শোভা শিল্পী মগ্ন নেত্রে উপভোগ করিতে করিতে আঁকিয়া চলিতে লাগিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিতে লাগিল। চিত্রকর ও আদর্শ আজ যেন নিজের নিজের ভাবের গভীরতায় ডুবিয়া গিয়া আত্মহারা।

ঘড়ি টং টং করিয়া পাঁচটা বাজিল চারুর চমক ভাঙ্গিয়া দিল। সে তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিল।

চারুকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল—"আজ তোমার এত দেরী কেন, চারু?"

চারু অপরাধীর মত ধীরে ধীরে স্বামীর শিয়রের কাছে টেবিলটার নিকট যাইয়া কাচের পাত্রে ঔষধ ঢালিতে আরম্ভ করিল।

এই ক্ষুদ্র সংসারটী হইতে দারিদ্র্যের কাল ছায়া আজকাল যেন অপসারিত হইয়াছে।—আশাতীত রোজগারের পয়সা হইতে চারু তাহার স্বামীর চিকিৎসা ও পথ্যের সুব্যবস্থা করিতে পারিতেছে;—আর সুরেশের পীড়ার অবস্থাও আজকাল অনেকটা ভালর দিকে চলিয়াছে।

রমেন্দ্রের তুলিকা আজ কয়দিন ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়কে অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতেছে;—কখন বা তাহার দৃষ্টি আবশ্যকের অতিরিক্ত সময় চারুর মুখের দিকে নিবদ্ধ থাকে আর ইহার মধ্যে কখন তাহার অজ্ঞাতসারে তুলিকা হস্তচ্যুত হইয়া মেজেয় পড়িয়া যায়! রমেন্দ্র অপ্রস্তুতের মত তাহা কুড়াইয়া লইয়া পুনরায় অঙ্কনে মন দেয়। এমনি এক দিনে, রমেন্দ্র যেন বিরক্ত হইয়া তুলিটা টেবিলের উপর ছুড়িয়া দিয়া বলিল,"না, আজ আর কাজে মন লাগ্‌ছেনা!" চারু কহিল, আজ তবে থাক্; আমি বাড়ী যাই" এই বলিয়া সে উঠিল। "এরই মধ্যে যাবেন কেন; একটু বসুন না? দুটো গল্প করা যাক্।" চারু বসিল বটে, কিন্তু উভয়ে যেন বলিবার মত কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

রমেন্দ্র ক্ষণপরে এই অশোভনীয় নীরবতা ভঙ্গ করিবার জন্যই যেন কহিল "এতদিন, আপনি এখানে আস্‌ছেন, আপনার পরিচয় ত আজও আপনি দিলেন না!"

—"পরিচয়ের প্রয়োজন কি? আমি যেন জগতের কাছে চিরকাল অপরিচিতই থাকি।"

"এমন কথা বল্‌ছেন কেন, বল্‌তে পারি না। তবে কোথায় কোন তরুগুল্মের আড়ালে বনফুল আনন্দে ফুটে থাকে, তার পরিচয় তার মধুর সৌরভেই জগৎকে জানিয়ে দেয়।"

চারু হাসিয়া বলিল "রমেন্দ্র বাবু, আপনি শুধু শিল্পী ন'ন। কবিও বটেন।

"ঠাট্টা রাখুন। বাস্তবিক, আপনি কি নিজেকে আমার কাছ থেকে রহস্যের আবরণে লুকিয়ে রাখ্‌বেন্?

"তাতে আপনার কি-ই বা যায় আসে; মনে মনে কি জান্‌ছেন না, যে আমি আপনার বেতন ভোগিনী মাত্র।

"কথাটা শুনে বড় দুঃখিত হ'লেম, টাকা আনা পাইএর কথা তুল্লে আমার প্রতি অবিচার করা হবে।"

চারু সে কথায় দুঃখিতস্বরে বলিল—"না না আমি তা বলছিনা। আমার মত হতভাগিনী নারীর অন্য পরিচয়ই বা কি হতে পারে!"

সত্যসত্যই চারুর চক্ষু সিক্ত হইয়া আসিল। পরে গাঢ় স্বরে বলিল, আচ্ছা, আর একদিন আমার কথা আপনাকে বল্‌'ব। আজ থাক্।"

রমেন্দ্র বলিল।" দেখুন, একটা কথা আপনাকে বলতে সঙ্কোচ বোধ কর্চ্ছি। আপনি যে ভাবে, আমাকে দেখেন অর্থাৎ টাকা আনা পাইযের সম্পর্কের ভিতর দিয়ে সে ভাবে দেখ্বেন না। আপনার কথার ভাবে মনে হয় আপনার মনের মধ্যে কোন একটা গোপন ব্যথা লুকান আছে। কিছু মনে কর্বেন না—আমাকে আপনার নিজের লোকের মত ভাব্বেন,—আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমি যথা সাধ্য—"চারু বাধা দিয়া বলিল, "ধন্যবাদ আপনাকে, প্রয়োজন হলে অবিশ্যি বল্বো বই কি? আপাতত নাই।' এই বলিয়া চারু উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমেন্দ্র দেরাজ হইতে দুইখানি নোট বাহির করিয়া চারুকে দিতে গেল—চারু তাহা লইতে চাহিল না—কেননা আজ কোন কাজ হইলনা। রমেন্দ্র চারুর আপত্তি শুনিল না—সে খপ্ করিয়া চারুর ডান হাত খানি ধরিয়া তাহার মুঠার ভেতর নোট দুইখানি গুজিয়া দিয়া নিজের দুই হাতে চারুর মুঠা চাপিয়া ধরিয়া চারুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল—সে দৃষ্টিতে কত কাতর অনুরোধ কত নীরব আকুলতা! চারু সহসা হাত সরাইয়া লইতে পারিলনা। লজ্জায় আরক্তিম হইয়া নিজের বক্ষঃস্পন্দন শব্দ যেন নিজে শুনিতে লাগিল। তারপর বিমুগ্ধ রমেন্দ্র ঘরের বাহির হইয়া গেল। চারু অর্দ্ধেক সিঁড়ি নামিয়া রমেন্দ্রের কণ্ঠের একটা কথা শুনিতে পাইল—"ক্ষমা।"

সে দিন চারু বাড়ী ফিরিলে সুরেশ একটু রুক্ষস্বরে চারুকে জিজ্ঞাসা করিল—

"আচ্ছা, চারু, তুমি আমায় বলবেনা তুমি কোথা যাও,"

"সে কথা, শুনে কাজ কি, তুমি কি আমায় সন্দেহ কর।" চারুর স্বর অভিমান রুদ্ধ।

"কি কথার কি উত্তর। আমি কি তাই বলছি, চারু। বড় কঠিন কথাটা বলে ফেল্লে। তোমার পীড়িত রুগ্ন স্বামীকে নিয়ে তুমি দেখ্ছি—"

চারু কথাটা শেষ করিতে দিল না আবেগ ভরে স্বামীর পা'য়ের উপর মাথা ঠেকাইল, সঙ্গে সঙ্গে যে টা দুই তপ্ত অশ্রু সেই রোগজীর্ণ পাদুখানিকে অভিষিক্ত করিল। আর আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, আমায় মাফ্ ক'রো। তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি আমায় মাফ্ করো।

সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া চারুকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টায় তাহার পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিল।

পরদিন চারু রমেন্দ্রের শিল্পাগারে গেল না—তাহার অসুখ করিয়াছে এই কারণ দেখাইয়া মোটর ফিরাইয়া দিল। ঝিকে বলিয়া দিল অসুখ সারিলে সে নিজে যাইবে। ইহার মধ্যে মোটর পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

উপরি উপরি তিন দিন দুপুর বেলায় চারুকে বাড়ীতে থাকিতে দেখিয়া সুরেশ চারুকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আর পড়াতে যাও না কেন? তারপর একটু হাসিয়া বলিল "দেওয়ালীর ছুটী বুঝি?" পশ্চিমে দেওয়ালীর খুব ধম, ৺কালীপূজাও আসন্ন।

চারু সে কথার উত্তর না দিয়া কি একটা কাজে মন দিল। ইহার পরদিন রমেন্দ্রের একখানি চিঠি আসিল। চারু তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া সুরেশকে লুকাইয়া চিঠিখানি পড়িল। চারুর অভাবে তাহার চিত্র সকল অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। সেদিনকার আচরণে যদি সে চারুর মনে ব্যথা দিয়া থাকে সেজন্য রমেন্দ্র চারুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছে। যদি চারু অন্ততঃ একদিনের জন্য একটী বার দয়া করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করে, তাহা হইলে সে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিঠিখানা পড়িবার পর হইতে চারু বড়ই অন্যমনস্ক। তবে কি সত্য সত্যই রমেন্দ্র তাহাকে ? তাহার হঠকারিতার কি এই পরিণাম? এর শেষ কোথায়? ভাবিতে ভাবিতে চারুর মস্তিষ্ক গরম হইয়া উঠিল! সে আর ভাবিতে পারিল না।

পরদিন দুপুর বেলা চারু সুরেশকে জানাইল সে আজ পড়াইতে যাইবে। ঝি একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকিয়া আনিল। চারু ঝিকে সঙ্গে করিয়া শিবপুর অভিমুখে চলিল। গাড়ী রমেন্দ্রের বাগানবাড়ী পৌছিলে, চারু ঝিকে নীচে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, একেবারে দ্বিতলে রমেন্দ্রের চিত্রশালার দ্বারে গিয়া করাঘাত করিল। রমেন্দ্র দ্বার খুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিল সম্মুখে চারু—।

চারু যে পুনরায় এ কক্ষে পদার্পণ করিবে রমেন্দ্র তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই চারুকে সে যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া ঘরের মধ্যে বসাইলে,—চারু রমেন্দ্রের

মুখের দিকে তাকাইতেই তার মনের ভিতর কে যেন একটা প্রবল ধাক্কা দিল। কি পরিবর্ত্তন! মুখশ্রীতে কে যেন কালী ঢালিয়া দিয়াছে—দৃষ্টি, নিষ্প্রভ! চারু মনে মনে প্রশ্ন করিল, "এর জন্য দায়ী কে? আমি?" আর সঙ্গে সঙ্গে তার কমনীয় মুখখানি ম্লান হইয়া পড়িল।

চারু জোর করিয়া মুখে হাসিয়া কি কহিল, "রমেন্দ্র বাবু, আমি ত' এসেছি; আপনার ছবি শেষ ক'রে দেলুন।

রমেন্দ্র ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "না, ছবি অসমাপ্তই থাক্।"

"কেন?" "সমস্ত হয়ে গেলে, আর ত সম্মুখের এই জীবন্ত ছবিখানি দেখ্‌তে পা'ব না!"

কথাটা শুনিয়া চারুর হৃৎপিণ্ডটা ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল! চারু হাসিয়া বলিল, সত্যিই কি আমি খুব সুন্দরী।" কথাটা বলিতে লজ্জায় চারুর রসনা জড়িত হইতেছিল। রমেন্দ্র উত্তর করিল—"খুব সুন্দরী কি না, ঐ দর্পণকে জিজ্ঞাসা কর—আমি বল্‌তে পারি না, তবে আমার কাছে তুমি—না না মাপ কর্ব্বেন আপনি শিল্পীর জাগ্রত স্বপ্ন—কবির মানসী প্রতিমা।"

বুদ্ধিমতী রমণী সমস্তই বুঝিল, আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া অনুচিত বোধে, চারু অন্য কথা পাড়িবার উদ্দেশ্যে বলিল,—

"রমেন্দ্র বাবু, আপনি না আমার পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন একদিন? কাল আপনাকে আমার পরিচয় দিব। তবে এখানে নয় আমার বাড়ীতে। আপনারা বড় লোক, যদি স্পর্দ্ধা বিবেচনা না করেন তবে গরীবের বাড়ী কাল মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ রৈল। আমি কুলীন-ব্রাহ্মণ কন্যা—আপনার আপত্তি হবে না। আশা করি নিরাশ কর্ব্বেন না।" এই কথাগুলি বলিয়া রমেন্দ্রকে কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া সে বাহির হইয়া গেল। রমেন্দ্র প্রথমে বিস্মিত পরে হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—যে ভাবনার না আছে কূল না আছে কিনারা।

আজ খুব ভোরে উঠিয়া চারু স্নানাদি সারিয়া রন্ধন কার্য্যে ব্যপৃত। সে সুরেশকে জানাইয়াছে যে আজ একটী নূতন অতিথি—যাঁহার বাড়ীতে চারু কার্য্য করে—তিনি নিমন্ত্রণে আসিবেন।

বেলা এগারটার সময় একখানি মূল্যবান মোটর সুরেশের বাড়ীর সম্মুখে থামিল। রমেন্দ্র বাটীর ভিতর ঢুকিতে ইতস্তত করিতেছে এমন সময় চারু বাহির হইয়া অতিথিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া নীচের একটী ঘরে বসাইল। চারু আজ একখানি লালপেড়ে গরদে দেহখানিকে আবৃত করিয়া মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার মত দেখাইতেছে। চারুর এ মূর্ত্তি দেখিয়া রমেন্দ্র বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইল।

সুরেশ ভাবিতেছে নিমন্ত্রিতটী কে? সুপুরুষ, যুবাপুরুষ। বড়লোকের ছেলে নিশ্চয়ই অত বড় যার মোটর! চারু ত অবাধে তাহাকে বাড়ীর ভিতর অভ্যর্থনা করিয়া আনিল, ইহা স্বচক্ষে সে উপরের ঘরের জানালা হইতে দেখিয়াছে। এ তবে কি চারুর? একটা সন্দেহের মেঘ সুরেশের মনের এক কোণে জড় হইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল, ব্যাপারটা কোথায় গড়ায় দেখিতে হইবে।

পার্শ্বের ঘরে আহার্য্য সামগ্রী সাজাইয়া দিয়া চারু রমেন্দ্রকে আহারার্থ ডাকিল। রমেন্দ্র সোল্লাসে বলিয়া উঠিল! এত আয়োজন করবার কোন দরকার ছিল না?"

চারু সে কথার উত্তর না দিয়া রমেন্দ্রের হস্তে স্বহস্তের কাটা সূতার প্রস্তুত কোঁচান খদ্দরের ধুতি ও উড়ানী দিয়া বলিল—"পরুন!"

রমেন্দ্র বিস্মিত স্বরে বলিল, "এ কেন?"

"এযে দিতে হয় ভাই আজ যে ভাই ফোঁটা, ভাই!"

রমেন্দ্র যেন বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। ক্ষণপরে মুখ তুলিয়া সম্মুখে দেখিল ঘরে একটী পুরুষ প্রবেশ করিয়াছে একি এযে তাহারই সহপাঠী, বন্ধু "সুরেশদা।"
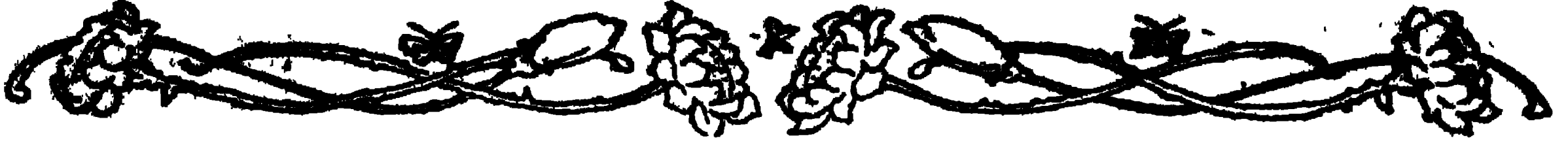
রূপ ও রঙ্গ

অন্তরের রূপ বাইরে প্রকাশ পায় নানা রঙ্গে নানা রসে। রূপের সঙ্গ-সাথী হয়ে চলে রঙ্গ। ব্যক্তি বিশেষের জীবনেও যেমন এই রূপ ও রঙ্গের খেলা দেখা যায় জাতির জীবনে ও দেশের জীবনেও তেমনি এই রূপ রঙ্গের খেলা অবিরতই চলেছে।

অন্তরের রূপ যেমন নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে বাইরের রঙ্গও তেমনি নানা ভাবে ফুটে উঠছে। রূপ ও রঙ্গের সম্পর্ক মন আর দেহের সম্পর্কের মতই। মন আর দেহের বিচিত্র লীলাই রূপ ও রঙ্গ।

দেশের রূপ রঙ্গের ধারা দেখে ব্যক্তি বিশেষ ও একটা জাতির অন্তর ও বাহির কেমন তা বোঝা যায়। কবিবা নিখিল বিশ্বকে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তুলনা করে গেছেন। রঙ্গমঞ্চের অভিনেতৃদের ধারা দেখেই বিশ্ব কেমন ভাবে চলছে তা বেশ বোঝা যায়।

রঙ্গমঞ্চ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সারা বিশ্ব ভরেই রূপ রঙ্গের খেলা চলেছে। রূপ রঙ্গও যে সব সময়ই সুন্দর হবে তার কোন মানে নাই—রূপ কোন দেশে কোন সময়ে কুরূপ হয়ে ফুটে ওঠে—রঙ্গ ও কোন সময়ে ব্যঙ্গ হয়ে কান্নায় অবসান হয়।

দেশের নানা উৎসব, গান বাজনা, পাচালী, যাত্রা, থিয়েটার, সংকীর্ত্তন এইসব জিনিষের মাঝ দিয়েই দেশের রূপ রঙ্গ আত্ম প্রকাশ করতে চাইছে। এ দেশে গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে আগে—যে রূপ রঙ্গের খেলা চলতো এখন তা চলে কি? দেশের সকলের মধ্যেই আগে যেমন রস রসিকতা—একটা খোলা প্রাণের পরিচয় পাওয়া যেত এখনকার দিনে আর তেমনটি মেলে কি?

দেশের সমবেত আশা আকাঙ্ক্ষা, খেয়াল তৃপ্তি ফুটে উঠত—একের বা দশের মধুর মনোহারী কণ্ঠ থেকে। হৃদয় ঢেলে দিয়ে দেশের মরমের কথা কয়ে তারা দেশবাসীর চিত্ত হরণ করত হৃদয়ের জলে তাদের তনু শুদ্ধ করে দিত। এ দেশের তেমনি স্বদেশী রূপরঙ্গের প্রসার যেন ক্রমেই রুদ্ধ হয়ে আসছে—সে সব জিনিসে এখনকার শিক্ষিত যারা [illegible] মন দিতে পারে না তাই সমাজও জাতির মস্তিষ্কের অবহেলায় সে সব আনন্দ ক্রমেই ম্লান হয়ে ঝরে পড়ছে।

দেশের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত যাঁরা তারাই দেশের রুচি গঠন করেন, তাদের সাহায্যেই দেশের রূপ ও রঙ্গ সমবেত ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, সে সুবিধা থেকে বাংলা দেশ ক্রমেই বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলা দেশটা কলকাতা নয়, কলকাতার দু'চারটা থিয়েঠারের উন্নতি অবনতির উপর বাংলা দেশের রূপ রঙ্গের বিচার চলে না।

আগেকার কালেও হয়তো দেশে বাঁধা ধরা দুচারটা থিয়েটার ছিল—কিন্তু সে ছিল সখের জিনিস। কালে ভদ্রে কচিৎ কখনো হোত তাও সর্ব্বসাধারণের জন্য নয়। সকলের মধ্যে পাচালী, যাত্রা, কীর্ত্তন এই সবই চলতো খুব। গ্রামে গ্রামে সর্ব্বত্র এ দেখা যেত এখন কচিৎ তেমন আনন্দ বাংলার কোন গ্রামে দেখতে পাই। রূপ রঙ্গের দল সব ভেঙ্গে গেছে—এখন সখ করে খুঁজলেও তা আর মেলে না। এই সব দলকে বা কোন গুণীকে পোষণ করা ছিল দেশের বড় লোকদের সম্মানের কাজ এখন রূপ রঙ্গের গুণীকে পোষণ করা এঁরা অপব্যয় মনে করেন।

দেশের ওস্তাদ গুণী গাইয়ে বাজিয়ে সব ক্রমে লোপ পাচ্ছে—অনাদরে উপেক্ষায় দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখে তারা হতাশ হয়ে মরে আছেন।

পুরোণ তর তর করে লোপ পাচ্ছে—তার কাছে নূতন রূপ রঙ্গ কিছু আসছে কি?

থিয়েটার জিনিসটা জনকত শিক্ষিতের জন্যে—তাও কোন রকমে চলতে পারে এক কলকাতা সহরে বাংলা দেশের আরো কোন কোন সহরে ও পল্লীতে থিয়েটার থাকলেও ভাল চলে না। বোধহয় কোনদিন চলা সম্ভবও হবে না।

কি রকম রূপ রঙ্গ দেশে এখন চলতে পারে তা বলা যায় না রূপ রঙ্গ তেমন ভাবে যেন এদেশে আত্মপ্রকাশই করতে পাচ্ছে না—তাই নিজের অন্তর ও বাহির সবই যেন কেমন রূপহীন রঙ্গহীন সঙ্গে সঙ্গে প্রাণহীনও মনে হয়।

দেশের মুহ্যমান রূপ রঙ্গ প্রাণের পরশ চাইছে। রূপ রঙ্গ থাকলে আনন্দ আসবেই সঙ্গে সঙ্গে। নইলে—হতাশা!

আক্কেলসেলামী

(এক নম্বর)
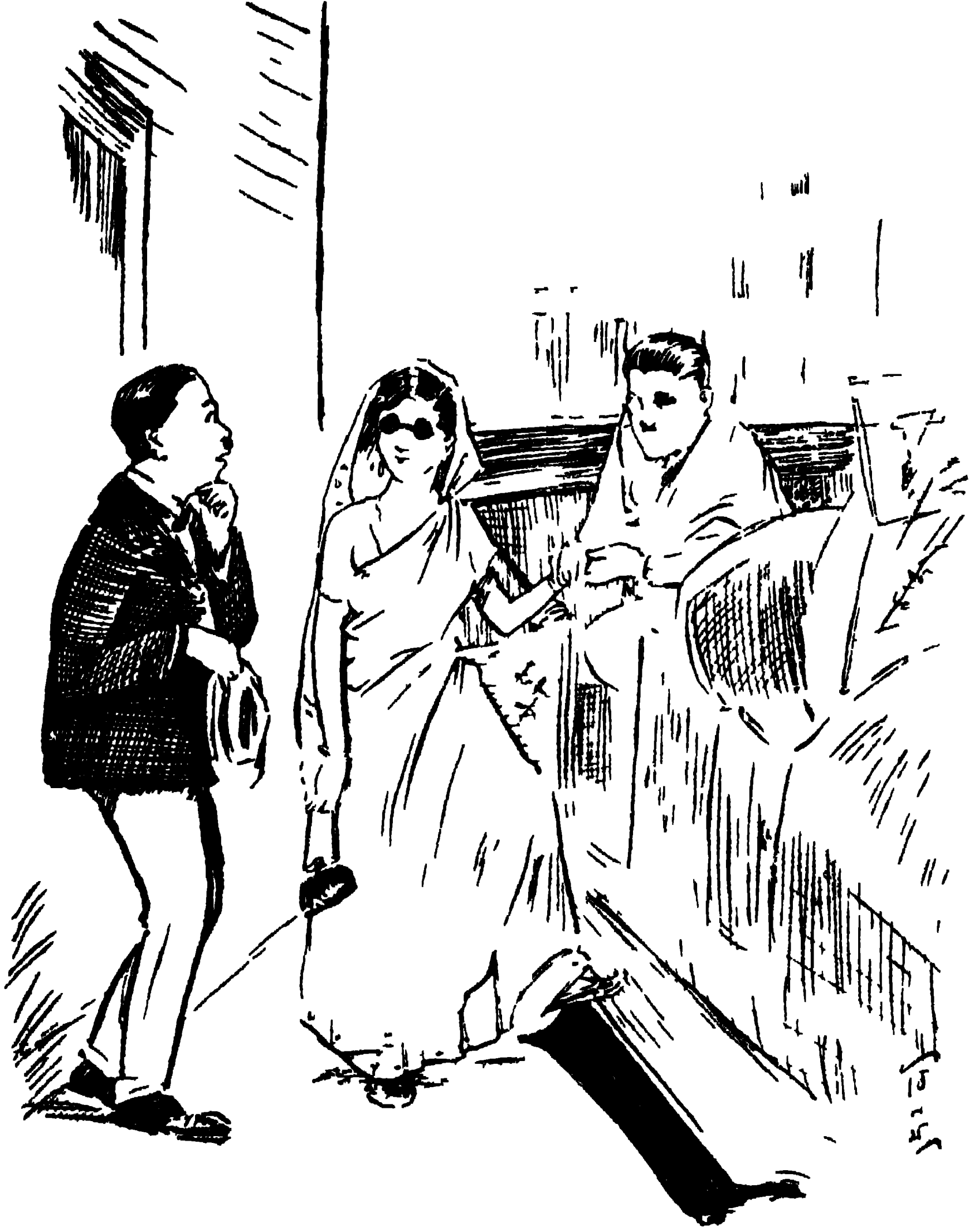
বায়ুসেবনার্থ-বহির্গমনোন্মুখ পত্নী—অফিস প্রত্যাগত স্বামী বাড়ী ঢুকিতেছে দেখিয়া বলিলেন "আমি একটু ঘুরে আসছি—খুকীর শরীরটা তত ভাল নেই যদি কাঁদে তো একটু ফুড্ করে ফিডিং বোতলে দিয়ে খাইও—"

স্বামী—অগত্যা—ভগবান তো স্তন্যদানের উপায় আমাকে দেন নাই।

মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সার সঙ্কলন

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বি-এস-সি

কি ভাবে কাজ চলিবে ঃ—স্বরাজ্যদল ও আমার যে মিলন হইয়াছে তাহা যদি আগামী সভায় গ্রাহ্য হয় তবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন আসিবে। শুধু ভোট-দেওয়া কংগ্রেস সভা আর থাকিবে না সেই স্থানে এমন হইবে যে সকলেই দিনের পর দিন কাজ করিয়া প্রধান জাতীয় কর্ম্মমন্দিরে সত্য কিছু দিবে। ইহাতে কংগ্রেসকে প্রকাণ্ড একটী উৎপন্ন দ্রব্যের কারখানা ও আমদানী রপ্তানীর ডিপোতে পরিণত করিবে। নির্দ্ধারিত পদ্ধতি, শ্রম, সময়ের জ্ঞান, দেশ ভক্তি, আত্মত্যাগ, বিশেষ সততা এবং অবশ্যকীয় কলাকৌশল না থাকিলে এ কাজ গড়িয়া তোলা যায় না। কংগ্রেস এ প্রস্তাব গ্রাহ্য না করা পর্য্যন্ত যে কেহ চার আনা দিয়া দিয়া কংগ্রেস সভ্য হইতে পারিলেও যদি আগামী সভা সেই সব প্রস্তাব অনুমোদন করেন তবে কংগ্রেসের অনুমোদনের মতই তাহা মানিয়া লইয়া সকল প্রদেশেই গঠন কার্য্য অবশ্য আরম্ভ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে কংগ্রেস সভ্যদের মধ্যে আন্দোলন চালাইয়া তাহাদের প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন বুঝাইয়া চরকা কাটা শিখিতে ও তাঁতের জোগাড় করিতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতে হইবে। কি ভাবে সুতা সংগ্রহ হইবে কি ভাবেই বা তাহা কাজে লাগানো হইবে এ কথা বিবেচনা করিতে হইবে। কংগ্রেসের কোন প্রস্তাব না থাকা সত্ত্বেও শুধু এই কাগজে লিখিয়াই আজ আমরা সাত হাজারের উপর নরনারী পাইয়াছি যাহারা স্বেচ্ছায় চরকায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। বোঝা যাইতেছে কংগ্রেস যদি প্রস্তাব অনুমোদন করেন তবে সামান্য ক'মাসের মধ্যেই আমরা অন্ততঃ লক্ষ লোক পাইব। প্রতি সভ্য পাঁচতোলা করিয়া সুতা ও যদি প্রতি মাসে কাটে তবে ৩১২·৫ মন সুতা বা ৪৫ ইঞ্চি বহরের ৬ গজ ধুতি বা শাড়ী ১২৫০০ খানা প্রতি মাসেই পাওয়া যাইবে। সুতা কাটা পর্য্যন্ত মজুরী যখন আমাদের দিতে হইবে না তখন কাপড় বাজারের যে কোন কাপড়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দীতা করিতে পারিবে। জাতি যদি শুধু এই একটীমাত্র জাতীয় কার্য্যের উপর সমগ্র চেষ্টা নিয়োজিত করে তবে বিদেশী কাপড় বর্জ্জন অতি সহজে—অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে ও অহিংস ভাবে হইতে পারিবে।

আগামী সভা ঃ—কিন্তু আগামী সভার উপর সব নির্ভর করিতেছে। এ শুধু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা নয়—সকল প্রাদেশিক সভার প্রতিনিধিও ইহাতে থাকিবেন। এই প্রতিনিধিরা মৌলানা মহম্মদ আলির এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন আমি এই আশা করি কংগ্রেসের বিচ্ছেদের প্রশ্নেই যে এই মিলন সভা শান্তির প্রলেপ দিবে তাহা নহে—অপরাপর বিখ্যাত নেতাদেরও ইহা কংগ্রেসে যাইতে বাধ্য করিবে। বা লার নির্য্যাতনের উত্তরে এই সভাকে কার্য্যকরী উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আমাদের আদর্শে পৌছিবার পথ লইয়া যতই মতভেদ থাকুক না কেন যথেচ্ছ ক্ষমতার প্রয়োগ আর যাহাতে না হয় সে ইচ্ছায় কাহারও দুই মত হইতে পারে না।

যতবড়ই তিনি হোন না কেন—যতক্ষণ একজন লোকের হাতে লক্ষ লক্ষ লোকের ধন প্রাণ মান থাকিবে ততক্ষণ ভারতের কোন স্বাধীনতা নাই। ইহা কৃত্রিম, অস্বাভাবিক, অসভ্য প্রথা। ইহার শেষই স্বরাজের প্রথম আরম্ভের একটী মূল উপাদান।

আমরা কত অসহায় :—সে তো দেখাই যাইতেছে। ইংরাজের শাসন করা ছাড়া আর সকল ক্ষমতাই আমরা হারাইয়াছি। কিন্তু গঠন কার্য্য পদ্ধতিতে যদি আমরা সকলে এক হইতে পারি তাহা হইলে ইহা হইতেই আত্মপ্রত্যয় এবং কাজ করিবার ক্ষমতা আসিবে। হিন্দু ও মুসলমানের যদি জ্ঞান ফিরিয়া আসে হিন্দুরা যদি অস্পৃশ্যদের নিজের ভাইয়ের মত দেখে আমরা যদি চরকার এমন প্রচার করিতে পারি যাহাতে সহজে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করা যায় তাহা হইলে আমাদের আকাঙ্ক্ষার সফলতার জন্য আর বেশী কিছু করিতে হইবে না। ইহা করিলে আমাদের আর অত্যাচারের জন্য গুপ্ত সমিতি বা প্রকাশ্য অহিংস বর্জ্জনও করিতে হইবে না। মিলিত স্থির সঙ্কল্প ও গঠন কার্য্যে অদম্য উৎসাহেই শুধু আমরা এই আকাঙ্ক্ষিত ধন পাইতে পারি। নির্য্যাতনের অগ্নি উদ্গার বা সমগ্র জাতির মজ্জাগত অসহায় পরবশতার প্রতিবিধান আমার মতে ইহাই।

অন্যান্য জিনিস : মহাত্মা জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষা ও মাদক দ্রব্য, আফিং প্রভৃতি পরিত্যাগ স্বরাজের অঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মাদক নিবারণ করিতে হইলে দেশের শাসন ব্যাপারে হাত থাকা চাই। দেশকে সেইভাবেই প্রস্তুত হইতে হইবে।

ইহা কি বাধ্যতামূলক :—মিঃ ষ্টোকস্ প্রত্যেক কংগ্রেস সভ্যের বাধ্যতামূলক চরকা কাটার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বেশী মূল্য দিতে গিয়া তিনি স্বেচ্ছাব্রত ও বাধ্যতার পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই। জরিমানা বা কারাগারের ভয়ে কিছু করাই বাধ্য করিয়া করানো। কিন্তু কোন মিলিত সঙ্ঘের সভ্য হইয়া তাহার দাম এড়াইতে কেহ পারেন না। যখন কোন লোক কংগ্রেস প্রভৃতির মত প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাব্রতী হন তখন ইহার নিয়মও তাহাকে স্বেচ্ছায়ই পালন করিতে হয়। [illegible] কাছে অন্যের ইচ্ছাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। কেহ যদি ইহাতে স্বেচ্ছাব্রতী না হন তবে তখনি তিনি এই প্রতিষ্ঠান বর্জ্জন করিতে পারেন। সম্মিলিত স্বরাজ প্রতিষ্ঠানে বহুর ইচ্ছামতই চলিতে হয়—ইহা বাধ্য করিয়া করানো নহে। সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান ইহা ছাড়া চলিতে পারে না। চরকা যদি ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করিতে পারে তবে ইহা অবশ্যই চলিবে। জাতীয় ইচ্ছা ও সঙ্কল্প জ্ঞাপনের ইহাই শ্রেষ্ঠ পথ।

ভারতের ঋণ :—ভারত সরকারের ভারতীয় ঋণ সম্বন্ধে আমার মত জনসাধারণ জানিতে চাহেন। এ সম্বন্ধে আমরা ক্ষমতাহীন—কিন্তু তবু জগতের লোক জানিবে ভারতের এই বিপুল অর্থ অপব্যয়ের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কি। মৃত লর্ড স্যালিসবারী এই প্রথাকে রক্ত শোষণ বলিয়াছেন। স্বরাজ্যের পক্ষ হইতে ভারত সরকারের এবং ইণ্ডিয়া আপিসের এই ব্যাপারের নিরপেক্ষ অনুসন্ধান ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। আজ ইহাতে উপহাসাস্পদ হইতে পারি কিন্তু সুদিন আসিলে আমরা দেখাইতে পারিব যে আমরা যথাসময়ে আমাদের অভিমত দিয়াছিলাম।

জাতীয় ক্ষতি—দলবাহাদুর গিরির মৃত্যুতে আমি তাঁহার পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি। ইনি শিক্ষিত গুর্খা ছিলেন ও গুর্খাদের মধ্যে ভাল কাজ করিতেছিলেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ কর্ম্মে হাজার হাজার লোকের সঙ্গে ইনিও জেলে যান। জেলেই ভীষণ অসুস্থ হন—ক'মাস মাত্র পূর্ব্বে ইনি মুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার বৃহৎ পরিবারবর্গ আজ অসহায়। বাংলার সংবাদপত্রে ইঁহার সাহায্যের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। আমি আশা করি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ইঁহার সম্বন্ধে সকল তথ্য লইয়া যথাযোগ্য সাহায্য করিবেন।

কাজের কথা

বাই আম্মা বিয়োগেঃ—আলি ভাতৃদ্বয়ের মাতা বাইআম্মা আর ইহজগতে নাই। পুত্র গৌরবে গর্ব্বিতা মাতা পুত্রদের হাতে দেশমাতার সেবার ভার অর্পণ করিয়া হাসি মুখে তাঁহার সাধনোচিতধামে গিয়াছেন। এই তেজস্বিনী মাতার স্নেহরসধারায় মৌলানা সৌকত আলি, মহম্মদআলির মত দু'টি দেশসন্তান গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। হিন্দুমুসলমান ভারতমাতার দু'সন্তানেরই মা ছিলেন ইনি। মহাত্মার কর্ম্ম প্রচেষ্টায় ইহাঁর বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। দেশ কর্ম্মে ইনি মহাত্মার সহায় ছিলেন। এই মুসলমান মাতা দেশপ্রাণতায় সন্তানদের অনুপ্রাণিত করিতে, অত্যাচার নির্য্যাতনকে ভ্রুভঙ্গী করিতে শিখাইয়াছেন—। বৃদ্ধাবস্থায়ও দেশকর্ম্মে দেশে দেশে মায়ের আশীষ বিলাইয়াছেন। হিন্দু মুসলমান দু'ভাইয়ের বিবাদে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়াছেন। এই মহিমময়ী মাতার পূণ্য স্মৃতির সম্মান আমরা দেখাইতে পারি হিন্দু মুসলমানের মিলন বন্ধন সুদৃঢ় করিয়া। মাতৃহারা হওয়ার মর্ম্মন্তুদ বেদনা আমরা আলি ভাতৃদ্বয়কে জ্ঞাপন করিতেছি।

শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তক মিঃ মণ্টেগুর মৃত্যুঃ গত ১৫ই নভেম্বর মিঃ মণ্টেগুর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি জাতিতে ইহুদী ছিলেন ও একজন বিচক্ষণ রাজনৈতিক ছিলেন। তাঁহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর ছিল সুতরাং তাঁহার মৃত্যু একরূপ অকাল মৃত্যুই বলিতে হইবে। বাতব্যাধি জন্য শোণিত দূষিত হওয়াতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। তিনি নির্য্যাতিত ইহুদী জাতির বংশধর ছিলেন বলিয়া অন্তরে অন্তরে ভারতবাসীর মর্ম্মব্যথা অনুভব করিয়া তাহাদের দুঃখের কথঞ্চিৎ প্রশমন জন্য নিজে ভারতে আসিয়া রাজনৈতিক সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য বিলাতের আভিজাত্য ধনী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কেহই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং তজ্জন্যই তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। ইহাতে তাঁহার মনোভঙ্গ হয় নাই একথা কে বলিবে। সংস্কারের ভিতর দিয়া তিনি বেশী কিছু দিতে পারেন নাই কারণ নানারূপে তাঁহার হস্তপদ একরূপ আবদ্ধই ছিল তথাপি তিনি উহা এমন সুকৌশলে রচিত করিয়াছিলেন যে যে কোন উদার হৃদয় রাজপ্রতিনিধি ইচ্ছা করিলে ঐ নীতির সাহায্যে ভারতকে প্রকৃত স্বায়ত্ব শাসনের আস্বাদন দানে তৃপ্ত করিতে পারিতেন কিন্তু ভারতের ও তাঁহার দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহার সে সদিচ্ছা পূর্ণ হয় নাই-কারণ স্বার্থই বিরাট কর্ম্মঠ ইংরাজ জাতিকে আজ একান্তই অন্ধ করিয়াছে। ভারতবাসী তাঁহার দানের মর্য্যাদা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে নাই কিন্তু আজ সেদিন আসিয়াছে - তাঁহার অন্তরের বাণী আজ ভারতের গ্রহণ করিবার এই প্রকৃত ভারত হিতৈষীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাবও উঠিয়াছে যাহাতে প্রত্যেক ভারতবাসীর যোগদান করিয়া এই পরদুঃখকাতর মহানুভবের মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত। ভারতের দুরদৃষ্টে সে মণ্টেগুর ন্যায় পরিচালক বেশী পায় নাই কিন্তু ভাগ্যবশে যাহা পাইয়াছিল তজ্জন্য তাহার কৃতজ্ঞতার উজ্জ্বল অভিব্যক্তির আজ অপরিহার্য্য প্রয়োজন আছে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্র কোন পথেঃ—নানাভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া, নিজেদের মধ্যে মতবাদ মনান্তর আনিয়া—আমরা মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি হারাইয়া দীনতার একেবারে চরম সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা, মুক্তি অনেকে মুখে কামনা করি বটে কিন্তু অন্তরেও সেইভাব পোষণ করি কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ভারত বিরাট দেশ—একটা মহাদেশের মত দেশ। এই দেশের নানা বর্ণের নানা জাতি একত্রিত ভাবে একটা নিখিল ভারত রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহে। মিলিত ভারতের রাজনৈতিক আশা যদি এই হয় তবে নানা দেশের নানা জনের বিভিন্ন মতবাদকে

শ্রেষ্ঠত্ব দিবার প্রয়াস না করিয়া নিখিল-ভারত-রাষ্ট্র গঠন-কামীদের নিজেদের মতবাদের সামঞ্জস্য বিধান করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিভিন্ন মতবাদের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া একটা জাতীয় মতবাদ গড়িয়া তুলিয়া সেই অনুযায়ী দেশের কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারিত করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার মধ্যেই দেশের নবজীবনের প্রবাহ নিহিত রহিয়াছে। জীবন আজ কোন দিক দিয়াই বিকশিত হইতে না পারিয়া মরণের বিভীষিকায় হাহাকার করিয়া মরিতেছে, সরল নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসাধনা ব্যতীত এ বিভীষিকা হইতে মুক্ত আমরা হইতে পারিব না। নিখিল ভারত-রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্ম্ম প্রচেষ্টা যাহা মহাত্মা গান্ধী নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই পরিধেয় বস্ত্রের পরাধীনতা ঘুচাইবার চেষ্টায় দেশকে যদি একবার মাতাইয়া উঠাইতে পার তবে স্বাধীনতার কত সুখ সে তাহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারিবে। বাক-বাহুল্য বা সভার পর সভায় প্রস্তাবের পর প্রস্তাব পাশ করিলেও জাতীয় মুক্তি আসিবে না। কর্ম্মেই মুক্তি—কর্ম্মহীন বাক্‌জালে বা আদর্শ বিশ্লেষণে নহে। নিখিল ভারত-রাষ্ট্র গঠনের প্রথম সোপান স্বরূপ যে সার্ব্বজনীন কর্ম্ম পদ্ধতি মুক্তিমন্ত্রের ঋষি মহাত্মার বিধানে দেশনেতৃত্ব-প্রয়াসীরা মানিয়া লইয়াছেন সেই চরকা উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে ভারতের ঘরে ঘরে তাঁহারা চালাইবার চেষ্টা করুন। চরকা নিখিল ভারত-রাষ্ট্রের ঐক্য বন্ধন ও মিলন প্রতীক হউক। কর্ম্মের ভিতর দিয়া দেশকে মুক্তির আস্বাদ পাইতে দাও। জাতির হাহাকার আর বাড়াইও না।

দোষ কার—নেতাদের না জন-সাধারণের?ঃ—বিভিন্ন মতবাদী নেতৃত্ব প্রয়াসীরা অনেক সময় আক্ষেপ করিয়া বলেন দেশবাসী তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিতেছে না তাঁহারা কি করিবেন? এ কথা সত্য নহে। দেশ এখন এমন একটা অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে নিষ্ক্রিয়তা ও অনাহার মৃত্যুর ভীতি তাহাকে জড় পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এ অবস্থা তাহাদের অসহ্য তাহারা আশার বাণী শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আশার সত্য বাণী তোমরা তাহাদের শুনাও—কর্ম্মে বিশ্বাসী ও রত হইয়া সেই পথে তাহাদের চলিবার বিধান দাও। দেশের জনশক্তি সেই কর্ম্মে বাঁচিবার আশ্বাস পাইলে আত্মপ্রত্যয় তাহাদের আপনা হইতেই আসিবে। জনমত কর্ম্মের আশা ও সাফল্যের মধ্য দিয়াই গড়িয়া উঠিবে। জাতীয় পরবশতা হইতে মুক্তি একদিনে সম্ভব নহে—অন্য যে কোন দেশের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমরা যাহারা পরবশতাই সর্ব্বাঙ্গীন সুখের আকর ভাবিয়া লইয়া জীবনটাই পরবশতার ক্লেদে উজ্জ্বল করিয়া গৌরব অনুভব করিতেছি তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই বিরাট দেশের জনগণ মত পরিচালনার ভার যাহারা লইতে চাহেন—তাঁহাদের ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের অভাবেই দেশের সত্য কর্ম্ম প্রচেষ্টা বার বার শ্লথ হইয়া পরবশতার মোহই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। নেতৃত্ব প্রয়াসীদের নিজেদেরই যদি কর্ম্মপন্থা না থাকে—তবে জনসাধারণের উপর পরীক্ষার খেলার ফল ভাল হইতে পারে না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও দেশের তেমনি অবস্থাই দাঁড়াইয়াছে। দেশের ক্ষুধিত অগণিত বিরাট জনসঙ্ঘের পানে চাহিয়া নেতৃত্বপ্রয়াসীদের মধ্যে যাঁহারা নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ, মতবাদ ও প্রাধান্যের মোহ ভুলিয়া জনসাধারণের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারিবেন—দেশ তাঁহাদেরই চাহিবে। আর যাঁহারা তাহা পারিবেন না তাঁহাদের আপনা হইতেই সরিতে হইবে। তবে দু'দিন আগে বা পরে।

পল্লীতে ফের দেশবাসীঃ—বাংলার পল্লীর শ্রী সৌন্দর্য্য সব নষ্ট হইয়া গেল—তাই একটা রব উঠিয়াছে—ঘরে ফের বাঙ্গালী! এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে লেখাও বাহির হইতেছে। পল্লীর শ্রী সৌন্দর্য্য সুখ শান্তি রক্ষার জন্য নানা জনে নানা ব্যবস্থাও দিতেছেন। পল্লীজীবনের সুখ শান্তির জন্য আবার যে একটা ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে ইহা শুভ লক্ষণ। কিন্তু কি উপায়ে আমরা আবার পল্লীর মধুর শ্রী ফিরাইতে পারিব? বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতা দেশের উন্নত সমাজ যতই গ্রহণ করিতেছে পল্লী ততই শ্রী হীন অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িতেছে। আধুনিক শিক্ষিত সভ্য সমাজ পল্লীর মায়া কাটাইয়া যতই সহর-নিবাসী হইতেছে তাহাদের দারিদ্র্য অভাব ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। সমাজের মস্তিষ্ক যাহারা তাহারা পল্লীর উপর শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলাতেই আজ বাংলার সোনার পল্লীগুলি লক্ষ্মীছাড়া

হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বকালে—খুব বেশী দিন আগেও নয় বাংলার পল্লীতে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ছিল—যে জীবন লীলার অভিনয় চলিত আজ আর তাহা দেখা যায় না। পল্লীগুলি সব যেন প্রাণ হীন। মরিলে গ্রামে মড়া পোড়াইবার লোক জোটে না—অত্যাচারী স্বচ্ছন্দে ধন সম্পত্তি, নারী-মর্য্যাদা হরণ করিতে পারে—বাধা দিবার শক্তি নাই, লোক নাই। পল্লীর স্বচ্ছন্দ খাদ্যদ্রব্যের উপর বিচিত্র ব্যবসায় চলিতেছে। এমন সুন্দর সোণার পল্লীর মর্য্যাদা পল্লী সন্তান আমরা দিতে পারিতেছি না—পল্লীর মায়া কাটাইয়া আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদের ঘর-হারা, লক্ষ্মী-ছাড়া করিয়া রাখিয়াছে। অথচ এই সহর মুখী কৃত্রিম সভ্যতা আমাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই যে দিতে পারিতেছে না। অতৃপ্ত আকাঙ্খায় সহরে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটাইয়া শেষ অবস্থায় সহায় হীন ভাবে আবার সেই পরিত্যক্ত শ্রীহীন পল্লীর কোলেই আশ্রয় লইতে হয়।

আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার মোহ থাকিতে বাংলার পল্লীর শ্রী সৌন্দর্য্য ফিরাইয়া আনিবার আশা একান্তই দুরাশা!

– * –

দেশের স্রোতস্বতীঃ সুজলা সুফলা এই বাংলা দেশ! বাংলার প্রবহমানা অসংখ্য নদ নদী—এই স্রোতস্বতীর রসধারায় বাংলাকে চির উর্ব্বর, চির শ্যামল রাখিত। বাংলার স্বাস্থ্য ছিল, শ্রী মাধুর্য্যে বাংলা দেশ চির নবীন থাকিত। আর আজ দেশের সম্পদ, দেশের রসধারা জোগাইবার শ্রেষ্ঠ উপাদান নদনদীগুলির অবস্থা কি? ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, পদ্মা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদীগুলির সে সহজ সরল নির্ম্মল স্রোতধারা আর নাই। নদী বক্ষে আজ বিপুল বালি চড়া পড়িয়া গিয়াছে—রসধারা মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বড় বড় নদীগুলির শাখা নদী যাহা দেশের প্রায় সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া প্রবাহিত হইয়া দেশকে শস্য সম্পদে ভূষিত করিত তাহা আজ শুষ্ক। গভীরতা নাই। বর্ষায় জল আসিলে দেশ বন্যায় ভাসে—আর গ্রীষ্মে দেশবাসী তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মরে। দেশের সম্পদ, অন্ন সংস্থান যে জিনিসের উপর এমন ভাবে নির্ভর করে সেই নদনদীগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া দেশবাসীও কর্ত্তব্য মনে করে না—দেশের শাসনভার যাহারা লইয়া আছেন তাহারাও দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন না। কিন্তু দেশের নদনদীগুলির অবস্থা যাহা হইতেছে তাহাতে জল-শূন্য দেশে অদূর ভবিষ্যতেই যে বিরাট হাহাকার উঠিবে! নদী মাতৃক বাংলার এমন অবস্থার কারণ কি—কারণ নির্দ্ধারণ ও তাহার দূরীকরণ—কাহার কর্ত্তব্য?

কাগজ শিল্প রক্ষা ও সংরক্ষণ শুল্ক। জবণালিষ্ট এসোশিয়েসন বা সংবাদপত্রসেবি সঙ্ঘে গত রবিবার অপরাহ্নে উক্ত শুল্ক সম্বন্ধে পূর্ণ বিবেচনা করিবার জন্য কার্য্যকরী সভার এক অধিবেশন হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে উক্ত সভা হইতে শুল্কের প্রতিবাদ জন্য এক আবেদন ও করা হইয়াছিল কিন্তু তৎপরে দেশীয় কাগজের মিলওয়ালারা সংবাদপত্রের জন্য আনীত কাগজের শুল্ক বসাইতে না চাওয়ায় ও টেরিফ বোর্ডের রিপোর্টে আরও অনেক নূতন তথ্য প্রকাশিত হওয়ায় সদস্যগণ উহার সম্যক আলোচনা করিয়া উক্ত প্রতিকূল প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ইহা যে তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচায়ক তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। দেশীয় শিল্পের রক্ষণ অনুমোদন করিয়া তাঁহারা কেবল যে মিলগুলিকেই বাঁচাইলেন তাহা নহে উপরন্তু একটী শিল্প তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিল। আমরা বরাবরই এই রক্ষণ নীতির সমর্থন করিয়াছি এবং আমাদের সহযোগিগণ যে এতদিন পরে যুক্তি ও প্রকৃত দেশহিতৈষণার অনুমোদন করিলেন তাহা দেখিয়া বড় আনন্দ অনুভব করিতেছি। সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু মহাশয় পূর্ব্বে শুল্কের প্রতিকূলে হইলেও পরে যে নিজের ভুল সংশোধন করিলেন ইহাতে তাঁহার Sportsman like spiritএর পরিচয় পাওয়া গেল।
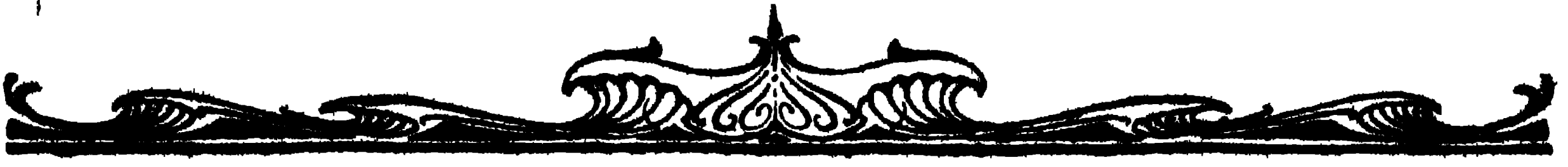
নারী ও পুরুষের বৈষম্য

নারী ও পুরুষের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত বহু বৈষম্য আছে। বর্ত্তমানে আমরা যথাসাধ্য সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব। অবশ্য পুরুষদের মধ্যেও এই পার্থক্য আছে এবং এক নারী হইতে অন্য নারীতেও এই দুই প্রকারের বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সেরূপ ব্যক্তিগত পার্থক্যের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, শ্রেণীগত বিবিধ পার্থক্যের আলোচনাই প্রয়োজনীয়। নারীর আকৃতি শিশু ও পূর্ণ বয়স্কের মধ্যবর্ত্তী স্থানীয় অর্থাৎ তাহাতে কৈশোরের লালিত্য ও যৌবনের দৃপ্তভাব এক অপূর্ব্ব সম্মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। নারী শরীরে কোমলতা, লালিত্য একটু ক্ষীণাভ ভাব বিদ্যমান থাকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শিরা বা মাংসপেশীর কর্কশ প্রকাশ থাকে না এবং সন্ধিস্থল সমূহ পুরুষের দেহাপেক্ষা সুগোল ও সুঠোল। পুরুষের দেহ কঠিন, শিরা বা পেশীমণ্ডল সবল ও কষ্টসহিষ্ণু। নারীর চর্ম্ম স্বভাবতই পুরুষের অপেক্ষা লঘুবর্ণ বিশিষ্ট অর্থাৎ যে বর্ণে পুরুষকে কৃষ্ণবর্ণ বলা যায়, নারীর চর্ম্মে সেই বর্ণ প্রতিভাত হইলে তাহাকে শ্যামবর্ণ বলা যাইতে পারে। অনেকে অনুমান করেন যে, পুরুষকে সর্ব্বদা বহিঃপ্রকৃতির সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া প্রকৃতির অত্যাচারে তাহাদের বর্ণ মলিন হয় কিন্তু তাহা কতকাংশে সত্য হইতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না কারণ অনেক অসভ্য জাতির রমণীরা পুরুষদিগের সঙ্গে সমভাবে চাষবাসের কার্য্য করিবার সময় রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপদ্রব সমভাবে সহ্য করে তথাপি তাহাদের বর্ণ পুরুষদিগের বর্ণ অপেক্ষা অনেকটা স্বচ্ছ। নারীর মস্তিষ্ক সম্বন্ধে Wagner বলেন "The brain of a woman taken as a whole is uniformly in a more or less embryonic condition" অর্থাৎ মোটের উপর নারীর মস্তিষ্ক স্ফুটোনোন্মুখ অবস্থায় থাকে Huschke বলেন "woman is always a growing child and that her brain departs from the infantile type no more than the other portions of her body" নারী সর্ব্বদাই বর্দ্ধনশীল শিশুর মত এবং শিশুর সহিত তাহার অন্যান্য অবয়বের যেমন পার্থক্য মস্তিষ্কও তাই। শক্তিতেও নারী পুরুষ অপেক্ষা স্বভাবতঃই ক্ষীণ, গতি মৃদু, আর পেশীর দার্ঢ্য পুরুষাপেক্ষা অনেক কম। আমেরিকার ইয়েল ইউনিভার্সিটীর ছাত্রদের ও ওবার্লিন ইউনিভারসিটীর ছাত্রীদের মধ্যে শারীরিক শক্তির প্রতিযোগিতার ফলে দেখা গিয়াছে যে নারীদের শক্তি পুরুষদিগের অনেক কম ইহার সম্পূর্ণ তথ্য জানিবার জন্য Sex and Society নামক পুস্তকের ২১।২২ পৃ দ্রষ্টব্য। ওজনেও নারীর শরীর পুরুষ অপেক্ষা অনেক কম। বৃটীশ এসোশিয়েসনে ৮৮৩ পৃঃ Anthropometive Society যে রিপোর্ট দেন তাহাতে তাঁহারা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, সাধারণ নারীরা পুরুষের অর্দ্ধেক শক্তি সম্পন্না। ভাসার কলেজের ব্যায়াম বিভাগের পরিচালিকা কুমারী হ্যারিয়েট ইসাবেল ব্যালেনটাইন বলেন "যেমন করিয়া নারীদের শিক্ষা দেওয়া হউক না কেন তাহারা কোন বয়সে শারীরিক শক্তিতে পুরুষের সমান হইতে পারে না এবং তাহা হইবার কোন আবশ্যকতাও আমি দেখি না।"

মাংসপেশীর দৃঢ়তার জন্য ক্ষিপ্রকারিতা, শ্রম সহিষ্ণুতা, প্রভৃতি গুণগুলির পুরুষই অপেক্ষাকৃত অধিক অধিকারী। পুরুষের মনোবৃত্তি (Passion) নারীর অপেক্ষা অধিকতর তীব্র ও সুপষ্ট—সেইজন্য আইন উল্লেখ-যোগ্য ও নৈতিক অপরাধ (moral and criminal offence) পুরুষের মধ্যেই বেশী এটা অবশ্য সার্ব্বজনীন। বিবিধ দেশের আত্মহত্যার তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, সাধারণতঃ নারীদের চেয়ে পুরুষের মধ্যে আত্ম-হত্যাকারীর সংখ্যা বেশী। সমস্ত ফ্রান্সে শতকরা ১৪ ২৮ জন পুরুষ আত্মহত্যাকারী আর শতকরা ১৩,৫৬ জন নারী আত্মহত্যাকারিণী একমাত্র ভিয়েনা সহরেই ইহার বিপরীত দেখা যায়। সমস্ত পৃথিবীর আত্মহত্যাকারীদের তালিকা হইতে দেখা যায় যে পুরুষ আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা স্ত্রী আত্মহত্যাকারীদের চেয়ে সাতগুণ বেশী ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে নারী জাতির যন্ত্রণা সহ্য করিবার

ক্ষমতা পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশী অর্থাৎ তাঁহাদের ধৈর্য্য অসীম। কিন্তু উন্মাদের তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে উন্মাদ অপেক্ষা উন্মাদিনীর সংখ্যা বেশী তবে উন্মাদের মধ্যে উন্মাদিনীদের চেয়ে মৃত্যুর হার বেশী এবং উন্মাদ রোগে আরোগ্য লাভ করিতে পুরুষগণ অপেক্ষা নারীগণই বেশী পরিমাণে সক্ষমা হন। ক্যাম্পবেল বলেন যে স্নায়বিক বিকৃতি পুরুষদের মধ্যেই সহজে ঘটিয়া থাকে পুরুষের স্বাভাবিক অস্থিরতাই এই সকল রোগ প্রবণতাকর মূল কারণ। প্রতিভার বিকাশ পুরুষ চরিত্রে যত অধিক সংখ্যা হিসাবে নারী চরিত্রে তদপেক্ষা অনেক কম— আবার জড়স্বভাবত্ব (Imbecility) পুরুষদের মধ্যে অত্যধিক Report of the sixty fourth Meeting of the British Association for the advancement of science 1894 p. 434এ দেখা যায় যে বালকদিগের মধ্যে শতকরা ১৯জন ও বালিকাদের মধ্যে ১৬জন জড় স্বভাবসম্পন্ন William J Thomas তাঁহার Sex and Society নামক পুস্তকে ২৪পৃঃ বলেন 'Morphologically men are the more unstable element of the society and this unstability express itself in the two extremes of Genius and Idiocy Genius in general is correlated with an excessive development in brain growth, stopping dangerously near the line of hypartraphy and Insanity; while microcephaly is a variation in the opposite direction, in which Idiocy results for arrested development of the brain, usually through premature closing of the natures, and both there variations occur more frequently in men than in women.

যৌবনে নারীর দেহ পুরুষাপেক্ষা অধিকতর পুষ্ট হয় এমনকি কৃশাঙ্গীর দেহলতাও যৌবনাগমে পুষ্পভারাবনতা ব্রততীর মত ও নয়নানন্দকর হইয়া উঠে তত্তুলনায় পুরুষের যৌবনাগমনে শ্রীবৃদ্ধি অল্পমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। শোণিত সম্বন্ধে গবেষণাকারী মিঃ হায়েমের মত পুরুষের শোণিতের লালকণিকা (red corpusles) নারীর শোণিতস্থ লালকণিকা অপেক্ষা অনেক বেশী এবং এই লালকণিকায় জীবশরীরে কার্য্যক্ষমতা ও উৎসাহ আনিয়া থাকে Nasses মতে পুরুষের রক্তে শতকরা ০.০৫৮২৪ ভাগ লৌহ আছে এবং নারী শোণিতে ০.০৪৯৯ ভাগ আছে। অবশ্য এগুলি সমান স্বাস্থ্যবান নর নারীর শোণিতের তুলনায় গৃহীত হইয়াছে। এমন কি ১৬।১৮ বর্ষবয়স্ক পুরুষের শোণিতের আপেক্ষিক গুরুত্ব সমবয়স্ক নারীর শোণিত অপেক্ষা অনেক উচ্চ এই শোণিতের পার্থক্য হইতে উভয় শ্রেণীর পার্থক্যের বৈষম্য বেশ সুচারু ভাবেই বুঝিতে পারা যায়। শ্বাসযন্ত্রের ক্ষমতা সম্বন্ধে ও উভয় শ্রেণীর অনেক পার্থক্য থাকে। নারীগণ পুরুষ অপেক্ষা ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস লইয়া থাকেন তাহার কারণ তাঁহাদের শ্বাস যন্ত্রের আয়তন সমবয়স্থাপন্ন পুরুষাপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র এবং তজ্জন্য তাঁহারা নিঃশ্বাসে অক্সিজেন কম লইতে পারেন এবং প্রশ্বাসে কম কার্ব্বনিক এসিডগ্যাস নির্গত করেন এইজন্য সহজেই তাঁহারা শ্বাস প্রশ্বাস অনুভব করেন এবং খুব সহজেই তাঁহাদের শ্বাসদোষ হইতে পারে। পুরুষদের অপেক্ষা হাঁপানী রোগে নারীরাই অধিক কষ্ট পাইয়া থাকেন। সহরের নারীদের মধ্যে অধুনা যে বিবিধ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয় বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবই তাহার অন্যতম কারণ। পল্লীবাসিনীগণ সহরবাসিনীগণের ন্যায় (অবশ্য ম্যালেরিয়ার কথা স্বতন্ত্র) এত অধিকমাত্রায় রুগ্ন হয়েন না। নারীগণ স্বভাবতঃ পুরুষদের তুলনায় অধিক নিদ্রাভোগিনী এবিষয়ে তাঁহাদের প্রকৃতির সহিত শিশুদের প্রকৃতির অনেকটা সামঞ্জস্য আছে তবে নিদ্রার অভাব জনিত কষ্ট পুরুষেরা যত অনুভব করেন নারীদের পক্ষে উহা তত কষ্টকর হয় না। জীবজগতের নিম্নস্তরে যন্ত্রণা সহ্য করিবার ক্ষমতা বেশী আছে এমন কি অনেক জীব কীটাদিকে ছুরিকাদ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিলে উহারা জীবিত থাকে এবং দুইঅংশ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে জীবনী শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করে ক্রমে যতই জীবজগতের উচ্চস্তরে আমরা উঠি ততই এই শক্তির হ্রাস হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। অসভ্যজাতিদের মধ্যে শারীরিক আঘাত বা ক্ষতাদির যন্ত্রণাটা তত গ্রাহ্য হয় না যতটা সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে দেখা যায়—সভ্যসমাজ

াধ্যেও নারীদের এই শ্রেণীর সহিষ্ণুতা অত্যধিক—প্রসব াবণা সহ্য করিতে হয় বলিয়াই জগৎপাতা নারীর শরীরে এই কল্পনাতীত সহিষ্ণুতা দান করিয়াছেন। Max Barlet এর মতে 'The higher the race the less he tolerance, the lower the culture condition in a given race the greater the tolerance অশিক্ষিতা নারীদের অপেক্ষা শিক্ষিতা নারীরা কম সহিষ্ণু তাহা অবিসম্বাদী সত্য—কলিকাতায় গৃহস্থের ঘরে আসন্ন-প্রসবানারী থাকিলে তাঁহাকে যেরূপ চিন্তা ও ভয়ে অভিভূত থাকিতে হয় পল্লীর অশিক্ষিতা রমণীদের প্রসব জন্য তাহাদের পুরুষদের ওরূপ দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগে কাল কাটাইতে হয় না। নারী শরীরে রোগ আক্রমণ আশঙ্কা পুরুষ শরীরাপেক্ষা অল্প, এবং রোগে মৃত্যুর আশঙ্কা ও তুলনায় অনেক কম। একমাত্র প্রসবকালীন বা তৎপর আক্রান্ত রোগেই নারী দিগের মৃত্যুর আশঙ্কা প্রবল হয়। কারণ ঐ সময় অপরিমিত শোণিতস্রাবহেতু শোণিতের তেজ কমিয়া যায় ও দেহে শোণিতের পরিমান ও প্রচুর হ্রাস হইয়া থাকে। Lombroso বলেন নারীরা স্বভাবতঃ পুরুষাপেক্ষা দীর্ঘ জীবিনী হয়েন ও দৈব দুর্বিপাকে বা কোন প্রকারে দুঃখ সহ্যকরিতে সহজেই সমর্থা হয়েন। তবে জীবনের মধ্য পথেই তাঁহাদের মৃত্যু সম্ভাবনা প্রবল থাকে নতুবা শৈশবে বা বার্দ্ধক্যে নারীর মৃত্যুর হার সমবয়স্ক পুরুষাপেক্ষা অনেক অল্প। কারণ শৈশবে বা বার্দ্ধক্যে তাঁহাকে ঋতুমতী হইতে বা পুত্রপ্রসব করিতে বা স্তনদান করিতে হয় না। এই তিনটি কারণে নারীর দেহ মধ্য জীবনে অনেকটা তদ্রূপ হইয়া থাকে তবে রজোনিরোধের (menopause) পর এই সকল আশঙ্কা বিদূরিত হয়। মস্তিষ্কের পুষ্টিলাভ সম্বন্ধে নারী ও পুরুষের পার্থক্য প্রচুর, নারীর মস্তিষ্ক পঞ্চদশ বর্ষেই সুপুষ্ট হয় এবং বিংশতিবর্ষের মধ্যে পূর্ণত্বলাভ করে পরে ক্রমশঃ উহা কমিত হইতে থাকে এবং রজো নিরোধের সময় (৪৫।৫০ বৎসর) পর্য্যন্ত কমিতে থাকে পরে আবার আন্দাজ দশ বৎসর সময় পর্য্যন্ত আবার বাড়িতে থাকে ও পরে ক্রমশঃ হ্রাসপাইতে থাকে। পুরুষের মস্তিষ্ক বিংশতি বর্ষে সবল হয় ও ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাড়িতে থাকে ৩৫এর পর ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত উহা আবার কমিয়া থাকে ৫০—৬০ বৎসর পর্য্যন্ত আবার বৃদ্ধি পাইয়া ৬০ বৎসরের পর আবার উহা হ্রাস হইতে থাকে। এই সকলের দ্বারা আমরা ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাই না যে নারী পুরুষাপেক্ষা কোনরূপে হীন বা অল্পশক্তিশালিনী আমাদের উদ্দেশ্য এই যে উভয় শ্রেণীর বিভিন্নতা তাহাদের কার্য্য ও কার্য্যক্ষেত্রের বিভিন্নতার সূচনাকারক মাত্র। এক বিষয়ে নারী যেরূপ উপযোগী পুরুষ সেরূপ নহে আবার কোন বিষয়ে পুরুষ যোগ্যতা নারীর অপেক্ষা অধিক। নারী ও পুরুষের মধ্যেই জগতের সমস্ত বিভাগ বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা পরস্পরকে অযথা আক্রমণ করিয়া অশান্তি উপদ্রবের সৃষ্টি না করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিলেই জগতের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে। আর একের বিভাগে অন্যে হস্তক্ষেপ করিলে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়া উভয় শ্রেণীর জীবনের সুখ-শান্তি, নষ্ট করিয়া দিবে—ফল উভয় শ্রেণীই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হারাইয়া অকারণ মূল্যবান জীবন আত্মকলহে নষ্ট করিবেন।

—পুরুষ।

রামময় আশ্রম—প্রতি বৎসরের মত এ বৎসরও কুণ্ডা রামময় আশ্রমে মহাসমারোহে শ্রীশ্রী৺কুণ্ডে শ্বরীমাতার পূজা ও উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই পূজা উপলক্ষে কুণ্ডায় একটী বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে; এ বৎসর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত বঙ্গের বাহিরের বাঙ্গালীরা এই মাতৃপূজায় সপরিবারে আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন।

পরদিন হোম, চণ্ডীপাঠ সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে প্রসাদ বিতরণ বেলা ২টা হইতে দরিদ্র নারায়ণের সেবা হইয়াছে। বৈকালে শ্রীযুক্ত শশিকান্ত পুরাণ শাস্ত্রী বি এ মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি সেই পুরাকালের আশ্রমের কথা যেন স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। ৩০।৪০ ক্রোশ দূর হইতে পরমোৎসাহে দলে দলে সাঁওতাল, ভীল, বিহারী, হিন্দুস্থানী, এই উৎসবে আসিয়া যোগদান করিয়াছিল সে এক বিপুল বিরাট ব্যাপার। সহস্রাধিক দরিদ্র কাঙ্গালী মহানন্দে ভোজন করিয়া কুণ্ডেশ্বরীমাতার জয়গানে দিগন্ত মুখরিত করিয়াছিল। এই উৎসব ও পূজা উপলক্ষে বিখ্যাত মণিকার মণিলাল কোং'র সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন, এবং এই উৎসব উপলক্ষে প্রভূত অর্থব্যয় করিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই।

কর্ণার্জ্জুন দেড়শত রাত্রি অভিনয় উৎসব ও ইরাণের রাণী জুবিলী— উপলক্ষে ষ্টার থিয়েটারের পরিচালক আর্ট থিয়েটারের পরিচালকগণ রঙ্গালয়টী পুষ্পপত্র পতাকা ও বৈদ্যুতিক আলোক মালায় বিভূষিত করিয়াছিলেন ও কলিকাতায় সমস্ত মাণ্যগণ্য সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ, কবি, সাহিত্যিক, সংবাদ-পত্রের সম্পাদক প্রভৃতি সকলকে নিমন্ত্রিত করিয়া আদর আপ্যায়নে পরম পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। দর্শকবৃন্দগণকে একখানি সচিত্র গীতাবলীসহ স্মারক অভিনয়-লিপি (Souvenir Programme) উপহার দেওয়া হইয়াছিল। দারুণ অসুস্থতার মধ্যেও সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই উৎসব রজনীতে শকুনি রূপে দর্শকবৃন্দকে অভিবাদন করিয়াছিলেন। শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী অধুনা অবকাশ লইলেও ইরাণের রাণী রূপে অবতীর্ণা হয়েন। প্রচুর দর্শক সমাগম হইয়াছিল; আনন্দ হাস্য ও উল্লাসের মধ্যে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের এই অভাবনীয় রজনীর অভিনয় সুসম্পাদিত হইয়াছিল।

গত রবিবারের Forwardএর Stage & Screenএ সমালোচক মহাশয় কিন্তু amidst deep regret লিখিয়াছিলেন যে এই সকল অভিনেতারা were more conspicuous by their absence. এই সমালোচক-প্রবর হয় অভিনয় রাত্রিতে উপস্থিত না থাকিয়া মনগড়া সমালোচনা লিখিয়াছিলেন নয় তিনি উক্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের চেনেন না এরূপ দায়িত্বহীনতার বা অজ্ঞতার পরিচয় যে সমালোচক দিতে ইতঃস্তত করেন না তাঁহার মত ব্যক্তিকে Forwardর মত উন্নতিশীল কাগজের এরূপ একটা দায়িত্বপূর্ণ বিভাগের ভার দেওয়া সমীচীন মনে করি না। আর এরূপ সমালোচকের সমালোচনায় জনসাধারণের কিরূপ আস্থা হইতে পারে তাহা বলাই বাহুল্য। বিলাতের প্রসিদ্ধ অভিনয় সমালোচক Mr James Agate সমালোচকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার অধুনা প্রকাশিত Comtemporary Theatre 1923 নামক পুস্তকে বহুবিধ জ্ঞাতব্য কথার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী ছত্র, এই 'স্বকৃতভঙ্গ' সমালোচক মহাশয়কে অবধান করিতে অনুরোধ করি—"since the crities' first duty is to his readers, it follows that no quality except sincerity will in the long run avail him • • • for the critic to be true to himself is the only way of not being false to his public. He is to put his readers in possession, not necessarily of absolute truth but of the whole truth as it is known to him. As play or actor strike him, so exactly will he set them down. Uncompromising honesty, then, seems to me to be the first qualification for the critic ; cleverness comes after."

নিরপেক্ষতার মূল্য— দুইটী প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষিত দুইখানি সাপ্তাহিক কলিকাতায় চলিতেছে ইহা অনেকেই জানেন, তবে তাঁহাদের কেহই উহা স্বীকার করেন না বরং উপরন্তু প্রত্যেক পত্রই নিজেরা যে নিরপেক্ষ তাহা খুব জোর দিয়াই বলেন; সম্প্রতি এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে দৈবমাহাত্ম্যে তাঁহাদের নিরপেক্ষতার বিচার করিবার সুযোগ সাধারণে পাইয়াছেন। গত ৯ই নভেম্বরের Forward পত্রে সাজাহান ও ভীষ্ম অভিনয়ের সমালোচনা

বাহির হইয়াছিল—সমালোচনার উভয় অভিনয়েরই দোষগুণ প্রদর্শিত হইয়াছিল অবশ্য সমালোচনা ঠিক হইয়াছিল কিনা সে বিচার আমরা এখানে করিব না, কারণ আমরা জানি প্রত্যেক সমালোচকের স্বীয় স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার অধিকার আছে ; তবে তাহা গ্রাহ্য করা না করা সাধারণের উপর নির্ভর করে। এই সমালোচনা পাঠ করিয়া একখানি নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক কেবল সাজাহান নাটকের অভিনয়ের প্রদর্শিত দোষের প্রতিবাদ করেন। অপর নিরপেক্ষ কাগজটি তীব্র সমালোচনার প্রতিবাদ করেন এখন পাঠকগণ বিচার করিবেন যে নিরপেক্ষতা কোন রাস্তা দিয়া গতায়াত করিয়া থাকে!

মিনার্ভার "জোর বরাৎ"—দ্বিতীয় অভিনয় রাত্রিতে অভিনয় আরও সুন্দর হইয়াছিল এবং যেরূপ দর্শক সমাগম দেখিলাম তাহাতে মনে হইল এই ক্ষুদ্র প্রহসনই হয়ত মিনার্ভার আগেকার বরাৎ আবার ফিরাইয়া আনিবে।

রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়—বাজারে গুজব ইনি নাকি ইতিমধ্যে নূতন দল গড়িয়া পুস্তকের মহলা দিতেছেন একথা আমরা বিশ্বাস করি না, কারণ খুব সুব্যবস্থা ও ভাবী রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হইয়া ইনি যে কোন কাজে হাত দিয়া ভূতপূর্ব্ব মডার্ণ থিয়েটারের মত অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ করিবেন তাহা বোধ হয় না। ইনি একজন রূপসজ্জ অভিনেতা—যিনি নাট্য-কলার জন্য অপর পথে জীবনের ভবিষ্যৎ উন্নতি ত্যাগ করিয়া ইহার সাধনায় নিযুক্ত আছেন—ইনি কোন একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত হইলে তাহা সাধারণের সহানুভূতি যে পাইবে তাহা প্রশ্নাতীত।

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী—বাজারে গুজব ইনিও নাকি একটা নূতন রঙ্গালয় গঠনের চেষ্টা করিতেছেন—তিনি ক্ষমতাশালী অভিনেতা ও বর্ত্তমান যুগে অভিনয় ও সঙ্গীত উভয় কলায় তাঁহার মত পারদর্শী অন্য কোন অভিনেতা নাই—বিশেষতঃ পুস্তকের প্রয়োগনৈপুণ্য (producing) ও শিক্ষকতা কার্য্যে অধুনা তাঁহাপেক্ষা যোগ্যতর কেহ নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই নূতন রঙ্গালয় স্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন—তথাপি তাহা করা তাঁহার উচিত নয় কারণ আমরা অল্প সংখ্যক উৎকৃষ্ট রঙ্গালয় চাই ; বহুসংখ্যক নিকৃষ্ট রঙ্গালয় প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী নই। অনুমান হয় এ গুজব একেবারে ভিত্তিহীন কারণ তিনি আর্ট, থিয়েটার কোম্পানীর সহিত শুধুইতো চুক্তিবদ্ধ নন তদপেক্ষা দৃঢ়তর স্নেহ প্রীতি ও শ্রদ্ধাবন্ধনে যে তিনি আবদ্ধ। আর্ট-থিয়েটার কোন কারণেই আজ তাঁহাকে খোয়াইতে পারেন না। তিনি নাকি একখানি পত্রে এ গুজবের প্রতিবাদ করিয়া এক পত্র দিয়াছেন। দুষ্ট লোকের রসনার কণ্ডুয়ন এইবার নিবৃত্ত হইবে তো? আমরা তাঁহাকে আর্টথিয়েটারে আজীবন স্থায়ীভাবে দেখিতে চাই।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—উদীয়মান তরুণ অভিনেতাদের মধ্যে দুর্গাদাস বাবু বড়ই জনপ্রিয়, ইহাঁর সৌম্য আকৃতি, মধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর ইহাঁকে রঙ্গমঞ্চে একটী এমন বিশেষ স্থান দিয়াছে যাহা অন্য কোন অভিনেতার অদৃষ্টে ঘটে নাই। চন্দ্রগুপ্তে "চন্দ্রগুপ্ত" ইরাণের রাণীতে 'কাজী' প্রফুল্লতে "শিবনাথ" রূপে ইনি অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন। সম্প্রতি ইনি অসুস্থ হইয়া ছুটীতে আছেন—জনরব রটাইতেছে যে ইনি উক্ত সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়াছেন বলা বাহুল্য এ জনরব সর্ব্বৈব মিথ্যা, কারণ আর্টথিয়েটার এরূপ একজন ক্ষমতাবান সংযত অভিনেতাকে কোন রকমেই ছাড়িয়া দিতে পারেন না। ইহাঁর অসুস্থতা বশতঃই তাঁহাদের 'সাজাহান' আজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছে না, ইনি মহম্মদের ভূমিকায় শীঘ্রই নাকি অবতীর্ণ হইবেন।

অভিনেত্রী রূপে ভদ্রমহিলা—সহযোগী 'নাচঘর' অভিনেত্রী রূপে ভদ্রমহিলাদের নিয়োগ প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে বলেন—আমরা কিন্তু তাহার কৃতকার্য্যতায় বিশেষ সন্দিহান। কারণ রঙ্গালয় এমন একটা স্থান, যেখানে নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা একরূপ অসম্ভব—এমন কি বিলাতেও অভিনেত্রীরা প্রকাশ্যতঃ রূপোপজীবিনী না হইলেও সাধারণতঃ তাঁহাদের চরিত্রের নৈতিক বন্ধন যে শ্লথ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর্টের উন্নতি করিবার অছিলায় মানুষের আত্মার ও মনের অবনতি যাহাতে ঘটে এরূপ পন্থার প্রচলন সমর্থন করা যায় না। শিক্ষিতই বলুন আর অশিক্ষিতই বলুন সাধারণ রঙ্গালয়ের মধ্যে দুএকটী অভিনেতা ব্যতীত সকলেরই প্রকৃতি যে উচ্ছৃঙ্খল তাহা সাধারণের অবিদিত নাই।

অভিনয় ও অভিনেতা

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের মন দিয়া শুধু মন বোঝা যায় কথাটা খুবই সত্য—দর্শকবৃন্দের মনের ভাব পর্য্যালোচনা করিলেই অভিনয়ের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে তাহা বেশ বুঝা যায় St. John Ervine তাঁহাব Organised Theatreএ বলেন "The Law is that all art, but specially the art of Drama, depends, not upon the quality of the small body of persons in any nation who practice the art, but upon the mental physical and spiritual condition of the whole Race" সমস্ত শিল্পকলাই বিশেষতঃ নাট্যকলা কেবলমাত্র যে কলার নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী উপাসকের উপরেই নির্ভর করে না তাহা সমস্ত জাতিব দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার পরিচয় দেয়। বঙ্গ ভঙ্গেব পবই আমবা জাতীয় মহানাটক প্রতাপাদিত্য, নন্দকুমাব সিরাজুদ্দৌলা প্রভৃতি দেখিয়াছি কিন্তু আজ বঙ্গবঙ্গমঞ্চে ঐ শ্রেণীর নাটক নাই—তাহার কারণ কি, ইহাকি আমাদেব জাতীয় ভাবেব অপমৃত্যুরই লক্ষণ—তবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই সার্ব্বজনীন নিয়মের একটু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, ভারতবাসীরা পরাধীন সুতরাং তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী রচিত নাটক তাহাদেব রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত করিবার অধিকাব তাহাদের নাই। এ বিষয়ে তাহাদের পুলিশতন্ত্রের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী ভারতের অন্যপ্রদেশের অধিবাসীদের ধারণা তাঁহার স্বজাতিপ্রেমে বাঙ্গলাকে হটাইয়া দিয়াছেন তাহা তাঁহাদের অনেকটা প্রবোধ দিতে পারে, কিন্তু তাহা জগতের চক্ষে ধূলাদিতে পারে না—বাঙ্গালার স্বদেশ প্রীতি তাহার রঙ্গমঞ্চে যেমন উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়াছে অন্যপ্রদেশের রঙ্গমঞ্চে এই শ্রেণীর কোন নাটক আজও যে জন্মিয়াছে তাহার পরিচয় বাঙ্গলা পায় নাই। জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি নাটকে যদ্রূপ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় তদ্রূপ আর কিছুতেই দেখা যায়না—জাতি যখন শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে পুষ্ট হইয়া উঠে তখন তাহার রঙ্গমঞ্চে বিয়োগান্ত নাটকের প্রাধান্য দেখা যায় আবার জাতি যখন দুর্ব্বল ভীরু অলস হইয়া পড়ে তখন তাহার রঙ্গমঞ্চ চপল আনন্দদানের (light entertainment) ব্যবস্থা কবিয়া থাকে জগৎপূজ্য সেকসনিয়র প্রায় সকল রসেব নাটকের রচয়িতা কিন্তু তাঁহার বিয়োগান্ত নাটকই তাঁহাকে অমরত্ব দানকরিয়াছে—তাহার Hamlet, King Lear Romeo and Juliet, Othcloর সম্মান Comedy of Errors, Merry wives of windsor As you like it এবং Twelfth Night এর চেয়ে ও অনেক বেশী ৺গিরিশচন্দ্রেব ধর্ম্মপ্রাণ ও সামাজিকে নাটকগুলির স্মৃতি নাট্যজগতে চিরোজ্জ্বল আছে ঐতিহাসিক নাটকে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্র লালেব প্রভাব অপ্রতিহত। ক্ষীরোদবাবুব আলিবাবাব অভিনয় সংখ্যায় প্রতাপাদিত্যেব চেয়ে যে বেশী তাহা নিঃসন্দেহ কিন্তু তাহার সম্মান যে আলিবাবাব সহস্র গুণ বেশী তাহাও সন্দেহাতীত। তাঁহাকে লোকে আলিবাবাব রচয়িতা বলিয়া মনে রাখে নাই তিনি প্রতাপাদিত্যেই অমব। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল হাসিব গানেব প্রথম প্রবর্ত্তক হইলেও সেকথা আমরা কমই ভাবি কিন্তুতাঁব চাণক্যেব কথা আমাদের অহোবহ মনে পড়ে।

বিগত কয়েক বৎসরে বাংলার রঙ্গমঞ্চে উল্লেখযোগ্য কোন নাটকের অভিনয় হয় নাই—এখন যে শ্রেণীর নাটক-নাটিকার চলন হইয়াছে তাহা জাতীয় জীবনের সহিত নিঃসম্পর্কিত—সাহিত্যে কখন তাহা স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারিবে না। তাহার কৃতীত্ব, আলোক-নিক্ষেপ কৌশল দৃশ্যপট, বেশভূষা ও অভিনেতাগণের কসরতের উপর নির্ভর করে। যাদুকরেরা যেমন হাত পা নাড়িয়াও বহুবিধ বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া দর্শকগণের মন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ঐন্দ্রজালিক ঘটনা ঘটাইয়া থাকে, আধুনিক অভিনেতারাও সেইরূপ হাত বা মুখের কসরতেই দর্শককে মাৎ করিয়া দেন—দর্শকের ভাগ্যে প্রকৃত অভিনয় সন্দর্শন ঘটে না—ইহার কুফল ফলিতে বেশী বিলম্ব হইবে না কারণ অসার মূল্যহীন জিনিস কখন স্থায়ী হয়না—হইতে

পারে না। মুহূর্ত্তে কোন প্রতিভাশালী সংযত অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিবেন সেই মুহূর্ত্তে এই কসরৎবাজি অভিনেতাগণ (acrobatic actors) জলের লিখন সম জলেতে মিলাইয়া যাইবে। কেবল বাংলার রঙ্গমঞ্চে আজ এই দুর্দশা নয় জগতের অধিকাংশ স্থানেই এই ব্যাপার বিলাতেও এখন Hamlet নাটক অভিনয় উপর্য্যুপরি একশত রাত্রি চালান কঠিন, কিন্তু অতি অসার অপদার্থ প্রহসন বা গীতিনাট্য উপর্য্যুপরি পাঁচশত রাত্রি অভিনীত হইতেছে এখানেও অধুনা অনেক অসার অপদার্থ নাটকেরও এইরূপ দীর্ঘ অভিনয় চলিতেছে এবং অনেকে উহা বঙ্গালয়ের সজীবতার লক্ষণ মনেও করিয়া থাকেন কিন্তু আসলে উহা জাতির দুর্ব্বলতার লক্ষণ—ইহাতে জানাইয়া দেয় যে এই জাতি আজ মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িতেছে, ইহা জাতীয় কবি বা নাট্যকারের অভাব জানাইয়া দিতেছে - আর জানাইতেছে যে হয় গভীর দুঃখে সমস্ত জাতি অবসন্ন আর নয় তাহার মন সুকুমার বৃত্তিতে আজ দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে কারণ নাটক বিশেষতঃ বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় দেখিতে মনকে অনেক বেশী রসদ যোগাইতে হয় এবং হাস্যরস মনের উপর দিয়া বহিয়া যায় সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া মানবের মর্ম্মস্থানকে আলোড়িত করিয়া হৃদয়কে সংক্ষুব্ধ করিয়া দেয় না। হাস্যরস অতি লঘু রস উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব নাই বলিলেই হয় এইজন্য উহা কখন স্থায়ী হইতে পারে না সাধারণতঃ যে লোক সদা সর্ব্বদা আমোদ করে হেসে বেড়ায় তাকে 'আমুদে' বলে লোকে ভালবাসে অর্থাৎ অনুকম্পা করে কিন্তু বিষয় কার্য্যে তাহার পরামর্শ লয় না অর্থাৎ তাহাকে শ্রদ্ধা করে না। সেই জন্যই হাস্যরস উপভোগরত জাতির অবস্থা স্বাভাবিক বা সুস্থ বলা যায় না—সেটা একটা বিকৃতি ও দুর্ব্বলতা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। অধঃপতনের যুগেই মানুষ হাস্যরস লিপ্সু হইয়া পড়ে—৺দ্বিজেন্দ্র লালের সাজাহান নাটকের 'মোরাদ' চরিত্রে ইহার ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায় মোরাদ বীর হইলেও সে হাসি—রূপ—গান আর সুরা লইয়া নির্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছিল তাহার অধঃপতন তাই অনিবার্য্য হইয়াছিল।

পূর্ব্বতন যুগে যাহাকে বর্ত্তমান রঙ্গালয় সমালোচকগণ 'পুরাণো দল' বলিয়া থাকেন ... ট্রাজিডিয়ান অভিনেতার সংখ্যা খুব বেশীই ছিল ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৺মহেন্দ্রলাল বসু, ৺মহেন্দ্রলাল মিত্র ৺অমৃতলাল মিত্র ইঁহারা সকলেই বিয়োগান্ত অংশ অভিনয়ে অনন্যসাধারণ ছিলেন; নূতন যুগের অভিনেতারা এখনও তাঁহাদের কৃতীত্বের অধিকার সীমার পার্শ্বেও যাইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান যুগে, পূর্ব্ব যুগের ন্যায় অভিনয়োপযোগী কণ্ঠস্বরের গৌরব ২।১টি ভিন্ন কোন অভিনেতা করিতে পারেন না। কেবল আমাদের দেশেই আজ অভিনেতার অভাব নহে, আমরা কথায় কথায় যে দেশের তুলনা দিয়া থাকি সেই ইংলণ্ডের নাট্যজগতেও আজ প্রতিভার একান্ত অভাব। অবশ্য বিলাতী থিয়েটার দেখা আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই তবে সেই দেশের বড় বড় সমালোচকগণের সমালোচনার মধ্যে যাহা দেখি তাহাতে সেখানেও অভিনেতার বড়ই দৈন্য ঘটিয়াছে বলা যায়। তবে অধুনা বিলাতের আদর্শে আমাদের রঙ্গালয়ে Stage craftএ বা রঙ্গমঞ্চ সজ্জা নৈপুণ্যে অধিকতর দক্ষতা পরিলক্ষিত হইয়াছে, প্রথম এ জিনিষটা আমদানী হয় ম্যাডান কোম্পানীর পারসী থিয়েটারে ক্রমশঃ মিনার্ভার উদ্যোগে কতক কতক অবলম্বন করা হয় এবং আর্টথিয়েটারে উহা পরিপুষ্ট হইয়া আরও উন্নত ভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে—শিশির বাবুর মনোমোহন নাট্যমন্দিরে ঐ কলাকৌশলকে প্রাচ্যভাবান্বিত করিয়া সন্নিবেশিত হয়; মোটের উপর বর্ত্তমান যুগে সমস্ত রঙ্গালয়েই এখন প্রয়োগনৈপুণ্যের উপর কর্ত্তৃপক্ষের খর দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। তাহাতে একদিকে যেরূপ উন্নতি হইতেছে প্রকৃত অভিনয় কলা সেইরূপে হীন হইয়া পড়িতেছে, এখন নূতন যুগে, অভিনয়ে ভাবাভিব্যক্তির দিকে অভিনেতা ও দর্শক উভয়েই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন আবৃত্তি কণ্ঠস্বর—এমন কি অনেক অভিনেতা শুদ্ধ উচ্চারণ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিতেছেন—নূতন যুগের আবৃত্তির মধ্যে একটা এমন সুর আসিয়াছে যাহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং অনেকটা পাদ্রীদের লেক্‌চারের মত। এটা অভিনয়ে স্থায়ী হইবে কি না এখনও সন্দেহের বিষয়। এই ভাবাভিব্যক্তির দিকে অত্যধিক আগ্রহকে Expressionism বলে এবং ইহা আমেরিকায় বেশী মাত্রায় প্রচলিত Stark Young, Kenneth Macgowan প্রভৃতি ইঁহার পৃষ্ঠ-

পোষক ইঁহাদের মতে নাকি ভবিষ্যতে এই নীতিতেই নাট্য জগৎ চালিত হইবে—বলা বাহুল্য যে এই নীতি ইংলণ্ডে ততদূর আদরনীয় হয় নাই। আমেরিকায় ইহার প্রাধান্যের একটা কারণ আছে তথায় চলচ্চিত্র অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয় এবং চলচ্চিত্রের অভিনয়ে এই অভিব্যক্তি-প্রধান অভিনয় বিশেষ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে তবে সেই কৃতকার্য্যতার নিমিত্ত ইহাকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী বলিয়া গ্রহণকরা অদূরদর্শিতার চিহ্ন। বাংলায় বঙ্গমঞ্চ আজ এই Expressionismএর তরঙ্গে উদ্বেলিত কিন্তু যে কয়খানি নাটক এই নীতিতে অভিনীত হইতেছে, সে কয়খানিই অন্তঃসারশূন্য ও সাহিত্যে কখন স্থায়ী হইবেনা সুতরাং সেগুলিকে খাড়া রাখিতে তাহার অসম্পূর্ণতাকে আবৃত করিতে এরূপ আতিশয্য আবশ্যকীয় হইতে পারে। এসম্বন্ধে Mr. Macgenunএর মন্তব্যের কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল "Expressionism –applies to realistic plays as well as to plays of spiritual emphasis, plays of colour, Imagination, exaltation, inner truth. It can create illusion as well as understanding. It can perfect the old Theatre as well as launch the new. It does in fact range from a beautiful realism to absolute abstract form. Its one definite cuts it off from the theatre of photographic realism. It is always and utterly opposed to the copying upon the stage of the confusion & detail of actuality. এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রভাব বাংলায় নাট্যরসিকদের মধ্যে একদলের মাথায় ইতিমধ্যেই বেশ জমী লইয়া ফেলিয়াছে তাঁহারা আর স্বাভাবিক অভিনয় কথাটার অর্থই বুঝেন না। ইহার উপর ইংরাজ নাট্যসমালোচক St John Ervine তাঁহার Organised Theatreএর ১৯৬ পৃঃ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও এখানে উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য; তিনি বলেন "An account which despite the adjectives of extremity, tells us uncommonly little about expressionism. What is "absolute abstract form ?" And how is something which is absolute & abstract to be presented relatively and concretely, as it must be if it is to be presented at all ? But even if we pass that passage as an burst of eloquence which must not be examined too closely, we are entitled to ask for examples of the new technique if there are any ?

অভিনয়ের প্রাণ—আবৃত্তি, ভাবাভিব্যক্তিকে বেশভূষার মত উপযোগী ভাবা যাইতে পারে কিন্তু কাহারো প্রাণ বধ করিয়া তাহাকে সুন্দর পোষাক পরাইলে কি ফলোদয় হইতে পারে? যদিই যুগধর্ম্ম প্রভাবে ভাবাভিব্যক্তিকে প্রাধান্যই দিতে হয় তবে তাহার একটা সংযম ও সীমা থাকা একান্ত আবশ্যক। যেমন অনেক সাধারণ বস্তুর মধ্যে একটী বস্তুতে কোন বিশেষত্ব থাকিলে তাহা অসাধারণ শ্রেণীভুক্ত হয় সেইরূপ অভিনয় কালীন আবৃত্তির মধ্যে মধ্যে ভাবাভিব্যক্তি অতি সুন্দর দেখায় কিন্তু কোন অভিনেতা যদি উত্তম আবৃত্তি করিতে অপারগ হন, যদি তাহার উচ্চারণ অশুদ্ধ হয় এবং তিনি যদি প্রতিকথায় ভাবের অভিব্যক্তি করিতে থাকেন তবে তাঁহার মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্বন্ধে যদি দর্শকের সন্দেহ জাগিয়া উঠে সেজন্য কি দর্শককে অপরাধী করা যাইতে পারে? সাধারণতঃ মানুষে প্রতিকথায় আকার ইঙ্গিত প্রয়োগ করে না তারপর বেশী হাত-পা-নাড়াটা গাম্ভীর্য্যের অভাব বলিয়া গণ্যহয়, এই অঙ্গভঙ্গীর আধিক্য বাচালতার নিদর্শন বলিয়া সমাজে বিবেচিত হয় সুতরাং অভিনয়ে এসবের অযথা আধিক্যের সমর্থন করা যাইতে পারে না। চিত্রকর যদি মানুষ আঁকিতে বসিয়া কেবল দুটী চক্ষু, দুটী নাসারন্ধ্র, আর দুখানি ঠোঁট আঁকিয়া বলেন বাকীটার আর বিশেষত্ব কি উহা সহজেই অনুমেয় তাহা হইলে সেই চিত্র কি সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। রাজনৈতিক জগতে এনার্কিজমের মত এই নূতন বাদ্ও একপ্রকার ধ্বংসবাদ। এই নূতনপন্থীগণ কেবল পুরাতনের ধ্বংস কামনা করেন, যা কিছু পুরাতন তাহাই ইঁহাদের চক্ষুশূল—পুরাতনকে ধ্বংস করিতে সেই চেষ্টায় নিজেদের ধ্বংসের পথে যাওয়াটাকেও এঁরা খুব বেশী ক্ষতিকর মনে করেন না। তবে দেশের সৌভাগ্য যে এখন নূতনপন্থার উন্মাদনা সীমাবদ্ধ আছে এবং সাধারণের মধ্যে তাহা বিস্তৃত হয় নাই। এঁরা ভিক্টোরিয়ামেমোরিয়াল দেখে প্রশংসা করেন এবং 'তাজ'কে না-দেখে তাকে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিতে পারেন তবে তাহাতে জগতের কিছু আসিয়া যাইবে না তাজ নিজের গর্ব্বে নিজে উন্নত থাকিবে কারণ সে অতীতের মত সে নিন্দা প্রশংসার বাহিরে বর্ত্তমানের ন্যায় প্রশংসার দুগ্ধ পানে তাহার জীবন নির্ভর করে না।

দারিদ্র্যের মূল

বিদেশী শিল্প, পণ্যদ্রব্য ভারতে দিনের দিন যত বেশী আমদানী হইতেছে, ভারতের দারিদ্র্য ততই বাড়িতেছে। ভারতের মত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশে অভাবের জ্বালা যত বেশী জগতের আর কোন অতি অনুর্ব্বর শস্য সম্পদহীন দেশেও বোধহয় তেমন নয়।

লক্ষ্মীর লীলা নিকেতন সোণার ভারত—যেখানকার ভূমি লক্ষ্মী মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অশ্রান্ত ধারায় সোণার ফসল দেশের সন্তানদের হাতে তুলিয়া দিতেছেন সেখানকার লোকেরা অভাব অভাব করিয়া ক্ষুধার তাড়নায় মরে কেন? এমন লক্ষ্মী শ্রী যে দেশের সে দেশের সন্তানেরা এমন লক্ষ্মীছাড়া হইল কি করিয়া?

মহার্ঘ রত্নখনি খচিত দেশের চেয়ে এ দেশ শত গুণে বহু প্রসবা। এ দেশের জল বায়ু, ভূমির এমনি গুণ যে যতই কেহ আহরণ কর না কেন এ দেশের রত্ন ভাণ্ডার কখনো কেহ উজাড় করিয়া ফেলিতে পারিবে না। মাসের পর মাস ঋতু পরিবর্ত্তনে প্রকৃতি রাণীর স্নেহধারা অজস্র শস্য সম্পদরূপে এ দেশবাসীর হাত ভরিয়া আসিবেই।

এত যদি সম্পদ এ দেশের—এমন অফুরন্ত যদি ইহার রত্ন ভাণ্ডার তবে আর এ দেশের সন্তানেরা এমন অভিশপ্ত কেন? এত জিনিস হাতে দিয়াও তবু আবার এমন অভিশাপ দিল কে? এমন মর্ম্মভেদী অভাব সহিবার অভিশাপ সোণার ভারতের উপর বাহিরের কেহ চাপাইয়া দেয় নাই—এ অভিশাপ ভারতবাসী নিজেরাই নিজেদের উপর চাপাইয়া লইয়া কর্ম্মভোগে হা হুতাশ করিতেছে। অভিশাপ আমাদের স্বকৃত। দেশ অভিশপ্ত নহে—দেশবাসী আমরাই অভিশপ্ত। মুক্তির কি পথ? অভিশপ্ত হইয়া আর কতকাল আমরা থাকিব—নিজের মুখের গ্রাস পরকে জোগাইয়া নিজে অনাহারে মরিব?

সমগ্র ভারতের ক্ষুধিত কণ্ঠ আর্ত্তনাদ করিয়া এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছে—আমাদের বাঁচিবার উপায় কি। মরণের পথে তো দাঁড়াইয়াই আছি—তবু যে বাঁচিতে চাই। মানুষ যে এমন মরণ সহিতে পারে না। সত্যি মরণের জ্বালা কি তাহা জানি না কিন্তু সহস্র অভাবে এই যে তিল তিল করিয়া মৃত্যু যাতনা, এই যে তুষের দহন কি উপায় এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার?

খাইবার ও পরিবার ভাবনাই মানুষের সব চেয়ে বড় ভাবনা। খাইবার পরিবার ভাবনা যাহার নাই সেই পরম সুখী। খাইবার ও পরিবার ভাবনায় অষ্টপ্রহর যাহাদের ব্যস্ত থাকিতে হয় তাহারা অপর কোনও কাজই সুচারুরূপে করিতে পারে না। আজ এ দেশে দেশ উদ্ধারের জন্য যত রকম প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহার মূলে নিজেদের উদ্ধারের, নিজেদের খাইবার পরিবার ভাবনা এড়াইবার তেমন কোন ব্যবস্থা নাই বলিয়াই তাহা একটির পর একটি ব্যর্থতায় এলাইয়া পড়িতেছে।

খাইবার পরিবার ভাবনা এই সুজলা সুফলা দেশে কেমন করিয়া এত আসিল—কি উপায়ে আমরা এই মারাত্মক অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি তাহাই আজ সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে। ভারতব্যাপী দারিদ্র্যের বুকভাঙ্গা হাহাকারের মূল গলদ কোথায় তাহারই নির্দ্দেশ করিতে হইবে—ও প্রতিকারের উপায়ে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

বাঁচিবার উপায় কি? অনাহার মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? বিদেশের প্রস্তুত বিদেশী আমদানী দ্রব্যের মোহজাল যত শীঘ্র আমরা ছিন্ন করিতে থাকিব আমাদের দারিদ্র্য দূর হইয়া ততই আমাদের মুখে হাসি ফুটিতে থাকিবে। খাইবার সংস্থান বিলাইয়া দিয়া পরদেশজাত বাহ্য বিলাস আবরণ সংগ্রহের মধ্যেই আমাদের দারিদ্র্যের হাহাকারের মূল নিহিত। বাহিরকে আয়াস দিতে অন্তর আমরা শূন্য করিয়া ফেলিতেছি—তাই অন্তরের হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাসে ভারত ছারখার হইয়া যাইতেছে।

যাচা নিমন্ত্রণ

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়

সেদিন সকাল থেকে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। চারদিকটা বর্ষাত বাদ্‌লা হাওয়াতে ঢেকে রেখেছিল। আমার তখন ছুটী; সারাটা নিস্তব্ধ দুপুর কাটাবার জন্যে একটা নভেল নিয়ে বসে বসে পড়ছিলাম। বাহিরে জুতার শব্দ হওয়াতে জিজ্ঞাসা করিলাম 'কে'? উত্তরের অপেক্ষা না রেখে মহিম তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ করিল। আমি বলিলাম, "কিহে মহিম যে, এই বাদ্‌লার, দিনে এখানে? মহিম বলিল, "পঙ্কজের বিয়ে তাই তোমার নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।" "কে পঙ্কজ" মহিম বল্লে 'তুই চিনিস্ না, সেই যে তোদের বাড়ীর পেছনে থাক্‌তো" বাস্তবিক পঙ্কজ কে তা আমি বুঝতেই পারলুম না একটু বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করে বলিলাম, "তা আমার নিমন্ত্রণ কেন?" মহিম বল্লে "সে তোর সঙ্গে স্কুলে পড়তো, তাই।" স্কুলে পড়ার কথা শুনে সেই বোকা পঙ্কজের কথা আমার মনে হ'ল, "ও! সেই বোকা পঙ্কজ, কেমন বৌ হল।" "গেলেই দেখতে পাবে। আমি ভাই আর অপেক্ষা করতে পারি না, আমার নিমন্ত্রণ আবার অনেক জায়গায় যেতে হবে। এই তোমার পত্র রইল।" মহিমের প্রদত্ত নিমন্ত্রণের চিঠিটা পড়তে শ্রীশশীবাবুর নাম কন্যাকর্ত্তার ভাগে রহিয়াছে দেখিলাম। বাস্তবিক আমার পরিচিত শ্রীশশীবাবুর সঙ্গে এ শ্রীশশীবাবুর কোনও সম্বন্ধ আছে কি না জানি না। তবে এই শ্রীশশীবাবু যদি সেই শ্রীশশীবাবু হন, তবে নলিনীর যে বিয়ে হচ্ছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

তার পরদিন সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য শ্রীশবাবুর বাটী গে'লুম সকাল বেলাতেই। বাহিরেই পরিচিত শ্রীশবাবুকে দেখ্‌তে পেয়ে ভাবলুম আমার সন্দেহটা অমূলক নয়। আমার মুখের দিকে চেয়ে শ্রীশবাবু বল্লেন, "আরে অমিয় যে" "আর কি করি বলুন, খবর'ত আর দিলেন না, তাই যেচেই এলুম।" শ্রীশবাবু একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। আমি বলিলাম, "আর, এতো আমার পরের বাড়ী নয়, যে নিমন্ত্রণ করলে আসবো।"

"হাঁ, বাবা তাতো বটেই, তা যাও একবার ভেতরে —না আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।" এই বলে শ্রীশবাবু হড হড করে হাত ধরে আমায় ভেতরে নিয়ে গেলেন তাঁর স্ত্রীর কাছে। শ্রীশবাবু বলিলেন "দেখো, কা'কে ধ'রে এনেছি।" খুড়ীমা বল্লেন "কে অমিয়, এস বাবা এস। আমি বলিলাম, "খুড়ীমা, এখন আমি যেয়ে নিমন্ত্রণ খে'তে আরম্ভ করেছি।" "কেন তুই খবর পাস্ নে।" "খবর না পেলে আর এলুম কোত্থেকে।" "বটে, কে খবর দিলে।" আমি বল্লাম, "আমি যে এখানে বরযাত্রী পঙ্কজ যে আমারই বন্ধু।"

বারাণ্ডার কোণে দাঁড়িয়েছিল নলিনী গায়ে হলুদের হলুদ দেওয়া কাপড়খানা পরে আর তার ছলছল চোখের করুণ দৃষ্টিটা পড়েছিল আমার অন্তরের গুপ্তব্যথার মাঝখানে।

কিছুক্ষণ বাদে বাহিরে দেখা হলো একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে। আমি বলিলাম "অরেনবাবু যে বসুন" "না আমি আর বসবো না, তুমি একবার শ্রীশবাবুকে ডেকে দিতে পারো।" আমি বলিলাম "কেন?" 'কেন—এ জোচোরের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হচ্ছে।" আমি'ত শুনে শুনে একেবারে অবাক্, জিজ্ঞাসা করিলাম "কি রকম" "তুমি' ত জান না অমিয় পঙ্কজের সঙ্গে যে আমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে আর সে' তো এই সেদিনের কথা, জানই তো তুমি কি রকম গরীব আমি, সামান্য গহনা দিতে পারি নাই বলিয়া পঙ্কজের বাপ আবার তার বিয়ে দিচ্ছে, আমার মেয়ের একেবারে সর্বনাশ কর্চ্ছে।" আমি একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বলিলাম, "পঙ্কজের বিয়ে হয়েছিল!" "হয়েছিল বৈকি অমিয় এই আমারই মেয়ের সঙ্গে।" ভাবিলাম কি পাষণ্ড এই পঙ্কজ। একবার বিয়ে করে আবার স্বচ্ছন্দে একটা বিবাহ করতে।

শ্রীশবাবু শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। আর সারা বাড়ীটা একটা অব্যক্ত নৈরাশ্যের মত হয়ে উঠ্‌লো। শেষে নলিনীর বড় বো'ন একটা উপায় আবিষ্কার করিল।

সকলে মিলিয়া যখন আমাকে বিবাহের আসনে বসাইয়া দিল তখন নলিনীর বড় বোন বল্লে, "দেখো অমিয় এরপর কখনও যেন আমাকে দোষ দিও না কারণ এ নিমন্ত্রণ তোমার যেচে নেওয়া"
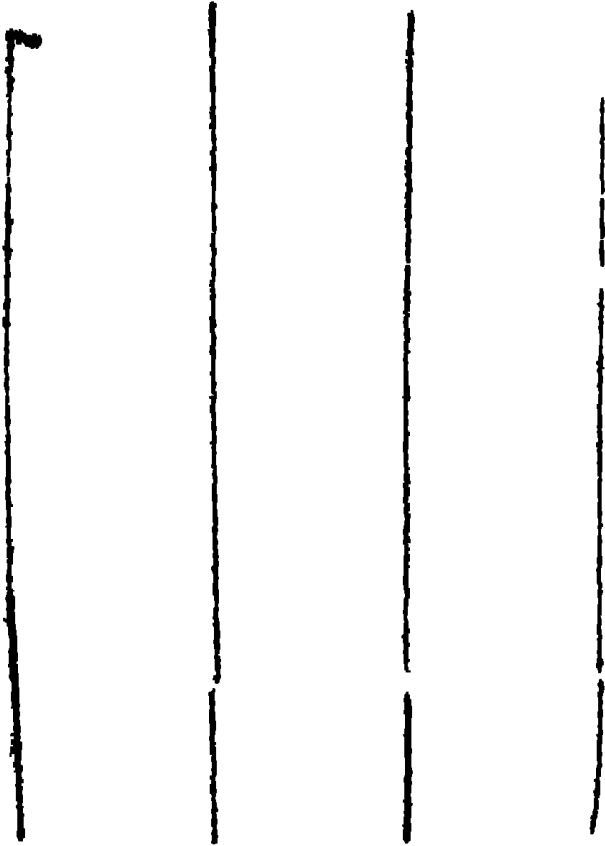
Printed & Published by Jnanendra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works ...

"বন্দিনী"
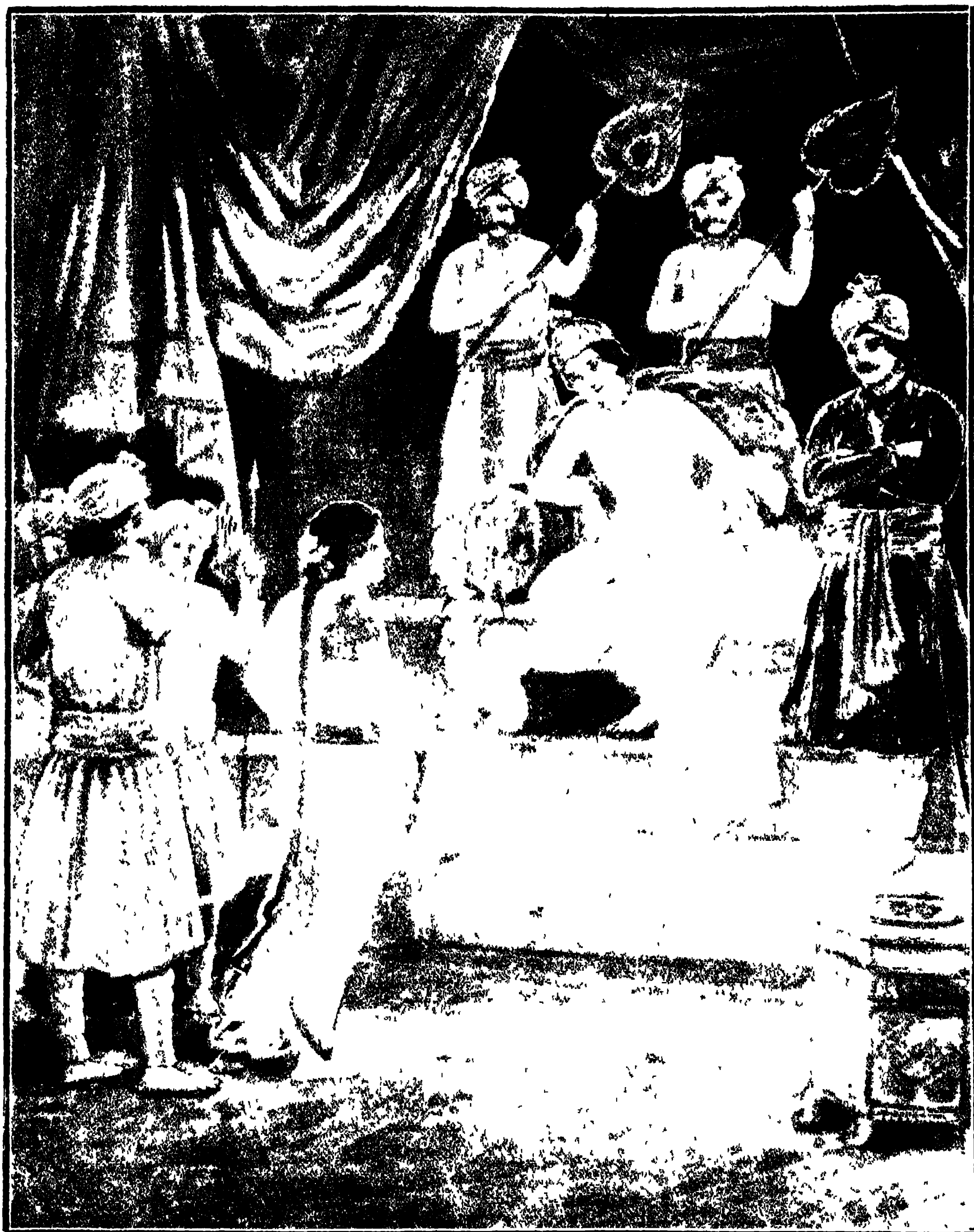
সচিত্র নবযুগ সাপ্তাহিক

প্রথমবর্ষ] ১৪ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ২৯শে নভেম্বর [১৮শ সংখ্যা

'নোতুন' যুগের ভিখারী

গৃহস্বামিনী—ভিক্ষা দিতে আসিয়া বলিলেন, “নাও বাছা —ধর”

ভি—একটু কাঁচুমাচু মুখ করিয়া বলিলেন, কাঁড়া চাল নেই মা—আকাঁড়া চাল নিলে আমার
ঝুলির কাঁড়া চাল যে দরে বিকাবে না।

গৃহকর্ত্রী —বিস্মিত—নির্ব্বাক্।

বাংলার বিখ্যাত ফুটবল ক্রীড়কগণ

এই বাঙ্গালার গৌরব স্বরূপ যুবকগণ সম্প্রতি সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন ও জাভা হইতে কৃত কার্য্যতার সহিত ফুটবল খেলিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

বামদিক হইতে দক্ষিণে দাঁড়াইয়া এফ্, মিত্র, পি, চট্টোপাধ্যায়, এইচ্, বসু, এফ্, রহমন, বি, ডি, চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায় এবং এম, দত্ত মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিংএর অনাঃ সেক্রেটারী, এম, দাস (কাপ্তেন), এ, ব, রসার (এই ভ্রমণ ব্যাপারের উদ্যোক্তা) পি, কে, গুপ্ত এবং এম, দাস (আঃ সেক্রেটারীদ্বয়) নিম্নে—এম, দওযার, ডি, গুহ, বৃত্তাকারে প্রতিফলিত, আর, গাঙ্গুলী এবং এস, সামাদ।

আর্ট থিয়েটারের পরিচালনায় প্রফুল্ল নাটকের পুনরাভিনয়ের কয়েকটা চিত্র।

রমেশ—প্রিয়দর্শন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী।

প্রফুল্ল—উদীয়মানা অভিনেত্রী শ্রীমতী নীহারবালা।

প্রফুল্লের হত্যাদৃশ্য।

মদন ঘোষের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

"রাণী মুদিনীর গলি"—দৃশ্যে

যোগেশ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

মিনার্ভায় "জোর-বরাৎ"

ঘটকসাহেবের ভূমিকায় হাস্যরসনিপুণ অভিনেতা
শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দে।

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর প্রতিকৃতির ব্লক যথাসময়ে না পাওয়ায় মুদ্রিত করিতে পারিলাম না — পরে তাঁহাদের চিত্র ও প্রতিভার অপূর্ব্ব পরিচয় পাঠকগণকে উপহার দিবার বাসনা রহিল। —নবযুগ সম্পাদক
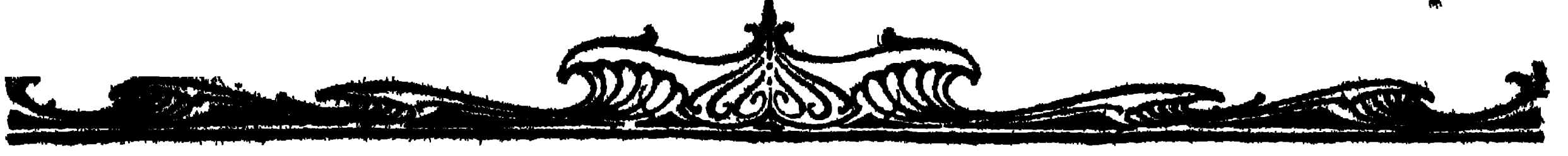
প্রদীপে প্রাচীন প্রথা

শ্রীশ্রীরাম শাস্ত্রী

সংসার-নির্ব্বাহের জন্ত যে সকল সামগ্রী সাধারণতঃ প্রয়োজনীয়, প্রদীপ তাহার মধ্যে প্রধানতম একটী। রজনীযোগে দীপালোকে দর্শনাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়, আর যদি দীপাভাব ঘটিলে মানব জগৎ অন্ধকার দেখে—দারুণ দুঃখ দশায় উপনীত হয়। ঘনান্ধকারে পতিত ব্যক্তি সহসা দীপ দর্শনে যেরূপ আনন্দ অনুভব করে আবার অকস্মাৎ দীপনির্ব্বাণে অন্ধকারে নিমগ্ন মানব তদ্রূপ দুঃখ পাইয়া থাকে। প্রদীপ প্রজ্বালিত হইলে তদ্দর্শনে মনে যে সহসা একটা আনন্দ আইসে, আর দীপনির্ব্বাপণকালে যে বিষাদের আবেশ হয়, ইহা সম্ভবতঃ সকলেরই অনুভববেদ্য, তাই বলিতেছি, প্রসাদ বিষাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষী সেই প্রদীপ সাংসারিক সামগ্রী মধ্যে এক মহা প্রয়োজনীয় বস্তু।

ইহা ত হইল ইহকালের সাংসারিক কথা- রাত্রিকালের দর্শনাদির কথা। পারলৌকিক কার্য্যেও শাস্ত্রীয় বিধানে দিবাভাগে কোথাও বা দিবারাত্র নির্ব্বিশেষে প্রদীপের প্রয়োজন প্রচুরতররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। পূজাদি কার্য্যে পঞ্চ, দশ, ষোড়শ, চতুঃষষ্টি প্রভৃতির উপচার সংখ্যা অসংখ্যেয়, তন্মধ্যে সর্ব্বনিম্ন পঞ্চোপচারেও এই দীপ বাদ পড়ে নাই। এইরূপ কি দান কি ব্রত, কি যাগ কি যজ্ঞ, যাবতীয় কার্য্যেই প্রদীপের প্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত আছে। ফল কথা,—সাংসারিক কার্য্যে প্রদীপের উপকারিতা ও শাস্ত্রীয় কার্য্যে অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা কাহারও অস্বীকার্য্য নহে।

সর্ব্বজীবে সমান দয়াশীল জ্ঞান-বিজ্ঞান পারদর্শী ঋষি মহর্ষিগণ আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আমাদের অশেষ কল্যাণকামনায় আমাদিগকে কি না শিখাইতে যত্ন করিয়াছেন? কেমন করিয়া মানুষ হইতে হয়,—কেমন করিয়া মানুষের মঙ্গলকর অশন বসন শয়ন উত্থানাদি গৃহধর্ম্মে সুশিক্ষা লাভ করিতে হয়, তাহা তাঁহারা শাস্ত্রে প্রকৃষ্টরূপেই প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা কিছুই বাদ রাখিয়া যান নাই; এমন কি প্রদীপ প্রসঙ্গেও তাঁহারা তাহার জ্বালন নির্ব্বাপণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার প্রণালীই বলিয়া দিয়াছেন। কেমন করিয়া জ্বালিতে হয়, কিরূপ পলতা দিতে হয়, কত উচ্চে রাখিতে হয়, কিরূপ আধার কিরূপ আকার, কোন কথাই বাকী রাখেন নাই। অন্ধ কল্পিমানব। নয়ন উন্মীলিতকর আর দেখ একবার দীপ বিষয়ে ঋষিগণের কিরূপ বিশুদ্ধ ব্যবস্থা।

> সুবৃত্তবর্ত্তিঃ সস্নেহঃ পাত্রেঽভগ্নে সুদর্শনে।
> সুশ্রায়ে বৃক্ষকোটৌ তু দীপং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ॥
> পদ্মসূত্রভবা দর্ভগর্ভসূত্রভবাথবা।
> শালজা বাদরী বাপি ফলকোষোদ্ভবাথবা॥
> বর্ত্তিকা দীপকৃত্যেষু সদা পঞ্চবিধা স্মৃতা॥

* * * *

> ঘৃতপ্রদীপঃ প্রথমস্তিলতৈলোদ্ভবস্ততঃ
> সার্ষপঃ ফলনির্য্যাসজাতো বা রাজিকোদ্ভবঃ॥
> দধিজশ্চান্নজশ্চৈব প্রদীপাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥

প্রদীপের বর্ত্তি অর্থাৎ পৈল্তা সুগোল ও স্নেহযুক্ত করিবে, প্রদীপপাত্র অভগ্ন মনোজ্ঞ হইবে, উচ্চস্থ পিলসুজাদি আধারে রাখিবে, আর এইরূপ প্রদীপ যত্নপূর্ব্বক দান করিবে।

বর্ত্তি বিষয়ে বিশেষ এই যে,—পদ্মনালোত্থিত সূত্র কুশগর্ভজাত সূত্র, শাল বদর বা ফলকোষজাত কার্পাসাদি সূত্র—দীপপ্রদানে এই পাঁচ প্রকার বর্ত্তি প্রশস্ত।

ঘৃত প্রদীপ প্রধান; তিল তৈল সরিষার তৈল, ফলনির্য্যাস, শ্বেত সর্ষপজাত তৈল, দধি বা তণ্ডুলাদিজাত রস ইহারা প্রদীপে পর পর প্রশস্ত। প্রদীপের এই সপ্ত প্রকার ঋষিগণ কথিত এই যে প্রদীপ লক্ষণ বর্ণিত হইল, ইহা ভিন্ন অন্য কোনরূপ প্রদীপ সাংসারিক কার্য্যেই কি, আর দৈব পৈত্র কার্য্যেই বা কি, পবিত্র বলিয়া গৃহীত হইবে [illegible] বিশেষতঃ শাস্ত্রীয় কোন কার্য্যে প্রদীপ প্রজ্বালন [illegible]

আরম্ভই হইবে না। দীপ প্রজ্বালনের সঙ্গে সঙ্গে যে একটা আনন্দ অনুভূত হয়, সেই আনন্দের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কার্য্যের বিঘ্ন বিদূরিত হইয়া সুষ্ঠু সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাই সকল কার্য্যের প্রারম্ভে শাস্ত্রে প্রদীপ প্রজ্বালনের ব্যবস্থা।

এইরূপ প্রদীপ ইহপরকালের উপকারিতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে,—

দীপেন লোকান জয়তি দীপস্তেজোময়ঃ স্মৃতঃ।
চতুর্ব্বর্গপ্রদো দীপস্তস্মাদ্দীপং যজেদ্‌বুধঃ॥

দীপ সর্ব্বতেজোময়, দীপে অখিল লোক জয় হয়, দীপ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গপ্রদ, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত পবিত্র প্রদীপের প্রতি আদর প্রদর্শন করিবেন।

হায়! হায়!! এহেন মহোপকারী মহামঙ্গলপ্রদ প্রদীপের কি দুষ্পরিণাম। ঘৃত গিয়াছে, চর্ব্বি আসিয়াছে, কাজেই প্রদীপের প্রথম কল্প বিলুপ্ত। তারপর তিলতৈলের প্রচলন প্রায়ই নাই, ভেজালে বিশুদ্ধ সর্ষপও প্রায় পঞ্চত্ব পাইয়া আসিল, ফলনির্য্যাসাদির প্রযোগ প্রক্রিয়া মানব জাতি অনেকদিন ভুলিয়া বসিয়া আছে। এই সুযোগে কলিরাজের ক্রম আক্রমণে সময় বুঝিয়া কেরোশিন আসিয়া দেখা দিল,—দেখিতে দেখিতে রাজ্য ছাইয়া ফেলিল। কলিসৈন্যসেবকগণ টীনের আধারে চতুষ্কোণ চওড়া সলিতায় চিমনির মধ্যে কেরোশিনের আলো জ্বালিয়া দিল। সেই আলো সমস্ত রাত্রি জ্বলিল, সেই আলোয় রন্ধন ভোজন শয়ন এমন কি শিশুগণের অধ্যয়ন পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল। ফলে কেরোশিনের ধূম মিশ্রিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি আহার করিয়া অজীর্ণ ও অম্বল আসিল,—অকালে মানুষ মরিতে লাগিল। শিশুগণের চক্ষু গেল, চল্লিশের পূর্ব্বে এমন কি শৈশবে কৈশোরেই চশমা ধরিল, কেহ কেহ বা শিরঃপীড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার চক্ষুরোগে অকর্ম্মণ্য হইল। খরচের দিব কেহ খতাইয়া দেখিল না, উপকার অপকার বুঝিল না, মানুষ ঋষি মহর্ষি-বিজ্ঞানে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া জলুষে মজিল—প্রাণে মরিল। সেকালের লোক অশীতি বর্ষেও চক্ষুষ্মান্ ছিল, চশমা ব্যতীত রাত্রিতেও পড়িতে পারিত, আর এ কালের লোকে যে অল্প বয়সেই অন্ধ—দিকে দিকে ছানি কাটার ছড়াছড়ি, প্রদীপ-বিপর্য্যাস যে তাহার অন্যতম প্রধানতম কারণ নহে, ইহা কে বলিবে? যে শাস্ত্রীয় প্রদীপের অঞ্জনে চক্ষুরোগ দূর হয়, তাহার পরিবর্জ্জনেই যে এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহাও নিশ্চিত।

স্থূলবুদ্ধিরা আপাততঃ একবার আঁক কষিয়া দেখিল, কেরোশিনের আলো খুব সস্তা। সস্তার দুরবস্থা কাহারও লক্ষ্য হইল না। এক দিকে যেমন সস্তা মনে হওয়ায় ঢালিতে ফেলিতে লাগিল, প্রয়োজনাতিরিক্ত পোড়াইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনই কেরোশিনবিষে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বিস্তর খরচ পত্র করিতে লাগিল। তবু মোহ কাটিল না, এই বিষ তৈলে বিশ্বাস টুটিল না। যাঁহারা খুব শাস্ত্র-বিশ্বাসী ঋষি মর্য্যাদা পালনকারী, তাঁহারাও এই কলিচেলার অন্তঃ পৈশাচিক চাকচিক্যে ভুলিলেন। সাংসারিক ব্যবহারে প্রাচীনগণের প্রদর্শিত পথে থাকিয়া সন্ধ্যার সময় একবার মাত্র প্রদর্শন করিয়া রাত্রির প্রয়োজনীয় সমস্ত সময় কেরোশিনই জ্বালিতে লাগিলেন। আর শাস্ত্রীয় কার্য্যে শক্তি অনুসারে যথাবিধি ঘৃত তৈলাদি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তবে সেরূপ লোকের সংখ্যাও যে খুব কম, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

স্নেহবস্তুর ব্যবহারে শরীর মস্তিষ্ক শীতল থাকে। স্নেহময় প্রদীপের অগ্নিশিখার সহযোগে দীপাগ্নিধূমে সেই স্নেহ দেহে সংক্রামিত হয়, ইহা বিশুদ্ধ দীপদানের শাস্ত্রীয় ঋষি-বিজ্ঞান। সেই স্নেহস্থানে কেরোশিন এখন কিরূপ কার্য্যকর, বুদ্ধিমান মাত্রেরই তাহা বিবেচ্য। কেরোশিনে সে স্নেহ নাই বা থাকিতেও পারে না, এই কেরোশিনের অত্যধিক ব্যবহারে আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে কিরূপ অনর্থ উৎপাদন করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তারপর সে কেরোশিনেও শানাইল না, এসিটিলিন আসিল। সহর নগর পল্লী ইহার অনধিকৃত স্থান প্রায় নাই। শুনিয়াছি—ইহাও অতি অমেধ্য বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত। অথচ বিবাহের সম্প্রদান ক্ষেত্রে, শালগ্রাম, সন্নিধানে দুর্গামণ্ডপে, ব্রাহ্মণগণের ভোজন পঙ্‌ক্তিতে পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। এক আসে আর যায়, একবারে না গেলেও নিষ্প্রভ না হইলেও জীবিত; তবে এসিটিলিন এখনও টলে নাই, প্রায় সমপ্রভই আছে। তারপর কালক্রমে উগ্র হইতেও উগ্রতর এক বৈদ্যুতিক আলো আসিয়া জুটিল। তবে ইহার প্রচলন সহর নগরেই বেশী। ক্রমে ক্রমে ইহা পল্লী অঞ্চলেও প্রবেশ করিতেছে।

আর ক্রমে যে ইহা সর্ব্বদেশ অধিকার করিয়া বসিবে না, ইহার বিক্রম দেখিয়া তাহা যে অনুমান না হয়, এমন নয়! কিন্তু ইহার ফল যে কি দাঁড়াইবে, তাহা বলা যায় না।

স্নেহহীন দ্রব্যের ব্যবহারে, বিশেষতঃ স্নেহপ্রধান দীপের অব্যবহারে মানুষও যেন পূর্ব্বকালের তুলনায় দিন দিন স্নেহহীন হইয়া পড়িতেছে। অবশ্য এ সম্বন্ধে অন্য কারণও থাকিতে পারে, তবে ইহাও যে একটি সহযোগী কারণ, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন।

মানুষ যে কি মোহে কোন্ গুণে ইহা সাগ্রহে গ্রহণ করিতেছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। ঘৃত প্রদীপে দিব্য গন্ধ থাকে; তৈল প্রদীপে সেরূপ সুগন্ধ সহজ্ঞানুমেয় না হইলেও কেরোশিনের মত কু-গন্ধ নাই। তারপর এসিটিলিনের আঁশ্টে গন্ধে ভূত পলায়। বৈদ্যুতিক আলোর না গন্ধ না স্নেহ, তাই বলি,—কেন যে এই সকল আলো আদৃত হয়, তাহা বুঝি না। তথাপি এই বৈদ্যুতিক আলোর আদর যে অন্ততঃ সহরে অত্যধিক বাড়িয়াছে এবং সেই আদর বাহুল্যে যে মানুষ শাস্ত্রীয় মর্য্যাদা পর্য্যন্ত পরিহার করিতে বসিয়াছে, তাহারও দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর না হইতেছে, এমন নয়।

আমাদের দেশে কার্ত্তিক মাসে আকাশপ্রদীপ দান একটী শাস্ত্রীয়বিধান। এ দীপদানের ফলও অনন্ত। ঋষিগণ বলিয়াছেন,—

> কার্ত্তিকে মাসি যো দদ্যাৎ প্রদীপ সর্পিরাদিনা।
> আকাশে মণ্ডলে বাপি স চাক্ষয়ফলং লভেৎ॥

কার্ত্তিক মাসে ঘৃতাদি দ্বারা যে ব্যক্তি আকাশমণ্ডলে দীপ দান করে, তাহার অনন্ত ফল লাভ হয়।

এ বিধানের অন্তর্গত শাস্ত্র-মত অনেকই আছে। দীপদাতা উপবাসী থাকিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় মন্ত্রপূত আলোক আকাশে উঠাইয়া দিবে, ইহাই হইল বিধান। সে বিধান এখন অনেকস্থলেই লুপ্তপ্রায়। তথাপি লোক দেখান আলো দেওয়া এখনও অনেক স্থলেই আছে। এবার এই সহরের অনেক স্থলেই সেই অতি পবিত্র অশেষ পাতকহর আকাশ প্রদীপ আধুনিক বৈদ্যুতিক আলোকে সম্পন্ন হইতে দেখা গিয়াছে।

তাই বলিতেছি কালে কালে এ হইল কি? হে অজ্ঞাতস্থাননিবাসি আমাদের শাস্ত্রগুরু ঋষি মহর্ষিগণ! কালে কালে এ বিভীষিকা আর কত দেখিব। আর ত দেখিতে পারি না,—আর ত সহিতে পারি না। তোমরা যেখানেই থাক, যে তপোবিজ্ঞানবলে এই ভারত সন্তানগণকে সর্ব্ববরণ্যে করিয়াছিলে, তোমাদের সেই সন্তান আজ তোমাদিগকে ভুলিয়া অশাস্ত্রীয় অনার্য্য সেবিত কু আদর্শ গ্রহণ করিতেছে—মরিতেছে। হে মাননীয় নরষিগণ! তোমরা যেখানেই থাক না কেন, পথহারা স্বসন্তানে করুণা বৃষ্টিদানে—তোমাদের অনন্ত জ্ঞানালোকদানে ফিরাইয়া লও—সেই প্রাচীন সুপ্রাচীন পথে পরিচালিত কর, ইহাই তোমাদের পূজনীয় পাদপদ্মে প্রার্থনা। যতই অভাব হউক - যতই দ্রব্যাভাব ঘটুক, তোমাদের কৃপাদৃষ্টিদানে সে সকল পূর্ণ হইবে—মহী মঙ্গলময় হইয়া উঠিবে।

(৭ই অগ্রহায়ণের "বঙ্গবাসী" হইতে উদ্ধৃত)

রূপ-সায়র

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

আকাশ বয়ে রূপ ছুটেছে, আজকে বুঝি পূর্ণিমা?
ঘরের মাঝে ঘুমিয়ে কেরে! বাহির হরে, ঘুম থামা॥
রূপের পাগল আয়রে ছুটে, ধরেছে যার রূপ নেশা।
প্রাণভরে আজ পান করে নে, রূপ-সায়রে মন মেশা॥
নদীর বুকে চাঁদ নেমেছে, ঝাঁপ দিয়েছে জ্যোৎস্না।
কাণ পেতে শোন, বায় দূরে ওই, কোন বিরহীর গান শোনা॥

রূপ হারিয়ে কোন রূপসী, আছিস্ ঘরে আন্মনে।
ঘর ছেড়ে তুই আয়লো বারেক নদী তীরের ঝাউ বনে॥
হারাণ রূপ ফিরিয়ে পাবি বুকের মাঝে-আপন-মনে।
রূপ কথা নয়, সত্য এ যে, রূপহারা তুই ভাবিস্ নে॥
রূপ নশ্বর, এমন কথা কে বুঝা'ল আজ্ তোরে?
মনের;—মাঝে বাস বাঁধে সে, বাইরে এলে যায় ঝ'রে॥

আয়ত্তই হইবে না। দীপ প্রজ্বালনের সঙ্গে সঙ্গে যে একটা আনন্দ অনুভূত হয়, সেই আনন্দের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কার্য্যের বিঘ্ন বিদূরিত হইয়া সুষ্টু সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাই সকল কার্য্যের প্রারম্ভে শাস্ত্রে প্রদীপ প্রজ্বালনের ব্যবস্থা।

এইরূপ প্রদীপ ইহপরকালের উপকারিতা সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে,—

দীপেন লোকান্ জয়তি দীপস্তেজোময়ঃ স্মৃতঃ।
চতুর্ব্বর্গপ্রদো দীপস্তস্মাদ্দীপং যজেদ্বুধঃ॥

দীপ সর্ব্বতেজোময়, দীপে অখিল লোক জয় হয়, দীপ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গপ্রদ; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত পবিত্র প্রদীপের প্রতি আদর প্রদর্শন করিবেন।

হায়! হায়!! এহেন মহোপকারী মহামঙ্গলপ্রদ প্রদীপের কি দুষ্পরিণাম! ঘৃত গিয়াছে, চর্ব্বি আসিয়াছে, কাজেই প্রদীপের প্রথম কল্প বিলুপ্ত। তারপর তিলতৈলের প্রচলন প্রায়ই নাই, ভেজালে বিশুদ্ধ সর্ষপও প্রায় পঞ্চত্ব পাইয়া আসিল, ফলনির্য্যাসাদির প্রয়োগ প্রক্রিয়া মানব জাতি অনেকদিন ভুলিয়া বসিয়া আছে। এই সুযোগে কলিরাজের ক্রম আক্রমণে সময় বুঝিয়া কেরোশিন আসিয়া দেখা দিল,—দেখিতে দেখিতে রাজ্য ছাইয়া ফেলিল। কলিসৈন্যসেবকগণ টীনের আধারে চতুষ্কোণ চওড়া সলিতায় চিমনির মধ্যে কেরোশিনের আলো জ্বালিয়া দিল। সেই আলো সমস্ত রাত্রি জ্বলিল, সেই আলোয় রন্ধন ভোজন শয়ন এমন কি শিশুগণের অধ্যয়ন পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল। ফলে কেরোশিনের ধূম-মিশ্রিত অন্ন ব্যঞ্জনাদি আহার করিয়া অজীর্ণ ও অম্বল আসিল,—অকালে মানুষ মরিতে লাগিল। শিশুগণের চক্ষু গেল, চল্লিশের পূর্ব্বে এমন কি শৈশবে কৈশোরেই চশমা ধরিল, কেহ কেহ বা শিরঃপীড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার চক্ষুরোগে অকর্ম্মণ্য হইল। খরচের দিক কেহ খতাইয়া দেখিল না, উপকার অপকার বুঝিল না, মানুষ ঋষি-মহর্ষি বিজ্ঞানে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া অকূলে মজিল—প্রাণে মরিল। সেকালের লোক অশীতি বর্ষেও চক্ষুষ্মান্ ছিল, চশমা ব্যতীত রাত্রিতেও পড়িতে পারিত, আর এ কালের লোকে যে অল্প বয়সেই অন্ধ—দিকে দিকে ছানি কাটার ছড়াছড়ি, প্রদীপ-বিপর্য্যাস যে তাহার অন্যতম প্রধানতর কারণ নহে, ইহা কে বলিবে? যে শাস্ত্রীয় প্রদীপের অঞ্জনে চক্ষুরোগ দূর হয়, তাহার পরিবর্জ্জনেই যে এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহাও নিশ্চিত।

স্থূলবুদ্ধিরা আপাততঃ একবার আঁক কষিয়া দেখিল, কেরোশিনের আলো খুব সস্তা। সস্তার দুরবস্থা কাহারও লক্ষ্য হইল না। এক দিকে যেমন সস্তা মনে হওয়ায় ঢালিতে ফেলিতে লাগিল, প্রয়োজনাতিরিক্ত পোড়াইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনই কেরোশিনবিষে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বিস্তর খরচ পত্র করিতে লাগিল। তবু মোহ কাটিল না, এই বিষ তৈলে বিশ্বাস টুটিল না। যাঁহারা খুব শাস্ত্র-বিশ্বাসী ঋষি মর্য্যাদা পালনকারী, তাঁহারাও এই কলিচেলার অন্তঃ-পৈশাচিক চাকচিক্যে ভুলিলেন। সাংসারিক ব্যবহারে প্রাচীনগণের প্রদর্শিত পথে থাকিয়া সন্ধ্যায় সময় একবার মাত্র প্রদর্শন করিয়া রাত্রির প্রয়োজনীয় সমস্ত সময় কেরোশিনই জ্বালিতে লাগিলেন। আর শাস্ত্রীয় কার্য্যে শক্তি অনুসারে যথাবিধি ঘৃত তৈলাদি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তবে সেরূপ লোকের সংখ্যাও যে খুব কম, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

স্নেহবস্তুর ব্যবহারে শরীর মস্তিষ্ক শীতল থাকে। স্নেহময় প্রদীপের অগ্নিশিখার সহযোগে দীপাগ্নিধূম্রে সেই স্নেহ দেহে সংক্রামিত হয়, ইহা বিশুদ্ধ দীপদানের শাস্ত্রীয় ঋষি-বিজ্ঞান। সেই স্নেহস্থানে কেরোশিন এখন কিরূপ কার্য্যকর, বুদ্ধিমান মাত্রেরই তাহা বিবেচ্য। কেরোশিনে সে স্নেহ নাই বা থাকিতেও পারে না, এই কেরোশিনের অত্যধিক ব্যবহারে আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে কিরূপ অনর্থ উৎপাদন করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তারপর সে কেরোশিনেও শানিল না, এসিটিলিন আসিল। সহর নগর পল্লী ইহার অনধিকৃত স্থান প্রায় নাই। শুনিয়াছি—ইহাও অতি অমেধ্য বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত। অথচ বিবাহের সম্প্রদান ক্ষেত্রে, শালগ্রাম, সন্নিধানে দুর্গামণ্ডপে, ব্রাহ্মণগণের ভোজন পঙক্তিতে পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। এক আসে আর যায়, একবারে না গেলেও নিষ্প্রভ না হইলেও জীবিত, তবে এসিটিলিন এখনও টলে নাই, প্রায় সমপ্রভই আছে। তারপর কালক্রমে উগ্র হইতেও উগ্রতর এক বৈদ্যুতিক আলো আসিয়া জুটিল। তবে ইহার প্রচলন সহর নগরেই বেশী। ক্রমে ক্রমে ইহা পল্লী অঞ্চলেও প্রবেশ করিয়াছে।

আর ক্রমে যে ইহা সর্ব্বদেশ অধিকার করিয়া বসিবে না, ইহার বিক্রম দেখিয়া তাহা যে অনুমান না হয়, এমন নয়! কিন্তু ইহার ফল যে কি দাঁড়াইবে, তাহা বলা যায় না।

স্নেহহীন দ্রব্যের ব্যবহারে, বিশেষতঃ স্নেহপ্রধান দীপের অব্যবহারে মানুষও যেন পূর্ব্বকালের তুলনায় দিন দিন স্নেহহীন হইয়া পড়িতেছে। অবশ্য এ সম্বন্ধে অন্য কারণও থাকিতে পারে, তবে ইহাও যে একটি সহযোগী কারণ, তাহা অনেকেই স্বীকার করেন।

মানুষ যে কি মোহে কোন্ গুণে ইহা সাগ্রহে গ্রহণ করিতেছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। ঘৃত প্রদীপে দিব্য গন্ধ থাকে; তৈল প্রদীপে সেরূপ সুগন্ধ সহজানুমেয় না হইলেও কেরোশিনের মত কু-গন্ধ নাই। তারপর এসিটিলিনের আঁশ্‌টে গন্ধে ভূত পলায়। বৈদ্যুতিক আলোর না গন্ধ না স্নেহ, তাই বলি,—কেন যে এই সকল আলো আদৃত হয়, তাহা বুঝি না। তথাপি এই বৈদ্যুতিক আলোর আদর যে অন্ততঃ সহরে অত্যধিক বাড়িয়াছে এবং সেই আদর বাহুল্যে যে মানুষ শাস্ত্রীয় মর্য্যাদা পর্য্যন্ত পরিহার করিতে বসিয়াছে, তাহারও দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর না হইতেছে, এমন নয়।

আমাদের দেশে কার্ত্তিক মাসে আকাশপ্রদীপ দান একটা শাস্ত্রীয়বিধান। এ দীপদানের ফলও অনন্ত। ঋষিগণ বলিয়াছেন,—

> কার্ত্তিকে মাসি যো দদ্যাৎ প্রদীপ সর্পিরাদিনা।
> আকাশে মণ্ডলে বাপি স চাক্ষয়ফলং লভেৎ॥

কার্ত্তিক মাসে ঘৃতাদি দ্বারা যে ব্যক্তি আকাশমণ্ডলে দীপ দান করে, তাহার অনন্ত ফল লাভ হয়।

এ বিধানের অন্তর্গত শাস্ত্র-মত অনেকই আছে। দীপদাতা উপবাসী থাকিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় মন্ত্রপূত আলোক আকাশে উঠাইয়া দিবে, ইহাই হইল বিধান। সে বিধান এখন অনেকস্থলেই লুপ্তপ্রায়। তথাপি লোক দেখান আলো দেওয়া এখনও অনেক স্থলেই আছে। এবার এই সহরের অনেক স্থলেই সেই অতি পবিত্র অশেষ পাতকহর আকাশ প্রদীপ আধুনিক বৈদ্যুতিক আলোকে সম্পন্ন হইতে দেখা গিয়াছে।

তাই বলিতেছি কালে কালে এ হইল কি? হে অজ্ঞাতস্থাননিবাসি আমাদের শাস্ত্রগুরু ঋষি মহর্ষিগণ! কালে কালে এ বিভীষিকা আর কত দেখিব। আর ত দেখিতে পারি না,—আর ত সহিতে পারি না। তোমরা যেখানেই থাক, যে তপোবিজ্ঞানবলে এই ভারত সন্তান-গণকে সর্ব্ববরণ্যে করিয়াছিলে, তোমাদের সেই সন্তান আজ তোমাদিগকে ভুলিয়া অশাস্ত্রীয় অনার্য্য সেবিত কু আদর্শ গ্রহণ করিতেছে—মরিতেছে। হে মাননীয় মহর্ষিগণ! তোমরা যেখানেই থাক না কেন, পথহারা স্বসন্তানে করুণা বৃষ্টিদানে—তোমাদের অনন্ত জ্ঞানালোক-দানে ফিরাইয়া লও—সেই প্রাচীন সুপ্রাচীন পথে পরিচালিত কর, ইহাই তোমাদের পূজনীয় পাদপদ্মে প্রার্থনা। যতই অভাব হউক-যতই দ্রব্যাভাব ঘটুক, তোমাদের কৃপাদৃষ্টিদানে সে সকল পূর্ণ হইবে—মহী মঙ্গলময় হইয়া উঠিবে।

(৭ই অগ্রহায়ণের "বঙ্গবাসী" হইতে উদ্ধৃত)

রূপ-সায়র

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

আকাশ বয়ে রূপ ছুটেছে, আজকে বুঝি পূর্ণিমা?
ঘরের মাঝে ঘুমিয়ে কেরে! বাহির হরে, ঘুম থামা॥
রূপের পাগল আয়রে ছুটে, ধরেছে যার রূপ নেশা।
প্রাণভরে আজ পান করে নে, রূপ-সায়রে মন মেশা॥
নদীর বুকে চাঁদ নেমেছে, ঝাঁপ দিয়েছে জ্যোৎস্না।
কাণ পেতে শোন, বাঁয় দূরে ঐ, কোন বিরহীর গান শোনা॥
রূপ হারিয়ে কোন রূপসী, আছিস্ ঘরে আনমনে।
ঘর ছেড়ে তুই আয়লো বারেক নদী তীরের ঝাউ বনে॥
হারাণ রূপ ফিরিয়ে পাবি বুকের মাঝে-আপন-মনে।
রূপ কথা নয়, সত্য এ যে, রূপহারা তুই ভাবিস্ নে॥
রূপ নশ্বর, এমন কথা কে বুঝা'ল আজ্ তোরে?
মনের;—মাঝে বাস বাঁধে সে, বাইরে এলে যায় ঝ'রে॥

ভোরের আলো

শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়

এক

রাত্রিকাল। ছোট্ট সাগরতীরে কাঠের তৈয়ারী কুটির-খানি; ভগ্নপ্রায় হলেও ঘরখানি বেশ গরম; আগুনের চুল্লী থেকে গরম আগুনের লাল আভাতে ঘরখানিতে সন্ধ্যার আলোর মত খানিক ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়েছে—ঘরের মধ্যে যা কিছু আছে, সবই বেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দেওয়ালে জেলের জাল ঝুলছে,—একটি কোণে সামান্য একটি শেল্‌ফের ওপর কতকগুলি হাঁড়ি আর তৈজস পত্র সাজান রয়েছে; তার পাশে প্রকাণ্ড এক বিছানা দুখানি বেঞ্চ জোড়া করে পাতা হয়েছে;—মশারী ফেলা হয়ে গেছে; সেই বিছানার মধ্যে পাঁচটি ছোট ছেলে অকাতরে ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে—যেন পাখীর বাসায় ছোট বাচ্ছারা ঘুমে আচ্ছন্ন। বিছানার পাশে, ছেলেদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, ছেলেদের মা বসেছিল। সে ছিল একাই তখনও জেগে, ঘরের বাইরে গভীর কালো সমুদ্রটা তুফান তুলে, গর্জ্জন করে, নিজের মাথায় বরফের মত সাদা ফেণার মুকুট পরে উল্লাসে মাতামাতি করছিল। স্বামী তার এই দুর্য্যোগে সমুদ্রের ওপরই নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল।

খুব ছোটবেলা থেকেই, সে এই জেলের কাজ করত। জীবনটা তার ভীষণ সমুদ্রের সঙ্গে নিত্য সংগ্রামের মধ্যেই বেড়ে উঠেছিল। প্রতিদিনই তার ছোট ছেলেদের খাওয়াতে হত, কাজেই তাদের খাবার সংগ্রহ করবার জন্য, ঝড় বৃষ্টি শীত সব উপেক্ষা করে, তাকে সমুদ্রে মাছ ধরা নৌকা খানি নিয়ে যেতে হত। চারখানি পাল লাগান তার নৌকা নিয়ে সে যখন একলা তার দুর্ব্বহ কাজে বেরিয়ে পড়ত, তখন তার স্ত্রী ঘরে বসে, পুরাণ পাল মেরামত করে, জালের ছেঁড়া অংশটুকু বুনে রাখত আর মাঝে মাঝে যে মাছের ঝোল আগুনের ওপর বসিয়ে রেখেছিল, সেই দিকে দৃষ্টি রাখত। ছেলে পাঁচটি ঘুমিয়ে পড়লে পর, সে নতজানু হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল, যাতে তার স্বামী সমুদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে, বিজয়ী হয়ে ফিরে আসতে পারে।

বাস্তবিকই তার স্বামীর দৈনিক কাজ ছিল বড়ই কঠিন। মাছ ধরার তার আড্ডা ছিল, সমুদ্রের মধ্যে একটুখানি ছোট স্থান; সামান্য একটি বিন্দুর মত দূর থেকে দেখাত। সে জায়গাটি তার কুটিরটির দ্বিগুণ লম্বা ছিল, তাও সে স্থানটি ছিল একটি চলতি চরের ওপর, কখন যে কোথায় ভেসে ভেসে বেড়াত, তার কিছু ঠিকঠিকানা ছিল না। মাত্র তার নিপুণ দৃষ্টি আর হাওয়ার গতি লক্ষ্য করার অপূর্ব্ব কৌশলের ফলে, কুয়াসাভরা শীতের রাতে, সেই জেলে তার মাছ ধরার আড্ডায় পৌছতে সক্ষম হত। সেই সমুদ্রের মাঝখানে, যেখানে গলান সোণার ঢেউ খেলিয়ে মণি-মাণিক্যের ধারা সাপের গতিতে ছুটে চলত, কিম্বা কখনও অন্ধকারে ভয়ে শিউরে উঠে সমুদ্রটা গর্জ্জন করে উঠত সেইখানে, সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে ভাবত, তার প্রিয়তমা জেনী'র কথা; আর জেনী তার কুটিরে বসে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তারই কথা কেবল আপন মনে ভাবত।

জেনী তার স্বামীর কথা ভাবছিল আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিল। সমুদ্রের পাখীগুলার বিকট চীৎকারে তার প্রাণ ব্যথিত হয়ে পড়ছিল আর কূলেতে সমুদ্রের গর্জ্জনের হুঙ্কার তার প্রাণকে শঙ্কিত করে তুলছিল। সে এক মনে ভাবছিল তাদের দারিদ্র্যের কথা। ভাবতে ভাবতে সে তন্ময় হয়ে পড়েছিল। ছোট ছোট তার ছেলে মেয়েরা কি গ্রীষ্ম কি শীত কখনও জুতা পায়ে দিতে পারে না! সাদা ভাল রুটি কখনও তারা খেতে পায় নি। হা ভগবান—বাতাস গর্জ্জন করে উঠল। [illegible] আরও ভীষণ হয়ে তার প্রতিধ্বনি বেজে উঠল। [illegible]

লাগল, আর ভয়ে কেঁপে উঠল। স্বামী যাদের সমুদ্রে, কি কষ্টই না হয়, সে বেচারীদের! মুখে উচ্চারণ করতেও ভয় হয়—"আমার পিতা, প্রিয় পরিজন, ভাই, ছেলে—সকলে ঝড়ের মধ্যে পড়েছে।" জেনীর অসুখী হওয়ার আরও অনেক কারণ ছিল। তার স্বামী নিছক একা সমুদ্রে পড়ে আছে—এই ভয়ঙ্কর রাত্রে তাকে সাহায্য করতেও একটি প্রাণী নেই! ছেলেরা তার এত ছোট্ট যে এখনও তার স্বামীকে সাহায্য করবার মত লায়েক হয়ে ওঠে নি। বেচারী মার প্রাণ! এখন সে বলছে—"ছেলেরা যদি বড় হয়ে তাদের বাপকে সাহায্য করতে পারত।" আরও বছর কতক পরে যখন তারা বড় হয়ে, তাদের বাপের সঙ্গে ঝড়ের রাতে সমুদ্রে যাবে, সে তখন চোখের জল মুছে বলবে "আমার ছেলেরা যদি আজ ছোট্ট থাকত!"

২

জেনী তার বাইরে যাবার মোটা কাপড় আর আলোটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সে আপনার মনে বলতে লাগল "এবার আমার স্বামী ঘরে ফিরে আসছেন, কি সমুদ্রটা একটু শান্ত ভাব ধারণ করেছে কিম্বা সন্ধানী আলোটা এখনও জ্বলছে কি না, তাই দেখবার সময় হয়েছে।" সে একাকীই চলতে লাগল। কোথাও কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, আকাশের কোলে একটুও আলোর আভা ফুটে ওঠে নি। বৃষ্টি, ঠাণ্ডা কনকনে ভোরের বৃষ্টি কালো আকাশের কোলে ঝরছিল। আশে পাশে কোনও কুটির থেকে একটিও আলোর সরু রশ্মি দেখা যাচ্ছিল না।

চারিদিকে চাহিতেই, হঠাৎ তার দৃষ্টিপথে পড়ল, একটি ভাঙ্গা কুঠুরী; তাতে আলো বা আগুন-জ্বলার কোনও চিহ্নই বর্ত্তমান ছিল না। দরজাটা বাতাসে দোল খাচ্ছিল; ঘুণধরা কাঠের দেয়ালগুলো যেন বহু কষ্টেই ঘরের ছাদটাকে কোনও রকমে উঁচু করে রেখেছে;—সেই ভাঙ্গা ছাদের ওপর হু হু করে বাতাস বয়ে গিয়ে, ঘরখানাকে যেন কাঁপিয়ে তুলছিল।

সে বলে উঠল "দাঁড়াও! তার মনে পড়েছে; আমি ভুলেই গিয়েছিলুম, যে, এই ঘরেতেই স্বামী সেদিন একজন নিরাশ্রয়া বিধবাকে রোগশয্যায় দেখে গিয়েছিলেন। কেমন আছে সে বেচারী, একবার দেখেই যাওয়া যাক্‌···"

জেনী দরজায় ধাক্কা দিয়ে কাণ খাড়া করে শুনতে লাগল। কেউ কোনও উত্তর দিলে না। ঠাণ্ডা কনকনে সমুদ্রের জোলো হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে সে আপন মনে বলতে লাগল "অসুখ করেছে তার; তার আবার দুটি ছেলে মেয়ে আছে যে · আহা নেহাৎ হতভাগা তারা। বড় গরীব যে তাদের স্বামীহারা দুঃখিনী মা···"

জেনী আবার দরজায় আঘাত করে বল্লে "ওগো শুনছো" কিন্তু কুটিরখানি পূর্ব্বের মত নীরব হয়ে রইল। "বাবা রে বাবা, কি ঘুমই সে ঘুমচ্ছে যে এতেতেও তার ঘুম ভাঙ্গল না—"

এমন সময় দরজাটা আপনিই হঠাৎ খুলে গেল। সে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। তার হাতের আলোতে অন্ধকার নীরব ঘরখানা আলোকিত হয়ে উঠল। সে দেখতে পেলে ছাদ থেকে ছাঁচের জলের মত জল পড়ছে। ঘরের শেষপ্রান্তে একটা যেন বিশ্রী আকারের কি পড়েছিল। চেহারাটি হচ্ছে একটি রমণীর; নিস্পন্দ তার দেহ নিষ্প্রভ চোখদুটি দৃষ্টিহীন পা-দুখানাও নগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে। খড়ের বিছানার ওপর তার পাণ্ডুর ঠাণ্ডা হাতদুখানা পড়েছিল। শরীর থেকে তার প্রাণবায়ু বাহির হয়ে গিয়েছিল। এক সময়ে সেই ছিল একজন সুখী সুস্থ, সবল ছেলে মেয়ের মা, আর সেই এখন সংসার সংগ্রামে বিধ্বস্ত হয়ে সামান্য একটা মানুষের শরীরের ছায়া-মাত্রে পরিণত হয়েছে।

সেই বিছানার পাশে একটি ছোট বিছানায় শুয়েছিল দুটি ছোট ছেলে মেয়ে। তাদের ঘুমন্ত মুখে, স্বপ্ন দেখা হাসি ফুটে উঠছিল। তাদের মা যখন দেখলে যে তার জীবনের শেষ হয়ে এসেছে—নিজের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, তখন ছেলে মেয়েদের শরীর গরম রাখবার আশায় সে তার নিজের গায়ের কাপড় খুলে তাদের পায়ে চাপা দিয়ে দিলে, আর নিজের পোষাক দিয়ে, তাদের শরীর বেশ ভাল করে ঢেকে দিলে।

ছোট ছেলে মেয়ে দুটি কি নির্ভয় সুখেই তাদের ভাঙ্গা ছোট্ট শয্যায় শুয়েছিল। মুখে কি প্রশান্তি! কিছুতেই যেন আর এ নিরাশ্রয় অভাগাদের সুখ [illegible]

...রে মা! ঘরের বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। সমুদ্রের গর্জ্জন যেন লোকজনকে সাবধান হবার সঙ্কেত করছিল। ভাঙ্গা ছাদের ফাটল থেকে এক ফোঁটা জল প্রাণহীন দেহটার ওপর ঝরে পড়ল; যেন একফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল বলে মনে হল।

৭

জেনী সেই মৃতা বিধবার ঘরে কি করছিল এতক্ষণ? তার কাপড়ের তলায় কি লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে? কেন তার বুকে দুরু দুরু কাঁপন সুরু হল? একবারও পিছন দিকে না চেয়ে এত ত্বরিত পদে কেন সে নিজের ঘরের দিকে চলল? মশারীর পাশে বিছানার ওপর কি লুকিয়ে রাখলে? কি চুরি সে করলে?...

যখন সে নিজের কুটিরে এসে হাজির হল, তখন পাহাড়ের উঁচু চুড়াটা শাদা হয়ে উঠেছে। বিছানার পাশের চেয়ারখানার ওপর সে অবসন্ন ভাবে বসে পড়ল। তার দেহের লাবণ্য যেন ঝরে গিয়েছে—তার বুকে যেন অনুতাপ জলে উঠল। বালিশের ওপর ঝুঁকে পড়ে, তার কপালখানি ছুঁইয়ে, সে মাঝে মাঝে আপন মনেই ভাঙ্গা অস্ফুট কথায় বিড় বিড় করতে লাগল। বাইরে দুর্দ্দান্ত সমুদ্র তখনও অবিশ্রাম গর্জ্জন কর্চ্ছিল।

সে বলতে লাগল "স্বামী আমার বড়ই দরিদ্র; হা ভগবান, কি না জানি তিনি বলবেন? কষ্টের ত তার সীমা নেই; তার ওপর এ আবার কি করলুম আমি? একে ত পাঁচটি ছেলে আমাদের আছেই; বাপ তাদের ত অনবরতই খেটে মরছে—কষ্টের অবধি নেই;—না, ও কিছু না...আমি খুব অন্যায় করেছি—তিনি এসে যদি আমাকে প্রহার করেন তবেই এর উপযুক্ত শাস্তি হয়। আবার ওকি? তিনি এলেন নাকি? না—ভালই, বাঁচা গেল। দোরটা নড়ছে এমন, যেন কেউ আসছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু না...তাঁকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখলে আমার নিশ্চয় ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠবে!

তারপর সে চিন্তায় তন্ময় হয়ে রইল। এক রকম সংজ্ঞা হারার মত হয়ে, ঝড়ের শব্দ, সমুদ্রের গর্জ্জন উপেক্ষা করে, মাঝে মাঝে কেবল শীতে কাঁপতে লাগল।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। এক ঝলক প্রভাতী আলো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। জেলে তার জলভরা জাল-খানি টান্তে টান্তে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে আনন্দের সুরে বল্লে "আমি এসেছি..."

"তুমি এসেছ" বলে জেনী উঠে পড়ল। প্রণয়ীর মত তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরে, তার পোষাকের ওপর সে মুখ গুঁজে রইল।

"এই যে আমি, জেনী" বলে, আগুনের আলোতে সে তার মুখখানি তার প্রিয়তমাকে দেখাতে লাগল; জেনীর চোখে এই সরল শান্ত মুখখানি ভারী সুন্দর লাগত। সে বলতে লাগল আজ কিন্তু অদৃষ্ট বিরূপ আমার জেনী!"

"আজ জল হাওয়া কেমন ছিল?"

"ভীষণ দুর্য্যোগ"

হোক্‌গে, তাতে আমি মোটেই দুঃখিত নই। তোমাকে আমার বুকে পেয়েছি, এতেই আমি সন্তুষ্ট। আজ মোটেই কিছু ধরতে পারিনি উল্টে কেবল জাল ছিঁড়েই এসেছি। আজকের রাতে হাওয়াটা ছিল অতি বিশ্রী। ঝড়েতে একবার মনে হ'ল নৌকাখানা যেন ভেঙ্গে দু আধখানা হয়ে গেছে ..যাই হোক্ তুমি এতক্ষণ কি করছিলে? এই কথায় সেই অন্ধকারেও জেনী যেন শিউরে উঠল। অস্বস্তির ভাবে সে উত্তর দিলে "আমার কথা জিজ্ঞাসা করছ? কিছুই না, যা করি তাই; আমি সেলাই করছিলুম সমুদ্রের গর্জ্জন শুনে আমার বড় ভয় হচ্ছিল।"

"হাঁ এই শীতের সময়টা ভারী বিশ্রী; যাক্ এখন আর সে দুর্ভাবনায় কাজ নেই"

তারপর জেনী যেন কি পাপ কাজ করছে, এমনই ভাবে কাঁপা গলায় বললে "দেখ, আমাদের একজন প্রতিবেশী মারা গেছে; তুমি কাল রাত্রে দেখে যাবার পরই বোধ হয় সে মারা গেছে। তার দুটি ছোট ছেলে মেয়ে আছে। উইলিয়ম বলে ছেলেটি সবে মাত্র হাঁটতে পারে আর ম্যাদা-লিন নামে ছোট্ট মেয়েটির সবেমাত্র কথা ফুটছে। তাদের মা বেচারী যথেষ্ট অভাবের ব্যথা পেয়ে মরেছে!"

তার স্বামী গম্ভীর হয়ে পড়ল। জলেঝড়ে ভেজা তার পশমী টুপীটা এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে বললে "আমাদের ত ইতিমধ্যেই পাঁচটি ছেলে মেয়ে; তাহলে এখন হবে সাতটি। হাওয়ার গতিক ভাল না থাকলে এখনই ত [illegible]

পাই না। কি করব আমরা এখন? বাঃ এতে আমার আর কি দোষ? ভগবানই এই করাচ্ছেন। এ সব আমি বুঝে উঠতে পারি না। তিনি কেন তাহাদের মাকে কেড়ে নিলেন? এ সব ব্যাপার সহজে বুঝে ওঠা যায় না; এসব বুঝতে গেলে রীতিমত পণ্ডিত জ্ঞানী হতে হয়! ছোট্ট কচি ছেলে, আহা! জেনী তুমি যাও, নিয়ে এস। যদি তারা এতক্ষণে জেগে ওঠে, তাহলে মার মৃতদেহ দেখে ভয় পাবে। আমরা তাদের আমাদের কাছে নিয়ে আসব। তারা আমাদের পাঁচটির ভাইবোন হয়ে থাকবে। ভগবান যখন দেখবেন আমাদের ছাড়া এদের ও খেতে দিতে হবে, তখন তিনি আমাদের মাছের ভাগও বেশী করিয়ে দেবেন। আমার কথা যদি বল, আমি জল খেয়ে থাকব। আমি যা খাটি, তার দ্বিগুণ পরিশ্রম করব। ব্যস্ তাহলেই যথেষ্ট! যাও, গিয়ে নিয়ে এস তা হ'লে। কি ব্যাপার কি? তুমি কি এতে বিরক্ত হচ্ছ না কি? তুমি ত অন্যদিন এর চেয়ে চটপট্ কাজ করো ."

জেনী আর কিছু না বলে ধীরে ধীরে মশারীটা তুলে তার স্বামীকে উদ্দেশ করে বললে "ঐ দেখ।"

ভোরের আলো তখন ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

(ভিকটর হ্যুগোর 'জেনী' নামক গল্পের অনুবাদ)

ফুলের অভিযোগ

শ্রীমতী স্বর্ণলতিকা দেবী

আকাশ কেন এমন ধারা করে
চাহিছে ওগো আমার দিকে হায়
লক্ষ শুধু লক্ষ আঁখির তার
আমার তরুণ অরুণ কায়
আর তো কিছু চায় না অন্য সে
দেখ্‌তে শুধু সুদূর প্রবাসে
কিন্তু আমি বড়ই লাজে মরি
যখন আকাশ আমার দিকে চায়।
করুণ তাহার দৃষ্টিখানি আহা
কতই ব্যথা না জানি সে পায়
কতই তাহার নীরব ভাষা কাঁদে
নীরব গানে নীরব বেদনায়
নীরবে তায় চায় সে আমার পানে
ভুই করে জ্যোৎস্না ধারার গানে
তখন আমি শিউরে উঠি লাজে
যখন আকাশ আমার পানে চায়।
মেঘ দিয়ে তার তনুখানি ঢেকে
বিষাদ ভরে যখন অভিমানে
রুদ্ধশ্বাসে ফুলে ফুলে উঠে
কান্না আসে বিষাদ-ভরা গানে
ভিজিয়ে দিয়ে মাটী স্তরে স্তরে
লুকোতে চায় আমার হিয়ার পরে
পুলক তখন ভিতর থেকে এসে
বাজায় বীণা আবেগভরা তানে।

তখন আমার হাসি ফুটে উঠে
লজ্জা দিয়ে লাজের আবরণে
অমনি সে'ত কান্না ছেড়ে দিয়ে
হাসিমুখে চায় শুধু মোর পানে
পাখীর ডাকে ভরিয়ে তুলে' বন
করুণ সুরে ডাকে আপন জন
আর সে শুধু চেয়ে আমার পানে
মুগ্ধ করে সব-ভুলানোর গানে।
তারপরে হায়! কি জানি কি করে
প্রাণের ভিতর ফুঁ দিয়ে সে যায়
বস্ত্র আমার আঁচলখানি টেনে
পাগ্‌লা হাওয়ায় উড়তে সে চায়,
বনের মাঝে একলা পেয়ে মোরে
চুমু দে যায় দখিন হাওয়ায় কোরে
রাঙিয়ে দে'যায় সদ্য-ফোটা মুখ
চোখ খুলে আর চাইতে নারি' হায়।
আবার ফিরে উপর দিকে চাই
হাসছে সে'ত তেমনি করেই হায়
তেমনি করে শত-আঁখি দিয়ে
দেখ্‌তে আমার তরুণ অরুণ কায়;
হায় গো আমি লজ্জাতে যে মরি
সাথী নেই যে লুকাই তারে ধরি
দুরু দুরু কাঁপছে হিয়া মোর
আবার কোন নূতন আশঙ্কায়।

শিক্ষয়িত্রীর পত্র

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

স্নেহশীলা নীলি,
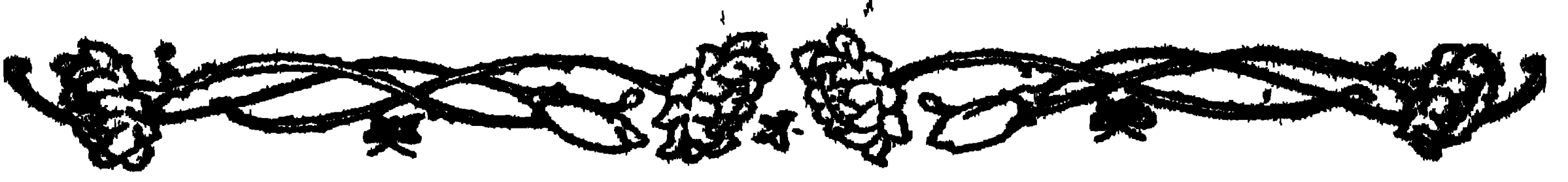
শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, তুমি নাকি বিবাহ করিতে যাইতেছ! শেষকালে তুমিও দেখিতেছি সাধারণের দলে মিশিলে! তোমার উচ্চ শিক্ষার কি এই পরিণাম?

তোমাকে কতদিন বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, পুরুষজাতি আমাদিগকে আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অজ্ঞানান্ধকারে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। এখন ইংরেজের কৃপায় আমরা কিছু কিছু জ্ঞানের আলোক পাইয়া চৈতন্যলাভ করিতেছি। এখন আমরা চারিদিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাই আমরা দেখিতেছি, অন্য সুসভ্য দেশের স্ত্রী-জাতির তুলনায় আমাদের অবস্থা কত হীন! স্বার্থপর পুরুষ-জাতিই আমাদিগকে এই হীনাবস্থায় রাখিয়াছে। তুমি তোমার বিবেক বুদ্ধি একেবারে বিসর্জ্জন না দিলে, আবার সেই পুরুষের নিকট দাসখত লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইবে কেন? যে পাখী একবার মুক্ত আকাশে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার স্বাদ পাইয়াছে, সে কি স্বেচ্ছায় পিঞ্জরাবদ্ধ হইতে চায়?

যদি বল, ইংরেজ সমাজেও কত শত নারী বিবাহ পাশে আবদ্ধ হইয়া পুরুষের অধীন হইয়া বাস করিতেছে। কিন্তু তাহারা প্রায় সেকেলে লোক,—তাহারা নারীজাতির নব জাগরণের কথা কখনও শোনে নাই। আর তাহার মধ্যে কয়জন তোমার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট আছে? যে সকল নারী নবীন আলোক পাইয়াছে, তাহারা কোন্ দুঃখে ঘরকন্নার খুঁটিনাটিতে তাহাদের মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করিবে? ঐ দেখ, আমেরিকায় যে সকল নারী কলেজে পাশ করিয়া বাহির হয় তাহাদের দুই তৃতীয়াংশ বিবাহ করে না, তাহারা গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ না করিয়া ক্লাবে থাকিয়া স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করে। আবার ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজের মহিলা-কলেজে শি[illegible] নারীগণের মধ্যে শতকরা ২২জন বিবাহ [illegible] কিনা [illegible]। আমরাও যদি এই সকল বিদুষী ভগিনীদের সদ্‌-দৃষ্টান্তের অনুগামী না হইতে পারি, তবে আমাদের কলেজে শিক্ষার ফল কি?

যাহা হউক, তুমি যখন বিবাহ করা স্থির করিয়াছ, তখন তোমাকে আর এ সব কথা লিখিয়া ফল কি। তবে তোমার বিবাহিত জীবন কি ভাবে যাপন করিবে সে বিষয়ে দুই একটি উপদেশ দিতেছি। তুমি আমাকে যেরূপ শ্রদ্ধা কর, তাহাতে আশাকরি তুমি আমার উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। আমি নারীজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী, সেইজন্যই তোমাকে এই সকল কথা লিখিতেছি।

(১) তুমি যাঁহাকে বিবাহ করিতেছ তিনি যদি নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্রগুণে একটি hero (আদর্শ পুরুষ) না হন, তবে তুমি তাঁহার সঙ্গে একত্র বাস করিয়া ঘরকন্না করিতে পার কিন্তু তাঁহার সঙ্গে প্রেমে পড়িও না। তুমি একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে সকল পুরুষ, নারীর প্রেম—বিশেষতঃ তোমার ন্যায় বিদুষী নারীর প্রেম—পাওয়ার উপযুক্ত নহে। প্রেম স্বর্গীয় পবিত্র বস্তু; ভবিষ্যতে সেইরূপ যদি কোন একটি আদর্শ পুরুষ বা পুরুষোত্তমের দেখা পাও, উহা তাঁহার জন্য সঞ্চিত রাখিবে।

(২) সাধারণতঃ পুরুষগণ তাহাদের বিবাহিতা স্ত্রীকে সীতা সাবিত্রীর ন্যায় পতিব্রতা হইতে আশা করে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন রামচন্দ্র বা সত্যবান্ হইতে পারে? তুমি যাঁহাকে বিবাহ করিতেছ তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিবে—"আগে তুমি রামচন্দ্র হও, পরে আমি সীতা হইব। তুমি রামচন্দ্র হইতে না পারিলে আমিও সীতা হইব না—অন্ততঃ আমার সীতা হওয়ার দাবী তোমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

(৩) সাধারণতঃ যে পুরুষ কোন নারীকে বিবাহ করে, সে তাহার বিবাহিতা নারীকে নিজের অধীন করিয়া রাখিতে চায়। সেইজন্য সেই পুরুষের [illegible] "স্বামী", "পতি!" এই সকল নাম স্ত্রী-জাতির [illegible] করে, সুতরাং এগুলি পরিত্যাগ করিতে [illegible]

তোমাকে বিবাহ করিবে তুমি তাহাকে "বিবাহক" বা সহায়ক" বলিয়া সম্বোধন করিবে, কদাচ "স্বামী" বা "পতি" বলিয়া স্বীকার করিবে না।

(৪) সংসার কার্য্যে তুমি সর্ব্বদা নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া চলিবে, একচুলও নিজের স্বত্ব ত্যাগ করিবে না। সংসার কার্য্যে অবশ্য স্ত্রী পুরুষের মধ্যে co-operation (পরস্পর সাহায্য) আবশ্যক, কিন্তু প্রয়োজন হইলে violent co-operation (স-হিংস-সহযোগ) অবলম্বন করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে non violent co-operation যেমন রাজনীতি ক্ষেত্রে অচল, গার্হস্থ্য জীবনেও তাহা তেমনি অচল।

(৫) যুগযুগান্তর ধরিয়া পুরুষ জাতি নারী জাতির উপর যথেচ্ছাচার ও অন্যায় উৎপীড়ন করিয়া আসিয়াছে। এখন নারীজাতির উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিশোধ লওয়ার সময় আসিয়াছে। এতদিন পুরুষ ব্যভিচার করিয়া পার পাইয়াছে, যত দোষ কেবল নারীর বেলায়। পুরুষ এক স্ত্রী মরিলে অবলীলাক্রমে আবার বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু নারী বিধবা হইলে তাহাকে আবার বিবাহ করিতে দেয় নাই। এখন নারীর পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের জন্য এই সকল অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ লওয়া একান্ত আবশ্যক। তোমার "বিবাহক" যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তুমি নিশ্চয়ই নীরবে তাহা সহ্য করিবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তুমি বিধবা হও, তবে আমরণ অন্য বিবাহ করিতে প্রস্তুত থাকিবে। এইরূপ সমান ব্যবহার না করিলে নারী-জাতির উদ্ধার নাই ইহা নিশ্চয় জানিবে।

আজ আর অধিক লিখিব না। আশাকরি তুমি কুশলে আছ, ইতি—

তোমার স্নেহের

শ্রীনবপ্রভা দেবী

স্মৃতি-রক্ষা

সি, কে, ঘোষ

(আরম্ভ)

সে বহুদিনের কথা। আমি তখন বেলগেছিয়া মেডিকেল কলেজে পড়িতেছি। তখন সবে মাত্র 'ফোর্থ ইয়ারে' উঠিয়াছি। মাত্র মাস দুই হইয়াছে।

সেদিন 'নাইট ডিউটী' পড়িয়াছিল। 'ইমারজেন্সি অফিসে' বসিয়া কয়েকজন গল্প করিতেছিলাম। আমাদের মধ্যে রামদাসও ছিল। তার কাছেই বাড়ী, তাব যদিও 'নাইট' ছিল না, তবু আড্ডা জমাইতে আসিয়াছিল। গল্পও বেশ জমিয়াছিল। এমন সময় একটা 'কেস্' আসিল। দেখিলাম, ১৫।১৬ বছরের একটী মেয়ে, মেয়েটীর সর্ব্বাঙ্গ প্রায় পুড়িয়া গিয়াছে। যাহারা লইয়া আসিয়াছিল তাহারা বলিল, ছেলের দুধ গরম করিবার জন্য ষ্টোভ জ্বালিতে গিয়া কাপড়ে আগুন ধরিয়া গিয়াছে। পরে জানিয়াছিলাম, তাহার স্বামী তাহাকে ডাকিয়া সাড়া পান নাই বলিয়া, বিড়ী ধরাইয়া দেশালাইটী লইয়া যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীর কাপড়ে ধরাইয়া দিয়াছিলেন, এবং পরে খানিকটা কেরোসিন তৈলও ঢালিয়া দিয়াছিলেন। মেয়েটী তখন ঘরের মেঝেতে শুইয়া ঘুমাইতেছিল। তাহাকে বাঁচান গেল না। আমাদেব চোখে এরকম নূতন নহে আর আমাদের এ বাংলা দেশে এ নূতন নহে।

একটা রোগীর অবস্থা বড়ই খারাপ, তাই ১২টা থেকে ২টা পর্য্যন্ত আমার 'স্পেশাল ডিউটী' পড়িয়াছিল। ঘড়ি দেখিলাম, ১২টা বাজিতে ৫মিঃ আছে। বাহির হইলাম। রামদাস আমার সঙ্গে আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে এখনও আছ যে।" সে বলিল "আরে ভাই, সকাল সকাল ঘুম আসে না।" আমি বলিলাম, "রাত জাগবার সাধ হয়েছে যদি ত এস।"

দুজনাই উপরে রোগীর কাছে আসিলাম। আমার আলাতে যে ছিল সে চলিয়া গেল। রহিলাম আমরা দুজন আর নার্স। নার্সের নামটা না হয় নাই করিলাম। তাঁহাকে আমরা, আমাদের মধ্যে নাম দিয়াছিলাম "তোলা-ফুল।" আপনারা না হয় ধরিয়া রাখুন, তাঁহার নাম "পুষ্প।" পুষ্পকে সুন্দরী বলা যায় না। তবে তাঁহার শরীরের একটা বাঁধন ছিল। আর ছিল তাঁহার ঘাড় বাঁকিয়ে আড় চোখে মুচকী হাসি। তাঁহাকে কখনও কোন একটা কথা বলিলে বা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি প্রথমে একটু আড়চোখে চাহিয়া পরে একটু ঘাড় হেঁট করিয়া কথার উত্তর দিতেন। কথা তিনি খুব অল্পই কহিতেন। যখনই কথা কহিতেন তখনই দেখিতাম, অধরে হাসির রেখা লাগিয়া আছে।

আমি রোগীর কাছে তাহার মাথায় আইসব্যাগ দিয়া বসিয়াছিলাম। সময়ে সময়ে নাড়ী দেখিয়া লিখিয়া রাখিতেছিলাম। ওপাশে খানিকদূরে রামদাস ও নার্স বসিয়া গল্প কবিতেছিলেন। শুনিলাস, রামদাস লেকচাব ঝাড়িতেছে। নার্স বোধ করি বলিয়াছিলেন, তিনি এখানে আব থাকিবেন না, তাই রামদাস তাঁহাকে বোঝাইতেছে যে তাঁহার এখন দেশে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কোনমতেই উচিত নহে। সে বলিতেছিল, "দেখুন, আমাদের দেশের মেয়েরা কত অজ্ঞ, ধাত্রীবিদ্যা যদি প্রত্যেক মেয়েই একটু শিখতো তা'হ'লে কত সুবিধা হতো। আমার ইচ্ছে, আপনি এখানে আরও কিছুদিন থেকে ভাল করে শিখে দেশে গিয়ে প্র্যাক্‌টিস্ করেন।" বুঝিতে পারিলাম না হঠাৎ তাহার স্বদেশ-প্রীতি এতটা জাগিয়া উঠিল কেন।

নার্সের কাছে কোন উত্তর না পাইয়া সে বলিল, "কি বলেন, তা'হ'লে আর বছর তিন থাকুন; আমিও ততদিনে পাশ করবো তখন দুজনাই একসঙ্গে প্রাক্‌টিস করবো।" বুঝিলাম হতভাগা ডুবিয়াছে। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, কিছু বলিলাম না। নার্স আস্তে আস্তে কি বলিলেন, শুনিতে পাইলাম না। রামদাস বলিতে লাগিল, "তবে আপনার একটা স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে যাবেন। বেশী কিছুই নয়; আমার একটা 'ক্যামেরা' আছে, আপনার একখানি ফটো তুলে নোব। সেইখানি আমার কাছে থাকবে; বলুন ফটো নিতে দেবেন ত?"

নার্স সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "আচ্ছা।" রামদাস আবার কি বলিতে যাইতেছিল; আমি দেখিলাম, বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, বলিলাম, "নার্স,

রকটা পাল্টে দিয়ে যান ত ?” নার্স উঠিয়া আমার কাছে আসিলেন।

রামদাসও আমার কাছে আসিয়া আমাকে শোনাইয়া বলিল, “নার্স বলছেন, উনি আর এখানে থাক্‌বেন না, বাড়ী যাবেন।” পরে নার্সের দিকে ফিরিয়া বলিল, “আচ্ছা নার্স, আপনাদের বাড়ীতে গেলে আমাদের কি খাওয়াবেন ?”

নার্স একটু হাসিয়া বলিলেন, “আমার বাড়ীতে আপনারা গেলে ? যা খেতে চাইবেন। সেখানে ত আর আপনাদের কলেজের সরকারের মুখের দিকে চাইতে হবে না।”

এমনি আরও দু'একটা কথা হইয়াছিল।

শেষ

শুনিলাম, রামদাসের টাইফয়েড হইয়াছে, অবস্থা বেশ সুবিধা নয়। দেখা করিতে গেলাম।

দেখিলাম, তেমন সুন্দর শরীর আর নাই। সে সোণার বরণ কালি হইয়া গিয়াছে।

আমায় দেখিয়া সে বলিল, “তুই এসেছিস্, বেশ হয়েছে তুই না এলে তোকে ডাক্‌তে পাঠাতাম।”

আমি বলিলাম, “কি ভাই, বল।”

সে বলিল, “বস্ না খানিক, তারপর বলবো'খন। কাছে তাহার দিদি বসিয়াছিলেন, তিনি বোধকরি ভাবিলেন তাহার সাক্ষাতে সে কোন কথা বলিতে পারিতেছে না তাই তিনি উঠিয়া গেলেন।

সে তখন বলিল, “ভাই বোধ হয় আমি বাঁচবো না।”

আমি তার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, “কি যে বকিস্ ছেলেমানুষের মত।”

সে বলিল, “আগে শোন ভাই, বন্ধুর কাজ কর। তুই সব জানিস্ তাই তোকে বলে যাচ্ছি।” বলিয়া সে তার বিছানার তলা হইতে দুটো জিনিষ বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। একটা দেখিলাম তাহার ফটো, অপরটা এক গাছা মুক্তার মালা। দুইটাতেই তাহার হাতের লেখা কয়েকটা অক্ষর ও দেখিলাম।

সে বলিল, যেদিন এই দুটো পুষ্পকে দোব বলে আনি সেইদিনই অসুখে পড়ি। এখন এ দুটো তোর কাছেই থাক্। যদি আমি ভাল হয়ে উঠি, তাহ'লে আমি নিজেই তাকে দোব। আর যদি—“তাহার চোখের কোণ বহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝড়িয়া পড়িল। একটা ঢোক গিলিয়া আবার বলিল, “যদি মরি, তাহলে তুই তাকে এই দুটো দিয়ে আমার কথা বলিস্।”

তাহাকে সান্ত্বনা দিবার বেশী কথা খুঁজিয়া পাইলাম না।

* * * * *

ভাবি নাই এত শীঘ্র রামদাস আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। তাহার কথামত তাহার শেষ অনুরোধ আমাকেই রাখিতে হইল।

‘ওয়ার্ডে’ যখন ঢুকিলাম, তখন দেখিলাম নার্স সামনে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একখানা বড় খামের উপর কি লিখিতেছেন। তখন সেখানে আর কেউ ছিল না। ডাকিলাম, “নার্স।”

তিনি ত্রস্তে উঠিয়া পড়িলেন, ঘাড়টী বাঁকাইয়া একটু হাসিলেন, পরে বলিলেন, “আজকের দিনটা নার্স বলে ডাকতে পাবেন। কাল আর আমাকে দেখতে পাবেন না। আমার ভাই এসেছেন, আমাকে নিয়ে যেতে” একটু থামিয়া বলিলেন, “আমার একটু কাজ আপনাকে করতে হ'বে। এই খামখানি অনুগ্রহ করে রামদাস বাবুকে দিবেন।” বলিয়া আমাকে খামখানা দিতে আসিলেন।

আমি বলিলাম, “নার্স, সে আমাদের ছেড়ে এমন এক জায়গায় গেছে, যেখানে আপনার খামখানি পৌছে দিতে কেউ পারবে না।” তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। আমি রামদাসের উপহার তাঁহার সামনে রাখিয়া বলিলাম “এই তার স্মৃতিচিহ্ন আপনাকে দিয়ে গেছে।” তিনি হারটী গলায় পরিতে লাগিলেন, আমি বাহির হইয়া গেলাম।

যখন আবার সেইখানে আসিলাম, তখন দেখিলাম, তিনি মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছেন,—সামনে মুক্তার মত টপ্ টপ্ করিয়া যেগুলি পড়িতেছিল, দেখিলাম সেগুলি মুক্তা নহে—অশ্রুবিন্দু।

মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া

পত্রিকার সার সঙ্কলন

পণ্ডিতজী :—স্বরাজ্যদলের ও আমার মধ্যে যে মিলন হইয়াছে তাহাতে পরিবর্ত্তন বিরোধীদের বিশেষ অসন্তুষ্ট হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নয়। আমি বহুবার স্বীকার করিয়াছি যে আমি অহিংস বিজ্ঞানের একজন সামান্য উপাসক মাত্র। সহকর্ম্মীরা ইহার লুকানো গভীরতা দেখিয়া যেমন হতবুদ্ধি হন আমিও তাই হই। আমি দেখিতেছি যে দুইদলে মিলন হইল তাহারা ছাড়া অপর কেহ ইহাতে বর্ত্তমানে সুখী নয়। অনেক ইংরেজ ইহাকে স্বরাজ্যদলের কাছে আমার হীন বশ্যতা স্বীকার ধরিয়া লইয়াছেন। অনেক পরিবর্ত্তন বিরোধী ইহাকে ঠিক বঞ্চিত মনে না করিলেও একটা চ্যুতি মনে করিয়াছেন। এক বন্ধু বলিলেন ছাত্রদের মধ্যেও ইহা বেশ সাড়া ফেলিয়াছে। তাহারা বলে অসহযোগই যদি স্থগিত হইল তবে আর তাহারা জাতীয় বিদ্যালয়ে থাকিবে কেন? কষ্ট সহিল তাহারাই সব চেয়ে বেশী অথচ মিলন চুক্তিতে তাহাদের কথা মোটেই বিবেচিত হইল না।

আমার পক্ষে যে ইহা বশ্যতা স্বীকার তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। জ্ঞানেই এ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছি—ইংরেজ কাগজ যেমন বলিতেছে হিংসার দলে এ বশ্যতা তাহা নহে। স্বরাজ্যদল যে হিংসার দল ইহা আমি স্বীকার করিতে চাহি না। এমনি অভিযোগ মৃত দাদা ভাই নৌরজী ও জজ রাণাডের উপরেও আরোপ করা হইয়াছিল। তাঁহাদেরও সন্দেহ ও নজরবন্দী করা হইয়াছিল। অত্যাচারী সত্রপ সার মাইকেল ও ডায়ারই লালা হরকিশেন লালকে অত্যাচারী বলিয়া আবদ্ধ করিয়া কারাগারে পাঠাইয়া ছিলেন। স্বরাজ্যদলের এই প্রয়োজনের সময় আমি তাহাদের পাশে না দাঁড়াইলে দেশের কাছে আমাকে মিথ্যা বলিতে হইত। সকলে যদি বলে ইহা হিংসার দিকেই যাইতেছে তবে এই মুহূর্ত্তেই আমি ইহাদের ছাড়িয়া দিব। এই প্রমাণ পাইলে আমি ইহাদের সকল সংশ্রব ছাড়িয়া দিব। কৌন্সিলে প্রবেশ এবং ইহাতে যুদ্ধ চালানোর কোন নীতিতে আমার বিশ্বাস না থাকিলে ইহাদের পাশ আমি ছাড়িতে পারি না।

একটা দলকে কংগ্রেসের অংশ করিয়া লওয়াতেই ব্যক্তিগতভাবে কাহাকেও অসহযোগ ছাড়িতে হয় না। স্বরাজ্যদল যে কংগ্রেসের একটা শক্তিশালী পক্ষ ইহাতে তাহাই স্বীকার করা হয়। যুদ্ধ ছাড়া ইহা যদি পেছনে দাঁড়াইতে না চাহে আর যুদ্ধ না করাই যদি আবশ্যক ও অতি সমত প্রয়োজন মনে হয় তবে তাহাকে প্রতিষ্ঠানে স্থান দেওয়া অপরিহার্য্য।

কংগ্রেসের লোক বলিয়াই যে কেহ কংগ্রেসের সকল নিয়মেই বিশ্বাস করিবে তাহা নহে। এই মিলন সর্ত্তের মূল হইয়াছি আমি—এজন্য আমি দুঃখিত নহি। ভালভাবে হোক, মন্দভাবে হোক দেশ আমার নিকটে কিছু চালনা পাইবার আশা করে। স্বরাজ্যদল অসহযোগীদের নিকট হইতে কোন বাধা না পাইয়া তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতি চালাইতে পারিলে দেশের মঙ্গলই হইবে। পছন্দ না করিলে ইহাদের কার্য্যে যোগ দিতে তাহারা বাধ্য নয়—স্বরাজ্যদলও যেমন বাধ্য তাহারাও তেমনি বাধ্য ও স্বাধীন। গঠনমূলক কার্য্যও ব্যক্তিগত অসহযোগ তাহারা স্বাধীনভাবে করিতে পারিবেন। কংগ্রেস পরিত্যাগ করিলে অসহযোগীরা কংগ্রেসের সাহায্য কিছুই পাইবেন না। ভিতর হইতে শক্তির সঞ্চয় করিতে হইবে তাহাদের। তাহাই তাহাদের পরীক্ষা ও বিচার। যদি বিশ্বাস থাকে তবে ইহা তাহাদেরও অসহযোগ ভুলের

পক্ষেই ভাল। বদ্ধ রাখিয়া যদি ইহা লোপ পায় তবে অসহযোগের শক্তিও সাধারণ জীবন হইতে মরিয়া যাইবে। কেহ বলেন আমি নিজেই যদি ইতস্ততঃ করি তবে আর সকলে কি করিবে। আমি ইতস্ততঃ করি নাই। অসহযোগের উপর আমার বিশ্বাস চির উজ্জ্বল আছে। জীবনের ত্রিশ বৎসরেরও বেশী ইহাই আমার লক্ষ্য। কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাসই আমি অপর সকলের উপর বিশেষতঃ একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উপর চালাইতে পারি না। ইহার সৌন্দর্য্য ও আবশ্যকতা আমি জাতিকে দেখাইয়া তাহাদের মতি লওয়াইতে চাহি মাত্র। জাতীয় জীবন কংগ্রেসের ভিতরে যতটা অনুভব করিয়াছি, তাহাতে আমায় থামিতে হইবে। যখন তাহা ঘটিবে তখন আমি আর কংগ্রেসে কোন শক্তি থাকিব না। ইহাতে খারাপ কিছু হইবে না কিন্তু খারাপ হইবে আমি যদি একগুয়েমী করিয়া দেশের উন্নতিতে কোন কারণে বাধা হই—অন্ততঃ যতক্ষণ তাহারা বিশেষ ক্ষতিকর ও অনিষ্টকর না হয় ততক্ষণ তাহাদের পথে দাঁড়াই। যদি সত্যি হিংসাই আরম্ভ হয় তবে একা হইলেও আমি তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইব। তবে আমি দেখিয়াছি যে যদি জাতি ইচ্ছা করে তবে সত্যি হিংসা দ্বারা সে নিজের স্বাধীনতাকে কলঙ্কিত করিতে পারে। তখনি শুধু ভারত আমার জন্মভূমি হইয়াও আর প্রিয়ভূমি থাকিবে না—মা বিপথগামী হইলেও আমি আর তাহার গৌরব করিতে পারি না। কিন্তু স্বরাজ্যদল স্থির উন্নতিই চাহে। আমার মত অহিংসা বিশ্বাস না করিলেও—অহিংসই ইহাদের নীতি। কংগ্রেসে ইহাদের প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট। আমি কংগ্রেস বর্জ্জন করিয়া ইহাদের কংগ্রেস ছাড়িয়া দেওয়াই ছিল সোজা। আমারও ও দলের মধ্যে যখন এক কিছুই থাকিবে না তখন আমি তাহাই করিব। কিন্তু যতক্ষণ কিছুমাত্রও আশা থাকিবে ততক্ষণ মাতৃস্তন্যপায়ী শিশুর মত আমি ইহা আঁকড়াইয়া থাকিব। ইহাকে অস্বীকার করিয়া বা কংগ্রেস ছাড়িয়া আমি ইহা দুর্ব্বল হইতে দিব না।

তাহাদের প্রভাব আমি স্বীকার করিয়া আমার প্রভাবও তাহাদের স্বীকার করাইতে চাই। অসহযোগীরা আমার সঙ্গে মিলিত হও। তাহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র ঠিক রাখ, তাহাদের অসহযোগ যদি প্রেম হইতে উদ্ভূত হয় তবে তাহারা স্বরাজীদের মতানুবর্ত্তী করিতে পারিবেন—না পারিলেও তাহাদের কিছু হারাইতে হইবে না।

অসহযোগ স্থগিত হইতে পারে কিন্তু স্কুল স্থগিত থাকিতে পারে না। ইহা অসহযোগের শ্রেষ্ঠ ফল। কংগ্রেস অসহযোগ স্থগিত রাখিলেও তাহারা যে উন্নতি করিয়া যাইতে পারে তাহা দেখাইতে হইবে। সুসময় হইলে দাঁড়াইব নতুবা এলাইয়া পড়িব ইহা বিশ্বাসের লক্ষণ নহে।

বাই আম্মা ঃ—বাইআম্মা নাই একথা ভাবিতেও মন চাহে না। তাঁহার সে মহিমময়ী মূর্ত্তি ও কণ্ঠস্বর কি ভুলিবার! বৃদ্ধাবস্থায়ও যৌবনের কর্ম্মশক্তি ছিল তাঁহার, খিলাফৎ ও স্বরাজের জন্য ইনি বহু স্থানে ঘুরিয়াছেন। ইসলামে প্রগাঢ় ভক্তিমতী এই মহিলা—ভারতের মুক্তিতেই যে ইসলামের মুক্তি তাহা বুঝিয়াছিলেন। হিন্দুমুসলমান মিলন ও খদ্দর ব্যতীত যে ভারতের মুক্তি নাই তাহা ইনি জানিতেন। সব বিদেশী ও মিলজাত দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া ইনি খদ্দর অঙ্গভূষণ করিয়াছিলেন। মরণের পরেও খদ্দরেই যেন অঙ্গ ঢাকা হয় এই তিনি পুত্রকে বলিয়াছিলেন। যখনি তাঁহার নিকট গিয়াছি তখনি তিনি স্বরাজ আর মিলনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ভগবান যেন হিন্দু-মুসলমানের সুমতি দেন—তিনি যেন স্বরাজ দেখা পর্য্যন্ত বাচিয়া থাকেন এই কামনা জানাইতেন। এই মহিমময়ী মহিলার কামনা পূর্ণ হইবে কি? মাতার মৃত্যুর দিনেও আলি ভ্রাতৃদ্বয় বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে সব্ব কার্য্য করিয়াছিলেন। জন্ম মৃত্যু বিভিন্ন অবস্থা নহে একই অবস্থার বিভিন্ন পর্য্যায়। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন। আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে কর্ম্ম ক্ষমতা দিন।

মৃত রোস্তমজী ঃ—পার্শি রোস্তমজী জীওনজীর মৃত্যু হইয়াছে। আমার পক্ষে এ ক্ষতি বড় বেশী। কথার মূল্য ছিল ইহার দলীলের মত। সিংহের মত সাহসী ছিলেন ইনি—প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতেন, সত্যাগ্রহী হইয়া এক চুলও তাহা হইতে কোনদিন বিচ্যুত হন নাই প্রাপ্ত বয়সে বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি খরচ খতাইয়া ইহার বিচার করেন নাই, নীরবে ক্ষতি সহিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার মত বন্ধু আর আমার ছিল না। রোস্তমজীর মত লোক আমাদের জীবনে বেশী পাইলে আমাদের বাসনা পূর্ণ হয়। তাঁহার আত্মা শান্তি লাভ করুন।

কাজের কথা

নিখিল ভারত নেতৃ মিলনঃ—নিখিল ভারত নেতৃ সম্মেলনে গান্ধী-দাশ-নেহেরু মিলন প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে ইহাতে আমরা পরম সুখী হইয়াছি। দেশের যা অবস্থা আর মতান্তর মনান্তর শোভা পায় না। নেতৃত্বকামীরা নিখিল ভারতের দিক দিগন্তর আশার বাণীতে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলুন—দেশময় দেশ কর্ম্মের প্রবাহ আসিলে সব অমঙ্গল দূর হইয়া যাইবে। আশার বাণী শুনিবার জন্য যে কোটি কোটি অনাহারে মৃত প্রায় নরনারী সতৃষ্ণ হইয়া আছে।

ভারতের অতীত গৌরব—গভর্ণমেণ্টের আর্কিও লজিক্যাল বিভাগের অধ্যক্ষ সার জন মার্শালের তত্ত্বাবধানে—পাঞ্জাবে হরাপ্পা ও সিন্ধুর মহেঞ্জোন দারো নামক স্থানে ভূগর্ভে যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে অনুমান করা যাইতেছে যে ৫ সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে উচ্চ শ্রেণীর সভ্যতা ও শিল্প নৈপুণ্য ছিল। ভারতবাসীরা যে তাহাদের অতীতের প্রতি এত শ্রদ্ধাবান এবং তাহার যে গভীর কারণ রহিয়াছে তাহা ক্রমশঃই প্রকাশ হইতেছে। পাঞ্জাবে রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহানী ও মহেজোন দারোতে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এই সকল গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের কার্য্য সমাপ্ত হইলে ভারতের অতীত ইতিহাস এক অপূর্ব্ব আলোক সম্পাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার সম্বন্ধে পূর্ব্বে একটী প্রবন্ধে কিছু আভাস। দিয়াছিলেন এই আবিষ্কারের ফলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের যুগের অন্ধকারটা কাটিয়া যাইবে বলিয়াই বিশ্বাস।

কাগজের শুল্ক—পুণায় টেরিফ বোর্ড আসিয়া কাগজের শুল্ক বসান সম্বন্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন। দাক্ষিণাত্যের কাগজের কলের তরফ হইতে যে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে এই সম্পূর্ণ স্বদেশী কাগজের মিলটীও বিদেশী প্রতিযোগিতার ধাক্কায় কাগজ প্রস্তুত বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। এ থেকে আমরা কি ঠিক করিতে পারি না যে দেশীয় কাগজ শিল্প রক্ষার জন্য সত্যই রক্ষণ শুল্ক স্থাপনের প্রয়োজন হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেশব্যাপী—অগ্রহায়ণ মাস চলিতেছে। বাংলাদেশের সোণার ফসল আমন ধানের এই সময়। নূতন চালের নবান্নও বাঙ্গালী এই সময়েই করিবে। বাংলার ঘরে ঘরে এখন ধান উঠিবে—লোকের মুখে হাসি ফুটবে। খাইবার জিনিস ঘরে তুলিয়া দেশের লোকে নিশ্চিন্ত হইবে। কিন্তু এই লক্ষ্মী ঘরে তুলিবার বেলায়ও বাঙ্গালীর কি দুরবস্থা! এ সময়েও ধান ৭ সেরের বেশী টাকায় মেলে না চাউলের মণ দশ টাকা। এই সোণার বাংলায় দুভিক্ষ কি চিরস্থায়ী আসন গাড়িয়া বসিল? ধান্যের এই অবস্থা দেখিয়া বাঙ্গালীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। কিছুদিনের মধ্যেই দেশব্যাপী যে অন্ন নাই—অন্ন নাই হাহাকার উঠিবে ইহা কি উপায়ে প্রশমিত হইবে?

এখনো বাংলায় পাটের টাকা চলাচল করিতেছে। তাই আজও অর্থের অভাব ও অন্নাভাব তেমনভাবে প্রকট হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু পাটের টাকাও ফুরাইয়া আসিল। এখন দেশের অবস্থা হইবে কি? না খাইতে পাইয়া দেশের লোকে চুরি ডাকাতি আরম্ভ করিবে—বুভুক্ষিত

অনাহারী জনসঙ্ঘের উপর নানা ব্যাধি মরণের তাণ্ডবলীলা চালাইবে—হাহাকারে দেশ ছাইয়া যাইবে। দুর্ম্মূলতা দেশবাসী সহিয়াছে কিন্তু এবারকার অবস্থা তার চেয়েও ভীষণ হইবে। দেশের শাসক সম্প্রদায়, নেতৃবৃন্দ এদিকে দৃষ্টি দিবার আবশ্যকতা কেহ বোধ করিতেছেন কি?

দুর্ভিক্ষের টীকা ঃ— ভারতের ধান চাল বিদেশে অতিমাত্রায় রপ্তানী হইতেছে ইহাও আমাদের চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষের, দুর্ম্মূল্যতার অন্যতম প্রধান কারণ! ভারতের জন্য যথোপযুক্ত খাদ্য না রাখিয়া বিদেশে চাউল রপ্তানী হইতে পারিবে না - এই বাধা ১৯২২ খৃঃ উঠাইয়া লইবার পর হইতে বাড়িবে রপ্তানী ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং ভারতে ধান চালের দাম বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯১৯-২০ ও ১৯২০-২১ সনে যথাক্রমে ৬, ১৭, ৬০০ ও ১০, ৫ ৯, ৯০০ টন চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল—। আর সেই স্থানে ১৯২২-২৩ ও ১৯২৩-২৪ সনে ২০, ৮৭, ৯০০ ও ২১, ৭৭,০০০ টন চাউল ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। দেশ অগ্নি মূল্যে খাদ্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া মরুক আর বিদেশ সেই চাউল গ্রহণ করুক এ ব্যবস্থা অবিলম্বে রোধ করা কর্ত্তব্য! কাউন্সিল, এসেম্ব্লী ও দেশের সরকার অবিলম্বে এই মারাত্মক সমস্যার সমাধান করুন! অন্নসঙ্কট মানুষের সব চেয়ে বড় সঙ্কট—বড় সমস্যা। এই সমস্যা ভীষণাকার ধারণের পূর্ব্বেই দেশের সরকার, দেশের প্রতিনিধিরা ইহা সমাধানের উপায় করুন। দেশের সংবাদ পত্র সমূহেরও যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে—আমরা আজ সকল পত্রকেই এক যোগে এ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলি। সংবাদপত্রের চেষ্টায়ই দেশের জীবনের উপায় প্রধান খাদ্যদ্রব্যের উপর বিচিত্র প্রাণঘাতী ব্যবসায়ের লীলা বন্ধ হইতে পারে।

চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ সপ্তাহ ঃ— শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহকে স্বরাজ সপ্তাহ করিতে চাহেন—এবং এই সপ্তাহে স্বরাজের নামে পল্লীর কার্য্যের জন্য তিনি কলিকাতা ও হাওড়ার প্রত্যেককে অন্ততঃ এক টাকা করিয়া দিতে বলিয়াছেন। মফঃসলেও পরে এমনি স্বরাজ সপ্তাহ করিয়া চাঁদা তোলা হইবে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন এই ঘোষণায় শুধু মাত্র বলিয়াছেন পল্লীতেই আমাদের মুক্তি নিহিত ইহাই তিনি চিরদিন বিশ্বাস করেন—তাই পল্লীর উন্নতিতে ইহার অধিকাংশ অর্থ ব্যয় হইবে।—কি ভাবে পল্লীর উন্নতি বিধান হইবে সে সম্বন্ধে কোন প্ল্যান দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন করিয়াছেন কি না তাহা জানি না। কোন কর্ম্মের প্রেরণা না আনিয়া পল্লীর শ্রী সম্পদ ফিরাইবার চেষ্টা এমনি চাঁদা তুলিয়া আদৌ হইতে পারে কি না সে বিষয়েও আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দেশবন্ধু আবার সেই ১৯২০-২১ সালের কর্ম্মচাঞ্চল্য দেশময় জাগাইয়া তুলুন—দেশের লোককে জীবনের স্বাদ লইতে দিন—বাঁচিবার আশা জাগান—বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার মোহমুক্ত করিবার চেষ্টা করুন তবেই এই বিরাট পল্লী উদ্ধারের চেষ্টা সফল হইতে পারিবে। পরীক্ষাচ্ছলে ইহা বাছিয়া বাছিয়া পল্লীর উপর চালাইতে গেলে কোন কাজ হইবে না, - জাতীয় ভাবে চালাইলে স্বরাজ আসিবে - কিন্তু তাহাতে জাতির কর্ম্মশক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর ভরা আশা আনিতে হইবে - কোন পথে পল্লী হইতে দেশের মুক্তি আসিবে দেশবন্ধু প্রদর্শিত সেই পথ দেখিবার আশায় আছি।

মিউনিসিপাল গেজেট ঃ—কলিকাতা কর্পোরেশনের নব প্রকাশিত গেজেট দু'সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। গেজেটের বাহ্যশোভা ভাল হইয়াছে। ভিতরে করদাতাদের প্রয়োজনীয় কি থাকিবে তাহা ক্রমশঃ বোঝা যাইবে। গেজেটের সম্পাদক হইয়াছেন শ্রীঅমল হোম।

ভ্রম সংশোধন— গত সংখ্যায় পত্রাঙ্ক ৪৩৯ হইতে ৪৬২ হওয়া উচিত ছিল তা না হইয়া মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ ১ হইতে ২৪ হইয়া গিয়াছে। পাঠক পাঠিকাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রাঙ্ক সংশোধন করিয়া লইবেন বর্ত্তমান সংখ্যায় ৩৬৩ হইতে পত্রাঙ্ক মুদ্রিত হইল। এই সংখ্যায় প্রফুল্লের চিত্রে যে দৃশ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে উহা রাণী মুদীনীর গলি না হইয়া "ওহে একটা পয়সা দাওত" হইবে। এ ত্রুটীর জন্য আমরা সাধারণের ক্ষমা প্রার্থী।

ছাত্রদিগের নৈতিক অবনতির প্রতিবাদ

(প্রাপ্ত)

৭ই অগ্রহায়ণের 'সচিত্র শিশিরে' কলেজের ছাত্রদিগের নৈতিক অবনতির বিষয় অবগত হইয়া আমরা যারপর নাই মর্ম্মাহত হইয়াছি। বেথুন কলেজের শিক্ষয়িত্রীগণ এবং পুরাতন ছাত্রীগণ ইহা জানেন সে এই পরেশনাথ দেবের শোভাযাত্রা উপলক্ষে কথিত স্থানে সর্ব্বজাতির ও সর্ব্ব প্রকারের 'বদমায়েস্' লোক সমবেত হয়। শিক্ষয়িত্রীগণ এই বিষয়ে ছাত্রীদিগকে সাবধান করিয়া দিলে, এই সকল জঘন্য কাণ্ড বোধহয় ঘটিতে পারিত না।

আমরা স্বীকার করি হয়ত কয়েকজন হীন প্রবৃত্তির ছাত্র সেইস্থানে ঐরূপ অভদ্রোচিত কাজ করিয়াছিল, সেইজন্য সমস্ত ছাত্র সম্প্রদায় দোষী হইবে কি? আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না যে যে কোন 'ভদ্র' নামধারী ছাত্রের এতদূর অধঃপতন হইবে যে কোনও ভদ্রমহিলার প্রতি 'অসৎদৃষ্টিপাত' এবং 'শিশির' বর্ণিত নির্ল্লজ্জ কাণ্ড করিতে পারে! আমরা ঐসকল ছাত্রের ব্যবহারে অত্যন্ত লজ্জিত এবং সমগ্র ছাত্র সমাজ তজ্জন্য বেথুন কলেজের ছাত্রীদিগের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

কিন্তু বেথুন কলেজের ছাত্রী দিগেরও কার্য্য সেদিন নিতান্ত প্রশংসার যোগ্য হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। Head Mistress মহাশয় আসিয়া বলার পর তাঁহারা জানালা বন্ধ করিয়া 'পাখী' তুলিয়া procession দেখিতে ছিলেন; তিনি না বলিলে জানালা বন্ধ হইত কিনা বলা যায় না। কেন?—তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদা অপেক্ষা শোভাযাত্রার আকর্ষণ কি এতই বেশী, যে সেই ক্ষণিক আনন্দের জন্য তাঁহারা আপনাদের নারীমর্য্যাদার অপমান অম্লান বদনে সহিলেন! ইহা কি ভারতনারীর পক্ষে খুব গৌরবের বিষয়? যে দেশের নারীরা আত্মহত্যা করিয়া তুচ্ছ অপমানের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেন, আজ সেই দেশের 'শিক্ষিতা' নারীরা সামান্য একটী শোভাযাত্রার দেখিবার জন্য অম্লান বদনে তাঁহাদের মর্য্যাদাহানি হইতে দিলেন। আত্মসম্মান রক্ষা করা নিজের হাতের ভিতর নয় কি? আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি—ছাত্রীদিগের কি কেবল শোভাযাত্রার দিকেই লক্ষ্য ছিল?—তাহা হইলে তাঁহারা এই সকল ব্যাপার দেখিলেন কি করিয়া?

এই পত্রের নিম্নে প্রকাশিত "সচিত্র শিশিরের" মহামান্য সম্পাদকের মন্তব্য এবং বিচারশক্তিও আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা এই সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে যাহারা "যৌবন বিজ্ঞান" "বিবাহ বিজ্ঞান" "যৌন-বিজ্ঞান" প্রভৃতি অশ্লীল গ্রন্থগুলি ও নারীর অৰ্দ্ধনগ্ন চিত্রাবলী সাধারণের সম্মুখে নির্ল্লজ্জের ন্যায় প্রকাশ করিতে পারেন, তাহারা ছাত্রদিগের নৈতিক অবনতির জন্য কতকাংশে দায়ী কি না, এবং নারীর সম্মান রক্ষা করিবার উপদেশ প্রদানের কতদূর যোগ্য পাত্র? তিনি এই "দুর্ব্বৃত্ত ছাত্রদের" জন্য "যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের" ব্যবস্থা দিয়াছেন, কিন্তু এই "দুর্ব্বৃত্ত কলেজের ছাত্রদের" নৈতিক অবনতির জন্য যাহারা মূলতঃ দায়ী তাহাদের শাস্তির কোন ব্যবস্থা করেন নাই কেন? "শিশির" ভুলিয়া যাইতেছেন কাহারা এই দূষিত ব্যাধির বীজ ছড়াইয়াছেন। "শিশির" নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে নারীর সম্মান রক্ষা করিবার উপদেশ লইতে—যাহারা নারীর নগ্নচিত্র এবং ঐরূপ অশ্লীল গ্রন্থ প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না—তাহাদের ন্যায় অদূরদর্শী দায়িত্ব জ্ঞানহীন সম্পাদকের নিকট ছাত্র সমাজকে কখনও যাইতে হইবে না। ইতি

কতিপয় "কলেজের ছাত্র"

ঘটনাটির বিষয় আমরা সম্যক অবগত নহি এবং আমাদের ধারণা কি পুরুষ কি স্ত্রী কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মধ্যে অসৎ লোকের অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। যে অশিষ্ট ছাত্রদের দ্বারা এরূপ নির্ল্লজ্জ আচরণ সম্ভব হইয়াছে তাহাদের জন্য সকলেই কেবল লজ্জিত নয় দুঃখিত তবে তজ্জন্য সমুদায় ছাত্রশ্রেণীকে দোষীভাবা ও ঠিক নহে।

—সঃ সং

Printed & Published by Jnanendra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
14 Jaggannath Dutta Lane Garpar, Calcutta.

উপাসনা

"নিরুপমা বর্ষস্মৃতি হইতে"

"কর্ম্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলায়— "

শিল্পী—শ্রীঅবনীন্দ্র বসু মহাশয়ের সৌজন্যে

"বাপের নাম ?"

"জানে না। বাপ্‌কে কখন দেখেছে বোলেও মনে হয় না।"

চিন্তাপূর্ণ স্বরে বোল্লে, "তবেই দেখ্, এই কনক কার মেয়ে কি বৃত্তান্ত কিছুই জানিনে! ছেলেবেলা থেকে এই ১৭।১৮ বছর বাপ্‌কে দেখেনি! বামুন মা এখানেই বা কোত্থেকে এলো? বরাবর ভাল ছিল কি না তাই বা কে বোলবে? এসব না জান্‌লে তো বিয়ে হ'তে পারে না বিমু!"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটবার পর বিমল শুক্‌নো মুখে বোল্লে, "বামুন মাকে এসব জিজ্ঞেস কোল্লে হয় না নীরদা?"

"তাই আপাততঃ কোত্তে হবে; তারপর ভাল কোরে খোঁজ নিয়ে দেখ্‌তে হবে।"

"তবে এক্ষুণি চল।"

নীরেন হেসে বোল্লে, "কেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের রে? দু-চার দিন যাক না। তর সইছে না বুঝি আর?"

"না নীরদা, সমস্ত না শোনা অবধি আমি মনে শান্তি পাবো না একটুও। তুমি চল।"

"বেশতো, চল্ যাচ্ছি।"

"কিন্তু আমার কথা কিছু বোলো না নীরদা।"

নীরেন হেসে বোল্লে, "কেন? তুই তার মেয়েকে এতটা ভালবাসিস্ তা জানাতে দোষ কি?"

একটু চঞ্চল হ'য়ে বিমল বোল্লে, "না—না, এখন বোলো না, খবর্দার! তাহ'লে ভাল হবে না কিন্তু।"

নীরেন হেসে বোল্লে, "ভাল হবে না? আচ্ছা, তবে নয় না-ই বোল্লুম। কিন্তু তোর রাঁধুনীটা যে বাড়ীতে একলাটী রইল, কেউ লুফে নিয়ে যাবে না তো?"

বিমল মৃদু হেসে বোল্লে, "যাও, তোমার সব তাতেই ঠাট্টা।"

(তিন)

সমস্ত শুনে বামুন মা বোল্লেন, "তাইতো বাবা, তোমরা কি কনীর বিয়ের সত্যি ঠিক্ কোরে ফেলেছো?"

নীরেন বোল্লে, "হ্যা বামুন মা। বর ঘর সবই খুব ভাল।"

"বেশ বাবা বেশ, ঈশ্বর তোমাদের আশীর্ব্বাদ কোর্ব্বেন। আমি অভাগিনী আর তোমাদের কি কোত্তে পারি বল? কন্যার যে কোনদিন বে দিতে পারবো তা ভাবিনি; কিন্তু কনা আমার এককালে বড় ঘরের মেয়ে ছিল!" বামুন মার দু চোখ থেকে টপ্ টপ্ কোরে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়্‌লো।

"কিন্তু কনকের কুলজিটা না জান্‌লে তো বিয়ে হ'তে পারছে না বামুন মা!"

"হ্যা, বোল্‌বো বৈকি বাবা! শুধু কুলজি কেন? আমার জীবনের অনেক কথাই আজ তোমাদের খুলে বোল্‌বো। তাহলে বুঝ্‌তে পারবে, আমার উপর দিয়ে কত বড় একটা ঝড় ব'য়ে গেছে, কিন্তু তবু আমি বেঁচে আছি শুধু এই মেয়েটার জন্যে।"

নীরেন ও বিমল সমস্বরে বোল্‌লে, "বলুন বামুন মা।"

"হ্যা বলি। কনা কই? তাকে ডেকে আন দেখি, সেও সব শুনুক; তাকে কোনদিন কিছু বলিনি তো!"

বিমল তখনি ছুটে গিয়ে কনককে নিয়ে এলে, বামুন মা বোল্‌তে আরম্ভ কোল্লেন:—

"আমার বাপের বাড়ী ছিল গোপালপুর—নদে জেলা। বাবা খুব গরীব ছিলেন; কখর যজমান ছিল তাইতে কোন রকমে সংসারটা চ'লে যেতো। আমি মা-বাপের একটীমাত্র মেয়ে, তাই বাবা আদর ক'রে নাম রেখেছিলেন দুলালী; খুব সুন্দরীও ছিলুম নাকি, তাই পাড়ার লোকে ডাকতো সুন্দরী। ছেলেবেলায়ই মা আমার মারা গেলেন, কাজেই আমায় মানুষ কোরে তোল্‌বার ভার সবটা আমার বাবার উপরেই প'ড়েছিল।

যাহোক দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেড়ে উঠ্‌লুম। ১১ ছেড়ে ১২য় পা দিতেই বাবার চমক্ ভাঙ্গলো; আমার বিয়ে দেবার জন্য তিনি উঠে প'ড়ে লাগ্‌লেন; কিন্তু শুধু রূপ দেখে কেউ বিয়ে কোত্তে চাইল না; সবাই চায় টাকা! আমার বাবার তা নেই, কাজেই অনেক ঘুরে ফিরে তিনি শেষে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়্‌লেন। ঠিক এই সময় হঠাৎ আপনা থেকে আমার বিয়ের ফুল ফুটে উঠ্‌লো।"

"তখন শীতকাল। একদিন ভোরবেলায় আমাদের ছোট্ট কুঁড়েঘরখানির পাশে দাঁড়িয়ে রোদ পোহাচ্ছি, এমন সময় দেখ্‌লুম দূর থেকে কে একজন ঘোড়া ছুটিয়ে সেইদিকে

আস্‌ছেন ; পরে জেনেছিলুম তিনি রাজাবাহাদুর আমাদের গ্রামের জমিদার। আমাদের কুঁড়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ আমার পানে তার চোখ প'ড়্‌লো। ঘোড়া থামিয়ে মিনিটখানেক আমার পানে চেয়ে থেকে তিনি আস্তে আস্তে কাছে এসে নাম জিজ্ঞেস কোল্লেন ; আমি নাম বোল্লুম। ঘোড়ার পায়ের শব্দে বাবাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। চেয়ে দেখ্‌লুম তিনি হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌ছেন। তাকে অভয় দিয়ে হাত ধ'রে রাজা আমাদের কুঁড়ের এসে বস্‌লেন। তারপর বাবার সাথে অনেকক্ষণ ধ'রে কি সব পরামর্শ হ'ল শুনিনি, শুধু জান্‌লুম, ৭ দিন পরে জমিদারের ছেলের সাথে আমার বে হবে।"

"রাজার বাড়ী সচরাচর যেমনটী হ'য়ে থাকে, তেমনি মস্ত ধুমধামের ভেতর দিয়েই আমাদের বে'টা হ'য়ে গেল। বিয়ের পর প্রথম প্রথম স্বামীকে খুব ভালই লেগেছিল দিব্যি সুপুরুষ হাসিখুসী-মানুষটী। তাছাড়া আমায় ভালও বাস্‌তেন যথেষ্ট। অন্ততঃ তাঁর কথাবার্ত্তায় হাবভাবে তখন আমার মনে এই দৃঢ় ধারণাটাই জন্মিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু শেষে বুঝেছিলুম যে সে ভালবাসা আসল ভালবাসা নয় শুধু রূপের মোহ। ফুলের সাথে মৌমাছির যেমন একটা আকর্ষণ থাকে এও কতকটা তেমনি! কিন্তু শ্বশুরঠাকুর আমায় সত্যি সত্যি ঠিক্ নিজের মেয়েটীর মতই ভালবাস্‌তেন। খাশুড়ী আমার বিয়ের আগেই স্বর্গে চ'লে গেছ্‌লেন, কাজেই শ্বশুরের পরিচর্য্যার ভার সবটাই আমি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলুম। আমায় দুদণ্ড না দেখ্‌লে শ্বশুরঠাকুর 'মা! মা!' ক'রে ডেকে ডেকে অস্থির ক'রে তুল্‌তেন।"

"দেখ্‌তে দেখ্‌তে এমনি ক'রে বিয়ের পর ছটা বছর কেটে গেছে এমন সময় হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। আমি কেঁদেকেটে বুক ভাসালুম। আমার কান্না দেখে তিনিও প্রথমটা কেঁদে আকুল হ'য়েছিলেন ; শেষে কিছুদিন পরেই আবার চোখের জল মুছে ফেলে আমায় সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌লেন। কিন্তু সান্ত্বনা সহানুভূতি পেলুম না শুধু একজনের কাছে ;—তিনি আমার স্বামী! দেখ্‌লুম, তিনি যেন একটু বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন! এই প্রথম আমার উপর তার বিরাগ দেখ্‌তে পেলুম।"

"যতদিন শ্বশুরঠাকুর আমার বেঁচেছিলেন, আমার মনে দুঃখের আঁচরটুকু পর্য্যন্ত লাগ্‌তে দেননি। আমার ছেলে-পুলে হ'ল না বোলে স্বামী মাঝে মাঝে দুঃখ কোল্লেন, একটু বিষণ্ণভাবও তার মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পেতুম ; কিন্তু শ্বশুর কোনদিনই সেজন্য দুঃখ করেননি। 'নিয়তি কেউ খণ্ডন কোত্তে পারে না। কপালে যা আছে তা হবেই ; মানুষের ভাবনা চিন্তে করা বৃথা।' এই ছিল শ্বশুরঠাকুরের মত। কিন্তু আমার এমন শিবের মত শ্বশুরও বেশীদিন রইলেন না, বাবা চ'লে যাবার ঠিক্ দু বছর পরে তিনিও স্বর্গে চ'লে গেলেন। যাবার সময় আমায় ডেকে ব'লে গেলেন, "বৌমা, আমার বোকা ছেলেটার হাব ভাব বড় ভাল ব'লে বোধ হ'চ্ছে না মা। তাই যাবার সময় আশীর্ব্বাদ কোরে যাচ্ছি, যেন তোমার এই বুড়ো ছেলে ম'রে গেলে শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর আবার মা হ'তে পারো!" এই অবধি ব'লে হঠাৎ চোখে কাপড় দিয়ে বামুন মা হাউ-হাউ কোরে কেঁদে উঠ্‌লেন।

(চার)

কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যাবার পর বিমল বোল্লে, "তারপর?"

চোখের জল মুছে ফেলে বামুনমা বোল্‌তে লাগ্‌লেন, "তারপর শ্বশুরের ভবিষ্যৎ বাণীই ফ'লে গেল! দুমাস যেতে না যেতে ছেলে-না-হবার অজুহাতে আমার কুলীন স্বামী একটী 'ডাগর' সুন্দরী মেয়ে বে কোরে নিয়ে এলেন। নূতন বৌকে চোখের জল মুছে, হাসিমুখে বরণ কোরে ঘরে তুল্লুম। অশান্ত চঞ্চল মনটাকে সংযমের চাবুক মেরে শান্ত কোল্লুম ; ভাব্‌লুম, স্বামী আমার ঠিক্ কাজই কোরেছেন। এত বড় জমিদারীটার একজন ওয়ারিশ চাইতো? নৈলে ভবিষ্যতে এত ধন সম্পত্তি কার হাতে দিয়ে যাবেন? সতীনকে হিংসে করিনি ; বরং তাকে আশীর্ব্বাদ কোল্লুম যেন সে আমার শ্বশুরের বংশ কুল গৌরব বজায় রাখ্‌তে পারে ; কিন্তু সেই সাথে নিজের দুর্ভাগ্যকেও শতবার ধিক্কার দিলুম।"

"সতীন কিন্তু আমায় বড় ভাল চোখে দেখ্‌লেন না ;

প্রথম থেকেই তিনি যেন আমায় তাঁর সুখের পথে কাঁটা মনে কোত্তে লাগ্‌লেন। আর স্বামীর তো কথাই নেই সতীনের উপর তাঁর আদর ভালবাসার মাত্রা দিন দিন যতই বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো, আমার উপর বিরক্তি অবহেলার মাত্রাও সেই পরিমাণে বাড়্‌তে লাগ্‌লো; চোখের উপর সব দেখে শুনেও একটা কথা কইলুম না।

বছর দেড়েক পরে সতীনের একটী ঘর আলো করা খোকা হ'ল। স্বামীর মুখে হাসির উপর হাসি ফুট্‌লো। তাঁর হুকুমে তার প্রকাণ্ড জমিদারীটার প্রতি ঘরে ঘরে আনন্দের উৎস ছুটে গেল। সবার আনন্দ চোখে আমারও আনন্দ হোলো; হাসিমুখে আদর ক'রে খোকাকে আমার বুকের ভেতর তুলে নিলুম; মনে মনে ভাব্‌লুম আমিও তার এক মা। কিন্তু হায় রে! সে আশা যে দুরাশা তখন তা স্বপ্নেও ভাবিনি। খোকা হবার পর থেকেই সতীনের আদর আরো দশগুণ বেড়ে গেল, তার হুকুম সেবা কোত্তে ১০।১২টা নূতন ঝি চাকর কাজে বহাল হ'ল; আর আমি তাদের ভেতরই একজন হ'য়ে রইলুম। আমার গয়নাগুলো আর ভাল কাপড়চোপড় যা কিছু ছিল সব কেড়ে নিয়ে স্বামী আমার আদর কোরে সতীনকে দিলেন, সতীনও সেগুলো বেশ হাসিমুখেই গ্রহণ কোল্লে দেখ্‌লুম। কিন্তু তবু আমি সতীনের উপর বা স্বামীর উপর রাগ কোরে একটা কথা কইনি। ভাবলুম, আমি গয়না কাপড় নিয়ে কি কোরবো? ওসব আমার সতীনেরই থাক, খোকার বৌ হ'লে সে সব প'রবে।"

"খোকা প্রথম প্রথম প্রায় সব সময়ই আমার কাছে থাক্‌তো। আমিই তাকে আদর কোরে খাওয়াতুম, পরাতুম, বুকের ভেতর ঘুম পাড়িয়ে রাখতুম। কিন্তু তাও আমার সতীন আর তার স্বামীর বেশীদিন সহ্য হ'ল না, আমার বুক থেকে তারা খোকাকে ছিনিয়ে নিলেন; খোকার সংস্পর্শে যাবার অধিকারটুকু থেকেও আমায় বঞ্চিত কোল্লেন; কড়া হুকুম হ'ল, খোকাকে আমি আর ছুঁতে পর্য্যন্ত পারবো না। তখন বুঝ্‌লুম যে খোকা আমার কেউ নয়, সে আমার সতীনের। বুঝেও কিন্তু সুবিধে পেলেই খোকাকে একটু কোলে না নিয়ে থাক্‌তে পাত্তুম না; কাজেই সেই থেকে আমার শাস্তিও আবার বেড়ে গেল। পদে পদে সতীনের গঞ্জনা স্বামীর ভর্ৎসনা সইতে লাগ্‌লুম; কিন্তু তবু শ্বশুরের ভিটে কামড়ে প'ড়ে থাক্‌তে হ'ল, কারণ আমার আর দ্বিতীয় আশ্রয় কোথাও ছিল না।"

এমনি ক'রে দাসীবাদীর মত লাথি ঝাঁটা খেয়ে আরো চার-চারটে বছর কেটে যাবার পর আমার সন্তান সম্ভাবনা হ'ল; স্বামী একটু প্রসন্ন হ'লেন; কিন্তু সতীনের আক্রোশটা আমার উপর শুক্‌নো খড়ের আগুনের মত ধূ ধূ ক'রে বেড়ে উঠ্‌লো, মনে মনে ঈশ্বরের দয়াকে একশবার ধন্যবাদ দিলুম। ভাবলুম স্বামী আমার সতীনকে প্রাণ ভ'রে ভালবাসুন ক্ষতি নেই, কিন্তু একটা ছেলে হ'লে যদি আমার একটুখানি সুদৃষ্টিতে দেখেন তাহলেই আমি যথেষ্ট পেলুম মনে কোরবো। কিন্তু বিধি আশা দিয়েও বাদ সাধ্‌লেন। ১০ মাস ১০ দিন পরে আমার যখন একটা মেয়ে হ'ল, তখন স্বামী একেবারে তেলে বেগুনে জলে উঠ্‌লেন, মেয়েটাকে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে বোল্লেন। আমি কিন্তু ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক্ মা হ'য়ে আমার নাড়ী ছেঁড়া ধনকে ঠেলে ফেল্‌তে পাল্লুম না; মার মতই আদর কোরে বুকের দুধ খাইয়ে তাকে মানুষ কোত্তে লাগ্‌লুম। ঠিক এই সময় একটা সামান্য ঘটনায় আমি দুঃখের শেষ সীমায় গিয়ে পৌছলুম।"

(পাঁচ)

একটু বিশ্রাম নিয়ে বামুনমা আবার বোল্‌তে লাগ্‌লেন "তখন সবে আঁতুর থেকে বেরিয়েছি; সেদিন কি জানি কেন মেয়েটা বড্ড কাঁদ্‌ছিলো, আমি তাকে মাই দিয়ে ভুলিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা কোর্‌ছিলুম। মেয়ের কান্নায় পাশের ঘরে বোধহয় স্বামীর আমার শান্তিভঙ্গ হ'য়েছিলো হঠাৎ তিনি চোখ লাল ক'রে রেগে আমার ঘরে ছুটে এলেন; এসেই কোন কথা না বোলে তিনি মেয়েকে আমার বুক থেকে টেনে নিয়ে বাইরে ফেলে দিতে চোল্লেন! এতদিন মুখ বুজে আমার উপর সব অত্যাচার সহ্য কোরে-ছিলুম কিন্তু আজ কচি মেয়েটার উপর এ অত্যাচার সহ্য কোত্তে পাল্লুম না। আমার নিজের রক্তমাংসে গড়া সোণার পুতুলকে এমনভাবে মেরে ফেলতে যেতে দেখে আমার বুকের ভেতরকার মা—টা হঠাৎ বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌লো। বাঘের মত লাফিয়ে প'ড়ে স্বামীর কোল থেকে

বাছাকে ছিনিয়ে নিলুম ; তারপর রাগের মাথায় কি বলেছিলুম মনে নেই, স্বামী আমায় গালাগাল দিয়ে লাথি মেরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।"

"সারা রাত কেঁদে কেঁদে মনটা একটু হাল্কা হ'ল। ভাবলুম, এখানেই বুঝি ঈশ্বর আমার দুঃখের শেষ সীমা-রেখা টেনে রেখেছিলেন, কিন্তু তা নয়। পরদিন শুনলুম সে বাড়ীতে আমার জায়গা হবে না, আমায় যেখানে হোক্ চ'লে যেতে হবে। মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো ; ভাবলুম, স্বামীর পা ধরে কেঁদে সেই মস্ত বাড়ীটার এককোণে একটু জায়গা চেয়ে নেবো, কিন্তু স্বামী আমার মুখ দর্শন কোত্তে চাইলেন না। সতীনের কাছে গেলুম, কেঁদে বোল্লুম চিরদিন তার দাসী হ'য়ে থাক্‌বো ; কিন্তু সতীন মুখ বেঁকিয়ে, বোল্লে, সে কিছু কোত্তে পারবে না। কিন্তু একটা দাসীর কাছে শুনেছিলুম, আমায় ভিটে-ছাড়া করবার ভেতর সতীনের অনেকখানি হাত ছিল। যা হোক, তারপর কি জানি কেন স্বামীর একটু দয়া হ'ল, আমায় একেবারে পথে দাঁড় না করিয়ে তিনি একজন গোমস্তাকে দিয়ে গোপনে আমায় কাশীতে অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। খুকীকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কাশীবাসী হোলুম।"

"সোণার পুতুলটীর মত খুকী আস্তে আস্তে বড় হ'তে লাগ্‌লো, তাই তার নাম রাখ্‌লুম কনকলতা, এই কনকই আমার সেই মেয়ে। যাহোক এমনি কোরে সেই অনাথ আশ্রমেই ১২টা বছর দুঃখে কষ্টে কেটে গেল। এর ভেতর স্বামী আমার একদিনের তরেও কোন খোঁজ খবর নিলেন না। গোমস্তার কাছে শুনেছিলুম, আমায় এমনি কোরে নির্ব্বাসন দিয়ে শেষে মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দেওয়াই নাকি স্বামীর উদ্দেশ্য ছিল!"

"পরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কোল্লে খুকীর ভাল আদর যত্ন হবেনা বোলে আমি একটা রাঁধুনীগিরি জুটিয়ে নিয়েছিলুম, গরীবের মেয়ে রান্নাটা ভালই জানতুম। রাঁধুনীর কাজ কোরে দুপয়সা জমছিল। মাঝে মাঝে মনটা বড্ড অশান্ত হ'য়ে উঠ্‌তো তখন কনাকে বুকে নিয়ে কেঁদে কেঁদে বুকটা হাল্কা কোরে নিতুম। এমনি করেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল এমন সময় কতকগুলো বদ্‌লোকের কুদৃষ্টি প'ড়লো আমার সেই ১৩ বছরের সুন্দরী মেয়েটার উপর। কাজেই কাশীর বাসও তুল্‌তে হ'ল। সেই গুণ্ডাগুলোর হাত থেকে কনাকে বাঁচিয়ে রাখা ক্রমেই অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ছে দেখে একদিন দুজনে রাতারাতি বৃন্দাবন পালিয়ে এলুম, সে আজ ৫ বছরের কথা। এখানে এসে একজন ভদ্রলোকের বাড়ী অনেকদিন রান্না কোরেছিলুম, তারপর এই কদিন হ'ল তোমাদের বেঁধে দিচ্ছি।"

চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বামুন মা শেষ কোল্লেন। বিমল, নীরেন ও কণা তিন জনেই অনেকক্ষণ থ হ'য়ে বোসে রইল। হঠাৎ মুখ তুলে বিমল জিজ্ঞেস কোল্লে "আপনার স্বামী কি এখনো বেঁচে আছেন বামুন মা?"

বামুন মা বিষাদের হাসি হেসে বোল্লেন, "না বাবা দেখছ না সাদা কাপড় পরেছি? আজ তিন বছর হ'ল স্বামী মারা গেছেন, সতীন ও তার বছর খানেক পরই স্বামীর কাছে গেছেন। তাদের মরার খবর আমি এখানে বসেই পেয়েছিলুম।"

"কিন্তু সতীনের ছেলেতো আছে? আপনি তার কাছে যাননা কেন?"

"হ্যা বাবা, খোকা বেঁচে আছে। কিন্তু সে কি আমায় আর এখন চিনতে পারবে বাবা? তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকে সে হয়তঃ শুনে এসেছে যে আমি মরে গেছি! সে বেঁচে থাক, সুখে থাক, তাতেই আমার তৃপ্তি। কনাকে কারো হাতে সঁপে দিতে পাল্লেই আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আর বাকী কটা দিন এমনি কোরেই কাটিয়ে দিতে পাত্তুম।"

আপনার শ্বশুরের নাম কি ছিল বামুন মা?"

৺হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজা বাহাদুর।"

"তাঁদের বাড়ী?"

'নদে জেলা কুসুমপুর।"

নীরেন এতক্ষণ চুপটী কোরে বামুন মার মুখের পানে চেয়ে ব'সে ছিল, এইবার হঠাৎ সে পাগলের মত লাফিয়ে উঠে বোল্লে, "আর স্বামী? আপনার স্বামীর নাম?"

মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে বামুন মা বোল্লেন, "স্বামীর নামতো মেয়েছেলের কোত্তে নেই বাবা।"

"আপনার স্বামীর নাম ৺দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল কি?"

"হ্যা বাবা, ঐ নামই বটে! কিন্তু তুমি কি কোরে—"

বামুন মার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে নীরেন বোল্লে "এ হতভাগ্যই তোমার সেই সেই খোকা মা"

বাইরে তখনো পাতায় পাতায় বৃষ্টি গড়িয়ে প'ড়ছিল টুপ্‌টাপ্, টুপ্‌টাপ্, টুপ্‌টাপ্।

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে বাঙ্গালীর জীবন কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাকবি কৃত্তিবাসের সময়ে হিন্দুসমাজের অবস্থা

মানব জীবনে সূতিকাগৃহে ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথাই সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য। আমাদের প্রাচীনকাল হইতে রাজা রাজড়া বা সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তৎসংবাদ জ্ঞাপক দাস-দাসীকে পুরস্কার প্রদানের প্রথা এবং জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতকে সংবাদ দিয়া আনাইয়া শুভ দিন ক্ষণ নির্ণয় করাইয়া সন্তানের মুখ দর্শনের প্রথা প্রচলিত আছে। কবি কৃত্তিবাসে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হইলে কৌশল্যার দাসী শুভ বার্ত্তা—সেই সংবাদ মহারাজ দশরথকে জ্ঞাপন করিলে যেরূপ পুরস্কৃত হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়াছেন—

"কৌশল্যার দাসী সেই শুভ বার্ত্তা নামে।
শুভ সমাচার দিল গিয়া রাজধামে॥
শুনি দশরথ পূর্ণ পুলক শরীরে।
অষ্ট আভরণ আরো দিলেন দাসীরে॥
পরম আনন্দে রাজা পসরি আপনা।
কতধন দিল দ্বিজে কে করে গণনা॥
আনন্দ সাগরে রাজা ভাসে সেই ঠাই।
পুনরপি দিল দান কত শত গাই॥
গণক আনিয়া করিলেন শুভকাল।
পুত্র মুখ দেখিবারে যান মহীপাল॥

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর সূতিকাগৃহে যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, পঞ্চাশ শতাব্দীতে যেরূপ ছিল, এখনও তাহাই আছে। কবি কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের জন্মপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

একৈক গণনে যে হইল চারিদিন।
পাঁচদিনে পাঁচটি করিল পরছিন॥
ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা নিশি জাগরণে।
দিয়া অষ্ট কলাই আষ্টাহ শিশুগণে॥
ডাক দিয়া আনে রাম বালক গণেরে।
কাপড় পুরিয়া সোণা দিল সবাকারে॥
ত্রয়োদশে রাজার হইল আশৌচান্ত।
কতেক করিল দান তার নাহি অন্ত॥

রামায়ণ—আদি।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে পুত্র কন্যার বিবাহ সভায় বর ও কন্যার বংশ কীর্ত্তন করা হইত। এই প্রথা প্রচলিত থাকিলেও বর্ত্তমানে তাহার ক্ষীণস্মৃতি মাত্র দৃষ্ট হয়। মহাকবি কৃত্তিবাস তদ্রচিত রামায়ণে রামচন্দ্রের বিবাহ প্রসঙ্গে যে বংশ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল।

চন্দ্রবংশ কীর্ত্তন

"শতানন্দ বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়।
সূর্য্যবংশ কি প্রকার দেহ পরিচয়॥
বশিষ্ঠ বলেন মুনি লোক বুঝাবুঝি।
কত দেখি তুমি চন্দ্রের শেষ কুলজি॥
শতানন্দ মুনি বলে সভার ভিতর।
শুন চন্দ্রবংশের বিস্তার মুনিবর॥
দেবাসুরে মন্থন করিল সিন্ধুনীর।
তাহে লক্ষ্মী জগন্মাতা হইল বাহির॥
সাগর মন্থনেতে জন্মিল শশধর।
চন্দ্র নাম হইল তাহার মনোহর॥
হইল চন্দ্রের পুত্র বুধ মতিমান্।
পুরুরবা নামে তাঁর হইল সন্তান॥
পুরুকুৎস নামে হইল তাঁহার কুমার।
শতবর্ত্ত নামে পুত্র বিদিত সংসার॥
আর্য্যাবর্ত্ত নামে হইল তাঁহার তনয়।
সে পদী নামেতে তাঁর পুত্র মহাশয়॥

বাণ নামে পুত্র হইল জানে সর্ব্বজন।
ভরত নামে তাঁর পুত্র অতি বিচক্ষণ॥
ধ্রুব নামে তাঁর পুত্র বিদিত ভুবনে।
স্বর্গ নামে পুত্র সর্ব্বলোকে বলে॥
পুত্র স্বর্গ রাজার সে সর্ব্ব নাম ধর।
হৈহয় নামেতে তাঁর পুত্র মনোহর॥
হৈহয়ের নন্দন অর্জ্জুন নাম ধরে।
শিখি নামে তাঁর পুত্র তুলনা অমরে॥
শিখির কীর্ত্তিতে ব্যাপ্ত সকল সংসার।
মিথি নামে তাঁহার হইল যে কুমার॥
সকলে মিলিয়া তার মথিল শরীর।
তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি নামে বীর॥
সেই বসাইল এই মিথিলা নগর।
জনম কুশধ্বজ হইল তাহার কোঙর।"

সূর্য্যবংশ বর্ণন

"বশিষ্ঠ বলেন শুনিলাম বিবরণ।
আমি তথা কহি তবে তাহে দেহ মন॥
আদি পুরুষের নাম হইল নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিনজন॥
তিন পুত্র হৈল তনয়া এক জানি।
সকলে তাহার নাম রাখিল কন্দিনী॥
জরৎকারু মুনি পুত্র নারদ বীণাপাণি।
তাহাকে বিবাহ দিল কালিন্দী ভগিনী॥
সবে গীত গায় নারদ বাজায় বেণু।
তাহাতে জন্মিল এক কন্যা তার ভানু॥
তাহাকে বিবাহ দিল জামদগ্ন্য বরে।
এক অংশে নারায়ণ জন্মিল তার ঘরে॥
ব্রহ্মার কাছেতে আসি বর সে মাগিল।
নামেতে মরীচ পুত্র তাহাতে জন্মিল॥
মরীচের পুত্র হৈল নামেতে কশ্যপ।
তাহার তনয় সূর্য্য প্রচণ্ড প্রতাপ॥
সূর্য্যের হইল পুত্র মনু নাম তার।
মনুর নামেতে সর্ব্ব ব্যাপিল সংসার॥
মনুর হইল পুত্র সুষেণ নামেতে।
প্রষেণ তাহার পুত্র বিদিত জগতে॥
প্রষেণের পুত্র যুবনাশ্ব নাম ধরে।
রাজা হয় যুবনাশ্ব অযোধ্যা নগরে॥
যুবনাশ্ব রাজার কহিব কিবা কথা।
তাহার জন্মিল পুত্র নাম যে মান্ধাতা॥
মান্ধাতার পুত্র হৈল মুচকুন্দ নাম।
গুণধাম ধুন্ধুমার তার পুত্র নাম॥
তাহার হইল পুত্র ইলা নাম ধরে।
তার পুত্র শতাবর্ত্ত অযোধ্যা নগরে॥
আর্য্যাবর্ত্ত নামে তার হইল নন্দন।
ভরত তাহার পুত্র জানে সর্ব্বজন॥
ভরত রাজার আর কি কব বাখান।
যার নামে পৃথিবীতে ভারত পুরাণ॥
তাঁর পুত্র হইল ইক্ষ্বাকু নরপতি।
বশিষ্ঠ পুরোহিত যার সুমন্ত্র সারথি॥
তাহার ভুধর নামে হইল নন্দন।
খাণ্ড নামে তাঁর পুত্র অযোধ্যা ভূষণ॥
হইল খাণ্ডের বেটা মণ্ড নাম ধরে।
প্রজার উপরে নানা অত্যাচার করে॥
তার পুত্র হইল হারীত নাম ধরে।
হরিবীজ তার পুত্র বিদিত সংসারে॥
হরিবীজ রাজ্য করে পরম আনন্দ।
তাঁহার হইল পুত্র নাম হরিশ্চন্দ্র॥
যাঁর দান লইলেন গাধির নন্দন।
বিকাইয়া আপনি যে শুধিল কাঞ্চন॥
হরিশ্চন্দ্র রাজ্য করে পূর্ণ অভিলাষ।
তাহার হইল পুত্র নামে রুহিদাস॥
সে রুহিদাসের পুত্র নাম মৃত্যুঞ্জয়।
ত্রিশঙ্কু তাহার পুত্র যিনি তপোময়॥
তাঁর পুত্র রুক্মাঙ্গদ অযোধ্যা-নিবাসী।
দ্বাদশ বৎসর কাল করে একাদশী॥
রুক্মাঙ্গদ জন্মাইল ধর্ম্মাঙ্গ তনয়।
তার পুত্র হইল মরুৎ মহাশয়॥
অনরণ্য তার বেটা জানে সর্ব্বজন।
তাহাকে মারিয়া গেল লঙ্কার রাবণ॥
তাহার হইল পুত্র বাহু নৃপবর।

শিব ভক্ত নাম তার হইল সাগর ॥
অসমঞ্জ নামে তার হইল নন্দন।
তার বেটা অংশুমান ধর্ম্মপরায়ণ ॥
অংশুমান রাজা রাজ্য করিয়া কৌতুকে।
মরিলেন তার বংশ আর নাহি থাকে ॥
ভগীরথ তার বেটা অযোধ্যা নগরে।
গঙ্গা আনি উদ্ধারিল দেব-দৈত্য নরে ॥
বিতপত্ত নামে তার হইল নন্দন।
বিকর্ণ তাহার পুত্র অযোধ্যা ভূষণ ॥
তাহার হইল বেটা অম্বরি রাজন।
দিলীপ তাহার বেটা জানে সর্ব্বজন ॥
দিলীপের সুত রঘু বড় বলবান।
রঘুবংশ বলি যাঁর এ শেষ আখ্যান ॥
রঘুর তনয় অজ পিতার সমান।
তার পুত্র দশরথ দেখ বিদ্যমান।
দশরথ রাজা শৌর্য্যবীর্য্য গুণধাম।
তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র এই ধার্ম্মিক শ্রীরাম ॥
এতেক বশিষ্ঠ মুনি বলিল সবাকে।
শুনি শতানন্দ মুনি চাক্ষ দিল নাকে ॥

বিবাহাদি মাঙ্গলিক উৎসব উপলক্ষে আভিজাত আর্য্য সন্তানগণ স্ব স্ব কুলপরিচয় বা বংশেতিহাস কীর্ত্তন করিতেন। বৈদিক যুগ হইতেই তাহার সূচনা, রামায়ণে তাহার পরিপুষ্টি। রামায়ণ রচনা কালেও বিবাহোৎসবে পূর্ব্ব বংশাবলী কীর্ত্তিত হইত। রামসীতার বিবাহ সভায় আমরা তাহার পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছি। কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ বর পক্ষের এবং মুনিবর শতানন্দ কন্যা পক্ষের আদ্যন্ত কুলকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

বিবাহ সভায় বরপক্ষের কুলপুরোহিতের এবং কন্যাপক্ষে স্বয়ং কন্যাকর্ত্তার আদ্যন্ত কুলপরিচয় প্রয়োজন হইত বলিয়াই প্রত্যেক আর্য্যসন্তানকে স্ব স্ব বংশাবলী রক্ষা করিতে হইত। এই কারণে ভারতের সর্ব্বত্রই পূর্ব্বকালে কুলপরিচয় রক্ষার যথেষ্ট সমাদর ও আগ্রহ ছিল, তাই রাজাধিরাজ হইতে উচ্চ নীচ সকল আর্য্যসন্তানই স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষগণের বংশ ও কুলপরিচয় মুখস্থ করিয়া রাখা জাতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

এ দেশের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয় জাতির সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থে লিখিত আছে যে, গৌড়াধিপ বল্লাল সেনের কুলবিধি প্রবর্ত্তনের সঙ্গে কুলাচার্য্য নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। তৎপূর্ব্বে প্রত্যেক সমাজে কুলপুরোহিত ও কুলবৃদ্ধগণ কুলপরিচয় লিখিয়া রাখিতেন এবং প্রধানতঃ ভাটগণই কুলমহিমা কীর্ত্তন করিতেন এ প্রথা অদ্যাপি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও কোন কোন সমাজে কোন কোন বয়োবৃদ্ধ নিজের এবং আত্মীয় স্বজনের কুলপরিচয় লিখিয়া রাখেন এবং এই কার্য্য জাতীয় গৌরবজনক বলিয়া মনে করেন। ইহা সেই সার্ব্বজনিক প্রথার ক্ষীণ স্মৃতি মাত্র।

ফটোর সাহায্যে

খর্ব্বাকৃতিবাবু—দেখুন আমার একটা ভাল ফটো তুলে দিতে পারেন—

ফটোগ্রাফার—নিশ্চয়ই কেন পার্ব্বনা—

বাবু—তবে একটু কথা আছে একটু এন্‌লার্জ্জমেন্ট করে দেবেন অর্থাৎ কি জানেন আমি বিবাহের জন্য ফটো দিয়ে দরখাস্ত করবো কিনা—আমাকে যেন নেহাৎ ছেলে মানুষ তারা না মনে ক'রেন

ধর্ম্ম ও যৌন-তত্ত্ব

আমাদের দেশে এখনও ধর্ম্মের সঙ্গে বিবাহ, পুংসবন, গর্ভাধান, প্রভৃতি যৌন সম্পর্কীয় ব্যাপারগুলি সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত আছে, সভ্য সমাজে ধর্ম্মের সঙ্গে এ সকল ব্যাপারের আর তেমন নৈকট্য নাই। ধর্ম্ম হইতে দূরে যাইলে এগুলির বাধাবন্ধন কমিয়া যায় বলিয়া ভোগপ্রধান পাশ্চাত্য এই যৌন সম্পর্ককে সম্পূর্ণ ভোগের ব্যাপার বলিয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছেন। পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত লোকেরাও অধুনা এই যৌন সম্বন্ধকে আর ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করেন না—এবং পঞ্জিকার বিধি নিষেধ মানিয়াও চলেন খুব কম লোকেই—ফলে ইহাতে ভাল কি মন্দ হইতেছে তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। বস্তুতঃ এই যৌন সম্বন্ধীয় ব্যাপারকে সম্পূর্ণ দৈহিক বলিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বাধা বিপত্তিগুলি দূরীভূত করার ফলে আমাদের কোন লাভ হইতেছে কি না দেখা উচিত। ধর্ম্ম হইতে যৌন ব্যাপারকে পৃথক করিয়াছে বিজ্ঞান—বৈজ্ঞানিক, শরীর বিজ্ঞানে জ্ঞানলাভ করিয়া হয়ত বুঝিলেন যে এ সকল বাধা বিপত্তির কোন মূল্য নাই কিন্তু শরীর বিদ্যায় তাঁহার যেরূপ জ্ঞান আছে সাধারণ লোকের তাহা নাই তিনি শরীরের অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারেন সুতরাং তিনি উহা ধর্ম্ম হিসাবে না মানিলেও বিজ্ঞান রীতি হিসাবে এমন কতকগুলি অবস্থায় উহা পালন করেন যদ্দারা ঐ বাধা বিপত্তি অবহেলা জনিত কোন ক্লেশ তাঁহাকে পাইতে হয় না কিন্তু সাধারণ মানবের শরীর বিজ্ঞানে তেমন অধিকার থাকে না তাই কোন অবস্থায় বাধা বিপত্তি মান্য করা উচিত আর কখন তাহা অনাবশ্যক তাহা বিচার করিবার শক্তি সাধারণ মানবের থাকে না তাই তাহারা বিচারে অক্ষম হইয়া ক্লেশ ভোগ করে। সাধারণ মানবের উপযোগী রীতি নীতিগুলি তাই পুরাকালে ধর্ম্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছিল যদ্দারা মানুষ অজ্ঞাতসারে সংযম বা প্রবৃত্তি দমন করিত; অবশ্য অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কিন্তু এই বিশ্বাসের দৃঢ় শক্তিই তাহাদিগকে সংযম শিখাইত যাহা আজ বিজ্ঞানালোকে দীপ্ত জ্ঞান পারিতেছে না—এইজন্যই ধর্ম্মের বল বেশী ব্যাপ্ত ও বিজ্ঞানের বল সঙ্কীর্ণ।

মানব জাতির ইতিহাসে ধর্ম্মে বিশ্বাস একটা খুব বড় ব্যাপার ছিল এই সুদৃঢ় ভিত্তির গায়ে বিজ্ঞান ক্রমাগত তাহার নির্ম্মম হাতুড়ীর ঘা মারিয়াও আজ তাহাকে একেবারে চূর্ণ করিতে পারে নাই মানুষ যতই সভ্য হইতেছে ততই সে ধর্ম্ম বিশ্বাস হারাইতেছে ফলে আজ জগতের কোথাও ধার্ম্মিক জাতি নাই এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে প্রকৃত ধার্ম্মিকের সংখ্যা এত অল্প যে তাহা নির্ণয় করা চলে না—তবে মুখে ধর্ম্মালোচনা—ধর্ম্মের আড়ম্বর—ধর্ম্মের আবরণ দেওয়া প্রভৃতি খুব বাড়িয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই অন্তঃসার শূন্য দ্রব্য মাত্রেই বহির্ভাগে উজ্জ্বল ও মনোরম হইয়া থাকে—মূর্খেরাই বেশী কথা বলিয়া তাহারা যে পণ্ডিত তাহা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হয়, অসতী স্ত্রী বাহ্যতঃ বেশী লজ্জাশীলা হয়, যে পুলিশ সামান্য চোর ধরিতে পারে না তাহারা রাজবিদ্রোহী খুঁজিয়া চাকরী রক্ষা ও নিজেদের পটুত্ব দেখাইতে যত্নবান হয়।

ধর্ম্মের দ্বারাই মানব প্রথম সংঘবদ্ধ হয় এবং সংসার, সমাজ, এমন কি জাতি পর্য্যন্ত এই ধর্ম্ম বন্ধন হইতেই সৃষ্টি হয়—পশুদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব নাই সেইজন্য তাহাদের মধ্যে আকৃতিগত বিভাগ ছাড়া অন্য কোনরূপে শ্রেণী বিভাগ নাই। যতই আমরা পুরাতন যুগের দিকে পিছাইয়া যাইব ততই দেখিব ধর্ম্মের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে ইহার কোন আবশ্যকতা হয়ত আজ আমাদের কাছে মূল্যহীন বোধ হইতে পারে কিন্তু সেই সময়ের অবস্থা দেশ কাল ও পাত্র হিসাবে তাহা কত আবশ্যকীয় ছিল তাহা বিচার করা আজ সত্যই অসম্ভব। Professor Frazer তাঁহার Lectures on the Early History of the kingship এর ৩৬-৩৭ পৃঃ লিখিয়াছেন "We are only begining to understand the mind of savage & therefore the mind of our savage fore fathers who created these institutions and handed them down to us"—আমরা পূর্ব্বযুগের অসভ্যদিগকে অর্থাৎ আমাদের অসভ্য পূর্ব্বপুরুষগণের মন এবং যে রীতিনীতি তাঁহারা আমাদিগকে দান করিয়া গিয়াছেন সবেমাত্র বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। তিনি এ সম্বন্ধে আলোচনাকালে নিম্নলিখিত বিষয়ে খুব সাবধানতা অবলম্বন করিতেও আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন" "a knowledge of the truth may involve a reconstruction of society such as we can hardly dream of" "অর্থাৎ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ

করিলে হয়তো বর্ত্তমান সমাজকে এমন ভাবে পুনর্গঠন করা আবশ্যক হইবে যাহা আমরা এখনও কল্পনায় আনিতে পারি নাই। সমাজের আদিম অবস্থার সম্পূর্ণ তত্ত্ব অবগত হইলে এই অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার যাহা আজ আমরা অবজ্ঞা ভরে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাই এবং যাহা এককালে এই অসভ্যগণের মজ্জাগত ছিল এবং তৎকালীন সমাজযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিত সেগুলির প্রভাব সম্বন্ধে আমাদিগকে খুব গভীর ভাবে আলোচনা করিতে হইবে "to reckon with the influence of superstition which pervades the life of the savage and has contributed to build up the social organism to an incalculable extent" "জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিন বিধাতার নিয়ে" একটী প্রাচীন প্রবাদ আজ পর্য্যন্তও ইহার প্রভাব মানব সমাজে অপ্রতিহত—পাশ্চাত্য জগৎ ইহাকে হাসিয়া উড়াইতে পারেন আমরা পারি না সুতরাং বিবাহের মধ্যে যে ধর্ম্মভাব থাকার আবশ্যকতা নাই একথা বলা চলে না। রেজিষ্টারী করিয়া দলীল পাকা করিবার মত বিবাহ বন্ধনকে একটা চুক্তিমাত্র বিবেচনা করা বিজ্ঞান সম্মত হইতে পারে কিন্তু বিবাহের মূল দলীল হচ্ছে ভালবাসা—ভালবাসার ভিত্তিতে স্থাপিত না হইলে লেখাপড়া দ্বারা স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি আসক্ত বা স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত রাখিতে পারে না আমাদের দেশের ভালবাসার ধারণা পাশ্চাত্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। জীবের জীবের প্রতি আকর্ষণের নাম ভালবাসা ইহা ক্ষণিক হইলে তাহাকে মোহ বলা হয় আর স্থায়ী হইলে তাহাকে প্রেম বলা হয়। ভালবাসাই জগতের অস্তিত্বের কারণ—এই বন্ধনেই সংসার সমাজ প্রভৃতি আবদ্ধ—ভালবাসার অভাব ধ্বংসের সূচনা করে। নরনারীর মধ্যেও এই ভালবাসার বন্ধন একমাত্র বন্ধন; স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা প্রীতি, অনুরাগ এই ভালবাসার রূপান্তর, দেশকাল পাত্র ভেদে এই রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। ভালবাসার প্রধান লক্ষণ নূতনত্ব, ভালবাসা পুরাতন হয় না। যাহাকে ভালবাসা যায়, সে যে ভালবাসে তাহার চক্ষে নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য লইয়া দেখা দেয় তাহাকে দেখিয়া আশা মিটে না—যতক্ষণ তাহাকে দেখা যায় তাহাকে এক মনে দেখিতে হয় আর মনের মধ্যে পাষাণ নিঃসৃত জলবিন্দুর মত আনন্দধারা ঝরিয়া হৃদয়কে অপূর্ব্ব আনন্দ রসে সিক্ত করিয়া দেয়। ভালবাসার অপার লক্ষণ নিঃস্বার্থতা, স্বার্থ থাকিলে দেনা পাওনার ভাব আসে, ভালবাসার মধ্যে একটা গণ্ডীর রেখা পড়ে—এই সীমাবদ্ধতাই ভালবাসার ধ্বংস-কারক। ভালবাসা অসীম অনন্ত—তাহার সীমা থাকিতে পারে না তাহা সাগরের ন্যায় অসীম, আকাশের ন্যায় অনন্ত বায়ুর ন্যায় বিশ্বব্যাপী।

স্বামী ও স্ত্রীর ভালবাসার পরিণতি ও এই—ইহা না হইয়া ঐ ভালবাসা যদি কেবলমাত্র দৈহিক সৌন্দর্য্য বা উপভোগে সঙ্কীর্ণ হয় তবে তাহা কামে পরিণত হয় কাম ভোগমূলক, প্রেম বা ভালবাসা ত্যাগমূলক। আমাদের দেশে পুরাকালে এই ত্যাগের স্পৃহাই আদর্শ ছিল, তাই তখনকার আচার ব্যবহার রীতিনীতি সমস্তই ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে ভোগ প্রধান হইয়া পড়িতেছে এবং ভোগের সহিত ত্যাগের অপরিহার্য্য বিরোধ তাহাই বিবিধ আকারে আমাদের সামাজিকজীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে পরিণামে কোন নীতি জয়লাভ করিবে তাহা বলা যায় না, তবে পরিবর্ত্তন-প্রয়াসীদের একটা সুবিধা আছে এই যে ভোগ আপতঃমধুর ও ত্যাগ কষ্টকর সাধনায় মাত্র লভ্য বলিয়া ভোগনীতির প্রশ্রয়-দাতার সংখ্যা বেশী কিন্তু যদি তাহা হয় তবে ভারতবর্ষ যে নিজের বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্য জগতের পূর্ব্বতন যুগেও এত ভোগপ্রাধান্য ছিল না সেখানেও ইহা আনিয়াছে এই সভ্যতার যুগ। পুরাতনের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা আনিয়া দিয়াছে এই আধুনিক সভ্যতা—পাশ্চাত্য লোকে তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন কিন্তু ভারতবাসী তাহা পারে না কারণ তাহারা জানে যে সভ্যতা তাহাদিগকে বাহাই দিক একটা 'কালিদাস' বা একটা 'শঙ্করাচার্য্য' দিতে পারে নাই। বস্তুতঃ সভ্যতার যা কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায় তাহা মূলতঃ বাহ্যিক সাধারণের মধ্যে মানসিক পরিবর্ত্তন খুব কমই লক্ষিত হয় এ সম্বন্ধে Chapman Cohen বলেন The Law of mental life remain the same in all stages of culture. The Brain functions identically whether we take the savage or the scientist. In a general way the savage intelligence is as rational as that of a modern thinker" সভ্যতার সকল সময়েই মনের গতি একপ্রকারেই নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক বা পুরাকালের অসভ্য উভয়ের মস্তিষ্কের ক্রিয়াশক্তি একই প্রকার। আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তির মতই পুরাকালের অসভ্যগণের বুদ্ধিও চিন্তাশক্তি সমভাবেই প্রবৃত্ত হয়।" পুরুষ

মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া

পত্রিকার সার সঙ্কলন

ভগবান সহায় হউন ঃ—অনেক প্রার্থনা ও হৃদয় বিচারের পর ভয়কম্পিতভাবে আমি আগামী কংগ্রেসের সভাপতির সম্মান গ্রহণ করিব স্থির করিয়াছি। শিক্ষিত ভারতীয় ও আমার মধ্যে যখন ব্যবধান অনেক বেশী এমনি সময়ে আমাকে সভাপতি হইতে হইতেছে। অল্প খ্যাতি বিশিষ্ট সামান্য কয়েকজন শিক্ষিত মাত্র আমার পাশে আছেন—দেশের আর সব শিক্ষিত আমার চিন্তা ও কার্য্যের বিরোধী হইয়াই দাঁড়াইয়াছেন। তবু জনসাধারণ আমায় প্রিয় মনে করে অনেক শিক্ষিত লোক আমাকে তাঁহাদেরই মত দেশপ্রেমিক মনে করেন—তাই তাঁহারা আমাদের দেশের ইতিহাসের এই সঙ্কট সময়ে আমাকে কংগ্রেস চালনা করিতে বলেন।

তাঁহাদের এ ইচ্ছায় আমি বাধা হইব না। দেশের উপকারের জন্য যে ভাবেই হউক আমি নিজেকে ব্যবহারে লাগাইব। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মতামত না জানা পর্য্যন্ত আমি শেষ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি নাই। এই সভায় স্বরাজী ও পরিবর্ত্তনবিরোধীরা কোন বিষয়ে আপত্তি থাকিলেও মিলনের পরিপন্থী হন নাই। স্বরাজী ও অপরিবর্ত্তন প্রয়াসী দলের পক্ষেই ইহা গৌরবজনক ব্যবহার হইলেও কার্য্য চালাইবার পক্ষে ইহা আশাপ্রদ অবস্থা নহে—বিশেষতঃ এক ব্যক্তির নিকট হইতে যে সময় অনেক পাইবার আশা করা যাইতেছে। কিন্তু আমার অহিংস বিশ্বাসকে পরীক্ষায় ফেলিবার এই উপযুক্ত অবস্থা। পরিবর্ত্তন বিরোধী, স্বরাজী, উদার, জাতীয় স্বায়ত্বশাসন পন্থী, স্বাধীন, ইংরেজ সকলকেই আমি সমান ভালবাসি। আমি জানি ইহা আমার পক্ষেও ভাল—কার্য্যের পক্ষেও ভাল।

দেশকে আমি অবশ্যই প্রতারিত করিব না। আমার পক্ষে ধর্ম্ম ছাড়া রাজনীতি নাই। অন্ধ বা কুসংস্কারের ধর্ম্ম নহে যে ধর্ম্ম ঘৃণা করে এবং যুদ্ধ করে সে ধর্ম্মও নহে—আমার ধর্ম্ম সার্ব্বভৌম উদার ধর্ম্ম। নীতি শূন্য রাজনীতি বর্জ্জনীয়। সমালোচক বলেন—তবে আমাকে সর্ব্বপ্রকার সাধারণ কার্য্য হইতে অবসর লইতে হইবে। আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু তাহা নহে। সমাজেই আমি বাস করিব কিন্তু ইহার পাকে পড়িব না।

এ সময় কংগ্রেস ছাড়িয়া যাওয়া আমার পক্ষে ভীরুতা। কংগ্রেস সভাপতির পদ গ্রহণ না করাই পলায়ন বিশেষতঃ সকলেই যখন আমাকে চাহিতেছে।

আমার কার্য্যে এবং মানবতার উপর প্রচুর বিশ্বাস আছে আমার। ভারতীয় মানবতা অপর কাহারও অপেক্ষা খারাপ নহে বরঞ্চ ভালই। পথ যদিও আঁধার তবু আলো আমি পাইব—ভগবান আমার সহায় হইবেন।

নিজে আমি অসহযোগে পূর্ণ বিশ্বাসী—কিন্তু জাতীয় ভাবে ইহা চালাইবার অবস্থা আসে নাই। তাই আমি জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল দলকে কংগ্রেসে আনিয়া দেখাইতে চাই যে কংগ্রেস অসহযোগ ঘৃণা বা দ্বেষ হইতে উদ্ভূত নহে। অসহযোগ বা বক্তৃতা বর্জ্জন সমালোচনা ও নির্য্যাতন দ্বারা অসম্ভব না করিয়া স্বরাজ প্রাপ্তি যাহাই অসম্ভব করিবার ভার আমি সর্ব্বদলের উপর দিব। তাই সর্ব্বদলের প্রতিনিধিদের আমি কংগ্রেসে উপস্থিত হইতে বলি।

স্বরাজী, অসহযোগী, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ প্রভৃতি কংগ্রেস সভ্যেরাই মহা দায়িত্ব বহিয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে ও দৈনন্দিন কর্ম্মে তাহাদের কর্ম্মধারা দেখাইতে

হইবে। সেবক ভাবে তাহাদের কংগ্রেসে যোগ দিতে হইবে—প্রভু ভাবে কর্ম্মের দাবী লইয়া নহে। গত চার বৎসর হইতে যে খদ্দর প্রচার তাঁহারা করিতেছেন সর্ব্বপ্রকার বস্ত্র বর্জ্জন করিয়া সেই খদ্দর পরিধান করিয়া তাহাদের খদ্দরে বিশ্বাস দেখাইতে হইবে। অপরের ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাহাদের এইরূপ উদারতা ও সম্মান দেখাইতে হইবে।

হিন্দু মুসলমান অনৈক্য, বাংলার নির্য্যাতন, আকালী, ভাইকম প্রশ্ন সর্ব্বোপরি স্বরাজপ্রাপ্তি এমনি নানা বিষয়ে কংগ্রেস দর্শীয়া আমার মতামত চাহিবেন। আমার হাতে তৈয়ারী কোন প্রতিকার নাই—প্রতিকার কংগ্রেসে আমন্ত্রিত দশবৃন্দের হাতেই। আমি পথ দেখাইব—সে পথ গ্রহণ করা না করা কংগ্রেসওয়ালাদেরই হাত। ভগবান আমাদের সহায় হউন।

অসহযোগের অবস্থা ঃ—পরিবর্ত্তন বিরোধীরা দুঃখিত হইয়াছেন--কিন্তু আমিও পরিবর্ত্তন বিরোধী। পরিবর্ত্তন বিরোধী কথাটার অর্থ কি -১৯২০ সালের কলিকাতার অসহযোগ প্রস্তাব যাহারা সমর্থন করিয়াছিল তাহারাই পরিবর্ত্তন বিরোধী। ইহার মধ্য কথা অহিংস ভাব। ১৯২০ সালের পূর্ব্বেও আমরা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মনে অসহযোগ করিলেও কার্য্যে সহযোগই করিতেছিলাম। ১৯২০ সালে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় চিন্তা, কথা ও কার্য্যের মধ্যে আমরা সহযোগিতা আনিবার প্রয়াস পাই। এ সহযোগ শুধু অহিংস ভাবেই হইতে পারে। শাসকদের সম্বন্ধে কোন খারাপ ভাব না লইয়াও তাহাদের চালিত প্রথা কাউন্সিল, কোর্ট, স্কুল, উপাধি এবং লোভনীয় বিলাতী বস্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। অন্যদিকে স্বাধীন স্কুল, সালিশী বিচার প্রথা, ও হস্তপ্রস্তুত সূতা ও খদ্দর করা ছিল ইহার কাজ। কংগ্রেস জাতীয় বিধানের নিয়মে হইয়াছিলেন—স্বেচ্ছাসেবীদের জন্যই ছিল তাহাদের বড় উপাধি। কিন্তু সরকারের পক্ষ প্রতিষ্ঠান বর্জ্জন করিতে না পারিবা—বিশেষতঃ কিছু গঠন করিতে না পারিয়া আমাদের কেহ কেহ কাউন্সিলে দেশকার্য্য করিবার সন্ধানে গিয়াছেন। পরিবর্ত্তন বিরোধীরা অহিংস বিশ্বাসী হইলে তাহাদের সহকর্ম্মীদের এ কার্য্যে উত্তেজিত হইতেন না। কিন্তু তাহারা স্বরাজীদের প্রতিবন্ধকই হইয়াছেন। নিজেদের উপর বিশ্বাস না থাকাতেই তাহারা স্বরাজীদের কাছে বল চাহিয়াছিলেন - যেমন আমরা সকলে আমাদের দুর্ব্বলতা এড়াইতে না পারিয়া শাসকদের নিকট বল প্রার্থনা করি। মনের এই অসহায় অবস্থাই আমাদের মিলনের বিরোধী হয়।

খদ্দর ছাড়া অসহযোগীদের হিন্দু মুসলমান সমস্যা ও অস্পৃশ্যতার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। বিশ্বাস থাকিলে খদ্দরে সকলেই লিপ্ত থাকিতে পারে। সত্যি অহিংস হইলে তাহারা অবশ্যই বুঝিবেন গঠনকার্য্য ভিন্ন বক্তৃতা বর্জ্জন অসম্ভব। বক্তৃতা বর্জ্জন অর্থ অসীম দুঃখ বরণ করা —হত্যার উগ্র মাদকতা ইহাতে নাই। সর্ব্বদলের মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত সে আশা নাই। খদ্দরে আত্মতৃপ্তির বিশ্বাস না হইলে তাহা হইবে না। আমি পরিবর্ত্তন বিরোধীদের সাহায্য চাই। ক্ষমতা সম্মানের প্রলোভন জয় করিয়াছেন—এমন কর্ম্মীই চাই।

বাঙ্গাল মাঝির খেদ

পরাণ্ডা মোর ভাইঙ্গা গিছে, কল্জি গিছে টুইটা,
দেহের তাগদ্ নাই যে আমার খৈসা পরে বৈঠা॥
দরিয়াতে চান্দের কিরণ
ঝলমলাইয়া চলে যখন,
কি যেন কার জানির মতন্ হিয়ায় উঠে জাইগা,
কাইন্দা উঠে পরাণ্ডা মোর কি যেন কার লাইগা॥
বিহান্ বিকাল্ হাওয়া যখন ধীরে বইয়া যায়,
কি যেন কার গন্ধ আইনা পরাণ্ মোর ভুলায়॥
নমাজ পরতি ভুল্যা যাই,
ব্যাকুল হইয়া ভাবি তাই,
ধূপের মাঝে গাছের ছাওয়ায় বুঝি সে লুকাইয়া
"কুচি কুচি" খেইলবার্ লাগ্ছে আমারে ঠকাইয়া॥
পাকে যখন পানির লহর লাওরের দিকে আসে,
ঠিক যেন তার মুখখানা ঐ চান্দের নাগাল্ ভাসে॥
দউর‍্যা আসে হামা টাইনা,
ধত্তি গিয়া আর যে পাইনা,
খইসা পরে হাতের বইঠা কাইন্দা উঠে প্রাণ
এত আছিল কোথায় গেল মোর কলিজার জান॥
রাইতে যখন আসমানেতে জইলা উঠে তারা
বাতাস যেন ঐখান থাইকা আইনা দেয় তার সাড়া॥
লায়ের ছৈয়ে শুইয়া থাকি
খোয়াবে মুই তারেই দেখি
আদর কইরা হাত বারাইয়া কোলে আসতি চায়
ব্যাকুল প্রাণে ধত্তি যাই মুই নিদ্রা টুটি যায়॥
খোদা! মেহের বান! এট্টামাত্র শেষাশেষি দিয়াছিল ফুল
ফুটবার আগেই তুইলা নিলা—বংশই নির্ম্মূল—॥
এ লায় মোর কিছুই নাই,
এখন খালি যাবার চাই,
দেহ আমার হৈয়া গিছে ভাঙ্গা লাওয়ের ছইটা,
কল্জি আমার ভাইঙ্গা গিছে খইসা পরে বৈঠা॥

"শিখি"

কাজের কথা
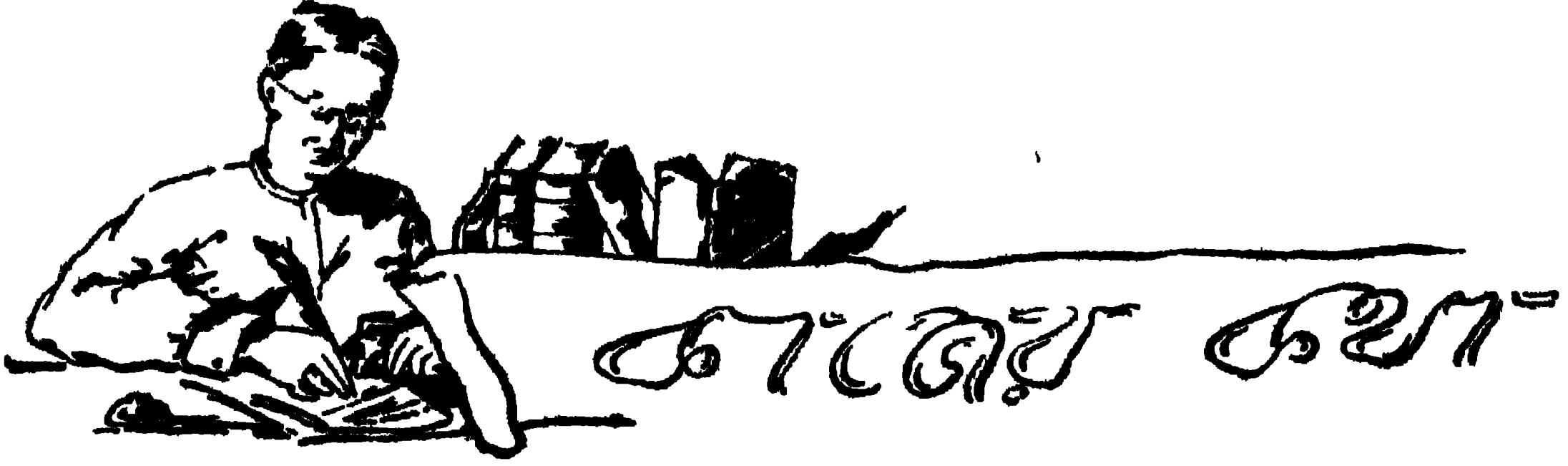
কংগ্রেস ও দেশ—দেশের কর্ম্মপন্থা কংগ্রেসে নির্দ্ধারিত হইবে, কংগ্রেসের বাণী অনুসারে সমগ্র ভারত চলিবে, নিখিল ভারতের জাতীয় জীবন ও রাজনৈতিক জীবনকে চালাইয়া লইবেন কংগ্রেসের সভ্যমণ্ডলী। কংগ্রেসের এ পরিকল্পনা সুন্দর—কংগ্রেস সভ্যদের এ সম্মান রাষ্ট্রনায়কের যোগ্য সম্মান। জাতীয় জীবনের আশা, পরম সৌন্দর্য্যসম্পদ এই কংগ্রেস। ভারতের এই কোটী কোটী নরনারীর নিরাশায় আশা, ক্ষুধায় অন্ন কংগ্রেসকে দিতে হইবে। দেশকে বুঝাইতে হইবে যে কংগ্রেস তাহাদের বড় আপন, কংগ্রেস তাহাদের বাঁচাইবার ব্যবস্থাই করিতেছে। এই বিরাট দেশের নানা বর্ণের নানা জাতির অক্ষর পরিচয়হীন নরনারীর মধ্যে কংগ্রেস কি করিয়া নিজ প্রভাব বিস্তার করিবে? কংগ্রেস ভারতবাসী সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যত প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে ভারতের জাতীয় জীবন ততই উন্নত হইবে। কংগ্রেসের দায়ীত্ব ও সম্মান প্রতিষ্ঠা ঐখানেই। নিখিল ভারতময় একটা জাতীয় কর্ম্মধারা কংগ্রেস যদি চালাইতে পারেন তবেই ভারতের স্বরাজের ভিত্তি স্থির হয়। ভারতের মত এমন বিরাট জনবহুল দেশে তেমন একটি জাতীয় কর্ম্মধারার নির্দ্দেশ ও তদনুসারে দেশকে পরিচালনা করা সহজ নয় বলিয়াই স্বরাজ স্বরাজ করিয়া হা হুতাশ করিলেও সত্যি স্বরাজ আলেয়ার আলোর মত কোথায় উধাও হইয়া যায়। কংগ্রেস ও দেশের যোগসূত্র স্থাপনার ভার জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সভাপতির উপর—আগামী বেলগাঁও কংগ্রেসের সভাপতি মহাত্মা গান্ধী দেশকর্ম্মের ধারা নির্দ্ধারিত করিবেন। সর্ব্বদলের—সকল মতের নেতৃবৃন্দ মহাত্মার আহ্বানে নিখিল ভারত জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন—[illegible] সমগ্র ভারত হয়তো আবার কংগ্রেস কর্ম্মের বিদ্যুৎ প্রবাহে উল্লসিত হইয়া উঠিবে। কংগ্রেস ও দেশের যোগাযোগ—কংগ্রেসের অসামান্য সম্মান—দেশের মুক্তি, স্বরাজ সবই নির্ভর করিতেছে কংগ্রেস সভ্যদের, ভারত রাষ্ট্রনায়কদের দেশাত্মবোধ, মর্য্যাদা জ্ঞান—দেশের সত্যি অবস্থা সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও নিজেদের বিবেক বিচারের উপর। নবযুগের প্রেরণা চাহিতেছে দেশ কংগ্রেসের মধ্য দিয়া—কংগ্রেস অগণিত জনসঙ্ঘের আশা আর বুঝি নিরাশ করিতে পারিবে না।

আদর্শ চরিত্র গুরুদাস :—গত মঙ্গলবার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র পুরুষ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পঞ্চবার্ষিকী মৃত্যু তিথি গিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য গুরুদাস নিজ জীবনে করিয়াছিলেন। আচারে ব্যবহারে, পারিবারিক জীবনে সামাজিকতায় ইনি খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। এমন মানুষের মত মানুষ যাহা চলিয়া যাইতেছে তেমন আর দেশে আসিতেছে না দেশের ইহা সৌভাগ্যের লক্ষণ নহে। আজ গুরুদাসের পঞ্চবার্ষিকী শ্রাদ্ধ বাসরে দাঁড়াইয়া আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মচ্যুতি :—কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এখন রাজবন্দী। জেলেও কিছুদিন তাঁহাকে কর্পোরেশনের কাজকর্ম্ম দেখিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু রেগুলেশন ও কর্পোরেশন বুঝি একসঙ্গে চলিতে পারে না তাই সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট সে সুবিধাও প্রত্যাহার করিয়াছেন। এ সুবিধা প্রত্যাহারের মানে যথাসম্ভব শীঘ্র কলিকাতা কর্পোরেশনকে নূতন প্রধান কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে। কি দোষে সুভাষবাবু দোষী, কি দোষে অভিযুক্ত হইয়া তিনি রাজবন্দী কর্পোরেশন তাহার কিছুই জানিল না অথচ তাঁহাকে সরাইয়া তাঁহার স্থানে নূতন লোক নিতে হইবে কর্পোরেশনের। কর্পোরেশন সদস্যগণ ইহাতে ক্ষীণ আপত্তি তুলিতেছেন কিন্তু এমন আপত্তিতে সরকারী ব্যবস্থার অন্যথা হইবে না। সুভাষবাবুর প্রতি সরকারের

ব্যবহারে যদি কর্পোরেশন সভ্যদের আপত্তি থাকে তবে একযোগে তাঁহারা সরকারকে সুভাষবাবুর দোষের প্রমাণ দিতে বলুন সরকার তাহা না দেন তাঁহারা অমন সম্মানের কর্পোরেশন সভ্যগিরী হইতে অব্যাহতি লাভ করুন। মেয়র, অলডারম্যান, কর্পোরেশনের প্রতি সভ্য যদি এমন সম্মানের পরিচয় দিতে পারেন তবে তবু দেশে একটু সাড়া পড়িতে পারে। এভাবে সংবাদপত্রে অসন্তোষের মৃদু গুঞ্জনে ফল কি?

সেণ্ট এণ্ড্রুজ ভোজ ঃ—এই স্কচ মহোৎসব রজনীতে বাংলার লাটসাহেব হইতে অনেক বড় বড় সাহেব সুবা পর্য্যন্ত দেশের কথা গাহিয়াছেন। দেশীয় সংবাদপত্র গুলি এই মহোৎসবের পালা গাহিতে ও তাহার সুরূপ ও বিরূপ সমালোচনা করিতে অনেক পত্র ও কালী ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু এই ভোজের বক্তৃতায় বাংলার শাসনভার গবর্ণরাই বা দেশের কতটা উপকার করিলেন আর দেশীয় সমালোচকেরাই বা কতটা উপকার করিলেন তাহাই দেখিবার জিনিস! বোধহয় কোনপক্ষেই কিছু নয়—যেমন বছর বছর হইয়া থাকে এবারেও তেমনি একটি পালা গাওয়া হইল।

দেশের অবস্থা—শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত একজন উচ্চাঙ্গের বাঙ্গালী সিভিলিয়ান। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটী করিবার সময় তিনি নিজে উৎসাহী হইয়া জেলার কর্ম্মক্ষমদের মধ্যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাদের সম্মুখে আদর্শ ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এ জন্য দেশে তাঁহার বেশ নাম হইয়াছে। জেলার কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া কলিকাতার সেক্রেটারিয়েটে আসিয়া কি ভাবে তিনি দেশের উন্নতিকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন তাহা দেখিবার ইচ্ছা আমাদের ছিল। গুরুসদয়বাবু সম্প্রতি কোন কোন ক্লাবে ও ছাত্র সমাজে দেশের উন্নতি কি ভাবে হইতে পারে সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেছেন। তাঁহার কথাগুলি বিচার যোগ্য, আলোচনার যোগ্য। বাংলা দেশের শিক্ষিত সভ্য সমাজ আজকাল কি হইতেছে-কেন তাহারা দিন দিন নিরাশার সাগরে ডুবিতেছে ও দেশকে মজাইতেছে তাই দত্ত মহাশয় অতি মিষ্ট ভাষায় মোলায়েম করিয়া ইয়োরোপীয় প্রথায় বাংলার শিক্ষিত সমাজকে শুনাইতেছেন। জাতীয় অবনতির দুঃখ দুর্দ্দশার মূল কারণ অনুভব করিয়া সেই কথা শিক্ষিত বাঙ্গালীকে শুনাইয়া তাহার প্রতিকারের পথও দেখাইতেছেন। শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের আজ মেরুদণ্ড নাই—শিক্ষা দোষে কর্ম্ম ক্ষমতা হারাইয়া তাহারা দিশেহারা, এ সময়ে জীবন মরণের সমস্যার কথা বাঙ্গালী অবশ্যই শুনিবে।

ছাত্র সমাজ—গুরুসদয়বাবু সে দিন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র সমাজে বক্তৃতা করিবার কালে বলিয়াছেন—দেশের লোকে না খাইয়া মরিতেছে তবু চাকুরীর মোহ ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। ভাল শিক্ষিত লোকও ৩০৲ মাইনের চাকরীতে খুসী থাকিবে তবু আর কোন কাজ করিবে না। নিজেকে খাটাইয়া পয়সা অর্জ্জন করিব সে উৎসাহ আমাদের নাই। লঙ্কায় ৪০৲ মাইনের কেরাণী মেলে না। এতেই বোঝা যায় লঙ্কাদ্বীপ ব্যবসায়ে বাংলার চেয়ে কত উন্নত। বাংলার লোকদের চাকুরীই নির্ভর কারণ তারা নিজেদের খাটাতে জানে না।

যুবক সমাজের দায়ীত্ব হীনতা—বাংলার যুবকদের চাকুরী করিবার মনোবৃত্তি একবারে ছাড়িতে হইবে। প্রত্যেকেরই যে একটা দায়ীত্ব আছে—এ জ্ঞান তাদের জন্মান চাই, এই জ্ঞান জন্মিলেই তাহারা উন্নতির পথে যাইবে। যুবকদের কর্ম্মকে সম্মান করিতে হইবে, কোন সৎকাজই নিন্দনীয় নয়—এ বুঝ তাহাদের চাই। ইয়োরোপীয় জাতির শ্রীবৃদ্ধির কারণই এই যে তাহারা কর্ম্মের সম্মান রাখিতে জানে। ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ নাই—তাই আমরা দুর্ব্বল। পরিবার প্রতিপালনের যোগ্য না হইয়া যুবকদের বিবাহ করা উচিত নহে। নিজের দায়ীত্ব মিটাইবার জন্য দেশের উন্নতির জন্য সকলেরই অর্থোপার্জ্জনে মন দেওয়া উচিত—যে ভাবেই হোক সৎপথে সেই অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে। চাকুরীতে তাহা হইবার উপায় নাই। চাকুরীর মনোবৃত্তি মানুষকে হীন করিয়া ফেলে চাকুরীপ্রিয় শিক্ষিত দ্বারা নিজের বা দেশের কোন উন্নতিই সম্ভবপর নয়। ইহাই বড় চাকুরে দত্ত মহাশয়ের মত। বাংলার আশা ভরসা তরুণ সমাজের এই কথাগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে।

ডাক্তার মল্লিক পরলোকে ঃ—ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক মহাশয়ও অকালে পরপারের যাত্রী হইয়াছেন। বাঙ্গালী সেনাদল গঠনে ইনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। রণপ্রিয় অনেক বাঙ্গালীই ইঁহার কথা স্মরণ করিবে।

পুরাকালের রঙ্গালয়

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

রঙ্গালয় এখানকার তৈরী একটা নতুন জিনিস নয়। রঙ্গালয় অতি প্রাচীনকালের সৃষ্টি। গ্রীস, রোম ও ভারত—এই তিন দেশেরই রঙ্গালয় খুব পুরাণ। চীন ও এশিয়ামাইনরের রঙ্গালয় কম দিনের নয়। পুরাতন গ্রীস ও রোমের দুইটী সাধারণ স্থান বড় প্রিয় ছিল—একটী মন্দির, অপরটী রঙ্গালয়। এদুটী জায়গায় গ্রীক ও রোমানদের দুরকম ক্ষুধা মিট্‌ত। প্রাচীন গ্রীক রঙ্গালয়ের দুটী ভাগ ছিল। একটী Orchestra, অপরটী Theatron [থিয়েটার] (theatre) রঙ্গালয় তৈরী করবার জন্য প্রায়ই পাহাড়ের ঢালু জায়গা পছন্দ করা হ'ত। দর্শকদের বসবার আসন পাহাড় কেটে করা হ'ত। এই আসনগুলি শ্রেণী বদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট থাকত। আসনগুলি এমনই ক'রে তৈরী যে, একটী আসন-শ্রেণী আর একটীর চেয়ে উঁচু। এতে দর্শকদের দেখবার সুবিধা হ'ত। আসন-শ্রেণীগুলি কেন্দ্র থেকে আরম্ভ করে' ক্রমশঃ চক্রাকারে বেড়ে চলেচে। প্রত্যেক চক্রাংশের পরিমাণ একটী সম্পূর্ণ বৃত্তের ⅓ অংশ। এইগুলির মধ্যে মধ্যে আবার যাতায়াতের জন্য খানিকটা করে' জায়গা ফাঁক রাখা হ'ত। যাতায়াতের পথগুলির দুই পাশে বসবার আসনগুলি (bench) পরস্পর সমান্তরাল রেখায় থাকৃত। যখন রঙ্গালয়ে ভিড় হ'ত, দর্শকরা বসবার জায়গা না পেয়ে অগত্যা যাতায়াতের পথগুলি অধিকার করে' দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখতে বাধ্য হ'ত। সকলের নীচের বা সম্মুখের আসনশ্রেণী থেকে সকলের উঁচু বা একবারে পিছনের আসনশ্রেণীর মাঝে মাঝে সিড়ির ব্যবস্থা থাকত। দর্শকদের এই বসবার জায়গার সামনেই একটা বৃত্তাকার ক্ষেত্র থাকত। এরই নাম Orchestra। এই জায়গাটা ঐকতানবাদন'ও নৃত্য প্রভৃতির জন্য নির্দ্দিষ্ট। এই ক্ষেত্রটী তক্তা দিয়ে ঢাকা, এর মধ্যস্থলে একটী উচ্চ মঞ্চের উপর দেবতা Dionysusএর বেদীর (thymele) স্থান। কখন কখন এটী আবার সঙ্গীত সম্প্রদায়ের নেতা, বংশীবাদক বা উত্তর-সাধকের দ্বারা অধিকৃত হ'ত। Orchestraর পিছনেই রঙ্গমঞ্চ বা Stage। এটী কিঞ্চিৎ উচ্চতর ভূমির উপর অবস্থিত। সম্ভবতঃ অভিনয়ের কার্য্যারম্ভে বাদক-সম্প্রদায় Orchestra থেকে রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করত। রঙ্গমঞ্চের পিছনে কয়েকটীদ্বারযুক্ত একটী প্রাচীর থাকৃত। একে তারা বল্‌ত Skene (Lat Scena) এবং Orcehstraর মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম ছিল Proskenion (proscenium)। কথাবার্ত্তার সময় এইটী অভিনেতাদের দাঁড়াবার জায়গা। দৃশ্যপট বা Scene বল্‌তে যা বোঝায়, তখনকার থিয়েটারে সেরূপ কিছুই ছিল না। তবে যে স্থান সম্পর্কে অভিনয় চল্‌চে এইটুকু নির্দ্দেশ করবার জন্য তখনকার Scenaকে চিত্র-বিচিত্র করা হ'ত। রঙ্গালয়ের কোন অংশ ছাদ দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল না। কাজেই অভিনয়ের সময় বৃষ্টি হ'লে
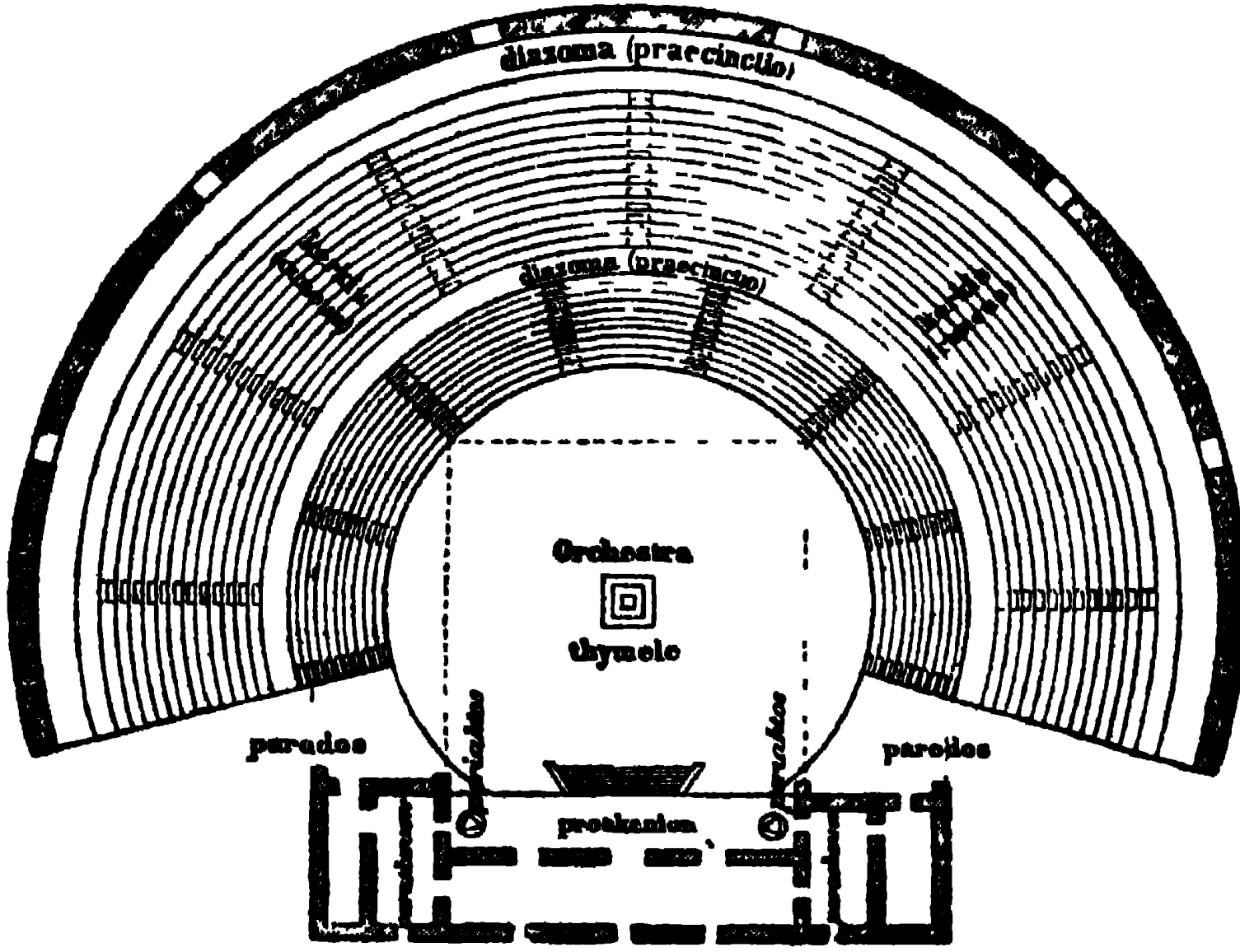
গ্রীক্ থিয়েটারের নকসা

দর্শকদের বাধ্য হয়ে কিছুক্ষণের জন্য রঙ্গালয়ের চারিপাশের বারান্দার নীচে আশ্রয় নিতে হ'ত। অভিনয় প্রায় দিনের বেলাই হ'ত। সুতরাং রৌদ্র নিবারণের জন্য সময়ে সময়ে চাঁদোয়ার ব্যবস্থা থাক্‌ত। গ্রীক থিয়েটারের নির্ম্মাণ-পদ্ধতির একটী বিশেষ দোষ ছিল। দর্শকদের মধ্যে যাদের সকলের পিছনে বস্‌তে হ'ত, তারা সাম্‌নের কিছু দেখ্‌তে পেত না, তাদের নজর রঙ্গমঞ্চের পাশের দিকে পড়্‌ত। রঙ্গমঞ্চের কতকটা দর্শকদের পিছনে পড়্‌ত। গ্রীক রঙ্গালয়গুলি খুব বড় ছিল। এত বড় করবার উদ্দেশ্য সহরের সমগ্র অধিবাসীকে এক সঙ্গে অভিনয় দেখবার সুযোগ দেওয়া। বিরাট্‌ রঙ্গালয়ে বহু লোকের স্থান সঙ্কুলান হ'ত বটে, কিন্তু অতি অল্প লোকই অভিনেতাদের কথা শুনতে বা তাদের মুখের ভাবভঙ্গী সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পেত। অনেককেই এ সুখে বঞ্চিত থাক্‌তে হ'ত। তবে তাদের রঙ্গালয়ের এই সব ত্রুটি আমাদের যতটা অসুবিধাজনক ব'লে মনে হয়, তাদের তখন ততটা বোধ হ'ত না। এর কারণ এই যে, আমরা নাট্যকে এখন যেভাবে বুঝ্‌তে অভ্যস্ত হয়েচি, তারা তখন সেভাবে বুঝ্‌তে অভ্যস্ত ছিল না। প্রাচীনকালের অভিনেতারা ধাতুনির্ম্মিত এক রকম মুখস পর্‌ত, এটী প্রকারান্তরে Speaking trumpetএর কাজ কর্‌ত। অত্যন্ত দূরের দর্শকেরা অত্যন্ত ছোট দেখ্‌বে ব'লে, একটু বড় দেখাবার জন্য তারা খুব উঁচু গোড়ালীওয়ালা জুতা পায়ে দিয়ে শরীরটাও padএর সাহায্যে বৃহৎ করে' রঙ্গমঞ্চে নাম্‌ত।

আধুনিক থিয়েটারের পূর্ব্বাবস্থায় যেমন সকল অভিনেতাই পুরুষ ছিল, গ্রীক থিয়েটারেও সেইরূপ অভিনয় কেবল পুরুষেই করত। স্ত্রীলোকেরা তখন থিয়েটার দর্শনে বঞ্চিত ছিল; তবে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় দেখ্‌তে যাবার বাধা ছিল না। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে তারা পৃথক্‌ স্থানে বসে' অভিনয় দেখ্‌ত।

অভিনয় প্রাতঃকালেই আরম্ভ হ'ত। পর পর ত' তিনটা নাটকের অভিনয় হ'ত। শেষে একটা প্রহসন হয়ে অভিনয় শেষ হয়ে যেত। পুরা অভিনয় শেষ হ'তে দশ বার ঘণ্টা সময় লাগ্‌ত।

সম্মুখের আসন শ্রেণীতে কেবল উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, পুরোহিত ও রাজদূতেরাই বসতে পেত। যারা বেশী পয়সা খরচ করতে পার্‌ত, তারাই অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসনে বসবার অধিকারী হ'ত। কিন্তু পেরিক্লিসের সময় থেকে গরীবেরা বিনা খরচে থিয়েটার দেখ্‌তে পেত। সাধারণ কোষাগার থেকে তাদের খরচ যোগান হ'ত। শেষে নগরবাসী সকলেই সেই সুবিধা ভোগ করে'ছিল।

প্রায় ৪৯৬ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে এথেন্স্‌ নগরে প্রথম পাথরের থিয়েটার নির্ম্মিত হয়। এর পর থেকে চারিদিকে থিয়েটারের ধূম লেগে গেল। গ্রীস্‌, এসিয়া মাইনর এবং সিসিলির সকল রঙ্গালয়ই এথেন্সের রঙ্গালয়ের অনুকরণে গঠিত হয়েছিল। তবে এগুলিতে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনও সাধিত হয়েছিল।

রোমে ২৪০ পূঃ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঠিক অভিনয় হয় নাই। এই সময় একটী কাঠের রঙ্গমঞ্চও তৈরী হয়। প্রত্যেকবার অভিনয়ের পর আবার সব ভেঙ্গে ফেলা হ'ত। ১৯৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে সেনেটররা রঙ্গমঞ্চের অব্যবহিত পরেই বস্‌তে পেত। কিন্তু তাদের নিরূপিত কোন আসন ছিল না। যাদের বস্‌বার দরকার হ'ত তারা নিজেদের চেয়ার আন্‌ত। কখন কখন সরকারের হুকুমে বসে' অভিনয় দেখা বন্ধ হ'ত। ১৫৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট আসনযুক্ত স্থায়ী থিয়েটার করবার চেষ্টা হয়; কিন্তু সেনেটের আদেশে থিয়েটার ভেঙ্গে ফেলতে হয়। ১৪৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে গ্রীস বিজয়ের পর গ্রীকদের অনুকরণে থিয়েটার নির্ম্মিত হয়। এগুলিও কাঠের। একবারের বেশী তাতে অভিনয় হ'ত না। পাথরে তৈরী প্রথম রোমান থিয়েটার ৫৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে হয়। Pompey এই থিয়েটার করেন। ১৭,৫০০ বসবার আসন এতে ছিল।
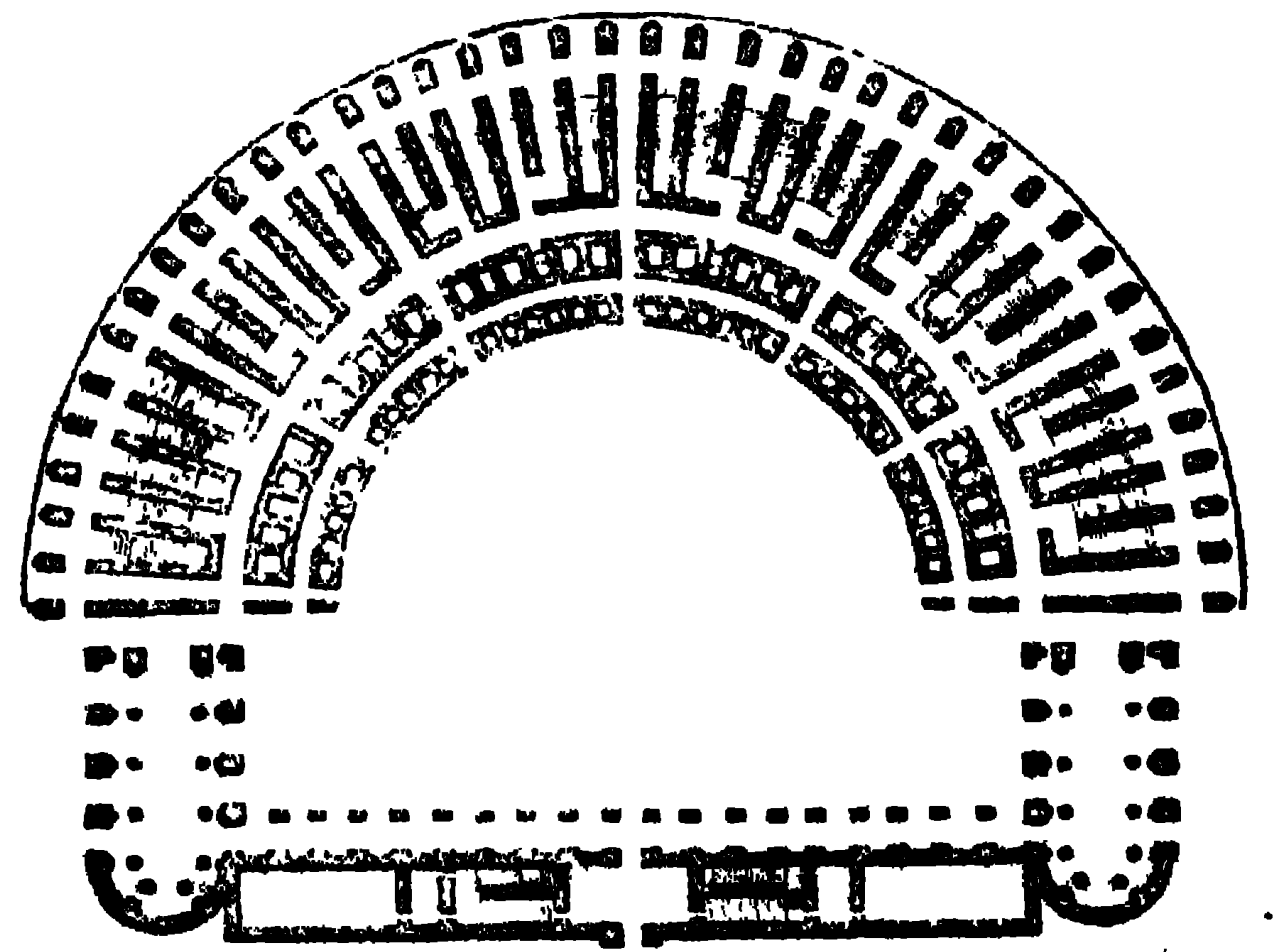
মারসেলাসের থিয়েটারের নক্সা

১৩ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে অগস্টস্ (Augustus) তাঁর ভাইপো মারসেলাসের (Marcellus) নামে একটী থিয়েটার করেন। এই থিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ আজও বর্ত্তমান। উপরে তার একটী groundplan দেওয়া গেল।

গ্রীক ও রোমান থিয়েটারে সাদৃশ্যও যেমন ছিল, পার্থক্যও তেমনই ছিল।

পার্থক্য ছিল দর্শকদের স্থান নিয়ে। গ্রীকদের মত এটীও সমান্তরাল পথ ও সিঁড়ি দিয়ে বিভক্ত ছিল। তবে এই ভাগগুলো সমান ভাবে গ্রীকদের মত ছিল না, ছিল অর্দ্ধবৃত্তাকারে। আর এর ব্যাসের শেষে রঙ্গমঞ্চের সামনের প্রাচীর ছিল। গ্রীকরা অর্দ্ধবৃত্তের চেয়ে বড় করে' এটাকে তৈরী করত। রোমানদের থিয়েটারে সর্ব্বোচ্চতলের স্তম্ভগুলার আবরণের উচ্চতা সমান ছিল।

ষ্ট্রাক্ সেগেষ্টাতে যে রোমান থিয়েটার ছিল তার অঙ্গগুলি জুড়ে' পুনঃস্থাপন করেছেন। নিম্নে দক্ষিণ পার্শ্বে এই থিয়েটারের প্রতিচ্ছবি দেওয়া হইল :—

অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতে নাট্যপদ্ধতির একটী গল্প আছে। ত্রেতাযুগে দেবতারা সকলে ব্রহ্মার নিকট যান। তাঁরা তাঁর কাছে চক্ষু ও কর্ণের সমান প্রীতিপদ কিছু প্রার্থনা করেন। এটী হবে পঞ্চম বেদ। তবে এখানি চতুর্ব্বেদের মত দ্বিজগণের একচেটিয়া হ'তে পারবে না, শূদ্রেরাও এর অধিকার পাবে। ব্রহ্মা তখন কোমর বাঁধলেন। আবৃত্তি করবার মত ধাতু নিলেন ঋগ্বেদ থেকে—সামবেদ থেকে গানের উপযোগী অংশ; যজুর্ব্বেদ থেকে নিলেন কুশীলব-কলা, আর রসভাব গ্রহণ করলেন অথর্ববেদ থেকে। তারপর তিনি বিশ্ব-কর্ম্মাকে রঙ্গালয় নির্ম্মাণ করতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভরতকে তাঁর সৃষ্ট কলাকে কাজে লাগাবার জন্য উপদেশ দিয়ে দিলেন। ব্রহ্মার এই অভিনবসৃষ্টি দেবতারা আনন্দে গ্রহণ করলেন। এইবার নাট্যকলার রচনায় মহেশ্বর ও বিষ্ণুর পালা। শিব দিলেন তাঁর 'তাণ্ডবনৃত্য'। পার্ব্বতীও চুপ করে' রইলেন না—তিনি তাঁর মৃদু নৃত্য 'লাস্য' প্রদান করলেন। বিষ্ণু চারিটী নাটকীয় পদ্ধতি আবিষ্কার করে' নাট্যকলার প্রবর্ত্তন করলেন। তখন ভরতের উপর ভার হ'ল—তিনি নাট্যশাস্ত্ররূপ এই দৈব পঞ্চম বেদ পৃথিবীতে নিয়ে যান।
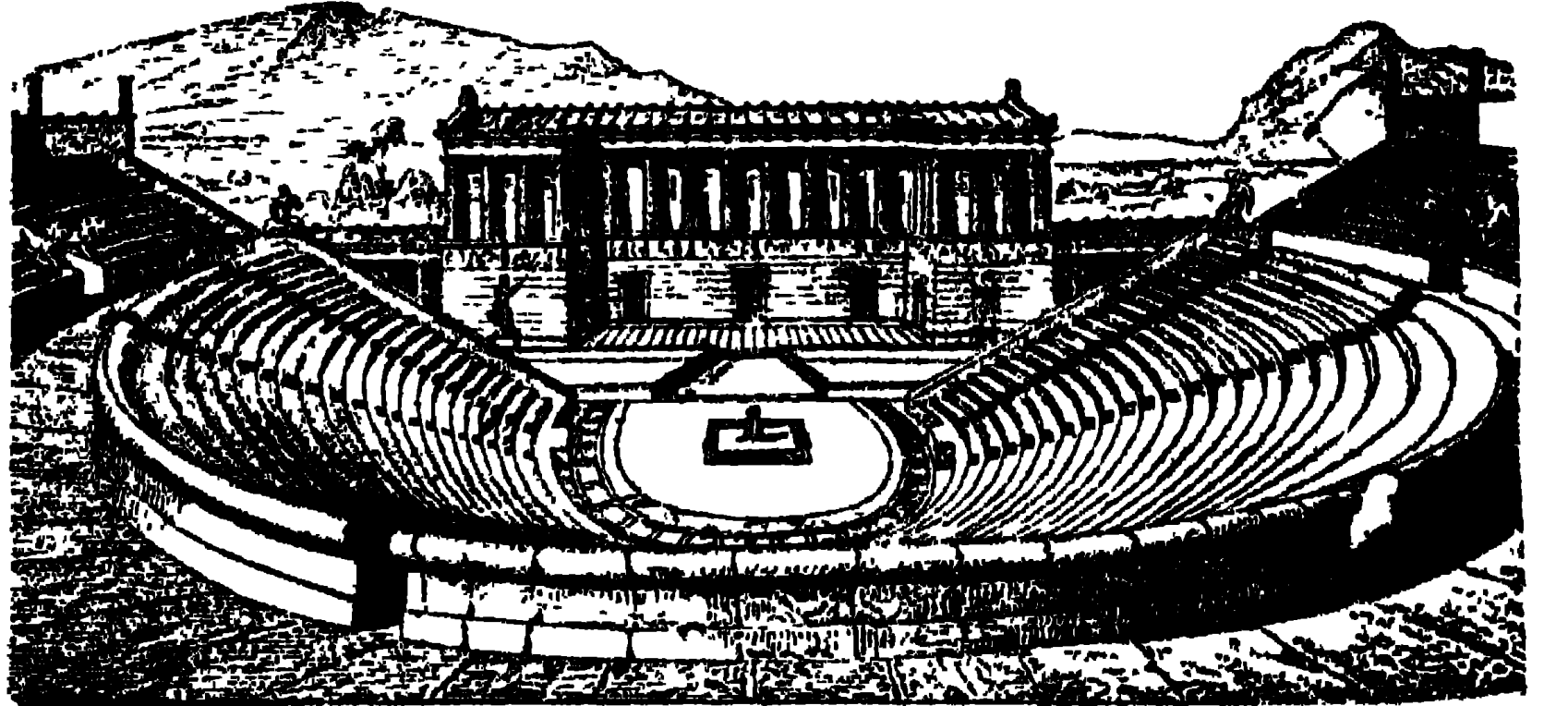
সঙ্গীতদামোদরে এই গল্পের একটু রকমফের আছে। এই গল্পে দেবতারা ব্রহ্মার নিকট না গিয়ে ইন্দ্রই যান। গল্পাংশে অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য নাই।

প্রচলিত প্রবাদ এই যে, ব্রহ্মা নাট্যপদ্ধতির প্রথম প্রবর্ত্তক। ভরত ঋষি ব্রহ্মার প্রণালী অবলম্বন করে' বনে ঋষিদের শিক্ষা দেন, নাট্যশাস্ত্র ও প্রণয়ন করেন। স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় অভিনয় দেখাবার জন্য তিনি উর্ব্বশী মেনকাকে নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত শিক্ষা দেন। পৃথিবীতে ইনিই নাট্যের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা। তাই নাটকের নাম "ভরত-সূত্র", নটের নাম "ভরত-পুত্র"। ভরতের নাট্যশাস্ত্র খুব প্রাচীন। কত প্রাচীন তা বলা যায় না। তবে এতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্য্যন্ত যে অনেকের হাত পড়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন ভারতে একটা করে' সঙ্গীতশালা থাকবার রীতি ছিল। রাজ-প্রাসাদে বা দেবমন্দিরে অভিনয়ের ব্যবস্থা হ'ত। প্রাচীন নাটক ও কথায় রাজপ্রাসাদে নৃত্যশালা ও সঙ্গীতগৃহের অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায়।

ষ্ট্রাক্ (Strack) সংরক্ষিত সেগেষ্টার

এইখানে রাজঅন্তঃপুরবাসিনীগণ নৃত্য ও সঙ্গীতকলা শিক্ষা করতেন। এই দুটীর কোনটী অনায়াসে অভিনয় ব্যাপারে ব্যবহৃত হ'তে পারে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যপ্রকরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আছে। এই গ্রন্থ অভিনয়ের জন্য তিন রকমের রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা দিয়েছেন :—

১। প্রথম পদ্ধতির রঙ্গালয় দেবতাদের জন্য। এর পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১০৮ হাত।

২। দ্বিতীয় পদ্ধতির রঙ্গালয় সমচতুরস্র (rectangular) দৈর্ঘ্য ৬৪ হাত, প্রস্থ—৩২ হাত।

৩। তৃতীয় পদ্ধতির রঙ্গালয় ত্রিকোণ (triangular) ৩২ হাত লম্বা।

দ্বিতীয় প্রকারের রঙ্গালয়ই সাধারণে পছন্দ করে।

রঙ্গালয় দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ দর্শকদের বসবার জন্য, অপর ভাগে রঙ্গ (Stage)—এখানে অভিনয় হয়। দর্শকদের স্থান আবার স্তম্ভ দিয়ে চিহ্নিত করা। সম্মুখে সাদা রঙের থাম—এখানে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেহ বস্‌তে পারবে না। তারপর ক্ষত্রিয়দের জন্য লাল রঙের থাম। উত্তর-পশ্চিমে পীত বর্ণের স্তম্ভ—এখানে বৈশ্যরা বসবে। উত্তর-পূর্ব্বে নীল-কৃষ্ণ স্তম্ভ, এটা শূদ্রদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। বসবার আসনগুলি কাঠের ও ইটের। এগুলি থাক থাক করে' সারি দিয়ে সাজান থাকত। সামনে রঙ্গের (Stage) পাশে চারিটী স্তম্ভের উপর বারাণ্ডা—এটীও বোধহয় দর্শকদের জন্য। দর্শকদের সম্মুখে 'রঙ্গ' (Stage) চিত্র ও মূর্ত্তি দিয়ে সাজান। এটী একটী বর্গক্ষেত্র—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুইই ৮ হাত করে'। রঙ্গের শেষ দিক্‌টার নাম "রঙ্গশীর্ষ"। রঙ্গশীর্ষ নানা রকম মূর্ত্তি দিয়ে সাজান।

রঙ্গের পিছনে 'যবনিকা'- এটী একটী রঙ্‌ করা পর্দ্দা। এর নাম 'পটি' বা 'অপটি'। আরও দুটী নাম আছে, 'তিরস্করণী'—'প্রতিশিরা'। যখন একজন তাড়াতাড়ি প্রবেশ করে, অপটি বেশ জোরে টেনে নেওয়া হয়; এর নাম "অপটিক্ষেপ"। পর্দ্দার পেছনে "নেপথ্য-গৃহ"। এটী সাজঘর—অভিনেতাদের অধিকৃত। নেপথ্যগৃহ থেকে দৈববাণীর ব্যবস্থা হয়। এক সঙ্গে অনেকের উচ্চকণ্ঠধ্বনি প্রভৃতি এইখান থেকেই করা হয়ে থাকে। যে সকল অভিনেতার রঙ্গে উপস্থিতি অসম্ভব অথবা অনভিপ্রেত তাদের কণ্ঠস্বর এইখান থেকে উচ্চারিত হ'ত। যবনিকার রঙ্‌ সকল সময়েই লাল হয়ে থাকে। কোন কোন মতে যবনিকার রঙ্‌ প্রয়োজন অনুসারে নানা রকমের হ'ত। 'আদিরসে শুভ্র, বীররসে পীত, করুণরসে ধূম্র, অদ্ভুতরসে হরিৎ, হাস্যরসে বিচিত্র, ভয়ানকরসে নীল, বীভৎসরসে ধূমল ও রৌদ্ররসে রক্ত'বর্ণের ব্যবস্থা কেহ কেহ করতেন। কিন্তু কোন মতে আবার যবনিকা সকল ক্ষেত্রেই লাল। আজকাল অভিনয়ারম্ভের পূর্ব্বে প্রতি অঙ্কের শেষে যবনিকা দিয়ে রঙ্গের সম্মুখভাগ ঢেকে রাখা হয়। পুরাকালে যবনিকা দুইখণ্ডে বিভক্ত থাকত, কোন ভূমিকায় অভিনেতার প্রবেশের সময় যবনিকার দুটীখণ্ড দুইটী সুন্দরী কুমারী দুই পাশ দিয়ে গুটিয়ে নিত। এখনকার মত কপিকলের সাহায্যে উদ্ধে তুলে দেওয়া হ'ত না। এই সুন্দরীদ্বয়ের কাজ হচ্ছে যবনিকা ধরে' থাকা। নেপথ্য বল্‌তে যদি রঙ্গের চেয়ে উন্নত কোন স্থান কেহ বোঝেন তাহ'লে তিনি ভুল করবেন। কেন না, ব্যুৎপত্তি অনুসারে (নি-পথ) নেপথ্য বল্‌তে নিম্নগামী পথই বোঝায়। নেপথ্য রঙ্গাপেক্ষা নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত।

সাধারণতঃ নেপথ্য রঙ্গের কিছু উঁচু হয়। তাই অভিনেতার রঙ্গে প্রবেশ করার নাম—"রঙ্গাবতরণ।" রঙ্গাবতরণ বল্‌তে সহসা মনে হ'তে পারে, যেন কোন উচ্চস্থান থেকে রঙ্গে নেবে আসা বোঝাচ্ছে। এটী ভুল।

রঙ্গ থেকে নেপথ্যে যাবার দুটী দ্বার থাক্‌ত। Orchestraর স্থান এই দ্বারদ্বয়ের মধ্যেই ছিল। গ্রীক রঙ্গালয়ের নেপথ্যে যাবার তিনটী দ্বার ছিল, পরে এই তিনটী আবার পাঁচটীতে পরিণত হয়েছিল। চীন দেশের রঙ্গালয় এদেশেরই অনুরূপ ছিল। এদেরও রঙ্গে দুইটীমাত্র দ্বার থাক্‌ত, তার মধ্যে একটী প্রবেশের রাস্তা অপরটী বাহিরে যাবার পথ। কিন্তু চীনা রঙ্গালয়ে যবনিকার ব্যবহার ছিল না।

ষ্টার থিয়েটার

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজগণের সম্বন্ধে অভদ্র মন্তব্য।

গত সপ্তাহের এক পয়সার শিশির রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজগণ সম্বন্ধে বেশ একটু গরম গরম "বক্তব্য' ঝাড়িয়াছেন। সহযোগী কিছুদিন পূর্ব্বে একটি প্রকাশ্য রঙ্গালয়কে নিরপেক্ষ সমালোচনা অছিলায় অনেক অযাচিত উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা কতদূর গড়াইয়াছিল তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। তারপর পরেশনাথ শোভাযাত্রা উপলক্ষে কলেজের ছাত্রগণের কর্ণমর্দ্দন করিতেও গিয়াছিলেন; পর সপ্তাহে প্রতিবাদের ধাক্কায় একটু বিনাইয়া "সাপও না মরে লাঠিও না ভাঙ্গে" এমন ভাবে সুর নরম করিতে হইয়াছিল। এবার তাঁহারা রামকৃষ্ণমিশনের শিক্ষিত, ত্যাগী, সেবাধর্ম্মরত সম্প্রদায়কে একটু সায়েস্তা করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। প্রভু রামকৃষ্ণের ত্যাগের মহিমায় দীক্ষিত সেবাব্রতে আত্মোৎসর্গকারী মহারাজগণ যে রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতে আসিয়া বিলাসব্যসনে ডুবিয়া যাইবেন এই আশঙ্কায় যদি সহযোগীর পরহিতৈষী প্রাণ কাঁদিয়া থাকে তবে আমরা বলিতে পারি যে 'জননবিজ্ঞান' 'কামবিজ্ঞান' প্রভৃতির সূতিকাগারে যে মহাপুরুষেরা সদা সর্ব্বদা বিচরণ করেন তাঁহাদের অপেক্ষা ইঁহাদের অধঃপতনের আশঙ্কা স্বভাবতঃই কম। সহযোগী বলেন "তাঁহারা নাকি অনেক যুবা মহারাজকে প্রায়ই থিয়েটারের বহু মূল্যের আসনে বসিয়া থিয়েটার দেখিতে দেখিয়াছেন।" মহারাজের দুইপার্শ্বের উদ্ধৃত চিহ্ন আমাদের নহে। সহযোগীর উহা দিবার অভিপ্রায় কি এই মহারাজগণের উপাধিকে ব্যঙ্গ করা? আমাদের রাজা-মহারাজ হিসাবে তাঁহারা পার্থিবধনের অধিকারী না হইতে পারেন কিন্তু আর্ত্তকে আশ্রয়দান, দীনের সেবা ও পরোপকার জাত পুণ্যরূপ মহাঐশ্বর্য্যের যাঁহারা অধিকারী তাঁহাদের পক্ষে মহারাজ বিশেষণ কোন প্রকারেই অত্যুক্তি নহে। প্রভু রামকৃষ্ণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতাগণের গুরুস্বরূপ ও বহু মাননীয় ছিলেন—সমস্ত রঙ্গালয়ের অভিনেতা অভিনেত্রীগণ তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন; তাঁহার ভক্তরা যদি অভিনয় দেখিতে রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন তো সেটা রঙ্গালয়ের পক্ষেই শ্লাঘার কথা—এবং খুব সম্ভবতঃ তাঁহারা রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষগণের অনুরোধে বা নিমন্ত্রিত হইয়াই আসেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এরূপ অপমানকর মন্তব্য প্রকাশের অধিকার সহযোগীকে কে দিল জানি না। তাঁহারা কি মনে করেন যে সম্পাদক হইলেই সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হয় ও অন্যের পদমর্য্যাদার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতে হয়। জানি না হয়ত ইঁহাদের আগমন জন্য থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের উচ্চ মূল্যের আসনে স্থান দিতে পারেন নাই—বা তাঁহাদের তদ্বিরের ষোল কলা পূর্ণ হয় নাই—তাই কি এই গাত্রদাহ? তাঁহারা যদি মনে করেন তাঁহারা কাগজে অবলীলাক্রমে যে কোন রঙ্গালয়কে 'বড়' বা 'ছোট' করিতে পারেন বলিয়া তাঁহারা ভিন্ন অপর কেহ রঙ্গালয়ের 'উচ্চ আসনে' বসিবার অধিকারী নহেন তবে সেটা সত্যই দুঃখের বিষয়। তাঁহারা রঙ্গালয়ের সুবিধা পাইবার জন্য যাহা খুসী করুন, আমরা তাহাতে আপত্তি করি না, তবে আমাদের আপত্তি এই যে, এইসব গায়ে পড়িয়া অযথা উপদেশ 'সসম্মানে দান' করাটা সমস্ত বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের পক্ষে কলঙ্ককর। ইহাতে সাধারণের ধারণা, সংবাদ পত্রের সম্বন্ধে অনেক নীচু হইয়া যায় তাই আমরাও 'সসম্মানে' এরূপ আচরণের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। এখন দেখা যাক্ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ তাঁহাদের এই উদ্ধত আচরণ কি ভাবে গ্রহণ করেন। তাঁহারা একটু চাপ্ দিলেই ইহারা হয়তো দায়ে পড়িয়া এই উক্তি প্রত্যাহার করিতে পারেন কিন্তু সে প্রত্যাহারের মূল্য কতটুকু।"

রূপকুমারী- বড়দিনের আনন্দের আব্‌হাওয়ায়-ঢাকা এই ব্যঙ্গ রঙ্গখানি গত বুধবার রজনীতে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয় অতীব সুন্দর ও কৃতকার্য্যতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। পুস্তকের আখ্যানভাগ একটী সাধারণ রূপকথা হইতে গৃহীত হইলেও গ্রন্থকার সুকৌশলে উহার মধ্যেই আধুনিক জীবনের অনেক আতিশয্যকে ব্যঙ্গ কশাঘাতে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বইখানির

অভিনয়কে সফল করিবার জন্য প্রযোজক মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টা, যত্ন ও অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ততার লক্ষণ অভিনয়ে সবিশেষ পরিস্ফুট। অধুনা ইঁহাদের নর্ত্তকী সম্প্রদায়েও একটু বাহ্যিক উন্নতি লক্ষিত হইল অর্থাৎ কয়েকটী চারুদর্শনা নবীনা নর্ত্তকীর নূতন নিয়োজন বুঝা গেল ; কিন্তু নৃত্যগীতের বিশেষ উন্নতি এখনও দেখা গেল না, আশা করা যায় অচিরে তাহাও দেখা যাইবে। কলার নামে যাহারা কলাধিষ্ঠাত্রীকে কলা দেখাইয়া কেবল কলার খোসা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন সেই কলাবিদ্গণের প্রতি নির্দ্দোষ ব্যঙ্গবাণ-বর্ষণে গ্রন্থকার নিপুণ ; সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমালোচকগণের উপরও একহাত লইয়া লইয়াছেন উহার উদ্দেশ্য যদি সমালোচকগণের মুখবন্ধ করা হয় তবে বলিতে পারি যে থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ বড় ভুল করিয়াছেন—যদি এতদিনের পর সত্যই তাঁহাদের এই ধারণা হইয়া থাকে যে সমালোচনা মানে “নিছক গালাগালি” তবে আমরা নাচার এবং তাঁহারা যা' তা' অভিনয় করিয়াও যদি “নির্ভেজাল প্রশংসা” আশা করিয়া থাকেন তবে তাহা তাঁহাদের আশ্রিত বা স্বার্থপরতা প্রণোদিত দুই-আড়াই খানা কাগজ হইতেই পাইতে পারিবেন। সখী ‘বিজলী’ সমালোচক ও রঙ্গমঞ্চের সম্পর্ক গাঢ়তর করিবার প্রস্তাব গত সপ্তাহে করিয়াছিলেন, এই নমুনা হইতে তিনি যেন অতঃপর অবহিত হইয়া পরামর্শ বিতরণ করিতে করিতে থাকেন।

খাসদখল—বঙ্গ রঙ্গালয়ের পিতামহ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের এই চির-নূতন সুরস সরস সমাজচিত্রখানি বাঙ্গালীর প্রাণকে কখন তৃপ্তিদানে বিমুখ হয় নাই এবং কখনও হইবে কিনা সন্দেহ ? এই বহু পুরাতন পুস্তকখানির অভিনয়ে ষ্টার সম্প্রদায় গত রজনীতে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই অনুমানাতীত। প্রথম দেখিলাম—ঠাকুর্দ্দার অংশে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর অভিনয়, এতে বুড়া সাজিবার জন্য স্বর চাপিয়া একটা কৃত্রিম টানা সুর আনা হয় নাই—আগাগোড়া বেশ সহজ, স্বচ্ছন্দ বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া তিনি এই অংশটীর ধারণা একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন ; আবার সেই গাম্ভীর্য্য যখন শ্লেষাঘাতে বিদীর্ণ হয় এবং সেই আহত স্থান হইতে ঝরঝর করিয়া মর্ম্মশোণিত মিশ্রিত হাস্যধারা নিঃসৃত করিল তখন এই শক্তিশালী অভিনেতাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা গেল না। এ অভিনয় সত্যই দেখিবার জিনিস।

নিতাই চরণের অংশে নরেশবাবুর অভিনয়ও আগাগোড়া নূতনত্বে মণ্ডিত এ নিতাইকে পুরকালে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিতাই এর চেয়ে কোন অংশে খাটো ভাবিতে পারিলাম না—এর চেয়ে সাফল্যের উচ্চতর আদর্শ আর কি হইতে পারে বা এর চেয়ে বড় কোন্ প্রশংসা অভিনেতাকে দেওয়া যাইতে পারে।

মোহিতের অংশে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয় স্থানে স্থানে আতিশয্যেরও আতিশয্য না হইলে খুবই চমৎকার হইত তবে তিনি অভিনয়টীকে যথেষ্ট নূতনত্ব দিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও অনেকাংশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

গিরিবালা—শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ী, আগেকার সুশীলার মত উচ্চশ্রেণীর অভিনয় না হইলেও বর্ত্তমান যুগের হিসাবে অভিনয় ভাল হইয়াছে এবং তন্মধ্যে গান দুখানি খুবই ভাল বলা যাইতে পারে।

মোক্ষদা—শ্রীমতী নীহারবালা—শ্রীমতী তারাসুন্দরীর বা ৺বসন্তকুমারীর এই অংশ অভিনয় যাঁহাদের দেখা আছে আজকালের অন্য কোন অভিনেত্রীর অভিনয় যে তাঁহাদের চোখে লাগিতে পারে না তাহা আমাদের ধারণা শ্রীমতী নীহারবালা অভিনয় চলনসই তবে বিশেষত্ব বর্জ্জিত বলিতে হইবে।

আহ্লাদী, বিধু, পূর্ব্বযুগের অভিনয় অপেক্ষা উন্নত। অন্যান্য অংশ চলনসই তবে লোকেনের অংশ আরও যোগ্যতর ব্যক্তিকে দেওয়া উচিত ছিল।

মোটের উপর সাজ সজ্জা দৃশ্য পট প্রভৃতিতে ষ্টার সম্প্রদায় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিষয়েই উৎকৃষ্ট করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান ষ্টারেই এই এরূপ সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় আমরা বহুদিন দেখি নাই। রূপকুমারী ও খাসদখল বাঙালী মাত্রেরই হৃদয় যে দখল করিবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে এই সাফল্যের জন্য আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

মিনার্ভা থিয়েটার—এঁরা আজ পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদের ‘বরুণা’ গীতিনাট্যের পুনরাভিনয় কর্‌বেন। অভিনয় খুব ভাল হওয়াই স্বাভাবিক কারণ

আধুনিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে নাচ গানে এখনও এঁরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'অভিরাম স্বামী'র অংশে প্রথম কোহিনুর থিয়েটারে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু) অবতীর্ণ হয়েছিলেন সম্ভবতঃ তিনিই এ ভূমিকা নেবেন। রাজাশিবচন্দ্র রূপে কুঞ্জবাবুর অবতরণ খুব স্বাভাবিক আর 'সংরুব অংশ সম্ভবতঃ কার্ত্তিকবাবুই নেবেন। 'পুণ্ডরীক' রূপে সত্যেনবাবু দেখতে পেলে আমরা আশ্চর্য্য হবনা। রাণী কে নেবেন? হয় নগেন্দ্রবালা নয় প্রকাশমণি জটাবতী রূপে শ্রীমতী শরৎকুমারীর নামা সম্ভব আর নায়িকার 'বরুণা' শ্রীমতী ননীবালাকেই ভাল মানবে মাধবীর অংশে শ্রীমতী শশীমুখীর দেখা পাওয়া যাইতে পারে। এগুলি অবশ্য আমাদের অনুমান- কারণ আমরা সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ সংবাদ বড় রাখি না। তবে এইরূপে বিন্যস্ত হলে জোরবরাৎটা খুবই জোর পড়বে বলে মনে হয়।

নূতন সম্প্রদায়—এদের সম্বন্ধে যতটুকু আমরা জানতুম তা গত সপ্তাহে জানিয়েছি তারপর একখানি সাপ্তাহিকে শুনলাম যে আমাদের অনুমান সত্য নয় সম্প্রদায় নাকি গঠিত হইতেছে তবে তাহার কোন চিহ্ন কোথাও পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। সহযোগীর মতে ইহা নাকি লিমিটেড্ কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং যদি কোন ব্যবসায়ী ইহাতে যোগ দিয়া থাকেন তাহাকে সহযোগী বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে উপদেশ দিয়াছেন। 'বিনামূল্যে ব্যবস্থা' ডাক্তার কবিরাজের সাইনবোর্ডে লেখা থাকে খবরের কাগজেও যদি তাহা সুলভ হয়তো মন্দ কথা নয়। সর্ব্বজ্ঞ সহযোগী নাকি এঁদের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নামটামও জানিয়াছেন এবং শীঘ্রই তাহা জানাইবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন—আমরা এখনও অতদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই সুতরাং উপস্থিত নীরব রহিলাম তবে যদিও এমন কোন প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠে তবে আশা করি তাহারা উৎকৃষ্ট নাটক দুচারখানি অভিনয় করিবেন। আজ ১২।১৪ বৎসরের মধ্যে একখানিও এমন নাটক অভিনীত হয় নাই যাহা নাটকত্বের জোরেই দাঁড়াইতে পারে কেবল সাজপোষাক দৃশ্য চাতুর্য্য ও বায়স্কোপী ঢংএর অভিনয় দেখিয়া দেখিয়া আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আরএকটা কথা এঁরা অভিনয়ের ছোটখাট অংশগুলি যাহাতে নিখুঁত হয় সেদিকে যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন কেবল ২।৪টী নামজাদা অভিনেতা নামাইলে দর্শককে প্রলুব্ধ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা যায় না এ বিষয়ে বর্ত্তমান সম্প্রদায়গুলি একেবারেই উদাসীন।

Printed & Published by Jnanendra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
14 Jaggannath Dutta Lane Garpar, Calcutta

শিবপূজা।
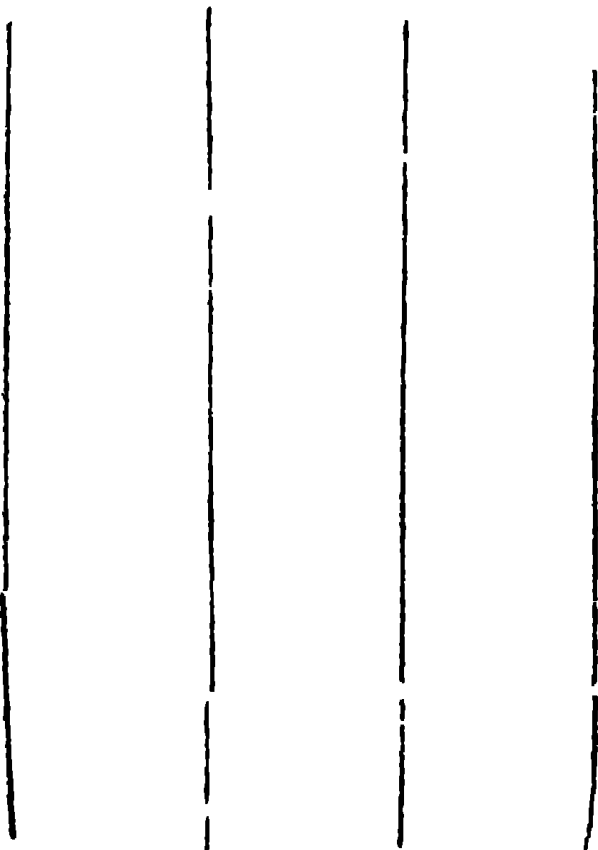
প্রথমবর্ষ]   ২৮শে অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ১৩ই ডিসেম্বর]\[২০শ সংখ্যা

নব-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠাবান অভিনেতা

শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়

…গুপ্তে 'এন্টিগোনাস' খাসদখলে 'নিতাই' বিবাহবিভ্রাটে 'মিঃ সিং' 'প্যালারাম' 'কেলো' রূপে যিনি অতুলনীয়

গল্প

গুরুমন্ত্র

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষাল

আমরা যখন রেঙ্গুনে থাকিতাম তখন আমাদের দুধ যোগান দিত শশী। এই নামেই সকলের কাছে অভিহিত। লোকটী দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট লালিত্যপূর্ণ চেহারা—তবে সে যখন কথা কহিত তখন তাহার হাবভাব দেখিয়া হাসি সংবরণ করা যাইত না। সাধারণ কথাবার্ত্তার সময় সে এত হাত আর মাথা পরিচালনা করিত যে মনে হইত সে যেন হাস্যরসের অভিনয় করিতেছে। তাই হঠাৎ একদিন শান্তি বলিয়া ফেলিয়াছিল "হাঁা শশীদা তা তুমি যাত্রারদলে সং দাওনা কেন?" আমরা সকলে উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলাম।

শশীর বাড়ী ছিল চট্টগ্রাম। সে যখন গ্রাম্য দুর্ব্বোধ্য ভাষায় তাদের দেশের বাঘ মারার গল্প করিত, তখন সে দেখিত না, যে কেহ শুনিতেছে কি না—সে আপন মনে বলিয়াই যাইত। কিন্তু মধ্যে মধ্যে একটা "হাঁ" না শুনিলে সে একটু অপ্রতিভ হইত। প্রত্যহ পাঁচটার সময় সে আমাদের দুধ লইয়া আসিত—বারাণ্ডায় একটা ভাঙ্গা বেঞ্চ ছিল—সেইটাই ছিল তার জমকাইবার আসর।

সেদিন বিকালে আমি আর শান্তি তার কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদের খালে কেমন করে একটা কুমীর তার মাসতুত ভগ্নিপতিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল—তাহার বর্ণনা শুনিতেছি—এমন সময় বাবা আসিলেন—শশীকে বক্তার মত কুমীরের সাহসিকতায় কতটা সত্য নিহিত আছে—এই বিষয়ে অদ্ভুত মন্তব্য প্রকাশ করিতে শুনিয়া একটু স্তম্ভিতনেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ওহে শশী—বলি, তুমি যে একেবারে জ্বালাতন করে মারলে—দুধে যে জল মেশাও সে আমরা জানি—জল মেশাও তাতে দুঃখু নেই তবে আর একটা কি যে মেশাও যে একটা বিটকেল গন্ধ হয়·····

বাবাকে বাধা দিয়া শশী কহিল "মাপ করবেন বাবা ঠাকুর—ভগবানের দিব্যি, আমি কিছুই নিজে মেশাইনি—যা দিতে হয় তা আমার ভাই দেয়—সত্যি করে বলচি বাবু সে ছাড়া আর কেউই কিছু দেয় না তবে পরশু দিন সে আমায় বলছিল 'দাদা হরে গয়লা বেশ এক মজার মৎলব বার করেছে। দুধে বেশী জল দিয়ে তাতে খানিকটা শটীর পালো আর খান দুই বাতাসা দিলেই ঠিক অবিকল গাইয়ের দুধই হয়ে যায়—লোকেও নাকি ধরতে পারে না'। তা বাবু বোধহয় সেই আজ শটীর পালোই দিয়েছে। মাপ করবেন—এ বেলা কিন্তু যে দুধ দিয়েছি তা একেবারে খাটী···"

কথার স্রোত উল্টাইয়া দিয়া বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁা শশী আজকাল কীর্ত্তন করচ ত?"

কীর্ত্তনের কথায় যেন নূতন জীবন পাইয়া শশী কহিল "নিশ্চয় বাবু—কীর্ত্তন করব না—আমি যে খুব ভাল বাজাতে শিখেছি। এখন শুধু ঐ হারামনিটী বাকি—তা আপনি যদি আপনারটা বেচেন তাহলে একেবারে খুব বড় ওস্তাদ হতে পারি বাবু··"

শান্তি বাধা দিয়া কহিল "কি কি যন্ত্র শিখেছ শশীদা?"

শশী একগাল হাসিয়া উত্তর করিল মাদল খঞ্জনি

আর কাঁসর—বলিয়াই কাহারও কোনরূপ প্রশ্নের আগে, মাদল কিরূপে বাজাইতে হয় তা দেখাইতে সে দু হাতে হাঁটু বাজাইতে লাগিল। শান্তি ত হাসিয়া কুটীকুটী। অপ্রসন্ন মুখে শশী মাদল বাদন হইতে নিরস্ত হইল। বাবা ব্যপার দেখিয়া চলিয়া গেলেন। সেদিন আর শশীর হাস্যরসযুক্ত কাহিনী কোন মতেই জমিল না।

শান্তি বলিল "যাই বল দাদা—কোন গয়লাই কখনো বলবে না যে সে দুধে জল দেয়—ওঃ এত সরল লোক ত দেখা যায় না।"

মাসখানেক পরের কথা। সেদিন ছিল শনিবার। বাবা দুটোর সময় ফিরিয়াছিলেন আর দিনটা বাদলা ছিল—সেজন্য আমিও খেলিতে যাই নাই। প্রায় চারটার সময় শশী এক বালতী দুধ লইয়া দরজায় ধাক্কা দিয়া ডাকিল "মেনি মেনি"। মেনি আমাদের বিড়ালটার নাম—তাহার জানা ডাকে মেনি লেজ তুলিয়া ঘরর ঘরর করিয়া ছুটিয়া আসিল। তাহাকে কিঞ্চিৎ দুধ ঢালিয়া দিয়া শশী সেই ভাঙ্গা আসনে বসিয়া ডাকিল "মা ঠাকরুণ দুধ এনেছি।" শান্তি দুধ লইয়া গেল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন "হা শশী আজকাল ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করছ ত?"

গরীমাদীপ্ত মুখে শশী উত্তর করিল "বাবু আমার কি আর সময় আছে—আমাদের ওখানে যে রোজ কীর্ত্তন হয়—ঐ যে গগণ দাস—ঐ যে আপনার বাড়ী খোল বাজাত—। প্রত্যহ বৃহস্পতিবার কীর্ত্তনে গগণ দাস আমাদের ঘরে খোল বাজাইত।—সে কিনা বলে বাবু হে হে হে আমি তোমার শিষ্য হব—কি বলব পায়ের ধূলো নিতে চায় ওঃ সে যে কি কাণ্ড করে—তা বাবু আমি কি দিতে পারি—তা কি করব বাবু একেবারে নাছোড়বান্দা নিলে পায়ের ধূলো—কি করব আর।" সেই দন্তবিকশিত নিটোল ওষ্ঠে গৌরবের হাসি দেখিয়া শান্তি অবশেষে নিজের মুখে কাপড় গুঁজিল—শশীর লক্ষ্যই নাই সে বলিয়া যাইতে লাগিল "তা বাবু ভক্তরা বেশ ভাল, সেদিন সত্যি সত্যিই আমাকে গুরু বললে, আজকাল আবার গুরুঠাকুর বলে ডাকে।"

বাবা বলিলেন "কাউকে দীক্ষা দিয়েছ নাকি?"

বাধা দিয়া শশী কহিল "না বাবু দীক্ষা দেওয়ার কি আর দরকার হয় আমি শুধু গানেই সব ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিয়ে দেই। রোজ কুস্তী করি, বুক ঠুকি—(সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ জোরে বুক ঠুকিল) আর বাবু গান এক গানেই সব বুঝিয়ে দি ভজন সাধন সব" এই বলিয়াই সে উৎকট কণ্ঠে তান ধরিল "আমি কেমনে রব তোমা বিনা কেমনে রব সখি···রে—সখি"। অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু, উন্মুক্ত মুখ-গহ্বর দেখিয়া আর হাসি চাপা দুঃসাধ্য হইল। শশী গাহিয়া চলিল "ডুবে মরব একেবারে ডুবে মরব—যমুনায় ডুবে—হাবুডুবু খেয়ে আমি ডুবে মরব "

তাহার সে সুর অসহ্য হইয়া উঠিল বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন "তা শশী এ সব গেনে ভক্তদের কি বোঝাও?" আবেগভরে শশী বলিল "কেন বাবু ভক্তেরা এতে কি কান্না কাঁদে চোখের জলে ভেসে যায় সে বাবু ঠাকুর"। নিতান্ত শিশুর মত শান্তি জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ শশীদা তোমার ভক্তরা জামা পায় কোথায় তারা ত সবাই গোয়ালা"।

শশী বলিল "কেন আমি যে তাদের সকলকে একটা করে জামা দিয়েছি।' শান্তি হাসিয়াই আকুল। বাবা বলিলেন "চুপ কর শান্তি—শশীকে বলতে দে" তারপর শশীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "তারপর"।

"তারপর কি আর বলব বাবু ভক্তরা বলে আমার সব সেবা করবে, কাল সত্যি সত্যিই যোগেন আমার পা টিপ্‌তে সুরু করেছিল কিন্তু আমি কি করে তা দিই বলুন—তারা সকলে একটু বাবু—ভক্ত"।

একটু রোসনাই দিয়া বাবা কহিলেন "যাই বল শশী তোমার পদসেবা করলে পুণ্যি আছে"।

এক গাল হাসিয়া শশী কহিল "হে হে তারা ত তাই বলে বাবু"। শান্তি জিজ্ঞাসা করিল "ভক্তরা তোমায় কে কি দিয়েছে শশীদা?"

শশী কহিল "ভক্তরা আর কে কি দেবে দিদিঠাকরুণ? তারা হল গরীব তারা বলে গুরুঠাকুর তুমিই মা বাপ ইষ্টধর্ম্ম সব আমি কি তাদের কাছ থেকে কিছু নিতে পারি"।

আমি বলিলাম "ভক্তদের খাওয়াতে হয় নাকি?"

"খাওয়াতে হয় বৈকি—রোজ সন্ধ্যেবেলা কীর্ত্তন হয়ে গেলে তাদের সকলকে প্রসাদ দিতে হয় তা তারা এখ

প্রসাদ পেলেই খুবই সন্তুষ্ট হয় তাই রোজ লুচিই ভোগ দেই"

বাবা বলিলেন "নিশ্চয়ই তা নইলে কি আর ভক্তি জন্মায় না থাকে? খুব খাওয়াবে আদর যত্ন করবে—ভক্তেরা হল সব ছেলের মত"। শশী কহিল "ঠিক বলেছেন কর্ত্তা।"

কথা ফিরাইয়া বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার রোজকার কেমন হচ্ছে শশী?"

"তা মন্দ নয় কর্ত্তাবাবু খরচ খরচা বাদ দিয়ে মাসিক শ' তিনেক টাকা হয়। আগে সব টাকাই চেটির (বেঙ্গুনের ধনী মহাজন) কাছে জমা রাখতুম তা এখন ভক্তদের দিতে হয় সেইজন্য আর আজকাল বড় একটা জমে না। একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন ভক্তদের কি তিনশ টাকাই খাওয়াতে লাগে নাকি?"

শশী কহিল "তা প্রায় লাগে বাবু! ঐ যে মাধব আছে ওর বউ খেতে পায় না ওকে দিতে হয় তিরিশ টাকা—বলে গুরুঠাকুর আমরা তোমার ভক্ত তোমার দাস আমাদের চলে কি করে—তারপর যোগেন বলে একটী ভক্ত আছে সে আবার গাঁজা খায় তাকে প্রায় কুড়ি টাকা করে মাসে দিতে হয়। তা বাবু যাই বলুন বেটা একেবারে হুকুমের চাকর সেদিন একটু খাটুনী বেশী হয়েছিল দুধ দিতে অনেক জায়গায় ঘুরেছিলাম ঘরে গিয়ে বললাম, যোগীন বড় কষ্ট হচ্চে কি করি বলত? সে অমনি চট্ করে বাবু দুটো টাকা নিয়ে গিয়ে কি যে এক অসুধ কিনে এনে খাইয়ে দিলে তা আর কি বলব আধ ঘণ্টায় সব সেরে গেল। একেবারে নতুন জীবন পেলুম বাবু কি ফূর্ত্তি যে হল তা আর কি বলব। তারপর বাবু বামাকে প্রায় ষাট টাকা দিতে হল সে গুরুদেব দয়া কর বলেই যে কি এক অখটগুন্ত মন্ত্র বলে শোলোক আওড়ালে আর আমার বার বার নমস্কার করতে আরম্ভ করলে না দিয়ে থাক্‌তে পাল্লুম না"

বাবা গম্ভীরভাবে বলিলেন দেখ শশী একটা কথা আমি তোমায় বলে রাখি তুমি যদি ভাল চাও ত ঐ ভক্তদের সঙ্গ ছাড়—তা নইলে তোমার পরিণাম বড় ভালনয়..।"

অপ্রসন্ন হইয়া শশী কহিল কি বলেন কর্ত্তা ভক্ত ছাড়ব কেমন করে তারা যে আমার ছেলের মতন।

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। শশীর দুধ দিতে অনেক বাড়ীই বাকি। তাহার সে দিকে মোটেই খেয়াল নাই। এতক্ষণ ঘরের ভিতর প্রদীপ জলিতেছিল শান্তি ইলেকট্রিক কারেন্ট্‌টা অয়েন করিয়া দিতেই বাতি জলিয়া উঠিল অমনি এক ঝলক আলো শশীর বিবর্ণ মুখের উপর একটা ব্যস্ততা জাগাইয়া দিল। অবিলম্বে দুধের বালতিটা হাতে লইয়া শশী কহিল "আজ আসি বাবু রাত হয়ে গেছে যে—" মুহূর্ত্তমধ্যে সে বাহির হইয়া গেল।

দিন দশেক পরে আবার আমাদের শশী-মিলন হইল। অনেক কথাই তাহার প্রসঙ্গের ভিতর স্থান পাইয়াছিল। আবার সেই ভক্তদের কথা—শশী একেবারে পঞ্চমুখ। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন শশী দীক্ষা তাহলে দেবেনা ঠিক করেছ, না? হাসিয়া শশী কহিল "না বাবু তারা ছাড়লে কৈ দীক্ষা দিতে হল বৈকি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি মন্ত্র দিলে বৈষ্ণবী না শক্তিমন্ত্র।" শশী বলিল "না বাবু তারা বললে তার গুরুমন্ত্রই নেবে আর তাই তারা জপ করবে সুতরাং আমি তাদের প্রত্যেকের কাণে শশীভূষণ দাস শশীভূষণ দাস তিন বার করে বললুম ওঃ তারা সে মন্ত্র পেয়ে একেবারে পুলকে ভরে উঠল—শিউরে উঠল গুরুমন্ত্রে যে কি আনন্দ! এখন তারা সেই নামই জপ করছে বেশ ভক্ত সব যাই বলুন বাবু—"

আমি আর শান্তি সেই যে হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তা আর সন্ধ্যার আগে থামে নাই। শশী একটু অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবু ভুল ত কিছু হয়নি"। বাবা বলিলেন "রামঃ তা কখন হয় ভক্তরা গুরুমন্ত্রই করে। শশী গম্ভীর ভাবে বলিল "তারাও ত তাই বলে"।

একটু থামিয়া শশী বলিল "একটা পরামর্শ করতে এসেছি আপনার সঙ্গে আমার দেশে ত এক সহধর্ম্মিণী আছে- তা সে সব্বদাই বাপের বাড়ী থাকে, তাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেই কি বলুন"?

বাবা বলিলেন "নিশ্চয়ই স্ত্রী ত" শশী কহিল "আজ প্রায় পাঁচ বছর বাড়ী যাইনি বউটা বড়ই কষ্ট পাচ্চে তা বাবু কিছু অলঙ্কার আর কিছু টাকা পাঠিয়ে দেই—না বাবু তার চেয়ে আমারই দেশে যাওয়া ভাল, কি বলুন আমার টাকা ত অনেক আর সে বেচারী এত কষ্ট পায়"।

শান্তি চুপি চুপি বলিল "দাদা, সব পরামর্শত একলাই

করেচ"। শশী আবার জিজ্ঞাসা করিল তা বাবু কত টাকা নিয়ে যাই বলুন ত"

বাবা বলিলেন "শ'পাঁচেক নিয়ে যাও—তারপর ফেরবার সময় তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এস"।

আনন্দ সহকারে শশী বলিল "তা বেশ এবারে বাবু তাকে নিয়েই আসব কিন্তু সে যদি আমার ভক্ত না হয়,

গম্ভীর ভাবে বাবা বলিলেন "দেখ শশী স্ত্রী নিয়ে এসে ভাল করে ঘর সংসার কর ও সব ভক্ত টক্ত ত্যাগ কর"। বিষণ্ণ মনে শশী বলিল "তবে আসি বাবু—কাল থেকে আমার ভাই সুরেশ দুধ দিয়ে যাবে। দিনচার মধ্যে আমি হয়ত জাহাজে উঠব আমাকে সব গুছিয়ে নিতে হবে ত তারপর ভক্তদের একটা গতি করতে হবে"। সকলকে প্রণাম করিয়া শশী বাহির হইয়া পড়িল।

তার পর দিন হইতে সুরেশ দুধ দিতে আসিল। তার বয়স এই যোল সতের, বেশ বুদ্ধিমান ছেলেটী।

মাসখানেক পরে বাবা সুরেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ও সুরেশ বলি শশী কবে আসবে?" সুরেশ কহিল "সে কি আর আসবে ঠাকুরমশাই সে যখন যায় তখন ছ'জন ভক্ত সঙ্গে করে নিয়ে গেছে তারা ত দাদাকে যা ভুগিয়ে নিচ্চে তা আর কি বলব ঐ এক যোগেন আছে সে বেটা দাদাকে মদ গাঁজা এসব ধরিয়েছে—এখানে চেটীর কাছে যা জমিয়েছিল প্রায় হাজার ছয়েক টাকা সে সব নিয়ে গেছে—রাখবে কি আর কিছু"। ক্রোধের আতিশয্যে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

আমরা সকলেই দুঃখিত হইলাম। তাহার পরিণাম একেবারে সুস্পষ্ট—এত সরল লোক—তার এত পয়সা—এবং সেগুলির যে আদ্যশ্রাদ্ধ হইবে তাহা নিঃসন্দেহ—মাস ছয়েক কাটিয়া গিয়াছে। শশীর কথা খুব অল্পই মনে হইত। কিন্তু হঠাৎ সে যখন একদিন একটা ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়া ত্বরিত পদে ভিতরে আসিয়া সেই পুরাতন ভাঙ্গা বেঞ্চখানা অধিকার করিল তখন আমরা সকলেই চমকিয়া গিয়াছিলাম। বাবা ঘরে ছিলেন। শশী তাঁহাকে দেখিয়াই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিতে লাগিল আমার সব ভুলিয়ে নিয়েছে বাবু—কেন যে আপনার কথা শুনিনি দেশে যেতেই আমার শ্বশুর ত আমার ভক্তগুলোকে আর তাদের সঙ্গে আমাকেও যে কি মার দিলে বাবু তা আর কি বলব—ভক্তগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে আমাকে বললে তোমার ঘাড় থেকে ভূত ছাড়াচ্চি দাড়াও। ভক্তগুলো চলে গেল তা আমি কি বাবু তাদের ছেড়ে থাকতে পারি আমি লুকিয়ে ভক্তদের কাছে গেলুম বললুম চল তোমাদের সঙ্গে আমি বনে গিয়ে সাধন করব—তা বাবু বেটারা কি নেমকহারাম কেউ গেলনা উল্টে আমায় সকলে মিলে এমন মার দিয়ে গেল উঃ—বললে শালা তোর জন্যে আজ কি মারটাই না খেয়েছি কি বলব বাবু যাবার সময় আমার সব টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে গেল—কেন যে তখন আপনার কথা শুনিনি বাবু."। টপ্ টপ্ করে সে অঝোর নয়নে ঝরাতে লাগিল।—হাসি আসলেও নিরীহ শশীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করিয়া সে হাসি অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল।

বন্দিনী

শ্রীজ্ঞানরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় বি, এস সি

এমনি তুমি হ'য়েছ কি বন্দিনী গো সুন্দরী?
কাঞ্চনেরই কঙ্কনেতে হাতে দিছি হাতকড়ি:
কটিদেশে স্বর্ণগোট কঠিন দৃঢ়-শৃঙ্খলে;
অটুট ফাঁসি পরায়ে দিছি হীরকেরি হার গলে।

চতুরা তোর পায়ের বেড়ি নূপুররূপে ঝন্‌ঝনে,
নাকের দড়ি মুক্তাফল নাকে দিছি তার সনে,
সবার সেরা প্রণয় ডোরে বেঁধেছি লো! প্রাণ তোরি।
এমনি তুমি হ'য়েছ কি বন্দিনী গো সুন্দরী?
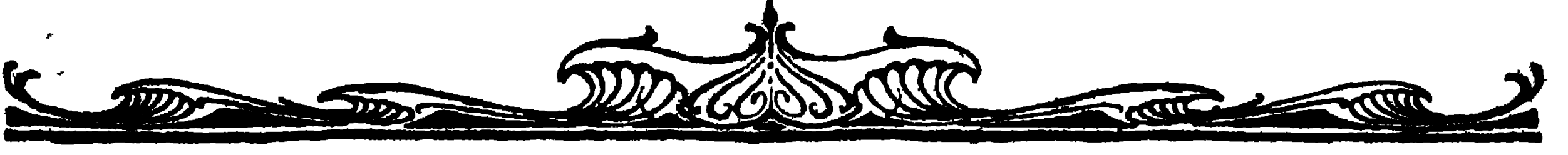
শিল্প-সংরক্ষণ

ভারতের অতীত যুগের শিল্প নৈপুণ্যের কথা স্মরণ করিয়া আজ অনুশোচনায় কোন ফল নাই জানি—এবং যে প্রকারে ধীরে ধরে বৈদেশিক শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য আসিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়াছে সে কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু আজ এই নব জাগরণের দিনে আবার যখন ভারতবাসী তাহার লুপ্ত অধিকাব, মৃত জাতীয়তা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছে তখন তাহাব পক্ষে স্বদেশী শিল্পের পুনঃ প্রচার বাসনা যে জাগিবে তাহা অন্যায় অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক বলা যায় না। অবশ্য শিল্প সংরক্ষণ রাজা প্রজা উভয়েরই কর্ত্তব্য—এবং উভয়ে এক মন হইয়া করিলেই উহা প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকর হয় তবে পৃথক ভাবেও উহা অনুষ্ঠিত হইতে পারে এবং রাজা ও প্রজাব স্বার্থ একই দেশে নিবদ্ধ থাকিলে ঐ পৃথগাচরণও নিষ্ফল হইতে পারে না কিন্তু রাজার স্বার্থ যদি অন্য দেশে সংযুক্ত থাকে তাহা হইলে তাঁহার শাসিত রাজ্যের শিল্পোন্নতিব বিষয়ে রাজ সাহায্য পাওয়া অসম্ভব বিশেষতঃ যে দেশে রাজার স্বার্থ আবদ্ধ সেই দেশই যদি শাসিত রাজ্যের শিল্পের প্রতিদ্বন্দী হয় তবে শাসিত রাজ্যের শিল্পসংরক্ষণ এক প্রকাব অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবে এ স্থলে প্রজা যদি কায়মনোবাক্যে স্বদেশী শিল্পের পোষকতা করেন তবেই সেই দেশেব শিল্প সংবক্ষণ সম্ভব হয় অন্যথা তাহা অচিরে বিধ্বস্ত ও নিম্মূল হইযা যায়। শেষোক্ত প্রকাব সংরক্ষণই স্বাভাবিক এবং অদম্য শক্তিসম্পন্ন এ সংরক্ষণের বিনাশ নাই পরাজয় নাই কারণ তাহা বিশুদ্ধ স্বদেশ প্রেমিকতার পুণ্য শুভ্র নিষ্কলঙ্কবেদীব উপব স্থাপিত। তবে একপ প্রগাঢ় স্বদেশ প্রেমে দীক্ষিত জাতি জগতে অতি অল্প কারণ পরাধীন জাতিব স্বদেশ প্রেম প্রায়ই মুহ্যমান অবস্থায় থাকে সে মোহ ভাঙ্গিতে সে নিস্পন্দ অবস্থায় স্পন্দন আনিতে একটা মহাশক্তিব প্রয়োজন—তদুপরি যদি সেই পরাধীন জাতি অশিক্ষিত ও দরিদ্র হয়, অন্ধ কুসংস্কারে বিমূঢ় হয় তবে এই জাতীয় ভাবের উদ্দীপন একান্ত অসম্ভব না হইলেও দুষ্কর—সুদূরপরাহতও বলা যাইতে পারে। এ জাতিব শিল্প কচিৎ জীবিত থাকে এবং বৃদ্ধিও পাকে তাহা সেই জাতির অসামান্য শিল্প নৈপুণ্য ও ভগবানেব বিশেষ অনুগ্রহ চিহ্ন ব্যতীত আর অপর কিছুই নহে।

ভারতের শিল্প আজ একে একে অন্তর্হিত হইতেছে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা ও রাজ সাহায্যের অভাব ইহার প্রধান কারণ হইলেও এজন্য ভারতবাসীর অপরাধই তা যে কোন কারণেই হউক না কেন তাহা আমরা গুরুতরই মনে করিব কাবণ পরের দোষ বড় করিয়া দেখার চেয়ে নিজেব দোষ বড কবিয়া দেখার আত্মগ্লানিতেও পুণ্য আছে। বিদেশী বণিক আমাদেব শুধু শিল্পে প্রতিযোগী নহে তাহাদের স্বজাতিরাই আমাদেব সুখ দুঃখেব ভাগ্য বিধাতা—দণ্ডমুণ্ডেব কর্ত্তা সুতবাং তাঁহারা যে এই পদানত অনন্যউপায় জাতির শিল্প সংরক্ষণে যত্ন আগ্রহ বা চেষ্টা কবিবেন না ইহাই স্বভাবিক তবে ভদ্রতার খাতিরেই হউক বা কোন উদ্দেশ্যেব বশীভূত হইয়াই হউক যদি তাহা করেন তবে তাহা দেশের সৌভাগ্যই বলিতে হইবে—এবং সেই সামান্য বাহ্যিক আগ্রহটুকুও যদি সেই পরাধীন জাতি বুঝিবাব ভুলে উপেক্ষা করে—অনাদব করে তাচ্ছিল্য করে তবে সে জাতিব আর কোন আশা ভবিষ্যতের তমোময় গর্ভেও নিহিত আছে কি না তাহা বুঝিতে পারি না। টেরিফ বোর্ড কলিকাতায় আসিয়াছেন এব ভারতেব কাগজ শিল্প সংরক্ষণ করা উচিত কিনা ও উচিত হইলে কি ভাবে তাহা সুসম্পাদিত করা যাইতে পাবে সেই মর্ম্মে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন। ভারতবর্ষস্থ কাগজ নির্ম্মাতাগণ, বিদেশ হইতে আনীত কাগজের উপর, সাধাবণ দ্রব্যাদিব উপর যে হারে আমদানী শুল্ক বসান আছে তদপেক্ষা বর্দ্ধিত হাবে শুল্ক বসাইবার প্রার্থনা কবিযাছেন। সংরক্ষণকল্পে দুইটী উপায় রাজতন্ত্রের আছে একটী রাজকোষ হইতে অর্থ সাহায্য দান অপরটী সংরক্ষিত শিল্পের প্রতিযোগী বিদেশাগত পণ্যের উপর উচ্চ কর স্থাপন। প্রথমটী রাজ-কোষের ব্যয়বর্দ্ধক অপরটী প্রজাগণের বিরাগ বর্দ্ধক কারণ অধিক মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করা অপেক্ষা সুলভে ক্রয় করিতে পারাই আপাতঃ মধুর, অবশ্য বুঝিয়া দেখিলে উভয়বিধ উপায়ে অর্থব্যয় প্রজাগণের পক্ষে একই প্রকার। দেশীয় শিল্পের প্রতি অনুরাগবশতঃ যদি দেশবাসী অধিক মূল্যে দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিতেন তাহা হইলে রাজকীয় সাহায্যে সংরক্ষণের আবশ্যক হইত না। কিন্তু দরিদ্র ভারতবাসী তাহা সর্ব্বতোভাবে করিতে পারে নাই বঙ্গভঙ্গের

সময় হইতেই দেখা গিয়াছে যে সস্তার সুবিধাটাকে তাহাদের বেশীর ভাগই দেশানুরাগের উপরে স্থান দিয়াছে তাহা না হইলে আজ ভারতে বিলাতী কাপড়ের চিহ্নমাত্র ও দেখা যাইত না— এই সুলভতার আপাতঃ সুবিধাই খদ্দর প্রচারের পথে মহা অন্তরায় স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে—এই দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের গভীর মর্ম্ম দেশবাসীর অধিকাংশ আজও বুঝে নাই কতকাংশ তাহার ঔজ্জ্বল্য চাকচিক্য প্রভৃতি দেশীয় দ্রব্যাপেক্ষা বাহ্যাড়ম্বরে ভুলিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া আছে। সুতরাং ভারতে ভারতবাসীর স্বদেশ প্রীতির উপর নির্ভর করিলে যে কোন শিল্পই পুষ্ট হইবে না এমন কি জীবিত ও থাকিবে না। অগত্যা শিল্পকে বাঁচাইতে রাজকীয় সাহায্যের আবশ্যক কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজকোষের অবস্থাও খুব স্বচ্ছল নহে যাহাতে তাঁহারা অর্থ সাহায্য দানে কোন শিল্পকে রক্ষা করিতে পারেন সুতরাং আমদানী পণ্যের উপর কর বৃদ্ধি করাই বর্ত্তমান শিল্প সংরক্ষণে একমাত্র সহজ উপায়।

উপস্থিত কাগজ শিল্প রক্ষণার্থে যে সাক্ষ্যাদি গ্রহণ চলিতেছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে ইহার বিরুদ্ধে তিন শ্রেণীর লোক দণ্ডায়মান হইয়াছে যথা

(১) ইংরেজ চালিত ইংরাজী সংবাদপত্র- প্রথম ইহারা আপত্তি তুলিয়াছেন ভয়ে যে পাছে তাঁহাদের আনীত সংবাদপত্রে ব্যবহারার্থ কাগজে বেশী শুল্ক চাপিলে তাঁহাদের লভ্যাংশ কমিয়া যায়, পরে যখন কাগজ নির্ম্মাতাগণ এই সংবাদ পত্রাদির জন্য আনীত কাগজকে শুল্ক বর্দ্ধন প্রস্তাবের বহির্ভূত করিবার কথা বলেন তখন ইহাঁদের আপত্তি— এক শ্রেণীর দাঁড়াইল মর্য্যাদার জন্য অর্থাৎ প্রথমে আপত্তি করিয়া পরে সংবাদপত্রে শুল্ক বর্দ্ধিত হইল না বলিয়া তাহা প্রত্যাহার করিলে পাছে লোকে তাঁহাদিগকে স্বার্থপর ভাবেন আর এক শ্রেণী সেই সুদূর শ্বেতদ্বীপবাসী কাগজ নির্ম্মাতা ভ্রাতৃগণের প্রতি প্রীতি বশতঃ— সুতরাং এ শ্রেণীর কোন আপত্তির মূলে ভারতবর্ষের মঙ্গল চিন্তা নাই এবং তাহা কোনরূপেই ভারতবাসীর বিবেচনার বিষয় নহে।

(২) বিদেশী কাগজের আমদানীকারকগণ ইহাঁরা শুল্ক বসিলে নিজেদের আনীত কাগজের মূল্য বাড়িয়া যাইবে সুতরাং বিক্রয় কম হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের লভ্যের পরিমাণ কম হইবে ইহাই ইহাঁদের একমাত্র বিচার্য্য বিষয়—এঁদের আপত্তিও স্বার্থপরতা প্রসূত ভারতীয় শিল্প নষ্ট হইলেই ইহাঁদের পরম লাভ। ইহাঁদের উদ্দেশ্যের সহিত ভারতীয়গণের কোন সহানুভূতি থাকিতে পারে না।

(৩) একদল স্বদেশহিতৈষী ভারতবাসী - ইহাঁরা মনে করেন যে কাগজ শিল্প ভারতে প্রধানতঃ ইংরাজগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত এবং উহা সংরক্ষণ অভাবে বিনষ্ট হইলে প্রকারান্তরে ইংরাজদের ক্ষতি হইবে কেবল এই জাতি বা বর্ণবিদ্বেষ ইহাঁদের বিবেচ্য, সমস্ত জাতির মঙ্গল, দেশের ভবিষ্যৎ এই বর্ণবিদ্বেষ তমসায় আচ্ছন্ন। এঁদের আমরা প্রকৃত দেশহিতৈষী ভাবিনা কারণ শিল্পের প্রবর্ত্তন যে জাতিই করুক না কেন তাহাতে যে দেশে ঐ শিল্প প্রবর্ত্তিত হয়, সে দেশের পক্ষে উহা মঙ্গলকর কারণ বিদেশী চালিত ঐ শিল্পাগারে বহুসংখ্যক দেশবাসী শ্রমিকের অন্ন সংস্থান হয় দেশের পণ্য উপাদান (raw material) উহাতে ব্যবহৃত হয়, দেশের ধনীগণের অর্থ উহাতে নিয়োজিত হইয়া লভ্যাংশের কতকাংশ দেশেই থাকিয়া যায় এবং ইহার মহৎ উপকার দেশবাসীর নিকট ব্যবসার শিক্ষায় সুযোগ উপস্থিত করা। ভারতের সমস্ত কাগজের কলগুলিই সাহেবদের নয় অনেক সম্পূর্ণ দেশীয় প্রতিষ্ঠানও ইহার মধ্যে আছে এবং সেগুলি যে এই বিদেশীয় প্রতিষ্ঠিত কারখানার দৃষ্টান্তে স্থাপিত তাহার কোন ভুল নাই—ভারতবাসীরা এই বিদেশী কল কারখানার উৎপন্ন দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতার সম্মুখে আসিয়া পরাভব স্বীকার করিয়া একে একে তাহাদের কুটীর শিল্পগুলিকে বর্জ্জন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছিল এবং কল কারখানা স্থাপনের উৎসাহ বা প্রবর্ত্তন করিতে প্রথম সাহস তাহাদের ছিল না। বিদেশীয়রা এদেশে সুলভে শ্রমিক ও পণ্য উপাদানগুলি ব্যবহারে লাগাইবার জন্য যে সকল কারখানা স্থাপন করিলেন উহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ক্রমশঃ ভারতবাসী এদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ইহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর নহে। জাতীয় শিল্প সংগঠনে ইহার মূল্য খুবই বেশী এখন কয়েকটী বিদেশী চালিত কাগজের কল আছে বলিয়া কাগজ শিল্পটীকে এই শৈশবে হত্যা করা বুদ্ধির পরিচায়ক নহে সুতরাং এই শ্রেণীর আপত্তির কোন বুদ্ধিমান ভারতবাসী সমর্থন করিবেন না ইহা অবধারিত সত্য।

অবশ্য সংরক্ষণের ফলে প্রথম প্রথম হয়ত কাগজের দাম কিছু বাড়িয়া সাধারণের অসুবিধা হইবে—যুদ্ধের সময় বিলাতী কাগজের মূল্য অসম্ভব রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল সে অসুবিধা যদি আমরা দায়ে পড়িয়া সহ্য করিয়া থাকি তবে আজ একটী দেশীয় শিল্পের প্রাণ রক্ষার্থ তদপেক্ষা অনেক অল্প অসুবিধা সহ্য করিতে যদি আজ না পারি তবে আমাদের 'স্বদেশ' 'স্বরাজ' প্রভৃতি উচ্চ চীৎকারের মূল্য কি? যদি সংরক্ষণ নীতি সত্যই সুফলপ্রদ না হয় তবে তাহা পরিবর্জ্জন করা অসম্ভব নহে কিন্তু তাহাকে উপযুক্ত পরীক্ষার অবসর না দিয়াই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

আমরা চার রকমের চার বিরহিণী

৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
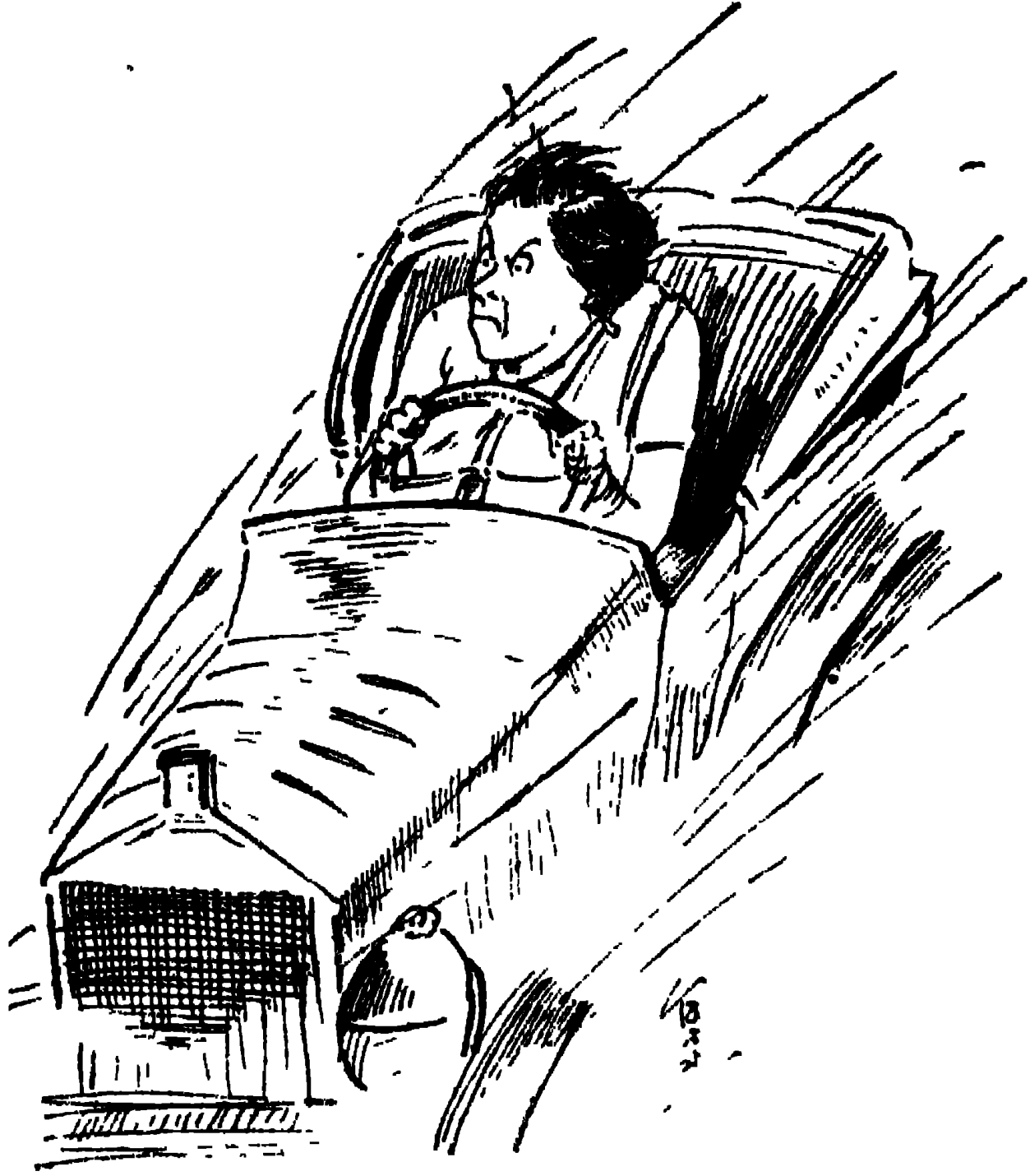
সভ্যাসমাজের বিরহের অভিব্যক্তি

শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু

বিরহের প্রথমাবস্থা

বায়ুসেবন

(মোটরযোগে)

গড়ের মাঠের শান্ত স্নিগ্ধ সমীরণ কি আমার
বিরহ দাবদগ্ধ হৃদয়ে শান্তি আনিতে পারিবে না?

দ্বিতীয়াবস্থা

সঙ্গীত

সর্ব্বব্যথা নাশক
মহৌষধ—

"এস বাঞ্ছিত
করি লাঞ্ছিত
হৃদয় জ্বালা জুড়ায়ে
বুঝিতে পারিবে
কি আগুনে মোর
হিয়াটী দিতেছে পুড়ায়ে।"

তৃতীয়াবস্থা

উপন্যাসপাঠ

—মনটা অন্যমনস্ক থাকে ভাব তরঙ্গে হৃদয়ের ফাঁকগুলোও ভরে আসে তবু আধুনিক সাহিত্য-সম্রাটদের উদ্ভট মনস্তত্ত্বেভরা উপন্যাস হওয়া চাই - বঙ্কিমের নভেল পড়া আর বিরহের আগুনে ধুনা দেওয়া ও একই কথা।

শেষাবস্থা

নিদ্রা

সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রার মত বিরহক্ষতের অব্যর্থ মলম আর নাই—বিরহিণীগণ সর্ব্বদা ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

আত্মহত্যা

সকলেই মরে, কিন্তু আত্মহত্যা করে খুব কম লোকে। কার মরণ কখন আসে বলা যায় না। তবে আসে। আসিলে নিরুপায়—, মরিতে হয়। লোকে মরে। তুমি আমি সকলেই মরিব। তোমার আমার মত অনেক তুমি আমি, চিরকাল মরিয়া আসিতেছে এবং মরিবেও। কেহ বাঁচিবে না। জীবনের শেষ মৃত্যু। মৃত্যুর পরে—? কৌতুহলী কল্পনা করে, গম্ভীর প্রকৃতি প্রচুর দার্শনিক চিন্তার অবসর পান, আর অন্ধকার দেখে। প্রেমিক অন্ধ; কিছু দেখে না—দেখিতে চায়না। কৃপণ ধনী টাকার কাড়ির দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মাঝে মাঝে সরিষা ফুল দেখে। একমাত্র মৃত্যুই সরিষা ফুল দেখাইতে পারে।

মানুষ মরে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। প্রত্যেক মৃত্যুই একটা হত্যা। অর্থাৎ কে যেন তাকে মারে। এত দুঃখ এত কষ্ট, এত হিয়া দগদগি, কলিজা পুড়নি, উঁহু- তবু মরিতে চায়না। কাঁঠালের আঠার মত দুনিয়ার পায়ের তলে লেপ্টে থাকিতে চায়। শূকর যেমন কর্দমে, কৃমীকীট যেমন বিষ্ঠাকুণ্ডে, মাতাল যেমন মদ্যে, কামুক তেমন কুলটার বুকে, অনেকটা তেমনি। মানুষ যদি সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে মরিতে পারিত—চাহিত, তবে আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য দয়াময়কে নিশ্চয়ই পায়ে ধরিয়া খোষামোদ করিতে হইত। কেননা আমরা না হইলেত প্রভুর লীলা চলিত না। কিন্তু হায়—মানুষ এ জগতে খোষামোদ পাইতে আসে নাই খোষামদ করিতে আসিয়াছে। কলাবিদ্যা হিসাবে এই খোষামোদের চর্চ্চা যে যত করিতে শিখিয়াছে সে তত ভাল রকমে বাঁচিতে পারে। আর যে খোসামদ করিতে পারে না—সে দগ্ধ কদলী ভক্ষণ করে। পরে শুকাইয়া মরে। কেননা দগ্ধ কদলীতে রস নাই।

অথচ মানুষ ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারে। এই শাঠ্য এই ধাপ্পাবাজীর মুখে লাথি মারিয়া চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে লাথি খাইতে জন্মিয়াছে, সে লাথি মারিতে পারে না। দুনিয়ার লাথি খেয়ে বেঁচে থাকা আমাদের অভ্যাসে দাড়াইয়াছে, লাথি খাওয়া আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক হইবার সময় আমরা পরস্পরের মধ্যে ইহা বণ্টন করিয়া লই। এবং উত্তরাধিকার সূত্রে বংশানুক্রমে পরমসুখে ইহা ভোগদখল করিতে থাকি। আমরা মরিব কেন? আমরা লাথি খাইব। যে লাথি খাইতে চায়না সে আমাদের শত্রু সে মরুক। যিনি ভীষণ দয়া করিয়া আমাদিগকে লাথি দিতে দিতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন তিনি আমাদের নমস্য—উপাস্য। তিনি তেত্রিশ কোটী ছাকিয়া একটি। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং অথচ আশ্চর্য্য রকমে নিরাকার।

অনেকদিন আগে একটি তরুণী আমাকে লিখিয়াছিলেন যে "তুমি যদি এই রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা না কর, তবে জেনো আমি প্রাণ আর রাখিব না—সাবধান, সাবধান আমি আফিং হাতে করিয়া তোমার উত্তরের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।" দুরন্ত মাঘের শীতেও আমার ছোগেটার ঘামে ভিজিয়া গেল। তিনি তরুণী হইলে আমিও বড় কম যাইনা। আমিও কিনা তখন তরুণ। তথাপি করুণ হইতে পারিলাম না। অকারণ করুণ হওয়াটা আমার অভ্যাস ছিলনা। যা হোক ছাদে পায়চারী করিতে লাগিলাম। দস্তুর মত ভয় হইতে লাগিল। এত যে—; আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি কাটিল—। তার পরে অনেক দিন অনেক রাত্রি কেটে গেছে। অনেক বৎসরও কেটেছে। আত্মহত্যা-প্রয়াসী তরুণী প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে একটি করিয়া সন্তান প্রসব করিয়া সম্প্রতি নাকি অতিশয় স্থূলকায়া হইয়া পড়িয়াছেন, এক সময়ে আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করিলে,—তার ফলে পরে অবয়ব স্থূল হয় কি না সে সম্বন্ধে

আমার কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। যাই হউক,—মরণে ইচ্ছা জেগেছিল, কি ভাবিয়া পারিল না।

মরণে ইচ্ছা জাগে। সাহসে কুলায়না। মরুভূমি জীবন মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া ছুটিয়া অতিক্রম করিতে হয়। রাত্রি দিন মানুষ কেবলি কল্পনা করে সুখে বাঁচিয়া থাকিবে কি করিয়া। আজ দুঃখ ভোগ করে কাল সুখে থাকিবে বলিয়া। সেই কাল কয়জনের ভাগ্যে আসে? সেই সুখ কয়জন সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে ভোগ করিতে পারে? সুখের কল্পনা লইয়া মানুষ দুঃখে জীবন কাটায়। বাঁচিয়া থাকে একদিন ঈপ্সিত মিলিবে এই আশায়। আত্মহত্যা করে না—একদিন দেখা হইবে বলিয়া যদি এই কল্পনা না থাকিত মানুষ যদি কবি না হইত, তবে সকলেই আত্মহত্যা করিত।

পচা আলস্যে পলে পলে মরে তবু আত্মহত্যা করে না। শিথিল, অকর্মণ্য কুলটা লাথি খেয়ে তাড়িয়ে দেয়, তবু বেঁচে থাকে—লম্পট। অত্যাচার বাহুপাশে পুরুষকে বুকে হাটিয়ে নেয় যুবতী স্ত্রী কন্যাকে উলঙ্গিনী করে,—তবু আবার ক্ষণিক পরে ঘরে ফিরিবে। এই উভয়ের সংঘাতে সৃষ্টির ক্রিয়া প্রভুর ইচ্ছায় নির্বিঘ্নে চলিতে থাকে। কি বলিব ভাষা খুঁজিয়া পাইনা।

কি বলিতে ছিলাম? মরণে ইচ্ছা জাগে। জীবনে বৈচিত্র্য ফুরাইয়া যায়—বড় বিস্বাদ লাগে। নারীর ঠোঁটে নবকের তীব্র হলাহল। পাত্র ভরিয়া উঠে—ঠোঁট পুড়িয়া যায়।

সন্মুখ মৃত্যু কি আত্মহত্যা! কুরু পাণ্ডব উভয়েই কি আত্মহত্যার জন্য কোমর বাঁধিয়াছিল? তা নয়। সেই মহাসন্মুখে সব ক্ষত্রিয়ই ছিল ভীরু। কেবল একজন ছিল বীর,—যার সত্যি মরণে ইচ্ছা জেগেছিল। ধৃতরাষ্ট্রের মোহান্ধতা, দুর্য্যোধনের দম্ভ, যুধিষ্ঠিরের আত্মম্ভরিতা, শ্রীকৃষ্ণের শাঠ্য দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ-একা বিদুর কতটুকু? আর কেই বা তাকে মানে? তাই ভারতের আদর্শ ক্ষত্রিয়—ঘৃণায়, ধিক্কারে স্বেচ্ছায় মরণকে বরণ করিয়াছিল। নহিলে মৃত্যুর কি সাধ্য ছিল।

নিতান্ত দৈন্য ব্যতীত সকলেরই আত্মহত্যা করা উচিত। পুরুষ মাত্রেই এ বিষয়ে একমত হওয়া কর্ত্তব্য। কাপুরুষের কথা স্বতন্ত্র। তবে যাহারা নিতান্ত আত্মহত্যা করিবে না—তাহারা একদিন নিশ্চয় মারা যাইবে। এতে কোন সন্দেহ নাই। ৩।১২।২৪

শ্রীধ্বজবজ্রাঙ্কুশ।

আত্মহত্যা

সকলেই মরে, কিন্তু আত্মহত্যা করে খুব কম লোকে। কার মরণ কখন আসে বলা যায় না। তবে আসে। আসিলে নিরুপায়—, মরিতে হয়। লোকে মরে। তুমি আমি সকলেই মরিব। তোমার আমার মত অনেক তুমি আমি, চিরকাল মরিয়া আসিতেছে এবং মরিবেও। কেহ বাঁচিবে না। জীবনের শেষ মৃত্যু। মৃত্যুর পরে—? কৌতূহলী কল্পনা করে, গম্ভীর প্রকৃতি প্রচুর দার্শনিক চিন্তার অবসর পান, আর অন্ধকার দেখে। প্রেমিক অন্ধ; কিছু দেখে না—দেখিতে চায়না। কৃপণ ধনী টাকার কাড়ির দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মাঝে মাঝে সরিষা ফুল দেখে। একমাত্র মৃত্যুই সরিষা ফুল দেখাইতে পারে।

মানুষ মরে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। প্রত্যেক মৃত্যুই একটা হত্যা। অর্থাৎ কে যেন তাকে মারে। এত দুঃখ এত কষ্ট, এত হিয়া দগদগি, কলিজা পুড়নি, উঁহু- তবু মরিতে চায়না। কাঁঠালের আঠার মত দুনিয়ার পায়ের তলে লেপ্টে থাকিতে চায়। শূকর যেমন কর্দ্দমে, কৃমীকীট যেমন বিষ্ঠাকুণ্ডে, মাতাল যেমন মদ্যে, কামুক তেমন কুলটার বুকে, অনেকটা তেমনি। মানুষ যদি সোজা খাড়াহয়ে দাঁড়িয়ে মরিতে পারিত—চাহিত, তবে আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য দয়াময়কে নিশ্চয়ই পায়ে ধরিয়া খোষামোদ করিতে হইত। কেননা আমরা না হইলে প্রভুর লীলা চলিত না। কিন্তু হায়—মানুষ এ জগতে খোষামোদ পাইতে আসে নাই খোষামদ করিতে আসিয়াছে। কলাবিদ্যা হিসাবে এই খোষামোদের চর্চ্চা যে যত করিতে শিখিয়াছে সে তত ভাল রকমে বাঁচিতে পারে। আর যে খোসামদ করিতে পারে না সে দগ্ধ কদলী ভক্ষণ করে। পরে শুকাইয়া মরে। কেননা দগ্ধ কদলীতে রস নাই।

অথচ মানুষ ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারে। এই শাঠ্য এই ধাপ্পাবাজীর মুখে লাথি মারিয়া চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে লাথি খাইতে জন্মিয়াছে, সে লাথি মারিতে পারে না। দুনিয়ার লাথি খেয়ে বেঁচে থাকা আমাদের অভ্যাসে দাড়াইয়াছে, লাথি খাওয়া আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক হইবার সময় আমরা পরস্পরের মধ্যে ইহা বণ্টন করিয়া লই। এবং উত্তরাধিকার সূত্রে বংশানুক্রমে পরমসুখে ইহা ভোগদখল করিতে থাকি। আমরা মরিব কেন? আমরা লাথি খাইব। যে লাথি খাইতে চায়না সে আমাদের শত্রু সে মরুক। যিনি ভীষণ দয়া করিয়া আমাদিগকে লাথি দিতে দিতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন তিনি আমাদের নমস্য—উপাস্য। তিনি তেত্রিশ কোটী ছাকিয়া একটি। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং অথচ আশ্চর্য্য রকমে নিরাকার।

অনেকদিন আগে একটি তরুণী আমাকে লিখিয়াছিল বা ছিলেন যে "তুমি যদি এই রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা না কর, তবে জেনো আমি প্রাণ আর রাখিব না—সাবধান, সাবধান আমি আফিং হাতে করিয়া তোমার উত্তরের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।" দুরন্ত মাঘের শীতেও আমার ছোয়েটার ঘামে ভিজিয়া গেল। তিনি তরুণী হইলে আমিও বড় কম যাইনা। আমিও কিনা তখন তরুণ। তথাপি করুণ হইতে পারিলাম না। অকারণ করুণ হওয়াটা আমার অভ্যাস ছিলনা। যা হো'ক ছাদে পায়চারী করিতে লাগিলাম। দস্তুর মত ভয় হইতে লাগিল। এত যে—; আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি কাটিল—। তার পরে অনেক দিন অনেক রাত্রি কেটে গেছে। অনেক বৎসরও কেটেছে। আত্মহত্যা-প্রয়াসী তরুণী প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে একটি করিয়া সন্তান প্রসব করিয়া সম্প্রতি নাকি অতিশয় স্থূলকায়া হইয়া পড়িয়াছেন, এক সময়ে আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করিলে,—তার ফলে পরে অবয়ব স্থূল হয় কি না সে সম্বন্ধে

আমার কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। যাই হউক,—মরণে ইচ্ছা জেগেছিল, কি ভাবিয়া পারিল না।

মরণে ইচ্ছা জাগে। সাহসে কুলায়না। মরুভূমি জীবন মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া ছুটিয়া অতিক্রম করিতে হয়। রাত্রি দিন মানুষ কেবলি কল্পনা করে সুখে বাচিয়া থাকিবে কি করিয়া। আজ দুঃখ ভোগ করে কাল সুখে থাকিবে বলিয়া। সেই কাল কয়জনের ভাগ্যে আসে? সেই সুখ কয়জন সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে ভোগ করিতে পারে? সুখের কল্পনা লইয়া মানুষ দুঃখে জীবন কাটায়। বাচিয়া থাকে একদিন ঈপ্সিত মিলিবে এই আশায়। আত্মহত্যা করে না—একদিন দেখা হইবে বলিয়া যদি এই কল্পনা না থাকিত মানুষ যদি কবি না হইত, তবে সকলেই আত্মহত্যা করিত।

পচা আলস্যে পলে পলে মরে তবু আত্মহত্যা করে না। শিথিল, অকর্ম্মণ্য কুলটা লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়, তবু বেচে থাকে লম্পট। অত্যাচার বাজপথে পুরুষকে বুকে হাটিয়ে নেয় যুবতী স্ত্রী কন্যাকে উলঙ্গিনী করে,—তবু আবার ক্ষণিক পরে ঘরে ফিরিবা এই উভয়ের সংঘাতে সৃষ্টির ক্রিয়া প্রভুর ইচ্ছায় নির্বিঘ্নে চলিতে থাকে। কি বলিব ভাষা খুঁজিয়া পাইনা।

কি বলিতে ছিলাম? মরণে ইচ্ছা জাগে। জীবনে বৈচিত্র্য ফুরাইয়া যায়—বড় বিস্বাদ লাগে। নারীর ঠোটে নরকের তীব্র হলাহল! পাত্র ভরিয়া উঠে—ঠোট পুড়িয়া যায়।

যুদ্ধে মৃত্যু কি আত্মহত্যা! কুরু পাণ্ডব উভয়েই কি আত্মহত্যার জন্য কোমর বাঁধিয়াছিল? তা নয়। সেই মহাযুদ্ধে সব ক্ষত্রিয়ই ছিল ভীরু। কেবল একজন ছিল বীর,—যার সত্যি মরণে ইচ্ছা জেগেছিল। ধৃতরাষ্ট্রের মহান্ধতা, দুর্য্যোধনের দম্ভ—যুধিষ্ঠিরের আহাম্মকি, শ্রীকৃষ্ণের শাঠ্য দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ একা বিদুর কতটুকু? আর কেই বা তাকে মানে? তাই ভাবতের আদর্শ ক্ষত্রিয়—ঘৃণায়, ধিক্কারে স্বেচ্ছায় মরণকে বরণ করিয়াছিল। নহিলে মৃত্যুর কি সাধ্য ছিল।

নিতান্ত দৈন্য ব্যতীত সকলেরই আত্মহত্যা করা উচিত। পুরুষ মাত্রেই এ বিষয়ে একমত হওয়া কর্ত্তব্য। কাপুরুষের কথা স্বতন্ত্র। তবে যাহারা নিতান্ত আত্মহত্যা করিবে না তাহারা একদিন নিশ্চয় মারা যাইবে। এতে কোন সন্দেহ নাই। ৩।১২।২৪

শ্রীধ্বজবজ্রাঙ্কুশ।

পল্লী সংস্কার

শ্রীপূর্ণেন্দু ভূষণ দত্ত রায়

"বাইরের ঘরে ওসব কেরে, চ্যাচামেচি করচে ?" ভিতর হইতে বৃদ্ধ কর্ত্তার জিজ্ঞাসা।

"আমরা"

"আরে আমরা কে ? নাম নাই ?

(ব্যঙ্গস্বরে) আম্—রা !"

"আমি উপেন্দ্র, টুনু, নন্দী' গোপাল—"

"এখানে কি চাই তোমাদের ?"

"আজ্ঞে, আপনার কাছে একটু—"

"কী" বলিয়া কর্ত্তার বাহিরে আগমন।

"ও খাতা কিসের ?"

হাতে লইয়া পড়িলেন, খাতার উপব বড বড় অক্ষবে লেখা, "পল্লীসেবা-সমিতি।" তারপর পাতা উল্টাইয়া দেখেন, "১। শ্রীযুক্ত জয়কিশোর ভদ্র—৩৲"

"আমি ত প্রত্যেক বছরই ৩টাকা করে দেই, এবার তিনটাকা হোল যে! আচ্ছা থাক, ও একটাকার ওজব, দেখা যাবে'খন। দেখ, এবার কিন্তু দলটা ভাল হওয়া চাই। এবার 'ঘোষাল টোষালে' হবে না, 'নবীন' চাই।"

"আজ্ঞে আম্‌রা বারোয়ারী পূজার চাঁদাব জন্যে তো আসি নাই।"

"পূজার নয়! তবে কিসের চাঁদা ?"

"এই যে—পল্লী-সেবা-সমিতির জন্যে।"

"পল্লী-সেবা-সমিতি! সে আবার কি হে? ও, তোমাদের ছোক্‌রাদের থিয়েটার বুঝি ?"

"আজ্ঞে না, তাও নয়। নরেনবাবু আমাদেব গ্রামেব যুবকদের নিয়ে পল্লী-সেবা-সমিতি নামে একটা সমিতি গঠন করেচেন।"

"আজ্ঞে আবার কি হবে ?"

"এই দেখুন না সমিতির উদ্দেশ্য", এই বলিয়া উপেন খাতা খুলিয়া জয়বাবুর হাতে দিতে গেল।

"না না, রেখে দাও আবার কি, মুখেই বলনা শুনি।"

"পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা, গ্রামের রাস্তাঘাটের সংস্কার করা, ছেলেমেয়েদেব শিক্ষার ব্যবস্থা করা, রোগীর সেবা, দরিদ্রের সাহায্য—এক কথায় গ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতি বিধান করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। নরেনবাবু এই সমিতিব সম্পাদক। তাঁদেব বাহির বাটীর ঘরটাতেই আপিস করা হয়েচে। প্রথমতঃ আমরা দু'টি কাজে হাত দিতে চাই। বাজাবেব কাছের পুকুরটির পঙ্কোদ্ধার করা আব তিলীপাড়া হইতে বড সড়ক পর্য্যন্ত একটা রাস্তা বাহির কবা। আমবা গায়ে খাটিয়াই সব কবব, তবুও কিছু কিছু টাকার দরকার। আপনারা দশজনেব সহায়তা ভিন্ন হয় না। এই, আপনাকে ও সামান্য চাঁদা "

জয়বাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতেছিলেন। চাদার কথায় আসিতেই বলিযা উঠিলেন—

"হাঁ, আমাকে তোমরা টাকার গাছ পেয়েছ বুঝি! এই সব বুদ্ধি তোমাদের মাথায় কে দিলে? নরেন্ বুঝি ?"

"আজ্ঞে তিনিই ইহার প্রধান—"

"আবে আর বল কেন, আমি কি আর কিছু বুঝি না? তিনি না এখন কি পড়েন ? - ল না কি ?"

"হাঁ, গেল বছর তিনি ওকালতি পাশ করেচেন।"

"এখন বুঝি পসার জমাবার ফন্দি আঁটছেন ?"

"আজ্ঞে না, তিনি প্র্যাক্‌টিস্ করবেন না। পল্লীজননীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করেচেন।"

"আরে যাও, যাও,—পল্লীজননী—! তোমরা ছেলেমানুষ, এসব চাল্‌বাজী তোমাদের মাথায় ঢুকতে এখনও ঢের দেরী।

উকিল হয়েচেন কি না,—এই প্রথম দাঁওটা আমার উপর দিয়েই চালাতে চাইছেন। আরে রাম! আমি যেন আর কিচ্ছু বুঝি না!

তোমরা ও যেমন, সে যাই বলে আর অমনি নাকিয়ে উঠ্‌লে। আচ্ছা,—এই যে গ্রামের উন্নতির কথা বলছ কি উন্নতিটা তোমরা করতে চাও শুনি? সকরে থাক কিনা, গায়ের কি জান তোমরা। দুপাতা ইংরেজী পড়ে

ফুইস্, ফাইস্ কর, আর মনে কর যে, এগুলা কি অসভ্য। আরে তোমরাই বাপু, দেশটাকে মাটি করতে বসেছ। আমাদের আমলে এত ফুইস্, ফাইস্ ও ছিলনা, এত রাস্তাঘাট, হাটবাজার, গাড়ী ঘোড়াও ছিল না। ছিলাম দিব্বি সুখে। দুপয়সা সের দুধ, চার আনা সের ঘি আর মাছের ত কথাই নাই। আর এখন তোমাদের হাতে পড়ে কিনা,—একেবারে না খেয়ে খেয়ে মরছি! উন্নতি ত এই পর্য্যন্ত।"

"দেখুন ডাক্তারেরা বলেন, আজকাল এই যে কলেরা, উদরাময়, ইত্যাদি কাল-ব্যাধির প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, উপযুক্ত পানীয় জলের অভাব ইহার একটি প্রধান কারণ। এই পুকুরটির সংস্কার করতে পারলে বহুলোকের উপকার হয়। আর তিলীপাড়ার রাস্তাটিরও খুবই দরকার। নতুবা বর্ষাকালে বাড়ীর বাহির হওয়াই দায়।"

কেন, এখন ত প্রায় সব বাড়ীতেই পুকুর, পাতকুয়া। আগে সারাগ্রামে পুকুর বল্‌তে এক দত্তবাড়ীর পুকুর। তাতেই বৌ-ঝিরা স্নান কর্ত্তো জল নিয়ে আস্‌তো। আর কালীগঞ্জ না গেলে বাপু, সড়কের মাথায় পা পড়ত না। কথায় বলে যার ছেলে যত খায় তার ছেলে তত চায়।

জয়কিশোর বাবুর নিকট হইতে কিছুতেই কিছু পাইবার আশা নাই দেখিয়া যুবকগণ অগত্যা আস্তে আস্তে পাঁচুবাবুর বাড়ীর দিকে চলিল।

স্বাধীনতার সেবা

(টি-এল-ভাশোয়ানির রচনা হইতে অনুদিত।)

নিজের ক্ষেত্রে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিয়া যাও—কর্ম্মের সার্থকতা তাহাতেই। জাতীয় জীবনের সংস্কার করিতে হইলে নিজের হৃদয়ের সংস্কার কর। কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তবেই বাক্যের চেয়ে তোমার কর্ম্ম উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

ভারতের সেবা করিতে হইলে সোজা হইয়া চল। চতুর মানুষ যথেষ্ট আছে। দেশ এমন লোক চায় যে সত্য লক্ষ্য করিয়া চলিবে—তাহারাই সাহস ও আত্মসংযমের সঙ্গে কার্য্য করিতে পারে।

দরিদ্র নারায়ণকে পদ দলিত করাতেই ভারতের পতন হইয়াছে। ভারতের পুনরুত্থান দেখিতে চাহিলে দরিদ্রকে আবার তেমনি হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের গৌরব অনুভব করিতে হইবে। ভারতের পাহাড়, পর্ব্বত, গিরি, আশ্রম, নদ নদী হ্রদ, গ্রাম কর্ম্মশালা সকলেরই গৌরব গাথা গাহিতে হইবে। তার সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত গৌরবভরে দেখ। ভারতকে এমন ভাল যে বাসিতে পারে সে ধন্য।

যে সেবা তোমার নিজের মর্ম্মে পীড়া দেয় তেমন সেবায় কোন কাজ হইবে না। সেবা নামে সাধারণতঃ যাহা চলে তাহা আত্মসেবা মাত্র। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই ইহার উদ্দেশ্য। সত্য সেবা করিতে চাহিলে নত হও।

প্রতিদিন ভারতকে ভাব। প্রত্যেক ভাবনা নক্ষত্র হইয়া ফুটিয়া উঠিয়া স্বাধীনতার আলো বিকীর্ণ করিবে।

দরিদ্র এক বৃদ্ধ শীতে কাঁপিতেছিল। পথিক একজন তাহাকে দেখিয়া নিজ পকেটে হাত দিয়া দেখিল কিছু নাই—তখন সে নিজের গায়ের জামাটি খুলিয়া দরিদ্র বৃদ্ধের গায়ে দিয়া ভগবানকে বলিল 'হে দরিদ্রের নারায়ণ ইহাকে দয়া কর। যখন এ দৃশ্য দেখিলাম তখন রাত্রিকাল। উপরে চাহিয়া দেখিলাম নক্ষত্ররাজি নগরের উপর উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিয়া আশীর্ব্বাদ ছড়াইতেছে।

কাজের কথা
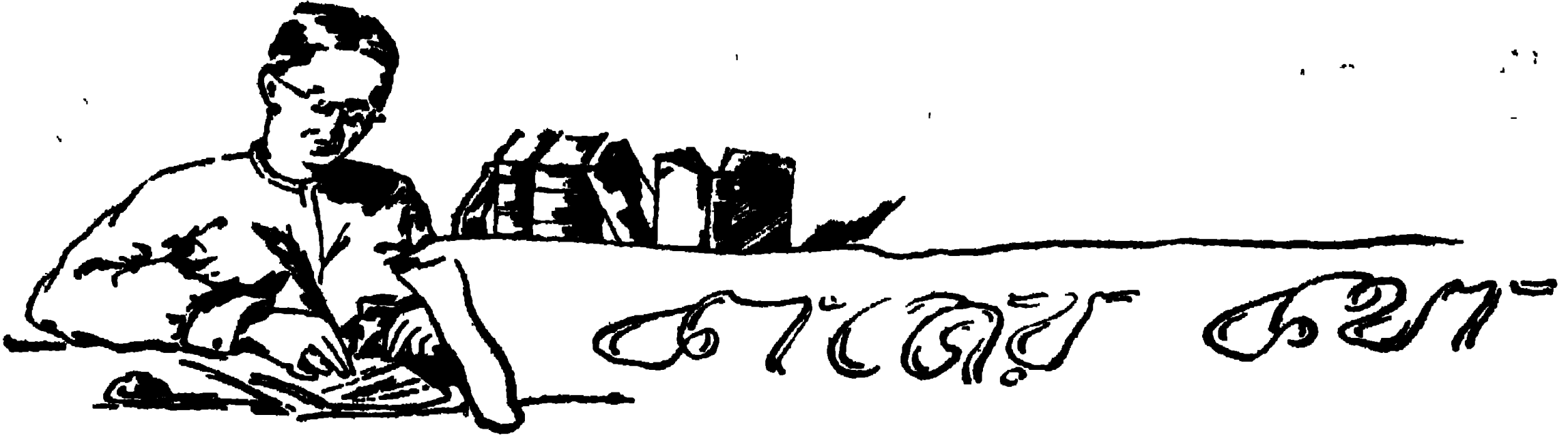
পরলোকে সুব্রহ্মণ্য আয়ার - দাক্ষিণাত্যের গৌরব তেজস্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সুব্রহ্মণ্য আয়ার আর নাই। নির্ভীক দেশপ্রেমিক ৮২ বৎসর বয়সে ইহলোকের কর্ম্ম সমাধা করিয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। ১৮৪২ খৃঃ সুব্রহ্মণ্যের জন্ম হয়—১৮৬৬ খৃঃ বি-এ ও পরে বি-এল পাশ করিয়া ১৮৮৮ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি মাদুরায় ওকালতী করেন। ১৮৯৫ খৃঃ ইনি মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। তিন বার সুব্রহ্মণ্য মান্দ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন ও উচ্চ রাজ সম্মান স্যর ও অন্যান্য উপাধিতে ভূষিত হন। আইনে ইঁহার অসাধারণ দক্ষতা ও ন্যায়বান্ বিচারক রূপে বিশেষ খ্যাতি ছিল। কিন্তু এ সব খ্যাতির চেয়েও অন্যদিকের খ্যাতিই তাঁহাকে উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করিয়াছে বেশী। ইনি নিখিল ভারত জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তারপর ভারতীয় জাতীয় জাগরণের সময় শ্রীমতী বেসান্তকে যখন গবর্ণমেণ্ট অন্তরীণে আবদ্ধ করেন তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সুব্রহ্মণ্য এই অন্যায়ের প্রতিবাদে নিজের রাজ সম্মান উপাধি প্রভৃতি অম্লান নির্ভীক চিত্তে ফিরাইয়া দেন। সুব্রহ্মণ্যের কার্য্যে তখন সমগ্র ভারতে সাড়া পড়িয়াছিল। তারপর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসনের কাছে ইনি ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের যে অপ্রীতিকর সমালোচনা পাঠাইয়াছিলেন তাহা লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল। ভারত সরকারের পরম বিশ্বাসভাজন ন্যায়বান প্রধান বিচারপতি সত্যের অনুরোধে সেই সরকারেরই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ গৌরব সুব্রহ্মণ্যের সত্যই প্রিয় ছিল, সত্য তাঁহার বর্ম্ম ছিল বলিয়াই—এমন দৃঢ়চেতা তিনি হইতে পারিয়াছিলেন। অখ্যাত বাঙ্গালী যুবক স্বামী বিবেকানন্দ যখন বিশ্বজয়ের শক্তি লইয়াও নিঃস্ব অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন এই সুব্রহ্মণ্যই তাঁহাকে যথোপযুক্ত সাহায্য করিয়াছিলেন। আদর্শ চরিত্র ভারত গৌরব পুরুষসিংহের স্মৃতি ভারতীয়ের দেশাত্মবোধকে উজ্জ্বল রাখিবার সহায়তা করিবে। মহাপুরুষের স্মৃতিকে নবযুগ অন্তর ভরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে।

গৌরহরি পরলোকে:- চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা অক্লান্তকর্ম্মী জ্ঞান প্রচারের সহায়ক গৌরহরি সেন মহাশয়ের অকাল বিয়োগে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। সাধারণ পাঠাগার স্থাপন সমাজের পক্ষে কত আবশ্যকীয় কত কার্য্যকরী গৌরহরিবাবু তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন তাই জ্ঞানের মন্দির চৈতন্য লাইব্রেরী আজ তাঁহার উজ্জ্বল স্মৃতি হইয়া রহিয়াছে। স্থানান্তরে গৌরহরির জীবন-কথা দেওয়া হইল।

—ঃ—

দেশপ্রেমিকা শ্রীমতী বেসান্ত:— মহাত্মার মিলন আহ্বানে অন্যান্য দেশনেতাদের সঙ্গে শ্রীমতী বেসান্তও কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন! কংগ্রেস নেতাদের চরকা কাটিতে হইবে, ইহাই ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নিয়ম। তাই শ্রীমতী কথা ও কার্য্যে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য এই বৃদ্ধ বয়সেও চরকা কাটা শিখিতেছেন। বেলগাঁ কংগ্রেসের সময় হয়তো শ্রীমতী বেসান্ত রাষ্ট্রপতি মহাত্মা গান্ধীকে স্বহস্তে কাটা সূতা দিয়াই অভ্যর্থনা করিবেন।

কংগ্রেস ব্যবস্থায় বাংলা কতদূর?— এক শ্রীমতী বেসান্তের কার্য্যের দৃষ্টান্তে সমগ্র মান্দ্রাজ অনেক অগ্রসর হইবে। বাংলায় বেসান্ত ভক্ত রাজনীতিকের অভাব নাই—তাঁহারা এবার কি এ পথে অগ্রসর হইবেন না? বাংলার নেতারা আধ ঘণ্টা চরকা কাটার ব্রত কি ভাবে উদ্‌যাপন করিতেছেন তাহা কিন্তু এখনো বিশেষ জানিতে পারা যাইতেছে না। মিলন যে সর্ব্বজন নেতারা মানিয়া লইয়াছেন তাঁহারা নিজেরা দৈনিক অর্দ্ধ ঘণ্টা করিয়া

এই চরকা কাটা আরম্ভ করিলেই সারা দেশময় আবার চরকার প্রচলন হইতে পারে—দেশে বস্ত্র সমস্যার সমাধান হইতে পারে। নিজহাতে দেশের জন্য সত্য কিছু করিতেছি এ বোধেও দেশের লোকে তৃপ্তিতে উল্লসিত হইতে পারে—দেশের প্রাণ সঞ্চারের মুখ্য জিনিস ছাড়িয়া গৌণের সেবা আর কতকাল চলিবে?

এদেশী ও বিদেশী -এদেশে যে জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় তাহা ব্যবহারে না লাগাইয়া বিদেশী জিনিসের উপর আগ্রহ কেন! দেশীয় শিল্পের, দেশীয় খনিজ দ্রব্যের উপর দেশের লোকের যেমন দরদ থাকা দরকার দেশের সরকারেরও তেমনি দরদ থাকা দরকার। এদেশে যথেষ্ট কয়লার খনি আছে, কয়লাও ভিন্ন দেশের চেয়ে খারাপ নহে তবু কিন্তু ভারতীয় কয়লা ব্যবসায়কে ধ্বংস করিয়া আফ্রিকার কয়লা ভারতে চালাইবার যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে। ভারতীয় কয়লা এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশ যাইতে যে মাশুল লাগে ভারতের বাহির হইতে ভারতে কয়লা আসিতে তার চেয়ে কম মাশুলে আসে। ব্যবসায়ে এ অবিচার কেন থাকিবে! তারপর ভারত সরকার সম্প্রতি সক্কর নদীর বাঁধের জন্য আফ্রিকা হইতে বহু টন কয়লা আমদানী করিতেছেন—ভারতেই প্রচুর কয়লা থাকিতেও ভারতীয় কয়লার উপর এ বিষ দৃষ্টি পড়িবার কারণ কি সরকারের? ট্যারিফের অবিচার দেশীয় সকল জিনিসের উপরেই পড়িয়া দেশীয় শিল্পকে মুহ্যমান করিয়া রাখিয়াছে। দেশীয় কাগজ-কলগুলিকে বিদেশী কাগজের অসম প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিয়াই আশা করি ট্যারিফ্ বোর্ড ভারতীয় কয়লার ব্যবসায়গুলিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবেন।

চিত্তরঞ্জনের সর্ব্বস্ব দান—সংবাদপত্রে দেখিলাম শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও বসতবাটীখানি দাতব্য কার্য্যে ট্রাষ্ট করিয়াছেন। মেয়েদের জন্য একটি কলেজ ও মন্দির বিগ্রহ তাঁহার ভবানীপুরের বাটীতে রাখিতে হইবে, হিন্দু বালিকাদের ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে। দাতব্যের মর্ম্ম এই। শ্রীযুক্ত দাশ টালিগঞ্জ অঞ্চলে ছোট একখানি বাড়ী করিয়া ২০০্, ৩০০্ মাসিক খরচে দিন কাটাইবেন। তবে এই সব হইবার আগে তাঁহার বন্ধকী অবন্ধকী সমগ্র ঋণ ট্রাষ্টকে পরিশোধ করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত দাশের অন্যান্য সম্পত্তি ও বাটীখানির মূল্য কত দেনাই বা কত? ভারতীয় নারীর জন্য একটি কলেজ স্থাপনেও তো ব্যয় কম নয়। শ্রীযুক্ত দাশের ইচ্ছামত অন্যান্য দু' তিনটি দাতব্য কার্য্যেও অর্থ লাগিবে। ঋণ শোধ দিয়া সম্পত্তি হইতে এ অর্থ আসিবে তো? চিত্তরঞ্জন ত্যাগী পুরুষ যে ইচ্ছায় তিনি সব ছাড়িয়া আজ সামান্য গৃহস্থভাবে থাকিতে যাইতেছেন তাহা সফল হইলেই সুখের কথা। শুনিয়া সুখী হইলাম শ্রীযুক্ত দাশের পাওনাদারদের মধ্যে অনেকেই স্বপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে ঋণদায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন। ত্যাগীর সম্মান রক্ষায় মহাজনদের ত্যাগও প্রশংসনীয়।

বিদায়মান শেরিফ স্যর উইলোবি কেরী কলিকাতার শেরিফ স্যর উইলোবি কেরী তাঁহার কার্য্যকাল ফুরাইতে বিদায় লইতেছেন—তাঁহার স্থানে নূতন শেরিফ্ হইতেছেন স্যর ওঙ্কারমল জেঠিয়া। স্যর উইলোবি তাঁহার আমোলে একটি নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন করিলেন—শেরিফের বিদায় সম্মিলনী। প্রতি বৎসর ২০শে ডিসেম্বর এই সম্মিলনী হইবে ও সহরের বিশিষ্ট লোকেরা ইহাতে আমন্ত্রিত হইবেন। ইহাতে শেরিফের কার্য্য কলাপের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইবে—স্যর উইলোবি স্বনামধন্য ব্যবসায়ী, আজ এই দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ কালে আমরা তাঁহাকে আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

মিণ্টো প্রফেসর—ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় ৫ বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির মিণ্টো প্রফেসর নিযুক্ত হইলেন। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার নিয়োগে আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু বারংবার একই ব্যক্তিকে মোটা মাহিনার এই সম্মানের পদে নিয়োগের কারণ কি? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কোন যোগ্য অর্থনৈতিক কি নাই? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নাকি ভারতের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়—কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপককে কোন বড় কমিশনে দেখা গেল না—ইহাও পরিতাপের বিষয়।

স্বর্গীয় গৌরহরি সেন

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

'চৈতন্য লাইব্রেরী' আছে, কিন্তু 'গৌরহরি' নাই। একথা ভাবা যায় না। ভাবিতেও কষ্ট এ কথার ইঙ্গিতও মর্ম্ম স্পর্শ করে। আজ যাঁহার স্মৃতিতর্পণে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তিনি কোন দিন দিকপাল ছিলেন না; সাহিত্য-গগনের তিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন না সমাজ বা রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিয়া কখনও যশোমুকুট পরিবার সাধ তাঁহার হয় নাই, অথবা ধর্ম্মযজ্ঞে ঋত্বিকের কৃত্য বা পৌরোহিত্য করিবার সামান্য স্পৃহাও তাঁহার কোন দিন ছিল না। তবে তাঁহার জন্য এত আয়োজন উদ্যোগ কেন? "উৎসবপ্রিয়াঃখলু মানুষাঃ"—ইহা তাহার কারণে হইতে পারে না। প্রসিদ্ধি আছে বটে—

> "প্লাবনে ডুবিল গিরি
> কাঁদে লোকে আহা করি
> বড় ব্যথা পেয়ে।
> ক্ষুদ্র এক বালুকণা
> ডুবিল কি ডুবিল না
> কে দেখিবে চেয়ে॥"

জলপ্লাবনে পর্ব্বতচূড়া আজ নিমজ্জিত হয় নাই সত্য, কিন্তু ছোট্ট একটু বালুকণার জন্য কলিকাতাবাসীর হৃদয়ে আজ যে স্পন্দন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে গৌরহরিকে যিনি একবার দেখিয়াছেন—তাঁহার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়াছেন, তাঁহাকেই এই স্মৃতিসভায় টানিয়া আনিয়াছে। বিগত ১৫ই কার্ত্তিক তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁহারা সৌম্য সুন্দর মূর্ত্তি—তাঁহার সেই প্রকৃতিগত অমায়িক ভাব আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে। গৌরহরি স্পষ্ট বক্তা ছিলেন; কর্ত্তব্যে ছিলেন তিনি বজ্রের মত দৃঢ় ও কঠোর, আবার ব্যবহারে তিনি বালকের মত কোমল স্বভাব ছিলেন। ভবভূতির "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"র গৌরহরিই একালের জলন্ত উদাহরণ। তিনি আমাকে ও আমার বন্ধু মন্মথনাথ বসাককে অনেক সময় বলিতেন—

'সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ। মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।'

আর বলিতেন 'অমূল্য সংস্কৃতনবিশ, সে একরকম মানে করবে, কিন্তু আমি 'প্রিয়ং' 'অপ্রিয়ং'কে ক্রিয়ার বিশেষণ করব। প্রিয় অপ্রিয় সত্য বলা টলা বুঝি না, সত্য সকল সময়েই বলতে হবে, তবে প্রিয়ভাবে বলতে হবে, অপ্রিয়ভাবে নয়। বিংশ শতাব্দীর এই মল্লিনাথ কথায় ও কাজে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা ইহা নিজে পালন করিতেন। আমি তাঁহাকে কখনও রাগিতে দেখি নাই। তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ৩৩।৩৪ বৎসর পূর্ব্বে। তখন আমার বয়স ১৩।১৪ বৎসর। তখন হইতে আমি তাঁহাকে জানিতাম—ভাল করিয়া জানিতাম। অনেক সময় তাঁহাকে রাগাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। কেহ তাঁহাকে রাগাইতে পারিয়াছে বলিয়াও আমার জানা নাই।

ইঁনি সঙ্গতিপন্ন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব বিশ্বম্ভর সেন মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ছিলেন। পিতামাতার আনন্দদুলাল হইয়াও তিনি বিবাহ করেন নাই। তাঁহার একমাত্র নেশা ছিল বইপড়া—বই রীতিমত যত্ন করিয়া পড়িতেন, হজম করিতেন, দরকারী বিষয় টুকিয়া রাখিতেন। তাঁহার গুণ ছিল অনেক। মাত্র দু'একটীর অবতারণা করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসের 'মানসীতে' সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ আছে। গৌরহরিবাবুর কর্ম্মের কীর্ত্তি চৈতন্য লাইব্রেরী। চৈতন্যলাইব্রেরীর গৌরহরিবাবু বলিয়াই তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। গৌরহরিবাবুকে দেখিলেই চৈতন্যলাইব্রেরীর কথা মনে স্বতঃই জাগিয়া উঠিত। এই লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র 'মানসী' পত্রিকায় যাহা বলিয়াছেন আমি তাহাই কিছু উদ্ধৃত করিতেছি; কারণ সেই একই ঘটনা

নূতনভাবে পুনরায় উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা দেখি না; আরও একটা কথা উহাতে গৌরহরি বাবুর নিজের উক্তিই বেশী আছে ঃ—

"এ সম্বন্ধে গোবর্দ্ধন সঙ্গীতসাহিত্য-সমাজে পঠিত প্রবন্ধে তিনি 'গৌরহরিবাবু' যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"কম্বুলেটোলা লাইব্রেরীর অনুকরণে ৺গঙ্গানারায়ণ দত্ত মহাশয়ের আনুকুল্যে, টমরি সাহেবের নেতৃত্বে, বিডনষ্ট্রিটের ৮৩ নং বাটীতে, ১৮৮৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে চৈতন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়।'

লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন—'১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আমি কম্বুলেটোলা লাইব্রেরীর সভ্য ছিলাম। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিডনষ্ট্রীটের প্রতিবেশী বন্ধু কুঞ্জবিহারী দত্তকে ঐ লাইব্রেরীতে ভর্ত্তি করাই। কুঞ্জের তখন গাড়ী ঘোড়া ছিল না। বর্ষাকালে কম্বুলেটোলা যাইতে কষ্ট হওয়ায় তাহার বিডনষ্ট্রীট অঞ্চলে একটা লাইব্রেরী করিতে সাধ হয়। কুঞ্জর দ্বিতীয় ভ্রাতা নিতাইচাঁদ খুব উৎসাহী ছিল। আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া, তাহারও লাইব্রেরী সম্বন্ধে বাতিক জন্মে। দুই একদিনের মধ্যে নিতাইএর গৃহশিক্ষক হরলাল শেঠ ও আমাদের প্রতিবেশী রঙ্গলাল বসাক আমাদের দলভুক্ত হইলেন।

কিন্তু টাকা কোথা? ঘর কই? হরলাল বাবু মাষ্টার, রঙ্গ সামান্য মাহিনার কেরাণী, নিতাই হেয়ার স্কুলে পড়ে, কুঞ্জ এফ-এ ক্লাসের ছাত্র, আমি এফ, এ পরীক্ষায় ফেল হইয়া টোটো কোম্পানীর কার্য্য করি। কুঞ্জ ও নিতাইএর পিতামহ গঙ্গানারায়ণ দত্ত মহাশয়ের ইংরাজী চিঠি-পত্র লিখিয়া আমি তাঁহার স্নেহ ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলাম। কুঞ্জ ও নিতাইএর পরামর্শে তাঁহার নিকট লাইব্রেরীর কথা পাড়িলাম। অল্পদিনের মধ্যেই বিড়ালের ভাগ্যেও শিকা ছিঁড়িল। তিনি বলিলেন, তোমাদের কিছু টাকা আর এই ঘরটা দিব। এই ঘরটা মানে বিডনষ্ট্রীটের ৮৩ নং বাড়ীতে ঢুকিয়া বাঁধারের ঘর ...। লাইব্রেরী ঐ ঘরে বিনা ভাড়ায় কিঞ্চিদধিক চারিবৎসর ছিল।

"[illegible] তাহার দাদার, মাষ্টারের, রঙ্গর ও আমার [illegible] লইয়া একটা আলমারিতে পুরিল। প্রথম মাসে দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকায় খান কতক বাঙ্গালা পুস্তক কেনা হইল। একদিন ভূপেন (এখন বাবুডাঙ্গাবাসী) আসিলে তাহার নিকট খান ছয়সাত বই পাওয়া গেল। কিন্তু দুইমাসের চেষ্টায় কিছুতেই একটা আলমারি ভরিল না। কুঞ্জর শ্বশুর মহাশয় প্রত্যহ "Indian Mirror" পাঠাইয়া দিতেন। প্রতি সপ্তাহে "বঙ্গবাসী" ও "সঞ্জীবনী" কেনা হইত।"

৺গৌরহরি সেন

তারপর লাইব্রেরীর নামকরণ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। গৌরহরি বাবুর কথায় বলি—"আমি নাম দিয়াছিলাম Beadon Square Literary Club" [গঙ্গানারায়ণ] দত্ত মহাশয় বলিলেন, "অ্যাঁ, ঠাকুরদের নাম দাও নি?" অনেক তর্কাতর্কির পর Chaitanya Library and Beadon Square Literary Club এই নাম স্থির হইল। আমরা ১৮৮৯ সালের ১লা জানুয়ারী সাইন বোর্ড লাগাইব স্থির করিয়াছিলাম। [illegible] মহাশয়

পাঁজী দেখিয়া বলিলেন, দিনটা খারাপ। সুতরাং সরস্বতী পূজা (৫ই ফেব্রুয়ারী) পর্য্যন্ত দিন পিছাইতে হইল।"

ইহাই চৈতন্য লাইব্রেরীর জন্মের কাহিনী।

প্রথম বৎসরের কার্য্য বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ দত্ত মহাশয় ৩০০৲ টাকা ও শ্রীযুক্ত ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ২০৲ টাকা এক কালীন দান করিয়াছিলেন।

ঐ বৎসরে কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন— টমরি সাহেব।

সহঃ সভাপতি ছিলেন—ডাঃ এম এন্ ব্যানার্জ্জি ও সোম প্রকাশকের সম্পাদক বিদ্যাভূষণ মহাশয়।

সম্পাদক ছিলেন শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক	,,	শ্রীগৌরহরি সেন
গ্রন্থরক্ষক	,,	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সহকারী ঐ	,,	শ্রীনিতাই চাঁদ দত্ত ও
		শ্রীরঙ্গলাল বসাক
ধনাধ্যক্ষ	,,	শ্রীকুঞ্জবিহারী দত্ত
হিসাব নিকাশ পরিদর্শক..		শ্রীহরলাল শেঠ

১৮৯৪ সালে গৌরহরি বাবু সম্পাদক পদে মনোনীত হন। তদবধি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। এই সামান্য আরম্ভ হইতে পাড়ার যুবকবৃন্দের উৎসাহে ও গৌরহরি বাবু ও তদীয় বন্ধুবর্গের চেষ্টায় আজ চৈতন্যলাইব্রেরী কলিকাতার উত্তরাঞ্চলের লাইব্রেরীগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

তৎপরে "কুঞ্জর আন্তরিক যত্নে ও রাধকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের ব্যয়ে ১৮৯৩ সালের শেষ ভাগে, ৪।১ নং বিডন ষ্ট্রীটে লাইব্রেরীর জন্য দ্বিতল বাড়ী তৈয়ারী হয়। ভাড়া সস্তা, বৎসরে দুইশত টাকা।"

টমরি সাহেব এই প্রতিষ্ঠানটীর উন্নতির জন্য যে যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহা গৌরহরি বাবুর কথায় বলি,—"১৮৯১ সাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক চিঠি, প্রত্যেক বাৎসরিক রিপোর্টের গোড়া হইতে শেষ লাইন, তিনি দেখিয়া দিতেন। সাহেবের ইচ্ছা ছিল যে, এমন একটী Reading Circle গঠিত হউক যেখানে সভ্যগণ মিলিত হইয়া নূতন নূতন পুস্তক পাঠ ও আলোচনা করিবেন। কিন্তু যুবক গৌরহরির পরিকল্পনা ছিল Circulating Library করিবার। ইহার সাহায্যে সাধারণের মধ্যে পাঠানুরাগ বর্দ্ধিত করিবার ইচ্ছাই তাঁহার বলবতী ছিল। তাঁহার আরও ইচ্ছা ছিল যে, এই লাইব্রেরীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভা সমিতিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীদের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দান। এই লাইব্রেরীকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন কেন্দ্র করিবার জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যৌবনকাল হইতেই বুঝিয়াছিলেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনোৎপন্ন জ্ঞানের আলোকেই ভারতের সাধারণ লোকদের ভিতর যে অন্ধকার রহিয়াছে তাহা দুর করিতে সমর্থ। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান-বিমুখ ভারতবাসীকে কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে শুধু অতীতের দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। ভারতবাসীর মনে চেতনা ও প্রেরণা আনাইয়া দিতে পারে—পাশ্চাত্যের কর্ম্মপ্রবণতা ও পরীক্ষিত জ্ঞান। আর তিনি বুঝিয়াছিলেন এই দুই জাতির পরস্পরের ভাবের আদান প্রদানে যে সুফল উৎপন্ন হইবে তাহাতে একতার বন্ধন দৃঢ় হইবে। দেশী ও বিদেশী মনীষীদের প্রদত্ত প্রবন্ধগুলি জ্ঞানানুশীলনে যে সহায়তা করিয়াছে তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। বঙ্গ ভাষায় শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় "আর্য্যামি ও সাহেবী আনা" 'সাধনা' 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' 'অদ্বৈতবাদের সমালোচনা' ও "একটী প্রশ্ন ও তাহার উত্তর" ; বিশ্বকবি বরেণ্য রবীন্দ্রনাথ 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরী', 'ইংরাজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধ', "বঙ্কিমচন্দ্র' 'মেয়েলি ছড়া', 'স্বদেশী সমাজ', 'পথ ও পাথেয়' প্রভৃতি প্রবন্ধ ; পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত "হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়", কুশাগ্রবুদ্ধি স্বভাবসুন্দর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'অরণ্যে রোদন' প্রভৃতি অনবদ্যসুন্দর প্রবন্ধ নিচয় পাঠ করেন। Dr Grierson, Dr Wilson, Pro F. Alexander Thomson, the Hon Sir Alexender Miller, Sir Roper Lethbridge, the Hon Sir Lawrence Jenkins, W. King Consol Genl. R. F. Paterson, Hon Sir Edward Law, S. K. Ratcliffe, Sister Nivedita, Principal Havell, Consol-

General W. H. Nichal, General Samuel Merill Hon'ble F. G. Monohan Wodrofe প্রভৃতি বিদেশী পণ্ডিতবর্গ তথ্যপূর্ণ নানা বিষয়ক ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহাদের মতের সহিত আমাদের পরিচয় সাধন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত Rev. Tomary, Rev. Father Lafont, the most Rev. weldon প্রভৃতি পুরোহিতগণও জ্ঞানের বর্ত্তিকা লইয়া বিষয় বিশেষে আমাদিগকে আলোক দান করিয়াছেন। আর যে সকল দেশীয় মনীষী পাশ্চত্যদিগকে আমাদের জ্ঞানানুশীলনের (cultureএর) ধারা বুঝাইবার জন্য প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে A. Choudhuri, T. N. Mukherjee, N. N. Ghose. P. N. Bose, Hon. Mon. Mr Ananda Charlu, Hon Mr B. L. Gupta, Hon Dr R. G. Bhandarkar প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমরা আশ্চর্য্য হইয়া যাই কেমন করিয়া গৌরহরি বাবু বৎসরের পর বৎসর প্রতিবর্ষে এইরূপ বিদ্বজ্জন সমাদৃত মনীষিগণের দ্বারা প্রবন্ধ লিখাইতে সমর্থ হইতেন। এই সকল সভায় যাঁহারা সভাপতি হইয়াছেন তাঁহারাও সর্বজন-পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম করিতেছি :—

Hon. Justice Norris, Sir Gurudas Bannerjee, Raja Pearymohan Mukherji, Rev. Alax Tomary, Dr. Mahendra Lall Sarkar, Hon. Mr Harry Lee, Hon. Sir Comer Petharam, Sir Edward Buck J Wilson (I, D. News), R. D. Mehta, Rai Bahadur Bankim chandra Chatterji Mr B. De, Hon. Dr Rashbehari Ghose, Hon. Sir Henry Cotton, Hon. Mr A. M. Bose, Hon. Sir Herbert Risley, Hon. Sir Francis machan, Hon. Sir John Stanley, John Woodborn, Hon. Sir Edward F. Law, Mr R. C. Dutt, Hon. Major Genl Sir Edward Ellis, Hon. Sir Earle Richards, Chandranath Bose Hirendranath Dutta.

এই তালিকা হইতে বেশ বোঝা যাইবে যে, বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীদেরও চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। ইহার উন্নতির জন্য তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। এই বড় বড় সভাসমিতির ব্যাপার লইয়া গৌরহরিবাবুর সহিত টমরি সাহেবের মতের পার্থক্য ছিল। তিনি এ সকলকে হুজুগ বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু গৌরহরিবাবুকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন বলিয়া এই কার্য্যে বাধা দেন নাই। গৌরহরিবাবুর কথায় বলি, এইজন্য "তিনি আমাকে হুজুগে বলিয়া ভৎর্সনা করিতেন।" অধ্যাপক টমরি সাহেব জ্ঞান প্রচারের জন্যই ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি চাহিতেন, ছাত্রদিগের ভিতর জ্ঞানানুশীলন স্পৃহা বর্দ্ধিত হউক। আর গৌরহরিবাবু চাহিতেন, সকলের মধ্যে ঐরূপ স্পৃহা বর্দ্ধিত হউক। ভারতবাসীর মন যাহাতে ব্যবহারিক শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হয় তজ্জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। যাহা হউক দুজনের মধ্যে পার্থক্য আমরা বড় দেখিতে পাই না। পথটা একটু ভিন্ন ছিল। কিন্তু উদ্দেশ্য উভয়ের একই ছিল—শিক্ষার ব্যবস্থা। এই প্রতিষ্ঠানটী তাঁহার বড় আদরের, প্রাণের সামগ্রী ছিল। ইহার কার্য্য করিয়া তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন। ইহার বিষয় তিনি অপরকে বলিয়া পুলকিত হইতেন। এখানে আসিবার জন্য তিনি সাহিত্যিকদিগকে নিমন্ত্রিত করিয়া উৎফুল্ল হইতেন। তাঁহার স্মৃতি চৈতন্য লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরী যাহাতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং উত্তরোত্তর যাহাতে ইহার উন্নতিবিধান হয় তাহাই করিলে তাঁহার প্রকৃত স্মৃতিরক্ষা করা হইবে। আর একটা কথা বলি, আজিও তাঁহার চিরদিনের পোষিত বাসনা ফলবতী হইল না তাঁর বড় সাধের চৈতন্য লাইব্রেরীর স্থায়ী গৃহ নির্ম্মিত হইয়া উঠিল না। চৈতন্য লাইব্রেরী আর কতদিন 'পরবাসভূমে' থাকিবে?

গৌরহরি অপরকে সাহিত্য-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পিতৃনামে 'বিশ্বম্ভর সেন পদক' চৈতন্য লাইব্রেরী হইতে প্রদান করিয়াও তিনি প্রবন্ধ লেখক দিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন।

যাও বন্ধু অমরধামে যাও। তোমাকে হারাইয়া আজ আমরা বিষণ্ণ। কিন্তু বিষাদের মধ্যেও আনন্দের কথা

এই, তোমার শোকসভায় আজ যে সকল সুধীবৃন্দ উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহারা তোমারই গুণমুগ্ধ ভক্ত। ইঁহারা দেশের নেতৃস্থানীয়। আর এখানে দেখিতেছি বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ আশাস্থল যুবকবৃন্দ। তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে পারি—তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্য ইহাদের দ্বারাই সুসম্পন্ন হইবে। অমরধাম হইতে বন্ধু তুমি দেখিবে ইহাদের কার্য্য। আমরা দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝি নাই। তাই তোমার সহিত একপ্রাণ হইয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারি নাই। আজ বুঝিয়াছি, তুমি কেন মরুতদার ছিলে। কোনও দিকে তুমি লক্ষ্য রাখ নাই—লক্ষ্য ছিল তোমার চৈতন্যলাইব্রেরীর উন্নতি। ইহাকে দেশের ও দশের কাজে লাগাইবার জন্য তুমি যে চেষ্টা করিয়াছ তাহার মর্ম্ম তখন বুঝি নাই। আজ বুঝিতেছি, অতীতের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়া বর্ত্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে তুমি দেশবাসীকে নূতন করিয়া গঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছ। একতার হেমহারে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে আবদ্ধ করিতে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অশেষ চেষ্টা করিয়াছ। মিলন যতদিন সুদূর পরাহত থাকিবে, যতদিন ভারতের বিভিন্ন জাতিসকলকে আমরা প্রাণ দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব না—প্রত্যেক জাতির মর্ম্মস্থল দেখিতে আন্তরিক চেষ্টা করিব না যতদিন, ততদিন একতা সাধিত হইবে না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একদিন সত্যই বলিয়াছেন—

"আজ ভারতবর্ষে যেটুকু ঐক্য দেখিয়া আমরা সিদ্ধিলাভকে আসন্ন জ্ঞান করিতেছি, তাহা যান্ত্রিক তাহা, জৈবিক নহে। ভারতবর্ষের ভিন্নজাতির মধ্যে সেই ঐক্য জীবনধর্ম্মবশতঃ ঘটে নাই পরজাতির এক শাসনই আমাদিগকে বাহিরের বন্ধনে একত্র জোড়া দিয়া রাখিয়াছে।

সজীব পদার্থ অনেক সময় যান্ত্রিকভাবে একত্র থাকিতে থাকিতে জৈবিক ভাবে মিলিয়া যায়। এমনি করিয়া ভিন্ন শ্রেণীর ডালে ডালে জুড়িয়া বাঁধিয়া কলম লাগাইতে হয়। কিন্তু যতদিন না কালক্রমে সেই সজীব জোড়টী লাগিয়া যায়, ততদিন ও বাহিরের শক্ত বাঁধনটা খুলিলে চলে না। অবশ্য, দড়ার বাঁধনটা নাকি গাছের অঙ্গ নহে, এইজন্য যেমনভাবেই থাক, যত উপকারই করুক, সেত গাছকে পীড়া দেবেই, কিন্তু বিভিন্নতাকে যখন ঐক্য দিয়া কলেবরবদ্ধ করিতে হইবে, তখনই ঐ দড়াটাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

আমরা সেই দুঃসাধ্য সাধনা করিব, যাহাতে শত্রু মিত্র ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়; যাহা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য, যাহা পবিত্রতার তেজে, ক্ষমার বীর্য্যে, প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে পূর্ণ, আমরা তাহাকে কখনই অসাধ্য বলিয়া জানিব না, তাহাকে নিশ্চিত মঙ্গল জানিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইব।"

গৃহস্থ সন্ন্যাসী গৌরহরি, জীবনে তুমি কবির কল্পনাকে মূর্ত্তি দিয়াছিলে। অমূর্ত্ত ভাবকে সজীব করিয়াছিলে। বালবৃদ্ধযুবা সকলকে তুমি আলিঙ্গন করিয়া জ্ঞানের পথে, ঐক্যের পথে, সত্যের পথে ঋদ্ধির পথে চালিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলে, কৃতকার্য্যও যে তুমি হওনাই তাহা বলি না। কিন্তু তোমার আদর্শ হিমালয়ের ন্যায় উত্তুঙ্গ ছিল। সে আদর্শকে করায়ত্ত করিতে যে সাধনার প্রয়োজন তাহা একার চেষ্টায় হইতে পারে না; এখানে সমবেত চেষ্টার আবশ্যক। আমি কি যুবকদিগকে তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে সাফল্যদান করিবার জন্য, তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের সেবার জন্য অনুরোধ করিতে পারি না? এখন শিক্ষার প্রচলনের আবশ্যকতা কাহাকেও নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। লোকশিক্ষাদান নরনারায়ণের সেবার অন্যতম রূপ। ইহা দশ ও দেশেরই কার্য্য। আপনারা এই কার্য্যে অগ্রসর হউন। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন। স্বর্গহইতে বন্ধুবর তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের সাফল্য দেখিয়া আপনাদের মঙ্গলকামনা করিবেন।*

* চৈতন্যলাইব্রেরীর অনুষ্ঠিত স্মৃতিবাসরে স্কটিশচার্চ্চ কলেজহলে পঠিত।

ভ্রম সংশোধন গত সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার নারী শীর্ষক কবিতার অত্যুক্তির ৬ লাইনের পর এই দুটি লাইন বসিবে।

সাজিয়ে রাখ কি চমৎকার
সোণার কাজে বাঁধা।

মনোমোহন নাট্য মন্দির—ইঁহাদের ভীষ্ম অভিনয় দেখিয়া আমরা যথার্থই সন্তোষ লাভ করিয়াছি এবং ভাদুড়ী মহাশয়ের প্রয়োগ নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতেছি। অভিনেতার মধ্যে ভীষ্ম চরিত্রে শিশির বাবুর ও পরশুরামবেশী ললিত বাবুর অভিনয়ই সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল এবং অভিনেত্রীদের মধ্যে অম্বার ভূমিকায় শ্রীমতি চারুশীলা ও সত্যবতীর অংশে শ্রীমতী নীরদার অভিনয় বেশ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। দৃশ্যপটে প্রাচ্যের জাতীবিশিষ্টতা সন্দর্শনে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, তবে জাতির অংশে যে নবীনা অভিনেত্রীর প্রশংসা পত্রান্তরে পাঠ করিয়াছিলাম তাহার সম্বন্ধে আমরা সহযোগীর সহিত একমত হইতে পারিনা। তিনি প্রিয়দর্শনা বটে কিন্তু সঙ্গীতে পারদর্শিনী বলিয়া ভাবিবার কোন হেতু পাইলাম না। কিশোর রুদ্রের অংশে বালক অভিনেতার সঙ্গীতও উল্লেখযোগ্য। আগামী সপ্তাহে "পাষাণীর" অভিনয় সমালোচনা পাঠকবর্গকে উপহার দিবার বাসনা রহিল।

মিনার্ভা থিয়েটার—ইঁহারা বরুণার পুনরভিনয়ে বিশেষ কৃতীত্ব দেখাইয়াছেন। বরুণার নাচ গানের পরিকল্পনা কবিজনোচিত মধুর ভাবকে প্রস্ফুটিত করিয়া প্রকাশ্যে প্রমাণিত করিয়াছে যে বর্ত্তমান বঙ্গালয়ের মধ্যে নাচ গান ও হাস্যরসের অভিনয়ে ইঁহারা পুরাতন হইলেও নবীন সম্প্রদায়ের অনেক উচ্চে অবস্থিত। রাজা শিববর্ম্মার অংশে কুঞ্জবাবুর, অভিরামের অংশে হাঁড়বাবুর, মংরুর অংশে কার্ত্তিকবাবুর ও বরুণার অংশে শ্রীমতী ননীবালার অভিনয় প্রশংসনীয়। বেদিনীগণের নৃত্যে ইঁহাদের অভিনেত্রীদিগকে চিরাচরিত প্রথানুসারে ঘুঙুর পরাইয়া না দিয়াও তালে তালে পদধ্বনিতে মৃদঙ্গের গুরুগম্ভীরধ্বনি সৃষ্টি করিয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে শিল্পী অপরূপ নৃত্য চাতুর্য্যে বরুণার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি পারের রঙ্গমঞ্চে সহস্র অসুবিধার মধ্যেও বরুণার শেষ দৃশ্যটি এত সুন্দর যে ইঁহারা করিতে পারিবেন তাহা আমরা ভাবি নাই। বড়দিনের জন্য ইঁহারা 'কৃতান্তের বঙ্গদর্শন' নাটক এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রঙ্গগীতিকার আয়োজন করিতেছেন।

— —

ষ্টার থিয়েটার—রূপকুমারী ও খাসদখলের সঙ্গে সঙ্গেই ঋষ্যশৃঙ্গের অবতারণা করা সহজ শক্তির কথা নহে। ঋষ্যশৃঙ্গ পুস্তকখানি ঠিক আজকালের রুচির সঙ্গে না মিলিলেও ইহার সঙ্গীত ও অভিনয় উপভোগ করিবার মত—ইহা প্রকৃত দেশীয় গীতিনাট্য। আধুনিক যুগের গীতিনাট্য গুলি পাশ্চাত্যের প্রভাবে কণ্টকিত ইহাতে, সে আড়ম্বর নাই ঋষ্যশৃঙ্গের ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালার অভিনয়ে সরলতার অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি ও সঙ্গীত মাধুর্য্যে দর্শকবৃন্দ পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলেন—লম্বোদরীর অংশটী খুবই নৈপুণ্যের পরিচায়ক হইয়াছিল—এই অভিনেত্রীটি ক্রমশঃ উন্নতি করিয়াছেন তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। নর্ম্মসখার অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ কাশীবাবু তাঁহার অভিনয় প্রথা যদিও আধুনিক রঙ্গমঞ্চের উপযোগী না হইলেও নৃত্যগীতও হাস্যরস অনেক পরিমাণে উপভোগ্য হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। ঋষ্যশৃঙ্গে লীলোদ্যান, জলবিহার প্রভৃতি দৃশ্যপট ও বেস সুন্দর হইয়াছিল। তবে গানের সুরকে আরও মধুর এবং নৃত্যের

ভঙ্গীতে নূতন ছন্দ প্রার্থনীয়। রঙ্গদিনের জন্য ইঁহারা অপরেশ বাবুর 'বন্দিনীর' জন্য অপূর্ব্ব আয়োজন করিতেছেন—সুতরাং 'বন্দিনী'র সাফল্য এক প্রকার অবধারিত।

গত ১লা ডিসেম্বর মনোমোহন নাট্য-মন্দিরে Doctors Amusement Club' কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণীর" অভিনয় হইয়াছিল। রূপ ও রঙ্গের বিশ্লেষণ যাঁহারা স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ ছুরিকার অগ্রভাগ দিয়া পরীক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহাদের জীবন ধারায় রূপ ও রসের নাটকীয় আস্বাদন অভূতপূর্ব্ব না হইলেও প্রশংসনীয়। সেদিন রঙ্গমঞ্চটী পত্রপুষ্পমাল্যশোভিত এবং অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-শ্রীমণ্ডিত হইয়া ছিল। কলিকাতার গণ্যমান্য ভদ্র-মহোদয়গণ অভিনয় দেখিতে আসিয়া সম্প্রদায়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। একখানি থিয়েটারী সাপ্তাহিক এই অভিনয় উপলক্ষ করিয়া রসিকতার আবরণে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়া সুরুচির পরিচয় দিয়াছিলেন। অভিনয় কলার সাহায্যে রসানুশীলন যে কেবল ব্যবসায়ী নাট্য-সম্প্রদায় বিশেষের বা ব্যক্তির একচেটিয়া নহে এ কথা বলা বাহুল্য। আমরা এই অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম, কেননা কেবলমাত্র সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয় সমালোচনায় সমস্ত দেশের নাট্যকলার উন্নতি অবনতির গতি নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। রাজা ও রাণী কাব্য হিসাবে অতুলনীয় হইলেও রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া এই নাটকে সাফল্য লাভ করা অতীব দুরূহ। অবৈতনিক ও সাধারণ রঙ্গালয়ের এই কল্পে চেষ্টা কোথাও সম্পূর্ণ সার্থক হইতে দেখি নাই কারণ কাব্য চিরদিনই কাব্য। সেদিনকার অভিনয়ে নির্ম্মম চিকিৎসকগণ সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ না করিলেও, একেবারে ব্যর্থ হয়েন নাই। যিনি বিক্রমাদিত্যের অংশে অভিনয় করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ব্যর্থ অনুকরণে, নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া বড় ভুল করিয়াছেন এমন কি শিশিরবাবুর মত কণ্ঠবিলম্বিত মুক্তারমালা ঘন ঘন মুষ্টিবদ্ধ করিতে তাঁহার ভুল হয় নাই। অভিনয়ে অনুকরণের মত শত্রু আর নাই। ইহা কলা বিজ্ঞানের বিকাশের সহায়তা তো করেইনা বরং অনেক সময় অযোগ্যস্থলে হাস্যের উদ্রেক ক'রে ইহা "এমেচার" অভিনেতার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বিভিন্ন প্রকৃতির মনোভাবের দ্বন্দ্ব অভিনয়ে ফুটাইয়া তুলিতে পারাই কৃতীত্ব। বিক্রমদেব প্রথম চারি অঙ্কে তাহা পারেন নাই কেবল পঞ্চম অঙ্কের দুইটী দৃশ্যে তিনি কৃতীত্বের পরিচয় দিয়াছেন। দেবদত্তের অভিনয় স্বাভাবিক এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ত্রিবেদীর অংশ যিনি অভিনয় করিলেন তিনি ভূমিকার ধারণাই ভালরূপ করিতে পারেন নাই।

শঙ্করের অংশ যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ক্ষমতাবান অভিনেতা তাঁহার কণ্ঠস্বর গম্ভীর সুতরাং অভিনয়ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। "চন্দ্রসেন" ও অমরুরাজ একেবারে অচল। মস্তকে এবং দেহে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন বিরাজিত থাকিলেও আবৃত্তি এবং চালচলনে বার্দ্ধক্য পরিস্ফুট হয় নাই। কুমারসেনও শিশিরবাবুর প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি সুপুরুষ, আকৃতি, ও ভাল কিন্তু তাহার অঙ্গভঙ্গী মাত্রাতিক্রম করিয়াছিল। ইলার নিকট হইতে বিদায়ের দৃশ্যে করতালি দিয়া ইলাকে আহ্বান এবং চুম্বন শুধু অশোভন নহে নাটকীয় চরিত্রের ধারণার বিপরীত। কুমারসেন যে যুগের মানুষ সে যুগে এ ভাবে প্রেম প্রকাশিত করা যুক্তিযুক্ত কি না তাহা সন্দেহজনক স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় মোটের উপর ভাল হয় নাই, একরূপ আশা করাও অস্বাভাবিক। স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে রাণীর অভিনয়ই কথঞ্চিৎ উত্তম তবে চালচলন অস্বাভাবিক গানের মধ্যে ইলার একখানি গানই উপভোগ্য হইয়াছিল। বাকী সব চলন-সই। প্রবেশ ও নির্গম সম্বন্ধে সম্প্রদায়কে বড়ই উদাসীন দেখা গেল। ইহা রস সঞ্চারের বিষম পরিপন্থী। আশা করি ডাক্তার বাবুগণ আমাদের এই সমালোচনায় বিরুদ্ধ হইবেন না। চিকিৎসা বিদ্যায় তাঁহারা বিশারদ হইলেও এ সম্বন্ধে তাঁহাদের ত্রুটী প্রদর্শন করিবার সাধ্য আমাদের আছে সেই ভরসায় কয়েকটী কথা এই উদ্দেশ্যে বলিলাম যে আগামী বৎসর অভিনয়ে তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা নাট্যকলার সম্পূর্ণতা আশা করি তাঁহারা সুশিক্ষিত, কৃতবিদ্য বুদ্ধিমান এবং রক্তমাংসের হ মর্ম্ম একটু আমাদের চেয়ে বেশী বুঝেন।

Printed & Published by Jnanendra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
14 Jaggannath Dutta Lane Garpar, Calcutta

সাপ্তাহিক
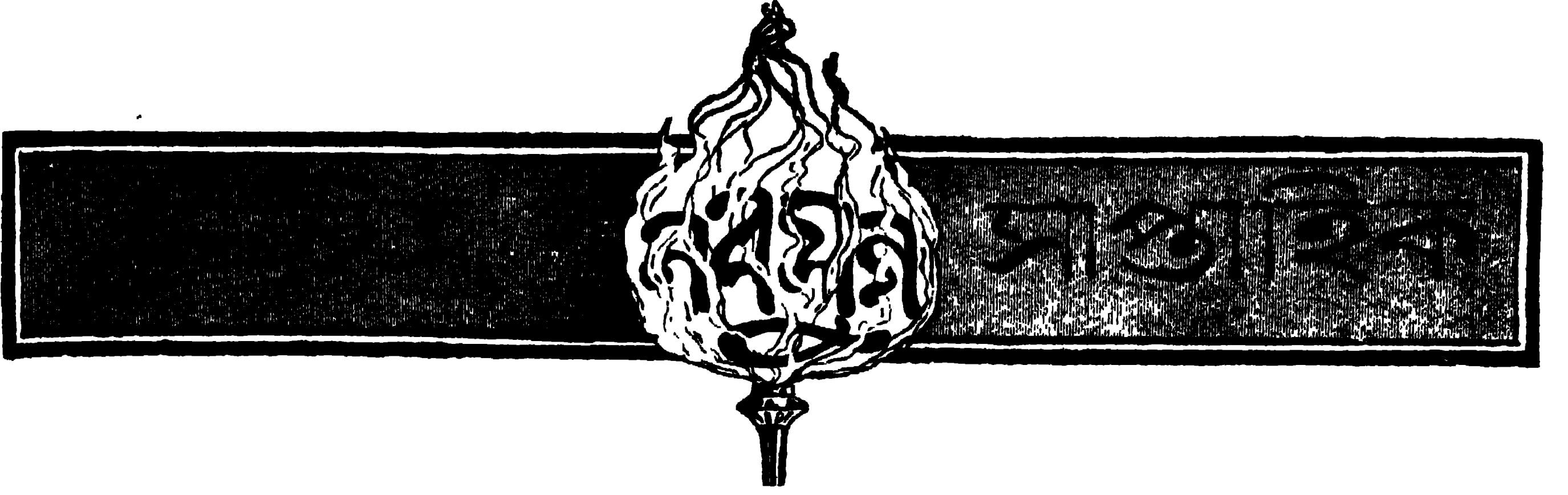
প্রথমবর্ষ] ৫ই পৌষ শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ২০শে ডিসেম্বর [২১শ সংখ্যা

গোপীযন্ত্র

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এসরাজ আমি নই তা জানি
নইকো আমি সারঙ্গ
তবু আমি বাজবো খানিক
করোনাক বারণ গো।
বুঝেও যা যায় না বোঝা
অসম্ভব ও আজগুবি যা,
আমি তারি কারবারী যে
বুঝি নাকি কারণ গো।

১

আমি ভবের পাগলা পথিক
দমকা হাওয়ায় বসন্তর,
উড়িয়ে যাই ফাগ আর পরাগ
পথ যে আমার সতন্তর।
চাই অচেনায় চিনিয়ে দিতে,
আনন্দকে ছিনিয়ে নিতে,
রসিক যে হয় রসের মাঝে
করতে চাহি ধারণ গো।

২

ধনী মানীর আদর পেতে
করিনাক প্রাণান্ত
সহজিয়া সহজ খুঁজি
সহজে পাই আনন্দ।
দু'দণ্ডেরি আলাপ যে খুব,
বাজিয়ে যাব গাব্‌গুবাগুব্
অকূলের কোন 'কেন্দুবিল্বে'
করবো গিয়ে পারণ গো।

নবরত্ন

শিল্পী—শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যারত্ন--

"বিদ্যান অষ্টবস্তারে"

বৈদ্যরত্ন—
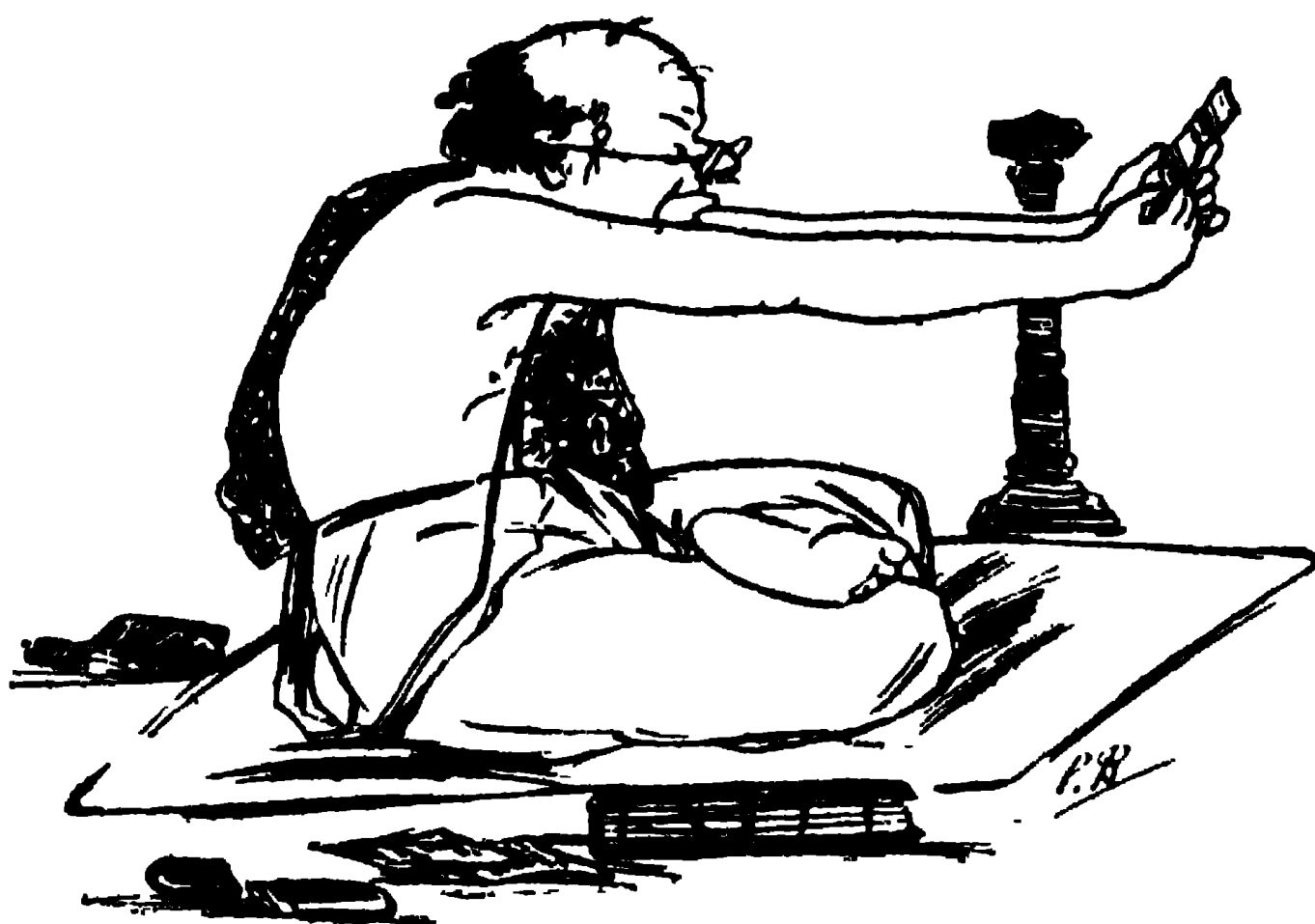
অট্টালিকা চূর্ণের কথা শুনেছ! এই ধর, সেবন কর--
হাতে হাতে ফল পাবে

পুত্ররত্ন—

পিতার প্রতি "ওল্ড্ফুল্ নারীর মর্য্যাদা জাননা—কি পুণ্যে এমন পত্নী লাভ হয় তা জানো "

স্ত্রীরত্ন—

স্বামীর প্রতি—'স্বামী স্বামী, স্বামী হয়েছে তো হয়েছে কি, আজ কালকার অভিধানে স্বামী মানে কি জান—স্বামী মানে সার্ভেণ্ট বিশেষতঃ এমন কি সুইপার ও বলা চলে"

রত্নাকর—

পাহারাওলার প্রতি "কাহে বাবা অশাস্নীয় বাক্য প্রযোগ কর্ত্তা হ্যায়, হামলোক কেয়া সাধারণ ডাকাত হ্যায় বাল্মিকী কো জানতা হ্যায়—যো তোমরা রামজীর জীবন বৃত্তান্ত লিখা হ্যায়—ও বাল্মিকী ভি পহেলা রত্নাকর থা"

রত্নাকর—

অর্থে স্বর্ণকার ; যাঁর শুভাগমনে গৃহিণীর মুখ পূর্ণ শশধরের ন্যায় কৌমুদী-দীপ্ত হয়, আর কর্ত্তার মুখখানি প্রভাতের চন্দ্রের মত নিষ্প্রভ পাণ্ডুর হয় , আর বক্ষঃস্থলে হৃদপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন হইতে থাকে।

রত্নদ্বীপ—

অর্থে সেই সাগর পারের দ্বীপ, যথায় জগতের সমস্ত রত্ন ছলে বলে কৌশলে সংগৃহীত হয়।

চক্ষুরত্ন—

তরুণ সম্প্রদায় সর্ব্বদাই এই রত্নকে পরম যত্নে রক্ষা করেন।

রত্নগর্ভা—

"মা তুমি রত্নগর্ভা তোমার
তিনটি ছেলে, একটা মাতাল,
একটা জোচ্চোর আর একটা চোর"
জ্ঞানদার প্রতি যোগেশের উক্তি—
৺গিরীশচন্দ্র ঘোষের প্রফুল্ল হইতে।
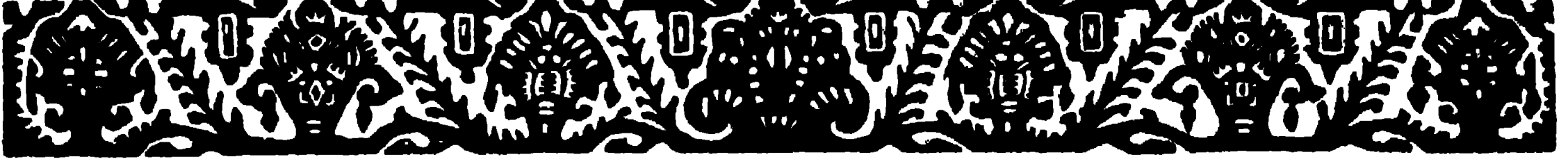
দেশের কাজ

শ্রীহরিহর শেঠ

দেশের কাজ করিবার জন্য একটা আগ্রহ, এমন কি ব্যস্ততা অনেকের মধ্যেই আজকাল কিছুদিন হইতে একটু বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। কেহ, মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্মে বা কর্ত্তব্যজ্ঞানে বা সাধ্যে যতটা হয় করিতে চেষ্টা করেন। কেহ নিজের এবং সংসারের সব কাজকর্ম্ম সারিয়া যদি হয় হউক এই মনে করিয়া করেন। কেহ অপরের অনুরোধে বা চক্ষুলজ্জায় নিজের অসুবিধা না হইলে একটু আধটু করিয়া থাকেন। আবার এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা যেরূপেই হোক দেশের কাজ করিবেন-ই, করা চাই-ই। না করিলে তাঁহাদের চলিবে না, তা দেশ সে কাজ চাগ্ বা না চাগ্, তাহাকে চাগ্ বা না চাগ্, এমন কি তাঁদের কাজের ফলে দেশ যদি রসাতলেও যায় তথাপি তাঁহারা কাজ করিতে বিরত হইবেন না। আর নিজের বা নিজ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিকূল হইলেও প্রকৃত কাজ করিবার জন্য উদ্যোগী এক শ্রেণীর লোকও দেখা যায়।

মোটামুটি মহাত্মা গান্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া আমার মত লোক পর্য্যন্ত যে কেহ দেশসেবক বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিয়া থাকেন, দেশের কাজ করিবেন বা করিতেছেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় উক্ত কোন না কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কর্ত্তব্যজ্ঞানে, অনুরোধে, চক্ষুলজ্জায় অথবা অবসর সময়েও যাঁহারা দেশের কাজ করেন, এমন কি স্বার্থের বিনিময়েও যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাহাদের সকলেরই ইহাতে ত্যাগের কথা না থাকিলেও, তাঁহাদের সকলের দ্বারাই যে দেশ মাতৃকার সেবা অল্প বিস্তর হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থ যতই থাক তাহাতে যদি দেশের বা কাহারও কোন প্রকার ক্ষতি কিছু না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বার্থের বিনিময়ে দেশকে যে কাজটুকু দিয়া থাকেন, তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। কিন্তু চিন্তার কথা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাঁহাদের জন্য, যাহারা দেশের কাজ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, যাঁহারা দে[শের] কাজ না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না। যেরূপে[ই] হোক এবং সেজন্য যে অপকর্ম্ম করিতেই হোক না কে[ন] কাজ করিতেই হইবে। তাঁহাদের কবল হইতে মাকে রক্ষা করাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন হইয়াছে।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা দিনের দিন ক্র[মে] বাড়িয়াই চলিয়াছে, সুতরাং দেশহিতৈষী আখ্যাধারী[র] সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত প্রকৃত দেশের কাজের পরিবর্ত্তে বর[ং] তাঁহাদের দ্বারা ক্ষতি বৃদ্ধিই হইতেছে। দেশসেবার না[মে] আত্মসেবাই তাঁহাদের কাজ। তাঁহাদের জন্য সর্ব্বাপেক্ষ[া] ভয়ের কারণ এই, যে সাধারণ সরল লোকেরা তাঁহাদে[র] স্বরূপ দেখিবার সুযোগ পায় না সুতরাং প্রতারিত হয় [।] এই সাধারণ লোকই অধিক। তাঁহারা তাঁহাদের কথা[য়] ভুলিয়া বা দুটা কাজের অভিনয় দেখিয়া, এমন কি সম[য়] সময় সহজ দৃষ্টিতে যাহাকে ত্যাগ বলে, তাহা দেখিয়[া] অযথা শ্রদ্ধা ভক্তির দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া থাকে[ন।] এই শ্রদ্ধা ভক্তির সুযোগ লইয়াই দেশসেবার ভাণ করিয়[া] তাঁহারা যে অত্যাচার করিতেছেন, তাহা চিন্তা করিবা[র] বিষয়। নিজের দেহ মনের ভোগের জন্য যা কিছু কাজ এমন কি একটা পাবার জন্য অন্য একটা ত্যাগ তাহ[া] অনেক সময় পরের বিপদের কারণ। যে ত্যাগের পশ্চাতে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের ভোগ বা ভোগেচ্ছা লুক্কায়িত থাকে, সে ত্যাগ ত্যাগই নহে, তা তাহা যত বড় ত্যাগই হোক।

সেকালে দেশের কাজ বলিতে কি বুঝাইত বলিতে পারি না। এক্ষণে মিউনিসিপ্যালিটী, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিল, বিদ্যালয়, লাইব্রেরী বা কোন দেশহিতকর প্রতিষ্ঠান-কমিটির মেম্বর, অধ্যক্ষ বা সভাপতি হওয়াকেই অনেকে সাধারণতঃ দেশের বা দশের কাজ করা বলিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেশের কাজ করিবার জন্যই বেশী লোককে ব্যস্ত দেখা যায়। ইহার

মধ্য দিয়া ভিন্ন তাঁহারা আর কিছু করিবার কাজই দেখিতে পান না। পরন্তু এ কাজ করিতেই হইবে, যে কোন উপায়েই হৌক মেম্বর হইতেই হইবে। সেজন্য খোসামোদ, সময়পাত, অর্থব্যয়, পায়েধরা কিছুতেই বাধে না। এইরূপে দেশ সেবার প্রবেশ পথে বিফল মনোরথ হইলে আর রক্ষা নাই। এত করিয়াও যাঁহারা এইভাবে দেশ সেবার উক্ত গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন।

আজকাল সময় সময় দেখা যায় ও শুনা যায় কাউন্সিলের সভ্য, এমন কি সামান্য মিউনিসিপ্যালিটী বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের একজন সভ্য হইবার জন্য কোন কোন লোক পাঁচ দশ হাজার বা আরও অধিক টাকাও ব্যয় করিয়া থাকেন। অথচ তাঁহাদের কোন দুঃস্থ প্রতিবেশী অন্নাভাবে, চিকিৎসা ভাবে তাঁহাদের চক্ষের সমক্ষে মারা যাইলেও তাহার দিকে একবার ফিরিয়া দেখিবারও সময় হয় না বা তাঁহাদের দ্বারে আর্ত্ত ভিখারী উপস্থিত হইয়া কখন একমুষ্টি ভিক্ষা পায় না। দেশ সেবা করিবার জন্য মাত্র এই একটা পথই তাঁহারা দেখিতে পান, সভ্য হইয়া ভিন্ন আর অন্য উপায়ে তাহাদের কিছু করিবার নাই। বৎসর বৎসর বা নির্দ্ধারিত সময় অন্তর যথা সময়ে ভোট রণাঙ্গণে জয়ী হইয়া সারা জীবন পণ করিয়া এই পথ দিয়া তাঁহাদের দেশের কাজ করিতেই হইবে। যদি অপর একজন তাঁহারই মত দেশ বন্ধুদের কাছে এই দ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়া তাঁহার এই দেশ সেবার পথে বাধা পড়ে, তাহা হইলে পুত্রশোক অপেক্ষাও কেহ কেহ কাতর হইয়া পড়েন। আবার সাধারণের যে কাজ নিজে করিবার উপলক্ষ্য হওয়া সাধ্যাতীত, সে কাজ যত ভালই হৌক, অপরে করিলে তাহা ইহাদের পক্ষে অসহ্য। এমন কি সহর কি পল্লীগ্রাম সর্ব্বত্রই এই অভিনয় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই বিরাট দেশসেবা বৃত্তি বা প্রবৃত্তিতেই আমাদের যে বিষম অনিষ্ট সাধন হইতেছে, তাহা সামান্য চিন্তার দ্বারাই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই প্রকার দেশসেবার নামে,—যদি আর কিছু নাও থাকে, তবে যশোলাভ রূপ আত্ম-সেবাই আমাদের অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যশের আকাঙ্ক্ষা একটা খুব বড় মনোবৃত্তি না হইলেও, মানুষ সাধারণের উহা একটা কাম্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মিউনিসিপ্যাল কমিশনার অর্থাৎ সহরের পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য প্রভৃতির ভার, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, অর্থাৎ ছোট ছোট বিচারের ভার, কাউন্সিলের মেম্বর অর্থাৎ দেশের কতকগুলি কার্য্যে নিজ মত জ্ঞাপন ক্ষমতা; অর্থ দ্বারা ক্রীত বা ভিক্ষার দ্বারা লব্ধ এই সব অবৈতনিক ভারপ্রাপ্ত হইলে যে কি চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয় বা কি এমন যশের কাজ করা হয় তাহা ঠিক মত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অথচ এই একটি বিষয়ের সুযোগ লইয়া আজ বহু বৎসর ধরিয়া আমাদের বিরুদ্ধে কি অসাধ্য সাধনই না হইতেছে। উক্ত সব অবৈতনিক কার্য্যগুলির প্রবর্ত্তনে কি উপকার হইতেছে, তাহা উহার সৃষ্টিকর্ত্তা গভর্ণমেণ্ট অবশ্য ভালই জানেন। কিন্তু ইহার দ্বারা ভেদ সৃষ্টি হইয়া আমাদের যেমন সর্ব্বনাশ হইতেছে, তেমন বুঝি আর কিছুতে হইতেছে না। যাঁহারা এই অভিনয়ের নায়ক, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহা যে একেবারে না বুঝেন তাহা মনে হয় না, কিন্তু তাহাতে কি হয়, তাঁহাদের যশঃ কামনা তাঁহারা কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। ইহা দ্বারা আমাদের যাহা হইবার তাহাত হইতেছে। অপর পক্ষ একাধারে উভয়বিধ ফল পাইতেছেন। মুখ্যতঃ অবৈতনিক ভাবে কাজ পাওয়ার জন্য, তাঁহাদের বিস্তর অর্থব্যয় লাঘব হইতেছে। আর গৌণতঃ ইহা দ্বারা আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি। ইহাতে ব্যবস্থাকর্ত্তা গোপনে হাসিতেছেন এবং এই কার্য্যকারীদের তাঁহারা প্রত্যুপকার স্বরূপ চরম পুরস্কার দিতেছেন—রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর ইত্যাদি।

আজ প্রায় আটশত বৎসর পূর্ব্বে যে আত্মকলহ ও গৃহ বিবাদে ভারতের সুখ রবির শেষ ম্লান কিরণ দিল্লির প্রাঙ্গনে যামিনীর অন্ধকারে চিরদিনের জন্য মিশিয়া ভারতের কপাল পুড়িয়াছে, আজিও তাহাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। এক্ষনে ধর্ম্মগত বিদ্বেষ ত আছেই, তদুপরি আত্মকলহে বা নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও অনৈক্য রাখিয়া যত ভালই করা যাগ পরাধীন জাতির পক্ষে তাহা প্রায় নিরর্থক। আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ সকল ভুলিয়া এখনও যদি সংযত ও আত্মপ্রতিষ্ঠ না হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আর গতি নাই। দেশের স্বার্থ,

জাতির বিরাট স্বার্থ ভুলিয়া যদি তাহা আমরা নিজ নিজ ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের কাছে বলি দিয়া এখনও উন্মত্ত আচরণ করি তবে আমাদের এই তথাকথিত দেশসেবা দেশ-দ্রোহিতার নামান্তর হইবে। মাতৃপূজার নামে মাতৃদ্রোহীর কাজ করাই হইবে। যে বল থাকিলে ইপ্সিত স্বরাজ পাওয়া যায়, মনুষ্যত্ব রক্ষা হয়, আমাদের তাহা নাই। মহাত্মা প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা অনুসারে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইল না। আর আমাদের এই সব দুর্ব্বলতা লইয়া বিদেশীয় রাজার কাছ হইতে আমরা বড় বড় রাষ্ট্রীয় অধিকার সকল কাড়িয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছি।

যে সব কার্য্যের উল্লেখ করিয়া দেশসেবার কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া যে কিছুই করিবার নাই বা করা দূষনীয় অথবা যিনিই এই কাজ করেন, তিনিই যে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও নাম যশের প্রয়াসী বা কোন গোপন স্বার্থের জন্য চেষ্টিত, এমন কথা কেহই বলিতে পারে না। যাকে উক্ত সব কাজের জন্য লোকে চায়, বা যাঁকে যত বেশী লোকে চায়, তাঁহার মহত্ব তত অধিক। যেমন করিয়াই হউক এ কাজ করিতে হইবে, দেশ তাঁহাকে চান বা নাই চান, তাঁহাকে নিজের কোন না কোন স্বার্থের জন্য উহার মধ্যে প্রবেশ করিতেই হইবে এই ভাবে যাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ তাঁহাদের কথা, সেই ভণ্ড স্বার্থপর নীচমনাদের কথাই আমার বলিবার বিষয়। লোকের বিশ্বাস, অর্থ, পৈত্রিক সম্ভ্রম, আভিজাত্য এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির সুযোগ লইয়া যাঁহারা সরল হৃদয় দেশবাসীর অন্তরে দেবতার আসনে নিজের স্বার্থকলুষিত আসন রচনায় ব্যস্ত, আমি তাঁহাদের কথাই বলিতেছি। ভুল ভ্রান্তি সহস্র বার মার্জ্জনীয়, কিন্তু যাঁহারা দেশের লোকের অজ্ঞতা, ঔদাসীন্য ও শিক্ষাহীনতার সুযোগ লইয়া স্বকার্য্য সাধনার্থ রত; তাঁহারা কখন দেশের প্রকৃত বন্ধু নন, তাঁহারা বিশ্বাসঘাতক শত্রু।

ভুলানো

শ্রীপ্রমথনাথ বসু

তোরা কেউ পারবিনেগো
পারবিনে কেউ ভুলাতে,
কি ছিল তার মনে মনে,
বলে গেল নয়ন কোণে,
সদাই যে তাই পড়ে মনে
ভুলে গেনু শুধাতে।
তোরা কেউ পারবিনেগো
পারবিনে কেউ ভুলাতে।
পরাণ আমার উঠে কেঁদে
আর কি পারি রাখ্‌তে বেঁধে
চোখের জলে বুক ভে'সে যায়
লুটাই ধুলাতে
তোরা কেউ পার্‌বিনেগো
পার্‌বিনে কেউ ভুলাতে।
কলস কাঁকে মাঠে মাঠে
গিয়েছিল দীঘির ঘাটে
চুলগুলি তার উড়েছিল
উছলি জল পড়েছিল
অলটী তার দুলাতে
তোরা কেউ পারবিনেগো
পারবিনে কেউ ভুলাতে।

জানিনা সে কেমন ক'রে
হারিয়ে গেল অগোচরে
মনকে আমার পারিনিক
কোনমতেই বুঝাতে
তোরা কেউ পার্‌বিনে গো
পারবিনে কেউ ভুলাতে।
দিনের আলো নিভে এল;
পথ বুঝি তার হারিয়ে গেল
সারাটি রাত খুঁজে মরি
পারিনেক ঘুমাতে।
তোরা কেউ পার্‌বিনে গো
পারবিনে কেউ ভুলাতে।
প্রভাতে সে এসেছিল;
চোরের মত দাঁড়িয়েছিল,
আঁখিতে জল ভরে এল
ঠোঁটদুটী তার ফুলাতে
তোরা কেউ পার্‌বিনেগো
পারবিনে কেউ ভুলাতে।
চোখ দুটি তার রক্ত-রাঙ্গা
গলাটি তার ভাঙ্গাভাঙ্গা
আর কি তোরা পারিস্ আমায়
তার কথাটী ভুলাতে
তোরা কেউ পার্‌বিনেগো
পার্‌বিনে কেউ ভুলাতে।

১-৭-২৮.

নিরালায়

শিল্পী শ্রী বিনয়কৃষ্ণ বসু [নিরুপমা-বর্ষস্মৃতি হইতে

গল্প

বিপদের পথে

শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষ

(১)

"দরোয়ানজি—"

"হাজির হ্যায় মায়ি।"

দরোয়ানজী আঁধারে লণ্ঠন হাতে করিয়া বাহিরের ঘর হইতে মুখ বাড়াইল। অন্তঃপুরের কাছে একটি তরুণী বাঙালী-মেয়ে কাল রংয়ের র‍্যাপারে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া, দাঁড়াইয়াছিল। দরোয়ান মেয়েটির উদ্দেশে বলিল "কেয়া হুকুম মায়ি?"

মেয়েটি নিম্নস্বরে বলিল "চন্দ্রবাবুর বাড়ী যেতে হবে লাঠি কম্বল নাও।"

"যো হুকুম?"—বলিয়া দরোয়ান পুনশ্চ নিজের ঘরে ঢুকিল। একে পৌষের শীত, তায় মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার সন্ধ্যা। ঘুটঘুটে আঁধারে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছিল। এক হাত তফাতে কি আছে, দৃষ্টিগোচর হওয়া দুঃসাধ্য। মেয়েটি দুয়ারের কাছে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রুদ্ধশ্বাসে সেই গাঢ় শীতার্ত্ত অন্ধকারের নির্ম্মম-গভীরতা সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া অনুভব করিতে লাগিল। একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় তার হৃৎপিণ্ড সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল,—যেন এখনি কি একটা অভাবনীয় দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করা হইতেছে।

গায়ে কম্বল জড়াইয়া লাঠি ও লণ্ঠন হাতে করিয়া দরোয়ান বাহির হইল। মেয়েটি কাপড়ের ভিতর হইতে চাবি ও কুলুপ বাহির করিয়া অন্তঃপুরের দুয়ার বন্ধ করিয়া কুলুপ লাগাইল। তারপর দ্রুত বাহিরের উঠান পার হইয়া চলিতে চলিতে বলিল "একটু তাড়াতাড়ি চলো।"

বাহিরের দুয়ার পার হইয়া দরোয়ান সে দুয়ারেও চাবি কুলুপ বন্ধ করিল। সদর রাস্তায় নামিয়া, দরোয়ান সবেমাত্র পা বাড়াইয়াছে, সহসা দূরে কোন এক সম্পন্ন ভদ্রলোকের বাড়ীতে একদল বালিকার সমবেত ঐক্য সঙ্গীতের উচ্চ সুর শোনা গেল!—মেয়েটি নিজের অজ্ঞাতে মুগ্ধ কাণ পাতিয়া,—শুনিল সেখানে গান হইতেছে :—

"সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির—
উঠ বীরজায়া..................."

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে,—অদূরে কোন একটা পথ হইতে একজন ভদ্রবেশী পথিকের ইতর শ্লেষ-গঞ্জিত কণ্ঠের—বিকৃত রসিকতা শোনা গেল, "বাহবা, বেশ! "

মেয়েটি চমকিয়া উঠিল! মনে হইল, বর্ত্তমান বাস্তবকে এড়াইয়া স্বর্গলোকের একটা অতর্কিত বীণা ঝঙ্কার দৈবাৎ কাণে পৌছিতে না পৌছিতে—হঠাৎ চোখের উপর হিংস্র বর্ব্বর কুকুরের আঁচড় পড়িল!—চলিতে চলিতে মেয়েটি হঠাৎ হোঁচট্ খাইল। মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইয়া, ব্যস্তভাবে পুনশ্চ দ্রুত হাঁটিতে সুরু করিয়া বলিল দরোয়ানজি, জোরে—আরো জোরে চল।"

দরোয়ান বিনাবাক্যে লম্বা পা বাড়াইল। উত্তেজনা কশাহত দ্রুত নিঃশ্বাস মেয়েটির দুর্ব্বল শ্বাসনালীর ভিতর তুমুল হুটাপাটি জুড়িয়া, তার কণ্ঠতালু শুকাইয়া তুলিল! শক্তির অতিরিক্ত বেগে চলিবার জন্য দ্রুততর বেগে পা চালাইল!

ঠিক সেই সময় সামনের অন্ধকারের ভিতর হইতে সুগম্ভীর পুরুষকণ্ঠে কে প্রশ্ন করিল "স্নেহলতা সান্যালকা কোঠি কিধার্ জি?"

যেন একটা বিপুল ত্রাসের বিদ্যুৎ কশাঘাত খাইয়া মেয়েটি সহসা অসাড় নিশ্চল পদে দাঁড়াইল। দরোয়ান ও থমকিয়া দাঁড়াইল। আলো তুলিয়া প্রশ্নকারীর মুখের উপর আলোক রশ্মি ফেলিয়া ঈষৎ রূঢ়ভাবে দরোয়ান বলিল "কাঁহে জি? আপ্ কোন্ হ্যায়্?"

স্নিগ্ধ গম্ভীরস্বরে উত্তর হইল "একঠো বিহারী ব্রাহ্মিন্। হাম্ প্রয়াগধামসে আয়া। উয়ো মায়িকো কোঠি কিধার্ হ্যায়—বাৎলানে সেক্তা বাবা?"

দরোয়ান একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "কুচ্ জরুরী কাম্ হ্যায় মহারাজ?"

উত্তর হইল "হাঁ জি, বহুৎ জরুরী কাম হ্যায়।"

দরোয়ান পুনশ্চ ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার 'মায়ির' দিকে চাহিল। শঙ্কিতা মেয়েটি ঘোমটার ভিতর হইতে এতক্ষণ বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া আগন্তুককে দেখিতেছিল। আগন্তুক, খর্ব্বাকৃতি ক্ষীণকায়, প্রৌঢ়। কাঁধে একটি বৃহৎ বোঁচকা।—তাঁহার বেশভূষা সাধারণ বিহারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জনোচিত। তাঁহার গৌরোজ্জ্বল-সুন্দর বদনমণ্ডলে একটি প্রসন্ন সৌম্যভাব, স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছে। মেয়েটি চাহিয়া চাহিয়া,—দরোয়ানের উদ্দেশে অস্ফুটস্বরে বলিল "নামটি জিজ্ঞাসা করো।"

দরোয়ান অপেক্ষাকৃত বিনীতভাবে বলিল "মহারাজকো নাম?"

সস্মিত মুখে আগন্তুক বলিলেন "নাম্ মে তোম্—"

দরোয়ান বাধা দিয়া বলিল "কসুর মাপকি জিয়ে। গরীব, ওহি কোঠিকে গেট্‌কিপার। মুঝে সম্‌ঝায় দিজিয়ে মায়িকো, কেয়া কহেঙ্গি?"

'বহুৎ আচ্ছা। কহিয়ো কি সুঙ্গৎরাম তেওয়রি মায়িকো মুলাকাৎ মাংতে।"—

মুহূর্ত্তে তরুণী ফিরিয়া বাটীর অভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিল "দরোয়ানজি, মহারাজকে সঙ্গে করে এসো।"

সে অগ্রসর হইল। দরোয়ান আগন্তুককে আলো দেখাইয়া পিছু পিছু চলিল। তিনজনেই নীরব।

(২)

পূর্ব্বোক্ত বাড়ীতে পৌঁছিয়া, দরোয়ান কুলুপ খুলিয়া ভিতরে ঢুকিল। মেয়েটি শ্রান্তি-বিকম্পিত স্বরে বলিল "দরোয়ানজি, মহারাজকে বস্‌বার কম্বল দাও।"

আগন্তুক কৌতূহলী দৃষ্টিতে একবার চারিদিক চাহিলেন। তারপর তরুণীর নিকটস্থ হইয়া পরিষ্কার বাংলায় নিম্নস্বরে বলিলেন,—এ পৃথিবীতে এমন অনেক কাজ আছে মা, যে কাজগুলা, "মোরিয়া" হয়ে না করলে,—করাই হয় না। আমার বর্ব্বরতা মার্জ্জনা কর, তুমিই কি মেহলতা সান্ন্যাল?"

তরুণী সেইখানেই ধূলার উপর নতজানু হইয়া প্রণাম করিল। অবগুণ্ঠন সরাইয়া স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত আগন্তুকের আপাদমস্তক লক্ষ্য করিল। তারপর নিম্নস্বরে বলিল "চাক্ষুস পরিচয় না থাকলেও চিন্‌তে কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি। পণ্ডিতজি আপনাদের দেশাচার,—অবরোধ, অবগুণ্ঠন প্রথার সৌজন্য শিষ্টাচার লঙ্ঘন করছি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। আপনার সঙ্গে আলাপের মধ্যে তৃতীয় প্রাণীকে মধ্যস্থ রাখি, এমন বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান লোক আমার কেউ নেই। অবস্থা বুঝে আমার এই ক্রটিটুকু মার্জ্জনা করবেন।"

পণ্ডিতজী স্মিতহাস্যে বলিলেন "আমি রাজদ্রোহী, দেশাচারদ্রোহী। মনুষ্য সমাজের ক্ষতি এবং অপমানকর সমস্ত কিছু লোকপ্রিয়-প্রথার বিদ্রোহী। আমার কাছে ক্রটি মার্জ্জনার আশাভরসা তো কিছুই নেই মা।"

"সে পরিচয় আগেই পেয়েছি।" তরুণী ম্লানভাবে হাসিল।

দরোয়ান ঘরের ভিতর হইতে কম্বল বাহির করিয়া বারেণ্ডায় বিছাইতে উদ্যত হইল। তরুণী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল পণ্ডিতজি, এই পৌষের হিমে, খোলা বারেণ্ডায় বসা সুবিধা জনক হবে কি?"

পণ্ডিতজী প্রসন্নমুখে বলিলেন "ভিখারী ফকীরদের সবই সুবিধা। কিন্তু তোমাকেও একটু কষ্ট দেব যে মা, তোমার বস্‌বার সুবিধা মত স্থান—

"এইখানেই হবে তাহলে। বসুন।"

দরোয়ান কম্বল বিছাইয়া দিল। পণ্ডিতজী বসিলেন। তরুণী কিছুদূরে দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিল। দরোয়ান হাতের কাছে একটা ছেঁড়া চটের বস্তা পাইয়া সেটা আগাইয়া দিল, তরুণী বিনাবাক্যে টানিয়া লইয়া বসিল।

পণ্ডিত বলিলেন "তোমার ঠিকানার সন্ধান পেতে

বড় কষ্ট পেয়েছি মা, তোমার আত্মীয়েরা কেউ তোমার সংবাদ জানেন না। কত জায়গায় ঘুরেছি তা বল্‌বার নয়,—তোমার আত্মীয়েরা তোমার নাম শুনে, কেউ বলেন চিনি না, কেউ বলেন জানিনা।—দয়া করে কেউ যদি-বা জানায় কথাটা স্বীকার করলেন, কিন্তু কোথায় আছ—সে কথাটা জানেন বলে স্বীকার করলেন না। উল্টে পুলিশে দেবেন বলে খাতির জানালেন!"

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিল। ধীরে বলিল "আপনার রচনার খাতাখানি সোজাসুজি ডাকে পাঠাবার জন্যে আমিও চেষ্টা করেছি। কিন্তু ঠিকানার সন্ধান জানিনে বলে পাঠাতে পারি নি। খাতাখানির জন্যে আপনি কষ্ট পেয়েছেন জেনে দুঃখিত হচ্ছি। একটু বসুন, এনে দিচ্ছি।"

তরুণী উঠিতেছিল, পণ্ডিতজী বাধা দিয়া বলিলেন "ব্যস্ত কেন মা? সেটা এরপর হলেও চল্‌বে, বস।"

তরুণী কুণ্ঠিত ভাবে বলিল "আর কিছু প্রয়োজন আছে?"

পণ্ডিত সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। দরোয়ানের দিকে চাহিয়া বলিলেন "এ লোকটি কি তোমারি দরোয়ান?"

তরুণী ক্লিষ্টহাস্যে বলিল "হা। পণ্ডিতজি, আজ আমার একটু বিশেষ কায আছে, যদি অনুমতি করেন—"

পণ্ডিত ধীর স্বরে বলিলেন "এই দরোয়ানের দ্বারা সে কাযটা কি শেষ করা যায় না?

তরুণী চিন্তিত ভাবে ক্ষণেক নীরব রহিল। তারপর বলিল "আচ্ছা তাই হোক। দরোয়ানজি তোমার পেন্সিলটা দাও তো।"

দরোয়ান পেন্সিল আনিয়া দিল। তরুণী কাপড়ের ভিতর হইতে পিস্‌বোর্ড মোড়া একটি প্যাকেট বাহির করিল। প্যাকেটটি গেঞ্জি ও মোজায় পরিপূর্ণ।

পিস্‌বোর্ডের পিঠে গোটাকতক কথা লিখিয়া তরুণী দরোয়ানের হাতে দিল। মৃদুঃস্বরে বলিল "চন্দ্রবাবুর অন্দরে পাঠিয়ে দিও। ৬৲ টাকা দাম। টাকাটা আজই এনো।"

প্যাকেটটি হাতে করিয়া দরোয়ান বলিল "মায়ি, অন্দর মে বাত্তি মিলে গা?"

আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া দিয়া তরুণী বলিল "হাঁ। মাকে বল, আমার পড়ার ঘরের আলোটা দেবেন। কি থাক্ আমিই দিচ্ছি চল। পণ্ডিতজি, একটু অপেক্ষা করুন।"

দরোয়ানকে সঙ্গে করিয়া তরুণী অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল। পণ্ডিতজি নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, মৃদু গুঞ্জনে গান সুরু করিলেন:—

"লাগে না ক কেবল যেন
কোমল করুণা
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ কোর না।"

(৩)

মিনিট পনের পরে দরোয়ানের সঙ্গে তরুণী আবার ফিরিল। তার হাতে মোটা পিস্‌বোর্ডে বাঁধা দুইটি সুবৃহৎ খাতা। দরোয়ান আলো দেখাইয়া তাহাকে বারেণ্ডা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া, বাহিরে চলিয়া গেল। বহির্দ্বার খোলাই রহিল।

খাতা দুখানি পণ্ডিতের সামনে রাখিয়া তরুণী বলিল আপনার ক খানি খাতা ছিল, জানিনে। এই দুখানি মাত্র আমার জিম্বা লাগিয়ে দিয়ে গেছেন,—একটু দেখুন দেখি।"

পণ্ডিতজি খাতা দুখানির প্রথম পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিলেন। তারপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বাহিরের খোলা দুয়ারের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "হঠাৎ কেউ এসে পড়বেন কি?"

না। আসা তো কারুর পক্ষেই উচিত নয়।"—পরক্ষণেই কি ভাবিয়া ঈষৎ হাসিয়া মেয়েটি বলিল অবশ্য অনুচিত ভেবে নিশ্চিন্ত থাক্‌বার কোন অধিকারও আমার নেই। কেন না, অসহায় দরিদ্র স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচার কর্‌বার এবং সব রকম—ঘৃণ্য অপমান সূচক কটূক্তি বর্ষণ করবার অধিকার এ সমাজে সকলেরই আছে।"—কথার সঙ্গে সঙ্গেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "পণ্ডিতজি, এবার অনুমতি করেন তো আমি এখান থেকে বিদায় হই।"

পণ্ডিতজি তখন নিজের অজ্ঞাতেই একখানি খাতার শেষ পৃষ্ঠায় গভীরতর ভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; তরুণীর কথা তাঁহার কাণে ঢুকিল না। বহুদিনের পর

বিদেশ প্রত্যাগত পিতা যেমন স্নেহের শিশুকে পাইয়া গভীর বাৎসল্যের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন,—খাতাখানি চোখের কোণে ধরিয়া, তিনি তেমনি স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।”

তরুণী ইতস্ততঃ করিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল “পাণ্ডিতজি খাতা দুখানি ঠিক মিলেছে? আমি তা হ’লে যেতে পারি?”

ক্রীড়া-তন্ময় বালক যেন জননীর আকস্মিক আহ্বানে হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। চোখ তুলিয়া পণ্ডিত সবিস্ময়ে শিশু-সুলভ কোমল কণ্ঠে বলিলেন “কোথা যাবে মা?”

তরুণী সে প্রশ্নের ভঙ্গিতে একটু যেন কুণ্ঠিত হইল। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল “গৃহে।”

“গৃহে? তোমার গৃহ কোথায় মা?”

অন্তঃপুরের দিকে তর্জ্জনি নির্দ্দেশ করিয়া তরুণী মৃদু-স্বরে বলিল “যেখানে আহার নিদ্রার ব্যবস্থাটা আছে। ওই স্থানটাকেই আপাততঃ গৃহ বলে মনে করতে হচ্ছে।”

পণ্ডিত মশাই নিরুত্তর হইলেন। গম্ভীরভাবে কি একটু ভাবিয়া বলিলেন “ওখানে আর কে আছে?”

“আমার রুগ্না শাশুড়ী, আর বালিকা ভ্রাতৃজায়া।”

“ভ্রাতৃজায়া? তোমার? সুধীর রায় কি -” পণ্ডিত মুখের কথা অসমাপ্ত রাখিয়া প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টিতে তরুণীর পানে চাহিলেন।

তরুণী সস্মিত মুখে মাথা হেলাইয়া বলিল “তারই স্ত্রী।” “সুধীরের? সুধীর রায় কি তোমার জ্যেষ্ঠ?”

“না আমরা যমজ ভাই বোন। সুধীর আমার চেয়ে আধঘণ্টার ছোট।”

পণ্ডিত সামনের খাতাখানির দিকে চাহিয়া বলিলেন “এ হস্তাক্ষর—আমার হিন্দির এই বাংলা তর্জ্জমা, এ কি সুধীরের?”

“সবটা নয়। আমরা তিনজনেই ওটা সমাপ্ত করে-ছিলাম। সুধীর ওটায় অল্পই লিখেছে।”

“প্রশান্ত বাবুর হস্তাক্ষর চিনতে পারছি, সুধীরের হস্তাক্ষর কি এই?” পণ্ডিত খাতার মাঝখানে একটা পাতা খুলিয়া দেখাইলেন।

তরুণী চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল ওটা আমার হস্তাক্ষর। পণ্ডিতজি এবার বিদায়।

“অপেক্ষা কর মা। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

তরুণী উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল “আপনার সঙ্গেও সামাজিক অনেক কথা ছিল। কিন্তু মার্জ্জনা করুন। আমাদের সামাজিক প্রথা আপনার অবিদিত নয়। কোন পুরুষ-মানুষের সঙ্গে নিভৃত আলাপ আমার অবস্থার পক্ষে মার্জ্জনীয় নয়।

পণ্ডিত স্থির দৃষ্টিতে তরুণীর মুখের দিকে ক্ষণেক চাহিয়া রহিলেন। তারপর শান্ত স্বরে বলিলেন “তুমি কি সামাজিক প্রথার ঐ সকল বিধিকে শ্রদ্ধা কর?”

বিষাদের হাসি হাসিয়া তরুণী বলিল “জেলের কয়েদী যদি জেলের নিয়ম অশ্রদ্ধা করে, তাতে নিয়মটার কোন হানিই নাই। কিন্তু শৃঙ্খল যখন হাতপা’কে মুচড়ে বেঁধে রেখেছে, তখন হাত পা সোজা করবার চেষ্টায় কেবল যন্ত্রনাবৃদ্ধি ছাড়া কোন লাভই নাই। বিশেষ—সে চেষ্টার ফলে সাজাটা যখন যথেষ্ট বেশী রকমেই ভোগ করছি

পণ্ডিত স্মিতমুখে বলিলেন “সমাজের সাজা তুমিও ভোগ করে’ছ? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার সমাজ কোথায় মা?”

তরুণী ম্লান হাস্যে বলিল, “সমাজ যে কোথায়, আর আমার সমাজ বলতে বাস্তবিক কিছু আছে কি না, তা আমি জানিনে পণ্ডিতজি। কস্মিনকালে জান্‌ব বলে আশা করি না, তবে ভয়টা চিরকালই করব।”

“তবে কাকে ভয় কর মা?”

“সমাজের সম্মানরক্ষার দোহাই দিয়ে যারা আমার কর্ম্মকে, প্রতিদিনের সকল শুভ শক্তি, উদ্যমকে লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত, নিপীড়িত করে,—সেই দানব শক্তির অত্যাচার আমি যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতে চাই।”

“এবং তোমার সমস্ত কল্যাণশক্তিকে তুমি হত্যা করতে চাও?”

দপ্‌ করিয়া তরুণীর দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল! তীব্র কণ্ঠে সে বলিল “কল্যাণশক্তিকে হত্যা করা, শুভ উদ্যম শৃঙ্খলিত নির্য্যাতিত করা, সেইত আমাদের পুণ্যময় দেশের সমাজ ধর্ম্ম! পণ্ডিতজি, অসহায় নারী আমি—

আমার চেয়ে শতগুণে অসহায় এক রুগ্ন বৃদ্ধা, আমার চেয়েও সহস্রগুণে অসহায় এক ভীরু দুর্ব্বল বালিকার গ্রাসাচ্ছাদন জীবন ধারণের উপায় সংস্থাপনের ভার আমার উপর! এদের জন্য, গবর্ণমেন্টের সাহায্যপ্রাপ্ত একটা বালিকা বিদ্যালয়ে আমার পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের চাকরী করতে হয়। আমার এমন ক্ষমতা নাই যে বাসন মাজবার জন্য একটা তিনটাকা মাইনের ঝি রাখি। কিন্তু দানবশক্তির উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য আমায় বারো টাকা মাইনে দিয়ে একজন দরোয়ান রাখ্‌তে হয়েছে! কেন? কেন জানেন? আপনাদের সমাজ ধর্ম্মের মহামহিম বিধান যন্ত্র এম্নিই মহান্ যে অসহায়—অর্থাৎ পুরুষ অভিভাবকহীন নারী সে যন্ত্রে গম-পেষা হতেই বাধ্য।"

পণ্ডিতের ললাটের শীরাগুলা স্ফীত হইয়া উঠিল। রুদ্রদৃষ্টি তুলিয়া কঠোরস্বরে তিনি বলিলেন "তুমি যদি সত্যকার গম হতে, তাহলে তোমায় পিষে ফেলাই ন্যায় সঙ্গত ছিল। কিন্তু তুমি যে আস্ত একটা মানুষ মা!"

তরুণী শান্ত হাস্যে বলিল "মানুষের অধিকার থেকে যাদের বঞ্চিত করে রেখেছেন আপনারা—হাঁ আপনারাই বলছি—আপনি আমায় মার্জ্জনা করবেন তাদের আবার মনুষ্যত্ব কোথা? মানুষের অধিকার বঞ্চিত দুর্ভাগা জীবদের মানুষ বলা, আর শ্মশানের জলন্ত চিতায় শায়িত শবের মাথায় রাজছত্র ধরা একই কথা।

পণ্ডিত গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন "কূটতর্কে সুপণ্ডিত হলে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আমি তোমাকে আরও খানিকক্ষণ উত্যক্ত করতুম মা কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। তোমাকে অত্যন্তই ব্যস্ত বিব্রত দেখছি: এখন আমার বিদায় গ্রহণ করাই উচিত।"

পণ্ডিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তরুণী প্রণাম করিয়া সনিঃশ্বাসে বলিল "এখানে কোথায় বাসা নিয়েছেন বাবা।

পণ্ডিত সস্নেহে তরুণীর মাথা ছুঁইয়া মনে মনে কি আশীর্ব্বাদ করিলেন; তারপর স্মিতমুখে বলিলেন "কোথাও না। সরকারের অতিথিশালা ফেরৎ ভাগ্যবান মানুষ আমরা—আমরা যেখানে গিয়ে আশ্রয় নিই; সেইখানেই সরকারী সুদৃষ্টি পড়ে। কাজেই কোথাও গিয়ে গৃহস্থ বাটীতে আশ্রয় পাইওনা; নিইওনা। পথে ঘাটেই দিনরাত কাটাই।"

তরুণী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল "তাহলে আজ এ পৌষের রাতে আপনি বাইরে থাক্‌বেন কোথা? ওই যাঃ আবার বৃষ্টি সুরু হোল যে!

সত্যই সেই সময় বাহিরে ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বর্ষণ সুরু হইল! আজ বৈকাল হইতেই আকাশে মেঘ জমিতেছিল শীতকালের মেঘ বলিয়া কেহ বাদলের আশঙ্কা করে নাই। শীত বাড়িবার সম্ভাবনাই সকলের মনে হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতির খেয়াল বিচিত্র! অসময়ে অতর্কিতে হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

(৪)

পণ্ডিত উদ্ধশ্বাসে চিন্তিতভাবে আকাশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; কোন কথা বলিলেন না তরুণীও উদ্বিগ্নভাবে আকাশের দিকে চাহিল, কিন্তু সে মেঘ মলিন আকাশের দিগন্ত-পসারী বুকে কোথাও এতটুকু আশার আলো দেখিতে পাইল না।

হতাশ হইয়া তরুণী, সেই প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিল ব্রাহ্মণ তখনও ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চিন্তা বিভোর! তাঁহার সুদৃঢ় গঠিত মুখমণ্ডলে রৌদ্রদগ্ধতার দুঃখ, দৃষ্টিতটে তাহার অনাহার অনিদ্রার অত্যাচারে গভীর শুষ্ক ম্লানতার চিহ্ন, কপালে কঠোর দুশ্চিন্তার কুঞ্চন রেখা; -ওষ্ঠে অবসাদের বিবর্ণতা যেন নীরব বেদনার অভিযোগ ঘোষণা করিতেছিল। সেই ক্লেশ-নির্য্যাতিত: অবসাদ-ক্লান্ত মানুষটির মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া গভীর মর্ম্মব্যথায় তরুণীর চোখে জল আসিল; —হায়রে ঘর ছাড়া পাগলের দল; দুঃখ এবং দুর্ভাগ্যের অভিশাপই কি তোমাদের সাধনার একমাত্র পুরস্কার।

গলা ঝাড়িয়া তরুণী ডাকিল "পণ্ডিতজী"

পণ্ডিতজী দৃষ্টি নামাইয়া বলিলেন "কেন মা?"

তরুণী বেদনা করুণ কণ্ঠে বলিল "এ দুর্য্যোগে আর ত আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি না। আজকের মত কষ্ট করে এইখানেই রাতটা কাটিয়ে যান বাবা।"

পণ্ডিতজী মাথা নাড়িয়া বলিলেন "অনুচিত! এর জন্য কাল প্রাতঃকালে লোকসমাজ তোমার কাছে কত কৈফিয়ৎ দাবী করবে জানো মা?"

তরুণী ধীর কণ্ঠে উত্তর দিল "জানি। কিন্তু, বিশ্রামহারা সন্তানের জন্য, মাতৃহৃদয়ের একটা বেদনা আছে, সে বেদনার দাবী অগ্রাহ্য করতে পারি না, ঠাকুর। আমার প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করবেন, মনে করুন, আমি একটি বিপন্না মা, আপনি ততোধিক বিপন্ন একটি সন্তান। দুর্য্যোগের দায়ে ঠেকে বিপন্ন মায়ের কুটীরে একদিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন।"

পণ্ডিতজী রুক্ষ হাস্যে বলিলেন "কিন্তু এই দুর্য্যোগের সুযোগটুকু গ্রহণ করে, লোক-সমাজ তোমার বিরুদ্ধে কত অপ্রিয় সংবাদ রচনা করবে, তাতো জানো মা।—"

তরুণী স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তর দিল "বলেছি ত—সব জানি। নিজের জীবনে আমার এমন দিন, একদিন এসেছিল, যেদিন প্রাণঘাতী বিপন্নতার চরম সীমায় ঠেকেছিলাম! সেদিন সমাজের কাছে যে শিক্ষা পেয়েছিলাম ঠাকুর, সে শিক্ষা আমি আশীর্ব্বাদ করি, আমার অতি বড় শত্রুও যেন কখনো না পায়! সে শিক্ষার জের আমার, এখনো চল্‌ছে। প্রতিদিন, প্রত্যেক ঘটনায়—নূতন চেতনায় উপলব্ধি কর্‌ছি,—এ সমাজে মানুষের মনুষ্যত্ব কোন বিশেষত্বের দ্বারা বিচারিত হচ্ছে!—দৈব দুর্ব্বিপাক, বা অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে অনেক প্রত্যক্ষ দৃষ্ট কারণকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় সত্যি।—হতে পারে অদৃষ্ট দোষে রাজনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয়, কিন্তু তাহলেও সামাজিক-কর্ত্তব্যের দিক থেকে আমাদের প্রত্যেকেরই শিক্ষা, সহবৎ, সততা, সদাচার যে নৈতিক-আদর্শকে জবাই করে যাচ্ছে, আর সেটা জবাই করার জন্যে যে আমাদের নির্লজ্জতা, রুচিহীনতা দায়ী নয়, শুধু রাজনৈতিক কারণটাই দায়ী,—একথা আমি স্বীকার করতে পারি না। যদিও দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সংগ্রামে আমার ভ্রাতা বন্দী, স্বামী নিরুদ্দেশ,—সাংসারের দিক থেকে আমি অশেষ রকমে ক্ষতিগ্রস্ত, সত্যি বটে,—কিন্তু তা সত্বেও বলছি, আমার চার পাশের জনসমাজের মনুষ্য নীতির ঔদার্য্য সম্বন্ধে আমায় যে তীব্র-তিক্ত কাণ্ডজ্ঞান অর্জ্জন করতে হয়েছে, তার তুলনায় রাজনৈতিক দুর্দ্দশা বেশী কষ্টকর বলে মনে করি না।"

তরুণী থামিল। ব্যথিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "পণ্ডিতজী, এ সব রাজনৈতিকর আলোচনায় মনকে ক্রমাগত বিষিয়ে তুললে, নিজেদের ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, এই সব সামাজিক অত্যাচার ভোগ করেও আমরা যেন সমাজকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসতে পারি, সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা কর্‌তে পারি।"

পণ্ডিত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন "কোন চেষ্টাতেই কিছু হবে না মা! যারা নিজের মঙ্গল চায় না, তাদের মঙ্গল সাধনের ক্ষমতা ব্রহ্মা বিষ্ণু কারুরই নেই! দেশের ইতর ভদ্র সকলেরই সঙ্গে মিশেছি, সকলেরই মনোভাব বিশ্লেষণ করে বেড়িয়েছি,—সবই ভুয়ো ধাপ্পাবাজী! রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের সেই পাগ্‌লা মেহের আলীটার মত, আমার এখন পথে পথে চীৎকার করতে ইচ্ছা হয়,—"সব্‌ ঝুটা হ্যায়! সব্‌ ঝুটা হ্যায়!"

তরুণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল "না ঠাকুর, অতটা নিরাশাবাদী হবেন না। এই সব্‌ ঝুটার মধ্যেও সাচ্চা চিজ্‌ কিছু না কিছু আছেই, না হলে এতদিন ধরে, এই ভুয়ো ধাপ্পাবাজীর সৃষ্টিটা কিছুতেই টিক্‌ত না।"

পণ্ডিতজী কিঞ্চিৎ উগ্রভাবে বলিলেন "টিক্‌ছেই বা কই? যা কিছু গড়া হয়েছে, আমিত দেখ্‌ছি সবই ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে!"

বহির্দ্বারে লাঠি ঠুকিবার শব্দ হইল। উভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, মুখের উপর কম্বল মুড়ি দিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে দ্বারবান আসিতেছে।

বারেণ্ডায় উঠিয়া সে তরুণীর হাতে একখানি চিঠি ও গুটি-কতক টাকা দিল। তরুণী আলোর দিকে ঈষৎ হেলিয়া চিঠিখানাতে একবার চোখ বুলাইয়া লইল, তারপর বলিল "দরোয়ানজী, মহারাজকে পা-ধোবার জল দাও। আমি জলযোগের ব্যবস্থা করতে চললুম।—"

তরুণী বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

(৫)

অনেকক্ষণ অবিশ্রাম বর্ষণের পর বৃষ্টিটা একটু ধরিয়া আসিল। দ্বারবান বাড়ীর ভিতর হইতে ঘুরিয়া আসিয়া জানাইল, অন্তঃপুরে পণ্ডিতজীর ডাক পড়িয়াছে, আহার্য্য প্রস্তুত।"

পণ্ডিত তখন হাত পা ধুইয়া আবার আলোর কাছে ঝুঁকিয়া সেই খাতা পড়িতেছিলেন। দ্বারবানের আহ্বানে

চমকভাঙা হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন "কত বাজ্‌ল ?"

দ্বারবান জবাব দিল "দশটা।"

পণ্ডিত খাতা দুইখানি নিজের বোঁচকার ভিতর ঢুকাইলেন। তারপর বোঁচকাটি পিঠে ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "চল।"

দ্বারবান আলো ধরিয়া পণ্ডিতজীকে অন্তঃপুরের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

অন্তঃপুরের মধ্যে একটি পরিষ্কার ছোট বারেণ্ডায় আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আসনের সামনে এক গ্লাস জল ও একটি থালায় নানা রকম ফলমূল খানিকটা ছানা চিনি, ও এক বাটি দুধ রাখা হইয়াছিল। আসন হইতে কিছুদূরে সেই তরুণী এবং একটি বৃদ্ধা বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাছে একখানা মাদুরের উপর বসিয়া একটি অল্প বয়স্কা বধূ মোজা বুনিবার কলে মোজা প্রস্তুত করিতেছিল। পণ্ডিতজীর আহার স্থানে যে আলো রাখা হইয়াছিল, সেই আলোতেই বধূটির মোজাবোনা চলিতেছিল।

পণ্ডিতকে বারেণ্ডায় পৌঁছাইয়া দিয়া দ্বারবান প্রস্থান করিল। পণ্ডিত বারেণ্ডায় উঠিয়া, চক্ষের নিমেষে সমস্ত দৃশ্যটা দেখিয়া একটু যেন থতমত খাইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চিন্তাগম্ভীর মুখ মণ্ডলে একটা অব্যক্ত বেদনাভরা ক্ষোভের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। পণ্ডিত আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। মাথা হেঁট করিয়া স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইলেন। বধূটি দূর হইতে নিঃশব্দে প্রণাম করিয়া নিজের কাজে মন দিল, বিমূঢ় প্রায় পণ্ডিত ভালমন্দ কোন আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

বৃদ্ধা উঠিয়া দুহাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিলেন। শ্লথ-কম্পিত কণ্ঠে নিম্নস্বরে বলিলেন "এগিয়ে আসুন বাবা, আসনে বসুন।"

পণ্ডিত প্রতিনমস্কার করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বেদনাহাস্য রঞ্জিত মুখে বলিলেন "মা গো, অপরাধী ছেলের দল আমরা! ঘরের মায়ের চোখের জলের অভিশাপ মাথায় নিয়ে দেশমায়ের সেবায় আমরা বেরিয়েছি। আপনাদের সামনে এসে যখন দাঁড়াই,—তখন ঘরের মায়েদের প্রতি কর্ত্তব্য হানির অপরাধটা মস্ত বড় হয়ে চোখে পড়ে! মন বড় বেদনা-সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে!—"

বৃদ্ধার শুষ্ক শীর্ণ অধরপ্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চোখের কোণে একফোঁটা জল আসিল, সেটুকু তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া বৃদ্ধা নিম্নস্বরে "ও সব কথা বন্ধ করুন। আমাদের চারিদিকেই শত্রু।"

অন্তঃপুরের পিছনে একটা সুবৃহৎ ত্রিতল বাড়ীর দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া তিনি আবার বলিলেন "এই বাড়ীর সমস্ত জানালাগুলি সর্ব্বদা আমাদের ওপর কড়া বিদ্বেষে পাহারা দিচ্ছে। কোন কথার প্রয়োজন নাই,—খেতে বসুন। আপনি আমাদের কাশীর পাণ্ডা, এই পরিচয়টা মনে রাখবেন।—"

পণ্ডিত বিস্ময়-স্তম্ভিত মুখে কয় মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক রহিলেন, তারপর নিঃশব্দে আত্ম সম্বরণ করিয়া আসনের উপর গিয়া বসিলেন। কোমল কণ্ঠে বলিলেন "আহারের আয়োজনটা যে অনেক আড়ম্বর পূর্ণ হয়েছে মা। একমুঠো চানা আর একঘটি জল যাদের দিনান্তের সম্বল তাদের কি এত আড়ম্বর সাজে?—"

বৃদ্ধা নিম্নস্বরে বলিলেন "কালকের দিনে সে চানামুঠা জুটবে কি না তাই বা কে জানে? যা জুটেছে আজ খেয়ে নিন্।

পণ্ডিত নিঃশব্দে একটু হাসিলেন। আচমন করিয়া নীরবে আহারে মন দিলেন। সকলেই নীরব।

ছোট বধূটি কলে সেলাই করিতে করিতে সহসা কল থামাইল। তরুণীর দিকে চাহিয়া বলিল "দিদি একবার সরে আসুন, গোড়ালিটা দেখিয়ে দিয়ে যান।—"

তরুণী সরিয়া গিয়া কলের কাছে বসিল। কল চালাইয়া বধূটিকে কি একটা সমস্যা দেখাইয়া দিতে লাগিল। বধূটি তবুও ভাল দেখিতে পাইল না, কারণ একটি মাত্র লণ্ঠনের আলোতে পণ্ডিতজীর আহার ও বধূটির কলের সেলাই চলিতেছিল। বধূটি একটু বিব্রত হইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল "দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, আলোটা আর একটু সরিয়ে আনব।"

তরুণী সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল "না না, পণ্ডিতজীর খাওয়া আগে হোক। সেলাই এখন থাক।"

কল্প থামিয়া গেল। পণ্ডিতজী কি যেন একটা ভাবিতে ভাবিতে অত্যন্ত উন্মনা ভাবে আহার করিতেছিলেন ইহাদের দিকে মনোযোগ দেন নাই। হঠাৎ তরুণীর শেষ কথাটা কাণে যাইতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন "কি মা আলো চাই? নাও, নাও। আমার খাওয়া হয়েছে;"

তিনি বাঁ হাত বাড়াইয়া আলো নিজেই সরাইয়া দিলেন! ডান হাতে জলের গ্লাশ মুখে তুলিলেন।

তরুণী ও বৃদ্ধা ব্যস্ত হইয়া বলিল "ও কি ঠাকুর কি খাওয়া হোল? দুধ সুদ্ধু পড়ে রইল যে—"

"যথেষ্ট খেয়েছি, আর নয়।—" বলিয়া পণ্ডিতজী আসন ত্যাগ করিলেন।

পণ্ডিতজীর অল্পাহারের জন্য বৃদ্ধা ও তরুণী আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। নিম্নস্বরে বলিলেন "মা আপনাদের সঙ্গে দু একটা কথা বল্‌তে চাই, একবার ঘরে চলুন।"

"আসুন -" বলিয়া বৃদ্ধা পাশের ঘরে ঢুকিলেন। সে ঘরটি খুবই ছোট, ঘরের একপাশে পূজাহ্নিকের উপকরণ সজ্জিত; ঘরের কোণে একটি রেড়ির তেলের প্রদীপ মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া একটি আসন পাতিয়া দিয়া বৃদ্ধা বলিলেন "বসুন।"

পণ্ডিত বসিলেন। বৃদ্ধা দুয়ারের চৌকাঠের কাছে বসিলেন। তরুণী ও বালিকা বধূ বাহিরের সেই বারেণ্ডায় বসিয়া মোজা সেলাই করিতে লাগিল।

(৬)

পণ্ডিত একটু নীরব থাকিয়া ধীরে বলিলেন—"আপনাদের অবস্থাটা আমার কাছে প্রহেলিকার মত লাগ্‌ছে। পুরুষ অভিভাবকহীন অবস্থায় পড়ে আপনারা আর্থিক এবং মানসিক দুই ব্যাপারের দিক থেকেই বড় ক্লেশভোগ করছেন, নয়?"

বৃদ্ধা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "আমাদের অবস্থা যে কি হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠাকুর, তা আমরা ছাড়া আর কেউ বুঝ্‌বে না, কাউকে বোঝাতে ও পারব না। আমার ছেলে আজ চার বছর নিরুদ্দেশ, দু'মাস ছ'মাস অন্তর তার হাতে [illegible] একখানা করে বেনামী চিঠি পাই—সে এখনো বেঁচে আছে, এখনো পুলিশের হাতে পড়েনি শুধু এইটুকু জান্‌তে পারি মাত্র,—আর কিছু নয়। সর্ব্বদাই সশঙ্ক হয়ে আছি, কখন সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে কখন তার কি বিপদের কথা শুনি......মায়ের প্রাণ বাবা, কি হয়ে যে রয়েছি বলবার নয়। তার ওপর এই মেয়ে আর বৌটিকে নিয়ে...।" বৃদ্ধা আর বলিতে পারিলেন' অজস্র অশ্রু বাষ্পে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল!

তরুণী উঠিয়া আসিল। মায়ের পদতলে বসিয়া পড়িয়া আবদারভরা ভৎসনার স্বরে বলিল "ওমা-মা,—ওকি ছেলেমানুষী হচ্ছে-মা?"

বৃদ্ধা বলপূর্ব্বক সে উচ্ছ্বাস দমন করিলেন। অশ্রু মুছিয়া বলিলেন "এই মেয়ে, এই আমার আজ একমাত্র ছেলে হয়ে, ছেলের কায করছে। আজ এই মেয়ে ছিল বলে, দুবেলা দুমুঠো খেয়ে আমার আঁচাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তাতেই কি আমার নিস্তার আছে ঠাকুর? পথে ঘাটে সর্ব্বত্র গুজব উঠেছে যে আমি...সে আর আপনাকে কি বল্‌ব বাবা?...অতি জঘন্য অপবাদ!—কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষ্য করে বল্‌ছি বাবা—দেবতার ও দোষ আছে তবু এ মানুষটার মধ্যে আপনি "অন্যায়" বল্‌তে একটা কিছুকে খুঁজে পাবেন না। অথচ বাইরের সমাজ, এরই কুৎসাপবাদ ঘোষণা করছে।

পণ্ডিত শান্ত হাস্যে বলিলেন আমি ও তাই শুনতে শুনতে আস্‌ছিমা, সত্যিই পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই এই পরম উপাদেয় সমালোচনা চল্‌ছে। তখুনি বুঝেছি যে এর মধ্যে একটা কি আক্রোশের বীজ লুকুনো আছে, নইলে প্রশান্ত সান্যালকে যিনি মানুষ করেছেন, তাঁর নামে এত বড় কথা ওঠে কেন? আপনাদের সমাজ বড় সুন্দর জিনিষ দেখলুম্‌। এখানে নিরুপায় মেয়েদের দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দুটি বৃত্তি মাত্র সমাজ—পরম শ্লাঘার চোখে দেখে।—এক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা, আর এক দৈহিক পরিশ্রম; তাও বাসন মাজা, ঘরঝাঁট্‌ আর মুখরোচক তরকারী রান্নার সীমায় আবদ্ধ! এর বাইরে আপনারা কোন কাজ করতে গেলে, সমাজ অপমানে উষ্ণ হয়ে ওঠে! কাযেই দিল্‌-দরিয়া মেজাজে কটূক্তি বর্ষণটা চলে ও খুব! হায় রে মাথা-পাগ্‌লার দেশ! সাধে কি আর এত অধঃপতন!—"

মিলন-মাধুরী

শিল্পী—এস ভি ধুবন্ধর

তরুণী, বৃদ্ধার হাঁটুর উপর মাথা ঝুঁকাইয়া নতমুখে বসিয়াছিল' এবার মুখ তুলিয়া চাহিল। অশ্রুসজল চোখে ঈষৎ হাসিয়া বলিল "ঠাকুর কথা যদি তুললেন তাহলে একটু শুনে যান। আমার এই বালিকা ভ্রাতৃজায়া ও বেচারা বহির্জগতের কোন সংশ্রবে নেই নেহাৎই বাঁটনা বেটে কুটনো কুটে—দিন কাটায় আর ঘরের কোণে বসে মোজা বুনে সংসারের একটু আর্থিক সাহায্য করে—এই মাত্র ওর অপরাধ! ওর স্বামী গেছে জেলে, সুতরাং ওর আর পরিত্রাণ নেই। ওর নামেও বেনামী চিঠি আসছে, বাড়ীতে ঢিল পড়ছে, আরও কত কি মধুরতম আবদার উপদ্রব চলছে, সে সব বলবার নয়!—এই দেখুন আমাদের বাড়ীর পাশেই এক বড় লোকের তেতালা বাড়ী—এই বাড়ী থেকেও কতকি ঐন্দ্রজালিক কীর্ত্তিকলাপ চলছে।—"

পণ্ডিত রুদ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "এই নবপ্রেত গুলোর ঘাড় মট্‌কে রক্তপান করে, এমন মরদ-বাচ্ছা কি তোমাদের দেশে নেই?"

তরুণী উত্তর দিল "দেখতে ত পাইনে ঠাকুর, বরং অনেকে নবপ্রেত গুলির কেরামতিতে মোহিত হয়ে স্তব গান করছেন, কিম্বা সত্য ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়েও একবার সাপের মুখে চুম দিচ্ছেন, একবার ব্যাঙের মুখে চুম দিচ্ছেন,—আর নাকি সুরে দোতরফা গাইছেন,—এমন ন্যাকামির-দেবতা যথেষ্টই নজরে পড়ে"

পণ্ডিত বলিলেন "অধঃপাতে যাক! দেশের পুরুষরা যারা দেশমায়ের সেবা করতে গেছেন তাদের ভাগ্যে উপহার বরাদ্দ হয়েছে পুলিশের নির্য্যাতন, জেল, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, —আর তাঁদের পরিবারবর্গের জন্য পুরস্কার বরাদ্দ হয়েছে,—উপবাস, আশঙ্কা, সমাজের নরপশুদের উপদ্রব লাঞ্ছনা—শক্তিশালী নরপশুর দল পদাঘাত করে দেশকে সত্যমোক্ষের পথে পাঠাচ্ছেন আর আমরা মুষ্টিমেয় আত্মম্ভকের দল রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে মাথা খোঁড়া খুঁড়ি করছি, আমাদের নিজেদেরই যে গোড়ায় গলদ সেদিকে দৃকপাত নেই! ব্যবস্থা বেশ চলছে! "

বাহির হইতে দ্বারবান হাঁকিল "মহারাজ আপ্‌কো এক চিঠ্‌ঠি হ্যায়!

(৭)

একি অপ্রত্যাশিত সংবাদ! সকলেই হঠাৎ প্রচণ্ড চমক খাইলেন একি অদ্ভুত! পণ্ডিতজী—ওই নবাগত অতিথি এখানে আসিয়া পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তাঁহার নামে পত্র আসিল। তবে ত তাঁহার আগমন সংবাদটা আর গোপন নাই।—

আতঙ্ক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকেরা পরস্পরের মুখ তাকাইল; বালিকা বধূটীর কল বন্ধ হইয়া গেল!

পণ্ডিত একলাকে বাহিরে গিয়া দ্বারবানের হাত হইতে চিঠি লইয়া পড়িলেন, তারপর বিনা বাক্যে উর্দ্ধশ্বাসে বাহিরের দিকে ছুটিলেন!

পণ্ডিতের পাগলের মত আচরণে দ্বারবানটি হতবুদ্ধি হইয়া বারেণ্ডার সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইল। তাহার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অজস্র বিস্ময়ভরা প্রশ্নের ঢেউ খেলিতেছে দেখিয়া তরুণী ত্রস্তে আত্মদমন করিল। গলা ঝাড়িয়া বলিল "দরোয়ানজি, উনি আমাদের গুরু মহারাজ। উঁর বাড়ী থেকে কার অসুখের খবর এসেছে বোধহয়, তাই অমন ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন।"

"হুঁ হুঁ তব্‌ সমঝা মাঝি—" বলিয়া দ্বাররান শশব্যস্তে, বোধহয় গুরুমহারাজের তত্ত্বাবধান করিবার উদ্দেশ্যেই বাহিরে চলিয়া গেল।

পাঁচ মিনিট পরে পণ্ডিত একজন দীর্ঘকায় পুরুষকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন, নবাগত ব্যক্তির মুখমণ্ডলে বিরাট চৌগোঁপ্পা, পরিধানে পশ্চিমদেশীয় মোটর চালকের বেশ। পণ্ডিত লোকটিকে সঙ্গে করিয়া সোজা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। বলিলেন এ লোকটিকে কখনো দেখেছেন মা?"

বৃদ্ধা বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে নবাগতকে দেখিতে লাগিলেন। সে লোকটি মৃদু হাসিয়া একবার সকলের মুখের দিকে চাহিল, তারপর বৃদ্ধার পায়ের কাছে মাথা নোয়াইয়া দুহাতে পদধূলি তুলিয়া মাথায় দিল, কোমল কণ্ঠে বলিল "এখন পরিচয় দেবার ইচ্ছে ছিল না মা, কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়ে আসতে হোল।—"

বৃদ্ধা হঠাৎ দুহাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন। অদম্য উচ্ছ্বাসে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন বাবা আমার! প্রশান্ত!—কোথায় ছিলি এতদিন বাবা? "

তরুণী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চোখে আঁচল চাপিয়া ধরিল। বালিকা বধূ দু হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

প্রশান্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া একবার সকলের অবস্থা দেখিল, তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বলিল "তোমরা চুপ কর। জানো ত আমরা কত বড় বিপজ্জনক-পথের পথিক! আমার কথা বলবার সময় নেই, পণ্ডিতজীর পিছনে পুলিশ লেগেছে, ওঁকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে এসেছি। আসুন পণ্ডিতজি, প্রণাম মা কাঁদবেন্ না। পনের দিন পরে একজন ফেরিওলা সেজে যা-হোক কিছু বিক্রী করতে আস্‌ব। হৈচৈ করোনা, আমি খুব কাছাকাছির মধ্যেই এখন আছি।"

আগ্রহ ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন হইল কোথায়, কোথায়?"

প্রশান্ত শান্ত-কণ্ঠে জবাব দিল "পাশের ওই তেতলা বাড়ীর বার্‌মহলে আছি। সরকারী খেতাব আর খেলাতের লোভে ওই ছোটলোক নবাবরা সব দিকেই বড় নবাবী ফলাতে সুরু করেছেন, তোমাদের ওপর ও কাস্তের ঠোক্করে চাবার ঠাট্টা চলাচ্ছেন সব শুনেছি। তাই ওঁদের মোটরের সফার হয়ে চাকরী করতে এসেছি। হপ্তা খানেকের মধ্যেই বাবাজীদের কিঞ্চিৎ মোটা পুরস্কার দিয়ে সরে পড়ব। চলে আসুন পণ্ডিতজি, রাস্তায় মোটর রেখে এসেছি। এই বাড়ীর রান্নাঘরের পাঁচিলের ওপাশেই আমার মোটর গ্যারেজের টিনের ছাদ পাবেন, সাবধানে ছাদ পার হয়ে ওপাশে গেলেই নীচু পাঁচিল পাবেন। সেই পাঁচিল বয়ে পশ্চিমদিকে খানিকটা গেলেই একটা সরু গলি পথ দেখতে পাবেন সেই খানে গিয়ে অপেক্ষা করুন আমি বাইরের দিক থেকে ঘুরে যাচ্ছি।—নইলে লোকে সন্দেহ করবে।"

পণ্ডিত নিজের বোঁচকা কাঁধে লইয়া বাহিরে আসিলেন, প্রশান্ত ও আসিল। পণ্ডিতকে কাঁধে তুলিয়া পাঁচিলে উঠাইয়া দিল। পণ্ডিত নিঃশব্দে পাঁচিলের ও পাশে অদৃশ্য হইলেন।—

প্রশান্ত কোন দিকে না চাহিয়া দ্রুত বাহিরের দিকে ছুটিল। বারেণ্ডার দুয়ারের কাছে অন্ধকারে তরুণী দাঁড়াইয়া ছিল প্রশান্ত সেখানে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারেই যথাসাধ্য তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তরুণীর মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে বলিল "আত্ম-বলিদানের পথে যারা যাত্রা করেছে, আত্মদৌর্ব্বল্যের মোহে অভিভূত হয়ে তাদের কাঁদবার সময় আছে কি? সে আত্মপ্রতারণা ক্ষমা করতে পারেন এমন ভগবান কেউ আছেন কি?"

তরুণী বলিল "না। তুমি যে পথে চল্‌ছ, চলে যাও, আমি বাধা দিতে আসিনি। বিপদগ্রস্তের ভার যারা নিজের কাঁধে তুলে নেয়, তাদের বীরধর্ম্ম অভিনন্দিত হবার যোগ্য। আমার প্রণাম নাও। ভগবান করুন, তোমাদের বিপদসঙ্কুল সাধনা আত্মজয়ের অক্ষয় কবচ মণ্ডিত হোক?"

সে প্রণাম করিল। প্রশান্ত স্তম্ভিত ভাবে একমুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া নম্রস্বরে বলিল "ধন্যবাদ! অনেক ধন্যবাদ! তোমাদের সম্বন্ধে ও আমার সেই—প্রার্থনা।"

পরমুহূর্ত্তে পাশ কাটাইয়া সে বাহিরের উঠানের অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

দ্বারবান তখন নিজের ঘরে উনান ধরাইতে ধরাইতে গুণ্ গুণ্ স্বরে কি একটা ভজন গাহিতে ছিল। অন্ধকার উঠানের দিকে তার লক্ষ্য ছিল না। তরুণী স্তব্ধ নিস্পন্দ-ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সজোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, তারপর দ্বারবানকে ডাকিয়া বলিল দরোয়ানজি, তাঁরা চলে গেছেন। বাইরের দুয়ার বন্ধ করো।
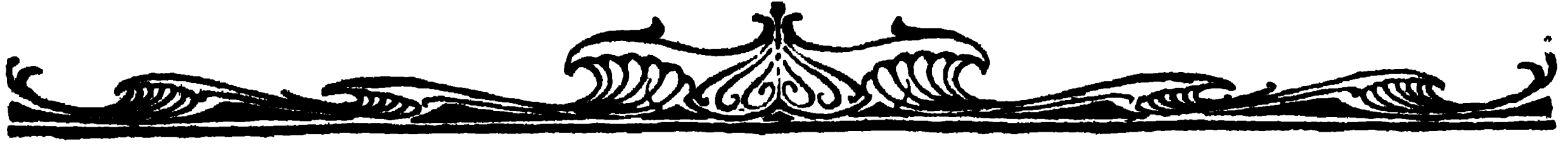
ভিজিয়ানাগ্রাম

(বহরমপুরে কালীপূজা)

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুরে কালীপূজার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কয়েকজন বন্ধু অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করাই আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বিবেচনায় দুইদিন পরে যাহা লিখিবার ইচ্ছা ছিল দুইদিন আগেই তাহা লিখিতে বাধ্য হইলাম। অতীতের কথা স্মরণ করিয়া বলিতে অন্তরের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ নিজেকেই প্রফুল্লিত করিয়া তোলে। অতএব এ লোভের হাত হইতে আত্মরক্ষা করা যতদূর সহজ মনে করা যায় প্রকৃত পক্ষে ততদূর নয়। কোন একটা ছুটীর পূর্ব্বে সংবাদপত্রে, যে কোন একটা ভ্রমণকাহিনী যদি প্রকাশিত হয় তবে তাহার মধ্যে যেন একটা অজ্ঞাত আকর্ষণ সর্ব্বদিক দিয়া কর্ম্মক্লান্ত মনটাকে বাহিরে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রলুব্ধ করিয়া তোলে।

যে দিন নর্ত্তকী লইয়া মাদ্রাজমেলে, ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে ফিরি, সেদিন কিন্তু, সারা পথটা গমনের দিনের মত দুর্ব্বিসহ ভারাক্রান্ত মনে হইল না। পথে নারী বিবর্জ্জিতা, এ কথা, যতই মূল্যবান ও সত্য হোক, আমি কিন্তু, সেদিনকার পথের নারী সঙ্গীদ্বয়কে কোন মতেই পূর্ব্বোক্ত নিদারুণ অপবাদ হেতু গাড়ীর মধ্যে স্থান না দিয়া থাকিতে পারি নাই। তাহারা গাড়ীতে না থাকিলে কেমন করিয়া যে বহরমপুর ফিরিতাম তাহা বলিতে পারি না। একেই ত গাড়ীতে জনমাত্র বাঙ্গালী সঙ্গী নাই, তাহার উপর দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় মুখ বুজিয়া মৌনী সন্ন্যাসীর মত শুষ্ক, নীরস, কঠিন পর্ব্বতের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করা যে কি বিড়ম্বনা তাহা ভুক্তভোগী নহিলে কেহই ইহার তিক্ত রস আস্বাদ করিতে পারিবেন না। মনে করিতে পারেন, অবলা নারী সঙ্গী লইয়া আসা ত এক দুরূহ ব্যাপার তাহার উপর তাহাদিগের কথার একটি বর্ণও ত বুঝিবার সাধ্য নাই; সুতরাং কঠিন কর্কশ পর্ব্বতের দৃশ্য ও এই নারীদ্বয়ের মৌন ও নির্ব্বাক অবস্থিতির মধ্যে বড় বেশী প্রভেদ আছে বলিয়া ত মনে হয় না। আমি ইহাদের কথা বুঝিতে না পারিলেও ইহারা আমাকে বিষণ্ণ ও নির্ব্বাক বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বোধহয় ইহাদিগের করুণা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাই কথায় না পারিলেও গানে, সারা পথটা বিপুল আনন্দ দান করিতে করিতে আসিয়াছিল। সঙ্গীতের সমস্ত কথা বুঝিতে না পারিলেও সুরের তরঙ্গহিল্লোলে মন মুগ্ধ হইয়া যাইতেছিল। তাহাদের সঙ্গীতের সুরধারার মধ্যে প্রাণের অনুভূতির যে অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি মুখে চোখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল তাহা সত্যই পবিত্র ও স্বর্গীয়। রমণী যে প্রকৃত সঙ্গীত সুধা-ধারায় আপনাকে নারীর মহিমাময়ী উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করিতে পারেন তাহা এই নর্ত্তকীদ্বয়ের সঙ্গীতের মধ্যে প্রকটিত হইয়া উঠিতেছিল।

রাত্রি ৮৷৷০ টার সময় আমরা বহরমপুরে আসিয়া পৌছিলাম। অনেকগুলি ইংরাজ পুরুষ ও মহিলা কেলনারের Refreshment Roomএ সান্ধ্য ভোজন সমাধা করিবার জন্য অবতরণ করিলেন। ষ্টেশনটী বৈদ্যুতিক আলোকমালায় দিবসের মত দেখাইতেছিল। ঠিক যেন যন্ত্রচালিতের মত সকলে কেলনার কোম্পানীর নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। এবং কলের পুতুলের মত খানসামাগুলি বিনা বাক্যব্যয়ে আহার্য্য সরবরাহ করিতে লাগিল। গোলমাল নাই, হৈ, হৈ নাই, চীৎকার নাই, ছুটাছুটী নাই, কোনরূপ বিশৃঙ্খলা নাই; একটি সুবন্দোবস্ত সংযত নিয়মের মধ্য দিয়া চক্ষের নিমিষে শৃঙ্খলার সহিত দেওয়া নেওয়া, খাওয়া-দাওয়া কাজগুলি চলিতে লাগিল--সে এক সুন্দর দৃশ্য! ভোজনাগারের একপ্রান্তে পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টি লইয়া ম্যানেজার স্থির গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার নয়নের দিকে চাহিয়া তাঁহার ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া খানসামাগুলি অবলীলা ক্রমে অনায়াসে, রেলওয়ের নির্দ্দিষ্ট গাড়ী ছাড়িবার সময়ের মধ্যে, সকলের ভোজন কার্য্য সুচারুরূপে শেষ করাইয়া মূল্য আদায় করিয়া লইল এবং বিনীত সেলাম দিয়া যাত্রীগণকে বিদায় করিল। এত অল্প

সময়ের মধ্যে কেমন করিয়া যে এমন কাজ হইয়া যায়—যাহারা ১০টা লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে বাড়ী শুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া তোলে—মাথা খারাপ করিয়া চীৎকারে, শিশুদিগের ভয়োৎপাদন করে তাহারা ইহা স্বচক্ষে দেখিলে ও বিশ্বাস করিতে পারিবে না এমন আশঙ্কা আমার মনে হয়। সংযম ও শৃঙ্খলা সকল জাতি ও সকল মানুষের উন্নতির একমাত্র সোপান—ইহা বোধহয় কেহ কোন দিন অস্বীকার করিতে পারিবেন না?

সেদিন, বহরমপুরস্থ প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী ও তদ্দেশীয় রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ অনেকেই আগ্রহ ভরে, উৎসুক দৃষ্টিতে আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া নামাইয়া লইতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাকে কিম্বা আর কাহাকেও সে কথা আমি নাই বা ভাবিলাম—আপনারা মনে মনে, যাহাই মনে করুন আমি কিন্তু এতবড় সম্মানটা পাবার লোভ সহজে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নই।

আপনারা ভাবিতে পারেন, আমার সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছিলেন—তাঁহারা নারী, এবং এই বর্ত্তমান নারী-স্বাধীনতার যুগে তাঁহাদের ন্যায় সঙ্গত প্রাপ্য সম্মানে আমি বঞ্চিত করিতেছি—ইহা অমার্জ্জনীয় ত্রুটী হইতে পারে—মানুষ চিরদিনই স্বার্থপর সুতরাং আমি আমার স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাহা লইতে চাই, তাহাতে যে অপরের স্বার্থহানি ঘটিবে তাহা বুঝিতে পারা না পারিলেও স্বীকার করা কোন দিক দিয়াই বর্ত্তমান সভ্যতার দিনে উচিত নয়।

গাড়ী হইতে নামিবামাত্র সকলেরই দৃষ্টি গাড়ীর অভ্যন্তরস্থ সুন্দরী নর্ত্তকীগণের দিকে আকৃষ্ট হইল। আমি একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম। নর্ত্তকীগণ গাড়ী হইতে নামিলে তাহাদের সমভিব্যাহারী লোকগুলি তাহাদিগের আসবাবপত্র লইয়া নিম্নশ্রেণীর গাড়ী হইতে নামিয়া সেথান আসিয়া উপস্থিত হইল। ট্রেন ছাড়িয়াদিল। আরোহিগণ কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে নর্ত্তকী পরিবেষ্টিত জনতার দিকে দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। কে একজন, ঠিক মনে নাই, উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—"Three cheers for our Chatterje's beautiful selection" একটা উচ্চহাস্যে সমস্ত প্লাটফর্ম্ম ভরিয়া গেল। আমি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সত্য বলিতে কি; পথে অনেকবার মনে মনে ভাবিয়াছি, আমার নির্ব্বাচিত নর্ত্তকিগণ সকলের নয়ন ও মনোরঞ্জন করিতে পারিবে কি না? মনোরঞ্জনত দূরের কথা, নয়ন রঞ্জন যে করিতে পারিয়াছে, তাহার প্রশংসাপত্র পাইয়া আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। ষ্টেশনে একটি কোয়ার্টার খালি ছিল, উহা কালীপূজার জন্য নির্ম্মিত পাণ্ডেলের সন্নিকটবর্ত্তী, ঐ কোয়ার্টারেই নর্ত্তকীদের বাসস্থান দেওয়া হইল। আমাকে আর তাহাদের জন্য বড় ভাবিতে হইল না। বুঝিলাম, এখন আমাকে আমার আপন ভাবনাই ভাবিতে হইবে কারণ নর্ত্তকীদের আহারাদি ও থাকিবার ব্যবস্থা লইয়া সকলেই চতুর্দ্দিক হইতে বিশেষ আগ্রহ ও ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি বাসায় যাইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া বিপুল উৎসাহে ভোজনের ব্যবস্থা করিলাম। আমি আহারে বসিয়াছি—মনে মনে ভাবিতেছি, বুঝিবা দিগ্বিজয় করিয়া ফিরিয়াছি, আমার কণ্ঠে জয়মাল্য পরাইবার জন্য কেহত সুকোমল বাহুলতা প্রসারিত করিয়া পরম আনন্দে প্রীতিভরে ধীর পদ বিক্ষেপ করিয়া এখনও অগ্রসর হইতেছে না? ঠিক এমনই সময়, ঠাকুরের সুদৃঢ় মাংসপেশী সম্বলিত হস্ত, মাংসের বাটী লইয়া আমার থালার সম্মুখে দেখা দিল। এমনই সময় বাহির হইতে পূর্ণবাবু মহাউল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে আসিতেছিল, "বহুৎ আচ্ছা ভায়া বহুৎ আচ্ছা! তোমার পছন্দ আচ্ছা বটে, কালীপূজাটা তুমিই জাঁকিয়ে তুল্লে দেখছি! এদিককার আয়োজনত সব ঠিক, কিন্তু, আসল সংবাদই পাচ্ছি না, শেষে কি বাবা, শিব রহিত যজ্ঞ করবে?" বলিয়াই সে আমার ক্যাম্পখাটখানির উপর ধড়াস্ করিয়া বসিয়া পড়িল। আমার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কোথায় বিজয় উৎসবের আনন্দ সঙ্গীতধ্বনি? কোথায় কবীশুণ্ড সদৃশ ভুজবল্লরীধৃত জয়মাল্য? সবই শূন্য সবই এক নিশ্বাসে উড়িয়া গেল? আমি মাথা তুলিয়া তাহার দিকে একটু চাহিয়া বলিলাম, বাহবার ধাক্কায় ত টেঁকা দায় হয়ে উঠল? বলি, যা'দের নিয়ে এত বাহবা তাদের কাছে গিয়ে এটা দিলে কি ভাল হয় না? এ যে অপাত্রে দান হচ্ছে! জিজ্ঞাসা করি ব্যাপারটা কি? আসলী জিনিষটা আসে নি কথাটার মানে কি?" পূর্ণভায়া তখন বেশ

গম্ভীর এবং ধীরস্বরে বলিল "পরশু পূজো এখনও যে প্রতিমা এসে পৌছাল না; তার কি করছো ?

আমি হাসিয়া বলিলাম, সে ভার তো আমার উপর নেই। তোমরা আমায় সজীব প্রতিমা আনতে বলেছিলে, আমি তাহাই এনেছি, মৃন্ময়প্রতিমা আনবার ভার ভাই আমার উপর ছিল না, আমিত সে বিষয় কিছুই জানি না।

পূর্ণবাবু খুব গম্ভীরভাবেই বলিল, চল এখন আমরা সেই-টাই আগে ঠিক করিগে ; দেখছত এ বারোয়ারীর ব্যাপার, আমোদ নিয়েই সবাই মেতে উঠেছে। পূজার কথা বোধ হয় অনেকেরই মনে নেই। আহারাদির পর আমরা উদ্যোক্তাগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মায়ের প্রতিমা আনবার কি ব্যবস্থা হয়েছে ? উত্তরে তাহারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। একজন বলিলেন, সে ভার তো শরৎবাবুর উপর আছে, তিনিই বলিতে পারেন। আমরা ষ্টেশনে শরতের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। শরৎকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল,"আমি লোক পাঠিয়েছি,কালকের সকালের মেলে মা এসে উপস্থিত হবেন। ঐ গাড়ীতে কলিকাতা হইতে পুরোহিত মহাশয়েরও আসিবার কথা আছে।" আমরা তখন নিশ্চিন্ত হইলাম।তারপর এ দিককার কতদূর কি হইয়াছে, দেখিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। ষ্টেসন Compoundএর বাহিরে রাস্তার পার্শ্বে খোলা মাঠ পড়িয়াছিল তাহারই উপর রেলওয়ে Contractor প্রকাণ্ড মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াছে। মণ্ডপের মধ্যে প্রায় ৪০০০ লোক বসিবার স্থান হইয়াছে। মণ্ডপের পূর্ব্বদিকের এক অংশ বাঁশের বেড়া দিয়া মায়ের পূজার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী স্থান হইয়াছে। একটির মধ্যে পূজার আয়োজন, নৈবেদ্যাদি করিবার স্থান, অপরদিকে স্ত্রীলোক-দিগের বসিবার স্থান। মণ্ডপটী সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হইতেছিল। বড় বড় বারোয়ারীর আটচালা দেখিয়াছি, কিন্তু প্রবাসে মুষ্টিমেয় বাঙ্গালীর চেষ্টায় মায়ের পূজার স্থান ও মণ্ডপ যে এমন সুন্দর হইতে পারে তাহা সত্যই ধারণাতীত ! সেখান হইতে বাহির হইয়া যেখানে আহারাদির ভেন বসিবে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহা শরতবাবুর বাসার একটী পার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেখানে বড় বড় ডেকে জল সংগ্রহ করা হইতেছে, উনান প্রস্তুত করা হইতেছে, চারিদিক সুন্দররূপে ঘেরা হইয়া গিয়াছে, ভিতরে যাইবার কেবলমাত্র একটি দ্বার রাখা হইয়াছে। তিন চারজন বাঙ্গালী ও দেশীয় কয়েকটী লোককে লইয়া মহা উৎসাহভরে এই কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। সেখান হইতে, যেখানে ভাঁড়ার হইবে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে চলিলাম। একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী সে একাই এখানে থাকিত সুতরাং তাহার বাসা বাড়ীটি ভাঁড়ারের কার্য্যের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছে। সে গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইয়াছে। দেখিলাম, নানাবিধ তরিতরকারী ভারে ভারে রক্ষিত হইয়াছে। একটী গৃহের মধ্যে শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন; এক ঘর কমলালেবু বোঝাই করা হইয়াছে। এ অঞ্চলে কমলালেবু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইলেও এই সমস্ত লেবু ভিজিয়ানাগ্রাম, ওয়ালটেয়র প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী হইয়া থাকে। লেবুর পাহাড় দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এত লেবু কি হইবে ? এক পার্শ্বে দেখি মায়ের পূজার বস্ত্রাদি সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে। আলো, বাতি, বাসনপত্র রন্ধনাদির জন্য বড় বড় ডেকচি, কড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে। ঘরের মধ্যে একটি ছোট্ট টেবিল ও একখানি চেয়ার। এক পার্শ্বে একখানি ক্যাম্পখাট তাহার উপর পরিষ্কার একটি শয্যা টেবিলের উপর একখানি খাতা, দোয়াত-কলম, একটি ক্লিপে কতকগুলি Slip। খাতাখানি খুলিয়া দেখিলাম, তাহা Stock bookএর মত। সে সমস্ত জিনিস যেখান হইতে আসিয়াছে, তাহাদের নাম, ঠিকানা ও পরিমাণ লেখা রহিয়াছে। যাহা যাহা আনিতে বাকী আছে, তাহাদের ফর্দ্দ টেবিলের উপর সংরক্ষিত আছে। বেশ একটি শৃঙ্খলার সহিত উল্লিখিত কাজগুলি সম্পাদিত হইয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি যে ঐ নিয়মে অনুষ্ঠিত হইলে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিবে না তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। এই ব্যবস্থাটি দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। হুজুগের মধ্যেও যে এরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা বড় আমি আশা করি নাই। যে সমস্ত জিনিস আনিতে বাকী ছিল ফর্দ্দে দেখিলাম

† ইহাকে আমরা দাদাঠাকুর বলিয়া ডাকিয়া থাকি। ইনি সারা বেঙ্গল নাগপুর রেলের দাদাঠাকুর।

তাহার মধ্যে ২৫ ডজন সোডা ১০ ডজন লেমনেড ২ ডজন টনিক ১ ডজন জিনজারেট এই ত গেল জলের দিক সাহেব সুবা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের জন্যই এই বিপুল বোতলের জলের ব্যবস্থা নাকি তারপর নানাবিধ সিগার, সিগারেট, কেক বিস্কুট, অবশেষে, কালীপূজার প্রধান অঙ্গ বোতল-বাসিনী সুরারঙ্গিনীগণের ফর্দ্দ তাহা দেখিয়া ত আমার মাথা ঘুরিয়া গেল সে বোধহয় ৩।৪ শো টাকা মূল্যের হইবে। বোতলবাসিনীরা তখন কেহই আসিয়া পৌছায় নাই। পূজার দিন সন্ধ্যার পর তাহাদিগের শুভ আগমনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভাবিলাম এই সুরাসুন্দরীগণের আগমনে মায়ের পূজা না পণ্ড হইয়া যায়? একটা তাণ্ডব নৃত্যের ভৈরব হুঙ্কারে ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানা না ক্ষেপিয়া উঠে।

ইহার পর নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ। দূরের নিমন্ত্রিতগণকে ডাকে কার্ড পাঠান হইয়াছে। দূরাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। কটক হইতে ভিজিয়ানাগ্রাম পর্য্যন্ত সকল রেলওয়ে কর্ম্মচারীকেই এই আনন্দ উৎসবে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। চারিদিক হইতে কে কখন কোন ট্রেণে আসিবে তাহার পত্র আসিতেছে। সারা লাইনময় এই উৎসব ব্যাপারটিকে অবলম্বন করিয়া সকলের প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়াছে। কলিকাতার দিক হইতে বহরমপুরের দিকে যে ট্রেণ চলিয়াছে সেই সকল যাত্রী গাড়ী ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইলে রেলওয়ে কর্ম্মচারী-বৃন্দ আগ্রহভরে গাড়ীর ধারে দাঁড়াইয়া সন্ধান লইতেছেন। কালীপূজার উপলক্ষে কোন কিছু বা লোকজন বহরমপুরে চলিয়াছে কিনা। সে গাড়ীতে যদি কোন অপরিচিত লোক কালীপূজা উপলক্ষে আসিয়াছেন একথা শুনিবামাত্র তাঁহার আদর আপ্যায়নের সীমা থাকিতেছে না। অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব সমাদর করা হইতেছে এবং তাঁহার মারফত বলিয়া দেওয়া হইতেছে আপনি অগ্রসর হোন; আমরাও ঠিক সময় আসছি বলবেন। এই কয়দিন বহরমপুরে গাড়ী পৌছিবার পূর্ব্বেই কি আগ্রহ উৎসাহ আর আনন্দপূর্ণ অন্তরে সকলেই প্লাটফর্ম্মে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলেন তাহা বোধহয় ভাষায় ঠিক ব্যক্ত করা অসাধ্য এমিলে অন্যায় বলা হয় না।

এদিকে, প্রবাসে বাঙ্গালীর মেয়েরা একটানা বৈচিত্র্য-বিহীন জীবনের মধ্যে, সহসা এই উৎসবকে উপলক্ষ করিয়া এক অনহুভূত আনন্দে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরম উৎসাহে মাতৃপূজার কার্য্যে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। কোন বাড়ীতে পূজার দীপের জন্য তুলার সলিতা পাকান হইতেছে, কোন বাড়ীতে আতপ তণ্ডুল বাছা হইতেছে, কোন বাড়ীতে হোমের ঘৃত প্রস্তুত হইতেছে, কোথাও পরম যত্নে "শ্রী" প্রস্তুত হইতেছে, কোথাও বরণডালার কুলা সংগ্রহ হয় নাই বলিয়া হৈ চৈ বাধাইয়া দিয়েছে। কোন বর্ষিয়সী প্রবীণা বরণডালার "গঙ্গা মৃত্তিকা "আসিয়া পৌছায় নাই বলিয়া কর্ম্মকর্ত্তাদের অনভিজ্ঞতার জন্য অশেষ প্রকার দোষারোপ করিতেছেন। কেহবা অভিমান করিয়া বলিতেছেন, এ যেমন তেমন পূজা নয় অনুষ্ঠানের ত্রুটী হইলে, শেষে কি একটা কাণ্ড ঘটিয়া উঠিবে! অন্যদিকে কোন সুন্দরী এদেশের লোককে 'বরণডালার' সকল জিনিষের নাম বার বার বলিয়া বুঝাইতে না পারিয়া শেষে হতাশ হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। একটা মহাচাঞ্চল্য ঝড়ের মত আসিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর কয়েকটি অন্তঃপুরকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ভক্তিপরায়ণা স্নেহে কোমলান্তরা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিনী অন্তঃপুরবাসিনী বাঙ্গালীর মেয়েগুলি আনন্দে ও আশঙ্কায় কেমন করিয়া সুচারুরূপে মায়ের পূজা সমাধা হইবে; তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। এদেশের লোকে কখনও বাঙ্গালীর "কালীপূজা" দেখে নাই। বাঙ্গালীর পূজাপদ্ধতি খাওয়া-দাওয়ায় ও নাচ গানের ব্যবস্থা ইহাদের নিকট একটা অভিনব দর্শনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দলে দলে, মেয়ে পুরুষ আসিয়া সংবাদ লইয়া যাইতেছে; কখন কেমন করিয়া ঠাকুর পূজা হইবে? খাওয়া-দাওয়ার কিরূপ ব্যবস্থা হইবে? নাচগান কাহারা করিবে? ইত্যাদি—

পূজার একদিন থাকিতে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরগুলি যেন একটি অন্তঃপুরে পরিণত হইয়া গেল। তেমন মিলন, তেমন সৌহৃদ্য ও তেমন একাত্মবোধ বাঙ্গালীর মেয়েদের মধ্যে আর কখনও দেখিয়াছ কি না সন্দেহ— আমার তো স্মরণ হয় না। প্রবাসের পাতান সম্পর্ক সত্যিকার

সম্পর্ক অতিক্রম করিয়া এমন নিবিড় ও ঘনীভূত হইতে পারে' তাহা যাহারা কোনদিন এ অভাবনীয় মধুর সম্মিলন দেখিবার সুযোগ লাভ করে নাই, তাহারা এ কথা হয়ত বিশ্বাস করিতে পারিবে না। বিশ্বাস করিতে না পারাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইতি-মধ্যেই শরৎবাবু অনেক সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছেন, যে তাঁহারা কালীপূজা উপলক্ষে বহরমপুর আসিতেছেন এবং তাঁহাদের থাকিবার যেন ব্যবস্থা করা হয়। পত্র পাইয়াই শরৎবাবু নানা-স্থান হইতে পত্র লিখিয়া অনেক তাঁবু সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছেন। পূজামণ্ডপের চতুর্দ্দিকে তাঁবু ফেলা হইতেছে। কোন কাজই মুখ হইতে বাহির হইবার তর সইছে না, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা নিষ্পন্ন হইয়া সকল কাজ যেন মন্ত্রে সাধিত হইয়া যাইতেছে। আর দিন নাই, মধ্যে একটি দিন মাত্র বাকি, একদিকে মেয়েরা যেমন অন্তঃপুরে পূজার কাজ লইয়া ব্যস্ত, এক প্রাণ একমন, একচেষ্টা, অন্যদিকে বহরমপুরের সমস্ত বাঙ্গালী যেন কা'র মন্ত্রবলে অপূর্ব্ব প্রীতিমিলনে একপ্রাণ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর পূজাকে বাঙ্গালার বাহিরে ভিন্ন-জাতির মধ্যে কেমন করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে সুসম্পন্ন করিবে, তাহার জন্য সমস্তশক্তির নিয়োগ করিতে তাহা-দিগের মধ্যে বিন্দুমাত্র ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই। অফিসের কাজকর্ম্মে কাহারও মন নাই, কেহ কেহ, একা তিন জনের কাজ করিতেছে, অপরকে পূজার কাজে ছাড়িয়া দিয়াছে; নাম মাত্র অফিস যাওয়া আসা হইতেছে। আহারে বিহারে, অফিসে বাহিরে, কথায় বার্ত্তায়, গল্পে গুজবে সেই একই কথা! কেমন করিয়া কালীপূজা সুসম্পন্ন করিবে। সকলেই উৎসুক দৃষ্টিতে বাঙ্গালীর এই অনুষ্ঠান প্রতি আগ্রহভরে চাহিয়া আছেন। ইংরাজ কর্ম্মচারী ও স্থানীয় অধিবাসিগণের উৎসবহীন দিনগুলির মধ্যে এই উৎসাহের আয়োজন সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতার সহিত গৃহীত হইয়াছিল পূজার পূর্ব্বদিন মাদ্রাজ মেলে কটকের দ্বিতীয় মালবাবু প্রতিমা লইয়া বহরমপুর আসিয়া পৌছিলেন। সেই গাড়ীতে কলিকাতা হইতে পুরোহিত মহাশয়, পূজার চাঁদমালা, ঘট ও অন্যান্য দ্রব্য লইয়া আগমন করিলেন। ব্রেক হইতে প্রতিমা নামান হইলে প্লাটফরমের উপর অত্যন্ত ভীড় হইয়া গেল। ঠাকুর দেখিতে দলে দলে জনসমাগম হইতে লাগিল। যাত্রীরা গাড়ীর অভ্যন্তর হইতে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে প্রতিমা দেখিতেছিল।

লোক মুখে অচিরে ক্ষুদ্র বহরমপুর সহরমধ্যে ঠাকুর আসিয়াছে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল।

প্রতিমা লইয়া গিয়া দেবী মণ্ডপে রক্ষা করা হইল। মেয়েরা আসিয়া আলপনা দিয়া পঞ্চশস্য ছড়াইয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া বরণ করিয়া লইলেন। মা আসিয়াছেন এই আনন্দ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ছোট ছোট ছেলেরা পূজার আনন্দে উল্লাসে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। বর্ষিয়সীরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত প্রতিমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। রেলগাড়ীতে আসিতে কোন প্রকার অঙ্গহানি ঘটিয়াছে কিনা! অচিরে প্রকাশ পাইল সর্ব্ববিঘ্ননাশিনী মহামায়া অক্ষত শরীরে প্রবাসে বাঙ্গালী সন্তানের আহ্বানে শুভাগমন করিয়াছেন। এই সময় হইতেই দেবী মণ্ডপে মায়ের "রক্ষণাবেক্ষণের" জন্য কেহ না কেহ উপস্থিত রহিল। পুরোহিত মহাশয় নূতন স্থানে আসিয়া খুব আনন্দ অনুভব করিলেন। এবং পূজার প্রয়োজনীয় আয়োজনের জন্য মেয়েদের মধ্যে ফর্দ্দ পাঠাইয়া দিলেন। পূজার ফলমূলাদি এবং এদেশে দুষ্প্রাপ্য খুঁটিনাটী সমস্ত জিনিসগুলি তিনিই সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিলেন।

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন তাঁহাকে যিনি গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া গিয়াছেন তিনি একখানি পত্র দিয়াছেন এবং মুখে বলিয়া দিয়াছেন আগামী কল্য তিনি একজন ভাল ম্যাজিশিয়ান ও ভীমনাগের সন্দেশ ও অন্যান্য দ্রব্য লইয়া ঠিক সময়ে উপস্থিত হইবেন। পুরোহিত মহাশয় এদেশের লোকের কথা শুনিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক কথাটি একজন দো-ভাষীর সাহায্যে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল।

ইতিমধ্যে মণ্ডপের চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া অনেকগুলি দোকানপাট বসিয়াছিল। আজ হইতে অনেক নূতন দোকানও আসিতে সুরু করিল। টঙ্গা ও পুস্পুসওয়ালা-দিগের নানা স্থান হইতে যাত্রী সমাগম হওয়ায় বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন হইতে লাগিল। এ দিন বড় একটা কেহ

অফিস যাইতে পারিল না মাঝে মাঝে রেলের কাজ যেটুকু না করিলে নয় সেইটুকুই যাইযা করিয়া আসিতে লাগিল। ইহাতে উৰ্দ্ধতম ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ কোনরূপ আপত্তি করিলেন না এবং তাঁহাদের দ্বারা কি সাহায্য হইতে পারে তাহা করিতে তাহারা সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন একথা জানাইয়া দিলেন।

পূর্ণবাবু (দাদাঠাকুর মহাশয়) রন্ধনশালার ভার গ্রহণ করিলেন। দাদঠাকুর দ্রৌপদী না হইলেও ভীমসেনের ন্যায় সুন্দর সুপকার ছিলেন। তিনি আরও তিন চারজন উৎসাহী যুবককে সঙ্গে লইলেন। দাদাঠাকুরের উৎসাহ, উদ্যোগ, আনন্দ ও অফুরন্ত সঙ্গীত ধারা—সদা হাস্যানন ও নিরঙ্কুশ কৌতুক রহস্য সকলের মধ্যে একটা নূতন জীবন আনিয়া দিতেছিল। দাদাঠাকুরের সেই হাত দুলাইয়া দুলাইয়া আস্ফালন করিয়া বলা যে যত লোক আসুক না কেন আমি দ্রৌপদীর ন্যায় দুর্ব্বাসার পারণ করাইব। সমস্ত ভাঁড়ারের ভার এবং তত্ত্বাবধান আমার স্কন্ধেই পড়িল। নর্ত্তকী হাজির করিয়া, মনে ভাবিয়াছিলাম নিষ্কৃতি পাইব—কিন্তু তাহা হইল না। সমবেত ভোটে ভাঁড়ারীর পদটী আমাকেই কায়েম করিয়া ধরিল।

সকল কাজের এক একটা বিভাগ করা হইল—যে, যে কাজ করিবে তাহার দায়ীত্ব তাহার স্কন্ধে দিয়া খাতায় তাহার নাম লিখিয়া লওয়া হইল। খাতা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে কে কোন কাজে কোথায় আছে—সমস্ত দায়ীত্বপূর্ণ কাজগুলি বাঙ্গালীদেরই লইতে হইল। কারণ তাহারাই এই কার্য্যের অনুষ্ঠাতা। পূজার পূর্ব্বদিন হইতে রোসনচৌকী বাজিতে সুরু করিল। পূজার পূর্ব্বদিন রাত্রে শয্যার সহিত কাহারও আর দেখা সাক্ষাত ঘটিল না. উদ্যোগ আয়োজনের মধ্যেই ভোরের বাতাস ঊষার আলো লইয়া দেখা দিল। বিনিদ্র রজনীর ঘুম-ভারাক্রান্ত অলস নয়নের সম্মুখে পূর্ব্ব গগনে তরুণ অরুণের কনক আভায় বিশ্বে মধুর আনন্দ-বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল। সঙ্গে সঙ্গে বিহঙ্গকুলের প্রভাতী সঙ্গীত তরুকুঞ্জে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

প্রাতঃকালেই পুরোহিত মহাশয় আমাদের নিকট আসিয়া তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন—গাড়ীতে ত আমার মোটেই ঘুম হয় না—যদি বা কখনও একটু তন্দ্রা আসে গাড়ীর এক একটা ঝাঁকুনীতে কেবলই মনে হইয়াছে এই বুঝি ছিটকাইয়া পড়িয়া গেলাম। আজ ত পূজা উপলক্ষে সারারাত্রি জাগিতে হইবে সেজন্য মনে ভাবিয়াছিলাম গত রাত্রিতে পরিতোষের সহিত ঘুমাইয়া লইব, কিন্তু বিধাতা কি ভাগ্যে সে সুখ লিখেছেন। বল্লে তোমরা হয়ত প্রত্যয় করবে না গত রজনীতে ভূলেও কি একবার চোখে পাতায় কর্ত্তে পেরেছি। কেবলই মনে হয়েছে দূর থেকে হুড়মুড় করে করে প্রকাণ্ড একটা জলস্রোত ভীষণরবে আমার ঘাড়ের উপর পড়বার জন্যে ছুটে আসছে। প্রথমটা মনে হল এতদূর পর্য্যন্ত রেলে চেপে আসা অভ্যাস নেই মাথার মধ্যে এই রকম একটা চিন্তা নিশ্চয়ই ঘোরপাক খাচ্ছে—ভাবলাম ঘুম চেপে এলেই চিন্তাটা ছেড়ে যাবে। ঘুমে চোখ ভেঙ্গে পড়তে লাগল কিন্তু সে ভীষণ গর্জ্জন মুহূর্ত্তের জন্য নিস্তব্ধ হল না। শেষে উত্যক্ত হয়ে ব্যাপারটি কিছু বুঝতে না পেরে প্রভাতের জন্যেই অপেক্ষা করেই রইলুম। আমরা এতক্ষণ মুখ টিপিয়া নীরবে পুরোহিত মহাশয়ের কথা শুনিতেছিলাম অবশেষে সকলে হাসিয়া উঠিলাম এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম উহা কিছুই নয় সমুদ্র গর্জ্জন মাত্র। সমুদ্র গর্জ্জন শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন সমুদ্র কি নিকটেই? আমরা বলিলাম মাইল আষ্টেকের মধ্যেই। হাস্য রস ও আনন্দের মধ্যেই প্রভাতে মায়ের পূজার কার্য্য সুরু হইল। মাদ্রাজ মেলে কলিকাতা হইতে অনেকগুলি বন্ধু ও ম্যাজিসিয়ান আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের সঙ্গে ভীম-নাগের সন্দেশ ও দর্শন দিলেন। এ অঞ্চলে সন্দেশ একটা অপূর্ব্ব জিনিস। এই ট্রেণেই কটক, ভুবনেশ্বর, খুরদারোড, পুরী গাঞ্জাম হইতে অনেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যাহারা এগাড়ীতে আসিয়া পৌছিলেন না তাঁহারা পূজার পূর্ব্বে রাত্রির গাড়ীতে আসিবেন বলিয়া সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

সারাদিন নানা কার্য্যের মধ্যে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় মণ্ডপের চতুর্দ্দিকস্থ বাড়ীগুলি দীপমালায় আলোকিত হইয়া উঠিল। মায়ের সম্মুখে মণ্ডপের মধ্যে আলো জ্বালা হইল এবং আসর সজ্জিত করা হইল। রাত্রি আটটা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নৃত্যের ব্যবস্থা হইল। কারণ ১২টার সময়

পল্লী-সন্ধ্যা   নিরুপমা বর্ষস্মৃতি হইতে
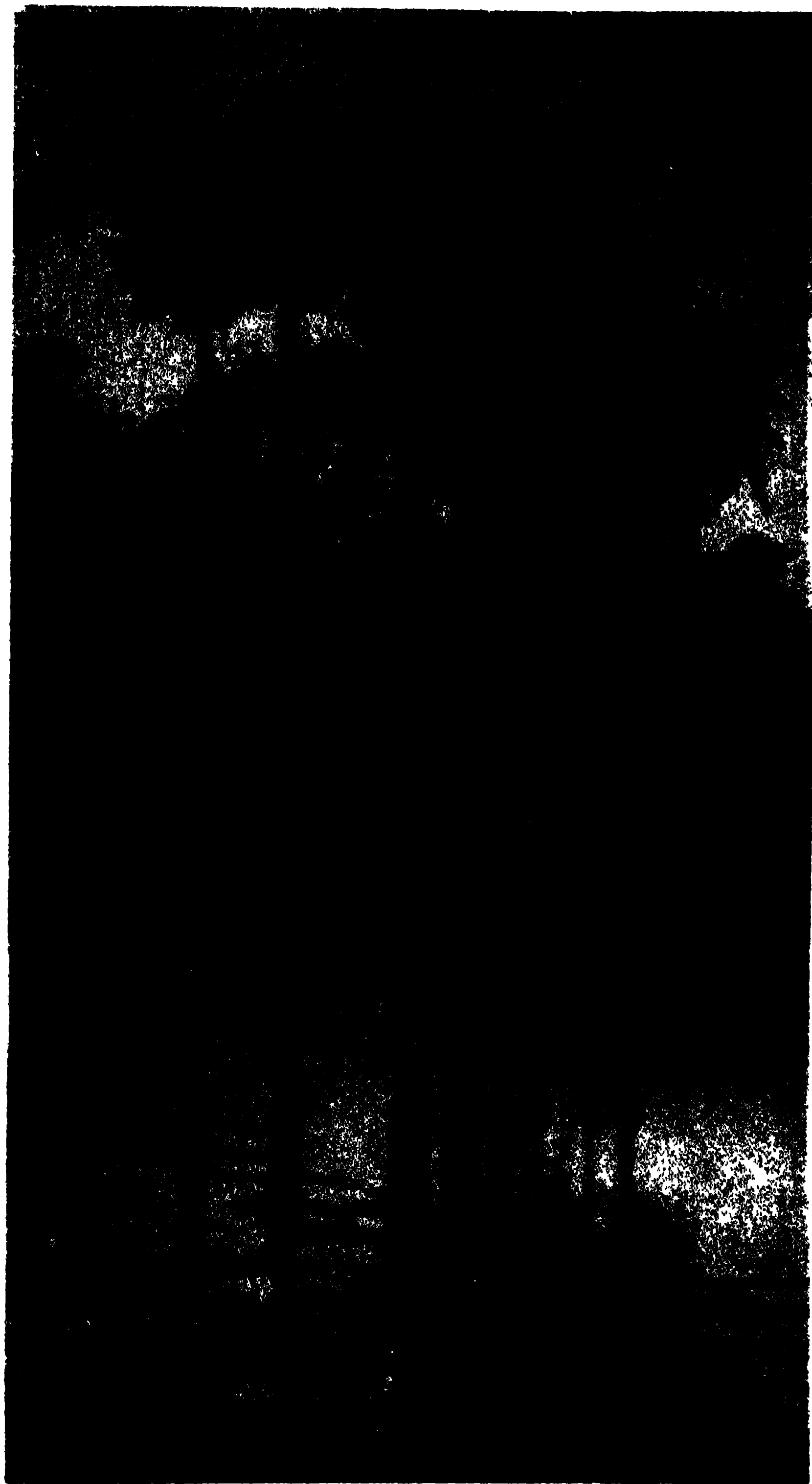
মায়ের পূজা আরম্ভ হইবে। ইতিমধ্যে সাহেব মেম, রাজা-মহারাজা জমীদার প্রভৃতি নৃত্য দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া যাইতে পারিবেন কারণ পূজার সময় বা পূজা শেষ হইবার পর আমোদ-প্রমোদের সে রাত্রে মোটেই অবসর পাওয়া যাইবে না। এই উদ্দেশ্যেই নৃত্যগীতের ব্যবস্থা সেদিনকার মত পূজার পূর্ব্বেই করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই লোক সমাগম হইয়াছিল। স্থানীয় জমীদার ও রাজাগণের বসিবার জন্য একপার্শ্বে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। অপর পার্শ্বে ইংরাজদিগের জন্য বসিবার আসন করা হইয়াছিল—সমস্ত প্রাঙ্গনটী সর্ব্বসাধারণের জন্য রাখা হইয়াছিল। মায়ের মণ্ডপের দুই পার্শ্বে মহিলাদিগের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক রাখা হইয়াছিল। মাদ্রাজ লাইনে মাত্র ৪ খানি ট্রেণ যাতায়াত করিয়া থাকে। দুইখানি দিনে ও দুইখানি রাত্রে, অবশ্য বর্ত্তমানের কথা বলিতেছি না—এখন গাড়ীর সময় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে—তখন বহরমপুরে মাদ্রাজ মেলে প্রভাতে Break fast হইত এবং রাত্রে Dinner হইত। নিমন্ত্রিত সাহেবদিগের জন্য কেলনার কোম্পানীর সহিত আহারাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল রাত্রি ৮টার সময় নাচ আরম্ভ হইল। লোকে লোকারণ্য যদিও কটক হইতে বাঙ্গালী নর্ত্তকী আসিয়াছিল তথাপি সে দিনে সাহেব দগের অনুরোধে ভিজিয়ানাগ্রাম আগত নর্ত্তকীর নাচের ব্যবস্থাই হইয়াছিল। প্রধানা নর্ত্তকীর নাচই প্রথমে সুরু হইল। সে নৃত্য অপূর্ব্ব। নৃত্যের তরঙ্গে গানের সুরে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উল্লাস সকলের মধ্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ঘন ঘন করতালি উৎসাহ বাক্য হর্ষোচ্ছ্বাসে নর্ত্তকীকে অভিভূত করা হইতে লাগিল। প্রথম নৃত্য শেষ হইবার পর সুন্দরী নর্ত্তকীর মধ্যে একটা অননুভূত-প্রেমোচ্ছ্বাস বিরহাবৃত নারীর প্রায় সঙ্গীতে ও নৃত্যে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। এবার মানভঞ্জন নৃত্য আরম্ভ হইল। এরূপ নৃত্য বা সঙ্গীত আমরা কোনদিন শুনি নাই বা দেখি নাই। শ্রীকৃষ্ণ হইয়া যখন মানময়ী রাধার হস্ত হইতে চরণ পর্য্যন্ত করুণা ভিক্ষা করিয়া সমস্ত দেহটা নৃত্যের সৌন্দর্য্যে অবনমিত করিয়া শিখিপাখা চরণে স্পর্শ করিল—তখন মনে হইতেছিল যে এই নর্ত্তকী যেন স্বর্গ হইতে আসিয়াছে। সঙ্গীতের করুণ নিবেদনের সহিত বিরহ ব্যথিত মানময়ী শ্রীরাধার চরণে আত্মনিবেদন করিতেছিল, তখন মনে হইতেছিল ইহার শরীরের অস্থিগুলি বুঝি রবারের নির্ম্মিত বা অস্থি নাই। সঙ্গীতের ভাবের সহিত যখন শরীরের যে অঙ্গ নৃত্য সঙ্গীত করিতে বাসনা করিতেছিল অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় তখন দেহের সেই অংশটুকু ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ নীরব, নিশ্চল, নিস্পন্দ। যাঁহারা "সারপেনটাইন" নৃত্য দেখিয়া ধন্য ধন্য করিয়াছেন, তাঁহারা এ নৃত্য দেখিলে উহা যে ইহার নিকট কত সহজ ও সাধারণ মনে করিবেন তাহা মুখে বলিয়া বোঝান সুকঠিন। মনে হয় ইহারা যদি কোন দিন কলিকাতায় আসিয়া নৃত্য প্রদর্শন করেন তাহা হইলে বিপুল অর্থোপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতে পারেন।

রাত্রি ১১টার সময় পূজা বসিল। বাঙ্গালীর মেয়েরা সারাদিন উপবাস করিয়া মায়ের পূজার নৈবেদ্য ও ভোগাদি প্রস্তুত করিয়াছিল। শেষ যাত্রী গাড়ীখানি যখন বহরমপুর ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল আরোহীগণ এই নীরব নিস্তব্ধ এত প্রান্তরমধ্যস্থিত ঘোর অমাবস্যা অন্ধকারের মধ্যে সহসা এই আলোক উৎসবের আয়োজন দেখিয়া অনেকেই গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছিলেন—এবং তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধানে পূজার ব্যাপার জানিয়া দুইদশজন পরদিন প্রভাতের ট্রেনে যাইবেন স্থির করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সহর ষ্টেসন হইতে প্রায় দুইমাইল দূর। ষ্টেসনের গাড়ী চলিয়া যাইলে প্রতিদিনই এই স্থানটী গভীর নির্জ্জনতার মধ্যে ডুবিয়া যায়। শুধু মাঝে মাঝে রেলওয়ে ইয়ার্ডের মধ্যে গাড়ীর Shunting এর শব্দ শোনা যায়। আজ এই অমাবস্যার বিপুল অন্ধকারের মধ্যে মহামায়ার পূজা উপলক্ষে পর্ব্বত প্রান্তর আকাশ, বাতাস, প্রকম্পিত করিয়া যখন বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল যখন দীপালোকে অন্ধকারের অস্তিত্ব লোপ করিল, যখন জন কোলাহলের উৎসাহিত আনন্দ ধ্বনিতে নীরবতা, নিস্তব্ধতা ডুবিয়া গেল, তখন মনে হইতেছিল শস্য শ্যামলা বঙ্গজননীর পল্লী অঞ্চলের করুণ আচ্ছাদনের মধ্যে এমন দিনে মায়ের কত পূজা হইতেছে, কিন্তু সেখানে ত মায়ের

সন্তানগণ মায়ের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য এমন করিয়া ত কোনদিন সমবেত হয় না। পুরোহিত, কর্ম্মকর্ত্তা, ও গৃহস্থ ভিন্ন পূজার সময় বড় আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু আজ প্রবাসে বঙ্গের বাহিরে মায়ের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য, বাঙ্গালীর মাতৃপূজা দেখিবার জন্য মায়ের সন্তানসন্ততি জাতিনির্ব্বিশেষে কি পরমানন্দে যোগদান করিয়াছে। বাঙ্গালায় যে ম্যালেরিয়া বাঙ্গালার অধিবাসীকে অস্থিচর্ম্মসার করিয়া মৃত্যুর দিকে ক্রমান্বয়ে টানিয়া লইয়া যাইতেছে সেখানে কি তাহারা এমন করিয়া মায়ের পূজায় যোগদান করিতে পারে। মহা সমারোহের সহিত মায়ের পূজা শেষ হইয়া গেল। পর্ব্বতে, প্রান্তরে, সমুদ্রগর্ভে পুরোহিতের মন্ত্রধ্বনি যেন আজও ধ্বনিত হইয়া রহিয়াছে। পূজা অন্তে সকলেই প্রসাদ পাইল। আহারাদি শেষ করিতে প্রভাত হইয়া গেল। দাদাঠাকুরের রন্ধনাদি কার্য্যের ও বাঙ্গালীর খাদ্যের রাশি রাশি প্রশংসা লোক মুখে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পরদিন বেলা দুইটা হইতে আনন্দ উৎসব চলিল। নৃত্যের পর নৃত্য, সঙ্গীতের পর সঙ্গীত; তারপর কলিকাতা হইতে সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর প্রীতিভোজন এবং রাত্রে ম্যাজিক। দুইদিন উৎসবের পর প্রবাসের কালীপূজা শেষ হইয়া গেল। এই পূজা উপলক্ষে অনেকগুলি প্রবাসী বাঙ্গালীর সহিত স্নেহ বান্ধবতা লাভ হইয়াছিল মায়ের আশীর্ব্বাদে তাহা আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই কালীপূজার স্মৃতি প্রতি বৎসর শ্যামাপূজার দিন আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া যেন প্রবাসে টানিয়া লইয়া যাইতে চায়। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর মাতৃপূজার কথা শুনিলে আমি আজও ছুটিয়া যাইতে পারিলে ঘরে থাকিতে চাহি না।

অভিশাপ।

শ্রীচৈতন্যকিঙ্কর ঘোষ।
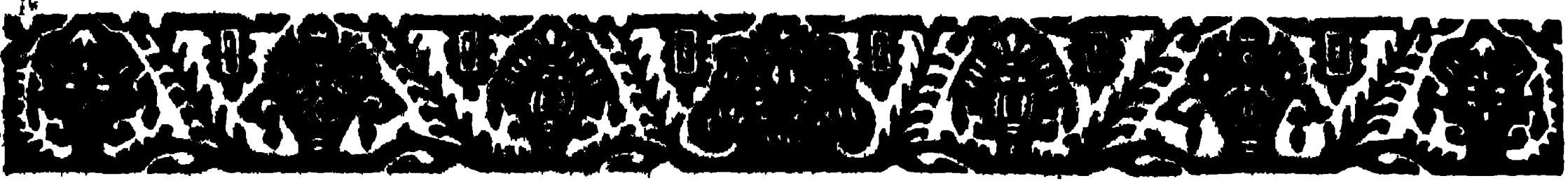
দুর্গাদেবী বুঝিতে পারিতেছিলেন না, কেমন করিয়া তাহার সেই বৌ এমন হইল। বহুদিন আগেকার কথা তাহার মনে পড়িল। ছেলের বিবাহ দিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার মত ভাগ্যবতী কে? সুহাস ও হইয়াছিল ঠিক তাঁহার মেয়ের মত। মেয়ের মতই সে তাহার কাছে আব্দার করিত, মেয়ের মতই অপরাধ করিয়া ক্ষমা চাহিত আবার স্বভাববশে সেই কাজ করিয়া ফেলিয়া তিরস্কৃত হইত।

একদিন সন্ধ্যার কথা মনে পড়িল, যেদিন সুহাস ধরিয়া বসিল, তাঁহাকে গল্প বলিতে হইবে। তিনি একটা ভূতের গল্প বলিয়াছিলেন। তিনি গল্প যত বলিতে থাকেন, ততই সুহাস "তারপর তারপর" বলিয়া ভয়ে তাঁহার কাছে সরিয়া বসে। হায়রে! সে সব কথা মনে করিলে আজ এত দুঃখেও হাসি আসে। ১৫ বৎসরে সুহাস অন্তঃসত্ত্বা হইয়া বাপের বাড়ী গেল। তাঁহার পুত্রও পড়াশুনা শেষ করিয়া কাজে ঢুকিল। সে আজ দেড়বৎসর আগেকার ঘটনা। তাহার পর হইতেই ক্রমে ক্রমে সুহাসের স্বভাব বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ছেলে? আপন পেটের সন্তান সেই নরেশ সেই বা এমন ভেড়া বনিয়া গেল কেমন করিয়া! নরেশেরও সেই ছেলে মানুষি প্রতিজ্ঞা মনে পড়িল। বিবাহের কথা উঠিলে সে বলিত "মা, আমি বিয়ে করবো না"। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল, "পরের মেয়ে পরের মাকে নিজের মায়ের মত কি দেখিতে পারে?" সে সব কথা মনে করিলে বোধহয় তিনি ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছেন, এখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

আজকার ঘটনা বিশেষ করিয়া তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছে। নরেশ খাইতে বসিয়াছিল, তিনি কাছে বসিয়াছিলেন। খাইতে খাইতে নরেশ একটা 'বিষম' খাইল। সুহাস কোথা থেকে আসিয়া "ষাট ষাট্" বলিয়া নরেশের মাথায় হাত বুলাইয়া তিন ফুঁ দিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গেল, "কি যে খাবার সময় ডাইনীর মত কাছে বসে থাকে তার ঠিক নেই।" হায়রে! গর্ভধারিণী জননী যিনি, ডাইনী তিনি!

কোন জিনিষে যদি ঠুক্ করিয়া একটা ঘা দেওয়া যায়, সেটা ভাঙ্গে না, কিন্তু যদি অবিরত তাহাতে ঠুক্ ঠুক্ করিয়া ঘা দেওয়া যায়, সেটা ভাঙ্গিয়া যায়। পুত্রবধূর বহুদিনের অযথা ঘৃণা ও রূঢ় ব্যবহার তিনি সহিয়া আসিয়াছেন। আজ আর পারিলেন না; বাঁধ ভাঙ্গিল। পঞ্চাশ বছরের বুড়ীর চক্ষু বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া ঝরিয়া ধরিত্রীর বক্ষ সিক্ত করিল। কেহ দেখিল না, কেহ জানিল না। মাতা ধরিত্রী জানিলেন কি? কে জানে?

(২)

এমন একটা কাণ্ড হইল যাহা লিখিয়া রাখা যায় না। পুত্র আসিয়া স্পষ্ট করিয়া তাহার মাকে বলিল, এমন করিলে সে পারিয়া উঠিবে না। সেইদিনই কর্ত্তব্যজ্ঞানী পুত্র রান্না বাড়ীতে চালা ঘরে মায়ের বাস করিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বলিল, "মা, তোমাকে আমি খরচের জন্ত মাসে মাসে দশ টাকা করে ফেলে দোব, তুমি মোট্ কথা আমাদের শোবার বাড়ীতে এস না। এ ব্যবস্থা তোমার পছন্দ হয় ভাল, না হ'লে আমি নাচার।"

স্নেহাতুরা মা তিনি। তিনি কি পুত্রের ব্যবস্থায় অমত করিতে পারেন? দুর্গাদেবী বলিলেন, "আচ্ছা বাবা, তোরা যদি সুখে থাকিস্—।"

সুহাস গর্জ্জিয়া উঠিল, "আমাদের সুখ? আমাদের সুখ দেখেই তোমার বুক ধড়্‌ফড়্ করে, চোখ টাটায়। আমাদের সুখের কথা ফের যদি তুমি মুখে আন, তা'হ'লে তোমার একদিন কি আমার একদিন দেখে নোব।"

যে মা পুত্রকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, সেই মা আজ হইতে পুত্রের ভিক্ষায় জীবন ধারণ করিবেন।

যে মা পুত্রের মুখ দেখিয়া গর্ভ যন্ত্রনা ভুলিয়াছেন, যে মা পুত্রের সুখে সুখ দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, সেই মায়ের আজ পুত্রের মুখ দেখিয়া বুক ধড়্‌ফড়্‌ করিবে! কথাটা পুত্রবধূ শুনাইয়া দিল ও শুনিল সবাই। বাতাস শুনিল কিন্তু ঝড়্‌ তুলিল না। আকাশ শুনিল কিন্তু ভাঙ্গিয়া পড়িল না। সমস্ত বাড়ীখানা শুনিল কিন্তু বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কেবল মাত্র একটা কাক গাছের ডালে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া কি ভাবিতেছিল, "ক, ক" করিয়া উড়িয়া গেল।

(৩)

বেশ নির্ব্বিবাদে দিন কয়েক কাটিল। সুহাস দুর্গা-দেবীকে খোঁচা দিতে ছাড়েনা তবে তিনি চুপ করিয়া থাকেন।

যেদিন সুহাস একখানি ছোট ছেঁড়া কাপড় পরিয়া অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় শাঁখারীর কাছে শাঁখা পরিতে বসিল, সেদিন তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি অনেকটা সেকালের ধরণের; তাঁহার চোখে এ দৃশ্য বড়ই বিসদৃশ ঠেকিল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা বৌমা, পুরুষের সামনে একটু লজ্জা সরম করতে হয়, কেমন মেয়ে গা তুমি?

বৌমা ত কথা শুনিয়া তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিল। চোখ পাকাইয়া বলিল, "কি তোমার এত স্পর্দ্ধা আমার বাপ তুলে কথা কও।"

দুর্গাদেবী অবাক্ হইয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "অবাক করে বৌমা, তোমার বাপ তুলে কথা কইলাম আমি!"

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া সুহাস বলিল, "আহা ন্যাকা! চুপ কর্ বল্‌ছি মাগী। নইলে তোর ভোঁতা মুখ থেঁতো করে দোব। আজ আসুন ত উনি তারপর দেখ্‌ছি।

উঃ এত অহঙ্কার! দুর্গাদেবীর ও মাথার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। "এত তেজ তোর বৌ? আমি যদি সত্যি নরেশের মা হই আর নরেশ যদি সত্যি তাঁর ঔরসে জন্মে থাকে, তাহ'লে আমি বলছি দেখিস্ বৌ, তোর এ তেজ থাকবে না।" [illegible] তলায় টিপ্ টিপ্ করিয়া তিনবার মাথা ঠুকিয়া বলিলেন, "দেখো ঠাকুর, আমার কথা যেন রেখো, তিন রাত্রির মধ্যে যেন রাক্ষসীর দর্প চূর্ণ করো।"

দেবতা বোধকরি শুনিয়া অলক্ষ্যে হাসিলেন।

(৪)

ইহার পর দুইদিন বেশ কাটিল। দুর্গাদেবীর মনটা বেশ ভাল নেই। আজ তৃতীয় দিন। বৌয়ের দর্প চূর্ণ হইবার চিহ্নও দেখা যায় না।

তিনি শুনিয়াছেন, নরেশের একটু অসুখ করিয়াছে। ডাক্তার বার দুই আনাগোনা করিয়াছে তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। সকালে সুহাসের সাথে একবার দেখা হইয়াছিল, মনে হইয়াছিল যেন সুহাস তাঁহাকে কি বলিবে অথচ বলিতে পারিতেছেনা। তিনি ও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই।

পাড়ারই একজন সন্ধ্যার সময় দেখা করিতে আসিয়া-ছিল। তাহার সঙ্গে তিনি গল্প করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি প্রায় দশটা হইল। যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি চলিয়া যাইবার জন্য উঠিলেন, দুর্গাদেবী প্রদীপ হস্তে তাঁহাকে খানিকটা পথ দেখাইয়া লইয়া গেলেন। ফিরিবার সময় হাওয়ায় প্রদীপটা নিবিয়া গেল।

তিনি যখন ঘরের কাছে আসিলেন, মনে হইল যেন ঘরে কি ঢুকিয়াছে। মনে করিলেন, কুকুর বা বিড়াল হইবে। "হেই হেই—ছেই, ছেই" করিতে করিতে ঘরে ঢুকিয়া আবছায়ায় দেখিলেন তাঁহার তক্তার কাছে কে যেন কি খুঁজিতেছে। তিনি বলিলেন, "কে গা?"

"আমি মা।" একি! এযে তাঁহার বৌমার গলা! তাঁহার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। বলিলেন, "কে? বৌমা?"

"হাঁ মা" বলিয়া সুহাস আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দুর্গাদেবী বলিয়া উঠিলেন, "কি মা? কি হয়েছে?"

"তোমার ছেলের যে বড় অসুখ মা; ডাক্তারে জবাব দিয়ে গেছে।"

দুর্গাদেবীর মনে হইল তাঁহার পায়ের তলা হইতে পৃথিবীখানা যেন সরিয়া যাইতেছে! নরেশ যে তাঁহার

সাত রাজার ধন এক মাণিক, বৃদ্ধ বয়েসের যষ্টি। তাঁহার নয়নের মণি, স্নেহের নরেশ—তাহারই অসুখ। ওরে বাপরে! তিনি উন্মত্ত হইয়া আলু থালু বেশে ছুটিলেন।

"নরু বাবা—বাবা আমার।"

"মা—মা।"

দুর্গাদেবী ছুটিয়া গিয়া মাথায় হাত দিয়া ডাকিলেন, "বাবা, এই যে আমি।"

কিন্তু হায়! যাহাকে ডাকিলেন সে তখন কোথায়!

সুহাস আছাড় খাইয়া পড়িল। দুর্গাদেবী মাথার চুল ছিঁড়িয়া বুক চাপড়াইয়া ডুক্‌রাইয়া ডুক্‌রাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সুহাসের দর্পচূর্ণ হইল কি? ঠিক জানিনা। তবে শুনিয়াছি, তৃতীয়ের অবর্ত্তমানে উভয়ের মিলন হইল ও উভয়ের ভুজচ্ছায়ায় নরেশের শিশু পুত্রটী বাড়িতে লাগিল।

দুই তার

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত

(১)

পিয়ন এসে হাঁকলে—"বাবু চিঠি—"
এস্তে তুলি চশমাঢাকা দিঠি
'দৈনিকটা' রাখ্‌নু টেবিল পরে
আমারই আজ নাম লেখা দুইখানি
খাম দিলে, রং গোলাপী আসমানি
লাল চিঠিটাই খুলনু দ্রুতকরে।
প্রবাসী এক বন্ধু সুতের বিয়ে
উৎসবে যোগ দিতেই হবে গিয়ে,
বন্ধুবরের বিশেষ অনুরোধ
মান্‌বেনা সে ওজর আফিস্ ছুটী,
না গেলে মাফ্ ক'রবেনা এ ত্রুটী
সাফ্ লিখেছে নেবেই প্রতিশোধ।

(২)

তৃপ্ত হলেম সখার খবর জানি
ফুল্লমনে নীল লেফাফাখানি
খুলেই দেখি মর্ম্মঘাতী কথা।
দূর বিদেশের আর এক সখা মম,
বাল্যকালের বন্ধু প্রিয়তম
জানিয়েছে তার দারুণ কাতরতা।
সর্পাঘাতে হঠাৎ গেছে মারা
একটিমাত্র পুত্র নয়ন-তারা
রোজ্‌গারী সে, সুস্থ সবল দেহ।
এই সেদিনে দিয়েছে তার বিয়ে
নববধূরে যায়নি প্রবাস নিয়ে
বৌ' দেখেনি সেথায় আজও কেহ।

* * * * *

স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে অসীম পানে
নিঃশেষিত বিহ্বল উদাস প্রাণে,
উৎসব ও শোক দেখ্‌ছে মানস দিঠি।
এক সাথে সুখ, দুঃখ, রোদন, হাসি,
হাত ধ'রে আজ দাঁড়িয়ে পাশাপাশি,
সাম্‌নে আমার ঐ দু'খানি চিঠি!

ইয়ং ইণ্ডিয়া

সঙ্কলয়িতা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

আমার পথ : ইহা আমার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য যে, বর্ত্তমান সময়ে আমি ইউরোপ ও আমেরিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। আমার সৌভাগ্য এই যে, জগতের সম্মুখে আমার প্রদত্ত বার্ত্তা পাশ্চাত্য দেশে আলোচিত ও হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আর আমার দুর্ভাগ্য এই যে, অনেকক্ষেত্রে ইহা অজ্ঞাতসারে অতিরঞ্জিত এবং অনেকক্ষেত্রে জ্ঞাতসারে বিকৃত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। প্রত্যেক সত্যই নিজের পথ নিজে করিয়া লয় এবং আত্মশক্তিতে শক্তিমান। অতএব আমার বার্ত্তা যখন ভুল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়, আমি তখন অনুদ্বিগ্ন থাকি। একজন ইয়োরোপীয়ান ভদ্রলোক দয়া করিয়া আমাকে জানাইয়াছেন যে, তিনি যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে রুশিয়াতে আমাকে জ্ঞাতসারে বা ঘটনা ক্রমে ভুল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা চলিতেছে! তাঁহার প্রদত্ত সংবাদ এই—

বার্লিনস্থ রুশিয়ার প্রতিনিধি মিঃ ক্রেষ্টিন্‌স্কী, পররাষ্ট্র-সচিব কর্ত্তৃক গান্ধীকে (?) বার্লিনে অভ্যর্থনা করিতে এবং ইহা দ্বারা তাঁহার অনুগামীদিগের মধ্যে বলশেভিকবাদ প্রচারের সুবিধা করিয়া লইতে আদিষ্ট হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ক্রেষ্টিন্‌স্কী গান্ধীকে রুশিয়ায় আহ্বান করিবার জন্যও উপদিষ্ট হইবেন। এসিয়ার নির্য্যাতিত জাতিদিগের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য পুস্তিকাদি বিতরণকল্পে সাহায্য করিতেও তিনি আদিষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি প্রাচ্যসমিতি ইত্যাদির জন্য গান্ধীর নামে একটী ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়া তাঁহার চিন্তার অনুগামী ছাত্রদিগকে সাহায্য করিবেন?)। তিনজন হিন্দুকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। এই সমস্ত কথা রুশিয়ার 'রাল' পত্রিকায় ১৮ই অক্টোবর সংখ্যায় ও অন্যান্য কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সংবাদে প্রকাশ যে আমার জার্ম্মাণী ও রুশিয়ায় নিমন্ত্রিত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। একথা বলা বাহুল্য যে, এইরূপ নিমন্ত্রণ পত্র আমি পাই নাই এবং বর্ত্তমানে এই সমস্ত মহান্ দেশে গমন করিবার বাসনা আমার [illegible]বিন্দুমাত্রও নাই। আমি জানি, যে সত্য প্রচারের জন্য [illegible] দণ্ডায়মান হইয়াছি, তাহা এখনও ভারতবর্ষে পূর্ণরূপে [illegible] হয় নাই,—ইহা এখনও পূর্ণরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। [illegible] ভারতবর্ষের কাজ এখনও পরীক্ষাগারা[illegible] [illegible]। এমন অবস্থায় বিদেশে প্রচারকার্য্যে গমনের কল্পনা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান অবস্থায় অনুপযোগী হইবে। আমার ভারতবর্ষীয় পরীক্ষা যদি সফল হয়, তাহা হইলেই আমি পূর্ণ সন্তোষলাভ করিব।

আমার পথ সুস্পষ্ট। কোন হিংসামূলক কার্য্য সাধনে আমাকে নিয়োজিত করিলে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। এক সত্য ছাড়া আমি কোন রাজনৈতিক চালবাজী জানিনা। অহিংসা ব্যতীত আমার আমার দ্বিতীয় অস্ত্র নাই। সময় সময় অজ্ঞাতসারে আমি একটু এদিক-ওদিক সরিতে পারি, কিন্তু তাহা চিরকালের মত নহে। অতএব আমার একটী সুনির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, যাহার মধ্যে আমাকে দিয়া কাজ পাওয়া যাইতে পারে। অন্যায়রূপে আমাকে দিয়া কাজে লাগাইবার জন্য অনেকবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমি যতদূর জানি, তাহা প্রত্যেকবারই ব্যর্থ হইয়াছে।

বলশেভিকবাদ যে প্রকৃত প্রস্তাবে কি, তৎসম্বন্ধে আমি এখনও অজ্ঞ। আমি ইহা এখনও অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি নাই। আমি জানিনা, দূর ভবিষ্যতে ইহা দ্বারা রুশিয়ার মঙ্গল সাধন হইবে কি না, কিন্তু আমি না জানিলেও, ইহা যতখানি হিংসার উপর, ঈশ্বরকে অস্বীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতেই আমার চিত্ত বিমুখ হয়। হিংসার স্বল্পতম পন্থায়ও আমি বিশ্বাসী নহি। যে সমস্ত বলশেভিক বন্ধুর আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি, তাঁহাদের জানা উচিত যে, যদিও আমি উচ্চ আশাগুলির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তথাপি মহৎ কার্য্যের জন্যও হিংসামূলক উপায় গ্রহণ করার আমি একজন তীব্র প্রতিবাদকারী—এক্ষেত্রে আমি কোন আপোশ করি না। অতএব হিংসাপন্থীদের ও আমার মধ্যে বাস্তবিক মিলনের কোন সাধারণ ভিত্তিভূমি নাই। আমার অহিংসানীতি বিপ্লবপন্থীদের সাহচর্য্য করিতে বাধা তো দেয়ই না, বরং তাহাদিগের সহিত মিশিবার প্রেরণা দেয়! মিশিবার উদ্দেশ্য এই, তাহাদিগকে ভুলপথ হইতে ফিরাইয়া আনা; কেননা, অতীত অভিজ্ঞতা হইতে আমি শিক্ষালাভ করিয়াছি যে, হিংসা ও অসত্য দ্বারা কোন স্থায়ী উন্নতি সাধন অসম্ভব। যদি আমার বিশ্বাস এক মোহময় কল্পনাবিলাস হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা এক হৃদয়গ্রাহী মোহ।

ঝড়

কি প্রবল ঝড়, গর্জ্জিয়া চলিয়াছে, সচকিত, ভীত আমি, স্তব্ধনেত্রে চাহিয়া আছি।

সংসারের উপর দিয়া এত ঝড় বহে কেন? কি দুর্দম, কি প্রচণ্ড, কি নির্দয়! কেবল ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, কেবল পিষিয়া যাইতেছে, এই ঝড়ে যেন সমস্তই বিচ্ছিন্ন, বিচূর্ণ হইয়া কোন দৃঢ় অন্ধকার এক ধ্বংসের মধ্যে নিঃশেষিত হইতেছে।

মাতা মুমূর্ষু সন্তানকে জড়াইয়া আছে, ঝড় আসিল, উড়াইয়া লইয়া গেল। পাগলিনী হাত বাড়াইয়া ছুটিতে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। মাটীর উপর বুক চাপিয়া পড়িয়া রহিল। মাতৃহৃদয়ের সেই বেদনা, সেই ক্রন্দন, সেই ক্ষোভ নীরবে ধীরে এই মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেল। পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেলনা অনায়াসে সহ্য করিল। এই দস্যুতার বিজয়োদ্ধত নিশান ঝড়ের মুখে ব্যঙ্গ করিতে করিতে উড়িয়া চলিল। কিযে নিগূঢ় মঙ্গল, মহাতত্ত্বকথা এই গুপ্তহত্যার মধ্যে নিহিত মা তাহা বুঝিল না। জগতে কোন মহাজ্ঞানী আজ পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারিয়াছে? না বুঝিয়া শুধু ভয়ে আমরা আড়ষ্ট হইয়া আছি। এই ভয় হইতেই পৃথিবীর যত বড় বড় ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ জন্মলাভ করিয়াছে। জ্ঞান শুধু তাহার এক একটা মহৎ ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত।

এই ঝড়ে অধর্ম্মের আগুন নিভিয়া যায় না বরং কখনো কখনো ছড়াইয়া পড়ে। অত্যাচারীর শাণিত কৃপাণ ভাঙ্গিয়া যায় না, বরং অন্ধকারে বিদ্যুতের মত ঝলসিয়া উঠে, আরও শাণিত হয়। পাপীকে নিরস্ত করে না, বরং স্বার্থত্যাগী পুণ্যাত্মার মস্তকে মেঘ হইতে বজ্র শিখা ঢালিয়া দেয়। এই ঝড় একটা মহাশক্তি; কিন্তু শক্তি কি শুধু দেবতার? কে বলে সে দানবের নয়? এ শক্তির বিচার বুদ্ধি কৈ, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান কৈ, পাপপুণ্য প্রভেদ কৈ?

সংসারের উপর দিয়া অবিরাম এই ঝঞ্ঝা বহিয়া যাইতেছে। সংসার বৃক্ষের ডাল পালা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে। যাহারা প্রাণপণ বলে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়—তাহারা কি নির্ম্মম আঘাতে বিচ্ছিন্ন হইতেছে, আবার যাহারা বিচ্ছিন্ন হইতে চায়, ঝড়ের প্রবল পেষণে তাহাদের গলায় একসঙ্গে বন্ধনরজ্জু অচ্ছেদ্য রূপে জড়িত হইতেছে।

তুমি বলিবে এই যে ভাঙ্গিতেছে,তবু তো বিশ্বের বিলোপ হয় না। তবু তো শূন্যে শূন্য মিশিয়া যায় না। জড় বা চৈতন্যে হোক, স্থূল বা সূক্ষ্মে হোক—কিছু না কিছু থাকিয়া যায়। একেবারে ফাঁকী নয়—শুধু ফাঁকী হইলে চলেনা চলিতে পারে না। সংসার বৃক্ষের জীর্ণ ডাল ভাঙ্গিয়া যাইতেছে আবার প্রকৃতির কোন নিগূঢ় তাড়নায় কোথা হইতে নূতন অঙ্কুরের উদ্গম হইতেছে। বসন্তসমীরে মৃদুকম্পিত নবকিশলয়, শাখে শাখে অর্দ্ধবিকশিত মুকুল গুচ্ছের মধুর সৌরভ, তার মাঝ থেকে কাল কোকিলের আবার সেই পঞ্চমে কুহুরব। এই নবজীবন জরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। শুধু ধ্বংস নয়—সৃষ্টিও আছে।

হা অদৃষ্ট! তাই তো দুঃখ এ সৃষ্টি কেন আছে? কেন আবার কচি মুকুল দেখা দেয়, কচি মুখে হাসি ফুটে! কচি বুকে লাবণ্য কেঁপে উঠে। কাল কোকিল আবার ডাকে! আবার কেহ বলে "খুব ভালবাসি" অথচ পরিণাম দেখে মনে হয় একি ব্যঙ্গ কি পরিহাসের এই হাসি। শুধু ধ্বংসে দুঃখ ছিলনা। ধ্বংস যে সৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া আছে আঁকড়িয়া আছে, তাই তো দুঃখ।

ফুল ফুটে, ঝরে যায়। যদি ঝরেই যায়, তবে আবার ফুটে কেন? আমি বলি আর ফুটে কাজ নাই। কিন্তু ঝরে যে যায় তবু ফুল ফুটে। তাই তো দুঃখ। ফুলকে জিজ্ঞাসা কর সে নিজে আর ফুটিতে চাহিত না। যে একবার ঝরে যায়,সে জানে কি কষ্ট; তার কি আবার ফুটিতে সাধ থাকে? কিন্তু তবু সংসারে আবার ফুটিতে হয় হাসিতে হয় চলিতে হয়। দৃপ্ত গরিমায় একদিন যেখান থেকে চলে আসে পরদিন কুক্কুরের মত পদলেহন করিতে সেই স্থানেই ফিরিতে হয়—। স্রোতের পাকে পাকে এই ঘুরা ফিরা এই আবর্ত্ত—স্রোতাবর্ত্তে এই এত জঘন্য চর্ব্বদমনয় পঙ্ক—পঙ্কে এই জীবন্যাপন নিয়ে বেঁচে থাকা,—যেন মৃত্যু পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।

যেন মরণ আর হবে না। তাইত দুঃখ। কোকিল ডাকে, থেমে যায়, আর ডাকে না। কত বিনিদ্র নিশায়—মন্দ্রে কত দুঃসহ বিষদংশন নিয়ে কাণপেতে চেয়ে থাক–আর ডাকিবে না। নীরব, নিস্তব্ধ, নিঝুম! শব্দ যেন চিরতরে এ পৃথিবী হতে নির্ব্বাসিত হয়ে গেছে। তারপর—আবার একদিন হঠাৎ কোকিল ডেকে ওঠে। তাই তো দুঃখ, আবার ডাকে কেন?

যে মুখের হাসি ফুরাইয়া গেছে, শ্মশানের সেই যজ্ঞধূমে যে মুখ পুড়িয়া এক মুষ্টি ছাই হইয়া গেল, চাহিয়া দেখিলাম। তারপর বহুদিন যায়—হঠাৎ আবার একদিন নূতন মুখে নূতন হাসি দেখে হৃদয়ের শ্লথ তন্ত্রী আবার বিলাপে মর্ম্মরিয়া উঠে! যদি ফুরাইয়া যায়,—পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তবে সেই মুখ, সেই হাসি আবার কেন?

সৃষ্টি যদি ধ্বংসের জন্য, সংসার বৃক্ষডালে নবীন অঙ্কুরোদ্গম যদি এক দিন ঝড়ে ভাঙ্গিয়া যাইবার জন্য তবে ধ্বংসের জন্য নয়, এই সৃষ্টির জন্যই মহাদুঃখ। একি কম দুঃখ,—তোমাকে নিঃশেষ হইতে দিবে না। তোমাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এই আঘাতের মধ্যে, বেদনার মধ্যে, টানিয়া আনিবে। সংসার বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটন করিবে না, কেবল নিরন্তর এই প্রবল ঝড়ে তাহাকে বিচ্ছিন্ন আহত ও বিচূর্ণ করিবে। অনন্ত নিখিলে এই বিরাট ধ্বংসের এক মহাবেদী নির্ম্মাণ করিয়া অনন্তকাল সৃষ্টিকে তাহার সম্মুখে বলিদান করিবে। একি ভীষণ কি বিপুল হত্যা, কি শোণিতস্রোত, কি মর্ম্মভেদী চীৎকার, কি প্রবল ঝড়! হায়রে জগত তুমি এত নিঃসহায়!

সৃষ্টি যদি স্বেচ্ছায় চলিতে পারিত তবে সে নিজেকে দুইবার সৃষ্টি করিত না, নিখিলের সৃষ্টি পরাধীন সৃষ্টি ধ্বংসমুখী অথচ অনিবার্য্য।

শুধু গর্জ্জন, শুধু প্লাবন, শুধু এই ঝঞ্ঝাবহমানা অন্ধকারে আকাশ হইতে রাশি রাশি মৃত্যু ঝরিয়া পড়িতেছে। কবে আরম্ভ হইয়াছে? কবে থামিবে? থামিবে না? এত বঞ্চনা, এত পীড়ন, এত পাপ, কেহ দেখিবে না? এমনি চলিবে? এই হত্যা, এই নির্ম্মমতা, এই পরিহাস, একেবারে পরিণাম শূন্য? উঃ ভাবিতে যে বক্ষের স্পন্দন থামিয়া যায়!

কি প্রহেলিকা দূর অন্তরীক্ষে কি ক্রূর হাস্য কি ব্যঙ্গ। তুমি স্তব্ধ হও। শুনিবে না? কি স্পর্দ্ধা!

এত বজ্র, আকাশ ফাটিয়া যায়, পৃথিবী কাঁপে, প্রলয় দোলে এক একবার ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়, তবু ভাঙ্গে না—তবু শেষ হয় না। কি ঝড়—সংসার বৃক্ষের উপর দিয়া কি ঝড়!

৭।৫।১০

শ্রীধ্বজবজ্রাঙ্কুশ

পকেট-মহিমা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পকেট যখন ভর্ত্তি থাকেন, ফুর্ত্তি-ভরা চিত্ত,—
পুষ্প তখন গন্ধ বিলায় সকাল-সাঁঝে নিত্য!
পাখীর গানে ছন্দ ঝরে, আকাশ ফোটায় বর্ণ,—
গ্রীষ্মে বহে বসন্ত-বায়, নদীর জলে স্বর্ণ!
প্রিয়ার মুখে হাস্য ক্ষরে, চাঁদের দীপ্ত ছটা!
'হে নাথ,' 'প্রিয়,' 'জীবন ধন'—সম্বোধনের ঘটা!
ধরণী [illegible] সুখের,—বন্ধুরা দেন্ সারি,—
পকেট [illegible] ভর্ত্তি থাকে, ফুর্ত্তি লাগে ভারি!

পকেট যখন হা-হা করেন,—একেবারে রিক্ত,—
বসন্তে হায় ভাদ্র আসে,—চিত্ত সদা তিক্ত!
বিদ্যা-বুদ্ধি সকল করে নিম্নপথে যাত্রা,—
ভাল কারো কয়,—সে হয়, তোষামোদের মাত্রা!
প্রেয়সী হন্ রুক্ষ, কথা পূর্ণ সদা ঝাঁজে,—
সূর্য্য মসী-ল্যাপা হয়, শঙ্খ-গান বাজে!
ধরণী ঘোর শুষ্ক লাগে, বন্ধু-হীন গেহ,—
পকেট যখন শূন্য,—দাদা, পার্শ্বে নাই কেহ!

টাকা

শ্রীরসময় লাহা

(টিপ্পনী)

টাকা—রূপচাঁদ—পূর্ণ ষোলটি আনায়,
শশী যথা বিকশিত ষোড়শ কলায়।
ষোলটি শোলকে তাই টাকার এ ছড়া, –
পূর্ণ বটে রসাবেশে ঠাসে মিঠে কড়া।

৵০

টাকা—টাকা—টাকা,—
তুমি সুশীতল, কঠিন, প্রবল,
রজতে উজ্জল চাকা,
রাজার মুণ্ড ধরিয়া বক্ষে,
বিশ্বাস আনি প্রজার চক্ষে,
তোমার বসতি যাহার কক্ষে,
তাহারি বচন বাঁকা।
তুমি দেব-বর, রূপ মনোহর,
জড়ে ও অজড় টাকা।

৶০

টাকা—টাকা—টাকা—
বাজে তব ধ্বনি, পড়ে যে তখনি
সকল রাগিণী ঢাকা,
নর্ত্তকী নাচে কতই বিলাসে,
গায়িকা নিত্য গায় তব আশে
নায়িকার প্রেম ? নায়কের পাশে
তুমি না থাকিলে ফাঁকা।
ঢাল নব রস [illegible] পরশ
হলেও তুমি যে টাকা।

৶৹

টাকা—টাকা—টাকা—
জগতের মাঝ [illegible] তুমি গোলাকার
[illegible] দেব রূপায় ঢাকা।

ওঙ্কার মূক ঝঙ্কারে তব
নিমিষে ক্ষান্ত রণ-বিপ্লব
লভে শ্রীবৃদ্ধি শিল্প বিভব,
দেশের সমৃদ্ধি চাঁকা;
হে সুদর্শন, জিনি নারায়ণ-
চক্র তুমি যে টাকা।

।০

টাকা টাকা—টাকা—
কবি, শূর, বীর, ধরিতে অধীর,
তোমায় রূপার চাকা,
শত শত লোক ধাইছে নিত্য
পাইতে তোমায় হে গোল বিত্ত
কেহবা মরিছে জলিয়া পিত্ত
কেহ খায় ভ্যাবাচাকা।
রজতের চাঁদ পাত' জাল ফাঁদ
সুধা বিষে মাখা টাকা।

।৵০

টাকা—টাকা—টাকা—
সজাগ দেবতা জুড়াইতে ব্যথা
নিরত তোমার ডাকা;
বিবাহের পণ করিতে চুক্তি,
কন্যার দায়ে লভিতে মুক্তি,
হইল বিফল সকল যুক্তি
যেহোই যড়ই ডাকা;

আসে তাঁর বোধ পাইলে নগদ,
বরের ওজনে টাকা।

৷৵০

টাকা - টাকা — টাকা —
কত অপকারে, কত উপকারে,
ঘুরিছ রজত চাকা ;
এধারে তোমার জাগিছে কুশল
ওধারে তোমার অশুভ মুষল
রজনীর মত ঘুরিছ ভূতল,
পাশাপাশি অমা রাকা ;
কা'রে কর চুর, কা'রে বা প্রচুর,
দাও সুখ — মোহমাখা।

৷৶০

টাকা— টাকা — টাকা—
তোমার বিহনে হেরি যে নয়নে
এ ভুবন ফাঁকা ফাঁকা ;
মিছে এ জীবন, ভূতের এ কায়া,
মিছে ভালবাসা, স্নেহ, দয়া, মায়া,
মিছে সখাসখী, ছেলে, মেয়ে, জায়া,
জ্যাঠা, মামা, পিসে, কাকা,
তোমারই স্নেহে, বল পাই' দেহে,
রুধির তুমি যে টাকা।

৷৷০

টাকা — টাকা - টাকা —
চাষীর কুটীরে হেরি যে ধনীরে,
ধান তা'র হ'লে পাকা,
ডাক্তার ঘোরে মোটর হাঁকিয়া,
কৌন্সেল ওড়ে গাউন আঁটিয়া,
এঞ্জিনিয়ার হ্যাট বাঁকাইয়া,—
ছুটে ছোটে লয়ে ঝাঁকা,
ফেরাও সবারে ভবের বাজারে
হে রজতরূপী টাকা।

৷৷৵০

টাকা — টাকা – টাকা —
পাপ পুণ্য ভুল, তুমিই যে মূল
যত দিন ভবে থাকা,
তোমার প্রভাবে যশোমাল্য পরি'
সাধু হয় লোক পরধন হরি'
জিতেন্দ্রিয় সে. ভূজতা করি,
সব দোষ যায় ঢাকা,
হোক কদাকার, ফটো ওঠে তা'র
মদনমোহন বাঁকা।

৷৷৶০

টাকা—টাকা—টাকা—
সংসারীর সার, চাঁদি গোলাকার,
সর্ব্বস্ব তুমি একা,
তুমিই ব্রহ্ম - নাহিক দ্বিতীয়,
কিবা ছোট বড় সবাকার প্রিয়,
তুমি না থাকিলে আঁধার যে গৃহ,
হে গৃহ দেবতা পাকা।
কুরূপা প্রেয়সী হয় যে রূপসী
সাথে যদি আসে টাকা।

৷৷৷০

টাকা—টাকা—টাকা —
এত পাশ দিয়ে বিনাপণে বিয়ে
ক'রে দায় ঘরে ট্যাকা
জোগাইতে মন তরুণী রমার
দিতে হ'বে তাঁরে চিরুণী সোণার
রাখিতে আয়তি চাই যে তাঁহার
দু'গাছি গিনির শাঁখা ;
শুনিয়া কবিতা ভোলেনা বনিতা
চিনেছে তোমায় টাকা।

৸০

টাকা—টাকা—টাকা—
তুমি ছাড়া নাই মানুষ যাচাই
করিতে নিকষ পাকা ;
কৈকেয়ী, ভরত, দ্রুপদ ও দ্রোণ
তুমিই দেখালে কে কেমন জন
ত্যাগ ও স্বার্থ মধুর ভীষণ
চিত্র তোমাতে আঁকা,
জেলে যায় 'শশী' কাঁদে চোখ ঘসি'
'প্রমদা'—ছাড়ে না টাকা।

৸৹

টাকা—টাকা—টাকা—

কাতর ভক্ত, হায়রে শক্ত
তোমায় ধরিয়া রাখা,
সম্ভাবে তব বুঝা যায় বেশ
জোছনা, বাঁশরী, কোকিলের রেশ
কুসুমে মলয়ে, ভরে' যায় দেশ,
ময়ূর মেলে যে পাখা ;
সরিষার ফুল হেরে কবিকুল
অভাবে তোমার টাকা।

৸৵৹

টাকা—টাকা—টাকা—

বাড়িলেই লোভ জেগে ওঠে ক্ষোভ,
অশান্তি দেয় দেখা ;
মরণের কালে লুণ্ঠিত ধন,
হেরি মামুদের ঝ'রে দু'নয়ন,
সকলি বিফল বিভব রতন
ফেলে যেতে হয় একা,
ক্লাইবের ফাঁদ ঘুঘু উমি চাঁদ
মরে তব শোকে টাকা।

৸৶৹

টাকা টাকা—টাকা

সভা-সমিতিতে, বোসে বণচিতে
হাসি মুখে দাও দেখা ;
তোমার কারণে হয় রোজ কাঁদা
কতই উপাধি,—বক্তৃতায় কাঁদা
করুণার নামে তোলা হয় চাঁদা,
দেশে দেশে খুলে শাখা,
কঠিন, ধবল, কুটিল, সবল,
তুমি যে সচল টাকা।

১৲

টাকা—টাকা—টাকা –

তুমি ভরা পেটে রহিলে পকেটে,
যায় দেশ সুখে পাকা,
রোগে, শোকে, তুমি দাও বরাভয়
সৃজন পালন ঘটাও প্রলয়
ঘুরিয়া বেড়াও এ ভুবনময়
যেন নিয়তির চাকা ;
দেবতার সার, নমি বার বার
সাকার রূপার টাকা।

টাকার মাহাত্ম্য।

সব ঠাকুরের সেরা তুমি
সাবাস্ তোমায় টাকা,
দেখ্‌ছি এ দুনিয়া ভূমি
তোমারি এলাকা।
তেত্রিশ কোটী দেবতা আছে
কল্‌কে পায়না তোমার কাছে
তুমি নইলে হয় যে পাছে
উপোস করে থাকা।
সুস্থ হবার পরশ মাণিক
দুঃস্থ দেহের তুমিই টনিক
বল বুদ্ধি ভরসা ক্রমিক
তোমার তরেই রাখা।
জগৎ চালান জগন্নাথ
কিন্তু তাঁহার কোথায় হাত?
তোমার চক্রে চল্‌বে কি হাত
ক্যাবাৎ মজার চাকা।
দাতা তোমার কদর জানে
দেশের হিতে উদার প্রাণে
তোমার কীর্ত্তি নিত্য দানে
দেখান কতই পাকা।
কৃপণ তোমায় করে জড়
মনে মনেই মস্ত বড়
চিনির বলদ বইতে দড়
ভাগ্যে নাই তা'র চাকা।
তাপে তুমি গল' তবু
গলে না তা'র হৃদয় কভু
তোমার চাপেই হেন প্রভু
ভঙ্গী ধরেন বাঁকা।
ব্যাঙ্কে কর আনা গোনা
কারবারে যে ফলাও সোণা
করতে তোমার উপাসনা
চাক্‌রি যে চায় ভ্যাকা।
সচ্ছন্দ রবে নিরবধি
বইবে যাবৎ জীবন নদী
তোমার পুণ্যে উড়ায়ে দি'
বিজয় পতাকা।

কাজের কথা
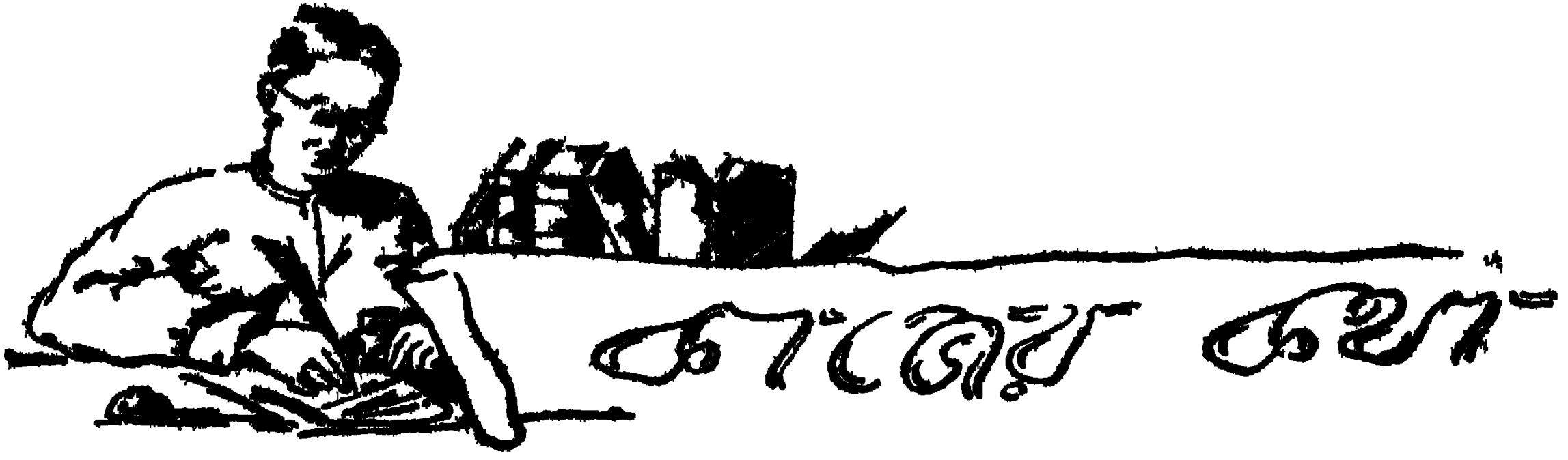
নবযুগের বড়দিনের অবকাশ

নবযুগ বড়দিনের আরম্ভে দু'সপ্তাহের অবকাশ গ্রহণ করিতেছে। তৃতীয় সপ্তাহে কংগ্রেসের বিচিত্র সুন্দর আশা আনন্দের বার্তা ও নানা সৌন্দর্য্য সম্ভার লইয়া নবযুগ আপনাদের অভিবাদন করিবে।

কংগ্রেস ও মহাত্মা—বড়দিনের সময়ই কংগ্রেস আরম্ভ হইবে। কংগ্রেসের সঙ্গে দেশের সামাজিক ও আর্থনৈতিক আলোচনার আরও নানা সভার অধিবেশনও বেলগাঁয়ে হইবে। মহাত্মা ভারতবাসীকে এমন একটা কার্য্যধারা দিবার সঙ্কল্প করিতেছেন যাহাতে অবতীর্ণ হইলে হয় স্বরাজ লাভ নয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। মাঝা-মাঝি পথের নিরাপদ ভাব কিম্বা ব্যর্থ উত্তেজনা ইহাতে থাকিবে না। আগামী কংগ্রেসে জাতির মুক্তির কোন পথ মহাত্মা নির্দ্দেশ করিবেন তাহা দেখিবার জন্য সকলেই উদগ্রীব হইয়া আছে। কংগ্রেসের সাফল্য সকলেই কামনা করিতেছে।

আদর্শ জননী—আদর্শ মাতাই দেশের সন্তান গণের চরিত্র গঠনের মূল। সন্তানের বাল্য জীবন মা গঠন করেন, ভবিষ্যৎ জীবন তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। মায়ের আশীর্ব্বাদ সন্তানকে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জীবন পথে দৃঢ় উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়াইবার ও চলিবার ক্ষমতা দেয়। দেশাত্মবোধ হারাইয়া ভারতের সন্তান-শক্তি আজ বিভ্রান্ত; আদর্শ চির পূজিত মাতৃশক্তির মহিমাও আমাদের আর যেন মহিমান্বিত করিতে পারিতেছে না। দেশে আদর্শ মাতার ধ্বংসাবশেষ এখনো আছে নানা সংঘর্ষের [illegible]ও দেশীয় মহিলাদের অন্তর-বৃত্তি তেমনি দেশকালোপ-[illegible] আছে—শুধু শক্তিময়ীর অন্তর-শক্তির আজ উদ্বোধন [illegible] হইবে। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মহিমময়ী জননী বাই আম্মা[illegible]ত্যতে ভারতীয় অনেক মহিলা তাঁহার স্মৃতি কি ভাবে রক্ষিত হইতে পারে সে সম্বন্ধে নানা মত দিতেছেন। সম্প্রতি কমরেড পত্রে একজন পঞ্চনদ-বাসিনী লিখিয়াছেন 'এই সত্যসন্ধা মহিয়সী মহিলার জীবন-বৃত্তান্ত ভারতের প্রতি নারীর হস্তে দিতে হইবে, তাঁহার আদর্শে ভারতীয় নারীদের জীবন গঠিত হইলেই আলী মাতার স্মৃতি রক্ষিত হইবে, ভারতীয় মাতৃশক্তিও সাফল্য মণ্ডিত হইবে।' ভারতে আদর্শ নারী চরিত্রের অভাব নাই—কিন্তু তাহার চর্চ্চার দিকে আমাদের রুচি লোপ পাইতেছে। এই রুচিকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে, তবেই দেশের মাতৃশক্তির আশীর্ব্বাদে সন্তান শক্তি আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

দেশীয় শিল্পের রক্ষণ না ধ্বংস—কোন নীতি? দাদা ভাই নৌরজী, গোখলে, তিলক, রাণাডে, রমেশ দত্ত প্রভৃতি সকলে আজীবন দেশীয় শিল্পের রক্ষণ নীতির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। দেশীয় লৌহ শিল্প যখন রক্ষণ শুল্কের সাহায্য চায় তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মতিলাল টাটা কোম্পানীর পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। লৌহ শিল্পের ব্যাপারে রক্ষণ নীতির পক্ষে ও বিপক্ষে বলিবার অনেক কথা থাকিলেও টাটা কোম্পানীর পরিচালন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকিলেও আমরা মূলতঃ রক্ষণ নীতির পূর্ণ সমর্থন করি কারণ তাহা না হইলে বিদেশী প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কোন শিল্প প্রচেষ্টা সফল হইবে না। বাংলার দেশবন্ধু ও সেই নীতি অনুসারে লৌহের রক্ষণ শুল্ক সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু দেশীয় কাগজের কলগুলির রক্ষার ব্যাপারে দেশবন্ধু সম্পাদিত ফরওয়ার্ডে গত শনিবার যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। "[illegible] স্বরাজই যাহার কামনা তাঁহারই সম্পাদিত [illegible] দেশীয় শিল্পের রক্ষণ নীতি চাহিতেছে না ইহার চেয়ে [illegible]", আর

কি হইতে পারে ! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কি গত শনিবারের ফরওয়ার্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি দেখিয়াছেন—তাঁহার অনুমোদনেই কি ইহা ফরওয়ার্ডে প্রকট হইয়াছে? ফরওয়ার্ডের সম্পাদকরূপে দেশীয় শিল্প রক্ষণে দেশবন্ধুর কি এই নীতি ?

এদেশের রেল কোম্পানী দেশের লোকের চলাচলের সুবিধার জন্য, দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির জন্যই কোন দেশে রেল পথের সৃষ্টির আবশ্যক হয়। ভারতে কোম্পানীর বন্দোবস্তে চালিত রেলপথগুলি এর কোন সুবিধাই ভারতীয়দিগকে দিতে পারিতেছে না। ভারতের নিজস্ব শিল্প, পণ্য ও খনিজ দ্রব্যাদি এমন কি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত এক স্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণের ভাড়া এমন বৃদ্ধি করিয়া রাখা হইয়াছে যে তাহা দেশীয় ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির ও দেশের অন্যান্য বিষয়ের স্বচ্ছলতার প্রবল অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। ভারতীয় ব্যবসায় কোন কোন বিষয়ে রক্ষণ শুল্কের সাহায্য পাইলেও—দেশীয় রেল কোম্পানীর এই নীতি থাকা পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ সুবিধার আশা নাই। রেলের মাশুল কি ভাবে দেশীয় শিল্পের উন্নতির বিঘ্ন হয় তাহা ইনডাষ্ট্রীয়াল কমিশনের রিপোর্টে বিশেষ করিয়া দেখানো হইয়াছে। এমনভাবে রেলওয়ে মাশুলের ব্যবস্থা করা আছে যে তাহাতে বিদেশ হইতে প্রস্তুত দ্রব্য ভারতে সুবিধায় আসে ও ভারত হইতে কাঁচা মাল বিদেশে সুবিধায় যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট ও কোম্পানীর নিজস্ব রিপোর্টে ইহার অনেক প্রমাণ আছে। কমিশনের রিপোর্টে স্পষ্ট লেখা আছে মোটের উপর ইহা ভারতীয় ব্যবসায়ের বিষম অসুবিধাই করিয়াছে। রেল কোম্পানীগুলির এই নীতিতে ভারতীয় ব্যবসায়ও দাঁড়াইতে পারিতেছে না—ভারতীয়ের চলাচল ও ক্রমশঃ অতি কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে—অথচ ইহার প্রতিকার নাই ভারত ছাড়া আর কোন দেশের রেলওয়েই বোধ হয় এই শোষণ নীতি চালাইবার সাহস পাইবে না।

কাগজওয়ালা ও সংবাদপত্রসেবি সঙ্ঘের বার্ত্তা—দেশীয় কাগজ শিল্পের সংরক্ষণ ব্যাপার লইয়া সঙ্ঘে যে আন্দোলন চলিতেছিল তাহার আভাস পূর্ব্বে আমরা দিয়াছি ও গত বারের সঙ্ঘের সভা-প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয়কে তাঁহার Sportsmanএর ভাব দেখিয়া সুখ্যাতিও করিয়াছিলাম কিন্তু পরে তিনি আবার unsportsmanএর মত নির্দ্ধারিত বিষয়টি লইয়া আড়া ছাড়া করিতে গিয়া অপ্রিয় আলোচনার সৃষ্টি করেন। যাহা হউক গত রবিবারের সঙ্ঘের কার্য্যকরী ও সাধারণ সভায় সেক্রেটারী মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া এই অপ্রিয় আলোচনায় যবনিকা পাত করিয়াছেন ও যাঁহাদের বিপক্ষ ভাবিয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে আলিঙ্গনে সব মন ক্ষোভ বিদুরিত করিয়াছেন। এইদিনের সভায় নানা মতের সংবাদপত্রসেবী অনেকেই সঙ্ঘের সভ্য হইয়াছেন। দেশের জনমত পরিচালনা করিতেছেন বলিয়া যে সকল মস্তিষ্ক-জীবিরা গর্ব্বিত তাঁহাদের এই মিলন সঙ্ঘের অনেক কার্য্য করিবার আছে—আশা করি সভ্যেরা সেদিকে দৃষ্টি দিবেন। নবযুগ ছাপা হইতেছে এমন সময় শুনিলাম সম্পাদক মৃণালবাবু অভিমানে সঙ্ঘের সম্পাদক ও সভ্যপদ ত্যাগ করিতেছেন। আবার আমাদের Sportsman উক্তি প্রত্যাহার করিতে হইল দেখিতেছি। সেক্রেটারী পদ ত্যাগ করাই বোধহয় ইনি কনষ্টিট্যুশনাল মনে করিয়াছেন কিন্তু সভ্যপদ ত্যাগের অভিলাষ কেন ?

চিত্তরঞ্জনের কনষ্টিট্যুশনাল বিঘ্ন—পল্লী গঠন কার্য্যের জন্য স্বরাজ সপ্তাহ নামে চিত্তরঞ্জন যে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন তাহার নাম কংগ্রেস সপ্তাহ না দিয়া স্বরাজ সপ্তাহ কেন দেওয়া হইল এ প্রশ্নের উত্তরে চিত্তরঞ্জন জানাইয়াছেন কংগ্রেস সপ্তাহ নামকরণে কনষ্টিট্যুশনাল বিপত্তি আছে। কি সে বিপত্তি এখনো তাহা জানা যায় নাই। স্বরাজ সপ্তাহের চাঁদা আদায়ের সীমা বাড়াইয়া জানুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। সোয়া দু'লক্ষ টাকা নাকি এ পর্য্যন্ত আদায় হইয়াছে—আরও হইবার সম্ভাবনা আছে। দেশের কোনরূপ সৎকার্য্য যদি এই অর্থ দ্বারা হয় তবে আমরা পরম সুখী হইব। গঠন কার্য্যে চিত্তরঞ্জন অপারগ এই অপবাদ তাঁহার নামে শোনা যায়। এবার চিত্তরঞ্জন দৃঢ়কণ্ঠে বাংলার পল্লী গঠনের জন্যই এ অর্থ চাহিয়াছেন আশা করিতেছি দেশ গঠনেও তাঁহার [illegible] পরিচয় পাইব। কোন কোন যোগে পূর্ব্বে [illegible]

অর্থ অপব্যয় হইয়াছে - চিত্তরঞ্জনের তাহা অবিদিত নাই, সে ভাবে এবারেও যেন টাকা উড়িয়া না যায় !

ধর্ম্মাধিপ—মহারাজ দ্বারবঙ্গ সনাতন ধর্ম্মাধিপ হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। সার্ভাণ্ট ও অমৃত বাজার তাঁহাকে লইয়া এত মাতিয়াছেন যে দুই কাগজে ধর্ম্মাধিপকে লইয়া পাল্লা চলিয়াছে। ফরওয়ার্ড তুষ্ণিভাব অবলম্বন করিয়াছেন মৌনভাব সম্মতিরই লক্ষণ ধরা যাইতে পারে। অর্ডিনান্স সম্বন্ধে অধিপ যে বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহার আর উচ্চবাচ্য নাই। কেবল এক বসুমতী দ্বারবঙ্গকে রেহাই দিতেছেন না। তিন বৎসর পর পর নাকি এই জমীদারের সেরেস্তার রেকর্ড একেবারে বদলিয়া যায় ইঁহার রাজ্যের প্রজারা নাকি বৃদ্ধি খাজনার দায়ে ত্রাহি ত্রাহি করে। এ সব যদি সত্য হয় তবে এমন লোক আর বাংলার সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠানের অধিপতি না হইবেন কেন ? আর বাংলার জনমতের পূর্ণ বিকাশ সংবাদপত্রগুলিই বা ইঁহার গুণ কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ না হইবেন কেন ! অনেক অরসিক জিজ্ঞাসা করে এমনটির অর্থ কি—অরসিক রসের মর্ম্ম বুঝিবে কি করিয়া !

নূতন সাহিত্য রত্ন—শুনিতেছি—মাসিক বসুমতী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়কে ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি দিয়াছেন। মহামণ্ডলের তুঙ্গ শৃঙ্গ দ্বারবঙ্গাধিপ স্বয়ং এ সব উপাধি দিতেছেন—না এ সব উপাধি বিতরণেরও কমিটি আছে ? মহারাজ দেখিতেছি—জমিদারী, ধর্ম্ম ও সাহিত্য সব দিকেরই বৃহস্পতি হইলেন !

পয়সা কাগজ—গত মঙ্গলবার হইতে প্রসিদ্ধ বাংলা দৈনিক আনন্দবাজারের মূল্য দু'পয়সার স্থলে এক পয়সা করা হইয়াছে। ইংরেজী দৈনিক সার্ভাণ্টের মূল্য পূর্ব্বেই চার পয়সার স্থলে এক পয়সা হইয়াছে। সার্ভাণ্ট ও আনন্দবাজার দেশের জাতীয়তা গঠনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে—মূল্য কমাইয়া এইবার তাহারা সাধারণের সহজ লভ্য হইল। সার্ভাণ্ট এক পয়সা হইবার পর সম্পাদকীয় [illegible] কার্য্য উন্নত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যদি পরিচালন [illegible] লাভ হয় তবে ইহা সত্যই সংবাদপত্র মহলে যুগান্তর [illegible]। আনন্দবাজারের সম্পাদকবর্গ ও পরিচালকবর্গ এই নূতন অভিযানে জয়যুক্ত হউন ইহাই আমাদের কামনা।

সেবাব্রত শশীপদ—গত সোমবার সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। দরিদ্রের কষ্ট নিবারণে ইনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। দেবালয় ইঁহার কীর্ত্তি। যাহারা ইঁহার সঙ্গে মিশিয়াছেন তাঁহারাই ইঁহার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াছেন।

বাংলায় অন্নকষ্ট—বাংলার অনেক জেলায়ই এবার অন্নকষ্ট ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। ধান চালের দাম এত বাড়িয়া গিয়াছে যে তাহা কিনিবার সামর্থ্য অনেকেরই হইতেছে না। চাল চার সের, ধান সাত সের টাকায়—বাংলায় কাহার ঘরে কত টাকা আছে যে এইরূপ টাকার বিনিময়ে নিত্য আহার্য্য জোগাইবে। তাই বাংলাময় অন্ন নাই অন্ন নাই রব উঠিয়াছে। সোণার বাংলার এই দারুণ অভাব কি ভাবে প্রশমিত হইবে কে জানে ?

ডাকবিভাগের মাশুল—বিলাতে আবার পেনি পোষ্টেজ চালাইবার আন্দোলন হইতেছে। প্রধান মন্ত্রী বাল্ডুইনের আমলে তাহা বোধহয় চলিবেও। ভারতেও চিঠি পত্র প্রেরণা প্রেরণের মাশুল যে ভাবে বাড়িয়াছে তাহা অবিলম্বে কমান কর্ত্তব্য। আগামী বাজেটে সরকার পক্ষ এটি কমাইলে দেশের একটি বিশেষ সুবিধা হইবে।

রেল ষ্টীমারের ভাড়া- ভারত সরকার কোম্পানীর হাত হইতে রেলপথ নিজেদের পরিচালনাধীনে লইতেছেন। রেল ষ্টীমারের ভাড়া হু হু করিয়া যে ভাবে বাড়ান হইয়াছে ইহাকে জুলুম ভিন্ন অপর কিছু বলা যায় না। কোম্পানীর হাত হইতে সরকারের হাতে গেলে যদি ভাড়া কমিয়া পূর্ব্বের মত হয় তবে লোকে গবর্ণমেণ্টকে সুখ্যাতি করিবে।

শান্তি পুরস্কার না পরিহাস—নোবেল প্রাইজ কমিটির কর্তৃপক্ষ এবার আর শান্তি স্থাপনার জন্য কাহাকেও পুরস্কার দিবেন না স্থির করিয়াছেন। জগতে যে ভাবে শান্তি অগ্রসর হইতেছে তাহাতে শান্তির জন্য বছর বছর লক্ষাধিক মুদ্রা পুরস্কার বিতরণ যে পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয় এতদিনে বোধহয় তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

লি-রিপোর্ট—কমিশনের পর কমিশনে যাহা হইতেছে লি-কমিশনেও তাহাই হইয়াছে। বিলাতাগত সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীদের মাহিয়ানা ও পেনসনের আরও কিছু সুবিধাই এই কমিশনে হইল। কমিশনে সুবিধা ইহাদেরই হয়—দরিদ্র নিরন্ন ভারতীয়ের সুবিধার আশা ক্রমেই দূরে সরিয়া যায়। এই এক রিপোর্টেই কি বছরে ভারতের সোয়াকোটি পরিমাণ মুদ্রা শোষিত হইবে।

জলকষ্টের সূচনা। বর্ষা যাইতে না যাইতেই দেশব্যাপী জলকষ্টের সূচনা দেখা গিয়াছে। দেশের নদী গর্ভগুলি সব শুষ্ক তাই বর্ষার প্লাবনে দেশ ভাসিয়া যায় আবার জল টানিতেই শুষ্ক নদীগর্ভে বালুচড় ভরিয়া যায়—জলকষ্টে দেশ মরিতে বসে। দিনের দিন জলকষ্ট বাড়িয়াই চলিয়াছে। এত বড় বড় নদীর এমন অবস্থা হইল কেন, এমন জলহীন, অনুর্ব্বর কি করিয়া দেশ হইতেছে তাহার কোন অনুসন্ধান পর্য্যন্ত হইতেছে না। অথচ আমরা শুনি অতি সভ্য বিজ্ঞানবিদ সরকার আমাদের রাজ্যভার স্কন্ধে লইয়া আছেন। এই বিজ্ঞানের যুগে যে দেশে নদী নাই সে দেশেও কৃষিকার্য্য ও দেশের স্বাস্থ্য সম্পদের জন্য নদী সৃষ্টি হইতেছে আর এ দেশে এত নদী থাকিতেও তাহা মরিয়া যাইতেছে। রেলের জন্য বিচারহীনভাবে লৌহবর্ত্ম গড়া নদী মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ অনুমান হয়—প্লাবনেরও ইহা অন্যতম কারণ। আরও অনেক কারণ নিশ্চয়ই আছে—নতুবা আর জলের দেশের লোক জলাভাবে তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া মরিবে কেন?

বররুচি—বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিতের কথা বলিতেছি না। আমাদের রুচিবাগীশ প্রবীণতম মাসিক প্রবাসীর কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। অগ্রহায়ণের সংখ্যায় এ কটী ঔষধের বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছেন, ঔষধটা বলকারক বা রসায়ন শ্রেণীভুক্ত; তাহার এক স্থলে লেখা আছে "নির্ম্মলাদির স্বামী নাকি * * * সেবনে চড়ুই পাখীর মত হয়েছে। এবার স্বামীকে এটা সেবন করান চাই। বউদিকেও একটী এনে দিব" এতে অবশ্য কোন অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ নাই, কিন্তু এর ভাবটা এই রুচিবাগীশ বররুচি-গণের পছন্দ সই হলো কি করে আমরা তাই ভাবি। আর এই উক্তি দ্বারায় বাঙ্গালার নারীদের কত হীন মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কি এই রুচিতাত্ত্বিকগণ বুঝতে পারেন না। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবুর পত্রে এ শ্রেণীর বিজ্ঞাপন কি করে প্রকাশিত হয় আমরা ভেবে পাই না; এতে মনে হয় যে তিনি এখন সম্ভবতঃ এ সব বিষয়ে উদাসীন এবং যাদের হাতে কাগজের ভার, তাঁরা অর্থের জন্য মার্জ্জিত রুচিটা পর্য্যন্ত বর্জ্জন করেছেন। আমাদের আপত্তি কেবল নারী জাতিকে এই ঘৃণ্য বর্ণে চিত্রিত করায় আমরা অবশ্য নারী স্বাধীনতার ঢাক পিটি না কিন্তু তবুও নারী জাতিকে এত লঘুচিত্ত বিবেচনা করিতে পারি না।

মশার যুদ্ধ—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত মূল্য ।০ আনা প্রকাশক নর্ত্তন কুলজা লাইব্রেরী পোঃ কুলাউড়া শ্রীহট্ট। লেখক অল্প বয়স্ক হইলেও ব্যঙ্গ-রসাত্মক রচনায় ক্ষমতাবান। বিপুল ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া এইরূপ দেশ-হিতকর পরামর্শ এ যুগের বিশেষ উপযোগী। এই ছোট বইখানি পড়িয়া ছেলে বুড়ো সকলেরই আমোদ ও শিক্ষা লাভ হইবে।

খাদ্য ও স্বাস্থ্য

খাদ্য ও স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ট সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিজ দেশজাত টাট্‌কা ফল মূল ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের উপর আমরা যত অনাদর দেখাইতেছি আমাদের স্বাস্থ্যও ততই খারাপ হইতেছে। দেশবাসীর শরীর আজ ব্যাধিমন্দির—নানা নূতন ব্যাধি এদেশে আসিয়া জাঁকিয়া বসিয়া পরম আগ্রহ ভরে দেশের লোককে মরণের পথে টানিয়া লইতেছে। দেশজাত খাদ্য দ্রব্যকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশী খাদ্যের উপর অতি লালসাই যে আমাদের এই অবস্থার অন্তর্তম কারণ তাহা গত নবেম্বরের প্রসিদ্ধ ডাক্তারীপত্র ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ডে ডাক্তার ওয়াহেদ বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। দেশীয় ফল মূল দুধ দই, ঘি প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য এখন আর তেমন মেলে না—যাহার পয়সা আছে সেও দূর দেশাগত শুষ্ক আঙ্গুর বেদানা, খেজুর খায়, কিম্বা বিস্কুট চা সংযোগে ভক্ষণ করিয়া খাদ্য-বিলাস চরিতার্থ করে,—কিম্বা নানা ভেজাল বিষাক্ত খাদ্য খাইয়া শরীরকে ব্যাধিমন্দির করিয়া বিদেশী ঔষধগুলির পোষণ করেন। কবিরাজী বা হকিমী এ বিদেশী ব্যসনে লোপ পাইতেছে। ভাল খাদ্যের রস লইতে স্বাদ গ্রহণ করিতে আমরা ভুলিয়া যাইতেছি এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য। অন্নপূর্ণার দেশেও এখন খাবার যোগান দিতেছে বিদেশীয় ব্যবসায়ীরা। হরলিক্স মেলিনিস এখন মাতৃদুগ্ধ ও গো-দুগ্ধের স্থান অধিকার করিয়া শিশুমঙ্গল রচনা করিতেছে।

সরস মধুর স্নিগ্ধ ডাবের জল পানের রস আমরা উপভোগ করিতে পারিনা অথচ ঝাঁঝাল সোডা লেমনেড বিকৃত মুখে পান করিয়া তৃপ্তি সাধন করি। অসুখে সাগু বার্লীর ব্যবস্থা অথচ তাহাতে সার কতটুকু তাহা আমরা জানি না। আর স্বাস্থ্য জানিয়াই বা লাভ কি খাদ্যাভাবে এবং দুর্ভিক্ষেই তো আক্রমণকারী চিরপ্রিয় মৃত্যুকে বরণ করিতেছে।

ডাক্তার ওয়াহেদ দুগ্ধশালীদের গোশালা বর্জ্জন করিয়া [illegible] খাদ্যভার অর্পণের তীব্র নিন্দা করিয়া- [illegible] যদি এই রীতি হয় তবে নানারূপ ব্যাধি [illegible] দেখিয়া আমাদের মোটেই বিস্মিত হইলে চলিবে না। প্রাচীন প্রথায় খাদ্যাদি আমাদের অনেক ভাল ছিল তাই পূর্ব্বে দেশের স্বাস্থ্যও ভাল ছিল। এখন স্বাস্থ্য ভাল চাহিলে এদেশের খাদ্য প্রথাও পূর্ব্বের মতই করিতে হইবে। আধুনিক সভ্যদের চেয়ে অসভ্যদের খাদ্য প্রথা ভাল তাই তাহাদের স্বাস্থ্যও সভ্যদের চেয়ে উন্নত।

সারাংশ বর্জ্জিত খাদ্য ভক্ষণেই বাঙ্গালীর রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা নাই। মানুষের স্বাভাবিক বৃদ্ধি যেমন হয় বাঙ্গালীর তেমন হইতেছেনা—কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার এ অবস্থা ছিল না, খাদ্যে সার থাকিলেই তাহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়, রোগ মুক্ত থাকা যায়। মায়ের বুকের দুধেই ছেলে মানুষ হয় ভারতীয় মেয়েরা এখনও বাহিরের কাজে এমন লিপ্ত হন নাই যাহাতে কৃত্রিম খাদ্য মাতৃস্তন্যের স্থান অধিকার করিতে পারে - শিশু পালনই মায়ের প্রধান ও পবিত্র কর্ত্তব্য এ ধারণা নারীর যত বেশী জন্মিবে শিশুরোগ ততই হ্রাস পাইবে। ডাক্তার ওয়াহেদ ভারতের নারী সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা রাখিয়াছেন - কিন্তু এ স্থলে ইহা ও বলা প্রয়োজন ভারতে বিদেশীর কৃত্রিম শিশুখাদ্য ক্রমেই বেশী আমদানী হইতেছে - ইহা শুভলক্ষণ নহে অকালে মাতৃত্ব, স্ত্রীরোগ ও গোদুগ্ধের অভাব ইহার অপরাপর কারণ।

এ দেশের ডাক্তারেরা বিদেশী পেটেণ্ট ঔষধের গুণ কাগজে দেখিয়া তাহার প্রচারে যত আগ্রহান্বিত হন, দেশীয় সুখাদ্য কথা প্রচারে তেমন উৎসাহী হন না বলিয়া ডাঃ ওয়াহেদ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। নিজ দেশের রত্নভাণ্ডারের প্রতি আমরা উদাসীন, পরনির্ভরতা আমাদের মজ্জাগত হইয়াছে - তাই ডাক্তারেরাও সেই প্রবাহেই ভাসিয়া গিয়াছেন ইহাতে আশ্চর্য্য কিছু নাই। কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্ত্তন না আসিলে জাতীয় শ্রীবৃদ্ধিরও কোন আশা নাই।

ডাক্তার ওয়াহেদ বাঙ্গালীর খাদ্যের এই ব্যবস্থা দিয়াছেন। দৈনিক এক পোয়া মোটা চালের ভাত—গমের আটার রুটি খাওয়াই ভাল। ভাতের পরই ডাল। ডাল পূর্ব্বরাত্রে ভিজাইয়া পরদিন রন্ধন করিতে হয়। বেশি জ্বাল না দিয়া বন্ধ করিয়া রাঁধিতে হয়। [illegible]

উপকারী। মুগ মসুর ছোলা প্রভৃতিও উপকারী। প্রতিদিন এক আউন্স ঘৃত ব্যবহার করা ভাল। বাসী মাছ খাওয়ার চেয়ে না খাওয়াই ভাল। আধ পোয়া মাছ প্রতিজনে খাইতে হয় মাছ না পাইলে ডাল বেশী খাইবে। টাট্‌কা মাংস দৈনিক আধ পোয়া খাওয়া ভাল। অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম দিন দুইটি খাওয়া যাইতে পারে। দুধ এক পোয়া দৈনিক পান করা ভাল—কাঁচা দুধেই উপকার বেশী। তাজা ফল খাওয়ার গুণ বড় বেশী। তাজা শাক্ সব্‌জীও খুব উপকারী পাশ্চাত্যেরা স্যালাড্ খায়—এ দেশেও তেমনি কাঁচা ফল মূল খাওয়া চলিত ছিল।

স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যরক্ষা প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার—ইণ্ডিয়ান মেডিকেল রিপোর্টে এই সব প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা হইতেছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। যক্ষ্মা প্রভৃতি নানা মারাত্মক রোগের সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বহু নূতন তথ্য জানা যায়। স্বাস্থ্য বিষয়ক এমন পত্রিকার প্রচার এদেশে যত হয় ততই ভাল।

শরীরতত্ত্ব

ভারতের আজ শক্তিসাধনা করা দরকার -বল চাই।

আমেরিকার আদর্শ হইতেছে কর্ম্মদক্ষতা। ভারতের সাধনা হউক—শক্তি। ভারতকে স্বাধীন জাতি করিবার সাহায্য বলবানই করিতে পারে।

ভারতের যুবকদের শরীর আজ দুর্ব্বল। পুরুষকারেই মানুষ জয়ী হয়। জাতির যুবকদের আমি শরীর তৈরী করিতে বলি।

শরীর তৈরী করিবার মূল ব্রহ্মচর্য্য। ভোগাসক্তিতেই যুবকদের মাটি করিয়াছে। ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত রাখাতেই শরীরের শক্তি প্রকাশ পায়।

শারীরিক ব্যায়াম দরকার। পুরুষোচিত খেলায় অনুরাগ বাড়াইতে হইবে। গ্রীক্ যুবকেরা ভাল খেলোয়াড় ছিল। জাপানীদের শিক্ষার উপর অনুরাগ খুব বেশী প্রত্যেক গ্রামে সেখানে স্কুল আছে। শতকরা ৯৮ জন লোকই সেথায় শিক্ষিত। কিন্তু জাপান শুধু শিক্ষিত হইয়াই সন্তুষ্ট নহে। জাপান বলবান জাতি হইতে চায়। জাপান মানুষ তৈরী করিবার শিক্ষা প্রথায় বিশ্বাসী। তাই জাপানী যুবারা ব্যায়াম, সামরিক শিক্ষা জিজুৎসু, পর্ব্বতারোহণ প্রভৃতি শিক্ষা করে। পর্ব্বতে সমস্ত রাত্রিব্যাপী অভিযান তাহারা করে। শরীরকে সওয়াইয়া শক্ত করাই ফিনল্যাণ্ডের যুবকদের আদর্শ। ভাল খেলোয়াড়ের উপর সেখানে কোন কর নাই। ছোট ছোট বালকবালিকাদের বরফের উপর হাঁটিবার উৎসাহ দেওয়া হয়।

যুবকগণের খাবার দিকে দৃষ্টি দিতে বলি। ভাল সাধারণ খাবার তাদের আবশ্যক। বিলাসের খাবার, মাংস বা হোটেলের খাদ্যের দরকার নাই। জীবের উপর আমাদের সমান দয়া দেখাইতে হইবে।

টি এল ভাসোয়ানী

প্রান্তর-পথে

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

চলেছি প্রান্তর পারে সরু এক আলি-পথ দিয়া—
হেমন্তের হিম বায়ু বহিতেছে কাঁপিয়া-কাঁপিয়া ;
সরণি সঙ্কীর্ণ অতি—একজন কোনমতে ধরে,
দুটি পাশে পাকা ধান ধীরে ধীরে করস্পর্শ করে
পল্লবে ও বাহুপাশে স্বর্ণ-আভা শস্য শীর্ষভাগে—
সির-সির করে অঙ্গ প্রগল্ভ সে পরশ-সোহাগে !

অপরাহ্ণ মুদে' আসে সায়াহ্নের আলিঙ্গন-পাশে,
চেলাঞ্চল শস্যক্ষেত্রে গোধূলির লগ্ন নেমে আসে !
ফিরিতে পথের মোড়—সহসা সম্মুখে দেখি চেয়ে—
বিপরীত দিক্ হতে, আসে এক কৃষাণের মেয়ে !
শিরে আঁটি, কাস্তে-হাতে, দ্রুত গতি, মুখে মৃদু গান,
নিটোল ডাগর দেহ, বর্ণ ওই ধানেরই সমান !

একেবারে মুখামুখি—চকিতে গুঞ্জন গেল থামি',
চারুদন্তে জিহ্বা কাটি' ধীরে ধীরে পথ হ'তে নামি'
সসরিলা বরতনু বক্ষস্পর্শী শস্য মাঝখানে,—
ঈষৎ সরম-রাঙা হাসিতে চাহিয়া মোর পানে !
পলকের কাণ্ড মাত্র ! মুহূর্ত্তে কাঁপিয়া দেহ মনে
বাধাহীন পন্থা বাহি' আবার চলিনু আনমনে।

ষোড়শী না সপ্তদশী—ঘরে তার কে আছে না জানি,
একা ফিরে ধান কাটি', কত দূর হবে গৃহখানি !
কি গান গাহিতেছিল—বিরহের অথবা প্রীতির—
কিম্বা কোনো গ্রাম্য ছড়া, ছিন্ন অংশ স্বদেশ-গীতির ?
কত দূর গেল চলি'—এ পথে ফিরিবে না ত আর—
চিরাভ্যস্ত মুক্তচারী—তবু কেন হাসি ও লজ্জার !

সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে প্রান্তরের পার দেখা যায়,
সমুজ্জ্বল শুক তারা জ্বলে' উঠে মাঠের মাথায় ;
পথ হয়ে আসে শেষ, ধান্যক্ষেত্র পড়িয়া পশ্চাতে,
হেমন্তের সিক্ত বায়ু লাগে রিক্ত দেহের সীমাতে।
—একটানা দীর্ঘ যাত্রা—জানিবার নাহি আজ কেহ—
এটুকু হাসি এই প্রান্তরের পথের পাথেয় !
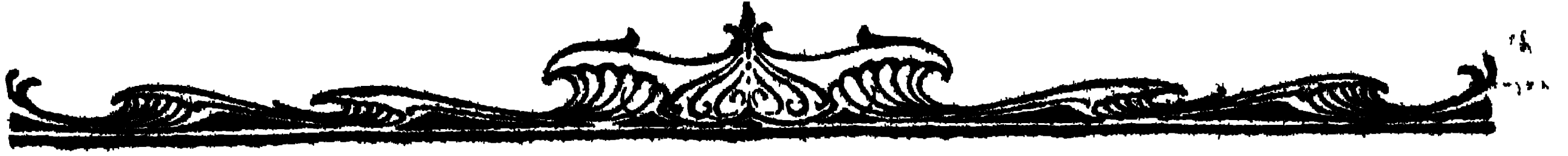
নগ্ন-সৌন্দর্য্য

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

একথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না— শিল্পের আদর্শ তাহাই, যাহা শিল্পীর কাম্য বা বাঞ্ছিত। কথাটি প্রাঞ্জলতর করিলে বলিতে হয় যাহা সৃষ্টি করিয়া শিল্পী কৃতার্থ হন। মানসিকবৃত্তির বিভিন্নতার জন্য আদর্শের প্রচলিত কোন মাপকাঠি নাই। একজনের যাহা অভিপ্রেত অন্যের তাহা প্রার্থনীয় নয়, একজন যাহার স্তাবক, অন্যের হয়ত তাহা উপেক্ষনীয়।

আমার অঙ্কিত একটী চিত্র দেখিয়া আমার কোন জ্ঞানী আত্মীয় একটু বিচলিত হইয়াছিলেন, ক্ষোভ করিয়া বলিলেন "দেখ, তোমাদের চিত্রকে এত লঘু আদর্শে তৈরী কর কেন? প্রকৃত শিল্পীর চিত্র কামগন্ধহীন হইবে। জাতির অনুকরণের যোগ্য না হইলে তাহার দ্বারা সমাজের কি উপকার হইবে ইত্যাদি।" কথাগুলি নৈতিক-নিক্তিতে ওজন করিলে গুরু স্থান অধিকার করে সন্দেহ নাই, কিন্তু পক্ষান্তরে রস সৃষ্টির দিক দিয়া আবার অঙ্গহীনতার পরিচয় দেয়। কামকে বাদ দিলে প্রেমের উদারতা থাকে না, আঁধার ছাড়িলে আলোক দেখি কি প্রকারে? পাপী না থাকিলে পুণ্যাত্মার মূল্য কৈ? তাই শাস্ত্রকারগণ সৃষ্টি রক্ষার প্রয়োজনীতায় কামকেও একটা শাস্ত্র বিশেষ বলিয়া গণ্য করিয়া দিয়াছেন।

পেটের খাদ্যের ন্যায় মানুষের মনেরও খাদ্য আছে। যথা কাম ক্রোধ লোভ মোহ ইত্যাদি ষড়রিপু, এবং তাহার বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে। আবার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব উপলব্ধির জন্য রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি পঞ্চ অনুভূতিও আছে, উপরোক্ত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ইন্দ্রিয় চক্ষু। এই পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা কিছু সম্ভোগ করা সম্ভব তাহাই নিয়া ব্যস্ত, এই চক্ষু। সুন্দর-কুৎসিৎ, ভাল-মন্দ, মধুর-কষায়, কোমল-কঠোর, দর্শন-বর্জ্জন-ইত্যাদির অবতারণার মালিক এই চোখ।

রূপ বা রস সৃষ্টির দিক দিয়া কবি বা শিল্পীকে বিচার করিতে যাইয়া আধুনিক শিক্ষিত সমাজ শ্লীল অশ্লীলের একটা বিষম দ্বন্দ্ব বাধাইয়া দিয়াছেন। অনুদার চিত্তবৃত্তি ও [illegible] অজ্ঞতাই ইহার হেতু। কালিদাসের কাব্যের তিন চতুর্থাংশেই আদিরস। নৈতিক শাসনের কষাঘাত সহ্য করিতে হইলে কোন্ [illegible] কাব্য অপাঠ্য হইয়া ওজন দরে বিক্রী হইয়া যাইত! জয়দেবের কৃষ্ণসাগরের ঢেউ যদি [illegible] করিয়া উঠানামা করিত তবে কোন্ কালেই সাগর নামক অলীক উপমা মাঠে পরিণত হইয়া যাইত! বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের প্রেমের স্রোত যদি বিচারের অপেক্ষা করিত তবে 'কাণের ভিতর দিয় মরমে পশিবার বহু পূর্ব্বেই চিরবধিরতায় জীবনযাপন করিয়া অদৃষ্টলাঞ্ছিত হইয়া যাইত। পাণ্ডিত্য একজিনিষ, কবিত্ব অন্য জিনিষ। কাব্য ও ব্যাকরণে বহু প্রভেদ। তৎপর সেই আত্মীয় বলিলেন "এতাদৃশ রসসৃষ্টি করিয়াই সমাজ আজ ঘোর বিপথে চলিয়াছে, এই সব চিত্র কামোদ্দীপনা অধিক পরিমাণে জাগাইয়া দিতেছে" এই শ্রেণীর প্রশ্ন আরও কতবার শুনিয়াছি। উত্তরে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই, তবে বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে আয়ান ঘোষের পত্নী রাধা নাকি শ্যাম নামে পরপুরুষের নিকট সম্ভ্রমদান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী আধুনিক যুগের হিসাবে চরিত্রহীনতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, অতএব রাসলীলা সাঙ্গ করিয়া দেওয়া হউক। একটা চিত্র দেখিলেই যদি কাম বর্ষার প্লাবনের মত উদ্দাম হয় তবে বিল্বমঙ্গলের চিন্তামণির কথা পড়িবামাত্রই বারাঙ্গনাকুলের অনুগামী হইতে হইবে ইহা সুনিশ্চিত!

কোন এক কাগজের সম্পাদক আমায় বলিয়াছিলেন "আপনাদের চিত্রগুলি দেখিলে মনটা শিথিল হয়" কথাটা খুব আশ্চর্য্য বোধ হইল না, কারণ ইনিও ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। উত্তরে বলিলাম "এটা আপনাদের দুর্ব্বলতা, সংযমশিক্ষাও আবশ্যক

তিনি অধিকতর রুষ্ট হইয়া বলিলেন "আপনারা এসব চিত্তোত্তেজক চিত্র আঁকেন কেন?"

আমি বলিলাম "ধরুন, কোন যুবতী শিশুপুত্রকে স্তনদান করিতে করিতে শিশুর মুখে স্নেহচুম্বন করিতেছেন, এ অবস্থা আপনার দৃষ্টিগোচর হইলে তখন যদি আপনার ভাববিপর্য্যয় ঘটে তবে মাতৃত্বের কোন অপরাধ আছে কি? চিত্রে ও হুবহু সেই মাতৃস্নেহ ফুটাইয়া দিলে যদি ভোগের কামনাই জাগায়, তবে সেটা চিত্রের দোষ না চিত্তের দোষ? শিল্পী যখন নগ্নসৌন্দর্য্যের অনুশীলন করিয়া বিবস্ত্রাকে রূপ প্রদান করে, তখন তাহাকে কামের মূর্ত্তি না ভাবিয়া প্রেমের সম্পত্তি ভাবিতে চাহিলে অসংযমী ব্যক্তিরও ক্রমে আত্মশুদ্ধি জন্মে। যতক্ষণ এইরূপ আত্মপ্রত্যয় না হয়, ততদিন ঐরূপ চিত্র দেখিবার অধিকার জন্মে না না দেখাই বরং উপকারী।"

নগ্নতাই সৌন্দর্য্য। তাহাই প্রকৃতির দান। মানুষ

তাহাকে সমাজের আবশ্যকতার বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া লইয়াছে বলিয়া সেইটাই আদর্শ একথা দুর্ব্বলচিত্ত বা নির্ব্বোধের। আদর্শ, ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। একটা সাধারণ লোক এক মণ ওজনের বোঝা বহিতে পারে। এমনও লোক আছে যাহারা কুড়ি মণেরও অধিক বহিবার শক্তি রাখে। এখানে কোনটা আদর্শ ? প্রশস্ত রাজপথে একটা মহাপুরুষ উলঙ্গ হাঁটিয়া যায় বলিয়া তোমার আমার তাহাতে অধিকার আছে কি ? অজ্ঞান শিশু বা জ্ঞানাতীত সাধুরই তাহা শোভা পায়, মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানের কাজ নয়, সুতরাং এস্থানেও আদর্শ এক নয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আদর্শ একমাত্র ব্যক্তিত্বের উপরই নির্ভর করে। আর ব্যক্তিত্বও অবস্থার দাস তাহা বাহিকই হউক আর মানসিক অবস্থাই হউক।

অনেকে হয়ত আছেন যাহারা নগ্নতার আদৌ সমর্থন করেন না, সাজসজ্জার আবরণ ব্যতীত তাঁহাদের অন্য ধারণাও নাই। তাঁহাদের বেশভূষারই কি একটা নিয়ম আছে ? যে ধনী সে পাঁচটা পোষাক পরে যে মধ্যবিত্ত সে দুইটা, নিতান্ত গরীবকে একটাই পরিতে হয়। চাষা অনাচ্ছাদনে মাঠে যায় শীত গ্রীষ্ম নাই মানাপমান নাই অসুস্থতাও নাই, বরং একদিন পরে নিলে চলিবার শক্তি নাই। সাধু ফকির মাঘ মাসের রাত্রিতে দিগম্বর বেশে থাকে। পরিচ্ছদের আদর্শ এখানে কোনটা ? আজ যাহার আকাঁড়া চালও জোটে না মোটা পয়সার বস্ত্র দেখিলে হয়ত দাদখানও তাহার মনস্তুষ্টি করিতে পারে না। এই গেল আবরণের বিবরণ। তারপর লজ্জা।—সেও ঐ নিয়মের বশবর্ত্তী। ম্লেচ্ছ শাসনের পূর্ব্বে এ দেশে কি সতী লক্ষ্মীর অভাব ছিল ? আমরা জানি তখন ১৫।১৬ বছরের যুবতীরাও বড় একটা আচ্ছাদনের বাড়াবাড়ি ঘটাইতেন না। আজকাল সেমিজ বডিস্ জ্যাকেট ব্লাউজ ইত্যাদি আবরণ সত্ত্বেও অবস্থায় এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়াও অসংযত চরিত্রের অভাব নাই। পার্শী গুজরাটী মাদ্রাজী প্রভৃতি তরুণীরা আদৌ পর্দ্দার আড়ালে থাকে না তাঁহারা কি আর সতী নয় ? রাজপুতবালাদের অন্দর বাহিরে সমান অধিকার ছিল, কখন মাতৃস্নেহের পীযূষধারা, কখন রণ উন্মাদিনী বেশ আবার পরক্ষণেই জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ ! কয়জন আধুনিক শিক্ষিতা আছেন যাহারা তাঁদের মত সতীত্বের মূল্য দিতে পারেন ? সংযম বা সভ্যতা কি একটা কথার কথা ? বাহিক পারিপাট্য হাজার হইলেও অন্তরশুদ্ধির অভাবে লক্ষ বছর গেলেও সংযম আসে না। সভ্যতাটা কি ? কতগুলি মূল্যবান পোষাক না কয়েকটা কেতা দুরস্তবুলি তোতার মত অভ্যস্ত করা ? রামকৃষ্ণ পরমহংসের পোষাকও ছিল না—ভাষাজ্ঞানও ছিল না তিনি কি অসভ্য ছিলেন ? মানসিক উদারবৃত্তিগুলির যথার্থ উন্মেষ হইলেই তিনি সভ্য, যেমন প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

অনেকে হয়ত আবার প্রশ্ন করিবেন অসাধারণ বা অমানুষের পক্ষে যে বিধি তাহা সাধারণের হজম হইবে কেন ? শিল্পী বা কবির উপলব্ধি কি অকবি বা জ্ঞানহীনে বুঝিতে পারে ? কথাটা সত্য। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে কবি বা শিল্পীর সৃষ্টি যদি হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারি তবে নীরব থাকিব, অজ্ঞানের মত দোষারোপ করিব না। ল্যাটিন বা গ্রীক ভাষা বুঝিতে পারি না বলিয়া তাহা কিছুই নয় এ উন্মাদের কথা।

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইলোরা অজন্তা প্রভৃতি স্থানের ভাস্কর্য্য দেখিলে নির্ম্মল নগ্নতার নিদর্শন পাওয়া যায়, উন্নত পয়োধরের উপর বৃথা আচ্ছাদনের কোন প্রয়োজন তখন তাহারা বোধ করে নাই। ক্ষীণকটি ও স্থূল নিতম্ব দেখিলে রূপ সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা সেই অরূপের কথাই জাগাইয়া দেয়। তখন মানুষের এতটা পতন ছিল না—সম্ভোগের সীমাও তখন ছাড়াইত না। সভ্যতার হুকুমে দেহ আবৃত করিলেই যদি কামের লিপ্সা কমিয়া যাইত তবে আধুনিক আচ্ছাদন প্রবল সাধু বৃত্তিপতির বাণপ্রস্থ অবলম্বনেরই কথা ছিল। এটা বড়ই ভুল। যে কামান্ধ, সে স্ত্রীলোক দেখিলে শত আচ্ছাদনের ভিতর দিয়া সে মানস চক্ষে স্ত্রীলোকের নগ্নতাই দর্শন করে। বক্তৃতাদ্বারা কামজয়ের নামে শুধু একটা সাময়িক স্তব্ধতা আসিতে পারে, স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠনও তেমনি ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির উত্তেজনার বিরুদ্ধে ক্ষণিক প্রতিকুলাচরণ করে মাত্র।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে ঐ রোগের যথার্থ ব্যবস্থা আছে—তাহা সাধন। এমনকি উলঙ্গ যুবতীকে লইয়াও সাধন আছে তাহা তান্ত্রিক সাধন। যাহা ভোগ করিবার জন্য মানুষ এত অন্ধ হয়, চক্ষের সামনে অধিককাল স্থায়ী হইলে তাহা ভোগাসক্ত আর এতবেশী আকুল করে না। একবার চূড়ান্ত ভোগ হইয়া গেলে পরিশেষে ত্যাগের জন্যই তাহার অধিক ব্যাকুলতা আসে। যে দুই চিহ্নই মাতৃত্বের বিশেষ নিদর্শন—যাহার অপব্যবহারের জন্য শ্লীল অশ্লীলের সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে মাতৃত্বের ত্রিসীমায়ও সঙ্কোচের অধিকার না আসে, সেইজন্য হিন্দু-যোগী-শিল্পী মহাকালীর উলঙ্গিনীরূপ প্রদান করিয়াছেন। জগন্মাতার এ রূপ হৃদয়ঙ্গম করা কতবড় নৈতিকবলের পরিচায়ক ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা এক বিষম জিনিষ। ভাবের ঘরে চুরিই ইহার লক্ষ্য। সভ্যতা একটা কথার কথা। নিজেদের শিক্ষা দীক্ষার উপর পাশ্চাত্য বুদ্ধির একটা প্রলেপ মাখাইয়া ব্যবসার মত যাহা চলিয়াছে তাহাতে সার কতটুকু সহজেই অনুমেয়। সোণার খাঁচায়,

যাহারা গিল্টি করে জহরের বিনিময়ে যাহারা কাচ বেচে -সভ্যতার জন্য যে দেশ সতীত্বের বলি দেয় তাহাদের আদর্শ কিরূপ তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে? আর সেই আদর্শে তৈরী আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ—প্রেমের অপভ্রংশ যেখানে কাম - ত্যাগের অপর নাম যেখানে ভোগ মিথ্যানুকরণ যেখানে আত্মপ্রসাদ জন্মায় নগ্ন-সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি সেখান হইতে বহু জন্মজন্মান্তরের ব্যবধানে থাকে!

চিত্র-সমালোচনা

ভারতবর্ষ (অগ্রহায়ণ)

[illegible]—শিল্পী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার কর্ত্তৃক অঙ্কিত। ইহা হতাশের আক্ষেপ কারণ সাক্ষী নীচে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। চিত্রে আক্ষেপের কোন কথাই লিখা নাই বরং লুপ্ত হাসি যেন কাহার আগমনে দীপ্ত হয়ে উঠিয়াছে। দেহের ভঙ্গী যেন আরো বলে দিচ্ছে 'তিনি' যেন এই এলেন। চিত্র আঁকা আর রংএর শ্রাদ্ধ এক কথাই।

[illegible]হস্যগল্প—শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ গুপ্ত অঙ্কিত। চিত্রের বিষয় নির্ব্বাচন এদেশীয় উপাদান লইয়া। অঙ্কন নৈপুণ্যে বিদেশীয় ছায়াই সম্পূর্ণ পড়িয়াছে অর্থাৎ সাধুভাষা ছাড়িয়া দিলে বলিতে হয় যে কোন একটা বিদেশীয় ছায়া চিত্র হটাইয়া (অবশ্য তাহাতে মৎস্যের গন্ধ ছিল অর্থাৎ চিত্রকলার অনুকূল ছিল) তাহার উপর কারিকুরী করিয়া সম্পাদককে ফাঁকি মারা হইয়াছে।

শঙ্কর ও চণ্ডাল—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় শিল্পাচার্য্য অঙ্কিত। শিল্পসাধনা একটু কষ্টসাধ্য, ইহাতে ধৈর্য্য চাই। যাহাই মা তুলিপাণি কৃপা করেন তাহাই যখন যন্ত্রস্থ হইয়া যায় তবে ধৈর্য্য ধরিবার প্রয়োজন? আবার পদবী ও আকাঙ্ক্ষার পূর্ব্বেই জুটিযাছে তারপর যদি পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত কিছু অর্থ মোতায়েন থাকে তবে সমালোচনার ধার ধারিতে হয় না।

ব-ন্ত স মাগমে—শ্রীযুক্ত রহমান চাঘতাই অঙ্কিত। চাঘতাই মহাশয় শিল্পী খারাপ নন। তিনি লাহোর হইতে চিত্র অঙ্কিত করিয়া পাঠান। তবে জিজ্ঞাস্য চিত্রের নামটা কি তি'ম স্থির করেন না এদেশের কল্পনা প্রসূত? চিত্রের [illegible]তে বসন্তের কোন হাওয়াই নাই এ যেন মস্তকে [illegible]ড়িবার পূর্ব্বাশঙ্কা।

[illegible] (কার্ত্তিক)

মু[illegible]র বাঁশী—শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী অঙ্কিত। আর্য্যবাবু একজন বিখ্যাত আলোক-চিত্রকর। তাঁহার খ্যাতি উহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই 'অরিয়েনট্যালটি' তাঁহার প্রতিষ্ঠা বাড়াতে পারে নাই। নীচে নামাকরণ হইয়াছে মুরারির বাঁশী। আমরা বলি মুরারিরই রূপান্তর করিয়া "কুব্জার বন্ধু" নাম হউক। কারণ চিত্রে সাম্যভাব বেশী ফুটিযাছে। সা৺্যের সাধারণ অর্থ সমজ্ঞান ভাব, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে তাহা আরও একটু গাঢ়তর হইয়াছে। যথা নায়িকা যদি শীতে কাঁপিতে থাকেন নায়কের তাহা দৃষ্টি মাত্রই প্রাণে সেই আঘাতের অনুভূতি আসিবে অর্থাৎ তিনি কাঁপিতে থাকিবেন। আমাদের মনে হয় চিত্রেও বোধহয় শ্যামচাঁদ কুব্জাকে ধ্যান করিতে করিতে ব শীধ্বনি করিতেছেন। আর রাধা পেছনে যেন শ্যাম-স্মৃতিহীনা হইয়া যমুনায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন!

[illegible] মনে কাহর কথা ইত্যাদি শিল্পী বি, টি, দে। এতদিন ধরে কাগজে যে সব চিত্র বাহির হইয়াছে, তাহাদের সকলকেই টেক্কা দিয়াছে এ চিত্রখানা। জনৈকা রমণার একটি ফটোগ্রাফের উপর বিদ্যা ফলাইয়া দেখান হইয়াছে আবার সামনে পিকদান, ডাবর, পাদান ইত্যাদিও অঙ্কিত। তারপর একটা কলম হাতে দিয়া প্রেমের বিলাপ—কেমনে কহিব ইত্যাদি কথা লিখান হচ্ছে। এ যেন জ্যান্ত বারাঙ্গনালয়! এমন বীভৎস চিত্র যে সব কাগজে বাহির হয় তাহার সম্পাদক বা অভিভাবক আছে কিনা বলা যায় না। ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে সমাজপতির "সাহিত্যে" যে সব শিল্পসঙ্গত চিত্র বাহির হইত তাহা কি ইহাঁরা দেখেন নাই? আজকাল দেশে ভাল ভাল শিল্পী থাকা সত্ত্বেও এমন কদর্য্য চিত্র দেওয়া বসুমতীর মত কাগজের অন্তঃসার শূন্যতার প্রমাণ করিয়া দেওয়া হইতেছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত। দু'একটা প্রেমের গান গাহিলেই আর বিদ্যাপতি হয় না। ছবি না পাও—দিও না। ভাল ভাল স্থানের দৃশ্য দেওয়া খারাপ কি?

শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ—বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব চিত্রপুস্তিক

শিল্পরসজ্ঞ বাঙ্গালী মাত্রেই শিল্পী হেমেন্দ্র নাথের তুলিকার সহিত যে পরিচিত তাহা বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। বাংলায় শ্রেষ্ঠ মাসিক ও সাপ্তাহিকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য হেমেন্দ্র নাথের চিত্রাবলী এতদিন বাণীর মন্দিরে যে অর্ঘ্য দান করিয়া আসিতেছে সত্যই তাহা অতুলনীয়। চিত্র-শিল্পী বাঙ্গলায় অনেক জন্মিয়াছেন, অনেক জন্মিতেছেন কিন্তু প্রাণবন্ত চিত্র অঙ্কণে হেমেন্দ্রনাথ আজও অপরাজেয়। ইঁহার মূল চিত্রগুলি ভারতের সর্ব্বদেশের ধনীগণের প্রাসাদ শোভাবর্দ্ধন করিতেছে কিন্তু তাহাতে হেমেন্দ্রনা সন্তুষ্ট নহেন তিনি বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থার কথা তিনি জানেন এবং চিত্রসৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে এই ভাবপ্রবণ জাতি যে কতখানি সক্ষম তাহাও জানেন, তাই তিনি তাঁহার বিখ্যাত চিত্রগুলির সমাবেশে খণ্ডে খণ্ডে এই সৌন্দর্য্য পুস্তিকা প্রচার করিতেছেন। ছবিগুলি বেশ মনোজ্ঞ আকারে সুমুদ্রিত করিয়া আধুনিক রুচিসঙ্গত অঙ্গসৌষ্ঠব দান করিয়া বাঙ্গালীর ঘরের যোগ্য করিয়া এই এলবাম্ বাহির করিয়াছেন। মূল্যও যথেষ্ট সুলভ করিয়াছেন এক্ষণে এই পুস্তক প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে স্থান পাইলে তাঁহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। জাতির সেবার জন্য তাঁহার এই উদ্যম সার্থক হইলেই আমরা সুখী হইব। প্রথম খণ্ডের মূল্য ১৷৷০ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রত্যেকে ১৸০। ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব আর্টস ২৪নং বিডন ষ্ট্রীটে এই এলবামগুলি পাওয়া যায়।

২য় খণ্ড—প্রথম চিত্র, রতি ও মদন—ইঁহাদের উৎপাতে সমস্ত জগতই ব্যস্ত সুতরাং এঁদের পরিচয় অনাবশ্যক।

পরিণাম—নর-কপাল হস্তে এক অপূর্ব্ব সুন্দরীর চিত্র, দেখিলে মনে হয় সুন্দরী যেন পার্থিব সৌন্দর্য্যের অসারত্ব বুঝিয়া আপন মনে বলিতেছেন "এই নারীদেহ—এই পরিণাম তার।"

চন্দ্রহার—চন্দ্রমুখীরা চন্দ্রহার যে কত ভালবাসেন এবং চন্দ্রহার পরিয়া নিরালায় দাঁড়াইয়া তাহার সৌন্দর্য্য যে কি একাগ্র নয়নে দর্শন করেন চতুর শিল্পী তাহা ছবিতে ধরিয়া দিয়াছেন। তবে কাজটা ভাল করেন নাই, স্বর্ণকারেরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেও তাঁহার চিত্র গৃহস্থের পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে।

আলেখ্য দর্শন—সখী সহ বসিয়া নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের আলেখ্য দর্শন করিতেছেন। Love at first sight বিলাতে হয় কিন্তু এই পুরাতন ভারতবর্ষ তাহার উপরও টেক্কা দিয়াছে দর্শনে প্রাণে প্রেমের উদ্ভব ও মুখে তাহার অভিব্যক্তি প্রকাশ করা যে সে তুলিকার সাধ্য নহে।

গোপন পথে—অভিসারিকাই যান্ তবে সুন্দরী অভিসারিকা কি না না বুঝিলেও সুন্দরী যে সত্য সুন্দরী এবং তাঁহার নীলাম্বরী নিঙাড়িলে যে অনেক পরাণ তৎসহ নিঙাড়িতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ন্যাসী—এ আমাদের দ্বারে যে অর্থলোভী গণৎকারবেশী হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী দেখা যায়, সে শ্রেণীর সন্ন্যাসী নহে—এ যেন সেই পঞ্চনদের পারের বীরত্বব্যঞ্জক তেজঃপুঞ্জকান্তি সন্ন্যাসী - চিত্রখানি প্রকৃতই প্রাণবন্ত।

প্রতিধ্বনি—পুকুর ঘাটে স্নানের পর সুন্দরী যখন তাঁহার সুদীর্ঘ কেশপাশ নিঙাড়িতেছিলেন তখন বুঝি এক কালামুখো কোকিল ঝোপের ভিতর ডাকিয়াছিল কুহু—আর সেটা সুন্দরীর হৃদয়ে গিয়া প্রতিধ্বনিত হইল উ-হু এই প্রতিধ্বনি ধরা পড়িয়াছে সুন্দরীর মুখে ও দেহলতায়।

ব্রীড়া—এই সুন্দর চিত্রখানি আমরা শারদ-শ্রী নবযুগে গ্রাহকগণকে উপহার দিয়াছি—এর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

মানস-কমল—শিল্পীর মানস কমল প্রসূত মানসী মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য কেবল স্থিরনেত্রে উপভোগ করিতে পারা যায়—এ সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই—এ ব্রীড়া এ সঙ্কোচ এ ফুটি ফুটি ভাব আজও বাংলার কোন শিল্পী তুলিকায় ধরিতে পারেন নাই।

তৃতীয় খণ্ড—অচেনা—এই চিত্রে শিল্পী অচেনাকে দেখিয়া নারীর মুখে যে বিমিশ্র ভাব ফুটিয়া থাকে তাহাই তুলিকা সহযোগে এক অপূর্ব্ব সুন্দর মুখে প্রতিভাত করিয়াছেন—ইহার অঙ্কণপদ্ধতি নূতন এবং নিপুণতার পরিচায়ক।

একটী কথা—বহুবর্ণ অঙ্কিত চিত্র। শ্রীরাধা যখন যমুনা হইতে জল লইয়া গৃহে ফিরিতেছেন তখন শ্যাম নটবর পথের মাঝে তাঁহার কাণে কাণে কি একটী কথা বলিলেন যাহাতে শ্রীমতীর মুখখানা লজ্জায় অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। উজ্জল বর্ণবিন্যাসে গৌরবান্বিত এই চিত্রের তুলনা নাই।

স্মৃতি—দর্পনে মুখ দেখিতে বসিয়া সুন্দরী নিজের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভাবিলেন সেইদিনের কথা, যেদিন পিছন থেকে কে একজন এসে তাঁকে এই অবস্থায় চোরের মত দেখে ফেলেছিল, অমনি লজ্জা অমনি অতীতের সুখ কণ্টকের মত হৃদয়ে বিঁধিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল—এক বর্ণের চিত্রে এরূপ জীবন্তভাব ক্বচিৎ দেখা যায়।

পল্লীশ্রী—রমণী সৌন্দর্য্যের একনিষ্ঠ শিল্পী ক্ষণেকের জন্য যেন সেই সুদূর পল্লীর কথা মনে করিয়া সেই বাঁশবন ঘেরা পল্লীর পুকুর ঘাটের বহুবর্ণ চিত্র আঁকিয়াছেন—কলিকাতার প্রাসাদকারার মধ্যে বসিয়া পল্লীর এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সন্দর্শন সহর বাসীর পক্ষে পরম সৌভাগ্য হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আলতা—অলোক সামান্যা সুন্দরীর পদ কোকনদে আলতার আবশ্যক হয় কি না জানি না তবে শিল্পী যে অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে অলক্তকরঞ্জনকারিণীকে দাঁড় করাইয়াছেন তাহা সত্যই সাংঘাতিক।

কর্দ্দমে কমল—কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় চিত্রপ্রদর্শনীতে সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত এই চিত্রের পরিচয় অনাবশ্যক। তবে একটা কথা এই যে শিল্পী আজ মেথরাণীকে যে গৌরব দান করিয়াছেন তাহা অনেক রাজরাণীর ও নাই।

মানভঞ্জন—বাঙ্গালীর জীবনে মানভঞ্জন একটি নিত্য কর্ম্মের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে—সুতরাং এ চিত্র অনভিজ্ঞদের নিকট অভিজ্ঞের বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাইবে।

শেষ প্রতিশোধ—বহুবর্ণে করুণরসাসিক্ত মর্ম্মস্পর্শী চিত্র - ইহার তুলনা নাই।

নিবৃত্তি—সুন্দরীর স্বামী বারনারীতে আসক্ত হইলে তাহার সৌন্দর্য্য মরুভূমির কুসুমসৌন্দর্য্যের ন্যায় ম্লান মথিত হইয়া যায়—রুদ্ধ শোক ও মর্ম্মবেদনায় একাকিনী বিনিদ্র যামিনী যাপনের দুঃখময়ী চিত্র। এ চিত্র বুঝিবেন যারা ব্যথার ব্যথী তাঁরা।

দিবাস্বপ্ন—প্রকৃতই এ চিত্র স্বপ্নময়ী—এ সত্য হইলে ধরায় স্বর্গ নামিয়া আসিবে—তাই এ অপূর্ব্বচিত্রের নাম হইয়াছে দিবাস্বপ্ন।

পরিত্যক্ত, মায়া, সাপুড়িয়া—সকল গুলিই সুন্দর চিত্র।

রূপের মোহ—নারীর মোহে পুরুষের মোহ হয় কিন্তু নারী যখন দর্পনে নিজের রূপ দেখিয়া নিজে বিভোরা হন, তখন সে রূপ সত্যই প্রাণঘাতক হইয়া পড়ে—"আপন রূপের লহর ধরে গলায় পর হার"—কবির এই উক্তি তাহা হইলে অত্যুক্তি নহে।

রঙ্গালয়

মনমোহন নাট্যমন্দিরে "পাষাণী"— প্রথম রজনীর অভিনয় মন্দ হয় নাই এবং পরে হয়ত অভিনয় হিসাবে আরও উপভোগ্য হইলেও হইতে পারে। শিশিরবাবুর ইন্দ্রের ও গৌতমের ভূমিকা ভালই হইয়াছিল, ইন্দ্রবেশে অহল্যা হরণ ও অহল্যা পরিত্যাগ দুইটী দৃশ্যেই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিশেষত্ব দেখা গিয়াছিল। গৌতমের ভূমিকায় পুত্রের নিকট বিদায় দৃশ্যটিও বেশ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। তবে কৈলাস পর্ব্বতে তপস্যারত গৌতমকে জামা ও চাদর পরা অবস্থায় অনুমান করিতে আমাদের যেন কেমন কেমন লাগিতেছিল। রাজর্ষি জনক বেশে পুরাতন যুগের শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্তর অভিনয় বেশ স্বাভাবিক ও মধুর হইয়াছিল এবং অভিনেতাদের মধ্যে মাত্র ইনিই ভাদুড়ী মহাশয়ের কণ্ঠস্বর ও ভাব ভঙ্গী অনুকরণ না করায় যেন আমরা একটু হাফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিলাম—কারণ বাকী সমস্ত অভিনেতাই ভাদুড়ীমহাশয়ের অনুকরণ-সর্ব্বস্ব হওয়ায় তাঁদের অভিনয় যেন প্রাণহীন যন্ত্রচালিতবৎ বোধ হইতেছিল। চিরঞ্জীবের অংশের হাস্যরসের অভিনয়টুকু বেশ ভালই হইয়াছিল কিন্তু যে দুএকস্থলে যেখানে তাঁহাকে সহজভাবে কথা কহিতে হইয়াছে সেখানেই ভাদুড়ী মহাশয়ের অনুকরণ প্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহার অভিনয়শক্তি উচ্চমাত্রায় আছে, ইনি অনুকরণ পরিত্যাগ করিলে একটা নিজের স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন বলিয়া এইটুকু বলিলাম। "মদন" একেবারে অচল তাঁহার সেই নবে'র মত চালচলন ও ন্যাকামিটুকু অসহ্য, তবে রতিকে কোলে করিয়া রঙ্গমঞ্চ হইতে বাহির হইবার জন্য অর্থাৎ দৈহিক শক্তির জন্য যদি ইহাকে এই অংশ দেওয়া হইয়া থাকে তবে আমাদের বলিবার কিছু নাই নতুবা এই অংশ শ্রীমতি চারুশীলাকে দিলে বোধ হয় অধিকতর মনোজ্ঞ হইত অন্ততঃ নৃত্যগীতের সৌন্দর্য্যে অংশটি ফুটিয়া উঠিত। দশরথ চলনসই। বিশ্বামিত্রের আবৃত্তি ও পুরামাত্রায় ভাদুড়ীমহাশয়ের অনুকরণদুষ্ট এবং বিশেষত্ব বর্জ্জিত। শতানন্দের অংশ অভিনয় হিসাবে খুবই ভালো হইয়াছিল, কিন্তু গৌতমঋষির পুত্রের কণ্ঠে সোণার একছড়া হার পরাইয়া দেওয়া কেবল বাহুল্য নহে অশোভন! রামের অংশে একেবারে প্রাণহীন—আবৃত্তি ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতার মত, পাষাণ অন্তরকে সরস করিয়া দিবার মত কোন মাধুর্য্য তাহাতে ছিল না। অহল্যার অংশের স্থানে স্থানে বেশ ভাল হইয়াছিল কিন্তু ভাদুড়ীমহাশয়ের মত চরিত্র আবৃত্তি ও ঘনঘন দক্ষিণ হস্ত নাড়িয়া অভিনয় একেবারে বিসদৃশ। অনেকস্থলে মনে হইল কণ্ঠস্বরের নিম্নতাহেতু অভিনয়ের স্থলবিশেষ পরিস্ফুট হইতে পারিল না। মাধুরীর অংশটি চলনসই হইয়াছিল। অহল্যার সঙ্গীত মধুর বা বিশেষ উচ্চশ্রেণীর হয় নাই। দিলীপকুমার রায় মহাশয় গানে সুর দিবেন শুনিয়া সুরে কিছু বৈচিত্রের আশা করিয়াছিলাম কিন্তু কোন গানের সুরই এমন কোন একটা নূতন আস্বাদন দিতে পারে নাই, নৃত্যভঙ্গীতেও কিছু বিশেষত্ব ছিল না—নৃত্যপ্রকরণ একেবারেই মামুলী। বেশভূষা প্রাচীনাকালোচিত ও সুন্দর হইয়াছিল, দৃশ্যপটে কিছু বিশেষত্ব না থাকিলেও আলোক নিক্ষেপ ও প্রয়োগ নৈপুণ্য অর্থাৎ সাজাইবার গুণে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অঙ্কের বা দৃশ্যের ব্যবধান সময় সীতা অভিনয়ের দৃশ্য ব্যবধান সময় অপেক্ষা দীর্ঘ হওয়ায় রসবিচ্যুতি ঘটিয়াছিল এবং দর্শকবৃন্দের অধীরতা প্রকাশ চতুর্দ্দিকে বিরক্তির সহিত ফুটিয়া উঠিতেছিল। মোটের উপর অভিনয় ভাল বলা যাইতে পারে তবে যে অসামান্য প্রয়োগ নৈপুণ্যের কথা গত কয়েক সপ্তাহের আলোচনার বিষয় হইয়াছিল তাহার কোন সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। গৌতম ও ইন্দ্রের বিরোধ ভূমিকা অভিনয়ে ভাদুড়ী মহাশয় যে একটা কিছু আলোকসাধারণ করিতে পারিয়াছেন তাহাও বুঝা যায় নাই কারণ উভয় অংশই একই কণ্ঠস্বরে অভিনীত হইয়াছিল—তিনি যদি গৌতমের অংশে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর প্রয়োগ করিতেন তবে তাঁহার বিশেষত্ব বিচার করিবার সুবিধা পাওয়া যাইত। ইতিপূর্ব্বে ৺গিরীশবাবু কপালকুণ্ডলায় ৫টি অংশে ও ম্যাকবেথে ৫।৬টি ভূমিকায় ৺মুস্তাফী সাহেব অবতীর্ণ হইয়া প্রত্যেক অভিনয়ে কণ্ঠস্বরের অসামান্য পরিবর্ত্তন দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে আর একটি কথা বলিবার আছে তাহা পুস্তক সম্বন্ধে, এই পুস্তক এতদিন কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই কেন—তাহার কারণ

আমাদের বোধ হয় অভিনেতা বা প্রয়োগনৈপুণ্যের অভাব নহে—তখনকার যুগের রঙ্গমঞ্চ হিন্দুভাবে পূর্ণ ছিল এখনকার মত সেকালের রঙ্গমঞ্চ এত ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে অভিভূত ছিল না—সেকালের রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা বুঝিতেন যে সাধারণ হিন্দু, পুরুষ বা স্ত্রী তা তাঁহারা যত শিক্ষিত হউন না কেন ৺দ্বিজেন্দ্রলালের অঙ্কিত রাম, সীতা বা অহল্যাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করিবেন না সুতরাং দর্শক অভাবে পুস্তক চলিবে না এই জন্যই তাঁহারা এই পুস্তকখানি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন শিক্ষিত হিন্দুসমাজ নব্যতন্ত্রে উন্মত্ত তাই এখন এ শ্রেণীর পুস্তকের অভিনয় চলা সম্ভব হইয়াছে। হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার প্রথমা হচ্ছেন "অহল্যা" সে অহল্যা দ্বিজেন্দ্রলালের অহল্যার মত স্বেচ্ছায় পরপুরুষকে পথ হইতে হাতে ধরিয়া গৃহে লইয়া যায় নাই সে অহল্যা স্বামীর শিষ্য দেবরাজ ইন্দ্র তাহার যৌবনে অভিভূত হইয়া গুরুর ছদ্মবেশে গুরুপত্নী হরণ করে ও গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিবার মুখে গুরুর সম্মুখে পড়িয়া অভিশাপগ্রস্ত হয় সে গৌতম ক্ষমাশীল হইলেও তাঁহার শরীর রক্তমাংসে নির্ম্মিত ছিল তাই সে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিয়াছিল আর দ্বিজেন্দ্র লালের ক্ষমাশীল গৌতম যে কি পদার্থে প্রস্তুত তা জানি না—মনুষ্য হইতেই পারে না কারণ রক্তমাংসে গঠিত মানুষ পত্নীর উপর এ অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না—ইহা নিছক কল্পনার রচিত চরিত্র। আর 'পাষাণী'র অহল্যার চরিত্র এতই ভীষণ যে তাহাকে সাধারণ বারনারী ভিন্ন অন্য কিছু ভাবা অসম্ভব—যে অহল্যা যোগীবেশী ইন্দ্রকে পথ হইতে ধরিয়া গৃহে লইয়া যায় যে অহল্যা উপপতির জন্য পুত্রহত্যা করে, সুরাপানে উন্মত্ত হয় প্রত্যাখ্যাতা হইয়া উপপতির পদতলে বসিয়া প্রণয় ভিক্ষা করে তার পর উপপতিকে বধ করিতে প্রয়াস পায় আবার নির্লজ্জার মত সমাজে ফিরিয়া আসিয়া সমাজের অত্যাচার ও পুরুষের অত্যাচারের উপর বিশিষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারে তাহার স্থান কাব্যে থাকিতে পারে কিন্তু সাধারণের সম্মুখে অভিনীত নাটকে থাকা ঘোরতর অন্যায়। এরূপ ভাবে যদি হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতির নারীর চরিত্র কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত তাহা হইলেই গ্রন্থকার ও অভিনেতাদের কি অবস্থা হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। নিরীহ বলিয়া হিন্দুজাতি তাদের স্বজাতির এইরূপ ভীষণ খেয়াল সহ্য করিয়া আসিতেছে কিন্তু বোধ হয় পাষাণী সে সহিষ্ণুতার সীমাতিক্রম করিয়াছে। কোন জাতির ধর্ম্মে আঘাত দিবার অধিকার কাহারও নাই বলিয়া জানা ছিল কিন্তু কাব্যের দোহাই দিয়া আজ হিন্দুনারী চরিত্রকে রঙ্গমঞ্চে এত হীন করিতে যে কাহারও সাহস হইবে আমরা তাহা আশা করি নাই। এ অভিনয় নীরবে দেখা ও অসম্ভব হইয়া পড়ে আশা করি শিশিরবাবু এ শ্রেণীর নাটক অভিনয় করিয়া হিন্দুদের মনে অযথা ব্যথা দিবেন না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ কেবল দর্শন বা মনস্তত্ত্বের বিকাশের স্থান নয়, লোকে প্রাণবন্ত অভিনয়কে বাস্তব বলিয়া অনেক সময় ভুল করে এটা যেন তিনি ভুলিয়া না যান। তিনি ক্ষমতাবান্ বলিয়া তাঁহার ক্ষমতা এভাবে অপব্যবহার করিবার, হিন্দুধর্ম্মকে প্রকারান্তরে বিদ্রূপ করিবার কোন অধিকার তাঁহার নাই। এরূপ অভিনয়ের সহিত কোন হিন্দু নরনারী সহানুভূতি দেখাইতে পারে না।

মিশর-রাণী—কর্ণওয়ালিস থিয়েটার ম্যাডান থিয়েটারে প্রস্তুত এই ছায়াচিত্রখানি দেখিয়া আসিয়াছি। এই চিত্রখানি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সর্ব্বজন বিদিত "ইরাণের রাণীর" ঘটনাবলী অবলম্বনে প্রস্তুত। এই চিত্রের অভিনয় দেখিয়া আমরা আশানুরূপ আনন্দ পাই নাই কারণ অভিনেতা অভিনেত্রীর মধ্যে একমাত্র শ্রীমতী নীহারবালা ব্যতীত কেহই প্রকৃত ঘটনা ও তৎসঞ্জাত ভাবকে অঙ্গভঙ্গীতে অভিব্যক্ত করিতে সক্ষম হয়েন নাই। বড় বড় চোখ বাহির করিলে বা ঘন ঘন চোখ কপালে তুলিলে কিম্বা মুহুর্মুহু বক্ষ স্পন্দন দেখাইলেই যে ছায়াচিত্রে অভিনয় হয় না তাহা দেশীয় অভিনেতাগণ কবে বুঝিবেন। সাজসজ্জার ঘটা খুব ছিল কিন্তু সেগুলি কতদূর উপযোগী হইয়াছিল তাহাও বিচার্য্য। ফটোগ্রাফী হিসাবে ম্যাডান কোম্পানীর অন্যান্য চিত্রাপেক্ষা এখানি অত্যন্ত নিষ্প্রভ বলিয়া বোধ হইল। চিত্রপাঠ বা title লেখাতেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ম্যাডান কোম্পানী যদি একজন ভাল প্রযোজকের (Producer) তত্ত্বাবধানে এই সকল চিত্র গ্রহণ করেন তবে বোধহয় এ সকল দোষ তিরোহিত হইতে পারে। তাঁহারা যখন অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন না তখন এমন নিম্ন শ্রেণীর চিত্র কেন প্রস্তুত হয় বুঝিতে পারি না। বাংলায় এখন এর চেয়ে ঢের দক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রী আছেন যাঁদের অভিনয় সাহায্যে চিত্র অধিকতর সুন্দর হইতে পারিত।

Printed & Published by Jnanendra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
14 Jaggarnath Dutta Lane Garpar, Calcutta

—এই বৎসরের কংগ্রেসের সভাপতি—

জগৎপূজ্য মহাত্মা গান্ধী

প্রথমবর্ষ] ২৮শে পৌষ শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী .০ই জানুয়ারী [২২শ সংখ্যা

জাতীয় মহাসমিতির উনচত্বারিংশ অধিবেশন।

মহাত্মাজীর বক্তৃতার সারমর্ম্ম

"১৯২০ ও ১৯২১ সালে যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্য আমাদের ছিল তাহা সিদ্ধ হয় নাই এবং তৎপরিবর্ত্তে পরস্পরের মধ্যে বিরুদ্ধ ও সন্দিগ্ধ ভাব জন্মিয়াছে—ইহা স্বরাজের পথ নহে।

লোকমান্য তিলক বলিতেন স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার কিন্তু আমি ঐ স্বরাজ লাভ করিবার জন্যই জন্মিয়াছি, আমি এই জীবনের মধ্যেই স্বরাজ লাভ করিতে চাই, কিন্তু তজ্জন্য যতটুকু কার্য্য করা আবশ্যক আমরা এখনও তাহা করিতে পারি নাই—আমি এই কংগ্রেসের অধিবেশন সময়কেও মূল্যবান সময়ের অপব্যয় মনে করি। মহম্মদ আলি সাহেবের পত্নী বলেন যে কংগ্রেসের অধিবেশন সপ্তাহে আমরা যেন সত্যই স্বরাজ পাইয়াছি এইরূপ মনে হয়; এটা অনেকটা সত্য, কারণ কংগ্রেসের সপ্তাহে স্বরাজের একটা অভিনয় হয় মাত্র। সাধারণের মধ্যে স্বরাজ আসিবার একমাত্র রাস্তা "চরকা"—যাঁহার এ বিশ্বাস নাই তিনি তাহা বর্জ্জন করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না।

শ্রীযুৎ সি আর দাস মহাশয় যে আপোষ সর্ত্ত উপস্থিত করিবেন তদ্দারা বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে। কিন্তু আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে তদ্দারা স্বরাজের আগমন অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইবে যদি আপনারা এই সর্ত্তগুলি ভগবানকে স্বাক্ষী করিয়া মানিয়া লয়েন ও আন্তরিকতার সহিত তাহা প্রতিপালন করেন।

আমি ভুলের অতীত নাই এবং হিমালয়ের মত বিরাট ভুল ও করিয়াছি সুতরাং আমার ব্যক্তিত্বের উপর কোন নির্ভর না করিয়া আপনারা হিন্দুমুসলমানের একতা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটিতে ভোট দিবেন। আমার স্মরণ আছে মৌলনা সওকৎ আলি বলেছিলেন যে হিন্দুও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই নির্ব্বোধের ন্যায় আচরণ করিতেছেন সুতরাং আপনি আপনার নিজের নির্দ্দিষ্ট তালিকাবদ্ধ কার্য্যে অগ্রসর হউন। এই মিলনের জন্য সহনশীলতার আবশ্যক; সেই জন্যই গুলনার নাম্নী এক মুসলমান বালিকাকে আমার কাছে রেখেছি। আমি তাকে গোমাংস খেতে নিষেধ করি না, যদিও আমি গোমাংস স্পর্শ করি না। আমি তাহাকে স্নেহ ও সহনশীলতার মাধুর্য্য দিয়া অভিভূত করিয়া স্বেচ্ছায় গোমাংস ভক্ষণ ত্যাগ করাইতে পারিব কারণ আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারিব যে গোমাংস না খাইলে কোরাণের মতে সে ধর্ম্মচ্যুতা হইবে না কিন্তু আমি হিন্দু বলিয়া গো-পূজা করিতে বাধ্য।

শ্রীমতী নাইডু নিবারেলদের সম্বন্ধে আমায় কিছু বলিতে বলেছেন আমি তাঁদের এই কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ্যদলের মত পেতে চাই। আমি তাঁদের পূজা করি এবং তাঁদের জন্য আমি হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি।

কংগ্রেসের গঠনসম্পর্কীয় পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমি এই বলিতে পারি যে তদ্দারা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বা মূলনীতির কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না তবে 'চরকা' আমি ত্যাগ করিতে

পারি না। আমি তাঁদের বলিয়াছি যে আমায় কংগ্রেস হইতে বাহির করিয়া দিয়াও যদি তাঁহারা ইহার মধ্যে আসিতে চান তাতেও আমি স্বীকৃত ; ইহার অধিক আমার বলিবার কিছু নাই।

পরিশেষে প্রত্যেক কংগ্রেসের সভ্যের নিকট আমার এই নিবেদন যে আপনারা যেন প্রকৃত আন্তরিকতার সহিত কার্য্য করেন আপনারা ইচ্ছা করিলে আমার প্রস্তাব নামঞ্জুর করিতে পারেন কিন্তু যদি ইহা গ্রহণ করেন তবে সততার সহিত তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সাফল্যের গৌরবে মণ্ডিত করুণ।"

বেল গামে কংগ্রেস

মহাত্মা গান্ধী গত ২০শে তারিখ পুণা মেলে বেলগাম বেলগাম আগমন করেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীযুত প্যাটেল, আলীভ্রাতৃদ্বয়, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, শ্রীমতী নাইডু এবং গুজরাটের অনেক প্রতিনিধিও আগমন করেন। একটী বিরাট জনসঙ্ঘ তাঁহাকে বিজয়নগর (অস্থায়ী) কংগ্রেসষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করে। ঐ দিন অপরাহ্নে তিনি সমাগত পরিবর্ত্তনবিরোধীদলেব প্রতিনিধিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

কলিকাতা চুক্তিপত্রে সম্মতি-পরিবর্ত্তনবিরোধীদলের প্রায় দুইশত প্রতিনিধি বেলগ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহাদের আলোচনা প্রায় সাত ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়। এই আলোচনার ফলে পরিবর্ত্তন বিরোধীদের সকলেই কলিকাতা চুক্তিপত্র সম্বন্ধে মহাত্মার মতের সমর্থন করেন। আলোচনার সময় গুজরাট, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের পরিবর্ত্তন বিরোধিগণ, মহাত্মা গান্ধীকে অনেক প্রশ্ন করেন ; কিন্তু মহাত্মাজী সকলের প্রশ্নেরই ধীরভাবে উত্তর প্রদান করেন এবং পরি শেষে প্রায় সকলকেই তাঁহার মতে মতান্তরিত করিতে সক্ষম হন। উপস্থিত পরিবর্ত্তনবিরোধীদের মধ্যে বার জন মাত্র তাঁহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। শ্রীযুত রাজগোপালাচারিয়া, শ্রীযুত বল্লভভাই প্যাটেল শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটাপ্পায়া, শ্রীযুত রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন বিরোধী নেতাগণ এই এই আলোচনায় খুব অল্পই যোগদান করিয়াছিলেন.—কারণ তাঁহারা সকলেই মহাত্মার মতে তাহাদের সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। এই আলোচনা কালে বাঙ্গলার অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপিত হয় নাই।

অসহযোগ স্থগিত হওয়ার পরে কোন কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে—এই প্রশ্ন মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—"চরকায় সুতাকাটা"। তখন আর একজন বলিলেন, "আইন অমান্যের মত একটি সতেজ ও উৎসাহদায়ক কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্দেশ করুন।' মহাত্মাজী উত্তর দিলেন যে, বিদেশীবস্ত্র-বর্জ্জনই একটি উৎসাহদায়ক কর্ম্মপন্থা ; ইহা উপযুক্তভাবে করিতে পারিলে আইন অমান্যের মতই ফলদায়ক হইবে।

নির্ব্বাচনাধিকাবের সর্ত্তে দুই হাজার গজ সুতা দেওয়াই মহাত্মাজীর সর্ব্বনিম্ন দাবী। যদি তাঁহার এই দাবীও রক্ষা না করা হয়, তাহা হইলে তিনি আর কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন না। বর্জ্জননীতি প্রত্যাহারের যথার্থতা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, দেশবাসীকে খদ্দরের কার্য্যে একাগ্র কবিতে বর্জ্জননীতি স্থগিত রাখাই বর্ত্তমানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। তিনি স্বরাজ্যদলকে কংগ্রেসের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়ার কথাও আলোচনার সময় উত্থাপন কবেন। তিনি বলেন, তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেও, তাঁহারা তাঁহাদের কাউন্সিল কার্য্য সম্বন্ধে পরিবর্ত্তনবিরোধীদের সাহায্য বা সমর্থনের দাবী করিতে পারিবেন না। এই আলোচনা সভায় বাঙ্গলাদেশের পরিবর্ত্তন বিরোধীদলের প্রতিনিধি সংখ্যা খুব কম ছিল। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বাঙ্গলার পবিবর্ত্তনবিরোধীদলের অভিমত প্রকাশ করেন!

মহাত্মাজীকে অভিনন্দন

গত ২১শে ডিসেম্বর তারিখে বেলগামের মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ড, মহাত্মাজীকে অভিনন্দন প্রদান করেন। মহাত্মাজী অভিনন্দনের উত্তরে বলেন, জাতীয় আন্দোলনে মিউনিসিপালিটিসমূহের যোগদান করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু ইহা করিতে গিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি তাঁহাদের স্বীয় কার্য্যে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। এই সকল বিষয়ে তাঁহাদের পাশ্চাত্য দেশ হইতে যথেষ্ট শিখিবার আছে।

এই অভিনন্দনের জন্য যে অর্থ লাগিবে তাহা খরচ করিতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সম্মতি দিয়াছিলেন।

প্রতিনিধিগণের আগমন

গত ২২শে ডিসেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, কংগ্রেসের বাসস্থানাদির বন্দোবস্ত সমস্তই বেশ ভালরকম শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দিন অপেক্ষা প্রতিনিধিগণের আগমন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে ২৩শে তারিখে শ্রীযুক্ত দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বেলগামে পৌছিয়াছেন।

পরিবর্ত্তন বিরোধীদলের প্রায় সকলেই চুক্তিনামায় স্বীকৃত হওয়ার ফলে বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির সভায় এই লইয়া খুব বিশেষ বাদানুবাদ হইবে না বলিয়াই আশা করা যায়। তবে এই সম্বন্ধে প্রতিবাদ যে একেবারেই উত্থাপিত হইবে না এরূপ আশাও করা যায় না। বিশেষতঃ গত কল্য অপরাহ্নে অন্ধ্র, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি প্রদেশ হইতে যে সকল পরিবর্ত্তনবিরোধী প্রতিনিধি আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই মহাত্মার সহিত আলোচনার পরিবর্ত্তনবিরোধী প্রতিনিধিগণের চুক্তিনামায় সম্মতি প্রদানে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কংগ্রেসের কার্য্য খুব ধীরভাবে এবং তাড়াতাড়ি শেষ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তবে বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির সভায় বাঙ্গালার অর্ডিন্যান্স ও লক্ষ্ণৌ প্যাক্‌ট সম্বন্ধে আলোচনার উপরই ইহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। জানা যায় যে, বিষয় নির্ব্বাচনী সভাতেই সকল বিষয়ের বিশদ আলোচনা হইবে এবং যাহাতে ভোটা-ভোটী ছাড়া অন্যান্য সমস্ত কার্য্যস্ত নির্ব্বাহ হয়, তাহার জন্য মহাত্মাজী চেষ্টা করিবেন। কংগ্রেসের কার্য্য দুই দিনেই শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির সভায়

প্রস্তাবের পূর্ব্বাভাষ

বেলগামের ২২শে তারিখে সংবাদে প্রকাশ যে, বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির সভায় যে সমস্ত বিষয় আলোচনা হইবে, তাহাতে মিশরের স্যার লী ষ্ট্যাকের হত্যাকে নিন্দা করিয়া একটী প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে। তবে এই প্রস্তাবে ইহাও, উল্লিখিত হইবে যে স্যার লী ষ্ট্যাকের হত্যার দরুণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে ইহার প্রতিশোধ লইয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে কেবল এই হত্যার ক্ষতিপূরণ এবং দোষীকে শাস্তি দিবার জন্যই তাঁহারা এইরূপ করেন নাই, বরং এই সুযোগে মিশরের স্বাধীনতার ভাবকে নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এইজন্য কংগ্রেস ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এইভাবে ক্ষতিপূরণ লওয়ার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

ভারতের বাহিরে যে সমস্ত ভারতবাসী বাস করিতেছেন, তাঁহাদের কথাও আলোচিত হইবে এবং প্রকাশ যে, দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণর জেনারেল, দক্ষিণ আফ্রিকবাসী ভারতীয়-গণকে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া যে অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন, তাহা গত ১৯১১ সালে তত্রত্য ভারতবাসী ও ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে চুক্তি-নামা হইয়াছিল, তাহার পরিপন্থী হইয়াছে বলিয়া একটী প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে।

শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা প্রচার করিতে আমেরিকা ও গ্রেটব্রিটেনের প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন।

জানা যায় যে, পরিবর্ত্তন বিরোধীগণের প্রায় সকলেই কলিকাতার চুক্তিপত্রে সম্মতি দেওয়া সত্ত্বেও অনেক গোঁড়া পরিবর্ত্তন বিরোধী বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির সভায় এই চুক্তিপত্রের তীব্র সমালোচনা করিবেন। তাঁহাদের অনেকেরই বিশ্বাস যে, মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসে একতা আনিবার জন্য কেবল স্বরাজ্যদলের দাবীতেই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন।

গত সোমবার দিন মহাত্মাজী মৌন ছিলেন, কাজেই তাঁহার সহিত নেতৃবৃন্দের ঐ দিন কোনরূপ আলোচনা হয় নাই। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং অনেক স্বরাজ্য প্রতিনিধি মাদ্রাজ হইতে আগমন করিয়াছেন।

স্বরাজ্যদলের প্রচার কার্য্য

স্বরাজ্যদলের প্রতিনিধিগণ, বিশেষতঃ কর্ণাটকের স্বরাজ্যদল ইতিমধ্যেই তাহাদের সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা কংগ্রেস ক্যাম্পের নিকট এই নিমিত্ত জনসভা করিয়া বক্তৃতাদি দিতেছেন।

দর্শকগণের টিকিট

অভ্যর্থনা সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রকাশিত করিয়াছেন যে, কংগ্রেসের অধিবেশনের সকল সময়ের জন্য দর্শকগণকে গেলারিতে বসিতে হইলে ১৫৲ টাকা দিয়া প্রবেশ টিকিট ক্রয় করিতে হইবে। আর যদি কেবল প্রথম দিনে কংগ্রেস মণ্ডপে প্রবেশ করিতে হয় তাহা হইলে ১০৲ টাকা দিতে হইবে এবং তাহার পরবর্ত্তী প্রত্যেক দিনে ৫৲ টাকা করিয়া দিতে হইবে। মহিলা দর্শকগণকে অধিবেশনের সকল সময়ের প্রবেশ করিবার জন্য ১০৲ টাকা এবং ৭ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাকে কংগ্রেস-মণ্ডপে প্রবেশের জন্য ৫৲ টাকা প্রবেশ মূল্য দিতে হইবে। যে সকল দর্শক ৩০৲ টাকা প্রবেশ মূল্য দিয়াছেন বা দিবেন তাহাদের বসিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে।

বেলগাম প্রদর্শনী

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক উদ্বোধন

গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখ বিহারের প্রসিদ্ধ পরিবর্ত্তন-বিরোধী নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ বেলগামে নিখিল-ভারত জাতীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করেন। উদ্বোধন সভায় মহাত্মা গান্ধী, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজগোপালাচারিয়ার, মৌলানা সৌকৎ আলী, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সত্যমূর্ত্তি, কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পায়া, পুরুষোত্তম দাস টণ্ডন, শিবপ্রসাদ গুপ্ত, এন, সি, কেলকার প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রদর্শনীর উদ্বোধন সময় একটী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, তাঁহাকে এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করিতে আহ্বান করিয়া তাঁহারা বিহারে যে সামান্য খদ্দরের কার্য্য হইতেছে তাহারই প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। এই খদ্দর কার্য্যের উপর দেশের জীবনমরণ সমস্যা নির্ভর করে। তিনি একবার বিহারে কি প্রকার কার্য্য হইতেছে তাহার তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই সময় তিনি জানিতে পারেন যে বিহারের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যদি অন্ততঃ গড়ে ১১ গজ করিয়া খদ্দর প্রস্তুত করিতে হয় তাহা হইলে অন্ততঃ একলক্ষ তাঁতের দরকার। বিহারের মন্ত্রী সার ফকরুদ্দীন বিহারের তাঁত সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করিয়াছিলে তাহার ফলে জানা যায় যে বিহারে মোট আটষট্টি হাজার তাঁতে কাপড় বোনা হইতেছে। তিনি বলেন যে তাঁহারা যদি এই তাঁতের সংখ্যা দ্বিগুণ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা শুধু বিদেশী বস্ত্র নয়, দেশী মিলের কাপড়ও বর্জ্জন করতে সক্ষম হইবেন। অতঃপর তিনি বলেন যে কংগ্রেসের চেষ্টা ছাড়াও দেশে অনেক চরকা চলিতেছে এবং তাহাতে উৎপন্ন সূতাও বাজারে খুব বিক্রীত হইতেছে। কাজেই এই চরকার দ্বারা যে বিদেশী ও মিলের কাপড় যে, সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে পারা যাইবে না এই কথা সত্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। কিছুদিন পূর্ব্বে পাটনাতে যে চরকা প্রতিযোগিতা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, সেখানে প্রতিযোগিতা করিতে যাহারা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাদের অনেকেই বলিয়াছে যে সূতা কাটিয়া তাহারা মাসে ৫৲।৬৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। ভারতবাসীর গড়ে মাসিক আয় মাত্র ২৷০ আনা তাহার তুলনায় সূতা কাটিয়া এই টাকা উপার্জ্জন করা সামান্য ব্যাপার নহে। বিহারে অনেক পরিবারই এই প্রকার সূতা কাটা দ্বারা প্রাপ্ত অর্থে তাহাদের জীবনযাপন করিতেছেন। এই সমস্ত কার্য্য হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে খদ্দর কার্য্য মোটেই লোকসানজনক নহে। খদ্দর কার্য্য পরিচালন কেবল ভাল প্রতিষ্ঠানের অভাবেই বহুল বিস্তৃত হইতেছে না—যাহাতে বিভিন্ন স্থানে তুলার চাষ হয় এবং যাহাতে জনসাধারণ ভাল ভাল চরকা ও তুলা পাইতে পারে তাহার সুবন্দোবস্তের উপর এই কার্য্য নির্ভর করে।

সূতাকাটার মণ্ডপে এক ঘণ্টার জন্য একটী চরকা প্রতিযোগিতা হইবে, এবং সূতার দৈর্ঘ্য এবং সূক্ষ্মতা উভয় বিষয় ৫টী পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

প্রদর্শনীর উল্লেখযোগ্য দ্রব্যাদি

প্রদর্শনীতে যে সমস্ত দ্রব্য দেখান হইয়াছে তাহার মধ্যে কর্ণাটকের সিল্ক সাড়ী খুব উল্লেখযোগ্য, বেগমকোট হইতে মহাত্মার নামাঙ্কিত একখানা সিল্ক সাড়ী আসিয়াছে। সবরমতী আশ্রম ও অন্ধ্র দেশ হইতে আনীত চরকার সূতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্ধ্রদেশ হইতে ৯০ নং এর পর্য্যন্ত সূতা আসিয়াছে মহীশূর ও কোচিন রাজ্য হইতে প্রদর্শনীর জন্য অনেক জিনিষ আসিয়াছে। মহীশূরের সোনালি ও

রূপালি জরির কাজ করা সিল্কের কাপড়সমূহ উল্লেখযোগ্য। মহীশূর গভর্ণমেণ্ট এই প্রদর্শনীতে জিনিস প্রেরণের জন্য ৩০০৲ মঞ্জুর করিয়াছেন। কোচিন রাজ্যের হাতীর দাঁতের ও কাঁসার তৈরী জিনিস উল্লেখযোগ্য। নিখিল ভারত খাদি সঙ্ঘ হইতে নানাপ্রকার খদ্দর প্রদর্শিত হইয়াছে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভা

গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় কলিকাতার চুক্তিপত্র আবার আলোচিত হইয়াছিল। অনেক বাদানুবাদের পর অধিকাংশ সভ্যের ভোটে উহা গৃহীত হয়। মাত্র ১৮ জন সভ্য বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে লালা লাজপৎরায় এবং বল্লভ ভাই পেটেলও ছিলেন।

বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির সভা

নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্য শেষ হইলে, উহা কংগ্রেসের বিষয় নির্ব্বাচনী সভার কার্য্য খুব শান্তভাবে অগ্রসর হয়। সভার প্রারম্ভেই মহাত্মাজী উপস্থিত সভ্যবৃন্দের মধ্যে স্বরাজদল ও পরিবর্ত্তন বিরোধী-দলের সংখ্যা কত, তাহা নির্ণয় করিয়া লন। উভয় দলের সংখ্যা সভাতে প্রায় সমান সমান ছিল। কলিকাতার চুক্তিপত্র নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে গৃহীত হওয়ার দরুণ এবং কংগ্রেসে উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বিষয় নির্ব্বাচনী সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবার জন্য, আলোচিত হয়। মহাত্মা গান্ধি প্রথমেই বলেন যে তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে কংগ্রেসের ভোটাধিকারের সর্ত্ত পরিবর্ত্তন করাতে উহা কংগ্রেসের পক্ষে হানিজনক হইবে বলিয়া অনেকের মনেই একটী ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে কাজেই এই সম্বন্ধে বিষয় নির্ব্বাচনী সভার আলোচনায় তিনি যোগ দিবেন না এবং উপস্থিত সভ্য-বৃন্দকে বিষয়টি স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতে তিনি আহ্বান করিতেছেন। তিনি এই চুক্তিপত্রের ফলে স্বরাজ্যদলেরও যে তাহাদের নিয়মপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করেন। তখন স্বরাজ্যদলের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত দাশ বলেন যে কংগ্রেসের ক্রীড পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। কেবল ভোটাধিকারের সর্ত্তটি পরিবর্ত্তন করিবার কথা উত্থাপিত হইয়াছে। স্বরাজ্যদলের নিয়মপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়া এবং যাহাতে কংগ্রেসের ভোটাধিকারের সর্ত্তের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহাদের নিয়মাদি গঠিত হয়, তিনি সে বিষয়ে চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন।

এই প্রকারে এই সর্ত্ত সম্বন্ধে স্বরাজ্যদলের পক্ষের প্রতিবন্ধক উঠিয়া যাওয়ার বিষয়টির আলোচনা অনেকটা সহজ হইয়া যায়। একজন সভ্য এই বিষয়ে স্ব স্ব দলের নেতাদের সহিত যাহাতে আরও আলোচনা করা যায়, তাহার জন্য সময় প্রার্থনা করেন এবং তদনুযায়ী আর একজন সভ্য সভা স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। অতঃপর অধিকাংশ সভ্যের ভোটে কলিকাতার চুক্তিপত্র গৃহীত হয়। কংগ্রেসে উত্থাপন করিবার জন্য এই চুক্তিপত্র অনুযায়ী প্রস্তাব খসড়া করিতে মহাত্মাজীর সভাপতিত্বে উভয় দলের ১৬জন সভ্য লইয়া একটি সাব কমিটি গঠিত হয়।

সাব-কমিটির কার্য্য

এই কমিটি কলিকাতার চুক্তিপত্র অনুযায়ী যাহাতে সূতা কাটা ও খদ্দরের বহুল প্রচার হয় সেই প্রকার খসড়া করিবেন এবং দেশীয় রাজন্যবর্গকে ও যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই তাহাদিগকে খদ্দর প্রচারে সহায়তা করিবার জন্য আবেদন করিয়া এবং কাপড়ের কলওয়ালাদিগকে, বস্ত্র প্রস্তুত বন্ধ রাখিবার জন্য আবেদন করিয়া আর একটি প্রস্তাবের খসড়া করা হইবে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটী

নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে ৪ ঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীযুত জাহাঙ্গীর পেটিট, লেনিনের মৃত্যু সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি সভায় উপস্থাপিত করেন। শ্রীযুত রামস্বামী আয়াঙ্গার প্রভৃতি কয়েকজন সদস্য প্রস্তাবকারীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, লেনিনের সত্যসত্যই মৃত্যু হইয়াছে কি না? শ্রীযুত পেটিট বলেন:—আপনারা বাঁচিয়া আছেন, ইহা যেমন সত্য, লেনিনের মৃত্যুও তেমনি সত্য। গান্ধ...

সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখে তিনি সত্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন অতঃপর বক্তৃতায় বলেন :—আমি রুসিয়ার শ্রমজীবিসম্প্রদায়ের বন্ধু লেনিনের মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ সূচক এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিতেছি লেনিনের মৃত্যুতে রুসিয়ার যে বিষম ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতে আমাদের সমবেদনার কথা তারযোগে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্টকে জানাইবার জন্য আমি এই কমিটীর প্রেসিডেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীযুত জাহাঙ্গীর পেটিট বলেন যে, মহাত্মা যেমন চরকার প্রচলন দ্বারা ভারতের আর্থিক মুক্তি আনায়নের চেষ্টা করিতেছেন, লেনিন সেইরূপ রুসিয়ার শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতিসাধনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। লেনিন কেবল রুসিয়ার জারের ধ্বংসসাধন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। প্রভুত ধনী মহাজনদের কবল হইতে দুর্ব্বল শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের রক্ষার জন্য ঘোর সংগ্রাম করিয়াছিলেন। জগৎ এখন তাঁহার প্রবর্ত্তিত নীতিগ্রহণে প্রস্তুত না হইলেও সুদূর ভবিষ্যতে তাঁহার নীতি যে জগতের লোক কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইবেই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীযুত অতুলচন্দ্র সেন শ্রীযুত পেটিটের প্রস্তাবের সমর্থন করেন। শ্রীযুত খারে এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আপত্তি প্রকাশ করেন যে মিঃ মণ্টেগু যিনি ভারতের মঙ্গলের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন যখন তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হয় নাই, তখন সুদূর রুসিয়াবাসী লেনিন, যাহার সহিত ভারতের প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্বন্ধই নাই, তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিবার প্রস্তাব এই কমিটীতে উপস্থাপিত করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আরও এই প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হইলে তাহার ভাবীফল শুভকর নহে। মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুত খারের আপত্তি সমর্থন করেন। মূল প্রস্তাবের পক্ষে ৫৪ জন এবং বিপক্ষে ৬৩ জন ভোট দেওয়ায় প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হইল। (দৈনিক বসুমতী ১৪ পৌষ)

মহাত্মার শেষ অভিভাষণ

গত ২৭শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে মহাত্মা এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, সমবেত প্রতিনিধিবর্গ আমার প্রতি যে প্রকার ভালবাসা প্রদর্শন করিয়াছেন ও তাঁহারা যে প্রকার মনোযোগ পূর্ব্বক আমার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা কোন প্রেসিডেণ্টের অদৃষ্টে ঘটে বলিয়া আমি মনে করি না। অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, কংগ্রেস ও বিষয় নির্ব্বাচন কমিটিতে সভাপতিত্ব করিয়া আমি খুবই আনন্দলাভ করিয়াছি। আমি যখন যাহা বলিয়াছি আপনারা তৎক্ষণাৎ তাহাই করিয়াছেন। আমি আপনাদিগকে হাঁটাইতে পারি নাই, আমার জন্য আপনারা দাঁড়াইয়াছেন। আমি আপনাদিগের গমন দ্রুত করিয়া দিয়াছি। আপনারা অধীর হইয়া পড়িয়াছেন আমিও অধীর হইয়াছি। আমাদের স্বরাজ্যের দিকে অভিযান করিয়া যাইতে চাহি।

আমাদের অভিযান মন্থর গতিতে না হইয়া দ্রুত হওয়াই আবশ্যক কাজেই মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট হওয়া সমীচীন নহে, তাই আমি আপনাদের এক মিনিট সময়ও বৃথা নষ্ট করিতে পারি না, তাই আপনাদিগকে এত তাড়াতাড়ি চালাইতে হইয়াছে। আপনারা আমার কথা অনুসারে কাজ করিয়া মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। আমি যাহা চাহিতে পারিয়াছি, আপনারা তাহা প্রদান করিয়াছেন। আমি এক্ষণে আপনাদের নিকট আরও বেশী কিছু চাহিতেছি। আমার প্রতি যে প্রকার উদারতা ও ভালবাসার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার প্রতিও সেই প্রকার ভালবাসা ও উদারতা দেখাইতে আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। সেই জিনিষটী আমার ও আপনাদের সকলেরই আদরের। আমরা তাহারই জন্য একত্র হইয়াছি। সেই জিনিষটী হইতেছে স্বরাজ। আমরা যদি স্বরাজ চাহি, তাহা হইলে আমাদিগকে অবশ্য অবশ্য

স্বরাজের সর্ত্তগুলি

জানিতে হইবে। শ্রীযুত দাশ প্যাক্টসম্পর্কে যে প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই প্রস্তাবে সেই সর্ত্তগুলি বলা হইয়াছে। আপনারা সেইগুলিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন কাজেই আপনারা সর্ত্তগুলি অবগত আছেন। অন্তরে অন্তরে সেই সর্ত্তগুলি প্রতিপালন করিতে আপনারা

চেষ্টা করুন। আপনাদের নিকট আমার এই অনুরোধ অন্ততঃও ইহা পূর্ণ করিতে করিতে বাধ্য করুন। অবশ্য আপনাদিগকে বলপ্রয়োগ করিয়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে বলিতেছি না। আপনার সংবাদপত্র ও তদনুভূত প্রভাব দ্বারা অন্ততঃও এব সর্ত্তগুলি পূর্ণ করিতে বাধ্য করিতে পারেন।

জিলায় জিলায় পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র

খদ্দর প্রচারের

ব্যবস্থা করুন সকলকে খদ্দর, হিন্দু-মুসলমান একতা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সম্পর্কীয় বার্ত্তা শুনাইয়া দিউন এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করুন। যুবক-সম্প্রদায় স্বরাজ সংগ্রামের প্রকৃত সৈনিক। তাহাদিগকে হস্তগত করুন।

বিদ্বেষ ভাব

পরিবর্ত্তনবিরোধী ও স্বরাজ্যদলভুক্ত লোকেরা যদি এখনও পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে, বিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যাভাব পোষণ করেন, তাহা হইলে সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। বিদ্বেষ, ক্রোধ এক কথায় হৃদয়ের সমস্ত কুভাব বর্জ্জন করিয়া সকলে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আপনারা সকলেই এই পবিত্র সঙ্কল্প লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করুন যে, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও আজ আমরা যে বন্ধনে বদ্ধ হইলাম, পরিবর্ত্তনবিরোধী ও স্বরাজ্যদল যে বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, সেই বন্ধন কিছুতেই ছিন্ন হইবে না।

ধন্যবাদ প্রদান

অতঃপর মহাত্মা গান্ধী অভ্যর্থনা সমিতির প্রত্যেক সদস্য, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর নায়ক ডাক্তার হার্দ্দিকর প্রভৃতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এই বৎসরের জন্য কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ করেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

পণ্ডিত মতিলাল নেহারু সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে উঠিয়া এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, আমি আশা করি, প্রত্যেক লোক, তা তিনি স্বরাজ্য দলভুক্তই হউন বা পরিবর্ত্তনবিরোধীই হউন প্যাক্ট অনুসারে কাজ করুন।

বিষয় নির্ব্বাচন কমিটি

বেলগাঁওয়ের ২৭শে ডিসেম্বরের সংবাদপত্রের সংবাদে প্রকাশ, গত রাত্রে কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচন কমিটির শেষ হইয়াছে। আজ কংগ্রেসে যে যে প্রস্তাব উপস্থিত হইবে, তাহা সমস্তই স্থির হইয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচারক ও প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া ভারতের দুঃখ দুর্দ্দশা, অভাব অভিযোগ তদ্দেশবাসীগণকে অবগত করান, লোকাল ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডসমূহ কংগ্রেস সেবকগণ কর্ত্তৃক অধিকার ও রাজনৈতিক বন্দীদের বিধবা ও আত্মীয়বর্গকে সাহায্য প্রদান—এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী পরামর্শ দেন যে, কলিকাতায় চুক্তি যেন এত শীঘ্র লঙ্ঘন করা না হয়, এই কারণ এই বিষয়গুলি নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির হস্তে শেষ মীমাংসার জন্য দেওয়া হয়।

বেলগাঁওয়ের পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, কংগ্রেস শেষ হইবার কয়েক মিনিট পরই বিষয় নির্ব্বাচন কমিটীর অধিবেশন হয়। ঐ সময় কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর ও কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনের সম্বন্ধে আলোচনা হয়, স্থির হয় যে, সেক্রেটারীদের মধ্যে একজন অন্ততঃ স্বরাজী থাকিবে। মহাত্মা গান্ধী ইহাতে সম্মতি জানান, তবে সেই স্বরাজীর খদ্দরে পূর্ণবিশ্বাস থাকা চাই। সিংহল বৌদ্ধ সভার প্রতিনিধি মিঃ পেরেরিয়া অতঃপর বক্তৃতা করিয়া বলেন, গয়ার বুদ্ধগয়া-মন্দির বৌদ্ধদের অধিকারে আনা দরকার। তাঁহার প্রস্তাবে বিষয় নির্ব্বাচন কমিটীর অধিকাংশ সভ্য সম্মত হন এবং হিন্দুদিগকে এ বিষয়ে বৌদ্ধদিগের সহিত যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু বিষয়-নির্ব্বাচন কমিটি বুদ্ধগয়া সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু জানেন না বলিয়া বিষয়টির অনুসন্ধান ভার তাঁহারা নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর উপর স্থাপন করেন। কমিটী আশা করেন যে, হিন্দু মহাসভা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এই দাবীর প্রতি সহানুভূতিসূচক দৃষ্টি করিবেন। মিঃ সত্যমূর্ত্তি প্রস্তাব করেন যে ১৯২৫ সাল হইতে কংগ্রেসের গঠন

হইতে যেন গ্রেটবৃটেনে ভারতের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতীকারার্থ কল্পে আন্দোলন করা হয় এবং কংগ্রেসের পক্ষ হইতে একটী "পাবলিসিটি বুরো" বা সংবাদ প্রকাশক সমিতি স্থাপন করিয়া বিদেশে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কিরূপ প্রচারিত হইতেছে, তাহা জানান হয় এবং কংগ্রেসের কার্য্যকরী কমিটী যেন এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করেন। মহাত্মা গান্ধী বলেন, এ প্রস্তাব একবৎসরের জন্য স্থগিত রাখা হউক; কিন্তু মিঃ সত্যমূর্ত্তি বলেন, স্বরাজ্যদল ও মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে যখন গ্রেটবৃটেনে ও আমেরিকার প্রবল আন্দোলন চলিতেছে, এ সময় ভারতীয় কংগ্রেসের চুপ করিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। অবশ্য যদি ভারতের অনুকূলে বক্তৃতা ও প্রচার করার দরকার না হইত, তবে কিন্তু তিনি কখনও এরূপ প্রস্তাব করিতেন না, তিনি স্পষ্টতঃ দেখিতে পারিতেছেন যে, বিদেশে এখন প্রচার করা দরকার। ইজিপ্ট, রুসিয়া আয়ারলণ্ড এবং অন্যান্য যে সমস্ত দেশ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, তাহারা মার্কিণে প্রচারের জন্য তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেছে ভারত কেন তাহা করিবে না? আবেদনের নিবেদনের ঝুলি স্কন্ধে দিয়া ডেপুটেশন পাঠাইতে তিনি রাজী নন, তবে এ সময়ে বিদেশে ভারতীয় প্রতিনিধি না পাঠাইলে ভারতের সমূহ ক্ষতি হইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি এই প্রস্তাব করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রামদাস এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

মহাত্মা গান্ধী

বলেন, তাঁহার মনে হয়, এই প্রস্তাব উপস্থাপিত ও পাশ হইলে তাঁহার কার্য্য পদ্ধতি নষ্ট হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া এ বিষয়ে তিনি কোনপ্রকার বাদানুবাদ করিতে চান না। প্রস্তাবটি তখন ভোটে উপস্থিত করা হয়, প্রস্তাবটির স্বপক্ষে ৫৫ জন আর বিপক্ষে ৫৬ জন ভোট দেওয়ায় প্রস্তাবটি বাতিল হয়। মহাত্মা সত্যমূর্ত্তিকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন আবার এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করিবার জন্য পীড়াপীড়ি না করেন। অতঃপর মহাত্মা গান্ধী বলেন, স্বরাজ্যদল বিদেশে প্রচারকার্য্য চালাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব সেজন্য তাঁহারা কংগ্রেসের অনুমতি গ্রহণ করিবেন। মহাত্মার নিকট হইতে এই আশা ও আশ্বাস পাইয়া সত্যমূর্ত্তি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন, এই সময়ে কয়েকজন সদস্য বলেন যে, এই কমিটীতে এমন কয়েকজন লোক রহিয়াছেন, যাঁহারা বিষয়নির্ব্বাচন কমিটীর সদস্য নহে। ইত্যবসরে আরও কতকগুলি সভ্য আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং মিঃ সত্যমূর্ত্তির প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট লওয়ায় দেখা যায় যে, প্রস্তাবটির স্বপক্ষে ৫৯ জন আর বিপক্ষে ৬৫ জন। বিষয় নির্ব্বাচন কমিটীর নিয়ম এই যে, যদি কোন প্রস্তাব বিষয় নির্ব্বাচন কমিটীতে আলোচিত হওয়ার পর দেখা যায় যে, প্রস্তাবটির স্বপক্ষে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ সদস্য মত দিয়াছেন, তখন সেই প্রস্তাবটি প্রকাশ্য কংগ্রেসে উপস্থিত করা যাইতে পারে। তদনুসারে মিঃ সত্যমূর্ত্তি মহাত্মা গান্ধীর অনুমতি চান, মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে আরও এক বৎসরকাল অপেক্ষা করিতে বলেন।

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ

কলিকাতায় তাঁহার সহিত মহাত্মার যে মিলনচুক্তি হইয়াছে, সেই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে দাশ মহাশয় বলেন, তিনি কখনও কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। যদি দিল্লী ও কোকনদে উভয়দলে মিটমাট হইয়াছিল, তবুও তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, স্থায়ী মিলন তখনই হইবে, যখন মহাত্মা গান্ধী মনে প্রাণে স্বরাজ্যদলের কার্য্যনীতি বুঝিতে পারিবেন। ব্যুরোক্রেশী আজ বাঙ্গালা দেশে বে-আইনী আইন প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতবাসীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যুরোক্রেশীর এই আবেদনের কি উত্তর দিবেন? বিদেশী দ্রব্য বয়কটই — এ আহ্বানের প্রত্যুত্তর দেওয়ার একমাত্র উপায়। ব্যুরোক্রেশী আশা করিয়াছিলেন যে, বেলগাঁওয়ে স্বরাজ্যদলে ও মহাত্মা গান্ধীর দলে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা, দ্বন্দ্ব-কলহ হইবে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তাহা হইতে দেন নাই। তিনি (দাশ মহাশয়) গঠনমূলক কার্য্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই গঠনমূলক কার্য্যের শিকড় উন্মূলিত করিবার অবকাশ শত্রুকে দিতে চাহেন না (করতালি)। ব্যবস্থাপক সভার অস্তিত্ব রাখা তাঁহাদের স্বরাজলাভের প্রতিবন্ধক বলিয়াই মনে করেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভা ধ্বংস করিতে ও মিউনিসিপ্যালিটী, জিলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতি অধিকার করাও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন।
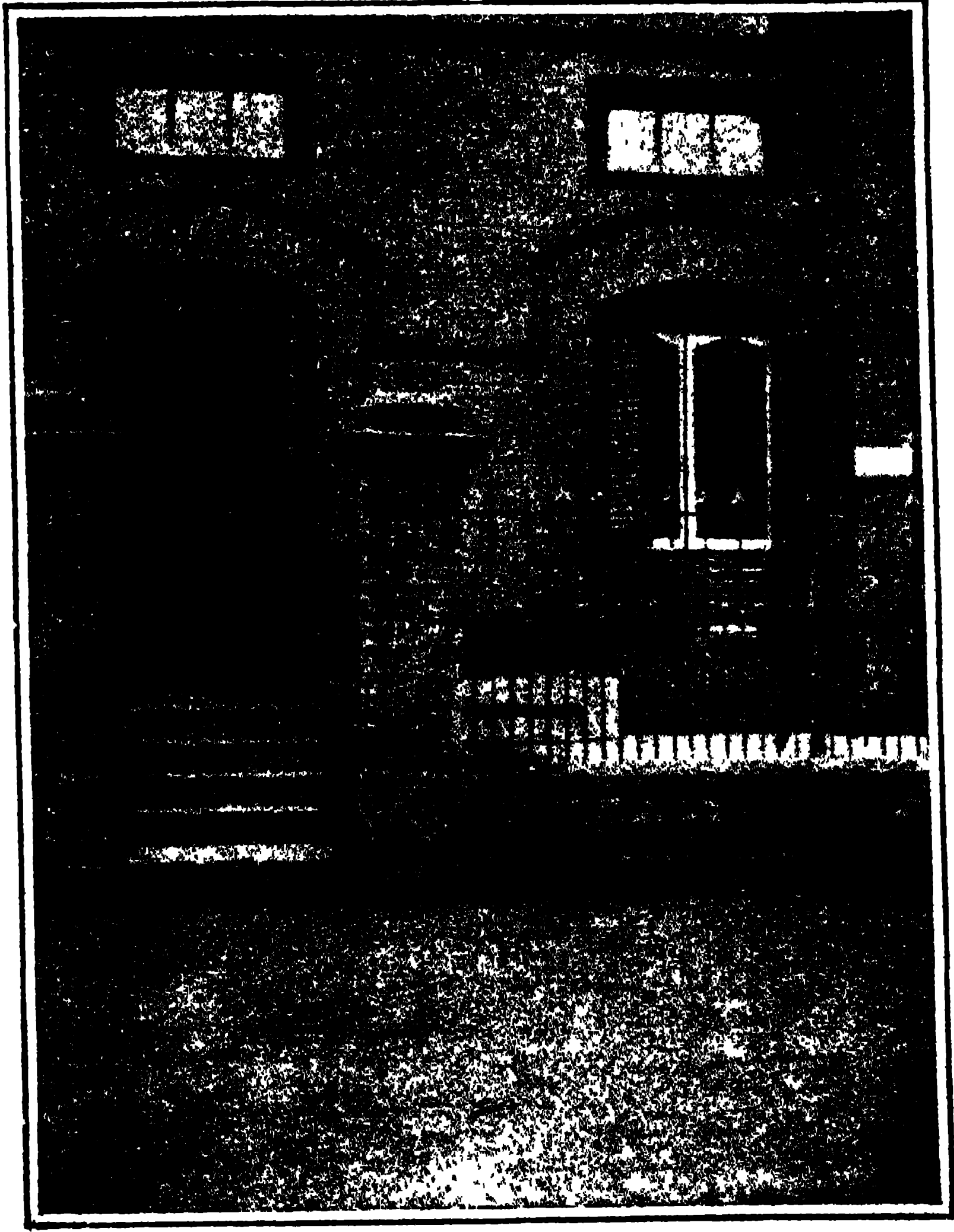
হাঁসপাতালে রজনীকান্ত

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কটেজ ওয়ার্ড।

(এইখানেই কবি রজনীকান্ত সুদীর্ঘ ৮ মাস কাল শয্যাশায়ী থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।)

আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও তাহাদের পরলোকগতা জননী

অনেকে মনে করেন, ব্যবস্থাপক সভার কাজই বুঝি স্বরাজ্য দলের প্রধানতম কাজ ; কিন্তু তাহা নহে, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার ধ্বংসকারীরাই কার্য্যান্তে সভার সহিত সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিবেন। তিনি এ বিশ্বাস করেন যে, চরকার দ্বারা পল্লীগ্রামের লোকেদের যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হইবে। আজ ভারতের ত্রিশ কোটী লোককে দেড় লক্ষ মাত্র ইংরেজ ক্রীতদাস করিয়া রাখিয়াছে, ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে! তিনি আশা করেন, প্রত্যেক লোকেই চরকায় সুতা কাটিবে এবং একটি সভাও, চরকা কাটিতে অনিচ্ছুক স্বরাজীরা কিনিতে পারিবে না (হাস্যধ্বনি)। উপসংহারে দাশ মহাশয় সকলের নিকট নিবেদন করিয়া বলেন, আগামী মাঘমাস ধরিয়া যেন সকলে "খাদী কী জয়" ধ্বনি করেন।

মৌলানা হসরৎ মোহানী

বলেন, তিনি যদিও স্বরাজ্যদলের একজন সভ্য, তথাচ তিনি দাশ মহাশয়ের এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছেন, ইহাতে যদি তাঁহাকে কংগ্রেস হইতে বাহির করিতে দেওয়া হয়, তাহাতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইবেন না। যখন অসহযোগকে ত্যাগ করা হইয়াছে, তখন স্বরাজীই হউন, আর পরিবর্ত্তনবিরোধী হউন, কাহারও কোকনদের পর কোন রাজনৈতিক কার্য্যপদ্ধতি নাই। কাজেই চরকায় সুতা কাটিলে অথবা চরকার সুতা দিলে কংগ্রেসের সভ্য হওয়া যাইবে, এরূপ কোন নিয়মের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। তিনি সকলকে এই কথা স্মরণ করিতে বলেন যে, বর্দোলির কথা নয়, মহাত্মা গান্ধী "বয়কটের" প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, অসহযোগই স্বরাজ আনয়ন করিবে ; এক্ষণে মহাত্মা গান্ধী নিজের অভিমতের বিরুদ্ধেই কাজ করিতেছেন। তিনি স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছেন যে, কংগ্রেস একটা সুতাকাটার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কাজেই কংগ্রেসে ভোট দিয়া কোনই লাভ নাই। একদিকে পরিবর্ত্তনবিরোধীরা মহাত্মার নেতৃত্ব ছাড়িতে চাহেন না। পক্ষান্তরে দাশ মহাশয় তাঁহার অনুচরদিগকে গোপনে গোপনে "চুক্তি"র স্বপক্ষে ভোট দিতে বলিয়াছেন। আরও অন্যান্য কথা বলিবার পর তিনি বলেন, ইহাতে কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা কমিবে। তিনি প্রতিনিধিগণকে সতর্ক করিয়া বলেন, কলিকাতা চুক্তির স্বপক্ষে ভোট দিলে কংগ্রেসের সমাধির স্বপক্ষেই ভোট দেওয়া হইবে।

মৌলানা আজাদ শোভানী

কলিকাতা চুক্তির প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, স্বরাজীদের এখনও উদীয়মান প্রভাবের অবস্থা আসিলেও মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ স্থগিত না করিয়াও তাঁহাদিগকে স্বমতে আনিতে পারিতেন না। তিনি ইচ্ছা করিলে স্বরাজীদিগকে কংগ্রেসের একটি পূর্ণ অংশ বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারিতেন। মৌলানা সাহেব চুক্তির মধ্যে যেখানে বাঙ্গালার দমননীতির কথা আছে, সেই অংশটুকুর সমর্থন করেন।

মিঃ কোরেসী

বলেন, তিনি বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে এই প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ভোট দিলেও প্রকাশ্য কংগ্রেসে ইহা সমর্থন করিতেছেন।

মিঃ এন্. সি. কেলকার

মারাঠীভাষায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, তাঁহারা সরকারের যেটুকু ভাল সেটুকু গ্রহণ করিবেন আর যেটুকু মন্দ, সেটুকুর প্রতিবাদ করিবেন কাজেই তিনি কলিকাতা চুক্তির সমর্থন করিতেছেন। মহাত্মা সম্বন্ধে তিনি বলেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন।

মিঃ অভয়ঙ্কর

বলেন, মৌলানা মহম্মদ আলী স্বরাজীদের প্রতি অনেক আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, দেশবন্ধু ব্যবস্থাপক সভার অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, স্বরাজ ওপথে লাভ হইবে না। তাই তিনি এখন চরকায় বিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি মহম্মদ আলীকে জিজ্ঞাসা করিতে চান, দাশ মহাশয় চরকায় কবে অবিশ্বাসী ছিলেন? বক্তা বলেন, তাঁহার (বক্তার) চরকায় বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই, তিনি নাগপুরে মহাত্মা গান্ধীর এই চরকাবাদের প্রতিবাদও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালীর কখনও বিরুদ্ধতাচরণ করেন নাই। বৃটিশজাতি যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখনও

ভারতে চরকা ছিল, ঘরে ঘরে চরকা চলিত, কিন্তু তাহাতে বৃটিশের আগমন বন্ধ হয় নাই। কাজেই চরকার দ্বারা স্বরাজলাভ হইবে না। গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক সভা ছাড়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। এই ব্যবস্থাপক সভার বলেই আজ বৃটিশশক্তি শাসনকার্য্য চালাইতেছেন। স্বরাজ্যদল এই ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি আশা করেন, স্বরাজ্যদল ও পরিবর্ত্তন-বিরোধীদল—এই উভয়দলই আজ কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করিবেন এবং পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবেন।

স্বামী গোবিন্দজী

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন এবং বলেন, জনসাধারণ মাত্রেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিবে। তাঁহার বিশ্বাস, শুধু আইনভঙ্গের দ্বারা দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

মহাত্মা গান্ধী

এই সময়ে বলিলেন, তিনি এই প্রস্তাবের বিপক্ষে বলিবার জন্য সকলকেই অবসর দিয়াছেন, আর দিতে পারেন না। তখন —

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু

হিন্দী ভাষায় একটি বক্তৃতা করিয়া বলেন, স্বরাজ্যদলের যে কেহ যে কোন মত প্রকাশ করুন না কেন, স্বরাজ্যদল আপন কথার সম্মান ও মর্য্যাদা রাখিবার জন্য খদ্দর প্রচার করিবে। তিনি আরও বলেন, মহাত্মা গান্ধী অসহযোগকে পরিত্যাগ করেন নাই কিম্বা স্থগিতও রাখেন নাই। তবে দেশ এখন অসহযোগে প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া তিনি অসহযোগ সমস্যা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন তিনি বলেন, হসরৎ মোহানী যখন বলিয়াছেন যে, বৃটিশ জাতি যখন প্রত্যহ ১৫ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া জার্ম্মাণ জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, তবে তাঁহারা কাপড়ের জন্য ভারত হইতে ১৫ কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হইলেও তাঁহাদের বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। তিনি হসরৎ মোহানীর এই উক্তির প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, এই খদ্দরের দ্বারা ভারতের জনসাধারণ উপকৃত হইবে। তবে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় একমাত্র চরকায় তাঁহার অকপট ও দৃঢ়বিশ্বাস নাই। তবে এই সূতা কাটার নিয়ম কেবল এক বৎসর অর্থাৎ বার মাসের জন্য প্রযুক্ত হইতেছে। এক বৎসর পরে ইহার আবার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারিবে।

সকলকে ভেদাভেদ ভুলিয়া কাজ করিতে অনুরোধ করেন। প্রস্তাবটি ভোটে উঠাইবার পূর্ব্বে বলেন, তিনি আরও অনেক স্বরাজীকে বক্তৃতা করিতে দিবার অধিকার দিয়াছেন, কারণ অনেক পরিবর্ত্তনবিরোধী স্বরাজীদিগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। তাঁহারা স্বরাজীদের নিকট হইতে যে প্রতিশ্রুতি জানিতে চাহেন, সে প্রতিশ্রুতি দেশবন্ধু দাশ ও নেহরু দিয়াছেন। উপসংহারে তিনি কংগ্রেসের এই দুই শাখাকে একত্রে কাজ করিতে বলেন এবং ভগবানকে সাক্ষী রাখিয়াও হৃদয়ে অকপট বিশ্বাস লইয়া কাজ করিয়া যাইতে সকলকে অনুরোধ করেন। যদি কোন দল কোন নীতিতে বিশ্বাসপরায়ণ না হইয়া ভোট দেন, তবে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন। তাঁহারা উভয় দলে অবশ্য মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবেন। তারপর প্রস্তাবটি উপস্থিত করা হয় এবং সকলে করতালি দিয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। অতঃপর সে দিনের মত কংগ্রেসের কার্য্য শেষ হয়।

আগামী বর্ষের কংগ্রেস

বেলগাও, ২৮শে ডিসেম্বর নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটীর অদ্যকার অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইল যে, আগামী বৎসরে কানপুর সহরে জাতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসমিতির (কংগ্রেসের) অধিবেশন হইবে। পূর্ব্বে স্থির করা হইয়াছিল যে, কয়েকটি প্রদেশের ভিতর সূতাকাটা সম্বন্ধে প্রতিযোগিতার পরীক্ষার পর কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান নির্ণীত হইবে। এক্ষণে কানপুরে অধিবেশন হইবে স্থির হওয়াতে সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইল।

সাহিত্যে সমালোচনার স্থান

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম্-এ ।

সাহিত্য বলিতে গেলে যদি সত্যকার সাহিত্য বুঝায়, শুধু খানকয়েক মুদ্রিত পৃষ্ঠা বা রঙিন মলাটে বাঁধান, চিত্রবহুল, ভাব ও ভাষাহীন বা কদর্য্যভাব কদর্য্যভাষায় ব্যক্ত একখানি পুস্তক না বুঝাইয়া যাহাতে উৎকৃষ্ট মনের ভাব উৎকৃষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে এমন গদ্য বা পদ্যরচনা বা নাটক বুঝায়, তাহা হইলে নিরপেক্ষ, নির্ভীক ও যথোচিত সমালোচনার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যেমন কয়েকখানি ছাপান কাগজকে সাহিত্য নামে অভিহিত করা যায় না, সেইরূপ কতকগুলি কটূক্তি গালিগালাজকেও সমালোচনা বলা চলেনা। সমালোচনা কার্য্য বড় সহজ নহে। কবিকে বুঝিতে গেলে কতককটা কবির চক্ষে দেখিতে হইবে, কবির ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, কবি কি বলিতেছেন, কেন এবং কিরূপ ভাবে বলিতেছেন ও কতদূর বলিতে পারিয়াছেন তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। Canons of criticism বলিতে ইহাই বুঝায়। প্রথমেই রচনার বিষয়টির সমালোচনা করিতে হইবে। বিষয়টির সম্বন্ধে আলোচনা রচয়িতার উচিত হইয়াছে কিনা, একপ আলোচনা ইতঃপূর্ব্বে কেহ করিয়াছেন কিনা, আলোচ্য রচনা পূর্ব্বতন লেখকদ্বারা কতদূর অনুপ্রাণিত হইয়াছে, ইহার মৌলিকত্ব আছে কিনা, একপ আলোচ্য বিষয় সাহিত্যজগতে ও মানবসমাজে সুফল বা কুফল প্রসব করিবে কি না, যে ভাষায় বা ছন্দে ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার বিশেষত্ব, সৌন্দর্য্য, মৌলিকত্ব, দোষ গুণ কি কি, ভাবটি ঠিক পরিস্ফুট হইয়াছে কিনা,- এ সমস্তই সমালোচককে নিরপেক্ষ-ভাবে দেখাইতে হইবে। সমালোচক হইতে গেলে সাধারণ সাহিত্যের উপর একটা দখল থাকা প্রয়োজন, শুধু বর্ত্তমান জাতীয়সাহিত্য নহে, অতীত ও বিদেশীয় সাহিত্যের সহিতও কিছু কিছু পরিচয় থাকা প্রয়োজন। মনের ভাব ও ভাষার উপর কতকটা দখল থাকিলে কবি হওয়া যায়, কিন্তু সমালোচক হওয়া যায় না। সমালোচকের জ্ঞান ও সমদৃষ্টি এক হিসাবে কবির অপেক্ষা অধিক হওয়া প্রয়োজন।

তাই বলিয়া কবির স্থান সমালোচকের নিম্নে কিংবা সমালোচক কবির সৃষ্টিকর্ত্তা একথা কেহ যেন মনে না করেন। সত্যকার কবির স্থান সমালোচকের অনেক উর্দ্ধে। Newton বা Galileoর স্থান কি একজন সাধারণ Mechnicএর বহু উচ্চে নহে? Shakespeare বা কালিদাস কি Johnson বা দণ্ডীর অপেক্ষা বড় নহেন? সুন্দর কাব্য বা নাটক রচনা করা অল্পসংখ্যক ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটে, কিন্তু পাণ্ডিত্য ও সমদৃষ্টি থাকিলে সমালোচক অনেকেই হইতে পারেন। প্রকৃত কবি বা দার্শনিক হইতে গেলে যে অনুপ্রেরণার আবশ্যক, সমালোচক হইতে গেলে তাহার আবশ্যক হয় না। সাধারণ জ্ঞান ও সমদৃষ্টি সমালোচকের প্রধান উপাদান। এই দুইটি উপাদান চেষ্টা করিলে আয়ত্ত করা যায়, কিন্তু কবির চক্ষু, কবির মন, কবির ধ্যান-ধারণা জন্মগত সংস্কারের ন্যায় সহস্র চেষ্টাতেও গড়া যায় না। "A poet is born, not made, a poem is not made but grows" সাধারণ লোক চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইয়া চলে, মুখ থাকিতেও তাহার কথা ফুটে না, কাণ থাকিতেও শুনিতে পায় না; তাই প্রকৃতির স্বরূপ, মানুষের মনের ভাব, সাধারণ বস্তুতে অসাধারণ সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করা তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। ভগবৎপ্রদত্ত শক্তি না থাকিলে তাহার রাজ্যে অণুপরমাণুতে অনন্ত সৌন্দর্য্য, অফুরন্ত আনন্দ ও অসামান্য শক্তি দেখা যায় না। এরূপভাবে জীবকে জগৎকে দেখিবার শক্তি মানুষ দিতে পারে না। তবে ভগবানের দেওয়া এই শক্তির উন্নতিসাধন করা মানুষের হাতে। একপ শক্তিমান্ ব্যক্তিগণ যাহাতে বিধিদত্ত শক্তির যথোচিত প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহা দেখাই সমালোচকের কার্য্য। রথ কোন্ পথ দিয়া কিরূপভাবে গেলে ক্ষতি না করিয়া উপকার করিবে তাহা দেখা, রথ সৃষ্টি করা নহে।

এখন কথা হইতেছে—সমালোচনার অভাবে সাহিত্যের বিকাশ হয় কি না। কোন্ কোন্ সমালোচকের প্রভাবে বাল্মীকি, Homer, Shakespeare, Euripedes, Dante, Moliere, Cervantes, Goethe প্রভৃতি

গড়িয়া উঠিয়াছিলেন? যখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে একচ্ছত্র হিন্দুসম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের সভায় বাগ্‌দেবীর বরপুত্র মনোহর কাব্যরচনায় ভারত মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তখন কোন্ সমালোচক তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছিলেন? আবার যখন জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি পদাবলী রচনা করিয়া মধ্যযুগে ভারতভূমিকে ধন্য করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশে ভাবের প্রস্রবণ ছুটাইয়াছিলেন, এবং ভাব, ভাষা ও রসের ত্রিবেণী সঙ্গম করাইয়াছিলেন, তখন কোন্ সাহিত্যাচার্য্য তাঁহাদের লেখনী পরিচালিত করিয়াছিলেন? আবার আধুনিক কালে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যসেবিগণ যে অমূল্য রত্নদানে বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা কাহার অনুপ্রেরণায় কলম ধরিয়াছিলেন? "Criticএর কড়া ছাঁচে" কি রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, গিরিশের কবিতা বাঁচিত। Classical unities মানিলে কি Shakespeare, Spenserএর সৃষ্টি হইত? বস্তুতঃ এসমস্ত প্রশ্ন মনে হইলে বলিতে ইচ্ছা হয় সাহিত্যের উপর সমালোচনার আধিপত্য বেশী নহে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, উল্লিখিত ক্ষেত্র গুলিতে সমালোচনা বিশেষ কোন কার্য্য না করিলেও সব সময় তাহাকে একেবারে ছাটিয়া ফেলা যায় না। সব দেশেই এক একটা Creative Epoch বা সাহিত্যসৃষ্টির যুগ আসে। যেমন বসন্তের সাড়া পাইলেই প্রকৃতির এক অপরূপ রূপ খুলিয়া যায়, সেইরূপ এই সব Creative Epochএ এমন একটা ভাবের বন্যা বহিয়া যায় যাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া সাহিত্যের মুখ খুলিয়া যায়। তখন যেন গিরিকন্দর হইতে নির্ঝর বহুদিনের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উদ্দামবেগে ছুটিয়া চলে। এই বন্যার সময় অনেক অসার রচনাও উঠে। "রুই কাৎলা"র সহিত অনেক "চুনোপুঁটি"ও ডাঙ্গায় উঠে। বন্যার বেগ একটু কমিলেই এই দুই শ্রেণীর রচনা পৃথক করিতে হইবে। ইহাই সমালোচকের কার্য্য। সমালোচনার অভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক "আগাছার" সৃষ্টি হইবে। এই "আগাছা"গুলিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফলবান্ বৃক্ষ ও ওষধিগণকে যত্ন করাই সমালোচকের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য।

বহুকারণের সমাবেশে যুগে যুগে সৎসাহিত্যের সৃষ্টি হয়। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা মেলে না। পণ্ডিতাগ্রগণ্য Saintsburyর মতে, * ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে পাঁচটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের যুগ আছে। এরূপ প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের যুগ একবার গ্রীসে, the great age of Greek literature from Aeschylus to Plato) একবার ইটালিতে ('the whole range of Italian literature from Dante to Ariosto'), একবার ফ্রান্সে (খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে) এবং দুইবার ইংলণ্ডে (একবার Elizabethan যুগে আর একবার ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অর্থাৎ Coleridge হইতে Keatsএর রচনাকালে আসিয়াছিল। Elizabethএর সময় যে সাহিত্য ইংলণ্ডে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা বোধহয় এই পাঁচটির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এখন Elizabethএর সময় ইংরেজি সাহিত্যের অসাধারণ উন্নতির কারণ একটি নহে। Europeএর পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবজাগরণের (Renaissance) ফল, ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র স্কুল কলেজে স্থাপন ও তাহাদের সহিত রাজকীয় সহানুভূতি, দেশে বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রচুর ধনাগম, ইংরেজগণের বিদেশ ভ্রমণ, পুরাতন গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যের চর্চ্চা, Hall, Holinshed প্রভৃতি কর্ত্তৃক ইংলণ্ডের পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান, Bibleএর প্রচলন এবং সর্ব্বোপরি বহিঃশত্রুর পরাভবে (Defeat of the Spanish Armada) জাতীয় উল্লাস, তাহার ফলে জাতীয় একতা ও জাতীয় শক্তির বিকাশ—সবগুলি একত্র হইয়া তবে অমন সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই সাহিত্যের আবার যখন অবনতি ঘটিল, তখন সমালোচনার প্রয়োজন আসিল। Dryden, Pope তাই সমালোচক-কবি। তাঁহারা দেখিলেন যে, আদর্শের অভাবে সাহিত্য মাত্র নামে পরিণত হইয়াছে। তাই Classical আদর্শ খাড়া করিয়া তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার অনুকরণে তাঁহারা কবিতা রচনা করিলেন। এইজন্য তাঁহাদের সাহিত্যযুগের একটি নাম Critical period of English literature। ইহাকে Classical ageও বলা যাইতে

* Elizabethan literature (1913) P. 458

পারে। আবার সাদৃশ্য দেখিয়া কেহ কেহ ইহাকে Augustan age of English literature বলিয়াছেন। নাম যাই হউক না কেন, এ যুগের বিশেষত্ব এই যে পুরাতন লাটিন এবং গ্রীক কবিদের গাম্ভীর্য্য এবং সরলতা দেখিয়া এবং ফ্রান্সের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সাহিত্যে ভাবের সরলতা ও কলাকৌশল দেখিয়া এ যুগের লেখকগণ নূতনভাবে সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। আবার ক্রমশঃ অনুকরণেরও অনুকরণের ফলে এবং মৌলিকত্বের একান্ত অভাবে যখন এই সাহিত্যের পুনরায় অবনতি ঘটিল, যখন কাব্য শুধু ছন্দে ও বাক্যচ্ছটায় পরিণত হইল (২) ও সাহিত্য গ্লানি ও নিন্দাবাদে পর্য্যবসিত হইল,(৩) যখন কবিগণ মানবহৃদয় এবং প্রকৃতির স্বরূপ ভুলিয়া যাহা তাহা লিখিয়া সাহিত্যের নামে প্রচার করিতে লাগিলেন,—তখন Wordsworth প্রমুখ কবিরা সাহিত্যের গতি অন্যদিকে ফিরাইয়া দিয়া নূতন আদর্শে নূতনভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন। Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, Byron, Scott প্রভৃতির রচনা ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তর আনয়ন করিল। বদ্ধডোবাগোদকের পরিবর্ত্তে সত্যকার কাব্যের নদনদীতে অবগাহন করিয়া আবার পাঠকবর্গ পুলকিত হইল। ইহাদের সকলেই এক একজন বড় কবি, তবে তাঁহাদের রচনার ভিতরও ইতরবিশেষ আছে। সকলেই সমভাবে আদর্শকে সম্মুখে ধরিতে পারেন নাই। সত্যকার আদর্শ সমাজের সম্মুখে ধরিতে পারেন নাই বলিয়াই বোধ হয় Byronএর কবিত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না (৪)। *Childe Harold, Don Juan* এখনও পঠিত হয়, আনন্দ দান করে, তবে Byronএর প্রতি সেরূপ ভক্তি, তাঁহার রচনা পড়িবার জন্য সেই সেরূপ আগ্রহ বোধ হয় বর্ত্তমান যুগের পাঠকের আর নাই (৫)। বস্তুত; সত্যকার আদর্শ, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, বিশ্বজনীন ভাব, প্রকৃতির সহিত সহানুভূতি, মানবচরিত্র সম্বন্ধীয় যথার্থ জ্ঞান এবং হাস্য ও করুণ রসের যথাযথ সমাবেশ করিবার শক্তি, এগুলি না থাকিলে বড় কবি—জগতের কবি—হওয়া যায় না। উপন্যাস বা নাটক রচনা করিতে গেলে শুধু গল্পের মাধুর্য্যে মুগ্ধ করিলে হইবে না, তাহাতে Art দেখাইতে হইবে, মানবচরিত্রের যথার্থ চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে, সে ভাবের ও আদর্শের প্রচার হইলে দেশের ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন হইবে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, নচেৎ তাহার স্থায়িত্ব দীর্ঘ হইবে না। হাউই বা তুবড়ী ক্ষণেকের জন্য চক্ষু ধাঁধাইয়া চিরকালের জন্য আঁধারে ডুবিয়া যায়, প্রদীপ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া জ্বলে, কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য যুগ যুগান্তর ধরিয়া সমভাবেই আলোক, জীবন ও আনন্দ দান করিয়া আসিতেছে। সাহিত্য গগণেও ও চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় কতকগুলি জ্যোতিষ্ক আছেন, তাঁহারা কখনই ম্লান হ'ন নাই, হইবেন না, হইবার নহেন। বাল্মীকি, Homer, কালিদাস বা Shakespeare এই শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক। আজ বিংশ শতাব্দীতেও আমরা পুত্রশোকে দশরথের ন্যায় কাঁদি, সন্তানের নিকট হইতে অকৃতজ্ঞতা দেখিলে Learএর ন্যায় পাগল হই, Ulysses ও Nestor এর বুদ্ধিমত্তা কিংবা Achillesএর বীরত্ব ও মহাপ্রাণতা দর্শনে আজও চমৎকৃত হই, আজও অজের শোকপ্রকাশ, কণ্বের সন্তানবাৎসল্যজনিত চিত্তচাঞ্চল্য বা শকুন্তলার বিরহ যাতনা দেখিয়া আত্মহারা হই; দেশ কাল পাত্র

২, 'English Poetry" remarks Mr Barchell (in Goldsmith's Vicar of Wakefield) "like that in the later Empire of Rome, is nothing at present but a combination of luxuriant images, without plot or connection, a string of epithets that inprove the sound, without carrying on the sense"

3, 'Our "Augustan Age" was an age of unbridled slander. Personalities were sent to and for like shots in battle' Stafford Brooke, English literature (১৯০১) page 122.

4 (Matthew Arnolds Essays in briticism First Series দ্রষ্টব্য)

5. (Byron সম্বন্ধে Saintsbury একস্থানে বলিয়াছেন "when the first rush of rocket was over, the fall began at once and has been though not as rapid, almost as uninturrupted as the simile suggests." [A history of English literature (1913,) Page 668]

ভুলিয়া মনে করি যেন কাব্য বা নাটকের পাত্র-পাত্রীর সহিত বিচরণ করিতেছি।

ইহার কারণ আর কিছুই নহে, শুধু এই যে, এই সকল অমর কবি মনুষ্য হৃদয়ের এমন তন্ত্রীগুলিতে আঘাত করিয়াছেন যাহাতে সকলের হৃদয়েই আঘাত লাগে। একটি সুরে ঘা পড়িলে বাকী গুলিতেও তাহার স্পন্দন পৌছাইবে। Ulysses আমাদের মত ডাল ভাত খাইতেন না বটে, Hamlet আমাদের মত ধুতি চাদর পরিতেন না বটে, রামচন্দ্র আমাদের অপেক্ষা অনেক উর্দ্ধস্তরের ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের, কবিগণ এমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে মনে হয় যেন আমাদের মতই তাঁহারা হাসেন কাঁদেন,, ভালবাসেন ও মনোভাব প্রকাশ করেন। এরূপ চিত্রাঙ্কণের শক্তি বিধিদত্ত। বেদের ঋষিদের ন্যায় ভগবৎশক্তি ইঁহাদের ভিতরদিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইঁহাদের রচনা শুধু তাঁহারই অনুপ্রেরণা। যেমন সত্যকার ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই এক, সেইরূপ সত্যকার সাহিত্যের স্বরূপ সর্ব্বত্রই এক। একই প্রাণে তাহা অনুপ্রাণিত, শুধু আকার-ভেদ মাত্র। উচ্চশ্রেণীর কবির মন অনেকটা Sensitive Plateএর মত। ছায়া পড়িবা-মাত্র তাহাতে আবদ্ধ হইয়া যায়। Plateগুলি ছোট বড় হইতে পারে, কিন্তু মূলতঃ প্রায় এক। সবগুলিই চিত্রোৎপাদনকার্য্যে সমভাবে পারদর্শী। সকলের উদ্দেশ্যই এক। সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ভাবের সমাবেশ সকলের ভিতরই সমভাবে বর্ত্তমান। অবশ্য স্থান কাল পাত্র ভেদে বর্ণনা ও চিত্রে বৈচিত্র্য থাকিবে, কিন্তু স্থূল স্থূল সত্যগুলি, প্রকৃষ্ট ভাবগুলি সর্ব্বত্রই প্রায় সমভাবে পরিলক্ষিত হইবে। এইজন্যই বলিতে ইচ্ছা হয় সাহিত্যে জাতিভেদ বা ধর্ম্মভেদ নাই। সাহিতের মহারথীগণ সকলেই সমভাবে আমাদের পূজ্য; কারণ সকলেই কায়মনোবাক্যে বাগেদবীর পূজা করিয়াছেন ও তাঁহার অনুপ্রেরণায় একই সত্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখাইয়াছেন।

এতক্ষণ সাহিত্যের স্বরূপ বুঝাইতে কিছু চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সমালোচনার সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ বিশেষভাবে আলোচনা করি নাই। এখন এ বিষয় একটু আলোচনা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাহিত্যের সহিত সমালোচনার সম্বন্ধ অতি নিকট। যে সাহিত্যে সমালোচনার অভাব সে সাহিত্যের উন্নতি অসম্ভব। মানুষ যশঃপ্রার্থী। আমি যদি কিছু ভাল লিখি ও তাহার যদি সুখ্যাতি না হয় আমার মন সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং আমার সমস্ত আশা অঙ্কুরে বিনষ্ট হইবে (অবশ্য Byron, ভবভূতি প্রভৃতি লোকমত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন কিন্তু কয়জন উদীয়মান লেখক এরূপ ভাবে জনমতের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন?)। অপরপক্ষে, অত্যধিক প্রশংসা পাইলে আমার গর্ব্ব হইবে, আমি মনে করিব আমি একটা অসাধারণ পুরুষ, আমি যাহা লিখিব তাহাই লোকে পড়িয়া ধন্য ধন্য করিবে, খারাপ লেখা আমার হাত হইতে বাহির পারে না। বস্তুতঃ সমালোচকের কার্য্য বড়ই দায়িত্বপূর্ণ। সমালোচক নিরপেক্ষভাবে লেখকের দোষ গুণ বিচার করিবেন। লেখক অপরিচিত হইলেনই বা, তাঁহার লেখায় যদি মাধুর্য্য থাকে তাহা হইলে তিনি নূতন বলিয়াই কি উপেক্ষিত হইবেন? আর লেখক পরিচিত ও সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই কি তাঁহার রচনা সকল সময় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে?

ভাব লইয়া সাহিত্য গঠিত। ভাবই সাহিত্যের প্রাণ, ভাষা আবরণ মাত্র। ভাব না থাকিলে Wordsworth, Browning এর কাব্যের এত আদর হইত না, Meredith এর আপাতঃ কঠোর উপন্যাসগুলি প্রথম শ্রেণীর রচনা বলিয়া পরিগণিত হইত না। মহাত্মা Carlyle বলেন (৬) Language is the Flesh garment, the Body, of Thought অর্থাৎ ভাষা ভাবের দেহ মাত্র, তাহা দেহী নহে। বস্তুতঃ ভাবহীন রচনা প্রাণহীন দেহের তুল্য। মাটির পুতুলকে যতই মনোহর সাজে সাজাই না কেন, তাহা মাটির পুতুলই থাকিয়া যাইবে, তাহাতে প্রাণ সঞ্চার হইবে না। সেইরূপ ভাষার যতই আড়ম্বর থাকুক না কেন, ভাব না থাকিলে রচনা নিস্পন্দ, নির্জ্জীব বোধ হইবে। আবার ভাষা ও ভাবের মধ্যেও সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ যাহার ভাব নাই তাহার ভাষাও নাই। শুধু কতকগুলি বাক্যের সমষ্টিতে ভাষা হয় না, যেমন হাড় সাজাইলেই মানুষ হয় না। ভাবের উপর ভাষার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য

6. Sartor Resartus, Book 1, chapter XI.

নির্ভর করিতেছে। যেমন মৃত ব্যক্তিকে যতই মনোহর বেশে সজ্জিত করা হউক না কেন তাহার বাঙ্‌নিঃসরণ হইবে না, সেইরূপ ভাব না থাকিলে ভাষাও মধুর হইবে না। প্রথমে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও পরে তাহার অসারতা আপনিই প্রকাশ পাইবে। (Dryden, Pope এর পরবর্ত্তী এবং Romantic Revivalএর পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরেজ কবিদের রচনা দ্রষ্টব্য। অবশ্য Goldsmith, Burns, Cowper ও Blakeকে বাদ দিয়া)।

এখন কথা হইতেছে সকল ভাব ও সকল আদর্শই কি প্রশংসার যোগ্য? ইহার উত্তর অতি স্পষ্ট সংক্ষেপে 'না' বলিলেই উত্তর দেওয়া যায়। মানুষের ভিতর যেমন ভালমন্দ আছে, ভাবের ভিতরও সেইরূপ ভালমন্দ আছে। এরূপ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কবিতা লিখিতে হইবে বা সাহিত্য রচনা করিতে হইবে যাহাতে পাঠকের উপকার হইবে, যাহাতে তাহাদের সঙ্কীর্ণ মন উদার হইবে, যাহাতে তাহারা জ্ঞানের আলোকে অস্পষ্ট সত্যগুলি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইবে, যাহাতে তাহারা সংসারকে যথার্থরূপে চিনিতে পারিবে, যাহাতে তাহারা সমসাময়িক Social and Economic problems গুলি যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবে। তবে সাহিত্যিকের শুধু Realismএর দিক দিয়া দেখিলে সব সময় চলিবে না। Idealismএর দিকে চাহিয়া Realistic ছবি আঁকিতে হইবে। কবিকে একসঙ্গে Real এবং Ideal হইতে হইবে অর্থাৎ আদর্শ চিত্রের স্বরূপ পাঠকের সম্মুখে ধরিতে হইবে। আরও মনে রাখিতে হইবে, বিদেশীয় সাহিত্যের অনুকরণে, যে সব ভাব এবং যে সব সমস্যার অবতারণা করা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে তাহার আলোচনা কদাপি উচিত নহে. অনুকরণ সর্ব্বদা দূষণীয় নহে। ভাব ও আদর্শ যদি খাঁটি হয় তাহাহইলে যে কোন দেশের সাহিত্য হইতে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু ইহারও একটা সীমা আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যে সব সমস্যার সমাধান করিবার জন্য Europeএ Tolstoi, Ibsen বা Bernard Shawকে কলম ধরিতে হইয়াছে তাহা যদি আধুনিক কালে বঙ্গদেশে না উঠিয়া থাকে, তবে সেগুলি লইয়া মিথ্যা মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। একই সত্য Wycliffe চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এবং Luther ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু Wycliffeএর মত লোকসমাজে গ্রাহ্য হইল না এবং Lutherএর মত উত্তর ইউরোপে Reformationএর বন্যা আনয়ন করিল। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের জনসাধারণ Wycliffe প্রচারিত সত্যের উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তখনও সে সত্যের জন্য মাটি তৈয়ার হয় নাই। তাই তাহার বীজ অঙ্কুরিত হইল না। অবশ্য একথাও সত্য যে সময় সময় Carlyle যাঁহাদের Hero বলিয়াছেন তাঁহারা মানুষকে নূতন করিয়া গড়িতে পারেন এবং কোন একটি বিশেষ সত্য, প্রচারের সময় সমাদর না পাইলেও পরে জগতে আদৃত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কবি, নাট্যকার বা উপন্যাস-লেখকের সমসাময়িক সমাজের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যে কোন সত্য প্রচার করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক Aristotle কবিতাকে জীবনের অনুকৃতি (Imitation of life) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাহিত্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত কবি-সমালোচক Matthew Arnold কবিতাকে জীবনের সমালোচনা (Criticism of life) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিক কবিতা বলিতে গেলে শুধু কতকগুলি ছন্দ বুঝায় না—তাহাতে মানবজীবনের প্রতিবিম্ব নিপতিত হওয়া আবশ্যক। প্রকৃত নাটকে সংসারের গতি প্রতিফলিত হয়, প্রকৃত উপন্যাসে গল্পের ছলে মানবজীবনের ইতিহাস অঙ্কিত থাকে। এক হিসাবে কাব্য ও বিজ্ঞানে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। উভয়েই সত্যের প্রচারকার্য্য করিতেছে, তবে বিজ্ঞান সত্যকে মনুষ্য সমাজ হইতে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করে, কাব্য মানুষের চোখ দিয়া সৌন্দর্য্য ও সত্যকে দেখিতে বলে। যে সত্য ও সৌন্দর্য্য, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রদ্বারা উপলব্ধি করেন; কবি মানসচক্ষে তাহার স্বরূপ দেখিয়া আত্মহারা হ'ন ও অপরকে তাহার রসাস্বাদন করাইতে ব্যগ্র হ'ন। তাই বলিতেছি, এরূপভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিতে হইবে যাহাতে দশে শিখিবে—যাহাতে পাঠক শুধু আনন্দ পাইবেন না, যাহাতে পাঠকের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও শিক্ষালাভ হইবে।

সমাজ পরিবর্ত্তনশীল। সমাজ নির্জীব, জড় পদার্থ নহে। ইহা একটি Organism বিশেষ। দেহে যেমন শৈশব, কৈশোর, জীবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থান্তর আছে, মনুষ্য সমাজেও সেইরূপ নানাবিধ অবস্থান্তর আছে। আজ যাহা সভ্যতা, আজ যাহা আইন, আজ যাহা আদর্শ, কাল তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। বস্তুতঃ সমাজে সভ্যতার আদর্শের বড়ই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। মানুষ সামাজিক জীব সামাজিক নিয়ম পালন করাই তাহার স্বভাব, তাহার ধর্ম্ম। অতএব সমাজের পরিবর্ত্তনের সহিত ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ভাব লোকসমক্ষে ধরিতে হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য এ কর্ত্তব্য কাহার?

প্রতিভাশালী লেখকগণ সহজেই এই চিত্র জনসাধারণের সম্মুখে ধরিতে পারেন। যুগবিশেষে যাহা আদর্শ ও ন্যায্য বলিয়া বিবেচিত বা যাহা ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন। সব লেখকের সমান ক্ষমতা নাই। লেখক যে বিষয় লিখিতে চাহেন, সে বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য। লেখকগণের এই জ্ঞানভাণ্ডার অসম্পূর্ণ থাকিলে লেখায় ফল হইবে না — তাহা ক্ষণেকের জন্য লোকের মন মোহিত করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে একটা বিশ্বজনীনতার, একটা চিরস্থায়িত্বের অভাব লক্ষিত হইবে। এখন লেখকগণকে এই সকল আদর্শ সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন কে? মনীষী Matthew Arnold বলেন—"সমালোচক"। সমালোচনার কার্য্য হইতেছে প্রচলিত সাহিত্যে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু আদর্শ তাহা সর্ব্বসমক্ষে জ্ঞাপন করা (৭)। যাঁহার লিখিবার ক্ষমতা আছে তিনি সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিবেন। অবশ্য এখানে সমালোচনা শব্দের অর্থ, পক্ষপাতশূন্য, যথার্থ সমালোচনা - দ্বেষমূলক, পক্ষপাতদুষ্ট সমালোচনা নহে। পক্ষপাতশূন্য সমালোচনার গুণ অনেক—ইহাতে লেখককে সংযত, ধীর ও উন্নত করে—দোষ গুণের কারণ নির্দ্দেশ করার জন্য কাহাকেও বাক্যযন্ত্রণায় অধীর করে না, পরন্তু লেখকের দৃষ্টি তাঁহার ভ্রমের দিকে ফিরাইয়া দেয়। এক কথায়, লেখকের সম্মুখে ইহা এমন দর্পণ ধরে যাহাতে তাঁহার রচনার প্রতিকৃতি তিনি দেখিতে পান। অপর পক্ষে, পক্ষপাতমূলক সমালোচনার দোষ অনেক - ইহাতে অনেক বিষময় ফল উৎপন্ন করে, ইহাতে অনেক অঙ্কুর বিনাশ করে, আবার অনেককে গর্ব্বে স্ফীত করে।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও রাজসচিব Disraeli বলিতেন, যে সব মগ্ন সাহিত্যিক সাহিত্য-সাধনায় বিফলমনোরথ হয়, তাহারাই সমালোচক হয়—নিজেরা গড়িতে পারে না, তাই পরে যাহা গড়িয়াছে তাহা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নহে, তবে একেবারে মিথ্যাও নহে। নিজে একখানি সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করা অপেক্ষা অন্য লোকের লেখা একখানি পুস্তকের দোষ গুণ অনুসন্ধান করা অনেক সহজ। আবার এ কথাও সত্য যে একজন উচ্চদরের সাহিত্যিক যে আসন পাইবেন একজন উচ্চদরের সমালোচক সে আসন কখনই পাইবেন না। কিন্তু তাই বলিয়া নিরপেক্ষ যথার্থ সমালোচককে তুচ্ছ করা উচিত নহে। উভয়েরই স্ব স্ব ক্ষেত্রে উপকারিতা আছে। এক কথায় সাহিত্য ও সমালোচনা সমসূত্রে গাঁথা, একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি—তবে সাহিত্য আগে, সমালোচনা পরে, সাহিত্য জ্যেষ্ঠ, সমালোচনা কনিষ্ঠ। কিন্তু কনিষ্ঠ বলিয়াই যে অনাদৃত হইবে এমন কোন কথা নাই।

7 Its buseness is to know the best that is known and thought in the world and to create a current of true and fresh ideas" (M. Arnold) Essays in Criticism, First Series)

সরোজিনী নাইড়ু

মিঃ আব্বাস তাবেবজী

মৌলানা আবুল কালামআজাদ

বিবেকানন্দ স্বামী

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

মিঃ এস, ই. ষ্টোকস

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র

চূর্ণক

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ

কাঁচা ও পাকা

একটি পাহাড়, একদিন সকালে তাহার উপর উঠিলাম, উন্নত, অবনত ভূমি অতিক্রম করিয়া, পাথরের পর পাথর লঙ্ঘন করিয়া দেখিলাম—একটি প্রশস্ত মাঠ। পাহাড়ের উপর এই সমতল ভূমির সৌন্দর্য্য আমাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিল।

পিছনে চাহিয়া দেখি আর একটা পাহাড় দুর্ভেদ্য শালবনে গাত্র ঢাকিয়া শীতার্ত্ত অলস বৃদ্ধের মত পড়িয়া আছে। পাহাড়ের শিখরদেশ হইতে একটা ঝরণা নাচিতে নাচিতে শত পাথরে প্রতিহত হইয়া তীরবেগে দুরন্ত বালকের মত নীচে ছুটিয়া আসিতেছে।

ঝরণাটি এই মাঠটির একপাশ দিয়া বহিয়া গিয়াছে। আমি বেড়াইতে বেড়াইতে তাহারই নিকটে আসিয়া বসিলাম। জলকণাগুলি গায়ে মুখে চোখে ছিটাইয়া পড়িতে লাগিল।

দেখিলাম—নিকটে কতকগুলি ছোট ছোট শালগাছ ঘন সবুজবর্ণে মণ্ডিত হইয়া বায়ুভরে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। তাহারা সতেজ, সজীব মাতৃস্তন্যে পরিপুষ্ট শিশুগুলির মত।

তাহারা এতই চপল, এতই নূতন ও কমনীয় যে তাহাদের দেখিয়া আমিও যেন প্রাণে একটা মুগ্ধকর স্পন্দন অনুভব করিলাম। নিবিড় আনন্দ আমাকে যেন তন্দ্রাবিষ্ট করিয়া ফেলিল।

বোধ হইল-সবুজ গাছগুলি দুরন্ত ঝরণাটির সঙ্গে একটি গান জুড়িয়া দিয়াছে, আমি তন্ময় হইয়া সেই গান শুনিতে লাগিলাম। ঝরণার প্রতি তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া, প্রভাতের সূর্য্যালোকে, জলকণায় প্রতিফলিত রামধনুর আভায় ও জীর্ণ অরণ্যানীর শুষ্ক হরিৎ বর্ণে সেই গান ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িল।

বোধ হইল—তাহারা যেন বলিতেছে—আমরা সজীব, সুন্দর, বিশ্বের জীর্ণতা ঘুচাইয়া আমরাই চির নবীনতার বার্ত্তা লইয়া আসিতেছি।

শুষ্কতা জীর্ণতা লুপ্ত হইয়া যাক্—আমরাই এখানে আবার সরসতা ও সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিব। আমরাই এখানকার সম্পদ-এখানকার সর্ব্বস্ব।

মুক্ত আলোক ও বাতাসে আমরা ঘনশ্যাম পত্রপুঞ্জে সুশোভিত হইয়া এখানে দিন দিন বর্দ্ধিত হইব। আমরাই এখানকার রাজা, আমরাই এখানে অবাধে রাজত্ব করিব।

বেলা বাড়িতে লাগিল। সূর্য্যের উত্তাপ যখন ক্রমশঃ চারিদিক ঝলসিয়া দিল। তখন যেন আর একটা সুর শুনিতে পাইলাম।

পিছনের পাহাড়টির শিশিরার্দ্র গাত্রাবরণ তখন শুকাইয়া আসিয়াছে। এক একটা বাতাস শুষ্কজীর্ণ শালবৃক্ষগুলির মধ্যে উদাস সুর জাগাইয়া তুলিতেছে।

বোধ হইল তাহারা বলিতেছে, আমাদের যাহা দিবার তাহা দান করিয়া ঋণমুক্ত হইয়াছি। আমাদের সন্তানেরা ঐ দেখ নীচে খেলা করিতেছে।

তাহারা নাচুক, হাসুক, আমাদের গালাগালি দিক, আপনাদেরই প্রাধান্য ঘোষণা করুক, আমাদের তাহাতে দুঃখের কারণ নাই। আমরা পৃথিবীকে সাজাইয়াছি, এখনও শুষ্কপত্রের মধ্যেও শ্যামসম্পদের জীর্ণাবশেষ আছে কিন্তু তাহাতেই আমরা নিজেদের সম্পন্ন মনে করি না। নীচের সন্তানেরা রস, রঙ্ লইয়া মাতুক, আমরা পীতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া তাহার অপেক্ষাও অধিকতর আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান লাভ করিয়াছি।

আমাদের জীর্ণ হাড়ে তেজ আছে, বল আছে তবে সে তেজ, সে বল আমরা অসার উত্তেজনায় নষ্ট করিতে চাই না। এখন আমরা আরো শুষ্ক হইব, দেহের প্রতি অংশ পরের জন্য বিলাইয়া দিব, মরিয়াও দেশে দেশে বীজ ছড়াইয়া সর্ব্বত্র শ্যামসৌন্দর্য্য ঘনাইয়া তুলিব। সন্তানের

এখন মোহে পড়িয়াছে। একদিন তাহারাও আমাদের ভাবেই অনুপ্রাণিত হইবে।

পাহাড় হইতে নামিয়া আসিবার সময়েও এই নির্জীবের বাক্-কলহ আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। মনে হইল—আজিকার ভ্রমণ বৃথা হয় নাই।

মা।

দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশ্রেণী অতিক্রম করিতেছিলাম। চারিদিকে নিবিড় জঙ্গল, স্থানে স্থানে পথ এত সংকীর্ণ যে একজন মানুষ অতিকষ্টে তাহার উপর দিয়া যাইতে পারে।

প্রভাতের কুয়াসায় চার হাত দূরের জিনিষ অস্পষ্ট দেখাইতেছিল; পথটি পাহাড়ের গা দিয়া এমনভাবে গিয়াছে যে একটু পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই—কোন্ অন্ধকার জঙ্গলময় অতলে মিলাইয়া যাইব তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

আমি চলিয়াছি যেন আমার আর কোন উপায় নাই। বর্ষা নামুক, ঝড় উঠুক, যত বিপদ ঘটিতে পারে ঘটুক, আমাকে যাইতেই হইবে। এ যাওয়ার শেষ কোথায় তাহাও জানিনা।

এত বিপদ মাথায় করিয়া কোথা যাইব। আর অগ্রসর হইব না মনে করিয়া একটা গাছের তলায় বসিয়া পড়িলাম।

কিন্তু হায়, উপায় নাই, তখনি বোধ হইল, কে যেন আমাকে চালাইতেছে।

উঠিলাম, কুয়াশা ভেদ করিয়া কণ্টকে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া আবার অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সহসা দেখিলাম—সম্মুখে একটা খাদ—তাহার ভিতর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

হটাৎ পদস্খলন হইল। আমি গড়াইতে গড়াইতে খাদের নিকটবর্ত্তী হইলাম। এখনি পড়িব—এমনভাবে পড়িব যে কেহ আমার উদ্দেশ করিতে পারিবে না।

বোধ হইল—কে যেন আমাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে—আমি খাদের ভিতর পড়িলাম না। কে আমাকে ধরিয়া তুলিল।

চাহিয়া দেখিলাম—একজন প্রৌঢ়া রমণী—মাতৃত্বের জীবন্তমূর্ত্তি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কে তুমি?

উত্তর হইল "আমি তোমার মা।"

আমি সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিবার উপক্রম করিতেছি; কিন্তু আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। মায়ের কি নিঃস্বার্থ দয়া!

মনে করিলাম—মা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন আমার ভয় কি? আবার অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিছু দূরে আসিয়া দেখি আর একটা খাদ—তবে ইহা পূর্ব্বের মত গভীর নয়। আবার এখানে পদস্খলন হইল। কই কেহত আমাকে ধরিল না। আমি সেই খাদের ভিতর পড়িলাম। পায়ের একস্থান কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

তখন একটা কীট কোথা হইতে আসিয়া সেই রক্ত পান করিতে আরম্ভ করিল।

উপরে চাহিয়া দেখি—মা দাঁড়াইয়া আছেন।

সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল! মাকে উদাসীনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম ভাবিলাম আমার প্রতি ইঁহার দয়া নাই, এ মা বড়ই নিষ্ঠুর।

মা হাসিতে লাগিলেন। আমার রাগ আরও বাড়িয়া গেল—বলিলাম "তুমি মা না রাক্ষসী। নিজে আমায় খাইতে পার নাই, তাই এই কীটটাকে দিয়া আমায় খাওয়াইতেছ।"

মা আবার হাসিলেন, বলিলেন, "এই কীটটা আজ দুদিন কিছুই খাইতে পায় নাই।"

ওঃ আমার রক্তে কীটভোজন! এ কি? বিস্মিত হইয়া বলিলাম। "তুমি আমার মা?"

তখনি শুনিলাম প্রতি অনুপরমাণু হইতে গিরিনদী লতাগুল্ম আকাশবায়ুর মধ্য দিয়া ধ্বনিত হইতেছে "তোমার একার নয়, আমি জগতের মা।"

বলিলাম "জগতের মা এতই নিষ্ঠুর?"

আর কোনও কথা শুনিতে পাইলাম না।

—

আনন্দ

আমি তাহাকে চাই—সারাজীবন তাহাকে খুঁজিতেছি ? সে মাঝে মাঝে দেখা দেয় ; কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারি নাই, বার বার সে আমার নিকট হইতে পলাইয়া যায়।

কখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, সংসারের কুটিলতা যখন দূরে দিগন্তের মেঘের মত অপসারিত হইয়া আমাকে মুক্ত, মুগ্ধ করিয়া ফেলে, তখন মাঝে মাঝে দেখি সে সম্মুখে আসিয়া হাসিতেছে। তখন সে অযাচিত হইয়াই আসে।

তারপর একবার তাহাকে দেখিয়া যখন ধরিবার জন্য ছুটিতে আরম্ভ করি তখন আর দেখিতে পাই না। পরিশ্রান্ত হইয়া যখন অবসন্ন দেহে কোথাও বসিয়া পড়ি—তখন শূন্য পানে চাহিয়া দেখি সে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। আমি যত অগ্রসর হই, তত তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাই, ভবিষ্যতে তাহাকে দেখিতে পাই না, কিন্তু দেখিতে পাই সে অতীতকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

একটি নবীন প্রভাতে হঠাৎ একদিন তাহাকে দেখিলাম, বলিলাম "তুমি আর দেখা দাও না কেন ?"

সে বলিল "তুমি কি আমাকে চাও ?"

আমি বলিলাম "তোমাকে পাইব বলিয়া সারাজীবন পরিশ্রম করিতেছি।"

সে বলিল "তুমি পরিশ্রম চাও ক্লান্তি চাও, আমাকে চাও না।" আমি বলিলাম "কি বলিতেছ ? তোমার কথা বুঝিলাম না।" সে বলিল "আমাকে পাইতে হইলে পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই। স্থির হও, আমি আপনই তোমার নিকট যাইব।"

স্থির হইলাম ; কই তুমি কোথায় ? তোমাকেত দেখিতে পাইতেছি না। আবার স্থির হইলাম—কই তুমিত আসিলে না, তোমার কথা সব মিথ্যা। আবার পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিতে লাগিলাম। দেহ ক্লান্ত অবশ হইয়া পড়িল, তবুও তাহার দেখা পাইলাম না।

একদিন নীরবে বসিয়া আছি, হঠাৎ সে দেখা দিল। আমি বলিলাম তোমার সকল কথা মিথ্যা।"

সে বলিল "তুমি স্থির থাকিতে পার নাই। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়াই অস্থির হইয়া পড়িয়াছ।"

আমি বলিলাম "কতদিন স্থির হইয়া থাকিতে হইবে।"

সে বলিল "চিরকাল।"

আমি বলিলাম " তাহা পারিব না।"

সে বলিল "তবে আর আমাকে পাইবে কেমন করিয়া ?"

আমি বলিলাম "তোমাকে চাই না।"

সে হাসিয়া চলিয়া গেল।

কিছুকাল পরে আবার সে দেখা দিল, বলিলাম "আসিলে কেন ?"

আমি বলিলাম "তুমি যে আমার জন্য ব্যস্ত হও নাই, তাই আসিয়াছি ?"

তারপর তাহার জন্য কখনও আকুল হই নাই, তবুও সে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে, সর্ব্ব ঋতুতে আকাশে বাতাসে বর্ণে গন্ধে স্পর্শে শব্দে কেবলই আমার চোখে চোখে ফিরিয়াছে।
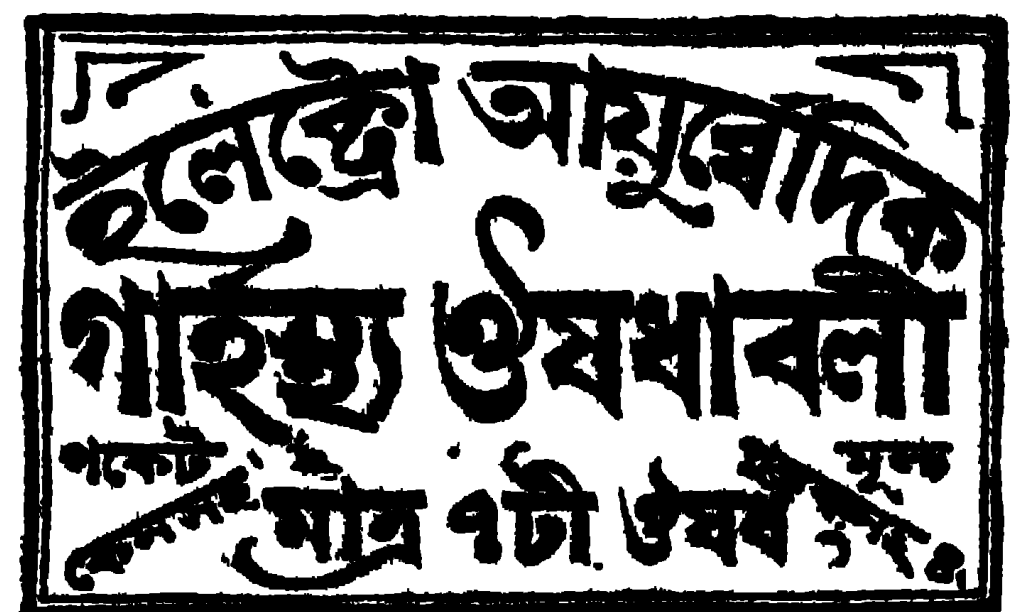
গল্প

হতভাগ্য

শ্রীমতী তটিনী দেবী

অলক্ষিত অশব একটা উদ্দাম উচ্ছ্বাস বুকের মধ্যে চাপিয়া মণিমালা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। নরেন্দ্রনাথ সেই মন্থর গতির দিকে চাহিয়া একটু ক্রুর হাসি হাসিল, মনে মনে বুঝি বলিয়া ফেলিল—নিষ্ফল, ওগো, তোমার এ গোপন অভিমান নিষ্ফল। মুখ হইতে একটা শ্লথ শ্লেষ বাক্য বাহির হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় জননী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

—সতীলক্ষ্মীর এমন ক'রে হেনস্তা করিস নে নরেন বলিয়া মাতা পুত্রের দিকে চাহিলেন।

—থাক তোমার সতী লক্ষ্মী নিয়ে, সাফ্ কথা আমি পেত্নী নিয়ে ঘর কত্তে পারব না —

ক্ষণকাল মাতা পুত্র নীরব। একমাত্র সন্তানের এই দারুণ অভিমান পুত্র বৎসলা জননীর হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হইলেও, তিনি নিরপরাধা বধূর অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া বিশেষ কাতর হইয়া উঠিলেন।

— বউমাকে ত' তারা কাল নিতে আসবে—

—পারত' আজই পাঠিয়ে দাও না পুত্রের উত্তরে বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিল।

- তবে কি তোর পাঠাবার মত নেই ?--

—আমি কি বলছি পাঠিও না'— ।

মাতা বিমর্ষ ভাবে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। মণিমালা শ্বশ্রুকে বলিল—থাক মা আমার গিয়ে কাজ নেই ।

—সে কি হয় মা! বেহাই এত করে বলে গেছেন, আর একটী মাত্র ভাইয়ের বিয়ে!—

—কিন্তু যদি উনি বিরক্ত হন। বলিয়া ব্যথিত দৃষ্টিতে সে ভূতলপানে চাহিল। সে সজল মিনতি ভরা দৃষ্টির অর্থ স্নেহময়ী নারী বুঝিলেন, বলিলেন দূর পাগলী, ছেলে মানুষ রাগ করেছে খানিক পরে পড়ে যাবে'খন।—মণিমালা মুখে কিছু বলিল না কিন্তু অন্তরে বুঝিল এ রাগ পড়িবার নহে। একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে গৃহকার্য্যে মন দিল।

পরদিন প্রভাতে সে পিত্রালয়ে যাত্রা করিল।

(২)

মণিমালা মেয়েটী ছিল বড় শান্ত। অতুলন সৌন্দর্য্যের ভুবন মোহিনী জ্যোতি তাহার শরীরে নৃত্য না করিলেও, তাহার সেই কালো রূপে দরিদ্র পিতার জীর্ণ কুটীরখানি আলো হইয়া থাকিত। সেই শ্যামল দেহ বল্লরী চকিতা হরিণীর মত যখন দরিদ্রের কুটীর প্রাঙ্গনে নৃত্য করিয়া বেড়াইত, তখন স্নেহ-বিহ্বল পিতা বীরেশ্বরের চোখ দুটী সজল হইয়া উঠিত। দরিদ্রের কুটীরে জন্মিলেও সে যে এক সময় রাজরাণী হইবে এই চিন্তা তাহার মনে স্থান পাইত। কিন্তু যখন সংসারনেমীর ভীষণ আবর্ত্তনে বাস্তবতার সহিত তাঁহার পরিচয় হইল, তখন তিনি বুঝিলেন, এ সংসারে কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করা বড় শক্ত কথা। তিনটী বৎসর অশ্রান্ত চেষ্টা করিয়াও, যখন অন্য কোনও পাত্রের ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, নরেন্দ্রের পিতা রামজীবনের শরণাপন্ন হইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সহপাঠীর মান রাখিলেন।

একদিন ধূসর-সন্ধ্যার ম্লান গোধূলির আলোকে মণিমালা তাঁহার পুত্রবধূরূপে গণ্য হইল। কিন্তু এই বিবাহের ফল দেখিবার জন্য তাঁহাকে অধিক কাল অপেক্ষা করিতে হয় নাই। ৬ মাস পরেই একদিন তিনি পরপারের হিসাব-নিকাশ করিবার জন্য চলিয়া গেলেন।

আজ দুটী বৎসর মণিমালা নরেন্দ্রের গৃহে বধূ হইয়া আসিয়াছে। বধূ হইয়া এ গৃহে আসিয়াই সে শুনিয়াছে, যে সে কালো। আজ দুটী বৎসর সে স্বামীর নিকট শুনিয়া আসিতেছে, তাহার রূপের অবিশ্রান্ত অখ্যাতি—তাহার মত কুৎসিতা, ভিখারিণী হইয়া কেন জন্মে নাই—সেও তাহাই ভাবিত, কেন সে ধূমকেতুর মত উদিত হইয়া এই সৌন্দর্য্য-পিপাসু যুবকটীর শান্তির পথে বাধা দিতে আসিল! অশ্রুপীড়িত চক্ষে সে কতদিন স্বামীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে—ঠাকুর, কেন আমাকে ভিখারিণী করিয়া গড় নাই, তাহা হইলে ত' আজ পথে থাকিয়াও সুখে থাকিতে পারিতাম! স্বামীর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের বাণে কতদিন তাহার হৃদয়খানি ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোনও দিন একটী অস্ফুট বেদনাধ্বনিও তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নই, কত অশ্রু তাহার নয়ন-কোণে আসিয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিষ্ফল! সে বুঝিয়াছিল যে তাহাকে সব সহ্য করিতে হইবে কারণ, সে গরীবের ঘরের কালো মেয়ে! তাই সে স্বামীর উপর এতটুকু অভিমানও কোনদিন করে নাই।

(৩)

—একি তোমার উচিত কাজ হ'চ্চে নরেন?—বলিয়া মাতা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চহিলেন। নরেন তখন কেবল কনে দেখিয়া আসিয়া বন্ধু ধীরেনের সহিত ভাবীবধূর সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। মাতার প্রশ্নে একটু কৌতুকের হাসি হাসিয়া সে বলিল—তবে কি তুমি বল সেই পেত্নীকে নিয়ে আমায় সমস্ত জীবনটা জ্বলতে হবে?—মাতা নীরব। পরে ভগ্নস্বরে বলিলেন কি রত্ন আজ তুমি হারাতে যাচ্ছ নরেন, আজ না হোক পরে বুঝবে।—আচ্ছা যখন বুঝব তখন না হয় তাকে আবার ডেকে আনা যাবে। এই বলিয়া পুত্র শিষ দিতে দিতে প্রস্থান করিল।

রঞ্জিত আকাশ ঘন ঘোর ঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। মাতার নয়ন প্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় মাতা শীঘ্র নয়ন মার্জ্জনা করিলেন।

জননীর উপদেশ শিক্ষিত, অভিমানী পুত্রকে টলাইতে পারিল না। এক সন্ধ্যায় ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে সানাইয়ের শব্দে মুখরিত করিয়া, নরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিয়া জীবনের মুঞ্জরিত বাসনাকে সফল কাম করিবার জন্য যাত্রা করিল।

মণিমালা পিত্রালয়ে বসিয়া সমস্তই শুনিল। সে ঠাকুর ঘরে গিয়া মাথা কুটিয়া বলিল—পাষাণ দেবতা, যদি নারী জন্ম দিয়েছ, তবে রূপ দাও নাই কেন?—

(৪)

মধুর চাঁদিনী রাত্রি। আকাশে আলোকের, ছড়াছড়ি, বাতাসে ফুলের গন্ধের লুকোচুরি। দূরে মন্থর-তটিনীর কল-নিনাদ। নরেন্দ্রনাথের হৃদয়েও বুঝি প্রীতি-সরসী মৃদু কল-নিনাদে বহিয়া যাইতেছিল। আজ তাহার কল্পিত কাব্যময় জীবনের আরম্ভ। আজ তাহার ফুলশয্যা।

নিঝুম রাত্রি। সজ্জিত কক্ষে নরেন্দ্রনাথ একাকী একখানি শোফার উপবিষ্ট। পার্শ্বে শয্যায় শায়িতা তাহার নব-বিবাহিতা পত্নী। নরেন্দ্রনাথ উঠিল, ধীরে অতি ধীরে বধূর হাত দুখানি নিজের কোলের মধ্যে টানিয়া আনিল, বলিল—কাঁদছ কেন রাণী, এখানে এসে বড় কষ্ট হচ্চে? বধূ নীরব। নরেন্দ্রনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু রাণী কথা কহিল না। নিরুপায় হইয়া নরেন বলিল—তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলবে না রাণী? কেন এত কি অপরাধ করেছি?

এবার রাণী কথা কহিল তুমি আর একবার বিয়ে করেছিলে না? সুরে অভিমানের ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিল।

—করেছিলাম

—তবে আবার আমায় বিয়ে কল্লে কেন?

- ভয় নেই রাণী আমি তাকে পরিত্যাগ করেছি

—পরিত্যাগ করেছ; কেন?

—আমি কখনও তাকে ভালবাসতে পারি নি। সে বড় কালো।

রাণী কথা কহিল না। ঝুঁকিয়া শুইয়া পড়িল। নরেন জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি আমায় ক্ষমা করবে না রাণী? বল না রাণী! বলিয়া ব্যাকুলভাবে পত্নীর হাত দুখানি চাপিয়া ধরিল। আবার বলিল

—কই বললে না?

—কি বলব?

—তুমি কি আমায় ক্ষমা করবে না?

রাণী পাশ ফিরিয়া শুইল, একটু অস্ফুটস্বরে বুঝি বলিয়াও ফেলিল "কখনও নয়।"

ফুলশয্যার কাব্যময় রজনী নরেন্দ্রনাথের এইরূপে প্রভাত হইল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সে মনে মনে সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিল কোথাও ভুল করিনি ত! হায়, তাহাকে কে বলিয়া দিবে। সে যে আজ অন্ধ!

(৫)

বিবাহের পর ছয়টী মাস অতিক্রম করিয়াছে। রাণী এখন ষোড়শী সুন্দরী। যুবক নরেন্দ্রনাথ সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইত। গোলামের মত তাহার সেবা করিত। চির-অভিমানী যুবক পত্নীর রূপের মন্দিরদ্বারে ভিখারীর ন্যায় হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, একটু কৃপাদৃষ্টির আশায়। কিন্তু সে বিফল প্রয়াস! গোলামের মত সেবা করিয়াও সে একদিনও পত্নীর মন পাইল না।

একেলা ঘরে চুপটী করিয়া নরেন্দ্রনাথ বসিয়া আছে। রাণী কক্ষে প্রবেশ করিল, হাতে একখানি আয়না। স্বামীর মুখের সামনে আয়নাখানি ধরিয়া সে বলিল দেখ না?

—কি দেখব?

—কি দেখা যাচ্ছে?

—কি আবার দেখা যাবে, আমার মুখ!

—কেমন মুখখানি। রাজপুত্রের মত না?

শশুরকে বলিয়া হাসির [illegible] কক্ষটী মুখরিত করিয়া রাণী

—সে কি হয় না! নরেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত দৃষ্টিতে [illegible]

আর একটী মাত্র ভাইয়ের বিয়েতীক্ষ্ণ বিদ্রূপের বাণে আজ ছয়টী মাস সে জর্জ্জরিত হইতেছে। সে ভাবিল সে কি দুর্ভাগ্য! তাহার অনুতাপ আরম্ভ হইতেছে।

(৬)

—তুমি কি আমায় ভালবাস না বলিয়া নরেন রাণীকে জড়াইয়া ধরিল।

—কেন সে কথা কেন?

—জীবনের একটা বাসনা।

—যদি বলি, না

—কেন?

—তুমি কি মনে কর তোমাকে ভালবাসতেই হবে।

—পত্নী হিসাবে অন্ততঃ তোমার তাই কর্ত্তব্য।

—তুমি আমায় ভালবাস?

—তোমার ঐরূপ যে একবার দেখেছে সে কি না ভালবেসে থাকতে পারে রাণী।

—তবে কি তুমি আমার রূপকেই ভালবাস?

—না রাণী আমি তোমাকেই ভালবাসি।

—আমি কালো হলে আমায় ভালোবাসতে?

নরেন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। রাণী বলিল আমার রূপ আছে তুমি আমায় ভালবাসতে পার, কিন্তু তুমি রূপহীন, কুৎসিৎ কদাকার তোমায় আমি ভালবাসব কেমন করে?

—এটা কি তোমার কর্ত্তব্য রাণী?

- কেন নয়? তোমরা কি মনে কর এক পুরুষেরই সৌন্দর্য্য অনুভূতি আছে, সেই কি কেবল রূপ দেখতে জানে? আর নারীর ইন্দ্রিয়গ্রাম, সেগুলো কি সব অনুভূতিহীন। কালো হ'লে তোমরা যেমন নারীকে ঘৃণা কর, তোমরা কুৎসিৎ হ'লে নারীও তোমাদের ঘৃণা কর্ত্তে পারে তা জান কি।

নরেন্দ্রনাথের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তাহার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইতেছিল, সে উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল। একি নিষ্ঠুর পরিহাস! কিন্তু কঠোর হইলেও এ সত্য! বহুদিন পরে আর একজনের কাতর, [illegible] মিনতিভরা চোখদুটী তাহার মনে পড়িল। উষ্ণ-অশ্রুর উচ্ছ্বসিত প্রবাহ তাহার চোখদুটীকে যেন অন্ধ করিয়া দিল।

(৭)

মণিমালা বিকারের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছিল যেন স্বামী তাহার প্রতি ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যাইতেছেন। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল এবার আমায় ক্ষমা কর, তোমার তৃপ্তির জন্য এবার ঠাকুরের কাছে রূপ-বর নিয়ে রুদ্ধ আসব। বাত্যাহত তরুর ন্যায় আবেগে কাঁপিতে কাঁপিতে নরেন্দ্রনাথ সেই শয্যাপরে লুণ্ঠিত হইয়া সমস্ত প্রাণের আবেগে মণিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল তুমি শত জন্ম কুরূপা থেক, আর আমি অভিমান কর্ব্ব না। এইবারটি আমায় মাপ করো।

কিন্তু নিস্ফল! আদরের মণি তখন তাহার ডাকের বহুদূরে।

সাধককবি রজনীকান্ত *

শ্রী নরেন্দ্র দেব

"কান্তকবি রজনীকান্তের জীবন-চরিত" পড়ে' মুগ্ধ হয়েছি। নিপুণ চিত্রকর তাঁর তুলির টানে যে ছবিখানি ফুটিয়ে তোলেন—তার মধ্যে রূপ, রেখা, ভাবব্যঞ্জনা ও বর্ণ-বৈচিত্র্য ছাড়া আরও এমন একটা কিছু থাকে, যার গুণে তাঁর অপরূপ আলেখ্যখানি মুগ্ধ দর্শকের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে সজীব ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকরের অনুপম বৈশিষ্ট্যটুকুও রসজ্ঞের কাছে ধরা প'ড়ে যায়। কোনও সুদক্ষ ভাস্কর যখন যাদুকরের মতো তাঁর তীক্ষ্ণ অয়স কাঠির স্পর্শে জড় পাষাণখণ্ড ভেদ করে' শিল্পীর কল্পিত মানস-মূর্ত্তিটিকে গ'ড়ে তোলেন, তখন সেই মর্ম্মর মূর্ত্তির মধ্যে সুচারু ভঙ্গী, সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব, সুকুমার লালিত্য ও সহজ ভাব-মাধুর্য্য প্রভৃতি তক্ষণশিল্পের যাবতীয় কলা-নৈপুণ্যের সমাবেশ ছাড়া আরও এমন একটা কিছুর ছাপ থাকে যাতে তাঁর সেই ভাস্কর্য্য একটা জীবন্ত সৃষ্টির মতো সব দিক দিয়ে সার্থক ও মনোহর হ'য়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই কলাবিদের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যটুকুও রসগ্রাহীদের কাছে সুপরিচিত হ'য়ে যায়! আর্টের সেই অব্যক্ত ছাপটাই চমৎকার চিত্রকলা বা ভাস্বর ভাস্কর্য্যশিল্পের বাহিরের সৌন্দর্য্যকে ধন্য ক'রে তোলে—তার অন্তরের ঐশ্বর্য্যটুকুকেও যুগপৎ প্রকাশ ক'রে দিয়ে! সেইটুকুই হচ্ছে আর্টের প্রাণ! এই প্রাণ, যে আর্টের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না সে যেন নিতান্ত গতিহীন, নির্জ্জীব ও অসম্পূর্ণ ব'লে মনে হয়। সাহিত্য-রচনও একটা আর্টের মধ্যে গণ্য, সুতরাং সাহিত্যশিল্পীর সূক্ষ্ম লেখনী যা সৃষ্টি করে, তার মধ্যে যদি আর্টের সেই অব্যক্ত প্রাণশক্তির সন্ধানটুকু না মিলে তাহ'লে সে লেখকের রচনাও সাহিত্যরসিক পাঠকের কাছে প্রাণহীন, নীরস ও নিষ্প্রভ ঠেকে! বিশেষ ক'রে জীবনীকারদের রচনার মধ্যে যদি এই অভাবটা দেখতে পাওয়া যায় তাহ'লে লেখকের রচিত জীবন-রচিতখানি যতই কেন বৃহৎ, সুদীর্ঘ ও সচিত্র হোক্ না—তথাপি সে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেরূপ জীবন-চরিতের মধ্যে বর্ণিত মহাপুরুষের জীবনও খুঁজে পাওয়া যায় না এবং চরিত্রও অপ্রকাশ থাকে! শুধু কেবল বিস্তৃত বংশ-পরিচয়, বাসস্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ ভৌগোলিক বিবরণ, কোষ্ঠিলিপি বা জন্ম-পত্রিকা, শিক্ষা-দীক্ষা দানধর্ম্মময় দশবিধ সংস্কার ইত্যাদি ও আলোচ্য ব্যক্তির জীবিত কালের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর বিরাট তালিকা লিপিবদ্ধ ক'রে এবং তাঁর মহত্ত্ব ও সদ্‌গুণরাশির উচ্ছ্বসিত কীর্ত্তন ক'রে যেতে পারলেই জীবন চরিত লেখা সম্পূর্ণ ও সার্থক হয় না। জীবনী তো শুধু জীবনের ইতিহাস নয়, সে যে জীবনের অন্তর্নিহিত যে সত্য মানুষটি তার প্রাণের সঙ্গে পাঠকের অন্তরঙ্গ পরিচয় করিয়ে দেওয়া! তাকে চোখের সামনে সজীব ও প্রত্যক্ষ ক'রে দাঁড় করিয়ে দেওয়া! জীবনী প'ড়ে যদি সেই মানুষটিকেই না চিন্‌তে পারি, তার প্রাণের পরিচয়ই যদি না পাই, যদি তার সত্তা ও সান্নিধ্য অন্তরে অন্তরে না অনুভব করতে পারি তবে সেরূপ জীবন-চরিত পড়ে সময় নষ্ট না ক'রে, সেটা বাজে কাগজের ঝুড়ীর মধ্যে ফেলে রাখাই সুবুদ্ধির কাজ! কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি

* কান্তকবি রজনীকান্ত—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রণীত। মূল্য চারি টাকা মাত্র।

প'ড়ে আমাদের বর্তমানে মাথায় ক'রে রাখতে ইচ্ছা করে, কারণ পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন কবি রজনীকান্ত সেনের স্বর্গারোহণের যুগান্তকাল পরে তাঁর যে সুন্দর জীবনী প্রকাশ করেছেন, তা সব দিক দিয়ে সার্থক ও সম্পূর্ণ হয়েছে। সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের সুকঠোর সাধনায় তিনি যে সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধকাম হয়েছেন, একথা দেশের শ্রদ্ধেয় মনীষিবর্গ সকলেই একবাক্যে বলেছেন, দেশের ইংরাজী বাঙ্‌লা সমস্ত কাগজে পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন প্রণীত কবির এই অনুপম জীবনচরিতখানির এতবেশী প্রশংসা হয়েছে এবং শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ দেশের বহু সুধী যে ভাবে এই গ্রন্থখানির সুদীর্ঘ সমালোচনা ক'রেছেন, বাংলা দেশের কোন গ্রন্থকারের কোনও রচনারই এ পর্য্যন্ত সে সৌভাগ্য লাভ ঘটেনি। তথাপি বাহুল্য মাত্র হবে জেনেও আজ সেই অতি আলোচিত গ্রন্থখানির আমি যে পুনরায় কেন গুণকীর্ত্তন করতে বসেছি, তার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া বোধ হয় একেবারে অবান্তর হবে না।

গানের কবি রজনীকান্ত আমাদের প্রাণের আসন অনেকখানি দখল ক'রে নিতে পেরেছিলেন ব'লে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হ'বার আমার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা সেদিনের তরুণ মনের মধ্যে জেগেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কবির জীবদ্দশায় সেটা ঘটে ওঠেনি, তবে তাঁর সুকণ্ঠের সঙ্গীত সুধা 'শ্রবণ ভরিয়া' শোনবার সৌভাগ্যটা একবার অপ্রত্যাশিত রকমে ঘটেছিল সেদিন প্রীতি পুলকিত রোমাঞ্চিত হৃদয়ের যে অগাধ শ্রদ্ধা নীরবে তাঁর চরণে নিবেদন ক'রে দিয়ে এসেছিলেম, পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন প্রণীত কবির জীবনচরিত প'ড়ে আজ বুঝতে পেরেছি সেদিন আমার আনন্দাশ্রু দিয়ে আমি শুধু এক কবির নয়, এক দেবতার পূজা ক'রে এসেছিলেম! সিদ্ধপুরুষের মত পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন তাঁর গ্রন্থের পাঠকদের সেই দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়েছেন, যে বিভূতির প্রভাবে এবং কবি যেখানে দুঃখের বজ্রানলকে বক্ষে বরণ ক'রে নিয়ে সন্তোষ বেদীর উপর দেবতার আসনখানি দখল ক'রে দাঁড়িয়েছেন, আমি আজ শুধু গ্রন্থের সেই রোজনামচা ও হাসপাতালের অধ্যায় থেকে সেইটুকুর পরিচয় দিয়ে ধন্য হ'তে চাই।

প্রথমেই ব'লে রাখা উচিত যে, স্বর্গগত কবির এই রোজনামচা ঠিক যাকে ইংরেজীতে "ডায়েরী" বলে, সে জিনিস নয়। ছিন্নকণ্ঠ কবি বাক্‌শক্তি হারিয়ে একটি পেন্সিলের সাহায্যে যে খাতা কয়েকখানিতে অস্ত্রোপচারের দিন থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ আটমাস হাসপাতাল বাসের সময় তাঁর যা কিছু অভাব অভিযোগ, আলাপ আর্ত্তনাদ, পরামর্শ প্রার্থনা, উপাসনা মর্ম্মোচ্ছ্বাস প্রভৃতি যা তিনি বাক্যের দ্বারা প্রকাশে অসমর্থ হ'য়ে পত্তিবার লিখে লিখে জানাতে বাধ্য হ'য়েছিলেন, কবির সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসম্বদ্ধ ও অস্পষ্ট মনোভাবগুলি সযত্নে সংগ্রহ ক'রে পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন অসীম অধ্যবসায় ও অসাধারণ পরিশ্রমের সঙ্গে তার পাঠোদ্ধার ক'রে তাকে ধারাবাহিক ও শ্রেণী বিভক্ত ক'রে সাজিয়ে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

নিপুণ ও চতুর কুম্ভকারের হাতের গুণে যেমন কর্দ্দমাবশেষের মৃত্তিকা একটা সুগঠিত সুন্দর রূপ পায়, তেমনি লোক চরিত্রজ্ঞ প্রতিভাশালী পণ্ডিত নলিনীরঞ্জনের হাতে প'ড়ে কবি রজনীকান্তের সেই লিখিত কথোপকথনের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অংশ আজ তাঁর "রোজনামচার' অতুলনীয় রূপ ধ'রে দেখা দিয়েছে।

রোজনামচার প্রথম অংশে আমরা কবির রসরূপের দর্শন পাই। নিদারুণ ব্যাধির অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও বাকশক্তিহারা কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রস প্রকৃতির বশে হাসতে হাসতে লিখে গেছেন

'তোমাদের মতন যদি আমার আগেকার মত Loud-logic (গলাবাজির ক্ষমতা) থাকতো, তবে তর্ক করতেম। তোমরা চট ক'রে বলে গেলে, উত্তর লিখতে আমার প্রাণান্ত। যখন না পারি, তখন ভাবি, –

প'ড়েছি পাঠানের হাতে,
খানা খেতে হবে সাথে।"

এই শুভ্র হাসির অন্তরালে অসহায় কবির যে নিগূঢ় অন্তর্দাহ আত্মগোপন ক'রে রয়েছে, হৃদয়বান্ পাঠকের চোখে তা সহজেই ধরা প'ড়বে। এমনি নানা বিচিত্র রসালাপের মধ্যে স্বর্গগত কবির যে আনন্দময় চরিত্রটি ফুটে উঠেছে তা মহৎ ও মধুর। অর্থের চরণে পরমার্থকে উৎসর্গ ক'রে তিনি ধনী হ'তে চান নি।

পল্লীকুসুম—

"শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ"

তারপরেই আমরা দেখতে পাই, কবির নিরভিমান নিরহঙ্কার অ-তমো মূর্ত্তি –তাঁর সেই তৃণাদপি সুনীচ ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞানের মধ্যে!

"এ আমার মানুষের কাছে নত হবার সময়। আর এই আমার প্রাণের ভগবান সমস্ত রাত্রি শিখিয়েছেন।"

কবির এই উক্তির মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র কপটতা নেই এবং তিনি যে সত্যসত্যই এটাকে মেনে নিয়েছিলেন এ পরিচয় তাঁর পরবর্ত্তী সমস্ত লেখার মধ্যেই বরাবর পাওয়া যায়। ভগবানের প্রতি একটা অসীম গভীর বিশ্বাস তাঁকে ভগবৎ সান্নিধ্যে উপনীত করেছিল। রোগশয্যায় অসহায় অবস্থায় শুয়ে দারুণ অর্থ কষ্টের মধ্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্তা পত্নীকে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন —

"ভগবান আছেন · তবে আবার চিন্তা কি? আমাদের ভাবনা তিনি ভাবছেন। ভার দাও। যে দিচ্ছে বরাবর সেই দেবে তবে ভাব কেন? কষ্ট ··তাও যে তাঁরি প্রেরিত, তাঁর যদি ইচ্ছা হয় তবে কি তুমি ভাবলে খণ্ডে যাবে? তোমার ভুল।· 'তা ত হবেই না। যা হবার নয়, তা ভেবে কষ্ট পাও। তা ভেব না।·"

এত বড় প্রকাণ্ড ঈশ্বর নির্ভরতা যাঁর ছিল তাঁর মুখেই একথা সুন্দর শোভা পেয়েছে—

"মানুষে আমার জন্য এত করছে। তাঁরি মানুষ, সুতরাং তাঁরি প্রেরণায়।"

কবির অপরিসীম কৃতজ্ঞতা শুধু উপকারীকেই ধন্যবাদ দিয়ে ক্ষান্ত হ'তে পারে নি,—উপকারীকে উপলক্ষ্য ক'রে যে অদৃশ্য মহাশক্তির করুণাধারা তাঁর উপর বর্ষিত হচ্ছিল তিনি প্রকৃত কবির মতো সত্যসাধকের মতো সর্ব্বান্তঃকরণে সেই করুণাময়কেও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

তাঁর উদার ধর্ম্মবিশ্বাস শুধু কবির যোগ্য কেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব প্রভৃতি সিদ্ধ মহাপুরুষগণেরও সমতুল্য! 'ভগবান সকলেরই হৃদয়ে আছেন, সব তীর্থই মানুষের মনে'—একথা তিনি বারংবার বলেছেন, কারণ এ তিনি খুবই বিশ্বাস ক'রতেন। তিনি ধর্ম্মের নামে বলিদানের সমর্থন ক'রতেন না। বিনা বলিতে পূজা করবার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেছিলেন—"জগন্মাতার সম্মুখে আমরা একটা নিরীহ প্রাণীকে হত্যা করি এতে কি দেবী প্রসন্না হন?"

নিজের পাপ যে অকপটে স্বীকার করতে পারে সে মহৎ—কবি রজনীকান্তে আমরা এই মহত্ত্বের পরিচয় পেয়েছি। তিনি পাপ স্বীকার করেছিলেন। ব্যাধি-জনিত তাঁর অসহ্য শারীরিক কষ্টকে তিনি ঈশ্বরের ন্যায় বিচার বলেই মেনে নিয়েছিলেন। কোনও দিন এজন্য তিনি ভগবানের উপর দোষারোপ করেন নি, তিনি বল্‌তেন—

··· "আমার পাপের শাস্তি ভোগ করছি!··· ভগবান কি অবিচার করেন? জীব নিজের কর্ম্মফল ভোগ করে।·····ভগবান, আমার ত শারীরিক কষ্ট। আমার আত্মা ত কষ্টমুক্ত। দেহমুক্ত হলেই আত্মা কষ্টমুক্ত হবে। তবে আত্মাকে দেহমুক্ত কর দয়াল।"

এত দুঃখ কষ্ট এত পীড়ন এত যন্ত্রণার মধ্যেও যে ভগবানকে সতত 'দয়াল' ব'লে ডাক্‌তে পারে, সেই মানুষই প্রকৃত মহাত্মা! মহাপুরুষ না হ'লে কি একথা এমন ক'রে কেউ বল্‌তে পারে যে—"যাঁর দয়ায় এপর্য্যন্ত বেঁচে আছি, তাঁরই দয়ায় কষ্ট পাচ্ছি। নিচ্ছেন, আগুনে দগ্ধ ক'রে পাপের খাদ উড়িয়ে দিয়ে নিচ্ছেন; তা তো মানুষ বোঝে না,—মানুষ ভাবে কষ্ট দিচ্ছেন।"

"······এটা ঠিক জেনেছি যে, যত শাস্তি তত প্রেম। এ তো কষ্ট নয়।·····আমাকে আগুনের মধ্যে ফেলে না দিলে খাঁটি হব কেমন ক'রে?··· ··পাপ নিয়ে অসরলতা নিয়ে তো সেখানে যাওয়া যায় না।"

হাঁসপাতালে কঠিন রোগশয্যায় প'ড়ে থেকেও কবি যে অপূর্ব্ব কাব্যসম্পদ উপহার দিয়ে বঙ্গের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে উজ্জ্বল করে রেখে গেছেন, সে তাঁর এক অসাধারণ কীর্ত্তি! কেবলমাত্র কবি হ'লে তিনি এ অসাধ্য সাধন করতে পারতেন না, ভারতচন্দ্রের জীবনী রচনা ব্যপদেশে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঠিকই বলেছেন যে, স্বাস্থ্য শুধু সাহিত্য সৃষ্টি নয়, জীবনের সমস্ত বিষয়ের মূল। দেহ রোগগ্রস্ত হলে কিছুই হয় না। রজনীকান্তের জীবনীকার পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন দেখিয়েছেন যে, কবি এই সর্ব্বজনগ্রাহ্য সত্য খণ্ডন করেছেন। "হাঁসপাতালে রোগশয্যায় নিজের জীবন ও কার্য্যের দ্বারা তিনি স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করেছেন যে, দৈহিক কষ্ট ও যন্ত্রণা যতই নিদারুণ

হোক্ না কেন, তা উপেক্ষা ক'রে সাহিত্যসাধনা ও সাহিত্য-রসসৃষ্টি করতে পারা যায়।" জীবনীকারের একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলেছেন, "মৃত্যুভীতি তাঁর হৃদয়ের স্বাভাবিক কবিতার প্রস্রবণ বন্ধ করতে পারে নি। এটা তাঁর ভাবময় জীবনের মধুরতা সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর ন্যায় ভাবুক কবির জন্ম বাঙালী জাতির পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নয়।" কিন্তু যিনি যত বড় কবিই হোন বা শিল্পীই হোন, কোনও মানুষের পক্ষে যে কাজটা একেবারে "Physically Impossible" সেই ব্যাপার কবি রজনীকান্তের দ্বারা কেমন করে সম্ভব হয়েছিল? কি ক'রে তিনি নিদারুণ দৈহিক কষ্ট ও যন্ত্রণা উপেক্ষা ক'রে সাহিত্যসাধনা ও সাহিত্যরসসৃষ্টি করতে পেরেছিলেন? কেন মৃত্যুভীতি তাঁর হৃদয়ের স্বাভাবিক কবিতার প্রস্রবণ বন্ধ করতে পারে নি? সাধারণ পাঠকের মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান সাধক কবি রজনীকান্তের রোগশয্যার রচনার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। রজনীকান্ত শুধু কবি ছিলেন না, তিনি একজন প্রকৃত সাধক ছিলেন। এবং সাধকের মতই তাঁর দেহমুক্ত আত্মা ইষ্ট আরাধনায় তন্ময় ও তদ্গত চিত্ত হয়ে যেত। ভগবৎ গুণগাথা রচনায় একান্ত প্রাণ-মন তাঁর দেহের কষ্ট অনুভব করতে পারত না। এই একাগ্র সাধনার বলেই তাঁর একদিন প্রত্যক্ষ ইষ্টলাভ হয়েছিল, সেদিন তিনি তাঁর রোজনামচায় লিখেছিলেন—

"একি বিকাশ! একি মূর্ত্তি প্রেমের! সখা, প্রাণবন্ধু! প্রাণের বেদনা কি বুঝেছ? আজ ভগবান আমাকে নিজের পায়ের তলায় একটু স্থান দিয়েছেন, আমাকে ভগবান দয়া করেছেন।"

ভগবান যাঁকে দয়া করেছিলেন তাঁর পক্ষেই অসম্ভব সম্ভব করা সম্ভব হয়েছিল। তাই তিনিই কেবল বড়গলা ক'রে বলতে পেরেছিলেন, "ওগো এ মার নয়, প্রহার নয়, কষ্ট নয়, ব্যথা নয়—শুধু প্রেম, শুধু দয়া!" এবং এই সুরটিই তাঁর হাসপাতালের সমস্ত সাহিত্য-সাধনার মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে ঝঙ্কৃত, মুখরিত ও নন্দিত হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। সাধনতত্ত্বে অতুলনীয় তাঁর যে সকল সঙ্গীত—

> "আমি অকৃতি অধম বলেও তো মোরে
> কম ক'রে কিছু দাওনি,
> যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া
> কেড়েও তো কিছু নাও নি।"

কিম্বা—"আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে গর্ব্ব করিতে চূর।"—ঐ সমস্তই সেই সিদ্ধ সাধক মহাকবির সচ্চিদানন্দ অন্তরের প্রতিধ্বনি মাত্র।

উমেদার-গীতি

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক

আমি	নিশিদিন তোমার দ্বারে প'ড়ে আছি
তুমি	অবসরে কথা কহিও,
আমি	নিশিদিন তোমায় পূজি দেব প্রভু
তুমি	পদতলে তুলে লইও।
আমি	সারা দিবারাতি ধরিয়া
যাব	তব মোসাহেবী করিয়া,
তুমি	নিমিষের তরে দন্ত বিকাশি'
	করুণা নয়নে চাহিও।
আমি	বড় আশা করে এসেছি
ওগো	বড় সাধ বুকে পুষেছি
তুমি	কুরসুৎ মত পায়ে ঠাঁই দিয়ে
	সেগুলি পূরণ করিও।
দিও	যেন তেন কাজ আফিসে
তব	ধন্য তাতেই আমি যে
ওগো	চিরদিন তব কেনা হ'য়ে রব,
	যাহা চাও তাই লইও।

পটলা

শ্রীমতী নীহারবালা দেবী

অনেক করেও হিসাবটা না মেলাতে পেরে, খাতা সশব্দে বন্ধ করেই খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটা লোক এদিক পানে আস্‌ছিল দেখ্‌লাম—ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরেছে সে। পাড়ার ডান্‌পিটে ছেলেগুলো সবাই তার পেছনে লেগেছে,—কেউ লাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছে, কেউ কাপড় ধরে টান্‌ছে আর নানারকমের সব ছড়া কাট্‌ছে। পোষ্টাফিসের সামনে এসেই সে বিকট হাস্যধ্বনি করে উঠ্‌ল। তেমন প্রাণ চম্‌কানো হাসি কাউকে বড় একটা হাসতে দেখা যায় না। বুঝ্‌লাম—সে পাগল। সে আবার বিকট একটা হাস্যধ্বনি তুলে বল্লে,—"পটলা এসেছিস্ বাপ্! আয় কোলে আয়। কতগুলো পটলা আজ এসেছে যে।" এই বলেই একটা ছেলেকে ধরতে হাত বাড়িয়ে সে এগিয়ে গেল। ছেলেরা সবাই ছুটে পলাল, লোকটাও চলে গেল। কিন্তু আমার মনে হতে লাগ্‌ল, এমনি একটা লোক কোথায় যেন দেখেছি। পটলা! তাইত, নামটাও যে শোনা শোনা বোধ হচ্ছে। ফিরে এসে চেয়ারটা টেনে বস্‌লুম। টেবিলের উপর থেকে চাবির গোছাটা তুলে আঙ্গুল দিয়ে ঘুরাতে ঘুরাতে ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। হঠাৎ মনে পড়ল, সেই সাত বছর আগে, তখন কমলডাঙ্গায় নরেন-বাবুদের বাড়ীর উপরে পোষ্টাফিসে কাজ করিত অনেকটা এমনি ধরণের একটা লোক,—যগা, হাঁ, যজ্ঞেশ্বরই না কি যেন ছিল তার নামটা—পিয়নের কাজ করতো। অফিসের কাছে নরেনবাবুদের বাগানের মধ্যে ছোট একখানা খড়ের ঘরে সে থাক্‌তো তার স্ত্রী, আর একমাত্র পুত্র পটলাকে নিয়ে স্ত্রীলোকটা বাগানের কাজ সেরে বাসায় এসে আমাদেরও অনেক কাজ করে দিত। ছেলেটা প্রায়ই খোকাকে কোলে করত দেখতাম। যগাও বেশ ভাল মানুষ ছিল,—প্রত্যহ আমাদের বাজার করে দিত।

সেবার এমনি গ্রীষ্মের সময়ে কলেরা তার প্রচণ্ড মূর্ত্তি নিয়ে সমস্ত কমলডাঙ্গাটা উজাড় করে দিয়েছিল! কি ভীষণ! আজও মনে হলে প্রাণ কাঁপে। দিনরাত কেবল কান্নাই শোনা যেত চারদিকে। তখনও জমিদার বাড়ীর সবাই ভাল ছিল। হঠাৎ একদিন যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রীর কলেরা হ'ল দুপুরবেলা। দু' তিনবার খুঁজেও একমাত্র ডাক্তার গোপাল গুপ্তের সন্ধান পাওয়া গেল না। এদিকে সন্ধ্যা হ'তেই সব শেষ হয়ে গেল। উঃ! কি কান্নাটাই কেঁদেছিল ওরা সে'দিন। ছেলেটার সে "মাগো—মাগো" কান্না শুনে মানসী, আমার স্ত্রী, চোখের জল রাখতে পারেনি। পরেও অনেক-দিন সে কথা তুলে তাকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়তে দেখেছি।

বিপদ একা আসে না, কথাটা বোধহয় সত্যি। সকাল না হতে হতে যগা এসে জানিয়ে গেল ছেলেটারও নাকি তিন চারবার ভেদবমি হয়েছে। আজ আর তার 'ঝিটে' যাওয়া হয়ে উঠ্‌ছে না।

দেখতে দেখতে আর এক বিপদ! দুপুরবেলা নরেন-বাবুদের গোমস্তা এসে ওকে বলে গেল,—বড়বাবুর হুকুম, এরকম রোগী নিয়ে সে আর এখানে জায়গা পাবে না। এমন রোগী কি কেউ কখনও বাড়ীতে রাখে! সর্ব্বনাশ!

সন্ধ্যেবেলা ওদের ওখানে একটা গণ্ডগোল শোনা গেল, বড়বাবুর গলা। তিনি সরোষে বলেছেন,—পাজি, নচ্ছার এখনও বেরোস্‌নি? শেষটায় তোর ছেলের জন্ত আমরা বাড়ীতে কলেরা ডেকে আনবো ভেবেছিস্! এখনো যা বলছি—কোন আত্মীয়ের বাড়ী নিয়ে যা।" "দুনিয়ায় আমার আপন বলতে যে কেউ নেই বড়বাবু।" এইটুকু বলেই সে কেঁদে উঠ্‌ল। বড়বাবু নাছোড়বান্দা, আবার তেমনি সুরে বল্‌লেন,—"কোন ওজর তোর খাট্‌বে না এখানে। কেউ নেই তো ওটাকে টেনে নদীতে কেন ফেলে দিস্‌নে! পাজি কোথাকার! না যাস্‌তো হরে বাগ্‌দীকে ডাকিয়ে এখনি ওটাকে মাঠে ফেলিয়ে দেওয়াব।" বলেই বড়বাবু দিকে ভিতর চলে গেলেন।

সন্ধ্যের পর চারদিক ঘুটঘুটে আঁধার। দু চোখে কিছুই দেখা যায় না বাইরের। সমস্ত আকাশটা কাল-বৈশাখীর মেঘে ছেয়ে ফেলেছে। গাছের একটী পাতাও নড়ছে না। গ্রামটা একেবারে নিঝুম্। শোনা যাচ্ছিল কেবল অবিশ্রান্ত ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ—ঝিল্লিরব। এমনি সময়ে

[illegible] — "বাবু, [illegible] [illegible] আশীর্বাদ করবেন।" [illegible] এই [illegible] বাবু কোথায় তোমরা।" বলেই উঠে দরজাটা খুলে বাহিরে এসে দেখ্‌লাম, সে আর দাঁড়িয়ে নেই। ডাক্‌লাম, জবাব নেই। তার পরেও এক বছর সেখানে কাজ করেছি, কিন্তু মগাকে কেউ কখন দেখেছে বলে শুনিনি। আর আজ এই·········

হঠাৎ বাসার মধ্য থেকে, আমার চিন্তাস্রোতের বাঁধ ভেঙ্গে খোকার সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আমাকে জানিয়ে দিল, চা তৈরী হয়েছে, আর তার মা আমায় ডাকছে। বাসায় পা দিতেই মানসী বললে,—পাগলটাকে চিনলে তুমি? ও সেই [illegible] আহা [illegible] বুড়ি মা আর বেঁচে নেই। তাই [illegible] পাগল হয়ে গেছে।"

"আমি তাই ভাবছিলাম এতক্ষণ।"

"দেখতে পায় একটু গেল কোনদিকে। আহা বেচারী!

আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখ্‌লাম কিন্তু তাকে কোথাও দেখ্‌লাম না। দু'তিন দিন পরে পাড়ার ছেলেদের জিজ্ঞেস করে জান্‌লাম্ সে রেলগাড়ীতে কাটা পড়ে মারা গেছে। ভিতরে সংবাদ পৌঁছাবার পর গিয়া দেখি, মানসীর মুখটা ভারী, চক্ষুদুটী আরক্ত, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ, আর কপোলে শুষ্ক অশ্রুর দাগ; বুঝিলাম এই সমবেদনাই নারীকে মহৎ করে।

নিমন্ত্রণ

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ

কুঞ্জে কুঞ্জে হ'ল আমার
আজকে নিমন্ত্রণ,
শুভ্র চন্দ্রাতপের তলে
নৃত্য আয়োজন।
রসের কুম্ভ ভ'রে ভ'রে
উঠ্‌ছে নিত্য সবার ঘরে,
পিয়াসীর পিয়াস ব্যাকুল
কর্‌তে সে হরণ।
সবার কাছে পাঠায় তাহার
প্রাণের নিমন্ত্রণ।
বাঁশী আমার সেধে নেরে
সকল সভার গান।
সকল সুরে গাইতে হ'বে
সকলতর তান,
সকল বধুর সাথে যে মিল
হয় বা যেন হয় না অমিল,
সবার সুধা কর্‌তে হ'বে
আনন্দেতে পান,
ভেঙ্গে সে আজ ভঙ্গ হ'ল
বাধার অবসান।
চূড়াবাঁধি সকল চঙ্গে
পরি সকল মালা,
শুভ্র হল বসন আমার
সকল রঙ্গ সে ঢালা,
অচিন রং'এ কেউনা মানে
আপন যেন সবাই জানে,
কুঞ্জদ্বারে না হয় যেন
পরিচয়ের জ্বালা,
মিলনের সোহাগেতে
উজান পথে চলা।

কুঞ্জছায়ে লুকিয়ে থেকে
ওগো কুঞ্জ-বধু,
গুণ্ঠনের অন্তরালে
ফুটাও সদাই মধু,
তোমার আঙুর অধর মাঝে
যে রস আছে ভাঁঝে ভাঁঝে,
চুম্বনেব পিয়াস-পানে
স্বার্থক তা মানি,
বিশ্বমাঝে পাঠাও তোমার
নিমন্ত্রণ খানি।
কোন্ আড়ালে ছিল আড়াল
তোমার প্রাণের চাওয়া,
তত দিন সে বইতেছিল
কেমনতর হাওয়া,
আজকে শুভ আলোর রাতে
পেলাম তোমার হাতের পাতে,
নিবেদিতার নম্র লিপি
আকুল করা বাণী,
তোমার কুঞ্জ সভার মাঝে
লয় সে মোরে টানি।
বধুর দলে চিনমু আমার
আজকে পূর্ণিমাতে,
অগোচরের আড়ালেতে
দাঁড়ায়ে মালা হাতে,
পরব তাঁদের মালা গলে
নাচ্‌ব সবার সভা তলে,
আঙুর অধর রস যে চুম্বি
রাখব নিমন্ত্রণ
ধন্য হব ধন্য হবে;
আজু-ন।

সেকালে ভদ্রেশ্বর *

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুঃসীমা

ভদ্রেশ্বরের কথা কিছু বলিতে হইলে ভদ্রেশ্বরের থানা যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ততদূর পর্য্যন্ত বলিতে হইবে। ভদ্রেশ্বর থানা উত্তর দিকে চন্দন নগর পর্য্যন্ত, পশ্চিম দিকে পাটুল-শেঠপুর পর্য্যন্ত ও দক্ষিণ দিকে বৈদ্যবাটীর কোল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, পূর্ব্বে ভাগীরথী ইহার পাদ দেশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে।

ভদ্রেশ্বরের প্রাচীনত্ব

ভদ্রেশ্বরের প্রাচীনত্ব ও শিবের পরিচয় শ্রীমহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে শ্রীশিব পার্ব্বতী-সংবাদে নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় :—

ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বর স্তথৈব চ।
বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বর॥
ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি রত্নাকর নদী-তটে।
ভাগীরথী নদী তীরে কপালেশ্বর ঈরিতঃ॥
ভদ্রেশ্বরশ্চ দেবেশি কল্যাণেশ্বর এব হি।
কালীঘট্টে নকুলেশঃ শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ॥

বৈদেশিক পরিদর্শক

বিগত ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে Charles Joseph নামে জনৈক ইংরাজ গঙ্গাতীরস্থ দক্ষিণ ভাগের প্রসিদ্ধ গ্রামগুলি দর্শন করিয়া যে প্রবন্ধটী লিখেন, তাহাতে ভদ্রেশ্বর শিব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"ভদ্রেশ্বর শিবের নামানুসারে এই স্থানের নাম ভদ্রেশ্বর হইয়াছে। এই ভদ্রেশ্বর শিবের উৎপত্তি যে কত প্রাচীন যুগের তাহা আবিষ্কার করা অসম্ভব এবং কোন্ প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহই জানেন না। এই শিব স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ স্বয়ং পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন—কোন মানব ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি যে সকল শিবের মস্তকে শূদ্রগণ হস্তার্পণ করতঃ পূজাদি করিতে পারে, ভদ্রেশ্বর শিব সেই সকল শিবের মধ্যে অন্যতম। যে কোন রকম বিপদে পড়িয়া ভদ্রেশ্বর শিবকে আরাধনা করিলে, সেই বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত বংশের স্ত্রীলোকেরা দলে দলে আসিয়া স্বীয় অভীপ্সিত বস্তু লাভের কামনায় ইহাঁর পূজা করেন। ইনি লক্ষ বিল্বপত্রে পূজিত হইলে বিশেষ রূপে প্রসন্ন হন। [Cal, Review 1845 Vol. 4 Notes on the right bank of the Hooghly. p. 5·6

মনসার ভাসান—বিপ্রদাস

বিগত ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের রাজত্ব কালে কবি বিপ্রদাস রচিত মনসার ভাসানে ভদ্রেশ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

চাঁদ সদাগরের সপ্ত ডিঙ্গা এইরূপ ভাবে গঙ্গা অতিক্রম করে যথা :—

* * * *

ডাহিনে হুগলী রহে বামে ভাটপাড়া
পশ্চিমে বাহিল বোরো পূর্ব্বে কাঁকিনাড়া
মূলাজোড়া গাড়ুলিয়া বাহিল সত্বর
পশ্চিমে পাইকপাড়া রহে ভদ্রেশ্বর
চাঁপদানি ডাহিনে, বামে ইছাপুর
বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকিছে প্রচুর
বামে বাকিবাজার বাহিয়া যায় রঙ্গে
চাঁপদানি বাহি রাজ প্রবাসে নীর্থারে।

[বিপ্রদাস—কৃত মনসামঙ্গল, ১৩৩ পৃষ্ঠা]

গত ষোড়শ শতাব্দী হইতে প্রকৃতপক্ষে শুধু ভদ্রেশ্বর কেন, এ অঞ্চলের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। এই সময়ে ছয়টী বিভিন্ন ইয়ুরোপীয় জাতি গঙ্গার উভয়

---

* ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগারের বাৎসরিক সভায় লেখক কর্তৃক পঠিত। এই সভায় পণ্ডিত শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি ছিলেন।

তীরে দুই তিন মাইল মাত্র ব্যবধানে উপনিবেশ-স্থাপন করেন। চুঁচুড়ায় ডাচেরা, চন্দন নগরে ফরাসীরা আসেন। এই ফরাসীগণের পল্লী-নিবাস নির্ম্মিত হয় গিরীটী বা গৌরহাটীতে।

গিরীটী বা গৌরহাটীর পল্লী-নিবাস

গিরিটী বা গৌরহাটীতে ফরাসীগণ যে প্রাসাদটী নির্ম্মাণ করেন, সেটী তখন সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোত্তম প্রাসাদ বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রাসাদের মনোহর সোপানাবলী, বৈচিত্রময় অত্যুজ্জ্বল কক্ষগুলি, নানা কারুকার্য্য সমন্বিত প্রাসাদের কার্ণিশগুলি, দেবদারু ও বকুল-বৃক্ষ-বাটীকা দেখিলে মনে হইত যেন বিধাতা জগতের সকল সৌন্দর্য্যের সমাবেশ এখানে করিয়াছেন। তখন গৌরহাটীর প্রতীচ্যের বিলাসভূমি ভার্সাইলকে, সৌন্দর্য্যে পরাজিত করিয়াছিল। এখানে আসিয়া জুলিয়াস ফ্রান্সিস, ওয়ারেন্ হেষ্টিংস, ক্লেভারিং, স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রভৃতি তদানীন্তন ভারতের ভাগ্য নিয়ন্তৃগণ কতই না আমোদ প্রমোদ, ভোজনোৎসব প্রভৃতি করিয়া গিয়াছেন। কাপ্তেন ষ্ট্যাভোরিনাস বলেন যে গত ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ডচেরা ফরাসী গভর্ণরের সহিত খুব জাঁক জমক করিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসেন। গভর্ণর তাঁহাদের প্রধান ফ্যাক্টরীতে অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু ডাচ ডাইরেক্টার গিরীটিতে গিয়া উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন হইবার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। ডচেরা তখন ছয়খানি গাড়ী করিয়া বেলা ৪টার সময় চুঁচুড়া হইতে যাত্রা করিয়া বেলা ছয়টার সময় chateu (স্যাটো) অর্থাৎ গৌরহাটীর এই সম্ভ্রান্ত পল্লী-নিবাসে উপস্থিত হন। প্রাসাদের সোপানবলীতে, ইহাদের অভ্যর্থনা করা হয় এবং যে সৌন্দর্য্যময়কক্ষ চন্দননগরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহিলাগণ সমাসীন ছিলেন, সেই স্থানে আনীত হন। সেখানে তখন অভিনয়োপযোগী একটি রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত ছিল সেইরঙ্গমঞ্চে সন্ধ্যা ৭ টার সময় একখানি নাটক অভিনীত হয়। সকলে এই অভিনয় দেখেন। রাত্রি দশটার সময় অভিনয় শেষ হইলে, একশত জন স্ত্রী ও পুরুষ একটি কক্ষে বসিয়া পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন ক্রিয়া [illegible] করেন। তারপর রাত্র একটার সময় চুঁচুড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(Cal; Review 1845)

পরে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিদ্রোহের অগ্নি য়ুরোপে প্রজ্বলিত হইলে, প্যারী হইতে সংবাদ আসে যে তথায় বিদ্রোহীদল বিজয়ী হইয়া ভার্সাইলে অগ্রসর হইয়াছে এবং সম্রাটকে বন্দী করিয়াছে। তদনুকরণে চন্দননগরবাসীরা তদানীন্তন গভর্ণর M. Chevaluiকে বন্দী করিতে অগ্রসর হন। তিনি গিরীটীতে পলাইয়া আসেন। এখানেও তিনি নিষ্কৃতি পান নাই। বিদ্রোহীদল তাঁহাকে গিরীটীর প্রাসাদ হইতে বন্দী করিয়া আনে এবং পরে তাঁহাকে সমুদ্র প্যারীতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করে। পথিমধ্যে লর্ড কর্ণওয়ালিশ জাহাজ আটকাইয়া বন্দীগণকে মুক্ত করিয়া দেন।

[Travels of a Hindu by Bholanath Chandra Vol I page 9]

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ডাচেরা তদানীন্তন বাংলার নবাব মির্জ্জাফরের সহিত গোপনে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন এবং ইংরাজদিগকে উচ্ছেদমানসে ৭০০ গোরা ও ৮০০ শত মালয় সৈন্য লইয়া বাণিজ্য ছলে গঙ্গাবক্ষে অগ্রসর হইতে থাকেন। সুচতুর ক্লাইব ইহা বুঝিয়া, তাহাদের গতিরোধ করেন। ইহাতে ডাচ ও ইংরাজে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

২০শে নবেম্বর তারিখে কর্ণেল ফোর্ড বরাহনগরে ডাচ ফ্যাক্টরী দখল করিয়া পলতার ঘাটে গঙ্গা পার হন এবং গিরীটীতে নিশাযাপন করেন। কর্ণেল ফোর্ড চুঁচুড়ার দিকে অগ্রসর কালীন চন্দননগরে ডাচ সৈন্যের নিকট বাধাপান কিন্তু অবশেষে ডাচগণ চুঁচুড়ায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।

যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া, ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে ফোর্ড, ক্লাইবকে একটু চিরকুট লেখেন। ক্লাইব তখন তাস খেলিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উহার পৃষ্ঠে লিখিয়া দেন "প্রিয় ফোর্ড, এখনই তুমি উহাদের আক্রমণ কর। আগামীকল্য আমি তোমাকে কোন্সিলের হুকুম পাঠাইব।"

ব্যাজড়ার যুদ্ধ

ফোর্ড অতিপ্রত্যুষে এই সংবাদ পাইয়া ব্যাজড়ার [বিদেড়া] সমতলক্ষেত্রে ব্যূহ রচনা করেন এবং ডাচদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। Malcom

সাহেব তাঁহার রচিত Decisive Battles of India তে অতি সুন্দর ভাবে এই যুদ্ধের বর্ণনা দিয়াছেন। "তাঁহার দক্ষিণ বাহিনী বিদেড়া (বা ব্যাজড়ায়) থাকে, বাম বাহিনী একটি আম্রকুঞ্জের মধ্যে থাকে, সম্মুখ বাহিনী সরস্বতী নদীর গভীর পরিখামধ্যে অবস্থান করিতে থাকে। পশ্চাৎভাগে কামান গুলি সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে।"

ফরাসী অধিকৃত গৌরহাটী

ফরাসী অধিকৃত গৌরহাটীর নাম ইতিহাসকারেরা দিয়াছেন ফরাসিস্‌গঞ্জ, বা ফরাসী প্রমোদোদ্যান। ইহা সর্ব্বসমেত ১২০ বিঘা মাত্র, গঙ্গা ও গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের মধ্যে ঋজুভাবে অবস্থিত। কেবল মাত্র ১১০ গজ ভূমি অর্থাৎ দেড় একার মাত্র। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

ফরাসীদিগের ন্যায় ইংরাজেরাও গৌরহাটীতে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন। এখানে তাঁহাদের একটি সুবৃহৎ দুর্গছিল। Bengal armyর অর্দ্ধেকাংশ এখানে থাকিত।

[Hooghly Medical Gazetteer—by Crawford.

এই গিরীটী সম্বন্ধে টেভোরিনাস ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে লিখিয়া ছেন :—এখানে ইংরাজদিগের একটি দুর্গ আছে। এখানে সদাসর্ব্বদাই এক হাজার সৈন্য থাকে। সময়ে সময়ে বেশীও থাকে।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ তারিখের লিখিত কাউন্সিল বিবরণীতে এইরূপ মন্তব্য লিখিত আছে যথা :—

"অতঃপর এইরূপ স্থির হইল যে, সৈন্যগণকে সুস্থ ও সংযমী এবং সীমান্তপ্রদেশস্থ বহিঃশত্রুকে দমন করিবার নিমিত্ত ও দেশমধ্যে শান্তিস্থাপনার্থ সমগ্র সৈন্যের অর্দ্ধেকভাগ পাটনায় থাকিবে—অপরার্দ্ধ গিরীটীতে থাকিবে। গিরীটীর এই সৈন্যদলের মধ্য হইতে প্রতিসপ্তাহে ৬০জন করিয়া গোরা সৈন্য কলিকাতা রক্ষার জন্য এখান হইতে যাওয়া আসা করিবে।"

১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখের লিখিত কাউন্সিল বিবরণীতে এরূপ লিখিত আছে যে কাপ্তেন গ্রীন্‌হেড এখানে একটী স্বাস্থ্যকর হাসপাতাল নির্ম্মাণ করেন। ১৬ই মে, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে রবার্ট উইলসন এসিস্‌টেন্ট সার্জ্জেন নিযুক্ত হন। পরে তিনি ২৪শে এপ্রেল ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিভিল সার্জ্জেনের পদে উন্নীত হন। গিরীটি তাঁহার এমনি ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি এ স্থান ত্যাগ করেন নাই। ১৮১৩খ্রীষ্টাব্দে ৯ই জুন তারিখে এই গিরীটিতেই তাঁহার ৭৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। যে দুইটি প্রাচীন কবর আজিও রহিয়াছে, তাহার মধ্যে একটি ইঁহার, ও অপরটি আর একজন বীর সেনানীর। কবর দুইটির উপর যে স্মৃতিস্তম্ভ গঠিত হইয়াছিল, তাহা আজও অবিকৃত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। একটির উপর এই স্মৃতিলিপি খোদিত আছে।

To the memory
Of
Robert Wilson Esq
Many years in the service of the Hon'ble Company who departed this life here on the 9th June A. D. 1813

Aged 73 Years

অপরটিতে আছে,—

To The momory
Of
MajR: James Moore
Who so gallantly distinguished himself during the late war in the Carnatic,

---

He died the 26th of January 1785 Aged 34 years

S. C. Sculp.

চাঁপদানী—চাঁপদানী অতি প্রাচীন গ্রাম। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে ইহার উল্লেখ আছে।

এই চাঁপদানীগ্রাম বাংলার নবাব মির্জাফর, কর্ণেল কুটকে [যিনি পরে ভারতের সর্ব্বপ্রধান সমর সচিব হইয়াছিলেন] উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। এখানে তিনি তাঁর প্রিয়তমা পত্নী সুশানা হাচিনসানকে লইয়া বাস করিতেন।

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কর্ণাটের যুদ্ধের সময় হায়দার আলির বিরুদ্ধে যে বিরাট অভিযান কর্ণেল পিয়ার্সের নেতৃত্বে প্রেরিত হয়, তাহার শেষ সৈন্যদলকে এই চাঁপদানীতে ওয়ারেন হেষ্টিংস স্বয়ং ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পর্য্যবেক্ষণ করেন।

[Bengal Past & Present . page 69]

এখানে Storm নামক জনৈক ইংরাজের ফ্যাক্টরী ছিল। সেটি এখনও খাঁপুকুরের তীরে বর্ত্তমান রহিয়াছে

Cal Review 1845 Vol 4 page 506

তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাবু রতিকান্ত বন্দোপাধ্যায়। ইনি ১১৫০ বঙ্গাব্দে মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন নবাবী আদলতে মোক্তারি করিতেন। তৎকালীন সেওড়াফুলির রাজাকে রাজস্ব প্রদান ব্যাপারে বিশেষরূপে সাহায্য করার, তিনি তেলিনীপাড়া গ্রামটি তাঁহার নিকট হইতে উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে জমিদারী বিস্তারের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই জমিদারী পরে তদীয় পৌত্র বৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়। ইনি কমিসেরিয়েটে চাকুরী কালে বহু ধনরত্নাদি প্রাপ্ত হয়েন।

[Vide Hooghly Distt. Gazetteer]

Adam's report এ দেখিতে পাই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভদ্রেশ্বরে ১০ টী টোল ছিল। এখানে অধ্যাপকগণ ব্যাকরণশাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যাপনা করিতেন। এখানকার ইহাই ছিল বিশেষত্ব।

[Mr . Ward's Enumeration as quoted in pages 40 & 41 of Adam's report, long Edition]

কিম্বদন্তী অনুসারে গৌরহাটীর গঞ্জ ১২১৬ বঙ্গাব্দে ভদ্রেশ্বরে আইসে। তখন এই ভদ্রেশ্বরগঞ্জ ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। কলিকাতা ও কালনার মধ্যে এই ভদ্রেশ্বর গঞ্জ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গঞ্জ ছিল। গত অষ্টাদশ শতাব্দীতে [illegible] পাকাবাড়ী, গুদাম ঘর প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। [illegible] ভদ্রেশ্বর ২০ মাইল দূরবর্ত্তী চতুর্দ্দিকের গ্রাম গুলির [illegible] যোগাইত এবং কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শস্যভাণ্ডার ছিল এই ভদ্রেশ্বর।

[Vide Topographical Survey of the River Hooghly by Chareles Joseph 1841]

ইতিপূর্ব্বে আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়াছি, এই গৌরহাটী গ্রামে একজন মস্ত সাহেব কবিওয়ালা বাস করিতেন। তাঁর নাম ছিল আণ্টুনী। ইহারা দুই ভাই। এক ভায়ের নাম ছিল কেলি, ইঁহারা জাতিতে ছিলেন পর্ত্তুগীজ ও বাংলাদেশে ব্যবসা করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। যুবা বয়সে এই অণ্টুনী সাহেব চন্দননগরের একজন অসামান্যা রূপসী ব্রাহ্মণবিধবার ধর্ম্ম নাশ করিয়া স্বামীস্ত্রী-রূপে বসবাস করিতে থাকেন, আণ্টুনীর গৃহে থাকিয়া এই হিন্দুকন্যা আপন ধর্ম্মানুমোদিত সকল ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত ধূমধামের সহিত করিতে থাকেন। আণ্টুনী ইহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং আনন্দ উপভোগ করিতেন। এই ব্রাহ্মণ কন্যার অনুরোধে তিনি কলিকাতায় ২৪৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে একটি কালীমন্দির করিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত লোকে এই কালীমূর্ত্তিকে ফিরিঙ্গিকালী নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছে। আণ্টুনীর গিরীটীর বাড়ীতে কাজকর্ম্ম উপলক্ষে বহু কবিওয়ালার সমাবেশ হইত। এই কবির লড়াইয়ে তিনি বিশেষরূপে আনন্দ অনুভব করিতেন এবং তিনি নিজে বেশ ভাল করিয়া বাংলা ভাষা শিখেন। এই সময়ে তাঁর একটি নিজের কবির দল গঠন করিতে সাধ হওয়ায়, গোরক্ষনাথ নামে জনৈক বাঙ্গালীকে গান বাঁধিতে নিযুক্ত করেন। পরে দেখেন যে তিনি নিজেই একজন কবি হইয়া উঠিয়াছেন। তখন তিনি নিজে গান বাঁধিয়া কবির দল লইয়া কবির লড়ায়ে যোগ দিতে থাকেন।

ভদ্রেশ্বর সম্বন্ধে হয়ত আরো কত কথা বলিবার আছে হয়ত এই প্রসঙ্গে কত অনাবশ্যক কথা কহিয়াছি—কিন্তু আপনারা ত জানেন আমার দৈন্যের কথা। অতএব আশা করি আমাকে আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

শিল্প-জগৎ

চিত্র প্রদর্শনী- (সোসাইটী অব ফাইন আর্টস, কলিকাতা ১৯২৪) কলিকাতা সোসাইটী অব ফাইন আর্টস্ এর উদ্যোগে প্রতি বৎসর যে চিত্র প্রদর্শনী হইয়া থাকে গত ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টে তাহার চতুর্থবার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সহরের বহু ধনী, মানী, সম্ভ্রান্তকে লইয়া স্বয়ং বাংলার লাট লিটন সাহেব উদ্বোধন কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। চিত্রের সংখ্যা অন্যান্য বৎসরের তুলনায় শুধু যে কম হইয়াছে তাহা নহে—গুণেও যে ঐগুলি অতি হেয় একথা অকুণ্ঠচিত্তে বলা যাইতে পারে। অন্যান্য বৎসর বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু ভাল ভাল চিত্র, প্রদর্শনী অলঙ্কৃত করিত—এবার সে সকল স্থান হইতে কোন চিত্রই আসে নাই। শুধু ইহাই নহে, কলিকাতার বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রও এ বৎসর নাই—ইহার অর্থ কি? কর্তৃপক্ষদের কাছে আমরা ইহার সদুত্তর আশা করি। অবিলম্বে ইহার বিশেষ প্রতিকার না করিলে শিল্প-প্রদর্শনীর চিত্র সংখ্যা যে অচিরে লুপ্ত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জাতির পক্ষে ইহাপেক্ষা দুঃখের কারণ আর কি হইতে পারে? জাতীয় মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির মূলে—শিল্প; শিল্পের ভিতর দিয়াই জাতিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিনিতে পারা যায়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অন্যূন ৫।৬টী চিত্র প্রদর্শনী আছে - বোম্বাই, মাদ্রাজ সিমলা প্রভৃতি প্রদর্শনী আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। আমাদের কলিকাতা প্রদর্শনী সর্ব্বাপেক্ষা তরুণ; অথচ এই অল্প সময়ের ভিতরেই ইহাতে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। কাগজে-কলমে ও বচনে বাংলাদেশ ভারতের শিরোভূষণ, হুজুগেও কাহারো অপেক্ষা ন্যূন নহে—কিন্তু কার্য্যকালে কোন সদ্বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না—ইহা কি কম ক্ষোভের কথা? গত বৎসরও "বসুমতী" পত্রিকায় এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই কারণে যে শিল্পীদের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়া সম্ভব তাহার যথেষ্ট আভাসও তাহাতে বিদ্যমান ছিল; তবুও কর্ত্তারা তো নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্বেগ।

চিত্রবিচার ও উপযুক্ত স্থানে চিত্রের সন্নিবেশ (Placing) এই দুইটী ব্যাপারই প্রদর্শনীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও শক্ত কাজ। ইহার একটীরও ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ একটা ভাল চিত্র উপযুক্ত আলোকে বা যোগ্যস্থানে স্থাপিত না হইলে চিত্রের গুণাবলী দর্শকের নিকট আদৌ ধরা পড়ে না। ইহা প্রদর্শনীর 'Hanging Committe'র কাজ। চিত্র ঝুলান ব্যাপারে জগতের বড় বড় প্রদর্শনীতেও গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। ইহাও অতি সত্য, সমস্ত চিত্র-গুলিকেই উপযুক্ত আলোকে স্থান দেওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে না—কিন্তু যে সকল চিত্র গুণে, উচ্চ স্থান অধিকার করে ঐসকল ছবির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নহে সেইজন্য কর্তৃপক্ষেরাও নিরপেক্ষভাবে, গুণানুসারে ঐ সকল চিত্রের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন—আর চিত্রবিচার সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য; শিল্পীরা প্রাণপাত করিয়া যশের আকাঙ্ক্ষায় চিত্রাঙ্কণ করিয়াও যদি ন্যায় বিচার প্রাপ্ত না হয় তবে তাহাদের উৎসাহ উদ্যম কিরূপ আঘাত পায় তাহা সহজেই অনুমেয়। কর্তৃপক্ষেরা কি ধাতু দ্বারা গঠিত জানি না, তবে এত অভিযোগ অনুযোগ সত্বেও যে তাঁহারা কিছুমাত্র বিচলিত হইতেছেন না ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য।

শুনিতে পাইলাম কর্তৃপক্ষের উপরোক্ত ব্যাধির সংবাদ শুনিয়া নাকি বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতে এবৎসর কোন চিত্র আসে নাই। এ সকল কথা যদি সত্য হয়, এবং এত তীব্র প্রতিবাদের পরেও যখন প্রদর্শনীর কোন সুনিয়ম দেখিতে পাইতেছি না তখন স্বতঃই মনে হয় ইহার ভিতর প্রকৃত শিল্পীর প্রাণে প্রাণবন্ত, কোন মানুষের মত মানুষ নাই।

দিল্লীকা লাড্ডু

খো খায়া—

বাস্ বিয়ের এত জ্বালা—আগে জান্‌লে কোন্ * * এ কাজ কর্ত্ত—দ্বিজুরায় যে বলেগেছে

"বিয়ে কল্লেই পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা

কথাটা ঠিক। পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্ব্বস্বান্ত।

বা বিধাই

যো নেহি খায়া—

সংসারে আমার কে আছে—বাপ মা ভাই দাদা আছে বটে—কিন্তু আমার—আমার অন্তরের আমার যে কেউ নেই—হৃদয়টা যেন সাহারার মত শুষ্ক এতে স্নেহ প্রেম করুণার মৃতসঞ্জীবনীধারা ঢালা দেবে কে—সে—সে আমার হৃদয়রাণী আমার কুটীররাণী—ওঃ সে কবে আসবে বিলম্ব অনেক।

কাজের কথা
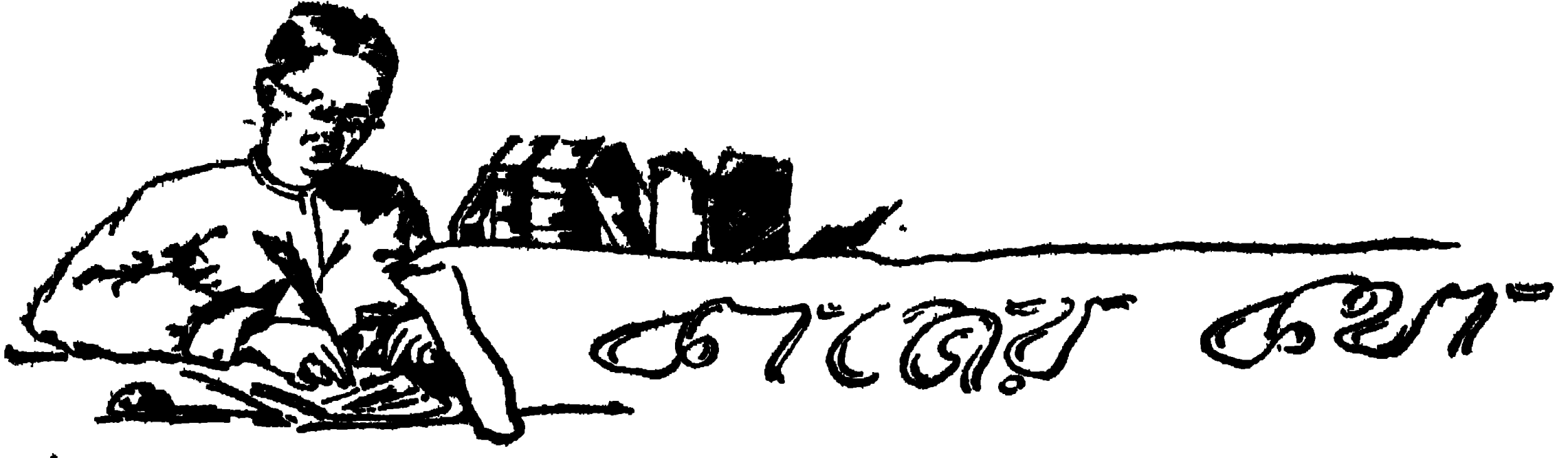
আবার সম্ভাষণ—দুইসপ্তাহের দীর্ঘ অবকাশের পর কংগ্রেসের আশার আনন্দ ও উৎসাহের বাণী লইয়া আমাদের গ্রাহক ও পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত হইলাম এবৎসরেরমত আমাদের ছুটীলওয়া শেষ হইয়াগেল। এই অল্পদিনের মধ্যে নবযুগ যে সাহিত্যরসপিপাসুদের অনুগ্রহ দৃষ্টিলাভে সমর্থ হইয়াছে তাহার মূলকারণ বাঙ্গলায় সাহিত্য-সেবীগণের নিঃস্বার্থ সহৃদয়তা। তাঁহারা সকলে বিনাস্বার্থে নবযুগের জন্য লেখনীধারণ না করিলে আজ তাহার অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ তজ্জন্য বাঙ্গলার সাহিত্যসেবীগণকে নবযুগ আজ আন্তরিক অভিবাদন জানাইতেছেন!

ভ্রম সংশোধন—ছাপাখানা হইতে আমাদের কার্য্যালয় বহুদূরে অবস্থিত বলিয়াও ৩।৪ দিনের মধ্যে ৮ ফর্ম্মা কাগজ ও কয়েকখানি চিত্র মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল বলিয়া গত সংখ্যার সকল ফর্ম্মার প্রুফ্ ভাল করিয়া দেখা হয় নাই তজ্জন্য কয়েকটী গুরুতর ভ্রম ঐ সংখ্যায় থাকিয়া গিয়াছিল—এ ত্রুটীর জন্য আমরা বিশেষ লজ্জিত ও পাঠক বর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। ভবিষ্যতের জন্য সুবন্দোবস্ত করিতে চেষ্টিত আছি ও শীঘ্রই পত্রিকাখানিকে নির্ভুল করিয়া মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিব। "নবরত্ন" শীর্ষক ব্যঙ্গচিত্রের 'রত্নগর্ভা' নামক চিত্রে 'উমাসুন্দরী' স্থলে জ্ঞানদা মুদ্রিত হইয়াছে। মিলন-মাধুরী নামক চিত্রের শিল্পীর নাম এম্, ভি, ধুরন্ধর না হইয়া শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম হইবে পল্লীসন্ধ্যা নামক চিত্রের শিল্পীর নাম শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র শীল, উহা ভ্রমক্রমে মুদ্রিত হয় নাই। ৫৮১ পৃঃ "চরিত্র" স্থলে "কবিতা" হইবে এই শ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমপ্রমাদ ও বর্ণাশুদ্ধি অনেক আছে সেগুলির সংশোধন সহজসাধ্য বলিয়া স্বতন্ত্র-সংশোধন তালিকা দেওয়া হইল না। এই সংখ্যায় চিত্রাবলীর মধ্যে যে [illegible] শ্রীমতী বাসন্তীদেবীর নাম ভ্রমক্রমে লিখিত হইয়াছে. উহা শ্রীমতী ঊর্মিলা দেবীর এই সকল মুদ্রাকর প্রমাদের জন্য আমরা ত্রুটী স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের নামের শেষে দাস না হইয়া 'দাশ' হইবে।

বাঙ্গালার অর্ডিন্যান্স

একটী বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত করিবার কথা

বড়লাট তাঁহার অতিরিক্ত করিবার ক্ষমতার বলে বাঙ্গালায় যে নূতন অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা ছয় মাসের বেশী সময় স্থায়ী হইতে পারে না। উহাকে একটি বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আগামী অধিবেশনে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটি বিল উত্থাপিত হইবে। এই অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তনের সময় ভারত-সরকার যে সমস্ত কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বিল উত্থাপনের সময়েও সেইগুলিই প্রদর্শিত হইবে। এই বিলের প্রধান প্রধান সর্ত্তগুলি অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তনের সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমুদয় সর্ত্তে এই অর্ডিন্যান্স উহার পরিবর্ত্তনের দিন হইতে পাঁচশত বৎসরকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া একটি সর্ত্ত আছে। এখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই অদ্ভুত আইন মঞ্জুর হয় কিনা তাহা সাধারণের কৌতূহলের বিষয় হইয়াছে।

আমোদের নেশা—মদ্ ভাঙ্গের মত থিয়েটার বা বায়স্কোপ দেখার একটা নেশা যে প্রবল ভাবে আমাদের আক্রমণ করিয়াছে ও অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে। ৩রা জানুয়ারীর ফরওয়ার্ড পত্রের প্রেরিত পত্রের মধ্যে এক "আশা-হত" (disappointed) পত্র লিখিয়াছেন যে এলফিনষ্টোন বায়স্কোপে গুণ্ডাশ্রেণীর লোকেরা পূর্ব্বাহ্নে ।০ ও ॥০ আনার টিকিট কিনিয়া অভিনয় সময়ে দেড় বা দুইগুণ মূল্যে উহা বিক্রয় করে;

ইহা যাত্রীবিশেষের পক্ষে ঘোরতর অসুবিধাজনক। তিনি এইসম্বন্ধে অভিযোগ করিবার জন্য ম্যানেজারের নিকট গেলে ম্যানেজার তাঁহাকে ধর্ম্মতলায় হেড অফিসে যাইতে বলেন কিন্তু সেখানকার বুরোক্রাটরা বলেন এসম্বন্ধে তাঁহারা নিরুপায়। আমরা ও এসম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে কোন ফল ফলে নাই—ফলিবেও না জানিতাম তাহার কারণ; সুরাপায়ীদের যেমন কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকেনা — এই আমোদের নেশা যাহাদের ধরিয়াছে তাঁহাদেরও আত্মমর্য্যাদা বা সম্ভ্রমজ্ঞান থাকেনা, তা থাকিলে ম্যাডান কোম্পানীর বায়স্কোপে আজ বাঙালী দর্শকে ভরিয়া যাইত না কিন্তু উপায় নাই, আজকাল আমাদের কাছে মনুষ্যত্ব ছোট জিনিস হইয়া গিয়াছে। আর শুধু বায়স্কোপ কেন এখনকার কোন কোন থিয়েটারেও আজকাল এমন ব্যাপার হইতেছে যাহা কয়েকবৎসর পূর্ব্বে ঘটিতে পারিত না Slavementality-র পরিচয় এইরূপ অনেক জিনিষের মধ্যেই পাওয়া যায়—বিদেশীয় শিক্ষা আমাদের যেটুকু উপকার করেছে সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়ে অপকারও বড় কম করে নাই।

মোস্লেম কনফারেন্স প্রমাণ করিয়াছেন হিন্দুদের মধ্যে যেমন ধামাধরার অভাব নাই মুসলমান দিগের মধ্যেও তদ্রূপ, আবার হিন্দুদের মধ্যে যেমন সত্যকার মানুষ আছে আমাদের মুসলমান ভাইদের মধ্যেও মহৎ মানব বিরল নহে কিন্তু তবুও আত্মবিরোধ লুপ্ত হয় না কেন? মুসলমান ধামাধরার দল তাঁহাদের জাতভাইদের একত্রকরে লাটের নূতন অর্ডিন্যান্সটিকে অভিনন্দিত কর্ব্বার উদ্যোগ করেছিলেন কিন্তু সত্যে ও মহত্বে যাঁরা খোদার আশীর্ব্বাদের সন্ধান পেয়েছেন, তাঁদের কণ্ঠে যখন প্রতিবাদের বাণী গর্জ্জন করে উঠল তখন অগত্যা সভা ভঙ্গ হয়েছিল, কিন্তু সত্য আর মহত্ব জিনিষদুটী ভঙ্গ হয় নি। এরচেয়ে আনন্দ ও সুখের বার্ত্তা দেশবাসীর কাছে আর কি হতে পারে?

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে—গত ১লা জানুয়ারী হইতে উক্ত রেলওয়ে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আসিল, মুখবদলানোর হিসাবে ইহা মন্দ হইবেনা তবে আমাদের অদৃষ্ট যেরূপ সুপ্রসন্ন তাহাতে এই পরিবর্ত্তনে দেশবাসীর কোন লাভ হইবে কিনা জানি না। রেলওয়ে শ্বেতকৃষ্ণের বর্ণভেদ যদি না উঠিয়া যায়, তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রীদের নরকযন্ত্রণা ভোগ যদি না কমে, টিকিটঘরের লাঞ্ছনা যদি না দূর হয়, গার্ড ও টিকিট কলেক্টরদের জুলুম যদি না বন্ধ হয়, উচ্চ ভাড়ার হার, মালের মাশুল, যদি না কমে তবে আমাদের পক্ষে ত তা অন্ধের জাগার মত "কিবা রাত্র কিবা দিন" এর মতই হইবে।

টাটার ব্যাপার—রক্ষণশিল্প পাইয়াও টাটার কর্ত্তারা সামলাইতে পারিতেছেন না! সেজন্য ২রা জানুয়ারীর ফরওয়ার্ড পত্র গভর্ণমেণ্টকে কর্ত্তব্যচ্যুতির অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছেন। উত্তম কথা, কিন্তু কাগজের রক্ষণ শিল্পের প্রস্তাবের সময় সহযোগীর তো উচ্চ বাচ্য দেখিলাম না। টাটাকে রক্ষণ সুবিধা দান অবশ্য উত্তম, কিন্তু সে সুবিধা অন্য শিল্পে দিলে যে কিছু মহাপাতক হইবে আমরা তাহা ভাবি না। টাটাকোম্পানীর কারখানা পরিচালনে এত অধিক শ্বেতাঙ্গ নিযুক্ত আছেন ও তাঁহাদের জন্য কোম্পানীকে এত ব্যয়ভার বহন করিতে হয় যে বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার দিনে সত্যই তাহা কোম্পানীর পক্ষে গুরুভার। ক্রমাগত গভর্ণমেণ্ট তথা দেশবাসীর অর্থসাহায্য লইয়া এই শ্বেতাঙ্গদলটীকে প্রতিপালন করা অপেক্ষা ব্যয় লাঘব করা কি বেশী যুক্তি সঙ্গত নয়? রক্ষণ শুল্কের সুবিধা পাইয়াও যদি তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে না পারেন তবে সেই নির্লজ্জ অকর্ম্মণ্যতার জন্য আবার বাউণ্টি বা সাহায্য চাওয়া কেন? কথায় বলে "বাব ছেলে যত খায় তার ছেলে তত চায়।"

প্রেরিত পত্র

শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীযুক্ত "নবযুগ" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন—

বর্ত্তমান পৌষ মাসের 'প্রবাসী' পত্রে আমার লিখিত কেবর্টজাতি" প্রবন্ধপাঠ করিয়া "মাহিষ্য-সমিতির" কয়েকজন প্রতিনিধি আমার নিকট আসিয়া প্রবন্ধের কয়েকস্থলের বিবৃত বিষয় সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন ও পুনরায় বিশেষভাবে আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত অংশ বিশেষের যাথার্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিব এবং তাহার ফল সাধারণে প্রকাশ করিব। এ পত্র মাঘমাসের প্রবাসী পত্রে প্রকাশ করা সম্ভব হইবেনা বুঝিয়া আপনার সুযোগ্য পত্রে প্রকাশ জন্য পাঠাইলাম। ইতি—

বশংবদ

১৯এ পৌষ। শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

মিনার্ভা থিয়েটারে

জোর বরাতের অভিনয় চিত্র

দনুজ দম্পতীর ভূমিকায় শ্রীমতী শশীমুখী

আমাদের পাষাণীর অভিনয় সমালোচনা এক সংযোগিনী ও এক সহযোগীর মনঃপূত হয় নাই তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের অযথা আক্রমণ করেছেন। প্রথমদলের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই কারণ তাঁরা আমাদের বক্তব্যটী ঠিকমত বুঝেন নাই; আমরা লিখিয়াছিলাম "তখনকার, সগের রঙ্গমঞ্চ হিন্দুভাবে পূর্ণ ছিল" ইহার অর্থ যে তখনকার **রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণ হিন্দুভাব মানিয়া চলিতেন ও বিপরীত** কিছু করিতে সাহস করিতেন না। সুতরাং তখনকার লোকেরা অর্থাৎ দর্শকেরা যে কোন ভাবাপন্ন ছিলেন, সে বিচার আজ নিষ্প্রয়োজন। আমরা নাটকে হিন্দু বা অহিন্দু প্রভৃতি কোন জাতীয়ত্ব আরোপ করি নাই, তবে পাষাণী নাটকে সাধারণ হিন্দুদের অহল্যা চরিত্র সম্বন্ধে যুগযুগান্তর ধরিয়া যে সংস্কার বদ্ধমূল আছে তাহাতে আঘাত লাগে এই কথাই বলিয়াছিল। পঞ্চকন্যার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যাহা আলোচনা করিয়াছেন তাহা যে সাধারণ হিন্দুরা নতশিরে গ্রহণ করিয়াছে সে বিষয়ে আমরা এখন ও সন্দিহান, একপ স্থলে মতান্তর অনিবার্য্য হইলেও সহযোগীর সংযত আলোচনা ও শিষ্টাচারের আমরা প্রশংসা করি।

দ্বিতীয় দল আমাদের সমালোচনা পাঠে একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়াছেন ও ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া এমন কতকগুলি কথা প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা স্থিরচিত্তে তাঁহারা পাঠ করিলে নিজেরাই লজ্জিত হইবেন। আলোচনার মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণও আছে কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণের স্থান সাহিত্যে নাই। আমাদের সমালোচনায় অহল্যা সম্বন্ধে সাধারণ হিন্দুদের যে ধারণা আছে তাহাই মোটামুটি বলিয়াছি এবং তাহা যে কোন পুরাণে আছে বা বাল্মিকীর মূল রামায়ণে আছে এমন কোন কথা আমরা বলি নাই। সুতরাং আমাদের পুরাণ জ্ঞানের দৌড়টা তাঁহারা কেমন করিয়া কল্পনা চক্ষে দেখিতে পাইলেন, জানি না। দেশের অধিকাংশ হিন্দুই কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের, রামায়ণ ও মহাভারত হইতে পৌরাণিক চরিত্রের ধারণা করিয়া লয়, মূল রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না সুতরাং তাঁহাদের সংস্কার, কুসংস্কার হইতে পারে কিন্তু আমরা হিন্দু আমরা এই শ্রেণীর কুসংস্কারের দাস। কুসংস্কার সম্বন্ধে স্বর্গীয় সমাজপতি মহাশয় সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন। *

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের পরম সুহৃদ ও লেখক শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী তাঁহার দ্বিজেন্দ্রলাল নামক গ্রন্থের ২৫০।২৫১ পৃষ্ঠায় পাষাণী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই আমরা ভ্রান্ত কি না তাহা বুঝা যাইবে।*

* "আমরা স্বীকার করিতেছি, হিন্দুর মনের ভাব এইরূপ জটিল বটে। হিন্দু কুসংস্কারের দাস। আমরা কুসংস্কারের অনুরোধে * * * করিতে অক্ষম। অগত্যা এই লেখককে ক্ষমা করিলাম। হিন্দুর দেশে হিন্দু পৃষ্ঠপত্রে এইরূপ মন্তব্য একটু অদ্ভুত একটু উদ্ভট, একটু মারাত্মক নয় কি? ধর্ম্মসংস্কার সু হউক, কু হউক তাহাতে কাহারও ইঙ্গিতেও আঘাত করিবার অধিকার নাই, লেখক সভ্য সমাজের এই সহজ ও প্রাথমিক শীলতার শর্ত্তটি বিস্মৃত না হইলে এমন মন্তব্য দিনের আলোয় বাহির করিয়া অসংখ্য হিন্দুর মর্ম্মপীড়ার কারণ হইতেন না।"

* কল্কী অবতার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া দেবকুমারবাবু লিখিয়াছেন "মুখ্যতঃ দুইটী কারণে ইহা রঙ্গালয়ে অভিনীত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। প্রথমতঃ ইহাতে সমাজের সকল সম্প্রদায়ের উপরেই সমভাবে ব্যঙ্গবিদ্রূপ নির্ব্বিচারে বর্ষিত হইয়াছে; এবং দ্বিতীয়তঃ এই সব লঘু উদ্দেশ্য সাধনার্থ অশোভন ও যথেচ্ছরূপে হিন্দু দেবদেবীর সহায়তা গৃহীত হইয়াছে। ইংরাজীতে Judge Hale-এর একটী কথা আছে "Never make jest of any scripture Expression" অর্থাৎ ধর্ম্মগ্রন্থের কোন উক্তি লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিও না।

মজ্জাগত ধর্ম্মভাবাপন্ন এ দেশের পক্ষে এ উপদেশটী বিশেষভাবে মূল্যবান। আমাদের মনে হয় এই উভয় কারণ বশতঃই; সাধারণ দর্শকবৃন্দের বিরক্তি উদ্রেকের আশঙ্কায় এই পুস্তিকাখানি অদ্যাপি রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতে পারে নাই আর কল্কী অবতারের কথাই বা বলি কেন? ইহা ছাড়া পরবর্ত্তীকালে প্রণীত তাঁহার "পাষাণী" নামক নানা গুণান্বিত নাট্যকাব্যখানিও এই একই দোষে **সাহিত্য সমাজে অনাদৃত ও রঙ্গালয় সমূহে অচল হইয়া রহিয়াছে।"**

দ্বিজেন্দ্রলাল (২য় সংস্করণ) ২৫০।২৫১ পৃঃ

পাষাণীর সম্বন্ধে এঁরা নজীর দিয়াছেন যে "পাষাণীর দুইছুটী সংস্করণ বাংলার পাঠক সমাজ নীরবে সহ্যকরেছেন" সুতরাং এঁদের মতে এর অভিনয়ও তাঁরা নীরবে দর্শন করতে বাধ্য। কিন্তু ১৩০৭ সাল হইতে ১ ২২ সালে যাহার একটীমাত্র সংস্করণ নিঃশেষিত হইতে লাগিয়াছিল পাঠক সমাজে তাহার আদর যে খুব বেশী হইয়াছে তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই। দ্বিজেন্দ্র লালের অনেক নাটকের ৪।৫ বৎসরে ৮।৯টী সংস্করণ হইয়াছে; সুতরাং বাঙ্গালী পাঠক পাষাণী নাটক যে কতটা সহ্যকরিয়াছেন তাহা "দুইদুটী সংস্করণ" কথার উপর জোর দিয়া বলা চলে না। উপরও কাব্যহিসাবে ইহাকে যতটুকু সহ্য করা চলে, অভিনয় দর্শন করিতে বসিলে সে সহিষ্ণুতাটুকুও লোপ পায়; কারণ, লালসা, কাম প্রভৃতি প্রবৃত্তি নিয়ে অভিনয়ে অত্যাধিক পরিস্ফুট হয় বলিয়া উহারা অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া পড়ে, সেইজন্যই ইহার অভিনয় নৈতিকহিসাবে এত আপত্তিজনক।

বিশেষতঃ কাব্যেদুর্নীতির গন্ধ পাইয়া যে কবি একদিন রবীন্দ্রনাথকে লইয়া বীভৎস ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন, দুর্নীতির পঙ্কলিপ্ত তাঁহার এই কাব্যের অভিনয় আজ সমর্থন করা চলে কিনা তাহা সকলেরই প্রণিধান যোগ্য। দুর্নীতির লড়াই, পাষাণী প্রকাশের কয়েক বৎসর পরে ঘটে, পাষাণীর রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল তখন স্বদেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল। তিনি চিত্রাঙ্গদা চরিত্রকে দুর্নীতিমূলক ও অস্বাভাবিক বলিয়াছিলেন বোধ হয় সেইজন্যই তিনি নিজে তৎপরে যখন কোথাও 'পাষাণী' বা 'সীতা' অভিনয় করাইতে বিশেষ উদ্যোগী হয়েন নাই। শেষ জীবনে দ্বিজেন্দ্র লালের রুচি নীতি ও ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছিল।

রুচি ও নীতির পরিবর্ত্তন খুব স্বাভাবিক; নতুবা পাষাণী-প্রণেতা দ্বিজেন্দ্রলাল নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র লিখিতে পারিতেন না" "আর চিত্রাঙ্গদা! বেচারী, মা আমার! বঙ্গের কবিবরের হাতে পড়িয়া তোমার যে এ কেন দুর্গতি হইবে তাহা বোধ হয় তুমি স্বপ্নেও ভাবো নাই! [illegible] যে সে হিন্দু-কুলবধূ যে অবস্থায় প্রাণ দিত, [illegible] না, সেই অবস্থা তুমি উপযাচিকা হইয়া [illegible] করিলে। আর বলিব কি সর্বভোর—দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, ধর্ম্ম নাই, কেবল নিত্য ভোগ, ভোগ, আর নির্লজ্জভাবে তাহার বর্ণনা।—"(সাহিত্য ২০ বর্ষ ২য় সংখ্যা ১১৬-১১৭ পৃঃ কাব্যেনীতি—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়) যদিও তিনি জানিতেন যে চিত্রাঙ্গদা কোন কুলের বধূ নহেন এবং অহল্যা এক ঋষির পত্নী। তাঁর নিজের মন্তব্য অহল্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলে কিরূপ বীভৎস' অথচ সত্য বোধ হইত!

আমাদের গতসংখ্যায় কয়েকটী ছাপার ভুল লইয়া ইহাঁরা স্বাভাবিক ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়া কতকগুলি ব্যঙ্গকৌতুকও করিয়াছেন। এজন্য আমরা অনেকটা অপরাধী সুতরাং এইমাত্র বলিতে পারি যে পরবর্ত্তী সংখ্যা (অর্থাৎ এই সংখ্যা) প্রকাশ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আমাদের উহা সংশোধনের ন্যায়সঙ্গত অবকাশ দিলে তাঁহাদের মহত্ব বোধ হয় কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হইত না। মানুষ মাত্রেরই ভ্রম হওয়া সম্ভব। এই সংখ্যায় "কাজের কথা"র মধ্যে আমরা ভ্রমসংশোধন করিয়া দিলাম। ইহাঁদের মত আমরা নাকি নিম্নশ্রেণীর শিক্ষানবীস কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকদের ও যে মনোভাব প্রকাশ করিবার অধিকার আছে তাহা কি এই যুগ্ম সম্পাদক বিস্মৃত হইয়াছেন। আর ভুঁইফোড় সম্পাদকের চেয়ে শিক্ষানবীশ বরং সহ্য হয় কারণ শিক্ষানবীশ ভুল কর্ত্তে পারে কিন্তু ভুঁইফোড়েরা না কর্ত্তে পারে এমন কোন কাজই নেই। অভিনয়ের মত উচ্চশ্রেণীর আর্ট আলোচনার একমাত্র এই সম্পাদক যুগল ভিন্ন আর যে কেহ অধিকারী হইতে পারেন না তাহা সত্যই কারণ বেশীদিনের কথা নয় ১৩২৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ভারতী পত্রে এই জোড়া সম্পাদকের একজনের লিখিত "অভিনয়ের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধ সমালোচনাকালে সাহিত্য সমালোচক মহাশয় পৌষের "সাহিত্যে" ৬৭৫ পৃঃ লিখিয়াছেন "ইনি বাঙ্গালীর কুক্কুট-মিশ্র শর্ম্ম, চিত্র, ভাস্কর্য, অভিনয় - সকল কলায় স্বয়ংসিদ্ধ। মন্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলির বহর ও বড় মন্দ নয়। ইহাঁর মুখে বড় কথা শুনিতে শুনিতে আমরা শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, কিন্তু শ্রীমানের শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, বিরামনাই, বিশ্রাম নাই। কি অনুকম্পা!" ইত্যাদি

১৩২৬ সালের আষাঢ় মাসের সাহিত্যে (২২ বর্ষ

২২৩ পৃঃ) এই 'একমাত্র' অধিকারীদের একতমের সম্বন্ধে স্বর্গীয় সমাজপতি মহাশয় লিখিয়াছিলেন "ভারতশিল্প" ও ভারতবাসী প্রবন্ধে ইনি যুগপৎ ভাষার শ্রাদ্ধ ও ভারতীয় চিত্রকলার ওকালতী করিয়াছেন; একঢিলে দুইপাখী মারিয়াছেন। ইনি যে খুব শিকারী, তাহা কে অস্বীকার করিবে? * * অশিক্ষিত পটু-আর্টিষ্ট, না-আঁকিয়া-র‍্যাফেল, না-খুঁদিয়া-বেঁদে * * যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা এক হিসাবে সত্য। প্রশংসার বিপরীতকে অনেক ক্ষেত্রেই গালাগাল বলিয়া মনে হয়" ইত্যাদি। ইহাঁদের অন্যতম রুচিবাগীশ মহাশয়ের সম্বন্ধে ১৩২৪ সালের অগ্রহায়ণের "সাহিত্যে" দেখিতে পাই (৫০৭ পৃঃ) "* * আগুন লইয়া খেলা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ছেলে ধরিবার আগে কেউটে ধরিবার চেষ্টা সুবুদ্ধির কাজ নহে। * * realism ধন্য হউক। 'আর্ট' গোকুলে বাড়ুক। 'লক্ষ্মীর' মাহাত্ম্য ফুটিয়া উঠুক। কাঁচা হাতের এইরূপ সৃষ্টি যাহারা বাঙ্গলাদেশে ছড়াইয়া দিতেছেন, তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। কিন্তু যাহারা ছেলেমেয়ে লইয়া ঘরকরেন, তাঁহারা সাবধান হউন।" এই শ্রেণীর প্রশংসাপত্র-প্রাপ্ত রথীদ্বয় যে অপরের ইংরাজী পড়িয়া তাহাকে চীনাপাড়ার ইংরাজী বলিবেন ও অপরের ভাষাকে চামাগুড়ি দিতে দেখিবেন তাহা অন্যায় নহে কারণ ইহাঁদের ভাষা যে "কুন্তী কবে" সেরকম প্রশংসাপত্র ও আছে, বাহুল্য হয়ে আর সে সব উদ্ধৃত করিলাম না।

অহল্যাবইখানির রুচি ও নীতির প্রশংসা আমরা করিতে পারি নাই বলিয়া আমরা বোধ হয় ইহাঁদের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছি। ইহাঁদের রুচি নীতি বা প্রবৃত্তির সহিত আমাদের মিল নাই কিন্তু সেজন্য সত্যই কাহারা অপরাধী তাহার বিচার সাধারণ পাঠক ব্যতীত অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল কতবড় হিন্দুছিলেন আজ সে বিচার করা চলেনা তবে পাষাণী-প্রণেতা দ্বিজেন্দ্রলাল যে হিন্দুভাবে সমৃদ্ধ ছিলেন না, তাহা তাঁহার চিত্রিত দেবদেবী চরিত্রেই প্রমাণিত তবে শেষ বয়সে তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধে ও যে মত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা তাঁহার শেষজীবনের রচনার মধ্যেই পরিস্ফুট; তাঁহার জীবন চরিত লেখকেরা ও এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। অবশ্য এইপরিবর্ত্তন বয়সের সঙ্গে স্বাভাবিক ও প্রশংসার্হ।

ষ্টারে বন্দিনী—এবার আর্ট থিয়েটার লিঃ, বড়-দিনের বাজার জমাইবার জন্য এই সৌন্দর্য্যবহুল বিয়োগান্ত নাটকখানি সাধারণের সমক্ষে অভিনীত করিয়াছিলেন। বন্দিনী, দৃশ্যসৌন্দর্য্যের খনি বলিলেই চলে ইহার দৃশ্য-পটাদি এত অধিক চিত্তাকর্ষক, যে একবার মাত্র ইহার অভিনয় দেখিলে ইহার সৌন্দর্য্যের সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না—বেশভূষার পরিকল্পনাও সম্পূর্ণ মৌলিক এবং যুগোপযোগী। দর্শকের চক্ষু ও মন এই দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার আড়ম্বরে সহজেই আত্মহারা হইয়া অতীতের গৌরবময়ী মিশরের মধ্যে যেন বিচরণ করে। বন্দিনীর অভিনয়ও সাজসজ্জার অনুরূপই হইয়াছে।

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে ইস্‌কিবল, এ্যামসিস, মিতানীর রাজা ও তাবেজের ভূমিকায় অপরেশবাবু, অহীন্দ্রবাবু, দুর্গাপ্রসন্নবাবু ও শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ীর অভিনয় অত্যন্ত স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ইসকিবলের—বিয়ে-পাগলা বুড়োর স্বভাবটী, অপরেশ যেমন হাস্যোজ্জল করিয়া তুলিয়াছিলেন সঙ্গে সঙ্গে ঐ চরিত্রের শেষাংশে করুণরসের দ্যোতনাও তেমনি মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। এ্যামসিসের ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়ে বীরত্ব, তেজ সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের গভীর অনুভূতির, অভিব্যক্তি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছিল এতদিন পরে তাঁহার সু-আবৃত্তির চেষ্টা হইয়াছে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম। দুর্গাপ্রসন্নবাবুর অভিনীত মিতানীর রাজার ভূমিকা, ক্ষুদ্র হইলেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; অভিনয়ের তাঁহার ক্রমোন্নতি দর্শনে আমরা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। তাবেজের ভূমিকায় শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ীর অভিনয় সত্যই আমাদের আশ্চর্য্য করিয়াছে—এরূপ অভিনয় যে তাঁহার দ্বারা সম্ভব তাহা আমরা দেখিবার পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারি নাই রহস্য-পরিহাস ও মধুর সঙ্গীতের একত্রে এরূপ সমাবেশ কচিৎ দেখিবার সৌভাগ্য হয়;-নায়েরেণ শ্রীমতী নীহারাবালা, ইহাঁর অভিনয়ে হাস্যরসের সলীল ছন্দের সহিত দেশভক্তির গভীর মন্ত্র সুন্দররূপে বাজিয়া উঠিয়াছিল।

বন্দিনী শ্রীমতী ফিরোজবালা চেষ্টা ও শিক্ষার গুণে

একজন সাধারণ অভিনেত্রী কিরূপ সুন্দর অভিনয়ে সক্ষমা হন, ইঁহার অভিনয়ে আমরা সেটী সুন্দররূপে উপলব্ধি করিয়াছি। আজিয়ার অভিনয় মন্দ না হইলেও বেশভূষা ও মানান হিসাবে এ আর্ভিয়া অচল; তবে দৃশ্যপট ও বেশভূষার উৎকর্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গে সজ্জা কৌশলে (make-up) ইঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। দুই একটী চরিত্র ব্যতীত অপরগুলিতে মিশরীয় আকৃতির সৌসাদৃশ্য ছিল না। শেষ দৃশ্যে, সাতদিন আহার ও জলপান করিতে না পাইয়া এ্যামসের যে শারীরিক অবস্থা হওয়া সম্ভব তাহাতে অত দীর্ঘস্থায়ী ভাবাতিশয্যপূর্ণ আবৃত্তি কতদূর সঙ্গত তাহাও চিন্তার বিষয় আমাদের মনে হয় শেষ দৃশ্যের শেষাংশটুকু কেবল নির্ব্বাক অভিনয় হইলেই ভাল হইত। তবে এই দৃশ্যে বন্দিনীর কণ্ঠে যে করুণ সঙ্গীত ও তদুপযোগী মধুর করুণ বাদ্যধ্বনির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—তাহা সত্যই কবিজন যোগ্য। দূরে—অতিদূরে একটী করুণ কাতর বিরহ গীতি উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ তাহা ব্যথা ও বেদনার ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যেন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া অবশেষে রঙ্গমঞ্চে প্রণয়ীর কাছে আসিয়া দুঃসহ আবেগে লুটাইয়া পড়িল—এ করুণ মর্ম্মস্পর্শী কাব্য সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই।

মিনার্ভাথিয়েটারে

"কৃতান্তের বঙ্গদর্শন":—কৃতান্তদেব বঙ্গদেশের উপর যে অতীব সদয় তাহা আমরা জানিতাম, কিন্তু বঙ্গদেশ হইতে তিনি যে অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুকৌশলে অভিব্যক্ত করিয়া নাট্যামোদীগণের আনন্দ পিপাসা তৃপ্ত করিয়াছেন। মিনার্ভা সম্প্রদায় বড়দিনের আমোদের মাঝখানে এই হাড়ভাঙ্গা শিক্ষাপূর্ণ শ্লেষাচ্ছাদিত নাটকখানি অভিনয় করিয়া নাটকীয় পরিকল্পনার চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন—এ শ্রেণীর পুস্তক অভিনয় এঁদের একটা বিশেষত্ব। অভিনেতাদের মধ্যে কৃতান্তরূপী কুঞ্জবাবু, চিত্রগুপ্তবেশী কার্ত্তিকবাবু ও মহাবীরের ভূমিকায় হাঁদুবাবুর অভিনয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দৃশ্যে বৈচিত্র, চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য সত্যই প্রশংসনীয় দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ঝড়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতি দৃশ্য বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে দৃশ্য-সৌন্দর্য্যের বহুল উন্নতিসাধন করিয়াছে—শ্মশানের দৃশ্যটীও প্রশংসনীয়। অপরের রঙ্গমঞ্চে এরূপ দৃশ্যপটের সুব্যবস্থা করা দুরূহ হইলেও সম্প্রদায় তজ্জন্য অর্থব্যয় বা মস্তিষ্কব্যয়ে কাতর হন নাই। প্রত্যেক বাঙ্গালী এই নাটকে স্বদেশ ও স্বজাতির বর্ত্তমান অবস্থার প্রকৃত চিত্র দেখিতে পাইবেন কাল বিলম্ব না করিয়া সকলেরই এই নাটকের অভিনয় দেখিয়া রাখা উচিত কারণ এ শ্রেণীর অভিনয় দেখিবার সুযোগ ক্বচিৎ আসে এবং যাহা আসে তাহাও স্বল্প কালের জন্য।
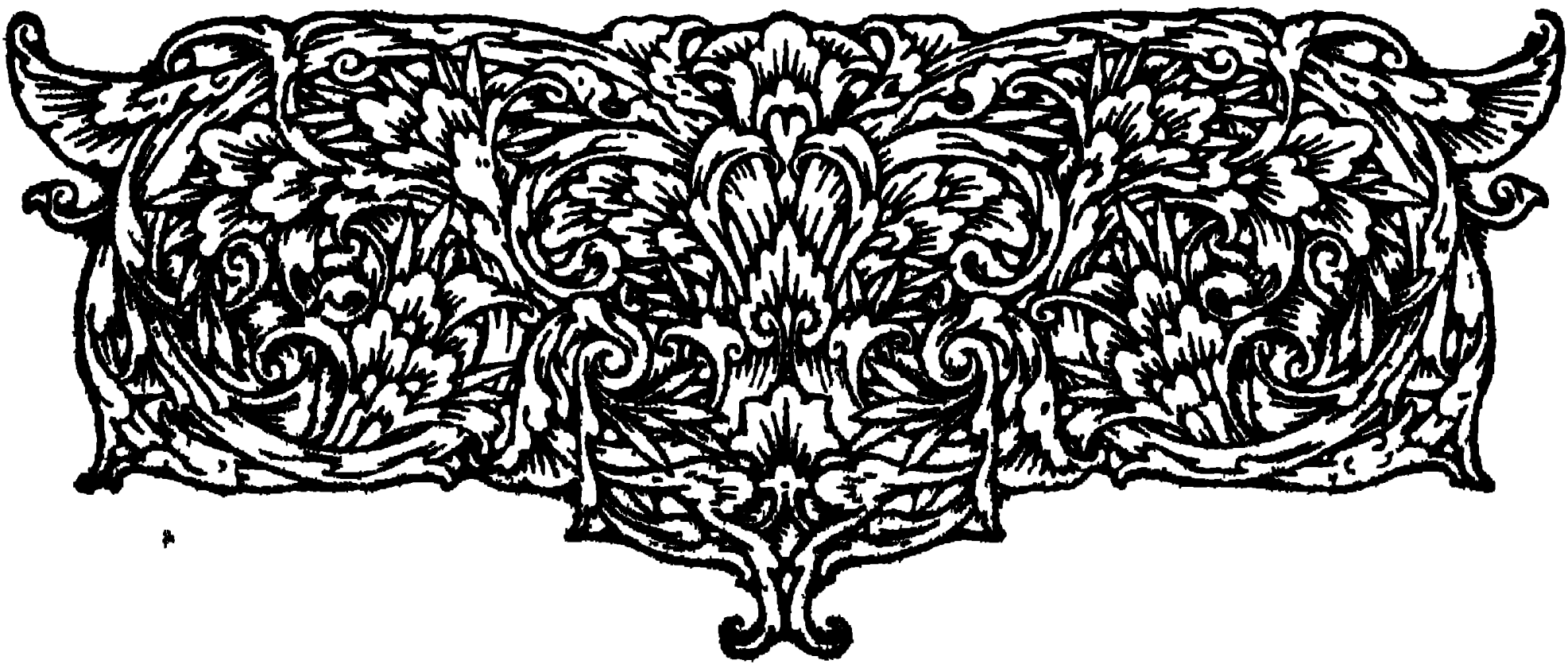
পথিক বঁধু

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

ওগো পথিক-পরাণ পথে কেন চল
ধীরে ধীরে।

বঁধু পথিকের পানে কেন চাও বল
ফিরে ফিরে!

ঐ চাওয়াখানি মোর মনে আনে
আহা কতনা যুগের ভোলাগানে।
যেন কার লাগি চলি পথ মাগি
আমি চিরজীবনের বিরহীরে।
ওগো পথিকপরাণ।

ঐ আঁখির আলাস পরাণে জ্বালায়
কি আশারে।
মোর হিয়া পিয়াসা পিয়া পিয়াসা
ত্রিয়ারে।

মোর সারাজীবনের সব পাওয়া —
শুধু ঐ—চাওয়া আর এই চাওয়া!
তাই আঁখিটানে যাই পিছুপানে,—
চাই আঁখিপানে তব আঁখিনীরে।
ওগো পথিকপরাণ।

মোরে কেন চাও কেঁদে, লুটে নাও বেঁধে
যৌবনে।
বঁধু বচ মোর কারা ঐ পথহারা
যৌবনে।

প্রিয়, মোর নয়নের কথা শোনো
ওগো নাই তোমা বিনা আমি কোনো
তব চরণ ধূলায় বচিয়া কুলায়
নত করি মাথা পথতীরে!
ওগো পথিকপরাণ।
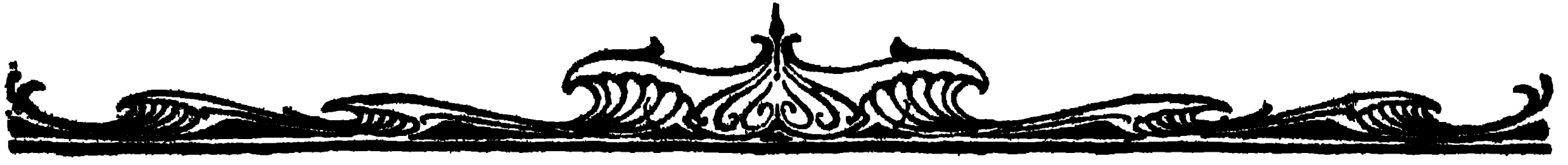
"লেখকের পরিণাম'

প্রবন্ধকেশরী শ্রীসুনীল চন্দ্র মজুমদার

(১)

নীলমণি বোস্ শ্রীমান হীরেনের পড়ার বহর দেখে পৈ পৈ করে বলেছিলেন,—"ওরে, হোমিওপ্যাথি পড়্। তোদের মত লেখাপড়াজানা লোকের ও ছাড়া আর গতি নেই"। কিন্তু হীরেন বাবার কথা আদো না শুনে তার ষোল আনা মনটাকে সাহিত্য সেবায় লাগিয়ে দিয়েছিল।

হীরেন যখন স্কুলে পড়ত তখনই কোন এক পত্রিকায় দেখেছিল—নবীন লেখকদের লেখা যদি ভাল হয় তবে টাকা দিয়া লেখা নেয়। এই লেখাটা দেখাই তার কাল হ'ল। সে তার পাঠ্যজীবণের কাজ ভুলে লেখা সুরু করলে। শুধু কি তাই। পত্রিকায় নাম বের করবার জন্য সে এতই উদব্যস্ত হোয়ে উঠেছিল যে দু দুটো বছর ক্লাস-প্রমোশনে তার নাম মোটেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। বেকার এতগুলো টাকা জলে গেল দেখে নীলমণি বাবু ছেলেকে স্কুল ছাড়িয়ে দিলেন। হীরেন স্কুলকে দণ্ডবৎ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

স্কুল ছাড়ার পর হীরেণ বাপের সামনে দাঁড়াতে একটু যেন লজ্জা বোধ করত। তাই ২।৩ মাস তাকে ঘরের ভেতর মুখ গুজে কাটিয়ে দিতে হয়েছিল। কিন্তু ২।৩ মাসের শেষাশেষি আবার সে বসন্তের গাছপাতার মত চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌লো। তখন সে আবার ঘর থেকে দুপুরে বেড়িয়ে যেতে সুরু করলে—আড্ডা দেবার মতলবে। কিন্তু ঘরের বাইরে পা দিয়েই প্রথম যখন জানতে পারলে তার সমবয়সীরা সব পড়তে গিয়েছে, তখন বাধ্য হোয়েই সে ঘরে ফিরেছিল প্যাচামুখো নিয়ে।

যখন নিঃসঙ্গ অবস্থা তাকে পাগল করে তুলেছিল, তখন সে তার শেষ সম্বল সাহিত্যজীবনকেই আঁকড়ে ধরেছিল খুব বেশী করে। হীরেন সবচেয়ে ভয় করত তার বাপকে। তাই বাপের চোখ বাঁচিয়ে প্রায়ই সে দু চারটে প্রেমের কথা গল্পের মধ্য দিয়ে ফোটাবার চেষ্টা করত আর সেগুলোকে তাদের বাড়ীর চাকর দয়ারামকে শুনাতে পারলেই সে বর্তে যেত, এই ভেবে, যে সে একটা কি হোলরে।

আমদানীর সংখ্যা খুব বেশী আর রপ্তানীর বেলা ঢুঢু ছিল বলে সে লিখতে লিখতে একটা কমলা কান্তের দপ্তর রচে ফেলেছিল। তাই সেদিনের গল্প লেখার আগেই সে ধনুকভাঙ্গা পণ করলে যে তার অনেকার লেখাগুলো ছাপার অক্ষরে না বেরুলে এই লেখাই তার শেষ হবে। শেষ লেখাটা যাতে ভাল হয়, সেজন্যে খুব মন দিয়ে সে গল্পটা লিখ্‌ছিল। হঠাৎ পিছন দিক থেকে নীলমণি বাবু এসে বল্লেন—"হ্যারে খাতার পর খাতা লিখছিস্। আমার বর্ত্তমানেই কি তুই নিজের উইল করে রাখছিস। সেই সময় তিনি এটাও বুঝিয়ে দিলেন, যে তাদের মত বেকার লোকদের জন্যে হ্যানিমান, চৈতন্য মহাপ্রভুর মত প্রেমের পরিবর্তে হোমিওপ্যাথি তৈরী করে গেছেন, সেটা যেন সে পড়্‌তে না ভোলে। বাবার উপদেশে গল্পের প্লটটা ঘুলিয়ে গেল দেখে বাবার ঘর থেকে অন্তর্দ্ধানের সাথে সাথে, সে খেঁকী কুকুরের মত দাঁত খিঁচিয়ে উঠ্‌লো এই ভেবে—বাবার সময় নেই রাতদিন শুধু হোমিওপ্যাথি। আর হোমিওপ্যাথি।

(২)

হেমেন যে সাহিত্যে বেশ উন্নতি করেছিল তা তার মাথার প্রশস্ত টাক দেখেই বুঝ্‌তে পারা যেত। হেমেন লিখেছিল অনেক বই। তারপর। সেগুলো বড় বড় রাজা জমিদারদের করকমলে উৎসর্গ করে উপায় করত মন্দ নয়।

লেখকের যে শেষ দশা সরকারী হাঁসপাতাল সেটা মাইকেল আর রজনীকান্ত প্রমাণ করে যাবার পরও হেমেন নিজের হাতে গড়া ছুঁচোর কীর্ত্তন জমিয়ে ছিল খুব ভাল। একটু পানদোষ থাকতে তার আয় অপেক্ষা ব্যয় হোত বেশী। তাই তার ভদ্রসমাজে কোচার পত্তনের ভেতর দিয়েই দৈন্যের ভাবটা ফুটে উঠত খুব বেশী করে। সময় সময় পাওনাদারেরা এমন তাগাদা দিত যে লেখকের মাথা বলেই সে আত্মহত্যা করে বসত না।

সেদিন শনিবার। উমেশ বাবু অনেক ধরে করে হেমেনকে বায়স্কোপে নিয়ে গিয়েছিলেন। বায়স্কোপ থেকে ফেরবার পথে পাশের সিগারেটের দোকানে সে বল্লে 'তেওয়ারী মহারাজ, দোঠো সিগ্রেট্ তো দেনা।' তেওয়ারীর কোনকালে কেউ মহারাজ ছিল না, তবে সে তার কাছে কিছু ধারতো বলে রাজনৈতিকচালে তাকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে এ উপাধিটার অপব্যয় করেছিল। তেওয়ারী যা ধার দিয়েছিল তা তামাদির সামিল বলেই চলত। আবার নতুন করে ধার চাইতে দেখে সে বোর্ডবার্ড হবার যোগাড় হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে অপরিচিত লোকটাকে দেখে ইঙ্গিতে দোকানের সাইন বোর্ডটা দেখিয়ে দিলে—

—'ধারে বিক্রয় নাই'।

ডাকের চিঠী পাওয়ার পরও সেদিন তাকে একটু ভাবিয়ে তুলেছিল। কলকাতায় সাহিত্য সম্মিলন হবে, অথচ তার মত একজন সাহিত্যসেবক সেখানে নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েও যাবে না, সেটা কি সম্ভব। কিন্তু তখন সম্ভব অসম্ভব নির্ভর কর্চ্ছিল কেবল মাত্র পাঁচটী টাকার উপর। ঘরের কড়িকাঠ গুণতে গুণতে সে অনেক চিন্তা করলে কেমন করে এ টাকাটা পায়। এক পকেটমারা ছাড়া যখন সে কোন উপায় স্থির করতে পার্ল্লে না, তখন তাকে বাধ্য হোয়েই তার বড় সখের রিষ্টওয়াচটী বাঁধা দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হোল।

(৩)

কলকাতায় সাহিত্য সম্মিলন হবে শুনে হীরেন উৎফুল্ল হোয়ে গেল। সে অনেকদিন ধরে এই রকম একটা সুযোগের অপেক্ষা কর্চ্ছিল। আজ সেই সুযোগটা হাতের কাছে দেখে সে সারাটা দিন ষ্টেশনে এ দৌড়াদৌড়ি কর্চ্ছিল—বিদেশী লেখকদের আদর অভ্যর্থনার জন্যে। সেদিন যখন সে ষ্টেশন থেকে ফিরলে, সে দেখ্লে তাদের সম্মিলনীর কটকের কাছে বেশ একটু ভীড় জমে গিয়েছে।

একটা জুতাওয়ালা মুচি এতদিন পরে হেমেনকে হেদোর ধারে দেখে বল্লে—"কই বাবু আমার জুতো সেলাইয়ের পয়সাটা দিন। প্রায় এক বছর হতে চল্ল আর ক'দিন রাখি বলুন। চার গণ্ডা পয়সা বৈ তো নয়।" হেমেন মহা মুস্কিলে পড়ে গেল, তার যে পকেট ছিল তখন তাহা একরূপ শূন্যমন্দির। পাছে মুচির কাছে বেল্লিক হতে হয়, এই ভয়ে সে তার চোখদুটোকে ছানাবড়ার মত করে পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বল্লে,—"এই! আমার ব্যাগ সমেত টাকা পথে কে তুলে নিয়েছে।" তারপর! এসরাজের সাধা গলায় একটু করুণ সুরে বল্লে,—"ভাই দেখতেই তো পাচ্ছ আজ আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে। আজ তো দিতে পারলাম না, কাল এই সময় এখানে এলে পয়সা পাবে'খন।' তার বিট্কেলমী দেখে মুচি ভারী চটে গিয়েছিল। চার আনা পয়সার সুদ যখন পাবে না, তখন কথার দ্বারা সেটা উশুল করে নিতে সে ছাড়্লে না। গণ্ডগোলটা বেশ তখন জমে উঠেছে, এমন সময় হীরেন এসে চার গণ্ডা পয়সা দিয়ে সব গোল মিটিয়ে দিল।

সাহিত্যসম্মিলন কবে চলে গিয়েছে, কিন্তু তার স্মৃতিটুকু নিয়ে হীরেন আর হেমেন আজও বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ রয়েছে। হীরেন এতদিনেই হেমেনের তালিম দেওয়ার মত লোক হয়ে পড়েছিল। যেদিন পাওনাদার হেমেনকে বেশী বিরক্ত করত, সেদিন হীরেনরই তালিমের জোরে সে সে বেগাৎ পেত। এই জন্যে হেমেনের কাছে হীরেনের প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশী। হীরেন সেই খাতিরের জোরে প্রায়ই তাকে খোঁচাতো তার লেখাগুলো ছাপার অক্ষরে বের করবার জন্যে। তার উত্তরে হেমেন বল্ত—"তুমি ভাব কেন, তোমার লেখা বেরুবেই। আমার পিস্‌শ্বশুর যে ভারতবাসীর এডিটর।"

সাহিত্যের নেশা এমনই নেশা যে যাকে এটা ধরে সেই' বুঝতে পারে। আজকাল হেমেনের নেশা ভাঙ্গের খরচটা

পাকেই বেঁকেই চলত। দ্বীপবাসী যেমন সিন্ধবাদের কাঁধে চড়েছিল, সোজা কথায় হেমেন ও সেই ভাবে হীরেনের কাঁধে চড়েছিল। হীরেন বুঝেও বুঝ্‌তে পার্চ্ছিল না, এই পথে-পাওয়া নেশাড়ী মাতব্বরটা তার লেখার কতদূর কি করবে। কিন্তু এই 'না বোঝা' বিস্‌মোল্লায় গলদই একদিন বড় ফাঁক হোয়ে তার চোখ খুলে দিল।

(৪)

তিন মাস হোল লেখা দিয়েছে, কিন্তু হীরেনের লেখা বেরুচ্ছে বেরুবে করেও এতদিনে বেরোয় নি। হীরেন আশা-আলেয়ারটার পিছু যত ছুটছিল—'আজ বেরুবে' এই ভেবে ততই তার দিনগুলো পিছিয়ে যাচ্ছিল অনেক দূরে।

সেদিন শনিবার। হীরেন 'বারদোষ' নিয়ে কতক গুলো জিনিষ কিন্‌তে মুদির দোকানে গিয়েছিল। মুদি ভায়া হীরেনের জন্যমাফিক চিনি ডাল আর মশলা ঠোঙায় ঠোঙায় সাজিয়ে দিলে। হঠাৎ তাদের ঠোঙায় নজর পড়্‌তেই সে বর্ষাকালের মুড়ির মত মিইয়ে গেল। সে দেখ্‌লে তারই লেখা, পুস্তকের দোকান ছেড়ে মুদির দোকানে স্থান পেয়েছে, পুস্তকের আকার ছেড়ে ঠোঙার আকারে জনসমাজে প্রচার হোতে চলেছে।

সেই সময় হেমেন টল্‌তে টল্‌তে হীরেনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হীরেন ডাক্‌লে—"ও, হেমেনবাবু, আমার লেখা আপনার পিস্‌শ্বশুর—

রাঙা চোখে হেমেন টল্‌তে টল্‌তে মিলিটারী মেজাজে বল্লে—"আমার এখন সময় নেই। আমি এখন Iron Octboer। Don't be sorry। লিখে যাও! লিখে যা—ও। তোমাদের পরিশ্রমে বটতলা উঠে 'মুদি পাব্লিশিং হাউস' হোক।"

Printed & Published by Jnanendra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
14 Jaggannath Dutta Lane Garpar, Calcutta.

বন্দিনী

Lakshmibilas Press, Calcutta.

প্রথমবর্ষ] ৪ঠা মাঘ শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ১৭ই জানুয়ারী [২৩শ সংখ্যা

মানসী

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

তোমার কপোল রাঙা হাজার ভাঙা চুমে,
তোমার আনন আলা স্বপনঢালা ঘুমে,—
তুমি দাওনা ধরা বওনা বাধা গো।
তোমার বাহু মরি, যেন পরীর পাখা
তাদের নিমেষতরে বক্ষে ধরে রাখা,
তারা যায় গো উড়ে কোন্ সুদূরে
মায়ায় ফাঁদা গো।
তারা সুধায় ঢাকা বেদনমাখা
বয়না বাধা গো।

তোমার অধরহাসি মরণফাঁসি দুলায়!
তোমার নয়নশিখা মরীচিকা ভুলায়!
টানে পথিক তারা পথহারা কোন্ কুলায়!
কাদের বুকের লালে লাল হয়েছে ফুটি
তোমার অরুণ রাঙা করুণ চরণ দুটি!
তারা হৃদয়-ভাঙা রক্তে রাঙা
পরাণ-কাঁদা গো!
তারা ছন্দে লুটি পালায় ছুটি'
বয়না বাঁধা গো!

ওযে ভুলের ফুলের তোমার গলায় মালা,—
ওযে কত প্রাণের মরণ-গানের ডালা,
কত বিরহেরই জমাট অশ্রু ঢালা।
তুমি নেচেই আসো চপল, হৃদয়পুরে—
তুমি যাও পালিয়ে বাঁশীর করুণ সুরে!
তোমার ভালোবাসা তৃষার আশা
ব্যথায় সাধা গো!
তুমি কোন্ আলেয়া দূরের খেয়া
রওনা বাঁধা গো!
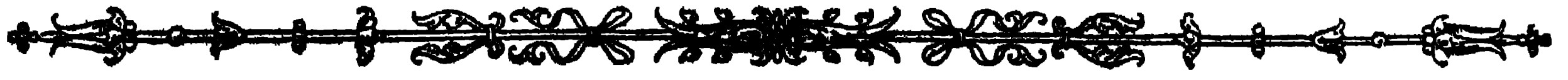
বড় দিনের সফর

শ্রীজলধর সেন

(প্রথম কিস্তি)

বড় দিনের ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া একটা যেন প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় দিন আস্‌বার আগে থেকেই কে কোথায় যাবে, তা নিয়ে কল্পনা-জল্পনা চল্‌তে থাকে। বন্ধু-বান্ধব যাঁর সঙ্গে দেখা হবে, তিনিই জিজ্ঞাসা করবেন 'বড় দিনে কোথায় যাচ্ছেন ?'

অনেকে হয় ত মনে করেন, এটা একটা ফ্যাসান, একটা সখের ব্যাপার; কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায় যে, এটা সখ নয়—সত্যিসত্যিই দরকার। হাইকোর্ট ও দেওয়ানী আদালতের ছুটীর কথা স্বতন্ত্র; যাদের বছরের মধ্যে বল্‌তে গেলে ছয়মাসই ছুটী, কিন্তু তা ছাড়া যত সরকারী আফিস আছে, সওদাগরী আফিস আছে, তাদের লম্বা ছুটী, সবে দুটী—এক পূজার সময়, আর এক বড়দিনের সময়। 'লম্বা' কথাটা বোধ হয় ঠিক হোলো না, কারণ 'লম্বা' বল্‌লে অন্ততঃ মাসখানেক বোঝায়। আসলে কিন্তু তা নয়—ছুটীর মেয়াদ পূজায় ১২ দিন, আর বড় দিনে দশ দিন; তাও আবার সকলের ভাগ্যে জোটে না, অনেকবেই বিস্তিবন্দী করে ছয়-দিন ও পাচ-দিন ছুটী দেওয়া হয়—আফিসের কাজ ত চলা চাই। এই ছয় দিন আর পাঁচ-দিনের ছুটী, চাকুরীগত-প্রাণ বাঙ্গালী কেরাণীদের জীবন-মরু-ভূমির মধ্যে ওয়েসিস্‌। সেই দশটা-ছয়টা হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর এই কয়দিনের অবকাশ পেলে মানুষের প্রাণটা কর্ম্মস্থান থেকে ছুটে বেরুবার জন্য যে আকুল হয়, এটা স্বাভাবিক। এ ফ্যাসনও নয়, সখও নয়। একটু ঘুরতে-ফিরতে মানুষের ইচ্ছাই হয়,—কেরাণীও ত মানুষ !

আমি যদিও ঠিক কেরাণী নই, তা হ'লেও আমি যাই করি না কেন, সে টা যে চাকরী, তার আর সন্দেহ নেই। সে চাকরীতে সৌভাগ্যক্রমে মনিবের ভ্রুকুটী নেই, বা বিলম্ব বা গরহাজিরীর কৈফিয়ৎ নেই। তা হ'লেও ত চাকরী বটে, সুতরাং তার নিয়ম-কানুন মেনে চলা অবশ্য কর্ত্তব্য।

তাই এবার যখন বড় দিনের পূর্ব্বে বন্ধু-বান্ধবেরা জিজ্ঞাসা করলেন 'দাদা, বড় দিনে কোথায় যাবেন ?' তাঁদের কারও কারও প্রশ্নের জবাব দিয়াছিলাম "কোথায় আর যাব ? যাই যদি, ত নিমতলায় যাব।" যাঁদের কথার জবাব ও ভাবে দেওয়া সঙ্গত নয়, তাঁদের বলেছিলাম "কি করে যাই ভাই, আমাদের বড দিনে সবে এক দিনের ছুটী।" সুতরাং এই দুর্ম্মূল্যের দিনে ঘরের পয়সা খরচ করে কোথাও যাচ্ছি নে, এই ঠিক করে নিশ্চিন্ত মনে বসেছিলাম। তখন কি জানি যে, যাওয়া-না-যাওয়ার যিনি কর্ত্তা, তিনি অলক্ষ্যে বসে আমার যাওয়ার প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলেছেন।

ব্যাপার এই। বড়দিনের আট-নয়-দিন আগে টাটা-কোম্পানীর রাজধানী জামসেদপুর থেকে শ্রীমান্‌ আশুতোষ সান্যাল ভায়া হঠাৎ আমার বাসায় এসে উপস্থিত। আমি তখন হৃদ্‌দৌর্ব্বল্যে শয্যাগত। শ্রীমান্‌ জামসেদপুর সাহিত্য-সভার সম্পাদক। তিনি এসে বল্‌লেন যে, ২৮শে ডিসেম্বর রবিবার এবং তার পরদিন সোমবার, এই দুই দিন তাঁদের সাহিত্য-সভার বার্ষিক উৎসব, সেই উৎসবে আমাকে সভাপতি হ'তেই হবে। এ ব্যবস্থা তাঁরা ঠিক করে ফেলেছেন। তিনি নিজেই সেই জন্য এসেছেন; অধিকন্তু জামসেদপুরে তাঁরই মত আর যাঁরা আমার পরম-স্নেহ-ভাজন, তাঁদের কাছে থেকেও পরওয়ানা নিয়ে এসেছেন। তাঁর কথা শুনে এবং পরওয়ানা গুলি দেখে আমি আর কি বল্‌ব, বল্‌লাম "বেশ, তাই হবে।" অস্বীকার করা যে আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তারপর আব্‌দার, আমাকে তিনচার দিন আগে যেতে হবে এবং একটা অভিভাষণ লিখে নিয়ে যেতে হবে। আমি তখন আমার শরীরের অবস্থা

দেখিয়ে বললাম যে, অভিভাষণ আমি লিখতে পারব না এবং তিন চার দিন আগেও যেতে পারব না; ২৬শে শুক্রবার বিকেলের নাগপুর মেলে যাব, আর ২৯শে মঙ্গল বার রাত্রির গাড়ীতে ফিরে আসব। শ্রীমান্ তাইতেই স্বীকার হয়ে চলে গেলেন। আমারও বড় দিনের ভ্রমণের একটা ব্যবস্থা হোলো; কিন্তু তখন যদি জানতে পারতাম যে, আমাকে এই জামসেদপুর ভ্রমণের বিবরণী লিখতে হবে, তা হোলে আমি এমন কর্ম্মও করতাম না; চুপ্ করে ঘরে ব'সে থাকতাম। ভগবান মানুষকে একটু ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি না দিয়ে এমন বিপদেই ফেলেচেন!

যাক্, অনুশোচনা বৃথা! আমাকে জামসেদপুরে যেতেই হয়েছিল, অভিভাষণ লিখব না বলে মনে করেছিলাম, সে অভিভাষণও লিখতে হয়েছিল, তিনদিনের জায়গায় পাঁচদিন আফিস কামাইও করতে হয়েছিল, আর এখন ঘরের বুড়া ঘরে ফিরে এসে এই রাত জেগে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখার কর্ম্মভোগও করতে হচ্ছে। বিধাতার বিধান, কি করা যায় বলুন!

এক দিন ছিল, যখন একেলা কত বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত ভেঙ্গেছি। এখন আর সে দিন নেই। এখন কোথাও যেতে হ'লে নানা ভাবনা হয়, এখন পথে-ঘাটে সঙ্গীর দরকার হয়, কেউ যদি আমার সঙ্গে চলে-ফেরে, তবে ভাল হয়—এমনই অসহায় আমার অবস্থা। সুতরাং জামসেদপুর যাওয়ার একজন সঙ্গী চাই। আবার সে সঙ্গী এমন হওয়া চাই যে, আমার এই দুর্ব্বল শরীরে যদি ভেঙ্গে পড়ে, তা হ'লে সাহিত্য-উৎসবের তাল তিনি সামলে নিতে পারেন। সাহিত্যিক শ্রীমান্ চারুচন্দ্র মিত্র ব্যতীত এমন সঙ্গী আমার আর কেহই হ'তে পারেন না, বিশেষ, আমি জানি যে, আমার কথা অমান্য করবার সাহস বা ধৃষ্টতা শ্রীমান্ চারুচন্দ্রের এখনও হয় নাই এবং আমার জীবনান্ত পর্য্যন্ত হবেও না। শ্রীমানকে বলতেই তিনি সম্মত হলেন এবং একটা ভাল রকমের প্রবন্ধ লিখে নিয়ে যেতেও রাজী হলেন। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। পথের সঙ্গী ত হোলোই, তা ছাড়া সেই সাহিত্য-উৎসব ক্ষেত্রে আমি যদি অসমর্থ হয়ে পড়ি, তা হলে শ্রীমান্ চারুচন্দ্র আসরও রক্ষা করতে পারবেন এবং আমার চাইতে ভালই পারবেন, এ বিশ্বাসও আমার ছিল।

শ্রীমান্ চারুচন্দ্রের সঙ্গে ব্যবস্থা এই হোলো যে, তিনি ২৬শে ডিসেম্বর শুক্রবার বেলা দুইটার সময় আমার বাসায় উপস্থিত হবেন, এবং তখনই আমরা হাবড়া ষ্টেশনে যাত্রা করব। গাড়ী ছাড়বে কিন্তু চারটে বাজবার পনর মিনিট থাকতে। এত আগে অর্থাৎ প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে ষ্টেশনে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি জানেন? আমি ঠিক করে-ছিলাম যে, রেল কোম্পানীকে বেশী পয়সা দেওয়া হবে না, আমরা আমারই নামকরণ করা সেই এক-শ-এগার নম্বর গাড়ীতে (যাকে অনেকে সম্মান দেখানের জন্য গাঁডি ক্লাসও বলে থাকেন) সওয়ার হব। সে গাড়ীতে স্থান পেতে হ'লে অন্ততঃ গাড়ী ছাড়বার দেড় ঘণ্টা আগে যে ষ্টেশনে যেতে হয়, এ অভিজ্ঞতা আমি অনেক ঠেকে লাভ করেছি। শ্রীমান্ চারুচন্দ্রও তা জানেন। তাই তিনি বেলা দুইটার সময় যাত্রা করাই স্থির করে গেলেন।

আমি এদিকে একটার মধ্যেই আফিসের কাজকর্ম্ম গুছিয়ে ফেলে, শনিবারটা গরহাজির থাকবার কথা মনিব-দের কাছে বিজ্ঞাপন করে বাসায় ফিরে এলাম এবং দুইটার পূর্ব্বেই প্রস্তুত হয়ে নিলাম। কিন্তু দুইটা বেজে গেল, আড়াইটাও হোলো, শ্রীমানের দেখা নেই। তাই ত, এ কি হোলো। আরও একটু দেখে যা হয় করা যাবে।

প্রায় তিনটে বাজবার সময় চারু এসে উপস্থিত হলেন। অবশ্য, তখন গেলেও গাড়ী ধরা যাবে, তা জানতাম; কিন্তু এত দেরীতে গিয়ে এক-শ-এগার নম্বর গাড়ীতে দাঁড়াবার স্থান পাওয়াও যে অসম্ভব হবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। তখনই তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ী নিয়ে দুই জনে যাত্রা করা গেল। সঙ্গে বিশেষ কিছুই লগেজ ছিল না। ষ্টেসনে গিয়ে আর এক-শ-এগার নম্বরের টিকিট ঘরের দিকে না গিয়ে মধ্যশ্রেণীর টিকিট নেবার স্থানে যাওয়া গেল। যে বিবিটী টিকিট দিচ্ছিলেন, চারুচন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা মেলে রিটার্ণ টিকিট পাব কি না। মেম সাহেব বললেন মেলে মধ্যম-শ্রেণীর বড়দিনের রিটার্ণ টিকিট মিলবে না, এক্সপ্রেসে

মিল্‌বে। এক্সপ্রেস গাড়ী কিন্তু সেই রাত্রি দশটায়। সুতরাং মধ্যমশ্রেণীর শুধু যাওয়ার টিকিট দুইখানি নিয়ে প্ল্যাটফরমে গিয়ে দেখি এক-শ-এগার একেবারে সবগুলি বোঝাই; সে বোঝাইও যেমন তেমন নয়; প্রত্যেক কামরায় ৬০ জনের স্থলে এক-শ জন গিয়ে বসে, দাঁড়িয়ে আছেন। প্রায় সবগুলি গাড়ী অতিক্রম করে তবে একখানি মধ্যমশ্রেণীর গাড়ী পাওয়া গেল। সেই একখানি মাত্রই মধ্যমশ্রেণীর গাড়ী, মেল গাড়ীতে সংযোজিত হয়েছে, তারও আবার আধখানি মেয়েদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। সেই আধখানি গাড়ীতে এত যাত্রী উঠেছেন যে, বস্‌বার স্থান ত নেই-ই, দাঁড়াবার স্থানেরও অভাব। কি করা যায়। আমরা বাঙ্গালী—খেয়ার কড়ি দিয়ে সাঁতরে নদী পার হওয়া আমাদের অদৃষ্টে বিধাতা জোর কলমে লিখে রেখেছেন; তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। রেল কোম্পানী কালা আদমীর জন্য এর চাইতে সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য বলে মনেই করেন না, আমরাও বিনা প্রতিবাদে পয়সা দিয়ে দাঁড়িয়েই যাই।

গাড়ীতে উঠে দাঁড়িয়েই রহিলাম। তখন বোধ হয় উপবিষ্ট ভদ্রলোকদের মনে দয়ার সঞ্চার হোলো। দুজন বিহারী ভদ্রলোক বিলাসপুর যাচ্ছেন, তাঁরা সারা রাত্রি রেলে কাটাবেন, তাই তাঁরা বিছানা পেতে নিয়েছিলেন। আমাদের দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে তাঁরা দয়াপরবশ হয়ে ডেকে নিয়ে তাঁদের বিছানায় বস্‌বার স্থান করে দিলেন। আমরা দুইজন তাঁদের ধন্যবাদ করে আসন গ্রহণ করলাম।

এ মেল গাড়ী কি না, তাই রাস্তায় সব ষ্টেসনে থামে না। হাবড়া ছেড়ে একেবারে খড়্গপুর—প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে আর দাঁড়ানো নেই, ক্রমাগত চল্‌ছেই। গাড়ী যখন খড়্গপুরে গেল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। খড়্গপুরে আমাদের গাড়ী থেকে অর্দ্ধেকের বেশী যাত্রী নাম্‌তে দেখে আশা হোলো, বাকী পথটা একটু হাত-পা ছড়িয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু সে আশাতেও নিরাশ হতে হোলো। যতজন নেমে গেলেন, তার দেড়া লোক এসে গাড়ীতে উঠ্‌লেন। এঁরা সবাই নবীন যুবক,—একজনও বালক বা প্রৌঢ় এঁদের দলে নেই। তাঁদের দেখে আমার প্রথমে মনে হোয়েছিল, তাঁরা বুঝি বিয়ের বরযাত্রী; কিন্তু পৌষ মাসে ত হিন্দুর ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় না। এই কথা মনে পড়্‌তেই আমি অনুমান কর্‌লুম এরা হয় কন্‌সার্টের দল, আর না হয় অবৈতনিক নাটকের দল। আমার কোন অনুমানই সত্য হোলো না, শ্রীমান্ চারুচন্দ্র এঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা জুড়ে দিলেন। তখন জান্‌তে পারা গেল যে, এই যুবক দল খড়্গপুরে রেলে চাকরী করেন, কিস্তিবন্দী মত তাঁরা পাঁচ দিনের ছুটী পেয়ে কোম্পানীর দয়ায় পাশ নিয়ে জব্বলপুরের মার্ব্বেল পাহাড় দেখ্‌তে যাচ্ছেন। ভাল কথা। তাঁরা গাড়ীখানি একেবারে গরম করে তুল্‌লেন তাঁদের আনন্দ দিয়ে। হাসি আমোদ তর্কবিতর্ক কর্‌তে কর্‌তে তাঁরা আমাদের বাকী ঘণ্টা দুই সময় বেশ কাটিয়ে দিলেন। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমরা একেবারে টাটানগর হাজির, গাড়ী থেকে নাম্‌তে-না-নাম্‌তেই জামসেদপুরের সাহিত্য-উৎসবের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীমান্ সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত ভায়ার আলিঙ্গন বদ্ধ।

টাটানগর ষ্টেশন থেকে জামসেদপুর প্রায় তিন মাইল পথ। যান হচ্ছেন, গো-রথ, অশ্ব রথ ও মোটর। আমাদের জন্য মোটরেরই ব্যবস্থা ছিল। সেই মোটরে আরোহী হওয়া গেল। পূর্ব্বে যে কয়েকবার জামসেদপুরে গিয়েছি, সকল বারেই আমার পুত্রদ্বয়ের বাসায় উঠেছি। এবার আর তা হোলো না—এবার যে সাহিত্য-সভার নিমন্ত্রণে এসেছি। তাই আমাদের বাসস্থান স্থির হয়েছিল সাহেব-পাড়ায়, অর্থাৎ ১ ও ২ নম্বর সেণ্ট্রাল এভিনিউ রোডে শ্রীমান্ সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমান্ মনিলাল মুখোপাধ্যায় প্রতিবেশীদ্বয়ের ভবনে, অর্থাৎ মিঃ গুপ্ত ও মিঃ মুখার্জ্জি সাহেবদ্বয়ের বাংলোতে। তথাস্তু! এখন কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন দুই স্থানে বাস করিলাম কি করিয়া। উত্তরে বলি শয়নকার্য্য ১ নম্বরে ও ভোজন ব্যাপার ২ নম্বরে থাকিয়া করিয়াছি, তাই ঐরূপ লিখিলাম। অল্পক্ষণ পরেই আমরা প্রান্তর অতিক্রম করে বিদ্যুতালোকিত সহরে প্রবেশ করলাম। হায় রে জামসেদপুর! কুড়ি পঁচিশ বছর আগে সহরের অস্তিত্বও ছিল না—এমন শ্রবণ মনোহর নামও ছিল না। পরলোকগত জামসেদজী টাটা

মহোদয়ের সোণার কাঠীর স্পর্শে এই অল্প দিনের মধ্যেই এমন পুরী নির্ম্মিত হয়ে গেল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও ষ্টেসনের নাম বোধ হয় কালীমাটী ছিল, আর সহরের নাম ছিল সাকচী। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন টাটার লৌহ-কারখানা দেখ্তে এসে এই কারখানার স্থাপয়িতা জামসেদজী টাটার নাম চিরস্মরণীয় কর্‌বার জন্য ষ্টেসনের নাম রেখে গেলেন টাটানগর, আর সহরের নাম রেখে গেলেন জামসেদপুর।

আমরা বিদ্যুতালোকিত প্রশস্ত রাজপথ অতিক্রম করে, কারখানার পাশ দিয়ে চল্‌তে লাগলাম। তখনও কারখানার কাজ চল্‌ছে—দিনরাত সমানভাবে কাজ চলে। কারখানার মধ্যের বিদ্যুতের আলোকে, কলগুলির অগ্ন্যুৎপাতে সমস্ত সহর সারারাত্রি আলোকিত থাকে। সেই বিদ্যুতের সমারোহ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা একেবারে সাহেব পাড়ায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে আমাদের কয়েকটী বন্ধু ও আমার পুত্রদ্বয় অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের আনন্দধ্বনির মধ্যে আমরা হারিয়ে গেলাম।

এই ভ্রমণের প্রথম পর্ব্ব এখানেই শেষ করা কর্ত্তব্য বলে মনে হচ্চে, কারণ পরের দিন অর্থাৎ শনিবার থেকে সাহিত্যিক পর্ব্ব আরম্ভ হবে। সে কথা বারান্তরে বল্‌বার চেষ্টা করব,—পাঠকপাঠিকাগণের ধৈর্য্যেরও যে সীমা আছে, তা কি আর আমি বুঝি না।

বন্দে-মাতরম্

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

স্বদেশী যুগের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা।

পূর্ব্ব বাংলার ছোট্ট একটি সহর—গ্রাম বল্‌লেই হয়। একটু এদিক সেদিকে রাস্তার দুধারের ল্যাম্পপোষ্টগুলি গাছ হয়ে দাঁড়িয়েছে আর তারও আগে সহরের ইটপাথরে তৈরি ভাল রাস্তা গ্রামের ধূলোমাখা মাটির রাস্তাকে আলিঙ্গন করেছে।

ছোট্ট একটি খাল বয়ে গেছে সহরটির বুকের উপর দিয়ে—দুধারে তার উকিল আম্‌লাদের বাসা। বর্ষায় সে খাল উদ্দাম জলস্রোত নিয়ে মাতালের মত ছুটে চলে যায়। একটা পোল সে খালটির উপর দিয়ে চলে গেছে লোক চলাচল করবার জন্য।

পোল হতে নেমেই পুলিশ কর্ম্মচারীদের বাসস্থান। তিনজন দারোগা—একটি ইন্‌স্পেক্টর।

তরুণ বাংলার প্রাণ সেদিন স্বদেশের কল্যাণ কামনায় মেতে উঠেছে। বঙ্গবিচ্ছেদের সূচনায় যে আন্দোলন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই ছোট্ট সহরটিকে মাতাল করে তুলেছে। ছেলে বুড়ো সবার মুখে সেই এক কথা—"বঙ্গ আমার জননী আমার।" দিনে রাতে চারিদিকে 'বন্দেমাতরম্'।

সেদিন সহরের থানায় বেশ একটু সাড়া পড়ে গেল। পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল থানা দেখ্‌তে আসবেন। সেদিনের আন্দোলনের মধ্যে বোমা বন্দুকের গন্ধ বেশ একটু ছিল—তাই রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ দাঁড়িয়ে গেল—ইন্‌স্পেক্টরের দেহ-রক্ষার্থে আর তাঁকে সম্মান দেখাতে থানার সম্মুখে দেবদারু পাতা দিয়ে নানা রকম সাজিয়ে—রঙীন কাপড়ের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা হ'ল WEL-COME স্বাগতম্। মোটের উপর এসব ব্যাপারে যা' যা' হওয়া উচিত সবই হ'ল।

খালের ওপারেই পোলের ধার দিয়ে চলে গেছে রাস্তা—সেখান দিয়ে সাহেব যাবেন। থানায় যা'বার সময় বড় দারোগা বাবুর সাত বছরের ছেলে ধরে বসল সে পোলের উপর দাঁড়িয়ে সাহেবকে দেখ্‌বে।

বাসার চাকরের সঙ্গে সেখানে সে দাঁড়িয়ে রইল। দারোগাবাবু থানায় চলে গেলেন।

এর মধ্যে সংবাদ পৌঁছল লঞ্চ নদীর ঘাটে পৌঁছেছে—এক্ষুণি সাহেব আসবে—যে বল্‌বে 'বন্দেমাতরম্‌' তা'কেই জেলে দেবে।

অজিত (দারোগা বাবুর ছেলে) চাকরকে জিজ্ঞেস করল—হাঁ দাদা— বন্দেমাতরম্‌ মানে কি ?

চাকর এ প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে বল্‌ল—ওসব কথায় কাজ নেই—বাবু শুন্‌লে রাগ করবেন।

না—বলোনা—বল্‌তেই হবে।

এর মানে হচ্ছে—মা'কে পূজো করি।

বেশতো—মাকে পূজো কর্‌বোনা তবে কাকে করব—এতে জেলে দেবে কেন ?

তা দেবে না—বাবু বল্‌ছিলেন যত গোলমাল তো ওতেই—এই মা নাকি সত্যিকারের মা নয়—এ নাকি দেশ-মা।

তা আমার দেশকে আমি পূজো করলে—আমি ভাল বাস্‌লে সাহেব আমাকে জেলে দেবে ?

সে ইহার কি উত্তর দিবে ? কে ইহার উত্তর দিবে ? যে দেশে জন্মেছে—যে দেশের অন্নজল খেয়ে মানুষ হয়েছে—যার মাটি আঁকড়ে ধরে বড় হয়েছে—তাকে ভাল বাস্‌বার—তাকে পূজো কর্‌বার অধিকার যে মানুষের জন্মগত অধিকার—তা থেকে কেন বাধা দেবে অন্যে ?

ঐ সাহেব আস্‌ছে খোকাবাবু দেখ।

চারিদিকে চুপ। এতদিন রাজ্যের যে সব ছেলেরা বন্দেমাতরম্‌ বলে চীৎকার করত তাদের দেখাটি নেই। এম্‌নি তাদের দেশভক্তি।

সাহেব পোলের কাছে আস্‌তেই—বালক দীপ্তকণ্ঠে হাঁক্‌ল—"**বন্দেমাতরম্‌**"।

"খোকা বাবু কর কি—করকি" বলে চাকরটা তাকে থামাতে গেল। সে দ্বিগুণ উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল্‌

সাহেব—**বন্দেমাতরম্‌**।

সাহেব থম্‌কে দাঁড়ালেন। তার প্রাণটা ছাঁৎ করে উঠ্‌ল। এই মানুষের জন্মগত অধিকারের প্রকাশ্য ঘোষণা, একে কে বাধা দেবে ? মুহূর্ত্তে তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল। একটা পুলিশকে জিজ্ঞেস করলেন ওটা কার ছেলে ?

পুলিশ বল্‌লে—বড় দারোগাবাবুর।

সাহেব ফিরে চল্‌লেন 'লঞ্চের' দিকে। সকলে প্রমাদ গণলেন।

বড় দারোগাবাবু সাহেবের দেরী দেখে থানা হতে বেরিয়ে আস্‌লেন—একটা কনেষ্টবল্‌ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে একখানা কাগজ তাঁর হাতে দিয়ে বল্‌লে—সাহেব দিয়েছেন

দারোগাবাবু তাড়াতাড়ি তা খুলে সেটা পড়লেন। নীল-পেন্সিলে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—"DISMISSED." তলায় ইন্‌স্পেক্টার জেনারেলের সাঙ্কেতিক সহি।

যৌবন

শ্রীগুরুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অলিকুল্‌ মসগুল্‌ কোন্‌ মধু গন্ধে,
গায় টীয়া বুল্‌বুল্‌ আজ কোন্‌ ছন্দে ?
নিয়ে আয় বীণাখান্‌ ভেঙ্গে করি চুরমার,
কাণে বিষ ঢেলে দেয় আজ ওর ঝঙ্কার।
আন্‌ সাকী সরবৎ ভরে দেবে পেয়ালা,
পাশে এসে শোন্‌ ব'সে ঐ ডাকে কোয়েলা,
ফুর্‌ফুর্‌ ঝির্‌ঝির্‌ দখিণের বায়-টী,
খোলা চুলে দিয়ে যায় মৃদু মধু দোল-টী।
বুক থেকে খসে পড়ে মস্‌লিন্‌ ওড়না,
প্রাণ মোর আজ সাকী, কী চায় বল্‌না ?
জমকাল মখমলে চুমকীর চিক্কণ,
একা শু'তে, আজ বুকে কেন ঘন কম্পন ?
আজ ওরে, জ্যোছনা কি ? তবে দেখি আঁধিয়ার,
দরদর ধারা ঝরে, কেটে গেছে আঁধিয়ার ?

নাটক ও অভিনয়*

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল

বিগত পঞ্চদশ সাহিত্য সম্মিলনে "সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে বলিতে গিয়া, একস্থলে বলিয়াছিলাম, "প্রকৃত সমালোচক সাধারণ রুচির পরিবর্ত্তক। যুগে যুগে রুচির যে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহার মূলে সমালোচকের মঙ্গল হস্ত সুস্পষ্ট বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন বাঙ্গালা দেশের রঙ্গালয়ের কথা। পাশ্চাত্য জগতের রঙ্গালয়গুলির ন্যায় আমাদের দেশের রঙ্গালয় গুলি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের পদবাচ্য না হইলেও, প্রকৃত সমালোচকদিগের সমালোচনার ফলে ঐগুলি সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হইতেছে—নাট্য-সমালোচকগণের আলোচনার ফলে দেশের লোকের রুচি সৎনাটক দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছে। আদর্শ নাটকের পরিকল্পনা, স্থান কালোপযোগী বেশভূষা, স্থানোপযোগী দৃশ্যপটাদি সংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে রঙ্গমঞ্চের অধিকারীরা সমালোচকদের লেখনীর ফলে অবহিত হইতেছেন। নৃত্যার জনক নৃত্যগীত স্থলে মনোমোহকর লীলায়িত দেহভঙ্গীর সচল গতি ও রসপূর্ণ সঙ্গীত দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। * * * আশা করি আমরা অচিরে রঙ্গমঞ্চগুলি শিক্ষার অনুকূল প্রতিষ্ঠানরূপে দেখিতে পাইব। নাট্য-সমালোচকগণ রঙ্গমঞ্চের রুচিকে উন্নত করিতে ও রঙ্গালয়ের গতিকে উচ্চ আদর্শের দিকে পরিচালিত করিতে পারেন।" অত্যন্ত দুঃখের সহিত কিন্তু বলিতে হইতেছে, আজ কাল আর নাটকের সমালোচনা বাহির হইতেছে না। বাহির হইতেছে তথাকথিত অভিনয়ের সমালোচনা। এ বৎসরে রঙ্গালয় সমালোচনার জন্য কয়েকখানি নিজস্ব পত্রিকা বাহির হইয়াছে; সেগুলিতে আজিও একখানি নাটকের প্রকৃত সমালোচনা বাহির হয় নাই। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রেও রঙ্গভূমির সমালোচনা বাহির হইতেছে, কিন্তু যাহা বাহির হইতেছে তাহা নাটকের সমালোচনা নয়।

বাস্তবিক আজকালকার সমালোচনায় নট ও নটীর বিজ্ঞাপন প্রচার হইতেছে মাত্র। এ গুলিকে সমালোচনা না বলিয়া 'সমালোচনার বিড়ম্বনা' বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নট বা নটীর প্রশংসা বা নিন্দা এখন অনেকটা দলাদলির উপর নির্ভর করে। এরূপ হওয়া কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

নাটকের সংজ্ঞা লইয়া প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মত আলোচনা করিতে চাই না। সঙ্গীতরসজ্ঞ ডাক্তার সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'ভারতীয় নাট্যরহস্যে' নাটকের লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—'যাহাতে নৃপতিগণের চরিত বর্ণিত আছে, যাহা নানাবিধ রসভাবে পরিপূর্ণ এবং যাহা পাঠ বা শ্রবণ করিবামাত্র মনোমধ্যে অনুভূত সুখ দুঃখের উদয় হয় তাহার নাম নাটক।' নাটকের এ লক্ষণ এখন সুপ্রযুক্ত হইবে না। আমরা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলি, "অন্তঃপ্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাত চিত্রিত করাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য।" সত্যই মানব মনে ভাবোদ্দীপন করা নাটকের প্রধান কার্য্য। নাটক পাঠে মনে যদি অন্ততঃ একটাও ভাবের চিহ্ন স্থায়ীভাবে মুদ্রিত না হয়, একটাও সংস্কার যদি চিরদিনের জন্য বদ্ধমূল না হইয়া যায়, তাহা হইলে সে নাটক রচনা ব্যর্থ। অন্যের অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সে ভাবকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। আর এরূপ করিবার আবশ্যকতা কি ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, সমাজ-জীবনকে অক্ষুণ্ণ, সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য ব্যষ্টি মানব চেষ্টা করিয়া থাকে, সমাজের দোষ প্রদর্শন ও তাহার সংশোধন চেষ্টা নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য। অবশ্য সামাজিক নাটকে ও প্রহসনে এই উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সাধিত হয়। অন্যান্য নাটকেও সাধারণের বিকৃতরুচি, দুষ্ট আচার ব্যবহার, অস্বাস্থ্যকর

* জামসেদপুর প্রথম সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

নীতি ও কলুষিত প্রবৃত্তির প্রতি কটাক্ষ থাকে। নাট্যকার সমাজের শিক্ষক। সমাজেব দুষ্ট ক্ষতগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া তিনি সাধারণের সমক্ষে চিত্রিত করিয়া থাকেন এবং ঐ সকল ক্ষতেব জন্য প্রলেপের ব্যবস্থাও তিনি করিয়া দেন। মানবের তিনি সহমর্ম্মী। মানবেব দুঃখ দারিদ্র্য মোচনের জন্য মানবকে ধর্ম্ম ও নীতির উচ্চগ্রামে লইয়া যাইবাব জন্য তিনি সর্ব্বদাই যত্নশীল। মানবের অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তির বিকাশ সাধনে তিনি তৎপর। কলাকুশল চিত্রকরের ন্যায় তিনি সুন্দর শোভন নয়নাভিরাম চিত্র অঙ্কিত কবিয়া পাঠকদের সমক্ষে ধবেন, আবাব তিনি সমাজকে শিক্ষা দিবার জন্য সুন্দব চিত্রেব পার্শ্বে অসুন্দরেব, ন্যায়ের চিত্রের পার্শ্বে অন্যায়েব, পুণ্যের চিত্রের পার্শ্বে প্রলোভন ও পাপের চিত্র অঙ্কিত কবেন, কিন্তু শেষোক্ত চিত্রের ভিতর লালসা বা অশ্লীলতা ফুটিয়া ওঠে না। রসোন্মেষকারী নাট্যকাব জগতেব অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন।

অভিনীত না হইলে নাটকেব উৎকর্ষ বুঝা যায় না। নাট্যকারের কল্পনাকে মূর্ত্তি দান করে অভিনেতা, তাঁহার ভাবকে জীবন্ত করিয়া প্রতিভাত করে সেই অভিনেতা। নাট্যকার নাটকে ভাবেব যে ইঙ্গিত, যে আভাস দেন, অভিনেতা তাহা অভিনয় সাহায্যে স্ফুটতর—সুস্পষ্ট—কবিয়া সাধাবণেব সমক্ষে ধবেন। নাট্যকাব স্রষ্টা—অভিনেতা তাঁর মল্লিনাথ—ব্যাখ্যাতা। আবার সমালোচকের ন্যায় অভিনেতাও স্রষ্টা। অভিনেতা নাট্যকারের ভাবগুলিব সহিত সম্যক্ ভাবে পরিচিত হইয়া অপূর্ণ ভাবকে আপনার অভিনয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা, সময়ে সময়ে পূর্ণতা দান কবেন। অভিনয়ে নাটক সুন্দর না হইলে নাটক নামের অযোগ্য। নাটক দৃশ্যকাব্য। দৃশ্য সুন্দর না হইলে, নাটক কাব্য হইতে পারে, সৎ-সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিতে পারে, নাটক আখ্যায় আখ্যাত হইতে পারে না। অভিনেতার হাবভাবে, অনুভূতির স্ফুরণে নাটকেব বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যে নাটকে হাবভাবের স্ফূর্ত্তি অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই নাটকই অভিনয়ের উপযোগী। যে নাটকে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা পুস্তকালয়েই শোভা পাইয়া থাকে। ভাবুক পাঠকের তাহা মনোরঞ্জন করিতে পাবে, সাধারণের চিত্ত-বিনোদন তাহা কোনদিনই করিতে পাবে না। নাটকের আর একটী উদ্দেশ্য, সমাজ ও সাধারণকে তৃপ্তি ও আনন্দ দান করা।

অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, নাটকে হাবভাব থাকা সত্ত্বেও অভিনেতার দোষে নাটক জমে না, আবার রসজ্ঞ অভিনেতাও যদি প্রকৃত নাটক নামের অযোগ্য কোন নাটকের অভিনয় করেন, তাহা হইলে তিনিও সফলকাম হন না। এই জন্যই মনে হয় অভিনয় করিবার পূর্ব্বে নাটকখানিব সম্যক্ আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নাটকেব যে যে অংশ অভিনীত হইবার উপযুক্ত নয়—যে যে অংশ অভিনয় কবিলে মনে ভাবেব রেখা পর্য্যন্ত টানিতে পাবিবে না, সেই অংশ পবিবর্জ্জন কবা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নাটকের বসভঙ্গ না কবিয়া অংশ বিশেষ বাদ দিয়া অথবা নাটকীয় উৎকর্ষ সম্পাদনের জন্য কোন কোন অংশ যোগ কবিয়া নাটককে অভিনয়োপ-যোগী কবা দরকাব। নাটকেব দোষগুণ বিচাব কবিয়া সর্ব্বাগ্রে অভিনেতাদেব মধ্যে একদিন অভিনয় করা উচিত। অভিনযকালে ভূমিকা বিশেষেব যে সকল অংশ দর্শকের মনে ভাবোদ্রেক কবিতে অসমর্থ হইবে বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেই সকল অংশ বর্জ্জন কবা কর্ত্তব্য, কিংবা অভিনেতাব অক্ষমতাব জন্য যদি কোন অংশ ফুটিয়া না ওঠে, তাহা হইলে অন্য অভিনেতা দ্বাবা সেই অংশ অভিনয় করাইয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, তাঁহার দ্বারা ভাবোদ্রেক হয় কি না, অথবা পূর্ব্বের অভিনেতাব দোষ দেখাইয়া সংশোধন কবা উচিত। এইরূপ করিলে নাট্যকাব ও অভিনেতাদেব মধ্যে বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। নাট্যকাবকেও দুঃখ কবিয়া বলিতে হইবে না, অভিনেতার দোষে নাটকখানি সম্পূর্ণ নষ্ট হইল, আবার অভিনেতাও বলিবার সুবিধা পাইবেন না যে নাটকের দোষে অভিনয় জমিল না। অভিনেতারাও যে অনেক স্থলে রস-ভঙ্গ করেন না, তাহাও বলিনা। অনেক খ্যাতনামা নট বিষয়টী ভাল করিয়া আয়ত্ত না করিয়া সম্যকরূপে নাট্যকারের ভাব গ্রহণ না করিয়া অবহেলা পূর্ব্বক মহলায় যোগ না দিয়া, কেবল মাত্র

প্রম্পটারের' সাহায্যে অভিনয় করিতে গিয়া এমন রস-ভঙ্গ করেন যে তাহা কোনরূপেই মার্জ্জনা করা যায় না। আমাদের মনে হয় অভিনয়ের উপযোগী করিয়া নাটকের অংশ বিশেষ পরিবর্জ্জিত ও নূতন অংশ সংযোজিত করিয়া অভিনয় করা কর্ত্তব্য। সেদিন কিন্তু প্রতিভাশালী অভিনেতা ভিয়েনার যাদুকর 'ম্যাক্স রেনার্ড' সম্বন্ধে নব প্রকাশিত 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় পড়িতেছিলাম, প্রতি নাটকই তাঁহার ভাবে নূতনরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে; অথচ কোন নাটকের কোন অংশ তিনি বর্জ্জন করেন নাই। সেক্সপীয়ার, ইস্কাইলাস, এরিষ্টোফেনিস, মোলেয়ার, গেটে, শিলার প্রভৃতির নাটক তিনি যেমন ভাবে অভিনয় করিয়াছেন কোন অংশ বর্জ্জন না করিয়া, তেমনি ষ্ট্রাইণ্ডবার্গ, টলষ্টয়, শেকফ, হ্যানসম, ইবসেন, গর্কি প্রভৃতির নাটকের অভিনয় করিয়াছেন।' এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। আমরা ত এরূপ ধারণাই করিতে পারি না। অবশ্য মনীষার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই। আমাদের মনে হয় নাট্যকার যদি স্বয়ং নট হন, তাহা হইলে তিনি অভিনয়োপযোগী করিয়া নাটক রচনা করিতে পারেন এবং ঐরূপ নাটকের সমগ্র অংশই অভিনীত হইতে পারে। তাই গিরীশচন্দ্র, বিহারীলাল, অমৃতলাল প্রভৃতি নট-রচিত সমগ্র নাটক অভিনীত হইয়া জনসাধারণকে তৃপ্তি ও আনন্দ দান করিয়াছে ও করিতেছে।

এখন অভিনয় সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চাই; কারণ আজকাল সাময়িক পত্রে অভিনয়ের নামে যে সমালোচনা বাহির হয়, তাহা অনেকস্থলেই প্রকৃত অভিনয়ের সমালোচনা নয়—তাহা ব্যক্তি বিশেষের নিছক স্তুতি বা নিন্দা-ব্যাখ্যান মাত্র। নৃত্য ও অভিনয় সম্বন্ধে আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করিয়া এ বিষয়ের একটু আলোচনা করিতে চাই। ইহা দ্বারা অভিনয়ের রীতি (Standard) বেশ সহজে বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

আলঙ্কারিকেরা অভিনয়ের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

হৃদ্গত ক্রোধাদি ভাবাভিব্যঞ্জকঃ।
অঙ্গুল্যাদিনা ব্যক্তীকৃত মনঃ কার্য্যম্॥

হৃদয় নিহিত ক্রোধাদি ভাব ব্যঞ্জনা অঙ্গুলী আদি দ্বারায় প্রকাশের নামই অভিনয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা মানসিক ভাবনিচয় দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে সাক্ষাৎকারের ন্যায় প্রতিভাত করা যায়, সেই প্রক্রিয়াকেই অভিনয় আখ্যা দেওয়া যায়। অভি এই উপসর্গের সহিত 'নী' ধাতু যোগে যখন এই 'অভিনয়' শব্দ উৎপন্ন তখন ইহার অর্থ এইরূপই। অপরোক্ষ বিষয়কে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করাকে অভিনয় বলে।

"অভিপূর্ব্বস্তু নিঞ্ ধাতুরাভিমুখ্যার্থ নির্ণয়ে।
যস্মাৎ প্রয়োগং নয়তি তস্মাদ্ অভিনয়ঃ স্মৃতঃ॥"

সাহিত্যদর্পণের মতে অভিনয় চারি প্রকার—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক। ইহাদের মধ্যে বাচিক অভিনয়ই শ্রেষ্ঠ, কারণ অঙ্গ নেপথ্য ও সত্ত্ব বাগার্থের ব্যঞ্জনা করে। রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত না হইয়া যে কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহাই নেপথ্য কার্য্য।

'অঙ্গনেপথ্য সত্ত্বানি বাগার্থং ব্যঞ্জয়ন্তিহি।
তস্মাদ্বাচঃ পরং নাস্তি বাগধি সর্ব্বস্ব কারণম্॥'

বাচিক—

গদ্য, পদ্য, খণ্ডকাব্য, সংস্কৃতে, প্রাকৃতে বা উভয়ের সংযোগে, অর্থানুরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া বাচিক অভিনয় করা হয়—

'গদ্যপদ্যাদি ভাষা প্রাকৃত সংস্কৃতৈঃ।
সার্থকৈ রচিতো ব্যাখ্যা বাচিকঃ সোঽভিধীয়তে॥'

এই বাচিক অভিনয় আমাদের দেশে পূর্ব্বে কথকেরাই করিয়া আসিতেন। আজকাল গোস্বামীবংশাবতংস চিত্তরঞ্জন, বিদূষক সম্পাদক সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র সিংহ, ফ্যানিম্যান শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হাস্যরস-রসিকেরা করিয়া থাকেন। ভাবের অভিব্যক্তি ইহা দ্বারা সুন্দর ভাবে প্রকটিত হয়। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তারকনাথ বাগচী প্রমুখ ভাবাভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আলোকচিত্র সাহায্যে এইরূপ ভাবের অভিব্যক্তি করিয়া থাকেন।

আহার্য্য—

সাজসজ্জা পরিধান করিয়া যে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম আহার্য্যাভিনয়—"আহার্য্যোঽভিনায়া নাম জ্ঞেয়ো নেপথ্যজো বিধিঃ।"

নেপথ্যবিধি আবার চারি প্রকারের। পুস্ত, অলঙ্কার সংজীব ও অঙ্গরচনা। পর্ব্বত, যান, বিমান, চর্ম্ম, বর্ম্ম, অস্ত্র ধ্বজ পতাকা প্রভৃতি পুস্তের অন্তর্গত। অন্যত্র অমর কোষের প্রসিদ্ধ টীকাকার ভরত মল্লিকের মতে—'মৃদা বা দারুণা বাথ বস্ত্রেণাপ্যথ চর্ম্মণা লোহরত্নৈঃ কৃতংবাপি পুস্তমিত্য ভিধীয়তে।' পুস্ত নেপথ্য আবার তিন প্রকারের সন্ধিমা, ভাজিমা ও চেষ্টিমা। বস্ত্র বা চর্ম্মাদি দ্বারা নির্ম্মিত দৃশ্যকে 'সন্ধিমা' বলে। যন্ত্রঘটিত দৃশ্য হইলে তাহাকে 'ভাজিমা' ও চেষ্টমান দৃশ্যকে 'চেষ্টিমা' বলে। অলঙ্কার—যথা যোগ্য অঙ্গের জন্য মাল্য আভরণ ও বস্ত্রাদি যে নির্ম্মাণ করিতে হয় তাহাকে অলঙ্কার নেপথ্য বলে। নেপথ্য হইতে যে প্রাণী প্রবেশ হয় তাহার নাম সংজীব। অঙ্গরচনা —মাল্যাভরণাদি ধারণ ও যথাযোগ্য স্থানে বর্ণ-বিন্যাস দ্বারা অঙ্গরচনা করা হয়।

সাত্ত্বিক সুখাদি অনুভূতির দরুণ মনের যে বিকার সাধিত হয় তাহাই সত্ত্ব। সত্ত্বের ভাবই সাত্ত্বিকভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বিবর্ণতা অশ্রু, প্রলয়, এই আট প্রকার সাত্ত্বিক ভাব বাহ্য শরীরে ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা অভিনেতাকে প্রকাশ করিতে হয়।

এ ভাব প্রকাশ ছাড়া নাটক অভিনয়ে নৃত্য ও গীতের প্রয়োজন আছে। তাল-মান-যুক্ত গীতের প্রভাব অচিন্ত-নীয়। গীত সম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। নৃত্য সম্বন্ধে দু-এক কথা বলিব। 'সঙ্গীত দামোদরের' মতে তাল-মান রসামিশ্রিত বিলাসযুক্ত অঙ্গ বিক্ষেপের নাম নৃত্য। 'নর্ত্তক নির্ণয়ে'র মতে ও জন-চিত্তানুরঞ্জক অঙ্গ-বিক্ষেপের নাম নর্ত্তন। প্রধানতঃ নৃত্য দুই প্রকারের— তাণ্ডব ও লাস্য। পুং নৃত্যকে 'তাণ্ডব' ও সুকুমার স্ত্রীনৃত্যকে 'লাস্য' বলে। উভয় নৃত্য আবার দুই প্রকার যথা তাণ্ডব—পেবলি ও বহুরূপ। অভিনয় শূন্য অঙ্গ-বিক্ষেপমাত্রকে 'পেবিল', আর ছেদ, ভেদ প্রভৃতি যুক্ত অভিনয় সাহায্যে অনুষ্ঠিত অঙ্গবিক্ষেপকে 'বহুরূপ' বলে।

লাস্য নৃত্যও দুই প্রকারের—'ছুরিত' ও 'যৌবত'। ভাবরসাদিব্যঞ্জক অভিনয় সহকার নায়ক নায়িকা উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গন সহ যে নৃত্য তাহাকে 'ছুরিত' নৃত্য বলে; আর লীলাসহ নর্ত্তকীর নৃত্যকে 'যৌবত' বলে। সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের নিয়মানুসারে নৃত্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য জিনিষ আছে, তাহা আলোচনা করিবার এ প্রসঙ্গে আবশ্যকতা নাই। এখন অভিনয়ে যে নৃত্য চলিতেছে তাহা পুরাকালের নৃত্যের অনুরূপ নয়। উহা প্রতীচ্যের আমদানী নৃত্য। আমি রসজ্ঞ নাট্য-মন্দিরগুলির অধি-কারী ও অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের নিকট অনুরোধ করি যেন, তাহারা কোন প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু রসজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা ঐ সকল নৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা করাইয়া ঐ গুলির মধ্যে যেগুলি সময় ও রুচির উপযোগী বোধ করিবেন সেগুলির যেন নব-প্রচলন করেন, কারণ আমাদের প্রাচীন নৃত্যগুলিতে ভাবের ব্যঞ্জনা অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়।

অভিনয় করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নটকে নাট্যকারের ভাবে ভাবিত ও অনুপ্রাণিত হইতে হইবে,—তাঁহার ভাবকে আয়ত্ত করিতে হইবে ও দর্শকদিগের নিকট সেই মনস্তত্ত্বের ভাব প্রকাশের বাহিরের দ্যোতনা (Expression) সম্যক্‌রূপে না জানিলে উত্তম অভিনেতা হওয়া যায় না। অভিনেতার স্বাভাবিক ভাবে অঙ্গভঙ্গী করা দরকার। দর্শকদিগের নিকট এমন ভাবে অভিনয় করিতে হইবে যেন, তাহারা ধরিতে না পারেন যে অমুক নট অভিনয় করিতেছেন। অভিনেতার কার্য্য দর্শকের মনে ভ্রান্তি উৎপাদন করা। যেন দর্শকেরা মনে করেন অভিনীত বিষয় চক্ষুর সম্মুখে প্রকৃত প্রস্তাবে সংঘটিত হইতেছে। অভিনেতার ব্যক্তিত্বকে, তাঁহার বৈশিষ্ট্যকে, এমন কি তাঁহার অস্তিত্বকে না হারাইলে ভাল অভিনেতা হওয়া যায় না, অভিনয় দেখিয়া দর্শকের মনে যদি অমুক অভিনেতার অভিনয় দেখিতেছি মনে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে তাঁহার অভিনয় সফল হয় নাই। আর দর্শকের মনে যদি তাঁহার গৃহীত ভূমিকার কথা মনে উদয় হয় তাহা হইলে অভিনয় সফল হইয়াছে বলিতে হইবে। ক্ষমতাশালী অভিনেতা তিনিই যিনি একই নাটকে বিভিন্ন ভাব-প্রকাশক বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়া দর্শককে চমৎকৃত করিতে পারেন। ভাব-তন্ময়তা অভিনেতাকে বড় অভিনেতা করে। আজকাল ছোট ভূমিকা লইতে অনেক অভিনেতা রাজী হন না, কিন্তু সে কার্য্য কর্া ঠিক নয়। ছোট ভূমিকার অংশ যে নট গ্রহণ করিয়া

প্রকৃত ভাবে অভিনয় করিতে পাবেন, তিনিও কোন বড় ভূমিকা বা নায়ক নায়িকার ভূমিকা গ্রহণকারী নট অপেক্ষা ছোট নন।

নাটকের ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষবৎ দেখাইতে পারা যায় যেমন অভিনয় চাতুর্য্যে, তেমনি দৃশ্যপটে ও পোষাকপবিচ্ছদে দেখাইতে পারা যায়। একাবণ এগুলিকে আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রকাবেবা অভিনয়েব মধ্যেই ধবিয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দব অভিনয়েব জন্য অভিনেতাকে দাযী কবিতে পাবা যায়, অন্য ত্রুটীব অভাবেব জন্য বঙ্গমঞ্চেব অধিকাবীগণ দায়ী।

উত্তম অভিনয় কবিতে হইলে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল বায মহাশয়েব মতে,—

(১) আবৃত্তি, (২) মুখভঙ্গী ও (৩) অঙ্গ-ভঙ্গীব প্রতি লক্ষ্য বাখিতে হইবে। তিনি লিখিয়াছেন,—অভিনয়েব প্রধান অঙ্গ আবৃত্তি। এরূপ আবৃত্তি করিতে হইবে, যাহাতে স্বব অন্ততঃ এরূপ হইবে যাহাতে সমস্ত দর্শকমণ্ডলী তাহা শুনিতে পায়। অভিনয়ে স্বব উঠাইতে বা নামাইতে জানা অভ্যাস কবা দবকাব। কোন স্থানে ধীবে ও কোন স্থানে দ্রুত আবৃত্তি কবা উচিত, তাহা মনস্তত্বেব বিষয়। অভিনেতাব সে সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা দবকাব। স্বব ক্রমে ক্রমে নামানোও অভিনয়ে প্রযোজন হয। অভিনয়ে 'একঘেযে' ভাব যাহাতে না আসে, তাহাব জন্যও স্বব খেলানো চাই। আবৃত্তিতে কোথায় যতি পড়িবে তাহাও অভিনেতাব জানা প্রযোজন। উত্তম অভিনেতা সর্ব্বাপেক্ষা এই যতি দ্বাবা অর্থ পবিস্ফুট কবেন।' মুখভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গীব কথা আমবা পূর্ব্বে বলিযাছি।

এক্ষণে অভিনয় সমালোচকেব কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দু এক কথা বলিব। এইরূপ সমালোচকেব প্রথম প্রথম কর্ত্তব্য নাটকেব সমালোচনা কবা। তাবপব দেখান উচিত কোন ভূমিকায় কোন অংশ নট নাট্যকাবেব ভাবেব অনুরূপ ভাব অঙ্গভঙ্গী ও হাবভাবেব সাহায্যে প্রকাশ কবিতে পাবিয়াছেন, কিংবা কোন নট নাট্যকারেব ভাবের অনুরূপ ভাব দর্শকদের মনে উৎপাদন না করিয়াও অনুরূপ ভাব উৎপাদন কবিয়াছেন, যাহা নাট্যকারেরই করা উচিত ছিল। অভিনেতার ভাব-প্রকাশ কোন্ কোন্ স্থলে মনো-বিজ্ঞান সম্মত আব কোথায় তাহা নয়, তাহাও যথা লেচককে দেখাইযা দিতে হইবে। ধরুন সেক্সপীয়ারের হ্যামলেটের বিখ্যাত স্বগতোক্তিSoliloquy 'To be or not to be that's the question' কত প্রথিতযশ অভিনেতা ভিন্নভাবে অভিনয় করিয়াছেন তাহা Some Notable Hamlets পুস্তকেব পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন। ইহার দুই প্রকাব আবৃত্তি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং বিলাতে শুনিয়াছিলেন। তাঁহাব কথায় বলি,—'একরূপ আবৃত্তিতে বোঝায যে হ্যামলেট ভাবিতেছিলেন যে, তিনি আত্মহত্যা কবিবেন কি না। আব এক আবৃত্তিতে ইহার অর্থ দাঁড়ায যে হ্যামলেট "আত্মহত্যা" জিনিষটাই একটী অপ্রাসঙ্গিক সমস্যা হিসাবে আলোচনা করিয়াছিলেন।' আব আজকাল আমাদেব দেশেব সমালোচকেরা কথায় কথায় পূর্ব্ব অভিনয়কাবী নটের সহিত আধুনিক নটের ভূমিকা বিশেষেব তুলনায এক এক কথায় সমালোচনা কবিযা বায দিয়া থাকেন। এরূপ করা কোনও মতে যুক্তি-যুক্ত নয। তুলনামূলক সমালোচনা অতীব দুরূহ ব্যাপার। পূর্ব্ববর্ত্তী নটেব অনুকরণই যে অভিনয়েব প্রশস্ত পথ তাহাও নয়। ধ্যানযোগে অনন্যমনা হইয়া নটকে অনু-ধাবন কবিতে হইবে, কি কবিয়া ভূমিকা প্রকাশ করিতে পাবা যায়—কি কবিয়া নূতনভাবে দর্শকদের মনে ভাবো-দ্রেক করিতে পারা যায়। একই অংশের বিভিন্নভাবে অভিনয় যে হইতে পারে সে সম্বন্ধে প্রাগুক্ত Some Notable Hamlets পুস্তকই প্রমাণ। আর গিরীশচন্দ্রও 'অভিনয় ও অভিনেতা' প্রসঙ্গে অর্দ্ধেন্দুশেখর ও তাঁহার বিল্বমঙ্গলের স্থান বিশেষের অভিনয়ের পার্থক্য দেখাইয়া দিয়াছেন। একথা নাট্য সমালোচকদের সর্ব্বথা মনে রাখা উচিত। গতানুগতিক অভিনয় যে একমাত্র ভাব-প্রকাশের পন্থা তাহাও মনে করা উচিত নয়।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের "পাষাণী"

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সম্প্রতি কবি দ্বিজেন্দ্রলালের "পাষাণীর" অভিনয়োপলক্ষে উক্ত নাটকের গুণাগুণ সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত ও এতৎ সম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিমত প্রকাশিত হইতেছে। অনেকে বিশ্বাস করেন নাটকখানিতে হিন্দুর প্রাণে ব্যথা দেওয়া হইয়াছে, কারণ অহল্যা হিন্দুর নিকট প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার মধ্যে প্রথমস্থানীয়া, এবং তাহাকে কুৎসিৎভাবে চিত্রিত করিয়া কবি হিন্দুর দৃঢ়বদ্ধসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। অনেকে বলেন, "পাষাণী" দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য, এবং বাল্মিকীর চিত্রিত চরিত্র তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুণ্ণ করেন নাই, তবে যাহারা কৃত্তিবাস প্রভৃতির অনুসরণ করিয়া অহল্যাকে 'পঞ্চ সতীর' মধ্যে গণ্য করিয়া হিন্দু নামে কলঙ্ক সঞ্চার করেন, বাস্তবিকই তাহারা বিশেষ কৃপার পাত্র। তাঁহারা বলেন, "Do the signal achivements of any of the five "Satees" justify her being remembered daily by decent men or women who have learnt to think even a little for themselves"? দ্বিজেন্দ্রলালের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় মহাশয় লেখনী ধারণ করিয়া দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন :—

(১) বাল্মিকী অহল্যাকে যে ভাবে লোকচক্ষে প্রতিভাত করিয়াছেন তাহাতে তাহার (অহল্যার) প্রতি হিন্দুগণের শ্রদ্ধা হওয়া বিস্ময়কর।

(২) "পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্" শ্লোকে মনে হয় ইহার প্রণয়নকর্ত্তা সম্ভবতঃ অহল্যা দ্রৌপদী প্রভৃতি নাম করিয়া উপহাসই করিয়াছেন (I sometimes really wonder if the composer of the sloka did not mean to be ironical)

(৩) যেমন ভীষ্ম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি বর্ত্তমানে রাম ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে অযথা সম্মান প্রদর্শন করিয়া আমরা এতদিন ভুল করিয়াছি (we have often erred in honouring too much men like Judhistir and Rama), সীতা গান্ধারী প্রভৃতি বর্ত্তমানে অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, মন্দোদরী ও তারা পঞ্চকন্যাকে সম্মান করিয়াও আমরা সেইরূপ অন্যায় করিয়াছি। এবং এখন এই পূর্ব্বকৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করিয়া ঐ সমস্ত নাম বিস্মৃতির গর্ভে বিদায় দেওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে (Is it not high time to wake up to what our ideals should be, revaluing them if need be)

(৪) দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্মিকীর আদর্শ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করেন নাই।

(৫) রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি অনেকেই "পাষাণী"কে দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটকাবলীর মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন।

দিলীপবাবু পিতাকে সমর্থন করিয়া উপযুক্ত পুত্রের কার্য্যই করিয়াছেন, এইজন্য আমরা তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করি। কিন্তু যাহারা নিরক্ষর মূর্খ, nameless non-entities, কৃত্তিবাস পর্য্যন্ত যাহাদের রামায়ণ জ্ঞানের দৌড়, তাঁহাদের পক্ষ হইতেও কয়েকটা

কথা বলিবার আছে। সম্প্রতি বাল্মিকী ও দ্বিজেন্দ্রলাল যে যে ভাবে অহল্যা চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমরা পাশাপাশি তাহা প্রদান করিব।

মহামুনি বিশ্বামিত্র শ্রীরামলক্ষ্মণ সহ যখন মিথিলায় গমন করিতেছিলেন তখন শ্রীরামচন্দ্র মিথিলার উপবনে একটী নির্জ্জন পুরাতন রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইয়া বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্, এই স্থানটী আশ্রমের ন্যায় বোধ হইতেছে। কিন্তু সম্প্রতি উহাতে কোন ঋষি নাই। পূর্ব্বে ঐ আশ্রম কাহার ছিল? শুনিতে আমার অভিলাষ হইতেছে।" বিশ্বামিত্র তখন স্বল্প কথায় গৌতম অহল্যার তপস্যা এবং তৎপর অহল্যার সাময়িক পতন ঘটিত বৃত্তান্ত বিবৃত করেন। অহল্যার সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনা বিশ্বামিত্রের মুখেই কবি আরোপিত করিয়াছেন এবং তাঁহার উক্তি হইতেই আমরা বলিতে পারি গৌতমের অবর্ত্তমানে সুযোগ পাইয়া (তস্যান্তরং বিদিত্বা) একদিন ইন্দ্র গৌতম বেশ ধারণ পূর্ব্বক তাহার নিকট নিজের কামেচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং অহল্যাও তাহার ইচ্ছা চরিতার্থ করেন। বিশ্বামিত্রের কথা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে অহল্যা ইন্দ্রকে চিনিয়াও নিজদেহ বিতরণ করিয়াছিল—

মুনিবেষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিঞ্চকার দুর্ম্মেধা দেবরাজ কুতূহলাৎ॥

এখন স্বল্প দুই একটী কথায় ('বিজ্ঞায়') তপোনিষ্ঠ বিশ্বামিত্র অহল্যার জ্ঞানতঃ পাপ সম্বন্ধে যখন বলিতেছেন তখন তাহা কর্ত্তন করিবার বৃথা যুক্তি প্রদান করিতে আমাদের অভিলাষ নাই। বিশেষতঃ স্বামীর বেশ ধারণ করিয়া ব্যক্তি বিশেষ স্ত্রীর নিকট অসদভিপ্রায়ে উপস্থিত হইলে স্বামীর মন ও আত্মা লইয়া সে যে আসে নাই, কাম-তাড়িত ও কুতূহলাক্রান্ত না হইলে তপোনিষ্ঠা অহল্যাও বুঝিয়া সেই সময়ে সতর্ক হইত। কিন্তু ইহা কামাতুরা নারীর নারী-সুলভ দুর্ব্বলতা, এইখানেই অহল্যার পতন এবং এই জন্যই আমরা তাহার কার্য্যের অনুমোদন করি না। কিন্তু বাল্মিকী আরও কতকগুলি অবস্থাও উপস্থিত করিয়াছেন:—(১) তৃতীয় ব্যক্তি বিশ্বামিত্রের উক্তি (২) গৌতমের অনুপস্থিতি (৩) অহল্যার আন্তরিক অবস্থা ও সুযোগ (৪) ইন্দ্রের বেশ পরিবর্ত্তন এবং আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়েও গৌতম তাহাকে নিজবেশধর দেখিয়া অভিসম্পাত প্রদান করে—

"মমরূপং সমাস্থায় কৃতবানসি দুর্ম্মতে!"

গৌতমের কোন কথায়ই মনে হয় না যে অহল্যা চিনিয়া এই কাজ করিয়াছিল (৫) অভিসপ্ত হইয়া ইন্দ্র দীন নয়নে অগ্নি প্রভৃতি দেব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণকে বলিতেছেন—

"কুর্ব্বতা তপসো বিঘ্নং গৌতমস্য মহাত্মনঃ
ক্রোধমুৎপাদ্য হি ময়া সুরকার্য্যমিদং কৃতম্।"

"আমি মহাত্মা গৌতমের তপস্যার বিঘ্ন সম্পাদনার্থ তাঁহার ক্রোধ উৎপাদন পূর্ব্বক সুরকার্য্য সাধন করিয়াছি আমিই গৌতমকে কঠিন পাপ প্রদান করাইয়া তাহার তপস্যা অপহরণ করিয়াছি।" এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় গৌতমের অনিষ্ঠ করিবার জন্য ইন্দ্রের ষড়যন্ত্রেই অহল্যার অপরাধ, স্বামীবেশে ইন্দ্রকে দেখিয়া দুরদৃষ্টবশতঃই তাহার পতন। এই বিষয়ে পুনবায় কবিও শতানন্দের মুখে আরোপ করিতেছেন

"অপি রামায় কথিতং যদ্‌বৃত্তং তৎ পুরাতনম্
মম মাতুর্হাতেজো দৈবেন দুরনুষ্ঠিতম্।"

কিন্তু বহুদিন স্বামীসহ তপস্যায় ব্যাপৃত থাকিয়া যদি মুহূর্ত্তের জন্য অহল্যার জীবনে "দৈব-দুরনুষ্ঠিত" একটা ভ্রমই সংঘটিত হয়, তবেই কি তাহার ত্রাণ নাই? দিলীপবাবু ও তাহার মতানুবর্ত্তীগণ অহল্যা প্রভৃতির নাম প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারেন, বা কৃত্তিবাসের একেবারে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে পারেন, কিন্তু বাল্মিকী ত তাহার ন্যায় এরূপ নাসিকা কুঞ্চন করেন নাই। বিশ্বামিত্র অহল্যা বৃত্তান্ত শুনাইয়া রাম চন্দ্রকে খুব ত্রস্ত হইয়া আগ্রহের সহিত বলিতেছেন—হে মহাতেজসম্পন্ন রাম, তুমি পুণ্যকর্ম্মা গৌতমের আশ্রমে শীঘ্র চল, এবং তথায় গিয়া সেই মহাভাগা দেবরূপিনী অহল্যাকে উদ্ধার কর:—

"তারয়ৈনাং মহাভাগামহল্যাম্ দেবরূপিনীম্।"

কি আশ্চর্য্য, "এই অসতী-কুল-পাংশুলাকে" মহাভাগা, দেবরূপিনী! কেবল ইহাই নহে। আশ্রমে আসিয়া তাহারা অহল্যাকে দেখিলেন

"দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোদিতপ্রভাম্"।

এইখানে বাল্মিকীব বর্ণনা কি চমৎকাব! রামচন্দ্র তথায় গিয়া দেখিলেন—তপস্যাব তেজে অহল্যাব প্রভা অধিকতব প্রতিফলিত হইয়াছে। মানুষের কথা দূবে থাকুক, দেবদানবগণ পর্য্যন্ত তাহাব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিতে পারেন না। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয বিধাতা প্রযত্নাতিশয়ে এই মায়াময়ী মোহিনীমূর্ত্তি বচনা কবিয়াছেন। তাঁহাব দীপ্তি ধূমপূর্ণ বহ্নিশিখাসদৃশ। হিম বিজড়িত বা মেঘমিশ্রিত পূর্ণচন্দ্রেব লাবণ্য যেরূপ, জলমধ্যে প্রদীপ্ত সূর্য্য-প্রভা যে প্রকাব, তাহাব আকৃতিও তদনুরূপ হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই বঘুনন্দন বাম ও লক্ষ্মণ সানন্দে তাঁহার পাদ বন্দনা কবিলেন—

বাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ জগৃহতুর্ম্মুদা

তখন দেবলোকে দেবদুন্দুভি সকল বাজিতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সবাগণেব মহান্ মহোৎসব ও স্বর্গ হইতে সেই আশ্রমে পুষ্পবৃষ্টি হইল। সত্য বটে শ্রীবামচন্দ্রেব কৃপায় অহল্যাব উদ্ধাব হয, কিন্তু বাল্মিকী তাহাকেও অল্প তপশ্চাবিণী কবিয়া বামেব নিকট উপস্থিত কবেন নাই। অহল্যা সৃজনে এইখানেই বাল্মিকীব বিশেষত্ব। বাস্তবিক দেবতারা সেই তপোবল বিশুদ্ধাঙ্গী গৌতমেব বশীভূতা ও অনুগামিনী পত্নী অহল্যাকে "সাধু, সাধু" বলিয়া প্রশংসা কবিলেন :—

"তপোবল বিশুদ্ধাঙ্গীং গৌতমস্য বশানুগাম্"

আর গৌতম? সেই "abusing ও unforgiving" গৌতমও অহল্যাব সহিত মিলিত হইযা সুখী হইলেন।

"গৌতমোঽপি মহাতেজা অহল্যা সহিত সুখী'

ইহাব পব মিথিলানগবীতে শতানন্দ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা কবিতেছেন—

আমাব মহাভাগা যশস্বিনী মাতাকে শ্রীরামচন্দ্রেব সন্দর্শন কবাইয়াছেন ত?

এখন বাল্মিকী যাহাব দৈবনিবন্ধন মুহূর্ত্ত কালীন ভ্রম সহস্র বৎসর প্রায়শ্চিত দ্বাবা অপনোদন করাইয়া পরে মহাভাগা দেবরূপিনী, যশস্বিনী, গৌতমবশা, বিশুদ্ধাঙ্গী রূপে তাঁহার যশোগান করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, যাহার পরিত্রাণের জন্য তপোনিষ্ঠ কঠোর যোগী বিশ্বামিত্রও অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, যাহাব তপোতেজ-প্রভাবে শ্রীবামচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাব পাদ-বন্দনা কবেন, সেই তপশ্চাবিণী মাতাব নাম মহাপাতক-নাশসনরূপে স্মবণ কবিয়া যদি হিন্দুবা গাত্রোত্থান কবিয়া আনন্দ বোধ কবে তবে দিলীপবাবু তাহাদিগেব প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা কবিয়া মনে কবিতে পাবেন" "Sanctioned by no better authorities than nameless nonentities of nonsensical numbers" এবং হযত বা মনে কবিতে পাবেন এ বাল্মিকী ও আমাদেব কৃত্তিবাস রূপে আমবা ভ্রম কবিযাছি, কিন্তু তাহাব নবোৎসাহিত সুললিত ভাষ্যে হিন্দুব বিশ্বাস অহল্যা দ্রৌপদীব প্রতি বিন্দুমাত্রও আলোড়িত হইবে না। সত্য বটে, সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, শৈব্যা, গান্ধাবী, দময়ন্তী, চিন্তা, বেহুলা, ফুল্লবা, প্রভৃতি আদর্শ সতী সন্দেহ নাই, এবং এখন হিন্দু বিরল যাহাদেব নামে যে যাহাব অদয় না পবিত্রতায় স্নাত হয। আব এই সকল আদর্শ সতীব নিকট সত্য বটে অহল্যাব তুলনা হইতে পাবে না। কিন্তু অহল্যাব মত এমন আব একটী চবিত্র অমব। বামাযণ মহাভাবতে খুঁজিযা পাই না, যিনি মুহূর্ত্ত কালীন ভ্রম তীব্র প্রায়শ্চিত্ত সাধনে (স্বামীব ক্ষমাবলে নহে) নিজেব দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ অগ্নিশুদ্ধা কবিয়া পবে—পবে আবাব ক্রোধপবাযণ স্বামীব ও মনস্তুষ্টিসাধনে সক্ষম হইযা সুখে দাম্পত্য জীবন যাপন কবিতে সক্ষম হয়েন। পূর্ব্বকালীন হিন্দু এত ক্ষমাশীল বলিযাই এইরূপ হইযাছিল। আব এখন নির্দ্দোষী বালিকা আততাযীব হস্তে পতিত হইযা সমাজ পবিত্যক্তা! এই মর্ম্মব্যথা আমবা ববাবব বলিযাছি এবং ববাবব বলিব। পাঠক দেখুন এই অহল্যার প্রতি বাল্মিকীব ধারণা (Conception) ও কত উচ্চ, এবং এই জন্যই অহল্যা এত বড। পঞ্চস্বামী বর্ত্তমানে দ্রৌপদীব অপূর্ব্ব সংযমই তাহাকে আবাব প্রাতঃস্মবণীয়া কবিযা বাখিয়াছে। এখনও কি দিলীপবাবু বলিতে চাহেন "why waste admiration to those who donot merit the same." দিলীপবাবু হিন্দুব বাম যুধিষ্ঠিব প্রভৃতিতে যেরূপ শ্রদ্ধাবান, তাহাতে তাহার সঙ্গে বোধ হয তর্ক না করাই ভাল। আমাদেব সংস্কার

আলাদা, শিক্ষা আলাদা, বিশ্বাস আলাদা। তবে একটা কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে তিনি যাহাদিগকে প্রাতঃস্মরণীয় ও সম্মানার্হ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন—অর্থাৎ ভীষ্ম এবং লক্ষ্মণ তাঁহারা সেই পূজ্য চরিত্রদ্বয়কে এত শ্রদ্ধা করিতেন কেন ? এবং ভীষ্মদেব শ্রীরামের অপর রূপ কৃষ্ণকেই বা এত ভক্তি করিতেন কেন ? এখন এই অহল্যাকে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল কিরূপে চিত্রিত করিয়াছেন আমরা সেইটুকু দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব।

কবি দ্বিজেন্দ্র লালের মতে দশবৎসরের সময় অহল্যার বিবাহ হয়। তারপর আর ও পাঁচবৎসর অতীত হইয়াছে, এখন সে পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী। তাহার—

আজি উচ্ছসিয়া
ছাপিয়া হৃদয়-পাত্র যাইতেছে
নিরুদ্ধ প্রাণের ব্যথা।

সঙ্গীতেও অহল্যার সেই মর্ম্মব্যথা, সেই করুণ কাহিনী—

আজি কি ব্যথা উঠিছে জাগি রে
মম হৃদয় কাহার লাগি রে
যেন উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

কিন্তু এভাব কি স্বামীর জন্য ? যখন বিবাহের মর্ম্ম বুঝিতেন না, ভাবিতেন পুণ্য পরিণয়ে জন্ম সার্থক হইবে, কিন্তু—এখন ? যৌবনাগমনে—

"এতদিনে বুঝিয়াছি ভ্রম"

ইহার মধ্যে আবার ৪।৫ বৎসরের এক ছেলেও তাহার ক্রোড়ে (১০ বৎসর পরে সে যুবক)। স্বামীর কথা উঠিলে তিনি বলেন—

তিনি ধার্ম্মিক মাধুরি। কিন্তু রমণী-হৃদয়
তার প্রার্থী নহে সখি ! থাক্ কাজ নাই
নিষ্ফল বিলাপে আর। বুঝিবি না তুই।
অথবা কি ফল অনুতাপে ? (সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস)
নাহি জানি কেন আজি হৃদয় কাতর।

এইবারে যখন আশ্রমে রাখিয়া গৌতম কিছুদিন বাহিরে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, অহল্যা যেন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল, স্বামীকে খুব শক্ত দুই কথা শুনাইয়া দিল—

দেখ চাহি এই মুখপানে এই
নব উদ্ভিন্ন যৌবন, এই উচ্ছসিত রূপ,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, এই উদ্বেল হৃদয়
দেখিছ ? বাঁধিলে কেন নব সুকোমল
কুসুমিত পল্লবিত শ্যামল বল্লরী
নীরস বিশুষ্ক বৃক্ষ কাণ্ডে ?" (ক্রন্দন)

স্বামী বৃদ্ধ বলিয়াই বোধ হয় এত অভিমান। কোথায় বা অহল্যার তপস্যা ? কোথায় বা দেবাসুর সংগ্রামে মুহূর্ত্তেকের জন্য পতন ও ইন্দ্রকে চিনিয়াও আত্মরক্ষায় অনিচ্ছা। অহল্যা যেন পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত—

"আমার জীবন চাহে সম্ভোগ। তোমার
জীবনের ব্রত পুণ্য সঞ্চয় ; তোমার
কার্য্য ব্যয়। ভিন্নরূপ গতি দুজনার
ভিন্নদিকে। এ জীবনে হইব না মোরা
কভু সম্মিলিত। যাও, বাড়িবেনা তাহে
আমাদের জীবনের গভীর বিচ্ছেদ।"

এই ভাবে বরষার বারিসম্পাতে সন্ধ্যাসমাগমে যখন কুটীরে সে একাকিনী, যখন তাহার,—

আকুল বেদনা আর হৃদয় আবেগ
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারি,
মরম ভেদিয়া উঠে গভীর নিরাশা
ধিক্ ধিক্ জনম আমারি—

যখন তাহার বাসনা—

আর রাখিতে না পারি
বাঁধিয়া প্রবাহ। হায় বুঝেছি আমার
বিফল যৌবন, এই নারী জন্ম বৃথা

সুঠাম, সুন্দর, দীর্ঘদেহ, প্রসারিত বক্ষ ইন্দ্র কুটীর-দ্বারে উপস্থিত। বাল্মিকীর সৃষ্টির ন্যায় স্বামী মূর্ত্তি পরিগ্রহের কোন উল্লেখ নাই। তথাপি অহল্যা তাহাকে দেখিয়াই ডাকিলেন, "মদীয় আশ্রমে যাপ নিশীথ" বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ভাবে গদ্গদ হইয়া কথনও বলিতেছেন—

"কি নাম যেতেছি ভুলিয়া"

আবার আত্মস্থ হইয়া তখনই বলিতেছেন "আশ্রমে চল।" (অস্ফুটস্বরে)—"সত্য বলিতেছি, আমি তব দাসী, তুমি মোর প্রাণেশ্বর"— (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)।

এইভাবে কতদিন চলিল, তাহার ঠিক নাই। কিন্তু মাধুরী তাহার স্বামী চিরঞ্জীবকে বলিতেছে—"একজন

সুন্দর সুগৌর যুবা প্রত্যহ নদীবক্ষে একখানা সজ্জিত তরণীর সহায়তায় অর্দ্ধরাত্রে আসে, আর প্রত্যহ প্রত্যুষে চলে যায়। ছেলেকেও নিজের কাছে শুইতে দিতে অহল্যা রাজী নহেন, এবং এই অবস্থায় সংবাদ আসিল গৌতম সপ্তাহমধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। ইন্দ্র অহল্যাকে লইয়া যাইবার আয়োজন করিতেছে, আর অহল্যা তখনও কম্পিতস্বরে শপথ করাইতেছে

"সত্য ভালবাস ?"

উপপতি সঙ্গে যাইবার কি আনন্দ! একমুহূর্ত্তে সে ভবিষ্যদ্-সুখ কল্পনা করিয়া লইতেছে—

যেখানে ভুঞ্জিব
পরস্পরে নিত্য চির অতৃপ্ত বিলাসে
অলক্ষ্যে নিভৃতে সুখে। সেখানে
বুঝিব বিশ্ব জনশূন্য, শুদ্ধ তুমি আমি আছি
ভাসায়ে যাইব যুগে যুগে নিরবধি
ক্ষুদ্র মিলনের তরী, অকূল
গভীর প্রেমের সমুদ্রে।

যাইবার সময়ে নিশীথে হঠাৎ পুত্র শতানন্দ জাগিয়া অনর্থ উৎপাদন করিল। "মা ক্ষুধা, মা ক্ষুধা" বলিয়া জাগিয়া উঠিল। কিন্তু অহল্যা—

"তবে দিতেছি মিটায়ে চিরজীবনের ক্ষুধা।"

বলিয়া শিশুর কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। অবশ্য ক্ষণেকের তরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল

"করিলাম হত্যা আপন সন্তানে'

কিন্তু পরক্ষণেই প্রেমিকের হাত ধরিয়া গৃহের বাহির হইল। পথে মাধুরী বাধা দিল, চিরঞ্জীব বাধা দিয়া ইন্দ্রের অস্ত্রে ভূতলশায়ী হইল। কিন্তু অহল্যাকে কিছুতেই প্রতিহত করিতে পারিল না। 'মাতৃত্বের' নিধন সাধন করিয়া, আশ্রয়-কর্ত্তার মৃত্যু স্বচক্ষে দর্শন করিয়া প্রিয় সখীর কাতরোক্তি উপেক্ষা করিয়া উপপতির প্রেমপাশে আবদ্ধা অহল্যা পর্ব্বতপ্রান্তে ইন্দ্রের সহিত দিবস-রজনী বিহার করিতে লাগিল। এই অবস্থায় কিছুদিন মধ্যে যখন ইন্দ্রের ক্ষুধা তুষ্ট হয়, স্বর্গে আবার ফিরিয়া যাইবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে আসে, অহল্যা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়—

"এই নহে আমাদের স্বর্গ ?
করে কর, বক্ষে বক্ষ,
অধরে অধর।
দশবর্ষ ধরি পান করিয়াছ বটে
এ রূপের তীব্র সুধা, পাত্রে চেয়ে
দেখো আরো আছে। আরো দিতে
পারি এই পীনবক্ষ—যত চাহ দিব,
যত চাহ পান কর।

কিন্তু ইন্দ্র যখন একান্ত দৃঢ়মনোরথ, তখন সুরাপানোন্মত্তা অহল্যা উপপতির বক্ষে শাণিত অস্ত্রাঘাত করিয়া উন্মাদবৎ অট্টহাস্য করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

পাঠক দেখুন বাল্মিকী যাহার মুহূর্ত্তকালীন পতন-সংঘটন করিয়া পরে তাহাকে মহাভাগা দেবীরূপে পরিণত করিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্র চিত্রে সেই অহল্যাকে হীন বারাঙ্গণারও অধম করিয়া সৃজন করা হইয়াছে কি না? আর যদি তাহাই হয়, তবে কি এই 'সাহিত্যের দুর্নীতি' নিবারণের কোন উপায় নাই?

ইহার পর অহল্যা জানিতে পারে যে তাহার পুত্র জীবিত, তাহার সহিত অহল্যার সাক্ষাৎও হয় কিন্তু পুত্র মাতাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম এতদিনে বোধ হয় অহল্যা নিজের পাপের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে ভগবানের কৃপাভিক্ষা করিবেন কিন্তু এখনও তাহার রূপের গরিমা, তাহার তীব্র প্রতিহিংসা, এখনও আকাঙ্ক্ষা, এখনও মানুষের প্রতি তীব্র কটূক্তি, নিজের পাপের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ নাই, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নাই, বিন্দুমাত্র অনুতাপও দৃষ্ট হয় না—

আমি কলঙ্কিণী সত্য। কিন্তু কার দোষ ?
কে রোপিয়াছিল এই স্বর্ণ প্রতিমারে
নীরস পাষাণস্তূপে ? কেবা প্রলোভনে
ভুলাইল অসহায়া দুর্ব্বলা রমণী।
নহে সে নির্ম্মম ক্রূর পুরুষ ? তথাপি
তথাপি শুধু আমি দোষী একা সমাজ বিচারে
কেহ নহে নির্ম্মম, যেমতি ক্রূর পুরুষ নির্ম্মম।
বহ বহ ঝঞ্ঝা কর চূর্ণ ধূলিসাৎ
এই অরাজক রাজ্য। ভৈরব উল্লাসে
দাঁড়ায়ে দেখুক তাহা অহল্যা পাষাণী।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাল্মিকীর শ্রীরামচন্দ্র—অহল্যার তপশ্চরণে মুগ্ধ হইয়া দর্শনমাত্রেই তাহার পাদবন্দনা করেন ও বিশ্বামিত্র স্বয়ং তাঁহাকে সেই মহাভাগার নিকটে লইয়া আসেন, আর দ্বিজেন্দ্রলালের অহল্যা বিশ্বামিত্রকে বলিতেছে—

তুমি কপট পুরুষ
একা মহাসত্য জানিয়াছি প্রভু
"লম্পট পুরুষ জাতি"। তুমি ঋষি বটে
তথাপি বিশ্বাস নাই পুরুষ ত তুমি
আসিয়াছ বুঝি রূপ লালসায় ?

রামচন্দ্রকে বলিতেছেন —

আরম্ভ হইয়াছিল জীবন আমার
প্রকাণ্ড প্রসাদে। হায় রাখিল বিনাতা
পূর্ণ জ্যোৎস্না কেন ভগ্নগৃহে, পাপিয়াস
অন্ধকারে, ফুটাইল নির্জ্জন বিপিনে
পুষ্পের সুগন্ধ রাশি ?

দ্বিজেন্দ্রলালের রামের অনেক বক্তৃতার পরে তবে অহল্যার হৃদয়ে কিঞ্চিৎ অনুতাপ আরম্ভ হয় এবং পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে তাহার কিঞ্চিৎ অনুতাপ দেখিতে পাই। ইহার পরে গৌতম তাহাকে গ্রহণ করেন।

পূর্ব্বাপর দেখিয়া পাঠক বিবেচনা করুন, বাল্মিকী হইতে কবি কতদূর সরিয়া পড়িয়াছেন এবং বাল্মিকীর মহাভাগা দেবীরূপিণী অহল্যাকে তিনি দশবর্ষব্যাপী লালসাকূপে নিমজ্জিতা, পুত্রঘাতিনী, প্রেমিকের প্রাণহন্ত্রী প্রতিহিংসা-পরায়ণারূপে চিত্রিত করিয়াছেন কি না ? কিন্তু নাটকখানা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথমকালীন নাটক, প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। এবং দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুদিন পরে পদ্যে নাটক না লিখিয়া গদ্যে নাটক লিখিবেন স্থির করেন এবং তজ্জন্য অনেক কৈফিয়ৎও দেন। ইহার পরে দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যজগতে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, ইচ্ছা করিলেই যে কোনও থিয়েটারে তিনি এই নাটকের অভিনয় করাইতে পারিতেন। কিন্তু সাহিত্যে দুর্নীতি নিবারণের জন্য যিনি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও লেখনী ধারণ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হয়েন নাই, হিন্দুর প্রাণে তিনি কিছুতেই ব্যথা দিতে পারেন নাই। হিন্দুর অহল্যাকে, বাল্মিকীর অহল্যাকে আদর্শচ্যুত দেখিয়া অপরে অট্টহাস্য করিতে পারে, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিলে দ্বিজেন্দ্রলাল ইহাতে খুসী হইতেন কি না, সুধী সমাজ তাহার বিচার করুন।

এই সমস্ত চরিত্র যে হিন্দুসমাজের সমাদৃত ও পূজিত তাহার কারণ শ্রীভগবানের করুণা। মহাপাতকীরও তিনিই উদ্ধারকর্ত্তা, পথভ্রষ্ট পাপাচারী নরনারীর ত্রাতা, অহল্যা চরিত্র স্মরণে হিন্দুর মনে সেই মহাসত্যই প্রতিভাত হয়। যে সকল চিত্র বা চরিত্র হিন্দু যুগ যুগান্তর ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, বালকের কথায় তাঁহাদের আজ মতিচ্ছন্ন ঘটিবে না।
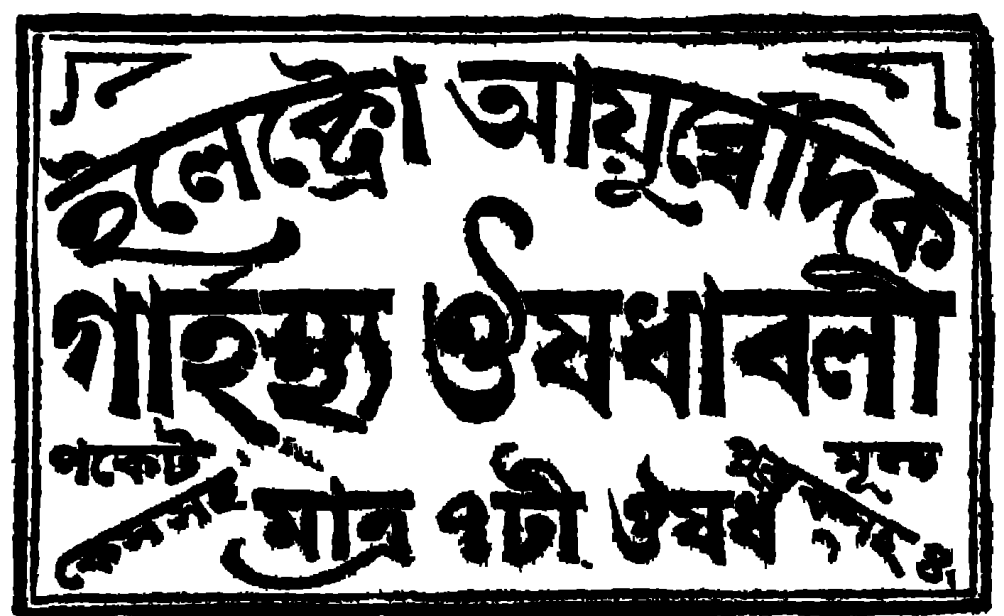
মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সার সঙ্কলন

কেমনে সম্ভব—

আজ কংগ্রেস যেভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে তাহা দেখিয়া কেহ বলেন ইহা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে আবার কেহ বলেন পাগলের কথায় হঠাৎ এমন স্থির সিদ্ধান্ত করা নিতান্তই আহম্মকী। কংগ্রেসসেবীগণকে ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ২০০০ গজ সুতা, স্বহস্তেই হউক অথবা অপরের দ্বারায়ই হউক মাসিক বৃত্তি স্বরূপ কংগ্রেসকে দান করিতে হইবে। ইহাতে সুফল অনেক, কারণ প্রথমতঃ তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ একটী বিষয়ে ঐক্য থাকিবে, দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা স্বহস্তে সুতা কাটিতে অনিচ্ছুক তাঁহাদেরও চরকাসেবীদের সহিত সৌহৃদ্যবর্দ্ধন করিতে হইবে এবং তাঁহাদের সহিত মিশিলে তাঁহারা (কংগ্রেসসেবীগণ) অতি উচ্চ অঙ্গের রাজনীতি শিক্ষা করিবেন ক্রমে চরকার প্রতি শ্রদ্ধা-পরায়ণ হইবেন।

প্রস্তাবমত কার্য্য করা দুরূহ কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে কার্য্যটী দুরূহ না হইলে তাহা হইতে আমাদের আশানুযায়ী বিরাট সুফল উৎপাদন করাও দুষ্কর। প্রস্তাবটীকে কার্য্যকরী করিতে হইলে প্রথম প্রত্যেক প্রদেশে কত সংখ্যা চরকাসেবী পাওয়া যায় তাহা নির্দ্ধারণ করা উচিত এবং যতদিন না সংখ্যা পূরণ হয় ততদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা সভ্য সংগ্রহ করা উচিত—উপস্থিত যত লোক চরকায় সুতা কাটেন তাঁহাদের জানান উচিত যে তাঁহারা মাত্র দৈনিক অর্দ্ধঘণ্টা পরিশ্রমে দেশের কত উপকার করিতে পারেন এবং কংগ্রেসভুক্তসভ্য হইতে পারেন। একজন দক্ষ এবং উপযুক্ত কর্ম্মী কুড়িজন সভ্যের সহিত এক একটী সভা স্থাপন করিয়া সুশৃঙ্খলের সহিত তুলা পেঁজা, পাঁজ তৈয়ারী করা, সুতা কাটা প্রভৃতি শিক্ষা-দান করা উচিত। প্রধান সভ্য একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন কারণ তাঁহার উপর অপর কুড়িজনের কার্য্য নির্ভর করে।

যাঁহারা চরকাসেবায় অনিচ্ছুক তাঁহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সভ্য, যাঁহারা নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে কাহারও দ্বারা সুতা কাটাইয়া লইবেন—দ্বিতীয় শ্রেণী—যাঁহারা কোন সুপরিচিত চরকাসেবীর নিকট হইতে ক্রয় করিবেন তৃতীয় শ্রেণী যাঁহারা বাজারের চলিত সুতা কংগ্রেসকে দান করিবেন—ইহার মধ্যে তৃতীয় পর্য্যায়ের সভ্যগণকে সাবধান করিতেছি যে তাঁহারা সতর্ক না হইলে কংগ্রেসকে আসল সুতা না দিয়া নকলই দান করিবেন একার্য্য কাহারও অভিপ্রেত নহে।

"অনিচ্ছুক চরকাসেবী এই কথাটী প্রস্তাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তজ্জন্য আমি দুঃখিত কিন্তু এমন অনেক পুরাতন কংগ্রেসসেবী আছেন যাঁহাদের চরকায় বিন্দুমাত্র আস্থা নাই—তাঁহাদের উপর জোর চলে না তাঁহারা এজন্য কংগ্রেস-সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত কিন্তু আমরা তাঁহাদের ছাড়িলে আমাদের ক্ষতি বই লাভ নাই সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে উক্ত বাক্যটী গ্রহণ করিতে হইবে। আমি প্রার্থনা করি তাঁহাদের অনিচ্ছা শীঘ্র ইচ্ছায় পরিণত হউক—চরকা, অন্যকে কার্য্য করাইতে না পারিলেও—এই সামান্য হাতের কাজে প্রাণে মহত্ত্বের প্রেরণা আনিয়া দিবে—সেই প্রেরণার অন্তর—চরকার গৌরব অনুভব করা।

রামরাজ্য ঃ—ভারতীয় রাজ্যগুলির আদর্শ সম্বন্ধে আমার ধারণা রামরাজ্যের মত। দয়ার অবতার রাম প্রজারঞ্জনের জন্য নিজ জীবনের মত প্রিয় সীতাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। রাম একটা কুকুরের উপর পর্য্যন্ত সুবিচার করিয়াছেন। সত্যের জন্য রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়া রাম জগতের রাজাদের সম্মুখে মহৎ-চরিত্রের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কঠোর একপত্নী-নিষ্ঠাদ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন যে রাজারাও সংযত জীবন যাপন করিতে পারেন। জনপ্রিয় শাসন দ্বারা তিনি সিংহাসনের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন রামরাজ্যই স্বরাজের গৌরব। রাম আধুনিক প্রথায় জনমত নির্দ্ধারণের জন্য ভোট গণনা করেন নাই, তিনি জনগণের চিত্তহরণ করিয়াছিলেন। জনমত তিনি আপনা হইতেই বুঝিতে পারিতেন। রামের প্রজারা সর্ব্ববিষয়ে সুখী ছিল। এমনি রামরাজ্য এখনও সম্ভব। রামের জাতি এখনও লোপ পায় নাই। আধুনিক সময়ের প্রথম খালিফেরাও রামরাজ্যেরই স্থাপনা করিয়াছিলেন। আবুবাকর ও হজরত উমার কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করিয়াও ফকীরের মতই জীবন কাটাইয়াছেন। সাধারণ ধনাগার হইতে তাঁহারা এক পাইও পান নাই। সাধারণ যাহাতে সুবিচার পায় সে সম্বন্ধে তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। শত্রুর সঙ্গেও কেহ যাহাতে ছল না করিয়া সত্য ব্যবহার করে ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল।

রাজা ও প্রজা ঃ—প্রজারা যেথায় ঘুমন্ত উদাসীন থাকে রাজারও সেথায় রক্ষক না থাকিয়া অত্যাচারী হইবার সম্ভাবনাই বেশী হয়। নিজেরা যাহারা পূর্ণ জাগ্রত নয় তাহাদের রাজার উপর দোষ দিবার অধিকারও নাই। রাজা ও প্রজা দুই-ই অনেক সময় অবস্থার দাস। উৎসাহী রাজা ও প্রজা অবস্থাকে নিজের উপকারী করিয়া গড়িয়া লয়। অবস্থাকে নিজ কার্য্যকরী দাস করিয়া লওয়াতেই আমাদের মনুষ্যত্ব। তাহা না পারিলেই ধ্বংস। ইহা বুঝিতে হইলে অধৈর্য্য হইলে বা ভাগ্যকে নিন্দা করিলে কিম্বা অপরকে দোষী করিলে চলিবে না। আত্মনির্ভর যাহারা বোঝে বিফলতার জন্য তাহারা নিজেকেই দোষী করে। এইজন্য আমি অত্যাচারের বিরোধী। নিজেকে যেথায় দোষী করিব সেথায় অপরকে দোষী করিলে বা তাহাদের ধ্বংসের ইচ্ছা করিলে দেশের দুর্দ্দশা ঘুচিবে না।

জনের কার্য্য ঃ—প্রত্যেকের কর্ম্ম, ত্যাগ, সত্য, অহিংসা, আত্মসংযম ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। গঠন-কার্য্যে নিযুক্ত হইলে এই সব গুণ বাড়িবে। জনসাধারণ নীরব কর্ম্মে ব্রতী হইলে অনেক সংস্কার আপনিই আসিবে।

চরকা ঃ—চরকার বিপক্ষে আমি অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু আমি জানি যাহা আজ নিন্দিত অতি শীঘ্রই তাহা সুদর্শন চক্রের মত পূজা পাইবে। আমার স্থির বিশ্বাস, নিজেরা ইচ্ছা করিয়া না লইলেও অবস্থাচক্রে আমাদের ইহা লইতে হইবে। ভারতীয় অর্থনীতিই চরকা। ইহাতেই ভারতের গ্রাম্য শিল্প জাগিবে।

দারিদ্র্য ঃ—একজন বাঙ্গালী বন্ধু লিখিতেছেন :—বাঙ্গালায় বোধ হয় অন্যান্য প্রদেশেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক দুর্দ্দশাই জনমতগঠনে ও দেশাত্মবোধে বাধা জন্মায়। যুবকেরা সভাসমিতিতে বক্তৃতা শুনিয়া বাহবা দেয়, পরে স্কুল কলেজ ছাড়িয়াই তাহার জীবনসংগ্রামের তীব্রতা অনুভব করে। ইহাতে তাহাদের তরুণ উৎসাহ ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়, জাতীয় কার্য্যে কোন আগ্রহ থাকে না।

লেখকের উল্লিখিত এই ব্যাধি অল্প বিস্তর সকল প্রদেশেই আছে। প্রতিকারও সুস্পষ্ট। প্রতি বৎসরই বর্দ্ধিত ছাত্রের জন্য কোন গবর্ণমেণ্টই চাকুরী দিতে পারেন না। শিক্ষাই জীবিকার উপায় এই সাধারণ ধারণা পরিবর্ত্তিত হইলে তবে এ সমস্যার সমাধান হইবে। শিক্ষাকে আমাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্যই গ্রহণ করিতে হইবে। বেকার যুবকদের শ্রমের মর্য্যাদা বুঝিতে হইবে এবং চরকা-শিল্প-প্রতিষ্ঠান রক্ষার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। আগ্রহ করিয়া ইহা শিখিলে ও পল্লীতে গিয়া অল্প আয়ে তুষ্ট হইতে পারিলে ইহাতে অসংখ্য যুবকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হইবে।

কাজের কথা
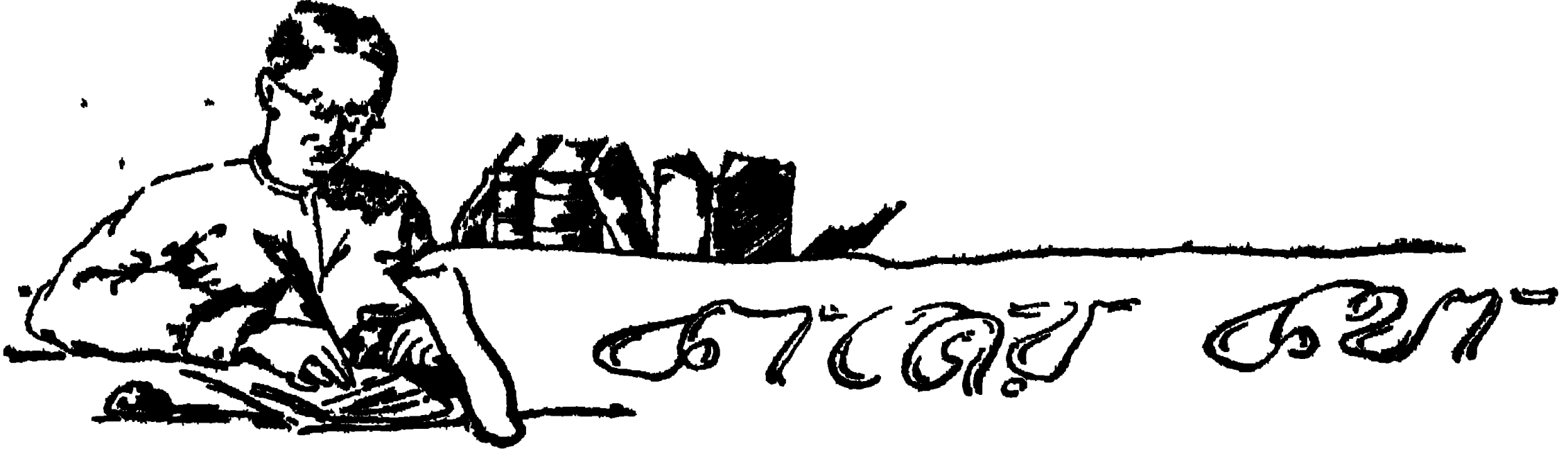
কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ঃ—মহাত্মার নেতৃত্বে ভারতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র কংগেসের কার্য্য এবারকার মত সুনির্ব্বাহিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের ভারতীয় নেতৃবর্গ কংগ্রেস সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছেন ও তদনুসারে দেশময় কর্ম্মপ্রবাহ জাগাইয়া তুলিবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাদেশিক নেতৃবর্গ ও কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির উপর গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছে। দেশের লোকদেরও বাঁচিবার উপায় মানুষের সম্মান রক্ষার উপর করিতে হইবে। বাঁচিবার উপায় ও আত্মসম্মান রক্ষার উপায় আমরা নিজেরা যত দূরে সরাইয়া দিতেছি আমাদের দুঃখ দারিদ্র্যও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। অভাবের জ্বালায় ভারতীয় জনসাধারণ এ সত্য ভীষণভাবে অনুভব করিতেছে। অভাবে সব নিষ্ক্রিয় প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণের জন্যই তাহারা মুক্তিমন্ত্রের ঋষি মহাত্মার পানে চাহিয়া আছে। মহাত্মার নির্দ্ধারিত জাতীয় মুক্তির পথ সুনির্দ্দিষ্ট—কিন্তু সেই নির্দ্দিষ্ট পথে চালাইবার যোগ্য পুরোহিত আজ ভারতের সর্ব্বত্র চাই। কংগ্রেস সেই দেশব্রতধারী পুরোহিত যোগাইবার ভার লইয়াছেন। সকল অনাচার, অনৈক্যভেদ ও বিবাদ দূর করিয়া পুরোহিতদের জাতীয় জীবনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কর্ম্ম সুকঠিন, দায়িত্বপূর্ণ। কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিলে ভারতের আকাশবাতাস, জাতীয় জীবন, পারিবারিক ও সমাজজীবন আবার আবার শান্তিসুখে ভরিয়া উঠিবে। সিদ্ধান্ত স্থির—এখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে—তার পর সিদ্ধি। নির্ভর, ভগবান ও জাতির আগ্রহ!

ইয়ং ইণ্ডিয়া ঃ—গত সংখ্যার ইয়ং ইণ্ডিয়ায় মহাত্মা ভারতীয় আদর্শ রামরাজ্যের কথা, রাজা প্রজার সম্বন্ধ, দেশের দারিদ্র্যনিবারণের উপায়, চরকা ও দেশের লোকের কর্ম্মসংস্থান সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। মহাত্মার প্রতি কথাটীই পরম সত্যমণ্ডিত। দেশকে বাঁচাইতে হইলে আমাদের মানুষের মত মানুষের অধিকার লইয়া বাঁচিতে হইলে সেইরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কর্ম্মী ভিন্ন অধিকারী কোন বিষয়ের কেহ হইতে পারে না। বর্ত্তমান সংখ্যা 'নবযুগের' ইয়ং ইণ্ডিয়ার আশা করি আমাদের কর্ম্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

কাউন্সিলের পাশ ও ভেটো ঃ—কাউন্সিলে কোন প্রস্তাব উঠিতেছে—ভোটে তাহা অগ্রাহ্য হইতেছে। আবার ভেটো করিয়া তাহা পাশ হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই গ্রাহ্য অগ্রাহ্য, ভুল্দয ও অসাধারণ ভেটোর যতটুকু উত্তেজনাও বা সংবাদপত্র পাঠক মহলের ছিল এখন তাও নাই। ইহার পর কি? তাহাই জানিবার জন্য অনেকের মনে এখনও ক্ষীণ আশা জাগে।

ছাত্রদের স্বাস্থ্য ঃ—সার জর্জ্জ নিউম্যান ইংলণ্ডের শিক্ষাবিভাগের প্রধান চিকিৎসক। সম্প্রতি বিলাতের ছাত্রদের স্বাস্থ্য কিরূপ সে সম্বন্ধে ইনি ষোড়শ বার্ষিকী রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন। এই রিপোর্টে যে কেবল ছাত্রদের স্বাস্থ্য কথাই আলোচিত হইয়াছে তাহা নহে। দেশের অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কথাও ইহাতে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ইংলণ্ডে ১,৭৫৪,০১৯ জন ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইয়াছিল—ইহার মধ্যে শতকরা ১৯·৪ জনেরই স্বাস্থ্য খারাপ এবং সেজন্য চিকিৎসা আবশ্যক। ছাত্রদের স্বাস্থ্য আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ইহাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ভাল থাকা চাই,—শারীরিক শক্তি ও মাংস-

পেশীর বৃদ্ধি চাই, হজমশক্তি ও খাদ্যরস গ্রহণের ক্ষমতা চাই।

ছাত্রদের স্বাস্থ্য আলোচনা প্রসঙ্গে স্যর জর্জ বলিয়াছেন সৈন্যবিভাগে লোক নিতে দেখা যায়—হাজার করা গড়ে ৬৬০ জনকে চোখ, কাণ, শরীর ও দাঁতের দোষের জন্য বর্জ্জন করিতে হয়। ইংরেজী শিক্ষা-আইনে স্বাস্থ্যহীন ছেলেদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে বটে—কিন্তু তাহা চালাইবার ভার স্থানীয় ব্যবস্থাপকদের উপর—১৫০,০০০ বিকৃতাঙ্গ ছাত্রের মধ্যে বর্ত্তমানে মাত্র ৪০,০০০ বিশেষ বিদ্যালয়ে থাকিবার সুযোগ পাইয়াছে।

আগে দেশ-গাঁয়ে যেসব ছেলেরা থাকিত তাহাদের স্বাস্থ্য সহরের ছেলেদের চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু এখন আর তেমন দেখা যায় না, এখন পল্লীবিদ্যালয়ের ছাত্রদের সে স্বাস্থ্য উৎসাহ ও যৌবনদীপ্ততা নাই—ইহার কারণ আলোচনার রিপোর্টে দেখা যায় যে যোগ্য অবস্থাপন্ন যাহারা তাহারাই পল্লী ছাড়িয়া সহরে যায়, তাই পল্লীবিদ্যালয়ের এই অবস্থা।—পল্লীর মুক্ত বাতাস, সূর্য্যালোক কিছুই দারিদ্র্যের অভাব পূর্ণ করিতে পারে না।

এই রিপোর্ট লইয়া বিলাতে অনেক আলোচনা আন্দোলন চলিবে, ছাত্রেরাই দেশের আশাভরসা তাহাদের ভগ্ন স্বাস্থ্যে জাতীয় দুর্ব্বলতারই পরিচয়। বিলাতী হিসাবে যাহা দেখা যায়—আমাদের দেশের অবস্থা তার চেয়ে শতগুণে ভয়াবহ। ম্যালেরিয়া ও খাদ্যনীতির অভাবই এ অবস্থা আরও ভয়াবহ করিয়াছে।—ছাত্রদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও তাহার প্রতিকারের জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাদের বর্ত্তমান বর্ষের রিপোর্ট দেখা যায় দশটি কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য মাত্র ইঁহারা পরীক্ষা করিয়াছেন। কলিকাতার ছাত্রদের তিনজনের মধ্যে দু'জনের স্বাস্থ্যই খারাপ। ১৫।১৬ বৎসর হইতেই এরা চোখে কম দেখে ও কাণে কম শোনে। শতকরা ৫০ জন ছাত্রও সোজা সরলভাবে মানুষের মত চলিতে পারে না। ইহাদের গাত্রচর্ম্ম, বক্ষ-বিস্তৃতি, দাঁতের অবস্থাও শোচনীয়। বিদ্যাশালা হইতে কেবলি যদি এমনি ভগ্ন স্বাস্থ্য ভবিষ্যৎ-আশা বাহির হইতে থাকে, তবে দেশের ভবিষ্যৎ যে অতি উজ্জ্বল তাহাতে আর সন্দেহ কি। সবে অনুসন্ধান হইয়াছে—এখন প্রতিকার হইবে কবে। আদৌ সম্ভব, না সুদূর পরাহত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমতী বেসান্ত।—শ্রীমতী বেসান্ত কমলা বক্তৃতায় ভারতীয় শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুন্দর জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ অনেক কথা বলিতেছেন। শ্রীমতী বেসান্তকে কমলা-বক্তারূপে পাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবান্বিত।

জালবুনা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

ওগো, যখন তুমি লোকলোচনের অন্তরালে,
আয় না ব'লে, আমার পানে হাত বাড়ালে,
গেলাম নাক সেদিন তোমার হাতছানিতে,
আমি, ব্যস্ত তখন, নূতন রঙ্গীণ জাল বুনিতে।

জড়িয়ে গেছি এখন আমি আপন জালে,
'তুমি,' আপন হাতে বাঁধন যদি না দাও খুলে,
আজ, ব্যর্থ-প্রয়াস হলেও তবু, মুক্ত হতে—
হয়ত হবে কাল্‌কে আমায় জাল ছিঁড়িতে।

জালবুনা মোর স্বভাব হলেও মুক্তি চাই;
চেষ্টা করি সময় সময়, পাই না পাই,
শিখিয়ে দিলে তুমি নিজেই এ জালবুনা,
জালের মাঝে থাক্‌তে আবার ক'রছ মানা।

ওগো, বুঝ্‌বো তোমার স্বরূপ আমি কেমন করে,
বুঝিয়ে তুমি, নিজেই যদি না দাও মোরে,
আমি ভুল্‌বনাক শুধুই তোমার হাতছানিতে,
মোরে, ঢুকতে যদি না দাও তোমার রাজধানীতে।

গল্প

প্রভু-ভৃত্য সম্বাদ

(নক্সা)

শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার। কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা প্রতাপশালী ছিল তাঁহার খানসামা রামচরণ-মালাকর। প্রমোদবাবুকে ভয় করিত না এমন লোক তাঁহার জমিদারীর মধ্যে পাওয়া যাইত না এমন নহে,—কিন্তু রামচরণকে ভয় করিত না এমন লোক সত্যই বিরল ছিল। কারণ শত অত্যধিক স্নেহ ও প্রচুর প্রশ্রয় সে প্রমোদবাবুর নিকট পাইত যে হয়কে নয় ও নয়কে হয় বলিয়া তাঁহার নিকট যাহা সে পেশ করিত তাহা নড়চড় করান অতি বড় যুধিষ্ঠিরেরও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এমন কি প্রমোদবাবুর স্ত্রী পুত্রেরাও ইহার জন্য রামচরণকে ভয় করিয়া চলিত।

রামচরণের প্রভুত্ব ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেয়াদবি এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে তাহা আর সহ্য করা প্রমোদবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র রাধিকারঞ্জনের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল। রাধিকারঞ্জন ভাবী জমীদার, তাহার উপর বি, এ, পরীক্ষা দিয়া সবে দেশে ফিরিয়াছে যাহা তাহাদের বংশে ইতিপূর্ব্বে আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং তাঁহার মেজাজটা কিছু গরম থাকাই স্বাভাবিক। তাহার উপর সকল কাজেই রামচরণের কর্ত্তৃত্ব তাহার একেবারেই সহ্য হইত না। রামচরণও সেজন্য প্রভুপুত্রের উপর সদয় ছিল না। সেদিন কথায় কথায় রাধিকারঞ্জন রামচরণকে গালি দিয়া উঠিতেই রামচরণ উত্তর দিল—"গাল দিও না বলে দিচ্ছি বড়-দাদাবাবু—আমারও মুখ আছে।'

ক্রোধে রাধিকারঞ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিল—'ফের যদি একটা কথা কইবি হারামজাদা ত লাঠি দিয়ে তোর মাথা গুঁড়ো করে দেব।"

রামচরণও উদ্ধতভাবে উত্তর করিল "লাঠি মারলেই হ'ল নাকি। আমারও লাঠি আছে।"

সামান্য ভৃত্য হইয়া জমিদারের জ্যেষ্ঠপুত্রকে বলে তাহারও লাঠি আছে, ইঃ! অসহ্য বোধ হইলেও রাধিকারঞ্জন পিতার ভয়ে সত্যই লাঠি চালাইতে সাহস করিলেন না। মুখে গর্জ্জন করিয়া বলিল—"দূর হ'য়ে যা আমার সুমুখ থেকে—নইলে আমি লাথি মারতে মারতে দূর করে দেব।"

রামচরণ চুপ করিবার লোক নহে। সেও উত্তর করিল "লাথি মারলেই হ'ল কি না। আমারও পা আছে।

কি আস্পর্দ্ধা! এক জন ভৃত্য ভাবী-জমিদারকে পা দেখাইতে সাহস করে! রাধিকারঞ্জন আর সহ্য করিতে না পারিয়া রামচরণকে তাড়া করিল,—রামচরণও অপেক্ষা না করিয়া পলায়ন করিল।

ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া প্রমোদবাবুর নিকট গিয়া রাধিকারঞ্জন রামচরণের বিরুদ্ধে নালিস করিয়া জানাইল যে এরূপভাবে রামচরণের নিকট অবমানিত হইয়া সে তাঁহার জমিদারীর প্রত্যাশা করিতে চাহে না। রামচরণের নিকট অবমানিত হইয়া জমিদার হওয়া অপেক্ষা মুটে-মজুর হওয়াও শ্রেয়স্কর।

এরূপ নালিশ আজ নূতন নহে। কিন্তু রামচরণের

বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া কেহই কখনও জয়লাভ করিতে পারে নাই—এমন কি রাধিকারঞ্জনও নহে।

প্রমোদবাবু গম্ভীরভাবে পূর্ব্বগত রামচরণকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে রাধিকারঞ্জনের কথার উপর 'তাহারও মুখ আছে' এ কথা সে বলিয়াছে কি না।

রামচরণ করজোড়ে উত্তর দিল—"হুজুর মা-বাপ, রামচরণ কখনও মিথ্যা বলে না। বড় দাদাবাবু আমায় বড্ডই গাল পাড়ছিলেন, তাই আমি বলেছিলাম—'আর গাল দেবেন না—আমারও মুখ আছে।' অর্থাৎ কি না আরও যদি গাল দেন তাহ'লে আমি কেঁদে ফেলব।

প্রমোদবাবু মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। বাহিরের ক্রোধ বজায় রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই বলেছিলি তোরও হাত আছে?"

কর্ত্তাবাবুকে প্রণাম করিয়া রামচরণ বলিল—"হ্যাঁ হুজুর বলেছিলাম। বড় দাদাবাবু আমায় লাঠি মেরে মাথা গুঁড়ো করে দেবেন বলেছিলেন—তাই আমি বলেছিলাম 'আমারও হাত আছে।' অর্থাৎ কি না লাঠি মারলে আমি হাত দিয়ে লাঠিও আটকাতে পারব।'

রাধিকারঞ্জন ক্রোধে লাল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রমোদবাবু একটু [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর বলেছিলি তোরও পা আছে?"

রামচরণ বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ [illegible] বলেছিলাম। মিথ্যা কথা আমি কিছুতেই [illegible] না। বড় দাদাবাবু আমায় লাথি মেরে দূর করে' দেবেন বলেছিলেন, তাই আমি বলেছিলাম 'আমারও পা আছে।' অর্থাৎ কি না লাথি মারতে আসবার আগেই আমি 'পলায়ন' দেব। আর সেই মত আমি ছুটও দিয়েছি হয় নয় দাদাবাবুকে জিগ্যেস করুন।

প্রমোদবাবু হাসিয়া রাধিকারঞ্জনের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"বাপু, রামচরণ আমাদের পুরাণ চাকর—ওর মত প্রভুভক্ত নেমকের লোক আজকাল পাওয়াই যায় না। ও কি কখন তোমায় অপমান করতে পারে! শুনলে ত ও কি ব'ললে।"

রাধিকারঞ্জনের শুনিবার আর বড় প্রবৃত্তি ছিল না। যেরূপ অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া সে আসিয়াছিল, এক্ষণে ভিতরে ভিতরে সেই অগ্নির জ্বালা লইয়া সে সেস্থান ত্যাগ করিল। দাদাবাবু চলিয়া যাইবার পর রামচরণ কর্ত্তাবাবুর পদধূলি লইল ও মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল, কর্ত্তাবাবুও মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলেন সেটা বোধ হয় সহজে শান্তি-স্থাপনের আনন্দচিহ্ন।

বৈঠকখানার ব্যাঙ্কিন্

"স্বর্ণ সূর্য্যাহের সাপ্তাহিক (এক পয়সার) শিশিরে ৬ই পৌষ বৈঠকখানা বোড হইতে মির্জ্জা আলাউদ্দিন যে নামক এক মুসলমান ভদ্রলোক নবযুগের ১৯শ সংখ্যায়, ৬ই ডিসেম্বরে প্রকাশিত "উপাসনা" নামক চিত্র সম্বন্ধে "তুই একটী কথা" বলিবার অছিলায় ছবিখানির দু-একটী 'ছল-ছুতা' ধরিয়া কয়েকটী বিদ্বিষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কিছু কেবামতী দেখাইয়াছেন। যদি তিনি প্রকৃতই সহৃদয়তাব সহিত শিল্পীর ভ্রম প্রদর্শন কবিতেন তাহা হইলে আমবা তাঁহাকে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ দিতাম, কিন্তু চিঠিখানি পড়িলেই বুঝা যায় যে তাহা ভ্রমপ্রদর্শনেব সাধু উদ্দেশ্যে লিখিত না হইয়া 'নবযুগেব' বিরুদ্ধে যেন গাত্রদাহেব জ্বালা মিটাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রকৃত ভ্রমপ্রদর্শক হইলে তিনি আমাদেব নিকট এই পত্র প্রেরণ করিতে পারিতেন এবং আমবা যোগ্য বিবেচনা করিলে সানন্দে তাহা পত্রস্থ করিতাম। তিনি তাহা না করিয়া অন্যত্র ইহা প্রেবণ কবিয়া সাধুজন বিগর্হিত পন্থা অবলম্বন করিলেন কেন? আমবা তাঁহাব পত্র প্রকাশ না কবিলে অবশ্য উহা অন্যত্র প্রেবণ কবিলে তাহা অশোভন হইত না।

অনেক অবাস্তব কথাব পব তিনি লিখিয়াছেন যে ছবির লোকটী পূর্ব্বদিকে ফিবিয়া নামাজ পড়িতেছেন এইখানেই তাঁহার আর্টের বিদ্যা জাহির হইয়া পড়িয়াছে। মিঞাসাহেবেব বিদ্যা ভূগোলেব মানচিত্রেব সূত্র "ডানদিক পূর্ব্ব—বামদিক পশ্চিম" মুখস্থ কবা পর্য্যন্ত, সেই হিসাবে তিনি চিত্রের মূর্ত্তিটীকে পূর্ব্বমুখ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন কিন্তু সকল চিত্র যে মানচিত্র নয় তাহা তাঁহাকে কে বুঝাইবে? চিত্রেব সময় সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকালে সূর্য্য পশ্চিমদিকেই অস্ত যান অন্ততঃ এতদিন ত যাইতেন, পশ্চিমদিকে মুখ আছে বলিযাই মূর্ত্তিব মুখে অস্তগামী সূর্য্যেব আলোক প্রতিফলিত হইয়াছে ও পশ্চাতে ছায়া পড়িয়াছে চিত্রবিদ্যাব এই Shade and light এর প্রাথমিক সূত্র না জানিয়া চিত্রবিদ্যার উপর বিদ্যা জাহির করিতে যাওয়া কেবল নির্লজ্জতার পরিচয় নয়, অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা। আবার এই বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া তিনি 'তুঃখের বিষয়' 'তুঃসাহসিকতার পরিচয়' 'মাথায় একটী টিকি জুড়িয়া দিলেই চূড়ান্ত হইত' প্রভৃতি কতকগুলি জ্যেঠতাতত্বের পবিচয় দিয়াছেন, যাহা সত্যই "তুঃখের বিষয়" এবং 'তুঃসাহসিকতা'। তাব পর তিনি লিখেছেন এই ক্রটীগুলি জ্ঞানকৃত না হইয়া নিতান্তই অজ্ঞতা? এ সন্দেহ প্রকাশের কাবণ কি? চিত্রশিল্পে Techincalitiesএব ভ্রম সর্ব্বদাই মার্জ্জনীয়। বৈঠকখানাব দাফ্তাবী পাড়ায় অনেক সচিত্র কাগজ ও বই বাঁধাই হয ঐ দাফ্তারীখানা হইতে বে-সাহেব যদি শিল্পবিদ্যাবিশারদ হইয়া থাকেন তবে শিল্প-কলার অন্তিমকাল আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। নবযুগের চিত্রসমালোচনাই বোধ হয় বে-সাহেবের প্রাণে ভীষণ কষ্ট দিযাছে তাই তিনি নবযুগকেও এক বেশ কামড় দিয়াছেন। বোলতাব পেছন দিকেই হুল থাকে, তাই উপসংহারেই ইনি সমস্ত বিষ পুঞ্জীভূত করিয়াছেন।

আজকাল যে আঁচড়াইতে জানে সেই শিল্পী, সেইজন্য শেয়াল কুকুব থেকে সিংহ পর্য্যন্ত সবাই আর্টিষ্ট পর্য্যায়ে পড়ে—এই যদাকিতং তৎছাপিতং এর যুগে চিত্রসমালোচনাব একান্ত অভাব, অযোগ্য অক্ষম শিল্পীব দল বেঙেব ছাতাব ন্যায় দিন দিন গজাইতেছে দেখিয়া আমবা চিত্র সমালোচনা আরম্ভ কবিয়াছি। আমাদেব উদ্দেশ্য সৎ-শিল্পের প্রচার ও প্রকৃত শিল্পীকে মর্য্যাদা দান, তবে তজ্জন্য আমবা অনেক অকর্ম্মণ্য পটুয়াব চক্ষুঃশূল হইয়াছি সেটা অবশ্য আমাদেব দুর্ভাগ্য।

নবযুগ ভীষণ সমজদাব হইয়াও কেন এ চিত্রকে স্থান দিয়াছেন—তাহাব উত্তর চিত্রখানির ভাব-সম্পদ—সৌন্দর্য্য, এক কথায় আর্ট, যাহা বৈঠকখানায় নবাবির্ভূত বাঙ্কিনেব দংশনে কোন যুগে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

উপসংহারে আমাদেবও এই নিবেদন যে দন্তের দৃঢ়তা না বুঝিয়া দংশন করিতে অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমানের উচিত নহে।

Printed & Published by Jnanedra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
14 Jaggannath Dutta Lane Garpar, Calcutta.
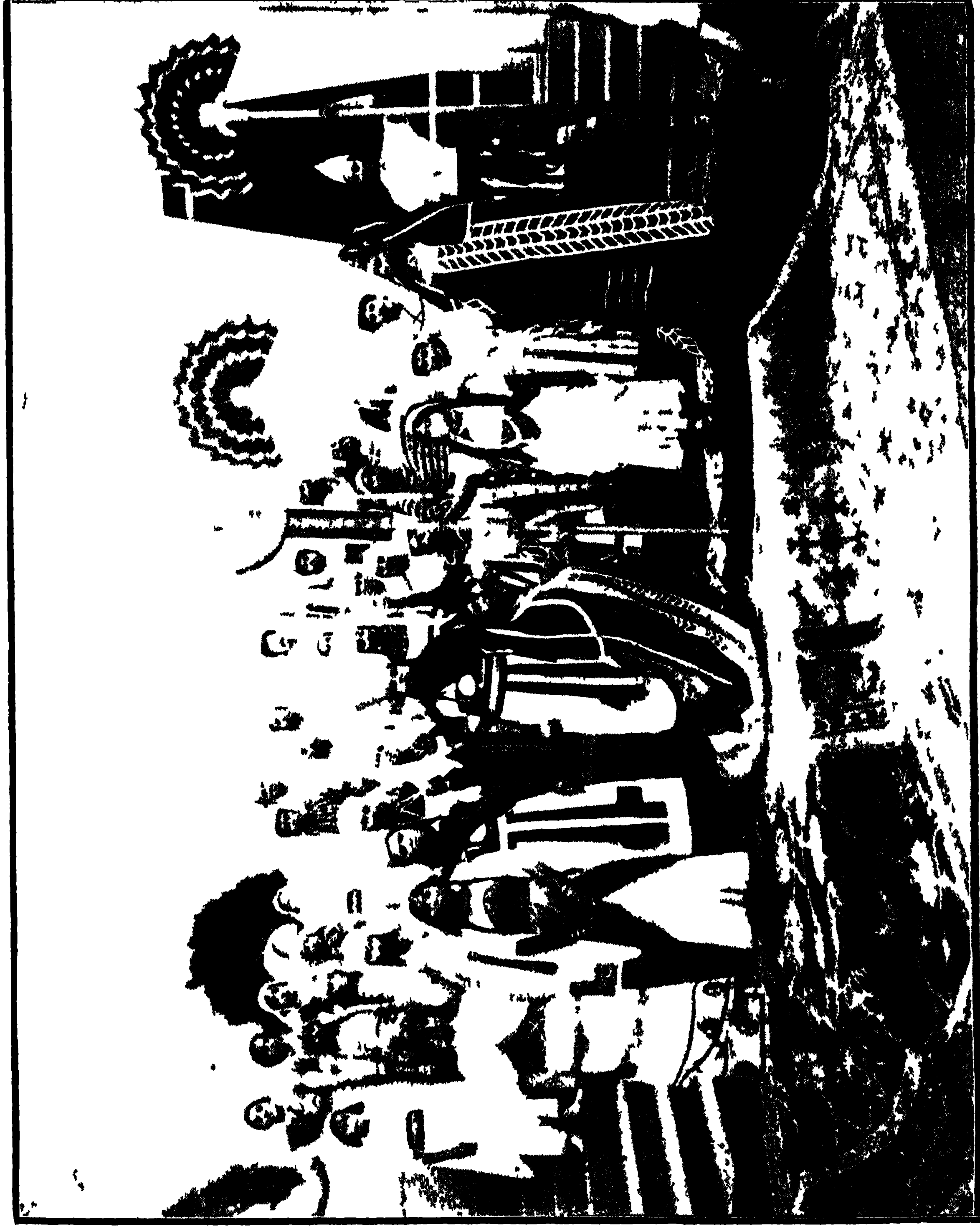
মিশরের রাজসভা

প্রথমবর্ষ]   ১১ই মাঘ শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ২৪শে জানুয়ারী   [২৪শ সংখ্যা

নারী-সমস্যা

শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

পড়িলাম যবে মোহমুদ্গরে "কা তব কান্তা পুত্র,"
সে অবধি আর বুঝিলাম না কি এ মহা জটিল সূত্র,—
রাগিয়া হৃদয়ে বাধিল দ্বন্দ্ব,
ঠেকিল জগতে সকলি মন্দ,
বিশেষতঃ যার শঙ্কর নাম হইল তাদের সন্দ,
তাহারই মত বুঝিবা এরাও মূর্খ পাগল অন্ধ।

বাতুল প্রলাপ করিতে প্রমাণ পড়িতে লাগিনু শাস্ত্র,
দেখি এক মুনি লিখেছেন—আহা কিবা সে অথণ্ডাস্ত্র!
"পুত্র—পিতার নরক-ত্রাতা
পত্নী—ভগিনি, সহচরী, মাতা"
লাগিল না ভাল শেষের কথাটা করিল না প্রাণস্পর্শ,
তবুও কতক উথলি' হৃদয় বহিল বিমল হর্ষ।

য়ুরোপে যেরূপ রাখে রমণীরে আবরি' প্রণয়-বর্ম্মে,—
ভাবিলাম কভু রমণী অসার বলেনা তাদের ধর্ম্মে,
ভাবিলাম তার ভাঙ্গিব দর্প,
বাহিরিল হায় সবিষ সর্প,
দেখিলাম যাহা চটিল তাহাতে বাইবেলে মম ভক্তি,
দেখি তায় লেখা—"রমণীর তরে ক'রনাক ক্ষয় শক্তি।"

বিপুল উদ্যমে লাগিনু তখন নিরূপিতে নারীতত্ত্ব,
যাহা পাই তাই লাগিনু পড়িতে বুঝিতে কোন্‌টা সত্য,—
নানা শাস্ত্র হ'তে যত জ্ঞান হয়,
ততই মনেতে বাড়ে সংশয়,
সকলেই দেখি চলে নিজ মতে সকলেরই মত ভিন্ন,
দেখিয়া শুনিয়া সন্দে দ্বন্দ্বে হ'য়েছে বিবেক ছিন্ন।

কেহ বলে নারী সৃষ্টি স্বরগে ললিত মধুর ছন্দে,
কেহ বলে নারী নরকের ধূম পূরিত নরক গন্ধে,
এ সব যদিও হৃদয় হইতে
সংশয় মোর নারে ঘুচাইতে,
লাগে তবে ভাল যাদের যুক্তি সকলই নারীর পক্ষে
আর, নারী বিপক্ষে বলে যারা কিছু বিষময় ঠেকে চক্ষে।

বিশ্ব ব্যাপিয়া পূজিছে নারীরে সবাই তাহারা তুচ্ছ,
আর, মুষ্টিমাত্র সন্ন্যাসী শুধু তারাই জগতে উচ্চ?
ভাবিয়া ভাবিয়া হ'য়েছি শ্রান্ত
বুঝিতে পারিনা কাহারা ভ্রান্ত
বিচারের ভার তোমাদের 'পরে করিলাম তাই ন্যস্ত,
কে ভুল কে ঠিক করিতে প্রমাণ হ'য়ে পড় সবে ব্যস্ত।

"সে আমার সৌভাগ্য, কিন্তু হিম্?—আমি তো তোমাদের কেউ নই,—"

"তুমি আমাদের আত্মীয় নও, তা জানি,—কিন্তু তুমি যে কেউ নও—" হিমানীর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া একটু পরে বলিল,—"চল্লুম বিভাসদা, আজকের মত।"

"না—আর একটু থেকে যাও।" বিভাস তার দুই চক্ষুর বুভুক্ষিত দৃষ্টি লইয়া হিমানীর পানে চাহিয়া রহিল। আবার তাদের দৃষ্টিরেখা মিলিত হইল,—পরস্পর পরস্পরকে নীরব মৌনভাষায় যৌবনের অভিনন্দন জানাইয়া দিল। বিভাস অধীরভাবে হিমানীর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ থামিয়া বলিল,—"আচ্ছা যাও, আর অপেক্ষা করতে তো বল্‌তে পারিনে।"

"কেন?—"

"সে সৌভাগ্য কি আমার হবে! ওকি—সত্যিই চল্লে যে? আচ্ছা, না যাও, আর বাধা দোব না।"

তখন সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু আকাশের গায়ে মিলাইয়া গিয়াছে,—পশ্চিমের রক্তাম্বরনিকা অপসৃত হইয়া শুভ্র জ্যোৎস্না গাছের পাতায় পাতায় চিক্‌চিক্ করিয়া হাসিতেছিল।

* * * * *

মধুর স্নিগ্ধকণ্ঠে বিভাস ডাকিল,—"হিমানী—হিম্!—"

হিমানী মৃদুকণ্ঠে বলিল,—"কি।"

"কেন এমন করে ছুটে এস হিম্!—"

"তা জানিনা,—তবে ভাল লাগে তাই ছুটে আসি।"

"ভেবে দেখেছ কি?"

"কি?—"

"এর পরিণাম—"

হিমানী কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"পরিণাম!—পরিণাম তো তুমি—তুমিই।"

"একি! চোখ মুখ তোমার এমন হয়ে গেল যে?—"

"না—ও কিছু নয়!—" বলিয়া হিমানী মুখ ফিরাইল।

খোলা জানালা দিয়া রৌদ্র আসিয়া তাহাদের মুখে লাগিয়া মেঝেতে গড়াগড়ি দিতেছিল, কদম্বশাখা হইতে মাঝে মাঝে 'বউ কথা কও' ডাকিতেছিল, দূর মন্দিরের কাঁসরের আওয়াজ ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল। বিভাস রৌদ্ররঞ্জিত আকাশের দিকে চাহিয়া বিভোরস্বরে বলিল,—আমাদের ছেলেখেলা জীবনে সত্য হবে কি হিম্?"

"মুখ নীচু করিয়া পদাঙ্গুলি দ্বারা মেঝে ঘসিতে ঘসিতে হিমানী বলিল এ ছেলেখেলা তোমায় কে বল্লে?"

"তাইত হিম্! শিশুসুলভচাঞ্চল্যে যখন আমরা ছুটোছুটি বকাবকি করে বেড়িয়েছি, তখন আমি বুঝ্‌তে পারিনি,—তুমি কতখানি আমার বুক জুড়ে বসেছিলে,—কিন্তু আজ আর কোন সন্দেহ নেই।"

"বাঁচলুম,—।

"আমিও,—এ যদি আমার জীবনের বিনিময়ে পেতে হয়,—তাও স্বীকার।"

তিন

সমস্ত সন্ধ্যা দিয়া সকলেই বিপুল পুলকে বিভাসের মন ভরিয়া উঠিল। বিশ্বের সৌন্দর্যভাণ্ডারের দুয়ার তার সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া গেল,—আকাশের নীলিমা, ঘাসের স্নিগ্ধতা, বনানীর শ্যামশোভা তাকে যেন কোন এক স্মৃতিরেখা স্বপ্নপ্রেমলোকের বার্ত্তা জানাইয়া দিল। নিখিলপ্রকৃতি যেন তার কাণে গানের সুরে বাজিয়া উঠিল, মন তার অধীর আনন্দে গুঞ্জরিয়া উঠিল,—"ওগো! আমি যে তোমায় চাই, চাই! এই আমার শেষ চাওয়া—এ জীবনের মত।"

অন্তরের একান্ত আরাধনা ও সাধনা আজ শাশ্বতরূপে পরিপূর্ণতার ভিতর দিয়া বিভাসের কাছে আসিয়াছে,—কি মধুর আনন্দময়! তার মনের সব সঙ্কোচ,—সব দৈন্য মুছিয়া প্রেমের একটা অনবদ্য শ্রীসৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে।

মানুষ যাহা নিজের বলিয়া সযত্নে বুকের ভিতর আঁকড়াইয়া লইতে চায়,—পারিপার্শ্বিক ঘটনা এমন অনুকূল হইয়া দেখা দেয়, যে মনে হয় সার্থকতার পুষ্প মাল্য তাহারই কণ্ঠে শোভা পাইবে, কিন্তু বিধাতার কোন্ কুটিলকটাক্ষে তাহা যে কখন্ সরিয়া যায়, তাহা সে জানিতেও পায় না,—একদিন চমকিয়া চাহিয়া দেখে—অন্তরের নিভৃত আশা, ভোরের কুয়াশার মত কোথায়

অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। বিভাসের ভাগ্যেও ঘটিয়া গেল ঠিক তাহাই। তাহার জননী সহসা পরপারে চলিয়া গেলেন। তারপর একবৎসর কালাশৌচ ভোগের পরও দীর্ঘকাল অকাল।

অন্তত্র হিমানীর বিবাহের চেষ্টা চলিতে লাগিল, কারণ তাহার মত বয়স্থা মেয়েকে আর অনূঢ়া রাখা চলে না। সেবার মাঘের প্রথমেই শীতের প্রকোপ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল খিড়কীর আমগাছগুলি মুকুলে ভরিয়া গিয়াছিল। একদিন সানাইয়ের করুণ সুর হিমানীর বিবাহের অধিবাস ঘোষণা করিয়া দিল। উৎসবভবন পত্রপুষ্পে সুশোভিত- আলোক সৌরভে ভরপুর। কোন স্বপ্নমাখা বসন্তপ্রভাত যেন তার সুরভরা বক্ষ লইয়া আনন্দের শিহরণ জাগাইয়া তুলিল। সন্ধ্যার জ্যোৎস্নায় পথঘাট ধৌত হইতেছিল, সদ্য ফোটা ফুলের গন্ধে দিক মাতোয়ারা। মধুর প্রকৃতি যেন উৎসবাবেশে সজ্জিত, তার আনন্দ বার্তা অক্লান্ত [illegible] চতুর্দিকে ছড়াইতেছিল।

বাঁশীর সুর বিভাসের কানে ভাসিল। ভাসিয়া আসিতে লাগিল, সে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ছাদের এক কোণে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল, মন তাহার কোন এক সুদূর — বিরহবেদনার অতীত দেশে উধাও হইয়া গিয়াছে। এক দিকে মিলন, আর একদিকে বিরহ,- একদিকে ভাঙ্গিয়া যায়,-অপরদিকে গড়িয়া উঠে,- এইতো বিশ্বের শাশ্বত নিয়ম! তার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, মনে হইল জ্যোৎস্নার হাসি আজ ম্লান হইয়া গিয়াছে, গাছের পাতাগুলি মর্মরশব্দে প্রলাপ বকিতেছে, অস্থির পবন হা হা করিয়া ছুটিয়াছে।

রিক্ত,—শূন্যহৃদয়ে নিঃশব্দে পায়চারী করিতে করিতে ব্যথাদীর্ণ গাঢ়স্বরে বিভাস বলিয়া উঠিল,—"তোমাকে যে আমি সমস্ত মন-প্রাণ-হৃদয় দিয়ে,—সর্বস্ব দিয়ে চেয়েছি। প্রতিদানে তার যেটুকু পেয়েছি,—সেইটুকু আমার সারাজীবনের সান্ত্বনা—!

বিবাহ বাড়ীর কোলাহল, ছুটাছুটি নিশীথিনীর নীরবতায় মিশিয়া গিয়াছে। মিলনোৎসব-মুখর বিবাহ বাসর হইতে কোন কিন্নরীর কিন্নরকণ্ঠের মোহনীয় সঙ্গীতঝঙ্কার আকাশে বাতাসে আবেশের মদিরা ঢালিয়া দিতেছিল —'আমি বড় আশা করে—

তোমারি দুয়ারে,—

ভিখারীবেশে এসেছি।"

[illegible] বিভাস শয্যায় এলাইয়া পড়িল, তার [illegible] মর্মে মর্মে রক্তধারা উৎসারিত হইয়া উঠিল। এই চাওয়াই শেষ চাওয়া,-আমরণের বিষাদভরা পুলকস্মৃতি। তাহার কাণের কাছে কেবলই ধ্বনিতেছিল,—"তোমারি দুয়ারে—

ভিখারীবেশে এসেছি!'

আধেক চেনা

বন্দে আলী মিয়া

কোন্ তরুণীর হাতের ছোঁয়া
জাগিয়ে দিলে আজ্‌কে রাতে।—
পড়্‌লো বুকে কার্ সে ছবি,
রক্ত লেখা আল্‌পণাতে!

গোপন চলার চরণ ধ্বনি,
কণক গড়া জীবন-মণি,
দূরের পথে কুড়িয়ে নিয়ে,
রাখ্‌লো আমার বক্ষপাতে

আজ্‌কে যেন কোন্ নয়নে,
একটু তারে চিন্‌তে পারি—
এই জীবনে তাহার সনে,
কিসের যেন চল্‌ছে আড়ি।

আস্‌বে না সে বাঁধন ভয়ে,
অন্ধকারের দ্রুপ বয়ে
উপেক্ষারি মৌন ভাষা,
রচ্‌বে মায়া আমার সাথে!

নাচওয়ালী রহস্য

ভূস্বর্গ কাশ্মীর রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী রাজা …সিং কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতের একটি বিবাহিতা নারীকে …য়া মহাকেলেঙ্কারী করিয়াছিলেন। সে কেলেঙ্কারীর …হিনী উপন্যাসের মতই চিত্তচমকপ্রদ। কি করিয়া …মন সম্মানী লোক অবৈধ নারীঘটিত ব্যাপারে মর্য্যাদা …ন বিসর্জ্জন দিয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা জলে ফেলিয়া দুনাম …লে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। রাজা হরি …ং ভারতীয় হইলেও সে ঘটনার কেন্দ্রস্থল ছিল বি…স …নের অবাধমুক্তরাজ্য ইওরোপ। সম্প্রতি ভারতীয় …র একটি রাজ্যেও চমকপ্রদ পরম বিস্ময়কর নারীঘটিত …পার ঘটিয়াছে। এই নাট্যের নায়িকার নাম মমতাজ …ম। পরমা সুন্দরী ইনি, বয়স মাত্র একুশ বৎসর। …তাজ অবিবাহিতা বাইজী এবং ইন্দোরের মহামান্য …হারাজার রক্ষিতা ছিলেন এই প্রকাশ। মমতাজের মা …জির জান সুন্দরী কন্যা প্রাপ্ত বয়স্কা হইলে তাকে লইয়া …ন্দোরে আসেন, ইন্দোর রাজ্য হইতে মমতাজের মাসিক …ত্রার হাজার মুদ্রা পাইবার ব্যবস্থা হয়। নাম হয় তার …লা বাই। কি কারণে এখনো জানা যায় নাই— …ণ প্রেমের ব্যাপার বড়ই জটিল, মমতাজ ইন্দোরের …-সম্পদ ছাড়িয়া বোম্বাইয়ে চলিয়া আসেন। বোম্বাইয়ে …ঃ বলা নামে একজন সুন্দর ধনী যুবকের সঙ্গে তার ভাব …। মমতাজ বোম্বাইয়ে আসিলেও ইন্দোর কিন্তু তাহার …া ছাড়িতে পারে নাই। তখন হইতেই তাহাকে আবার …দোরে ফিরাইয়া লইবার নানা চেষ্টা চলিতে থাকে।

মিঃ বলাও নামজাদা অর্থবান্ লোক। তিনি বুঝিতে …রিলেন যে মমতাজকে ছিনাইয়া লইবার জন্য খুব …তাপশালী লোকের চেষ্টা চলিতেছে এবং পেছনে ইহার …লোকবল ও অর্থবল দুই-ই প্রচুর আছে। মিঃ বলার কাছে …তাজকে ছাড়িয়া [illegible] প্রস্তাব আসিল এজন্য তাঁহাকে …ষ্ট অর্থের [illegible] দেখান হইল কিন্তু নারীর প্রেম অর্থকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে—মিঃ বলা প্রচুর অর্থের বিনিময়েও মমতাজকে ছাড়িতে স্বীকার করিলেন না। মিঃ বলা যখন কোন মতেই সুন্দরীকে ছাড়িতে রাজী হইলেন না তখন তাহাকে নানা ভাবে ভয় দেখানো আরম্ভ হইল। মিঃ বলা বোম্বাইয়ের নামজাদা অর্থশালী লোক হইলেও সর্ব্বদা জীবনের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি বোম্বাইয়ের পুলিশ বিভাগ ও ক্ষমতাশালী অ…নরকেও ঘটনা জানাইয়া তাহার প্রাণনাশের আশঙ্কাও জানাইলেন।

সর…রে জ…নই। …থাবিধি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াও তিনি নিরাপদ বোধ করিতে পারেন নাই। …ন্ত …বস্থ য মৃত্যুমুখে …জ সম্পত্তির উইল করেন। এই উইলে মমতাজকে …িনি …ক্ষ মুদ্রা দাবি দিয়া গিয়াছেন কেহ কেহ অর্থের পরিমাণ দশ লক্ষও বলেন।

অনেকবার বিপদ এড়াইয়া অবশেষে গত ১২ই জানুয়ারী রাত্রে তিনি মমতাজের সঙ্গে মোটর ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন অনুসরণকারীরা তাহাকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করে। মমতাজ ও অন্যান্য অনেকে এই ব্যাপারে আহত হয়।

মিঃ বলা এত ক্ষমতাশালী লোক হইয়াও—ইংরেজ সরকারকে পূর্ব্বাহ্নে সমস্ত জানাইয়াও আততায়ীর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। বোম্বাইয়ের মত সহরে এমন লোককে হত্যা করা হইল ইহার মত আশ্চর্য্যের বিষয় বর্ত্তমান যুগে যে ঘটিতে পারে সে বিশ্বাসই কাহারও ছিল না।

বোম্বাইয়ের জনসাধারণ ও সংবাদপত্রসমূহ এই ব্যাপারে অতি মাত্রায় বিচলিত হইয়া বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ও ভারত-গবর্ণমেণ্টকে জানাইতেছেন যে যত ক্ষমতাশালী লোকই এই ভীষণ কাণ্ডের অন্তরালে থাকুন না কেন তাহাকে আইনের কবলে আনা হউক।

এই ভীষণ হত্যার ষড়যন্ত্রের নেতা কে তাহা ব্যাপারটি পড়িলেই অনুমান করা যায়। তাহার নাম নাকি বোম্বাইয়ের লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। কিন্তু নাচওয়ালীর কাণ্ডের নায়ক মহাপ্রতাপশালী অর্থবান লোক তাই লোকে কিছুই করিতে পারিতেছে না। তাহারা শুধু চাহিতেছে এই ঘৃণ্য কাণ্ডের নায়ক আইনের কবলে আসুক।

মমতাজ বেগম এখনো পুলিশের হেফাজতে আছেন। মিঃ বলার আহত ম্যানেজার ম্যাথু বলেন মমতাজ বেগমকে অরক্ষিত অবস্থায় ছাড়িয়া দিলে তাহাকে হত্যা করা হইবে।

শ্রীরাম শম্ভুদয়াল নামে ইন্দোর সরকারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী বলেন মমতাজ বাইজী ইন্দোর মহারাজার রক্ষিতা ছিলেন তিনি হঠাৎ ইন্দোর ছাড়িয়া অমৃতসরে যান। মিঃ শাঙ্কারো নামে রাজসরকারের একজন লোকের সঙ্গে মমতাজের গুপ্ত প্রণয় চলিতেছে এই সন্দেহের কারণে মমতাজ বিদায় হন। মমতাজের গমনের কিছুদিন পরেই মিঃ শাঙ্কারোকে দীর্ঘ কারাবাসে পাঠান হয়।

পরে শ্রীরামকে মমতাজের অনুসরণ নিযুক্ত করা হয়, গত এপ্রিল মাসে অমৃতসরে তাহার সন্ধান মেলে। অনেক লোক মমতাজকে ইন্দোরে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। এই কাজের জন্য শ্রীরামের হাতে ইন্দোর সরকার হইতে মাঝে মাঝে টাকা দেওয়া হইত। মহারাজার তহবিল হইতে এ কাজের জন্য শ্রীরামকে ৩২,৫০০ মুদ্রা দেওয়া হয়, ইহার কাগজপত্র আছে। সাধারণ খরচ বিভাগ হইতেও তিনি এই কাজের জন্য ২০,৩০০৲ পান তাহা সবই খরচ হইয়াছে।

এই নাচওয়ালীর পেছনে ইন্দোর সরকার লাখ মুদ্রার বেশী খরচ করিয়াছিল সাক্ষ্যে এমন দেখা যাইতেছে। পরিণামে এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে।

মিঃ বলা বোম্বে কর্পোরেশনের সভ্য ও অনেক সাধারণ প্রতিষ্ঠানে জড়িত ছিলেন। মমতাজ বেগম আহত অবস্থায় প্রাণের ভয় লইয়া এখন যাহা বলিতেছেন সুস্থ হইলে আরও অনেক কথা বলিতে পারিবেন মনে হয়। তাহাতেও দেশীয় রাজন্যের বে-পরোয়া খেয়ালের অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হইবে আশা করা যায়।

ভারত সরকার ও বোম্বে সরকার এ বিষয়ে কোন পন্থা অবলম্বন করেন তাহাও দেখিবার বিষয়।

মহারাজার গুপ্ত প্রণয়ের চমকপ্রদ কাহিনী

১৯২৪ সালের জুন মাসে মমতাজের মাতা বোম্বাইয়ে পুলিশ কমিশনারের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছিল যে তাহারা মা ও মেয়ে দু'জনাই ব্যবসায়ে নাচওয়ালী। ১৯১৭ সালে ইন্দোর মহারাজ তুকোজী রাও হোলকার বেতন দিয়া তাহাদের গায়িকা নিযুক্ত করেন। তার মেয়ে প্রাপ্তবয়স্কা হইবার উপক্রম হইলে মহারাজ তাহাদের রক্ষিতা ভাবে রাখেন এবং তাহাদের কড়া পাহারায় দিয়া বাড়ি নজরবন্দী রাখা।

১৯১৯ সালে মহারাজ তাহাদের সঙ্গে লইয়া বোম্বাই আসেন ও তাহাদের কোন বড় মুসলমান সওদাগরের বাসায় পাহারার ব্যবস্থায় রাখেন ও নিজে তাজমহল হোটেলে থাকেন। ১৯১৯ সালের ২৭ এপ্রিল তারিখে মহারাজ মমতাজকে সিনেমায় লইয়া যাইবার ছলে ইন্দোরে পাঠাইয়া দেন।

ইংলণ্ডে গমন

মহারাজ বিলাত গমন কালীন কমলাবাই নাম দিয়া মমতাজকেও সঙ্গে লন। মমতাজের মাতা তখনও পুলিশে আবেদন করে কিন্তু পুলিশ জানায় যে মমতাজ স্বেচ্ছায় ইংলণ্ড যাইতেছে। মমতাজের সঙ্গে তখন তাহাকে দেখা করিতে দেওয়া হয় নাই। ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিবার বছর খানেক পরে মমতাজ গর্ভবতী হয়। ৭ মাসের পর বহু অনুরোধে মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা মমতাজের সঙ্গে থাকিবার অনুমতি পায়। সময় মত একটি জীবিত কন্যা প্রসব হয় কিন্তু কিছুকাল পরেই নার্স সংবাদ দেয় যে মেয়ে মরিয়া গিয়াছে।

এই ব্যাপারে মমতাজের মন মহারাজার উপর একেবারে বিরূপ হইয়া যায় সে রাজপ্রাসাদ ছাড়িতে ব্যাকুল হইয়া উঠে কিন্তু রক্ষীবেষ্টিত থাকায় পারে নাই।

এ স্থান হইতে তাহাদের ভাণপুরায় লওয়া হয়, তথা

হইতে বন্দীবেষ্টিত অবস্থায় মুসৌরীতে লইবার আদেশ হয়। দিল্লীতে আসিয়া মমতাজ গবর্ণর জেনারেল ও পুলিশ কমিশনারের কাছে আবেদন করে ও মুসৌরী যাইতে অস্বীকার করে। মহারাজার বন্দীরা গোলমাল করিলেও মমতাজ ও তাহার মাতা রেলওয়ে পুলিশের সাহায্যে মুক্ত হইয়া অমৃতসরে পলায়ন করে। এইখানে মহারাজার কর্ম্মচারী শ্রীরাম বালু তাহাদের বোম্বে যাইতে বলে ও নানা ভয় দেখায়। এইখানে বিহারীলাল নামে একটি লোক তাহাদের মহারাজার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে বলে। বিহারীলালের চাকর রামলালের সাহায্যে তাহারা বোম্বে আসে এবং পারশোভায় বুলাকীদাসের বাংলোয় উঠে, পরে নির্জ্জন স্থানে বিপদাশঙ্কায় তাহারা মদনপুরায় আসে। রামলাল তখনো তাহাদের সঙ্গে, বিহারীলালও বোম্বে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে থাকে। বিহারীলাল মমতাজের পিতা মহম্মদ আলির দলিল টাকা লইয়া পলায়ন করে এই সন্দেহে রামলালকে পুলিশে দেওয়া হয়। রামলাল বলে—মহারাজ কর্ত্তৃক মমতাজকে হরণ করিবার জন্য দল নিযুক্ত হইয়াছে। বিহারীলাল ও আম্নাসাহেবও সেই দলভুক্ত। এই দলের উদ্দেশ্য হয় মমতাজকে ইন্দোরে লইয়া যাইবে কিম্বা তাহার নাক কাটিয়া দিবে। ওয়াজির বেগম ও তাহার স্বামী মহম্মদ আলীকেও হত্যা করিবে।—ইহারা তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে না পারে এই মর্ম্মেই মমতাজের মাতা আবেদন করিয়াছিল। বর্ত্তমানে মমতাজ পুলিশ হাঁসপাতালে পুলিশের রক্ষণাধীনে আছে।

শেষ সুলতানের শেষ বিবাহ

তুরস্কের শেষ সুলতানের শেষ বিবাহ কাহিনী আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর মতই মনোরম। ৬০ বৎসর বয়স্ক সুলতানের সঙ্গে ১৫ বৎসর বয়সের রূপসী সুন্দরী বালিকার বিবাহের কথা একখানি তুর্কী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সুন্দরীর নাম নেভজাদ—ইনি সুলতানের বাগান রক্ষকের কন্যা ছিলেন।

নেভজাদ একদিন সুলতানের কক্ষ ঝাড়ু দিতে আসিলে সুলতান প্রসন্ন হইয়া তাহার সঙ্গে কথা কহেন। বালিকা বাঁদীদের কাছে সুলতানের সেই কথার উল্লেখ করেন।

পর দিনই রটিয়া যায় যে সুলতান আবার বিবাহ করিতে যাইতেছেন। প্রাসাদে মহা ধুমধাম পড়িয়া যায় কিন্তু তখনও কেহই জানিত না যে সুলতানের নব বিবাহিতা কে হইবেন। পরে প্রকাশ পায় যে এই ভাগ্যবতী তাহারই বাগান রক্ষকের কন্যা নেভজাদ।

দু'দিন পরেই তাঁহাকে সুসজ্জিত প্রাসাদ কক্ষের অধিকারিণী করা হয়। বাহিরে বিবাহ সম্বন্ধে এই প্রচার করা হয় যে 'প্রথামতে মহামান্য সুলতান একটি সুন্দরীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন।'

এই সময় হইতেই সুলতান বেশী সময় হারেমে কালযাপন করিতে আরম্ভ করেন। রাজসভা ও রাজনৈতিক ঘটনা তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে থাকে। অনেক দিন কেহ তাঁহার দেখা পাইত না।

তারপর হইতেই সুলতানের দুর্ভাগ্যের আরম্ভ হয়, এবং একদিন প্রভাতে তিনি বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজে চড়িয়া রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সে সময়ে তিনি মাত্র প্রথমা ও দ্বিতীয় পত্নীকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। নির্ব্বাসিত অবস্থায় [illegible] গান করে তাহার স্ত্রীরা তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া কারণ অনুসন্ধান করেন। সুলতান সজল চোখে সকল কথা বলেন। কিছুদিন পরেই কনষ্টানটিনোপলে নেভজাদের কাছে সুলতানের চিঠি যায়, "নেভজাদ, এস আমার কাছে। অন্যথা কোরো না এতে। তোমা ছাড়া আমি বাঁচিতে পারি না।"

এর পর সুলতানের একজন অনুচর নেভজাদকে সুলতানের কাছে নিতে আসে। নেভজাদ ইতস্ততঃ করিয়া দেখিলেন তাহাকেও হারেমের অন্যান্য পরিত্যক্তা নারীদের মত মণি মুক্তা বিক্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে। ভাবিয়া অবশেষে তিনি সুলতানের কাছে গেলেন। এই রাজ্য-সম্পদহারা সুলতানের সঙ্গে বয়সের অনেক পার্থক্য থাকিলেও নেভজাদ এ বিবাহে নাকি পরম সুখী হইয়াছেন।
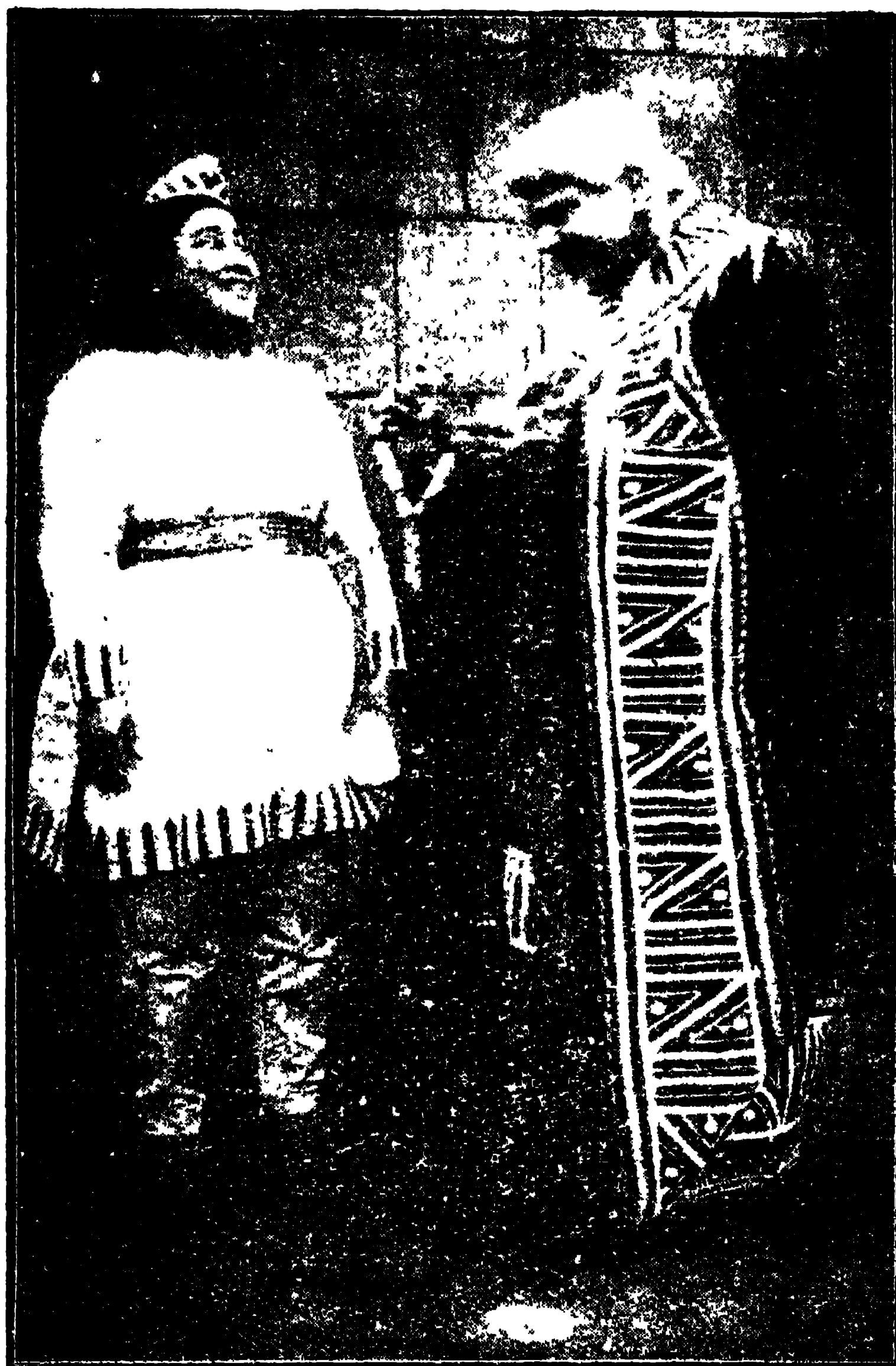
কিল্লাদার (শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) ও তাবেজ (শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ী)

মিশরের রাজকুমারী আর্ভিনা। শ্রীমতী রাণীসুন্দরী।

সাহিত্যে সমালোচনার স্থান

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম, এ

সমালোচনা যদি সত্যকার কোন নিন্দনীয় কার্য্য হইত, তাহা হইলে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখককে ছাঁটিয়া ফেলিতে হইত। তাহা হইলে Sidney, Ben Jonson, Dryden, Pope, Addison, Johnson, Wordsworth, Coleridge, Lamb, Hazlitt, Matthew Arnold, Walter Pater প্রভৃতির সহিত আমাদের সম্পর্ক তুলিয়া দিতে হইত। তাহা হইলে Voltaire, Buffon, Lessing, Gœtheর রচনা সাহিত্য বলিয়া আখ্যাত হইত না। তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যমহারথগণকে সাহিত্যসমাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইত। বস্তুতঃ প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টি যদিও অনুপ্রেরণা ব্যতীত সম্ভব নহে, তথাপি শুধু অনুপ্রেরণা থাকিলেই সব সময় আদর্শ সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। কবি বা নাটাকারের প্রধান উপাদান ভাব বা আদর্শ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি একটু Critical power না থাকে, অর্থাৎ কোন্ ভাবটি কেমন করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে ও কতদূর আলোচনা করিতে হইবে, কোথায় কোন্ শব্দটি প্রয়োগ করিলে রচনাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, কোন্ রসের পর কোন্ রসের অবতারণা করিতে হইবে তাহার সম্যক্ জ্ঞান না থাকে এবং অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধীয় একটা সাধারণ জ্ঞানও যদি না থাকে, তাহা হইলে বড় লেখক—প্রথম শ্রেণীর লেখক—হওয়া যায় না। প্রত্যেক বড় লেখকই অনুপ্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে এ শক্তিটিও ভগবানের নিকট হইতে পাইয়া থাকেন। Shakespeare, কালিদাস, Gœthe ও বঙ্কিমচন্দ্রের এ বিষয় সম্যক্ জ্ঞান ছিল বলিয়াই তাঁহাদের অধিকাংশ রচনা এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। বোধ হয়, মধুসূদনের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা সত্ত্বেও এ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান ছিল না বলিয়া তাঁহার মহাকাব্যের ভিতর, পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্করেখার ন্যায়, সময় সময় ভাবের অসামঞ্জস্য, শব্দবিন্যাসের ত্রুটি ও সুষ্ঠু প্রয়োগের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। একাধারে বাঙ্গালার Shakespeare ও Garrick মহাকবি গিরিশচন্দ্রের রচনায় যে এত Inequalities লক্ষিত হয়, তাহার অন্যতম কারণও বোধ হয় Critical power বা নিজের রচনা সম্বন্ধীয় সমালোচনাশক্তির অভাব। অবশ্য এ ক্ষেত্রে অন্যান্য কারণও আছে (যথা তৎকালীন বঙ্গমঞ্চের ত্রুটি ও অভাব, তদানীন্তন দর্শকগণের রুচি ইত্যাদি), তবে এইটি যে একটি প্রধান কারণ, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

বস্তুতঃ সমালোচনা শক্তি (শুধু অপরের রচনা সম্বন্ধে নহে, নিজের রচনা সম্বন্ধেও) একটি বিশেষ শক্তি। ইহার অভাবে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাও পূর্ণ বিকসিত হইতে পারে না। অবশ্য সমালোচনা ও অলঙ্কার সাহিত্যসৃষ্টির পর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে লেখকগণ পুরাতন সাহিত্যস্রষ্টাগণের পথ যাহাতে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্যে যথেচ্ছাচার আনয়ন না করেন, এই জন্যই বোধ হয় অতি পুরাকাল হইতেই সমালোচনার দিকে সব দেশেই সাহিত্যরসজ্ঞগণের দৃষ্টি ছিল। বড় বড় লেখকগণের রচনার উৎকর্ষগুলি বাছিয়া নিয়মাকারে সাজাইতে সব দেশেই একটা চেষ্টা লক্ষিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য পরবর্ত্তী লেখকগণকে রচনার একটা Standard বুঝান। মৌলিকত্ব ও যথেচ্ছাচার বিভিন্ন জিনিষ। সৎসাহিত্যে একটা সুরুচি সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইবে। এই সুরুচি শুধু ভাবগত নহে, কতকটা ভাষাগতও বটে। এই জন্যই গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত, ফরাসী, জার্ম্মান, ইংরাজী, বাঙ্গালা, সব সাহিত্যেই অল্পাধিক পরিমাণে সমালোচনার চেষ্টা আছে। সমালোচনার ইতিহাস ও স্বরূপ সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পণ্ডিতাগ্রগণ্য Saintsbury-প্রণীত *A History*

(এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এ পর্যন্ত বোধ হয় কেহই করেন নাই, অন্ততঃ আমাদের জানা নাই)।

of *Criticism* (3 Vols), Matthew Arnold এর *Essays in Criticism* (First series), Walter Pater এর *Appreciation* (With the *Essay on Style*), Aristotleএর *Poetics*, Wordsworthএর *preface to the lyrical ballads*, Shelleyর *A defence of poetry* প্রভৃতি পাঠ করিলে যথেষ্ট শিখিবার বিষয় পাইবেন। *Encyclopaedia Britanica* (II th, Edition Vol, VII,PP, 468—70) তে সুপণ্ডিত Edmund Gosse যে একটি ক্ষুদ্র সারগর্ভ প্রবন্ধে সমালোচনার ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাহাও দ্রষ্টব্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত পণ্ডিতবর Henry Stephen-প্রণীত *A syllabus of poetics* নামক পুস্তিকা পাঠ করিলেও এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবর অযথা বৃদ্ধি করিব না, তবে দুই চারিটি কথা না বলিলে প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইবে বলিয়া এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রথমেই সংস্কৃত সাহিত্যে সমালোচনার কতটা স্থান ছিল তাহা দেখা যাক্। অতি প্রাচীন কাল হইতেই অলঙ্কারশাস্ত্রের আলোচনা ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে। ভরত-প্রণীত "নাট্য শাস্ত্র" ও "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর" নামক গ্রন্থদ্বয়ে নাটক, মহাকাব্য প্রভৃতি রচনার নিয়ম বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। এই গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকাল নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। তবে কালিদাসের পূর্ব্বে যে গ্রন্থদ্বয় রচিত হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। বামন-প্রণীত "কাব্যালঙ্কারবৃত্তি"ও শুনা যায়—এ সম্বন্ধে একখানি প্রাচীন গ্রন্থ (ম্যাক্‌ডনেল সাহেবের মতে ইহার রচনা কাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী)। ধনঞ্জয়-প্রণীত "দশরূপ" গ্রন্থেও নাটক-প্রণয়নের নিয়মাবলী সন্নিবেশিত আছে (ইহার প্রণয়ন-কাল বোধ হয় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী)। এ গুলি ছাড়া এ সম্বন্ধে তিনখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে—দণ্ডি-প্রণীত "কাব্যাদর্শ," মম্মট-প্রণীত "কাব্যপ্রকাশ" ও বিশ্বনাথ কবিরাজ-প্রণীত "সাহিত্যদর্পণ"। এ তিনখানির মধ্যে কাব্যাদর্শ (ইহার রচনা কাল বোধ হয় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী) সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং বিশ্বনাথ কবিরাজ-প্রণীত "সাহিত্যদর্পণ' সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক বলিয়া বোধহয় "সাহিত্যদর্পণ" বোধহয় খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। ম্যাক্‌ডনেল সাহেব ১৪৫০ খৃষ্টাব্দ ইহার রচনাকাল বলিয়া বিবেচনা করেন। এই অমূল্য গ্রন্থে শুধু নিয়মাবলী সন্নিবেশিত হয় নাই, ইহাতে পুরাতন কবিগণের নামোল্লেখ করিয়া দোষ-গুণ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেকের ধারণা "সমালোচনা" বলিলে যাহা বুঝায় তাহা ভারতের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বুঝিতেন না। কিন্তু সাহিত্যদর্পণ ভাল করিয়া পাঠ করিলে এ ধারণা যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক তাহা বুঝা যায়। বস্তুতঃ Aristotle বা Quintilian যদি সমালোচক বলিয়া বিবেচিত হন, তাহা হইলে মম্মট, ধনঞ্জয়, দণ্ডী বা বিশ্বনাথ কবিরাজকেও এ সম্মান দেওয়া অন্যায় হইবে না। তবে আধুনিক ভাবের সমালোচনা, একখানি গ্রন্থবিশেষের বিশদভাবে সমালোচনা, গ্রন্থোক্ত চরিত্রগুলি বা উপাখ্যানটী কিরূপভাবে ফুটিয়াছে, কোন চরিত্র কিরূপভাবে এবং কেন বর্ণিত হইয়াছে, গ্রন্থখানির উপর পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদের কতটা প্রভাব দৃষ্ট [illegible] বোধ [illegible] তখন হইত না। পুনশ্চ, ভাস কি বাল্মীকি কিরূপভাবে সাজাইয়াছিলেন, কালিদাস তাঁহার নাট্যকাব্যে সমসাময়িক সমাজ ও ইতিহাস কতদূর প্রকাশ করিয়াছেন, ভারবি বা মাঘের আখ্যানাংশ মহাভারত বর্ণিত উপাখ্যান হইতে কতটা বিভিন্ন, শূদ্রক বা বিশাখদত্ত-বর্ণিত সমাজ-চিত্র যথার্থ কিনা, ভবভূতির নাটক হইতে ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় কতদূর জানিতে পারা যায়—এরূপভাবের সমালোচনা বোধ হয় প্রাচীন ভারতে হইত না। কিন্তু তাই বলিয়া সমালোচনার একেবারে অভাব ছিল না যদিও পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যের উপর সমালোচক বিশেষের কতটা প্রভাব ছিল, এ সম্বন্ধে কিছুই আমরা এখন বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারি না।

প্রাচীন ভারতবর্ষের পরেই বোধ হয় প্রাচীন গ্রীস দেশে প্রচলিত সমালোচনার উল্লেখ করিলে অন্যায় হইবে না, সাধারণ লোকের বিশ্বাস Aristotleই অলঙ্কার ও সমালোচনা শাস্ত্রের জনক (Criticism কথাটিই Greek *Kritikos* হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে)। তাঁহার *Rhetoric* ও *Poetics* নামক গ্রন্থদ্বয়ের নাম সুধীগণের নিকট

সুপরিচিত। কিন্তু Aristotleএর পূর্ব্বেও Plato, Isocrates এবং Aristophanes এ সম্বন্ধে আলোচনাও করিয়াছিলেন। Aristophanes হাস্য ও ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। *Clouds* নামক নাটকে তিনি Socrates-কে যেমন নিন্দা করিয়াছিলেন (এ নিন্দা যে নিতান্তই অসার ও ঈর্ষ্যামূলক তাহাব সন্দেহ নাই*), সেইরূপ *Frogs* নামক নাটকে তিনি তদানীন্তন মহাকবি Euripedesকে ঠাট্টা করিয়াছিলেন। Swiftএর *Gulliver's Travels*এর ভিতর যেমন Satire জ্বলজ্বল করিতেছে, সেইরূপ Aristophanesএর নাটকে ব্যক্তিগত ও সাহিত্যগত আলোচনা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, তবে এ আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্বেষমূলক বলিয়া তাহাকে আর "সমালোচনা" বলা চলে না। বস্তুতঃ Aristotleএর পার্শ্বে Aristophanesকে সমালোচকের আসন দেওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে কেবল ইহাই বলিবার আস্মান জমীন ফারাক্। Aristotleএর পর Greek ভাষায় সমালোচনা গ্রন্থ বিরল হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে Alexandria নগরে Neoplatonist সম্প্রদায়ভুক্ত সমালোচকগণের এবং Dionysius of Halicarnassusএর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রীক সাহিত্যের পরই লাটিন সাহিত্যের আলোচনা ও তৎসংক্রান্ত সমালোচনার কথা আপনিই আসিয়া পড়ে। সমালোচক-প্রধান Edmund Gosse বলেন "In Roman literature criticism never took a very prominent position," কথাটী একেবারে মিথ্যা নহে, তবে লাটিন ভাষায় সমালোচনার একেবারে অভাব নাই। Cicero, Horace এবং Senecaকে সমালোচকের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া চলে না। Quintilian প্রণীত INSTITUTES OF ORATORY ও একখানি বিখ্যাত সমালোচনাগ্রন্থ। আবার Italian Renaissanceএর সময় Dante, Bocaccio এবং Erasmus সমালোচনাক্ষেত্রে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাও উল্লেখ না করিলে এ বিষয়ে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইবে।

এতক্ষণ ত প্রাচীন সাহিত্যে সমালোচনার স্থান উল্লেখ করা হইল। এখন আধুনিক সাহিত্যগুলিতে সমালোচনার ইতিহাস কিছু আলোচনা করা যাক্। ফরাসী ভাষায় Joachim du Bellary প্রণীত *Defense et Illustration de la langue francaise* (Published 1549) বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম সমালোচনাগ্রন্থ। ইংলণ্ডে প্রায় এই সময় Thomas Wilson *art of rhetoric* নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে Gascoigne প্রণীত *Instruction* বাহির হয়। ইহার পর Elizabethan যুগে Harvey, Lodge, Stephen Gosson, Sir Philip Sidney প্রভৃতি ইংরাজী ভাষায় সমালোচনার ধারা বজায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থসমূহ সমালোচনার ইতিহাসে "হাতেখড়ি" অবস্থা বলা যায়। Stephen Gossonএর সাহিত্যের উপর তীব্র কটাক্ষপাত ও Sidneyর *Apology for poetry* নাম দিয়া তাহার প্রত্যুত্তর ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যথার্থ সমালোচক দুই জনের কেহই নহেন। একজন সাহিত্যবিদ্বেষী, অপর ব্যক্তি এমন সব নিয়ম পালন করিতে বসিয়াছেন যাহা মানিলে ইংরেজী সাহিত্যে Ben Johnson বা Dryden সৃষ্ট হইতে পারিত, কিন্তু Shakespeare, Spenser, বা Shelly, Keats, Wordsworth জন্মাইত না। বস্তুতঃ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে আরও যে সব সমালোচক জন্মিয়াছিলেন (যেমন Ascham, Webbe, Puttenham) তাঁহাদের সমালোচনা ঠিক Criticism বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। *Art of English Poetry* কিংবা *Discourse of English Poetry* নামক গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলে তৎকালীন সমালোচনার স্বরূপ অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

* It is more than probable that the caricature of Isocrates is too distasteful to have appealed to an audience who knew the original.—J P Maine Introduction to Aristophanis plays Every man's Library series)

* এখানে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না কারণ উন্নতি সমালোচনার উপর ততটা নির্ভর না করিলেও গদ্য রচনার উন্নতি সমালোচনার উপর অনেকটা নির্ভর করে। এই জন্যই বোধ হয় ...

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই Malherbe সাহিত্যের ধারা পরিবর্ত্তনেচ্ছায় নূতন ধরণের সমালোচনার সূচনা করেন, তাঁহার আদর্শ ছিল গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যের উৎকৃষ্ট রচনাবলি। Balzac, Boileau, Renan Rapin ফরাসী ভাষায় এইরূপ সমালোচনার প্রচার করিয়াছিলেন এবং ইংরেজী সাহিত্যে ইহাদের প্রভাব Dryden এবং Addison এর লেখায় বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সাহিত্য যুগকে Critical period বা classsical age নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যুগের লেখকগণ—Classics (Neo classic বলিলেই ভাল হয়) বলিলে তখন যাহা বুঝিতেন তাহার অনুকরণে ও Academy of France এর প্রভাবে উৎপন্ন ফরাসী সাহিত্যের আদর্শে, গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই যুগের সমালোচনা ও সাহিত্যের স্বরূপ বুঝিতে গেলে ইংরেজীতে Pope, Blair, Johnson এবং ফরাসীতে Voltaire, Buffon এর রচনা পাঠ করিতে হয়।

এস্থলে একটী কথা না বলিলে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থাকিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমালোচনার প্রভাবে গদ্য সাহিত্য মার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত হয়। তাই বোধ হয় সমালোচনাপ্রধান অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজী গদ্য সাহিত্য এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। Addison Johnson Swift, Defoe, Goldsmith, Burke, Richardson, Fielding প্রভৃতি লেখকগণ ইংরেজী গদ্যসাহিত্যের এক একটী স্তম্ভস্বরূপ। যে গদ্যসাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি আমরা Elizabethan যুগে দেখিতে পাই না, যাহা Milton এবং Bacon এর রচনাতেও স্পষ্ট লক্ষিত হয় না, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে *Areopagitica, Ecclesiastical polity* বা *Advancement of Learning* এ প্রচুর পরিমাণে আমরা দেখি। ইংরেজী সাহিত্যে এগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সন্দেহ নাই, কিন্তু এগুলির সহিত *Lives of the poets, Essays in the Spectator, Vicar of Wakefield, Gulliver's travels, Tom Jones, Refletion on the French Revolution* প্রভৃতি পাঠ করিলেই এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থে রচনাগত পার্থক্য স্পষ্ট লক্ষিত হইবে। এই অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের যুগ যথার্থ *Critical* period of English literature. গদ্য সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি এই যুগে সাধিত হইয়াছিল। ইংরেজীতে Modern Novel রচনা এই যুগেই আরম্ভ হয়, শুধু আরম্ভ নহে, ইহার বিশেষ উন্নতিও হয়।* বস্তুতঃ Novel রচনা, অভিধান প্রণয়ন, প্রবন্ধ রচনা, সমালোচনা, এককথায় গদ্য সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এযুগের কবিগণকে ইংরেজী সাহিত্য হইতে ছাটিয়া ফেলিলে ক্ষতি নাই কিন্তু Addison, Johnson Swift Fielding Goldsmith, Gibbon, Burke কে বাদ দিলে ইংরেজী সাহিত্যের সারাংশ অনেকটা বাদ দিতে হইবে। ইহাতেই সুধীগণ সাহিত্যের বিশেষতঃ গদ্যসাহিত্যের উপর সমালোচনার প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আধুনিক ভাবের সমালোচনা বলিতে যাহা বুঝায় (যাহা Romantic criticism নামে এককালে অভিহিত হইত) তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা প্রথম প্রত্যক্ষ করি। France এ Diderot Germanyতে Lessing এবং England এ Wordsworth, Coleridge প্রভৃতি কবিগণ ইহার প্রবর্ত্তক। তাহারা যে মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার বীজ বিশেষভাবে অঙ্কুরিত হইয়া ফলস্বরূপে সর্ব্বত্র পরিণতি লাভ করিয়াছে। "সমালোচনা" কথাটি আর কাণে নূতন শুনায় না। যদিও ইহার যথার্থ স্বরূপ সর্ব্বত্র লক্ষিত হয় না, তথাপি ইহা একটি সুপরিচিত

—

শতাব্দীতে (ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর) ইংরাজী কাব্য ও নাটকের এত উন্নতি হইলেও গদ্য সাহিত্যে তত উন্নতি হয় নাই। তাই বুঝি Sidney এর Lyly র রচনাপারিপাট্য ও মাধুর্য্য সত্ত্বেও Hooker [illegible] অদ্ভুত ও বিচিত্র অলঙ্কারপ্রিয় এবং Bacon এর রচনায় [illegible] এত অসামঞ্জস্য Elizabethan গদ্যের সহিত Classical যুগের গদ্যের তুলনা করিলেই সাহিত্যের উপর সমালোচনার প্রভাব বুঝা যায়।

* Lyly র Euphues বা Sidney র Arcadia কে আমরা Novel বলিতে পারি না, পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত Romanceগুলি ত Novel এর মধ্যে গণ্যই হইতে পারে না। Novel এর ইতিহাস লিখিতে গিয়া কিন্তু পণ্ডিতাগ্রগণ্য Walter Raleigh এগুলির উল্লেখ করিয়াছেন।)

শব্দ। বর্ত্তমান যুগের সমালোচকগণের নাম করিতে গেলে তালিকা অতি দীর্ঘ হইবে। এখন সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা বিশেষ ভাবে উন্নতিলাভ করিতেছে। সমালোচনা শুধু সাহিত্যের দোষ গুণ দেখাইতেছে না, ইহা সাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট সমালোচনা সাহিত্যনামে আখ্যাত হইতেছে। Sainte-Beuve, Saint-Marc, Matthew Arnold, Walter Pater বৃথা কলম ধরেন নাই। সমালোচনাব স্রোত তাঁহারা ফিবাইয়া দিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্ত্তমান যগেব ইংরেজী, ফবাসী, জার্ম্মাণ ও বাঙ্গালী সমালোচকগণেব নামোল্লেখ কবিয়া প্রবন্ধেব কলেবব আব বৃথা বৰ্দ্ধিত কবিব না, কাবণ সাহিত্যসমাজে তাঁহাবা সুপবিচিত। Dowden, Raleigh, Saintsbury, Furnivall, Gervinus Taine, Gosse, Quiller-Couch, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়-চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ—সমালোচনার আসরে নামিয়া সাহিত্যের যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন ও তাঁহাদের পথাবলম্বন কবিযা বর্ত্তমান যুগে শত শত সাহিত্যিক সমালোচনা-ক্ষেত্রে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাব উল্লেখ এ প্রবন্ধে করিব না। আজকাল উল্লেখ-যোগ্য এমন একখানি মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা বোধ হয় নাই যাহাতে বর্ত্তমান সাহিত্যের সমালোচনা করা হয় না। তবে সমালোচকগণ যাহাতে একটা Standard মানিয়া সমালোচনা কবেন, সঙ্গে সঙ্গে মৌলিকত্ব ও ব্যক্তিত্বেব বিকাশ সম্যকভাবে লক্ষ্য করেন, ও নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ভাবে সমালোচনা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।

(ক্রমশঃ)

কাজের কথা
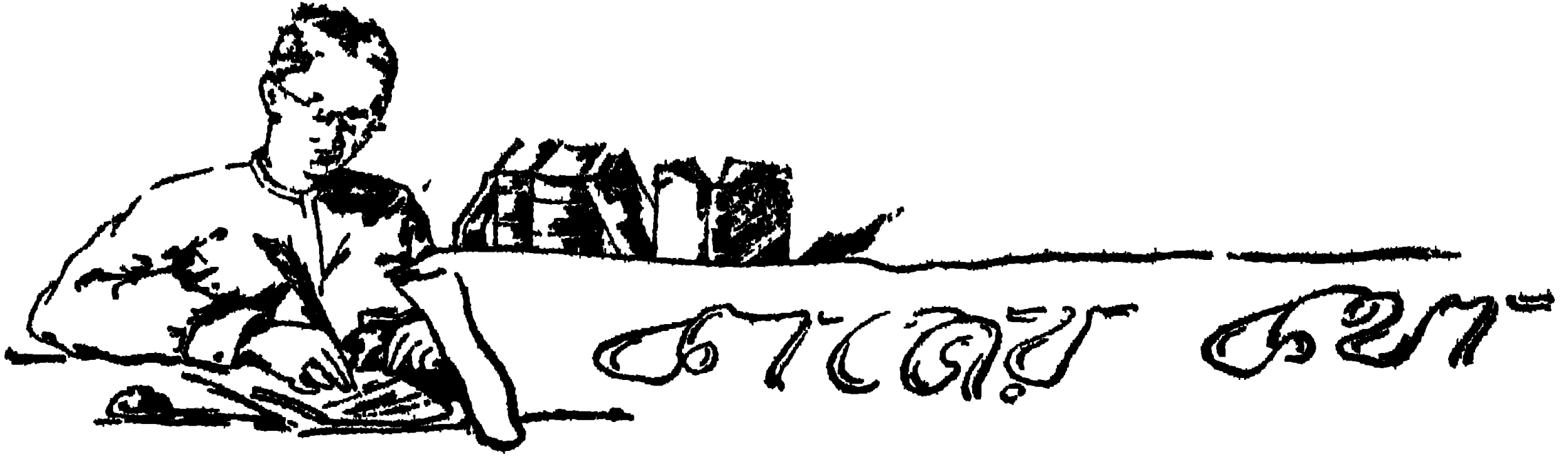
স্বরাজ্যদলের স্পষ্টভাষণ ঃ—স্বরাজ্যদলের কোন কোন নেতা আজকাল অকপটচিত্তে স্বীকার করিতেছেন যে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত দেশের কোন উপকার করিতে পারেন নাই এবং যে অবস্থায় তাঁহারা চলিতেছেন তাহাতে তাহা সম্ভবও নহে। তবে জাতির প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহারা উপকারে অক্ষম হইলেও অপকারে বাধা দিতেছেন—তাঁহাদের এ কার্য্যও নাকি দেশের হিতের জন্য! দেশের হিত সব দিক দিয়াই [illegible] পড়িতেছে। কথার মার প্যাঁচে যতটুকু হিত ও উপকার করা যায়,—তাহাও অপকারের পরিপন্থী বটে। তবে দলের কাহারও কাহারও নিজেদের কার্য্যের হিতাহিতের সমালোচনা প্রবৃত্তি জাগাই যে দেশের পরম [illegible] তাহাতে হয়তো সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সংবাদ পত্রে প্রকাশিত নিজ বক্তৃতার এক সংশোধনী প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন স্বরাজ্যদল কোন কাজ করে নাই ইহা সত্য নহে তবে কৌন্সিলে তাঁহারা কিছু করিতে পারেন নাই ইহা সত্য কথা। কৌন্সিল ও কর্পোরেশন ছাড়া স্বরাজ্যদল দেশের আর কোন্ কাজে নিযুক্ত আছেন ও সে কাজ কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহা জানিতে পারিলে আমরা সুখী হইব। ইঁহাদের অপর কোন দেশহিতৈষণার কর্ম্ম দেশবাসী অবগত নহে। কোন কোন উৎসাহী স্বরাজী বলিতেছেন তাঁহারা পরের গড়া আইনে কৌন্সিলে দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্য গ্রহণ করিবেন না। কথা উত্তম—স্বাধীন ও সতেজ। কিন্তু এ উক্তিকে কার্য্যকরী করিতে হইলে যাহার মধ্যে নিজেদের গঠন প্রতিভা নিয়োজিত করিয়া তাহাকে সার্থক করা যাইতে পারে এমন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া [illegible]। তেমন কার্য্যের ক্ষেত্রের অভাব দেশে নাই—[illegible] ভিড়িবার যোগ্য কর্ম্মীর অভাব সব দিকেই পরিলক্ষিত হইতেছে। তাই মহাত্মা স্বরাজী-দের কৌন্সিলে নিষ্ফল বিজয়ে সম্বর্দ্ধনা করিয়াও তাঁহাদের যুক্তিতর্কে বলসঞ্চার করিবার জন্য তাঁহাদের চরকায় মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছেন। আত্মসমালোচনায় কোন পথে গতি ফেরে তাহা দেখিবার বিষয়। অর্ডিনান্সের সার্টিফিকেশন ইহাদের উপাস্যের শেষ মোহ ভাঙ্গিয়া দিবে কি?

মহাশান্তির কি এই পথ ঃ—গত মহাযুদ্ধের [illegible] জাতি অতি দরিদ্র হইয়াছে [illegible] পাইতেছে না। এই পয়সার সদ্ব্যবহারের জন্য তাহারা যুদ্ধোপকরণ প্রচুর মাত্রায় নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতেছে। ভোগ লালসা অজস্র উপভোগ করিয়া আমেরিকা এখন যোদ্ধার খ্যাতিলাভে ব্যগ্র। আমেরিকা, ইংলণ্ডের নৌ বহরের আয়োজন দেখিয়া জাপান বোধ হয় অতীত ভাবিয়া [illegible] মাঝে মাঝে গ্লানি করিয়া থাকে। সুদূরের মৈত্রীর প্রীতিতে বিপর্য্যস্ত হইয়া জাপানকে হয়তো প্রতিবেশী চীনের সঙ্গে শত্রুতা দূর করিতে হইবে। সত্য যুদ্ধ নাই—অথচ সাজ সাজ রবে ক্ষমতাশালী জাতিরা সকলেই শান্তির অগ্রদূতের কার্য্য করিতেছে। তুর্ক সীমান ঠিক করিবে—আফগান বড় হইবেই—ইংলণ্ড আমেরিক বড় থাকিবেই। ব্যবসায়ী জাতিরা জগৎজোড়া ব্যবসায় যেমন করিয়া হোক বজায় রাখিয়া নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবেই। কেহ অধিকার বাড়াইতে ব্যগ্র—কেহবা অধিকার না হারাইতে হয় এই ভয়ে ব্যগ্র—এই অবস্থা মুখো-মুখি হইলে নরশোণিতে আবার ধরিত্রীর পিপাসা মিটিবে।

চিনি গুড়ের ব্যবসায়—১৯২৩-২৪ সালে ভারতে চিনির ব্যবসায় কেমন চলিয়াছে তাহার রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের মত আলোচ্য বর্ষেও ভারতে বাহিরের চিনির আমদানী কম হইয়াছে। ভারতে গুড় বেশী উৎপন্ন হইতেছে তাই বাহিরের চিনির আমদানী কম ইহাই অনেকে মনে করেন। ১৯২২-২৩ সালে ভারতে ২,৫৩২,৫০০ টন, ২৩-২৪ শে ২,৯৫৩,২০০ টন গুড় হইয়াছিল। ২৪-২৫শে আরো বাড়িয়া ৩,১০৩,৩০০ টন হইতে পারে এইরূপ অনুমান। গুড়ের দর কম বলিয়া চিনির আমদানী বেশী হইতেছে না অনেকে এই যুক্তি দেখাইতেছেন বটে কিন্তু গুড়ের দর কম যে কোথায় তাহা তো আমরা দেখি না। ০ আনা সের গুড় আর ছ'আনা সের চিনি উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা [illegible] ক্ষেত্রে চিনিই ব্যবহার করে। শীতের দিনে এ দেশে অতি উৎকৃষ্ট খেজুরে গুড় হয়, [illegible] গুড়ও এদেশের সুন্দর। গুড় দেশের লোকের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ ছিল। পায়েস, বড়বড়া দুধ দই পায়স [illegible] সমভাবে গুড়ের ব্যবহার চলিত—কিন্তু গুড়ের দাম অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের লোকে এখন পৌষ সংক্রান্তির পিঠে পুলি খাইবার আনন্দটা পর্য্যন্ত নষ্ট [illegible] করিয়া [illegible]। দেশের ছেলে মেয়েরা পর্য্যাপ্ত মিষ্ট [illegible] ভরিয়া খাইতে পায় না। বর্ত্তমান বর্ষে গুড় আরো বেশী উৎপন্ন হইবে আশা হইতেছে কিন্তু এবারকার পৌষ সংক্রান্তিতে বাংলা দেশের অনেক স্থানেই গুড় [illegible] [illegible] সের বিক্রয় হইয়াছে। গুড়ের ব্যবসায় খুব ভাল [illegible] এতে শ্রীবৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই—কিন্তু গুড়ের দর ক্রমশঃ না কমিয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইতেছে কেন তাহার আলোচনা দেখি না। আলোচ্য বর্ষে ভারতে চিনির ব্যবসায়ও উন্নত হইয়াছে। ইহা আশার কথা। ভারতে আখ প্রচুর হয়, খেজুর গাছেরও অভাব নাই, এমন অবস্থায়ও যদি চিনির জন্য ভারতকে পরদেশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয় তো সে লজ্জার কথা—ও মিষ্টি খাইবার সাধে তাহাতে বাদ পড়িবেই। বিট চিনির আমদানী এদেশে বেশী হইতেছে, আমদানী কম কম বলিয়াও ১,১৩,৩৪,৯৩৬৲ টাকার এক বিট চিনিই আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর হইতে এবার প্রায় দ্বিগুণ আমদানী। বিদেশী চিনি এমনি ভারতের বাজারে আসিলে ভারতীয় চিনির ব্যবসায় টেঁকান দুঃসাধ্য হইবে।

এবারের শীত—রাজধানী কলিকাতা ও বাংলার পল্লীসমূহে এবার এত শীত পড়িয়াছে যে অনেকে বলিতেছেন, এমন শীত বহুদিন পড়ে নাই। শীতে সংক্রামক ব্যাধি পীড়ার উপদ্রব কম হয় আবার অসাবধান হইলে সুস্থ শরীরেও ব্যাধি আসে। শীতে খাবার সুখ সবরকমে মেলে। শীতে একবস্ত্র দরিদ্রের কষ্টের সীমা থাকে না [illegible] দেশে [illegible] দুঃখী যথেষ্ট রহিয়াছে। শীতে মানুষকে উৎসাহী করে উৎসাহহীন হইলে শীতের ভয়ে জবুথবু হইয়া থাকিতে হয়। অনেকদিন পরে দেশে শীতের মত শীত [illegible] হইয়াছে [illegible] হয় ভাল কথা।

রোগ বিস্তারে নারী—ক্যান্সার রোগের বিস্তারের কারণ নির্দ্দেশকালে বিখ্যাত ডাক্তারেরা বলিতেছেন সভ্যতায় নারী জাতির অবনতিই ইহার প্রধান কারণ, এখন আর নারীরা পূর্ব্বের মত দৃঢ় গঠিতা অসভ্যা নহে। শিক্ষা নামে যাহা চলে তাহার ভারে মস্তিষ্কের অতি উত্তেজনায়, খারাপ খাবার ও ঔষধে ঔষধে তাহারা দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাই ছেলে মেয়েদের খাবার ওদের বাজার হতে জোগাতে হয়—এর ফলে শিশুদের দেহ ভস্ত্রা বিষে বিকৃতজীবনা হয়ে পড়ে—ক্যান্সারও এ থেকেই আসে। নারীদের স্বাস্থ্যের উপর সমগ্র মানবজাতির স্বাস্থ্য বিশেষভাবে নির্ভর করে। নানা কারণে সকল দেশের নারীর স্বাস্থ্যই অল্পাধিক পরিমাণে অবনত হইয়াছে। আমাদের দেশের নারীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। নারীর দেহ সংস্থান যেমন জটিল তাহা সুস্থ রাখিবারও তেমনি বিধান আছে। সে বিধান ব্যত্যয় করিলে তাহার ফল সমগ্র জাতিকে ভোগ করিতে হয়। এ সম্বন্ধে পুরুষ ও নারী দুয়েরই গুরু কর্ত্তব্য রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা সভ্যতা অনাচারের বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় অবনতি ঘটাইতেছে, নারী

এই অবনতির গতি রুদ্ধ করিতে পারেন—তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা ও সংযম দিয়া।

কলিকাতার রাজপথ ঃ—কলিকাতা সহরের রাজপথগুলির অবস্থা পরম শোচনীয় হইয়াছে। সামান্য দু'পশলা বৃষ্টিতে একহাঁটু জল, গুঁড়ি বৃষ্টিতে বিশ্রী কাদা এতো কলিকাতার দেশী পাড়ার রাজপথের অঙ্গের ভূষণ। তাহার উপর পথে অজস্র খানা ডোবা হইয়াছে—ফুটপাথের পাথরগুলিও উঠিয়া উঠিয়া এমন অসমান হইযাছে যে পড়িয়া গিয়া কখন হাত পা ভাঙ্গে সেই ভয় মনে সদাই জাগে। রাজপথগুলির এ অবস্থার সংস্কার যত শীঘ্র হওয়া প্রয়োজন তাহা হইতেছে না। কেন তাহা জানি না। কর্পোরেশন সহরবাসীর নিকট এজন্য পূর্ণ দায়ী, কর্পোরেশন এতদিনে রাস্তা সংস্কারের জন্য কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন—কমিটি নির্দ্ধারণ শীঘ্র শেষ করিয়া রাস্তাঘাট সংস্কারের কার্য্য জোর চলিলেই সহরবাসীর এবিষয়ে যে চূড়ান্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা দূর হইবে। সংস্কার আরম্ভ করিয়াও ঢিমে তেতালায় চালাইলে চলিবে না। দু একটি রাস্তায়, যথা মাণিকতলা ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে যে ভাবে সংস্কার চলিতেছে তাহাতে সংস্কারের নামেও ভয় হয়। কর্পোরেশনের এ কার্য্যে বিশেষ লক্ষ্য না থাকিলে সহরবাসীর পথ-চলা বন্ধ হইবে।

বাংলায় বিচার বিতরণ ঃ—বাংলা দেশে বিচার বিতরণ করিয়া সরকারের খরচ খরচা বাদে কিরূপ নেট্ লাভ হয় তাহারই একটা পরিমাণ দেওয়া গেল। ১৯১৩ হইতে ১৯২২ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে কেবল দেওয়ানী বিচারে সরকারের নেট্ লাভ হইয়াছে আট কোটি আট চল্লিশ লক্ষ তেপ্পান্ন হাজার ছয় শত উনসত্তর টাকা। কোর্ট ফিঃরই আয় এই—ইহার উপর শমনজারীর আয় ২ কোটি দশ লক্ষ ছাপাইয়া গিয়াছে। দুঃস্থ, অত্যাচারিত যাহারাই সুবিচারের সাহায্য চায়। কিন্তু যেরূপ টাকার থোলার ভিতর দিয়া এই বিচারের মধ্যে যাইতে হয় তাহা ভাবিতেও লোকের রক্ত জল হইয়া আসে! তবু কিন্তু এ দেশে মামলার সংখ্যা কমিতেছে না। মহাত্মার নির্দ্দেশের মধ্যে দেশবাসীর বিচারালয় পরিহারের কথাও আছে—সে নির্দ্দেশমত কার্য্য দেশে চলিলে অর্থের অনেক অপব্যয় বাঁচিবে, সাধারণের অনর্থক কলহস্পৃহা—পরধন সম্পত্তি লোলুপতা ও মামলাবাজী মিটিবে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় কাগজশিল্প রক্ষণ শুল্ক ঃ—ভারতীয় কাগজ শিল্প রক্ষণনীতির সাহায্য পাইবার যোগ্য কিনা ট্যারিফ্ বোর্ড সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান শেষ করিয়াছেন। ট্যারিফ্ বোর্ডের অনুসন্ধানফল ও মন্তব্য ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে পেশ করা হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা বিবেচনা করিয়া দেশের হিতার্থে ইহা মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করিবেন। দেশীয় শিল্প রক্ষণ ও উৎসাহ দানের ভার আজ প্রকারান্তরে দেশবাসীর হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে দেশসভার সভ্যেরা বিদেশজাত পণ্যের উপর দেশজাত পণ্যের প্রার্থিত কর বসাইয়া বিদেশী পণ্যের প্রচার পথ এদেশে রুদ্ধ করিতে পারেন। স্বদেশীর আগে পোষণ ও শ্রীবৃদ্ধি, পরে বিদেশী। বিদেশী কাগজের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কলের কাগজ ভারতের বাজারে বিকাইবার সুযোগ করিতে পারিতেছে না, মাল এইভাবে বন্ধ হইয়া থাকিবার দরুণ তাহাদের কারখানা বন্ধ করিতে হইতেছে এ সময়ও যদি ভারতীয় কাগজ শুল্ক রক্ষণনীতির সুবিধা না পায় তবে আমাদের স্বদেশী শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি কোন দিনই সম্ভব হইবে না। আমাদের আশা আছে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা ভারতীয় শিল্প রক্ষার জন্য বিদেশী তৎশ্রেণীর দ্রব্যের উপর রক্ষণ শুল্কনীতির সমর্থন করিবেন। বাংলার প্রভাবশালী ১৭ খানি নানা মতের সংবাদপত্র রক্ষণ শুল্ক দ্বারা স্বদেশী কাগজ শিল্প রক্ষার আবেদন ট্যারিফ্ বোর্ডে পাঠাইয়াছিলেন। বাংলার জনমতের প্রভাবশালী নেতারা রক্ষণ শুল্কের প্রবর্ত্তন চাহিতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

শিক্ষা ধর্ম্ম হইতে পারে কখন ঃ—শিক্ষার ক্ষমতা অসীম, তবে কু-শিক্ষা বর্জ্জনীয়। এই সে দিন ক্রোড়পতি মিঃ ডিউক শিক্ষা ও দান ধর্ম্মে ৪৬ কোটি ডলার দান কালে বলিয়াছেন 'I recognize that edu-

cation when conducted along sane and practical as opposed to dogmatic and theoretical lines is, next to religion, the great civilizing influence."

ম্যাট্রিক পরীক্ষার বয়স ঃ—১৬ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়া যাইত না। সম্প্রতি সেনেট কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে ১৫ বৎসর বয়সেই ছেলেরা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটের বয়স কমানো বাড়ানো লইয়া অনেক সময় নানা মিথ্যাচার অবলম্বিত হইয়া থাকে। নিয়মকে এড়াইয়া সুবিধা পাইবার জন্যই ছাত্রের অভিভাবক ও ছাত্রেরা এরূপ করিতে বাধ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরা এই নিয়মের একটু হ্রাস করিয়া সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছেন।

শিক্ষার জঞ্জাল ঃ—জগতের অনেক বিখ্যাত লোক ১৬ বছরে গ্রাজুয়েট হইয়াছেন অনেকে আবার ১৬ বছরে হাতে খড়িও দেন নাই। দেশের সকল বিদ্যার্থীকেই মায়ের কোল ছাড়িতে না ছাড়িতেই এই যে নানা বিদ্য, পুঁথিপত্র ও খাতার ভারে পীড়িত করা হইতেছে ইহা সমীচিন কি? এ দেশে রক্তশোষী শিক্ষার জুলুমে শিশুর স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ মাটি হইতেছে—পুত্র কন্যার শিক্ষার ব্যয় ভারে ও ভবিষ্যৎ ব্যর্থতায় পিতামাতাও ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। দেশের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার উপর দিয়া একটা প্রচণ্ড রক্তশোষী ব্যবসায় চলিয়াছে—এ ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীদের স্বার্থসিদ্ধি হইলেও যাহাদের উপর দিয়া এ ব্যবস্থা চলিতেছে তাহার মধ্যে শতকরা ৯৯ জনেরই জীবন ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। যে শিক্ষায় দেশের লোককে কর্ম্মী, আনন্দপূর্ণ, সুখী করিতে না পারে সে শিক্ষা জীবনে কোন উপকারেই আসে না। দেশের নবজাগরণের দিনে এ ধারার শিক্ষার জঞ্জাল দূর করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ব্যবসায়ে জুলুম ঃ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত সংগ্রহ পাঠ্যগুলির (Selections) মূল্য অপরিমিতরূপে বেশী। নির্দ্ধারিত ছাপা মূল্যের চেয়েও দু'চার আনা বেশী মূল্যে ইহা কলিকাতার পুস্তকালয়েই বিক্রীত হয়। কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বলের ছেলেদের এ সব বহি আরও বেশী মূল্যে কিনিতে হয়। কলিকাতার পুস্তক বিক্রেতাদের এ সব বহি পাইবার অনেক অসুবিধা আছে। হাজার টাকার বহি একসঙ্গে কিনিলে শতকরা মাত্র পাঁচ টাকা কমিশন মিলিবে—তাহাও মুদ্রায় নহে, টেকস্ট ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত অন্য বহিরূপে। বিশ্ববিদ্যালয় নিজে পুস্তক প্রকাশকের ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পর হইতে এ বিভাগে যাহা জুলুম চলিতেছে তাহা অপ্রকার নানা জুলুমকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচিত সংগ্রহ পাঠ্যের স্বতন্ত্র কোন গৌরব নাই—ভ্রমপ্রমাদও ইহাতে থাকে, ছাপার ভুলও দুষ্প্রাপ্য নহে। তবু ছেলেদের এই বহিই বেশী দামে না কিনিলে চলিবে না, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রচেষ্টা তাহা হইলে নষ্ট হইবে। পাঠ্য বহির এমন খেয়ালমত মূল্য প্রকাশকেরা করিলে শিক্ষাবিভাগ তাহা তখনি নামঞ্জুর করিতেন—কিন্তু স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ের এ জুলুম নিবারণ করিবে কে? ছাত্র ও অভিভাবকেরা শিক্ষার ব্যয়ভারে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে এ সময়ে পাঠ্যবহির এই ধরণের বিচিত্র ব্যবসায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি করিয়া অম্লানবদনে চালাইতেছে তাহা ভাবিতেও বিস্ময় লাগে। পাসের উপর ছেলেদের এখনও যেরূপ মোহ আছে তাহাকে পাস বিতরণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় টাকার খাকৃতি অনায়াসে মিটাইতে পারেন—কিন্তু এভাবের পুস্তক ব্যবসায়ে যে পেটও ভরে না—দুর্নামেও রাজ্য ছাইয়া যায়।

নূতন ডায়েরী ঃ—শিক্ষিত সমাজে ডায়েরীর ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কর্ম্মী লোকের ডায়েরী না হইলেই চলে না—তাই ভাল ডায়েরী অনেকেই খুঁজিয়া থাকেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ পুস্তকব্যবসায়ী ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী এবার ষ্টুডেণ্টস্ ডায়েরী নামে একখানি অতি সুদৃশ্য মনোরম, কার্য্যকরী ডায়েরী বাহির করিয়াছেন। ছোট ধরণের এত সুন্দর ও সস্তা পকেট ডায়েরী আমাদের

চোখে বেশী পড়ে নাই। ঝকঝকে তকতকে ডায়েরীখানি প্রকাশকের সুরুচি ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানে উজ্জল লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ছয় আনা মূল্যে এই সুন্দর ডায়েরীখানা পাইয়া সকলেই খুসী হইবেন আশা করা যায়।

রাজসাহী কলেজের কুমুদিনীবাবু পরলোকে ঃ—গত শনিবার ৬০ বৎসর বয়সে রাজসাহী কলেজের খ্যাতনামা প্রিন্সিপাল রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। রাজসাহী কলেজের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা কুমুদিনীবাবুর জন্যই। প্রিন্সিপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যা ও বুদ্ধির খ্যাতি দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বাংলার শিক্ষাবিভাগের একটি গৌরবস্তম্ভ খসিয়া পড়িল।

পরলোকে সরোজনলিনী ঃ—শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী সরোজনলিনী দত্ত গত সোমবার পরলোক গমন করিয়াছেন। সরোজনলিনী স্বামীর সর্ব্বকার্য্যের সহায় ছিলেন, নিজেও দেশীয় ভগ্নীদের উন্নতির যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। অসময়ে প্রেমময়ী কর্ম্মকুশলা পত্নী হারাইয়া গুরুসদয়বাবুর হৃদয় ভাঙ্গিবার কথা—ভগবান শান্তির প্রলেপে ও কর্ম্মের প্রবাহে তাঁহাকে সুস্থ করুন।

সরস্বতী পূজা ঃ—আগামী সপ্তাহে সরস্বতী পূজা। শিক্ষিত, কলাবিদের আরাধ্যা দেবী সরস্বতী। সরস্বতী পূজার দিন নানাস্থানে আনন্দ সম্মেলনের ব্যবস্থা হয় বটে, কিন্তু সাহিত্যিকদের সারস্বত সম্মেলনের তেমন ব্যবস্থা এত বড় সহরেও নাই ইহা দুঃখের কথা। সরস্বতী পূজার সময় তেমন ব্যবস্থা হইলে সুখের কথা। সংবাদপত্রসেবিসঙ্ঘ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইতে পারেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ—গত সপ্তাহে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব গিয়াছে। স্বামীজীর বহু স্বদেশী ও বিদেশী ভক্ত সেদিন মঠে সমবেত হইয়া স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। ভারতের নবযুগকে মহিমান্বিত করিবার জন্য যাহারা জ্ঞান ও আশার আলো লইয়া পথ দেখাইয়া চলিয়াছেন তাহার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম প্রধান। ভারতের এই কর্ম্মী সাধক অকালে কালের করাল কোলে ঢলিয়া পড়িলেও মহামানবতার জন্য তিনি তাঁহার স্বল্প পরিসর জীবনে যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বহুমূল্য। সে সম্পদ সহায়ে একটি বিরাট মনুষ্যত্বপূর্ণ জাতি গঠিত হইতে পারে। নবযুগের জাতি গঠন প্রচেষ্টায় কর্ম্মীরা এই সাধক পুরোহিতের বাণীকে রূপ দিতে চেষ্টা করিলে ভারতজীবন অনেক দিকেই সার্থক হইতে পারিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—নবযুগের অনেক গ্রাহক প্রায়ই আমাদের জানান যে 'নবযুগ' তাঁহারা নিয়মিত পাইতেছেন না। অথচ লিষ্ট যথারীতি দেখিয়া মিলাইয়া গ্রাহকদের যথাসময়ে নবযুগ প্রেরিত হইয়া থাকে। তবু প্রতি সপ্তাহে অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য অভিযোগ আসে। গ্রাহকদের প্রতি বিশেষ নিবেদন, তাঁহারা যেন স্থানীয় ডাকঘরে কাগজখানির বিশেষ অনুসন্ধান করেন ও অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য ডাক বিভাগের কৈফিয়ৎসহ আমাদের জানান। বারবার এইভাবে কাগজ পাঠাইতে হইলে আমাদের অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়।
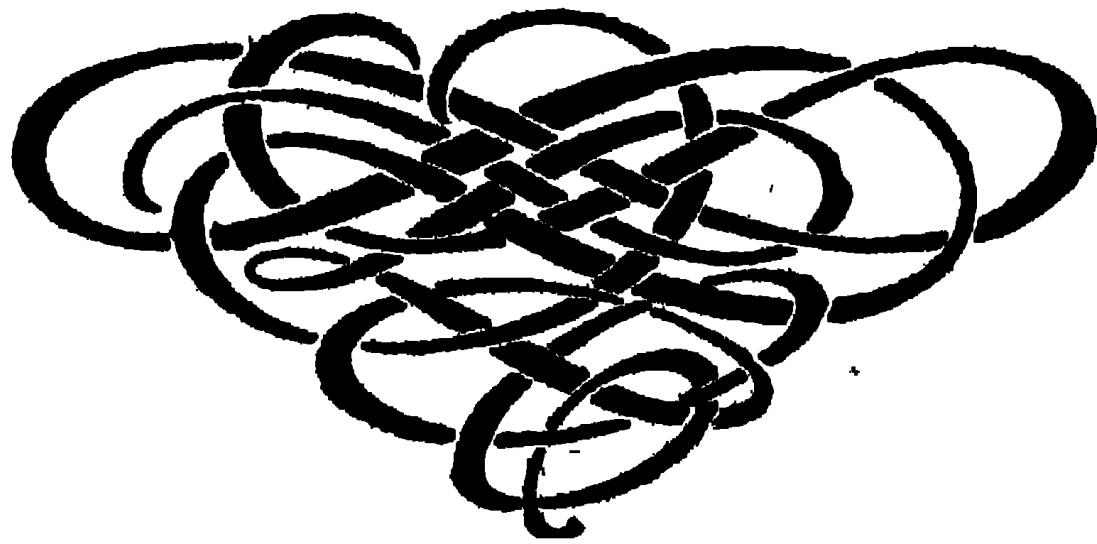
মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সার সঙ্কলন

সাবাস ঃ—লর্ড লীটনের বিরুদ্ধে দেশবন্ধুর সর্ব্বশেষ জয় একটি চমৎকার ব্যাপার। ঐ সময় দেশবন্ধু অসুস্থ ছিলেন এবং একখানি ষ্ট্রেচারে করিয়া তাঁহাকে কাউন্সিল গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। এই দৃশ্য তাঁহার বিজয় গৌরবকে একটি সহজ অভিনয়ের শোভা দিয়াছিল। অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার কাউন্সিলগৃহে অবস্থিতিই বক্তৃতার চেয়ে বেশী কাজ দিয়াছিল। যদি লর্ড লীটনের কিছুমাত্র কল্পনাশক্তি অথবা খেলোয়াড়ের ভাব থাকিত, তাহা হইলে এই প্রত্যাখ্যানের পর তিনি অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করিয়া বন্দিগণকে ছাড়িয়া দিতেন এবং তিনি বাঙ্গালাদেশে যে বিপ্লববাদ আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহার সমস্ত দায়িত্ব দেশবন্ধু ও তাঁহার সমর্থনকারিগণের উপর ন্যস্ত করিতেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অধিকাংশ সদস্যের আচরণ সম্বন্ধে তাঁহার অভিযোগ করা কর্ত্তব্য নহে,—জনপ্রিয় ব্যবস্থাপকসভার তাৎপর্য্য এই যে, সদস্যের যুক্তিযুক্ত সহায়তার উপরই নির্ভর করে, হইতে পারে তাহারা সময় সময় সন্দেহ, একগুঁয়েমী ও বুদ্ধিহীনতা প্রকাশ করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের তখন ধৈর্য্য-সহকারে তাহাদিগকে মতান্তরিত করিতে চেষ্টা করিয়া, যাহাতে দেশে কু-শাসন না হয়, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। একটি লোকপ্রিয় পরিষদ কেন স্বেচ্ছাচারের হাত হইতে রক্ষিত হইবে না? লর্ড লীটন একথা স্বীকার করিতে পারেন না যে, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থাতেই সমস্ত রাজনৈতিক দুর্ঘটনা দূরীভূত হইয়া যাইবে; কিন্তু একথাও ঠিক যে, জনসাধারণ এবং সমস্ত সংবাদপত্র একযোগে লীটন-নীতির নিন্দা করা সত্ত্বেও জনমত উপেক্ষিত হইবে, কারণ গবর্ণমেণ্ট জনমতকে উপেক্ষা করিতে অভ্যস্ত। কাজেই আমি আমার দেশবাসিগণকে বলি যে, তাঁহারা যদি তাঁহাদের মতকে শক্তিশালী করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদের চরকা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে উহাই দেশের মধ্যে উৎপাদক শক্তিসম্পন্ন সহজলভ্য বস্তু। দেশবন্ধু দাশ, কাউন্সিলে শৃঙ্খলা রক্ষার দ্বারা যে কাজ দেখাইয়াছেন, ভারতের প্রত্যেক ঘরে ঘরে চরকা চলিলে এবং তাহার ফলে বিদেশী বস্ত্র সম্পূর্ণ বর্জ্জিত হইলে তাহার অপেক্ষা আরো অধিকতর কার্য্য দেখা যাইবে। আহা, যদি একটা জাতি সম্পূর্ণভাবে একটা প্রত্যক্ষ কার্য্যে মনোনিবেশ করে!

'আনন্দবাজার'

স্যার প্রভাশঙ্কর সূতা কাটিবেন ঃ—

স্যর প্রভাশঙ্কর প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে অর্দ্ধঘণ্টা করিয়া সূতা কাটিবেন। বাহিরে ভ্রমণে বাহির হইলেও তাঁহার সূতাকাটা বন্ধ থাকিবে না, কারণ, তিনি প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন, সেখানে অনায়াসে চরকাতে সূতা কাটিতে পারিবেন। স্যর প্রভাশঙ্করের পক্ষে এ খুবই আশ্চর্য্য ঘটনা। আশা করি তিনি তাঁহার সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারিবেন। তাঁহার উদাহরণে কাথিওয়াড়ের সূতাকাটা আন্দোলন যথেষ্ট উৎসাহ পাইবে। স্যর প্রভাশঙ্কর বোধ হয় কাথিওয়াড় সভায় উপস্থিত থাকিবেন না, আমিও বলিতে চাই চরকার রাজনৈতিক দিক থাকিলেও প্রতি সূতাকাটনীর এ সংস্রবে আসিবার প্রয়োজন নাই। রাজা এবং মন্ত্রীরাও একার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শাসিতদের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ রাখিবেন এ আশাও আমি করি। কাথিওয়াড়ের চাষীরা দরিদ্র এবং তাহাদের অবসর আছে। রাজরাজড়ারা যদি চরকা কাটেন তবে তাহারাও ইহা করিবে ও জাতীয় ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবে। স্যর প্রভাশঙ্কর কি করিয়া সূতাকাটায় সম্মতি দিলেন বলিতেছি :—তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া বিষয় নির্ব্বাচন সভায় উপস্থিত হন। সূতা কাটা প্রস্তাব গৃহীত হইলে যাঁহারা ইহাতে ইচ্ছুক তাঁহাদের নাম দিতে আমি অনুরোধ করি। অনিচ্ছুকদের মধ্যেও দু'জনকে চাই। আনন্দধ্বনির মধ্যে স্যর প্রভাশঙ্কর তখনি ইহাতে সম্মতি দেন। স্যর প্রভাশঙ্করের শিক্ষক-রূপে আমিই তাঁহাকে সূতাকাটা শেখাই। আশা করি অপরাপর শাসক ও মন্ত্রীরা প্রভাশঙ্করের মহৎ আদর্শ লইয়া নিজেদের ও প্রজাসাধারণের উপকার করিবেন।

থিয়েটারে ব্যভিচার *

দেশের দুর্ভাগ্যে এখন ব্যভিচার-দোষ ক্রমেই বহুল-ভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে। ইহা আর জাতির নিম্ন স্তরে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। এখন অন্দরে বাহিরে ব্যভিচার, ধর্ম্মে কর্ম্মে ব্যভিচার, সাহিত্যে সঙ্গীতে ব্যভিচার যাত্রা-থিয়েটার বায়স্কোপে ব্যভিচার,—সবই যেন ব্যভিচার-ময়। ব্যভিচারের মাত্রা বৃদ্ধিতে জাতির মরণ লক্ষণই সূচিত হইয়া থাকে। বাঁচিতে হইলে, ইহার প্রতিকার বিধান সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

অশ্লীল পুস্তকের প্রচার এবং মাসিকপত্রিকাদিতে অশ্লীল চিত্রের আদর যেমন সাহিত্যে ব্যভিচারের পরি চায়ক, কলিকাতার মনোমোহন থিয়েটারে পরলোকগত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত যে "পাষাণী" নাটকের অভিনয় হইতেছে, তাহা তেমনি রঙ্গালয়ের ব্যভিচারের চূড়ান্ত উদাহরণ। শৌণ্ডিকালয় ও গণিকালয় অপেক্ষা রঙ্গালয় যে কিছু উচ্চস্তরে অবস্থিত,—"পাষাণী'র অভিনয় দেখিলে তাহা মনে হইবে না। শৌণ্ডিকালয়ের বা গণিকালয়ের ব্যভিচার সমগ্রজাতিকে কলঙ্কিত করে না, কিন্তু রঙ্গালয়ের ব্যভিচার সমগ্রজাতিকে কলঙ্কিত করে, অতএব তাহা অমার্জ্জনীয়। একে ত' "পাষাণী" পুস্তক-খানিই জঘন্য, বাঙ্গালা ভাষায় এমন জঘন্য নাটক অল্পই রচিত হইয়াছে, তাহার উপর থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ অভিনয়ে তাহাকে আরও জঘন্য করিয়া তুলিয়াছেন।

"পাষাণী" যুগ যুগান্তর প্রসিদ্ধ পুণ্যপূত অহল্যা-চরিত্র অবলম্বনে লিখিত পঞ্চাঙ্ক নাটক। তথাপি ইহাকে জঘন্য এবং ইহার অভিনয়কে আরও জঘন্য বলিতেছি কেন, শুনুন।—আপনি ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দু, প্রতি প্রভাতে আপনি অহল্যার নাম স্মরণপূর্ব্বক শয্যাত্যাগ করেন, কারণ আপনি জানেন,—অহল্যার নাম মহাপাতকনাশন। থিয়েটারে এই আদর্শ নারীচরিত্রের অভিনয় হইতেছে শুনিয়া আপনার তাহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেখানে গিয়া আপনি কি দেখিবেন? দেখিবেন,—সেই গৌতমঘরণী, শতানন্দজননী, সাধ্বী শিরোমণি অহল্যা নহে, 'পাষাণী'র অহল্যা চরিত্র লম্পট পুরুষের পরম লোভনীয় ঘৃণ্য জঘন্য কামচারিণী কুলটাচরিত্র অপেক্ষাও কুৎসিৎ। দেখিবেন,—সেই সতত পতিসেবাপরায়ণা পতি-অনুরাগিণী অহল্যা নহে, 'পাষাণী'র অহল্যা তাহার অদম্য কামাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য আশ্রমের বাহিরে পরপুরুষের সন্ধাননিরতা! দেখিবেন, সেই পুত্র শতানন্দের প্রতি সতত স্নেহবতী মূর্ত্তিমতী মাতৃশক্তিরূপিণী অহল্যা নহে, 'পাষাণী'র অহল্যা কামবিহ্বলা স্বহস্তে পুত্রঘাতিনী পিশাচী! আর দেখিবেন,—স্বর্গ রাজ্য একটা প্রকাণ্ড শৌণ্ডিকালয়, স্বর্গপতি দেবরাজ ইন্দ্র মুহুর্ম্মুহু সুরাপান করিয়া, পবন হুতাশন বরুণ প্রভৃতি দেবতারূপী দস্যুদের সাহায্যে ত্রিভুবনে কোথায় কে সুন্দরী যুবতী আছে, তাহারই সন্ধান করিতেছেন। অহল্যা চরিত্র আপনার বিদিত, তাই আপনি থিয়েটারে এই দৃশ্য

* গত ৪ঠা মাঘের বঙ্গবাসী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

দেখিয়া কুসংস্কারাপন্ন হইবেন না, কেবল অন্তরে আঘাত পাইবেন। কিন্তু যাহারা অহল্যাচরিত্রের গূঢ়তত্ত্ব অবগত নহে, যাহারা শাস্ত্রবিদ্ সংস্কৃতজ্ঞ নহে, যাহারা ঋষিবর্ণিত বিবরণের মূল মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই, অথবা যাহারা বিদেশী বিধর্ম্মী,—তাহারা থিয়েটারে এই বিকৃত অহল্যা-চরিত্র দেখিয়া কি মনে করিবে, একবার ভাবুন দেখি! তাহারা কি মনে করিবেন না যে,—হিন্দুদের অহল্যা একটা ঘৃণিত কুলটা, রাজর্ষি জনকের পুরোহিত শতানন্দ গণিকাপুত্র এবং দেবরাজ ইন্দ্র লম্পটের নায়ক? গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ থিয়েটারের এই বিকৃত অভিনয় দেখিয়া প্রাণে আঘাত পাইবেন না? থিয়েটারের এই ব্যভিচার হিন্দুর ধর্ম্মভাবের ঘোর অপমানজনক, হিন্দুজাতির অমর্য্যাদাজনক, হিন্দুর নারীচরিত্রের কলঙ্কজনক, হিন্দুর ঋষি-বাক্যের অগৌরবজনক।

সংক্ষেপে কয়েকটি দৃশ্যের পরিচয় দিতেছি, তাহা হইলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন আন্দোলন কত কঠিন। প্রস্তাবনার দৃশ্য—স্বর্গরাজ্য, বরুণ পবন হুতাশন চন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণে পরিবৃত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র পুনঃ পুনঃ পাত্রে সুরা পান করিতেছেন। অন্যান্য দেবতারাও অতি-রিক্ত সুরাপানে অপ্রকৃতিস্থ, অপ্সরা মেনকা রম্ভা তাহাদিগকে ঘিরিয়া বিলাস বিভঙ্গে অঙ্গ দুলাইয়া নাচিতেছে, গাহিতেছে। মদের স্রোত, আর মেয়ে মানুষের তরঙ্গ, দেবগণ আত্মহারা হইয়া তাহাতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। পরামর্শ হইতেছে,—উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা 'নেহাৎ পুরাণো' হইয়া গিয়াছে, এখন একটা বেশ 'যুতসই' নারীর সন্ধান করিতে হইবে। ইহাই স্বর্গরাজ্যের দৃশ্য বলিয়া দেখানো হইতেছে। ছিঃ ছিঃ, স্বর্গের দৃশ্য যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে নরকের দৃশ্য আর কি হইবে? "পাষাণী" পুস্তকে ইহা প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য। কিন্তু থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ইহাকে টানিয়া বাহির করিয়া প্রথমেই দেখাইয়াছেন। বোধ হয় মুখপাতে অভিনয়ের নমুনা দেখানই উদ্দেশ্য! ইহার পর, প্রথম অঙ্কেরই একটি দৃশ্য,—পুস্তকে দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য—মহর্ষি গৌতমের অনুপস্থিতিকালে শতানন্দমাতা অহল্যা সন্ধ্যার সময় তপোবন-পথে দাঁড়াইয়া আছেন। দূরে এক সুদর্শন যুবা পুরুষকে দেখিতে পাইয়া তিনি তাহাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন—আজ রাত্রিতে আমার আশ্রমে থাকিয়া যাও। এই যুবা তাপসবেশধারী ইন্দ্র। তিনি বলিলেন,—না, তোমার আশ্রমে যাইব না। অহল্যা বলিলেন,—হাঁ যাইতেই হইবে; আমি তোমার দাসী, তুমি আমার প্রাণেশ্বর। ইন্দ্র ইহাতেও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন বলিয়া, অহল্যা তাঁহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ছিঃ ছিঃ, পথের ধারে যে বেশ্যারা দাঁড়াইয়া থাকে, এ দৃশ্য দেখিলে তাহারাও বোধ হয় লজ্জা বোধ করিবে। হায় সম্মার্জ্জনি! তুমি কি চিরকালই অন্দরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে? আর এক দৃশ্য—পুস্তকে দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য—কিছু-কাল তপোবনে কুৎসিত ভোগ সম্ভোগের পর অহল্যা ও ইন্দ্র উভয়ে পরামর্শ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছেন। রাত্রির শেষভাগ সুপ্ত শিশু শতানন্দ অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে অহল্যাকে নিকটে না দেখিয়া মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু অহল্যা তখন এমনই কামোন্মাদিনী যে, পুত্রকে তাহার সুখের পথে কণ্টক বুঝিয়া, ইন্দ্রের পরামর্শে স্বহস্তে শিশুর কণ্ঠরোধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন এবং ইন্দ্রের সহিত আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। শতানন্দ মরে নাই, দৈবক্রমে সে প্রাণে বাঁচিয়া ছিল। এ কি অহল্যার দৃশ্য—না পুত্রঘাতিনী পিশাচীর দৃশ্য? এ কি রামায়ণের অহল্যা, না পাশ্চাত্য রমোন্মাসের কোন রঙ্গিণী রমণী? অহল্যার পবিত্র নামের ছাপ দিয়া থিয়েটার কর্তৃপক্ষ হিন্দুকে কি বীভৎস নারকীয় দৃশ্য দেখাইতেছেন। আর একটি দৃশ্য—ইহা পুস্তকে তৃতীয় অঙ্কে পঞ্চম দৃশ্য, অভিনয়ে তৃতীয় অঙ্কে তৃতীয় দৃশ্য—কৈলাস পর্ব্বতের এক রম্য উপবনে ইন্দ্রের উপপত্নীরূপে অহল্যা। রতি ও মদন আসিয়া গান করিতেছে,—"ফুল ফুটেছে চাঁদ উঠেছে আস্‌ছে ভেসে মলয় বায়। * * * আপন মনের মানুষ বিনে প্রাণ ধরে কি থাকা যায়॥" অহল্যা 'আরও দাও, আরও দাও' বলিতে বলিতে কিছুক্ষণ ধরিয়া আকণ্ঠ সুরা পান করিয়া লইলেন এবং তাহার পর বেশ নেশা জমিয়া উঠিলে, তিনিও রতি-মদনের সহিত গান ধরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সময়ে অহল্যার জড়িত কণ্ঠের "প্রাণ ধোরে কি থাকা যায়"

গানের অস্ফুট উচ্চারণ এবং স্খলিত পদের খেমটা নাচ দেখিয়া মনে হয়,—ছিঃ ছিঃ, জাতিটার কি অধঃপতনই ঘটিয়াছে। শিক্ষিত ভদ্রসন্তানেরা পয়সার জন্য শেষে পুণ্যস্মৃতি অহল্যাচরিত্রও এইরূপ কুৎসিত করিয়া দেখাইতেছে, আবার বহু ভদ্রসন্তান ইহা পয়সা দিয়া দেখিতেছে। পঞ্চানন্দ কোন সম্পাদককে বলিয়াছিলেন, মাকে গালাগালি দাও, পয়সাও মিলিবে, মানহানিও হইবে না, ইহাও কতকটা তাই। অহল্যা সতী সকলেই জানে, তাহাকে বেশ্যা বানাও, রোজগার হইবে, অথচ মুখ পুড়িবে না। হিন্দুর শাস্ত্রপুরাণ যে বে-ওয়ারীশ মাল! হায়! হায়! যাহার এমন উচ্চ আদর্শকে তাহাদের ঘৃণা রুচির অনুরূপ ক্ষুণ্ণ করিয়া দেখাইতে বা দেখিতে আমোদ উপভোগ করে, তাহাদের পরিণাম কি ভয়ানক! আর একটি দৃশ্যের উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। ইহা পুস্তকের তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য, অহল্যা ইন্দ্র কক্ষে উপস্থিত। ইন্দ্র স্বর্গে যাইতে উদ্যত অহল্যা বলিতেছেন—আমার ভোগের আকাঙ্ক্ষা এখনও মিটে নাই, তুমি যাইতে পারিবে না। ইন্দ্র কিছুতেই যখন শুনিলেন না তখন অহল্যা কটিদেশ হইতে ছুরিকা লইয়া ইন্দ্রকে হত্যা করিলেন পুস্তকে আছে, অহল্যা ইন্দ্রের স্কন্ধে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন ইন্দ্র পড়িলেন, অহল্যা অট্টহাস্য করিতে করিতে উন্মাদিনীর মত প্রস্থান করিলেন, কিন্তু অভিনয়ে থিয়েটার কর্তৃপক্ষ দেখাইয়াছেন,—ইন্দ্র এই ছুরিকাঘাতে নিহত হইলেন। অতঃপর আর কোন দৃশ্যে ইন্দ্রের উপস্থিতি নাই। গ্রন্থকারের উপর হাত ফলাইতে গিয়া থিয়েটার কর্তৃপক্ষ একটা হাস্যকর ব্যাপার করিয়া বসিয়াছেন। অহল্যা মানবী, কিন্তু ইন্দ্র যে দেবতা এবং দেবতা যে অমর, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহারা ব্যাপারটাকে একটা খুব উত্তেজনাপ্রদ করিতে গিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে অহল্যার জার—রামবাবু শ্যামবাবুর মত—এক ইন্দ্রবাবু করিয়া বসিয়াছেন। হা ধিক্ তোমাদের শিক্ষায়, ধিক্ তোমাদের মানসিকতায়, ধিক্ তোমাদের রুচিতে, আর শত ধিক্ তোমাদের পেটের দায়ে!

এইবার বুঝুন পাঠক, থিয়েটারে কিরূপ ব্যভিচার চলিতেছে। রামায়ণের উপাখ্যানের সহিত "পাষাণী"র উপাখ্যানের মিল নাই, পরন্তু "পাষাণী"র অহল্যা-চরিত্র রামায়ণের অহল্যা-চরিত্রের সম্পূর্ণ বিকার ব্যতীত আর কিছু নহে। রামায়ণের অহল্যা আশ্রমবাসী ঋষির পতিপরায়ণা পুণ্যবতী ব্রহ্মপত্নী, "পাষাণী"র অহল্যা রূপযৌবনগর্ব্বিতা কামলালসা-তাড়িতা পাপীয়সী। রামায়ণের উপাখ্যান,—"এক রাত্রিতে মহর্ষি গৌতমের অনুপস্থিতিকালে দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি গৌতমের বেশ ধারণ করিয়া অহল্যার নিকট উপস্থিত হন এবং সেই ছদ্মবেশেই অহল্যার সতীত্ব নাশ করেন। গৌতম ইহা জানিতে পারিয়া অহল্যা এবং ইন্দ্র উভয়কেই অভিশাপ দেন। অহল্যা গৌতমকে বলেন—'প্রভু, আমার কোন দোষ নাই, ইন্দ্র তোমার বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছিল, আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই, তাই এরূপ ঘটিয়াছে। আমার কামাচারবশতঃ এরূপ ঘটে নাই।' ইন্দ্র দেবতা হইলেও পরবশ মানবীর কোন অবস্থাতেই পরপুরুষ [illegible] অহল্যাকে তিনি [illegible] পারেন নাই। অহল্যার দৈহিক পাপ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ছিল তাই দীর্ঘকাল নিরাহারা বায়ুভক্ষা [illegible] এবং পাষাণের মত নিশ্চল অবস্থায় দীর্ঘকাল তপস্যায় দেহের পাপের অবসান ঘটিলে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তিনি পুনরায় পতির সহিত মিলিতা হইয়াছিলেন।" রামায়ণে এই উপাখ্যান নির্মল শান্ত সংযত ও পবিত্র ভাবপূর্ণ কিন্তু "পাষাণী"র উপাখ্যান একটা কামবিহ্বলা পতিতা নারীর ব্যভিচার কাহিনীতে পূর্ণ, অতি অপবিত্র এবং বিস্ময়গাত্মক। দ্বিজেন্দ্রলাল দেখাইয়াছেন,—অহল্যাকে গৌতম ক্ষমা করিলেন। কিন্তু তাহাতে ঋষিজনোচিত উদারতার পরিবর্ত্তে স্ত্রৈণ পুরুষের দুর্ব্বলতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে, তিনি অহল্যাকে মারেন নাই, অন্ধ করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু থিয়েটার-কর্ত্তৃপক্ষ আবার তাহাতেও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা দেখাইয়াছেন,—অহল্যা গৌতমের নিকট ক্ষমা লাভ করিবার পর, গৌতম যেমন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইবেন, অমনি অহল্যা সেখানে পড়িলেন, তখনই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। রামায়ণের অহল্যা-চরিত্র অদ্ভুত, "পাষাণী"

নাটকের অহল্যা চরিত্র কুক্কুর মূত্র। রামায়ণের আদি-কাণ্ডে দেখিতে পাই, মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন,—"মতিঞ্চকার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ।" অর্থাৎ "ইন্দ্র ছদ্মবেশে—গৌতমের বেশে—আসিলে, অহল্যা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং দেবরাজ বলিয়া আরও কৌতূহলবশে তাঁহার সহিত অবৈধ সহবাসে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।" কিন্তু উত্তরাকাণ্ডে আছে, ইন্দ্র অহল্যাকে ধর্ষিত করিয়া চলিয়া যাইবার পর, অহল্যা নিজেই পতির সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"অজ্ঞানাদ্ ধর্ষিতা বিপ্র ত্বদ্রূপেণ দিবৌকসা। ন কামকারাদ্বিপ্রর্ষে প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।" অর্থাৎ—"হে বিপ্র গৌতম! ইন্দ্র তোমারই রূপ ধরিয়া আসিয়াছিল, তাই আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই, সেই অবস্থাতেই সে আমাকে ধর্ষণ করিয়াছে। কামাভিলাষিণী হইয়া আমি এরূপ করি নাই। আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও।" সতী নারী ব্যতীত কে এমন অকপটে পতির নিকট নিজের পাতিব্রত্যের কথা ব্যক্ত করিতে পারে? দুই স্থানে দুই কথা দেখিয়া পাছে কেহ অহল্যার সতীত্ব সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করিয়া পাপভাগী হয়, এই জন্য মহর্ষি বাল্মীকি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন,—"রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্ম্মুদা।" অর্থাৎ—"শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণ উভয়েই তখন প্রীতিপূর্ব্বক সেই সাধ্বী ঋষিপত্নী অহল্যার চরণ বন্দনা করিয়াছিলেন।" ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র শ্রদ্ধা সহকারে যাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রে যাঁহারা অসতীত্বের আরোপ করিতে পারেন, তাঁহাদের অসাধ্য আর কি আছে? ষোল আনা হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত হইতে না পারিলে, হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থের মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহাদের হৃদয় কদাচারে কলুষিত, তাঁহাদের হিন্দুর রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির নরনারী চরিত্রের আলোচনা করিতে যাওয়াই ধৃষ্টতা।

রামায়ণে অহল্যাচরিত্র ঋষি-মনীষীর অমূল্য দান। মহামতি বাল্মীকির সত্বভাবময় বিশুদ্ধ হৃদয়-কমণ্ডলু-নিঃসৃত এই আদর্শ সাধ্বীচরিত্রধারা যুগান্তর ধরিয়া ভারতে জাহ্নবী প্রবাহের মত অবিচ্ছিন্নভাবে নিত্য নারীসমাজের কতই কল্যাণ সাধন করিতেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল শক্তিশালী কবি হইয়াও, বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যবশে, তাঁহার পাশ্চাত্য-শিক্ষার মদিরা প্রমত্ত মস্তিষ্কে আর্য্যচরিত্র সৃষ্টির এই পবিত্র ভাব ধারণা করিতে পারেন নাই তাঁহার কলুষিত কাচ-পাত্রে পড়িয়া ঐ কমণ্ডলুর পবিত্র ধারাও দূষিত হইয়াছে। তিনি পাশ্চাত্যবিদ্যায় বিভ্রান্ত, বিলাত-প্রত্যাগত, ব্রাহ্মণ। তিনি যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানকৃত কি অজ্ঞান-কৃত, তিনি মৃত সুতরাং তাহা জানাইবার উপায় নাই। তাঁহাকে কিছু বলাও এখন বিফল। কিন্তু মনোমোহন থিয়েটার-কর্ত্তৃপক্ষের এই বে-আদবীর মার্জ্জনা নাই। ১৩০৭ সালে "পাষাণী" প্রকাশিত হয়, তাহার পর হইতে গত ২৪ বৎসর কালের মধ্যে কোন থিয়েটার-কর্ত্তৃপক্ষই এই জঘন্য নাটকের অভিনয় করিতে সাহসী হন নাই। বাঙ্গালায় রঙ্গালয়ের প্রাচীন ধারা যাঁহাদের অস্থিমজ্জায় ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, তাঁহাদের কেহই এখনকার মনোমোহন থিয়েটারের সংশ্রবে নাই। তাই বুঝি এমন অর্ব্বাচীনতার প্রাদুর্ভাব। থিয়েটার-কর্ত্তৃপক্ষ যদি অবিলম্বে "পাষাণী"র অভিনয় বন্ধ না করেন, তাহা হইলে, হে হিন্দু-সন্তানগণ! তোমরা কি হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয়া আদর্শ সতী নারী অহল্যাদেবীর এই বিকৃত কলঙ্কিত চরিত্রের অভিনয় চলিতে দিয়া তোমাদের সমগ্র নারী-সমাজের ঘোর অব-মাননা নীরবে সহ্য করিয়া যাইবে? তীর্থে অনাচার অত্যাচারের প্রতিরোধে তোমাদের যে দেশাত্মবোধ উদ্দীপিত হইয়াছিল, পুলিশ-প্রশংসা প্রসঙ্গে গবর্ণর লর্ড লিটনের মুখে ভারতের নারীচরিত্রের কলঙ্ক ঘোষণা শুনিয়া তাহার প্রতিবাদে তোমাদের প্রাণে যে কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উন্মেষ হইয়াছিল, মাতৃজাতির মর্য্যাদা সংক্ষেপে চিরদিনই তোমাদের যে সৎসাহসের সুখ্যাতি সুবিদিত,—হে হিন্দু-সন্তানগণ! আজ তোমাদের সে দেশাত্মবোধ কোথায়? খৃষ্টান, মুসলমান বা শিখের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কোন চরিত্র লইয়া এমন বিকৃতভাবে অভিনয় করিলে, রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃ-পক্ষের আজ কি অবস্থা হইত? যে নাটকে কোন শ্বেতাঙ্গ-চরিত্র আছে, পুলিশ-কর্ত্তৃপক্ষ তাহা পূর্ব্বে দেখিয়া শুনিয়া অনুমোদন করিলে তবে তাহার অভিনয় হইয়া থাকে। শিখ এবং মুসলমানেরাও এপক্ষে উদাসীন নহেন। কিন্তু হিন্দুরা কি চিরদিন ঘুমাইয়া থাকিবে? কোথাকার কে

এক শ্বেতাঙ্গ লরেন্স-ফষ্টার চরিত্র আছে বলিয়া পুলিশের হুমকিতে "চন্দ্রশেখর" অভিনয় বন্ধ হইতে পারে, মুসলমানদের আপত্তিতে আওরঙ্গজেব চরিত্রের জন্য "রাজসিংহ" অভিনয় বন্ধ হইতে পারে, "মহম্মদ" নাটকের অভিনয় আরম্ভ না হইতেই তাহা বন্ধ হইতে পারে, "সৎনাম" অভিনয় বন্ধ হইতে পারে, শিখদের আপত্তিতে "গুরু-গোবিন্দ" অভিনয় বন্ধ হইতে পারে,—হিন্দুদের আপত্তিতে "পাষাণী" অভিনয় বন্ধ হইতে পারে না?

রঙ্গালয় হিন্দুর ধর্ম্মশিক্ষার চতুষ্পাঠী নহে, সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর ধর্ম্মভাবের কেন্দ্র স্থানীয় আদর্শ চরিত্রসমূহকে অতি কুৎসিতভাবে বিকৃত করিবার অধিকার রঙ্গালয়েরও নাই। দর্শকদের মধ্যে অনেকে আধুনিক শিক্ষার দোষে কুরুচির পক্ষপাতী থাকিতে পারে, থিয়েটারে, বায়স্কোপে যুবক যুবতীর অবাধ জড়াজড়ি চুম্বন আলিঙ্গন সুরাপান খেমটা নাচ দেখিয়া আমোদ উপভোগ রুচিসম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সেই কুরুচি অনুসারে নাচ গান বা তামাসার দ্বারা মনোরঞ্জন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করাই কি রঙ্গালয়ের চরম লক্ষ্য? না, তা ত নহে। নাচ গান বা তামাসার ভিতর দিয়া কিঞ্চিৎ সৎশিক্ষা, উচ্চ আদর্শ এবং সুনীতি প্রচার করাই এদেশের রঙ্গালয়সমূহের লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রাচীনকালে, কথকতা ছাড়া পাঁচালী কবির দল যাত্রা এই লক্ষ্য লইয়াই চলিয়াছিল। এখন থিয়েটার তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন রুচি, প্রাচীন নীতি, প্রাচীন ধারার ব্যতিক্রম হইবে কেন? নাট্যাভিনয় এদেশে বহুদিন হইতে প্রচলিত। কিন্তু তাহা শুধু এমন কদর্য্যের অভিনয় ছিল না, তাহা সৌন্দর্য্যের অভিনয় ছিল। সুন্দরকে আরও সুন্দর করিয়া দেখানই নাট্যাভিনয়ের সার্থকতার পরিচায়ক, কিন্তু সুন্দরকে কদর্য্য করিয়া দেখান ব্যভিচার। অহল্যা চরিত্র হিন্দুর চক্ষে চিরসুন্দর তাহাকে এমন কদর্য্য করিয়া দেখাইলে নাট্যাভিনয়ের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ অভিনয়ের বিষয় নির্ব্বাচনের সময় এদিকে লক্ষ্য রাখেন নাই। শুধু অর্থাগমের দিকে লক্ষ্য রাখার ফলে তাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন, সুনীতির মাথা খাইয়া কুনীতির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, হিন্দুর ধর্ম্ম হিন্দুর শাস্ত্র, হিন্দুর সমাজ—হিন্দুর সবই যে অসার বলিয়া মনে করিয়া হিন্দুর প্রাতঃস্মরণীয় পূজনীয়া নারীকে দিয়া খেমটা নাচাইয়া লইয়াছেন। [illegible] জন্য তাঁহারা সবই করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর পৌরাণিক সতী চরিত্রের অপমান করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। যাহারা নীচ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এমন অনধিকারের [illegible] করে তাহারা কখনই সমাজের বন্ধু নহে। যাহারা উদরের জন্য অর্থের জন্য এমন নির্লজ্জভাবে হিন্দুর ঋষি আদর্শ প্রতিষ্ঠিত পবিত্র সমাজে ব্যভিচারের বীজ বপন করিতে পারে তাহাদের সমুচিত শাসন কর্ত্তব্য।

— —

Printed & Published by Jnanendra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
14 Jaggannath Dutta Lane Garpar, Calcutta.

সাহিত্যে সমালোচনার স্থান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম, এ

আজকাল সর্ব্বত্র সমালোচনার যেরূপ ধুম পড়িয়াছে, তাহা একপক্ষে যেমন সুখের বিষয় পক্ষান্তরে সেইরূপ দুঃখের বিষয় ও ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমালোচনার দিকে যে জনসাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশেষ পক্ষ সমর্থন বা কোন লেখকবিশেষকে নির্জ্জলা প্রশংসা বা নিন্দা করিবার জন্য যে আলোচনা তাহাকে সমালোচনা বলিতে পারি না। Party System ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রে সুফল প্রসব করিয়াছে এবং Modern Cabinet এর জন্মদান করিয়াছে। কিন্তু সমালোচকের মনে Party spirit প্রবেশ করিলে, সমালোচনা নিন্দাস্তুতিতে পর্য্যবসিত হইবে। আবার গ্রন্থের প্রাপ্তিস্বীকার জ্ঞাপন করিবার জন্য যে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা সাধারণতঃ মাসিক পত্রিকা প্রভৃতিতে বাহির হয়, তাহাতে অনেক সময় সমালোচনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে সংক্ষিপ্ত সমালোচনার এত বিরোধী ছিলেন, * এবং কতকটা দায়ে পড়িয়া এ কার্য্যে ব্রতী হইলেও পরে এজন্য অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমরা বিশেষ জানিয়া এ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। আর করিব না' † বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনার স্বরূপ এবং উপকারিতা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, (যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের "বৃত্রসংহার কাব্যের সমালোচনা পাঠ করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার ইংরেজী ভাষায় "মেঘনাদ বধ" কাব্যের সমালোচনা দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও সমালোচনা-শক্তির সম্যক্ পরিচয় পাইবেন)। Matthew Arnold যেমন *Literary Influence of the academies* নামক প্রবন্ধে ‡ প্রকৃত সমালোচনা ও ভাষাসংস্কারের নিমিত্ত French Academy র ন্যায় সাহিত্য-সমিতি স্থাপনের পক্ষে যুক্তি দেখাইয়াছেন, সেইরূপ বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রথম বৎসরের আষাঢ় সংখ্যায় "বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ" নামক প্রবন্ধে এরূপ সমিতির প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আজকাল যদিও "বঙ্গভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তাহার একতা সম্পাদন করিবার ও সাহিত্য প্রয়োগযোগ্য ভাষা নির্ণয় করিবার ততটা আবশ্যকতা নাই (কারণ, বঙ্গভাষা এখন মনোভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম নহে), তথাপি সৎসাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধন করিবার জন্য এরূপ সমিতির যে একেবারে আবশ্যকতা নাই তাহা কে বলিবে? বঙ্কিমচন্দ্রের দিনে যদি "এমত কোন সর্ব্বজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন না যাঁহার 'প্রচারিত নিয়ম দেশীয় সকল লোকের নিকট মান্য হইবে," আজ কাল সেরূপ প্রভাববিশিষ্ট ব্যক্তি নাই বলিলেই হয়। অবশ্য এরূপ একজন ব্যক্তির অভাবে যে সাহিত্যের বিকাশ হয় না এ ধারণা মূলতঃ ভুল, তবে হয় ব্যক্তিগত নয় সমিতিগত একটা literary standard না থাকিলে গদ্য সাহিত্যের বিকাশ যে সুচারুরূপে হয় না এবং প্রচলিত সাহিত্যে যে গ্রাম্যতা দোষ বা প্রাদেশিকতা (*Provincialism*) আসিয়া পড়ে তাহাতে সন্দেহ নাই। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" ন্যায় শিক্ষিত সম্প্রদায় গঠিত একটি সমিতি যদি এদিকে একটু দৃষ্টি রাখেন তাহা হইলে বোধ হয় বঙ্গীয় সাহিত্যের স্বরূপ অনেকটা মার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত হয়।

শস্যক্ষেত্রে "আগাছা" জন্মিবেই, গাছ জন্মিলেই "পরগাছা' ও জন্মিবে। তবে "পরগাছা" এবং "আগাছা যাহাতে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি না পায় সেদিকে সাহিত্যের রূপ উদ্যানপাল ও ক্ষেত্রপালগণের দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন বন্যার মুখে বাধা প্রদান করিলে বন্যার বেগ শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে, Creative

* ... ... বঙ্গদর্শন দ্রষ্টব্য)

‡ ... series দ্রষ্টব্য)

Epochএর সময় Criticism আনিয়া Creationকে মিথ্যা বাধা দেওয়া উচিত নহে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপ মন্তব্যের স্বপক্ষ বা বিপক্ষে কিছু না বলিয়া যদি তাহা মানিয়াও লওয়া যায় তাহা হইলেও বলিতে হয় পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সাহিত্যমহারথগণের রচনার সম্যক্ আলোচনা করিবার সময়ও কি এখন আসে নাই? ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, বঙ্কিম, নবীন, ভূদেব রমেশচন্দ্র, গিরিশ, দ্বিজেন্দ্র—ইঁহাদের সমালোচনা করিলেও কি কোন অপরাধ করা হইবে (সমালোচনা অবশ্য কিছু কিছু হইয়াছে কিন্তু আরও বিস্তৃত সমালোচনার প্রয়োজন), না তাঁহারা রাগ করিয়া সমালোচকের বিরুদ্ধে মুখ ফিরাইয়া পথের অপর পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবেন? Shakespeare কতগুলি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন† তাহা পর্য্যন্ত গণিত হইয়াছে, তাঁহার সৃষ্ট নরনারীর চরিত্র সমালোচিত হইয়াছে, তাঁহার প্রত্যেক নাটকের Source খুঁজিয়া বাহির করা হইয়াছে, এবং Internal ও External Evidence দ্বারা তাঁহার প্রত্যেক নাটকের রচনাকাল স্থিরীকৃত হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালার Shakespeare গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভা সম্বন্ধে কয়খানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে?* সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা, সুপণ্ডিত অমৃত বসু প্রভৃতি গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক ব্যক্তিগণের জীবদ্দশায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইলে নাট্য-সাহিত্যের পরমোপকার সাধিত হইবে। মধুসূদন সম্বন্ধে অবশ্য দুই এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছে (যথা যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "মাইকেল মধুসূদনের জীবন চরিত" নগেন্দ্রনাথ সোম প্রণীত "মধুস্মৃতি"), জ্যোতিরিন্দ্রঠাকুর, রবীন্দ্র নাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাবান্ লেখকগণ তাঁহার কাব্য-আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধেও এমন অনেক কথা বলিবার আছে, যাহা এখন পর্য্যন্ত বলা হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটি কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মধুসূদন, বাল্মিকী, কালিদাস প্রভৃতির নিকট কতটা ঋণী, তাঁহার "মেঘনাদবধ" কাব্য সত্যসত্যই "Three-fourths Greek" কিনা, এ বিষয় কি কেহ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন? নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যখন মেঘনাদের লক্ষ্মণ ও বিভীষণের সহিত বাগ্‌যুদ্ধ হয়, তখন মধুসূদন-লিখিত কবিত্ব-পূর্ণ-বাক্যাবলির (যথা "কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি……পরঃ পরঃ সদা"; "নিজ দোষে হায়, মজাইলা এ কনক-লঙ্কা……রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী তেঁই আমি", "আমায় মাঝারে মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু ছাড়ে রে কিরাত তারে?" ইত্যাদি) আমরা শতমুখে প্রশংসা করি, কিন্তু উক্তগুলির মধ্যে কতখানি মধুসূদনের নিজস্ব ও কতখানি বাল্মিকী হইতে সংগৃহীত তাহা কি কেহ তুলনা করিয়াছেন? মেঘনাদ-বধের পর মধু-বর্ণিত বিভীষণের খেদের সহিত বালিবধের পর বাল্মীকি-বর্ণিত সুগ্রীবের খেদ কি তুলনীয় নহে? আবার, "অন্যায় সমরে" বীরাগ্রগণ্য বালী পতিত হইলে, বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের মুখ দিয়া (তাঁহার দোষ-স্খলনার্থ) যে সব যুক্তি অবতারণা করিয়াছেন তাহার সহিত লক্ষ্মণ ও বিভীষণের মুখ দিয়া, মধুসূদন যে সব যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া মধুসূদন "রত্নাকরের" নিকট রত্নরাজি লইয়া নিজ প্রতিভা-বলে কিরূপ ভাবে নূতন হার রচিয়াছেন তাহা কি কোন সমালোচক দেখাইয়াছেন? অনেকে বলেন, মধুসূদন লক্ষ্মণকে ভীরু কাপুরুষ করিয়া গড়িয়াছেন* কিন্তু কবি কি

† He uses 15,000 words, and he writes pure English out of every five Verbs, adverbs and nouns (e g in the last act of Othello) four are Teutonic and he is more Teutonic in Comedy than in Tragedy."—Stopford Brooke's Primer of English Literature (1900) p 90

* অবশ্য শ্রীযুক্ত অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "গিরিশচন্দ্র" ও পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিত "গিরিশচন্দ্র" এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য। ৺কালিদাস মিত্র ও শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিত গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীও উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত সমালোচনা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

* যে লক্ষ্মণ চণ্ডীর দেউলে যাইবার সময় মায়াসৃষ্ট ভীষণ ঝড় ও দাবাগ্নিকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি "জয়রামনাদে" মায়াসিংহকে রণে আহ্বান করিয়াছিলেন, যিনি স্বয়ং চন্দ্রচূড়কেও সমরে আহ্বান করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, যিনি মায়া-সুন্দরীগণের কুহকে না ভুলিয়া জিতেন্দ্রিয়তা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, যিনি পুত্র-শোকাতুর সমরে দুর্ব্বার রাবণের রণসাধ মিটাইতে তিলমাত্র দ্বিধা করেন

লক্ষ্মণকে একেবারেই কাপুরুষ করিয়া গড়িয়াছেন? আবার, শ্রীরামচন্দ্রের প্রেতপুরীদর্শন দৃশ্য ছাড়া কোথায় কোথায় মধুসূদন পাশ্চাত্য Classic writerদের অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়াছেন (পাশ্চাত্য কবিদের ও মধুসূদনের রচনাংশগুলি উদ্ধৃত করিয়া তুলনামূলক আলোচনা করিতে হইবে, শুধু মুখে বলিলেই হইবে না, স্থানে স্থানে Danteর গন্ধ পাই বা Homerএর ছায়া দেখি, আরও মনে রাখিতে হইবে Spenser এবং Miltonও এ বিষয় Classical Authorদের নিকট সমভাবে ঋণী) তাহা কি কোন সমালোচক বিশদভাবে দেখাইয়াছেন? মধুসূদনের নাটকগুলি সংস্কৃত নাটকানুযায়ী না পাশ্চাত্য নাটকানুযায়ী? তাঁহার "প্রহসন" দুইখানির প্রভাব দীনবন্ধু প্রভৃতির উপর কতখানি ও সেগুলির মৌলিকত্ব কোথায়?—এই সব প্রশ্নের সদুত্তর কয়জন সমালোচক দিয়াছেন? যদি কেহ দিয়া থাকেন ত তিনি নিশ্চয়ই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার পাত্র সন্দেহ নাই।

মধুসূদন সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইল, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও তাহা অনেকটা খাটে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে অনেক পুস্তক বাহির হইয়াছে ও তাঁহার প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলির সমালোচনা বহুস্থলে হইয়া গিয়াছে। ৺গিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত "বঙ্কিমচন্দ্র", শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত "বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম", শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন চরিত' অধ্যাপক অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত প্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাজি বঙ্কিম সাহিত্যের উপর উজ্জ্বল আলোকপাতে তাহাকে সমুদ্ভাসিত করিয়াছে। ইহা ছাড়া অক্ষয়কুমার সরকার, নবীনচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্র বিজয় বসু ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকগণ অল্প বিস্তর বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে লিখিয়া ও তাঁহার রচনাবলির সরস সমালোচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। কিন্তু এখনও বিস্তর প্রশ্ন আছে যাহার সদুত্তর আমরা আজ পর্য্যন্ত বোধহয় পাই নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের বৈশিষ্ট্য কি? (এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা যে হয় নাই, তাহা নহে, তবে আরও হউক এই আমাদের প্রার্থনা)। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য কবি, দার্শনিক ও উপন্যাসকারগণের নিকট কতটা ঋণী? সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের উপর তাঁহার কতটা দখল ছিল? তিনি বাঙ্গালায় উপন্যাস রচনায় pioneer কিনা?[*] তাঁহার বাস্তবচিত্রণ (Realism) বা কোথায়? আবার আদর্শচিত্রণই (Idealism) বা কোথায়?[†] তাঁহার সৃষ্ট নরনারীগণ True to the life, না Ideal না Typical?[‡] তিনি গল্প রচনা করিবার সময় সংগৃহীত উপাদানগুলি কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতেন (উপন্যাস, উপন্যাস মাত্র, ইতিহাস নহে, ইত্যাদি বঙ্কিম লিখিত বাক্যাবলি পাঠে আমরা তৃপ্ত হইতে পারি না), এ বিষয় একদিকে Shakespeare Scott, Dickens অপরদিকে রমেশচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির সহিত তাঁহার সাদৃশ্যই বা কোথায়, আবার পার্থক্যই বা কোথায়? সর্ব্বদা তিনি তাঁহার ঋণ স্বীকার করিতেন কিনা?[§] সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের উপর তাঁহার প্রভাব কতটা ছিল, আবার পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যিকগণই বা তাঁহার দ্বারা কতটা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন (তুলনামূলক আলোচনা চাই)?

নাই, যাহার অচেতন দেহ দেখিয়া নারীর শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়া তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য ও মহত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছে—তাহাকে কবি যে নিতান্ত কাপুরুষ করিয়া গড়িয়াছেন ইহাত আমরা কিছুতেই মানিতে পারি না)।

[*] শ্রীযুক্ত হারাণ রক্ষিত মহাশয়ের মতে 'দুর্গেশনন্দিনী হইতেই প্রকৃত উপন্যাসের সৃষ্টি হয়।

[†] দত্তগুপ্ত মহাশয়ের পুস্তকের ৮৩/৮৪ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে একটি মন্তব্য আছে।

[‡] ৺দেবেন্দ্র বিজয় বসু লিখিত 'বাঙ্গালা উপন্যাসের বিশেষত্ব' ও শ্রীযুক্ত হারাণ রক্ষিতের "বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম" দ্রষ্টব্য।

[§] আনন্দমঠের প্রথমখণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদে দুর্ভিক্ষ বর্ণনার সময় তিনি Hunter প্রণীত Annals of Rural Bengal হইতে অনেক passage ভাষান্তরিত করিয়াছেন এবং যদিও পরিশিষ্টে সন্ন্যাসীবিদ্রোহের ইতিহাস প্রমাণ করিবার জন্য Hunter হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন তথাপি যেস্থান হইতে হুবহু অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই, দুর্গেশনন্দিনীতে আমরা Ivanhoeর ছায়া স্পষ্ট দেখিলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাহার উল্লেখ করেন নাই।

তাহার Humour—যাহা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব, যাহা তাঁহার সমস্ত গ্রন্থে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহার রচনাকে সরস, মধুর ও হাস্যোজ্জ্বল করিয়াছে, যাহাকে একজন শ্রেষ্ঠ কবি তাঁহার "নির্ম্মল, শুভ্র, সংযত, হাস্য," বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—তাহার বিশেষত্ব কি, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য অপর Humorists দের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য ও পার্থক্য কোথায়, তাঁহার Humour কোথায় সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট? তাঁহার উপর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কোন্ কোন্ লেখকের প্রভাব লক্ষিত হয় (শুধু মুখে বলিলেই হইবে না যে ঈশ্বরগুপ্ত তাঁহার শিক্ষাগুরু)? তাহার ব্যক্তিত্ব বা মৌলিকত্ব কোথায় এবং কতটুকু? তাঁহার রচনাবলিতে Didactic Element কতটা আছে? তিনি কতটাই বা Critic of life, আবার কতটাই বা Critic of literature ছিলেন? তাঁহার স্বভাববর্ণনের স্বরূপ ও বিশেষত্ব কি এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের স্বভাব-কবিদের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে কিনা? তিনি তাঁহার age কে কতটা represent করেন? Thackeray, Dickens প্রভৃতি ইংরেজী উপন্যাস লেখকগণের ন্যায় উদ্দেশমূলক উপন্যাস রচনায়, তাহার বর্ণিতব্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান লক্ষিত হয় কিনা? বিশ্বসাহিত্যে তাহার স্থান রক্ষিত থাকিবে কিনা ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসলেখকগণের (যথা Fielding, Jane Austen, Scott, Thackeray, Dickens, George,Eliot,Meredith,Dumas Victor Hugo, Tolstoi) সহিত তিনি একাসনে বসিতে পারেন কিনা?—এই সব প্রশ্নের সমাধান বোধ হয় এখনও বিশদ ভাবে কেহ করেন নাই। তুলনামূলক সমালোচনা * না হইলে প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করা যায় না ও সমভাবাপন্ন লেখকগণের পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য ও পার্থক্য বুঝান যায় না। সমালোচনা অনেকটা Analysis বা বিশ্লেষণ কার্য্য, কবির শুধু সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিলেই হইবে না, তাঁহার কাব্যের প্রতি শিরা, উপশিরা, স্নায়ু, অণুস্নায়ু, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ সূচারুরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হইবে ও Comparative Criticism করিয়া অন্যান্য কবির সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইবে। আবার, কবিকে বুঝিতে গেলে তাঁহার যুগকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে শুধু তাঁহার Biography লিখিলেই চলিবে না। (আবার জীবনী লিখিতে বসিয়া শুধু নির্জ্জলা স্তুতি করিলেই হইবে না। "Boswell রোগ" বড় সংক্রামক, জীবনী লেখকগণকে এই রোগ বড় শীঘ্র আক্রমণ করে)। তবে, ভরসার বিষয় সুপণ্ডিত প্রবীণ অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুলেখক অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত মহাশয় যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া পড়িয়াছেন, তখন বঙ্কিম সম্বন্ধে অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা আমরা অদূর ভবিষ্যতেই পাইব।

আর উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের কলেবর অযথা বাড়াইব না। বক্তব্য নেহাৎ Abstruse হইয়া যাইবে এই ভয়ে দুইটি উদাহরণ দিলাম। মোট কথা, Criticism যেমন হওয়া উচিত, ঠিক তেমন ভাবে প্রায়ই হইতেছে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা অনেক সময় কার্য্যকরী নয়। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দর সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও আজকাল বড় একটা বাহির হয় না। পুরাতন 'বঙ্গদর্শনে' ও "বান্ধবে" * সময় সময় যেমন সুন্দর সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বাহির হইত, আজকাল ত আর তেমন বেশী বড় একটা দেখি না। গ্রন্থকার কি মনে করিবেন, যথার্থ সমালোচনায় তাঁহার সহিত বন্ধুবিচ্ছেদ হইবে কি না, কোন সম্প্রদায় বিশেষকে সর্ব্বদা সমর্থন করিতেই হইবে—এরূপ ভাবিলে সমালোচনা কার্য্যে বিস্তর অন্তরায় ঘটিবে। যতদূর মনে পড়ে, Herbert Spencer তাঁহার *Introduction to Sociology*তে কয়েকটী Bias বা প্রবণতার উল্লেখ করিয়াছেন—যথা Intellectual, Political, Social, Religious ইত্যাদি। ইহাদের কবল

* অধ্যাপক অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্তের মতে, ইহাতে "একটা বিপদ আছে," ইহাতে "অনেকেরই মৌলিকতা-খ্যাতির মূলে সন্দেহোৎপাদন সম্ভব'।

* ১২৮৭ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শনে "স্বাস্থ্যকৌমুদী," "ঐতিহাসিক নবন্যাস" ও '[illegible]' নামক গ্রন্থত্রয়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ও ১২৮১-৮২ বঙ্গাব্দের বান্ধবে "বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য-সটীক," "বঙ্গের সুখাবসান," "পুরুবিক্রম নাটক," "বিচিত্র মিলন নাটক," "অপূর্ব্বসহবাস" প্রভৃতি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই শক্ত। Froudeএর মত ঐতিহাসিক ও Religious biasএর হাত এড়াইতে পাবেন নাই, তাই তাঁহার অমূল্য পুস্তকগুলিতে Roman Catholicism এর প্রতি এত শ্লেষ, Philip IIএর কার্য্য সমালোচনা করিবার সময় এত চাপা গলায় বিদ্রূপ। Macaulay বোধ হয় কাহারও নিকটে কবে ঠকিয়াছিলেন, তাই সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উপর এমন তীব্র ও সুতীক্ষ্ণ মন্তব্য করিয়া Racial biasএর পরিচয় দিয়াছেন। (Macaulayএর *Warrn Hasting* প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) প্রথম যুগের ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীদের পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি অভক্তি এবং বিরাগ প্রকাশের কারণ শুধু তাহাদের Intellectual Bias বা শিক্ষাগত সংস্কার। বস্তুতঃ যিনি যে ভাবে গঠিত হইয়াছেন, তিনি সেই ভাবেই প্রণোদিত হইয়া লেখেন ও কার্য্য করেন। কিন্তু প্রকৃত সমালোচকের কোনরূপ Bias বা প্রবণতার বশবর্ত্তী হইয়া লেখনী ধারণ করা উচিত নহে। কর্ত্তব্যের অনুরোধে যাহা বলা উচিত তাহা বলিতেই হইবে। চিকিৎসক কি রোগীর রুচির দিকে চাহিয়া চিকিৎসা করিবেন? রোগীর ক্ষণেকের কষ্টের দিকে চাহিয়া তিক্ত ঔষধ বা যন্ত্রণাদায়ক অস্ত্রোপচার হইতে তিনি কি বিরত হন? তাঁহার উদ্দেশ্য যখন সাধু, তখন তাঁহার ভয় কি? The end justifies the means—উদ্দেশ্য ভাল হইলেই হইল। বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা বা অন্ধ বিশ্বাস সমালোচকের হৃদয়ে স্থান পাইবে না। "Disinterestedness" ought to be the rule of Criticism—ম্যাথুআর্ণল্ড এই সত্যই বারংবার প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনার সংজ্ঞা ("A disinterested endeavour to learn and propagate the best that is known and thought in the world") আমরা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে না পারি, তাঁহার কাব্যের সংজ্ঞা ("Criticism of life") আমাদের মনঃপুত না হইতে পারে, কিন্তু তিনি যখন সমালোচনাকে একটী "disinterested Endeavour" বলিয়া অভিহিত করেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বক্তব্য থাকিতে পারে না।

"খাটি সোণা যত পিটিবে, ফাটিবে না, চটিবে না, বাড়িবে বই কমিবে না।" বাঙ্গালা সাহিত্যে খাটি সোণার অভাব নাই। আজ কাল আর জোর গলায় বলা যায় না, "যে কয়খানি বাঙ্গালা রচনা পাঠযোগ্য, তাহা দুই তিন দিনের মধ্যেই শেষ করা যায়।" বাঙ্গালায় এখন অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছে যাহাকে Classic বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য আজ কাল পাশ্চাত্যেও পঠিত ও আলোচিত হয়। বাঙ্গালা উপন্যাস বাঙ্গালা কাব্য এখন পাশ্চাত্য ভাষায় অনূদিত হইতেছে। বাঙ্গালী কবি Nobel prize পাইয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে আজকাল (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে) M. A. পর্য্যন্ত পরীক্ষা লওয়া হয়। এসব বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নহে। কিন্তু বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের কয়খানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচিত হইয়াছে? ইংরেজী বা ফরাসী ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাস গণনা করা যায় না। কিন্তু রামগতি ন্যায়রত্নের পর কয়জন এ সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন? দীনেশবাবু, সুশীলবাবু প্রভৃতি এ চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া চিরকাল আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এসম্বন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় যে সব অমূল্য সাহিত্য-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহার সমালোচনা করিলে বোধ হয় কাহারও মনে অকারণ পীড়া দেওয়া হইবে না, কারণ এই সময়কার উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ গ্রন্থকার হয় পরলোক গমন করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন, না হয় সাহিত্য-সমাজে এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যে তাঁহারা এখন নিন্দা স্তুতির বাহিরে। যেমন Elizabethএর রাজত্ব কালে ইংরাজী সাহিত্যের অসম্ভব উন্নতি হইয়াছিল অথবা Sophocles এবং Pindar এর যুগে Greek সাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল অথবা গুপ্ত-বংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় সংস্কৃত-সাহিত্য মনোহর ফলফুলে পূর্ণ বিকসিত হইয়াছিল, সেইরূপ পূর্ব্বোল্লিখিত অর্দ্ধশতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উন্নতি হইয়াছিল তাহা Unprecedented and Unparalleled বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের ন্যায় তখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অপূর্ব্ব ও

অভূতপূর্ব্ব সংমিশ্রণের ফলে যে সংসাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার সমান সাহিত্য যে শীঘ্র বঙ্গভাষায় রচিত হইবে এরূপ আশা করা যায় না, কারণ প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সর্ব্বসময় আশা করা যায় না। একটা কিছু বিশেষ পরিবর্ত্তন,—একটা জীবন ও জনগণের লক্ষণ, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও সমাজ প্রভৃতির একটা অসাধারণ বিপ্লব, কতকগুলি প্রকৃত ভাব ও আদর্শের আবির্ভাব—এগুলি না আসিলে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হয় না। আবার প্রায়ই দেখা যায় রচনার যুগের পরই সমালোচনার যুগ আসে। বৈদিক মন্ত্রের পর ব্রাহ্মণের ন্যায়,পদ্যের পর গদ্য রচনার ন্যায়, সৃষ্টির পর সমালোচনার যদি আবির্ভাব সত্য সত্যই স্বাভাবিক নিয়ম হয়, তাহা হইলে এই সমালোচনা-প্রধান যুগে বঙ্গ-সাহিত্যে সমালোচনার বিশেষ সময় আসিয়া পড়িয়াছে। এ বিষয় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলে সাহিত্যের প্রতি অসম্মান করা হইবে, কারণ কবিকে ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা না করিলে, তাঁহার উপর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি রাখিয়া তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা না করিলে, তাঁহাকে পড়াই বৃথা। কবিতার আবৃত্তি করিলেই তাঁহাকে সম্মান দেওয়া হয় না। তাঁহাকে প্রকৃত সম্মান দেওয়া হয় তখন, যখন তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করি, বুঝাইতে চেষ্টা করি অর্থাৎ এক কথায় তাঁহাকে 'সমালোচনা' করি।

ঠাকুরের ঠাঁই

(নানক)

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্দিরের দিকে আমি পা দুখানি রেখে—
শুয়েছিনু, পুরোহিত কহে মোরে ডেকে
দেবতার পানে তুমি চরণ রাখিয়া
করিয়াছ অপমান ঠাকুরে, হাসিয়া,
কহিনু তাহাই যদি সত্য, বল তবে,
কোন মুখে পা রাখিয়া শুইব, এ ভবে,
আকাশে বাতাসে চারি পাশে কাছে দূরে,
যেদিকেই চাহি আমি দেখি যে ঠাকুরে।

মিনার্ভায় জোর-বরাতে

জয়শঙ্করের ভূমিকায়--কুঞ্জ বাবু

ও

পটলচাঁদের ভূমিকায়--সুরেন বাবু

বন্দিনী নাটকে—নাহেবণের ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালা ও বন্দিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী ফিরোজবালা।
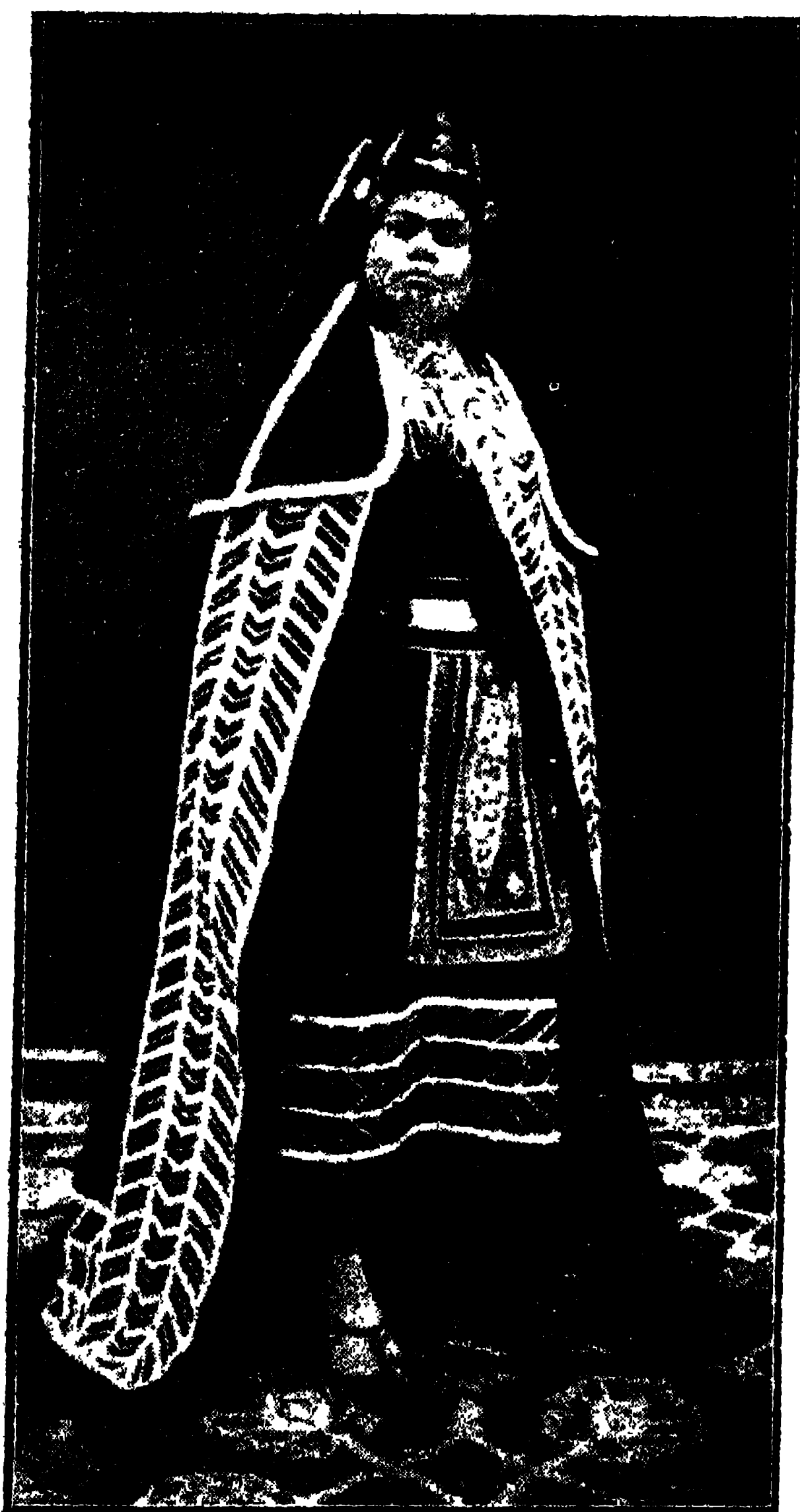
বন্দিনী নাটকে ক্যারওর ভূমিকায় শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন গুপ্ত।

বন্দিনী নাটকে মিতানীরাজের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন বসু ও বন্দিনীর ভূমিকায় শ্রীযুক্তা ফিরোজবালা।

বন্দিনী নাটকে নাহেষণের ভূমিকায় শ্রীযুক্তা নীহারবালা।

শান্তিসাধনের সন্ন্যাস

শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্ত্রীর মৃত্যুর পর শান্তিসাধন প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল আর সে সংসারে থাকিবে না, কারণ যার স্ত্রী নাই তার কেহই নাই। শান্তিসাধনের বয়স একুশ, বাইশ, বি-এ, ফেল করিয়া বছর খানেক কর্পোরেশনে চাকুরি করিতেছে। সংসারে আপন বলিতে তাহার ছিল কাকা, কাকীমা ও স্ত্রী। যখন শান্তিসাধন, আই এ পড়ে তখন মনোরমাকে বিবাহ করে, সে আজ প্রায় পাঁচ বছরের কথা। এই পাঁচটা বছর তার বেশ সুখেই কাটিতেছিল। যখন শান্তিসাধন কলেজে পড়িত তখন তার কাজ ছিল কলেজ হইতে ফিরিয়া প্রত্যহ স্ত্রীর নিকট নভেল পড়া, তাহার সহিত চা, ডিম ইত্যাদি খাওয়া—প্রথম প্রথম মনোরমা ডিম খাইতে বড়ই আপত্ত করিত, বলিত, হিন্দুর মেয়ের ডিম খাইতে নাই। কিন্তু, শান্তিসাধন যখন তাহাকে সাফ্ বলিয়া দিল, যে মনোরমা ডিম না খাইলে সে ত' উহা ত্যাগ করিবেই এবং এই ডিম না খাওয়ার ভিতর তাহার প্রাণত্যাগেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, তখন অগত্যা মনোরমাকে ডিম খাওয়া অভ্যাস করিতে হইল। পরে যখন শান্তিসাধন আফিসে ঢুকিল তখন তাহার কাজ হইল প্রত্যহ স্ত্রীর নিকট খরচের হিসাব দেওয়া, জলখাবার ও ট্রাম ভাড়ার পয়সা চাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু, এ সুখ শান্তিসাধনের ভাগ্যে বেশীদিন সহিল না, হঠাৎ একদিন মনোরমা জীবন যাত্রার অর্দ্ধ পথেই অনন্ত যাত্রীর সাথী হইয়া কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গেল।

স্ত্রীর এই অকরুণ অবিচারের জন্য শান্তিসাধন প্রথম মনে করিয়াছিল তাহার জলন্ত চিতায় লাফাইয়া পড়িয়া মরিবে, কিন্তু, সাহসে কুলাইল না সুতরাং মরা হইল না।

মরা কাজটা কথার চেয়ে কাজে করা যে ঢের কঠিন—তাহা মরার সময় সমুপস্থিত না হইলে ঠিক বোঝা যায় না। সুতরাং শান্তিসাধনের জ্বলন্ত চিতায় সেবার আর পড়া হইল না।

গলায় দড়ি দিয়া, বিষ খাইয়া, জলে ডুবিয়া মরারও প্রথা আছে, তবে শান্তিসাধন একটু ধর্ম্মভীরু বলিয়া বাধ্য হইয়া তাহাকে এ সব পথও ত্যাগ করিতে হইল। এখন সংসার ত্যাগ ভিন্ন সহজ অন্য গন্তব্য পথ সে বর্ত্তমানে দেখিতে পাইল না।

পাড়ার রামপ্রসন্নবাবু শান্তিসাধনের পিতার বন্ধু। উভয়ে এক সঙ্গে তামাক খাইতেন, সুখ-দুঃখের গল্প করিতেন, কাহাকে একঘরে করিতে হইবে, কাহাকে জাতে তুলিতে হইবে, সকল পরামর্শ এই দুইটি বৃদ্ধ মিলিয়া করিতেন। সুতরাং তিনি বন্ধু পুত্রের সংসার-ত্যাগের সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন। বলিলেন—বাবাজীবন নাকি মতলব করেছ সংসার ছেড়ে চ'লে যাবে?

শান্তিসাধন প্রথমটা কোন উত্তর করিতে পারিল না। নীরবে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া রহিল। অল্প পরে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"আজ্ঞে, সেই রকমই ত' স্থির করেছি।"

"কেন? সংসার ত্যাগ ত বড় তুটিখানি কথা নয়?"

"কে আছে বলুন?" সে আর বলিতে পারিল না। তার নয়ন অশ্রু প্লাবিত হইয়া আসিল।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রামপ্রসন্ন বাবু বলিলেন—বৌমা গত হ'য়েছেন, বড়ই দুঃখের বিষয়! কিন্তু তুমি চির-জীবন সন্ন্যাসী হ'য়ে বেড়াবে, সেকি উচিত হয় বাবা? তুমি ছেলে মানুষ, তোমার বয়সই বা কি? এমনটা ত প্রায়ই ঘট্‌ছে; তা বলে কি সবাই সন্ন্যাসী হবে? একটা বন্ধন নইলে কোন কিছুরই স্থিতি হয় না?

পাড়ার বয়স্কা মহিলারাও অনেক আসিলেন—দাদা, কেন মন খারাপ কর্‌ছো? যা হ'বার তাও' হ'ল, এখন আবার একটা বে-থা' কর, আমার বোনঝির মেয়ে

শান্তিসাধন হাতজুটো জোড় করিয়া বলিল—দিদিমা, কেন আমায় অধর্ম্মে মতি দিচ্ছ, তুমি কি ফুলির বেব বে দিতে পার?

কাঁদ কাঁদ হইয়া ফুলির দিদিমা বলিলেন—আর দাদা, মেয়ে মানুষের কপাল. একবার পুড়্‌লে—

তবে! তবে! দিদিমা, স্ত্রীজাতিরা যদি স্বামী মারা গেলে এত কষ্ট সহ্য কর্‌তে পারে, তবে পুরুষরাই বা না পার্‌বে কেন?

এইরূপে সকলের উপদেশই বৃথা হইল। এক রাতের শেষে শান্তিসাধন গুরুজনদের অজ্ঞাতে জন্মভূমিকে প্রণাম করিয়া দেশত্যাগ করিল। সঙ্গে লইল একখানি পকেট-গীতা, কিছু টাকা, খানকতক আলখাল্লা, কাপড় এবং স্ত্রীর একখানি ফটো আর ডায়রী বই। আগের দিন শান্তি-সাধন আলখাল্লা ও কাপড়গুলি গেরুয়া রঙে ছোপাইয়া রাখিয়াছিল।

২

শান্তিসাধন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বরাবর কালীঘাট যাইল। সেখানে স্নান,দর্শনাদি শেষ করিয়া বোঁচকা হইতে গেরুয়া কাপড় ও আলখাল্লা বাহির করিয়া পরিল। শান্তি-সাধনের থিয়েটারে খুব সখ ছিল বলিয়া চুল ছাঁটিত না, লম্বা চুলগুলো ঘাড় অবধি ঝুলিয়া তাহার অভিনয়-নিপুণতার পরিচয় দিত. এখন সেটা বেশ কাজে লাগিয়া গেল।

এইরূপে যোগীবেশে সজ্জিত হইয়া শান্তিসাধন হাওড়া ষ্টেশনের দিকে রওনা হইল, এবং তথায় একখানি কাশীর থার্ড ক্লাশ টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে বসিয়া গান ধরিল—

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমার রসাল নন্দনে
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল
তোমার করুণা চন্দনে ·· ··· ···

পাশে একটি বয়স্ক ভদ্রলোক বসিয়া চুরুট টানিতে-ছিলেন ও গরমে হাঁপাইতেছিলেন। তিনি শান্তিসাধনের গান শুনিয়া বলিলেন "আপনার ত' বেশ গলা মশাই— গান্ না আরেকটা।

শান্তিসাধন তাদের থিয়েটার ক্লাবে গান শিখিতেছিল, কিন্তু দিন চার পাঁচ বাদে একদিন সে ক্লাবে আসিয়া দেখিল নোটীশ বোর্ডে নোটীশ টাঙান রহিয়াছে—ক্লাব-সময়ে কাহারও গান শিক্ষা করা নিষেধ, কেহ গলা সাধিতে ইচ্ছা করিলে অনুগ্রহ করিয়া ক্লাব-সময়ের পূর্ব্বে আসিবেন।

শান্তিসাধনের ঐ সময়ে আসা অসম্ভব. অতএব তাহার গান শিক্ষা আরম্ভেই বন্ধ হইল। কিন্তু, শিক্ষা বন্ধ হইলেও গাওয়া বন্ধ হইল না,কারণ সে সম্বন্ধে কোন প্রকার নোটীশ সে পায় নাই। নোটীশ না পাইলেও উৎসাহও কখন সে কাহারও কাছে পায় নাই, আজ এই প্রথম তাহাকে গান গাহিতে লোকে অনুরোধ করিল, সুতরাং শান্তি-সাধন পরমানন্দে গানের পর গান গাহিয়া গেল।

এইরূপে গানের মধ্য দিয়া ভদ্রলোকটি শান্তিসাধনের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া দিলেন, এবং দু'চার কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—মশায়ের এ বেশ কেন?

আজ্ঞে আমি সন্ন্যাসী।

কতদিন হ'য়েছেন?

সম্প্রতি।

কারণটা জানতে পারি কি?

তখন শান্তিসাধন তাহার বিবাহ, স্ত্রীর মৃত্যু, নিজের বয়স ইত্যাদি বলিয়া শেষে বলিল, এখন আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি বলুন, আর কি জন্য আমার সংসারে থাকা?

তিনি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—সে কথা আর একবার বল্‌তে বাবা, সংসারটাই যখন অরণ্য হয়ে পড়েছে, তখন সত্যই অরণ্যে যাওয়ার দরকার। যদিও আপনার সঙ্গে মুহূর্ত্তের আলাপ তথাপি আপনাকে বহুদিনের পরিচিত আত্মীয়ের মত দেখেছি, সেজন্য আমার একটী অনুরোধ রাখতে হবে বাবাজী, কাশীতে পৌছে, মাঝে-মাঝে, আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে হবে, আর যদি কখন কোন রকম বিপদে পড, আমাকে তখনই জানাবে, নূতন জায়গা, বিদেশ বিভূঁইএর কথা বলা ত' যায় না। আমার নাম ঠিকানা লিখে রাখ তাহ'লে।

শান্তিসাধন এতখানি স্নেহ, এতখানি যত্ন, অনেক দিন কাহারও নিকট হইতে পায় নাই। তাহার আলখাল্লার পকেট হইতে ডায়রী বইখানা বাহির করিয়া তাহাতে লিখিল—"শ্রীযাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাঙালীটোলা কাশীধাম।"

৩

শান্তিসাধন কাশীতে পৌছিয়া সমস্ত দিন চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া বিকালে সন্ন্যাসীদের এক আশ্রমে গিয়া উঠিল। জনকয়েক হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী একজনকে ঘেরিয়া গাঁজা খাইতেছিল। শান্তিসাধন তাহাদের সাম্‌নে হাত জোড় করিয়া বলিল,—আমি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, আপনাদের দলে থাকতে চাই—যদি দয়া করে আশ্রয় দেন। সন্ন্যাসীর দল তাহাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিল।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গত রাত্রিতে জাগরণ, সমস্ত দিনের কষ্ট ইহাতে শান্তিসাধন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন একটি আশ্রয় পাইতে সে কিছু জলখাবার খাইয়া শুইয়া পড়িল। ⋯ ⋯ যখন তাহার ঘুম ভাঙিল, রাত তখন একটা। শান্তিসাধন কি একটা স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া পড়িল এবং চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। সন্ন্যাসীরা সব কোথায় গিয়াছে, শুধু ধুনীর পোড়া কাঠখানা তখনও পর্য্যন্ত জ্বলিতেছে। কাঠের আগুনে শান্তিসাধন চারিদিক ভাল করিয়া দেখিল কেহ কোথাও ঘুমাইতেছে কি না—কিন্তু, হায়! কেহ নাই, সব শূন্য—সব শূন্য! ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। একে বিদেশ, সবে মাত্র আসিয়াছে, এত রাতে অজানা জায়গায় কোথা যাইবে সে! একবার ভাবিল চোখ কান বুজিয়া রাতটা কোন রকমে এখানেই কাটাইয়া দিবে, পরে সকালে যাহা হয় করিবে। তখনই আবার তাহার অজানা স্থানে একটা রাত কাটাইতে সাহসে কুলাইল না, শেষে শান্তিসাধন স্থির করিল রাতটা ষ্টেশনে গিয়া শুইয়া থাকিবে। জিনিষপত্র গুছাইতে গিয়া কিন্তু শান্তিসাধন মাথায় হাত দিয়া বসিল, হায়, হায়, সন্ন্যাসীর দল তাহার বন্ধন ভার একেবারে হাল্কা করিয়া দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ক্রোধে, ক্ষোভে, দুঃখে, ভয়ে শান্তিসাধনের চক্ষু ফাটিয়া কান্না আসিল।

বাকী রাতটা সে রাস্তায় পায়চারি করিয়া কাটাইয়া দিল।

ভোর হইতেই শান্তিসাধনের প্রথম ও প্রধান চিন্তার বিষয় হইল সে এখন কি করিবে? আলখাল্লার পকেট দুটো একবার হাতড়াইতে সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল সাধুরা সেখানটাও অনুসন্ধান করিয়াছে, এবং দুইটী জিনিষ ফেলিয়া রাখিয়া অন্য সব গ্রহণ করিয়াছে। দুইটীর মধ্যে একটি শান্তিসাধনের স্ত্রীর ফটো, বোধহয় কামিনীর ছবি বলিয়া সংসার ত্যাগী ঋষিগণ উহা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, সজীব হইলে কি করিত বলা যায় না। দ্বিতীয় শান্তিসাধনের ডায়রী বইখানা, বোধ হয় ধরা পড়িবার আশঙ্কায় সেখানি ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। স্ত্রীর ফটোটি পাইয়া শান্তিসাধন এত দুঃখের মধ্যেও সুখ অনুভব করিল। ধীরে ধীরে আলোক চিত্রখানিকে প্রাণস্পর্শী চুম্বনে অভিষিক্ত করিয়া, বুকে ঠেকাইল, পরে পকেটে রাখিল। ডায়রীটা হাতে লইয়া লিখিল—

১২ই শ্রাবণ—কাশীধামে একটি সন্ন্যাসীর আড্ডায় আসা, রাত্রি বাস, সর্ব্বস্ব চুরি, জ্ঞানলাভ—গেরুয়াধারী লোকদের মধ্যে সাধু অসাধু বেছে নেওয়া বড় শক্ত। চোরের দল তাচ্ছল্য করে যা ফেলে গেল, সব রেখে সেইটে নিয়ে গেলেই আমি পাগল হ'য়ে যেতুম; তারা ফেলে গেছে, মনোর ছবি, আর এই ডায়রী খানা।"

লেখা হইলে শান্তিসাধন পুরাণ পাতা গুলো উল্টাইতে লাগিল—

২০শে আষাঢ়—উঃ কি বৃষ্টি!—সমস্ত দিন একই আওয়াজ ঝম্ ঝম্ ঝম্, বাইরে এই দুর্যোগ আবার অন্তরেও দুর্যোগ, আর বুঝি মনো থাকে না। ...

২১শে আষাঢ়—কাল রাত দুটোয় মনো চলে গেছে।

...

১১ই শ্রাবণ—ট্রেণে বেশ লাগচে, ট্রেণ চল্‌চে, তার ঝ্যাক্ ঝ্যাক্ শব্দটা যেন আমার অন্তরের করুণ ব্যথাটাকে আর শুনতে দিচ্চে না। একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, বেশ লোক ব'লে মনে হয়, আমায় অনেক ক'রে দেখা করতে বল্‌লেন, তাঁর নাম ও ঠিকানা—শ্রীযাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালীটোলা, ৺কাশীধাম।

এইখানটা পড়িয়াই শান্তিসাধনের মন পুলকে নাচিয়া উঠিল—আছে, একটা পরিচিত স্থান তাহা [illegible] এখনও তাহার আছে। আর ভদ্রলোক যখন নিজেই বলিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে তখন আর বাধা কি? [illegible] শান্তিসাধন ঠিক করিল সে এখনই বাঙ্গা[illegible] [illegible] বাবুর বাড়ী যাইবে, এবং তাঁহার উপদেশ [illegible] করিবে, শেষে না হয়, পদব্রজে দেশ পর্য্যটনে বাহির হইবে।

৪

সকালে যাদববাবু চা খাইতেছেন, তাহার মেজ মেয়ে আসিয়া বলিল—বাবা, একজন সন্ন্যাসী তোমায় ডাক্‌চেন—সন্ন্যাসী হ'লেও দেখতে ঠিক ভদ্রলোকের মত।

যাদববাবু হাসিয়া বলিলেন—ছিঃ [illegible] বলে! সন্ন্যাসী কি ভদ্রলোক নয়!

নীলা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলি[illegible] না, না [illegible] ভদ্রলোক, তবে ইনি যেন ঠিক সন্ন্যাসী নন, যেন কি রক[illegible] কি রকম।

চল দেখা করি—বলিয়া যাদববাবু বাহিরে আসিলেন।

শান্তিসাধন বাহিরে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল তাহার দুরবস্থার বিষয়, মনে নানাপ্রকার ভয় ও দুশ্চিন্তা জাগিতেছিল, যদি ভদ্রলোক এখন তাহাকে না চিনিতে পারেন। [illegible] ত' অমন কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়, ক[illegible] গল্প, কত আলাপ, কিন্তু, ট্রেণ হইতে নামিলে কে কাহার খোঁজ রাখে? শান্তিসাধনের ভয় হইল যদি ভদ্রলোক বেমালুম বলিয়া বসেন—কেহে বাপু, তোমায় ত' আমি মোটেই চিন্তে পারছি না, তখন উপায় কি হইবে? এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি সন্ন্যাসী না হওয়াই ছিল ভাল। বাড়ীতে থাকিয়া যথেষ্ট পরিমাণে দুঃখ বরিলেই চলিত।

যাদববাবু বাহিরে আসিয়া শান্তিসাধনকে দেখিয়া বলিলেন—আরে, তুমি! এস এস, আমি ভেবেছিলুম বাবা তুমি গাড়ী থেকে নেমেই আমার কথা ভুলে যাবে। বস, বস, একটু চা' টা খাও, ওঃ তুমি ত আবার সন্ন্যাসী মানুষ, চা খাবে ত?

কাল থেকে শান্তিসাধনের ভাল রকমের খাওয়া হয় নি, তার উপর [illegible] [illegible] নেশাটি তা[illegible] বর্ত্তমান আ[illegible] [illegible] সন্ন্যাসী [illegible] এ লোভ [illegible] [illegible] না। [illegible]—চা' টা আমি বরাবরই খা[illegible]।

[illegible] যাদববাবু [illegible] ডাকিলেন—[illegible] [illegible] শান্তিসা[illegible] [illegible]—বেশ সুন্দর কোঁ[illegible] [illegible] বয়স আন্দাজ তের চোদ্দ [illegible] নিবড় ঘন [illegible] মেয়েটির মুখে [illegible] বিস্ম[illegible]। নীলা আসি[illegible] যাদববাবু বলিলেন—মা, [illegible] বাবুটির জন্য এক কাপ চা নিয়ে এস ত'।

'বাবুটি' শুনিয়া নীলা একটু আশ্চর্য্য হইল—বাবু কি রকম! ইনি ত' দেখ্‌ছি সন্ন্যাসী, তবে সে রকম জটা ফটা নেই বটে [illegible] পোড়া পোড়া নয়, বেশ ফর্সাই আর [illegible] ভাল করিয়া দেখিবার জন্য নীলা শান্তিসাধনের [illegible] দিকে চাহিয়া দেখিল, সেও তাহা[illegible] দিকে [illegible] চাহিয়া আছে। মুখখানা রাঙা করিয়া নীলা চা আনিতে চলিয়া গেল।

যাদববাবু বলিলেন এই পাশের ঘরটায় তুমি 'বস' বাবা। আমি মহা বিপদে প'ড়ে এসেছি—বলিয়া শান্তিসাধন গত রাতের কথা সব খুলিয়া বলিলে, যাদববাবু হাসিয়া বলিলেন—তীর্থস্থান মাত্রেই জুয়াচোরের আড্ডা, খুবই সাবধানে থাকতে হয়, তুমি নতুন এসেছ, কিছু [illegible]

জানো না। যা হ'ক্ যেখানে সেখানে থাকবার দরকার নেই, তুমি কাশীতে যে ক'দিন থাকবে, আমার এখানেই থাক।

আজ্ঞে, আমি ভাবছি আজই হেঁটে এলাহাবাদে যাবার জন্য রওনা হ'ব।

যাদববাবু বলিলেন—তা কি হয় বাবা, সে কখন হ'তে পারে না, কাশীতে কিছুই দেখা হ'ল না। এখানে অনেক দেখবার আছে, সে সব দেখা চাই তো! দিন কতক এখানে থেকে সব দেখা শেষ ক'রে তারপর যা হয় কর'। এসেছ বিশ্বনাথের দিনকতক সেবা কর তবে ত তোমার সন্ন্যাস পাকা হবে। মহাযোগী মহাদেবের আশ্রমে দিন কতক অবস্থান না করলে পাকা সাধু কেমন করে হবে?

আজ্ঞে.

কিছু না—কিছু না বাবা, সঙ্কোচ কিছু কর' না. তুমি আমার ছেলের মত। এই যে নীলা, চা এনেছিস্ মা, দে—দে।

নীলা এক কাপ চা আর জলখাবার লইয়া আসিয়াছিল, যাদববাবু তাহার হাত হইতে সেগুলি লইয়া বলিলেন—ভজুয়াকে বল্ একখানা কাপড় নিয়ে এসে দিক।

পরে শান্তিসাধনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—গেরুয়া ত বাবাজী তোমার আর নেই সাদা ধুতিই পর।

৫

যাদববাবুর বাড়ীতে শান্তিসাধনের প্রায় চার পাঁচদিন কাটিয়া গেল। প্রত্যহ সকালে যাদববাবুর সঙ্গে বেড়াইয়া, গঙ্গাস্নান করিয়া, সন্ধ্যায় বিশ্বনাথের আরতি দেখিয়া শান্তিসাধনের দিনগুলি বেশ সুখ ও আনন্দে কাটিতেছিল। আজ বাড়ীর সকলে নৌকা করিয়া কাশী-নরেশের বাড়ী দেখিতে গিয়াছিলেন। এবং শান্তিসাধনকে আজ বড়ই প্রফুল্ল দেখা গিয়াছে। সন্ধ্যায় সকলে ফিরিলে, নীলা এক কাপ্ চা হাতে লইয়া শান্তিসাধনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শান্তিসাধন তখন কি বা কাহার বিষয় ভাবিতেছিল, জানা নাই, তবে নীলাকে দেখিবামাত্র তাহার সারাদেহ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সঙ্কোচ-কম্পিত স্বরে শান্তিসাধন জিজ্ঞাসা করিল—নীলা, কাশীর রাজার বাড়ীটা কেমন দেখ্‌লে? খুব বড় নয় কেমন?

বেশ্—বলিয়া নীলা চাএর কাপ্‌টা ঠক্ করিয়া তক্তাপোষের উপর রাখিয়া দিল, এবং মৃদু হাসিয়া, উজ্জ্বল নয়নে তাহার জিজ্ঞাসু মুখের উপর একবার চাহিয়া চলিয়া গেল। শান্তিসাধন তখনি ডায়রী বইখানা বাহির করিয়া লিখিল—১৮ই শ্রাবণ—নীলা মেয়েটি বেশ্—তার কথা, তার হাসি, তার চাওয়া খুবই ভাল। সবই ভালো তার, তবে আমার মনোর মত কি? না—না তা কি হয়! যাদববাবুর আদর যত্ন ভোলবার নয়, নীলাও যত্ন করে যেন প্রাণ দিয়ে। কেন? কে জানে?

শান্তিসাধন ডায়রী লিখিয়া পুনরায় পড়িতেছিল, এমন সময় নীলার ছোট ভাই অজিত আসিয়া বলিল—দেখুন, দেখুন, মেজ্‌দি ওই লুকিয়ে লুকিয়ে আপনাকে দেখ্‌চে—ওই যে—ওই যে শান্তিসাধন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহাকে লুকাইয়া দেখিতেছে, কে? না, নীলা? জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

অজিত বলিল—আপনি ওর বর কিনা।

শান্তিসাধন নির্ব্বাক হইয়া তাহার মুখের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল কাশীতে কি দিনের বেলায় জাগিয়া জাগিয়া মানুষ এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতে পাবে! তারপর তার নিজে নিজে লজ্জায় মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিল। সে যে কোথায়, কেন এখানে আসিয়াছে, কিছুই তার মনে পড়িল না। অনেকক্ষণ পরে অজিতকে আগ্রহভরে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিল—ছিঃ, ও কথা বল্‌তে নেই। আমি যে সন্ন্যাসী।

অজিত বলিল—না, বল্‌তে নেই ত' বাবা বল্‌লেন কেন? তুমি ত সন্ন্যাসী নও। তুমি সাজা সন্ন্যাসী।

এ কথায়—শান্তিসাধন চমকিয়া উঠিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। যুগপৎ অন্তরের মধ্যে একটা অনাবিল আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

৬

পরের দিন সকালে নীলা আর শান্তিসাধনকে চা দিতে আসিল না, আসিল তাহার দিদি সুরমা। ইহাতে

শান্তিসাধনের মনটা যেন খারাপ হইয়া গেল। সুরমা চা ও জলখাবার শান্তিসাধনের হাতে দিয়া বলিল—বল্লুম নীলাকে যে চা টা তুই দিয়ে আয়, তা,সে কিছুতেই আস্‌তে চাইলো না। সন্ন্যাসীদের কথা শুন্‌লে 'সে' ভারি রেগে যায়।

শান্তিসাধনের ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে—কেন? কিন্তু শত চেষ্টাতেও তাহার মুখ হইতেও একটা কথাও বাহির হইল না।

সুরমা বলিল—সে বড্ড লাজুক, কে কি বলেছে, অম্‌নি লজ্জায় আসা বন্ধ হ'য়ে গেল, যেন বে'টা হ'যে গেছে আর কি? শান্তিসাধন একটি কথাও বলিতে না পারিয়া খালি ঘামিতে লাগিল। সুরমা তাহাকে আড়ে আড়ে একবার দেখিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—আমি তাকে কত বোঝালুম কেন মিছে মন খারাপ কচ্ছিস্, উনি ত' কালই চলে যাবেন, সন্ন্যাসী মানুষ, গৃহী ত' আর নন, যে তোর রূপের ফাঁদে তাকে আট্‌কে রাখ্‌বি।

শান্তিসাধন মনে মনে ভাবিল—তাইতো, ফাঁদই তো বটে, নইলে কেন আমার মাঝে মাঝে মনে হ'চ্ছে যদি নীলাকে পাই তবে আবার সংসার পাতি! নাঃ—এ মোহ দূর ক'র্‌তেই হ'বে, হৃদয়ের এ দুর্ব্বলতা কিছুতেই থাকতে দেওয়া হবে না, কালই আমি এখান থেকে পালাব, নইলে কি জানি, কি হয়! মন্‌কে যেন বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিল—তুমি যাচ্ছো কবে?

শান্তিসাধন বলিল—আজ্ঞে আমি কালই যাবো ভাব্‌ছি—দেখা ত' এক রকম সবই শেষ ক'রেছি। আপনাদের ঋণ আমি জন্মে শোধ কর্‌তে পার্‌বো না।

সুরমা বলিল—তা সে পার্‌বে না, তা বোঝাই যাচ্ছে, নূতন করে' আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, আমরা এমন কি আর করেছি! তবে নীলার একটু কষ্ট হবে বটে।

নীলার কষ্ট হইবে শুনিয়া! শান্তিসাধনের মনটা কেমন বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল—নীলার কষ্ট হ'বে কেন? এই ত বল্লেন সন্ন্যাসীদের সে বড় পছন্দ করে না।

সুরমা হাসিয়া বলিল—পাগল তাই, নইলে কে কোথাকার তার ঠিক নেই··পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—যাক্‌······তোমার একটা কোন স্মৃতিচিহ্ন দিতে পারো?

স্মৃতিচিহ্ন! তাইত! কি আমার আছে যে নীলাকে দিতে পারি! কিন্তু, মন যেন চাইছে নীলাকে কিছু দেয়।

শান্তিসাধন মনে মনে বলিল—হায়, নীলা, কেন তুমি আমার স্মৃতিচিহ্ন চাইলে? যা' হবার নয় তা তো হ'বে না, তবে কেন মিছে নিজেকে অকারণ কষ্ট দিচ্ছ। শান্তিসাধন দেখিল নীলার জন্য, মনটা ক্রমেই ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে। তবে কি সে নীলাকে ভালবাসে! শান্তিসাধন স্থির করিল, মনকে দৃঢ় করিতে হইবে, বড়ই অসংযত হইয়া পড়িতেছে। সন্ন্যাসীর পক্ষে এ অমার্জ্জনীয় অপরাধ! একথা কি সে ভুলিতে বসিয়াছে।

সুরমা হাসিয়া বলিল—কই, স্মৃতিচিহ্ন দেবার নামে আপনি দেখ্‌ছি ভেবেই আকুল! কি স্মৃতি-চিহ্ন দেবেন বলুন?

আমার কি আছে বলুন! জানেন তো, আমি সর্ব্বত্যাগী! সন্ন্যাসী, ভিখারী!—

মিথ্যা বলবেন না, সত্যই আপনার কি কিছুই নেই?

আমার স্ত্রীর ফটো, আর একখানা খাতা শুধু আছে।

সুরমা বলিল—বাঃ বেশ হ'বে, সেই খাতাখানাই দিয়ে যাও। নীলা মাঝে মাঝে তোমার হাতের লেখা দেখ্‌বে। আর বল্‌বে সাধু সন্ন্যাসীর রোজ নামচা পরে মাসিক পত্রিকায় বাহিরও করিতে পারে।

শান্তিসাধন ইহাতে বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে কি! এই খাতাই যে তার সর্ব্বস্ব, সে কি করিয়া ইহা ত্যাগ করিতে পারে! কিন্তু নীলার জন্য···ইহাতে যে অনেক গোপনীয় কথা আছে, নীলার বিষয়ও অনেক আছে। না—না তাহাতে যে প্রকাশ পাইয়াছে নীলাকে সে ভাল বাসিয়াছে, সে ইহা কিছুতেই দিতে পারে না। অসম্ভব।

সুরমা পুনরায় বলিল—কি বলেন?

শান্তিসাধন বলিল—দেখুন সে বড়ই গোপনীয়···

সুরমা আর হাসি চাপিতে পারিল না। হাসিয়া

বলিল—ওঃ গোপনীয় ত' যাও! যেন কেউ কিছু জানে না।

শান্তিসাধন অবাক হইয়া ভাবিল—একি কথা! তাহার ডায়রী বইএর কথা এঁরা কি করে জান্‌লেন! তাড়াতাড়ি খাতাখানা খুঁজিতে গিয়া দেখিল নাই।

সুরমা বলিল—খাতাখানা প'ড়ে দেখ্‌লুম নীলাকে তোমার বেশ লাগে—তাই ভাব্‌ছি বেশ হবে'খন।

শান্তিসাধন জড়িতস্বরে বলিল—কেমন ক'রে পেলেন ডায়রীখানা? দেখ্‌চি কাশীর সাধু, গৃহস্থ সবাই সমান।

সুরমা বলিল—কাল সন্ধ্যের পর আপনার ঘরে আলো দিতে এসে দেখি একখানা খাতা পাশে খুলে রেখে আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। হটাৎ তার পাতার ওপর নজর প'ড়তেই দেখি, তাতে নীলার নাম লেখা আছে, তাই সেটা লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে পড়ে ফেলেছি। এ অন্যায়ের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। এই নিন ভাই আপনার খাতা।

সুরমা আঁচলের ভিতর হইতে ডায়রী বইখানি বাহির করিয়া শান্তিসাধনের হাতে দিয়া বলিল—বাবা, মা শুনে খুব সুখী হ'য়েছেন। এবার তুমি যেতে পারো।

... ...

তখন বেলা দশটা বাজে। শান্তিসাধনের কাকা তাড়াতাড়ি আফিস যাইবার জন্য বাহির হইতেছেন। পিওন আসিয়া তাঁহার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানি পড়িয়াই তিনি চেঁচাইতে চেঁচাইতে বাড়ীর ভিতর ঢুকিলেন। ওগো শুনচো, কোথা গেলে এমন সময়ে! শান্তিসাধনের যে বে এই শনিবার! আমাদের এখনই রওনা হ'তে হ'বে।

নিশাবসানে

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

আলু থালু কেশদাম, খুলে গেছে কবরী,
মস্‌লিন ওড়নায় নাহি বুক আবরি,—
আঁখি করে ঢুলঢুলু, মুছে গেছে সুর্‌মা,
ভোর হ'ল নহবতে বাজে ওই সাহানা।

'বসরা,' ছড়াছড়ি চুর্‌মার্ পেয়ালা,
তার ছিঁড়ে আছে পড়ে, এস্রাজ, বেহালা,
বাতি-দানে বাতি নাই, জলে শুধু পলিতা,
নিশা শেষ হল,বলে,—আঁখি মিলে ললিতা।

জড়তা মাখান তার ঘুম ভাঙ্গা চাহনি,
কয় যেন ধীরে ধীরে গত নিশি কাহিনী,
কবি বলে সুন্দরী; কেন এত ভাবনা?
সুখ নিশি হবে ভোর একি তুমি জাননা?

তোমার শালও

(গান)

(সুর—তোমার ভাল তোমাতে থাক ইত্যাদি)

কবিগুণাকর—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ

তোমার শালও তোমার থাক্
আমায় ত তার ভাগ দেবে না,
যে শীতে হায় মর্‌চি কেঁপে
বুঝেও তুমি তা বোঝ না!
হিমে হিঃ হিঃ কর্‌চি যত,
বুঝেও তুমি বোঝনা ত';
আমি কাঁদচি, যত, তুমি হাস্‌চ তত—
জাননাকি ভদ্রলোকের
বুক ফাটে ত—মুখ ফোটে না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া
পত্রিকার সার সঙ্কলন

বিনীত আবেদনঃ—গুজরাটের বাহিরে খুব কম লোকেই "কালী পরাজ" কি তাহা জানেন না কথাটীর অর্থ "কালা আদমী"। ইহারা গুজরাটের দলিত ও লাঞ্ছিত জাতি—ইহাদের নাম শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে যাহারা তাহাদের এই নামে অভিহিত করে তাহারা ইহাদের অপেক্ষা বেশী সুন্দর।

ইহাদের একটী দোষ ইহারা সুরাপানে বড়ই আসক্ত। ইহাদের মধ্যে তিন বৎসর পূর্ব্বে এক অপূর্ব্ব জাগরণ ও নূতন সংস্কার আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই সঙ্গে পার্শী মধ্যবিক্রেতাদের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল, তাহারা এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা একযোগে মিলিত হইয়া সংস্কারক কর্ত্তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার ফলে, একদল কালী পরাজী মিতাচারকে পাপের বেশ পরাইয়া কর্ম্মীদের এই চেষ্টা ব্যর্থ সাধনে বদ্ধ পরিকর হইয়া উঠিল। সেইজন্যই আজ পর্য্যন্ত এই দলিত জাতি তাহাদের বংশগত পাপের প্রায়শ্চিত করিবার সুযোগটী পর্য্যন্ত হারাইল।

'কালী পরাজ'দের একটী সভায় একটী প্রস্তাবে ব্রিটিশ সরকারকে সমস্ত শৌণ্ডিকালয় বন্ধ করিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু প্রস্তাব ফলবতী হয় নাই। কি উপায়ে এই দুর্নীতি বন্ধ করা যায়? ১৯২১ সালের আন্দোলনে অসহযোগী কর্ম্মীরা সরকারের ক্ষমতা হ্রাস করিতে উক্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন—কিন্তু এখন যাহারা ভুক্তভোগী—যাহারা নিজেদের দলিত এবং নীচ অবস্থার হীনতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে—যাহারা এই দুর্নীতির হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইতে পারে না তাহারা আজ আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, তাহাদের কাতর প্রার্থনা কি পূর্ণ হইবে না? তাহারা স্বরাজ কাহাকে বলে তাহা জানে না অসহযোগ কি জানে না—সুরাপানে বিরত হওয়াই তাহাদের অসহযোগ। ইহাদের আবেদন আমাদের মনুষ্যত্বের নিকট; সে আবেদন কি গ্রাহ্য হইবে না?

সভাপতিরূপে আমি তাহাদের আবেদনের পোষকতা করিতে বাধ্য। কৌন্সিলের সভ্যগণের প্রতি আমার অনুরোধ যে তাঁহারা যেন এবিষয় কৌন্সিলে উত্থাপন করেন এবং তাঁহাদের এই চেষ্টা ফলবতী করিতে যদি শিক্ষা-বিভাগের ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হয় তাহাও যেন অকুণ্ঠিত চিত্তে করেন।

পার্শী মদ্যবিক্রেতার প্রতি আমার সানুনয় অনুরোধ তাঁহারা মনুষ্যত্বের আহ্বানে যেন পশ্চাৎপদ না হন। তাঁহারা স্থির-বুদ্ধি, মতিমান্ এবং কর্ম্মে উৎসাহী তাঁহাদের পক্ষে অন্য অপেক্ষাকৃত সুশোভন কার্য্যে ব্রতী হওয়া দুষ্কর নহে। আমার অনেক প্রিয় সুহৃদ্ পার্শী। আমি পার্শীগণকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি তাই তাঁহাদের প্রতি আমার এ অনুরোধ অশোভন নয় সে আশা করি। যাঁহাদের মধ্যে দাদাভাই, ফেরোজশা প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তি জীবন কাটাইয়াছেন তাঁহারা যে আজ দেশের এই দুর্দ্দিনে একটু স্বার্থত্যাগ করিয়া জাতির কল্যাণ সাধন করিবেন সে আশা করা আমাদের উচিত—

রামনামঃ—সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া একটী প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলা আর সেই প্রতিজ্ঞা সহস্র প্রলোভনের বিরুদ্ধে রক্ষা করা দুইটীর মধ্যে প্রভেদ অনেক। এইরূপ সময়ে একমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন গতি নাই। আমি এইজন্যই রামনামের উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু বলি, এখানে বলা আবশ্যক যে আমার কাছে রাম, আল্লা এবং ঈশ্বর একই অর্থবোধক, কতকগুলি সরল বিশ্বাসী আমাকে তাঁহাদের বিপদভঞ্জন মনে করিতেন তাঁহাদের এই ভ্রম আমি ভাঙ্গিয়া দিই এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের এক অব্যর্থ মন্ত্রের সন্ধান দিই; তাহা—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং সূর্য্যাস্তের পরে ভগবানে নিকট স্বকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ সাহায্য ভিক্ষা করা—সকল হিন্দুর নিকটই রাম নাম অতি পবিত্র—এই নামে ভয় দূরীভূত হয়—সেইজন্যই শিশুদিগের এই নামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস—এই নাম গ্রহণ করিতে আমি সকলকেই অনুরোধ করি এবং আশা করি তাঁহাদের কাছে ইহা উপেক্ষিত হইবে না।

তাই সাধারণের মুখপাত্ররূপে এক একটা দল রাজনৈতিক দল নামে দেশের মুখপাত্ররূপে খাড়া হইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এ দেশী রাজনীতি এখন জীবন-নীতিকে বাঁচাইতে চাহে—তাই এ রাজনীতিতে চালের মোহ আসিলেই তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। দেশের লোক অন্ন চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মুখপাত্র চাহিতেছে বটে—তাতে দেশসেবীর সম্মান পাইবার লোভে অগ্রসরও হইতেছেন কেহ কেহ কিন্তু গোড়ার কারণ অন্য সমস্যা ছাড়িয়া যেই তাহারা উচ্চ রাজনীতিতে মন দিতেছেন অমনি দেশের অন্তর হইতে সরিয়া পড়িতেছেন। কোন রাজনীতিক দেশের এই অন্ন চিন্তা চমৎকার দূর করিয়া দেশের জীবন নীতিকে বাঁচাইয়া তাহাতে রাজ-নীতির প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিবেন—কে জানে।

—

অবাধ বাণিজ্য না লুণ্ঠন ?—'New Age' নামক ইংলণ্ডের অর্থনীতির সাপ্তাহিক পত্র খানি লিখিতেছেন 'British advocacy of Free Trade for India is unfortunately mixed up with our purely selfish regard for the Lancashire cotton industry." তবে কি অর্থনীতিক জগতে ইহারই নাম Economic exploitation ?

———

ট্রেনে নারী হরণ ?—কাথিয়াড় গোদাগারী রেল ট্রেণ হইতে একজন বিবাহিতা যুবতীকে পাওয়া যাইতেছিল না—পরে তাহাকে রেলওয়ে পুলিশ একজন ইওরোপীয় গার্ডের বাংলো হইতে উদ্ধার করে। গার্ডটি ধৃত হইয়াছে—ইহার বিচারও হইবে। এমন ঘটনা মাঝে মাঝেই শোনা যায় এবং যাহারা এরূপ ঘৃণ্য কার্য্যের নায়ক তাহারা সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ। ইহাদের এমন শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য যাহাতে ভবিষ্যতে অপর কাহারও এ কার্য্য করিতে আতঙ্ক আসে। তেমন শাস্তির ব্যবস্থা না হইলেই এ কার্য্য বাড়িয়া চলে। নারীদের আত্ম রক্ষার ক্ষমতা নাই—তারপর এভাবে নির্য্যাতিতা নারী-দের সমাজেও কোন স্থান সহজে মেলে না। রাজশক্তি ও সমাজশক্তির তাই নারী রক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রযত্নে করিতে হয়—ইহার অপলাপ দেশে বাড়িলে অতি কলঙ্কের কথা।

—

ভারতের গৌরব কাহিনী ?—আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র সে দিন প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্রদের কাছে প্রদত্ত বক্তৃতায় বলিয়াছেন তিনি ভারতের গৌরব মহিমা-প্লুত অমর কাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের ভক্তপাঠক এবং জীবনে উন্নতির পথে দাঁড়াইতে এই গ্রন্থ তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। ভারতের জাতীয় কাব্য রামায়ণ ও মহাভারত কিছুদিন পূর্ব্বেও ভারতের অক্ষর জ্ঞানহীনা নারীদের দ্বারাই তাঁহাদের সন্তানদের মধ্যে প্রচারিত হইত। বর্ত্তমানে তথাকথিত শিক্ষায় এ পথে বাধা পড়িয়াছে। তাই জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া আসি-তেছে। ধর্ম্মের সঙ্গে, কর্ত্তব্যের সঙ্গে, সত্যের সঙ্গে জীবনের উন্নতির সম্বন্ধ কত নিকট এই অমর কাব্য যুগ যুগান্ত তাহাই মানব সমাজের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। জাতীয় উন্নতির পথে এ কাব্য পরম সহায়।

—०—

দেশীয় সঙ্গীত ?—দেশে সঙ্গীতের আদর ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। প্রকৃত গুণী সঙ্গীতজ্ঞেরা এখন আর তেমন ভাবে মহৎ লোকের আশ্রয়ে থাকিয়া সঙ্গীতের সাধনায় আত্ম নিয়োগ করিয়া থাকিতে পারেন না। এ দেশী বড় লোকের নানা বিভাগে গুণীর পোষণ স্পৃহা এখন নাই। অন্য ভাবের বিলাস ব্যসনে তাঁহারা তাঁহাদের খেয়ালবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন। নবাবত্ব অধীপ হইবার প্রবৃত্তিও তাহাদের নাই—সে ক্ষমতাও বোধ হয় নাই। এমন অবস্থায় ভারতীয় যে সব সুকুমার কলা এখনো ধ্বংশ হইয়া যায় নাই—সে কেবল ভারতের মহা পুণ্য ফলেই। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাই কোন প্রকৃত কলাবিদের আদর দেশ বিদেশে হইতে দেখিলে প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়—এবং আশা হয় ভারতের ভবিষ্যৎ হয়তো বা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে না। এবারকার নিখিল ভারত সঙ্গীত সভায় লক্ষ্ণৌর অধিবেশনে বাংলার পক্ষ হইতে প্রসিদ্ধ কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত বিশারদ গায়ক শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয় সভায় যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ধ্রুপদ ও খেয়ালে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই সভা হইতে তিনি প্রশংসা পত্র ও নানা উপহার পাইয়াছেন। বাঙ্গলার বাহিরে প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞের সম্মানে আমরা পরম সুখী হইয়াছি। আশা করি আচার্য্য গোস্বামীর সঙ্গীতের ভাবধারা বাঙ্গালী সযত্নে নিজেদের মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করিবে। এ সব জিনিষ হেলায় হারাইলে আর সহজে মিলিবে না—জাতীয় বিকৃতা বাড়িয়াই চলিবে।

বাংলার নদ-নদীর অবস্থা ও সংবাদপত্র সেবি সঙ্ঘঃ—গত রবিবার সংবাদপত্রসেবি সঙ্ঘে রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বাংলার নদনদীর শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। বাংলা নদীমাতৃক দেশ—অথচ এই দেশের নদীগুলি দেখিতে দেখিতে এমনভাবে শুকাইয়া যাইতেছে ও বালিতে ভরাট হইয়া উঠিতেছে যে অগ্রহায়ণের আরম্ভেই এই সুজলা দেশে ভীষণ জলকষ্ট আরম্ভ হয়। শীতের সময়ে দেশের বড় বড় নদীগুলির পর্য্যন্ত এমন অবস্থা হয় যে দেখিয়া কেহ বিশ্বাস করিবে না যে এই স্থান দিয়া বর্ষার উত্তাল তরঙ্গময় ভীষণ স্রোতস্বতী বহিয়া যায়। নদীর এমন অবস্থা হওয়ায় সুফলা দেশে শস্যের ফলন তেমন হইতেছে না, বাণিজ্যদ্রব্যাদির প্রেরণাপ্রেরণেরও মহা অসুবিধা। সব চেয়ে ভীষণ অসুবিধা হইয়াছে জলাভাবে। বাংলার পল্লী সমূহে জলাভাবে যে করুণ দৃশ্য হয় তাহা চোখে না দেখিলে বোঝা যায় না। দেশের নদীগুলির এ অবস্থা কেমন করিয়া হইল—কি করিয়া নদীগুলিকে রক্ষা করিয়া দেশকে বাঁচানো যায় ইহাই বর্ত্তমানের সমস্যা। নদীর স্রোতের স্বচ্ছন্দ গতিকে বিচারহীনভাবে মারিয়া অবাধ রেলওয়ে ব্রীজ দেশে চালানোতে নদীগুলির একরূপ অবস্থা হইয়াছে—অনেক বিশেষজ্ঞের এই মত। উন্নত যুগে মরুর দেশে নদীর সৃষ্টি হইতেছে—আর এই নদীর দেশ এ যুগে জল শূন্য মরু হইয়া যাইতেছে। দেশের উপর ভাগ্যচক্রের নিষ্ঠুর পরিহাস! কিন্তু দেশ এমন অবস্থায় বাঁচিতে পারে না—দেশের নদনদী যে ভাবেই হোক রক্ষা করিতেই হইবে, জলাভাবের হাহাকার হইতে দেশকে বাঁচাইয়া তাহাকে শস্য-সম্পদ—শ্রীসৌন্দর্য্য ভূষিতা করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেশের শাসক সম্প্রদায়ের যেমন কর্ত্তব্য আছে—দেশের জনসঙ্ঘেরও তেমনি গুরু কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আমরা নানাভাবে দেশের নদনদীর শোচনীয় অবস্থার কথা জানাইতেছি। দেশীয় সকল সংবাদপত্রগুলি এ বিষয়ে আন্দোলন করিলে নদনদীগুলি রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। কার্য্য গুরুতর কঠিন—কিন্তু ইহা দেশের মরণ-বাঁচন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই আজ সংবাদপত্রসেবীদের এ বিষয়ে দেশের গবর্ণমেণ্ট ও জনমতকে প্রবুদ্ধ করিতে উদ্যোগী দেখিয়া আমাদের আশা হইতেছে—যে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে দেশকে বাঁচাইবার উপায় অদূর ভবিষ্যতেই অবলম্বিত হইতে পারে।

সৌন্দর্য্যের উপভোগঃ—অধ্যাপক নিকোলস রোরিচ নামে একজন বিখ্যাত রুশ চিত্র শিল্পী ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া চিত্রাঙ্কনের জন্য ভারতে আসিয়াছেন। এই তাঁহার দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন। সম্প্রতি ইনি হিমালয়ের চিত্রাঙ্কনে অনুভূতি পাইবার জন্য দার্জ্জিলিং যাইতেছেন। এই রুশ শিল্পী বলেন—'আমার ইচ্ছা হিন্দুর কলা শিল্প তাহার সকল সৌন্দর্য্যের ধারা বজায় রাখিয়া চলে, কারণ ইহা একটা পৌরাণিক মহাজাতির কলা ও জীবন বিকশিত করিয়াছে। আমি পুনরায় হিমালয়ে যাইতেছি, তাহার অসীম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সবটা এমন ভাবে আঁকিব যেমনটি আর কখনো আঁকা হয় নাই। সকল রকম শ্রেষ্ট কলা শিল্পের ও সৌন্দর্য্যের উৎস এই হিমালয়। ইহাই জগতের সত্য মরকত মণি। জগতের শ্রেষ্ট সৌন্দর্য্যের উপাসকেরা অনেকেই ত্যাগের দিক দিয়াই হোক বা ভোগের দিক দিয়াই হোক দু'দিক দিয়াই ভারতকে পরম উপভোগ্য মনে করেন। পরম রম্য এই ভারত ভূমির সৌন্দর্য্য উপাসনা করিয়া সত্যদর্শী ঋষিরা আজও অমর। এই চিরসৌন্দর্য্যের দেশের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার বোধশক্তি ভারতসন্তানেরা ক্রমশঃই যেন দ্রুত হারাইতেছে—তাই কি ভারতের এত দুঃখ ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে?

বিলাতে "বাঙ্গলার অর্ডিনান্স"

বাঙ্গলার অর্ডিনান্স লইয়া এদেশে যেমন আন্দোলন চলিয়াছে—বিলাতে ততটা না হউক পার্লামেণ্টে কিছু পরিমাণ বাক্‌বিতণ্ডা চলিয়াছিল। কমন্স সভায় মিঃ জন স্কর নামক জনৈক সদস্য এই অর্ডিনান্সের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া বলেন যে শুনা যায় বঙ্গদেশে নাকি এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে গুপ্ত ষড়যন্ত্র বিদ্যমান আছে, ভয়প্রদর্শনই নাকি এই শ্রেণীর ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য। স্বরাজ্যদলের অগ্রণী সি, আর, দাশ মহাশয় নাকি এই শ্রেণীর ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রকাশ্য বক্তৃতায়ও তাঁহার দলের পত্রে তিনি গত আগষ্ট মাসে নাকি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান রাজতন্ত্র যদি প্রজাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক হন তবে প্রজাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ স্বরাজ্যদল ভবিষ্যতে কি ভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিলে উহা প্রজাদিগের মনের মত হয় সে সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু দাশ মহাশয়ের পরবর্ত্তী কথাতেই প্রকাশ যে গভর্মেণ্ট তাঁহার যোগনির্ণয় স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহার প্রস্তাবিত উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রাহ্য করেন নাই। সেই জন্যই আজ যে অর্ডিনান্স সৃষ্টি হইয়াছে যাহার আইনে লোকদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে যে কোন প্রকাশ্য অভিযোগ না থাকিলেও রাজতন্ত্রের ইচ্ছানুযায়ী ধৃত ও বন্দী করা যাইতে পারিবে। আমার মতে রাজতন্ত্রের এই আবরণই জবরদস্তীর পরিপোষক এবং ইহা দ্বারাই গুপ্ত হত্যা প্রবৃত্তি বাড়িতে পারিবে। ইহার স্বপক্ষে এই প্রথম কথা যে সাক্ষীদিগকে রক্ষা করাই ইহার উদ্দেশ্য—কোন সাক্ষীর নাম প্রকাশ পাইলে তাহার জীবনের আশঙ্কা ঘটিতে পারে কিন্তু এই সাক্ষী যখন জানিবে যে সে যে কোন অভিযোগ কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে আনয়ন করিবে তাহাই বিনা প্রকাশ্য বিচারে গ্রাহ্য হইবে ও তাহাতে কেহই পরীক্ষা করিতে আসিবে না, তখন সে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য নিজের ইচ্ছামত যে কোন অভিযোগ যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনিতে সাহসী হইবে। তৎপরে ইনি অর্ডিনান্স সম্বন্ধে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের উক্তির কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে "স্যার পি, সি, রায়ের মত লোক যিনি কোনরূপ রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত থাকেন না এবং যিনি বৃটীশরাজের স্বপক্ষে বরাবরই আছেন তিনিও যখন এই চণ্ডনীতি সমর্থন করেন নাই তখন সেক্রেটারী অব ষ্টেট মহাশয়কে ভারতগভর্মেণ্টকে সুপরামর্শ দিয়া এই নীতির পরিবর্ত্তন করিতে ও ভারতের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম গভর্ণর লর্ড উইলিংডনের প্রস্তাবিত পন্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতে বলা আমাদের কর্ত্তব্য। ভারতবাসীর রাজকার্য্যে যোগ্যতা সম্বন্ধে লর্ড উইলিংডন বলিয়াছিলেন যে ভারত গবর্মেণ্ট পরিচালন সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা আছে তাহা বজায় রাখিতে আমি ইচ্ছুক কিন্তু মন্ত্রীত্বের পদে সুবিধা পাইলেই অধিক সংখ্যক ভারত বাসীর নিয়োগ দ্বারা শাসন পদ্ধতির উন্নতি করা যাইতে পারে। আমার অভিজ্ঞতার ফলে আমি জানি যে সমস্ত ভারতীয় সদস্যগণের সংস্রবে আমি আসিয়াছি তাঁহারা সকলেই রাজ্যশাসন সম্বন্ধে স্ব স্ব বিভাগের কার্য্যে অভূতপূর্ব্ব দক্ষতা দেখাইয়াছেন। অভিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ অফিসারদিগের সাহায্য দিয়া ভারতীয় সদস্য নিয়োগে শাসন সংস্কার কার্য্যে অনেক অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে।"

এই সকল কথা বলিবার পর স্কার সাহেব বলেন যে লর্ড উইলিংডনের মত অভিজ্ঞ শাসনকর্ত্তার মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এইরূপভাবে চলিলেই সহজেই জবরদস্তি ও ষড়যন্ত্র লোপ পাইতে পারে—কিন্তু তাহা না করিয়া রুদ্রনীতি অবলম্বনে ভারতবর্ষ আমাদের পর ভাবিবে ও শত্রু বোধ করিবে।

কর্ণেল ওয়েজউড বলেন আমি ভয় দেখানোর ষড়যন্ত্রও যেমন ঘৃণা করি আবার রুদ্রনীতিকেও তেমনি ঘৃণা করি। আয়র্লণ্ডে চণ্ডনীতির যথেষ্ট লীলা দেখিয়াছি ফলে আয়র্লণ্ড ও আমরা আজ মনে মনে পৃথক্ হইয়া গিয়াছি। ভারতে এরূপ ঘটুক ইহা আমরা চাই না। আমাদের জানা উচিত যে চণ্ডনীতি যে কেবল নিষ্ফল হয় তাহা নয়—যাঁরা চণ্ডনীতি প্রয়োগ করিতে যান তাঁহারা যে সত্যই ভীত তাহাও ইহার প্রয়োগে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আমাদের জানা উচিত যে এই নীতি প্রয়োগে ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্বন্ধও ভিন্ন হইয়া যায়, এতে যাদের উপর এ নীতি প্রযুক্ত হয় তাদের মন তিক্ত হয়ে উঠে। ভারত-

গভর্মেন্টের বুঝা উচিত যে যতটুকু এর আবশ্যক অর্থাৎ যেখানে রাজতন্ত্র একবারেই নিরুপায় হন, কেবল সেইখানে সাময়িকভাবে ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে; আবার সুবিধা পাইবামাত্র এই শ্রেণীর আইন প্রত্যাহার করিতে হয়, কিন্তু গুপ্তহত্যা বন্ধ করিতে ইহা কতদূর কার্য্যকর হইতে পারে তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত। বাঙ্গালায় যদি সত্যই এই ভীতি প্রদর্শন ও গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র বিদ্যমান থাকে তবে তাহা হইলে আমরা যা কিছু মূল্যবান মনে করি তৎসমূহেরই বিপদ উপস্থিত বুঝিতে হইবে এমন কি মণ্টফোর্ড রিফর্মও আজ বিপন্ন বুঝিতে হইবে।

এটা আমি নিশ্চিত জানি যে ভারতের স্বরাজ্যদল অর্থাৎ মিঃ দাশের চালিত দল, মিঃ নেহেরু বা মিঃ গান্ধির অনুবর্ত্তী দলগুলির মধ্যে কোনটার সহিতই বাঙ্গালার বিপ্লববাদী দলের কোন সম্বন্ধ নাই এবং যদি এই জুলুমবাজদিগের উপর তাঁহাদের কোন আধিপত্য থাকে ত তাঁহাদের যেন বুঝাইয়া দেন যে মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ সমস্যার মধ্যে বর্ত্তমান সময়েই ভারতের উন্নতি বাংলার বিপ্লবহীনতার উপর এমন নির্ভর করিতেছে যে পূর্ব্বেও কখন করে নাই।

মিঃ থর্টলের অভিমত :—যে উদ্দেশ্যে বাঙ্গালায় অর্ডিনান্স ও তিন আইন প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, আমার মতে উহা সত্য নহে, উহার মূল উদ্দেশ্য ভারতের একটী শক্তিশালী রাজনৈতিক দলকে কাবু করা। ভারতের মত প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে একটু আধটু অশান্তি বা উপদ্রব হইবে না এতটা আশা করা ঠিক নয়, এদেশেও অশান্তি উৎপাত আছে। এই আইন লেবারদল গড়িয়াছেন কি কোন্ দল গড়িয়াছে সে বিচার নিষ্প্রয়োজন, আমি ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি এবং এই স্বাধীনতাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব। স্বাধীনতার কাছে বর্ণ বিচার নাই এবং প্রত্যেক ভারতবাসীই এই স্বাধীনতা ভোগ করিতে ন্যায়তঃ অধিকারী। অসাধারণ আইন চালাইতে হইলে দেশের অবস্থাও অসাধারণ হওয়া চাই নতুবা দেশের অধিবাসীদিগকে তাহাদের প্রাথমিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা অকর্ত্তব্য। আমার মনে হয় এই সকল আইন প্রয়োগে ভারতবাসীরা রাজনৈতিক উন্নতি লাভ সম্বন্ধে এমনি নিরাশ হইবে যে তাহারা বিপ্লব, অত্যাচার ও রক্তপাতের পথে, এই আইনের বিভীষিকার দ্বারাই অনিচ্ছায় চালিত হইবে।

মাসিক সাহিত্য-পরিচয়

প্রবাসী:—মাঘ, ১৩৩১। প্রথমেই শ্রীমতী শান্তা দেবীর রঙ্গীন চিত্র 'বাজে কাজ'। মা একমনে সূচি কার্য্যে নিযুক্তা—ছেলে পিঠের দিকে মুখ লুকাইয়া অভিমানে জানাইতেছে মা আমার কান্নার কাছে ও সবই তোমার বাজে কাজ। মায়ের চোখে মুখে, দেহভঙ্গীতে, সূচিতে ফুল তুলিবার সময়কার অখণ্ড মনোযোগ ফুটিয়া উঠিয়াছে—ছবিখানি ভাব প্রকাশে চমৎকার হইয়াছে। 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়রী' রবীন্দ্রনাথের এবারকার পাশ্চাত্য-দেশ ভ্রমণ-কাহিনী। এই ডায়েরীর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের দু'টি বড় কবিতাও আছে। ছন্দে, সুরে, রূপে বিচিত্র বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছে ইহা। জীবন মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল কাব্যপ্রতিভা যেন আরও ভাস্বর হইয়াছে।

'খোলো, খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,—
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলি-বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
লয়ে তার ভীরু দীপ শিখা।
দিগন্তের কোন পারে চলে' গেল আমার ক্ষণিকা॥
ভেবেছিনু গেছি ভুলে, ভেবেছিনু পদচিহ্নগুলি
পদে পদে মুছে নিল সর্ব্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।
আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তা'র
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার;
দেখি তা'রি অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রু-সরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি॥"

বিরহের দূতি এসে তার সে স্তিমিত দীপখানি,
চিত্তের অজানা কক্ষে কখন রাখিয়া দিল আনি'।
সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে,
মুহূর্ত্ত বাজিয়াছিল, তার পর শব্দহীন রাতে।
বেদনা—পদ্মের বীণাপাণি
সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে—থেমে-যাওয়া বাণী ॥

* * * * *

খোলো, খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।
খুঁজিব তাহার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হ'তে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি আলো, যেথা হ'তে নামে পৃথ্বী'পরে
শ্রাবণের সায়াহ্ন-যূথিকা,
যেথা হ'তে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণ দীপ্ত টীকা ॥

কবি আজ রহস্যরাজ্যের যবনিকা সরাইতে ব্যাকুল। ডায়ারির গদ্যে ও পদ্যে কবি নূতন ছন্দ ও সুর আনিয়াছেন, পদ্যের ছন্দ—উপভোগ্য, চমৎকার! গদ্যের এ ছন্দে আমরা অভ্যস্ত নহি বলিয়াই একটু এলো-মেলো বোধ হয়। হয়তো কবি গদ্যের এই সুরই তাহার অন্তর ভাব প্রকাশের উপযুক্ত মনে করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে প্রকাশিত ডায়ারিগুলির মত বর্ত্তমান পরিণত বয়সের ডায়ারিখানিও ব্যক্তিগত মনোভাব প্রকাশেই ভরিয়া যাইতেছে। পূর্ণ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নিখিল বিশ্বের যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ হইলেও পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি হইতে লোকে আরও নানা কথা জানিবার আশা করিয়া থাকে। আশা করি সে সব আকাঙ্ক্ষা আমাদের ক্রমে পূর্ণ হইবে। 'খেলা' রবীন্দ্রনাথের আরও একটি কবিতা—সুন্দর!

'পুঁইমাচা' ঃ—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প আমাদের দেশে মেয়ের জীবন কতটা ব্যর্থ হইয়া যায়—মা-বাপের মেয়ে ও শ্বশুরবাড়ীর বৌ কতটা পৃথক হইয়া পড়ে এই চিত্রে ছবির মত তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছেলে বিয়ে দিয়া বৌ ঘরে আনিয়া যাহারা তাহাদের উপর নিরঙ্কুশ শাসন ও অত্যাচার চালান এই গল্পটি পাঠে তাহাদের একটি বারও মনে জাগিবে—শ্বশুর ঘরের এই বাক্যহীন বধূটাও তো কোন হতভাগ্য মা-বাপের আদরিণী আব্দারে মেয়েই ছিল!

ঘুমের ঘোর ঃ—শ্রী প্রফুল্লকুমার পালের গল্প।—হিন্দু সমাজের নিম্ন জাতির মধ্যে কচি মেয়েদের বেশী বয়সের পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হয়। সমাজে বিধবার সংখ্যাও বেশী সেই বিধবারা সমাজেরই কোন বিপত্নীক কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইয়া স্বামী স্ত্রী ভাবেই বাস করে। স্বামী স্ত্রী ভাবে বাস করিয়াও এই বিধবাদের জীবন্ত সন্তানের জন্ম দিবার অধিকার নাই। হিন্দু সমাজের একটা স্তর কি ভাবে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে লেখক এই উজ্জ্বল চিত্রে তাহাই দেখাইয়াছেন।

শ্রীসঞ্জীব চৌধুরীর—'নেপালরাজের ইন্দ্র যাত্রা'—নেপালের একটি মিছিলের কাহিনী। নেপাল প্রবাসী অধ্যাপক চৌধুরী নানা ইংরেজী ও বাংলা পত্রে নেপাল সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা লিখিতেছেন।

'শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ দর্শন' একবর্ণ চিত্র। শিল্পী শ্রীগগনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের অঙ্কিত হইলেও বিশেষত্ব বিহীনই মনে হইল।

'তুসার ঝটিকা' রুশ সাহিত্যিক পুসকিনের একটি গল্প—অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। বর্ত্তমানের অনন্ত বিভবশালী রুশ সাহিত্যের গোড়া-পত্তন করিয়াছিলেন এই শক্তিশালী লেখক পুসকিন। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ একনিষ্ঠভাবে বিদেশী সাহিত্য সম্পদের সঙ্গে বাঙ্গালীর পরিচয় করাইতেছেন। কিন্তু অনুবাদ সাহিত্যে বাঙ্গালীর যেন তেমন রুচি নাই—অথচ ইংরেজ, ফরাসী, রুশ, জার্ম্মেন, জাপান সকলেই নিজের সাহিত্য থাকিতেও বিদেশী ভাল বহি বাহির হইবামাত্র তাহার অনুবাদ নিজ ভাষায় করিতেছে। শ্রীবীরেশ্বর বাগচীর রুশ-ইতিহাসে রুশ দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। 'নিদালি' শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের কবিতা। বাংলায় এ ধরণের কবিতায় কতকটা প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত। এ কবিতা যেন ছন্দ ও ভাবকে ভেংচাইয়া চলিয়াছে। শ্রীরামানুজ করের সমগ্র ভারতের তুলনায় বাঙলার কারখানা নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ প্রবন্ধ। ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালী কত নীচে এবং সেইজন্য বাঙ্গালীর অবস্থা কত হীন হইতেছে প্রবন্ধটি পড়িলে তাহা বোঝা যাইবে। নূতন 'ভূত' শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায়ের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। শ্রীবিমানবিহারী মজুমদারের 'কাব্যের আর একটি উপেক্ষিতা'য় নিমাই-পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা কহিয়াছেন। শ্রী অরবিন্দ দত্তের "বামুন বাগ্‌দী" উপন্যাস চলিতেছে। শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা লুই পাস্তুরে এই বৈজ্ঞানিকের জীবন কথা ও কার্য্যাবলীর পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীসারদাচরণ উকিল দিদিমা, মা ও মেয়ের ছবিতে "ত্রিযুগ" ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—সুন্দর হইয়াছে। শ্রীহরিহর শেঠের চন্দননগরের কথক কবিওয়ালা ও যাত্রা' জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ প্রবন্ধ। 'রাজপথ' উপন্যাস চলিতেছে। "পঞ্চশস্যে" শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায় বিদেশী অনেক নূতন জিনিষের সরস পরিচয় দিয়াছেন। বীরভূম-জেলা-সম্মিলনীর সভাপতির বক্তৃতা—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ যোগ্য। 'বিবিধপ্রসঙ্গ' কংগ্রেস সভাপতিরূপে মহাত্মার অভিভাষণের

আলোচনায় অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছে। জাতীয় বিদ্যাশালার আদর্শ, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিবারণ প্রভৃতি প্রসঙ্গে যে মত দেওয়া হইয়াছে—এবং যেরূপ চুল-চেরা ভাবে মহাত্মার মতের সমালোচনা করিয়া তাহা খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে তাহা নানা ভাবে অসমীচিনও দেখানো যাইতে পারে। তবে রাজনীতি ক্ষেত্রে নানাজনে নানা ভাবে ভাবেন—মতভেদ থাকা অসম্ভব নহে, তাই এক্ষেত্রে মাদক দ্রব্য আগে নিবারিত হইবে না খদ্দর আগে চালাইতে হইবে, কিম্বা জাতীয় বিদ্যালয় বড় আইনজ্ঞ করিতে পারিবে না বলিয়াই এই বিদ্যালয়ই রাখিতে হইবে এ সব তর্কে কোন ফল নাই। মাদকদ্রব্য নিবারণ যদি এতই সহজ সাধ্য হইত তবে আমেরিকায় এখনো এত হুলুস্থুল চলিত না—স্বাধীন দেশের প্রচেষ্টাই বা কেন সার্থক হয় না? এ পথেও বিঘ্ন যথেষ্ট আছে—নহিলে মহাত্মাই বা সর্ব্বদিকে কার্য্য আরম্ভ করিয়া আবার থমকিয়াছেন কেন? জাতীয় চরিত্র বল যে শিক্ষায় হরণ করে তাহাও কি শিক্ষা? মহাত্মার জাতীয় শিক্ষার আদর্শ সংকীর্ণ নহে বিবিধ প্রসঙ্গের লেখক মহাশয় বিবেচনা করিলেই বুঝিবেন।

(পাঠক)

রঙ্গালয়

স্টারে "সরলা"—দেশের এই বিষম দুর্দ্দিনে এই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁইএর যুগে, এই পবিত্র শিক্ষামূলক সামাজিক নাটকের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া আর্টথিয়েটার লিঃ দেশবাসীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। এই পুনরাভিনয়ে ইঁহারা কৃতীত্বও যথেষ্ট দেখাইয়াছেন। দানীবাবুর 'গদাধরচন্দ্র' পরিণত বয়সের অভিনয় হইলেও উপভোগ্য, এবং ইহাতে তাঁর সুনাম বর্দ্ধিতই করিয়াছে। নীলকমলের ভূমিকায় নরেশবাবু বেশ একটু নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। আর সুন্দর স্বাভাবিক স্বচ্ছ অভিনয় হইয়াছিল! তিনকড়ি বাবুর 'শশীভূষণ' বিধুভূষণ চরিত্রে স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ ও কণ্ঠস্বর প্রয়োগ না করিলে তাঁহার অভিনয়ও সুন্দর হইত, স্থানে স্থানে তাঁহার অভিনয় বেশ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। সরলার ভূমিকায় শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর অভিনয় অতুলনীয়। গোপালের অভিনয় স্বাভাবিক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল। দৃশ্যপটাদিরও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে আর্ট থিয়েটারে খুব শীঘ্রই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' সম্পূর্ণ নূতন ভাবে অভিনীত হইবে। বিষবৃক্ষ বহুবার প্রায় সকল রঙ্গমঞ্চেই অভিনীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আর্ট থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ যখন এই পুরাতন নাটকখানির পুনরাভিনয়ের জন্য যত্নবান হইয়াছেন, তখন ন্যাট্যামোদী দর্শকবৃন্দ নিশ্চয় নূতন কিছু দেখিতে পাইবেন এমন আশা করিতে পারেন। আর্ট থিয়েটারের Producer এর হাতে বিষবৃক্ষকে নূতন বইএর মত নূতন ছাঁচে ঢালা ও সর্ব্বদিক দিয়া নূতন দেখিব এমন কথা মনে করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। অধুনা তাঁরা যে কয়েকখানি পুরাতন নাটক অভিনয় করিয়াছেন, সেই সকলেরই মধ্যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সুতরাং তাহাদের এ চেষ্টা যে জয়যুক্ত ও ফলবতী হইবে—এমন কথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় বলা হইবে না।

ক্ষীরোদবাবুর ঐতিহাসিক নাটক "গোলকুণ্ডা"র মহল আর্ট থিয়েটারে পরিপূর্ণ উৎসাহে চলিয়াছে। শুনা যাইতেছে খুব শীঘ্র এ নাটকখানি অভিনীত হইবে। এবার দর্শকগণ আর অনুযোগ করিতে পারিবেন না—এক"কর্ণার্জ্জুন" দেখিয়া চক্ষু পচিয়া গেল। দেখা যাক আর্ট থিয়েটার নিত্য নূতন নাটক অভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দের অভিনয় দর্শনের আকাঙ্ক্ষাকে পরিশ্রান্ত করিয়া ফেলেন কিনা!

মনোমোহন নাট্যমন্দিরে ঃ— ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রণীত "পুণ্ডরীক" নাটকখানি খুব শীঘ্র অভিনয় করিবে বলিয়া আজ কয়েক সপ্তাহ আশা দিয়া আসিতেছে। এই নাটকখানির অভিনয় হইতে আর বিলম্ব কত? শুনিয়াছি ইহার মহলাও নাকি খুব জোর চলিতেছে।

পাষাণীর অভিনয় লইয়া যখন হিন্দুর মনে আঘাত লাগিতেছে, তখন শিশির বাবুও ত হিন্দু, ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত তাঁহার কি উচিত নয় এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া? ইহাতে তাঁহার থিয়েটারের ত কোন কারণে ক্ষতি হইবে না।

Printed & Published by Jnanedra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works

সেই মুখ

Lakshmibilas Press, Calcutta.

নবযুগ সাপ্তাহিক
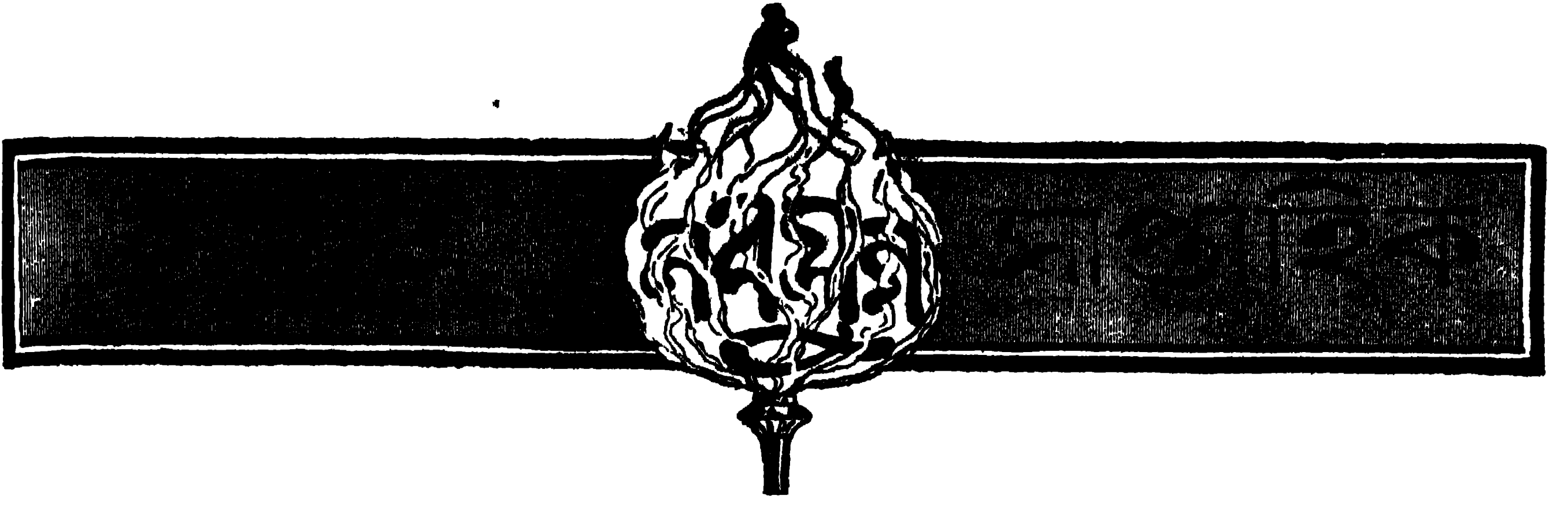
প্রথমবর্ষ]   ২৫শে মাঘ শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ৭ই ফেব্রুয়ারী   [২৬শ সংখ্যা

আত্ম-ভিক্ষা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী

বিমুক্ত আকাশ তলে,
ছোট বড সবে মিলে
রচিত যে মহাবিশ্ব
—সুন্দব মহান্ !

তারি সবাকার মাঝে
আপনারে চলি' খুঁজে,
কবিতে বিকাশ নিজ
সঙ্কীর্ণ পরাণ।

রুদ্ধ এ নয়ন লয়ে,
কেবলি চলেছি ধেয়ে,
কেন চলি ?—নাহি জানি—'
—কোথা এব শেষ !

কে আছ নয়ন খুলি' ?
দেহ, ভাই, পথ বলি,
যে পথে তোমরা, বন্ধু,
চল কাম্য দেশ !

হে ক্ষুদ্র, মহান্ সবে,
এস, ভাই, বন্ধুভাবে,
—লহ তোমাদের মাঝে
করি' আলিঙ্গন।

দেহ জ্ঞান, দেহ আলো,
যাহা কিছু আছে ভালো
তোমা সবাকার মাঝে,
—মাগি' অনুক্ষণ !

ছাত্রীর উত্তর

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী

(১৮শ সংখ্যা ১৪ই অগ্রহায়ণের নবযুগে প্রকাশিত 'শিক্ষয়িত্রীর পত্রের উত্তর।)

শ্রদ্ধেয়া বনলতা দি,—

আপনার স্নেহ ও উপদেশ পূর্ণ পত্রখানি আজ দেড়মাস হইল পাইয়াছি কিন্তু নানারূপ কারণে উত্তরটা দিতে বড়ই দেরী হইয়া গেল সেজন্য সর্ব্ব প্রথমেই আপনার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইবার প্রধান কারণ আমার নিজের অসুস্থতা সে সংবাদ বাবা বোধহয় আপনাকে জানিয়েছেন। আমি তাঁকে লিখতে বলেছিলাম। অসুখ সারতে প্রায় মাস খানেক লেগেছিল। যাহা হউক এখন আমি বেশ সুস্থ হয়েছি। আশা করি এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না।

এখন আপনার পত্রের বিষয় সম্বন্ধে আমার কৈফিয়ৎ আমি আপনাকে জানাইতেছি। বোধহয় ইহা আপনার নিকট প্রীতিপ্রদ হইবে না কিন্তু তথাপি আমি অকপটে আমার মানসিক এই পরিবর্ত্তনের মোটামুটি কারণগুলি আপনাকে জানান কর্ত্তব্য বোধ করি, কারণ পাঠ্যাবস্থাতে আপনি আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন এবং আপনার শিক্ষা দীক্ষা ও জ্ঞান বিশ্বাস অনুযায়ী যাহা সব আমার পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করিতেন, সযত্নে তাহা আমাকে উপদেশ করিতেন, সেজন্য আমি আপনার নিকট চির জীবন কৃতজ্ঞ থাকিব। আর আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি যে যদিও দৈবক্রমে আমার জীবনস্রোত আপনার নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে তথাপি যেন আপনার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিতা না হই কারণ সেটাকে আমি একটা দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে করিব।

আপনি আমার বিবাহ হইবে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন এবং আমিও সাধারণের দলে মিশিলাম বলিয়া আমার উচ্চ শিক্ষার এই পরিণাম দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছেন, হইবারই কথা বটে। আমি নিজেই আমার এই পরিবর্ত্তনের কথা মনে করিলে বিস্মিতা না হইয়া পারি না তবে সেটা অন্য ভাবে! আপনারা আমাকে যে সব শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য নব সামাজিক তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা পুস্তক পাঠ করিতে দিয়াছিলেন, সে সব তত্ত্বের অর্থ আমার মনে ভাল করিয়া আঁকিয়া দিয়াছিলেন তাহা হইতে আমিও বাস্তবিকই মনে প্রাণে বুঝিয়াছিলাম এবং বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, পুরুষ জাতি আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমাদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। এখন ইংরাজের কৃপায়ই আমরা চৈতন্য লাভ করিয়াছি এবং দেখিতেছি যে পাশ্চাত্য সুসভ্যা নারীগণের অপেক্ষা আমরা কত হীনা-কত দীনা। এ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে সে সময় অনেক আলোচনাও হইয়াছে, হষ্টেলের ঘরে অনেক সময় রাত দুপুর পর্য্যন্ত পুরুষমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আমরা সতেজে করিয়াছি সে সবও বেশ মনে আছে। সুতরাং সে সময় পুরুষ জাতির ছায়া দেখিলেই গা জলিয়া উঠিত,—ঘৃণাতে চিত্ত ভরিয়া যাইত। বিবাহের কথা তো ছাড়িয়াই দিন, সর্ব্ব প্রকার পুরুষের সংশ্রব ত্যাগই তখন কার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। মনে মনে সংকল্পও দৃঢ় ছিল যে পুরুষ জাতিটাকে উঁচু গোড়ালির জুতার ঠোকরে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া একটা শিক্ষা দিয়া যাইব। তখন তো সংসারটা কিছুই দেখি নাই— কলেজ আর হষ্টেলটাই তখন সমস্ত পৃথিবী ছিল। মধ্যে মধ্যে বাড়ী যা আস্‌তাম তাতেও সংসারের সঙ্গে পরিচিত হবার তেমন সুযোগ ছিল না। দাদারা এবং ছোট ভাইরা আমার মুখে ঐ সব নব্য আলোকের দীপ্তির ছটা দেখিয়া আমাকে অনেকটা বর্জ্জন করেই চল্‌তেন। মা অবাক হয়ে চেয়ে থাক্‌তেন আমার মুখের পানে, বাবা একটু মুচ্‌কি চাপা হাসি হেসে চলে যেতেন, আমি তখন নিজের গর্ব্বে-নিজের দর্পে আত্মহারা! নিজেকে বিজয়িনী মনে করে খুব সুখ পেতাম। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট

পদবীর পরীক্ষা-সাগরে অবগাহন করে শরীরটা যখন বড ভেঙ্গে পড়্‌লো তখন বাবার একান্ত ইচ্ছাতে আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুকাল আমার দাদামশায়ের পল্লীভবনে গিয়ে বাস কর্ত্তে হয়েছিল। দাদা মশায় বৃদ্ধ, বয়স ৭০ বৎসবের কম নয়। চুল দাডী সব কাশ-শুভ্র, তিনি ইংরাজীতে বিশ্ব-বিদ্যালয়েব সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি ধাবী, সেও একালের কথা নয় প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার! পাশ্চাত্য সাহিত্যাদিতে তিনি খুব লায়েক। তাছাডা ফবাসী, লাটিন, জর্ম্মানও তাঁব বেশ জানা আছে এ দিকে আমাদেব সংস্কৃত বিদ্যাতেও কম নন, সাহিত্য নাটকাদি তো ছেডে দিন, উপনিষদ, ষডদর্শনাদিতেও তাব বিশেষরূপ অধিকাব আছে। দিদিমাটীও কম নন, তিনি অবশ্য আমাদেব মত মার্কামারা গ্রাজুয়েট্ নন তবে তিনি সদ্বংশেব কন্যা, তাঁব পিতা একজন সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁব কাছ থেকে বামায়ণ, মহাভাবত এবং প্রধান প্রধান পুরাণাদিব উপদেশ যথেষ্ট পেয়েছিলেন। বাংলা লেখা পডা তো খুব ভালই জানেন, তাবপর দাদা-মশায়ের সাহচর্য্যে ইংরাজিও কিছু কিছু চলন সই মত শিখেছেন, আব তাঁব কাছে পাশ্চাত্য ভাল ভাল বইএর মোটামুটি তত্ত্ব ও আখ্যান ভাগ আদি ও শিখে নিয়েছেন। এসব তো আমি আগে জান্‌তাম না। দিদিমাকে বাহিবে থেকে দেখে আর তাঁর কাজ কর্ম্ম দেখে সেই সেকেলে মূর্খ —একাধাবে গৃহদাসী ও পাচিকা বলেই মনে কর্ত্তুম। তাঁদের কাছে গিয়ে কযেক দিনেব পব ক্রমে তাঁব অন্তবের খবর পেলুম। দাদামশায়ের সঙ্গে আমি জুলিয়াস্ সিজারেব পোর্সিয়া চবিত্রেব আলোচনা কর্চ্ছিলাম, তর্কাতর্কিও চল্‌ছিল এমন সময় দিদিমা এসে জুট্‌লেন এবং ক্রমে ঐ চবিত্রের বিশেষত্ব লইয়া তিনি দু একটা এমন মন্তব্য প্রকাশ করলেন যে আমি চমকে উঠ্‌লাম। সে মন্তব্য গুলি এমনই সমীচীন আর এমন সুন্দব যে তা যেন দাদামশায়ের থেকেও ভাল বলে আমার মনে লাগলো! পবে বিস্ময় দমন করে তিনি এসব কি কোরে জান্‌লেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আমাকে ঠাট্টা করে বল্লেন "কেন আমি লরেটো কি বেথুন কলেজে পড়ি নি বলে?" যাহোক পরে জান্‌লাম দাদামশায়ই তাঁকে এ সব শিখিয়েছেন। আমি বল্‌লাম কতবার তো আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে, একটু তো বুঝতে পারিনি যে আপনি এত সব জানেন? দিদিমা হেসে বল্‌ছেন "আমরা তো কলেজে পড়া নয় রে দিদি, যে বিদ্যা বমন করে বেড়িয়ে পাঁচজনকে উত্যক্ত করে তুলবো। কিইবা জানি যে তার বড়াই করবো! তোরা সব বেশী জানিস্, তোদের শোভা পায়। যখন তোদেব বাড়ী যাই কোন ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষ কোরে, তখন তারই দিকে সাধ্যমত যা পারি চেষ্টা করি, কাজ ফুরুলে চলে আসি। বাস!" আমার মনের মধ্যে সেই প্রথম একটা ওলট পালট আরম্ভ হলো, অটল বিশ্বাসের ভিত্তি কেঁপে উঠ্‌লো! তবে কি কলেজে শিক্ষয়িত্রীরা যা সব শিখিয়েছেন সে ভুল! এই তো দাদামশায় আর দিদিমা—শুনেছি দাদামশায় যখন ১৬।১৭ বছরের আর দিদিমা ৮।৯ বছবেব তখন এঁদের বিয়ে হয়। অথচ আজ এই অর্দ্ধ শতাব্দির উপর দুজনে বিবাহিত জীবন যাপন কর্চ্ছেন, সংসারের সব খুটি নাটিও কর্চ্ছেন তাঁরা কোন কালেই অর্থশালী নন,—ঘরকন্না, গেরস্তালী, রান্নবান্না, সেলাই-ফোঁডাই আবো কত কি! তারপব ছেলে মেয়েদের পালন পোষণ,—তাদের কারো কারো অকাল মৃত্যুর শোকও সহ্য করেছেন,—আবার তারই মধ্যে দাদামশায় তাঁকে এত শিক্ষা দিয়েছেন—তবে পুরুষজাতি যে তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধিব জন্য নারীজাতিকে নিজ দাসী করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদেব চক্ষে অজ্ঞানতাব ঠুলি বাঁধিয়া দিয়াছে এ সব শিক্ষা যে আমবা পেয়েছি তা কেমন কোরে সত্য হতে পারে। এই সন্দেহ আমার মনে জেগে উঠ্‌লো! মনের মধ্যে বড় জোরে একটা ধাক্কা লাগলো! আব আমি বড় অশান্ত হয়ে পড়লাম। সেইদিন থেকে কয়েকদিন পর্য্যন্ত দিবারাত্র আমার মনের মধ্যে আপনাদের প্রদত্ত পূর্ব্বের theoretic শিক্ষা এবং প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত practical শিক্ষার মধ্যে দ্বন্দ বিবোধ চল্‌তে লাগলো, আর আমি দাদামশায় দিদিমার কার্য্যাবলী বিশেষ মন দিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলাম, আর সেই পল্লীর আর আর স্ত্রী পুরুষদের ধরণধারণ চালচলনও লক্ষ্য করতে লাগলাম। আপনাদের দত্ত শিক্ষার সঙ্গে এগুলি কেমন মিলে তাই বুঝবার জন্য। দাদামশায় আমার পূর্ব্ব শিক্ষার—নারী-

জাগরণতত্ত্বের ইতিহাস বেশ জানতেন—তাই বুঝি বাবা আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দাদামশায় ও দিদিমা সময় সময় স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ, বিবাহিত জীবন, উভয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সংসারে পুরুষ ও নারীর স্থান ও অধিকার, এই সব বিষয়ের আলোচনাও কৌশলে কথায় কথায় পরোক্ষভাবে এনে ফেলতেন, সেটা এমন ভাবে যে আমাকে উপদেশ দেওয়ার জন্যই যে তা করা হচ্ছে সেটা আমি কিছুতে বুঝতে না পারি কিন্তু আমার মনের মধ্যে তোলা পাড়া চলছেই সুতরাং আমি তাই মনে করি। তবে তাতে আমি বিরক্ত হইনা কারণ তার মধ্যে গুরুগিরি মোটেই থাকেনা! আমার মনে হয় আপনারাই বরং গুরু গিরিটা বেশী ফলাতেন্ আর মাথার দিব্যি দেওয়ার মত করে তা সব মেনে চলতে বলতেন! যাহোক সে বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে দু'চার চিন্তা কাগজের দরকার, এত সময়ও আমার নাই, আর সে সব বলাও অনেকটা নিস্প্রয়োজন। তবে মোটামুটি এই বলতে পারি যে সেই পল্লীর মেয়েদের সঙ্গে মিশে আমি বুঝলাম তাদের অনেকে নিরক্ষর হলেও তাদিগকে মূর্খ, অজ্ঞান বলা যায় না। তাদের ধর্ম্মের মোটামুটি সত্য গুলি, সদসতের পার্থক্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান, আদর্শ স্ত্রী পুরুষের জীবন কথা, সংসার পরিচালন ব্যবস্থা, সন্তান পালন ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। তারপর তাদের পুরুষদের ব্যবহারও তাদের সঙ্গে যে সর্ব্বদাই প্রভু ভৃত্যের মত তাও তো নয়। আজকালকার সব গল্পে নারী-নির্য্যাতনের যত রকম বিবরণ পড়ে ছিলাম বাস্তব জীবনে এই পল্লীর নিরক্ষর লোকদের মধ্যেও একটাও ঠিক সে ভাবে আমি দেখতে পাচ্ছি না। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে যেমন দু'একটা পুরুষ কর্ত্তৃক নারী-নির্য্যাতনের দৃষ্টান্ত দেখিলাম তেমনি মুখরা চণ্ডী নারী কর্ত্তৃক পুরুষকে সম্মার্জ্জনী প্রহার অথবা কেবল কর্কশ বাক্যের তেজে পুরুষকে গৃহ হইতে বহিষ্করণের দৃষ্টান্তও দু'চারিটি না দেখিতেছি তাহা নহে; আবার আশ্চর্য্যের কথা এইযে দু'চার ঘণ্টা বা একবেলা বাদে সেই সেই পুরুষ বা রমণী নির্য্যাতিতের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে অথবা বাড়ী ফিরাইয়া আনিবার জন্য অশ্রু পূর্ণ কাকুতি মিনতি করিতেছে দেখা গেল।

সংসারের খুটি নাটি কাজ কর্ম্মে তাদের মধ্যে যে মতদ্বৈধ হয় না তা নয়, কিন্তু তাতে কখন বা পুরুষই রমণীর মতে মত দিচ্ছে, কখন বা রমণীই পুরুষের অনুবর্ত্তন কচ্ছে। দাদামশায় ও দিদিমার গার্হস্থ্য জীবন যাপনের মধ্যে এমন একটা সহজ অনাবিল শান্তির ধারা আমি বহিতে দেখিয়াছিলাম যে তাতে আমার মনটা বড়ই বেশী ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁদের মধ্যে তো আপনার দত্ত শিক্ষার প্রভু ও দাসী সম্বন্ধ দেখি না, একটা গভীর প্রেম ও স্নেহের বন্ধনই দেখিতে পাই। এই ভালবাসার টানে দিদিমাও দাদামশায়ের দাসীর মত খাটেন, দাদামশায়ও দিদিমার দাসের মত খাটেন। একজনের সেবা শুশ্রূষা অন্যে না করিয়া অপর তৃতীয় ব্যক্তির হাতে দিয়া যেন তাঁদের তৃপ্তি হয় না। নিম্নশ্রেণীর ঝগড়া দ্বন্দের মধ্যেও যে এ ভাবটা দেখিতে পাই নাই তা বলতে পারি না। বিস্তারিত লিখতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়। তারপর যখন দেখলাম যে যাঁরা আজকাল মাসিক পত্রের পৃষ্ঠাতে নির্ম্মমভাবে এদেশের স্বামীগণকে এবং পুরুষ সাধারণকে কশাঘাত কচ্ছেন তাঁদেরই কেহ কেহ নিজ কন্যাকে ঐরূপ একজন পুরুষের হাতে সমর্পণের জন্য ছুটাছুটি করিতেছেন, কেহ বা নিজ স্বামীর প্রসঙ্গ ছাটিয়া ফেলিয়া অন্যের প্রতি তীব্র ভাষা প্রয়োগ কচ্ছেন, তখন আমার মনে আরও সন্দেহ জেগে উঠলো যে তাহলে তো তাঁদের লেখায় ও কার্য্যে সামঞ্জস্য দেখি না। তখন মনে পড়লো দাদামশায়ের একটা কথা যে বঙ্গ ভঙ্গের পর যখন ছেলেদের জাতীয় বিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রস্তাব করা হয় তখন কোন কোন নেতা তারস্বরে সরকারী বিদ্যালয়কে গোলামখানা বলিয়া গালি দিয়া ছাত্রগণকে তাহা পরিত্যাগ করতে আজ্ঞা করিতেছিলেন অথচ নিজেদের ছেলেপিলের সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা করেন নাই, কেহ বা বাহিরে ঐরূপ বক্তৃতা দিয়া নিজে তলেতলে মুনসেফী লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। আমাদের এই সব লেখিকাদেরও মধ্যে অন্ততঃ কেহ কেহ সেই পথবর্ত্তিনী। তাঁদের লেখার

গুণে পরের মেয়েরা পুরুষ-দ্বেষিণী হউক, বিবাহকে ঘৃণা করুক, স্বৈরিণীভাবে বিচরণ করুক, তাতে তাঁদের কি ক্ষতি! কি করিয়া এই সব উপদেশের প্রতি আস্থা থাকে বলুন তো! বরং যদি দেখিতাম তাঁহারা কয়েকজন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটা নারীরাজ্য স্থাপিত করিতেছেন তাহাতে পুরুষের সম্পর্ক আদৌ না রাখিয়া নিজেরাই সকল বিষয়ের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থার ভাব লইয়া দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে আমরা নারীগণ পুরুষদের সাহায্য পরামর্শ বা সম্পর্ক বিন্দু মাত্র গ্রহণ না করিয়া নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং নিজেদের মর্য্যাদা, শীল, ও সম্মান সমস্ত স্বীয় বলে বজায় রাখিয়া সংসারে বিচরণ করিতে ষোল আনা বল ও সাহস রাখি তাহলে তাঁদের আন্তরিকতাতে সুখী হইতাম এবং আমিও সানন্দে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়া উহার সাফল্য লাভে যত্ন করিতে পারিতাম কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমি অন্যরূপই দেখিতেছি। আর এদিকে আপনাদের কল্পনার জগতের গণ্ডী পার হইয়া বাস্তব জগতের সামান্য পল্লী ভবনে গিয়া আমি যে শান্ত গার্হস্থ্য সুখের সন্ধান পাইয়াছি, দাদামশায় ও দিদিমার নিকট আমাদের দেশের আদর্শাদির যে সুন্দর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি তাহাতে আমার মনের গতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং আমি বিবাহিত জীবনকেই নারী জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য আর মাতৃত্বকেই নারী জীবনের সফলতা বলিয়া বুঝিয়াছি সুতরাং বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইতে আমার আপত্তির পরিবর্ত্তে আগ্রহই জন্মিয়াছে। গার্হস্থ্য ধর্ম্মকে আমাদের দেশের শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বোচ্চ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কারণ এই জীবনে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে এক মনপ্রাণ হইয়া জগৎ পালনী শক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে সক্ষম এইজন্যই নারীর কর্ম্মক্ষেত্র গৃহে—সে পত্নী-রূপে, কন্যারূপে, মাতারূপে ও ভগ্নীরূপে সংসারে শান্তি আনিবে, সৎশিক্ষা দিবে, মানুষ প্রস্তুত করিবে, সংসারে সেই রাণী—অন্তঃপুরে তারই প্রভাব সর্ব্বোপরি। এখন আমি বেশ বুঝিতে পারি কেন মা আপনাদের শিক্ষা দীক্ষার কথা আমার মুখে শুনিয়া অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন। তিনি যে এমন বাপ মায়ের মেয়ে। এখন আমি মাকে ভাল করে চিন্‌তে শিখেছি। বাবার চরণে কোটি কোটি প্রণাম যে আমার কলেজি শিক্ষার ঐরূপ পরিণাম দেখে তিনি বুদ্ধি করে এমন দাদামশায় দিদিমার কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাই না আমার চোক্ খুল্‌লো! আপনাদের মোহে পড়ে কি সব বিষ যে সানন্দে গিলেছিলাম, পাশ্চাত্য সব পুঁথি কেতাব থেকে কি সব ঘৃণ্য জিনিষ সাদরে রত্ন বলে নিতে গিয়েছিলাম আর ঘরের রত্ন কাঁচ বলে অবহেলা করেছিলাম তা মনে করে চোকে জল আস্‌ছে। যাক—এই আমার মনের পরিবর্ত্তনের ইতিহাস।

আপনি তারপর দফাওয়ারি যে সব উপদেশ দিয়াছেন আমার জন্য আর তাহার প্রয়োজন হইবে না সেটা বোধহয় বুঝিতেছেন। আমার দাদামশায়, পিতৃদেব প্রভৃতি গুরুজন আমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁদের প্রতি আমার অচলা ভক্তি জন্মিয়াছে, আমার জীবনের সঙ্গী নির্ব্বাচনে আমাপেক্ষা তাঁহাদিগকে বেশী উপযুক্ত মনে করি সুতরাং তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া যাঁহাকে আমার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া স্থির করিবেন তাঁহাকেই স্বামী বলিয়া মনে প্রাণে স্বীকার করিব এবং তাঁহাকেই হৃদয়ের ভালবাসা অর্পণ করিব। দাদামশায় একদিন কথা প্রসঙ্গে যে বলেছিলেন যে আমাদের হিন্দুর মেয়ে স্বামীত্বটাকেই নিজের হৃদয় নিবেদন করিয়া দেয়, তারা বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই স্বামীত্বকেই ভালবাসিতে শিক্ষা করে তার বিবাহ কালে সেই স্বামীত্ব যার প্রতি বর্ত্তে, ভালবাসাও তারই উপর গিয়া পড়িবেই। একথাটার মধ্যে বাস্তবিকই বড় গভীর ভাব আছে।

যেখানে পছন্দের ভার বর কনেদের নিজেদের হাতে থাকে, সেখানেও যে অনেক স্থলে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলিই চলিতে থাকে, একজন অন্যজনকে বিবাহের পূর্ব্বে transition periodএর মধ্যে প্রকৃত ভাবে চিনিতে পারে না এ দৃষ্টান্ত তো অনেক দেখা যায়! সুতরাং তাদের নির্ব্বাচনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা সব সময়ে নিরাপদ হয় না, কারণ যৌবনের উন্মাদনার রঙ্গীন চসমাতে আসল জিনিষটার রূপ তাদের চোকে ধরা পড়ে না। কেবল উভয়ের মধ্যে "তিন তাসের খেলা" চলিতে

থাকে। তার চেয়ে আমি গুরুজনদের হাতে ঐ ভারটা দেওয়াই বেশী নিরাপদ মনে করি।

যে কোর্টসিপহীন বিবাহে দাদামশায় ও দিদিমার মত আদর্শ দম্পতীও দেখা যায় আমি সে বিবাহকে হীন মনে করিতে পারি না—তাকে আমি শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছি। সুতরাং আপনার আর আর উপদেশ গুলির কোন সার্থকতা আমার মধ্যে হইবে না। পত্র বড়ই দীর্ঘ হইয়া পড়িল কিন্তু তবুও আমি যত বলিতে চাই তার অনেক কথাই বলা হইল না। আর আমার ভয় হচ্ছে, আপনি আমার এই সব পড়িয়া নিশ্চয়ই ভয়ানক রকম রাগিয়া যাইবেন, আমাকে বা পাগলই মনে করিয়া বসেন কিন্তু তবু না লিখিয়া পারিলাম না, কারণ আপনিও আমাকে আন্তরিক ভালবাসেন জানি আর আমিও আপনাকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। এজন্য আপনাকে আমি বিনীত ভাবে অনুরোধ করি কল্পনার রাজ্য ছাড়িয়া বাস্তব জগৎটা একটু ভাল করিয়া দেখিবেন আর ওই পশ্চিমা হাওয়াটার প্রভাব থেকে নিজকে একটু দূরে সরাইয়া লইয়া ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন ঐ সব শিক্ষা দীক্ষার ভালমন্দটা আমাদের মধ্যে কেমন ভাবে কার্য্য করিবে!

পুরুষকে কেবলই গালি দিয়া যাইবেন না। ভাল মন্দ স্ত্রী পুরুষ সকলের মধ্যেই আছে। আর ভাল মন্দ সকল সমাজের মধ্যেই আছে। পাশ্চাত্য জগতের কতকগুলি রমণী যে ক্লাবে থাকিয়া স্বাধীনতার জীবন যাপন করেন, তাঁদের অনেকে যে বলেন যে বিবাহিত জীবনে কখন প্রকৃত প্রেমের আস্বাদ পাইতে পারা যায় না সে গুলি কি আমাদের এই দেশের এই সমাজের পক্ষে হিতকর? না তাঁদের সমাজেই সকলে সে গুলি মঙ্গল কর বলিয়া মনে করে, সীতা সাবিত্রীদের আদর্শটা কি উঁহাদের আদর্শ অপেক্ষা হীন না বহু উচ্চে?

আপনি বিদুষী, বুদ্ধিমতী, স্থিরভাবে পাশ্চাত্য চসমাখানি খুলিয়া রাখিয়া অন্তর্দৃষ্টির সহিত আমার কথাগুলি একবার ভাবিয়া দেখিবেন তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনিও আমার মত মত্ পরিবর্ত্তন করিতে দ্বিধা করিবেন না। পরমেশ্বরের কাছে কাতরে প্রার্থনা করি যে আপনাদের ন্যায় সুশীলা সুশিক্ষিতা যে সব মহিলা আমাদের দেশের নারীগণের শিক্ষার পবিত্র ও মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা পাশ্চাত্য মোহ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের ললনাকুলকে দেশীয় সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলুন, যাহা প্রকৃত সৎ তাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল জাতি ও ভাষা হইতেই সংগ্রহ করিয়া শিক্ষা দিবেন কিন্তু দেশের ধাতে যাহা বেশ সয়, দেশের আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাহার অনুকূল, সেই দেশীয় ভাবেই যেন তাহাদিগকে উপস্থাপিত করা হয়। তা হলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল হবে। অন্ধ অনুকরণে আরও বিনাশের পথই প্রশস্ত হবে। আপনি আমার শিক্ষয়িত্রী, আমাপেক্ষা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। আপনাকে এ সব উপদেশ করিতেছি ইহা ভাবিয়া আমাকে অপরাধিনী করিবেন না। আমার মনের কথা বিশ্বস্তভাবে আপনার কাছে নিবেদন করিলাম মাত্র।

দীর্ঘ পত্রে অনেক কিছুই বাচালতা করিলাম সে জন্য ক্ষমা করিবেন। আশীর্ব্বাদ করিবেন আমার বিবাহিত জীবন যেন সর্ব্বপ্রকারে সাফল্য মণ্ডিত হয়।

ইতি—

আপনার স্নেহ গর্ব্বিতা ছাত্রী

"লিলি"
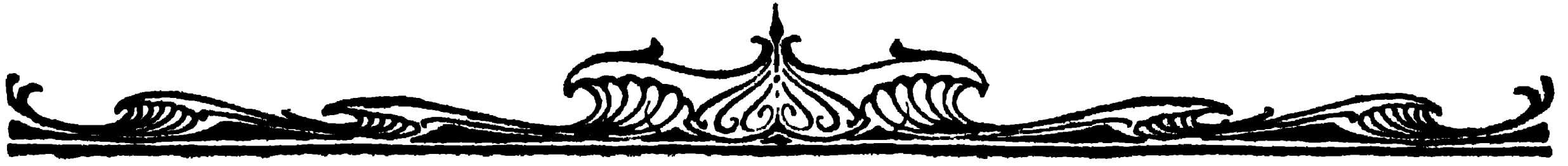
প্রিয়সঙ্গী

শ্রীধ্বজবজ্রাঙ্কুশ

রাজপথে কে গান গেয়ে যায়? কেন গায়? গান বন্ধ করে দাও।

আনন্দ—আনন্দ—আনন্দ! মূর্খ দার্শনিকের অসার কল্পনা। এত যদি আনন্দ তার এককণা আমি পাইনা কেন? যার আছে, তার আছে। আমার নাই।

দুঃখে দুঃখময় হয়ে দেখা দিল। নরকের সমস্ত হুতাশ একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে। বিষপাত্র উপচিয়া পড়ে। এত বিষ—খাবে কে? অমৃতের সন্তানেরা—সব কোথায়? নন্দদুলালদের আর দেখা পাওয়া ভার।

আদি-অন্ত—সব মিথ্যা। পাপপুণ্য একেবারেই মিথ্যা—দুর্বল মস্তিষ্কের দিবাস্বপ্ন। চাওয়া-পাওয়া সব ভুল। তুমি চেয়েছিলে—পাও নাই। যদি পেয়েছিলে, তবে হারিয়েছ। যদি হারিয়েছ—তবে বালাই গিয়াছে। ফিরে না—ফিরিবার নয়। দুর্বার জীবনস্রোত কেবল সম্মুখে চুলে ধরে টানে—পশ্চাতে ফিরে তাকায় না। তাকাতে দেয় না। নিয়তি? উত্তম—তবে নিয়তি। তাতে এলো গেল কি? সমস্যার সমাধান হলো কোথায়?

মঙ্গল—মঙ্গল! আমি দেখি ষোলকলায় পরিপূর্ণ এক মহা-অমঙ্গল। থম্ থম্ করে যেন এক চরাচরগ্রাসী এক মহা-অন্ধকার। যতদূর দৃষ্টি যায়—অবশিষ্ট জীবন—এই অন্ধকার কবলিত। কতদূর তাও বুঝা যায় না। অথচ প্রতিপদক্ষেপে জটিল—পিচ্ছিল-কণ্টকিত। এই অন্ধকারে—আলেয়ার ভাতি যারা দেখেছিল—তারা অন্ধকার-স্রোতে দূরে বা নিকটে কে জানে। আলেয়াও নাই—তারাও নাই। জীবনের আঁধারপথে কেউ আলো দেখাবে না। সে পুষ্পিত-বীথি—কুসুমসজ্জা—আলোর আলোময় উজ্জ্বল নিশা—সবি গে'ছে। থাকে না—। যারা আলো জ্বালে, তারাই আলো নিভায়। যে যার আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘরে গিয়ে নিরাপদে দ্বার রুদ্ধ করে বসেছে। বাহিরে অন্ধকার একলা কেঁদে মরে—কেউ দুয়ার খোলেনা—কেউ ফিরে তাকায় না।

এই ঘনঘোর অন্ধকারে মনে হয় কে যেন লুকিয়ে ফিরে। তার নিঃশ্বাস যেন কচিৎ আমায় স্পর্শ করে যায়। অথচ হাত বাড়ালে পাওয়া যায় না। শুধু বায়ুর প্রবাহ। শূন্যে শূন্যময়।

—যদি দেখা হত। দেখাত হ'লো না। দেখাত হবে না। দেখা হলে জানিনা কি হ'ত। বুঝিবা প্রলয়। ঈশানকোণে বিষাণ বাজে, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকে—কার হাতে শূলজ্বলে শতমণি প্রভাজিনি। তাণ্ডবের ছন্দে ছন্দে ভৈরব-হুঙ্কারে-ভূকম্পে—ধরা কি খান্ খান্ হবে? বিগত সুখ, বিগত দুঃখ—জীবন, মরণ—একই ধারায় বয়ে চলেছে। তবু থেকে থেকে,—কেন গর্জ্জে উঠে চারিদিক—? কোথায় আমার পরিত্যক্ত—চিরপরিচিত যুদ্ধক্ষেত্র। আমার তরবারী হাত থেকে কে নিলরে কেড়ে?

প্রলোভন, আকর্ষণ—চিরজন্ম তোমাতে আমাতে। শেষ নির্ভর আমার—তুমি। এস ফিরে এস—মন্ত্রপূতঃ মহাশক্তিধর,—জীবনের শতযুদ্ধে প্রিয়সঙ্গী আমার! দামিনী-ঝলকে দৃপ্ত-গরিমায়—তোমার সংহার ও প্রয়োগে চির-অভ্যস্থ আমি এস। বক্ষ শোণিতার্দ্র—তবু দক্ষিণ বাহু অক্ষত। আমি এখনো অক্ষম হইনি। আহত, ব্যথিত—মৃত ত নই, তবে এস। একবার—শেষবার—দেখি আমি!

কে কথা বলে? কে তুমি এ আঁধারে? কেন নয়? কে তুমি সঙ্গে সঙ্গে ফের—কে তুমি ঘুমঘোরে শিয়রে জাগ। কে তুমি বল—না-না—। কি শুনিতে কি শুনি। কেউ নাই। কে আবার কথা বলিবে। কার কথা কে শুনে।

তবে—তবে এস ! আমি কুঞ্জবনের গান থামিয়েছি। রাজপথে পথিকের ত্রস্তগতি আর নাই। আঁধারে সব ঢেকেছি। পাপ-পুণ্য সব মুছে দিয়েছি। এস বক্ষে ধরে—ওরে শোণিত-তৃষিত, উজ্জ্বল-প্রভাময়-দৃঢ়-তীক্ষ্ণ-তীব্র-প্রখর, বড় ধারাল-তুই-তোকে আলিঙ্গন করি। শত চুম্বনে-তুইরে প্রিয়সঙ্গী আমার তোরে ভরে দেই। আয় আয়, শেষবার একবার আয়।

নিস্তব্ধ-ধরণী—অন্ধকারে যেন মূর্চ্ছিতা। অথবা তন্দ্রাহতা। ঘনঘোরা-যামিনী— কোন্ সে পামর, সৃষ্টিতে এত দুঃখ ঢেলে দিয়েছে—? অঙ্গে যদি তার আঘাত করি—কাপুরুষ যুদ্ধ দিবে না? ডাকি যদি সম্মুখে এসে দাঁড়াবে না?

আমার অন্তরে থেকে আমাকে নিঃশেষ করে দিয়ে যাবে? পলে পলে, তিলে তিলে—? না,—আর না—। পুরাতন সঙ্গী আমার তোমারে স্মরি আমি—অতি নির্দ্দয় অতি নির্ম্মম হয়ে এস তীক্ষ্ণধার বন্ধু আমার। এই অন্ধকারের বক্ষভেদ করে দেখিব কোথায় সে—? পীড়িত সংসারকে হত্যা করে—আজ আমি মুক্তি দিব। কেন আমায় আহত করিল?

না—না—আবার না। তবে যাও দূরে অস্ত্র প্রলোভন—, নেভ প্রতিহিংসা-বহ্নি—হাস খলখল অট্টহাসি, বল ছলছল শুধু ছল, সর্ব্বনাশী—প্রেয়সী-ভৈরবী-গণিকা আমার। আসব আবেশে উন্মত্তা কি তুই? চল জলন্ত চিতায় তোমাতে আমাতে বুকে বুকে মুখে মুখে বিস্মৃতির দগ্ধ ভস্মমাঝে—অথবা ডুবি চল—কালো শীতল—অনন্ত অতলে!

২৯।১২।২৪

পল্লীর-আহ্বান

শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ওগো, এস ফিরে পল্লীর দ্বারে,
সবে এস ফিরে পল্লীর দ্বারে।
রহি' অগণিত বিলাসেতে মগন
আর ক'র না লাঞ্ছিত তারে।

রাখ আপাত-মধুর সব তুলিয়া,
যাও সহর-বিলাস-সুখ ভুলিয়া,
আজি পঙ্কিল পল্লীর মাঝারে
ওগো দলে দলে এস সবে চলিয়া,
আজি দূর ভবিষ্যতে চাহিয়া
এস লহ বরি' পল্লী-মাতারে।

আজি জীর্ণ ত্যক্ত পল্লী মাঝারে
ওগো দ্বন্দ্ব কলহ শুধু রাজে রে,
তার রোগ ও দৈন্য চির সাথী যে,
সেথা নিত্য মরণ বীণা বাজে রে;
গেছে অতীত গর্ব্ব সব চলিয়া
পিছে কঙ্কালখানা তার ফেলিয়া,—
সেই কঙ্কালে প্রাণ পুনঃ দানিতে,
তারে পূর্ব্ব গৌরবে আনিতে,
এস পল্লীর নন্দ দুলাল,
এস পল্লী ডাকে হাহাকারে।

বিয়োগ বিধুরা ।

পথি নারী বিবর্জ্জিতা

অধ্যাপক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

এই মহাশাস্ত্র বাক্যটির প্রতি আজকাল তেমন আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। নারীজাতির প্রতি পুরুষের চিরদিনই ভক্তি আছে, কিন্তু আজকাল এই ভক্তি-প্রবণতাটা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, রাস্তা ঘাটেও নারী নহিলে—অন্ততঃ তাঁহাদিগকে সম্মান দেখাইবার জন্য—আর চলে না। শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস বলিয়াই হউক, আর ঠেকিয়া কিঞ্চিৎ শিখিয়াছি বলিয়াই হউক, আমার এখন পথে নারী দেখিলেই মনে হয়, তাঁহাদের গায় মোটা মোটা অক্ষরে যেন লেখা আছে—বিবর্জ্জিতা, একবচনেও বটে, বহুবচনেও বটে যেহেতু শাস্ত্র বচন কখনও মিথ্যা হয় না।

সেদিন ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে জে, সি, চাটুয্যের অফিসে গিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে প্রায়ই যাই। চাটুয্যে আজকাল বড় লোক হইয়াছেন, ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিতেছেন, কিন্তু একদিন ক্লাশে আমার নীচে বসিতেন। আমি পরীক্ষায় তুকুড়ি সাতের জোগাড় রাখিয়া দিতাম বরাবরই, জে, সি, অর্থাৎ জীবনচন্দ্র প্রায় ফেল করিত। তবুও আমাদের মধ্যে বেশ প্রণয় ছিল। আমি অফিসে ঢুকিলেই জে, সি, একবার একটু হাসিয়া তাহার বিরল কেশ মাথা দুলাইয়া বুঝাইয়া দিত যে সময় নাই, সময় নাই। এর কোনও দিন ব্যতিক্রম ছিল না, কিন্তু ঐ ঘাড়-নাড়ার মধ্যে বেশ বুঝা যাইত যে জে, সি, তাহার পূর্ব্বতন সহপাঠীকে ভুলিতে পারে নাই।

আমিও ত কাজের লোক বটে, আমি বন্ধুবরকে বিরক্ত না করিয়া চট করিয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িতাম। প্রথমতঃ জে, সি, কাজের লোক, তার প্রতি মিনিটের দাম হয়ত কত মুদ্রা, কে জানে? দ্বিতীয়তঃ পাশের ঘরে তাহার টাইপিষ্ট কাজ করিত। দু' তিনটি টাইপ-রমণী নিয়ত কল চালাইয়া চালাইয়া হয়রাণ হইয়া যাইত। এত কি লিখিতে হয়, কে জানে? ব্যবসাতে লেখাপড়ার দরকার হয় না, অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু আমি দেখি যে ব্যবসাও ঝকমারি কম নয়। বন্ধুবরের এখন যেরূপ লেখা-পড়ার বহর তার সিকির সিকি বাল্যকালে থাকিলে—নাঃ, তাহা হইলে হয়ত ছোট আদালতের উকীল হইয়া আমারই মত পশার হইত। যাহা হউক, ঐ টাইপ রমণী-দের মধ্যে একজনকে বেশ বনেদী ঘরের মেয়ে বলিয়া বোধ হইত। তার নাম মিস ভ্যাণ্ডারবিল্ট্। এ মেয়েটিকে দেখিলে, সে যে অল্প মাহিয়ানার নকরী করে, তাহা বোধ হইত না। তাহার পোষাকে, পরিচ্ছদে, চাল চলনে বেশ একটু রুচির পরিচয় পাওয়া যাইত। তাহার বয়সও অন্যান্য টাইপিষ্ট অপেক্ষা কম।

প্রথম যেদিন এই মেমটি প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে নিযুক্ত হয় সেদিন আমি জে, সির অফিসে বসিয়াছিলাম। জে, সি, নিজেই আমাকে উহার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দেয়। তার পরে আমার কোনও লেখা টাইপ করিবার দরকার হইলেই আমি সটান জে, সির অফিসে আসিয়া হাজির হইতাম এবং জে, সিও ঐ মেয়েটির হাতে আমার কাজ ফেলিয়া দিতেন। জে, সি, সৌজন্যে চিরদিনই অতুল-নীয়।

কিছুদিন পরে আমি যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া গেলাম, তখন আমার [illegible] প্রত্যহই জে-সির অফিসে আসিতে হইত। সেবার অসহ-যোগ নীতির ফলে অনেক বাজে লোক নির্ব্বাচিত হইয়া-ছিল, কাজেই আমাকে সব বিষয়ে একটু নজর রাখিতে হইত। কাউনসিলে বক্তৃতা যে বড় বেশী আমাকে করিতে হইত, তাহা নহে। তবুও প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম সর্ব্বদা; কারণ উপস্থিত বক্তৃতা আমার কোনও কালে অভ্যাস ছিল না। এই কাউনসিলের ব্যাপারে আমার টাইপ

করিবার প্রয়োজনও কিছু বলবৎ হইয়া উঠিল। প্রতিদিন জে, সির অফিসে আসিতে কেমন বাধো বাধো ঠেকিত। কিন্তু জে, সি, লোক অতি অমায়িক।

এখন আর জে, সিকে বলিয়া দিতে হয় না, আমি নিজেই দরজা ঠেলিয়া সটান ঢুকিয়া পড়ি। এবং মিস্ ভ্যাণ্ডারবিল্ট্‌কে নানা প্রকার মিষ্ট বচনে তুষ্ট করিয়া আমার বক্তৃতার কপি 'যন্ত্রস্থ' করাই। আমি আমার লেখাটি পড়িয়া দিতাম, তাহাতে কাজ দ্রুত অগ্রসর হইত। এভাবে মেমসাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও সুতরাং অগ্রসর হইত।

আমার একটি নেশা ছিল, নস্য লওয়া। মিস্ ভ্যাণ্ডার বিল্ট্ তাহাতে বড় কৌতুক বোধ করিত। আমি নিজের মস্তিষ্ক সাফ্ করিবার জন্য মাঝে মাঝে নস্য লইতাম বিশেষতঃ হাতের লেখা পড়িতে পড়িতে যখন নিদ্রাবেশ হইত। কিন্তু একটু বেশী সান্নিধ্য হেতু সেই ঝাঁঝালো নস্যের দুই চারিটি কণিকা বিদ্যুৎ-বীজনের দ্বারা বাহিত হইয়া সময় সময় তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিত। তখন মেম সাহেব হাঁচিয়া হাসিয়া অস্থির হইত। অবশ্য তাহাতে তাহার কাজের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত যে হইত না, এমন নহে। লেখাতেও অনেক গলদ পড়িয়া যাইত। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, আমার এই বক্তৃতাগুলি অনেক সময়ে 'টাইপস্থ' রহিয়া যাইত। ভবিষ্যতে যদি আমার বক্তৃতা কেহ সংকলন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাকে শুধু আমার লেখার উপর চুণকাম করিলে চলিবে না; মেমসাহেবের অনিচ্ছাকৃত 'ব্যাসকূট'গুলিরও একটা হেস্ত-নেস্ত করিতে হইবে।

সে যাহা হউক বেচারী আমার জন্য মেহনৎ করিত যথেষ্ট। আমার এমনও কখনও কখনও মনে হইত যে, আমার বক্তৃতাগুলি টাইপ করিয়া সে গৌরব অনুভব করিতেছে। কারণ জে, সি, যত বড়ই ব্যবসায়ী হউন না, নাম ত বেনে, তার বেশী ত কিছু না। কাউন-সিলের মেম্বর, আইন ব্যবসায়ী, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের বক্তৃতা টাইপ করিবার সৌভাগ্য ক'জন মেয়ের ঘটে? আমি মিস্ ভ্যাণ্ডার বিল্ট্‌কে একেবারে শুধু খাটাই নাই। আমার একটি আসল মাদার-অব-পার্লের নস্যের কৌটা ছিল, সেইটার প্রতি মেমসাহেবের লোভ হয়। আমি তৎক্ষণাৎ সেটা 'প্রেজেন্ট' করিয়া দিলাম। আমার বেশী লোকসান হয়নি। ও কৌটাটি আমি এক ফিরিয়ালার নিকট আট গণ্ডা পয়সায় কিনি। শুনিয়াছি প্যারিসে ওর দাম বিস্তর। বোধ হয় বেটা চোরাই মাল আমাকে সস্তায় দিয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক, যেদিনকার কথা বলিতেছিলাম, সে বোধহয় ১লা এপ্রিল। তার পরদিন কাউন্সিল হইয়া বন্ধ হইবে। ওদিনটা ছিল ছুটী। আমি আদালত থেকে বরাবর ষ্ট্র্যাণ্ডরোডে গিয়া গরু-বাছুর খোঁয়াড়ে দিবার যে আইন আছে, তাহার সংস্কার সম্বন্ধে প্রস্তাবের সমর্থন কল্পে এক বক্তৃতা লিখিয়া তাহাই টাইপ করাইতেছিলাম। এমন সময়ে মিস্ ভ্যাণ্ডারবিল্ট্ কলিক বেদনায় অস্থির হইয়া পড়িল এবং টাইপ শেষ করিতে না পারার জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিল। আমি আর কি করি? বেচারীকে ছুটী দিবার জন্য জে, সিকে বলিলাম। জে, সি, ঈষৎ হাসিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মেমসাহেবের প্রতি আমার যে কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল, জে, সি,

একদিন এরূপ একটু ব্যঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছিলেন আজ তাঁহার হাসিতেও সে ভাবটি প্রকাশ পাওয়ায় আমি প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলাম। এমন সময় দেখিলাম, রুমালের ব্যাগ ও ছাতা হস্তে লইয়া মেমসাহেব জে সির ঘরে আসিয়া অতি কাতরভাবে জানাইল যে তাহার অসুখ করিয়াছে।

জে, সি বলিলেন, "তা হলে, একখানা গাড়ী ডেকে দিতে বল্‌ব কি?"

"না, মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি, অনেক ধন্যবাদ। আমি যেতে যেতে একটা ট্যাক্‌সি ডেকে নেবো এখন। নমস্কার।"

বলিয়াই একদৌড়ে মেমসাহেব গিয়া লিফ্‌টে উঠিল। আমিও তৎপর ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমিও লিফ্‌টে চড়িলাম।

মেমসাহেব আমার ব্যস্ততা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি মহাশয় আপনি কোথায় যাবেন?"

আমি বলিলাম, "তোমাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আমি কোর্টে যাব।"

"তার কিছু দরকার নেই, অত্যন্ত ধন্যবাদ।"

"সে কি মিস্ ভ্যাণ্ডারবিল্ট্? তুমি আমায় কি অকৃতজ্ঞ ঠাউরেছ? তুমি কলিকে কষ্ট পাচ্ছ, আর আমি তোমায় একটু পৌঁছে দিতে পারব না?"

মেম সাহেব এক কথায় নিরুত্তর। ব্যথাটাও ক্রমশঃ বাড়িতেছিল বোধহয়। রাস্তায় নামিয়া ট্যাক্সি বা গাড়ী কিছুই দেখা গেল না। মেমসাহেবের চোখে জল আসিল। আমি বলিলাম, "তুমি একটু দাঁড়াবে? আমি ছুটে গিয়ে তোমার জন্য ট্যাক্সি ডেকে আনি?"

মেম সাহেব বলিল, "না, মিষ্টার বটব্যাল আপনাকে অত কষ্ট করতে হবে না। ধন্যবাদ। আমি আস্তে আস্তে যেতে পারব বোধ হয়।"

কিন্তু তখন তাহার চলিবার শক্তি যে বেশী ছিল, তাহা বোধ হইতেছিল না। আমি বলিলাম "তাহলে এক কাজ কর, আমার বাহুর উপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে এস। এর মধ্যে একটা ট্যাক্সি ফ্যাক্সি এসে যাবে। অন্য দিন বেটারা ভোঁ ভোঁ করে কান ঝালাপালা এবং প্রাণ সঙ্কটাপন্ন করে তোলে, আজ এক বেটারও পাত্তা নেই!"

মেম সাহেবকে আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইল। জীবনে সেই প্রথম মেম সাহেবের অঙ্গস্পর্শ! রাস্তার মাঝে না হইলে যে একটা পুলক শিহরণ অনুভব করিতাম সর্ব্বাঙ্গে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার হৃদয়ে এক দিকে যেমন আনন্দের একটু আমেজ আসিল, অপর দিকে তেমনি বড় লজ্জা করিতে লাগিল। আলাপী যদি কেহ যায়, কি মনে করিবে? আমার বয়স পঞ্চাশের দিকে গড়াইয়াছে, তার সবে কুড়ি কি বাইশ। আমার রঙ কিছু বেশী ঘোরালো, তার রঙ বড্ডই ফর্‌সা। আমি কিছু খর্ব্ব, সে আমা অপেক্ষা অন্ততঃ তিন ইঞ্চি লম্বা। বড়ই বেমানান, বড়ই অসামঞ্জস্য ঠেকিতে লাগিল। কেহ যদি লক্ষ্য করিয়া দেখে! চোখ বুজিয়া চলিলাম পাছে পরিচিতের সঙ্গে চোখোচোখি হয়। মুক্ত হস্তটি একবার পকেটে চালাইয়া দিলাম, নস্যের কৌটার সন্ধানে। কিন্তু সেটি অপর পকেটে ছিল, সুতরাং নিরুপায় হইলাম।

এইরূপ ভাবে কিছুক্ষণ চলিয়াছি; মিস্ ভ্যাণ্ডার

বিল্‌টুও বোধহয় কিছু আরাম বোধ করিতেছিল, কেননা পূর্ব্বে আমার উপর যতখানি ভর সে দিয়াছিল, ক্রমেই তাহার লাঘব হইতেছিল। প্রথমে সে কথা কহিতে পারিতেছিল না, পরে সে একটু আধটু হাসপরিহাসও জুড়িয়া দিল। বলিল, "আপনি কাল খোঁয়াড়ের গরুর কি ব্যবস্থা করিবেন, মিষ্টার বটব্যাল? খাতাপত্র সব যে আমার ডেস্কের মধ্যে আবদ্ধ থেকে হাঁফিয়ে উঠছে।"

আমি বলিলাম, "সে যাক্‌গে যাক্। উপস্থিত বল্‌তেও আমার কিচ্ছু আট্‌কাবে না। আমার বক্তৃতা শুনে সেদিন চিফ্ সেক্রেটরী—"

"খুসী ত হবেনই। আপনার মতগুলি যেরূপ উদার, ভাষাও তেমনি স্বাধীন। আমি ভাবছি যে যদি আজ আপনাকে আপনার কোনও বন্ধু আমার সঙ্গে এরূপভাবে পাশাপাশি ভ্রমণ কর্‌তে দেখেন, তা হ'লে——"

আমি মাঝে একটু চক্ষু চাহিয়াছিলাম। কিন্তু প্রত্যাসন্ন কোনও বন্ধুর সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। চোখ বুজিবার আর একটি কারণও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য—গভীর চিন্তা। এখন আমি কি করি?

হঠাৎ মোটরের শব্দে চক্ষু চাহিলাম—মনে করিলাম এতক্ষণে ট্যাক্সি মিলিল। কিন্তু দেখিলাম প্রাইভেট্ কার। তখন আবার চক্ষু মুদ্রিত করিবার জোগাড় করিতেছি, এবং মস্তিষ্কে পূর্ব্ব সঞ্চিত নস্যের আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ গতিকে একটি অবশ্যম্ভাবী হাঁচির প্রতীক্ষা করিতেছি এমন সময় নাকের ঠিক ডগাটির উপর এমন একটি প্রচণ্ড ঘুষি পড়িল যে যুগপৎ হাঁচি অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল এবং তার বদলে নাসারন্ধ্র হইতে শোণিত নির্গত হইল। প্রহার কর্ত্তাকে দেখিয়া লইবার সুযোগ হওয়ার পূর্ব্বেই আমি ভূমিতলগত হইলাম এবং কোন্ ধারা অনুসারে এইরূপ আক্রমণ দণ্ডনীয় তাহা এক মুহূর্ত্তে চিন্তা করিয়া লইলাম। পরক্ষণেই উঠিয়া দেখিলাম একজন সাহেব মিস্ ভ্যাণ্ডার বিল্‌টুকে টানিতে টানিতে মোটরে উঠাইয়া লইয়া চম্পট দিল।

তখন হিতোপদেশের বচনের সত্যতা সম্বন্ধে আমার আর সন্দেহ মাত্র রহিল না:—পথি নারী বিবর্জ্জিতা। (হিতোপদেশে বা বিষ্ণুপুরাণে বচনটি আছে, ঠিক স্মরণ হয় না, তবে বচনটি অমূল্য)।

কিছু দিন পর্য্যন্ত টাইপ করানো—স্থগিত রহিল। পরে আফিসে গিয়া শুনিলাম মেম সাহেব চাকরীতে এস্তফা দিয়াছে। সে মাসের শেষ ভাগে মিস্ ভ্যাণ্ডার বিল্‌টের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম। জে, সির মোটরে এক সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া ত অবাক্! যে পাষণ্ড আমাকে সেদিন পথে অসহায় অবস্থায় পাইয়া ঘুষি মারিয়াছিল, মেম সাহেব তাহাকেই বরমাল্য দিয়াছেন। আমি পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিব ভাবিতেছি, এমন সময় সেই গুণ্ডাকের তথাকথিত বর আমার করপেষণ করিয়া বলিল, "সেদিন আমার ভুল হয়েছিল, মাফ কর্‌বেন।"

মিস্ ভ্যাণ্ডার বিল্‌টু ওরফে মিসেস্ টপ্টি ডন বলিলেন "ওঁর দোষ নেই। সেদিন উনি প্রথম মেসপট্ থেকে এলেন। অফিসে যাচ্ছিলেন আমার খোঁজ কর্‌তে। আমি কলিকের ব্যাথায় আপনার সঙ্গে আস্‌ছিলাম, তা উনি আদপেই বুঝ্‌তে পারেন নি। বুঝেছেন মিষ্টার বটব্যাল, আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না।"

আমি ভাবিলাম যত আহম্মকের দিন ১লা এপ্রিল ওঁর মেসোপটামিয়া থেকে ফিরে আসাটা ভাল হয় নাই।

অক্রম

শ্রীধ্বজবজ্রাঙ্কুশ

শুনাইতে যাই—কেউ শুনে না। দেখাইতে যাই—সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। আমি কাঁদি—তারা হাসে। অদ্ভুত!

তাকে কি আমার কিছু দিবার ছিল? সে কি না নিয়ে চলে গেল? না,—নিয়ে শেষে পথে ফেলে দিয়ে গেল?

এ জগতে যাকে দিতে হবে—তাকে সেধে সেধেই দিতে হবে। যে দিবে সেই সব চেয়ে বেশী ভিখারী।

তবু—আমি যা দিতে চাহিলাম—তা বুঝি কেউ নিল না।

তুমি নিলেনা কেন? নিবে বলে ত আশা দিয়েছিলে—তবে নিরাশ করিলে কেন?

জাগ্রত স্বপনে—জীবনের ধ্যানে—তুমি এসে ধরা দিয়েছিলে। তোমাকে দেখে ভেবেছিলাম—এই হবে। তোমাকে না জেনে—আমি ভেবেছিলাম। বুঝিতে পারি নাই। কোন কথাইত হয় নাই।

সফল হওয়া—মহৎ হওয়া;—দুঃখীর অশ্রু মুছিয়ে দেওয়া—আর্ত্তের ভরসা হওয়া—তারাবাজীর মত আকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

নিশীথের দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়। হয়ত যা খুঁজেছিলে আমাতে তা পেলে না। কি খুঁজেছিলে? পাবার মত কিছু কি আমাতে ছিলনা—দিবার মত কিছু কি আমার নাই?

যারা এতদিক থেকে এতমতে এসেছিল—কত কথা বলে গেল—তারা সবাই কি—তোমারি মত? না তুমিই তাদের মত? তবে আমি কি? হীন-দরিদ্র-অভাগা? দুর্ব্বল কিছু নাই?

না—না——দয়া করো না। ক্রোধ কর—ঘৃণা কর,—পার—যুদ্ধ কর। দয়া নয়।

* * ওরে—তোর কিরে কিছুই নাই? ১৪।৫।১০

নাচওয়ালী রহস্য

২

নাচওয়ালী রহস্য ব্যাপারটি ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে। বর্ত্তমান সংখ্যা নবযুগে এই রহস্যের নায়িকা প্রসিদ্ধ সুন্দরী মমতাজ বেগমের চিত্র প্রকাশিত হইল। মমতাজের মাতা, তাহার মাতার দ্বিতীয় বিবাহের স্বামীর চিত্রও বাহির হইল। আর বাহির হইল মমতাজের নিরাশ প্রণয়ী মহামান্য ইন্দোর মহারাজ হোলকারের চিত্র। এই সুন্দরী নাচওয়ালীর রূপের জ্বালায় কতটা বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছে—কত অর্থ জলের মত খরচ হইয়া যাইতেছে—কত প্রাণ এই জ্বালাময়ীর অনলে আত্মাহুতি দিয়াছে তাহা সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। মমতাজের মত সুন্দরীর রূপের জ্বালাকে চিত্রে ঠিক প্রকাশ করিতে পারে না—তবু এই চিত্রে সে রূপের কতকটা আভাস দিতে পারিবে।

বোম্বাইয়ে নানা স্থানে প্রকাশ্য জনসভা করিয়া আবদুল কাদের বলার হত্যাকারীদের শাস্তি প্রার্থনা করা হইতেছে—এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের অন্তরালে যে আছে তাহাকেও আইনের কবলে আনিবার জন্য বোম্বাই সরকার ও ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হইতেছে।

মমতাজের ব্যাপারে হায়দ্রাবাদবাসীরাও খুব উত্তেজনা দেখাইতেছে। মমতাজ ইন্দোর যাইবার আগে একবার তার মার সঙ্গে হায়দ্রাবাদে মুজরা গাইতে গিয়াছিল। সে রূপ হায়দ্রাবাদবাসীরা এখনো ভুলিতে পারে নাই।

মহারাজ হোলকারের দু'একজন আত্মীয় ও ষ্টেটের কয়েকজন কর্ম্মচারী এই হত্যা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে দু'জনকে লেফ্‌টানেন্ট সিগার্ট সনাক্ত করিয়াছেন—এই লেফ্‌টানেন্টও ঐ ব্যাপারে বিষম আহত হইয়াছিলেন। বোম্বাই পুলিশ বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে এই হত্যার অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। মমতাজের কোন কোন আত্মীয়ও এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার হইয়াছে—তাই অনেকে অনেক কথা বলিতেছে। মমতাজ এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে ও বেশ আনন্দেই আছে। *

নিষ্ফল-যাত্রা *

শ্রীমুরারিমোহন দাস

তরুণ উষায় অরুণ-আলো
যেদিন উঠিল জাগিয়া গো,—
প্রথম প্রভাতে মেলিয়া আঁখি,
গাইল যেদিন বনের পাখী,
নবীন আলোকে উন্মাদ হ'ল
গন্ধ বিধুর পবন গো,—
তটিনী যেদিন উঠিল চমকি
শুভ্র তুষার-শয়নে,
যুগ যুগান্তের স্বপন-ঘোর
আলোক পরশে হইল ভোর
সাগর দরশে চলিল যেদিন
সরম-জড়িত চরণে—

সেইদিন হ'তে যাত্রা আমার
তীর্থ-পথের যাত্রী গো!
প্রথম তরুণ উদিল যেদিন
আলোক উঠিল উছলি গো!

ভাবিনু সেদিন—যাত্রার শেষ
সেদিন সাঁঝেই হবে গো!
দীর্ঘ দিনের শ্রান্তি শেষে,
শান্ত, মধুর তীর্থ-দেশে
হৃদয় ভরিয়া শান্তি পাব
পূজিয়া তীর্থ দেবতা গো;—
র'ব চিরকাল দেব-সেবায়
হ'ব না ক্ষুদ্র কুটীর বাসী,—
বহিব না আর দৈন্যের ভার
কঙ্কর-পথে ফিরিব না আর—
ক্ষুব্ধ আকুল অশ্রু-ধারায়
বক্ষ যাবে না ভাসি,
র'ব চিরকাল দেব-সেবায়
হ'ব না ক্ষুদ্র কুটীর বাসী!

হায়!—সুমুখের দিকে চেয়ে দেখি আজো
অনন্ত নীলিম আকাশ গো!
আজিও হল না যাত্রার শেষ
আজিও শ্রান্ত যাত্রীর বেশ
আজিও লাগে না তপ্ত দেহে
শীতল-তীর্থ সমীর গো!
আজো সে চলেছি পথ হারাইয়া—
আজো আসে পথে আঁধার রাতি,
আজো পাখী গায় উদার স্বরে
কে জানে তীর্থ আরো কতদূরে
আজো উঠে ফুটি অলস উষায়
স্নিগ্ধ তরুণ ভাতি!
যাত্রার শেষ আজিও হ'ল না
আজো ঘিরে আসে আঁধার রাতি!

ভ্রম সংশোধন ঃ—গত ২৫ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার 'সাধনা' কবিতাটির ১৮ লাইনের প্রথমে 'যদিও' না হইয়া 'যাইও' হইবে।
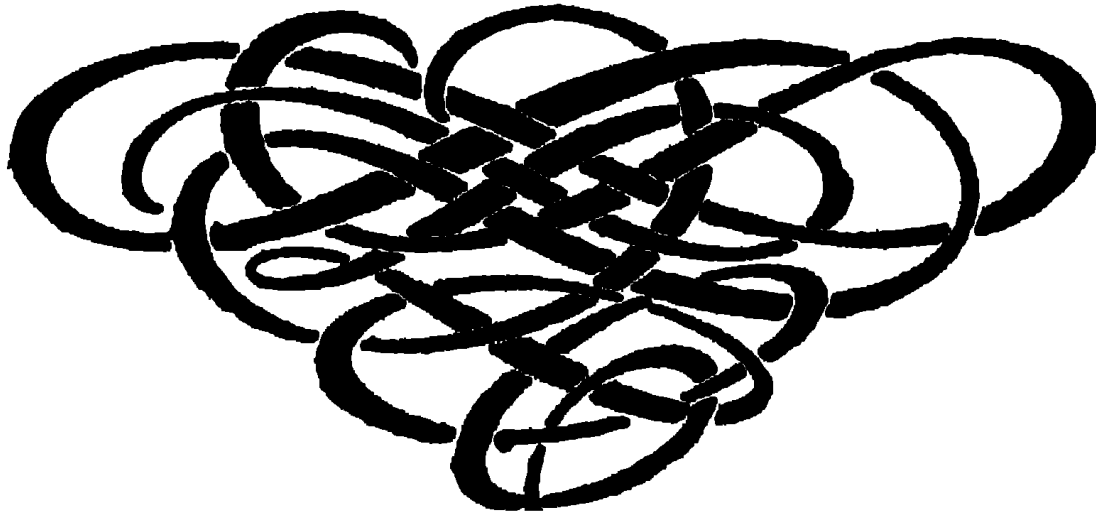
শিল্প-জগৎ

(ভারতবর্ষ)

ভারতী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত। ভারতী না মেলেরিয়ার সারথী? তা দেশের যে নিদারুণ অবস্থা মায়ের এ কঙ্কালরূপ সৃষ্টিকরা শিল্পীর পক্ষে স্বাভাবিক যদি মায়ের অন্তরের রূপ অঙ্কিত করাই শিল্পীর উদ্দেশ্য হয়। তবে এমন টুকটুকে লালপাড শাড়ী না পরাইয়া, অলঙ্কার বিভূষিতা না করাইয়া, ভঙ্গবীণার নিরর্থক বোঝা ঘাড়ে না চাপাইয়া যদি মায়ের আনুসঙ্গিক অবস্থাটা মনের ঐক্যতা রক্ষা করিত তবেই ঐ কথা বলা চলিত। মানসিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মায়ের রুচিগুলির কেন পরিবর্ত্তন ঘটিল না, এ কেমন? বীণার সুর শুনাইবার ক্ষমতা আর মায়ের আছে কি?

নীলকান্তমণি—শ্রীযুক্ত সারদা চরণ উকীল অঙ্কিত। সারদাবাবুর নীলকান্তমণি যথার্থ ই মূল্যবান হইয়াছে। মুখের ভঙ্গিমা ও ভাবটী অতি মধুর—হইয়াছে। বিষয়বস্তুর সঙ্গে যদি তুলি সামঞ্জস্য রক্ষা না করিতে পারে তবে আঁকিয়া ফল—কি? বহু অরিয়েণ্টাল ঘাঁটিলেও সহজে ও মুখখানা বের হয় না।

নীলাম্বরী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার অঙ্কিত। কবির দোহাই যতই দাও চিত্র তাহা মোটেই মানে না। কতগুলি দুর্ভেদ্য বর্ণ, অপ্রাকৃত দেহভঙ্গীর সমষ্টি; তার উপর রংএর অপাত্রে খরচ বড়ই দোষের।

আলপনা—শিল্পী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চৌধুরী। এটি চিত্রের বংশই নয়। আলপনা ভাল হচ্ছে না বলে ক্ষিপ্তা খাশুড়ী পৃষ্ঠে যেন বিরাশী সিক্কা ওজনের কিছু পতন ঘটাইয়াছেন। শিল্পী হইতে গেলে কিছু বুদ্ধি থাকা দরকার। তা ছাড়া ঘরবাড়ী দেয়াল মেঝে ইত্যাদি সব ভুল। তবু ছবি আঁকা চাই। আর কাগজওয়ালারাও অতি উদার—আঁকবার পূর্ব্বেই ছাপিয়া বসিয়া থাকেন!

(বসুমতী)

তুলসী মূলে—এস, জি, ঠাকুর সিংহ অঙ্কিত। চিত্রটার কোন মৌলিকতা নাই। মামুলী ভিজা কাপড় মাত্র। ভিজা কাপড় অঙ্কিত করিতে যাইয়া শিল্পী অন্য কর্ত্তব্য সবই ভুলিয়া গিয়াছেন। তুলসীতে জল দেওয়ার কোন আগ্রহই নাই। চিত্রের গতি ভুলিয়া 'মডেল' যেন শিল্পীর হুকুম মান্য করিতে দাঁড়াইয়া আছে।

গোধূলী—শিল্পী জে, মজুমদার। এগুলি [illegible] শতাব্দীর পূর্ব্বের চিত্র মনে হয়। আধুনিক বৈজ্ঞা[illegible] উপায়ে অঙ্কিত মোটেই মনে হয় না—বড পটুয়া ভাব।

বর্ষার বেসাতী—শিল্পী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র কুশারী অঙ্কিত। বর্ষার নিদর্শন কোথায়? তা ছাড়া ড্রয়িং প্রভৃতিও সুবিধা হয় নাই। আর দেখিবার কি আছে?

(প্রবাসী)

বাজে-কাজে—শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী অঙ্কিত। শিল্পীর অন্যান্য চিত্র অপেক্ষা ইহা ঢের ভাল হইয়াছে। কিন্তু ক্ষীণ বাহু ও প্রশস্ত নিতম্বের কোন সাদৃশ্য নাই। পায়ের অস্তিত্ব আরও পরিস্ফুট হওয়া দরকার ছিল। তবে অনেক পুরুষ অরিয়েণ্টাল অপেক্ষা ইহা অনেক মূল্যবান।

শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ দর্শন—শ্রীযুক্ত গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত। চৈতন্যের যে পরিমাণ নিদ্রা-বেশ হইয়াছে তাহাতে জগন্নাথ দর্শন সম্ভব হইবে কিনা জানি না। ডান হাতখানা চৈতন্যের না অচৈতন্যের?

সূর্য্যাস্ত—চিত্রকর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিত্রের ছাপা এমনি হইয়াছে যে এ অবস্থায় যদি একবার সূর্য্যাস্ত ঘটে তবে যে শিল্পী আবার সূর্য্যের উদয় ঘটাইতে পারবেন এ ক্ষমতায় আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে।

ত্রিযুগা—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল অঙ্কিত। চিত্রের বিষয় বস্তুর কল্পনা সুন্দর হইয়াছে, সম্পাদনও মন্দ নয়।

মোমতাজ বেগম

ইন্দোরের মহারাজা

মোমতাজের সৎপিতা

মোমতাজের মাতা

গল্প
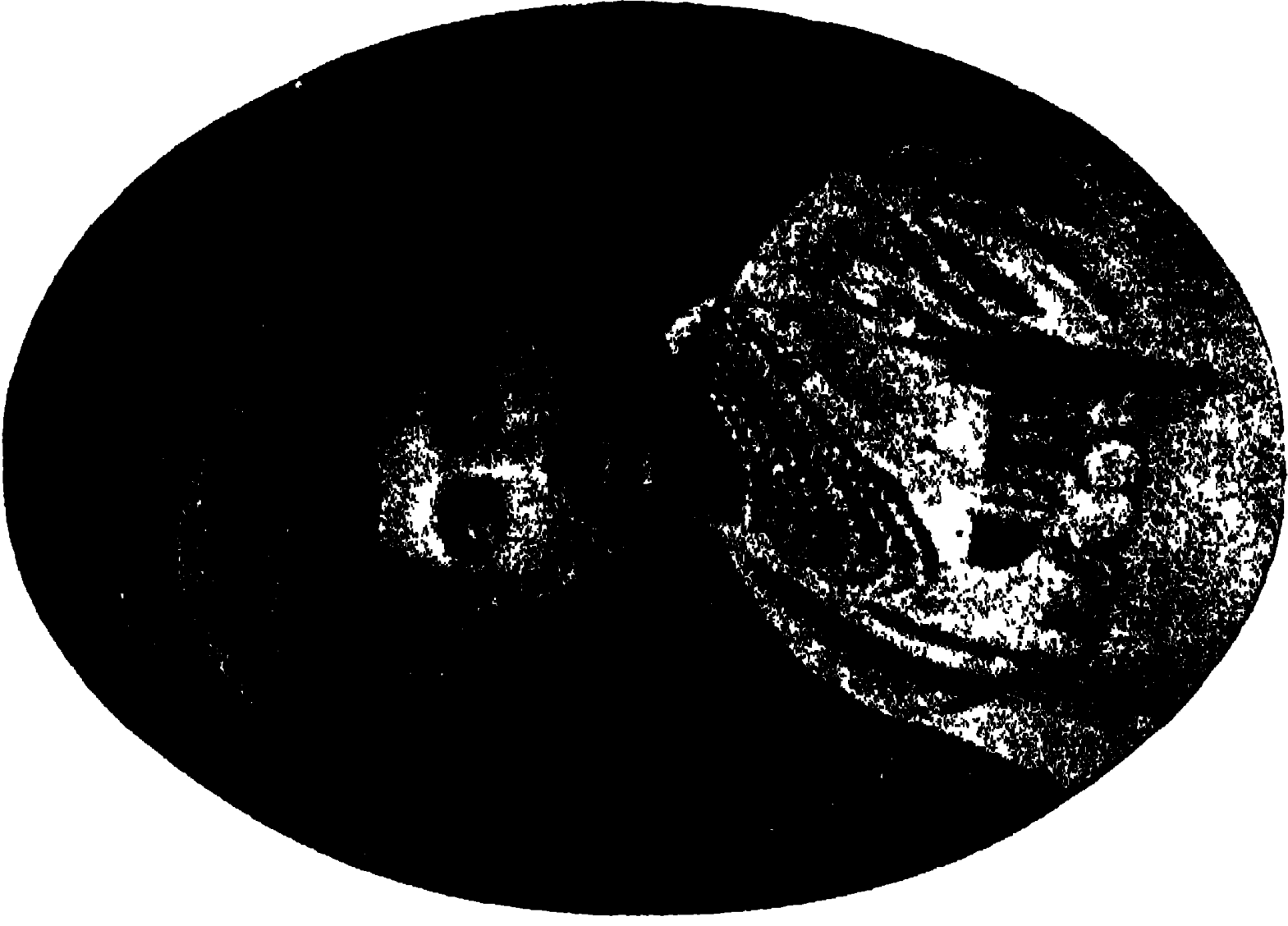
শ্রান্তি শেষে

শ্রীমতী প্র ভাবতী দেবী সরস্বতী

শান্তি অকারণে ছেলেটাকে ধরিয়া ঠেঙাইতেছিল, সেটা চেঁচাইয়া বাড়ী মাথায় করিতেছিল। প্রতিবাসিনী তারা ধরিতে আসিলে, শান্তি তাহাকে যা' মুখে আসিল তাহাই শুনাইয়া দিল। বেশ করিবে সে নিজের ছেলেকে ঠেঙাইবে, তাহাতে কাহার কি? দেশের লোকের ইহাতে এত মাথাব্যথা কেন, কেন তাহারা পরের ব্যাপারে হাত দিতে আসে? যে যাহার নিজের চরকায় তেল দিক, পরের ব্যাপারে কাহাকেও মাথা ঘামাইতে আসিতে হইবে না।

তারা আর অগ্রসর হইল না, পিছাইয়া গেল—"মাগো মা কি তেজই হয়েছে? তবু যদি ঘরে আরও ভাত থাকতো, পরণে ভাল একখানি কাপড় থাকত, না জানি কি-ই বা করত। যা হোক—মেয়েমানুষ বটে! আমরই বোকামী হয়েছে তাই তোমার ছেলেকে ধরতে এসেছিলুম বাপু, গড় করি তোমার পায়ে, খুব শেখানই আমায় আজ তুমি শেখালে।"

সে চলিয়া গেল। পরের উপর ঝালঝাড়া চলে না, শান্তি হরিনাথকে বেদম মারিতে মারিতে চেঁচাইয়া বলিল "ওরে হতভাগা ছেলে, তোদের জন্মেই না আমায় এত কথা শুনতে হয়? তোরা যদি না থাকতিস, আমায় কি এত কথা শুনতে হতো?"

হরিনাথ চেঁচাইয়া কাঁদিয়া চারিদিক সরগরম করিয়া তুলিল।

ঠিক সেই সময় রামনাথ বাড়ী ফিরিল।

সেই সকালবেলা সে বাহির হইয়াছিল, বেলা বারটা পর্য্যন্ত রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এইমাত্র বাড়ীতে ফিরিল। বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রতেজ তাহার ভগ্ন ছাতায় নিবারিত হয় নাই, তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে, ঘামে গায়ের শত তালিযুক্ত জামাটা ভিজিয়া গিয়াছে।

ঠিক-দুপুরে রৌদ্রে ঘুড়িয়া বাড়ীতে ফিরিয়া সে এই কাণ্ডটা দেখিতে পাইল। হাতের জীর্ণছাতাটা বেড়ার গায়ে যথাস্থানে ঝুলাইয়া রাখিতে রাখিতে মৃদুকণ্ঠে সে বলিল "আহা ছেলেটাকে অত মারছো কেন বলতো? এই ঠিক দুপুর রোদে—"

তীব্রকণ্ঠে চেঁচাইয়া শান্তি বলিয়া উঠিল "থাক্ গো—থাক্, যথেষ্ট হয়েছে, আর পুত্রস্নেহ দেখিয়ে কাজ নেই, তোমার স্নেহ তোমাতেই থাক্। ওই যে কথায় বলে "ভাত কাপড় দিতে পারে না, আদর কাড়াতে আসে" কি মুখের আদরই শিখেছ, ছেলে ভাবে বড় ভালবাসে; তবু যদি একখানা তরকারী দিয়ে ভাত দেবার যোগ্যতা থাকত, একখানা কাপড় দেবার ক্ষমতা থাকত। মরে যাই আর কি, ছেলেকে আর আদর দিতে হবে না।"

রামনাথ একবার মাত্র পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া শ্রান্তভাবে বসিয়া পড়িল; তখন একটা কথা বলার সামর্থ্যও তাহার ছিল না, আর সামর্থ্য থাকিলেও সে মুখরা স্ত্রীর কাছে চির নির্ব্বাকই থাকিত।

তোমার কি, তুমি তো বাইরে ঘোরো, আমি কেন তোমার জন্যে এত কথা শুনতে যাব, কি দায় পড়েছে আমার? দাও সব আমায়, আমি এখনি গিয়ে মাধবকে দিয়ে আসব।"

সে একবার প্রত্যাখ্যান করিয়া আবার লইতে চাহিল দেখিয়া রামনাথ যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়া গেল; একটা পয়সা গোপনে রাখিয়া বাকিগুলি সবই সে শান্তির হাতে ধরিয়া দিল, শান্তি টাকা পয়সা লইয়া তখনি বাহির হইয়া গেল।

দুর্গানাথকে ডাকিয়া রামনাথ বলিল "এই নে দুর্গা, এই পয়সাটা নে, কিন্তু কাউকে দেখাবি নে, এমন কি রাধাকেও না, আগে বল?"

দুর্গানাথ তখনি রাজি হইয়া গেল, পয়সা লইয়া মহানন্দে সে ছুটিল।

তাহার একটু পরেই হরিনাথ ও রাধা আসিয়া ধরিল—"দুর্গাকে পয়সা দিয়েছ, আমাদেরও দাও।"

রামনাথ সে সময়টায় ভাবি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে সেই সময় শান্তি আসিয়া পড়িল। ছেলেমেয়েগুলি শান্ত প্রকৃতি পিতাকে ভয় করিত না কিন্তু মাকে বড় ভয় করিত, তাই মা আসিবামাত্র তাহারা কাজেই পিঠটান দিল।

শান্তি একটু শ্রান্ত হইয়া বসিল, রামনাথ তখন মাথা চুলকাইয়া বলিল "সব টাকা পয়সাগুলো দিয়ে এলে, তার পর কি হবে? ঘরে তো এদিকে একটা চাল নেই বলেছ, এখন চাল আনান যায় কি করে, ছেলেপুলেগুলো খাবেই বা কি?"

শান্তি গম্ভীর মুখে অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিল "শুকিয়ে মরবে।"

কথাটা শুনিয়া রামনাথ স্তম্ভিত হইয়া রহিল, একটু পরে আস্তে আস্তে বলিল "কিন্তু আর একটু পরেই যে খেতে এসে কান্না সুরু করবে, মার খেলেও সে কান্না তো থামবে না।"

শান্তি কথা কহিল না।

রামনাথ বলিল "তাই বলছিলুম—"

শান্তি রাগিয়া বলিল "যা বলছিলে তা আর বলে কাজ নেই, চুপ করে থাক। আজ তিন মাসের পর উপার্জ্জন করে এনেছেন মোট চারিটী টাকা আর পৌনে ন গণ্ডা পয়সা, এরই আবার এত কৈফিয়ৎ। দোকানে এখনও আটটাকা রইল সে হিসেব আছে কি? ঘরে তবু একটা চাল নেই যে রেঁধে ভাত খাওয়াব। যাও না, জোয়ান মরদ তুমি, যেখান হতে পার আজকের মত কিছু চাল নিয়ে এসো, রোজ যে আমারই আনতে হবে এমন কোন কথা নেই। গায়ে যার অত বল আছে, চাকরী না জুটলেও তার কুলি মজুরগিরি করার পথ তো বন্ধ নেই, দিন সাত আট আনা তাতে রোজগার করতে পারবে। পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকবে, আর আমি এ দোর ও দোর, সাতদোর কুড়িয়ে এনে তোমায় খাওয়াবো? একটু লজ্জা হয় না মুখ দেখাতে আর বসে দিব্যি ভাত গিলতে? তোমার মত বেহদ্দ বেহায়া তাই, অন্য কেউ হলে একদিকে চলে যেতো, যেমন করেই হোক কাজের ঠিক না করে ফিরে আসত না।"

"ঠিক্ বলেছ শান্তি—"

রামনাথ যেন অকূলে কূল পাইয়া গেল, শান্তি যেন পথ দেখাইয়া দিল, সে তখনি উঠিয়া দাঁড়াইল। জামাটা দিয়া গায়ে চাদরখানা হাতে লইয়া বলিল, "ঠিক কথা বলেছ, আমায় পথ দেখিয়ে দিয়েছ। আমি এখনই যাচ্ছি, যদি চাকরী পাই, তবেই ফিরে আসব, নচেৎ ফিরব না। আমার আশা তুমি করো না, মনে জেনো তুমি বিধবা হয়েছ, যেমন করেই হোক তোমার আর ছেলেমেয়ে তিনটীর আহারের যোগাড় তোমাকেই করতে হবে। আমি উপার্জ্জন করতে পারিনে অথচ তোমার গলগ্রহ হয়ে পড়ে আছি, তবু আমি সুস্থ সবল একটা লোক। চললুম শান্তি, যদি কাজ পাই, তখন আসব।"

হন হন করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

শান্তি বিস্ময়ে খানিকটা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শান্তপ্রকৃতি রামনাথ যে যথার্থই এতটা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে তাহা সে কোনও দিনই ভাবে নাই। আজ হঠাৎ তাহাকে দীপ্ত হইয়া উঠিতে দেখিয়া সে থতমত খাইয়া গেল, তাহার পর সত্যই যখন সে হনহন করিয়া চলিয়া গেল তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

"ওগো, রাগ করে যেয়ো না, আমি মিথ্যে কথা বলেছি

আজকের ভাত রান্না হয়ে গেছে, মুখের ভাত ফেলে যেয়ো না, ওগো ফের—ফের—”

ডাকিতে ডাকিতে সে একেবারে পথে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কোথায় রামনাথ? সে নিমেষে কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে। পাষাণ প্রতিমার মতই শান্তি পথের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। ... ...

মাথার উপর প্রখর রৌদ্র তেজ, পদতলে মাটী ভীষণ উত্তপ্ত, পাদুকাবিহীন পা দুখানা জলিয়া যাইতে লাগিল, রামনাথ পথ ছাড়িয়া পথের পার্শ্বে শুষ্ক ঘাসের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। পথে তখন একটীও লোক ছিল না, অসহ্য রৌদ্রতেজ ধরণী সহ্য করিতে অক্ষমা। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর, পক্ষীগুলি গাছের ঘনপাতার আড়ালে আশ্রয় লইয়াছে। সম্মুখের বিশাল অশ্বত্থ গাছের পাতার মধ্যে ঠাণ্ডায় বসিয়া একটা কাক চিৎকার করিতেছে কা—কা, বহুদূরে কোথা হইতে আর একটা কাক বোধ করি তাহার প্রত্যুত্তরই দিতেছিল! ভগ্ন ছাতার নীচে মানুষটী ঘামিয়া নাহিয়া উঠিয়াছিল। গ্রামের প্রান্তভাগে দিঘীর ধারে বড় বটগাছটীর তলে সে আসিয়া বসিয়া পড়িল। স্থানটী বড় ঠাণ্ডা; তাই যত পাখী সব এই গাছটীতে আশ্রয় লইয়াছিল, এই গাছটী তাই কোলাহল মুখরিত।

হায় রে অদৃষ্ট!—এই দুপুরে—একমুষ্টি ভাত তাহার উদরে নাই, স্ত্রী—সে কিনা তাহাকে তাড়াইল? কিন্তু না, তাহারই বা অপরাধ কি? আজ যদি রামনাথের মা বাঁচিয়া থাকিতেন তিনিও ঠিক এই কথাই বলিতেন। সে স্ত্রীলোক হইয়া এখান ওখান হইতে চাহিয়া আনিবে আর রামনাথ পুরুষ হইয়া তাহার কষ্টার্জ্জিত অন্নে ভাগ বসাইবে ইহা যে একেবারেই অন্যায়।

কোথায় চাকরী, হায়!—চাকরীর বাজার যে আগুন! এই একটা বৎসর সে খোঁজ করিতেছে, কই, চাকরী তো মিলিতেছে না কত শিক্ষিত ছেলে যে চাকরীর বাজার খুঁজিয়া আলোড়িত করিয়া দিতেছে, সে মূর্খ, তাহার স্থান সেখানে কোথায়?

ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল একটা কথা।

সে আজ বহুকালের কথা—বোধহয় ১২।১৩ বৎসর হইবে, তাহার অবস্থা তখন খুবই সচ্ছল, মাসিক সে পঁচিশ ত্রিশ টাকা উপার্জ্জন করে। ঘরে জিনিসপত্র থই থই করিতেছে, ছেলে মেয়ে কেহই তখন জন্মে নাই। সেইবার সে লটারীতে একটী টাকা দিয়া একশত টাকা লাভ করে।

যেদিন সে সেই টাকা কয়টী পাইল সেইদিনই তাহার বাড়ীতে আসিল এক অতিথি, জাতিতে সৎগোপ। সে নাকি দুইদিন খায় নাই, চলিতে চরণ তাহার ভাজিয়া পড়িতেছে। কোনক্রমে সে আসিয়া কৈবর্ত্ত রামনাথের দুয়ারে পড়িল।

তরুণ যুবক রামনাথ ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে অতিথিকে বসাইল, তাহার উপযুক্ত পরিচর্য্যা করিল। কিশোরী স্ত্রী তাহার তাড়াতাড়ি ভাত ডাল রাঁধিয়া দিল, মহা আনন্দে স্বামী-স্ত্রী অথিতিকে আহার করিতে ডাকিল। দুদিনের অনাহারক্লিষ্ট অতিথি সম্মুখে প্রস্তুত অন্ন দেখিয়াও খাইতে বসিল না, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া রামনাথ জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কাঁদছো কেন?

গোপীমোহন বলিল, গৃহে আমার বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, ভাই বোনগুলি সব উপবাস করিয়া আছে। একশ’ টাকার জন্য জমিদার তাহার ৭০।৮০ বিঘা জমি প্রায় ৫০।৬০টী দুগ্ধবতী গাভী আটক করিয়াছে, তাহার সন্তান সন্ততিবর্গ একফোঁটা দুধের অভাবে মারা যায়, সে তাহাদের অনাহারে রাখিয়া এক্ষণে অন্ন মুখে দেয় কি করিয়া?

করুণ হৃদয় রামনাথের প্রাণ গলিয়া গেল, তাহার মনে হইল ভগবান তাহাকে পরীক্ষা করিতেছেন। আজই একশত টাকা পাইয়াছে, অতিথিরূপে নারায়ণ তাই আসিয়াছেন। সে ধর্ম্মান্ধ, মনে করিল এ সুযোগ সে হারাইবে না। সে বলিল, “তুমি ওঠো, আমি তোমায় একশ’ টাকা দেব, তুমি আগে খেয়ে নাও তারপর টাকা নিয়ে গিয়ে দেনা শোধ করে দাও গিয়ে।”

এমন কথা কি বিশ্বাস করিতে কখনও পারা যায়? গোপীমোহন ভাই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে শুধু চাহিয়াই রহিল। রামনাথ বুঝিল সে অবিশ্বাস করিতেছে, সে

বলিল, "বিশ্বাস হচ্ছে না, তোমার তা বুঝতে পেরেছি। সত্যি আমি তোমায় টাকা দেব, ভগবানের নামে শপথ করে বলছি তোমায় খাইয়ে প্রতারণা করব না।

আহারের পর সত্যই যখন দশ টাকার দশখানি নোট আনিয়া গোপীমোহনের হাতে দিল তখন গোপীমোহন কাঁদিয়া ফেলিল। সান্ত্বনা দিয়া রামনাথ বলিল, কেঁদনা। ওই টাকা নিয়ে গিয়ে আগে দেনা শোধ দাও গিয়ে; আর চাল ডাল দিচ্ছি নিয়ে যাও, সন্ধ্যা লাগাৎ তোমার গাঁয়ে পৌছে তোমার আত্মীয়দের খেতে দিতে পারবে।"

একটা প্রকাণ্ড ধামায় সে চাল, ডাল, লবণ তরকারী সাজাইয়া দিল। একটা বড় ঘটি করিয়া ঘরের গরু মঙ্গলার সেদিনকার সব দুধখানি দিল।

অতিথি কাঁদিয়া বলিল, "আমি এ টাকা ধারস্বরূপ নিলুম, এরপর এর সুদশুদ্ধ তোমায় নিশ্চয় দেব।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে নারায়ণ তোমার সেই দিনই দিন, যেন আমায় সুদশুদ্ধই এই টাকা তুমি ফিরিয়ে দিতে পার।"

যথার্থ সেদিন স্বামী-স্ত্রীতে কি তৃপ্তিই পাইয়াছিল, ইহার পর অনেকদিন তাহাদের এই অতিথির কথাই চলিয়াছিল।

তাহার পর দিনের পর দিন যাইতেছিল, কবে যে রামনাথ একশটি টাকা দিয়া কাহার উপকার করিয়াছিল সে কথাও ভুলিয়া আসিতেছিল। এতদিন সুখ দুঃখ এই দুইটার আঘাত সে সমভাবেই সহ্য করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু একদিন যে একটী অনাহারক্লিষ্ট পথিককে সে আহার্য্য দানে বাঁচাইয়াছিল তাহার পর তাহাকে টাকা দিয়া বিদায় করিয়াছিল সেকথা ইদানিং মনেই পড়িত না, কেননা বহুকাল আগেই সে তাহার আশা ছাড়িয়াছিল। লোকটা যদি অবস্থা ফিরাইয়া লইত তাহা হইলে সুদ না হোক—আসল টাকাটা নিশ্চয়ই দিয়া যাইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

আজ যখন সে ভাবিতেছিল কোথায় যাই কি করি তখন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল গোপীমোহনের কথা। সে কি আজও বাঁচিয়া আছে, কে তাহার খবর রাখে? অথবা বাঁচিয়া থাকিলেও কি সে তাহার নিজের অবস্থা ফিরাইতে সক্ষম হইয়াছে? বোধ হয় নয়। যদি সে নিজের অবস্থা ফিরাইয়া পাইত নিশ্চয়ই একশটা টাকা শোধ দিয়া দিত। কিম্বা অবস্থা ফিরিয়াছে, তাহার কথা গোপীমোহনের মনে নাই। ভাল দেখাই যাক না একবার পনের ক্রোশ পথ বইতো নয়, একদিনে না হয় তিনদিনে সে পথে ভিক্ষা করিতে করিতে চলিবে। ভিক্ষা—তাহাতে লজ্জাই বা কি? এই একশ টাকা পাইলে সে যে এখন বাঁচিয়া যায়, সে ছেলেপুলেদের দুইটা খাইতে দিতে পারে। দেনাগুলা শোধ করিয়া বাকি টাকা শান্তির হাতে দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়া বিদেশে চাকরীর চেষ্টায় যাইতে পারে। ইহাদের এরূপভাবে ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে সে যে পারিতেছে না, তাহার পা নড়িতেছে না।

সম্মুখে দপ করিয়া আশার আলো জ্বলিয়া উঠিল, সে আলোতে রামনাথ আত্মহারা হইয়া গেল। শ্লথ-চরণ দুইটাকে টানিয়া লইয়া সে দীর্ঘ পনের ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে চলিল। . . . . . .

সম্মুখে দ্বিতল নূতন হর্ম্ম্য। এই বাড়ীটিই নাকি গোপীমোহন দাসের। আনন্দে রামনাথের চোখ দুইটা দীপ্ত হইয়া উঠিল, আহা তাই হোক, নারায়ণ তাই হোক, সকলের ভালই কর তুমি? রামনাথ শান্তিপূর্ণ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল—আঃ, এবার কিছুদিনের জন্যে খেয়ে বাঁচব টাকাগুলো পেলে। রামনাথ জনৈক ভৃত্যকে অনুনয় বিনয় করিয়া বাবুকে একবার খবর দিতে বলিল।

ঘরের মধ্যে ঘড়িতে ঠন ঠন করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল, রামনাথ অত্যন্ত সচকিত হইয়া উঠিল, এইবার বাবু উঠিবেন।

বাবুর চা খাবার শেষ হইয়া গেল, বন্ধু বান্ধব আসিয়া জুটিয়াছিল তখন অনেকগুলি।

* * * *

"বাবু—"

রামনাথের কণ্ঠে কথা ফুটিতেছিল না।

বাবু রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "চাকরটাই আসতে দিয়েছে, আচ্ছা তার কথা পরে হবে। কে রে বাপু, কি চাস তুই?"

কি রুক্ষ কণ্ঠস্বর, কিন্তু এই তো সেই লোক তের

বৎসর আগে দুয়ারের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, একটু কথা ওই মুখে বাহির হইতেছিল না।

"আমায় চিনতে পারছেন না আপনি, আমি কুমোর-পোতার রামনাথ দত্ত।"

গোপীমোহন মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় তোর কুমোর পোতা, কে তুই রামনাথ দত্ত, তোকে চেনে কে রে বাপু? এই অসভ্য জানোয়ারটাকে এখানে আসতে দিলে কে?

সাহসে ভর করিয়া রামনাথ বলিল, "কেউ দেয়নি বাবু, আমি নিজেই এসেছি। কুমোর পোতা চেনেন না বলছেন কিন্তু মনে করে দেখুন, বেশীদিনের কথা নয়, মাত্র তের বছর আগে—একদিন দুপুরে আপনি আমার দবজায় দুদিনের অনাহারে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন, আমি নিজের মুখের ভাত আপনাকে খাইয়েছিলুম। তাবপর একশো টাকার জন্যে আপনার গরু, বাছুর, জমি, জমা, জমিদার আটক করেছিল শুনে আমিই আপনাকে একশো টাকা দেই, আর ধামায় করে চাল, ডাল, তরকারী, ঘটিতে করে ছেলেদের দুধ দিয়েছিলুম, দেখুন মনে করে।"

বাবু একেবারে রাগিয়া উঠিলেন, "জুয়াচুরী করবার আর জায়গা পাসনি; বটে, তাই আমাব কাছে এসেছিস জুয়াচুরী করতে? আমি এত বন্ধু বান্ধব থাকতে গিয়ে-ছিলুম তোর দুয়ারে ভিক্ষে চাইতে? লোকটা গাঁজায় দম দিয়ে এসেছে নাকি?"

অতি ধৈর্য্যশীলা পৃথিবীই সময় সময় ভার সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁপিয়া উঠে, অনেক স্থানে ভূবিদারণও ঘটে, চিরশান্ত রামনাথেরও এই স্পষ্ট মিথ্যা কথা শুনিয়াও মাতাল অপবাদে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল; সে একটু রুক্ষস্বরেই বলিল, গাঁজা আমি খাইনি বাবু, মিথ্যা কথাও বলছিনে। তের বছর আগে কেউ কি এ গাঁয়ে দেখেনি আপনাকে একটা ধামা মাথায় করে গাঁয়ে ঢুকতে?"

বাবু মুখ ফিরাইয়া বন্ধুবর্গের সহিত কথা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া রামনাথ দমিয়া গেল, সাহসে ভর করিয়া সে ডাকিল, "বাবু—"

বাবু কথা কাণেও নিলেন না।

রামনাথ কাতরকণ্ঠে আবার ডাকিল—"বাবু—"

বাবু গর্জ্জন করিয়া ডাকিলেন, "হীরাসিং—"

হীরাসিং রামনাথকে সিংহবিক্রমে চাপিয়া ধরিল।

অনাহারক্লিষ্ট রামনাথ তাহার প্রচণ্ড ধাক্কায় পড়িয়া গেল, আর্ত্তকণ্ঠে একবারমাত্র ডাকিল "ভগবান!"

বাবুরা হো হো করিয়া হাসিলেন, হীরাসিং একহাতে হাত ধরিয়া আর একহাতে ধাক্কা দিতে দিতে গেটের বাহিরে লইয়া গেল, সেখানে একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া সে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

রামনাথের শুষ্ক ওষ্ঠ ভেদ করিয়া একটা শব্দও বাহির হইল না,—সে নড়িল না, জড়ের মত আকাশপানে তাকাইয়া পড়িয়া রহিল।

হাঁ, এই উচিত পুরস্কার, তাহার দয়ার যোগ্য লাভ! নারায়ণ যথেষ্ট হইয়াছে, পরীক্ষা বিধিমতরূপেই করিয়াছ, এবার আর কোন পরীক্ষা বাকি আছে প্রভু? সে জুয়া-চোর, সে মিথ্যাবাদী; সে একদিন নিজের টাকা পরের উপকারার্থে দিয়াছিল বলিয়াই না এই বিশেষণগুলি লাভ করিল? যে লইল সে আজ ধনী, সে আজ মানী, আর যে দিল সে তাহার ভৃত্যের হাতে নিগৃহীত হইল। তাই জিজ্ঞাসা করি, আরও কি বাকি আছে—ওগো, একবার তাই বল—

* * * *

"ওরে বাবা এসেছে রে, আমাদের বাবা এসেছে গো—"

দুজনে ছুটিয়া আসিয়া পিতাকে জড়াইয়া ধরিল। কচি মুখে হাসি আর ধরে না, যেন বহুকাল পরে তাহারা হারাণ রত্নকে হঠাৎ পথের মাঝে কুড়াইয়া পাইয়াছে।

রামনাথ মলিন মুখে মলিন হাসি হাসিল, ছোট ছেলেটাকে বুকে তুলিয়া লইল, বড়ছেলেটা আগে আগে ছুটিল, চিৎকার করিতে করিতে চলিল "আমাদের বাবা এসেছে রে,—আমাদের বাবা এসেছে রে—"

মাস দুই এদিক ওদিক বৃথাই ঘুরিয়া বেড়াইয়া রাম-নাথ বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে সত্যই একদিন সে দেশের পানে ফিরিল।

ছেলে গিয়া আগেই বাড়ীতে খবর দিয়াছিল, শান্তি আশাপূর্ণ হৃদয়ে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে জানিত রামনাথ প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিল উপার্জ্জন না করিয়া আসিবে না, নিশ্চয়ই সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছে।

কিন্তু রামনাথের সেই মলিন ছিন্ন বসন আর মলিন মুখের পানে চাহিয়াই সে বুঝিতে পারিল, বিশ্বের অন্ধকার তাহার মুখের উপর ঘনাইয়া আসিল। মেয়েটা 'বাবা'—'বাবা'—করিয়া ছুটিয়া গেল, ছেলেকে নামাইয়া রামনাথ একটু হাসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বারাণ্ডায় বসিয়া পড়িল।

স্ত্রীর অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখখানার পানে তাকাইয়া তাহার প্রাণ শুকাইয়া উঠিতেছিল, তবু যথাসাধ্য সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "ভাল আছ?"

শান্তি ততোধিক শুষ্ককণ্ঠে বলিল "দেখতেই পাচ্ছো।"

সাহস করিয়া রামনাথ আর একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু হয়েছে?"

শুষ্ক হাসিয়া রামনাথ মাথা নাড়িল "কিছু না।"

"চাকরীই পেলে না?"

"না।"

সেই যে শান্তি মুখ বন্ধ করিল, আর কথা কহিল না। রামনাথ কোল হইতে মেয়েকে নামাইয়া দিয়া উদাসনেত্রে কোনদিকে চাহিয়া রহিল।

প্রাত্যাহিক রাত্রের আহার যেমন হয় ছেলেপুলেরা তেমনি খাইল। শান্তি রামনাথের ভাত বাড়িয়া রাখিল কিন্তু তাহাকে ডাকিল না। দুর্গানাথ একবার ডাকিল— "বাবা ভাত দিয়েছে—" রামনাথ উঠিল না।

জড়ের মতই সে বসিয়াছিল, কি হইতেছে না হইতেছে সে সংবাদ সে রাখিতে পারিতেছিল না।

সে সমস্ত রাত বারাণ্ডাতেই বসিয়া রহিল, শান্তি ছেলে মেয়েদের শোয়াইয়া ঘরের দরজা ভেজাইয়া আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল, কখন ঘুম আসিল ঠিক নাই।

মধ্যরাত্রিতে বড় ছেলেটীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, বাহিরে বৈশাখের ঝড় তখন বড়ই মাতামাতি করিতেছে, চোখ ধাঁধিয়া বিদ্যুৎ ছুটাছুটি করিতেছে ···· •••

"বাবা—"

ভয় পাইয়া সে ডাকিল, উত্তর নাই—

"ও মা, মা—ওঠ না, বাবা কোথা গেল দেখ না।"

শান্তি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আলো জ্বালিল, ঘরে রামনাথ আসে নাই। বারাণ্ডায় আলো ধরিয়া দেখিল সেখানেও সে নাই। এই দারুণ ঝড়বৃষ্টিতে সে হতভাগ্য কোথায় গেল?

শান্তি ছেলেকে আশ্বাস দিল "কোথায় যাবে সে? সকাল হলেই আসবে এখন, তুই ঘুমো।"

সকালবেলা প্রথম ঘুম ভাঙ্গিল দুর্গানাথের, পিতাকে ঘরে না দেখিয়া সে দরজা খুলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইল।

রাত্রের সে ভীষণ প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আকাশ এখন পরিষ্কার স্বচ্ছ সুনীল, পূর্ব্বদিক আরক্ত করিয়া সূর্য্য ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতেছে, তাহার অরুণ আলো ধরার গায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সম্মুখেই—প্রাঙ্গণে আমগাছের ডালে দোদুল্যমান ওটা কি?—বিস্ফারিত চক্ষে বালক চাহিয়া দেখিল উত্তরীয় গলে বাঁধিয়া তাহার পিতাই ঝুলিতেছে! তাহার পিতার দেহের স্পন্দন তখন থামিয়া গিয়াছে, আরক্ত বিস্ফারিত চোখ যেন তাহারই উপর ন্যস্ত।

"ও বাবা—বাবা গো—"

দুর্গানাথ আছড়াইয়া পড়িল—

"ও বাবা, তুমি গাছে ঝুলছো কেন বাবা—বাবা তোমার কি হয়েছে গো?"

বালকের চিৎকারে শান্তির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, ছেলে মেয়েরা উঠিয়া পড়িল। বারাণ্ডায় আসিতে আসিতে এই দৃশ্য দেখিয়া শান্তি কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

এরোপ্লেনে হিমালয় ভ্রমণ ঃ—আকাশ পথে বাণিজ্য বিস্তার প্রচেষ্টার অগ্রদূতরূপে মিঃ এলান কবহামের যথেষ্ট খ্যাতি হইয়াছে। লণ্ডন হইতে ব্যবসায়ী মহলের অনুরোধে ইনি জগতের নানা বাণিজ্যকেন্দ্র ঘুরিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আছেন স্যর সেফ্টন ব্রাঙ্কার। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্শে ইঁহার কাজ আছে—সম্প্রতি ইনি অসুস্থ হইয়া পড়ায় কবহাম ক'দিনে হিমালয় ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প করেন। এখানে থেকে জলপাইগুড়ি ২৮০ মাইল পথ ইনি সাড়ে তিন ঘণ্টায় যান। তথা হইতে দার্জ্জিলিংয়ের প্রায় হাজার ফিট উপর দিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘায় যান—এ স্থানের উচ্চতা ২৮০০০ ফিটেরও উপরে। হিমালয়ের সকল সৌন্দর্য্যই সেখান হইতে দেখা যায়। ইঁহারা অক্সিজেন সঙ্গে না লওয়াতে নিশ্বাস ফেলিবার একটু অসুবিধা বোধ হইয়াছিল কিন্তু শীত ইহারা তেমন অনুভব করেন নাই। ৪০০ ঘোড়ার ক্ষমতাশালী ইঞ্জিন থাকিলে ইনি সহজেই এভারেষ্ট ঘুরিয়া আসিতে পারিতেন। গৌরীশঙ্করের তুঙ্গশৃঙ্গ আজ বিমানযাত্রী কবহাম দেখিতে দেখিতে ঘুরিয়া আসিলেন। এশিয়ার গৌরব ভারতের মরকত মণি এই হিমালয়, কত মহিমা, কত রহস্য—কত অফুরন্ত সম্পদ ইহার—এ সম্পদের সন্ধান লইবার জন্য, এ রহস্য ভেদ করিবার জন্য মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান আজ উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের গৌরবশৃঙ্গ হিমালয় কত অগণিত সম্পদ উদ্যমশীল পুরুষসিংহদের হাতে বিলাইয়া দিবে কে জানে? এই দুর্দ্দান্ত শীতের মধ্যেও তুষার-শৃঙ্গ ভ্রমণকারী বিমান-বিহারী প্রথম হিমালয় যাত্রী মিঃ কবহামকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন ঃ—মাহেন-জো-দারো ও হারাপ্পার খনন ব্যাপারে ভারতীয় সভ্যতার অনেক অভূতপূর্ব্ব নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে—আরো আবিষ্কৃত হইতে পারে সে আশা আছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ স্যর জন মার্শাল একার্য্যে খুব উৎসাহ দেখাইতেছেন। কিন্তু আশানুরূপ অর্থের অভাবে এ কার্য্যে তিনি তেমনভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। এ বিভাগে ভারতীয় যুবকদের শিক্ষারও আবশ্যক আছে। ভারতীয় বিদ্বজ্জন সমাজের গৌরব শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের এই অতীত সভ্যতা আবিষ্কারে যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এ বিষয়ে উৎসাহ না থাকিলে এই আবিষ্কার জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্যের মনীষীমণ্ডলী পর্য্যন্ত বহু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন। রাখালবাবু সে বিভাগ ছাড়িয়া বর্ত্তমানে বোধ হয় বাংলার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্ব্বময় হইয়া আছেন। শুনিতেছি তিনি হিমালয় প্রদেশে তিব্বত অঞ্চলে প্রোথিত [illegible] গৌরব স্মৃতি উদ্ধারে শীঘ্রই যাত্রা করিবেন। ভারত সরকার এ কার্য্যে অর্থব্যয় করিলে তাহাতে সরকারের গৌরব বাড়িবে ভারতের সভ্যতাও জগতের প্রাচীনতম সভ্যতা বলিয়া গৌরব পাইবে। বর্ত্তমানে এই কার্য্যে মিঃ দীক্ষিত নিযুক্ত হইয়াছেন—কার্য্য এত ধীরে চলিতেছে যে পূর্ব্ব বৎসর ৬০০ বিঘার মধ্যে মাত্র এক বিঘার খনন হইয়াছে—অথচ এই সামান্য খননেই সিন্ধুতীরের সভ্যতা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—সবটা শেষ হইলে ইহা আরও কত অতীত গৌরব নিদর্শন বহন করিয়া আনিবে কে বলিবে?

অভাব মিটাইবার পথ কি ? ঃ—প্রসিদ্ধ রাসায়নিক ডাঃ গিলবার্ট ফাউলার বারাণসীর ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনে বলিয়াছেন যে ভারতের আধুনিক শিল্প

বাণিজ্য প্রথা একেবারেই কৃত্রিম। এ দেশে ইউরোপীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হইতেছে বটে—তাহাতে ভারতীয় কুলী মজুর, কেরাণী, বা কিছু ভারতীয় সেয়ারও আছে বটে কিন্তু সত্যি স্বদেশী শিল্প যাহাতে দেশে ধন উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয়—যাহাতে শিক্ষিত ভারতীয়েরা স্বাধীন, আত্ম-নির্ভরশীল হ'ইতে পারে তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। একমাত্র কৃষিকার্য্যেই সে ব্যবস্থা হইতে পারে। ভারতের শতকরা ৯৫জন লোক কৃষি ব্যবসায়ী, ভারতের মূল ব্যবসায় কৃষি—ইহার উপরে অন্য কিছু গড়িয়া উঠিতে পারে কিন্তু ইহা উপেক্ষা করিয়া কিছুই গড়িয়া উঠিতে পারে না। কৃষির দিকে মন দিলে এখনকার চেয়ে ফসল দেড়গুণ বেশী হইতে পারে। ভারতে সারেরও অভাব নাই। অন্য দেশে কলকবজায় যাহা হয় এদেশে সূর্য্যতাপেই তার চেয়ে বেশী কাজ হয়। সস্তা মজুর ও সহজ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভারতের কৃষিসম্পদ বাণিজ্য জগতের প্রতিদ্বন্দ্বী-তাকে সহজে পরাভূত করিতে পারে। ভেজাল দিবার সহজ প্রবৃত্তি দূর করিয়া জিনিসের গুণ বাড়াইতে হইবে। এ বিষয়ে শিক্ষার দরকার। যাহার সামন্য জমিজমা আছে তাহাকে সহরের চাকরীর উমেদারী ছাড়িয়া পল্লীতে ফিরিতে হইবে—ও কৃষকদের সঙ্গে সহ-যোগীতা করিতে হইবে। ভারতের আট কোটি ভূস্বামী-শ্রেণীর লোকদের শিক্ষা ও সহায়তা ছাড়া ইহা হইবার উপায় নাই। ভারতের এই অন্ন সঙ্কটের দিনে অধ্যাপক ফাউলারের যুক্তি কার্য্যকরী করিতে পারিলে অনেক কাজ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতায় মানুষের এ দিকের প্রবৃত্তিই একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। দেশের যুবকদের মতি গতি, শিক্ষা দীক্ষার ধারা আজ যদি একেবারে বদলাইয়া ফেলিতে পারা যায় তবেই এ কাজ সম্ভব হইবে। ভারতের মূল শিল্প বাণিজ্য আবার শ্রীসম্পদে পূর্ণ হইতে পারিবে। ভারতীয়ের ক্রম বর্দ্ধিত দুঃখ দুর্দ্দশাও ঘুচিবে—নতুবা যথেষ্ট বিজ্ঞান, আইন, পদার্থ বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়াও ভারতকে পাণ্ডিত্যের সার্টিফিকেট ধোয়া জল খাইয়া অভাবের জ্বালা মিটাইতে হইবে।

মুসলমানের শিক্ষা ও স্যর পি, সি, রায় ঃ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুস্লিম হলে বক্তৃতাদান কালে স্যর পি সি রায় বলিয়াছেন 'আমার ইচ্ছা করে আমি যদি স্যর আব্দার রহিমের জায়গায় ২৪ ঘণ্টার জন্যও শিক্ষার দপ্তরের ভার লইয়া বসিতে পারিতাম তবে মুস্লিম শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকের জন্য বহু লক্ষ মুদ্রা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিতাম।' স্যর প্রফুল্লচন্দ্রের ইচ্ছা শুভ—কিছুদিন পূর্ব্বে ইনিই না বলিয়াছিলেন যে ডায়ার না ফ্রাঙ্ক জনসনের মত মিলিটারী কম্যাণ্ড অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য পাইলেও আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টাকে তোপের মুখ উড়াইতেন। স্য পি সির মনে অনেক ভাবে অনেক ইচ্ছা জাগিলেও—সেই ইচ্ছাগুলি উক্ত হইলে—সেই উক্তিতে আমরা একটা সামঞ্জস্য দেখিবার আশা করি। হিন্দুরা যে ধরণের শিক্ষা এতকাল বেশীপরিমাণে লাভ করিয়া আসিয়াছে সেই ধরণের শিক্ষাই মুসলমানদের আবার বেশী পরিমাণে দিতে হইবে কি? বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান কৃষিজীবি—তথাকথিত উচ্চশিক্ষার মোহে তাহারা হাল গরু ছাড়িয়া যদি কেরাণীগিরীর উমেদারী বেশী করিয়া আরম্ভ করে তাহাতে দেশেরই বা কি স্বার্থ আর মুসলমান সমাজেরই বা কি স্বার্থ! তাহাতে তাহাদের অন্নাভাব বাড়িবে না কমিবে? শিক্ষা মানুষ মাত্রেরই প্রয়োজন—এ জন্য সরকারের টাকা খরচ করাও দরকার—কিন্তু স্যর প্রফুল্লচন্দ্র কি এই ধরণের শিক্ষাই দেশময় আরও ছড়াইতে চাহেন?

সর্ব্বসাধারণের অসুবিধা ঃ—ক'বৎসর হইল কি অজুহাতে যে পোষ্টকার্ড, খাম প্রভৃতি চিঠিপত্র লেখার জিনিসের দাম বাড়াইয়া রাখা হইয়াছে—তাহা কমাইয়া পূর্ব্বাবস্থায় আনিবার নামও আর শোনা যাইতেছে না। পোষ্টাফিসের চিঠিপত্র, মনিঅর্ডার, ইনসিওররেন্স, ভিঃ পি, টেলিগ্রাফ্ সব তারই মাশুল দ্বিগুণ তিন গুণ হইয়াছে। এ সমস্ত জিনিষের মাশুল বাড়াতে দেশের লোককে যে কত অসুবিধা অসোয়াস্তি ভোগ করিতে হয় মাশুল বৃদ্ধির কর্ত্তারা তাহা একটুও বুঝিলে এতদিন এ জুলুম দেশে চলিতে পারিত না। ১৯২৩—২৪শের হিসাব

যাহা বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় খরচ খরচা বাদে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের হাতে ৩৫,২২,৬৬৫৲ উদ্বৃত্ত আছে। বর্ত্তমানে পোষ্টাল বিভাগ অতি আবশ্যকীয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় চিঠিপত্রের দ্রব্যাদির মূল্য কমাইয়া পূর্ব্বের মত করিলে চিঠিপত্র লেখা অনেক বাড়িবে, অধিক কাট্‌তি হইলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিবে না। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যেরা ও সরকারের অর্থসচিব দেশের লোকের এই মহা অসুবিধার বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দিয়া কাউন্সিলের বর্ত্তমান অধিবেশনেই চিঠিপত্রের মাশুল কমাইবার ব্যবস্থা করিলে দেশবাসীর ধন্যবাদ-ভাজন হইবেন।

আরও একটি গুরুতর অসুবিধা রেল ষ্টীমারের ভাড়া অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়াতে সৃষ্টি হইয়াছে। এ অসুবিধা ক্রমশঃ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। স্থানান্তরে যাতায়াত ও মালপত্র প্রেরণাপ্রেরণে যে কত ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে ও সে জন্য যে দেশবাসীর কত অসুবিধা হইতেছে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। এ অসুবিধা যত শীঘ্র সম্ভব কর্ত্তৃপক্ষের দূর করা কর্ত্তব্য।

দেশরক্ষায় দেশীয় সৈন্য ঃ—সকল মতাবলম্বী লোকেরাই বলিতেছেন ভারতীয়েরা স্বায়ত্তশাসন চাহিলে তাহাদের যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া নিজ দেশরক্ষায় যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। ভারতীয়ের স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তির পক্ষে প্রথম বাধা ও যুক্তি যে ইহারা স্বায়ত্তশাসন পাইলে বাহিরের শত্রুর হাত হইতে ইহাদের রক্ষার ভার গ্রহণের দায়িত্ব কে বহন করিতে যাইবে? সত্য কথা ভারতের রাজস্বের অধিকাংশ এখন এই ভারত রক্ষার দায়েই ব্যয়িত হইতেছে। নিজ দেশ রক্ষার জন্য ভারতীয় সৈন্যদল গঠিত হইলে এ বিভাগে বহু অর্থ বাঁচিবে—ভারতীয়দেরও স্বায়ত্তশাসন লাভের পথ মুক্ত হইবে। কিন্তু এ পথে বাধা কে এবং কি? ভারতীয়েরা সৈন্য হইতে অনভিলাষী নহে—যুদ্ধবিদ্যায়ও পশ্চাৎপদ নহে ইহা প্রমাণিত সত্য কথা। কিন্তু তাহারা এ অধিকারে একরূপ বঞ্চিতই হইয়া আছে। অস্ত্রধারণের অধিকার নাই বলিয়াই তাহারা অস্ত্রের ব্যবহার জানে না—জগতে কোন জাতিকে এভাবে নিরস্ত্র—আত্মরক্ষায় অক্ষম করিয়া রাখিতে নাই—ইহার ফল বড় ভীষণ হয়। অধিকার দিলে ভারতীয়েরা অধিকারের যথেষ্ট যোগ্যতা দেখাইতে পারিবে সে বিশ্বাস আমাদের আছে।

মাসিক সাহিত্য-পরিচয়

ভারতবর্ষ ঃ—মাঘ, ১৩৩১। প্রচ্ছদপটে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রঙ্গীন চিত্র। প্রতি মাসে ভারতবর্ষ জাতীয় মহৎ ব্যক্তিদের এক একখানি চিত্র প্রচ্ছদপটে দিতেছেন—ইহা ভাল কথা। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বিদ্যার গৌরব' প্রবন্ধে ভাবিবার অনেক কথা আছে। শ্রীশৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহার 'অন্বেষণ' কবিতাটি দিশেহারা হইয়া ছুটিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত হর্ষচরিত হইতে 'রাজ্যশ্রীর' আখ্যান শুনাইয়াছেন—উপভোগ্য।

শ্রীবিনয়কুমার সরকারের 'দক্ষিণ জার্ম্মানি'তে জার্ম্মাণ দেশের জীবন ও জীবন ধারণের উপযোগী অনেক বিভাগেরই কিছু পরিচয় আছে। ধর্ম্ম, শিক্ষা ও বাণিজ্য প্রভৃতি দেশজীবনে কি ভাবে কার্য্যকারী করিয়া লইতে হয়—জার্ম্মাণ কথা প্রসঙ্গে লেখক তাহার আভাস দিয়াছেন। শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 'উদাসী' ভাঙ্গা-ছন্দের কাব্য হইলেও সুন্দর। 'বিবিধ-প্রসঙ্গে' মহম্মদ অবদুল্লাহের 'পরলোক-প্রসঙ্গে ইসলাম' উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দে 'অকাল মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ' প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যত আলোচনা হইয়াছে তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের এই আলোচনার অংশটি বিশেষ আবশ্যকীয়। এ সম্বন্ধে যত আলোচনা হয় ততই ভাল। জাতীয় স্বাস্থ্যের অবনতি, পারিবারিক জীবনের অশান্তি দিনে দিনে বাড়িতেছে বই কমিতেছে না—ইহার কারণ নির্ণয় করিবার চেষ্টা সব দিক্ দিয়াই প্রয়োজন। শ্রীহরিহর

শেঠের 'চন্দননগরের সাধক ও সিদ্ধপুরুষ' জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ! শ্রীসুনীতি দেবীর 'বরযাত্রী' কাঁচা হাতে তেমন খোলে নাই। শ্রীমুনিন্দ্রদেব রায়ের 'পাণ্ডুয়ায়' এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানের অনেক কথা আছে। 'ভ্রম সংশোধন' শ্রীরেবা দেবীর গল্প। দু' পৃষ্ঠায় সংক্ষেপ করিয়া একটি প্রাকাণ্ড প্রেম উপন্যাস বা নাটককে পিষ্ট করা হইয়াছে। সবটাই প্রেমের দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালী—শেষকালে 'ভালবাসি' বলিয়া মধুরেণ করা হইয়াছে। শ্রীঅমিয়া বসু 'জ্যোতি-র্বিজ্ঞান' আলোচনা করিতেছেন—আকাশের নক্ষত্র, গ্রহ উপগ্রহের আলোচনা আগে মেয়ে মহলেও চলিত, এখন কিন্তু পাঠশালায়, ইস্কুলে, কথায় কথায় নানা বিজ্ঞানের দোহাইর মধ্যেও এসব আলোচনা যেন হ্রাসই পাইতেছে। শ্রীঅরুণ প্রকাশ বন্দোপাধ্যায়ের 'প্রেমতত্ব' নূতন কথা কিছু না থাকিলেও প্রেমিকদের মুখরোচক কতকটা হইতে পারে। 'মুয়লা' শ্রীসত্যভূষণ সেনের অনুবাদ গল্প মন্দ নহে। আরও অনেক ক্ষুদ্র কবিতা—সচিত্র ভিন্ন দেশের কথা ও ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস আছে। ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসের মধ্যে এক মাত্র শ্রীনরেশচন্দ্র সেনের 'রাজগী'ই পাঠে আগ্রহ জন্মায়। ভারতবর্ষের মত আরও অনেক মাসিকেই ক্রমশঃ প্রকাশ্যর জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। যে ক্রমশঃ পাঠকদের মনে আগ্রহ বজায় রাখিতে না পারে সেগুলি বেশী দিলে পাঠকদের উপর অত্যাচারই করা হয়।

'পাঠক'

গ্রন্থ-পরিচয়

বিদ্রোহী—উপন্যাস। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত। মূল্য পাঁচ সিকা। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। শ্রমিকদের একঘেয়ে নিরাশাভরা জীবনকাহিনী লইয়া উপন্যাসখানি রচিত হইলেও মনের বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতের বিকাশে বিদ্রোহী সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রঘুয়া, লছমী, নথনী প্রভৃতি পুস্তকের সবগুলি চরিত্রই স্বাভাবিক ও উজ্জ্বল। শ্রমিক-সমস্যা আজ সব দেশেরই চিন্তাশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—বাংলায় এ সমস্যা লইয়া এমন সুন্দর উপন্যাস বোধহয় এই প্রথম পড়িলাম। বিশ্বের নিরাশ, উদ্দেশ্যহীন টানিয়া লওয়া জীবনগুলিতেও বিদ্রোহের ভাব কি করিয়া অজ্ঞাত-সারে আসে 'বিদ্রোহী'র বৈচিত্র্যহীন জীবনকে তাহাই বিচিত্রতা মণ্ডিত করিয়াছে। উপন্যাসপ্রিয় পাঠকপাঠিকা-গণ বিদ্রোহী পাঠে সত্যই আনন্দলাভ করিতে পারিবেন। বিদ্রোহীর মূল বস্তু যেমন সুন্দর—ছাপা, কাগজ বাঁধাইও তেমনি মনোরম হইয়াছে।

নীল পাখী—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত রূপ-কথা, মূল্য আট আনা। মেটারলিঙ্কের Blue Bird নাট্যখানা নানা দেশী ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। সেই বইখানিই উপভোগ্য করিয়া সাজাইয়া গ্রন্থকার বাংলার ছেলেমেয়েদের হাতে দিয়াছেন। 'নীল পাখী' পড়িয়া ছেলে মেয়েরা খুসী হইবে ও নূতন ধরণের চিন্তার খোরাক পাইবে। বয়স্কেরাও ইহা পাঠে আনন্দ পাইবেন। ভাষা সহজ সরল ও স্বচ্ছ হইয়াছে। ছাপা কাগজও সুন্দর—তবে দাম আর একটু কম হইলেই ভাল হইত। প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

ভক্তিকথা—মূল্য দেড় টাকা। উড়িষ্যার ঢেঙ্কানল রাজ্যের রাজমাতা রাণী শ্রীমতী কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া দেবী রচিত। শ্রীপদ্মচরণ দাস কৃত উড়িয়া ভক্তিকথা গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলা, ভক্তিরস ও শাস্ত্র তত্ত্ব ব্যাখ্যানে ভক্তিকথা পরম মনোহর হইয়াছে। বাংলার বাহিরের অন্যভাষাভাষী একজন নারী এবং তিনি রাণী হইয়াও এমন সুন্দর গ্রন্থ বাঙ্গালীদের হাতে তুলিয়া দিয়া বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। 'কাম ও প্রেমের বিচার' বৃন্দাবন তত্ত্ব, গোপিনী লীলা, কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণতত্ত্ব প্রভৃতি অধ্যায়গুলি পরম উপভোগ্য। আশা করি বাংলায় এ গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে। রায় এম-সি সরকার ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শিল্পীর চক্ষে রঙ্গালয়

রঙ্গালয় সম্বন্ধে আজকাল খবরের কাগজে বিস্তৃত আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু আলোচনা বা সমালোচনা কোনটাই চীৎকার ব্যতীত কোন নূতন উপায়ের পথ বলিয়া দিতে পারিতেছে না। অনেক কাগজ আছে যাহারা মনে করে আমরা যা বুঝি তাহাই সর্ব্ববাদী মীমাংসিত। আবার অনেক কাগজের জন্ম হইতেছে তাহাদের কর্ত্তব্য হইয়াছে নিজ নিজ রঙ্গালয়ের উপর সুখ্যাতি বর্ষণ করা--তা অভিনয় ভালই হউক আর মন্দই হউক। এই শ্রেণীর কাগজের কোন মূল্য আছে কি না জানি না। একথা সত্য সমালোচনা ব্যতীত জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারিত হয় না। প্রকৃত সমালোচক দোষগুণগুলি ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া দিবে এবং যদি সমালোচনাযোগ্য হয় তবে অভিনেতা ও অভিনেতৃবর্গও তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে নতুবা অভিনয় কখনও নির্দ্দোষ হইতে পারে না।

আমরা জানি অনেক অভিনেতা আছেন যাহারা নিজ গুণগ্রামের বিষয় এতটা জাগ্রত যে অপরের কোন পরামর্শ বা উপদেশ গ্রহণ মানহানির কার্য্য মনে করেন। এই শ্রেণীর অভিনেতা কখনও সর্ব্বজনপ্রিয় হইতে পারেন না। বিখ্যাত শিল্পী হেমেন্দ্রনাথকে বর্ত্তমান রঙ্গালয়গুলির বিশেষত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন "আমি অভিনয় বড় একটা দেখি না, কারণ আমার অভিনয় দেখার কোন সার্থকতা হয় না। কোন বইএর অবতারণার কথা শুনিলে মনে একবার দেখবার সাধ হয় বটে এবং নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয়রাজ্যে যখন প্রবেশ লাভ করি তখন নিজের প্রার্থিত কল্পনার সঙ্গে অভিনেতাদের অভিনয় কৌশলের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়, সংগ্রাম যখন অসহ্যের ঘরে যায়, তখন উঠিয়া আসিতে ইচ্ছা হয়। শেষে ফলাফলের ঘরে দেখা যায় আনন্দলাভের আগ্রহটুকু বহুগুণে ব্যর্থতার আপশোষে পরিণত হইয়া গিয়াছে।"

যে সব দোষে অভিনয়ের অঙ্গহানি ঘটে তাহার পূরণ না করিলে শত অর্থব্যয়েও কোন ফল হয় না। অভিনয়ের অর্থ কি? তিনিই অভিনেতা যিনি কল্পনার সাহায্যে বাস্তবের সত্য প্রাণে উপলব্ধি করিয়া হাসি-কান্না রাগ-অনুরাগের রূপগুলি মূর্ত্তিমন্ত করিয়া দর্শককেও সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলেন। না হউক সাজ পোষাক—না হউক দৃশ্যপট। পোষাক বা দৃশ্যপটের যতই পরিবর্ত্তন ঘটুক কৃত্রিমতা থাকিবেই। সেইজন্য আমাদের পুরাণ বা যাত্রাদলের পাণ্ডারা ঐ রাস্তায় না না গিয়া শুধু প্রাণের ভিতর যাহাতে রসের ব্যঞ্জনা আসে তাহার চেষ্টাই করিয়াছেন। রামায়ণ গান কতবার শুনিয়াছি, প্রাণ তখন বাহ্যিকতার আস্বাদ চায় নাই—সীতার দেহ সৌন্দর্য্যের জন্য কাতর হয় নাই; আদর্শ হিন্দু কুললক্ষ্মীর প্রাণের সুর টুকু শুনিবার জন্যই মন পাগল হইত।

আমাদের রঙ্গালয়গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় রঙ্গালয় সৃষ্টির পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এ পরিবর্ত্তনের কার্য্যকরী ফল কতদূর হইয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার আছে। প্রাচীন অভিনেতাগণের সঙ্গে আধুনিকদিগের তুলনা একটু দুঃসাহসের কাজ। কারণ আমার মনে হয় এমন অনেকগুলি গুণ উভয় পক্ষেই আছে যাহা দ্বারা পরস্পর তুল্য হইতে পারে না। একথা বোধ হয় বলা যায় অভিনয়ের উৎকর্ষের কথা ছাড়িয়া দিলে রঙ্গালয়ের সৌষ্ঠব, সাজ, সজ্জা, রুচি দৃশ্যপট ইত্যাদির উন্নতি সেকাল হইতে বর্ত্তমানে, প্রভূত পরিমাণে সাধিত হইয়াছে; অভিনয়ের ভিতরও এ যুগের নেতারা অনেক স্থলে কৃতিত্বের অধিক পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন দলের গিরিশচন্দ্র, মুস্তফি, অমৃতমিত্র বা অমৃতবোস প্রভৃতি ব্যক্তি বিশেষের যে সকল [illegible] অভিনয় শক্তি ছিল এ যুগেও তাহার পূরণ হয় নাই।

অভিনয়ের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ রুচি সৃষ্টি-করা। ইহার অপর নাম কলানৈপুণ্য। কারণ কলা সঙ্গত রুচি না হইলে তাহা রুচিই নয়। আধুনিক রঙ্গালয়ের ভিতর এই রুচির সাড়া যেন পড়িয়াছে। ইহা আশার কথা। ষ্টার থিয়েটার সর্ব্ব প্রথম এই নূতন রুচির আভাষ দেয় তাহাদের "কর্ণার্জ্জুন"। এই সম্পর্কে তাঁহারাই পথ প্রদর্শক। চিরন্তন প্রথাকে ইঙ্গিতে নূতন ছাঁচে ঢালাই করিয়া এত শীঘ্র অভিনয় করা সাহস ও নৈপুণ্যের পরিচয়। তবে কর্ণার্জ্জুনের স্রষ্টার নূতনত্ব কিছুই দেখিতে পাই না, এমন আমার মনে হয় 'কর্ণার্জ্জুন' নামটাও বিশেষ মানায় নাই। ইহাতে কর্ণের কৃতিত্ব আছে অর্জ্জুনের আদৌ নাই। শুধু অভিনয় চাতুর্য্য ও কলা নৈপুণ্যের এমন কতগুলি অবতারণা আছে যাহা পূর্ব্বে ছিল না। সেইজন্যই এতটা মধুর হইয়াছে। নূতনত্বের জন্য মধুর বলি নাই—কলা সঙ্গত বলিয়াই বলা হইযাছে।

ইহার পর এই রুচি বা নৈপুণ্য বেশ খানিকটা পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে মনমোহনের "সীতা'তে। ভাষাগত বহু দোষ থাকিতে পারে তবে এটা বলিতেই হইবে সীতা নাটক দেখিলে রামযুগের একটা প্রবল স্রোত আসিয়া মনটাকে নাচাইয়া তোলে। এই ঢেউটা বড় সোজা নয়। সাজ পোষাকের সামঞ্জস্য ও নূতনত্ব এতই উজ্জ্বল ও মধুর যে তাহা অযোধ্যার সত্য রক্ষা করিয়াছে কি না জানি না তবে হৃদয়টাকে বর্ত্তমান সভ্যতার গণ্ডী হইতে ঝাঁ করিয়া হাজার বছর পেছনে সরাইয়া দেয়। পাতাল প্রবেশের দৃশ্যটা নিমিষেই বেশ অনির্ব্বচনীয় ভারতীয় অগুরু মিশ্রিত দেবধূমে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। রামের ভূমিকায় অভিনয় কৌশল আছে, উদ্দীপনা আছে, পৌরুষ আছে, গতি আছে জ্যোতিঃ আছে, সবই আছে নাই শুধু আমাদের রাম চরিত্র। যদি রাম না বলিয়া এন্টিগোনাস, সেলুকাস প্রভৃতি বিজাতীয় চরিত্রের অনুশীলন হইত তবে আমার মনে হয় ভাবনৈপুণ্যে শিশির বাবুর সমকক্ষ আধুনিক বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে কেন ভাবতেও দুর্লভ। এই স্থানে রুচির অমর্য্যাদা হইয়াছে।

রামচন্দ্র বলিতে আমরা বুঝি সুন্দর, মধুর, স্থির, ধীর, বীর, দাতা ত্রাতা ইত্যাদি। রামের শোক হইলে যদি চাঞ্চল্যদ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে হয় তবে প্রাণে আদর্শ থাকে না। অসহ্য শোক প্রকাশ হবে মুখের জ্যোতিঃ-হীনতায়, দেহের অবসন্নতায়, ক্রোধের লক্ষণ শুধু যুগ্মভ্রূর ঈষৎ বঙ্কিমতায়, আনন্দ প্রকাশিত হইবে বিশাল চক্ষের প্রশান্ত স্ফীতিতে দাতা বা ত্রাতার কাজ করিবে হস্তের ঈষৎ উত্তোলনে। গুরুবাদ—হিন্দুর রাম চরিত্রের বর্ণে বর্ণে থাকা দরকার গুরুর আদেশ না মানিলেও তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে গুরুর শ্রীপাদপদ্মে।

উপরোক্ত রুচির অন্যপ্রকার সমাবেশ দেখা গিয়াছে মিনার্ভায় "জোর বরাতে" ও "কৃতান্তের বঙ্গদর্শনে" এই দুটী নাটক উপরোক্ত কর্ণার্জ্জুন বা সীতা হইতে অন্য প্রকার। উপরোক্ত দুইটি মহাকাব্য, এই দুইটার একটী গার্হস্থ্য কাব্য ও অপরটী জাতীয় কাব্য। মানুষের একই হৃদয়ের দান পাত্র বিশেষে যেমন সখ্য বাৎসল্য ও প্রেমে পরিণত হয়, রুচি বা কলা নৈপুণ্যের বিভিন্ন ব্যবহার পাত্র বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। জোর বরাতে বীর রস নাই, করুণ রস নাই আছে হাস্য রস। রস যাই থাক ভূমিকায় দর্শককে সেই রসে ডুবাইয়া দিতে পারিলে কর্ত্তব্য করা হইল। জমিদার জয়শঙ্কর, ছোড়দা ও ঘটক এই তিনটী চরিত্র বেশ ভূষা, দেহভঙ্গী ও ভাষা বৈচিত্র্যে এত স্বাভাবিক হইয়াছে যে নিখুঁত বলিলে ও অন্যায় হয় না।

কৃতান্তের বঙ্গদর্শন ঠিক বিচার করিলে বলিতে হয় ইহা একখানা allegorical Drama বা রূপক নাটক। দেশের দারুণ বিলাপের চিত্রগুলি বিলাপ সৃষ্টির কারণ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ম্যালেরিয়া, ভূমিকম্প প্রভৃতি গুলিকে স্ব স্ব গুণের রূপপ্রদান করিয়া ভূমিকাস্থ করা হইয়াছে।

অভিনয় যদি ত্রুটী যদি শত ও থাকে তথাপি যাহা বলিবার জন্য গ্রন্থের জন্ম হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে ঘা পড়ে নাই।

নাটকটীতে বেশ ভূষার ঝলক নাই,—থাকিতে পারে না, কারণ হাহাকার কখনও ঐশ্বর্য্যে ঘটে না, তবে ইহা এমন কতগুলি উপাদানে তৈরী যাহার প্রত্যেকটীতে বর্ত্তমান বাঙ্গালাকে শ্মশানে পরিণত করিতে স্থির নিশ্চয় হইয়াছে দর্শকগণকে সে বিষয়ের আর সন্দেহ নিয়া বাড়ী ফিরিতে হয় না। সমস্ত অভিনয়েই শিল্পীর হাত যে সুস্পষ্ট রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে অধিক সময় লাগে না।

রুচির শ্রাদ্ধ হইয়াছে আমাদের ম্যাডেন রঙ্গালয় সকলে। এলফ্রেড বা করিনথিয়ান রঙ্গমঞ্চে যে সব অভিনয় দেখিয়াছি তাহাতে কখনও হাসিয়াছি কখনও কাঁদিয়াছি। হাসিয়াছি এইজন্য 'ভিখারীর' ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ তাহার পরিচ্ছদ দেখিলে মনে হয় বিলাতী ভিখারী,—নাই বলিতেও লাখ টাকা। তারপর ম্যাডেন বড় লোক তাহার থিয়েটারের ভিখারী কি আর ষ্টার মিনার্ভার মত হওয়া উচিত? ইহাদের হরিশ্চন্দ্র অভিনয় হইতেছে। হরিশ্চন্দ্র মিলনান্ত নাটক হইলেও তিন চতুর্থাংশই করুণ ও বিলাপ প্রধান। অভিনয় কালে হয়ত একটু প্রাণে কান্নার জল আসিয়াছে এমন সময় অদরকারী একটা অবতারণা হইল কোন এক তোৎলাকে লইয়া। এ রসভঙ্গের ক্ষমা নাই। আর কাঁদিয়াছি ওরূপ অপাত্রে অর্থব্যয় দেখিয়া।"

'দর্শক'

ইয়ং ইণ্ডিয়া
পত্রিকার সার সঙ্কলন

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্নকর্ত্তা—জনৈক ইংরাজ—উত্তরদাতা মহাত্মা গান্ধী।

প্রশ্নোত্তর ঃ—প্রশ্নকর্ত্তা একজন ইংরাজ, তাঁহার ইচ্ছানুসারে নিম্নে আমাদের প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করা হইল। ইংরাজেরা আমার বন্ধুগণের মধ্যে পরিগণিত সুতরাং তাহাদের মনে যদি কোনও প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হয় আমি বন্ধু হিসাবে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বাধ্য। প্রশ্নকর্ত্তা অধিকাংশ স্থলেই নিজে উপলক্ষ্য হইয়া সমগ্র জাতির পক্ষ হইতে প্রশ্ন করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

"খদ্দর প্রচারের উপর আপনার জেদ করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?"

"সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, অহিংসার দ্বারা আনিত 'স্বরাজ'ই আমি চাই, আর তাহা কেবলমাত্র খদ্দর আন্দোলনের দ্বারাই সম্ভব। এই আন্দোলন অশিক্ষিতদের মধ্যে একতা স্থাপন করিবে এবং সুপ্ত জাতীয়তার অনুভূতি জাগাইয়া দিবে—যদি প্রত্যেকে মাসিক এক টাকা মাত্র উপার্জ্জন করিতে পারে, তবে সমগ্র ভারতবর্ষে কত টাকা হইবে? সেই টাকায় সকলের সাহায্যে জাতীয় কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইবে, ইহা কি গৌরবের বিষয় নয়? আর যদি সত্যই খদ্দর প্রচলন ফলবতী হয় তাহা হইলে ল্যাঙ্কাশায়ার যে অর্থ হইতে বঞ্চিত হইবে তাহাতেই ইংরাজ সরকারের ভারতকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা প্রভূত পরিমাণে হ্রাস হইবে।"

"খদ্দর প্রচলনের ফল—জাতীয় রুচির পরিবর্ত্তন আপনি কি আশা করেন যে স্বদেশবাসীকে বিলাতী বর্জ্জন করাইতে সক্ষম হইবেন?"

"আমি সে আশা করি, কেন না, আমি তাহাদের বেশী কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে বলি নাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রুচিই পরিবর্ত্তন করাইতে হইবে—আর তাহা অসম্ভবও নয় কারণ আজকাল খদ্দর ক্রমেই উন্নত হইতেছে।"

"স্বরাজ কথাটীর অর্থ কি? ইহার সীমাই বা কতদূর?"

"সমগ্র ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী, পুরুষ যাহারা এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বা যাহারা এদেশে বাস করিতেছে কিম্বা যাহারা কৃত-কর্ম্মের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভারতের উপকার সাধন করিয়াছে এবং নিজেদের ভোটার প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহাদের সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে দেশ-শাসন তাহাকেই আমি স্বরাজ বলি।"

"আপনার প্রতি অন্যান্য নেতাগণের ভাব কিরূপ?"

"তাঁহাদের ভাব অবিচ্ছিন্ন সৌহৃদ্যে জড়িত; স্বার্থত্যাগে ও স্বদেশ-হিতৈষণায় তাঁহারা আমাপেক্ষা কোন অংশেই কম নহেন।"

"শুনা যায় যে আপনি নাকি দাশ মহাশয়ের মতের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন?"

"কংগ্রেস সদস্যগণের মধ্যে অকারণ মনোমালিন্য প্রতি-রোধ করিয়াছি—সে হিসাবে কথাটা ঠিক; তবে যদি মনে

করেন যে আমার স্বীয় কর্ত্তব্যপথ এবং মূলনীতি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে তবে তাহা একেবারেই ভুল।"

"এরূপও শুনা যায় যে আপনি অধীনতা স্বীকার করায় নৈতিক প্রাধান্যও হারাইয়াছেন।" "নৈতিক প্রাধান্য কখন জোর করিয়া রাখা যায় না, উহা স্বতঃই আসে এবং বিনা আয়াসে থাকে। আমি নিজে প্রাধান্য হারাইয়াছি বলিয়া বোধ হয় না, কারণ সেরূপ কোন কাজ আমি করি নাই। যাহা হারাইয়াছি,—তাহা অনেক সজ্জন এবং বিদ্বান্ ব্যক্তির, স্বরাজ লাভের একমাত্র পন্থার সহিত সহযোগ—সেই পন্থা—চরকা।"

"অসহযোগ আন্দোলনের সকল চেষ্টা বিফল হওয়া স্বত্বেও আপনার ইহার উপর জেদ করিবার কারণ কি এবং "মুলতুবী থাকা" এই কথাটী এস্থলে কিরূপভাবে প্রযোজ্য?"

"পূর্ব্বে জেদ করিতাম বটে, এখন আর করি না। অসহযোগ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে তাহাও আমি স্বীকার করি না। অসহযোগ স্থগিত আছে মাত্র এই আমি বলি, কারণ ইহাই আমার জীবনের মূলমন্ত্র, আমার মতে এই অসহযোগ ভারতের—না, শুধু ভারতেরই বা বলি কেন সমগ্র জগতের প্রভূত হিতসাধন করিয়াছে—তাহা আমরা এক্ষণে সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, পরে পারিব।'

"হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কি প্রকারে করা উচিত?"

"এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে কেবলমাত্র দুই পক্ষের মধ্যে যাহাতে প্রীতি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করা যায় অহরহ সেই চেষ্টার দ্বারা। হিন্দুর সর্ব্বদাই মুসলমানের জন্য প্রত্যেক পার্থিব বিষয়ে স্বার্থত্যাগ করা উচিত। আমি বুঝাইয়া দিতে চাই যে কেবলমাত্র শাসন ভার গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিলেই স্বরাজ পাওয়া যাইবে না, সেই ক্ষমতার যদি ব্যভিচার ঘটে তাহার প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য থাকিলে তবে আমরা স্বরাজ গ্রহণের উপযুক্ত হইব।"

"ইংরাজের প্রতি আপনার ব্যক্তিগত ভাব কিরূপ এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ কিরূপ আশাপ্রদ?"

"আমি ইংরাজের প্রতি সৌহৃদ্য এবং শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করি, আমি তাহাদের কাছে বন্ধুত্বের অধিকার চাই, কেননা, কাহাকেও অবিশ্বাস করা আমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং পৃথিবীতে কোন জাতির মুক্তির পথ রুদ্ধ ইহা আমার প্রত্যয় হয় না। আমি ইংরাজদের, জাতির জন্য স্বার্থত্যাগ ও বীরত্বের নিদর্শন দেখিয়া মুগ্ধ, তাহাদের ঐক্য ও পরিচালনা শক্তিকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। ইংরাজ আজ যে পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করুক—তাহারা বিচ্ছিন্ন-শক্তি জাতিকে ছলে, বলে কিংবা কৌশলে স্বীয় আয়ত্বাধীন করিবার লোভ তাহারা দমন করুক এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করুক যে আসন্ন বৃটীশ কমনওয়েলেথে ভারতবাসী তাহাদের সমকক্ষ, বন্ধু এবং তাহাদের সুখসমৃদ্ধির ন্যায্য অংশীদার—ইহা কার্য্যে সম্ভব কিনা তাহা প্রধানতঃ আমাদের কার্য্যাবলীর উপর নির্ভর করে—অর্থাৎ, ভারতের উপর আমার আশা অনেক, তাই ইংলণ্ডের শুভাকাঙ্ক্ষাই আমি করি। আমরা চিরকাল এরূপ বিশৃঙ্খল এবং অন্তুকরণলুব্ধ থাকিব না।—বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলা, নৈতিক অবনতি এবং নিরুদ্যমের মধ্যেও আমি শৃঙ্খলা, নৈতিক উন্নতি এবং নবীন উদ্যমের ক্রমিক উন্মেষ দেখিতে পাই। এমন দিন আসিতেছে যেদিন ইংরাজ ভারতের বন্ধুত্বে গৌরব অনুভব করিবে। সেইদিন ভারতও তাহাদের অতীত দুঃখ কষ্টের কথা মনে স্থান না দিয়া সাগ্রহে সৌহৃদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। আমি জানি আমার এই আশা কোন বাস্তব ভিত্তির উপর স্থাপিত নয় তাহার দৃঢ় ভিত্তি আমার অটল, অকম্পিত বিশ্বাস। আর যেখানে তথাকথিত প্রমাণের উপরই সব নির্ভর করে সেখানে এই বিশ্বাসের স্থান কোথায়—?

Printed & Published by Jnanedra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
14 Jaggannath Dutta Lane Garpar, Calcutta.

ত্রস্তা

প্রথমবর্ষ] ২রা ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ১৪ই ফেব্রুয়ারী [২৭শ সংখ্যা

ফুটাও

৺ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

তুমি ফুটাও তোমারে আপনি।
হেথা ঘোর ঘন মেঘ স্তরে স্তরে-স্তরে
রচিয়া তিমির যামিনী।
আমি আঁধারে অন্ধ, ঘুচেনা সন্দ
কেবলি দ্বন্দ্ব করি হে,—
বল কেমনে তোমারে ধরি হে।
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মেঘ,
দেয় সে যেমন সমীর বেগ,
ফুটায়ে কনক রেখা হে,—
তুমি ফুটাও তোমারে তেমতি হে।
রাখনা ত তুমি আঁধারে
তুমি যে জগজ্জ্যোতি হে।

মোহিতের ইঞ্জিনিয়ারী

(নক্সা)

শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ইচ্ছামত কুৎসা করা ও তাহার জন্য অবাধে মিথ্যা বলায় মোহিত সিদ্ধহস্ত ছিল, এবং সেই মিথ্যার পর মিথ্যার সামঞ্জস্য রক্ষা করা ছিল তাহার বাহাদুরী। তাহাকে যদি কেহ এই বদ্‌ অভ্যাসের জন্য দোষারোপ করিত তাহা হইলে সে বলিত যে ব্যাসদেব হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাস, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ হইতে বটতলার যেদো, মেধো, রাম, শ্যাম পর্য্যন্ত সকল ঔপন্যাসিক ও লেখকেরা কাল্পনিক কতকগুলি মিথ্যা গল্পাকারে প্রকাশ করিয়া যশস্বী হন তাহাতে কোন দোষ নাই,—আর সে না হয় সেই মিথ্যাগুলি পুস্তকে না ছাপাইয়া মুখে মুখে গল্প করে তাহাতে এমন বিশেষ কি দোষ হইতে পারে। তাহার ব্যক্তিগত চর্চ্চা সম্বন্ধে বলিলে সে উত্তর দিত যে সকল ঔপন্যাসিকই সৎসাহসের অভাবে প্রকৃত নাম ধাম গোপন রাখিয়া কাল্পনিক নায়ক-নায়িকা সৃজন করিয়া বাস্তব ঘটনা সকল গল্পাকারে প্রকাশ ক'রেন—ইহার প্রমাণ সে অনেক দিতে পারে। যাহাই হউক পরের সুখ্যাতি অপেক্ষা পরের কুৎসা অধিকতর শ্রবণ-তৃপ্তিকর বলিয়া আমরা মেসে কাজ না পাইলেই মোহিতকে দম দিয়া দিতাম ও সেও কলের গানের মত অবাধে মিথ্যা বলিয়া যাইত।

সেইমত সেদিন বাদলার সন্ধ্যায় চা বেগুনি ও মুড়ি খাইতে খাইতে বিপিন মোহিতকে নূতন ইউনিভার্সিটী বিল্ডিংএর উৎপত্তির প্রকৃত ইতিহাস বলিতে বলিল। গল্পটা বিপিনের শোনা ছিল—অপর সকলকে এই আজ-গুবি 'সত্য-ইতিহাস' শুনাইবার জন্যই বিপিন কথাটা পাড়িল। মোহিত তাহার অভ্যাসমত লোক দেখান একটু আপত্তি করিয়া শেষে বলিতে লাগিল,—

"এম-এ পাশ করার পরও যখন চাকরী পাওয়া এক-রকম দুর্ঘট হ'য়ে উঠ্‌লো তখন একদিন ক-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব'ল্লাম যে 'আপনারা আমাদের পাশে ঢাকা দিয়ে এমন বিবর্ণ করে' দিচ্ছেন যে আমাদের প্রকৃত বর্ণ আবার প্রকাশ ক'র্ত্তে হ'লে কাছাকাছি একটা দীঘির প্রয়োজন।'

তিনি বিরক্ত হ'য়ে ব'ল্লেন—'কেন সুমুখেই ত ঐ গোলদীঘি র'য়েছে।'

আমি ব'ল্লাম—'কিজানেন গোলদীঘিতে অনেক গোল —ওটা করপোরেশনের দীঘি, ওতে নামতে দেয় না। ইউনিভার্সিটীর তরফ হ'তে একটা দীঘির প্রয়োজন।'

তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন—'কেন—ঐতেইতো সব ছেলেরা সাঁতার দেয়, নৌকা বায়?'

আমি ব'ল্লাম—'তার জন্য চাঁদা দিতে হয় যা কেবল অভিভাবকের অর্থে পুষ্ট ছাত্রদের পক্ষেই সম্ভব। ছাত্রাবস্থা কেটে যাবার পর আর চাঁদা দেবার সামর্থ্য থাকে না।'

তিনি বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন—'ছাত্রাবস্থা কাটবার পর আর সাঁতার দেবার সময়ও পাবে না আর দরকারও হবে না।'

আমি বাধা দিয়ে ব'ল্লাম—'কিন্তু বেশীর ভাগ ছাত্রদের ছাত্রাবস্থা শেষ হবার পর অর্থাগমের উপায়াভাবে ডুবে মরবার দরকার হয় এবং যে ইউনিভার্সিটী ছাত্রদের এই অসহায় অবস্থার কারণ তারই উচিত এই দুরবস্থা হ'তে উদ্ধার হবার একটা উপায় করে' দেওয়া।'

তিনি অধিকতর বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন—'আচ্ছা যাও শীঘ্রই তার একটা বন্দোবস্ত করছি।'

কিছুদিন পরেই দেখি মাধববাবুর বাজারটা কিনে নিয়ে তার ওপরকার পুরান বাড়ীগুলো ভেঙ্গে ফেলে দীঘি কাটা আরম্ভ হ'য়ে গেছে। তখন আমার বিয়ে হ'য়ে গেছল ও শ্বশুর মহাশয়ের সুপারিশে একটা চাকরীও জোগাড় ক'রতে পেরেছিলাম,—কাজেই আমার আর

ডুবে মরবার ইচ্ছা বা অবসর ছিল না। তবুও নিছক ভবিষ্যৎ ছাত্রদের পক্ষ হ'য়ে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে ক'বাবুর কাছে ছুটে গেলাম। তিনি আমায় দেখে হেসে ব'ল্লেন—'কেমন হে ছোকরা, তোমার কথা রেখেছি ত?'

আমি নমস্কার করে' বল্লাম—'তা'তে আর সন্দেহ কি! ঐ জায়গায় দীঘিটা কাটতে আরম্ভ করে সকল দিক হ'তে ভাল হ'য়েছে।'

তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি রকম?'

আমি ব'ল্লাম—'এই ধরুন সেনেট হল থেকে লাফিয়ে পড়তে পারবে, হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল থেকে লাফিয়ে পড়তে পারবে। দরকার হ'লে মেডিক্যাল কলেজ, ল-কলেজ কাছাকাছি সব জায়গার ছাত্রেরাই একটা ডুবে মরবার সুযোগ পাবে। তারপর ধরুন ঐ করপোরেশন যারা সহরবাসীর পয়সায় পুষ্ট হ'য়েও তাদের ছেলেদের একটা মরবার সুযোগ দিতেও অনিচ্ছুক তাদের নাকের ওপর এই দীঘিটা হ'য়ে গেলে তারাও খুব জব্দ হ'য়ে যাবে।

তিনি বল্লেন—'কিন্তু এতে একটা গোল উপস্থিত হ'য়েছে। ১০।১২ ফুট খুঁড়তেই ভয় পেয়ে করপোরেশন, ট্রাম কোম্পানী, গ্যাস কোম্পানী, ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী প্রভৃতি এক যোগে দরখাস্ত করেছে যে এই দীঘিটা হ'লেই গোলদীঘির সঙ্গে যে কোন এক রাত্রে এক হ'য়ে গিয়ে তাদের ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে' দেবে।'

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'তাহ'লে কি কর্ব্বেন মনে কর্চ্ছেন?'

তিনি বল্লেন—'মনে এখনও কিছুই করি নি। তবে ওখানে যে কি করছি তাও কাকেও জানাই নি। সুতরাং যাই করি এই দীঘির রহস্য কেউই জানতে পারবে না।'

আমি ব'ল্লাম—'কেন আমি যে জানি?'

তিনি গম্ভীরভাবে ব'ল্লেন—'ছোঃ—তোমার কথা কেউ বিশ্বাসই ক'র্ব্বে না।"

বিপিন প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"অবশ্য আমরা ছাড়া"

মোহিত একটু হাসিয়া বলিল—"তোমরাই কি দাদা সব সময় বিশ্বাস কর। অনেক সময় নিছক সত্যও তোমাদের হাতে পড়ে' মিথ্যা হ'য়ে যায়।"

বিপিন বলিল—"সেটা ভাই 'পাগলে-বাঘ পড়ার' জন্যে।"

আমি বিপিনকে ধমক দিয়া বলিলাম—"গল্পের সময় বাধা দিও না বিপিন। মোহিতকে ব'লতে দাও।"

অনুযোগের সুরে মোহিত বলিল—"ঐ ত দাদা, তুমিও ত এটাকে গল্প ব'লছ।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"I beg your pardon—গল্প নয়—নিছক সত্য ঘটনা।"

মোহিত আবার বলিতে লাগিল,—

"কিছুদিন পরে ক-বাবু আমায় বাড়ীতে ডেকে পাঠিয়ে ব'ল্লেন—'দেখ মোহিত, তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে আমি তোমার ওপর ভারী সন্তুষ্ট হ'য়েছি। আমি তোমায় একটা লাভের কাজ দিতে ইচ্ছা করি। দু'পয়সা যদি রোজগার করবার ইচ্ছা থাকে তাহ'লে বিবেচনা করে' জবাব দিও।'

কি কাজ তাও জানা নেই আর বিবেচনাই বা কি ক'রবো তাও জানি নে তবুও আমি সম্মত হ'য়ে গেলাম।

পিঠে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে' আদর জানিয়ে তিনি বল্লেন—'এই জন্যেই ত তোমায় আমার এত পছন্দ। এখন শোন—সেই যে নতুন দীঘিটা কাটতে কাটতে বন্ধ হ'য়ে গেছে—মনে আছে ত? তার ওপর আমি একটা পাঁচতলা বাড়ী ক'র্ত্তে চাই—আর তোমায় হ'তে হবে তার ইঞ্জিনিয়ার।'

আমি সভয়ে ব'ল্লাম—'আমি যে ইঞ্জিনিয়ারিংএর 'ই'-ও জানিনে। আর ঐ ১০।১২ ফুট গভীর খাদের ওপর পাঁচতলা বাড়ী করা ত সহজ হ'বে না। প্রকৃত ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষেই ত এ একটা বিষম সমস্যা—তা আমার কাছে—'

তিনি ধমক দিয়ে ব'ল্লেন—'তোমার ঐ আবোল-তাবোল বেসুরো কথা আমি শুনতে চাইনে। পার্ব্বে কি না তাই বল?'

আমি সুবোধ গোপালের মত ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। তিনি তখন ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'লতে লাগলেন—'দেখ Engineeringটা হচ্ছে শুধু Common Sense। আমি ইঞ্জিনিয়ারদের ঠাট্টা করে কি বলি জান?—আমি

বলি ইঞ্জিনিয়ার তিন প্রকার—one who builds the Engine, -one who drives the Engine আর one who cleans the engine। সুতরাং তুমিই বা কেন ইঞ্জিনিয়ার হবে না? সাঁওতাল পরগণায় শালবনের অভাব নেই—সেখান থেকে মোটা মোটা শালগাছ আনিয়ে খাদে যত পার শালের খুঁটী পুঁতে ফেল। তারপর ঐ দশ বার ফুট খাদটা আগাগোড়া গাঁথ্‌নি করে' ভরিয়ে ফেল।'

আমি সাশ্চর্য্যে ব'ল্লাম—'বলেন কি—তাতে যে অনেক খরচ পড়বে!'

তিনি মহাবিরক্ত হয়ে ব'ল্লেন—'তাতে তোমার কি? যাও—তোমার কাজ নয়—চলে যাও—যাও—যাও।'

আমি অগত্যা ক্ষমা চেয়ে ব'ল্লাম—'এরকম আর ব'লব না।' অনেক সাধ্য-সাধনা স্তুতিমিনতির পর তিনি ব'ল্লেন—'ফের্‌ যদি প্রতিবাদ কর তাহ'লে দূর করে দেব।'

আমি 'যে আজ্ঞে' বলে মনে মনে ফুল হাতে করে স্তবচণ্ডীর কথা শুনতে লাগলাম। তিনি বলতে লাগলেন—'এই রকম করে' বনেদ শেষ হ'লে পর বনেদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ৫।৭ ফুট চওড়া ভিত দিয়ে বাড়ী আরম্ভ ক'র্ত্তে হবে। সকলেই বুঝবে উপযুক্ত ভিতের জন্যে উপযুক্ত বনেদ করা হ'য়েছে। দেশের মধ্যে এমন কেউ নেই যে এ বিষয়ে-কথা কইতে সাহস কর্ব্বে।—বুঝলে?"

৫।৭ ফুট করে ভিত দিলে সব জায়গাটা যে ভিতেই ভরে যাবে এটা বুঝলেও আর ব'লতে সাহস হ'ল না। তিনি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে হেসে বল্লেন—'মোটা মোটা ভিতে জায়গা কমে যাবে তাতে তোমার আমার কি বল? আমরা দেখাব ইউনিভার্সিটীর greatness এর মত একটা great building যার গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত দেখে লোকে স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে কথা কইতে আর সাহস কর্ব্বে না। তার সঙ্গে সঙ্গে তোমারও নাম বেরিয়ে যাবে as a great engineer!'

আমি অদূরে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর কাজে বাহাল হ'তে স্বীকৃত হ'য়ে গেলাম।

কিন্তু তখনও মনে মনে সন্দেহ হচ্ছিল যে এই অসম্ভব রকম মালমসলা ও জমির অসদ্ব্যবহার হবে জেনে শুনেও করপোরেশন কি প্ল্যান পাশ ক'রবে। একটু ইতস্ততঃ করে বুক ঠুকে কথাটা বলে ফেল্লাম। তিনি হেসে বল্লেন—'সে ভার আমার হে আমার। করপোরেশনের বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্টে কি হয় জান? তারা দেখে শুধু আইনমত খোলা জায়গা ঠিক ছাড়া আছে কি না,—আর দেখে যে য'তলা বাড়ী তার দেড়া ফুট বোনেদ হ'য়েছে কি না। যেই দেখবে পাঁচ দেড়ে ৭॥০ ফুটের জায়গায় ১০।১২ ফুট বোনেদ অমনি চোখ বুঁজে সই ক'রে দেবে। এমন কোন ত আইন নেই যে মালমসলা কি জমি বেশী খরচ ক'রতে পাবে না,—তখন আর ভাবনা কি?

আমি খুসি হ'য়ে নমস্কার করে এসে কাজে লেগে গেলাম। প্রথমেই চার কোণে চার খানা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিলাম—'M. N. Mukherjee A. M. I. C. E.'

বাধা দিয়া ললিত বলিয়া উঠিল—"এইখানেই খেই হারিয়ে ফেল্লে মোহিত।"

মোহিত বলিল—"একেবারেই না। আগে শেষ পর্য্যন্ত শোন।"

বিপিন বলিল—"এইবারই ত আসল মজা।—গোল ক'রো না, শোনো।"

মজা জমিয়াছিল মন্দ নয়;—তাহার পর আরও মজার আশ্বাস পাইয়া আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতে লাগিলাম। মোহিত বলিতে লাগিল—"ক-বাবু ইন্‌স্পেকসনে এসে আমার সাইনবোর্ড দেখে চমকে উঠে বল্লেন—'ক'রেছ কি মোহিত! জেলে যাবে যে! Mr. M. N. Mukherjee র সাইনবোর্ড চুরী ক'রে এনেছ?"

আমি হেসে বল্লাম—'আজ্ঞে না—আমারও নাম মোহিত নাথ মুখোপাধ্যায়।'

তিনি বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—A.M.I.C.E. হ'লে কবে?'

আমি ব'ল্লাম—'আজ্ঞে দরখাস্ত ক'রেছি শীঘ্রই হব। আর তার আগেই যদি ধরা পড়ি তাহ'লে ব'লব আমি

A. M.I.C.E. নই—আমি সাগরবন্ধনে কাঠবিড়ালীর ন্যায় এই মহাযজ্ঞে আপনাদের A. Mice."

আমরা সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। বিনোদ বলিল—"A Mice কি রকম?"

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া মোহিত বলিল—"আমার personal capacityতে A আর তোমাদের সকলকে represent করি বলে Mice."

আবার এক চোট হাসি শেষ করিয়া বিপিন বলিল—"শেষটা বল মোহিত—শেষটাও মন্দ না।"

মোহিত বলিল—"বাকীটা সংক্ষেপে ব'লব—কারণ এটা আমার পতনের ইতিহাস। তার পর এইরকম করে দোতলার কতটা শেষ কর্ত্তেই দেখা গেল যে পাঁচ তলার জন্যে যে টাকা মঞ্জুর হয়েছিল তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর একটা statistic নিয়ে দেখা গেল যে আমাদের দেশে যত ইটখোলা আছে, তাতে এ বাড়ীর পাঁচতলা শেষ কর্ত্তে হলে আরও ইটখোলার দরকার। আমরা তখন গোটাকতক ইটখোলা করবার জন্য কেল্লার Trenchএর চারিদিকে কিছু জায়গার জন্যে Land acquisition Departmentএ লিখে পাঠালাম, আর ইট পোড়াবার জন্যে কেল্লার Trenchটা কয়েক বছরের জন্যে ধার দিতে লিখলাম। তখন গবর্ণমেণ্টের নজর পড়ল এদিকে। প্রথমেই নজর পড়ল আমার সাইন বোর্ডের ওপর—আর সঙ্গে সঙ্গে আসল ইঞ্জিনিয়ার M. N. Mukherjeeর আবির্ভাব ও A Miceএর নিরুদ্দেশ—গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দোতলা পর্য্যন্ত শেষ করে কাজ বন্ধ রাখবার আদেশ—ও মোহিতনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুনর্মূষিক প্রাপ্তি,—কিন্তু এবার a mice নয় a mouse.

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে মোহিত সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিয়াছিল যেন গল্পটী কর্ত্তৃপক্ষীয় কাহারও কর্ণগোচর না হয়, কেন না তাহা হইলে তাহার ডিগ্রী কাড়িয়া লইতে পারে। আমরাও সকলে সেইমত প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। কিন্তু আজকালকার রাজনৈতিক যুগে প্রতিশ্রুতিপালন দুর্ব্বলতার চিহ্ন বলিয়া ইহা প্রকাশ করিয়া প্রতিশ্রুতিভঙ্গের লোভও সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

রাধিকা

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ কাব্যবিনোদ

হে মোর রাধিকা ;
হে আমার অন্তরের আগুণের শিখা,
ফাগুন-গীতিকা।
কবে কোন বসন্ত দিবসে
যৌবন যাতনা লয়ে
মরিনু হুতাশে,
সেই ক্ষণে,
আমার ও বক্ষ হ'তে আসিছে বাহিরে,
স্বর্গময় সঙ্গীতের সুরে।
আগুন রাগের রংয়ে
দিলে দীপ জ্বালি,
সীমা শূন্য শূন্যের মহলে—
রচিয়া দীপালি।
দেখিনু যেইদিকে—শিখায় শিখায়
আমারই সে সঙ্গীতের
তরঙ্গ খেলায়।
তারি মাঝে
শত ভিন্ন সাজে,
শত শিখা বুকে,
তোমারে হেরিনু আমি
মুগ্ধ চোখে,—
হে কিন্নরী,

কোন্ সে কামের তৃষা
মিটাবার তরে
কামনারে—
রেখেছ প্রসারি'।

কে সে কাম !
ওগো বিশ্ব-রতি,—
তোমার রূপের আলো দিয়া
কারে তুমি করিবে আরতি !
কে তোমার ঈপ্সিত দেবতা,
তোমার প্রাণের রসে—
করি পান সাধ ভরে—
হে চিরযৌবনা সতী—
যৌবনেরে দিবে স্বার্থকতা !
কাহার চুম্বন পেয়ে
অন্তর মন্থিত হ'য়ে
বিকাশিবে কামনা মঞ্জরী,
অর্ঘ্য রূপে
কাহার আঁখির—
নিত্য নব প্রসূনেব রচিয়া মাধুবী !
হে আমার রতি,
সে যে আমি, সে যে আমি,
আমি সেই কাম—
শত পাত্রে তব রস
আমি যে করিতে চাহি পান,
তাই মম গান

ছড়ায়ে দিয়াছি চারিভিতে
শতেক বীণার মাঝে
বাজে তাহা বিচিত্র সঙ্গীতে।
তাই শত কুঞ্জে কুঞ্জে
ব্রজের ভবনে,
শত শত গোপিকার
পরাণে পরাণে
বাজে মোর বাঁশি,
করিয়া উদাসী
পাঠায় সে
আমারই কি কুঞ্জ মাঝে—
অভিসার সাজে।
সেই ক্ষণে,
হে মোর রাধিকা,
রাসের রঙ্গের লীলা মাঝে
তোমারে সম্ভোগ করি—
শত ভিন্ন সাজে,
শত পাত্র হ'তে ঢালি
রসের মদিরা,
পান করে হয়ে মাতোয়ারা,
তোমার ফিরায়ে লয়ে
আমারে ছড়ায়ে দেহ
বিশ্বের ভবনে,
তোমারে ফিরিয়া পেতে—
বার বার নবরূপে
নবীন গগনে।

ইওরোপিয়ান এ্যাসোসিয়েসনের নূতন পথ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ইওরোপিয়ান এ্যাসোসিয়েসনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে লর্ড কেব্‌ল ভারত-প্রবাসী ইয়োরোপীয়দের ভারতীয়দের প্রতি সৌজন্য ও ভদ্রতা দেখাইতে বলিয়াছেন—এই সৌজন্য ও ভদ্রতা প্রদর্শনে সাহেবরা ত্রুটি করিতেছেন বলিয়াই আজ ভারতময় সাহেব বিদ্বেষ ছড়াইয়া পড়িতেছে। অথচ ভারতবাসীরা সাহেবদের সঙ্গে মিশিতে ও ভদ্র ব্যবহার পাইতে ইচ্ছুক। লর্ড কেব্‌লের মতে ইহাই ধূমায়িত বিদ্বেষের মূল। সাহেবেরা প্রত্যেকেই যদি এক একটি রাজা সাজিয়া ভারতীয়দের উপর রাজ-মেজাজ দেখান তবে কিছুদিন মেজাজের খোস খেয়ালে চলিবে ভাল বটে—কিন্তু পরিণাম ইহার যাহা হইবে তাহা ভাবিয়াই বোধ হয় লর্ড কেব্‌লের মত বিচক্ষণ ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইওরোপীয়ান এ্যাসোসিয়নেও শুধু ভারতীয় আন্দোলনকারীদের দোষারোপ না করিয়া সাহেবদেরই রাজ-মেজাজ সংযত করিয়া ভদ্র হইবার উপদেশ দিয়াছেন। লর্ড কেব্‌ল ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী—ভারতময় ইহার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। বার্ড ও হিলজার্স কোম্পানীর মূল মালিক ইনি। মাসখানেক হইল ইনি বিলাত হইতে ভারতের কারবার দেখিতে আসিয়াছেন। ভারতের একদিকের অবস্থা তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার বিরাট ব্যবসায়ের কথা ভাবিয়াছেন, ইংরেজের সাম্রাজ্য নীতি ও ভারতের অধিকারের কথাও বোধ হয় চিন্তা করিয়াছেন। এই চিন্তা করিয়াই বোধ হয় তিনি আভিজাত্যগর্ব্বী, উন্নতচেতা, বিরাট কর্ম্মী ইংরেজের মত ভারতবর্ষের ইওরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েসনকে এই কথা শুনাইয়াছেন। লর্ড কেবলের বক্তৃতার পরে ম্যকিনন ম্যাকাঞ্জি কোম্পানীর সর্ব্বেসর্ব্বা, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট—ইওরোপীয় সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার উইলিয়াম্ কুরী তাঁহার আপিসের ভারতীয় কর্ম্মচারীদের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া বলিয়াছেন, 'আমাদের কর্ম্মচারীদের মধ্যে প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক নাই—সকলেই এক কর্ম্মে নিয়োজিত—তবে কেহ একটু আগে পিছে আছে মাত্র। আমাদের ব্যবসায়ের জীবন ও কাজকর্ম্ম ফুটবল খেলারই মত,—সকলে মিলিয়া নিজ দলকেই উন্নত করিতে চাহিতেছি। স্যর উইলিয়াম নিজ কোম্পানীর লোকদের ক্রীড়া কৌতুকে উৎসাহ দেখিয়া তাহাদের সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের প্রশংসা করিয়াছেন।

স্যর কুরীর বক্তৃতাও সহৃদয়তাপূর্ণ। এই সব ফার্ম্মের বহু রকমের বড় বড় ব্যবসায় আছে—লক্ষ লক্ষ ভারতীয় এই ফার্ম্মে কাজ করিতেছে। ভারতে অর্থের আনা-গোণা ইহাঁরাই করাইতেছেন। রত্নভূমি ভারত কত রত্ন প্রসব করিতে পারে ইহারা তাহার পথ মুক্ত করিতেছেন। ইহাঁদেরই এক একটী ব্যবসায়ে দালালী করিয়া কত ভারতীয় লক্ষপতি হইতেছে। ভারতে অর্থের অফুরন্ত সম্ভাবনা ইহারাই দেখিয়াছেন। ভারতের সঙ্গে ইহাঁদের স্বার্থ সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ।

ভারতীয়েরা যে পথে জীবন চালাইয়াছে সে পথে চলিতে গেলে ইহাঁদের সম্পর্কচ্যুত হইয়া চলিবার উপায় নাই, দেশের বর্ত্তমান ব্যবসায় বাণিজ্যের—অর্থাগম ও অর্থব্যয়ের পথ যাঁহারা জানেন তাঁহারা এ কথা বুঝিবেন।

আবার এই সমস্ত ব্যবসায়ীদেরও ভারতীয় না হইলে চলিবার উপায় নাই। চাকুরী গেলে অভাবের ভীতি আত্মমর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া চাকরীতে রাখিতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে দু' পক্ষের মনের বিদ্বেষই বাড়িয়া চলে—মূল কাজেরও ক্ষতি হয়। এই সংঘর্ষ ইওরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ ভাবে চলিয়াছে বলিয়াই ইওরোপীয় নেতারা অবস্থা বুঝিয়া ইহা দূর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

এ সময়ে যে সব ইংরেজ সিডেনহাম বা ভাম্মারের মত লর্ড জিঙ্গো ভাবে ভারত শাসন ও করায়ত্বে রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন তাহাতে অশান্তি উপদ্রব দেশে ক্রমে বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। উন্নত চরিত্র কর্ম্মী ইংরেজ আজ সাম্রাজ্যবাদের আদর্শ হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া পড়িতেছেন। ক্ষমতার দীপ্ততায় ইংরেজ যদি আরও কিছুদিন তাহার আদর্শ ভ্রষ্ট হয় তবে ইহার লাভ লোকসান ভারতীয় ও ইওরোপীয়কে সমভাবেই ভুগিতে হইবে। ইহার ফল কি হইতে পাবে দু' সমাজেরই বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তাহা বুঝিতেছেন।

ইওরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েসন ভারত প্রবাসী ইওরোপীয় জনমতের মুখপাত্র। ভারতেব রাজতন্ত্রও ইহাদের দ্বারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত, কারণ ব্যবসায় বাণিজ্যেব পবিচালকদের দ্বারাই জাতীয় সম্পদ বাড়িতেছে। ইহাদের উপেক্ষা করিয়া রাজতন্ত্র চলিতে পারে না।

ভারতবাসীকে মানুষের অধিকার না দিলে তাহাদের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষতি,—আরও নানা ক্ষতি হইতে পারে। ভারতীয়দের সঙ্গে স্বার্থ সম্বন্ধ অনেকটা এক করিতে না পারিলে ইওরোপীয়ানদের বিরাট প্রতিষ্ঠার ভিত্তি আপনা হইতেই কাঁপিয়া উঠিবে।

ভারতীয়দের কি করিতে হইবে, কি ভাবে যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে সে ব্যবস্থা ধীরভাবে কবিতে হইবে। যথেষ্ট কর্ম্মী হইতে হইবে, নিজ দেশেব ধূলিমুষ্টিও যে স্বর্ণ প্রসব করে ইহা বুঝিতে হইবে। কর্ম্মের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিবার জন্য ইওরোপীয়দেব মত ধৈর্য্য ও আত্ম-নিষ্ঠা সঞ্চয় করিতে হইবে। বাঁচিবার অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার তাহাতেই আসিবে।

ভারতপ্রবাসী ইওরোপীয় সমাজে যে নূতন ভাব আসিয়াছে তাহা ভারতেব বর্ত্তমান অবস্থায় দেখিবার যোগ্য। স্বার্থ-সংঘষ কি ভাবে মিটিবে—কমিবে না বাড়িবে? দু' পক্ষের মনের মিলন হইলে বাহিরেব অশান্তিব লাঘব হইবে।—ভারতীয় নেতারাও ইওরোপীয়দেব মানসিক অবস্থারই পরিবর্ত্তন চাহিতেছেন। ইহাব আবশ্যকতা অপব পক্ষও স্বীকার করিয়া লইতেছেন। এখন কার্য্য কি ভাবে চলিবে, ক্রমে তাহাব পবিচয় পাওয়া যাইবে।

আমারে রাঁধ্‌তে বলে'

(গান)

সুর—আমারে আস্‌তে বলে' এত অপমান ইত্যাদি।

কবিগুণাকর—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ

আমাবে বাঁধ্‌তে বলে' এত অপমান কবা,
দিলেনাক' উনুন জ্বেলে, দিলেনাক' জলের ঘড়া।
দিলেনাক' চড়িয়ে হাঁড়ি,
হাতেব কাজ নিলেনা কাড়ি,
দিলেনাক' ফ্যানটী গেলে—চৌচির হ'যে গেল সরা।
দিলেনাক' মসলা পিষি,
এলেনাক' বামুনী পিশি
ডালটী কডায় গেল চুঁয়ে—হলোনা মোর নভেল পড়া।

নবযুগ

শ্রীচৈতন্যকিঙ্কর ঘোষ

ঘোষেদের সদর দরজায় যখন ঘোড়ার গাড়ীখানা থামিল, তখন তাহার ভিতর থেকে মিস্ প্রতিমা বসু, বি-এ তাহার ছোট ভাইয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। কোচ-ম্যানকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক এই বাড়ী ররেন্দ্র বাবুর বটে ত ?" উত্তরে সে যখন বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, এই বাড়ীই তার" তখন প্রতিমা তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিল ও সদরে প্রবেশ করিল।

প্রথমে সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর লক্ষ্য করিয়া দেখিল অদূরে ঘরের ভিতর একটী লোক চরকা কাটি-তেছে। সে ডাকিল, "ওহে শোন ত।"

যে চরকা কাটিতেছিল, সে নিকটে আসিল। তাহার পরণে একখানা ছোট খদ্দরের ধুতি, গায়ে একটা খদ্দরের মেরজাই।

নাকের উপর চশমাটা একটু বাগাইয়া লইয়া, হাতে বাঁধা ঘড়িটার উপর একটু নজর দিয়া প্রতিমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ররেন্দ্রবাবু কোথায় বল্‌তে পার ? এটা কি তাঁরই বাড়ী ?"

সেই ব্যক্তি বলিল, "হ্যাঁ, এটা তাঁরই বাড়ী তবে তিনি পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন।"

"মিসেস্ নীলিমা ঘোষ এখানে আছেন কি ?

"হ্যাঁ তিনি আছেন। আপনি বাড়ীর ভেতর যান না, তিনি বোধ হয় খাচ্ছেন।"

কপাল ও ভ্রুদ্বয় একটু কুঞ্চিত করিয়া, চোখে মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটাইয়া, হাতঘড়ির পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া প্রতিমা বলিল, "It is about two—দুটো বাজে, এখন খাচ্চে।" বলিয়াই টক্ টক্ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ভিতরের দরজায় সবে মাত্র যখন পা দিয়াছে, নীলিমা তখন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া বলিল, "কি ভাগ্যি ভাই।"

উত্তরে প্রতিমা একটু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া বলিল, এখনও খাওয়া হয় নি নাকি।"

নীলিমা বলিল, "আর এই হ'লো বলে। কৃষাণগুলো খাচ্ছে, ওদের হয়ে গেলেই আমি খেয়ে নোব।" ঝিকে হাত পা ধুইবার জল দিতে বলিয়া, তাহাকে বলিল, "তুই ভাই জুতো মোজা খুলে; হাত পা ধুয়ে একটু মিষ্টি মুখ করে নে, আমিও তার মধ্যে খেয়ে নোব।"

নীলিমার বাড়ী দেখিয়া প্রতিমা অবাক্ হইয়া গেল। কত কি তাহার নজরে পড়িল তাহা দেখিয়া সে সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

প্রতিমাকে হাত পা ধোয়াইয়া তাহাকে জোর করিয়া একটু মিষ্টি খাওয়াইয়া, নীলিমা নিজে খাইতে বসিল।

নীলিমা যখন খাইতেছে, পিওন আসিয়া বলিল, "মা একখানা চিঠি আছে।" মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া সরিয়া বসিয়া সে বলিল, "নিয়ে আয় ত প্রতিমা।"

চিঠিখানা হাতে করিয়া প্রতিমা বলিল, "তিনি লিখেছেন বুঝি, খুলি কি বলিস।"

হাসিয়া নীলিমা বলিল, "খোল না কেন! তবে ঠকবি—কিছুই পাবি না।"

চিঠিখানা খুলিয়া মনে মনে পড়িয়া প্রতিমা বলিল, "তোর চিঠি তুই নে।"

নীলিমা চিঠিখানা লইয়া হাসিয়া বলিল, "পাড়া-গাঁয়ের লোকগুলোর সবাই অদ্ভুত না? বৌকে লেখা চিঠিতেও দুটো প্রেমের কথা থাকে না।" খাওয়া শেষ করিয়া সে উঠিল।

এই সময়ে এক প্রৌঢ়া একটা লাউ হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, "বৌমা, এই লাউটা ডাক্তারকে বেঁধে দিও!—আমার বড় কাজের ভিড় মা, এখন তবে আসি।" সে চলিয়া গেল।

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল "তোর দেওর কি ডাক্তার?

"হ্যাঁ এই দুবছর হ'লো এম্-বি, পাশ করে এসেছে। হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া সে বলিল, "ঘরের লাউ কে খায় তার ঠিক নেই, আবার অপরে দিয়ে যায়। তবে দাঁড়া ভাই একটুকু, লাউটা কুটে দি—গরুর ভাত হবে—তাতে দেবে এখন।"

প্রতিমা হাসিয়া বলিল, "তোর ডাক্তার দেওরের জন্যে দিয়ে গেল। তোর দেওরটা কি তবে গরু?"

হাসিমুখে নীলিমা বলিল, "তা' বই আর কি?"

"একজন পুরুষের সম্বন্ধে আড়ালে এ রকম হাস্য-পরিহাস ভদ্রতার নীতি বিরুদ্ধ।"

কথাটা শুনিয়া প্রতিমা পিছনে ফিরিয়া দেখিল। ইনিই তবে নীলিমার দেবর। ইনি তবে সমস্ত কথাই শুনিয়াছেন, ইহারই সহিত সে সদরে নির্লজ্জভাবে অভদ্রের মত কথা কহিয়া আসিয়াছে। সে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। আত্মগ্লানিতে তাহার সমস্ত হৃদয়টা ভরিয়া উঠিল।

নীলিমা হাসিয়া বলিল, "আড়াল থেকে তুই যুবতীর হাস্য-পরিহাস শোনা ও কোন পুরুষের পক্ষেও নীতি সঙ্গত নয়। তারপর, কোথাও বেরুচ্ছ কি?"

সমীরেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ ভক্তিপুর থেকে একটা ডাক এসেছে। ফিরে আসতে দেরী হবে বোধ হয়। তোমরা কি আজ কোথাও বেড়াতে যাবে, তাহ'লে গাড়ী থাক।"

নীলিমা বলিল, "না তুমি গাড়ী নিয়ে যাও। আমরা না হয় কাল একবার বাগান দিয়ে বেড়াতে যাবো।—আর দেখ তোমার দাদার একখানা পত্র পেলাম।

"ও তখন এসে দেখবো—আছে ত লাঙ্গল আর গরুর কথা।"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে বাহির হইয়া গেল।

২

নীলিমা ও প্রতিমা একই স্কুলে পড়িয়া একই বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করে। নীলিমা পাশ করিবার পর তাহার পড়া শুনা বন্ধ হয় ও বরেন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়। বরেন্দ্র তখন এম্, এ পাশ করিয়া প্রফেসারি করিতেছে। হঠাৎ প্রফেসারি ছাড়িয়া দিয়া দেশে আসিয়া চাষবাস করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে আসিয়া বেশ উন্নতিও করিয়াছে। এমন ফসল নাই—যাহা তাহার ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয় না।

প্রতিমা ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর পড়িতে থাকে। চার বৎসর অতীত হইয়াছে। সে বি, এ, পাশ করিয়াছে। নীলিমার সহিত তাহার খুব ভাব উভয়েই উভয়ের খবর পত্রেই রাখিত। প্রতিমা জন্মাবধিই কলিকাতায় আবদ্ধ বলিলেও চলে। যদিও দু'একবার কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে বটে, তবে পল্লীগ্রামে কখন দেখে নাই। পল্লীগ্রাম দেখিবার অভিপ্রায়ে সে ছোট ভাইটীকে সঙ্গে লইয়া নীলিমার বাড়ীতে আসিয়াছে। আগে হইতে নীলিমাকে জানায় নাই, তাহার কারণ তাহাকে একটু তাক্ লাগাইয়া দিবে বলিয়া। নীলিমার পত্রে সে জানিয়াছিল, এই গ্রামেই ষ্টেশন, ষ্টেশনে গাড়ী পাওয়া যায় ও তাহাদের বাড়ীও খুব কাছে, সেইজন্য অন্য কাহাকেও সঙ্গে আনে নাই। সোণার শৃঙ্খল খুলিয়াছে, স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু দেহে লাগিয়াছে, সুতরাং সঙ্গে যাইবার জন্য কাহারও দরকার নাই—এই রকমও একটা ধারণা থাকায়, সে অন্য কাহাকেও সঙ্গে লয় নাই।

গ্রামটী আধা পল্লী আধা সহর। এখানে নীলিমার বাড়ীতে আসিয়া যাহা দেখিয়াছে তাহাতে সে খুসীই

হইয়াছে। বিশেষ নীলিমাদের বাড়ী দেখিয়া সে বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছে।

গোয়ালঘরের চালার উপর একটী লাউগাছে লাউ ধরিয়াছে। গাছে লাউ যে এত সুন্দর দেখায় তাহা তাহার ধারণাই ছিল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় প্রকৃতি বর্ণনা তাহার বড় সুন্দর লাগে কিন্তু লাউ গাছে লাউ ধরিলে যে এত সুন্দর দেখায়, লঙ্কা গাছে লঙ্কা পাকিলে যে এত সুন্দর দেখায় তাহা সে জানিত না। সেলি, বায়রণ মুখস্থ করিয়া সে বি, এ পাশ করিয়াছে কিন্তু এতদিনে সে বুঝিতে পারিল প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্যই বুকে করিয়া রাখিয়াছে এই পল্লীগ্রাম।

মুক্ত বাতাসের মধ্যে আসিয়া সে মুক্ত নিঃশ্বাস ফেলিল। ওজনকরা সভ্যতার মধ্যে সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। এখানে আসিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মোট কথা সে বুঝিল, এখানে কয়দিন সে নিশ্চিন্তভাবে কাটা-ইতে পারিবে।

৩

বৈকালে নীলিমা চরকায় সুতা কাটিতেছিল। প্রতিমা পাশে বসিয়া দেখিতেছিল। সে বলিল, "আচ্ছা ভাই, চরকায় যে সুতো কাটিস্, এ তোর ভাল লাগে।"

"কেন লাগবে না?"

"কিন্তু এতে নূতনত্ব কিছুই নেই। সেই মামুলী জিনিষ। কোন নূতন উত্তেজনা এতে নাই। এ যুগটা বিজ্ঞানের যুগ—এ যুগে সময় ও পরিশ্রম দুই-ই এ রকম করে নষ্ট করা উচিত বলে ত আমার মনে হয় না।"

নীলিমা বলিল, "অতশত বুঝি না ভাই। তবে এটুকু বুঝেছি, এতে আমাদের লাভ বই লোকসান নেই। যখন থেকে চরকায় সুতো কাটতে শিখেছি, তখন থেকে কাপড় কিনি নি। তা ছাড়া আমাদের ঘরে কাপড়ের যা কিছু দেখছিস তা আমাদের হাতে কাটা সুতোর তৈরী। তোকেও যে কাপড়খানা পড়তে দিয়েছি তাও আমাদের তৈরী। এইটুকু যদি নিজেরা কর্ত্তে পারি তা হলেও যথেষ্ট। আমাদের এই পদদলিত পরাধীন জাতির ধার করা নূতনত্বের কি দরকার? উত্তেজনারও সময় গেছে, এখন চাই কাজ।

এমন সময় গায়ের জামা খুলিতে খুলিতে সমীর আসিয়া বলিল "বৌদি, এক কাপ চা, বড্ড ক্লান্ত।" গা থেকে জামাটা খুলিয়া নীলিমাকে দিয়া বলিল- "পকেটে আটটা টাকা আছে; বোসেদের বাড়ী একটা 'ডেলিভারি কেসে' গিয়েছিলাম।" সে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

চায়ের জল গরম করিবার জন্য নীলিমা প্রতিমাকে ষ্টোভ জ্বালিতে বলিল। ষ্টোভে পাম্প করিতে করিতে প্রতিমা বলিল, "আচ্ছা ভাই, একটা ডেলিভারি কেসে মোট আট টাকা ফি।"

নীলিমা একটু হাসিয়া বলিল, "দেশটা গরীবের। গরীবের দেশে এর বেশী আর কি আশা করা যেতে পারে তারা দিতে পারে না বলেই দেয় না। ঠাকুর পো বলে, "আমি ৮ টাকার জায়গায় হয়ত বিশ টাকা আদায় করতে পারি, কিন্তু তাতে টাকাই পাবো, তাদের হৃদয়টাতো পাবো না। হৃদয় দিয়ে হৃদয় পাওয়া যায়, ভালবাসা দিয়েই ভালবাসা পাওয়া যায়, টাকায় তা পাওয়া যাবে না।" শেষ কথা কয়টা প্রতিমার হৃদয়ে ধ্বনিত হইল।

চা হইয়া গেলে নীলিমা বলিল, "যা দিয়ে আয়।"

কি ভাবিয়া প্রতিমা উত্তর করিল, "তুই যা, আমি যাবো না।"

নীলিমা গম্ভীর হইয়া বলিল, "তাহ'লে সূচনা আরম্ভ হয়েছে দেখ্‌ছি, শেষকালে অনুশোচনায় না দাঁড়ায়।"

মুখ খিঁচাইয়া প্রতিমা বলিল, "যা, তোর সব তাতেই ঠাট্টা, কি যে ঠাট্টা করিস্ তার ঠিক নেই।"

"তবে যাচ্ছিস্ না কেন?"

"যা'ব না কেন, তবে সেদিনকার কথাগুলো মনে করে একটু বাধ বাধ ঠেকে।" চায়ের কাপ লইয়া প্রতিমা উঠিল।

সমীরের সম্মুখে চায়ের কাপ রাখিতে সে বলিল, "খদ্দরের শাড়ী পরে আপনাকে বেশ মানাচ্ছে কিন্তু। এবার থেকে খদ্দর পরবেন।"

প্রতিমার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল। মুখ নীচু করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "দেখুন সেদিন আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার আমি করেছি, তার জন্যে আমি বড়ই লজ্জিত। আপনি যদি কিছু মনে না করেন—"

সমীর হাসিয়া বলিল, "ওঃ সেই কথা, তা'র জন্য কিছু ভাববেন না।"

মুখ তুলিয়া প্রতিমা বলিল, "আমাকে আর 'আপনি' 'আপনি' বলে কথা কইবেন না।"

"আচ্ছা, এবার থেকে আপনাকে 'তুমি'ই বল্‌বো।" সমীর হাসিল।

প্রতিমা বাহিরে আসিলে,নীলিমা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "কি গো, 'ড্রপ্‌সিন্‌' উঠ্‌লো?" উত্তরে প্রতিমা তাহার পৃষ্ঠে দড়াম্ করিয়া এক কিল বসাইয়া দিল।

৪

দিন কুড়ি কাটিয়া গেল। সমীরের কাছে প্রতিমার যে একটা বাধ-বাধ ভাব ছিল তাহা কাটিয়া গিয়াছে। সমীর তাহাকে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কত কথা বলে,প্রতিমা মুগ্ধ হইয়া শোনে। সমীর কোনস্থানে গেলে সে তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। অথচ একথা সে নিজে বুঝিতে পারে না।

সেদিন সমীর বাড়ীতে ছিল না। নীলিমা বলিল, 'ঠাকুরপোর ঘরখানা একটু ঝেড়ে জিনিষপত্তরগুলো একটু গুছিয়ে রাখ দিকি।"

প্রতিমা সমীরের ঘরখানা গুছাইতে বসিল। বইগুলি গুছাইতে গিয়া সমীরের ডায়রিখানা বাহির হইয়া পড়িল। ডায়রিখানা হাতে করিয়া সে তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল। একজায়গায় তাহারই নামের উপর নজর পড়িল। সে পড়িতে লাগিল, "প্রতিমা গদ্দরের শাড়ীখানি পরিয়া আমার চা লইয়া আসিল, দেখিলাম প্রতিমা প্রতিমাই বটে। সার্থক তাহার নাম। কি নম্র, ধীর, সহজ সুন্দর তাহার স্বভাব।" "প্রতিমার পা কাঁচের টুকরায় কাটিয়া গিয়াছিল, আমার কাছে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে আসিল। পা খানি ধরিয়া সযত্নে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলাম একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।" প্রতিমা শিহরিয়া উঠিল। সব কথা ভাবিতে বসিল। ভাবিতে গিয়া নিজের অন্তরে যে সন্ধান পাইল তাহাতে চমকাইয়া উঠিল। ঠিক করিল আর এখানে থাকিবে না, শীঘ্র চলিয়া যাইবে।

সন্ধ্যার সময় তাহার শরীর বড়ই অসুস্থ হইল। রাত্রে জ্বর আসিল। সকালে দেখিয়া শুনিয়া সমীর বলিল, "ডেঙ্গু বলেই বোধ হয়, এখন বড় ডেঙ্গু হ'চ্ছে।" ডেঙ্গুই বটে, শীঘ্র সে ভাল হইয়া উঠিল।

নীলিমাকে প্রতিমা বলিল, "বাবাকে একখানা টেলিগ্রাম করে দে, দাদা যেন আমাদের নিয়ে যায়।"

নীলিমা বলিল, "জলে ত আর পড়িস্ নি, এত তাড়াতাড়ি কেন?"

"না ভাই, আর থাকা যায় না, অনেকদিন হ'ল এসেছি।"

"যাবি বল্‌ছিস্ কিন্তু এখনও যে তোর অসুখ ভাল হ'লো না।"

"বাঃ রে, অসুখ ভাল হয়নি ত কি?"

নীলিমা গম্ভীর হইয়া বলিল, "অসুখ হয় দু রকমের। দেহের অসুখ তোর সেরেছে, মনের অসুখ ত সারে নি।"

প্রতিমা একটু রাগ দেখাইয়া বলিল, "তোর কেবল কথায় কথায় ঠাট্টা। মনের অসুখ কিসে সার্‌বে শুনি?"

নীলিমা বলিল, "শিগ্‌গির ঠাকুরপোর বিয়ে দোব, তার বিয়েতে লুচি সন্দেশ খেয়ে যা, সব অসুখ সেরে যাবে।"

উৎকণ্ঠার সহিত প্রতিমা বলিল, "শিগ্‌গির হবে না কি? তা'হলে ত থেকে যেতে হয়।"

"দেখি তোর বুকে হাত দিয়ে"—তাহার বুকে হাত—দিয়া নীলিমা বলিল, "'প্যালপিটেসন্' দেখ্‌ছি যে। ঠাকুরপো থাকলে একটা 'ইন্‌জেক্‌সন্' দিত—"

নীলিমার পিঠে এক কিল বসাইয়া দিয়া প্রতিমা বলিল, "তোর সব তাতেই ঠাট্টা আর ইয়ারকি।"

"নেহাৎ বাজে ইয়ারকি নয় ভাই। ঠাকুরপোর হাতের 'ইন্‌জেক্‌সন্' একেবারে ব্যর্থ হয় না, বিশেষতঃ যদি 'ইনট্রাকারডিয়াক্' (অন্তরে) দেয়।

"তোর সঙ্গে আমি পেরে উঠ্‌বো না তোর যা ইচ্ছে হয় বল্।"

নীলিমা এবার হাসিমুখে বলিল, "বল্লেই ত হয় সোজা কথা, আমার যা ইচ্ছে হয় তাই কর্‌ব্বি। সে বড়ই বেয়াদবী আরম্ভ করিল, বলিল "তদবধি অবোধী মুগধ

নাম নারী, কি কহি, কি বলি, কছু বুঝয় না পারি।" কাজেই প্রতিমাকেও হাসিতে হইল।

প্রতিমার দাদা অমিয়া তাহাদের লইয়া গেল। কিছু-দিন পরে বরেন্দ্রও বাড়ী আসিল। প্রতিমার পিতার নামে সে একখানা পত্র দিল। সঙ্গে সঙ্গে নীলিমাও প্রতিমার মাকে একখানা পত্র দিল, কি যে লিখিল তাহা সেই জানে।

যথাসময়ে উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল, কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেও নীলিমা প্রতিমার কাছে একটা কিল খাইল।

৫

সমীর চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল। প্রতিমা সেখানে আসিয়া বলিল, "মশায় কি ভাবছেন?"

একটু হাসিয়া সমীর উত্তর দিল, "আপনারই কথা।"

"কথাটার দুটো অর্থ। এক মানে হয় নিজের কথা, আর এক মানে হয় আমার কথা।"

"উভয়ই।"

"তার মানে?"

"এম-বি, পাশ করে মশায়কে দিবারাত্র দেখিতেছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছুই প্রাপ্য পাই নি।"

"এই কথা! আচ্ছা আজ পাওনা চুকিয়ে দোব।" বলিয়া প্রতিমা ক্ষিপ্রহস্তে ট্রাঙ্ক খুলিয়া, তাহার ভিতর হইতে একখানা খদ্দরের ধুতি বাহির করিয়া আনিয়া সমীরের পায়ের কাছে রাখিল, বলিল, "আমারই হাতে কাটা সুতার তৈরী।"

এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে সমীরের হৃদয়টা ভরিয়া উঠিল, সে বলিল, "তোমার তৈরী এ জিনিষ আমি মাথায় করে নোব।" পরে একটু হাসিয়া বলিল, "এতেও ত আমার সব দাবী মিট্‌ল না, প্রতিমা।" প্রতিমা কথাটা বুঝিতে পারিল না, তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দাড়াইয়া রহিল।

"তবে সরে এসো, আমিই সেটা আদায় করে নিই।"—বলিয়া প্রতিমাকে বাহুর দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার বঙ্কিম অধরে চুম্বন করিয়া সমীর কি যে আদায় করিল তাহা সেই বুঝিল। আনন্দে প্রতিমার সমস্ত বক্ষটা আলোড়িত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে তাহার স্বামীর বুকে বড় তৃপ্তিতে মাথা রাখিল।

মলয়ের বায়

শ্রীপ্রসাদদাস চট্টোপাধ্যায়

আয় ভেসে আয়, রঙীন হাওয়া, চাঁদের কিরণ ছড়িয়ে,—
দোল দিয়ে যা আমের বোলে,
শরসে ক্ষেতের হলদে ফুলে,
চুম্ দিয়ে যা বকুল ফুলে
উথলে উঠি মস্‌গুলে।
ঢেউ তুলে দে মাতাল বাতাস ফুলের গন্ধ বিলিয়ে।

আয় নেমে আয়, রঙীন পাখী, দখিন পাড়ার গান গেয়ে।
কোন্ সুদূরের কুহু তানে
ছুট্‌তেছিস্ আজ আনমনে,
কোন্ বিরহীর ব্যাকুল ভরা
আকুল করা আহ্বানে!
গান গেয়ে যা, পাগল পাখী, মাতাল-নেশায় ভরিয়ে।

তুমি সুন্দর

শ্রীধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ

তুমি সুন্দর! তুমি সুন্দর! তোমার সৌন্দর্য্যে—এই নিখিল বিশ্ব পুলকে শিহরিয়া উঠিতেছে। প্রভাতে—মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায়—আমি তোমায় কেবল চেয়ে চেয়ে দেখি। তুমি বৃক্ষপত্রে, মলয় হিল্লোলে, মৃদু কাঁপিয়া; দূর শূন্যে—আকাশের গায়ে—নক্ষত্রে ফুটিয়া,—স্থির দামিনী সম তরুণীর চোখে—বুকে—মুখে লাবণ্যে ঢালিয়া দেখাইতেছ—তুমি সুন্দর।

নন্দনের ফুল গন্ধ তুমি,—সদ্যস্নাত সিক্ত মুক্ত রমণীর এলায়িত কেশ তুমি,—সরমে জড়িত মরমের আধ আধ ভাঙা ভাঙা ভাষা তুমি। তুমি জ্ঞানে উজ্জ্বল—ধ্যানে গম্ভীর—প্রেমে চঞ্চল। হে কবি, এ অনুপম—অতুলন সৌন্দর্য্য তোমারি রচনা। কি ছন্দে নিখিলের এই মহাকাব্য তুমি—কোথায় একাকী নির্জ্জনে বসিয়া রচনা করেছিলে? সেও তোমারি রচনা,—তোমারি ছন্দ—তোমারি পুলক- তোমারি শিহরণ—তোমারি মধুমাখা ছুরী—তোমারি সুধামাখা বিষ। আমি জানি।

সমুদ্রের ঐ উত্তাল তরঙ্গে—অন্তরীক্ষের ঐ গ্রহ উপগ্রহের আবর্ত্তে সর্ব্বকালে সর্ব্বদিকে এই গতিতে তোমার অমোঘ নিয়ম উদ্যত দণ্ড—অনুপম শৃঙ্খলা বিস্তার করিয়া আছ। সকলকে ধরিয়া আছ তুমি। এই সে সুমহান গভীর ঐক্য—ইহার মধ্যে কিছুই হারায় নাই। ইহার মধ্যেই তোমার বিকাশ তোমার অফুরন্ত অনন্ত সৌন্দর্য্য কম্প্র বক্ষে নন্দিত হ'তেছে চিরকাল। তুমি সুন্দর—আর সুন্দর—শুধু সুন্দর।

৮।১।১০

তবু—বাঁচিব

এমনিই কি সকলে সকলকে ত্যাগ করে? আশা দেয়—কাছে বসে চেয়ে থাকে—তারপর সহসা একদিন ছেড়ে চলে যায়—আর ফিরে আসে না—কথা কয় না—জন্মের মত ভুলে যায়?—আর একজনের হয়?

বড় শুষ্ক—বড় নিষ্ঠুর এ সংসার। কি নিদারুণ এই প্রতারণা। মনে হয় এই বুঝি এল—কিন্তু আসে না। তৃষিত তুমি—অতি কাতরে চেয়ে আছ—সম্মুখে ধূ ধূ—করিতেছে—শুধু ধূসর বুঝিবা মরুভূমি। তারি উপর দিয়া, অঞ্চলে সুধাভাণ্ড ঢাকিয়া চলিয়া গেল।—চোখে চাহিয়া যেন ডাকিয়াও গেল। কিন্তু ধরা দিল না। পশ্চাতে ছুটিয়া তুমি তোমার জীবনের অর্দ্ধেক পরমায়ু ক্ষয় করিলে—তবু ধরা দিল—দিল—অথচ দিল না। তৃষা মিটিল না। এ তৃষা বুঝি মিটে না।

ভাণ্ড ভাঙিয়া দেখা যায় না—সুধা কি বিষ? যা ভাণ্ডে—তাইত ব্রহ্মাণ্ডে। বক্ষের পঞ্জরে—অস্থিতে মজ্জায় রাত্রিদিন ঘিরিয়া-বেড়িয়া রয়েছে যা—তাইত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী। বাহিরে ত আমি আমার অন্তরকেই দেখি। অন্তরের ছায়াই ত বাহিরে কায়া ধরে আসে। এই ছায়া কায়া—মায়া—এইত ভুলায় বুক ভেঙে দেয়।

আর ভাবিতে পারি না। সে কেন ভাল বেসেছিল যদি চিরদিন বাসিতে পারিবে না—কেন সে আমার সুখের স্বপন ভেঙে দিল? কেন সে আমার প্রেমের কুঞ্জে—ক্ষণিকের তরে এসে—হেসে- শেষে শুধু একটা অভিশাপের তপ্তশ্বাস ফেলে, দগ্ধে দিয়ে চলে গেল?—এই কি তার বিলাস?

তবু সকলে যা করে তাই করিব। তবু বাঁচিব—তবু সহিব। এরি নাম কি বাঁচা? তবু কেন মরিতে ইচ্ছা হয় না। এ দহনে—এ দুঃখের আগুনে, তিল তিল করিয়া পুড়িয়া মরিতেও যেন কেমন একটা সুখ আছে।

৭।১।১০

প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্প

শ্রীভবতোষ রায়

ভারতীয় শিল্প খনিজদ্রব্যাদি কলকারখানা এসব যাহাতে সমপর্য্যায়ে উন্নত হইয়া বিদেশী দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতায় টিঁকিতে পারে সেজন্য ব্যবসায়ীরাও যেমন চেষ্টা করিতেছেন দেশের শিক্ষিত সমাজও তেমনি চেষ্টা করিতেছেন। এই শিল্পরক্ষা ব্যাপার ও উন্নতপর্য্যায়ে চালানোর পক্ষে অন্তরায় কত তাহা এই সব ব্যবসায়ে যাহারা লিপ্ত আছেন তাহারা বুঝিতেছেন। ভারতজাত দ্রব্যাদির সঙ্গে বিদেশজাত দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতা দেশে যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে এ সমস্যা কতকটা দূর হইতে পারে দেশের শিল্পবাণিজ্যসংক্রান্ত আইনের বিধান দ্বারা —আর কতকটা দূর হইতে পারে ব্যবসায়ীদের সম্মিলনে। ভারতীয় লৌহ কয়লা, কাগজ, পাট প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে ধ্বংস হইয়া যাইবে না থাকিবে বর্ত্তমান ভারতীয় বাণিজ্যে ইহাই মহাসমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁউন্সিলে ইহা লইয়া বাদপ্রতিবাদ চলিতেছে—ব্যবস্থাদ্বারা ভারতীয় শিল্পের রক্ষণ সম্ভোব। সকলেই অনুমোদন করিতেছেন। শিল্পবাণিজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য কমিটি বসিতেছে—ট্যারিফ বোর্ডও যথেষ্ট তৎপরতার সহিত সকল অবস্থা বিবেচনা করিতেছেন। অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ের উদ্যোগী কর্ণধার ইউরোপীয়েরাও প্রতিযোগিতায় নিজেদের ভারতীয় ব্যবসায়কে বাঁচাইবার জন্য নানা আলোচনা করিতেছেন। স্যর উইলোবি কেরী, স্যর আলেকজাণ্ডার মারে, স্যর উইলিয়াম কুরী প্রভৃতি অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা ভারতীয় অনেক বড় বড় ব্যবসায়ে দিকপাল সম। বর্ত্তমান সমস্যায় ইঁহারা যেভাবে মতামত দিতেছেন ও কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত করিতেছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে ইঁহারা যথেষ্ট সাহস ও ধৈর্য্য লইয়া বিদেশী প্রতিযোগিতাকে পরাস্ত করিতে বদ্ধপরিকর। সেদিন 'Mining and Geological Institute'র বার্ষিক উৎসবে ট্যারিফবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট স্যর জর্জ্জ রেণী ভারতীয় ব্যবসায়ের আশাপূর্ণ ভবিষ্যৎ দেখিয়াছেন। স্যর উইলোবী কেরী বর্ত্তমান ভারতীয় কয়লা সমস্যায় যে সব যুক্তিপূর্ণ কার্য্যকরী কথা কহিয়াছেন তাহা ব্যবসায়ী অব্যবসায়ী সকলকেই সমস্যার প্রকৃত কারণ বুঝাইবার সহায়তা করিবে। স্যর উইলোবী কয়লা ব্যবসায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন বাহির হইতে যথেষ্ট প্রতিকূলতাচরণ করিলেও ভারতীয় কয়লা ব্যবসায় দু'একবৎসর মধ্যেই আবার তাহার পূর্ব্বস্থান অধিকার করিতে পারিবে। ব্যবসায়ীদের সকলের মধ্যে একতা চাই—ক্ষুদ্র যে তাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না। এই একতার অভাবেই ভারতীয় ব্যবসায় প্রচেষ্টা অনেক সুযোগ হারাইয়াছে—সুযোগ হারাইয়াও তাহারা বাহিরের প্রতিযোগিতা না থাকায় বাঁচিয়াছিল কিন্তু যেই বাহিরের প্রতিযোগিতা আসিয়াছে অমনি অবস্থা টলটলায়মান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাটের সম্বন্ধেও স্যর উইলোবি আভাসে অনেক কথা কহিয়াছেন। স্যর কেরী সামান্য শ্রমিককেও ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত করিয়া মূল ব্যবসায়ের উন্নতি চাহেন—সেদিন স্যর কুরীর বক্তৃতায়ও এই ভাবই দেখা গিয়াছে। পাটের ব্যবসায়ে ইহাদের চেষ্টায় যদি এমন অবস্থা হওয়া সম্ভব হয় যে যাহারা রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া এই পাট উৎপাদন করে তাহারা শ্রমের উপযুক্ত অর্থ পায় তবে সত্যই ইঁহারা ধন্যবাদভাজন হইবেন। অনেক রকম ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইংরেজ দু'চার জন থাকিলেও ভারতীয়ই আছে অধিক সংখ্যক, মালিক বা অংশীদার ভাবে আছেন অনেকে, আর শ্রমিক রহিয়াছে অসংখ্য —ভারতীয় ব্যবসায় রক্ষা পাইলে ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়েরাও লাভবান হইবে। যে রকম ধীরভাবে তৎপরতার সঙ্গে এই সব ইউরোপীয়েরা ভারতীয় বাণিজ্যের রক্ষার উপায় স্থির করিতেছেন তাহাতে ভারতীয়দের শিখিবার অনেক বিষয়ই রহিয়াছে। ব্যবসায়ে সুখও যেমন আছে ঝড়ঝাপ্টাও তেমনি আছে।

ব্যবসায়ের সুখ উপভোগ করিব কিন্তু ঝড়ঝাপ্টা সহিব না এ নীতি অনুসরণ করিলে ব্যবসায় রক্ষা করা যায় না—অর্থেরও মুখ দেখা যায় না। বাহিরের শিল্পকে প্রতিহত করিতে হইলে কত ধৈর্য্য চেষ্টা চাই বর্ত্তমান ভারতীয় শিল্পরক্ষা ব্যাপারে তাহাই ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে।

কাজের কথা
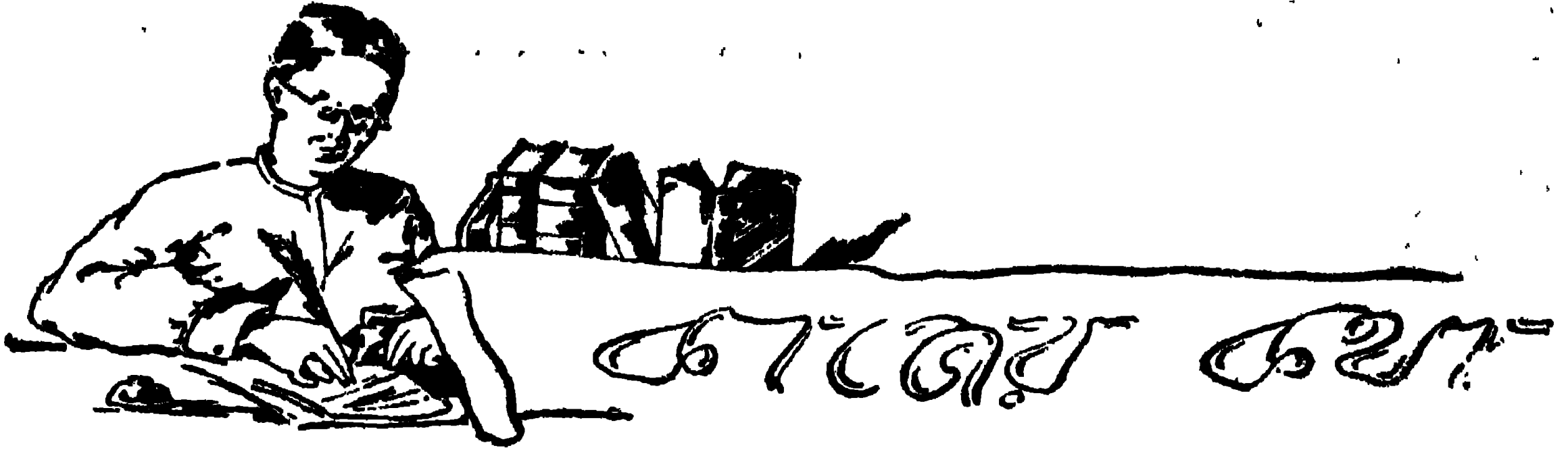
বিলাস ও অভাব ঃ—দেখিতে দেখিতে দেশে বিলাস ব্যসনের স্রোত খুব জোর চলিয়াছে। বিলাসী হইবার ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করিবার যে সব প্রথা এদেশী যোগ্য লোকদের মধ্যে চলিত ছিল এখন তাব ধারাই যেন বদলাইয়া গিয়াছে! আগেকাব ধনশালীদেব বিলাস-ব্যসনে নিজেদের দেশ গ্রাম উন্নত হইত—আশ-পাশেব লোকেবা আমোদ উৎসব করিতে পাবিত। দান-ধ্যানে পালে-পার্ব্বণে যে উৎসব চলিত তাহা এখন অতীতেব সুখ-স্বপ্নের মত সামাজিক ও দেশেব ইতিহাসে লেখা থাকিবে—চিহ্ন যেটুকুও বা আছে—নূতন শিক্ষা দীক্ষাব আবহাওয়ায় তাহাও তর্‌তর্‌ কবিয়া লোপ পাইতেছে। জুতা, জামা, ছাতা, ঘড়ি, চা, সিগাবেট, বিড়ি এগুলি নিত্য জীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছে। সহর হইতে দেশেব পল্লীগুলিতে এসব জিনিসের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। উচ্চশ্রেণীব পুরুষ সমাজ বিদেশী বিলাসিতাব আদর্শে ডুবিয়া আছেন। শিক্ষা দীক্ষায়, আচাবে নিয়মে, আহারে বিহারে তাঁহাবা ইহা ভালভাবে ফুটাইতে পাবিলেই গৌরব বোধ কবেন। প্রথমে পুরুষদের আবদাবে পবে স্বাভাবিক লোভ হইতে দেশের নাবী সমাজেও এই বিদেশী ধারার বিলাস ব্যসন স্রোত চলিয়াছে। যোগ্য উদ্যমশীল লোকের বিলাস ব্যসনের আবশ্যক নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিলাসেরও পার্থক্য আছে। এক পুরুষ পূর্ব্বের বিলাসী পুরুষেব বিলাসে দেশেব লোক আনন্দ পাইষাছে, খাইতে পাইয়াছে, তৃষ্ণার জলের জন্য ভাবে নাই। আর এখনকার পুরুষদেব বিলাসিতায় শ্রীহীন পল্লীর শুষিয়া-আনা-অর্থে সহরে মোটর জুড়ী, বাগানপার্টি চলিতেছে—কোথায় যে সে অর্থ উড়িয়া গেল—কে যে এ বিলাসিতার অগণিত অর্থে লাভবান হইল তাহা দেখিবার শক্তি বিলাসীদের নাই। ধনবান-গৃহিণী লক্ষ্মী স্বরূপিনী নারীদের বিলাসে দেশে কেহ অভুক্ত থাকিতে পারে নাই, দেবমন্দির উঠিয়াছে, অন্নসত্র হইয়াছে—পূজা পার্ব্বণে নারীর কল্যাণ-বিলাসে দেশ হাস্যময় হইয়া উঠিয়াছে—আর এখন বিলাসিনী নারীদের বিলাস ব্যসনের অর্থ কোথায়—কাহাব ঘরে যাইতেছে! অন্নপূর্ণা আজ অন্নদান ভুলিয়া বিলাসিনী নাবী সাজিয়া কি ভাবে মাতৃত্বেব কল্যাণ আশীষ বর্ষণ করিতেছেন? রাজনৈতিক বলিতেতেছেন বিদেশীবা অর্থ শোষণ করিতেছে তাই আমাদেব এ দুর্দ্দশা।—অর্থনীতিবিদ্‌ কাবেন্সী প্রসঙ্গে এক-শঙ্ক লইয়া মহা হুলুস্থূল কবিতেছেন। আর দেশবাসীরা ক্রমেই বিদেশী ধাবাব বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত হইয়া হাহাকাব কবিয়া মবিতেছে—দেশে অন্নাভাবও যেমন চিরস্থায়ী হইতেছে বিলাসিতাও তেমনি বাড়িতেছে। একসঙ্গে অন্নাভাব ও মাবাত্মক বিলাস ব্যসন কি ভাবে বাড়িতে পাবে আমাদেব এ দেশ বর্ত্তমান যুগে তাহাবই প্রমাণ উজ্জ্বল কবিয়া জগতের সম্মুখে ধবিয়া দিতেছে। বিলাসিতা চালাইব না বাঁচিব——কোন্ পথ? পবদ্রব্যে বিলাসিতা কবিব—আবাব পবম সুখে দিনও কাটাইব এ ব্যবস্থা বর্ত্তমান অর্থনীতি বা রাজনীতি কিছুতেই অনুমোদন করে না। দেশেব অবস্থা বুঝিয়া কে আজ জীবন-নীতিতে প্রাণ সঞ্চাব কবিবেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর ধড়া চূড়া ঃ—বিশ্ববিদ্যালয়েব পাশ করা ডিগ্রী লাভেচ্ছু ছেলেদেব কন্‌ভোকেশনেব সময় যে বিচিত্র ধড়া-চূড়া পড়িয়া হাজিব হইতে হয় তাহাতে তাহাবা একটা দর্শনীয় বস্তু হইয়া পড়ে। জাতীয় পরিচ্ছদ পরিহিত অবস্থায় এই ডিগ্রী লইতে বাধা কি? ঐ বিচিত্র গাউন আর টুপি কি যে এ্যাকাডেমিক শ্রীমণ্ডিত করে—তাহা যে ছাত্র গাউন পবিয়া

পথ চলে সেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে। পথে ও পোষাক এমনি কৌতুক দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে বাধ্য হইয়া গাড়ীতে ঢাকা অবস্থায় যাইতে হয়। তার উপর ঐ পোষাকের বাজে খরচের দায়ে অনেক পাশ-করা ছেলেকে কন্‌ভোকেশনে উপস্থিত হওয়ার গৌরব হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য জাতীয় নরনারীরাও তাহাদের জাতীয় পরিচ্ছদে উপস্থিত হইতে পারেন। এই বাজে ও অদ্ভুত পোষাকের প্রচলন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন্ হইতে কবে দূর হইবে ?

কমার্স গ্র্যাজুয়েট ও আইন অধ্যয়ন ঃ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কমার্শ গ্রাজুয়েট বাহির হয়, কমার্শ সম্বন্ধে ইহারা কতটা কি শেখেন ও কমার্শিয়াল লাইনে ইহাদের চাকুরী পাইবার কতটা সুবিধা তাহার পরিচয় কেহ কিছু বিশেষ জানে না। সম্প্রতি কমার্শ গ্রাজুয়েটরা আইন পাঠ করিয়া উকীল হইতে অভিলাষী কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃপক্ষ সে অধিকার দিতে নারাজ। আইনে কমার্শকে গ্রাস করিবে এই ভয়ে বোধ হয় ! এই ব্যাপার লইয়া সংবাদপত্রে বাদপ্রতিবাদ চলিয়াছে। যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিজ্ঞান, প্রাণীতত্ত্ব, খনিতত্ত্ব সব বিদ্যার পরিণাম ওই আইনে পর্য্যবসিত হয় সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় কমার্শকেও খালাস দিলে বোঝার উপর শাকের আঁটি ভিন্ন আর বিশেষ কি হইবে ?

পরের ধনে পোদ্দারী ঃ—ডাঃ স্যর হরিসিং গৌর দেবোত্তর সম্পত্তির অছি, দেবস্থানের সেবাইত মোহান্তদের বিলাসব্যসনের উপর যে নির্ম্মম কষাঘাত চালাইয়াছেন সেই ব্যবস্থামত কার্য্য হইলে দেবসেবা ও নরসেবার জন্য ব্যক্তিবিশেষ ও সাধারণে যাহা দান করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার সারাংশ একজনের বিলাস-খেয়ালে না উড়িয়া দশের উপকারে আসিতে পারে। আরো একটি কথা যে সব দেশীয় জমিদার নিজ পল্লীভবন ছাড়িয়া আসিয়া—পিতামাতাদের কীর্ত্তিকলাপ ধ্বংস করিয়া জমিদারী হইতে অর্থ আনিয়া সহরে বিলাসব্যসনে জলের মত অর্থ লুটাইতেছে তাহাদের উপরও একটা শাসন-আইনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বাংলাদেশের অনেক জমিদারদের এই রোগ অতিমাত্রায় প্রবল হইয়াছে—ইহাদের অবিমৃষ্যকারিতায় দেশের লোকে যথেষ্ট ভুগিতেছে। পরের ধনের সদ্ব্যবহার কিভাবে করিতে হয় তাহা ভুলিয়া আজ ইহাদের অনেকেই সুখেচ্ছ পোদ্দারী করিতেছেন।

নারী কর্ম্মী প্রতিষ্ঠান ও লর্ড লিটন ঃ—নারী কর্ম্মী প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক অধিবেশনে বাংলার গবর্ণর নানা কথায় মধ্যে দেশে স্বেচ্ছাসেবা ব্রতের মিলিত প্রতিষ্ঠান কতটা কার্য্যকরী ও দেশের পক্ষে উপকারী হইতে পারে তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে যে সব দুঃখ দুর্দ্দশায় আমরা নিত্য ভুগি তাহা সহজেই দূর হইতে পারে। মিলিত হইয়া দূর করিবার চেষ্টা না করিলে কোনকালেই অনিষ্টকর কোন প্রথা দূর হইবে না। পাশ্চাত্যের মত স্বেচ্ছাসেবার তেমন কোন মিলন-প্রতিষ্ঠান এদেশে বিশেষ না থাকিলেও এদেশী লোকের মনোভাবই ছিল সেবার দিকে। নরনারায়ণের সেবা এদেশী লোকে মহাপুণ্যকার্য্য বলিয়াই জানিত। কিন্তু সে ভাব দেশে লোপ পাইতেছে। এখন যে দিন কাল পড়িয়াছে—যে ভাবে নানা দিক দিয়া দেশে নানা অত্যাচার অনাচার—নারীনিগ্রহ পর্য্যন্ত চলিতেছে তাহাতে মিলিত সেবা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন। পল্লীতে পল্লীতে এই সেবাসঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি হইতেছে। স্বেচ্ছাসেবীরা মিলিত থাকিলে কোন অত্যাচার দেশে সহজে হইতে পারিবে না। চুরি, ডাকাতী নারীনিগ্রহ তো লোপ পাইবেই—সামাজিক অনেক ব্যাধিও দূর হইবে। দেশের এই দুর্দ্দিনে পল্লীতে পল্লীতে এমন সেবাসঙ্ঘ স্থাপিত হওয়ার আবশ্যক সকলেই বোধ করিতেছেন। কিন্তু যে উৎসাহ ও হৃদয়ভাবে এ প্রচেষ্টা সহজে সফল করা যাইতে পারে তাহারই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এমনি মিলিত প্রতিষ্ঠান করিয়া অত্যাচারকে বাধা দিতে না শিখিলে দেশে নানাভাবে অত্যাচার বাড়িবেই।

শর্ম্মা ব্যানার্জ্জীর ক্যালেণ্ডার ঃ—প্রসিদ্ধ সৌন্দর্য্য উপাদান ব্যবসায়ী শর্ম্মা ব্যানার্জ্জী কোম্পানীর নববর্ষের বর্ষ-শোভা আমরা উপহার পাইয়াছি। সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী ভুবনভরা সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া বিকশিত হইতেছেন বহুবর্ণরঞ্জিত এই চিত্রখানি বর্ষশোভার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। ক্যালেণ্ডার খানি একবার দেখিলে আরো একটু দেখিবার ইচ্ছা হইবে। আমরা শর্ম্মা ব্যানার্জ্জী কোম্পানীর রুচি ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের প্রশংসা করিতেছি।

মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সার সঙ্কলন

প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুকাল পূর্ব্বে আমি বঙ্গদেশ হইতে প্রাপ্ত একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়াছিলাম উহা সুচিন্তিত, সুযুক্তিপূর্ণ ও অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন বিষয়ক মন্তব্যে পরিপূর্ণ ছিল। জনৈক মদ্রদেশ অধিবাসী পুনরায় এবিষয়ে প্রশ্নাকারে একখানি পত্র দিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিলাম।—এ জটিল সমস্যাটী যে গোঁড়া হিন্দুদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তাহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

"অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কার্য্যকরী করিতে হইলে প্রথমতঃ কিভাবে কার্য্য আরম্ভ করা উচিত?"

(ক) বিদ্যালয় দেবমন্দির প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে অব্রাহ্মণের গতিবিধি আছে সেই সমস্ত স্থানে অস্পৃশ্যদের অবাধগতি প্রদান করা উচিত।

(খ) তাহাদের পুত্রকন্যাগণের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, প্রয়োজনমত কূপখনন করা এবং যাহাতে তাহারা মিতাচারী হয়, এবং আবশ্যকমতে চিকিৎসার সাহায্য পায়, তাহাদের স্বাস্থ্যসংস্কার হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত।

"অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের পথ" এই জাতির ধর্ম্মের কোথায় স্থান পাইবে?" ইহারা হিন্দুজাতিরই শাখা—শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে নমঃশূদ্র বা অতিশূদ্র জাতি তখন লোপ পাইবে।

"জাতিবিচার না থাকাই কি আপনার মতে ভাল?"

আমার মতে চারিটি বর্ণ ব্যতিরেকে জাতিবিভাগ বলিয়া কিছু না থাকাই উচিত। "অস্পৃশ্যেরা অন্যের মন্দিরে হস্তক্ষেপ না করিয়া নিজেদের পূজার জন্য পৃথক মন্দির স্থাপন করিতে পারে কি না?"

উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা তাহাদের সে স্বাধীনতা রাখেন নাই বলিলেও চলে, উপরন্তু তাহারা আমাদের মন্দিরে হস্তক্ষেপ করিতে চায় এভাব পোষণ করা অন্যায়, তাহাদের আমাদের মন্দিরে অবাধগতি প্রদান করা আমাদের কর্ত্তব্যের অঙ্গবিশেষ।

আপনি কি মনে করেন যে রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রত্যেক জাতির স্বজাতীয় প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক?"

না, তাহা আমি মনে করিনা, তবে যদি তাহাদের ইচ্ছাপূর্ব্বক না আসিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে স্বরাজ লাভের পথে একটী অন্যায় প্রতিবন্ধক স্থাপন করা হইবে।

"আপনি কি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ?"

হাঁ, কিন্তু অধুনা কেবল আছে বর্ণের বর্ণ-বৈষম্য আর ধর্ম্মের ভাণ—এবং আশ্রমের কণামাত্রও কোথাও বিদ্যমান নাই। ধর্ম্ম জগতের উপযোগী করিতে হইলে ইহার এক্ষণে আদ্যোপান্ত সংস্কার আবশ্যক।

"ভারত যে মানবের কর্ম্মভূমি ইহা কি আপনি বিশ্বাস করেন না? এখানে সকলেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কৃতকর্ম্মানুযায়ী ধনসম্পদ, বিদ্যা, বুদ্ধি জ্ঞান সমস্তই প্রাপ্ত হয়"

পৃথিবীর সকল স্থানেই এই চিরন্তন নিয়ম—"যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল" অর্থাৎ সকল স্থানই ভোগভূমি ; কিন্তু ভারত সত্যই কর্ম্মভূমি।

"অস্পৃশ্যতাবর্জ্জনের পূর্ব্বে কি তাহাদের শিক্ষা ও সংস্কার বেশী আবশ্যক নয় ?"

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন না করিলে তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা বা সংস্কার কিছুই সম্ভবপর নয়।

"যেমন সাধারণে মদ্যপকে ঘৃণা করে তেমনি নিরামিষাশী মাংসভোজীকে ঘৃণা করিবে ইহাই কি স্বাভাবিক নিয়ম নয় ?"

সর্ব্বথা নয় ; যাহারা মদ্যপান বিরোধী তাহাদের কি উচিত নয় মদ্যপকে তাহার কুঅভ্যাস হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করা ? সেইরূপ নিরামিষাশীরও উচিত মাংসভোজী প্রতিবাসীর সহিত মেলামেশা করা।

"একজন সুচরিত্র লোক কি কুসংসর্গে পড়িয়া দুশ্চরিত্র হয় না ?"

যাহারা মদ্যপান করাতে বা মাংস ভোজন করাতে কোন পাপ হয় জানে না তাহারা সত্যই দুশ্চরিত্র নয়, তবে দুর্ব্বলচিত্তদের কথা স্বতন্ত্র।

উপরোক্ত কারণের জন্যই ব্রাহ্মণগণ অন্যজাতি হইতে নিজেদের দূরে রাখিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করেন।

যদি স্পর্শের দ্বারায় আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাঘাত জন্মে তবে সে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন কি ? আর পূর্ব্বকালে যে ঋষিরা পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত নিজেরা সংসার হইতে চিরনির্ব্বাসিত হইয়া থাকিতেন সে কাল আর নাই।

"আপনি অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন নীতির প্রচলন করিতে গিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতেছেন না ?"

একটী মতের মাত্র পোষকতার দ্বারা কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয় না আমি যদি সংরক্ষণশীল সমাজের উপর অযথা জোর করিতাম তাহা হইলেই হস্তক্ষেপ করা হইত।

"গোঁড়া ব্রাহ্মণদের এ বিষয়ে প্রথমতঃ হৃদবোধ না জন্মাইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত করার জন্য আপনি কি হিংসা অপরাধে অপরাধী হইবেন না ?"

আমি তাঁহাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন না করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসকে আক্রমণ করি নাই সুতরাং উক্ত অপরাধে আমি অপরাধী নহি।

"অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন না করার জন্য কি ব্রাহ্মণগণ দোষী ?"

যদি তাঁহারা কোন মানবকে স্পর্শ করিতে ঘৃণাবোধ করেন বা অস্বীকার করেন তাহা হইলে তাঁহারা পাপগ্রস্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

"অস্পৃশ্যগণ তাহাদের এই অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত অবস্থায় অহিংস-অসহযোগের ভাবগ্রহণ করিতে অক্ষম জানিয়া এবং ব্রাহ্মণগণ রাজনীতি অপেক্ষা ধর্ম্ম সংরক্ষণকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন জানিয়াও এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা—সত্যাগ্রহের পক্ষে হিংসাবৃত্তির পরিচায়ক নয় কি ?"

বহুদর্শিতার ফলে জানিয়াছি অস্পৃশ্যদের আত্মসংযম অতুলনীয়। প্রশ্নের শেষভাগ দেখিলে মনে হয় হিংসা ব্রাহ্মণের পক্ষ হইতেই হওয়া সম্ভব—যদি তাহাই হয় তবে আমি বড়ই দুঃখিত হইব কারণ ইহা তাঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে না পরন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মবিষয়ে অজ্ঞতা এবং তাচ্ছিল্যের প্রকাশক হইবে।

"আপনি কি বলেন যে জাতিধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত স্বাতন্ত্র্য উচ্ছেদ করিয়া কেবল সমতা বিরাজ করুক ?"

মানবের মধ্যে যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি সমতা বিজ্ঞাপক, তেমনি মানবের প্রাথমিক অধিকার হিসাবে বিধিমত তাহাই হওয়া উচিত।

"এই দার্শনিক মহাসত্য কেবলমাত্র যাঁহারা কর্ম্ম চক্রের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারাই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন, কিন্তু সামান্য গৃহস্থ যাঁহারা ঋষিমতাবলম্বী হইয়া কার্য্য করেন এই সত্য উপলব্ধি করিবার শক্তি তাঁহাদের কোথায় ?"

কেবলমাত্র জন্মবৈষম্য হেতু একজন মানব অস্পৃশ্য হইয়া থাকিতে পারেন না ইহা অতি সরল সত্য, ইহা জটিল দার্শনিক সমস্যা নয়—ইহা এত সরল যে এক অন্ধবিশ্বাসী হিন্দু ভিন্ন জগতের আর সকল জাতিই জানে—আমরা যে ভাবে ছুৎমার্গ মানিয়া চলি ইহা কোন ঋষির দ্বারা প্রচলিত হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট সন্দিহান !

— —

সেবা-শিক্ষায়তন *

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী

বর্ত্তমান যুগে জার্ম্মান মুলুকে নারীসমাজের সম্মুখে যে এক অভিনব উপজীবিকার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। ইহাকে জার্ম্মান-ভাষায় "wohlfahrt" বা 'সেবা-ব্রত' বলা হয়। এই সেবা-ব্রতকে উপজীবিকা রূপে গ্রহণ করিতে হইলে ইহার জন্য নির্দ্দিষ্ট বিদ্যালয়ে উপযোগীতা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য যথা-রীতি শিক্ষা লাভ করিতে হয়।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প-ব্যবসায় ইত্যাদি বিষয়ের ন্যায় এই সেবা-ব্রতেরও পুরাদস্তুর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইয়া থাকে। শিক্ষার্থিনী মহিলাগণ দয়া, বিশ্বপ্রেম বা দেশহিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া এই সব আয়তনে শিক্ষালাভের জন্য আসেন না। অপর দশটা উপজীবিকার ন্যায় এ-পথেও যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়া সভ্যসমাজ-অনুমোদিত স্বচ্ছল ও মার্জ্জিত জীবনযাপনের জন্য এই সকল আয়তনে মহিলাগণ ভর্ত্তি হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বে এরূপ বিদ্যালয় এদেশে ছিল না;—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বার্লিননগরে সর্ব্বপ্রথম এইরূপ একটি বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় হইতে এদেশে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বার্লিন নগরে "নারী-সেবা-শিক্ষায়তনের মহাসম্মিলনে"র (Congress of the women's social schools) প্রথম অধিবেশন হয়। দেশের পঁচিশটি 'নারী-সেবা-শিক্ষায়তন' এই অধিবেশনে যোগদান করে। তন্মধ্যে চারিটি বার্লিন এবং দুইটি মুনিচ সহরের। আজকাল এ মুলুকে এরূপ চল্লিশটি আয়তন বর্ত্তমান আছে।

দু'একটি বেসরকারী আয়তন ব্যতীত সকল আয়তন-গুলিই জার্ম্মান-সরকারের অনুমোদিত। প্রুশিয়ান প্রদেশের হিতসাধন-সঙ্ঘের মন্ত্রীসভা ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২২এ অক্টোবর তারিখে সরকারী ব্যবস্থাপক সভায় এই সেবা-শিক্ষায়তনগুলিকে শিক্ষাবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। জার্ম্মানীর অন্যান্য রাষ্ট্র প্রদেশগুলিও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে।

এই আয়তনগুলিতে তিনপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রথম বিভাগে ছাত্রীগণ স্বাস্থ্য ও শরীরতত্ত্ব (hygiene and sanitation) সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হন। দ্বিতীয়ভাগে শিশু-মঙ্গল (welfare-works for babies and children) এবং তৃতীয় বিভাগে আর্থিক সদনুষ্ঠান economic welfare-works) সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

ছাত্রীগণ উপযোগীতা ও অনুরাগক্রমে এই তিন বিভাগের যে কোন বিভাগে ভর্ত্তি হইতে পারেন। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সকল বিভাগের ছাত্রীগণের অবশ্য-পাঠ্য-রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা:—

(১) স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম (General laws of health)

(২) স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ নিয়ম (Special laws of health)

(৩) মনস্তত্ত্ব (Psychology)

(৪) শিক্ষা-বিজ্ঞান (Science of education)

(৫) জাতীয় শিক্ষা-সমস্যা (Problems in national education)

(৬) ধন-বিজ্ঞান (Economics)

(৭) সমাজ-বিজ্ঞান (Social politics and social insurance)

(৮) রাষ্ট্র ও নাগরিক অধিকার-বিজ্ঞান (Politics law and civics)

(৯) হিতসাধন-বিজ্ঞান (Theory of welfare)

এই সকল আয়তনে পুথিগত ও হাতে-কলমে দুই

---

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের ইংরাজী হইতে।

রকমেই শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা আছে। এই সব আয়তনের সরকারী ও বে-সরকারী শিক্ষা-সমিতিগুলির বিশেষ তত্ত্বাবধানে কার্য্যকরী শিক্ষার (practical works) অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে।

শিক্ষা-কাল দুই বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। পুঁথিগত বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য ছাত্রীগণকে মোট ৬০০—৮০০ ঘণ্টা সময় অর্পণ করিতে হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তালিকায় কার্য্যকরী শিক্ষাকে অবশ্য-পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং এ জন্য অতিরিক্ত সময়েরও নির্দ্দেশ আছে।

এ সকল আয়তনে প্রবেশ-কালে ছাত্রীগণকে সেকেণ্ডারী ইস্কুল-ফাইনালের নিদর্শন-পত্র উপস্থিত করিতে হয়। এই সেকেণ্ডারী পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীগণ বয়সে অন্যূন অষ্টাদশ বর্ষ এবং বিদ্যা-বৈভবে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, বি-এস্-সির প্রায় সমকক্ষ হইয়া থাকেন।

ছাত্রীগণকে ইপ্সিত বিভাগে প্রবেশের উপযুক্ত নিদর্শন-পত্র প্রদর্শন করিতে হয়। যথা,—প্রথম বিভাগে প্রবেশার্থিনীকে গভর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত নার্স বা সিস্টারের নিদর্শন-পত্র উপস্থিত করিতে হয়। দ্বিতীয় বিভাগের জন্য নিম্নলিখিত নিদর্শন-পত্র প্রদর্শনের আবশ্যক হয়। যথা :—(১) কিণ্ডার-গার্টেন শিক্ষয়িত্রী (২) বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী (৩) কোন সেবা শিক্ষায়তনে ক্রমান্বয়ে তিন বছরের কর্ম্ম অথবা (৪) মহিলা-বিদ্যালয়ে দুই বৎসরের অধ্যয়ন। এবং তৃতীয় বিভাগের জন্য (১) শিক্ষয়ত্রী (২) তিন বছরেব কাযাকরী অভিজ্ঞতা (৩) মহিলা-বিদ্যালয়ে দুই বছরের অধ্যয়ন অথবা (৪) বাণিজ্য-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অন্যূন এক বছরের কার্য্যকরী অভিজ্ঞতার নিদর্শন-পত্র থাকা আবশ্যক।

এই সকল নিদর্শন-পত্র দ্বারা ছাত্রীগণের ইপ্সিত বিষয়ের উপযোগীতা ও পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা জানা যায়। এই সকল নিয়মাধীনে যাঁহারা এই সকল বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন তখন তাঁহারা প্রায় বিংশ অথবা দ্বাবিংশ বর্ষ বয়স্ক হইয়া থাকেন।

জার্ম্মান-সরকার কর্ত্তৃক এই সব বিদ্যালয়ের "উপাধি-পরীক্ষা" গ্রহণ করা হয়। লিখিত ও মৌখিক বিবিধ পরীক্ষা গৃহীত হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীগণকে পূর্ণ এক বৎসরকাল সমাজ-সেবায় ব্রত থাকিয়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে কার্য্য-নিপুণতায় সন্তুষ্ট করিয়া "Welfarist" উপাধি লাভ করিতে হয়। ইহার পরেও এই সর্ত্ত থাকে যে উত্তীর্ণা ছাত্রী পূর্ণ চতুর্ব্বিংশবর্ষ বয়স্কা না হইলে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিবার উপযুক্তা বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এই সকল বিধি-নিয়মের মধ্য দিয়া যে সকল মহিলা কৃতকার্য্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন জার্ম্মান-মুলুকে তাঁহাদিগকে "আদর্শ সেবিকা" বলিয়া গণ্য করা হয়।

ব্রেসল্, কোলন, মুনিচ এবং মুনষ্টর সহরে স্থাপিত বিদ্যালয়গুলি ঐ সকল নগরবাসী দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ আয়তন তাহাদের প্রতিষ্ঠা-কাল হইতে বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা পর্য্যন্ত জার্ম্মান-মহিলা-সম্মিলন (Association of women) কর্ত্তৃক রক্ষিত ও পরিচালিত। এই প্রকার কতকগুলি বিদ্যালয় কোনো কোনো ধর্ম্ম-সম্প্রদায় কর্ত্তৃকও পরিচালিত আছে। যথা বার্লিন ও মুনিচের কয়েকটি বিদ্যালয় ক্যাথলিক মহিলা-সম্মিলন কর্ত্তৃক এবং হেনবাব, এলবারফেল্ড এবং রাইন-ল্যাণ্ডে অবস্থিত কয়েকটি বিদ্যালয় জার্ম্মান-এভান্‌জিলিষ্ট-মহিলা-সম্মিলন কর্ত্তৃক পরিচালিত আছে।

এইরূপ আয়তনগুলির মধ্যে বার্লিন নগরে অবস্থিত "Soziale-Frauen-Schule" নামক বিদ্যালয়টি সর্ব্বপ্রধান। ইহা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। কুমরী ডাঃ গার্টারুড্ বেউমার এবং কুমারী ডাঃ এলিস সলোমনের প্রাণপাত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক অনুরাগের উপরেই ইহার বর্ত্তমান গৌরবময় উন্নত অবস্থার ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কুমারী এলিস এক্ষণে ইহার অধ্যক্ষ-পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই আয়তন-সৌধে "নারী সেবা শিক্ষায়তন-মহাসম্মিলনে"র (Congress of women's social school) আপিসও অবস্থিত আছে। সমগ্র জার্ম্মান মুলুকের স্ত্রী-শিক্ষা ও সমাজ-সেবার কেন্দ্র-রূপে এই আয়তনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

মাতৃ-আবাহন

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি তোমায় আবাহন করিব। কি দিয়া তোমার আবাহন করিব দেবি! ধনদৌলৎ সাজসজ্জা ধূপ দীপ নৈবেদ্য গন্ধপুষ্প কি দিয়া কোন্ শঙ্খবাদ্যধ্বনিতে তোমার আবাহন করিব? অট্টালিকার কোন্ স্বর্ণ-সিংহাসনে তোমার অধিষ্ঠান নির্ণয় করিব জননি! এই যে মঙ্গলময়ী শ্রীপঞ্চমীর শুভ-উষায় তোমার আবাহন করিতে হইবে—ঐ যে দ্বারে দ্বারে নহবৎ বাদ্য—সাজ আলোক পত্রপল্লবের বিরাট আয়োজন করিয়া পুরবাসীরা তোমার শুভাগমন স্বচনা করিতেছে।—সে ব্যবস্থার সমর্থনই বা করিব কি দিয়া? যাহা লইয়া ঐ শুভ ব্যবস্থার (!) আয়োজন করিতে হইবে তাহাই যে অভাব মা! তবে কি তোমার আবাহন করিতে পারিব না? তবে কি আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা—যে শতগুণে হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়া তোমার চরণ-কমলে লুটাইয়া পড়িবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে; তাহার তীব্রতা, তাহার পরিসমাপ্তি কি ঐ স্বষ্টির সহিতই সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে?—ফুল না ফুটিতেই মুকুলেই কি তাহার শেষ সমাধি! জননি! পুত্রের বাসনার কি এই শেষ পরিণতি?—ছেলে হইয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও দুনিয়ার সার (!) 'রূপচাঁদে'র কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়া তোমার রাঙ্গা পা দু'খানি অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হইবে না? হাঁ মা! সে কেমন মা!—তুই তা'র? যে ছেলের মুখ-পানে চাহে না, ছেলের প্রাণের কথা বুঝে না—অভাবেই সব ভাব নষ্টের জাগতিক স্বত্র যা'র তো'র মত মায়ের নিকটও খাটিয়া যায়! হাঁগা এই কি সত্যি?—যা'র অর্থ নাই তা'র কিছু নাই, তা'র সব অসার—সব অনর্থ—সে মাতৃ-কৃপালাভেও বঞ্চিত! কে বলিবে কোন্‌টী সত্য? কে ইহার সিদ্ধান্ত করিবে?—জগৎ, সে'ত বাক্‌শক্তিহীন।—জগৎবাসী?—সে'ত চিরদিনই দেখাইতেছে—অর্থই সার, অর্থই পুরুষার্থ অর্থই পরমার্থ; অর্থহীন মানবের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। অতএব হে জগৎবাসি! তোমরা অর্থের সাধনা কর,—পরকে আপনার করিতে জগতে খ্যাতি-প্রতিপত্তি বা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে ইহা তোমার অমোঘ অস্ত্র! এ বিদ্যায় তুমি বলবান হও—তোমার মনুষ্য জন্ম সার্থক হইবে।

এখন তুমি কি বল মা! ধনই কি ধর্ম্ম?—চতুর্ব্বর্গ ফল-সাধনের উপায়? ইহাতে কি মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বজায় থাকে,—সত্যই কি ইহার দ্বারা 'পর'কে 'আপনার' করা যায়? যদি তাহা হয়, তবে ঐ যে ধনীর প্রাসাদে তোমার আবাহন-স্বচিত হইয়াছে—ঐ যে প্রমোদ-লীলার অট্টরোল উঠিতেছে, ইহাই কি তোমার শান্তিস্নিগ্ধ মূর্ত্তির শান্তি-প্রবাহ।—ঐ যে ব্যভিচার-বন্যার প্রবল-তরঙ্গ, ঐ কি তোমার আরাধনার মন্ত্র, ঐ মন্ত্রে ঐ অর্চ্চনায় কি তুমি প্রীতিলাভ কর? আর ঐ দীনজনের অনাড়ম্বর অশ্রু-বিগলিত ধারে কাতর আহ্বান—হৃদয়ভরা প্রেম-পুষ্প ভক্তিচন্দনে যে তোমার চরণকমল অর্চ্চনা করিতে প্রয়াসী, তাহার কিছুই কি তুমি শুনিবে না, কিছুই কি তাহা গ্রহণ করিবে না?—উহাতে কি তোমার প্রীতি নাই? বল জননি! কোন্‌টী তোমার স্পৃহনীয়।

অর্থই 'পুরুষার্থ' তবে তাহা মানবের সঙ্গে যায় না কেন মা! যদি বল, অর্থ থাকিলে ধর্ম্ম-সাধন হয় আর সেই ধর্ম্ম বলে সে মুক্তিলাভ করে তাই বা কই হয় মা? ঐ'ত শত শত ধনীর অট্টালিকা জনেধনে পরিপূর্ণ—কই, কত সেখানে তোমার আরাধনা—যজ্ঞ যাগ অর্চ্চনার মঙ্গল বাদ্যধ্বনি নিত্য প্রতিধ্বনিত হয়? যদি বল, সে অনাড়ম্বরে তোমার সাধনা করে,—সে আড়ম্বর চায় না তাহা হইলে তাহার প্রাণের একটা টান আছে, কেমন নয় কি? যে টান্ ধনের দিকে নয়—ধনের উপর! সত্য নয় কি মা! এই যে প্রাণের টান্, এ ধনকে চায় না, ধন থাকিলেই এ প্রাণের টান যে আসিবেই তাহাও সত্য নহে; ধনের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই—তাহার 'প্রবৃত্তি' চাই!—মনসা চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞঃ ততোবাচাভিধিয়তে! মনটা চাই-ই! নইলে তোমার আরাধনাও হয় না—ধর্ম্ম-কার্য্য-সাধনও চলে না, আর পুণ্য সঞ্চয়ে মুক্তি শান্তি যাই লাভ করা বল তা'ও হয় না, অতএব "মন থাকা চাই!" এখন বল

মা! যদি মন লইয়াই সব, তবে যার প্রাণের কামনা সাধনা তোমার শ্রীচরণ অর্চ্চনা করা তা'র ভক্তিচন্দনার্চ্চিত-প্রেম-পুষ্পার্ঘ তুমি লইবে না কেন? তুমি যে লইতে বাধ্য।—তুমি ত অর্থ চাও না। আড়ম্বর—ধূপদীপ-নৈবেদ্য পুষ্প বাদ্যাদিও তোমার প্রীতি-সাধন করে না, চাও মনের টান—প্রাণের ভক্তি! এতেই তুমি প্রীত, এতেই তোমার আবাহন—তোমার অর্চ্চনা—তোমার তুষ্টি সাধিত হয়! ভাই দীন-হীন হিন্দু! তোমার অর্থ চাই না, তোমার আড়ম্বর চাই না; চাই—তোমার প্রাণের আবেগ ভরা ভক্তি, তাই দিয়া তুমি মা'কে পূজা করিতে পারিবে—ইহাই তোমরা 'পরা-অপরা' সিদ্ধির উপায়! তুমি ক্ষুব্ধ হইবে কেন ভাই! তাই ঐ দেখ, মায়ের ভক্ত প্রাণ খুলিয়া গাহিতেছে—

"ওরে আড়ম্বরে না করিস্ পূজা
হবে অহঙ্কার মনে মনে!"

ঐ অহঙ্কারই যে পতন—ধন দেখাইবে কাহাকে? যিনি ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাহাকে 'ধন' দেখান যে বাতুলতা! একি প্রজার নিকট জমিদারের—গরীবের নিকট ধনীর প্রভুত্ব প্রদর্শন! এ ত তা নয় নাই ভাই। মা যে আমার মহাধনে ধনী' ভাই হিন্দু! তাই যে মা অন্নপূর্ণা ঘরে থাকিতেও শিব পূর্ণ-বৈরাগী—শ্মশানবাসী—সন্ন্যাসী! ধনে যে অহঙ্কার আসে—কামাদি কলুষ-বাসনায় সহস্রফণী মানবকে বেষ্টন করিয়া—জগৎকে দংশন করিতে উদ্যত হয়! তাই যে, শিব ফণী বেষ্টিত হইয়াও তাহারা অহঙ্কার বিবর্জ্জিত—তাহারা দংশন করে না!—মনে বিকার নাই, মহাসাধনায় শিব সদাই তাই উন্মাদ—তাই বিভোর!

ভাই! মনে পড়ে কি "কুবেরের সেই দান-পরীক্ষা"র কথা! ভাব ত' ভাই,—ধন অর্থ বড না ভক্তি বড! এ পূজার ধূপ, দীন, মন্ত্র তন্ত্র যে কেবল প্রাণের ভক্তি আকর্ষণের জন্য; এ ত প্রাণের সাধনার উপায় নয় ভাই! দেখ মন্ত্র তন্ত্র বিচার কর, সবই তাঁহার মঙ্গলময়ী শক্তির উদ্ভাবনা, তাঁহার প্রেমময় ভাবের বিকাশের কল্পনা ব্যতীত আর কি?

ভাই দীনমাতৃ-ভক্ত সাধক! ও আড়ম্বরে ক্ষুব্ধ হইও না। মা অর্থ চান্ না, চান—তোমার প্রাণের টান্—তোমার গলদশ্রুলোচনে প্রাণের আবেগে 'মা' কে 'মা' বলিয়া আহ্বান! ইহাই তোমার শ্রেষ্ঠ আবাহন—ইহাই তোমার পরমপূজা! এই প্রাণভরা ডাকেই মা'র প্রীতি লাভ করিতে পারিবে! ইহাই মনুষ্যত্বের বিকাশ, ইহাই মানবের সাধনা।—এ মায়ের পূজা একদিন নয়, আজীবন সম্বন্ধ, পূজা তোমার—

"আমি যদি ছেলে হই, কে মা না হ'য়ে থাকৃতে পারে।
ঘরে ঘরে আমারই মা, নাচ্ছে সেজে বারে বারে!!"

রঙ্গালয়

শ্রীমতী তারাসুন্দরী—প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরী ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থায় কিছুদিন রঙ্গালয়ের সংশ্রব হইতে দূরে ছিলেন। তারাসুন্দরীর আজীবন একান্ত সাধনার ক্ষেত্র এই রঙ্গভূমি—বাংলার রঙ্গমঞ্চ তাঁহার যেমন প্রিয়—তিনিও রঙ্গমঞ্চের তেমনি প্রিয়। রঙ্গমঞ্চে তিনি যে আলো, যে উচ্ছ্বাস, যে প্রাণের খেলা আনিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। রঙ্গমঞ্চ ছাড়িয়া জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি সুখ শান্তিতে কালযাপন করিতে পারিবেন ইহাই আমরা আশা করিতেছিলাম। কিন্তু ভাগ্য বিপর্য্যয়ে রঙ্গরাণীর পক্ষে তাহা সম্ভব হইল না। ভগ্ন স্বাস্থ্যের উপর তিনি মর্ম্মন্তুদ শোক পাইয়াছেন—প্রাণসম প্রিয় পুত্র হারাইয়াছেন। তারপর আজীবন অক্লান্ত শ্রম ও সাধনায় তিনি যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার রঙ্গালয়ের উন্নতি-পরিকল্পনার মধ্যেই আবদ্ধ।—এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীরাণী যে কল্পনায় রঙ্গভূমি ছাড়িয়া তীর্থক্ষেত্রে আশ্রম-বাসিনী হইয়াছিলেন ভগবান তাহাতে বাদ সাধিলেন। শ্রীমতী তারাসুন্দরী শীঘ্রই শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মনোমোহন নাট্য-মন্দিরে অবতীর্ণা হইতেছেন। শিশিরকুমার তারাসুন্দরীকে পাইয়া নানা ভাবে লাভবান ও উপকৃত হইবেন। তারাসুন্দরীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অসামান্য প্রতিভা ও কলাজ্ঞান, শিশিরকুমারের নাট্য প্রচেষ্টাকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিবে সন্দেহ নাই। জীবনের বিশ্রামের সময় তারাসুন্দরীকে বিধাতা আবার নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া রঙ্গালয়ে আনিতেছেন। রঙ্গরাণীর প্রতিভার দীপ্তিতে বাংলা রঙ্গালয়ে নূতন আলো ফুটিয়া উঠুক—এই বলিয়াই আমরা নাট্য-মন্দিরে বঙ্গবাণী তারাসুন্দরীর সম্বর্দ্ধনা করিতেছি।

মাসিক সাহিত্য-পরিচয়

মাসিক বসুমতী—পৌষ, ১৩৩১। 'মুক্তি ও ভক্তি' শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণের ১১নং আলোচনা। ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে যে সকল মতভেদ লক্ষিত হয় তাহারই একটু আলোচনা আবশ্যক বলিয়া ইনি এই ভীষণ প্রবন্ধে হস্ত-চালনা করিয়াছেন। এ আলোচনায় স্বরূপ ফোটে নাই আরো ঘোর হইয়াই উঠিয়াছে।—পাঠকদের মনে বিন্দুমাত্র রেখা তো পাত করিতেই পারে না—'মুক্তি ও ভক্তি' যত নিবিড়ভাবে ধরিবারই অগ্রসর হইতে চাহি না কেন অল্প সময়ের মধ্যে নয়নেও যেন ধাঁধা লাগিয়া আসে। 'সোনার চিরুণী' শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়ের গল্প—মাঝে মাঝে সুন্দর জমিয়াছে—আবার তাল কাটিয়া গিয়াছে। শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোইর 'বাঙ্গালার বিপ্লব-কাহিনী' সরস—উপভোগ্য। তৎকালীন অবস্থার যে চিত্র ইনি মনোভাব বিকাশের মধ্য দিয়াই অনেক স্থানে ফুটাইতেছেন তাহাতে চিন্তার খোরাক যথেষ্ট আছে। 'নারী মন্দিরে' শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় দেশের সন্তানদের জন্মস্থান ও নারীর মহা 'একদশার' আশ্রয়স্থল আঁতুড় ঘরের কথা ও প্রসবের সময় প্রসূতিকে কি ভাবে থাকিতে হইবে তাহারই উপদেশ দিয়াছেন। দেশে শিশুমৃত্যুর অভাব নাই, সন্তান প্রসবের পর অধিকাংশ নারীর স্বাস্থ্যও একেবারে মাটি হইয়া যাইতেছে। সন্তানের জন্ম নারীর পক্ষে যেমন আনন্দের তেমনি সঙ্কটেরও। পুরুষের দশ দশা, কিন্তু নারীর এক দশা, ঐ খানেই—সুসন্তান চাহিলে, প্রসূতির জীবন রক্ষা করিতে চাহিলে এ সব বিষয় প্রত্যেক নব-নারীরই বিশেষ জানা দরকার। অন্যান্য দেশে এ সম্বন্ধে সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত—আমাদের দেশে অভিজ্ঞ ডাক্তারেরা বর্ত্তমানে এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা সুখের কথা। 'চন্দননগর পরিচয়' শ্রীহরিহর শেঠ তথাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা কহিয়াছেন। 'পল্লী সংস্কার' উল্লেখযোগ্য। 'বাঙ্গালার নবযুগের রাষ্ট্রকথায়' শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল—জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনার কল্পনা কি ভাবে আসিল তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। 'বিমাতা' শ্রীমতী রাধারাণী দত্তের বড় গল্প—এই সংখ্যায় শেষ হইল। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর—সংসার অবস্থা কি ভাবে অনেক স্থানে নারীদের দ্বারাই শোচনীয় হইয়া উঠে—সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে কি ভাবে তাহাকে বিধ্বস্ত হইতে হয় 'বিমাতায়' তাহা সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পেট্রোলিয়াম প্রসঙ্গে মস্ত একটা প্রয়োজনীয় জিনিস সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। কৃষিবাণিজ্যে 'খেজুরে গুড়ের' কথা আছে—উপাদেয়। সাম্রাজ্য প্রদর্শনী ও ভারতের বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য। মহাত্মা গান্ধী ও হেনরী ফোর্ডের তুলনামূলক বিচার অনুবাদ সুন্দর। টিরোলী আল্পসের তালে তালে শ্রীবিনয় কুমার সরকারের পাশ্চাত্য ভ্রমণ কাহিনী, ভিন্ন দেশের প্রকৃতি ও জীবন যাপন প্রণালী অল্প কথায় লেখক দেখাই বার চেষ্টা করিতেছেন। 'মহেন জো দড়োতে' শ্রীরাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের সিন্ধুতীরের প্রাচীন ভারতীয় গৌরব নিদর্শনের আবিষ্কারের পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্ন তত্ত্ব হইলেও ভারতের লুপ্ত বস্তুর এ পরিচয় পরম সরস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীঅমৃতলাল বসু 'পুরাতন পঞ্জিকায়' সে যুগের সামাজিক প্রথা,প্রসাধন ও অঙ্গাভরণের পরিচয় দিতেছেন—সুন্দর। 'সাময়িক প্রসঙ্গ' উল্লেখযোগ্য—দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে মতামত যাহা দেওয়া হইয়াছে ও যে ভাবে আলোচনা হইয়াছে তাহা ভাসা-ভাসা নহে। বসুমতীর সাময়িক প্রসঙ্গ উন্নত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস চয়ন ও ডজনখানেক কবিতা প্রভৃতি আছে। —'পাঠক'

Printed & Published by Jnanedra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
14 Jaggannath Dutta Lane Garpar, Calcutta.

সালিশীর সমস্যা

"Arbitration"   Walter C. Horsley.

প্রথমবর্ষ]   ১০ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ২১শে ফেব্রুয়ারী   [২৮শ সংখ্যা

গুরুমারা বিদ্যা

শিল্পী—দেখুন দেখি ছবি কেমন হয়েছে।

শিল্পীর পিতা—এটা কার ছবি, বাবা?

শিল্পী—চিন্তে পার্চ্ছেনা এ যে আপনারই পোর্ট্রেট।

পিতা—বটে! আমার চেহারা কি এই পিলেরুগীর মত?

শিল্পী—(সলজ্জভাবে ঈষৎ হাসিয়া) ওটা ওরিয়েন্টালের বৈশিষ্ট।

মহিলা-ঔপন্যাসিক জর্জ্জ ইলিয়ট

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত, এম-এ

ইংরেজী-সাহিত্যে উপন্যাস রচনা করিয়া যে কয়জন মহিলা যশস্বিনী হইয়াছেন জর্জ্জ ইলিয়ট তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা। তাঁহার প্রকৃত নাম মেরী অ্যান ইভান্স (Marie Anne Evans), জর্জ্জ ইলিয়ট ছদ্মনাম মাত্র। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ওয়ারউইকসায়ারের (Warwickshire) অন্তর্গত একটি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। মেরীর পিতামাতা সামান্য কৃষক-শ্রেণীর লোক ছিলেন বটে, কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া প্রতিবেশীদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কন্যারও যাহাতে ধর্ম্মানুরাগ জন্মে সে বিষয়ে তাঁহারা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ইহার ফলে কন্যা পিতামাতারই আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। যথাসময়ে মেরী বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন, কিন্তু কয়েক বৎসর অধ্যয়নের পরেই তাঁহাকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মাতার মৃত্যুতে সংসারের সমস্ত ভার মেরীর উপর পড়িয়াছিল, কাযেই বিদ্যালয় ত্যাগ করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। মেরীর পাঠস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল, বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার পরেও তিনি অবসরমত নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিতেন। বিবিধ পুস্তক পাঠ করার ফলে তাঁহার চিন্তাশক্তি সম্যক্ বিকাশ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। তাঁহার জীবনে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর এক ধনী বন্ধু পরিবারের সহিত মেরী ভ্রমণে বহির্গত হন এবং কয়েকমাস পরে স্বদেশে ফিরিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। Westminster Review পত্রে তাঁহার কয়েকটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার অনতিকাল পরেই উক্ত পত্রের সহকারী সম্পাদকের পদে তিনি নিযুক্ত হন। এই সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত হইতেই মেরী লণ্ডন নগরে অবস্থান করিতে থাকেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে স্পেন্সার, মিল প্রভৃতি তৎকালীন খ্যাতনামা লেখকগণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং এই সময়েই জর্জ্জ হেন্‌রী লিউয়েসের (George Henry Lewes) সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, ইনি পররর্ত্তীকালে মেরীর স্বামী হইয়াছিলেন। বিখ্যাত না হইলেও Lewes একজন সুদক্ষ লেখক ছিলেন এবং তাঁহারই আগ্রহে ও উৎসাহে মেরী উপন্যাস রচনায় মনোযোগিনী হন। উপন্যাস ক্ষেত্রে মেরীর প্রথম চেষ্টা—অ্যামস্ বার্টন (Ames Barton)। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এই উপন্যাসখানি মাসিকপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ইহা ইংলণ্ডের জনসাধারণের প্রশংসা লাভ করে। পর বৎসরে প্রকাশিত Scenes of Clerical Life নামক গ্রন্থে এই উপন্যাসটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সুবিখ্যাত উপন্যাস অ্যাডাম্ বীড্ (Adam Bede) প্রকাশিত হয় এবং এই পুস্তকখানি তাঁহার যশের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়। অ্যাডাম্ বীড্এর অপ্রত্যাশিত সাফল্য মেরীকে পরম আশান্বিত করে এবং তিনি নবোৎসাহে উপন্যাস রচনায় চিত্ত নিবিষ্ট করেন। ইহার ফলে দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি দুইখানি বৃহৎ উপন্যাস—দি মিল অন দি ফ্লস্ (The Mill on the Floss) ও সাইলাস্ মার্ণার (Silas Marner)—রচনা করেন। এই কয়খানি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার পর সাহিত্যক্ষেত্রে মেরী প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন এবং ইংলণ্ডের জনসাধারণ পরম বিস্ময়ের সহিত অবগত হন যে এই সমুদয় গ্রন্থ রমণীরচিত—তাঁহাদের ধারণা ছিল, উক্ত গ্রন্থগুলি সম্ভবতঃ কোন ধর্ম্মযাজকের লেখা। পূর্ব্বোক্ত চারিখানি উপন্যাসই ইংলণ্ডের পল্লীজীবন লইয়া রচিত। ইংলণ্ডের পল্লী-জীবনের সহিত লেখিকার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, জীবনের অধিককাল তিনি পল্লীতে অতিবাহিত করেন, তাই এই চারিখানি গ্রন্থে তিনি ইংলণ্ডের পল্লীজীবনের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা পরম উপভোগ্য হইয়াছে। উপরোক্ত প্রায় সব কয়খানি গ্রন্থেই লেখিকার পারি-

যারিক জীবনের প্রচুর আভাস পাওয়া যায়। লেখিকা আপনাকে ও স্বীয় পিতামাতাকে এই সকল গ্রন্থে চিত্রিত করিয়াছেন। The Mill on the Floss উপন্যাসের Maggie মেরী নিজে এবং Adam Bede উপন্যাসের নায়ক Adam Bede ও Mrs. Poyser মেরীর পিতা ও মাতা। মেরী অতঃপর পরিচিত দৃশ্য ও নরনারী ত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে উপন্যাস প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইতালীতে ভ্রমণকালে তিনি "রমোলা" (Romola) উপন্যাসের পরিকল্পনা করেন এবং উপন্যাসে বর্ণিতব্য বিষয়গুলির সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব হেতু বহুকাল যাবৎ পরিশ্রম করেন। শুনা যায়, মেরী নাকি বলিয়াছিলেন যে, যখন তিনি এই পুস্তকখানি রচনা করিতে আরম্ভ করেন তখন তিনি ছিলেন যুবতী নারী, কিন্তু যখন ইহা সমাপ্ত করিলেন তখন দেখিলেন যে বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছেন। "রমোলা" (১৮৬৩) কিন্তু সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই এবং এই কথা পরবর্ত্তী উপন্যাস ফেলিক্স হল্ট দি র‍্যাডিক্যাল্ (Felix Halt the Radical) সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মিড্‌লমার্চ (Middlemarch) নামক উপন্যাস প্রকাশিত হইবার পর জর্জ্জ ইলিয়ট সাধারণের সমাদরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন—যদিও এই উপন্যাসখানি তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত উপন্যাসগুলি অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ড্যানিয়েল ডেরাণ্ডা (Daniel Deranda) নামক উপন্যাস প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থকর্ত্রীর মতে ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

জর্জ্জ ইলিয়টের উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। এক্ষণে তাহাদের সাধারণ প্রকৃতি (general character) সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। কবি ব্রাউনিং (Browning) এর ন্যায় মানবচিত্তের নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করা জর্জ্জ ইলিয়টের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার উপন্যাসে কৌতুকাবহ ঘটনার আধিক্য লক্ষিত হয় না, মানবমনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই তাঁহার উপন্যাসের প্রাণ। মানবের কার্য্যাবলী তাহার আকাঙ্ক্ষা ও জন্মগত প্রবৃত্তির দ্বারা কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়, বিরুদ্ধভাবের সংঘাতে মানব-চরিত্র কিরূপে গঠিত হইয়া উঠে ইত্যাদি বিবিধ বিষয় জর্জ্জ ইলিয়টের উপন্যাসে চিত্রিত হইয়াছে। জর্জ্জ ইলিয়টের সৃষ্ট চরিত্রগুলির (characters) একটি বিশেষত্ব এই যে, প্রথম সাক্ষাতে তাহাদের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। কখন্ কোন্ পথে তাহারা যাইবে, কি কার্য্য করিবে সে সম্বন্ধে আমরা প্রথমে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকি; নানাবিধ চিন্তা ও কার্য্যের মধ্য দিয়া তাহাদের চরিত্র ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করে। কুচিন্তা ও কুকার্য্যের দ্বারা তাহাদের চরিত্রের ক্রমিক অবনতি হইয়া থাকে এবং সুচিন্তা ও সুকার্য্যের ফলে তাহাদের চরিত্রের ক্রমিক উন্নতি ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ "রমোলা" উপন্যাসের টিটো (Tito) ও রমোলা চরিত্রদ্বয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। "টিটো"কে যখন আমরা প্রথম দেখি তখন সে ভাল বা মন্দ কোন্ দিকে যাইবে তাহা আমরা জানিতে পারি না, পরে সময় যত গত হইতে থাকে আমরা দেখি ক্রমশঃ তাহার অবনতি হইতেছে, কারণ তাহার সমস্ত চিন্তা ও কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে হীন স্বার্থের দ্বারা। অপর পক্ষে "রমোলা" চরিত্র আত্মত্যাগের প্রতি মহনীয় কার্য্যের সহিত সৌন্দর্য্যে ও নৈতিকবলে ধীরে ধীরে উন্নত হইয়া উঠে। তাহার চরিত্রের প্রথম যে অস্পষ্ট সূচনা পাই তাহা হইতে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্বন্ধে কোন ধারণাই করা যায় না। ডিকেন্স বা থ্যাকারের সৃষ্ট চরিত্রগুলির উক্ত বিশেষত্ব নাই। তাহাদের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ-কালেই আমরা দেখি যে তাহাদের চরিত্র পূর্ব্ব হইতে গঠিত হইয়া আছে, কোন্ অবস্থায় তাহাদের দ্বারা কোন্ কার্য্য সম্ভব তাহা অনুমান করিয়া লইতে কষ্ট হয় না।

উপন্যাসক্ষেত্রে জর্জ্জ ইলিয়ট বস্তুতন্ত্রের (realism) পক্ষপাতী ছিলেন, আদর্শ সৃষ্টির দিকে তাহার ঝোঁক ছিল না। তাঁহার উপন্যাস সমুদয় বাস্তবের প্রতিকৃতি, তবে ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলার (Emile zola) ন্যায় বাস্তবের কুৎসিত দিকটা তিনি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার উপন্যাসে বাস্তবের যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা মানবের মনে অপবিত্রভাবের উদ্রেক করে না! বস্তুতঃ পাপের প্রতি মানবের যাহাতে ঘৃণা জন্মে এবং ধর্ম্ম ও নীতির প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হয় সে চেষ্টা জর্জ্জ ইলিয়-টের গ্রন্থের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে জর্জ্জ

ইলিয়টকে মানবজাতির শিক্ষাদাত্রীরূপে গণনা করা যাইতে পারে।

জর্জ্জ ইলিয়টের উপন্যাস সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। জর্জ্জ ইলিয়টের উপন্যাস হৃদয়কে বেদনাভিভূত করে। মানবজীবনের দুঃখের দিকটাই লেখিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তিনি দুঃখের চিত্রই আঁকিয়া গিয়াছেন। লেখিকা নিজেও বিষাদময়ী ছিলেন বলিয়া মনে হয়; যদিও তাঁহার জীবনীকার Cross বিপরীতই বলিয়াছেন। কথিত আছে, এক সময়ে তাঁহার স্বামী কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলেন যে তাঁহার উপন্যাসগুলি বিষাদময় (sad), ইহাতে তিনি নাকি সজলচক্ষে উত্তর করিয়াছিলেন যে জীবনকে যেভাবে তিনি দেখিয়াছেন সেইভাবেই তাহাকে চিত্রিত করিতে বাধ্য। বঙ্গদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উপন্যাস লেখিকা নিরুপমা দেবীর সহিত এই বিষয়ে জর্জ্জ ইলিয়টের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাই, কারণ নিরুপমা দেবীর অধিকাংশ উপন্যাসেই একটি করুণ সুর বিদ্যমান যাহা পাঠকের মনকে বিষাদমগ্ন করে।

বিশ্রাম

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক এম-এ, বি-এল

কেন মোরে যেতে বল আগে ?
তুলিয়া চরণ-ভার ফেলিতে না পারি-আর
ফেলিতে বেদনা আরো লাগে।

আপনি নয়ন দুটী ফিরে ফিরে চায়
পিছনের আব্‌ছায়া দেশের সীমায়,
যাহার ভিতর দিয়া মাতিয়া খেলায়—
ছুটেছিল শিশুকাল মোর,

যাহার ভিতরে কত ঝরে পড়া হাসি
অকারণ কোলাহল, ঘুরে ঘুরে ভাসি
এখনো বেড়ায় বুঝি হয়ে বনবাসী
প্রহরীর ভয়ে যেন চোর।

যাহার ভিতরে মোর যৌবন কাল
করুণ-বিলোল-দিঠি, হেরি কেশ-জাল
বাপীতটে, বাতায়নে—বুকে ঘন তাল
বাজাইত অতি চুপে চুপে,
যাহার ভিতরে কত অস্ফুট বাণী
আবেগ জড়িত সুরে করে কানাকানি
এখনো ফুলের সনে মনে অণুমানি
নব অভিসারিকার রূপে;
যাহার ভিতরে মোর জননীর মায়া
এখনো কোথাও রচে বটতরু ছায়া
যাহার ভিতরে মোর অশরীরী জায়া
এখনো চাহিয়া মোর পানে
আছে বুঝি দাঁড়াইয়া কোন্ দূর দেশে
কোন্ মেঘে-ঢাকা হিমগিরি-চূড়া-বেশে,
তবু আগে যেতে হবে ? যাব সব শেষে—
আপাততঃ বসিনু এখানে।

গল্প
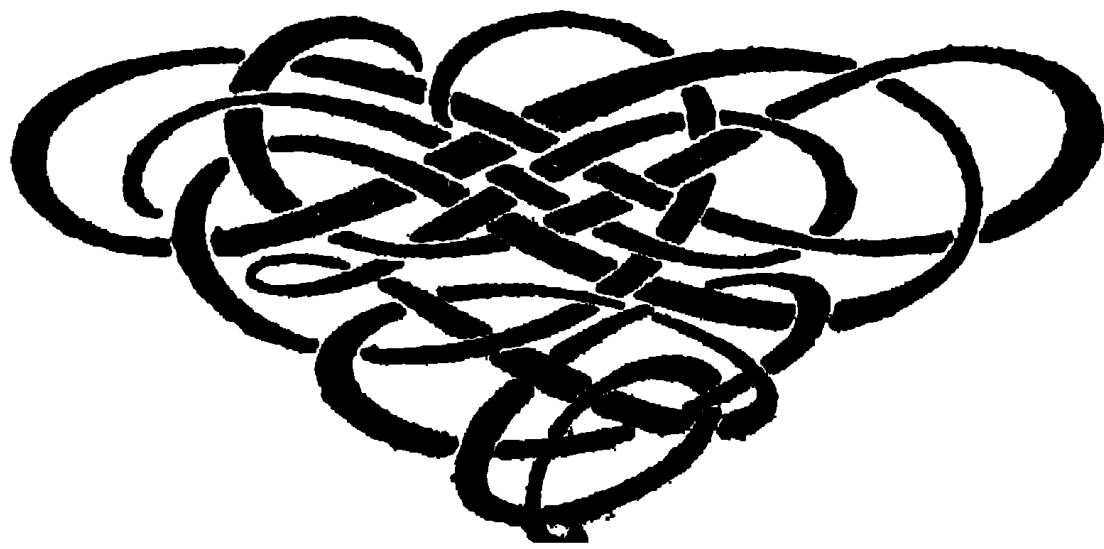
যাদুঘর

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যেক লোকেরই একটা না একটা সখ্ থাকে, আমার সখ ছিল ভ্রমণের। ফুরসৎ পাইলেই বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িবাব অধীর আগ্রহে মন আমার সর্ব্বদাই উন্মুখ ছিল। কলেজে লালা রামশরণ লাল বলে এক বিহারবাসী ধনী সন্তানের বন্ধুত্বের সৌভাগ্য লাভ করে ছিলেম—রামশরণ খুব বড় ঘরের ছেলে হলেও আমাদের মতন 'চিংড়িমাছ খেকো' বাঙ্গালীর সঙ্গে অসঙ্কোচেই মিশত —এবং সে মেশাটুকুও যে তাকে আনন্দ দিত, তা সে নানা প্রকারে জানাত। গরমের সময়—কলেজ বন্ধ হলে সে আমায় ধরে বস্‌লো এবার 'বন্ধী'তে তাদের মুল্লুকটা আমায় বেড়িয়ে আসতে হবে এবং এটুকুও জানিয়ে দিল 'মছ্‌লিকো বাস্তে ডর নেহি উস্কাভি বন্দবস্ত কর্ দেঙ্গে।' বাস্তবিকই 'মছ্‌লির' আমি খুব ভক্ত ছিলাম না—তবুও বাঙ্গালীর স্বভাবগত এই দৌর্ব্বল্যটুকু ও যে সে বন্ধুত্বের খাতিরে ক্ষমা কর্ত্তে প্রস্তুত, তা জেনে আমি বড় আনন্দিত হলাম; তবে এক কথায় সম্মতিও দিতে পারলাম না—মনে মনে রাজী হয়েও তাকে বল্লুম বাবাকে জিজ্ঞাসা করে আমি এর শেষ জবাব দেব।

এতদূরে বেড়াবার সুবিধা ইতিপূর্ব্বে কখনও পাই নাই সুতরাং এ নিমন্ত্রণের প্রলোভন সম্বরণ করা আমার পর্য্যটন-লুব্ধ মনের কাছে খুব সোজা ছিল না—অন্তরায় ছিল কেবল পরের বাড়ীতে গিয়া থাকিবার অসুবিধা—সর্ব্বদাই যেন 'কিন্তু' হয়ে থাকা বিশেষতঃ নামে হিন্দু হইলেও হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীর আচারগত বিভিন্নতা এবং তাহার সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিবার অনভিজ্ঞতাই যেন বিভীষিকার মত এই আনন্দ-কল্পনায় সঙ্কোচ জাগাইয়াছিল। মনের মধ্যে অনেকগুলি খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল—শেষ লোভেরই জয় হইল।

পিতার সম্মতি গ্রহণ খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না—আমার বাবা ছিলেন সদাশিব, তাবলে একেবারে ব্যোম ভোলানাথও নন্, তাঁহাকে যুক্তিপূর্ণ কোনও কথা বল্‌লে তিনি বড় 'না' বল্‌তেন না—তবে এ ক্ষেত্রে সহজে সম্মতি পাবার একমাত্র কারণ ছিল এই যে রামশরণ আমাদের বাড়ী মাঝে মাঝে যেত এবং এই স্থির ধীর স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ অথচ পর ধর্ম্মের প্রতি সম্যক্ মর্য্যাদা দানে অবিমুখ এই শান্ত শিষ্ট ছেলেটীর উপর তিনি পরম প্রসন্ন ছিলেন—এ রকম সঙ্গীর সংসর্গে আমায় ছাড়িয়া দিতে মোটেই ইতস্ততঃ করিলেন না। সংসর্গের প্রতি বাবার বড় খরদৃষ্টি ছিল, তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন A man is known by the CSmpany he keeps.

২

ষ্টেশন হইতে মাইলটাক দূরে বন্ধুর বাড়ী হলেও ষ্টেশনে আমাদের লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিল এক ঐরাবৎ জাতীয় হস্তী, হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিব কি, তাহার আকৃতি দেখিয়াই আমার অন্তরাত্মা ভয়ে কাঠ হইয়া যাইতেছিল, বন্ধুবর অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া সঙ্গে করিয়া

আমায় হস্তী পৃষ্ঠে তুলিলেন—তখন বুঝিলাম চড়িবার পূর্ব্বে যতটা ভয় হইয়াছিল ফলতঃ হস্ত্যারোহণ ততটা ভীতিপ্রদ নহে। দূর হইতেই একটা প্রকাণ্ড চূড়া দেখা যাইতে ছিল রামশরণ সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল 'ঐ মেরা কোঠীকা গুম্বজ দেখা যাতে' একটু নিকটবর্ত্তী হইতেই সানায়ের আওয়াজ শোনা যাইল আমি বলিলাম তোমারা ঘরমে কিসিকো সাদী হায় রামশরণ হাসিয়া বলিল, কেন বাজনা হইতেছে বলিয়া নাকি? আমি বলিলাম 'হাঁ' রামশরণ বুঝাইয়া দিল উহা আমাদের সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য—আমি তো অবাক্— কে আমি বাঙলা দেশের এক কেরাণীর পুত্র, আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বাজনা—আশ্চর্য্য! আরও নিকট-বর্ত্তী হইয়া দেখিলাম বহুমূল্য উর্দ্দীপরা আশাসোটাধারী বরকন্দাজের দল শির নত করিয়া অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছে। অভ্যর্থনার মাত্রাটা একটু যেন বেশী বলিয়া বোধ হইল। আমি সেজন্য অভিযোগ করিলে রামশরণ বলিল যে সে ইহা করিতে বলে নাই—এবং ইহা যে আমার জন্য বিশেষভাবে করা হইয়াছে তাহাও নহে, তাদের বাড়ীতে কেহ আসিলে যাইলে এইভাবেই বিদায় দেওয়া বা অভ্যর্থনা করা হইয়া থাকে। আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক।

যখন গিয়া বন্ধুবরের 'কোঠী'তে পৌছিলাম তখন সূর্য্যদেব পাটে বসিয়াছেন—চতুর্দ্দিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে—হঠাৎ অবিরাম শোঁ শোঁ শব্দ শুনিয়া ভাবিলাম এ কিসের আওয়াজ—উপরে চাহিয়া দেখি পালে পালে বক উড়িয়া আসিয়া সেই কুঠীর বাগানের এক কোণে একটা বিশাল বটবৃক্ষে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে—কতগুলি ঝাঁক যে আসিল, কতদিক হইতে যে আসিল তাহার হিসাব দিতে হইলে শুভঙ্করেরও বোধ হয় গোলযোগ হইয়া যাইত—ভাগ্যিস, আমাকে মাসিক পত্রে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে না তাই রক্ষা, নতুবা গিয়াছিলাম আর কি! আজকাল ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়িতে বসিলেই দেখি ট্রেণের বর্ণনা আর আর গন্তব্যস্থানে গিয়া ক'কাপ্ চা খাইলাম, ক'টা ডিম্ব সিদ্ধ খাইলাম তাহার সবিস্তার বর্ণনা আর শিক্ষিতা গৃহ-স্বামী থাকিলে তাঁহার মধুর যত্নের সুখ্যাতি, আমার মত অপটু অর্ব্বাচীনের দ্বারা এসব ব্যাপারের বর্ণনা মধুর ত হইতই না—অধিকন্তু রসভঙ্গের ত্রুটীর আশঙ্কাই বেশী পরিমাণে বাড়িয়াই যাইত। হিন্দুস্থানীদের আমরা কেবল ডালরুটীধ্বংশকারী বলিয়া জানি কিন্তু খাইতে বসিয়া যে আয়োজন দেখিলাম তাহাতে চক্ষুঃ স্থির হইয়া গেল—আমার আহারের স্বল্প পরিমাণ দেখিয়া বন্ধুবরের পিতা অনেক দুঃখ করিলেন, বলিলেন "বাবুজী আপ্‌লোক পেট্ ভরকে খাতে নেই ইস্ মজেসে আপ্‌লোক দুব্‌লা হো যাতে, থোড়া রোজ ইধার রয়নেসে আপ্‌কো পালওয়ান বনায় দেঙ্গে।" লালাজী জানিতেন না যে আমার উদরের পরিধি তাঁহাদের স্বদেশবাসীগণের চেয়ে কত কম।

বহির্ব্বাটীতে অনেকগুলি সুসজ্জিত কক্ষ ছিল, তাহার মধ্যে একটী আমার শয়ন জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, বন্ধু নিজে আমার সঙ্গে আসিয়া কক্ষে পৌছিয়া দিলেন সুন্দর কারুকার্য্য খচিত পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যা। খাটখানি দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম তাহার একটু কারণও ছিল, খাটখানি দেখিয়া বোধ হইল তাহা বহু কালের জিনিস অথচ কারুকার্য্যের খুটীনাটী তাহাতে এত যে তাহা সেই অসভ্য যুগের কারিকরে কি করিয়া করিয়াছিল তাহা সত্যই ভাবিবার বিষয়। আমাকে বিস্মিত দেখিয়া বন্ধু বলিলেন কেয়া দেখতেহে শিববাবু—পুরানা কারীগরকা কাম এতনাহি উমদা। কাল সবেরমে আপ্‌কে বহুৎ চিজ দেখলায়েঙ্গে—খেয়াল রাখিয়ে হিন্দুস্থানকা কারিগরমে তাজ বনা হুয়া হায় যো আপকো ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার কভি বনানে নেহি সখেঙ্গে" কথাটা সত্য, তাজের চিরনবীন সৌন্দর্য্য যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া অটুট আছে, যাহা সভ্য জগতের কোন স্থাপত্য শিল্পের কীর্ত্তিতে আজিও ম্লান হইয়া যায় নাই। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দুই বন্ধুতে গল্প করিলাম, এমন সময় পাশের ঘরের ঘড়ীতে টং টং করিয়া ১২টা বাজিল, আমি রামশরণকে শুইতে যাইবার জন্য বলিলাম সে উঠিয়া গেল। আমি দ্বার বন্ধ করিয়া শুইলাম মুক্ত বাতায়ন পথে ম্লান জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরের অন্ধকারকে দুর্ব্বল করিয়া দিতেছিল, আর বাতাসে ভাসিয়া আসিতে-ছিল অদূরের বাগানের বেড়ার হেনার পুষ্পমঞ্জরীর গন্ধ-ভারাক্রান্ত গন্ধ—মনে হইল যেন আমি রূপকথার রাজবাটীতে

আসিয়াছি। কখন যে অলক্ষিতে নিদ্রাদেবী আসিয়া আমার চেতনা অপহরণ করিয়াছিলেন তাহা জানিনা।

৩

দ্বারে ঘন ঘন করাঘাতের ধ্বনিতে সুখ নিদ্রা ভাঙ্গিল—চোখ কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দেখি বন্ধুবর হাজির, সঙ্গে বেহারা ট্রেতে করিয়া চার সরঞ্জাম লইয়া সওয়ায়মান। তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া লইয়া চা-পানে রত হইলাম—বন্ধুবর কলিকাতা প্রবাসী হইয়াও চাএর রসে বঞ্চিত। কলিকাতায় সহস্র রকম বদ্‌খেয়ালের ভিতর থাকিয়াও রামশরণ লাল হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়ামীটুকু পুরা-মাত্রায় বজায় রাখিতে যে কি করিয়া সমর্থ হইয়াছিল, তাহা সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয় অথচ এইটুকু রাখিতে সে কাহারও মনে কখনও আঘাত দেয় নাই বা এজন্য সে কখনও কোনরূপ ভণ্ডামো করে নাই—সবিনয়ে, সসঙ্কোচে সে নিজেকে এই সকল ভ্রষ্টাচারের প্রলোভন হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিত। চা পান সমাপ্ত করিয়া দুই বন্ধুতে বেড়াইতে বাহির হইলাম—বন্ধুবরের পৈতৃক বাসগৃহখানি যে কত বিঘার উপর স্থাপিত তাহা আন্দাজ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছিল। দেখিবার জিনিস বটে, এমন গাছ নাই যা সে বাগানে দেখিলাম না—দেশ-বিদেশ হইতে আনীত দুষ্প্রাপ্য ফল ও ফুলের গাছে সযত্নে সজ্জিত বাগান, দেখিলে কলিকাতার বাবুদের বাগানের কথা মনে পড়িত—সে যেন দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার ব্যর্থ প্রয়াস। বাড়ীখানি কলিকাতার বাড়ীর মত উচ্চতায় ৭।৮ তোলা না হইলেও ঘরের সংখ্যায়, আয়তনে, স্বাস্থ্যপ্রদ গঠনে, বায়ু ও আলোকের প্রাচুর্য্যে মনোরম। বাড়ীটি মাত্র দ্বিতল এবং সাত মহল—তার ছয় মহল পর্য্যন্ত বেড়ান চলিল, সপ্তম মহল অন্তঃপুর—আর এ দেশে অন্তঃপুরের পর্দ্দার কঠোরত্ব আমাদের বাঙালীর পর্দ্দার চেয়ে যে কত বেশী আইন-কানুনে বাঁধা তাহা এক কথায় বুঝান অসম্ভব। সাত মহল বাড়ীর সন্ধান ছেলেবেলায় ঠাকুরমার গল্পের মধ্যে পাইয়াছিলাম তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম আজ। সেকালের বাড়ীর একটা স্পষ্ট ধারণা করিয়া আজ বুঝিলাম বাসস্থান নির্ম্মাণের দিকে পূর্ব্ব যুগের লোকেদের ধারণা কত সুন্দর ছিল প্রায় সবঘরগুলিই ভাল ভাল আসবাবে সাজান, কত প্রাচীন তৈল-চিত্রে সজ্জিত তাহাতে কোন অতীত যুগের শিল্পীর তুলিকা নিঃসৃত হইয়া আজ জীবন্তবৎ রহিয়াছে অথচ কোন শিল্পীর কোন চিত্রে তাহাদের নামগন্ধও নাই আর আজকালের অনেক শিল্পীকেই দেখিতে পাই চিত্রে শিল্প চাতুর্য্য দেখাইতে পারুন আর নাই পারুন কিন্তু নামসহীতে যথেষ্ট ওস্তাদী দেখাইবার চেষ্টা করেন। বাগান বেড়াইয়া, অন্যান্য ঘরগুলি দেখিয়া নিজের কক্ষে ফিরিতে প্রায় এগারটা বাজিল, তখন স্নানের উদ্যোগ হইল—বাগানেতে একটী সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত স্বচ্ছতোয়া দীর্ঘিকা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, উহাতেই স্নানের অভিলাষ প্রকাশ করিলে বন্ধুবর বড় খুসী হইয়া আমার সঙ্গে চলিলেন, বেহারা তেলের বাটী, সাবান, তোয়ালে, ধুতি প্রভৃতি লইয়া সঙ্গে চলিল। কলের জল বালতীতে ধরিয়া মাপা-জলে-যাদের সংক্ষেপে স্নানকরা অভ্যাস তাদের পক্ষে এই মৃদু প্রবহমাণ, শুভ্র নির্ম্মল, জলরাশিতে স্নানের সুখ যে কি অপরিমেয় তাহা বুঝান সম্ভব নয়—খাঁচার পাখী, যে কেবল জলের ঝাপটায় স্নান করে—সে ছাড়া পাইয়া যখন মাঠের জলে স্নান করে তখন সে বুঝিতে পারে এই দুইয়ের পার্থক্য। একটার মধ্যে মনের স্বচ্ছন্দগতি অব্যাহত থাকে আর একটা যেন বাঁধাধরার কঠোর রাজত্ব।

স্নান করিয়া আহারের জন্য ভিতরে যাইতেছি এমন সময় হঠাৎ আমার শয়নকক্ষের পাশেরকক্ষের দ্বারে দৃষ্টি পড়ায় দেখিলাম সেই দরজায় তিনটী বড় বড় লোহার তালা লাগান রহিয়াছে—বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম আচ্ছা সব ঘর দেখাইলে কিন্তু এই তালাবন্ধ ঘরটী কেন দেখাইলে না—ওতে কি কিছু গুপ্ত রহস্য আছে নাকি। বন্ধু একটু হাসিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ, রহস্যই বটে—তবে সে রহস্যের সঙ্গে অনেক কষ্ট ও দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত আছে—এখন চল খেয়ে আসি—তারপর ওঘর দেখাব, আমরা আহারার্থ চলিয়া গেলাম। মনে বড় ভয় হইতেছিল যে এ বেলাও হয়ত আবার রুটী বা পুরীর ব্যবস্থা আছে কিন্তু দেখিলাম তাহা নহে, আতপ তণ্ডুলের শুভ্র সুগন্ধি অন্ন ও বহুবিধ ব্যঞ্জন, নিরামিষ হইলেও বিশেষ কোন অসুবিধা অনুভব হইল না। কারণ এখানকার তরীতরকারির আস্বাদ অতীব মধুর—তরকারীর এমন স্বাদ কলিকাতায় কখনও

পাই নাই—সেটা যে রন্ধনের কোন বিশেষ কৌশল তাহা নহে। এ দেশে কূয়ার জলে চাষবাস হয়, অর্থাৎ অত্যধিক জল পায় না বলিয়া শাক সব্জীতে জলের আস্বাদ প্রাধান্য লাভ করে না। আর তাছাড়া এমন টাট্‌কা শাক-সবজীর আস্বাদন লাভ করা কলিকাতাবাসীদের স্বপ্নেরও অগোচর।

৪

আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে দুই বন্ধুতে বাহিরে আসিলাম—কক্ষ প্রবেশ করিবার পুর্ব্বেই পাশের ঘরের দিকে চাহিয়া বন্ধুকে বলিলাম—এইবার এই ঘরটা দেখাও। বন্ধু বলিলেন অত ব্যস্ত হবেন না শিববাবু ও ঘর খুলিলে আর আপনার এ ঔৎসুক্য থাকিবে না—এই বলিয়া বেহারাকে বলিলেন এই "যাদুঘরকা কুঞ্জি লে যাও"—বুঝিলাম বাটীর মধ্যে এই ঘরটি যাদুঘর বলিয়া পরিচিত। বন্ধু বলিলেন এই ঘরটাই বাড়ীর ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া মাননীয় অতিথি অভ্যাগত আসিলে তাঁহাদের ব্যবহারার্থ দেওয়া হইত কিন্তু ঐ ঘরে আমার প্রপিতামহের, পিতামহের ও পিতার সময়ে তিন জন পদস্থ অতিথি নিহত হন সেইজন্য বাপজী ও ঘর আর ব্যবহার করিতে দেন না—সেই পর্য্যন্তই উহা বন্ধ হইয়া বায়ু ও আলোকহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে। বেহারা আসিয়া চাবি দিয়া গেল বন্ধুবর একটা একটা করিয়া তিনটি তালা খুলিতেই আমি আগ্রহে অধীর হইয়া দরজায় ধা দিলাম—দরজা খুলিতেই ঘরের বদ্ধ বায়ু মরণোন্মুখের শেষ শ্বাসের ন্যায় প্রবলবেগে বাহিরে আসিল তাহাতে যেন একটা অপার্থিব সোঁদা গন্ধ, ভিতরে প্রবেশ করিতেই চারিপার্শ্বের শীতল রুদ্ধবায়ুর হিমস্পর্শ জানাইয়া দিল যে সেটা ঠিক পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কিত নহে। বন্ধুবর একটু অগ্রসর হইয়া সম্মুখের একটা বদ্ধ জানালা খুলিয়া ফেলিলেন। বাহিরের মুক্ত সূর্য্যালোক সেই পথে যেন দৌড়িয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল, ঘরখানি বেশ প্রশস্ত—একদিকে একটা প্রাচীন পালঙ্কে সুসজ্জিত দুগ্ধফেননিভ শয্যা, পার্শ্বের দেয়ালে একটা প্রকাণ্ড ঘড়ী—ঘড়ীটা কিছু অস্বাভাবিক রকম বড়—বিপরীত দিকের দেয়ালে তিনখানা বড় বড় তৈলচিত্র একখানি হিন্দুস্থানী ভদ্র লোকের, মাঝের খানি একটা সাহেবীবেশে সজ্জিত বাঙ্গালীর, আর শেষেরখানি একটা সাহেবের ছবি। ছবিগুলির নীচে পিতলের ফলকে কাল অক্ষরে কি লেখা রহিয়াছে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া তাহা পড়িলাম। প্রথম খানির তলায় লেখা আছে—

Rai Sahib Narayan Singh of Jummarpur Aged 53, died in this very room on the 15th May 1855 Stabbed by Unknown Hand.

দ্বিতীয় চিত্রের নিম্নে লেখা আছে—

Dr. M. B. Ray of Calcutta aged 43. died in this very room on the 15th May 1875. Stabbed by Unknown Hand.

তৃতীয় চিত্রের নিম্নে লেখা আছে—

Lt. J. Patterson 23rd. Artillery Agra Aged 33, died in this very room on the 1895 15th May Stabbed by Unknown Hand.

ছাঁৎ করিয়া একটা অমঙ্গলকর সৌসাদৃশ্য আমার মনে জাগিল—আজ ১৯২৪ সালের মে মাসের ১৫ই এবং আমার বয়স মাত্র ২৩ তবে কি এই অজ্ঞাত নরহন্তার ছুরিকা আজ আমার শোণিতে তর্পণ করিবে? অজ্ঞাত বিভীষিকায় মনটা—শুধু মনটা কেন সমস্ত দেহটা পর্য্যন্ত ব্যাতাতাড়িত বেতস পত্রের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল। পেছনে চাহিয়া দেখি বন্ধুবর রামশরণ লাল নির্ব্বিকারভাবে দণ্ডায়মান—অধরে স্মিত হাস্য; সে বলিল, "কেমন শিববাবু, কিছু বুঝিলেন?" সত্য সত্যই তখন আমার মাথাটার ভিতরে বেশ গোলমাল হইতেছিল; বন্ধুর এই অতর্কিত প্রশ্নের আঘাতে সচেতন হইয়া বলিলাম, "কিছু কিছু আভাষ পাচ্ছি, কিন্তু ব্যাপারটা কি খুলিয়া বলিলে বড় ভাল হয়।" সেই ঘরের দুখানা চেয়ার জানালার কাছে টানিয়া লইয়া দুইজনে বসিলাম, বন্ধু তাঁহার অতীত স্মৃতির সিন্দুক খুলিয়া নিম্নলিখিত গল্পটী আরম্ভ করিলেন, "ছবির লেখা দেখেই বুঝছো যে এই ঘরে ঠিক ২০ বৎসর অন্তর একই তারিখে একই সময়ে তিনটী বিভিন্ন জাতীয় অতিথি খুন হইয়াছেন, তিন জনেই ঐ পালঙ্কে হত হইয়াছেন, একই প্রকার অস্ত্রের আঘাতে এবং তিনবারেই হত্যাকারীর কোন চিহ্ন

পাওয়া যায় নাই; এবং উপযুক্ত পুলিশ তদারক হওয়া সত্ত্বেও ঐ সকল হত্যার কোন কিনারা হয় নাই। আমার প্রপিতামহ ছিলেন নবীনগড়ের রাজার দেওয়ান, এখনকার রাজাদের মত তাঁহারা সাহেবসুবার সঙ্গে মিলিতে মিশিতে ভালবাসিতেন না। শুনিয়াছি লাটসাহেব বা পদস্থ সাহেব-সুবা আসিলে দরবারে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া করমর্দ্দন করিতে হইত বলিয়া তাঁহারা দরবার হইতে আসিয়া স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতেন, এতদূর নিষ্ঠাচারী হিন্দু ছিলেন তাঁহারা। আমার প্রপিতামহকে রাজা সাহেব বড়ই ভালবাসিতেন, তাঁহার মৃত্যুকালে এই মানভূম জেলার একখানা তালুক তিনি বখ্‌শিষ দিয়া যান—ভাগ্য মানুষকে কখন যে সুনয়নে দেখেন তাহা বলা একবারে অসম্ভব। ঐ জায়গীর পাইয়া রাজাসাহেবের দেহত্যাগের পর পিতামহ চাকরী ত্যাগ করেন। রাজার কার্য্য করিবার সময় ফ্রান্সিস্ লোভেট্ বলিয়া এক সাহেবের সহিত প্রপিতামহের বড় সদ্ভাব হয়—লোভেট সাহেব একজন খুব বড় ভূতত্ত্ববিৎ ছিলেন। তিনি নিজে প্রপিতামহের কোন উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ ঐ তালুকের জমী পরীক্ষা করিয়া বলেন যে ঐ সকল জমীতে উৎকৃষ্ট কয়লা আছে। পিতামহ তাহা শুনিয়া ঐ সমস্ত জমি ধীরে ধীরে খাস করিয়া লয়েন ও ক্রমশঃ বড় বড় ইংরেজ কোম্পানীর সহিত উচ্চ সেলামী ও মাসিক খাজনার ব্যবস্থায় ঐ জমি বিলি ব্যবস্থা করেন। সেই আমাদের সৌভাগ্যের প্রথম সূত্রপাত। মুন্সী দীনদয়াল (আমার প্রপিতামহের নাম) হঠাৎ একেবারে ক্রোড়পতি হইয়া গেলেন। টাকার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের মান সম্ভ্রম, উপাধি, বন্ধু, হিতৈষী, পরামর্শদাতার আগমন অবশ্যম্ভাবী। বৃদ্ধ বয়সে মুন্সী দীনদয়াল রাজা উপাধি পান এবং অনেক রাজরাজড়ার সহিত তাঁহার 'দোস্তি' হইয়া যায়। তিনিই এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন সে আজ প্রায় পঁচাশী বৎসরের কথা। বাড়ী নির্ম্মাণের পর তিনি বাড়ী সাজাইবার জন্য মূল্যবান আসবাব পত্রের সন্ধানে রহিলেন। হঠাৎ শুনিলেন যে কলিকাতায় এক সাহেবের কুঠীতে অনেক সৌখীন আসবাবপত্র নিলাম হইবে। তিনি নিজে কলিকাতায় যাইয়া বহুৎ জিনিষ নিয়ে আসেন। এইসব খাট পালং তাঁরই খরিদা। ঐ যে বড় ঘড়ি দেখছ ওটাও সেই সময়ে নেওয়া হয়। ঘড়ীটার মজা এই যে এটা এমনি কায়দায় তৈরী যে এতে দম দিতে হয় না। শুনেছি নাকি এ ঘড়ী এক দমে একশ' বছর চলে। ঘড়ীটার অসাধারণ আকৃতি দেখিয়া আমার হাসি পাইল, বলিলাম, "তা আর বেশী আশ্চর্য্য কি? এর যা 'সাইজ' তাতে ইনি অক্লেশেই একশ' বছরের দম উদরস্থ করে রাখতে পাবেন।" বন্ধুও ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে" কিন্তু মজা দেখ এই তিন তিনটা খুনই এই ঘরে হয়েছে এবং এই খাটের উপরই তিন জন মরেছে, আবার ঠিক একই জায়গায় শুয়ে, এবং তিন জনেরই ঠিক বুকের মাঝখানে অস্ত্রাঘাত ছিল—একই জায়গায়। সেই অবধি সাধারণের ধারণা এ অলৌকিক ব্যাপার এবং এই ঘরে ভূত আছে এই সকলের বিশ্বাস কিন্তু আমরা কখনও চোখে দেখি নাই। তবুও কি জান ভাই সাবধানের মার নাই তাই এই ঘর বন্ধই থাকে, সেই অবধি আর কাকেও এ ঘরে থাক্‌তে দেওয়া হয় না।

৫

অপরাহ্নে দুজনে বেড়াইতে গেলাম নদীর ধারে—নদীটি অবশ্য নামে মাত্র নদী—পাহাড়ে দেশের নদীর গ্রীষ্মকালে অবস্থা যা হয়ে থাকে এর অবস্থাও তাই ছিল—তবে নদীটির নামটি ছিল "যামিনী"—বেশ কবিত্বমাখা নাম। হাজারিবাগ অঞ্চলের এক অজ্ঞাত পাহাড়ের কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া মানভূমজেলা ভেদ করিয়া ইনি দামোদরকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এখন নদীতে মোটেই জল নাই কেবল ধূ ধূ করিতেছে বালি—যেন মরুভূমি। শুনিলাম বর্ষায় নাকি ইনি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করেন তখন দুকূল ভাসিয়া শস্যভরা মাঠগুলিও অধিকার করেন। পাহাড়ের ঘোলা জল যখন প্রবলবেগে নামিয়া আসে তখন এঁর গর্জ্জন সাগর গর্জ্জনের মত ভীষণ শোনায় এবং জলে এত টান হয় যে গরু মহিষও পার হইতে গেলে টানে ভাসিয়া যায় আর সেই নদী এখন জলহীনা জীবন্মৃতা—যেন বাঙালীর ঘরের বিধবা; বিধাতার চমৎকার সৃষ্টি! নদীর গর্ভে এখন বড় বড় পাথরের স্তূপ দেখা যাইতেছে তন্মধ্যে কতগুলি স্রোতে আনীত, কতগুলি

ভূগর্ভোত্থিত ; এসব পাষাণস্তূপ বর্ষার জলে ডুবিয়া যায় এবং ভীষণ আবর্ত্তের সৃষ্টি করে—সেই ঘূর্ণ্যমান জলরাশির গর্জ্জন ও চক্রায়াতগতি নদীর উদ্দাম ভীষণতা তখন আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তোলে। দুজনে নদীর গর্ভে বালুকা-স্তূপের উপর চঞ্চল বালকের মত দৌড়াদৌড়ি করিলাম —ছড়ির ডগা দিয়া কত জায়গা খুঁড়িলাম এবং মনের আনন্দে ক্রীড়ারত শিশুর মত সেই গর্ত্তে উত্থিত জল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিলাম কি মিষ্ট, কি মধুর! তার স্বাদ কি তৃপ্তিকর—যেন মাতৃস্তন্যের মত। মনে হল এই পাষাণকারায় ঘেরা দেশেও স্নেহময়ী মা আমার সন্তানের জন্য স্নেহসতর্ক দৃষ্টি লইয়া জাগিয়া বসিয়া আছেন—এ মার কাছে ছেলের বয়স নাই, ছেলে বড় বলে লজ্জা নাই—এর কোলে এলে আমি যে মানুষ—আমি যে বয়ঃপ্রাপ্ত এসব কোন ভাবনা চিন্তা জাগে না—মনে দ্বিধা উঠে না প্রকৃতির সঙ্গে মা-ছেলের এই মধুর সম্পর্ক সনাতন হইলেও ত চিরনূতন। অপরাহ্নে পশ্চিম দিকের মেঘে যখন কমলালেবুর রঙ ঢেলে দিয়ে সূর্য্য অস্ত গেলেন তখন সেখান থেকে দুজনে ফিরে এলুম।

রাত্রে আহারান্তে দুজনে অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প স্বল্প করিলাম পাশের ঘরের ঘড়ীতে যখন টং টং করিয়া এগারটা বাজিল, বন্ধু বাড়ীর ভিতর শুইতে গেলেন, তিনি যাইবার পর আমি দরজায় খিল দিয়া শুইব মনে করিতেছি—এমন সময় কক্ষস্থিত বর্ত্তিকার উজ্জল স্নিগ্ধ আলোকে দেখিলাম দেয়ালের একটা হুকে শিকলে গাঁথা তিনটী চাবি ঝুলিতেছে দেখিয়াই বুঝিলাম এ সেই 'যাদু-ঘরের চাবি।'

শুনিয়াছি অকারণে লোকে নাকি সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করিয়া দুর্ভোগ ভোগ করে, কাহারও সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়ঃ কাহারও কাঁধে খুন চাপে কিন্তু আমার ঘাড়ে চাপিল সে রাত্রে এক ভীষণ দুর্বুদ্ধি। আমার হঠাৎ মাথায় ঢুকিল যে আজ রাত্রিটা ঐ পাশের ঘরে শুইয়া থাকিব ও এই উপর্য্যুপরি হত্যার রহস্য হয় উচ্ছেদ করিব নয় তাদের মত হত হইব। গরীব কেরাণীর পুত্র নিবীর্য্য, সদাশঙ্কিত, হাঙ্গামা স্থান হইতে মাত্র পলায়নেপটু বাঙ্গালীর মাথায় এ সখ কেন জাগিল তাহার কারণ তখন আমি বুঝিতে পারি নাই ; কিন্তু বহুবর্ষ পরে আজ বুঝিয়াছি সে—'নিয়তি' ; সেই আমাকে ঘাড়ে জোয়াল দিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল এই রহস্যপুরীতে তার নিজের কোন্ মহাভীষ্ট সাধন করিতে তাহা তখন সেই মাত্র জানিত। এই রহস্যভেদের ইচ্ছা এত প্রবল হইল যে তখন বিপদের আশঙ্কা, জীবনের আশঙ্কা প্রভৃতি কোন আশঙ্কার বাধা আমায় নিরস্ত করিতে পারিল না। পকেট হইতে পেন্সিল লইয়া একখণ্ড কাগজে ইংরাজীতে লিখিলাম—

আমি শ্রীশিবপ্রসদে চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা…নং… লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত… এর পুত্র আমি স্বেচ্ছায় পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে রজনীযাপন করিতে যাইতেছি—যদি প্রভাতে জীবিত থাকি তবে এই হত্যারহস্যের সমাধান করিব আর যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি পূর্ব্ববর্ত্তী তিনজন ভদ্রলোকের মত অজ্ঞাত হত্যাকারী কর্ত্তৃক হত হই তবে আমার মৃত্যুর জন্য কাহারও কোন দায়ীত্ব থাকিবে না। আমার বন্ধু ও তাঁহার আত্মীয়বর্গকে অকারণ পুলিশ হাঙ্গামা ভোগ যাহাতে কবিতে না হয় তজ্জন্য এই স্বীকারোক্তি লিখিয়া বাখিলাম তাবিখ ১৫ই মে ১৯২৪ রাত্রি ১১টা ১০ মিনিট ; নিম্নে সহি করিয়া কাগজখানি আমার শয্যার উপর রাখিয়া কক্ষের দ্বাব ভেজাইয়া এক হাতে একটী জলন্ত বাতী ও অপর হাতে যাদুঘরের চাবি লইয়া ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

৬

ঘরের দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিবা মাত্র একঝলক গরম হাওয়া এসে আমার নাকে মুখে চোখে লাগিল—যেন কোন ক্রুদ্ধ ব্যক্তির রুদ্ধশ্বাসের মত—অজ্ঞাত আশঙ্কায় শরীরে বেপথু আসিল—জিহ্বা যেন শুষ্ক হইয়া গেল তবুও আমার কৌতূহল আমাকে সাহসী করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিল—আমি দ্বাব ভেজাইয়া দিয়া সেই জানলার কাছে চেয়ারে বসিলাম—বর্ত্তিকার মৃদু আলোকে কক্ষস্থ পুঞ্জীভূত অন্ধকার তরল হইয়া গেলেও যেন একেবারে বিদূরিত হয় নাই ; আরও আলোক ও বাতাসের জন্য প্রাণটা যেন হাঁপাইতেছিল—তাই সম্মুখস্থ জানালাটা খুলিয়া দিলাম অবশ্য ধীরে ধীরে, কি জানি শব্দ হইলে যদি কেহ জাগিয়া উঠে তাহা হইলেই তো সব ফাঁস হইয়া যাইবে। বাহির হইতে জ্যোৎস্নার প্রফুল্ল আলোক

আসিয়া ঘরের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল মনে হইল যেন একটী সুন্দর শিশু আনন্দে হাসিতেছে ও হাত পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে—বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিলাম চারি দিক নিস্তব্ধ কেবল ভিতরের দিকে দোতলায় একটী ঘরে মৃদু আলোক ও সার্শিতে মানুষের ছায়া দেখিতে পাওয়া গেল। চারিদিকে গাঢ় নীরবতা—পাষাণের মত নিস্তব্ধতা বিরাজিত, ঠিক যেন মৃত্যুর রাজ্য কোনরূপ শব্দ বা স্পন্দনের চিহ্নমাত্র নাই। একাকী বাতায়নপথে চাহিয়া বসিয়া আছি মনে কৌতূহল ও আশঙ্কার পর্য্যায়ক্রমে আন্দোলন চলিতেছে; কখন বাড়ীর কথা, বাপ্ মার কথা মনে পড়িয়া মন দ্রবীভূত হইয়া চক্ষে অশ্রুরূপে আসিয়া পল্লব-গুলিকে সিক্ত করিতেছে আবার কখন এই রহস্যোদ্ভেদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের আনন্দ মনে জাগিয়া মনকে দৃঢ় ও গর্ব্বের আনন্দে পূর্ণ করিতেছে এমন সময় দেয়ালের ঘড়ি টং টং করিয়া বাজিতে লাগিল—বুঝিলাম বারটাই বাজিবে—সেই দিকেই চাহিয়া আছি ও মনে মনে ঘটীকার বাদ্যধ্বনি শুনিতেছি যেমন বার গোণা শেষ হইল অমনি ঘটাং করিয়া একটা আওয়াজ হইয়া ঘড়ির ডায়েলের নীচের দরজাটা আপনি খুলিয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে দুই ফুট আন্দাজ উচ্চ একটী ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি প্রায় দুই হাত বাহিরে আসিল—তাহার দক্ষিণ বাহু প্রসারিত, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ সেই মুষ্টিতে প্রায় এক ফুট লম্বা একখান তীক্ষ্ণধার লৌহ ফলক—বাহিরে আসিয়াই মূর্ত্তির হাত তিনবার উঠিল ও নামিল অর্থাৎ তিনবার যেন শূন্যে ছুরিকার আঘাত করিল আবার আপনাআপনি ভিতরে চলিয়া গেল ও সশব্দে ঘটিকার দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। আমি বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম পরক্ষণেই মনে হইল যেন চৈতন্য হারাইয়া মেঝেতে পড়িয়া গেলাম।

* * * *

জ্ঞান হইলে চাহিয়া দেখি দিবালোকে চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল, আমি শয্যায় শায়িত; বন্ধুবর রামশরণ আমার মাথায় আইস-ব্যাগ ধরিয়া বসিয়া আছেন—ঘরটা অডিকলনের গন্ধে গুলজার হইয়া রহিয়াছে আমার পার্শ্বে একটা স্মেলিং সল্টের শিশি পড়িয়া, দুএকজন ভৃত্য উন্মুখ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে একজন সাহেব ডাক্তার কক্ষে পাইচারী করিতেছেন—আমি নেত্রোন্মীলন করিলে রামশরণ জিজ্ঞাসা করিল "কেমন শিববাবু—একটু ভাল বোধ করিতেছেন" আমি একটু হাসিয়া উঠিয়া বসিলাম, শরীরে বাস্তবিক তখন কোন গ্লানি আর ছিল না। ডাক্তার বাবু আসিয়া নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, "আর কোন ভয় নাই—এইবার খানিকটা গরম দুধ খাইতে দিন।" বেহারা তাড়াতাড়ি দুধ আনিয়া দিল—পান করিয়া বেশ সুস্থবোধ করিলাম তখন উঠিয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া বন্ধুকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলিলাম। বন্ধু হাসিয়া আনন্দে আমায় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "আরে সাবাস বাঙ্গালী।"

* * * *

তারপর দিবালোকে উভয়ে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই দরজাটী খুলিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুতেই আর সে দরজা খুলিতে পারিলাম না। উভয়ে বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। বন্ধুর পিতা সমস্ত শুনিয়া খুব আনন্দপ্রকাশ করিলেন ও তখনি কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহেব ঘড়ীওয়ালার নিকটে একজন খুব ভাল সাহেব কারীগর পাঠাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিলেন। পরদিন অপরাহ্নের এক্সপ্রেসে একটী বাঙ্গালী বাবু ও একজন সাহেব সেই ঘড়ীওয়ালা সাহেবদের পত্র লইয়া আসিলেন—নিকট-বর্ত্তী থানাতেও সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল—ইন্‌স্পেক্টার বাবুও আসিলেন—তাঁহারা আর একবার আমার মুখ হইতে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া লইলেন; ইন্‌স্পেক্টার বাবু সব নোট করিলেন—সাহেবটী বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিল—সেই রোগা বাঙ্গালী বাবুটী তখন উঠিয়া ঘড়িটীর অবস্থান বেশ করিয়া দেখিয়া লইলেন ও চাকরদের সাহায্যে সেটী নামাইয়া আনিয়া মেঝেতে উপুড় করিয়া রাখিয়া কৌশলে পিছনের তক্তাগুলি খুলিয়া ফেলিলেন—তারপর ভিতরের কল কব্জাগুলি নিরীক্ষণ করিয়া ঘড়িটাকে খাড়া করিয়া বসাইলেন। চারিজন চাকর পিছনদিক হইতে ঘড়িটী ধরিয়া রহিল ঘড়িটীর পশ্চাৎভাগ খোলা অবস্থায় আমাদের সামনেই রহিল তখন একটী খুব সরু স্ক্রুড্রাইভার দিয়া তিনি একটী স্প্রীং খুলিতে লাগিলেন খানিকক্ষণ পরে সেই রাত্রের মত ঘটাং করিয়া আওয়াজ হইয়া ডায়লের নীচের দরজা খুলিয়া সেই ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি বাহির হইল ও শূন্যে

তিনবার ছুরিকাঘাত করিয়া সেখানেই নির্জীব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—ব্যাপার দেখিয়া সকলের নেত্র বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল কাহারও মুখে আর কথা নাই। ক্ষণপরে সাহেবটী আসিয়া সে মূর্ত্তিটীকে ঘড়ির পেণ্ডুলম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন তখন ঘড়ির ভিতরটা সকলে দেখিতে লাগিলেন ভিতরে একখণ্ড হস্তিদন্তের ফলকে এক দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কি লিখিত ছিল; সাহেব সেটী লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন ও বলিলেন এ সম্বন্ধে তিনি যাইয়াই একটী পত্র দিবেন—তাঁর না আসা পর্য্যন্ত বাঙ্গালী বাবুটী এখানে থাকিবেন।

৭

সাতদিন পরে সাহেবের পত্র আসিল তিনি সেই লেখার পাঠোদ্ধারে জানিতে পারিয়াছেন যে এই ঘড়ি রোমনগরী এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারিগরের তৈয়ারী ইহা সুন্দরী-শিরোমণি লুক্রেশিয়া বর্জ্জিয়ার আদেশ অনুসারে প্রস্তুত হয়। তিনি তাঁহার অপ্রীতিভাজন প্রণয়ীগণকে ইহার সাহায্যে ইহলোক হইতে বিদায় দিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জনৈক রোমান ক্যাথ্‌লিক ধর্ম্মযাজক ইহা অপহরণ করিয়া ইংলণ্ডে পলায়ন করেন কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার শুশ্রূষাকারিণীকে ইহা দান করেন—ঐ রমণী কোন সময়ে অভাবগ্রস্থা হইয়া এই ঘড়ি সেখানকার এক ব্যবসায়ীকে বিক্রয় করেন—ঐ ব্যবসায়ীর পুত্র ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন তিনি বহুদিন কলিকাতায় অবস্থান করিয়া প্রচুর অর্থো-পার্জ্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালীন নিজের আসবাব-পত্রের সহিত ইহা নীলাম করেন কিন্তু ঐ ধর্ম্মযাজক ব্যতীত ইহার রহস্য কেহই জানিত না এবং তিনিও মৃত্যুকালে ঐ রহস্যের কথা কাহাকেও জানাইয়া যান নাই। কিন্তু এ যাবৎ ঐ শয়তানী ঘড়ী নরহত্যা করিবার মত সুযোগ না পাওয়ায় উহার সম্বন্ধে কোনরূপ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয় নাই। বাঙ্গালী কারীগরটী তখন ঐ ঘড়িটী আবার পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন।

আরও কয়েকদিন সেখানে আনন্দে অতিবাহিত করিলাম—সেখানে আমার বুদ্ধির প্রশংসা এত জাহির হইয়া পড়িয়াছিল যে পথে বাহির হওয়া আমার পক্ষে দায় হইয়া পড়িল—বন্দেগী বাবু ও রামরামের ঠেলায় আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম সকলেরই মুখে "এয়সা হুঁসিয়ার বাঙ্গালী" "কেয়সা সাফ্ মগজ" "কেয়সা ভরোসা" প্রভৃতি শুনিতে শুনিতে কান ঝালাপালা হইয়া উঠিল, আর বন্ধুবরের পিতৃ-দেবের আমার প্রতি স্নেহ এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে তাহা আর বলিবার নহে। আসিবার দিন দুই বন্ধুতে সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইব এমন সময় তাঁহার পিতা আমার হাতে একখানা আঁটা খাম দিয়া বলিলেন ইহা কলিকাতায় যাইয়া খুলিও। আমি বাটী ফিরিয়া সেখানকার কথা একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিলাম—একদিন হঠাৎ সেখানকার কথা মনে পড়ায় খামটী টেবিলের ড্রয়ার হইতে বাহির করিয়া খুলিয়া দেখি তার মধ্যে আমার নামের একখানা ত্রিশ হাজার টাকার বেয়ারার চেক—সঙ্গে একখানি পত্র তাহার মর্ম্ম এই যে প্রত্যেকবার এই হত্যার পর তাঁহার হত্যাকারীকে ধরিয়া দিবার জন্য বা তাহার সন্ধান দিবার জন্য তাঁহারা দশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনবারে ঐ পুরস্কার মুদ্রা ত্রিশ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে—ঐ টাকা ন্যায়তঃ আমারই প্রাপ্য বলিয়া বন্ধুর পিতা এই চেক আমায় আন্তরিক স্নেহের চিহ্নস্বরূপ উপহার দিয়াছেন আমি বন্ধুকে সব জানাইলাম—রামশরণ বলিল "ও নিতে সঙ্কুচিত হয়োনা বন্ধু ও ভাগ্যদেবীর উপহার।"

ইহার তিনমাস পরে সংবাদপত্রে পড়িলাম এই ঘটনা বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রোমের মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষ ঐ ঘড়িটী পাইবার জন্য একলক্ষ পাউণ্ড মূল্য দিতে স্বীকৃত হইয়া পত্র দিয়াছেন—বন্ধুর পিতাও ঐ বিপজ্জনক ঘড়ি ঘরে রাখা অপেক্ষা যেখানকার পাপ সেখানে বিদায় দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কাঞ্চনমূল্যকেই নিজ ভাণ্ডারে স্থান দিয়াছেন।

কাজের কথা

মহাত্মার কাছে দেশ কি চায় ?—কেহ কেহ মনে করিতেছেন মহাত্মার অহিংস অসহযোগ আন্দোলন বিফলে গিয়াছে, তাই তাঁহারা মহাত্মাকে রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়া অপর প্রকার আন্দোলনের বাধা দূর করিতে বলিতেছেন—ইহার উত্তরে মহাত্মা যাহা বলিয়াছেন তাহা সকল ভারতীয়েরই প্রণিধান যোগ্য। মহাত্মা বলেন :—কখন কি ভাবে আমি দেশের রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইব সে সম্বন্ধে কাহাকেও কোন কথা কখনো আমি দেই নাই। ভারত যদি আমার কথা না শুনিয়া রক্তরঞ্জিত বিপ্লবের পথেই যায় তবে আমি অবশ্যই রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইব—এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনো বলিতেছি। তেমন আন্দোলনে ভারতের কিম্বা জগতের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না—তাই তাহাতে আমার কোন অংশ গ্রহণ করিবারও দরকার নাই। আমার মনে হয় জগত সশস্ত্র বিদ্রোহে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমার বিশ্বাস অপর দেশের পক্ষে যাহাই হোক না কেন ভারতে এ ধারার রক্ত-রঞ্জিত বিপ্লবে কোন কার্য্য হইবে না। যে আন্দোলনে সাধারণ লোক তেমন কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করিতে না পারে সে আন্দোলন তাহাদের কোন উপকারও করিতে পারে না। রক্তরঞ্জিত বিপ্লব কৃতকার্য্য হইলেও জন-সাধারণের দুঃখ কষ্ট তাহাতে আরও বাড়িবেই—এখনো যেমন তখনো তেমনি তাহাদের বিদেশী শাসনের অধিকারেই থাকিতে হইবে।'

দেশের অবস্থা নানা জনে নানা ভাবে চিন্তা করে। মহাত্মার সত্য দৃষ্টি সকলের থাকা সম্ভব নহে—কিন্তু তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়া আমাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। দেশনীতি বর্জ্জিত রাজনীতি প্রচেষ্টা কোন দিন কোন দেশে সার্থক হইয়াছে কি ? দুয়ের সামঞ্জস্য বিধানে ভারতের মুক্তির ব্যবস্থা অগ্রসর করিতেই কি মহাত্মার রাজনীতি-ক্ষেত্রে থাকিবার প্রয়োজন আছে ? ভারতীয় উচ্চ সভ্যতার চিরন্তন বাণী প্রচারের জন্যই কি এই সত্যসন্ধ মহাপুরুষ আজও রাজনীতির জঞ্জালের মধ্যে আছেন ? রাজনীতির জঞ্জাল দূর করিয়া মানবতার সত্য বাণীর প্রকাশই কি মহাত্মা রাজনীতিতে দিতে চাহিতেছেন ?

জগতের শ্রেষ্ঠব্যক্তি কে—এযুগে ?—মান্দ্রাজে বক্তৃতাকালে রেভারেণ্ড ডাঃ চার্লস্ গিলকে বলিয়াছেন—জগতের তরুণ যারা তারা সকলেই দেশ ও জাতীয়তার বাধা এড়াইয়া সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে কোন মতামত দেওয়া সহজ নহে—তবে আত্ম উন্নতির জন্য মহাত্মা যাহা করিতেছেন তাহা শুধু এ দেশে নয়—সমগ্র জগতে এ যুগে অপূর্ব্ব।

কোহাট সমস্যা—দেশের আশা ও নিরাশা ঃ—কোহাটে হিন্দু-মুসলমানের দু' পক্ষের সম্মানজনক প্রাণের মিলন মহাত্মাও বুঝি ঘটাইতে পারিলেন না। দেশের হিন্দু-মুসলমান সর্ব্বজাতীয় নেতারাই কোহাট হাঙ্গামা মিটাইতে উদ্যোগী ছিলেন—কিন্তু কেন ইহা সম্ভব হইতেছে না ? নেতাদের সাধু ইচ্ছায় যাহা সফল হইল না—মহাত্মা পর্য্যন্ত যাহাতে হাল ছাড়িয়া দিতেছেন তেমন সমস্যাও গবর্ণমেণ্টের শাসন ব্যবস্থায় সহজেই মিটিতে পারে এবং মিটিতে বাধ্য হইবেও। এই সব অবস্থা দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে আশা জাগে না নিরাশায় চিত্ত ভরিয়া আসে ? মহাত্মা মনোদুঃখে বলিয়াছেন 'I am but a broken reed not worth relying upon.' ভারতের অবস্থা ভাবিলে সকলের চিত্তই কি এমনি অবিশ্বাস ও অশান্তিতে ভরিয়া আসে না ? মহাত্মার এ উক্তি জাতীয়তার হৃদয় ভাঙ্গা হাহাকার ছাড়া আর কি হইতে পারে ?

জগতের পণ্যক্ষেত্র ভারতের অবস্থা ঃ—ভারতের ব্যবসায় ক্ষেত্র অধিকার করিবার জন্য জগতের ক্ষমতাশালী ব্যবসায়ী জাতিদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা ও রেশা-রেশি চলিতেছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মেনী, জাপান, ইটালী সকলেই নানা রং বেরঙ্গের পণ্য দিয়া ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে।

জগতের পণ্য চালাইবার শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ। ভারত কি ধরণের মাল চায় তাই জানিয়া জগতের ব্যবসায়ীরা মাল তৈরী করে। জগতের মহা ক্ষমতাশালী ব্যবসায়ী জাতি সমূহের অর্থ বাহির করিবার মুখ্য উৎস যে দেশ সে দেশের লোককে তারা যদি ধনবান মনে করে তবে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় কি উপায়ে? এই সব পণ্য যদি ভারত নিজে প্রস্তুত করে ও এই পয়সা যদি সে সত্যই ঘরে রাখিতে পারে তবে ভারতের মত ধনী জগতে কে? ভারতীয় ধন-বিজ্ঞানবিদ্ ও রাজনীতিকেরা এ সম্বন্ধে কি মত পোষণ করেন?

বিষের ব্যবসায়ে দায়ী কে ঃ—চীনে বিস্তর আফিংয়ের চাষ হয়। ভারতেও আফিংয়ের চাষ হয়। ভারতের আফিংয়ের চাষ ভারত সরকার নিয়ন্ত্রিত করেন। ইহা চাষের ও উৎপন্নের ব্যয় বাদে বিক্রীতে যে প্রচুর লাভ হয় তাহা ভারত সরকারেরই থাকে। পারস্যে তুরস্কেও এই দ্রব্যের চাষ হয়। এই মহা বিষ হইতে মরফিয়া, হিরয়ন প্রভৃতি উন্নত পর্য্যায়ের বিষাক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করে জাপান, সুইজারল্যাণ্ড জার্ম্মেনী প্রভৃতি। এক আফিং লইয়া জগৎজোড়া একটা মহাবিষের ব্যবসায় চলিয়াছে। আমেরিকায় নানা আকারে এই বিষ বেজায় চলিয়াছে। আমেরিকা ইহাতে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর। চীন কিন্তু আফিংয়ের চাষ বন্ধ করিতে নারাজ। চীন সেনাপতিরা আফিং চাষে জোর করিয়া চাষীদের বাধ্য করিতেছে—তাই আফিং নিবারণী দল বলিতেছেন চীন যদি জোর করিয়া এই বিষের চাষ চালায় তবে চীনে অস্ত্র শীঘ্র আমদানী বন্ধ করিতে হইবে। কোন কোন সংবাদপত্র ইহাতে উৎসাহী হইয়া বলিতেছেন আফিং চাষের জন্য না হোক চীনে ঘরোয়া বিবাদ লাগিয়াই আছে—তাই এখানে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী না হইতে দেওয়াই ভাল। এসব খৃষ্ট-প্রেমের রাজনীতি ধান ভানিতে শিবের গীত! কিন্তু এই বিষের চাষ ও বিষব্যবসায় চালাইতেছে কোন দেশের চাষী সমাজ নহে—দেশের সরকারই। ভারত সরকারেরও ইহা বন্ধ করিবার যেমন প্রয়োজন আছে চীন সরকারেরও তেমনি প্রয়োজন আছে। তুর্ক পারস্যও এবিষয়ে সজাগ হইতে বাধ্য হইবে। আর এই কাল মাণিক বিষকে যাহারা চিকণ করিয়া জগৎজোড়া ব্যবসায় চালাইতেছে তাহাদেরও বেজায় ঘা পড়িবে। বিষকে এভাবে ব্যবসায় পণ্যরূপে চালানো এই সভ্যযুগেই সম্ভব হইয়াছে। কোন দেশ এ ব্যবসায়ে বেশী অগ্রসর তাহা দেখিয়া অপর দেশের ক্ষোভের কারণ নাই—জগতের সভ্যজাতীয় নরনারী এই বিষ ব্যবসায়ের বাণিজ্যনীতিক প্রচার বন্ধ করিতে আজ বদ্ধপরিকর। বিষ বন্ধ করাতে মনুষ্যত্বের অনুশাসন যাহারা মানিতে চাহিবে না তাহাদের বাধ্য করিয়া ইহা অবশ্যই মানাইতে হইবে। ঔষধার্থে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে—বিলাস-নেশা হিসাবে কখনো নহে। আমেরিকানরা এই নেশায় বেজায় আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে—তাই তাহারা ইহা বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর। সকল জাতির উন্নত-চরিত্র মানবই এ বিষ ব্যবসায়ের উচ্ছেদ চাহিতেছে।

ফরাসী বিধবার স্বামী-স্মৃতি ঃ—সম্প্রতি কোন এক ফরাসী মহিলা তাঁহার স্বামীর স্মৃতি-রক্ষার্থে কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে সোয়া দু'লাখ টাকা ও তাঁহার স্বামীর চিত্রসংগ্রহ প্রদান করিয়াছেন। সে চিত্র-সংগ্রহও এক বিরাটব্যাপার—এই চিত্রগুলি সুব্যবস্থায় রাখিবার জন্যই একটি মিউজিয়াম তৈরী করিতে হইবে। চিত্র রাখিবার মিউজিয়াম তৈরী করিবার জন্যই মহিলাটি ঐ সোয়াদু'লাখ টাকা দিয়াছেন। এই ফরাসী বিধবার স্বামী হিন্দুধর্ম্ম ভালবাসিতেন—তাই সাধ্বী ফরাসীমহিলা এইভাবে দান করিয়া স্বামীর আত্মার প্রীতিসম্পাদন করিলেন। বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ও দূর সাগরপারের বিদেশিনীর এই শ্রদ্ধা-দান পাইয়া ধন্য হইল।

সঙ্গীত বিশারদের মৃত্যু ঃ—সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ওস্তাদ গুণী রাধিকা গোস্বামী মহাশয় আর নাই। যাঁহারা ইহাঁর মধুরকণ্ঠ ও যন্ত্রধ্বনি শুনিয়াছেন তাঁহারা জীবনে সে ধ্বনি ভুলিতে পারিবেন না। আলাপ আপ্যায়নও ইহাঁর এত মিষ্ট ছিল যেন সুধারস ঝরিয়া পড়িত। ইহাঁর মৃত্যুতে বাংলার ও ভারতের এদিকের যা ক্ষতি হইল তাহা কোন দিন আর পূরণ হইবে কিনা জানি না। আর একটি মহিলা গায়িকা তরুণ বয়সেই কালের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন—ইনি শ্রীমতী সবিতা পারেখ। বাঙ্গালী না হইলেও সুকণ্ঠে এই তরুণী বাংলা মাতাইয়াছিলেন। ভগবান ইহাঁদের আত্মার সদ্গতি করুন।

লর্ড রেডিংয়ের বিরাটদান ঃ—ভারতে নানা রোগের মধ্যে কুষ্ঠও একটি ভয়ানক ব্যাধি। এই এই ব্যাধি যাহাতে আর বিস্তৃত হইতে না পারে সেজন্য ভারত সরকার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। স্বয়ং গবর্ণর জেনারেল এই ব্যাধি নিরোধ কল্পে যে আয়োজন চলিয়াছে সেই ফণ্ডে অর্দ্ধ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছেন। লর্ড ও লেডী রেডিংএর এই দান প্রশংসনীয়। আশা করি ইহাদের আদর্শে এই কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানকে আর অর্থাভাবে বন্ধ হইতে হইবে না।

মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সার সঙ্কলন

বিদ্রোহীর আত্ম-সমর্থন

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১২ই ফেব্রুয়ারীর ইয়ং-ইণ্ডিয়া হইতে সংগৃহীত)

বিদ্রোহীর পত্র ঃ—আজ এক বৎসর ছেড়ে প্রায় পাঁচ বৎসর গত হ'ল কিন্তু আপনার অহিংস অসহযোগ ত' কই ফলবতী হ'ল না—আর কত দেরী? দেশের ছেলেরা আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছে—এমনভাবে দিয়েছে যেরকম তারা এ'র আগে আর কখন দেয়নি—তাদের মধ্যে আশা উৎসাহের কোন অভাব নেই—আপনার আন্দোলনে অর্থের অভাব নেই—অর্থ ও সামর্থ্য দুইই আশাতীতরূপে পেয়েছেন কিন্তু হায়, তাদের আশা আজও পূর্ণ হ'ল না! হ'ল না কেন? তার কারণ আপনি যে পথে তাদের নিয়ে যেতে চান সে পথে গেলে তাদের আশা ফলবতী হতে পারে না—আপনি হয়ত বলবেন আপনার কাজে ভীরুর অহিংসা আপনি চাননি—চেয়েছিলেন বীরের অহিংসা—তাহার ক্ষমা—তাহার ধৈর্য্য, কিন্তু আপনার কার্য্য প্রণালীতে ভীরুকে কি ক'রে বীরে পরিণত করা যায়, সে পন্থার উল্লেখও নাই। ভারতবাসীরা কাপুরুষ নয়! তারা এর আগে অনেকবার তার পরিচয় দিয়েছে—ইতিহাস তার উজ্জ্বল প্রমাণ! তারা এখনও সে বীরত্ব ভুলে যায় নি—তা প্রকটিত হবে একদিন—যেদিন তারা উপযুক্ত নেতা ও গুরু পাবে—যথা গুরু গোবিন্দ সিং, গুরু রামদাস এবং শিবাজী! আপনি যে দার্শনিক মত প্রচার কর্চ্ছেন তা বীরের ক্ষমা নয়, ঋষি বর্ণিত ক্ষমা ও অহিংসা নয়—তাহা টলষ্টয় ও বুদ্ধের মতের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ! এদেশের কর্ম্মীদের পক্ষে তাহা রুচিকর হ'তে পারে না—যদি জাতির কল্যাণের জন্য রক্তপাতের প্রয়োজন হয়, তবে ভারতবাসী তাতেও কুণ্ঠিত হবে না! আপনি কংগ্রেস অধিবেশনে বিদ্রোহীদের প্রতি অন্যায় অভিযোগ করেছেন আপনি বলেন যে তারা ভারতের উন্নতির পথে বিষম অন্তরায় কিন্তু আমি বলি যে এ পর্য্যন্ত যদি ভারতের রাজনৈতিক উন্নতি একটুও হয়ে থাকে, তবে সেটুকুর জন্য ভারত আজও এই বিদ্রোহীদের কাছে ঋণী—তার সাক্ষী—বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলন—মর্লি-মিণ্টো সংস্কার—মণ্টফোর্ড সংস্কার ইত্যাদি। আপনি যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের এ বাহাদুরীটুকুও কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেন—তবে আমিও বলি যে ভারত রাজনৈতিক বলেও কম বলীয়ান্ হয়নি এই বিদ্রোহীদের কল্যাণে! তারা আজ মরবার ভয়ে পালায় না—তারা দেশের জন্যে দশের জন্যে মরণে যে কি সুখ তা বুঝেছে। প্রাণভরা বিশ্বাস থাকলে, নিজের জাতির মধ্যে ভগবানের স্বরূপ দেখতে শিখলে, মৃত্যুভয়ও তখন তাদের ভয় করে চলে, তা তারাই প্রথম দেখিয়েছে।—একে কি আপনি নৈতিক উন্নতি বলেন না?

বিদ্রোহীরা তাদের মধ্যে অশিক্ষিতদের ডেকে আনেনি এইজন্য, যে তারা আপনার অনুবর্ত্তী নেতাদের চেয়ে এই অশিক্ষিতদের বেশী চিনত। উত্তরভারতের অশিক্ষিতদের টানতে গিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড ঘটে ছিল সেজন্য দায়ী আপনি এবং আপনার অনুগামীগণ, বিদ্রোহীরা নয়? আপনারা বুঝতে পারেন নি যে তাদের প্রাণের ভিতর কত বৎসরের সঞ্চিত অত্যাচারের কথা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে হঠাৎ ক্ষতের মুখ ছিঁড়ে গিয়ে ছুটল শোণিতপ্রবাহ! যদি বলেন তোমাদের জন্য নির্দ্দোষ ব্যক্তিরাও শাস্তি পায় তবে বলি যারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে তাদের একজনও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ নয়! আর যাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে তাদের কতক নির্দ্দোষ বটে, সেটা আমাদের দোষ নয় সেটা সরকারের ভুল, ভারতবাসীর মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখলেই তাহাকে চেপে পিষে ফেলতে গিয়ে দমনের অত্যধিক আগ্রহে তাঁরা এই ভুল করেন।

আপনি বলেন যে আমরা যাদের হঠাতে চাই তারা আমাদের চেয়ে বেশী অস্ত্রবিশারদ ও কৌশলী? কিন্তু এটা কি কখন মনে স্থান দেন নি যে তাদের মুষ্টিমেয় জনসংখ্যা আজ আমাদের কোটী কোটী লোককে শুধু চোখ রাঙিয়ে দমন কর্চ্ছে—শাসন কর্চ্ছে আর যথেষ্ট অত্যাচার চালাচ্ছে এটা আমাদের কম দুর্ভাগ্যের কথা নয়!—আপনি কোন সূত্রে কোন্ যুক্তিতে একথা বলেন যে আমরা তাদের মত এবং তাদের চেয়ে ভাল হতে পার্ব্ব না?—আপনার এ যুক্তির ভিত্তি কোথায়? এই জন্যেই বলি যে আপনার ক্ষমা শক্তিমানের ক্ষমা নয় এ কেবল নৈরাশ্যের ক্রন্দন আর আশাহতের অক্ষম ধৈর্য্য!—ইহা শুধু সহজ, সরল—তামস!

বিদ্রোহীরা তাদের সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়েছে শুধু দেশ-মাতার সেবার জন্য—তাই বলি, যদি তাদের এ অবস্থায় সাহায্য না কর্ত্তে পারেন অকারণ দোষারোপও কর্ব্বেন না।

মহাত্মার উত্তরঃ—আমি যেদিন ঠিক বুঝব যে ভারত চায় রক্তাক্ত বিদ্রোহ সেদিনই আমি তার রাজনৈতিকক্ষেত্র হ'তে অবসর গ্রহণ কর্ব্ব। ভারতবাসী যে আমার ডাকে সাড়া দিয়েছে তা আমি অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করি আর আমার চেষ্টা যে আশাতীত ফললাভ করেছে তাও স্বীকার করি—আরও স্বীকার করি যে তারা অপূর্ব্ব সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে—কিন্তু একথাও বলি এই প্রচেষ্টা সাফল্যে মণ্ডিত কর্ত্তে হ'লে যতটা অহিংসার প্রয়োজন ততটা ধৈর্য্য এখনও আমাদের মধ্যে নাই তাই এই ব্যর্থতা। আমার দার্শনিক মত' কেবলমাত্র আমার প্রাণের সবল সত্যের অনুভূতি ইহাতে মিশ্রণ নাই—মনে হয় এ অনুভূতি গীতার গোমুখী-নিঃসৃত।

অকারণ রক্তপাতের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণা জন্মেছে রক্তপাতের চেষ্টা কেবল দুঃখকে বরণ করা বই আর কিছু নয়—আমার বর্ণিত অহিংসা—বলীর অহিংসা কিন্তু অতি দুর্ব্বলেরও ইহাতে অধিকার আছে ইহা সর্ব্বজীবে সমভাবে সুশোভন।

বিদ্রোহীদের স্বার্থত্যাগে ও বীরত্বে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই তবে তাদের প্রতি অভিযোগ করি শুধু তাদের বীরত্বের ও ক্ষমতার অপব্যয়ে ও অপপ্রয়োগে!

স্বরাজলাভের পথে বর্ত্তমানে বড় অন্তরায় হচ্চে চরকার প্রচলন কমে যাওয়া—হিন্দু মুসলমানের অহেতুকী মনোমালিন্য—অস্পৃশ্যদের উন্নত না করা।

কার্য্যের সমালোচনা করা আর অন্যায় অভিযোগ করা এক নয়। আমার ভুল হ'লে বিদ্রোহীদের তাহার সংশোধন ইচ্ছা প্রকাশের যতটুকু অধিকার আছে আমারও তাদের ভুল দেখিয়ে দেবার ততটুকু অধিকার আছে।

মহাত্মার স্থির ধীর বিচক্ষণ উত্তরে যে বিবেচনা করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা উচিত তাহা বলা বাহুল্য।

রামগড়ের নাচঘর

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

বাঙ্গলার দক্ষিণ-পূর্ব্বে সুরগুজা(১) ষ্টেট্। রামপুর এই ষ্টেটেরই একটী পরগণা। এই পরগণায় লখনপুর গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে চার ক্রোশের মধ্যে একটী পাহাড় আছে। পাহাড়টী তার পাদদেশ থেকে ২৬০০ ফুট উঁচু। এই পাহাড়ের নাম রামগড় (২)। কলিকাতা থেকে রামগড় যেতে

১। কেহ কেহ এই শব্দটীর উচ্চারণ করেন 'সরগুজা' বা 'সিরগুজা', কথাটীর প্রকৃত উচ্চারণ 'সুরগুজা'। পূর্ব্বে সুরগুজা ছোটনাগপুরের এলাকাভুক্ত ছিল।

২। আমার কোনদিন রামগড় যাবার সুবিধা ঘটে নি। কাজেই নানা লেখকদের বর্ণনা পড়ে', নক্সা, চিত্রাদি দেখে' বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখতে বাধ্য হয়েচি। রামগড়ে যাঁরা গিয়েছিলেন অথবা রামগড়ের বিষয় যাঁরা লিখেচেন নিম্নে তাঁদের প্রবন্ধের উল্লেখ করা গেল।

১৭৯২ সালে সরকার বাহাদুরের সুরগুজার উপর প্রথম নজর পড়ে। ১৮১৮ সালে অল্পা সাহেবের সঙ্গে সন্ধি হয়ে সুরগুজা বৃটিশদের অধীনতা স্বীকার করে। ৭০।৭৫ বছর আগে সংস্কৃতাধ্যাপক কাপ্তেন ফেল (Captain Fell) রামগড় পাহাড় দেখতে এসেছিলেন। তিনি এই পাহাড়ে উঠে' প্রসিদ্ধ রামগড় মন্দিরে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পথে জ্বর হয়ে মারা যান। তারপর কর্ণেল উসলী (Col. J. R. Ousley) রামগড় পাহাড় দেখে' ১৮৪৭ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখে ছোটনাগপুর থেকে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সেক্রেটারীদের একখানি পত্র লেখেন। এই পত্রে রামগড় ও সুরগুজার অন্যান্য স্থানের বিবরণ আছে। পত্রখানি ১৮৪৮ সালের ঐ সোসাইটীর পত্রে (J. A. S. B.—[illegible] পৃষ্ঠায়) মুদ্রিত হয়েচে। ইনি রামগড়ের অদ্ভুত গুহাগুলি ও হাতীপোলের উল্লেখ করেচেন। সামান্য একটু বর্ণনাও দিয়েচেন। রামগড়ের উপরের মন্দিরের একটা প্রতিকৃতিও দিয়েচেন। তারপর ১৮৬৩-৬৪ সালে লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল ড্যালটন (Lt. Col. T. Dalton) ভ্রমণ করতে এসে এই পাহাড় দেখতে এসেছিলেন। তাঁর লেখা বিবরণ ১৮৬৫ সালে বাহির হয় (J. A. S. B. Vol. XXXIV., pt. II., pp 23-27)। ১৮৭৩ সালে ভ্যালেনটাইন বল (Valentine Ball) রামগড় পাহাড়ে এসেছিলেন। তাঁর লেখা বিস্তৃত বিবরণ Indian Antiquary পত্রে (Vol. II [1873], pp 243-246) প্রকাশিত হয়েচে। এরপর বেগ্‌লার (J. D. Beglar) দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রদেশ ভ্রমণকালে ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রামগড় গিয়েছিলেন। তাঁর লেখা বর্ণনা ১৮৮২ সালে (Archæological Survey of India, Vol. XIII, pp 31-55) বাহির হয়। তিনি রামগড়ের দুইটি শিলা-

লিপির ছাপ নিয়েছিলেন। Corpus Inscriptionum Indicarum (Vol. I.) গ্রন্থে ক্যানিংহাম (A. Cunningham) ১৮৭৭ সালে সামান্য একটু বিবরণ (পৃঃ ৩৩) দিয়ে ছাপেন (plate XI)। তিনি একটা নক্সাও নিয়েছিলেন। নক্সাটী ১৮৮২ সালে ছাপা হয় (A. S. R. Vol. XIII, pl. X)। এরপর ১৯০২ সালে ডিসেম্বর মাসে মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কালিদাসের রামগিরি ও রামগড় যে অভিন্ন তা' দেখাতে চেষ্টা করেন (Proceedings A. S. B. 1902 p 90)। তাঁর আলোচনায় রামগড়ের শিলা-লিপির তর্জমা আছে। ব্লথ (T Bloch) রামগড়ে গিয়ে তার উপর তিনটা প্রবন্ধ লেখেন। Arch Surveyর Annual Reportএ (for the year Ending April 1904, pt II, p. 12) একটা বিবরণ বেরোয়। ১৯০৩-০৪ সালের Arch Surveyর Annual Reportএও (পৃঃ ১২৩-১৩১) আর একটা সচিত্র বিস্তৃত বিবরণ বাহির হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত চিত্র ও নক্সা ব্লথের এই বিবরণ থেকেই গ্রহণ করিচি। ব্লথ ১৯০৪ সালে ৩০ এপ্রেল তারিখে রামগড়ের রঙ্গালয় সম্বন্ধে একখানি পত্র ভিণ্ডিশকে (E Windisch) লেখেন। এতে তিনি ভারত-নাট্যশালায় গ্রীক প্রভাব সপ্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। পত্রখানি Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft নামক প্রসিদ্ধ জার্ম্মান পত্রে (১৯০৪, পৃঃ ৪৫৫—৪৫৭) প্রকাশিত হয়। তারপর ঐ বৎসর ঐ পত্রে (পৃঃ ৮৬৭- ৮৬৮) হাইনরিখ লুডেস (Heinrich Luders) রামগড়-নাট্যশালা প্রসঙ্গে ভারতের প্রাচীন গুহাতে যে নৃত্যাদি হ'ত তা দেখাতে চেষ্টা করেন। ১৯০৫ সালে বার্গেস (James Burgess) Indian Antiquaryতে (Vol. XXXIV, pp 197-199) রামগড়ের নাট্যশালা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। লুডেসের জার্ম্মান প্রবন্ধের একটা তর্জমাও প্রকাশ করেন (৩৪ খণ্ড, পৃঃ ১৯৯-২০০)। এর পর আট নয় বছর রামগড়-রঙ্গালয় সম্বন্ধে আর কেহ উচ্চবাচ্য করেন নি। ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় সরকার বাহাদুরের তরফ থেকে রামগড়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের রামগড়ের বিবরণ ১৩২১ সালের কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী' পত্রে (পৃঃ ৫৫—৬৩) বাহির হয়। ঐ বৎসর 'নারায়ণ' পত্রে (২০৪ পৃঃ) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় এবং 'প্রবাসী' পত্রে (১২১ পৃঃ) শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গতঃ দুকথা লেখেন। ১৯০৯ সালে 'রঙ্গমঞ্চের' কয়েকটা সংখ্যা বাহির হয়। রঙ্গমঞ্চের একটা সংখ্যায় ব্লথ-লিখিত প্রবন্ধের সার-সঙ্কলন আছে। র‍্যাপসন (E. J. Repson) একবার ১৯১১ সালে (E. R. E. Vol IV. p 885) এবং পরে ১৯২২ সালে তাঁর ইতিহাসে (The Cambridge History of India Vol. I pp 642-643) ও ১৯২৪ সালে কীথ (B. Keith) তাঁর ভারতীয় নাটক সম্বন্ধীয় পুস্তকে প্রসঙ্গতঃ কিছু আলোচনা করেচেন। এই সালের জানুয়ারি মাসে Calcutta Review পত্রে (পৃঃ ১০৯) শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও রামগড়ের নাট্যশালার উল্লেখ করেন।

হ'লে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের পেণ্ড্রারোড্ ষ্টেশনে নাবতে হয়। এখান থেকে পাহাড়টা ৪৬ ক্রোশ। কয়েকটা পাহাড় বন, ছোট নদী পার হ'তে হয়। শেষ নদী পার হ'য়ে একটা গ্রাম—নাম 'পোরী'। এর পর একটা বিস্তৃত অরণ্য। এখানে বুনো হাতীদের আড্ডা। তার পর কয়েকখানি গ্রাম আর কতকগুলি পার্ব্বত্য নদ-নদী পার হ'তে হয়। অতঃপর 'পাথরী' বলে' একটা জায়গা অতি-ক্রম করে' একটা সমতল উপত্যকা পাওয়া যায়। এইটা ছাড়িয়ে 'উদিপুর' গ্রাম। এখান থেকে রামগড় ক্রোশ দুই। আজকাল রাঁচি থেকে মোটরে রামগড় পাহাড়ের কাছে যাওয়া যায়। রামগড় আর আগেকার মত উপেক্ষিত নয়। সেখানে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট কয়লা বাহির হওয়াতে ধনী ও ব্যবসায়ীদের সেদিকে নজর পড়েচে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী রামগড়ের ৮ মাইল দূরে বারমো নামে একটা ষ্টেশন খুলেচেন। এটা তাঁদের আদরা-গোমো লাইনের মহুদা ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে বারমোয় এসে শেষ হয়েচে। রাঁচি থেকে হাজারিবাগ যাবার ৩টা মোটর সার্ভিস আছে। এদের যাবার পথ রামগড়ের প্রান্ত দিয়ে। রাঁচি থেকে ২৬ মাইল দূরে এই সার্ভিসে রামগড় বলে' একটা ষ্টেশন আছে। সেটা অবশ্য নামেই রামগড়, কারণ, যেখানে মোটর থামে সেখান থেকে বন, জঙ্গল, পাহাড় ভেদ করে' আরও ১৩ মাইল আন্দাজ ভিতর দিকে গেলে, তবে রামগড়ের রাজার দুর্গ ও দেবীমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এর পর রামগড়ের প্রান্তস্থ উত্তুঙ্গগিরি শ্রেণীর গা বেড়িয়া চক্রাকার গতিতে মোটর মাণ্ডুর দিকে চলে' যায়। এই পথের উচ্চতা জমি থেকে প্রায় ৩।৪ শত ফুট। মোটরে বসে' নীচের দিকে চাইতে ভয় করে; কারণ এই উঁচু নীচু জায়গার মাঝখানে গড়েন জায়গা বড় নাই। এখানে মোটর খুব আস্তে' চলে। সেইজন্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখবার বেশ সুবিধা হয়।

রামগড় পাহাড়ের উপর বার আনা উঠ্‌লে একটা গুহায় পৌছুতে পারা যায়। গুহাটী মানুষের তৈরী, নাম 'মুনিগোফা'। গুহার মুখ পশ্চিম দিকে। এর প্রবেশ-পথ ১ফুট ৫ ইঞ্চি × ১ ফুট ৪ইঞ্চি।

পাহাড়ের বিবরণ

গুহাভ্যন্তরের দৈর্ঘ্য ৩ ফুট ১০ ইঞ্চি। গুহার তলদেশ কতকটা ভরাট হয়ে গেছে বটে, কিন্তু গুহার মধ্যে একটা মানুষ গুঁড়িমেরে ঢুকে তলদেশে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে' থাকতে পারে, এটুকু বেশ বোঝা যায়। আরও কতকটা উঠলে একটী ক্ষুদ্র মহাদেবের মন্দির দেখা যায়। মহাদেবের বিগ্রহ মন্দিরেব ভিতবে আছে। মন্দিরের কাছে দেয়াল দিয়ে ঘেরা খানিকটা পরিচ্ছন্ন জমি আছে। এই জায়গা থেকে ১০০০ ফুট নীচে বন—গাছে ভরা। দেয়ালে ঘেবা জায়গায় প্রায় ৫০ ফুট উঁচুতে ওঠবার সিঁড়ি তৈবী কবা আছে! এই সিঁড়ির ৪৮টী ধাপ বেয়ে উঠলে একটী মন্দিরের জীর্ণ কঙ্কাল দেখতে পাওয়া যায়। জীর্ণমন্দিরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে দুইটী দুর্গামূর্ত্তি—একটী বিংশভুজা, একটী অষ্টভুজা, একটী হনুমানের মূর্ত্তি, ও একটী অষ্টভুজ-শিবমুর্ত্তি আছে। এখান থেকে পাহাড়েব চূড়া আবও ১০০ ফুট উঁচুতে। খানিকটা চড়াই পাহাড়ে উঠলে উঁচু উপত্যকায় এসে পড়া যায়। উপত্যকা পাব হয়ে একটী জীর্ণ প্রাচীন মন্দিব—একেবাবে ভগ্ন হয়ে গেচে, কিন্তু তার ভিতরকাব দেওয়ালটী এখনও আছে। এখানে লক্ষ্মণ, জানকী, জনকরাজাব মূর্ত্তি আছে। এই পাহাড়েব শিখরের গায়ে ঠিক নীচেই ঐ উপত্যকাব একটী ঝরণা ও কুণ্ড। প্রবাদ সীতা এইখানে বামলক্ষ্মণেব সঙ্গে স্নান কবেছিলেন। প্রতিবৎসব এইখানে মেলা হয়। যাত্রীবা এইখানের জলকে গঙ্গাজলেব চেয়ে পবিত্র বলে' মনে কবে। ১৭৫৮ সালে মবাঠাবা সুরগুজা আক্রমণ কবে। প্রবাদ আছে যে, যখন এই দুর্ঘটনা ঘটে, সুরগুজার রাজাবা তখন এই কুণ্ডে তাঁদের বমণীদের আকণ্ঠ নিমজ্জিত বেখেছিলেন। ধনরত্নও এরই ভিতব ফেলে দিয়েছিলেন। আবও কয়েকবাব নাকি তাঁদের এই কার্য্য করতে হয়েছিল। এইখান দিয়ে নেমে 'যোগীমাবা' নামক গুহায় যাওয়া যায়। ১৮০ ফুট পাহাড়ের নীচে একটী গহ্বরপথ—নাম 'হাতীফোঁড়'। হাতীফোঁড নামের কারণ হচ্চে এই সুড়ঙ্গপথটী এত চওড়া যে তার ভিতর দিয়ে 'হাতী ফুঁড়ে পাহাড়েব এপার ওপার হয়ে যেতে পারে।' হাতীফোঁড এই পাহাড়ে উদিপুর গ্রামের কাছে অবস্থিত। এই সুড়ঙ্গটীর ভিতরে প্রবেশপথের সামনে একধারে পাহাড়ের ফাটাল দিয়ে জল বেরিয়ে নীচের পাথরের উপর চুঁয়ে চুঁয়ে পড়চে। ক্রমাগত জল পড়ে' জায়গাটী ক্ষয়ে' ক্ষয়ে' কালে গোল হয়ে পড়েছে। এই স্থানটীর শোভাবর্দ্ধন করবার জন্য পাহাড়ের গায়ে ক্ষোদাই করে' একটী রেখা অঙ্কিত করা হয়েছে। প্রবেশপথে সুড়ঙ্গটী ৫৫ ফুট চওড়া, উঁচু ১০০ ফুট। ঢুকে ৪০ ফুট গেলে দেখা যায় এটী সেখানে ৩২ ফুট চওড়া, ২০ ফুট উঁচু। তারপব ক্রমশঃ কমে গিয়ে প্রবেশস্থান থেকে ৪০০ ফুট দূরে ৩৫ ফুট চওড়া আর ১৬ ফুট উঁচু। যেখানে শেষ হয়েচে সেখানটা ৯০ ফুট চওড়া। সুড়ঙ্গটী দক্ষিণ-পূর্ব্বে গেচে।

এই সুড়ঙ্গপথের দক্ষিণপূর্ব্বপ্রান্তে বাটালি দিয়ে কাটা একটী প্রস্তরফলক দেখতে পাওয়া যায়। এটী যে শিলালিপি ক্ষোদিত কববাব উদ্দেশ্যে কাটা হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক এর উপর শিলালিপি ক্ষোদিত হয় নি। এরই নিকটে একটী ক্ষুদ্র গুহা আছে। ওঠবার নাববার একটী ধাপও আছে। এ গুহাব কতকটা হাতেব তৈরীও বটে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য নয়। তবে পুরাকালে যারা গুহায় বাস করত তারা কেমন কবে' তাদেব ঘর তৈরী করত তার কিছু নিদর্শন এতে পাওয়া যেতে পাবে। হাতীফোঁড় অতিক্রম করে'ই দক্ষিণে দুইটী গুহাদ্বাব দেখতে পাওয়া যায়। গুহাদুটীর নাম 'যোগীমাবা' ও 'সীতাবেঙ্গরা'। সীতাবেঙ্গরা সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে। এখানকার লোকদের ধারণা সীতা এইখানে বাস করতেন। পাহাড়ের পাদদেশের কাছে রেউর নদী। লোকে একে মন্দাকিনী বলে। সীতাবেঙ্গরা গুহা ভিতবেব দিকে ছয়ফুট উঁচু। মাঝে মাঝে ছয়ফুটেরও কম। "গুহার একেবারে ভিতরে দেয়ালের চারপাশটা উঁচু বেদী দিয়ে ঘেরা।·····একটা বড় নালী ঐ বেদীটীর নীচে দিয়ে দেয়ালের দিকে চলে' গেচে। মেঝের উপর কতকগুলি গর্ত্ত বেশ যত্নসহকারে কেটে তৈরী।" গুহার ভিতবে প্রবেশের পথ ১৭ ফুট চওড়া। গুহাটী সর্ব্বসমেত ৪৪২ফুট। মধ্যভাগে ১২ ফুট ১০ ইঞ্চি চওড়া, আর প্রায় ৬ ফুট উঁচু। চারিদিক্কার দেয়াল কেটে তৈরী করা। দেয়ালের চারিদিকে পাথরকাটা উঁচু উচু মঞ্চাসন। তিন দিকে দুইসারি মঞ্চাসন। ভিতরের অংশ বাহিরের

অংশের চেয়ে দুই ইঞ্চি উঁচু। যে দিক্‌টার সম্মুখ প্রবেশ-পথের দিকে দুইসারি মঞ্চের (double bench) সেই দিক্‌টা ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া। প্রবেশপথের পশ্চাদ্ভাগের মঞ্চাসনগুলি অপেক্ষাকৃত নীচু; প্রাচীরের দিকে ছোট ছোট পাথরকাটা মঞ্চাসন আছে।

মঞ্চাসনের উপর কতকগুলি ভাঙ্গাচোরা মূর্ত্তি আছে বটে, কিন্তু ঐ গুহার সঙ্গে মূর্ত্তিগুলির কোন সম্বন্ধ নাই। গুহার প্রবেশপথের সম্মুখে সারি সারি পাথরকাটা মঞ্চাসন। এই মঞ্চাসনশ্রেণীগুলি অর্দ্ধবৃত্তাকারে বিন্যস্ত। বেগ্‌লার সাহেবের মতে এগুলি ওঠবার-নাব্‌বার সিঁড়ি। কিন্তু ব্লখ বলেন, এগুলিকে সিঁড়ি বলা যেতে পারে না। সিঁড়ি হ'লে ভিতরে প্রবেশের জন্য যেখানে সিঁড়ির দরকার সেইখানেই থাকৃত। গুহার দক্ষিণপ্রান্ত দিয়ে গুহার ভিতরে প্রবেশ করবার সুবিধা নাই। অথচ সেখানে ও সিঁড়ি কেন? বিশেষতঃ, উত্তরপ্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত কষ্ট করে' কুঁদে সিঁড়ি কববার কোন প্রয়োজন ছিল না। বল সাহেব বলেচেন যে, গুহার ভিতরে যারা থাকৃত তাদের স্নানের জল ঐ পথ দিয়ে বেরিয়ে যেত। কিন্তু এগুলিকে জল বাহির হ'বার নর্দ্দামাও বলা যেতে পারে না; কারণ, এদের কোনদিকে জল বাহির হ'বার পথের অভাবে জল বাহির না হয়ে জমে' না থাকবারই কথা। ব্লখ সাহেব বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করে' দেখে' বলেচেন যে, এগুলি সিঁড়িও নয়, জলনিকাশের পথও নয়। অথচ এগুলি মানুষের হাতে গড়া শিল্প—বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নিশ্চয়ই এগুলি নির্ম্মিত। ব্লখ বলেন, এগুলি অভ্যন্তরস্থ মধ্যভূমিতে অভিনীত নাট্যাভিনয় বা এইরূপ কোন তামাসা দেখবার উদ্দেশ্যে বস্‌বার উপযোগী আসনশ্রেণী ছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারে বলে' তিনি মনে করেন না। বেঞ্চিগুলি বৃষ্টির জলে কিছু কিছু ধুয়ে গেছে। ব্লখ এর একটী নক্সা দিয়েচেন। বলসাহেবও দিয়েচেন। নিম্নে ব্লখপ্রদত্ত নক্সা দেওয়া গেল:

এই নক্সা থেকে এর অবিকল ধারণা না হ'তে পারে।
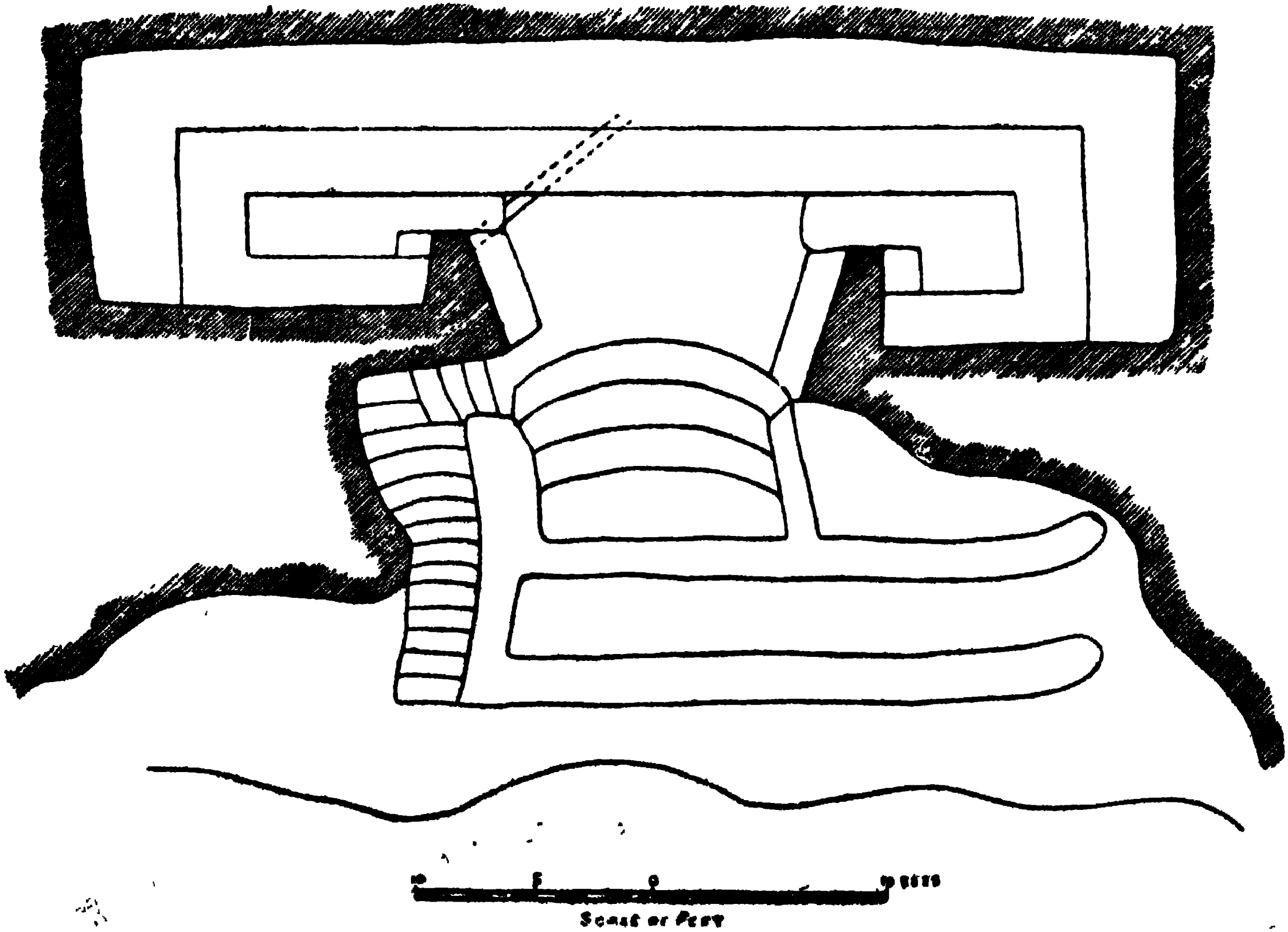
কিন্তু তিনি আর একটা যে চিত্র দিয়েচেন তাতে চিত্র আরও সুস্পষ্ট। চিত্রটী এই—

SCALE OF FEET
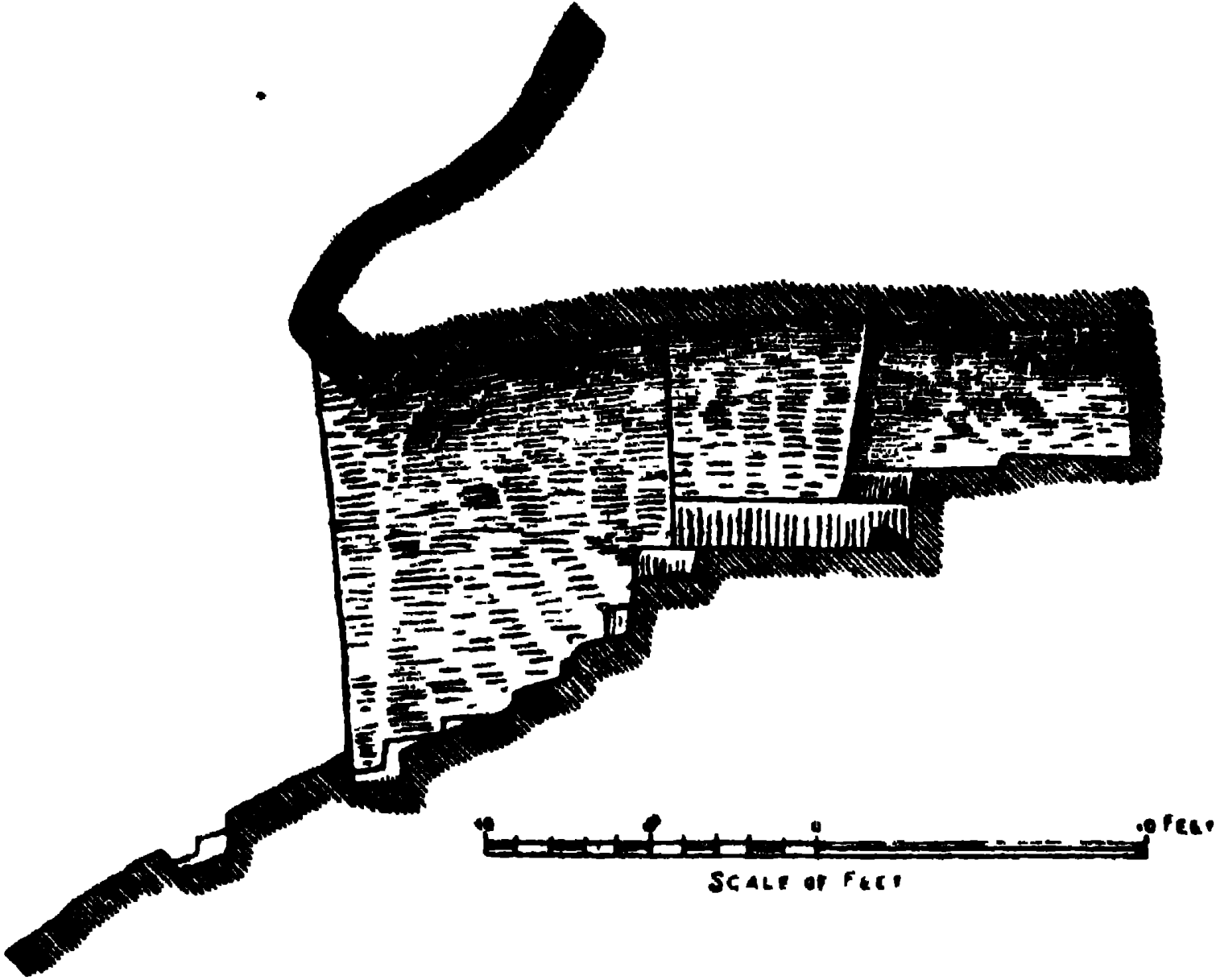
পূর্ব্ব চিত্রের নীচের দিকের শেষ বেখা মালভূমির প্রান্তদেশ নয়, এখানে জমি কিছু নেবে গেচে। ব্লথ বলেন, এই ক্ষুদ্র পাথরকাটা ডিম্বাকার নাট্যশালার সম্মুখে রঙ্গপীঠ (stage) স্থাপনের জন্য প্রচুর স্থান আছে। আর মঞ্চাসনগুলিতেও পঞ্চাশ ষাটজন দর্শকের বস্‌বার জায়গা হয়। ব্লথ ফোটোগ্রাফ নিয়েছিলেন। ফোটোগ্রাফে অভ্যন্তরে পৌঁছিবার জন্য সোপানগুলি বেশ সুস্পষ্ট; সিঁড়িগুলিকে বামদিকেই কেবল দেখা যায়। ডানদিকে একটীও সিঁড়ি দেখা যায় না। অভ্যন্তরদেশ ৪৬ ফুট লম্বা ও ২৪ ফুট চওড়া একটী আয়তচতুরস্রাকৃতিবিশিষ্ট (oblong)। তিনদিকেই পাথরকাটা সুপ্রশস্ত বস্‌বার জায়গা; এগুলি ২॥ ফুট উচ্চ ৭॥ ফুট প্রশস্ত, সম্মুখ ভাগ কয়েক ইঞ্চিমাত্র নীচু করে' আসনগুলি চাতালের আকৃতি বিশিষ্ট করা হয়েচে। প্রবেশপথের নিকটস্থ ভূমি আসনের কোণের ভূমির চেয়ে কিছু নীচু।

ব্লথ সাহেব যাকে নাট্যশালা বলচেন সেটী ঠিক নাট্যশালা কিনা তা' নিয়ে তর্ক উপস্থিত হয়েচে। প্রবেশপথের মেঝেতে কোণের দিকে ২টী বড় বড় ছিদ্র আছে। ব্লথ বলেন এই ছিদ্রগুলি কাঠের খুঁটি বসাবার জন্য ব্যবহৃত হ'ত। দর্শকেরা যখন ভিতরে চলে' যেত, এই খুঁটির উপর শীতকালের রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া আট্‌কাবার জন্য পর্দ্দা খাটান হ'ত। এই সময়ে দর্শকেরা প্রশস্ত মঞ্চাসনের উপর বস্‌ত, আর প্রবেশপথ-আবদ্ধকারী পর্দ্দার সাম্‌নে নৃত্যাদি তামাসা চলত।

গুহার সম্মুখভাগে ডিম্বাকৃতি নাট্যশালা নাট্যশালার চত্বরাকৃতি আসনাবলি অর্দ্ধবৃত্তাকারে সংহিত; আসনচত্বরের শ্রেণীগুলি সমকেন্দ্র চক্রাংশাকৃতি—আর এই চক্রাংশগুলি পিছনের দিকে ক্রমোন্নত। ব্লথসাহেব যে চিত্র দিয়েচেন তার সাহায্যে বর্ণনাটী বেশ বোঝা যাবে।

এটী নাট্যশালা হ'তে পারে কিনা তা নিয়ে বর্গেস্ বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করেচেন। তিনি বলেন, এত অল্প জায়গায় অভিনয়ের কাজ চালান সম্ভবপর নয়। এটীকে নাট্যশালা বলে' মেনে নোবার পক্ষে আরও সন্তোষজনক প্রমাণের দরকার। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় রামগড় পাহাড়ে গিয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, "ডাঃ ব্লক ও অপরাপর কয়েকটী প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে এই গুহাটি ভারতের প্রাচীর নাট্যমন্দিরের একমাত্র নিদর্শন এবং গ্রীকদের প্রাচীন নাট্যমন্দিরের অনুকরণে তৈরী। গুহাটির বাইরে চারকোণে চারটে বড় বড় ছিদ্র আছে। এর থেকে তাঁরা অনুমান করে স্থির করেছেন যে ঐ গর্ত্তের মধ্যে কাঠের খুঁটি দিয়ে যবনিকা টাঙান হত; আর বাইরের দিকে অর্দ্ধবৃত্তাকার নীচে থেকে ক্রমশ উপরের দিকে গুহায় উঠ্‌বার যে সিঁড়ি আছে সেই সিঁড়িগুলি দর্শকদের বস্‌বার মঞ্চাসনরূপে ব্যবহৃত হ'ত। কিন্তু দ্বারের বাইরের দিকে অর্দ্ধবৃত্তাকারভাবে সিঁড়িগুলি থাকায়, নাট্যমন্দিরের অভ্যন্তরে নটনটীদের অভিনয় দেখা সম্ভবপর নয়। দর্শকের পশ্চাতে নাট্যমন্দির এবং সম্মুখে দৃশ্যপটটি থাকার যে কি সার্থকতা আছে তা আমরা বুঝে উঠ্‌তে পারিনি। গুহাটির দ্বারের বাইরে এমন প্রচুর দাঁড়াবার স্থান নেই যে, সেখানে নৃত্যোৎসবাদি ঐ অর্দ্ধবৃত্তাকার সিঁড়িতে বস্‌লে দর্শকেরা সামনে দেখ্‌তে পায় এরূপভাবে সম্পাদিত হতে পারত মনে করা যেতে পারে। সেখানটা আবার খাড়া পাহাড়। তবে অন্য কোন উপায়ে যদি বাইরে কাঠে স্থায়ী মঞ্চের উপর অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকৃত ত বলা যায় না। কিন্তু তারও কোনরূপ চিহ্ন পাওয়া যায় না।" শ্রীযুক্ত অসিতবাবু এই গুহাকে ছোটখাট গানবাজনার স্থায়ী সভা এবং বাসস্থান বলে' মনে করেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের মতে এটী যে স্থায়ী রঙ্গালয়ের উদাহরণ তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ষ্টার থিয়েটারে 'গোলকুণ্ডা' ঃ—৩য় অভিনয় রজনী ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬। বহুদিনের পর পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের নূতন নাটকের অভিনয় দেখিতে প্রচুর দর্শক সমাগম হইয়াছিল। পুস্তকখানিকে নাটক বলা কতদূর চলে জানি না তবে এখানি উচ্চশ্রেণীর কাব্য লক্ষণাক্রান্ত। ইতিহাসের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক—নামে মাত্র, অর্থাৎ গোলকুণ্ডা কথাটী ও কয়েকটী নাটকীয় চরিত্রের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে তুলিয়া লইয়া কবি তাহাদিগকে নিজের কল্পনা সাগরে স্নান করাইয়া অপরূপ মূর্ত্তি দান করিয়াছেন পুস্তক এখনও প্রকাশিত হয় নাই—পুস্তক পাঠ না করিয়া কেবলমাত্র অভিনয় দেখিয়া এশ্রেণীর ভাবপ্রধান নাটকের সমালোচনা করা একরূপ অসম্ভব তজ্জন্য আমরা বর্ত্তমানে কেবলমাত্র অভিনয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম—ভবিষ্যতে বিস্তৃতভাবে ইহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সামান্য সামান্য ত্রুটীর জন্য অভিনয়ের সৌন্দর্য্য যেরূপ বিকৃত হইয়াছে তজ্জন্য প্রয়োজক (Producer) মহাশয়কেই আমরা দায়ী বিবেচনা করি। মোটের উপর অভিনয় সুন্দর বলা চলে না তবে চলনসই বিবেচনা করা যাইতে পারে—কিন্তু আর্ট থিয়েটারের নিকট আমরা চলনসই অভিনয়ের প্রত্যাশী নই—সেইজন্যই আমাদের ইচ্ছা যে তাহারা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটীগুলি সংশোধিত করিয়া পুস্তক খানিকে কবি-জনযোগ্য নাটকীয় সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত করুন। নিম্নে কয়েকটী চরিত্রের অভিনয় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা লিপিবদ্ধ করিলাম।

ঔরংজেব—শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। সমস্ত চরিত্রের মধ্যে একমাত্র ইহার অভিনয়কেই সুন্দর বলা যাইতে পারে এবং ইহার বক্তব্যই মুখস্থ ছিল বাকী সকলকেই কাণ খাড়া করিয়া প্রম্পটার মহাশয়ের শরণাগত হইতে হইয়াছিল। অহীন্দ্রবাবুর অভিনয় কৌশল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত দেখিলাম—এ অভিনয়ে ভাবাভিব্যক্তি বা ভঙ্গিমার কোনও আতিশয্য নাই আবৃত্তির মধ্যেও বেশ একটা সংযমের চিহ্ন পরিস্ফুট এবং সাজাহান নাটকের ঔরংজেবের মত এই ঔরংজীবেও ধর্ম্মবিশ্বাসী চতুর রাজনৈতিকের লক্ষণগুলি অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল। অহীন্দ্রবাবু এই ভাবে অভিনয়ের ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া কেবল যে নিজের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করিলেন তাহা নহে দর্শকবৃন্দকে অপূর্ব্ব তৃপ্তি দান করিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল তাহা নিঃসন্দেহ।

মীরজুমলা—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী—স্থানে স্থানে বিশেষতঃ ভাবপ্রধান অংশগুলির অভিনয় অতি উচ্চশ্রেণীর হইয়াছিল কিন্তু অযোগ্য সহযোগী অভিনেতার কদর্য্য অভিনয় অনেকস্থলে তাহার অভিনয়কে ফুটিতে দেয় নাই, বেজার্থা, আহিরন, আমিন, জনৈক ওমরাহ প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ এই রসভঙ্গের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। তিনকড়ি বাবুর মত অভিনেতার নিকট আমরা আরও বেশী কিছু আশা করিয়াছিলাম।

হাসান—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী। স্থানে স্থানে ইহার অভিনয় অতি সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল কিন্তু আগাগোড়া সমস্ত অভিনয়ের ধারার একটা সামঞ্জস্য ছিল না, বিশেষতঃ নূতন প্রথার অভিনয় করিবার দিকে ইহার বেশী ঝোঁক থাকায়, সহযোগীগণের পুরাতন প্রথার আবৃত্তি

সঙ্গে ইঁহার অভিনয় বেশ খাপ্ খায় নাই তবে অভিনয় ইনি যে প্রাণ দিয়াই করিয়াছিলেন তাহা বেশ বুঝা যাইল। একটু সংযত হইলেই ইঁহার অভিনয়ও অতি সুন্দর হইবে মনে করি। উদ্দাম ভাব মধ্যে মধ্যে সুন্দর লাগে কিন্তু বেশী ঘন ঘন হইলে বড় অস্বাভাবিক লাগে এটা স্মরণ রাখা উচিত।

মহম্মদ—শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়—অভিনয় সুন্দর বলা যাইতে পারে তবে শিল্পী ইচ্ছা করিলে আরও দুএকস্থলে সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্য ভঙ্গিমায় প্রকাশ করিতে পারিতেন যাহা তাঁহার লক্ষ্য হয় নাই—ইন্দুবাবু অঙ্গভঙ্গীর দিকটা একটু উন্নত করিতে চেষ্টা করুন কারণ তাঁহার কণ্ঠস্বর সুন্দর, আবৃত্তিও আশাপ্রদ।

নাসীর—চলনসই অভিনয়, কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া অভিনেতা তাহা একটু অস্বাভাবিকরূপে কোমল করিয়াছেন 'ভাবে গদগদ' ভাবটা বড় বেশী হইয়াছে কণ্ঠস্বরে একটু পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্যের অভাব রহিয়াছে—চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তাঁহার অভিনয় হাসানের অভিনয়ের সঙ্গে পাল্লা রাখিতে পারে নাই এইস্থান (expression) অঙ্গভঙ্গী প্রকাশে একটু মর্ম্মস্পর্শী করা উচিত।

আমীন—অভিনেতা অভিনীত চরিত্রের কোনরূপ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। তাঁহার অভিনয়ের দোষে তাঁহার সহযোগী অভিনেতৃবৃন্দের অভিনয় অনেকস্থলে নীচু হইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ নাটকে হাসান চরিত্রের সহিত এই চরিত্রের আকৃতি কণ্ঠস্বর ও চালচলনের যে সৌসাদৃশ্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে অভিনেতা সেটা মোটেই খেয়াল করেন নাই আমাদের মনে হয় এই অংশে শ্রীযুত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অবতীর্ণ হইলে সকলদিক দিয়া সুবিধা হইত—বিশেষতঃ তিনি যখন দীর্ঘ অবকাশের পর সম্প্রতি অন্যান্য অভিনয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

রেজা খাঁ—পূর্ব্বোক্ত অভিনেতার অভিনয় যে দোষে দুষ্ট, ইঁহার অভিনয়েও সেই সকল দোষ বিদ্যমান। দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে যখন ইনি ত্রিশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিয়াছেন ও ইঁহার প্রভু মীরজুমলা বলিতেছেন "রেজা খাঁ। তুমি অতি ক্লান্ত" রেজা খাঁর শরীরে কিন্তু তখন কোন ক্লান্তির চিহ্ন দেখা যায় নাই। তার পর তাঁহার অন্যতম প্রভু 'হাসানের'—যাহাকে খুঁজিতে তিনি ইরাণ হইতে হিন্দুস্থানে আসিয়াছেন—সহিত সাক্ষাতের সময় একটু বিস্ময়ের একটু আনন্দের অভিব্যক্তি দেখাইতেও তিনি চেষ্টা করেন নাই—অতঃপর তাঁহাকে এই সকল বিষয়ে মনোযোগী দেখিলে আমরা আনন্দিত হইব—কারণ পোষাক করিয়া রঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া বক্তব্য অংশটুকু আবৃত্তিকরিলেই অভিনেতার কর্ত্তব্য সমাপ্ত হয় না—চরিত্রের প্রাণের সন্ধান করিয়া নিজের সর্ব্বাঙ্গে তাহা পরিস্ফুট করাই অভিনেতার কর্ত্তব্য—অভিনেতা শিল্পী, সে গ্রামোফন নয়।

নসরৎ—অভিনেতার আবৃত্তি উত্তম এবং ভাবাভিব্যক্তির চেষ্টা প্রশংসনীয় তবে এই অংশের উপযোগী দৈহিক সৌষ্ঠব ও কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য্য তাঁহার নাই—কিন্তু অভিনয়ের উপযোগী মস্তিষ্ক তাঁর আছে।

কুতব সা—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত। অভিনয় খুব উচ্চশ্রেণীর না হইলেও চলনসই এবং তাহাতে বিশেষ কিছু ক্রটী ছিল না—কোনরূপ বিশিষ্টতা বা নৈপুণ্যের বিদ্যুৎ-বিকাশও দেখা যায় নাই।

খুচরা অংশগুলির অধিকাংশই ভাল হয় নাই কাহারও পার্ট মুখস্থ হয় নাই—এসব দোষ—অবৈতনিক সম্প্রদায়েই থাকিত, আর্ট থিয়েটারে থাকা অনুচিত ও অশোভন। স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে একমাত্র 'আরজমন্দের' অংশে শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভামিনী বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বহুদিন আমরা এরূপ প্রাণবন্ত মর্ম্মস্পর্শী অভিনয় দেখি নাই—এমনি কি একস্থানে দৃপ্তিপূর্ণ চাহনী, গর্ব্বোন্নত ভ্রূভঙ্গী ও ক্ষোভ স্ফুরিত কণ্ঠস্বর আমাদের স্মরণ করাইয়া দিল অতীত যুগে শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরীর অভিনয়।

সেলিমার অংশ লইয়াছিলেন শ্রীযুক্তা সুবাসিনী তাঁহার দ্বিতীয় সঙ্গীতখানি অতি সুন্দর হইয়াছিল, ইহা সত্যই যে অনেকের প্রাণে সাড়া দিয়াছিল—তাহা পুনঃ পুনঃ "এন্‌কোরে"ই প্রমাণিত হইয়াছিল।

আহিরণ—মীরজুমলার পত্নী বা হাসান ও আমীনের জননীরূপে ইঁহাকে মোটেই মানায় নাই তদ্ভিন্ন ইঁহার

অভিনয়েও জননী বা ওমরাহপত্নীর গাম্ভীর্য্য ছিল না। চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে হাসানের মর্ম্মস্পর্শী অভিনয়ের পর ইঁহার নেকা-সুরের অভিনয়, অমন চমৎকার দৃশ্যটীকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। প্রয়োজক মহাশয়ের কর্ত্তব্য ছিল হাসানের আবৃত্তির পরই পটক্ষেপের ব্যবস্থা করা—এমন দৃশ্য-পরিণতি অকর্ম্মণ্য অভিনেতা অভিনেত্রীর অপটুতায় নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত হয় নাই।

আজকালের যুগে দর্শকবৃন্দ নৃত্যগীতে একটু নূতনত্বের আশা করিয়া থাকেন কর্ত্তৃপক্ষ তাহার সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই—নৃত্যে নূতন ভঙ্গী দিবার প্রয়াস একেবারেই নাই—তবে নর্ত্তকী সঙ্ঘকে সুদৃশ্য করিবার চেষ্টা ও সাফল্য লক্ষিত হইল। দৃশ্যপটাদিতে অনেক অনবধানতা লক্ষিত হইল। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে "গোলকুণ্ডার প্রান্তভাগ" ও দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে গোলকুণ্ডার প্রান্তভাগ একই দৃশ্য হওয়া উচিত নয় কারণ হাসান ও নসরুৎ প্রথম অঙ্ক হইতে পথ চলিয়া আসিয়াছে বহুদিন পরেও আবার ঠিক সেই দৃশ্যে পুনঃ প্রবেশ হাস্যোদ্দীপক। প্রথম অঙ্কে উদ্যানের দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে দুর্গের সম্মুখ ও নবম অঙ্কে দরবার দৃশ্য গুলি সুন্দর ও নয়নাভিরাম হইয়াছিল। যত্ন করিলে গোলকুণ্ডাব অভিনয় অতি সুন্দব হইতে পারে এবং বহুদিন বিপুল দর্শকসমাগমের মত আকর্ষণী-শক্তি ইহাতে আছে তবে একমাত্র প্রয়োগ নৈপুণ্যের অভাবে অর্থাৎ অবহেলায় যদি কর্ত্তৃপক্ষ ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া না তুলেন তবে সেজন্য বাঙ্গলার কাব্যরসিক দর্শকবৃন্দ কলঙ্কভাজন হইবেন না। পুস্তকের স্বতন্ত্র সমালোচনা পরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

গিরিশ স্মৃতিসভা—গত সোমবার এই সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল ষ্টার থিয়েটারে। গণ্যমান্য অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি হইলেন পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহোদয়। বক্তা ছিলেন স্বামী অভিদানন্দ শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, প্রফেসার মন্মথমোহন বসু, টাকায় গৌরব সুপ্রসিদ্ধ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রসরাজ অমৃতলাল বসু, সুবিখ্যাত নাট্যসমালোচক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দেবী প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় দুইখানি গান গাহিয়াছিলেন ও শ্রীযুক্ত অপরেশ বাবুর রচিত একখানি গান ষ্টারের শ্রীযুক্ত রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল। এই সভায় জোড়াপুকুর স্কোয়ারটী গিরিশ পার্ক বলিয়া অভিহিত করিবার অনুমতি দান করার জন্য কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় ও ঐ পার্কে গিরিশ বাবুর মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপনের আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়েব বক্তৃতা আমরা আগামী সংখ্যায় পাঠকবর্গকে উপহার দিব। গিরিশ বাবুর সুযোগ্য পুত্রকে সভাস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় নাই বা তাঁহার অনুপস্থিতির কোন উল্লেখ হয় নাই দেখিয়া আমরা একটু আশ্চর্য্য হইলাম।

'সন্ধি'

শ্রীমুরারিমোহন দাস

"আঃ—ছাড়—কর কি ?
খোঁপাটাই ছিঁড়ে দাও !"
"নাঃ—আর কাজ নেই—
তুমি যদি ব্যথা পাও !"
"যাঃ—কি বা বল্লুম,
মিছামিছি এত রাগ ?"

"হ্যাঃ—আমি রাগি বুঝি ?
আঁখি কোণে কি ও দাগ ?
"ছিঃ—ক্ষেপি,—কাঁদে নাকো
এই ওঠো,—মাথা খাও !"
"চুপ্ ! কি যে বল ছাই—
দাও খোঁপা খুলে দাও !"

Printed & Published by Jnanedra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
14 Jaggannath Dutta Lane Garpar, Calcutta.
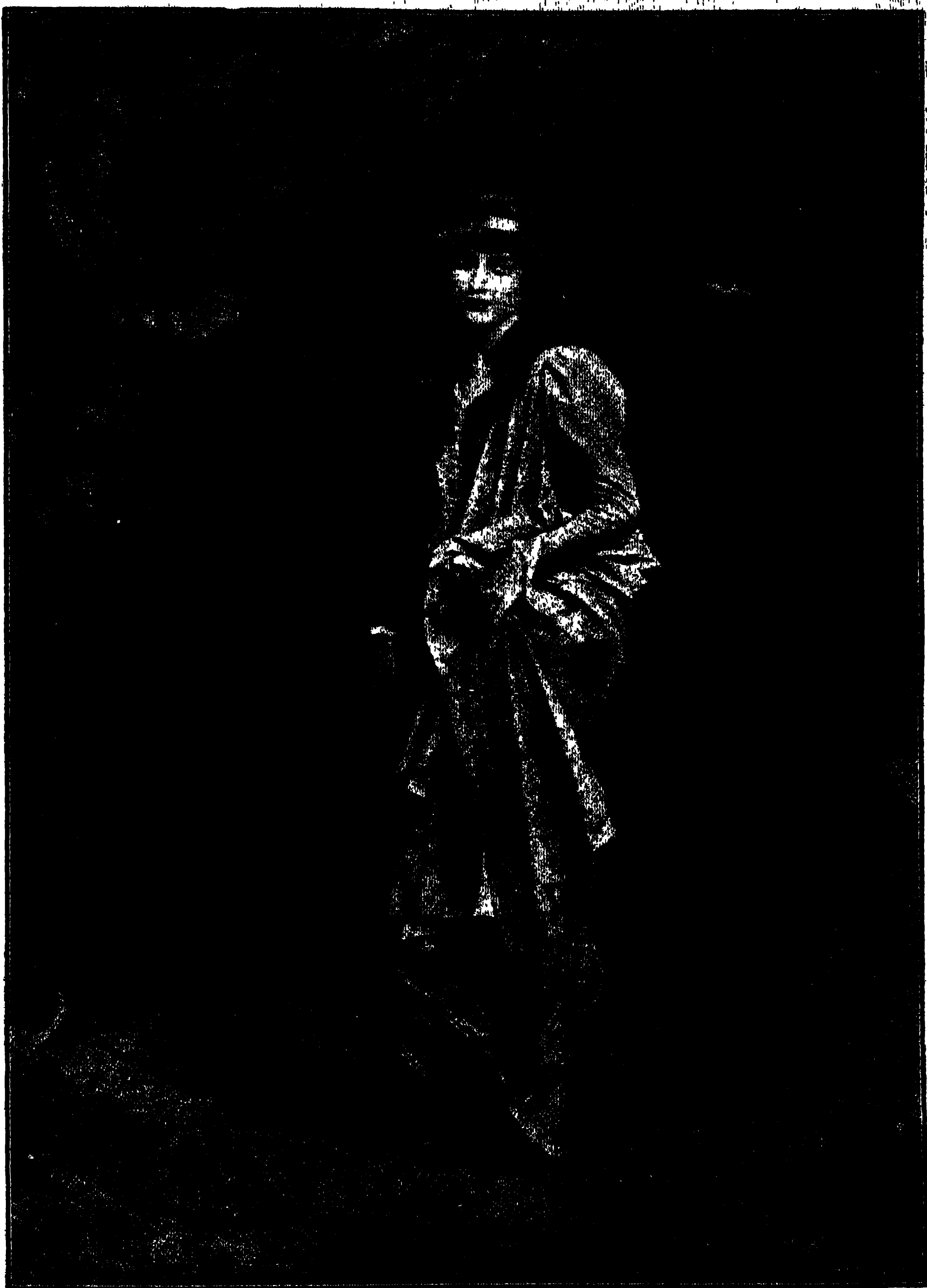
"And will he not come again ?" E. J. Gregory A. R. A.

"সে কি রে আসিবে ফিরে ?"

প্রথমবর্ষ] ১৬ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ২৮শে ফেব্রুয়ারী [২৯শ সংখ্যা

বড়দিনের সফর

শ্রীজলধর সেন

(দ্বিতীয়-কিস্তি)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলেছি যে, ২৬শে ডিসেম্বর শুক্রবার আমরা জামসেদপুরে গিয়াছিলাম। যে উপলক্ষে গমন অর্থাৎ জামসেদপুর-সাহিত্য-সভার প্রথম বার্ষিক উৎসবে সভাপতিগিরি করা, সে উৎসব কিন্তু আরম্ভ হবে ২৮শে ডিসেম্বর রবিবারে এবং শেষ হবে তার পর দিন সোমবারে। একদিন—শনিবারটা হাতে রাখবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সে দিনটা একেবারে বিশ্রাম করা যাবে—শুধু গল্প গুজবে দিনরাতটা কাটিয়ে এই শরীরটাকে একটু তাজা করে দেওয়া যাবে। কিন্তু শনিবার প্রাতঃকালে শ্রীমান্ সাহিত্যিকেরা সে দিনের যে 'প্রোগ্রাম' হাজির করলেন, তাতে বিশ্রামের কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না। সেই কথাই আগে বলি।

আমার চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ অমিয়কুমার প্রাতঃকালেই বলিলেন যে, সেদিন অপরাহ্ন দুইটার সময় তাদের ইলেকট্রিক মেসের যুবকগণ আমাদের চা-মজলিসে আপ্যায়িত করবেন। পুত্রবর ইলেকট্রিক বিভাগে কাজ করেন এবং ঐ মেসেই থাকেন, সুতরাং এ নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করা একেবারেই অসম্ভব। সেই সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আরও জানিয়ে দিলেন যে, তাদের মেসের অভ্যর্থনা শেষ হলেই আমাকে সাড়ে তিনটার সময় তাঁদের ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবু দত্তমহাশয়ের ভবনে জলযোগ করতে হবে। এটাও শ্রীমানের অনুরোধ, সুতরাং অপরিহার্য্য। এই কথা হইতে হইতেই আমাদের গৃহস্বামী এবং সাহিত্য-সভার ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীমান্ সত্যেশচন্দ্র এবং আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ অজয়কুমার আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, শ্রীমান্ অমিয়ের নিমন্ত্রণ সে দিন অপরাহ্নে গ্রহণ করা অসম্ভব, কারণ তাঁরা পূর্ব্ব থেকেই ব্যবস্থা করেছেন এবং নিমন্ত্রণ পত্রও বিলি করেছেন যে, সেইদিন অপরাহ্ন পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্য্যন্ত একটা সান্ধ্য-সমিতি করবেন, উদ্দেশ্য যে সহরের সাহিত্যিকবৃন্দ ও গণ্যমান্য ভদ্রলোকগণ শ্রীযুক্ত মণিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাঙ্গণে সমবেত হবেন 'to meet' আমাকে অর্থাৎ কি না পরের দিন যিনি তাঁদের উৎসবে সভাপতিগিরি ক'রে তাঁদের কৃতার্থ করবেন, তাঁকে আগে থাকতেই অভ্যর্থনা করা হবে।

তখন তাঁদের গৃহ কলহ আরম্ভ হওয়ার রকম দেখে আমি বললাম যে, শ্রীমান্ অমিয় যে ব্যবস্থা করেছেন, তাতে মহারথীদিগের সান্ধ্য-সম্মেলনের কোন বাধাই উপস্থিত হবে না; আমি অপর দুইটী নিমন্ত্রণ রক্ষা করে,

ঠিক পাঁচটার মধ্যেই তাঁদের দরবারে হাজির হ'তে পারব। তাই ঠিক হোলো।

কিন্তু এই 'ঠিকে' একটু ভুল হয়ে গেল। আমার মনে রাখা উচিত ছিল যে, এই জামসেদপুর কারখানার বাবুরা দশটা পাঁচটার বাবু নহেন,—এরা ভোর ছটায় আফিসে যান, আর সাড়ে এগারটায় ছুটী পান; আবার ছুইটায় যান পাঁচটায় ছুটী; সুতরাং কাহারও বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজন একটার পূর্ব্বে হওয়া টাটা কোম্পানীর আইন-বিরুদ্ধ। এই ত দস্তর; তারপর আমরা শ্রীমান্ সত্যেশের গৃহে অতিথি; সুতরাং তিনি আতিথ্য-সৎকারের যে বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে মধ্যাহ্ন-ভোজন তিনটার পূর্ব্বে কিছুতেই সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তখন শ্রীমানের অন্দর মহলে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা করে কতকগুলি দ্রব্যের রন্ধন রাত্রির জন্য মুলতবী করিয়ে, বেলা দেড়টার সময় বিপুল মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করে, দুইটার সময়ই নিকটবর্ত্তী ইলেকট্রিক মেসে যাত্রা করা গেল। একটু যেতেই বামদিকে পড়্‌লো ইলেকট্রিক বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রকাণ্ড বাংলা। এইখানে ব'লে রাখি জামসেদপুরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বল্‌লে কেউ চিন্‌তেই পারে না; তিনি এখানে সর্ব্বজন পরিচিত ও সর্ব্বজনমান্য মিঃ ঘোষ বা ঘোষ সাহেব; নিতান্ত আত্মীয় বন্ধু ব্যতীত তাঁর বাংলা নাম কেউ বল্‌তে পারে না— জানেই না।

যাক্, সে কথা। আমরা সে সময় ঘোষ সাহেবের সঙ্গে যে দেখা কর্‌তে যাব না, তা বাসা থেকেই ঠিক করে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের পরম 'সৌভাগ্য' যে তিনি তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, সুতরাং তাঁর বাংলোয় যেতেই হোলো। তিনি যখন শুন্‌লেন যে, নিকটবর্ত্তী ইলেকট্রিক মেস হযে আমরা দূরবর্ত্তী জি-টাউনে যাব, তখন তিনি বল্‌লেন "এত রাস্তা আপনি কিছুতেই হেঁটে যেতে পারবেন না, আমি এখনই আমার মোটর ডেকে দিচ্ছি; তাতেই যান। সন্ধ্যার সময় মোটরখানি ছেড়ে দেবেন, কারণ আপনার অভ্যর্থনায় যেতে হবে। তখনই মোটর এলো—আমরা সওয়ার হোয়ে বস্‌লাম। 'সৌভাগ্য' কথাটা কেন বলেছি, তা বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছেন।

তারপর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সহরের দুই প্রান্তের দুই নিমন্ত্রণ রক্ষা করে, পাঁচটার সময়ই সান্ধ্য-সমিতিতে হাজির! সহরের অধিকাংশ ভদ্রলোকই সেখানে উপস্থিত
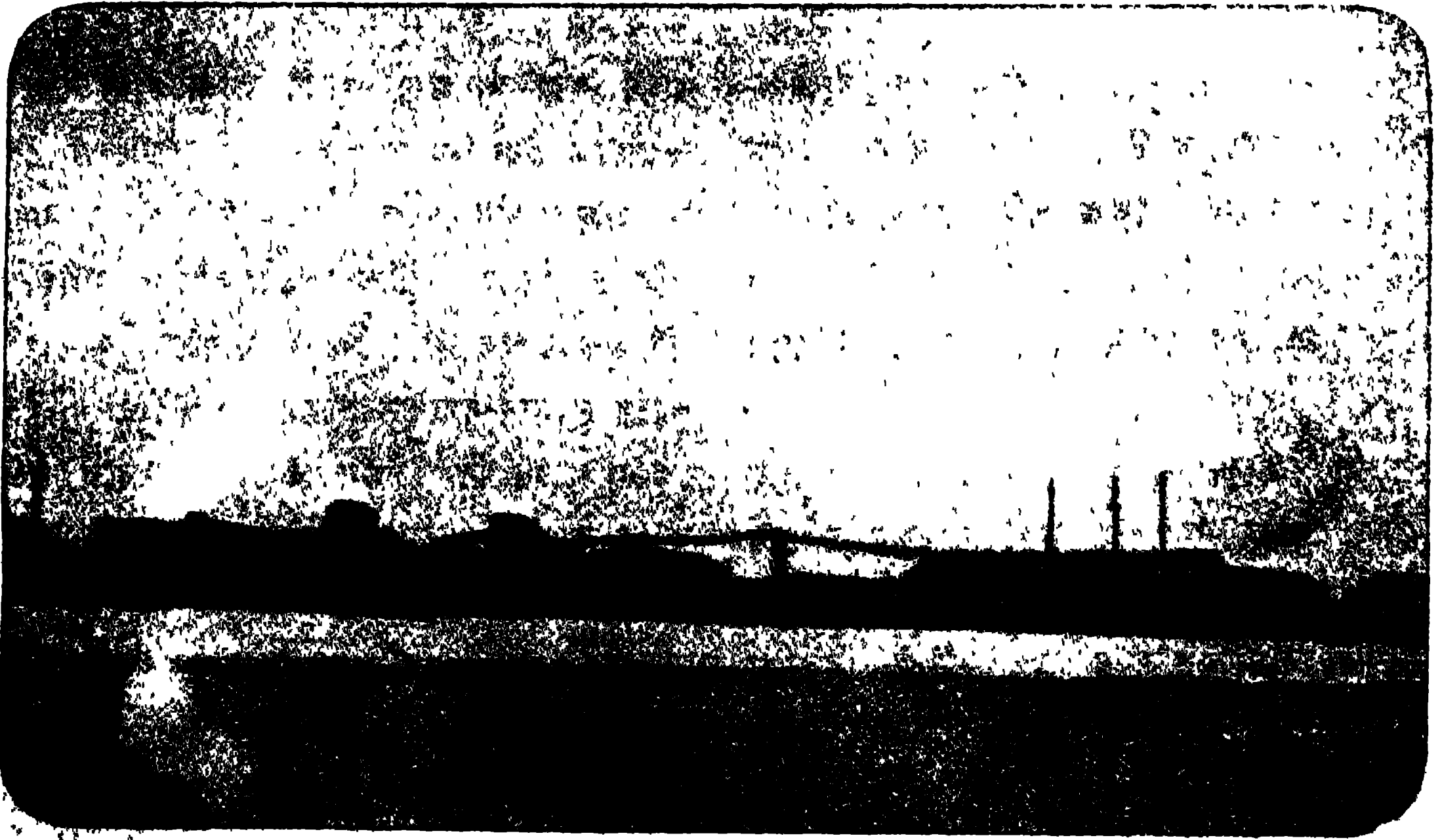
হয়েছিলেন, সাহিত্যসভার সদস্যগণ সামান্য জলযোগ (light refreshment) নাম দিয়ে প্রচুর জলযোগ ও চা যোগের আয়োজন করেছিলেন। রাত প্রায় নটার সময় এ মজলিস ভেঙ্গে গেল। তখনই শ্রীমান্ গৌরীচরণ বললেন যে, পরদিন মধ্যাহ্নে তাঁর বাড়ীতে প্রসাদ পেতে হবে; আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘোষ সাহেব বললেন যে, আমরা যেন প্রাতঃকালে নয়টার মধ্যে স্নান ও জলযোগ করে ঠিক হয়ে থাকি; তিনি এসে আমাদের নিয়ে জলের কল ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়ে বারটার সময় শ্রীমান্ গৌরীর বাড়ীতে পৌছে দেবেন এবং সেখানে প্রসাদ পাবার পর একেবারে তিনটার সময় উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া যাবে। তথাস্তু!

একটু পরেই শ্রীমান্ সত্যেশ সংবাদ দিলেন যে, চক্রধরপুর থেকে কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তার করেছেন যে তিনি প্যাসেঞ্জার ট্রেণে জামসেঁদপুর আস্‌বেন। এই পৌষ মাসের কনকনে শীতের মধ্যে বসন্তের আবির্ভাব যে কি করে হবে, আমি তা বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না। আমার মত বৃদ্ধের কাছ থেকে বসন্ত অনেক দিন আগে বিদায় নিয়েছেন, সুতরাং সে কালের কথা আর মনে নাই। তবে স্মৃতি-সাগর মন্থন করে একটু যেন দেখ্‌তে পেলাম যে, এমন দিনও ছিল, যখন পৌষের শীতের রাত্রিতেও বসন্তের দেখা পাওয়া যেত। কিন্তু, 'সে দিন ত আর নেই!' তাই, শ্রীমান্ সত্যেশ যখন হঠাৎ ব'লে বললেন যে, বসন্ত আসছে, তখন তাঁর নাম সত্যেশ হ'লেও আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পার্‌লাম না। তিনি তখন টেলিগ্রামখানি দেখালেন; তখন বুঝলাম যে বসন্ত ঋতুর আগমন হবে না—আস্‌ছেন আমাদের চির-প্রিয় বসন্তের মতই সদা-প্রফুল্ল কবিবর শ্রীমান্ বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। মনটা খুব প্রসন্ন হোলো। এই যে বসন্তকুমার ইনি যদি কারও কাছে উপস্থিত থাকেন, তা হ'লে তাকে নিদারুণ পুত্রশোকও ভুলে যেতে হয়, এমনই সুন্দর, এমনই সদানন্দ এই কবি বসন্ত।

অতএব, শ্রীমান্ বসন্ত যখন সাড়ে দশটা এগারটা রাত্রিতেই এসে পড়্‌বেন, তখন তাঁকে ফেলে রেখে আর আমরা আহারাদি সেরে লেপ-মুড়ি দিতে কিছুতেই পারি নে। কিন্তু, আমাদের দুর্ভাগ্য,—রাত্রি দশটা বেজে গেল, এগারটাও বেজে গেল, সাড়ে এগারটা হোলো—কৈ বসন্ত! বসন্তের আগমন হোলো না, কনকনে শীত আরও প্রবল হয়ে উঠ্‌লো। তখন বসন্তের আগমনে নিরাশ হয়ে আমরা রাত্রি বারটার সময় আহার শেষ করে শয়ন করলাম।

রাত যখন চারটে, তখন একেবারে মহা সোরগোল করে বসন্তের আবির্ভাব হোলো; দ্বারে করাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পাওয়া গেল—'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।' দ্বার খুলিবামাত্র শ্রীমান্ বসন্তের হাসির উচ্চ রোলে সত্য সত্যই শীতকে বিদায় নিতে হোলো—সত্য-সত্যই একটা বসন্তের হিল্লোল বইতে লাগল।

আর নিদ্রার অবকাশ হোলো না, গল্প গুজবে বাকী রাতটুকু কেটে গেল। বসন্তকুমার প্যাসেঞ্জার গাড়ী ফেল করে শেষ রাত্রের নাগপুর মেলে এসেছেন।

প্রাতঃকালেই একদল সাহিত্যিকের সমাগম হোলো। আজ রবিবার তাঁদের ছুটী। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ অজয়কুমার তাঁর সত্যেশ কাকার প্রতিনিধি হয়ে সকলের চা ও খাবার সরবরাহ করতে লাগ্লেন। আর যে গৃহে আমরা হল্লা করছি, সেই গৃহের বর্ত্তমান মালিক শ্রীযুক্ত মণি বাবু একেবারে আনন্দে অধীর হয়ে কি যেন করবেন, তার দিশে পাচ্ছিলেন না। মণি বাবু তাঁর মা জননীকে কাশীধামে পাঠিয়ে একলা এই বাড়ীতে বাস করছিলেন; পাশের বাড়ীই সত্যেশের। আমাদের আহারের ব্যবস্থা ছিল সত্যেশের গৃহিণীর জিম্বায়, আর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল এই লক্ষ্মীহীন প্রবাসী মণিবাবুর গৃহে।

তারপর তাড়াতাড়ি নটার মধ্যেই স্নান ও বিপুল জলযোগ শেষ করে আমরা প্রস্তুত হয়ে রইলাম। মিঃ ঘোষ সাহেব মানুষ; আমাদের মত নটা ব'লে সাড়ে দশটায় আস্বার পাত্র তিনি নন। ঠিক ন'টা বাজ্তেই তিনি তাঁর মোটর নিয়ে উপস্থিত হোলেন। তখন শ্রীমান চারুচন্দ্র, বসন্ত ও আমি তাঁর সঙ্গে সহর ভ্রমণে বের হলাম। তিনি আমাদের নিয়ে প্রথমেই জলের কল দেখাতে গেলেন। সেখানে সব দেখাশুনা করে আমরা টিন-প্লেট কোম্পানীর ও অন্যান্য কারখানা এবং সহরের ঐ দিকটার দৃশ্য দেখ্তে দেখতে গেলাম। পথ বড় কম নয়—তিন মাইলের উপর। সেখানে যাওয়াই সার হোলো, টিন-প্লেট কোম্পানীর কারখানা দেখা হোলো না, রবিবারে সব বন্ধ থাকে। তখন সারা সহরটা চক্র দিয়ে আমরা প্রায় সাড়ে এগারটায় সময় জি-টাউনে শ্রীমান গৌরীর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম এবং খবর নিয়ে জান্‌লাম যে প্রসাদ প্রস্তুত হতে বেলা দেড়টা। ততক্ষণ কি করা যায়। শ্রীমান্ চারুচন্দ্র প্রস্তাব করলেন যে, শ্রীমান অজয়ের বাসায় যাওয়া যাক্। গৌরী বল্লেন, অজয় এখনই আসবে, যাওয়া নিরর্থক। জামসেদপুরে কিন্তু এসে জ্যেষ্ঠপুত্রের নূতন বাসা না দেখে যদি কলিকাতায় ফিরে যাই, তা হ'লে বাড়ীতে কি কৈফিয়ৎ দেব? আমরা শ্রীমানের বাসায় যাওয়াই স্থির করলাম। বসন্ত ভায়াকে ডাকতে তিনি গম্ভীর হ'য়ে বল্লেন "না, আমি আর কোথাও যাব না। সাহিত্য-সভার উৎসবে এসেছি; আর কিছু না পারি ত সভাপতির উদ্দেশে একটা কবিতা আমাকে এখনই লিখ্তে হবে। আপনারা যান, আমি লিখ্তে বসি।" এমন সাধু সঙ্কল্পে বাধা দেওয়া নিতান্তই অকর্ত্তব্য মান করে, আমরা দুই জনে প্রথমে শ্রীমান্ অজয়ের বাসায় গেলাম; সেখান থেকে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাড়ী গেলাম। সতীশবাবু টাটারি চাকরি করতেন; কিছুদিন হোলো চাকরি ছেড়ে দিয়ে কন্‌ট্রাক্টরী আরম্ভ করেছেন এবং আর দশজনের বাড়ী তৈরী করতে করতে; নিজের জন্যও একখানি বাড়ী তৈরী করে কায়েম হয়ে বসেছেন, আর যাঁরা মাস গেলে বেতনের টাকা গণ্‌ছেন, তাঁরা সবাই পর-ঘরী! তবুও আমাদের চোখ খোলে না। হায় চাকুরীর মোহ!

এমন করে বাজে কথা বল্‌তে গেলে চাইকি এক বৎসরেও এই 'বড়দিনের সফর' বলা শেষ হবে না। অতএব, একটু সংক্ষেপ করা যাক্।

বলা বাহুল্য যে, শ্রীমান গৌরীর বাড়ীতে প্রসাদ পাওয়া যখন আমাদের শেষ হোলো, তখন আড়াইটা বেজে গেছে। ঠিক তিনটার সময় সভার অধিবেশন। জামসেদপুরের লোকেরা আর কিছু শিখুন আর না শিখুন, ঘড়ি ধরে কাজ করতে শিক্ষালাভ করতে তাঁদের হয়ই,; তাঁরা সময়ের মূল্য দায় ঠেকে বুঝেছেন; সুতরাং অন্যান্য স্থানের মত তিনটা বলা থাকলে, সাড়ে চারটার পরে সভা বসানো এখানে অসম্ভব। তাই, এই গুরুতর প্রসাদ পাওয়ার পরই সভায় যেতে হোলো।

সভার অধিবেশন স্থান 'মিলনী'-মন্দিরে। জামসেদ-

পুরের সর্ব্বশ্রেণীর ভদ্রলোকেরা মিলে এই প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তার সুন্দর নামকরণ করেছেন 'মিলনী'। এখানে সবাই মিলিত হন; যত সভা-সমিতি সবই এখানে হয়; প্রকাণ্ড হল; পাশে লাইব্রেরী আছে; নিকটস্থ প্রাঙ্গণে খেলাধুলারও স্থান আছে। কিন্তু বাড়ীটির অভ্যন্তর-ভাগ দেখ্‌লেই মনে হয়, এটা রঙ্গালয়, কারণ এক পাশে প্রকাণ্ড ষ্টেজ বাঁধা আছে; রঙ্গালয়ে যেমন দর্শকদের বস্‌বার ব্যবস্থা থাকে, এখানেও তাই। শুন্‌লাম প্রায়ই এখানে নাটকাভিনয় হয়।

যাক্ সে কথা। সভায় উপস্থিত হয়ে দেখি যে, অত-বড় হল একেবারে জনপূর্ণ; উপরের গ্যালারীতে পর্দ্দার অন্তরালে বহু মহিলা সমাগত হয়েছেন। হলের মধ্যেও এক পার্শ্বে কয়েকটী মহিলা উপবিষ্ট আছেন। সাহিত্য-সভায় এত মহিলার সমাগম বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লাম, এ সহরে বাঙ্গালা-সাহিত্যের ঢেউ একটু বেশী রকমই লেগেছে। শুভ-লক্ষণ সন্দেহ নাই।
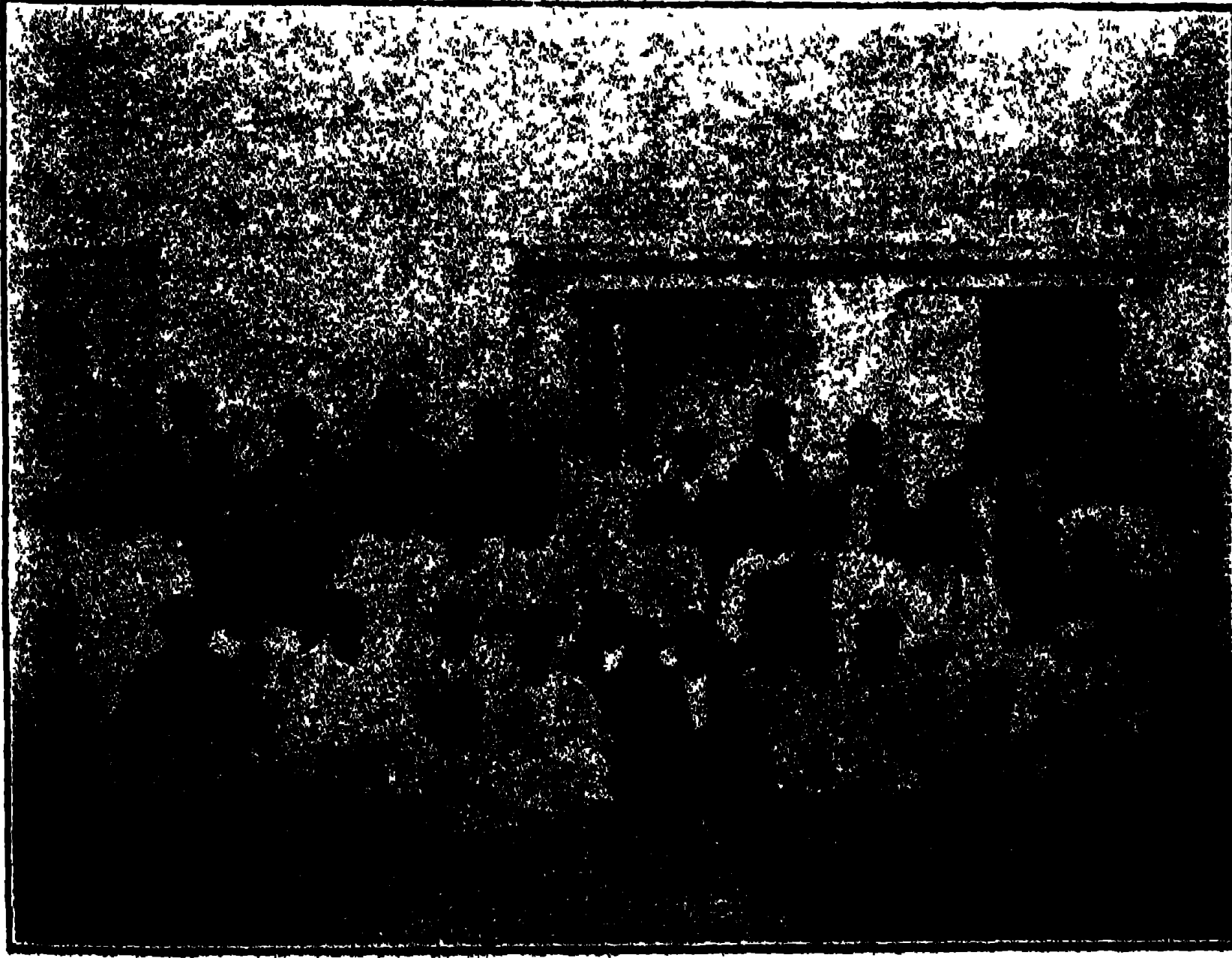
সাহিত্য-সভায় সমবেত ভদ্রমহোদয়

ঠিক তিনটার সময় সভার কাজ আরম্ভ হবার আগেই ডি এম মদন এম-এ, এল-এল-বি, এম-এল-সি, মহোদয় সার ডোরাব টাটার সঙ্গে এসে পৌঁছিলেন। শিষ্টাচারের অবতার সার ডোরাব কলিকাতার সাহিত্যিকদিগেরও উপস্থিত কয়েকজন ভদ্র মহোদয়ের সহিত কর-মর্দ্দন ও আলাপ আপ্যায়ন করিলেন, তারপর কাজ সুরু হল।

অন্যান্য সাহিত্য-সম্মেলনে যেমন হয়ে থাকে, এখানেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখ্‌লাম না। ঐক্যতান বাদন হোলো, অভ্যর্থনা-সঙ্গীত ও অমরগীতি 'আমার ভাষা' গীত হোলো। তারপর টাটার কারখানার বড় কর্ত্তা (Town Administrator) ও প্রধান ইঞ্জিনিয়ার এক সি [illegible] মহোদয় সুললিত ভাষায় সভার উদ্বোধন কাজ ইংরাজীতে সমাধা করেন। তিনি বিজ্ঞান ও প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে সাধারণের কাছে যে বিরোধের ভাব আছে তাহার মূলে কোন সত্য নাই তা প্রমাণ করেন। কথাটা যে খাঁটি সত্য তার প্রমাণ জামসেদপুরের বড় বড় বৈজ্ঞানিক-দের সরস রচনা। তারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত (এখন আর শ্রীমান্ বলা শোভন হবে না) সত্যেশ-চন্দ্র গুপ্ত এম-এ মহাশয় তাঁর অভিভাষণ পাঠ কর্‌লেন। এ অভিভাষণে, শুধু 'আমরা দীন' 'আমরা কোন আয়োজন কর্‌তে পারি নি' 'আমাদের সহস্র ত্রুটী মার্জ্জনা কর্‌বেন' 'আপনাদের পেয়ে আমরা একেবারে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছি' ইত্যাদি এই রকম মামুলী কথা ছিল না বল্‌লেই হয়; ও-সব শিষ্টাচার দুই চারিটী কথায় সেরে দিয়ে তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথা বল্‌লেন। তিনি যে একজন প্রতিভা-বান সাহিত্যিক, সে পরিচয়, যখন তিনি মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হাকিম ছিলেন, তখনই পেয়েছিলাম; এখন দেখ্‌লাম সরকারী হাকিমীর মায়া ত্যাগ করে, এই টাটার লৌহ-কারাগারে এসে তাঁর সাহিত্যালোচনা মোটেই কমে নাই, বরঞ্চ বেড়ে গেছে। তাঁর সুদীর্ঘ অভিভাষণ সকলেই একাগ্র চিত্তে শুনেছিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর

তারপর সভাপতি বরণ, অর্থাৎ নিছক স্তুতিবাদ। আমি যার শতাংশেরও দাবী রাখি নে, সে সব আমার এই দুর্ব্বল মস্তকে আরোপ করে আমাকে একেবারে বিব্রত করে তোলা হোলো। তখন আর কি করা যায়, করতালির মধ্যে সভাপতির উচ্চ ঘরে যুবরাজ অঙ্গদের মত উপবেশন, মাল্য-ধারণ। তৎপরে বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পঠিত হোলো। অতঃপর কবি বসন্তকুমার দণ্ডায়মান হ'য়ে তাঁহার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে লেখা কবিতা পাঠ কর্‌লেন; শুনে ত আমি লজ্জায় অধোমুখ হলাম। কবি হ'লে কি এত অতিশয়োক্তি কর্‌তে হয় না কি? আমি আরও সাতজন্ম সাধনা করেও যে সমস্ত গুণের অধিকারী হ'তে পার্‌বো না, কবি শ্রীমান্ বসন্তকুমার অম্লানবদনে ছন্দে গেঁথে তাই আমার উপর প্রয়োগ কর্‌লেন।

তারপরেই আমি একটা অমনি নামমাত্র অভিভাষণ পাঠ করিলাম। আমি বারবাব বলেছিলাম, আমি কিছু লিখ্‌তে পার্‌বো না, কিন্তু লৌহ-কারখানাব প্রহরীরা লৌহের মতই কঠিন, তাঁরা আমাকে দিয়ে একটা কিছু না লিখিয়ে নিয়ে ছাড়্‌বেন না। সুতরাং ফরমায়েসী সন্দেশে যেমন তের আনা চিনি আব তিন আনা ছানা থাকে, আমার অভিভাষণও তাই হয়েছিল।

আমার অভিভাষণ পাঠ শেষ হ'লে সভার কার্য্যসূচী অনুসারে সেইদিনই সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পাঠেব ব্যবস্থা ছিল। যে কয়েকটী প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল, তার সম্বন্ধে একটু একটু বল্‌তে গেলেও অনেক হয়ে পড়্‌বে; সুতরাং এ কীর্ত্তিতে তা থাক্, আমি এইখানেই এবারকার মত পাঠকদিগকে ঢক্কা-নিনাদ যে কখন মিষ্টি লাগে, তাহা অনুভব কর্‌বার অবকাশ দিচ্ছি।

রাণী

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার অলক বাহি এল নব মধুমাস—
হইল বয়ানখানি গোলাপ রঙিন।
মলয়ে উড়িল তব নীল নিচোলের পাল—
বাজিল তোমার কণ্ঠে শত বেণু বীণ্।
নয়ন সলিলে তব ফোটে নীল শতদল—
কুসুম ফেলিয়া অলি সেই দিকে ছুটে।

কপোল গোলাপী হ'ল, রাঙিল অধরতল—
মানস কাননে তব কোন ফুল ফুটে?
বাসন্তী-প্রতিমাসমা ল'য়ে সুধা পাত্রখানি—
পূর্ণ করি সুষমায় ওগো অনুপমা—
সুমুখে দাঁড়ালে মোর সাজিয়া হৃদয়-রাণী—
ভুলে-যাওয়া পুরাতন সুখস্বপ্ন সমা!

মধু-স্মৃতি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

কবিশেখর—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

প্রায় প্রতিবৎসর কলিকাতার কোন-না-কোন সাহিত্য সভায় আমি মাইকেল মধুসূদনের সম্বন্ধে কিছু কথা বলিতে কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া থাকি। একই বিষয় একই ব্যক্তির দ্বারা বিবৃত হইলে তাহা প্রায়ই পুনরুক্তি দোষে দূষিত হইয়া পড়ে। কাজেই যদি অপরাপর উৎসাহী, অনুসন্ধিৎসু যুবক-বৃন্দ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে মধুসূদনের বিষয়ে আরও অনেক নূতন নূতন অপূর্ব্ব-প্রকাশিত তথ্য জানিতে পারা যায়। আমরা প্রৌঢ়ের সীমা অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যের তোরণে উপনীত হইয়াছি, যৌবনের সেই প্রদীপ্ত-উদ্যম আর নাই, কাজেই মধুসূদনের জীবনের অপ্রকাশিত বিষয় সমূহের পুনরুদ্ধার আমাদের দ্বারা আর সম্ভবপর নহে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাসের এবং য়ুরোপ-প্রবাসের বহু মনোরম স্মৃতি-চিত্র এক্ষণে দীর্ঘ-বিস্মৃতির দুর্ভেদ্য তমসায় । তাঁহার য়ুরোপ-প্রবাসে যাঁহারা নিত্য-সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আর কেহই বর্ত্তমান নাই। য়ুরোপীয় যদিও দু'একজন এখনও জীবিত থাকেন, তাঁহারাও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অপরিচিত। সুতরাং মধুসূদনের য়ুরোপ-প্রবাসের নূতন কথা জানিবার আপাততঃ কোন সম্ভাবনা নাই। তবে কালক্রমে যে হইবে, সে কথা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, কারণ কালই মহাপুরুষগণের জীবনের বিলুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া থাকেন। হোমর, ভার্জ্জিল, টাসো, সেক্‌পীয়র, ভলটেয়ার, এবং আমাদের কবিত্ব-শ্যামল বঙ্গদেশের চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস, কালিদাস, রামপ্রসাদ প্রভৃতি মহাকবিগণের জীবনের চির-বিস্মৃত ঘটনা, তাঁহাদের তিরোধানের বহুবৎসর পরে অতীতের গাঢ় যবনিকা বিদীর্ণ করিয়া, আপনার স্বরূপ প্রকটিত করিয়া থাকে।

মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাসের অনেক দুর্লভ কাহিনী, বিস্মৃতির কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন হইলেও, বিশেষ চেষ্টা করিলে উদ্ধার করা অসম্ভব নহে। কারণ মাদ্রাজে অবস্থানকালে তিনি যে সকল সাময়িক পত্র সম্পাদিত করিয়াছিলেন, সেগুলির প্রায় অধিকাংশ দুষ্প্রাপ্য নহে! মাদ্রাজের প্রাচীন পুস্তকালয় এবং কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে অনুসন্ধান করিলে তাঁহার মাদ্রাজ-জীবনের বহু প্রীতিপ্রদ আখ্যায়িকা আমাদের আয়ত্বাধীন হইতে পারে। মধু-স্মৃতি রচনাকালে কবির মাদ্রাজ-প্রবাসের যে সকল অপূর্ব্ব উপকরণ আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, কবির সম্পাদিত প্রাচীন কতকগুলি মাদ্রাজ-পত্র অনুসন্ধান করিয়া তাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, আরও অনুসন্ধান করিলে কত যে নূতন তথ্য বাহির হইয়া পড়িবে, সে বিষয়ে বলাই বাহুল্যমাত্র। এখনও মাদ্রাজে প্রকাশিত কোন কোন সাময়িক পত্রে মধুসূদন সম্বন্ধে দু'একটি কৌতুকাবহ ও কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাঁহার মাদ্রাজ পরিত্যাগের পর প্রায় ৭০ বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাচ সেই নৈশ-অন্ধ-

কায় সমাবৃত সুদূর প্রদেশের নিবিড় তিমিরাবরণ ভেদ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার স্মৃতি-রশ্মি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে! সেই ক্ষণোদ্ভাসিত আলোকের সাহায্যে উৎসাহী অনুসন্ধিৎসু চিত্ত অনেক রত্ন আহরণ করিতে পারেন!

মাদ্রাজ এবং য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর কবিবর মাইকেল যে কয় বৎসর বঙ্গদেশে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কবি-জীবনের সেই কয়-বৎসরের বহু সুখ-দুঃখ-পরিপূর্ণ বিচিত্র স্মৃতি বহু সাময়িক পত্রে এবং নানাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইলেও অনেক বিষয় তাদৃশ সুশৃঙ্খলে গ্রথিত হয় নাই। সে গুলির সঙ্কলন এবং গ্রন্থন সবিশেষ শ্রমসাধ্য। আমরা মনে করি ইচ্ছা করিলে মধুসূদনের বঙ্গদেশের যাবতীয় স্মৃতি-সংগ্রহের কার্য্য অনেক উদ্যমশীল যুবক সম্পন্ন করিয়া যশ অর্জ্জন করিতে পারেন। এইরূপ কার্য্য করিয়া য়ুরোপে এবং আমেরিকায় বসওয়েল, হ্যাজলিট্ ব্ল্যাক, ফরেষ্টার, আবট প্রভৃতি মনস্বীবর্গ চিরঅমর হইয়া রহিয়াছেন।

আমাদের সাহিত্যের এক্ষণে ঘোরতর দুর্দ্দিন। আমাদের মনে হয় এরূপ দুর্দ্দিন পূর্ব্বে আর কখনও আসে নাই! বর্ত্তমান সময়ের নিতান্ত অসার, কদর্য্য নাটক এবং উপন্যাস এই দুর্দ্দিন আনয়ন করিয়াছে। তারল্যে বঙ্গদেশ ডুবিয়া গিয়াছে! বর্ত্তমান সময়ে তথাকথিত রাশি রাশি উপন্যাস ও নাটক ব্যতীত কয়খানি উৎকৃষ্ট উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বা নাটক রচিত হইতেছে? এক্ষেত্রে কেহ যেন মনে না করেন আমরা নাটক বা উপন্যাস-গ্রন্থকে খর্ব্ব করিতেছি। আমাদের বক্তব্য এই যে, নাটকের ন্যায় নাটক, উপন্যাসের মত উপন্যাস এত অল্প রচিত হইতেছে যে তাহা অঙ্গুলী-পর্ব্বে গণনা করা যায়। কিন্তু এই শ্রেণীর যে সকল গ্রন্থ বর্ত্তমানে লিখিত হইতেছে, তাহাতে পাঠক পাঠিকার চিত্ত তারল্যে প্লাবিত করিয়া দিতেছে। তাঁহাদের আর গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ, গবেষণাপূর্ণ কবিত্ব-পূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিবার মেরুদণ্ড নাই। আজকাল কয়জন কাব্যগ্রন্থ, ইতিহাস, জীবন-চরিত, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং ধর্ম্মপুস্তক প্রভৃতি পাঠ করিয়া থাকেন? আর এই সকল বিষয়ে কয়খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে? পাঠক থাকিলে ত প্রকাশিত হইবে?

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই লাইব্রেরীর এক বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বর্ত্তমান সময়ের কদর্য্য উপন্যাস-গ্রন্থাবলী প্রত্যেক পুস্তকালয় হইতে বহিষ্কৃত করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, এই সকল পুস্তকই সৎ-সাহিত্য প্রচারের প্রধান অন্তরায়। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসাহিত্যে কাব্য, গীতিকাব্য, খণ্ড-কবিতা প্রভৃতির সমাদর নাই। নাটক ও উপন্যাসেরই তুফান উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানপ্রদ গ্রন্থসমূহ অধীত হইলে সাহিত্যের কতই মঙ্গল হইত?
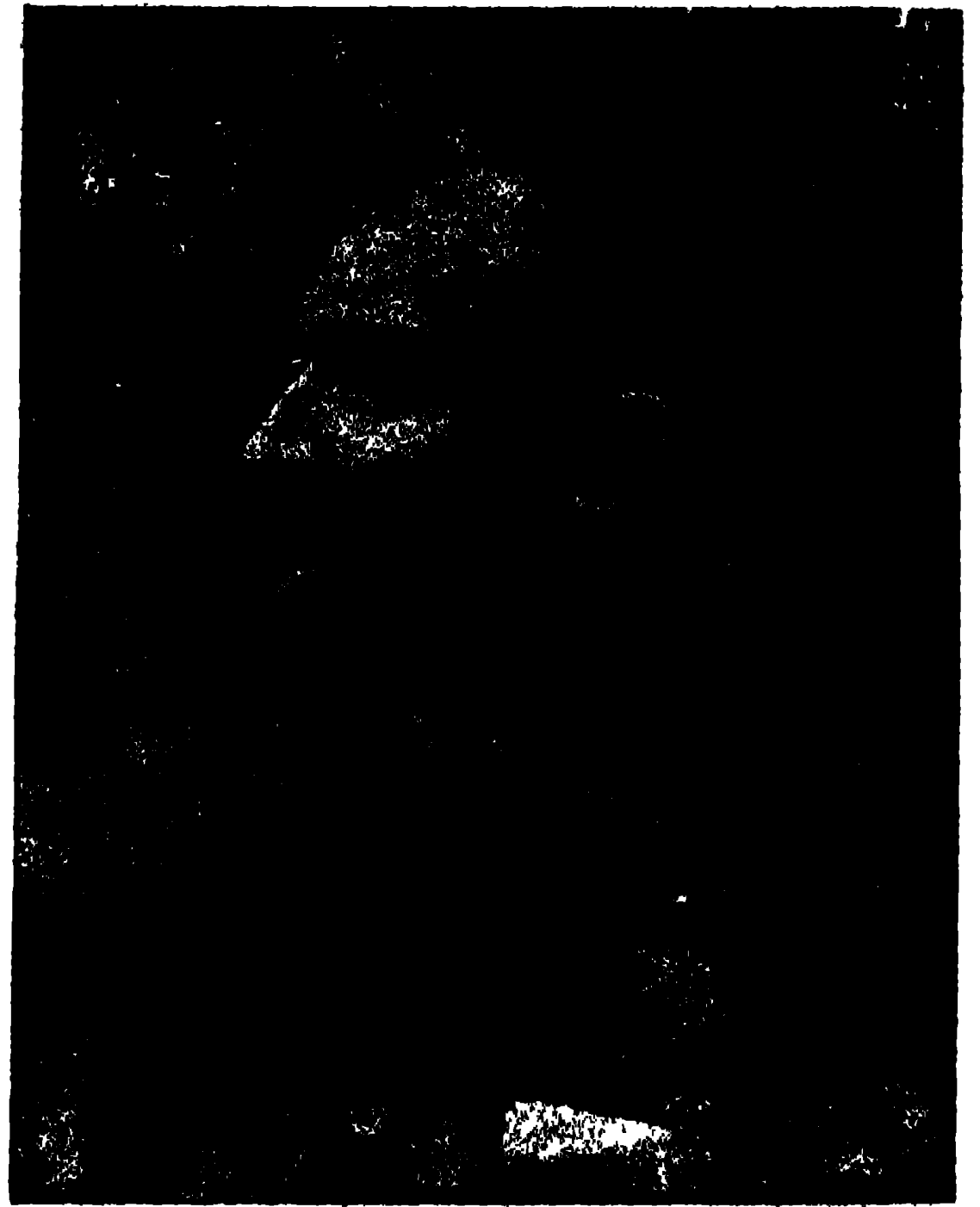
মহাকবি মধুসূদন 'তিলোত্তমা', 'মেঘনাদবধ' 'ব্রজাঙ্গনা' রচনার সঙ্গে সঙ্গেই 'পদ্মাবতী নাটক' 'একেই কি বলে সভ্যতা' 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। গভীর বিষয় হইতে হাল্কা বিষয় রচনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ লোকে গভীর বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে সচরাচর সমর্থ হয় না। কাজেই তাহাদের জন্য রহস্যপূর্ণ সাহিত্যেরও প্রয়োজন। উভয়দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাহা

কয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় এবং তাহাতেই বঙ্গসাহিত্যের এতাদৃশ উন্নতি হইয়াছিল। একণে সেই বিরাট সাহিত্য-মন্দিরের প্রধান স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার পুনর্গঠনের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে এই কথাই বলিয়াছিলেন! দেশের যখন এতদূর অধঃপতন তখন মহাকবিদিগের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে কোন চেষ্টার পথই বিশেষ দুর্গম ও সঙ্কট-সঙ্কুল।

কিন্তু তাহাতে ভীত বা নিরাশ হইলে চলিবে না। যতই বাধা-বিঘ্ন ঘটুক না কেন, ঐকান্তিক চেষ্টার ফল অবশ্যম্ভাবী। সদুদ্দেশ্যের সিদ্ধি সময়-সাপেক্ষ। যে সকল আবর্জ্জনা একণে বাগ্‌দেবীর পবিত্র মন্দির কলঙ্কিত করিতেছে, কালের করাল সম্মার্জ্জনীর প্রচণ্ড তাড়নে তাহারা কোথায় উড়িয়া যাইবে, কেহ জানিতে পারিবে না। যাহা প্রকৃত বিশুদ্ধ, সনাতন, চিরস্থায়ী, সারবান্ তাহা সহস্র বিপাকের দুর্ভেদ্য পরিবেষ্টন ভেদ করিয়া নিজের পথ মুক্ত করিয়া লইবেই? সূর্য্য প্রাবৃটে মেঘাচ্ছন্ন হইলেও নিজের রশ্মি বিকীর্ণ করিবার পথ খুঁজিয়া লন। সেইরূপ মধুসূদনের ন্যায় সাহিত্যের কবি, এবং বিদ্বজ্জনাগ্রগণ্যের স্মৃতি-রক্ষার উপযোগী যাবতীয় উপকরণ-সম্ভার চেষ্টা করিতে করিতে সমস্তই আমাদের করতলগত হইবে! সকল উগ্র বিঘ্নই একে একে সমূলে উন্মূলিত ও অপসারিত হইবে? য়ুরোপে জন্মিলে যাঁহার স্মৃতিসৌধের সমুচ্চ শিখর গগন-চুম্বন করিত, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ বঙ্গদেশ কি করিয়াছেন? বিলাতে যেমন মহাকবি সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলীর সমধিক প্রচার ও পঠনের উদ্দেশ্যে Shakespear Society আছে, তদ্রূপ কলিকাতায় মাইকেল সোসাইটি সংস্থাপনের নিমিত্ত স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদে মধুসূদনের এক সাম্বৎসরিক স্মৃতি-সভায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তিনি ফ্রান্সের কবিবর ভিক্টর হ্যুগোর স্মৃতি কিরূপ ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে তাহার সবিস্তার বর্ণনা করেন। চৌধুরী মহাশয় সেই সভায় স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যদি কবির স্মৃতি-রক্ষার নিমিত্ত কোন প্রকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান না হয়, তাহা হইলে বৎসর বৎসর একটা মিথ্যা-আড়ম্বর পূর্ণ সভার কোন প্রয়োজনই নাই। সেই সভার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মধুসূদনের সমাধিস্থলে এক স্মৃতি-সভায় তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সেই সভা এবং পরিষদে অনুষ্ঠিত সভার অন্তর্বর্ত্তীকালে কবির স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশে প্রকৃত কার্য্য কিছুই হয় নাই, এজন্য তিনি দৃঢ়স্বরে এইরূপ সভাসমিতির প্রতি যথেষ্ট দোষারোপ ও কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে যখন কবির সমাধিক্ষেত্রে বাৎসরিক স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইত; তখন সেই সভায় মধুসূদনের জীবনীকার কবির সমাধি-স্তম্ভের উপর একটি শিল্পাভরণ সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে সাধারণের নিকট একটি প্রস্তাব প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে উত্থাপিত করেন। সেই জন্য মাত্র তিন শত টাকার প্রয়োজন। ফলে কিছুই হয় নাই। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে অতীব লজ্জার কথা।

কবির স্মৃতি-রক্ষা করিতে হইলে কবির নাম-সম্বলিত স্মৃতি-সভা, সমিতি, পুস্তকালয় প্রভৃতি যে তিনটি প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান আছে, সেই প্রতিষ্ঠান-সমূহের কর্ত্তৃপক্ষেরই তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার যাবতীয় গুরুভার ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই মাইকেল লাইব্রেরী সেই প্রতিষ্ঠান-ত্রয়ের অন্যতম। কবির প্রবাসের বাসভবন যে পল্লীতে এখনও বর্ত্তমান, খিদিরপুরের সেই পল্লীতেই 'মাইকেল' নাম সংযুক্ত এই পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত। রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, লর্ড মেকলে, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনস্বীগণের কলিকাতাস্থ বাসভবনের প্রাচীরগাত্রে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক তাঁহাদের স্মৃতি-ফলক সংযোজিত হইয়াছে, কিন্তু মধুসূদনের খিদিরপুরস্থ বাসভবনে সেইরূপ প্রস্তর-ফলক সংলগ্ন করিবার জন্য এই কর্ত্তৃপক্ষের বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীকে পত্র লেখা উচিত। ইহা গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত করিবেন এজন্য তাঁহাদের কোন অর্থব্যয় নাই। কেবল কিঞ্চিৎ উদ্যমের প্রয়োজন! আমরা আশা করি, কবির বাসভবনের ভিত্তি-গাত্রে শীঘ্রই, তাঁহার ঐ ভবনে বাস-কাল নির্দ্দেশক মর্ম্মর-ফলক দেখিতে পাইব। কলিকাতার সাহিত্য-পরিষদে, পুলিশ আদালতে তাঁহার তৈল-চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। কবির

জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী গ্রামে তাঁহার বিশাল পৈত্রিক বাসভবনের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কবির জন্মস্থান-নির্দ্দেশক একটি বৃহৎ প্রস্তর-ফলক-সমন্বিত স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কবির তিরোধানের পঞ্চদশবৎসর পরে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা লোয়ার সার্কুলার রোডের খ্রীষ্টীয় সমাধি-ক্ষেত্রে তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন-হীন সমাধি-ভূমির উপর তাঁহার কৃতজ্ঞ স্বদেশ-বাসীরা একটি মর্ম্মর-নির্ম্মিত মধ্যমায়তন সমাধি-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং গত ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কবি-পত্নী এমিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া দত্তের চির-অনাবৃত সমাধি-ভূমির উপর ডাক্তার মরেনো সাহেবের আন্তরিক চেষ্টায় এবং উদ্যোগে একখানি প্রস্তর-ফলক বিন্যস্ত হইয়াছে।

কলিকাতা-হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মহাশয়দিগের বার লাইব্রেরীতে তাঁহার তৈলচিত্র সংরক্ষণের প্রস্তাব ব্যারি-ষ্টার-সমিতির অনুমোদিত হইয়াছে। ব্যারিষ্টার এন্ মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে বলিয়াছেন, সত্বরই কার্য্য আরম্ভ হইবে।

এতদিনের মধ্যেও এই পুস্তকালয়ের ভবনে মধুসূদনের তৈলচিত্র সুরক্ষিত হয় নাই। এই পুস্তকালয়ের কার্য্য-বিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ধনে মানে গণনীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই পুস্তকালয়ের সভ্য, অথচ এই সামান্য স্মৃতি-চিহ্ন এতদিনে সংরক্ষিত হয় নাই। আমরা আশা করি আগামী বৎসরে কবির সৌম্য প্রতিভা-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি লাইব্রেরীর ভিত্তি-গাত্রে সুশোভিত দেখিতে পাইব। এ বিষয়ে এই মুহূর্ত্ত হইতেই উদ্যোগী হইতে হইতে হইবে। কার্য্যই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রকৃত উপায়। একটি প্রকৃত কার্য্যের ফলের সহিত শতবক্তৃতাও তুলনীয় নহে।

এই স্মৃতি-সংরক্ষণের উদ্দেশ্য কেবলই যে মহাকবির প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন তাহা নহে। যুরোপীয়েরা তাঁহাদের বিখ্যাত কবি, বীর, মনীষী এবং বৈজ্ঞানিকগণের যে তৈলচিত্র, প্রতিমূর্ত্তি, স্মৃতি-স্তম্ভ, প্রস্তর ফলক প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন তাহার উদ্দেশ্য অতীব মহৎ। ভবিষ্যদ্-বংশীয়েরা পূর্ব্ব-সূরীগণের চিন্তার ধারা অব্যাহত রাখিতে পারিবেন বলিয়া সেই সমস্ত স্মৃতি-চিহ্নের পরিকল্পনা। এই চির-বিস্মৃতি-পূর্ণ সংসারে কালের মহা-অন্ধকারে সমস্তই নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতেছে; কিন্তু সেই নিবিড় তমসা ভেদ করিয়া যাঁহারা আপনাদের যশোরশ্মি বিকীর্ণ করিতে শক্তিমান্, তাঁহাদের স্মৃতি-মঠ তাঁহাদের স্বদেশীয়-গণের দ্বারা যদি নির্ম্মিত না হয়, তাহা হইলে সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। এ কথা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক নাই। এতদ্ভিন্ন আরও একটি কথা এই যে, যাহাতে বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থপাঠে সকলের অনুরাগ জন্মে সেই কারণে তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে লোকে এত আগ্রহান্বিত হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে। আমাদের দেশে সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে মাত্র। ইহা যাহাতে শীঘ্র বিশাল মহীরুহে পরিণত হয় তজ্জন্য সকলের সমবেত চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

খিদিরপুর নিবাসী বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের নিকট আমাদের ঐকান্তিক নিবেদন এই যে, খিদিরপুরে মধুসূদনের যে কয়টি স্মৃতি-চিহ্ন সংস্থাপন সম্ভবপর, সেই কয়টির সংস্থাপনে তাঁহারা যত্নবান হউন তাহা হইলে মধুসূদনের স্মৃতি-রক্ষা-কার্য্যের কার্য্যের কতকাংশও সংসাধিত হইবে।

পরিশেষে একটি অতীব আনন্দ-সংবাদ প্রদান করিয়া আমরা আমাদের বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করিব। কৃষ্ণনগর নিবাসী ডাক্তার রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর এবং সাগর-দাঁড়ী নিবাসী মধুসূদনের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদমোহন দত্ত চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের অনুরাগে সাগরদাঁড়ী গ্রামের মাইকেলোদ্যান নামক আম্রকাননে কপোতাক্ষ-নদীর তীরে মধুসূদনের ফরাসীদেশে বিরচিত 'কপোতাক্ষ নদ' শীর্ষক চতুর্দ্দশ-পদী কবিতাটি শুভ্র মর্ম্মরে উৎকীর্ণ হইয়া, একটি সুদৃশ্য স্তম্ভে সংযুক্ত হইয়া, সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিগত রবিবার ১২ই মাঘ মধুসূদনের জন্মদিনে শীতের এক সুন্দর মনোমুগ্ধকর প্রশান্ত অপরাহ্নে উপরি-উক্ত নদীতীর শোভিত সুরম্য স্মৃতি-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে মহাকবির এই দীন-স্মৃতি-লেখক, রায় জলধর সেন বাহাদুর, গিরিজা-কুমার বসু, চারুচন্দ্র মিত্র এবং ডাক্তার ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই উৎসবে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইয়া-

ছিলেন। কবির সেই চিরমধুময় প্রাণস্পর্শী স্মৃতি-উৎসব ভুলিবার নয়। সেই স্মৃতি-সভায় সভাপতি রায় বাহাদুর জলধর সেন স্মৃতি-স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন। বহু কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হয়। সকলেই মধুস্দনের মধুর-স্মৃতিতে বিভোর হইয়াছিলেন। মধুর নাম মধুর প্রসঙ্গে রচিত কবিতা, মধুর সম্বন্ধে প্রবন্ধ, মধুর-স্মৃতি-সঙ্গীত সকলের হৃদয় মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী মধুময়। তরঙ্গায়িত নীল কপোতাক্ষের মৃদুমন্দ হিল্লোল, গগন-প্রান্তে অস্তগামী সূর্য্য-রশ্মির কনকআভা, বিটপ-বহুল উদ্যানরাজীর শীতল ছায়া, শীতের স্নিগ্ধ-সমীরণ, আম্রকানন পরিবেষ্টিত স্মৃতি-স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে মধুস্দনের আত্মীয়বর্গ ও স্বদেশীয়গণের ভক্তি-শ্রদ্ধা-সমন্বিত কবি-অর্চ্চনা এবং সর্ব্বোপরি মহাকবির করুণ স্মৃতি-কাহিনী বিজড়িত সভাপতির সকরুণ বক্তৃতায় শ্রোতাগণের হৃদয়ে যে ভাব অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল তাহা জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে।*

* বিগত ১৬ই মাঘ, খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরীর দশম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

কপোতাক্ষ তটে

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

তোমার নীলিমধারা বহিয়াছে বুকে
যুগে যুগে নষ্ট হাসি, বহু সুধারাশি
কত বিচিত্রিত লীলা অবাধ কৌতুকে
তব জল-ছলছলে বাজিয়াছে আসি
তব তটতরুতলে আলোকে ছায়ায়
কত চারু মিলনের ইতিহাস লেখা,
মরমের কোটি ব্যথা প্রেমের মায়ায়
রেখে গেছে তীরে তব আঁখিবারি রেখা।

স্মরিয়া তোমার কথা সুদূর প্রবাসে
বিরচিল মধুছন্দে বাঙ্লার মধু
প্রীতির মোহনহার প্রাণের উচ্ছ্বাসে
পেলব ভাষার ফুলে, দশদিক্‌বধূ
মাতিল সৌরভে তার মদির হরষে
বাণীর চরণ-পদ্ম উঠিল শিহরি'
বুঝি তার স্নেহমন নিবিড় পরশে,
অন্তর, অমৃত-লোকে আসিল বিহরি'

ধন্য তুমি প্রিয় নদ মধুস্দনের
হে সুন্দর কপোতাক্ষ নয়ন-নন্দন
ধন্য আমি আজি তব পূজা-বোধনের
আনিয়াছি অনুরাগে কুসুম চন্দন,
তোমার পুলিন-ধূলি রাখিব গরবে
কবি' এই ললাটের মহিমার ভূষা
জীবনের অন্ধকারে রবে তুমি রবে
কোমল কিরণ মোর, হৃদয়ের উষা।

* কবি মধুস্দনের উন্মোচনে কবিকর্ত্তৃক পঠিত।
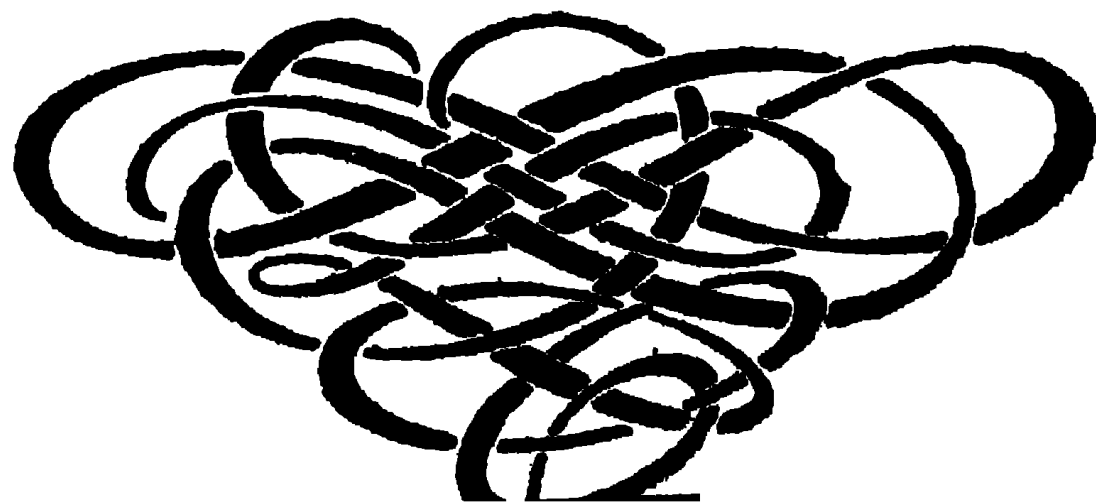
গল্পের শেষ

শ্রীশরচ্চন্দ্র বিশ্বাস

১

* * * গলীর ভিতর ঢুকিতেই বাম হাতি ত্রিতল বাড়ীখানি অনেকের নজরে পড়ে। উহারই বাহিরের ঘর, প্রসিদ্ধ মাসিক 'পথিকে'র আস্তানা। সম্পাদক সবিতেশ উদীয়মান সাহিত্যিক, তরুণ ও সুপুরুষ। মা বাপ উভয়েই কিছুদিন পূর্ব্বে স্বর্গলাভ করিয়াছেন। অগাধ অর্থ, তিনখানি বাড়ী ও মোটর পাইয়াও সবিতেশ 'রেসে' যোগ দেয় নাই। একমাত্র বন্ধু অমলের সঙ্গে 'পথিক' লইয়াই মাতিয়া আছে। কারণ সাহিত্যের নেশা রেসের মত ফলে মারাত্মক না হইলেও তার চেয়ে কমজোর নয়।

বেলা দুইটা বাজিয়াছে। ফাল্গুনের পথিকের জন্য যে একরাশ পদ্য ও গল্প আসিয়াছিল তাহা উভয়ে নাড়া চাড়া করিতেছিল। সহকারী অমল একখানি খাম খুলিয়া বলিল, ওহে, কল্পনা বোস্ কি লিখেছে দেখ!

সবিতেশ—তখন ফাল্গুনে প্রাপ্ত 'বর্ষার' অভিনন্দন কবিতাটি মুখ বিকৃত করিয়া পড়িতেছিল ও মনে মনে ভাবিতেছিল যে কবিদের মত 'অটোক্রাট' দুনিয়ায় বুঝি কেউ নাই—ঘাড় তুলিয়া কবিতার এককোণে ফাউন্টেন পেনে সবুজ কালিতে লিখিল "প্রত্যর্পিত হইবে" তারপর বলিল, "তুমিই পড়—আমি শুনছি।"

কলিকাতা
—নং মহেশ বারিক লেন
৩।১১।৩৩

মাননীয় 'পথিক' সম্পাদক মহাশয়
মান্যবরেষু;

সবিনয় নিবেদন,

সর্ব্বসমেত নয়খানি পত্র লিখিবার পর যে দয়া করিয় গল্পটী ফেরৎ দিয়াছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করিলে বাধি হইব! গল্পের কপি করা বা করান যে কি কর্ম্মভোগ তাহ এক সংবাদপত্রের সম্পাদক ব্যতীত সকলেই জানে।

আপনারা লিখিয়াছেন, আর কোনও গল্প ন পাঠাইলে বাধিত হইবেন! গল্পে মন্তব্য করিয়াছে 'অসম্ভব' এবং এই আলনাস্কারের 'দুঃস্বপ্ন' গল্পের কদ আজকাল আমাদের বাংলার পাঠকমহলে নাই! উত্ত মেয়েদের লজ্জাই ভূষণ হলেও আধুনিক শিক্ষা তাদের এক সাহসী ও স্পষ্টবাদী করেছে সেটকু মনে রাখিয়া চলি লজ্জাহীনতা দেখিয়া লজ্জায় আপনাদের সঙ্কুচিত হই হইত না। যাহা হউক আপনাদের গল্প পাঠাইয়া অ অন্যায় করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ডাকঘরকে যে দক্ষিণা দিয়াছি একণে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আম নাম গ্রাহক-তালিকা হইতে কাটিয়া দিলে পরম আন লাভ করিব। ইতি—

বিনীতা—শ্রীকল্পনা

পত্র শুনিয়া সবিতেশ বলিল "একবারেই ক্ষিপ্ত !"

অমল বলিল, "প্রায় কিন্তু সবিদা এই কল্পনা বোস্কে কল্পনা কর্ত্তে পার ?

সবিতেশ—চক্ষু মুদিত করিয়া জ্যোতিষীদের ন্যায় গম্ভীর গলায় বলিতে লাগিল "বয়স চল্লিশও হতে পারে সত্তরও অসম্ভব নয়। তবে চল্লিশের নীচের মত symptom নাই—মাথা একটু গরম হয়ে সব চুল উঠে গেছে—না হয় যে কটা আছে তা প্রায় সাদা হ'য়ে এসেছে। নাতী যদি এদ্দিন না হ'য়ে থাকে—তবে হবার বেশী বিলম্ব নাই। কর্ত্তাটী গোবেচারা—বাহিরের ঘরে দাবা পাশা খেলেন আর পুস্তক, কাগজ, কলম প্রভৃতি সববরাহ করেন—হয় বড় আফিসের মুৎসুদ্দী নয় কোন এষ্টেটের ম্যানেজার।

উচ্চহাস্যে অমল বলিল আরে তুমি যে একেবারে 'ম্যাক্সওয়েল' হ'লে চোখ্ মুদে যাকে দেখলে তার লেখা দেখেই বয়স বর্ণ, হাঁড়ীর খবর সব আবৃত্তি করছ। মা-লক্ষ্মীর বিদ্যের দৌড়টা কতদূর অনুমান কর ?

'রয়্যাল রীডার চতুর্থ পাঠ। নিঃসন্দেহ। ওতেই 'আল্নাস্কারে'র কথা আছে না ? ওইটাই কল্পনা দেবীর খুব ভাল লেগেছিল এখনও তার চোঁয়া ঢেকুর উঠ্ছে।'

"কিন্তু হাতের লেখাটা বেশ !"

আরে তা' হ'বে না কেন। সংসারের কাজ বামুন চাকরের ঘাড়ে চাপিয়ে ধোপা গয়লা আর বাজারের হিসেব কর্ত্তার জিম্মায় রাখতে পাল্লেই লেখা পাকে। যাক্ পরস্ত্রীর কথা নিয়ে এত নাড়াচাড়া করা অন্যায়। পথিক আর যে নেবেন না—সেটা পথিকের পুণ্যফল। বাবা ! মাসে দু'বার ঠিকানা বদলাবার চিঠির হুমকী অসহ্য। আজ মধুপুর কাল দার্জ্জিলিং, তারপর গয়া, কাশী বৃন্দাবন, —জ্বালাতন !

ফাল্গুনের প্রথম তিন ফর্ম্মার প্রুফ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সবিতেশের ভগ্নী কমলার চিঠি আসিল। সে ও তাহার স্বামী লিখিয়াছে, তাহাদের খোকার ভাত আসা চাই-ই। অমলকে ডাকিয়া সবিতেশ ভগ্নীর পত্র দেখাইয়া বলিল "কি করা যায় ?"

অমল তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, তার জন্য আর কি এদিককার ব্যবস্থা আমি করে নিতে পারব এখন। তুমি আজই বেরিয়ে পড়—"

২

সেই দিন সন্ধ্যায় অমল সবিতেশকে জিনিষপত্র সমেত বোম্বে মেলের একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠাইয়া দিল।

মেল ছাড়িবার পাঁচ মিনিট আগে রেলের এক কুলি সেই কামরায় প্রকাণ্ড একটা বড় 'ট্রাভেলিং ব্যাগ' তুলিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক তরুণী গাড়ীর মধ্যে টকাশ করিয়া উঠিলেন। কুলীকে বখশীস্ করিয়া তিনি সবিতেশের ঠিক সামনের বঞ্চে বসিয়া ঘোমটার ভগ্নাবশেষটুকু খোঁপায় পিন্‌করা আছে কি না দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময় ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, তরুণী বিশেষ সুন্দরী, খদ্দরের শাড়ীতেও তাঁহাকে বেশ মানাইয়াছিল।

তরুণী আপন মনে বেশ একটু জোরের সঙ্গে বলিলেন—এমন বিপদেও মানুষে পড়ে।

সবিতেশ বিস্মিত হইলেন নবাগতার সহজ চালচলনে, পরে আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে ? বলেন তো পরের ষ্টেশনে আমি পাশের কামরায় যাব'খন।"

তরুণী তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, আমার সঙ্গে যাঁর যাবার কথা ছিল, তিনি এসে পৌঁছাতে পাল্লেন না। আমার আর ফেরবারও সুবিধা নেই। আপনাকে দেখেই এ গাড়ীতে উঠেছি।

সবিতেশ তাঁহার কণ্ঠে আর্ত্তস্বর অনুভব করিয়া সাগ্রহে বলিল, "কি অনুমতি করুন—আমার দ্বারা—"

তরুণী গম্ভীরভাবে বলিলেন, বিশেষ দরকারেই আমাকে যেতে হবে শোন্-ইষ্ট-ব্যাঙ্ক্ পর্য্যন্ত। আপনি কতদূর যাবেন ? "আমি পালামৌএ আমার ভগ্নীর বাড়ী যাচ্ছি। শোন্ ব্যাঙ্কে আমায়ও নামতে হবে, আপনি স্বচ্ছন্দে আমার সঙ্গে যেতে পারেন।"

সেদিন সবিতেশের ঘাড়ে শনিগ্রহ বোধহয় চাপিয়াছিলেন। সে নিজ মুখে কোন স্থানে যাহা ভুলিয়াও উচ্চারণ করে নাই তাহা আজ করিল ; কথায় কথায়

বলিল সে 'পথিকে'র সম্পাদক। তরুণীর সৌন্দর্য্যে বোধ হয় একটু মাদকতা ছিল; তাহার প্রভাবেই এই স্বল্প-ভাষী তরুণ বিনা দ্বিধায় মনের অর্গল খুলিয়া দিয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে সবিতেশ বলিল, শোন্ ব্যাঙ্ক থেকে আপনি কোথায় যাবেন ?

তরুণী বেশী কথা কহেন নাই—তবে কথাবার্ত্তাকে সজীব রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে কেবল উস্কাইয়া দিতেছিলেন।

ঐ খানেই যাব। বলিয়া তরুণী জান্লা হইতে বাহিরের দিকে চাহিলেন, বাহিরে তখন জ্যোৎস্নাস্নাত প্রকৃতি গাছপালা, নদী, মাঠ প্রভৃতি বুকে লইয়া মেলের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা দিতেছিল—তরুণীর উজ্জ্বল ভাস্বর নয়ন দুটীর উৎসুক দৃষ্টি সেই দৌড়াদৌড়ির সঙ্গে মিশিয়া গেল।

সবিতেশ কথা কহিবার প্রবল ইচ্ছা দমন করিয়া হাতের বইখানির যেখানে পড়িতেছিল, অন্যমনস্কে পাঁচ পরিচ্ছদ পরের পাতা উল্টাইয়া সেই অর্থহীন, পিপীলিকার সারির মত অক্ষরগুলির দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তার মস্তিষ্ক কিরূপে তরুণীর সঙ্গে কথা পাড়া যায় অথচ অর্ব্বাচীনতা না প্রকাশ পায় তাহার উপায় খুঁজিতেছিল।

হঠাৎ তরুণী উঠিয়া তাহার ব্যাগ খুলিয়া একখানি বই বাহির করিল।

সবিতেশ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, ওখানা কি বই ?

তরুণী নিরুত্তর—গম্ভীর !

জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাওয়ায় সবিতেশের মুখ তাচ্ছিল্যের অপমানে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

এক মিনিট পরে সে ভাবিল ইনি বোধহয় শুনিতে পান নাই তাই সে ঈষৎ জোরে আবার জিজ্ঞাসা করিল আপনি কি বই পড়ছেন, তখন তরুণী তাহাকে বইটী মুড়িয়া মলাটে লেখা নামটী দেখাইল, "পত্রাবলী—৩য় ভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ," কথা কিন্তু হইল না।

উপেক্ষার আঘাত কঠিন হইলেও সময় বিশেষে খুব বেশী কাজের হয়—সবিতেশ অগত্যা কথাবার্ত্তার আশা ত্যাগ করিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল।

আসানসোলে তাহার টিকিট দেখিয়া পরিদর্শক বিস্মিত ভাবে বলিল, ওঁর টিকিটখানাও দেখাবেন মশায়।

তরুণী তখনও নির্ব্বিকার ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন দেখিয়া সবিতেশ বড় অধীর হইয়া উঠিল। পাছে পরিদর্শক অন্য কিছু মনে করিয়া কিছু সন্দেহ করিয়া বসে, সেজন্য সে তাহাকে একটা যা'তা বলিয়া শোন্ব্যাঙ্ক পর্য্যন্ত ভাড়া দিয়া রসিদ লইল। মনে ভাবিল, "যাক্ এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম।"

কিন্তু তরুণীটীর সহিত আলাপ করিবার জন্য তার মন এত উন্মুখ হয়ে উঠেছিল যে নিজেকে আর ঠিক জায়গায় রাখতে না পেরে, যেন কথা কহিবার একটা অছিলা খুঁজিতেছিল—হঠাৎ তরুণীর মুখের দিকে চেয়ে সে বল্লে, "কিছু খাবার নেওয়া যাক্—কি বলেন ?

উত্তরে তরুণী ঘাড় নাড়িয়া প্রস্তাবের সমর্থন করিল। ঠোঙা ভরিয়া খাবার লইয়া সে তাহার সামনে ধরিল। কথা কহিতে আপত্তি থাকিলেও তরুণী সন্দেশ ও রস-গোল্লার সদ্ব্যবহারে অমনোযোগী হইলেন না। সবিতেশ মনে করিয়াছিল, কিছু খাবার সকালের জন্য রাখিবে, কিন্তু তরুণীর ভোজনের বহর দেখিয়া সে 'থ' হইয়া গেল। আহারান্তে জল পান করিয়া ব্যাগ খুলিয়া তরুণী বইখানি তাহার মধ্যে রাখিয়া 'ফাউণ্টেন-পেন্' ও 'নোট-বুক' লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিল।

সাবিতেশের বুকে বড় বাজিল তার এই হৃদয়হীন ঔদাসীন্য—সে কি একবার মুখের কথায়ও একটা সন্দেশ খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিত না। সে তাহার সহিত আলাপের আশা ত্যাগ করিয়া বই হাতে করিয়া ঝিমাইতে লাগিল।

এমনি ভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। গয়া হইতে ছাড়িয়া গাড়ী কিছুদূর আসিয়া হঠাৎ থামিয়া যাইতেই সে ঘুম-ঘোরে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় এল ? তরুণী খাতা মুড়িয়া বলিল, গয়া ছেড়ে এসেছে।

তরুণীর কণ্ঠস্বরে সবিতেশের ঘুম একেবারে ছুটিয়া গেল। সে হাসিয়া বলিল, যাই হ'ক, আপনি যে ব্যবহারটা করলেন,—কোনও গল্পের বইতেও আমি এরকমটা দেখবার আশা করি নি; আপনার কি হয়েছিল বল্বেন—অবশ্য যদি কোনও আপত্তি না থাকে।

তরুণী ম্লানস্বরে বলিল, "আমি কোন একটা কথা—

আমার নিজেরই কথা আপনাকে বলব কিনা ভাবছিলাম।

সবিতেশ তাড়াতাড়ি বলিল, কি ভাবছিলেন ?

"আপনাকে বলা যেতে পারে কি না ?" দেখুন আমি মহা বিপদে পড়েছি। আপনাকে সংক্ষেপে সকল কথা খুলে বল্‌ছি। আমার বাপ অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক। আমার নাম অরুণা। আপনাদের বাড়ীর পাশে র-বাবুদের বাড়ী। তার ছেলে অনিলের সঙ্গে আমি ছোট বয়সে অনেক খেলা করেছি। দু'বছর আগে আমরা দু'জনেই জানতে পারি আমরা উভয়েই পরস্পরকে ভালবেসেছি। কিন্তু কোনও উপায় ছিল না—আমরা ব্রাহ্মণ সে কায়স্থ। আমি বিয়ে করব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। কিন্তু বাবা আমাকে জোর করে এই সপ্তাহে বিয়ে দেবেন বলেছেন। আমি অনিলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাশীতে আমার ভগ্নীর কাছে যাব ঠিক করে বাড়ী থেকে চলে এসেছি—কিন্তু অনিল আসবে বলেও এ'ল না—। শোণ ব্যাঙ্গে সকাল হ'য়ে যাবে Time tableএ দেখেছিলুম—তাই আপনাকে—

সবিতেশ হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, বাধা দিয়া বলিল বেশত আমিই কাশীতে আপনার মাসীর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবো। এ অবস্থায় আমি আপনাকে একলা ছেড়ে দিতে পারি না।—পালামৌ এ আমার দু'দিন পরে গেলেও কোন ক্ষতি হবে না।

তরুণী সামান্য আপত্তি করিয়া অবশেষে সবিতেশের কথায় স্বীকৃত হইল।

৩

কাশীতে দু'দিন কাটিয়া গেল। মাসীমার সমস্ত পরিচয় পাইয়াও সবিতেশ তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না। অরুণাও কোন সঠিক ঠিকানা বলিতে পারিল না।

তিন দিনের দিন অগত্যা সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

বাপের নাম ঠিকানা না বলায় সবিতেশ তাহাকে লইয়া নিজের বাড়ীতে আসিল। অমল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল; কিন্তু ভাগ্নের ভাতে যাইয়া সে ভাস্করের মনসী প্রতিমার মত সুন্দরী তরুণীকে কি সূত্রে কোথা হইতে জয় করিয়া আনিল প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও তখনই তাহা জিজ্ঞাসা করিবার ভরসা পাইল না। উপরের ঘরে অরুণার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পথিকের 'আস্তানায়' অমলের বিছানায় গা ঢালিয়া দিয়া সবিতেশ তাহাকে একটী একটী করিয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। অমল বলিল, একটা গল্পের প্লট্ বটে। কিন্তু এর শেষ কি হবে মহাসমস্যার কথা!

পরদিন সকালে সবিতেশ কমলাকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইল, বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে সে যাইতে পারিল না ইহার জন্য তাহারা যেন দুঃখিত না হয়। কাজ শেষ হইয়া গেলে সে পালামৌ-এ যাইবে এবং এক সপ্তাহ থাকিয়া আসিবে।

বাড়ীতে আসিতেই অরুণা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার হাতের রান্না খেতে সবিবাবু বা তাঁর বন্ধুর কোন আপত্তি আছে কি না ?

সদ্যস্নাতা তরুণীর মুখের পানে চাহিয়া সকল কথা ভুলিয়া সবিতেশ বলিল, বাঃ!

তাহার প্রশংসমান দৃষ্টি অরুণার মুখখানিকে লজ্জায় গোলাপের পাপড়ীর মত লাল করিয়া দিল। সে বলিল, তা' হ'লে আপনারা আমার হাতের রান্না খাবেন না! আপত্তি আছে—কেমন ?

সবিতেশ বলিল, "কিছুমাত্র নয়। কিন্তু ঠাকুর কি ক'রবে।" "সে যা' হ'ক করবে'খন। ভালকথা, আপনার বন্ধুটীকে আমার কথা কি বল্লেন ?"

সবিতেশ বলিল, যতটুকু জানি সব বললুম। কিন্তু ভাবছি,—

আর ভাববেন্ না! চলুন স্নান্ করবেন।

সেদিনকার মধ্যাহ্নভোজন অমল ও সবিতেশকে কাবু করিয়া ফেলিল। এত জোর ভাল খাওয়া সবিতেশের মা মারা যাবার পর আর তাহাদের বরাতে ঘটে নাই একথা অমল অরুণাকে শুনাইল।

ইহার পর দু'দিনের মধ্যে অরুণা সবিতেশের কোথায় কি থাকে না থাকে সমস্ত জানিয়া লইল এবং পাকা গৃহিণীর মত সংসারের কাজ করিয়াও অমল, সবিতেশকে ভূরিভোজনে তৃপ্ত করিতে লাগিল। সবিতেশকে দিয়া সে

কয়েকখানি কাগজে বিজ্ঞাপন দিল, অরুণা—নং—লেনে আছে। অনিলবাবু আসিয়া দেখা করুন কয়েক স্থানে পত্র লিখিয়া সে সবিতেশ ও অমলকে জানাইল কোন দিক হইতে একটা উত্তর আসিলেই সে তাহাদের 'আস্তানা' হইতে বিদায় লইবে। বাপের বাটী যাইবে না।

চলিয়া যাইবার কথায় সবিতেশ ও অমর ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল কিন্তু সে ব্রাহ্মণের মেয়ে এবং অন্য একজনকে ভাল বাসিয়াছে ইহা তাহাদের অবিদিত ছিল না। থাকিতে বলা অসম্ভব—অথচ,—

সেদিন বৈকালে অমল ও সবিতেশকে গরম লুচি তরকারী ও তিন রকম মিষ্টি খাওয়াইয়া অরুণা বলিল, আপনারা দু'জনে আমার জন্যে দু'জোড়া খদ্দরের শাড়ী আনবেন। যার খানি পছন্দ হ'বে আমি নেব। দেখি কার পছন্দ করবার ক্ষমতা বেশী। দু'জনে যেন যুক্তি করে একই কাপড় কিনবেন না। আপনি একদিক থেকে আর আপনার বন্ধু আর দিক থেকে, বুঝেছেন?

দুই বন্ধু হাসিয়া জানাইল যে তাহারা বুঝিয়াছে।

সন্ধ্যার পর সবিতেশ কাপড় লইয়া আসিয়া অরুণাকে দেখিতে পাইল না। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, তাঁর বাড়ী থেকে মোটর নিয়ে লোক এসেছিল—তিনি তাঁর জিনিষপত্র নিয়ে চলে গেছেন।

অমল আসিলে সবিতেশ তিক্তস্বরে বলিল, মেয়ে মানুষের কৃতজ্ঞতাটা দেখ্‌লে হে অমল!

অমল বলিল, কেন কি হ'য়েছে?

অরুণা বাড়ীতে চিঠি লিখে কাকে আনিয়ে আমাদের না জানিয়ে চলে গেছে।

বল কি! বলিয়া অমল বসিয়া পড়িল। কোন কিছু লিখেটিখে রেখে যায়নি ত? ঘরটা দেখেছ?

সবিতেশ ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, চল দেখা যাক।

সবিতেশের ঘরে অরুণাকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। সবিতেশ ও অমল পথিকের 'আস্তানায়, কয় রাত কাটাইয়াছিল ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর ক্লিপে চাপা তাহার নাম লেখা একখানি খাম সবিতেশ পাইল। অরুণা লিখিয়াছে—

আমি যাহা যাহা লইয়া গেলাম আপনার পুলিশে খবর দিবার সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া লিখিয়া রাখিয়া গেলাম।

নোট্ একতাড়া ৫০০০৲

ক্যাসবাক্স (আপনার মায়ের গহনার বাক্স) আন্দাজ ১৫০০০৲

মোট কমবেশ ২০,০০০৲

আপনার ঠাকুর ইহার কিছুই জানে না। আমি দুই দিন হইতে সমস্ত গুছাইয়া রাখিয়াছিলাম। দলের লোক আসিলে তাহার সঙ্গে চলিয়া গেলাম। নমস্কার জানিবেন। ইতি—

সবিতেশ চিঠিখানি অমলের হাতে ফেলিয়া দিল। অমল বিবর্ণ মুখে বলিল, মার গহনা নিয়ে গেছে! তার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না।

সবিতেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সংসারের খরচপত্রের জন্য তাকে চাবির রিং দিয়েছিলাম। মার গহনার বাক্সর কথাও যে বলেছিলাম।

নারীর এই হীনতা সংসারের এই অভাবনীয় কুটীলতায় সবিতেশ শয্যা গ্রহণ করিল। সর্পে রজ্জুভ্রম হইলে এইরূপ হইয়া থাকে।

অমল পুলিসে খবর দিতে চাহিলে সে বলিল—না।

৪

তিন দিন সবিতেশ তাহার ঘর হইতে পথিকের 'আস্তানায়' আসে নাই। অমল লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া বলিল, তুমি যে সামান্য টাকার জন্য এমনি করে মরতে বসেছ একথা আমার কখনই বিশ্বাস হয় নি—মেয়েটা আরও কিছু চুরী করেছে নয়?

সবিতেশ ম্লান হাসিয়া বলিল, না, আর কি? সে যা যা নিয়েছে তা' ত' লিখে রেখে গেছে।

অমল তাহার হাতের খাতাখানি দেখাইয়া বলিল, কল্পনা বোস আবার গল্প পাঠিয়েছে—এটা বার কর্ত্তে হবে।

চুলোয় যাক্—তোমার কল্পনা বোস্।

অমল হাসিয়া বলিল, চট কেন? গল্পটাই শোন। বলিয়াই অমল পড়িতে সুরু করিল এবং একটু পরে সবিতেশ উঠিয়া বসিয়া হাঁ করিয়া অভিনব আগ্রহে কল্পনা বসুর গল্প শুনিতে লাগিল।

গল্পটীর প্লট এই বড়লোকের ছেলে পরিমল এক বিপন্না নারীকে উদ্ধার করে। তাহার ধারণা ছিল নারীরা স্বভাবতঃ বোকা বিশেষতঃ বাঙ্গালীর মেয়েরা একেবারে অপদার্থ। সে মেয়েটীকে বাড়ী লইয়া আসে। দিনকতক পরে মেয়েটী কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া যায় ও গহনাপত্রে আন্দাজ ২০,০০০ টাকাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়। পরিমল পুলিশে খবর দেয়। মেয়েটী বোম্বায়ে ধরা পড়ে। গোয়েন্দা পাঁচকড়ি বাবু তাহার বুদ্ধিমত্তার জন্য ৫০০০৲ পুরস্কার টাকা ও সরকারী খেতাব পান!

অমল গল্প শেষ করিয়া বলিল, এর সঙ্গে কল্পনা বসু যে চিঠি পাঠিয়েছেন তা' গল্পের মাধুর্য্য নষ্ট হ'বে ব'লে আগে পড়ি নি। শোন্,

কলিকাতা—
—নং মহেশ বারিক লেন
১৯।১১।৩০

মাননীয় শ্রীযুক্ত 'পথিক' সম্পাদক
মহাশয় মান্যবরেষু,

সবিনয় নিবেদন,

পথিকের জন্য আর একটী 'অসম্ভব' আল্‌নাস্কারের দুঃস্বপ্ন গল্প পাঠাইলাম। আশা করি এবার হইতে আমার গল্প নিয়মিত বাহির হইবে। গহনার বাক্স ও টাকা কাল ফেরৎ পাইবেন।

আমার ভাই আপনাকে চিনিত। সেদিন আমরা একস্থানে নিমন্ত্রণে যাইতেছিলাম। আপনার পরিচয় পাইয়া তাহাকে আমি জোর করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিই। আমার পত্রানুযায়ী মোটর লইয়া আপনাদের অনুপস্থিতিতে—সে আমাকে লইয়া আসিয়াছে। নিবেদন ইতি

বিনীতা—
শ্রীকল্পনা বসু—

পুঃ গল্প, গহনার বাক্স ও টাকার প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন।

সবিতেশ বলিল, চৈত্র মাসের 'পথিকে' গল্পটা বার করা যাক, কি বল অমল?

অগত্যা,—ফাল্গুন বার করে ফেলেছি নইলে,—প্রথম আর শেষটা একেবারে বদলে দেব।

অমল বলিল, তাই হ'বে। তুমি তা' হলে আজই পালা-মৌ এ যাও। তাঁরা বড় অসন্তুষ্ট 'হচ্ছেন, বুঝেছ?

৩

কমলা বলিল, দাদা তোমার সঙ্গে একজনের আলাপ করে দেব—তোমরা দুজনেই সব শেষে এসেছ।

সবিতেশ তাহার খোকাকে বুকে লইয়া আদর করিতেছিল; বলিল, তা' সে ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে আয়? ডাক্তার কোথায়?

তাঁর আসতে দেরী হ'বে। বলিয়া কমলা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সবিতেশ শুনিল কে বলিতেছে, যাব না ত' কি! তোর দাদা কি বাঘ যে খেয়ে ফেলবে।

কমল বলিতে বলিতে আসিতেছে, বা! এই যে বেশ মুখ ফুট্‌ছে তা' তোমাকে খাবার সৌভাগ্য দাদার সব কটা বন্ধু একত্র হ'লেও অর্জ্জন করতে পারবে কিনা সন্দেহের কথা। তোমার এ জীবনের অবসান কবে হবে কে জানে। তোমার শ্রীচরণ,—ও মাগো সত্যি কথার জন্যে এত বড় কিলটা মার্‌লি! তুই আজিই মর।

খোকা কান্না জুড়িয়াছে দেখিয়া সবিতেশ চেঁচাইয়া বলিল, তোর ছেলেকে নিয়ে যা কমলা।

কমলা ঘরে ঢুকিয়া ছেলে লইয়া বলিল, দাদা, হাঁ করে দেখছ কি ও কল্পনা বসু। আমার সঙ্গে বেথুনে পড়ত, আমার ছেলের ভাতে এসেছে—ভাতের পাঁচ দিন পরে তোমারই মত। এ—তোমার—বাঃ আমার Introduction কিছুই তোমরা—বুঝেছি বলিয়া সে কল্পনার পিঠে সজোরে এক কিল বসাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

কল্পনা হাসিতেছিল। বলিল, গল্পটা আস্‌ছে মাসে বার হ'বে ত?

সবিতেশ গম্ভীরস্বরে বলিল, হাঁ।

কল্পনা তাহার কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া বলিল, আপনার কি অসুখ করেছিল?

সবিতেশ বলিল, হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কল্পনা বলিল; আচ্ছা, আমি এখন তবে যাই।

সে চলিয়া যাইতেছিল। সবিতেশ বলিল, যাবেন না একটা কথা শুনুন। কল্পনা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

আপনার গল্পের প্রথম আর শেষটা আমি একেবারেই বদলে দিচ্ছি। অমন সুন্দরী তরুণীর জেলে যাওয়া পাঠিকারা পছন্দ করতে পারেন কিন্তু যাদের উপর আশা রেখে কাগজ চলে সেই তরুণের দল চটে যাবে। বাঙালী মিলনান্তই ভালবাসে।

তা বেশ করেছেন।

অমল থাকিলে চিরলাজুক সবিতেশের কথা শুনিলে কি ভাবিত বলা যায় না। সবিতেশ বলিল, দেখুন আপনি ব্রাহ্মণ ন'ন আর সেই গাড়ীর কাহিনী সেটা সব গল্প ?

কল্পনা চোখ নীচু করিয়া বলিল, হাঁ। কিন্তু,—

কিন্তু কি,—

এইটাই আপনি অন্যায় করেছেন ! তা সে যাক্। দেখুন ঐ গল্পটার মত আমি পুলিশে খবর দিই নি—আর টাকার শোকেই যে আপনি চলে এলে তিন দিন বিছানায় পড়েছিলাম না তা অমল বলেছে। গল্পটার শেষ করেছি—পরিমল মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাইচে ? বন্ধু-বান্ধবের সূচীভক্ষণও সঠিক হয়ে উঠেছে। আমায় নিরাশ করবেন না আপনার যদি আপত্তি না থাকে আমি আপনাকে পেলে ধন্য হ'ব।

কল্পনা বলিল, দেখচি আমাকে একটা বিয়ে করতেই হ'বে। ঘরে বাপ মার আর বাইরে কতকগুলি ভদ্রসন্তানের কাকুতিমিনতি আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।

সবিতেশের স্বর কাঁপিয়া গেল ; সে বলিল, তা' হলে আমি আশা করতে পারি কি ?

কল্পনা নম্রস্বরে বলিল, আমাকে পেলে আপনি সুখী হ'তে পারবেন ?

সবিতেশ সোৎসাহে বলিল, ধন্য হ'ব! আমি বড় সুখী হ'ব। আপনাকে না পেলে আমার জীবন বৃথা হ'য়ে যাবে। বলিতে বলিতে সে কল্পনার হাত নিজের মুঠের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সতৃষ্ণনয়নে তাহার মুখের পানে চাহিল।

কল্পনা প্রবল আপত্তি করিয়া বলিল, আপনার গল্পের শেষে 'ও' থাকলেও বিয়ের আগে আমি 'ওসব' একেবারেই ভাল মনে করি না !

সবিতেশ তাহার আপত্তি শুনিল না। কমলার ছোট শাঁখটী উপরি উপরি তিনবার বাজিয়া উঠিতেই সে সেই আদিম মানুষের মত হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া গল্পের শেষ মিলাইবার জন্য কল্পনার স্ফুরিত রক্তিম ওষ্ঠে ওষ্ঠস্পর্শ করাইল।

শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ তিথি পূজা—

সে আজ বেশীদিনের কথা নয়, যখন বিদেশী সভ্যতার প্রবল স্রোতে বাঙ্গালীর সমাজ ও ধর্ম্ম ভাসিয়া যাইবার মত হইয়া আসিয়াছিল। চারিদিকে একটা অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও গ্লানি পরিদৃশ্যমান হইয়া উঠিতেছিল, যখন হিন্দুধর্ম্ম একটা নির্জীব, স্থবির, স্বার্থপর ও ব্রাহ্মণ-প্রধান বলিয়া শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালীর স্পর্দ্ধা, অকারণে ভাসিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল, ঠিক এমনি দুর্দ্দিনে দয়াবতার ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ধর্ম্ম রক্ষার্থে, সাধুদের ত্রাণ করিবার নিমিত্ত জাহ্নবীর পূর্ব্ব কূল উদ্ভাসিত করিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে দেখা দেন।

ইংরাজি শিক্ষিত,আচারভ্রষ্ট ধর্ম্মহীন বাঙ্গালী যুগাবতার পরমহংসদেবকে প্রথমটা চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার পবিত্র, সঙ্গস্পর্শে যাহারা একবার আসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিল তাহাদের গর্ব্ব,শিক্ষাভিমান ও অহঙ্কারকে তরঙ্গে ভাসমান ঐরাবতের অবস্থাই প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। ইহারাই, শেষে তাঁহার প্রচার-কার্য্য মস্তকে লইয়াছিলেন। ঠাকুরের কি অপার দয়া! সামান্য সামান্য কথার ভিতর দিয়া উপদেশ অমৃত ধারায় সকলের অজ্ঞানতা ও আত্মম্ভরিতা দূর করিয়া প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়া তাঁহাদের অন্তর পুলক আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

গত মঙ্গলবার বেলুড় মঠে ও অন্যত্র শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তিথি পূজা হইয়া গিয়াছে। এই তিথি পূজা কেবল যে মঠে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা নয়। কত জানা-অজানা, দেশ বিদেশে, কত সহরে পল্লীতে শত শত ভক্তের অন্তরে তাঁর তিথি ও স্মৃতি পূজা নিত্য হইয়া থাকে, সে পূজায় আড়ম্বর নাই, সে পূজার পবিত্র অর্ঘ্য নীরবে নিভৃতে ঠাকুরের চরণকমলে শ্রদ্ধাভরে ভক্তি অর্পণ করিয়া থাকেন। আগামী রবিবার বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহোৎসব হইবে। তিনি নবযুগের প্রবর্ত্তক, "নবযুগ" বার বার তাঁর চরণপ্রান্তে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছে।

কাজের কথা
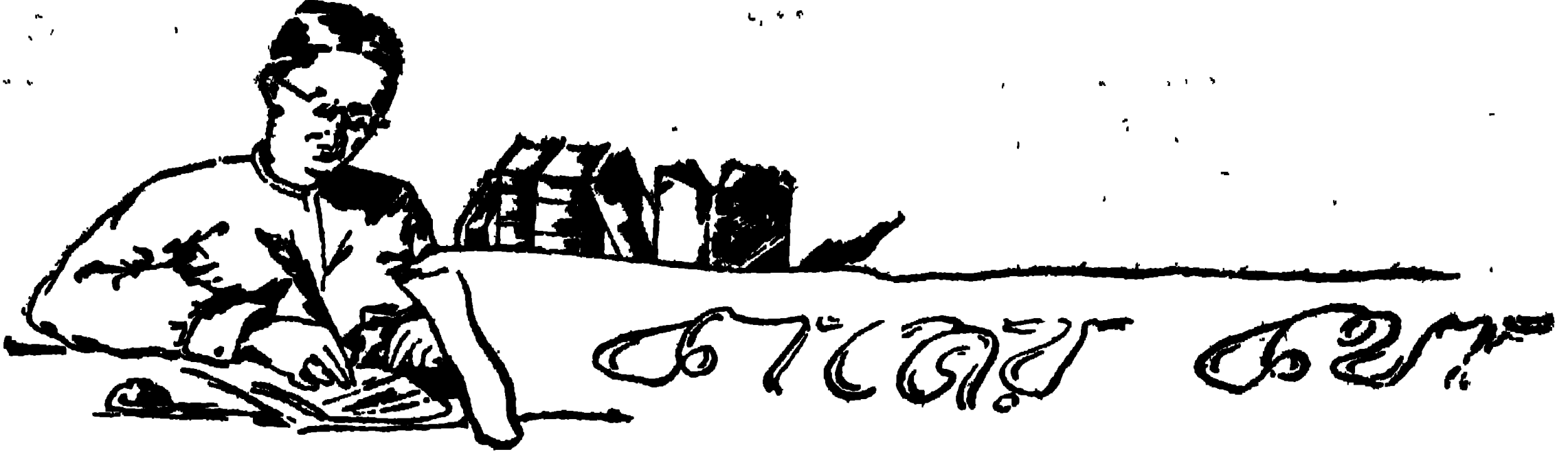
কর্মের সীমা ঃ—মানুষের কর্ম্ম শক্তি ও কর্ম্মক্ষমতা থাকে কত বছর পর্য্যন্ত—আমাদের দেশে আগে বেশী বয়সেও যেমন কর্ম্মক্ষম পুরুষ ও নারী দেখিতে পাওয়া যাইত এখন তেমন দেখিতে পাওয়া যায় কি? যৌবনে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্তি কোন দিক দিয়াই সুখের নহে। ব্যক্তিগত ভাবেও নহে—জাতীয় ভাবেও নহে। ইংরেজ বা অপর কোন বিদেশী লোকের যে বয়সে যেরূপ কর্ম্মক্ষমতা ও উৎসাহ থাকে আমাদের তাহা থাকে না কেন? অভাবে কর্ম্মক্ষমতা হ্রাস করে ও যৌবনে জড়তা আনে এ কথা অনেকটা সত্য বটে—কিন্তু কর্ম্মী অভাবকে যেমন দূর করিতে পারে অকর্ম্মী কোনদিন তাহা পারে না। এ দেশে অভাবে মোটেই না ভুগিয়াও অনেক কৃতকর্ম্মী লোক বহুমূত্র প্রভৃতি ব্যাধিতে অকালে মৃত্যুমুখে যত পতিত হইতেছেন, বিদেশীরা তত হয় না। যে উৎসাহে জীবন চালাইবার প্রবাহ দেয় সে উৎসাহের অভাব হইলেই জীবন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। বিদেশীদের জীবনে এই উৎসাহ বা প্রবাহের যেমন পরিচয় মেলে আমাদের দেশে বর্ত্তমান সভ্যযুগে তাহার অভাব ক্রমেই বাড়িতেছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে একজন ইংরেজ কর্ম্মীর সামান্য পরিচয় দিতেছি—ইনি সম্প্রতি প্রায় ১০০ বছর বয়সে মারা গিয়াছেন। এঁর নাম গিলফোর্ড মোলস্‌ওয়ার্থ—পরে ইনি স্যর হন। ১৮২৮ খৃঃ প্রথম দেশ ছেড়ে লঙ্কায় আসেন, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে। ১৮৬৭ খৃঃ ইনি সিলোন গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে ও পাবলিক ওয়ার্কসের ডিরেক্টর জেনারল হন। কিছুদিন পরে ভারত সরকারের রেলওয়ের পরামর্শদাতা হয়ে আসেন। পরে K. C. I. E. উপাধি পেয়ে কর্ম্ম থেকে অবসর লন। ৭১ বছর বয়সে পূর্ব্ব আফ্রিকায় উগাণ্ডা রেলের রিপোর্ট দিতে যান। এই সময় ভীষণ রৌদ্র ও গরমের মধ্যে ইনি বাইকে ৫০।৬০ মাইল স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতেন। ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে এঁর অনেক ভাল ভাল বই আছে। এর মধ্যে 'Pocket-Book of Engineering Formulae'র নাম খুব বেশী। শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা এক সঙ্গে কি করিয়া সমান সজাগ ও সতেজ রাখা যায় উপরোক্ত বিখ্যাত কর্ম্মী তাহার প্রমাণ দিতেছেন।

রোগের নিদান—অন্নের কাঙ্গাল দেশ রোগের আকর ঃ—ভারতে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। কতকগুলি মারাত্মক ব্যাধি তো এদেশে কায়েমীভাবে আসন গাড়িয়া আছেই তা ছাড়া আকস্মিকভাবে যাহা আসে তাহাতেও অল্প সময়ের মধ্যেই এত লোকের কর্ম্ম নিকাশ করিয়া যায় যে কোন মহাযুদ্ধেও তত লোককে গ্রাস করিতে পারে না। ১৯১৮ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা তাহার প্রমাণ। সহরে ঠাসা-ঠাসিভাবে বাস, বদ্ধ আলো বাতাস, ভাল দুগ্ধের অভাব অনেক রোগের কারণ ধরা যাইতে পারে—কিন্তু পল্লীতেও তবে এই সমস্ত রোগে অসংখ্য লোক মরিতেছে কেন? অনেক বিখ্যাত অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মত এবং আমরাও মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝি যে অভাব দারিদ্র্যই ভারতব্যাপী এই নানা রোগ ভোগের মূল কারণ। অভাবের জ্বালায় যে দেশের লোক এক বেলা পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, রোগ তাহাদের আশ্রয় করিয়া সুখে ভোগদখল করিবে না তো কাহাকে আক্রমণ করিবে! ভারতীয়ের জন প্রতি আয় গড় পড়তায় অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি সামান্য। ইউরোপ ও আমেরিকায় ধন-বণ্টন নীতির দোষে দারিদ্র্য আসে কিন্তু ভারতের দারিদ্র্য অর্থ নীতির সে ভুলে আসে না। এদেশে যে ধনাগম হয় তাহাতে এদেশের লোককে পেটভাতা খাইয়াও দিন চালাইবার ও রোগ বাধা দিবার

ক্ষমতা দিতে পারে না। ভারতের রোগ দূর করিতে হইলে ইহার জনসংখ্যা ও দারিদ্র্য সমস্যা আগে দেখিতে হইবে। যে ভাবে দেশে জনসংখ্যা বাড়িতেছে ধনাগম সে তুলনায় কিছুই হইতেছে না। এ সমস্যার হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় কি? দেশে ধনাগমের উপায় বাড়াইতে হইবে। কি উপায়ে ইহা হইতে পারে—কি উপায়ে দেশের কৃষিসম্পদ, খনিজ সম্পদ ও অন্যান্য নানা সম্পদ বাণিজ্যহিসাবে চলিয়া দেশের দৈন্য দূর করিতে পারে তাহার উপায় দেশের জনশক্তি ও শাসকবৃন্দকে করিতে হইবে।

একদিকে অপরিসীম দারিদ্র্য অভাব, ক্ষুধায় পেটে খাদ্য নাই—তৃষ্ণায় জল নাই; অপর দিকে নানা রোগে পরিবার পরিজন, দেশময় হাহাকার করিতেছে—এ অবস্থা হইতে ভারত রক্ষা পাইতে পারে কি উপায়ে?

কাউন্সিল প্রসঙ্গ ঃ—বাংলার স্বরাজ্যদলে ইতিমধ্যেই নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। কাউন্সিলের বসন্ত অধিবেশনে পর পর স্বরাজ্যদলের কয়েকটি হার হইয়াছে—আরও হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন অনুপস্থিত, অসুস্থাবস্থায় পাটনায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি উপস্থিত থাকিলেও এ পরাজয়ের গতি রোধ করা যাইত কিনা সন্দেহ! কিন্তু এই জয় পরাজয়ে দেশের ভাগ্য কতটা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, দেশ কতটা আশার আলোর সন্ধান পাইতেছে তাহা এপর্য্যন্ত কোন কিছুতেই বোঝা যায় নাই। দেশে জনে জনে ভোটাধিকারী হওয়া ভাল, সকল সভ্যদেশেই এই ভোটাধিকারের ও শাসনব্যবস্থায় ভোটের সুপ্রয়োগ যাহাতে চলে তাহার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু সে চেষ্টা উন্নত স্বাধীন দেশেই হইতেছে। অস্বাধীন দেশে স্বাধীনতার গোড়ার সূত্র ছাড়িয়া এই ভোট লইয়া হুলস্থুল করিলে তাহা কতটা সুফল প্রসব করে দেশের বর্ত্তমান রাজনীতি ভবিষ্যতে তাহার পরিচয় দিবে। মন্ত্রী না থাকিলেও তাহা দেশের জন্য হইবে না—ব্যক্তিগত আশাতঙ্কের জন্যই সম্ভব হইতে পারে। বাজেট বিতর্কে আমাদের লাভ কতটা? শাসন ব্যবস্থায় সব শোষণ হইলে দেশের অভাব নিবারণের জন্য যন্ত্রী যে কিছুই থাকে না। আর দেশের নিত্য বর্দ্ধিত অভাবের হাহাকারই বা এ ব্যবস্থা হইলেও মিটিবে কোথা হইতে?

জল নাই দেশে ঃ—সারা বাংলায় জলকষ্ট খুব বেশী হইয়াছে। এ সময় প্রতি বৎসরই এমন হয়। অগ্রহায়ণের শেষ হইতেই নদনদী খাল বিল শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয়—পল্লীবাসীরা প্রথমে বদ্ধ অপরিষ্কার জল খায় তার পর ক্রমে তাহাও পাওয়া যায় না। তখন লোকে কাদা ঘাঁটা জল খাইতে আরম্ভ করে। এমন কাদা ঘাঁটা জলও পরে আর সহজে মেলে না। পল্লীনারীরা বহুদূর পথ হাঁটিয়া জলের সন্ধানে ফেরে। কিন্তু দেশের এমন অবস্থা হইয়াছে যে জলাভাব প্রতিবৎসরই ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। শুষ্ক নদীগর্ভে বালি চড়া পড়িয়া গিয়াছে। নরনারী, গৃহপালিত জীবজন্তুর এ সময় কি ভীষণ কষ্ট হয় তাহা চোখে না দেখিলে বোঝা যায় না। দেশের সরকারের অবিলম্বে দেশের নদনদী সংস্কারের ব্যবস্থা করা উচিত তাহা না হইলে দেশ জলাভাবে শ্মশান হইবে। দেশের নদনদীর গতি যাহারা দেখিতেছেন তাহাদের মনে নানা আশঙ্কা জাগিতেছে। বর্ত্তমানে সর্ব্বাগ্রে নদনদীর সংস্কার ও জলনিকাশের ভাল ব্যবস্থা না করিয়া সরকারের রেলপথ বিস্তারের অতি উৎসাহ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি। দেশ যাহা খাইয়া বাঁচিবে, যাহাতে দেশের শ্রীসম্পদ বৃদ্ধি হইবে তাহাকে এভাবে মরিতে দিয়া দেশে রেলপথ নির্ব্বিচারে বাড়াইয়া যাওয়াতে যে স্বার্থ পরিণামে তাহা ভয়াবহ ক্ষতিরই কারণ হইবে। কে দেশের এ অবস্থা বুঝিবে—কে অসংখ্য নরনারীর তৃষ্ণার জলধারা অব্যাহত রাখিবে?

ই-আই-আর গাড়ী ছাড়িবে শিয়ালদহ হইতে ঃ—শোনা যাইতেছে লক্ষ্ণৌ এক্সপ্রেস হাওড়া হইতে না ছাড়িয়া শীঘ্রই শিয়ালদহ হইতে ছাড়িবে। ইহাতে যাত্রীদের কি সুবিধা হইবে, রেলকর্ত্তৃপক্ষেরই বা কি সুবিধা হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

মফস্বলবাসীর ইয়ং ইণ্ডিয়া

পত্রিকার সার সঙ্কলন

প্রাপ্তপত্র

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দুমুসলমান সমস্যাঃ—"শিক্ষা সম্বন্ধে মুসলমানগণ এখনও হিন্দুদের অনেক পশ্চাতে—একথা আপনার পত্রিকায় ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। ঐরূপ আর একটী বিষয় আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি, বিষয়টী—মুসলমানজনসংখ্যা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অল্প ইহা আমরা বরাবর বিনা দ্বিধায় মানিয়া লই কিন্তু কথাটা কি সত্য? মুসলমানের একটী শাখা, যথা—সুন্নি, হানাফি, হিন্দুধর্ম্মের যে কোন শাখা হইতে সংখ্যায় বেশী বলবান্ ইহা মানিতেই হইবে। হিন্দুধর্ম্মের কোন কোন দুইটি শাখার ভিতর যে মতবৈষম্য আছে তাহা মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যের পার্থক্য অপেক্ষা ঢের বেশী! অস্পৃশ্য জাতিরও জনসংখ্যা বিশেষ কম নয়—যদি মুসলমান সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া তাহাদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় তবে অস্পৃশ্যগণেরও এ দাবী করিবার অধিকার আছে—তাহারা এতদিন ধরিয়া যে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করিয়াছে এবং করিতেছে তাহার সহিত মুসলমান এবং অন্য সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ চিন্তার এবং ভয়ের কোন তুলনাই হয় না। এই সব জানিয়া শুনিয়া কি বলিব যে মুসলমানের জনসংখ্যাই কম?"

পত্রলেখক তাঁহার পত্রে একটা আন্তরিকতা এবং সহানুভূতির ভাব জাগাইতে চেষ্টা করিলেই তাঁহার সব যুক্তিই যেন ভাসা ভাসা বলিয়া বোধ হয়—তিনি গোড়ার কথাটাই ভুলিয়া গিয়াছেন—যখন জনসংখ্যার তুলনা করিতে হইবে তখন সমস্ত মুসলমান সংখ্যার সহিত সমস্ত হিন্দুর সংখ্যার তুলনা করা উচিত। তর্কক্ষেত্রে সুবিধামত দুইপক্ষের দুইটী শাখা লইয়া তুলনা চলে না—ভারতে সাত কোটী মুসলমান এবং বাইশ কোটী হিন্দু—ইহা অস্বীকার করা চলে না। মুসলমানেরা বলেন যে হিন্দুরা তাঁহাদের প্রতি কখনও ভাল ব্যবহার করেন নাই তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রতি এবং সামাজিক আচারের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করেন নাই এবং হিন্দুরা তাঁহাদের অপেক্ষা ধনী এবং শিক্ষিত এই সব কারণে তাহারা হিন্দুপ্রাধান্যকে ভয় করেন—হিন্দুরা সবই স্বীকার করেন কিন্তু তাঁহারা যে কখনও মুসলমানের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন কিংবা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা একেবারেই অস্বীকার করেন—অতএব এ বিষয়ে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক—হিন্দুরা আবার বলেন যদিও তাঁহারা সংখ্যাপ্রধান তথাপি তাঁহারা মুষ্টিমেয় মুসলমানের সম্মুখে একদিন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন—আরও বলেন যে মুসলমানদের নিকট তাঁহারা রূঢ়ব্যবহারই পাইয়াছেন—সুতরাং তাঁহাদের অন্তরে মুসলমানপ্রাধান্যভীতি এখনও জাগরূক আছে এই বিষয় আলোচনা করিয়া আমার মনে হয় ছোটখাট আপত্তিগুলি অগ্রাহ্য করা—কি হইলে ভাল

হইত তাহা না ভাবিয়া কি করিলে ভাল হয় তাহার চেষ্টা করাই সুবিবেচকের কার্য্য।

লক্ষ্ণৌ প্যাক্টমত কার্য্য করিতে গেলে এখন অনেক বিপদ—মুসলমানের অভাব অভিযোগ অগ্রাহ্য করার মানে স্বরাজলাভের পথে বিঘ্নউপস্থিত করা—সুতরাং প্রত্যেক স্বরাজ প্রত্যাশীই এই সমস্যার একটী মীমাংসা দেখিতে সমুৎসুক সন্দেহ নাই।

ইহার মীমাংসা সম্ভব এইভাবে—মুসলমানের পক্ষে এখন তথাকথিত সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি শাসক সভায় না পাঠাইয়া নিজেদের মনে যাহাকে সত্য নেতা বলিয়া মানিতে পারা যায় এমন কোন লোককে পাঠান উচিত—ইহা আইনসঙ্গত ভাবে না হইতে পারে কিন্তু সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে ইহার আপোষে মীমাংসা করাই উচিত—এইরূপ মীমাংসা সকল পক্ষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত—আমার মতে নির্ব্বাচনের সময় পূর্ব্ববর্ত্তী সদস্যগণের মতানুক্রমে পরবর্ত্তী সদস্য নির্ব্বাচিত করা শ্রেয় অবশ্য এ বিষয়ে সকলে একমত হওয়ার প্রয়োজন। ইহা বিশেষ দুরূহ হয় না যদি সকলের মনে একই প্রেরণা জাগরূক থাকে—এবং তাহা স্বরাজলাভ! যদি স্বরাজই একমাত্র লক্ষ্য হয় এইরূপ অপ্রকাশ্য নির্ব্বাচন বা আপোষ করা খুবই সহজসাধ্য আর যদি সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনই উদ্দেশ্য হয় তবে এরূপ মীমাংসা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

শিল্পজগৎ

(প্রবাসী—ফাল্গুন ১৩৩১)

কাঠের খেলনা—শ্রীমতী সরযূবালা দেবী অঙ্কিত। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের অঙ্কিত চিত্র একটা আশার কথা। পুরুষ পুঙ্গবেরা যা আঁকেন তাহাতে স্ত্রীলোকেরা কিরূপ আঁকিবেন তা সহজেই অনুমেয়। স্ত্রীলোকদের চিত্রের সমালোচনা করা উচিত নয়, তবে গোড়াতেই 'অরিয়্যানট্যাল'এর আঁচ দেখিয়া যা একটু ভয় হইতেছে।

বৃষ্টির পরে—শ্রীযুক্ত বীরভদ্র রাও—এটা কোন্ থিয়েটারের ফেরতা? জহুরী জহর চিনে—প্রবাসীর হাঁস-পাতালটী এই সব কানা-খোঁড়ার জন্যই রিজার্ভ থাকে। দয়ার কার্য্য সন্দেহ নাই, তবে শিল্পীদের মুণ্ডটা খাওয়া হচ্ছে কেন? শিল্পীরাও মনে মনে হাসে—"কি ফাঁকিই না দিচ্ছি।"

উপাসিকা ও গৃহাভিমুখে—চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদা উকিল। রেখা চিত্র। কিছুই হয় নাই। আঁকিতে পরিশ্রম যত না হউক, দেখার কষ্ট দশগুণ। কারণ মেজাজ রুক্ষ হইয়া যায়।

কেশবভারতীর দ্বারে শ্রীচৈতন্য—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত। এ সম্বন্ধে আর বলে কি হবে? ডাক্তার এসে পায় কি না সন্দেহ। আমাদিগকে শিক্ষা দিতে হলে আর একটু অস্পষ্ট ছাপিলেই হয়।

(ভারতবর্ষ—ফাল্গুন ১৩৩১)

সন্ধ্যা-প্রদীপ—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ অঙ্কিত। চিত্র যাহাকে লইয়া সে কোন্ জাতীয়—পুরুষ না স্ত্রীলোক তাহা বোধগম্য হয় না—তারপর যিনিই হউন—শিবনেত্র হইয়া হাঁ করিয়া আছেন কেন? একটা কিছু দাঁড় করাইতে পারিলেই হল, নাম অভিধান ঘাঁটিয়া ঠিক হইবে। মুখে কি বলে—হাসি না কান্না? কেনই বা আঁকা?

গুণটানা—(কাশ্মীর) শিল্পী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল। অতি বিশ্রী চিত্র, তারপর বাহাদুরী ফলান হইয়াছে "কাশ্মীর" কথাটা যোগ করিয়া। এরূপ হতভাগ্য চিত্রের আদর যাঁহারা করেন, তাঁহারা হয় খুব বোঝেন না হয় কেবল ছবিই খোঁজেন। ব্লক করিয়া ছাপার মজুরী পোষায় কেমন করিয়া?

নীরব ভাষা—এ আরও বড় ওস্তাদ। এদের জ্বালায় চক্ষু ঝালাপালা করে, মাথা ঘোরে। কলাশিল্প যে দারুণ রোগগ্রস্ত তাহাতে ডাক্তারও জুটিয়াছে ভাল।

সময়ও নিকট। "ভারতবর্ষে"র হাঁসপাতালটী কি দাতব্য? উদার বটে!

খুকুর দুঃখ—শিল্পী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত। এ সব চিত্রের সমালোচনা করা বৃথা। এরা স্কুলের নীচের কেলাসের ছাত্র চিত্রের মাথামুণ্ড কিছুই জানে না অথচ আস্কারা দেন যারা তারাও বোঝেন—অশ্বডিম্ব।

(বসুমতী—ফাগুন ১৩৩১)

বসন্তের রাণী—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহা অঙ্কিত। আমাদের মাসিক পত্রিকাগুলির নিয়ন্তারা এত বুদ্ধিমান যে শিল্পী কি চিত্র আঁকে তাহার ভালমন্দ বিচার করা ত বড় কথা সেগুলি কোন্ লিঙ্গের তার জ্ঞানটাও নাই। চিত্রটীর মধ্যে কোন পদার্থই নাই। তারপর বিদেশীয়ের চুরি। যাত্রাদলের পুরুষও নারী বলিয়া ভ্রম ঘটাইতে পারে কিন্তু অপদার্থ শিল্পী ভাবরাজ্যে বিচরণ করা ত দূরে—নারীকে নারী বলিয়া পরিচয় দিতেই ঘর্ম্মাক্ত!

না পড়িছে পোড়া মনে ইত্যাদি—শিল্পী গিরীন্দ্রনাথ বসু। এদেরকে "শিল্পী" বলিয়া আমরা শিল্পজগতের যে অমর্য্যাদা করিতেছি তারও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে বসুমতীকে লেখনী হস্তে কোন পুরমহিলাকে ভাবরাজ্যে টানিয়া আনা হইয়াছিল, সেটা আমাদের বেশ মনে আছে। তার জন্ত কয়েকটা শক্ত কথা লিখিতে হইয়াছিল—সেটা ৩।৪ মাসের কথা। এর পর আবার ঐ প্রেমপত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়া কি সাহসে ছাপিলেন। এটা বোধহয় নির্লজ্জতার গৌরব! ধিক এই শ্রেণীর পত্রিকায়। মাথার ঘোমটা সরাইয়া বয়স্থা স্ত্রীলোকের চিত্র যাহারা দশজনের জন্ত ছাপিতে পারে তাহারাও নারী-নির্য্যাতন কি কম করিতেছে? আমাদের বলিবার একটা সীমা আছে—ওদের কানের তুলো ছাড়িয়া তাহা বোধহয় পৌছায় নাই।

গ্রামে অগ্নিকাণ্ড—শিল্পী সত্যচরণ ঘোষ। চিত্রখানার বিষয়ও একটু নূতন। এই শ্রেণীর বিষয়কে নিপুণতার সহিত দেখান সোজা কথা নয়। অনেক ভুল প্রমাদ সত্ত্বেও চিত্রখানা অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে যে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা স্বীকার করা যায়।

ষষ্টির গোষ্টী—শিল্পী জে, সিংহ। তা মন্দ হয় নাই। তবে রেখাচিত্রের দখল হইতে পাটুয়ারী বুদ্ধির খেলায় কিছু বেশী হাত আসিয়াছে।

'পঙ্কদলী'

রঙ্গ-সমালোচক

বিজ্ঞাপন পাইবার পূর্ব্বাবস্থা—

—অসন্তোষের চীৎকার।

বিজ্ঞাপন পাইয়া—

—অনুমোদন জ্ঞাপন।

মনমোহন নাট্যমন্দিরে "রঘবীর"

রঘুবীরের দ্বিতীয় অভিনয় বজনীতে আমবা উপস্থিত ছিলাম। অভিনয় বেশ ভালই হইযাছিল। শিশিব বাবুর রঘুবীবেব অভিনয় স্থানে স্থানে অতি সুন্দব হইযাছিল। তুলিয়াব ভূমিকার অভিনয় ভাল হইলেও একটু বেশী 'ভদ্রগোছে'র বলিযা বোধ হইল, বন্যভীল চবিত্রেব স্বভাবজ কর্কশ ভাব তাহাতে ছিল না। দেবলেব ভূমিকা আমাদেব ভাল লাগে নাই, যদিও অভিনেতা হীবালাল বাবুর হাস্যরসাভিনয়ে বেশ প্রতিষ্ঠা আছে—এ ভূমিকায় তিনি হাস্যরসকে "কচ্‌লে কচ্‌লে—কচ্‌লে" তিক্ত কবিয়া দিয়াছিলেন—এ শ্রেণীর অভিনয় যাত্রা সম্প্রদায়েবই উপযোগী। অনন্ত রাওএব ভূমিকায় অভিনেতাব মৃদুগম্ভীর কণ্ঠস্বর বেশ উপযোগী হইয়াছিল তবে ভাবাভিব্যক্তি দেখাইবার সুযোগ তাঁহাব বক্তব্যে না থাকায় তাঁহাব অভিনয় ফুটিয়া উঠিতে পায়ে নাই—জাফবেব অভিনয় বড নিম্নশ্রেণীব হইয়া অনেকস্থলে অভিনয় সৌন্দর্য্যে ব্যাঘাৎ জন্মাইয়াছে। ছোট ছোট ভূমিকাব মধ্যে 'মাঝি'ব অংশ ও জনৈক কৃষকের অংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সহদেবের অভিনয়ে শিশির বাবুব কণ্ঠস্ববানুকবণেব মাত্রা এত বেশী হইয়াছিল যে তাহা উপভোগ কবা কঠিন হইয়া পডিয়াছিল, অথচ ইঁহার অভিনয়েব ক্ষমতা আছে, ইনি নিজেব উপর নির্ভর করিলে বোধ হয় ভবিষ্যতে ভালই হইবে। স্ত্রীচবিত্রেব মধ্যে শ্যামলীই উল্লেখযোগ্য এবং বিশেষভাবে, পবলোকগতা বসন্তকুমারীর, কর্ণওয়ালিস্ থিয়েটাবে এই ভূমিকার অভিনয়েব তুল্য না হইলেও বর্ত্তমান যুগে একপ অভিনয অন্য বোন অভিনেত্রীর দ্বারা সম্ভবপব বলিয়া বোধ হয় না। দৃশ্যপটাদি সুন্দব হইয়াছিল তবে শেষ একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল—এদৃশ্যে গ্রন্থকারের দৃশ্যপটাদি সম্বন্ধীয় আভাষ গ্রহণ করিলেই বোধহয় ভাল হইত। নৃত্যগীতাদির সংযোজন অতি সুন্দর ও মধুব হইযাছিল।

ষ্টারে 'গোলকুণ্ডা'—সংবাদপত্র জগতে এই পুস্তক লইয়া বড গোল বাঁধিয়াছে বিশেষতঃ পুস্তক অপ্রকাশিত থাকায় 'আন্দাজে ফয়তা' দিয়া অনেকেই বাহাদুবী লইতেছেন। আজকাল একশ্রেণীব সমালোচনা চলিতেছে থিয়েটারেব হাঁডীর খবর লইয়া ইহা কতদূর সঙ্গত তাহা বিচার্য্য। সমালোচক অভিনয়ে যাহা দেখিবেন তাহাই সমালোচনা কবা উচিত থিয়েটাবেব কর্ত্তৃপক্ষ গ্রন্থকারকে কি পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহাবা ঘবেব পয়সা বাব কবিযা নাটক অভিনয কবিতে আবম্ভ কবিযাও যাহাতে তাহা না চলে তজ্জন্য বদ্ধপবিকব, এসকল অসম্ভব কাহিনীব স্থান সমালোচনায় থাকা উচিত নয়। তাবপব পুস্তকেব অভিনয় কোনবাবে হইবে তৎসম্বন্ধে দর্শকগণেব মতামত লইয়া চলা সকল স্থলে সম্ভব মনে হয় না। বুধ বৃহস্পতি বা শুক্রবাবেও যে কোন নূতন নাটক আজকাল খোলা হয় কাবণ থিয়েটাবের কর্ত্তারা আজকাল "বাব দোষ" মানেন না।

গত সপ্তাহে অভিনয়েব ত্রুটী দেখিয়া তজ্জন্য আমবাও কর্ত্তৃপক্ষকেই দোষী বলিয়াছি—পবে শুনিলাম অধ্যক্ষ অপবেশ বাব পীডিত থাকায় এ সকল বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন নাই—সুতবাং সর্ব্ববিধ দোষই 'নন্দঘোষে'ব উপর স্থাপন কবা অনুদার ও সঙ্কীর্ণতাব পবিচায়ক। আমাদেব মনে হয়, যে 'অহিংস অসহযোগ' ভিত্তির উপব এই নাটকের প্রতিষ্ঠা উহাব প্রভাব এক্ষণে মন্দীভূত—তজ্জন্যই এই নাটক তেমন জমিতেছে না। তৃতীয় রজনীর অভিনয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি দেখা যাইল এবং শুক্রবাবেও যেরূপ ভীড দেখা গেল তাহাতে মনে হয় না যে কোন দর্শকেব পরামর্শমত রবিবারে ইহা দিলে থিয়েটাব কোম্পানী বেশী লাভবান হইতেন।

Printed & Published by Jnanedra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works
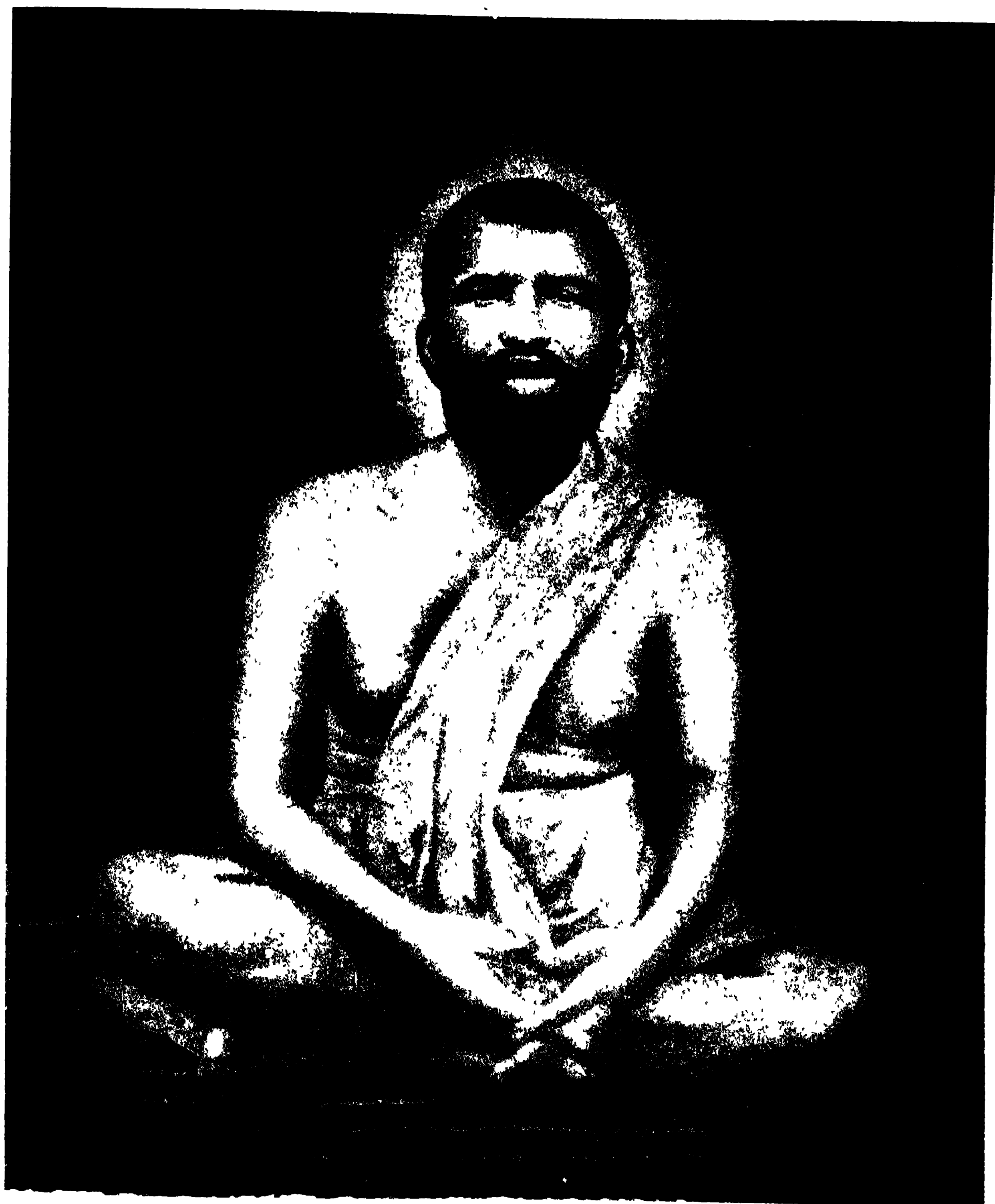
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব
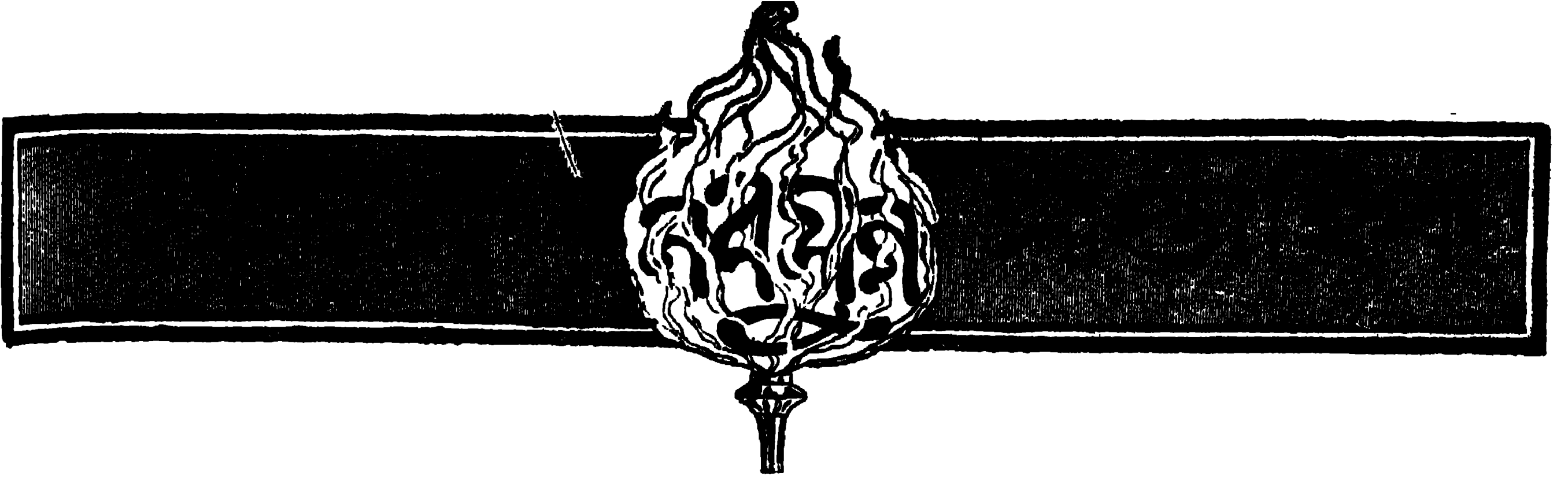
প্রথমবর্ষ]   ২৩শে ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ৭ই মার্চ্চ   [৩০শ সংখ্যা

স্বদেশ

শ্রীভক্তিসুধা হার

ভূষণ-বিহীনা মলিনা জননী
রূপসী শ্যামল-বসনে
ভুল-মোহিনী, হৃদয়-হরণী
করুণা-কাজল নয়নে।
কবে কোন্ শুভ দিবসের প্রাতে
সৃজনের ধাতা দুটি রাঙা হাতে
মোরে দিল দান নিয়তির সনে
তোমারে, বিজনে, গোপনে
তুলি নিলে সুখে আপনার জনে
কোমল-বক্ষ-শয়নে।

কতবার আমি ফুল-বীথিকায়
আপনারে লয়ে মগনা
ফুলমালা আর প্রেম-গীতিকায়
করেছি কাহার সাধনা,
তুমি সযতনে মোর ধূলিরাশি
অঞ্চলে মুছি লয়েছিলে হাসি'
কল্যাণি, তব স্নেহের বাঁধনে
টুটিয়া করেছি ছলনা
মোর প্রীতি-হারে করিনি যতনে
তব কেশ-পাশ রচনা।

অঙ্গনে তব জোনাকীর মেলা
হে মোর দুঃখিনী জননী,
মন্দির ছাড়ি দূরে দূরে খেলা—
কাটায়েছি সুখে রজনী!
আমার দুঃখ-আলস-জড়িমা
ঢেকেছে তোমার সকল গরিমা
তবু বসন্ত-বর্ষা-শরতে
নবরূপে চিরতরুণী
শোভিতা শোভন-শ্যাম-মেখলাতে
ভুলায়েছ প্রেমে অবনী।

অন্তর-বীণে রণি' রণি' আজি
কি রাগিণী করে আরতি
বাঁশরীর তান বেদনায় বাজি,
গাহিছে লক্ষ্মী, ভারতি!
তোমালাগি আজ করেছি রচনা
হৃদয়-পদ্মে অশ্রুর কণা
শোভিত-শিশির শতদল হ'তে
শুভ্র, অমল মিনতি-
ঢাকি' লাঞ্ছনা-বঞ্চনা-ক্ষতে
অধমের প্রাণ প্রণতি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার তুমি, হে রামকৃষ্ণ দেব, আজি তোমার জন্মতিথিতে তোমায় স্মরণ করিয়া প্রণাম করি।

বাংলার নব জন্মের শুভক্ষণে তুমি আসিয়াছিলে স্বর্গের অমৃতধারা বহিয়া। সে অমৃতধারায় স্নান করিয়া বাংলা ধন্য হইয়াছে, পুণ্য হইয়াছে, শক্তিমান্ হইয়াছে। সে অমৃত আকণ্ঠ পান করিয়া বাংলা অমর হইয়াছে। হে দেবতা, তোমায় বার বার প্রণিপাত করি।

বাংলার সুষুপ্তি ক্ষণে, হে গুরু, তুমি তাহার অর্দ্ধোন্মুক্ত গবাক্ষ পথে গাহিয়াছিলে, "উত্তিষ্ঠ, জাগ্রত, প্রাপ্য বরণে নিবোধত।" সে গান আজিও আকাশে, বাতাসে, বনে, প্রান্তরে ধ্বনিত হইতেছে। তাহার মরণভীত প্রাণের সমস্ত ভয় বিদূরিত করিয়া তোমার জয়শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছিল, "অভিরভিরভিঃ!" মনের আকাশে সে শঙ্খ নাদের কম্পন রহিয়া গিয়াছে। তোমায় প্রণাম করি।

কর্ম্ম তোমায় স্পর্শ করে নাই, অথচ সকল কর্ম্মের কর্ম্মী তুমিই, গুণ তোমার অন্ত পায় নাই, অথচ সকল গুণের গুণী তুমিই; মান তোমার চরণ দুটির নাগাল পায় না, অথচ সকল মানের চরণদাতা তুমিই। তোমায় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি।

হে সমন্বয়ের অবতার, জগতের সমস্ত বৈষম্যের মাঝে তুমি সমন্বয় আনিয়া দিয়াছ,—দ্বৈত-অদ্বৈত তোমার স্পর্শে সমস্ত দ্বৈধ হারাইয়াছে; জ্ঞানের সমুদ্র ও কর্ম্মের আকাশ তোমার পায়ের কাছে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। বেদ ও কোরাণে, বাইবেল ও জোরোস্থান আজ পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছে। হে যাদুকর, তোমায় স্মরণ করিতে আমাদের মনে পুলক জাগে, আমাদের বড় ভালো লাগে। তোমায় প্রণাম করি।

হে দেবতা, তুমি তো পাষাণ নও। মানবের দুঃখ, মানবের বেদনা তোমায় স্পর্শ করে, তাইতো যুগে যুগে নব নব রূপ নব নব আনন্দের বার্ত্তা বহিয়া আন। যুগে যুগে তুমি আসিয়াছ, তোমায় চিনিতে কেহ ভুল করে নাই। কখনও বহিয়া আনিয়াছ নিষ্কাম কর্ম্মের বার্ত্তা, কখনো আনিয়াছ অহিংসার বাণী, কখনও আনিয়াছ জ্ঞানের বার্ত্তা, কখনও প্রেমের বাণী; আর এবার আনিয়াছিলে স্বর্গের সমস্ত বাণীর পুষ্পসার। হে মহান, হে বিরাট, তোমার পদ বন্দনা করি।

বাংলার একান্ত প্রয়োজনের দিনে তুমি আসিয়াছিলে, হে শান্ত, হে সৌম্য! কিন্তু তোমায় শুধু প্রয়োজনের দেবতা ভাবিয়া তো তৃপ্তি পাই না। একান্ত প্রয়োজনের দিনেও যে তোমার স্পর্শ পাই। তুমি প্রয়োজন অপ্রয়োজনের অতীত। তোমায় প্রণাম করি।

তুমি বিরাটের চেয়ে বিরাট, তাইতো তোমায় ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না। তুমি অণুর চেয়ে অণু, তাই তো তোমায় খুঁজিয়া পাই না। হে বিরাট, হে অণু, তোমায় বারম্বার প্রণাম করি।

তুমি দুর্জ্ঞেয়ের চেয়ে দুর্জ্ঞেয়, তাই তো আমাদের বিস্ময় লাগে। তুমি সহজের চেয়ে সহজ তাই আমাদের ভালো লাগে। তোমায় প্রণাম করি।

হে শান্ত, হে তেজস্বী, হে সৌম্য, হে উদ্দাম, হে বিরাট, হে অণু, হে দুর্জ্ঞেয়, হে সহজ, আমরা তোমার শরণ লইয়াছি। তোমায় প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম।

তুমি রাম, তুমি কৃষ্ণ, হে রামকৃষ্ণদেব, তোমায় বারম্বার প্রণাম করি।

---

* ১২ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ১১নং ইডেন হাসপাতাল রোড, রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীমদ্ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নেতৃত্বে যে উৎসব সভা হইয়াছিল, তাহারই জন্য প্রবন্ধটি রচিত হইয়াছিল।
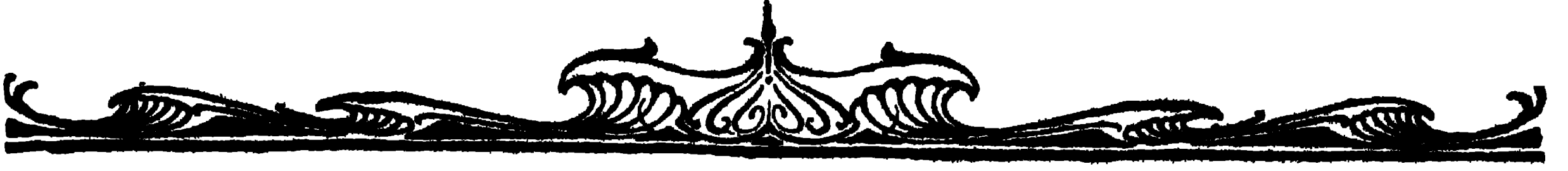
চন্দ্রালোকে

শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায় বি, এ

কবি গাহিয়াছেন,—

"এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল,
সে মরণ স্বরগ সমান।"

এই অনন্ত তৃণশস্পসমাচ্ছন্না শস্যশ্যামা বসুন্ধরা যখন রজত চন্দ্রকিরণধারা-স্নাত হইয়া হাসিতে থাকে, যখন এই অনন্ত শব্দময়ী সুন্দরী ধরিত্রীর পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ সহ শুভ্রচন্দ্রালোকধারা পান করিয়া কি এক মধুর মোহন আবেশে বিভোর হইয়া এ উহার পানে মুগ্ধ নয়নে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে, তখন সেই শুভ্রজ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীর চন্দ্রাতপতলে দাঁড়াইয়া মনুষ্যহৃদয়ে মরণকামনা জাগিবার অপেক্ষা জীবন ভরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার সাধ হওয়াই ত স্বাভাবিক। কিন্তু এমন পরিপূর্ণ চাঁদের আলো দেখিয়া কবি কেন গাহিলেন—'মরি যদি সেও ভাল, সে মরণ স্বরগ সমান'—ইহা কি কবিহৃদয়ের শুধুই একটা অর্থহীন উচ্ছ্বাস, শুধুই একটা ঝঙ্কার, অথবা ঐ বসুন্ধরার ক্রোড়ে এই অনন্ত সুখদুঃখ সমাকীর্ণা পৃথিবীর বিচিত্র অভিজ্ঞতালব্ধ একটা অনুভূতি অসহায় শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে ঘুমাইয়া আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—প্রকৃতি করুণাময়ী, মনুষ্যহৃদয় অসার। কিন্তু জানিনা কেন মনে হয় হৃদয় মাত্রই করুণা ও হৃদয় মাত্রই স্নেহপ্রবণ। যে করুণাময় বিধাতা এই প্রকৃতি জননীকে করুণাময়ী করিয়াছেন, তিনিই ত এই মনুষ্যহৃদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তিনিই আবার এই অতি ক্ষুদ্র মানব ক্রীড়নকের পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে অতি কঠোর, অতি প্রবল অলঙ্ঘনীয় বিচিত্র ঘটনা পারম্পর্য্যের দাস করিয়াছেন। তাই হৃদয় যখন করুণার শতধারায় বিগলিত হইয়া উন্মুক্ত আলিঙ্গনে অপর হৃদয়কে আবদ্ধ করিতে চাহে, নিয়তির মত দুর্ব্বার অতি প্রচণ্ড ঘটনার প্রবল প্রতিঘাত সেই ব্যগ্র আলিঙ্গনের সমস্ত মাধুর্য্য সহসা নিজে নিঃশেষিত করিয়া দেয়। তাই আজ যাহাকে বন্ধু বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি, যাহার দর্শন মধুময়, যাহার কণ্ঠস্বর শ্রবণময় হইয়া পান করিতে ইচ্ছা করে, যাহার হৃদয়ে হৃদয় রাখিয়া স্বর্গসুখলাভ করিতেছি, হয়ত কালপ্রবাহে, ঘটনার কঠিন নিষ্পেষণে সেই বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হইবে। আজ যাঁহাকে স্বদেশভক্ত দেখিয়া হৃদয়াধারে স্তরে স্তরে ভক্তির অর্ঘ্য সাজাইয়া রাখিয়াছি, যাঁহাকে স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির জন্য সর্ব্বস্ব অকাতরে ত্যাগ করিতে দেখিয়া হৃদয়ের সমস্ত বাসনা তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, হয়ত দুইদিন পরে তাঁহাকেই আবার স্বদেশ-দ্রোহী বিভীষণ দেখিয়া লজ্জায় মাটীতে মুখ লুকাইতে হইবে। অধিক কি আজ যে অকৃত্রিম পিতৃমাতৃস্নেহের সুশীতল ছায়াতলে তনুমন স্নিগ্ধ পবিত্র হইতেছে, কে বলিবে হয়ত অদৃষ্টদোষে কাল তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে না পারে? মানুষ যতদিন মানুষ ততদিন এই অঘটনের গতিরোধ করা তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। এই অনন্ত ঘটনা স্রোতের তরঙ্গ শিরে যতদিন দারিদ্র্য রাক্ষসের ভ্রুকুটি কুটীল ফেনহাস্য স্ফুরিত হইতে থাকিবে, ততদিন মনুষ্য হৃদয়ের সমস্ত আগ্রহ তাহার সহজাত আন্তরিকতা সত্বেও বারবার এইরূপে নিষ্ফল হইয়া যাইবে। এইস্থলে দারিদ্র্য বলিতে আপনারা শুধু বাহিরের দারিদ্র্য বুঝিবেন না, অন্তরের বিবিধ দারিদ্র্যও ইহার অন্তর্গত।

ইহার উপর মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিশাপ যম-যন্ত্রণা আছে—রোগ আছে, শোক আছে, তাপ আছে। ঐ যে শিশুটী হেলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, ভাঙ্গা ভাঙ্গা, আধ আধ ভাষায় ধরায় নন্দনের সৃষ্টি করিতেছে, বৎসর না ঘুরিতে ঘুরিতে সেই পুষ্পকোরকে কীট প্রবেশ করিবে, তোমার আয়ুষ্কাল দশবৎসর পিছাইয়া

অকালে ঝরিয়া পড়িবে। আজ যে প্রেমময়ী পত্নীর মিলন সুখে নিখিলহারা হইয়া আছে, মুহূর্ত্তের জন্য যাঁহার বিরহ কল্পনা করিলে চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছ, হয়ত দুইদিন পরে তাঁহাকে উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত, জীবন্মৃত দেখিয়া তুমিই তাঁহার মৃত্যুকামনা করিবে। তাই আজ যখন বন্ধু আছে, স্বদেশভক্তের স্বদেশপ্রীতি অটুট আছে, অপত্য-স্নেহ তেমনই মধুবৃষ্টি করিতেছে, দাম্পত্য প্রেম তেমনই অনাবিল রহিয়াছে, তখন নিমিষে তাহা ধূলিসাৎ হইবার পূর্ব্বে এই পরিপূর্ণ-সুখচন্দ্রকরোজ্জ্বল ধরণীর ক্রোড়ে, এস দয়িত, আজ মরণ-শয়ন রচনা করি। এই সতত পরিবর্ত্তন শীল, ক্ষণস্থায়ী সুখ-বিদ্যুৎ-চমকিত, ঘটনা ঘাতপ্রতিঘাত সংক্ষুব্ধ ধরণীপৃষ্ঠে অমানিশীথিনীর অন্ধকার চকিতে নামিয়া আসিবে—আজিকার এই সুখনিশি বহিয়া যাইলে যে জীবন পড়িয়া রহিবে তাহা জীবন নহে—মরণ। তখন বন্ধুকে শত্রু দেখিয়া, দেশভক্তকে দেশদ্রোহী দেখিয়া, অপত্যস্নেহ আহত কলঙ্কিত দেখিয়া, দাম্পত্যপ্রেম রাহুগ্রস্ত দেখিয়া বাঁচিতে পারিব না, মরিতেও পারিব না, তখন মরিয়াও বুঝি সুখ পাইতে না। অতএব এস প্রিয়, এস প্রিয়তম, এই চাঁদিনী রজনীর ষোলকলা যখন চারিভিতে সুধাবৃষ্টি করিতেছে, যখন এই একটী অনন্ত মুহূর্ত্তের জন্য সুখের ষোলকলা প্রাণের কাণায় কাণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে,—তখন এ হেন চাঁদের আলোর সুখসাগরতলে, নয়নে নয়ন রাখিয়া, মরণ শয়ন বিছাইবে এস! সে মরণ জীবনের চেয়েও প্রিয়তর হইবে, সে মরণে স্বর্গসুখ লাভ ঘটিবে,—সে মরণ স্বরগ সমান'!

কবি বোধহয় এক পূর্ণিমার শরচ্চন্দ্রিকাধৌত-রজনীতে নিজ জীবনে এই অনুভূতির প্রেরণা পাইয়াছিলেন তাই অন্তরের অন্তর হইতে গাহিয়াছেন—

এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল
সে মরণ স্বরগ সমান!

মেয়েদের শারীরিক ব্যায়াম ও নৃত্য

শ্রীহেমকুমার সরকার এম-এ, এম, এল, সি,

ছেলেবেলা হইতে আমরা নীতি ও চরিত্রবান্ হেরম্ব বাবুর শিষ্য। থিয়েটারের বা মেয়েলোকের কথা ভাবা পর্য্যন্ত আমরা মহা পাপ বলিয়া মনে করিতাম। তাঁহার সহিত ভালরূপ পরিচিত হইবার সুবিধা পাইয়া আমাদের সে সংকীর্ণ ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছিল। তাই বন্ধুদের নিমন্ত্রণে মধ্যে মধ্যে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছি। থিয়েটারে মেয়েদের চেহারা দেখিয়া দেখিয়া মেয়েদের পক্ষে শারীরিক ব্যায়ামের যে কত প্রয়োজনীয়তা তাহা আমার মনে ওঠে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের "সীত"ার অভিনয় দেখিতে গিয়া রামায়ণের করুণ কাহিনীর জন্য যেমন কাঁদিয়াছি, অভিনেত্রীদের চেহারা দেখিয়া তদপেক্ষা কম কাঁদি নাই। শুনিয়াছি বিলাতে অভিনেত্রীগণকে খাদ্যবিষয়ে ও ব্যায়াম চর্চ্চায় বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। এম্পায়ার থিয়েটারে শকুন্তলা অভিনয়ে যে নটরাণী ও অভিনেত্রীদের দেখিয়াছিলাম তাহাদের নৃত্যকৌশল ও শারীরিক সৌষ্ঠব বড়ই মনোহর। আমাদের দেশের অভিনেত্রীগণকে রোজ সকালে বিকালে ব্যায়ামের পর গরম জলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা মধু খাওয়ান উচিত ও পান খাইয়া মুখ ধুইয়া ফেলার বন্দোবস্ত এবং মাঝে মাঝে ডাক্তার দিয়া দাঁত scrape করানো না হইলে অভিনয়ের উৎকর্ষ হইবে না। নাচের ভিতর চমৎকার ব্যায়াম আছে। আমাদের দেশে অভিনয়ে শুধু বাইজীর নাচ না দিয়া, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির জীবন্ত নৃত্যভঙ্গী প্রবর্ত্তন করা উচিত।

ভদ্র সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে নাচ উঠিয়া গিয়াছে। বাইজী বা বেশ্যাগণ এখনও এই শিল্পকলাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। অবশ্য আজকাল ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মেয়েরা অনেকে waltz, foxtrot, cammel trot প্রভৃতি নানা ভঙ্গীর নাচ শিখিয়াছেন। বল নাচেও অনেকে

দক্ষ। কিন্তু এই বুড়ো জাতটার নারীকুল নাচ কি তা জানে না। সমাজের চোখে এটা একটা মহা অপরাধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গানেরও এই দশা হইয়াছিল কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ অনেক অত্যাচার সহিয়া গানটা যে ভদ্রলোকের অন্দরেও চলিতে পারে ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গানবাজনা বেশ চলিয়া গিয়াছে—এখন ভদ্রসমাজে নাচটা চলিলে হয়। জাতির এখন যৌবন নাই—যেদিন কাজরী নৃত্যে, দোল-লীলার স্মৃতি কত উদ্যান, কত অঙ্গন কাঁপিয়া উঠিত। এখনও পশ্চিম দেশে ও পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েদের মধ্যে বিবাহের সময় একপ্রকারের নাচগান চলিত আছে। কিন্তু দেশ যেরূপ দিন দিন "সভ্য" হইতেছে, তাহাতে প্রাণের এ স্পন্দনটুকুও শীঘ্রই নিভিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। কলিকাতার আধুনিক ভাবাপন্ন দুই এক পরিবারে এক-আধজন মেয়ে দিশীনাচ আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলার "রঙ্গ-রস-ভরা" প্রাণে ইহাদের তেমন সমাদর কই? বিলাতে ভদ্র মেয়েরা থিয়েটার করে—সমাজে একজন যদি কোনও একটা অসাধারণ গুণের অধিকারী হয়, সকলের তাহা ভোগ করিবার অধিকার তাহাদের সমাজে আছে? যে ভাল নাচিতে গাহিতে জানে, হেঁসেলের হাঁড়ীর ভিতরেই যদি গুণপণার শেষ হয়—তবে আর শিখিবে কে? অবশ্য সকলেই যে হাতা-বেড়ি ছাড়িয়া ধেই ধেই করিয়া নাচিয়া পাড়াশুদ্ধ লোককে আমোদ যোগাইবে এমন কথা নাই।

নৃত্যকলা একটি অতি উচ্চাঙ্গের শিল্প। ইহার অনুশীলন বা প্রদর্শন ক্ষেত্র আজকাল নাই। এক রঙ্গমঞ্চে খানিকটা অধিকার আছে; কিন্তু সেখানকার হাওয়া বদলাইতে না পারিলে ভদ্রলোকের মেয়ের স্থান নাই। এই অসম্ভব কি কোনদিনই সম্ভব হইবে না? বাংলার দুঃখময় জীবনের আনন্দমুহূর্ত্তে নটরাজ কি তাঁহার স্থান গ্রহণ করিবেন না?

আমাদের দেশে কৃত্রিম ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। জাঁতা, ঢেঁকি, কুলো যেমন বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনে সহায়তা করিত, তেমনি হিষ্টিরিয়া, পেঁচো-পাঁচী তাড়ানোতো কার্য্যকরী ছিল! যে সকল মেয়েরা পরিশ্রম করে, তাহাদের সন্তান পরিশ্রমী হয় এবং সন্তান প্রসবেও কোনও কষ্ট হয় না। ঝাড়ুওয়ালী, মেথরানী, ধোপানী প্রভৃতি শ্রেণীর মেয়েরা অনেক সময় দেখিতে কেমন সৌষ্ঠবশালিনী হয়। শারীরিক ব্যায়ামই ইহার একমাত্র কারণ। কলেজে পড়া মেয়েদের কোটরগত চক্ষু ও কর্কশ মুখখানি দেখিলে সরস্বতী দেবীকে অন্দর হইতে বিদায় করিয়া দিতে ইচ্ছা হয়। পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েরা অনেকেই সাঁতার জানিতেন। এখন সভ্যতার চাপে তাঁহারা সাঁতার ভুলিয়াছেন কি না জানি না।

যাহা হউক গৃহকর্ম্ম ও শিল্পকলার ভিতর দিয়া ব্যায়াম অভ্যাস করাইলে বড় সুন্দর হয়। রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতনে মাদলের সঙ্গে মণিপুরী নাচ হইত। সে এক আনন্দময় দৃশ্য ছিল। গোখলে মেমোরিয়াল মেয়ে স্কুলে একবার নাকি নাচ শেখাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। এজন্য দেশে কি ভয়ানক আন্দোলনই উপস্থিত হইয়াছিল।

যতদিন না আমাদের মায়েরা আনন্দময়ী ও শক্তিময়ী হইতেছেন, ততদিন আমাদের মত নিরানন্দ শক্তিহীন কু-সন্তানের দলই দেশে জন্মিবে এবং পরাধীনতার অন্ধকার সকলকেই চোখ থাকিতে কাণা করিয়া রাখিবে। এখন প্রয়োজন কয়েকজন যুবকযুবতী অগ্রণীর হইয়া লোক নিন্দা ও ধিক্কারকে অগ্রাহ্য করিয়া এই নূতন পথে যাত্রা করা। কিন্তু দেশের জীবনীশক্তি বোধহয় এখনও সে উচ্চ সীমায় উঠে নাই। তাই মনে হয় যে আর কিছুদিন আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

গল্প

"দিদি"

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

খানিক আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। আকাশ তখনও থম্‌থমে, বাদল হাওয়া বুক কাঁপিয়ে দিয়ে জোরে জোরে বইছে।

বেলা তখন দুটো। সে ঘণ্টায় আমাদের ক্লাশ ছিল না। চার নম্বর রুমটা খালি দেখে, নীচেয় না নেমে সেই ঘরের কোণের দিকে দু'খানা বেঞ্চি দখল ক'রে আমরা জন কত বন্ধু বসে গল্প জুড়ে দিলুম।

প্রথমেই প্রোফেসরদের সমালোচনা আরম্ভ হল, কিন্তু তারপর কি করে যে 'দেশের কথা' প্রভৃতি তার মধ্যে এসে পড়ল সে এখন মনে আসছে না।

অমল ছেলেমানুষ হলেও তার মুখে বুড়োদের গাম্ভীর্য্যের একটা ছাপ লাগান থাকতো, সে বল্‌লে—নবযুগের এই আন্দোলনের ভেতর প্রাচীনদের একটা বিশেষ স্থান দেওয়া দরকার। আমাদের, তরুণদের উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা ঠিক্‌পথে চালাতে পার্‌বে কেবলমাত্র তাদেরই সারা-জীবনের অভিজ্ঞতা।

যোগেশ হো হো করে হেসে বল্লে—"ওটা একেবারেই 'bosh' বুড়োরা আমাদের কিছুতেই সুনজরে দেখ্‌তে পারবে না। এই যে সংযত রাখার কথা বল্‌লে, ওর সোজা মানে হচ্ছে প্রতি পদে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি, তাঁদের সুপরামর্শ এসে উন্নতির পথে আমাদের এক ইঞ্চিও পা বাড়াতে দেবে না।

তর্কটা ক্রমেই তুমুল হ'য়ে উঠ্‌ছিল। দিনটা ছিল ঠাণ্ডা, সবারই মনে একটু আড্ডা দেবার ভাবটাই জেগে উঠেছিল, প্রাচীনের প্রতি কেমন একটা মায়া আস্‌ছিল। তাই অনেকেই অমলকে 'ভোট' দিলে, তখন নিমাইকে মধ্যস্থ মানা হ'ল।

নিমাই এতক্ষণ কোনদিকে মন না দিয়ে চুপচাপ বসেছিল। বেশ ভাল মানুষটীর মত, এখন সালিসীর উচ্চ পদ পেয়ে দুবার গলা খাঁকারি দিয়ে নিলে, চোখ দুটী একটু বিস্ফারিত করিয়া আমাদের মুখের উপর পেচকের মত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অস্বাভাবিকরূপ গম্ভীর স্বরে বল্‌লে—যোগেশের কথাই ঠিক্‌। বুড়োরা আমাদের মোটে বুঝ্‌তে পারে না বা বোঝাবার চেষ্টা করে না। তাঁরা আমাদের সর্ব্বদাই সন্দেহের চোখে দেখেন, এর একটা ছোটখাট প্রমাণ আমার নিজের জীবনের একটা ঘটনা থেকে দিচ্ছি। তার শেষটা তোমাদের কাছে কমেডি বলে বোধ হ'তে পারে কিন্তু আমার পক্ষে সে হয়েছিল ভীষণ ট্র্যাজেডি, কেননা তার জন্যে এখনও আমার অভিভাবকেরা আমায় সন্দেহ করেন, যদিচ সেটা গোপনে। ম্যাট্রিকে আর ইণ্টারমিডিয়েটে ভাল রেসাল্ট দেখিয়েও খুব সম্ভব তার হাত সম্পূর্ণরূপ এড়াতে পারিনি।

কথার মধ্যে অতর্কিতভাবে গল্পের সম্ভাবনা দেখে তর্ক নীরব হয়ে গেল। সতীশ ঘড়ি দেখে বল্‌লে—তবে চট্‌পট্ আরম্ভ ক'রে দাও হে, ঘণ্টা পড়্‌তে আর মোটে বিশ মিনিট আছে।

তখন বাইরে টিপিটিপি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে, শার্শীর কাঁচের ফাঁক দিয়ে বাইরেটা কেমন ধোঁয়াটে দেখাচ্ছিল। নীচে, পথের দুপাশে ক্রোটন গাছের লাইনগুলো জল থেমে৷ হাস্যমুখরা স্নানোত্থিতা তরুণীর সারির মত দাঁড়াইয়া ছিল। নিমাই বলিল—

তখন ফার্ষ্টক্লাসে পড়ি, পুজোর বন্ধ পড়েচে, পড়াশুনো একরকম করে ফেলেচি কেননা কথা আছে স্কুল খুললেই test আরম্ভ হবে, বিকেলে কলেজ ষ্ট্রীটে বেড়াচ্ছি, দেখি হকারগুলো ফুটপাথের দু'ধারে হরেক রকমের বই সাজিয়েছে, আপন মনে বই দেখ্‌তে দেখতে চলেছি হঠাৎ একটা বইয়ের নাম দেখলুম 'Secret of Sanskrit Grammar', দেখেই বুকটা চমকে উঠ্‌ল। এই সংস্কৃত ব্যাকরণ জিনিষটাকে আমি চিরদিন যমের মত ভয় করে এসেচি। এত ক'রে পড়তুম তবু সে 'আলুচ', 'বিমুণ' প্রভৃতি মুখরোচক প্রত্যয়গুলো মনে রাখতে পারবো তা প্রত্যয় কর্ত্তে পার্ত্তম না, একদিন সমস্ত কারক মুখস্ত করে তার পরদিন দেখলুম অপাদান কারকের 'ভীত্রার্থানাং ভয়হেতু' সূত্রটি কেবলমাত্র মনে আছে আর মনের মধ্যে পরীক্ষায় ফে'লের ভীষণ ভয় উৎপাদন করচে।

যা হোক এই বইখানা দেখে আর গোটা কত পাতা উল্টে মনটা বেশ আশ্বস্ত হ'ল, সিদ্ধিলাভ করবার সময় সাধকদের মন বোধ হয় এই রকমই শান্ত হয়! ভাবলুম এবার পণ্ডিতকে ফাঁকি দিয়ে এই চটি বইখানা প'ড়ে বেশী নম্বর মেরে দেব! লোকটার সঙ্গে দর দস্তর ক'রে সাড়ে চার আনা দিয়ে বইটা কিনে নিলুম, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে সন্ধ্যের আগেই আলোটি জেলে খুব যত্ন করে বইটা নিয়ে পড়্‌তে বসলুম।... প্রথম পাতা খুলতেই আমার চোখে পড়্‌ল মেয়েলী ছাদে বেশ গোটা গোটা করে ইংরেজীতে লেখা রয়েচে—

'বুলু'

বেথুন কলেজ, থার্ডইয়ার,

বল্‌তে ভুলেচি—পড়াশুনা কিছু কিছু করলেও আমি একেবারে নিছক ভালছেলে ছিলুম না। ইতিমধ্যে আলমারিকে আলমারি গল্পের বই লুকিয়ে লুকিয়ে শেষ করেছিলম। এদিকে স্কুলের Reading Union এ প্রায় সমস্ত রকম সাময়িক পত্রিকা আসিত, তাই থেকে সাময়িক সাহিত্যের সঙ্গেও নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়েছিলুম। কোন একটা গল্পে পড়েছিলুম কেমন ক'রে এক গোছা নারীর কেশ, বা কোন সুন্দরীর একটা ক্ষুদ্র ছবি দেখে, বা কোন স্ত্রীলোকের লেখা একটি ছেঁড়া চিঠি কুড়িয়ে পেয়ে লেখকদের কল্পনা রেসে ঘোড়ার মত অনন্তের মাঠে চার-পা তুলে দৌড়াদৌড়ি করে।...এই সব মনে হয়েই আমার মাথা যেন হঠাৎ গরম হ'য়ে উঠ্‌ল।...

ভাব্‌তে লাগ্‌লুম 'বুলু' অবশ্যই একটা ছদ্মনাম, হয়ত বন্ধুবান্ধবেরাই তাকে ঐ নাম দিয়েছে আর এই নামটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটী বেশ হাস্যময়ী। কি রকম দেখ্‌তে? রংটা নিশ্চয়ই ফরসা, তবে খুব ফ্যাকাসে নয়। চুলগুলো ইচ্ছে ক'রেই একটু উস্কো খুস্কো করে রেখেছে। মুখখানা শান্তভাবের—দেখলে কেমন ভাল লাগে, কিছুক্ষণ ধ'রে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে! ক্ষীণ হাত দুটি লালপাড় শাড়ীর পাড় ছাপিয়ে দেখা দেয়। বয়স? হিসেব করে দেখ্‌লে আমার চেয়ে বড় নিশ্চয়ই কিন্তু তাই বলে যে আমার চেয়ে সে মাথায়ও বড় হবে তার কোন মানে নেই। আচ্ছা, সে কবিতা লেখে কি গল্প লেখে? হয়ত দুই-ই লেখে—কারণ গল্প ও কবিতা লেখা ছাত্র ও ছাত্রীদেরই আজকাল প্রায় একচেটিয়া। আজকালের সাহিত্য বেঁচে থাকে এদেরই তরুণ মনের ফুলে ফলে। আর্ট স্কুলের ছেলেরা যোগায় ছবি, আর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাই অতিকায় মাসিকদের পাতা ভরাইবার একমাত্র অবলম্বন। আমি ত তার আসল নামটা জানি না, বইটার কোথাও কি সে নাম নেই? নাঃ, উল্টে পাল্টে আর কোন নাম দেখতে পেলুম না। বড় ইচ্ছে করতে লাগ্‌ল বুলুর সঙ্গে চেনা-শুনা কর্ত্তে।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে বোঁ বোঁ ক'রে মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল। এদিকে মা ভাত খেতে ডাকলেন। নানা চিন্তায় অন্যমনস্কভাবে আধপেটা খেয়েই শুয়ে পড়্‌লুম।

সকালে উঠে সে সব কথা ভুলেই গিয়েছিলুম কিন্তু বইখানা আবার সব মনে পড়িয়ে দিলে। তখন একখানা লাইন-টানা কাগজ নিয়ে লিখতে বসে গেলুম।...কি ব'লে আরম্ভ করব? ভেবেছিলম একটা প্রেমসম্ভাষণ বা ঐ রকম

কিছু দিয়ে আরম্ভ করি, কিন্তু সেই উজ্জ্বল দিনের আলোয় আর লোকজনের চেঁচানিতে ওভাবটা যেন জমতে চাইলে না, একেবারেই বেসুরো বোধ হ'ল।···তাইতো কি লেখা যায়? হঠাৎ কি যেন পুলক-কাঁপনে লিখে ফেল্লুম 'ভাই বুলুদি!

ছেলেবেলা থেকে এই একটি অভাব বড়ই আমায় ব্যথা দিত, সে হচ্ছে একটা দিদির অভাব। আমার দিদি নেই, যখন বড়দি, মেজদি, সেজদি, ন'দি, ছোড়দি প্রভৃতি উপন্যাসে দিদিদের স্নেহের কথা পড়ি কিম্বা কোন আধুনিক উপন্যাসে দেখি দিদির সঙ্গে ছোট-ভাইয়ের খুনসুটী প্রভৃতি রয়েচে, তখন আমার চোখে কান্না আসতো।···তাই বুলুদি' লিখতে আমার বড় আনন্দ হ'ল, লিখ্‌লুম—

ভাই বুলুদি'

আমার চিঠি পেয়ে তুমি আগেই হয়ত খানিকটা আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে, আর কে লিখেচে জান্‌বার চেষ্টা করবে, কিন্তু আমি ব'লেই দিচ্চি আমাকে তুমি চেন না, আমার নাম নিমাই—আমি ফার্ষ্ট ক্লাশে পড়ি। আমার বড় ইচ্ছে হয় যে তোমার মত নামের একটি দিদি আমার থাকে। সেই কথাটা জানাবার জন্যে এই চিঠি লিখ্‌লুম, যাই হোক, তুমি যদি এই চিঠির আর মাঝে মাঝে যে সব চিঠি লিখ্‌ব তার জবাব না দাও তা'হলে আমার পড়া-শুনায় মন যাবে না আর রাত্রে বিছানায় শুয়ে যতক্ষণ না ঘুম আসে ততক্ষণ কেবল চোখে জল আস্‌বে!

ইতি—নিমাই।

বেথুনের ঠিকানায় চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে কেমন একটু আরাম বোধ হ'ল।

দু'দিন কেটে যায় তবু উত্তরের পাত্তা নেই! অভিমান কর্‌তে যাব—এমন সময় পিওনটা জান্‌লা গলিয়ে একটা চিঠি ফেলে দিল—সেই একহাতের লেখা! চট্‌ করে সেটা সেখান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে পড়্‌বার ঘরের এক কোণে ব'সে পড়তে লাগ্‌লুম। সত্যি এটা বুলুদির কাছ থেকে এসেছে। লিখেচে, আমার দিদি হ'তে পেয়ে তার খুব আনন্দ হোয়েচে। আর আমি যত চিঠি লিখ্‌ব একটুও বিরক্ত না হ'য়ে বুলুদি' সমস্ত চিঠির উত্তর দেবে। ···বুলুদির এই চিঠি পেয়ে আমার এত আনন্দ হ'ল যে কি বল্‌ব। এমনি ক'রে আমাদের চিঠি পত্তর চল্‌তে লাগ্‌ল।

বুলুদি'র পরের চিঠিগুলো এত স্নেহমাখা হ'তে লাগ্‌ল যে ঠিক কর্‌লুম তার সঙ্গে দেখা ক'রে একদিন গল্প ক'রে আসি।···মনটা প্রীতিতে ভ'রে উঠ্‌লো, সারারাত ভাল ঘুম হ'ল না।

পরদিন বুলুদিকে সেকথা লিখে দিলুম, সে উত্তরে লিখ্‌লে যে বৃহস্পতিবার তার সময় থাকে, এদিকে আমার ও test হ'য়ে গেছে, স্কুলে যেতে হয় না।· বৃহস্পতিবার স্পন্দিত হৃদয়ে, লজ্জাজড়িতচরণে বেথুন কলেজের দিকে গেলুম। এর আগে কখনও আমার কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার দরকার হয়নি। দেখা করতে হ'লে কাকে কি বল্‌তে হয় তা আমার জানা ছিল না, সেইজন্যে গেটের কাছে থম্‌কে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করে ফাঁক দিয়ে উঁকি মারচি এমন সময় একটা গম্ভীর হুঙ্কারে চম্‌কে উঠে পেছনে চেয়ে দেখি—বড় মামা! তাঁর প্রকাণ্ড কালো হাতটা এগিয়ে এসে জোরে আমার একটা কান ধর্‌লে···

ঠিক সেই সময়ে দরোয়ানজী দুটো চল্লিশের ঘণ্টা মার্‌লেন—ঢং ঢং ঢং!

স্বামী অভেদানন্দ

গিরিশ চন্দ্র *

গিরিশ চন্দ্রকে যে দিক দিয়া দেখি সেই দিকেই তাহার বিশালত্ব উপলব্ধি হয়। তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন কিরূপ সুখ-দুঃখ, ভালমন্দ, উত্থানপতন, সুন্দর ও কুৎসিতের ভিতর দিয়া ক্রমে তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পদপ্রান্তে সমর্পিত করিয়াছিল, এ বিষয়ে প্রাচীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্যক্ বলিতে পারেন—তিনি এখনও জীবিত। শেষ জীবন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, দানীবাবু ও তাঁহার ভাগিনেয় দুর্গা বাবু ও অন্যান্য বন্ধুগণ অবগত আছেন। তাহার ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণই সবিশেষ বলিবার অধিকারী এবং এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত স্বামী অভেদানন্দ মহাশয় এখনই আপনাদিগকে অনেক কথা শুনাইবেন। তাঁহার নট-জীবন সম্বন্ধে আমি কোন বিষয় অবগত নহি, তাঁহার সঙ্গী ও বন্ধু, নট-কুল-শেখর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ই তাহার অভিনয় কুশলতা ও রঙ্গজীবন সম্বন্ধে বলিবার সম্যক্ অধিকারী। কেবল এইটাই আমার মনে হয় বরণীয় নাট্যকলাকে দেশবাসীর নিকট আদরণীয় করিবার জন্য ও রঙ্গমঞ্চকে জাতীয়-মন্দিরে পরিণত করিবার জন্যই, আত্মীয় স্বজন, সমাজ-পরিজন, মান-অপমান, নিন্দা কুৎসা সব তুচ্ছ করিয়া তিনি ধ্যাননিষ্ঠ তাপসের ন্যায় জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। তথাপি রঙ্গমঞ্চের এক কোণে 'নটো গিরিশ ঘোষ' ভাবে পড়িয়া থাকিলেও তাঁহার নাট্য প্রতিভায় যে বাঙ্গলা আজ গৌরবান্বিত ও বাঙ্গলার জাতীয়তাগঠনকর্ত্তাদের মধ্যে তিনিও যে একজন, সে সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ বিবৃত করিবার দিন আজ নয়! কেবল তাহার জাতীয়তার দিকটা যাহা আমার মনে আজ সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হইতেছে আমি তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আপনাদের নিকট অবতারণা করিব।

আমার খুব মনে আছে স্বদেশীর সময়ে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এই মহানগরীতে নৌরজী পরিচালিত কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিয়া সেই মহাসম্মিলনীর প্রভাব প্রথমে অনুভব করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম কিন্তু এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে সেই সময়েই 'উপেক্ষিত' রাজনীতি-সংসর্গ বিরহিত রঙ্গমঞ্চ হইতে নাট্যকারের 'সিরাজউদ্দৌলা', 'মীরকাশিম্' অভিনয় দেখিয়া আমার জাতীয়তা শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। মনে হইয়াছিল পঁচিশ বৎসর যাহা শিখিয়াছি, তার আসল ফেলিয়া নকল আলেয়ো ভুলিয়াছি, আর আজ যাহা দেখিলাম ইহাই খাঁটি সত্য। ইহার পর জাতীয়তার দিকে যদি কিছু অগ্রসর হইয়া থাকি বা জীবনে যদি কিছু করিবার সৌভাগ্য হইয়া থাকে তবে তাহা এই শিক্ষারই ফলে। রঙ্গমঞ্চ হইতে সিরাজুদ্দৌলার সেই উক্তি "বাঙ্গলার সিংহাসনে আমার পরিবর্ত্তে হিন্দু কি মুসলমান অপর কাহাকেও উপবেশন করান্ কিন্তু নিশ্চয় জান্‌বেন বিদেশী বাঙ্গলার দুসমন" আজও যেন সেই কথা আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়। স্বদেশী যুগের তিনখানা নাটকেই কেবল সাময়িক উত্তেজনার তৃপ্তি-সাধনের জন্য জাতীয়তামূলক কথার অবতারণা করা হয় নাই। পূর্ব্বাপর সাহিত্যেও এই ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। তখনও জাতীয় মহাসঙ্ঘ বা কংগ্রেস্ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বাঙ্গলায় রাজনৈতিকগণ তখনও রাজ-নীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন নাই, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মাতৃ-দাসত্ব-মোচনকারী গরুড় শীর্ষক প্রবন্ধে মাতৃমন্ত্রের বীজ প্রথমে উচ্চারিত হয়। "মাতৃমন্ত্র কেবল ইউরোপেই ফলে এমন নহে বিপদ্-দীক্ষিত সম্রাট আক্‌বর ও রাণা প্রতাপের সিংহনাদে কম্পিত হইতেন—রাণাএকজন মাতৃ উপাসক। ইতিহাসে শুনি তাহার জয় অপেক্ষা পরাজয়ই অধিক গৌরব-জনক। শতদ্রুসলিল কম্পিত করিয়া ভীষণ সিংহনাদ উঠিল, পাণ্ডুগণ ইংরাজ তাহা শুনিল, দেখিল এ মন্ত্র, হীন ভারতবর্ষেও সম্পূর্ণ ফলপ্রদ। ইতিহাসে দেখিতে পাই কেহই ঈদৃশ হীন নাই যিনি মনে করিলে এ মন্ত্র গ্রহণ করি-

* গিরিশ স্মৃতিসভায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বক্তৃতার মর্ম্ম।

করিতে পারেন ; তবে কি নিমিত্ত আমরা আপনাদিগকে হীন বিবেচনা করি ? সিদ্ধমন্ত্র রহিয়াছে, কিন্তু কেহ কি উহা গ্রহণ করিতেছে ?" জাতীয় উদ্বোধনে এই মন্ত্রের আরম্ভ এবং 'ছত্রপতি শিবাজীতে' ইহার অভিব্যক্তি। এবং এই দীর্ঘ পঞ্চবিংশবর্ষ ব্যাপী স্বদেশী প্রচারে নাট্যকার থাঁটি হিন্দুভাবেই জাতীয়তা প্রচার করিয়া গিয়াছেন,তিনি হিন্দু, অন্তরে বাহিরে হিন্দু, অন্যের অনুকরণে নিজের স্বাতন্ত্র্য কখনও নষ্ট করেন নাই। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে 'মায়াবসানে' তিনি সতর্ক করিয়া বলেন, আমি ইংরেজের অনুকরণের বিরোধী, ইংরেজের আচার ব্যবহার ইংরেজের উপযোগী, ভারতের পক্ষে অহিতকর। ইহার পরে বিজাতীয় ভাব দেখিলে ব্যথিত হইয়া তিনি আক্ষেপ করিতেন। "বিজাতীয় আদর্শে সকলেই প্রায় বিজাতীয় ভাবাপন্ন। হিন্দুর হিন্দু পরিচ্ছদ নাই, হিন্দুর অভিবাদন নাই, হিন্দুর হিন্দুভাবে সদালাপ নাই।" আজ যে মহাত্মা গান্ধী ভারতবাসীকে এই কুশিক্ষা হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সম্মুখে এইরূপ জাতীয়তা ও আড়ম্বরশূন্য জীবনের আদর্শ স্থাপন করিয়া ধন্য হইয়াছেন, বঙ্গবাসীকে তিনিও কিন্তু বিশেষ কিছু নূতন শুনাইতে পারেন নাই। কি স্বদেশী প্রচার কি আদালত-বর্জ্জন কি তাঁহার প্রেম, সত্য ও অহিংসা বাঙ্গালীর কাছে কোন শিক্ষাই একেবারে নূতন নহে। গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীর পত্রে পত্রে এ আদর্শ আমরা জাজ্বল্যমান দেখিতে পাই। "মায়াবসানের" নিম্নলিখিত ছত্রে এই ভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়—

মোড়ে মোড়ে মদের দোকান তুলে দিন, বড়লোকেরা একত্র হয়ে, যে মদ খাবে তাকে সামাজিক শাসন করুন। নিজ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণকে শিক্ষা দিন। চক্ষের উপর দেখ্‌ছেন দীন দরিদ্র প্রভৃতি ইংরাজি চালে চলে আয় অনুসারে ব্যয় করতে পারে না, তাতে যে কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পার্ব্বেন এমন কুটীর নাই যেখানে মদের বোতল সাবান এসেন্স নাই। যদি বড়লোক একত্র হয়ে থাকেন— সাধারণকে সুনীতি শিক্ষা দিন। পরিমিতাচারী হতে বলুন। বিলাতে টাকা না পাঠিয়ে সেই টাকায় দীন দরিদ্রের সাহায্য করুন।"

উকীল এবং আদালত সম্বন্ধেও গিরিশ চন্দ্রের অভিমত মহাত্মা অপেক্ষাও কম তীব্র নহে। মায়াবসানে কালী-কিঙ্করের মুখে গিরিশ দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন "গ্রাম পল্লী সহর মোকর্দ্দমায় উৎসন্ন যাচ্ছে, সব বড়লোকে একত্র হয়েছেন, পঞ্চায়ৎ ক'রে মোকদ্দমার সর্ব্বনাশ নিবারণ করুন। তাতে বিস্তর জজের মাইনে কমে যাবে, কোর্টফি বেঁচে যাবে, কৌন্সিলীরা যে কাঁড়ী কাঁড়ী টাকা নিয়ে যাচ্ছে সে টাকা দেশে থাক্‌বে। চরক বলেন 'যে দেশে উকীল প্রধান, সে দেশ ত্বরায় উৎসন্ন যায়। তাঁর মতে ব্যবহার-জীবির সংখ্যা-বৃদ্ধি মারীভয়ের অন্যতম কারণ। এই বায় আপনাদের হাতে আছে এইটে আগে করুন।"

স্বদেশী শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধেও তাঁহার উক্তি সমানই স্পষ্ট। দেশীয় শিল্প কেন বিনষ্ট হইয়াছে, কি উপায়ে আবার উহার পুনরুত্থান হইবে, পূর্ব্বে শিল্পের জন্য এই দেশ কত সমৃদ্ধ ও উন্নতিশীল ছিল, কেন আমরা আত্ম-নির্ভরতা শিখিতেছি না সেই করুণ-কাহিনী কবি (১৮৯০ খৃঃ) "মহাপূজায়" গাহিয়াছেন—

"কিন্তু এই দুঃখ মনে ভারত সন্তানগণে
কোনমতে শিখিল না আপন নির্ভর
শিল্পকার্য্যে নিয়োজিত করিল না কর।
এ দুঃখ কহিব কারে' তব শ্বেত পুত্র দ্বারে
পরিধেয় বস্ত্রতরে অধীন সকলে
শ্বেত পুত্র শিল্প বলে গৃহে দীপ জ্বলে।
লবণের প্রয়োজন, নিত্য জানে জনে জন
তব পুত্র হতে তারা ক্রয় করি আনে
শিল্পী নাহি হয় কেহ, শিল্প নীচ জ্ঞানে।
প্রিয় ভগ্নী সরস্বতী নানা বিদ্যা দিল সতী
করিতেন যদি হায় এই ভ্রান্তি দূর
ভারতের সমকক্ষ হ'ত কোন পুর ?
সুজলা সুফলা বামা, ফলে ফুলে সাজে শ্যামা
বৈজ্ঞানিক শিল্প বিনা সকলি বিফল
শারীরিক শ্রম বিনা শরীর দুর্ব্বল।"

কি কারণে দেশীয় শিল্প সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া দীন প্রজার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে গিরিশচন্দ্র তাহাও প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই—

বৃটোনিয়া—

বল সতি, কি কারণে, ভারত সন্তানগণে

এতদিন শিল্পবিদ্যা করনি প্রদান

চিরদিন শিল্পে জান উন্নতি সোপান ?

সরস্বতী—

অনুমতি মম প্রতি, কর নাই ভাগ্যবতী

রাজোৎসাহ একমাত্র শিল্পের সহায়

সে সাহায্য বিনা শিল্প সদা নিরুপায়।

ছিল শিল্প নানা মত, শ্বেত শিল্প তেজে হত

নিরুৎসাহে শিল্পকার্য্য না করে গ্রহণ

ভারতসন্তানে দেহ আশ্বাস বচন।

১৮৯৭ খৃঃ অব্দের হীরক জুবীলিতেও এই ভাবের সুস্পষ্ট আভাষ দেখিতে পাই—"ভারতে কিছুরই অভাব নাই কিন্তু সম্পূর্ণ অভাব, লবণ-সমুদ্র বেষ্টিত ভারত লবণের জন্য লিভারপুলের ভিক্ষুক। যে ভারত-প্রস্তুত কাপড় জগদ্বিখ্যাত, পূর্ব্বতন রোমে যাহা বিক্রয় হয়েছে সেই ভারত এখন বিদেশের নিকট বস্ত্রের নিমিত্ত অধীন"।

মহাপূজায় এই কথা পাই—

"চিকণ বসন তবে, রোম আসি তব ঘরে

জানাইত জন্মদে তোমায় প্রয়োজন।

জাতিভেদ ও হিন্দু মুসলমান অনৈক্যের সম্বন্ধে ও নানাস্থানে তাঁহার উক্তি দেখিতে পাই। "জাতি ভেদ বুদ্ধি শত্রুর বাহু বলবান করে। স্বাধীনতাপ্রিয় মনুষ্যমাত্রেই একজাতীয়। স্বাধীনতায় তারা একসূত্রে আবদ্ধ। যে স্বাধীন-চেতা—তার হৃদয়ে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ নাই। ভেদবুদ্ধি কাপুরুষের হৃদয়ে, কাপুরুষে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ করে।" এবং এই সঙ্কীর্ণতাই ভারতের অবনতির যে একমাত্র কারণ, তাহা "সৎনামে" গিরিশ বিস্তারিত উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রামবাসীগণকে রণেন্দ্র বলিতেছে "মেরুশির, উপত্যকা ও বিশাল প্রান্তরে হিন্দুর বীরত্বগাথা অঙ্কিত রহিয়াছে" কিন্তু—

হিন্দুর পতন

অনৈক্য কারণ

দ্বেষহিংসা পরস্পরে

উচ্চ নীচ জাতি অভিমান।

অথচ "সেই হিন্দু, বেদ যেই করে সত্যজ্ঞান"। সামান্য আচারভ্রষ্ট হইলেই হিন্দুত্ব যায় না। এইপ্রকার জাতীয়তা মূলক কত অসংখ্য উক্তি গিরিশ চন্দ্রের বিরাট গ্রন্থ-রাশির পত্রে পত্রে, তাহা লেখনীতে শেষ করা কঠিন। কিন্তু—গিরিশচন্দ্র কি কেবল কতকগুলি নীতিকথার আবৃত্তি করিয়াই দেশপ্রীতি জানাইয়াছেন ? তিনি বলেন "হিন্দুর মর্ম্মস্পর্শ না করিয়া জাতীয়তা বিস্তারে দেশনায়ক কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। হিন্দুর বৈশিষ্ট্য—ধর্ম্ম, এবং এই ধর্ম্মের ভিতর দিয়া না হইলে হিন্দুর জাতীয়-জীবন উন্নত হইবার কোন আশা নাই। জাতীয়তা ধর্ম্মেরই এক অঙ্গবিশেষ হিন্দুকে তাহা না বুঝাইতে পারিলে জাতীয়তার উদ্বোধন অসার হইবে [দেশবন্ধুও বলেন Nationalism is another form of Religion

দৃষ্টান্ত স্বরূপ গিরিশচন্দ্র ফকিররামের মুখে যে ধর্ম্মাশ্রিত জাতীয়তার আরোপ করিয়াছেন আমরা পাঠকবর্গকে তাহা উপহার দিতেছি "এমন হিন্দু বিরল যে ধর্ম্মরক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হয় না। আত্মরক্ষা স্বদেশরক্ষা এ সকল কথায় কর্ণপাতও করে না, কিন্তু যখন দেখে মুসলমানেরা দেবদেবীর মূর্ত্তি ভগ্ন কর্‌ছে তখন হিন্দুরা জীবন উপেক্ষা করে দেবদেবী লয়ে পলায়ন করে; দেখা যায় সে সময় তাহাদের মুসলমান ভয় দূর হয়। তুমি যদি উপদেশ ও আদর্শ দ্বারা বোঝাতে পার যে মাতৃভূমির নিমিত্ত, ধর্ম্মের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা—অপঘাত নয়; কাশীতে মৃত্যু অপেক্ষা শ্রেয়, বোধ করি অনেকে তোমার কার্য্যে অনুধারণ ক'র্ত্তে প্রস্তুত হয়।"

পুনরায় স্বদেশভক্ত চরণ দাসের মুখে তিনি বলিতে-ছেন—

"মৃত্যুভয় হিন্দুর নাই, বাঙ্গালী বলে' একজাতি হিন্দু আছে, জগৎ জুড়ে যাদের ভীরু ব'লে জানে, তাদেরও দেখছি মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'লে জাহ্নবীতীরে নিয়ে যেতে উৎসাহের সহিত স্বজনকে অনুরোধ করে। হিন্দুর ভয় কি জান ? পাছে অপঘাত মৃত্যু হয়। হায়, হায়, যদি এই সংস্কার দূর হয়, যদি গীতার প্রকৃত মর্ম্ম হিন্দুরা হৃদয়ে স্থান দেয়, তা হ'লে বুঝতে পারবে যে আত্মরক্ষার জন্য স্বজনরক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলে

কোটী জীবন গঙ্গায় সজ্ঞান মৃত্যুর ফল হয়। হায় হায় এ ধারণা হিন্দুর হৃদয়ে স্থান পেলে ভারত অজেয় হ'তো। অযথা, শাস্ত্র ব্যাখ্যায় দেশ উৎসন্ন গেল।"

হিন্দুর জাতীয় জীবন কিরূপ ত্যাগ, সেবা ও ধর্ম্ম-শিক্ষার উপর নির্ভর করে গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথানুসরণ ক'রিয়া ভ্রান্তি, বলিদান, শান্তি কি শান্তি ও মিরকাশিমে তাহা দেখাইয়াছেন। আবার সমস্ত জাতীয়তার মূলই ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম ও পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত নাটকে কিরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা বিল্বমঙ্গল, রূপসনাতন, পূর্ণচন্দ্র, কালাপাহাড়, নসীরাম, শঙ্করাচার্য্য, তপোবল ও অশোক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

"গিরিশচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর নাট্যকার, কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতি এ যুগের আদর্শ নহেন। মহৎ কবি সেক্‌সপিয়রের ধারা হিন্দুজাতির ধর্ম্মস্পর্শ করে নাই। ইহলোক-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য জাতির সকল কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের মূলে নীতি ও পুরুষকার। আমাদের জাতীয় জীবনের মূলে ধর্ম্ম, পরলোক, ঈশ্বর-নির্ভর প্রভৃতি এবং ইহাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। যেখানে অতীন্দ্রিয় জগৎ, সেক্সপিয়ার সেখানে মূক, গিবিশচন্দ্র সেখানে মুখর। এইজন্যই গিরিশচন্দ্রের প্রায় মুখ্যনাটকেই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, ঈশ্বর-বিশ্বাস, নির্ভরতা, ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং মুক্তির কথা। হিন্দুর জাতীয় ভাবের দিক হইতে গিরিশচন্দ্রের আলোচনা করিলে তাঁহাকে ঠিক বুঝা যাইবে।"

অসামান্য গুরুভক্ত একান্ত নির্ভরশীল গিরিশচন্দ্রই গাহিতে পারেন।

"আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে
যেখানে যাই সে যায় পিছে
আমায় ব'ল্‌তে হয় না জোর ক'রে
মুখখানি সে যত্নে মুছায়
আমার মুখের পানে চায়
আমি হাস্‌লে হাসে, কাঁদলে কাঁদে
রাখে কত আদরে
আমি জানতে এলেম্ তাই
কে বলেরে আপন রতন নাই
সত্যি মিছে দেখ্ না কাছে
কচ্ছে কথা সোহাগ্ ভরে।

আবার—

ভগবানের রূপ কল্পনা করিতে করিতে তদ্গত চিত্ত হইয়া কখনও 'এক' কখনও বা বহু'র উপাসনা করিয়াও তিনি আনন্দ সাগরে ভাসিতে ভাসিতে বলিতে পারেন—

"চিন্তামণি কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী
বরাভয়করা, ভক্ত মনোহরা
শবোপরে নাচে বামা
কভু ধরে বাঁশী, ব্রজবাসী
বিভোর সে তানে
কভু রজত ভূধব
দিগম্বর জটাজুট শিরে
নৃত্য করে বম্ বম্ বলি গানে
কভু রাস রসময়ী প্রেমের প্রতিমা
সে রূপের দিতে নারি সীমা
প্রেমে চলে বনমালি গলে
কাঁদে বামা কোথা রাধাশ্যাম ব'লে
একা সাজে পুরুষ-প্রকৃতি—
বিপরীত রতি কেহ শব কেহবা চঞ্চলা
কভু একাকাব
নাহি আর কালের গগন
নাহি হিল্লোল কল্লোল—
স্থির স্থির সমুদায়—
নাহি নাহি ফুবাইল বাক্
বর্ত্তমান বিরাজিত।"

শেষোক্ত অবস্থা নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা—আমি আমার নাই, তুমি তোমার নাই, ভবিষ্যৎ নাই, দিক্ নাই, দেশ নাই, রূপ নাই, নাম নাই, সব স্থির, যেন শিব শব হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন—কেবলানন্দরূপং আনন্দং, আনন্দং সর্ব্বত্রমানন্দনং।

কাজের কথা
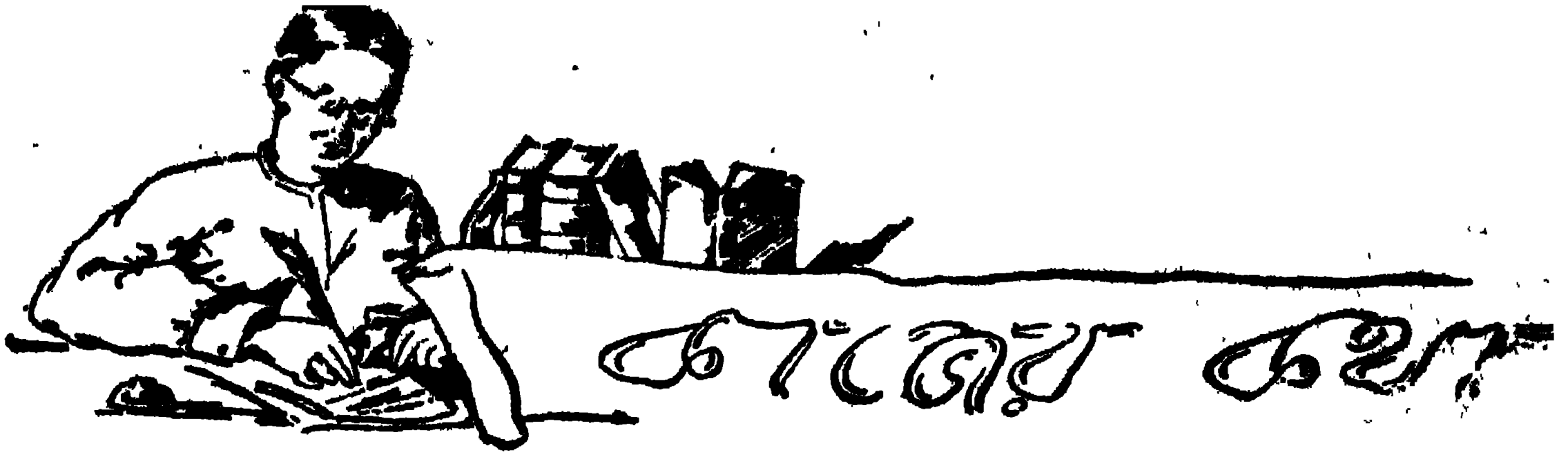
মহাপুরুষের স্মৃতি উৎসব ঃ—কিছুদিন মধ্যে বাংলা দেশের কয়েকটি মহাপুরুষের স্মৃতি উৎসব হইয়া গেল। দেশের ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া জাতিকে উন্নতিপথে চালাইয়া লইবার উৎস ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। স্বামীজীর যোগ্য শিষ্যেরা তাহাব বাণী দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া দিয়াছেন। মঠের উৎসবে দেশ-দেশান্তর হইতে কত বিদেশী, মানবতাব মূর্ত্ত দেবতার স্মৃতির কাছে মাথা নত করিয়া ধন্য হইতে আসিতেছে। মহামানবতার কাছে ভেদ নাই, জাতি-বর্ণের গণ্ডী বিভাগ নাই—এ রাজ্যে মানুষে মানুষে হৃদয় বিনিময়, প্রাণের আদান-প্রদান চলে। তবে এ রাজ্যে যাইতে হইলে নকল মানুষ সাজিয়া গেলে চলে না, সত্য মানুষ হইয়া মানুষের হৃদয় মন লইয়া যাইতে হয়। মহাপুরুষের স্মৃতি উৎসবে মানুষের মান এই ভাবেই জাগাইয়া তোলে—তাই ইহার সার্থকতা, স্বামী রামকৃষ্ণ—ও বিবেকানন্দের বাৎসরিক স্মৃতি উৎসব হইয়া গেল—কত ভাবিবার বিষয় ইঁহারা জাতিকে দিয়া গিয়াছেন ; এইদিনে দেশবাসী তাহা স্মরণ করিয়াছে কি ? মানব স্বাধীনতার, মৈত্রীর—ও জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্যের কথাই ইঁহারা শুনাইয়া গিয়াছেন—ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সমন্বয়েই জাতীয় উন্নতি ও মুক্তি, মানব স্বাধীনতা তাহাতেই গড়িয়া উঠে। জাতির নিরাশা ও হাহাকারের এই যুগে—এই সব মহাপুরুষের স্মৃতি তাহাদের হৃদয়ে বল ও প্রাণে উৎসাহ আনিবে।

স্বদেশে রবীন্দ্রনাথ ঃ—দীর্ঘদিন বিদেশ বাস করিবার পর ভারতগৌরব কবি রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে ফিরিয়াছেন, প্রাচ্যের মনীষা এই উন্নত যুগেও পাশ্চাত্যকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিতেছে—রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বরণীয় মনীষীদের গুণেই। জীবন সায়াহ্নে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগ-বন্ধন সুনিবিড় করিবার জন্যই কবি নবজীবনের নবীন রসধারা দিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব রসমণ্ডিত বাণীতে জগতের চিত্ত হরণ করিতেছেন। ভ্রমণ ক্লেশে কবি শরীরিক অসুস্থ—কিছুদিন দেশে থাকিয়া আবার তিনি বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইবেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। সোণার বাংলার প্রিয় সন্তান তিনি—জাতির জীবনের একদিকের গৌরব আদর্শ তিনি। তাঁহার অপূর্ব্ব রসমণ্ডিত বাণী শুনিবার জন্য আজ শুধু বাংলা নহে সমস্ত জগৎ আগ্রহে অধীর হইয়া আছে। মানুষেব এ সৌভাগ্য, দেশমাতার প্রিয় সন্তানের এ সৌভাগ্য কল্পনায়ও সুখ আছে। সুস্থ-দেহ মনের অপূর্ব্ব কর্ম্মীর বিরাট প্রতিভার আরও বহু দান পাইবার জন্য বিশ্বের নরনারী উদ্গ্রীব হইয়া বাংলার কবির মুখপানে চাহিয়া আছে—কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা নমস্কার করিতেছি।

আচার্য্য গিদোয়াণীর মুক্তি ঃ—নাভা ব্যাপারে আর যোগ দিবেন না এই সর্ত্তে আচার্য্য গিদোয়ানীর মুক্তি হইয়াছে। কি দোষে ইনি কারারুদ্ধ আর কি গুণে এখন মুক্ত তাহা কেহই বিশেষ জানে না। তবে নাভা ব্যাপারে যাওয়াতেই ইঁহার এই কর্ম্মভোগ ছিল। কিন্তু এ কর্ম্মভোগ সহা, স্বাধীনতাকামী জাতির পক্ষে অতি প্রয়োজন। ভারতের মুক্তিমন্ত্রের ঋষি মহাত্মা আচার্য্যের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন—আমরাও দেশভক্তের সম্বর্দ্ধনা করিতেছি।

নারী রক্ষা—দেশের ইজ্জত রক্ষা ঃ—এই পোড়া দেশে নারী নির্য্যাতন নানা ভাবে হইতেছে। গ্রাম আজ জনশূন্য, পল্লী শ্রীহীন তাই অসহায় নারীর

উপর দুর্বৃত্তেরা অত্যাচারে সাহসী হয়। দেশের যুবক-শক্তি আজ ঘরছাড়া হইয়া বিকৃত শিক্ষায় মগজ পূর্ণ করিয়া, বিদেশে খাদ্য চাকরীর জন্য লালায়িত। পল্লীলক্ষ্মী, দেশের সুখসম্পদ-ভাণ্ডারের অযত্নে কাঁদিয়া দেশসন্তানদের অভিশাপ দিতেছে। এইরূপ নারী নির্য্যাতনের কয়েকটি মামলা বিচারার্থ বিচারালয়ে যায়। আমাদের দেশে দরিদ্রের সুবিচার পাইবার আশা কম—কারণ বিচারলাভ অর্থসাপেক্ষ। সম্প্রতি বাংলার এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস প্রভৃতি এইরূপ মামলা চালানোর জন্য অর্থ প্রয়োজন বলিয়া দেশবাসীর কাছে অর্থসাহায্য চাহিয়াছেন। এক নির্য্যাতিতা নারীর সুবিচার চাহিতে পঞ্চহাজার মুদ্রার বেশী খরচ হইয়াছে—আরও প্রয়োজন। কেন—? দেশের এ কলঙ্কের ব্যাপার সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য সরকার হইতে এইরূপ মামলা চালাইয়া দোষীকে ভীষণ শাস্তি দিবার ব্যবস্থা কি সঙ্গত নহে। একে নারী অসহায়—তার পর অর্থহীন—তাই নির্য্যাতনের বিচারও কি সে অর্থাভাবে পাইবে না? দেশবাসী মাতৃত্বের এ অবমাননা রোধ কর—দেশের সরকার নারীর উপর এ অত্যাচার আর যাহাতে না হয় তার ব্যবস্থা কর। সভ্যতাগর্ব্বী দেশ—স্বায়ত্বশাসনকামী দেশ—মাতৃত্বের অবমাননার গতি রোধ কর। সঙ্ঘবদ্ধ যুবকশক্তি দেশের ভিতরকার অনাচার অবিচারের প্রতি তোমাদের সচল বাহু ও জ্বালাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। দেশের হাতে ইহা দূর করিবার ভার রহিয়াছে—দেশ তাহা পালন করিতে না পারিয়া নিজেদের অক্ষমতাই প্রমাণ করিতেছে!

যার দেশ সেই তাহা রক্ষার অধিকার চাহিতে পারে কি না?—ভারতীয়েরা সৈন্য হইতে চাহিতেছে—সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তাহারা দেশরক্ষার ভার গ্রহণ করিতে চাহে। ভারতীয়ের এ ভার গ্রহণের অধিকার লুপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন দেশের সরকার! অথচ সৈন্য হইবার শিক্ষা দেশ না পাইলে কোন দিন সে দেশ স্বায়ত্ব শাসনের যোগ্যতা লাভ করে না। ইংলণ্ড একথা বলিয়া থাকে—জগতের সব জাতিরই মত, সামরিক শিক্ষায় কোন জাতিকে বঞ্চিত রাখিতে নাই। ইহা লইয়া কৌন্সিলে কিছুদিন হইল বাদ প্রতিবাদ চলিয়াছে। ভারতকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিলে সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডের তাহাতে সুবিধা বই অসুবিধা নাই। কিন্তু শুধু বর্ত্তমান দেখিয়াই ইংলণ্ড যদি ভারতকে এই সুবিধায় বঞ্চিত করে তবে ভবিষ্যতে তাহাকেও পস্তাইতে হইবে। আর ভারতের অবস্থা যে কি হইবে তাহা ভবিষ্যৎই বলিতে পারে! সামরিক শিক্ষার অধিকার দেশকে যথাসম্ভব শীঘ্র দেওয়াই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এবিষয়ে সরকার দেশের কথা গ্রহণ করিয়া ভারতীয়দের সামরিক শিক্ষার সুযোগ দিবার জন্য কমিটি গঠিত করিবেন জানিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

রেলের বর্দ্ধিত মাশুলের জুলুম আরও থাকিবে কি?—সংবাদ প্রেরণাপ্রেরণ ও যাতায়াত ইহা দেশের সকলকেই করিতে হয়। রেল ষ্টীমারের ভাড়াও যা বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে সর্ব্ব সাধারণের দারুণ অসুবিধা হইয়াছে। কোম্পানীর হাত হইতে ভারত সরকার বড় বড় রেলপথ নিজহাতে নিয়াছেন। রেলবিভাগের জন্য যথেষ্ট অর্থ ও রাজস্ব হইতে মঞ্জুর করা হইয়াছে। তবু এখনো সর্ব্বসাধারণের এই অসুবিধা কেন থাকিবে! সর্ব্বসাধারণের এ সবে যদি নিত্য অসুবিধা ও খরচান্তই হয় তবে ইহার সার্থকতা কি! কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হইবে—কিন্তু কর্ত্তারাও সাধারণের ইচ্ছা বুঝিয়া কার্য্য করিবেন এইটুকুই মাত্র সাধারণে চায়—এবং এ অধিকারও বোধ হয় সাধারণের থাকিতে পারে। অধিকারের এই চাওয়া ও পাওয়া নিয়াই যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। নানা অজুহাতে এবারকার কৌন্সিলেও রেলের জুলুম ভাড়া হ্রাস হইল না দেখা যাইতেছে। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম—সুতরাং দেশের লোককে বেশী ভাড়া দিয়াই রেল ষ্টীমারে যাতায়াত করিতে হইবে!

মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সার সঙ্কলন

অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে—সত্য ও অহিংসাই আমাকে জীবনে চালাইয়া লইতেছে। জীবনের এই দুইটি উদ্দেশ্য ছাড়া আমি জীবনহীন শবে পরিণত হইব। কিন্তু সত্য ও অহিংসার সাধনার সঙ্গে দুইটি জিনিসের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। খদ্দর প্রচার ও অস্পৃশ্যতা দূর করিবার কথাই আমি কহিতেছি। একভাবে এ দুটি জিনিস হিন্দু-মুসলমান মিলনের চেয়েও বেশী দরকারী—কারণ ইহা ছাড়া এ মিলন হইবার সম্ভাবনা নাই। যতদিন হিন্দুধর্ম্ম হইতে আমরা ছুঁৎমার্গের কলঙ্ক দূর না করিব ততদিন সত্য হিন্দু-মুসলমান মিলনও সম্ভব হইবে না। একজন বিজ্ঞ মুসলমান আমাকে বলিয়াছিলেন যতদিন হিন্দুধর্ম্মে অস্পৃশ্যতা আছে ততদিন এ ধর্ম্মে ভক্তি আনা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বহুবার বলিয়াছি কোন শাস্ত্রে অস্পৃশ্য বলিয়া কোন কথা নাই। তাঁতি বা ময়লাপরিষ্কারককে শাস্ত্রে অস্পৃশ্য বলিয়া ধরা হয় নাই। আমি তো দুই-ই। আমার মাও বাল্যে আমার কত ময়লা পরিষ্কার করিয়াছেন—কিন্তু সেজন্য তো তিনি অস্পৃশ্য হন নাই। তবে কেহ কেন অস্পৃশ্য থাকিবে? জগতের সব শাস্ত্র যদি আমার বিরুদ্ধে বলে তবু আমি জোর গলায় বলিব—অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে।

খদ্দর সর্ব্বত্র চালাও—রাজা, মন্ত্রী সমাজ ও রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দ সকলকেই খদ্দর পরিতে হইবে। আপনারা আমাকে বহুমূল্য উপহার দিয়াছেন। ইহা রাখিবার যোগ্য সুরক্ষিত ঘর বা সিন্দুক আমার নাই। তাহা থাকিলেও পাহারা দিবার লোক আমার নাই। তাই এ সব জিনিস সাধারণের ব্যবহারের জন্য যমুনলাল বাজাজের মত বন্ধুর কাছে দিতে হইবে। কিন্তু খদ্দর রাখিবার স্থান আমার যথেষ্ট আছে—তাই সকলের কাছেই আমি খদ্দর চাই। লর্ড রেডিং এবং তাঁহার অনুচরদেরও আমি অসঙ্কোচে খদ্দর ব্যবহার করিতে বলিতে পারি।

শাসকের সত্য পথ—যোগ্য রাজা তোমার তরবারী শক্তিরই রূপ। তোমাদের পথও তরবারীর তীক্ষ্ণাগ্রের মতই সঙ্কীর্ণ—এই সঙ্কীর্ণ সত্য পথ ছাড়িয়া তিলমাত্র বিচ্যুত হইতেও তোমরা পার না। তোমার রাজ্যে একটিও মাতাল কিম্বা কুচরিত্রের নর-নারী থাকিতে পারিবে না। যেখানে দুর্ব্বলতা সেখানে বল দেওয়া, ময়লা যাহা তাহা উজ্জ্বল করাই তোমার কর্ত্তব্য। দরিদ্র ও নির্য্যাতিতের বন্ধু হও। তোমার ও তরবারী অপরের স্কন্ধের জন্য নহে—ইহা তোমার নিজের জন্যই। প্রজাদের বলিতে পার যে মুহূর্ত্তে তুমি তোমার প্রভুত্বের সীমা লঙ্ঘন করিবে সেই মুহূর্ত্তে তারা যেন তোমায় ওই তরবারীর নীচেই রাখিতে পারে।

[রাজকোটে প্রদত্ত বাণী হইতে]

আচার্য্য গিদোয়াণীর মুক্তি—আচার্য্য গিদোয়াণীর মুক্তিতে আমি পরম আনন্দিত—তাঁহার কারাদণ্ড অবিচারে হইয়াছিল—সে অবিচার দূর করা হইল ইহাতে আমি সুখী। নাভার ব্যাপার সত্যই অদ্ভুত। তারা এখন আচার্য্যের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছে, তাহা

বহু পূর্ব্বেই পাইতে পারিত। আচার্য্য গিদোয়াণী আদেশ অমান্যের জন্য কখনো নাভার সীমানা পার হইয়া ভিতরে যান নাই। মানবতার কার্য্য করিবার জন্যই তিনি নাভায় গিয়াছিলেন। কিন্তু এই কারাদণ্ডে জাতিকে বা আচার্য্যকে কিছুই হারাইতে হয় নাই। স্বরাজ্য পাইতে ইহা আবশ্যকীয় শিক্ষা,—স্বাধীনতার জন্য এ মূল্য স্বাধীনতা-কামীদের দিতেই হইবে।

অন্ধ বিশ্বাস—বাংলার একজন জমিদার লিখিয়াছেন—পাঁচশ' বছরেরও বেশী হইল হিন্দু-মুসলমান শত্রু হইয়াই আছে। বৃটিশ রাজত্বের আরম্ভ হইতে ইহা কমিয়া আসিতেছে—সে ভীষণ শত্রুতা আর এখন নাই। কিন্তু এই দুই জাতির মূলগত বিভিন্নতা এখনো রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস এখনকার এ সম্বন্ধ বৃটিশ শাসনের জন্যই হইয়াছে—হিন্দুদের উদারতার জন্য নহে।'

আমার মনে হয় এ মত অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া কিছু নয়। মুসলমান রাজত্বে দুই জাতি শান্তিতে বাস করিয়াছে। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে অনেক হিন্দু মুসলমানদের কোল দিয়াছে। মুসলমান রাজত্ব না হইলেও এখানে মুসলমান থাকিত, খৃষ্টান রাজত্ব না হইলেও খৃষ্টান থাকিত। বৃটিশ রাজত্বের পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমান কেবলি মারামারি করিয়াছে এমন কোন প্রমাণ নাই। আমার বিশ্বাস বৃটিশের 'ভাগ করা রাজনীতিই' আমাদের এই দ্বন্দ্বের কারণ। এই নীতি আছে জানিয়াও যতদিন আমরা মিলিত হইবার চেষ্টা না করিব ততদিন এ দ্বন্দ্ব আমাদের মধ্যে চলিবেই। কাজ ও ক্ষমতা লইয়া যতদিন আমাদের দ্বন্দ্ব চলিবে ততদিন এ দ্বন্দ্ব মিটিবে না। এ মিলনের পথ হিন্দুকেই দেখাইতে হইবে।

কৃষি সম্বন্ধে—এলাহাবাদ কৃষি বিদ্যালয়ের মিঃ হিগিনবটমের কৃষি মন্তব্যের উপর মহাত্মা বলিতেছেন,—চারিটি কথা উল্লেখযোগ্য। ভাল সার নষ্ট করা,—পশুদের দুরবস্থা, অলাভজনক ক্ষেত্র ও কাজ ছাড়া হইয়া বসিয়া থাকা ইহাই ভারতের কৃষিকার্য্যের অন্তরায়। এ দিকে দেশসেবীদের দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। যে দেশে গো পূজ্য সে দেশে পশু সমস্যা হওয়ার কারণ দেখি না। কিন্তু আমাদের গো পূজা একটা অহেতুকী ভাবে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যত পশু আমরা খাইতে দিতে পারি তার চেয়েও বেশী পুষি কেন? এ সমস্যারও সমাধানের দরকার। অলাভজনক ক্ষেত্র ধরিয়া থাকা ব্যাপারে পারিবারিক প্রথাই দায়ী। সার নষ্ট করা—এ কৃষি সম্বন্ধে অজ্ঞতা হেতুই হয়—কৃষি শিক্ষা থাকিলে এমন হইত না। বছরের অর্দ্ধেক, লক্ষ লক্ষ নর নারীর কর্ম্মহীন থাকা এ সমস্যা চরকা মিটাইতে পারে। এ সব সমস্যার বৈজ্ঞানিক কারণ দেখিতে হইবে ও তাহাতে শিক্ষিত হইয়া ইহার সমাধান করিতে হইবে।

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীমনোমাধব চাকী, এম-এ,

হে তাপস, হে উদাত্ত, হে উদার স্বদেশ-বৎসল,
"সত্যাগ্রহ"-দীক্ষা-দানে মানবেরে করেছ মহান্।
স্বার্থের কুটিল-খেলা-মাঝে তুমি স্থির অচঞ্চল,
আপন বিরাট-ত্যাগে রহিয়াছ সদা গরীয়ান্।

রাজনীতি—ধর্ম্ম-নীতি—তব কাছে নাহি ভেদাভেদ,
বাধা-বন্ধ-টুটি তুমি ছুটিয়াছ কর্ত্তব্যের পানে,
স্খলন-পতন-ভয় নাহি তব, নাহি কোন খেদ,
সংশয় কুহেলি আসি ফিরে নাই ও মহাপরাণে।

সম্ভ্রমে লুটায় শির যোগিবর, তোমারে হেরিয়া,
কর্ম্মের ঘর্ঘর-মন্দ্র সংযমেতে করেছ মধুর,
দুঃখ দৈন্য ভারতের হাসিমুখে লয়েছ বরিয়া
হেরিছ অরুণ-রাগ ললাটেতে পূর্ব্ব-দিগ্বধূর!

আপন আলোক-মাঝে আপনারে রেখেছ লুকায়ে,
স্বরগের জ্যোতিঃ হেরি চিত্ত মোর পড়িছে লুটায়ে।

ময়মনসিংহ সম্মিলনী

গত শনিবার ময়মনসিংহ সম্মিলনীর বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছে। অধিবেশনের বিশেষ বিশেষত্ব হইয়াছিল সঙ্গীতে। আর তার অমর্য্যাদাও হইয়াছিল বিশেষ ভাবে। যে সভায় সঙ্গীতের এত আয়োজন হইল—এত প্রতিষ্ঠাবান সঙ্গীতজ্ঞদিগকে নিমন্ত্রিত করা হইয়াছিল—সেই সভাতেই শ্রোতাবর্গের সঙ্গীতশ্রবণে অবজ্ঞা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়—ইহাদিগকে আবাহন করা হইয়াছিল কি অপমান করিবার জন্য? এমন ব্যাপার আর কোথাও সংঘটিত হইয়াছে কি না মনে নাই। প্রারম্ভেই সঙ্গীতমঞ্চে বাঙ্গলার বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞদিগকে দেখিয়া মনে কতই না আনন্দ হইয়াছিল।

প্রথমেই ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত এম, এন, ঘোষ (মোন্তাবাবু) জায়লোকোন বাদ্যদ্বারা সকলকে চমৎকৃত করেন। কাঠের প্রস্তুত এরূপ উচ্চশ্রেণীর যন্ত্র, পূর্ব্বে ছিল না, ঘোষ মহাশয় আপন কৃতিত্বে ইহা বিলাত হইতে তৈরী করাইয়া আনিয়াছেন। ইহার পরই মনমোহন থিয়েটারের বিখ্যাত অন্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে একটী পূরবী আলাপ করেন। এমন মধুর আলাপ আমরা কম শুনিয়াছি। কিন্তু শ্রোতাবর্গ একেবারে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। বুঝিলাম এই শ্রেণীর উচ্চসঙ্গীত তাহাদের হজম হইতেছে না। কি বিপদ! কি লজ্জা! চারিদিক হইতে অমনোযোগ যেন মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিল। কাজেই ওস্তাদকে নিরস্ত হইতে হইল। শ্রোতাবর্গের বিদ্যা হিসাবে আয়োজনের তারিফ দিতে পারি না। এঁদের যোগ্য গান হওয়া উচিত ছিল—চোখ যদি লাগে ভাল। তারপর বিখ্যাত গায়ক কে মল্লিকের "লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার" গীত হইল দেখিলাম ইহাতে কোলাহল যেন কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইল। তারপর গাইলেন মধুরকণ্ঠ শ্রীযুক্ত বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়। এটাও কোন রকম হজম করান গেল কিন্তু হজমের কারণ ছিল বুঝা গেল সঙ্গীতকারকে যেন কেহ বলিয়া দিয়াছিল দেখবেন মশায় চ্যাঁ ভ্যাঁ করবেন না—স্রেফ্ কয়েকটী বচন একটু মেয়েলি ঢংএ চুবিয়ে গান্। এতাদৃশ গায়কগণ যখন মনস্তুষ্টি করণে সমর্থ হইলেন না ঠিক তেমনি সময়ে আসিয়া যোগদান করিলেন শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়। চন্দ্রকিরণে সিন্ধু যেমন প্রবোধ পায়—সভাটীও নিমিষেই দেখিলাম স্থির ধীর। গান গাইলেন "সারা সকালটী বসে বসে।" কি অদ্ভুত নির্ব্বাচন। এ গান এত বড় সভার কি সে যোগ্য হইল বুঝিলাম না। অথচ সমজদারগণ দেখিলাম তাতেই ভারী খুসী। বুঝিলাম বাঙ্গলার কপাল পুড়িতে আর বাকী নাই। এ গানের আস্কারা দেন যাঁরা তাঁদের বিদ্যার বিশেষণ খুঁজিতে অনেক সময় লাগে। এ গান জমে ভাল চারতলা বাড়ীর দক্ষিণ কামরায়, সময় রাত্রি ১০টা, আয়োজন—চাঁদের আলো ও প্রেমের পাত্রী। দিলীপকুমার যখন আসরে পৌছিলেন ঠিক ঐ সময় আসিয়াছিলেন আমাদের বাঙ্গলার গৌরব গায়কচূড়ামণি দিগ্বিজয়ী গোপেশ্বর বাবু। দিলীপকুমারকে গাইতে অনুরোধ করা হইল অমনি তিনি হারমোনিয়ম নিয়ে গান সুরু করলেন! আশ্চর্য্যের বিষয় গুরুতুল্য প্রাচীন গোপেশ্বর বাবুকে একটু মুখের কথায় ভদ্রতাসূচক বাক্য 'আপনি গা'ন', কথাটী পর্য্যন্ত বলিলেন না। একটু ভয়ও প্রাণে আসিল না? তিনি বিদেশ ঘুরিয়া বিদ্যা সংগ্রহ করিয়াছেন জানি কিন্তু বিনয় শিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন নিশ্চয়ই। এটা প্রকারান্তরে অপমান নয় কি? পরিশেষে একটু বলা দরকার—এই সব সঙ্গীতকারদিগকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন আমাদের শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ। নতুবা ময়মনসিংহ সম্মিলনীর ভাগ্যে এ অঘটন ঘটিত কি না সন্দেহ! হেমেন্দ্রবাবুর অপমানবোধ হয় নাই, হলেও সেটা তিনি হজম করিতে বাধ্য, কারণ তিনিও ময়মনসিংহবাসী। হেমেন্দ্রবাবুর উচিত ছিল অধিবেশনের শ্রোতাদের বিদ্যার ওজন বুঝিয়া গায়ক নির্ব্বাচন করা, তাহা হইলে অরসিকের কাছে রস নিবেদনের কর্ম্মভোগ আর হইত না।

নরনারীর বিকি-কিনি ব্যবসায়

অনেক দেশে দাসপ্রথা এখনো আছে। গরু ভেড়ার মত মানুষের ব্যক্তিগত ও বংশানুক্রমিক বিকি-কিনিও দাসখত লিখিয়া দেওয়া বর্ত্তমান যুগেও চলে। দাস-ব্যবসায়ও অনেক দেশে চলিতেছে। সভ্যজগৎ চাহে না যে মানুষও পশুর মত বিকি-কিনির পণ্যে পরিণত হয়। সভ্যজগৎ ইহার বিরুদ্ধে হইলেও এ প্রথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এখনো চলিতেছে—তবে আগে যেমন জোরের সঙ্গে চলিত বর্ত্তমান যুগে তাহার কিছু সঙ্কোচ ঘটিয়াছে। ব্রহ্মদেশের অনেক স্থানেও এই প্রথা আছে—প্রথা যে দেশে যেমন চলিতেছে কেহই তাহা বিলোপ করিতে সহজে রাজী হয় না। দাস যাহারা আছে তাহারাও যেন দাসভাবে থাকাই পছন্দ করে—দাস ও প্রভু সম্বন্ধও অনেক জায়গায়ই পারিবারিক সম্বন্ধের মতই হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও এই দাসত্বপ্রথায় এমন কতকগুলি বীভৎস ব্যাপার আছে যাহা কোন সভ্য-মানবই অনুমোদন করিতে পারে না। ভারত সীমান্তের স্বাধীন রাজ্য নেপালে এই প্রথা বহুদিন হয় চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি নেপালরাজ দেশ হইতে মনুষ্যত্বের অপমানকর এই প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ প্রসঙ্গে নেপালরাজ যাহা বলিয়াছেন তাহা সবদিক দিয়া নানা ভাবে বিবেচনার যোগ্য। দাস বা প্রভু বা দেশাচার কোন কিছুকেই ক্ষুণ্ণ না করিয়া—অকস্মাৎ কিছু করিয়া দেশের গৃহস্থালী অচল করিয়া তিনি ইহার সংস্কার চাহিতেছেন না—মানবতার নামে দেশবাসীর সহায়তায় তিনি দেশ হইতে মানব-দাসত্ব লুপ্ত করিতে চাহিতেছেন। নেপালে বর্ত্তমানে ৫১,৪১৯ জন দাস এবং ১৫,৭১৯ দাসাধিকারী আছে। নেপালের লোকসংখ্যা প্রায় ৫,০০০,০০০ দাসও বিভিন্নপ্রকার আছে—বর্ত্তমানে নেপালে তিন রকম দাস আছে। বংশানুক্রমে সংসারের দাসভাবে চলিয়া আসিতেছে—দাসদের সন্তানেরাও সংসারে অন্য পরিবারের মতই ব্যবহার পাইতেছে। এই একশ্রেণীর দাস। দ্বিতীয় শ্রেণীর দাসদের শ্রমজীবির কার্য্যে রাখা হয়—ইহারাও মালিকদের কাছে ভাল ব্যবহার পায়। তৃতীয় শ্রেণীর দাসত্বই ভীষণ—ইহাদের লইয়াই দাস-ব্যবসায় চলে। ব্যবসায়ীরা স্ত্রীব নিকট হইতে স্বামী, স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রী, মাতাপিতাব নিকট হইতে সন্তান লইয়া বাহিরে গরু ঘোড়াব মত বিক্রয় করে।—এই ঘৃণিত দাস ব্যবসায় উঠাইবার জন্যই মহারাজার দেশ ও জাতির নিকট সবিনয় নির্ব্বন্ধ। যাহারা মূল্য দিয়া দাস কিনিয়াছে তাহাদের ন্যায্যমূল্য তাহারা ফেরত পাইবে—মহারাজা এই ঘৃণিত-মনুষ্য ব্যবসায় লোপ করিবার জন্য চৌদ্দ লক্ষ মুদ্রা প্রথম খবচ হিসাবে দিয়াছেন। কিন্তু দাসপ্রথা উচ্ছেদের অন্য বিপত্তিও আছে—দাস ও প্রভু দুই-ই ইহাতে সমান অনিচ্ছুক হইতে পারে—দাসেরা স্বাধীনতা পাইতে প্রস্তুত নহে এ অবস্থায় হঠাৎ স্বাধীনতা পাইলে সুফলেব চেয়ে কুফলই হইবার সম্ভাবনা। দাসত্ব মুক্ত হইয়াও সাত বছর এদের পূর্ব্ব মনিবের কাছেই শিক্ষানবীশ থাকিতে হইবে ও তাহাদের কাজ করিয়া খোরপোষ লইতে হইবে। তবে মানুষের বিকি-কিনি, সংসার হইতে মানুষ বিক্রী করা—এখনি বন্ধ করা হইবে। পুরাণ বৃদ্ধ দাসও এর মধ্যে অনেকে মরিবে—এইভাবে কিছুদিন মধ্যেই ইহা লোপ পাইবে। মহারাজা জাতির সাহায্যে জাতির ও দেশের মঙ্গলের জন্যই—নিপুণ দেশহিতৈষীর মত এই দাসপ্রথা উচ্ছেদে মনোনিবেশ করিয়াছেন।
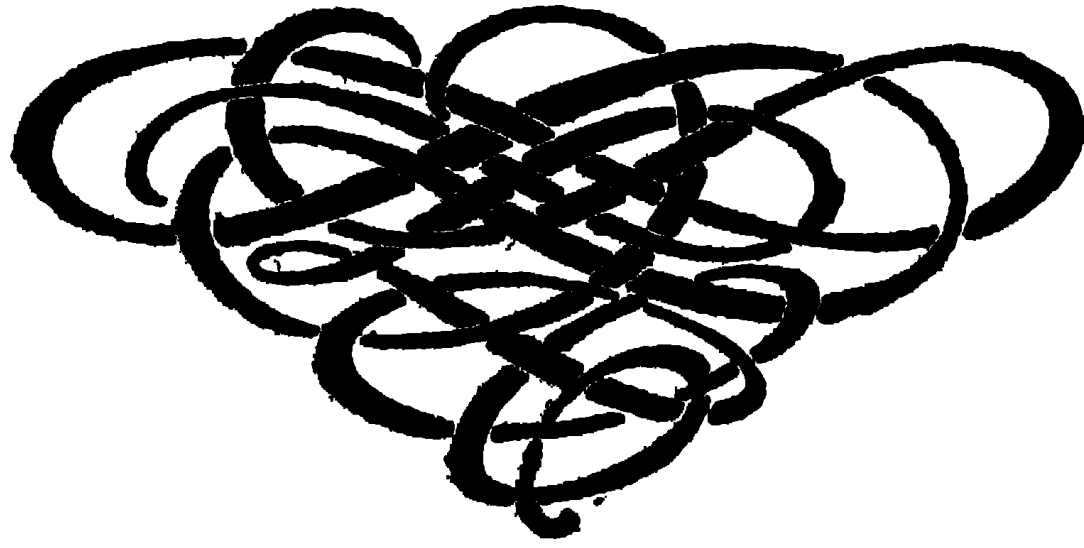
মাসিক সাহিত্য-পরিচয়

প্রবাসী ফাল্গুন, ১৩৩১—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের তিনটী কবিতা এ মাসে প্রবাসীতে বাহির হইয়াছে। প্রথমে স্থান পাইয়াছে "ভাবী কাল"। 'ভাবী শতাব্দীর সপ্তদশীর' কাছে কবি ক্ষমা চাহিতেছেন এইজন্য, যে, যদি গর্ব্ব-ভরে কবি কল্পনা করিয়া থাকেন যে কবির কাব্য সপ্তদশী 'একেলা পড়িছে বাতায়নে বসি।' কবির এরূপ কল্পনা নিশ্চয়ই অপরাধ নহে; কবির প্রতিভার দান 'ভাবী শতাব্দীর সপ্তদশী' নিশ্চয়ই বিরলে বসিয়া উপভোগ করিবেন। কবিতার দুই ছত্র

"আকাশেতে শশী—
ছন্দের ভরিয়া রন্ধ্র ঢালিছে গভীর নীরবতা
কথার অতীত সুরে পূর্ণ করি কথা।"—

অনেকের পক্ষে 'ভাবে-ভরা অর্থহীন ভাষা'! দ্বিতীয় কবিতাটীর নাম 'অপরিচিতা'। কবি মানসীকে বলিতেছেন, 'পথ আমার আর বাকী নাই, একা চ'লে এলেম; তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না, তাই তোমার জন্য এই গানগুলি রেখে গেলেম। তুমি তোমার বন্ধুর উদ্দেশ্যে এই গানগুলি গাইবে যখন—

"রোদন খুঁজে ফির্‌তে তোমার প্রাণের বেদন খানি
আমার গানে মিল্‌বে তাহার বাণী।

অপরিচিতা কবিতাটী কবি-প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। কবির বাঁশরী আবার যেন যৌবনের সেই প্রাণস্পর্শী সুর ফিরিয়া পাইয়াছে।

"ভোরের বেলা অশ্রুভরা অধীর অভিমান,
ভৈরবীতে জাগিয়াছিল গান।"

অতি অল্প কথায় বিরহীর এই করুণ চিত্রটী যথার্থ শিল্পী ভিন্ন আর কে আঁকিতে পারে? অপরিচিতা রস-পিপাসুর অন্তরে ভাবের হিল্লোল তুলিবে। তৃতীয় কবিতাটী শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত কবিতায় চিঠি। কবি চিঠিতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কুলিশপাণি' পুলিশ নাকি

বাংলা দেশের যৌবনের প্রাণ হাসি সব ঢেলে
কুলুপ দিয়ে করুছে আটক আলিপুরের জেলে।

তারপর কবি লিখিতেছেন,—

রাজ-প্রতাপের দম্ভ সে ত এক দমকের বায়ু
সবুর কর্ত্তে পারে এমন নাইক তাহার আয়ু
ধৈর্য্য বীর্য্য ক্ষমা দয়া ন্যায়ের বেড়া টুটে
লোভের ক্ষোভের ক্রোধের তাড়ায় বেড়ায় ছুটে ছুটে।

*   *   *   *

পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি'
ভগবানের ব্যথার পরে, হাঁকায় সে চার-ঘুড়ি।

বহুদিনের পর, 'বিশ্বের' ভাবনার মধ্যে কবি যে এই ক্ষুদ্র বাঙ্গলা দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার কথা ভাবিবার সময় পাইয়াছেন, তাহা বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য তাহা বলিতে পারি না।

কবি বলিতেছেন,—সবই নশ্বর—"রঙীন কুর্ত্তি, সঙীন মূর্ত্তি রইবে না কিছুই"—"আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে"—সবই যাবে, "তখনো এই বনের কোণে ফুট্‌বে লাজুক জুঁই। কবি তাই শুধু জুঁই ফুলের গান গেয়েই জীবনের বাকী কটা দিন কাটাবেন।

"ভাঙ্‌বে শিকল টুক্‌রো হ'য়ে ছিঁড়বে রাঙা পাগ,
চূর্ণ-করা দর্পে মরণ খেল্‌বে হোলির ফাগ।

*   *   *   *

সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান
"মেশীন গান্‌-এর সম্মুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান্‌"—

কবি তাহার মনের কথা খুলিয়াই বলিয়াছেন। রাজনৈতিক বাঙ্গলা, বিশ্ব-কবির নিকট 'জুঁই ফুলের গান' ছাড়া আর যেন কিছুই প্রত্যাশা না করে।

"অতুলপ্রসাদ ও তাঁহার সঙ্গীত" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতা শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেনের গানের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার বক্তব্য এই যে বাঙলার কীর্ত্তন ও বাউল সঙ্গীত কবিত্ব এবং সৌকুমার্য্য (refinement) বর্জ্জিত। তাহাতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না, প্রাণে 'পুলক-শিহরণ' জাগায় না। অতুলপ্রসাদ তাঁহার সঙ্গীতে বাউল-কীর্ত্তনের গান কবিত্বমণ্ডিত করিয়াছেন এবং তাঁহার বাংলা গানে "হিন্দুস্থানী ঢং আমদানী করিয়াছেন।" প্রচলিত ধর্ম্ম ও প্রাচীন ধর্ম্ম সঙ্গীতগুলি সম্বন্ধে

লেখক যে ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন, তাহা শোভন হয় নাই। "বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ" অক্লান্তলেখনী শ্রীবিনয়কুমার সরকারের রচনা এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন বাংলা-সাহিত্য-সমাজ ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনায় একান্ত উদাসীন। এ সম্বন্ধে সকল সাহিত্যিকের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কি উপায়ে বাঙ্গলা সাহিত্যে ধনবিজ্ঞানের দিকটার পুষ্টিসাধন হইতে পারে তাহার একটী কর্ম্মপ্রণালীও (scheme) বিনয় বাবু দিয়াছেন। তাঁহার কথা ধন-হীন বাঙ্গলার প্রণিধান যোগ্য।—"বামুন বাগ্‌দী" শ্রীঅরবিন্দ দত্তের ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস, সতেজে চলিতেছে। আমরা এই উপন্যাসখানির সমাপ্তির অপেক্ষায় রহিলাম; কেননা লেখকের রচনার ভঙ্গীতে আমরা বিশিষ্টতার ও শক্তিমত্তার পরিচয় পাইতেছি। 'স্মৃতি' একটী কবিতা। লেখকের নাম নাই। এই আত্মগোপনেচ্ছু কবিকে আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে সাদরে আত্মপ্রকাশের জন্য আহ্বান করিতেছি। কল্পনার এবং তাহা প্রকাশের ক্ষমতা কবির যথেষ্ট আছে।

"ওপারের আলো" শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্রের একটী ছোট গল্প! সুলেখক শরৎচন্দ্র "নব-বিধানে" ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের যে ছবিটী আঁকিয়াছেন, বর্ত্তমান গল্প লেখক ঠিক তাহার "Converse"টা দেখাইয়াছেন। কল্পনার বিশেষত্ব নাই। "জগতের রূপ" শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়ের লিখিত। নরওয়ের সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক John Borjorএর লিখিত The Fall of the world নামক গ্রন্থের পরিচয় এবং তাহার অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধে আলোচনা প্রবন্ধ-লেখক করিয়াছেন। আমরা প্রবন্ধ লেখকের সহিত সম্পূর্ণ একমত। প্রাচ্য ভাব কিরূপে পাশ্চাত্য লেখকের লেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বিস্ময়ের বিষয় অথবা যাহা সার সত্য তাহা বুঝি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই সত্য। শ্রীহরিহর শেঠ লিখিত "চন্দননগরের দেবালয় ও উপাসনা" বহু ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। "রাজপথ" উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস পথের শেষ এখনও হয় নাই। আগামী বারে হইবে লেখক এইরূপ ভরসা দিয়াছেন। এ সকল ভিন্ন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুদিত গল্প, যোগেশ বাবুর "মহাভারত মঞ্জরী" গ্রন্থের পরিচয় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সুলিখিত নিবন্ধ মৌমাছির ব্যবসায় সম্পাদকীয় বিবিধ প্রসঙ্গ ইত্যাদি রচনা এ মাসের প্রবাসীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

ভারতবর্ষ ফাল্গুন ১৩৩১—প্রথমেই অধ্যাপক হরিহর শাস্ত্রীর গবেষণা মূলক প্রবন্ধ—'জৈন হরিবংশ পুরাণে কৃষ্ণচরিত্র'। আমাদের সুপরিচিত হরিবংশে কীর্ত্তিত শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের সঙ্গে জৈন হরিবংশের কৃষ্ণ-কথার কোথায় সামঞ্জস্য বা কোথায় পার্থক্য তাহা কুতূহলী পাঠকবর্গকে শাস্ত্রী মহাশয় জানাইয়াছেন। তিনি সুলেখক এবং তাঁহার লিখিত বিষয়ে মৌলিকত্বের অভাব নাই। 'শ্রীশ্রীজগন্নাথজী' একটী ছোট কবিতা; লেখিকার প্রাণের ভক্তির প্রশংসা করিতে পারি কিন্তু কবিত্বহীন কবিতার নহে। ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনের রাজগী ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস সুতরাং পরিণতি না দেখিয়া সমালোচনা অনাবশ্যক। 'ভ্রাম্যমাণ' দিলীপকুমার রায়ের 'দিন পঞ্জিকা' কতকটা Musieal Survy of India. ইনি একজন Connoisseur-রূপে আজ কয়মাস 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় ভারতের তৌর্য্যবাদিত্র কলাবিদ্‌দিগের কাহাকেও 'ফাষ্ট কেলাসে প্রমোশন দিতেছেন, কাহাকেও বা নীচের কেলাসে' নামাইয়া দিতেছেন। 'দ্বন্দ্ব' সরোজকুমারী দেবীর ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস। এবার ভারতবর্ষ মোটের উপর চারিটী ভ্রমণ কাহিনীর ভারে ভারাক্রান্ত। মাসিকের পৃষ্ঠা পূরণের জন্য এমন সহজ উপায় আর নাই। রসরচনায় দ্বিতীয়-অমৃতলাল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোষ্ঠীর ফলাফলকে সম্পাদক মহাশয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিয়া পরিচয় দিলেও এই ক্রমশঃ প্রকাশ্য সুলিখিত প্রবন্ধটী তদতিরিক্ত আরও কিছু। 'কাশীর কিঞ্চিৎ' প্রণেতার এই রচনায় বহু স্থানে অরুণ রাগরঞ্জিত শিশির-বিন্দু গ্রথিত মালার মত ভাবসৌন্দর্য্যে ঝল্‌মল্ করিতেছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনার ভঙ্গী আমাদের বড় ভাল লাগে। শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তাঁর ধারণা একে অটুট নিষ্ঠার নাম সতীত্ব। এক—ব্রহ্ম অতএব সতীত্ব—যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ অর্থাৎ সেই পরম ব্রহ্মে নিষ্ঠাবতী

তিনিই সতী, বাহং। কিন্তু প্রবন্ধের শিরোভাগে যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন প্রবন্ধে তাঁহার সমাধান খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রবন্ধশেষে তিনি খাঁটী সতীত্ব ও ঝুটা সতীত্ব এই দুই শ্রেণীর সতীত্বের উপর লম্বা sermon দিয়াছেন। শিকেরা লিও আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলবাসী জাতিদের পরিচয়, নানা মাসিকে Standard Literature Society র Nations of the Worldএর অবলম্বনে এই জাতীয় প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। জগতের সহিত যত পরিচয় হয় ততই ভাল।

এবারকার ভারতবর্ষে তিনটী ছোট গল্প। 'পথের আলো', 'গোপন দুঃখ' 'আশুর নষ্টামি'। 'পতিতা' কাহিনী অবলম্বনে আজকালকার গল্প গজাইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং লেখকও সে লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই।— প্রথমে গল্পটী 'পতিতার সিদ্ধি'র হুবহু অনুকরণ— 'গোপন দুঃখে' পল্লীসমাজে অবিবাহিত জগদীশের প্রতি বিধবা মৃণ্ময়ীর মনোভাব পল্লীসমাজের চরিত্রবিশেষকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 'আশুর নষ্টামি' যদি গল্প হয় তবে আর মাসিকে গল্পের অভাব হইবে না। ছোট গল্পের রাজা জলধর বাবুর সম্পাদিত ভারতবর্ষে আমরা প্রকৃত ছোট গল্পের আশা করি। 'চুম্বন' শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তীর একটী কবিতা। আমাদের কোন রসিক বন্ধু কবিতাটী পাঠ করিয়া 'চুম্বন' শব্দের সংখ্যা গণিয়া বলিলেন কবি ভাবের উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা হইয়া ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় ১০৮টী চুম্বন ছাপিয়া দিয়াছেন। অষ্টোত্তর শতনাম শ্রীকৃষ্ণের ছিল,এখন চুম্বনও দেখিতেছি লীলাময়ের সমপর্য্যায়ে ভুক্ত হইল। "চুম্বন যেন সর্ব্বনাশের নেশা গো! চুম্বন যেন 'অকটোপশের' পেষা গো।" কি চমৎকার! এরূপ কবিতা 'সর্ব্বনাশের নেশারই মত। ভারতবর্ষ সম্পাদকের নিকট এরূপ কবিতার কেন খাতির হইল, বুঝিলাম না।

রামগড়ের নাচঘর

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

রামগড়ের সীতাবেঙ্গরা গুহাকে কেহ কেহ যে নাট্যশালা বলিতে প্রস্তুত নন তা আমরা পূর্ব্বেই বলিচি। এখন এটী নাট্যশালা হ'তে পারে কিনা তা'ই প্রথমেই বিচার করে' দেখা যাক্। এই আলোচনায় আমাদের কয়েকটী বিষয়ের সমাধান করতে হ'বে। সীতাবেঙ্গরা গুহায় যদি নাট্যশালা সাব্যস্ত করতে হয় তা'হলে প্রথম দেখ্‌তে হ'বে, গুহাতে নাট্যশালা হওয়া সম্ভব কি না। বর্গেস সাহেব বলেন, এত জায়গা থাকৃতে রামগড়ের নির্জন গুহায় নাট্যশালা করবার সার্থকতা উপলব্ধি করা যায় না। বিশেষতঃ দেখা যাচ্চে পশ্চিমাঞ্চলের আর কোন গুহায় নাট্যশালার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় নি। বর্গেসের নিজের উক্তি এই—

"Had this been so, we should naturally expect that such would be found not only in this solitary insatance in remote Sarguja, but that other and better examples would certainly occur among the hundreds of rock excavatinos still fairly complete in Western India. Yet no trace of such has been found elsewhere." (Ind. Ant. Sep. 1905 p. 198.)

ভারতের আর কোথাও নাট্যশালারূপে ব্যবহৃত গুহা পাওয়া যায় নি সত্য, কিন্তু না পাওয়া গেলেও সীতাবেঙ্গরা গুহাটীতে নাট্যশালার উপযোগী নিদর্শন যদি থাকে তবে তাকে নাট্যশালা বলে' অঙ্গীকার করবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায়ও থাকে না। তিনি নিজেই বলেচেন যে, কতকগুলি প্রাচীন গুহা আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যবহৃত হওয়া খুব সম্ভব; দৃষ্টান্তও তিনি দিয়েচেন। ঔরঙ্গাবাদে একটী বৌদ্ধ গুহাতে একেবারে মন্দিরেই নাচের যে বন্দোবস্ত ছিল, নীচের এই ছবিটী দেখলে বেশ উপলব্ধি হ'বে (Arch. Surv. Western India, Vol III, pl liv, fig. 5):

নাসিকেও এই রকম নাচগানের জন্য ব্যবহৃত দুইটী গুহা আছে। আজও গুহা দুটী দেখ্‌লে দর্শকের চোকে নৃত্যগীতের দৃশ্য ভাস্‌বে। জুনাগড়ের উপরকোট গুহার দৃশ্যও আমাদের এই কথাই সপ্রমাণ করে' দেবে। কুদা ও মহাড়ের গুহাতেও নাচগানের ব্যবস্থা ছিল। শুধু তাই নয়, দেখা যায় এই গুহাদুটীর তিন ধারে বস্‌বার আসনের যেরূপ বন্দোবস্ত তাতে এ গুহা দুটী সম্ভবতঃ অভিনয়ের জন্যও ব্যবহৃত হ'ত। ফর্গুসন ও বর্গেস সঙ্কলিত 'Cave temples' (pls iv, V. I ; XIX, XXVI, &c) ও Arch. Surv. Western. Ind. (Vol IV, pls VII to X.) নামক দুইখানি পুস্তকে গুহাগুলির চিত্র আছে।

গুহাতে যে শুধু যোগীরা ধ্যানই করতেন তা নয়। নাচগান আমোদের জন্য প্রাচীনকালে এগুলির যে ব্যবহার ছিল তার সাহিত্যিক প্রমাণও আছে। অধ্যাপক লুডেস্‌ কতকগুলি এইরূপ প্রমাণের উল্লেখ করেছেন।

হিমালয়-বর্ণনায় মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভবে (১।১০) 'দরীগৃহে'র কথা বলেচেন। এই সকল গুহাগৃহে রজনী-যোগে বনেচরগণ সঙ্গীতে সুরতোৎসব কর্‌ত।

বনেচরাণাং বনিতাসখানাং দরীগৃহোৎসঙ্গনিষক্তভাসঃ।
ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যামতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ॥

তারপর তিনটী শ্লোকের পরে (১।১৪) কবি বলেচেন—

এই গিরিবরের গুহাগৃহের মধ্যে কিন্নর ও কিন্নরীরা বিহার করে' থাকে, কিন্নরগণ ক্রীড়াকালে কিন্নরীদের বসনবিহীন করলে তারা লজ্জিত হয়। মেঘ তখন গুহদ্বারের সম্মুখে সহসা যবনিকার ন্যায় লম্বমান হয়ে তাদের লজ্জা নিবারণ করে।

যত্রাংশুকাক্ষেপবিলজ্জিতানাং যদৃচ্ছয়া কিম্পুরুষাঙ্গনানাম্।
দরীগৃহোৎসঙ্গবিলম্বিবিম্বাস্তিরস্করিণ্যো জলদা ভবন্তি॥

কালিদাসের এই সমস্ত বর্ণনায় কল্পনার যথেষ্ট পরিচয় থাকলেও সত্যের আভাস পাওয়া যায়। কালিদাস যদি গুহাগৃহে আমোদ-প্রমোদ হওয়ার কথা না জান্‌তেন তাহলে কখনও তিনি গুহাগৃহের এরকম বর্ণনা দিতেন না। তারপর তিনি মেঘদূতে (১।২৫) বিদিশার নিকট একটী পাহাড়ের 'শিলাবেশ্মে' আমোদ-প্রমোদের কথা বলেচেন।

মেঘের প্রতি উক্তি—

তুমি বিশ্রামের জন্য বিদিশার সমীপবর্ত্তী রামগিরিতে অবস্থান করো, সেইখানে অসংখ্য কদম্বকুসুম বিকসিত হওয়াতে বোধ হ'বে যেন তোমার সঙ্গে আসাতেই গিরিবরের রোমাঞ্চ সঞ্চার হয়েচে। ঐ পাহাড়ের কন্দর সকল পণ্যস্ত্রীদের রতিপরিমলগন্ধ বিস্তার দ্বারা নাগরিকদের যৌবন প্রকাশিত করে' দেবে।

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতো-
স্তৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।
যঃ পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদ্গারিভির্নাগরাণা-
মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি॥

মল্লিনাথ 'শিলাবেশ্ম' শব্দের অর্থ করেচেন "কন্দর"। কালিদাসের লেখা থেকে গুহাভ্যন্তরের সমাবেশ কি রকম ছিল তা বোঝা যায় না। তবে কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গের চোদ্দ শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে, গুহার প্রবেশ-পথ যবনিকা দিয়া ঢেকে দেওয়া হ'ত। কালিদাসের মতে গণিকারা এই সমস্ত গুহায় বাস কর্‌ত। আর গুহাতে যে নাটকাভিনয় হ'ত, আর গণিকারা যে নাটকাভিনয় কর্‌ত তারও প্রমাণ আছে।

মথুরার প্রাচীন একটী শিলালিপিতে একজন গণিকার দানের একটা ফিরিস্তি আছে। এই গণিকার নাম 'নাদা'। নাদা শিলালিপিতে আপনাকে 'লেনশোভিকা দন্দা'র কন্যা বলে' বর্ণনা করেচেন। 'লেনশোভিকা' শব্দের অর্থ "গুহাভিনেত্রী"। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে "কংস-বধ" ও "বলিবন্ধ" নাটকাভিনয়-প্রসঙ্গে "যে অভিনয় করে"

এই অর্থে 'শোভিকা' শব্দের উল্লেখ আছে, (পাণিনি ৩।১।২৬; বার্ত্তিক ১৫)। দেখা যাচ্ছে, গুহাতে শুধু মুনি-ঋষিরা থাক্‌তেন না, গণিকারা, লেনশোভিকারা—আর তাদের প্রণয়াস্পদেরাও থাকৃত।

এখন দেখা গেল যে, গুহায় অভিনয় হ'তে পারৃত। আর গুহায় এক সময়ে অভিনয় হ'ত বলে'ই ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে (২।৬৯) লিখেচেন যে, নাট্যমণ্ডপ "শৈল-গুহাকার" হওয়া দরকার।

"কার্য্যায়সং প্রতিদ্বারং দ্বারবিদ্ধং ন কারয়েৎ।
কার্যঃ শৈলগুহাকারো দ্বিভূমির্নাট্যমণ্ডপঃ॥"

দশকুমার-চরিতেও (বম্বে সং—পৃঃ ১০৮, ১৪, পিটার্স্‌ন সং—পৃঃ ১০, ২৩) এই একই কথা প্রতিধ্বনিত হয়েচে।

এখন প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে অভিনয় হ'ত কোন্‌খানে? প্রাচীনকালে রঙ্গপীঠেই অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। রঙ্গপীঠ হ'ল Stage। এই রঙ্গপীঠের পরিমাণ ৮ হাত। "অষ্টহস্তং তু কর্ত্তব্যং রঙ্গপীঠং প্রমাণতঃ" (নাট্যশাস্ত্র—২।৮৬)। প্রথমে মাপ করে' রঙ্গমণ্ডপ তৈরী কর্‌তে হ'বে। আর সেই রঙ্গমণ্ডপ দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত ও প্রস্থে ৩২ হাত হওয়া চাই।

চতুঃষষ্টিকরান্ কুর্যাদ্দীর্ঘত্বেন তু মণ্ডপম্।
দ্বাত্রিংশতং চ বিস্তারান্ মর্ত্ত্যানাং যো ভবেদিহ॥
(নাট্যশা ০—২।২০)

রঙ্গমণ্ডপের অর্দ্ধেক "প্রেক্ষক-পরিষৎ"। বাকী অর্দ্ধভাগে রঙ্গপীঠ। রঙ্গপীঠের একেবারে পিছনে "রঙ্গশীর্ষ"। এতে চারহাত পরিমিত ছয়টা কাঠের স্থাণু থাকবে। এই-খানে দেবতাদের পূজা হয়। রামগড়ের নাচঘরে এইরূপ একটা ঘরে 'বেদী' আছে। সম্ভবতঃ সেইখানে পূজার ব্যবস্থা ছিল। রঙ্গশীর্ষের পরেই নেপথ্য গৃহ। নেপথ্যও রঙ্গশীর্ষের মাঝখানে দুইটা দরজা। নেপথ্য গৃহ থেকে রঙ্গপীঠে যেতে হ'লে একটা বা দুইটা দ্বার থাকার বিধি নাট্যশাস্ত্রে আছে। রামগড়ের গুহার "প্রেক্ষক-পরিষদে"র পাশে কাঠের মঞ্চ তৈরী করে' 'রঙ্গপীঠা'দি নির্ম্মাণ করা অসম্ভব নয়। প্রেক্ষকদের বসবার জায়গা ও নাট্যশাস্ত্রের অনুমোদিত। নাট্যশাস্ত্র (২য় উপদেশ করেচে—

*　　*　　*　　*

স্তম্ভানাং বাহ্যতশ্চাপি সোপানাকৃতি পীঠকম্॥৭৯
ইষ্টকাদারুভিঃ কার্য্যং প্রেক্ষকাণাং নিবেশনম্।"
—　—　—　—　৮০

রামগড়ের নাচঘরেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত দেখে মনে হয় রামগড়ের গুহাটি রঙ্গালয়ের জন্যই তৈরী হয়েছিল।

তারপর একটা রীতি আছে যে রঙ্গালয়ে যক্ষলিপি থাক্‌বে। সীতাবেঙ্গরা গুহাতেও দেখা যায় একটা লিপি আছে। এটাকে যক্ষলিপি বলে' ধরে' নিলে আর কোন গোল থাকে না।

সীতাবেঙ্গরা গুহার প্রবেশপথের উত্তর পার্শ্বে গুহার ছাদের ঠিক নীচেই একটা ক্ষোদিত লিপি আছে। লিপিটা মাত্র দুই ছত্র। প্রতি ছত্র তিন ফুট আট ইঞ্চি লম্বা। এক একটা অক্ষর প্রায় ২॥ ইঞ্চি। দুইটা ছত্রেরই শেষের দিক্‌কার অক্ষরগুলি সিমেন্টে বুজে গেচে।

ব্লথ সাহেবের ধৃত পাঠ এইরূপ—

১। অদিপয়ন্তি হদয়ং সভাব-গরু কবয়ো এরাতয়ং…
২। দুলে বসংতিয়া হাসাবানুভূতে কুদস্ফতং এবং অলং গ [৩].

এই শ্লোকের তিনি যে তর্জমা করেচেন তা এই—

"Poets venerable by nature kindle the heart, who......

"At the swing festival of the vernal full moon, when frolics and music abound, people thus (?) tie *(around their necks garlands)* thick with jasmine flowers."

এরপর ব্লথ যোগীমারা গুহার যে লিপি আছে তারও পাঠোদ্ধার করেচেন। তাঁর ধৃত পাঠ এই—

(১) শুতনুক নম
(২) দেবদাশিক্যি
(৩) শুতনুক নম। দেবদাশিক্যি
(৪) তং কময়িথ বল ন শেয়ে
(৫) দেবদিনে নম। লুপদখে।

এই কথাগুলির ব্লথ সাহেবের অনুবাদ এইরূপ—

(1) "Sutanuka by name,
(2) "a Devadadasi.
(3) "Sutanuka by name, a Devadasi.
(4) "The excellent among young men loved her,
(5) "Devadinna by name, Skilled in Sculpture
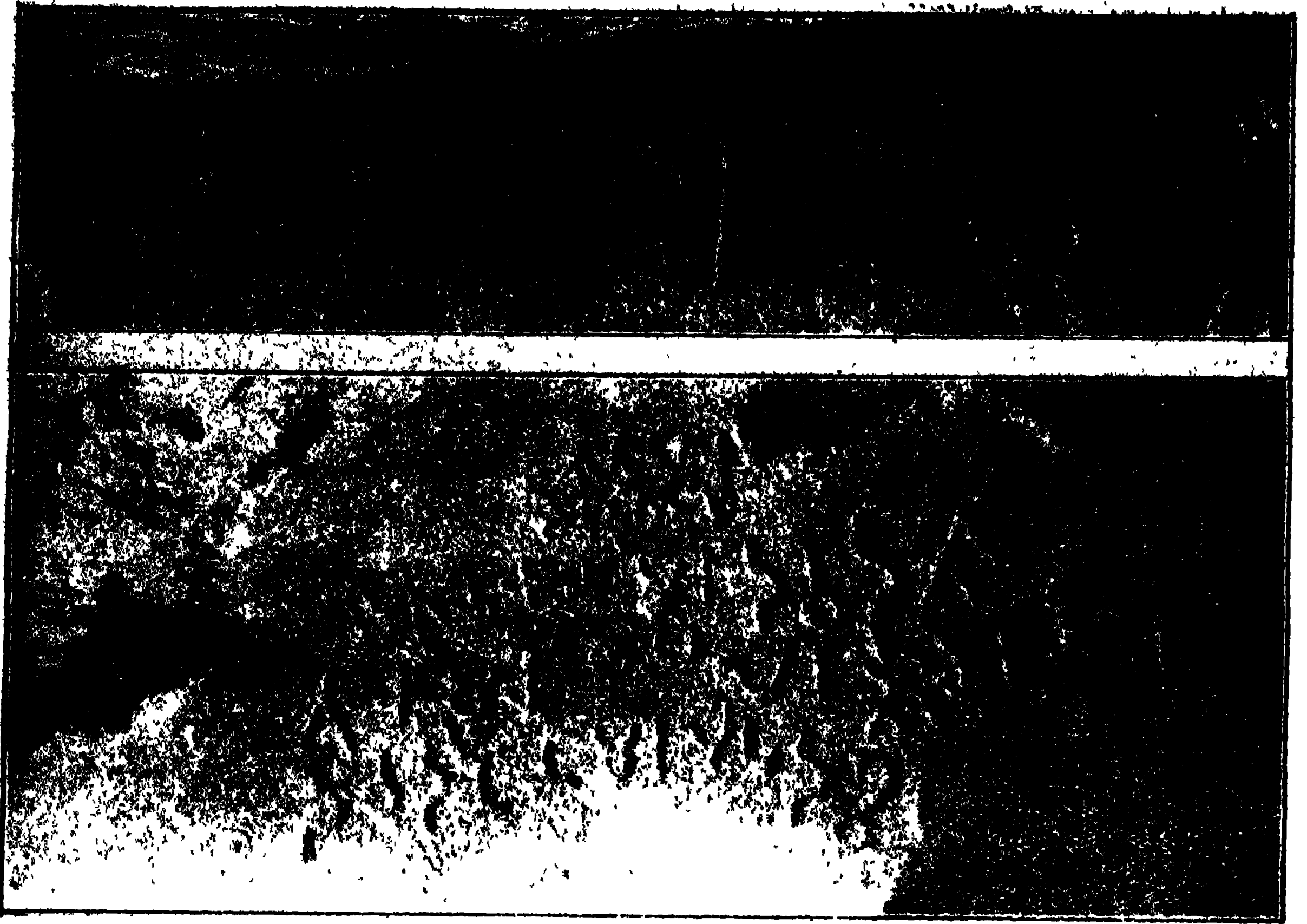
উপরে এই সকল লিপির ব্লখ সাহেবের গৃহীত প্রতিলিপি দেওয়া গেল :—

বোইয়ে (A. M. Boyer) কিন্তু উপরের দুইটী লিপির অন্যরূপ পাঠ করেচেন। তাঁর ধৃত পাঠ নিম্নে দেওয়া গেল :—

১। অদিপয়ন্তি হৃদয়ং। স[ধা]ব গরক[ং] বয়ো
এতি তয়ং ... ... দুলে বসং তিয়া
হি সাবানূভূতে কুদস্ ততং এবং অলং গ[তা]

২। সুতনুকা নম। দেবদাশিক্যি।
তং কময়িথ ব লু ন শেয়ে।
দেবদিনে নম। লুপ দখে।

[Journal Asiatique, Xieme Ser, tom. III. pp 478].

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এ দুটী লিপির পাঠ অন্যরূপ করেচেন। তিনি যদিও তাঁর পাঠ দেন নাই, কিন্তু যে অনুবাদ দিয়েচেন তা থেকে তাঁর পাঠ যে ভিন্ন তা বেশ ধরা যায়। তাঁর কৃত অনুবাদ নীচে দিয়ে আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করলুম। লিপি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সময়ান্তরে জ্ঞাপন করব।

প্রথম লিপির শাস্ত্রী মহাশয়ের ইংরেজি অনুবাদ—

"I Saulte the beautifully-formed one who shows us the gods. I salute the beautiful form that leads us to the gods. He is much in quest at Varanasi. I salute the god-given one for seeing his beautiful form."

দ্বিতীয় লিপির অনুবাদ—

"The heart of a lady living at a distance (from her lover) is set to flames by the following three—Sadam Bagara and the poet. For her this cave is excavated. Let the God of love look to it."

[I. A. S. B. Proceedings, 1902, pp 90-91]

Printed & Published by Jnanedra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works

শ্রীনিমাইয়ের শুচি-অশুচি বিচার

শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু

প্রথমবর্ষ] ৩০শে ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ১৪ই মার্চ্চ [৩১শ সংখ্যা

পঞ্চভূত

পঞ্চভূতে মানব দেহ নির্ম্মিত বলিয়া মানব চরিত্রে এই পঞ্চ ভূতের প্রভাব সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পঞ্চভূতের লীলা-মাধুর্য্য ব্যঙ্গচিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু।

প্রথম ভূত ... ... "ক্ষিতি"

ধরণীর ন্যায় সহিষ্ণুতা দেখা যায় কোথায়? পাওনা-দারেব কাছে—তিনি তাগাদায় আসিয়া উচ্চকণ্ঠে অকথা-কুকথা বলিলেও আমরা নীরবে সকলই পরিপাক করি অর্থাৎ তখন একেবারে সত্যই মাটীর মানুষ হইয়া যাই এবং প্রমাণ করি যে সত্যই আমারা মাটীতেই গড়া।

দ্বিতীয় ভূত ... ... 'অপ্' অর্থে জল

গৃহিণীর সামনে বসিয়া যখন তাঁহার নথ নাড়া দেখি ও তাঁহার সুদীর্ঘ লেক্‌চার শুনি তখন সত্যই অঙ্গ যেন জল হয়ে যায়।

তৃতীয় ভূত ... ... তেজ

তেজ দেখাইবার সুযোগ জীবনে অল্পই জুটে—সেটা কেবল ঝি চাকরকে বকাঝকায় ফুটিয়া উঠে।

চতুর্থ ভূত ... মরুৎ অর্থে 'হাওয়া'

১০টায় আফিসে হাজিরা দিবার সময় আমাদের তনুমন মরুদ্বেগেই অফিস পানে ছুটিয়া যায়—আশে-পাশে দৃষ্টি থাকে না—হোঁচটই খাই কি কারুর ঘাড়েই ঘড়ি।

পঞ্চমভূত ... ... ব্যোম্ অর্থে শূন্য

সারাদিন পরিশ্রম করিয়াও যখন অপরাহ্ণে বাড়ী ফিরিয়া গৃহিণীর মুখে ঘরে 'তেল নাই' 'নুন নাই' শুনি ও ছেলে পিলের "খাই খাই" কান্না শুনিতে হয় তখন জগতকে তাই শূন্য বলিয়া বোধ হয় এবং ইচ্ছা করে "ব্যোম্ হর হর বলিয়া" সন্ন্যাসী হইয়া যাই।
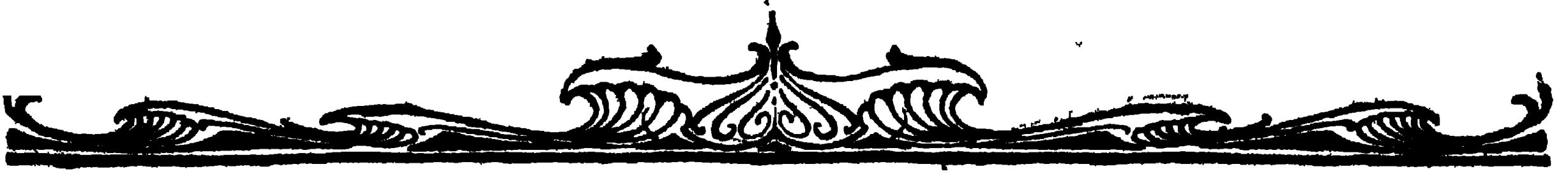
দোল

অধ্যাপক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

দোল বসন্তের উৎসব।

এসময় শুষ্ক তৃণ অঙ্কুরিত, তরু-লতা পল্লবিত—মুকুলিত; প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের নবীন ছটায় নয়ন-মন আনন্দ-রসে সিক্ত। শাস্ত্রে বলে, এটা বসন্তকাল; সুতরাং বসন্ত-সমাগমে বাসন্তী মাধুরীতে প্রকৃতি বিভোর হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা না বলিলে প্রত্যবায় আছে। বসন্তে কবিও গান ধরিয়া বলেন—

"মনের কোণে রঙ্ ধরেছে,
আকাশ-বাতাস বদ্‌লে গেছে,
মল্লী-চাঁপা-যুঁই-বেলেতে দখিন্ হাওয়া যায় বুলে—
তাকা তোরা চোক তুলে।"

বসন্তের কত কবি কালোপযোগী কত ভাবেরই সুর তুলিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত কবিচূড়ামণি জয়দেবও রাধা-সহচরীর মুখ দিয়া

"বসন্তে বাসন্তীকুসুমসুকুমারৈ রবয়বৈর্ভ্রমন্তীং
কান্তারে বহুবিহিতকৃষ্ণানুসরণাম্"—ধ্বনিতে বসন্ত-প্রভাবের বর্ণনায় কন্দর্পজ্বরজনিতচিন্তাকুলতাও সমানয়ন করিয়াছেন। আজিকার দোললীলাও সেই বাসন্তী রুচির এক অভিনব লীলায়িত-ক্রম। আমরা আজ এই বসন্তোৎসব সম্বন্ধে দুই-চারিটী কথা বলিবার উপক্রম করিব।

বহুকাল ধরিয়া ভারতের সর্ব্বত্র বসন্তকালে একটী উৎসব চলিয়া আসিতেছে। আমরা বঙ্গদেশেও এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। তবে, আমরা যেভাবে করি অন্য দেশের লোকেরা ঠিক সেই ধারা অনুসারে চলে না। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" এই মহাবাক্যের সার্থকতায় দেশভেদে এই উৎসবের যথেষ্ট অনুষ্ঠানভেদ আছে। আমরা বাঙ্গালা ও ওড়িষায় ইহাকে **দোলযাত্রা** বলি, উত্তরাঞ্চলে ইহার নাম **হোলি**। দাক্ষিণাত্যে বসন্তোৎসব '**সিঙ্গা**' নামে পরিচিত। এখানকার সিঙ্গোৎসবের শাস্ত্রীয় নাম '**হুতাশনী**'। সিঙ্গা মাসে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম সিঙ্গা। ভারতের একেবারে দক্ষিণাঞ্চলে লোকে এই উৎসবকে '**কমনপণ্ডুগাই**' বলে। কন্নড়-প্রদেশে ইহার নামান্তর "**কমন্নন হব্ব**"। হব্ব শব্দের অর্থ উৎসব।

দোলযাত্রা হিন্দুদিগের উৎসব হইলেও, মুসলমানরাও যে এই উৎসবে বড় কম আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা নহে (কোলব্রুকের বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড, ২৩৫ পৃঃ)। মুসলমানদিগের মধ্যেও এ উৎসবের প্রচলন সম্বন্ধে অনেক নজির দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাট্ অক্‌বরের অন্তঃপুরে হোলিখেলার একখানি চিত্র আছে। চিত্রখানি 'নবযুগে'র বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই চিত্রে দেখা যায় যে, পুরমহিলাগণ তাঁহাদিগের সহচরীবর্গের প্রতি পিচ্‌কারি-বর্ষণ ও আবির নিক্ষেপ করিয়া নানারূপ রঙ্গরস উপভোগ করিতেছেন। চিত্রখানি অবশ্য অক্‌বরের সমসাময়িক নহে; পরে, জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া অঙ্কিত হইয়াছিল (Loan Exhibition of Antiquities, Coronation Dbraur. ১৯১১, নং c-৯২, পৃঃ ৯০, চিত্র নং ২৮)। চিত্রখানি আল্‌ওয়ারের মহারাজের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। বদাউনী ও আবুল ফজ্‌ল্-লিখিত বিবরণাবলী হইতে অবশ্য সম্রাট্ অক্‌বরের অন্তঃপুরে এই উৎসব-আনন্দের প্রচলন সম্বন্ধীয় কোনরূপ তথ্য পাওয়া যায় না। 'আইন্-ই-অক্‌বরী'তে আমরা মাত্র এইটুকু উল্লেখ দেখিতে পাই—"এখানেও চেরামতী নামক স্থানে হুলীর ভোজের সময় অদ্ভুত উপায়ে মৃত্তিকা হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া থাকে" (গ্লাড্‌উইনের আইন্-অকবরী, ২য় খণ্ড, ৩৪পৃঃ; জ্যারেট-সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৩ পৃঃ)। তবে, লাহোরের মহম্মদ হুসেন আজাদ্-প্রণীত 'দরবার অক্‌বরী' নামক একখানি আধুনিক উর্দ্দু গ্রন্থে সম্রাট্ অক্‌বরের অন্তঃপুরে এই আনন্দ-উৎসব প্রচলন থাকার কতকটা বিবরণ পাওয়া যায়। অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ-দৌলার সময়ে মুসলমান-

গণের মধ্যে এই উৎসবের যে কি আদর ছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মীর তকীপ্রণীত 'কুল্লীয়াৎ' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায় (কুল্লীয়াৎ-ই-মীর তকী, পৃঃ ২৫৪)। দিল্লীর জামীর, সৈয়দ হিদায়ৎ আলি খাঁর (ইনি নাজির-উদ্-দৌলা বক্সী-উল্-মুল্‌ক্ আশদ্ জং বাহাদুর নামেও পরিচিত) নিকট হইতেও আমরা এই উৎসব সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাইয়া থাকি। 'এসিয়াটিক্ রিসার্চে' কোলব্রুক্ বলেন—"আমি শুনিয়াছি, মুসলমান হইলেও, সুজা-উদ্-দৌলা হোলি-খেলার বড় পক্ষপাতী ছিলেন" (২য় খণ্ড, ৩৩৪ পৃঃ)। এতদ্ভিন্ন ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের 'কথা'য় ও সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' প্রভৃতি কয়েকখানি সাহিত্য-গ্রন্থ হইতেও মুসলমান-অন্তঃপুরে 'হোলি'র কথা পাওয়া যায়।

গুজরাট প্রদেশের গ্রাম্য পারসিগণের মধ্যেও হোলি উপলক্ষে জলন্ত অগ্নিতে আহুতিপ্রদান প্রভৃতি কতকগুলি প্রথার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় (বোম্বাই গেজেট্, নবম খণ্ড)। শিখ্‌রাও, দশেরা ও দেওয়ালির মত বিশেষ ধূমধামের সহিত এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে (উইল্‌সনের রচনাবলী, ১৪৭—১৪৮ পৃঃ)।

বিহার ও উত্তরাঞ্চলে এই হোলি-উৎসব সাধারণতঃ ফাল্গুনী পূর্ণিমার ১০।১২ দিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয় ও পূর্ণিমার দিনে ইহার অবসান হয়। তবে, অধুনা প্রায় পূর্ণিমার ৩।৪দিন পূর্ব্ব হইতেই উৎসব আরম্ভ হইয়া থাকে। আবাল-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিয়া নানারূপ নৃত্যগীত ও কুৎসিত রঙ্গরস করিয়া এই উৎসব উপভোগ করে। পরস্পরের প্রতি পিচকারি-বর্ষণ ও আবির, কুঙ্কুম নিক্ষেপই এই উৎসবের প্রধান উপকরণ। পূর্ণিমার দিনেই এই উৎসবের বিশেষ জাঁক। সেদিন আর স্ত্রী-পুরুষে কোন ভেদ-বিচার থাকে না। সকলেই স্বাধীন। যাহার যাহা ইচ্ছা অবাধে করিতে থাকে। নানারূপ নেশা, ক্রীড়া ও কুৎসিত আমোদের চূড়ান্ত করিয়া উৎসবের সমাধান হয়।

উৎসবের কয়দিন ধরিয়াই ইহারা যেরূপ অশ্লীল ভাষায় পরস্পর কথা-কাটাকাটি করিতে থাকে ও স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহাদের প্রতি যেরূপ কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা শুনিলে প্রত্যেক ভদ্র ব্যক্তিকেই লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে হয়। এই উৎসব উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ খাদ্য-প্রস্তুত-প্রণালী প্রচলিত আছে। পূর্ণিমার দিন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে এই সকল খাদ্য বিতরিত হইয়া থাকে।

পূর্ণিমার রাত্রে প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া কাষ্ঠাগ্নি প্রজ্বলিত করা হয় ও বালকেরা তাহাতে নানারূপ ক্রীড়া করিয়া থাকে। এই অগ্নি-উৎসবকে 'সম্বৎ' বলা হয়। সম্বৎ-জ্বালানো একটা বড় আমোদের ও সমারোহের ব্যাপার। শ্রীপঞ্চমীর দিন হইতে ইহার আয়োজন হইয়া থাকে। বালকেরা সেইদিন হইতে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী হইতে কাঠ ও খড় সংগ্রহ করিয়া একটা খোলা জায়গায় উহা স্তূপীকৃত করে। অতঃপর, পূর্ণিমার রাত্রে গ্রামের দক্ষিণদিকে সেগুলিতে অগ্নিসঞ্চার করা হয়। এই সম্বতের মধ্যস্থলে একটি খোঁটা পুঁতিয়া তাহার উপরে একখানি 'পিষ্টক' রাখা হয়। এই পিষ্টককে 'ঠেকুয়া' বলে। সারা-রাত্রি ধরিয়া এই সম্বৎ জ্বালানো হয়। অতঃপর, রাত্রিশেষে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে খোঁটার উপরিস্থিত সেই ঠেকুয়াখানি ভাঙ্গিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। খোঁটাটি পড়িয়া যাইবার সময়ে যে ব্যক্তি এই ঠেকুয়াখানি সংগ্রহ করিতে পারে, সে বিশেষ ভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভীল ও মুণ্ডা প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণের মধ্যেও এই উৎসব প্রচলিত আছে। এই উৎসব উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষে একটা কৃত্রিম যুদ্ধ হয়। সম্ভবতঃ, ভূত প্রেত দূরীকরণই এই যুদ্ধের অভিপ্রায়। মিঃ গ্রাউজ্ মথুরায় নন্দগাঁওএর পুরুষ ও বরসানার স্ত্রীলোকদের মধ্যে এইরূপ একটি চমৎকার কৃত্রিম যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন (মথুরা, ৮৪ পৃঃ)। উত্তর ভারতের কয়েকটি জাতির মধ্যে এই উৎসবে অগ্নিসংযুক্ত একটি খাতের মধ্য দিয়া চলাফেরা করার একটা প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে, আজকাল আর এ প্রথা বড়-একটা দেখা যায় না। মেবারের ভীলেরা দশদিন ধরিয়া এই উৎসব করিয়া থাকে। হোলির এই কয়দিনই তাহারা অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া থাকে ও আবির-খেলা, নর্ত্তন ও কদর্য্য রঙ্গ-রস করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। ইহাদের স্ত্রী-

লোকেরাও এই উৎসবে ইহাদের সহিত এই সকল কদর্য্য আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে এই সকল স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া রাস্তায় গান গায়িতে গায়িতে চলিতে থাকে এবং কোন সমৃদ্ধ পুরুষ দেখিলে তাহার গতিরোধ করিয়া উপহারস্বরূপ তাহার নিকট কিছু আদায় করিয়া তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। মাড়বার ও গোয়ালিয়ারে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই উৎসবের অধিকতর প্রভাব দেখা যায়। ওয়ার্দ্ধায় স্ত্রীলোকেরা হোলিতে যোগদান করে না। মধ্যভারতের কয়েক স্থানে ও মান্দ্লায় এই বসন্তোৎসব-ঋতুটী একটা অসংযত উচ্ছৃঙ্খতার কাল বলিয়া পরিগণিত। ভগর ভীলগণ সারাবৎসর ধরিয়াই হোলির আগুন জ্বালাইয়া রাখে।

গুজরাটের কয়েকস্থলে হোলি-পূর্ণিমার পরেও প্রায় দশ-বারদিন ধরিয়া স্থানে স্থানে হোলির অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। কুমারীগণ এই সকল স্থান পূজা করিয়া থাকে। পণ্ডিত রামগরীব চৌবে ১৯১০ সালের 'ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়েরীতে (৩২ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"সাহারাণপুরে 'সাং'বা 'স্বাং' নামে একজাতীয় বিশেষ সঙ্গীত আছে। এই-সকল সঙ্গীত হোলি-উৎসবের প্রায় ৫দিন পূর্ব্ব হইতে গীত হইতে থাকে। এই সকল সঙ্গীত রচনায় স্থানীয় কবিদিগের মধ্যে বেশ-একটু প্রতিযোগিতা দেখা যায়। সাহারাণপুরনিবাসী অম্বা নামক জনৈক গুজরাটী ব্রাহ্মণ এই সকল সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে সাহারাণপুরে এই সকল সঙ্গীতের প্রচলন আরম্ভ হয়।

পাঞ্জাবে হোলি একটি কৃষি-দেবতার উৎসব। এখানে বয়স্থ স্ত্রীলোকগণ দরজার দুই পার্শ্বে "হোলি"র অনুকরণে রক্ত বা পীতবর্ণে রঞ্জিত করিয়া 'স্বস্তিক'-চিহ্ন স্থাপন করিয়া উহার পূজা করিয়া থাকেন। (ইণ্ডিয়ান এ্যান্টিকোয়েরি, ১৯০৯, ১২৭ পৃঃ)।

মথুরায় গোয়ালা জাতিদিগের হোলি-পূজা একটি অদ্ভুত উৎসব। গ্রাউজ্-প্রণীত 'মথুরা' নামক পুস্তকে (৮৪ পৃঃ) ইহার একটি সুন্দর বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণেল টড্, তাঁহার প্রসিদ্ধ ইতিহাসে (১ম খণ্ড, ৬১৯ পৃঃ) মাড়বারে প্রচলিত হোলির উৎসব-প্রথা বড় সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। আধুনিক মাড়বারীগণের মধ্যে স্ত্রীলোকেরাই নানা সঙ্গীত ও রঙ্গের দ্বারা এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই উৎসবে বাজারের-মধ্যে নাথুরামের একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে ঐ মূর্ত্তিকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। দাক্ষিণাত্যে এ উৎসব একটি নূতন জিনিস। এখানকার অধিবাসিগণ এই উপলক্ষে কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করে ও নানা অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিয়া পরস্পরের প্রতি আবির নিক্ষেপ করে। হোলি-উৎসব ধারওয়ারে অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। লিঙ্গায়ৎগণের হোলি-উৎসব একটি বড় মজার ব্যাপার। এই উপলক্ষে তাহারা একটি কাষ্ঠের ভবন নির্ম্মাণ করে। এই ভবনমধ্যে কামের ক্রোড়ে রতিকে বসাইয়া একটি মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিয়া এই মূর্ত্তির সমক্ষে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি করিতে থাকে। পূর্ণিমাই এই উৎসবের উপযুক্ত দিন। তবে উৎসব কয়েকদিন ধরিয়া চলে। উৎসবের পরদিবস কাষ্ঠাগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়।

এই উৎসবের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মতামত দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়াই এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে, এক অসুর বড়ই দৌরাত্ম্য করিত। তাহার অত্যাচারে লোকে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইত। কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে হত্যা করিয়া দোলায় বসিয়া বিশ্রাম-সুখলাভ করিয়াছিলেন। দোল শব্দের অর্থ 'ইতস্ততঃ সঞ্চালন'। কৃষ্ণচন্দ্রের এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়াই দোলোৎসব। জৈমিনি ঋষি বলিয়াছেন—

> 'ফাল্গুনে মাসি কুর্বীত দোলারোহণমুত্তমম্।
> যত্র তিষ্ঠতি গোবিন্দো লোকানুগ্রহণায় বৈ॥
> প্রত্যর্চাং দেবদেবস্য গোবিন্দস্য চ কারয়েৎ।"

ফাল্গুনমাসে শ্রীকৃষ্ণ বুঝি জীবের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়া থাকেন। এইজন্যই লোকে এই সময়েই বিশেষ করিয়া তাঁহার পূজার আয়োজন করিয়া থাকে।

স্কন্দপুরাণের ফাল্গুনমাহাত্ম্য একটা বড় অধ্যায়। এই অধ্যায়ে ফাল্গুনমাহাত্ম্যের কত কথারই আলোচনা আছে। এই সম্পর্কে হোলিকা নামে এক রাক্ষসীর

আখ্যায়িকা এবং মেড্র অসুরের দহন লইয়া একটি গল্প আছে। ভবিষ্যোত্তর পুরাণে এই উৎসবের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য প্রকারের আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। ফাল্গুনমাহাত্ম্যে যে সকল জঘন্য বিষয়ের আলোচনা ও বিবরণ আছে, ইহাতে তাহা নাই। এই গল্পটী অন্য রকমের।

গল্পটি এই—একদিন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, ফাল্গুন মাসে যে গ্রামে গ্রামে কাঠ জ্বালাইয়া ও পল্লীতে পল্লীতে বালকেরা চীৎকার করিয়া এই উৎসব করিয়া বেড়াইতেছে ইহার কারণ কি? এ উৎসবে তাহারা কাহারই-বা পূজা বা অবতারত্ব ঘোষণা করিতেছে?

হে জনার্দ্দন, আমি এই উৎসবসম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করি। আমাকে দয়া করিয়া তাহা বলুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সত্যযুগে রঘু নামে এক ধার্ম্মিক ও গুণবান্ রাজা ছিলেন। তিনি সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া ন্যায় ও কারুণ্যসহকারে প্রজাপালন করিতে থাকেন। ফলে তাঁহার রাজ্যে অধর্ম্মের স্থান হইল না। দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর অসদ্ভাব হইল। প্রজাদের প্রিয় হইয়া দেবতার আশীর্ব্বাদে রাজা তাঁহার জীবন সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পরে, একদিন প্রজাপুঞ্জ কাঁপিতে কাঁপিতে রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, ঢুণ্ঢা নামে এক রাক্ষসী তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। তাহার প্রভাবে তাহারা ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছে। ওষধি ও মন্ত্রবলে বালকদেব কোন উপকার হইতেছে না। কাজেই নিরুপায় হইয়া রাক্ষসীর হস্ত হইতে রক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা রাজার শরণাপন্ন হইয়াছে। ইহা শুনিয়া রাজা তাহার পুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে ডাকিয়া বলিলেন, প্রজারা বিপন্ন, সুতরাং আমিও বিপন্ন। প্রজাদের কষ্ট দূর করুন। আর বলুন, কেন এ রাক্ষসী এরূপ কষ্ট দিতেছে। বশিষ্ঠ রাজাকে অভয় দিয়া বলিলেন, আমি এই রাক্ষসীর বিবরণ বলিয়া ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় বলিব। পুরাকালে মালিনীর কন্যা ঢুণ্ঢা কঠোর সাধনা করিয়া শিবের অনুগ্রহ লাভ করে। শম্ভু বর দিতে চাহিলে সে অমরত্ব প্রার্থনা করিল। দেবাদিদেব কিন্তু এতদূর করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বর দিলেন যে, মর্ত্ত্য বা সুরলোকে কোনও শক্তি তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কেবল ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময় উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি ও বালকগণ হইতে তাহার বিশেষ ভয় থাকিবে। বালকেরা তাহার বৈরী এ কথা জানিতে পারিয়া রাক্ষসী তাহাদিগকে নানারূপে নির্যাতিত করে—তা ছাড়া অন্যান্য লোককেও কম যন্ত্রণা দেয় না। এখন তাহাকে জব্দ করিতে হইলে কি করা চাই, শাস্ত্র তাহা এইরূপ বলিতেছে—

> অদ্য পঞ্চদশী শুক্লা ফাল্গুনস্য নরাধিপ।
> শীতকালো বিনিষ্ক্রান্তঃ প্রাতগ্রীষ্মো ভবিষ্যতি ॥
> অভয়ং সর্ব্বলোকানাং দীয়তাং পুরুষর্ষভ।
> তথাহশঙ্কিতা লোকা হসন্তু চ রমন্তু চ।
> দারুণানি চ খড়্গানি গৃহীত্বা সমরোৎসুকাঃ।
> যোধা ইব বিনির্যান্তু শিশবঃ সংপ্রহর্ষিতাঃ ॥
> সঞ্চয়ং শুষ্ককাষ্ঠানাং লোলানাঞ্চকারয়েৎ।
> তত্রাগ্নিং বিধিবদ্ধত্বা রক্ষোঘ্নৈর্মন্ত্রবিস্তরৈঃ।
> ততঃ কিলিকিলা শব্দৈস্তালাশব্দৈ র্মনোহরৈঃ।
> তত্রাগ্নিং ত্রি পবিক্রম্য গায়ন্তু চ হসন্তু চ ॥
> জল্পন্তু স্বেচ্ছয়া লোকাঃ নিঃশঙ্কা যস্য যন্মতম্।
> ভগৈর্ব্বহুবিধশব্দৈঃ কীর্ত্তয়ন্ দেশভাষয়া।
> বিস্তারয়ংশ্চ গায়ংশ্চ সহস্র নাম তস্য বৈ ॥
> তেন শব্দেন সা পাপা হোমেন চ নিরাকৃতা
> অট্টাট্টহাসৈর্ভিম্ভানাং রাক্ষসী ক্ষয়মেষ্যতি ॥

কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি মরাঠী বই পড়িতেছিলাম। তাহাতে বসন্তোৎসবের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা দেখিলাম। গ্রন্থখানির নাম শিবলীলামৃত—এখানি স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মোত্তর খণ্ডের মরাঠী প্রস্থান।

ইহাতে যে উপাখ্যানটী আছে, তাহা এইরূপ—তারকাসুর ও তাহার তিনটী পুত্র এক সময়ে বড়ই অত্যাচারী ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। স্বর্গে দেবগণও ভয়ে ত্রস্ত। দেবতারা শিবের ধ্যান আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র তিনজনে বসিয়া তাহাদের নিধনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে সাব্যস্ত হইল যে, এমন কোন শক্তির উদ্ভব চাই যাহা দ্বারা এই অসুরদের বিনাশ হইবে। শিবপুত্রই এই কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সমস্যা এই

যে, মহাদেব ধ্যানস্থ। তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করা যার-তার কাজ নয়। অনেক চিন্তার পর স্থির হইল যে, কামদেবই মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিবেন। কাম রতিসহ এই কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। বসন্তসমাগমে তাঁহারা দেবাদিদেব যেখানে ধ্যানমগ্ন সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বৃক্ষ-বল্লরীর নূতন কিশলয়সমূহ উদ্গত, শুক-শারিকা মধুর সংলাপনিরত। ললিত বিহঙ্গকুলের কল-কূজনে ও মঞ্জুল ভ্রমরের সরস গুঞ্জনে কুঞ্জবন মুখরিত। কোকিলের কুহুতানে ময়ূর-ময়ূরীর গর্জ্জনে এবং অন্যান্য পক্ষীর উন্মাদক গানে পাছে মহাদেবের ধ্যানের ব্যাঘাত হয়, তাই তাঁহার প্রিয় অনুচর নন্দী তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে করিতে দূরে গমন করিতেছে। কামদেব কুসুম-শর-নিক্ষেপের মাহেন্দ্রক্ষণ বুঝিয়া রতিদেবীকে পশ্চাতে রাখিয়া যেমন শর-সন্ধান করিবেন, অমনই শম্ভু নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখেন সম্মুখে কাম। তিনি তাহাকে তিরস্কারব্যাকুল করিতেছেন এমন সময় তাঁহার তৃতীয় নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া মদনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে এই ঘটনা ঘটে। শিবদূত সকল আসিয়া মহা আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল—আনন্দে মত্ত হইয়া তাহারা গালাগালি, খেউড়ের ছড়াছড়ি করিতে লাগিল। মহাদেব তখন আদেশ দিলেন, এই ঘটনার স্মৃতি-স্বরূপ প্রতি বর্ষে এইদিনে বহ্ন্যুৎসব করিয়া পবিত্রভাবে দিবসযাপন করিতে হইবে। যিনি ইহার অন্যথাচরণ করিবেন, তাঁহার অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। এদিকে রতিদেবী হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে ইন্দ্রের হৃদয় দ্রবীভূত করিলেন। দ্বাপরে কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্ররূপে রতি তাঁহাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া ইন্দ্র আশ্বস্ত করিলেন।

হরিবংশের ভবিষ্যপর্ব্বে এই ঘটনার অনুরূপ বিবরণ আছে।

'পৃথ্বীরাজরসৌ' গ্রন্থে এই বসন্তোৎসবের বিবরণ আর এক রকমের। পৃথ্বীরাজ হোলিসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। পৃথ্বীরাজের প্রশ্নের উত্তরে একদিন চন্দ্রবাঈ তাঁহাকে বলেন, চাহুআন-কুলে ঢুণ্টা নামে এক রাক্ষসী ছিল—উহার ভগিনীর নাম ঢুণ্টিকা। ঢুণ্টা আজমীর ও দিল্লীর সীমা অতিক্রম করিয়া কাশীগমন করে ও সেখানে তপস্যা করিতে থাকে। ঢুণ্টিকাও তদনুসরণ করিবার মানসে বারাণসী উপস্থিত হইয়া দেখে যে, তাহার ভাই নিজের শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিতে হোমাহুতি দিয়াছে। ঢুণ্টিকা ভ্রাতৃবিয়োগে শুষ্কচিত্ত হইয়া তপস্যা আরম্ভ করিল। নিরাহারে তপ করিতে করিতে বহু বর্ষ অতীত হইলে, পার্ব্বতী প্রসন্ন হইয়া বর লইতে বলেন। আমিষাহারী রাক্ষসী ইহা শুনিয়া বলিল, দেবী, যদি বর দিবেন, তাহা হইলে এই বর দিন, যেন আমি আবাল-বৃদ্ধ-যুবা যে-কোন মানবকে খাইয়া ফেলিতে পারি। রাক্ষসীর প্রস্তাবে ধর্ম্ম-সঙ্কট দেখিয়া পার্ব্বতী সমস্ত বৃত্তান্ত মহাদেবের গোচর করিলেন। মহাদেব চিন্তা করিয়া বলিলেন, তুমি গিয়া রাক্ষসীকে বল, যে ব্যক্তি উন্মত্তের ন্যায় অসভ্য কার্য্য করিবে, রাক্ষস-স্বরূপ বিবেচনা করিয়া সে তাহাকে খাইতে পারিবে না। মহাদেবের আদেশে পবনদেব এমন ধূলি উড়াইলেন যে, সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল, আর লোকেরা তিনদিন অসভ্য কর্ম্ম কবিতে লাগিল। ফলে, ঢুণ্টিকা মনুষ্য ভক্ষণ করিতে পারিল না। এই সময় হইতে হোলিব ব্যবহাব প্রচলিত হইয়াছে।

রাইট্ সাহেব তাঁহার নেপালের ইতিহাসে (৪১ পৃঃ) বলেন যে, এদেশে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে প্রতি বৎসব হোলির সময় পতাকামালা শোভিত একটি কাঠের খোঁটা জ্বালান হয়। নেপালবাসিগণের ধারণা যে, এই উপায়ে পুরাতন বৎসরের দহন-কার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে। মির্জ্জাপুরে দ্রাবিডগণের মধ্যে হোলি-প্রথা প্রচলিত নাই, কিন্তু প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ইহাদের পুরোহিতগণ একটি কাঠের খোঁটা জ্বালাইয়া থাকেন। এই প্রথার নাম 'সম্বৎ-জলানা' অর্থাৎ পুরাতন বৎসরের দহন। (W. Crooke—An introduction to the popular religion and folklore of Northern India. p. 392)। কুমায়ুনবাসিগণ এই উপলক্ষে একটি গাছ কাটিয়া উহাকে নিষ্পত্র করে এবং হোলি-দেবতার তুষ্টিসাধনের নিমিত্ত উহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া পুড়াইয়া ফেলে (Fraser—Golden Bough, Vol IV, p. 306-7)। কর্ণেল টড্ তাঁহার প্রসিদ্ধ রাজস্থানে 'হোলি' সূর্য্যের

ক্রান্তিবিষয়ক কোন একটী উৎসব এইরূপ ধারণার পরিচয় দেন; কিন্তু ক্রুক্ সাহেবের মতে এই উৎসবের মূলতত্ত্ব অনেকটা সূর্য্যের রশ্মির প্রসন্নতাসাধনের উপর নির্ভর করে (W. Crooke—Introduction p. 391)। আবার ফ্রেজার সাহেব বলেন শস্যের উৎকর্ষ ও পরিপক্কতা বিধান কল্পেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে (Golden Bough, Vol IV, p. 306)। হোলির আধুনিক অনুষ্ঠান-প্রণালী সম্বন্ধে বোধ হয়, আরও অনেক তত্ত্ব আছে। বস্তুতঃ, যুগ-যুগান্তর ও দেশ-দেশান্তরের মধ্যে এই বসন্তোৎসবে যে সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহার মূলান্বেষণে আমরা দেখিতে পাই যে, কি প্রাচীন, কি মধ্য, কি বর্ত্তমান, সকল যুগেই নানা দেশের এই বসন্তোৎসবে বসন্তের প্রতি একটা জীবন্ত শ্রদ্ধা ও প্রকৃতির নব জাগরণে সকলের ভিতর একটা স্বচ্ছন্দ অবাধ আনন্দের চিহ্ন সর্ব্বতোভাবে বিরাজিত হয়।

মধু-তর্পণ

শ্রীমানকুমারী দেবী

সুদূর ফরাসী দেশ নীলাম্বুধি-পারে
রমণীয়া নিরুপমা সুষমার রাণী।
সেথা বঙ্গ-কবিবর, জাগ্রত স্বপনে
বিরলে স্মরিত তার প্রিয় জন্মভূমি।
কনক পিঞ্জর মাঝে বিহঙ্গ যেমতি,
স্মরে তার বনভূমি মরমে মরমে।
তোরে স্মরি কপোতাক্ষ! গাহিল উচ্ছ্বসি,
"সতত হে নদ! তুমি প'ড় মোর মনে"

*   *   *   *

বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ দলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে,
দুগ্ধ-স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে"
কিন্তু নিয়তির ফল—অদৃষ্ট লিখন,
আর যে হ'ল না দেখা-কবিকুলেশ্বর
নারিলা ও স্নিগ্ধনীরে মিটাতে পিপাসা!
কত যুগ পরে আজি—সে করুণ গীতে,
গলিল একটী হিয়া, মহেশের গানে,
দ্রবীভূত নারায়ণ গোলকে যেমতি।
মর্ম্মর প্রস্তরে তাই আঁকি "মধুধ্বনি"—
—সহৃদয় সদাশয় "মধু"র স্বদেশী—
আজি তোরে কপোতাক্ষ! দিলা আভরণ।
প'র এ অমূল্য রত্ন—সযত্নে সাদরে
পরেন কৌস্তুভ মণি কমলেশ গলে।
আমারো মিনতি তুমি যতদিন যাবে
"বারিরূপ রাজ-কর" যোগাতে সাগরে
অমর কবির নাম গাবে কলস্বনে—
আরো গাবে সেই সাথে তাঁরো যশোগীতি
পরাইলা হেন রত্ন সাদরে যেজন
তব গলে—অবহেলি শত-বিঘ্ন বাধা।
হও তৃপ্ত কবিবর! কপোতাক্ষ কূলে,
শ্রদ্ধার তর্পণ লহ মিটুক পিপাসা।
যেখানে যে লোকে তাতঃ! করহ বসতি
লহ তব দুহিতার সহস্র প্রণতি।

সীতানাটকে রামচরিত

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের চরিত যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি হিন্দুজাতির আরাধ্য দেবতাকে নিতান্ত হীন করিয়াছেন বলিয়া অনেকে মাইকেলের নামে অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন সমালোচক মাইকেলের দোষক্ষালন জন্য নানাপ্রকার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। সংপ্রতি কলিকাতার মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত সীতানাটকের রচয়িতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী যে ভাবে রামচরিত অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার তুলনায় মাইকেল কিছুই করেন নাই বলিতে হইবে।

আজ আমরা "জাতীয়তা রক্ষা কর" বলিয়া যতই চীৎকার করি না কেন, হিন্দুজাতির লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যত বড় বড় "মহাসভা"ই করি না কেন, বাঙ্গালী হিন্দু এখন প্রাণশূন্য জড়পদার্থে পরিণত হইয়াছে। নচেৎ ভারতের বিশ কোটী হিন্দুসজ্জন যে রামচন্দ্রকে ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে পূজা করিয়া আসিতেছে, তাঁহাকে কোন্ নাট্যকার এরূপ কুৎসিত আকারে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিতে সাহস করিত? আজ মুসলমানের আরাধ্য মহাপুরুষ মহম্মদকে যদি কোন নাট্যালয়ে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক আরোপ করিয়া কেহ উপস্থিত করিত, তবে ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানদিগের হস্তে সেই নাট্যকার ও নাট্যালয়ের কি দশা ঘটিত তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

সংপ্রতি রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মাঘ মাসের বসুমতী পত্রিকায় মধুসূদনের স্মৃতি-প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান্ কথা বলিয়াছেন :—"পৌরাণিক প্রাণ না লইয়া যিনি পুরাণঘটিত বিষয় লিখিতে যাইবেন, তিনি নিজে ঠকিবেন এবং জাতির আজীবনের মজ্জাগত বিশ্বাসের বক্ষেও ঠোকর মারিবেন।" সীতানাটকের লেখকও সেইরূপ নিজে ঠকিয়াছেন এবং হিন্দুজাতির হৃদয়ে গুরুতর আঘাত দিয়াছেন, কিন্তু জাতীয় শিক্ষার অভাবে সেই আঘাত অনুভব করিবার শক্তি আমাদের লোপ পাইয়াছে। তিনি রামায়ণ ও রামচরিত্র একজন বিংশ শতাব্দীর সাম্যবাদী সংস্কারকের নীল চশমা পরিয়া অধ্যয়ন করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন,—তাহার ফলে তিনি বিড়ম্বিত হইয়াছেন।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে "Fools rush in where angels fear to tread"—যেখানে দেবতারা পদক্ষেপ করিতে শঙ্কিত হন, সেখানে মূর্খগণ অবাধে দৌড়াইয়া প্রবেশ করে। মহাকবি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ অবলম্বনে কালিদাস, ভবভূতি, কৃত্তিবাস, তুলসীদাস প্রভৃতি কত কবি কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অতি সন্তর্পনে নিজ নিজ গ্রন্থে ঘটনা সমাবেশ ও চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা মূল রামায়ণের চরিত্রগৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া এবং অনেকস্থলে তাহার উৎকর্ষ-বিধান করিয়াছেন। কিন্তু এই নাট্যকার অবাধে বাল্মীকি কালিদাস ভবভূতির উপর কলম চালাইয়া তাঁহাদের সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন!

তাঁহার এই নাটক প্রধানতঃ ভবভূতির উত্তর রামচরিত অবলম্বনে রচিত, কিন্তু উত্তর রামচরিতের উৎকৃষ্ট অংশ সকল তিনি পরিত্যাগ করিয়া "নূতন কিছু" করিবার মতলবে যাহা খাড়া করিয়াছেন তাহাতে হুঁকার খোল ও নলচে সব বদলিয়া গিয়াছে।

রামচন্দ্র রাজা হইয়া একদিন সীতার সহিত নিভৃতে অবস্থান করিতেছিলেন, সীতা তাঁহার অঙ্কোপরি মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রিতা। এমন সময়ে মহর্ষি অষ্টাবক্র আসিয়া বলিলেন, ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞস্থল হইতে মহর্ষি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন,—

"বংশ মান রক্ষা হেতু
সত্যের পালনে আর প্রজানুরঞ্জনে
সর্ব্ব ইষ্ট দিতে বিসর্জ্জন
রামচন্দ্র বিমুখ না হন যেন।"

"সর্ব্ব ইষ্ট দিতে বিসর্জ্জন"—ভবভূতি এ কথাটা বশিষ্ঠ অথবা অষ্টাচক্রের মুখ দিয়া বলান নাই, ইহা রাম নিজেই বলিয়াছেন। কিন্তু এখানে রাম যেন বশিষ্ঠের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন,—

"প্রভু ইক্ষ্বাকু কুলের রাজা
প্রজার মঙ্গল তার জীবন সাধনা।
পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি দিলীপ
রঘু অজ পিতা দশরথ
সূর্য্যবংশ ধুরন্ধর নরপতিগণ
যেই পুণ্যব্রত করিলেন
চিরদিন জীবনে করুণ
সেই ব্রতে দীক্ষিত আমি দেব।

*　　*　　*　　*

সর্ব্বকাম্য, সর্ব্বস্বর্গ, সর্ব্বইষ্ট,
সর্ব্ব কামনার শ্রেষ্ঠ, সহস্র জীবনাধিক
মোর জানকীরে এই দণ্ডে বিসর্জ্জন দিতে পারি

ভবভূতি রামের মুখ দিয়া এই কথাগুলি একটি সত্য প্রতিজ্ঞার মত বাহির করেন নাই, রাজা দশরথ কৈকেয়ীর নিকট যেরূপ সত্য করিয়াছিলে রামের কথায় সেরূপ সত্য-পালনের কোন আভাস নাই। কিন্তু এই গ্রন্থকার রামকে দিয়া সেইরূপ একটি সত্য করাইলেন। কিন্তু পরে তাঁহার রাম যখন সীতাবর্জ্জনরূপ সত্যপ্রতিজ্ঞা করিয়া সে জন্য নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার ঐ কথাগুলি নেহাৎ যাত্রারদলের বক্তৃতা বলিয়া মনে হয়। তিনি দুর্ম্মুখকে বলিতেছেন,—

"অন্তর্য্যামী দেব
আমার মুখের কথা তাই সত্য হবে
অন্তরের সত্য কেহ দেখিবে না!
মুহূর্ত্তের মত্ততায় জীবনের ভুল।
জীবনের সব চেয়ে বড় সত্য হ'তে প্রবল কি হবে?"

অর্থাৎ অষ্টাবক্র ঋষির নিকট মুখ দিয়া একটা বেফাঁস কথা বাহির করিয়া তিনি নিতান্ত দায় ঠেকিয়াছেন—যদি সে রূপ না করিতেন, তবে প্রজার হাজার কটু কথায়ও কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহার মুখের কথার সহিত অন্তরের কথায় মিল নাই। ইনিই কি সেই বাল্মীকির সত্যব্রত সত্যসন্ধ প্রজারঞ্জক রামচন্দ্র?

আমরা রামায়ণে পড়িয়াছি, রামচন্দ্র সীতাকে বর্জ্জন করিবার মনঃস্থ করিয়া একমাত্র লক্ষ্মণকে জানাইলেন এবং লক্ষ্মণই সীতাকে মুনির আশ্রম দর্শনের ব্যপদেশে তমসা-তীরে বাল্মীকির আশ্রমের নিকটে লইয়া গিয়া সেখানে রাজাদেশ জ্ঞাপন করিলেন। ভবভূতিও রামায়ণের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। কালিদাসের অঙ্কিত চিত্রে সীতাদেবী লক্ষ্মণের নিকট রামের আদেশ শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইহার ফল যে কতদূর tragic তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। নির্ব্বাসনের সময় রাম কি করিয়া সীতার সম্মুখীন হইবেন? কিরূপে তাঁহার মুখের-পানে তাকাইবেন? আর পৌরজনকে আগে সে কথা জানিতে দিলে সীতাই বা কি করিয়া তাহাদের নিকট মুখ দেখাইবেন? যে সকল দুষ্ট লোক তাঁহার নিন্দা করিয়াছিল, রাজপথ দিয়া যাইতে দেখিলে তাহারা যে হাসিবে! সীতা কিরূপে এই অপমান সহ্য করিবেন? আমাদের এই নাট্যকারের এ সকল জ্ঞান আদৌ নাই, তাই তিনি আগেই অন্তঃপুর মধ্যে উর্ম্মিলার দ্বারা সীতাকে নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা জানাইয়া দিলেন, এবং সীতা ও রামকে একত্র বসাইয়া দুই একটা "হাংতোঽস্মি" বলাইয়া, পৌরজনের ও নাগরিক-গণের সমক্ষে সীতাকে নিতান্ত হীন ও কৃপারপাত্রী করিয়া বনে পাঠাইলেন।

সীতাকে বনে পাঠাইয়া রামচন্দ্রের কিরূপ অবস্থা হইল? মহাকবি ভবভূতি একটি কথাদ্বারা সেই গভীর শোকের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—"অনির্ভিন্নো গভীরত্বাৎ অন্তর্গূঢ় ঘনব্যথঃ, পুটপাক প্রতিকাশো রামস্য করুণোরসঃ" অর্থাৎ রামচন্দ্র পুটপাকের ন্যায় অত্যন্ত গভীর শোকাগ্নিতে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতেছেন, বাহিরে তাহার কোন প্রকাশ নাই। ইহাই ত সেই "বজ্রাদপি কঠোর" এবং "কুসুমাদপি কোমল" রঘুকুল তিলকের প্রকৃত চিত্র। কিন্তু এই গ্রন্থকারের রাম রাজকার্য্য ছাড়িয়া দিয়া রাত্রি-

দিন শোক করিতেছেন, এবং রাজকার্য্যের জন্য যে কাছে আসিতেছে তাহাকেই যেন কামড়াইতে যাইতেছেন! তিনি একজন সচিবকে বলিতেছেন,—

"শুষ্ক রাজকার্য্য, নীরস কর্ত্তব্য,
নিশিদিন এ কঠোর আত্মপ্রবঞ্চনা
আর বুঝি না পারি সহিতে।
যক্ষ্মা রোগগ্রস্তসম
বিন্দু বিন্দু করি প্রতিদিন—নিয়মিতভাবে
অলস মরণ রস পান
রাজসভা তিক্ত হলো—
আসিলাম উপবনে,
উপবন তিক্ততর হেরি।"

সেই সচিব বেচারি রামচন্দ্রকে দাক্ষিণাত্যের দুর্ভিক্ষের কথা বলিল, তখন রাম দাঁত খিঁচাইয়া বলিতেছেন,—

"প্রজানুরঞ্জন—প্রজানুরঞ্জন,
বিসর্জ্জন দিনু সীতা প্রজানুরঞ্জনে
প্রজাদের মনস্তুষ্টি করিনু বিধান,
কিন্তু তাহে কি ফল ফলিল—
প্রজা রক্ষা কেমনে হইবে?"

আবার অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তাব লইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ যখন আসিয়া বলিলেন,—

"বৎস রাম
একাকী বান্ধবহীন, চিন্তামাত্র সাক্ষী
যাপিছ দিবস নিশি সঙ্গোপনে
রাজঅন্তঃপুরে, কতদিন গত হ'লো
যাও নাই রাজসভাতলে,
অলঙ্কৃত কর নাই বিচার আসন,
প্রজাগণ ছিল সব মৌন বেদনায়
হেন উদাসীন ভাব নেহারি তোমার।
অশ্বমেধ যজ্ঞ বার্ত্তা শুনি"—

রাম তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—

"নিতান্ত অসুস্থ আমি তাত,
রাজকার্য্য করিতে অক্ষম।
প্রজানুরঞ্জন আপাততঃ
কিছুদিন রহুক স্থগিত
একাকী বিশ্রাম আমি চাই।"

এ যেন একজন নব্য বাঙ্গালী যুবক নিজের অনিচ্ছায় স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইতে বাধ্য হইয়া নিজের শয়নকক্ষে বসিয়া বিরহানলে দগ্ধ হইতেছে, আর তাহার মা ভাত খাইতে ডাকিতে আসিলে, তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিতেছে,—

ভাত নাহি খাব আমি
মাথা ধরিয়াছে,
চাহি আমি একাকী থাকিতে
করিতে বিশ্রাম!
যাও মাতঃ, ক'রো না বিরক্ত
মোরে!

অথবা একজন সাহেব সিভিলিয়ান প্রসবার্থ মেম সাহেবকে বিলাতে পাঠাইয়া খাসকামরায় নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া মেমের চিন্তা করিতেছে, আর পেস্কার কাগজ দস্তখত করাইতে আসিলে খিটিমিটি করিয়া বলিতেছে,—

চাহি আমি একাকী থাকিতে,
ভাগো আবি হিঁয়াসে!

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য রাম সোণার সীতা নির্ম্মাণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, কিন্তু সে কাহার পরামর্শে? তিনি যদি অন্যের পরামর্শ লইয়া তাহা করিবেন, তবে তাঁহার রামত্ব থাকে কোথায়? সীতা যখন শুনিলেন তাঁহার রাম তাঁহার অভাবে সোণার সীতা নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞ করিবেন, তখন তিনি বুঝিলেন তাঁহার রাম তাঁহারই আছেন, নচেৎ তিনি সোণার সীতা গঠনের কল্পনা করিতে পারিতেন না। ভবভূতি এই ভাবটী অতি মর্ম্মস্পর্শীভাবে উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু এই নাট্যকারের রাম নিজে সে কল্পনা করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে সোণার সীতা নির্ম্মাণের পরামর্শ দিলেন কৌশল্যা! সীতার নিকট ইহার যে কতটা পার্থক্য, এই গ্রন্থকারের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন, রামকে দিয়া সেই মূর্ত্তিটা গড়াইয়া লইলেই বুঝি খুব বাহাদুরি হইল; অমনি রামচন্দ্র তাঁহার রাজকার্য্যাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই স্বর্ণসীতা গঠনে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে ত একটা পূর্ব্বের শিক্ষা দরকার? যিনি আজীবন ধনুর্ব্বাণ হাতে যুদ্ধ করিয়া বেড়াইয়াছেন তাঁহার সে শিক্ষা ছিল কি না কে জানে?

অশ্বমেধের ঘোড়া লইয়া শত্রুঘ্ন সসৈন্যে বাল্মীকির আশ্রমের নিকট আসিলেন। লব ও কুশ সেই ঘোড়া বাঁধিল। সেই ঘোড়া লইয়া লবের সহিত রাঘব সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কুশ আশ্রম রক্ষার্থ নিযুক্ত হইল। লব একাই জম্ভকাস্ত্রে সকল সৈন্যকে অচেতন করিয়া ফেলিল, সেনাপতি শত্রুঘ্নও সেই সঙ্গে ভূপতিত হইলেন। এমন কি অযোধ্যায় গিয়া সংবাদ দেওয়ার জন্য একটি সৈন্যও রহিল না। তাই লব নিজেই Volumteer সাজিয়া কোমর বাঁধিয়া অযোধ্যায় সংবাদ দিতে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিল। যেখানে রাম স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণ শেষ করিয়া তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, লব কাহারও বাধা না মানিয়া একেবারে সেখানে গিয়া উপস্থিত। লব রামকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—

"মহারাজ
ধরেছিনু আমি অশ্বমেধ
যজ্ঞ-অশ্ব তব। তোমার সমস্ত সৈন্য
সেনাপতিসহ পরাজিত মম করে,
তমসারতীরে জ্ঞানহারা
ধরণী লোটায়।"

কিন্তু রাম তখন সীতার ধ্যানে বিভোর, লবের কথা তাঁহার কাণে প্রবেশ করিল কি না সন্দেহ, তিনি লবকে দেখিয়া বলিলেন,—

"সেই নীল নলিন নয়ন ছুটী!
আঁখি তারকায় সেই স্নিগ্ধ
অমৃত পরশ! বালক, বালক
হেন রূপ কে তোমারে দিল?
কোন্ মাতৃবক্ষঃ হ'তে স্নেহরসধারা
করি পান, ভুবনমোহন
দিব্যরূপ পাইয়াছ?"

ইহার উত্তরে লব বলিল,—

"আমি তব শত্রু, হে রাঘব
আসি নাই শুনিবারে প্রিয়সম্ভাষণ
রণ রণ রণ মোরে দেহ রঘুপতি।
রাবণ বিজয়ী মহাশূর
যুদ্ধ সাধ তোমার সহিত
তাই আসিয়াছি আমি এ অযোধ্যাপুরে।"

কিন্তু কোথাকার যুদ্ধ কোথায়? সেই যে শত্রুঘ্ন বেচারা সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে রাম সে কথা কাণেই তুলিলেন না। তিনি রঘুকুল তিলক ক্ষত্রিয় রাজা, একটি বালক শত্রুরূপে আসিয়া তাঁহার নিকট যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছে, রামচন্দ্র সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। যে আদর্শ বীরপুরুষ যুদ্ধের নাম শুনিলে নাচিয়া উঠিতেন; যে আদর্শ নরপতি। রাজার কর্ত্তব্য পালনের জন্য স্বীয় ধর্ম্মপত্নীকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন; ইনি কি সেই রামচন্দ্র? তাঁহার ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরব রক্ষার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনের আবশ্যকতা তা একবারও মনে আসিল না? এই নাট্যকার বোধহয় মনে করিয়াছেন, এই সময় লবকে রামের নিকট আনিয়া স্বর্ণসীতা দেখাইয়া তিনি মস্ত একটা Dramatie effect সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু হায়রে নির্ব্বুদ্ধিতা! এখানে তোমার রামচন্দ্র যে একেবারে রসাতলে গেলেন,—তিনি ত সেই রামচন্দ্র নহেন, তিনি বিষবৃক্ষের সূর্য্যমুখীর শোকে অধীর নগেন্দ্রনাথের ন্যায় একটি বাঙ্গালীবাবু!

কিন্তু এই নাট্যকারের বিদ্যা চরমে (Climaxএ) উঠিয়াছে, শম্বুক-বধের দৃশ্যে। পূর্ব্বে রামকে দেখিলাম তিনি বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথের ন্যায় একজন পত্নীহারা বাঙ্গালীবাবু, আর এখানে তিনি একজন বিংশ শতাব্দীর Reformer (সমাজ-সংস্কারক)। তিনি সংবাদ পাইলেন দাক্ষিণাত্যে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, আর একজন ব্রাহ্মণ বালক অকালে মরিয়াছে। বশিষ্ঠ ঋষি বলিলেন, একজন শূদ্র দণ্ডকারণ্যে "যাগ" করিয়া সমাজ-শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়াছে তাহার ফলে এই সব দুর্ঘটনা। কিন্তু রামচন্দ্র বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক আর্য্য-নরপতি, তিনি সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্মে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলিলেন,—

"বুঝিতে না পারি
কি হেতু শম্বুক দোষী।
করে মাত্র যাগ যজ্ঞ ধর্ম্ম আচরণ
নিজ রুচি অনুসারে—
* * * *
এই হেতু কেন বা মরিবে ব্রাহ্মণকুমার!"

অথচ তিনি যন্ত্রচালিতের ন্যায় দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়া

নিতান্ত ভীরু কাপুরুষের ন্যায় তাহাকে বধ করিলেন! ইহার চেয়ে hypocrisy আর কি হইতে পারে।

গ্রন্থকারের শাস্ত্রজ্ঞান এতদূর প্রবল যে তিনি তপস্যা আর যাগযজ্ঞের কি প্রভেদ তাহা জানেন না। ত্রেতাযুগে শূদ্রের তপস্যা করা নিষিদ্ধ ছিল, এমন কি ব্রাহ্মণও প্রথমতঃ গার্হস্থ্যধর্ম্ম স্বীকার না করিয়া বানপ্রস্থ বা তপঃসাধন করিতে পারিতেন না। পৃথিবীতে যখন অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার যুগ আসে নাই, তখন সকল দেশের লোকেই ধর্ম্মকে একটা জীবন্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং সেই ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে বা প্রাণ নিতে কুণ্ঠিত হইত না। বেশী দিনের কথা নহে, ইংলণ্ডের Queen Maryর আমলের ইতিহাস একবার স্মরণ কর। ইতিহাসে লেখে যে, রাজ্ঞী মেরীর আদেশে Bishop Latimer, Ridley, Cranmer প্রমুখ শত শত Protestantকে তাঁহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য আগুনে পোড়াইয়া মারা হইয়াছিল। সেই সম্বন্ধে একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন,—"The fierce persecution of the Protestants has given Mary and her advisers an evil reputation in history, which they do not altogether deserve. In the Sixteenth Century it was still thought the business of the state to uphold religious truth and to put down false teaching by the severest means."*

ইহাই যদি ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ধর্ম্মবিশ্বাস হয়, তবে অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষের ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং যখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভারতের State Religion ছিল, যখন হিন্দু নৃপতি সেই ধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন, তখন তিনি প্রজাপুঞ্জের হিতের জন্য শম্বুকের ন্যায় এক বর্ণাশ্রম বিরোধীর প্রাণদণ্ড করিবেন. ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? আজ তুমি সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার চেলা শম্বুকের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া রামচন্দ্রের দেবচরিত্রে মসীলেপন করিয়াছ, কিন্তু তোমার কল্পনাশক্তি এতই ক্ষুদ্র যে তাহা বর্ত্তমান কালেই সীমাবদ্ধ, তাহা সেই দূর অতীত পর্য্যন্ত পৌছাইতে অক্ষম। মহাকবি ভবভূতি এখানে রামচন্দ্রকে কিরূপ আকারে চিত্রিত করিয়াছেন দেখা যাক্।

রামচন্দ্রের রাজত্বে অকাল মৃত্যু ছিল না, কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার মৃতশিশু বক্ষে লইয়া রামচন্দ্রের নিকট নালিশ করিতে আসিলেন। তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া রাম দেখিলেন, শম্বুকনামক একজন শূদ্র—দণ্ডকারণ্যে কঠোর তপস্যা করিতেছে। রাম যখন দৈববাণী দ্বারা এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যকে তাঁহার রাজ্যে অকাল মৃত্যুর কারণ বলিয়া বুঝিলেন, তখন শম্বুকের প্রাণদণ্ড করিলেন। কিন্তু কৃপাণ হস্তে লইলে করুণাময় রামচন্দ্রের হাত কাঁপিয়াছিল, তাই তিনি বলিতেছেন:—রে আমার দক্ষিণ হস্ত! তুমি বিনাদোষে গর্ভবতী জানকীকে বিসর্জ্জন দিতে পারিলে, আর মৃত ব্রাহ্মণ শিশুকে বাঁচাইবার জন্য এই অপরাধী শূদ্র মুনির মস্তক ছেদন করিতে পারিবে না? এখানে কর্ত্তব্যপরায়ণ নরপতি প্রজার মঙ্গলের জন্য অপরাধীর দণ্ড দিলেন, তাঁহার মধ্যে কপটতা বা কাপুরুষতা বিন্দুমাত্রও নাই। সেই ব্রাহ্মণবালক বাঁচিয়া উঠিয়া তাঁহার ন্যায় বিচারের প্রমাণ দিল। শম্বূকও দিব্যদেহ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের স্তব করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে জনস্থানের নানাস্থান দেখাইয়া স্বর্গারোহণ করিল।

কিন্তু এই নাট্যকার তাঁহার reforming zealএর দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাঁহার সৃষ্ট শম্বুকের রামচন্দ্রের প্রতি কিরূপ হলাহল উদ্গীরণ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

রাম। ভাঙ্গিয়াছ সমাজশৃঙ্খলা
বর্ণাশ্রমদ্রোহী তুমি
অনাচারী, তব যাগ-যজ্ঞ ফলে
মরিয়াছে ব্রাহ্মণকুমার
দাক্ষিণাত্যে হইয়াছে অনাবৃষ্টি—

শম্বূক। তুমি শক্তিহীনা
রাজ্যে অকাল-মরণ
এ সকল মম অনাচারে
ঠিক্ জান তুমি?

* An Advanced History of Great Britain (p. 365) By T. F. Tout.

হেন যুক্তিহীন বাণী
মুখে তুমি উচ্চারণ করিলে কেমনে
নরেশ্বর! এই কি গো
ন্যায়নিষ্ঠা তব?
অথবা সে জানকীরে
নির্ব্বাসিত করি, ছন্নমতি তুমি
সেই হেতু হেন কথা কহ—

রাম। শূদ্ররাজ!
বাগ্‌বিতণ্ডায় নাহি প্রয়োজন।
বিচার হইয়া গেছে তব
দণ্ড দিতে আসিয়াছি এবে।

শম্বুক। রাজদণ্ডে মরিতে বসেছি
তবু রাম, হাসি পায়
শুনিয়া তোমার কথা।
দোষী নিজে জানিল না কি অভিযোগ,
বিচার হইয়া গেল তবু!
এ ত বড় অদ্ভুত বিচাব!
দুঃখ হয় তোমার এ অধঃপাতে
নেহারি নয়নে হে রাঘব!
যৌবনের সে প্রতিভা
এমনই কি নষ্ট হয়ে গেছে
কিছু তার নাই?
যে সতীর তেজে ছিলে তেজস্বী রাঘব,
সেই সীতা হারা হয়ে
এ দুর্দ্দশা তব!

এখানে নাট্যকার রামচন্দ্র সম্বন্ধে নিজে যাহা বিশ্বাস করেন বোধ হয় তাহাই শম্বুকের মুখ দিয়া বাহির করিয়াছেন। নচেৎ এ সকল কথা এমন করিয়া পাড়িয়া রামচরিত্রে অযথা মসীলেপন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার রাম শম্বুকের কথার কোন জবাব দিতে না পারিয়া যেন এইরূপ ব্যক্তিগত আক্রমণের প্রতি-হিংসায় জলিতে জলিতে নিতান্ত ভীরুর ন্যায় শম্বুককে তাহার স্ত্রীর সম্মুখে হত্যা করিলেন! রামের পক্ষে গ্রন্থ-কারের আক্রোশ এত অধিক যে কেবল শম্বুককে দিয়া নহে, তাহার একটি স্ত্রী-চরিত্র কল্পনা করিয়া তাহা দ্বারাও রামকে যতদূর সম্ভব গালি দিয়াছেন!

রামচন্দ্রের মুখ দিয়া বাহির করা হইয়াছে—
"বিচার হইয়া গেছে তব
দণ্ড দিতে আসিয়াছি এবে।"
ইহার উত্তরে শম্বুককে দিয়া বলান হইয়াছে—
"দোষী নিজে জানিল না কিবা অভিযোগ
বিচার হইয়া গেল তবু।"

এই কথোপকথনদ্বারা রামচন্দ্রকে নিতান্ত gratuitously insult করা হইয়াছে। তখনকার দিনে শূদ্রের তপস্যা সমাজদ্রোহ এবং রাজদ্রোহ বলিয়া গণ্য হইত; রাম ত নিজে স্বচক্ষে শম্বুককে "যাগযজ্ঞ" করিতে দেখিলেন, ইহাতে শম্বুকেব অসাক্ষাতে আবার বিচার কিরূপে হইল? দণ্ডদাতা রাজা যদি নিজে কাহাকেও অপরাধ করিতে দেখেন আর সেই অপরাধী যদি নিজের কৃতকার্য্য স্বীকার করে তবে তাহার আবার প্রমাণেব দরকার কি?

কেহ কেহ বলেন, এই সকল উক্তি প্রত্যুক্তিতে বর্ত্তমান সময়োপযোগী একটা political tinge আছে, অর্থাৎ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিনা বিচারে অনেকগুলি লোককে ordinance জারি করিয়া যে জেলে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন, এখানে তাহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আপন নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করার কথা অনেকে শুনিয়াছেন, কিন্তু আপন পূজনীয় পিতৃপুরুষ বা হৃদয়ারাধ্য দেবতার নাক কাটিয়া অপরের যাত্রাভঙ্গ বোধহয় আজ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই। যে গ্রন্থকার তাঁহার স্বজাতির আরাধ্য দেবতাকে এইরূপে সর্ব্বসমক্ষে ঘৃণিত আকারে চিত্রিত করিয়া অপরকে ঠাট্টা করিতে চান, তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করা করা যায় না। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য, এ কথাটা তাঁহার মনে একবারও আসিল না যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই শ্লেষবাক্যে জব্দ হওয়া দূরে থাকুক বরং অনায়াসেই একথা বলিতে পারেন,—তোমাদের রামরাজ্যে যখন এইরূপ ন্যায় বিচার হইত তখন তোমাদের দেশে ত ইহার পুরাতন নজিরই রহিয়াছে, কেবল আমাদের দোষ দাও কেন?

যাহা হউক, শ্রীরামচন্দ্রের সীতা নির্ব্বাসন তাঁহার জীবনের এক ট্রাজেডি। কিন্তু সেই মহাপুরুষ এই বিরাট দুঃখকে একজন বিরাট পুরুষের ন্যায়ই বরণ করিয়া লইয়া-

ছিলেন। যে সীতা তাঁহার "নয়নের অমৃতবর্ত্তি" "হৃদয়ের বিশ্রাম" "জীবনের আলোক,—যে সীতার শোকে অধীর হইয়া তিনি সুগ্রীবের সাহায্যলাভার্থ অন্যায়-সমরে বালি-বধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই—যাঁহার উদ্ধারের জন্য সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়াছিলেন, সবংশে রাবণবধ করিয়াছিলেন, লঙ্কাপুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন—সেই প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা সতীসাধ্বী পত্নীকে আসন্ন প্রসববস্থায় তিনি বনবাসে প্রেরণ করিলেন। ইহার কারণ রামচন্দ্র যেমন একজন আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পতি, তেমনি একজন আদর্শ রাজা। রাজা আছেন কেন? না প্রজার হিতের জন্য। ইহাই ভারতের প্রাচীন রাজধর্ম্ম। আদর্শ নরপতি রামচন্দ্র নিজের আচরণদ্বারা জগৎকে দেখাইয়াছেন যে, রাজা যদি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রজাপুঞ্জকে পার্থিব উন্নতি ও নৈতিক কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার নিজেকেও সেই শাসনাধীনে থাকিতে হইবে। যদি তিনি ন্যায় ও ধর্ম্মপরায়ণ নৃপতি হন, তবে তাঁহার কঠোর দণ্ডনীতি তাঁহার নিজেকে অথবা তাঁহার আত্মতুল্য যে কোন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করিবে না। সীতা যেমন রামময়-জীবিতা ছিলেন, রামও সেইরূপ সীতাময়-জীবন ছিলেন। সেই আদর্শ পতিপ্রাণা সীতার সহিত সেই আদর্শ-পতি রামচন্দ্রের সম্পূর্ণরূপে একাত্মতা জন্মিয়াছিল। তাই রাম সীতাকে বা সীতা রামকে পৃথক্ ব্যক্তি মনে করিতেন না। সুতরাং রাম সীতাকে বর্জ্জন করিয়া তাঁহার রাজোচিত কর্ত্তব্যের নিকট নিজেকেই বলিদান করিয়াছিলেন। সীতাও তাহা বিশেষরূপে জানিতেন, সে জন্য নির্ব্বাসিতা হইয়া নিজের ভাগ্যেরই দোষ দিয়াছিলেন, কদাচ রামচন্দ্রের নিন্দা করেন নাই। আবার যখন তিনি পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি জন্মে জন্মে রামই যেন তাঁহার পতি হন ইহা কামনা করিয়া রামের চরণে নয়ন-যুগল স্থাপিত করিয়া মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে রামচন্দ্রের পতিধর্ম্ম তাঁহার রাজধর্ম্মের নিকট ম্লান হইয়াছে। সীতাপতি রাম নরপতি রামের ছায়ায় কতকটা ঢাকা পড়িয়াছেন। একজন যত বড় মহাত্মাই হউন, তাঁহার একই জীবনে তাঁহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার আদর্শ রক্ষা করা বোধহয় সম্ভবপর নহে, এতদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

কবীরের কৈফেয়ৎ

শ্রীকালিদাস রায় বি, এ, কবিশেখর

তোমার প্রেমেতে ডুবে থাকি বলে' লোকে কয় অপদার্থ
তোমার প্রেমের ব্যথা সই তাই লোকে কয় আমি আর্ত্ত।
তব প্রেমে আমি বদ্ধ বলিয়া লোকে ভাবে মোরে বন্দী
পাগল আখ্যা পেয়েছি হে নাথ হয়ে তব প্রেমানন্দী।
তব প্রেম ছাড়া কি যে পদার্থ জানিনাক আছে বিশ্বে,
জানি প্রভু তব প্রেমধনে ধনী করেছ এ দীন নিঃস্বে

লোকে যা বলুক আর্ত্ত নইক লভেছি পরমানন্দ,
লোকের চক্ষে বন্দী হলেও টুটেছে আমার বন্ধ।
তুমি জানো প্রভু সত্যই আমি পাগল বা প্রকৃতিস্থ
বন্দীই হই পাগ্‌লাই হই লভিতেছি শুভাশীস্ ত!
মানুষ আমারে যত ঘৃণা করে, তত হই প্রভু ধন্য—
লোকের হেলার আড়ালে তত হই শ্রীচরণাসন্ন।
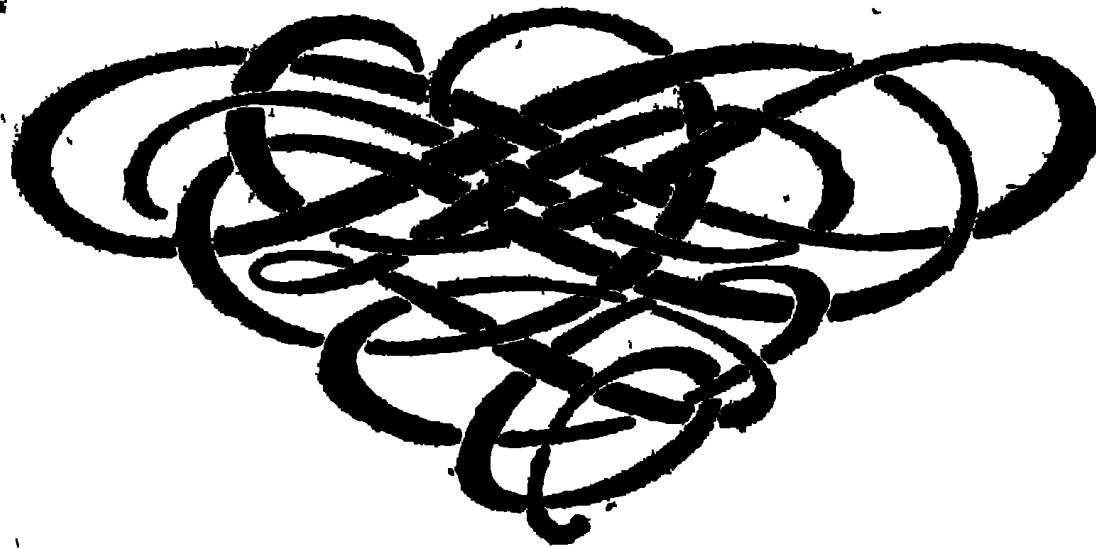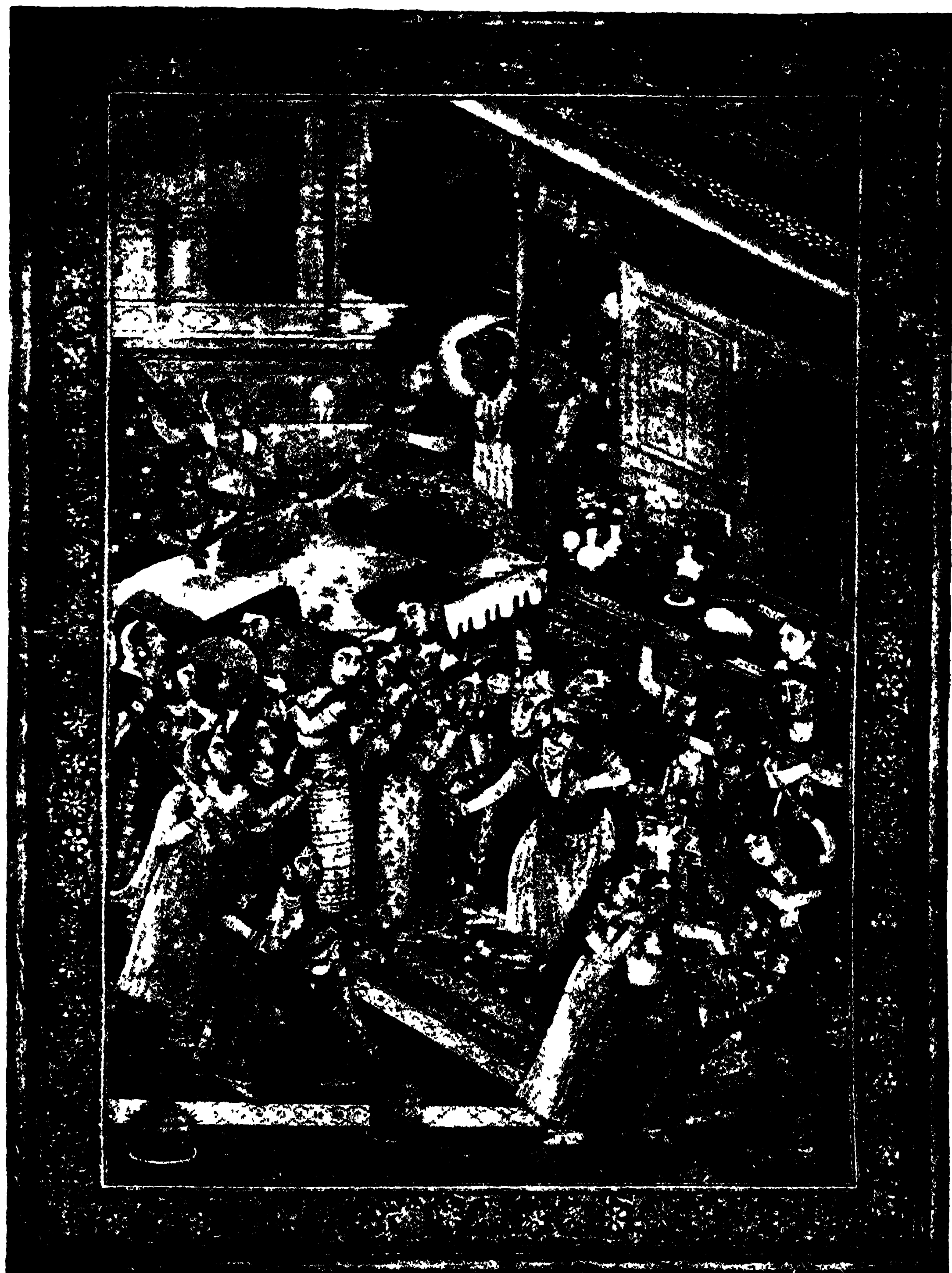
সম্রাট আকবরের হারেমে হোলী উৎসব

গল্প

আহুতি

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

আমার কথায় আপত্তি করিয়া মা স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিলেন ; না উপেন, তা কোন মতেই হতে পারে না। অমিকে ছেড়ে থাকা যে আমার পক্ষে কতখানি কষ্টকর, কতখানি অসম্ভব, তা তুই কোন দিন হয়তো স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবি না। আঘাত খেয়ে খেয়ে যাদের পবিত্র স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে যাবার রাস্তায় অনেকখানি এগিয়ে এসেছে, তারা ভিন্ন কেউ বুঝতে পারবে না, কি বেদনা! কি দুঃখ দিনরাত্রি আমাকে উদ্ভ্রান্ত করে রেখেচে।

তা হলে তোমার ইচ্ছে অমি একটা পাড়াগেঁয়ে ভূত ও আস্ত গণ্ডমূর্খ হ'য়ে থাক্। তোমার অন্তরের অন্যায় দুর্ব্বলতার জন্য মা হ'য়ে ছেলের ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট করে দিতে চাও বল? তোমার স্নেহাঞ্চল ছায় যদি আর কিছুদিন সে, এমনি করে তার শিক্ষার অমূল্য সময় নষ্ট হতে দেয়—তা হ'লে মা, আমি সত্যি বলচি, সে ত ভদ্র-সমাজে মিশতে পারবে না, উপরন্তু চোর, ডাকাত হ'বে। যখন সে, নিজের অবস্থা বুঝ্‌তে শিখ্‌বে, তখন তোমাকেই অভিশাপ দেবে। তখন এই স্বহস্তে গঠিত মূর্খ পুত্রের ব্যবহারে অস্থির হ'য়ে উঠতে হবে, এ কথা ধ্রুবসত্য মনে রে'খ মা।

আমার উত্তর শুনিয়া কি জানি, মা ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। তাঁহার নয়নকোণে একটা তীব্র আলোক রশ্মি দেখা দিয়া তখনি মিলাইয়া গেল। তিনি বলিলেন, ছেলের ভবিষ্যতের দিকে চেয়েই মায়ের দল, তাঁদের আহার, নিদ্রা, সুখ, ঐশ্বর্য্য চিরদিন অম্লানবদনে, হাসিমুখে অগ্রাহ্য করে আস্‌চে। নিজের জীবন তুচ্ছ করে বুকের শোণিত দিয়ে তাদের মানুষ করে তোলবার কতখানি আগ্রহ, কতখানি উদ্বেগ, কতখানি করুণা, যে মাতৃহৃদয়ে ভরা থাকে তা, বোঝবার মত সৌভাগ্য যদি ভগবান্ কোনদিন দেন, তবেই বুঝ্‌তে পারবে। এবং যখন তারা সত্যিকার মায়ের অজস্র প্রবাহিত স্নেহধারা দেখ্‌তে পায়, তখন উপেন, তাদের তর্ক করবার নির্ব্বোধ শক্তি, পরামর্শ দেবার হাস্যকর প্রগলভতা, বোঝাবার মত অযোগ্য যুক্তি ঘৃণায় লজ্জায় মাটির ধূলার সঙ্গে আত্মগোপন করতে অধীর হয়ে উঠে। মনে রাখিস্, এর চেয়ে বড় সত্যি কথা তোর মা আর কিছু জানে না। কিন্তু, এটাও খুব সত্যি যখন তারা বুঝতে পারে তখন মাতৃত্বের পবিত্র সিংহাসনখানি বিদ্রোহীর ভীষণ অত্যাচারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। সেখানে শুধু পড়িয়া থাকে—উৎপীড়িত স্নেহের ব্যথিত ক্রন্দন! বলিতে বলিতে, মার নয়নদ্বয় অশ্রু সমাচ্ছন্ন হইয়া কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। তিনি আর কোন কথা বলিতে পারি-লেন না।

আমি অস্পষ্ট বিরক্তি-সূচক কণ্ঠে বলিতে বলিতে আসিলাম, তোমাদের মত মায়েদের স্বার্থপর ভালবাসাই, জাতির ও দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

২

যাদবপুর নদীয়া জেলার মধ্যে একটী ব্রাহ্মণ-প্রধান ক্ষুদ্র-গ্রাম। এই গ্রামেই আমাদের সাত পুরুষের বাস। ষ্টেশন হইতে যাদবপুর প্রায় দুই ক্রোশ ব্যবধান। গ্রামের সে সমৃদ্ধি ঐশ্বর্য্য এখন আর কিছু নাই। শুনিয়াছি, একদিন নাকি যাদবপুরে আশ্বিনের আরম্ভে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত। প্রভাতেব হিম-সিক্ত বাতাসের মধ্যে, বিহঙ্গমের আগমনী সঙ্গীতধারার মধ্যে, রক্তবৃন্ত সেফালি-আস্তীর্ণ পথে, রক্তজবার আনন্দ-চঞ্চল হিল্লোলের মধ্য দিয়া মা মহামায়া গ্রামের পঞ্চাশখানি বাড়ী সমুজ্জ্বল করিয়া আসিতেন। এখন পঞ্চাশখানির জায়গায় পাঁচ-খানিতেও আসেন না। ক্ষুদ্র শান্তিপূর্ণ যাদবপুর যাহাদের বক্ষে ধারণ করিয়া যৌবন-আনন্দে টল্‌মল্ করিত তাহাদের অনেকেরই বংশ, ভীষণ ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে লোপ পাইয়াছে। যাহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছিল, তাহাদেরই নাকি বংশধরগণ গৃহশূন্য, আত্মীয়শূন্য, হইয়া অভিশপ্ত জাতির মত কোন প্রকাবে বাঁচিয়া আছে।

আমার পিতা ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল। অনেক টাকা তিনি উপার্জ্জন করতেন। তাঁর দান ছিল এত বেশী, যে তিনি নিজে তেমন বিষয় সম্পত্তি করে যেতে পারেন নাই। তাঁকে একা কার্য্যোপলক্ষে বাধ্য হ'য়ে কলিকাতায় থাক্‌তে হ'ত। সপরিবারে কলিকাতা বাস, ইংরাজি শিক্ষা করিয়াও সভ্যতার উন্নতির দিনে তিনি মোটেই পছন্দ কর্‌তেন না। দেশের দিকেই তাঁর যথেষ্ট টান ছিল। তিনি বল্‌তেন, একবার দেশ ছাড়্‌লে আর ফিরতে পারা অসম্ভব হ'বে। আমি ছিলাম বাড়ীর বড় ছেলে। সুতরাং পিতামাতার স্নেহ, ভালবাসা সর্ব্বদিক দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করে রাখ্‌তে এতটুকু ক্রটী করত না। তখন জান্‌তাম না, এই অনাবিল স্নেহ-বন্যা আমাকে অসংযত, উদ্দাম, উদ্ধত করে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে। অনেক সময় আমার মনে হ'য়েছে, আমার ছেলের হয়ে জন্মানটাতে যেন, তাঁদের একটা প্রকাণ্ড উপকার করা হ'য়েছে, এবং এই উপকারের প্রতিদান দেওয়া বাপমার একমাত্র কর্ত্তব্যকার্য্য। তাঁরা আমাকে স্নেহ কর্‌বার, ভাল-বাস্‌বার যে নির্ব্বিরোধ অধিকার পেয়েছেন, এটাই তাঁদের পক্ষে দাবীর চেয়ে ঢের বেশী!

আলালের ঘরের দুলালের মত আমার শৈশব অপ্রতিহত অসংযত স্রোতের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হ'য়েছিল। কোন প্রকার প্রতিবাদ বা বাধা কাহারও নিকট হ'তে সহ্য করা আমার অভ্যাসের অনেক বাহিরে চলে গিয়েছিল। অবাধ্যতা, একগুঁয়েমি, আমার বুদ্ধিমত্তা, ভবিষ্যতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হ'বার লক্ষণের ভিতর পড়ে গিয়েছিল। আমার অন্যায়গুলা নানা বিশেষণে পরিশোভিত হ'য়ে আমার মায়ের কাণের কাছে প্রতিবেশী ও আত্মীয়গণের দ্বারা সর্ব্বদা ঝঙ্কৃত হ'তো। পূর্ব্বেই বলেছি, আমি ছিলাম বাড়ীর বড় ছেলে—মা বুঝতে পারতেন না, যে এত স্নেহ, এত ভালবাসা, এত অন্যায় প্রশ্রয়, একদিন সুদ সমেত নির্লজ্জ স্বার্থপরতা—শাসনের অনেক দূর থেকে তাঁকে যে ভীষণ আঘাত করবে, তাকে বাঁধা দেবার কোন শক্তিই তিনি তার অজস্র করুণাধারার মধ্যে সহস্র চেষ্টায় অনুসন্ধান করে বার কর্‌তে পার্‌বেন না। ভগ্নপাত্রে তখন আর কোন রসেরই স্থান থাকবে না! যাহা জগতে বিনা আয়াসে, অতি সহজে পাওয়া বায়, বুঝি তাহার মর্য্যাদা কেহই করে না! অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, অবহেলার দারুণ নিষ্পেষণের মধ্যে তাহার বিকাশ স্ফুর্তি লাভ করে না।

আমার লেখা-পড়া তেমন হচ্ছেনা দেখে, বাবা আমাকে কল্‌কাতায় নিয়ে গেলেন। সহরের সভ্যতার মধ্যে পড়া-শুনা যেমন চল্‌তে লাগল সঙ্গে সঙ্গে বাবুয়ানী পুরাদস্তুর আমাকে আঁকড়ে ধরলে। বাবা প্রতি সপ্তাহে প্রায় দেশে গিয়ে থাকেন। বাবার অবর্ত্তমানে আমার বন্ধু-বান্ধবেরা এসে বাসায় মজলিস বসান। জটলা পাকান। চা, কেক্, চপ্, কাটলেটের শ্রাদ্ধ করেন। খরচাটা কিন্তু, সমস্তই আমাকে বহন করতে হয়—কারণ (position) রাখাই হ'চ্ছে সহরে একটা বড় সম্মান। তারপর, আমার বাবা হচ্ছেন হাইকোর্টের একজন বড় নামজাদা উকীল। আমাকেও অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হ'য়ে এঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হতো—সেজন্য টাকার বিশেষ প্রয়োজন হ'তো। নানা অছিলায় বাবার নিকট হ'তে

টাকা আদায় কর্‌তে হ'তো। বাবা উকীল হ'লে কি হয়? স্নেহের দাবী বিশ্বমানবের পিতৃত্বে ও মাতৃত্বে চক্ষে এমন রঙ্গীণ মোহের পর্দ্দা খাটিয়ে রেখেছে, যে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। আমি অল্পে অল্পে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে বেশ সৌখীনবাবু বনে উঠলাম। দেশের, মা, ভাই বোনের কথা ক্রমেই ভুলে আস্‌তে লাগ্‌লাম। ছুটি-ছাটা উপলক্ষেও বাড়ী যেতে ইচ্ছা বড় হতো না। বাবার ভয়ে বাড়ী যদিও যেতাম, সেখানে বড় ভাল লাগ্‌ত না। পালিয়ে আস্‌বার জন্য সর্ব্বদা ছট্‌ফট্‌ কর্‌তাম। নানা অছিলায় পড়া-শুনার ক্ষতি হ'চ্ছে জানিয়ে ছুটি শেষ হবার আগেই চলে আস্‌তাম। জন্মভূমির উপর এম্‌নি করেই আমার শ্রদ্ধা কমে আস্‌ছিল, সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনের উপরেও মায়া মমতা, শ্রদ্ধা ভক্তি হ্রাস পেতে লাগ্‌ল।

এই সব বিষয় যখন বুঝ্‌তে পেরে ছিলাম, তার পূর্ব্বে ঘটনাই আজ আপনাদের বল্‌তে বসেচি। আগের অপরাধটা বল্‌তে গিয়ে, শেষের অনুতাপটা মাথা ঝাড়া দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চায়।

৩

বাবার কাছে থেকেই এম, এ, পর্য্যন্ত পাশ কর্‌লাম। শিক্ষিত বলে খুব একটা নাম গ্রামময় রাষ্ট হলো। এমন ছেলে আজকাল দেখা যায় না, হাইকোর্টের জজ যে খুব শীগ্‌গীর হব এমন অভিমত প্রকাশ কর্‌তে কেহ একটু দ্বিধা পর্য্যন্ত কর্‌লে না। বিয়ের বাজার তখন খুবই চড়াদরে চল্‌ছিল—স্নুতরাং আমার মত চার-চরটে পাশ করা ছেলে 'সোঁদা' থাকৃতে পারে না। বিয়ের বীজাণু আমায় শরীরের মধ্যে খুব সত্বর প্রবেশ করানো অত্যন্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে,—এ সংবাদ বাবার নিকট প্রতিদিন সকাল বিকাল ঘটক্‌ ও ঘটকিগণ জানাইতে লাগিল। মার সঙ্গে এ বিষয় বাবা একটা পরামর্শ বোধহয় করেন নি। কারণ মাব ইচ্ছা ছিল, সকলের পাশ করা ছেলে যেমন শ্বশুরের নিকট হ'তে একটা নূতন সংসারের সমস্ত আস্‌বাবপত্র আদায় করে আনে আমিও সে পদ্ধতির মর্য্যাদ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব। কিন্তু, বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। পূর্ব্বেই বলেছি, বাবা খুব সাদাসিদে রকমের মানুষ ছিলেন। এক ভদ্র-লোকের কন্যা দেখিয়া সেই দিনই, একেবারে কথা পাকা করিয়া বাসায় ফিরিলেন। মাকে পত্র দিলেন—মার অনেক আপত্তি উপর, আমাকে জীবন-সংগ্রামের রথে জুতে দেওয়া হ'লো। আমার শ্বশুরের তেমন টাকাকড়ি ছিল না, স্নুতরাং আমি বিবাহ করিয়া বড় কিছু পাইলাম না। মার মনে মনে বড়ই অভিমান হলো। আমার বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই বাবা হঠাৎ সর্দ্দিগর্ম্মী হ'য়ে মারা পড়েন। মা কলিকাতার বাসা তুলিয়া কলিকাতার উপর বিষম চটিয়া বৌ লইয়া দেশে চলিয়া গেলেন।

৪

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। মা ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী ও বিদূষী। আমার দাদামশায় স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। মা তার একমাত্র কন্যা। বাড়ীতে পণ্ডিত রাখিয়া মাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। আমি এম, এ, পাশ কর্‌লে কি হয়? মার সঙ্গে কতদিন তর্ক করতে গিয়ে হেরে—অভিমানে গর্‌গর্‌ করে রণে ভঙ্গ দিয়েছি।

টাকার অভাবে আমার আর 'ল' পড়ার স্নুবিধা হলো না। একদিন মাকে বল্লাম, মা কলিকাতা গিয়ে না হয় একটি 'প্রাইভেট টিউসন্‌' করে আমার পড়ার খরচ এক রকম করে চালিয়ে নেব এখন।

মা বল্লেন, তাতে সংসারের কি লাভ হবে? এত বড় সংসার কে চালাবে? তিনি ত আর জমিদারী রেখে যান নাই, যে সেখান থেকে হুকুম কর্‌লেই টাকা আসবে। তোমার সংসার, এখন তোমাকে চালাতে হবে। এখন সংসার বেড়ে চলবার দিন এসে পড়েছে—তোমার ভার তোমাকে নিতে হবে বাবা উপেন।

আমি একটু উত্তেজিতকণ্ঠে বল্লাম—আমার কিসের সংসার? তোমরা বিয়ে দিয়েছ, তোমাদের সে ভার বইতে হবে। আমার একটা পেট, যেমন করে হোক চলে যাবে? সংসার-টংসার কিছু আমার দরকার নেই।

অবাক কল্লি যে উপেন! সংসার তোর নয়, তবে কি আমার? সংসারের যত প্রয়োজন, সব আমার জন্য—এই হতভাগিনী বিধবার নিমিত্ত! অনেক টাকা ব্যয় করে

তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তা' বেশ শিক্ষা হয়েছে! কেমন করে তুই আমার মুখের উপর এত বড় কথাটা বল্‌তে সাহস পেলি উপেন, সে কথাটা ভাবতেও যে আমার সমস্ত অন্তরটা ভীষণ মর্ম্মবেদনায় একেবারে ভেঙ্গে পড়্‌চে রে? আশ্চর্য্যের বিষয়, এত বড় অন্যায় কথাটা উচ্চারণ কর্‌তে তোর প্রাণে কি এতটুকু কষ্ট হ'লো না? না, না, তোর কোন অপরাধ নাই, অজস্র স্নেহ, নির্ব্বিরোধ অনুযোগ, আব্দার, নির্ব্বিচারে গ্রহণ করার শেষ পরিণাম এর চেয়ে বড় বেশী আর কি হ'তে পারে উপেন? আমি তোর গর্ভধারিণী, মা, বিধবা, নিঃসহায়া অবলা, তুই আমার বড় ছেলে, তবুও পৃথিবীতে তোকে একা ছাড়া তুই আর দ্বিতীয় মানুষ খুঁজে পেলি না? তখন এ কথা নিশ্চয় সবাইকে স্বীকার কর্‌তেই হবে, মার চেয়ে পৃথিবীর সহ্যশক্তি কোনদিক্ দিয়ে বেশী বলা চলে না। তুই তোর ছোট ভাই,—যে দাদা বল্‌তে অজ্ঞান, তোর ছোট বোন, দাদা বাড়ী আস্‌চে শু'নে রাস্তায় গিয়ে কি আনন্দে পথ চেয়ে অপেক্ষা করে—তাদের কথা একেবারে, মনের বাহিরে ছুড়ে ফেলে দিতে পেরেচিস্ এ তোর কম বাহাদুরী নয় রে উপেন!

মার কথায় প্রথমটা কোন উত্তর দিতে পার্‌লাম না। মনে মনে ভাবলাম—উত্তর দিতে না পারাই হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়—সত্য যা, আমার অন্তরের প্রকৃত ইচ্ছা যা, তাকে গোপন করে অন্যায় মিথ্যার সাহায্যে মাতৃ-ভক্তি, ভালবাসা, প্রণয় দেখান হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা। লেখা-পড়া শিখে আমাকে যদি মা, বোন, ভাই এঁদের সঙ্গে প্রতারণা কর্‌তে হয় তার চেয়ে পাপ নাই! তার চেয়ে অধর্ম্ম নাই! মার চক্ষের জলে, বা দুঃখে যদি আমাকে সত্য বিসর্জ্জন দিতে হয় তা হ'লে আমার মনুষ্যত্ব কোথায়? আমার লেখা-পড়া শেখার মূল্য কি? সাধারণ অশিক্ষিত ব্যক্তিতে আমাতে প্রভেদ কি? ছোট ভাই, ছোট ভাই-ই আছে, ছোট বোন, ছোট বোনই আছে এবং পরেও থাকবে, তাহাদের জন্মগত সম্পর্ক ত আর আমি লোপ কর্‌তে যাচ্চি না? যে যার পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে—পরের, আত্মীয়ের সাহায্যর উপর নির্ভর করে, এ জাতটা একেবারে অধঃপতিত হ'য়ে ধ্বংশের মুখে ছুটে চলেছে—স্নেহ, মায়া, মমতা, কেবলই দুর্ব্বলতার নামান্তর ভিন্ন আর কিছু না? না, এসব মত আমি কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারব না। একমাত্র স্ত্রী অগ্নিসাক্ষী করে, যার ভার নেবার সত্য করেচি, তাকে ছাড়া আর কারো জন্য ভাবা বা ভার গ্রহণ করা আমার কর্ত্তব্য নয়। এত বড় স্বাধীন জাতি ইংরাজ, তাদের মধ্যে এইরূপ দুর্ব্বলতা নাই বলেই তারা আজ বিশ্বের মধ্যে এত বড় জাতি বলে পরিচিত হতে পেরেচে!

* * * *

পরদিন সকালের গাড়ীতে উপেন কাহাকেও কোন কথা বা কাহারও কোন মত নেওয়া প্রয়োজন মনে না করে, স্ত্রীকে সঙ্গে করে কলিকাতা চলিয়া গেল।

যাইবার সময় উপেনের জননী আনন্দময়ী কোনরূপ আপত্তি কর্‌লেন না। বধূমাতার অঞ্চলে নির্ম্মাল্য বাঁধিয়া দিয়া সজল নয়নে মুখচুম্বন করে, তার মঙ্গল-আশীর্ব্বাদপূর্ণ হাতদুখানি বধূমাতার মস্তকের উপর রেখে, স্নেহাদ্র-কাতরকণ্ঠে ধীরে ধীরে বল্লেন, বৌ-মা আশীর্ব্বাদ করি, উপেনকে নিয়ে সুখে থাকো! তার যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়—সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখো। সে বড় অভিমানী! একটুতে তার রাগ হয়—না বুঝে যা তা বলে বসে, সেজন্য যেন রাগ করো না। আর একটা অনুরোধ! এই অনুরোধটি হয়ত আমার শেষ, তোমাদের কাছে আর আমার কোন প্রার্থনা নেই মা। মাঝে মাঝে, এক একখানা পত্রে তোমরা কেমন থাক লিখে জানাবে! উপেন লিখ্‌তে যদি মানা করে, তাকে লুকিয়ে লিখো, তাতে আমি শ্বাশুড়ী—বল্‌ছি, তোমার কোন পাপ হ'বে না বৌ-মা! বরং তোমার মঙ্গলই হবে। যদি দেখ্ বড় কষ্ট হচ্ছে, উপেন কষ্টে পড়েছে, সেই দণ্ডে আমাকে পত্র দেবে—না হয়—এখানে চলে আসবে,—লজ্জা করো না মা—হাজার অত্যাচারেও বিধাতা তাঁর অজস্র স্নেহ আশীর্ব্বাদ হ'তে মানুষকে কোন দিন বঞ্চিত করেন না। পাষাণের বক্ষ বিদীর্ণ করে যে নদী ধরাবক্ষে নেমে আসে—মানুষের সহস্র অত্যাচারে উৎপীড়িত হ'লেও তার নির্ম্মল বারিরাশি

হ'তে কোন দিন তাহাদের তা দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এ যে বৌ-মা প্রকৃতির পবিত্র প্রসন্নতা, এখানে শুধু আঘাত সহ্য কর্‌বার মত পাষাণ বক্ষ আছে। আঘাত দেবার মত নির্ম্মতা, নিষ্ঠুরতা, স্নেহময়ী প্রকৃতির করুণ অন্তরের অনেক দূরে পড়ে থাকে। শুধু এই কথাটা জেনে রেখো, সহ্য করার মধ্যেই মানুষ গড়ে উঠে, বড় হয়, বিশ্ব-নিয়ন্তার পবিত্র আশীর্ব্বাদ লাভ করে। তা না হ'লে অকৃতজ্ঞ মানুষের অমানুষিক ব্যাভিচার সহ্য করে প্রকৃতি এতদিন বেঁচে থাকতে পারত না। তবে এস মা—

সজল-নয়নে কমলমণি শাশুড়ীর পদধূলি মস্তকে লইয়া গরুর গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

সেদিন গ্রাম্য-পথ ধরিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপেনের গাড়ীখানি দেখা গিয়েছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত আনন্দময়ী অনিমেষনয়নে সেইদিকে তাকাইয়া ছিল। তার মনে হইতেছিল, এতদিনের পরিচিত, এই যে ফল পুষ্প ভারাবনত তরুলতা পরিশোভিত, কত সাধের, কত আদরের যাদবপুর, যার ধূলা মাটি, জল, বাতাস, আকাশ উপেনের অস্থিমজ্জা আচ্ছন্ন করে রয়েছে, যার ছোট বড়, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তার আজন্ম পরিচিত, যার হাঁড়ি, চণ্ডাল, ডোম, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈশ্য সকলের সঙ্গেই তার একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ এতদিন ধ'রে গড়ে উঠেছে, যার পথ, ঘাট, মাঠ, পুষ্করিণী তড়াগ, নদী তার শৈশব যৌবনকে জুড়ে বসে আছে, এদের দিকেও সে, একবার ফিরে চাইলে না? এদের এতদিনের স্মৃতি, একদিনে অনায়াসে মুছে ফেল্‌তে, কেমন করে যে সে পারলে, তা' ভাব্‌তে গিয়ে আনন্দময়ীর নয়ন অশ্রুসমাচ্ছন্ন হয়ে এলো। তাড়াতড়ি অঞ্চলে নয়ন মুছিয়া ফেলিয়া পুত্র ও বধূর মঙ্গলের জন্য করযোড়ে বিধাতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলেন।

ঠিক এমনি সময়, অমিয় এসে ক্ষুদ্র দুই বাহু দিয়া আনন্দময়ীকে জড়াইয়া ধরিল। রোদন-রুদ্ধ-কণ্ঠে বালক জিজ্ঞাসা করলে—মা দাদা কবে আসবে? কই আমাকে কলকাতায় ত নিয়ে গেল না? আমি দাদার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে হাট পর্য্যন্ত গিয়েছিনু। দাদা রাগ করে তাড়িয়ে দিলে—বৌ-দিদি চুপ করে রইল, একটা কথা বললে না। মা, দাদা আবার করে আস্‌বে? তুমি বুঝি আমাকে যেতে দিলে না বলে দাদা রাগ করে চলে গেল? তুমি খালি বল আমাকে ছেড়ে থাকৃতে পারবে না। কেন পারবে না মা? আমি কি চিরকাল তোমার কাছে থাকব? বড় হ'লে, দাদা যেমন চলে গেল—আমিও তেমন চ'লে যাব, তখন কেমন করে থাকৃবে মা? ওই যে মা, আবার তুমি কাঁদচ? তুমি কাঁদলে আমার যে কান্না পায় মা। না মা, মিথ্যে কথা বলছিনু। তুমি না বল্লে, আমি কোথাও যাব না। তোমাকে ছেড়ে আমি যে থাকৃতে পারব না মা।

আনন্দময়ী মনে মনে বলিলেন, ছেলে আর কোনদিন কাছছাড়া করব না? সংসারের বাহিরে বিদেশ ছেলে আল্‌গা ছাড়া পড়ে থাক্‌লে তার মধ্যে মায়া, মমতা, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রস্ফুটিত হবার অবাকাশ পায় না। সংসারের দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বোঝবার মত শক্তির বিকাশ কেমন করে হ'তে পারে? বাহিরের সুন্দর সোজা দিক্‌টা দিয়ে সব বিষয় বিচার করতে শেখে, স্বাধীনতা নিয়ে বড়াই করে—নিজের স্বার্থে অন্ধ হয়ে পড়ে।—তারপর প্রগাঢ় স্নেহে অমিয়র চিবুক স্পর্শ করে, মুখ চুম্বন করলেন।

পশ্চিমদিকের আকাশের কোলে একখানা কাল ছেঁড়া মেঘ ঝুলছিল, সেদিকে, আনন্দময়ীর দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাঁর প্রাণটা যেন আসন্ন-বৃষ্টির আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। অবাধ্য পুত্রের পাছে পথে কষ্ট হয় সেজন্য মার প্রাণ অমনি কাতর প্রার্থনায় দেবতার চরণে লুটাইয়া পড়িল। ক্ষণমুহূর্ত্তে যে আনন্দময়ী মনের অত্যন্ত নিভৃত অঞ্চলে আপনাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে কতই সন্তর্পণে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, উপেনের জন্য আর কোন ভাবনাই ভাব্‌বেন না—একখানা টুকরা মেঘের ভর সে প্রতিজ্ঞার পক্ষে সহ্য করা অসাধ্য হয়ে উঠ্‌ল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিকার চেষ্টা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু, বিধাতা এমনি দুর্ব্বলতা দিয়া জননীর অন্তর সৃষ্টি করেছেন—যে প্রতিকার ত দূরে থাক, সামান্য অনুযোগটি পর্য্যন্ত সে বরদাস্ত করিতে পারে না।

৬

তারপর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। উপেন সেই যে ভাইকে কলিকাতা নিয়ে যেতে এসে বিফল মনোরথ

হ'য়ে ফিরে গেছে,—সেই পর্য্যন্ত আর সে যাদবপুর আসা ত দূরের কথা, যাদবপুরের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনে নাই। স্নেহময়ী, আনন্দময়ী পত্র লিখিয়া লিখিয়া হার মানিয়া গিয়াছেন। আপন গর্ভযাত সন্তানের এই অমানুষিক ব্যবহার তাঁহাকে মর্ম্মান্তিক লাগিয়াছে। এই বেদনার বিরুদ্ধে জননীর প্রাণ কোনদিন বিদ্রোহী হইতে পারে না। সহ্য করাই তার মহত্ব তার মাতৃত্ব! প্রথম প্রথম আপনা-আপনি মনকে কত প্রকারে আশ্বাস দিতেন, ভরসা দিতেন, নিজের অন্যায় বলিয়া কতই না নিজেকে ভৎর্সনা করতেন। কত রাত্রি উপেন ও বধুর চিন্তায় প্রভাত হইয়া যাইত—সামান্য শব্দে কতদিন "উপেন এলি" বলে শয্যার উপর উঠে বসেছেন। তারপর, আবার নিজেকে নিজেই অকারণ উত্তেজনার জন্য তিরস্কার কবেচেন। এমনি করে যখন তার দিন কাটিতেছিল; তখন কলিকাতার বৌবাজার অঞ্চলে উপেন একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে স্ত্রীকে লইয়া সংসার করিতেছিল। কিন্তু, এমনটি বুঝি সব দিন কাহারও চলে না, তাই, উপেনের সুখের পথে একটী পুত্র আসিয়া দেখা দিল। পুত্র পাইয়া উপেন খুবই আনন্দিত হইল। এসংবাদ গ্রামের একটী লোকের মুখে উপেন,মায়ের নিকট পাঠাইয়াছিল। কিন্তু,মায়ের আশীর্ব্বাদ-পত্র আসিলে সে, আর কোন সংবাদ দেয় নাই।

* * * *

সেবার পূজার পূর্ব্বেই যাদবপুরে প্রবল পরাক্রমে ম্যালেরিয়া দেখা দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে আসিল মৃত্যু-নিশ্চয় কালাজ্বর। এই নূতন অতিথির প্রথম পরিচয় ঘটিল বালক অমিয়কুমারের সহিত। গ্রামের ডাক্তারেরা তাঁহাদের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি ব্যয় করেও বিধবার কাতর আবেদন যখন পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইল তখন সকলেই অমিয়-কুমারের জীবনের আশা একরূপ ত্যাগ করিল। জেলা হইতে সাহেব ডাক্তার আনা হইল। তিনি বলিলেন, বায়ু পরিবর্ত্তন করিলে উপকার হ'তে পারে।

আনন্দময়ী যে কি করিবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। স্ত্রীলোক, তার উপর বিধবা—একা কেমন করিয়া পীড়িত পুত্রকে হাওয়া বদলাইতে বাহিরে লইয়া যাইতে পারেন? যদি পথে বা সেখানে কিছু হয়। তবে সে দুঃখ রাখিবার স্থান সারা পৃথিবীর কোথাও খুঁজিয়া পাইবেন না? তাঁর বুক ফাটিয়া কান্না যেন বন্যার মত সমস্ত ভাসাইয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিল। বুদ্ধিমতী আনন্দময়ীর এতদিনের সুদৃঢ় সংযমের বাঁধ স্নেহের আঘাতের নিকট নিরুপায়ভাবে চূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া পড়িল। তিনি সেদিন সজল নয়নে দোয়াত কলম লইয়া পুত্র উপেনকে পত্র লিখিতে বসিলেন। বেদনা-পীড়িত জননীর অন্তরের মর্ম্মবেদনা রক্তাক্ত অক্ষরে পত্রের প্রতি ছত্রে করুণ আহ্বান জাগিয়া উঠিল। অমিয়কে কলিকাতা লইয়া গিয়া চিকিৎসা করান, এটা সে বড় ভাই, তার একান্ত কর্ত্তব্য—টাকার জন্য কোন চিন্তা নাই, আমি দিব। যে দিন আনন্দময়ীর পত্র উপেনের হাতে গিয়া পড়িল, সেদিন, স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির মত একবার উপেন জাগিল। তার শরীরটা যেন কি একটা অজানা চিন্তার আশঙ্কায় কম্পিত হইয়া উঠিল। বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত জীবনের সমস্ত ইতিহাসটা মুহূর্ত্তে সজীবচিত্রের মত তার নয়ন সম্মুখে বিদ্যুতস্ফুরণে বিকশিত হইয়া তখনি মিলাইয়া গেল। এদিকে, উপেনও মনে করিয়াছিল, অমিয়কে কলিকাতা আনিয়া রাখিতে পারিলে—তার স্ত্রী কমলমণির অনেকটা পরিশ্রমের লাঘব হবে। একা দুরন্ত ছেলে সে কোন মতেই সাম্‌লাইতে পারে না। একজন চাকর রাখ্‌তে গেলেও তার খরচ আছে?

* * * *

অনেক দিন হইল অমিয় মায়ের কোল ছাড়িয়া দাদার নিকট কলিকাতায় আসিয়াছে। কিন্তু আজো রোগের কোনপ্রকার উপশম হয় নাই। তার উপর অমিয়র সেবা, তাকুত, যত্ন পথ্যাদির কোন ব্যবস্থা ডাক্তারের আদেশ মত কিছুই হয় না। পরন্তু সারাদিন তাকে প্রায় উপেনের ছেলের তত্ত্বাবধান করিতে হয়। মরণ-বাসরের সদ্য যাত্রী, আনন্দময়ীর মাতৃত্বের পবিত্র নির্ম্মাল্য অমিয়কে। অমিয়র অবস্থা যখন নিতান্ত খারাপ হইয়া আসিল, প্রাণপণ প্রয়াসেও সে যখন ভাইপোকে নিজের সামর্থ মধ্যে আঁটিয়া উঠিতে অপারক হইয়া পড়িল—এবং একদিন শিশু অমিয়র দুর্ব্বল কোল হইতে পড়িয়া মাথা কাটিয়া ফেলিল—সেদিন, কমলমণি অমিয়কে যৎপরনাস্তি ভৎর্সনা করিল, এমন

কি এই মরণোন্মুখ রুগ্ন বালকের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। সেই দিন, রাত্রিতেই অমিয়র সে বাড়ী হইতে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিল। পরদিন রবিবার ছিল। উপেন অমিয়কে যাদবপুরে মায়ের নিকট রাখিয়া আসিতে রওনা হইল।

৮

যাদবপুর ষ্টেশনে একখানি গরুর গাড়িতে অমিয়কে তুলিয়া দিয়া উপেন পদব্রজে বাড়ী চলিল। সেই পুরাতন পথ, সেই পুরাতন বাড়ী ঘর সবই যেন তার মুখের প্রতি তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া অবজ্ঞায় মুখ ফিরাইতেছে। ঘৃণায় বৃক্ষগুলি মাথা নত করিতেছে—গ্রামের পুরাতন বৃদ্ধেরা সকৌতুক-নয়নে কেবল মাত্র তার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিতেছে, কোনপ্রকার কুশল প্রশ্ন করিতেছে না। উপেন এই নীরব তিরস্কারে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে ছিল। উপেন্দ্রের কেবলই মনে হইতে লাগিল—যেন শান্ত পল্লী-শ্রী-মণ্ডিত চির-পরিচিত যাদবপুর তার অবজ্ঞা ও অবহেলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে। সে, কিছুতেই এই নীরব প্রকৃতির মৌণ তিরস্কার বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না। মনে হইতেছিল, এখনি ছুটিয়া পলাইয়া যায়।

এদিকে আজ কয়েকদিন হইতে আনন্দময়ীর প্রাণটা কেমন শূন্য শূন্য মনে হইতেছে। অমিয়র কোন সংবাদ না পাইয়া বড়ই চিন্তান্বিত হইয়াছেন। কয়েক রাত্রি তিনি একবারে চোখে পাতায় মোটেই করিতে পারেন নাই। আহার ত নাই, আকাশে বাতাসে, বিশ্বের কোনখানেই যেন তিনি এতটুকু শান্তির আশ্বাস খুঁজিয়া পাইতেছেন না। শরীরে ও মনে কিছুমাত্র বল নাই—সোলার মত সমস্ত শরীর হাল্কা হইয়া গিয়াছে। আজ ডাকে উপেনের চিঠি না পাইলে, বৈকালে গাড়ীতে তিনি কলিকাতা যাইবেন মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

কিন্তু, কতবার মনে হইতেছিল, যদি সেখানে গিয়া দেখি, বৌ-মা মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে, যদি উপেন আমাকে দেখিয়া আমার সহিত অভিমান করিয়া কথা না বলে, যদি বলে,এতদিন পরে কি করিতে এখানে এলে? ছেলে-বৌ বলে কই এতদিন ত একবার দেখ্‌তে এসো নাই? পৌত্র হইয়াছে—শুনিয়াছিলে, কিন্তু এত রাগ যে, একবার তাকেও দেখ্‌বার ইচ্ছা হ'লো না? 'আমি না হয়—অপরাধ করেচি, তোমার বৌ না হয় তোমার অবাধ্য! কিন্তু, এই নিষ্কলঙ্ক, সরল সুন্দর শিশু—যে পৃথিবীর কোন স্বার্থ-গন্ধ এখন পর্য্যন্ত আঘ্রাণ করে নাই, যার—মুখখানি কুসুমকলিকার মত নির্ম্মল, যার অধরের মধুর হাসি স্বর্গের সুষমা বিকীর্ণ করে, যার ক্ষুদ্র বাহু দুটি তোমার কণ্ঠ বেষ্টন কর্‌বার জন্য প্রসারিত করে—তাকে এ কঠিন শাস্তি দেওয়া তোমার নিশ্চয় উচিত হয় নাই। আনন্দময়ীর প্রাণটা পৌত্রকে মানসনয়নে দেখিতে লাগিল, তাহাকে চাক্ষুস দেখিবার জন্যও তাঁর প্রাণ আগ্রহে আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু—যদি সেখানে গিয়া অমিয়কে দেখিতে না পাই! যদি—না, না, তা হ'তেই পারে না। যদি দেখি আজও চিঠি এলো না তা' হ'লে যতই অপমান হোক আমাকে যেতেই হবে।

এমন সময় শঙ্কিত অন্তরে শুষ্কমুখে,অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে নীরবে উপেন্দ্র বাড়ী গিয়া প্রবেশ করিল। উপেনকে একা আসিতে দেখিবা মাত্র আনন্দময়ী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বেদনা-রুদ্ধ কাতরকণ্ঠে কেবল বলিলেন, অমিয়কে আহুতি দিয়ে এলি উপেন! এরপর বুঝি তাঁর মাতৃ-হৃদয় আব সহ্য করিতে পারিল না। তিনি সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। উপেন তাড়াতাড়ি জননীর মস্তক কোলের উপর তুলিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, অমিয় গরুর গাড়ীতে পশ্চাতে আস্‌ছে—সেই ত আমাকে ফিরিয়ে এনেচে মা—আনন্দময়ী ধীরে ধীরে কেবল মাথা নাড়িলেন—উপেন ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিল, মা! মা! মা! ক্ষীণ কণ্ঠে বুঝি শেষ উত্তর আসিল, না, না, না।

তখন অদূরে অমিয়র গরুর গাড়ীখানি দেখা যাইতেছিল।

পরশ-রতন

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

ওগো, তুমি কি আমার মুখের কথাই মান্‌লে, আমার অন্তরের কামনা কি জান্‌তে পার্‌লে না? আমি যে তোমায় আস্‌তে বারণ ক'রেচি সে যে কত অভিমানে তাকি তুমি বুঝ্‌তে চেষ্টা ক'র্‌লে না? আমার যে সে কথা বল্‌তে পাঁজর ঝাঁঝরা হ'য়ে গেছে, বুক ফেটে গেছে, প্রাণ-ভাঙ্গা বেদনায় চোখে অশ্রুসাগর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেচে তাকি তোমার মনে হোলনা—তার আঘাত কি তোমার হৃদয়ে এক তিলও বাজলো না? আর, কই বারণ ক'রেচি তোমায় আস্‌তে? শুধু ব'লেছিলুম আমায় দয়া কর্‌বার জন্যে এস না, আমায় দর্শন ভিক্ষা দিতে এস না, আমায় অনুগ্রহ কর্‌বার জন্যে এস না। তুমি কেন এলেনা, সব নিষেধ পায়ের তলায় মাড়িয়ে? তুমি কেন বল্‌লেনা, খুব আস্‌বো, একশবার আস্‌বো, কোটিবার আস্‌বো। আমি না দেখে থাকৃতে পারিনি তাই আস্‌বো, আমি দর্শনের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে আস্‌বো, আমি ভালোবেসে আস্‌বো। তুমি কেন আমার অভিমানের মর্য্যাদা রাখ্‌লে না? তুমি যদি তা না রাখ তোমার প্রেমের গর্ব্ব কোথায় থাকবে? তুমি ভালোবাসার অভিমানে কাতর হবে তাইতো অভিমান, তুমি চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেবে তাইতো অভিমান, তুমি বুকে তুলে নেবে তাইতো অভিমান। নয়তো কিসের দাম অভিমানের? তোমাদের খুব বিপদ হ'য়ে গেছে শুন্‌লুম, আমি ভগবানের কাছে লোকান্তরিত আত্মার মঙ্গল ও তোমাদের সান্ত্বনা প্রার্থনা করি। আমি ভুক্তভোগী, একদিন আমার কোল থেকে সন্তান ও আত্মীয়েরা অমরলোকে চ'লে গেছে, আমার শিরা ছিঁড়ে নিয়ে সুতরাং আমি এ আঘাতের ক্ষত কি জালাময় তা জানি! ভেবেছিলুম সন্তানবিরহী হৃদয়ের বুভুক্ষা তোমাকে কোলে নিয়ে মিট্‌বে—ভগবান আমায় সংসার মরুভূমে তোমার মূর্ত্তিতে অমৃতের অনন্তধারা সেচন ক'রেচেন। সে আশা যে উথানেই লয় পাবে, এত বড় অভিশাপ আমার কপালে ছিল—তা কল্পনাও করিনি। এই তো মানবজীবন—চোখের ওপর বুকের মণি একে একে সব ক্রমে ক্রমে স্খলিত হ'চ্চে দেখ্‌চি। তবু আমরা প্রাণের নিধি বার বার পদদলিত ক'র্‌তে উদ্যত, এটা কি ঈশ্বরের অসম্মান নয়? সংসারের সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত মনকে সঞ্জীবিত কর্ব্বার জন্য ভগবান যে প্রেমের সোণার কাঠিটি দিয়েচেন, তাকে আমরা বুকে না ঠেকিয়ে, জীর্ণ-ভগ্ন ধূলিলীন কেন ক'র্‌বো?

তুমি অসুস্থ এ খবর অপরের কাছে আমায় জান্‌তে হোলো এও অদৃষ্টে ছিল। আমি সে খবর পেয়ে পর্য্যন্ত কি রকম ছট্‌ফট্‌ কর্চ্চি, জগদীশ্বর তা কেবল জান্‌চেন। কেউ আমার সঙ্গে কথা বল্‌চে না, কাউকে জিজ্ঞাসাও ক'র্‌তে পাচ্চি না, কি অসহ্য যে এ যন্ত্রণা তা প্রকাশ কর্‌বার মত ভাষা আমার নেই। নিজের বুকে এত ব্যথা, যে কথা কইতেও কষ্ট হয়—কিন্তু বুকের ওপরের সে ব্যথা—তার ভেতরের ব্যথার তুলনায় কী তুচ্ছ! আমি তোমায় তা বোঝাতে পার্‌বো না—আমার চোখের জল দেখ্‌তে পেলে, তার কিছু হয়তো বুঝ্‌তে।

তবু, তুমি সুখে থাক। কি করে এতদিন না দেখে, না কথা ক'য়ে আছ তা একটুও বুঝ্‌তে পারৃচি না গো। তোমার নয়ন কি ভ'রে উঠ্‌চে না জলে, তোমার মন কি একটুও চঞ্চল হ'চ্চে না আস্‌বার জন্যে, তোমার স্বপ্ন কি এই হতভাগ্যের দীন ছবি দেখ্‌তে পাচ্চে না?

তুমি ভালো থাক। আমি চারিদিকেই তোমাকে দেখ্‌চি, আমি দেখা না দেখায় সমান ক'রেচি' আমি তাইতেই জীবনের দুঃখসাগর পার হব। তুমি আমায় যে বড্ড ভালবাস গো, সে কি তুমি মিথ্যা ব'লেছিলে? না-না-না তুমি মিথ্যা ব'ল্‌তে পার না, তুমি ছলনা ক'রৃতে পারনা, ভগবানের সৃজনের প্রশংসাপত্র তুমি, তুমি কি অসরল হ'তে পার? আমার জীবনের সুধাতরঙ্গিণী তুমি, তুমি কি তিক্ত আচরণ ক'রৃতে পার?

বুঝ্‌তে পেরেচি, তুমি আমায় পরীক্ষা কর্‌চো—তুমি আমায় পুড়িয়ে খাঁটি বা মেকী তাই যাচাই ক'রৃতে চাও। সে পরীক্ষায় তোমার প্রেমের লীলা প্রকাশিত হ'চ্চে। কিন্তু কিছু দরকার ছিল না তার, তুমি স্পর্শমণি তুমি একবার ছুঁলেই যে সোণা হ'য়ে যাব। তবু, তোমার ইচ্ছাই জয়ী হোক্‌। আমি যে তোমার লীলাকেই বড় ক'রৃতে চাই।

কাজের কথা
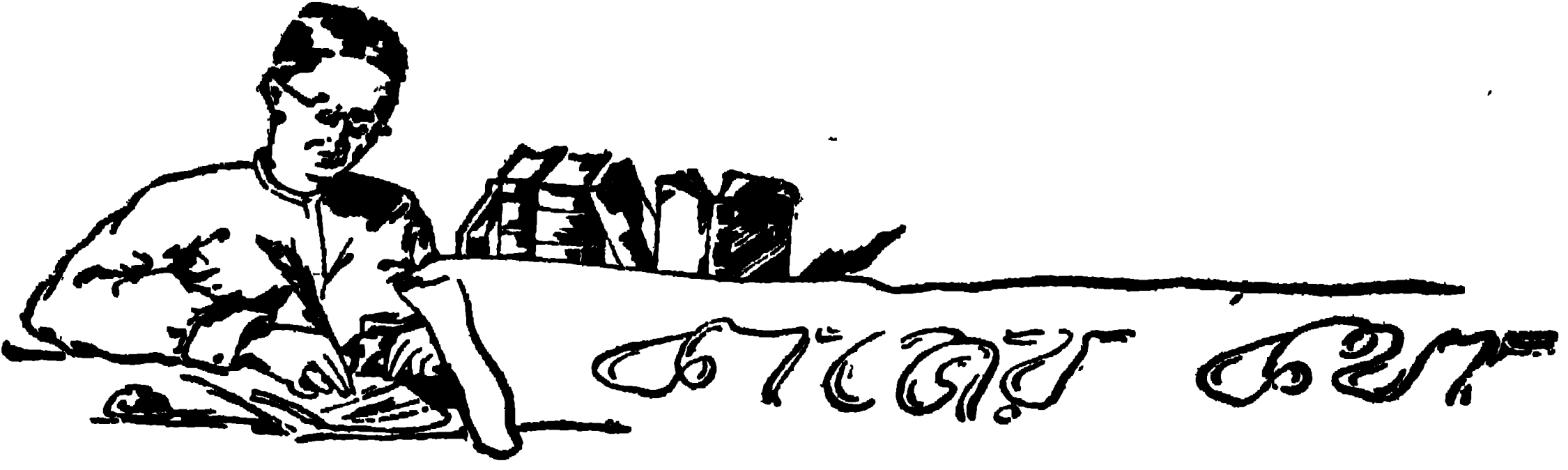
সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ঃ—ভগবৎকৃপায় আরোগ্য লাভ করে ক্রমশঃ স্বাস্থ্যলাভ করেছেন এবং সম্রাজ্ঞী মেরী সহ ভূমধ্য-সাগরে সমুদ্রবায়ু সেবনার্থ জলযানে ভ্রমণ কর্ব্বেন।

শাসক ও মন্ত্রী সমস্যা ঃ—লর্ড রেডিং ভারতীয় অবস্থার আলোচনার জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। বাংলার লাট লর্ড লিটন তাঁহার অনুপস্থিতে ভারতের গবর্ণর জেনারেল হইবেন। লাট লিটনের গদীতে কে বসবেন তা একটা চিন্তার বিষয় হয়ে পড়েছিল—কেউ বলেন সার আব্দর রহিম—কেউ বলেন সার হিউ ষ্টিফেনসন, কেউ গম্ভীরভাবে মিট্‌মিটে চোখে বল্লেন আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি যে "সার চার্লস ইনেস্"—দেখ মজা,— বন থেকে বেরুল টিয়ে

সোণার টোপর মাথায় দিয়ে—

ঠিক হয়েছে; আসামের সার জন কার হলেন বাঙ্গলার বিধাতাপুরুষ, আর তাঁর গদীতে বস্‌বেন সার উইলিয়াম রিড্।

এতে যাঁদের মনে ব্যথা লেগেছে—তাঁদের জন্য আমরা দুঃখিত; বিশেষ করে সার আব্দার রহিমের জন্য। আমাদের সাধ ছিল তিনি গদীতে বসলে শাসন পদ্ধতিতে একটু বাদসাহী আব্‌হাওয়া পাওয়া যাবে, কিন্তু বিধি বাম—পূরিল না মনস্কাম।

সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ চৌধুরী এবং নবাব নবাবআলি চৌধুরী এঁরা দুজনে মন্ত্রীর তক্ত পাইয়াছেন। ইঁহাদের দু'জনার দু'জন বিপরীত ধর্ম্মী সেক্রেটারী থাকিবেন। তবে এবার কাউন্সিলে ইহাঁদের বেতন সম্বন্ধে গোল বাধিলে এই সকল বিভাগ নাকি খাসে চলিয়া যাইবে। এখন দেখা যাক দেশের প্রতিনিধিগণ এই ভয়ে সত্যই ভীত হন কি না। মন্ত্রী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বলবার কিছু নাই যোগ্যং যোগ্যেন যুজয়েৎ।

পূর্ব্বে নবাবআলি সাহেব চাষবাসের মন্ত্রী ছিলেন এবারে তাঁর দপ্তরে শিক্ষাটাও প্রবেশ পাইল। শিক্ষার বিষয়ে তিনি যে খুব ওয়াকিবহাল ব্যক্তি সেটা সাধারণে কিন্তু জানতো না, গোপাল ঠাকুর নৈলে শালুক চেনা কি যার তার কর্ম্ম?

সন্তোষের রাজা বাহাদুরের এইবার মন্ত্রীত্বের হাতে-খড়ি, তিনি কাজে কি রকম কেরামতী দেখান সেটা এরিমধ্যে উৎকণ্ঠার বিষয় হয়ে পড়েছে।

সংস্কার তদন্ত সমিতির রিপোর্ট বাহির হয়েছে ঃ—ডাঃ সাপ্রু, পরাঞ্জপে সার শিবস্বামী আয়ার ও মিঃ জিন্না ব্যতীত সকলেই অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ সভ্যেরা ও বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর সংস্কারের আয়ু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। যাক্, আটাশে ছেলেটী পেঁচোর উপদ্রব সহ্য করেও যে বাঁচবে তা শুনে আমরা খুব খুসী হলুম। তবে এটীকে বাঁচাবার জন্য এঁরা তিনটী মাদুলী ধারণের ব্যবস্থা করেছেন (১ম) আসামের মাছের, চাষবাস ও বনজঙ্গল বিভাগ হস্তান্তরিত করা, (২য়) বিশুদ্ধ ভারতীয় ব্যাপারে বিলাতের ষ্টেট সেক্রেটারির খরদৃষ্টি শিথিলীকরণ (৩য়) মেষ্টন বন্দোবস্ত সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করা।

সল্লা পরামর্শ ঃ—স্বরাজ্যদলের চাঁইয়েরা পাটনায় মুখোমুখী হয়ে স্থির করেছেন—সাবেকের মতই তাঁরা লড়াপেটা কর্ব্বেন, উজীরী তাঁরা নেবেন না—তবে কি ভাবে যে বাধাদান চলবে সে সম্বন্ধে কর্ম্মকর্ত্তারা এখনও কিছু ভাঙ্গেন নি।

ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী—ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক উৎসবে বক্তৃতাকালে মিঃ হেনরী বার্কেসশ ইঞ্জিনিয়ারিংএর সঙ্গে জাতির উন্নতির সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ট তাহা বিসদ ভাবে দেখাইয়া ভারতীয় তরুণ শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন। কার্য্যকরী বিদ্যার সুপ্রয়োগেই ইঞ্জিনিয়ারের কৃতিত্ব। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যও নানা প্রকার উন্নত প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য ব্যতীত চলা সম্ভব নয়। ভারতে আগে যে সব ঘরোয়া নিপুণ কারিকর ছিল এখন তাহা নাই। উন্নত যুগের কারিগরী শিক্ষালয় ভারতে অতি অল্প আছে—যাহারা ইচ্ছুক তেমন শিক্ষার্থীও এসব শিক্ষালয়ে ঢুকিবার সুযোগ সহজে পায় না। ইঞ্জিনিয়ারিং দেশের তরুণদের দারিদ্র্য সমস্যা অন্নাভাব ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লালসা ও তাহার সুপ্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারে সত্য—কিন্তু ইহাতে অপরিসীম ধৈর্য্য থাকা চাই। এ বিভাগের দিকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিক দুয়েরই দৃষ্টি বেশী ভাবে পড়া বাঞ্ছনীয়।

পাশ্চাত্য রেডিও ব্যবসায় ঃ—'রেডিও' 'রেডিও' আমরা শুনি জিনিসটা কি এবং উহার ব্যবসার কি সম্ভাবনা তাহা অনেকেই জানি না। পাঁচ বছর আগে ২০ কোটী ডলার নিয়ে এ কাজ আমেরিকায় আরম্ভ হয়। গত বছর ৩৫ কোটী ডলার এতে খাটিয়াছে। এ বছরে ৫০ কোটী ডলার খাটিবার সম্ভাবনা—পরে দু'এক বছর মধ্যে বিরাট ব্যবসায় হইবার কথা। তিন বছর আগেও ঐ ব্যবসায়ে ১০।১২ জন লোকের বেশী ছিল না এখন এ ব্যবসায়ের উপরেই ৩০০ কারবার চলিতেছে। বাহিরে চালান দিবার জন্যও ঐ পরিমান কারবার চলিতেছে। প্রায় ৩০০,০০০ লোক এই ব্যবসায়ে খাটে—যন্ত্রপাতির কাজেও প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। মোটরকারের ব্যবসায় আজ যেমন ফলাও, এ ব্যবসায়ও শীঘ্রই তেমন হইবে আশা করা যায়। পাশ্চাত্য জাতি আনন্দ উপাদান দিয়া অর্থ লুটিয়া ব্যবসায়ের সঙ্গে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতেছে—আর ভারত—এ সব প্রচেষ্টা কোন কালে তাহার হইবার সম্ভাবনা আছে কি?

সাহিত্য-সাধক জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর নাই ঃ—বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক হাস্যময় মধুর-ভাষী জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর গত পূর্ব্ব বুধবার ইহলোকের মায়া কাটাইয়া পুণ্য ধামে গিয়াছেন। বাংলা দেশের ঠাকুর পরিবার লক্ষী ও সরস্বতীর চিরপ্রিয়—ঠাকুর পরিবারের নরনারীরা নানা উজ্জ্বল উপহারে দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নাথ যে যুগে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন সে সময়ে এ দুর্গম পথের যাত্রী বড় বেশী ছিল না—তাই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পথ প্রদর্শক বলিয়া জ্যোতিরিন্দ্র নাথ দেশবাসীর প্রভূত শ্রদ্ধা পাইয়াছেন, বাংলার নাট্য সাহিত্য—অনুবাদ সাহিত্য জ্যোাতিরিন্দ্র নাথের দ্বারা যথেষ্ট লাভবান হইবার সুযোগ পাইয়াছে। সাধকের মত ইনি সাহিত্যের সাধনা কবিয়াছেন। ইঁহার জীবনের কাম্য ছিল সাহিত্য—তাই সাধনাতে সাহিত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ৭৬ বৎসর বয়সে সাহিত্য-সাধক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহাপ্রয়াণ্য করিলেন—আমবা বেদনা-ভবা-চিত্তে জ্যোতিরিন্দ্র-কথা স্মরণ করিতেছি।

অবিলম্বে ডাক বিভাগের মাশুল কমান আবশ্যক ঃ—ভারতীর ব্যবস্থা পরিষদে এবার পোষ্টাফিসের দ্রব্যাদি যথা—পোষ্টকার্ড খাম প্রভৃতির মাশুল কমাইবার প্রস্তাব উঠে উঠে করিয়াও স্থগিত আছে—সম্ভব শীঘ্রই উঠিবে। প্রস্তাব উঠিলে তাহার পরিণাম কি যে হইবে তাহা দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব আছি। সর্ব্বসাধারণের বিষম অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া আছে এই ডাক ও টেলিগ্রাফ্ বিভাগের মাশুল-বৃদ্ধি। পৃথিবীর সকল সভ্যদেশ যাহা কমাইবার জন্য ব্যগ্র এ দরিদ্র দেশে তাহা আর চালানো সঙ্গত নহে—ইহা রীতিমত জুলুম। এইবারের ব্যবস্থা পরিষদেই অর্থসচিব ও সভ্যেরা একযোগে ইহা কমাইয়া অন্ততঃ পূর্ব্ববৎ করিবেন এই আশা দেশের সকলেই করিতেছে—আশা

করি দেশের সর্ব্বসাধারণের এই অসুবিধা অরণ্যের রোদনের মত কাউন্সিল উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

বায়স্কোপে "বুদ্ধ" ঃ—নামজাদা বক্তা বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের বড় ছেলে শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল বায়স্কোপের বই লেখায় বিলাতে খুব নাম কিনেছেন, সম্প্রতি তিনি ৪জন জার্ম্মাণ ছবি-তুলিয়ে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে আসবার অনুমতি পেয়েছেন—এখানে তাঁহার 'বুদ্ধ' নামক একটী পুস্তকের ছবি তোলা হবে। খুব ধূমধামের সঙ্গেই কাজটী ঘট্‌বে, এদেশের লোকের ভাগ্যে অবশ্য মজুরী কিছু মিলবে, এবং তাঁর পূর্ব্বেকার বইএর ফিল্মগুলিকে সতের বৎসর পরে তারা প্রথম দেখবার সুযোগ পাবে জানা গেল।

সর্ব্ব তত্ত্ববিৎ ঃ—'চরিত্রহীনে'র সৃষ্টিকর্ত্তা শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এতদিন মনস্তত্ত্বের রাজা ছিলেন বলিয়া বাজারে খুব সোরগোল ছিল। পূর্ব্বে কংগ্রেসে ঢুকে ও তা ছেড়ে দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে তিনি একজন রাজনীতি-তত্ত্ববিদ; তারপর সীতা নাটকের সার্টিফিকেট দিয়ে হয়েছিলেন নাট্যতত্ত্ববিদ্। গত মাসের ভারতবর্ষে তিনি যে সঙ্গীত-তত্ত্ববিদ্ তা প্রমাণ করেছেন, আর এখন হাওড়ার মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌সানের ব্যাপারে বোঝা যাবে তিনি একটী বিরাট্ মিউনিসিপ্যাল তত্ত্ববিৎ —এমন সর্ব্বতত্ত্ববিদের মঙ্গলার্থ মা—ষষ্ঠীর পূজার আয়োজন করা উচিত।

দোল

শ্রীপ্রসাদদাস চট্টোপাধ্যায়

আজ দোলে কি দোল খেলেছে ব্রজের রাখাল রঙ গুলে,
ঢঙ করে কি রঙ দিয়েছে, সঙ সেজে সব কদম তলে,
শ্যাম বসে কি নীপের বনে
ডাকছে বাঁশীর মোহন তানে,
ফাগ নিয়ে কি দাঁড়িয়ে আছে, রাধার গালে দেবে ব'লে?

২

কোন্ উদাসী পাগল প্রেমিক দোল দিয়েছে প্রিয়ার প্রাণে!
সবুজ রঙের ঘোমটা ঢাকা
পাপ্‌ড়ি রাঙা যায়না দেখা
চুম্ দিয়েছে কার ঠোঁটেতে—রঙ দিয়েছে কার গালে!

৩

কুম্‌কুমেরই রঙে ভেসে
আকাশ যেন উঠল হেসে,
দুষ্টু রবি রঙ ঢেলেছে ভাঙা ভাঙা মেঘের কোলে?

৪

দোলে কি সব দুলছে দোদুল,
উঠছে হেসে বকুল মুকুল
আবেগে ঝুলন বাগে আকুল হল সবে বকুল তলে?

৫

কোকিল-বালা আকুল তানে প্রাণ ভোলান মাতন তোলে,
চুম্ দে ফুলের ওষ্ঠ পুটে
পাগলা ভ্রমর পরাগ লুটে?
দোল দিয়ে যায় দখিণ হাওয়া প্রাণটা বুঝি তাই দোলে।

রঙে—বদরঙ্

যে রং দিলে সে লুকিয়েছে—বাবুর রাগের চোট্‌টা গিয়ে পড়ল পিচ্‌কারী হাতে এক বুড়োর উপর—বেচারা দাদা মহাশয় নাতীর জন্য সেটী কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন।
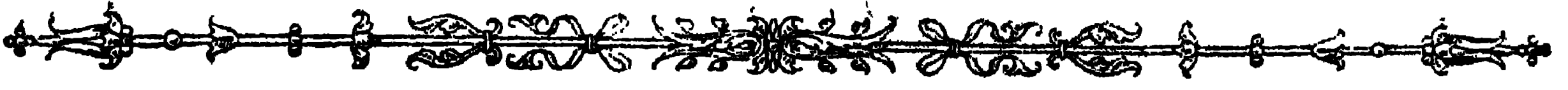
পুস্তক-সমালোচনা

মধুমালতী ঃ—বিজলীর সম্পাদক সুকবি সাবিত্রীপ্রসন্নের মধুর কবিতা গ্রন্থ। কাব্যজগতে সাবিত্রী বাবু আগন্তুক নহেন—তাঁহার পল্লীব্যথা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাকে কবি-প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকে বিবিধ রসেব ৩৪টী কবিতা আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটী এমন অতি উচ্চশ্রেণীর কবিতা আছে যাহাতে কবির গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙলাব সুধী-সমাজে এই পুস্তকের আদব দেখিলে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইব।

ব্রহ্মানন্দ প্রশস্তি ঃ—যুগাবতাব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দেব জীবনকথা, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র প্রণীত। সাধকের মধুব জীবন কাহিনী যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকাব মহাশয সাধাবণের সমক্ষে ত্যাগের এমন একটী উচ্চ আদর্শ স্থাপিত করিয়াছেন—যাহা বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্ম-কর্ম্মহীন জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। এই পুণ্যজীবনী পাঠে প্রকৃত মানুষ কেমন করিয়া গড়িয়া উঠে—ধর্ম্ম-জীবনের মধ্য দিয়া ‘দেশসেবা, দরিদ্রনারায়ণের-সেবারূপ কর্ম্মজীবন কেমন করিয়া বিস্তৃতি লাভ করে তাহা অবগত হওয়া যায়। অসার গল্প উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গদেশে এই শ্রেণীর গ্রন্থের সমাদর দেখিলে আমরা পবম সুখী হইব।

নাপিত-সমস্যা—নাপিত জাতির উন্নতি করণার্থ লিখিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পুস্তকখানির মধ্যে উন্নতির কোন প্রকৃত পথ নির্দ্দিষ্ট না হইয়া জাতি লইয়া বাক্‌বিতণ্ডাই বেশী করা হইয়াছে—ইহাতে প্রকৃত উন্নতি কতদুর ঘটিবে তাহা সন্দেহজনক। জাতি একতাবদ্ধ হইয়া উন্নত হউন তবে উন্নতির অছিলায় অকারণ আত্মবিদ্বেষের সৃষ্টি করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

ফরাসী গল্প—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগ্‌চি প্রণীত। বিদ্বজ্জন সমাজে সতীশবাবুর নাম সুপরিচিত। তাঁহার ন্যায় পাশ্চাত্য শিক্ষিত ও বহুবিধ বিদেশীয় ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি আমাদের দেশে একান্তই বিরল। তিনি মাতৃ-ভাষায় বিদেশী গল্প লিখিয়া বঙ্গজননীর চরণে যে অর্ঘ্য দিয়াছেন তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ যোগ্য। ভূমিকায় ছোট গল্পের সম্বন্ধে তিনি যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন তাহা আধুনিক ছোটগল্প-লেখকগণের বিশেষ প্রণিধান যোগ্য. তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে আকারে ছোট উপন্যাসকে ছোট গল্প বলা যায় না। আলোচ্য পুস্তকে বিখ্যাত ফরাসী ছোটগল্প-লেখক নোদিয়ে, ব্যালজাক, দেম্যুসে, ও বোইয়ের প্রভৃতির চারিটী উৎকৃষ্ট গল্প ভাষান্তরিত করা হইয়াছে কিন্তু ইহা ঠিক হুবহু অনুবাদ নহে—ইহাতে অনুবাদের খটমট ভাষা বা ভাবে বোটকা গন্ধ নাই—গল্পের ভাষা সহজ সলীল স্রোতস্বিনীর মত ভাবে তরঙ্গায়িত। গল্পগুলিকে নিজের হৃদয়ের অনুভূতি দিয়া ভাষা-জননীব অলঙ্কারে গঠিত করিয়া বাগচি মহাশয় গল্পামোদী মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। আব অকটি অভিনব সৌন্দর্য্যে এই গল্পগুলি মণ্ডিত, সেটি গল্পগুলির পবিত্রতা, মানব-মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য বিকাশে গল্পগুলি ভরপুর। বর্ত্তমান যুগে এই শ্রেণীর গল্পের প্রয়োজন যে কত বেশী তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। প্রথম গল্প ইউলালির প্রতিপাদ্য বিষয় “প্রত্যেক একজন মানুষের ভিতর হাজার হাজার নরনারী নিহিত রহিয়াছে, যাহা কিছু ঘটিয়াছে, যাহা কিছু ঘটিবে, সকলেরই ছাপ এই ভিন্ন ভিন্ন আত্মার মধ্যে চিরকাল থাকিবে। তাই জীবনের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনাটি আমাদের বড় সুখের মধ্যেও মর্ম্মন্তুদ বেদনা জাগাইয়া দেয়। এই মহাসত্যটীকে ক্ষুদ্র একটি ঘটনার মধ্যে দিয়া রচয়িতা যে কৌশলে ফুটাইয়াছেন বাগ্‌চি মহাশয়ের ভাষা তাহার গৌরব অদ্ভুত ভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছে। দ্বিতীয় গল্প, চিত্রকর; ইহাতে চিত্রকরেরা ভাবরাজ্যে কি ভাবে স্বপ্নাবিষ্টের মত বাস কবেন ও বাহিরের নির্ম্মম সত্যের আঘাতে সে রাজ্য হঠাৎ ধূলিসাৎ হইলে তাঁহাদের কি অবস্থা হয় তাহা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। তৃতীয় গল্প দেম্যুসের ‘মূক’; এই গল্পের মধ্যে মানুষের সকল সিদ্ধান্তই যে ধ্রুব নয়, তাহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ফ্রান্সে ‘বোবাকালার আত্মা নাই’ বলিয়া একটা ধারণা বহুদিন হইতে বদ্ধমূল ছিল সে জন্য তাহারা

মানুষের অধিকারে বঞ্চিত ছিল ; এপের জনৈক পুরোহিত বোবা-কালা দিগকে প্রথম মানুষের অধিকার দিবার চেষ্টা করেন। সেই মহাপ্রাণের মহদুদ্দেশ্যের পোষকতা করিতে লেখক একস্থানে বলিয়াছে' 'মানুষ কার্য্যকারণ সম্বন্ধে একটা নিয়ম ঠিক করিয়া লইয়াছে বলিয়াই যে সব সময় সেই নিয়মই খাটিবে এমন কোন কথা নাই। আমরা যে জায়গায় একটীমাত্র দুয়ার দেখিতে পাই,প্রকৃতি সেখানে হাজার হাজার দুয়ার খোলা রাখিয়াছে।" ভারতবাসীদের জীবনেও এই কয়েকটী কথা বেশী করিয়া ভাবিবার দিন আসিয়াছে। শেষ গল্প বোইয়েরের "জমীদার" ইহাতে দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য্যের সংঘর্ষের একটী ছবি আছে। মানুষের ইচ্ছার উপরও যে একটা প্রবল শক্তি আছে এবং তাহার বিরুদ্ধে যে সে দাঁড়াইতে পারে না—এই কথাটাই সুন্দর ঘটনার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। পুস্তকখানি নির্ভুল সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই ; মূল্যের অল্পতা ইহাকে প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীর পক্ষে সুলভ করিয়াছে—এ পুস্তকের সম্যক আদর হইতে দেখিলে আমরা পরম পরিতুষ্ট হইব। ভবিষ্যতে বাগ্‌চি মহাশয়ের নিকট বাঙ্গলা ভাষা যে আরও কিছু বেশী আশা করেন সে কথাতাঁহাকে স্মরণ করাইয় দিতেছি তাঁহাদের ন্যায় কৃতবিদ্যগণ সাহিত্যের পরিপুষ্টি না করিলে অসার উপন্যাসে বাঙ্গলা সাহিত্যের অধোগতি অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে।

সুপ্রভাত—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মূল ১৲টাকা, প্রাপ্তিস্থান নারায়ণ সাহিত্য-মন্দির, ৮ রাধামাধ গোস্বামী লেন কলিকাতা। ইনি প্রসিদ্ধ 'চরিত্রহীন'কা শরৎচন্দ্র নহেন ; সুতরাং ইঁহাকে দুই নম্বর শরচ্চন্দ্র ব উচিত। গত কয়েক বৎসরে ইনি খানকয়েক উপন্যা রচনা করিয়াছেন। সুপ্রভাতে গ্রন্থকার পল্লগ্রামের হি পরিবারের একটী চিত্র দিয়াছেন তাহা মন্দ খুব না হইলে বিশেষ নূতন নহে। গল্পপ্রিয় পাঠকগণের সময় কাটাইবা অবলম্বন বলাচলে, ইহার সাহিত্যিক মূল্য অতি অ চরিত্র বা গল্পাংশে কোন নূতনত্ব নাই। সুপ্রভাতের সহি আর একটী ছোট উপন্যাস আছে সেটীর নাম "হারাণ পথে সেটীও নেহাৎ মামুলী আকারে ছোট গল্প হইলে 'প্রকারে' তাহা নয়।

স্বার্থ সাধন

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ বি, এ, কাব্যবিনোদ

তুমি লও তুমি মোরে লও
বিস্ময়ে ব্যাকুল হয়ে,
আমার মুখের পানে
কেন চেয়ে রও।
এ নহে তো দান,
আমি ত আসি নি হেথা
তোমারে করিতে অপমান
এ যে শুধু গান
তোমার তন্ত্রীর বুকে
ঝঙ্কারি তুলিব মোর প্রাণ।
এ নহে তো দেওয়া
এ যে শুধু পাওয়া,
নিজেরে নবীন ক'রে
তোমার অন্তর মাঝে যাওয়া।
এ শুধু স্বার্থের আবেদন,
তোমার পাত্রেতে ভরি
আমার প্রাণের রস,
আমি যে করিতে চাহি পান
আনিবে সে নব আস্বাদন।
তুমি লও তুমি লও
আমার এ বোঝা তুমি সও,
আমার প্রাণের গানে
মরমের কথা তুমি কও।
তোমার কণ্ঠের সুরে
ফুটিয়া উঠুক মোর গান
মোর প্রাণ।
এ পূর্ণ পূর্ণিমা রাতে
স্বার্থের সাধনে মোর
দিয়া সফলতা—
আপনার আজি অবসান।
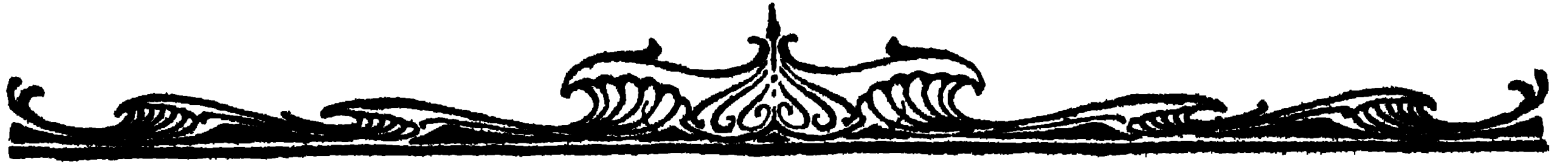
সন্তান-হারা

শ্রীমঞ্জরী দেবী

পৌষের কুহেলিকাচ্ছন্ন রাত্রি।

দোতালায় সার্শী বন্ধ ঘরে আরামে 'ইজিচেয়ারে' শুয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে একখানা নব-প্রকাশিত সাপ্তাহিক ভাবী মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলুম।

চাকর এসে জানালে—একটী লোক ডাক্‌ছে—তাব ছেলেব অবস্থা বড খারাপ। কাগজ থেকে মুখ একটু তুলে বিরক্তভাবে বল্লুম বলগে যা এখন যাবার সুবিধা হবে না। খানিক পরে চাকর আবার এসে বল্‌লে—লোকটী বড কাঁদ্‌ছে, কিছুতেই যেতে চায় না—একটী-বাব দেখা কর্‌তে চাইছে। কি জ্বালাতন! এই শীতের রাতে মানুষ বাইবে বেরুতে পারে? অনিচ্ছাসত্বে নীচে নেমে গেলুম। দেখি একজন শীর্ণ বৃদ্ধ বসে আছে। আমাব পায়ের শব্দে, সে উঠে এসে পাগলের মত আমার পা দুটো জড়িয়ে বলে উঠ্‌ল—"ডাক্তার বাবু—একটীবার চলুন দয়া কবে—আমার ছেলের বড় অসুখ"—সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুব বন্যা তার শুষ্কগণ্ডে প্লাবন এনে দিলে।

ছেলের অসুখ? গলায়-বেঁধা মাছেব কাঁটার মত বুকের মাঝে একটা কিসের আঘাত খচ্‌খচ্‌ কর্ত্তে লাগল। মনে হল আমিও যে পুত্রহারা। আমার বুকে খোক-নেব স্মৃতির চিতা এখনও জ্বল্‌ছে! মনের মাঝে চাবুক হাকিয়ে কে যেন বল্লে "যাও—যেতেই হবে" ওভার-কোটটা গায়ে দিয়ে তার সঙ্গে বেরুলুম। দূরে অন্ধকার-ঘেবা একটী বস্তির মধ্যে, অনেক সরু গলি ঘুরে একটা স্যাঁৎ-সেঁতে দুর্গন্ধ ঘরে ঢুকলুম। ঘরে একটা কেরাসিনেব ডিবা জ্বলছিল, সেটাও তৈলাভাবে নিবু-নিবু হয়ে এসেছে—ময়লা বিছানার উপর একটী পাঁচ-ছ বছরের সুন্দর শিশু রৌদ্রদগ্ধ ফুলের মত নেতিয়ে পড়ে আছে। বৃদ্ধ পাগলের মত বলে উঠ্‌ল—"এই আমার সর্ব্বস্ব—এটীকে ভাল করে দিন ডাক্তার বাবু—এই মা-হারা ছেলেটী আমার বুকের পাঁজরা"—আমি নাড়ী দেখিবার জন্য হাত ধরিতে গিয়া দেখি—দেহ তুহিন-শীতল, নিস্পন্দ, সভয়ে হাত ছাড়িয়া দিলাম—আঁৎকে উঠে বুড়ো জিগ্যেস কবলে—"কেমন দেখলেন বলুন তো? ভাল আছে তো?—আহা বাছা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে"—

কি উত্তর দোব? শিশুব সুন্দর মুখে স্নিগ্ধ হাসি এখনও যে জেগে রয়েছে, যেন মৃত্যু সরোবরে স্বর্ণ কমল ফুটে রয়েছে—নাই শুধু ওই কোমল বুকে জীবনের স্পন্দন!

এমনি এক অন্ধকার রাতে আমারও একমাত্র পুত্র বুক খালি করে চলে গিয়েছিল—সেও আজ পাঁচ বছরের কথা। তাব মৃত্যু ছায়াচ্ছন্ন মুখখানি বারে বারে মনে পড়ছিল। চোখের কোণ বেয়ে হুহু করে জল নেমে এল। কেমন কবে এই বৃদ্ধকে—এই সংসার ঝ্যাতা-বিধ্বস্ত মানুষটীকে—বলি যে আজ তার কেউ নাই। আমি যে জানি পুত্রশোকের যাতনা কি তীক্ষ্ণ, কি মর্ম্ম-স্পর্শী! মাটীর উপর সে বৃদ্ধ শুষ্ক অশ্রুহীন চোখে বসে ছিল, দুই হাতে মাথাটা চোপ বুকফাটা স্বরে সে আর্ত্তনাদ করে বললে—"ওরে মনি বে—আমায় একলা ফেলে কোথায় গেলি—এত অভিমান কিসের তোর"—

আমার শোক-সন্তপ্ত বুকে পুত্র বিয়োগের জ্বালা আজ আবার নতুন করে জেগে উঠ্‌ল। আবার চোখ দিয়ে জল পড়ল।

তখন বাইরে ঘোর অন্ধকারের মাঝে শীতের হিম-বাতাস হা হা করে ছুটে বেড়াচ্ছিল—

সন্তানহারা হৃদয়ের বিলাপধ্বনির প্রতিধ্বনির মত......

নাট্য সমালোচনা—ষ্টারের মুখপত্র বৈকালী সংবাদ পত্রে নাট্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে গত ১৯শে ফাল্গুনের সংখ্যায় বলিয়াছেন যে সংবাদ পত্রে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন দিলেই তাঁহারা থিয়েটাবের জয়ধ্বনি করিতে বাধ্য রহিবেন। সখীর জানা উচিত যে এই শ্রেণীব সংবাদ পত্রের সংখ্যা একটা আঙ্গুলেই গণা যায়—কারণ সব কাগজই বৈকালী নয়। ফবওয়ার্ড, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় থিয়েটাবওলারা বিজ্ঞাপন দেন ব্যবসার খাতিরে নিজেদের অর্থাগমের জন্য, কাগজগুলাদেব মাথা কিনিবাব জন্য নয়। আর 'ফ্রি'পাশ ছাড়িলেই সকল সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ হয় না—এমন সংবাদ পত্রও আছে যাহার কর্ত্তৃপক্ষেব পাশ না পাইয়াও থিয়েটার দেখিয়া আসিবার সামর্থ্য রাখেন এবং যাহাব উদ্দেশ্য সমালোচনা দ্বাবা দর্শকগণকে নট্যরস উপভোগেব প্রকৃত পথ প্রদর্শন করা। আর এটাও তাঁদেব মস্ত বড একটা ভুল যে থিয়েটাবেব সমালোচনা না করিলে কাগজওয়ালাদেব বিক্রয়ের কিছু হানি হইবে—নাট্য সমালোচনার উদ্দেশ্য দেশীয নাট্যশিল্পেব পৃষ্ঠপোষকতা। অবশ্য যে সংবাদপত্রকে থিয়েটারেব পাশেব উপব বা তাঁহাদের বিজ্ঞাপনের ভবসায় হাঁডী চডাইয়া বসিয়া থাকিতে হয় তাহার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু সকল সংবাদ পত্র যে একই শ্রেণীভুক্ত নয তাহা যদি থিয়েটাবেব কর্ত্তাবা ভুলিয়া যান তবে বুঝিতে হইবে প্রচুব অর্থাগমে তাঁহাদেব মস্তিষ্ক বিচলিত হইয়াছে। সংবাদপত্রে থিযেটাবেব আলোচনা হইতেছে বলিয়া আজ রঙ্গালয়ে পাঁচ বাত্রি অভিনয় চলা সম্ভব হইয়াছে।

জনা—এই নাটকের অভিনয় লইয়া নাট্য-জগতে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। প্রথমে শুনা যাইল ইহা মনমোহন নাট্য-মন্দিরে অভিনীত হইবে এবং শ্রীযুক্তা তারাসুন্দবী জনাব অংশে অবতীর্ণা হইবেন একখানি থিয়েটারী কাগজে জনা'য় নাটকত্বের অভাবেব কথাও উল্লিখিত হইয়াছিল এবং তাহা পরিবর্তিত কবিয়া অভিনয় করিবার জন্য ভাতুডী মহাশয়কে পরামর্শও দেওয়া হইয়াছিল। পরে শুনা যাইল যে আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এই নাটকের অভিনয়-সত্ব অধিকার কবিয়াছেন এবং শিশির বাবু নূতন জনা শিখাইয়া অভিনয় কবিবেন। এই অভিনয়-সত্ব-সংরক্ষণ করিয়া ব্যবসাদারী হিসাবে আর্ট থিয়েটার হয়তো ভাল কাজই করিয়াছেন কিন্তু তাহা নাট্যবসপিপাসুগণের মনঃপূত হইবে না—তবে ব্যবসাদার থিয়েটার সম্প্রদায়ের নিকট কেবল নাট্য-কলাব উন্নতিব আশা কবা সম্পূর্ণ উচিত নহে কারণ ব্যবসাব দিকটাই তাঁহাদেব পক্ষে বড়। এক সম্প্রদায় ব্যবসাব দিকে ক্ষতি স্বীকার কবিয়া অন্য সম্প্রদায়কে নাট্যকলাব উন্নতি তথা অর্থাগমেব সুবিধা কবিযা দিতে যে পারেন না ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তারপব এখন গুজব শোনা যাইতেছে যে শিশিববাবু নাকি গিরিশবাবুব জনাই অভিনয় করিবেন—বাধা-বিপত্তি সত্বেও। ফল কোথায গিয়া দাঁডাইবে জানি না—তবে ইহাতে এই সকল একচেটিয়া সত্বেব একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাইবে। আর্ট থিয়েটার কোম্পানী জনাব ভূমিকা ইতিমধ্যেই বিজ্ঞাপিত কবিয়াছেন—এবং তাহা আশাপ্রদ। প্রবীরেব ভূমিকায় দানীবাবুর প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট থাকিলেও এবারে তিনি বিদূষকের বেশে নাট্য-বসিকদেব সম্বর্দ্ধনা করিবেন।

মিনার্ভা থিয়েটার—ইঁহাবা একটী সুকণ্ঠী গায়িকা সংগ্রহ কবিযাছেন এবং 'বরুণা'য় বরুণাব ভূমিকায তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন—এই নূতন বরুণা দেখিয়া তাঁহাব সম্বন্ধে আমাদেব মতামত শীঘ্রই পাঠকবর্গকে জানাইবাব অভিলাষ বহিল।

নূতন থিয়েটার—আবার একটী নূতন থিয়েটাব সম্প্রদায়েব আবির্ভাবেব গুজব উঠিয়াছে, ফলে কতদূব দাঁড়াইবে জানি না। তবে নূতন থিয়েটার খোলা যত সহজ তাহাকে স্থাযী কবা তত সহজ নয়—বিশেষতঃ এই নাটকের দুর্ভিক্ষের যুগে থিয়েটার চালানই যে কত কষ্টকব তাহা বর্ত্তমান থিয়েটাবেব কর্ত্তারা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন ভাবী থিয়েটারের উদ্যোক্তাগণ যদি সখ মিটাইতে আসরে নামেন সে স্বতন্ত্র কথা, নতুবা ব্যবসাব উদ্দেশ্য থাকিলে বিশেষ চিন্তা করিয়া যেন কাজে হাত দেন ইহাই আমাদের অনুরোধ। কিছু দিন আগেও এইরূপ আব একটা থিয়েটারের গুজব উঠিয়াছিল, এবং সে সম্বন্ধে আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছিল তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন।

Printed & Published by Jnanedra Nath Chakravarti at the Lakshmibilas Printing Works

শেষ-সম্বল

Lakshmibilas Press, Calcutta.
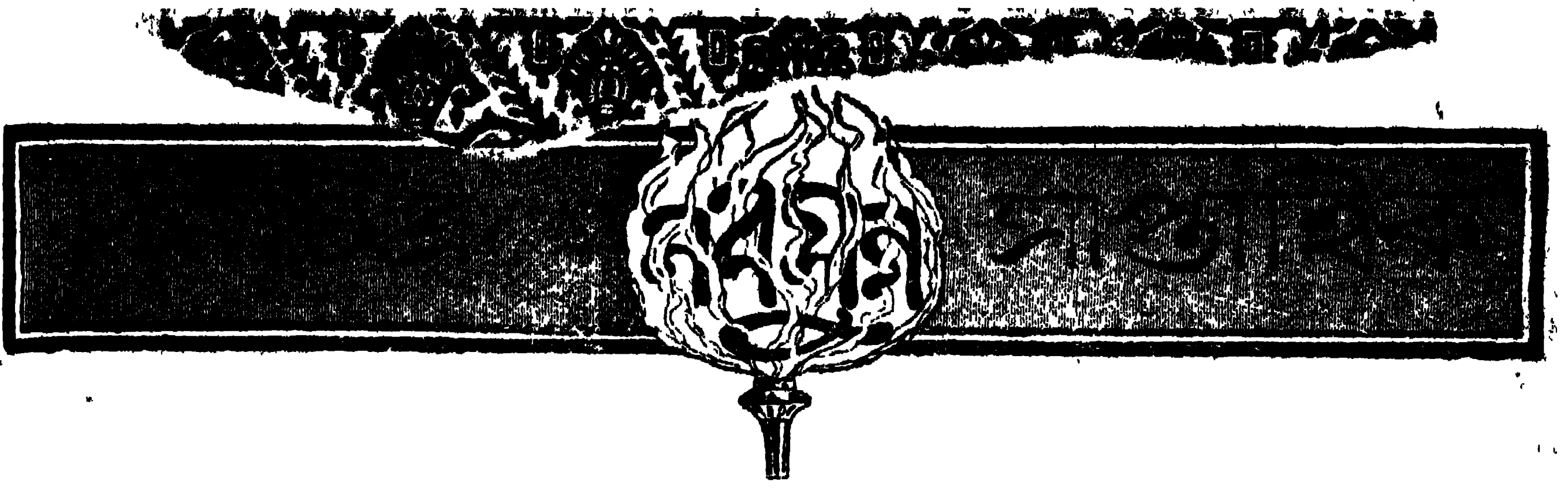
প্রথমবর্ষ]　　৭ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩১ সন।　ইংরাজী ২১শে মার্চ্চ　　[৩২শ সংখ্যা

রঙ্গালয়ের স্থান　… … ?

নব্য-তন্ত্রের রসিকেরা বলেন—

"সুনীতি-দুর্নীতির বহু ঊর্দ্ধে"
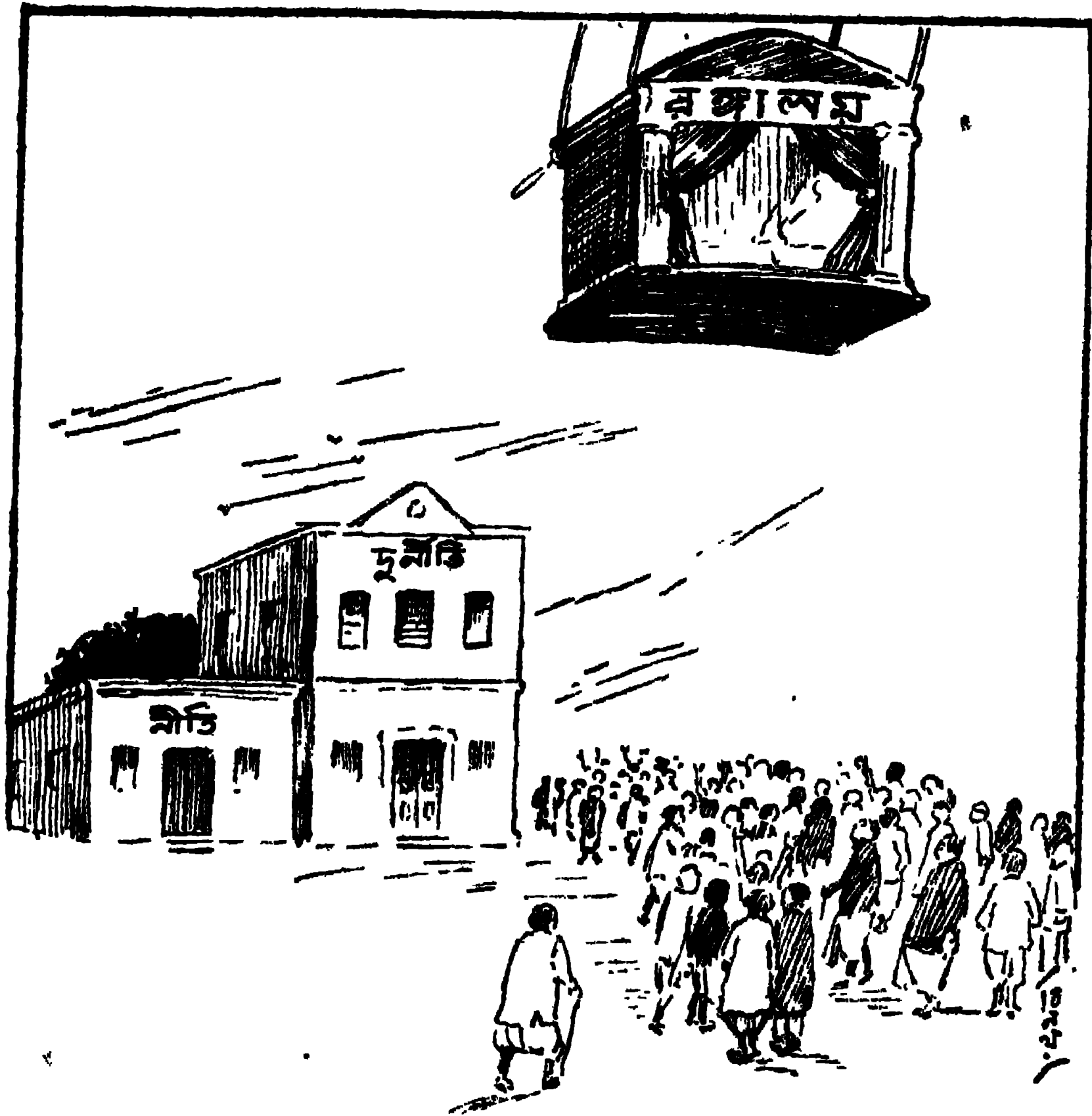
এত ঊর্দ্ধে যে সমালোচকেরা তো নাগাল পাবেনই না দর্শকেরা টানাহেঁচড়া করিয়া যদি পান।

স্বামী বিবেকানন্দ *

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

মুগ্ধ উষার শান্ত ছটায়
এসেছিল যেবা বিশ্বে নেমে,
মানবের চির-কল্যাণ তরে
মেতেছিল যেবা বিশ্বপ্রেমে।
বিরাট্ বক্ষ হয়নি তৃপ্ত
বিলায়ে সত্য আপন দেশে,
সুদূর পারের একলা পথিক
হয়েছিল যেবা অকূলে ভেসে।
অপরের ব্যথা আপনার বুকে,
বজ্র বেদনে সহিল যেবা,
জগৎ-বাসীরে দিল শিখাইয়া—
দীন আতুরে করিতে সেবা।
পথের ধূলায় ভগবানে যেবা
হেরিল সজল নয়ন ভরে,
পতিতের সখা, দীনের বন্ধু—
করিল বিশ্বে যেবা আপনারে ;
শোক, তাপ, জরা, ধরার বেদনা
আপনার বুকে সহিয়া—কত,
হাসিমুখে হাসি বিলাইল সবে,
পতিতে তারণ করিল শত।
হইয়া ভিখারী—জগতের দ্বারে,
গাহিল পুলকে বেদের বাণী,
স্কন্ধে লইয়া ভিক্ষার ঝুলি,
ঘুরিল বিশ্বে অভয় দানি।

প্রশান্ত বিশাল অন্তর যার,
ঢালিল ধরায় শান্তি-বারি,
জ্ঞানের আলোক দেখাল ভুবনে
উন্নত শিরে প্রদীপ ধরি।
সংসার সুখ, বিলাস, বিভব,
রিপু পরাজিত যাঁহার তেজে,
গুরুর আসনে বসাল, বিদেশী ;
কীর্ত্তি যাঁহার এখনও রাজে।
গুরুর বিজয় মন্ত্র যাঁহার,
হইল সফল ভুবনময়,
গৈরিক ধ্বজা উড়াইয়া যাঁর—
গাহিল বিশ্ব—পুলকে জয়।
পাতিল গুরুর মহান্ আসন
জীবন-সাধনা করিয়া দান।
শান্ত-মুরতি যাঁর ঘরে ঘরে,
গুরুর পার্শ্বে পাইল স্থান।
দানেতে দধীচী জ্ঞানে ঋষি ব্যাস
প্রহ্লাদ সম ভক্ত বীর,
ভারতের চির দীনের দয়াল,
পরের দুঃখে নয়নে নীর।
করুণায়—যাঁর মুগ্ধ 'বিবেক'
হে চির 'আনন্দ' যোগীরাজ !
ভারতের একনিষ্ঠ-সেবক—
লহগো অর্ঘ্য দীনের আজ ॥

* স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসবে জামসেদপুরে বিবেকানন্দ সোসাইটীতে পঠিত।
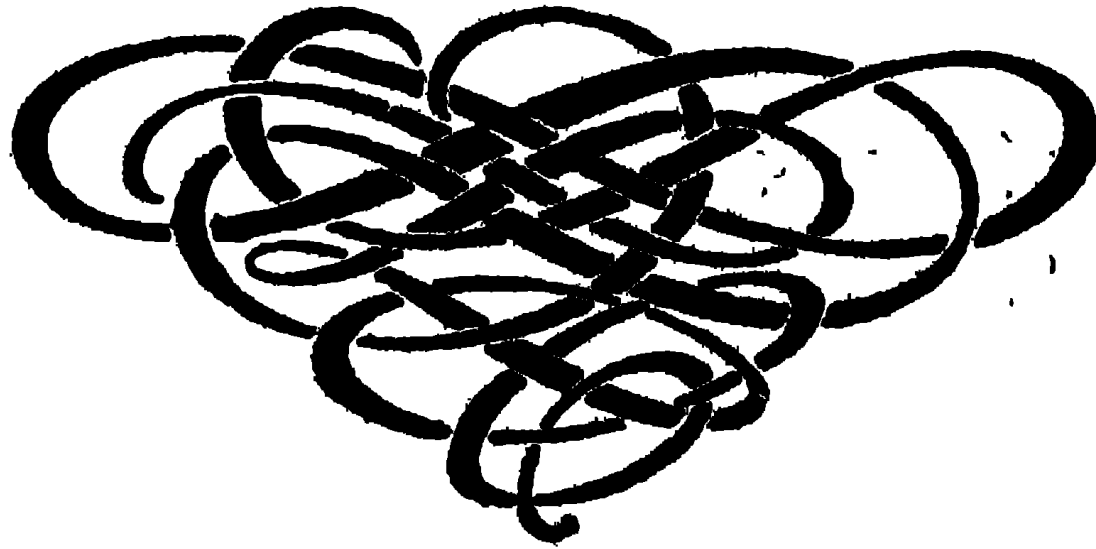
ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি

অধ্যাপক—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

পাটনার খুদাবক্স লাইব্রেরীর কথা অনেকেই অবগত আছেন। এই পাঠাগারের অমূল্য চিত্রাবলীর কথাও অনেকে জ্ঞাত আছেন। পারসীক চিত্রকলা পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখিতে হইলে খুদাবক্স লাইব্রেরীতে আসিতেই হইবে। কিন্তু, পাটনারই অন্যত্র যে পারসীক রাজপুত ও কাংড়া পদ্ধতির অত্যুৎকৃষ্ট বহু নিদর্শন রহিয়াছে তাহা অনেকে অবগত নহেন। ভারতবর্ষের অন্যত্র কোন এক-স্থানেই—ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র পৃথিবী বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না—এরূপ অমূল্য চিত্রসম্পদ নাই। এই চিত্রাবলীর মূল্য প্রায় সাত লক্ষ টাকা এবং ইহার অধি-কারী শ্রীযুক্ত পি, সি, মানুক। ইনি পাটনা হাইকোর্টের অন্যতম সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যারিষ্টার।

এই অমূল্য চিত্রসংগ্রহের পূর্ব্বে, মানুক সাহেব পুরাতন চীনামাটীর বাসন সংগ্রহে তৎপর ছিলেন। এইরূপ চীনা-মাটীর বাসনেরও বেশ মূল্য আছে এবং ইনিও অনেক টাকার বাসন ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু খুদাবক্স লাই-ব্রেরীতে চিত্রসম্পদ দেখিয়া ইঁহার চিত্রসংগ্রহে আগ্রহ জন্মে এবং ক্রমে ক্রমে ইনি বহু লক্ষ টাকার চিত্র ক্রয় করিয়া নিজ গৃহ সজ্জিত করিয়াছেন। বলা আবশ্যক যে, মানুক সাহেবের সংগৃহীত ছবি দেখিতে হইলে তাঁহার অনুমতি লইতে হয়। খুদাবক্স লাইব্রেরী আজকাল সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত, তজ্জন্য তথায় ছবি দেখিতে হইলে সাধারণতঃ কোন অনুমতির আবশ্যকতা নাই।

এই অমূল্য চিত্রসম্পদ সংগ্রহে মানুক সাহেব সৌভাগ্য-দেবীর অনুগ্রহ অনেক সময়েই লাভ করিয়াছেন। ফলে, বহু মূল্যবান কতকগুলি ছবি তিনি একপ্রকার নামমাত্র মূল্যেই ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই চিত্রাবলী সংগ্রহে তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কোন স্থানই তাঁহার পক্ষে অগম্য নহে। রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর কিছুই বাদ যায় নাই। ছবির সংবাদ পাইবামাত্রই তিনি সকল কাজ পরিত্যাগ করিয়া উহার পিছনে দৌড়াইয়াছেন। আজ দিল্লী, পরশু পেশোয়ার, কাল হায়দরাবাদ এমি করিয়া তাঁহাকে দৌড়াদৌড়ি করিতে হইয়াছে। কোন ক্লেশেই তিনি কাতর হন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাটনা জলে ডুবিয়া যায়। এই অবস্থায় হাঁটু সমান ও তাহার অধিক জল ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে ছবি অনুসন্ধান করিতে দেখা গিয়াছে। ভদ্রপল্লী, অভদ্রপল্লী, বাজার হাট কিছুই তিনি বাদ দেন নাই।

মানুক সাহেবের চিত্রাবলীর একটী বিশেষত্ব আছে। খুদাবক্স লাইব্রেরীতে মুগল চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির ছবি অবশ্য খুবই বেশী পরিমাণে আছে। কিন্তু, তথায় অন্য কোন চিত্রকলার নিদর্শন নাই। কিন্তু মানুক সাহেবের গৃহে, মুগল, রাজপুত, কাংড়া, বঙ্গীয়—কোন চিত্রকলা-পদ্ধতিরই অভাব নাই। তবে বঙ্গীয় চিত্রকলা পদ্ধতির সংখ্যা কম—ইহার কারণ আমরা পরে নিবেদন করিব।

ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি আলোচনা করিতে গেলে কয়েকটী কথা মনে পড়ে। খৃষ্টীয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে অজন্তায় যে চিত্রকলা পদ্ধতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল, তৎপরে, সহস্র বৎসরে, ভারতবর্ষে আর সেরূপ চিত্রকলার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মধ্যবর্ত্তী এই সহস্র বৎসর ব্যাপী যুগে চিত্রকলা পদ্ধতির কেন যে এরূপ অবনতি হইয়াছিল তাহার বিশেষ কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। তবে, পাঠানরাজগণের চিত্রাঙ্কনের বিরাগের জন্য যে অনেক পরিমাণে ইহা ঘটিয়াছিল তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অজন্তা ও অন্যান্য গুহামধ্যস্থ সুচিত্রিত চিত্রগুলি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহার অন্যতম

কারণস্বরূপ মুসলমানগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশাধিকার পাইতে সহজে সমর্থ হন নাই, ইহা উল্লিখিত হইতে পারে। পর্ব্বতগাত্রে, কন্দরমধ্যে ও এইরূপ স্থানের চিত্রগুলি সাধারণতঃ আক্রমণকারীদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু, প্রাসাদ, মন্দির ও অন্যান্য প্রকাশ্যস্থানে চিত্রিত আলেখ্যগুলি সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল বলিয়া সেগুলি রক্ষা পায় নাই।

সৌভাগ্যের বিষয়, পাঠানযুগের পরেই প্রথম মুগল বাদশাহ বাবর অনেকগুলি চিত্রকরকে চিত্রাঙ্কনে নিযুক্ত করিয়া চিত্রবিদ্যার সহায়তা করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত পারসীক চিত্রকর বিহীজাদ বাবরের সমসাময়িক ছিলেন এবং তজ্জন্য মুগল চিত্রকলা সর্ব্বপ্রথমে পারস্যেই উদ্ভুত হইয়া, প্রথম বাবর, পরে আকবরের অনুগ্রহ ও সহায়তায় ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। আকবরের প্রতিপোষকতায় মুগলকলা প্রাধান্যলাভ করে। তৎপরে জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের কৃপায় ইহা উন্নতির শীর্ষপ্রদেশে আরোহণ করে। মানুক সাহেবের চিত্রাগারে মুগল চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে আসিয়া মুগল কলাপদ্ধতি শীর্ষস্থান অধিকারে সমর্থ হইলেও, ইহা বলা যাইতে পারে যে মুগল চিত্রকরগণ অনেকাংশে চৈনিক চিত্রকরগণের নিকট ঋণী। মানুক সাহেব এই প্রসঙ্গে বলেন যে, মুগল চিত্রবিদ্যা ভারতবর্ষে আসিয়া নূতন আদর্শের সংস্রবে নবভাব ধারণ করিয়াছিল। মুগল চিত্রকলা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভারতীয় নহে। তবে মুগল চিত্রকরগণ হিন্দুচিত্রকরগণের সহিত একত্র কাজ করিতে করিতে ভারতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করে। ইতিপূর্ব্বে তাহারা জন্তু ইত্যাদি অঙ্কিত করিত না। ভারতীয় চিত্রকরগণের প্রভাবে মুগল চিত্রকরগণ জন্তুর চিত্রাঙ্কণ করিতে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু এগুলি চক্ষুর তৃপ্তিসাধন বা মনে আনন্দ উৎপাদন করে না। মানুক সাহেব বলেন যে, হিন্দু চিত্রকরগণের এরূপ

বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। তাহাদের দেবদেবীর চিত্রসমূহ তাহাদের নিকট জীবন্ত মূর্ত্তি ছিল! ইহারই ফলে হিন্দুচিত্রকরগণ কর্ত্তৃক চিত্রসমূহ আত্মার তৃপ্তিসাধনে সমর্থ হয়।

মান্নুক সাহেবের রাজপুত চিত্রকলাপদ্ধতিরও অনেক সুন্দর সুন্দর নিদর্শন আছে। এই পদ্ধতি, একপ্রকার মুগল চিত্রকলার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভূত হয়। এক হিসাবে রাজপুত কলা মুগল কলাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—কারণ বর্ণ-বৈচিত্রে এইগুলি বড় সুন্দর এবং সম্ভবতঃ পবিত্রতা হিসাবেও এগুলিকে শ্রেষ্ঠস্থান দেওয়া যাইতে পারে। রাজপুতচিত্রে রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক চিত্রের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

আর এক শ্রেণীর চিত্রকলাপদ্ধতিরও অনেক নিদর্শন মান্নুক সাহেবের চিত্রগৃহে পরিদৃষ্ট হয়। এগুলিকে কাংড়া চিত্রকলাপদ্ধতি বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। ১৭৬০ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর চিত্রকরগণের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মোলারামের সময় নির্ণয় করা যাইতে পারে। মোলারাম গঙ্গানদীর অন্যতম শাখা অলকানন্দার তীরস্থ ঘাড়োয়ালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মোলারাম ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের অঙ্কিত চিত্রগুলি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর এবং ইহারা পৌরাণিক চিত্রগুলি অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

তিব্বতীয় এবং মধ্য এসিয়ার চিত্রকলাপদ্ধতির আলেখ্য সংখ্যায় কম হইলেও এসিয়ার চিত্রপদ্ধতি অনুসন্ধিৎসুতার পক্ষে এগুলি অত্যাবশ্যক। এতদ্ব্যতীত মান্নুক সাহেবের সংগ্রহের মধ্যে এরূপ চিত্র আছে যাহাকে কোন বিশেষ পদ্ধতিভুক্ত করা যায় না।

মান্নুক সাহেবের চিত্রের মধ্যে বঙ্গীয় চিত্রকলাপদ্ধতির নিদর্শন কম। বস্তুতঃপক্ষে, তিনি এই শ্রেণীর চিত্রের অনুরক্ত নহেন। তিনি বলেন যে বঙ্গে চিত্রাঙ্কনপদ্ধতিতে যে ভীষণ বৈদেশিক ভাব ও অনুকরণ প্রবেশ করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মান্নুক সাহেব এই বৈদেশিক ভাবগ্রহণের অত্যন্ত বিরোধী। তাঁহার মতে

ভারতবর্ষ অতীতকালে যাহা করিয়াছে তিনি তাহারই প্রতি অনুরক্ত। প্রকৃতপক্ষে, জাপান বা য়ুরোপীয় পদ্ধতির সহিত তাঁহার বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নাই। এবং তিনি ভারতবর্ষের অতীত গৌরবস্মৃতির অনুসরণই কর্ত্তব্যোচিত মনে করেন।

এক মানুক সাহেবের সংগৃহীত চিত্র দেখিলেই মুগল, রাজপুত, কাংড়া সকল চিত্রকলাপদ্ধতিরই প্রকৃষ্ট এবং যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। খুদাবক্স লাইব্রেরীতে মুগল কলার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন থাকিলেও অন্যান্য কলাভুক্ত চিত্র তথায় পাওয়া যায় না। এই সংগ্রহের জন্য মানুক সাহেবকে যে কি পরিমাণ অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহা ধারণার অগম্য।

আমরা এই প্রবন্ধের সহিত মানুক সাহেবের দুই খানি চিত্রের প্রতিলিপি প্রদান করিলাম। বলা বাহুল্য প্রতিলিপিতে প্রকৃত চিত্রের বর্ণবিন্যাস ও অন্যান্য সৌন্দর্য্য কিছুই অনুভূত হয় না। তথাপি এ ক্ষেত্রে দুধের আস্বাদ ঘোলের দ্বারাই মিটান ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

গোলাপ

শ্রীরামেন্দু দত্ত

মধুর খনি গোলাপ মণি,
ভাল লাগে তোরে—
একটু যদি হ'তিস্ বড়
বুকে নিতাম ভ'রে!
বল্ না কি তোর পাপ্‌ড়ি বেয়ে
সুরার গেলাস পড়ল ভেঙ্গে,
টলটুলে তাই কর্‌ল নেশায়
রক্তে দিল ভরে?
সুষমা খনি গোলাপ মণি
ভালো লাগে তোরে॥
বল্ না তোর ওই স্নিগ্ধ কোমল
গন্ধ কোথায় পেলি?
পরীর দেশে সিনান করে
আতর মেখে এলি?
অলক-ঝোরার, গন্ধ ভরা
ঝরণা-জলে সিক্ত করা,
মামুলি ধরায় সরম-গড়া
পাপ্‌ড়ি নরম মেলি!'
অমন মোহন মন-মাতানো
গন্ধ কোথায় পেলি?

রাঙা গোলাপ, রাঙা গোলাপ,
জান্‌তে পারো তুমি,
কত সুখে রঙিণ তোমার
পাপ্‌ড়িগুলি চুমি?
গন্ধ তোমার মন্দ মৃদু,
পিয়ে তাহার নন্দ সিধু,
ইচ্ছে করে তোমার কোলে
ঢুলে পড়ি' ঘুমি।
রাঙা গোলাপ, ইচ্ছাটি মোর
জান্‌তে পারো তুমি?
ছিলে কোথায় দ্যুলোক পুরে
পুলক ঝোরার ধারে,
উর্ব্বশী আর মেনকাদের
উরস-দোলা হারে!
আহা সে কোন শুভক্ষণে
খেলতে এলে মোদের সনে
ভুলিয়ে ব্যথা, মুছিয়ে দিতে
আঁখির অশ্রুধারে!
নামলে ধরায়, ছিলে সে কোন্
স্বপন লোকের পারে!

গল্প

নিবেদন

শ্রীহরিধন মিত্র

তুমি দেবতা আর আমি—পতিতা।

চিঠি দিতো ভয় হচ্ছে! কি হবে চিঠি দিয়ে তাও জানিনা—তবু না দিয়েও থাকৃতে পার্চ্ছিনা—! কে তুমি আমার কেউ নও, জানি। আমিও তোমাব কেউ নই, ...তবু—

মনে পড়ে সেদিনেব কথা?... যেদিন পথে যেতে যেতে আমি হোঁচট্ খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম—তুমি ছুটে এসে আমায় কত যত্ন করে তুললে, বাড়ী পৌছে দিলে—স্নেহ মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কল্লে, "বড় লেগেছে কি"? সেই স্পর্শই আমার সর্ব্বনাশ করেছে অমন স্পর্শ মানুষের সঙ্গে থাকে তা আমি জানতুম না—!...সেইদিন থেকেই তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়। সেইদিন থেকেই তোমায় আমি আপনার বলে ভেবেছি—সে অধিকার তুমি দাওনি জানি কিন্তু আমার হৃদয় সে কথা বিশ্বাস কবে না—এমনি দুষ্ট সে!

তারপর—তুমি যেমন রোজই সামনেব বাড়ীতে তোমার বন্ধুর বাড়ীতে আসতে তেমনি আসতে—আমি কিন্তু কেন জানি না তোমার সাম্‌নে আর বেরুতে পার্ত্তাম—কেমন যেন লজ্জা কোর্ত্ত—কিন্তু বাড়ীব জানালার কপাট্ আধখানা খুলে দিয়ে অথবা বারান্দার পাশে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে তোমায় দেখ্তুম—কতবার তোমায় আমি দেখেছি—কিন্তু তুমি তো দেখনি—একদিনের জন্য মুখ দুটো তুলে চাওনি—ওঃ কি পাষাণ তুমি—এক একবার মনে রাগ হতো—অভিমান ভরে কতদিন—আমি চোখ ফিরিয়ে নিতে গেছি কিন্তু পারি নি—পরক্ষণেই আবার তোমার মুখের দিকে চেয়েছি—কি সুন্দর হাসি তোমার মুখে লেগে থাকৃত—এত মিষ্টহাসি এমন সর্ব্বনাশী হাসি কোথায় পেয়েছিলে?

একদিন—সেদিন সরস্বতী পূজা। সামনের বাড়ীতে তুমি বাহিরেব ঘরে ঠাকুরের কাছে বসে পূজা কর্চ্ছিলে—আর কেউ ছিল না। দেখ সেদিন তোমার দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মারলুম—উঃ তাতে মার কাছে আমার কত দোষী হতে হয়েছিল—তা জানি, তবুও—খুব সাজগোজ করেছিলাম—সেদিন বাসন্তী রঙের ছোপান কাপড়, আর নানা রকম গয়না পরেছিলাম—নিজের সাজ একবার তোমায় দেখাতে বড়ই ইচ্ছা হয়েছিল—আপনার অজ্ঞাতে তোমার কাছেই চলে গেছলুম।

আমায় দেখে তুমি—হাসতে হাসতে বল্লে "কি ঠাকুর দেখতে এসেছ?"

আমি ঢোক গিলে বল্লুম—"হাঁ"। তখন কপাল আমার ঘেমে গিছল, ঘাড়ের চুলগুলো ঘামে জড়জড় কর্চ্ছিল—যেন দম আট্‌কে যাবার মত হয়েছিল—তুমি আমার দিকে বিস্ময়দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—"কেমন ঠাকুর বল" পাষাণ তুমি বোধ হয় বুঝ্‌তে পারোনি—যে কোন্ ঠাকুর আমি দেখছিলুম—মাটীর ঠাকুরের চেয়ে বড় বেশী ভক্তির ঠাকুর তুমি যে সেখানে বসেছিলে—তোমায় ফেলে কি

আমি সেই মাটীর ঠাকুর দেখতে পারি—মনে ভাবতে পারি—আমার সমস্ত মনটা যে জুড়ে ছিলে তুমি। আমায় নীরব দেখে তুমি হয়ত মনে কল্লে আমি ঠাকুর ভালবাসি না—কিন্তু তা নয়—ঠাকুরকে আমি ভক্তি করি—কিন্তু সেদিন আমার যত ভক্তি ছিল সব আমার দুটো চোখ দিয়ে উথলে বেয়ে পড়ছিল তোমার মুখের পানে।

তুমি আবার জিজ্ঞাসা কল্লে—"কেমন ঠাকুর বল্লে না" ?

আমি উত্তর না দিয়ে ঠোঁটের পাতা দুটো কেবল উল্টালাম! তোমার ঠাকুরকে অবজ্ঞা কর্ব্বার জন্য—খানিক পরে বল্লুম—"তোমার—আপনার কেমন লাগে" ?

তুমি হো হো করে হেসে উঠলে—কি ভয়ানক হাসি সে—আমার পাঁজরা গুলো যেন ঘড় ঘড় করে নড়ে উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে বল্লে "আমায়" 'তোমার'ই বোলো আপনার বল্‌তে হবে না!

তারপর আবার একটু মিটিমিটি হাস্‌তে হাস্‌তে আমার দিকে চেয়ে বল্লে—"ঠাকুর খুব ভাল তবে তোমার চেয়েও সুন্দর নয়"!

কি কল্লে ঠাকুর এসব কথা কি নারীর সামনে বলে—এ যে তাদের মৃত্যুবাণ—জানিনা—সে তোমার ঠিক মনের কথা কি না—কিন্তু তা—উঃ—কি বল্‌ব—ঐ কথাতেই আমার কচি বুকে একটা এমন ঢেউ খেলিয়ে দিয়েছিল,—বুকের রক্ত এমন তাণ্ডবভাবে নেচে উঠেছিল—যে কর্ণমূল দুটো তেতে লাল হয়ে উঠেছিল,—কাণের দুল দুটো পর্য্যন্ত তপ্ত শলাকার ন্যায় গাল দুটোতে ছেঁকা দিচ্ছিল—মেয়ে মানুষের স্বভাব কি জান ?—কেউ যদি তার রূপকে ভাল বলে—ব্যস্‌! তা'হলেই মেয়েমানুষ আত্মহারা হয়ে পড়ে। মনে এত আহ্লাদ তবুও উত্তরে বলেছিলুম—"হাঁ আমিত ছাই সুন্দর!

তার উত্তরে—তুমি কি বলেছিলে—আজও সেকথা ভাবলে—হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো একসঙ্গে বেজে প্রাণের মাঝে একটা সুরের নেশা সৃষ্টি করে।—তুমি কি বলেছিলে জান "তোমায় আমার কাছে বড় ভাল লাগে!"

ছাই রূপ আমার ?…না না ছাই কেন তোমার চোখে সেটা যদি একটুও ভাল লেগে থাকে—তবে সে সার্থক—আমি পবিত্র আমার জন্ম ধন্য—আর নির্লজ্জার মত আমার তোমার কাছে যাওয়া—তাও চরিতার্থ।

সেদিন থেকে তোমায় দেখলে আর আমি পালিয়ে যেতুম না। কেন বল্‌ব—তোমার কথা শোন্‌বার জন্য—তোমার কথা যে আমার বড় ভাল লাগে! কেন তা জিজ্ঞাসা করো না—ভালবাসার অভিধানে 'কেন' নাই—"কেন কিজন্য হল" এ সব স্বার্থে মাখান কথা ভালবাসায় নাই।

তুমি সামনের বাড়ীর দরজায় এসে যখন কড়া নাড়তে—অমনি আমি জানলার বাহিরে বা সদর দরজার পাশে এসে দাঁড়াতুম—লুকিয়ে তোমার মুখখানি দেখ্‌বার জন্য। সকলের সামনে তুমি আমার দিকে ভাল করে চাইতে না বটে, কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে একটু একটু চাইতে! অন্ততঃ আমি তাই মনে করতুম—জগতের সব কিছু সৌন্দর্য্য যেন তোমার চোখ দুটীর ভেতর জমাট বেঁধে রয়েছে!

ভোরে উঠে তুমি রোজ রোজ বেড়াতে যেতে আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে—যে কখন বেলা ৯টার আগে চোখ মেলতনা সে তোমায় দেখবার জন্য ভোরে উঠে হাঁ করে তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌ত, ভাবতুম—অত রূপ তুমি কোথায় পেয়েছ! প্রকৃতি বোধ হয় তোমার ঐ রূপ দিতে তার সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারটা একেবারে খালি করে দিয়েছে।

আমার টেবিল ফুলদানীতে বড় বড় গোলাপের তোড়া সাজান থাকে—কই তাদের সৌন্দর্য্য তো আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে না—আকাশে কত তারাই না হাসে—কই ওদের হাসি ত আমায় তত মোহিত কর্ত্তে পারে না—বাতাসে কত দূরের কত বাঁশীর সুর ভেসে আসে—কই সে সুর তো আমার প্রাণে স্পর্শ কর্ত্তে পারে না—যতটা পারে তোমার মুখ—তোমার নীরব চাহনি—তোমার হাসি!

সেদিন বাবুর বাড়ী থেকে অনেক খাবার এসেছিল। তোমায় ডেকে একটু জল খেতে দেবার ইচ্ছা হল—তোমায় ডাকলুম—অকুণ্ঠিতভাবে এলে তুমি আমাদের ঘরে। আমি ভেবেছিলাম হয়ত আসবে না—হয় ত ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে কিন্তু আশ্চর্য্য হলুম তোমার সেই

ঘাড় উঁচু করে আসাতে। এঘরে কত জমীদার বড়লোক এসেছে কিন্তু অমন সোজা চোখে কেউ আসতে পারে নি কিন্তু তুমি—

আসন পেতে রেকাবী করে যখন জলখাবার সাজিয়ে দিচ্ছিলাম তখন এক একবার বুকটা দুরদুর করে উঠছিল, ভয় হচ্ছিল পাছে বলে বস তোমার দেওয়া জিনিস খাব না—আশ্চর্য্য হলুম তোমার দ্বিধাহীনভাবে আসনে বসে পড়া দেখে। খাওয়া শেষ ক'রে যখন তুমি আমার হাত থেকে পান নিতে নিতে আমায় বল্লে খুব খাইয়েছ—আমি কুণ্ঠার সহিত ছোট্ট করে বল্লুম—ভারী ত! তুমি হেসে বল্লে—আরও ভারী করে দিলেই পারতে!

আমি বল্লুম—"কোথায় পাব? আমি যে গরীব"!

বাস্তবিক, তোমার ঐ "ভারী ক'রে" কথাটা গুরু-ভারের মত দুলতে দুলতে প্রাণে এসে লাগল। মিষ্টি লাগল,—মনে হ'ল—আমার কাছ থেকে তুমি হাল্কা খাবার পেয়ে যেন তৃপ্ত নও—ভারী কিছু চাও সত্য সত্যই চাও! কিন্তু দেবতা কোথায় ভারী কিছু পাব? আমার ফুলের মত হাল্কা প্রাণ—এর ভার কি তুমি বইতে রাজী হবে—আমার নিবেদন কি তুমি নেবে?

জানিনা কেন আমার মা (সত্যিকারের মা নয়—একটী রাক্ষসী মায়ের আকারে আমাদের মত হতভাগিনীদের মাতৃত্বগৌরব বহন করে বেড়ায়) তোমায় একদম দেখতে পারতেন না। সেদিন তোমায় জলখাবার দিয়েছিলুম—কি করে জানতে পেরেছিলেন। তিনি আমায় তোমার কাছে যেতে কিম্বা কথা বলতে একদম নিষেধ করে দিয়েছিলেন—সেইদিন রাত্রে আমার প্রবল জ্বর হয়। চার দিন বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছিলুম, সেই জ্বরে যদি আমার মৃত্যু হ'ত—বেশ হ'ত দেবতা—কিন্তু ভগবান আমায় বাঁচিয়ে দিলেন—বোধ হয় অনেক কষ্ট সইতে হবে বলে। চোখ থেকে কান্না বেরিয়ে আসতে চায় কিন্তু বেরোয় না—এরই মধ্যে এই ছোট বুকখানা একদম যেন পাষাণ হ'য়ে গেছে।

বেহারাটার মুখে শুনেছিলুম—তুমি দুই তিনবার ক'রে এসে আমার খবর নিয়ে গেছ—তার কাছ এসে চুপি চুপি জিজ্ঞেস কর্ত্তে। সত্যই তুমি দেবতা! এ ঋণের পরিশোধ নাই?···দেওয়া যায় সে দিতে পারব না ·· চেষ্টা করতুম—কিন্তু ক্ষমতা নাই—কিন্তু তুমি যে সত্য দেবতা, আর আমি রূপোপজীবিনী একথা কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছি না—এ কি ভুলা যায়······অসুখ সারবার পর যেদিন তোমায় আমায় প্রথম দেখা হয়—তখন তুমি বলেছিলে—"সরো, তুমি বড রোগা হয়ে গেছ"! তোমার সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর জানিয়ে দিল আমার জন্য তুমি কত না ব্যথা অনুভব করেছ তোমার মুখে যেন আমার জন্যে একটা কষ্টের ছাপ সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছিল কিন্তু তাতে মনে আহ্লাদ পেয়েছিলুম! আমি কি পাপিষ্ঠা!

কিন্তু ভাল হবার পর আর তোমার সে নিত্য আসা ছিল না—প্রথমে ভেবেছিলাম ভালবাসতে তাই আসতে পরে বুঝলুম নিষ্টুর সেটা শুধু তোমার করুণা—করুণা আমি তো চাইনি—যা চেয়েছিলুম—না না—কিছু চাইনি।

অনেক কথা লিখে গেলুম—জানি কোন লাভ নাই এতে—কারণ তুমি অনেক উপরে আর আমি অনেক নীচে তুমি আলোয় আমি অন্ধকারে—

জানি চিঠি লেখাটাই আমার ভুল হয়েছে।

না দিলে তোমার কিছু যেত আসত না। কিন্তু পারি না—যে এ রুদ্ধ আবেগ শেষে কি বুকটা ভেঙ্গে দেবে? কিন্তু ভয় যদি এ অভাগীর কষ্টে তোমার করুণা জাগে—যদি তাকে আশ্রয় দিতে তোমার মহিমার সৌধ শিখর থেকে নীচে নেমে এস, না—না—তা এস না—সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু সেটা পার্ব্ব না।

তুমি আমার হৃদয়ের ধন—তুমি আমার প্রাণের প্রাণ—আমি তোমার কে? জানি আমি তোমার কেউ নয়—পথের ধারের একটী ক্ষুদ্র ধূলিকণা—পায়ে দলে' যেও তাতেই আমার তৃপ্তি—সন্তোষ! এতদিন জানাই নাই আর আজ জানাচ্ছি কেন—এ কথার উত্তর যে আর তোমায় আমার দেবার সম্ভাবনা লুপ্ত হল—আমি আজ সব ত্যাগ করে যাচ্ছি তাই পেতে যা এত দিন ত্যাগ করেছিলুম। বিষয়সম্পত্তি সব রইল তোমার তত্ত্বাবধানে—দীনের সেবার জন্য—তার তদারকের ভার তোমার উপর—এইটুকু পেলে জানব আমি ধন্য। মনে থাকে যেন সেই প্রথম দেখার কথা—যেদিন আমি পথে পড়ে যাই, আর তুমি হাত ধরে তোলো, যখন তুলেছ আর ফেলে দিও না—

বড়দিনের সফর

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

(তৃতীয় কিস্তি)

বিপদ যে কোন্ দিক হ'তে এসে মানুষকে আক্রমণ করে তা বুঝে ওঠা তার পক্ষে বড় শক্ত। সে দূরদৃষ্টি তার নাই। সেদিন জলধরদার বাড়ীতে যাবামাত্র তিনি বল্লেন, "ভায়া জ্ঞান ত সফরে'র দ্বিতীয় কিস্তি নিয়ে গেল না, তুমি এটা তাকে দিও। আর এর 'শেষ বেশ'টা তোমাকেই করতে হ'বে।" আমার মাথায় যেন হঠাৎ আকাশ ভেঙ্গে বাজ পড়্‌ল। অনেক অনুরোধ করলাম; কিন্তু ফল কিছুই হ'ল না। 'বেদের বড় ও কায়েতের ছোট' হওয়া যে কি দায় তাহা বেশ বুঝলাম। তাঁর কথার উপর 'না' বলবার শক্তি কোন দিনই আমার নাই। কৈফিয়ৎ স্বরূপ পাঠকপাঠিকাদিগের নিকট এটা আগেই বলে রাখি যে, তাঁহাদিগকে 'দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হ'বে।' তাঁরা তাঁর কাছ থেকে যে রস পাচ্ছিলেন, সে রস পাবেনই না। এ 'কিস্তিতে' প্রবীণ লেখক মহাশয় পাঠকদিগকে 'মাৎ' করিতেন, তাহা আমি জোর গলায় বল্‌তে পারি, কিন্তু এ অধীন যে নিজেই মাৎ হয়ে পড়্‌বে তাতে আর অণুমাত্র ভুল নাই। থাক বেশী ভণিতা আর না করে, কথাগুলা বলেই ফেলি। বরাত ছাড়া ত আর পথ নাই!

প্রথমদিনের প্রথম প্রবন্ধ ছিল শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি এস সি মহাশয়ের 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রাধা'—তুলনামূলক সমালোচনা। ইহাতে ও তৃতীয় পঠিত প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত নিরাপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'বৈদিকযুগে রমণী'তে নূতন কিছু না থাকিলেও বর্ণন-ভঙ্গীর গুণে প্রবন্ধ দুইটী বেশ চিত্তাকর্ষক হ'য়েছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধকার স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহাশয়। তাঁর 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে অনেক ভাব্‌বার কথা আছে। এটী সময়োপযোগীও হ'য়েছিল। তারপর সাহিত্য-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ সান্যাল, তাহার 'প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্র' প্রবন্ধ পড়্‌লেন। শুনে ত অবাক্ হ'য়ে গেলাম। কথা-সাহিত্যিক ও সুবিখ্যাত নটশিল্পী এত গভীর গবেষণামূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখ্‌তে যে পারেন তাহা ভাব্‌তেও পারি নাই। এ প্রবন্ধে তাঁর যত্ন ও অনুসন্ধিৎসার যে নিদর্শন দেখ্‌তে পাওয়া যায় তার প্রশংসা না করে থাক্‌বার যো নাই। ভায়া আমার প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতে আধুনিক যুগের রঙ্গমঞ্চের মত রঙ্গমঞ্চ ছিল ও নাটকের অভিনয়ও সেখানে হ'ত। গ্রীকদের কাছ থেকে যে রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনা আমরা ধার করি নি, এ কথাটা শুনে প্রাণে খুব আনন্দ পেলাম। রাত্রি ৭৷৷০ টার সময় সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হ'ল।

পরদিন প্রাতর্ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল ভূতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত বলরাম সেন মহাশয়ের বাড়ী। বেলা ২টার সময় 'চোষ্য-চোষ্যলেহ্যপেয়' রসনাতৃপ্তিকর দ্রব্য সমূহের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করা গেল। সে সব জিনিষের তালিকা (menu) দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয় বলেই মনে করি; কারণ জোর গলায় বল্‌তে পারি যে, যত বড়ই সংযমী হ'ন না, তা শুন্‌লে তাঁর মনেও লালসার উদ্রেক হ'বে। কাজ কি আর তা বলে। মণিবাবুর বাড়ীতে এসে একটু বিশ্রাম করলাম ও হেড মাষ্টার মহাশয়, সত্যেশ ভায়ার বড়কুটুম্ব শ্রীযুক্ত মহাদেব গুপ্ত এম-এ, বি-এল মহাশয়, বসন্ত ভায়া ও আমি একটু ব্রিজ খেল্‌লাম। তারপর চায়ের সদ্ব্যবহার করে Indian Associationএর At Home পার্টিতে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে পড়্‌লাম। সার ডোরাব ও লেডী টাটার সম্বর্দ্ধনার জন্যই এই আয়োজন হয়েছিল। ঘোষ সাহেব আমাদিগকে তাঁর মোটরে করে নিয়ে যান। সেখানে জামশেদপুরের শিক্ষিত ভারতীয়দের সামাজিক চিত্র দেখ্‌বার বেশ অবসর পেয়েছিলাম। আমি এখানে কিন্তু ঠিক ধাতস্থ থাকতে পারি নি। আমরা কতকটা
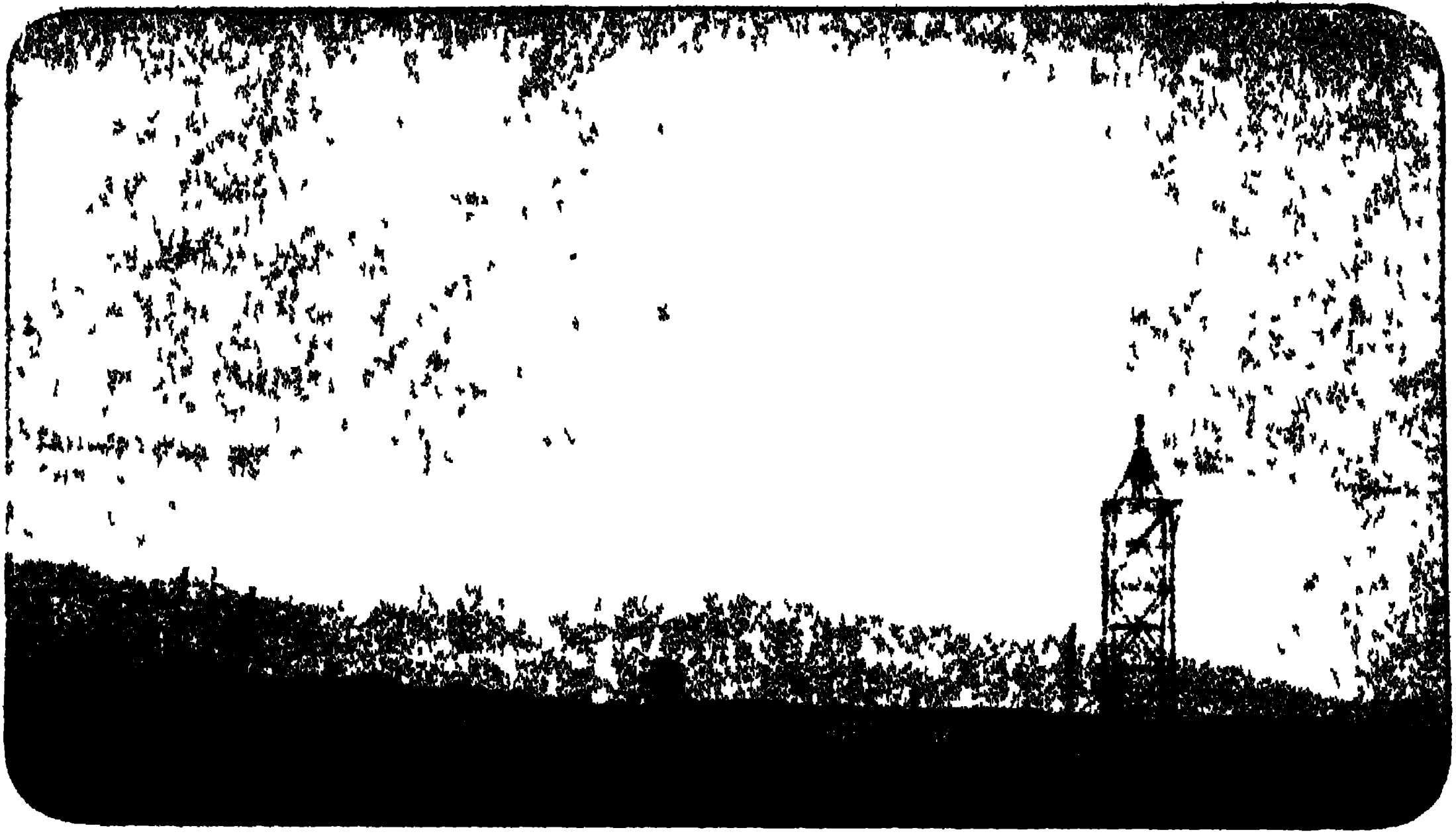
সেকেলে লোক হ'য়ে পড়েছি। অনেকগুলি অপরিচিত সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহিলাকে সাধারণ পুরুষদের সঙ্গে একসঙ্গে মেলামেশা করতে দেখলুই আমার মনে হয়, মা জননীরা ঠিক পুকুর থেকে ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত হ'য়ে পড়েন। তাঁরা পর্দার বাহিরে এসেছেন সত্য কিন্তু আমি জোর করে বল্‌তে পারি, তাঁদের মুখের ভাব দেখে মনে হয়েছিল যে, তাঁদের জড়তা এখনও সম্পূর্ণভাবে যায় নি। অবশ্য এটা আমার যে অনভ্যস্ত চোখের দোষ নয় তা বল্‌তে পারি না। যাক তারা যে তাঁদের স্বামী ও বন্ধুবান্ধবদিগের আনন্দবর্দ্ধন করে ছিলেন একথা খুব ঠিক। তবে একটা কথা মনে হয়, পাশ্চাত্য জাতিদের দেখা-দেখি আমরা যেন আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য কোনও দিন না হারাই। নব-নারীর অবাধ মেলা-মেশা এদেশে কোনদিনই আদর পায় নি. আর বোধহয় পাবেও না। তবে একথাও ঠিক পুরুষদিগের কর্ম্মক্লিষ্ট প্রাণকে সতেজ রাখতে, তাঁদের হৃদয়ে উৎসাহ সঞ্চারিত করতে, আত্মীয়া নারীদের মন্দাকিনীর ন্যায় পূত আনন্দ ও রসধারা যে দরকার, সে কথা কেহই অস্বীকার করবেন না। ভারতীয় রমণীদের লজ্জাই যে ভূষণ তা সেদিনও সেখানে দেখে, প্রাণে আনন্দ পেয়েছিলাম। বসন্ত ভায়া সাহেবী-ঘেঁষা লোক হলেও সেদিন তাকেও ঠিক মেজাজে থাকতে দেখি নি, কিন্তু আমাদের জলধরদা always forword. লেডী টাটা ও অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে বেশ আলাপ করেছিলেন। অস্বাভাবিকতার চিহ্ন মাত্রও তার মুখ চোখে দেখতে পাই নি। ঘোষ সাহেব আমাদের অবস্থাটা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন—অন্ততঃ আমার অবস্থাটা. তাই তিনি বসন্ত ভায়া ও আমাকে লইয়া গল্প জুড়ে দিলেন। তার অমায়িকতা ও সদালাপের ভূয়সী প্রশংসা না করে থাকবার যো নাই। তিনি কাশী-ধামের প্রসিদ্ধ ঘোষবংশের সন্তান। সেদিন আমার সঙ্গে কায়স্থদের সামাজিক অনেক কথা লইয়াই তাঁহার আলোচনা হ'ল। তার পিতার শ্রাদ্ধের সময় গোলোযোগ তিনি যেভাবে মিটিয়েছিলেন, তাহা শুনে তাঁহার বুদ্ধির, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ও সৎসাহসের ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। বিলাত ফেরতা সাহেব মানুষ কায়স্থদের জাতীয়তার এত খবর যে রাখেন, তা ধারণাই করতে পারি নাই। কুলগ্রন্থেও তার বেশ দখল আছে দেখলাম। দাদা ও বসন্তভায়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করলেন। উদরে স্থানাভাব থাকায় আমি আহার্য্য সামগ্রীর কিছুরই সদ্ব্যবহার করতে পারলাম না। জলযোগান্তে ঘোষ সাহেবের মোটরেই মিলনীতে গেলাম।

দ্বিতীয় দিনের সভার কার্য্যের আরম্ভ ঠিক ৬।০টায়

সময়েই হয়। প্রথমেই একটী সংগীত হল। তারপর সভাপতি মহাশয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি পাঠের পূর্ব্বে সাহিত্যবিষয়ক যে কয়টী প্রবন্ধ পূর্ব্বদিনে পঠিত হয় নাই—তাহা পাঠ করিতে লেখক মহাশয়দিগকে অনুরোধ করেন। সুকবি বসন্তকুমারের 'ভারতের নারী' কবিতা সত্যেশভায়া পাঠ করেন। কবিতাটী যেমন সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী, পড়াও তেমনি সুন্দর হ'য়েছিল। শুনে প্রাচীন ভারতের নারীর গৌরবময় চিত্রখানি নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তৎপরে শ্রীযুক্ত গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহু-তথ্যপূর্ণ 'লৌহের জন্মকথা' প্রবন্ধ পাঠ করেন। এবার সভাপতি মহাশয় বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এস, বি (হারওয়ার্ড) ওরফে গুপ্ত সাহেবকে তাঁহার "By-pfroduct in coking" প্রবন্ধ পাঠ করতে অনুরোধ করেন। প্রবন্ধটী এমন সরস সরল ইংরাজীতে লিখিত হয়েছিল যে, সকলেই ইহার রসগ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ইহাতে বহু জ্ঞাতব্যতথ্য ছিল। প্রবন্ধ যে ভাষাতেই লিখিত হোক্ না কেন,একপ হৃদয়গ্রাহীভাবে লিখিত হওয়া দরকার। তারপর সভাপতি মহাশয় শর্ম্মাকে 'নাটক ও অভিনয়' প্রবন্ধ পাঠ করতে বলেন। কোন রকমে পাঠ করলাম। তারপর ছিল ভূতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত বলরাম সেন বি, এস-সি মহাশয়ের 'রত্নের সন্ধান' ও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ জনার্দ্দন রাথের 'জামসেদপুরের পত্তন' নামক ল্যাণ্টারণ সাহায্যে প্রবন্ধ। দুঃখের বিষয় অত সহজে রত্নের সন্ধান পাওয়া গেল না—জীবনে রত্নের সন্ধানের জন্য মানুষ অনবরত ছুটে, কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হ'লে সে রত্নের সন্ধান পাওয়া দুরূহ। একদিন এই রত্নের সন্ধান পেয়েছিলেন রাজপুত্র বুদ্ধদেব। তাঁরই নিকট থেকে জগৎবাসী সে সন্ধান পেয়ে কৃতকৃতার্থ হয়েছে। সে রত্নের সন্ধান বহু যোগী, সন্ন্যাসী গৃহীও পেয়ে নিজেও ধন্য হয়েছেন, অপরকেও করে-ছেন। যাক্ কি বল্‌তেছিলাম। ম্যাজিক লাণ্টরণের কলটী বিগ্‌ড়ে যাওয়ায় 'রত্নের-সন্ধান' মিলিল না। বলরাম বাবু সন্ধান দিবার জন্য ত প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে 'রত্নের সন্ধান' জুটিল না। আশা করি শীঘ্রই তিনি আমাদিগকে মাসিক পত্রিকার সাহায্যে তাঁর 'রত্নের সন্ধান' দিবেন। ঐ একই কারণে কর্ম্মী বিশ্বনাথ বাবুর 'জামসেদপুর পত্তন' ও দেখ্‌তে পেলাম না; কিন্তু সুখের বিষয় পরদিন প্রাতঃকালে তিনি আমাদিগকে ৫২খানি প্লেট দেখিয়েছিলেন। সেগুলি দেখে বাস্তবিক বিস্মিত হ'তে হয়। বন জঙ্গলের ভিতর গোযানে চাপিয়া সাহেব ও মেম আসিয়া প্রথম স্থানটী দেখ্‌ছেন, সে চিত্র থেকে আরম্ভ করে আজিকার দিনের সহরের চিত্র পরপর দেখালেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় দু'একটী প্রবন্ধ যাহা অন্যত্র থেকে এসেছিল, তাদের নাম উল্লেখ করেন ও সেগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়; তন্মধ্যে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত আশুতোষ গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রবন্ধ;"Electrons, Atoms and Molecules সভাপতি মহাশয় উপাদেয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধগুলির উপর দু'এক কথা বলে 'সাহিত্য সভা'র কর্ম্মীদের সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করেন। এত অল্প দিনের মধ্যে এমন সুন্দরভাবে কার্য্য চালিয়েছেন বলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে তিনি ধন্যবাদ জানান। তিনি জামসেদপুরবাসী বাঙ্গালীর নিকট ও বাঙ্গালা ভাষাভিজ্ঞের নিকট প্রার্থনা করেন যে, যেন তাঁরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান ক'রে সাফল্যকে করায়ত্ত করেন—সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সহায়তা করেন। এই অনুষ্ঠানের সাহায্যে তিনি বলেন,একতার হেমহারে সকলে আবদ্ধ হ'তে পারবেন, আর পারবেন ভাবের বিনিময় করে সকলেই একমন্ত্রে দীক্ষিত হ'তে। ভাষা-জননীর পূজা করতে করতে একপ্রাণ হয়ে দেশ-জননীর সেবায় ব্রতী হ'তে জামসেদ-পুর একদিন পারবেই পারবে। লাভ-লোকসানের দিকে না তাকিয়ে আপনারা সকলে প্রাণপণে অবসর সময়ে সাহিত্য-সেবা করুন। আর কিছু পান আর না পান আত্মপ্রসাদ পাবেনই পাবেন। আর একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি, সেটা লোক-নিন্দা। এ পথে চল্‌তে গেলে লোকে নিন্দা করবে—বেকুব বলবে। সমালোচকেরাও যে কশাঘাত করবে না তা বলি না; কিন্তু তাতে পেছ্-পাও হ'লে চলবে না। কার্য্যে অগ্রসর হ'তে হবে। আর যখনই একটু অগ্রসর হবেন, তখনই আনন্দ পাবেন। আর দেখুন না কেন সারা বৎসরের ভিতর লোক-নিন্দা

ও গঞ্জনার মধ্যে থেকে আপনাদের ন্যায় গুণজ্ঞ ও রসজ্ঞ সাহিত্যিকদের নিকট আদর আপ্যায়ন ও ভূরিভোজন পাওয়াটা মরুভূমির মধ্যে ওয়েশিষের মত নয় কি? তৎপরে সাহিত্য-সভার সভাপতি মহাশয় তাঁকে সুললিত ভাষায় ভাবপূর্ণ অভিবাদন করে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভা-ভঙ্গের পূর্ব্বে সুকণ্ঠ শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ সেন বি-এ, মহাশয়, 'বন্দেমাতরম্' গীত গায়িয়া এই সাহিত্য-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান করেন।

আমরা ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, জামসেদপুর সাহিত্য-সভার চেষ্টা সফল হউক। সাধনায় কর্ম্মীরা সিদ্ধিলাভ করুন।

সভা ভঙ্গ হ'তে না হ'তেই বন্ধুবর সতীশচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাড়ী গেলাম। সে রাত্রের ভোজন-ব্যবস্থা তাঁর বাড়ীতেই ছিল। দাদা আমার কয়দিন ভূরিভোজনে একটু অসামাল হয়ে পড়েছিলেন—আজ রাত্রে তাঁর নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা করা গেল। দাস মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করে আহার্য্য দ্রব্যগুলির প্রতি সুবিচার করতে আমরা কেহই পারি নাই, পারাও সম্ভবপর নয়। রাত্রি ১২টার সময় বাড়ী ফির্‌লাম।

বাড়ীতে আস্‌তে না আস্‌তেই পরদিনের কার্য্যতালিকা ঠিক হ'য়ে গেল। Agricultural Implements Company Ltd,টিন প্লেট ইত্যাদি সহরের Extended areaতে যেগুলি আছে সেগুলি মধ্যাহ্নে দেখিতে যাওয়া হ'বে, আর রাত্রি ৯॥০টা হইতে ১১॥০টা পর্য্যন্ত মিলনীতে সার ডোরাব ও লেডী টাটাকে অভ্যর্থনা (meet) করিবার জন্য মিলনীর সদস্যগণ কর্ত্তৃক যে অভিনয়ের ব্যবস্থা আছে তাহা দেখ্‌তে হ'বে। তখন জলধরদা সত্যেশভায়াকে বল্লেন, 'এল্ টাউনে প্রাইমারী বিদ্যালয়ে সন্ধ্যার সময় কাল একবার যেতেই হবে। 'বাণীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে কথা দিয়েছি।' 'সেখানে কি হবে জানেন?' বলে সত্যেশভায়া প্রশ্ন কর্‌লেন। দাদা সরলভাবেই বল্লেন, শ্রমিকদিগকে দেখ্‌তে যাচ্ছি, আমিও যে একজন তাদের দলের, দেখ না এই বুড়া বয়েস পর্য্যন্ত খেটে মর্‌ছি। সাহিত্য-সভা কর্‌তে ত যাচ্ছি না। তা যদি যেতাম তা হ'লে তোমরা বল্‌তে পার্‌তে, তোমাদের আতিথ্য গ্রহণ করে, তোমাদের কাছ থেকে গাওনার বায়না নিয়ে তাদের ওখানে গায়িব কেন?' সত্যেশভায়া তখন একখানি বড় বিজ্ঞাপন দেখিয়ে বল্লেন 'দেখুন ত'? উত্তরে দাদা বল্লেন, 'ওসব কথা রেখে দাও, কাল সকাল বেলা অজয় এলেই বলে পাঠাব যে সাহিত্যের গাওনা গায়িতে যেতে পার্‌ব না—শুধু তোমাদের সঙ্গে মেলা-মেশা কর্‌তে যাব। সেখানকার উদ্যোগ কর্ত্তারা যদি রাজী হন, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা এতেই রাজী হবেন। তা হ'লেই যাব।' সত্যেশভায়া তখন বল্লেন, 'বেশ, তথাস্তু—আমাদের তাতে কোন অমত নাই।' দাদা তখন জিজ্ঞেস কর্‌লেন 'ব্যাপারখানা কি?' উত্তরে সব শুন্‌লাম। সাহিত্যের ভিতর এর মধ্যেই একটা দলাদলির সৃষ্টি হয়েছে। এল্ টাউনবাসী সাহিত্যিকেরা সাহিত্য-সভার যজ্ঞে যোগদান করেন নাই। আমি বল্লাম্ 'এখানকার সাহিত্যিকদের যে প্রাণ আছে এই বিরোধ থেকে তা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। এখন কেন চেষ্টা করে দেখাই যাক্ না দুটো দলে মিল্‌তে পারে কি না?' তারপর রাত্রি একটার সময় শয়ন কর্‌তে গেলাম; আর প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম এ যাত্রা আর কোনও ভদ্র ব্যক্তির বাড়ী নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর্‌বো না। পেটের অবস্থা জয়ঢাকের মত হয়ে পড়েছে। পাকস্থলীটা দেখ্‌ছি ফুটবলের ব্লাডারের মত, হাওয়া যত ঢোকাও ততই ঢোকে, উপরে শক্ত চামড়া থাকায় ছেঁড়েও না। কলিকাতার ভেজাল জিনিষ খাওয়া অভ্যাস, এখানকার খাঁটী জিনিষ এত বেশী পরিমাণে গ্রহণ করা হচ্ছে তবুত এখনও ঠিক রয়েছে!

(আগামী বারে সমাপ্য।)

—

জল

শ্রীচৈতন্য কিঙ্কর ঘোষ

"তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃ প্রাণবিনাশিনী।" প্রবল পিপাসা মিটাইয়া জল অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে—"পীযূষ-বল্লীবিনাম্!"

আয়ুর্ব্বেদে কয়েকরকম জলের কথা উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে করকাজল, ঝরণার জল ও কূপের জলের কথা বলিব।

"করকাজ জলং রুক্ষং বিশদ গুরু চ স্থিরম্।
দারুণং শীতলং সান্দ্রং পিত্তহৃৎ কফবাতকৃৎ॥"

করকাজল—ইহা রুক্ষ বিশদ, গুরু, স্থিরগুণ, অত্যন্ত শীতল, কঠিন, পিত্তনাশক, কফ ও বায়ু বর্দ্ধক। বরফও ঐ গুণ বিশিষ্ট। "কৃত্রিমা তু দূষং প্রোক্তা করকা সদৃশী গুণৈঃ।"

"নৈর্ঝরং রুচিকৃন্নীরং কফঘ্নং দীপনং লঘু।
মধুরং কটুপাকঞ্চ বাতলং স্বাদপিত্তলং॥"

ঝরণার জল—রুচিকারক কফবিনাশক ক্ষুধাবর্দ্ধক, লঘু, মধুর, কটুপাক ও বায়ুবর্দ্ধক।

"কৌপং পয়ো যদি স্বাদু ত্রিদোষঘ্নং হিতং লঘু।
তৎ ক্ষারং কফবাতঘ্নং দীপনং পিত্তকৃৎ পরম্॥"

কূপের জল স্বাদু হইলে লঘু ও বায়ুপিত্ত কফ-নাশক, আর ক্ষারবিশিষ্ট হইলে বায়ু ও কফ নাশক ও পিত্তবর্দ্ধক হয়।

স্নান করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয়, অবসাদ দূর হয়। সাধারণতঃ আমরা ঠাণ্ডা জলে না হয় গরম জলে স্নান করি। ৯৮°এর বেশী উত্তাপ যে জলের সেই জল গরম, ৭০°র কম উত্তাপ যে জলের সেই জল ঠাণ্ডা। যে জলের উত্তাপ এই দুইয়ের মাঝামাঝি (৮৮°–৯৮°) তাতে স্নান করিলে বিশেষ কোন ফল দেখে না, তবে সাধারণতঃ আমরা এই রকম জলেই স্নান করি অথবা ৭০°-৮৮° উত্তাপের জলে স্নান করি।

শীতল জলে স্নান করিলে প্রথমে শরীরের উত্তাপ (heat) বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সেই জল শীতল বলিয়া সেই উত্তাপকে টানিয়া লয় (abstracts heat), এই রকমে যখন বৃদ্ধির চেয়ে ক্ষয় হয় বেশী, তখন শরীরের উত্তাপ (temperature) হয় কম। নাড়ী দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্যও দ্রুত হয়, কিন্তু শীঘ্রই কমিয়া আসে। স্নানের পর ক্লান্তি দূর হয়, শরীর স্নিগ্ধ হয়, উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলী শান্ত হয়, মনে বেশ একটা স্ফূর্ত্তি আসে।

গরম জলে স্নানের একটা প্রধান গুণ—স্নানের পর খুব ঘাম হয়, স্নানের পরেই গায়ে জামা দেওয়া উচিত।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহাকে নিঃশ্বাস লইবার জন্য ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেওয়া হয়।

মূর্চ্ছায়—চোখে জলের ঝাপটা দেওয়া হয়।

অধিক জ্বরে—Hyperpyrexia—যদি হঠাৎ জ্বর শরীরের উত্তাপ খুব বেশী হয়, তাহা কমাইবার জন্য ঠাণ্ডা জলে স্নান করান হয়।

প্রদাহে—Inflamation—জল বিশেষ উপকারী। পড়িয়া গিয়া হাতে পায়ে আঘাত লাগিলে, সেই স্থানে বরফ বা ঠাণ্ডা জল লাগাইলে, যন্ত্রণার উপশম হয়। Meningitisএ মাথায় ice bag দেওয়া হয়।

রক্ত পড়ায়—ঠাণ্ডা জল (বা বরফ) শিরাগুলি সঙ্কুচিত করিয়া রক্তপড়া বন্ধ করে।

বাতে ও কলিক বেদনায়—গরম জলে স্নান বিশেষ উপকারী। গরম জলে স্নানে শরীরের জড়তা নষ্ট হয়, মাংসপেশীর আক্ষেপ (Muscular Spasm) দূর হয়, স্থানীয় যন্ত্রনার উপশম হয়।

অনিদ্রায়—শুইবার পূর্ব্বে গরম জলে স্নান করিলে সুনিদ্রা হয়। সর্দ্দিতে নাক বুজিয়া গেলে, রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। পায়ে সরিষার তৈল মালিস করিয়া গরম জলে পা ধুইয়া শয়ন করিলে, সুনিদ্রা হয়। রাত্রে পরিশ্রমের পর শয়ন করিবার পূর্ব্বে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইলে সুনিদ্রা হয়।

বাধকে—Hip bath (বা hot foot bath) অনেক সময়ে উপকার দেখে।

পাথুরীরোগে—জল বিশেষ উপকারী। জলে প্রস্রাব বৃদ্ধি করে, সুতরাং পাথরগুলি (urinary calculi)

মূত্রাশয়ে (bladder) জমিবার পূর্ব্বেই বাহির হইয়া যায়। (... For the minute collections of crystals which are the beginning of all calculi are washed out of the urinary system before they have time to grow to any size ....) যখন খুব জল খাওয়া দরকার তখন ভাল জল খাওয়াই ভাল; এ ক্ষেত্রে Lithia water বা ডাবের জল প্রশস্ত। পিত্ত-কোষের পাথুরীরোগেও (gall-stone) জল উপকার করিতে পারে।

ভোরবেলায় ঠাণ্ডা একগ্লাস জল খাইলে অনেক সময়ে বাহ্যে খোলসা হয়।

অল্প অল্প গরম জল (Warm-water) বমি করায়। বমি করাইতে হইলে সেই জলে খানিকটা লবণ দেওয়া উচিত। কিন্তু গরম জলে (Hot-water) বমি নিবারণ করে।

Nephritis (বৃক্কপ্রদাহে) ও uraemia—গরম জলে স্নান করানর পর ঘাম হওয়া চাই-ই। সুতরাং স্নানের পরই কম্বল ঢাকা দেওয়া উচিত।

নিউমোনিয়ায় (Pneumonia)—"Hydrotherapy is espeeially indicated for patients with high fever, deliriam, Severe toxaemia or circulatory failure."

টাইফয়েডে (Typhoid)—"The use of water inside and outside...Hydrotherapy may be carried out in several ways of which the most satisfactory are sponging, the wet pack, the ice rub and the full bath." টাইফয়েড রোগীকে স্নান করানর সুফল—(১) স্নায়ুমণ্ডলীর উপর প্রভাব বিস্তার করে, প্রলাপ প্রশমিত হয়, কম্প নিবারিত হয়। (২) বৃক্কদ্বয়ের (Kidneys) কার্য্যকরী ক্ষমতার বৃদ্ধি হওয়াতে শরীরস্থ বিষ (toxin) প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয়। (৩) রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার উপর বলকারক প্রভাব বিস্তার করে (Tonic effect on circulation). (৪) শ্বাসনালী ও ফুস্ফুসের প্রদাহ থাকিলে তাহার উপশম হয়। (৫) গাত্রের চর্ম্ম পরিষ্কার থাকাতে ঘা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। (৬) শরীরের উত্তাপ কমিয়া যাইতে পারে। (৭) মৃত্যু কম হয়। (mortality is reduced ... At the Brisbane Hospital where F. E, Hare used it so thoroughly, the mortality was reduced from 14·8 to 7·5 per cent.)

এক পেট ভাত খাওয়ার পর ঢক্‌ঢক্ করিয়া একঘটী জল খাইলে কোন উপকার ত হয়ই না বরং অপকার হয়।

"অত্যম্বুপানান্ন বিপচ্যতেঽন্নং নিরম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মান্নরো বহ্নি-বিবর্দ্ধনায়মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদভূরি॥"

অত্যধিক জল পান করিলে অথবা একেবারেই পান না করিলে অন্ন পরিপাক হয় না, সুতরাং ভোজন করিবার সময় ক্ষুধা বৃদ্ধি করিবার জন্য অল্প অল্প করিয়া জল পান করা উচিত।

"অরোচকে প্রতিশ্যায়ে মন্দেঽগ্নৌ শ্বয়থৌ ক্ষয়ে।
মুখপ্রসেকে জঠরে কুষ্ঠে নেত্রাময়ে।
ব্রণে চ মধুমেহে চ পিবেৎ পানীয়মল্পকম্॥"

অরোচক, প্রতিশ্যায়, মন্দাগ্নি, শোথ, ক্ষয়, মুখস্রাব, উদররোগ (উদরী), কুষ্ঠ, নেত্ররোগ, জরে, ব্রণরোগে ও মধুমেহ রোগে অল্প পরিমাণে জল খাওয়া উচিত।*

* Books of reference—1. দ্রব্যগুণ। 2. Materia medica by Hale-white. 3. The principles and practice of Medicine by Orler and Mobrae. 4 The cold bath treatment of Typhoid fever by F. E. Hare.

হনুমান ও বীরবাহু

(নক্সা)

শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

স্থান—হিমালয়। কাল—অপরাহ্ন।

হনুমান। বীরবাহু, কোন্ প্রয়োজনে মাগিয়াছ
দর্শন আমার ? কি মহা বিপদে পড়ি'
আসিয়াছ এ দুর্গম স্থানে ? বানরের
কুশল ত সব ?

বীরবাহু। হায় প্রভু, কুশলের
কথা শুনি' বক্ষ যায় ফাটি'—রুদ্ধ কণ্ঠে
কথা না জোগায়। কি মহা বিপদ প্রভু,
কেমনে কহিব বল!—দূর জার্ম্মাণীতে
কে এক ভীষক্ নির্ব্বীর্য্যে সবীর্য্য করে
বানরের বীর্য্যগ্রন্থি ল'য়ে। সেই হ'তে
দেশে দেশে ভীষকের দল হইয়াছে
বানরের মহাশত্রু সবে। য়ুরোপের
যত বৃদ্ধ নির্বীর্য্যের দল, হ'বে বলে'
বীর্য্যবান পুনঃ, অকাতরে অর্থ ঢালি'
ল'য়ে যায় বানরের দল আপনার
স্বার্থসিদ্ধি তরে। ভীষকের দল আজি
অর্থ লোভে—শুধু মানবের ইষ্ট তরে—
সর্ব্বনাশ সাধিছে মোদের—শুধু অর্থ
আর খ্যাতি তরে। শক্তিহীন মোরা—
মূক মোরা—দলে দলে তাহাদের করে
করিতেছি আত্ম সমর্পণ।

হনুমান। এ যে অতি অসম্ভব। যেই দেশে
ডারউইন জন্মিল,—পূর্ব্ব পিতৃকুল
বানর নরের যেই দেশে নির্ব্বিরোধে
মানিল সকলে,—সেই দেশে ভীষকেরা
আজি বানর হত্যায় হইছে সহায়!

বীরবাহু। শুধু অর্থ আর খ্যাতি তরে নির্ব্বিবাদে
পিতৃকুল করিছে নির্ম্মূল। হায় প্রভু,
কলঙ্ক কাহিনী কত আর কব বল!
ভারতবাসীরা—তাহারাও সবে
অর্থলোভে অতি হীনভাবে বানরেরে
দেয় নির্ব্বাসন সুদূর য়ুরোপে আজি।
বদ্ধ করি ক্ষুদ্র পিঞ্জরেতে,—নাহি জল,
নাহি খাদ্য,—স্বল্প পরিসরে ঠেসাঠেসি করি,—
যতদূর সম্ভবে দীনতা,—অর্থ লোভে
হেন অবস্থায় পাঠাতেছে আমাদের
আত্মীয় স্বজনে নিশ্চিত মৃত্যুর তরে।
ভুলে গেছে তারা আজ সীতার উদ্ধার,—
রাঘবের বানর-বাহিনী উদ্ধারিল
যুদ্ধ করি কি মহা বিক্রমে জানকীরে
দুর্জ্জয় রাবণ গ্রাস হ'তে। ভুলে গেছে
অকৃতজ্ঞ নরগণ, বানরেরা অকাতরে
সেতু বন্ধে দলে দলে দিয়াছে জীবন।
সীতার উদ্ধার তরে অর্দ্ধেক বানর
দগ্ধমুখ আজি, ভুলে গেছে সেই কথা।
উৎকল বিহার অঙ্গ বঙ্গ মদ্রবাসী—
রামনাম না করিয়া করে না গ্রহণ
জল,—তাহারাও আজি হায় নিস্পন্দ নিশ্চল,—
নির্ব্বিরোধে হেরিতেছে বানরের
এই হেয় নির্ব্বাসন—পরিণাম মৃত্যু যার।
তাই প্রভু না হেরি উপায় কোন আর
আসিয়াছি তব পাশে প্রতিকার তরে—
বানরের প্রতিনিধি হ'য়ে। কর প্রভু
যা হয় বিহিত।

হনুমান। কি করিতে পারি আমি
বীরবাহু ? নাহি আর মোর পূর্ব্ববল,—
নহি আর সক্ষম সবল। সত্য বটে
রামচন্দ্র কৃপাপরবশ হয়ে দিয়াছেন
অমরত্ব মোরে, কিন্তু নাহি আর মোর
সে শকতি অসম্ভবে করিল সম্ভব
যাহা। তবু ইচ্ছা হয় একদিন শুধু
যদি ফিরে পাই সেই বল,—অকৃতজ্ঞ এই

ভারতবাসীরে শিক্ষা দিই রীতিমত,—
কৃতন্ত্রের পুরস্কার দিই তাহাদের
ডুবাইয়া সাগরের জলে। কিন্তু আজ
আছে মাত্র নিস্ফল আক্রোশ,—নাহি আর
সে শকতি মোর।
হৃতবীর্য্য আমি আজি কে করিবে মোরে
বীর্য্যবান! বড় দুঃখ এ সময়
নাহি আসিলাম স্বজাতির কোন উপকারে।
যাও বৎস, দগ্ধমুখ মর্কট গরিলা
বন-নর মেনি আদি বদ্ধ হ'ও সবে
একতায় আজি ;—ভুলে যাও জাতিভেদ।
স্মরি' মনে সকলের বিপদ সমান
জীবন সংগ্রামে সবে হও অগ্রসর।

সর্ব্বদা রাখিও মনে—একতাই বল,—
একতাই রাবণ বধিল, পরাইল
জয়-মাল্য রাঘবের গলে ;—নহে কিবা
সাধ্য সেই ক্ষুদ্র বাহিনীর করে জয়
দুর্জ্জয় রাবণে। বানর কটক রচি'
নিভৃত অরণ্যে হও সবে একত্রিত ;—
জীবন করিয়া পণ কর রণ সবে
মানবের সনে ;—রহিতে জীবন কভু
বন্দীত্ব স্বীকার না করিবে হোক তব
পণ আজি ;—নখ-দন্ত হউক সহায় ;—
আর মোর শুভ ইচ্ছা শুভ আশীর্ব্বাদ
দৃঢ় বর্ম্মসম সকল বিপদ হ'তে
নিরাপদে রাখুক সবারে।

ভ্রান্তির বিপদ

শ্রীজ্ঞানরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় বি-এস-সি

থামো, থামো, কেঁদনা প্রেয়সী!
আমি নই দোষী।
আঁধারের মাঝে একা বসে বসে তুমি,
পান যে সাজিতেছিলে বুঝি নাই আমি।
আফিস হইতে ফিরি রুক্ষ ছিল মেজাজ আমার,
গালাগালি ক'রেছিল সাহেব চামার ;
ঘরে ঢুকে দেখি এক কোণে
সাদা দেখা যায়, ভাবিলাম মনে—
খুটখাট করিতেছে, নিশ্চয়ই ওটা—
ও বাড়ীর বোসেদের সেই পাজি বেটা—
নচ্ছার বেরাল ;
চুরি করে খেয়ে খেয়ে হ'য়েছে জোরাল।

ভাল ক'রে দেখাব উহারে,
বারে বারে চুরি করা অত সোজা না রে,
ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে তাই,
তুমি যে ওখানে ছিলে তাতো বুঝি নাই!
রাগে রাগে যা ছিল শকতি—
সব দিয়ে মেরেছি যে লাথি!
কে জানিত তুমি ছিলে বসি?
থামো, থামো, কেঁদনা প্রেয়সী।
আগে যদি জানিতাম তাহা,
তবে কিগো তোমা কভু মারিতাম? আহা!
আঁখি-জলে ভেসে যে গো গেছে মুখশশী ;
থামো, থামো, কেঁদনা প্রেয়সী!
আমি নই দোষী।

কাজের কথা
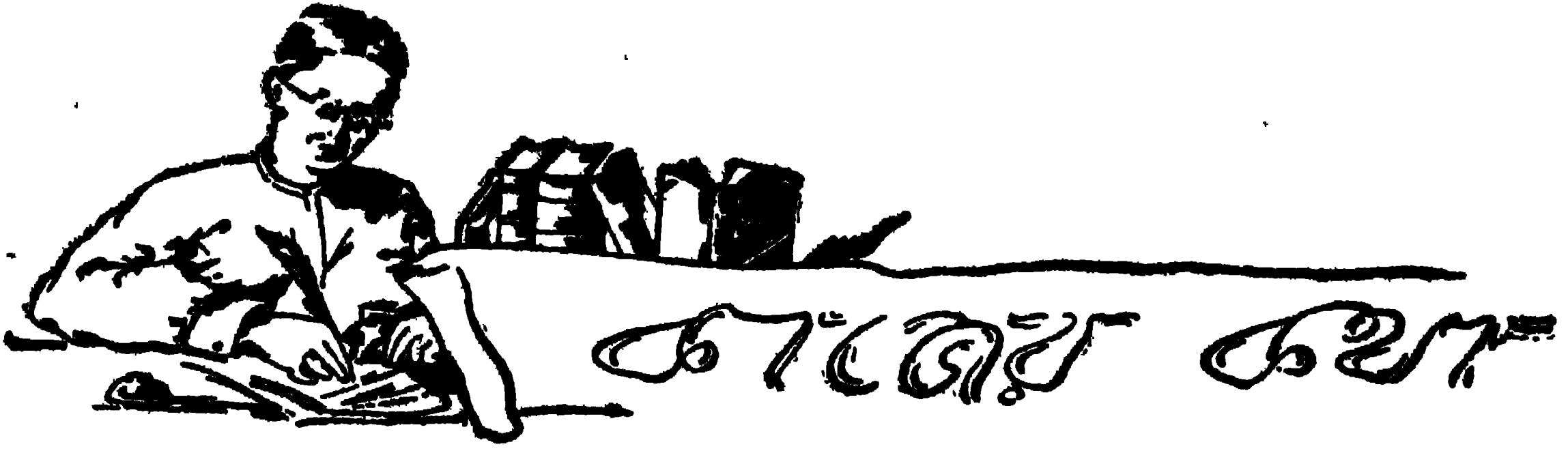
কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ—কলিকাতায় ফিরে এসেছেন এবং আলিপুরের হাওয়া আফিসের কর্ত্তা শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন শরীর অসুখ বলে এখন তিনি লোকজনের সঙ্গে দেখাশুনা কর্ত্তে অক্ষম। ভগবানের কৃপায় তিনি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করুন ইহাই সকলের কামনা।

স্পোর্টস ক্লাব—সহরের চারিদিকে এই নূতন নামে সনাতন জুয়ার আড্ডা খোলা হইতেছে। এঁর উদ্যোক্তারা বোম্বাই থেকে দয়া করে এসে হর্সরেসটাকে খুব সুপ্রাপ্য করে দিচ্ছেন সহরের উত্তরাংশেও একটী আড্ডা স্থাপিত হয়েছে—উদ্দেশ্য বোধহয় অন্তঃপুরিকারাও ঝি চাকরের বা ছেলেপুলের মারফতে যাতে বেটিং কর্ত্তে পারেন তার সুবিধা করে দেওয়া,জাকারিয়া ষ্ট্রীটে, হ্যারিসন রোড ও সেণ্ট্রাল এভিনিউয়ের মোড়েও এরকম আড্ডা খোলা হয়েছে। প্রকাশ্যে এগুলি অবশ্য কেবল মেম্বর দিগের জন্য। যাঁরা সময়াভাবে মাঠে যেতে না পারেন বা পয়সার কমতির জন্য এতদিন বের কর্ত্তে পার্চ্ছিলেন না তাঁদের জন্য এঁরাই সদাসর্ব্বদা উদ্যোগী। পুলিস এঁদের কিছু কর্ত্তে পার্ব্বেন? না আইনে বাধবে তাও জানি না। রাতারাতি বড়লোক হবার নেশাটা জগতের সব জাতিরই আছে এবং সেটা বেশী করে এই পোড়া চাকরীসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর আছে কারণ তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে, পরিশ্রম করে বা ধীরে ধীরে বড়লোক হবার ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছে "হঠাৎ নবাব" হবার জন্য সকলেই সচেষ্ট সুতরাং বাঙ্গালীদের কাছে এরকম ফাঁদ পাতলে তাতে যে তারা সহজেই পা দেবে, তা জানে এই ধূর্ত্ত বোম্বাইওলারা। অঙ্কুরে বিনাশ না হলে এর ফল তুলার খেলার মত হয়ে দাঁড়াবে।

ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন—গত রবিবার ধূমধামের সঙ্গে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক উৎসব হয়ে গেছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই প্রসঙ্গে ছেলেদের উপলক্ষ করে দেশের লোককে অনেক দামী কথা শুনিয়েছেন। দেশের মান্যগণ্যের দল সব উপস্থিত ছিলেন নানারূপ আমোদ প্রমোদ ব্যায়াম, সন্তরণ, শিল্পপ্রদর্শনীরও ব্যবস্থা ছিল। এ জিনিসটী ছোট থেকে আরম্ভ হয়ে ক্রমশঃ বড় হয়েছে এবং বাঙ্গালীর কর্ম্মশক্তির একটী গৌরবস্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন দেশের লোকেরা যথাসাধ্য সাহায্য করে এটীকে আরও বড় করে তুল্লেই বাঙ্গালীর বাকসর্ব্বস্ব নাম ঘুচিয়ে তারা সত্যকার প্রতিষ্ঠা পাবে। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এ উৎসবে যোগদান কর্ত্তে না পেরে আমরা বড় লজ্জিত আছি এবং উদ্যোক্তাগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর্চ্ছি।

মৃত্যুর পথে—মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী অর্থাৎ এই আমরা যারা প্রকৃত পক্ষে শ্রমিকদের চেয়ে গরীব অথচ যারা বাহ্যিক ফর্সা কাপড় চোপড়ে ঢেকে মধ্যবিত্ত বলে পরিচয় দেয় তাদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব বেশ দস্তুরমত হয়েছে এর কারণ অতিরিক্ত পরিশ্রম, অপর্য্যাপ্ত বা পুষ্টিহীন আহার আর অধিক ইন্দ্রিয় সেবা। এ রোগের প্রতিকার ব্যয়সাধ্য বলে মধ্যবিত্তদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা বেড়েই চলেছে—সেদিকে বড় একটা কারুর দৃষ্টি নেই যার মরবার সে নীরবে মরে যাচ্ছে কিন্তু এতে জাতিটার ভবিষ্যৎ যে কি হবে তা কারুর এখন ভাববার অবসর নেই। বড়লোকের সংখ্যা খুব বেশী নয় আর তাঁদের রোগ হলে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবার ভয়, নেই আর মারা গেলেও তাঁদের স্ত্রীপুত্র পথে বসবেন না সুতরাং এদিকে কে মাথা ঘামায়। ডাঃ মুথু বিলাতে এই যক্ষ্মা

নিবারণের জন্য নূতন চিকিৎসাপ্রণালী ও বন্দোবস্তে একরকম স্বাস্থ্যনিবাস খুলে যক্ষ্মা আরোগ্যের সম্ভাবনা এক রকম হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন। সে দেশের লোকেরা তাঁকে যথাসাধ্য উৎসাহও সাহায্য করে তাঁর কৃতিত্বের ফল উপভোগ কর্চ্চে, সম্প্রতি তিনি তাঁর নিজের দেশ এই ভারতবর্ষে ঐ রকম একটা কিছু কর্ত্তে চান এতে ভারতবাসীদেরই বেশী উপকার কিন্তু এসব ব্যাপারে অর্থাৎ যাতে বাহবা নেই, হাততালি নেই যা কর্লে রাজ-খেতাব মিল্‌বে কিনা সন্দেহ—কারুর গা ঘামবে কি? যে দেশ বিশ্বাস তো হয় না—তবে বড়লাট বা গভর্ণর যদি অগ্রণী হতেন তা হলে ম্যাও ধরবার জন্য লেজুড়ওলা লোক অনেক মিলতো সন্দেহ নাই।

রৌলট কীর্ত্তি—রৌলট আইনের প্রবর্ত্তক জাষ্টিস রৌলটের নাম বোধ হয় আপনারা ভুলেন নাই। সম্প্রতি বিলাতে তিনি এক ইনকম ট্যাক্‌সের মাম্‌লায় একটা মজার রায় দিয়েছেন তিনি বলেছেন ঘোড়দৌড়ের বাজী জেতার টাকার উপর ইনকম ট্যাক্স বসতে পারে না এতে অবশ্য 'রেসাড়ী'দের মধ্যে তাঁর একটা সুনাম পড়ে যাবার কথা কিন্তু বাজীর টাকার উপর কেন যে ইনকম ট্যাক্স বসতে পারে না সে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে তাহলে বড় বড় ব্যবসাদার যারা মোটা লাভ করেন—লাভের টাকাটা রেসখাতে লোকসান দেখিয়ে সরকারকে ফাঁকী দেবে। উহ্য রাখলেই তাঁর একটা কীর্ত্তি থেকে যেত কিন্তু হলে কি হয় এক ফোঁটা চোণাতে এক কলসী দুধ একেবারে মাটী করে দিয়েছে।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সভা—সেদিন বার্টন সাহেবের সভাপতিত্বে এঁদের সভার একটা অধিবেশন হয়েছিল উদ্দেশ্য ছিল এংলো ইণ্ডিয়ানদের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে একটু ওয়াকিব হাল করে দেওয়া কিন্তু কাজে তা হয় নি, হয়েছিল ফাঁকা কনষ্টিটিউসনের সূক্ষ্মনীতির কাটাকাটি আর দলাদলি আমাদের জাতীয় ব্যাধি এঁদের উপরও বেশ প্রভাব স্থাপনা করেছে বোঝা গেল; জল বায়ুর দোষ এড়িয়া যাওয়া কি সোজা কথা?

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীর বেতন—স্বরাজী-দের ভোটের জোরে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীদের বেতন আবার ২৲ টাকায় দাঁড়িয়েছে এটা কিন্তু ভারী অন্যায় যে দিন কাল ১৮।২০ টাকা মাইনে না দিলে একটা চাকর মেলে না ২৲ টাকার মন্ত্রী পাওয়া যাবে কি করে? তার চেয়ে পরিষ্কার বোল্লেই হোতো আমরা কাটের পুতুল নিয়ে আর খেলবো না।

"রবীন্দ্রনাথের প্রতি"

শ্রীমনোমাধব চাকী এম্-এ

বাঙ্গলা তোমার মুখের পানে যুগ-যুগান্ত ধরি'
চেয়ে আছে হায় কবিবর, ব্যর্থ আশায় মরি'!
প্রেমের গানে তৃপ্তি নাই আর, মলিন নয়ন তা'র,
বুকের ব্যথায় গুম্‌রে মরে—এ যে পাষাণ ভার'!

বিজন বনে চাঁদের আলোয় কি গান গা'বে কবি,
আঁধার হ'য়ে আস্‌ছে আকাশ, চন্দ্র-তারা সবি—
সবই যাবে মেঘে ঢেকে, বাজ্‌বে "মেসিন্-গান্"
নাচ্‌বে বিশ্ব বিরাট নৃত্যে, কেঁপে উঠ্‌বে প্রাণ'!

—তখন তোমার জুঁই ফুলের গান কোথায় যাবে ভেসে
ক্ষ্যাপা কবির কাণ্ড দেখে উঠ্‌বে জগৎ হেসে!

সন্ধ্যা হ'য়ে এল কবি, বারেক দেশের পানে
চাওনা ফিরে, জাগাও তাদের ঘুম-ভাঙান গানে!
সময় যদি থাকে তখন, বিশ্বপ্রেমের ঢেউ—
ছেড়ো তখন মনের সাধে—মানা কর্ব্বে নাক কেউ!

ইয়ং ইণ্ডিয়া

পত্রিকার সার সঙ্কলন

স্বদেশী ও জাতীয়তা ঃ—জনৈক বন্ধু আমায় লেখেন—"আপনি বোধ হয় মঁসিয়ে রোমঁ্যা রোলাঁর প্রণীত "মহাত্মা গান্ধী" শীর্ষক পুস্তকখানি পড়িয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন—'গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাও—যাহা ছিল আর যাহা আছে তাই থাক। কিছুরই পরিবর্ত্তন না হয়—ঘরে বসিয়া নিজের দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধিতে মন দাও—কিছু আমদানীও করিও না রপ্তানীও করিও না সব বন্ধ থাক—ইহাকে অতি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা ছাড়া আর কি আখ্যা দিতে পারা যায়—আর সেই উদারচেতা মহাত্মা গান্ধীর নাম ইহার সহিত জড়িত! (ভি, বি কালেলকার কৃত Gospel of Swadesism নামক পুস্তকের গান্ধী লিখিত ভূমিকা সম্বন্ধে) আপনার এক গুণমুগ্ধ ভক্তের এইরূপ উক্তির উপযুক্ত উত্তর আপনার দেওয়া উচিত।

কালেলকার প্রণীত পুস্তিকা সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই ইহা প্রথমতঃ গুজরাটী ভাষায় লিখিত আমি ইহা সম্পূর্ণ না পড়িয়াই দুই চারি ছত্র ভূমিকা লিখিয়া দিই কারণ গ্রন্থকর্ত্তার স্বদেশী সম্বন্ধে মতামত আমি জানিতাম। পরে এণ্ড্রুজ সাহেবের অনুরোধে আমি ইহার ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া দেখি সত্যই ইহাতে সঙ্কীর্ণতা পরিস্ফুট, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে তিনি অনুবাদের দায়িত্ব স্বীকার করেন না সুতরাং এই মাত্র বলিতে পারি উক্ত পুস্তিকার মতামত আমার নিজের নহে। আমি পরকে আপন করিতে গিয়া আপন করা সঙ্গত মনে করিনা, বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া করি না যে দ্রব্য সত্যই আবশ্যক যাহা না হইলে চলে না তাহা বিলাতী কিনিতে বাধা নাই যেমন চিকিৎসা বিষয়ক যন্ত্রাদি—সুইজার্লণ্ডে নির্ম্মিত ঘড়িও ব্যবহার করিতে পারি তবে যাহা আমাদের দেশে পাওয়া যায় তাহা ছাড়িয়া শুধু বিলাসিতার খাতিরে অন্য দেশ হইতে আনীত দ্রব্য ব্যবহারের আমি সম্পূর্ণ বিরোধী—আমার জাতীয়তা সম্পূর্ণ উদার আমি অন্য জাতির ধ্বংসের উপর আমার দেশের উন্নতির ভিত্তিস্থাপন করিতে চাই না। আমি চাই আমার দেশের উন্নতি এমন হউক যাহাতে অন্যদেশও তাহার দ্বারা উপকৃত হইবে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ ঃ—বিষয়টী আমার নিকট বিশেষ রুচিকর নহে—আজ প্রায় ৩৫ বৎসর যাবৎ এবিষয়ে বাদানুবাদ চলিতেছে—কৃত্রিম উপায়ে জন্মরোধ করা সম্বন্ধে আমার নিকট অনেক পত্র আসিয়াছে তাহাদের আমি যথাযথ উত্তর দিয়াছি—এবং যদিও আমি জ্ঞানতঃ কখন কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের পক্ষ সমর্থন করি নাই তথাপি এই প্রসঙ্গে জনৈক লেখক আমার এবং আরও দুইজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম সমর্থনকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমি সর্ব্বসমক্ষে আমার মতামত জ্ঞাপন করা উচিত বলিয়া বিবেচনা করি। ব্রহ্মচর্য্যই যে জন্মরোধের একমাত্র উৎকৃষ্ট উপায় ইহা আমাদের দেশে চিরকাল বিদিত আছে—এই ধর্ম্ম পালনে সুখ ছাড়া দুঃখ নাই, তাই বলি যে সমস্ত চিকিৎসক কৃত্রিম উপায়ের সমর্থন করেন তাঁহারা যদি তাহা না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপকারিতা সম্বন্ধে সকলকে উপদেশ দেন তাহা হইলে তাঁহারা সত্যই জগতের হিতসাধন করিবেন।—কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য গ্রহণের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—পুরুষত্বহীনতা ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য—কর্ম্ম করিব আমি কিন্তু তাহার ফলভোগ করিব না ইহা হইতে পারে না প্রকৃতির নিয়ম তাহা নহে প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিলে ফলভোগ করিতেই হইবে অন্যথা হইবার উপায় নাই—নৈতিক উন্নতি করিতে হইলে নৈতিক সংযম থাকা চাই। যাঁহারা কৃত্রিম উপায়ের পোষকতা করেন তাঁহারা বলেন আসক্তি জীবনের একটী অত্যাবশ্যক সামগ্রী—ইহা অপেক্ষা ভুল আর কি আছে গোড়াতেই এই গলদ তাই বলি, একটু কষ্টস্বীকার করে সামাজিক দুর্নীতির আসল কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করুন। ধৈর্য্য চাই ধৈর্য্য হারাইয়া ছুটাছুটি করিলে কোন উপকারই হইবে না বরং অপকার হওয়াই সম্ভব।

কোথা সে প্রেরণাশক্তি!

টি, এল, ভাস্বানীর লেখা হইতে

অনুবাদক—শ্রীভগবতীচরণ মিত্র

স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ যুদ্ধে কোলাহল, তর্ক, প্রস্তাব, অর্থ কিছুই নয়। অনুপ্রেরিত করিবার শক্তি চাই। যদি সে শক্তি কোন আন্দোলনে না থাকে, সেই আন্দোলনের সেই আন্দোলনের পতন অবশ্যম্ভাবী। এই প্রেরণাশক্তি কেবলমাত্র ভাব ও কল্পনা নয়। আমরা বিচার শক্তি ও কল্পনা চাই। বিচার-শক্তি-হীন কল্পনা অন্ধ। কল্পনা-হীন বিচার-বুদ্ধির সত্বা নাই। কার্য্যপদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য দুইয়ের সামঞ্জস্য বিশেষ প্রয়োজন। কথার চাতুরী আমাদের অনেক সময় বিপথে লইয়া গিয়াছে। জাতীয় প্রয়োজন—কর্ম্ম-তালিকা।

কর্ম্মই জনগণের সহিত ভ্রাতৃভাব আনিবে। একতা, চাই। একতাই শক্তি। রাজনৈতিক দলের আগেকারের মত একতার প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস ও জনগণের সহিত যোগ থাকিবে। আজ পর্য্যন্ত গ্রামে কোনও কাজ হয় নাই। ভবিষ্যতের আশা ঐ গ্রামসমূহে লুক্কায়িত আছে। এই গ্রামসমূহ অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করিবে।

যতদিন না জনগণ সংঘবদ্ধ ও শিষ্ট হইবে, ততদিন এই চেষ্টা ফলবতী হইবে না। আফ্রিকার নিগ্রো-মুক্তির আন্দোলন হইতেছে। মার্কস গার্ভি ইহার নেতা। ৬০ লক্ষ নর-নারী তাঁহার মতানুবর্ত্তী। ইহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যকই সামান্য মানব। উদ্দেশ্য সিদ্ধার্থে আশ্চর্য্যজনক তাহাদের একনিষ্ঠা! গ্রাম সমূহে গার্ভিসমিতিব ৭০০ শত শাখা আছে। সভ্যগণ উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাহাদের সর্ব্বস্ব—অর্থ, স্বাস্থ্য ও জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। বেলজিয়ান অধিকারভুক্ত কঙ্গোদেশে সম্প্রতি নিগ্রোজাতি-মুক্তির আন্দোলনেয় এইরূপ একটী নেতা আবির্ভূত হইয়াছিল। তাঁহার নাম কিবাঙ্গো। নানা গ্রাম হইতে নিগ্রো-অধিবাসীগণ তাঁহার পতাকাতলে মিলিত হইয়াছিল। তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। কিন্তু রাজশক্তি তাঁমার আন্দোলন দমন করিতে সক্ষম হয় নাই। তাঁহার শিষ্যগণ সমস্ত কঙ্গোদেশে তাঁহার বাণী এবং তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণজাতির পরিত্রাতা রূপে প্রচার করিয়া ফিরিতেছে। জনগণ যাহা গ্রহণ করে তাহা সহজে দমিত হয় না। কামাল-চালিত আন্দোলনের মেরুদণ্ড—জনগণ, —আনাতোলিয়ার কৃষীগণ। কামাল তাহাদের একতা বদ্ধ বরিয়াছিলেন। এই সমস্ত কৃষীগণ সামান্য ভাবে জীবন যাপন করিত, গৃহনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিত। ইহারাই নূতন দেশাত্ম-বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া কামালের আন্দোলনকে বিজয় লক্ষীর অঙ্কে স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা সাহসও ও দৃঢ়তায় সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল তাহারা সামান্য আহারে সন্তুষ্ট থাকিত; তাহারা নগ্নপদে ভ্রমণ করিতে কষ্ট অনুভব করিত না, তাহারা রুগ্ন ও আহত অবস্থায় অপরের সেবার প্রয়োজন বোধ করিত না; ধর্ম্মের, জাতীয় সম্মান রক্ষার্থ যুদ্ধে তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করার গৌরব অনুভব কপিত, তাহারা পরাজয়েও সাহস হারাইত না। তাহারা দৃঢ থাকিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল।

দেশের জনশক্তিকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য আমরা কি করিতেছি? ত্রিশকোটী ভারতবাসীর মধ্যে আটাইশ কোটী সাধারণ মানব। ইহারা শ্রমজীবি ও চাষী। এই আটাইশ কোটীর মধ্যে সাত কোটী অন্ত্যজ শ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হয়। সমস্ত অধিবাসীর অতি অল্প সংখ্যক লোক জমিদার, ধনী, উকিল, ডাক্তার, কেরাণী ব্যবসা-দার। ইহাদের মধ্যে শতাংশের এক অংশ স্বরাজবাণী প্রচার করিবার জন্য তাহাদের শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে। আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ে কয়জন অস্পৃশ্যজাতীয় বালক শিক্ষা পায়? আমাদের গ্রামবাসীর মধ্যে কয়জন স্বেচ্ছাসেবক কাজে ব্রতী? গ্রামে কয়টী কংগ্রেস অনুষ্ঠান? কৃষী ও শ্রমিকদিগের মধ্যে স্বরাজবাণী—প্রচারের জন্য তিলক ভাণ্ডার হইতে কত অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে?

জনগণের সহিত ভ্রাতৃত্ব—এই কথাই স্বরাজকামীগণ প্রচার করিবে। এই কথা কাজে পরিণত করিতে হইবে। কথিত হয় যে অস্পৃশ্য চামারগণ লাল কাণাইয়ালালের মন্দিরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়া, শ্রীকৃষ্ণদর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিল। এই ত আজকাল চাই। আমরা শ্বেতাঙ্গের সহিত দ্বন্দ্ব করি; সেইজন্যই আমরা এই অস্পৃশ্য জাতির শৃঙ্খল মোচন করিতে বিলম্ব করিব না। অস্পৃশ্যতার শৃঙ্খলই মনুষ্যত্বের দাবীকে বন্ধন করে। মানবজগতে ভ্রাতৃভাবের উপর হিন্দু মুসলমানের মিলনের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত করিতে হইবে।

পুস্তক-সমালোচনা

'রতি-যন্ত্রাদির পীড়া' ডাক্তার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র প্রণীত। বইখানির বাঁধান মলাটের উপরে নাম লেখা রহিয়াছে 'Sexual of Venerial Diseases' বাহিরের নাম দেখিয়া লোকে মনে করিবে এখনি ইংরেজী বহি—বাঙ্গালী পাঠকদের এ অসুবিধায় ফেলিবার আবশ্যকতা বোঝা গেল না। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে নরনারীর জননেন্দ্রিয়ের পীড়া তাহার কারণও তাহা হইতে মুক্তি পাইবার উপায় আছে। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া সব দেশেই আছে ইহা মানুষকে জড় ও অথর্ব্ব করিয়া ফেলে। এ ব্যাধি হইতে জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের মনীষীদের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং এই বিষয়ে লোক শিক্ষার জন্য সাহিত্যও রচিত হইতেছে। আমাদের দেশে যখন ব্রহ্মচর্য্যের বিধান গার্হস্থ্যের বিধান লোককে পালন করিতে হইত তখন তাহারা সেই সাধনালব্ধ জ্ঞানদ্বারা সুস্থ ও সুন্দর সন্তানে লাভ করিতেন, সুখ শান্তিকে তাই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

আলেচ্যে গ্রন্থে রোগ নির্ণয় ও তাহার প্রতিকারেব ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রন্থকার যৌন সমস্যার সমাধানে দেহতত্ত্বের ও আনন্দ লিপ্সার আনন্দ ও বিষাদ দুই-ই দেখাইয়াছেন। শিক্ষা ও সংযমে বিষাদ ভুলিয়া ইহার আনন্দ উপভোগ করিতে পারিলেই মানুষ সব বিষয়েই উচ্চস্তরে উঠে।

এ বিষয়ে মারাত্মক শ্লীলতার সঙ্কোচ আবরণ দূরে সরাইয়া গ্রন্থকার যে ভাবে বিষয়টি পাঠক পাঠিকাদের বলিয়াছেন তাহাত্যে নিত্যজীবনের সুখ শান্তি ও আনন্দ বর্দ্ধনের বহু উপায় নির্দ্দেশ করা আছে। দেহতত্ব, যৌন সম্বন্ধ দাম্পত্যবিজ্ঞান, সন্তান লাভ প্রভৃতি সম্বন্ধে নূতন যাহা কিছু জানাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহার যথাসম্ভব আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। গ্রন্থকারের নিজস্ব মতামতও মূল্যবান। যাঁহারা জননেন্দ্রিয় সম্পর্কীয় পীড়ায় ভুগিতেছেন তাঁহারা ডাক্তার মৈত্রের এই ডাক্তারী সাহিত্য গ্রন্থখানি পড়িলে উপকৃত হইবেন, যুবক যুবতীরাও এ পুস্তকখানি পাঠে প্রকৃত লাভবান হইয়া সংসারকে মধুর ও সুন্দর করিতে পারিবেন। এ বিষয়ের আলোচনায় গ্রন্থকারকে পাশ্চাত্যের ও চিন্তার সাহায্য লইতে হইয়াছে, ভাব প্রকাশ করিতেও পাশ্চাত্য শব্দের সাহায্য লইতে হইয়াছে বাংলায় তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া একটু খটমটও হইয়াছে তবু যতটা জানি বাংলায় বোধ হয় এমন গ্রন্থ বেশী নাই। গ্রন্থখানি জ্ঞাতব্য ও উপভোগ্য হইয়াছে। যৌন-পাপ ব্যক্তির, সমাজের ও জাতির কত অহিতকর ইহা শিক্ষিত যুবক বুঝিলে দেশের শক্তি স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে বাড়িবে। ৪৫০ পৃষ্ঠার উপরে হইলেও বহিখানিব মূল্য ৪৲ একটু বেশী বোধ হয় সর্ব্বসাধারণের হাতে দিবার জন্য মূল্য কিছু কম হইলে ভাল হইত। আশা করি বাংলাব শিক্ষিত সমাজ এ গ্রন্থেব আদর করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিবেন।

প্রেমের জয়—শ্রীরমেশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত একটী চলচ্চিত্রেব আখ্যায়িকা বা Scenario মূল্য ।৹ আনা। এদেশে এরূপ গ্রন্থের প্রচলন নাই কারণ চলচ্চিত্রে ছবি না দেখিলে সাধারণতঃ লোকের উহা পাঠের আবশ্যকতা বা আগ্রহ থাকে না। ঘটনাটী বেশ দৃশ্যবহুল এবং চলচ্চিত্রের উপযোগী বলিয়া মনে হয় বাঙ্গলা দেশে চলচ্চিত্র প্রস্তুতকারকগণের মধ্যে বর্ত্তমানে এক ম্যাডান কোম্পানীর নামই উল্লেখযোগ্য, ইহা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে সুখী হইব। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে এ যাবৎ তাঁহারা যে সব Scenario অবলম্বনে চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন ইহা তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীব হইবে না।

মুষ্টিযোগ সংগ্রহ—শ্রীবিদ্যাধর পণ্ডা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত মূল্য ৶৹। কয়েকটী রোগের প্রচলিত মুষ্টিযোগ ও গো-ব্যাধির মুষ্টিযোগ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে সেগুলি প্রকৃত কার্য্যকরী হইলে স্বল্পব্যয়ে রোগ প্রশমনে অনেক সাহায্য করিবে।

গোলকুণ্ডা

(নাটক সমালোচনা)

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বি-এল

গোলকুণ্ডা পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নব-রচিত ঐতিহাসিক নাটক। গ্রন্থকর্ত্তা ইহাকে "ইতিহাসমূলক" বলিয়াছেন ; কিন্তু ইহাকে কল্পনামূলক বলিলেই বোধ হয় ঠিক হইত। কারণ ঘটনা সন্নিবেশে এবং চরিত্রাঙ্কণে নাট্যকার ইতিহাস অপেক্ষা কল্পনারই সাহায্য অধিক লইয়াছেন। ইতিহাসের পটে কল্পনার সুকুমার তুলিকাসাহায্যে কবি-নাট্যকার যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক নানা-বর্ণ-সমাবেশে সমুজ্জ্বল ও মনোহর। নাটকের আখ্যান বস্তু এই—গোলকুণ্ডা যখন সুলতান কুতব সার অধীনে একটী স্বাধীন রাজ্য ছিল, তখন সম্রাট সাজাহান দিল্লীর সিংহাসনে এবং আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবেদার। চতুর আওরঙ্গজেব কুতবসার দুই কন্যার মধ্যে একটীর সহিত নিজপুত্র মহম্মদের বিবাহ দিয়া বিনা রক্তপাতে গোলকুণ্ডা অধিকারের গোপন উদ্দেশ্য লইয়া সপুত্র তথায় আসিয়াছেন। কুতুব সার আন্তরিক ইচ্ছা এক কন্যাকে দিল্লীর হারেমে পাঠাইয়া এবং অন্যকে স্বীয় উজীর মিরজুমলার পুত্র আমীনের সহিত বিবাহ দিয়া রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করিবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে, আওরঙ্গজেবের মত পরিবর্ত্তিত হইল—তিনি মহম্মদকে বাঙ্গলায় যাইয়া সুজার কন্যাকে বিবাহ করিবার আদেশ করিলেন। এ আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া মহম্মদ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল।

এদিকে ওমরাহগণের চক্রান্তে গোলকুণ্ডার আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া পড়িল। ঠিক এই সময়ে সম্রাট সাজাহান, স্বীয় অন্তিমকাল উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া আওরঙ্গজেবকে দিল্লীর দরবারে আহ্বান করিলেন। ময়ূর-সিংহাসন হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কায় আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। মহানুভবতা দেখাইবার ব্যপদেশে তিনি বিদ্রোহী পুত্র মহম্মদকে ক্ষমা করিলেন এবং কুতবসার এক কন্যার সহিত মহম্মদের বিবাহ দিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন।

এই টুকুমাত্র ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরে নাটকের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু প্রকৃত নাটকীয় Romance মীরজুমলার অতীত জীবনের কাহিনী লইয়া,—তাহা বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী। ইরাণের দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত সামসুদ্দিন,—জঠোরজ্বালায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া পঞ্চ-আসরফীর বিনিময়ে পঞ্চদিবসের শিশুসন্তান বিক্রয়কারী সামসুদ্দীন, ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য সকল বুভুক্ষুর আশ্রয় স্থান হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিয়া ভাগ্যবলে আজ গোলকুণ্ডার উজীর, সুলতান কুতুব সার দক্ষিণ হস্ত। কিন্তু, আজ সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বৎসর পরেও অপ্রমেয় ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও মীরজুমলার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়, সেই পরিত্যক্ত হতভাগ্য সন্তানের জন্য কাঁদে ;—সামান্য অর্থের জন্য সন্তান-বিক্রয়-জনিত অনুশোচনা গোলকুণ্ডার উজীরের হৃদয় তীক্ষ্ণ কণ্টকের ন্যায় নিশিদিন বিদ্ধ করিতেছে। এদিকে মীরজুমলার পঞ্চ দিবসের পরিত্যক্ত শিশু, বিশ বৎসর পরে, তরুণ যুবক হাসানরূপে, তাহার পালক-পিতা ফকীর নসরতের সঙ্গে গোলকুণ্ডায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাসানের নিকট পরাস্ত ও তাহার ভৃত্যকে অঙ্গীকৃত পারস্য রাজপুত্র বীর রেজাক-খাঁ ও তাহার স্ত্রী সেলিমা সহ গোলকুণ্ডায় আসিয়াছে। এইরূপ ঘটনা-সংস্থানের সঙ্গে নাটকের আরম্ভ এবং এই সকল ঘটনা-পরম্পরা নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে বিবৃত। প্রথম অঙ্ক এবং দ্বিতীয় অঙ্কের কতকাংশ পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় ; কেননা নাটকীয় ঘটনা এই অংশে অতি কম, এবং এই অংশ নাটকের পরিচায়ক অংশ (introductory) বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দুই দৃশ্য হইতে নাটকীয় গল্পাংশ (Plot) ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে এবং পাঠকের কৌতুক জাগাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই অংশে মীরজুমলা পত্নী আহিরণের সহিত হাসানের (মাতা এবং পুত্রের) এবং কুতুবসা-তনয়া আরজের সহিত হাসানের (অর্থাৎ নায়ক ও নায়িকার) সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ ঘটান হইয়াছে। তাহার পর হইতেই নাটকীয় ঘটনার প্রবাহ মনোমদ ভাষার সাহায্যে পরিণতির দিকে তর্-তর্ বেগে ছুটিয়াছে। চতুর্থ অঙ্কে নাট্যকার সুকৌশলে

তৃতীয় জনক-জননী (মীরজুম্‌লা ও আহিরণ) এবং স্নেহ-ভিক্ষীর (রেজাকের) সাক্ষাৎ এবং পরিচয় করাইয়াছেন এবং পঞ্চম অঙ্কে, সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, বিদ্রোহ-বিপ্লবের মধ্য দিয়া মীরজুমলা-তনয় হাসানের সহিত কুতুব-সা তনয়া আরজবন্দের মিলন ঘটাইয়াছেন।

মীরজুম্‌লার অতীত জীবনের Romance টুকুই নাটকের মেরুদণ্ড এবং তাহা নাট্যকারের লিপিকুশলতায় একান্ত উপভোগ্য হইয়াছে। তাহা বাদ দিলে, নাটকে কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্নেহের পাত্রের প্রতি একান্ত অবিচার এবং তজ্জনিত জীবনব্যাপী অনুশোচনা এবং পরিশেষে নিপীড়িত স্নেহভাজনকে সাদরে আপনার করিয়া লইয়া পূর্ব্বকৃত অন্যায়ের সংশোধন ;—এইটিই ক্ষীরোদ বাবুর অনেক নাটকের মূল কথা (Keynote) দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা তাঁহার রচিত, বাদশাজাদী পলিন, বঙ্গে রাঠোর মিডিয়া প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতে পারি।

গোলকুণ্ডা নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে মীরজুম্‌লা চরিত্র; বাস্তবিক ইহাই নাটকীয় প্রধান চরিত্র; পরে আমাদের মনে স্থান পায় হাসান এবং তৎপরে আরজমন্দ। মীরজুম্‌লা, একদিকে বীর, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কূটরাজনীতি-বিশারদ ;—অপরদিকে,—অতিস্নেহপ্রবণ পিতা; প্রেমময় স্বামী—মানব চরিত্রের এই দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক নাট্যকার অতি নিপুণতার সহিত দেখাইয়াছেন।

অহিংস সত্যাশ্রয়ীকে আততায়ীর অস্ত্র হইতে ঈশ্বর কেমন করিয়া রক্ষা করেন, নাট্যকার হাসান-চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। এই চরিত্র আঁকিতে গিয়া বর্ত্তমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অহিংস-অসহযোগ নীতি সম্ভবতঃ নাট্যকারের মনে পড়িয়াছিল। স্ত্রীচরিত্রগণের মধ্যে কুতুবসার কন্যা আরজবন্দ বেশ ফুটিয়াছে। নির্ভীক-হৃদয়া স্পষ্টবাদিনী, আত্মমর্য্যাদাভিমানিনী অথচ পিতার প্রতি একান্ত স্নেহশীলা—কুতবসার এই কন্যাটী পাঠকের মনের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে।

পরিশেষে নাটকের ভাষা-সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। এমন সুমিষ্ট, ঝঙ্কারময়ী আবেগভরা ভাষা আমরা আজকালের অন্য কোন নাটকে পড়ি নাই। পাকা ওস্তাদের মিঠা হাতের সেতারের বাজনার মত ক্ষীরোদ বাবুর পাকা হাতের মিঠা লেখার মিঠা সুর কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া শ্রোতাকে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আবার কোথাও বা দূরশ্রুত মেঘমন্দ্রের মত গম্ভীর কিন্তু শ্রুতিকটু নহে।—আমাদের মনে হয় মীরজুম্‌লার উক্তির স্থানে স্থানে স্বর্গীয় ডি, এল রায়ের চাণক্যচরিত্রের ভাষা ও ভাবগত সাদৃশ্য আসিয়া পড়িয়াছে। যথা ৫ম অঙ্ক ১ম দৃশ্যে—"শয়তান তুমি আমায় কি করেছ ?··· তুমি আমায় ধীরে ধীরে নিয়ে গিয়েছ—পুণ্যের রাজ্য থেকে কোন্ মেঘাচ্ছন্ন নরকের দুর্গন্ধ পঙ্কে ! ···এবং ৩য় অঙ্কের ২য় দৃশ্যে—"হাস্‌ছ কি রহস্যবসনা কুহলিকে ! পূর্ব্ব যুগের সন্তান-বিক্রয়ী ··· ইত্যাদি ইত্যাদি।"

মোটের উপর নাটকখানি, পাঠককে তৃপ্তিদান করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস—অভিনয়ের ফল অন্যরূপ হইলেও পাঠে কাব্যামৃত রসাস্বাদের তৃপ্তি উপভোগ করিবার জন্য নাট্যামোদী মাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত।

Printed & Published by Sachindra Nath Banerji at the HIMANI PRESS.
83, Durga Charan Mitter Street, Calcutta.

'বেদানাওয়ালী'

বিলাতী চিত্র হইতে

প্রথমবর্ষ] ১৪ই চৈত্র শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ২৮শে মার্চ্চ [৩৩শ সংখ্যা

আশার ছলনে ভুলি
কি ফল লভিনু হায়!

স্বেচ্ছায় ছাড়িনু এক
অন্য হাত ছাড়া হয়!

বড়দিনের সফর

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

(চতুর্থ কিস্তি)

পরদিন ৩০শে ডিসেম্বর, সকাল বেলা উঠেই মুখহাত ধুয়ে চা পান করা গেল। দাদার শরীরটা আজ অপেক্ষাকৃত ভাল। সত্যেশভায়ার বড় কুটুম্ব শ্রীযুক্ত মহাদেব গুপ্ত ভায়াকে বল্লাম 'চলুন্ না একটু বেড়িয়ে আসি।' অমিয়কে বল্লুম 'চলনা', উত্তরে সে বল্লে যে, 'কাকাবাবু বেশীদূর যদি না যা'ন ত যেতে পারি, সকালবেলায় আজ আমার ছুটী। ২টার সময় আমাকে কাজে বেরুতে হবে।' উত্তরে আমি বল্লাম—'এখন ত ৮টা, চল।' তখনই আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়্লাম। কোথায় যে যাব তা ওদের কাছে ভাঙ্গলুম না। একেই ত কেহ এই বৃদ্ধের সঙ্গে পথে বেরুতে চায় না; তার উপর গন্তব্যস্থানটার কথা যদি আগে বলি ত সঙ্গীই মিল্‌বে না। যাহা হোক্ খরকাইয়ের দিকে চল্‌লাম। মনের মধ্যে ইচ্ছা—সুবর্ণরেখা ও খরকাইয়ের সঙ্গমস্থল দেখা। নূতন এন টাউনের ভিতর দিয়ে খরকাই নদীর ধারে পৌছিলাম—নদীটা বাঙ্গালীর মেয়েদের 'রূপার মেখলার' মত দেখাচ্ছিল। তারপর বহু স্থান ঘুরে সুবর্ণরেখা ও খরকাই নদীর সঙ্গম স্থলে এসে পড়ি। সে সব কথা বারান্তরে বল্‌বার ইচ্ছা রইল। বাড়ী ফির্‌লাম ১২॥টার সময়, আধ ঘণ্টা ক্লান্তি দূর করে স্নান কর্‌লাম। তাড়াতাড়ি আহার করতে হ'ল, কারণ ২টার সময় আবার সহর দেখ্‌তে বেরুতে হ'বে।

প্রথমেই দেখ্‌তে গেলাম—"The Agriculfural Implements Company Ltdএর কার্‌খানা। এদের ম্যানেজিং এজেন্টস্ হচ্ছে ভিখলদাস দামোদর থ্যাকারসে এণ্ড কোম্পানি। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষিকার্য্যের জন্য যে সব যন্ত্রপাতির দরকার তা পূর্ব্বে কতক কতক এদেশেই হ'ত, আর সবই পাশ্চাত্য দেশ থেকে আমদানী হ'ত। এদের যন্ত্রপাতির নিদর্শন দেখে বেশ আনন্দ অনুভব কর্‌লাম। সকল রকম কুড়াল, কোদালি, গাঁতি, পাথর কাটা ও ভাঙ্গার যন্ত্র, খনিত্র, আসামের চা বাগিচার ব্যবহার্য্য যন্ত্রপাতি থরে থরে রয়েছে দেখ্‌লাম। এ কোম্পানির উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যের উপযোগী নানা রকম উৎকৃষ্ট যন্ত্র তৈয়ার করা। আর এদের জিনিষপত্রের দাম পাশ্চাত্য জগতের আমদানী করা জিনিষপত্রের দামের চেয়ে ঢের কম।

সত্যেশভায়া বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে পাশ নিয়ে এলেন। পথে ছোট সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'ল; সত্যেশভায়া রায় বাহাদুর জলধর সেন যিনি, বাঙ্গালার বড় একখানি মাসিক পত্রের সম্পাদক তিনি দেখ্‌তে এসেছেন বলে, তাঁর সহিত পরিচয় করে দিলেন। ছোট সাহেব বেশ অমায়িক লোক দেখ্‌লাম। তিনি স্বয়ং আমাদিগকে কল কারখানার অনেক বিষয় বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লেন! কারখানা বাড়ীটা সম্পূর্ণভাবে তৈয়ারী হ'তে প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা লেগেছে। শুন্‌লাম জগতের মধ্যে এই কার্‌খানায় সব চেয়ে আধুনিক কলকব্জা বসান হয়েছে। বিজ্‌লীর সাহায্যে এই সব কল চল্‌ছে এবং এত শীঘ্র শীঘ্র যন্ত্র বার হচ্ছে তা' দেখে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। মানুষের বুদ্ধির দৌড় যে কতদূর হতে পারে তা এখানে এসে কল-কার্‌খানা দেখ্‌লে বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। এখানকার ধাতু রাখা চুল্লী (Tempering oven) দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। এখানে লোহার ধাতু ঠিক যাতে থাক্‌তে পারে তাই করা হয়। যন্ত্রপাতিগুলি বিশেষভাবে গরম করে ধাতুনির্ম্মিত স্নানাগারে রেখে দেওয়া হয় এবং বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা শক্ত ও চিরকালের মত ধাতসহ করা হয়। এখান থেকে বছরে ৪৫০০ টন যন্ত্রপাতি বেরুতে পারে। এখানকার আর একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিষ Pulverized Coal Plant। এখানে বিভিন্ন স্থানে ৩০টী গরম করিবার চুল্লী heating furnace আছে। এই যন্ত্র ভারতে আর কোথাও

এখনও পর্য্যন্ত বসান হয় নাই। ইহার সাহায্যে তাপের সমতা রাখা হয়। বেশী তাপের দরুণ (over heating) যন্ত্রপাতির ক্ষতি হয় না।

Extended areaতে যে সব কারখানা হয়েছে টাটা কোম্পানির সহিত তাহাদের প্রথম সর্ত্ত হচ্ছে যে, তাদের Pig Iron ও Steel টাটা কোম্পানির নিকট থেকে নিতে হ'বে; আর কোম্পানিও তাদের পানীয় জল ও বিজলী সরবরাহ করবেন। এটা দেখে আমরা এনামেলের কারখানা দেখতে গেলাম। দুঃখের বিষয় অর্থাভাবে কারখানা বন্ধ। শুনলাম ৫লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে গেছে, তবুও কিছু হয় নাই; কোম্পানি টাকা ধারের চেষ্টায় আছেন। এই ব্যবসা এ দেশে বহু প্রাচীনকালের। মালদহের গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ইষ্টকের উপর এনামেলের কার্য্য অতীব সুন্দর। তাদের নমুনা দেখবার যাঁদের সৌভাগ্য হ'য়েছে তাঁরাই বলবেন যে, পাশ্চাত্য এনামেলের কাজ, সে কাজের চেয়ে নিকৃষ্ট। এনামেলের কাজ এ দেশ থেকে কেন যে উঠে গেল তা বলতে চাই না। এ কোম্পানির নির্ম্মিত কতকগুলি কাজ বা'র থেকে দেখতে পেলাম। কাজ মন্দ নয় বলেই বোধ হ'ল, কিন্তু চলছে না ত। আশা করি বড লোকেরা যাঁরা টাকা ব্যাঙ্কে রেখে অল্প সুদ পাচ্ছেন, তাঁরা দেশের এই অনুষ্ঠানটীকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য টাকা ধার দিয়ে কোম্পানিকে সাহায্য করে, না হয় Share খরিদ করে দেশের এই ব্যবসাটীকে বাঁচিয়ে রাখেন। এর পরে আমরা টিন প্লেট কোম্পানী দেখতে গেলাম। আমেরিকার সাহেব সুবাবাই এ কারখানার কার্য্য বেশ দক্ষতার সহিত চালাচ্ছেন। পাশ নিয়ে আমাদের পথ-প্রদর্শক হ'য়ে যে যুবক এলেন, তিনি অমাদের অজয়ের বন্ধু; কিন্তু দুঃখের সহিত বলতে হ'চ্ছে বাবাজীবন কল-কারখানার কাজ বেশ ভাল করে আমাদিগকে বুঝিয়ে দিতে পারেন নাই। Pig iron থেকে নানারূপ অবস্থা ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তবে ঝকঝকে তকতকে টিন বার হচ্ছে। এখানকার যত মাল উৎরায়, তার সবই বর্ম্মাদেশে Patroleum Oil Company লয়। কেরাসিন তেলের টিনের মাপ কোম্পানি যেরূপ দেয়, সেরূপই ইহারা করিয়া দেয়। বাজারে ইহাদের কাজ তত বেরুচ্ছে না। কেরাসিন তেলের জন্য এত টিন যে লাগে তা ধারণাই করতে পারা যায় না। এদিকে বেলা পড়ে এল দেখে শীঘ্র বাড়ী ফিরে আসা গেল। চা পান ও জলযোগ করতে না করতেই দেখি এল টাউনের কয়েকজন ভদ্রলোক আমাদিগকে লইয়া যাবার জন্য এসেছেন। আমরাও তাঁদের সঙ্গে বার হয়ে পড়লাম। মিলন-ক্ষেত্র হয়েছিল এল্ টাউন প্রাইমারী বিদ্যালয়ে। লোক সমাগম বেশ হয়েছিল, স্থানীয় অধিবাসীরা দাদাকে যে অভিভাষণ দিয়েছিল, তাহা আন্তরিকতায় পূর্ণ। তার একাংশ উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। তাঁরা কেন জলধরদাকে ও আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তার কৈফিয়ৎটা তা'তে আছে, আর আছে এল্ টাউনের পরিণতি—কেমন করে সহরের এই অংশটা গড়ে উঠল। সেটা জানবার কৌতূহল অনেকের হ'তে পারে ভেবে তুলে দিলাম।

এল্ টাউনের অধিবাসীবৃন্দের অভিভাষণ

মহামান্যবর রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—

শ্রীকরকমলেষু—

মহাত্মন্,

আমরা সমগ্র এল্ টাউনের অধিবাসীবৃন্দ আপনাকে, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে ও সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আহ্বান করছি শুধু আপনাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে, সাহিত্য-চর্চ্চা করা আজকের এ আহ্বানের উদ্দেশ্য নয়। আপনাকে আমরা শুধু দেশমান্য সাহিত্যিক হিসাবে আহ্বান করবার দুঃসাহস হৃদয়ে পোষণ করি নাই। বঙ্গের সাহিত্যাকাশের যে স্থানে আপনি এখন অধিষ্ঠিত, তাতে আমাদের ন্যায়—সাহিত্যরসানভিজ্ঞ সামান্য শ্রমজীবিগণের আপনাকে আহ্বান করে আপনার অমূল্য সময়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার আমাদের নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে আমরা এতদূর অগ্রসর হই নাই, যা'তে আমরা আপনার ন্যায় সাহিত্য-রথীর সহিত আলোচনার স্পর্দ্ধা ক'রতে পারি। অপনাকে আমরা "আপনার" বলে ভাবি, বাংলার ও বাঙ্গালীর গৌরব বলে মনে করি এবং বঙ্গমাতার সপ্তকোটী সন্তানের মধ্যে মায়ের একজন যোগ্য সন্তান বলে মনে করি বলেই আমাদের এই জীর্ণ কুটীরে আপনাকে আজ আহ্বান করতে সাহস পেয়েছি।

জামসেদপুর কয়েকদিনের জন্য আপনার পরিচর্য্যার সৌভাগ্য পেয়েচে। জামসেদপুর 'সাহিত্য-সভা' এবং এই সহরের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীগণ তাঁদের কর্ত্তব্য দেখাবার ও আপনার আতিথ্য সৎকারের সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু এই অন্যুন ২৪ বর্গ মাইল সহরের আরও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ত আছে; আরও নীরব সেবক ত আছে, তাদের কি কর্ত্তব্য দেখাবার কিছুই নাই? এত বড় একটা সহরের মধ্যে শুধু এক সাহিত্য-সভা আপনার প্রতি কর্ত্তব্য দেখালেই সকলে তা'তে পরিতৃপ্ত হ'তে পারে কৈ? সেইজন্যই আমাদের এই উদ্যম।

জানি আমরা আপনার প্রতি কর্ত্তব্য দেখাতে গিয়ে আপনাকে বিরক্ত করে ফেলব; জানি আমাদের আয়োজন অতি হীন,জানি আমরা নিতান্ত অক্ষম, জানি আমরা সকল বিষয়েই আপনার আতিথ্য গ্রহণের ভার নেবার অনুপযুক্ত; কিন্তু মনকে ত তাই বলে বোঝাতে পারি না? মন যেন আপনা থেকে সাধক রামপ্রসাদের সেই গানখানা গেয়ে ওঠে,—"মন তোর্ এত ভাব্না কেনে।" সাধক সঙ্গীতচ্ছলে বলে গেছেন, "মনোময় প্রতিমা গড়ে হৃদিপদ্মাসনে বসিয়ে, মন, গন্ধ, মন, পুষ্প, জ্ঞান দীপ, জ্ঞান ধূপ, ভক্তিসুধা দিয়ে মায়ের পূজা করবে।" মন যেন আপনা থেকেই বলে ওঠে আমরা সেই দেশের পুরুষ যে দেশের নারী সীতাদেবী এককালে বনবাসিনী হয়েও অতিথি সৎকারে পরাঙ্মুখ হন নাই। আর সেই বনবাসেও তাঁর অতিথি সৎকারের জন্য কুশাসন ও বনজাত ফলমূলের অভাব হয় নাই। তবে আমরা আপনার আতিথ্যের ভার একদিনের জন্য পাবার দাবী করব না কেন?

শুধু ভক্তি অর্ঘ্য ছাড়া আমাদের আর কোনও আয়োজন নাই। হে মহাপুরুষ! আপনার পরিতৃপ্তির জন্য শুধু এই-ই আমাদের আয়োজন। আমরা যে কত উচ্চ বলে আপনাকে ভাবি, কত আপ্নার বলে আপনাকে জ্ঞান করি—তা সম্যক্‌রূপে জানাবার শক্তি আমাদের নাই। ভাষায় এমন কথা খুঁজে পাই না যা' দিয়ে আমাদের হৃদয়ের একখানা ছবি এঁকে আপনার সাম্নে ধর্‌তে পারি। শুধু এই বলেই শেষ করতে চাই যে আপনি আমাদের আপনার—"আপনার হ'তেও আপনার।"

কথা বাড়িয়ে আর আপনার অমূল্য সময়ে হস্তক্ষেপ করার অপাধী হ'ব না; শুধু আমাদের এ অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ব-কাহিনী এবং অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলির একটু আভাষ দিয়েই ক্ষান্ত হ'ব। আজ সন ১৩৩১ সাল। প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩১৯ সালে এই এল্ টাউনের চিহ্ন পর্য্যন্তও ছিল না। আজ যে স্থানে আমরা সমবেত হয়েছি এই স্থানটী এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। দুটো একটা সেকেলে বুনো গাছ এখনও সেই বিশাল বিজন অটবীর স্মৃতি রেখা বুকে করে আশে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অদূরেই ছিল সাঁকচীপল্লী। উহাই জামসেদপুরের আদি পল্লী এবং ইহার নাম অনুসারেই বর্ত্তমানের এই বিশাল কার্‌খানার নাম হয়েছিল, "সাকচী লৌহ ও ইস্পাতের কার্‌খানা।" সমগ্র কার্‌খানা—যেখানে আজ শত শত লোক দিবারাত্র কাজ কর্‌ছে, G Town, Northern Town প্রভৃতি স্থানগুলি—যা এখন সুরম্য সৌধমালা এবং বৈদ্যুতিক আলোক মালায় সুসজ্জিত, ওসবের যখন চিহ্ন পর্য্যন্তও ছিল না, তখন থেকেই এই সাকচী-পল্লী চতুস্পার্শ্বে বনজঙ্গলে পরিবেষ্টিত হ'য়ে বিরাজ কর্‌ছিল। আনুমানিক দশ বৎসর পূর্ব্বে কোম্পানির কর্ম্মচারীগণের থাক্‌বার জন্য এই এল্ টাউনে মাত্র দুই সারি বাড়ী নির্ম্মিত হয়—সেই সময় এ অঞ্চলে সাধারণ পাঠাগার ও নাট্যশালা ইত্যাদি কিছুই ছিল না। যে যাহার কার্য্য ক'রে এবং খেয়ে শুয়ে কাল কাটাত। কাহারও কাহারও মনে সাধারণ পাঠাগার ইত্যাদি খোল্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লেও, তাঁদের ইচ্ছা অনেক কারণে কার্য্যে পরিণত কর্ত্তে পারেন নাই। ক্রমে আরও বাড়ী নির্ম্মিত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে লোক সংখ্যাও বাড়্তে লাগ্ল এবং এ অঞ্চলের মধ্যে যেন একটা জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। কয়েকজন ব্যক্তি উদ্যোগী হয়ে এল্ টাউনে Social unionএর প্রতিষ্ঠা করলেন। সামাজিক উন্নতি বর্দ্ধনই এই Unionএর মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল। নানা প্রকার পুস্তক-পত্রিকা পাঠ, নাট্যচর্চ্চা, ক্রীড়া, কৌতুক ইত্যাদির অনুশীলন—যাতে কার্‌খানার কর্ম্মক্লিষ্ট অবসন্ন-জীবনকে সজীব করে এরূপ আয়োজনেরও ত্রুটী হ'ল না। যে সমস্ত কর্ম্মচারী হঠাৎ কর্ম্মচ্যুত হ'তেন তাঁদের

সাহায্যার্থেই Union অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লো, কোনও ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হ'লে তার ঔষধ পথ্যাদিরও ব্যবস্থা কর্‌তে লাগ্‌লো।

শারদীয় পূজাকালে সকলের ভাগ্যে অবকাশ লাভ না ঘটায়—তাঁরা চেষ্টা করে দুর্গোৎসব ও কালীপূজারও আয়োজন কর্‌লেন। এই Social unionই এ অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের আদি অনুষ্ঠান।

প্রায় ৪ বৎসর পূর্ব্বে এল্ টাউন আরও বাড়্‌তে থাকে এবং তার নামকরণ হয় নূতন এল্ টাউন। নূতন এল্ টাউনের অধিবাসী সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁরাও একটী ক্লাব স্থাপনের আবশ্যকতা বিবেচনা করেন এবং কয়েক-জন কর্ম্মবীরের যত্ন ও চেষ্টায় সেই ক্লাবটী গড়ে ওঠে। বর্ত্তমান সাকৃচীর নিকটস্থ স্থানে Bengal Club গৃহটী সে অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের দ্বিতীয় প্রচেষ্টার চিহ্ন বুকে নিয়ে বিদ্যমান রয়েচে!

এই সঙ্গে শ্রীযুক্ত পাণ্ডালে মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে ভুলে গেলে বড়ই অকৃতজ্ঞতা হ'বে। তাঁর চেষ্টায় ও যত্নে এই দুই এল্ টাউনের মধ্যস্থলে এল্ টাউন বাজার প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে জনসাধারণের বিশেষ সুবিধা হয়েছে। সাকৃচি-বাজারের পরপারেই কাশিডি। ৪ বৎসর পূর্ব্বে কাশিডি কতকটা বিস্তীর্ণ প্রান্তর মাত্র ছিল। কোম্পানি স্বল্প খাজনায় ও বিনা সেলামিতে ঐ স্থানের জমি সাধারণকে বিলি কর্‌তে থাকেন। বর্ত্তমানে কাশিডি প্রকাণ্ড পল্লীতে পরিণত হয়েচে। তাঁর একাংশেই বর্ত্তমান বাণী-ভবন।'

এখানে একটা কথা আগেই বলে রাখি। বাণী-ভবন থেকেই বাণীনামে একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা বার হ'চ্ছে।

অভিভাষণের পর শ্রদ্ধেয় ধজধরদা নর-সেবাই যে নারায়ণের সেবা তাহা বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন। ভগবান্ কেবলমাত্র নীরাকার বা নিরাকার ন'ন, তিনি নরাকার। নরই যে ভগবানের অংশ তাহা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তিনি বুঝিয়ে দেন। আত্মপর ভুলিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে যেমন কার্য্য না কর্‌লে কার্য্যে সুফল লাভ করা যায় না, সাহিত্য-সাধনায়ও তেম্‌নি সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করা উচিত। আপনার স্বার্থ সাধারণের হিতের জন্য বলি দিতে হ'বে। বঙ্গ-ভারতীর সেবায় স্বাধীনভাবে ব্যক্তি-বিশেষের চেষ্টা যেমন প্রয়োজন, তেম্‌নি সম্মিলিত চেষ্টায় জাতীয়-সাহিত্য গঠন করাও আবশ্যক। দশে মিলিয়া কাজ করিলে, হারিলে বা জিতিলে লজ্জা পাইবার কারণ থাকৃতে পারে না। সাহিত্য-সাধনার পূর্ব্বে পরহিতৈষণা বৃত্তি স্ফুর্ত্ত করা একান্ত আবশ্যক। সাহিত্য-সাধনার উদ্দেশ্য ত ভ্রাতৃভাব স্থাপন। সে কার্য্যে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করা যায়, যদি তার পূর্ব্বে আমার প্রতিবাসীকে আমি আপনার করে নিতে পারি।

তৎপরে এ শর্ম্মাকেও বসন্তভায়াকে কিছু বল্‌তে হ'য়েছিল। জলধরদা যে সুর বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই সুরেই আমরা ধর্‌লাম। প্রথমেই আমি বল্লাম, মানুষের সহমর্ম্মী না হ'লে তা'কে ঠিক বুঝে ওঠা যায় না। কাজেই তার চরিত্র-বিশ্লেষণ করে দেখ্‌তে গেলে, তা'তে ভুল ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে। মানুষের অনুভূতির ঠিক রকম ধারণা আগে করা চাই। আর একটা বড় কথা মনে রাখ্‌তে হ'বে, সব মানুষের মত কোন বিষয়েই একরূপ হ'তে পারে না। ভগবান্ সব মানুষের গুণ-বুদ্ধি একরূপ করেন নি। সকল লোকের কর্ম্মের প্রেরণার গতিও একমুখী নয়। কাজেই মত-পার্থক্য থাকবেই থাকবে, কিন্তু তাই বলে মতান্তর যেন কোনদিন মনান্তরে পরিণত না হয়। আর একটু ত্যাগ স্বীকার কর্‌লে—নিজের মত-প্রাধণ্য স্থাপন কর্‌বার বিশেষ উদ্যোগী না হ'লে, আর জেদের বশে কাজ না কর্‌লে সকলে মিলে-মিশে কজে করা যায়। বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা সহজেই করা যায়। অবশ্য স্বাধীন মত বা স্বাধীন চিন্তাকে একেবারে বলি দিতে বল্‌ছি না। আপনার মত, অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা আগে করা উচিত। মানুষ ভাবুক হ'লেও তা'র ভিতর যে জ্ঞানের আলো জ্বলে তা'র সাহায্যে সে মতের যাথার্থ্য অনেক সময় বুঝ্‌তে পারে। চেষ্টা করা প্রথমে দরকার, তারপর যদি অধিকাংশের মতের সহিত মিল্‌তে না পারা যায়, ত নাইবা সে মত সমর্থন করে কাজ কর্‌লাম; কিন্তু অধিকাংশের মতের প্রতিকূলাচরণ করা কোন মতেই উচিত নয়। তারপর বসন্তভায়া তাঁদের সাহিত্য-সাধনার উদ্বুদ্ধ কর্‌বার জন্য সমবেত চেষ্টার যে প্রয়োজন তা বেশ ভাল

করে বুঝিয়ে দিলেন। জলযোগান্তে আমরা মিলনীসদস্যগণ কর্ত্তৃক সার ডোরাব ও লেডী টাটার সম্মানার্থ অভিনীত 'ইরাণের রাণীর' অভিনয় দেখ্‌তে যাই। প্রথমেই বলে রাখি, আমি বহু বৎসর যাবৎ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখি নাই। অভিনয় কলার উৎকর্ষ কতদূর হ'য়েছে, তার সংবাদও আমি রাখি না। বাল্যে ও যৌবনে অবশ্য যাত্রা ও থিয়েটারের আমি একজন অনুরাগী ছিলাম। তারপর দেখ্‌তে আর ভাল লাগে না বলে, দেখ্‌তে যাই না। যাত্রা তবু মাঝে মাঝে দেখেছি, সাধারণ থিয়েটার অনেকদিন দেখি নাই। অভিনয় সম্বন্ধে আমার আদর্শ যে কি তাহা নবযুগের পাঠক পাঠিকারা আমার লিখিত প্রবন্ধ হইতে পূর্ব্বেই কতকটা আভাষ পেয়েছেন। অভিনয়ের সময় ছিল ৯৷৷০ টা হইতে ১১৷৷০টা। ঘড়ি ধরে যেখানে কাজ হ'বার কথা সেখানে কাজের দিকটায় লোকে বড় নজর দিতে পাবে না। বাঁধাধরা সময়ও কাজ ঠিক হাত ধরাধরি করে চল্‌তে পারে না। ইরাণের রাণীর মত বই ২ ঘণ্টায় ত কিছুতেই হ'তে পারে না, তাই বইখানার ল্যাজামুড়ো কাটুতে-ছাটুতে হয়েছিল। তা'তে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার অপরেশচন্দ্রের প্রতি যে অবিচার করা হ'য়েছিল তা বল্‌তেই হবে। দর্শকদের মধ্যে সাহেব ও মেম অনেক ছিলেন। তাঁদের চিত্তবিনোদনের জন্য অনেক নাচগান জুড়ে দিতে হয়েছিল। সেগুলি যে অনেক সময় বেশ খাপ্ খায়নি তা বল্‌তেই হ'বে। নাচ যে বালকগুলা করেছিল তাদের ধরণ-ধারণ ঠিক কলিকাতার ছেলেদের মত দেখে মনে হ'য়েছিল, কিন্তু গানের ভাষার উচ্চারণ শুনে ভাব্‌তে লাগ্‌লাম এরা কোন্ জেলার লোক। পরে জান্‌লাম ইঁহারা উৎকলবাসী। বাহবা উৎকলবাসী ছোক্‌রারা অনুকরণ করেছে মন্দ নয়। অভিনয় আমায় ভালই লেগেছিল। দারার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন আশুতোষ সান্যাল ভায়া। তাঁর মত কৃতী শিল্পীর কাছে আমরা আরও ভাল অভিনয় আশা করেছিলাম; বিশেষতঃ শেষ দৃশ্যে তিনি অভিনয়টা অতিরিক্ত মাত্রায় (ইংরেজীতে যাহাকে overdone বলে,) করে ফেলেছিলেন; কাজেই সে যায়গা একটু অস্বাভাবিক বলে ঠেকেছিল। অন্য দৃশ্যে তাঁর অভিনয় বেশ স্বাভাবিক ও সুন্দর হ'য়েছিল। অঙ্গভঙ্গী দ্বারা সুন্দরভাবে তিনি মনোভাব প্রকাশ কর্ত্তে পেরেছিলেন। পরিবর্ত্তিত আকারে পুস্তকখানির মধ্যে ভাবের একতা একটু ছিন্ন হওয়ায়, অভিনেতাদিগকে যে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল তা বুঝেছিলাম। নাদেরের ভূমিকা যিনি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি সুন্দরভাবেই তার অংশ অভিনয় করে সকলকে আনন্দ দান করেছিলেন। নাগরিক সুস্থির চন্দ্রের ভূমিকা অল্প হইলেও বেশ স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়েছিল। ইরাণের রাণীর ভূমিকা মাঝে মাঝে মন্দ হয় নাই—চলনসই হ'য়েছিল বল্লে অন্যায় হবে না। গুলরুখের ভূমিকা সুবিধা গোছের হয় নাই। সাহেবরা অভিনয় দেখে যে অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছিলেন, তা তাঁদের মুখ চোখের ভাব দেখে বেশ বুঝ্‌তে পারা গেছ্‌ল। মোটের উপর অভিনয় মন্দ হয় নাই। রাত্রি ১২৷৷০ টার সময় সত্যেশভায়ার বাড়ী গিয়ে আহারাদি করে শয়নে পদ্মলাভ কর্‌লাম।

৩১শে ডিসেম্বর—আজ বিশ্রামের পালা। কিছুই করা হ'বে না ঠিক হ'ল, কিন্তু একটু বেড়িয়ে না এলে প্রাণটা কেমন কর্ত্তে লাগ্‌ল। একাই বেরিয়ে পড়্‌লুম। ঘুরে এসে দেখি ফটো লইবার উদ্যোগ হচ্ছে। এইখানে প্রথমেই বলি সহরের চিত্রগুলি শ্রীযুক্ত শঙ্কর রাও কাত্রের গৃহীত ফটো হ'তে তোলা হ'য়েছে। গত বারের চিত্রখানি সুবর্ণরেখার দৃশ্য—পশ্চাতে দল্‌মা পাহড়। ফটো লওয়া হ'লে দুইজন স্থানীয় ভদ্রলোক আবার আহারের জন্য নিমন্ত্রণ কর্‌লেন; কিন্তু আমাদের শরীর খারাপ বলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'র্ত্তে পার্‌লাম না। মধ্যাহ্নে স্থানীয় সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপাদি করা গেল। সন্ধ্যা ৭টার ট্রেণে বসন্তভায়া চক্রধরপুরে রওনা হলেন। আর আমরা ৮৷৷০ টার ট্রেণে কলিকাতার দিকে রওনা হ'লাম। বিদায়ের পালাটা অল্পে অল্পে সেরে নিয়ে, আশুতোষ ভায়া ও অজঙ্ক বাবাজীর সঙ্গে আমরা জামসেদপুর ছাড়্‌লাম। সত্যেশভায়ার কাশী হয়েছিল বলে তাকে আমাদের সঙ্গে আর আস্‌তে দিলাম না। ট্রেণে যে কি ভিড় হয়েছিল তার কথা আর কি বল্‌বো। একটা ইণ্টার ক্লাশে কম্পার্টমেণ্টে আমরা ছিলাম ২৩ জন। দশজনের স্থানে গুড়ের পাস্নার মত চলেছিলাম। দাদাকে কোনগতিকে

বস্‌বার স্থান করে দিয়েছিলাম। খড়্গপুরে এসে তবে কাষ্টাসলের সহিত পরিচয় লাভ কর্‌বার সুবিধা পাই। এতক্ষণ ট্রাঙ্কের উপর আসন গ্রহণ করে আস্‌তে হয়েছিল। সমস্ত রাত্রি নিদ্রাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। ভোর বেলায় হাওড়ায় পৌছিবামাত্র জলধরদা একখানা Statesman কাগজ কিন্‌লেন, প্রথমেই দেখ্‌তে বল্লেন, দেখ হে কে কি টাইটেল পেলে,—আমি দেখে শুনে বল্‌লাম, সাহিত্যিকদের ভাগ্যে এবারও অষ্টরম্ভা, তবে ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় 'রায় বাহাদুরী' খেতাব পেয়েছেন। তিনি যে নিছক সাহিত্য-সেবার জন্য পেয়েছেন তা নয়। প্রত্নতত্ব বিভাগের বড় একজন কর্ম্মচারী বলেই বোধহয় এ উপাধি তার ভাগ্যে পড়েছে। যাক্ 'নাই মামার চেয়ে কাণা মামাও যে ভাল' তাই মনে করে, দাদাকে আমার আশ্বাস দিলাম। সকাল বেলাই বাড়ী আস্‌তে না আস্‌তেই পরিচিত ছেলেমেয়েদের কোলাহলে জানিয়ে দিল যে কলিকাতায় এসে পড়েছি।

অশোক

শ্রীনিমানন্দ ঠাকুর

১

আজি মোর অশোক কাননে
গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছে ফুল
চারিধারে রক্তিম উচ্ছ্বাস
সারা প্রাণ উদাস আকুল

২

একদা এই অশোকের মূলে
কবে হায়! সেই কবে কার
আঁখি কোণে হৃদয় শোণিত
উথলিল বন্দিনী-সীতার

৩

মনে হয় পুষ্পরূপে ওই
অশ্রু তার উঠেছে ফুটিয়া
মর্ম্মভেদী তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
পত্রে পত্রে ফিরিছে কাঁদিয়া

৪

জন্মান্তরের অতৃপ্তি লইয়া
প্রায়শ্চিত্ত করে দশানন
পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমরের বেশে
ক্ষমা আশে করিছে গুঞ্জন

৫

সতী সাধ্বী—ভারত রমণী—
তোমারি অপূর্ব্ব ইতিহাস
লিখিত এ অশোকের দলে
সত্য ধ্রুব দীপ্ত অবিনাশ

৬

বঙ্গ কবি সজল নয়নে
মালা ছলে বন্দনা তাহার
গাঁথি তাই এনেছে যতনে
লও দেবী লও উপহার।

ভালবাসার টান

শ্রীপ্রভাবতী দেবী গঙ্গোপাধ্যায়

এক

প্রথম যেদিন নিতান্ত অপরিচিত অসহায় অনাশ্রয় পথিকটীর মত কোন অজানা দেশ থেকে এসে একটুখানি আশ্রয়ের ভিখারী হ'যে সে আমার দোরের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তখন একবারও ভাবতে পারিনি তার সঙ্গে আমার জীবনটা ক্রমে ক্রমে এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে প'ড়বে।

আমার বেশ মনে পড়ে, তখন শীতকাল—রাত্রি ৯টা কি ১০টা হবে। বাইরে সন্ধ্যে থেকেই বরফ-গলা বৃষ্টি ঝির্ ঝির্ ক'রে গড়িয়ে প'ড়্ছিলো। সকাল সকাল ঘর কন্নার কাজ সেরে সবাই নিজের নিজের ঘরে লেপের নীচে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং খুব সম্ভব তখন ঘুমিয়েও পড়েছিলেন। শুধু আমি তখনো ঘুমুইনি, আমার ছোট ঘরখানির এককোণে খাবারটা ঢাকা দিয়ে রেখে সর্ব্বাঙ্গে একখানা ব্যাপার মুড়ি দিয়ে টেবলের কাছে ব'সে আমি আমার ছেলেবেলার সইয়ের কাছে জীবনের সব সুখ দুঃখের কথাগুলো একটী একটী ক'রে খুঁটে খুঁটে লিখ্ছিলুম। সইয়ের নামটী কি জিজ্ঞেস কোচ্ছেন? নামটা নাইবা শুন্‌লেন—তার সঙ্গে এ আখ্যায়িকার কোন সম্বন্ধ নেই তো।

হ্যাঁ তারপর চিঠি লিখ্ছিলুম, ঘরের দোরটা ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল; হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন বাইরে থেকে আস্তে আস্তে দোরে ঘা দিচ্ছে। প্রথমটা একটু ভয় হ'য়েছিল, ভূতটুত নয়তো? শেষে ভাবলুম বোধ হয় বাতাস, কিন্তু শব্দটা যখন ক্রমেই স্পষ্ট হ'তে লাগ্‌লো তখন মনের ভেতর অনেক রকম ধারণা এসে এমনি উৎপাৎ বাধিয়ে তুল্লে যে সাহসে বুক বেঁধে দোরটা খুলে ফেলাই শেষে উচিত মনে কোল্লুম।

'দোর খুলতেই দেখলুম সে একপাশটীতে অপরাধীর মত সসঙ্কোচে নতমুখে দাঁড়িয়ে র'য়েছে; আর তার সারা গা থেকে মুক্তার মত ফোঁটা ফোঁটা জল টপ্ টপ ক'রে গড়িয়ে প'ড়ছে। আমি কাছে যেতেই মুখ তুলে আমার চোখের উপর চোখ রেখে সে অস্ফুট শব্দে মৃদু স্বরে কি বোল্লে ঠিক বুঝতে পাল্লুম না; তবে ভাব দেখে মনে হ'ল যেন বোল্‌ছে "ওগো দয়াময়ি! আজকে রাতের মত একটুখানি আশ্রয় দিয়ে আমায় বাঁচাও। ঠাণ্ডায় ম'লুম যে!"

বড্ড দয়া হ'ল। আহা বেচারী কি কষ্টটাই না পাচ্ছে এই শীতে! তাকে ধ'রে আদর ক'রে ঘরের ভেতর নিয়ে এলুম, তারপর আমার নাইবার তোয়ালে খানা দিয়ে তার সমস্ত গা-টা বেশ ক'রে পুঁছিয়ে দিলুম। কিছু খাবে কিনা জিজ্ঞেস কোত্তে সে বোধ হয় বুঝতে পাল্লে, তার নিজের ভাষায় সাড়া দিয়ে সে খাবারের থালাটার দিকে ঘন ঘন চাইতে লাগলো।

সেদিন সে আমার সঙ্গেই খেয়েছিল, আর খেতে

খেতে গল্পও কোরেছিলুম বিস্তর। দুজনকার আলাদা আলাদা ভাষাও সেদিন আমাদের গল্পের ব্যাঘাত জন্মাতে পারেনি। খাওয়া হ'লে ঘরের মেঝের উপর সযত্নে তার বিছানা পেতে দিলুম। কিন্তু আলাদা বিছানা বোধ হয় তার ভাল লাগলোনা; আমি আলো নিবিয়ে শুতেই দেখি চোরের মত আস্তে আস্তে এসে সে আমার বুকের ভেতর শুয়ে প'ড়ছে! এ কি! তার অন্যায় সাহস দেখে আমি বিরক্ত হ'য়েছিলুম বৈকি! কিন্তু অনেক ভর্ৎসনার পরও যখন সে উঠে গেলনা, তখন অগত্যা বাধ্য হ'য়ে তাকে নিয়েই এক বিছানায় রাতটা কাটাতে হ'ল।

সুন্দর? হ্যা সুন্দর বৈকি! দিব্য ফুট্‌ফুটে চেহারা খানি আর সরলতা মাখা উজ্জল চোকদুটীতে বেশ দেখাচ্ছিল তাকে।

দুই

এক ভয় ছিল মাকে। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেই কথাটাই ভাবছিলুম। কাল ভোরবেলা হঠাৎ অজানা অচেনা নূতন প্রাণীটাকে দেখে কি বোল্‌বেন, ভাবতেই আমার ভয় হ'চ্ছিল। মা যদি বাইরে থেকে আমার এই বুকের ভেতরটা দেখতে না পান,—যদি আমায় ভর্ৎসনা করেন, আর তাকে তক্ষুণি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে বলেন, তা হ'লে কি কোর্ত্তে হবে না হবে তাও ভেবে রাখছিলুম। তাকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পার্‌বো না তো! সেই এক রাত্তিরেই তাকে অনেকখানি ভালবেসে ফেলেছিলুম যে! কিন্তু কি ক'রে আমার ভালবাসার ধনকে আমার ছোট ঘরখানির ভেতর লুকিয়ে রাখবো তাই ভেবে আকুল হোচ্ছিলুম।

সকালবেলা আমি বিছানা ছেড়ে উঠতেই সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে উঠে প'ড়্‌লো, তার্‌পর অবোধ্য ভাষায় কি যেন বল্‌লে। বোধ হয়, "আর একটু শুয়ে থাক্‌লে হোত না?" এই রকম ভাবটা। আমি আদর ক'রে তাকে চুমু খেয়ে বোল্লুম, "ওরে দুষ্টু! বুকের ভেতর শুয়ে ভারী আরাম পেয়েছ—না? ভোর হ'য়ে গেছে যে। নাও, আর শুয়ে থাক্‌তে হবে না, এখন বাইরে যাবে চল।

মা উঠোনে রোদ পোহাচ্ছিলেন! আমাদের দুজনকে একসঙ্গে ঘর থেকে বেরুতে দেখে তিনি একটু মুচকি হেসে বোল্লেন, "বেশ সঙ্গীটী জুটিয়ে নিয়েছিস্ দেখছি!" আমার বুকের উপর থেকে যেন মস্ত বড় একটা ভার নেমে গেল। আমি হেসে বল্লুম "একে কাল রাত্তিরে পেয়েছি মা! বড্ড নিরাশ্রয় ও। আমাদের বাড়ীতেই থাক্, কি বল? তুমি রাগ কোর্বেনাতো তা হ'লে?"

মা বোল্লেন, "না রাগ কোর্বো কেন? তবে দেখিস্ যেন চুরি কোত্তে সুরু না করে—ও জাতকে বিশ্বেস নেই।"

সে চোর! একথা ভাবতে আমার বুকের ভেতরে খট্ ক'রে উঠলো। একটু বিমর্ষ হ'য়েই উত্তর দিলুম, "না মা, ও চোর নয়। দেখো তুমি, ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে আমি কেমন মানুষ করে তুলি।" আমার কথা শুনে মা হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

সত্যি আমি বড্ড ভালবেসেছিলুম তাকে; অত ভাল বোধ হয় তখন আর কাউকে বাসিনি। সে আমার কুমারীর প্রাণে কি মায়াবলে হঠাৎ অতখানি ভালবাসার সঞ্চার করে ফেলেছিল, তা এখনও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনি। শুধু বুঝেছি, আমাদের সেই ভালবাসার ভেতর আবিলতার লেশ মাত্রও ছিলনা; শুধু ছিল একটা মিষ্টি মধুর মাদকতা—একটা তন্ময় ভাব। আমরা দুজন দুজনকে কাছে পেলেই যথেষ্ট সুখী হোতুম, অন্য কেউ এসে বাধা জন্মালে আর বিরক্তির অবধি থাকতো না।

না—না, তার বাড়ী কোথায় ছিল আমায় জিজ্ঞেস কোর্বেন না—আমি বোল্‌তে পার্‌বো না। তার নাম? তাও জানতুম না; তবে—হ্যাঁ, আমি আদর ক'রে তার নাম রেখেছিলুম 'দুলাল'।

তিন

কটা দিন এমনি ক'রেই একটানা সুখের ভেতর দিয়ে কেটে গেল। আমরা দুজন একসাথে একপাতে

রসেই খেতুম, একই বিছানায় একসঙ্গে জড়াজড়ি করে ঘুমুতুম। কিন্তু ডুলাল আমার কিছুতে নাইতে চাইতো না, কাজেই মাঝে মাঝে তাকে জোর ক'রে আগাগোড়া সাবান দিয়ে নাইয়ে দিতে হ'ত। আর হ্যাঁ তার ভাষাটাও আমি অনেকটা সড়গড় ক'রে নিয়েছিলুম,—সেও আমার কথাগুলো বেশ ভাল ক'রে বুঝতে শিখেছিল। আমি 'ডুলাল' ব'লে ডাকলে যেখানেই থাক্‌না কেন সে তখনি আমার কাছে ছুটে আসতো। আমায়? হ্যাঁ আমায়ও সে একটা কিছু ব'লে ডাকতো বৈকি! কিন্তু কি তা আমি আপনাদের কাছে ঠিক্ ব'লতে পারবো না।

একদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে 'ডুলাল' কোথায় যে চ'লে গেল, অনেক ডেকে ডেকেও ডুপুর অবধি তার কোন সাড়া পেলুম না। মনটা বড্ড খারাপ হ'য়ে গেল, সেতো কখনও বাইরে বেশীক্ষণ থাকে না। কোন বিপদ আপদ ঘটেনি তো? কি জানি! যাহোক্ ডুপুরের খাবার সময়ও যখন তাকে খুঁজে পেলুম না, তখন অগত্যা একাই খেতে ব'স্‌তে হ'ল। খেয়ে উঠেছি, এমন সময় দেখি ডুলাল এসে হাজির। সে একা আসেনি, তাদের জাতের ভেতর থেকে একটী মনের মতন সঙ্কোচমাখা সুন্দরীকে বেছে সঙ্গে নিয়ে এসেছে! তার দেরী হবার কারণটা এবারে বেশ বুঝতে পার্‌লুম—বুঝে বড্ড রাগ হ'ল। কেন? আমার ভালবাসাই কি তার কাছে যথেষ্ট নয়? তবে সে এমন নিমকহারামী কোত্তে গেল কেন? তার নূতন প্রণয়িনীটীর উপর একটু হিংসেও হ'য়েছিল বোধ হয়, আগেকার মত ডুলালকে আদর করে কাছে না ডেকে আমি মুখ ফিরিয়ে নিজের কাজে চ'লে গেলুম। আড়াল থেকে দেখলুম, ডুলালও খানিকক্ষণ থ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর তার প্রণয়িনীক নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

সে দিন সারাদিনটা আমার কি মনের কষ্টেই যে কেটেছিল তা বল্‌বার নয়। রাত্তিরেও ডুলাল ঘরে এলোনা দেখে তার উপর অভিমানটা শতগুণ বেড়ে গেল; রাগে ডুঃখে আমার বুকখানা ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। বালিশে মুখ গুঁজে আমি একলাটী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লুম। হাস্‌ছেন? না—না হাস্‌বেন না, সত্যি বড্ড কেঁদেছিলুম সেদিন। আমার মনে ডুলাল কি যে ব্যথায় বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল তা আপনারা বুঝতে পার্‌ছেন না বোধ হয়, কিন্তু তাই ব'লে আমার নারী-হৃদয়ের অভিমানটা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলে আমি কিছুতেই তা মেনে নিতে পার্‌বেন না।

তারপর, হ্যাঁ—কাঁদছিলুম। কাঁদতে কাঁদতে কখন যে একটু ঘুমের ভরে আঁখি ডুটী মুইয়ে প'ড়েছিল বল্‌তে পারিনে, হঠাৎ আমার বুকের ভেতর যেন কার উষ্ণ পরশ অনুভব ক'রে চ'ম্‌কে উঠলুম। চোখ চেয়ে দেখ্‌লুম, সে আর কেউ নয় আমারই ডুলাল! রাগে আমার শরীরটা জলে উঠলো, ডুহাত দিয়ে তাবে সজোরে ফেলে দিয়ে বোল্লুম, "বেবো পাজি কোথাকাব, বেরো ব'ল্‌ছি···" সেতো নড়্‌লই না উপরন্তু এমন করুণ চোখে আমাব পানে চেয়ে বইল যে আমি অনেক চেষ্টা ক'বেও কিছুতেই আর বাগ কোত্তে পাল্লুম না। কিছুক্ষণ অমনি ক'রে চেয়ে থেকে সে যেন বোল্লে,—"ওগো, তোমার ডুটী পায়ে পড়ি' রাগ ক'রোনা এমন নিমকহারামী কখনো কোর্‌বো না।" এর পর অভিমান ক'রে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হ'য়ে উঠ্‌লো না, আমি তাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে চুমু খেলুম। তারপর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কখন যে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম ঠিক বুঝতে পারিনি।

চার

ক্রমে রান্নাঘর থেকে ডুটো একটা জিনিস চুরি যাওয়া সুরু হ'ল। মা বল্লেন ডুলালই যত নষ্টের গোড়া আমার কিন্তু কথাটা বিশ্বাস হতোনা। তবু মার কথায় তার উপর একটু কড়া নজর রাখ্‌লুম, ডু-একদিন ব'ক্‌লুমও; কিন্তু সে কিছুতেই চোর অপবাদটা মেনে নিতে চাইল না। তবে এটুকু শেষে বুঝতে পেরেছিলুম যে ডুলাল যেন ক্রমেই অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়্‌ছে, আর একটু ফাঁক পেলেই ছুটে বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়। আগে যেমন আমার কাছটীতে থাক্‌তেই সে সব চেয়ে বেশী

ভালবাস্তো, এখন তেমনি বাইরে থাক্‌তেই বেশী ভাল-বাসে; কিন্তু তার এমন উদাসীন হবার কারণটা কিছু-তেই বুঝে উঠতে পাল্লুম না।

হ্যাঁ পরে বুঝেছিলুম বৈকি! আর সেই বোঝবার সঙ্গে সঙ্গে রাগের মাথায় এমন একটা কাজ ক'রে ফেলেছিলুম যার জন্য সমস্ত জীবন ধরে আমায় অনু-তাপ কোর্ত্তে হ'য়েছে। সেই কথাটাই আজ আপনা-দের ব'ল্‌তে যাচ্ছি।

সেদিন শরীরটা আমার মোটেই ভাল ছিল না। কেন তা ঠিক্ মনে নেই, বোধ হয় দুলালের ব্যবহারই আমার অসুখের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। বিকেলের দিকটায় ভাবলুম বাগানে একটু হাওয়া খেয়ে আসিগে —যদি শরীরটা ভাল বোধ হয়। আমাদের বাটীর পাশেই ছিল মস্ত বড় ফুলের বাগান। গাছে রঙ্গ-বেরঙ্গের ফুলগুলি হেসে হেসে বাতাসের সঙ্গে খেলা কোচ্ছিল, আর রামধনুর মত পাখা উড়িয়ে চঞ্চল প্রজা-পতিগুলো এদিক ওদিক ছুটোছুটি কোরে বেড়াচ্ছিল। আন্‌মনে বেড়াতে বেড়াতে এই সব দেখেছিলুম, হঠাৎ বোধ হ'ল যেন কাছেই কোথাও দুলালের গলার আওয়াজ শুনতে পেলুম। তাইতো! এমন সময় নিরালা বাগানে ব'সে দুলাল কি কর্‌ছে কৌতুহলটা কিছুতেই চেপে রাখতে পারলুম না, যেদিক থেকে আওয়াজটা আস্‌ছিল, পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে গেলুম।

সেদিকটায় অনেক দিনের পুরাণো একটা যূঁই-গাছের কুঞ্জ ছিল; আড়াল থেকে দেখলুম, তারি ভেতরে দুলাল আর তার সেই প্রণয়িনীটী দুজনে নিভয়ে হাসিগল্প কোচ্ছে! আমার বুকের ভেতরটা যেন কেমন কোত্তে লাগলো। দুলালের সমস্ত অদ্ভুত আচরণের কারণটা যেন আমার চোখের সাম্‌নে জল্ জলে—স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। এইবার বেশ বুঝতে পাল্লুম দুলাল তার প্রণয়িনীটীকে একটুও ভুলতে পাবে না, তার যখন তখন বাইরে ছুটে আসার উদ্দেশ্য প্রেমালাপের অবসর খুঁজে নেওয়া। রান্নাঘরের চোর কে তাও বুঝলুম; প্রণয়িনীর আহার যোগাতেই দুলালকে শেষে চুরি শিখতে হ'য়েছে।

কি ব'ল্‌ছেন? হিংসে? না—না হিংসে ঠিক্ নয় গো—রাগে আমার সমস্ত শরীরটা জ্বলে উঠলো, চোখ মুখ দিকে যেন আগুন ছুটে বেরুতে লাগলো; আমি আর নিজেকে কিছুতেই সাম্‌লে রাখ্‌তে পাল্লুম না। এদিক ওদিক চয়ে দেখ্‌লুম কাছেই একখানা মস্তবড় পাথর পড়ে রয়েছে, আস্তে আস্তে নিঃশব্দে সেটা কুড়িয়ে নিলুম, তারপর সকল নষ্টের গোড়া দুলালের প্রণয়িনীটীকে লক্ষ্য পাথরখানা সজোরে ছুঁড়ে মার্‌লুম। ওঃ! কি নিষ্ঠুর কাজই ক'রেছিলুম আমি! এখন ভাবতে যেন বুকের ভেতরটা সিউরে উঠে। নিবিবিলিতে নিশ্চিন্ত মনে দুটী প্রাণী মুখোমুখি ক'রে ব'সেছিল, এমন সময় বজ্রের মত পাথরটা দুলালের প্রণয়িনীর মাথার উপর গিয়ে প'ড়্‌ল, বেচারী টুঁ শব্দ কর্‌বারও অবসর পেলেনা, রক্তে চারদিক ভেসে গেল আর তার উপর সে মুখ থুবড়ে পড়ে অসাড় হয়ে গেল।

পাতার ফাঁক দিয়ে দেখলুম, হতভাগ্য দুলাল প্রণ-য়িনীর দুর্দ্দশা দেখে করুণস্বরে হাহাকার ক'রে উঠ্‌লো।

পাঁচ

ফাঁসি? হ্যা ফাঁসি হওয়াই সে আমার তখন উচিত ছিল গো! কিন্তু ইংরাজের আইনে এমন কোন ধারা ছিল না যাতে ক'রে আমার ফাঁসি হ'তে পারে।—তাই বেঁচে গেলুম। বাঁচলুম বটে, পর-দিন থেকেই আমার শাস্তির সূত্রপাত হ'ল; ঈশ্বর আমার মনে একটু একটু করে এমনি অশান্তির বিষ ছড়িয়ে দিতে লাগ্‌লেন, যে তার জ্বালা তুষানলের মত এখনও আমার বুকের ভেতরটা জ্বলিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

হ্যাঁ—তারপর যা ব'লছিলুম দুলাল যেন পাগলের মত হ'য়ে গেল। পরদিন সারাদিনটা সে কেঁদে কেঁদে সারা বাগানময় ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে লাগ্‌লো। এক একবার দৌড়ে এসে আমার পায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ে অশ্রুসজল করুণ চোখে আমার মুখচাইতে লাগলো, আমার শত আদর ভালবাসাও তার মনে আর সান্ত্বনা দিতে পার্‌লে না। সে বেশ—বুঝতে পেরেছিল তার

প্রণয়িনী-হন্ত্রী কে ; কিন্তু হায়রে সে জানতোনা যে তাকে বাঁচিয়ে দেবার ক্ষমতা ঈশ্বর আমাকে দেননি।

দুলালের চোখে জল দেখে আমারও চোক দুটী জলে ভ'রে উঠ্‌লো। কিন্তু কই ? সে জলে বুকের আগুন একটুও নিভলোনা তো! বরঞ্চ আরও হুহু ক'রে বেড়ে গেল যে! হা ঈশ্বর!

সারা রাত্তির এপাশ ওপাশ ক'রে ভোরবেলায় একটু ঘুমিয়ে প'ড়েছিলুম ; উঠে দেখলুম, বেলা আটটা বেজে গেছে। কাণ পেতে শুনলুম, কিন্তু দুলালের কোথাও সাড়া শব্দ পাওয়া গেলনা। তাইতো! সে গেল কোথায়? বাড়ী ছেড়ে কোথাও মনের দুঃখে কোথাও চ'লে যায়নি তো? মনটা নানা রকম সন্দেহের দোলায় দোল খেতে লাগলো। এক একবার ভাবলুম বোধ হয় সে তার সমস্ত কান্না সমস্ত হাহাকার ব্যর্থ হ'তে দেখে এইবার শান্ত হ'য়ে কোথাও ঘুমিয়ে প'ড়েছে ?

সমস্ত বাড়ীটা পাতি পাতি ক'রে খুঁজেও যখন তাকে পেলুম না তখন চিন্তিতমনে আস্তে আস্তে বাগানের দিকে চল্লুম।

বাগানে ? না বাগানেও তাকে দেখ্‌তে পেলুম না তো, সব দিকেই খুঁজে দেখলুম, শুধু সেই যুঁইবনটী ছাড়া ; কারণ আমি জানতুম আমার পাপের জলন্ত নিদর্শন স্বরূপ দুলালের প্রণয়িনীর মৃতদেহটা খুব সম্ভব তখনও সেখানে প'ড়েছিল। কিন্তু যখন তাকে আর কোথাও পেলুম না, তখন শেষে সেই যুঁইবনটাও একবার খুঁজে দেখতে হ'ল। আস্তে আস্তে, দুরু দুরু বুকে যুঁই গাছগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

যেখান হতে পাথর ছুঁড়েছিলুম, ঠিক্ সেই ঝোপের ফাঁক দিয়ে কুঞ্জের ভেতর চেয়ে দেখলুম,—কি দেখলুম ব'ল্‌তে পারেন ?—দেখলুন, ঠিক্ তার প্রণয়িনীর পাশে দুলালের প্রাণহীন মৃতদেহ নীরব নিস্পন্দ হ'য়ে প'ড়ে র'য়েছে! আমার বুকের ভেতরটা তোলপাড় ক'রে উঠলো। থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে আমি সেখানেই লুটিয়ে প'ড়ে গেলুম।

তারপর ? তারপর আর কি ? আমার বিয়ে হ'য়ে গেছে,—আজ আমি চাঁদপানা ছেলের মা হ'য়েছি। বড় ছেলেটার নাম রেখেছি 'দুলাল'। কিন্তু সেই ছেলেবেলার দুলালকে ভুল্‌তে পেরেছি কি ? আজকে জীবনের এত সুখের মাঝেও সেই বেরালটার কথা মনে পড়লে চোখদুটী জলে ভ'রে যায়, আর অনুতাপে বুকটা ভরে ওঠে।

পুরাতন চিঠি

শ্রীপ্রমথনাথ বসু

অনেক দিনের কথা সে আজ তোমার চিঠিখানি
পুঁজি করে রেখেছিনু তোমার লেখা জানি
কতই স্মৃতি কতই ব্যথা জাগায় আমার প্রাণে
বুকে ধরে বেঁচে আছি তারি টানে টানে
ছুটীর দিনে আপন মনে যখন তখন পড়ি
মনের আশা রইল মনে মনেই ভাঙি গড়ি
ভেবেছিলাম তোমায় আমায় বাঁধব খেলাঘর
রঙীন ফুলের ঝোপের কাছে যেথায় বালুচর
নিত্য যেথায় কোকিল ডাকে হরিণ চরে মাঠে
শিরিশ গাছটী হেলে আছে দীঘির বাঁধা ঘাটে
টগর গাছে ফুল ফুটে সব হাওয়ায় দুলে দুলে
ক্লান্ত হয়ে ভোরের বেলা ঘুমায় ঢুলে ঢুলে
একটী ছোট নদী যেথায় আঁকা বাঁকা হয়ে
কুলু কুলু যাবে বয়ে কতই কথা কয়ে
চাল্‌তা ফুলের পাপ্‌ড়িগুলি পড়্‌বে ঝরে ঝরে
নদীর বুকে ভাস্‌ব সুখে সোহাগ করে করে
স্বপন দেখার মত সে সব কোথায় গেছে চলে
কোথায় তুমি কোথায় আমি ভাস্‌ছি নয়ন জলে
মনের মতন খেলার গৃহ আজ পেয়েছ বুঝি
তোমার লেখা চিঠিখানি সেইটি আমার পুঁজি।

সাহিত্যে সমালোচনার স্থান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
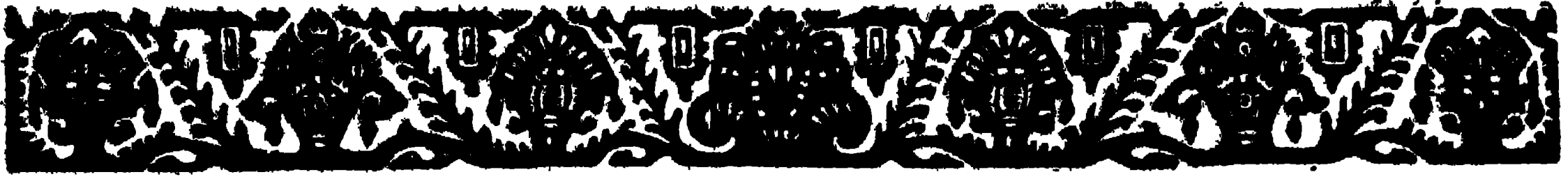
অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম-এ

সমালোচনা তুলনামূলক হওয়া চাই। কেহ কেহ তুলনামূলক আলোচনার অত্যন্ত বিরোধী, ইহাতে নাকি লেখকের মৌলিকতার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে লেখকের মৌলিকতা গেল কি না গেল, তাহাতে সমালোচকের কি আসে যায়। এ ত গেল, অনেকটা রাগের কথা বা ঝাঁজাল উত্তর। কিন্তু আসল কথা এই, একজন কবি বা উপন্যাসকার যদি কাহারও নিকট হইতে plot বা ভাব ধার করেন, তাহা হইলেই কি তাঁহার সমস্ত মৌলিকতা নিঃশেষ হইয়া গেল ? এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে Shakespear এর মত বড় Plagiarist সাহিত্যজগতে কেহ নাই। এমন কয়খানা নাটক আছে যাহার plot Shakespeare-এর স্বকপোলকল্পিত ? Hall, Holinshed প্রণীত ইতিবৃত্ত এবং Plutarch's *Lives*এর ইংরাজী অনুবাদের তিনি যেরূপ free use করিয়াছেন Miltonও বোধ হয় clasaical poetsদের কিম্বা Bibleএর সেরূপ করেন নাই। সকলেই জানেন Chaucerএর সাহিত্যে Italian period, French period, এবং English period নামে তিনটী যুগ আছে। কিন্তু Chaucerএর নিজস্ব, তাঁহার অপরূপ হাস্য ও করুণ রসের অপূর্ব্ব সমাবেশ করিবার ক্ষমতা—তাঁহার সব রচনাতেই অল্পাধিক লক্ষিত হইবে। Spenserকে ওরূপভাবে ধরিলে ত তাঁহার অমর কাব্য *Faerie queene* বা গীতিকাব্য *Shepherd's Calendar* নগণ্য হইয়া যায়। বঙ্কিমবাবু যদি স্থল বিশেষে* Hunterএর *Annals of Rural Bengal* † এর প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহার গ্রন্থে যদি স্থলে স্থলে Shakespeare বা Scottএর প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়, তাহা হইলে কি তিনি সাহিত্যের আসরে তুচ্ছ হইয়া পড়িলেন ? দীনবন্ধু যদি "নবীনতপস্বিনী"তে বা অমৃতলাল বসু যদি "চোরের উপর বাটপাড়ি"তে Shakespeareএর *Merry Wives of Windsor* হইতে কিছু ভাব লইয়া থাকেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা একেবারে খেলো হইয়া পড়িলেন ? "বিদ্যাসুন্দর" বা "অন্নদা-মঙ্গল" যদি তৎকাল প্রচলিত প্রবাদ ও গল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে কি ভারতচন্দ্র অকবি হইয়া পড়িলেন ? বস্তুতঃ ভাবের আদান প্রদান কোন্ সাহিত্যে নাই ? যে সব ভাব বিশ্বজনীন তাহা বড় বড় কবিদের মধ্যে সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইবে। ইহার জন্য Shakespeareকে কালিদাস খুলিতে হয় নাই, Tennysonকে চীনদেশের কবিতা পড়িতে হয় নাই, Confucius (Kong-Futzi) কে Pythagorusএর নিকট যাইতে হয় নাই, Zarathustraকে গৌতম বুদ্ধের নিকট আসিতে হয় নাই।‡ এ ত গেল universal ভাবের কথা, কিন্তু এমন কতকগুলি সুন্দর ভাব ও চিত্র আছে যাহা কোন কবি-বিশেষের নিজস্ব হইলেও পরবর্ত্তী কবিগণ তাহার ব্যবহার করিবার (জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক) লোভ সংবরণ করিতে পারেন না। যেমন হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্য। প্রথম সর্গেই আমরা দেখি Milton-এর *Paradise Lost*এর দ্বিতীয় সর্গ যেন স্থলে স্থলে পুনরুক্ত হইতেছে। পাতালপুরে অবস্থিত বিমর্ষ দেবগণের সহিত Milton বর্ণিত Fallen angles কি

* "আনন্দমঠ" প্রথম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।

† Chapter II.

‡ কি কারণবশতঃ প্রায় একই সময় Pythagorus, Zarathustra, Kong Futzi ও Gautam Buddha এই চারিজন মহাপুরুষের আবির্ভাব ও নব ধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যক হইল তাহা ঐতিহাসিকের অনুসন্ধের বটে। এ বিষয়টার কারণ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তুলনীয় নহে? Miltonএর Moloch এবং Belialএর বক্তৃতা এবং হেমচন্দ্রের বৈশ্বানর ও বরুণের বক্তৃতা কি অনেকটা এক নহে? কিন্তু তাই বলিয়াই কি হেমচন্দ্র আমাদের Estimationএ নামিয়া গেলেন? Paradise Lostএর কোথায় ঐন্দ্রিলা, শচী বা ইন্দুবালা পাই? যে হেমচন্দ্র বঙ্গবিধবার দুঃখে আত্মহারা হইয়া কাঁদিয়াছেন, যিনি বাঙ্গালীর মেয়ের শিক্ষার অভাব দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই, যাঁহার "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে" বলিয়া খেদ প্রকাশক কবিতাটি সাহিত্যে চিরস্মরণীয় থাকিবে, যাঁহার গীতি-কবিতাগুলি বঙ্গসাহিত্যে একটি অমূল্য সম্পদ, যাঁহার স্বদেশ প্রেমিকতা কাব্যের ভিতর দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল রহিয়াছে—তাঁহার আসন কি একবার নামিয়া যাইবে এইজন্য যে তিনি বৃত্রসংহার লিখিবার সময় Milton ও Homerএর স্থলে স্থলে অনুসরণ করিয়াছেন বা Dryden, Gray, Longfellow, Shelley, Tennyson ও Shakespearএর কতকগুলি রচনার বঙ্গানুবাদ বা স্থলে স্থলে অনুসরণ করিয়াছেন? হেমচন্দ্র যেখান হইতেই ভাব গ্রহণ করুন না কেন তিনি তাহাকে খাঁটি বাঙ্গালার উপযোগী করিয়াছেন 'একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ parallelism দেখাইলে বরং কোন লেখকের মৌলিকতার প্রগাঢ়তা স্পষ্ট করিয়া বুঝান হয়। কোনখানে তিনি distinctly original আর কোনখানে তিনি imitator এই দুইটী তুলনা না করিলে কি কাহারও originality বোঝান যায়? কালিদাসের "রঘুবংশ" ও মাইকেলের "মেঘনাদ বধের" originality হইতেছে সেইখানে, যেখানে তাঁহারা কবিগুরু বাল্মীকি হইতে বিভিন্ন চিত্র আঁকিয়াছেন। যতদিন সাহিত্য পঠিত হইবে ততদিন একদিকে অজের শোকপ্রকাশ (বঙ্কিমচন্দ্র "বিষবৃক্ষে" বুঝি কালিদাসকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন) দিলীপের প্রজারঞ্জকতা, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের রমণীয় বর্ণনা, অপর দিকে সীতা সরমার কথোপকথন, লক্ষ্মণের শৌর্য্য ও জিতেন্দ্রিয়তা, প্রমীলার বীরত্ব ও সতীত্ব, দশাননের পুত্রবিরহে শোকপ্রকাশ পাঠকবর্গকে চমৎকৃত করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া কি কালিদাস বাল্মীকি বা ভাসের নিকট কতটা ঋণী কিম্বা মধুসূদন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য হইতে কোন্ কোন্ রত্নরাজি আহরণ করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিব না? ভবভূতি "বীর চরিত" ও "উত্তর রামচরিত" রামায়ণ অবলম্বনে লিখিয়াছেন। বাল্মীকির কৈকয়ীকে অন্যরূপ করিয়া আঁকিতে ও বালিবধ ও সীতা নির্ব্বাসন জনিত রামচন্দ্রের কলঙ্ক কিঞ্চিৎ অপনোদন করিবার জন্যই হয়ত তিনি কলম ধরিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিশেষত্ব সেইখানে যেখানে তিনি বাল্মীকি হইতে পৃথক। "উত্তর রামচরিত" চিত্রদর্শন (যাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বিদ্যাসাগর "সীতার বনবাসের" প্রথম পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন), চন্দ্রকেতুর সহিত লবের যুদ্ধ বর্ণনা ও বিরহ-মধুর রামচন্দ্রের সহিত বিরহ-বিধুরা সীতাদেবীর অপূর্ব্ব মিলনের করুণ দৃশ্য পাঠকের মনে চিরদিন অবিকৃত থাকিবে। Shakespeareও দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসের শুষ্কঅস্থিগুলি লইয়া তাহাদিগকে রক্তমাংস দান করিয়া পুনর্জীবিত করিয়াছেন। এদিকে Hall, Holinshed অপর দিকে Todd, Dow যে মূল উপাদান করিয়াছেন Shakespeare ও দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা সমালোচকের দ্রষ্টব্য। হইতে পারে "চন্দ্রগুপ্ত" লিখিবার সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের মনে "মুদ্রারাক্ষসের" চিত্র বর্ত্তমান ছিল কিংবা "সাজাহান" লিখিবার সময় "*King Lear*" তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া কি দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের চক্ষে তিলমাত্র নামিয়া পড়িয়াছেন? গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকাবলীর Plot গুলি (এবং সময় সময় ভাষা পর্য্যন্ত) অতীত সাহিত্য হইতে লইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার মৌলিকত্ব আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজকাল বাঙ্গালায় অনেক উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস লিখিত হইতেছে। Ibsen, Barnard Shaw, Tolstoi, Anatole France, Oscar Wilde, H.G.Wells, Galsworthy, Jacob, Shekoff, Dostoiveskey, Nietzsche, Herbert Spencer প্রভৃতির কাহারও না কাহার প্রভাব আজকালকার অনেক উপন্যাসে লক্ষিত হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া কি বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি তিলমাত্র গৌরবহীন হইয়া পড়িয়াছে? হইতে পারে, আজকালকার অনেক

উপন্যাসে Moral tone একটু খাটো হইয়া পড়িয়াছে এবং যে সব সমস্যা এখনও বঙ্গদেশে জাগিয়া উঠে নাই তাহা আজকালকার কোন কোন উপন্যাসে আলোচিত হইতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া সব উপন্যাসগুলির মধ্যেই যে Artএর একান্ত অভাব বা মৌলিকতার নিতান্ত দারিদ্র্য লক্ষিত হয় তাহা নহে, তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, যে উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশ্বজনীন ভাব, আদর্শ ও স্বাভাবিকতা নাই ভবিষ্যতে সৎসাহিত্যের মধ্যে তাহাদের তাহাদের Permanent place থাকিবেনা।

ছোট গল্পের প্রচলন পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিলনা। বৈদেশিক সাহিত্যের অনুকরণে বোধ হয় তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়াই কি রবীন্দ্র-নাথের অতুলনীয় হাস্যকরুণরসাত্মক গল্পগুলি বা প্রভাত-কুমারের হাস্যকৌতুকোজ্জ্বল রচনাগুলি বা জলধর সেন ও সুধীন্দ্র ঠাকুরের করুণরসাত্মক গল্পগুলি কি সাহিত্যে স্থান পাইবে না, না তাহাদের মৌলিকত্ব ও সৌন্দর্য্য একবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে? আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ ফ্রেঞ্চ-বেলিজিয়ান নাট্যকার Maurice Maeterlinckএর উপর Schopenhauer, Emerson Carlyle, Hello, Novalis প্রভৃতির Mysticismএর প্রভাব সর্ব্বত্র লক্ষিত হয় কিন্তু তাই বলিয়া Maeterlinck প্রভৃতির Mysticism (রহস্যবাদ) এর ভিতর কি নূতনত্ব বা মৌলিকত্ব নাই? (idealism ও optimism যে Maeterlenckএর mysticism সহিত অস্থিমজ্জায় কিরূপভাবে জড়িত তাহা তাঁহার *La Temple Ensavelli* পড়িলেই বুঝা যায়, অবশ্য Maeterlinckএর প্রথম বয়সে রচনাগুলিতে optimismএর পরিবর্ত্তে একটা pessimistic toneই বেশী বর্ত্তমান) *Princess Maleine* নাটকখানি Shakespeareএর Hamlet ও Maeterlinckএর নিকট অনেক ঋণী বলিয়া কি তাহা সাহিত্য মধ্যে পরিগণিত হইবে না? অপরের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কি Maeterlinck সাহিত্য সমাজে জাতিচ্যুত হইবেন? তাঁহার *Treasure of the Humble*, *Life of the bee*, *Wisdom and the destiny* প্রভৃতি প্রবন্ধাবলি কিম্বা *Sightless*, *Intruder*, *Interior*, *Sister Beatrice*, *Monna Vanna Blue bird* প্রভৃতি নাটকগুলি কি পাঠকবর্গের চক্ষে হীনপ্রভ হইয়া পড়িবে?

আর অধিক উদাহরণ দিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। এক কথায় Comparative criticism কবি নাট্যকার বা ঔপন্যাসিককে খাটো করে না বরং তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও মৌলিকত্বকে আরও ফুটাইয়া তুলে। আঁধার হইতে আলোকে যাইলে যেমন আলোকের দীপ্তি আরও উজ্জল বোধ হয়, সেইরূপ লেখকের ঋণ ও মৌলিকত্ব পাশাপাশি রাখিলে মৌলিকত্ব আরও উজ্জলরূপে পরিস্ফুট হয়। তবে Comparative criticismএ যে বিপদ একেবারেই নাই তাহা নহে। এরূপ criticismএর বিশেষ বিপদ এই যে, parallel passage খুঁজিতে খুঁজিতে সময় সময় লেখকের প্রত্যেক lineএ খুঁত ধরিতে ইচ্ছা আসিয়া পড়ে। কিন্তু নিরপেক্ষ সমালোচকের খুঁতধরা বা প্রশংসা করা উদ্দেশ্য নহে। যাহা প্রকৃত দোষগুণ তাহা উদ্ঘাটিত করিয়া পাঠকের চক্ষে ধরাই কর্ত্তব্য। "খুঁজিয়া খুঁজিয়া দোষের স্থান বাহির করা"কে "মাক্ষিকী সমালোচনা" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাকে প্রকৃত সমালোচনা বলা চলে না। নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা না থাকিলে সমালোচক হওয়া যায় না। Maeterlinck এক স্থলে বলিয়াছেন (*Essay on the Pact* দ্রষ্টব্য) যে অতীত আমাদিগকে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মতই পথ দেখাইতে পারে। অতীতকে যে যে ভাবে ডাকিবে তাহার নিকট সে সেইভাবে উদয় হইবে তবে অতীতকে বন্ধুরূপে পাইতে গেলে নৈতিক বলের প্রয়োজন যাহার নৈতিক বল নাই, তাহার অতীতের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করা বৃথা, অতীত তাহার সহিত ছলনা করিবে তাহাকে বিপথে লইয়া যাইবে। আমরাও বলি যে ঈর্ষা, পক্ষপাত হইতে হৃদয়কে একেবারে মুক্ত করিতে না পারিলে, এক কথায় পরম নৈতিক বলে বলীয়ান্ না হইতে পারিলে, সমালোচনা বিশেষতঃ তুলনামূলক সমালোচনা করা উচিত নহে।

"There is, I fear, a prosaic set growing up among us, editors of booklets, book-worm index-hunters, or men of great memories an

no imagination, who impute themselves to the poet, and so believe that he, too, has no imagination but for ever poking his nose between the pages of some old volume in order to see what he can appropriate." অধ্যাপক Dawson কবি Tennysonএর *Princess* হইতে—

"A wind arose and rushed upon the South
And shook the songs, the wispers,
and the shrieks
Of the wild woods together, and a Voice
Went with it, Follow, follow, thou shalt win"

এই কয়টি লাইনের সহিত Shellyর *Prometheus unbound* হইতে এই লাইন কয়টি।

A wind arose among the pines, it shook
The clinging music from their bows and then
Low sweet faint sounds, like the farwell
of ghosts,
Were heard : "oh follow, follow, follow me !"

উদ্ধৃত করিয়া তুলনা করিয়াছিলেন। ইহাতে Tennyson কতকটা যেন বিরক্ত হইয়া উল্লিখিত বাক্যগুলি Dawsonকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন।* তিনি আরও বলিয়াছেন, When you say this passage or that was suggsested by Wordsworth, Shelley or another, I demur ; and more, I wholly disagree." দুইজন কবি এক দৃশ্য দেখিয়া একই কথায় কি ছবি আঁকিতে পারেন না ? Tennyson *Prometheus unbound* পড়িয়াছিলেন কিন্তু নিশ্চয়ই *Princess* লিখিবার সময় তাহা খুলিয়া বসেন নাই। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, সময় সময় অজ্ঞাতসারে আমাদের মুখ দিয়া বা কলম দিয়া অপরের হৃদয়গ্রাহী বাক্যাবলী বাহির হইয়া পড়ে, আমরা কাহার বাক্যের পুনরুক্তি করিতেছি। আবার দুইজন বা ততোধিক ব্যক্তি Quite independently of one another (সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে) একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। Platoর Idealismএর সহিত শঙ্করের মায়াবাদ কতকটা সদৃশ বলিয়া শঙ্কর যে Greek দার্শনিকের শরণাগত হইয়াছিলেন এরূপ ত বোধ হয় না। Hegel Kantian Philosophyর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রামানুজের শঙ্কর দর্শনের ব্যাখ্যার সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকিলেও Hegel সংস্কৃতজ্ঞ ও রামানুজের শিষ্য ছিলেন এরূপ কথা বলা চলে না।

তাই বলিতেছিলাম তুলনামূলক সমালোচনা করিতে গেলে, বিশেষ সাবধানতা ও নিরপেক্ষতার সহিত করিতে হয়। কাজ বড় দুরূহ ; কিন্তু দুরূহ ও সময় সময় অপ্রিয়কর বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। সমুদ্রলঙ্ঘন দুরূহ বলিয়া কি রামচন্দ্রের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত এ চেষ্টা হইতে কোন সভ্যজাতি বিরত আছেন ? সমুদ্রগর্ভ হইতে রত্নরাজি সংগ্রহ করা বিপজ্জনক বলিয়া কি ব্যবসায়ীগণ সে কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছেন ? সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার বিপজ্জনক বলিয়া কি ভিষকগণ তাহা হইতে নিবৃত্ত হন ? এরূপ সমালোচনার আর একটি বিপদ হইতেছে যে, সময় সময় সমালোচকের বিদ্যা জাহির করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, সময় সময় পাণ্ডিত্যের বড়াই করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহারা দমন করিতে পারেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন এক যুবককে শিক্ষা দিবার জন্য তাহার হাত হইতে ব্যাগ লইবার সময় নিজের অস্তিত্ব একেবারে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন,আরব্য উপন্যাসের হারুন-অল-রসিদ, আবুজয়িদ প্রভৃতি রাজেন্দ্রগণ রাজ্যপরিদর্শন করিবার সময় নিজেদের প্রকৃত পরিচয় যেমন একবারে গোপন করিয়া চলিতেন, সেইরূপ সমালোচককে তাঁহার পাণ্ডিত্যের অকারণ বাহ্যাড়ম্বর একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সমালোচনা কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। আরও মনে রাখিতে হইবে, A Little learning is a dangerous thing, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। দুইছত্র Hafez বা Firdusi পড়িয়া যদি আমি পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে বসি,Dakiki Unseri, Sakiর নাম শুনিয়াই যদি তাঁহাদের কাব্যের সমালোচনা করিতে চেষ্টা করি, অথবা ফরাসী ভাষায় একখানি পুস্তক না পড়িয়াই যদি ফরাসী সাহিত্যের বড় বড় সাহিত্যমহারথগণকে টানিয়া নামাইয়া ফেলিতে

* Tennyson—A memoir p 215 দ্রষ্টব্য।

চেষ্টা করি বা নগণ্য গল্প ও উপন্যাস লেখকগণের অনুবাদের অনুবাদ পড়িয়া ফরাসী সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখাইতে চাই, তাহা হইলে অজ্ঞব্যক্তিরা হাততালি দিয়া আমার প্রশংসা করিলেও সুধী-সমাজে আমি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর দাম্ভিক বলিয়া বিবেচিত ও হাস্যাস্পদ হইব ও অধম বলিয়া পরিগণিত হইব সন্দেহ নাই। কোন একখানি পুস্তকের সমালোচনা করিতে হইলে কয়টী জিনিষের বিশেষ প্রয়োজন—প্রথমত যে ভাষায় পুস্তক রচিত হইয়াছে সেই ভাষার সহিত সম্যক পরিচয়, সেই ভাষার সাহিত্যের উপর একটা মোটামুটি দখল, লেখকের যুগ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা জ্ঞান, লেখক যদি বিদেশীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রিয় বিদেশীয় সাহিত্যের (অন্ততঃ অনূদিত বিদেশীয় সাহিত্যেরও) সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় এবং সর্ব্বোপরি নিরপেক্ষ, নির্ভীক স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার সাহস। এগুলির উপর সাহিত্যানুরাগ, সাহিত্যিক মাত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি এবং সাহিত্যরসাস্বাদন করিবার একটী শক্তি থাকাও প্রয়োজন, নচেৎ সাহিত্য সমালোচনা করিবার চেষ্টা করা বৃথা।

(ক্রমশঃ)

পল্লী ব্যথা

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

জনম লভেছি শান্তি-দায়িনী পল্লী-জননী তোমার বুকে
নয়নে আজি গো পড়িছে অশ্রু, কাঁদিছে হৃদয় তোমার দুঃখে।
কলেরা বসন্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে ক্লিষ্ট আজি গো তোমার দেহ
তোমারি সন্তান পরবাসী আজ শূন্য তোমার সোণার গেহ।
তোমারি শ্যামল শস্য-ক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলে না আর
দুর্ভিক্ষ আর মহামারী রোগ হয়েছে তোমার গলার হার।
মুষ্টি অন্নের তরে গো তোমার সন্তান আজি পরের দ্বারে,
দাসত্ব করিয়া যাপিছে জীবন অন্ন নাহি মা তোমার ঘরে।
দীন দরিদ্রের ক্রন্দন রব গগন ভেদিয়া উঠিছে আজ
তুমি কি গো সেই সোণার দেশ ভাবিতে পাই যে বিষম লাজ।
দ্বেষ হিংসা আর কলহ বিবাদ বিরাজিত আজ তোমার ঘরে,
বিপদে সম্পদে সুখে দুঃখে কেহ কারো প্রতি হায় চাহে না ফিরে।
শ্মশান আজি গো সোনার পল্লী সে সুখের দিন হয়েছে গত
বসতি করিছে সে শ্মশান বুকে শৃগাল কুকুর গৃধিনী শত।
পরস্পর নাহি স্নেহ ভালবাসা নাহিক কাহারও সহানুভূতি
দলাদলি আর স্বার্থপরতা হয়েছে এখন সমাজ নীতি।
কমলা ছিলেন চির বিরাজিতা পল্লী-জননী তোমার ঘরে,
সে দিন আজি গো অতীত গর্ভে; লক্ষ্মী গিয়াছে তোমায় ছেড়ে।
জঙ্গল বন গজায়েছে আজ তোমারি শ্যামল ক্ষেত্র 'পরে
ম্যালেরিয়া দূত মশক বংশ তড়াগের মাঝে বসতি করে।
নিদাঘে জননী তোমার বক্ষে মিলে না একটু পানীয় জল,
তোমারি সন্তান সহরের বুকে স্থাপন করিছে জলের কল।
দুঃস্থ দরিদ্র সন্তান যারা তোমারি বুকেতে করিছে বাস
পচা জল পান করে হয়েছে আজি গো রোগের দাস।
আজি যে আমার পল্লী-জননী হয়েছ তুমি শ্মশান প্রায়,
স্মরিতে আজিকে তোমারে জননী দুঃখেতে বুক ফাটিয়া যায়।

কাজের কথা
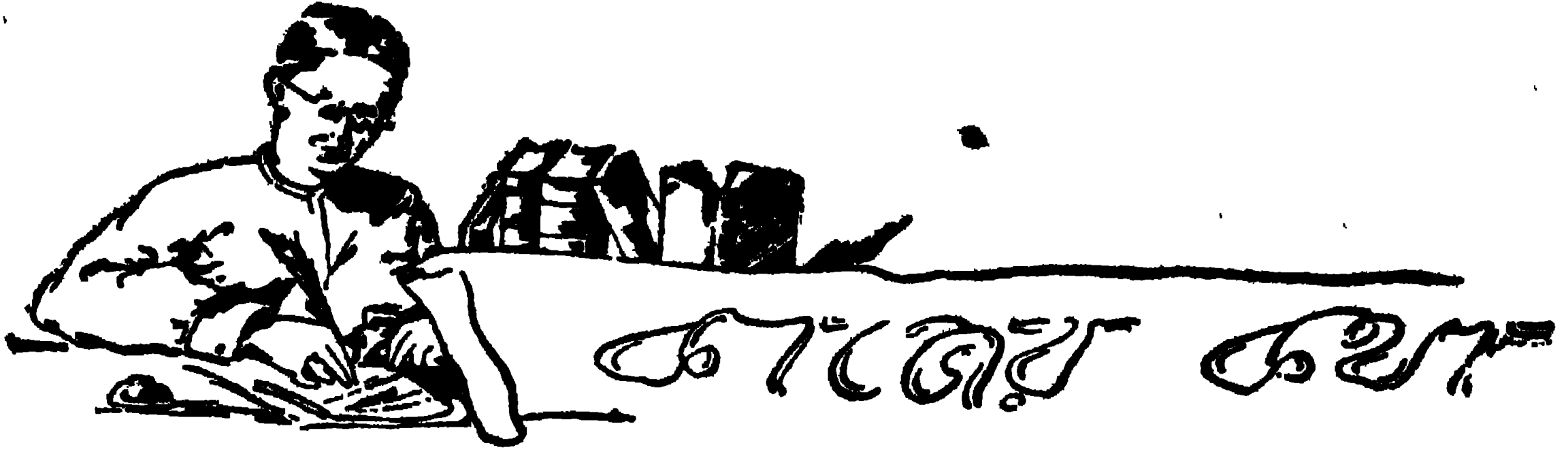
লর্ড কার্জ্জন ঃ—লর্ড কার্জ্জন আর ইহলোকে নাই। তাঁর মৃত্যুতে বৃটিশ সাম্রাজ্যে একজন কূট-রাজনৈতিক হারালেন, যা সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ অসুবিধাজনক। প্রতিভা মানুষকে কত বড় করে তুলতে পারে ইনি তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। অল্প বয়সে ভারতের বড় লাটের গদী পান এবং অনেকদিন লাটগিরী করেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ব্যাপার বাঙ্গলার ইতিহাসে এঁর নাম অক্ষয় করে রেখেছে; আর নিদ্রিত বাঙ্গলাকে জাগ্রত করে দেবার জন্য ইনি বাঙ্গলার অধিবাসীগণের নিকট চিরস্মরণীয় থাকবেন। মানুষ দোষেগুণেই হয়—আমাদের ভাগ্যে এঁর দোষের দিকটাই বেশী ফুটে উঠে ছিল কিন্তু তৎসত্বেও আজ তাঁর গুণের কথা স্মরণ করে আমরা তাঁর আত্মীয় স্বজনগণকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিবাহ-বিভ্রাট ঃ—মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এক আইন পাশ হয়েছে যাতে ছাত্রেরা বি-এ পাশ না করে আর বিয়ে কর্ত্তে পার্ব্বে না। বিয়ে করে নাই, এই মর্ম্মে একটা স্বীকারনামা লিখে দিলে তবে সে ছাত্র পরীক্ষা দিতে পার্ব্বেন এবং পরে যদি প্রমাণ হয় যে কারো স্বীকার-পত্র মিথ্যা, তাহলে তার ডিগ্রী বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবার ব্যবস্থাও আছে। বিয়ে বন্ধ না কল্লে বি-এ পাস করা যাবে না শুনে ছাত্রেরা এখন কি কর্ব্বে? তারা কোন বিয়েয় মন দেবে? দেশে মেলা সমস্যা ছিল আবার একটা বাড়িল—বোঝার উপর শাকের আঁটি। বাংলা দেশে এ আইন একবার চালিয়ে দেখলে হয় না—এতে বরের বাজার চড়ে কি নামে!

মালাবার হত্যাকাণ্ড ঃ—সুন্দরী মোমতাজের মামলা মাঝে কোর্টে উঠেছিল; ফলে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে কয়েকজন খালাস পেয়েছেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার জে, এম সেন গুপ্ত নাকি আসামীদের পক্ষ সমর্থন কর্ব্বেন এতদিন শুনা যচ্ছিল যে ৩০ লাখ টাকায় দেশবন্ধু এ মামলা হাতে নিয়েছেন সে বাজে গুজবটা ফেঁসে গেল—যাঁরা এই উপলক্ষে দেশবন্ধুকে খাটো করে দেবার মতলবে ছিলেন তাঁদের আশা অবশ্য পূরিল না!

ভস্মে ঘি ঢালা ঃ—কর্পোরেশানের খাদ্য পরীক্ষা বিভাগের জন্য টাকা বেশী চাওয়া হয়েছিল তাতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ বলেন—খাদ্য পরীক্ষা যা হয় তা মোটেই সন্তোষজনক নয় আর বেশী টাকা জলে ফেলা কেন? আমরা এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেকবার কর্ত্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি অতে ফল যে বিশেষ কিছু হয় নি তাও জানি—সাধারণের টাকায় কতকগুলি ডাক্তার প্রতিপালন হচ্চে সেটা অবশ্য ভাল কথা; কিন্তু তাঁদের দ্বারা সহরের খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল একবিন্দুও যে কমেচে তা মনে কর্ব্বার কোন কারণ নেই সুতরাং এদের পেছনে আরও বেশী খরচ করা মানে ভস্মে ঘি ঢালা।

বাপ কি বেটা ঃ—বি-এ পরীক্ষার্থী ছাত্র শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজ ইউনিয়নে লাট লিটন সাহেবকে নেতৃত্ব কর্ব্বার জন্য নিমন্ত্রণ করার তীব্র

প্রতিবাদ করে নাকি সংবাদপত্রে চিঠি লিখেছিলেন —ফলে শুনা গেল পরীক্ষায় ফি জমা দেবার পরও তাঁকে 'রাষ্টিকেট' করা হয় অর্থাৎ কলেজের হিসাবে ধোবা নাপিত বন্ধ হয়। কিন্তু অক্ষয়কুমার এতে না দমে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দরখাস্ত করে জানান তাঁর পত্র লেখাটা কলেজ সংক্রান্ত কোন অপরাধ নয়—পড়া শুনায় অমনোযোগিতা নয় কোনরূপ অছাত্রীয় আচরণ নয় সুতরাং কেন তিনি "বঞ্চিত হব চরণে'—বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অবশ্য এখন আর আশুতোষের মত পুরুষশার্দ্দুল নাই কিন্তু তাঁহার পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ ও শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় শ্রীমান অক্ষয় কুমারকে নন্-কলিজিয়েট ছাত্ররূপে পরীক্ষা দেবাব সুবিধা করে দিয়েছেন। স্বর্গগত মহাত্মা আশুতোষের আত্মা এতে যে কি সন্তুষ্ট হবেন তা বুঝা কঠিন নয় কিন্তু দেশের লোকেদেরও এতে আনন্দ করবার অধিকার আছে। আমরাও বলি সাবাস! বাপ কি বেটা!

উজীরদের বেতন নামঞ্জুর ঃ—গত ২৩শে মার্চ্চ বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভাব নব নিযুক্ত উজীর দ্বয়ের বেতন নামঞ্জুর হইয়া গিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব নাকোচ করা মন্ত্রী মিঃ ফজলল হক নূতন মন্ত্রীদেব বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন—স্বরাজ্য দলের শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত অনিলবরণ প্রভৃতি ভোট দিতে পারেন নাই তবুও ছয়টী ভোট তাঁহারা বেশী পাইয়া ছিলেন। বারবার তিনবার বেতন নামঞ্জুর হইল সুতরাং আর মন্ত্রী না খুঁজিয়া এগুলি খাস করিয়া লওয়াই ভাল তাহলে অবশ্য দোয়ার্কি নালায়েক হইয়া পড়িবে কিন্তু উপায় কি?

ভোটের জোরে অর্ডিনান্স—বেঙ্গল অর্ডিনান্সকে জোরাল করিবাব জন্য এসেম্বলীতে মুডিম্যান সাহেব বেঙ্গল ক্রিমিনাল এমেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্ট নামক সংশোধক আইন প্রবর্ত্তনের জন্য পেশ করেন উহাও ভোটে নাকোচ হইয়াছে তবে ইহা ভেটো দ্বারা বলবৎ থাকিবে এটা স্থির নিশ্চয়।

লবণ ও পেট্রল ঃ—মোটরের পেট্রলের উপর শুল্ক যেমন কমিয়াছিল তেমনি লবণ শুল্কও মণকরা চারি আনা কমিল। দুটাই শুনিতেছি বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলিয়া; একটা বড লোকদের, অপরটী গরীবের—সরকার বাহাদুর উভয় পক্ষকেই খুসী করিয়াছেন। আমরা বলি 'নাই মামার চেয়ে কাণা মামা' মন্দ কি?

তৃপ্তিহারা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

যৌবনে ছুটিলাম অর্থের পিছু পিছু,
হতাশায় ফিরি নাই, বাঁধিয়াছি গাঁটে কিছু।
প্রাণ খুলে হাসি নাই, শুনিনিক কভু গান,
পড়ি নাই প্রেমে, করি নাই রূপ সুধা পান।
তবু কেন প্রাণে মোব নাই আজি তৃপ্তি,
কবি বলে, কাঁচা আছে জীবনের ভিত্তি।

ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সার সঙ্কলন

অন্ধ্র দেশের এক ব্রাহ্মণ জাতীয় যুবক আমাকে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্র লিখেছেন :—

(পত্রের সার মর্ম্ম)

"গত সপ্তাহে বঙ্গদেশীয় জনৈক পত্র প্রেরকের পত্রোত্তর দিতে যাইয়া আপনি বলেছেন যে আমরা যখন শূদ্রদের হাতের জল খাই তখন অস্পৃশ্যদের ছোঁয়া জল খেতে আমাদের ইতস্ততঃ করা ঠিক নয়। এখানে আমাদের শব্দটী বোধ হয় আপনি উচ্চ জাতীয় হিন্দুদের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করেছেন। উত্তর ভারতের আচার সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই কিন্তু অন্ধ্রদেশে এবং দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণেরা, অব্রাহ্মণদের (কেবল অস্পৃশ্যদের নয়, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদের পর্য্যন্ত) স্পৃষ্ট জল খান না এমন কি যাঁরা বেশী গোঁড়া তাঁরা স্পর্শদোষটা খুব কঠোর ভাবেই বাঁচিয়ে চলেন।

আপনি অনেকবার বলেছেন যে বর্ত্তমান জাতিভেদ তুলে দেওয়ার জন্য সমস্ত জাতির একত্রে আহার করার প্রথা প্রবর্ত্তনের আপনি স্বপক্ষে নহেন। এমন কি মালব্যজীর কথা তুলে উদাহরণ স্বরূপ আপনি বলেছেন যে তাঁতে ও আপনাতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধান্বিত হলেও তিনি আপনার স্পৃষ্ট জল যদি পান না করেন তথাপি আপনি সেটাকে ঘৃণামূলক বলে ভাবেন না। এ স্থলে এটা যে সত্যই ঘৃণাজনিত নয় তা আমিও মানি কিন্তু আপনি কি জানেন অন্ধ্রদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই তাঁদের ভোজনকালীন অনেক দূরেও অব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেই আহার ত্যাগ করেন—ছোঁয়া ত অনেক দূরের কথা। ব্রাহ্মণ আহারে বসে যদি ঘর থেকে রাজপথবাহী শূদ্রের কণ্ঠস্বর শুনতে পান তাহলেও রেগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে খাওয়া ছেড়ে ওঠেন এবং সমস্ত দিন আর অন্ন স্পর্শ করেন না। এটা কি সত্যই হামবড়ামি নয়? আমি নিজে একজন ব্রাহ্মণ যুবা তাই এ সবের হাড়-হদ্দ আমি জানি—এখন এর কি প্রতীকার কি আপনিই বলুন।"

মহাত্মা বলেন এই স্পর্শ-বিচার কালনাগিনীর মত সহস্র ফণা বিস্তার করে আমাদের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমস্যা কিন্তু বিভিন্ন জাতির একত্র আহার করা, একটা সামাজিক সমস্যা মাত্র। এই অস্পৃশ্যতার আড়ালে এক জাতির প্রতি অপর জাতির ঘৃণা প্রকাশটাই বেশী ফুটে রয়েছে এই অস্পৃশ্য দোষটা গলিত কুষ্ঠের মত আমাদের সামাজিক জীবনটাকে গলিত ক্ষতে ছেয়ে ফেলেছে। এ প্রথা মনুষ্যত্বের দাবীটুকুও অস্বীকার করে—এটার সঙ্গে বিভিন্ন জাতির একত্র আহার করার সঙ্গে কোন তুলনাই হতে পারে না। সমাজ সংস্কারকগণ যেন এ দুটাকে এক ভেবে গোল করে না ফেলেন, যদি তা করে বসেন তবে এই অস্পৃশ্যদেরই বেশী ক্ষতি করা হবে। পত্র প্রেরকের কথা সত্যই ঠিক—সমস্যাটা এমনিই জটিল হয়ে পড়েছে। ব্রাহ্মণ বল্লে আগে আমরা বুঝতাম ক্ষমার অবতার, অহমিকাশূন্য, পরার্থে আত্মোৎসর্গকারী, নির্লোভ জ্ঞানী, জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী একনিষ্ঠ জাতি। কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে আজ ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে ভেদজ্ঞান জন্মেছে। ব্রাহ্মণ তার কর্ম্মদ্বারা যেটুকু উচ্চ অধিকার পেয়েছিলেন

অনেকস্থলে তা হারিয়ে ফেলেছেন; ফলে সেই নষ্ট দাবীর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কর্ত্তে গিয়ে তাঁরা এখন অব্রাহ্মণদের চক্ষুশূল হয়েছেন; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সৌভাগ্য যে আমার এই পত্রপ্রেরকের মত উদারহৃদয় ব্রাহ্মণ আজও আছেন, যাঁরা অস্পৃশ্যদের জন্য বুক দিয়ে পড়েছেন—অস্পৃশ্যদের উন্নত কর্ত্তে আজ ব্রাহ্মণেরাই প্রাণপণ কর্চ্ছেন—এঁরা সত্যই ব্রাহ্মণ নামের গৌরবজনক। ব্রাহ্মণেরাই পুঁথিপত্র ঘেঁটে—অব্রাহ্মণদের দাবী যে শাস্ত্রসঙ্গত তা প্রমাণ কর্ত্তে লেগে গেছেন। অন্ধ্রদেশের বা দক্ষিণ ভারতের যে সব ব্রাহ্মণেরা এখনও অযোগ্য আচরণ কর্চ্ছেন আমি তাঁদের অনুরোধ কচ্ছি যে তাঁরা এখনও অবহিত হউন—এসব ভ্রমাত্মক ধারণা বিসর্জ্জন দিন, ভুলে যান যে অব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর শুনলে তাঁদের খাদ্য কলুষিত হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণেরাই একদিন সবাইকে জগন্ময় ব্রহ্মের অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন—জগৎ যদি ব্রহ্মের আসন, তবে সেই জগৎ থেকে কলুষ কেমন করে আসবে; যদি আসে তা হলে বুঝতে হবে সেটা ভেতর থেকে আসছে। ব্রাহ্মণেরা আবার মুক্তকণ্ঠে বলুন যে, অস্পৃশ্য বর্জ্জনীয় হচ্চে কুচিন্তা, যা মনের গোপন অন্ধকারে লুকানো থাকে। তাঁরাই একদিন প্রচার করেছিলেন "মানুষ নিজেই যেমন তার উদ্ধার কর্ত্তা তেমন সেই তার নিজের ধ্বংশকর্ত্তা।"

অব্রাহ্মণেরা এই পত্রের মর্ম্ম জেনে যেন মর্ম্মাহত না হন। কারণ তাঁদের জানা উচিত পত্রপ্রেরকের মত ব্রাহ্মণেরাই তাঁহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে বসেছে। কয়েকজন বুদ্ধিহীনের আচরণে তাঁরা যেন সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতটাকেই ঘৃণাকর্ত্তে না শেখেন। যাঁরা তাঁদের সঙ্গে অযোগ্য ব্যবহার কর্চ্ছে, নিজেদের ভাল আচরণ দ্বারা তাঁদের যেন অব্রাহ্মণেরা পরিবর্ত্তিত করে ফেলতে পারেন না। আমাকে অন্যে মানছে না বলে নিজেকে অপমানিত বা হীন ভাবার কোন কারণ নেই। কেউ যদি আমি ছুঁলে বা আমার কণ্ঠস্বর শুনলে নিজেকে কলুষিত মনে করে তাতে আমার কোন ক্ষতি নাই, এমন ভাবতে হবে। কিন্তু আমি তাঁর সুবিধার জন্য রাস্তাদিয়ে যাওয়া বন্ধ কর্ব্বো না বা কথা বলাও বন্ধ কর্ব্বো না; তাহা হলেই যথেষ্ট, কিন্তু এ নিয়ে রেগে গিয়ে তাঁহাকে ঘৃণা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। অব্রাহ্মণেরা আজ সংযম হারিয়ে ফেল্লে নিজেরাই ঠক্‌বেন কারণ এতে যে ব্রাহ্মণেরা তাঁদের জন্য লড়ছেন তাদের মূল্যবান সহানুভূতিটুকু খোয়াবেন।

ব্রাহ্মণ কেবল হিন্দুধার্ম্মর নয় সমগ্র জগতের একটী অপূর্ব্ব সুন্দর কুসুম—কোন কারণেই এটাকে ছিঁড়েফেলে আমি নষ্ট কর্ত্তে পারি না। আমি জানি বর্ত্তমান সমস্যা এই জাতিই সমাধান কর্ব্বে—পূর্ব্বযুগেও অনেকবার সমাজের আপদে বিপদে তা করেছে। অব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে যেন একথা আমায় শুনতে না হয় যে তারা এই পুষ্পের সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ অপহরণ কর্ত্তে চায়। ব্রাহ্মণদের ধ্বংসকর্ব্বার জন্য অব্রাহ্মণদের উত্তেজিত করা আমি সমর্থন করি না বরং আমি চাই ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বের মত গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করুন; কারণ ব্রাহ্মণ হওয়া যায় একমাত্র জন্মের অধিকারে, কিন্তু ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম পালন কর্ত্তে পারে যে সে। উহা অনুশীলন ও শিক্ষা সাপেক্ষ!
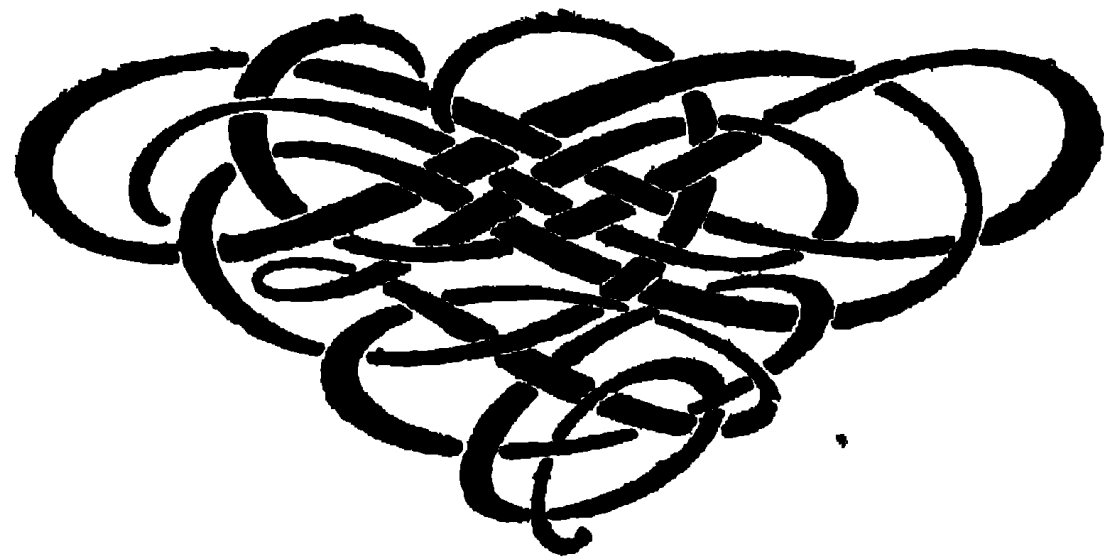
পুস্তক-সমালোচনা

সতীগাথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত মূল্য কুড়ি আনা প্রাপ্তিস্থান মেসার্স এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স ৯০।২, হ্যারিসন রোড কলিকাতা। কয়েকটী হিন্দুসতীর আখ্যায়িকায় ভরা এই সুন্দর সুমুদ্রিত বইখানি বিবাহে উপহার দিবার মত করে সাজান। এগুলি আবার হিন্দী, মারহাট্টি, গুজরাতি ও মাড়বারী সাহিত্যসাগর মন্থন্ করে সংগৃহীত। লেখকের ভাষা বেশ মধুর এবং স্বচ্ছন্দগতি। সতীদের পুণ্যজীবন কথা যে নববিবাহিতা কিশোরীদের নির্ম্মল হৃদয়ে সতীত্বের উচ্চ আদর্শের একটী সুস্পষ্ট রেখাপাত করতে সক্ষম হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আজকালে বিবাহে পুস্তক উপঢৌকন দেওয়া একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেজন্য অনেক রাবিশ উপন্যাসকে ভাল বাঁধাই ও রঙীন ছবি দিয়ে সাজিয়ে সাধারণের সামনে প্রকাশকেরা নিয়ে হাজির থাকেন—এসব অসার বিষকুম্ভ পয়োমুখ গ্রন্থের পরিবর্ত্তে এশ্রেণীর পুস্তকের সমাদর হওয়া উচিত—আর যদি তা না হয় তবে সাধারণের রুচি অনেকটা নীচু হয়ে গেছে বুঝতে হবে। তবে বাঙ্গালীর মেয়েদের জন্য যে বই লেখা তাতে অন্ততঃ বাংলাদেশের একটী সতীর স্থান পাওয়া উচিত ছিল এবং দক্ষিণা ষোল আনা হইলেই বোধ হয় ভাল হইত; অন্ততঃ দেশের অবস্থা হিসাবে।

সংক্রামক ব্যাধি—শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত মূল্য৸৹আনা।
খাদ্য ও স্বাস্থ্য „ মূল্য „
জর „ মূল্য ১৲টাকা।

তিনখানি বইই সুশ্রুত সন্স ১৭৭ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বইগুলি ডাক্তারদের জন্য লেখা নয় সাধারণের জন্য; কিন্তু এতে অনেক এমন কথা আছে—যা ডাক্তারদেরও কাজে লাগে। রোগের হাত থেকে বাঁচবার অনেক সহজ রাস্তা ও রোগাক্রান্ত হলে কি করে চলতে হয় এবং পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে তবে সমস্তই পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা। বিশেষতঃ প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, উপদংশ প্রমেহ প্রভৃতির সম্বন্ধে গ্রন্থকার যা লিখেছেন সেগুলি সকলের জানা উচিত—জানলে রোগের আক্রমণে এত ব্যস্ত হতে হবে না।

খাদ্য নামক বইখানি ও অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ, যদিও গ্রন্থকার যা বলেছেন সবই বিদেশী মতামত। এদেশের লোকের পক্ষে এদেশের খাদ্যাদি কতটা উপযোগী এবং তার কি দোষ—কি পরিবর্ত্তন কর্লে তা এদেশবাসীর কাজে লাগবে এরূপ বিশদ আলোচনা তিনি করেন নি—এরকম কিছু আলোচনা এশ্রেণীর পুস্তকে থাকলে বড়ই ভাল হোত। কারণ অন্য দেশের পণ্ডিতেরা যা বলেছেন সেটা তাঁদের দিক দিয়ে ঠিক কিন্তু আমাদের দেশে যেটা অনেক দিন থেকে চলছে সেটা আমাদের দিক দিয়ে কতটা ঠিক তার আলোচনা হওয়া বিশেষ দরকার। মোটের উপর বইগুলি পড়লে সাধারণেও বেশ বুঝতে পারবেন এবং তদনুসারে কাজ করলে জীবনধারণের পথটা অনেকটা সুগম হতে পার্ব্বে। বইগুলির ছাপা কাগজ ভাল এবং দামও খুব বেশী নয় তবে সাধারণের মধ্যে বহুল প্রচার কামনা কর্ত্তে হলে দাম আরও কম করা উচিত।

লিচ্ছবি জাতি—ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা প্রণীত "হৃষীকেশ সিরিজ"এর ১০নং গ্রন্থ মূল্য ১।০। প্রত্নতত্ত্বে ডাক্তার লাহার সুনাম আছে—তিনি যেমন সুপণ্ডিত তেমনি পরিশ্রমী. হিন্দু, জৈন,বৌদ্ধ পুঁথি ঘাঁটিয়া এই লিচ্ছবি জাতির সমাজের একটী সুস্পষ্ট ছবি সুন্দর ভাষায় আঁকিয়াছেন। বিমল বাবুর ন্যায় ইংরাজীতে সুপণ্ডিত লোকে যে বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক লিখিতেছেন তাহা বিশেষ আনন্দের কথা—তদুপরি তাঁহার ভাষা যেমন মিষ্ট রচনাভঙ্গী তেমনি সহজ সরল ও সুন্দর। শুষ্ক ইতিহাসের কথা এমন মিষ্ট করিয়া না লিখিলে যে বাঙ্গালী পড়িতে চাহিবে না তাহা বুঝিয়াই বিমলবাবু এত পরিশ্রম করিয়াছেন; এক্ষণে বাঙ্গালীর কাছে এই শ্রেণীর পুস্তকের আদর হইলেই তাহা সার্থক হইবে ও আমরা আনন্দিত হইব। বইখানিতে সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত কয়েক পৃষ্ঠা পূর্ব্বরঙ্গ আছে। তাহা পাঠে ইতিহাসের ভিতরও যে মধুর রস আছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা ডাক্তার বিমলাচরণের এই প্রভূত অধ্যবসায় ও গবেষণা কার্য্যে পরিশ্রম স্বীকারের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার চেষ্টা জয়যুক্ত হউক ইহাই আমাদের কামনা।

সান্ধ্য-সহযোগিনী বৈকালীর একটী নিজস্ব নাচঘব আছে তাতে এতদিন ঘোমটার আড়ালে খেমটা নাচই চলিত কিন্তু এখন সেখানে তাণ্ডব চলিতেছে দেখিলাম তাহাতে কিন্তু আমরা বিস্মিত হই নাই। কারণ এঁদের ব্যথা কোথায় তা আমরা জানি এবং সেখানে হাত যে পড়িবে তাও বুঝি। ১৯শে ফাল্গুনের সংখ্যায় এই থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষিত কাগজখানি সমস্ত সংবাদপত্র সম্বন্ধে এমন একটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যাহা প্রত্যেক সংবাদ পত্রের পক্ষেই অপমানজনক। আমরা তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ সখীকে কয়েকটী সত্য কথা শুনাইয়াছিলাম সখী তাহাতে চটিয়া গিয়াছেন এবং অভিমান করিয়া বলিয়াছেন আমরা তাঁহাকে গালি দিয়াছি। আমাদের কথাগুলি গালি নয় তবে অপ্রিয় সত্য—কিন্তু সখী যখন একটী ব্যবসায়ী থিয়েটারের আশ্রয়ের লোভে কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া সমস্ত সংবাদপত্রকেই হীনভাবে বিদ্রূপ করিতে পারেন তখন সংবাদপত্র-শ্রেণীভুক্ত হইয়া এই মিথ্যা চাটুবাদের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না।

সখী ১৯শে ফাল্গুনে লিখিয়াছিলেন "* * তাই আমাদের দেশের ফ্রিপাশ 'প্রাপ্ত লোকেরা এমন কি খবরের কাগজের প্রতিনিধিরাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন মন্দকেও ভাল বলে, বিশ্রীকেও সুশ্রী বলে" যে মুখে এইকথা বাহির হইয়াছে সেই মুখেই আবার আমাদের লেখার প্রতিবাদ করিতে বসিয়া ৪ঠা চৈত্র সহযোগিনী বলিয়াছেন" "ফ্রিপাশ ছাড়িলেই সকল সংবাদ পত্রের মুখবন্ধ হয় না—হয় যে তাহাকে বলিয়াছে?" সখী! তোমরাই বলিয়াছ—কিন্তু যাহা বলিয়াছ তাহার অর্থ বোধ হয় বোধগম্য হয় নাই, মস্তিষ্ক ভগবান না দিলে কে দিতে পারে? থিয়েটারের কর্ত্তারা চাকরী দিতে পারেন কিন্তু কুপোষ্যদের কাণ্ডজ্ঞান দিতে পারেন কি?

১৯শে ফাল্গুন তারিখে সখী আরও লিখিয়াছিলেন—

"তবুও থিয়েটারের কর্ত্তারা যদি ফ্রিপাশ বন্ধ করেন, তাহলেও তাঁদের কোন ক্ষতি হয় না। কারণ কাগজ-ওলাদের তো তাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়ে বেঁধে রাখেন—ভাল না বল্লে তো বিজ্ঞাপন কেড়ে নিয়ে সাজা দিতে পারেন। শুধু শুধু আর ফ্রিপাশ দেওয়া কেন" এর পর আবার ৪ঠা চৈত্র লিখেছেন "আমাদের ওই কথা হতে এটা বোঝা যায় না যে, আমরা স্বাধীন কাগজের বা স্বাধীন-লেখকের অস্তিত্ব অস্বীকার করি না।"

১৯শে ফাল্গুনের ঐ লাইন কটার মধ্যে 'কাগজওয়ালা-দের' কথাটীর অর্থে আমরা বুঝেছি সব কাগজওয়ালা সুতরাং ৪ঠা চৈত্র তারিখের ন্যাকামীর মানে কি? কথা বলার সময় একটু বুঝে বলা উচিত, সেইজন্যই আমরা বলেছিলাম যে সব সংবাদপত্র একশ্রেণীর নয়, এবং সেটা আজ আরও জোর দিয়ে বলছি। প্রতিবাদ কর্ত্তে হয় যুক্তি দিয়ে, ন্যাকা সেজে প্রতিবাদ করা যায় না। যে শ্রেণীর কাগজেরা থিয়েটারের অনুগ্রহলাভের জন্য লালায়িত তাদের উদ্দেশেই আমরা দুখানি কার্টুন ছেপেছিলাম তার পর বৈকালীও যখন তা ছাপলেন আমরা বিস্মিত হয়ে ভাবলুম সখীর অবশ্য প্রথম অবস্থা অর্থাৎ বিজ্ঞাপন না পাইবার অবস্থা ঘটে নাই, কারণ তিনি আজন্ম থিয়েটারের অনুগ্রহভোগিনী তবে শেষ অবস্থাটা যে তাঁর পক্ষেও প্রয়োজ্য—তা তিনি কি করে বিস্মৃত হলেন?

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করে, এমন লোকও আছে, এঁদেরও কি সেই দশা নাকি ?

* * * *

কোন কাগজ কি উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়—তা প্রমাণ করে তার লিখনভঙ্গী। নবযুগ কি উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে তার প্রমাণ দিচ্ছে তাহাতে প্রকাশিত সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকগণের রচনাবলী—সে কোন দিন কোন তেলের জন্য ঢাক পিটে নাই—সখী যেমন তার পালক থিয়েটারের জন্য পিটে বেড়ান। সুতরাং নবযুগ তেলের বিজ্ঞাপন প্রচার কর্ত্তে বেরিয়েছে—এমন হীন মিথ্যা যারা বল্‌তে সাহস করে তারা—যাদের মস্তিষ্ক বিকৃত। থিয়েটারের অত্যধিক আদর পেয়ে সখীর শেষটা মাথাটা পর্য্যন্ত বিগড়ে গেল দেখছি।

* * * *

তারপর সংবাদপত্র ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে সখীর যা উচ্চ ধারণা তা নীচের কছত্র পড়লেই বোঝা যায়—"শুধু থিয়েটারের বিজ্ঞাপন লইয়াই কথা নহে যে কাগজে যে জিনিসের বিজ্ঞাপন বাহির হয় সেই কাগজে সেই জিনিসের নিন্দাসূচক কোন লেখা সংবাদপত্র ব্যবসায়ী প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন" সংবাদপত্র সেবার সম্বন্ধে যাহাদের এই ধারণা তাহারা কত বড় সাহিত্যসেবী সেটা বুঝা বিশেষ কঠিন নয়—এদের চৈতন্য দেওয়া, শাস্ত্রকারেরা মূর্খদের জন্য যে বিশিষ্ট ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রয়োগ আবশ্যক।

তার পর আর একটী কথা সখী বলিয়াছেন—

"সমালোচনা যদি প্রতিকূল হয় তা হলে কোন থিয়েটারের কর্ত্তাই সে সমালোচনাকে সত্যি সমালোচনা বলে স্বীকার করেন না, সমালোচকদের বিদ্যার বুদ্ধির রসবোধের নিন্দা তো করেনই এমন কি চৌদ্দপুরুষ অবধি উদ্ধার কর্ত্তে ছাড়েন না" তাই নাকি ? থিয়েটারের মত একটা সাধারণ প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃত্বের গুরুভার যাঁদের স্কন্ধে, তাঁদের মন যে এত নীচু—ছোট তা আমরা তো ভাবতেই পারি না—সখীর অবশ্য থিয়েটার বিশেষের কর্ত্তাদের সঙ্গে বেশী মাখামাখি সুতরাং অন্ততঃ একটা থিয়েটারের কর্ত্তাদের মনোভাব সম্বন্ধে তাঁকে 'অথরিটী' বলে ভাবলে বোধ হয় দোষ হবে না কিন্তু অন্য থিয়েটারগুলির সম্বন্ধে তাঁর কথা কি করে খাটে ?

* * * *

রাগে মানুষের জ্ঞান থাকে না অনেক সময় রাগের মুখে 'হাঁ'ও 'না' হয়ে যায় তাই ৪ঠা চৈত্রের সংখ্যায় সখী লিখেছেন "বিজ্ঞাপন দিয়া বা ফ্রিপাশ দিয়া সবার মুখ যে বন্ধ করা যায় তা আমরা বলিয়াছিলাম।" এটা বোধ হয় 'যায় না' হবে. কিন্তু সখীর যে সব লেখা আমরা তুলেছি তাতে বোঝায় যে বিজ্ঞাপন দিয়া বা ফ্রিপাশ দিয়া সবার মুখ বন্ধ করা যায়—কিন্তু এর চেয়ে বড় ভুল ইনি আর কখনও করেন নি। ভুল বকাটা একটা রোগ এবং তা সাংঘাতিক—এই বেলা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

* * * *

নবযুগ যা লিখেছে সেটা সমস্ত আত্মসম্মানজ্ঞানবিশিষ্ট সংবাদপত্রের তরফ হতে, সেটা তার নিজের জন্য নয়—সে যে সতী (সখীর কথাতেই বলিলাম) তা সারা বাংলার লোকে জানে, এবং এই কারণেই সে দেশবাসীর এত অনুগ্রহ পাইয়াছে যাহা চাটুকারদের ভাগ্যে কখনও হইবে না। একজনের মুখ চাহিলে একজন খুসী হইতে পারে সত্যের পানে যে চেয়ে থাকে সবাই তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়—এ জ্ঞান যদি আজও না হয়ে থাকে তবে কবে হবে ?

Printed & Published by Sachindra Nath Banerji at the HIMANI PRESS.
83, Durga Charan Mitter Street, Calcutta.

বাঁশরী শ্রবণে

বিলাতী চিত্র হইতে ।

সাপ্তাহিক বসুমতী সাপ্তাহিক
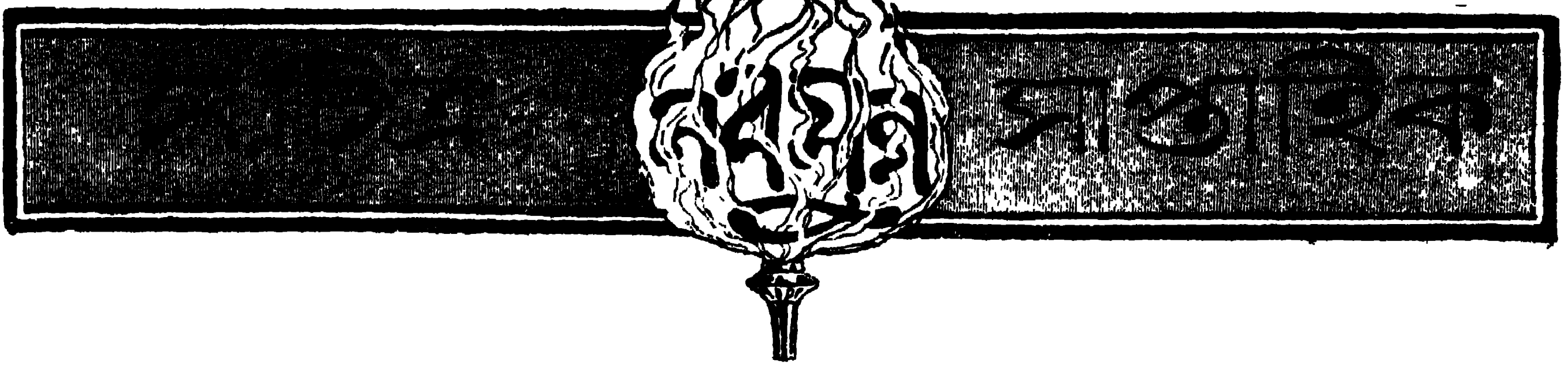
প্রথমবর্ষ] ২১শে চৈত্র শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ৪ঠা এপ্রেল [৩৪শ সংখ্যা

সমজ্‌দার

শিল্পী—(বন্ধুর প্রতি) আরে ভাই খোকাটা বড় জ্বালিয়েছে—যা এঁকে রাখব বেটা এসে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

বন্ধু—তা হবেই তো—ওই হচ্ছে তোমার আর্টের প্রকৃত সমজ্‌দার।

সাহিত্যে সমালোচনার স্থান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম-এ

প্রবন্ধের সূচনায় সাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে যেন বোধ হয় কাব্য, নাটক ও উপন্যাসকেই সাহিত্য নামে অভিহিত করা যায়। বস্তুতঃ কিন্তু সাহিত্য বলিতে গেলে আজকাল আমরা কাব্য, নাটক, উপন্যাসই শুধু বুঝি না। উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক প্রবন্ধ (যেমন Mill, Spencer, Huxley, Darwin, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু ও ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ সকল), উৎকৃষ্ট ইতিহাস (যাহাতে শুধু কতকগুলি facts নাই, যাহা আমাদের চিন্তাশক্তি বিকাশের সহায়তা করে, যাহাতে factsএর সঙ্গে সঙ্গে ideas ও reflections আছে, যেমন Freeman, Froude, Macaulay, Gibbon প্রভৃতির গ্রন্থাবলী), উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ, যাহা কোনও সম্প্রদায় বিশেষের জন্য রচিত হইলেও মানব ধর্ম্মকে অতিক্রম করে না (যথা Newman-এর *Apologia* বা Seelyর *Ecce Homo*), অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি বা সমাজনীতি বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রভৃতিও (যথা Hobbe's *Leviathan*, Adam Smith's *Wealth of Nations*, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক ও পারিবারিক প্রবন্ধ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আধুনিক অর্থনীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি) সাহিত্য মধ্যে স্থান পাইবে, যদি সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য—সৌন্দর্য্য ও আদর্শের সৃষ্টি ও প্রচার—তাহাদের দ্বারা সাধিত হয়।

সাহিত্য ও কাব্যের এককথায় সংজ্ঞা দেওয়া যাওয়া যায় না। Emerson যখন সাহিত্যকে "a record of the best thoughts" বলেন অথবা প্রসিদ্ধ ফরাসী সমালোচক Sainte Beuve যখন classic বলিতে "an author who has really added to its treausure, who has discovered some unequivocal truths, ...who has spoken to all in a style of his own, yet a style which finds itself the style of everybody, a style that is at once new and antique, and the contemporary of all the ages" বুঝেন অথবা John Morley যখন বলেন "Literature consists of all books......where moral truth and humen passion are to be touched with a certain largeness, sanity, and attraction of form*—আমরা তাঁহাদের প্রতিবাদও করিতে পারি না, অথচ বেশ বুঝি সাহিত্যের প্রকৃত সংজ্ঞাটী কি তাহা কেহই দেন নাই। Lord Morley সত্যই বলিয়াছেন Definitions always appear to me in these things to be in the nature of vanity. I feel that the attempt to be compact in the definition of Literature ends in something rather meagre, partial, starved and unsatisfactory."† যেমন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে আত্মার অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা বুঝান যায় না (কারণ তাহা সাধনা সাপেক্ষ), অথবা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কিরূপ বোধ হইবে তাহা যেমন গুরু শিষ্যকে সম্যক বুঝাইতে পারেন না, স্থূল কথায় মিষ্টের মিষ্টত্ব যেমন আস্বাদন করিতে না দিলে কিছুতেই বুঝান যায় না, সেইরূপ সাহিত্যের ও কাব্যের প্রকৃত স্বরূপ কথায় বুঝান যায় না, তাহার জ্ঞান কতটকা আস্বাদন সাপেক্ষ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই কাব্যের সংজ্ঞানির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। Aristotleএর আমল হইতে এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কত সংজ্ঞাই আমরা পাইয়াছি কিন্তু

---

* Stndies in Literature (Macmillan and Co. 1914) Page 218 দ্রষ্টব্য।

† Ibid page 216.

কোনটাই ঠিক্ আমাদের মনঃপুত হয় না। Leigh Hunt (*what is poetry* দ্রষ্টব্য), "Poetryকে passion বলেন। Shele *Defence of poetry* দ্রষ্টব্য), Poetryকে "the exporession of the imagination" বলেন। সৌন্দর্য্যের উপাসক কবি Keats বলেন "A drainless shower of light is poesy...it should be a friend to soothe the cares and lift the thoughts of men." আবার Matthew Arnold বলেন "Poetry is a criticism of life by the laws of poetic rruth and beauty". "সাহিত্য দর্পণে" রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলা হইয়াছে। Arishotle কাব্যকে Imitation of life বলিয়াছেন। আবার কেহ বা Poeteryকে Power বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত জগতের অনেক শ্রেষ্ঠ কবিও সমালোচক কবিতার স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কাব্য ও সাহিত্যের এ সব সংজ্ঞা ও স্বরূপ বর্ণনা পাঠকালে "অন্ধ-হস্তিদর্শন ন্যায়ের" কথা মনে হয়। সব সংজ্ঞাগুলিই আংশিকভাবে সত্য। প্রকৃত সংজ্ঞাটী যে কি তাহা বুঝান যায় না, তাহা নিজে বুঝিবার জিনিষ, তাহা বুঝাইতে গিয়া মিথ্যা সময় ও শক্তির অপচয় করা উচিত নহে। কাব্য ও সাহিত্যের ন্যায় ভাষা এবং রচনা প্রণালী (*style*) সম্বন্ধে ও মতভেদ সর্ব্বত্র লক্ষিত হইবে। Wordsworth, Matthew Arnold. Walter Pater, রবীন্দ্রনাথ সকলেই style সম্বন্ধে নিজ নিজ বক্তব্য বলিয়াছেন। সত্যই style is the man কিনা, styleএর Problem সত্য সত্যই One word for the one thing, the one thought amid the multitude of words, terms, that might just do" কি না (Walter Pater প্রণীত *Appreciation* দ্রষ্টব্য), Attic, Corinthian এবং Asiatic এই তিন শ্রেণীতে style কে সত্যই বিভাগ করা যায় কি না (M. Arnold's *Essays in Criticism* First series দ্রষ্টব্য), The language really used by men সত্য সত্যই কাব্যের ভাষা হইতে পারে কিনা (Wordsworth's "*Preface to the Lyrical Ballads* দ্রষ্টব্য)—কথিত ভাষা ও লিখিত ভাষা একরূপ হওয়া উচিত কিনা,—এ সকল কূট প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবর অযথা বর্দ্ধন করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ অল্প কথায় ইহার মীমাংসা হইতেই পারে না। "নসৌ মুনির্যস্য মতম্ ন ভিন্নম্।" এই সব প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া "Armies whole have sunk." আমাদের বিশ্বাস সত্যকার একটী সুন্দর গল্প (যেমন রবীন্দ্রের 'কাবুলীওয়ালা' নরেশচন্দ্রের 'একা' বা শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুরছেলে') বা একখানি সুন্দর কাব্য-গ্রন্থ (যেমন "বলাকা" বা "এষা") সুন্দর একটী নাটক (যেমন 'বলিদান' বা 'সাজাহান') কি একখানি সুন্দর উপন্যাস (যেমন 'কপালকুণ্ডলা' বা 'নৌকাডুবি') একজন সাধারণ পাঠকের হাতে পড়িলেও, তার সৌন্দর্য্য ও শিল্পকলা আপনি প্রকাশ পাইবে। তাহার জন্য বিজ্ঞাপন বাহির করিবার প্রয়োজন হয় না। Burke Carlyle, Macaulay, Ruskin, কিম্বা বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য রচনা পাঠ করিলেই তাহার অনন্যকরণীয় সৌন্দর্য্য আপনি ধরা পড়িবে; Huxley, Spencer, Darwin, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ও জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি পড়িলেই বুঝা যাইবে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য বলিয়া একটা জিনিস আছে কি না। Chaucer, Shakespeare, Addison, Dickens, বঙ্কিম, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রের রচনাবলীতে Humour কাহাকে বলে তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হইবে, এবং Pathosএর সহিত তাহার সামঞ্জস্য কেমন করিয়া বিধান করা যায় তাহাও বুঝা যাইবে। Saintsbury'র ভাষায়* বলিতে গেলে বলিতে হয়,It is these books and not the theories about them or the gossip about their authors. যাহার যাহার দিকে আমাদিগের মনোনিবেশ করিতে হইবে। কোন গ্রন্থকার বিশেষকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে হইলে, তাঁহার দুই চারিখানি গ্রন্থ পড়িতে হয়। নচেৎ শত সহস্র সমালোচনা পড়িলেও তাঁহাদের সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হয় না। সমালোচকের কার্য্য অনেকটা "To make access to them a little easier, comprehension of them in the

* A short history of English Literature (Macmillan & Co. 1913 Page 797.)

initial stages a little less arduous" যদিও "To do justice to such a theme is impossible."*

সমালোচকের কর্ত্তব্য, তাঁহার মূলমন্ত্র, তাঁহার জপমালা সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি। সাহিত্যের সহিত সমালোচনার সম্বন্ধ ও কতকটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি এবং নিরপেক্ষ নির্ভীকতা যে সমালোচকের হৃদয়ে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিবে ইহা বার বার উল্লেখ করিয়াছি। বঙ্গভাষার প্রকৃত সমালোচনার ইতিহাস বোধহয় "বঙ্গদর্শনের" সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক 'উত্তর চরিতের' সমালোচনাই বোধ হয় বঙ্গভাষায় প্রথম বিস্তারিত সমালোচনা। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত "বৃত্রসংহার" কাব্যের সমালেচনা ও 'বান্ধবে' প্রকাশিত 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের সমালোচনা † বঙ্গভাষায় বিস্তারিত সমালোচনার দেখাইল। বঙ্কিমচন্দ্র যে পথ "বঙ্গদর্শনে" দেখাইলেন অক্ষয় চন্দ্র সরকার, চন্দ্রমোহন বসু ও কালিপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি প্রতিভাবান্ লেখকগণ তাহার ধারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহের সহিত চালাইতে লাগিলেন। ইহার পরবর্ত্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। একাধারে প্রথমশ্রেণীর কবি ও সমালোচক —এ সৌভাগ্য বোধ হয় Mattnew Arnoldএর ভাগ্যেও ঘটে নাই। Wordsworth, Coleridge, Shelly ও বোধ হয় সমালোচনায় এত কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, যাহা বাঙ্গালার রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন। Biography এর সহিত Literary appreciation, কবিকে বুঝিবার পূর্ব্বে তাঁহার যুগকে বুঝিবার চেষ্টা (Goetheএর মতে যাহা অত্যাবশ্যক) আমাদের বাঙ্গালায় পূর্ব্বে ছিল না। কিন্তু কবিবর নবীনচন্দ্র প্রণীত 'আমার জীবন' যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেলমধুসূদনের জীবনী' নগেন্দ্রসোমের 'মধুস্মৃতি', মন্মথনাথ ঘোষের 'হেমচন্দ্র', অক্ষয় দত্তগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র' নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের 'কান্তকবি রজনীকান্ত' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি আমাদের সে অভাব অনেকটা দূর করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুস্তক ভাল না করিয়া পড়িয়াই (বা সমালোচনা করিতে হইবে সেইজন্ত) সমালোচনায় বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। মাসিক পত্রিকাদিতে যে সব ঝুড়ি ঝুড়ি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বাহির হয় তাহার অধিকাংশ অনেকটা মুরুব্বিয়ানা সমালোচনা বা Title page অথবা perface পড়িয়া সমালোচনা বলিয়া বোধ হয়। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বড়ই দুরূহ কার্য্য। যাহা বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্নও সব সময়ে যোগ্যতার সহিত করিতে পারেন নাই তাহা সর্ব্বত্র আশা করা অসম্ভব এবং এজন্ত পত্রিকা সম্পাদককে দোষী করা যায় না। সমালোচনা কত প্রকারের হইতে পারে তাহার নমুনা দেখাইবার জন্য ও সমালোচনার স্বরূপ বুঝাইবার জন্য ১২৮১ সালের আশ্বিন ও কার্ত্তিকের 'বান্ধবে' একটী প্রবন্ধ বাহির হয়। প্রবন্ধের উপর বান্ধব-সম্পাদক স্বাক্ষরিত একটি মন্তব্য আছে। এই প্রবন্ধ ও তদুপরি সম্পাদকীয় মন্তব্যের সহিত আমরা সব যায়গায় একমত হইতে পারি না। তথাপি প্রবন্ধ লেখকের Classificaton of Criticism এখানে উল্লেখ কবিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। প্রবন্ধ-লেখক, যেন বান্ধব-সম্পাদকের অবগতির জন্য, ছয় প্রকার সমালোচনার উল্লেথ করিয়াছেন (১ম) মার্কিন সমালোচনা—যাহাকে কাটাছেঁড়া বলা চলে—"গ্রন্থের আগাগোড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লেখকের মর্ম্মস্থলে আঘাত" করাই ইহার উদ্দেশ্য (২য়) আইরিশ সমালোচনা—ইহাকে সামান্যতঃ "ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি" বলা চলে। সমালোচক গ্রন্থকারের ভাব ও ভাষা না বুঝিয়াই গালাগালি দেন (৩য়) "কাকতালীয় সমালোচনা" এইরূপ সমালোচনায় গ্রন্থের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ নাই (যেমন মেকলের সমালোচনা) (৪র্থ)—গ্রন্থাবরণস্পর্শী—"গ্রন্থের টাইটেল্ বা বড় জোর বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিয়াই সমালোচনা করা হয়" (৫ম) মাক্ষিকী সমালোচনা—"দোষের স্থান খুঁজিয়া খুঁজিয়া দোষ প্রদর্শন" করাই ইহার উদ্দেশ্য—(৬ষ্ঠ) মুরুব্বীগিরি—"মৃদুভাবে গ্রন্থকারকে ভর্ৎসনা বা উপদেশ" দান করাই ইহার উদ্দেশ্য। উপরি উক্ত ছয় প্রকার সমালোচনার মধ্যে কোনটীকেই প্রকৃত সমালোচনা বলা চলে না। কিন্তু দুঃখের এই ছয়প্রকার সমালোচনাই (বিশেষতঃ শেষের তিন প্রকার) ঘুরিয়া ফিরিয়া অধিকাংশ মাসিক পত্রিকার পত্র

* Scintsbury প্রণীত A Short Hist6ry of English literature page 797.

† বান্ধব (১২৮১) আশ্বিন কার্ত্তিক ও সংখ্যা, দ্রষ্টব্য।

বৃদ্ধি করিতেছে। সাহিত্যিক ও সমালোচকের সম্বন্ধ পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধ লেখকের মত অনেকটা শিক্ষক-ছাত্র অথবা বিচারক-কেরাণীর মত। বান্ধব-সম্পাদক ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,"গ্রন্থকাররা গ্রাম-ব্যাপারী আর সমালোচকবৃন্দ আড়তদার। গ্রন্থকারেরা সাহিত্যের হাটে মাল পৌছান, সমালোচকরা দেখিয়া শুনিয়া পরীক্ষা করিয়া মাল চালান করেন। গ্রন্থকাররা তাহা আবার আনিবার সময় আপনা হইতেই বিশেষ সাবধান হইয়া থাবেন। অথবা গ্রন্থকাররা কুলীন,সমালোচকেরা তাঁহাদের কুলাচার্য্য। কে কুলীন, কে অকুলীন, কাহার কুল গেল কাহার কুল বাড়িল, তাঁহারা তাহা লিপিবদ্ধ করেন।" কথাটী সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিকভাবে যে সত্য তাহার আর সন্দেহ নাই। ব্যাপারীরা যাহাতে সাবধানতা সহকারে ভবিষ্যতে মাল আনেন সেদিকে আড়তদারগণের লক্ষ্য রাখা উচিত ইহা সত্য বটে ; কিন্তু আজকাল সর্ব্বত্র ও সর্ব্ববিষয় যেরূপ ভেজাল জিনিষের প্রচলন হইয়াছে এবং আড়তদারগণ যেরূপ চোককাণ বুজিয়া তাহা চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ আড়তদারদের হাতে ভেজাল দ্রব্যের নিবারণ আশা করিতে পারি না। আবার ব্যাপারীর সঙ্গে সঙ্গে আড়তদারের সংখ্যাও বড় বেশী হইয়া পড়িয়াছে। কুলাচার্য্যগণের দিনও আজকাল চলিয়া গিয়াছে। বিবাহাদি ব্যাপারে এখনও জাতিগত কৌলীন্য প্রথার প্রভাব প্রচলিত থাকিলেও সত্যকার কুলাচার্য্যের সংখ্যা বড় কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু সাহিত্য-সমাজে এরূপ কুলাচার্য্যের আবশ্যক বড়ই অধিক হইয়া পড়িয়াছে। সেই race of critics, যাঁহারা সত্যকার classicsগুলি বাছিয়া দিবেন, তাহাদের সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ভাবের বিশ্লেষণ করিবেন, তাঁহারা এখন কোথায়? আজকালকার দিনে সাহিত্যের "জড়" মারিতে বোধ হয় বঙ্কিম থাকিলেও পারিতেন না। সম্মার্জ্জনী লইয়া সাহিত্যের আসন পরিষ্কৃত করাও আজকাল সম্ভব নহে। তবে সত্যকার কবির গলায় পুষ্পমাল্য দিয়া তাহাকে সম্মানিত করিতে*, ঝুটামাল হইতে সাচ্চা মাল বাছিতে, বঙ্কিম, অক্ষয়, কালীপ্রসন্নের ন্যায় নিরপেক্ষ সমালোচকের একান্ত প্রয়োজন সন্দেহ নাই।

* শ্রীযুক্তহারাণ রক্ষিতের বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম দ্রষ্টব্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি একখানি সুন্দর কাব্যগ্রন্থ বা একখানি সুন্দর নাটক একখানি সুন্দর সমালোচনা গ্রন্থ অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। একথা নিশ্চয়ই সত্য যে সৎসাহিত্যের স্থান সমালোচনার অনেক উর্দ্ধে। তাই আজকালকার ইংরাজী সাহিত্যের এক প্রধান লেখক (Bernard Shaw) যখন বলেন—Good journalism is much rarer and more important than good literature—তখন আমরা তাঁহার সহিত ঠিক একমত হইতে পারি না। Bernard Shaw বোধ হয় ইংরাজীতে তাঁহার মতে প্রকৃত সমালোচনার অভাব দেখিয়াই এরূপ কথা বলিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যে কাব্যের যত উন্নতি হইয়াছে, সমালোচনার তত হয় নাই বলিয়া (Matthew Arnoldও ঐ মত পোষণ করেন) হয় তো Bernard Shaw এরূপ একটা একটা কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে সমালোচনা শুধু বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টি রাখে, কিন্তু একজন প্রথম শ্রেণীর কবির দৃষ্টি বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বমানবতার দিকে। Dr. Compton Rickett † Literature এবং Journalism-এর প্রভেদ দেখাইবার সময় একটি সুন্দর উপমা দিয়াছেন "Great literature is however great only so far is it a living organic thing, intimately related to life and related in two ways—its tap root lies in the soil from which it drains its sustenance, the soil of particular age, with its limitations and characteristics, but its flower is blown upon by the breezes of heaven and fed by rain and the sun. In this respect it is related to the universal and is an expression not of an age but of all ages." এক কথায় সৎসাহিত্য একটী পুষ্প স্বরূপ। উহার মূল কোনও দেশ বিশেষের মৃত্তিকায় নিবদ্ধ, কিন্তু বিশ্বের মুক্ত আলোক, বাতাস, বিশ্বের চন্দ্রসূর্য্য ইহার জীবনীশক্তির সহায়তা করে। সুষমা ও সুবাসের জন্য পুষ্পটী সর্ব্বত্রই আদরণীয় হয়। এতো গেল প্রথম শ্রেণীর

† A short History of English Literature (1920) p. 664.

সৎসাহিত্যের কথা। Journalismএর উপকারিতা তবে কিরূপ? না—"The great value of journalism lies in its close correspondence with actual life and thus it should lead to preserve litarature from becoming conventional and unreal" অর্থাৎ সাহিত্য যাহাতে কৃত্রিম এবং অমূলক না হয় ইহা দেখানই সমালোচনার প্রধান কার্য্য। Matthew Arnold এই কথাটী অন্যপ্রকারে বলিয়াছেন। তিনি বলেন সমালোচনার "business is to know the best that is known and thougt in the world and to create a current of true and fresh ideas" অর্থাৎ কোনও যুগবিশেষের বিশ্ব সাহিত্যে যাহা কিছু সুন্দর, আদর্শ ও মঙ্গলময় তাহা জানা এবং প্রচার করা, যাহাতে কবি ও সাহিত্যিকগণ সেই সব ভাব নিচয়ে অনুপ্রাণিত হইয়া পুনরায় নূতন সৎসাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারেন। সমালোচকের ইহাই যদি কার্য্য হয় তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য মহৎ সন্দেহ নাই, কিন্তু এ কার্য্য সাধন করিতে গেলে, সমালোচকের যেরূপ জ্ঞান ও সবদর্শিতার আবশ্যক তাহা সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। তাই বলিয়া সমালোচনাকে উপেক্ষাও করা যায় না। কবির সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ, লেখকের দোষ গুণ প্রদর্শন, সাহিত্যপাঠে পাঠককে কথঞ্চিৎ সাহায্য দান, সৎসাহিত্যের সৃষ্টির ও পুষ্টির পথ কিঞ্চিৎ সরল করণ—এগুলি অল্প বিস্তর সমালোচকেরই কার্য্য। সৎসাহিত্য সৃষ্টি করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না ও সব সময়ে সম্ভবও হয় না, কিন্তু সমালোচনা করা সব সময়ে সম্ভব। এ বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে অনেক কথা বলা হইয়াছে। প্রবন্ধের ভিতর পুনরুক্তি-দোষ অনেক দৃষ্ট হইবে কিন্তু, যদিও "Brevity is the soul of wit," তথাপি "Repetition being better than obscurity, আমরা পুনরায় বলি যে, সাহিত্যের যদি কেহ সত্য সত্য পূজা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সমালোচনা কার্য্যে তাঁহারা যেন অবহেলা না করেন। কারণ, সাহিত্যের প্রতি যথার্থ ভক্তি দেখান হয় তখনই, যখন তাহার আমরা নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়া তাহাকে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করি।

পথিক

শ্রীঅনামিকা দেবী

আমি পথিক!
পথ আমারে চলবে নিয়ে
যেথা বহু লোকের মেলা।
আমি যাত্রী।
সঙ্গে আমার আছে বোঝা
আজও সকাল সন্ধ্যে বেলা।
ভিড়ের মাঝে হারাই যদি
হারাই যদি বলে;—
সেত' আমিই হারাব।

আমায় নিয়ে ওদের যে কাজ
সে কাজ সাঙ্গ হলে—
জীবন প্রদীপটারেই নিবাব।
আমি পান্থ!
নিদ্রাশেষে তরুতলে
ওরা যখন আঁখি খোলে
আমি তখন বহু ঘুরে দেহ ও মন শ্রান্ত।
বহু লোকের মাঝে আমি
সদাই তলায় ক্লান্ত।

নবশিক্ষা পদ্ধতি

(নক্সা)

শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

কার্ত্তিকবাবু ছিলেন লক্ষ্মীপুরের গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অষ্টম শিক্ষক। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লইতে হইত বলিয়া লক্ষ্মীপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিও শিক্ষাবিভাগের ইচ্ছামত মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিতে হইত। তাহাতে আর কাহারও অসুবিধা হউক আর না হউক বৃদ্ধ অষ্টম শিক্ষক কার্ত্তিকবাবুর বিশেষ অসুবিধা হইত। অনেক কষ্টে কিণ্ডারগার্টেন আয়ত্ত করিয়া ছোট ছোট ছেলেদের নিকট অপরিসীম বিদ্যাপ্রকাশে নিজের পদগৌরব একটু স্থায়ী করিয়া লইতেছিলেন এমন সময় প্রধান শিক্ষকের আদেশ হইল যে শিক্ষাবিভাগের হুকুমমত নিম্নশ্রেণীসমূহে direct methodএ শিক্ষা দিতে হইবে। কার্ত্তিকবাবু আদেশ পাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। চিরজীবন যদি নিজেকেই ছাত্রাবস্থায় থাকিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার আর শিক্ষক হইয়া লাভ কি! কিন্তু উপায় নাই, শিক্ষকতা ছাড়িয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে সংসার চলে না। কাজেই প্রধান শিক্ষকের বাটী গিয়া সন্ধ্যার পর dircet method শিখিতে লাগিলেন—Nounকে বলিতে হইবে Nameword, Adjectiveকে বলিতে হইবে Quality word, Prepositionকে বলিতে হইবে Place word. Adverb কে বলিতে হইবে How when-where word ইত্যাদি। বিংশ শতাব্দীর ইচড়েপক্ক ছেলেরাও এই সব আজগুবি নাম শুনিয়া মনে মনে হাসিত ও নানারূপ প্রশ্ন করিয়া কার্ত্তিকবাবুকে ঠকাইতে চেষ্টা করিত। কার্ত্তিকবাবুও ঠিক হউক আর ভুল হউক direct methodএ তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতেন।

ক্লাসের মধ্যে মতি ছিল সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্র, তাহার পিতা আবার ছিলেন অবসর-প্রাপ্ত সব্‌জজ। মতি বাড়ীতে পিতার নিকট শিখিয়া আসিয়া বিদ্যালয়ে কর্ত্তিকবাবুকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া উত্যক্ত করিত ও তাঁহার ভুল উত্তর শুনিয়া হাসিয়া বড় গোল বাঁধাইত। ইহাতে কার্ত্তিকবাবু চটিয়া আগুন হইয়া উঠিতেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেন না; কারণ মতির বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষকের নিকট নালিশ করিলে তিনিও মতির পক্ষ লইয়া কার্ত্তিকবাবুকে শীঘ্র শীঘ্র ভালরূপে শিখিয়া লইবার উপদেশ দিতেন।

সেদিন শনিবারে ক্লাসে পুরাতন পাঠ ছিল। কার্ত্তিক বাবু ছেলেদের পাঠাভ্যাস করিবার আদেশ দিয়া চেয়ারে বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন ও ছেলেরা পুস্তক বন্ধ রাখিয়া direct mothedএ হট্টগোল করিতেছিল। কেবল মতি মধ্যে মধ্যে কার্ত্তিকবাবুকে প্রশ্ন করিয়া শান্তিভঙ্গ করিতেছিল ও তাঁহার উত্তর দানে অক্ষমতায় হাসিয়া অসন্তোষ বর্দ্ধন করিতেছিল। এইরূপ একসময়ে মতি প্রশ্ন করিল—"স্যার অলৌকিক ব্যাপার কাহাকে বলে?" কার্ত্তিকবাবু কোন কিছু না বলিয়া মতির গণ্ডদেশে একটী প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিলেন। মতি যন্ত্রণায় ক্রন্দন করিয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ছাত্রেরা ভয়ে ভয়ে স্ব স্ব স্থানাধিকার করিয়া "শান্ত ছেলে হইয়া পড়িল"; মতির ক্রন্দনে দৃক্‌পাত না করিয়া কার্ত্তিক বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি রে, লেগেছে খুব?'

কাঁদিতে কাঁদিতে মতি বলিল—"জ্বলে যাচ্ছে স্যার, আবার জিজ্ঞাসা করছেন লেগেছে কিনা!"

গম্ভীরভাবে কার্ত্তিক বাবু বলিলেন—"জ্বলে যখন যাচ্ছে—তখন বোঝা যাচ্ছে এটা অলৌকিক ব্যাপার নয়। যদি একটুও না লাগতো তাহ'লে এটা অলৌকিক ব্যাপার হ'ত। এখন বুঝ্‌লি অলৌকিক ব্যাপার কাকে বলে?"

তখন আর অলৌকিক ব্যাপার বুঝার সাধ মতির আর বড় ছিল না। সে বসিয়া বসিয়া ফুঁপাইতে লাগিল।

ঘটনাটী যখন মুখে মুখে লাইবেরী ঘরে পৌঁছিল তখন শিক্ষকদের মধ্যে একটা হাসির স্রোত বহিয়া গেল। প্রধান শিক্ষক কার্ত্তিক বাবুকে নিভৃতে ডাকিয়া আনিয়া ধনী পিতার পুত্রদের প্রতি নরম ব্যবহার করিবার জন্য উপদেশ দিলেন ও তাঁহার প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া বলিলেন যে উপস্থিত তাঁহার এই শিক্ষা ফলপ্রদ হইলেও উহা কিন্তু indirect methodএ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ভবিষ্যতে direct methodএর প্রতি অধিকতর যত্নবান হইবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দিলেন।

গল্প

কুলি

শ্রীনির্ম্মলকুমার রায়

সহরে আবর্জ্জনা সেখানে পাহাড়ের মত জমে রয়েছে। দিন নাই, রাত্রি নাই—গাড়ী গাড়ী ছেঁড়া ন্যাকড়া, টুকরো কাগজ, যত রাজ্যের খড়কুটো ময়লাতে সে জায়গা ভর্ত্তি হয়ে রয়েছে। সুন্দর সাজান এই প্রকাণ্ড সহরটাকে যেন স্তূপীকৃত আবর্জ্জনারূপী এই বিরাট দৈত্যটা গলা চেপে দম আটুকে মারছে—এখানে সহরটার শরীরে স্পর্শবোধ নাই, স্পন্দন নাই, অনুভূতি নাই। দূরে তেলের কলের লম্বা উঁচু চিম্‌নী—সহস্র সহস্র বীজাণুপূর্ণ বিষাক্ত বায়ুর অনেক উপরে মাথা তুলে অসীম শূন্যের গাঢ় নীলিমার সর্ব্বাঙ্গে যেন ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলছে। সেই আবর্জ্জনা স্তূপের পাশেই কত খাবারের দোকান—সেখানে লাল, হলদে নানা রকম নয়নবিমোহন খাদ্য আবর্জ্জনার মতই মশা মাছিতে ঢাকা রয়েছে। তাদের বর্ণের ঔজ্জ্বল্য যেন তাদের স্বাস্থ্যকর তার দৈন্যকে স্পষ্ট প্রকাশ করে তুলেছে।

কাছেই এক জোড়া রেল লাইন চলে গেছে অনেক দূরে গিয়ে যেন এক হয়ে অনন্তের কোলে মিলিয়ে গেছে।

একখানা ট্রেণ এল। একটা বিকট দানবের মত একখানা ভয়ঙ্কর চেহারা এঞ্জিন পেছনে অনেকগুলি ছোট ছোট গাড়ী টেনে নিয়ে। তার চক্রের নিরন্তর ঘর্ঘর বিঘূর্ণণ শব্দ—"বাফারের" ধাক্কার শব্দ whistleএর তীব্র কির্‌কিরে আওয়াজ আর সঙ্গে সঙ্গে ষ্টীমের ফোঁস ফোঁস শব্দ—একসঙ্গে মিশে যেন প্রেতলোকের বিভীষিকার সৃষ্টি করছিল।

বন্দী দানব যেমন নিজের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে—তেমনি এই এঞ্জিনটা বুঝি তার ঘাড়ে চাপান বোঝাগুলি ঝেড়ে ফেলবার জন্য যেন আজ বুভুক্ষ শার্দ্দূলের মত লম্ফঝম্ফ কর্চ্ছিল। মানুষ তাকে ইচ্ছামত চালাতে চায়, বুঝতে পেরে সে যেন আজ মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর্ব্বার জন্য উদ্যত হয়ে পড়েছে। ট্রেণ এসে সেই আবর্জ্জনা স্তূপের কাছে দাঁড়াল।

কুলিরা shovel দিয়ে গাড়ীতে আবর্জ্জনা ভর্‌তে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে আবর্জ্জনার স্তূপ গাড়ী বোঝাই হয়ে গেল তার—তারপর এক একটা গাড়ীতে একজন করে কুলি উঠে পড়ল। এঞ্জিন একটা গা-শিউরাণো বাঁশীর আওয়াজ করে রওনা হ'ল তার নির্দ্দিষ্ট পথে—যেখানে গিয়ে সে এই কলঙ্কের বোঝা ঝেড়ে ফেলতে পার্ব্বে। রাস্তার মাঝে এটা ওটা পড়ে যাচ্ছিল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই গাড়ীর কুলি গাড়ী হতে লাফিয়ে পড়ে সেটা তুলে আবার গাড়ীতে রেখে দিচ্ছিল।

হঠাৎ একখানা গাড়ী থেকে একটা Shovel পড়ে গেল—তার কুলিটা যেই লাফিয়ে পড়তে গেল অমনি তার পা-টা গাড়ীর ধারে আট্‌কে গিয়ে একেবারে পড়ে গেল গাড়ীর নীচে। নির্ম্মম লৌহদানব মুহূর্ত্তমধ্যে লোকটার উপর দিয়ে চলে গেল—অন্যান্য কুলিরা সব

চীৎকার করে উঠল—এঞ্জিন আকাশের বুক বিদ্ধ করে একটা তীব্র বাঁশী বাজিয়ে থামল; কিন্তু সেই এক মুহূর্ত্তের বিলম্বই একটা প্রাণ নষ্ট করে ফেল্‌লে।

গাড়ীখানা কুলিটার উপরেই দাঁড়িয়েছিল। চাকাগুলির নির্ম্মম পেষণে তার কোমর একেবারে ভেঙে গিছল—চারিদিকে রক্তের স্রোত বয়ে গেল তাতে ধূলা মিশে জমাট তাণ্ডবের মত দেখাচ্ছিল—চারিদিকে মরণের নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। বেচারীর চোখে মুখে অপ্রকাশিত যন্ত্রনা; রুদ্ধ ক্রন্দনের বীভৎসভাব ফুটে উঠে মুখটাকে ভীষণ দেখাচ্ছিল—ওঃ কি ভীষণ—কি ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য! গাড়ীর একখানা চাকা তখনও তার বুকের উপর বসেছিল। আর চাকার ধারগুলো রক্তে রাঙা টক্‌টক্ কচ্ছিল—Driver "এঞ্জিনে" উঠে ধীরে ধরে তা' চালিয়ে দিল—লাসটাকে বের কর্ব্বার জন্য। চাকাটা একটু সরে যেতেই আবার গাড়ী থামাল আর সঙ্গে সঙ্গে ঝলকে ঝলকে রক্ত বের হ'তে লাগল—তার সঙ্গীরা দেহটাকে টেনে এনে রাস্তার উপর শোয়াইল—চারিদিকে লোকের ভীড় জমে গেল—সহানুভূতিও সে ভীড়ে ছিল কিন্তু মজাদেখার লোকেরও অভাব ছিল না।

দুচার জন ভদ্রলোকও এসে জুটেছিলেন—কেউ বল্‌লেন, ওঃ বড় Sad accident হ'ল—কেউ বল্‌লেন—তা আর হবে না মশাই বেটারা যা অসাবধান—কিন্তু সেই হতভাগ্য তখনও যেন তার বিস্ফারিত স্থির চোখ দুটো মেলে কাতর ক্রন্দন জানাচ্ছিল। কয়েকটি যুবকও সেখানে ছিল একজন ambulanceএর জন্য phone করে দিল। আর একজন এসে সেই মরণপথের যাত্রীর মুখে একটু জল দিল—ঠোঁট দুটা শীতল জলের স্নিগ্ধ স্পর্শ পেয়ে যেন একবার কেঁপে উঠলো—বোধ হল দু এক ফোঁটা মুখের ভেতরও গেল—কিন্তু তারপর আবার সব স্থির নিস্পন্দ—নিশ্চল—অসাড়।

এক মিনিট দু'মিনিট করে ক্রমে আধঘণ্টা কেটে গেল কিন্তু এম্বুলান্সের দেখা নাই। এম্বুলান্স ও ধনী দরিদ্রের, শ্বেত, কৃষ্ণের, পার্থক্য জানে—সে সভ্য জগতের জীব, সভ্যতার আইনকানুন সে মানে। এক ভদ্র লোক মোটরে করে যাচ্ছিলেন রাস্তায় ভীড়দেখে মোটর থামিয়ে তাকে মেডিকেল কলেজের দিকে নিয়ে গেলেন। পথে Ambulanceএর সঙ্গে দেখা হ'ল—ঐ গাড়ীতে তাকে তুলে দিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন। এম্বুলান্স শবদেহ নিয়ে গেল কারণ সেটা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের কাজে লাগাতেও পারবে।

কয়েকদিন পরে সেই যুবকগুলি কিছু চাঁদা তুলে নিয়ে সেই কুলিদের বস্তীতে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেই কুলির স্ত্রীর খোঁজ পাওয়া গেল। মাটীর দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা ছোট খেলার ঘর। পাশ দিয়ে একটা প্রকাণ্ড নর্দ্দমা, পাশের চামড়ার কলের যত দুর্গন্ধজল সে বুকে করে নিয়ে যায়। ঘরটার এক দিকে একটা ঘুলঘুলি ছিল। সেটা দিয়ে ঠিক দুপুরে এক ঝলক রৌদ্র ঘরের মধ্যে ঢুকত আর সঙ্গে সঙ্গে ঢুকত একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ, আর যতরাজ্যের রোগের বীজাণু নিয়ে উপরের আকাশ চারিদিককার কলের ধোঁয়ায় ঢাকা, এখানেই থাকে এই কুলিরা, যারা অল্প পয়সার জন্য নিজেদের জীবন বিক্রীকরে, আমাদের স্বাস্থ্যটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রতিদানে আমরা যাদের ঘৃণাই করি আর আমাদের মঙ্গলের জন্য, জীবনের সমস্ত বিষটুকু পান করে ধীরে—অতিধীরে তারা গোপনে মরণের রাজ্যে চলে যায়।

ঘরের মধ্যে তার স্ত্রী একটা ছুকরী ঘুঁটি খেলছিল। তার মুখে শোকের কোন চিহ্ন নেই। যুবকের দল তা দেখে একটু অবাক্ হয়ে গেল।

একজন একটু এগিয়ে বল্‌লে "কে আছ ঘরে।" কুলি রমণী বের হ'য়েই সামনে এতগুলি বাবু দেখে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেল, তাদের সেই নোংরা বস্তিতে এক জমাদার ছাড়া কোনদিন পরিষ্কার কাপড়চোপড় পরা ভদ্রলোক আসে নাই। যুবক বল্‌তে লাগল এই সেইদিন তোমার স্বামী মারা গেল আহা বেচারীর চেহারা মনে কর্‌তে আজও গা শিউরে উঠে। কত রক্তই না বের হয়েছিল।

সে তো হবেই বাবু উ ভারী মরদ খা না—খুন তো গিরেই গা।

তোমায় দেখে বড় কষ্ট হচ্ছে—অল্প বয়সে স্বামী মারা গেল তোমার আর কে আছে? উত্তরে কুলী পত্নী যা বল্লিল

তাহার অর্থ এই যে কুলির মৃত্যু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মরিবার জন্যই তাহারা জন্মায়। নয়তো কত কুলি কতদিন মরে—কে তার খবর রাখে—এতে আশ্চর্য্যের বা দুঃখের কিছু নাই। সেই যুবতী কুলি রমণী কত সহজভাবে কত জটীল এই সমস্তার সমাধান কর্লে তা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়; কিন্তু এই সোজা বে-দরদীভাবের নীচে লুকান আছে কি মহান সত্য তা কে জানে? অনেকে হয়ত ভারতীয়দের অসীম দার্শনিক জ্ঞানের খোঁজ এতে পাইবেন কিন্তু এর পেছনে মানবাত্মার যে গভীর নালিশ লুকিয়ে আছে, এই ঘৃণিত লাঞ্ছিত কুলি-জীবনের বিরুদ্ধে, তার খোঁজ কয়জনে রাখে। কুলির জন্ম মরতে বাঁচতে নয় বাঁচতে তাদের অধিকার নাই। ঐ আবর্জ্জনা স্তুপের মত তার প্রয়োজন শুধু এ পৃথিবী হ'তে সরে যাবার জন্য; শুনে যুবকেরা অবাক্ হয়ে গেল। বল্লে তুমি কেন আফিসে সাহায্যের জন্য দরখাস্ত দেও না, তাদের কাজেই তো সে মারা গেল অবশ্যই তাঁরা একটা কিছু করবেন। তোমার খাওয়া পরা এখন কি করে চল্বে।

"তা এক রকম চলে যাবে বাবু তাতে আর কি হয়েছে।" "কি হয়েছে—কি বল্‌ছ? একটা মানুষ মরে গেল আর সে তোমার স্বামী; জানো একটা মানুষের দাম কত?"

তাইতো একটা মানুষের—একটা কুলির যে কিছু দাম আছে সে তো একথা জানতো না কোন দিন তো কেউ এমন কথা বলেনি। সত্যই তো একটা মানুষের দাম যে ঢের মানুষের দাম, হোক্ না সে কুলি; কথাটার আঘাত ঠিক জায়গায় লেগেছিল তাই সে হঠাৎ কেঁদে উঠল। ভাঙা গলায় সে বল্লে "বাবু কুলির আবার দাম কি? বেঁচে থাকতে সরকার দয়া করে ১২৲ মাইনে দিত; মরে গেছে—আর কেন দেবে? আর অত হৈচৈ করেই বা কি হবে। এতো আর বড়লোক নয় যে মর্লে—তদন্ত হবে পুলিশ আস্বে—এ যে কুলি, সামান্য—একটা রাস্তার কুলি। কত কুলি রাস্তায় পথে ঘাটে, কলে, কারখানায় দিনরাত মর্‌ছে—শেয়াল কুকুরের মত—কে তার খোঁজ রাখ্‌ছে—কত বড় লোক মর্‌ছে দেশে—তাঁদের জন্যই শোক করে মানুষ অস্থির—এর উপর কুলিদের কথা কে ভাবে—আর কেনইবা ভাব্‌বে—এরা যে সামান্য কুলি" এই বলে সে আবার ঘরে ঢুক্‌ল।

যুবকের দল নিজেদের চাঁদার পয়সা পকেটেই রেখে ধীরে ধীরে চলে গেল। কারুর মুখে কোন কথাটি নাই—অথচ সকলেই ভাবছিল ঐ একই বিষয় কিন্তু কে যে কি ভাবছিল তা বোঝবার কোন উপায় ছিল না। কারণ কুলিপত্নীর ব্যবহার তাদের নির্ব্বাক করে দিয়েছিল। কিন্তু একটা প্রশ্ন সকলেরই মনে জাগছিল, যে মানুষের দাম আছে কিন্তু কুলির প্রাণের কি দাম নেই?

বিধির লিখন

শ্রীশিবকুমার বসু

পয়সা আমরাও কিছু কিছু দেখেচি—তার সৃষ্টি যেখান থেকে হয় সেখানে আমাদের প্রভাব ও প্রতাপ অল্প বিস্তর আছে। সুতরাং অর্থের তমঃ আমাদের মনকে অন্ধকার ক'র্‌তে পারে না।

জগতের শ্রেষ্ঠ ও সাধু ব্যক্তিদের উপদেশ, উদাহরণ ও শিক্ষা থেকে জেনেছিলুম যে জাতি, ধর্ম্ম, মান মর্য্যাদা, দেশ কাল পাত্র, রাজা প্রজা, ছোট বড়, বিদ্যা, বুদ্ধি, বয়স প্রভৃতি সকল ব্যাপারের বৈষম্য ঘুচিয়ে, দুটি প্রাণীকে সমান করে, দুটি প্রাণকে যুক্ত করে একমাত্র জিনিষ। তা হ'চ্চে প্রেম। তোমাদের কাছে প্রথম শিখ্‌লুম প্রেমেও কাঞ্চনের অহঙ্কার আছে।

ধনী আমরাও দুদশজন দেখেছি। রাজা মহারাজার প্রাসাদে প্রীতির আহ্বানে আমরা মাঝে মাঝে গিয়ে থাকি। ভিতরে তাঁদের যাই থাক্, তাঁদের আদব কায়দা শেখ্‌বার জিনিস। তাঁরা অর্থের মাচায় অবস্থান ক'রে ফল দেন না। এই তৃণের বুকেই শিশিরের মতই দুল্‌তে

থাকেন। আর কোনো কথার উত্তর দিতে তাঁরা কায়দা ক'রে বিরত হন না। মন্দ লোকে গুজব করে যে তাঁদের প্রত্যেকের, সমস্ত কল্‌কাতার ধনীদের কেন্‌বার মত সঙ্গতি আছে। কিন্তু আমার মনে হয় তোমাদের মত পয়সা হয়তো তাঁদের নেই। কেননা, তোম্‌রা ভদ্র ব্যক্তির কথার জবাব দেবার মত মেজাজও রাখ না। তোমাদের মনস্তত্ত্ব বিধাতা কি রহস্যে প্রহেলিকাচ্ছন্ন ক'রে চেন, জানি না।

সেদিন একটা বায়স্কোপের ছবিতে দেখ্‌লুম একজন মানুষ মোহরকে আঁকড়ে ধ'রে প্রেমকে ঠেকাতে চেয়েছিল। তা'ত' সে পার্‌লেই না, অধিকন্তু তার সোণার ভারে সে পিষ্ট হোলো; অর্থাৎ, অর্থ সংসারের প্রয়োজনকে যতক্ষণ সরবরাহ করে ততক্ষণই তার সার্থকতা, সে যদি বস্তুর ওপর আধিপত্য ছেড়ে, হৃদয়ের ওপর শাসন বিস্তার ক'র্‌তে চায়, ভগবান তা সহ্য করেন না।

পয়সায় আত্মার তৃপ্তি নেই। থাক্‌লে মহা মহা ধনীদের সুধু কোন রকমে শরীরটাকে খাড়া রাখ্‌বার জন্যে দ'য়ের ভাঁড়ে ডুবিয়ে খ'য়ের মণ্ড খেয়ে দিন কাটাতে হোত না—জগতের সমস্ত রসসাহিত্য তাদের কাছ থেকেই আস্‌তো। কিন্তু তা কোনো দিনই হয়নি। যারা বাগ্‌দেবীকে বরণ ক'রেচে তারাই বসুধায় সব চেয়ে বেশী খাতির পেয়েচে। তাদের কাছে ধনীর লোহার সিন্দুক লুপ্ত পেয়েচে, তাদের প্রাণের রসধারায় ধনীর সমস্ত ভাণ্ডার ভেসে গেছে। তাই জন্যে ইংলণ্ডের রাষ্ট্র স্রষ্টাদের একদিন হয়তো মানুষ ভুল্‌বে কিন্তু সেকস্‌পিয়ার, শেলী, কিটস্‌কে ভুল্‌বেনা, প্রতাপাদিত্যকে মানুষ হয়তো ভুল্‌বে কিন্তু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাসকে ভুলবে না লক্ষ্মণসেনকে ভুল্‌বে কিন্তু মাইকেল মধু, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথকে ভুল্‌বে না।

তোমাকে বড় ক'র্‌তে চেয়েছিলুম, যথার্থ বড়—মানে বড়, গুণে বড়, প্রাণে বড়। কিন্তু দেখ্‌চি পয়সার মোহ, তোমাদের কাছে প্রেমের মুক্তির চেয়ে বড়। বিধাতার লিখন কে ঠেকাবে? একদিন প্রেমের কাছে মাথা নোয়াতেই হবে; কেননা সে আজ পর্য্যন্ত কখনো পরাজিত হয়নি তবু কর্ম্মফলের ভোগ যতটুকু আছে দৈবের বিধানে, তা আর রোধ করা গেল না। পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে বাধা দেবার চেষ্টা করা গেল, তোমার গৌরব যাতে হয় সেই জন্য কিন্তু ভাগ্যদেবতার লিখিত ললাট লিপি ধ্বংসে তুলে ফেলা যায় না দেখা গেল। তোমাকে বড় ক'র্‌তে চেয়েছিলুম ভালোবাসি ব'লে, আর সন্তান-ক্ষুধিত-হৃদয় প্রত্যেক মানব সন্তানকে আপ্‌নার ক'রে নিয়ে, বুকের প্রেম দিয়ে, শিরার রক্তদিয়ে বড় কর্‌বার গভীর আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই হৃদয়ে পোষণ করে ব'লে। এই তরুণ বয়সেও অর্থের গর্ব্ব তোমার প্রাণের রস শোষণ ক'র্‌বে তা ভাবিনি।

তোম্‌রা সুখে থাকো ব'ল্‌তে পারি হয়তো কখনো, কিন্তু আনন্দে থাক এ কামনা কিছুতেই ক'র্‌বো না। আমার দিন কেঁদে যাবে আর তোমাদের আনন্দে যাবে, হবে না তা কক্ষণো হবে না, তা সহ্য ক'রবোনা। বার বার আশা ক'র্‌বো যেদিন ধনের মোহ ত্যাগ করে কাউকে সত্যই ভালোবাস্‌বে, সেদিন তার উপেক্ষা যেন তোমাদের অদৃষ্টকে উপহাস করে। তা না হ'লে গর্ব্বের দ্বারা ভালবাসাকে কুণ্ঠিত কর্ব্বার যে, কী ব্যথা তা জান্‌বে কেমন করে? যাকে মর্ম্মের সমস্ত অনুরাগ দিয়ে ঘিরে রাখা যায়, সে যদি তা গ্রাহ্য না করে তো মন কি কর্‌তে থাকে, তা বুঝ্‌বে কেমন ক'রে? আমি যোগী, ঋষি, সাধু বুদ্ধ চৈতন্য খৃষ্ট নই, সামান্য মানব মাত্র; আমার এত উদারতা নেই যে একগালে চড় খেয়ে আর একগাল ফিরিয়ে দেবো, আমার এত ক্ষমা গুণ নেই যে এত বড় প্রেমের অসন্মান ক'রেচে তার আনন্দ প্রার্থনা কোর্‌বো।

অর্থের সুখ নেই, যদি বা থাকে আনন্দের সাধক আমরা সুখের মোহ চাই না। সে প্রাণের আনন্দ পয়সায় কোথা? আর সে আনন্দ না থাক্‌লে যিনি আনন্দময় তাঁর কাছে পৌছান যায় না। তাই মহাত্মা খ্রীষ্ট ব'লেছিলেন ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে উট গলানর চেয়ে কঠিন ব্যাপার ধনীর পক্ষে স্বর্গে যাওয়া। আজ তোমাদের ধনমদমত্ততা দেখে বুঝ্‌তে পাচ্ছি খ্রীষ্টের বাণী কী সঙ্গত।

সুখ চাই না, আনন্দ চাই, আমরা কেন? কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ব'ল্‌বো:—"সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধূলা লাগে বলিয়া সঙ্কুচিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি

দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়, এই জন্ত সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ। সুখ, পাছে কিছু হারায় বলিয়া ভীত, আনন্দ, যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এই জন্ত সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে; আনন্দ সংহারের মুক্তির মধ্য দিয়া আপন সৌন্দর্য্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে, এই জন্ত সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুধাটুকুর জন্ত সুখ তাকাইয়া বসিয়া থাকে, দুঃখের বিষকে আনন্দ অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এই জন্ত কেবল ভালটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত, আনন্দের পক্ষে ভাল মন্দ দুইই সমান।

একটু বুদ্ধি খরচ করলেই বেশ জ্ঞান হবে যে গর্ব্বটা আমার তরফ থেকেই হওয়া উচিত ছিল। কেন না বড় আমরাই। তোমাদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। ক'জনই বা দেশে তোমাদের জানে আর ক'জনই বা দেশে তোমাদের চেনে আর কজনই বা তোমাদের নাম করে? তোমাদের ভালোবাসি তাই সে গর্ব্ব ত্যাগ করে আলিঙ্গনে বাঁধ্‌তে চেয়েছিলুম, দেশে যাতে আমাদের সঙ্গে তোমাদেরই নাম হয় তাই ক'র্‌তে চেয়েছিলুম; কিন্তু ঈশ্বর যাকে উঁচু ক'র্‌তে চান্‌না, মানুষ তাকে কি ক'রে তুলবে?

তোমাদের গুরু-লঘুরা বলেছিলেন এবং বার বার বলেছেন আমাকে ভালোবেসে তাঁরা খুসী হ'য়েছেন এবং খুব ভালোবেসেচেন। তোম্‌রাও তাই ব'লেচ। তাঁরা না হয় বড, তাঁদের কথা ধরা গেল না। কিন্তু তোম্‌রা যদি এ বয়স থেকে এই রকম অকারণ, অনর্গল অকৃত্রিম, মিথ্যা বল, পরে কি দাঁড়াবে জানি না। রত্নাকরের সময় নারদ ছিল তাই সে উদ্ধার পেয়েছিল কিন্তু এখন আছে গারদ, সে অত্যন্ত উদার আর অতিথিবৎসল।

কেবল যার দরদ আছে, সেই সত্যপথে নিয়ে গিয়ে তোমায় রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে। সে দরদ আমার চেয়ে কারুর বেশী নেই তোমার প্রতি, কেননা তোমাকে বড় করে নিজেকে তোমার যশে মিশিয়ে দেবার আনন্দ আর কেউ কামনা করে না। "সুদর্শনা মেকি রাজা সুবর্ণের" মোহে ভুলেছিল, তাই আগুন জলেছিল, লড়াই বেঁধেছিল, যে ছিল রাণী তাকে রথ ছেড়ে, তার সম্পদ ছেড়ে, পথের ধূলোর উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হ'য়েছিল। সেই রকমই একদিন হবে, আর সকলে ব'ল্‌বে—

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে,
আর এক হাতে হার,
ও যে ভেঙ্গেচে তোর দ্বার।
আসেনি ও ভিক্ষা নিতে
লড়াই করে নেবে জিতে
পরাণটি তোমার।
ও যে ভেঙ্গেচে তোর দ্বার।
মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আস্‌চে জীবন মাঝে,
ও যে আস্‌চে বীরের সাজে।
আধেক নিয়ে ফির্‌বে না রে,
যা আছে সব একেবারে
ক'র্‌বে অধিকার
ও যে ভেঙেচে তোর দ্বার।

অভাগিনী

শ্রীমতী মলিনপ্রভা চৌধুরী

আকাশ থেকে নয়ন বারি,
কার অকালে ঝর্‌ল রে।
কার হৃদয়ের গোপন ব্যথা,
বৃষ্টি হয়ে পড়্‌ল রে॥
(এ) যেন কার আকুল রোদন,—
কে হারাল বুক-জোড়া ধন,
নইলে কেন প্রাণের বেদন
বৃষ্টি ধারায় মিশ্‌ল রে।
যে মায়ের হৃদয় ব্যথা
আকাশ ভেঙ্গে ছুটল রে॥

মুক্তির পথ

(টি, এল, ভাস্বানীর লেখা হইতে)

শ্রীভগবতীচরণ মিত্র

নিউ ষ্টেটসম্যানের (New statesman) মতে "ভারতের ব্যাপার সন্তোষ জনক নহে। মণ্টেগু শাসন প্রণালীর অবস্থা বড় সঙ্গীন। ভারতের এই জটীল ঘটনার জন্য স্বরাজপন্থীগণ দায়ী। বাঙ্গালা দেশ রাজনৈতিক ব্যাপারে অগ্রগামী কিন্তু স্বরাজপন্থীগণ তাহাদের পদ্ধতির দ্বারা বাঙ্গালার স্বায়ত্ব শাসন ধ্বংশ করিয়াছে।" লর্ড বার্কেনহেড হয় ত স্বরাজপন্থীগণের প্রতি কটাক্ষ আর উদারপন্থীগণের প্রশংসা করিতে পারেন। কোনও ব্রিটীশ পত্রিকার মত :—"আমরা (ইংরাজগণ) এই গুরুতর অবস্থায় উদারপন্থীগণের সুবুদ্ধি ও সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্মের উপর নির্ভর করিব।" এই "গুরুতর অবস্থা" হইতে বাহির হইবার একমাত্র পথ—প্রজার সহিত সহোযোগিতা। কিন্তু লর্ড বার্কেনহেড ও বিলাতের মন্ত্রী সভা তাঁহার দমন-নীতি-পন্থী সহকর্ম্মীগণ এই পথে চলিবে না। লর্ড বার্কেনহেড দমন-নীতির প্রবর্ত্তন সমর্থন করিবেন। নিউষ্টেটসম্যান স্বীকার করেন—"বাঙ্গালা দেশের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর পরামর্শে স্বরাজ আন্দোলনকে নির্ম্মূল করিবার জন্য দমন-নীতির প্রচার হইয়াছে।" এইরূপ রাজকর্ম্মচারীরা শীঘ্রই তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। মিঃ ব্রিয়াঁ (Mr. Bryant) একজন আই, সি, এস কর্ম্মচারী ও এংলো ইণ্ডিয়ান। তিনি জাতীয় শক্তির বিকাশ দেখিতে পারেন না। তাঁহার "গান্ধী ও সাম্রাজ্য পরিচালনায় ভারতবাসী—" (Gandhi & Indianization of Empire) নামক পুস্তকে তিনি ও স্বীকার করিয়াছেন—

"ভারতবাসীদিগের শাসন করা অসম্ভব। ভারতবাসী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমান আসন চায়, ইহা ব্যতীত অন্য কিছুতেই তাহারা শান্ত হইবে না। ভারতবাসী—সত্যই ভারতবাসী ধৈর্য্যশীল বড় বেশী রকমে ধৈর্য্যশীল। সেই ভারতবাসীদের আজ ইংলণ্ডের সদুদ্দেশ্যে বিশ্বাস নাই। তাহার এই দুর্ভাগ্যের কারণ ইংরাজের অর্থলিপ্সা। ভারত জাপানের চেয়েও আটগুণ বড়, জাপানের চেয়েও তাহার অধিবাসীর সংখ্যা চারিগুণ; তবুও ভারতজাত কৃষি দ্রব্যের পরিমাণ জাপানের দ্রব্যের ৮ ভাগের এক ভাগ। শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, কৃষিতে ও শিল্পোন্নতিতে ভারতের স্থান জাপানের নীচে। ইহার কারণ অনুসন্ধানে বেশী ভাবিতে হইবে কি? জাপানে স্বায়ত্তশাসন আছে আর ভারত আজ ও পরাধীন। জাতির উন্নতিকর নীতি সমূহের স্রষ্টা রাজা, প্রজাগণ নহে। ভারতে স্বরাজ নাই, এইজন্য ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীদের স্বার্থের বিষয়ে রাজশক্তির প্রখর দৃষ্টি আর ভারত ও তাহার কোটী কোটী অসহায় সন্তানের বিষয় তাহা তত মনোযোগী নয়। ভারত ব্রিটনের পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের স্থান। সুতরাং ইহা কি আশ্চর্য্যের কথা যে নিরন্নের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে? ইতিহাসবিদ জানেন যে এই অন্নাভাব বিদ্রোহের বীজ।

ভারতের জাতীয় শক্তি চিরদিন সুপ্ত থাকিবে, ইহা ভাবাই মূর্খতা। ভারতে নবজাগ্রত আত্ম-শাসনের আগ্রহ ব্রিটেন দমন করিতে বা পরিচালনা করিতে পারিবে না। ব্রিটেনের সে ক্ষমতা নাই। ব্রিটেনের একমাত্র সৎপথ—ভারতবাসীর আন্দোলনে সহযোগিতা। ভারত স্বরাজ্যের জন্য পণ করিয়াছে। হিডলে বার্গ (Heideleberg) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি, লেডের (Leder) বলিয়াছেন—

"রাজত্ব পুনরায় এশিয়ার অধিকারে যাইবে। ইউরোপের দুর্দ্ধর্ষ ও চঞ্চল আত্মা পূর্ব্বদেশের ঘৃণা অর্জ্জন করিয়াছে। এশিয়ায় ইউরোপের শাসন যে লুপ্ত হইবে। এই লক্ষণ একজন অনভিজ্ঞ ও বুঝিতে পারে।"

ভারতের সমস্যা শুদ্ধ স্বরাজ্য লাভ নয় পরন্তু ইহার পরিচালনা ও রক্ষা। উভয় কাজের পথ—আত্ম গঠন। আজ জাতি শিক্ষায়, অর্থনীতিতে ও সমাজ নীতিতে এই আত্ম-গঠনের পদ্ধতি চায়।

এক মিনিট*

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাণ্ড এক স্তম্ভাকার উচ্চ মনুমেণ্ট নির্ম্মাণ করা হয়েছে এক মাঠের উপর। উপরে উঠ্‌লে নীচের মানুষ পিপীলিকার মত দেখায়। প্রথমে কে উঠ্‌বে কে উঠ্‌বে বলে একটা রব উঠে গেল। সিদ্ধান্ত আর হয় না। রাজমিস্ত্রী সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে সকলের ভাব-গতিক দেখে বলে উঠ্‌ল 'গ্রামের রাজাকে ডাকা যাক।'

সকলেই মিস্ত্রীকে বাহবা দিতে লাগ্‌ল। রাজার কাছে লোক পাঠান হল। রাজা ব্যাপার শুনে মন্ত্রীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন সেই মনুমেণ্টের কাছে। মনুমেণ্ট দেখে ত রাজার চক্ষুস্থির। যাই হ'ক সে ভাব লুকিয়ে তিনি বল্লেন—'এ-আর-কি? আমি উঠ্‌ছি'। বলেই তিনি উঠ্‌তে আরম্ভ কল্লেন। সঙ্গে ছিল শুধু তরবারি।

যাই হ'ক উপরে ত উঠ্‌লেন। নীচের দিকে তাকাতেই কিন্তু তাঁর প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ল। কিছুতেই আর নাম্‌তে পারেন না। ভয়ে পা-দুখানি ঠক্‌-ঠক্‌ করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। মন্ত্রী যা কিছু বুদ্ধি খরচ ছিল সব করেও রাজাকে তো নামাতে পার্‌লে না। সকলেই ভাব্‌তে লাগল।

এমন সময় রাজমিস্ত্রী বল্লে "আমি এখনি রাজাকে নীচে নামাতে পারি, কিন্তু এক সর্ত্তে। যদি পরে আপনারা আমাকে বাঁচান।"

সকলেই বলে উঠল 'সে কি?'

রাজমিস্ত্রী বল্লে—"দেখুন রাজাকে যে উপায়ে আমি নীচে আনবো তাতে তিনি নেমেই আমাকে কেটে ফেল্‌বেন। তখন যদি আমাকে বাঁচাতে পারেন তাহলে আমি রাজাকে বাঁচিয়ে দিতে পারি।"

সকলেই রাজী হল।

রাজমিস্ত্রী তখন সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে বল্লে—"রে ভীরু তোর কি এমন সাহস নাই যে তুই নীচে নামিস্‌?"

রাজা তখন ক্রোধে মত্ত হয়ে সিঁড়ি ধরে নাম্‌তে লাগ্‌লেন। রাজমিস্ত্রীও আগে আগে নাম্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে যখন দুজনেই নীচে এসে পড়্‌ল তখন রাজা তরবারি নিয়ে মিস্ত্রীর পিছু পিছু ছুট্‌তে লাগ্‌লেন। কিছুদূর যেতে না যেতেই রাজাকে সকলে ধরে ফেলে বল্লে—"আপনি করেন কি? ও যে আপনাকে বাঁচিয়ে দিলে আর আপনি ওকে কাট্‌তে চলেছেন!"

তখন রাজার চৈতন্য হল, বল্লেন—"এ্যাঁ তবে কি সত্যই আমি নীচে এসেছি?"

দীনা

শ্রীমৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুলকিত চিতে রয়েছে তাহারা
কে চাহিবে মোর পানে?
ক্ষুধানলে জ্বলে এ পোড়া উদর,
সে কথা কে শুনে কাণে?
উৎসবে সবে রয়েছে মত্ত,
কে লইবে এ দীনের তত্ত্ব?
কেমনে আমার মরম বেদনা—
বাজিবে তাদের প্রাণে!
করিয়াছে তাই বঞ্চিত মোরে
কৃপা-কটাক্ষ দানে!
'প্রতিবেশী' তা'রা—বড় আপনার
তারা যে আমার ভাই,'
শুনি সেই কথা, বড়ই আশায়
গিয়াছিনু হায় তাই!
দীন আবেদন হয়েছে বিফল,
সম্বল মোর আঁখি ভরা জল,
দলিয়া সরমে দুই পদতলে,—
চেয়েছি সবার ঠাঁই,
কহিতে কাতরে হৃদয় বিদরে
'কিছুই যে পাই নাই।'
রহুক তাহারা ভোজনানন্দে—
করুক সুপেয় পান
কিসের দুঃখ? আমি নির্ধন
তাহারা যে ধনবান
আহার বিহনে যদি মারা যাই
তাতে তাহাদের কোন ক্ষতি নাই;
সুখে থাক তারা, তাদের বদন—
যেন নাহি হয় ম্লান
আমার রোদনে তাহাদের হাসি
শুখায়োনা ভগবান!

---

* সংস্কৃত অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রুত।

কাজের কথা
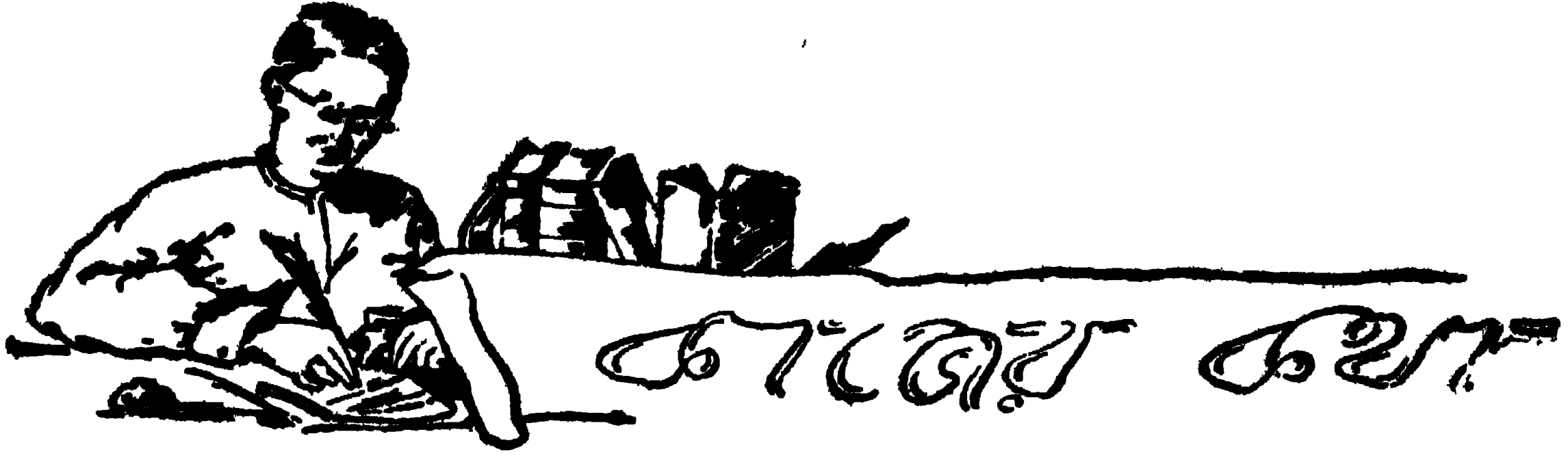
বসন্তের প্রকোপ ঃ—এবৎসর কলিকাতা সহরে ও আশেপাশে শীতলা মাতার অনুগ্রহের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। মৃত্যুসংখ্যার হার ও খুব বেশী। টীকা লওয়ার প্রবর্ত্তন না থাকিলে যে কি হইত তাহা ভাবিলে ও শরীর শিহরিয়া উঠে। সেদিন ফরওয়ার্ড পত্রে এক ভদ্রলোক বসন্ত রোগের একটী আশ্চর্য্য ঔষধের কথা লিখিয়াছেন। রোগীর নখ চাঁছিয়া সামান্য পরিমাণ ঐ চাঁচনী এক আউন্স জলে মিশাইয়া উহা তিনবারে রোগীকে খাওয়াইলে নাকি এই রোগ আশ্চর্য্য ভাবে আরোগ্য হয়। ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে ইহার পরীক্ষা করিয়া সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া যদি এই দ্রব্যগুণের কোন সত্য শক্তি থাকে তাহা হইলে সাধারণকে জানান উচিত কারণ ইহা সুলভ ও সহজসাধ্য।

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ ঃ—অল্ডারম্যান মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেব পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে মৌলভী ওহায়েদ হোসেন সাহেব নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ মুকুলহক চৌধুরী সাহেব ভোটে হারিয়া গিয়াছেন।

লর্ড মেয়র শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসের ও ডেপুটীমেয়র সুরাবর্দ্দী সাহেবের কার্য্যকাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। তজ্জন্য আবার নবনির্ব্বাচন হইবে। আমরা বলি এমন একজন মেয়র হওয়া উচিত যাঁহার মিউনিসিপালিটীর অভিজ্ঞতা এবং কার্য্য করিবার যথেষ্ট অবসর আছে। দেশবন্ধু যোগ্য ব্যক্তি সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁহার সময় অল্প এবং স্বাস্থ্য ও অক্ষুণ্ণ নহে। সব কাজের বোঝা তাঁহার ঘাড়ে চাপান বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

শ্রমজীবির ক্ষতিপূরণ ঃ—মেসার্স চাম্পিয়ন এণ্ড কোংর অধীনে রমজান খাঁ নামক কুলি কর্ম্ম করিত। কলকজা সাফ্ করিবার সময় তাহার ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলটী কাটিয়া যায়। তজ্জন্য সারভেন্ট বা ইণ্ডিয়া সোসাইটী তাহার পক্ষ হইতে ৫৭৯ টাকার দাবী করেন। দিল্লীর কমিশনার মিঃ ডি জনষ্টোন সাহেবের নিকট মামলার বিচার হয়। নূতন শ্রমজীবি আইন অনুসারে তিনি পূরা টাকার ডিগ্রী দিয়াছেন। ইহাই শ্রমজীবি আইনের প্রথম সুফল।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন ঃ—ইহার ষোড়শ অধিবেশন হইবে মুন্সীগঞ্জে (ঢাকায়)। সাহিত্য বিভাগের সভাপতি হইবেন ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছেন শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়। ২৭ ও ২৮শে চৈত্র দুইদিন অধিবেশনের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সমস্ত গণ্যমান্য সাহিত্যিক গণ উপস্থিত হইবেন শুনা যাইতেছে।

সাহেব সার্জ্জেনের দণ্ড ঃ—কুমারটুলি আউট পোষ্টের সার্জ্জেণ্ট আরমুপের বিরুদ্ধে কেদার ঘোষ নামক ট্যাক্সি চালক মারপীটের অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। চিৎপুররোডে কমলা কেবিন নামক দোকানের সামনে কেদার ঘোষ ট্যাক্সি লইয়া দাঁড়াইয়াছিল সার্জ্জেণ্ট তাহাকে চলিয়া যাইতে বলে কিন্তু কেদার যাইতে সম্মত না হওয়ায় বোধহয় তাহাতে সার্জ্জেণ্ট রাগিয়া উঠিয়া তাহাকে লাঠির দ্বারা প্রহার করে। বিচারে সার্জ্জেণ্ট দোষী বলিয়া ৫০৲ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ইহারাই শান্তির রক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকে না? এবং সরকারী ব্যয়েই বোধ হয় ইহাদের পক্ষ সমর্থন করা হইয়া থাকে। এদেরই ক্ষমতা আরও না বাড়াইলে দেশে ল এণ্ড অর্ডার থাকে না। ক্ষমতার অপব্যয় নিবারণ করিবার কোন আছে কি?

দেশবন্ধুর ঘোষণা ঃ—দেশবন্ধু বলেন ভারতে ও বিলাতে ইংরাজদের মধ্যে একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে তিনি ও স্বরাজদল রাজনৈতিক হত্যা প্রভৃতির সমর্থন করেন বস্তুতঃ তিনি নীতি হিসাবেই ঐ সকলের অনুমোদন করেন না। স্বরাজ্য চাই কিন্তু তাহা সাম্রাজ্যের নায্য অংশীরূপে এবং রাজনৈতিক সাম্যের উপর। দেশের যুবকগণকেও তিনি স্বরাজ সমরে যোগদান করিতে বলেন কিন্তু সেই যুদ্ধ ন্যায় যুদ্ধ হওয়া চাই। ইউরোপীয়ান গণকেও তিনি গভর্ণমেণ্টের দলননীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

মোমতাজের মামলা

আগরার তাজমহলের বিশ্বব্যাপী কীর্ত্তি ও অনন্ত সৌন্দর্য্যের মূলে রয়েছে সাহাজানের প্রিয়তমা বেগম, সুন্দরী শিরোমণি 'মোমতাজের' নাম। আর এক মোমতাজের জন্ত বোম্বাই সহরে ভীষণ হুলস্থুল পড়েছে শুধু বোম্বাই বা বলি কেন সমগ্র ভারতে আজ এই রহস্তময় প্রেম ও প্রতিহিংসার কাহিনী বিষম কৌতুহল ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। তার কারণ শুধু সুন্দরী মোমতাজের অসামান্ত সৌন্দর্য্য নয়—তিনি ইন্দোরের মহারাজের ভূতপূর্ব্বা প্রণয়িনী বলে। পুরাকালে অর্থাৎ বাদশাহী আমলে ঘটলে, এ ঘটনা এত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'র্‌তো না ; কারণ তখন রাজা রাজড়াদের উপপত্নীর সংখ্যা অগন্ত ছিল এবং তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে খুন জখম প্রায়ই হোত কিন্তু এই যুগে এই বৃটিশসাম্রাজ্যে তা হতে পারে না তাই এই খুনের সম্পর্কে ইন্দোরের মহারাজের অনেক কর্ম্মচারী আসামীরূপে ধৃত হয়েছে।

এ ঘটনার পূর্ব্বাভাষ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। একণে মামলার সমস্ত বিবরণ দিতেছি। গত ২৬শে মার্চ্চ বোম্বাই চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে (এস্‌প্লানেড্ কোর্টে) এই মামলা উঠিয়াছে। ঐ দিন আদালত লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। আদালতে শান্তি রক্ষার খুব সুব্যবস্থা ছিল। হিন্দু ও মুসলমান দর্শকের সংখ্যাই বেশী ছিল এমন কি কয়েকজন ইংরাজ ও পার্শী দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। কোর্টের ভিতরে তো স্থান ছিলই না এমন্ কি বাইরে ও আদালতের সাম্‌নের রাস্তায় জনসমাগম প্রচুর হইয়াছিল।

ঠিক দশটার সময় দুইখানি লরী করে আসামীদের কোর্টে আনা হল এবং তাদের নিয়ে গিয়ে চার্জসিটে লিখিত প্রত্যেকের পর পর দাঁড় করান হয়েছিল। আসামীদের খুব বিমর্ষ বা চিন্তিত বলে বোধ হচ্ছিলনা বরং তাদের মুখে বেশ একটা বেপরওয়া ভাব ফুটে উঠেছিল। পুলিশের কর্ত্তারাও সব হাজির ছিলেন। পলিশ কমিশনার বাহাদুর, ডেপুটী কমিশনার মিঃ কটী (Cauty) ইনি মামলার তদারকের ভার নিয়েছিলেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সাইকস্ মিঃ জেক্রিস্ ও মিঃ নারজ নামক দুজন ইন্‌স্পেক্টর ও সব্‌ইন্‌স্পেক্টার মিঃ ভাটকাল প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

সরকারী তরফে মিঃ কেনেথ কেম্প বার-এটল ও মিঃ কার্কস্মিথ উপস্থিত ছিলেন।

২নং হইতে ৯নং আসামীদের তরফে মিঃ এস্' জি, ভেলিনকার ও মিঃ এম, দিসা ও নাদকরনি ছিলেন ১নং আসামীর পক্ষ সমর্থন কর্চ্ছিলেন মিঃ এন টি গন্ধাওয়ালা। ১০নং আসামী মহম্মদ শফি মালিক ইমাম সরকারী সাক্ষ্যরূপে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় তাহাকে ক্ষমা করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল।

আসামীদের নাম।

১। সফী আহম্মদ নফি আহম্মদ (২৬) রিসালদার ইন্দোর মাউণ্টেড্ পুলিশ।

২। পুষ্পশীল বলবন্ত রাও পাণ্ডে (২৩) মানকরী ইন্দোর।

৩। বাহাদুর শা মহম্মদ শা (২০) মোটর চালক ইন্দোর।

৪। আকবর শা মহম্মদ শা (২৩) ইন্দোরের অধিবাসী।

৫। শ্যামরাও রেভাজী দিঘে (২৮) ইন্দোরের খেচর সৈন্তের কাপ্তেন।

৬। মোমতাজ মহম্মদ সৈয়দ মহম্মদ (২৫) ইন্দোরের গোয়েন্দা বিভাগের সব্ ইন্‌স্পেক্টার।

৭। আবদুল লতিক মযুদ্দিন (২৫) ইন্দোরের মোটর চালক।

৮। কারামত খাঁ নিজাম খাঁ (২৮) পে-সার্জেন্ট, ইম্পিরিয়াল ল্যান্সার্স ইন্দোর।

সফী আহম্মদ
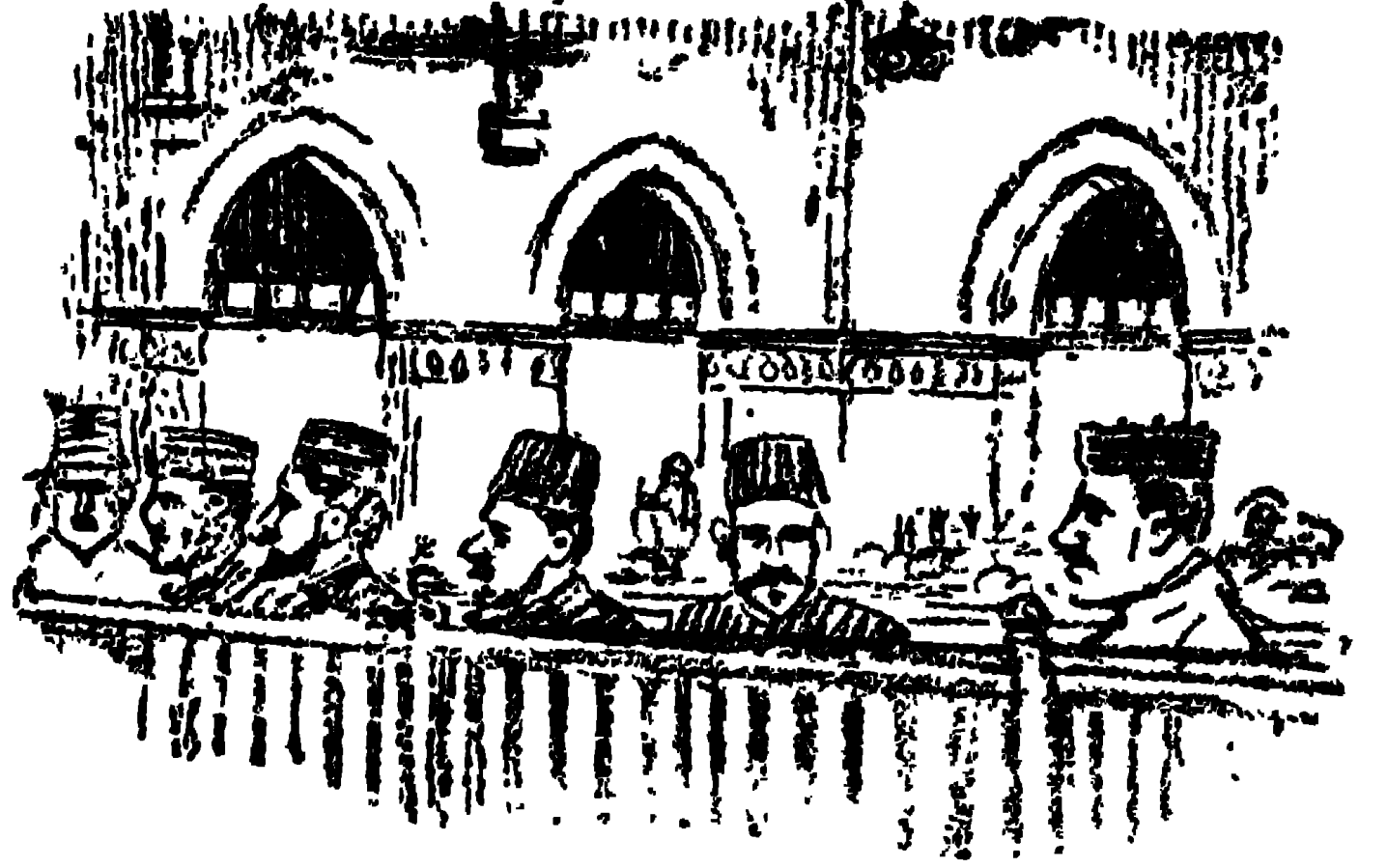
কাঠগড়ায় আসামীগণ

৯। আনন্দরাও গঙ্গারাম ফাঁসে (৩২) ইন্দোর রাজকীয় সৈন্যের এগুজুটাণ্ট জেনারেল।

১০। মোহম্মদ শাফি মালিক ইদাম; ১২ই জানুয়ারীতে নিহত মিঃ আবদুল কাদের বাওলাব মোটর চালক।

অভিযোগের বিবরণ—

আসামীদিগকে নিম্নলিখিত অপরাধে অভিযুক্ত করা হইয়াছে—

(১) বৃটিশ ভারতবর্ষ হইতে মোমতাজ বেগমকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ১৯২৪ সালের অক্টোবর হইতে ১৯২৫ সালের ১২ই জানুয়ারীর মধ্যে তাহারা বোম্বাই সহরে চক্রান্ত করিয়াছিল।

(২) গত ১২ই জানুয়ারী (১৯২৫) তারিখে তাহারা মোমতাজকে অপহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

(৩) তাহারা মোমতাজকে অবৈধ সংসর্গ করাইবার উদ্দেশ্যে অপহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বা তাহারা ইহা জানিত যে এই অপহরণের ফলে তাহাকে অবৈধ সংসর্গে প্রলুব্ধ করা যাইতে পারিবে এবং—

(৪) এই অপহরণ করিবার জন্য তাহারা ঐ তারিখে পিস্তলের গুলীতে আবদুল কাদের বাওলাকে হত্যা করিয়াছে এবং—

(৫) লেফটেনাণ্ট জে, এন সিগার্ট এবং কে, ই ম্যাথুস নামক সাক্ষীদের উপরও হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়িয়াছিল এবং—

(৬) বিপজ্জনক অস্ত্রদ্বারা (যথা ছুরিকা) গুরুতর আঘাত করিয়াছিল এবং ঐ অপরাধ করিবার সময় পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়াছিল।

অভিযোগ বিবরণ পাঠ সমাপ্ত হইলে মিঃ কেনেথ কেম্প মহম্মদ শফির (১০নং আসামী) তরফে এক আবেদন উপস্থিত করিয়া বলিলেন যেহেতু এই ব্যক্তি তাহার জ্ঞাত সমস্ত সত্য ঘটনা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে সেজন্য তাহাকে ক্ষমা করা হউক এবং তাহাকে আসামীদেব ডক হইতে সরাইয়া দেওয়া হউক।

আসামী পক্ষ হইতে মিঃ ভেলিনকার, ক্রিমিনাল প্রসিজিওরএর ৩২৭এ ধারানুসারে যে দলীলে আসামীকে ক্ষমা করা হইতেছে তাহার নকল চাহিলেন এবং বলিলেন যে আসামীকে ক্ষমা করিবার পূর্ব্বে আসামীকে কোনরূপ জের কবিতে পারিবেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট মহম্মদ শফীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আসামীরা যে সকল দোষে অভিযুক্ত তুমি সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা পরোক্ষভাবে তাহাদের অপরাধের সঙ্গে জড়িত—এ কথা সত্য কি না?"

শা—হাঁ হুজুর।

ম্যা—তুমি ঘটনার যে সমস্ত বিষয় জান তাহা কি যথাযথ প্রকাশ করিতে স্বীকৃত আছ।

শা—হাঁ হুজুর।

ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩৬৭ ধারা অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট এই আসামীকে ক্ষমা করিলেন।

তৎপরে মিঃ কেম্প এই সরকাবী সাক্ষীকে মামলা

শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পুলিশের তত্ত্বাবধানে রাখিতে বলিলেন কারণ সে এতদিন পুলিশের হেপাজতেই ছিল।

মিঃ ভালিকার তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন যে তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে রাখা উচিত কারণ তাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ স্বীকারোক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে এবং বাহিরের কোনরূপ প্রলোভন বা ভয় প্রদর্শনে তাহা বিকৃত হইবে না। মিঃ কেম্প তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই, ম্যাজিষ্ট্রেটও তাহাকে নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিবেন বলিলেন।

তারপর মিঃ কেম্প মামলার ব্যাপার বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন যে এই মামলার মধ্যমণি হচ্ছেন মমতাজ বেগম, একজন ২১ বর্ষীয়া যুবতী এবং সুন্দরী। তাঁর অতীত জীবনেব ইতিহাসেব সঙ্গে এই মামলাব ব্যাপার বিশেষরূপে জড়িত। অবশ্য ২৪শে অক্টোবর ১৯২৪ হইতেই এই মামলার ব্যাপাবেব সূত্রপাত হইয়াছে। মোমতাজ প্রথমে বাইজীরূপে সঙ্গীতকেই উপজীবিকা করে এবং ঐ সম্পর্কেই অতি অল্প বয়সে প্রথমে ১৯১৭ সালে সে ইন্দোরে আসে, ঐ সময়েই সে ইন্দোববাজের অধীনস্থা হয় এবং ক্রমশঃ তাঁহার বক্ষিতারূপে বাস করিতে থাকে। ১৯১৯ সালে ইন্দোর মহাবাজেব রক্ষিতারূপে সে একবার বোম্বে আসে ও তথায় বাস কবে তারপর ১৯২১ সালে মহাজাব সঙ্গে সে বক্ষিতারূপেই ইংলণ্ড যায়। কিন্তু ১৯২৪ সালে কি জন্য তাহার মনের পরিবর্ত্তন হইল এবং সে মহারাজকে ত্যাগ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল—১৯২৪ সালের মার্চ্চ মাসে মহারাজা যখন সদলবলে উত্তর ভারতে যাইতেছিলেন সেও একজন এডিকংএর তত্ত্বাবধানে তাঁহার সহিত যাইতেছিল। হঠাৎ দিল্লী ষ্টেশনে সে নামিয়া পড়ে এবং তাহার নিজের তাহার মাতার জন্য পুলিশের আশ্রয় প্রার্থনা করে। সেই অবধি সে ইন্দোরবাসী ব্যক্তিগণ দ্বারা সর্ব্বদাই অনুসৃত হইতেছিল। মহারাজ তাঁহাকে ফিরাইয়া লইতে যান ইহা বুঝিয়া ইন্দোররাজসংক্রান্ত ব্যক্তিগণ তাহাকে ইন্দোরে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। প্রলোভন দেখাইয়া বা ভয় দেখাইয়া যে কোন উপায়ে তাহারা উদ্দেশ্য সাধন করিবার চেষ্টায় ছিল। ১৯২৪ সালের মার্চ্চ মাসে সে তাহার মাতা ও সৎপিতার সঙ্গে বোম্বাই আসে এবং তাহার এখানে আসার পর থেকেই সে বিবিধপ্রকারে ইন্দোরবাসী লোকদের দ্বারা ত্যক্ত বিরক্ত হইতেছিল।

মোমতাজ ও বাওলার প্রথম সাক্ষাৎ।

গত আগষ্ট মাসে তাহার এক মাতুলের মধ্যস্থতায় মোমতাজ এখানে আব্দুলকাদের বাওলার সঙ্গে প্রথম পরিচিতা হন। ঐ প্রথম সাক্ষাৎ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে, ফলে মোমতাজ মিঃ বাওলার রক্ষিতারূপে থাকেন। তাহারা অনেক জায়গায় থাকিবার পর শেষে চাউ পাটিতে আসিয়া অবস্থান করে। গত ডিসেম্বরে তাহাবা লোনাভ্‌লায় যায় এবং কিছুদিন থাকে। ১১ই ডিসেম্বর তাহারা বোম্বাই সহরে প্রত্যাগমন করে। তারপব কেম্প সাহেব ইন্দোরের একটা দলের মোমতজ হরণের চেষ্টায় কথা বলেন। ১৯২৪ সালেব অক্টোবরমাসে ইন্দোব হইতে একদল লোক আসিয়া বোম্বায়ে আড্ডা লয়, বর্ত্তমান আসামীগণ সকলেই ঐ দলের লোক। বোম্বাই সহরে ইন্দোর মহারাজের সমারসেট হাউস নামে একটা বাড়ী আছে সেখানে মহারাজা ও তাঁহার অতিথি অভ্যাগতগণ আসিয়া বাস করেন এ ছাড়া হিউস রোডে অবোরা হাউস নামে আরও একখানা বাড়ী তাঁহার আছে। যে দল ইন্দোর থেকে এসেছিল তারা এই বাড়ীতে থাক্‌তো। প্রমাণেই দেখা যাবে যে ইন্দোরের মহারাজেব এড্‌জুটাণ্ট জেনারেল আনন্দ রাও ফাঁসে ও এই দলভুক্ত ছিলেন।

লাল ম্যাক্সওয়েল গাড়ী।

১৯২৪ সালের ২৩শে অক্টোবর তারিখে আনন্দরাও একখানা লাল রংএর ম্যাক্সওয়েল মোটরকার কিনিয়া কিনিয়া অরোরা হাউসের গ্যারেজে রাখেন আসামী লতিফ উহার চালক হয়। এই দলটি বোম্বেতে কি করছিল তার প্রমাণ সাক্ষ্যসাবুদেই পাওয়া যাইবে। তারা ঐ লাল মোটর অরোরা হাউসে রেখে ইন্দোবে

চলে যায় এবং ১২ তারিখে ডিসেম্বরে বোম্বে ফিরে আসে। তারা ইন্দোরে যাওয়ার পর ঐ লাল মোটর ইন্দোরে রেল যোগে পাঠান হয়; রেল রসিদ ছিল মিঃ ফাঁসের নামে। তারপর ব্যাপারটা ক্রমে পুনা সহরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সেখানে ফণ্ডের সঙ্গে ফাঁসের টেলিগ্রাম চলে। একটী টেলিগ্রামে ছিল "চেষ্টার সময় সুবিধাজনক হয়েছে।" ফলে ৯ই তারিখে এইদলটী ইন্দোর থেকে পুণায় গিয়ে পৌছয় সেখানে ফণ্ডে ও বাহাদুর শা থাকৃতো। দলের বাকী লোকেরা ১০ই ডিসেম্বর শনিবার ঐ লাল মোটর করে বোম্বাই পৌছায়। তারপর তারা বাওলার মোটর চালক শফিকে হাতকরে সুতরাং বাওলার গতিবিধি জানবার সুযোগ তাদের খুবই হয়েছিল। দলের লোকেরা সব অরোরা হাউসে থাকৃতো। ১২ই তারিখের অপরাহ্নে লতিফ্ ও বাহাদুর শা সমারসেট হাউসে যায় ও সেখান থেকে একখানা অতিরিক্ত চাকা নিয়ে আসে—এ চাকাটা ইন্দোরে যাবার আগে তারা সেখানে রেখে যায়। তার-পর অটোমোবাইল কোম্পানির কাছ থেকে তার সেইদিন একটা র‍্যাডিয়েটর কেনে! ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা দলের লোকেরা সব বাহিরে গিয়াছিল। মিঃ বাওলার গ্যারেজ ছিল ঠিক অরোরা হাউসের পাশেই। অরোরা হাউসের বাইরে এলেই মিঃ বাওলার গ্যারেজ দেখা যেত এবং সেখানকার লোকেদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়া যেত। বাহাদুর শা এসে সফির সঙ্গে কথাকইছিল। সাফি বলেছিল যে মিঃ বাওলা ও মোমতাজ বিবি এখনি বাহির হবেন, হোলও তাই, তারা খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে এসে মিঃ ম্যাথুসকে গাড়ীতে তুলে নিলে তারপর চাউপাটী হয়ে মালাবার পর্ব্বতের দিকে গেল। ইন্দোরের দলও অমনি লাল মোটরে করে তাদের পাছু নিলে এবং পোষ্টাফিসের কাছে এসে বাওলার গাড়ীর নাগাল ধরলে। তারপর কি ঘটেছিল তা সকলেই জানেন এবং তার সাক্ষ্যেরও অভাব হবেনা। মিঃ বাও-লাকে পিস্তলের গুলিতে হত্যাকরা হয়েছিল এবং সে পিস্তলটাও ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া গিয়াছে। একজন লোক মোমতাজকে ধরে রেখেছিল, এমন সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, কতকগুলি বৃটিশ অফিসার ক্লাব থেকে তাজমহল হোটেলের দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা পথ ভুলে গিব্‌সরোডে চলে যায়, ফলে তারা এই ঘটনাস্থলে এসে পড়েন এবং তাঁরা কি করছিলেন তা তাঁদের সাক্ষ্যেই জানা যাবে।

অভিব্যক্তি

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সরকার

বিপুল এ বিশ্ব পল্লী, এর ঘরে ঘরে—
করুণার দীপ তব যে আলো বিতরে,
স্নিগ্ধ তার শান্ত জ্যোতি পবিত্র সুন্দর,
তুমি তার উৎস—আরো, আরো মনোহর।

প্রিয়া

খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন

সে যে জান্‌লা পাশে দাঁড়ায় আসি ভুবন ভুলানো,
শ্যামল মাঠের বুকের পরে জোছ্‌না লুটানো,
প্রিয়ে প্রিয়তমা আমার হৃদয় মাতানো,
ফাগুন দিনের মলয় ভরা স্বপন মাখানো।
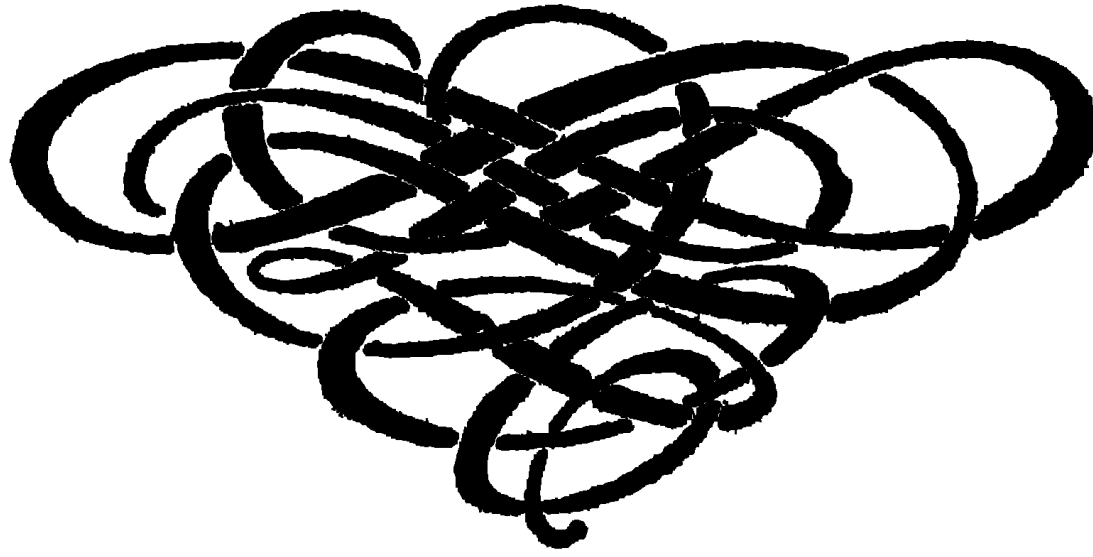
মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৩১—সত্যভূষণ ধরণীধর শর্ম্মা মহাশয়ের "প্রণবের ব্যাখ্যা" এ সংখ্যার ভারতবর্ষের প্রথম প্রবন্ধ। বক্তব্য বিষয়কে জটিলতর করাই যদি ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হয়, তবে সত্যভূষণ মহাশয়ের শ্রম সার্থক হইয়াছে। 'দরিদ্রতা' কবি কুমুদরঞ্জনের একটী কবিতা। উজানীর কবির কাব্যধারায় যেন ভাটা পড়িয়াছে। 'হিমের নিলামে কমলও ফেন্নার সলিলপ্রাসাদ ছাড়ে,' হেঁয়ালির মত দুর্ব্বোধ্য। "কপোতাক্ষী তীরে" কবিশেখর নগেন্দ্রনাথসোম বিরচিত একটী সনেট, পড়িয়া তৃপ্তি পাইলাম। "পল্লীবিধবা ও শিক্ষা" প্রবন্ধে লেখিকা পল্লী বিধবার প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটী অপ্রিয় সত্য কথা কহিয়াছেন এবং সমস্যার উত্থাপন মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু সমাধানের পন্থা দেখান নাই। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে এই সমস্যার সমাধান হইবে—ইহাই কি লেখিকার মত? গত সংখ্যায়) শ্রীমতি রাধারাণী দত্ত সতীত্ব মনুষ্যত্বের সংকোচক না প্রসারক প্রবন্ধে লেখিকা যে অদ্ভুত মত (অবশ্য লেখিকার নিজস্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতি সংযত ভাষায় তাহার উপযুক্ত প্রতিবাদ করিয়াছেন। স্ত্রী-শিক্ষা ও নারীজীবনের নামে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবর্ত্তন বঙ্গসমাজের পক্ষে কল্যাণকর কি না তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত স্বজননাথ মোস্তফীর মহম্মদপুর, এবং উদীয়মান লেখক গৌরীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের 'অজ্ঞাত পর্ব্ব' শীর্ষক ঘাটশিলা সম্বন্ধে ভ্রমণ কাহিনী বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে। "নৃতত্ত্বে জাতি নির্ণয়" Anthropology সম্বন্ধে অধ্যাপক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সুলিখিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ। বিজ্ঞানের এই নূতন শাখা সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় আলোচনা করিয়া অধ্যাপক মহাশয় মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করুন, ইহা আমাদের প্রার্থনা। হস্ত-পদাদির বিকৃতি প্রবন্ধে ডাঃ সত্যকুমার রায় শরীর গঠনে প্রকৃতির খেয়ালের পরিচয় দিয়াছেন। "মেটো হাকিমের কড়চা" পড়িয়া তৃপ্ত হইতেছি। রায় যতীন্দ্রনাথ সিংহ বাহাদুরের "উড়িষ্যার চিত্র" পরলোকগত যতীন্দ্রনাথের 'বেহার চিত্রে'র পর এই সাঁওতাল চিত্রটী আমাদের ভাল লাগিয়াছে লেখকের ভাষাও বেশ স্বচ্ছ; লেখনী ও শক্তিশালী। "অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে" প্রেততত্ত্বসম্বন্ধে আলোচনা, স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তৎপ্রণীত ছায়াদর্শনে এবিষয়ের সমক্যরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন। লেখকদের নিকট আমরা এবিষয়ে নূতনতথ্যের আশাকরি। "জাগরণ" রেবাদেবী লিখিত ছোট গল্প,plot মামুলী, কিন্তু লেখিকার রচনাশক্তি গল্পটীকে একেবারে ব্যর্থ করে নাই। ডাঃ নরেশচন্দ্রের রাজগী সৌরীন্দ্র মোহনের "পিয়ারী" ক্রমশঃ চলিতেছে। নরেন্দ্রদেবের "গরমিল" কোন বৈদেশিক গল্প অবলম্বনে লিখিত গল্পের প্রথম কিস্তি, অনুবাদ হইলেও লেখক তাহাকে দেশী ছাঁচে ঢালিয়াছেন। কেদার বাবুর 'কোষ্ঠির ফলাফল' এই সংখ্যায় শেষ হইল নাকি?

মাসিক বসুমতী ফাল্গুন ১৩৩১—প্রথমেই শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সময়োচিত কবিতা "কে তুমি!" নাম না থাকিলেও উদ্দিষ্ট মহাপুরুষকে চিনিয়া লইতে অসুবিধা নাই। লেখকের অন্তরের ভক্তি রচনাকে পূত ও সরস করিয়াছে। "কথার ফেরিওয়ালা" সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসিক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লিখিত "গল্প নয়"—তবে সত্য ঘটনা না কি? গল্পই হউক আর সত্য ঘটনাই হউক, বিবাহের বাজারের জুয়াচোর ব্যবসাদার—"গৌরীশঙ্করের" চিত্রটী লেখক অতি নিপুণতার সহিত আঁকিয়াছেন। "টিরোলী আল্পসের তালে তালে" অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের ভ্রমণ-কাহিনী, লেখকের সঙ্গে আমরা তাল রাখিতে পারিতেছি না। সরকার মহাশয় যাহা লিখিবেন, তাহাই কি মাসিক সম্পাদককে ছাপিতে হইবে? "বিচার-বিক্রয়" সুলেখক শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের তথ্যপূর্ণ সংগ্রহ। ইংরাজ রাজত্বে আদালতের সৃষ্টি পুষ্টি মকর্দ্দামায়; কোর্ট ফিঃ বেচিয়া; গভর্ণমেণ্ট কত টাকা আয় করিতেছেন, তাহার বিবরণ লেখক দিয়াছেন। "ভারতের লৌহ" প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত ফনীন্দ্রনাথ ঘোষ H. H. Hayden সাহেবের বিবরণী হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাঠককে উপহার দিয়াছেন।

"ভারতের বনভূমি"ও সুলিখিত সংগ্রহ প্রবন্ধ! "গরীবের মেয়ে" সুলেখিকা অনুরূপাদেবীর উপন্যাস ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সম্বন্ধে প্রবন্ধ এইসংখ্যায় শেষ হইল। দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে ভূপেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টার এই সংখ্যায় বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। "হোলিখেলা" নামক কবিতায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পূত আবীরের পরিবর্ত্তে বসুমতীর অঙ্গে রাস্তার নর্দ্দমার অপবিত্র পঙ্ক ছড়াইয়াছেন। বাঙ্গালায়গন্থ সাহিত্যের ধারা আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের লিখিত বঙ্গভাষার ইতিহাস,—ক্রমশঃপ্রকাশ্য রচনাও কৌতূহলদ্দীপক এবার বসুমতীতে প্রকাশিত কবিতা গুলির মধ্যে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "বাসন্তী বন্দনা এবং গোলাম মুস্তাফার "নিশীথ রাত্রের পথিক" আমাদের ভাল লাগিয়াছে; রসরাজ অমৃতলালের "পুরাতন পঞ্জিকা" সতেজ চলিতেছে এবং বাঙ্গালীর নীরস অন্তরে হাসির লহরী ছুটাইতেছে "আস্তাবলে অমৃতলাল" রসরাজ একচক্ষে হাসিয়াছেন এবং অপর চক্ষে কাঁদিয়াছেন এই সংখ্যায় কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়ের বড় গল্প "অন্নপূর্ণা" আরম্ভ হইল,—চরিত্রটিকে যে ভাবে তিনি ফুটাইতেছেন তাহাতে আমরা একটি ভাল গল্পের আশা করিতেছি। মোটের উপর প্রবন্ধগৌরবে মাসিক বসুমতী ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে।

চিত্র-সমালোচনা

বসুমতী (ফাল্গুন)

বসুপত্নী ও বশিষ্ঠের কামধেনু—শিল্পী শ্রীযুক্ত বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পী নামজাদা হইতে পারেন কিন্তু চিত্রে শিল্প-প্রতিভার কোন লক্ষণই নাই; ইহা বটতলার উপন্যাসের যোগ্য চিত্র, হাত পা ইত্যাদিই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই চিত্রের যে কি দোষ তাহা দেখাইতে যাওয়া অপেক্ষা একটা চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেওয়া সহজ। আকাশ আসিয়া মাঠের সঙ্গে যুদ্ধ সুরু করিয়াছে। পেছনে সাদা একটা গরু (?) যেন তুলার দ্বারা তৈরী। কি গুণে যে ইহা বসুমতীর প্রথমে স্থান পাইল তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর।

ভাবাবেশে শ্রীরাধা—শিল্পী শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা, —প্রৌঢ়কে গোঁফ কামাইয়া শ্রীরাধা সাজাইয়া যাত্রারদলের কাজ চলিতে পারে কিন্তু শিল্পজগতে এরূপ গোঁজামিল অসহ্য। পাকচক্রে যা হ'য় কিছু বুঝাইয়া দিলে পটুয়ার সন্তুষ্ট হইতে পারে কিন্তু পাঠক তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন কি? এসব চিত্র দেখিলে কেবল দুঃখই হয়। এ শ্রেণীর চিত্রের প্রধান দোষ—প্রাণহীনতা; যেন আড়ষ্ট, নিস্পন্দ, কোন গতিই নাই। ময়ূরটী কি মাটীর? ব্রজপ্রেম চিত্রে ফুটাইবার মত প্রাণে ভাবুকতা ও শক্তি না থাকিলে এ প্রয়াস বিড়ম্বনা নয় কি?

ভারতবর্ষ।

উষা—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত অঙ্কিত। বিদেশীয় চিত্রের বাতাস লাগিলে এদেশের চিত্র কখনও সজীব হইতে পারে না, কারণ বিদেশীয় মানসিক চিন্তার সঙ্গে ভারতীয় কল্পনা ধারাব বহু পার্থক্য আছে। চিত্রের মধ্যে জাতীয় ভাবটুকু ধরা না পড়িলে কেবল সাজ সজ্জায় কি হইবে? রঙের আন্তশ্রাদ্ধ বটে!

তন্ময়—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দে। অতি মামুলী চিত্র। ফটোগ্রাফকে রং চং করিয়া দেওয়া হইয়াছে। টেবলের উপর হাত রাখিতে কষ্ট হইয়াছে বলিয়া একটা বালিশ অস্বাভাবিকভাবে দেওয়া হইয়াছে। মুখে যে ভাব প্রাণে সে ভাব নাই। এসব চিত্র ছাপা হইলে শিল্পী নিজেকে ধন্য মনে করিতে পারেন কিন্তু সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য তাহাতে সুসম্পন্ন হয় কি?

বৈরাগ্য—শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গোস্বামী অঙ্কিত। মন্দের ভাল—অন্যান্য বিষয়ে এটী 'পদস্থ' বটে। কিন্তু নামটী "বৈরাগ্য" দেওয়ার মানে কি? বেশভূষাই যখন বলে দিচ্ছে বৈরাগ্য ঢের দিনের, তখন কেতাব হাতে দিয়া কি নূতন বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে বুঝান হইতেছে? চিত্রের যোগ্য নামকরণ হয় নাই।

ভজন—শিল্পী এম পি বর্ম্মা। ইনিও পূর্ব্ববৎ। পিছনে একটা গাছ দাঁড়াইয়া আছে—সেটা মানুষের হিসাবে যে কত ক্ষুদ্র হইয়াছে তাহা শিল্পী কি জানেন না। যাঁহারা শিল্পকে প্রাণের জিনিষ মনে করিয়া থাকেন তাঁহারা এরূপ চিত্র কখনও আঁকিতে পারেন না। চিত্র-শিল্প ক্রমে ছেলেখেলার সামগ্রী হইয়া পড়িল।

ষষ্ঠির গোষ্ঠী—ব্যঙ্গ চিত্রাবলী জে সিংহ। আঁকাব চেয়ে ছড়া কাটবার ক্ষমতা শিল্পীর বেশী। ব্যঙ্গ চিত্রের চিত্রেই যদি রস না রহিল তবে কতকগুলা কিম্ভূত কিমাকার আঁকিয়া তলায় বাক্য-বিন্যাস কবিলে সে উদ্দেশ্য সফল হয় না। আমাদের এক বন্ধু বলিয়াছিলেন "গোষ্ঠির পিণ্ডী" নাম দিলেই ঠিক হইত। আজকাল অতিকায় মাসিকগুলি পাল্লা দিয়া ছবিব সংখ্যাই বাড়াইতেছেন কিন্তু এতে কি শিল্পের উন্নতি কোন কালে সম্ভব হইবে? রঙের ও কাগজের শ্রাদ্ধ করিয়া আর্টকে বলিদান দিয়া আর কতদিন চলিবে?

প্রবাসী—চৈত্র ১৩৩১

হর-পার্ব্বতী—শ্রীযুক্তা প্রতিমাদেবী অঙ্কিত। চিত্রে হরগৌরী কথা লিখা আছে কি না জানি না, তবে পরিশ্রমের প্রমাণ আছে; এবং বর্ণ ও তুলিকায় উপর অধিকার মন্দ হয় নাই। স্ত্রীলোকের অঙ্কিত চিত্র না বলিয়া পুরুষের বলিলেও কোন দোষ নাই। আমাদের মনে হয় এত দুর্ভেদ্য না করিয়া সাধারণ হরগৌরী অঙ্কিত করিলেই সকলের বোধগম্য হইত।

সমুদ্রতীরে শ্রীচৈতন্য—শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত। এ চিত্রটী অরিয়ানট্যালকেও হার মানাইয়াছে। চৈতন্যের কোন লক্ষণই নাই যেন সম্পূর্ণ অচৈতন্য একটা মৃত্তিকাপিণ্ড। শিল্পী বয়সে প্রাচীন বিচক্ষণ এবং যশঃও যথেষ্ট আছে সুতরাং এসব চিত্র না হইয়া যায় কোথায়? শ্রীচৈতন্যদেবেব কুষ্ঠীতে এ বছরটা নেহাত খারাপ লিখাছিল বলিয়া বোধ হয় নতুবা এমন দুর্দ্দৈবের হাতে পড়িবেন কেন?

আনমনা ও চন্দ্রকলা—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল অঙ্কিত। রেখা চিত্র আঁকিয়া নীচে নাম উল্লেখ কবিবাব পূর্ব্বে একটু ভাবিয়া দেখা উচিত চিত্রে কোন রূপেব আধিক্য হইয়াছে। আনমনা চিত্রে নায়িকাব যেন মবণবাঁচনের সংগ্রাম চলিতেছে সুতবাং নাম দেওয়া উচিত 'দোটানা।' (অর্থাৎ ইহকালের টান ও পরকালের টান) চন্দ্রকলা নাম কেন হইল? কাণা ছেলের নাম পদ্ম লোচন! ছবিতে রূপ দিবার শক্তি নাই অথচ অভিধান ঘাটিয়া জোলুসওলা নাম খোজা চাই। কাগজওয়ালাদের দেখা উচিত ব্লকের দামের খরচা পোষাইবে কি না।

কৃতজ্ঞতা

শ্রীপ্রসাদদাস চট্টোপাধ্যায়

মুখটী তুলে কমল বলে—"অরুণ তুমি সুন্দর"
অরুণ বলে সত্য নাকি
কোন চোখেতে দেখলে সখী
কি আলোতে দেখলে আমায় এত মনোহর?"
"তোমার আলোয় সরম টুটি
ফুটল আমার নয়ন দুটী
সেই আলোতে দেখি তোমায় প্রিয় নিরন্তর।"

চিত্রশালা

ষ্টারে 'বিষবৃক্ষ'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই সুন্দর সামাজিক উপন্যাস, নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ষ্টার থিয়েটার অভিনয় করিতেছেন। বিষবৃক্ষ পূর্ব্বেও অনেকবার অভিনীত হইয়াছে কিন্তু এ শ্রেণীর পুস্তক 'চির নূতন' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এখনও ইহা অভিনয়-রসপিপাসু দর্শকগণকে সমভাবেই তৃপ্তি দান করিতেছে। এবার নূতনত্ব হইয়াছে 'দেবেন্দ্রনাথের' ভূমিকায়, শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ী মধুর সঙ্গীতে ও সুন্দর অভিনয়ে ভূমিকাটীকে সজীব করিয়া তুলিযাছিলেন। এমন কি দেবেন্দ্রের মন্ত পানজনিত জড়িত স্বরে অভিনয় ও মত্তপের অসংযত গতিও বেশ স্বাভাবিক হইয়াছিল। সূর্য্যমুখী—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী। অভিনয় অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছে এমন কি বর্ত্তমান যুগে এ ভূমিকায় অধিকতর যোগ্যতা যার কেহ দেখাইতে পারেন কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। কুন্দ—শ্রীমতী নীহারবালা। বিষাদময়ী সরলা কুন্দের চরিত্র এই উদীয়মানা অভিনেত্রীর অভিনয় নৈপুণ্যে জীবন্ত হইয়াছিল। সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিনয় হইয়াছিল কুন্দের 'না'; যে পরিচ্ছদে বঙ্কিমবাবু অদ্ভুত রচনানৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহা আজ অভিনয়েও সার্থক হইল।

হীরা—শ্রীমতী সুবাসিনী। গানে, হাবভাবে 'হীরা' সত্যই হীরার টুকরার মত জলজল করিতেছিল। দেবেন্দ্রের সহিত হীরার সংগীত সংগ্রাম সত্যই উপভোগ্য।

কমলমণি—শ্রীমতি রাণী সুন্দরী। এ ভূমিকায় ইঁহার কণ্ঠস্বর উপযোগী হওয়ায় অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল।

শ্রীশচন্দ্র—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী। নির্ম্মল বাবুর শ্রীশচন্দ্র ছবির মত হইয়াছিল। তিনি Docile Husbandর উৎকৃষ্ট নমুনা দেখাইয়াছিলেন। এ রকম শ্রীশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চে বহুকাল দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

নগেন্দ্র—শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। অভিনয়ের ভাবাভিব্যক্তি সুন্দর হইলেও কণ্ঠস্বর এবং আবৃত্তির সুর সামাজিক নাটকের নায়কের যোগ্য হয় নাই। এরূপ স্থানে সুর বা নূতন পদ্ধতির গোটা গোটা উচ্চারণ বেশ ভাল লাগে বলিয়া মনে হয় না। মোটের উপর তাঁহার অভিনয় দেখিবার সময় তাহা যে অস্বাভাবিক এই কথাই মনে হইতেছিল, তবে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং মহলা দিবার বিশেষ সময় পান নাই, এ সকল কারণেও এ শ্রেণীর ত্রুটী হওয়াও অসম্ভব নয়।

ডাক্তার ও সুরেন্দ্রের ভূমিকা দুটী চলনসই—সুরেন্দ্র, দুর্গাদাস বাবুর যোগ্য হয় নাই—হরদেব ঘোষাল মোটেই ভাল হয় নাই। ছোট ছোট ভূমিকার মধ্যে কৌশল্যা, নগেন্দ্রের ভৃত্য প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য।

মিনার্ভা থিয়েটার—সুগায়িকা প্রিয়দর্শনা শ্রীমতী আঙ্গুরবালা ইঁহাদের সম্প্রদায়ে যোগদান করায় ইঁহাদের সঙ্গীতের দিকটা বেশ পরিপুষ্ট হইল। সম্প্রতি ইনি বরুণায় 'বরুণা' ও রেশমী রুমালে বাইজী হইয়া অবতীর্ণা হইতেছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে সকলের ধারণা একরূপ হয় না—কেহ মিষ্ট সুর খোঁজেন কেহ বা তালমান বোঝেন। একদল হয়তো বলিবেন "যে ইহা বিস্বাদ ও অম্ল রসে পরিপূর্ণ, আর একদল হয়তো 'বাহবা' দিবেন আমরা

কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করি। এঁরা শীঘ্রই ডাক্তার নরেশচন্দ্রের "ঠকের মেলা' অভিনয় করিবেন, তারপর ভূপেন বাবুর 'দুর্গা শ্রীহরি'। তবে এটা সত্য, যে গীতি-নাট্য বা প্রহসন অভিনয়ে ইহাঁরাই বর্ত্তমানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়। জোর বরাত, কৃতান্তের বঙ্গদর্শনের সার্ব্বজনীন সুখ্যাতি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

মনোমহন নাট্য-মন্দির—৪।৫ বার প্লাকার্ড লাগানোর পর পুণ্ডরীকের আর সাড়া শব্দ না পাইয়া আমরা ক্রমশঃ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছি। শুনিতেছি 'জনা'ই নাকি ইহাঁরা সর্ব্বাগ্রে অভিনয় করিবেন। যাহা হউক একটা কিছু নূতন না পাইলে শিশির বাবুর অভিনয় নৈপুণ্য দেখিবার আর সুযোগ হইতেছে না। বিশেষতঃ এখানে তারাসুন্দরীর বহুদিন পরে অভিনয় দেখিবার জন্য অনেকেই অধীর হইয়া উঠিতেছেন। এ আগ্রহের সুযোগ পূর্ণরূপে উপভোগ করা প্রত্যেক সুব্যবসায়ীর উচিত। শিশিরবাবু কলাবিদ হইলেও কলাশিল্পকে যখন তিনি ব্যবসাহিসাবে অবলম্বন করিয়াছেন তখন ব্যবসার দিকটা উপেক্ষা করা তাঁহার উচিত নহে।

প্রেমাঞ্জলি।—ম্যাডান কোম্পানীর প্রস্তুত এই নূতন চলচ্চিত্রখানি আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। ইহা ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লীগীতিকা অবলম্বনে রচিত প্রেমের মর্ম্মস্পর্শীকাহিনীর চিত্র। সিনারিও লেখার দোষে ঘটনাতে তেমন নাট্যসৌন্দর্য্য ফুটে নাই তবে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোরম সৌন্দর্য্যে চিত্রখানি বিশেষ ভাবে গৌরবান্বিত। অভিনয়ের মধ্যে দুর্গাদাসবাবুর রত্না ও মহুয়ার সহচরীর অভিনয় উল্লেখ যোগ্য বাকী সবই মামুলী অভিনয়। ফটোগ্রাফি বেশ ভালই হইয়াছে। মোটের উপর চিত্রখানি উপভোগ্য বলা যাইতে পারে আমাদের মনে হয় সিনারিও লেখা ও অভিনয় তত্ত্বাবধান করার ভার যোগ্যতর লোকের হাতে যাওয়া উচিত কারণ ইহাঁদের চিত্রে এই সকল বিষয়ে যথেষ্ট তত্ত্বাবধানের চিহ্ন পাওয়া যায় না। নতুবা অর্থব্যয় বা শ্রম স্বীকার করিতে ইহাঁরা যে বিমুখ নহেন সে প্রমাণ যথেষ্টই পাওয়া যায় এ সকল দোষ সংশোধিত না হইলে ভবিষ্যতের উন্নতির আশা অল্প।

চাট্‌নী

শ্রীবাঁশরীভূষণ মুখোপাধ্যায়

ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ান

বিচারক (ক্রোধের সহিত)—এবার যে একটুও গোলমাল করবে, তাকে আদালত থেকে বার করে দেওয়া হবে।

কয়েদী (সোৎসাহে)—হুজুর আমি তো এই গোলমাল করেছি, আমাকে বার করে দেবার হুকুম হোক।

* * * *

পাওনাদার—মশাই, আপনার কাছে টাকাটা সাত বছর ধরে পাওনা রয়েছে। আপনি আজ নয় কাল, করে খালি ভোগাচ্ছেন।

বৈজ্ঞানিক অধমর্ণ—সে কথা ঠিক বটে, কিন্তু বাবু জান তো সাত বছরে মানুষের দেহের প্রত্যেক অণু পরমাণু বদলে যায়। বড় বড় পণ্ডিতেরা একথা বলে থাকেন। তাহলেই বুঝতে পার্চ্ছ যে লোক এসব জিনিস কিনেছিল, আমি আর সে লোক নই। আমি এখন বৈজ্ঞানিক মতে আমি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত।

* * * *

খরিদ্দার (রাগান্বিত ভাবে)—এত দাম দিয়ে সেদিন কাকাতুয়া পাখীটা কিনে নিয়ে গেলুম, আর এর মধ্যেই পালকগুলো যে সব খসে খসে পড়ছে ?

দোকানদার (স্মিতবদনে)—মশাই, একি যেসে পাখী আর্টে এর মাথা কিরকম বুঝুন! শীতকালে গাছের পাতা ঝরে পড়ে জানেন তো তবে ওর পালক খসতে আরম্ভ হবে না কেন ? কাকাতুয়ারা যেমন যা শোনে তাই বলে তেমনি যা দেখে তাই কর্ত্তে শেখে।

* * * *

আফিসের দারওয়ান। বাবু, ছাতাটা বাহিরে রেখে ভেতরে ঢুকবেন।

ভদ্রলোক। দরওয়ানজী আমার তো ছাতা নাই বাবা।

দারওয়ান। তা কি করবো বাবু, সাহেবের হুকুম, ছাতা বাইরে না রেখে ভেতরে ঢুকতে পারবেন না। তার চেয়ে এক কাজ করুন না দৌড়ে বাড়ী গিয়ে একটা ছাতা নিয়ে এসে বাইরে রেখে যান না।

Printed & Published by Sachindra Nath Banerji at the HIMANI PRESS.

সচিত্র শিশির সাপ্তাহিক

প্রথমবর্ষ] ২৮শে চৈত্র শনিবার, ১৩৩১ সন। ইংরাজী ১১ই এপ্রেল [৩৫শ সংখ্যা

সতীত্ব সংহার নাটক

ভারতের সতীত্বরূপিণী এক প্রাচীনাকে পশ্চাদ্দিক হইতে সাহিত্য সম্রাট যষ্টির আঘাত করিতেছেন সম্মুখ হইতে ডাক্তার সাহিত্যিক তীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া আক্রমণ করিতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা, স্ত্রীলাভ ও নারী-স্বাধীনতা-রূপিণী দুইটী নারীর হাত ধরিয়া এই হত্যা-উৎসব দেখিতে ছেন ও বলিতেছেন ; মারো মারো, এমন মারো যেন ওর অস্তিত্ব না থাকে। এখনও ওর জন্যই আমবা নির্ব্বিবাদে এদেশে আসর জমাইতে পাবিতেছি না।

রমজান

সৈয়দ আবদুর রসিদ বি-এ

রমজান মুসলমানের উৎসব। এ উৎসব সমগ্র মুসলেম জগতে একটা নূতন পবিত্র আনন্দধারা ঢালিয়া দেয়। সন্ধ্যায় যে শুভক্ষণে রমজানের চাঁদ নীলাকাশে তার স্নিগ্ধ-মধুর কিরণ বিকীর্ণ করে—সেই মুহূর্ত্ত হইতেই রমজান মাসের সূত্রপাত। তৎপর দিবস হইতে একমাসকাল সূর্য্যোদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত মুসলমানদের রোজা (উপবাসব্রত) এই একমাসকাল রমজান মাস।

গত ২৬শে মার্চ্চ রমজান চাঁদের উদয় হইয়াছে। সে দিনের সে সন্ধ্যায় সমগ্র মুসলেমের তৃষিত-নয়ন, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লালিমার মধ্যে স্নিগ্ধ-কিরণ-মণ্ডিত সুচিকণ চাঁদিমার ছটা দেখিবার জন্য কি আকুল ও ব্যাকুল হইয়াছিল। কি সুন্দর সে দৃশ্য, কি মধুর সে সন্ধ্যা—কি স্নিগ্ধ সে কিরণ! একটা দিনের জন্য তারা প্রতিদিনের অভ্যস্ত নিয়মিত কাজ ভুলিয়া গিয়া আনন্দে মাতিয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ বনিতা এ উৎসবে মাতোয়ারা। কত চাঁদের উদয় হয়—কত চাঁদ অস্ত যায়—কতদিন, কত মাস আসে, এই এত তৃপ্তি, এত আনন্দ এত ভক্তি-শ্রদ্ধা ত অন্য সময়ে দেখি নাই। রমজানের চাঁদ সত্যই সুন্দর, নির্ম্মল। তাই সারা মুসলেম জগতে একটা নূতন ধারণা ও প্রেরণার সৃষ্টি করিয়া দেয়।

হজরত মহম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন—এই রমজান মাসের আবির্ভাবে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত ও নরকদ্বার বন্ধ হইয়া যায়। প্রলোভনে মুগ্ধ সন্তান শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকে। পবিত্র এই মাস মুসলমানের শুধু সাধনা ও আরাধনার জন্য। এই মাসেই পবিত্র কোরাণ-সরিফ প্রথম অবতীর্ণ হয়। একটী কথা স্বতঃই মনে উদিত হয় যে দীর্ঘ একমাসকাল উপবাস করিবার প্রয়োজনীতা কি—দয়াময় আল্লাতালা তাহার সৃষ্ট জীবকে ক্ষুধার্ত্ত ও বুভুক্ষু দেখিয়া কি সুখী হয়েন? তাহা নহে, তিনিই সমগ্র মানবের সুখশান্তির নিয়ন্তা। তবে কেন এই উপবাস এত!—পবিত্র কোরাণ সরিফে লিখিত আছে—

"হে বিশ্বাসীরা রোজা তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে যেহেতু তোমরা ধার্ম্মিক হইবে।"

(কোরাণ ২, ১৭৯

বস্তুতঃ এই উপবাসব্রত মানবের চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া দেয়। কঠিনকে কোমল—মলিনকে নির্ম্মল করে। যিনি রোজা রাখেন খোদার নামে তার সমস্ত দুর্দ্দমনীয় অন্তর দমিত হয়। হজরত মহম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন—"যিনি রোজা রাখেন তিনি যেন কোন মন্দ কথা উচ্চারণ না করেন—কর্কশবাক্য, কলহ-বিবাদ না করেন। যদি কেহ রোজাদারকে (উপবাসব্রত পালনকারী) কুবাক্য বলেন—তিনি যেন উত্তরে কুবাক্য না বলেন।"

অন্যস্থানে লিখিত আছে—

"যদি কেহ রোজা রাখিয়া মিথ্যা কথা বলেন—আল্লা তাহার উপবাসের কোন পুরস্কার দিবেন না।"

যেমন স্বচ্ছ নির্ম্মল কাঁচেই প্রতিবিম্ব পড়ে—মৃত্তিকায় পড়ে না, তেমনি পবিত্র চিত্তেই কোরাণের পবিত্রবাণী প্রতিফলিত হয়। চিত্তকে পবিত্র করিতে পারিলেই আল্লার সত্তা উপলব্ধি করা যায়। উপবাস ব্রত পালন করিলে দূষিত চিত্ত পবিত্র হয় এবং পবিত্র চিত্তেই আল্লার বাণী অনুভূত হয়। বস্তুতঃ আহার বিহার করিলেই প্রকৃত খাটি মানুষ হওয়া যায় না। রোজার সময় প্রত্যেক মুসলমানের প্রধান কর্ত্তব্য এই যে সকল প্রকার আন্তরিক ও বাহিক পাপ হইতে বিরত থাকা। শুদ্ধচিত্তে পুণ্যসঞ্চয় করিতে হইবে। নামাজ ও কোরাণ সরিফ পাঠ করিতে হইবে। সাংসারিক বিষয়ে বিশেষ ভাবে লিপ্ত থাকিবে না। আলস্যে দিন কাটাইবে না—দিবসে নিদ্রা যাইবে না। তাস, সতরঞ্চ খেলা বা অনাবশ্যকীয় কথোপকথন, উপন্যাস পাঠ—ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অতীত যুগের ইতিহাস পাঠেও উপবাসব্রতের উপকারিতা দেখা যায়। হঠাৎ বিপদাক্রান্ত হইলে অতীতকালের লোকেরা সমবেত হইয়া ঈশ্বরের মন্দিরে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিতেন—এবং যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের দুঃখের অবসান না হইত ততদিন পর্য্যন্ত উপবাসে কাটাইতেন। তাহাদের বিশ্বাস ছিল এই যে ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা পিতা পুত্রের স্থায়। যেমন পুত্রের দুঃখ দেখিলে পিতা তাহা দূর না করিয়া থাকিতে পারেন না—ঠিক তেমনি ঈশ্বর তাহার স্বষ্ট সন্তানের দুঃখ দেখিলে তাহা অপনোদন না করিয়া পারেন না। ভিন্ন ভিন্ন আকারে এই উপবাসব্রত ইহুদি, খৃষ্টান ও হিন্দুদের মধ্যেও দেখা যায়। বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধিও এই উপবাসব্রত পালন করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সূত্রপাত করিয়াছেন। মুসলমানের রোজার (উপবাস) বিশেষত্ব এই যে উপবাসের সঙ্গে সঙ্গে সত্যকথন, পবিত্র ও শুদ্ধচিত্তে দিন যাপন, সুচিন্তা ও ধর্ম্মকার্য্য ইত্যাদিতে সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে থাকিতে হইবে।

মাতাল

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ

আমার নেশা গেলে ছুটে
তুমি যে গো থাক্‌বে না
সেটা আমি জানি যে বেশ ভাল
তাই,
পাত্র পরে পাত্র চারি
নেশা আমার রাখি ভারি,
না হয়
নিবে যাবে সকল আঁখির আলো।
মাতাল ভাবে সবে মোরে
ক্ষতি তাহে মানিনা'রে,
মাতাল আমি মাতাল অতি খাঁটি,
সুরার সুরে মত্ত হ'য়ে
বেড়াই আমি ধেয়ে ধেয়ে,
মাখি-গায়ে ধূলা কাদা-মাটী।

সেই ধূলাতে ধূসর হ'য়ে
নাচি আমি গে'য়ে গে'য়ে,
নূপুর আমার বাজে চরণ বেড়ি।
সেই গানেরই তানে তানে
প্রাণ যে জাগে হাজার প্রাণে,
ফুলে ফুল শূন্য যে যায় ভরি।
সে ফুল পাছে যায় যে খ'সে,
স্বপ্ন পাছে যায় গো ভেসে
এই তরঙ্গে ত্রস্ত সকল বন,
তাই
ফুটল যারা আমার গানে,
চেয়ে তাদের মুখের পানে,
মাতাল আমি—রব অনুক্ষণ।
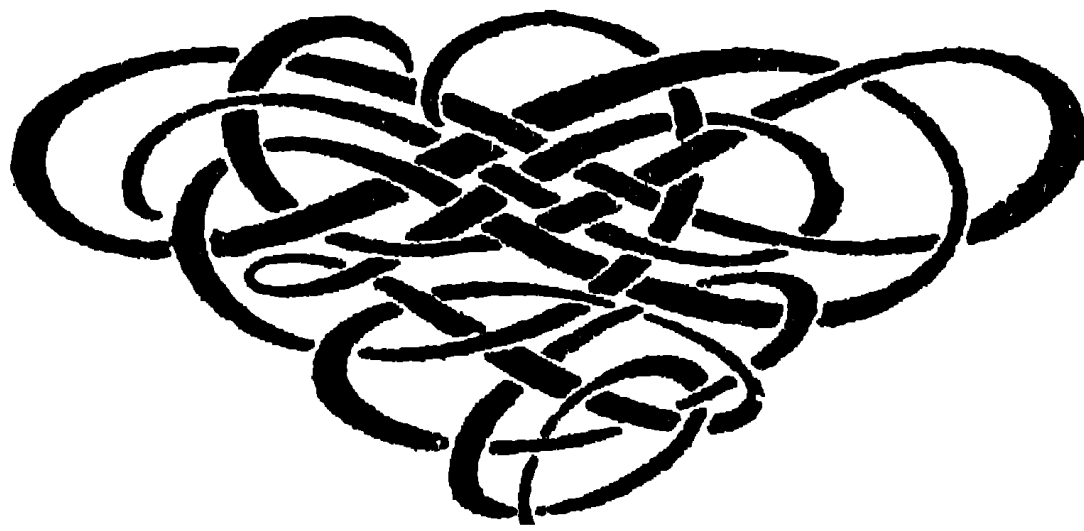
সুরের নেশা

(রূপক)

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ

তার সম্বলের মধ্যে ছিল এক বাঁশী। এ বাঁশী তার মা যখন তাকে এ সংসারে একান্ত অসহায় করিয়া ছাড়িয়া যান তখন তার হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন "বাবা এই বাঁশী কখন ত্যাগ করিস্‌নে ···এ হ'তেই তোর সকল অশান্তি দূর হবে।"

সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিল "মা, আমায় তো কখনো বাঁশী বাজাতে শেখাও নি কে আব আমায় শেখাবে ?"

"ও তোর নিজের প্রাণের সুরেই বেজে উঠবে বাবা !···শেখাতে হবে না কারুর।"

সেইদিন হতে বাঁশী নিয়ে বিভোর সে। প্রথম যেদিন সে বাঁশীর বুকে তার নিজেব বুকের বেদনার সুর জাগিয়ে দিতে চাইল, সে দিন সবাই বিদ্রূপেব হাসিতে তার ক্ষুদ্র অঙ্গণটি কণ্টকিত করিয়া তুলিল। কেবল একজনের চোখের দৃষ্টি বাঁশীব সুবে ম্লান হইয়া শেষে ছলছল করিয়া উঠিয়াছিল। সে হচ্ছে পাড়া-গাঁয়ের ঝিউড়ি—সবে বিয়ে হয়েছে।

*   *   *   *

সেদিন আর নাই। এখন আর অনাদর অবহেলা নয়—তার বাঁশীর সুরে এখন সবাই পাগল। অদ্ভুত সে বাঁশরীর সুর! যে শোনে তারই মনে হয় বাঁশী যেন তাহারি প্রাণের বিশেষ ভাবটী অন্তর হইতে টানিয়া আনিয়া তাহাতে সুরের ফুলঝুরি ধরাইয়া দিয়াছে। সবাই বাঁশী শুনিতে পাগল—

"ভাই, আর একবার—আর একবার—" এই অনুরোধ সকাল হতে সন্ধ্যা, নিত্য—অহোরহ!

সবাই বিস্মিত পুলকে জিজ্ঞাসা করে কোত্থেকে এমন বাঁশী বাজাতে শিখলে ভাই!"···কিন্তু কেউ-ই জিজ্ঞাসা করেনা—তুমিতো সারক্ষণ আপনা-ভোলা হয়ে বাঁশীই বাজাও, খাও কি করে ? জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত সে কোন উত্তর দিতে পারিত না। সে ভাবনা তার ছিল না—সন্ধ্যার আঁধার ঘরে গিয়া সে রোজই দেখিত কে তার জন্যে ঘরের প্রদীপটা জ্বালিয়া ফলমূল মিষ্টি কত কি রাখিয়া গিয়াছে। কে রাখিয়া যায় এ প্রশ্ন সে কখনও করিত না···সুরের নেশায় এম্নি সে বিভোর।

*   *   *   *

আজ সে কেবলি হাঁপাইয়া পড়িতেছিল। বাঁশীর বিচিত্র মধুর সুর আজ যেন থাকিয়া থাকিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সকলের সাগ্রহ অনুরোধ মিটাইতে গিয়া আজ যেন সুরের নাগাল আর সে কিছুতেই পাইতেছিল না। শ্রোতাদেব মুখে সে তন্ময়তাব ভাব আজ আর তেমন জমাট বাঁধিতেছিল না। শ্রোতার দল ভাবিল এমন তো কোনদিন হয় না। আজ কেন এমন হইতেছে। আ- যাব বাঁশী সেও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলনা। কেন এমন হইল। সে যে আজ আটদিন উপবাসী এ খবর কেউ রাখেনা—একটা প্রাণী ছাড়া। সে আটদিন হইল শ্বশুর বাটী গিয়াছে।

ক্ষণকাল বিশ্রাম লইয়া সে আবার বাঁশী বাজাইতে লাগিল। শ্রোতাদের মনে হইল যেন সুরের নাদে বান ডাকিয়া চলিয়াছে—যেন সে উচ্ছ্বাস বাঁশীর বুক চিরিয়া ছিটকাইয়া পড়িবে!

হঠাৎ সকলে বলিয়া উঠিল—"ওকি—ওকি থাম—থাম—"

সে কিন্তু থামিল না—দুই চোখে দুষ্ট হাসির ঝিলিক হানিয়া বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্তের ঝলক বহাইয়া বিস্মিত আতঙ্কে শ্রোতাদের হৃদয় কাণায় কাণায় ভরিয়া দিয়া সে বাঁশী বাজাইতে লাগিল।

একজন শ্রোতা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিতেই, তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ শ্রোতার কোলে ঢলিয়া পড়িল।

প্রেম

(পুরুষের প্রতি)

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী

তোমাদের প্রেম ?
সে ত বালকের কথা,
কর-পরশন ভীতা
যেন লজ্জাবতী লতা !
তোমাদের প্রেম ?
সে ত দু'দণ্ডের খেলা
শুধু আমোদের তরে
কাটাইতে বেলা !
তোমাদের প্রেম ?
সে ত চূর্ণ হ'য়ে যায়
ক্ষুদ্র ক্রীড়নক সম
শুধু নিমেষের ঘায় !
তোমাদের প্রেম ?
সে ত ভুলাতে অবলা,
নিদ্রায় স্বপন সম
নিমেষের ছলা !
তোমাদের প্রেম ?
সে যে নেত্র অন্তরালে
ডোবে, সূর্য্য যথা সাঁঝে
দিক্ চক্রবালে !
তোমাদের প্রেম ?
হায়, নিশির আঁধারে
উজ্জ্বলা বিজলীবালা
বজ্র সহকারে ।
তোমাদের প্রেম ?
বন্ধু, বুকে বয়ে যাই
ধ্বংসকারী সেই বহ্নি
ক্ষুদ্র আমরাই ;
তোমাদের প্রেম ?
সেই বজ্রের অনল
আমরা পরশে করি
কোটীন্দু শীতল
তোমাদের প্রেম ?
দণ্ডে মথি এ সাগর
অমৃত তুলিয়া মোরা
রাখি চরাচর ।
তোমাদের প্রেম ?
মরুবক্ষে জলরেখা
ক্ষণমাত্রেই চিহ্নটুকু
নাহি যায় দেখা ।
তোমাদের প্রেম ?
দিব্য পুষ্পগন্ধ প্রায়
দখিণা বাতাসে এসে'
অমনি মিলায় !
তোমাদের প্রেম নহে
মন্দার কুসুম
সুধাবাসে পরিপূর্ণ
চোখে আধ ঘুম !
তোমাদের প্রেম ?
নিয়ে থাক গো তোমরা
সাধ মিটিয়াছে, আর
দিব নাহি ধরা !

চোর ধরা

(নক্সা)

শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সেদিন বৈকালে মেসে ফিরিয়া দেখি আমাদের সমস্ত থালাবাটী গেলাস ও সকলের ছাড়া কাপড়ের ভার লাঘব করিয়া ভৃত্যপুঙ্গব নিরুদ্দেশ ভ্রমণে চলিয়া গিয়াছে ও বামুন ঠাকুর সেই ঘোর সঙ্কটে থাকিবে কি পলাইবে মনে মনে তাহারই গবেষণা করিতেছে। আমরা তাহাকে অভয় দিয়া আমাদের জলযোগের ব্যবস্থা করিতে বলিলাম, ও রাত্রের মত কলাপাতা ও মাটীর গ্লাস আনাইয়া 'নিমন্ত্রণ' রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া নলিনের ঘরে গিয়া Enquiry committee বসাইলাম। বলা বাহুল্য অন্যান্য সমস্ত committeeরই মত তর্ক করিয়া আমরা কিছুই commit করিলাম না, বরং আসল জিনিষ omit করিয়া শেষে চোর ধরিবার কাহার কি অভিনব উপায় জানা আছে তাহার গল্প জুড়িয়া দিলাম। শার্লক হোমসের যত রকম ফন্দি পড়া ছিল একে একে তাহা সকলে উজাড় করিয়া ফেলিলাম—প্রিয় মুকুজ্যে, পাঁচকড়ি দে-ও বাদ গেল না। শেষে ঘরের এককোণ হইতে বিপিন বলিল যে তাহাকে যদি বলিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে সে একটী স্বদেশী সনাতন পন্থায় চোর ধরিবার গল্প বলিতে পারে। আমরা সকলেই সম্মত হইয়া চুপ করিলাম। বিপিন বলিতে লাগিল,——

"আমাদের গ্রামের পুরোহিত ছিল কৈলাস ভট্টাচার্য্য, তিনকুলে তার কেউ ছিল না এক তৃতীয় পক্ষের ব্রাহ্মণী ভিন্ন। ছেলে হবে ছেলে হবে ক'রে তিন তিনটে বিয়ে করেও বংশরক্ষে হোল না। তবুও ব্রাহ্মণ পয়লা নম্বরের কৃপণ ছিল। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত থালা ঘড়া শাল দোশালা হ'তে আরম্ভ করে সোণা রূপার দান নগদ টাকা তার বিস্তর ছিল; এই সকলের বিশ্বাস। ব্রাহ্মণ কিন্তু ভিজে চাল ছোলামটর শুকিয়ে, খেত—পোর্‌তো মাটিহাতি দেনো ধুতি,—এমন কি তৃতীয় পক্ষের ব্রাহ্মণীর জন্যেও পয়সা খরচ করে কখন কিছু কিন্‌তো না। থাক্‌তো একখানা মাটীর দেওয়াল দেওয়া চালা ঘরে। আমরা ভয় দেখিয়ে বল্‌তাম—পুরুতমশায় একখানা অন্ততঃ পাকা দালান তুলুন—নইলে কবে চোরে সিঁদ দিয়ে সব চুরী করে নিয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ হেসে ব'ল্‌তো—তার মেহনতই সার হ'বে, নিতে কিছুই পার্‌বেনা—থাক্‌লে ত নেবে। আমরা অনেক ফন্দী করেছি, কিন্তু তার কাছে কখনও কিছু আদায় কর্‌তে পারি নি।

"সেবার বারওয়ারী পূজার সময় বড়'র দল ঠিক কেলে বন্দোবস্ত করেছিল। আমরা তখন ছেলে মানুষ ছিলাম—আমাদের ছেলের দল ঠিক ক'র্‌লে থিয়েটার করতে হবে। খুব উঠে পড়ে রিহার্সাল দিতে লাগলাম। কিন্তু হিসাব ক'রে দেখা গেল ষ্টেজভাড়া ড্রেসভাড়া চুলভাড়া ইত্যাদি ক'রে অন্ততঃ একশ টাকার কমে থিয়েটার হ'বে না। ব'ড়র দল যাত্রায় খরচ ক'রবে—আমাদের আর সাহায্য করতে রাজী হোল না। আমরাও সব হয় পোড়ো—না হয় one-fiveএর চাক্‌রে আর না হয় বেকার যুবক। টাকা পাওয়া যায় কোথায়! সকলে মিলে পুরুত ঠাকুরুণকে গিয়ে ধরলাম, কিন্তু কিছু ফল হল না—যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে—যেমন দেবা তেমনি দেবী। তখন সকলে মিলে ঠিক কর্‌লাম কৈলাস ভট্টচার্য্যের বাটীতে সিঁদ দিতে হবে। আমোদের জন্য কৃপণের টাকা চুরী করায় দোষ নেই, আমাদের চাণক্য মশায় এই নীতি পাশ করে দিলেন। ঠিক্ হোল কৈলাস ভট্টচার্য্য প্রায়ই বাইরের যজমান বাড়ী যায় সেইরকম একটা দিনে, তিন চারজনে মিলে কৈলাস ভট্টচার্য্যের বাড়ী সিঁদ দিয়ে ঢুকে একশ টাকা নিয়ে সবে পড়্‌ব।

"সেইমত সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে একদিন শুন্‌লাম কৈলাস ভট্টচায্ বাইরে গেছে। আমরাও চারজনে একটা শাবল নিয়ে রাত বারটার পর তার বাড়ীর কানাচে

গিয়ে হাজির। কিন্তু গিয়ে শুনি ঘরের মধ্যে ভড়াক্ ভড়াক্ করে তামাক খাওয়ার শব্দ হচ্ছে। কৈলাস ভট্‌চায্ ফিরে এসেছে বুঝে সে রাতে আমরা চম্পট দিলাম। কিন্তু পরের দিন সকালে খবর নিতে গিয়ে পুরুতঠাকরুণের কাছে শুন্‌লাম কৈলাস ভট্‌চায্ ভিন্ গাঁয়ে গেছে কার পৈতে দেবার জন্যে—রাত্রে ফিরবে। মহাবিস্ময়ে একটু মিথ্যা মিশায়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—'তবে যে মানিক চৌকিদার বল্‌লে তিনি রাত্রে ফিরেছেন?—তিনি তামাক খাচ্ছিলেন, তার হাঁকে গলা-খ্যাকার দিয়ে সায় দিয়েছিলেন?'

আমাদের ভেতরের খবর পুরুতঠাকরুণের জানা ছিল না। তিনি অকপটে ব'লে দিলেন—'একা থাকি দাদা,—চোরটোরের ভয়ে রাতে ঘুম ভাঙলে একটা ডাবায় জল রেখে পাকাটী দিয়ে টেনে তামাক খাওয়ার মত শব্দ করি,—আনাচে কানাচে যদি কেউ থাকে বুঝবে কর্ত্তা বাড়ী আছে।' এই ব'লে একগাল হেসে আমাদের একেবারে বোকা বানিয়ে দিলেন।

"যাই হোক্ আবার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম, সুযোগের অভাবও হোল না। পাশের গাঁয়ে জমিদার চৌধুরীদের মার শ্রাদ্ধে খুব ঘটা—তাই দিন তিন চারের জন্যে কৈলাস ভট্‌চাযের ডাক পড়্‌লো। আমরাও সেই সুযোগে প্রস্তুত হয়ে তার বাড়ী সিঁদ দিতে গেলাম। আমি ছিলাম সবচেয়ে ডানপিটে,—আমিই প্রথমে ভেতরে ঢুক্‌বো এই ঠিক হলো।

সে রাত্রে আর তামাক খাওয়ার শব্দ শোনা গেল না। পুরুত ঠাকরুণ নিদ্রিত জেনে আমরা আমাদের কাজ আরম্ভ করে দিলাম। যথাকালে সিঁদ কাটা শেষ হোলে আমি ধীরে ধীরে পা বাড়িয়ে দিয়ে পরীক্ষা ক'রে নিলাম। কোন বাধা না পাওয়াতে ধীরে ধীরে যাই মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছি অমনি একখান হাত প'ড়লো আমার ঘাড়ে, আর একথাবা উগ্র ভট্‌চাযে নস্যি সমেত আর একখানা হাত আমার নাকে চেপে ধর্‌লে। নিমেষে নাকে চোখে মুখে সেই উগ্র নস্যি ঢুকে ত্রিভুবন অন্ধকার করে দিল। কোন মতে মাথাটা পুরুত ঠাকরুণের কবল হতে টেনে ছাড়িয়ে এনে সকলে মিলে ছুটতে লাগ্‌লাম। সঙ্গে সঙ্গে পুরুতঠাক্‌রুন ঘরে তালা লাগিয়ে 'চোর চোর' ক'রে আমাদের পিছনে ছুটতে লাগলেন।

"আমার ছুট্‌বার ক্ষমতা বেশী ছিলনা—সঙ্গীরা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু দু'পা এগুই আর হাঁচি আর সঙ্গে সঙ্গে পুরুত ঠাক্‌রুণ 'ঐ চোর ঐ চোর' বলে চীৎকার ক'রে ওঠেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাড়ার সব লোক জেগে উঠে পিছু নিল—হতভাগা কুকুরগুলো পর্য্যন্ত পাছে লাগল। আমরা বনবাদাড় ভেঙ্গে খানা-ডোবা ডিঙ্গিয়ে একটু লুকোই, আর এই হাঁচি—আর সঙ্গে সঙ্গে 'ঐ চোর ঐ চোর' শব্দ। ছুটি আর হাঁচি আর 'ঐ চোর ঐ চোর' শব্দ।—লুকোই আর হাঁচি আর 'ঐ চোর ঐ চোর' শব্দ। ছেলেবেলায় লুকো-চুরি খেলবার সময় যে সব দুর্গম স্থানে লুকাতাম সেই সব জায়গায় গিয়েও পরিত্রাণ নেই,—পোড়া হাঁচিই সব বেফাঁস করে দেয়। ছুটও থামে না হাঁচিও থামে না, 'ঐ চোর ঐ চোর' রবও থামে না;—হাঁচি লক্ষ্য ক'রে চোরের পাছে লোক ছুটতে লাগ্‌লো। সঙ্গীরাও যঃ পলায়তি স জীবতি প্রথা অবলম্বন ক'র্‌লে। আমি শেষে নিরুপায় হ'য়ে আত্মসমর্পণ ক'রে বল্লাম—আর হাঁচতে পারি নে, এই ধর,—ধরে আমার হাঁচিটা থামিয়ে দাও।

তখনকার আমার অবস্থা বর্ণনা করবার মত বিদ্যে আমার নেই। সেই দারুণ হাঁচির কষ্ট,—মুখ জ্বালা চোখ জ্বালা,—তার ওপর সকলের বিদ্রূপ। আমার আমার তখন খালি মনে হচ্ছিল ধরণী দ্বিধা হও মা। পুরুত ঠাক্‌রুন বল্লেন—ওমা, একি বিপিন তুই? তাই বুঝি সেদিন তামাক খাওয়ার খবর নিচ্ছিলি? হারু ঘোষ বল্লে—ও হরি, তাই বুঝি ঠাকুর কুস্তি করে গায়ে জোর কর! ইত্যাদি। দেখতে দেখতে বাবাও এসে পড়লেন এবং কিল চড় জুতো লাথি দুম্ দড়াম্ আরম্ভ করে দিলেন। হাঁচি কিন্তু তখনো বন্ধ হয় নি। শেষে হাঁচতে হাঁচতে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গোড়া থেকে সব প্রকাশ করে বল্‌তে পুরুতঠাক্‌রুণের বোধ হয় একটু দয়া হ'ল। তিনি বাবার হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করে বাড়ী নিয়ে গেলেন।

বিপিনের হাঁচির গল্প শুনিতে শুনিতে আমরা অতি কষ্টে হাসি থামাইয়া ছিলাম। এখন সকলে মিলিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে পড়িয়া মেস সরগরম করিয়া তুলিলাম। হাসির রোল থামিলে মোহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"তারপর রিজিয়ার কি দশা হোল ?

বিপিন বলিল—"আমাদের দলের পাণ্ডা ছিল হারাণ—তার বক্তিয়ারের পার্ট ছিল। গোলযোগ সব মিটে গেলে সে একদিন আড্ডায় এসে ব'ল্লে—

'যেই আশা লতিকারে এতদিন ধরি'
করিলাম সলিল সিঞ্চন—উৎপাটিত
হোল আজি মূলদেশ তার।—
আমিই জ্বালিয়াছি দীপ—আমিই আবার
ফুৎকারেতে করিব নির্ব্বাণ।

"তখন থিয়েটার বন্ধ করে দেওয়াই স্থির হ'য়ে গেল। আমাদের মহলা বন্ধ হ'য়ে যাওয়াতে পাড়ার মেয়েরা মহা দুঃখিত হ'য়ে পড়্লেন। পরে তাঁরা সকলে মিলে স্থির কর্‌লেন যে আমার চুরীর অপরাধের শাস্তি স্বরূপ আমার মা ও পুরুত ঠাকরুণ অর্দ্ধেক খরচ দিবেন—আর সব মেয়েরা চাঁদা ক'রে অর্দ্ধেক দেবেন। সেইমত চাঁদা করে রিজিয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হোল।"

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার মা না হয় তোমার অপরাধের শাস্তি স্বরূপ দণ্ড দিলেন, কিন্তু পুরুত ঠাকরুণ কেন দণ্ড দিলেন ?"

বিপিন হাসিয়া বলিল—"মেয়েদের বিচারে ঐ রকম রায় দেওয়া হ'য়েছিল ;—কেন তা জানিনে। বোধ হয় নস্য দিয়ে আমাকে আধমারা করে ফেলেছিলেন তারই শাস্তিস্বরূপ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কৈলাস ভট্‌চাযের কাছে কি ক'রে টাকা আদায় হোল।

বিপিন বলিল "বিমল চৌধুরীর মার শ্রাদ্ধে নগদে ও তৈজস পত্রে কৈলাস ভটচায্ একশ টাকার ওপর বিদায় পেয়েছিলেন। তিনি ফিরে আস্‌তেই পুরুত ঠাকরুণ বলেন যে তাঁর বাড়ীতে ডাকাত পড়েছিল,—থিয়েটারের দলের ছেলেরা রক্ষা করেছে। তাই পুরস্কার স্বরূপ তাদের থিয়েটার করবার জন্য পঁচিশ টাকা দিয়েছেন। পঁচিশ টাকায় তাঁর সর্ব্বস্ব রক্ষা পেয়েছে শুনে আর মোটা বিদায় পেয়ে তাঁর মনটাও বেশ প্রফুল্ল ছিল,—কাজেই বিশেষ আর হাঙ্গামা করেন নি।"

মোহিত জিজ্ঞাসা করিল—"পরে তিনি টের পাননি ?

বিপিন বলিল—"হ্যাঁ, টের পেয়েছিলেন বৈকি। তবে তাঁর গৃহিণীর চোরধবার কাহিনী শুনে খুসী হয়ে তাঁর ওপর আর কথা কন নি।"

কিছুদিন পরে কৈলাস ভটচাযের বাড়ী থেকে টাকা আদায় হ'য়েছিল বলে আমার কিন্তু চোর বদনামের বদলে 'বাহাদুর ছেলে' বলে নাম বেরিয়ে গেল" বলিয়া বিপিন হাসিতে লাগিল। আমরাও সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলাম যে বিপিনের কিছু বাহাদুরী থাক আর না থাক্ পুরোহিত ঠাকুরাণীর যে বাহাদুরী ছিল তাহা নিঃসন্দেহ এবং তাঁহার চোর ধরিবার ঐ পন্থা যে সনাতন ও স্বদেশী তাহাতে কোনই সন্দেহ ছিল না।

নিদাঘ

শ্রীরামেন্দু দত্ত

রিক্ত, কাঙাল, অভাগায়—
কোল দিতে কেহ নাহি চায় !
ধূসর ধরণী ধূলায় ঊষর, মরুময়—
ফলফুল হীন শুষ্ক মলিন তরুচয় ;
দীর্ণ গগনে ওঠে গরীবের হায় হায়—
কোল দিতে কেহ নাহি চায় !
তপ্ত তপন কৃপাহীন—
পিঙ্গলাকাশ বিমলিন !
জ্বলন্ত অনল দিনের অনিলে বহে যায়—
কুলায়ে কুলায়ে বিহগকুল শিহরায় ;
বহ্নি'র বুক ভরি' উঠে যেন মমতায় !
ফুলি' ফুলি' উঠে ধূলি-ঝঞ্ঝায় নিশিদিন—
পিঙ্গলাকাশ বিমলিন !
ঐ আসে ছুটে বৈশাখ !
আসে বিদ্রোহী মৈনাক !
দেবদারু, শাল, হয় পয়মাল ঝঞ্ঝায়—
ঐ বুঝি তার পক্ষ-পাতনে প্রাণ যায় !
সে ভীম দৃপ্তে এ ভীত বিশ্ব চমকায় !
ভীষণ জ্বালায় ঐ ছুটে আসে মৈনাক !
হুঙ্কারি' আসে বৈশাখ !

গল্প

প্রতিমা, তুমি কোথায় ?*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন

এক

সেবার ঘুরে বেড়ান বাতিকটা আমার এক পাহাড়ের চূড়ায় এসে কিছুদিনের জন্য পঙ্গু হ'য়ে প'ড়লো। সেখানে কুয়াসা রৌদ্র ও মেঘের এমনি যাদুকরী খেয়াল যে ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির রূপ বাদলায়, কখনো রৌদ্রে মেঘের ঝিলিমিলির ফাঁকে হাসির ঝরণা ছড়িয়ে পড়ে, আবার কখনো বা সাদা কুয়াসার তুলি বুলিয়ে গোটা পৃথিবীটাই মুছে ফেলে, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় পাইনের ঝাড়—সবজ অঙ্গুলি মেলে যেন আকাশ আঁকড়ে ধর্‌তে চায়, সবুজ ঘাসের উপর শুয়ে মেঘেরা নিদ্রা যায় ! কাজেই মন আমার কিছুদিনের জন্য সেখানেই বাঁধা প'ড়লো।

আশমানি পরদা ছিঁড়ে দলে দলে মেঘগুলি উড়ে এসে যখন বর্ষার আগমনী জানিয়ে দিয়ে গেল, তখন লোষ্ট্র-তাড়িত মৌমাছির ন্যায় দলে দলে প্রবাসযাত্রীর দল পাহাড় ছেড়ে রওনা হোল। স্বাস্থ্য নিবাসের শূন্য ঘর গুলিতে একে একে তালা পড়তে লাগলো। গিরি নগরীর পথে পথে রিক্স যাত্রীর খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দোকান পাট সবই খোলা কিন্তু ক্রেতার আর তেমন ভিড় নেই; তবে দু' মাসেই তারা সারা বছরের রোজগার ক'রে নিয়েছে।

বন্ধুবরের দেশে ফির্‌তে দিন দুই দেরী হোল। বন্ধুকে গাড়ীতে বিদায় দিতে গিয়ে দেখি, তিনি একজন মহিলার সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত। বন্ধুর ব্যবহারে বোঝা গেল, মহিলার সঙ্গে তাঁর অনেক দিনকার পরিচয়; দু'এক কথায় বন্ধুটি মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনি মিস্ প্রতিভা দেবী, এখানকার মহিলা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, দেশের কাজে ইনি জীবন উৎসর্গ ক'রেছেন।

আমি মহিলাটিকে সসম্মান অভিবাদন জানিয়ে বল্লুম, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে বড় সুখী হোলেম।

তিনি আমাকে নমস্কার জানাইতেই বন্ধুটি আমার কথা উল্লেখ ক'রে বল্লেন,—রবিবাবুর ভাষায় যাকে বলে সৃষ্টি-ছাড়ার দল ইনি একটি তাই। বিনা কাজে ঘুরে বেড়ানোই তার একমাত্র কাজ। তবে খেয়াল মত মাঝে মাঝে ছবি আঁকেন তিনি।

আমি বল্লাম, আর তোমার পরিচয়টাই বাদ থাকে কেন? ইনি বর্ত্তমান সাহিত্য জগতের একজন উড্ডীয়মান কবি, লেখক, ভাবুক, শিল্পী, দার্শনিক প্রত্ন ও প্রেততত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক—একাধারে সব।

বন্ধুটি বল্লেন,—থাক্ আর ছ্যাবলামী ক'রে কাজ নেই, এখানে আর ক'দিন আছ শুনি?

আমি বল্লাম,—ক'দিন? এই তো সবে মাত্র বর্ষার সুরু। ধূর্জ্জটীর ধূসর জটা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে; আকাশে বিদ্যুতের পন্নগফনা নাচিয়ে ভৈরবের নাচ সুরু হবে; গৌরীর কাঞ্চন কিঙ্কিনীর ন্যায় ঝরণার বারি ঝর্‌ ঝর্‌ করতে থাক্‌বে; এ সময় তুমি যেতে বল?

* Tchehov-এর গল্পানুসরণে।

মহিলাটী হেসে বল্লেন,—তা হ'লে দেখছি, বর্ষাটাই আপনার বেজায় প্রিয়।

আমি বল্লাম,—কেননা বর্ষার মত সৌন্দর্য্য যে আর নেই। বর্ষা রাজার মত এসে আকাশ জুড়ে রাজত্ব বিস্তার করে দেয়, আর তার ঐশ্বর্য্যেরও অভাব নেই;—ঢেলে দিতে তার কিছুমাত্র ও কার্পণ্য নেই।—সত্য নয় কি?

মহিলা মুচকি হেসে বল্লেন,—আপনার দেখচি চিত্রের চেয়ে কবিত্বের দিকেই ঝোঁক্ বেশী।

আমি হেসে বল্লাম,—ঝোঁক্ দুই দিকেই সমান। কাজেই মাঝ গঙ্গায় সাঁতার কেটেই যেতে হোল—কূলে আর উঠতে পার্‌লুম কই,—শুধু নাকানি চুবানিই সার হ'লো চিত্র আর কবিতা দুই যে এক জিনিষ,—একটায় বাইরের দিকটা ফুটিয়ে তুল্‌তে হয়; আব একটাব মনের ভিতরের ছবি আঁকিতে হয়। দুইই এক—শুধু সমাবেশের তফাৎ। তা এর দার্শনিক ব্যাখ্যা নিয়ে মাথা ঘামানো মোটেই কোন কাজের কথা নয়।

মহিলাটি বল্লেন,—সে আলোচনা ববং আর একদিন হবে। মা আর আমার ছোট বোন প্রতিমা দুজনেই ছবির ভারি ভক্ত। দয়া করে একদিন আমাদের ওখানে আস্‌বেন কিন্তু; মনে থাক্‌বে তো?

আমি বল্লাম,—খুব থাক্‌বে। তা বেশ একদিন আপনাদের ওখানে যাওয়া যাবে।

তারপর আমি বন্ধুকে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে বাসায় ফিরে এলাম।

দুই

আমার ঘরের চারিপাশেই কাচের দরজা জানালা; কাজেই বাইরের আকাশ আমি ঘরের ভিতর চেয়ারে বসেই স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই। আকাশ ঘিরে দলে দলে মেঘেরা যেতে সুরু করেছে, কাজকর্ম্ম নেই;—বিনা কাজে সময় কাটানো যে কি দায়, তা' ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না। কল্পনার থেই হারিয়ে মনের কাঁটা তখন নিজের বুকেই বিঁধতে সুরু করে। সময় সময় ইচ্ছা হোত, বুকের ভিতরটা খুলে এই জানালা দিয়ে পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে দেই। বাইরে মেঘের উপর মেঘ জমে আকাশ ভারী হয়ে উঠেছে। বৃষ্টির দরুণ বাইরের গাছপালা আর পর্ব্বতশ্রেণী সব অস্পষ্ট। জানালার কাঁচে বৃষ্টির ধারা এসে পড়ে মুক্তার মত ঝক্ ঝক্ কর্‌তে লাগ্‌লো। আর বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে জানালার ফাঁক দিয়ে এসে একটা করুণ সুর ঘরের ভিতর ভেসে বেড়াতে লাগ্‌লো। সেই সুর যেন আমার প্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত হয়ে উঠচে।

"হা সইঞা পেরুসে তেরি পেইঞা
সতাও কাহে মেরী নেকা—"

বিকাল বেলা আকাশ পরিষ্কার হ'ল। সূর্য্য অস্ত গেছে; কিন্তু তার লালিমা তখনো সাদা বরফ শৃঙ্গের একটা অপূর্ব্ব সুষমা বিস্তার করে রেখেছে। পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে সেই আভাটুকু এসে পথটিকে স্বপ্নময় করে তুলেছে। গাছের আগায় সোণালী আভা চিক্ চিক্ কচ্ছে; আর পথের পাশে মাকড়শার জালে ইন্দ্রধনুর রেখা রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। মানুষের জীবনে এইটুকু সুখের স্বপ্ন। পায়ের তলায় নূতন ঝরা পাতার মর্ মর্ শব্দ, নীচে বনের পাখীর কলরব, আর উপলের ঝরণার তান মিলে একটা অপূর্ব্ব মিশ্র ঝঙ্কার বাজিয়ে তুলেছে। এত সুরের মূর্চ্ছনা মানুষকে বুকে পুরে রাখ্‌তে হয়।

হঠাৎ নীচের একটা বাড়ীর দিকে আমার নজর পড়লো। দেখি, একজন বৃদ্ধ মহিলা বারেন্দায় উপবিষ্টা—পাশে ষোল সতের বছরের একটী মেয়ে; আর দূরে একখানা চেয়ারের উপর আমার পূর্ব্ব পরিচিতা শিক্ষয়িত্রী প্রতিভা দেবী পাঠে নিমগ্না। প্রতিভা দেবী, সুন্দরী বটে—তার জলজলে আঁখিতারায় একটা এমনি স্বাভাবিক প্রাখর্য্য আছে যে কিছুতেই তাঁকে অস্বীকার করে চল্‌বার যো নেই। কিন্তু যে মেয়েটী বৃদ্ধার পার্শ্বে উপবিষ্টা—সে চোক তুলে একবার উপরের দিকে চেয়েই মাথা নীচু করলো। সেই চাউনিতে এমন একটা স্নিগ্ধ শীতলতা আছে, যে দেখ্‌লেই মনে সহানুভূতি ও প্রীতির সঞ্চার হয়।

সেদিন যাব যাব ক'রেও আর যাওয়া হ'ল না, কেমন একটা সঙ্কোচের ভাব যেন মনের ভিতর বিঁধে রইল।

পরদিন কতকটা জোর ক'রেই যেন সেই বাড়ীর দিকে বেড়াতে গেলাম। বাড়ীর দরজা অবধি গিয়ে হঠাৎ ফিরে আসবার মতলব করছি অমনি প্রতিভা দেবীর সঙ্গে আমার চোখচোখি হয়ে গেল। কাজেই নিতান্ত নিরুপায় হইয়ে সেই বাড়ীতে ঢুকে পড়লাম।

প্রতিভা দেবীর মা ও বোন দুজনেই বাড়ীতে ছিলেন। তার মা বিশেষ করে আমার যত্ন আদর করলেন। প্রতিভা দেবী আমাকে পরিচিত করে দিতেই তাঁর মা বল্লেন,—তুমি আমাদের বাড়ী স্থ—র বন্ধু? বেশ স্থ—তো আমাদের ঘরের লোক। তা এতদিন আসনি কেন? তোমার কথা অনেক শুনেছি। তারপর তিনি বল্লেন, তিনি আমার আঁকা ছবিও দেখেছেন, আর তা ভালও লেগেছে। স্থ—র মারফৎ আমার একখানা ছবিও প্রতিমা ইতিপূর্ব্বে উপহার পেয়েছে, তা আমি কিন্তু মোটেই জানতুম না।

তিনি নিতান্ত আপনার লোকের মতই আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানা প্রসঙ্গ চলতে লাগলো। তারপর প্রতিভা দেবী সম্বন্ধে চুপে চুপে বললেন,—এমন মেয়ে আর হয় না। রাতদিন পরের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। এইতো কিছুদিন থেকে একটা দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যাপার নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। তারপর লোকজনের বাড়ীতে গিয়ে লেখাপড়া শেখানো, এ সব তো আছেই।

প্রতিমা মৃদুস্বরে বলল,—দিদি আমার রাতদিন কাজ কর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত। সেজন্য কত লোক দিদির সঙ্গে দেখা করতে আসে।

প্রতিমা এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। আমাদের কথা-বার্ত্তায় কিছুমাত্র যোগ দেয়নি। এখনো তার ছেলে-বেলাকার খুকী নাম ঘোচে নাই, এবং বাড়ীর কাজ কর্ম্মে সকলেই তাকে খুকী বলে মনে করে। কিন্তু দিদির প্রসঙ্গ উঠতেই সে মনের কথা কিছুতেই চেপে রাখতে পারলে না।

আমি যতক্ষণ সেখানে ছিলাম, প্রতিমা কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকেই চেয়েছিল। টেবিলের উপর একখানা ছবির বই ছিল, সেখানা হাতে নিয়ে পাতা উলটাইতেই প্রতিমা আমার পাশে এসে দাঁড়ালো এবং কোন ছবিটা কার—কোন সময় তোলা হয়েছে ইত্যাদির বিস্তৃত ইতিহাস একে একে আমাকে শোনাতে লাগলো। আর সেই সঙ্গে তার জীবনের খুঁটিনাটি অনেক কথা এমন স্বচ্ছ নির্ম্মল স্রোতের মত বেরিয়ে এল যে তাতে তার গভীর অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত যেন দেখা যাচ্ছিল।

এতক্ষণ প্রতিভা দেবী অন্দরে ছিলেন; হঠাৎ সেজেগুজে বেরিয়ে এসে বল্লেন,—আমায় মাফ করবেন। এখুনি আমায় এক জায়গায় যেতে হবে—কথা দিয়ে এসেছি। আপনি ওঁদের সঙ্গে আলাপ করুন বলিয়া প্রতিভা দেবী টকটক্ করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেবে গেলেন। প্রতিভাদেবীর মা আমার কাছে একটু সরে এসে দুই চার বার দরজার দিকে তাকাইয়া চুপে চুপে বলতে সুরু করলেন।

—দেখুন, পরের জন্য কাজ, সেতো ভাল কথা। তাই বলে নিজেরটাও যে একেবারে বাদ দিতে হবে এমন কি কথা আছে। বয়স তো হোল, সব দিকই তো ভেবে দেখতে হয়।

আমি তাঁর কথার অর্থ বুঝে নিলাম। প্রতিমা বিষণ্ণ ভাবে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে,—মা, এসব নিয়ে আর দিদিকে বিরক্ত করো না। ভগবানের যেদিন ইচ্ছে হবে—হবে।

মা বললেন,—সে তো সত্যি কথা। তবু নিজের ভাবনাটাও তো একবার ভাবতে হয়। তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বল্লেন,—প্রতি, তুমি বাবুকে চা দিলে না।

অমনি প্রতিভা সলজ্জ ভাবে উঠে গেল, কি যেন একটা অপরাধ করে ফেলেছে এমনি সঙ্কুচিত হয়ে ভাবে।

একটু পরেই চা এলো। সকলে মিলে বাগানে একটা গাছের তলায় বসে চা পান করা গেল।

তারপর মার ফরমাস হোল,—মা তোমার এস্রাজটা একবার বাজাবে না?

একটা সলজ্জ সঙ্কোচের সহিত প্রতিমা এস্রাজ আনতে গেল।

অনেকক্ষণ গান বাজনা হোল, রাত ৯টায় বাড়ী ফিরে এলাম।

মাথার ভিতর যেন গানের একটা রেশ ক্রমাগত বাজ্‌তে সুরু করলো—"হায় পথহীন, হায় গৃহহারা।"

তিন

তারপর মাঝেমাঝে আমি সে বাড়ীতে বেড়াতে যাই। অনেক রাত্রি অবধি আমাদের গল্পগুজব চলে। সময় সময় জীবনের উপর কেমন একটা ধিক্কার জন্মে,—জীবনটা কি এই একঘেয়ে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবেই কেটে যাবে, জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা, ঐ রাশি রাশি মেঘ খণ্ডের মত ক্ষণিকের ছায়া ফেলেই বিলীন হবে, হায় রে জীবন! এত রং এত আলো, এত আনন্দের বন্যা কেন জীবনের পরতে পরতে ভরে দিয়েছিলে!—শুধু মরীচিকার মত মিশে যাবার জন্য? রাতদিন গল্পগুজব, পুস্তকপাঠ, সমালোচনা, আর পত্রিকার মারফৎ ঝুড়ি ঝুড়ি দেশ বিদেশের খবর জেনেও তো প্রাণ কিছুতেই ভরে উঠে না। মানুষকে যে নিত্য আনন্দের যোগান দিতে হয়। সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার যে একমাত্র মানুষের উপভোগের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই মানুষ প্রতি মুহূর্ত্তকে সেই রসের ধারায় ডুবিয়ে রাখ্‌তে চায়। নচেৎ প্রাণের সঙ্গে কৃত্রিমতা জন্মে—সমস্তই নীরস ও বিবর্ণ বলিয়া মনে হয়।

সময় সময় আমি ও প্রতিমা দুজনে এক সঙ্গে বেড়াতে বের হই।

বন ও গিরিপ্রপাতের অপূর্ব্ব শোভা যেন আনন্দের নূতন রূপে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। কল্পনার ছায়া তার অণুতে অণুতে সৌন্দর্য্যের আবেশ মিলিয়ে দিয়েছে।

প্রতিভা দেবী দিনের বেলা অধিকাংশ সময় স্কুলের কাজেই ব্যস্ত থাকেন, তারপর যে সময়টা ফুরসৎ পান, তাও বাইরে বাইরে দশ জনের কাজেই কেটে যায়। তার পর হাঁসপাতালের কাজ নিয়ে তাঁকে দশ জায়গায় যাওয়া আসা করতে হয়। তিনি যেন রাতদিন কাজের পিছনেই তাড়া করে আছেন। গল্প বা কোন বিষয় নিয়ে অধিকক্ষণ আলোচনা করার অবসর মোটেই তাঁর নেই। সকল রকম কাজের বীজাণু যেন তাঁর মগজের ভিতর বাসা বেঁধে রয়েছে।

রাত দিন এই সকল আলোচনা মোটেই আমার ভাল লাগতো না। তাঁর যুক্তি বিশ্বাস ও প্রমাণের উপর আমার একটুও আস্থা ছিল না! কাজেই দুজনে দেখা হোলে সময় সময় তুমুল তর্ক উপস্থিত হোত।

সেদিন—"তুমি ডাক দিয়েছ আমার মনে," এই নিয়ে আমাদের আলোচনা আরম্ভ হয়েছে, এমন সময় প্রতিভা দেবী ঘরের ভিতর এসে ঢুক্‌লেন; এই সব আলোচনা নিতান্ত অকেজো ও অর্থহীন, এই টুকু জোর করে প্রমাণ করবার জন্য যেন তিনি মাঝখানে পড়ে আলাপ সুরু করে দিলেন,—মা, হঠাৎ ন'—বাবুর সঙ্গে দেখা হোল, তিনি কি একটা কাজে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন,—আজই আবার চলে গেলেন। তিনি বল্লেন,—একটা কাজের মত কাজ হবে—যদি গড়ে তুল্‌তে পারি। এবার তিনি কাউন্সিলে আমাদের বিষয়টা পাশ করবার জন্যে বেশ ভাল করে চেপে ধরবেন। তবে আজকাল গবর্ণমেণ্টের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, বাজেট পাশ হোলে হয়। তারপর তিনি আমার দিকে ফিরে বল্লেন,—মাপ করবেন, আপনাকে বাজে বিরক্ত করলুম, আর এসব খবরও বোধ হয় আপনার মোটেই ভাল লাগ্‌চে না। এ সব বাজে খবর কেমন না? তবু যাই হোক দেশের কাজ তো বটে।

তাঁর কথার ভিতর একটা বিদ্রূপের ঝাঁজ বিদ্যমান ছিল।

আমি গম্ভীর হয়ে বল্লাম,—কেন ভাল লাগ্‌বে না। আপনি তো আর আমার মতামতের ধার ধারেন না। যাহোক্ আমাকে যে কাজের লোক ঠাউরিয়ে নিয়েছেন—একটা মতামত জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন?—

ঠিক তা নয়, তবে এসব খবর প্রয়োজনীয় নয় কি?

নিশ্চয়। তবে আমার মতে এই হাঁসপাতাল খোলা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

আবশ্যক কি তবে—শুধু ছবি আঁকা?

তা ও নয়; কিছুই আবশ্যক নয়; বিশেষতঃ আমাদের এই গরীব দেশে। প্রতিভা দেবী তাড়াতাড়ি

একখানা চেয়ারে বসে খবরের কাগজখানা উল্টাতে সুরু কর্‌লেন যেন একটা জরুরি খবর তার তখনো দেখা দেখা হয়নি। তারপর একটু শান্ত হয়ে বল্লেন,—জানেন পরশু একজন কুলির মেয়ে মারা গেছে, বিনা চিকিৎসায়; এমন কি একজন ডাক্তারও খুঁজে পাওয়া গেল না। আমার মনে হয় যে শিল্পীদের ও দেশমাতৃকার বিষয়ে একটু চিন্তা করা উচিত।

চিন্তা খুবই হচ্ছে, এমন কি ষোল আনা ছেড়ে সতের আনা।

প্রতিভা দেবী খবরের কাগজ খানা এমন মনোযোগের সহিত চোখের কাছে এনে ধর্‌লেন যে দেখে মনে হল হয় দৃষ্টিশক্তির অস্বাভাবিক ক্ষীণতা জন্মেছে আর নয় আমার উত্তর শোন্‌বার অপেক্ষা তিনি মোটেই রাখেন না।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই স্কুল লাইব্রেরী ডিস্‌পেন্সারীতে আমাদের জাতীয় দুর্গতির বোঝা কেবলমাত্র ভারী হয়েছে। যে দেশে লোকের পেটে দুবেলা অন্ন জোটে না, পরিধানে বস্ত্র নেই, দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়ায় প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয় সে দেশ আপনাদের চেষ্টায় যে কিরূপ কার্য্যকরী হবে তা আপনারাই ভেবে দেখুন। এ কেবল নূতন অভাবের বোঝা ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন।

তিনি আমার দিকে চেয়ে একটু বিদ্রূপের হাসি হাস্‌লেন। আমি নিজের কথা বলে যেতে লাগ্‌লাম। 'কুলীর মেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে, এই নিয়ে কথা নয়, কিন্তু তার মত কত সহস্র সহস্র লোক যে প্রতিদিন অভাবের তাড়নায় না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। অল্পাহার বা অনাহারে কঙ্কালসার হয়ে কত তরুণ জীবন অকালে ঢলে পড়ছে। এই অল্পাহারের ফলেই অধিকাংশ ব্যাধির সৃষ্টি এই জাতিকে শুধু চিকিৎসায় বাঁচিয়ে রাখা যায় না। প্রথম তাহাদিগকে এই অভাব থেকে বাঁচিয়ে তুল্‌তে হবে। তাদের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা না হোলে দেশ কখনো পুনর্জীবিত হয়ে উঠবে না। আমি জানি হাজার হাজার খনির মজুর ও চা-বাগানের কুলী ১০।১২ ঘণ্টা হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও দুবেলা উপযুক্ত আহারের সংস্থান করে উঠ্‌তে পারে না, ফলে অকাল বার্দ্ধক্য ও নানা পীড়ায় জর্জ্জরিত হয়ে মারা যায়। রোগ, মৃত্যু এতো তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বছর বছর আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ায় লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। দেশের একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার নাকি বলেছেন—malaria is a poor man's disease. সত্যি কি তাই নয়? ম্যালেরিয়া দারিদ্রের পীড়া। না খেতে পেয়ে এদের জীবনী শক্তি এত হ্রাস হয়েছে যে সংসারে তাদের বাঁচবার শক্তি অবধি লোপ পেয়েছে। এই দৈন্যের কারণ মোচন না করে দুই দশটা হাঁসপাতাল খুললেই দেশের কোন কাজ হয় না। দেশে যখন দুধ ঘি সস্তা ছিল, লোকেরা পেট ভরে খেতে পেতো, তখন এত রকম ব্যাধি মানুষের ছিল না। ডাক্তার কবিরাজ হাঁসপাতাল না থাক্‌লেও দেশে সুখ ছিল। স্বাস্থ্যহীনতার ফলে যে দেশের কর্ম্মশক্তি একেবারে লোপ পেয়েছে, সে দেশে আপনি স্কুল কলেজের চটক দেখিয়ে কেবলমাত্র অভাবের মাত্রাই বাড়িয়ে দিচ্ছেন। দেশের প্রকৃত কাজ কিছুই হচ্ছে না। দেশের জীবনীশক্তি যেখানে দেউলিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে তুরী ভেরী বাজালেই লোক যে জেগে উঠ্‌বে সে ধারণা ভুল। আপনারা ভুল পথে গিয়ে তাদিকেও সেই ভুল পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা দেশের কাজে মুখে যতই ভাল করুন না কেন—মিটিং সভাসমিতি, কমিটী,—তাতে তাতে তাদের জীবনীশক্তির মূলে একটুও শক্তি সঞ্চারিত হবে না। জাতীয় দুর্গতির উদ্ধার সাধন কর্‌তে হ'লে সর্ব্বাগ্রে অন্ন বস্ত্রের দরকার। বিদেশী বিলাস পণ্যের স্রোতে আমাদের দেশে অন্নাভাব ঘটেছে তার প্রতিকার কর্ব্বার শক্তি আমাদের নেই। কিন্তু কি করে যে আত্মরক্ষা করা যায় তার একমাত্র উপায় নির্দ্দেশ করেছেন আমাদের দেশের এক মহাপুরুষ। আমাদের দেশের আত্মা ঐ খানেই উচ্চ—এমন কি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্—কেন না আমরা নির্ব্বোধ, ধর্ম্মনীতির ভিত্তি আশ্রয় করেই বড় হতে চাই। পশুবলের অধিকার থেকে

আমাদের আত্মাকে সম্পূর্ণ বিজয়ী করে তুলতে চাই।

এই বুভুক্ষু দেশে কতকগুলি পাঠশালা খুললেই যে দেশ জ্ঞান বিজ্ঞানে হঠাৎ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে—এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এদেশে সাহিত্য বা শিল্প কলার মর্ম্ম বোঝাতে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র। উদরান্নের জন্য যাদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয়, তাদের নিকট শিল্পকলার সৌন্দর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

যে দুঃখদৈন্যের নৈরাশ্য দেশের মাথার উপর স্তূপীকৃত হ'য়ে রয়েছে তা সরিয়ে না দিলে এই সাহিত্য, শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান কিছুই এদেশের মাটীতে জন্মাবে না। মানুষ আর পশুর জীবনে যে কি তফাৎ তাই তারা বুঝে উঠতে পার্চ্ছে না। আপনারা স্কুল, কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয় এ নিয়েই ব্যস্ত, কিন্তু তারা যে বাইরের চাপে পিষে যাচ্ছে—মানুষ থেকে পশুত্বের দিকে গড়িয়ে পড়ছে তার কি ব্যবস্থা করছেন। এই সব বন্ধন হ'তে তাদের মুক্ত কর্ত্তে না পারলে মানুষের জীবনে প্রকৃত স্বাদ কি তা বুঝে উঠতে পাবে না। আপনারা তাদের এই বন্ধন আলগা না ক'রে শুধু নূতন অভাবের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছেন—এই তো! অন্নাভাবে যারা পীড়িত তারা পীড়ার জন্য ঔষধপত্রের আনুসঙ্গিক খরচ পত্র যোগাড় কি করেই বা কর্ব্বে।

প্রতিভা দেবী বল্লেন,—আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে। এই রকম তর্ক আমার ঢের শোনা আছে। আপনার মতে লোকে লেখাপড়া ছেড়ে দিক্, কাজকর্ম্ম বন্ধ করে নাকে খানিকটা সরিষার তেল দিয়ে বসে থাক—এই তো? জানি আপনি মানব জাতির উদ্ধারের চেষ্টা করছেন—সকল দেশকে একেবারে বাঁচিয়ে তুলতে হবে—দেশে দুঃখ দৈন্য কষ্ট কিছু থাকবে না—এমন একটা অসম্ভব উপায় বের করা কি সম্ভব? হয়তো আমাদের কাজে ঢের ভুল চুক থাকতে পারে, তাই বলে আমরা চুপ করে বসে নাই। যতটুকু পারি কাজ করে যাই। পরের উপকার—এই হোলো সকল ধর্ম্মের সার কথা। আমরা তাই বুঝেই কাজ করে যাচ্ছি। আপনার হয়তো ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু সকলের রুচিতো আর সমান নয়।

আমি বল্লাম,—সেটা ঠিক্ কথা। কিন্তু আপনারা যে কাজ করে যাচ্ছেন, সেটা প্রকৃত কাজ কিনা সন্দেহ। কুলীরা সামান্য দুই চার পাতা বই প'ড়তে শিখলেই যে দেশ উদ্ধার হ'য়ে যাবে—এ ধারণা ভুল। দুই দশটা স্কুল আর দাতব্য চিকিৎসালয় থাকলেই দেশব্যাপী অজ্ঞতা কমে যাবে বা মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস হবে—এ কোন মতেই সত্য নয়।

তবে লোকগুলি বুঝি কাজকর্ম্ম বন্ধ করে বসে থাকবে—এই আপনার মত না?

না, হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ফলে লোকেরা যে স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলছে, তা থেকে লোকদিগকে বাঁচাতে হবে। এদের কাজ লাঘব করে মানুষ করে তুলতে হবে। যারা সমগ্র জীবন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি নিয়ে থাকবে তারা আত্মার উৎকর্ষের কথা ভাববে কখন? তাদেরও একটা অবসর দিতে হবে। আত্মার চিন্তাই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবসর, তখনি মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ হবে। আর মানুষের দুঃখ কষ্টেরও লাঘব হবে। এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি থেকে বাঁচিলে তারা হবে সত্যকার মানুষ। তখন এই দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য মাথা খুঁড়ে মরতে হবে না।

মজুরদের কাজ কমিয়ে দিলে এত সব কাজ চলবে কি করে?

কেন, তাদের কাজের বোঝা সকলকে ভাগ ক'রে নিতে হবে। দেশের সকলেই যদি নিজের জন্য কিছু কিছু কাজ করে—অর্থাৎ সকলকেই কাজ করে খেতে হয়, তা হ'লে প্রত্যেকের গড়ে ৩।৪ ঘণ্টার বেশী কাজ করতে হয় না। মনে করুন, ধনী দরিদ্র সকলেই যদি তিনঘণ্টা করে খাটে তা হলে বাকি সকল সময়টাই আত্মার উৎকর্ষের অবসর ঘটে।

তারপর খাটুনি কমাবার জন্য যদি কোন সহজ উপায় উদ্ভাবন কর্ত্তে পারা যায় তা হলে অনেক শ্রমসাধ্য কাজও অনায়াসে ও অল্প সময়ে হতে পারে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্রতাও অভাব কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তা হলে আমাদের ভবিষ্যৎবংশীয়েরা এই দুঃখ দারিদ্র্যের পেষণ ও অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।

কুলীর মেয়ের মত অধিক পরিশ্রমের ফলে কাউকে মরতে হয় না।

মনে করুন, আমাদের হাসপাতাল নাই বা রইল, চিকিৎসাই বা নাই রইল, তামাক, গাঁজা, মদের কারখানা উঠে গেল, নানাপ্রকার বিলাস দ্রব্যের উপকরণ ও বাদ দিলাম তা হলে তো আমাদের যথেষ্ট সময় হতে পারে, যে সময় আমরা সকলে জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য বা শিল্পের চর্চ্চায় মন দিতে পারি।

আমরা সকলে যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রকৃত সত্য ও জ্ঞানের পথ অনুসরণ করি তবে অচিরেই মানব জাতি উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হবে। তা হলে মানুষের এই জীবনব্যাপী দুঃখ দৈন্যের বোঝাও চিরতরে অন্তর্হিত হবে। শুধু অন্নের কাঙ্গাল হবার জন্য মনুষ্য জন্ম হয়নি, সত্যের পথও তাকে গ্রহণ করতে হবে —এ কথা উপলব্ধি করবার সময় উপস্থিত হয়েচে।

আপনি আপনার কথারই যে প্রতিবাদ করছেন। আপনি দর্শন বিজ্ঞানের কথা বলচেন, আবার আপনি প্রাথমিক শিক্ষার বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা—এই দুই চারি পাত পড়া কিম্বা দুই একখানা বই পড়া?—তা দিয়ে বিশেষ কোন কাজ হয় না। বই না পড়েও তার চেয়ে ঢের বড় শিক্ষা আমাদের দেশে বহুদিন থেকে চলে আসছে। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন হওয়া উচিত, যাতে প্রাণ সতেজ করে তোলবার মত শক্তি সাহস ও আত্মার বল জন্মে। এরকম স্কুল চাই না, যেখানে মানুষের চিত্ত দিন দিন পঙ্গু বা বলহীন হয়। আমরা চাই উদার শিক্ষার কেন্দ্র, যেখানে প্রকৃত মনুষ্যত্ব গঠনের পাথেয় সংগ্রহ হবে। মানুষের চিত্তে সাহস, আত্মায় বল, কর্ম্মে দৃঢ়তা—সেই শিক্ষার মূল ভিত্তি হবে।

আপনি চিকিৎসা শাস্ত্রের এত বিরুদ্ধে কেন? তাতে তো মানব জাতির কোন অপকার হচ্ছে না।

বিরুদ্ধে এই জন্য, যে এই চিকিৎসা দ্বারা রোগের প্রতিকার কিছুমাত্র হয় না। এত চিকিৎসক থাকা সত্বেও রোগের প্রকোপ না কমে বরং দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। প্রত্যেকেরই ব্যারাম পীড়া না হওয়ার কারণ অবগত হওয়া উচিত। রাশি রাশি ঔষধ গিলালেই বা বেশী সংখ্যক ডিসপেনসেরী খুললেই দেশের কিছুমাত্র উপকার হবে সে ধারণা আমার নেই। রোগ সারানো হলো কথা, তাহলে কিসে রোগ হয় তার প্রতিকারের ব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে উচিত। আর ঔষধে পীড়া আরোগ্য হয়, এটাও আমি বিশ্বাস করি না। খাঁটি জ্ঞান না জন্মিলে তা' কার্য্যতঃ গ্রহণযোগ্য নয়। অন্ধকারে ঢিল ফেলার মত অধিকাংশ স্থলেই বিপরীত ফল উৎপাদন করে।

সমাজের বর্ত্তমান আবহাওয়ায় কোন জ্ঞানবিজ্ঞানই প্রকৃতভাবে গড়ে উঠবে না। মানুষের চিন্তাশক্তি লোপ করে দিয়ে কাজের কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারিদিক থেকে মানুষের জীবন এমনভাবে চেপে রেখেছে যে প্রকৃত জ্ঞানের পথ কিছুতেই উন্মুক্ত হচ্ছে না। আমাদের অধিকাংশ শক্তি ও সমস্ত বুদ্ধি বৃত্তি সাময়িক অভাবের মোচনেই ব্যয় করি, কিন্তু তাতেও আমাদের অভাব বাড়ছে বই কমছে না। প্রকৃত সত্য জ্ঞান বহুদূরে। মানুষ বর্ত্তমান সভ্যতার ভিতর দিয়ে কিছুমাত্র গড়ে উঠছে না, মানুষ যেন পশুত্বের ধাপেই ক্রমাগত নেবে পড়ছে। আমাদের প্রকৃত কর্ম্মশক্তি এইভাবে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হবে।

বর্ত্তমান অবস্থায় প্রকৃত শিল্পীর কাজেরও কোন মূল্য নেই। তিনিই বুদ্ধিমান চিত্রকর, যিনি মনে করেন, কতগুলি পশুবৃত্তি সম্পন্ন লোকের আমোদের জন্য তাঁর শিল্পশক্তির অপব্যয় হচ্ছে। কেন না প্রকৃত মানুষের সংখ্যা যে অতি অল্প।

'প্রতিমা বাইরে যাও'—

প্রতিভাদেবী তীব্র দৃষ্টিতে অগ্নিবান নিক্ষেপ করে ছোটবোনকে সেই স্থান হতে সরে যেতে বল্লেন, পাছে এই শিক্ষায় তার কোন অনিষ্ট হয়। তারপর তিনি বলতে লাগলেন,—

কাজকর্ম্মের কোন ইচ্ছা না থাকলে এই রকম ঢের সুন্দর সুন্দর যুক্তি তর্কের অবতারণা করা চলে। অনেক দর্শন বিজ্ঞান এনে যুক্তি-তর্কের পিছনে দাঁড় করান যায়। এ সব কথা বলা সহজ বটে, কিন্তু কাজ করতে গেলে দেখা যায়—কত ঝঞ্ঝাট সামলে চলতে হয়। আপনারা বোধহয়

এই সকল যুক্তি তর্ক সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণাই আছে। আর সেটা থাকাও স্বাভাবিক। যাক্—তর্কে এর মীমাংসা হবে না। তবে আপনার চিত্র শিল্প যে কোন নগণ্য লাইব্রেরী, দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে ঢের বেশী দেশের পক্ষে মূল্যবান্, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আমার তর্কের ধার এড়াবার জন্য তিনি মায়ের সঙ্গে তাড়াতাড়ি মিনিষ্টার, লাট বড়লাটের ও দরবারের কথা বল্‌তে সুরু করলেন। তাঁর চোখ মুখ একেবারে লাল হয়ে উঠলো—বোধহয় রাগে। তিনি খবরের কাগজখানা চোখের গোড়ায় এমন চেপে ধরলেন যেন তার চোখের দৃষ্টিশক্তি সেইমাত্র লুপ্ত হয়ে গেল।

অনর্থক এর কাছে বসে সময় নষ্ট না করে আমি নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

চার

বাইরে শান্ত নিস্তব্ধতা বিরাজ কচ্ছে, কোথাও একটু সাড়াশব্দ নেই। শুভ্র অন্ধকারে অস্পষ্ট তারার আলো মিটিমিটি জ্বলছে। দরজার একপাশে প্রতিমা আমাকে বিদায় দিতে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রতিমার মুখখানি আরো ভাল করে দেখ্‌বার জন্য আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি, তার বিষণ্ণ করুণ চোখ দু'টী একদৃষ্টে আমার পানে তাকিয়ে আছে। আমি শিউরে উঠ্‌লাম। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌লাম,—প্রতি, সমস্ত বিশ্বজগৎ শান্তির ধারায় অভিষিক্ত আর আমরা বাজে তর্ক নিয়ে মিছে অশান্তি সৃষ্টি কর্চ্ছি।

পাহাড়ের এক কোণে ঘোমটা-আড়াল করবার মত একটা অন্ধকারের ছায়া পথের এক পাশে এসে পড়েছে। আকাশে বার বার তারা খসে পড়ায় জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। প্রতিমা আমাকে এগিয়ে দিতে পথ পর্য্যন্ত এলো; পাছে উল্কাপাত নজরে পড়ে, সেজন্য সে মাথা নীচু করে চল্‌ছিল। কেননা 'উল্কাপাত দেখা অমঙ্গলের চিহ্ন' বোধ হয় তার মনে এই আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল।

"আমার মনে হয়, আপনার কথাই সম্পূর্ণ ঠিক"—প্রতিমা অতি আস্তে এই কথাটী বল্‌লে। "যদি সকলে আত্মার উৎকর্ষ নিয়েই থাকি, তা'লে ধ্রুব সত্যে উপনীত হওয়া কিছুমাত্র কষ্টকর নয়।

"ঠিক, আমাদের শাস্ত্রও সে কথা বলেছে। আমরা অমৃতের পুত্র। যদি আমরা সত্যসন্ধ হই আর সেই সত্যের পথ নির্দ্দেশের জন্য আমরা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করি, তা'হলে নিশ্চয়ই একদিন ভগবানের কাছে গিয়ে পৌঁছাতে পারবো। আমাদের বেদ উপনিষদ এই কথাই বলে আস্‌ছে। কিন্তু সে আশা যে কবে ফলবতী হবে কে জানে? মানুষ ক্রমাগত শক্তি হারিয়ে নীচে নেবে যাচ্ছে। হয়তো কালে মানুষের সকল প্রতিভার বিলোপ ঘটবে।

বাড়ীর দরজা ছেড়ে যখন খানিকটা দূর এগিয়ে এসেছি, তখন প্রতিমা বল্‌লে—নমস্কার, আজ তবে আসি। কাল্‌কে অবশ্য একবার আসবেন।

তার গায়ে ছিল একটা পাতলা জামা, বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ার দরুণ তার কষ্টবোধ হতেছিল।

আমার মনে যে কেমন একটা ভাবের উদয় হয়েছিল তা' বলা শক্ত। তবে নিজের উপরও কেমন একটা ধিকার এসে ছিল।

আমি বল্‌লাম,—আর একটু অপেক্ষা করবে না?

প্রতিমা বল্লে,—বলুন।

সত্যি, প্রতিমা যে দিন দিন আমার কিরূপ প্রিয়তম হয়ে উঠেছিল, সমগ্র হৃদয়স্পন্দনে তা' যেন আজ এক সঙ্গে জানিয়ে দিল। প্রতিমা রোজ আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, আর বিদায়ের বেলা প্রত্যহ আমাকে এগিয়ে দিতে আসে। তার সতৃষ্ণ আঁখিতারা আমার চোখের উপর যেন একটা তরুণ সজীবতার ছবি এঁকে দেয়। তার করুণ আঁখি দু'টী যেন কোন্ মমতা রাজ্যের কমনীয়তা আমার প্রাণে ঢেলে দেয়। তার ক্ষীণ কোমল হাত দু'খানি, তার পাঠে তন্ময়তা, তার কার্য্যে একান্ত মনোযোগ—সবই যেন আমার নিকট রমণীয় বলে বোধ হয়। তার এই কৃশ দেহলতা সকলের চেয়ে রুগ্ন বলে বোধ হলেও আমার চোখে অপূর্ব্ব সুন্দর বলে প্রতিভাত হতো।

চিত্রকর বলেই প্রতিমা আমাকে ভালবাসে। আমার

মামলা বাজের ভূমিকায়

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

এই প্রতিভা তার হৃদয় জয়ে সমর্থ হয়েছে মনে করে একটা অপূর্ব্ব গর্ব্বমিশ্রিত আনন্দ উপলব্ধি করলাম। ইচ্ছা হতো, আমার সমগ্র শিল্প প্রতিভা একমাত্র তারই আনন্দে নিয়োগ করি। মনে হতো—আমার মানসীর যদি কোন মূর্ত্তি থাকে, সে প্রতিমা। তখন চারিদিকের এই গাছ-পালা, শিশির, জ্যোৎস্না, কুয়াসার মনোরম ছবির ভিতর আর আপনাকে নিতান্ত একলা মনে হইত না।

"প্রতি, আর একটু অপেক্ষা কর।" আমি গায়ের কোটটা খুলে প্রতিমার গা জড়িয়ে দিলাম।

সে নিজের অপূর্ব্ব পোষাকের দিকে চেয়ে হেসে কোটটা খুলে পুনরায় আমার কাঁধের উপর তুলে দিল। আমি তার সরু হাত দু'খানি গলার উপর টেনে নিয়ে তার কপোলে একটা সতৃষ্ণ চুম্বন মুদ্রিত করে দিলাম।

তার পর মাথা নীচু করে বললো,—কাল সব কথা হবে। তোমায় আমায় কোন লুকোচুরি নেই। মা আর দিদিকে সব বল্‌বো। মার কিছুমাত্র আপত্তি হবে না, জানি। কিন্তু দিদি—বলেই সে থেমে গেল।

আজ তবে আসি—বলে সে গেটের দিকে ফিরে গেল।

মিনিট দুই তার পায়ের শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষণ আমি সেইখানেই চুপকরে দাঁড়িয়ে রইলাম। তার পর সে যে ঘরে থাকে সেই ঘরের সুন্দর ছবিটুকু দেখ্‌বার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। দূর থেকে সেই ঘরখানি যেন আমার মনের কথা জেনে হাস্‌ছিল। বাগানে প্রবেশ করে একখানা বেঞ্চের উপর বসে এক দৃষ্টে সেই ঘরখানির দিকে তাকিয়ে রইলাম। সেই ঘরের খোলা বাতায়ন পথে নীল পরদায় ঢাকা বাতির রশ্মিটুকু বাইরে এসে যেন গলে গলে পড়ছিল। ঘরের ভিতর একটা ছায়া যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রাণ আমার কি এক অজ্ঞাত আনন্দে ভরে উঠলো। একটা প্রাণভরা শান্তি যেন বহুকাল পরে ফিরে পেয়েছি। একটা স্বচ্ছ সুরের ভিতর দিয়ে যেন সমগ্র জীবনের ভালবাসার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছি, ভেবে প্রাণ আনন্দে ভরে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা আশঙ্কার কালিমা ও মনে ঘনীভূত হয়ে উঠলো—কি জানি যদি এই পুষ্পমাল্যের উপর প্রতিভার ঘৃণা ও বিরক্তির অশনি-পাত ঘটে।

আমি বাগানে বসে জানালার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলাম, যদি একবার প্রতিমার মুখখানি দেখা যায়।

উপরের ঘরে পরস্পর বাক্যালাপ কিছুক্ষণ শোনা গেল।

একঘণ্টা পরে ঘরের আলোক নিভে যেতেই সেই ছায়া ও মিলিয়ে গেল।

চন্দ্র পাহাড়ের আড়ালে হেলে পড়বার উদ্যোগ করছে। রজতশুভ্র আলোকে গাছপালা এমন কি পথটুকু পর্য্যন্ত রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। গাছের ফলগুলি অবধি স্পষ্ট চেনা যায়, রং টুকুও বুঝি বাদ পড়ে না।

শরীরটা ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগলো। আমি বাগান থেকে বেরিয়ে ওভার কোটটা গায় দিয়ে ধীরে ধীরে বাসায় ফিরে এলাম।

পরদিন পুনরায় সেখানে গেলাম। দেখি বাইরের দরজা সম্পূর্ণ খোলা রয়েছে। বাগানে একখানা বেঞ্চের উপর গিয়ে ব'স্‌লাম। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিমার আগমন প্রতীক্ষা করছিলাম। এখুনি হয়তো গাছের সারির ভিতর দিয়ে প্রতিমা আমার অভ্যর্থনার জন্য আস্‌বে। বুক দুরু দুরু কর্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু কই, কেউ নেই যে, অনেকক্ষণ দাঁড়ালেম। অপেক্ষা করে শেষে আমি ঘরের সিঁড়ির উপর গেলাম, জুতার শব্দ হলো, কিন্তু কেউ তো দৌড়ে এলো না। ঘরের ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখি, ঘর শূন্য। ভিতরে প্রতিভা দেবীর গলার আওয়াজ শোনা গেল।

'এক কাক—একখণ্ড পনির" প্রতিভা থেমে থেমে খুব জোরে বোধ হয় কাউকে লিখ্‌তে বল্‌ছিল। "এক কাক এক খণ্ড পনির কুড়াইয়া পাইয়াছিল।"

হঠাৎ আমার জুতার শব্দ তার কাণে গেল, জোরে বলিল,—

"কে ওখানে ?"

"আমি"।

"ও আপনি। দয়া ক'রে মাপ কর্‌বেন, এখন আমি বাইরে আস্‌তে পাচ্ছি না। একটী মেয়ের পড়া নিচ্ছি।

একটা কথা—আপনার মা কি কোথাও বেড়াতে গেছেন?

মা ছোট বোনকে নিয়ে আজই কলকাতায় ফিরে গেছেন। বিশেষ কাজে যেতে হলো। বছর দুবছর আর এখানে আসবেন না। নমস্কার।

একটু থেমেই পুনরায় বল্‌তে সুরু করলেন,—"এক কাক এক খণ্ড পনির কুড়াইয়া পাইয়াছিল—

"লিখেছ?"

আমি ঘরের বাইরে নিস্পন্দ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

আর কিছুই মনে নেই। কেবল এক কাক—এক খণ্ড পনির—কুড়াইয়া পাইয়াছিল—এই শব্দই কাণে আসছিল।

যে রাস্তায় প্রথম এই বাটীতে প্রবেশ করেছিলাম, সেই পথেই আজ বাইরে ফিরে এলাম বোধহয় চির-দিনের জন্য।

এমন সময় একটী ছোট ছোক্‌রা ছুটে এসে এক টুক্‌রা কাগজ আমার হাতে দিল। তাতে অস্থির হাতের ক্ষুদ্র লেখাটুকু ছিল,—"দিদিকে বলেছিলাম, দিদি কিছুতেই রাজী হলেন না। সে জন্য মা আর আমি যে কত কেঁদেছিলাম। তিনি আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে থাক্‌বার উপদেশ দিলেন, কিন্তু তার কথা অমান্য করে আর তার মনে কষ্ট দিতে চাই না। ভগবান অবশ্য একদিন তোমায় শাস্তি দিবেন আমায় ক্ষমা করো।

অদূরে ঘন পাইনের বন। ভাঙ্গা বেড়ার ওপাশে শোণিত রাঙা ডালিয়া ফুলের সারি। গাছের ডালে একটা কাক নিতান্ত কর্কশস্বরে চীৎকার সুরু করেছে। পাহাড়ের গায়ে একপাশে সোণালী আলো ছড়িয়ে পড়েছে, অপর পাশে ছায়া মসীকৃষ্ণ পাহাড়ের বুক জুড়ে রয়েছে। জীবনের সমস্ত আলোক বন্যা এক মুহূর্ত্তে ঘন নিবিড় আঁধারে ঢেকে গেল। পূর্ব্বেকার নিদারুণ নিরাশার তার যেন নূতন করে বুকের উপর চেপে বস্‌লো।

বাসায় ফিরে সে দিনই জিনিষ পত্র বেঁধে দেশে ফিরে এলাম।

* * *

বহুকাল পরে পুনরায় আমার সেই বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ। অনেক কথা হলো। তারপর সেই গিরি কুটীরের খবর জিজ্ঞাসা করলেম, কিন্তু বেশী কিছু খবর তিনি দিতে পার্‌লেন না। শুধু প্রতিভা দেবীর কথা বল্‌লেন, —তিনি আজকাল মস্ত বড় লোক। একটা বড় স্কুল খুলেছেন। শীঘ্রই হয়তো তিনি কাউন্সিলে ঢুক্‌বেন সেখানকার বহু সভাসমিতির তিনি সভানেত্রী হয়েছেন কাজেই আজকাল তার সহকর্ম্মচারীরও অভাব নেই।

প্রতিমার কথা সে কিছু জানে না। আজকাল তারা কোথায় আছে তাও সে জানে না।

এখন সেই বাড়ীর কথা ভুল্‌তে চেষ্টা করছি সময় সময় যখন একলা বসে ছবি আঁকি, কিম্বা কোন বই নিয়ে পড়তে বসি তখন হঠাৎ সব মুছে গিয়ে যেন মনে হয় একটা খোলা জানালা দিয়ে নীল আলোকের ছটা গলে পড়ছে, রাত্রিবেলা যখন-শূন্য মাঠের উপর দিয়া একলা যাই তখন হঠাৎ একটা পায়ের শব্দ মৃদু বেজে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে বহুদূরের একটা সুর ক্ষণিকের জন্য আনন্দ ধারা উৎসারিত করে মিলিয়ে যায়। সময় সময় প্রাণ যখন দুঃখে বেদনায় ভরে উঠে তখন এই অস্পষ্ট শব্দ-ছায়া প্রাণের উপর যেন চকিতের জন্য ভেসে উঠে।

আর মনে হয়, সে এখনো আমার কথা ভাবছে সে আমারি অপেক্ষায় বসে আছে। একদিন তবে নিশ্চয়ই আমাদের মিলন হবে। মনের ভাব দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ঝরে পড়ে আর যেন বলে "প্রতিমা তুমি কোথায়?"
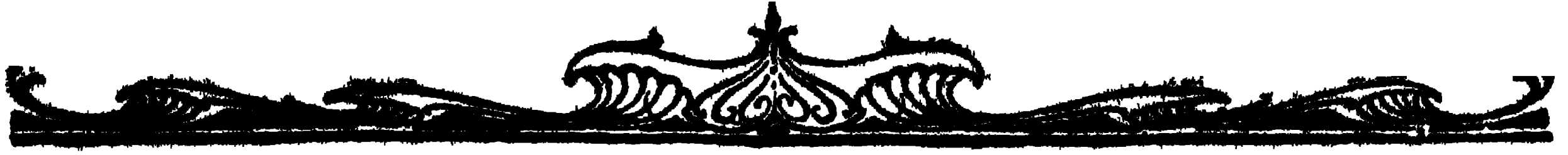
চূর্ণক

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ধকার

অমাবস্যার গভীর রাত্রি। চারিদিক নীরব—নিস্পন্দ। জনকোলাহল থামিয়া গিয়াছে, নিশাচর জন্তরও সাড়া-শব্দ নাই।

বাতাস বন্ধ, গাছের পাতাটিও নিশ্চল।

আমি জানালা উন্মুক্ত করিয়া বসিয়া আছি। মনে হইতেছে যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আজ একটা নিবিড় অন্ধকার-পিণ্ডে পরিণত হইয়া আমার নয়ন-সম্মুখে উপস্থিত।

সহসা অন্ধকার কাঁপিতে লাগিল। তাহার মধ্য হইতে একটি মসীকৃষ্ণ চূর্ণক্য পুরুষ ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে? কি ভাবিতেছ?"

আমি বলিলাম "আমি আমি, ভাবিতেছি—এই বিশাল জড় অন্ধকারের মধ্যে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া সম্ভব কি না।"

পুরুষ বলিল "কেন আমার সাড়াশব্দ ত পাইতেছ। তবুও কি আপনারে ছাড়িয়া আর কাহারও অস্তিত্ব অনুভব করিতে পার না?"

আমি বলিলাম "তুমি আরও কথা কও তাহা হইলে আরও অনুভব করিতে পারিব।"

পুরুষ বলিল "তুমি আমাতে ডুবিয়া যাও। আমার প্রাণে তোমার প্রাণ মিশিয়া যাক। তবে আমার কথা আরও ভাল করিয়া শুনিতে পাইবে।"

আমি বলিলাম "তুমি কোন কথা শুনাইতে পার?"

সে বলিল "অতীতের বর্ত্তমানের।"

আমি বলিলাম "অতীতের কথাই বল।"

সে বলিল "কাহার অতীত?"

আমি বলিলাম "এই পৃথিবীর।"

সে বলিল "এইটুকু জায়গার আবার অতীত—তুমি কি সারা পৃথিবীর অতীত জানিতে চাও? সব কথা বুঝিতে পারিবে?"

আমি বলিলাম "পারিব।"

পুরুষ একটি হাসির অন্ধকারে আমার অন্তর অভিভূত করিয়া বলিল, "সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহনক্ষত্রের ইতিহাস বেশ মনে আছে। পৃথিবীর কথাটা অনেক ভুলিয়া গিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "বেশ আমার অতীত কি তাহা বলিতে পার?"

সে বলিল, "ঐ যে তোমার কুকুরটা ঘুমাইতেছে তাহার অতীতটা বেশ মনে পড়ে। তোমার অতীতের খবর বেশী রাখিবার চেষ্টা করি নাই।"

আমি বলিলাম, "কেন? আমি কি কুকুরেরও অধম?"

পুরুষ বলিল, "আমার কাছে উত্তম অধম বিচার নাই।"

অপর কোন প্রশ্ন খুঁজিয়া পাইলাম না। সহসা দেখিলাম পূর্ব্বদিকে অরুণালোক দেখা দিয়াছে।

ঝঞ্ঝা

ভীষণ ঝড়। চারিদিকে প্রলয়ের বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে। আর রক্ষা নাই।

আকাশ বাতাস, গাছ-পালা বিদ্যুৎ-বৃষ্টি আজ যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। এই উন্মুক্ত ঝড়ের তাণ্ডব নর্ত্তনে আমি যে প্রাণভয়ে কতটা ভীত—আমার অন্তরে কি তীব্র হাহাকার দাবাগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে—তাহা কাহাকে বুঝাইব? কে আমাকে এই দুর্দ্দিনে আশ্রয় দিবে?

বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ছুটিয়া গিয়া যে কোন লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিব তাহারও কোন উপায় নাই। মাঠের উপরে যে গাছগুলি বাণবিদ্ধ পক্ষীর মত ঝটপট করিতেছে, তাহারা আজ শরণাগতকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।

রক্ষা নাই। তবুও ছুটিয়া আসিয়া এক বিশাল সহকারের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

সহসা মড় মড় করিয়া শব্দ হইল। বুঝিলাম মাথার উপর একটা বিশাল বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। চারিদিক অন্ধকার; শরীর অবসন্ন; পলাইবারও সামর্থ্য নাই। ভূমিতে মরণাহতের মত লুটাইয়া পড়িলাম। সংজ্ঞা লুপ্ত হইল।

যখন চেতনা ফিরিয়া আসিল তখন ঝড়ের বেগ থামিয়াছে; দিনের আলোকও দেখা দিয়াছে। দেখিলাম আমার মাথার দুই হাত উর্দ্ধে একটি পতিত নারিকেল গাছ আম্রবৃক্ষে বাধা পাইয়াছে।

ভূমি চূতমুকুলে সমাচ্ছন্ন। গাছটি তাহার সর্ব্বসম্পদ বিসর্জ্জন করিয়া বিশাল শাখাবাহু প্রসারিত করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছে।

গাছের প্রাণ নাই শুনিতে পাই। তবু সেদিন চক্ষু কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল।

আলেয়ার আলো!

(গল্প)

শ্রীহরিপদ গুহ

এক

"আলো! আলো! একটু আলো!"

একটু আলোর জন্য আমার সব ব্যর্থ হতে বসেছে! ধর্ম্মে বিশ্বাস নেই, অধর্ম্মে ভয় নেই, কর্ম্মে উৎসাহ নেই, অপকর্ম্মে ঘৃণা নেই, এ আমি কি হয়ে গেছি! কিন্তু, বরাবই আমি এমন ছিলুম না; তোমাদের মত হাসি কান্না, সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে আমারও জীবন গড়ে উঠেছিল। আর আজ!… …

দুই

সে এক বসন্ত শেষের কথা।

নদীতীরে আপন-মনে ইষ্ট-দেবতার আরাধনা কর্‌ছিলুম, —হঠাৎ কার চঞ্চলতায় এক ঝলক উচ্ছ্বসিত বারি এসে আমার অঞ্জলিবদ্ধ জল অপবিত্র করে দিলে। চেয়ে দেখ্‌লুম, —একটী বালক। সে এক কলসী পানীয় নিয়ে উঠে চলেছে। রাগে, আমার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠল; ছুটে গিয়ে তার পিঠে সজোরে এক কিল বসিয়ে দিয়ে বল্‌লুম —"ব্রাহ্মণের সম্মান রাখ্‌তে জানিস্ না হতভাগা?"

সে শুধু চোখ তুলে একবার আমার দিকে চাইলে, তারপর ধীরে ধীরে কলসীর জল ফেলে দিয়ে আবার তা পূর্ণ করে নিলে। আমি অবাক্ হয়ে তার কাণ্ড দেখছিলুম। সে চলে যাচ্ছে মনে পড়ায় তার পথ রোধ করে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"অমন কর্‌লে যে?"

সে কেবল একটু হাস্‌লে; পরে, আমার একান্ত জেদে উত্তর দিলে—"রাগ চণ্ডাল, তাই ও অপবিত্র জল ফেলে দিলুম।"

আমি চীৎকার করে বল্‌লুম—"কি!"

পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় মাথা নীচু করে রইলুম।

তিন

বহু বৎসর পরে প্রবাস-জীবন শেষে করে গৃহে এলুম। বালকের সে স্মৃতি আজও ভুলতে পারি নাই; দিবালোকের মত স্পষ্ট, উজ্জ্বল হয়ে তখনও আমার প্রাণের পর্‌তে পর্‌তে সে জড়িয়ে ছিল। জপ-তপ, পূজা-অর্চ্চনা সব

বিসর্জ্জন দিয়ে সেই বালক গুরুর উপদেশে প্রাণপণে ক্রোধ দমনের চেষ্টা করে চলেছি।

দেশে এসে কিন্তু তার দেখা পেলুম না; শুনলুম,—সংসার-মায়ার বন্ধন-মুক্ত হয়ে সে কোন্ শাশ্বত-ধর্ম্মের সন্ধানে ছুটেছে। বড় আনন্দ হলো,—মনের মধ্য থেকে কে যেন আমায় সেই পবিত্র মূর্ত্তির উদ্দেশে টেনে নিয়ে যেতে চাইলে। সে দুর্দ্দমনীয় আবেগ কিছুতেই রুদ্ধ করতে পারলুম না,—বেরিয়ে পড়লুম।

কতই দেশই না ঘুরলুম;—নদ-নদী, প্রান্তর, বন-উপবন, গিরিগুহা তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম।—কিন্তু কোথায় সে?

চার

সেদিন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তার দেখা পেলুম কিন্তু একি!—কি দেখলুম! হৃৎপিণ্ডটা সবলে ছিঁড়ে বাহিরে বেরিয়ে আসতে চাইলে,—সত্য-মিথ্যা, জীবন-মরণ, ইহকাল-পরকাল সমস্ত একাকার হয়ে গেল! পায়ের নীচ হতে পৃথিবীর মাটী যেন সরে যেতে লাগল। মাথা ঘুরে ঝাপ্সা চোখে একটা কাঁটাবনের ধারে 'ধপ্' করে বসে পড়লুম।

কার জন্য উন্মাদ হয়ে আমি জীবনের সমস্ত একাগ্রতা, সমগ্র বিশ্বাস একনিষ্ঠ করে তুলেছিলুম!—কিসের মোহে আমার এ দশা কেন ঠাকুর?

সে এখন বাউরীদের মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করে বেশ সুখে-সচ্ছন্দে নিজের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে চলেছে! স্ত্রী-পুত্র-কন্যার চিন্তায় নেশার পৈশাচিক আমোদে পূর্ব্ব জীবনটাকে সে বিস্মৃতির অতল-গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়েছে! আর আমি! ওঃ! ভগবান!

মনে হ'ল,—ছুটে গিয়ে পাগলের মত সজোরে তার টুঁটি চেপে ধরে বলি—"কি করলি হতভাগা! কি করলি রে নির্ম্মম!—নিজের ধ্বংসের মধ্যে আমায় টেনে এনে একি নিদারুণ মর্ম্মান্তিক ব্যঙ্গ করলি!—আমার ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই অন্ধকারের গভীর কূপে ঠেলে দিলি! এর আগে বজ্রাঘাতে তোর মৃত্যু হোল না কেন! রে নিষ্ঠুর! আমার অতীতের সহজ, সরল...... সে, সে, আমার পূর্ব্ব-জীবন..."

কিন্তু প্রবৃত্তি হ'লো না। আলেয়ার আলো নিভে গেছে!—তাই আলোর কাঙাল হয়ে ঘুরে ঘুরে মরছি!

"আলো! আলো! একটু আলো!"

শিল্পী

শ্রীসুধীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী

সে ছিল এক তরুণ শিল্পী; শিশুর মত তরল হাসি তার সুন্দর মুখখানাকে অবিরত ঘিরে থাকত। জগতের অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে সে নিজেকে খাড়া করেছিল তার এই শিল্পের ভেতরে। গাঁয়ের সব চেয়ে নির্জ্জন জায়গা বেছে সে তার ছোট্ট কুটীরখানি গ'ড়েছিল। সে উপার্জ্জনও ক'রত অনেক আয় তার প্রায় সবই বিলিয়ে দিত দীন দুঃখীদের; তার জীবনের একটা মস্ত বড় অভিপ্রায় ছিল এটা। এই ঢের-উপার্জ্জনের মধ্যে দেখতে পেত তার স্বর্গগতা জননীর অনাহারক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখখানি আর তাঁর বড় বড় চোখ দুটো বেয়ে যেন জলের ধারা গড়িয়ে পড়চে তাঁর বুকের ওপর। সে যে তাঁর জন্যে একমুঠো খাবারও জোগাড় ক'র্ত্তে পারেনি তার কৈশোরে; আর আজ—। আর সে ভাবতে পারত না, চোখের জলে তার দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে যেত সে সেইখানেই ব'সে পড়ত আর কেবল শিশুর মত অনেকক্ষণ ধ'রে কেঁদে তার পর কাজে মন দিত।

কুটীরের একটা ঘর ছিল তার বড় আদরের, সেইটে ছিল তার শিল্পভবন। চারিদিকে বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো মর্ম্মর পাথরগুলোর ভেতর কোন কোনটা শিল্পীর সুনিপুণ হাতের স্পর্শ পেয়ে হেসে উঠ'ত। আনন্দে তার মুখখানা

দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ত। সেই নির্ব্বাক মূর্ত্তিগুলোই নীরব ভাষায় তার সঙ্গে যেন কথা বল্‌ত। এই পাথরই ছিল তার জগতের ভেতর সব চেয়ে আপনার। কাজের সময় অন্য কোনদিকেই তার হুঁস্‌ থাক্‌ত না, যেন সে এ জগতের মানুষই নয়।

গাঁয়ের কোন এক তরুণী তার সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়েছিল তাই মাঝে মাঝে তরুণীর সেই চিরপরিচিত 'শিল্পী' ডাক্‌টা যখন তার কাণে পৌছাত তখন তাকে বাধ্য হয়ে তার ভাবরাজ্য হতে ফিরে আস্‌তে হত, সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য নির্ব্বাক্‌ভাবে তরুণীর মুখের ওপর তার বড় বড় টানা চোখদুটোকে তুলে ধ'রত আর তরুণী তখন কাজের অছিলা'য় পাশের ঘরে এসে শিল্পীর বিশৃঙ্খল ঘরখানাকে শৃঙ্খলার মধ্যে টেনে আনবার বৃথা কতই চেষ্টা ক'রত। এইভাবেই তাদের দিনগুলো এক রকমে কেটে যাচ্ছিল।

তরুণ শিল্পী একদিন তার আরাধ্যা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আঁকবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উ'ঠল। সাদা পাথরে যে কেমন ক'রে তার কল্পনাময়ীর মূর্ত্তিটী খোদাই ক'রে তুল্‌বে সেইটেই তার প্রধান ভাবনার বিষয় হ'য়ে দাঁড়াল। তার মনে এতদিনকার ভাস্কর্য্যের চরম নিপুণতা দেখাবার ইচ্ছা জেগে উ'ঠল সেই কল্পনার মূর্ত্তিটা গড়তে।

সে তখন তার শিল্পভবনে তার সেই আরাধ্যাদেবীর মূর্ত্তিখানার মুখে কেমন ক'রে হাসি ফোটাবে তাই ভাবছিল। তরুণী তার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে 'শিল্পী', শিল্পী তার নেত্র দুটো আরও বিস্ফারিত করে নির্ব্বাক্‌-হয়ে চেয়ে রইল তার মুখের পানে। "আমার একটা মাত্র কথার আজ উত্তর দিতে হবে শিল্পী" শিল্পীর জিজ্ঞাসু নেত্র তখনও তরুণীর মুখের উপর। তরুণীর কণ্ঠস্বর তখন কাঁপ্‌ছিল "শিল্পী তুমি"—, আবার তরুণী তার সমস্ত সঙ্কোচকে দূরে ঠেলে ফেলে বল্লে "শিল্পী তুমি আমায় ভালবাস না?" আর সে বল্‌তে পারল না, এই বলাটাই তাকে এতদিন নিয়মিতভাবে কাঁটার মত বিঁধ্‌ত; এই বলাটার জন্য যেন সে এতদিন অপেক্ষা করছিল।

শিল্পীর মুখে এক ঝলক রক্ত খেলে গেল; মৃদুস্বরে সে ব'লে উঠ্‌ল "বুঝি না তরুণী তোমার কথা; তুমি কি বল্‌ছ—" তরুণী তখন তার আবাসে ফিরে গেল; আর সে সেখানে যায় নাই।

আজ শিল্পীর পরিশ্রম সফল হবে। তার নিজের হাতে খোদা মূর্ত্তিকে আজ সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করে দেখাবে কেমন হয়েছে তার মানসপ্রতিমা। আজ এই সফলতার আনন্দে তার ছুটে যেতে ইচ্ছা কর্চ্ছিল সেই দরদী তরুণীর কাছে।

তরুণীর মনটা আজ বেশ ভাল ছিল না; সেদিনকার ব্যর্থতাই তাকে সর্ব্বদাই যেন খোঁচা দিচ্ছিল। কিছুতেই আর সে নিষ্ঠুরের কাছে যাবে না। তার সারা-জীবনের চেয়ে নেওয়া এই ব্যথাটাকে সে আগ্‌লে থাক্‌বে এই তার প্রতিজ্ঞা। যখন সে তার নিজের অজ্ঞাতসারে বিদ্রোহী পা'দুটো টেনে শিল্পীর কুটীরের পাশে এসে দাঁড়াল তখন যেন তার চমক্‌ ভাঙ্গল, তাকে দেখে শিল্পী ছুটে এসে তাকে সেই মানসী-প্রতিমূর্ত্তির সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে বল্লে "দেখ তরুণী আমার মানসপ্রতিমার প্রতিমূর্ত্তি"। তরুণী পাথরে খোদা শিল্পীর কল্পনা-প্রতিমার মুখের পানে চাইতেই বিস্ময়ে, আতঙ্কে একবার কেঁপে উঠ্‌ল দু'পা পিছিয়ে এসে তার চোখের জলে রুদ্ধ করুণ কণ্ঠস্বরে ব'লে উঠল "শিল্পী"। শিল্পী তখন একমনে তার গড়া সেই মূর্ত্তিটার পানে তাকিয়েছিল; হঠাৎ চোখ ফিরাতেই তরুণীর সাদা মুখখানা নজরে প'ড়ল, আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে আর একবার দেখে নিল তার সেই প্রতিমার মূর্ত্তিটাকে—

"তরুণী তুমিই আমার—?"

আর তার কণ্ঠ দিয়ে স্বর ফুটতে চাচ্ছিল না। দুচোখ বেয়ে তখন মুক্তার মত ধারা গড়িয়ে পড়ছিল শিল্পীর আলিঙ্গনবদ্ধ তরুণীর বুকের উপরে।

তখন শিল্পীর স্বর্গগতা জননীর প্রতিমূর্ত্তির পাণ্ডুর মুখখানা হাসিতে যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

মহাত্মাগান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সার সঙ্কলন

জাতীয় সপ্তাহ ঃ—৬ই ও ১৩ই এপ্রিল এই দুটী তারিখই ভারতবাসীর স্মৃতি-মন্দিরে চির-উজ্জ্বল থাকিবে। ৬ই ভারতের প্রচণ্ড ও অপ্রত্যাশিত জাতীয় জাগরণের তারিখ এবং ১৩ই তাহাদের আত্মোৎসর্গের দিন, যে দিন জালিয়ানওয়ালাবাগে হিন্দু মুসলমান শিখ প্রভৃতি সমস্ত জাতির শোণিত এক ধরণীর বক্ষে মিশ্রিত হইয়াছিল—যেদিন মরণে তাহারা এক হইয়াছিল।

তার পর শবরমতী নদীর সেতুর তল দিয়া কত জল বহিয়া গিয়াছে, জাতি কত বিভিন্ন আবর্ত্তের মধ্যদিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে—কিন্তু আজ হিন্দু মুসলমানের একতা যেন স্বপ্নের মত দাঁড়াইয়াছে। আমি দেখছি দুই দলই দ্বন্দ্বের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এবং দুই দলেই মুখে বলিতেছে যে তাহারা প্রত্যেকেই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, কতক বিষযে হয়ত তারা ঠিকই কর্চ্চে কিন্তু যদি লড়তেই হয়—তবে তাদের উচিত সাহসের সঙ্গে লড়া, অর্থাৎ পুলিশ বা আইন আদালতের সাহায্য না নিয়া। যদি তারা একাজ কর্ত্তে পারে তা হলে বোঝা যাবে যে ১৩ই এপ্রিলের শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। যদি আমরা দাসত্ব অবস্থা থেকে মুক্তি পাই তবে আমাদের বৃটীশের সঙ্গীণ বা তাদের অবিশ্বাস-যোগ্য বিচারের উপর নির্ভর করার অভ্যাস ত্যাগ কর্ত্তে হবে। বিবাদের সময় এ দুটার কোনটার উপর নির্ভর না করাই হচ্চে স্বরাজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনা। সার আবদার রহিমকে উপেক্ষা করার পর—অর্ডিনান্স পাশ করার পর, লবণ করের পুনঃ প্রবর্ত্তনের পর আরও কি স্পষ্ট করে আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে বৃটীশ শাসকগণ আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের শাসন কর্ত্তে চান? বস্তুতঃ তাঁদের কাজের দ্বারা তাঁরা স্পষ্টই জানিয়ে দিচ্চেন যে তাঁরা আমাদের সাহায্য ব্যতীত আমাদের শাসন কর্ত্তে পারেন এবং তা কর্ত্তে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁহাদের সাহায্যের উপর নির্ভর না করবার সাহসটুকুও আমাদের নাই? আমরা নিজেদের মধ্যে যখন ঝগড়া বিবাদ না করি, তখন তা যে আমাদের দ্বারা সম্ভব তা অনেক ঘটনায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। মাথাটা যদি ভেঙ্গে যায় তাতে যদি ব্যাণ্ডেজও বাঁধা থাকে তবুও সেই মাথা নিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ান ঢের ভাল, সেই মাথাকে বাঁচাতে গিয়ে যদি বুকে হেঁটে যেতে হয় তারচেয়ে। বাজারে যে সব দাঙ্গা বা মারামারি হয় তার মাঝেও হিন্দুমুসলমান একতার আভাষ পাওয়া যায় যদি সরকারী হাত তাতে না পড়ে। বৃটীশ রাজতন্ত্রের সরকারী পোষাকের আবছায়ায় দাঁড়িয়ে বা বৃটীশের আদালতের মিথ্যা সাক্ষ্যের আবরণে দাঁড়িয়ে যখন মারামারি চলে তখনই হিন্দুমুসলমানে একতা সম্বন্ধে আমি হতাশ হই। নিজেদের শাসন কর্ব্বার আগে নিজেদের সত্য মানুষ করে তুলতে হবে।

কিন্তু এই সত্যাগ্রহ সপ্তাহ প্রধানতঃ আত্মশুদ্ধি ও আত্ম বিচারের সময়। এ আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে এই হতভাগ্য দেশের সৌভাগ্য ফিরাইয়া আনিতে হইলে, চরিত্রের বিশুদ্ধতা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তাহা সম্ভব নহে, তার মানেই হচ্চে সত্য এবং অহিংসা দ্বারাই তা সম্ভব। এ রকম পবিত্রতা আনতে পারে প্রার্থনা ও উপবাস। বর্ত্তমান অবস্থার হরতাল এক প্রকার অসম্ভব সেই জন্য যাঁদের উপবাস ও প্রার্থনায় প্রবৃত্তি

বিশ্বাস আছে তাঁরা যেন ৬ই ও ১৩ই ঐ পবিত্র ব্রত-পালনে আত্মনিয়োগ করেন। খদ্দর এবং চরকাই হচ্ছে সর্ব্বজনযোগ্য পন্থা, যা ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিচারে আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অবলম্বন কর্ত্তে পারেন। যাঁরা সুতা কাটতে জানেন তাঁরা যত বেশী পারেন যেন সুতা কাটেন এবং বন্ধুবান্ধবদেরও সুতা কাটতে অনুরোধ করেন। যাঁরা পার্ব্বেন তাঁরা স্বগ্রামে যেন খদ্দর ফেরী করিয়া বেচেন যদ্দারা এই পুণ্য সপ্তাহটা এই মহৎ ও আবশ্যকীয় জাতীয় কার্য্যে উৎসর্গীকৃত হইতে পারে।

হিন্দুরা মধ্যে অস্পৃশ্যদের ভাই ভেবে তাদের সঙ্গে মেলা মেশা কর্ত্তে পারেন। তাঁরা যা কিছু পারেন জমিয়ে, অস্পৃশ্যদের মধ্যে যারা দুঃস্থ তাদের দুর্দ্দশা দূর কর্ব্বার জন্য যেন ব্যয় করেন—আরও নানারকম ছোট খাট সুব্যবহার দ্বারা তাদের যেন বুঝিয়ে দেন যে তারা আর সত্যই হিন্দুর মধ্যে ঘৃণ্য বা স্পর্শাযোগ্য জাতি নয়।

স্বরাজ স্থাপনের ভিত্তিই হচ্ছে হিন্দুমুসলমানে একতা, খদ্দর প্রচলনও স্পর্শদোষ দূরীকরণ। এই সকল ভিত্তির উপর এমন একটা মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারা সম্ভব যা জগত আজও দেখে নাই আর অন্য যে কোন ভিত্তির উপর যত কারুকার্য্যময় গৃহই গঠন করা যাক্ না কেন সে বালুকা স্তূপের উপর গাঁথার মত ভঙ্গুর ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে।

চুটী সমস্যা—দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালীন মহাত্মা দেখেছেন যে অনেক কংগ্রেস অফিস সুতার পরিবর্ত্তে তাহার মূল্যোপযোগী অর্থ চাঁদা হিসাবে লইতেছেন। কংগ্রেস-মেম্বর বা কাগজের সম্পাদক হিসাবে তিনি এ কাজ বে-আইনী মনে করেন অবশ্য এটা ঠিক কি বে-ঠিক তা নির্দ্ধারণ করবার ভার কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভার উপরে ন্যস্ত আছে—সুতরাং কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে এ সম্বন্ধে তিনি কোন অনুশাসন দিতে চান না। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে অর্থগ্রহণের পরিবর্ত্তে—সুতা গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল এতদ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। কংগ্রেসের খাতায় সুতাই জমা হওয়া উচিত তৎপরিবর্ত্তে অর্থ স্থান পাইলে কংগ্রেসের নীতির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। সুতাকাটার প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য সুতরাং তাহা যদি ব্যর্থ হয় তবে এই কর্ম্মপন্থাটীকে সম্পূর্ণ পরীক্ষার অবসর না দিয়াই তাহাকে নষ্ট করা হইবে। যে সব কংগ্রেস আফিস সুতার পরিবর্ত্তে মূল্য গ্রহণ করিতেছেন তাঁহারা অর্থ ফেরৎ দিয়া যেন সুতার জন্য পীড়াপীড়ি করেন ইহাই তিনি আশা করেন।

বোম্বাই অঞ্চলে আসিয়া তিনি শুনিয়াছেন যে অনেক কংগ্রেস সভ্য খদ্দর না পরিয়াও কংগ্রেস সভার অধিবেশনে যাইয়া থাকেন। তাঁহার মতে এদের কংগ্রেসের সভ্য বলিয়া বিবেচনা না করাই উচিত। যতক্ষণ না তাঁরা হাতেকাটা সুতার হাতেবোনা খদ্দর না পরিবেন ততক্ষণ তাহাদিগকে অধিবেশনের কোন কাজে যোগদান করিতে দেওয়া অনুচিত এমন কি এ অবস্থায় তাঁহাদিগকে ভোট দিতে দেওয়া বা বক্তৃতা দিতে দেওয়াও উচিত নয়।
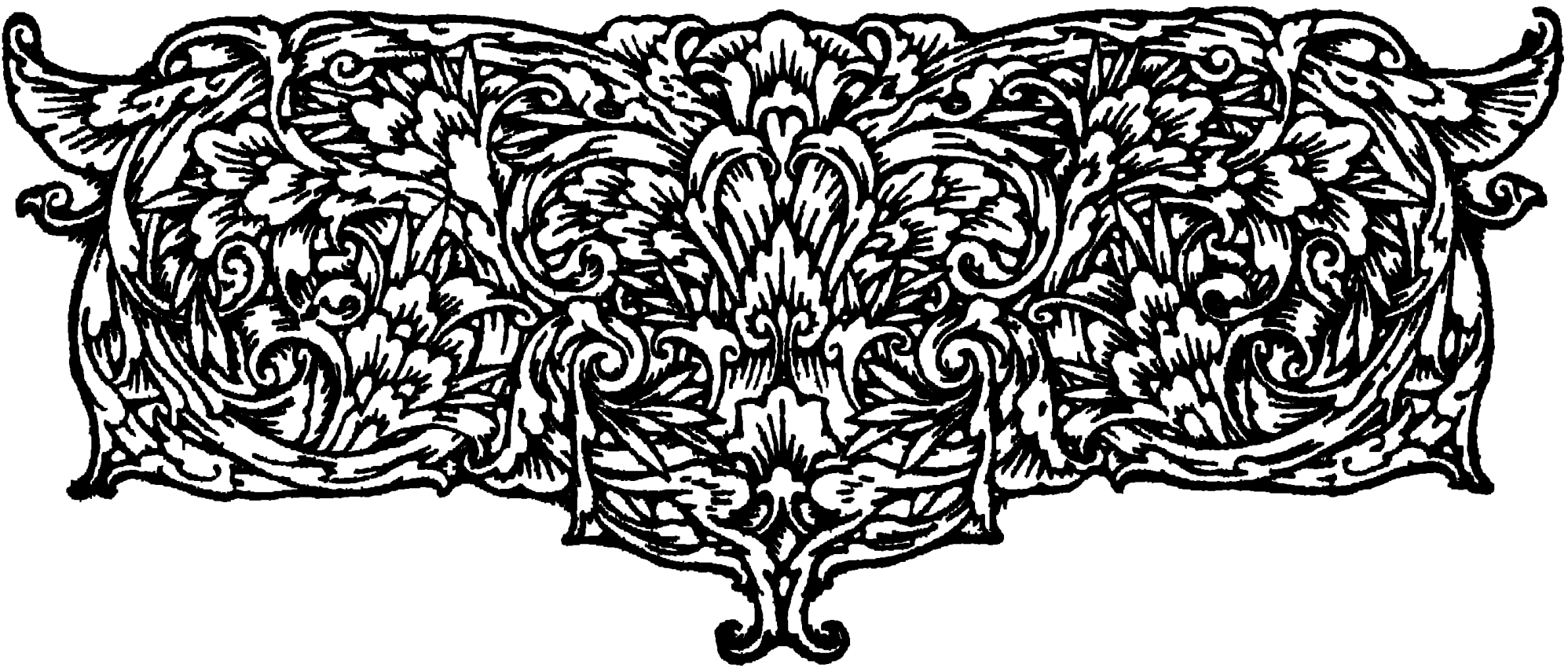
কাজের কথা

বৈশ্বানরের তাণ্ডব-লীলা ঃ—গত ঃস্পতিবার রাত্রে ৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে অগ্নি াগে—ঐ বাটীর উপর তালায় ম্যাডান কোম্পানীর যস্কোপের ফিল্মের গুদাম ছিল। ফিল্মগুলি অতিশয় হজ-দাহ্য, সেজন্য অগ্নি সহজেই বিস্তৃতি লাভ করে, স্ক ফায়ার বিগ্রেডের ক্ষিপ্র আগমনে সহজেই উহা ায়ত্তাধীন হয় ও শেষে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। ইংরাজ- াসনের দুঃখের মধ্যে সুখ আছে এই বিভাগের অস্তিত্বে, াব একটী ছিল ডাক-বিভাগ; কিন্তু অধুনা চিঠি-পত্রেব শুল বাড়িয়া যাওয়াতে হা আর ততটা জনপ্রিয় াই। অগ্নিদাহে ম্যাডান কাম্পানীর কয়েকলাখ কার ফিল্ম ধ্বংস হই- ছে তবে উহা বীমা করা ল বলিয়া প্রকাশ।

পরদিবস শুক্রবার াত্রি ৩-১৫ মিনিটের ময় আবার পূর্ব্বাকাশ লাহিত রাগে রঞ্জিত ইয়া উঠিল নিদাঘ- তপ্ত নিদ্রাহীন সহরবাসীরা সবিস্ময়ে ভাবিল এ বুঝি ঊষার অরুণ রাগ; কিন্তু কুণ্ডলীকৃত ধূম ও অগ্নির লেলিহান শিখা শীঘ্রই সে ভ্রম দূর করিয়া দিল। আগুন াগিয়াছিল নিমতলার কাঠগোলায়। স্থানীয় একটী তৈলের লে অগ্নির উৎপত্তি হয় এবং বায়ুযোগে উহা শীঘ্রই র্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; ৭টী দমকল আসিয়াছিল এবং াংপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা পরে অগ্নির যাপ্তি আয়ত্তাধীন হয়। ৪।৫টী বড বড় কাঠগোলা পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকার উপর, ইহার মধ্যে অধিকাংশই বীমা করা ছিল।

সম্পাদক পরিবর্ত্তন ঃ—বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় নবযুগের সম্পাদনভার পরিত্যাগ করিলেন। এই গুরুভার অতঃপর আমার উপর অর্পিত হইল জানিবেন, আমি এ কার্য্যের কতদূব যোগ্য জানি না, তবে প্রাণপণ শক্তিতে কর্ত্তব্য পালন করিতে প্রয়াস পাইব; এক্ষণে লেখক লেখিকাগণের সহানুভূতি পূর্ব্ববৎ পাইলে পরম বাধিত হইব। পাঠক-পাঠীকাগণের পরামর্শ ও মতামত পাইলে নবযুগ যে সর্ব্বরকমে উন্নত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

বিনীত—

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাত্মার বঙ্গে শুভাগমন ঃ—বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন উপলক্ষে আগামী ২রা মে মহাত্মা গান্ধী বহুদিন পরে বঙ্গদেশে শুভাগমন করিবেন। বঙ্গদেশ কি ভাবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে তাহা সত্যই দেখিবার বিষয় হইবে। বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানে তাঁহাকে লইয়া যাইতে যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে আচার্য্য রায়ের সহিত পত্র ব্যবহার করুন।

সাহেব দেওয়ান ঃ—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এবার নাকি মিঃ ওয়াটস্ নামক এক সাহেবকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করা হইবে এইরূপ একটা জনরব শুনিয়া ত্রিবাঙ্কুর-বাসী হিন্দুগণ তাহাতে আপত্তি করিয়া এক সভা করিয়াছিলেন। প্রজারা বলেন ধর্ম্মনীতি ও দেবমন্দিরাদি সমূহ যখন রাজার অধীন তখন একজন অহিন্দু ব্যক্তিকে দেওয়ান করিলে ধর্ম্মের উপর অবিচার করা হইবে। এই পদ ভারতবাসীরাও পূর্ব্বে দক্ষতার সহিত অধিকার করিয়াছেন এক্ষণে সাহেব দেওয়ান না হইলে যে রাজ্য কেন চলিবে না, তাহা বুঝা গেল না; একটা প্রবাদ আছে যে কর্ম্ম কর্ত্তার ইচ্ছায় হইবে সুতরাং উলুবনে কীর্ত্তন

দিলে কাহারও আপত্তি করা সুশোভন নয়—ত্রিবঙ্কুর-বাসীরা এ প্রবাদটা বোধ হয় শোনেন নাই তাই এত সভাসমিতির ধূম।

আধুনিক যুগের বিশিষ্টতা ঃ—নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভারসিটীর প্রেসিডেন্ট—ডাঃ নিকোলাস, আর বাটলার সাহেব বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মই দাঁড়াইয়াছে অসভ্য আচরণ। তিনি বলেন যে বিগত ত্রিশ বৎসর হইতেই মানুষের আচার ব্যবহার শ্লথ হইয়া পড়িতেছে—বিশেষতঃ তরুণদিগের মধ্যে এটা বেশী দেখতে পাওয়া যায়, বেশভূষা কথাবার্ত্তা এবং সাধারণের সঙ্গে ব্যবহারের ধাঁজে। এখনকার তরুণেরা আর আগেকার-মত বয়স্কের বা মানীর মান রাখিতে যত্নবান নহেন। যে কোন সামাজিক স্তরের পুরুষ বা নারীর সমাজে মেলামেশার ভাব লক্ষ্য করিলে বা সভা সমিতিতে উপস্থিত তরুণদিগের আচরণের প্রতি মনোযোগ দিলে, আচারের এই অবনতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এমন কি চালচলনে দাম্ভিকতা, কথাবার্ত্তায় অভদ্রতা, সাহিত্যের মধ্যে দুর্নীতি প্রচার এমন কি সাধারণ কাজের মধ্যেও নীতির অভাব যেন বর্ত্তমান যুগের বিশিষ্টতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই মন্তব্যগুলি আমাদের বাংলা দেশের সম্বন্ধেও যে বিশেষভাবে প্রযুজ্য তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। সভ্যতা আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা এখনও অবধান করা কর্ত্তব্য।

ষ্টুডেন্টস্ বেনোভোলেন্ট সোসাইটী ঃ—আগামী ১০ই এপ্রিল কলেজ ষ্ট্রীটস্থ ওয়াই, এম, সি, এ, হলে এঁরা আমোদ প্রমোদের সুন্দর ব্যবস্থা করিবেন। টিকেট বিক্রয় লব্ধ অর্থ জনহিতকর কার্য্যে দান করা হইবে। সঙ্গীত-সঙ্ঘের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক বিবিধ প্রকার বাদ্যের ব্যবস্থা থাকিবে, বিজয়লাল মুখার্জ্জী, কন্থুবাবু, জোৎস্না দেবী প্রভৃতি বিখ্যাত গায়ক গায়িকাগণের মধুর সঙ্গীত শুনিবারও সুযোগ পাওয়া যাইবে। প্রফেসার চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর রঙ্গভঙ্গ তো আছেই যাহারা ইষ্টারের ছুটীতে কলিকাতায় থাকিবেন তাঁদের পক্ষে এ একটা মস্ত বড় সুযোগ উপস্থিত। পূর্ব্বাহ্নে টিকিট সংগ্রহ করিয়া রাখিলেই ভাল হয় কারণ এরকম সংযোগ বড় ঘটিয়া উঠে না—বিশেষতঃ আনন্দ উপভোগের সঙ্গে সৎকার্য্যে দানের পুণ্য সঞ্চয় করা একটা বিশেষ রকম সুবিধাই বলিতে হইবে।

হোলকারের বিলাত যাত্রা ঃ—সার্ভাণ্ট পত্রিকায় প্রকাশ যে ইন্দোরের মহারাজ পাঁচ বৎসরের জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিতেছেন। কথাটা কতদূর সত্য—তাহা এখনও ঠিক বলা যায় না।

মালাবার-হত্যার মামলা ঃ—এই মামলার সাক্ষ্য-সাবুদ গ্রহণ করা শেষ হইয়াছে ও আসামীগণকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ঃ—এতে নাকি আর ইংরেজের ছেলেদের তেমন লোভ নেই—ভারী মেহনৎ আর অল্প মাইনে বলে কেউ নাকি এ কাজে আর আসতে চাইছেন না—তাই মুরুব্বী ইংরাজরা নাকি বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন—সত্যই ভারী ভাবনার কথাই বটে! —ষ্টীলফ্রেম বজায় রাখা শেষটা দায় হয়ে পড়বে দেখছি। সেদিন লর্ড মেষ্টন সন্ডে টাইমস্ পত্রে এক চিঠি লিখে জানিয়েছেন এখনও অনেক ভাল ভাল ইংরাজ এ রকম অল্প মাইনেতে ভারতবর্ষে যেতে ইচ্ছুক আছেন, যদি বৃটীশ মাপকাঠী দিয়ে তাদের কাজের বিচার করা হয়—অর্থাৎ প্রাচ্য মাপকাঠীতে তাঁর কাজের বিচার চান না। তারপর যদি হঠাৎ রাজনৈতিক কারণে তাদের চাকরী যায় তবে তাদের যোগ্য ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা চাই। তাদের উপর ষ্টেট সেক্রেটারীই হুকুম চালাবেন এবং সে ভার মিনিষ্টারদের দেবার আগে তাদের পরামর্শ নিতে হবে।

আধ্যাত্মিকা শক্তির বিরুদ্ধ পাপের অভিযান

(টি, এল ভাষানীর লিখিত প্রবন্ধ হইতে অনুদিত)

শ্রীমন্মথনাথ চৌধুরী

বার্মিংহাম সহরে রবিবার নিশাকালে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে লর্ড বারকেনহেড ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যার উল্লেখ করিয়া ভারতে ইংরাজ জাতির কতটা দায়িত্ব আছে তাহা বলেন। তিনি আরও বলেন 'ভারতে ব্রিটিশ জাতির স্বত্ব' দুই উপায়ে সংরক্ষিত হয়। উহার সহিত আধ্যাত্মিকা শক্তির কোনও সংস্পর্শ নাই।

স্বর্গগত স্যার চার্লস ন্যাম্বাল কোনও বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছেন ভারতীয় নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি শতাব্দীপূর্ব্বে যেরূপ সংঘটিত হইয়াছিল, গত পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক পরিলক্ষিত হইয়াছে।' ব্রিটিশ রাজ্যাধিকারের পূর্ব্বে ভারতের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি কতটা প্রসার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা এই বক্তৃতায় বক্তা স্বয়ং ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চান। কিরূপ উন্নতি, তাহা ভারত ইতিহাসে সম্পূর্ণ জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত রহিয়াছে কারণ ভারতবাসী ক্রমশঃ দারিদ্র্যের এক স্তর হইতে আর এক স্তরে আরোহণ করিতেছে। ভারতের জাতীয় ঋণ একশত কোটী মুদ্রায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কে না এই জাতির মর্ম্মন্তুদ দারিদ্র্য স্বীকার করিবে?

কিছুদিন পূর্ব্বে লর্ড রিডিং ভারতে ইংরাজের দায়িত্ব সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন 'আমরা জাতির উৎকর্ষ বা প্রাধান্য আছে এই ধারণা আদৌ মনে আনিতে পারি না।' ভারতের রাজপ্রতিনিধি ইহা যে ব্রিটিশ শাসনের মৌলিক সত্য তাহা বলেন। কি চমকপ্রদ ব্যাপার, সম্প্রতি একজন সুদক্ষ লেখক পৃথিবীতে শ্বেত জাতির প্রভুত্ব গৌরব অনুভব করেন কিন্তু আর একজন এংলো-ইণ্ডিয়ান্ বলিয়াছেন 'ভারতে রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যা অল্প এবং তাহারা সাধারণতঃ নীচবংশজাত, তাহাদের এমনি বংশমর্য্যাদা যে তাহাদের পিতা ভ্রাতা প্রভৃতিও ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া বসিবার কেদারা পর্য্যন্ত পায় নাই যাহাতে তাহাদের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকে, ইহাই হইতেছে ভারতীয় জাতির প্রতি ইংরাজের জাতি বিদ্বেষ।' অধ্যাপক টমাস স্বীকার করিয়াছেন যে জাতি বিদ্বেষ আমাদের প্রকৃতিতে, দেহের সহিত ক্ষুধার যেমন দৃঢ়-সম্পর্কিত, তেমনি দৃঢবদ্ধ হইয়াছে। কোনও এংলো-ইণ্ডিয়ান এ কথা বলিলে আশ্চর্য্য হইব না যে ভারতীয়েরা উপযুক্ত না হইলে এবং ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব থাকিলে বর্ণ বৈষম্য চিরকাল থাকিয়া যাইবে।" এই ব্যক্তিই বলেন ইংরাজও রূঢ ভারতবাসীর অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকিবে না।"

মানব জাতির জ্ঞানের ক্রমবিকাশে জাতির বর্ণ জ্ঞানের নিশ্চয় কিছু মূল্য আছে। কিন্তু জাতির ঔদ্ধত্য দোষাবহ। মানবের আধ্যাত্মিকা শক্তির বিরুদ্ধে ইহা প্রকৃত পাপ। এই মহাপাপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আসনে অচল হইয়া উপবিষ্ট আছে এবং মিশরের অশান্তি ও জালিওয়ানওয়াবাগের হত্যাকাণ্ড ইহার মূল। আমার বোধ হয়, একদিকে জাতির প্রভুত্ব অপর দিকে দাস্যভাব, ভারত স্বরাজ না পাওয়া পর্য্যন্ত থাকিবে। যতদিন না আমরা নিজেদের চরিত্র সংশোধন করি, আধ্যাত্মিকা শক্তির উন্নতি সাধন করি এবং ভারতের প্রতিভা, প্রাচীনকালের সূক্ষ্ম ধর্ম্মভাব প্রভৃতি জগতে প্রচারিত করি ততদিন এইরূপেই চলিবে। ভারত যখন নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখনই ভারতীয় নৈতিক ও আর্থিক সমস্যার এমন কি রাজনৈতিক সমস্যার ও সমাধান হইবে।

বঙ্গসাহিত্যে সমালোচনা

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বঙ্গসাহিত্য হইতে সমালোচনা জিনিষটা একপ্রকার লুপ্ত হইতে চলিল। সাময়িক সাহিত্যের ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সমালোচনা এখন বড় একটা দেখা যায় না। সাহিত্যে সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য। সমালোচনার উপরই সাহিত্যের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালাদেশে গ্রন্থকার ও লেখকের অভাব নাই, কবি, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লেখকগণই বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। নিত্য নূতন নূতন গ্রন্থও সংবাদ পত্র সাহিত্য পত্র প্রকাশিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতেছে। এখন সহরে সহরে অলিতে গলিতে পর্য্যন্ত মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে এখন আর মাসিক, সাপ্তাহিক, দ্বিসাপ্তাহিক, অর্দ্ধসাপ্তাহিক, দৈনিক, দ্বৈমাসিক, ত্রৈমাসিক কোন প্রকার কাগজেরই অভাব নাই। শিশু সাহিত্যের ও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। বঙ্গ সাহিত্যের এতদূর উন্নতি অবশ্য সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল গ্রন্থও সকল পত্রিকাগুলি দ্বারাই কি সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হইতেছে? সকল শ্রেণীর লেখক ও গ্রন্থকারই কি বঙ্গসাহিত্যকে উন্নতির পথে চালিত করিতে পারিতেছেন? এই সকল বিষয় আলোচনা করিবার জন্য সমালোচকও সমালেচানার আবশ্যক। সমালোচক সাহিত্যের উন্নতি অবনতির পথ প্রদর্শক, সাহিত্যের দোষগুণ আলোচনা করিবার জন্যই সমালোচকের প্রয়োজন।

বঙ্কিম যুগে সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক ছিলেন ৺চন্দ্রনাথ বসু। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলিয়া—বঙ্গসাহিত্যে পরিচিত। তাঁহার তিরোধানের পর ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই যুগে নিরপেক্ষ সরস সমালোচনার তীব্র কশাঘাতে বঙ্গসাহিত্য কানন হইতে অনেক আবর্জ্জনা দূর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনার ভয়ে অনেক লেখককেই লেখনী চালনা করিতে সংযমী হইতে হইত। সমাজপতি মহাশয় তদীয় "সাহিত্য" পত্রে মাসিক পত্রিকা ও প্রাপ্ত গ্রন্থাদির বিস্তারিত সমালোচনা করিতেন। এই সমালোচনার জন্যই এক সময়ে "সাহিত্য" পত্রিকাখানি জনসাধারণের অত্যন্ত আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় নিরপেক্ষ নির্ভীক সমালোচক বঙ্গসাহিত্যে বিরল। তাঁহার সমালোচনার প্রবল স্রোতে অনেক তথা কথিত বড় লেখকও ভাসিয়া যাইতেন। সমাজপতি—মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে বঙ্গসাহিত্যে ঐ প্রকার সমালোচনা এখন আর বড় দেখা যায় না। "মানসী" পত্রে প্রথমতঃ কিছুদিন মাসিক পত্রাদির ও প্রকাশিত পুস্তকের সমালোচনা বাহির হইত কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা লোপ পাইয়াছে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সাহিত্যে মাসিক পত্রাদির অভাব নাই কিন্তু কোন পত্রেই তেমন কোন সমালোচনা বাহির হয় না। একমাত্র একখানি নূতন সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র বর্ত্তমানে সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। ইহার প্রতি সংখ্যাতেই মাসিক সাহিত্য ও গ্রন্থাদির নিরপেক্ষ সমালোচনা বাহির হইতেছে।

সাময়িক সাহিত্যের সমালোচনা ত এক প্রকার হয় না বলিলেই চলে। তবে গ্রন্থকারগণ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট তাহাদের গ্রন্থ সমালোচনার্থ প্রেরণ করিলে সম্পাদকগণ তাঁহাদের কাগজে অতি সংক্ষেপে পুস্তকখানার একটু সামান্য পরিচয় প্রদান করেন মাত্র—তাহাকে বিজ্ঞাপনের নামান্তর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ পুস্তকের সমালোচনাই বর্ত্তমানে অনুরোধে উপরোধে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অনেক নিকৃষ্ট গ্রন্থাদিরও প্রশংসা করিয়া অনেক সম্পাদক মহাশয় লেখকগণের মনোরঞ্জনার্থ তাঁহাদের কাগজে সমালোচনা করিয়া থাকেন। সমালোচনা বলিয়া—আজকাল যাহা প্রকাশিত হয় তাহা বাস্তবিক সমালোচনা কিনা সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন। আধুনিক সমালোচনা, পুস্তক বিক্রয়ের—একটী উপায় মাত্র। সম্পাদকগণ অনেক সময় পরিচিত গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ খারাপ হইলেও ভাল সমালোচনা করিতে বাধ্য হয়েন তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

উপযুক্ত সমালোচক ও সমালোচনার অভাবেই বঙ্গ-

সাহিত্যে বর্ত্তমানে নানাপ্রকার আবর্জ্জনা অবাধে চলিয়া যাইতেছে। সাহিত্যে দুর্নীতি প্রবেশের কারণ সমালোচনার অভাব। উপযুক্ত অভিভাবকের অভাবে যেমন ছেলেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া অবনতির পথে ধাবিত হয়, বাঙ্গলা সাহিত্যও তেমনি উপযুক্ত সমালোচকের অভাবে নানাবিধ আবর্জ্জনা বহন করিয়া কলুষিত হইয়া ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। তীব্র সমালোচনাই ইহার গতিরোধে সমর্থ।

বঙ্গসাহিত্যে এখন উপন্যাসের বান ডাকিয়াছে। সকল উপন্যাসই যে সুরুচিসঙ্গত ও শিক্ষাপ্রদ এমন কথা বলা চলে না। সমালোচনার অভাবেই এখন এত নিকৃষ্ট উপন্যাস বঙ্গসাহিত্যে স্থান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এ বিষয়ে পতিত না হইলে সাহিত্যে ক্রমেই দুর্নীতি প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইবে এবং তদ্দ্বারা দেশের ও সমাজের অনিষ্ট বই ইষ্টসাধন হইবে না।

পাশ্চাত্য-সাহিত্যের অনুকরণে বাঙ্গলা সাহিত্যের সাময়িক পত্রগুলিতে নানাবিধ নগ্ন ও অর্দ্ধনগ্ন অশ্লীল ছবি বাহির হইতেছে। একমাত্র রূপসী রমণীর নগ্নচিত্রই এখন মাসিক পত্রিকাগুলির বিক্রয় বৃদ্ধির উপায় হইয়াছে। এই সকল চিত্র কতদূর সুরুচি সঙ্গত তাহাও আলোচনার বিষয়।

শিক্ষক সংশোধন করিয়া না দিলে যেমন ছাত্রগণের ভ্রম প্রমাদ দূর হইতে পারে না; সমালোচকের অভাবেও সেইরূপ সাহিত্যের আবর্জ্জনাদি বিদূরিত হইতে পারে না। বাঙ্গলা সাহিত্য বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সমালোচনার একান্ত আবশ্যক।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

প্রবাসী চৈত্র, ১৩৩১ঃ—ঝড়ের মত এলোমেলো এবং উদ্দাম ভাবরাশিতে পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'ঝড়' প্রথমেই প্রবাসীর পৃষ্ঠায় দেখা দিয়াছে। কবি 'ঝঞ্ঝার উদ্দাম হাসি' নিয়ে যে 'সুর গাঁথিয়াছেন' তাহার অন্তরালে ভাব-বেচারী চাপা পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের mystic কবিতার ইহা অন্যতম আদর্শ। 'নির্ভাবনার দুর্ভাবনা' শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটী রস-রচনা, বিশেষত্ব বর্জ্জিত। 'সান্ত্বনা' শ্রীঅমিয় বসুর রচিত ছোট গল্প। সম-বেদনা কেমন করিয়া উচ্চ ও নীচ, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান ভাঙ্গিয়া মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের সহজ মিলন ঘটায় এই গল্পটীতে তাহা লেখক (?) নিপুণতার সহিত দেখাইয়াছেন। গল্পটী পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। 'অজাত শত্রুর ব্রহ্মবাদ' দার্শনিক লেখক মহেশচন্দ্র ঘোষের বৃহদারণ্যক উপনিষদ-অবলম্বনে লিখিত ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ক গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ। "বাংলা ভাষার দৈন্য" প্রবন্ধে লেখক হতাশার গান গাহিয়াছেন। আমরা বলি লেখকের অত হতাশ হইবার কোন কারণ নাই; গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বঙ্গভাষায় সাহিত্যবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিভাগে যেরূপভাবে পুস্তক প্রবন্ধাদি বাহির হইতেছে তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল বুঝিতে হইবে। কেবলমাত্র হতাশের গান না গাহিয়া লেখক গঠনের দিকে শক্তি প্রয়োগ করুন না কেন? 'রাজপথ' এই সংখ্যায় শেষ হইল। আমরা ইহাকে পুস্তকাকারে দেখিতে ইচ্ছা করি। "বাদল প্রিয়া" অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিতা,—কতকগুলি ললিত শব্দ "নাচুনি ছন্দে" গাঁথা, সুতরাং কবিতা। একটু উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

পায়জোরে তোরে কঠিন ভূঁয়ের
　　খিতিয়ে পড়া পরাণমাতা,
আলগোছা তোর আঙুল ছোঁয়ায়
　　করলে উতল তেঁতুলপাতা
দাদুরীরা দাদ্‌রা সুরে
　　তোর বরণের বাজনা জুড়ে।

"দাদ্‌রা সুর"টী কি কবিরই আবিষ্কৃত? না ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে পূর্ব্ব হইতেই আছে। 'কঠিন ভূঁয়ের খিতিয়ে পড়া পরাণের' সন্ধান কবি ভিন্ন আর কে দিতে পারে? নারী—শ্রীসজনীকান্ত দাসের রচিত সুদীর্ঘ কবিতা—ইহা যথার্থ-ই একটী কবিতা; উদীয়মান কবি নারীর

মহিমা, নারীর গৌরব, উপযোগী ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ সেনের পর নারী-প্রশস্তি এমন ভাবে কেহ লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। নবীন লেখক অরবিন্দ দত্তের উপন্যাস "বামুন বাগ্‌দী" বেশ চলিতেছে। "গোরার" আনন্দময়ী চরিত্রের পরেই লেখকের সৃষ্ট মহেশ্বরীকে মনে পড়ে। লেখকের ভাব-প্রকাশের শক্তি এবং ভাষার উপর অধিকার অনন্য-সাধারণ। "কঙ্কাল" রবীন্দ্রনাথের আর একটী কবিতা। অতি সুন্দর! কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। স্থানাভাব নহিলে সমস্ত কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতাম। কবিতার শেষ দুই অনুচ্ছেদ দুইটী হীরকখণ্ডের ন্যায় সমুজ্জল।

মানসী ও মর্ম্মবাণী চৈত্র, ১৩৩১ ঃ— আলোচ্য সংখ্যা পাঠে আমরা প্রীত হইয়াছি। ঐতিহাসিক, সামাজিক ও দার্শনিক প্রবন্ধসম্ভারে, ছোট এবং ক্রমশঃ প্রকাশ্য বড় গল্পে ও সমালোচনায় এ মাসের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' সমৃদ্ধ হইয়াছে। "আর্টের অনুশাসন" প্রবন্ধে সুলেখক রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর পৌষের "বঙ্গবাণীতে" প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "সাহিত্য ও নীতি" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন। রায় বাহাদুরের বিশ্লেষণ এবং যুক্তিপ্রয়োগ-নৈপুণ্যে প্রবন্ধটী উপাদেয় হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষের মতকে তিনি নিপুণতার সহিত খণ্ডিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার রচিত "সামাজিক নব সমস্যা" প্রবন্ধে যে সকল কথা তুলিয়াছেন সমাজের হিতকামী প্রত্যেক ব্যক্তিরই সে সকল অনুধাবনযোগ্য। এই সকল সমাজ-ব্যাধির প্রতীকার অচিরে না হইলে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ-জীবন বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিবে। "পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্র" প্রবন্ধ, অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বিরচিত নাট্য সমালোচনা। গিরিশচন্দ্রের নাটক সম্বন্ধে সমালোচনা খুব কমই হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অধুনা লুপ্ত যমুনা পত্রিকায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, এম-এ, বি-এল, মহাশয় গিরিশচন্দ্রের কয়েকখানি নাটকের সমালোচনা করিয়াছিলেন এবং অধুনা লুপ্ত "নাট্যমন্দিরে" শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষাল এম-এ, এবং মহাশয় এ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে দু' একখানি পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে এক আধটা প্রবন্ধ দেখিতে পাই। কিন্তু গিরিশ প্রতিভার যথোপযুক্ত বিচার বা বিশ্লেষণ আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। আলোচ্য প্রবন্ধে যতীন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস' নাটকের ভাষার সহিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের ভাষাগত মিল কত অধিক। আলোচনা নূতন এবং চিন্তাকর্ষক হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারীদত্তের মুসলমান যুগের মথুরা, নানা ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ। পুলিনবাবু নানা দিক দিয়া মথুরার ও বৃন্দাবনের একটী ধারাবাহিক ইতিহাস ও কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় দিয়া বঙ্গসাহিত্যের এক দিকের অভাব পূর্ণ করিতেছেন। "কিশোরী" ও "নীরব বীণা" দুইটী ছোট গল্প। মন্দ নয়। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মণ্ডলের "নীরব বীণায়" আর্টের পরিচয় পাইয়াছি। ছোট গল্প লেখায় লেখকের বেশ হাত আছে। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী সুপাঠ্য প্রবন্ধ ও কবিতায় এ মাসের পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

পুস্তক সমালোচনা

স্বাতন্ত্রী ঃ—উপন্যাস শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ১৯২ পৃঃ মূল্য ১॥০ প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। উপন্যাস খানি "বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্" নামক প্রবাদটীর উপর স্থাপিত, ইহাতে নারী হৃদয়ে কামনার আকাঙ্ক্ষা কত প্রবল তাহা উজ্জ্বলরূপে দেখান হইয়াছে। বিজয় বাবুর উপন্যাসের হাত বড় মিঠা এবং উজ্জ্বল সুস্পষ্ট চরিত্র অঙ্কণে তিনি সিদ্ধহস্ত। নরনারীর প্রেমের মনস্তত্ত্বের একটা দিক তিনি ফলাইয়াছেন এবং তা খুব রুচির সহিত। আধুনিক উপন্যাস জগতে মনস্তত্ত্বের নামে ছাই পাঁশ ও চলিয়া যাইতেছে সুখের বিষয় ইহা সে শ্রেণীর মনস্তত্ত্ব নহে। ভাষা যেমন সহজ স্বচ্ছ তেমনি মিষ্ট —বর্ণনার কোথাও আড়ম্বর নাই, একটানা নদীর মত মধুর রসের যেন উজান বাহিয়া চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের পাঠক পাঠিকাগণ ইহা পাঠে তৃপ্তি পাইবেন তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। বইখানির ছাপা ও বাঁধা বেশ সুন্দর। উপহার দিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ডের রঙ্গালয়

শ্রীসুধাংশু কুমার গুপ্ত, এম-এ

রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব কালেই ইংলণ্ডে রঙ্গালয়ের সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে লণ্ডনে ও দেশের অন্যান্য স্থানে অনেকগুলি পেশাদার নাট্যসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, এবং জনসাধারণের নাটকাভিনয় দেখিবার আগ্রহও সাতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রধান যে দুইটী রঙ্গালয়ের সৃষ্টি হয় তাহাদের নাম থিয়েটার (Theatre) ও কার্টেন (Curtain)। প্রায় ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের শোরডিচ্ (Shoreditch) নামক স্থানে এই দুইটী রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। শুনা যায়, এলিজাবেথের সময়ে লণ্ডনে অন্যূন বারোটি রঙ্গালয় ছিল। ইহাদের মধ্যে সব চেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে গ্লোব রঙ্গালয় (Globe Theatre)। গ্লোব রঙ্গালয়ের নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবেন, কারণ ইহার সহিত ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্সপীয়র দীর্ঘকাল জড়িত ছিলেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে এই রঙ্গালয়টি সাউথওয়ার্ক (Shouthwark) নামক স্থানে নির্ম্মিত হয়, এবং এইখানে ১৬০২ খৃষ্টাব্দে সেক্সপীয়রের বিশ্ববিখ্যাত নাটক Hamlet (হ্যাম্লেট) অভিনয় হয়। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে অগ্নিকাণ্ডে এই রঙ্গালয়টির অস্তিত্ব লুপ্ত হয়, পরে বহুকাল অভিনয় বন্ধ থাকিবার পর ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের ইহাকে স্থানান্তরিত করা হয়। তৎকালীন রঙ্গালয়গুলির আকারে বিশেষ বৈষম্য দৃষ্ট হইত। আদি গ্লোব রঙ্গালয়ের আকার কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞরা বলে যে গ্লোবের বহির্ভাগ (exterior) অষ্টভুজ (octagonal) ছিল এবং অন্তর্ভাগ ছিল বৃত্তাকার (circular)। তৎকালীন রঙ্গালয় গ্রীক্ থিয়েটার বা রোমক রঙ্গভূমির (amphitheatre) মত অনাবৃত ছিল, কেবল অভিনেতাদের ঝড়-বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য রঙ্গমঞ্চের (stage) ঠিক উপরে একটি তৃণাদি রচিত আচ্ছাদন ছিল। বর্ত্তমান যুগের রঙ্গালয়ে বক্সগুলিকে (সে সময়ে boxকে room বলা হইত) যে ভাবে বিভক্ত করা হইয়া থাকে তখনকার রঙ্গালয়েও প্রায় সেইভাবে বিভক্ত করা হইত, তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, আধুনিক রঙ্গালয়ে পিট (Pit) ও রঙ্গমঞ্চের (stage) মধ্যবর্ত্তী স্থানে (এই স্থানকে orchestra বলা হয়) বাদকেরা আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সেকালের রঙ্গালয়ে তাঁহাদের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল উপরের একটি গ্যালারিতে (gallery) যাহাকে বর্ত্তমান কালে dress-circle বলা হইয়া থাকে।

তখনকার রঙ্গালয়ে চিত্রিত দৃশ্যপটের (painted scenery) ব্যবহার ছিল না। রঙ্গমঞ্চের উপর কতকগুলি পর্দ্দা টাঙ্গান থাকিত, অভিনেতাদের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থান ঐ পর্দ্দাগুলির সাহায্যে সম্পন্ন হইত, এবং স্থলকে নির্দ্দেশ করিবার জন্য রোম, এথেন্স, লণ্ডন, ফ্লোরেন্স এইরূপ একটি নাম লেখা একখণ্ড বড় কার্ড (board) রঙ্গমঞ্চের উপর বিলম্বিত হইত। দৃশ্যবিষয়ে (scene) এইরূপ অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হইলেও দৃশ্যের খুঁটিনাটির (details) দিকে কথঞ্চিৎ মনোযোগ দেওয়া হইত। শয়ন কক্ষ দেখাইবার প্রয়োজন হইলে টেবিলের উপর একটি শয্যা রাখা হইত, সরাইখানার দৃশ্যে (tavern) মদের বোতল ও পানপাত্র সমেত একটা টেবিল এবং তার চারিপার্শ্বে কয়েকটি বেঞ্চি রঙ্গমঞ্চের উপর বিরাজ করিত, এবং সুদৃশ্য চন্দ্রাতপের নিম্নস্থিত স্বর্ণমণ্ডিত কাষ্ঠাসন (gilded chair) প্রাসাদ বা গির্জ্জার বেদীর আভাস প্রদান করিত। অভিনয়ের সুবিধার জন্য রঙ্গমঞ্চের পিছন দিকে মাটী হইতে ৮।৯ ফুট উচ্চ একটী স্থায়ী কাঠের বারান্দা (balcony) নির্ম্মাণ করা হইত। যখন একজনকে অলক্ষ্যে থাকিয়া অপরের কথা বার্ত্তা শুনিতে হইবে তখন তাহাকে এই বারান্দার উপরে দাঁড়াইতে হইত; তা ছাড়া সময় সময় দুর্গ অথবা অবরুদ্ধ নগরের প্রাচীর এই বারান্দার দ্বারা সূচিত করা হইত।

তখনকার রঙ্গালয়ে পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইত না। পোষাক পরিচ্ছদে

দেশ ও কালের উপযোগী করিবার আবশ্যকতা সে সময়ের লোকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। নাটকের পাত্র পাত্রী যে দেশের ও যে যুগেরই হউন না কেন, অভিনেতারা সেই সময়কার পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন। তবে এইটুকু সৌভাগ্য যে ইংলণ্ডের সে সময়কার পরিচ্ছদ অত্যন্ত সুন্দর, সুশ্রী ও আড়ম্বরপূর্ণ ছিল।

সে সময়ে অতি অল্প ব্যয়ে অভিনয় দেখিবার সুযোগ ছিল, এবং সেই কারণে সাধারণ লোকেরাও ইচ্ছামত রঙ্গালয়ে যাইতে পারিত। বস্তুতঃ তৎকালে রঙ্গালয়ে ধনী লোকের অপেক্ষা দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের সমাবেশ অধিক হইত। সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয়ে উপস্থিত থাকা মহিলাদের পক্ষে নিন্দনীয় ছিল,এবং যখন তাঁহারা রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শনার্থ যাইতেন তখন সূক্ষ্ম বস্ত্রের দ্বারা তাঁহাদের মুখমণ্ডল আবৃত থাকিত, পাছে কেহ চিনিয়া ফেলে। অভিনয় সচরাচর প্রাতঃকালে হইত এবং যতক্ষণ অভিনয় চলিত রঙ্গালয়ের শীর্ষে একটি পতাকা দৃষ্ট হইত। অভিনয়ারম্ভের পূর্ব্বে তিনবার বংশীধ্বনি হইত। তৃতীয়বার বংশীধ্বনির পর একজন সৌম্যদর্শন পুরুষ (solemn personage) রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া প্রস্তাবনা (prologue) আবৃত্তি করিতেন। ইঁহার সচরাচর ব্যবহার্য্য পোষাক ছিল, কালো মখমলের একটা দীর্ঘ অঙ্গরাখা (cloak)। নাটক অভিনয় শেষ হইবার পর, কখনও বা প্রতি অঙ্কের শেষে, একপ্রকার হাস্যরসের অভিনয় হইত; ইহাকে লোকে জিগ্ (jig) নামে অভিহিত করিত। এই জিগ্ অধিকাংশ স্থলে clown বা ভাঁড়ের দ্বারা সম্পন্ন হইত। (তখনকার দিনে comic ও tragic উভয়বিধ নাটকেই clownএর দর্শন পাওয়া যাইত)। প্রয়োজন বোধে একটি ইংরাজী পুস্তক হইতে এই jig সম্বন্ধে কয়েকছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—"The Jig was a kind of comic ballad declamation in doggerel verse either really or professedly an improvisation of the moment introducing any person or event which was exciting the ridicule of the day and accompanied by the performer with tabor and pipe and with grotesque and farcical dancing.

গভীর বিয়োগান্ত নাটকের (deep tragedy) অভিনয় কালে রঙ্গমঞ্চে শাদার পরিবর্ত্তে কালো পর্দ্দা ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন ইংরাজী নাটক সমূহে তৎকালীন রঙ্গালয়ে উক্ত রীতির বাহুল্য উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় সে যুগের প্রতি কক্ষের ন্যায় রঙ্গমঞ্চের উপরেও তৃণ (rushes) বিছাইয়া রাখিবার রীতি ছিল, এবং ঐ তৃণের উপর কাষ্ঠাসন পাতিয়া সম্ভ্রান্ত দর্শকগণকে বসিতে দেওয়া হইত। সম্ভ্রান্ত দর্শকেরা রঙ্গমঞ্চে বসিয়া অভিনয়কালেই নাটক ও অভিনয়ের উচ্চকণ্ঠে সমালোচনা করিতেন এবং সময় সময় রঙ্গমঞ্চের সম্মুখস্থ সাধারণ দর্শকমণ্ডলীর সহিত বাদানুবাদে রত হইতেন।

বালক অথবা তরুণ যুবকের দ্বারা স্ত্রীলোকের অংশ অভিনীত হইত। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখিতে পাই, দ্বিতীয় চার্লস্ এর রাজ্যকালের প্রারম্ভে প্রায় ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের নারীরা সর্ব্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেন, এবং অনুসন্ধানের ফলে জানা যায়, ওথেলো (Othello) নাটকের Desdemona চরিত্রে সর্ব্বপ্রথম অভিনেত্রীর আবির্ভাব ঘটে। রঙ্গমঞ্চে নারীর আবির্ভাবে প্রথমে অনেকে বিরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মূলে যে যুক্তি (propriety) ও সুবিধা ছিল শীঘ্রই তাহা তাঁহাদের বিরুক্তিকে দূরীভূত করিতে সমর্থন হইয়াছিল। পুরুষের দ্বারা নারীর ভূমিকা অভিনীত হইত বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে তৎকালে নারীর ভূমিকা সুচারুরূপে অভিনীত হইত না। সে সকল তরুণ অভিনেতা নারীর অংশ অভিনয় করিতেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন যে পরম উৎকর্ষ (perfection) লাভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ের প্রমাণাভাব নাই।

Printed & Published by Sachindra Nath Banerji at the HIMANI PRESS.
83, Durga Charan Mitter Street, Calcutta.

"দুষ্টু ছেলে"

"বিলাতী চিত্র হইতে"

Lakshmibilas Press, Calcutta.
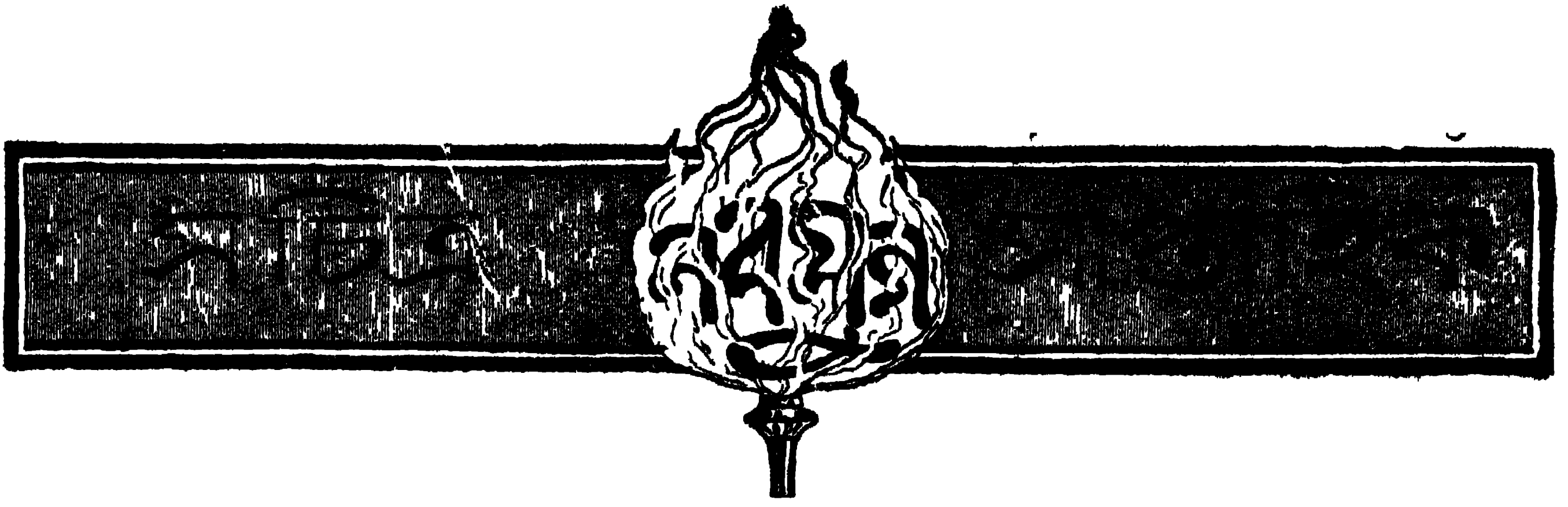
প্রথমবর্ষ] ৫ই বৈশাখ শনিবার, ১৩৩২ সন। ইংরাজী ১৮ই এপ্রেল [৩৬শ সংখ্যা

রোহিণীর আপীল
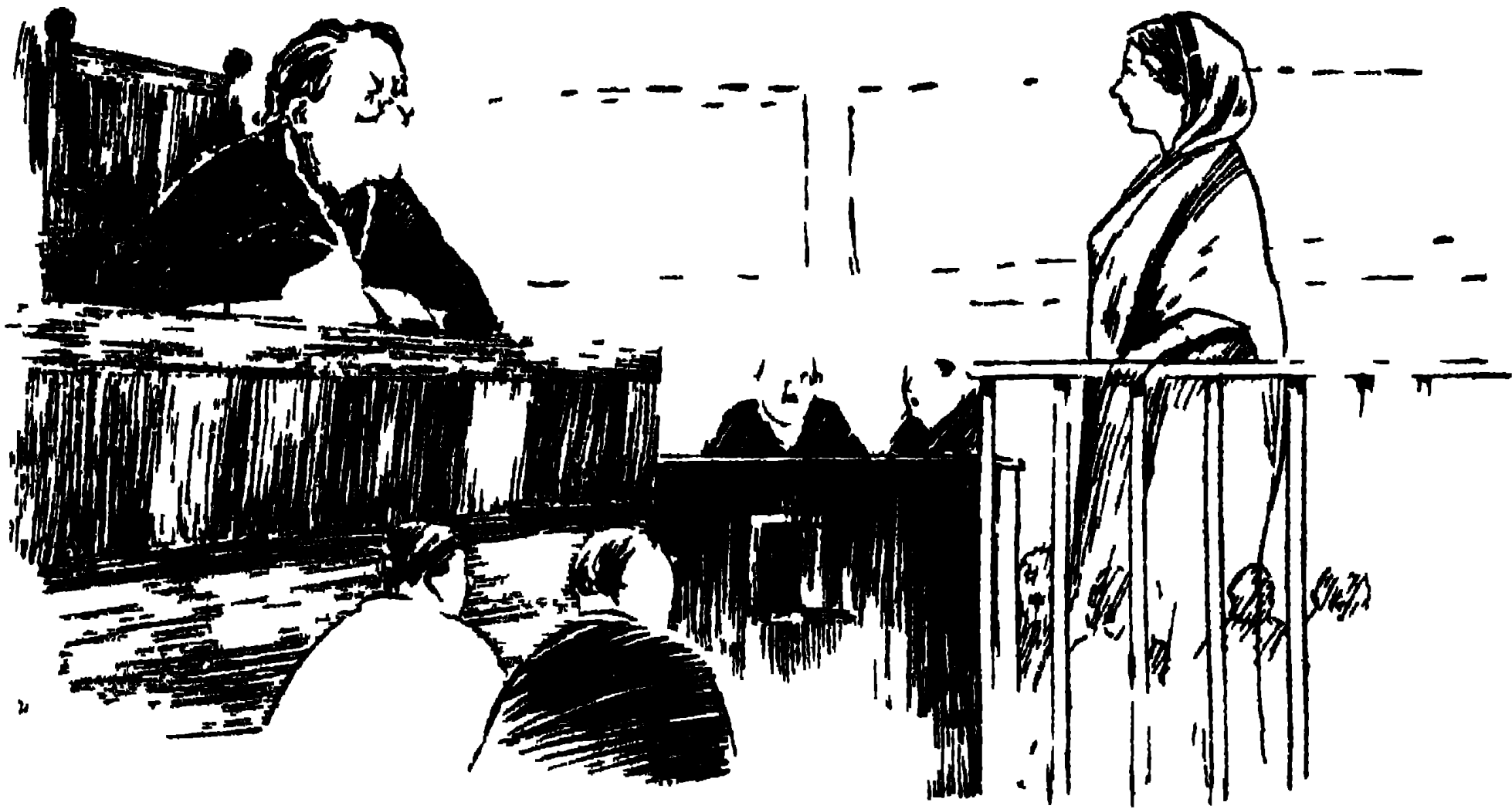
সাহিত্যের চীফ্ জাষ্টিশ—কি বল্লে তোমার নাম রোহিণী? ওঃ ছেলেবেলায় তোমার কেলেঙ্কারীর কথা অনেক শুনেছি বটে—তা কথাটা কি জান বঙ্কিম নীতি আর সমাজের মুখ চেয়ে তোমায় অযথা গুরুদণ্ড দিয়েছে। কি কর্‌বে সবই অদৃষ্ট, তুমি যদি আমার আমলে জন্মাতে তা হলে প্রেমের প্রকৃত মাহাত্ম্য দেখাবার জন্য আমি তোমায় 'সাবিত্রী'র উপরে আসন দিতাম। বরাতে যা কর্ম্মভোগ থাকে তা এড়াবার উপায় নেই—অতঃপর তুমি বেকসুর খালাস।
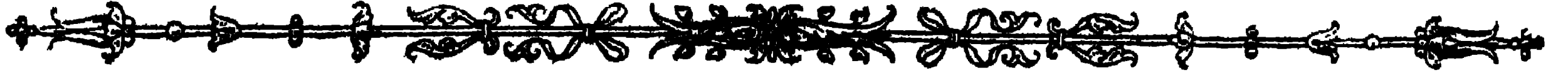
গোপন ব্যথা

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

১

ক'দিন মেঘমেঘ করে, কাল সকাল হইতে যে বর্ষণ সুরু হইয়াছে, তার আর ক্ষান্ত হইবার নামটি নাই। আকাশের মুখ অত্যন্ত বিরস, যেন কোন গভীর বিষাদের ভারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

ঝির্ ঝির্ করে জল পড়ছে, যেন উচ্ছ্বাসিত রোদন সম্বরণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা। সারা বিশ্ব জুড়ে সে রোদন আজ জেগে উঠেছে, তাহা কার তরে কে জানে।

বেদনাভরা দমকা বাতাস বয়ে গেল, তাহার কোথায় যে শেষ তা কে জানে।

বসে আছি, কোন কিছু করিতে আজ আর ভাল লাগিতেছে না। পাশেই নভেল খানা খোলা পড়ে রয়েছে। মোটে খানকতক পাতা পড়েছি, বাকী পড়িতে পারি নাই। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চেয়ে কেবলি মনের ভিতর আমার "গোপন ব্যথা" গুমরে উঠছে। "এমন দিনে তারে বলা যায়"—কিন্তু কারে? যেটুকু অস্পষ্ট ভাব মনের ভিতর জেগে উঠছে কাকেই বা তা বল্‌বো আর কেই বা তা শুন্‌বে?

উপরের ঘর হইতে পিয়ানোর মৃদুমৃদু সুমধুর আওয়াজ কাণে আসিতেছিল। করুণা রবিবাবুর একটা বর্ষা-সঙ্গীত বাজাইতেছিল, এই গানটি তাহার অতিপ্রিয়, তাই আজও সেই গানটা বাজাইতেছে।

আজ আমার অন্তরে যে কথাটি বার বার উঁকি মারিতেছে তাহা কি করুণাকে বলা যায় না? কেমন করেই বা তারে বল্‌ব, আর বল্‌লেই সে বুঝিবে কি? কি জানি! আমার তো মনে হয় তাহা আমি বলিতে পারিব না, কারণ অনেক কথা মনে করা খুব সহজ, কিন্তু মুখে বলা কিছুতেই যায় না। আর যদিই বা ভরসা করে তাহার নিকট বলিয়া ফেলি তাহা হইলে হয়তো সে হাসিয়া উঠিবে। সে হাসির আঘাতে আমার সকল চিন্তা বিকৃত হইয়া যাইবে।

করুণার হাসি আমি খুব ভালবাসি, কিন্তু এই অবস্থায় তাহার হাসি আমি সহিতে পারিব না; এই সেদিন সে বলিতেছিল, "তুমি যে কি ছাই পাঁশ আমায় বল বুঝিতে পারি না, সোজা করে কি বলা যায় না?

করুণাকে আমি পাঁচ বৎসর পাইয়াছি, কিন্তু আমার মনে হয়, যে এই পাঁচ বৎসর আমি তাকে এত কাছে কাছে পাইয়াও তাহাকে মোটে পাই নাই

যাহাকে পাইবার আশায় আমি আমার হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি, তাকে হয়ত আমি পাই নাই। আমাকে ফাঁকি দিয়ে সে যে আমার মনের নেহাৎ বাহিরে কোথায় থাকে তাহা দেখিয়াও যেন দেখিতে পাই না।

অনেক দিন এমন হয়েছে যে করুণার হাত দুইটি আমার হাতের ভিতর নিয়ে তাহার সেই কোমল সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া কত স্বপ্নের জাল বুনিতেছি এমন সময় স্বপ্নের জাল ছিন্ন করিয়া তাহার কথা কাণে এসেছে—"অমন করে কি দেখ্‌ছো গো?"

তাই আমি ভাবি করুণাকে আমি কিছুক্ষণের জন্য পাইয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর সে নাই। তাহাকে বোধ হয় সত্যি করে পাওয়া যায়, যদি আমি আমার "গোপন ব্যথা" গম্ভীর সুরে শুনিয়ে দিতে পারি।

করুণা যে আমার কথা বোঝে না সেটা আমারই দোষ, কারণ আমি জানি না কেমন করে বল্‌তে হয়। কিন্তু আমি কি করিব মানবের ভাষা এত দরিদ্র যে, তাতে মনের কোন গোপনকথা বলা চলে না। সে যতই না কেন গম্ভীর হউক, ভাষায় বলিতে গেলে সব ভাব এলোমেলো হয়ে যায়। কাজেই হাসি যে আসিবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

অন্য কেহ বলিলে আমারি হয়তো হাসি পাইত।

২

বিকাল হইতে বৃষ্টির ধারাটা আরও একটু বেড়ে

গেল। মুক্তার ন্যায় জলধারারাশি ঐ বড় গাছের নীচে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সম্মুখে সবুজ তৃণ আচ্ছাদিত মাঠ আপনার অসীম উদারতায় বুক পেতে দিয়ে আছে, যেন ইহাতে তাহার কোন কিছু কষ্ট বা বিরক্ত নাই। আমি পূর্ব্বের ন্যায় মোহাচ্ছন্ন ভাবে বসে আছি। মানুষের মনের সঙ্গে বাহিরের প্রকৃতির যে একটা মিল আছে, তাহা বাদলার দিনে বেশ ভাল করে বুঝিতে পারা যায়, আকাশ যখন মেঘে ভারী হইয়া থাকে, মানুষের মনও তখন ঠিক সহসা কোন অজ্ঞাত কারণে তেমনি ভারী হইয়া পড়ে। কাজের দিনে মনকে আমরা কোনরূপ স্ফূর্ত্তি কর্ত্তে দিই না বলেই এমনি একটা অবসরের প্রতীক্ষায় সে সব ব্যথা জমিয়ে রাখে। অবশ্য এই সময়ে সকল কথাই যে দুঃখের কাহিনী হইবে তা নয়; যদি কাহার কাহিনী সত্যই সুখের হয় তবুও তার তলে তলে যেন একটু না একটু "গোপন ব্যথা" লুকিয়ে থাকে।

সেই জন্যই মন যখন মানুষের সাম্‌নাসাম্‌নি হয়ে দাঁড়ায় তখন মানুষ নিজের মধ্যে একটা ভাব অনুভব করে। এ ছাড়া ত আমার এইরূপ হইবার আর কোনও হেতু খুঁজে পাচ্ছি না।

বইটা সবে পুনরায় আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময় করুণা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হচ্ছে? আমি তাহার কথার কোনও উত্তর না দিয়া, তার দিকে তাকাইলাম সে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে, আমার পাশে বসে বল্‌লে "খাসা দিনটি।"

দুইজনে এই রকম পাশপাশি বসে থাক্‌তে থাক্‌তে আমার মনে হইল করুণাকে যেন নিতান্ত কাছে আজ পাইয়াছি। বল্‌লুম—করুণা, আজ বহুদিন পরে তোমাকে আমার কাছে পেয়েছি। করুণা একটু অবাক্ হইয়া বলিল "কেন—এতদিন তবে আমি ছিলেম কোথায়?" ঐ তো মুস্কিল, এ কথার আমি কি জবাব দি? যদি সে এ কথাটা ভাল করে বুঝিত তাহা হইলে আমাকে সে এইরূপ প্রশ্ন করিত না। কিন্তু এটা বরাবরই ঝাপ্সা রয়ে গেল।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাক্‌বার পর করুণা উঠে যাবার উপক্রম কর্‌তেই বাধা দিয়ে বল্লুম, কোথায় যাচ্ছ করুণা বলিল যাই কাজ আছে, তুমিত আর কথা কইছনা, তার চেয়ে কাজ সেরে রাখিগে—। আমি বল্লুম কাজ পরে করো'খন এখন একটা গান গাও। করুণা একটু হেসে বল্‌লে ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি? আমি বল্‌লুম্ না না, সত্যি বল্‌ছি তুমি বেশ গাও, ঠাট্টা নয়। ভাল দেখে একটা গাও। করুণা গান ধরিল—

নিদ্ নাহি আঁখি পাতে।
আমিও একলা তুমিও একেলা
আজি এ বাদলা রাতে… …

গান শেষ হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, একি হল? তুমিও আমি এইত বসে রয়েছি, একাকী কোথা হল? হয়ত কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া করুণা বলিল কেন, গানটা কি ভাল নয়? আমার ত বেশ ভাল লাগে।

তাহার কথা শুনে মনে হল যে আমি যা ভাবছি ঠিক সেই কথাই করুণার মনেও জাগছে তবে আরও অস্পষ্ট ভাবে, সেও আজ আপনাকে নিতান্ত একাকী অনুভব ক'র্‌ছে আমারি মত।

আমরা উভয়ে নীরব, একটু পরে করুণা উঠিয়া গেল, মনে হল তাহারও হৃদয় আমার ন্যায় "গোপন ব্যথায়" ঘিরে আছে।

আজ আমাদের উভয়েরি মনে হয়ত জাগ্‌ছে একই বেদনা কিন্তু কেউ কাউকে তো জানাতে পার্‌ছি না।

মনে কর্‌ছি আর ভাব্‌ব না, কিন্তু ভাবনাটা আরও জটিল হইয়া মনে মধ্যে বার বার উদয় হচ্ছে। মনের তলায় যত কথা থিতিয়ে থাকে একটু নাড়া পেলেই তারা গুলিয়ে উঠে উপর দিকে আসতে চায়।

সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে, দিনের ম্লান আলোর আভা আরও মলিন হয়ে আসছে, দূরের অন্ধকার ক্রমেই জমাট হয়ে আস্‌ছে। পেচকের কর্কশ আওয়াজ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আকাশের গায়ে মিলাইয়া যাইল, পুষ্পমঞ্জরীগুলি সান্ধ্য বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া তাহারা তাহাদের ব্যথা সকল জানাইতেছে, কিন্তু আমার এ "গোপন ব্যথা" তাহাকে জানান হইল না।

শর্ট-সাইট

শর্ট-সাইটটা বাঙ্গলার তরুণ মহলে যে একাধিপত্য বিস্তার করেছে তাতে আর সন্দেহ নাই—প্রথম প্রথম অবশ্য অনেক ছোকরাবাবু সখের জন্য চসমা নিতেন এবং এখনও নেন্ তবে তার সংখ্যা কমে গেছে। তরুণীদের মধ্যেও চসমার আবির্ভাব হয়েছে এবং তার প্রাচুর্য্য নারীসমাজেও শর্ট-সাইটের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। বারাঙ্গনা সমাজেও 'ভব্যতার' খাতিরে চসমার রেওয়াজ বেশ হইয়াছে।

শর্ট-সাইট ব্যায়রামের উপায় আছে কিন্তু সখের অবশ্য ঔষধ নাই। ডাক্তারেরা বলে থাকেন যে কোন জিনিসের কাছে চোখ বেশীক্ষণ রেখে যাদের কাজ কর্ত্তে হয় তাদের অসুখ হয়; যেমন বই পড়া, ঠিক দেওয়া, কম্পোজ করা ঘড়ী মেরামত করা প্রভৃতি। কিন্তু এটা একটা অনুমান মাত্র একেবারে খাটী সত্য নয় কারণ মুটে মজুরদের মধ্যে ছাত্র কেরাণী বা কম্পোজিটারদের চেয়ে শর্ট-সাইটদের সংখ্যা অনেক বেশী; কিন্তু তাদের মধ্যে এত চসমার বাহার নেই কারণ 'সখ' জিনিসটা তাদের হাড়ে বোধহয় এতটা বিঁধে নাই যতটা এই ছাত্র ও কেরাণীদের হাড়ে বিঁধিয়াছে। তবে এটা কেবলই যে সখের অভাব তাও নয়—আর একটা কারণ এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, সেটা হচ্ছে এই যে যারা হাতে কাজ করে তারা চসমা ব্যবহারটা বড় অসুবিধাজনক মনে করে কাজেই তাহারা স্বভাবতঃই চসমার ব্যবহার পছন্দ করে না। একটা ভারী জিনিস তুলতে গেলে গলার শিরগুলো ফুলে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে চোখের ভেতরে স্নায়ুগুলি ও ফোলে এবং অক্ষিতারকায় বেশ একটু চাপ্ পড়ে, বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে সে সকল কাজে এই রকমে চক্ষুর স্নায়ুতে চাপ পড়ে সেই সকল কাজই শর্ট-সাইট হবার কারণ। এ ব্যারামটা অনেকস্থলে বংশগত হয়ে দাঁড়ায়। এই সকল বংশের ছেলে মেয়েদের হঠাৎ কোন কাজে চোখের স্নায়ুতে চাপ পড়লেই 'শর্ট-সাইটেডনেস্' আসে—ছেলে বেলায় হাম, ঘুংড়ি কাশী, ব্রঙ্কাইটীস্ প্রভৃতি ব্যায়রামে চক্ষু দুর্ব্বল হয়—এই সকল রোগে চিকিৎসার সময়ে চিকিৎসকদের উচিত চোখের সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা। বয়স্কলোকদেরও টাইফয়েড, বসন্ত প্রভৃতি রোগে চক্ষু আক্রান্ত হয়, এমন কি অনেক রোগী এ সব রোগের আক্রমণের ফলে অন্ধ পর্য্যন্ত হয়ে যায়। রোগ আরোগ্যের পর দুর্ব্বল অবস্থায় এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যাতে চোখের স্নায়ুগুলিকে বেশী খাটতে হয় এইজন্য এই সময় ডাক্তারেরা পড়াশুনা কর্ত্তে বারণ করেন। যাদের কাজই হচ্ছে ভারী জিনিষপত্র বহে নিয়ে যাওয়া তাদের চোখ প্রায়ই খারাপ হয়। সাইকেল চড়ে বেশীদূর যাতায়াত করাও শর্ট সাইট হবার অন্যতম কারণ। কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ থাকলে তাতেও দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়। এই সকল বিষয়ে গোড়া থেকে একটু লক্ষ্য রেখে চল্‌লেই এই একপ্রকার আরোগ্যাতীত রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কৃতজ্ঞতা

শ্রীবাঁশরীভূষণ মুখোপাধ্যায়

(ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ান)

তরু কহে "লো প্রেয়সী ছায়া, ধন্য মানি ও তনু সুন্দর।
পথিকের বিশ্রামের তরে বিছায়ে রেখেছ অকাতর।"

কৃতজ্ঞতা ভরা রুদ্ধ কণ্ঠে তরুরে কহিল কাঁপি' ছায়া।
'তুমিই তো নিজে পুড়ি নাথ রাখিয়াছ মোর এই কায়া॥'

আশ্রম শিক্ষা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সমাদ্দার

আশ্রম বা তপোবন বলিলেই আমাদের মনে পড়ে সেই সুদূর অতীতের সুন্দর ছবি। নিস্তব্ধ বনান্তরালে প্রকৃতির হাতে গড়া একখানি ক্ষুদ্র কুটীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শান্তির লীলানিকেতন। বৃক্ষলতার মৃদু কম্পনে উন্মুক্ত প্রকৃতির প্রেম-বিহ্বল-প্রাণ যেন জেগে উঠ্‌ছে।

"দুর্দ্দর্শ প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় ব্রাহ্মী শ্রী সতত সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। সর্ব্বভূতের শরণ্য ও অলঙ্কৃত প্রাঙ্গণ-ভাগ, · কোথাও পবিত্র পূজোপহার এবং হোম দ্বারা দেবার্চ্চনা হইতেছে, কোথাও বা বেদধ্বনি হইতেছে, কোথাও পদ্মপুষ্প পরিশোভিত সরোবর শোভমান, কোথাও বা পুষ্প সকল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ·· · · সূর্য্য ও অনলের ন্যায় তেজস্বী পরম পুণ্যবান্ মহর্ষিগণ তথায় বিরাজ করিতেছেন।"

আকাশের মত নির্ম্মল, সাগরের মত গভীর, সূর্য্যের মত দীপ্ত ও চাঁদের মত কোমল, শান্ত ও মধুর প্রকৃতি ঋষি কুমারগণের শান্তিময়, আনন্দময় প্রাণঢালা হাসি-খেলা, মৃগশিশুর ধীর অসঙ্কোচ অবাধ আত্মীয়তা, বিহঙ্গের সুমধুর কাকলী সকলই এক অনস্তভূত আনন্দময় নবীন প্রাণের সাড়া জাগিয়ে দিচ্ছে, সকলি সুন্দর অথচ সংযত বিশ্ব-প্রকৃতির প্রাণে এমন এক সুর বর্ষিত হইতেছে, যাহার একটুও বেসুর নয়। ধর্ম্ম আছে, প্রেম আছে, সংযম আছে, ভক্তি আছে, কর্ম্মনিষ্ঠা আছে, পরার্থে আত্মত্যাগ আছে, সকলের প্রাণই একসুরে বাঁধা। এখানে সকলই মধুর!—ইহাই আশ্রম। এখানে শান্তি আছে, আনন্দ আছে, চিত্তশুদ্ধি আছে, এখানে প্রকৃত প্রাণের স্পন্দন আছে, হৃদয়ে গভীরতা আছে, এখানে মনের স্থৈর্য্যসাধন হয়, ইহাই শিক্ষার উৎকৃষ্ট স্থান। এখানেই জ্ঞানের চরম বিকাশসাধন হয়। এখানে মানুষ, 'মানুষ' হয়, কলের পুতুল তৈরি হয় না। এস্থান একদিকে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও সাংসারিক সকল প্রকার জ্ঞান দিতে সক্ষম; অপরদিকে দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি শিখাইতে সক্ষম,—যদি না আমরা সেই আশ্রমছায়াতলে বসিয়া বিকৃত শিক্ষার সোপান গড়ে তুলি। এমনি আদর্শ আশ্রমই আজ আমরা চাই। আমরা আজ বড়ই নিঃস্ব কাঙ্গাল হয়ে পড়েছি, আমাদের প্রাণে একটুকুও স্পন্দন নাই। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের মনের জড়ত্ব ঘুচাইতে পারে না। তস্বীরওয়ালার মত, শিল্পীর মত, ছাঁচে ঢেলে, কতকগুলি পুতুল তৈরি করে সে আমাদের বাজারে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কলের পুতুল যে ছেলে খেলার সামগ্রী, কোন দরকারে লাগে না। চাকরির বাজারে তাই আমাদের দাম ওঠে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একঘেয়ে ছাঁচ ভেঙ্গে দিয়ে এমন সব শান্তিময় আনন্দময় আশ্রম-শিক্ষার বিস্তার করার বড় প্রয়োজন! যে শিক্ষার গোড়ায় থাকবে—**স্বাধীনতা, প্রেমের বন্ধন, মুক্তির আস্বাদ।**

পিতার ন্যায় স্নেহপরায়ণ, হিতাকাঙ্ক্ষী মহর্ষিগণের সাহায্যে ও সঙ্গে থেকে গড়ে উঠে **নীতি, ধর্ম্ম, চরিত্র, সৎসাহস ও সংযম।** ছাত্র স্বাবলম্বী হয়ে একাগ্রচিত্তে সাধনা দ্বারা শিক্ষা করবে দর্শন, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। আর সকল শিক্ষার ভিত্তি দাঁড়াবে স্বাধীনতায়, প্রেমে ও মুক্তির আনন্দে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি, আমাদের দেশে কি পুরুষ কি মেয়ে কাহারও পক্ষে প্রকৃত জ্ঞানবিকাশের অথবা জীবনযাত্রার পক্ষে অনুকূল নহে। এ শিক্ষা আমাদের নৈতিক-জীবন গঠনে উদাসীন। ইহা কতকগুলি বিষয় গলাধঃকরণ করাইয়া দিতে পারে মাত্র। জ্ঞানের চরম বিকাশ-সাধন বা ভাবী জীবন-যাত্রার সুসহায় মোটেই নহে। কেহ হয়ত বলিবেন, বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ জ্ঞানলাভের পথ উন্মোচন করিয়া

দিতেছে, কিন্তু সে কথার উত্তর এই যে, আমাদের যাহা অবস্থা তাতে ২৫।৩০ বৎসর জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করবার সাধনা ক'রে, পরে জ্ঞানান্বেষণের অবসর বা ধৈর্য্য আর আমাদেব থাকে না। স্নতরাং এমনটি আমাদের প্রয়োজন, যদ্দারা প্রারম্ভ হইতেই প্রকৃত জ্ঞানান্বেষণ চলে। তাই বলিতেছি আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি মোটেই আমাদের উপযোগী নয়। "প্রবর্ত্তকের" একজন লেখক বলেছেন, "আপন দর্শন পরীক্ষাও বিশ্লেষণ দ্বারা মানুষ যে সিদ্ধান্ত ও অভিজ্ঞতা পায়, তাই জীবনে ব্যবহারে লাগে—কিন্তু মুখস্ত করা কোনও সত্য বা অভিজ্ঞতাই মানুষের চিত্তে প্রবেশ করে না। ("প্রবর্ত্তক" পৌষ ১৩৩০)—স্নতরাং আধুনিক শিক্ষার উপকারিতা যতই থাকুক না কেন অপকারিতাও যথেষ্ট আছে। কোন একজন আধুনিক মহিলা লেখিকা বলেছেন,—"যে শিক্ষা আজকাল আমাদের ছেলেমেয়েরা পাচ্ছে, এটা একরকম বাঘের হাতে গরু-চরাণী দেবার মত। ছেলেমেয়ে যদি সাহেব মেম্ সাজতে চায়, তার জন্য আমি ছেলেমেয়েদের দোষ দিই না। যারা তাঁদের শিক্ষা দিতে যাবেন, তাঁরা হ্যাটকোট, আর গাউন পেটিকোট পরে সাহেবিয়ানা জাহির কর্ত্তে যাবেন। গুরু মশায় যা করেন তাইত সব চেয়ে ভাল।· · ··তা ছাড়া সাদা চামড়া না হলে নাকি আজকাল শিক্ষা ভাল হয় না।··· যেসব মেম্ সাহেবেরা এদেশের আচার ব্যবহার বা সভ্যতার বিষয় কিছুই জানেনা তাঁরাই যাচ্ছেন আমাদেব মেয়েদের শিক্ষা দিতে। ফল এই হয় যে তাঁরা নিজেদেব সাহেবিয়ানাই শিক্ষা দিতে থাকেন।··· ···এদেশটা হচ্ছে plain living and high thinking এর দেশ। এদেশে গুহা বা গহ্বরবাসী ঋষিরা গাছের ফলমূল খেয়ে যে সব সত্য আবিষ্কার করে গেছেন পাশ্চাত্যের ভোগবিলাসী পণ্ডিতদের মাথায় তা আজও খেলেনি। আমাদের দেশের মেয়েদের মানুষ করতে হলে ঠিক সেই ভাবেই করতে হবে।··· ··· ···আজকাল শিক্ষয়িত্রীরা মেয়েদের পড়ার দিকে যতটা নজর দেন, তাদের পোষাক পরিচ্ছদের দিকে তার দ্বিগুণ দিয়ে থাকেন।" (ভারতবর্ষ পৌষ ১৩৩০)

আজকাল আমাদের মেয়েদের যা শিক্ষা হচ্ছে, তা এই মহিলা লেখিকার কথা হইতেই অনেকটা বোঝা যাবে। ভোগবিলাসিতার ভিতর দিয়ে বাহ্যিক শিক্ষা আমাদের ধাতে সইবে না; আমরা তা চাই না। আমাদের শিক্ষা হবে আভ্যন্তরিক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, যে শিক্ষা মানুষকে "মানুষ" তৈরি করে তাকে তালপাতার সেপাই করেনা,—বাজারের রঙ্গীন পুতুল করে গড়ে না! —তাই আমাদের আশ্রম শিক্ষার এত প্রয়োজন। ঝিল্লি-রব মুখরিত পল্লীরাণীর ছায়াশীতল বনভূমির শূন্যবক্ষ, পবিত্র আশ্রমের সুললিত ঝঙ্কারে পূর্ণ করে দিতে হবে, তাপস কুমারগণের আনন্দময় কলকণ্ঠে মুখরিত করে তুলতে হবে। সহরে উত্তপ্ত হাওয়াব পরিবর্ত্তে আশ্রমের শান্তিময় ছায়ায় প্রাণকে সুশীতল করে দিতে পারে, এমন প্রতিষ্ঠান আমাদের চাই! স্থানবিশেষে অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করিতে হইলেও সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠান গুলির নিম্নলিখিতরূপ ভিত্তি হওয়া আবশ্যক। আশ্রমের দুইটী বিভাগ থাকবে—একটী পুরুষদের, একটা মেয়েদের। পুরুষ ও মেয়ে বিভাগে উপযুক্ত কয়েকজন আচার্য্য থাকিবেন। নৈতিক জীবন গঠনোপযুক্ত স্ত্রী পুরুষের সুবিধামত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ত্তব্যগুলি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে যে, যে বিষয়ের ছাত্র সে বিষয়ের অধ্যয়ন করিবে বা শিক্ষা লাভ করিবে। কতগুলি practical subject থাকিবে যেমন, কুটীরশিল্প, কৃষি, ছুতারের কাজ (carpentery), দরজীর কাজ (tailoring) ইত্যাদি এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়েব পরীক্ষার নিয়ম অনুসারে পাঠ করান হইবে। গ্রাম্য আশ্রমগুলিতে সাধারণতঃ Matriculation standard পর্য্যন্ত চলিতে পারে। (যে সব গ্রামে এতদূব অগ্রসর হওয়া সহজ সাধ্য নয় সেখানে গ্রামবাসী কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ও মহিলা একত্র হইয়া যথাক্রমে এরূপ আশ্রম ছোট খাট ভাবে চালাইবার চেষ্টা করিবেন। এতে অবশ্য বেশী টাকারও দরকার হইবে না।) মেয়েদিগের শিক্ষার কথা বলিতে হইলে আমাব মতে তাহাদিগকে Logic, Botany, Physics, Shakespeare প্রভৃতি না পড়াইয়া তাহাদিগকে নারীর পক্ষে যাহা সমধিক প্রয়োজনীয় সেই বিষয়গুলি বিশেষরূপে শিক্ষা

দিতে হইবে। আমেরিকায়ও এইরূপ স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। তাদের বিষয়গুলি যথা—Practical (১) আহার্য্য বস্তুর প্রস্তুত প্রণালী (Principles of selection and preparation of food (২) পথ্যাদির ব্যবস্থা (Dietetics) (৩) গৃহকর্ম্মে মিতব্যয়িতা (Home economics) (৪) গৃহকর্ম্মে সুবন্দোবস্ত (Household management) (৫) পরিচ্ছদ প্রস্তুত ও সূচীকার্য্য শিক্ষা (Millinery and Carpet-weaving) (৬) কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রিরকাজ (Laundry) (৭) শিশুর স্বভাবের উপর দৃষ্টিরাখা (Care of Children) (৮) গৃহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (House sanitation) (৯) চিত্র ও অন্যান্য শিল্প কার্য্য (Art and Design) (১০) এ সবের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতি বিষয় গুলিও সংযোগ করা যাইতে পারে। যেখানে যত বিস্তৃত আকারে চলিতে পারে সেখানে ততটা শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। যাহাতে, অর্থাৎ যাহা যাহা শিক্ষা করিলে ভবিষ্যতে তাহারা সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে পারে, আশ্রমগুলি সেই ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ শিক্ষা দেশের ছেলেমেয়েদিগকে দিতে হইলে আশ্রম শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন। কারণ—"ছাত্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমনি করা উচিত যেন সে অন্য প্রবৃত্তির খোরাকটা সেখানে না পাইতে পাবে, কারণ মানুষের প্রবৃত্তিগুলি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতেই আহার পাইয়া থাকে।" (আশ্রম ১৩৩০)

এ আশ্রম শিক্ষা আমাদের দেশের জিনিষ, এতে তেমন কিছুই নূতন নাই, যাহা জনসমাজে চাঞ্চল্য আনিয়া দিবে। একে আবার ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌লে, আমাদের আনন্দের যুগ, মঙ্গল যুগ ফিরে পাব। বোলপুর, রাঁচি বালিগঞ্জ, চন্দননগর, কাশী প্রভৃতি স্থানে এইরূপ প্রতিষ্ঠান আশাতীত ফললাভ করেছে। বিশ্বভারতীর আশ্রম একজন লেখিকা নিজে দেখে এসে লিখেছেন,—"বিশ্বভারতীর ছেলেমেয়েরা গাছতলায় বসে গভীর গবেষণাপূর্ণ তত্ত্বের যখন মীমাংসা করেন, তখন মনে হয় যেন সেই অতীতের ভাস্করাচার্য্যের নিকট মৈত্রেয়ীর শিক্ষার কথা। তখন তপোবনে মুনিবালকদের শিক্ষার দৃশ্য কল্পনারাজ্যে আঁকিতে চেষ্টা করি।" (ভারতবর্ষ পৌষ ১৩৩০)—রাঁচিতে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার ইতিহাসে লিখিত আছে—"পরস্পর প্রীতি, প্রগাঢ় ভালবাসা ও নিজ জীবনের উন্নতির সহিত দেশের ছোট ছোট ভাইদের চরিত্র গঠনরূপ মহান উদ্দেশ্য ও আশ্রম স্বাধীন জীবন যাপনের প্রবল আকাঙ্ক্ষাই এই কর্ম্মীগণকে প্ররোচিত করিয়াছিল ... ..." বিদ্যালয়টী সর্ব্বতোভাবে একটী আশ্রম, এখানে আচার্য্য ও ছাত্রের সেই সহজ সরল জীবন, খোলা আকাশের নীচে, খোলা মাঠে খোলা প্রাণ, লেখাপড়ায় ক্রীড়া কৌতূহলের ভিতর স্বাধীনভাব, সকাল সন্ধ্যায় কখনও বা গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সাধন ও সংকীর্ত্তনের পবিত্র আনন্দ, আশ্রমজীবনকে যেন ভরপুর করিয়া রাখিত। বিদ্যালয়ের নূতন ধারাটি শিক্ষক ছাত্রের সম্বন্ধে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। স্নেহ ভালবাসা প্রীতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার বন্ধনেই পরস্পরকে বাঁধিয়া রাখিত। সেই ছোট ছোট ছেলেদের মধুমাখা "দাদা" বুলি আশ্রমটীকে পারিবারিক মাধুর্য্য হইতেও বঞ্চিত করে নাই। সারাদিনের জীবনটী যেন কেমন মধুর স্বপ্নের ভিতর দিয়া কাটিয়া যাইত। শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া প্রত্যুষে গাত্রোত্থান, বহিঃশৌচের কার্য্য সমাপন করিয়া আসন, আহ্নিক ও পরে পাঠের ব্যবস্থা—সকালটা এইরূপ শ্রীভগবানের চিন্তায় ও অধ্যয়নে কাটিলে দামোদর নদের প্রবাহে দুএকঘণ্টা জলক্রীড়া, পরে আহার ও বিশ্রাম করিয়া ১৫।২০ জন ছাত্রকে মুখে মুখে শিক্ষাদান (অবশ্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা)—বৈকালে আচার্য্য ও ছাত্রগণের একসঙ্গে "ড্রিল", পরে একত্রে শৃঙ্খলার সহিত নদীতীরে ভ্রমণ ও গান অথবা শালবনে ক্রীড়া, সন্ধ্যা হইলে ধ্যান ধারণা, পাঠ ও আহারের পরে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত হইত। নদী, গিরি, বনপ্রান্তর, কন্দর প্রস্রবণ এই সব প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের কোলে সাধনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং স্নেহ প্রীতির সম্বন্ধ, আশ্রমের আবহাওয়াকে এক উঁচুভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। (আশ্রম)

রাঁচির এই আশ্রমটাই যে আদর্শ আশ্রম হইয়াছে, ইহাই আমার বলিবার অভিপ্রায় নহে। তবে ভিত্তিটা এইরকমই হওয়া চাই। স্থান ও অবস্থা বিশেষে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত প্রণালী অনুসরণ করার প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। আমি যাহা বলিয়াছি স্থান বিশেষে সবগুলি হওয়া সম্ভব নয় তাহা সত্য, আর আমি যাহা বলি নাই তাহার প্রয়োজন নাই এইরূপ মনে করাও ভ্রমাত্মক। স্থান ও অবস্থা বিশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োজনীয় উপাদানে আদর্শ আশ্রম গড়ে তুল্‌তে হবে। স্বাধীন মুক্ত আনন্দের মধ্যে ছেলেমেয়েদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি ক'রে, উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধ'রে তাদের শিক্ষা দিতে হবে। তবেই আশ্রমের সফলতা ও ভারতের সুদিন আসিবে।—আধুনিক একজন উচ্চশিক্ষিত আশ্রমবাসী ব্যক্তি, শিক্ষা সম্বন্ধে বলেছেন "কোমল মধুর ভীষণ কঠোর সব রকম ভাবের উচ্চ মহৎ ও বৃহৎ আদর্শকে সাম্‌নে ধরা উচিত। জীবনটা যেন একঘেয়ে ভাবের আধার না হয়, আর বড় মহৎ উদারকে ভালবাসিতে শিখে। আস্তে আস্তে তাহার সাম্‌নে যত বড় বড় ভাব ধরা যাইবে—বড়র গুণই এমনি যে সে তার শ্রদ্ধা ফুটাইয়া তুলিবে। তার থাকিবার জন্য অনন্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের কোল, তাহার খেলিবার প্রাঙ্গণ—নদী, পাহাড় অনন্ত আকাশ সুবিস্তৃত মাঠ ও খোলা হাওয়া চাই—এই সব খোলা ভাবে তার প্রাণটাও খুলিয়া যাইবে চাপিয়া থাকিবে না। সবল শিশু ও বালক তাহার সঙ্গী এবং সংযমী আদর্শ শিক্ষক তার চালক হইবেন। কাব্য, কলা, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বুদ্ধির খাদ্য এবং আত্মনির্ভরতা তার আহার বিহারের প্রধান সহায় হইবে, এবং বিশাল জীবসংঘকে সে কর্ম্মক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিবে।"—(আশ্রম সারদোৎসব ১৩৩০)—এমনি শিক্ষার অনুকূল আদর্শ আশ্রম প্রতিষ্ঠা আমরা করতে চাই। এ শিক্ষায় ভারত "মানুষ" হবে। ভারতের গৌরব যুগ ফিরে আস্‌বে।

"মৃত্যু-মাধুরী"

শ্রীমনোমাধব চাকী এম-এ

১

এই প্রেম, এই ভালবাসা,—
কিছু কি রবে না তা'র শশ্মানের ভস্ম-সার,
নিবে যাবে হৃদয়ের যতেক পিয়াসা ?

২

দীপ কেন আকাশের ভালে ?—
একে একে খসি' খসি' আঁধারে মিলাবে শশী',
এই যদি পরিণাম রয়েছে কপালে ?

৩

ফুল কেন ফোটে গাছে গাছে ?
গন্ধ তার কেন ছুটে মলয় পড়ে গো লুটে,
কোকিল কুহরে কেন, শিখী কেন নাচে ?'

৪

কিছু কি রবে না কোন কালে ?
রূপের মাধুরীটুকু, স্মৃতিটুকু, গন্ধটুকু
স্বপ্ন হ'য়ে অনন্তের অঞ্চল আড়ালে ?

৫

এ জনমে পূর্ণ নহে কিছু,
অপূর্ণ এ ভালবাসা, অপূর্ণ প্রাণের তৃষা,
তাই সবে ছুটে চলে মরণের পিছু।

গল্প

মিলন

শ্রীমঞ্জরী দেবী

এক

সারাদিনেব পরিশ্রমের পর শুষ্কমুখে নিখিল বাড়ী ফিরিতেই বেয়াব। সবিনয়ে জানাইয়া দিল—মা' জী বায়স্কোপে গিয়াছেন, এখন চা ও খাবাব আনিবে কি না। বিরস মুখে 'আভি নেই' বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া, নিখিল, ক্লান্তদেহ একটা সোফাব উপর এলাইয়া দিল। সমস্তদিনেব পর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বেযাবাব মুখের নীরস কয়টী কথা শুনিয়াই তাহাব প্রিয়া-মিলনোন্মুখ চিত্ত যেন একটা অজ্ঞাত বেদনায টন্ টন্ করিয়া উঠিল। অভিমান হইল, বুকেব ভিতব ক্ষুব্ধ সাগব-তরঙ্গের মত একটা ক্ষোভ হৃদয়েব বেলাভূমে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল।

সার্শীর কাঁচদিয়া রক্তিম পশ্চিমাকাশের দিকে চাহিয়া নিখিল ভাবিতে লাগল—তাহার জীবনের অতীত মধুময় দিনগুলি। যাহার স্মৃতি তাহার কাছে আজ রজনীগন্ধার সৌরভের মত মৃদু ও স্নিগ্ধ বোধ হইতে লাগিল।

সে আজ দশ বৎসরের কথা, তখন সে ছিল এক আফিসের কেরাণীমাত্র, মাহিনা ছিল ত্রিশ টাকা। কিন্তু বাংলার সাধারণ কেরাণীদের মত আজীবন অদৃষ্টের নির্ম্মম পেষণ তাহাকে সহ্য করিতে হয় নাই। তাহার হৃদয়কুঞ্জে তখন নবীন বসন্তের সাড়া আসিয়া পৌছিয়াছিল, উমাও ছিল প্রস্ফুট-যৌবন। তরুণী।

তাহার আত্মীয়হীন ছোট্ট সংসারে ছিল শুধু সে আব তাহাব মমতাময়ী প্রেয়সী, উমা। তাহার উদয়াস্ত পবিশ্রমের সবটুকু গ্লানি উমা তাহাব সেবানিপুণ হাত দুখানি দিয়া যখন মুছিয়া লইত, তখন "আঁখিতে মুছাই যত বালাই তুহারি" যেন সত্য—সার্থক হইয়া উঠিত। গ্যাস জ্বালা সুরু হইলেই ছুটী পাইয়া সে উদ্‌গ্রীব হইয়া গৃহপানে ছুটিত, উমার দর্শনাশায়। বাড়ী আসিতেই উমা স্নিগ্ধ-হাস্যোজ্জ্বল মুখে হাত-পা ধুইবার জল ও কাপড় আগাইয়া দিত, তারপর তার নিজের নিপুণ হাতে মাজা ঝকঝকে থালায নিজের হাতে তৈয়ার জলখাবার সাজাইয়া স্বামীর সাম্‌নে ধরিত। নিখিল মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্ব্বাক হইয়া তাকাইয়া থাকিত শ্যামল কিশলয়শোভিত বল্লবীর মত উমাব যৌবনোদ্ভাসিত তনুলতার পানে। তাহাব বক্ষ পবিতৃপ্তির আনন্দে কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিত! সে ভাবিত "এইত স্বর্গ—আবার স্বর্গ কোথায়।"

এমনি করিয়া তাহারা দুজনে বনের দুটী পাখীর মত নিজেদের ক্ষুদ্র গৃহ-নীড়ে থাকিয়া স্বর্গ-সুখ অনুভব করিত। কিন্তু আজ সেই সংসারে কত অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! সৌভাগ্যের হৈম অঙ্গুলি স্পর্শে লক্ষ্মীর ঝাঁপি আজ তাহার সুমুখে উন্মুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোথায় সেই পূর্ব্বের বুকভরা আনন্দ-পূর্ণ প্রেমের শান্তি—সেই লক্ষ্মীর অপূর্ব্ব শ্রী? অর্থের সুবর্ণ প্রাচীর যে তাহাদের দুজনার মাঝে একটা বিরাট ব্যবধান গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার ফলেই

না আজ এই ছাড়াছাড়ি—এই সহানুভূতির অভাব? হায় রে! তবে মানুষ কেন বলে যে টাকায় নর হয়—টাকা তাহাকে বাহিরের সুখ, পদমর্য্যাদা, সম্ভ্রম কত কি না দিয়াছে, কিন্তু তার তুলনায় সে যা চুরি করিয়াছে তাহার মূল্য যে অনেক বেশী।...সে আজ প্রেমের পরশমণি খোয়াইতে বসিয়াছে।

আজকাল অনেকদিনই তাহাকে একাকী আহার করিতে সমাধা করিতে হইয়াছে। নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী তাহার সম্মুখে সজ্জিত থাকে বটে; এবং তাহাতে পেট ভরাও উচিত কিন্তু খাবার সে আগ্রহ আজ নাই—তাহার তৃষিত চিত্ত তাতে তৃপ্তি পায় না। উমার স্নেহ-কোমল স্পর্শ-টুকু যে তাহাতে নাই। উমার স্নেহ ও যত্ন ক্রমশঃ যেন দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। তাহারা যেন পরস্পরের নিকট হইতে ক্রমেই দূরে চলিয়া যাইতেছে।

কিন্তু তাহার জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তো অর্থ দিয়া মিটিবার নহে, সে যে চায় তাহার তপ্ত প্রাণকে উমার প্রেম বারি সিঞ্চনে স্নিগ্ধ রাখিতে। হায়! সেই পূর্ব্বের দিনগুলি কি আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না? নিখিলের সন্তপ্ত বক্ষ আলোড়িত করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস প্রচণ্ডবেগে বাহির হইয়া বাতাসে মিশিয়া গেল।

সেই প্রথম যৌবনে এই শ্যামলা বসুন্ধরা যেমন নবীন বসন্তের মদির সুষমায় পূর্ণ হইয়া তাহার চোখে দেখা দিয়াছিল, তেম্‌নি তাহার ব্যর্থ অতৃপ্ত জীবনের উত্তাপে সমস্ত মধুরিমা আজ নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যেন দগ্ধ-মরুর মত জ্বালাময় বিশ্রী রূপ ধরিয়া এই ধরিত্রী তাহার সাম্‌নে ফুটীয়া উঠিল। টুপীটা মাথায় দিয়া নিখিল অস্থিরপদে বাহির হইয়া গেল।

দুই

রাত্ত নয়টার পর বায়স্কোপ হইতে ফিরিয়া উমা বেয়ারাকে বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিল। বেয়ারা উত্তর করিল—বাড়ী ফিরিয়া তিনি কিছু খান নাই, তাহারপর কিছুক্ষণ আগে যে কোথায় গিয়াছেন তাহা সে বলিতে পারে না।

উমার মুখ সহসা সন্ধ্যাকাশের মত পাণ্ডুর হইয়া উঠিল। তাহার আমোদ-তৃপ্ত প্রাণে সন্দেহের একটু ছায়া, একখানা কালো মেঘ যেন ঝড়ে উড়িয়া আসিল; সে ভাবিল, তবে স্বামী কি রাগ করিয়া গিয়াছেন? আপনার বুদ্ধিহীনতায় স্বামীর মনে সে যে আজ কত ব্যথার আঘাত করিয়াছে, তাহা ভাবিতেই সে আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল।...সত্যই কি তাহাদের প্রেমের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে—অর্থের আড়ালে তাহারা দু'জনে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

তাহার মনে পড়িল, দশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন ট্রামের পয়সা বাঁচাইয়া নিখিল একছড়া বেল ফুলের মালা কিনিয়া আনিয়াছিল। সে তখন পিছন ফিরিয়া রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া কুটনো কুটীতেছিল, মাথার ঘোম্‌টাটা সাঁজের হাওয়ায় খসিয়া পড়িয়া তাহার কুণ্ডলীকৃতা ভুজঙ্গিনীর মত কবরী অপূর্ব্ব শোভায় আত্মপ্রকাশ করিতেছিল আর সাপের মাথার মণির মত রুবী-সেট্ করা সোণার চিরুণীখানা তার মাঝে জল্‌জল্ করছিল; নিখিল পশ্চাৎ দিক্ হইতে উমার খোঁপায় মালাটী জড়াইয়া দিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল—সে কি সুখ, কি অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি সে অনুভব করিয়াছিল—আর আজ সহস্র সহস্র টাকার স্বর্ণাভরণ পরিয়াও বুঝি সে তার প্রাণে সে তৃপ্তি নাই। মূর্খ সে তাই অবহেলায়, অজ্ঞাতে সে স্বামীর বুকে আঘাত দিয়াছে। জুতায় পেরেক উঠিলে' তাহা যেমন অবিরাম পায়ে বিঁধে, গভীর অনুশোচনা তাহার প্রাণে সেইরূপ অবিশ্রান্ত যাতনা দিতে লাগিল।

* * * *

নিশীথ রাত্রিতে সহসা জাগিয়া উঠিয়া উমা দেখিল নিখিল তাহারই ঘুমন্ত মুখের পানে এক দৃষ্টিতে নীরবে চাহিয়া আছে। ধীরে ধীরে সে স্বামীর বক্ষের ভিতর নিজের মুখখানা চাপিয়া দিল—তাহার বোধ হয় মনে হইতেছিল যে এই বক্ষের মধ্যে মুখ লুকাইতে পারিলেই সে যেন বাঁচে—স্বামীকে মুখ দেখাইতে তার লজ্জা করিতেছিল। নিখিল দু'হাতে তার মুখটী বুকে আরও চাপিয়া ধরিয়া বলিল "আমি শুধু তোমাকেই চাই উমা। অটুট শান্তির ভিতর দিয়ে আমাদের প্রেমের পুষ্পটী চিরদিন অম্লান থাকুক—এই আমার কামনা।" উমা

নীরব, তাহার নয়ন-প্রান্ত দিয়া সঞ্চিত অশ্রুরাশি ছুটিবার বেগে মুক্তা-ধারার মত ঝরিয়া নিখিলের বক্ষ ভাসাইয়া দিল—শান্ত ও তৃপ্ত করিয়া দিল।

তিন

দেশের বুকে তখন স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া আঘাত করিয়াছে। মহাত্মাজীর মুক্তির বাণী সকলের প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে। বাংলার তরুণদল সেই স্বাধীনতার হোমানলে তাহাদের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, দেহমন আহুতি দিতেছে।

সেদিন রবিবার। বেলা প্রায় আটটার সময় নিখিল দোতালার ঘরে বসিয়া খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিয়াছে, এমন সময় সাগর-কল্লোলের মত বহু-মিলিত কণ্ঠের সুর তাহার কাণে ভাসিয়া আসিল। ক্রমে সুর স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইল, নিখিল দেখিল অগণিত যুবকের দল পথ দিয়া গাহিয়া যাইতেছে। তাহাদের দীপ্ত মুখে জ্বলন্ত উৎসাহের চিহ্ন পরিস্ফুট। তাহারা সমগ্র মনপ্রাণ ঢালিয়া গাহিতেছিল—

"আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা
মানুষ আমরা নহি ত' মেষ,
দেবী আমার, সাধনা আমার,
স্বর্গ আমার, আমার দেশ—"

এই সঙ্গীত তাহার শিরায় শিরায় এক অননুভূত উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিল। সে ভাবিল এই তো এক মহাকর্ত্তব্য তাহার সাম্‌নে রহিয়াছে; সে স্থির করিল মহাত্মাজীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিপীড়িতা মলিনা দেশজননীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিবে। সে পথে আসিয়া জনতার কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া গাহিল—

"দেবী আমার, সাধনা আমার,
স্বর্গ আমার, আমার দেশ—"

*　　*　　*　　*

সেইদিন রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্ণে নিখিল সভা হইতে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার প্রাণ নবীন আশা ও উৎসাহে পরিপূর্ণ।

উমার ঘরে উঁকি মারিতেই যে দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল, তাহাতে তাহার বক্ষ অপরিসীম পুলকে নাচিয়া উঠিল। মেজের উপর বসিয়া উমা চরকা কাটিতেছে; অঙ্গে শেফালি ফুলের মত শুভ্র মোটা খদ্দরের শাড়ী তাহার চওড়া রাঙা পাড়টা তাহার কালো কেশের উপর যেন উমার অরুণ-রাগের মত জ্বলিতেছে। তাহার কল্যাণী মূর্ত্তিটী ঠিক লক্ষ্মীর মত মানাইয়াছে।

গাঢস্বরে নিখিল বলিল "উমা—

উমা তাড়াতাড়ি আসিয়া নিখিলের পায়ের ধূলা মাথায় লইতেই, নিখিল তাহাকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল।

দেশজননীর পুণ্যসেবার মাঝে আজ আবার তাহারা তাহাদের হারাণো প্রেমকে চিরস্থায়ী করিয়া লইল।

আমারি দেখা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ

বলেছিলে আমায় যথা যেতে বার বার
সেথা তুমি আমার দেখা পাবে নাক আর।
আমার এখন ভাল লাগে শূন্য দীঘল ভূমি
ঝঞ্ঝা যাহার বুকের উপর নিত্য বহে থামি।
যথায় বহে শীর্ণা নদী কতই ঘুরে ঘুরে
কত দেশের করুণ-গাথা গেয়ে করুণ-সুরে।
যথায় গেয়ে বনের পাখী বনের মাঝখানে
কোন্ অজানার ঘুমন্ত-ভাব জাগায় প্রাণে প্রাণে।
আছে যথায় ধুলি-পরে ঝরা ফুলের রাশ
বুকের ব্যথা বুকেই আছে মুখে পাংশু হাস!
যেথায় বহে হু হু ক'রে ছুটি চোখের জল
নিভিয়ে দিয়ে বুকের চিতা ভাসায় ধরাতল।
কলধ্বনি নাইক যথা—সবাই একা একা।
সে সব ঠাঁয়ে নিতুই নিতুই পাবে আমার দেখা।

রিক্‌শ-আইন

(নক্সা)

শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

রহমান পশ্চিম হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিল অর্থোপার্জ্জনের জন্য। নানাপ্রকার চেষ্টার পর সে স্থির করিল যে তাহার মত বিদ্যাবুদ্ধিহীন অথচ বলিষ্ঠকায় পুরুষের পক্ষে স্বাধীনভাবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থোপার্জ্জনের সম্ভাবনা, রিক্‌শ চালনায়। সেইমত সে একখানি রিক্‌শ দৈনিক ভাড়ায় বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া রাজপথে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল। সুদৃঢ় বলিষ্ঠ দেহের কল্যাণে সে শীঘ্রই অন্যান্য রিক্‌শওয়ালাগণ অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতে লাগিল। যে পল্লীতে সে গাড়ী চালাইত সেখানে রহমানকে পাইলে কেহ আর অন্য রিক্‌শওয়ালাকে ডাকিত না।

সকলদিক হইতেই যখন ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া উঠিতেছিলেন সেই সময় রহমান একদিন এক বড়লোকের ছোট ছেলেকে চাপা দিয়া অনর্থ ঘটাইল। ছেলেটী ভৃত্যের সহিত পার্কে বেড়াইতে আসিয়াছিল। কিন্তু সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপ ভৃত্যটী ছেলেটীকে ছাড়িয়া দেওয়াতে সে স্বাধীনভাবে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। রহমান যখন দুইটী বিপুলকায় আরোহীকে লইয়া ছুটিতেছিল ঠিক সেই সময়ে সেই ছেলেটী অন্য একটা ছেলের পাছু পাছু ছুটিতে ছুটিতে রহমানের পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। বেচারা রহমান অতি কষ্টে তাহার বেগ সংযত করিয়া ছেলেটীকে চাপা পড়া হইতে রক্ষা করিল বটে, কিন্তু তাহার সহিত সংঘাতে ছেলেটী ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া ঠোঁট কাটিয়া ফেলিল। তাহার ক্রন্দনে তাহার পরিচারক গল্প ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিল ;—সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যপরায়ণ বহুলোক আসিয়া রহমানকে ঘেরিয়া ফেলিল। পাড়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনীর পুত্র,—প্রায় সকলেই তাহাকে চিনিত। সুতরাং সকলেই পর্য্যায়ক্রমে রহমানকে দু' একটা কিল চড় পুরস্কার দিল ;—প্রকৃত তাহার দোষ আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিবার কেহই প্রয়োজন বোধ করিল না। ইত্যবসরে ছেলেটীর অভিভাবক আসিয়া আর এক দফা ঘুষি লাথির সদ্ব্যবহার করিয়া রহমানকে রিক্‌শ সমেত পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য আরোহীদ্বয় ভাড়া হইতে নিষ্কৃতি লাভের ঐরূপ সুবর্ণ সুযোগের অপব্যবহার করেন নাই।

যথাকালে রহমানকে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির হইতে হইল। বাদী-পক্ষের সাক্ষীগ্রহণ শেষ হইল,—সকলেই একবাক্যে রহমানের দোষ প্রমাণ করিল। শেষে বাদীপক্ষের উকীল ঘটনাটী যথাসম্ভব অতি রঞ্জিত করিয়া ব্যাখ্যা করিবার পর বলিলেন—"ধর্ম্মাবতার, আসামীর চেহারা দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছেন আসামী দোষী। দেহে অত্যধিক বল থাকাতে আসামী সচরাচর অসতর্কভাবে ও পথিকগণের বিপজ্জনকরূপে অতি দ্রুত রিক্‌শ চালাইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ অসতর্কভাবে অতি দ্রুত রিক্‌শ চালাইয়া বাদীর পুত্রকে চাপা দিয়া আহত করিয়াছে। সুতরাং আসামী আইনতঃ দণ্ডার্হ। অধিকন্তু আসামী বাদীর পুত্রের ওষ্ঠচ্ছেদের কারণ হইয়া ক্ষতিপূরণ করিতেও বাধ্য,—যে হেতু ঐ ওষ্ঠচ্ছেদের জন্য ভবিষ্যতে পুত্রের বিবাহপণ্যে বাদীর অর্থহানি হইবার সম্ভাবনা। অতএব, ধর্ম্মাবতার, এরূপ খেসারতের হুকুম দিন যাহাতে বাদীর ভবিষ্যৎ অর্থহানি পূরণ হয় ও আসামীর এরূপ সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিন যাহাতে তাহার শারীরিক বল হ্রাস হইয়া সাধারণ রিক্‌শওয়ালাদের সমান হয়।"

গরীব রহমান অর্থাভাবে উকীল দিতে পারে নাই ও আসামী পক্ষে সাক্ষীও কেহ ছিল না। সুতরাং সে নিজেই কাঠগড়ায় উঠিয়া নিজের হইয়া হাকিমকে জানাইল যে 'তাহার কোন দোষ নাই,—ছেলেটী ছুটিয়া আসিয়া তাহার সাম্‌নে পড়ায় কিঞ্চিৎ আঘাত পাইয়াছে। কিন্তু তাহার তুলনায় শতাধিক লোকে মিলিয়া চাঁদা করিয়া তাহাকে যেরূপ প্রহার করিয়াছে তাহাতে সে এক সপ্তাহ গায়ের ব্যথায় রিক্‌শ চালাইতে পারে নাই ও এক সপ্তাহে তাহার মত গরীব লোকের ১০।১২ টাকা লোকসান

হইয়াছে। সে দোষী হইলেও উভয় প্রকারে তাহার শাস্তি হইয়া গিয়াছে;—তাহার আর কোন শাস্তি হওয়া উচিত নহে।'

রহমানের প্রতি হাকিমের সহানুভূতি থাকিলেও থাকিলেও আইনতঃ তাহার জবানবন্দী টেঁকে না,—যেহেতু তাহার কোন সাক্ষী নাই, অথচ অপর পক্ষের যথেষ্ট সাক্ষী। হাকিম রহমানের কথায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে রায় লিখিতে যাইতেছেন এমন সময় রহমান জোড়হাত করিয়া বলিল—"হুজুর, আমার আর একটা নিবেদন আছে, দয়া করে' শুনে' তারপর আমায় শাস্তি দেবেন।"

হাকিম সম্মত হইয়া তাহাকে বলিতে বলিলেন।

রহমান বলিল—"হুজুর, মটরগাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ীতে লোক চাপা দিলে মোটরের, ঘোড়ার বা গরুর শাস্তি হয় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমারও সাজা হওয়া উচিত নয়,—কেননা আমিও এখানে গরু ঘোড়ার মত গাড়ী টানি মাত্র। যদি কাহারও শাস্তি হয় তাহা হইলে গাড়োয়ান কোচওয়ান্ অভাবে আরোহীদের শাস্তি হওয়া উচিত,—যেহেতু তাহারাই সামনে বসিয়া রিক্শ-ওয়ালাকে 'ডাইনে বাঁয়ে' বলিয়া চালাইয়া যায়, এরূপ বলা যাইতে পারে।"

রহমানের কূট আইনের তর্ক শুনিয়া হাকিম স্তম্ভিত হইয়া মকর্দ্দমা মুলতুবি রাখিলেন ও এড্‌ভোকেট্ জেনা-রেলের পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইলেন। এড্‌ভোকেট্ জেনা-রেল কি মত দিবেন বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আরোহীগণ ভবিষ্যতের সাবধান।

ছবি ও সুর

"নিবেদন"

বিদায়ের করুণ রাগে হৃদয়-তন্ত্রী ঝঙ্কারে জানিয়ে গেল বুকভরা দীর্ঘশ্বাসের লুটিয়ে-পড়া হাহাকার! অন্তর আমার রঙে উঠেছিল বেদন নিপীড়িত হৃৎপিণ্ডের তপ্ত রক্ত-রাগে। বেদন-বাণে এক অব্যাহত রক্তনিঃস্রাবী রাগিনী বেজে উঠছিল—অন্তরটাকে নির্দ্দয়ভাবে মর্দ্দিত মথিত করে! এক একবার মনে হচ্ছিল নখে ছিঁড়ে ফেলি এ কঠোর সত্যের দুশ্ছেদ্য বন্ধন! আমি চাইনা এ পৃথিবীর নির্ম্মম অসাড় কর্ত্তব্যের কঠোর পাশে আবদ্ধ হয়ে থাকৃতে। ওরে ছেড়ে দে আমায়। মুক্ত করে দে—ঐ যে সুনীল গগনে পাখীটি আনন্দ কূজনে বায়ুতরঙ্গ মুখরিত করে হাওয়ায় ভর করে চলেচে অন্তরের সন্ধানে—ওরি মতন আমার আমার পায়ের সমস্ত বেড়ী কেটে দে! পরক্ষণেই অন্তর আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল—সারা জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে!

বাইরেও সেই একই দৃশ্য। পৃথিবী প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। প্রকৃতি সেই রক্তে স্নান করে উঠে খলখল করে হাসছেন! অন্তরে বাইরে আজ একি অপূর্ব্ব সাদৃশ্য! হৃদয়ে আমার উষ্ণ রক্তবিন্দু ঝরে প'ড়ছিল টপ্-টপ্-টপ্—বেদনার নিষ্ঠুর মন্থনে! সারা আকাশও তেমনি রক্তরাগে ছাপিয়ে উঠেছিল কি এক-মূর্ত্ত করুণ নিষ্পেষণে! খেয়ালীর মত সে ফাগ-রাগ যে কখন মিলিয়ে আস্‌ছিল তা বুঝতে পারিনি। মূঢ়ের মত নির্ব্বাক হয়ে বসেছিলাম। কতক্ষণ যে বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ এক তীব্র অরুণিমা আমার চোখ দুটো ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল। সজাগ হয়ে দেখলাম পশ্চিম গগনেও শেষ রক্তরাগটুকু নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত নিভ নিভ হয়েছে।

সতর্ক চোরের মত ধীরে ধীরে এক কালো যবনিকা পৃথিবীর বুকে ঘনিয়ে আসছিল। এক আঁধার-দৈত্য ক্রূর হাসিতে মুখখানা রঞ্জিত করে ধীরে ধীরে গুড়ি মেরে আমার অন্তর গ্রাস করতে আসছিল। কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। ক্রমে ক্রমে শেষ আলো রেখার সঙ্গে সঙ্গে বেদনার মধুময় স্মৃতি মোরাবাদীর উচ্চ শৃঙ্গও যখন আমার দৃষ্টিপথ থেকে বিদায় নিলে তখন সশঙ্ক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলাম অন্তর আমার আঁধার দৈত্যের করাল-গ্রাসে! বাইরেও সেই কালো যবনিকা পৃথিবীর দৃশ্য-পট মসীময় করে ফেলেছিল। আর সেই যবনিকার ওপর একটী একটী করে হীরের টুক্‌রো ফুটে উঠছিল।

চূর্ণক

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বি-এ

কুকুর

সরু রাস্তা; দুইদিকে শস্য ক্ষেত্র। সবে মাত্র গ্রাম ছাড়াইয়া আসিয়াছি, এমন সময় একটা কলরব শুনিতে পাইলাম।

দেখিলাম দুই একজন লোক ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিতেছে। কেহ বা গাছের উপর উঠিতেছে কেহ বা ভয়ে আকুল হইয়া কি করিবে ঠিক্ করিতে পারিতেছে না।

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একজন লোক্ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল "পালান, ভুলো আস্‌ছে।

কিছুক্ষণ পরে দেখি একটা কুকুর মাথা নাড়িতে নাড়িতে একমনে রাস্তার উপর দিয়া চলিয়াছে। দেখিয়াই তাহাকে চিনিতে পারিলাম।

কুকুরটাকে এক সময় আমাদের গ্রামের তালপুকুরের পাড়ে দেখিয়াছিলাম, তখন পাড়ার ছেলেরা তাহার মুখের ভিতর হাত দিত, তবুও সে কাহাকেও কামড়াইত না। এখন সে শীর্ণ, গত বৎসর সে উন্মত্ত হইয়া একটি বৃদ্ধকে দংশন করে, বৃদ্ধ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

তারপর পাড়ার ছেলেরা বেশীরকম মারপিট আরম্ভ করায় কুকুরটা গ্রাম ছাড়িয়া একটি পুকুরের পাড়ে একটা গর্ত্তে আশ্রয় গ্রহণ করে। আহারের অভাবে ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যায়।

অনেকে তাহার প্রাণনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এখনো করে; কিন্তু কেহ সক্ষম হয় নাই।

মাঝে মাঝে যখন সে বাহির হয় তখন কেহ তাহার নিকটবর্ত্তী হয় না। লোকের বিশ্বাস ভুলো কাম্‌ড়াইলে মরণ নিশ্চিত।

দেখিলাম কুকুরটির পিছনে দু একটী লোক লাঠি হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহার নিকটে আসিতে কাহারও সাহস হইতেছে না। কুকুরটি আন্‌মনে চলিয়াছে, কাহারও কোন ক্ষতি করিবার প্রবৃত্তি তাহার আছে এমন বোধ হইল না।

কুকুরটি ছুটিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। আর কেহ অনুসরণ করিল না।

ভাবিলাম—এই নিরীহ জন্তুর প্রাণসংহারের এত আয়েজন কেন?

উহার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে। কোনও না কোনও উষায় রাখাল বালকেরা দেখিবে কোথাও জঙ্গলের ভিতর ভুলোর নিরীহ শুষ্ক কঙ্কাল পড়িয়া আছে।

তখন আর এই জন্তুটির ভয় কাহারও থাকিবে না।

তখন প্রকৃতি সকলের সহিত তাহার সদ্ভাব আনিয়া দিবে।
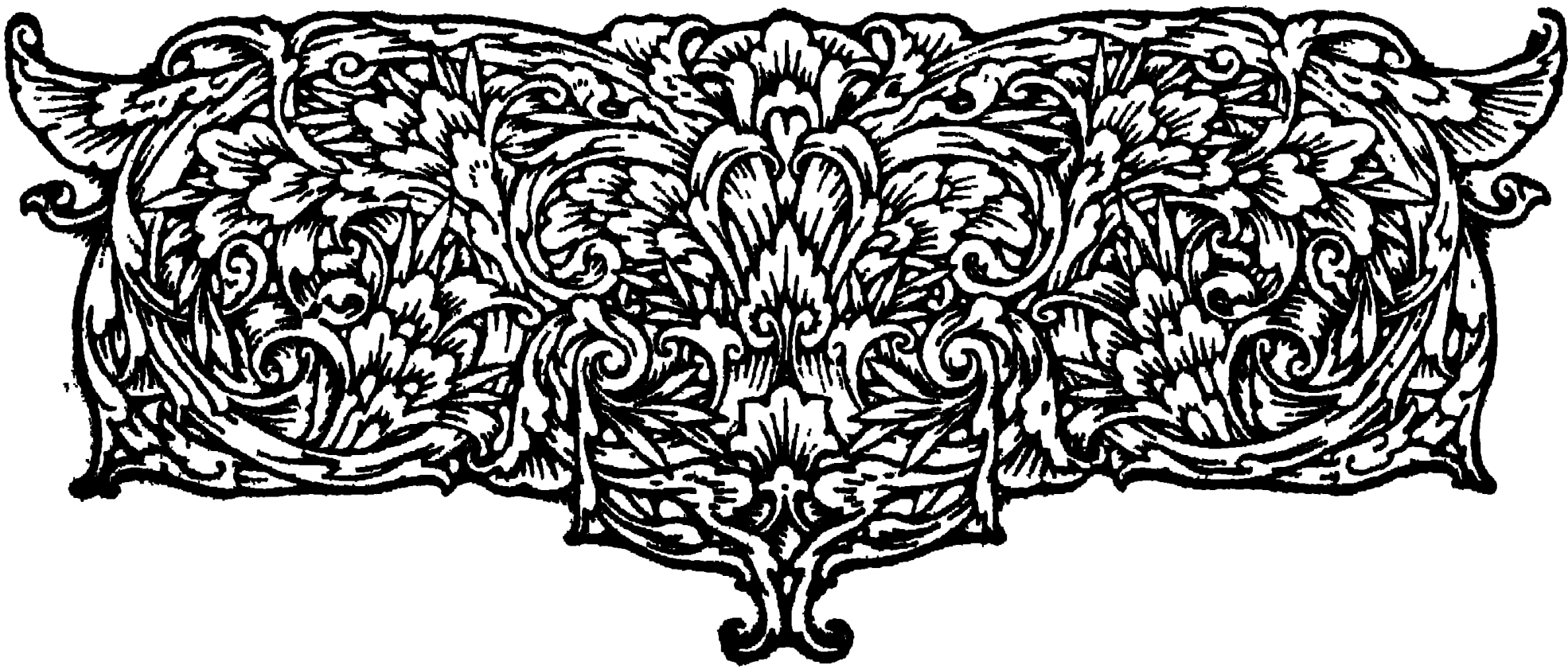
জাতি ও চরিত্র গঠনে প্রকৃতির প্রভাব

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

মানব জাতির সভ্যতার ইতিহাস মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিলে এবং বিশেষ করিয়া, কোন জাতি বিশেষের উত্থান-পতনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া উন্নতি ও অবনতির মূল কারণগুলির সন্ধানের চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইব যে প্রধানতঃ যে চারিটী প্রাকৃতিক কারণের উপর জাতির ও জাতীয় প্রকৃতির গঠনকার্য্য নির্ভর করিতেছে তাহা এই—জল-বায়ু; খাদ্য, ভূমি এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য। মানব সভ্যতার শৈশব অবস্থায় এই প্রাকৃতিক দৃশ্য মানব মনের উপর তাহার ইন্দ্রিয়-গ্রামের সহায়তায় যেরূপ ধারণা জন্মাইয়া দিবে মানবের ভাবরাজ্যে চিন্তার ধারা এবং প্রণালী তদনুগত হইবে। যেরূপ আবেষ্টনের মধ্যে মানব শিশু লালিত পালিত হইবে, তাহার চরিত্রও উত্তোরোত্তর সেই আবেষ্টনের প্রকৃতি অনুসারে গঠিত হইবে। শিশু মানব সম্বন্ধে যাহা সত্য, শিশু জাতি সম্বন্ধেও তাহাই। প্রাকৃতিক দৃশ্য-ভেদে জাতি বিশেষের সাধারণ চরিত্র, কল্পনা-শক্তি ধর্ম্ম-সংস্কার সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। উল্লিখিত প্রথম তিনটী কারণ অপেক্ষা চতুর্থ কারণ অর্থাৎ প্রাকৃতিক দৃশ্যও আবেষ্টন অধিকতর প্রভাবশালী। জলবায়ু, খাদ্য ও ভূমি পরোক্ষভাবে সমাজ গঠন, অর্থসংস্থান, কর্ম্ম-বিভাগ প্রভৃতি বিষয়ে সহায়তা করিয়া থাকে।

বিষয়টী আরও বিশদরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রথম জলবায়ু, খাদ্য, ভূমি এই তিনটি প্রাকৃতিক কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এই তিনটির মধ্যে খুব নিকট সম্বন্ধ। দেশের জলবায়ুর প্রকৃতির উপরে তদ্দেশ-জাত খাদ্যের পরিমাণও বিভিন্নতা নির্ভর করিতেছে। আবার ভূমির উর্ব্বরা-শক্তি, বায়ুর আর্দ্রতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতেছে। একারণ, জাতি ও চরিত্র গঠন কার্য্যে ইহাদের প্রত্যেকের প্রভাব পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা না করিয়া এই তিনের সমবেত শক্তি কিরূপে ঐ কার্য্যে সহায়তা করে সেই সম্বন্ধে বলিব।

জাতির গঠনের ইতিহাস আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে ধনবিজ্ঞানের কথা উঠে। সমাজের গঠন ও স্থিতির মূলে প্রধানতঃ অর্থ। এই অর্থের আগম ও সঞ্চয়ই, জলবায়ু—খাদ্য—ভূমি এই ত্রিশক্তির মিলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল। প্রথমে অর্থ সঞ্চয়, তৎপরে জ্ঞানবিস্তার। যতদিন সমাজের লোকে জীবিকার্জ্জন এবং জীবনধারণোপ-যোগী বস্তু সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিবে ততদিন সমাজে উচ্চ চিন্তা ও জ্ঞান বিস্তারের অবকাশ থাকিবেনা। যদি সমাজের লোক কেবলমাত্র নিজ প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া ক্ষান্ত থাকিত, তাহা হইলে দ্রব্যসামগ্রীর উদ্বর্ত্তন ও তাহার ফলে ধন সঞ্চয় ধনবৃদ্ধি হইত না। ধনবৃদ্ধি না হইলে, সমাজে একদল লোক যাহাদিগকে অর্থনীতি শাস্ত্রে unproductive class নামে অভিহিত করে অর্থাৎ যাহারা ধন উৎপাদন করে না অথচ উৎপন্ন ধনের উপরে ভাগ বসায় (যেমন বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, ব্যবহারজীবি) —এই শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব ঘটিত না;—তাহার ফলে বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রহত হইত এবং সভ্যতা বা civilisation এর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইত।

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, ধনাগম ও ধনবৃদ্ধি না হইলে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি এবং সমাজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের জন্য মানবের অনুরাগ বা অবসর ঘটিত না। তাহার ফল স্বরূপ মানব সভ্যতার উন্নতি ঘটিত না। সমাজের শৈশব অবস্থায় যখন মানব অল্প বিস্তর অজ্ঞ ছিল এবং ক্রয় বিক্রয় বাণিজ্য মুদ্রা প্রভৃতির প্রচলন ঘটে নাই তখন প্রধানতঃ দুইটী বিষয়ের উপর সভ্যতার উন্নতি ও বিকাশ পরোক্ষভাবে নির্ভর করিত;—প্রথম, মানবের শ্রম শক্তি, দ্বিতীয়, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি। এই দুই শক্তি আবার দেশের প্রাকৃতিক নিয়ম ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করিতেছে। যদি দেশ নদী-মাতৃক হয় অথবা আবহাওয়া গুণে প্রচুর বারি সম্পাতের সম্ভাবনা ও উত্তাপ ও আর্দ্রতার সামঞ্জস্য থাকে তবে মানব পরিশ্রমের উপযোগী ফসল নিশ্চয়ই পাইবে। যদি দেশের বায়ু নাতিশীতোষ্ণ হয় তবে

মানুষের পরিশ্রম করিবার সামর্থ্য জন্মে। উপরোক্ত দুইটী অনুকুল কারণের যে কোনটির অসদ্ভাব ঘটিলেই সমাজের উন্নতির গতি রুদ্ধ হইবে। এই কারণেই দেখিতে পাই পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত দেশবাসী মানবগণ অত্যধিক শীত বশতঃ গৃহের বাহিরে শ্রম করিতে বিমুখ অলস-প্রকৃতি এবং সেজন্য সুসভ্য শ্রেণীর অনেক নিম্নে তাহাদের স্থান। অবশ্য আমরা সমাজের প্রথম অবস্থার কথা বলিতেছি সমাজ উন্নতি পথে অধিক অগ্রসর হইলে ভূমি ও জলবায়ু ব্যতীত আন্যান্য অন্যান্য অনেক কারণে সভ্যতার গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। পৃথিবীর যে কোন মহাদেশের অপেক্ষাকৃত সভাজনপদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সভ্যতার এই মূল স্যত্রের সত্যতা স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। এশিয়ামহাদেশের মধ্যে যে বিস্তৃত ভূভাগ উর্ব্বর, নদী-মাতৃক, পলিস্তরাচ্ছাদিত, নাতিশীতোষ্ণ, যাহার দক্ষিণ চীনের পূর্ব্বভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া এশিয়ামাইনর ফিনিশিয়া ও পালেষ্টাইনের উপকূল ভাগ পর্য্যন্ত—সেই সকল দেশেই প্রাচীন সভ্যতা সীমাবদ্ধ। এই বৃহৎ জনপদের উত্তরাংশে সুবিস্তৃত অনুর্ব্বর প্রদেশ, এখানে অসভ্য যাযাবর জাতি সকলের বাস, ভূমির প্রতিকূল অবস্থার জন্য তাহারা চিরদরিদ্র এবং সেই হেতু চির অসভ্য। আবার ইহাদের মধ্যে যে সকল জাতি নিজ নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া অন্যান্য উর্ব্বর দেশে প্রবেশ করিয়াছে তথায় তাহারা সুসভ্যতার নিদর্শন রাখিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে অসভ্য মঙ্গোলীয় ও তাতারজাতিগণ ভিন্ন ভিন্ন কালে চীন ভারতবর্ষ ও পারস্যে প্রবেশ করিয়া রাজত্ব ও সভ্যতা বিস্তার করিতে পারিয়াছিল। দক্ষিণ এশিয়ার উর্ব্বরা ভূমি তাহাদিগকে ধনাগমের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল এবং ধনবৃদ্ধির ফলে ক্রমশঃ তাহাদের জাতীয় সভ্যতা জাতীয় সাহিত্য ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে আরব জাতি তাহাদের আবাসভূমি মরুময় আরব দেশে অতি অসভ্য এবং বর্ব্বর; কিন্তু তাহারা খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে পারস্যে, ৮ম শতাব্দীতে স্পেনের এবং ৯ম শতাব্দীতে পাঞ্জাবের এবং পরে উত্তর ভারতের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিল! নূতন দেশে আসিলে, তাহাদের প্রকৃতিও নূতন ভাব ধারণ করিল। আরবের উত্তরে যে জাতি অতি রুক্ষ অসভ্য ছিল, উর্ব্বর দেশে আসিয়া তাহারা ধনসঞ্চয়েব সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নব-সভ্যতা স্থাপন করিল তাহাদের জ্ঞানালোকে স্পেনের একপ্রান্ত হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই আরবের পশ্চিমে মাত্র লোহিত সাগর ব্যবধানের পর, সুবিস্তৃত আফ্রিকা মহাদেশ—অধিকাংশ ভূভাগ বালুময় মরুভূমি, অনুর্ব্বর, দরিদ্র (এবং সে কারণ) অসভ্য জাতিসকলে অধ্যুষিত। কিন্তু এই বালুকাময় মহাদেশেব যে অংশে নীল নদী প্রবাহিত ও জল-সম্পন্ন এবং শস্য শ্যামল সেখানে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার বিকাশ ও লীলা দেখুন।

এশিয়া মহাদেশে যেমন ভূমির উর্ব্বরাশক্তি সভ্যতা বিস্তারে যে কার্য্য করিয়াছিল, ইউরোপ মহাদেশেও অনুকূল জলবায়ু সেই কার্য্য সাধন করিয়াছিল। কিন্তু এই মহাদেশে জলবায়ুর প্রভাব যতটা মানুষেব কার্য্যক্ষমতা শ্রমশক্তি ও স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে, ভূমির সমৃদ্ধি সাধনে ততটা কার্য্য করে নাই। পৃথিবীর সভ্যতা বিস্তারে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি প্রথমেই সহজভাবে প্রাকৃত নিয়মে কার্য্য করে বলিয়া তাহার ফলস্বরূপ পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্ব্ব মহাদেশে সভ্যতার প্রথম বিকাশ ও উন্নতি। কিন্তু যদিও পূর্ব্ব মহাদেশের সভ্যতা প্রাচীন তথাপি সে সভ্যতা স্থায়ী দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় নাই। প্রকৃতির দানের প্রাচুর্য্যের অনুগ্রহে যে সভ্যতার জন্ম ও পরিণতি তাহা স্থায়ী হইতে পারে না মানুষের শক্তির প্রাচুর্য্যের প্রভাবে যে সভ্যতা স্বষ্ট তাহাই বহুকাল স্থায়ী; ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত। বারান্তরে আমরা এই মতের আলো-চনা করিব।

(ক্রমশঃ)

সহযোগীর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সার সঙ্কলন

আমার বিদ্রোহী বন্ধু

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুদিন পূর্ব্বে যে বিদ্রোহীর পত্রের আমি উত্তর দিয়াছিলাম, তিনি তাহার প্রত্যুত্তর দিয়া আমাকে তাহার জবাব দিবার জন্য বলিয়াছেন। আমার মনে হয় তিনিও কর্ত্তব্যপথ বাছিয়া লইবার জন্য আমারই মত অন্ধকারে হাতড়াইতেছেন। আমি নিম্নে তাঁহার কথাগুলির জবাব দিলাম এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি যুক্তিসহকারে পত্র দিবেন আমি তাঁহাকে উত্তর দিব। তাঁহার পত্রের একাংশে লিখেছেন—

আপনি কি বলেন যে বিদ্রোহীরা স্বরাজ্য, মডারেট বা জাতীয়দল অপেক্ষা স্বার্থত্যাগে, মহত্বে বা স্বদেশ-প্রেমে কোন অংশে কম? আপনাদের দলের মধ্যে এমন কে ছিল যে দেশের জন্ম প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে, যেমন বিদ্রোহীরা করেছে—বিদ্রোহীরা যতদূর স্বার্থত্যাগ কর্ব্বার তা করেছে, আপনি বিদ্রোহীদল ছাড়া প্রায় সকল দলের সঙ্গেই কিছু না কিছু সম্বন্ধ রেখেছেন—আপনি আমাদের যেমন বিপথগামী ইত্যাদি নামে সম্ভাষণ করেন, তেমনি অপরাপর দলকে করেন না কেন?"

বিদ্রোহীরা যে কম ত্যাগী বা কম মহৎ কি কম স্বদেশ-প্রেমিক এমন কথা আমি বলি নাই এবং তাঁহাদের মহত্ব ও যে বৃথা যায় নাই তাহাও নহে কিন্তু তাহাতে দেশের উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হয়েছে। তাহারা কেবল দেশের উন্নতির পথে বাধা দিয়াছে মাত্র—প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাণকে তাহারা প্রাণ জ্ঞান করে নাই, তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করিতে তাহারা কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। এই দারুণ অবিমৃষ্যকারিতার ফলে দেশে আজ অনর্থক দমন-নীতি প্রবর্ত্তিত হয়েছে তার ফলে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের অবশিষ্ট সাহসটুকুও অন্তর্হিত হ'য়ে গিয়েছে, তারা দিন দিন ভীত, ত্রস্ত ও কাপুরুষ হ'য়ে উঠেছে কারণ তারা কোনদিন রাজকীয় অত্যাচার সহ্য করতে পারে না—যদি সে শক্তি তাদের থাকত তা হ'লে এ নীতির ফল ভালই হ'ত—এইরূপে বিদ্রোহবাদীরা রাজকীয় শক্তি দিন দিন বাড়িয়ে দিচ্ছে—নিজের হাতে নিজেদের সর্ব্বনাশ কচ্ছে। সেই জন্য তারা দেশভক্ত হলেও তাদের আমি অবিমৃষ্যকারী ও বিপথগামী বলি। দেশের জন্য প্রাণ সমর্পণের দুইটী সুন্দর দৃষ্টান্ত তিলক ও গোখেল তাঁহারা দুইজনেই নিজ স্বাস্থ্যসম্পদ্ তুচ্ছ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের সেবা করিয়াছেন—তাঁহাদের অকাল-মৃত্যুর ইহাই একমাত্র কারণ কর্ম্মশীল জীবনের এই পলে পলে ক্ষয় কি ফাঁসীকাঠে জীবন-দান অপেক্ষা কম বীরত্বের? আরও বলি ফাঁসী-কাঠে আত্মবলি দেওয়াতে কখন্ দেশের উপকার হয় যখন দণ্ডিত-ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী হয়; কিন্তু এইরূপ ঘটনা বিদ্রোহীদের মধ্যে অতি বিরল, এমন কি নাই বলাও চলে।

"বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আপনার একটা অভিযোগ এই —যে তাহাদের আন্দোলন দেশব্যাপী নয় সুতরাং অশিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাতে উপকৃত হইবে না। প্রকারান্তরে আপনি বলিতে চান যে আমরা ইহাতে লাভবান হইব না। আপনি কি সত্যই ভাবেন যে বিদ্রোহীরা দেশমাতৃকার এই পাগল ছেলেরা যারা নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে, তারা এই তুচ্ছ জীবনের স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় এই কাজে অগ্রসর হয়েছে? স্বীকার করি এখনও সকলকে আমরা নিজেদের ভিতর টানি নাই তার কারণ সকলেই এ কাজের উপযুক্ত নয়—আমরা তাদের খুব ভাল করে চিনি এবং জানি যে কেবল তারা উপযুক্ত নেতার অভাবে এই নিস্পন্দ অসাড় জড় জীবন অতিবাহিত করছে তাদের মধ্যে প্রেরণা জাগাবার কেহই নাই নতুবা তারা সত্যই কাপুরুষ নয়—আমরাই এখন সেই উপযুক্ত নেতা গঠন করছি, করা শেষ হ'লে, সকলকেই আমাদের কাজে যোগ দেবার জন্য ডাকার প্রয়োজন হবে, জোর ক'রে টেনে আনবো দেখবো যে তারা সত্যই শিবাজী, রঞ্জিৎ, প্রতাপ, গোবিন্দ সিংহের বংশধর কি না?"

অশিক্ষিত সম্প্রদায় উপকৃত হয় নাই সুতরাং বিদ্রোহীরা ব্যর্থ হয়েছে বা হবে এমন কোন কথা আমি বলি নাই এরূপ ইঙ্গিত পর্য্যন্ত করি নাই—কারণ আমি জানি বিদ্রোহীদের ভাল হতেই পারে না। যদি বিদ্রোহীরা জনসম্প্রদায়কে "টেনে" না এনে তাদের নিজ মতে প্রবর্ত্তিত করতে পারে তা' হলে ত' বিদ্রোহের ও রক্তপাতের কোন প্রয়োজনই নাই। আর যতদিন জাতিবিচার আছে ততদিন দেশের সকলেই প্রতাপ, শিবাজী, রঞ্জিৎ ও গুরুগোবিন্দের বংশধর নয় তাঁদের বংশধরেরা সকলেই ক্ষত্রিয়; তবে তাঁহাদের স্বদেশবাসী বটে। সুতরাং তাঁর এ যুক্তি প্রদর্শন অপ্রাসঙ্গিক।

আর একটা কথা গুরুগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি দেশহিতৈষীগণ গুপ্ত-হত্যায় আস্থাবান ছিলেন না। তা ছাড়া তাঁরা দেশের লোকেদের ভালরকম চিনতেন এবং কর্ত্তব্যও উত্তমরূপে বুঝে নিতে পার্ত্তেন কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বিপ্লববাদীরা এর কিছুই জানেন না। তাদের সে লোকবল নাই, সে পারিপার্শ্বিক অবস্থা নাই সুতরাং গুরুগোবিন্দ সিংহ বা ওয়াশিংটন বা গ্যারিবল্ডী এমন কি লেনিনের কার্য্যকলাপের সঙ্গে বিদ্রোহবাদীদের কার্য্যের তুলনা করা ভ্রমাত্মক এবং বিপজ্জনক হইবে। এই পত্রলেখকের চেয়ে কৃষ্ণে আমার ভক্তি বেশী প্রগাঢ় বলিয়া আমার বিশ্বাস, আমার কৃষ্ণ সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্তা, স্রষ্টা ত্রাতা এবং সংহারকর্ত্তা। তিনি ধ্বংস করেন কারণ তিনিই সৃষ্টি করেন। তবে আমায় এই বন্ধুটীর সঙ্গে দর্শন বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বাদানুবাদ করিতে আমি চাই না। জীবনের রহস্য শিখাইবার মত আমার যোগ্যতা নাই। আমি যে আদর্শকে সত্য বলিয়া জানি তাহাতে পৌছিবার জন্য, সম্পূর্ণ ভাল হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি মাত্র এবং সত্যসত্যই আমি বাক্যে ও কার্য্যে সম্পূর্ণ অহিংসভাব আনিতে ইচ্ছুক তবে আমি জানি যে সে আদর্শে এখনও পৌছিতে পারি নাই। এবং এই আদর্শে পৌছান যে সত্যই কষ্টকর তাও আমি জানি কিন্তু এর সার্থকতার মধ্যে যে নিশ্চিত আনন্দ আছে তার তুলনায় এ কষ্ট যে কিছুই নয়—এ কথা আমি আমার বিদ্রোহবাদী বন্ধুকে নিশ্চয় বলতে পারি। এই আদর্শের পথে এক এক ধাপ উঠতে পারলেই মনে যে শক্তি ও আনন্দ পাওয়া যায় তাতে পরের ধাপে উঠবার যোগ্যতাও জন্মায়। বিদ্রোহবাদীরা আমার কথা নাও শুনতে পারেন এবং মোস্তাফা কেমালপাশা ডিভ্যালেরা, লেলিন প্রভৃতির কার্য্যের অনুমোদন করিতে পারেন তবে আমার এসম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বক্তব্য আছে যে ভারতবর্ষের অবস্থা তুরস্ক, আয়র্লণ্ড বা রাশিয়ার মত নয়। ভারতের মত এত বড় এবং এত বিভিন্নভাবে বিভক্ত এবং যে দেশের জনসাধারণ এত দরিদ্র এবং এত ভয়ে ভীত সে দেশে বিদ্রোহবাদ আত্মহত্যার মত নিন্দনীয়, বিশেষতঃ দেশের এই বর্ত্তমান অবস্থায়।

কাজের কথা
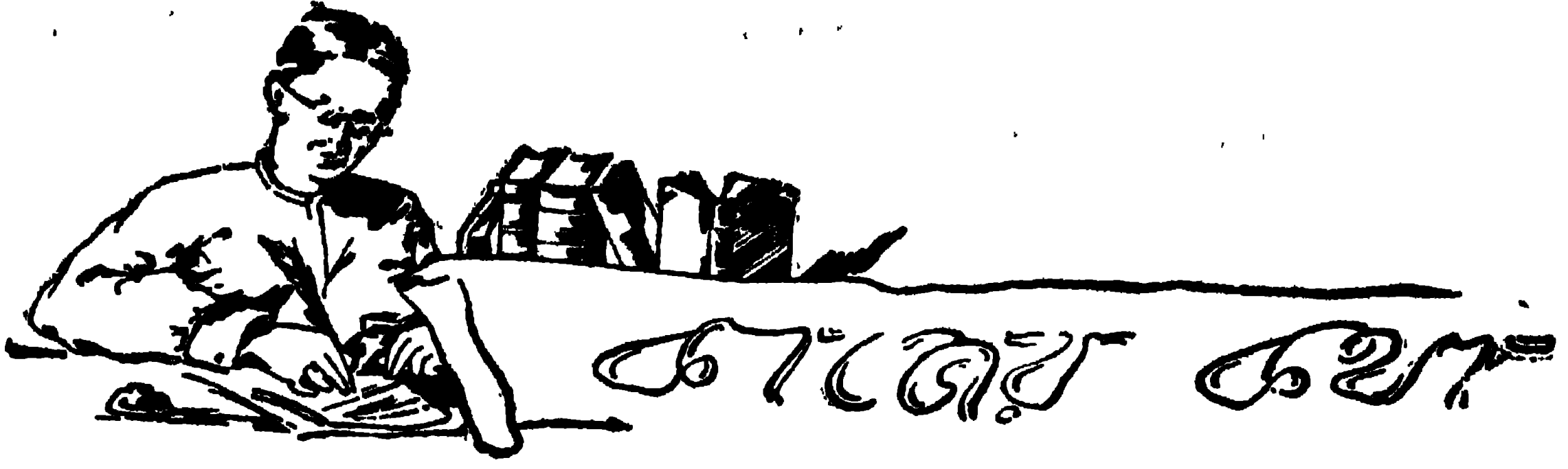
মায়াকান্না ঃ—বিলাতী সিগারেটের উপর ডিউটী কমে গেছে বলে—সিগারেটের দাম অনেকটা কমে গেছে। ৫০টীর টীনগুলি প্রায় টীনকরা ।৵০ আনা কম হইয়াছে। বেশীদামের জন্য টীনের সিগারেটের বিক্রী অসম্ভব রকম কমে গিয়েছিল। ষ্টেটস্‌ম্যান এতে আনন্দ করে বলেছেন, যে এবার ভারতবাসীগণ সস্তায় ভাল সিগারেট খাইতে পাইবেন। আবার দুঃখও করেছেন এই বলে যে এততেও বাঙ্গালীদের মধ্যে সিগারেট খাওয়াটা ভালরকম বাড়ছে না। এরির নামই প্রকৃত ভালবাসা।

ইরোলিন ঃ—ফ্রান্সের এক বৈজ্ঞানিকের পঞ্চদশ বর্ষীয়া কন্যা মোটরকারে ব্যবহারোপযোগী একপ্রকার সুলভ মূল্যের ইন্ধন আবিষ্কার করিয়াছেন। এটীর বিশেষত্ব এই যে ইহার শক্তি পেট্রোলের চেয়ে বেশী অথচ মূল্যে সুলভ হইবে। আবিষ্কারিকার নাম ম্যাডিমসলি ইরেন লরাঁ। ফ্রান্সের মোটর ব্যবসায়ীগণ এই দ্রব্যটীকে নানারূপে পরীক্ষা করিয়া ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন ও ইহার নাম আবিষ্কারিকার সম্মানের জন্য রাখিয়াছেন "ইরোলিন" বাংলার মোটর-স্বামীগণের পক্ষে এটা একটা সুখবর বলা চলে।

কলপ ব্যবহারে চক্ষুর অনিষ্ট ঃ—ডাঃ জে বর্ডন কুপার, বাথের চক্ষু-পরীক্ষাগারের অনারারী সার্জ্জন এবং পাশ্চাত্যের একজন শ্রেষ্ঠ চক্ষুতত্ত্ববিৎ। তিনি বলেন যে আজকাল চক্ষু-পীড়ার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হওয়াতে অনুসন্ধানে জানা গেল, যে প্রায় বেশীরভাগ চক্ষুপীড়া চুলের কলপ ব্যবহার করার ফল। এ বিষয়ে সাধারণকে সতর্ক করে দেবার সময় এসেছে নতুবা অনেক না-জানার দরুণ চক্ষুরত্ন খোয়াইয়া ফেলিবে। অনেক স্থলে চুলের কলপ ব্যবহারে চক্ষু পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে এমন দেখা গিয়াছে।

দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য ঃ—চিকিৎসকেরা দেশবন্ধু দাস মহাশয়কে সমুদ্র-ভ্রমণের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন; শুনা যাইতেছে তিনি নাকি ফরাসীদেশে ভ্রমণ করিতে যাইবেন। তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার বিশেষ এমন কোন রোগ নাই যাহা সত্যই দুর্ভাবনার বিষয়। তথাপি তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির স্বাস্থ্যের জন্য সকলেই উদ্বিগ্ন থাকে। এই মাসের শেষেই তিনি পাটনা হইতে কলিকাতায় আসিবেন এবং শরীর যদি ভাল থাকে তবে ফরিদপুরে উপস্থিত হইবেন। সেটা অবশ্য তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর নির্ভর করে।

হিন্দু-মহাসভা ঃ—হ্যালিডে পার্কে পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপতরায়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র সার পি, সি রায় ও বাবু বিপিনচন্দ্র পাল ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কেহই উপস্থিত ছিলেন। দেশবন্ধু অবশ্য অসুস্থতা-নিবন্ধন আসতে পারেন নি কিন্তু আরও অনেক লোক আছেন যাঁদের উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল। বাইরেরলোকেদের মধ্যে এসেছিলেন মালব্যজী, বেনারসের বাবু ভগবানদাস, পণ্ডিত নেকীরাম শর্ম্মা প্রভৃতি। সভাতে অনেক বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যার আলোচনা হয়েছে যথা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, বাল্য-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, শুদ্ধি (ধর্ম্মচ্যুত দিগের পুনর্গ্রহণ) পতিতজাতিদের উন্নতীকরণ, স্ত্রীদিগের অবরোধ-প্রথা বর্জ্জন প্রভৃতি। এরকম সভায় বাঙ্গলার মাতব্বর হিন্দুদের অনুপস্থিতি যে জাতির কি ঔদাসীন্যের পরিচায়ক ও লজ্জার বিষয় তাহা বলিবার নহে।

দশহাজার বৎসর পূর্ব্বে নারী-প্রাধান্য ঃ—আমেরিকান ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের স্থাপয়িতা সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান ব্যাঙ্কার মিঃ জর্জ, জি, হে, মিঃ হ্যারিংটন নামক একজন প্রত্নতত্ত্ববিদের অধিনায়কতায় দক্ষিণ-নেভাডার মোহানা জেলা খনন করাইয়া প্রায় ছয় মাইলব্যাপী একটী ভূগর্ভ-প্রোথিত নগরীর অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এটী প্রায় দশহাজার বৎসর পূর্ব্বের নগর এবং একটী কর্দ্দমাকীর্ণ নদীতীরে অবস্থিত ছিল। ইহা আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নগর বলিয়া বোধ হয় এবং তাহাতে পুরাকালের আমেরিকান (ইণ্ডিয়ান) সভ্যতার প্রচুর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তীরের ফলা, নানারকমের মাটীর বাসন, নানারকমের ঝুড়ী, অনেক কঙ্কাল প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। একটী বালক ও একটী কুকুরকে একসঙ্গে প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত দ্রব্যাদি-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহা বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে যে সে সময়ে নারীগণ পুরুষগণের উপর আধিপত্য করিতেন। নারী-স্বাধীনতার পাণ্ডাদের কাছে ইহা একটী অমূল্য প্রমাণ বলিয়া আদরণীয় হইবে।

প্রতিহিংসার দীর্ঘ স্থায়িত্ব ঃ—প্রতিহিংসায় মানুষকে যে উন্মাদ করে ফেলে তা সকলেই জানেন—আমাদের দেশে অবমানিত ব্রাহ্মণ চাণক্য প্রতিহিংসায় অন্ধ হইয়া নন্দবংশ ধ্বংস ক'রেছিলেন। সম্প্রতি বজ নামক এক ইটালীয়ানের অদ্ভুত প্রতিহিংসার ব্যাপার শুনা গিয়াছে। বজের ভাই তার উপর কোন অন্যায় করেছিল। বজ মনের মধ্যে বিশবৎসর সেই রাগ পোষণ করে শেষ ইতালী থেকে সুইজারল্যাণ্ডের লুগানো সহরে এসে হাজির হন। তার ভাই সেখানে একখানি ছোট দোকান খুলেছিল। সেই দোকানের সামনে এসে ভেতরে ভাইকে দেখে বজ তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে; বজের ভাই তাহাতে কাঁধে ও হাতে আঘাত পান—বজ অবশ্য ধরা পড়েছেন। তাঁর এই দীর্ঘস্থায়ী প্রতিহিংসা মানবমনের একটী নূতন অবস্থার পরিচয় দিল—এটা মোনস্তত্ত্ববিদদের গবেষণার একটী নূতন খোরাক হবে তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

আখের ছিবড়া ঃ—যা আমরা চিবাইয়া ফেলিয়া দিই এবং আমাদের দেশের আখমাড়া কলে যা শুকাইয়া গুড় জ্বাল দিবার জন্য ব্যবহার হয় তাও বৈজ্ঞানিকের হাতে পড়ে মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদল অষ্ট্রেলিয়ান ব্যবসায়ী প্রথমে এদিকে মাথা ঘামান। অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচুর পরিমাণে শক্ত ও সুন্দর কাঠ জন্মায় তবুও গৃহ নির্ম্মাণের জন্য আমেরিকা এবং স্কাণ্ডিনেভিয়া থেকে প্রতি বৎসর ৩০০।৪০০ মিলিয়ন ফুট নরম কাঠ প্রতি বৎসর আমদানি করতে হ'তো। আমেরিকার অগ্রণী ব্যবসায়ীশ্রেণীর নিকট তাঁরা প্রথমে আখের ছিবড়া থেকে কৃত্রিম কাঠ প্রস্তুত করবার প্রস্তাব করেন। সিড্নিবাসী মিঃ আর্ম্মষ্ট্রং ছিলেন একাজের উৎসাহদাতা। নিউঅর্লিয়ান্স সহরের কাছে যেখানে পাহাড়ের মত আখের ছিবড়া কারখানা থেকে ফেলে দেওয়া হ'ত, সেখানে বড় বড় পাত্রে এগুলিকে রাসায়ণিক দ্রব্যাদিসংযোগে সিদ্ধ করিয়া ৪ ঘণ্টার মধ্যে তা থেকে কৃত্রিম নরম কাঠ প্রস্তুত করা হচ্ছে। ফলে অষ্ট্রেলিয়ার একটী নূতন ধনাগমের পথ উন্মুক্ত হল। আর আমরা পারি সিগারেট্ ফুঁকিতে ও লম্বা চৌড়া বাক্যের বিন্যাস করিতে, এজন্যই তো এত দুঃখ!

আপন ঘরে পরবাসী

শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্ত রায়

সে জন্মেছিল সোণার বাংলায়, আর লোকটা ছিল একটু বেজায় রকমের ভাবুক। সারাদিন নেচে নেচে গেয়ে গেয়েই তার দিন কাটত। 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল' নিশিদিন তার ভাবের খোরাক দিত। এক একদিন সে তার পুরাণো সারেঙ্গটী হাতে করে নেশাখোরের মত যে কোথায় উধাও হয়ে যেত, কেউ তার খবর পেত না। এমনি একদিন ভাবের মদে মাতাল হয়ে সে সামনে যে পথ পেলে সেই পথেই

ক্রমাগত টল্‌তে টল্‌তে চল্‌তে লাগ্‌লো। বাঙ্‌লার-নদী 'গোপনে আপন মনে' কল কল তানে তাকে মাতিয়ে তুলে ছুট্‌তে লাগ্‌লো, মদের নেশা কাট্‌তে দিলে না। পাখীর কূজন, ভ্রমরের গুঞ্জন তার কাণে স্বর্গের বারতা দিয়ে গেল। দখিণের মাতাল হাওয়া ধীরে ধীরে তার হিয়াকে স্পর্শ করে চলে গেল। সে চলেছে আজ এক মনে সেই স্বর্গেরই পথে—দেবতার পায়ে অর্ঘ্য দিবে বলে। আজ আর কোনদিকেই তার লক্ষ্য নেই। পথে বেরিয়ে আস্‌বার সময় দোর রুদ্ধ করে আস্‌তে সে আজ ভুলে গিয়েছে। তার ক্ষেতের ধান পেকে রয়েছে, গোয়ালে গাইয়ের বাঁটে দুধ জমে রয়েছে, বাগানের ফল পেকে উঠেছে, ওদিকে তার খেয়ালই নেই। সে তার অর্ঘ্যের ডালি মাথায় বয়ে নেশার ঘোরে কেবলই চল্‌ছে সেই পথে, তার গায়ে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, চোখে নিদ্রা নেই। পথের কাঁকর তার পায়ে ফুটে ঘা হয়ে গেছে, সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপও নেই। জ্যৈষ্ঠের প্রখর রোদ শ্রাবনের ধারা সব সে ভুলে গেছে! সে কেবল আপন মনে গেয়ে চলেছে,—

"যাত্রী আমি ওরে?
কোন দিনান্তে, পৌঁছিব কোন ঘরে।
কোন্ তারকাদীপ জ্বলে সেইখানে,
বাতাস কাঁদে কোন্ কুসুমের ঘ্রাণে,
কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দু'নয়নে,
অনাদিকাল চাহে আমার তরে।"

এম্‌নি করে কতনিশি কতদিন গেয়ে সে হঠাৎ স্বর্গের দ্বারে এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু হ'লে কি হয়, স্বর্গের দ্বার তখন রুদ্ধ। তার মাথায় যেন হঠাৎ আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌ল; দু'নয়নের জলে বুক ভাসিয়ে দিলে। দ্বারী এসে জিজ্ঞাসা করলে,—"তুমি কাঁদ্‌ছ কেন গা,—তুমি কোন্ দেশের লোক,—এখানে কি কর্‌তে এসেছ?" সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে উত্তর দিলে, "আমি সোণার বাংলার লোক গো,আমি সোণার বাংলার; দেবতার পায়ে অর্ঘ্য দিব বলে এসেছি—দয়া ক'রে একটীবার দ্বার খুলে দাও।" দ্বারী হাস্‌তে লাগ্‌লো, বল্লে,—"তাইত, বাঙ্‌লার নইলে কি আর এমনটী হয়। ওহে ভাবুক লোক! দেবতার পায়ে অর্ঘ্য দিবে ব'লে এসেছ, তোমার উপকরণ তো কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনা—তোমার মাথায় যে শূন্য ডালি।" এতক্ষণে তার ভাবের নেশা ছুটে গেল। সে মাথার ডালি নামিয়ে দেখে,—"তাইত! আমি কি নিয়ে দেবতার পায়ে অর্ঘ্য দিতে এসেছি।" তার চোখ দুটী অন্ধকার হয়ে গেল, পৃথিবী পায়ের তলায় যেন ভোঁ ভোঁ করে ঘুর্‌তে লাগ্‌লো, শ্রান্ত শিথিল অঙ্গ তার অবশ হয়ে যেন নুয়ে পড়্‌ল। দ্বারী দ্বার খুলে দিলে না, দেবতার দর্শনটাও মিল্‌ল না। জোর করে পা দুটো টান্‌তে টান্‌তে আবার সে অর্ঘ্যের ডালি ভরে আন্‌তে সোণার বাংলায় ফিরে চল্‌লো।

এতদিন পরে ফিরে এসে দেখে, একি! কে তার ক্ষেতের ধান গোলায় তুলে নিয়েছে; তার গাইয়ের দুধ, তার পুকুরের মাছ, তার সেই ঘর দোরে এসব কারা গেরস্থ সেজে বসে আছে! সে ভয়ে ভয়ে মিনতির স্বরে বল্‌ল, "ওগো তোমরা কারা?—আমি দেবতার পায়ে অর্ঘ্য দিতে গিয়েছিলাম, এতদিন পরে ফিরে এসেছি, আমার বাড়ী ঘর আমায় ফিরিয়ে দাও।" তারা হেসে বল্‌লে,—"এসব তোমার হ'তে যাবে কেন! বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, তাও কি তুমি জাননা? যদি এসব ফিরে চাও তবে এস, আজি অগ্রে বীরত্বের পরীক্ষা হোক্।" কিন্তু সে যে আর অসি ভালবাসে না, সে যে এখন প্রেমের উপাসক—ভাবের উপাসক,—রণক্ষেত্র যে তার ভাবের বিরোধী! ভাব রাজ্যের জোয়ার ভাঁটাতেই তার আনন্দ; তাকে তো সে কিছুতেই আঘাত কর্‌তে পারে না। কাজেই আর তাতে মোটেই রাজী না হয়ে বল্‌ল,—না ভাই! তোমরা যেমন আছ তেমনি থাক, তোমাদের সঙ্গে আমি বিরোধ কর্‌তে চাইনে। শুধু চাই—ঐ আঙ্গিনার কোণে আমার মাথা পাতবার মতো একটু ঠাঁই, যাতে এই মাটিতে গড়া আমার দেহটী এই মাটিতেই মিশিয়ে দিতে পারি।

যতদিন না তার সেই মাটির দেহটি তার সাধের জন্মভূমি এই সোণার বাংলার মাটীর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সে পর্য্যন্ত বুঝি বা নিশিদিন জেগে বসে সে কেবলই ভাব্‌তো,—কি ভাবতো? যা বিশ্বমানবের মন নিশিদিন ভাবে তাই।

অভিনেতার বর্ণপরিচয়

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

সেদিনকার 'নাচঘর' পত্রিকার রঙ্গরেণুতে দেখিলাম,—"স্বনামধন্যা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী মারি প্রোভষ্ট বলেন, পোষাক পরিচ্ছদের রংয়ের ওপর অভিনেত্রীর মনোভাব নির্ভর করে, তার মনে হয়,—নীল রং মনকে শান্ত করে। সবুজ মনকে খিট্‌খিটে করে, বাদামী মনকে নত করে, এবং কাল মনকে দাবিয়ে ক্ষুণ্ণ করে।"

চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর এই অনুভূতি যথার্থই প্রশংসনীয় এবং যে দেশের লোক মনোভাবের সহিত বর্ণের (রং) সম্বন্ধ কোনদিন গবেষণা করেন নাই সে দেশের কাছে অভিনেত্রীর এই অভিজ্ঞতা একটা মস্তবড় সম্পদ। ভারতবর্ষের লোকের নিকট কিন্তু ইহার মূল্য অতি সামান্য। তবে যাঁরা কোনদিন মাথা না ঘামিয়ে পরের সাজে আপনাকে সজ্জিত করার পক্ষপাতী তাঁদের নিকট এর কিছু মূল্য থাক্‌লেও থাকতে পারে। বর্ণের সহিত মনোভাবের অতি নিকট সম্বন্ধ—এবং সেই সম্বন্ধের গবেষণা করে ভারতের প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বহুকাল পূর্ব্বে মনের ভাব ও রস সমূহের বর্ণ নির্ণয় করে গিয়েছেন। আজ আমাদের মহামূল্য সম্পদ সকল মাটী চাপা দিয়ে রেখে, বিদেশের সে ঝুঁটো জিনিষ নিয়ে নিজেদের যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করছি তার চেয়ে ঢের মূল্যবান আসল বস্তু আমাদের দেশের পণ্ডিত মহাশয়েরা পাশ্চাত্য প্রদেশে নাট্যকলার প্রবর্ত্তনেরও বহুপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন এবং সে সকল এমনই বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত করে গিয়েছেন যার কাছে এই বিদেশীয় অভিমত অতি অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

প্রাচীন ভারতের নাট্যকলাবিদেরা—তাঁদের যে সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির নিদর্শন রেখে গিয়েছেন, তার সঙ্গে বর্ত্তমানের পাশ্চাত্য নাট্যকলার তুলনা কর্‌লে সমুদ্রের নিকট গোষ্পদ সমান বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু, ভারতের দুর্ভাগ্য যে, সেই সকল গ্রন্থ—যা তার স্বাধীনতার লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে চলে গিয়েছিল সেই সকলই আবার নূতন সাজে এদেশে ফিরে আস্‌ছে। অথচ নিজের দেশের রত্নের সন্ধান ক'রে, তার উদ্ধারের চেষ্টা কর্‌তে আমাদের আলস্য বোধ হয়। সব চেয়ে মনে বেশী আঘাত লাগে—এই ভেবে যে আমাদের দেশের বড় বড় পণ্ডিত মহাশয়েরা—যাঁরা প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদির সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত, তাঁরা এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। তাঁরা অনেক সময় আবশ্যক মত মাঝে মাঝে সেই সকল গ্রন্থ হতে সূত্র প্রমাণাদি তাঁদের লিখিত প্রবন্ধাদিতে ব্যবহার করে মানুষের মনে কেবল অতীতের স্মৃতিটুকু জাগিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত। সেই সকল গ্রন্থ যদি যক্ষের ধনের মতন আগলে বসে না থেকে তারা অনুবাদ করে প্রচার করেন, তবে যাঁরা জাতীয় নাট্যশালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কল্পে আপনাপন উজ্জ্বল ভবিষ্যত উৎসর্গ করছেন এবং করেছেন তাঁদের সাধনার উত্তরসাধকরূপে বরেণ্য হয়ে নাট্যশালার অশেষ কল্যাণসাধন কর্‌তে পারেন।

বাঙ্গালা দেশের নাট্যশালা চরমোৎকর্ষে না পৌছতে পার্‌লেও অতি অল্পকালের মধ্যে নাট্যকলাবিদ্যাকে এতদূর আয়ত্ত করেছে, যে তার অভিনেতাগণ যদি পরমুখাপেক্ষী না হয়ে আপন জনের কাছে থেকে তার লুপ্ত রত্নের সন্ধান টুকু পান, তা হলে তাঁদের জীবনের সাধনা সার্থক হয়, এবং সেই সার্থকতা—একদিন সমগ্র জগতকে মুগ্ধ কর্‌তে পাবে। নইলে পরের দোরের টুক্‌রো কুড়িয়ে ফকিরের আলখাল্লা তৈরী করে পর্‌লে—তারা চিরদিনই ফকির হয়েই থাক্‌বে, কোনদিনই তাদের প্রতিভা—সকলের উপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পার্‌বে না।

বাঙ্গালা দেশের সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ পণ্ডিত মহাশয়ের ভগ্‌বদ্‌গীতার নানাবিধ অনুবাদ টীকা টিপ্পনী প্রভৃতির বহুল প্রচারের প্রয়োজন যেমন মনে করেন, তেমনি যদি—নাট্য-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় ভরতনাট্যশাস্ত্র, সাহিত্য-দর্পণ, অভিনয় দর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কার শাস্ত্রাদির বাঙ্গলা অনুবাদ করে প্রচার করেন, তা হলে বাঙ্গলাদেশের নাট্যকলার অশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং নাট্যকলারসপিপাসু ব্যক্তিগণের রসাস্বাদেরও সুবিধা হইতে পাবে।

শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়দ্বয়ের বহু প্রবন্ধে আমরা প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রাদির উল্লেখ দেখতে পাই। এবিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি পড়লে বাঙ্গলার নাট্যশালা ও নাট্যকলাবিদ্‌গণ যথার্থই উপকৃত হইবেন।

মাসিক বসুমতীর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা সম্বন্ধে আলোচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রবন্ধের নিম্নে ক্রমশঃ উল্লেখ থাকলেও আর দ্বিতীয় অধ্যায় প্রকাশ হয় নাই। তাঁহার বহু প্রবন্ধে এবং বক্তৃতায় প্রাচীন নাট্যসম্বন্ধীয় নানা কথার আভাষ ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। অর্দ্ধেন্দু-পাঠাগারে বক্তৃতাকালে তিনি নিজেই বলেছিলেন, "আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি সেই সেকালে, মানে অতি পুরাতন কালে, আমাদের যে থিয়েটার ছিল সে ইংরাজী থিয়েটারের চেয়ে ভাল বই মন্দ ছিল না। সেকালের মুনিরা আপনাদের অনেক বিষয় শিখাইতে পারিবেন। নাটকের সিদ্ধির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল, তাঁহারা বিস্তর পরিশ্রম করিয়া নাট্যশাস্ত্র লিখিয়াছিলেন, সে পরিশ্রমের ফল আপনাদের হাতের মুঠোর মধ্যে রহিয়াছে। আপনারা সে ফল গ্রহণ করুন। সেই মতে আপনাদের নাটকের পরিবর্জ্জন করুন, দেখিবেন আপনাদের নাটকের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। বাঙ্গলার যে ষ্টেজ বাঙ্গলার একটা শক্তি হইয়াছে তাহা শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে। হয়ত, পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলনে অদ্ভুত অপূর্ব্ব জিনিষ হইবে।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় মনে প্রবল বাসনা জাগিয়ে তোলে কিন্তু তা পরিতৃপ্ত করবার উপায় নাই। আমাদের মুনি ঋষিরা আমাদের জন্য যা রেখে গিয়েছেন তা আমাদের হাতের মধ্যে আসিলেও ফল গ্রহণের উপায় কৈ? সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ দেশবাসীদের পণ্ডিত মহাশয়গণের মুখের পানে চেয়ে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় কি?

প্রাচীন ভারতের নাট্য গৌরবের অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানসিক ভাব ও রসের বর্ণ বা রং সম্বন্ধে যাহা অবগত হয়েছিলাম, আজ নাচঘরে তারির উল্লেখ দেখে এই কটা কথা না লিখে থাকতে পারলাম না। হয়তো আমার পক্ষে ইহা ধৃষ্টতা হতে পারে,—ধান ভানতে শিবের গীত গাইলাম তথাপি বিদেশীয় অভিনেত্রীর যে অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয়তা হিসাবে বাঙ্গলার নাট্যশালা সংক্রান্ত পত্রিকায় স্থান পেয়েছে সেই অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের আলঙ্কারিকগণের যে কতদূর ছিল, তাঁরা—এইসকল জটিল বিষয় কত সরল ও সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন তা উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ বলেন,—প্রাকৃত পদার্থের ন্যায় অন্তরের ভাবরাশি ও রস সমূহেরও বর্ণ আছে। এই সকল বর্ণের সাহায্যেই চিত্রকরগণ মানুষের মনের ভাবরাশি চিত্রে প্রকাশ করে থাকেন। ভাবরাশির কোন বর্ণ না থাকলে বর্ণের প্রতি মনোভাবের অনুকূল ও প্রতিকূল ভাব পরিলক্ষিত হত না। অভিনেতাগণের ভাব ও রস সমূহের বর্ণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকলে তাঁহারা নাটকীয় চরিত্রানুযায়ী পরিচ্ছদাদির বর্ণ সহজেই নির্ণয় করতে পারতেন এবং সেই সকল বর্ণ তাঁহাদের অভিনেয় চরিত্র পরিস্ফুটনে যথেষ্ট সাহায্য করত।

বিভিন্ন রসের বিভিন্ন গতি চিন্তা করলেই ভাবরাশির বর্ণ সম্যক উপলব্ধি করতে পারা যায়।

প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকগণের মতে—শৃঙ্গার রস—শ্যাম বর্ণ, হাস্যরস—শ্বেতবর্ণ, বীররস—হেমবর্ণ, বীভৎস রস—নীলবর্ণ, করুণ রস—কপোতবর্ণ, রৌদ্র রস—রক্ত বর্ণ, অদ্ভুত রস—পীতবর্ণ, শান্তরস—চন্দ্রবর্ণ, বৎসলরস—পদ্মবর্ণ।

ভারতীয় বৈষ্ণবগ্রন্থেও—ভাবরাশি ও তাহার বর্ণের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদিগের মতে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বৎসল, মধুর, হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস রসের উল্লেখ আছে। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—তাহাদের বর্ণের এইরূপ বর্ণনা করেছেন,—

"শ্বেতাশ্চিত্রোরুণঃ শোণঃ পাণ্ডুর পিঙ্গলৌ।
গৌর ধূম্রস্তথা রক্তঃ কালো নীলঃ ক্রমাদমী॥"

অর্থাৎ—শান্তরস—শ্বেতবর্ণ, দাস্যরস—চিত্রবর্ণ, সখ্যরস—অরুণ বর্ণ, বৎসলরস—রক্তবর্ণ, মধুররস—শ্যামবর্ণ, হাস্যরস—পাণ্ডুরবর্ণ, অদ্ভুতরস—পিঙ্গল

বর্ণ, বীররস—গৌরবর্ণ, করুণরস—ধূম্রবর্ণ, রৌদ্র রস—রক্তবর্ণ, ভয়ানকরস—কালবর্ণ এবং বীভৎস রস—নীলবর্ণ।

সাহিত্যদর্পণকারও—মনোভাবের রং সম্বন্ধে বর্ণন করে গিয়েছেন—যথা—হাস্যরস সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,—

"—হাস্যো হাস্য-স্থায়িভাবঃ শ্বেতঃ প্রমথ দৈবত॥"

অদ্ভুত রস সম্বন্ধে বলেন,—

"অদ্ভূতঃ বিস্ময় স্থায়িভাবে গন্ধর্ব্বঃ দৈবতঃ।
পীতবর্ণো বস্তু লোকাতি গমালম্বনং মতম্॥"

ইত্যাদি রূপ সকল ভাবেরই তিনি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

পণ্ডিতগণের এইসকল মূল্যবান সংজ্ঞা হ'তেই বুঝতে পারা যায় যে—বর্ণের সহিত অন্তরের ভাব সমূহের কিরূপ যোগাযোগ আছে। মানুষের মনের কোন ভাবের উদ্রেক হলে তাহা বর্ণের দ্বারাই সাধারণতঃ মুখে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং যে বর্ণ যে ভাবের পরিচায়ক সেই বর্ণের বাহ্য ব্যবহারেও—মনোভাবের পরিবর্ত্তন হওয়ায় সম্ভব।

আমাদের দেশের রঙ্গালয় সমূহে পূর্ব্বে পোষাক পরিচ্ছদের চাকচিক্যই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান কালে যদিও স্থান কাল পাত্র বিচার করে সম্ভবমত পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন ঘটেছে তথাপি বর্ণ সম্বন্ধে সকলেই এখনো উদাসীন।

বিলাতের অভিনেত্রী তাঁহার অনুভূতি প্রকাশ করেছেন কারণ তিনি অভিনয় কালে মনোভাব প্রকাশে এই সকল বর্ণের সাহায্য গ্রহণ করে ফল পেয়েছেন। আমাদের দেশের অভিনেতারাও যদি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের অভিজ্ঞতা ও উপদেশ সকল অনুসন্ধান করে দেখেন তা হলে তাঁরাও যে প্রভূত উপকার পাবেন সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই ও পাশ্চাত্য চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর মুখে যাহা শুনিলেন তাহা যে নূতন কিছু নয় সে ধারণাও করতে পারবেন আর দেখতে পাবেন কতশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের মুনি ঋষিরা এবিষয়ে সারসত্যে উপনীত হয়েছিলেন।

পুস্তক সমালোচনা

জেলার বরাত (নাটিকা) ঃ—মূল্য ॥৹ আট আনা শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। মিনার্ভায় উচ্চ সাফল্যের সহিত অভিনীত এই পুস্তকের নূতন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। অধুনা সরস প্রহসন লিখিবার একমাত্র যোগ্য পাত্র আছেন ভূপেন বাবু, তাঁর পুস্তকের মধ্যে অনাবিল হাস্যরস এবং সরস সঙ্গীতের কখনও অভাব হয় না অথচ লোকশিক্ষার উপাদান থাকে প্রচুর। তাঁহার সৃষ্ট ব্যারিষ্টার নটক একটী নূতন অথচ বাস্তব চিত্র—এ শ্রেণীর ঘটকে যে আজ বাঙ্গলা ভরিয়া যাইতেছে তাহা সকলেই জানেন। পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে ইহাই ইহার জনপ্রিয়তার পরিচয়। বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে এ শ্রেণী পুস্তকের যে কত প্রয়োজন তাহা বলিবার নয়।

[illegible] (নাটক) ঃ—মূল্য ॥৹ আট আনা, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। এখানি গতানুগতিক পন্থার নাটক নয় বেশ একটু নূতনত্বের হেঁয়ালি হইলেও দুর্ব্বোধ্য নয়। এই হাস্যরস পূর্ণ রূপকের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান বাংলার শোচনীয় অবস্থা গ্রন্থকার যে কৌশলে দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। দেশের জন্য এতটা ভাবনা এত সহানুভূতি না থাকিলে দেশের মর্ম্মকথা কি শুনাইতে পারা যায়? বিদ্রূপের মর্ম্মভেদী আঘাতে অন্তঃস্থল নিঃসৃত শোণিত ধারা বহাইয়া জাতির চোখ খুলিয়া দিবার অনেক চেষ্টা তিনি করিয়াছেন—এর মধ্যে অনেক সামাজিক, নৈতিক ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যার কথাও তুলিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চে এরূপ শিক্ষাপ্রদ অথচ আনন্দবর্দ্ধক নাটক বহুদিন অভিনীত হয় নাই, তাই বাঙ্গালী রঙ্গামোদী এতটা অভ্যর্থনা করিতেছে। আর্ট-পাগলার দল অবশ্য নাটকে শিক্ষার কথা শুনিলে হাসিয়া উঠেন, বিদ্রূপ করেন, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ কেবল আনন্দের বেসাতি নয় সেখান হইতেও জাতিগঠনের উপাদান পাওয়া আবশ্যক। ভূপেন্দ্রবাবুর লেখনী জয়যুক্ত হউক কারণ আধুনিক যুগে প্রহসন লিখিবার হাত তাঁহার ছাড়া আর কাহারও আছে কিনা তাহা এখনও ঠিক বলা যায় না।

Printed & Published by Sachindra Nath Banerji at the HIMANI PRESS.
53, Durga Charan Mitter Street, Calcutta.

মুহ্যমানা

শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু

প্রথমবর্ষ] ১২ই বৈশাখ শনিবার, ১৩৩২ সন। ইংরাজী ২৫শে এপ্রেল [৩৭শ সংখ্যা

অদ্ভুত সাফাই

স্বামী অধিক রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া, সভয়ে দরজার কড়া নাড়িলে পত্নী আসিয়া দরজা খুলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জনে বলিলেন "বলে গেলেন থিয়েটারে যাচ্ছি, কটা বেজেছে খবর আছে? থিয়েটার একটায় ভাঙ্গে তা আমি জানি না নাকি?" স্বামী ঘাড় নীচু করিয়া, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন "তা আর জানবে না, তুমি কি রকম বুদ্ধিমতী—তা একটাই তো বেজেছে, আমি যখন দরজা ঠেল্‌ছিলাম তখন শুন্‌লাম ওপরের ঘড়ীতে টং করে ১টা বাজল একটু পরে শুনি আবার ১টা বাজল এইরকম চার বার একটাই বাজলো"—স্ত্রী স্বামীর অদ্ভুত সাফাই শুনে বল্লেন 'কি নির্ল্লজ্জ বেহায়া"—

স্বামী তখন মনে করিতেছিলেন যে কর্পোরেশন একটায় থিয়েটার ভাঙ্গার আইন পাশ করে নিশাচর ভদ্র-লোকদের কি বিপদই না ঘটাইয়াছে।

নারী চরিত্রে সতীত্ব

(ভিক্ষু অকিঞ্চন)

শাস্ত্রকার সত্যই বলিয়া গিয়াছেন—"স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্য দেবতাদের পর্য্যন্ত অবিদিত, মানুষ তাহা কি করিয়া জানিবে?" শাস্ত্রকার এই বচনে পুরুষ চরিত্রে নীতির উল্লেখ করেন নাই, কেবলমাত্র স্ত্রীজাতির চরিত্রের কথাই বলিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগ আমরা নিশ্চয়ই ইহাতে সন্তুষ্ট হইব না, আমরা পুরুষের চরিত্রেরও দাবী করিব। তবে কি আমাদের শাস্ত্রকারগণ একদেশদর্শী ছিলেন—তাঁহারা কি অবলা নারী জাতির উপর অবিচারই করিয়া গিয়াছেন!—একথা কেমন করিয়া ভাবিতে পারি যে সত্যদর্শী শাস্ত্রকারগণ যাঁহারা এক সময়ে বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন,—

"যৎসত্যং সর্ব্ববেদেষু যৎসত্যং ব্রহ্মবাদিষু।
যৎসত্যং ত্রিষুলোকেষু তৎ সত্যমিহ দৃশ্যতাম্॥"

তাঁহারা যোগনয়নে দেখিতে পাইয়া ছিলেন, পুরুষ ব্যভিচারী, একমাত্র নারীর পবিত্রতাই জগতকে রক্ষা করিতেছে! তাঁহারা বুঝিতেন, বীজের অপেক্ষা ক্ষেত্রের পরিশুদ্ধি শতগুণে বাঞ্ছনীয় কারণ ক্ষেত্রশুদ্ধ থাকিলে অতি নিকৃষ্ট বীজও স্ফুর্ত্তিলাভ করিয়া উঠে। ক্ষেত্র অনন্ত—বীজ পরিমিত!

পরমুখাপেক্ষী আমরা পরের মুখে ঝাল খাইয়া Mill পড়িয়া বর্ত্তমানে স্ত্রী-প্রশংসা করিতে শিখিয়াছি কিন্তু নিজেদের ভাণ্ডারে যে কি ছিল, তাহা একবার ভুলিয়াও কিচিন্তা করি? হিন্দু শাস্ত্রে যে স্ত্রী-প্রশংসা আছে, জগতের সাহিত্যে তাহার তুলনা কোথায়? শাস্ত্র ব্যতীত কে এমন তারস্বরে বলিতে পারে———

জয়ে ধরিত্র্যাঃ পুরমেব সারং পুরেগৃহং সদ্মনি চৈকদেশঃ।
তত্রাপি শয্যা শয়নে বরা স্ত্রী রত্নোজ্জ্বলা রাজ্যসুখস্যসারঃ॥

অর্থাৎ, বিজিত দেশের মধ্যে নগর শ্রেষ্ঠ, নগরের মধ্যে গৃহ, গৃহের মধ্যে একদেশ অর্থাৎ শয়নাগার, তন্মধ্যে শয্যা, শয্যার মধ্যে রত্নোজ্জ্বলা উত্তমা স্ত্রী শ্রেষ্ঠা, যেহেতু এইরূপ স্ত্রী—রাজ্যসুখের সার বলিয়া জানিবে।

(বৃহৎ-সংহিতা)

চরিত্র বিষয়ে শাস্ত্র কোনদিনও নারী জাতির প্রাধান্য অস্বীকার করে নাই। যখন অন্বেষণ করিয়া দেখি—

প্রব্রুতসত্যং কতরোঽঙ্গানানাং দোষাঽস্তি যো না চরিতো মনুষ্যৈঃ
ধার্ষ্ট্যেন পুম্ভিঃ প্রমদা নিরস্তা গুণাধিকাস্তামনুনাত্র চোক্তম্॥"—(বৃহৎ-সংহিতা)

অর্থাৎ "পুরুষগণ যেরূপ দোষাচরণ করে, সেইরূপ বৃহৎ কি দোষ রমণীদিগের কর্ত্তৃক আচরিত হয়? পরদারাদি গমনরূপ দোষ প্রথমত পুরুষ কর্ত্তৃক আচরিত হয়, পরে তাহারা ঐ দোষে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, পুরুষগণ নির্লজ্জতা হেতুই রমণীদিগকে দূষিত করিয়া থাকে।" ঋষিগণের এই প্রকার সুস্পষ্ট ও অকপট বাক্যে স্তম্ভিত না হইয়া থাকিতে পারি না। এমনভাবে নর-নারী-মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ আর কোন দেশে হইয়াছে কি? একমাত্র নারী ভক্ত Mill ছাড়া নারী জাতিকে কাণ্ট, নীট্সে সোপেনহাওয়ার উইনিনজার, মেন্‌কেন্ প্রভৃতি সকলেই গালি পাড়িয়াছে।

যে মনুর উপরে আমাদের তরুণ তরুণীদের এত আক্রোশ, তিনিও কি নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে নারীর স্বপক্ষে নহেন?

চন্দ্রমা রমণীদিগকে বিশুদ্ধতা প্রদান করেন, গন্ধর্ব্বগণ আনন্দজনক বাক্য প্রদান করেন এবং অগ্নি সর্ব্বভক্ষ্যতা প্রদান করেন, এইজন্যই কামিনীগণ সুবর্ণ সদৃশ মহৎ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের পদদ্বয় পবিত্র গাভীর পৃষ্ঠদেশ পবিত্র, অজা ও অশ্বের মুখ পবিত্র এবং নারী জাতির সর্ব্বাঙ্গই পবিত্র। রমণীগণ অতিশয় শুদ্ধা,

ইঁহারা কখনই দূষিতা হন না, মাসে মাসে যে আর্ত্তব-স্রাব হয় তাহাতেই ইহারা পাপরহিতা হইয়া বিশুদ্ধা হইয়া থাকেন।"

আমাদের বিচক্ষণ পূর্ব্বপুরুষদিগকে তাঁহাদের ভ্রম প্রমাদের জন্য আমরা যতই গালি দেই না কেন, তাঁহারা কিন্তু আমাদের মত এমন নিলর্জ্জভাবে পরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণে কৃতবিদ্য ছিলেন না। আজ স্বাধীন চিন্তা বলিয়া সাহিত্যে প্রেমেরও রমণীচরিত্র সম্বন্ধে যে সকল দুর্নীতিপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইতেছে,যাঁহারা ইংরেজী সাহিত্যের সহিত সুপরি-তাঁহারা জানেন যে তাহা বিদেশী সাহিত্যের চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র। তাঁহারা সত্যকে চিনিতেন, সত্যকে চিনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, আবার দুর্ব্বল ভিত্তিতে কাল পাত্রভেদে কঠিন সত্যের ঝল্‌সামো ঝাঁঝ যেখানে সহিত না সেখানে সত্যের রাশ একটু টানিয়াও ধরিতেন—এইজন্যই অপ্রিয় সত্য তাঁহারা হঠাৎ ব্যক্ত করিতেন না, কারণ সামাজিক অনুশাসনে অনেক সময়ে অপ্রিয় সত্য মারাত্মক হইয়া পড়ে। একথা ইব্‌সেনের ন্যায় সত্যদর্শী দার্শ-নিককেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইব্‌সেনের গ্রন্থাবলীর বিখ্যাত অনুবাদক Mr. William Archer সাক্ষ্য দিতেছেন———

"Having said his say and liberated his soul, he (ইব্‌সেন) now began to ask himself whether human nature was, after all, capable of assimilating the strong meat of truth—whether illusion might not be, for the average man, the only thing that could make life livable··· ···. Ibsen's very devotion to truth forces him to realise that truth is an antitoxin which rashly injected, at wrong times or in wrong doses may produce disastrous results. It ought not to be indiscriminately administered by "quack salvers" (ইব্‌সেনের The wild duck নামক নাটকটি দ্রষ্টব্য।)

উপরের এই কথাগুলি অচলায়তন ভঙ্গকারী, ভোগা-য়তন বৃদ্ধিকারী আমাদিগের সবুজ-পন্থী বাবুদের অতি ধীর ভাবেই ভাবিতে অনুরোধ করি। ভাঙ্গা সোজা কিন্তু গড়া শক্ত—এ সাদা কথাটা পৃথিবীর সব উন্নতিশীল জাতিই বুঝিয়াছে, কেবল তাহারাই পারে নাই যাহারা বুঝিতে চাহিবে না তাহা না হইলে শিক্ষাভিমানিনী নারীর মুখ হইতে আজ সতীত্বের অসারতার কথা শুনিতে হইত না? অথচ এই সতীত্বই সমাজ শৃঙ্খলারক্ষার্থ একটা অপূর্ব্ব ধর্ম্ম। এই সতীত্বের জন্যই জগতের কোন নারীর সহিত ভারত নারীর তুলনা হয় না। সতীত্বের আদর্শ যে দিন ভারত হইতে উঠিয়া যাইবে, সে দিন ভারতের বিশিষ্টতাও উঠিয়া যাইবে। এই সতী-চরিত্র যে সমাজ ধর্ম্মের কত আবশ্যকীয় উপাদান—একমাত্র সতীত্ব গুণেই যে নারী বহুভোগী পুরুষ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠা, ইহা আমাদের ঋষিগণ অতি পূর্ব্বযুগেও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন,—

"পুরুষ এবং স্ত্রী এই উভয়েরই ব্যুৎক্রমভাবে দোষ তুল্য অর্থাৎ পরস্ত্রীগমন বা পরপুরুষগমন দোষ শাস্ত্রানুসারে সমান দোষ কিন্তু পুরুষ ইহাকে দূষিত কার্য্য বলিয়া মনে করেন না, রমণীগণ কিন্তু ইহাতে দোষ মনে করেন, অতএব নারীগণই শ্রেষ্ঠা।"

(বৃহৎ-সংহিতায় স্ত্রী প্রশংসাধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

আমার অনেক সময়ে মনে হয় নীতি জিনিষটার সর্ব্বপ্রথম উদ্ভব নারী হইতেই হয়, পুরুষ সৃষ্টির প্রথম হইতেই নিলজ্জ ও নীতিহীন—একমাত্র নারীর ভিতর নিবৃত (latent) পুরুষ-ভাবই নারী-প্রকৃতিকে অযথা কলুষিত করিয়া তুলে, বহুভোগী,বহির্মুখী, অস্থিরধর্ম্মী পুরুষ-প্রকৃতি আবহমান কাল হইতেই নারীর কাছে অকৃতজ্ঞ, কিন্তু পুরুষের নারীর স্থিরতা ও কৃতজ্ঞতাই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন —এই সব গুণ না থাকিলে তাঁহারা কখনই মৃতপতির সহিত সহমরণে যাইবার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। আর এই জন্যই ভক্তি ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া-ছেন নারী! নারীভাব ব্যতীত ভক্তি ধর্ম্ম সজীব হইয়া উঠিতে পারে না। প্রেম জিনিষটা ভুলিয়াও পুরুষের সামগ্রী নহে—যদিও তাহারা স্ত্রী বিয়োগে জোর কলমে শোকাচ্ছ্বাস" লিখিয়া থাকেন—প্রেম, রাধিকারূপিণী মান-ময়ী নারীদেরই একচেটিয়া সামগ্রী! Plygamous

tendencyটা পুরুষ স্বভাবের মধ্যে এতই প্রবল যে, কোন নারীর পক্ষে পুরুষের নিকট একনিষ্ঠ ভালবাসার প্রত্যাশা বাতুলতা মাত্র ! কারণ বৈচিত্র্য বা নিত্য নূতনের অপেক্ষাই পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম ; ইহা প্রত্যেক নারীর ভাল করিয়া মনে রাখা কর্ত্তব্য।

সুপ্রসিদ্ধ জর্মান সমাজ বৈজ্ঞানিক Dr, L. Loewenfeld তাঁহার len conjugal Happiness নামক বহু গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে স্পষ্টই লিখিয়াছেন—

The saying "There is no fool like an old fool" applies far more to men than to women and we, accordingly, find that widowers of advanced years far more frequently contract a second marriage than do widows of the same age.

পুরুষের বহুভোগ প্রবৃত্তি দেখাইতে তিনি উক্ত পুস্তকের আর একস্থলে লিখিয়াছেন—

Some years ago I came across an interesting confirmation of the above statement. A poet lost his wife after a short happy marriage and about half a year after her death published a small volume of poems, in which he gave expression to his grief in the most touching manner. I have no reason to doubt the sincerity of the feelings of the poet experienced at the time. And yet, a year after the death of the woman so deeply lamented, he took a second wife, with whom he also led a life of perfect happiness."

বলা বাহুল্য এ চিত্র আমাদের দেশেও হইয়া গিয়াছে শ্মশান-বৈরাগী কবিজনও সংসারের পথে বারম্বার ফিরিয়াছেন—একাধারে মোক্ষ ও ভোগ লাভ করিতে !

এই বহুভোগ-প্রবৃত্তি (Polyandry) নারী চরিত্রে ও জাগ্রত হয় যখন নারীর ভিতর উচ্ছৃঙ্খল পুরুষ ভাব উদ্রিক্ত হয়। নারীর উদ্দাম পুরুষভাব সমাজ-জীবনের পক্ষে কখনই শুভ লক্ষণ নহে। এই ভাবের যখন বাড়াবাড়ি হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে সাম্বর্য্য তলে তলে সেই সমাজ বা জাতির জীবনকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। আমাদিগের আদর্শ স্বরূপ Mill ভক্ত ইংরাজজাতিও আজ এই সাম্বর্য্যের ঘোরে আচ্ছন্ন—অনেক চিন্তাশীল ইংরেজের পুরুষভাবাপন্না ইংরাজ নারীর তাণ্ডব-নৃত্যে চক্ষু স্থির হইয়া যাইতেছে—আর আমরা নারীর পুরুষ-ভাবকে জাগ্রত করিতে শবের মত পড়িয়া প্রমাদ গণিতেছি। পুরুষ ভাবাপন্না নারীকে দমনে রাখিতে হইলে আজ বাঙ্গালীর পুরুষসিংহ (superman) হওয়া চাই—কিন্তু সে শক্তি বিজেতার পদতল-আশ্রিত এই নির্জীব মসীজীবি জাতির আছে কি ?

ইংরেজর মত শক্তিশালী জাতিকেই যখন তাহার "trousered women" এর জন্য August Strindberg প্রভৃতি লেখকগণের নিকট "a nation of bigots that has delivered itself up into the hands of its women" বলিয়া গালি খাইতে হইয়াছে, তখন আমাদের মত পুরুষত্বহীন জাতির অদৃষ্ট কিরূপ অবস্থা হওয়া সম্ভব ? কেবল ভাব-প্রবণতায় আমরা আর কতদিন মোহাচ্ছন্ন থাকিব ? নপুংসকের যৌবন দ্বারা কোন সৃষ্টির কাজ হয় না—ইহা যেন আমাদের মনে থাকে।

যে জাতির পুরুষদিগের ভিতর সৃষ্টি শক্তি কমিয়া আসে ও কোমল নারীভাব জাগ্রত হয়, সে জাতির নারী কঠোর পুরুষভাব ধারণ করিবেই !—এই পুরুষভাবের বিষময় ফল হইতেছে ব্যভিচার। এই উপভোগের স্রোতে এখন হইতে বাধা দিতে না পারিলে এই বাক্য বীর বাঙ্গালী জাতির ভাগ্যে যে আরও কত লাঞ্ছনা আছে তাহা কে বলিতে পারে ? জাতি হিসাবে বীর্য্যে এবং চরিত্রে আমরা যে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদের তুলনায় কতদূর অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছি তাহা কি একবারও ভাবিয়া দেখি ! যথার্থ নারীপূজা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরাই জানিতেন। এই মাতৃমন্ত্রের উপাসক জাতি তাই সেদিন পর্য্যন্ত ও গাহিতে সক্ষম ছিল—

"মা বিরাজে ঘরে ঘরে
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে ॥"

এই জাতিই জোর গলায় বলিত—

বালাং বা যৌবনোন্মত্তাং বৃদ্ধাং বা সুন্দরীং তথা।

কুৎসিতাং বা মহাদুষ্টাং নমস্কৃত্য বিভাবয়েৎ ॥”

ইহার মূলে ছিল বীরোচিত সংযম,—মাতৃভক্তির মাপ কাটি হইতে জাতির মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়—মাতৃভাব যত জাগ্রত হইবে, জাতীয় জীবনের সেই অনুপাতেই শ্রীবৃদ্ধি হইবে!—কেবল মাত্র যৌবনের জয় গানে ও সবুজের নেশায় কোন দিনও কেল্লা ফতে হয় নাই—দুর্গ জয় করিতে হইলে সেই আদ্যাশক্তি অখণ্ড মাতৃমূর্ত্তি মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গার শরণাপন্ন হওয়া চাই। ইংরাজ জাতির একজন বিশিষ্ট চিন্তাবীর এই মাতৃভাবের সার্থকতা বুঝিয়া আজ জোর গলায় বলিতেছেন—

"That is why the value of a man, as a man, may almost and always be determined by his attitude towards Woman. The anarchist the degenarate, loves the prostitute; the true artist, the sober healthy citizen loves the mother."—Woman A Vindication by Anthony Ludovici page71.

তাই ভাবি সাধক রামপ্রসাদ যিনি একদিন গাহিতেন—"যত শুন মা কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে!" একজন true artist ছিলেন কি না?

চিরদিন মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙ্গালী জাতির আজ কি অভাবনীয় শোচনীয় পরিণাম! ফরাসী জাতির নারী-জাতিকে লক্ষ্য করিয়া নেপোলিয়ান একদিন প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"Madam, we want mothers!" আজকাল-কার শিক্ষিতা নারীদের উদ্দাম নারী-শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া আমাদেরও কি আজ ঠিক এই কথাই বলিবার দিন আসে নাই?

Weininger তাঁহার পুস্তকে এক অতি অপ্রিয় সত্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—"Confined to sexual life either she will be a mother or a courtesan." নারীর এই দুটি পন্থা ছাড়া অন্য গতি নাই—হয় মা হইতে হইবে, নচেৎ গণিকা সাজিতে হইবে। ভারতের নারী-শক্তি তাই মায়ের পথ বাছিয়া লইয়া সতী ধর্ম্মকেই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সতীত্বরূপ অনুষ্ঠানটি সমাজের পবিত্রতা রক্ষার্থ ঋষিদিগের একটি অতুলনীয় প্রয়োগ-কৌশল। কারণ সামাজিকজীবন শৃঙ্খলা ব্যতীত চলিতেই পারে না। সৎ সুন্দরের চরণতলে গড়াইয়া পড়িবার জন্য শৃঙ্খলার দিকেই ভারতের নর-নারীর সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য ছিল। সমাজের সুবিধা রক্ষা করিতে ভারতের নারী চরিত্র কিঞ্চিৎ জড় স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে এবং উগ্রস্বভাবা হইতে পায় নাই। ভারতের শান্তিপূর্ণ সামাজিক জীবন (social instinct) যে অনুপাতে হ্রাস হইয়া আসিবে, ততই পাশ্চাত্য সুলভ দুর্নীতিগুলি ভারতের নর নারীর ভিতর প্রসার লাভ করিবে—ফলে আবার আদিপর্ব্বের সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া আমরা কোল সাঁওতালদের বিধি নিয়মেই জীবন-যাপন করিব।

সম্প্রতি একজন শিক্ষিতা মহিলা লিখিয়াছেন—"জড়-স্বভাবা স্ত্রীলোকের হৃদয়ে স্বামী-প্রেমের অঙ্কুর মাত্রও জন্মিতে পারে না"—তবে কি লেখিকা মনে করেন যে চঞ্চলস্বভাবা শিক্ষিতা নারীদের হৃদয়ে স্বামী প্রেমের উৎস বহিয়া যায়? ভারতের নারী militant হইয়া উঠিলে ও সতীধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিলে কি লেখিকার মনো-বাসনা পূর্ণ হয়? তাহার অগ্রে লেখিকাকে একবার বর্ত্তমান ইউরোপের বীভৎস নারী সমাজের দিকে চাহিতে অনুরোধ করি—Ludovici সেই চিত্র কি ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা দেখুন—

'All frivolous, superficial and pretentious woman nowadays are to be found only shoulder to shouloer with degenerate men wherever and whenever he is "enjoylng himself" and whiling away his empty existence in a whirl of still more empty pleasure.'

বরং অচলায়তনে ভারতবাসী বাঁচিয়া যাইতে পারে,—কিন্তু ভোগায়তনে এদেশের নিস্তার কোথায়।

নারী কেবল সৌন্দর্য্যের উপাসিকা হইয়াই সুখী হইতে

পারে না। একমাত্র মাতৃত্বেই নারীর সুখ—রহস্যময়ী নারী চরিত্রকে তাহার এই একমাত্র অবস্থাই উজ্জলভাবে পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হয়।—Artistএর model হইয়া কোন নারীর জীবন্ত প্রতিমাই সুখী হইতে পারে না—তাহা ইব্‌সেনের "When We Dead Awaken" নামক নাটকে Irene ও Rubek চরিত্র অধ্যয়ন করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি।

ভারত নারীর সতীত্ব ক্ষণিকের Romance নহে কোন কাব্য জগতের খেয়াল নহে—সতীত্ব তাহার নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু বা আমরণের জপমালা, একটা সতী বিদ্রোহিনী, অতি শিক্ষিতার অপেক্ষা অশিক্ষিতা সতীর মাতৃমূর্ত্তি আজিও ভারবাসীর প্রাণে নববলের সঞ্চার করে—এদেশে সতী নারী চণ্ডালের পত্নী হইলে মহাব্রাহ্মণেরও আরাধ্যা। এমন একটা মহীয়সী মাতৃচিত্রকে—পূর্ব্বপুরুষের এমন জীবন্ত কল্পনাকে কতকগুলা বর্ব্বর অজসাহিত্যিক মিলিয়া কি মুছিয়া ফেলিতে পারিবে?

নারী চরিত্রে আজ যে দূষিত বেশ্যাবৃত্তির ও পুরুষ চরিত্রে পাশবিকতার আবহাওয়া বহিতেছে—ইহার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইলে সাধক রামপ্রসাদের পবিত্র মাতৃমন্ত্রের পুনরুদ্বোধন দরকার! ভারতবাসীকে whole sale সাঙ্কর্য্য হইতে রক্ষা করিতে হইলে—ভাবপ্রবণ feminismএর গতিরোধ করিতে হইলে মাতৃমন্ত্রের মঙ্গল শঙ্খরব আবার ঘরে ঘরে জাগাইয়া তুলিতে হইবে—অবিদ্যাকে বিদ্যার দ্বারাই নাশ করিতে হইবে।

বসন্ত শেষ

শ্রীপ্রসাদদাস চট্টোপাধ্যায়

১

হে বসন্ত, আজ যাচ্ছ চলে
রেখে ভুবন মায়ার ভুলে',—
গগন পবন জলে স্থলে
তোমার হাসি আকুল করে।

২

বেহায়া ওই বকুল বেলা
ঘোমটা খুলে করেছে খেলা,
গান গেয়েছে কোকিল-বালা
প্রাণ আমার পাগল করে।

৩

জ্যোছনা ভরা নিঝুম রাতে
গোলাপ বধূর রাঙ্গা ঠোঁটে
পাগল হাওয়া নেশায় মেতে
চুম দিয়েছে ঘুম ঘোরে।

৪

লাজে নত হাচনা হেনা
বলে ছি ছি! আরনা এসনা;—
পাগলা অলি শোনেনা মানা
লুটবে মধু প্রাণ ভরে।

৫

লজ্জাশীলা লজ্জালতা
মুখ তুলে সে কয়না কথা;—
পাগলা হাওয়া মনের ব্যথা
জানায় শুধু আকুল করে।

৬

হে বসন্ত যাওগো দেখে
তোমার কীর্ত্তি ফুলের বাগে,
চুম দিয়ে যাও যাবার আগে
চাঁপা বেলায় প্রাণ ভরে।
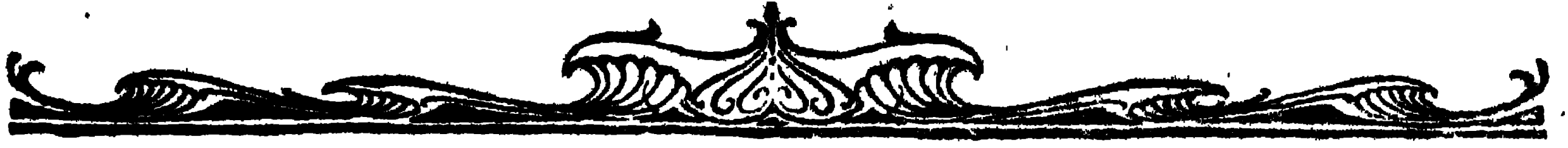
অশোক

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "অশোক" নাটকের ঐতিহাসিক ভিত্তি

১

Shakspeare এর *Richard II* বা *Richard III* কে যেমন Historical drama ও Tragedy উভয়ই বলা চলে, গিরিশচন্দ্রের "অশোক"কে সেইরূপ এক হিসাবে ঐতিহাসিক, আবার অপর পক্ষে, কতকটা পৌরাণিক নাটকও বলা চলে। Shakespeareএর *Macbeth* এর মত ইহা অনেকটা "A Medley of fable and tradition." এই নাটকে বাস্তব ও অবাস্তব, ইতিহাস ও কিংবদন্তী এরূপভাবে জড়িত, যে ঠিক ঐতিহাসিক নাটক নামে ইহাকে কিছুতেই অখ্যাত করা যায় না। ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাস হইলেই যে নাট্যকার বা উপন্যাসকারকে সর্ব্বদা ইতিহাসে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, বরং এরূপ নাটক, কাব্য ও উপন্যাসে কল্পনার যত প্রাধান্য থাকে, ততই রচনাটি মনোরম, স্বাভাবিক ও কবিত্বপূর্ণ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া একখানি ঐতিহাসিক নাটক বা উপন্যাসে যত কিছু absurdities ও anachronismsএর অবতারণা করিলে চলিবে না। কল্পনা ঐতিহাসিক চরিত্রকে রক্তমাংস দান করিয়া পুনর্জীবিত করিবে সত্য, কিন্তু বিভিন্ন যুগের চরিত্র ও দৃশ্য একত্র করিয়া একটা Medley সৃষ্টি করিবে না। তুষারোপরি দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর-রূপে অঙ্কিত করিলে বা মরুভূমি আঁকিতে গিয়া তাহাকে তরুলতা দ্বারা শোভিত করিবার চেষ্টা করিলে, তাহা চক্ষে যেরূপ বিসদৃশ ঠেকে, সেইরূপ বাস্তব ও অবাস্তবের অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখিলে চক্ষে বড়ই বিসদৃশ ঠেকে। এখন দেখা যাক্ "অশোক" নাটকে গিরিশচন্দ্র কতটা ইতিহাসের ও কতটা কল্পনার অনুসরণ করিয়াছেন ও উভয়ের সংমিশ্রণই কতটা শোভন ও যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

অশোক একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। শুধু তাই নহে, তিনি বোধ হয় ভারতের সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক রাজা যাঁহার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে আমরা কোন বিষয় বলিতে বলিতে পারি। তাঁহার ও তাঁহার পিতামহের কালনির্দ্ধারণের উপর তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের কাল অনেকটা নির্ভর করে। মৌর্য্যবংশের যে ইতিহাস অধুনা আমরা পাইয়াছি, নানাকারণে, তাহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" (শ্রদ্ধেয় শ্যামাশাস্ত্রী কর্ত্তৃক, বহুকাল পরে, পুনরুদ্ধৃত ও অনূদিত হইয়াছে) গ্রীকগণের, বিশেষতঃ মেগাস্থিনিসের, ভারত বৃত্তান্ত (Megsthenes এর মূলগ্রন্থ অধুনা বোধ হয় পাওয়া যায় না, তবে পরবর্ত্তী লেখকগণ তাঁহার বৃত্তান্ত হইতে অনেকস্থল উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া তাহা খণ্ডখণ্ডরূপে বর্ত্তমান আছে) ও সর্ব্বোপরি অশোকের অনুশাসনাবলী (V. A. Smith মহোদয় কর্ত্তৃক রচিত *Asoka* গ্রন্থে সব অনুশাসনগুলির ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া আছে) মৌর্য্যবংশের ইতিহাসকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। Alexander এর ভারত আক্রমণের তারিখ (৩২৭ পূঃখৃঃ) যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্তের (গ্রীক Sandracottos বা Xandrames) রাজত্বকালের সূচনা গণনা করা অতি সহজ। চন্দ্রগুপ্ত Seleucos Nikatorএর সমসাময়িক। এই Synchronism ঐতিহাসিকের নিকট বড় মূল্যবান্।* চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে Seleucos কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ ও তাঁহার রাজসভায় Magasthenes এর স্থিতি, বিন্দুসারের সহিত Antiochos Soterএর সদ্ভাব ও আদান প্রদান† ও অশোকের সহিত Antoichos Theos, Ptolemy Philadelphius Cyreneএর রাজা Mages, Epirusএর শাসনকর্ত্তা Alexander

* V. A. Smith's Early History of India (3rd Edition) pp 19—20

† Havell's Aryan Rule in India (1918) page 88.

প্রভৃতির সমসাময়িকতা* ঐতিহাসিককে অন্ধকার হইতে আলোকে আনয়ন করে ("from darkness to light) বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার ও অশোকের জন্য শুধু পুরাণ ও কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিতে হয় না। তাঁহাদের সম্বন্ধে কিংবদন্তী ও উপকথার কোনও অভাব নাই। বরঞ্চ তাঁহাদের সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ সমূদয়ে এত উপকথা আছে যে তাহা শুধু ইতিহাসকে প্রতি মুহূর্তে বিকৃত করিয়া ফেলে না, পরস্পরকেও খণ্ডন করে। কিন্তু অন্যান্য অকাট্য প্রমাণ থাকার জন্য আর আমাদের শুধু উপকথার উপর (Literary tradition, যাহার উপর মৌর্য্যবংশের পুরোবর্ত্তী ইতিহাস অনেকটা নির্ভর করে) নির্ভর করিতে হয় না। অশোক সম্বন্ধে আবার "পাথুরে প্রমাণ" থাকাতে তাহা অন্যান্য প্রমাণের সত্যতার কষ্টিপাথর স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'দীপবংশ'† 'মহাবংশ'‡ 'দিব্যাবদান'§ প্রভৃতি উপকথা গ্রন্থে অশোক সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহার সত্যতা নির্দ্ধারিত হইবে তাঁহার স্তম্ভলিপি (pillar edicts) ও শিলালিপি (Rock edicts) দ্বারা। তাঁহার ১৪টি Rock Edict, ৭টি Pillar Edict তাঁহার রাজত্ব কালের সাক্ষীস্বরূপ শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্য্যন্ত কালের ঝঞ্ঝাবাত উপেক্ষা করিয়া অচল, অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহা ছাড়া Minor Rock Edicts, Bhabra Edict, Kalinga Edict, Cave Inscription near Gaya ও Tarai pillar ও তাঁহার রাজত্ব সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সাক্ষ্যপ্রদান করে। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া কালের বিরুদ্ধে যাহারা মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের উপেক্ষা করিয়া আমরা কোন্ উপকথার উপর আস্থা স্থাপন করিব? এক কথায় বলিতে গেলে এইটুকুই বলিতে হয় যে, অশোকের রাজ্যের ইতিহাস তাঁহার স্তম্ভলিপি ও শিলালিপির উপর উৎকীর্ণ রহিয়াছে। 'অশোক অনুশাসন'ই অশোকের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইতিহাস।

এখন দেখা যাক্, এইসকল অনুশাসন হইতে আমরা অশোক সম্বন্ধে কতটা ইতিহাস পাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, অশোক খৃঃ পূঃ ২৭৩ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রবাদ আছে যে, রাজ্য লইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সুসীমের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ হয় ও তিনি ৯৯জন ভ্রাতাকে বলিদান দিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। এই প্রবাদের প্রথমাংশ ভিত্তিহীন নহে, কারণ, তাঁহার রাজ্যাভিষেক ৪ বৎসর স্থগিত ছিল; কিন্তু প্রবাদের অপরাংশটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। পঞ্চম শিলালিপিতে (Rock Edict V.) অশোক তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনীগণের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। খুব সম্ভব তিনি প্রথম বয়সে হিন্দু, ও হয়ত

* Rock Edicts II ও XIII দ্রষ্টব্য।

† দীপবংশ—পালিভাষায় রচিত, সিংহল দেশীয় একখানি উপকথার গ্রন্থ। Oldenberg কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়াছে। ইহাকে ইতিহাস বলা যায় না। অশোক সম্বন্ধে এই পুস্তকে ও 'মহাবংশ' নামক পুস্তকে যে সব উপকথা আছে, তাহা অপেক্ষা তাঁহার সম্বন্ধে উত্তর ভারতীয় উপকথাগুলি, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতে, অধিক বিশ্বাসযোগ্য। (vide Early History of India, 3rd Edition, page 171).

‡ মহাবংশ—এখানিও পালিভাষায় রচিত একখানি সিংহলদেশীয় উপকথার গ্রন্থ। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত সিংহলের ইতিহাস ইহাতে বিবৃত আছে। মহানামনামক একজন ভিক্ষু এ গ্রন্থ ("বিশ্বকোষের" মতে গ্রন্থের প্রথমভাগ) প্রণয়ন করেন। বুদ্ধ ও তাঁহার বংশ সম্বন্ধে অনেক উপকথা এই গ্রন্থে আছে। অশোক মৌর্য্যের কাল পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা কর্ত্তৃক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের কথা ও অশোকের সমসাময়িক সিংহলরাজ তিষ্য সম্বন্ধে অনেক গল্প ইহাতে আছে। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে Tournour কর্ত্তৃক গ্রন্থখানি ভূমিকা সহ ইংরাজিতে অনূদিত হয়। পরে Wije Sinha কর্ত্তৃক Turnour এর একখানি Revised Edition প্রকাশিত হয়। Geiger এর অনুবাদই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

§ দিব্যাবদান—একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহাতে অনেক ভারতবর্ষীয় উপকথা আছে। V. A. Smith (Early History of India, 3rd Edition, page 192) বলেন, ইহার একঅংশের নাম 'অশোকাবদান'। 'অশোকাবদান' এর একখানি পাণ্ডুলিপি ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক নেপাল হইতে সংগৃহীত হয়। Burnouf ভূমিকা সহ "দিব্যাবদান" প্রথম প্রকাশিত করেন। E. B. Cowell ও R. A. Neil কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণে ৩৮টী অবদান আছে। তন্মধ্যে সপ্তবিংশ, অষ্টাবিংশ ও উনত্রিংশ অবদান যথাক্রমে কুনাল, বীতশোক ও অশোক সম্বন্ধে রচিত।

শৈব * ছিলেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইতে নবম বৎসরে অর্থাৎ সিংহাসনারোহণ কাল হইতে ত্রয়োদশ বৎসরে, তিনি কলিঙ্গ দেশ জয় করিয়া তাঁহার রাজ্যের সীমা বাড়াইতে বাহির হন ও উক্ত দেশ জয় করেন †। এই রাজ্য জয় করিবার সময় শত্রুপক্ষের এত লোক ক্ষয় হইয়াছিল ও কলিঙ্গবাসিগণের প্রতি এরূপ অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল যে, অশোকের মনে বিষম অনুতাপ হয় ও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি (কিংবদন্তী মতে উপগুপ্তের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া) ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া ‡ ধর্ম্মকার্য্যে জীবন উৎসর্গীকৃত করিতে সংকল্প করেন। এই সময় হইতে তাঁহার জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য নানাদিকে প্রচারক পাঠান ও ধর্ম্মের মূলস্থত্রগুলি গিরিগাত্রে ও স্তম্ভে খোদিত করান। তিনি ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যকেই প্রকৃত জয়কীর্ত্তি বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার অনুশাসনাবলী হইতে বুঝা যায় যে ধর্ম্মের জন্য তিনি কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর তিনি মৃগয়া, জীববলি ও আমিষভক্ষণ পরিহার করেন ও লোক হিতকর কার্য্যে (যথা কূপ-খনন, চিকিৎসালয় স্থাপন, পথনির্ম্মাণ ইত্যাদি) সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। দিনমানকে দণ্ড অনুসারে ভাগ করিয়া তিনি যথাসময়ে যথাকার্য্য সম্পন্ন করিতেন ও রাজকর্ম্মচারিগণকে শাসন-কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। শেষ বয়স পর্য্যন্ত অতি যোগ্যতার সহিত তিনি রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। অহিংসা, সত্যকথন ও মাতা-পিতা প্রভৃতি গুরুজনের সেবা—এই তিনটী বিষয় উপদেশ দান করিতে তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। তাঁহার রাজ্য Afghanistan ও Beluchistan হইতে (Assam বাদ) Mysore পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৪জন রাজপ্রতিনিধি এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতেন ও রাজ্যমধ্যে অনেক করদ রাজা ছিলেন। তিনি Antiochos, Alexander, Magas প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন।

মোটামুটি এই পর্য্যন্ত আমরা অশোকানুশাসন হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। ইহা ছাড়া অশোক সম্বন্ধে অন্যান্য সংবাদের অধিকাংশ 'দীপবংশ,' মহাবংশ,' 'অশোকাবদান,' প্রভৃতি উপকথা গ্রন্থে ও Yuanchwang (Hiuentsang) লিখিত বৃত্তান্ত (Beal ও Watters কর্ত্তৃক দুইখানি অনূদিত সংস্করণ আছে) হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক কর্ত্তৃক ভ্রাতৃহত্যা ও গর্ভবতী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার প্রতি অত্যাচারের কথা, ভ্রাতুষ্পুত্র স্তগ্রোধের চণ্ডালালয়ে জন্ম ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অশোককে ধর্ম্মশিক্ষা দানের কথা, অশোকের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কথা, রাজপ্রতিনিধি তিষ্যের (গিরিশচন্দ্রের বীতশোক) উপাখ্যান, বার্দ্ধক্যে তিষ্যরক্ষিতার হস্তে অশোকের আত্ম সমর্পণের কথা—সিংহলদেশীয় উপকথার গ্রন্থদ্বয় ("Pali chronicles of Ceylon" viz. *Dipavamsa* and *Mapavamsa*) হইতে পাওয়া যায়। আবার অশোকের জন্মবৃত্তান্ত ও মাতৃকুলের পরিচয়, তাঁহার তক্ষশীলায় বিদ্রোহ দমন করিতে একাকী গমন, পথিমধ্যে দৈবসাহায্য প্রাপ্তি, তক্ষশীলায় যৌবরাজ্য, সুশীমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সুশীম কর্ত্তৃক কল্লাটকের অপমান, অশোককর্ত্তৃক সুশীমকে কৌশলে জলন্ত খাদে নিক্ষেপ, সিংহাসনে আরোহণের পর অশোকের নিষ্ঠুরতা তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ, বালপণ্ডিতের উপাখ্যান (গিরিশ

* V. A. Smith's Oxford History of India (page 95)

† Rock Edict No. xiii. দ্রষ্টব্য।

‡ গৌতম বুদ্ধের নাম বা বৌদ্ধধর্ম্মের নাম করিয়া বিশেষ উল্লেখ কিন্তু তাঁহার শিলালিপি বা স্তম্ভলিপিতে কোথাও আছে বলিয়া আমাদের মনে পড়ে না। তাঁহার "ধর্ম্ম"ও ঠিক বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম্ম নহে, তবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব তাহাতে বিলক্ষণ বর্ত্তমান। অবশ্য অষ্টম শিলালিপিতে তাঁহার "সম্বোধি" যাত্রার কথা আছে ও Bhabra Edictএ বুদ্ধ, সংঘ ও ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কিরূপ আস্থা ছিল তাহা উল্লিখিত আছে। অশোক কিরূপ বৌদ্ধ ছিলেন তাহা Sir Ramkrishna Gopal Bhandarkar প্রণীত A Peep into the Early History of India নামক গ্রন্থে কিছু আলোচিত হইয়াছে (১৯২০ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের ১৪—১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য V. A. Smith Foot note to page 32 of Asoka Second Edition দ্রষ্টব্য) দেখাইয়াছেন যে Bhabra Edictএ ৭টি ধর্ম্মসূত্রের উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে ৫টি বৌদ্ধ "নিকায়" হইতে গৃহীত। M. Senartও অশোক শিলালিপি হইতে অনেক বৌদ্ধগ্রন্থে প্রচলিত পদ ও বাক্যাবলী বাহির করিয়াছেন।

চন্দ্রের 'অশোকে' বালপণ্ডিতের পরিবর্তে ন্যগ্রোধকে জলন্ত কটাহে নিক্ষেপ করার কথা ও তাঁহার পদ্মোপরি অক্ষত শরীরে উপবেশনের কথা আছে) অশোকের তীর্থ-ভ্রমণ ও ৮৪ হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ, বীতশোকের উপাখ্যান ও তাঁহার আত্মোৎসর্গের ফলে অশোকের চৈতন্যোদয়, মহেন্দ্রের উপাখ্যান, কুণাল-তিষ্যরক্ষিতাঘটিত উপাখ্যান, তিষ্যরক্ষিতার হস্তে কুণালের ও বোধিবৃক্ষের নিগ্রহ প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতীয় উপকথার অন্ত নাই। ঐতিহাসিক V. A. Smith তাঁহার *Asoka* নামক গ্রন্থের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে এই সকল উপকথার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের অশোক পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে "পাথুরে প্রমাণ" বা অশোকানুশাসনের উপর নির্ভর না করিয়া তিনি উপকথার উপরই বেশী নির্ভর করিয়াছেন (অবশ্য উহাতে নাটক জমিয়াছেও ভাল)। সুশীম, বীতশোক, কুণাল, মহেন্দ্র, ন্যগ্রোধ, রাধাগুপ্ত, উপগুপ্ত, চণ্ডগিরিক, সুভদ্রাঙ্গী, দেবী, সঙ্ঘমিত্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার বেশীভাগ উপকথা অবলম্বনেই লিখিয়াছেন। উপকথার উপরও তিনি রং ফলাইয়াছেন। মার ও তৃষা,* আকাল ও পদ্মাবতী তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র। (তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র গুলির মধ্যে আকাল আবার সমধিক ফুটিয়াছে। *King lear* এর foolএর ন্যায়, "সাজাহানের" দিলদারের ন্যায়, আকাল স্পষ্টবাদী রসিক চরিত্র। "জনার" বিদূষক ও "পাণ্ডব গৌরবের" কঞ্চুকী যেন "অশোকে" আকালরূপে দেখা দিয়াছে)। ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিতে গিয়া গিরিশচন্দ্র বিস্তর অনৈতিহাসিক চরিত্র উপকথা অবলম্বনে আঁকিয়াছেন। তাহার উপর আবার উপকথাতেও নাই এমন সব চিত্র ও চরিত্র আঁকিয়া ইতিহাসকে একেটুঁটি টিপিয়া মারিয়াছেন। প্রবীণ বয়সে রচিত "অশোক"কে নাট্যকার কেন "ঐতিহাসিক নাটক" নাম দিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না।

এখন কথা হইতেছে, নাটকে উল্লিখিত উপকথা গুলির উপাদান নাট্যকার কোথায় পাইলেন? Details এ না গিয়া এককথায় বলা যাইতে পারে যে, "দীপবংশ," "মহাবংশ," 'দিব্যাবদান' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেই এই উপকথাগুলি তিনি পাইয়াছেন কিন্তু গিরিশচন্দ্র কি সত্য শ্রমস্বীকার করিয়া উক্ত গ্রন্থগুলি (বা তাহাদের ইংরেজী অনুবাদ) পাঠ করিয়াছিলেন? ইহার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, নিছক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ যেখানে না করিয়াছেন এমন স্থানে এমন কিছুই তিনি বলেন নাই যাহা Vincent Smith প্রণীত *Asoka*এর ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে নাই। V.A. Smith প্রণীত *Asoka*এর প্রথম সংস্করণ ১৯০১ (ও দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০৯) খৃষ্টাব্দে বাহির হয় ও তাহার পরে (বঙ্গীয় ১৩১৭* সাল) গিরিশচন্দ্রের "অশোক" নাটক অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র Smithএর *Asoka* পাঠ না করিয়া "অশোক" লিখিয়াছেন এমন প্রমাণ বোধ হয় নাই। যদি এরূপ কোনও প্রমাণ থাকে, তবে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই, আর যদি এরূপ কোন প্রমাণ না থাকে, তবে এই সিদ্ধান্ত করা বোধ অন্যায় হইবে না যে গ্রন্থের অধিকাংশ উপাদান তিনি V.A. Smith প্রণীত *Asoka*নামক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অবশ্য গিরিশচন্দ্রের ন্যায় পাঠানুরাগী ও অধ্যয়নশীল ব্যক্তি যে অশোকসম্বন্ধে অপর কোন গ্রন্থ পাঠ করেন নাই বা অশোকসম্বন্ধীয় প্রাত্নতাত্ত্বিক গবেষণাদি পাঠ করেন নাই বা "দিব্যাবদান" "মহাবংশ", Rhys Davidsএর *Buddhist India,* Hiuen Tsang এর ভারতবৃত্তান্তের ইংরাজী অনুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থের পাতা উল্টান নাই ও অশোক সম্বন্ধীয় উপ-

---

* "চৈতন্য-লীলায়" যেমন পাপ ও ছয় রিপু, বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছেন, "অশোক"-নাটকে সেইরূপ মার ও তৃষাকে সৃষ্টি করিয়া Naturalএর সহিত Supernatural Element সংযোজিত করিয়াছেন। অতি প্রাকৃতিক ও অতীন্দ্রিয় বিষয়ের কল্পনা গিরিশচন্দ্রের অনেক বাস্তব চিত্রের পাশেই দেখিতে পাওয়া যায়। "বিল্বমঙ্গল" ও "শঙ্করাচার্য্যে"র ন্যায় উচ্চ অঙ্গের নাটকেও ইহা দাঁত পাড়ে নাই।

* অশোকের তারিখ সম্বন্ধে পণ্ডিত উপেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত "গিরিশচন্দ্র" ও শ্রীযুক্ত অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের "গিরিশচন্দ্র" দ্রষ্টব্য।

কথার বিষয় পূর্ব্বে কিছু অবগত ছিলেন না, এমন কথা বলিতেছি না। তবে V.A. Smithএর *Asoka* তিনি যে পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার নাটক ও Smithএর গ্রন্থের ৬ষ্ঠ ৭ম অধ্যায়ের তুলনামূলক আলোচনা করিলে ও উভয় গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের [illegible] দেখিলে এ ধারণা ভ্রান্তিমূলক কিনা তাহা এ [illegible] পাঠক বুঝিতে পারিবেন।' এ সম্বন্ধে আর [illegible] আলোচনা করার প্রয়োজন নাই।

সুরের মিলন

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয়া মোব স্বর ভোব জ্যোৎস্না মাঝে,
ডালা ভবা ফুলে মালা গেঁথেছে সাঁঝে।
বাঁশরীতে দিয়া তান
গাহিছে সুখের গান,
মিলনেব বাণী তাব সুবেতে বাজে।

জেগে উঠি সেই গানে পড়িগো ঢুলে
পুলক আবেগ গেলে পরাণে বুলে,
একা আনমনে যবে—
বহি, সুব এসে তবে—
নাচিয়া নাচিয়া যেন ফোটায় ফুলে।

মেঘে ছুটে চলে তান স্বপন পুরী।
হাওয়ায় অজানা দেশে চলিল উড়ি।
পাতায় লতায় ফুলে—
চমকিছে দুলে দুলে,
সে সুবে মিলায় তান তটিনী সুবই।

সুব হাবা বাণী ঝবা হিয়াব মাঝে—
বাঁশী তাব স্ববগেব সুব যে বাজে,
ভুলে ভুলে একা গায়—
ভুলে আমি শুনি তায়,
চকিতে সে থেমে যায় আনত লাজে।

গল্প
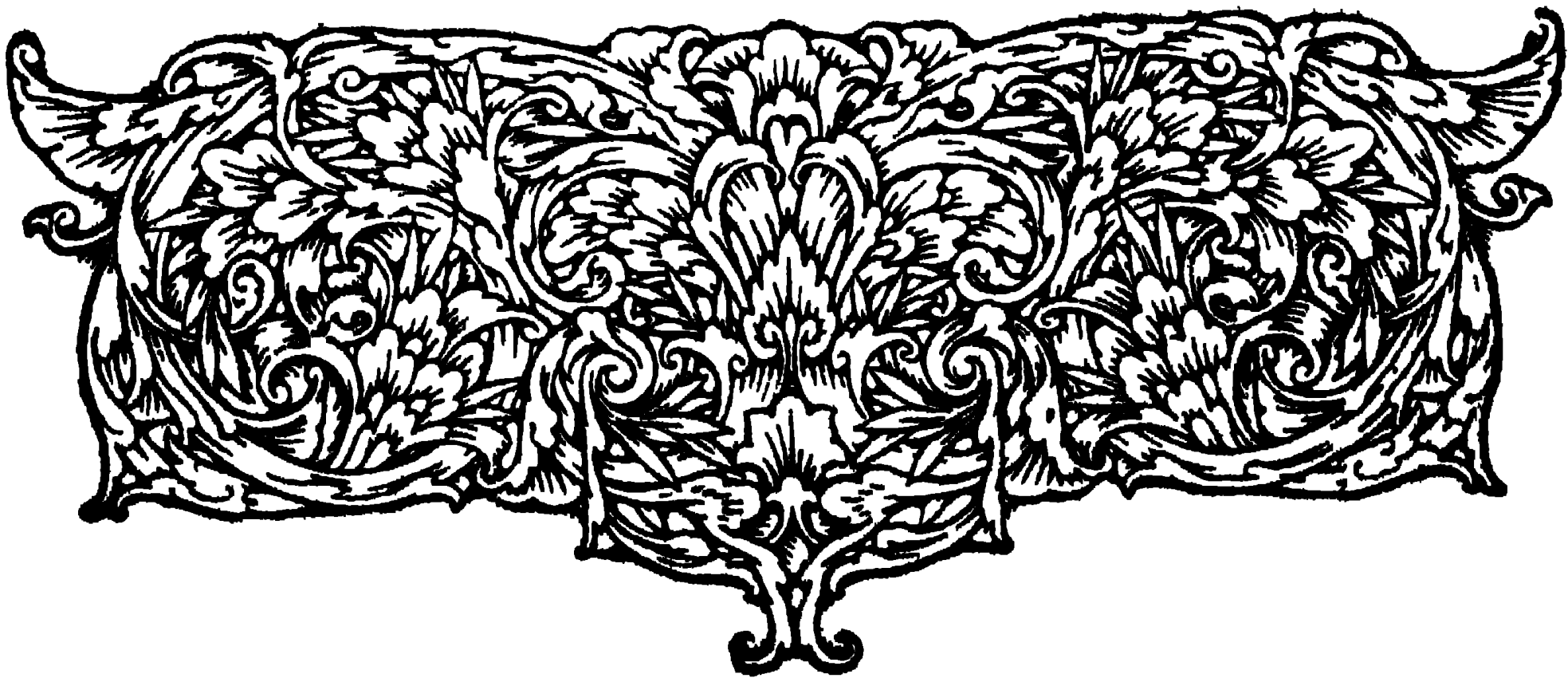
যৌবন সমাধি

১

অনাথবন্ধু মাস তিনেক হইল বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার পর অন্নপূর্ণাকে বিবাহ করিয়া তাহায় প্রেমরাজ্যে একাধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে।

সে যখন কলেজে পড়িত তখন ছেলে ভালই ছিল। কলিকাতার ছাত্রাবাসে থাকিত। বীরভূম জেলার আনকোরা পাড়াগেঁয়ে ছেলে বলিয়া অপরিচিতের সঙ্গে প্রথম আলাপ করিতে তাহার বড়ই বাধ বাধ ঠেকিত। কলিকাতার ভাগ-মাপ-করা সভ্যতার ধারও সে ধারিত না। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, স্কুলে পড়িবার সময় ত্রি-সন্ধ্যা পূজা অর্চনা ইত্যাদি বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে করিত। তাহার সন্ধ্যা-আহ্নিকের দৌরাত্ম্যে স্কুলের ফুলগাছগুলা বারমাস মুড়া হইয়া থাকিত। মাছ, মাংস, পেঁয়াজ সে খাইত না এমন কি আলুর সঙ্গে নিষিদ্ধ মাংসের কি একটা সম্পর্ক আছে এইরূপ ধারণা থাকায় তাহাও সে ত্যাগ করিয়াছিল।

এ হেন হিন্দু প্রবর কলিকাতার ছাত্রাবাসে আসিয়া মহা গণ্ডগোলে পড়িয়া গেল। এখানে কেহ জুতা পরিয়া জল খাইতে, এমন কি ভাত খাইতেও সঙ্কোচ বোধ করে না, পায়খানা হইতে ফিরিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে না, খাদ্যাখাদ্যের বিচার করেনা দেখিয়া তাহার মন বিগ্‌ড়াইয়া গেল।

তাহা ছাড়া পাচককে আপনি বলিবে কি তুমি বলিবে ইহা লইয়া সে বিষম সমস্যায় পড়িল। পাচক মহাশয়ের মসৃণ চিক্কণ দেহ, তদুপরি একটি বেগুণী রঙের রবার ষ্ট্যাম্প মারা কোরা 'পাবনার গেঞ্জি' আর কেয়ারী করা চুলের বাহার দেখিয়া সে প্রায় বাক্‌শক্তি হারাইয়া ফেলিল। কোন রকমে অগ্রসর হইয়া বলিল—দেখ ঠাকুর মশায়, আমি মাছ মাংস খাইনে আমার জন্যে নিরামিষ কিছু ক'রো, ঠাকুর মশায় তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল —Really ব'ল্‌ছেন বাবু? অনাথ চারিদিক অন্ধকার দেখিল, ঠাকুরের উচ্চারণের কায়দায় Really কথাটায় একটা 'এল' হইবে কি দুইটা হইবে এ সম্বন্ধে তাহার মনে সন্দেহ জন্মিল।

ঠাকুরের মুখে প্রথম ঐ কথাটা শুনিয়াই সে আর কিছু বলিবার চেষ্টা না করিয়া ঘরে গিয়া একখানা কাগজ টানিয়া লিখিতে বসিল—

Principal, Berhampur College. Intimate possibility admisoion first year science.

Anath Acharya

কাগজখানি লইয়া সে পোষ্টাফিসে গিয়া একখানি Reply paid telegram করিয়া আসিল এবং উৎকণ্ঠার সহিত উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিল। যথা সময়ে উত্তর আসিল Too-late. No Vacncy. Sorry. ... ... নিরুপায় হইয়া কলিকাতায় সে থাকিয়া গেল ও সেখানেই এক কলেজে ভর্ত্তি হইল। সকলের সঙ্গে খাইতে বসিয়া থালাটা একপাশে টানিয়া লইত, আরো অনেক রকম গোঁড়ামী সে মুদ্রাদোষের মত বহন করিত। তবে তাহার এই সঙ্কোচের ভাবটা ধরিবার উপায় ছিল না। সে যথাসাধ্য নিজের অসন্তোষ গোপন করিয়া রাখিত।

সময়ে সবই সহিয়া যায় তাহারও এই সহরের ওজন-করা সভ্যতার অংশ গ্রহণ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় একদিন হঠাৎ সে তাহার দোদুল্যমান শিখাটি Cornowallis sallonএ বিসর্জ্জন দিয়া আসিল। যাহার কর্ত্তনাশঙ্কায় সে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত যাহার জন্য কত সুহৃদের বন্ধুত্বও সে বিসর্জ্জন দিয়াছে আজ সেই মাথার মণিটি চারি আনা দক্ষিণা সহ অহিন্দুর হাতে দিতে তাহার কুণ্ঠা বোধ হইল না। তবে কি সে পুরাদস্তর সভ্য হইয়াছে? কিম্বা অন্য কোন কারণ ছিল। আর আর কুসংস্কারগুলার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কাণা খোঁড়া দেখিলে সাহায্য করিত, সত্য কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারিত। অন্যান্য ছেলেদেব মত সে এসেন্সের স্নিগ্ধতা ও সুগন্ধ সে অনুভব করিত না, থিয়েটার বায়স্কোপ বড় একটা দেখিত না, হোটেলে চপ্ কাটলেট খাইতে তখনও রুচি হয় নাই। শেষোক্ত সংস্কারগুলা দূর করিবার জন্য বন্ধুদের সমবেত চেষ্টায় কোনও ফললাভ হয় নাই।

২

এইরূপে চারি বৎসর গত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনাথের উপর দিয়া পরিবর্ত্তনের যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহার ধারা আমরা ঠিক অনুধাবন করিতে পারি নাই। তবে যাহা জানি সংক্ষেপে বলিতেছি।

সে বরাবরই মাসিক সাপ্তাহিক দৈনিক সমস্ত কাগজ আগ্রহ সহকারে পড়িত। কোথাও সভা সমিতির সংবাদ পাইলে সময় মত উপস্থিত হইয়া টেবিল চেয়ার পাতা হইতে আরম্ভ করিয়া সেগুলি ফিরিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত স্থিরভাবে বসিয়া থাকিত এবং বক্তৃতা-বারিধিতে সন্তরণ দিতে দিতে হোষ্টেলে ফিরিত। এই প্রকারে ফিরিতে বিলম্ব হওয়ার জন্য সে অনেকবার জরিমানা দিয়াছে। বিছানায় শুইয়া সভার সমস্ত বিষয়টা আলোচনা করিত এবং প্রতিক্রিয়ার হাত হইতেও নিস্তার পাইত না। একদিন খদ্দর বিক্রয় করিতে বাহির হইয়া মির্জ্জাপুর পার্কে একটি সভায় আসিয়া যোগ দেওয়াতে পুলিশ আসিয়া তাহাদিগকে থানায় লইয়া গেল। কিয়দ্দূর গিয়া ছাড়িয়া দিল, জেলে স্থানাভাব। সে কি করিবে? সে ত প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। দেশমাতা তাহার সেবা গ্রহণ করিলেন না মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে সে মেসে ফিরিয়া আসিল।

শেষে সে পল্লী-সংস্কারের সংকল্প করিল। কিন্তু সমাজের কর্ত্তাদের কথা স্মরণ হইতেই সে শিহরিয়া তিনবার দুর্গা নাম জপ করিল। যাহারা বিনা দোষে সমাজের নিরীহ ব্যক্তির জরিমানা করিয়া সখের যাত্রার দল বাঁধে, যাহারা পাঠশালা বন্ধ করিয়া সেখানে বাইনাচের আড্ডা করে, বিধবার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া দেবোত্তর বাড়ায়, কলেজ প্রত্যাগত যুবক দেখিলেই ম্লেচ্ছ জুয়াচোর ঠাওরায়, মানুষ হইয়া মানুষের ছায়া মাড়াইলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করে, সহস্র ব্যভিচার দুষ্ট হইয়াও ব্যভিচারের শাস্তি নির্ণয় করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। তাহাদের ভিতর 'বিধাতা যদি হঠাৎ একটা হাসি হেসে উঠেন' তবে কি তাহারা সহ্য করিতে পারিবে?

জমিদারের ছেলে হইলেও তাহাব ভরসা ছিল। তাহার তরুণ মন পরের দুঃখকে নিজের মত দেখিতে চেষ্টা করিত। নিজের দেশের লোকের মধ্যে যে অভাব সে দেখিত তাহা দূর করিবার জন্য ব্যাকুল হইত। লোকশিক্ষার প্রধান অবলম্বন সংবাদ পত্রের পরস্পর অনুক্ষণ মত বিরোধকে সে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিত না। দেশের সাধারণ কার্য্য পদ্ধতি সৃজনে তর্কের উৎপত্তি হইতে পারে কিন্তু তাহা সর্ব্বদাই বিপরীতমুখী হইবে কেন? তাহাতে কার্য্যকারককে দ্বিধায় ফেলিয়া কার্য্যে বাধা দেয় এবং স্বার্থ সিদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন ফল লাভ হয় বলিয়া তাহার মনে হয় না। দেশাত্মবোধ তাহার মনে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। যৌবনের দৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, অদম্য অজস্র শক্তিধারায় তাহার মন আপ্লুত কিন্তু তাহার গতি, যোগ্য পরিচালকের অভাবে যেরূপ মন্দীভূত হইয়া থাকে তাহাই হইল।

৩

অভিভাবকহীন সচ্চরিত্র জমীদার পুত্র যুবক অনাথবন্ধু অবিবাহিত এ সংবাদ কাহারো অবিদিত ছিল না। অনেকেই আপন আত্মীয়ার পানি-পীড়নের জন্য তাহাকে

অনুরোধ করিয়াছে। যাহার চিত্তে বিশ্ব-বিজয়ের আশা সে কি ক্ষুদ্র বিবাহের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চায়? কিন্তু যৌবনের লালিমায় যখন তাহার তরুণ মন রক্তিমাভ হইয়া উঠিল—তখন সে উজ্জ্বল দাবানলে আহুতি দিবার কিছুই পাইল না। যৌবন আপন সৌন্দর্য্য বিলাইতে চায়, প্রাণ বিনিময় করিতে চায়। দেশ কাল মিলিয়া তাহাকে যে কাজে তাহাকে লাগাইবে সেই কাজেই সে আত্মোৎসর্গ করিবে। কেহই ডাকিল না কেহ কোন পথ নির্দ্দেশ করিল না।

এইরূপ অবস্থায় বহু ধনী কন্যাকে উপেক্ষা করিয়া এক দরিদ্র বিধবার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া সে জীবনের সাধ মিটাইবার আশায় আত্ম প্রবঞ্চনা করিয়া বসিল। তাহার কোমল মন সহজেই সুবিমল প্রেম-রাজ্যের সুন্দর স্বপ্ন গড়িয়া তুলিল। অনন্ত অব্যয় সে প্রেমের কুল কিনারা খুঁজিয়া পাইল না। অন্নপূর্ণাকে লইয়া সে ক্ষুদ্র স্বর্গরাজ্যটি রচনা করিবার জন্য বনিয়াদ খুঁড়িতে লাগিল—সেখানে বিশ্বের আর অন্য কোন মাল মশলার অভাব অনুভব করিল না। আর কাহার কিছু প্রাপ্য আছে বলিয়া স্বীকার করিল না।

তাহার কাছে আজ আকাশ প্রেমের সোণালি রঙে রঙ্গীণ, বাতাস গন্ধে ভরপুর, বিশ্ব যেন শুধু প্রেমের জয়গান গায়িছে। তাহার কল্পনালোকের দেবী, প্রেমের অখণ্ড স্বরূপ,যেন আজ তাহার চিত্তাকাশের সমস্ত জায়গাটি জুড়ে ব'সেছে সে খবর সে নিজেই জানে না। তার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি, তারও চেয়ে মিষ্টি তার হাসিখানি তাহাকে স্বর্গের আবরণে ঘিরে রেখেছে।

সে সহজেই অন্নপূর্ণার হৃদয় দখল করিল—কোন বাধা পাইল না। কিন্তু এই বিজয় আনন্দের অসারতা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। বাধার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই যৌবনের বিকাশ কিন্তু এই প্রেমের সাধন পথের বাধা না পাইয়া তাহার সমস্ত উৎসাহ নিবিয়া গেল। তাহার মন যেন দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল।

আরো দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দেবতার আশীর্ব্বাদের মত একটি সুন্দর সুকুমার শিশু তাহাদের কোলে আসিয়াছে। কিন্তু অনাথবন্ধু তাহাকে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত গ্রহণ করিতে পারিল না। বালকের আগমনে সে বেশ সুখী হইতে পারিল না, শিশুর বিশ্ব-রূপকে দেখিতে পাইল না, অন্নপূর্ণার উদ্বেল আনন্দে যোগ দিতে পারিল না। সে দেখিল কোথায় যেন ভুল হইয়াছে। যৌবন আর সাড়া দেয় না। প্রেমের নূতনত্ব খুঁজিয়া না পাইয়া সে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। দশটা ছয়টা আফিসের পর সে এখন আর সংবাদ পত্র পড়ে না, সভা সমিতির ধার দিয়াও যায় না, পরের দুঃখ অভাবের সংবাদ রাখে না। তাহার অবসর নাই। সে এক একা অনেক সময় ভাবে এমনই করিয়া কত যৌবন নিত্য সমাধিস্থ হইতেছে।

পরিচয়

(হেঁয়ালি)

স্নানের ঘাটে দাঁড়িয়ে এক গোছা করবী ফুল হাতে নিয়ে উদীয়মান প্রাতঃসূর্য্যের দিকে তাকিয়ে সে আপন মনে দুলছিল। কাণে তার দুটি ওপেলের দুল—ঠোঁটে তার ক্ষীণ স্নিগ্ধ হাসির রেখা। গাছের পাতা, পুকুরের জল, হাতের ফুল, কাণের দুল সবই নড়ছে তারই তালে তালে সেও দুলছে।

বাতাস ভাবছে সেই তাকে আপনার তালে তালে দুলিয়ে দিচ্ছে।

গাছের পাতা ভাবছে তার ইসারা বুঝতে পেরে সে তাতে সায় দিচ্ছে।

পুকুরের জল ভাবছে তারই ঢেউএর তালে তালে তার দেহে মনে ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে।

কাণের দুল দুটি থেকে থেকে ভাবলে—তারাই তাকে হিন্দোলে দোলাচ্ছে।

কিসের সে এক পুলকভরা পরশ পেয়ে তার অন্তর বাহির দুলছে সে খবর তারা জানে না। শুধু সেই জানে এ অভিনব অপূর্ব্ব আহ্বান কিসের!

মহাত্মা গান্ধীর

ইয়ং ইণ্ডিয়া

পত্রিকার সার সঙ্কলন

আমার অবস্থা

আজকাল অনেকেই অভিযোগ করেন যে আমি রাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছি বলিলেই হয়, কথাটা সত্য; কারণ কংগ্রেস হইতে এই কার্য্য করিবার জন্য একটী বিশিষ্ট দল নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহারা স্বরাজ্যদল নামে খ্যাত। এই স্বরাজ্য দল রাজনীতি ক্ষেত্রে যে সমস্ত দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহা হইয়া উঠিত বিনা সন্দেহ—দেশবন্ধু, পণ্ডিত মতিলাল, মিঃ জয়াকর ইঁহারা এক একটি রত্ন; ইঁহাদের আমি কোনক্রমেই আমাপেক্ষা অনুপযুক্ত মনে করি না। যদি ইঁহাদের কার্য্য আমি হস্তক্ষেপ করি তাহা হইলে তাঁহাদের শক্তিকে অবিশ্বাস ও অবমাননা করা হয়। অনেকের বিশেষ, সংবাদপত্রের কর্ত্তাদের ইচ্ছা যে আমি অল্‌ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী আহ্বান করি। উক্ত কমিটী আহ্বানের উদ্দেশ্য নূতন কার্য্য বিবরণী প্রস্তুত করা ইত্যাদি, আমার মতে এক্ষণে তাহার প্রয়োজন নাই তবে মিথ্যা কার্য্য-নিরত কতকগুলি সদস্যকে দূরদেশ হইতে টানিয়া আনার প্রয়োজন কি? কেবল অযথা অর্থ ও সময়ের অপব্যয়—তবে যদি অধিকসংখ্যক সদস্য এবিষয়ে একমত হন এবং তাঁহারা কমিটি আহ্বানের আবশ্যক আছে বলেন তাহা হইলে বিলম্ব না করিয়া কমিটি আহ্বান করা হউক।

আমার নিজের তিনটী কার্য্য আছে; তাহা চরকা প্রচলন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতিস্থাপন এবং ছুঁৎ-মার্গ পরিহার। ইহা ছাড়া আর কার্য্যে লিপ্ত হইবার আমার আকাঙ্ক্ষাও নাই, অবকাশও নাই। চরকা আন্দোলনের বিরুদ্ধে আজকাল এক ধুয়া উঠিয়াছে আমাদের এ উদ্যোগ নিষ্ফল হইবে কিন্তু ঐ সকল নৈরাশ্য ও সন্দেহবাদীগণকে আমি বলিতে চাই যে ইহার উন্নতি ছাড়া আর আমি অন্য কিছুই দেখি না। ইহা ধীরে ধীরে গ্রামের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইতেছে—ইহা গ্রামের উন্নতির অতি উৎকৃষ্ট পন্থা। কোন কোন প্রদেশে শত শত নরনারী কেবল ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, শত শত নরনারী অনশনে ধীরে ধীরে কালের গ্রাসে নিপতিত হইতেছে—তারা আজ একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত—একমাত্র চরকাই তাহাদের মুক্তির পথ।—আর যে সমস্ত গ্রাম উন্নত, যারা চরকার প্রতি আস্থাহীন তারাও এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া ক্রমে ক্রমে তাহাতে বিশ্বাসবান হইবে না কেন, চারিদিকেই যখন একই কথা চরকা চরকা, তখন তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের মন এই দিকেই আকৃষ্ট হইবে। আমরা কাহাকেও লোভ দেখাইতে চাই না এবং প্রশ্রয়ও দিতে চাই না কাজ যদি করিতে হয় তবে দ্বিধা না রাখিয়া কায়মনোবাক্যে করিতে হইবে—নতুবা কেহই কংগ্রেসের সদস্য বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না।

হিন্দুমুসলমান-প্রীতির বাহ্যিক অবস্থা এখন দেখিলে মনে হয় তাহার সার্থকতা সুদূর পরাহত কিংবা অসম্ভব কিন্তু আমার মনে হয় যে এই দুই দল ঝগড়াই করুক আর মারামারিই করুক তাহাদের মধ্যে একদিন একতা স্থাপিত হইবেই হইবে। এবিষয়ে কোন ভুল নাই আর তাহা অদূর ভবিষ্যতে, হইবে তবে মধ্যে দুই একটা হাঙ্গামা না হওয়াও অসম্ভব নয়। ছুঁৎমার্গ পরিহার আন্দোলন ফলবতী হইতে এখনও বিলম্ব আছে, তবে যাহা হইয়াছে তাহা অতি আশ্চর্য্যজনক; ইহাতে চাই ধৈর্য্য, অস্থির, হইলে চলিবে না।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যদি সত্যই কংগ্রেস কার্য্যবিবরণী নূতন করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে অলইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী আহ্বান করা হউক, নতুবা পূর্ণ উদ্যমের মধ্যে স্বরাজ্যদলের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আমার অভিপ্রেত নয়—তাহারা বাহিরের কার্য্য করুক আমি ভিতরের পথ প্রশস্ত করি—শান্তির মূলমন্ত্র—চরকা—চরকা—চরকা!

কাজের কথা
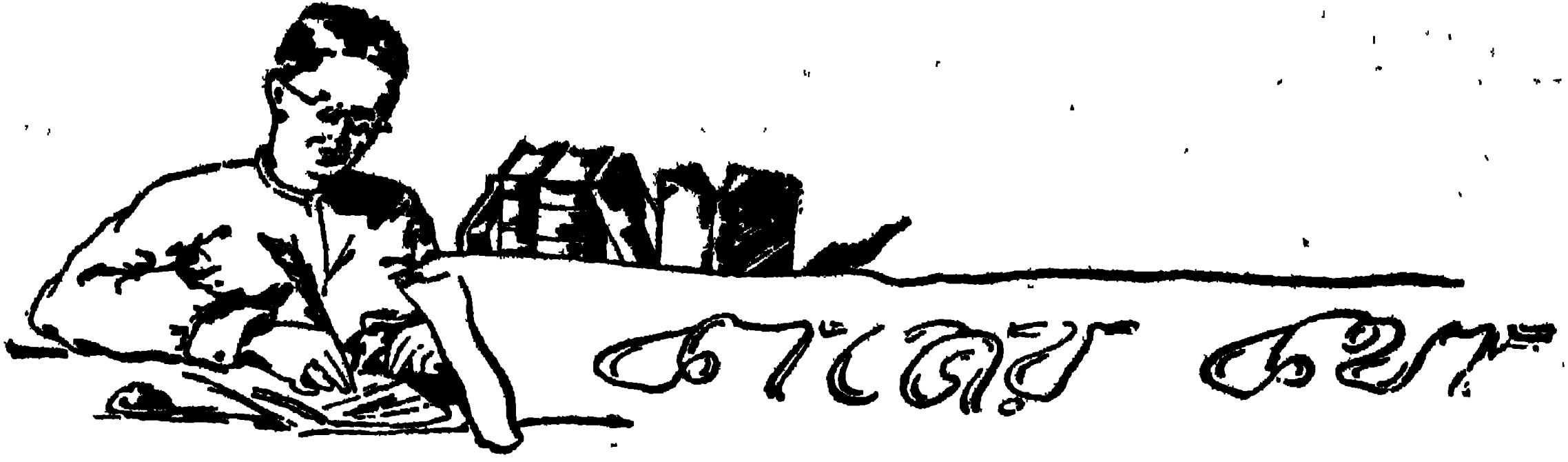
আফগানিস্থানে ভিক্ষা নিবারণী আইনঃ—পায়োনিয়র জানাইতেছেন যে আফগানিস্থানের আমির সাহেব নিজের রাজ্যে ভিক্ষা নিবারণার্থ এক নূতন আইন প্রণয়ন করিয়াছেন, যদ্দ্বারা সক্ষম ব্যক্তিগণকে ভিক্ষাবৃত্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য করা যাইবে। বালকগণকে ভিক্ষা করিতে দেখিলে, হয় তাহাদিগকে পিতামাতা বা অভিভাবকদিগের হাতে এই সর্ত্তে সমর্পণ করা হইবে যে তাহাদিগকে স্কুলে দেওয়া বা কোনরূপ কাজকর্ম্ম করিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে আর নয় তাহাদিগকে 'অনাথ' বলিয়া গণ্য করিয়া সরকারের তত্ত্বাবধানে রাখা হইবে। বৃদ্ধ বা অকর্ম্মণ্য ভিখারীদিগকে সরকার হইতে খাওয়াইবার ও আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা থাকিবে। একার্য্যের ভার কোতোয়ালের উপর ন্যস্ত থাকিবে। ভিখারিণীদিগের জন্যও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিবে।

বাঙলাদেশ বিশেষতঃ এই কলিকাতা সহর ভিখারীতে পরিপূর্ণ বলিলেই চলে। আবার কত জাতের ভিখারী যে এদেশে আসিয়া এই অল্প পুঁজির অথচ মোটা লাভের ব্যবসায় চালাইতেছে তাহা বলা যায় না। খোট্টা বা হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, মাড়বারী, রাজপুত উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মুসলমান, ফকীর, সাধুসন্ন্যাসী, বেদিয়া, এমন কি মান্দ্রাজ হইতে ঝাঁক বাঁধিয়া ভিখারী আসিয়া কলিকাতার রাজপথ ভরাইয়া দিতেছে গঙ্গার ঘাটে ভিখারী ট্রামে ভিখারী, রেলষ্টেশনে ভিখারী, দোকানে জিনিষ কিনিতে যাও সেখানে ভিখারী,পথেঘাটে যত্র তত্র ভিখারী। আবার কাগজ ছাপাইয়া সভ্য প্রণালীতে ভিক্ষাকরার রেওয়াজও হইয়াছে; দেশের নামে, ধর্ম্মের নামে, পরোপকারের নামে, কায়দা-দুরস্ত ভিক্ষাও চলে। মোটের উপর ভিখারীর উপদ্রবে কলিকাতাবাসী ব্যতিব্যস্ত অথচ এখানে এমন একটা আইন হয় না কেন? মালসী মশাইদের ভেতর কেউ একটা এমন প্রস্তাব করে ফেলুন না, যাতে এই সব কর্ম্মঠ ব্যক্তিদিগের আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া বন্ধ করা যায়। আমাদের বোধ হয় ভিক্ষার ব্যবসাটা সুবিধাজনক বলিয়া সহরে ঝি-চাকরের এত অভাব ঘটিতেছে—ভিক্ষায় চলিলে আর কে পরিশ্রম করিতে চায়?

কুমারী আন্দোলনঃ—রেঙ্গুনের একমাত্র বাঙ্গালা সাপ্তাহিক "সম্মিলনী" পত্রিকায় শ্রীমতী সুমতি দেবী বালুরঘাট দিনাজপুর হইতে পণপ্রথার অত্যাচার নিবারণার্থ বাঙ্গলার কুমারীদের, যতদিন না বরপক্ষ মাত্র শাঁখা-শাড়ী লইয়া তাহাদের বধূত্বে বরণ করিতে স্বীকৃত হইবেন ততদিন কুমারী থাকিবার যুক্তি দিয়াছেন এবং প্রত্যেক জেলা, মহকুমা ও গ্রামে গ্রামে এই আন্দোলন পরিচালনা ও স্থায়ী করার জন্য ভুক্তভোগী ও সহানুভূতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

পণপ্রথার অত্যাচার সত্যই অসহ কিন্তু কি জন্য এই অত্যাচার দিনের দিন বাড়িতেছে তাহার যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতীকারের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে তাহাতে যে কোন স্থায়ী ফল হইতে পারে আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। পণপ্রথা আমরাও সমর্থন করি না কিন্তু তা বলিয়া এরূপ আন্দোলোনের অনুমোদন করাও যায় না। আমাদের দেশেও এককালে কৌলীন্য প্রথার মর্য্যাদা রাখিবার জন্য অনেক নারীকে আজীবন কুমারী থাকিতে হইত কিন্তু তৎকালীন সামাজের নৈতিক অবস্থা যে বড় ভাল ছিল তাহাতো মনে হয় না; এবং সেই কারণেই এ প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। নিরুপায় হইলেই যে কোন নীতি অবলম্বন সদ্‌যুক্তি নহে।

যে কার্য্যের উদ্দেশ্য সৎ, সে কার্য্যের পন্থাও সৎ হওয়া চাই। নতুবা তাহা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে অসমর্থ হয়। আমাদের দেশে অধুনা চিরকুমারী থাকার অবশ্য প্রথা নাই কিন্তু বিলাতে আছে তৎসত্বেও সেখানে পণপ্রথা লোপ পাইবার মত কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। পুরাকালে এই দেশেই শাঁখাশাড়ী দিয়া বিবাহ হইত এখন তাহা হয় না কেন? আমাদের মনে হয় ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্যতম কুফল। প্রথমে উচ্চ শিক্ষার এত প্রাদুর্ভাব ছিল না, তখন কন্যার পিতারা পাত্রান্বেষণ সময়ে পাত্রপক্ষের গৃহে ভাত কাপড়ের সংস্থান আছে কি না দেখিতেন ও পাত্রটী বিনয়ী, সুশীল, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও সচ্চরিত্র কিনা দেখিতেন; ক্রমশঃ যেমন উচ্চ শিক্ষার প্রচার আরম্ভ হইল, ধনাঢ্য কন্যাকর্ত্তারা তখন গৃহস্থের সংস্কৃত-শেখা বা অল্প লেখাপড়া-শেখা পাত্র পরিত্যাগ করিয়া পাশকরা ছেলে খুঁজিতে লাগিলেন এবং তজ্জন্য উচ্চ পণের প্রলোভন দিতে লাগিলেন। উচ্চ শিক্ষায় তখন ভাল চাকরী মিলিত তাই ছেলের বাপেরা তাহার লোভে ও বিবাহে দাঁও মারিবার জন্য এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনার্থ অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া পুত্রদের উচ্চ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বাজারে উচ্চ শিক্ষিত পাত্রের চাহিদা জোর থাকায় পাত্রবর্গ বেশ উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইয়া পিতৃকুলের লাভজনক পণ্যরূপে বিবেচিত হইতে লাগিল। বড় লোকের দেখাদেখি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যার মাতারাও পাশকরা জামাইএর জন্য কর্ত্তার কাছে বায়না ধরিতে লাগিলেন—কর্ত্তার অবস্থায় না কুলাইলেও গৃহিণীর বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায় কর্জ্জ করিয়াও কার্য্য উদ্ধার করিতে লাগিলেন—ক্রমশঃ সকল অবস্থার লোকের মধ্যে এই পাশকরা পাত্রের প্রলোভন প্রবেশ করিল; ফলে প্রায় সকলেই, অবস্থায় না কুলাইলেও কন্যার বিবাহে কর্জ্জ করিয়া অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে পাশকরা পাত্রের দাম উঁচুই রহিয়া গেল। এ অবস্থায় এ প্রথাটীকে ঠিক হিন্দুর সামাজিক প্রথা বলা চলে না। তবে এ প্রথা যে এতদিন কেন রহিত হয় নাই তাহারও মূলে কয়েকটী বিবেচনার যোগ্য কথা আছে প্রথম, এদেশে বিবাহযোগ্য যুবক অপেক্ষা কিশোরীর সংখ্যা বোধ হয় বেশী; দ্বিতীয়, কুল মেল গোত্র প্রভৃতি মিলের জন্য নির্ব্বাচন সময়ে পাত্রের সংখ্যা কমিয়া যায়; তৃতীয় বরের বাপেদের ইহাতে বিনা আয়াসে কিছু অর্থ ঘরে আসে অর্থাৎ পেচ বা মোচড় দিতে পারিলেই এ কার্য্য সহজে সিদ্ধ হয়; চতুর্থ,—ছেলের ও মেয়ের জননীরা কন্যার বিবাহের কষ্টের প্রতিশোধ লইবার জন্য পুত্রের বিবাহের সময় বৈবাহিককে যথাসাধ্য পীড়ন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন; পঞ্চম, আমাদের দেশের কন্যাদের প্রতি আমরা ঠিক কর্ত্তব্য পালন করি না পুত্রকে মানুষ করিতে যে ব্যয় করি কন্যার বিবাহ পর্য্যন্ত খরচ হিসাব করিলেও তাহার চেয়ে বেশী হয় না। সুতরাং কন্যার বিবাহে অর্থব্যয় করিয়া আমরা কর্ত্তব্য পালন করি মাত্র বেশী কিছু করিতেছি এটা মনে ভাবাই ঠিক নয়; তবে পুত্র ঘরে থাকে সুতরাং তাহার ভবিষ্যতের উপার্জ্জনের আশা করি (বস্তুতঃ উচ্চশিক্ষার যুগের পুত্রের উপার্জ্জন পিতাকে কচ্চিৎ ভোগ করিতে দেখা যায়) আর কন্যা পরগৃহে যায় সুতরাং তাহার নিকটে কোন প্রত্যাশা নাই। পণপ্রথা শুধু হিন্দু সমাজের কলঙ্ক নয়, ব্রাহ্ম মুসলমান ও ক্রীশ্চান প্রভৃতি সমাজের মধ্যে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে সর্ব্বত্রই পণপ্রথা প্রচলিত আছে; সুতরাং কেবল হিন্দুসমাজকে তজ্জন্য অপরাধী না করিয়া যাহাতে এই প্রথা নির্ম্মূল হয় তজ্জন্য প্রত্যেক সমাজহিতৈষী ব্যক্তির চিন্তা করা কর্ত্তব্য। মাটীতে ভাত থাইলে যদি চোরের উপদ্রব তিরোহিত হইত তবে সকলেই সেই পন্থা অবলম্বন করিত। পাশ্চাত্যের ভোগবাদ যতদিন না ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত হইবে ততদিন আর কোন ভরসা নাই। মানবের মন হইতে ভোগবিলাসের লিপ্সা অন্তর্হিত না হইলে, তাহাকে সেই লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য সৎ হউক আর অসৎ হউক যে কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। যদি পুত্রের বিবাহ দিয়া সহজে কিছু পরের কড়ি ঘরে আসে তাহাতে বাধা দিবার জন্য কে উদ্যোগ করিবে।

অর্দ্ধেন্দু নাট্য-পাঠাগার—সম্প্রতি বাংলার নাটক ও রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পূর্ণ এই একমাত্র

পাঠাগারটি বিডন ষ্ট্রীট হইতে ৯নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য লেনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। নটশেখর অর্দ্ধেন্দু শেখরের নামের গৌরববাহী এই পাঠাগারটার সাধারণের নিকট যতটা সাহায্য পাওয়া উচিত ছিল তাহা সে পায় নাই, কাজেই অর্থসাচ্ছল্য নাই। কলিকাতা কর্পোরেশন প্রভৃতির নিকট ইঁহারা অর্থ সাহায্য পান কি না জানি না তবে কিছু পাওয়া এঁদের উচিত এবং পাইবার মত যোগ্যতাও ইঁহাদের আছে। আশা করি স্বদেশবাসীর পরিচালিত কর্পোরেশনের কৃপাদৃষ্টি এদিকে পতিত হইবে।

ফিল্ম অভিনেত্রী—ষ্টেটসম্যান লিখিয়াছেন কলিকাতাবাসিনী সুন্দরীগণ বোধ হয় চলচ্চিত্রে অভিনয়ের খ্যাতি পাইবার জন্য তেমন উৎসুকা নহেন।

একদল চিত্র ব্যবসায়ী কয়েকটী অভিনেত্রীর জন্য সম্প্রতি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন; তাহাতে বলা হইয়াছিল যে কতকগুলি শিক্ষিতা ভারতবর্ষীয়া ও এংলো ইণ্ডিয়ান মহিলার আবশ্যক আছে—চলচ্চিত্রের প্রধান প্রধান স্ত্রী ভূমিকার অভিনয়ের জন্য। আবশ্যকীয় গুণের নিম্নলিখিত উল্লেখ ছিল "হাত পা মুখ নাক চোখ পরিষ্কার ও স্পষ্ট হওয়া চাই চোখ দুটি বড় এবং ভাবপ্রকাশক হওয়া চাই এবং সহানুভূতি পূর্ণ সৌম্য আকৃতি থাকা আবশ্যক; অবশ্য পারিশ্রমিকের জন্য কোনরূপ অসুবিধা হইবে না।" এতেও নাকি বেশী পদপ্রার্থিনী আসেন নাই। ষ্টেটসম্যান বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে এদেশের অভিনেত্রী শ্রেণীর মধ্যে আকৃতির সৌন্দর্য্য বিরল এবং এদেশের ভদ্রমহিলাগণ বিদেশে যাইয়া পরপুরুষের সঙ্গে অভিনয় করা অসম্মানের কাজ মনে করেন।

এংলো ইণ্ডিয়ানদের দাবী—এংলো-ইণ্ডিয়ান সভা হইতে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুবিধার জন্য যে দাবী করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে লর্ড অলিভিয়ার কনটেম্পোরারী রিভিউ পত্রে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। ব্রিটিশ পিতামাতার জাত সন্তানগণ এক্ষণে "ডোমিসাইল্ড ইউরোপীয়ান" ও বৃটীশ এবং ভারতীয় পিতা বা মাতার জাত সন্তানগণ "এংলো-ইণ্ডিয়ান" নামে অধুনা পরিচিত হইতেছেন। ইঁহারা বলেন যে ইংরাজগণ ভারতবর্ষে আগমন করার ফলে যখন ইঁহাদের উৎপত্তি হইয়াছে তখন এই সম্প্রদায়ের ভালমন্দের জন্য তাঁহারাই ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ দায়ী; সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদিগের সর্ব্ববিধ সাচ্ছন্দ্য ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় স্থির করিয়া দিতে বাধ্য। শাসন সংস্কার নীতির প্রবর্ত্তন হওয়া অবধি গত চারি বৎসর ইহাদের নাকি নানারকম অসুবিধা হইতেছে তদুত্তরে লর্ড অলিভিয়ার বলিয়াছেন যে এই সম্প্রদাদের জন্য যদি বৃটীশ জাতিকেই দায়ী করা হয়, তবে তাহাদের নিজেদেরই সে দায়ীত্ব বহন করা উচিত এবং তজ্জন্য ভারতবাসীদিগের উপর তাহারা কোন দাবী করিতে পারে না। যদি এমনই মনে করা যায় যে ভারতবাসীরা তাহাদের দেশবাসী এই সম্প্রদায়ের উপর অকারণে অপ্রসন্ন হইয়া আছে তাহা হইলে তাহাদের ঘাড়ে জবরদস্তী এই সম্প্রদায়ের সুযোগ ও সুবিধার ভার চাপাইয়া দিলে তাহাদের মন যে আরও তিক্ত হইয়া উঠিবে। কথাটা খুব পাকা এবং একজন চতুর রাজনৈতিকের মত বটে। আমাদের 'শাদা'দাদাদাদের 'গরম মেজাজ' ও ভারতবাসীকে 'ড্যাম্‌নিগার' ভাবার জন্যই এই দুই সম্প্রদায়ে সম্প্রীতি স্থাপিত হয় নাই। বিলাতী গন্ধ গায়ে থাকায় এতদিন তাঁরা ময়ূরপুচ্ছ পরা পক্ষীটির মত সগর্ব্বে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে নিজেদের সমান মনে করতেন এবং ভারতবাসীকে যে কি ভাবতেন তা সকলেই জানেন। শাসন সংস্কার মাকালই হোক্ আর যাই হোক্, সে তাদের এই দিব্যজ্ঞানটুকু দিয়েছে যে এদেশে বাস কর্ত্তে হলে তাঁহাদের ভালমন্দও এই ড্যামনিগারদের ভোটের উপর নির্ভর করবে। আমরা বলি এত হাঁক-ডাক না করে তাঁরা আমাদের সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী হয়ে দেখুন না। মিষ্ট ব্যবহারে বনের পশু বশ হয় তা ভারতবাসী তো মানুষ; আর এমন মানুষ তারা যারা মুখের দুটো মিষ্ট কথায় ভুলে গিয়ে সর্ব্বস্ব খোয়ায়। আমাদের মনে হয় 'কটা'দাদা বা কালা আদমীদের কাছে গরম মেজাজ না দেখালে আর তাদের ঘৃণা না করে নিজেদের সমান ভাবলেই সর্ব্বরকম অসুবিধা শীঘ্রই দূর হয়ে যাবে।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

মাসিক বসুমতী চৈত্র সংখ্যা ১৩৩১ —মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলনের এ বৎসরের অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ সমালোচ্য সংখ্যায় বাহির করিয়া বসুমতী বাহাদুরী লইয়াছেন। যে দিনে যে সময়ে মুন্সীগঞ্জে সভাপতির বক্তৃতা পাঠ চলিতেছে, সেই দিনে প্রায় সেই সময়েই কলিকাতায় বসিয়া "বসুমতী" আমাদিগকে সভাপতির বক্তৃতা পাঠের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। মাসিক-সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল নহে। ইতঃপূর্ব্বে কোন সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা সভাস্থলে পঠিত হইবার পূর্ব্বেই কোন মাসিকে প্রকাশিত করিবার অনুমতি দিয়া উক্ত পত্রিকার প্রতি প্রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে "বসুমতী" বা তাহার সাহিত্য সম্রাটের কার্য্য সমালোচনার উর্দ্ধে; বিশেষতঃ যখন নজীর রহিয়াছে। যাক্ সে কথা। এখন সাহিত্য সভার সভাপতির অভিভাষণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তিনি অভিভাষণের একস্থলে বলিয়াছেন, "পূজ্যপাদ রবিবাবু আমাকে বলেছিলেন, এবারে যদি তোমার লক্ষ্ণৌ সাহিত্য সম্মিলনে যাওয়া হয় ত অভিভাষণের বদলে তুমি একটা গল্প লিখে নিয়ে যেও।" অভিভাষণের বদলে গল্প? আমি একটু বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি শুধু উত্তর দিয়াছিলেন, "সে ঢের ভাল।" আমরাও কবির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলি —সে ঢের ভাল হইত!

জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্বের সুযোগে সাহিত্য সম্রাট তাঁহার স্বপক্ষে এবং তদীয় পন্থাবলম্বী তরুণ সাহিত্যিকদলের পক্ষে ওকালতী করিয়াছেন মাত্র। নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাকে তিনি হাওড়ার সাহিত্য সম্মিলনী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় নানাভাবে সমর্থন করিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বক্তৃতা হইতে বিরত থাকিলে সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির অগৌরব তথা বঙ্গ-সাহিত্যের কোনই ক্ষতি হইত না। সাহিত্য-সম্রাটের অভিভাষণে আমরা অনেক আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু নিতান্ত হতাশ হইয়াছি। এরূপ বক্তৃতা বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের একান্ত অযোগ্য, ইহা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে। "বসুমতীর" দ্বিতীয় Journalistic enterprise প্রকাশ পাইয়াছে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের অপ্রকাশিত কবিতা "সাহিত্য" প্রকাশে। সম্পাদকের প্রচেষ্টা খুব সময়োপযোগী হইয়াছে। আলোচ্য সংখ্যায় চারিটী গল্প আছে। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প অন্নপূর্ণা এইবারে শেষ হইল। গত সংখ্যার এই গল্পের সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা কেদার বাবুর নিকট যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহা তাঁহার সুনিপুণ লেখনী তাহা দান করিয়াছে। "অন্নপূর্ণা" চরিত্রে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। পর-হিত ব্রতী আপন-ভোলা, খোলা-প্রাণ পল্লীযুবকের চিত্র, সুলেখক নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার রচিত "মোড়লের পো" শীর্ষক গল্পে সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। বৈচিত্র বিহীন, অনাড়ম্বর পল্লীবাসীর ঘরের কথা গল্পের আকারে প্রকাশ করিতে নারায়ণ বাবু সিদ্ধ হস্ত। "মোড়লের পো" গল্পের অন্তর্নিহিত tragedyটী বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। "কোন-পথে?" শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষের গল্প। নট-জীবনের কাহিনী লইয়া লিখিত। প্লটে বিশেষত্ব না থাকিলেও সরোজবাবুর লিপিকুশলতায় গল্পটী সুপাঠ্য হইয়াছে।

গল্পটী "গল্প" হইলেও লেখকের কল্পনা এমনই realistic যে গল্পের নায়ককে এই কলিকাতা সহরের আধুনিক রঙ্গমঞ্চের নটগণের মধ্য হইতে অতি সহজে চিনিয়া লওয়া যায়। অবশ্য আমরা এ কথা বলিতে চাহি না যে সরোজ বাবু কোন বিশেষ অভিনেতাকে লক্ষ্য করিয়া গল্পটী লিখিয়াছেন। "বেকারের বোকামী" আর একটী গল্প। মন্দ হয় নাই। বেকারের বোকামীটুকু তাহার দারিদ্র্য-পীড়িত হৃদয়কে গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছে। সত্যেনবাবুর গল্পে আর্ট আছে। সুলেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "বৈষ্ণব-কাব্য" চলিতেছে এবং যতদিন বৈষ্ণব কাব্য থাকিবে ততদিন চালাইলেও চলিবে। শেষ দিকের তিন পৃষ্ঠার মধ্যে কুড়ি লাইন লেখকের রচনা আর সবই "কোটেশন"

প্রবন্ধ লিখিবার এরূপ কৌশল জানিলে মাসিকে প্রবন্ধের অভাব হয় না! কানুনগোই মহাশয় রচিত "বাঙ্গালার বিপ্লব কাহিনী" হইতে সভয়ে দূরে রহিলাম; কেননা দিনকাল বড়ই খারাপ। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা" ক্রমশঃ চলিতেছে বাঙ্গলা ভাষার পুষ্টি ও পরিণতির একটা সংক্ষিপ্ত অথচ ধারাবাহিক ইতিহাস (a brief survey) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র দিতেছেন। প্রবন্ধটী সুপাঠ্য হইতেছে। "তুথ শিল্পের ভবিষ্যৎ" একটা সময়োপযোগী এবং অতি প্রয়োজনীয় বিষয় অবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধ। লেখক নিকুঞ্জবিহারী দত্ত মহাশয় অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া এ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যতদূর স্মরণ হয় স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ মহাশয় প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে ভারতীর পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছিলেন। "সপ্তগ্রাম" শ্রীমুণীন্দ্রদেব রায় বিরচিত ক্রমশঃ প্রকাশ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। ইদানীং আমরা দেব-রায় মহাশয়ের সাহিত্য সাধনার পরিচয় পাইতেছি, ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। লক্ষ্মীর প্রিয় পুত্রগণ বাণীর সেবা করিয়া চির-প্রচলিত সংস্কারের উচ্ছেদ সাধন করুন। "বঙ্কিমচন্দ্র, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ প্রসঙ্গে" অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মতের ও ধারণার পরিচয় দিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট আমরা এ সম্বন্ধে নূতন বার্ত্তা, নূতন আলোকের আশা করিয়াছিলাম। এইবার সাহিত্যক্ষেত্রে হাস্যোদ্দীপক গল্পলেখকরূপে সুপরিচিত রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর তাঁহার প্রকৃত elementএ দেখা দিয়াছেন। অনেকেই হয়ত জানেন না যে মজুমদার মহাশয় একজন শুধু সঙ্গীতজ্ঞ নহেন বাঙ্গালা দেশের মধ্যে বর্ত্তমানে অদ্বিতীয় "খেয়ালী"। তিনি এই সংখ্যায় সঙ্গীততত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ন্যায় বিশেষজ্ঞের নিকট সঙ্গীত শাস্ত্রের অনেক কথা জানিবার আশা করি। তাঁহাকে আর একটু বিশদভাবে আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। "থিয়েটারে পিছু" শীর্ষক নক্সায় রসরাজ অমৃতলাল হাস্যের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়াছেন। Don quixote নায়ক বিখ্যাত পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপ একটা কথা প্রচলিত আছে যে "যদি কাহাকেও বই পড়িতে পড়িতে হাসিতে দেখ তাহা হইলে জানিবে হয় সে পাগল, নয় সে Don Quixote পড়িতেছে।" "অমর্ত্ত্য ভোজের" লেখা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। "দ্বৈত শাসন সংস্কার (দ্বৈতশাসন সংস্কার?) শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সাময়িক প্রসঙ্গ অবলম্বনে লিখিত সুপাঠ্য প্রবন্ধ। বড় উপন্যাস দুটী "গরীবের মেয়ে" ও "শনির দশা" চলিতেছে। "মুক্তি ও ভক্তি" তর্কভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধ; মুমুক্ষু তাহা পাঠে নিশ্চয়ই তৃপ্ত হইবেন। ছোট-বড়, সিকি-দুয়ানী আকারের ভজনের অধিক কবিতা "বসুমতীর" অঙ্গ-শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে বা শূন্য-স্থান পূর্ণ করিয়াছে। "দপ্তর" "চয়ন" "সাময়িক প্রসঙ্গ" শীর্ষক অংশগুলি চিত্তাকর্ষক নানা বিষয়ে পরিপূর্ণ।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩২—ইউরোপের সুপ্রসিদ্ধ লেখক লেখিকারা তাহাদের মাতৃভাষায় "ডায়ারী" (রোজ-নামচা) লিখিয়া থাকেন; সাহিত্যের দিক দিয়া সেই সব ডায়ারীর মূল্য খুব বেশী। বাঙ্গালা ভাষায় ডায়ারী সাহিত্য নাই। বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গ-গত কবি ও সাহিত্যিক নিত্যকৃষ্ণ বসু যখন "সাহিত্য" পত্রিকায় "সাহিত্য-সেবকের ডায়ারী" লিখিতেন, তখন অনেক পাঠক সাগ্রহে তাহা পাঠ করিতেন। "৺নিত্যকৃষ্ণ বসুর ডায়ারী" "সাহিত্যে" সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। কবি রবীন্দ্রনাথের সম্প্রতি-সমাপ্ত পাশ্চাত্য-ভ্রমণ সময়ে তাঁহার মানস-পটে যে সকল ভাব ফুটিয়া উঠিত তাহা তিনি গদ্য ও পদ্যে ডায়ারী আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। কয়েকমাস হইতে "প্রবাসী"তে সেই ডায়ারী প্রকাশিত হইতেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই ডায়ারী গৌরবময় স্থান অধিকার করিবে। যে তরুণ কবির রচনা একদিন "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র"রূপে "ভারতীর" পত্রে পত্রে মোহজাল ছড়াইত, আজ তাঁহার পরিণত বয়সের পরিপক্ক হস্তের রচনা প্রবাসীর পাতায় পাতায় সুগভীর ভাব খনির হীরা-পান্না ছড়াইতেছে। আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত ডায়ারীর অংশ চিন্তার গভীরতায়,—প্রকাশের কবিত্বমোচিত ভঙ্গিমায়, বর্ণনীয় উপভোগ্য

হইয়াছে। কবিবর এই সংখ্যায় স্বরচিত "রক্ত-করবী" সম্বন্ধে দু' এক কথা বলিয়াছেন। কবির অনুরোধ 'রক্ত করবীর' ভিতর থেকে গোপন অর্থ ধ'রে টানাটানি না ক'রে সাহিত্য-হিসাবে যে রস আছে তাই উপভোগ কর।' কিন্তু লোকে সে কথা শুনে কই? কবি আরও বলিয়াছেন 'রক্ত করবীর' সঙ্গে রামায়ণের কাহিনী-গত মিল আছে। কিন্তু তাই বলিয়া কবি রামায়ণ হইতে গল্পটী আহরণ করেন নাই; "মহা কবিই" "বিশ্ব-কবির" গল্পটী 'ধ্যানযোগে আগে থাকৃতে হরণ করেছেন।' কবি সকলকে "রক্ত করবীর" আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিতে নিষেধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বয়ং রামায়ণের রাম-সীতা কাহিনী সম্বন্ধে তাঁহার স্বকল্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পুনরাবৃত্তি করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই! (Do as I say, but dont do as I do ?) "বিদায়-বাসনা" একটী প্রেমের কবিতা। লেখকের নাম নাই। আত্মগোপনেচ্ছু কবির বিদায় বাসনা কেন হইল বলিতে পারি না কিন্তু তাঁহার উচ্চ কল্পনা শক্তির প্রশংসা করি। যদি উৎকট কবিতার আদর্শ দেখিতে চাহেন ত পাঠক শ্রীকালিদাস নাগের "সুন্দর দূত" ও শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরীর "সুর-সমাপ্তি" পাঠ করুন। কবি-যুগল দেখিতেছি Mysticismএ তাঁহাদের গুরুকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। সুন্দর দূত সম্পাদকীয় টীকা সত্বেও "অসীমের" "মতো" বোধাতীত। কথার উপরে 'কথা বরিষণ' করিয়া এঁরা "ছন্দে গেঁথে গেঁথে" বেশ দুইটী সুদীর্ঘ কবিতা প্রসব করিয়াছেন; কিন্তু সে কবিতার রস গ্রহণ করিতে হইলে intellectual gymnastic অভ্যাস করিতে হইবে! যে কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—রস গ্রহণ করুন—

"জানি খুলে যাবে দ্বার,
আপনি দাঁড়াবে হেসে আজিকার প্রলয় আঁধার
তব মনোহরণের মুখের গুণ্ঠন অপসারি,
নিমেষে নিঃশেষ করি দেবে তোর স্বপন পসারী
অজানার বক্ষভরা গোপন সঞ্চয় তা'র যত।
—সেদিন পথের ক্লান্তি পোষমানা পশুটীর মতো
পড়ি রবে তৃপ্ত বক্ষে একপাশে মৌন মূক, মুখ তোর চাহি
নীরব সম্ভ্রমে" —(সুর সমাপ্তি)

"সভ্যতা" উদীয়মান কবি সজনীকান্ত দাসের একটী কবিতা। নবীন কবির লেখা আমাদের ভাল লাগে। আলোচ্য কবিতায় উদ্ভট কল্পনা বা অস্পষ্টতার কুহেলিকা নাই। ছন্দের গতিও সলীল এবং সহজ; সজনীবাবুর বাণী-সাধনা সফলতা মণ্ডিত হইবে, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। "রবীন্দ্রনাথের বাণী" প্রবন্ধে সুলেখিকা দেবী রবীন্দ্র-প্রতিভার নানা দিকের বিশেষত্ব দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। লেখিকা সত্যই বলিয়াছেন,—"রবীন্দ্রনাথের লেখা সাধারণের নিকট সহজ-বোধ্য নহে; তাহার কারণ যিনি অনন্তের বার্ত্তা শুনাইতেছেন তাঁহার বার্ত্তা এত গভীর ও এত ব্যাপক যে পরিকার করিয়া রেখা টানিয়া তাহা বুঝানো কঠিন।" "হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ" প্রবন্ধের লেখক দেশকালোপযোগী করিয়া হিন্দু-সমাজ ও ধর্ম্মকে গড়িতে চাহেন। এ সম্বন্ধে টীকা অনাবশ্যক। শ্রীবুদ্ধদেব বসু বর্ত্তমান রুশ-সাহিত্য প্রবন্ধে রুশীয় লেখক চেখভ" ও গোর্কীর সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। "নষ্টচন্দ্র" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব-আরব্ধ উপন্যাস বা বড় গল্প। "কারখানা বাদী ও স্বাচ্ছন্দ্যবাদী" প্রবন্ধে লেখক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় শ্রমিক সমস্যার একটী নূতন দিক আলোচনা করিয়াছেন। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর "মনের রোগ" কৌতূহলপ্রদ। গিরীন্দ্রবাবু ফ্রয়েড প্রমুখ পাশ্চাত্য লেখকের রচনা হইতে মনস্তত্ত্বের অনেক নূতন কথা আমাদিগকে উপহার দিতেছেন। তিনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ; বাঙ্গালা ভাষায় একটী নূতন বিষয় গঠনের পক্ষে তিনি, ডাঃ সরসীলাল বসু, রভীণ হালদার ও প্রফেসর সিংহ মহাশয় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। শ্রীশান্তা দেবীর "পথের দেখায়" আমরা তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। "রূপ-রেখার রূপ-কথা" শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রং ও রেখা সম্বন্ধে প্রবন্ধ অনেক স্থলে হেঁয়ালীর মত দুর্ব্বোধ্য যথা—"রেখার বেদনা সৃষ্টির শিরায় শিরায় টন্ টন্ ক'রে প্রকাশ হ'তে পারে না, রং এসে রেখা দিয়ে লেখা বিশ্বের মনের কথা ধুয়ে দেয়, মুছে দেয়, জানাতে দেয় না, খুলে ব'লতে দেয় না একবারও।" শিল্পাচার্য্যের লেখা ক্রমশঃ তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের মত ধোঁয়াটে এবং অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে।

"ভারতীয় দর্শনের মূল ধারা-প্রবাহ" পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনে দর্শনশাখার সভাপতিরূপে পঠিত দার্শনিক প্রবন্ধ। শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশ্লেষণ তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনুরূপ হইয়াছে। দর্পণের কথা" শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দর্পণ-শিল্পের পরিচায়ক, কাচপ্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া, দর্পণের ফ্রেমের সেগুণ কাঠের জন্মকথা প্রভৃতি অতি মনোজ্ঞ ভাষায় বলিয়াছেন; প্রবন্ধটী অতি সুপাঠ্য হইয়াছে।—"মহত্তর ভারত" সম্পাদকীয় প্রবন্ধ; ভারতের অতীত গৌরব-কাহিনীর প্রামাণিক বিবরণ। উপসংহারে রামানন্দবাবু লিখিয়াছেন "পূর্ব্ব-পুরুষের গৌরব বর্ণনা করিয়া অলস-প্রকৃতির যে অহঙ্কার জন্মে তাহার উদ্রেক করিবার জন্য এ প্রবন্ধ লিখিতেছি না।...আমরা বরং লজ্জা ও দীনতা অনুভব করিয়া ইহাই জিজ্ঞাসা করিতে যাই, প্রাচীন ভারতীয়েরা কি কারণে "মহত্তর ভারত" সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন, এবং আমরাই বা কেন তাহা সৃষ্টি করিতে পারিতেছি না। আমাদের মহত্তর ভারত সৃষ্টি করিতে পারা দূরে থাক্ ইংরেজেরা আসিয়া ভারতবর্ষকেই বরং বৃহত্তর ব্রিটেনের (Greatar Britaeni) সামিল করিবার চেষ্টায় আছেন। ভারতের যদি মহত্তর বৃটেনের সামিল হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলেও মন্দের ভাল মনে করিতাম। কিন্তু তাহা হইবার নয়।"—এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য! এই সকল প্রবন্ধ ভিন্ন সম্পাদকীয় 'বিবিধ প্রবন্ধ' এবং কষ্টি-পাথর' প্রভৃতিতে অনেক সারবান কথা ও সংগ্রহ আছে।

পরিত্যক্তার ব্যথা

শ্রীমতী নলিনী দেবী

আধেক রাতে এমন কোরে
ঘুম ভাঙ্গালে কে!
একলা ঘরে জেগে যে আর
রইতে পারি নে!
আমার ঘুম ভাঙ্গালে কে!
কি দুঃখে যে দীরঘ দিন
চোখের জলে হল বিলীন!
অনেক আশে রাতের পানে
চেয়ে ছিলাম যে!—
আমার ঘুম ভাঙ্গালে কে!

ওই যে কেঁদে বইছে বায়ু
আঁধার বাহিরে,
অনেক দিন যে হল, কাছে
বন্ধু নাহি রে!
এতদিন তার আসার আশে
ছিলাম বসে পথের পাশে,
ঘুমের মাঝে প্রিয়তমে
পেয়ে ছিলাম যে,
আমার, ঘুম ভাঙ্গালে কে!
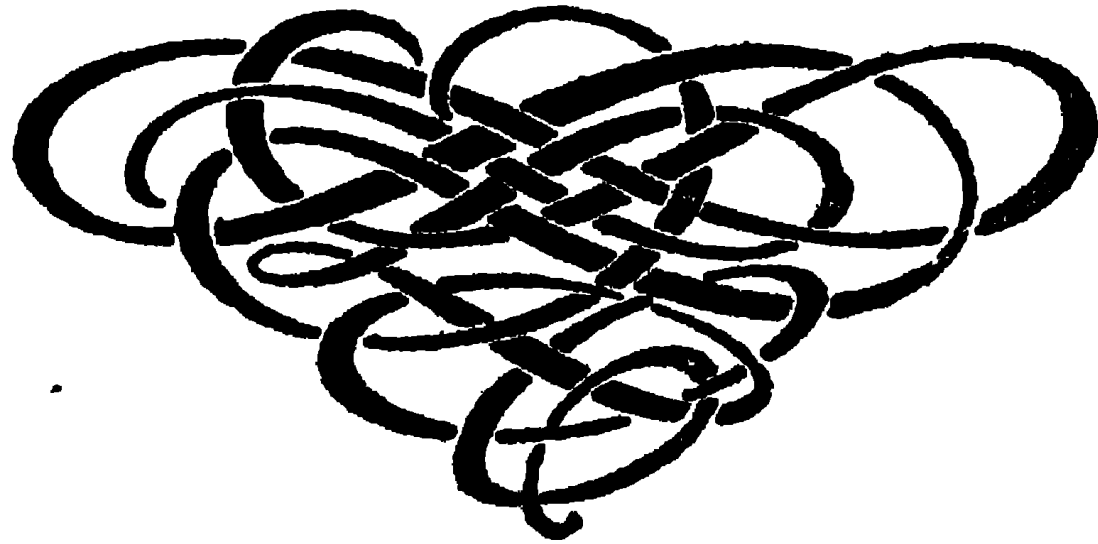
ষ্টার থিয়েটারে 'জনা'—গত শুক্রবার আমরা ষ্টার থিয়েটারে 'জনা' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয় মোটের উপর চলন সই বলা চলে, তবে এসব বহু অভিনীত নাটকের পুনরভিনয়ে কিছু নূতনত্ব বা বিশিষ্টত্ব না থাকিলে পুনরভিনয়ের কোন সার্থকতা থাকে না। দৃশ্যপটে কিছুই নূতনত্ব ছিল না কতকগুলি গ্রীসীয় ও মোগল যুগের দৃশ্যপট দেখিয়া মনে হইল প্রয়োজক মহাশয় যা তা দিয়া দর্শকদের ভুলাইতে চাহিয়াছেন। বেশভূষাযও বিশেষ বিশিষ্টতা ছিল না কেবল প্রবীরের বেশভূষা ও সজ্জা (make-up) ভাল হইয়াছিল।

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে বিদূষকের অভিনয় এবং স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে নায়িকার অভিনয় ও গীত উল্লেখ যোগ্য। অহীন্দ্রবাবু প্রবীর চরিত্রের সবিশেষ মর্য্যাদা রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না বিশেষতঃ যেখানে নায়িকার রূপের মোহে আকৃষ্ট হইতেছেন সে দৃশ্য তাঁহার কণ্ঠস্বরে প্রেমের আবেগ, বা সর্ব্বাঙ্গে প্রেমের আকুলতা ও আবেগজনিত অস্থিরতা কিছুই তিনি ফুটাইতে পারেন নাই। অর্জ্জুনের ভূমিকায় প্রতিভার পরিচয় দিবার মত বিশেষ কিছু ছিল না, তথাপি রাজা নীলধ্বজের সহিত সখ্যতা স্থাপন দৃশ্যে নির্ম্মলেন্দু বাবুর অভিনয় অতীব সরস ও প্রসংশনীয় হইয়াছিল। জনার ভূমিকায় অভিনেত্রী সুশীলা সুন্দরী যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন ও যত্ন লইয়াছেন বুঝা গেল কিন্তু ইহাকে রূপ দিতে তিনি পারেন নাই এবং জনার আকারে যে মহিমান্বিত সম্রাজ্ঞী মূর্ত্তি আমরা দেখিতে চাই তাহাও পাই নাই। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদেরও বিশেষত্ব ছিল না। সখীগণেব নৃত্যগীত বা পুরুষদের কোরাসগান তেমন মিষ্ট হয় নাই।

ইঁহাদের সম্প্রদায়েব কতকগুলি অভিনেতা ও অভিনেত্রী রেঙ্গুন সহরে অভিনয় প্রদর্শন করাইতে গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী ও শীঘ্রই তথায় যাইবেন। সেখানে নাকি ইঁহারা প্রচুর অর্থ ও যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন। বিদেশে ইঁহারা বাঙ্গালীর মান বাড়াইতে পারিয়াছেন ইহা কেবল তাঁহাদের গৌরবের কথা নয় সমস্ত জাতির পক্ষে একটা আনন্দের সংবাদ।

মিনার্ভায় 'ঠকের মেলা'—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের প্রণীত এই প্রহসন খানি গত শনিবার ইঁহারা প্রথম অভিনয় করিয়াছেন রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা না থাকিলে অভিনয়-যোগ্য নাটক লেখা বড়ই কঠিন—উপন্যাসে নরেশবাবুর প্রতিষ্ঠা আছে কিন্তু এপথের তিনি নূতন পথিক, কাজেই পুস্তকখানি ঠিক রঙ্গমঞ্চের উপযোগী হয় নাই তথাপি মিনার্ভা সম্প্রদায় প্রহসন ও গীতিনাট্য অভিনয়ের বিশেষ ক্ষমতা রাখেন বলিয়াই অভিনয় উপভোগ্য হইয়াছে। পুস্তকের ঘটনাংশটুকু বেশ সুন্দর এবং তাহা যে একখানি উচ্চশ্রেণীব প্রহসনের উপাদান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মিনার্ভাসম্প্রদায় এই অভিনয়ের জন্য যে বিশেষ যত্ন লইয়াছেন তাহারও চিহ্ন পাওয়া গেল।—এই ক্ষুদ্র প্রহসনের জন্য তাঁহারা তিনখানি সুন্দর দৃশ্যপট অঙ্কিত করাইয়াছেন; তন্মধ্যে

হাওড়া ষ্টেশনের প্লাটফর্মের দৃশ্যপটখানি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য অথচ ইহা একখানি ক্ষেপণীয় পট অর্থাৎ, ঠেলা সিন বা Set Scene (সজ্জিত দৃশ্য) নয়। এই পট অঙ্কণকারী শিল্পী পরেশবাবুকে তাঁহার অসামান্য তুলিকানৈপুণ্যের জন্ত সবিশেষ ধন্তবাদ দিতেছি আর শুধু আমরাই বা কেন সে রাত্রিতে সমাগত সমস্ত দর্শকবৃন্দই এই দৃশ্যপট দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ঘন করতালি দ্বারা নিজেদের আনন্দ অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন, ক্ষেপণীয় দৃশ্যপটের অদৃষ্টে এরূপ প্রশংসা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে বোধ হয় এই প্রথম। এই পুস্তকখানিতে কয়েকটী এমন কথাবার্ত্তা আছে যাহা ভদ্র সমাজের শ্রবণ যোগ্য নহে। নরেশবাবু উপন্তাসে যাহা খুসী করেন তাহাতে তত আসে যায় না কারণ উপন্তাস লোকে নিজমনে পাঠ করে কিন্তু সাধারণের সম্মুখে বিলাত ফেরত স্বামী (তা তিনি যতই জুয়াচোর হউন না কেন) শিক্ষিতা পত্নীকে কেমন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন "কিন্তু একটা কথা প্রিয়ে। আমায় তুমি যেমন করে গেঁথেছিলে এমন করে আর কটিকে পূর্ব্বে জুটিয়েছিলে বল দিকিনি"। এই যদি তাঁহার শিক্ষিত সমাজের অভিজ্ঞতার ফল হয় তবে সেটা সাধারণের সামনে এমন ভাবে জাহির না করিলেই ভাল হইত। নাচগান খুবই ভাল হইয়াছিল তন্মধ্যে খানসামা ও আয়ার দ্বৈত সঙ্গীত বিশেষরূপে উপভোগ্য হইয়াছিল। আগামী সপ্তাহে 'ঠকের মেলা' পুস্তকের সমালোচনা নবযুগের পাঠকগণকে উপহার দিবার বাসনা রহিল।

মিনার্ভা থিয়েটার শীঘ্রই তাঁহাদের জন্ত নির্দ্দিষ্ট রঙ্গমঞ্চে যাইবেন তজ্জন্ত এলফ্রেডের অভিনয় রাত্রি শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে। হাস্তরসের উৎকৃষ্ট অভিনয় দর্শন ও মধুর সঙ্গীত এবং সুন্দর নৃত্য দেখিতে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের এই অল্পদিনের অবসরই বিশেষ অসুবিধাজনক হইবে কারণ বর্ত্তমান অন্ত কোন সম্প্রদায় নাট্যকলার এই লঘু অথচ আনন্দদায়ক দিকটা এমন সুন্দরভাবে দেখাইতে পারেন না সেইজন্য তাঁহাদের উচিত সময় থাকিতে মনের জন্য কিছু আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করিয়া রাখা। এলফ্রেডে আর ৩।৪ সপ্তাহ অভিনয় হইবে তৎপরে ইঁহারা নূতন রঙ্গমঞ্চকে সুসজ্জিত করিবেন। এই নূতন রঙ্গমঞ্চ সজ্জিত হইলে কলিকাতার মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। নূতন রঙ্গমঞ্চের জন্য ইঁহারা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর একখানি নূতন নাটক সংগ্রহ করিয়াছেন সেটাও বড় কম আনন্দের কথা নয় কারণ অমৃতবাবুর সরস হাতের রচনা বহুদিন উপভোগ করিবার সৌভাগ্য সাধারণের হয় নাই। দৃশ্যপটের যে নমুনা ইঁহারা ঠকের মেলায় দিয়াছেন তাহাতে বোধহয় দৃশ্যপটের সৌন্দর্য্যেও এই নূতন রঙ্গমঞ্চ অদ্বিতীয় হইবে। আমরা মিনার্ভার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

যেদিন আমারে দিলে

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

যেদিন আমারে দিলে, তাই নিয়ে খুসী রাখি দিল্
একা বসে বসে বকি কবিতার মিল।
গেঁথে দি' কথায় মিঠে সুর
কল্পনা আল্পনা এঁকে মন ভর পুর!

যেদিন আমারে দিলে, তাই নিয়ে খুসী রাখি দিল্
বাদলের ঝড় আর ফাগুয়া অনিল
দুই মোর ভালো লাগে মনে,
অশ্রুধারা আকুলতা, সুরভি পবনে!

যেদিন আমারে দিলে, তাই নিয়ে খুসী রাখি দিল্
কেকার আকুতি আর, পাপিয়া কোকিল,
দুই জনে কি বলিতে হয়,
দরদী মরম কথা ফেলা ছড়া নয়!

যেদিন, আমারে দিলে, তাই নিয়ে খুসী রাখি দিল্
দুঃখ সুখ, দুই মনে খুলে দেয় খিল,
এক হ'য়ে যায় ঘর বা'র,
আগুনে আকাশ আনে, মনে পারাবার।

Printed & Published by Sachindra Nath Banerji at the HIMANI PRESS.

"চিন্তাকুলা"

"বিলাতী চিত্র হইতে।"

নবযুগ

প্রথমবর্ষ] ১৯শে বৈশাখ শনিবার, ১৩৩২ সন। ইংরাজী ২রা মে [৩৮শ সংখ্যা

কুসুম

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

লোকে বলে কুসুম কোমল,
সহজে নেতিয়ে পড়ে, কেঁপে ওঠে বায়ুভরে
শিশিরেতে ধুয়ে ফেলে' তাজা পরিমল !
সহেনাক ভ্রমরের ভর,
নুয়ে' পড়ে একেবারে, মনে হয় হাল ছাড়ে,
নেহাৎ বেচারা যেন, ভয়ে থর থর !
আমি দেখি কুসুম কঠোর,
শীতের খাতির নাই, করে না'ক আসি যাই
বড় বাড়াবাড়ি যবে বাদলের জোর !
জন্ম হ'তে আলোর মিতালি,
যদি দেহ নুয়ে পড়ে, মাটীর আঁচল ধরে,
ভোলেনাক পূজার রয়েছে তার পালি !
দুঃখ সুখ সব কিছু সয়ে'
ফুলে ফল কবি তোলে, মনের দুয়ার খোলে,
ভরে বীজকোষ, নাহি মরে মৃত্যু ভয়ে !

অশোক

("অশোক" নাটকের সংক্ষিপ্ত সমালোচন)

অধ্যাপক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

২

"অশোক" গিরিশচন্দ্রের শেষ বয়সের রচনা (১৩১৭ সালে ইহা প্রথম অভিনীত হয়)। যে গিরিশ-প্রতিভা ভক্তিমূলক নাটকে "বিল্বমঙ্গল ঠাকুরে" আরম্ভ হইয়া "শঙ্করাচার্য্যে" পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল, পৌরাণিক নাটকে "জনা", "পাঁণ্ডব গৌরব" ও শেষ বয়সে "তপোবল" রচনা করিয়া কবিকে যশোমণ্ডিত করিয়াছিল, যাহা "প্রফুল্ল", "বলিদান", "হারানিধি" ও "শাস্তি কি শাস্তি" রচনা করিয়া গার্হস্থ্য ও সামাজিক নাটকে নূতন যুগ আনিয়াছিল, ও ঐতিহাসিক নাটকে "সিরাজদ্দৌলা" (১৩১২ বঙ্গাব্দ) ও "মিরকাশিম"কে (১৩১৩ বঙ্গাব্দ) কবির লেখনীর ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছিল—সেই গিরিশ-প্রতিভার পরিণত বয়সের দান হইতেছে "অশোক"। কিন্তু কি নাট্য সম্পদে কি কবিত্ব সম্পদে ইহা উপরিলিখিত নাটকগুলির সহিত এক আসনে বসিতে পাবে না। "সিরাজদ্দৌলা", "মীরকাশিম", লিখিয়া গিরিশচন্দ্র ঐতিহাসিক নাট্যকার বলিয়া যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই দুইখানি নাটক দ্বিজেন্দ্রলালের ও ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটকাবলীর অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। কিন্তু "অশোকে" নাট্যকার সে খ্যাতি বজায় রাখিতে পারেন নাই। অবশ্য আড়াই হাজার বৎসরের পুরাণ কথাকে নূতন করিয়া বলা, সুদূর অতীত হইতে, যেন এক ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে নরনারীগণকে পুনর্জ্জীবিত করা, কম শক্তির পরিচায়ক নহে বরং সে হিসাবে গিরিশচন্দ্র যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। Tennyson যেমন প্রায় দুহাজার বৎসর পূর্ব্বের Arthurকে রক্তমাংসে গড়িয়া পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন, Shakespeare যেমন Julius Caesar, Antony and Cleopatra, Lear ও Macbethকে নবজীবন দান করিয়া অশেষ শক্তির পরিচয় দান করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রও সেইরূপ 'অশোক' নাটকে অশোক, বীতশোক, উপগুপ্ত, কুণাল, তিষ্যরক্ষিতা প্রভৃতিকে নবজীবন দান করিয়া ও তাহাদিগকে নূতনভাবে দর্শকের চক্ষে ধরিয়া অসীম শক্তির পরিচয় দান করিয়াছেন। অতি সাবধানে তাঁহাকে চলিতে হইয়াছে। নাটকীয় উপাদান তাঁহার যথেষ্ট ছিল কিন্তু উপদানগুলি দুই শ্রেণীর—উপকথা ও কঠোর ইতিহাস। Scylla ও Chesrybdesএর মাঝে জাহাজ চালানর মত এই দুই শ্রেণীর উপাদানের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নাটক রচনা করা কম কঠিন কার্য্য নহে। একদিকে একটু বেশী হেলিলেই নাটকখানি অবাস্তব হইবার ভয়, আবার অপর দিকে বেশী ঝুঁকিলেই একেবারে কবিত্বহীন, শুষ্ক, কর্কশ ইতিহাস হইয়া পড়িবে। একটু রূপক ('মার' ও 'তৃষার' allegory উপগুপ্ত কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ৪র্থ অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক দ্রষ্টব্য) সংযোজনা করিয়া এই দুইটী উপাদান তিনি নিপুণ শিল্পীর ন্যায় জড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন। আবার আকালকে সৃষ্টি করিয়া স্বচ্ছ, সুন্দর হাস্যরসের অবতারণা করিয়া সমগ্র রচনাকে উজ্জ্বল ও মধুর করিয়াছেন। ইহাও কম শক্তির পরিচায়ক নহে। ভাষা অধিকাংশ স্থলে ভাব প্রকাশের বেশ উপযোগী হইয়াছে। নানাশ্রেণীর চরিত্রও যেমন অঙ্কিত হইয়াছে, গুরুগম্ভীর সাধুভাষা হইতে গ্রাম্য ভাষাও তেমনই প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকের ভাষা হইতে পুরুষের ভাষার কতটা পার্থক্য, রাজমহিষীর ভাষা হইতে পরিচারিকার ভাষার কতটা ব্যবধান, গৃহীর ভাষা হইতে ন্যগ্রোধের ন্যায় সন্ন্যাসীর ভাষায় কতটা বিভিন্নতা থাকিতে পারে, সাধুভাষা ও গ্রাম্যভাষার যথার্থ তারতম্য কতটা, এ সমস্ত প্রবীণ

নাট্যকার এই নাটকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য এস্থলে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি পরিতেছি না যে গদ্যে কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ মনোভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই নাটকের কোন কোন চরিত্রকে "গৈরিশী" অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথা কহিতে দেখিলে, সময় সময় বড়ই অদ্ভুত ঠেকে। মনে হয়, গদ্যে কি কেহ মনোভাব প্রকাশ করিতে পারেন না? দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাটকের শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলি তো বিশুদ্ধ গদ্যে মনোভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কোথাও ত তাঁহাদের ভাষার জন্য অন্তরের কথা প্রকাশিত হইতে অসুবিধা হয় নাই। গিরিশচন্দ্রের চরিত্রগুলিই বা মনোভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গদ্য ছাড়িয়া পদ্য ব্যবহার করিবেন কেন? যাহা স্বাভাবিক তাহা, যতদূর সম্ভব, হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে কি? একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে সংস্কৃত নাট্যকারগণ ও Marlowe, Shakespeare প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যকারগণ সময়ানুসারে একপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন ও যাহা কালিদাস, Shakespeare প্রভৃতি অনুমোদিত তাহা দোষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। তবে দেশ কাল ভেদে, সামাজিক রীতি নীতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, নাট্য ও কাব্য রচনার নিয়মও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। ইংরেজিতে Shakespeareএর রচনার সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের Bernard Shaw, Galsworthy প্রভৃতির রচনা তুলনা করিলেই এ সত্য উপলব্ধি হইবে। "Old order changeth, yielding place to new" স্বয়ং Shakespeare ও তাঁহার প্রথম যুগে রচিত নাটকগুলিতে যত rhymed couplets ব্যবহার করিয়াছেন, মধ্যও শেষ বয়সের রচনায় তাহা করেন নাই। তাই বলি, গিরিশচন্দ্রও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখিলে বোধ হয় তাঁহার রচনা আরও নির্দ্দোষ ও সুন্দর হইত।

কেহ কেহ দেখাইয়াছেন যে জীবনের প্রথমে রচিত Shakespeareএর ভাষা বড় terse ও compressed হইয়াছে। একথা গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধেও বোধ হয় কতকটা খাটে। ভাষার পরিপক্কতা অনেক পুস্তকের রচনাকালের সাক্ষ্য দান করে। ভবভূতি যে ভাষায় 'বীর চরিত' লিখিয়াছেন, সে ভাষায় 'মালতী-মাধব' লেখেন নাই, Shakespeare যে ভাষায় *Romeo and Juliet* ও *Comedy of Errors* লিখিয়াছেন সে ভাষায় *Tempest* ও *Winter's Tale* লেখেন নাই; দ্বিজেন্দ্রলাল যে ভাষায় "সীতা" ও "পাষাণী" লিখিয়াছেন, সে ভাষায় "সাজাহান" ও "চন্দ্রগুপ্ত" রচনা করেন নাই। গিরিশচন্দ্রও যে ভাষায় "লক্ষ্মণবর্জ্জন" ও "সীতারবিবাহ" লিখিয়াছেন সে ভাষায় "তপোবল", "গৃহলক্ষ্মী", অশোক" ও "শঙ্করাচার্য্য' লেখেন নাই। ভাষা গিরিশচন্দ্রের হস্তে ক্রমশঃ সতেজ ও পরিপক্ব, অথচ মধুর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু "অশোক" নাটকে এ বিষয় একটু ব্যতিক্রম লক্ষিত হইবে। যে যতি-পাত ও আবৃত্তি সম্বন্ধীয় অস্বাভাবিকতা পরিহার করিবার জন্য তিনি "গৈরিশাছন্দ" সৃষ্টি করিয়াছিলেন,* সেই "গৈরিশীছন্দে"ও এই নাটকের ছন্দপাত হইয়াছে ও স্থল বিশেষে অত্যন্ত অস্বাভাবিকতা আসিয়া পড়িয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এসকল বড় কথার সবিশেষ আলোচনা করিয়া আর পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। এসম্বন্ধে যাহা ইঙ্গিত করিলাম সহৃদয় ও সাহিত্যানুরাগী পাঠক তাহা যেন নিজে আলোচনা করেন। Shakespeareএর মত গিরিশচন্দ্রকে যদি কখনও কোন সমালোচক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া সমালোচনা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তাঁহার রচনার ভিতর Inequalities বা অসামঞ্জস্য সমূহের কারণ সবিশেষে আলোচিত হইবে। তাঁহার critical power কম ছিল কি না, তাঁহার রচনায় collaborators' hands দেখিতে পাওয়া যায় কিনা, তদানীন্তন দর্শকগণের রুচি অনুসারে তাঁহাকে কতটা নামিয়া আসিতে হইয়াছিল, আবার দর্শকবৃন্দকেও তিনি কতটা উন্নত করিতে পারিয়াছিলেন, ইত্যাদি প্রশ্নের সদুত্তর ও সমালোচনার কাল আসিয়াছে। এ সম্বন্ধে যোগ্য সমালোচকের হস্তে যথার্থ সমালোচনা হউক, ইহাই আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

* যতদূর মনে পড়ে গিরিশচন্দ্র তাঁহার প্রবর্ত্তিত "গৈরিশী" ছন্দের উপযোগিতা সম্বন্ধে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন।

"অশোক" নাটকে বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণের কথা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক নাটকে মার ও তৃষার অবতারণা, মারের ইন্দ্রজাল প্রভাবে বহু অসম্ভব ব্যাপারে সৃষ্টি (যথা শূন্যে ঘোটকে আরোহণ, মায়াহ্রদ ও মায়াপুরীর সৃষ্টি, বৃক্ষকে সৈন্যে পরিবর্ত্তন করা), ন্যগ্রোধের তপ্ত কটাহ হইতে পদ্মোপরি অক্ষত শরীরে উপবেশন ও শূন্য হইতে অশোকের সম্মুখে অবতরণ, প্রভৃতি দৃশ্য দর্শকবৃন্দের চক্ষু পরিতৃপ্ত করিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বাভাবিক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পৌরাণিক নাটকে ইহার স্থান যতটা শোভন ও সুন্দর হইত, বাস্তব ঐতিহাসিক নাটকে ততটা নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

পরিশেষে এই নাটকের চরিত্র গুলি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। এরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিশদরূপে চরিত্র সমালোচনাও অসম্ভব। তবে একবারে বাদ দেওয়াও চলে না তাই দু'চারিটী কথা বলিব।

প্রথমেই আশোককে নাট্যকার কিরূপ ভাবে আঁকিয়াছেন দেখা যাক্। অশোকেব মাতা সুভদ্রাঙ্গী ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলেন। দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া বলেন যে তাঁহার গর্ভে সসাগরা ধরণীর অধিপতি জন্ম গ্রহণ করিবেন। অশোকের মাতামহ এইজন্য বিন্দুসারের অন্তঃপুরে, নাপিতানী রূপে ইঁহাকে পাঠাইয়া দেন। পরে ইঁহার সহিত বিন্দুসারের বিবাহ হয় ও বিন্দুসারের ঔরসে "রাজচক্রবর্ত্তী"-লক্ষণযুক্ত অশোক জন্মগ্রহণ করেন। অশোকের অপর সহোদরের নাম বীতশোক। পাছে পুত্রের অকল্যাণ হয় এইজন্য সুভদ্রাঙ্গী জ্যেষ্ঠ পুত্র অশোককে কখনও স্নেহ প্রদর্শন করিতেন না*। বিন্দুসারও কুরূপ বলিয়া অশোককে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবন তিনি বহুবার রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। এইরূপ সর্ব্বজন কর্ত্তৃক অনাদৃত ও ঘৃণিত হইয়া ও নির্জ্জনে বাস করিয়া, তিনি অন্যান্য রাজপত্র হইতে পৃথক্ ভাবে মানুষ হইয়াছিলেন। একদা বিন্দুসার সপ্তদিবস ধরিয়া রাজধানীতে আমোদ প্রমোদের আয়োজন করেন। তখন তক্ষশীলায় বিদ্রোহের সূচনা হইতেছিল। এমন সময়ে আমোদ প্রমোদে রত হওয়া ও নাচ গান করা অশোক অকর্ত্তব্য মনে করেন। বিন্দুসার অশোকের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া তাহা ঔদ্ধত্য বিবেচনা করেন ও তৎক্ষণাৎ উক্ত বিদ্রোহ দমন করিতে যাত্রা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আদেশ করেন। সৈন্যসাহায্য চাহিলে বিন্দুসার ব্যঙ্গ করিয়া বলেন যে, আমোদ প্রমোদে বত হীন ব্যক্তিগণ কি তাঁহার মত মহাপুরুষের সাহায্য করিতে পাবে? ইহাতে অশোক মর্ম্মাহত হইয়া একাকী, কাহারও নিষেধ না শুনিয়া তক্ষশীলা যাত্রা করেন। পথে মার তাঁহাকে ছলনা করিবার নিমিত্ত দৈবসাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু অশোক তাহার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তক্ষশীলায় গমন করিয়া তিনি তেজঃপুঞ্জ বপু ও তেজগর্ভ বাক্যাবলীর দ্বারা বিদ্রোহীগণের হৃদয় জয় করেন ও সে রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তক্ষশীলায় অবস্থান কালেই তাঁহার দেবীর সহিত পরিণয় ঘটে (এই পরিণয়েব ফলে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা জন্মগ্রহণ করেন)। দেবী অধিকাংশ কাল পিত্রালয়ে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেন, কদাচ অশোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

এদিকে মারের প্ররোচনায় চিত্তহরা নামক এক বারাঙ্গনা অশোকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুশীমকে প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহাকে বিপথে লইয়া গিয়াছিল। চিত্তহরার প্ররোচনায় সুশীম যখন তক্ষশীলায় অশোকের অনুসরণ করিতে ব্যস্ত তখন একদিন বিন্দুসার প্রাণত্যাগ করেন। অশোক তখন রাজপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রাজমন্ত্রী কহ্লাটক সুশীমের উপর বিরূপ ছিলেন। তিনি শূন্য সিংহাসনে অশোককে স্থাপিত করেন। অশোক এখন হইতে পূর্ণোদ্যমে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। আত্মীয় স্বজনের নিকট বারংবার অনাদৃত অপ-

* কেহ কেহ মনে করেন ইহা autoboigraphical; শুনা যায়, গুরুজনেরাও, পাছে অমঙ্গল হয় এই জন্য অশোককে প্রকাশ্যে যত্ন করিতেন না। অশোক নাটকে আরও দুই একস্থলে autoboigrphical reference আছে।

মানিত হইয়া তাঁহার হৃদয় কঠোর হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সুসীম রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলে, অশোক তাঁহাকে কৌশলে বধ করিলেন ও গর্ভবতী ভ্রাতৃজায়ার উপর নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন। সুসীমপত্নী চন্দ্রকলা অশোক মহিষী পদ্মাবতীর সাহায্যে রাজপুরী ত্যাগ করেন কিন্তু পদ্মাবতীও তাঁর অনুসরণ করেন। এক চণ্ডালের আশ্রয়ে চন্দ্রকলা, ন্যগ্রোধ নামক পুত্রকে প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে পদ্মাবতী তাহার ধাত্রীমাতারূপে তাহাকে প্রতিপালন করেন ও বৌদ্ধগুরু উপগুপ্তের সাহায্যে তাহাকে বৌদ্ধধর্ম্মানুসারে শিক্ষিত করেন। অশোক এসব কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি তখন কলিঙ্গজয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই কলিঙ্গজয়-কালে শত্রুপক্ষের বহুলোক ক্ষয় হয়। ইহাতে নানা প্রকার বিভীষিকা অশোকের মনে উদিত হয়। মারের প্রভাব তখন তাঁহার উপর পুরাদস্তুর আধিপত্য করিতে-ছিল। ঠিক এই সময় ন্যগ্রোধ* ও উপগুপ্তের নিকট অশোকের ধর্ম্মশিক্ষা আরম্ভ হয় ও তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য ও অহিংসাধর্ম্ম বিস্তারের জন্য অনেক সদনুষ্ঠান করেন ও দিকে দিকে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠান। রাজপুত্র মহেন্দ্র ও রাজকন্যা সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু রাজভ্রাতা বীতশোক কিছুতেই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। এজন্য অশোক এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। আকাল নামক তাঁহার পার্শ্বচরকে বলিয়া দিলেন যে কোনক্রমে বীতশোককে যেন একবার সে সিংহাসনে বসায়। একদিন আকালের অনুরোধে, পরিহাসচ্ছলে, যেই বীতশোক সিংহাসন আরোহণ করিয়া-ছেন, অমনি অশোক তথায় হঠাৎ আগমন করিলেন ও কৃত্রিম ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। পরে পুত্র কুণাল ও মন্ত্রীদিগের অনুরোধে তাঁহাকে একসপ্তাহ সময় দিলেন ও ভোগ বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য উক্ত সময়ের জন্য তাঁহাকে রাজপদ দান করিলেন। সপ্তাহান্তে মৃত্যুভয় বীতশোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করাইল ও তিনি সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষু হইলেন।

মুখে অহিংসা প্রচার করিলেও অশোকের হৃদয়ে তখনও মারের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল। চিত্তহরা (তিষ্যরক্ষিতারূপে) যখন তাঁহার রাজমহিষী, তখনও তাঁহার অজ্ঞানের মোহ কাটে নাই। ৮৪ হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রকৃত আলোক তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হয় নাই। তাই তখন যে কেহ বৌদ্ধগণের প্রতি দুর্ব্যবহার করিত বা বুদ্ধের অপমান করিত, তাহার উপরই তিনি অত্যন্ত-ক্রোধ হইতেন। এই সময় একজন জৈন বুদ্ধমূর্ত্তিকে মহাবীরের মূর্ত্তির পদতলে স্থাপিত করায় অশোকের ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি আদেশ দিলেন যে জৈন সন্ন্যাসীদিগের মুণ্ড যে দিতে পারিবে, তাহাকে পুরস্কৃত করা হইবে। নিদারুণ রাজকোপ হইতে জৈনগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৌশলে ছদ্মবেশী বীতশোক নিজ মুণ্ড রাজসমীপে পাঠাইলেন। বীতশোকের অদ্ভুত আত্মোৎসর্গ দর্শনে অশোকের অনেকটা চৈতন্যোদয় হইল ও এই কঠোর আজ্ঞা তিনি রহিত করিয়া দিলেন।

কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত অশোকের পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই। ছদ্মবেশিনী চিত্তহরা বা তিষ্যরক্ষিতার হস্ত হইতে তিনি তখনও উদ্ধার পান নাই। তিষ্যরক্ষিতা ধর্ম্মসেবার ভাণ করিয়া তাঁহার কৃপাপাত্রী হইয়াছিল কিন্তু তাহার প্রকৃতি ছিল অতি কদর্য্য। রাজপুত্র কুণালের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে লালসার পঙ্কে নিমগ্ন করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া সে তাঁহাকে তক্ষশীলায় যাইতে বাধ্য করিয়া-ছিল। পরে অশোকের কোন দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য সে সাত দিনের জন্য রাজত্ব করিবার অনুমতি পাইয়া সে প্রতিহিংসা-পরায়ণা হইয়া তক্ষশীলায় রাজাদেশ পাঠাইল যে, কুণালের চক্ষুদ্বয় যেন উৎপাটিত করা হয়। কুণাল এই পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া নিজেই চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাহাকে পাঠান। আবার, কৌশলে বোধিবৃক্ষকে নষ্ট করিয়াও

* Time-limit দ্বারা বিচার করিলে বলিতে হয়, এখানে নাট্যকার একটু গোল করিয়াছেন। ন্যগ্রোধের জন্ম হইতে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া অশোককে উপদেশ দিতে হইলে যতটা সময় লাগা উচিত নাট্যকার তাহার বোধ হয় হিসাব করেন নাই।

তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া তিষ্যরক্ষিতা অশোকের আরও বিশ্বাসভাগিনী হন ও অশোককে ঔষধ বলিয়া বিষ প্রদান করিতে উদ্যত হয়। এমন সময় আকাল আসিয়া তাহার প্রকৃত চরিত্র উদঘাটিত করিয়া দেয় ও উক্ত বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া দেখান যে উহা ঔষধ নহে বিষ। অন্ধ কুণাল এই সময় উপস্থিত হওয়াতে তিষ্যরক্ষিতার সমস্ত অপরাধ প্রকাশিত হয়। অতঃপর গত্যন্তর না দেখিয়া বিষপান করিয়া তিষ্যরক্ষিতা প্রাণত্যাগ করে। ঠিক এই সময় উপগুপ্ত আসিয়া কুণালকে চক্ষুর্দ্বয় ও আকালকে প্রাণদান করিলে অশোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল।* কিন্তু এখনও অশোক পূর্ণভাবে অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার অহমিকা জ্ঞান এখনও যায় নাই। শেষ বয়সে বৌদ্ধসঙ্ঘ ও বৌদ্ধভিক্ষুগণকে দান করিয়া তিনি রাজকোষ শূন্য করিয়া ফেলিলেন ও একটী আমলকী ছাড়া আর কিছুই তাঁহার অবশিষ্ট রহিল না। রাজমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রাজ্য কাহার? রাজমন্ত্রী যখন বলিলেন যে রাজ্য অশোকের, তখন নগদ টাকা না থাকাতে অবশেষে তিনি তাঁহার রাজ্য বৌদ্ধ সঙ্ঘকে দান করিয়া ফেলিলেন। তিনি একশত কোটী স্বর্ণমুদ্রা সঙ্ঘকে দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। তন্মধ্যে ৯৬ কোটী দেওয়া হইয়াছিল বাকী ৪ কোটী পাইলে উপগুপ্ত রাজ্য প্রত্যার্পণ করিবেন বলিলেন। এতদভিপ্রায়ে পদ্মাবতী ও পুত্রবধূ কাঞ্চনমালা প্রভৃতির অলঙ্কার আনীত হইল। উপগুপ্ত অশোককে যখন উক্ত অলঙ্কার সকল দান করিবার আজ্ঞা দিতে বলিলেন, তখন অশোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, অহঙ্কার ও মারের প্রভাব † একেবারে বিদূরিত হইল ও তিনি উপলব্ধি করিলেন যে রাজ্য, ধন, কীর্ত্তিকলাপ কিছুই নহে, সবই বুদ্ধদেবের, তিনি কেবল নিমিত্ত মাত্র। এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল ও মার করযোড়ে বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের পরাভব স্বীকার করিল।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাই অশোক চরিত্র। এই চরিত্রে অশোকের অনেক গুণ ও দোষ দেখান হইয়াছে। অশোক চরিত্র কেবল গুণাবলীর সমষ্টি নহে। তাঁহার নিষ্ঠুরতা, ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামী, তাঁহার অবিবেকিতা, হঠকারিতা সবই তাঁহার গুণগ্রামের পার্শ্বে দৃষ্ট হয়। এই সব দোষ গুণ তাঁহার ছিল কি না ও এ সবের সংমিশ্রণ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কিনা, পাঠক তাহা নিজে বিচার করিবেন

"অশোক" নাটকে অনেক প্রকারের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বীতশোকের সৌভ্রাত্র, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও স্বার্থত্যাগ, পদ্মাবতীর অমানুষিক কীর্ত্তিকলাপ, দেবীর বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগ ও ধর্ম্মপরায়ণতা, তিষ্যরক্ষিতার ঘৃণ্য স্বার্থপরতা, কুণালের নির্ম্মল হৃদয় ও পিতৃভক্তি, ন্যগ্রোধের ধর্ম্মানুরাগ, মারের প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি খলতা ও বিরুদ্ধাচরণ—সবই বেশ নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে। আকালের কর্ত্তব্যপরায়ণতা, তাহার রসিকতা, তাহার প্রভুভক্তি ও স্বার্থত্যাগ সমগ্র নাটকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া নাটকখানিকে উজ্জ্বল ও মধুর করিয়া রাখিয়াছে।

---

* শেষের দিকের ঘটনাগুলি এত দ্রুত ঘটিতে দেওয়া হইয়াছে যে সময় তাহার সহিত গতি রাখিতে পারে না। Stage-এর উপর উপযোগী ও চিত্তাকর্ষক হইলেও, এতগুলি ঘটনা একসঙ্গে ঘটা সম্ভব পর বলিয়া বোধ হয় না।

† মারকে রঙ্গমঞ্চের উপর আনিয়া দর্শকদিগকে struggle between soul and body অথবা মনের মধ্যে পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বিধবা কুমারী সম্বাদ

(নক্সা)

শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারী। দিদি, বিষণ্ণ বদন কাতর নয়ন
চিন্তাকুল মন কি হেতু তোমার বল ?
ত্যজি' নিত্য পূজা বিভু আরাধনা, বল
অন্যমনা কি কারণ আজি ? কে দিয়াছে
ব্যথা প্রাণে ? কি হেতু নয়নকোণে ঝরে
অশ্রুবারি ? হুতাশ্বাস কি হেতু তোমার ?

বিধবা। হায় বোন, নিদারুণ ব্যথার কারণ
কহিব কেমনে তোরে। কতদিন গেল,
কত মাস,—কত বর্ষ গিয়াছে চলিয়া
হেরি নাই প্রাণেশে আমার। আছিলাম
কিশোরী তখন—সদ্য প্রস্ফুটিত, নব-
কুসুম কোরক,—মধু গন্ধে ভরপুর,
আপন সৌরভে আপনি পাগল যেন।
কৈশোরের নবীন নেশায় পতি সনে
আছিলাম নিমজ্জিত সুখের সাগরে।
বাহির জগৎ লুপ্ত ছিল মোর,—ছিল
শুধু অফুরন্ত হাসি, অনাবিল সুখ,
অগণিত আনন্দ হিল্লোল। ভাবি নাই
সেই সুখস্রোত রুদ্ধ হ'বে অকস্মাৎ,—
সুখের আকর প্রাণেশ আমার বোন
যাবে চলে' কালের কবলে।

কুমারী। আহা দিদি,
বড়ই দুঃখিতা আমি তোমার কারণ।
কিন্তু, বল কে খণ্ডাবে বিধির লিখন ?

বিধবা। বিধির লিখন। তোরও মুখে ঐ কথা বোন ?
ধিক তোর শিক্ষালাভে—শত ধিক তোরে।
অনর্থক অর্থ ব্যয়ে পিতা মাতা তোরে
পাঠাইলা বিদ্যালয়ে। নহে কি এখনও
আধুনিক শিক্ষিতা রমণী হয়ে—হেন
অসম্ভব কথা আনিতে পারিস মুখে।
কে বিধি। কিসের লিখন ? না, না,—নহেক সম্ভব
ইহা বিধির লিখন। অতি জরা জীর্ণ
অকর্ম্মণ্য স্থবির সমাজ,—চিন্তাহীন
যুক্তিহীন অতীতের নির্ম্মম কঙ্কাল,—
এ তাহার অত্যাচার শুধু। নহে কিবা
প্রয়োজন এই বৈধব্য পালনে ?
কিবা ইষ্ট তিলে তিলে রমণী হত্যায় ?
বৃথা এই কঠোর নিয়ম—ব্রত পূজা—
তপ জপ,—প্রকৃতির পরিহাস যেন।
বুভুক্ষু তৃষ্ণার্ত্ত যবে হয়লো হৃদয়
সংযম শিক্ষার আশা কোথা রহে তার ?
পড় নাই কবিবর হেমচন্দ্র
লিখে গেছে কাব্যেতে তাহার
"যুবতীর যোগধর্ম্ম মিথ্যা সমুদায়"

কুমারী। দিদি,
হেন কথা সাজে না তোমারে। তুমিও কি
শুধু আত্মসুখ চাও ? তুমিও কি শুধু
পাশ্চাত্য নারীর মত স্বার্থপর হ'য়ে
পতি ল'য়ে করিবে সংগ্রাম অভাগিনী
কুমারীর সনে ? ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পূজা
সব ফেলি দূরে—নাহি তার কোনো প্রয়োজন ?
শুধু ভাব দিদি একবার কুমারীর
হৃদয় বেদনা। কতজনা কাঁদিতেছে
নিরাশা আঁধারে—মরিছে গুমরি' শুধু
পতির অভাবে। কত শত কুমারীর
কৈশোর ফুরায়—কত যৌবন শুখায়—
তবু নাহি পায় তা'রা পতি-সুখ স্বাদ।
নর চেয়ে নারী সংখ্যা কত যে অধিক
জান না কি দিদি ?—প্রত্যেক নারীর তরে
সম্ভবে না নর একজন,—নর নহে
সুলভ নারীর মত। তাহাতে আবার
তোমরাও যদি পুনরায় চাহ পতি
কি হ'বে তাদের দশা ? জনক-জননী
কতই উদ্বিগ্ন কন্যার বিবাহ তরে,
তাহে তোমরাও যদি হও অন্তরায়,
কন্যার কারণ উন্মাদ হইবে তারা

বিনা আত্মহত্যা, অন্য পথ আর
রহিবে না কুমারীগণের।

বিধবা। জলে যাই শুনি' তোর
কথা—স্বার্থবিষে-মাখা। তাই যদি হ'বে
তাহ'লে কি সমাজের সংস্কার হেতু—
বিধবা বিবাহ তরে এত সুধী জন
হইত ব্যাকুল! আর যদি তাই হয়
কিবা আসে যায় মোদের তাহাতে!
এ সংসারে শুধু পরের সুখের তরে
কেবা চাহে বিসর্জ্জিতে আপনার সুখ?
পর মুখ চাহি' কে কবে বরণ বল্
দুঃখানল চিরদিন তরে? তাহা ছাড়া
বিবাহের সুখ অজ্ঞাত তোদের কাছে,—
না, পাইলে পতি পাবি না অধিক ব্যথা
আমাদের চেয়ে—পতি সুখ আস্বাদন
পাইয়াছে যারা কিছুদিন।

কুমারী। সেই হেতু দিদি, বিবাহ মোদের
আরও প্রয়োজন। নাহি জানি কিবা পতি
মোরা,—কিবা তার আস্বাদন!
লভিয়াছ স্বামীর সোহাগ,
পতি প্রেম ভুঞ্জিয়াছ কিছু,—সাধ তব
মিটেছে কতক। মিলেছিল প্রাপ্য তব,—
ভাগ্যদোষে পার নাই রাখিতে তাহারে,—
সে কি আমাদের দোষ? কেন তবে বল
বঞ্চিত করিতে চাহ তোমরা মোদের
কুমারীর ন্যায্য-প্রাপ্য হ'তে? হোক্ আগে
সমগ্র কুমারী বিবাহিতা জনে জনে,—
তার পর রহে যদি পুরুষ উদ্বর্ত্ত
বরিও তাদের,—দ্বন্দ্ব তাহে না রহিবে
কিছু। কিন্তু তার আগে চাহ যদি পতি,
সন্ধি না করিব কভু তোমাদের সনে।
যদি আর কিছু নাহি পারি, দিব অভিশাপ
সন্তাপ যাহাতে হয় সাথী চিরদিন।

বিধবা। হেরি স্পর্দ্ধা তোর, আশ্চর্য্য হ'য়েছি আমি!
সেদিনের মেয়ে—ধরি যদি কণ্ঠ চাপি'
এখনো দুধ উগারিবি ভয়ে। আর দ্বন্দ্ব
চাস্ তুই মোর সনে? বিধবা বিবাহ
তবে তোর মতে নহেক উচিত? সব
সমাজের নেতা মূর্খ তবে তোর মতে?

কুমারী। মূর্খ তাঁরা বলি নাই আমি,—বলি নাই
বিধবা বিবাহ নহেক উচিত কভু।
তবে তুমিও যেমন স্বার্থ তরে শুধু
উঠেছ নাচিয়া,—তাঁহারাও সেইরূপ
আপাতঃ মঙ্গল তবে ভবিষ্যত ফল
বিচারে অক্ষম আজি। কেহ যশঃ—
কেহ বাহাদুরী তরে,—কেহ বা আপন
বিধবা কন্যার হেতু,—নহে ত বা কোন
আত্মীয়ার তরে—নহে নিত্য-চোখে-পড়ে
হেন প্রতিবাসী-কন্যার দুঃখের হেতু
হ'য়ে বিগলিত বিধবা বিবাহ দ্বারা
আজি তাঁরা সমাজের চান সংস্কার।
ভুলে যান্ তাঁরা, বিবাহ অভাবে—কত
স্নেহলতা কেরোসিনে দিতেছে আহুতি,
কত পিতা দেউলিয়া আজি, কতশত
পুত্রের জনক, নির্ম্মম কসাই সম
আছে বসি' কুমারীর মুক্তিপথ রোধি'।
আগে হোক্ কুমারী উদ্ধার,—আগে
হোক্ নিবারণ সধবা পীড়ন,—শুষ্ক হোক্
অশ্রুজল কন্যার পিতার,—তার পর,
তার পর বিধবা বিবাহ। নহে এই
সমাজের সংস্কার শূন্য বাক্য শুধু,—
অক্ষমের ব্যর্থ আস্ফালন। মাঝামাঝি
কর যদি সন্ধির প্রস্তাব, এই মাত্র,
স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত মোরা,—
বালিকা বিধবা—বুঝে নাই স্বামী কিবা
যারা—তাহাদের হউক বিবাহ পুনঃ,—
অসম্মত না হইব মোরা তাহে। কিন্তু
অন্য তরে—হউক সে কিশোরী যুবতী—
তাহাদের তরে তিলমাত্র দাবী মোরা
না করিব ত্যাগ। সব নেতৃবৃন্দ যদি
আজি হন একত্রিত, তবুও রহিব মোরা
অচল অটল অটবজ্র সম। কুমারী বিবাহে
বাধা দিবে যেই বিধবা কামিনী
চিরশত্রু হইব তাহার।

গল্প

ভলান্‌টিয়ার

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সমাদ্দার

১

সবাই বলে "ওরে তুই হাস্ হাস্।" অকস্মাৎ কোথা থেকে অশান্ত বেদনার ভারে বুকটা ভেঙ্গে চুরে ছিঁড়ে পড়্‌তে চায়? বল তো একে রোধ করি কি দিয়ে? জোর করে যে হাসা চলে না, এবং হাস্‌লেও সে জোরকরা হাসিকে প্রচ্ছন্ন ক'রে কান্নাই বেশী সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা তো তারা বোঝেনা, তাই একটু নকল হাসি হেসে বলি, "কেন আমিতো বেশ আছি।" তাতেই তারা খুসী হয়; আমার বুকের ভিতর যে অহোরহ কিসের আগুন জ্বলছে—তা তারা বুঝ্‌বে কি করে? সেখানে যে চোখের দৃষ্টি পথ খুঁজে পায় না।

নিজের গায়ে যার কাঁটার আঁচড় লাগেনি, বজ্রাঘাতটা তার কাছে ফুলের মধুর স্পর্শ ব'লে মনে হবে—এটা একটা নূতন কিছু নয়। নিজেরটাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে রেখে, তারা হেসে বলে, "ওলো তুই, তো ভাগ্যবতী, —তোর তো সুখের কপাল; তোর স্বামী দেশের কাজে গেছেন—একি তোর কম সৌভাগ্য?" রাগে—দুঃখে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুত না; মনে হোত এই নিয়ে ঝগড়া করি—একবার প্রাণ খুলে। দেশটা কি একা তাঁর নিজের? উদ্ধার হ'লে কি একা তাঁরই হবে, তোমাদের হবে না? এদেশ কি তোমাদের নয়? এমনি সহস্র প্রশ্ন কণ্ঠ পর্য্যন্ত আসে, তারপর বেরোবার পথ না পেয়ে বুকের মধ্যে ছুটোপাটী কর্ত্তে থাকে।

২

সেদিন ওবাড়ীর ললিতা এসে ব'ল্লে, "চল্ সই ঘাটে।" নদীর ঘাট এখান থেকে খানিকটা দূর, মা মোক্ষিকে সঙ্গে দিয়ে আমাদের পঠিয়ে দিলেন।

আমাদের বাড়ীর পেছনের পুকুরপাড় দিয়ে—ভট্‌চায্ বাড়ীর রান্নাঘরের সাম্‌নে দিয়ে এসে বাঁশঝাড়গুলোর অন্ধকার তলা দিয়ে যেতে যেতে নদীর ধারে খোলা মাঠেরভিতর গিয়ে পড়েছি। আমি সবার আগে, সই মাঝে, তারপর মোক্ষি। তখন কি জান্‌তুম ঠিক এম্‌নি মুখোমুখি করেই দাঁড়াতে হবে? তখনই—তার সঙ্গে আমার প্রথম চোখে চোখে দেখা।

নদী যাবার সরু পথটার দুধারে সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা, তারই মাঝে মাঝে ঘেঁটুফুলের গাছ। দুপাশে আরও অনেক রকম রঙবেরঙের ফুল। জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট লতায়-পাতায় জড়ানো, আর তাদেরই ফুলের জংলা মিষ্টি গন্ধ শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্র-পাতে—উদ্ভ্রান্ত হ'য়ে পথিকদের ভুলিয়ে দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু এসবের দিকে যে দৃষ্টি দেবার অবসর ছিল না মোটেই। তাদেরই মাঝে পথ ছেড়ে দিয়ে যিনি একটু দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন—চোখ দুটো গিয়ে প'ড়েছিল ঠিক্ তাঁরই চোখের পর।—কি ছিল সে চোখে বিদ্যুতের মত তীব্র—অথচ মিষ্ট। যার দিকে চাইতে ইচ্ছে করে অথচ চাওয়া যায় না। মাথাটা আমার লজ্জায় ভারে

মুইয়ে পড়ল। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে সচকিত করে সহসা একটা বিদ্যুৎ ছুটে গেল—দেহের ভিতর দিয়ে।

জমিদারের মেয়ে আমি—রূপ বলে আমার মস্ত একটা গর্ব্ব—মস্ত একটা অভিমান ছিল, কিন্তু সেদিন আমার নবোদ্ভূত যৌবনের সমস্ত রূপৈশ্বর্য্য উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছিলুম সেই অপরিচিতের উদ্দেশে।

চলার পথ, আর চলনটা ঠিক্ করে নিতে আমাকে অনেকখানি সময় আর শক্তি ব্যয় করতে হ'য়েছিল। সই খুব একচোট হেসে নিয়ে আমার গা টিপে দিয়ে বল্লে, "কি হ'লো লো তোর?" আমি তাকে ছোট্ট একটু টিপ্‌নী দিয়ে বল্লুম 'যাঃ—'অনেকক্ষণ আর কোন কথা ব'ল্‌তে পর্‌লুম না, কারণ অনেক কথায় আমার মন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

ঘাটে এসে লতিকে জিজ্ঞেস করতে বড়ই লজ্জা করছিল, তবুও অনেক কষ্টে লজ্জার মাথা খেয়ে বল্লুম, "সই, উনি কেরে?"

লতি হেসে বল্‌ল, "ওঁকে জানিস্‌নে—উনি যে আমাদের জ্যোতিদা, আমাদের বাড়ীর পাশেই ওঁদের বাড়ী।" আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লাম, "কই ওঁকে তো কখনও দেখিনি?"

লতি বল্‌ল, "উনি কবছর কল্‌কাতায় থেকে পড়ছিলেন —আর তুমি এসেছ আজ দুবছর মামাববাড়ী থেকে।"

তাঁর বিষয়ে আরও হাজার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছিল —কিন্তু তা পার্লুম না, মেয়ে মানুষের যে বড় লজ্জা!

স্নান করতে ভাল লাগলো না। ফিরিবাব পথে ললিতার সঙ্গে একটা কথাও বলিনি। যা জিজ্ঞেস্ করেছে, খুব সংক্ষেপে তার জবাব দিয়েছি।

ক্ষীরু মালীর কুঁড়ের পাশে এসে ললিতা বল্‌লে, "দেখ্‌ছিস্ কি সুন্দর দুটো পাখী।"—আমি অন্য দিকে চেয়ে, অন্যমনস্কভাবে বল্লুম—"হুঁ—বেশ"

সই যে আমার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল তা তখন দেখিনি,—হঠাৎ তার একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাসে চম্‌কে উঠে মালীর কুঁড়েটার দিকে তাকালুম। একটা মাচা ভরা কচি কচি মোটা লাউয়ের ডগা! তারই পাশে খানিকটা জায়গা জুড়ে মটর শুঁটীর গাছ—ভাবী সবুজ আর সুন্দর ঘন হয়ে গজিয়েছে তার মাঝে ছোট একটা হাঁড়ীর মাথায় একটা মানুষের বিকট চিত্রিত মাথা।

কিন্তু সে পাখীর খোঁজ মিল্‌লোনা—ভাব্‌লুম্ উড়ে গেছে বুঝি। সই বল্‌ল, "এমনি আমাদেরও ভুলে যাবি?" আমি তাড়াতাড়ি ভট্‌চায্ বাড়ীর আঙ্গিণায় এসে উঠলুম —সই অন্যপথে তাদের বাড়ীর দিকে চলে গেল।

বাড়ী এসে মাকে তাঁর কথা বল্‌তেই, তিনি সব বুঝলেন। অনেক কথার পরে বল্লেন, "ওব সঙ্গেই তোব বিয়ে দিব।" তাড়াতাড়ি পবদা ঠেলে পাশের ঘরে পালালুম।

৩

মায়ের অনেক চেষ্টায় তার সঙ্গে আমাব অবাধে মেলা মেশা করবার সুযোগ হয়েছে। বাবার কিন্তু এতে মত ছিল না মোটেই। মা একদিন বুঝিয়ে দিলেন —তাঁর নিজের ছেলে নেই, এ কিন্তু বেশ হবে।— বাবা অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলেন। কিন্তু মা যেমনটী করে তাঁকে বদ্‌লে নিতে চেয়েছিলেন, তেমন বদল তাঁব একটুও হ'ল না। সুখের খাতিরে স্বাধীনতা বিক্রী করে ঘর-জামাই হ'তে তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না।

তাঁর নিজেব বাড়ী, সেই খড়ের ঘর না হ'লে তাঁর সুনিদ্রা হ'তনা—এও ছিল তাঁব এক রোগ। তবু মাস ২।৩ দিন পর একদিন বল্লুম, "মাকে আমাদের এখানে নিয়ে এলে কেমন হয়?" তিনি একটু গম্ভীরভাবে বল্লেন "কেন?"

"ওবাড়ীতে অনেক অসুবিধে,—আমাদের এখানে হয়তো সুখী হ'তে পারতেন"—বলে, উত্তরের অপেক্ষায় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি একটু চুপ করে থেকে হেসে বল্লেন, "নিজের বাড়ী ছেড়ে কি পরের বাড়ী সুখ হয় বীণা! আর আন্‌তে চাইলেই বা তিনি আসবেন কেন?"

যে ঐশ্বর্য্যকে মানুষ দু'হাত বাড়িয়ে আরাধনা কবে, তাই যে আমাদের মিলনের পথে এমনি অলঙ্ঘনীয় ব্যবধানের সৃষ্টি ক'রে তুল্‌বে তা কোনদিন ভাবিনি, মনে হলো ঝেড়ে ফেলে দি এ বিপুল ঐশ্বর্য্য তাঁর ঐ

স্নিগ্ধ প্রশান্ত দৃষ্টির তলায়। এই দিয়ে সবাইকে ভুলানো চলে—কিন্তু যাদের চলে না, তারা যে এর চাইতেও অনেক ভারী দামী।

তিনি প্রতিদিন একবার ক'রে—আমাদের বাড়ী আস্তেন আমাদের বিশেষ অনুরোধের দাবীতে তাঁকে কতখানি ভালবেসেছিলুম তা জানি না, তবে সারাটা মনপ্রাণ যে নিশিদিন তাঁরই পথ চেয়ে ঐ মুহূর্ত্তটীর অপেক্ষায় সজাগ হয়ে থাকত—তাইতেই এক একবার অবাক হয়ে যেতুম। মানুষ না হ'লে মানুষের চলে না —তা জানি,—ঐ একটী বিশেষ মানুষের জন্য কেন এত খানি অস্বস্তি ভোগ কর্‌তে হয় বল্‌তে পারো কেউ তোমরা?

সেদিন তিনি একটীবারও এলেন না। সারাটা রাত কি উৎকণ্ঠা নিয়েই কাটালুম। ঘুম হ'লোনা —কেবলই সে ভাঙ্গাচোরা ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে যেন চোখের সম্মুখে এসে দাঁড়াচ্ছিলেন তিনি।

ধবধবে পা দুখানি তার অনাবৃত। পরিধানে তেমনি মোটা খদ্দর, গায়ে মোটা খদ্দরের জামা, তবুও তো তিনি এ সামান্য পোষাকে পৃথিবীর কারুর চাইতেই কম সুন্দর ছিলেন না। গুচ্ছ গুচ্ছ কোঁকড়ান কেশভার তাঁর ললাটের উপর ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত মুখখানিকে কি একটা স্বর্গীয় দীপ্তিতে ভরিয়ে তুলেছিল।

সকালবেলা একবার লতি এলো। তাকে জিজ্ঞেস কর্‌লাম তাঁর কথা। আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু-খানি চমকে উঠে বল্‌লে, যে সে কিছুই জানে না। ওরে হতভাগিনী,—এই খবরটুকু আজ তুই নিয়ে আসতে পার্‌লিনে তোর সয়ের জন্যে।

তখন অভিমানে, দুঃখে আমার মর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছিল। লতি কি একটা কথা বল্‌তে যাচ্ছিল, আমি বিদ্রোহের স্বরে বলে উঠ্‌লুম "তুই যা, আজ আমার শরীরটা মোটেই ভাল নেই।"

সে কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে থেকে একটুখানি হেসে বেরিয়ে গেল অন্যদিকে। আমি তাড়াতাড়ি দোর বন্ধ করে দিলুম।

মেয়েমানুষের ভিতরটা খুবই নরম—কিন্তু এত দুর্ব্বল তারা! সেদিনের এই দুর্ব্বলতাই একটা দুঃসহ খোঁচার মত আজ আমায় বিঁধছে। আঘাত পেয়ে পেয়ে সবই শক্ত হয়—ভিতরটাও, কিন্তু আমার এই ১৭ বৎসর জীবনে যে ভুল করে কোনদিন ফুলের আঘাতও করেনি কেউ!

দুপুরের পর ললিতা আর একবার এলো। তার মুখ দেখে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল। সে যেন কি কঠিন দুঃসংবাদ ব'য়ে এনেছে আমার জন্যে। কিছু-ক্ষণপরে সে বল্‌ল, "কাল ভোরে তিনি কোন্ একটা গ্রামে স্বদেশী বক্তৃতা দিতে গেছেন—এখনও ফেরেননি।"

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে দোতালায় আমার ঘরে পশ্চিমের জানালাটার ধারে দাঁড়িয়েছিলুম। খোলা জানালার ভিতর দিয়ে অস্তগমনোন্মুখ রবির শেষ বিদায়ের করুণ চাওয়া একটুখানি ম্লান হাসির মত এসে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়েছিল। জানালার গা বেয়ে কতকগুলো কুঞ্জ-লতা দোতালার উপর পর্য্যন্ত উঠে আবার নুয়ে পড়্‌ছে। তাদের গায়ে ছোট ছোট লাল টুক্‌টুকে ফুল, যেন কার প্রতীক্ষায়, কোন অজানা দেশের পানে উদাস ভাবে চেয়ে রয়েছে। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাস এসে তাদের স্পর্শ ক'রে যাচ্ছিল। তারা এক একবার কেন যেন শিউরে উঠছিল। তাদের এমনি ধারা আনন্দ দেখে বুকের বোঝা আরও ভারি হয়ে উঠ্‌ল। হঠাৎ বাইরে থেকে তিনি ডাকলেন—"বীণা।" কি আছে ঐ কথাটুকুর ভিতর,—বল্‌তে পার তোমরা? কই আমিতো লক্ষবার নিজমুখে এ নামটা উচ্চারণ করে দেখেছি। কাণদুটো তো তেমন ব্যাকুল আগ্রহে পাগলের মত একে গ্রহণ কর্‌তে চায় না।

জবাব দেওয়া হ'ল না,—পরদা সরিয়ে দিয়ে একটু সরে দাঁড়ালুম তিনি ঘরের ভিতর এসে দাঁড়ালেন— মুখে তাঁর স্নিগ্ধ মধুর হাস্য।

ওগো নির্ম্মম! ওগো নিষ্ঠুর! নারীর চিরজন্মের সঞ্চিত অশ্রুতেও কি তোমার ও কঠিন হৃদয় অভিষিক্ত হবে না! কথা ফুটলো না। তাড়াতাড়ি স'রে গিয়ে আঁচল দিয়ে চোখ ঢাক্‌লুম।

তিনি একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে তাইতে বসে

পড়লেন। মিনিট খানেক পব মুখেব দিকে চেয়ে বল্লেন "বড্ড জরুবী কাজ ছিল যে,—তাই জানানো হয় নি—যাবাব আগে।" তবুও কোন কথা বল্লুম না।

আজ আমি বুঝতে পাবিনি—একটা কথা। যাব অসাক্ষাতে তাকে কত প্রশ্ন কব্‌বো বলে ভেবে রাখি—কাছে গেলে তাকে কিছু বলা যায় না কেন? কিছু বলতে বেধে যায় কেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বল্‌লেন,—"আচ্ছা একটী দিন দেখা না হলে—" এমন অপবাধীব মত তাকে ত কোন্ দিন দেখিনি। তাঁব গলাব স্বব কেঁপে উঠল চোখ দুটোতে আজ এ কিসেব দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে আমাব মনেব অজ্ঞাতে, গোপনে যেন তাকে কি একটা দিয়ে দিলুম। বাগ ক'বে দূবে স'বে থাকা হ'লনা—অভিমান ভেসে গেল, কি এক নীবব গোপন ইঙ্গিতে।

৪

তখন অসহযোগ আন্দোলনেব ঝাপ্‌টাব দাপটে ইংবেজদল ব্যতিব্যস্ত, তাব চাইতে বেশী ব্যস্ত সহযোগীদেব দল। গোবাব হুঙ্কাব—সার্জ্জেণ্টেব চোখবাঙানী—পুলিশেব কঠোবতা যেন নিবীহ ভাবতবাসীদেব ব্যতিব্যস্ত কবে তুলছিল।

সেদিন আমাদেব গ্রামেব পাশেব গ্রামে ১৫।২০ জন লোক দাঙ্গায় মাবা গেল। যেন একটা বিবাট মৃত্যুব অপদেবতা তাব ক্ষুধিত জিহ্ব বিস্তাব কবে সাবা দেশ ময় ছুটে বেড়াচ্ছিল। তবুও আগুনমুখো পতঙ্গের মত বাঙ্গালী যুবকেবা ছুটে চলেছিল মবণেব কোলে। মৃত্যুব মধুব আহ্বান তাদেব পাগল ক'বে দিয়েছিল—এ যেন তাদেব কত সাধনাব—কত কামনাব।

সেদিন বিকেলে তিনি এলে, মা তাঁব হাত দু খানি ধ'বে কাছে বসিয়ে বল্‌লেন, "দেখ্ বাবা জ্যোতি—ওব ভেতব তোমাব থেকে কাজ নেই।" তারপব অনেক যুক্তি তর্কের পব তাকে বুঝিয়ে দিলেন "ওসব গবীবেব জন্য। যাদের প্রাণেব বিশেষ কোন একটা মূল্য নেই তাবাই যায় ওর ভেতব।"

একবার তিনি মাযেব মুখেব দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "আমিও তো গবীব মা।" মা বল্লেন "ছিঃ বাবা। ওকি কথা? তোমাব জমিদাবী তুমি এখন বুঝে শুঝে নিতে চেষ্টা কব।" হয়ত বল্‌লে তিনি অনেক কথাই মাকে বুঝিয়ে বল্‌তে পার্‌তেন—কিন্তু তাঁর সঙ্গে তিনি কোন তর্কই করলেন না।

সেদিন তাঁব চোখে যে দৃষ্টি দেখেছিলুম—তার পায়েব নীচ দিয়ে শত সহস্র বাজ্য ভেসে গেলেও যে সে মুখ তুলে চাইবে না তা খুবই সত্যি। ভয় তো তাঁব অন্তবে এক ফোঁটাও ছিল না। সংসাবে এব দল লোক আছেন যাঁদেব চোখেব সম্মুখে পৃথিবীব বঙ বদ্‌লে গেলেও তাদেব একটুও বদল হয় না—ইনি ছিলেন সেই দলেব।

বাবা ছিলেন ইংবেজ ভক্ত। বাড়ীব আসবাব পত্রগুলি সবই ছিল ইংবেজী কায়দায় সাজানো। মাঝে মাঝে দু'একজন সাহেব এসে আমাদেব বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ কব্‌তো। আমোদ প্রমোদ ক'বে আবাব চলে যেত।

একদিন বাবা হুকুম কবলেন তাব জমিদাবীব ভিতব স্বদেশী চলবে না—আব যাবা ও সব কব্‌বে—তাদেব শাস্তি ভোগ কব্‌তে হবে।

একথা যখন আমাদেব কাণে এলো, তখন তিনি কাছেই বসে। মাব সঙ্গে এই নিয়েই তাব অনেক কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। মা বেগে বল্লেন, "যে জাত স্ত্রীব আঁচল ছেড়ে নড়্‌তে চায় না তাবাই হবে স্বাধীন—এই তুমি বিশ্বাস কব—"বলেই অন্যদিকে মুখ ফিবালেন।

তাঁব তর্ক করবাব ক্ষমতা কিছু কম ছিল না, কিন্তু আজ তিনি মাব সঙ্গে আব কোন কথাই বল্‌লেন না। কিছুক্ষণপবে আমাব দিকে মুখ ফিবিয়ে বল্‌লেন বিলাতী শাড়িখানা বদ্‌লে আস্‌তে। ভেতরে যাব বিলাতী বাইবে তাকে দেশী দিয়ে ঢাক্‌লে কি হবে? অন্তবেব ভিতবটাকে যে দেশী কব্‌তে পাবিনি। সেখানে একখানা বিলাতী শাড়িব আঁচল বাতাসে পাল তুলে দিয়ে উড়্‌ছিল যে। এর উপব আবার মাব মুখেব দিকে চেয়ে, আমি তাঁব কথাটাকে সেদিন অগ্রাহ্য করলুম।

যে ঐশ্বর্য্যেব অহঙ্কাবে তার কথাটাকে একদিন

অবহেলা করে—বিলাসিতায় বুক ঢেকে রেখেছিলুম—আজ তাই একটা দুঃখের পাহাড় হ'য়ে বুক জুড়ে ফেলেছে। কবে যাবে আমার এ দুর্ব্বহ বোঝা।

দু'দিন হ'ল তিনি একটীবারও আসেন নি। পথ চেয়ে চেয়ে শ্রান্ত হয়ে গেছি—তবুও তার দেখা নাই। একটী মুহূর্ত্তও চোখ বুজে থাকা চ'ল না—মনে হয় বুঝি সে এসে ফিরে গেল। তাই আবার চোখ মেলে চেয়ে থাকি—ঐ পথটার পানে। ঐ পথে তার যাওয়া আসা বেশী হ'ত, এখান থেকে ঐ জানালার ধারে দাড়িয়ে আমি সব দেখ্‌তে পেতুম।—বিছানাটা টেনে এইবারে সরিয়ে নিয়েছি—দুপুরে ঘুমুতে খুব চেষ্টা করেছি, পারছিনে। আচ্ছা,—চেয়ে চেয়ে কি ঘুমুনো যায় না। না, চোখের পাতা দুটো বারবার ভারে ভেঙ্গে পড়্‌তে চায় তবুও জোর করে চেয়ে আছি। দিলুম জানালাটা বন্ধ করে,—আবার কি ভেবে তাড়াতাড়ি খুলে দিলাম। পথটার একটুখানি মাধবীলতায় আড়াল করে রেখেছিল—দিলুম সে গুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলে। সে গুলো কত আদরের কত যত্নের ছিল আমার তা তোমরা কেউ জাননা, বুঝতেও পার্‌বে না। উপরের ঘরের জানালা থেকে মুর্চ্ছিতের মত গিয়ে পড়ল সেগুলো—একেবারে নীচে।

কেন একটা মানুষের জন্য—মানুষ এমন হয়ে যায়। ক্ষুব্ধ সিন্ধুর উন্মাদ ঢেউয়ের মত এতটা দুঃখ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে বুকের তীরে আঘাত করে—সমস্ত দেহ আর মনের রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিয়ে দেয়।

এমন সময় লতি এলো। তাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বল্‌লাম, "সই, কই সে?" সে চোখ মুছে বল্‌ল, "তোমার সাথে তার এখন বনবে না—সে চ'লে গেছে। সে যে ভলান্টিয়ার।"

৫

তারই প্রতীক্ষায় বসে আছি। লতিকে তিনি বলে গেছেন, যেদিন আমি সবার উপরে নিজের দেশকে ভাবতে পারব, যেদিন আমি দেশের দেওয়া সকল জিনিস মাথ পেতে নিতে পার্‌ব—সেদিনই আবার তার দেখা পাব। সে আদেশ আমি কতদূর পালন করেছি তা জানিনা—তবে কেমন যেন অনুভব কর্‌ছি—তাঁর ফিরে আসবার সময় হয়েছে।

অনেকদিন পর আবার আজ ভট্‌চায বাড়ীর উঠান দিয়ে, ঐ অন্ধকার বাঁশবনের নীচ দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে নদীর ধারে খোলা মাঠের ভিতর এসে পড়েছি। এই পায়ে চলার সরু পথটা বেঁকে ক্ষ্যাপামালীর কুঁড়ের সুমুখ দিয়ে নদীর ঘাট বেঁকে, বেঁকে ঐ বনের ভিতর গিয়ে কোথায় শেষ হয়েছে জানি না। এই সেই জায়গাটা, যেখানে তার সঙ্গে আমার প্রথম দৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল—এখানেই একদিন তার দেখা পেয়েছিলাম,—আবার কবে তার দেখা পাব?
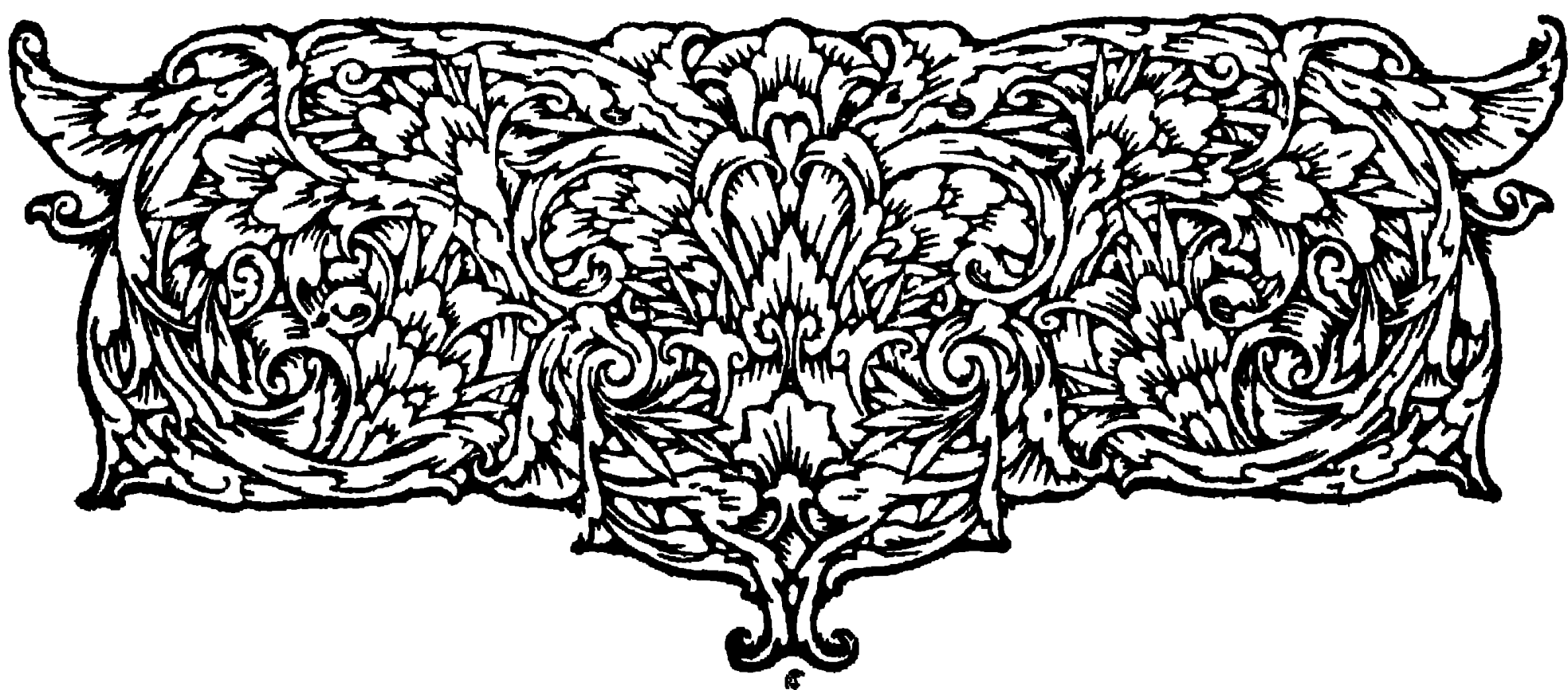
জাতি ও চরিত্র গঠনে প্রকৃতির প্রভাব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

গত বারে আমরা বলিয়াছি, প্রকৃতিব প্রাচুর্য্যের উপব যে সভ্যতার ভিত্তি তদপেক্ষা, মানবের শক্তিমত্তার উপব স্থাপিত সভ্যতা দীর্ঘকাল স্থায়ী। জীবন-সংগ্রামে দুর্ব্বল মরিবে অথবা বাঁচিলেও অতি হীনাবস্থায়, শক্তিমানেব পদানত অবস্থায় অস্তিত্ব রক্ষা করিবে, ইহাই প্রকৃতিব নিয়ম। এই নিয়মেই বিশ্ব-সংসাব চলিয়া আসিয়াছে, চলিতেছে এবং চলিবে। ভূমির উর্ব্বরাশক্তির একটা সীমা আছে, বৈজ্ঞানিক উপায়ের সাহায্য ব্যতিরেকে উৎপাদিত শস্য-সামগ্রীর পরিমাণও সীমাবদ্ধ। কিন্তু যতদূব জানিতে পারা গিয়াছে মানবের বুদ্ধি অসীম, এইরূপ কথা বলা চলে না যে মানব মস্তিষ্কের ক্ষমতা এই সীমা-রেখা পর্য্যন্ত যাইবে এবং তদতিরিক্ত নহে। পঞ্চবিংশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা কল্পনার অতীত ও বিশ্বরাজ্যে একান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছে, মানব-মস্তিষ্কের শক্তিতে আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন কবিতেছে। এই মানব মস্তিষ্ক বাহ্যপ্রকৃতিব উপর আধিপত্য করিতেছে। তাহাকে নিজ প্রয়োজনে লাগাইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দতা ও সভ্যতার উৎপাদন বৃদ্ধি কবিতেছে। দেখা যাইতেছে, জলবায়ুর প্রভাব, মানুষের শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাব শ্রমক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া ও বিবিধ উপায়ে সমাজের ধনবৃদ্ধিব সাহায্য কবিয়া, মানুষের সভ্যতা বিস্তারের যতটা আনুকূল্য করে, প্রকৃতিদত্ত উপাদান অর্থাৎ প্রকৃতিব নিয়মে ভূমি হইতে স্বতঃ উৎপন্ন খাদ্য-সামগ্রী মানবসমাজেব সম্পদ্ বৃদ্ধির ও সভ্যতা বিস্তারের পক্ষে ততটা অনুকূল করে না।

ভূমি ও জলবায়ু মানবজাতির ধনবৃদ্ধি সম্বন্ধে কতটা কার্য্যকরী তাহা এই পর্য্যন্ত বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু শুধু ধনাগম হইলেই জাতির উন্নতি হইবে না। সঞ্চিত ধনের রীতিমত বিভাগ হওয়া চাই; সমাজের উচ্চ-নীচ সর্ব্ব স্তবে এই সঞ্চিত ধন সমান অনুপাতে ছড়াইয়া না পড়িলে মানবেব দেহ-যন্ত্রেব স্থান বিশেষে অতিবিক্ত সঞ্চিত শোণিতবাশিব ন্যায় সমাজ-দেহেব পীডারই কাবণ হইবে। অধুনাতন কালে এই উন্নতিব যুগে, ধনেব সমানুপাতিক বিভাগ সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত-গণেব নিকট একটা কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁডাইয়াছে। কিন্তু সভ্যতাব শৈশব অবস্থায় এই সমস্যা তেমন কঠিন আকাব ধাবণ কবে নাই। তখনকাব দিনে ধনাগম যে প্রাকৃতিক নিয়মেব অধীনে হইত, সমাজেব বিভিন্ন স্তবেব মধ্যে ধনেব বিভাগ বণ্টনও সেই নিয়মেব বশে ঘটিত। কথাটা একটু বিশদরূপে বুঝাইবাব চেষ্টা কবিব। মানব-সভ্যতাব যে অবস্থায় ধনসঞ্চিত হইতে আবম্ভ কবিযাছে, সে অবস্থায় এই সঞ্চিত ধনবাশি দুই শ্রেণীব লোকের মধ্যে সঞ্চাবিত হইয়া পড়িবে, প্রথম—যাহারা শ্রমিক, দ্বিতীয় যাহাবা শ্রমিক নহে। শ্রমিকেব দল সংখ্যায় বেশী, দ্বিতীয় দল সংখ্যায় কম, কিন্তু তুলনায় ক্ষমতা-শালী। এই প্রথম দলই, দ্বিতীয় দলেব কর্ত্তৃত্ব ও বুদ্ধির দ্বারা পবিচালিত হইয়া, ধন-সংগ্রহেব কার্য্য কবিবে। প্রথম দলেব পবিশ্রমেব পুবস্কাব বেতন বা মজুবী, দ্বিতীয় দলেব কর্ত্তৃত্বও বুদ্ধির পুবস্কাব, ব্যবসায়ে লাভ (profit)। সামাজিক সভ্যতা আরও একটু অগ্রসব হইলে আর একদল দেখা দিবেন তাঁহাদেব কার্য্য প্রথম ও দ্বিতীয় কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তাঁহাবা খাটিবেন না বা খাটাইবেনও না, তাঁহারা কেবল "পোঁটলা বাঁধিবেন।" এক কথায় তাঁহারা হইতেছেন "মহাজন।" তাঁহাদের কার্য্য, যাঁহারা খাটাইবেন, তাঁহাদিগকে সঞ্চিত অর্থ ধার দেওয়া এবং বিনিময়ে ব্যাজ বা সুদ আদায়। যাহা হউক সে অনেক পরবর্ত্তী কালের কথা, আমবা বক্তব্য হইতে একটু দূরে আসিয়াছি,—আমাদেব বক্তব্য বিষয়

এই ;—শ্রমিক ও মনিব এই দুই শ্রেণী মধ্যে ধন-বিভাগও প্রাকৃতিক নিয়মের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত। আমরা দেখিতেছি মজুরী হইতেছে পরিশ্রমের মূল্য; দ্রব্যের মূল্যের ন্যায়, এই পরিশ্রমের মূল্যও বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে। "চাহিদা" অপেক্ষা "জোগান" বেশী হইলে যেমন জিনিষের দাম সস্তা হয়, কোন দেশে কর্ম্মের অপেক্ষা শ্রমিকের সংখ্যা বেশী হইলে মজুরীও সেইরূপ সস্তা হইবে। সুতরাং মোটামুটি কথাটা এই দাঁড়াইতেছে, জন-সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির উপর মজুরীর অল্পতা-আধিক্য নির্ভর করে।

এখন দেখা যাউক কি কি প্রাকৃতিক কারণ, দেশের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির অনুকূল, তাহা জানিতে পারিলেই আমরা শ্রমিক সংখ্যার প্রয়োজনাতিরিক্ত বৃদ্ধির এবং তাহার ফলে মজুরীর অল্পতার কারণ জানিতে পারিব। খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির নিকট সম্বন্ধ। দুইটী দেশের মধ্যে অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমান থাকা সত্ত্বেও একটী দেশে যদি খাদ্য সুলভ এবং প্রচুর হয়, এবং অপর একটী দেশে তাহা দুর্লভ এবং মহার্ঘ হয়, তাহা হইলে শেষোক্ত দেশ অপেক্ষা প্রথমোক্ত দেশের লোক সংখ্যা অধিকতর দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইবে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। সুতরাং লোক বৃদ্ধির ফলে তদ্দেশের শ্রমিকের মজুরীও অপেক্ষাকৃত সুলভ হইবে। তবেই, ঘুরিয়া ফিরিয়া, আমাদিগকে আবার সেই গোড়ার কথাটার অর্থাৎ **খাদ্যের** কাছে ফিরিয়া আসিতে হইল। কি কি অনুকূল অবস্থায়, কি কি প্রাকৃতিক কারণে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণের তারতম্য ও প্রকার ভেদ হইয়া থাকে?— এই প্রশ্নের উত্তর আমাদিগকে পাইতে হইবে; এবং জৈবরসায়ন শাস্ত্রের কল্যাণে আমরা এ প্রশ্নের সঠিক উত্তরও পাইব।

মানব-দেহ রক্ষার জন্য ভুক্ত খাদ্যের কার্য্য দুইটী (১) উত্তাপ প্রজনন (২) "টিসু-"ক্ষয় নিবারণ। কার্ব্বন (অঙ্গার) প্রধান খাদ্য, গৃহীত বায়ুর যোগে দেহের মধ্যে প্রজ্জলন ক্রিয়া ঘটায় এবং তাহাতে দৈহিক উত্তাপ সংরক্ষিত হয়। আর নাইট্রোজেন-(যবক্ষার)-প্রধান খাদ্য জীর্ণ হইয়া দৈনিক জীবনের শ্রম-জনিত;—টিসু-ক্ষয় পূরণ করিয়া মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীর দৈহিক উত্তাপ যত সহজে সংরক্ষিত ও উৎপাদিত হয়— শীতপ্রধান দেশবাসীর তত সহজে হয় না। সেজন্য প্রকৃতির বিধানে শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীর পক্ষে কার্ব্বণ-ঘটিত খাদ্য যত বেশী আবশ্যকীয় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীর ততটা নহে এবং শেষোক্ত দেশের লোকের টিসু-ক্ষয় নিবারণ-পূরণের উপযোগী খাদ্যেরও তত প্রয়োজন নহে কেন না, দৈহিক উদ্যম-প্রকাশ ও নড়াচড়া তাহাদের কম করিতে হয় বলিয়া তাহাদের টিসু-ক্ষয় সেরূপ দ্রুত ঘটে না। অতএব গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সঞ্চিত খাদ্যের খরচ শীতপ্রধান দেশের অপেক্ষা তুলনায় কম বলিয়া, তথাকার প্রজা-বৃদ্ধিও সেই অনুপাতে বেশী হইবে।

এইবার শীত-প্রধান দেশের কথা ধরা যাউক। এই সকল দেশের লোক শুধু যে গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের লোকের চেয়ে বেশী খায়, তাহা নহে তাহাদের খাদ্যও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের খাদ্য অপেক্ষা মহার্ঘতর অর্থাৎ উৎপাদন ও সংগ্রহ অধিকতর শ্রম-সাপেক্ষ। কেন, তাহার কারণ বলিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি খাদ্যের দুই কার্য্য;—উত্তাপ রক্ষা ও টিসু-ক্ষয় নিবারণ। আমাদের প্রশ্বাসের সহিত টানিয়া লওয়া বায়ুর উপাদান অম্লজান, ভুক্ত খাদ্যের উপাদানভূত অঙ্গারের সহিত যুক্ত হইয়া রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা দৈহিক উত্তাপ সৃষ্টি করে। এই অম্লজান ও অঙ্গারের মিলন একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে হইয়া থাকে, নতুবা প্রজ্জলন হইবে না, উত্তাপ জন্মিবে না। যে অনুপাতে অম্লজান লইবে, ঠিক সেই অনুপাতে অঙ্গার লইতে হইবে। শীতের প্রভাবে শীতপ্রধানদেশবাসীর দৈহিক উত্তাপ যত বেশী কমিবে তত বেশী তাহাকে অম্লজান ও অঙ্গার দেহের মধ্যে পুরিতে হইবে অর্থাৎ তত বেশী পরিমাণে অঙ্গার (কার্ব্বণ)-প্রধান খাদ্য লইতে হইবে। আর একদিক দিয়াও প্রাকৃতিক নিয়মে শীতপ্রধান দেশের লোক বেশী অম্লজান দেহের মধ্যে পুরিবে, তাহা এই—শীতপ্রধান দেশের বায়ুমণ্ডল খুব ঘন, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পাৎলা। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে একটান প্রশ্বাসের সঙ্গে যতটা অম্লজান দেহের ভিতর ঢুকিবে শীতপ্রধান দেশের লোকে বায়ুর ঘনত্বের কারণে সেই একটানে তাহার অপেক্ষা বেশী অম্লজান বাষ্প দেহের ভিতর প্রবেশ করাইবে। আবার

শীতাধিক্যের জন্য নিশ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অপেক্ষা ঘন ঘন হইবে, সে কারণেও অধিক মাত্রায় অম্লজান শীতপ্রধান দেশের লোকের শরীরে ঢুকিবে। এই দুই প্রাকৃতিক কারণে যেমন শীতপ্রধান দেশের লোকেরা প্রশ্বাসের সঙ্গে অম্লজান বাষ্প অধিক গ্রহণ করিবে, ঐ গৃহীত অম্লজানের পরিমাণের সহিত অনুতাপ ঠিক রাখিবার জন্য তাহাকে বেশী মাত্রায় কার্ব্বণঘটিত খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে,—নতুবা, অনুপাত ঠিক না হইলে রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যাহত হইবে, উত্তাপ জন্মিবে না, দেহও টিকিবে না।

এক্ষণে আমাদের আলোচনার ফল এইরূপ দাঁড়াইতেছে:—যে দেশের শীত যত বেশী সে দেশের অধিবাসীর খাদ্য সামগ্রীও তত বেশী অঙ্গার প্রধান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মেরুর নিকটবর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসীদের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। সেখানকার এক এক জন "এস্‌কুইমো" তের চৌদ্দ সের পর্য্যন্ত তিমির মাংস ও চর্ব্বিতে এক এক বারে আহারে উদর পূর্ণ করে। কিন্তু একজন এসকুইমোর খাদ্যের সিকি অংশ একজন ভারতবাসীকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। উষ্ণমণ্ডলের লোকের প্রধান খাদ্য কি? কার্ব্বন প্রধান খাদ্য নহে, নাইট্রোজেন বা অক্সিজেন প্রধান খাদ্য, চাউল, দাল, তরি-তরকারী, ফল যাহা আমরা ভারতবাসীরা খাইয়া জীবন ধারণ করি। প্রকৃতির অদ্ভুত নিয়মে এই কার্ব্বণ প্রধান খাদ্য সংগ্রহ অধিক শ্রম এবং ব্যয়সাপেক্ষ এবং বিপদ-সঙ্কুল। আর অম্লজান বা যবক্ষারজান-প্রধান খাদ্য সহজে এবং সুলভে প্রাপ্তব্য, প্রকৃতি যত্র তত্র ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন একটু কষ্ট করিয়া মাটী খনন কর—মূল মিলিবে শস্য জন্মাইতে পারিবে। গাছে ওঠ,—ফল পাড়িয়া খাইবে কিন্তু একটা তিমি মাছ, কি একটা হরিণ শীকার কত পরিশ্রমজনক, কত বিপদপূর্ণ কাজ। প্রকৃতিদেবী মানব-প্রকৃতিকেও সেই খাদ্য সংগ্রহের উপযোগী করিয়া গড়িয়াছেন। শীত-প্রধান দেশের উপযোগী খাদ্য, প্রাণী, এমন-কি হিংস্রপ্রাণী হনন করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে! শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীও সেজন্য বীর্য্যশালী, দুঃসাহসিক, হিংস্রপ্রকৃতি, উগ্রস্বভাব। আবার দেখুন গ্রীষ্মমণ্ডলের খাদ্য শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন্যের ন্যায়, তদ্দেশবাসী অনায়াসলভ্য সেজন্য তিনি নির্বীয্য, শান্ত-প্রকৃতি, কোমলহৃদয়। তিনি বলিবেন —"স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে। অস্য দগ্ধো দরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ।"

এখন আমাদের সিদ্ধান্তগুলি এইরূপ দাড়াইল:—জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির উপর মজুরীর কমবেশী নির্ভর করিতেছে. শ্রমিকের সংখ্যা অনাবশ্যকরূপে বৃদ্ধি পাইলে মজুরী কমিবে, শ্রমিক সংখ্যা কমিলে মজুরী বাড়িবে। জনসংখ্যা, অন্যান্য কারণের মধ্যে, খাদ্যের উপর নির্ভর করে, খাদ্যের প্রাচুর্য্য ঘটিলে, প্রজাবৃদ্ধি,—অভাব ঘটিলে, জন্মহ্রাস ও মৃত্যুহার বৃদ্ধি ঘটিবে। জীবন রক্ষার উপযোগী খাদ্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অপেক্ষা শীতপ্রধান দেশে দুর্লভ, শুধু দুর্লভ নহে শীতপ্রধান দেশে অধিক পরিমাণে আবশ্যক, সেজন্য সেই দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায় ঘটে। অল্প কথায় বিষয়টী প্রকাশ করিতে হইলে বলিব শীতপ্রধান দেশে সাধারণতঃ মজুরীর বৃদ্ধির দিকে গতি, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গতি হ্রাসের দিকে। আবার, কোন দেশের শ্রমিকের পারিশ্রমিকের হার অস্বাভাবিকরূপে কম হইলে, অর্থনীতির দিক দিয়া বুঝিতে হইবে যে সে দেশের ধনের বিভাগের সমতা ঘটে নাই—সুতরাং উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় শক্তির ও সামাজিক শক্তির অধিকার বণ্টনে অসমতা ঘটিয়াছে। মোটের উপর দেখা যাইতেছে কি জাতি গঠন, কি রাষ্ট্র-গঠন সকল বিষয়েই প্রকৃতির প্রভাব ওতঃপ্রোতভাবে বিদ্যমান।

মহাত্মাগান্ধীর

ইয়ং ইণ্ডিয়া

পত্রিকার সার সঙ্কলন

আবার সেই বাঙ্গালা ঃ—এবার বঙ্গদেশ-যাত্রা সম্বন্ধে আমি মনে মনে অনেক আশা পোষণ করিতেছি। বাঙ্গালীর কল্পনা শক্তি অতুলনীয়, বাঙ্গালী জাতি যেমন তীক্ষ্ণধী তেমনই স্বার্থত্যাগী—আজ বঙ্গদেশ হইতে অজস্র লোভনীয় পত্র আসিতেছে, যদি এইদেশ ভ্রমণের ক্লান্তি সহ্য করিবার মত আমার স্বাস্থ্য দৃঢ় হইত তবে বড়ই সুখের হইত—কাথিওয়াড় ভ্রমণকালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়া পর্য্যন্ত এখনও নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারি নাই। সেইজন্য উদ্যোগকারীদিগের প্রতি সানুনয় অনুরোধ, যেন তাঁহারা যতদূর সম্ভব আমার দৈনিক শ্রম লাঘব করিবার চেষ্টা করেন। আমার ইচ্ছা যে ভ্রমণকালীন কার্য্যগুলি যাহাতে সুশৃঙ্খলে সমাধা হয় ও বৃথা সময় নষ্ট না হয় সেদিকে তাঁহারা যেন দৃষ্টি রাখেন। শুনা যায় বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধি তেমন তীক্ষ্ণ নয় এই অভিযোগ খণ্ডনের তাঁহাদের এই উপযুক্ত অবসর—যদি তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ, প্রখর কল্পনা শক্তি এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত উপযুক্ত ব্যবসায় বুদ্ধি মিলিত হয় তবে শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তাঁহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আমি চাই, তাঁহারা আমার প্রশংসাপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ না করিয়া তাঁহাদের নিজেদের কার্য্য বিবরণী এবং ক্রমিক উন্নতি সম্বন্ধে বিবরণ পাঠ করিয়া আমাকে সুখী করেন। কার্য্য বিবরণীতে এই সমস্ত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইলে ভাল হয়; যথা প্রত্যেক কমিটির অন্তর্গত স্থানে কতগুলি করিয়া চরকা চলিতেছে, কত গুলি সভ্য আছে, সকলেই সুতা কাটেন কি না প্রত্যেক চরকায় কত সুতা উৎপন্ন হয়, কয়খানি তাঁত আছে, কত খদ্দর কত সুতা প্রস্তুত হয় ইত্যাদি। তাঁহাদের প্রতি আর একটী অনুরোধ তাঁহারা যেন অভিভাষণ পত্রখানি সাধারণ কাগজে বা এক টুকরা খদ্দরে লিখিয়া আমার হস্তে প্রদানে—স্বর্ণ রৌপ্যের পত্রাধার দিয়া বৃথা অর্থব্যয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই—বৃথা আড়ম্বরের পক্ষপাতী আমি কোনকালেই নই। আমি চাই আমার প্রাণ দিয়া তাঁহাদের প্রাণের কথা শুনিতে—যেখানে হৃদয়ের সুখ দুঃখের বিনিময় হয় সেখানে বাহ্যাড়ম্বর একটা মস্ত বাধা—আমি চাই তাঁহাদের কার্য্য দেখিতে, তাঁহাদের বাক্যোবচ্ছটায় মুগ্ধ হইবার জন্য আমি এত পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছি না।—সাদাসিধা খদ্দর সোণা রূপার চেয়ে আমার কাছে লক্ষগুণে আদরনীয়।

এখনও কোন নিদর্শন নাই ঃ—দাক্ষিণাত্যে প্রাপ্ত বহু অভিভাষণ পত্রের মধ্যে একটীর কিয়দংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহা এই :—বার্দ্দোলিতে আপাততঃ কার্য্য স্থগিত করা সত্ত্বেও আমাদের মনে আশা আছে যে আপনি অদূর ভবিষ্যতে আমাদের পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে পরিচালিত করিবেন এবং আমরাও এই লোভী স্বার্থপর রাজশক্তির নিকট হইতে, 'সার্ব্বজনীন আইন অমান্য ও অসহযোগ' দ্বারা স্বরাজ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব।

আমার বার্দ্দোলির অভিমত শ্রবণে অনেকেই নিরাশ হইয়াছেন এবং অনেকে মনে করেন যে এই অভিমত প্রকাশে আমি একটী মারাত্মক ভুল করিয়াছি। আমি রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুপযুক্ত ইহাই তাহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু আমি মনে করি যে এই পন্থা

অবলম্বন করিয়া আমি দেশের প্রভূত হিতসাধন করিয়াছি এবং ইহাই আমার রাজনৈতিক পরিণামদর্শিতার একটা প্রধান দৃষ্টান্ত। তখন যে ভাবে আন্দোলন চলিয়াছিল তাহাতে যদি আমরা জয়ী হইতাম তাহা হইলে আমাদের সে জয় চিরস্থায়ী হইত না, অথচ তাহার ফলে রাজশক্তি আবার নূতন উদ্যমে স্বীয় ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া স্থাপন করিত, বর্দ্দোলিই তাহাকে সে সুযোগ দেয় নাই।

যদি আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে নামি তবে আমাদের এখন হইতেই এমন প্রস্তুত হইতে হইবে, যাহাতে আমরা শেষ পর্য্যন্ত লড়িতে পারি নতুবা জয়ের আশা বৃথা। আর ইহা আমাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে এখনও ভারতের অদৃষ্টাকাশে এমন কোন নিদর্শন পাই নাই যাহাতে আশা করিতে পারি যে সার্ব্বজনীন আইন অমান্য আন্দোলন ফলবতী হইবে। তাহার প্রথম কারণ আন্দোলন চালাইবার জন্য কর্ম্মীর অভাব, দ্বিতীয় আমরা এপর্য্যন্ত অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত যেটুকু সহযোগ করিয়াছি তাহা পর্য্যাপ্ত নয়। তাহারাই এ আন্দোলনের প্রাণ! তাহাদের সহিত সর্ব্ববিষয়ে ঘনিষ্ঠ ভাবে নিজেদের জড়িত করিতে না পারিলে জয়ের আশা সুদূরপরাহত। যেদিন 'তোমরা' ও 'আমরা' এই ভাব বিলুপ্ত হইবে, যেদিন সবাই 'আমরা' হইবে, যেদিন সকলেই একমন একপ্রাণ হইয়া এই আন্দোলনে যোগদান করিবে সেদিন আইন অমান্য করার আর প্রয়োজন হইবে না। সেদিন আর কি করিয়া জয়লাভ হইবে, তাহা ভাবিতে হইবে না সেদিন জয়শ্রী আপনি আসিয়া বিজয় মাল্য জাতির গলায় পরাইয়া দিবেন। ইহার পূর্ব্বে চাই আমাদের মনের দৃঢ়তা, নতুবা আইন অমান্য সম্ভব নয় আজও সে দৃঢ়তা আমি দেখিতে পাই নাই সুতরাং এখন আইন অমান্য করিতে চেষ্টা করিলেই রাজশক্তির সহিত ভীষণ সংঘর্ষ হওয়াই সম্ভব তাহা হইলেই অহিংস নীতির পরাভব—আর অহিংসভাবে কার্য্য করিতে না পারিলে আমাদের আশা কখনও সফল হইতে পারে না। এখন এই মনের দৃঢ়তা আনিতে সক্ষম কেবলমাত্র—চরকা। চরকাই অশিক্ষিতের সহিত শিক্ষিতের মিলনের একমাত্র উপায়, সহযোগিত্ব স্থাপনে ইহা পৃথিবীতে এক অভিনব পন্থা—ইহা অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে আত্মনির্ভরতা আনিয়া দিবে—ইহার গতি অপ্রতিহত—ইহা পবিত্রতার চরম নিদর্শন—ইহা দারিদ্র্যের গর্ব্ব—ভারতের উন্নতির পথে একমেবাদ্বিতীয় উপায়!

নৈরাশ্যের আবশ্যক নাই—চরকা যতদিন আছে ততদিন আমি নিরাশ হইব না। ইহা অনেক অত্যাচারের ঝঞ্ঝাঘাত সহ্য করিয়াছে, আজ ও করিবে—সত্য ও অহিংসা আমার যুদ্ধের প্রধান উপকরণ। এখন সার্ব্বজনীন এবং ব্যক্তিগত ভাবেও আইন অমান্য সম্ভব নয় কারণ আমাদের ভিতরের বন্ধন শিথিল। চরকাসেবী ছুঁৎ-মার্গ-পরিহারকারী, ও হিন্দু মুসলমানে ঐক্য স্থাপনকারী সকলকেই প্রথমতঃ অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে তারপর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াই বিধেয়।

অতৃপ্ত

শ্রীরামেন্দু দত্ত

একি আমায় দিয়েছ গো—
আমায় সদাই ভুলায় এ!
দুঃখের জ্বালা, সুখের হাসি,
ফুলের মালা দুলায়ে!

সংসারের এ অট্টরোলে
হৃৎ-কমল কি পক্ষ খোলে?
দাও তাহে ও কমল কোমল
করের পরশ বুলায়ে!

আর মায়াবী কোরোনাক
আমার সাথে ছলনা,
কেমন করে' যোগ্য হব,
তাই আমারে বল না!

আমায় তোমার করে' আনো,
টানো, তোমার পায়ে টানো,
মন যে আমার চায়নাক আর
রইতে পোষা, কুলায়ে।

কাজের কথা

জার্ম্মানীর "গৌরীশঙ্কর অভিযান" ঃ—আল্পাইন ক্লাব নামে জার্ম্মাণীতে পাহাড় চড়িয়েদের একটা দল আছে, তাঁদের ভাবী ইচ্ছে হয়েছে যে তাঁরা একবার হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে উঠবার চেষ্টা করবেন—সেজন্য তোড়জোড়ও খুব হচ্ছে, তবে ইংরাজদের হুকুম এখনও লওয়া হয় নাই। যদি হুকুম যোগাড় হয় তবে তাঁরা ভিনিসে এসে ২রা জুলাই সেখান থেকে ভারতবর্ষে রওনা হবেন। এঁরা নেপালের দিক থেকে উঠিবার চেষ্টা করিবেন। এখন কথাটা হচ্ছে এই যে ই রাজেরা এ হুকুম দেবেন কি না, কারণ এজন্য তারা অনেকবার চেষ্টা করেছেন, অনেক অর্থ ও প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, এবং অকৃতকার্য্যও হয়েছেন সুতরাং তাঁরা নিজেরাই এ সম্বন্ধে আবার চেষ্টা না ক'রে কি অপরকে সে সাফল্যের গৌরব লাভ করিবার সুবিধা করিয়া দিবেন। টাইমস্ তো এরই মধ্যে বেসুরা ধরিয়াছেন। এখন দেখা যাক ফলে কি দাঁড়ায়।

খাঁটী দুগ্ধ ঃ—বর্ত্তমান সভ্যতার অন্যতম চিহ্ন হচ্ছে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, যদিও সভ্যতার নীতি পুস্তকে এ সকল নিবারণের জন্য আইন আছে তথাপি ঐ আইনের ফাঁক দিয়ে ভেজাল জিনিস এমন চলে যে, খাঁটী জিনিস পাবার আর উপায় নাই বল্লেই চলে। তবে এই সব আইন-কানুনের বলেই আবার ভেজাল জিনিস বেশ চড়াদরেই বিক্রী হয়। দুধ, ঘি, তেল, আর তৈরীখাবারেই ভেজালের প্রাবল্য খুব বেশী। এগুলি নিবারণের ভার আছে কর্পোরেশনের হাতে, তাঁদের একটী স্বাস্থ্য-বিভাগ আছে, তাঁরাই এ সকল দেখেন-শুনেন বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু বাজারে জিনিস কিনিতে যাইলে তো মনে হয় না যে স্বাস্থ্যবিভাগ ব'লে কিছু একটা আছে। কর্পোরেশন কি ইচ্ছা কর্লে এ বিষয়ের সুব্যবস্থা কি কর্ত্তে পারেন না? কর্ত্তারা কি মনে করেন যে গোটা কতক ডাক্তার মাইনে করে রাখলেই আর হপ্তায় হপ্তায় মিউনিসিপ্যাল কোর্টে ফাইন আদায় হলেই তাঁদের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হয়ে গেল। স্বরাজ্যদলের হাতে কর্পোরেশন আসবার পরও যদি সাধারণের মঙ্গল-জনক কোন কাজ না হয়, তবে কেমন করে বুঝা যাবে যে এই দলটী দেশবাসীর মঙ্গলামঙ্গলের ভার নেবার যোগ্য হয়েছেন। সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে খাঁটী দুগ্ধ সরবরাহের জন্য যেসব কঠোর নিয়ম কানুন হবার ব্যবস্থা হচ্ছে, সেগুলি আলোচনা করে দেখে, এখানে তা চল্‌তে পারে কি না ও তার ফল সত্যই শুভ হয় কি না একবার দেখা উচিত। পয়সা দিয়ে আর এমন করে বিষ কিনে খাওয়া চলে না—সহিষ্ণুতারও তো সীমা আছে।

— —

ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি এচ্ ডি। ১৬ বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করার পর সম্প্রতি ভারত সরকারের নিকট স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি পেয়েছেন। শ্রীযুক্ত দত্ত যুগান্তরের সম্পাদক ছিলেন। যুগান্তরের মামলায় এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করার পর, ১২০৯ সালে আমেরিকায় গমন করেন এবং তথায় ৫ বৎসর কাল অধ্যায়ন করিয়া এম-এ, উপাধি লাভ করেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি ইউরোপ গমন করেন। গত কয়েক বৎসর হইতে তিনি নবদেহ-বিজ্ঞান অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন, এবং ঐ বিষয়ে বার্লিন বিশ্ববিত্থালয় হইতে পি-এচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন।

ডাঃ দত্ত ১৮৮০খৃঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন বর্ত্তমানে তাহার বয়স ৪৪ বৎসর। তিনি

রঙ্গালয়

ষ্টার থিয়েটার ঃ—গত শনিবার ইঁহাদের 'জনা' অভিনয়ে ভূমিকার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। অহীন্দ্রবাবু রেঙ্গুন যাওয়ায় প্রবীরের ভূমিকা অভিনয় করেন 'দানী'বাবু; এ ভূমিকায় দানীবাবুর যে অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা ছিল প্রৌঢ়ত্বেও সে প্রতিষ্ঠা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এবং make-up বা সজ্জাকৌশলে বয়স যে সত্যই ঢাকা যায় তাহাও সেদিন সাধারণে প্রমাণিত হইয়াছে। এরপর পরশ্রীকাতরের দল যদি তাঁহাকে প্রৌঢ়ত্বের অপবাদ দিয়া তাঁহাকে খেলো করিবার চেষ্টা করে তবে সে চেষ্টার ফলে তাহারাই উপহাসাস্পদ হইবে। বিদূষকের ভূমিকার শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী মহাশয় বেশ একটু নূতন পরিকল্পনা দিয়া তাহাকে সদানন্দ উদর-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণের প্রতিচ্ছবি করিয়া তুলিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের ভূমিকায় নির্ম্মলেন্দুবাবু অবতীর্ণ হইতে পারেন নাই; শুনিলাম তিনি বিশেষরূপ অসুস্থ, একজন নূতন অভিনেতাকে এই ভার দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু তিনি ভূমিকার মর্য্যাদা রাখিতে পারেন নাই 'জনা' চরিত্রে শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরীর অভিনয় একটু উন্নত ও আশাপ্রদ হইয়াছে। ছোট ছোট ভূমিকাগুলির অভিনয়ে এখনও অনেক ত্রুটি রহিয়াছে।

বলিদান ঃ—এই বুধবার অভিনয় হইয়াছে সে সম্বন্ধে মতামত আগামী সংখ্যায় দেওয়া হইবে তবে ভূমিকা বণ্টন আশাপ্রদ বটে।

মিনার্ভার নবগৃহে প্রবেশ—ভাগ্যনির্য্যাতিত এই নাট্য সম্প্রদায় প্রায় তিন বৎসর হেথা-সেথা করিয়া শ্রীভগবানের করুণায় অবশেষে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। গত ১৩ই বৈশাখ রবিবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মাঙ্গলিক যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহারা গৃহপ্রবেশ-রূপ শুভ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। বাটী নির্ম্মাণ কার্য্যের অল্পই বাকী আছে বোধহয় এক বা দেড় মাসের মধ্যেই ইঁহারা সেখানে অভিনয় আরম্ভ করিতে পারিবেন। এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে এতগুলি নট-নটীকে আশ্রয় দিয়া, সম্প্রদায় রক্ষা করিবার জন্য, সম্প্রদায়ের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র বি-এ, মহাশয় প্রাণপণ চেষ্টার নিমিত্ত তিনি কেবল এই নট সম্প্রদায়ের কৃতজ্ঞতাভাজন নহেন—সাধারণেরও প্রশংসাভাজন বটে। আর যে সকল নট-নটীরা প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্য-সম্প্রদায়ের প্রলোভনপূর্ণ আহ্বান উপেক্ষা করিয়া পুরাতন অধিকারীকে ত্যাগ না করিয়া দুঃখের দিনে তাঁহার দুঃখের দুঃখী হইয়া ছিলেন তাঁহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানের জন্য তাহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও নাট্যরসিকগণের আন্তরিক সহানুভূতি পাইবার যে তাঁহারা একান্ত যোগ্য তাহা তাঁহাদের 'অগ্নি-পরীক্ষায়' প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই নবগৃহ প্রবেশ উপলক্ষে গত ১৪ই বৈশাখ সোমবার সন্ধ্যায় নূতন রঙ্গমঞ্চে তাঁহারা শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের নিমন্ত্রিত করিয়া এক প্রীতি-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই সভায় মিনার্ভার সত্বাধিকারী, তাঁহার আত্মীবর্গ ও অভিনেতা ও অভিনেত্রী-বৃন্দ সমস্ত সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া জলযোগ ও সঙ্গীতাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। প্রবীণ নাট্যকার ও অভিনেতা রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বহু সংবাদ পত্রের সম্পাদক, বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক ও অনেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী (যাঁহারা এক্ষণে অন্য নাট্য সম্প্রদায়ভুক্ত) সমবেত হইয়াছিলেন। আনন্দের উৎসব কলরবে, সকলের সহানুভূতি-স্নিগ্ধ-হাস্যের তরঙ্গে নবনির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চ পূত হইয়াছিল। নির্ম্মল আনন্দধারা-নিষিক্ত এই মঞ্চে তাঁহারা বিজয়ী হইয়া নাট্যরসিকগণকে চিরদিন মধুর আনন্দ দান করুন, ভগবৎ সমীপে আমাদের এই ঐকান্তিক কামনা।

নূতন রঙ্গমঞ্চের বিশেষত্ব দেখিলাম দর্শকবৃন্দের আরামের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার; বসিবার স্থানের ব্যবস্থা অতি সুন্দর হইয়াছে। আলোকের ব্যবস্থাও নিখুঁৎ হইবে বলিয়া বোধ হইল; বায়ু চলাচলের পথ বেশ উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। ত্রিতলে মহিলাদিগের আসনের ব্যবস্থা এত সুন্দর হইয়াছে যে, এ আরামজনক বসিবার সুবিধা ছাড়িয়া দর্শিকাগণ অন্যত্র অভিনয় দেখিতে যাইবেন কি

না সন্দেহ। মেয়েদের জন্য একটী সুসজ্জিত প্রশস্ত বিশ্রামাগারও নির্ম্মিত হইয়াছে, স্বতন্ত্র কল শৌচাগার প্রভৃতির সু-বন্দোবস্ত রহিয়াছে।

ষ্টেজ বক্সগুলি অতি পরিপাটী হইয়াছে ও বিলাতী থিয়েটারের মত আরাম-প্রদ হইয়াছে। ষ্টেজের উপবার্দ্ধে কারুকার্য্যে প্রাচ্যভাব বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে, মোটের উপর বর্ত্তমানে ইহা আদর্শ রঙ্গমঞ্চ হইবে।

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখায় রঙ্গমঞ্চ কেবল সুন্দর হয় নাই, উপরন্তু যুগোপযোগী হইয়াছে। দৃশ্যপট বেশভূষা সজ্জাদ্রব্য সমস্তই নূতন হইতেছে—পুরাতন মিনার্ভা যেন দেবতার বরে নবযুগের উপযোগী আনন্দ দানের জন্য আবার নবীন যৌবন লাভ করিল।

একখানি নূতন নাটক অভিনয়েরও ব্যবস্থা হইতেছে শুনিলাম। আমাদের মনে হয় যে বিশেষত্বের জন্য মিনার্ভার প্রতিষ্ঠা, তাঁহারা সেই নৃত্যগীতের প্রাচুর্য্য দৃশ্যপটে বৈচিত্র্য ও অভিনব বেশভূষা প্রদর্শনের সুবিধা পূর্ণ একখানি Melodrama অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়, কারণ তাহাতে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের শক্তি পূর্ণভাবে বিকশিত হইবার সমধিক সম্ভাবনা। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাটক বা প্রহসনগুলি তাঁহাদের সম্প্রদায়ের যেমন উপযোগী হয় এমন আর কাহারও পুস্তক হয় না; তাহার কারণ অভিনেতা অভিনেত্রীদের ক্ষমতা তিনি বিশেষরূপ জানেন এবং রঙ্গমঞ্চের খুঁটিনাটী সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে সেই জন্য stage author হিসাবে আজ তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেও খুব বেশী বলা হয় না। আর হাস্যরসের বন্যা ছুটাইতে তাঁহার লেখনী যেমন সক্ষম তেমন ক্ষমতা বর্ত্তমানে আর কাহারও নাই (রসরাজ অমৃতলাল ব্যতীত—তবে তিনি এক্ষণে আর এসব বাজে বড় একটা কলম ধরেন না) আমাদের মনে হয় যে, যে শকুন্তলার মহলা দিতে গিয়া মিনার্ভায় অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল, সেই শকুন্তলাকে যুগোপযোগী করিয়া লিখাইয়া লইলে বোধ হয় খুব সৎসাহসের পরিচয় দেওয়া হইবে। শকুন্তলা দৃশ্যপটের বৈচিত্র্য দেখাইবার অবসর যথেষ্ট, বেশভূষাতেও প্রাচ্যযুগের ললিত কলার অনেকনিদর্শন দেওয়া যাইতে পারে এবং প্রচুর নৃত্যগীতের স্থানও ইহাতে আছে। কালিদাসের শকুন্তলার কাঠামোতে একটু নূতনত্ব মাখাইয়া লইলেই খুব সুন্দর এক খানি মধুর রসের নাটক হইতে পারে এবং ভূপেনবাবুর হাতে এই ভার দিলে বোধ হয় খুবই ভাল হয়, কারণ বর্ত্তমান দর্শকেরা কি চান তিনি সেদিকে খুব লক্ষ্য রাখিয়া লেখনী চালনা করেন।

বঙ্গের নাট্যশালা

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ

বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালা ত্রিপঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। সাধারণতঃ এক এক পুরুষের স্থিতিকাল পঞ্চাশ বৎসর পরিমাপ করা হইয়া থাকে। এতদনুসারে নাট্যশালা দ্বিতীয় পুরুষে উপনীত হইয়াছে। কালধর্ম্মে নাট্যকলা, অভিনয় কলা ইত্যাদি নাট্যশালার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথেষ্ট পরিবর্ত্তনও হইয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। তবে এই পরিবর্ত্তন নাট্যশালাকে অভ্যুদয় অথবা অধঃপতনের দিকে অগ্রসর করিতেছে তাহা নাট্যমোদী সুধীবৃন্দ বিচার করিবেন।

নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার যুগে বাঙ্গালা ভাষায় সংবাদ পত্রের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল এবং তাহার সকলগুলিতে রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় আলোচনাও হইত না। কোন কোন কাগজে যাহা লেখা হইত তাহাও যৎসামান্য। সুতরাং কেবলমাত্র তৎকালীন সংবাদপত্র পাঠে নাট্যশালার স্বরূপ অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। "অভিনয় শিক্ষা" এই চিরন্তন মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর, মতিলাল, মহেন্দ্রলাল, নগেন্দ্রনাথ এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল প্রভৃতি যে সকল মহাপুরুষ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে একমাত্র বুঅমৃতবাই জীবিত আছেন।

এই অমৃতবাবু মিনার্ভা থিয়েটারে অনুষ্ঠিত, নাট্যশালার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়াছেন যে "হাসি ও কান্না বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের অভিনেতা ও অভিনেত্রী দিগের মধ্যে কেহই হাসিতে বা কাঁদিতে জানে না, শেখেও না। কেবল হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করিলেই যদি হাসি হইত এবং "বাবাগো মাগো" বলিয়া চীৎকার করিলেই যদি কান্না হইত, তাহা হইলে কোন ভাবনাই থাকিত না দেশকাল পাত্র ভেদে হাসি কান্নারও যে বিভিন্ন সুর ও বিভিন্ন স্বরূপ হইয়া থাকে ইহা বাস্তবিকই ভাবিয়া দেখিবার এবং শিখিবার জিনিষ।" এই প্রসঙ্গে তিনি কি করিয়া সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকান্তর্গত মড়াকান্না আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করেন। কেবল হাসিকান্না কেন, অভিনয় কলার সকল বিভাগেই এইরূপ সাধনার প্রয়োজন। স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুবাবুর বক্তৃতায় শোনা গিয়াছিল যে কোন এক-খানি নাটকের মহলা দিবার সময়ে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় মতিলাল সুর একটি পংক্তি যথাযথরূপে আবৃত্তি করিতে না পারাতে উক্ত নাটক খানির অভিনয় প্রায় মাসাবধি কাল স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। এই সকল কথা বিস্তারিতভাবে তৎকালীন সংবাদও সাময়িক পত্র সমূহে আলোচিত হইত না। কাজেই যাঁহারা তখন অভিনয় দেখিয়াছেন ও অভিনয় কলানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া সভাসমিতিতে বক্তৃতাদি শুনিয়াছেন তাঁহারাই এইসকল তথ্য অবগত আছেন।

নাট্যকার নাটক রচনা করেন, নট—উক্ত নাটক অভিনয় করেন। উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়া নাট্যকার দেশবিদেশে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন, এমন কি অমরত্ব লাভ করেন। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের নাম মহাসম্ভ্রমে উল্লেখ যোগ্য। নাটক রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন—তাঁহার যশঃ ভুবন বিখ্যাত। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালও জগতের নাট্যকারদিগের মধ্যে উচ্চাসন অধিকার করিয়া গিয়াছেন। রঙ্গমঞ্চে নাটকীয় ভূমিকাকে জীবন্ত করিয়া দেখাইতে পারিলেই অভিনেতার কৃতিত্ব। কেবলমাত্র মুদ্রিত নাটকের ছত্রগুলি অবিকল আবৃত্তি করিলেই অভিনয় হয় না। সুতরাং নাটকীয় চরিত্রের পরিকল্পনা সম্যক আয়ত্ত করিয়া উহার স্বরূপ নির্ণয় করা অভিনেতার এবং অভিনয় শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। অতঃপর উক্ত পরোক্ষকে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত করিতে পারিলেই যথার্থ অভিনয় করা হয়। নাটক দৃশ্যকাব্য, অভিনয়েই তাহার বিকাশ। অতএব অভিনয় যতই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় নাটকীয় উৎকর্ষের গৌরব ততই বর্দ্ধিত হয়। বিভিন্ন অভিনেতা দ্বারা একই চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা করা সম্ভব এবং ইহাদ্বারা অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধন অবশ্যম্ভাবী না হইলেও সুগম ও সহজসাধ্য হইয়া থাকে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মহাকবি গিরিশচন্দ্র এবং সেক্সপীয়র রচিত বিভিন্ন নাটকের চরিত্র অভিনয়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিনেতার প্রসিদ্ধি-লাভ ইহার উদাহরণ স্বরূপ উল্লিখিত হইতে পারে।

বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ সংবাদ পত্রের স্তম্ভেই নাটক ও অভিনয়ের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আলোচনা প্রায়ই পক্ষপাত-বর্জ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ আলোচনার সার্থকতা অতি সামান্য। বর্ত্তমান যুগে রঙ্গমঞ্চে আর একটী নূতন কীর্ত্তির আবির্ভাব দেখা যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত নাটক মাত্রই যে কোন রঙ্গালয়ে অভিনীত হইত। ইহার ফলে একই নাটক একই সময়ে বিভিন্ন রঙ্গালয়ে অভিনীত হইত। অভিনয়ের স্বত্বসংরক্ষণ প্রথার অস্তিত্ব তখন এদেশে ছিল না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সুযোগ্য অভিনেতার পরিকল্পিত একই চরিত্রের পৃথক পৃথক ছবি দর্শকবৃন্দের সম্মুখে প্রদর্শিত হইবার সুবিধা ছিল। দর্শকগণও তুলনায় সমালোচনা করতঃ নাটকীয় প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ উপলব্ধি করিয়া তৃপ্তি ও প্রীতি লাভ করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ গিরিশবাবুর প্রফুল্ল, হারানিধি, বিল্বমঙ্গল, চৈতন্য লীলা, দ্বিজেন্দ্রবাবুর রাণাপ্রতাপ, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, এবং নাটকাগারে গ্রথিত বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস গুলির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। অধুনা এই প্রথার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন নাটকের অভিনয় স্বত্ব সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইতেছে। "কিন্নরী" নাটিকার অভিনয় লইয়া ষ্টার ও মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চের বিবাদেই এই প্রথার সূত্রপাত। ইহাতে লাভ হইতেছে রঙ্গালয়ের স্বত্বাধিকারী-গণের, ক্ষতি হইতেছে নাট্যানুরাগী জনসাধারণ দর্শক বৃন্দের, এই প্রথা যত শীঘ্র উঠিয়া যায়, ততই মঙ্গল।

Printed & Published by Sachindra Nath Banerji at the HIMANI PRESS.
83, Durga Charan Mitter Street, Calcutta.

খুকুরাণী

[নিকং ১। নমস্কা • হইতে।

প্রথমবর্ষ]　২৬শে বৈশাখ শনিবার, ১৩৩২ সন।　ইংরাজী ৯ই মে　[৩৯শ সংখ্যা

কন্যা বন্দনা

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী

১

যেদিন　ভাগ্যজলধি মথিয়া জন্মিলে হেন মোব কন্যা আদর্শ।
উঠিল　ভবনে বি সে কলবব—যদিও তাহাতে ছিল না হর্ষ।
সেদিন তোমাবে হেবিযা নয়নে ঘনায়ে আসিল নিবাশারাত্রি,
যদিও সকলে কহিল, "কিরূপ। মেযে তো নয়, যেন জগদ্ধাত্রী।"

কোরাস্

ধন্য হইল আমাব অঙ্ক, লভিয়া তোমাব কোমল স্পর্শ,
ভাবী বেয়া'য়েব ভ্রূকুটী স্মরিয়া, নিভিয়া আসিল যতেক হর্ষ।

২

সদ্য মধুতে সিক্ত রসনা, নয়নে সদ্য কাজল লিপ্ত
ক্ষণেক রোদন ক্ষণেক হাস্যে কমল আনন হইল দীপ্ত।
উপবে "মেয়েটা হ'যেছে কেমন ?" সু'ধান শ্বশুব অসন্তুষ্ট,
মন্ত্রমুগ্ধ, তোর মুখ পানে তাকায় তবুও নয়ন তুষ্ট।
ধন্য হইল আমার অঙ্ক, লভিয়া তোমাব কোমল স্পর্শ,
ভাবী বেয়া'য়ের ভ্রূকুটী স্মরিয়া, নিভিয়া আসিল যতেক হর্ষ!

৩

শীর্ষে কৃষ্ণ কেশের সুষমা হেবিয়া উঠিছে আলোড়ি' চিত্ত,
একটীরে বিয়ে দিয়েছি সেদিন,খোয়ায়ে যা'কিছু আছিল বিত্ত
কখনো মা আমি ভীষণ তিক্ত হ'তেছি স্মরি' সে বিবাহ দৃশ্যে,
হাসিয়া কখনো তব মুখ চেয়ে ভাবি বুঝি এই নিয়ম বিশ্বে।
ধন্য হইল আমার অঙ্ক, লভিয়া তোমাব কোমল স্পর্শ,
ভাবী বেয়া'য়ের ভ্রূকুটী স্মরিয়া, নিভিয়া আসিল যতেক হর্ষ!

৪

উপরে তোমাব জন্মে, জননি! চলে আলোচনা অবিশ্রান্ত;
বাজেনি আজিকে শঙ্খ, হবষে পরশি' নারীর অধর প্রান্ত,
উপবেব সেই আলোচনা রব করিছে প্রলয় বজ্র বৃষ্টি,
মস্তকে তার', যে তব জননী আর যে তোমারে করেছে সৃষ্টি!
ধন্য হইল আমার অঙ্ক, লভিয়া তোমাব কোমল স্পর্শ,
ভাবী বেয়া'যেব ভ্রূকুটী স্মরিয়া, নিভিয়া আসিল যতেক হর্ষ!

৫

জননি! তোদের জন্ম হেরিয়া কণ্ঠেতে আসে সভয় উক্তি
বৃদ্ধিতে হ'য় ক্ষুধাব অন্ন, বিবাহে দাও মা পরম মুক্তি!
জননি, তোমাতে বিজড়িত আহা,কতনা বেদনা কতনা হর্ষ,
জন্ম কাঙালী বাঙালীর ঘরে সহ্য-শক্তিব তোবা আদর্শ!
ধন্য হইল আমাব অঙ্ক, লভিয়া তোমার কোমল স্পর্শ,
ভাবী বেয়া'য়েব ভ্রূকুটী স্মরিয়া, নিভিয়া আসিল যতেক হর্ষ!
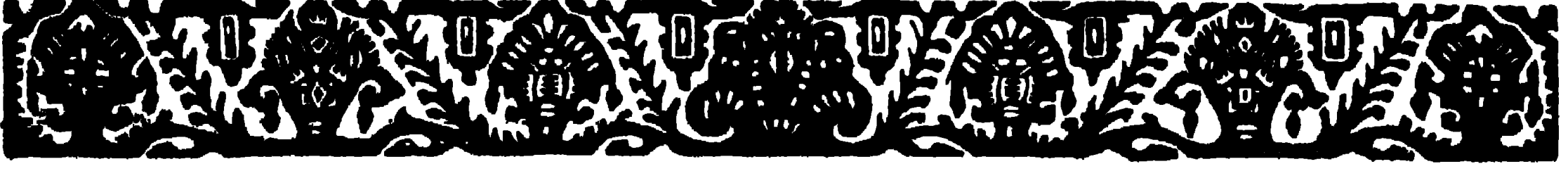
বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত

মুন্সীগঞ্জে বিগত সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতি, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে সন্দেহ হওয়ায় বর্ত্তমান প্রবন্ধটী লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। "সমালোচনার ছলে দায়িত্ববিহীন কটূক্তির আবেগেও বাণীর মন্দির-পথ সমাচ্ছন্ন হ'তে পারে", শরৎবাবুর এই অনুশাসন সত্ত্বেও আমি যে লেখনী ধারণ করিলাম, শরৎ বাবুর সহজ সরল ভাষা বুঝিতে না পারার জন্য, তাঁহাকে কটূক্তি করিবার অভিপ্রায়ে নহে। শরৎবাবু নিজে না বলিলেও আমরা অস্বীকার করি না যে তিনি প্রাচীন, তাঁহার চুল ও বুদ্ধি উভয়ই পাকিয়া গিয়াছে, তাই ভরসা হয়, তিনি আমার ন্যায় অর্ব্বাচীনের অপরাধ লইবেন না।

শরৎবাবু বলেন, বঙ্কিম প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের কাজ সারিয়া স্বর্গীয় হইয়াছেন ও এখন নবীন সাহিত্যিকগণের দিন আসিয়াছে। তাহাদেরই অগ্রণীস্বরূপ শরৎবাবুর অপ্রত্যাশিত মনোনয়নের দ্বারা তিনি মনে করেন, নবীনের দল আজ জয়যুক্ত, আর তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করেন "তাদের যাত্রাপথ যেন উত্তরোত্তর সুগম ও সাফল্যমণ্ডিত হয়"। এই প্রসঙ্গে শরৎবাবু প্রাচীন ও নবীনের পার্থক্য দেখাইয়া আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন "উভয়দলের অনৈক্য ঘটিতেছে এখন ভাষা,ভাব ও আদর্শে"। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই চেষ্টায় তৎকালীন সাহিত্যিকগণ সহানুভূতি প্রকাশ না করায়, সেই নবোদ্গত ভাবধারা আজ প্রায় একপ্রকার রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তা যদি না হ'ত এমন উদাসীন হয়ে যদি তাঁরা না থাকতেন নিন্দা, গ্লানি, নির্য্যাতন সকলই তাঁহাদিগকে সহ্য ক'রতে হ'ত সত্য, কিন্তু আজ হয়ত আমরা হিন্দুর সামাজিক অবস্থার আর একটা চেহারা দেখতে পেতাম্। কিন্তু যাঁরা (অর্থাৎ বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যিকগণ) এখন বিগত, যাঁরা সুখ দুঃখের বাহিরে, এ দুনিয়ার দেনা-পাওনা শোধ দিয়ে যাঁরা লোকান্তরে গেছেন, তাঁদের ইচ্ছা, তাঁদের চিন্তা, তাঁদের নির্দ্দিষ্টপথের সঙ্কেতই কি এত বড়? আর যারা (শরৎবাবু প্রভৃতি নবীন সাহিত্যিকগণ) জীবিত, ব্যথার বেদনায় হৃদয় যাঁদের জর্জরিত, তাদের কামনা কি কিছুই নয়? মৃতের ইচ্ছাই কি চিরদিন জীবিতের পথরোধ ক'রে থাকবে? তরুণ সাহিত্য শুধু এই কথাটাই বল্‌তে চায়। তারা না বল্‌লে বল্‌বে কে? আজ তাকে বিদ্রোহী মনে হ'তে পারে, প্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থার পাশে হয়ত তার রচনা আজ অতি অদ্ভুত দেখাবে, কিন্তু সাহিত্য ত খবরের কাগজ নয়। গতি তার ভবিষ্যতের পানে। আজ যাকে চোখে দেখা যায় না, আজও যে এসে পৌঁছায় নি, তারই কাছে তার পুরস্কার, তার কাছে তার সম্বর্দ্ধনার পথ আছে।"

শরৎবাবু যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা খণ্ডন করিতে প্রয়াস করিব না, কারণ কোন জিনিসই চিরন্তন প্রথা মানিয়া ঘাঁটায় ঘাঁটায় চলিতে পারে না। প্রতি অনুষ্ঠানেই সংস্কার অবশ্যম্ভাবী এবং সময় সময় কেহই তাহা অমান্য করিতে পারে না। কিন্তু এই বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গেই শরৎসাহিত্যের কোথাও ত নবীনের নির্ভীকতা দৃষ্ট হয় না। স্পষ্টভাবে বিধবা বিবাহের সম্বন্ধে কোথাও যুক্তি নাই, সংস্কার প্রয়াস কুত্রাপি দৃশ্য হয় না, এবং সমাজ ভয় অতিক্রম করিয়া তিনি আমাদিগকে নূতন কোন সত্যই দিতে পারেন নাই। অথচ তিনি আলোচনা করেন ভীষণ কশাহস্তে, এবং গতি তাঁর অপ্রতিহত—ভবিষ্যতের পথে! কিন্তু ক্ষুদ্র আমরা 'শতকোটীবর্ষের প্রাচীন পৃথিবী আজও তেমনি বেগে ধেয়ে চলেছে, মানবমানবীর যাত্রাপথের সীমা আজও তেম্‌নি সুদূরে।' দৃষ্টান্তস্বরূপ

বলিতেছি চরিত্রহীনে সাবিত্রী সতীশকে সেই মেস্ হইতে ভালবাসিয়াও বিবাহ করে নাই, বিধবা কিরণময়ীর অন্তরের গুরু উপেন্দ্র যাহাকে প্রথম দর্শনেই ভালবাসিয়া সে তাহাকে সর্ব্বদা ধ্যান করিত, শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যা মানুষ হইয়া যাহা পায় নাই, কিন্তু কিরণময়ীর বস্তু যে উপেনের তুলনা নাই, এবং যে দুটী নরনারীর যে গোপন সম্বন্ধ কিরণময়ীর স্পষ্টোক্তিতে ঝাপ্সা জ্যোৎস্নার ঈঙ্গিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিল, হাওয়া উঠিয়াছে মেঘ দ্রুত সরিয়া যাইতেছে — অথবা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া যে দিবাকরকে লইয়া কিরণময়ী সধবা সাজিয়া সমুদ্র অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়, সাধারণের নিকট যাহাকে স্বামী বলিয়া পরিচয় দিতে দ্বিধা করে না, বাহু জড়াইয়া নিভৃতে একশয্যায় শয়ন করিতে কিছুমাত্রও সঙ্কোচ নাই, অথবা যে সতীশ, কিরণময়ীর অপেক্ষা সুন্দরী আর কাকেও দুনিয়ায় দেখে নাই, সামান্য পরিচয়েই এক সঙ্গে বসিয়া লুচি বেলিতেছেন ও ভাজিতেছেন, খালি-বাড়ীতে রান্নাঘরে গিয়া প্রথমে এমনিধারা ঠোকাঠুকী ও সংঘর্ষের উত্তাপটা শীতল হইয়া গেল, ইহাদের কাহারও সহিত কিরণময়ীর বিবাহ হয় নাই। হয়ত তিনি বলিতে পারেন উপেন্দ্রনাথ কৃতদার, সতীশ অন্যাসক্ত, দিবাকর মুখস্থ করিয়া পাশ করিয়া থাকে বলিয়া তাহার উপর কিরণময়ীর শ্রদ্ধা নাই, কিন্তু পল্লীসমাজে রমেশ ও রমার বিবাহ হওয়াতে ত কোনই বাধা ছিলনা। আবার "বড়দিদি"তে একনিষ্ঠ প্রেমিক সুরেন্দ্রনাথ ও তদনুরক্তা মাধবীর মিলনেই বা দোষ কি হইত? এবং আমরা দেখিতে পাই "পথনির্দ্দেশ' গল্পটীতে, যদিও বা বিধবা হেমের বিবাহ দিতে হেমের মা ও গুণী উভয়েরই ইচ্ছা ছিল, গুণী নিজেও সমাজের বড় ধার ধারিত না, এবং হেম ভিন্ন তার অপর কেহ আপনার ছিল না। সেখানেও তিনি উপসংহারে 'অতৃপ্ত বাসনার' এক লম্বা বক্তৃতা আওড়াইয়া একটা মূল্যবান জীবনকে মারিয়াই ফেলিলেন। বক্তৃতায় আদর্শের ধারা নির্দ্দেশ করিলেও শরৎবাবুকে কার্য্য-কালে কিন্তু আমরা কিছুই করিতে দেখি না, অথচ ঐ প্রাচীন, ভ্রান্ত, আর্টের গুরুমহাশয় বঙ্কিমবাবু, সেই যুগেই বিষবৃক্ষে বিধবা কুন্দকে সমাজের কোন বাধা না মানিয়া সপত্নীক নগেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ দিয়া দিয়া-ছিলেন, উত্তর হইতে পারে—বিষবৃক্ষে কবি বিধবা-বিবাহের কুফলই দেখাইয়াছেন। কিন্তু অভূতপূর্ব্ব সংস্কার কার্য্যে পরিণত করা বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন আর কাহার সৎসাহসে কুলায়? সংস্কার একটা পথ দেখাইয়া দেয় মাত্র কিন্তু সেইসূত্র ধরিয়া অবস্থান্তরে পরিণাম হয়ত সর্ব্বত্র কুন্দের মত বিষময় নাও হইতে পারে। আর বঙ্কিম-বাবু অন্যদিকও ত উল্লেখ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। নগেন্দ্রনাথ বলিতেছেন "বিদ্যাসাগর মহাশয় ত প্রমাণ করিয়াছেন বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত। সমাজ? যে গ্রামে আমিই সমাজ সেখানে আমাকে কে সমাজচ্যুত করিবে? এই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ ও নয়, কারণ যাহা অধিকাংশ লোকের অহিতকর—তাহাই নীতিবিরুদ্ধ। তবে সূর্য্যমুখী? সেইই ত এই বিবাহের ঘটক।" অতঃপর উপন্যাসে বিবাহের পরিণাম বিষময় হইলেও, ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে বুদ্ধিমান বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই জানিতেন যে সর্ব্বত্র কুন্দের মত মুখচোরা মেয়েরই বিবাহ হইবে না। কেবল বঙ্কিমবাবুই নহেন, রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার সংসার ও সমাজ নামক উপন্যাসদ্বয়ে বিধবা বিবাহের অনুকূল যুক্তি তর্ক ও তাহার সুখের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রাচীনের মধ্যে আরও এক-জন তাঁহার নাটকে বিধবা বিবাহ-প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। হয়ত নূতন দলের অনেকে তাঁহার নামে বিশেষ প্রীতিলাভ করিবেন না, কিন্তু ধীরে ধীরে তাহার প্রভাব এতই প্রসার লাভ করিতেছে, যে আমরা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে দেখিবে বাঙ্গলার সাহিত্য-গগনে তিনি একদিন 'একশ্চন্দ্রের' প্রাধান্য লাভ করিবেন। গিরিশচন্দ্র "শাস্তি কি শান্তি"তে প্রমদার বিবাহ সংঘটন করিয়া বিধবা বিবাহের দোষগুণ আলোচনা করিয়াছেন। নাটকখানিতে তিনি বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের প্রাধান্য প্রমাণিত করিলেও অন্যদিকেও সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন নাই। প্রসন্ন-কুমার বলিতেছেন "হৌক্ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, হৌক্ দেশাচার-বিরুদ্ধ, বিবাহ দিলে তবু একটা নিয়মাধীনে থাক্‌বে, ভ্রূণহত্যা হবেনা, কন্যা স্বেচ্ছাচারিণী হবেনা, একেবারে ঘৃণিতা হবেনা।" প্রসন্নকুমারের স্ত্রী পার্ব্বতী জন্ম-

জন্মান্তরের অন্ধসংস্কারে যদিও তাতে বাধা দিয়া বলিতে-ছেন :—

"কেন বিধবাদের মধ্যে কি সতী নাই ? ইন্দ্রিয় কি এতই দুর্দ্দম যে নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মাচরণে দমিত হয় না ?"

তিনি এইরূপ আদর্শ সাধারণে প্রযোজ্য নয় বলিয়া তৎক্ষণাৎ সমাজের স্বরূপ অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছেন—

"শিবপূজার যোগ্য নির্ম্মল ধুতুরা বিলাস সজ্জিত সংসার উপবনে সর্ব্বদা ফোটেনা। স্বপ্নে দেবীদর্শন জাগ্রত অবস্থার উদাহরণ নয়। আর ইন্দ্রিয় দুর্দ্দম কিনা, তোমার সন্দেহ আছে ? পুত্রশোকাতুরা নারী বৎসর না ফিরিতে আবার পুত্র প্রসব করে, ইন্দ্রিয় তাড়নায় উপপতির দাসী হয়, শোণিত সম্বন্ধ বিচার করে না।"

প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখিতে পাই সাহিত্যের পবিত্র ভিত্তি রক্ষা করিয়া প্রাচীনেরা সর্ব্বদাই সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন আর প্রাচীনের প্রতি সতত আক্রমণে যে নবীন শতমুখ, সেই নবীনের মুখপাত্র শরচ্চন্দ্র সমাজকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া, সমাজসংস্কারে কোনরূপে প্রাচীন গণ্ডী অতিক্রম না করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কারে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইয়া, প্রাচীনের স্কন্ধে সম্পূর্ণ দায়ীত্ব ন্যস্ত করিয়া নিজে পরিষ্কার থাকিতে সর্ব্বদাই সতর্ক। অথচ খেয়ালমত শরৎবাবু যে কিছু নূতন বিপ্লব ঘটাইতে পারেন, এমনও ত অনেক সময়ে দেখা যায়। কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিব।

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আজকাল সর্ব্বত্রই এককথা শুনিতে পাই, কিন্তু এ সম্বন্ধে কেবল সমাজই যে বিরোধী আমার তাহা মনে হয় না। হিন্দুসমাজ যেরূপ উদার তাহাতে বিধবা-বিবাহে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া অন্ততঃ গত বিশ বৎসরের মধ্যে কেহ সমাজচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। বর্ত্তমান সময়েও আর্য্যসমাজ, বিধবা-বিবাহ-সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান প্রতিবৎসরেই অনেকগুলি বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিও অচল আছে বলিয়া জানা নাই। একদিন নবম বৎসরে যে সমাজ গৌরীদানের ব্যবস্থা করিত, সময়ের আবর্ত্তনে আজ সেইখানেই পঁচিশ বৎসরে বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানে সমাজের কোন সঙ্কীর্ণতা দৃষ্ট হয় না। তবে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কতকগুলি অনতি-ক্রমনীয় বাধা আছে। প্রথম, পবিত্র ভারতভূমে আজও ব্রহ্মচারিণী বিধবার সংখ্যা নিতান্ত ন্যূন নহে। আমাদের এই দেশ কেন, যে সব দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত, সেখানেও ব্রহ্মচারিণী বিধবারই গৌরব অধিক। তবে একথাও ঠিক, সকল অবস্থায় এই নিয়ম সমাজে চলে না। আজ সে আদর্শ নাই, সে পবিত্র শিক্ষা নাই, সে একান্নবর্ত্তিতা নাই। বিধবার অবস্থা পরিবারে আজ বড়ই হেয় হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় যদি কোন বিধবা নববিবাহিত জীবনযাপন করিয়া উহা সার্থক করিতে চায়, কাহারও তাহাতে প্রতিকূলতা করিবার অধিকার নাই, কারণ তাহাতে সমাজেরই মঙ্গল, কিন্তু বিধবার নিজের ইচ্ছায়ই কি জীবনে সর্ব্বদা সফলতা লাভ হয় ? অনেক সময়ে দেখা যায়, বিধবাকে দরদ দেখাইয়া, ভাল-বাসিয়া, সহানুভূতি করিয়া অনেক কলির চেলাই তাহার সম্মুখীন হয় কিন্তু কার্য্যোদ্ধার হইলে পলায়ন করিতেও বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে তাহারাই পথ খোঁজে, স্বামীভ্রমে যে বিধবা দুইদিন পূর্ব্বে যে প্রেমাস্পদকে দেহদান করিয়াছিল বিবাহপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেই সেই পাষণ্ডই বিপন্না বিধবাকে লাথি মারিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিজেকে লোকের কাছে সাধু বলিয়া পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করে না। এইজন্যই দেশে এত ভ্রূণহত্যা, নারীহত্যা প্রভৃতি পাপের ভীষণ প্রবাহ। এইত বিধবার শোচনীয় অবস্থা, ইহার উপরে আবার বয়স্থা কুমারীকন্যাও একটা ক্ষুদ্র সমস্যা নয়। তবে যদি বাস্তবিকই দৃঢ়চিত্ত কোন খাঁটি মানুষ বিধবাকে যথার্থ ভালবাসিয়া বিবাহ করে, তবে তাহা শ্লাঘার কথা। কিন্তু তাহাতে অল্প ত্যাগ স্বীকারের আবশ্যক হয় না। যতদিন এইরূপ নিঃস্বার্থ প্রেমের যুগ না আসিবে ততদিন বিধবা বিবাহ অবাধ-ভাবে চলিবে বলিয়া আমার মনে হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ ঔপন্যাসিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ নিঃস্বার্থ প্রেম ও ত্যাগস্বীকার "পঙ্কতিলকে" গোবিন্দ ও সন্ন্যাসী

চরিত্রে পরিকল্পনা করিয়াছেন। তাহার এই উচ্চ কল্পনা ও নির্ভীকতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

কিন্তু পরিণাম যাহাই হউক; বিবাহ, সংখ্যায় যত অল্পই অনুষ্ঠিত হউক, বিধবাবিবাহের পাত্রাপাত্রী সমাজের চক্ষে নীতির দিক্ হইতে কখনও হেয় হয় না। বিবাহ যেরূপই হউক্ কস্মিন্‌কালেও উহা নীতিবিরুদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে সম্বন্ধ যতই দৃঢ় হউক্ না কেন, উদ্বাহ-সংস্কার না হইলে প্রেমিক প্রেমিকার একত্রাবস্থান কোন সমাজই অনুমোদন করে না। ইহা যে কেবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুর ধারণা নহে, পরন্তু সমস্ত সভ্যজাতিই এই নীতির অনুমোদন করেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় শরৎবাবু আজ বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী হইয়াও, কখনও নির্ভয়ে সে কথা মুখ ফুটিয়া ব্যক্ত করেন নাই, অথচ প্রয়োজনবোধে সমাজ ও নীতি বিগর্হিত যৌন সম্বন্ধের সমর্থন করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা "শ্রীকান্তের" রোহিণী-অভয়া প্রসঙ্গ উল্লেখ করিতেছি। অভয়ার স্বামী বর্ম্মাস্ত্রী লইয়া বাস করিত, অভয়াকে পত্র ও দিত না, স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থও পাঠাইত না। অনন্যোপায়া অভয়া রোহিণীকে লইয়া রেঙ্গুনে আসে। নৃশংস কদাকার স্বামী অভয়াকে যে ভাবে গ্রহণ করে, অভয়া তাহা নিজের দক্ষিণবাহু অনাবৃত করিয়া শ্রীকান্তকে দেখাইল—বেতের দাগ চামড়ার উপর কাটিয়া বসিয়াছে। তারপরে বলিল "এমন আরও অনেক আছে যা আপনাকে দেখাতে পার্‌লুম না।" ইহার পরে অনেক দুঃখ জানাইয়া অভয়া বলিতে লাগিল "একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই কি একেবারে মিথ্যা? একজন নির্দ্দয়, মিথ্যাবাদী কদাচারী স্বামী বিনাদোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে ব'লেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ পঙ্গু হওয়া চাই? এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেপুলে, তাঁর ভালবাসা কিছু আর আমার নিজের নয়। তবুও তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকলেই কি আমার জীবন ফলে ফুলে ভ'রে উঠে সার্থক হ'তো শ্রীকান্তবাবু? আর সেই নিস্ফলতার দুঃখটাই সারাজীবন ব'য়ে বেড়ান কি আমার নারীজন্মের সবচেয়ে বড় সাধনা?" এই পর্য্যন্ত কোন সমদর্শী লোকই অভয়ার প্রতি সহানুভূতি না দেখাইয়া পারে না, এবং এই পর্য্যন্তের জন্য শরৎবাবু ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী অভয়ার গণিকা ব্যবহার কোন দেশেরই সামাজিক নীতি বা বিধান সমর্থন করিতে পারে না। স্বামীগৃহ হইতে তাড়িতা হইয়া আসিয়া রোহিণীকে ভালবাসিবার জন্য যেন পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়াই অভয়া বলিতেছে "রোহিণী-বাবুকে আপনি দেখে গেছেন? তাঁর ভালবাসা ত আপনার অগোচর নেই? এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পঙ্গু করে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিন্‌তে চাই না শ্রীকান্তবাবু, একটা রাত্রির বিবাহ অনুষ্ঠান যা স্বামী স্ত্রী উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মত মিথ্যা হয়ে গেছে, তাকেই জোর করে সারা-জীবন সত্য ব'লে খাড়া রাখ্‌বার জন্যে এতবড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ করে দিব?" কোন সভ্যদেশের আইন এইরূপ মিলন সমর্থন করেন না বলিয়াই বোধহয় আইনের ডাক্তার নরেশচন্দ্রকে "শুভা"য় একটা বিবাহ ব্যাপারে অন্ত আইনের অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু সমাজনীতি বা বিধিব্যবস্থা অনুমোদন না করিলেও অভয়ার যুক্তিতে শ্রীকান্তের গভীর শ্রদ্ধা জন্মিল। কাঠের মূর্ত্তির মত সে স্থির হইয়া রহিল, কেননা "সত্য যখন সত্যই মানুষের হৃদয় হইতে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মনে হয় যেন ইহারা সজীব, যেন ইহাদের রক্তমাংস আছে, যেন তার ভিতরে প্রাণ আছে, নাই বলিয়া অস্বীকার করিলে যেন ইহারা আঘাত করিয়া বলিবে "চুপ্ কর, মিথ্যা তর্ক করিয়া অন্যায়ের সৃষ্টি করিওনা"।

দেখা যাইতেছে শরৎচন্দ্র যাহা সত্য মনে করেন, ইঙ্গিতে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না। এই রোহিণী ও অভয়ার মিলন সংঘটন করিয়া তাহাদের জীবন সার্থক করিতে তিনি মুসলমান ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেও ত্রুটী করেন নাই, এবং উহাদিগকে সেই ধর্ম্মেই দীক্ষিত করিবার জন্য প্রস্তুতও ছিলেন, তবে করেন নাই, কেননা হিন্দুরা যখন দিন দিন তুচ্ছ ও হীন হয়ে যাচ্ছে, তখন অভয়ার ইচ্ছা সমস্ত কলঙ্কের দুর্ভাগ্য মাথায় লইয়া সে নাকি চিরদিন হিন্দু হইয়াই থাকিবে। কোন হিন্দুই অভয়াকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে না, তবে

কথা এই যে কোন সভ্যদেশের সমাজই যাহা নীতিসঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করেন না তাহা ডাক্ হাঁক্ করিয়া লিখিলেও, বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে (যদিও ইহা কোন প্রকারেই নীতি-বিরুদ্ধ নয়), তিনি এরূপ নির্ব্বাক কেন? আর নিজে কিছু না করিয়া বঙ্কিম প্রভৃতিকে অযথা আক্রমণ করিতেছেন কেন? তবে কি আমরা এই বুঝিব এই বিষয়ে তাঁহার চারুবাবুর মত নির্ভীকতা নাই, অথবা তিনি নিজের মনের কথাও বুঝাইতে পারেন নাই, অথবা প্রাচীনকে দোষারোপ করাই এখন তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়াছে।

অতঃপর শরৎবাবু, বোধ হয় নিজের দোষ স্খালন করিবার জন্যই বলিয়াছেন "তাই ব'লে আমরা সমাজ সংস্কারক নই, এ ভার সাহিত্যিকের উপরে নাই"। আমার মনে হয় এই কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে কেবল আত্মপ্রবঞ্চনার জন্য, ইহা সত্য নহে। শিল্পী কি স্রষ্টা নহেন? সত্য বটে তিনি সৃষ্টি করিব বলিয়া সৃষ্টি করেন না, কিন্তু তাঁহার কার্য্যই তাঁহার সৃষ্টি। আপনার ছায়াকে কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না, মাকড়সা যে জাল বুনে সে তাহারই ভিতরকার জিনিস।

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তাধারা যদি খুব প্রবল হইত, তবে তিনি তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি একথা নিজেই বলেন "বিচিত্র ও নবনব অবস্থার মাঝ দিয়ে তাকে অহর্নিশি যেতে হবে,"

যাহা হউক্—ইহার পর স্পষ্টই শরৎচন্দ্র বলিতেছেন "কথাটা পরিস্ফুট করবার জন্য যদি নিজের উল্লেখ করি, অবিনয় মনে ক'রে আপনারা অপরাধ নেবেন না। পল্লী-সমাজ ব'লে আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা, বাল্যবন্ধু রমেশকে ভাল বেসেছিল ব'লে, আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য ক'র্তে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও ক'রেছিলেন এতবড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে কেউ আর বিধবা থাকবে না। মরণ বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিক্ও ত আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয় হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্ম গ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দুসমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে এত বড় দুটী মহাপ্রাণ নরনারী এ জীবনে বিফল ব্যর্থ পঙ্গু হ'য়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্ত্তাটুকু পৌঁছে দেওয়া ভিন্ন বেশী কিছু করবার আমার নেই"। আমি যাহা বলিতেছিলাম শরৎবাবু নিজেই তাহা প্রমাণ করিতেছেন। যদি তিনি স্রষ্টা বা সমাজসংস্কারকই না হইবেন, তবে বেদনার ঐ বার্ত্তাটুকুই পৌঁছে দিতে চান কেন? নতুবা তিনি নিশ্চয় জানিবার আশাই বা করেন কেন যে "ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দ্দোষীর এত বড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবেনা"। আর স্পষ্টভাবে না বলিয়া কেবল পৌঁছাইয়াই বা দিতে চাহেন কেন কারণ বিবর্ণগ্রীব মুখে ত তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন সত্যকে সত্যের মত ক'রেই বল্‌তে হয়। তবে মানুষ যে যার বুদ্ধির পরিমাণে বুঝ্‌তে পারে"।

যাহাহউক্ উদ্ধৃত কথাগুলিতে নিজের ওকালতি করিলেও ইহা যে খাঁটি সত্য নহে, একটু তলাইয়া দেখিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। আর যদি পাঠকের এই ধারণাই হয় তবে ইহাও বিবেচনার বিষয় যে শরৎবাবুর নিজের উক্তি "সুবিধা ও প্রয়োজনের অনুরোধে অনেক মিথ্যাকেই হয়ত সত্য ব'লে চালাতে হয়, কিন্তু সেই অজুহাতে জাতির সাহিত্যকেও কলুষিত ক'রে তোলার মত পাপ অল্পই আছে" এস্থলে প্রযোজ্য কিনা?

শরৎবাবু রমেশ ও রমার ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া যে একটা গর্হিত অন্যায় করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিনা বরং মনে হয়, শরৎবাবুর এই পরিকল্পনা প্রকৃতই স্বাভাবিক, কারণ রক্তমাংসের দেহে এইরূপ ভালবাসা কখনও অস্বাভাবিক নয়, তাহা গর্হিতই হউক্ বা সহজেই হউক। তবে উভয়ের পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনার সমাধান যে হিন্দু সমাজে ছিল না, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই সমাধান দুইপ্রকারে হইতে পারিত (১) পবিত্রভাবে মহান্ আদর্শে

জীবন নির্ব্বাহ করিয়া উভয়েই সমবেত সাধনায় পল্লীর উন্নতি সাধন করিয়া,—রমেশ নিজে যাহা চাহিত; অথবা (২) উভয়ে পবিত্র উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সমবায় শক্তি ও সাধনায় গ্রামে শান্তিরাজ্য স্থাপন করিয়া।

দুইটী সমাধানের কোনটীতেই বিন্দুমাত্র বাধা ছিল না। ইহা ব্যতীত তৃতীয় পন্থা ত আমার কল্পনায় আসে না। ঝগড়া করিয়া বা বাধা দিয়া রমার সাধ্য ছিলনা,যে কর্ম্মবীর রমেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কিছু করিতে পারে। অন্যত্র আবার পবিত্র উদ্বাহ ব্যতীত একত্রাবস্থান গ্রাম্যসমাজ কেন, কোন সভ্যসমাজই অনুমোদন করিত না। কোঁয়াপুর গ্রামে সঙ্কীর্ণতা,দলাদলি ও পরস্পরবিদ্বেষ প্রভৃতি আবর্জ্জনার বিষাক্ত বায়ুতে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিলেও রমেশের কর্ম্মদক্ষতা ও ত্যাগসাধনায় (শরৎবাবুর এ কল্পনা নিশ্চয়ই অতি মহৎ) সেই গ্রামেই একটী নূতন সমাজ গঠিত হইতেছিল, এই পল্লী-সংস্কারে রমেশ হিন্দুমুসলমান, মাষ্টার ছাত্র, সকলেরই হৃদয়জয়ে সমর্থ হইয়াছিল। বেণী ঘোষাল,গোবিন্দ গাঙ্গুলী, পরাণ হালদারের বিষদাঁত ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল এবং স্বয়ং বিশ্বেশ্বরী ছিলেন তাহাদের প্রধানা উৎসাহদাত্রী। এই অবস্থায় রমা তাহার বুদ্ধি, আদর্শ ও অর্থবল লইয়া রমেশের পার্শ্বে আসিয়া যদি শান্তির নিশান বহন করিত তাহা হইলে কোঁয়াপুর স্বর্গে পরিণত হইতে পারিত। বিবাহে ও দোষ হইত না অথবা বিবাহ না করিয়া উভয়ে পবিত্র আদর্শে গ্রামের উন্নতি করিলেও কোন মিথ্যা কলঙ্ক তাহাদিগকে কলুষিত করিত না। বিশেষতঃ একদিকে রমেশ যেমন অল্পসময়ের মধ্যে সকলের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল, রমার প্রভাবও সমাজে নিতান্ত অল্প ছিল না। এই উভয়বিধ সুবিধা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র উভয়ের পবিত্র সম্মিলনে নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়া কেন যে নবীনের মাহাত্ম্য বাড়াইলেন না আমাদের তাহা বোধগম্য হয় না; বরং আমাদের মনে হয় রমার সমস্ত বাসনার সহিত ঐ বয়সে, তাহার রমেশ, তাহার গ্রাম ও জমিদারী ছাড়াইয়া কাশীবাসের ব্যবস্থা করায় তাহাকে জীবন্ত দগ্ধ করিবার সম্পূর্ণ দায়ীত্ব শরচ্চন্দ্রের।

আরও একটী বিষয় ভাবিবার আছে। উভয়ের জীবন সার্থক করিতে রমা বা রমেশ কি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। বরং রমেশ উল্লেখযোগ্য দুই একটী ঘটনায় রমার জন্য কিছু স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু রমাকে ত দেখিতে পাই বাল্যবন্ধু রমেশকে প্রতিপদে অপদস্থ করিতে তাহার চেষ্টার ত্রুটী নাই। রমেশের মাতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত, রমা পরামর্শ করিতেছে, "আচ্ছা বড় দা, এমন করতে পারনা যে কোন ব্রাহ্মণ না তাদের বাড়ী যায়।" রমেশ স্বয়ং আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেও রমা সে বাড়ীতে পদার্পণ করে নাই। পুকুরে মাছ ধরা হইতেছে, বেণী ও রমা নিজের নিজের ভাগ লইতে লোকসহ হাজির হইয়াছেন, রমেশের চাকর ভজুয়া সসম্ভ্রমে আসিয়া রমাকে জিজ্ঞাসা করিল "মা-জী বাবুজী বলিয়া দিলেন মা-জীকে জিজ্ঞাসা করে আয় ওপুকুরে আমার ভাগ আছে কি না, মা-জীর জবান থেকে কখনও ঝুট্ বাত বাব হবে না"—কিন্তু রমা স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হউক্ বা জেদ্ বজায় রাখিবার জন্যই হউক, উত্তর করিল, "তোর বাবুর এতে কোন অংশ নাই, যা পারে তাই করুক্ সে।" ভজুয়ার নামে রমাই পুলিসে ডায়েরী করায় রমেশের বাড়ীতে পুলিস ঘেরাও করে, আবার রমার মিথ্যাসাক্ষ্যেই কর্ম্মবীর রমেশের ছয়মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হয়। শরৎবাবু বলিতে পারেন কলঙ্কভয়ে রমা মিথ্যা কথা বলিয়াছে। মিথ্যাচরণে রমার মত গরীয়সী নারীর কলঙ্কভয় দূর হয় না, সৎসাহসেই মিথ্যাকলঙ্কের বিষ শীঘ্র শীঘ্র নিঃশেষিত হয়। তবে রমা কেন কাশী চলিয়া গেলেন? যদি রমেশের হিতার্থেই তাহাকে ছাড়িয়া কাশীবাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে, তবেই বা তাহার জীবন পঙ্গু, বিফল বা ব্যর্থ হইবে কেন? কারণ তাহার কাছে রমেশের চিন্তাই ত স্বর্গ। বিশেষতঃ তাহার কনিষ্ঠ যতীন, তাহার কার্য্য ও তাহাদের জমিদারী সবই ত রমেশের হস্তে ন্যস্ত। রমেশই বা শেষাশেষি রমাকে এইরূপ বনবাসে রাখিবেন কেন, নির্ভীক রমেশ কাশীতেই বিশ্বেশ্বরী ও রমার পরামর্শ লইতে মাঝে মাঝে যাইবেন না কেন? আমরা শরৎবাবুর যুক্তির সার্থকতা কিছুই বুঝিলাম না। আর শরৎবাবুর রচিত উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন সময়ে সময়ে যেরূপ মারাত্মক হইয়া উঠে, তাহাতে বিবাহই যে একমাত্র সমাধান তাহাও ত মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি বিরাজ-বৌর উল্লেখ করিতেছি। নীলাম্বর ও বিরাজের দাম্পত্যপ্রণয় সাধারণতঃ দুর্ল্লভ, অথচ স্বামীর একদিনের অনিচ্ছাকৃত দুর্ব্ব্যবহারহেতু মুহূর্ত্তমধ্যে বিরাজের তাহাকে পরিত্যাগ ও লম্পট জমিদারের পান্সীতে গমন, হিন্দুসমাজে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতঃপর শরৎবাবু বলেন পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব নাকি সতীত্বের চেয়ে বড়, যেন সতীত্বের কল্পনায় মনুষ্যত্বকে বাদ দিতে হইবে। যাহা হউক এই বিষয়ে সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অতিকাব্য

শ্রীরসময় লাহা

(পূর্ব্বরাগ)

হতেম মৌমাছি, তুমি হ'লে বধূ চাক
ঢালিয়া দিতাম মধু তোমাতে বেবাক্।
সাগর হইলে তুমি, হতেম জাহাজ;
পালভরে করিতাম তোমাতে বিরাজ'
হইলে বিড়াল তুমি, হ'তেম ইঁদুর
আমারে পাইতে হ'তে আনন্দে বিধুর।
হ'তেম পুকুরে পোণা—তুমি হ'লে জাল
যেতাম তোমার কোলে ঘুচায়ে জঞ্জাল।
বাঘিনী হইতে যদি হ'তেম ছাগল,
ডাকিতাম প্রেমে তব হইয়া পাগল।
কৃপাণ হইলে তুমি হ'তেম পিধান,
তুমি আদি হ'তে যদি, আমি অবসান।
মাথামুণ্ড হ'তে যদি, হইতাম কাঁধ,
ঘুঘু হইতাম, যদি হ'তে তুমি ফাঁদ।
আকাশ হইলে তুমি, হ'তাম বিমান—
উড়ে উড়ে লইতাম তোমার সন্ধান।
কালি হইতাম, তুমি হইলে দোয়াত
গুঁড়ি হইতাম, তুমি হইলে করাত্,
গুহা হইতাম, তুমি হইলে পর্ব্বত—
তুমি লোটা হ'লে, আমি হ'তেম সর্ব্বৎ।
তুমি রাহু হ'লে, আমি হইতাম চাঁদ—
তুমি বন্যা হলে, আমি হইতাম বাঁধ।
কর্প্পূর হ'তাম, যদি হইতে ফানুষ,—
তুমি যে মানুষী, হায় আমিও মানুষ।
তুমি কি হইলে আমি কি যে হইতাম
কবি হ'লে উপমায় কত বলিতাম।
বকিনু বিভোল চিতে আবোল তাবোল,
তুমি কবে শুনাইবে মিঠে কড়া বোল।

(অনুরাগ)

তুমি কনে' আমি বর কি মিলন রাত
প্রসন্ন বিধির বরে দোঁহার বরাত।
অদৃষ্টে ঘটায়—হয় পর আপনার—
তুমি সুখে থাকিলেই সন্তোষ আমার।
সালঙ্কারা বালা তুমি, আমি সুপুরুষ,—
তোমারে লভিয়ে আরো বাড়িল জলুস।
সংসারের সব কাজে রবে তব হাত
তুমি রেঁধে দিলে আমি খেতে পা'ব ভাত।

(বিরাগ)

একি বধূ নিদ্রা গেলে তুমি বেমালুম্
আমার দু'চোক থেকে কেড়ে নিয়ে ঘুম!
জমাট পীরিতি মোর বিরাট অটল
পলক ফেলিতে কিনা ক'রে দিলে জল।

(রাগ)

পীরিতি সুখের ভরে ধায় উড়ে উড়ে,
মিথ্যা সে, কেবল দুঃখ রং বক্ষ জুড়ে।
থাকিলে তাহার পক্ষ উড়াতাম হেসে—
পীরিতির ফলে রাগে ফুলে মরি শেষে।

(উপরাগ)

পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, বিরাগ, কি রাগ
ভাবিতে ভাবিতে গেল নিভিয়া চেরাগ।
উপজিল উপরাগ—এবার ঘুমাব,
এক নিঃশ্বাসেই হ'ল ইতি—অতিকাব্য।

আঁধার ঘুমায়

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

আঁধার ঘুমায়,
চলে গেছে শেষ রাত গগনে আলোকপাত
জেগে উঠে তপনের চরণ চুমায়!
পাখীদের সাড়া,
জাগো, জাগো, জাগো বলে, কুসুম ডাকার ছলে
শিশির ছড়ায় গায়ে দিয়ে মুখনাড়া!

জাগিবে যখন,
তখন অনেক বেলা, বসেছে ভোরের মেলা,
কোন লাজে যাবে পথে, ভরা লোকজন?
বনের আড়ালে,
লুকায়ে দাঁড়ায়ে র'বে, গোধূলি নামিবে যবে,
পথ নেবে, তারাদলে কিরণ ছড়ালে!

মানুষ

১
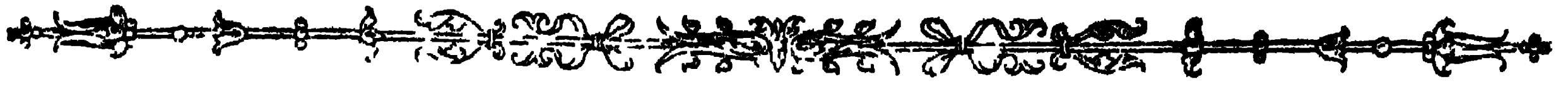
হঠাৎ একদিন আমাদের সমিতিতে ব্যবসার কথা উঠলো, কি প্রসঙ্গে যে উঠেছিল, তা আজ আর মনে নেই। ব্যবসাদার কেউ তার ভেতর ছিলাম না—তবে আমরা ছিলাম কেউ ব্যবসাদারের পুত্র, কেউ উকীলের পুত্র, কেউ ব্যারিষ্টারের পুত্র। চণ্ডীর বাপের একটা পাব্লিশিং হাউস্ ছিল—তিনি খুব সস্তায় বটতলার লেখকদের কাছ থেকে ২।৩ টাকা ফর্ম্মা হিসাবে প্রেসের উপন্যাসের কাপীরাইট খরিদ করে সেগুলিকে খুব ছবি-টবি দিয়ে ভাল করে বাঁধিয়ে বেশ সস্তাভরা করে মোটা দামে বেচে অগাধ সম্পত্তি করেছিলেন। চণ্ডী ছিল আমাদের দলের চাই। চণ্ডী বাপের চলতি কারবারের মালিক হয়ে খুব দেমাকে হয়ে উঠেছিল ও মনে মনে ভাবতো যে তার মতন পাকা ব্যবসাদার বাঙ্গালীর মধ্যে কেউ জন্মায়নি—ধরাকে শরার মত না দেখলেও চেঁচে-কেটে থালার মতই সে দেখতো—এর দরুণ গ্রন্থকারগণ হংসেনা স্বর্ণডিম্ব প্রসব ক'রে তার চারতলা বাড়ী গ'ড়ে দিয়েছিল, বাগে পেলেই তাদের গলায় সে ছুরা চালাত। সাহিত্যসেবীর হঠাৎ টাকার দরকার পড়লেই চণ্ডীভায়া টাকা দিত, কিন্তু ভাবী দাও ক'সে তবে। চণ্ডীর অহঙ্কারটা কেউ পছন্দ কর্ত্তো না, মনে মনে অনেকে তার সৌভাগ্যকে হিংসা কর্ত্তো কিন্তু তার মুখের সামনে কেউ "ট্যাফোঁ" কর্ত্তে পার্ত্তো না—এমনি রাশভারী সে ছিল।

ব্যবসার কথা উঠে সিদ্ধান্ত হল যে বাঙ্গালাদেশে একটা খুব উঁচুদরের ফিল্ম কোম্পানী খোলা। ব্যবসাটা ভারী লাভের, আমেরিকান জার্ম্মাণরা এই ব্যবসায় ফেঁপে গেছে—আর পোড়া ভারতবর্ষ এইটে না কত্তে পেরেই এখনও পরাধীন হয়ে আছে কারণ চণ্ডীর মুলমন্ত্র ছিল—সে বলতো দেশভক্তি স্বাধীনতা যা কিছু বল সবার মূলেই ঐ গোল, ঐ টাকা। যেমন মতলব ঠিক করা, সঙ্গে সঙ্গে বিপিন কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিসাব কত্তে বসে গেল—বিপিন সেবার এম্ এস্‌সিতে অনায়াসে পাশ করেছিল সে বিলাতে চার্টার্ড একাউন্ট্যাণ্ট হতে যাবে যাবে কর্চ্ছিল। শেষে স্থির হল, প্রথম দশজনে পাঁচহাজার ক'রে টাকা মূলধন দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে কাজ সুরু করা হবে—কোম্পানীটা উপস্থিত প্রাইভেট লিমিটেড্ হবে, কার্য্যক্ষেত্র হবে চণ্ডীদের দমদমার বাগানে। চণ্ডী চালাক লোক, সে এই হিসাবে বাগানটা হাজার টাকা ভাড়া হিসাবে তিন বছরের লীজ কোম্পানীকে দেবে, আর সেজন্য কোম্পানী তাকে দশহাজার টাকায় সেয়ার দেবে; অর্থাৎ সেয়ারের টাকা ঘর থেকে না বের ক'রে মাছের তেলেই মাছ ভেজে নেবেন। মনে মনে সকলে এতে খাপ্পা হয়ে উঠলেও চণ্ডীকে মুখের উপর কেউ কিছু বল্লে না।

তারপর স্থির হলো এখন ক্যামেরা ট্যামেরা কেনা হবে না—একজন ফিল্ম তুলতে জানে এমন সাহেব নাকি কলকেতায় আছেন, তার সঙ্গে ফুটকরা একটা দর ঠিক করে লওয়া যাবে—তারপর সেই ফিল্ম দেখিয়ে যা টাকা পাওয়া যাবে তা দিয়ে খুব ভাল uptodate ক্যামেরা কিনলেই চলবে—চণ্ডীর এ যুক্তি সকলের মাথায় বেশ লাগল। চণ্ডী বললে সে অনেক সখের থিয়েটারে রাজরাজড়া সেজেছে সুতরাং সেই অভিজ্ঞতার বলেই সে "প্রডিউসার" বা প্রয়োজকের পদ পেতে—আমাদের ভেতর অনেকেই পূর্ব্বে সখের দলে থিয়েটার করে এসেছেন, সে হিসাবে চণ্ডীর চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ লোক থাকলেও তার গোমড়া মুখের জোরে সেই প্রযোজক হল। তারপর "সিনারীও" লেখার কথা উঠতেই রমেশ বল্লে, প্রথম সিনারীও সে দেবে তার সেজন্য তাকে দিতে হয় একটা মোটা টাকা (মোটা অর্থাৎ বনেদী বড়লোকের মত তত মোটা নয়, পাঁচশত অবধি তার আন্দাজ ছিল) নয় ফিল্মের আয়ের উপর একটা কমিশন দিতে হবে। চণ্ডী বল্লে, তা হতে পারে না, কারণ তার হাতে এত ঔপন্যাসিক আছে যারা তার খাতিরে সে কাজ অমনি করে দেবে। রমেশ এবারে একটু রেগে উঠল, বল্লে আচ্ছা বেগারে কাজ কখন লাভ দেখাতে পার্ব্বে না। চণ্ডী বল্লে, আচ্ছা, রিহার্শাল্ অবধি দেখা যাক্, না চলে, তখন তোমার সিনারীও লওয়া যাবে। মোটের উপর, চণ্ডী টাকা বের না করে একসঙ্গে প্রডিউসার

ম্যানেজিং ডিরেক্টার সবই হয়ে গেল। আর আমাদের মধ্যে ৪ জন ডিরেক্টার হলো এবং আমি হলুম ম্যানেজার। পরে জানতে পেরেছিলুম "ম্যানেজার" মানে—ম্যানেজিং-ডিরেক্টারের তাঁবেদার।

২

কর্ত্তাদের কাছ থেকে টাকা বারকরা শক্ত হয়ে পড়লো।—কেউ মার সাহায্যে কিছু আনলে, কেউ বা শ্বশুরবাড়ী থেকে মস্ত বড় এক কারবার কর্ব্বো বলে কিছু আনলেন, কেউ বা পত্নীর গহনা গোপনে বন্ধক দিয়ে কিছু আনলেন। মোটের উপর হাজার দশ টাকা সংস্থান হল—কিন্তু কাগজে কলমে ৫০ হাজারই জমা খরচ হ'চ্ছে। টাকা কম, সস্তায় লোক যোগাড় কর্ত্তে হবে। পুরুষ অভিনেতা প্রায় সব বিনামূল্যে পাওয়া যেতে লাগল—কিন্তু স্ত্রীলোকের কি উপায়? চণ্ডী গড়গড়া টান্‌তে টান্‌তে গম্ভীরমুখে উপদেশ দিত ও বলত "বিনয় তুমি কি হে? গোটাকত মাগী আর সস্তায় মস্তায় যোগাড় কর্ত্তে পার্চ্ছ না?" শাস্ত্রে বলেছে 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'; জানি, কিন্তু সেখানে ঘেঁসবার মত সাহস আমার ছিল না। অনেকবার বারাঙ্গনা পল্লীর মধ্য দিয়ে যাতয়াত কর্ত্তম—উদ্দেশ্য যদি কোন সুশ্রী সুন্দরীকে দেখি তাহাকে অভিনয় করাইবার ব্যবস্থা করিব কিন্তু ফলে বেশী কিছু হত না; অর্থাৎ কাজ আগাইত না। দিনের বেলায় ঘরের বাহিরে অর্থাৎ বারান্দা প্রভৃতি সহজে-দেখা-যায় এমন জায়গায় প্রায় সুন্দরীদের দেখা পাওয়া যাইত না; দেখা পাওয়া যাইত, দু একটী প্রৌঢ়া বা বিগত-যৌবনা বা ভীষণ-দর্শনা খাটো কাপড় পরিয়া হয়ত বারান্দা হইতে কাঁচাপাকা চুল ঝুলাইয়া আঙুল দিয়া কুরিয়া কুরিয়া চুল শুখাইতেছেন; কস বহিয়া পানের ছেপের দাগ বহিয়া পড়িতেছে, কাহারও দাঁতগুলি মিসিতে মসীময় হইয়া বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার সময় রং চং মেখে সাজগোজ করে সুন্দরীরা বস্‌তেন বটে কিন্তু তাও আবার ঝাঁক বেঁধে। এখন সেই ঝাঁকের মধ্য গিয়া কি করিয়া কথা পাড়িব আমি ভাবিয়া পাইতাম না। ভাবিতাম যদি সকলে পাগল মনে করিয়া হাসিয়া উঠে—যদি ঠাট্টা করিতেছি মনে করিয়া গালি দেয়; বিশ্বাস কি? হয় ত ধরিয়া "চোর" "চোর" বলিয়া চেঁচাইয়া লোক জড় করিতে পারে। জামা কাপড় কাড়িয়াও লইতে পারে কুৎসিৎ ইয়ার্কিও দিতে পারে—সে সব তো সহ্য করিতে পারিব না; তা'তে ম্যানেজারী যায় যাক্‌। মাসাবধি এইরূপে বিফলে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এক সুন্দরীর পাত্তা মিলিল। সুন্দরী সত্যই সুন্দরী;—নামেও সুন্দরী ব্যবহার আরও সুন্দর। তিনি একটু লেখা পড়াও জানেন—ঠিক দস্তুর মত বারাঙ্গনাও নন, অথচ সমাজের ভেতরও চলতে পারেন না। তিনি ছিলেন আমাদের জানাশুনা এক ব্যারিষ্টার বাবুর রক্ষিতা—তাঁর নাম সুন্দরী; এবং রঙ তার ফর্‌সাই ছিল।

চণ্ডী যে সিনারিও এনে দিলে সেটা বটতলার নভেলে-সাগর মন্থন করে অর্থাৎ তাতে জলে ঝাঁপ, পাহাড় থেকে পড়া, অশ্বপৃষ্ঠে দৌড়ান, গলায় দড়ি, ঘরে আগুন দেওয়া, জেল-ভাঙ্গা,দরজা ভেঙে ঢোকা প্রভৃতি সমস্ত চিত্তোত্তেজক ব্যাপার একসঙ্গে গাঁথা ছিল। চণ্ডী বল্‌লে, এমন জমাটী প্লট খুব কমই মেলে। তা'রির রিহার্শাল চলতে লাগল। দৃশ্যপট কিছু কিছু সস্তায় তৈরী করান হল। মুস্কিল হল জেলখানার ব্যাপার নিয়ে জেলের অভিজ্ঞতা আমাদের কারুর ছিল না। উকীল ব্যরিষ্টারেরা প্রায়ই হয় জেলে পাঠান, নয় জেল থেকে খোলসা দেন, কিন্তু জেল জীবনের কিছুই জানেন না—বিশেষতঃ এটা ছিল গোয়ালিয়রের জেল-ভাঙ্গা। সেটাকে স্বাভাবিক কি করে করা যায় তা কেউ বল্‌তে পার্‌লে’ন না; সুতরাং একজন ওয়াকি-ভাল ব্যক্তির বড় আবশ্যক হয়েছিল। এ তো আর এ্যামেচার বাবুর দ্বারা হবে না! তাই কি করা যাবে ভেবে আমরা বড় চিন্তিত হয়ে পড়লুম। চণ্ডী ছিল আমাদের বিস্‌মার্ক; সে দয়া করে ঠোঁট দুটী একটু ফাঁক করে অস্পষ্ট একটু হাসি—তাও তাচ্ছিল্যের—ফুটিয়ে বললে, গোয়ালিয়রে আমার অনেক খদ্দের আছে তাদের কাছে খবর নিচ্ছি। ব'লেই, গুড়গুড়ির নলটা ঠোঁটের ফাঁকে দিয়ে, আর কথা বেরিয়ে আসবার রাস্তা বন্ধ করে দিলে। আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম; ভাবলুম, এত গুণ না থাকলে ম্যানেজিং ডিরেক্টর!

৩

খুব জোরে রিহার্শাল চলছিল। তাড়াতাড়ি একখানা

ফিল্ম না বের কর্ত্তে পারে টাকার আমদানী হচ্ছে না না—এদিকে সংগৃহীত দশ হাজারের অর্দ্ধেক, মোটর ভাড়া, পান-সিগারেটেই খরচ হয়ে গিছল সুতরাং মেয়ে-কেটে আর মাসখানেক আমাদের আয়ু; তার মধ্যে ফিল্ম না উঠলেই তো কোম্পানী কাবার! সকলেই খুব উঠে পড়ে লেগেছিলাম। প্রায় সব দৃশ্যই ঠিক হয়েছিল, বাকী ঐ লক্ষ্মীছাড়া গোয়ালিয়র জেলের দৃশ্য। একবার পরামর্শ হল ওটা বদলে কেলে কলকেতাব জেলখানা করা যাক্—আলিপুরে একদিন ট্রমে চড়ে গিয়ে সামনেব ফটোটা তুলে নেওয়া যাবে, আর ভেতরের দৃশ্য এঁকেই মেরে দেব—দর্শকেরা ত আর জেলের ফেরৎ নয়, যে ভেতরটা ঠিক হল কিনা মিলিয়ে নিতে পার্কে! চণ্ডী নিজেই বেঁকে বসল—বললে, তাহলে রোমান্স মাটী হবে! আর যদিই কোন জেলখালাসী বায়স্কোপ দেখে আব খবরেব কাগজে লিখে দেয় যে দৃশ্যটী অস্বাভাবিক, তাহলে বদ্নাম রটে যাবে। প্রথম ফিল্মে বদ্নাম রটলেই সর্ব্বনাশ! সকলে ভেবে দেখলাম কথাটা অসম্ভব নয়, কিন্তু উপায়ই বা কি? লোকে যে বলে নিরুপায়ের উপায় ভগবান, তা ঠিক। সেই সময় একখানা চিঠি এল গোয়ালিয়র থেকে—অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে মানুষের সুখের আর যেমন অবধি থাকে না আমাদেরও হইয়াছিল তাই। পত্রপ্রেরক একজন বাঙালী তিনি লিখেছেন যে তিনি গোয়ালিয়রে পূর্ব্বে এক ব্যাঙ্কে কেরাণীগিরি কর্ত্তেন, লোভে পড়ে তহবিল ভেঙ্গে কিছু টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন, ফলে তিন বৎসব সশ্রম কারাবাস হয়েছিল, দুই বৎসর খুব ভালভাবে কাটানোতে জেলের কর্ত্তৃপক্ষ মুচ্লেখা নিয়ে এক বৎসরের জেল মকুব করেন—তবে জেলের বাইরে এসেও তিনি দুঃখের হাত থেকে এড়ান পান্‌নি, দাগী বলে চাকরী বাকরী জুটছে না বড় কষ্টে আছেন। সেখানা হঠাৎ একদিন একটী বাবুর মুখে আমাদের প্রয়োজনের কথা শুনে তিনি আমাদের শরণাপন্ন হয়েছেন, যদি আমারা এই দুঃস্থ ভদ্রসন্তানটীকে প্রতিপালন করি।" চিঠি শুনে গুড়গুড়ির নলটা মুখ থেকে সরাইয়া চণ্ডী জোরে হেসে উঠল, হো—হো করে, চণ্ডীর মুখে এমন হাসি বড় একটা দেখেছি বলে মনে পড়ে না—সেইজন্ম হাসিটা খুব বীভৎস দেখাল, হাসি থামলে চণ্ডী বল্লে 'দেখ হে বিনয় একেবারে right man, film টা হবে খুব realistic একেবারে গোয়ালিয়রের জেল-ফেরতা এ্যাক্টর পাওয়া যাবে' সকলেই চণ্ডীকে ধন্য ধন্য কর্ত্তে লাগল ও তার ব্যবসা বুদ্ধির কি রকম দৌড় তা ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে পড়ল; কেবল রমেশ আমার কাণে কাণে বল্লে "ওহে আর কর্ত্তার কেরামতীটা কি? জান হে বিনয় কথায় বলে "পড়ে পাশা তো জেতে কোদালের বাঁট"। আমি কথাটা শুনিয়া প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও অন্তরে অন্তরে একটু মধুব রসের যে আস্বাদন পাইয়াছিলাম তাহা আজ আর অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই। এই জেল-ফেবতা ব্যক্তিকে আনাইবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। চণ্ডীর পবামর্শে তাহার পরিচিত ব্যক্তির নিকট থার্ডক্লাসের ভাড়া মনি-অর্ডাব করা হইল এবং তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল যে তিনি যেন 'Kindly' একটু কষ্ট করিয়া টিকিট কিনিয়া তাহাকে গাড়ীতে চড়াইয়া দেন—কারণ বিষয়-বুদ্ধিশালী চণ্ডী ভাবিল, দাগী আসামীকে টাকা পাঠাইলে যদি সে টাকাগুলি হজম করিয়া না আসে তাহা হইলে টাকা আদায়ের কোন কিনারাই হওয়া সম্ভব হইবে না।

লোকটা যে জেল-ফেরার সে কথাটা গোপন রাখা আবশ্যক ছিল, কারণ সখের অভিনেতারা হয়তো একজন দাগী আসামীব সঙ্গে play করিতে রাজী হইবেন না। তার উপর একটা ভয় ছিল ব্যারিষ্টার দস্তীদার সাহেবকে তিনি আমাদের নায়িকা সুন্দরী বিবির বন্ধু,তাঁর prestige জ্ঞান খুব টন্‌টনে, যদিও বারনারী সমাজে তাণ্ডব আমোদ-প্রমোদ করিতে তাঁর প্রেষ্টিজে বাধিত না। তারপর সুন্দরী বিবিও হয়ত আপত্তি তুলিতে পারেন—নানা ভাবনা চিন্তার পর ঠিক হইল ওকথাটা আমরা পাঁচজন ডিরেক্টর ছাড়া অপর কেহ জানিবে না, জানিবার কোন আবশ্যকও নাই। আর তাছাড়া লোকটাকে তো কিছুদিনের জন্ম রাখা হইবে কারণ পরের ছবিতে আর সে লোকের কোন দরকার নাও হইতে পারে।

৪

সেদিন দুপুর বেলা দমদমার বাগানে আমরা পাঁচজন ডিরেক্টার বসিয়া সল্লা পরামর্শ করিতেছিলাম, সেখানে আর কেউ ছিল না, এমন সময় একটী রোগা ছোকরাকে

সঙ্গে করে বাগানের দরওয়ান এসে সেলাম কল্লে—লোকটাও নমস্কার কল্লে। লোকটাকে দেখতে ভদ্রঘরের ছেলের মত, অনাহার-শুষ্কমুখে বড় বড় ডবডবে কোটর-গত দুটো চোখ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া উস্কো-খুস্কো চুল, পরনে শত ছিন্ন ময়লা কাপড়, খালি পা, গায়ে একখানা চাদর পর্য্যন্ত নেই—তার দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে চণ্ডী বল্লে "কি হে বাপু কি চাও?" বাবুর চাউনীর জলুস দেখে দ্বারবানজী আস্তে আস্তে পাশ কাটাইয়া পড়িল—মনে মনে হয়ত ভাবিল একে আনিয়া কি কুকর্ম্মই না করিয়াছি। লোকটা বেশ সহজভাবে বল্লে "আমার নাম গোপেন্দ্র বসু" "ওঃ তুমিই সেই দাগী আসামী" কথাটা শুনে লোকটার সেই কোটরগত চোখ দুটো যেন একবার দপ্‌ করে জ্বলে উঠল, পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে করুণস্বরে বললে 'দেখুন বাবু সে কথা তুলে আর আমায় কেন লজ্জা দেন, আমিও কায়স্থের ছেলে কিছু লেখা পড়াও জানি "ওঃ বেটা একেবারে নবাব খাঞ্জা খাঁ—কায়েতের ছেলে, লেখা পড়া জানি—জান তো জেলে গেছলে কেন? দ্বিতীয় ভাগেইতো বিদ্যেসাগর মশাই লিখে গেছেন না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা মহাপাপ, যে চুরি করে সকলে তাহাকে ঘৃণা করে" এমন মুখ ভঙ্গীর সঙ্গে চণ্ডী এই কথাগুলি বলিল যে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল—তবে তিনি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তাই ঝাঁজটা গোপন রাখিয়া বলিলাম, "থাক্‌ ওর অতীতের কথা তুলে আর কি হবে—এখন ওঁর সঙ্গে একটা মাহিনার কথা কয়ে নিন্।" মাইনে আবার কি! দাগী আসামীর আবার মাইনে—দশ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যেতে পারে" এমনভাবে খেঁক্ খেঁক্ করে এই কথাগুলো চণ্ডী বল্লে যে তা কোনরকম মানুষেই বরদাস্ত কর্ত্তে পারে না, কিন্তু তবুও সেই উমেদারটী নীরব হয়ে রইল, কাতরনেত্রে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বললে, "দশ টাকা যে বড্ড কম হবে বাবু একটা লোকের পেটও যে তাতে আজকাল চলে না।" "চলে না তো যেখানে নশো পঞ্চাশ টাকা পাবে সেখানে যাও, আমাদের পাঠান ভাড়ার টাকা ফেরত দাও"—বলিয়া জ্বলন্ত-দৃষ্টিতে চণ্ডী তাহার মুখের দিকে চাহিল—লোকটা দাগী আসামী হলেও তার কাতর-দৃষ্টি, অন্নাভাবে ক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ আমাদের সকলের মনে অনুকম্পা জাগিয়ে দিলে কিন্তু পারেনি কেবল চণ্ডীকে টলাতে। ব্যবসায় বুদ্ধির আড়ালে তার প্রাণের অনুভূতি বলে জিনিসটা বোধহয় সে হারিয়ে ফেলেছিল। গোপেন্দ্র বলিল "দেখুন বড় বাবু, আমি বড় বিপন্ন আমার ঐতে রাজী না হয়ে উপায় নেই তবে দয়া করে আমায় জেলে থাওয়ার কথাটা আর কাউকে বল্‌বেন না—এটুকু—" 'বড় বাবু' শব্দটীর মহিমা আছে, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য এবং একমাত্র এই শব্দটীর প্রয়োগ-নৈপুণ্যে গোপেন্দ্র সে যাত্রা বাঁচিল—চণ্ডী অন্তরে প্রসন্ন হইলেও তাহার মুখটী এমন পদার্থে প্রস্তুত যাতে তার মনোভাবের ছায়া পড়তো না। সেক্সপীয়ার চণ্ডীকে যদি দেখে যাবার সৌভাগ্য পেতেন তাহলে আর বলতেন না যে face is the Index of the soul চণ্ডী গম্ভীরভাবে বল্লে 'আচ্ছা আচ্ছা সে দেখা যাবে, যদি সদ্ভাবে থাক আর প্রাণপণে খাট তাহলে তার জন্য আটকাবে না" বলে আর দুজন ডিরেক্টরকে নিয়ে তিনি মোটরে উঠলেন। রইলুম বসে বিপিন, আর আমি। বিপিন বল্লে 'আচ্ছা গোপেন বাবু— 'গোপেন বাবু শুনিয়াই লোকটা কাঁদিয়া উঠিল—ভাঙা ভাঙা গলায় বল্লে "মশাই এ হতভাগাকে আর বাবু বলে, বাবু শব্দটা খারাপ কর্ব্বেন না—" বিপিন বলিল "তাতে কি—আপনি সেজন্য কিছু ভাববেন না আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টার বাবুটী একটু রুক্ষস্বভাব, পাকা ব্যবসাদার কিনা—ওতে কিছু মনে কর্ব্বেন না আপনি যাতে সৎপথে থেকে আবার ভাল হতে পারেন সে চেষ্টা আমরা কর্ব্ব" গোপেন আমাদের পায়ের উপর উপুড় হইয়া বলিল "আপনারা সব দেবতা বাবু।" আমি বলিলাম "দেখুন আপনার মুখ চোক যে রকম শুক্‌নো তাতে বোধ হচ্ছে আপনার আজ খাওয়া হয়নি" ম্লানমুখে আমাদের দিকে চাহিয়া সে বলিল "শুধু আজ কেন বাবু আজ ৩দিন জলছাড়া কিছু পেটে যায়নি—আপনারা টিকিটের দাম দিয়েছিলেন আর সেই বাবুটী নিজে থেকে ।০ আনা দিয়েছিলেন তাতে প্রথম দিনটা খাবার কিনে খেয়েছিলুম শেষ তিনদিন আর কিছু জোটেনি"। বিপিন, কথা শেষ হইতে না হইতে "দরওয়ান

দরওয়ান" বলিয়া হাঁক দিল—দরওয়ান আসিতেই ঠন্ করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিল "জলদী কুছ খাবার লেয়াইও"—

৫

গোপেন লোকটা খুব কাজের বটে এমন চালাক, এত বুদ্ধি আমি খুব কম লোকেরই দেখেছি, কিন্তু হলে কি হয় তার গুণই শেষটা তার কাল হল। ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন "গুণ হইয়া দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়" গোপেনের দুরদৃষ্টেও তাই দাড়াল। জেলখানার দৃশ্য সে এত কম খরচে এমন চমৎকার তৈরী করলে—যে ডিরেক্টরর দেখে হাঁ হ'য়ে পড়লেন, আর তার নিজের অংশ ছাড়া রিহারশলের মুখে সে এমন সব ভাও বাতলাতে লাগল যাতে অভিনয় খুব উচু হয়ে গেল এবং দৃশ্যপটাদি অসাধারণ রকম সুন্দর হল—এতে চণ্ডীর বুব পরামর্শের কতক কতক বদলাতে হয়েছিল। চণ্ডী তখন ভিতরে মনে মনে ভারী চটে গেল—মুখে অবশ্য কিছু বলতে না, কারণ সে বুঝতে পেরেছিল যে গোপেনের ব্যবস্থা সত্যই ভাল হয়েছিল। তা ছাড়া গোপেনকে পেয়ে কোম্পানীর অনেক দিক দিয়ে লাভ হচ্ছিল, তার থাকবার জায়গা ছিল না বলে সেই বাগানে চাকরদের একটি ঘরে তাকে থাকতে দেবার ব্যবস্থা আমি করিয়ে দিয়েছিলুম। প্রথম অবশ্য চণ্ডী রাজী হয় নি, বলেছিল "না হে বিনয় ওসব চোর-ছ্যাচড়দের সঙ্গে অত ভদ্রতা ভাল নয়, ওরা সব Cut throat" শেষটা আমার একান্ত অনুরোধে জায়গা দিয়েছিল আর শুধু অনুরোধই বা কেন, এর আরও একটু প্রচ্ছন্ন কারণ ছিল, ব্যবসাদার চণ্ডী জানতো যে সে বাগান তার হলেও এখন সেটা কোম্পানীর এবং গোপেন তার পরিশ্রম, বুদ্ধি, রুচি, নম্রব্যবহার আর প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের গুণে ডাইরেক্টারদের এত প্রিয় হয়েছিল যে চণ্ডী এখন খুসী হলেই তাকে তাড়াতে পার্ত্তো না। গোপেন বেশ আঁকতে জানত—দরকার মত নিজেই সিন্ এঁকে নিত—পুরাণ কাপড় নানান্ রকম রঙে ছুবিয়ে এমন সব পোষাক তৈরী করতো যা দামী দামী পোষাকের চেয়ে ফটোগ্রাফীতে খুব বেশী জমকাল দেখাত অর্থাৎ ভড়ংএর উপর অল্প খরচে কাজ সমাধা কত্তে সে ছিল সিদ্ধহস্ত। তারপর ইলেক্ট্রীকের জেনারেটর খারাপ হলে—গোপেন নিজেই যন্ত্রপাতি নিয়ে মেরামত কর্ত্তে বসে গেল—এমন কি একদিন রিহারশালের পর, রাত তখন ১টা, গেল চণ্ডীর মোটর খারাপ হয়ে, কি করে বাড়ী ফির্বে চণ্ডী তো ভেবেই আকুল, গোপেন যন্ত্রপাতি এনে আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ীকে চলচ্ছক্তি দান করলে—এতে কোথায় চণ্ডীর মন নরম হবে তা নয়, সে নির্লজ্জের মত হাসতে হাসতে বল্লে "বেটা পাকা চোর কিনা সব বিদ্যায় ওস্তাদ" কথাটা শুনে চণ্ডীর উপর আমাদের বড় ঘৃণা হল। মানুষ—হায় রে মানুষ! তুই মানুষকে এত ঘৃণাও কর্ত্তে পারিস—পরে রক্ত মাংস! তোর এ ধর্ম্ম তুই কবে ছাড়তে পারবি?

কত কাজই যে গোপেন কর্ত্ত আর কি সুন্দরভাবেই যে কর্ত্তো তা বলতে পারি না—সে ক্রমশঃ এই ছবির ব্যবসার প্রাণ হ'য়ে দাড়িয়েছিল—সে যতই সকলের প্রিয় হয়ে উঠতে লাগল তার উপর চণ্ডীর আক্রোশ ততই যেন বাড়তে লাগল। রাস্তার পাগলা ঘেয়ো কুকুরকে লোকে যেমন ঘৃণার চক্ষে দেখে, গোপেনকে সে তার চেয়ে ভাল চোখে একদিনও দেখেনি। রিহারশালে সিন সাজান, পোষাক পরান, পেণ্ট করা, সব কিছু সে এত চটপট এমন সুন্দরভাবে করে দিত যে আমাদের ফটোগ্রাফার উইলার্ড সাহেব বলতো He is born for the Swen—just send him to England and he is sure to be a multimillionaire. স্বাধীনদেশে জন্মে সাহেব কি করে বুঝবে যে শুধু এদেশে জন্মানোর পাপে এ দেশে মানুষের মত মানুষকেও জগতের চক্ষে কত ছোট দেখায়। এসব শুনে চণ্ডীর রাগ আরও বেড়ে যেত, আর সে গজ গজ ক'রে বলতো "নাঃ ঐ চোর ব্যাটাকে তোমরা বড় বেশী আস্কারা দিচ্ছ হে—কুকুরকে নাই দিলে সে মাথায় উঠে—সেটা ভুলো না" সে মাথায় উঠিবে কি না, বুঝিতে না পারিলেও সকলেই এটা বুঝিত যে সে কুকুরের মত অল্পে সন্তুষ্ট, গভীর প্রভুভক্ত পরিশ্রমে অকাতর, সর্ব্বদা সতর্ক—মনিবের এক আধলাও কোনদিকে যাতে অপব্যয় না হয় সেদিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

চণ্ডীর রাগের আর একটা গুহ্য কারণ আমি পরে টের পাইয়াছিলাম সেটা এই। সাজসজ্জার জিনিসপত্র

সব বাজার থেকে চণ্ডীই কিনিত—সে ।/০ গজের সাদা পাতলা থান কিনিয়া ঘরে তাহাকে রঙ করিয়া পোষাক করাইত, হয় তো তাতে দুটাকা খরচ পড়িত কিন্তু জামাটীর বিল কোম্পানীর নিকট হইত ১৩৲ টাকার—এ সব কাজ গোপেন উপষপড়া হইয়া সস্তায় করিবার ফিকির বাৎলাইয়া দেওয়ায় মুখে সেজন্য তাহাকে শুষ্ক ধন্যবাদ দিলেও চণ্ডী অন্তরে অন্তরে তাহাকে তাড়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল কিন্তু ভগবান যাহাকে রক্ষা রক্ষা করেন মানুষ তাহার কি করিবে। চণ্ডী বড় ব্যবসাদারই হউক আর যাই হউক মানুষ ছিল তো সেও শেষটা যেন আর গোপেনের সঙ্গে পারিয়া উঠিতে-ছিল না। কি বিড়ম্বনা?

৬

কুড়ি বাইশ দিনের ভেতর প্রায় ন'হাজার ফুট ছবি উঠে গেল এর একটা পার্ট বাকি সেট, হলেই একখানা ছবি শেষ হয় আর কি। সেদিন শনিবার সেই সিনটা তোলবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিল—এ্যাক্টররা, যারা আফিসে চাকরী-বাকরী কর্ত্ত, তারা ১টার সময়ই পালিয়ে এসেছে, ছুটো বাজতে আর তর সয় নে, আমরা তো এগারটার সময়েই হাজির হয়েছি। গোপেন মহা-উৎসাহে খাটছে। এটা হচ্ছে এমন একটা দৃশ্য, যেখানে বিরহিণী রাজকুমারী অলিন্দে বসে তাঁর নির্ব্বাসিত প্রণয়ীর কথা ভাবছেন, আর দূরে ঘন কুয়াশায় আচ্ছাদিত পর্ব্বত থেকে সেই রাজপুত্র নেমে আসছেন—বাগানে একটা পাথরের পাহাড় ছিল তার চুড়োয় ছিল একটা ঝরণা—গোপেন সেই ঝরণাটার সঙ্গে একটা মস্ত গাছের ডাল জুড়ে দিলে ও পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গাছের বড় বড় ডাল খাড়া ক'রে সেটাকে বনবেষ্টিত পর্ব্বতের মত করে ফেলেছিল, আমরা তো দেখে খুব তারিফ্ দিলাম—তারপর কুয়াশা দেখাবার জন্য সে আমাদের কাছথেকে পুরাণো পাতলা উড়ানি চেয়ে নিয়ে তাকে এমন হালকা ধূসর রং করে নিয়েছিল ও সেগুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে দড়ি দিয়ে এমন নাড়তে লাগল ও নীচে থেকে শুক্‌নো গাছের পাতা পুড়িয়ে শাদা ধোঁয়া দিলে যে খুব দূর থেকে দেখে মনে হল সত্যই যেন পাহাড়টাকে কুয়াশায় ঘেরে ফেলেছে—খানিকটা দূরে একটা পটে রাজবাড়ী আঁকা ছিল, তার দোতলায় একটা জানালা খোলা—সেখানে একটা প্লাটফরমের উপর একখানা ভাল কৌচ পেতে দেওয়া হইয়াছিল, রাজকন্যা নীহারিকা তার উপর 'আধ শুয়ে আধ বসিয়ে ভাবিতেছে কত কথা' দেখাবেন বলে। চণ্ডী নিজেই সব তদারক কর্চ্ছিল অর্থাৎ কাজে কিছু নয় কেবল নামে—যাকে মুখে কর্ত্তাপনা করা বলে আর কি। অভিনেত্রী সুন্দরীকে সেই প্লাটফরমে উঠতে হবে অবশ্য বাঁশের মইয়ে করে, শুনেই সে বললে ওঃ বাবা ঐ টিলটিলে মইয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে মরব নাকি—বুড় বয়সে (এটা অবশ্য তার দীপ্ত যৌবনের গরিমাটুকু প্রকাশ কর্ব্বার জন্যই সে বলেছিল) কি আপনাদের জন্য হাত-পা ভাঙ্গবো। চণ্ডী, বাইরে পেঁচার মত গম্ভীর হলেও সুন্দরী স্ত্রীলোকদের কাছে সে যে মস্ত একজন রসিক তা জানাবার চেষ্টা কর্ত্তো, এক গাল হেসে বললে—সুন্দরী, তোমার জন্য কত লোকের বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে আর আমাদের জন্য তুমি হাতটা পা-টা ভাঙতে পার্ব্বে না।"—সুন্দরীও বড় কম যেত না—সে বড় একটা কারুর তোয়াক্কা রাখতো না, সে মুখের উপর ফট্ করে বল্লে "কি জানেন বড়বাবু বুক ভাঙ্গলে ঝেলে নেওয়া যায়, কিন্তু হাত পা ভাঙ্গলে যে এম্পুটেট কর্ত্তে হয়"—যখন তাকে সেই মুক্ত বাতায়নে বসান অসম্ভব হয়ে উঠল তখন কেবল গোপেনই অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করলে, সে নিজে সিঁড়িটা চেপে ধরে রইলো—তখন সুন্দরী তার কাপড়-চোপড় একটু সামলে নিয়ে সিঁড়িতে উঠ্‌তে লাগল—সে পাটাতনে উঠে বল্লে "আমার গা কাঁপছে"—গোপেন তখন তাড়াতাড়ি উপরে উঠে তাকে ঠিক দরকার মত বসিয়ে দিলে—সেই সময় তার গলার জড়োয়া নেকলেসটা খুলে গেল, গোপেন সেটা পাটাতনের উপর থেকে কুড়িয়ে তাকে ফের পরিয়ে দিতে গেলে সুন্দরী হেসে বল্লে না ওটা আর পরবো না Clampটা আল্‌গা হয়ে গেছে ফের পড়ে টড়ে যাবে—ওটা তুমি সাবধান করে রেখে দাও যাবার সময় আমায় মনে করে দিও। এসব ব্যাপার তখন আমরা কেউ জানতেম না—অবশ্য পরে শুনেছিলাম।

গোপেনের গায়ে যে জামাটা ছিল সেটা আমারই একটা পুরাতন জামা—এরকম পুরান কাপড়টা জামাটা জুতাটা আমি তাকে প্রায়ই দিতাম, জামাটার পকেট ছিল ছেঁড়া আর গোপেনও তা সেলাই টেলাই করে নে কারণ তার পকেটে রাখবার মত বড়কিছু ছিল না—এখনও মাস পূরা হয়নি মাইনেও সে পায়নি, তাকে খোরাকী বাবদ বিপিনই মাঝে মাঝে দুটাকা একটাকা হাওলাত দিতো, তাতেই সে চাল ডাল কিনে একবেলা দুটো ফুটিয়ে নিত। পকেট ছেঁড়া দেখে সে মনে করলে নীচে এসে আমার কাছে নেক্‌লেসটা রেখে যাবে—তাই নেকলেসটাকে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে যেমন তাড়াতাড়ি নেমে আসতে যাবে অমনি সিঁড়িটা হড়কে পড়ে গেল—গোপেনও নীচে ধপাস করে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ীর সিনখানাও তার ঘাড়ের উপর উল্টে পড়ে গেল—গোপেনের অবশ্য খুব বেশী লাগেনি, ছুতার মিস্ত্রিরা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে সিন্‌টা তুলে ধর্ল্লে, গোপেন উঠে দাঁড়াতে যাবে এমন সময় চণ্ডী ছুটে এসে পেছনথেকে মারলে তাকে এক লাথি, সে আবার পড়ে গেল। চণ্ডী এই গোলমালে ভারী রেগে গিছল, চেঁচিয়ে বড় বড় চোখ রাবকোবে বল্লে—Bloody Swine দূর করে দাও বেটাকে—ব্যাটা পাজী জেল-খালাসী—চোর" শেষের দুটো কথা শুনে সমবেত সকলে চম্‌কে উঠল—আর গোপেন, সে লজ্জায় ঘৃণায় অধোবদন হয়ে বসে রইল, তার বোধ হয় মনে হচ্ছিল এই সময় পৃথিবীটা যদি দুফাঁক হয়ে যেত তা হলে সে তার ভেতর সেঁধিয়ে বাঁচতো—

৭

চণ্ডীকে আমরা শান্ত কর্ত্তে চেষ্টা কল্লুম কিন্তু ফল খারাপ হল—সে এত রেগে উঠতে লাগল এবং এমন সব গালাগাল-মন্দ কর্ত্তে লাগল যাতে সম্পর্ক বিচার তো ছিলই না—ভাষার দোষও বহুৎ ছিল এবং ব্যাকরণের ভুলে ভরা ছিল;—তার বহুদিনের সঞ্চিত ক্রোধটা আজ যেন একটা অজুহাত পেয়ে পূর্ণ কেন পূর্ব্বের চেয়েও বেশী মাত্রায় আত্মপ্রকাশ কচ্ছিল—গোপেন মাটীতে বসে ঘাড় হেঁট করে পাষাণমুর্ত্তির মত সব গাল সহ্য কচ্ছিল আর তার চোখ থেকে গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল—সে কাঁদছিল কিন্তু সে কান্নার আওয়াজ ছিল না—ফল্গুনদীতেও নাকি জল বয় কিন্তু লোকে তা দেখতে পায় না কারণ সেটা বালির ভিতর দিয়া বয়ে যায় তার কান্নাও তেমনি নীরবে পৌছাচ্ছিল বোধ হয় ভগবানের চরণে। শেষটা রাগ সামলাতে না পেরে চণ্ডী যখন ফের তার মাথায় একটা লাথী মেরে বললে "এখনও বসে আছিস বেটা পাজী যা বেরো দূর হ এখান থেকে" তখন সে জ্যামুক্ত তীরের মত সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল—একবার চণ্ডীর মুখের দিকে চাইলে—তার চোখ দুটা তখন যেন জলন্ত কয়লার মত দেখাচ্ছিল আর তার মাথার উস্কো খুস্কো ঝাঁকড়া চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠে সেই চোখ দুটোয় এমন একটা ভীষণ ভাব সৃষ্টি কর্ল্লে যা সত্যই ভয়ঙ্কর। তারপর কি জানি কেন সে হঠাৎ আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল—সকলেই চুপ করে রইল কারুর মুখে কথা নেই কেবল সেই ভীষণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চণ্ডী হেঁকে বললে "সব বসে কেন, ফের সিন সাজাও আজ ছবি শেষ কর্ত্তেই হবে—এক ব্যাটা চোরের জন্য কি কোম্পানী এত Loss suffer কর্ব্বে?" তখন আবার আয়োজন হতে লাগল—ফটোও উঠল কিন্তু কারুর মুখে আর উৎসাহ ছিল না—যে আনন্দ এতক্ষণ সবার মুখে দীপশিখার মত পড়ে সবাইকে উজ্জ্বল করে রেখেছিল তা নিভে গিছল, ফটোগ্রাফার উইলার্ড সাহেব ফটোতোলা শেষ করে বল্লে—Very sorry Babu—this part has become a grand failure—there is no life in this thousand feet." ফটো তোলার পর আমরা সব সাহেবের সঙ্গে তার পাওনাথোওনা হিসাব কর্ত্তে লাগলুম। সখের অভিনেতা বাবুরা সিগারেট ধরাইয়া বাগানের হেথাসেথা বেড়াইতে লাগিলেন। বাগানে একটা খুব বড় দীঘি ছিল তার শাণ-বাঁধান ঘাটের চাতালে বসিয়াছিল অভিনেত্রী সুন্দরী আর একটা ৯।১০ বছরের ছোট মেয়ে তার নাম নিনা—ভাল নামটা নিভাননী বা ঐরকম একটা কিছু ছিল এই মেয়েটী সুন্দরীর সঙ্গেই আসতো-যেতো—আমাদের ছবিতে তারও একটা ছোট পার্ট ছিল, মেয়েটী বোধ হয় সুন্দরীর বাড়ীর আশে পাশেই কোথাও থাকতো এবং বোধ হয় তার কোন সমব্যবসায়িনীর কন্যা বা পালিতা।

কন্যা ছিল—যাই হোক্ মোটের উপর মেয়েটাকে সুন্দরী খুব ভালবাসতো—মেয়েটী দেখতেও খুব সুন্দরী ছিল এবং কথাবার্ত্তায়ও বেশ চটপটে ছিল। মুখের উপর চোটপাট জবাব দেওয়া তার একটা স্বভাব ছিল, তবে যা বলত তা বেশ পাকা পাকা কথা—এমন সব কথা যা তার চেয়ে বেশী বয়সের মেয়েরাও ধাঁ করে মাথায় আনতে পারে না। সুন্দরীতে আর নিনাতে যখন কথা কইছিল তখন দূরে একটা চাঁপা গাছের ফুলে ভরা সৌন্দর্য্য, নিনার চোখ দুটোকে যেন সেদিকে টেনে নিয়ে গেল, নিনা বল্লে "ছোটমাসী (সুন্দরীকে সে এই বলেই ডাকতো) তুই একটু বস আমি দুটো চাঁপাফুল নিয়ে আসি" সুন্দরী বল্লে "যেন গাছেটাছে উঠতে যাসনি —মালীকে বলগে যা সে চাটি পেড়ে দেবে" "তাই হবে গো তাই হবে—আমি কেন গাছে উঠতে গেলুম" বলিয়া সুন্দরীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িতে নাড়িতে সে চাপা গাছের দিকে ছুটিয়া গেল। গাছটার কাছ বরাবর গিয়াছে এমন সময় হঠাৎ তার নজর পড়লো গাছটার তলায়—তার বোধ হল কে যেন একটা লোক তার তলায় ঘাড় গুঁজে বসে আছে—সন্ধ্যার সময় হলে সে হয়ত ভূত মনে করে চেঁচিয়ে উঠতো কিন্তু তখন সন্ধ্যা হয় হয় হইলেও দিনের আলো বেশ স্পষ্ট ছিল—সে একটু তফাৎ হইতে বলিল 'কে গা তুমি—কে গা গাছতলায় বসে?' উপবিষ্ট ব্যক্তি ঘাড় তুলিল—আওয়াজ যে দিক হইতে আসিতেছিল সেদিকে চাহিয়া বলিল "আমি—" তার মুখ দেখে নিনা বল্লে "কে গোপীমামা—তা অমন করে বসে কেন—বড্ড লেগেছে বুঝি? ঐ চণ্ডী মুখপোড়াটা ভারী পাজি—ভদ্রলোককে এমন করেও মারে, আমার ইচ্ছা হচ্ছিল খেংরে মিন্সের বিষ ঝেড়ে দি"—গোপেন্দ্রের অশ্রুজল গণ্ডে শুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল—অপমানের জ্বালাটাও বোধ হয় একটু কম পড়িয়াছিল—কিন্তু বালিকার কথা শুনে—ঘা ধোয়াতে বসে রোগী যেমন অপারেসনের জ্বালা নূতন করে সহ্য করে তেমনি তার সমস্ত অপমান লাঞ্ছনা নির্য্যাতন আবার তাকে কষ্ট দিতে লাগল—তা দেখে নিনার বড় কষ্ট হল —সে বললে আচ্ছা "গোপীমামা তুমি কাঁদ কেন? তুমি না বেটাছেলে—তোমায় অত গালাগাল দিলে—মারলে, আর তুমি চুপ করে পালিয়ে এলে—আমি হলে কিন্তু সেখানেই ওকে দেখিয়ে দিতাম ওরই একদিন কি আমারই একদিন।' কথাটা গোপেনের প্রাণে একটু যেন তৃপ্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগাইয়া দিল সে বলিল—তা নয় নিনা—তুই মনে করিসনি যে গায়ে আমার জোর নেই—আমি যদি ঘুসী চালাতুম ত বড়বাবুকে সেখানেই পাট করে দিতুম—কিন্তু তাতে কি হবে—আমি যে সত্যিই চোর—সে তো আমায় মিছামিছি চোর বলে নে —এ অপমান থেকে আমি কি করে বাঁচবো—সব লোক তো জানে আমি দেখতে ভদ্রলোক, ভদ্রবংশে জন্মেছি—তবুও আমি চুরি করেছি, জেল খেটেছি—আমি যে দাগী আসামী—ওঃ ভগবান কেন আমায় এ কুমতি দিয়েছিলে?" "তাতে কি গোপীমামা—যদি বোঝবার ভুলে চুরীই করে থাক, জেলখেটে তার প্রায়শ্চিত্ত করেছ আর ত চুরি কর নি—ভাল হবে বলেই তো আবার এই সামান্য মাইনের চাকরী কর্ত্তে এসেছ—তাতে তোমার লজ্জা কিসের, ভয় কিসের? তুমি যদি মানুষ হও ত যাও এখুনি গিয়ে সেই লক্ষ্মীছাড়া মিন্সেকে আচ্ছারকম শিক্ষা দিয়ে এস—মুখপোড়া বল্লুক সেও মানুষ তুমিও মানুষ। একদিন চুরি করেছিলে বলে তুমি আজ আর তারচেয়ে ছোট নও—তুমি যখন আবার ভাল হবে বলে চেষ্টা কর্চ্ছ তখন তোমায় ভাল হবার জন্য সাহায্য না করে তোমার সেই পুরাণো ভুলের কলঙ্ক চাপা দিয়ে সে তোমাকে চিরদিনই ঘৃণার অন্ধকূপে ডুবিয়া রাখতে চায়—সে মানুষ নয় মামা—সে একটা জানোয়ার" "ঠিক বলেছিস নিনা—আমি মানুষ - বড় মনে করিয়ে দিয়েছিস্—সত্যই আমি তো মানুষ—আচ্ছা যাচ্ছি, আমি একবার দেখ্‌বো তাকে" বলে সেই মুহ্যমান নরদেহটা হঠাৎ যেন নবীন শক্তিতে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং আস্তেন গুটিয়ে ছুটলো আফিসঘরের দিকে।

তখন প্রায় সকলে চলে গেছে, চণ্ডী একটা চুরুট ধরিয়ে বেরুচ্ছে, বাগানের গেটে তার মোটর দাঁড়িয়ে নিনা ও সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে তাতে উঠবে আর কি; আর আমি ভেতরে হিসাবগুলো মিলাচ্ছিলাম বাজসেরে

বাড়ী যাব বলে। হঠাৎ বাহিরে গোলমাল শুনে বেরিয়ে এলুম—এসে দেখলুম গোপেন দাঁড়িয়ে আছে, আর চণ্ডী তার দিকে চেয়ে বলছে "আবার এসেছিস যে, ব্যাটা বেহায়া নচ্ছার" "হিসেব নিকেশের জন্য এসেছি" "হিসেব নিকেশ, কিসের হিসেব ? তোর মাইনের, কাল এসে বিনয়-বাবুর ঠেঙ্গে নিয়ে যাবি আর খবদ্দার এ বাগানে যেন ফের তোকে না দেখি" "সে হিসেব নয় চণ্ডীবাবু (চণ্ডী গোপেনের মুখে নিজের নাম শুনে চমকে উঠ্লো।) আমায় অকারণ যে অপমান করেছেন তারির আজ প্রতিশোধ নিতে এসেছি, তবে আপনি আমায় যেমন বলা-নেই কওয়া-নেই খামকা মেরেছিলেন আমি তা করবো না—আমি আপনাকে মারবো এর যদি সাধ্য থাকে আপনি আত্মরক্ষা করুন—" চণ্ডীর মুখ শুখাইয়া গেল, বোধ হয় ভয়ে। তবে সে 'ভাঙ্গিবে তবু মচকাইবে না' প্রকৃতির লোক বলিয়া মুখে দাঁত দেখাইয়া বলিল" "তুই বেটা একটা দাগী চোর, তোর সঙ্গে কোন্ ভদ্রলোক লড়বে রে—দিচ্ছি তোর উপযুক্ত ঔষধ" বলিয়া "দারওয়ান—দারওয়ান" বলিয়া যেমন চেচাইল অমনি গোপেনের বজ্রমুষ্টি করকাবর্ষণের ন্যায় তাহার নাকে মুখে চোকে চট্ পট্ করে অবিশ্রান্তভাবে পড়তে লাগলে, আমি ছুটিয়া গেলাম, দারওয়ান আসিল কিন্তু—গোপেন তখন পগার পার। নিনা, সুন্দরী সকলে ছুটিয়া আসিল।

* * * *

তার পরদিন দুপুরবেলা সুন্দরী খাওয়াদাওয়ার পর তার ঘরের মেঝেয় শুইয়া আছে, মাথার দিকে দরজার একটা কপাট খোলা আছে, সেইখান উপর হইতে রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে ও সেই রৌদ্রে সে তাহার বিপুল নিবিড় কেশরাজি মেলিয়া দিয়া শুখাইতেছিল, আর নিনা বসিয়া সমুদ্রের ঝিনুক দিয়া তার গায়ের ঘামাচি মারিয়া দিতেছিল, হটাৎ নীচে মানুষের পায়ের আওয়াজ পেয়ে সে চমকে উঠে বল্লে "দেখতো নিনি কে আবার আসে—দুপুর বেলাও একটু নিশ্চিন্দি হবার যো নাই—ব্যবসার মুখে আগুন" নিনি উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া আহ্লাদে চেচাইয়া বলিল "ছোটমাসী গোপীমামা এসেছে" সুন্দরী ধড়মড করে উঠে পড়লো এবং একটা চেয়ার টেনে এনে "এসো, গোপীন বসো" বল্লে, নিনার হাতে একটা আধুলি দিয়ে চুপি চুপি বল্লে "যা ঝিকে দিয়ে চার আনার সন্দেশ আর চার আনার রসগোল্লা আনাগে যা, তোর মামাবাবুর জলখাবার জোগাড় কর।" গোপেন চেয়ারে বসিয়াছিল তাহার মুখ শুষ্ক, চোখ দুটা চঞ্চল কর্চ্ছে যেন ভারী অন্যমনস্ক—সুন্দরী বললে 'কাল খুব কীর্ত্তি করে যা হোক' গম্ভীরভাবে গোপেন বলিল "দিদি আমরাও যে মানুষ—" কথাটা সুন্দরীর প্রাণের একটা নিভৃত স্থানে আঘাত করিল, তাহার বিস্মৃত মানবতাকে যেন সচেতন করিয়া দিল—সে আনন্দে, গর্ব্বে যেন ফুলিয়া উঠিয়া বলিল "বেশ করেছিস্ ভাই—আজ তোকে পেয়ে মনে হচ্ছে তুই আমার যেন জন্ম জন্মান্তরের আপন ভাই" "সে আমার বহুপূণ্যফলের কথা দিদি, যাক্ যে কাজটার জন্য আমি এসেছি—এই নাও তোমার নেক্লেস্, কাল প্রথমে গোলমালে তোমায় দিতে ভুলে গেছলুম, তোমরাও কেউ খোঁজ করনি তারপর রাত্রে বিডনগার্ডেনে একটা চাতালে শুয়ে আছি এমন সময় হঠাৎ এটার কথা মনে প'ড়লো প্রথমে ভারী লোভ হল একবার ভাবলুম এইটে নিয়েই সরে পড়ি এটা বেচে যা পাব তাতে আমার মত লোকের বাকী জীবনটুকু বেশ সহজেই কেটে যাবে—মিছে পোড়া পেটের জন্য কেন পরের দোরে লাথি ঝাঁটা খেতে যাই—তারপর মনের কোণে কে একজন যেন গর্জ্জন করে বল্লে 'হ্যারে তুই না মানুষ ?' অমনি মনে পড়ল, সেকাল আমি আমার হারাণ মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে পেয়েছি—সারারাত এইটিকে নিয়ে যক্ষের ধনের মত আগ্‌লে ব'সেছিলাম—সকালে উঠে তোমার এখানে আসব ব'লে আসছি এমন সময় পথে দেখা হ'ল সেই ফটোগ্রাফার সাহেবের সঙ্গে, আমায় দেখে তিনি মোটর থামিয়ে গাড়ীতে তুলে নিয়ে বল্লেন "তিনি ভবানীপুর যাচ্ছেন সেখানে কয়েকজন ধনী বাঙ্গালী মিলে একটি নূতন ফিল্ম কোম্পানী খুলবেন—তিনি তার ম্যানেজার হয়েছেন এবং আমাকে তাঁর সহকারী ক'রে নেবেন স্থির করেছেন, উপস্থিত আমায় দুশোটাকা করে মাইনে দেবেন" সাহেবটি বড় ভাল লোক তাঁকে আমি সব খুলে বল্লুম, শুনে তিনি বল্লেন "মিঃ বসু—পৃথিবীতে অনেকরকম প্রলোভন আছে আর তাতে

প'ড়েই মানুষ পাপ করে—পাপ করাটা রক্তমাংসেরই ধর্ম্ম, যিনি পাপীদের ত্রাণ করেন, লোকে তাঁকেই ভগবান বলে —যা হয়ে গেছে সে কথা ভেবে আর নিজের মনুষ্যত্বকে ছোট ক'র্‌বেন না—সামনের দিকে চেয়ে—উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে, ভরাবুকে সাহস করে পা ফেলে অগ্রসর হউন।"

কথাগুলো সুন্দরী শুন্‌ছিল নির্ব্বাক বিস্ময়ে—গোপেন হাতে করে নেক্‌লেস্‌টা দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, সেও নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল কিন্তু হাতদুটো সেই রকম দেওয়া নেওয়ার উন্মুখ অবস্থাতেই ছিল, গোপেন কথাগুলো বলতে আর সে তা শুনতে এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে দেওয়া বা নেওয়াটা হয়ে ওঠে নে—কথা শুন্‌তে শুন্‌তে সুন্দরী এত তন্ময় হ'যে গিয়েছিল যে কখন অলক্ষিতে তার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল বেরিয়ে তার গালদুটীতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল তা সে টের পায় নে—সব শুনিয়া সে বলিল "গোপেন নেক্‌লেসের কথা সত্যই আমার মনে ছিল না—ওটা তোমার হাতে দেখে আমি, প্রথমটা একবারে চম্‌কে উঠে ছিলুম, তারপর ভাবলুম এর জন্য তোমায় কিছু পুরস্কার দেওয়া উচিত, কিন্তু যিনি পাপের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার দেন, তাঁর চোখ এড়িয়ে কিছু তো দেওয়ার যো নেই, তিনিই তোমায় যোগ্য পুরস্কার দিয়েছেন। মিঃ দস্তীদার কালরাত্রে সব ব্যাপার শুনে ওদের ওপর ভারী চটে গিয়েছেন এবং আর ওদের কোম্পানীতে আমার প্লে করা হবে না বলে দিয়েছেন।"

* * * *

আজও আমাদের ফিল্ম সাধারণে প্রদর্শিত হয় নাই —কারণ Trial Showতে সকলেই বলিল শেষাংশের জন্যই ফিল্ম চলিবে না। দেনাপত্র অনেক হইয়া পড়িয়াছিল অগত্যা কোম্পানী লিকুইডেশনে গেল। ঘর থেকে আরও কিছু কিছু টাকা আক্কেলসেলামী দিয়া আমরা most profitable businessকে দণ্ডবৎ করিলাম। চণ্ডী চালাক ছেলে সে এখন তার বইএর দোকানে বসে বই বেচে আর গুড়্‌গুড়ি টানে—আমাদের সঙ্গে আর বড় মেশে না, কারণ তার মনে একটা বদ ধারণা হয়ে গিছল যে গোপেনকে আমরাই উত্তেজিত ক'রে তাকে অপমান করিয়েছি। পৈতৃক ব্যবসার গরমে সে ভুলে গিছল "যে মান রাখ্‌তে জানলে কেউ তাকে অপমান কর্ত্তে পারে না।"

প্রেমদেবতা

শ্রীকালিদাস রায়

এইরূপহীনে বাসিয়াছ ভালো
ভাবিলে, রূপসী অবাক্ হই
আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
আমাকে সুশ্রী করেছ সই।
আপন সুষমা নীরবে আহরি'
কখন গোপনে দিয়াছ বিতরি'
তব লাবণ্য আমাতে হেরেছ
তব আঁখে তাই কুরূপ নই।

প্রেম দেবতার প্রতিমা গড়েছ
তোমাতে আমাতে মিলায়ে নিয়া
কোমলে কঠিনে ধবলে অসিতে
রুক্ষে ললিতে মিশায়ে প্রিয়া
আমি যোগায়েছি খড় বাঁশ মাটি,
তুমি করিযাছ তারে পরিপাটী
রঙে অঙ্কণে, চারু চিত্রণে
বসনে ভূষণে ভূষিয়া অই।
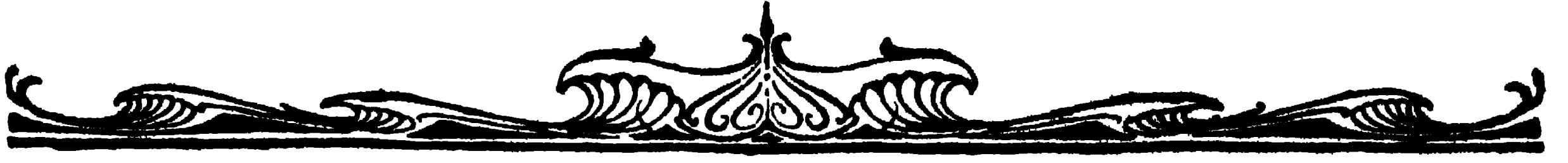
ব্যবসার বাজার

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

কি বাজারই পড়িয়াছে! দিন আর চলে না! পূর্বাহ্ণ হইতে মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ণ, অপরাহ্ণ হইতে সায়াহ্ন ডিস্পেন্সারির দরজা খুলিয়া ডাক্তারবাবুটি তীর্থের কাকের মত হা পিত্যেশ করিয়া বসিয়া আছেন, পূর্বের সূর্য্য পশ্চিমে হেলিল, ঢলিল, শেষে লুকাইল, হায় "সে জন না আসিল।" যাহার আসার আশায় মোহন বেশ, পীতধড়া, চূড়া, মুরলী সে ত কভু না আসিল। অথচ যাহাদের আসার আশা আদপেই করা যায় নাই, আরও যাহারা না আসিলেই ভাল হইত, তাহারা কিন্তু কেহই আসিতে ভুলিল না। একে একে, দুয়ে দুয়ে দলে দলে আসিল, চীৎকার করিল, গালমন্দ পাড়িল, ভয় দেখাইল, চলিয়া গেল। কিন্তু যে আসে, ধুঁকিতে ধুঁকিতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, দীন-নয়নে চাহিতে চাহিতে ভক্তের দেবমন্দিরে প্রবেশের মত —সে আসিল কৈ? যাহার দরশনে আনন্দ, স্পর্শনে মহানন্দ; শ্যাম দরশনে প্রেমিকা শ্রীরাধিকার মত, পতি স্পর্শে লাজনতা নববধূর মত, মেঘোদয়ে ময়ূরের মত, বসন্তাগমে পুষ্প-লতার মত, বর্ষাগমে নদীর মত নাচিয়া উঠে, হাসিয়া উঠে, ঢলিয়া পড়ে, গলিয়া পড়ে—কৈ, সে আসিল কৈ? মুদী মাসকাবারের পাওনার খাতা আনিল, গয়লা জল-মিশ্রিত খাঁটি দুগ্ধের বিল দাখিল করিল; দর্জি পূজার পোষাকের ফর্দ ফাইল করিল, ভদ্র বাড়ীওয়ালা ভদ্রভাষায় বাড়ী ত্যাগ করিতে কহিয়া দিল। এবং বাড়ীখানি যে ডাক্তারবাবুর স্বর্গীয় পিতৃদেব অথবা তাঁহারও পিতৃদেবের সম্পত্তি নহে, এই বিস্মৃত সত্যটাও জানাইয়া দিয়া গিয়াছে। পরিচারিকা নিয়মিত-কার্য্যে আসা বন্ধ করিলেও, বাকি মাহিনার তাগাদা দিতে আসা বন্ধ করে নাই। আজ প্রভাতে আসিয়া পুলিশ-কোর্টের জুজুর ভয়ও দেখাইয়া গিয়াছে। এক কথায়, সবাই আসিল ও গেল, কেবল সে-ই আসিল না, যে আসিলে সকল আসা সার্থক হইতে পারিত।

ডাক্তারখানার আল্‌মারীতে সাতপুরু ধূলা পড়িয়াছে, শিশির ঔষধ বহুদিবস অবধি অব্যবহৃত থাকায় বর্ণ সব বিবর্ণ হইয়াছে। ডাক্তারবাবুর ষ্টেথিস্কোপে কুমীরকে বাসা বাঁধিয়াছে। ছুরি-কাঁচিগুলির অবস্থা আরো শোচনীয়,—সেগুলি প্রায় বৈষ্ণব বাড়ীর অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাড় যদি বা বিদ্ধ করিতে সক্ষম হয়, মাংস খণ্ডিত করিতে পারিবে না। অথচ একদিন ছিল, ঐ ধূলা-মলিন আল্‌মারীর কাচের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া রোগিগণ স্বরূপ দর্শনে আতঙ্ক-গ্রস্থ হইয়া দ্বিগুণ তিনগুণ দর্শনী দিয়াও পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া মেঝে ভাসাইত।

এই ষ্টেথিস্কোপ—যাহা আজ কুমীরকের আবাস স্থল হইয়াছে তাহারই ধ্বনি ডাক্তারবাবুর কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া ডাক্তার বাবুকে আনন্দে আকুল ও রোগীকে ভয়ে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। এই ছুরি কাঁচি-গুলি একদিন ঔজ্জ্বল্যে চাঁদিকেও হারি মানাইত। হায় রে সেদিন!

কি অশুভক্ষণেই আজি রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল! পাওনাদারের তাগাদায় শ্রান্ত, ঘর্মাক্ত, গালি ভক্ষণে পরিশ্রান্ত ডাক্তারবাবু বিশ্রামলাভাশায় অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। অহো দুর্দৈব! কে জানিত, বাহিরে পাওনাদার আর ঘরে স-দার দুইই একজাতীয় জীব! ডাক্তার গৃহিণী আজ রণরঙ্গিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা। পুত্র প্রহৃত, কন্যার কেশ উৎপাটিত, গৃহপালিত মার্জার সম্মার্জনী শেলাঘাতে মৃত, অঙ্গন প্রাঙ্গণের কাক-চিল বিতাড়িত। "দেখি সে মূরতি সর্ব্বনাশিয়া" "ডাক্তার পরাণ উঠিল ত্রাসিয়া"—অবিলম্বে য পলায়তি···

ডাক্তারগৃহিণী যুদ্ধশাস্ত্র-নিপুণা। শব্দভেদী বাণগুলা ডিস্পেন্সারী কক্ষে উপবিষ্ট ডাক্তারবাবুকে দগ্ধ করিতেও ছাড়িল না। ডাক্তার বাবুর হার্ট প্যালপিটেশনের রোগ ছিল, রোগীর অভাব হইলেও রোগের অভাব হইত না, অল্পক্ষণ মধ্যে বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়িতে সুরু হইল। ডাক্তারবাবু চায়ের পরিবর্ত্তে নিমপাতা সিদ্ধ, চিনির পরিবর্ত্তে গুড়, লুচির স্থানে তেলেভাজা বেগুণি, রসগোল্লার পরিবর্ত্তে নারিকেল লাড়ু, সকলই সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু হায়, কত সয়! আর পারিলেন না—ডাক্তারবাবু অপারেশন টেবিলে আড় হইলেন। অশক্যের নির্দ্দয় যোদ্ধা তাহা বুঝিলেন না, দেখিলেন না। আপন পিতার অবিমৃষ্যকারিতার এবং একচক্ষু বিধাতার নির্বুদ্ধিতার তীব্র সমালোচনা সমভাবেই করিয়া যাইতে লাগিলেন। অ দৃষ্টপূর্ব বৈধব্য-লোকের পথ দেখাইবার জন্য বার বার অদৃশ্য লোক-নিবাসী দেবতা দিগকে আহ্বান দিতে লাগিলেন।

ডাক্তারবাবুর আশঙ্কা হইল বুঝি বা দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীমতীর প্রার্থিত বরই দান করিতেছেন, ডাক্তার

নাঃ, নাড়ী আছে। গৃহিণীর আশু-বৈধব্যের কোন সম্ভাবনা নাই—

বাবুর নিঃশ্বাসের গতি রুদ্ধ হইয়া আসিল, চক্ষু কোটরগত হইল, নাসিকা অকস্মাৎ বক্রভাব ধারণ করিল। নির্ব্বাণো-ন্মুখ প্রদীপের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া, সাধ্যমত সোজা হইয়া ডাক্তার ষ্টেথিস্কোপ হাতে লইলেন। ক্যাথিটার-নল দ্বারা কুমীরকে কূল নির্ম্মূল করিয়া কাণে লাগাইলেন।

না, নাড়ী আছে। গৃহিণীর আশু বৈধব্যের কোন সম্ভাবনা নাই নিশ্চিৎ বুঝিয়া ডাক্তার বাবু আবার টেবিলে আসিয়া শয়ন করিলেন ও চক্ষু মুদিলেন।

ডাক্তারবাবু চিন্তা করিতে লাগিলেন—সহরে ধুলা সমানভাবে উড়িতেছে, ভেজাল খাবার খুব চলিতেছে, চায়ের দোকান, হোটেল, রেস্তোঁরা পরিচালন করিয়া অনেকেই বাড়ী জুড়ি করিতেছে, রান্নাঘরের ধোঁয়া আকাশ কাল করিয়া ফেলিতেছে কিন্তু কোথায় যক্ষা, ডিস্পেপসিয়া, কোথায় ডায়েবেটিস, কোথায় টাইফয়েড, কোথায় নিউমোনিয়া, কোথায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা! সহরের শেনসাস রিপোর্টে ত দেখা যায়—নর নারীর সংখ্যা ছারপোকার মতই বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু কৈ, রোগী কৈ? একটা ইন্‌জেক্‌সনের খরিদ্দারও ত আসে না, অপরেসেন ত দূরের কথা, একটা লোসানও যে বিক্রয় হয় না।

খবরের কাগজে পড়া যায় পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর রাজ্যের দিনদিন শ্রীবৃদ্ধি হই-তেছে, কালাজ্বর, ডেঙ্গুজ্বর, হলদে জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, সর্দিজ্বর, ধাতস্থ জ্বর, এককালীন, দ্বৌকালীন, ত্রৈকালীন জ্বর—কোনটারই বিরাম নাই। কিন্তু তাহার প্রমাণ ত কৈ পাওয়া যাইতেছে না। তবে কি কাগজওয়ালারা কাগ-জের বিক্রয় বাড়াইবার জন্য ঐ সব রচা কথা ছাপিয়া মরিতেছে! তবে কি ওসবই বাজে? কেবল হৈ চৈ, কেবল গণ্ডগোল! স্রেফ মিথ্যা কথা গুলা বেচিয়া পেট ভরাইতেছে! সত্য কথা বলিতে কি, খবরের কাগজয়ালাদের উপর ডাক্তার বাবু কোনদিনই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাহাদের অভদ্র আচরণ তাঁহাকে বরাবরই পীড়িত করিয়া রাখিয়াছে। প্রথম পাশ করিয়া ব্যবসায়ে পসার করিবার জন্য তিনি প্রায়ই গৃহিণীর, পুত্র কন্যা বা চাকর-দাসীর

কল্পিত কঠিন কঠিন রোগে অমোঘ ঔষধাদি দিয়া, সারাইয়া, বিবরণ সহ কাগজের আফিসে ছাপাইতে নিজে লইয়া যাইতেন, অভদ্র, চক্ষের চামড়া হীন কাগজওয়ালা-পুত্রগণ তাহাই ছাপিবার জন্য টাকা চাহিয়া বসিত। হতভাগ্যেরা বুঝিত না সেগুলি ছাপাইবার কোন স্বার্থই ডাক্তার বাবুর ছিল না, যদি না পৃথিবীর লোকের উপকার সম্ভাবনা বুঝিতেন। কিন্তু কাগজওয়ালারা 'বিশ্ব' 'বিশ্ব' করিয়া চীৎকার করিয়া মরিলেও তাহারা পানাডোবার অধিবাসী, এসকল যুক্তি বুঝিত না। ইহা হইবে না ত কি হইবে, মিথ্যা খবর ছাপিয়া, বেচিয়া পয়সা দিয়া উদরান্নের সংস্থান করে, তাহাদের মনুষ্যত্ব কোথায়? ইংরেজ আইনে এত কড়াকড় কানুন আছে, কাগজ ছাপাটা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেছে না কেন, তাই ভাবি।

কিন্তু কাগজগুলারই বা দোষ কি। বিবাহের সময় গৈহাটি গ্রামখানার কি শ্রীই দেখিয়াছিলাম, সেদিন গিন্নীকে রাখিতে গিয়া দেখিলাম, একেবারে শ্মশান, মরিয়া সব ভূত। কাগজের খবরে মিথ্যাই বা বলি কি করিয়া! কিন্তু এত যে রোগী, কৈ একটার মুখও ত আমরা দেখিতে পাইতেছি না। "সে মুখ যে অহরহ পড়ে মনে—মনে পড়ে।" ঠিক হইয়াছে

সর্বনাশ করিয়াছে ঐ পেটেণ্ট ঔষধগুলা। ঐ যে ব্যাটারা শিশির গায়ে লিখিয়া দেয় 'গরু হারাইলে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, মরা মানুষ জীবিত হয়'—এর কি রক্ষা আছে? সব ব্যাটা-বেটী সস্তায় কিস্তি পাইয়া যথাক্কাবাদ বণ্ডনা হইতেছে। কি বিজ্ঞাপনের বাহার, বাবা! আমাদেরই মাঝে মাঝে বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হয়। সেই যে লেখে—এই ঔষধ জ্বরের যম, টাইফয়েডের টাইগার নিউমোনিয়ার নিয়তি, কালাজ্বারের কাল, বাতের ব্যাঘ্র অম্লের অরি! একবার মাত্র ব্যবহার করিলেই তাহা আপনিও স্বীকার করিবেন। ইহার কতগুণ তাহা একমুখে কত আর বলিব? আপনি স্কুলের ছাত্র, পড়া মুখস্থ হয় না, একদাগ ঔষধ খাইয়া পাঠে মননিবেশ করুন, দেখিবেন পাঁচ মিনিটে পঁচিশ পাতা কণ্ঠস্থ হইয়া যাইবে। আপনি কলেজের ছাত্র, নোট মুখস্থ করিয়া হায়রাণ হইয়া

গরু হারাইলে খুঁজিয়া পাওয়া যায়'

পড়িয়াছেন, আপনাদের আর গাদা গাদা নোট বহি কিনিতে হইবে না, বেশী নয়,—একটি দাগ মাত্র সেবন করুন। আপনি প্রোফেসর, গাধা পিটিয়া ঘোড়া করা আপনার কার্য্য। ইহাতে আপনার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, ইহা আপনি লক্ষ্য করিতেছেন কি? আমাদের একদাগ ঔষধ সেবন করুন, আপনার দেহের লাবণ্য ফিরিয়া আসিবে, খিটখিটে মেজাজ আর থাকিবে না। স্নায়বিক দৌর্বল্য হইয়াছে,—না? আপনার মাথা ঘোরে, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, রাত্রে সুনিদ্রা হয় না, চোঁয়া ঢেঁকুর উঠে, কোষ্ঠ কাঠিন্য হয়—কেমন? বেশ। আপনি আমাদের ঔষধ দুই দাগ সেবন করুন ও একদাগ মাথায় মালিস করুন। দেখুন কি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ! বৃথা আপনি হাতুড়ে কবিরাজের বগলাক্ষ ঘৃত খাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিবেন না, দোহাই—আপনার। উহারা ঠক, প্রতারক, জালিয়াৎ, জোচ্চোর, যদি স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে চাহেন ধর্ম বজায় রাখিতে চাহেন, অর্থ অপব্যয় করিতে বাসনা না থাকে, তবে ঐ বন-মানুষ কৃত বগলাক্ষ ঘৃত অথবা স্বেদবারি-আদি তৈল কিনিয়া অর্থ, ধর্ম ও দেহ নষ্ট করিবেন না। ওসব বুজরুকির দিন চলিয়া গিয়াছে। আগে বগলাক্ষ ঘৃত শুনিয়া লোকে ভাবিত না জানি কি ভয়ঙ্কর মহৌষধ। এখন সবাই

মহাত্মা হ্যানিমানের মহাপ্লব হনুমান শিষ্য–

"ঐ বমমনুষ্যকৃত বগলাস্থ ঘৃত অথবা স্বেদবারি আদি তৈল কিনিয়া অর্থ ও দেহ নষ্ট কবিবেন না।"

বুঝিতে পাবিয়াছে উহা আব কিছুই নহে। ভুঁড়ি সর্বস্ব চরক বংশধরেব দেহেব পুঞ্জীভুত ক্লেদ ভিন্ন আব কিছুই নহে। স্বেদবাবি আদি তৈল উহাবই ডাইলিউটেড সংস্কবণ। আমাদেব কথায় প্রত্যয় না হয় তবে একখানি অভিধান খুলিযা স্বেদবাবির অর্থ স্বযং আপনি নিবীক্ষণ করিয়া লইবেন।

এক ফোঁটা জলে যদি রোগ সাবিত তবে আর দুঃখ ছিল কিসেব? লোকে এক ফোঁটা কেন, এক এক লোটা জল গিলিয়া নিরোগ হইয়া যাইত। লম্বা দাড়ি নাড়িয়া মহাত্মা হ্যানিমানেব হনুমান শিষ্য যাহাই কেন বলুন না, এক ফোঁটা জল বোগীর বোগ দূবীকবণ করিতে কখনই সমর্থ নহে। আপনাবা আমাদের কথায় বিশ্বাস করুন। আমবা একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ কবিয়াছি, এতৎ সঙ্গে তাহারই বৃত্তান্ত প্রদান কবিলাম। কিছুদিন পূর্বে আমাদের কোন এক ধনী আত্মীয়েব পীডার সময় কলিকাতাব বড বড কালেয়াত কবিবাজ, ডাক্তাব হোমোপাথী, হনোপাথী সব আসিয়া জুটিলেন। কথা হইল, প্রত্যেককে এক এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হইবে, যিনি আবাম কবিতে পাবিবেন তিনি হাজাব টাকা পুরস্কাব পাইবেন। প্রথমে এম্ বি, এস্ ডি, ডি ডি, আই এম্-এস্গণ সময় লইলেন। তাবপব বগলাস্থ-ঘৃত প্রস্তুতকাবকগণ আসিলেন এবং উভয়েই যথারীতি কলা ভক্ষণ কবিয়া বিদায় হইলেন। তাবপব হোমো-পাথী। আমাদের আত্মীযেব এক নাস্তিক নাতি হোমেপাথীর বাক্সেব ঔষধেব ছিপিগুলা সব উলট পালট কবিয়া দিল, এটাব ছিপি ওটায়, ওটার ছিপি সেটায়, এমনই আব কি। হোমোপাথীর ঔষধেব শিশির ছিপিতেই ঔষধেব নাম ছাপা থাকে ইহা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। হোমোপাথিটী এ সকল ব্যাপাব কিছুই জানিলেন না, তিনি চশমা লাগাইয়া চক্ষু মুদিয়া, ছিপি পবীক্ষা করিয়া শিশি হইতে এক ফোঁটা ঔষধ ঢালিয়া দিয়া প্রস্থান কবিলেন। এদিকে

রোগীর ভোগকাল পূর্ণ হইয়াছিল নিশ্চয়ই, রোগী সুস্থ হইলেন। হোমোপাথি বকশিস্ লইতে আসিলেন। আমরা তখন ব্যাপারটা হোমোপাথি মহাশয়ের গোচর করিলাম এবং বলিলাম, হোমোপাথি মহাশয়, আপনার বাক্সটা ত সঙ্গেই রহিয়াছে, আপনি প্রত্যেকটা শিশির ছিপি খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ছিপিতে যাহা লেখা আছে, শিশিতে ঠিক্ সেই ঔষধ আছে কি না! আপনি আমাদের আত্মীয়টাকে যে ঔষধ মনে করিয়া দিয়াছিলেন দুঃখের বিষয় ছিপি পরিবর্ত্তিত হওয়াতে তিনি তাহা না খাইয়াই সারিয়া উঠিয়াছেন। এখন আপনিই বলুন, কি পুরস্কারের প্রার্থী আপনি? হোমোপাথি মহাশয় বিপদ বুঝিয়া "আমার বাড়ীর মধ্যেকে, জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিব" বলিয়া সেই যে চোঁ চাঁ প্রস্থিত হইলেন, মহাত্মা হ্যানিমানের সেই প্রিয়তম শিষ্যটাকে আর এপথে পা বাড়াইতে দেখা যায় নাই।

"আপনারা বলিবেন এলোপ্যাথি ঔষধের খুব গুণ। এলোপ্যাথি নির্গুণ এমন কথা আমরাও বলি না; তবে এলোপ্যাথি ঔষধের সকলগুলিই যে গুণযুক্ত ইহা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। দুই একটি গুণ আছে বটে, যেমন এই ক্যাষ্টর অয়েলের। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গুণ প্রত্যক্ষ করা যায়। গুণ মানি, হাইড্রোসিনিক্ এসিডের, খাইতে যা দেরী। গুণ আছে স্বীকার করিব স্পিরিট মেথিলেটেডের; একটা গ্যাসষ্টোভ দেশালাই কাঠি, গ্যাস্, অমনি গোঁ গোঁ জ্বলিবে। তখন লুচি ভাজ, হাঁসের ডিমের কচুরী কর; ছেলের দুধ গরম, চা কফি-কোকো তৈরী কর। আর একটা জিনিষের গুণ আছে, তাহা অক্সিজেন গ্যাসের। যেমন লাগাও, যেমন তেমন রোগীই হউক, বেবাক্ অক্কা পাইতেই হইবে। ইন্জেক্সনের গুণও অস্বীকার করা চলে না, পৃথিবীর ভার লাঘব করিতে এমন অব্যর্থ মহৌষধ আর নাই বলিলেও চলে।

"এলোপ্যাথি, হোমিওপাথি ইউনিপ্যাথি অবশেষে কবিরাজী নিঃশেষ করিয়াও যাহারা কোন ফল লাভ করেন নাই; যমের দক্ষিণ দুয়ারে উপস্থিত হইয়া যাঁহারা হাঁ করিয়া খাবি খাইতেছিলেন, তাঁহারাও আমাদের ঔষধ সেবনে মহোপকার পাইয়াছেন। লক্ষ লক্ষ প্রসংশা পত্র আছে, পত্র লিখিলেই **বিনামূল্যে** ও **বিনা-মাশুলে** প্রেরিত হয়।

"স্মরণ রাখিবেন, **ইহা কেবলমাত্র ঔষধ নহে** ইহা জগদ্বিখ্যাত **শ্রীশ্রীধান্যেশ্বরী** মাতার **আশীর্বাদি মহাকবচ।** ইহা ধারণে (একটা এয়ার-টাইট **'বায়ুবদ্ধ' মাদুলীর** মধ্যে এককাঁচ্চা পরিমাণ আশীর্বাদি জল ভরিয়া) **বন্ধ্যার পুত্র** জন্মিবে, মৃতবৎসার বৎস জীবিত থাকিবে, **হুড়কো স্ত্রী** বশ মানিবে; পক্ষোচ্ছেদ হওয়ায় যে সকল **স্বামী সময় সময়** গৃহত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের **পক্ষ ছিন্ন হইয়া, গতি** সংযত হইবে। ইহা ধারণে (উপরি **উক্ত উপায়েই**) আপনার শত্রু নিপাত হইবে: মোকদ্দমায় **জয়লাভ হইবে;** মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। যে সব ছাত্র **ইউনিভার্সিটির** পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারে না, তাহারা **আশীর্বাদি** বারিপূর্ণ মাদুলী ধোয়া জল খাইয়া **পরীক্ষা দিলে অবশ্যই** পাশ হইবে। চাকরীর উমেদারগণ আফিসে **আফিসে** ঘুরিয়া নাজেহাল পেসমান হইয়া যখন **আত্মহত্যার** উদ্যোগ করিতেছেন তখন এই মাদুলী **একটা—ঈশ্বর** প্রেরিত অমূল্য বস্তুর কার্য্য করিবে। চাকরী **ত মিলিবেই** পরন্তু গো-শূকর-মাংস-পুষ্ট গোঁয়ার সাহেবও **গরু ভেড়ার** মত বশ্যতা স্বীকার করিবে।

"আপনি যদি ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিতে **চাহেন,** যদি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া **অপ্রতিদ্বন্দ্বী** হইতে চাহেন, আপনার লাইনে একমেবাদ্বিতীয়ম্ **হইবার** অভিলাষ আপনার থাকে, তবে এক বোতল **সর্ব্বরোগহর,** সর্ব্বদুঃখবিনাশন, সর্ব্বচিন্তাঘাতক এন্টি-এভরিথিং **মিক্সচার-**সুধা ক্রয় করিয়া আসুন। নিজে **একটা মাদুলী ধারণ** করুন; দোকানের মৃণ্ময় গণেশঠাকুরটিকে **নিত্যই এই** জলে স্নান করাইবেন, দেখিবেন সেই যে বলে—**বাণিজ্যে** বসতে লক্ষ্মী—আপনার তাহাই হইবে। আপনার **প্রতি-**দ্বন্দ্বিরা আপনার সৌভাগ্যদর্শনে ঈর্ষায় ফাটিয়া **মরিবে—** আপনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' হইবেন।

"আপনি উকিল। গাছতলা ভরসা করিয়া **অনেককাল** ত কাটাইলেন। আটগণ্ডা পয়সার জন্য **রাস্তায় লোকের** কাছা ধরিয়া টানাটানি করিয়া 'ছেলেধরা' খেতাবও পাইলেন; একবার কিডন্যাপিং চার্জেও পড়ি পড়ি হইয়া-

ছিলেন কিন্তু একটী তাম্রমুদ্রার মুখও ত দর্শন করিতে পাইলেন না, একবার শ্রীশ্রী১০৮ ধান্তেশ্বরী মাতার পাদোদক পান করিয়া ও শিশি ভরিয়া পকেটে রাখিয়া দেখুন। এই পাদোদকের সৌরভে মধুচক্রের সৌরভে আকৃষ্ট মধুপের মতই মক্কেল কুল আকুল হইয়া আপনার কাছে ছুটিয়া আসিবে; আপনার পকেটটি তাহাদের অর্থে ভরিয়া উঠিবে। আপনার গৃহিণীর মুখের হাসি দেখিয়া আপনার জীবন ধন্য হইবে।

"আপনি ব্যারিষ্টার। বিলাত গিয়াছেন, বিলাতি-গরুর মাংস খাইয়াছেন, হার্বার্ট, মিল, স্পেন্সার পড়িয়াছেন, আপনাদের কিছুতেই বিশ্বাস নাই। আপনারা বুঝুন আর নাই বুঝুন, তাহার ফল আপনারা হাড়ে হাড়ে ভোগ করিতেছেন। মহাশয় শ্বশুরের কতগুলি কোম্পানি কাগজের ঘাড় মটকাইয়া বিলাতে গিয়াছিলেন, হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন কি? সেই টাকার সিকির সিকিও যদি আজ পাইতেন তবে আর মিঃ এন্ ভি গ্যাঙ্গলেকে শত

মিঃ এন ভি গাঙ্গলে– পুরাকালের নাম নীরদবরণ গঙ্গোপাধ্যায়—

তালিযুক্ত প্যান্ট্স্ পরিয়া পাইপমুখে পাইপের সামনে দাড়াইয়া জামায় সাবান লাগাইবার দুঃখভোগ করিতে হইত না। বাঙ্গালায় একটা কথা আছে—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। আপনি যদি বিশ্বাস করিয়া ধান্যেশ্বরী মাতার স্বপ্নাদ্য এন্টিএভারিথিং মিক্‌শ্চার এক বোতল ক্রয় করেন তবে আপনিও অচিরে একজন সি আর দাস, ল্যাংফোর্ড জেমস হইতে পারিবেন। এমন কত লোক হইয়াছেন, একদিন আমাদের আফিসে আসিলেই আপনাকে আমরা তাঁহাদের প্রতিকৃতি দেখাইয়া দিব। নাম বলিতে নিষেধ আছে, আপনারা সেই প্রতিকৃতি দেখিয়া গিয়া বার লাইব্রেরীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের positionটা দেখিয়া লইবেন।

"আপনি ত মেডিক্যাল কলেজের দাগা ষাঁড়; আষ্টে পৃষ্ঠে ছাপ খাইয়া আসিয়া এখন নথ-ঝাপ্টা ও একাদশী খাইতেছেন; বিলাতি ঔষধের দালালী করিয়া ত ঐ হাড়ীর হাল, এখন একবার স্বদেশী শিল্পের দিকে মন-নিবেশ করুন। আমাদের শ্রীশ্রী৺ধন্যেশ্বরী মাতার স্বপ্নাদ্য অব্যর্থ এন্টীএভরিথিং এণ্ড এন্টি অল্-ইন্-অল্ মিক্‌শ্চার বিক্রয় করুন। উচ্চহারের কমিশনের বন্দোবস্ত আছে।

—কাচা ধরিয়া টানাটানি করায় ছেলেধরা খেতাব পাইলেন।

আমরা হলপ বলিতে পারি যে আপনার ষ্টেথিস্কোপে কুমীরকে বাসা বাধিবে না, ঔষধের শিশির ছাতা দেখিয়া আপনার বুকের ছাতা ভাঙ্গিয়া যাইবে না; ছুরি-কাঁচি-গুলিকে ভাঙ্গা-লোহা-বিক্রি ওয়ালাকে বেচিবার দরকার হইবে না। আপনার যে গৃহিণী এই কিছুক্ষণ আগে আপনাকে অন্তঃপুর হইতে গরু-তাডান করিয়া খেদাইয়া দিয়াছেন, তিনিই আপনার পায়ের তলায় লুটাইতে থাকিবেন। এ সুযোগ কি আপনি হেলায় ত্যাগ করিবেন ? তা যদি করেন তবে বুঝিব, বিধি আপনার প্রতি বাম! ঐ দেখুন, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখুন, চরাচর-সুখদায়িনী শ্রীশ্রীধান্তেশ্বরীমাতা আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার আশীষ-প্রচারে সহায়তা করিতে বলিতেছেন। ঐ দেখুন!"

হঠাৎ ডাক্তারবাবুর জ্ঞান সঞ্চার হইল; চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন—সামনেই রোষ রক্তিম আননে শ্রীশ্রীধান্তেশ্বরী মাতার পরিবর্ত্তে শ্রীশ্রীমতি রুদ্রেশ্বরী দেবী দণ্ডায়মানা! যে লোকটা এই মাত্র তাঁহাকে অমূল্য উপদেশ বিতরণ করিয়া এক অ-দৃষ্ট, অপরিচিত স্বর্গলোকের পথ দেখাইতেছিল, তাহাকে খুঁজিতেই ডাক্তার বাবু "চীৎকার করিয়া" চাহিতেই দেখিলেন, রুদ্রেশ্বরী দেবীর অভয় হস্ত দুইখানি তাঁহার দুইটি কর্ণস্পর্শ করিল—এবং দেবী-স্পর্শ-জনিত সুখানুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই কর্ণে প্রবেশ করিল—ভাত দেবার ভাতার নন্, গোঁসা করবার গোঁসাই গো! বাইরে শুতে এসেছেন! ভাল চাও যদি এখনি উপুরে চল; নইলে… …

ডাক্তারবাবু মন্দ চাহিতেন না; সুতরাং 'নহিলে' শুনিবার তাঁহার প্রয়োজন হইল না। লাফে-লাফে বাল্য-লীলা দেখাইয়া তিনি দ্বিতলে উঠিলেন।

কেন ?

শ্রীশান্তি দেবী

আজিকে সজনি বিপিন মাঝে
কেন গো বাঁশরী নাহিক বাজে
কেন শ্যামচাঁদ নাহি বিরাজে
মাধবী, বকুল তলে।

কেন গো যমুনা বয় উজানে
বিহগ বিহগী নাহি জাগরণে
কেন উপবন শূন্য পরাণে
ডাকিছে রাখালরাজে।

কেন গো রাখাল যায়নি বিপিনে
(আছে) মরমে মরিয়া ধরণী শয়ানে
কেন গো সকলে মলিন বয়ানে
ভাসিছে নয়ন জলে।

কুঞ্জ কাননে কেন বনফল
তুলি ব্রজবালা ভরেনি আঁচল
কেন গো আজি কামিনী বকুল
অভিমানে ধূলি মাঝে।

কেন ধেনু বৎস নাহি করে খেলা
কেন গো হরিণী পরাণ উতলা
কেন গো ময়ূরী নয়ন সজলা
সাজেনি মোহন সাজে।

কেন রাধারাণী ভাসে আঁখিজলে
যায়নি যমুনা, জল-আনা-ছলে
শিথিল কবরী লুটায় ভূতলে
উদাসিনী কেন সাজিল।

কেন বৃন্দাবন হয়েছে মলিন
কেন দশদিশি সুষমা বিহীন
নিধুবন আজি কেন প্যারী-হীন
নূপুর নাহিক বাজে।

কই সে অধরে মনচোরা হাসি
কই সে করেতে কুল-নাশা-বাঁশী
বন-ফুল-মালা শুধু হ'ল বাসি
বনমালী কেন লুকাল ?

ভারতীয় নাটকের গোড়ার কথা

(১)

অধ্যাপক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ইতিহাস যখন মূর্ত্তি ধারণ করে তখন নাটকরূপে তার স্ফূর্ত্তি হয়। নাটক কাব্যাকারে বিশ্বেতিহাস; আর সেই কাব্য অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনক্ষেত্র, বর্ত্তমানের উপভোগ্য। অমর কবি সেক্‌স্‌পীয়র বলেচেন, নাটকের কাজ হচ্চে—

"To hold as it were the mirror up to nature, to virtue her own feature, scorn her own image and the very age and body of the time her form and pressure."—Hamlet.

অতি প্রাচীনকালে ভারতে যে নাট্যকলার অস্তিত্ব ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণ নাই। ধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেই আমাদের দেশে নাট্যকলার সূত্রপাত হয়েচে। সঙ্গীত, কথোপকথন, রঙ্গভঙ্গী, অনুকরণপ্রচেষ্টা প্রভৃতি থেকে ক্রমশঃ নাট্যাভিনয়ের উদ্ভাবন হয়েচে বলে' মনে হয়। সঙ্গীতকলা খুব প্রাচীন। বৈদিক-যুগেও সঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া যায়।* যাঁরা যজ্ঞকার্য্যে অধ্যক্ষতা করতেন আর যাঁরা যজ্ঞদর্শন করতেন, তাঁরা হোতাদের নীরস মন্ত্র, অধ্বর্য্যুদেব· সমস্বরবিশিষ্ট আবৃত্তি শুনে' সন্তুষ্ট হ'তে পারতেন না। জনমণ্ডলীকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করবার জন্য তাঁদের কল্পনাশক্তির উত্তেজনার কিছু দরকার হয়ে পড়েছিল। তাঁদের এই অভাব মোচন করবার জন্য উদ্গাতা নামে একশ্রেণীর পুরোহিত-সম্প্রদায় গড়ে' উঠ্‌ল। এঁদের কাজ হ'ল যজ্ঞে সামগান করা। এই সাম ঋগ্বেদ থেকে নিয়ে সঙ্গীতের সুরে বাঁধা হ'ত। এ থেকেই বোঝা যাচ্চে সামবেদেই সঙ্গীতের আদি বিজ্ঞান ও কলার অস্তিত্ব।

কথোপকথনচ্ছলে উত্তর-প্রত্যুত্তরের আকারের রচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বলে' বৈদিক, পৌরাণিক, এমন কি পৌরাণিকযুগের পরবর্ত্তী রচনাতেও এই রীতি অক্ষুণ্ণ রয়ে গেচে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই রকম রচনা খুব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে প্রায়ই দেবতাদের সঙ্গে ঋষিদের কথোপকথন দেখ্‌তে পাওয়া যায়। পুরুরবা ও উর্ব্বশী-সংবাদ (ঋগ্বেদ ১০.৯৫), বরুণ ও ইন্দ্রের কথোপকথন (৪.৪২), যম ও যমীর কথোপকথন (১০. ১০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পুরাণগুলি পরস্পর কথোপ-কথন বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। সমগ্র মহাভারত সূত ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে রচিত। উপ-নিষদেও অনেক কথোপকথন আছে।

নাটকেব উৎপত্তি ঠিক কেমন ক'রে হয়েচে, তা বল্‌তে পারা যায় না। কেউ কেউ বলেন, পুতুল-নাচ থেকেই নাট্যের উৎপত্তি। পুতুল-নাচ নাট্যের সৃষ্টিতে সহায়তা কবে' থাক্‌তে পারে, কিন্তু সেটা একমাত্র কারণ নয়।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে দুই শ্রেণীর লোক ছিল। উচ্চশ্রেণীর লোকেদেব ভাষা নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ভাষা থেকে পৃথক্ ছিল। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সংস্কৃত ভাষায় কথা কইত, আব নিম্নশ্রেণীর ভাষা ছিল প্রাকৃত। উচ্চ-শ্রেণীর লোকেবা যে সকলেই সংস্কৃতে কথা কইত তা নয়, যারা শিক্ষিত তাবাই সংস্কৃতে কথা কইত। স্ত্রী-লোকেরা প্রায়ই প্রাকৃত ভাষা বল্‌ত। প্রাকৃতই জন-সাধারণের ভাষা ছিল। সুশিক্ষিতের সংখ্যা চিরকালই কম; কাজেই অল্পলোকেই সংস্কৃতে কথোপকথন করত।

প্রাকৃত ভাষায় 'নট্' ধাতুর অর্থ 'অভিনয় করা'। সংস্কৃতে 'নট্'ধাতু স্থানে 'নৃৎ'ধাতু পাওয়া যায়। 'নৃৎ' ধাতুর অর্থ "নৃত্যকরা"। সংস্কৃত ভাষায় অভিনয় করার অর্থ বোঝায় এমন কোন ধাতু পাওয়া যায় না। কাজেই মনে হয়, শিক্ষিত সমাজ থেকে নাটকের জন্ম হয় নাই।

পাণিনির মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সময়ে এবং পাণিনির

---

* "ভূমিঃ শ্লোকং জগৌ"—শতপথ ব্রাহ্মণ. ১৩. ৭. ১. ১৫.
"তদপ্যেতে শ্লোকা অভিগীতাঃ"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ. ৮ ২২

এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পরযুগে রামায়ণ, মহাভারতেও যথেষ্ট নজির আছে। "পা ইদং কাব্যমগায়তাম্"—রামায়ণ ১. ৪. ১৩; "গীযতামিদমাখ্যানম্"—১০; "জগুঃ শ্লোকামিমম্"—মহাভারত, বনপঃ ২৬৪৮.

সময়েও শিক্ষিত সমাজ সংস্কৃতে আর জনসাধারণ প্রাকৃতে বাক্যালাপ করত। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'নট্' ধাতুর উল্লেখ আছে। পাণিনিও 'নট্'ধাতুর উল্লেখ করেচেন। পতঞ্জলি খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের লোক; পাণিনি অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতকের বৈয়াকরণ। কাজেই বল্‌তে পারা যায় তার পরে নাটকের জন্ম হয় নি।

পুতুল-নাচের প্রথা ভারতবর্ষে খুব প্রাচীন। মহাভারতেও এ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুতুল-নাচ সুত্রের সাহায্যেই হ'ত। যিনি সুত্রের সাহায্যে এই অভিনয় কার্য্য সম্পন্ন করতেন, তাঁকে 'সূত্রধার' বলা হ'ত। পরে দেখা যায়, অভিনয়-কার্য্য জীবন্ত মানুষ দিয়েই করা হ'তে লাগল। তখন যিনি অধিনায়কত্ব করতেন, তাঁকে আর সূত্র ধরে' অভিনয় করাতে হ'ত না। তবুও তাঁর পূর্ব্বের সেই 'সূত্রধার' নামটী রয়ে গেল। এই সূত্রধার থেকে বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পুতুল-নাচের রীতি নাটকীয় অভিনয়-প্রথার পূর্ব্ববর্ত্তী। নাটকীয় অভিনয়ের উৎপত্তি পুতুল-নাচ থেকে না হ'লেও এই রীতি কিছু সহায়তা করেচে। পূর্ব্বে সাধারণ লোকে তাদের নিজের ভাষাতেই অভিনয় করত। কিন্তু একথা সব সময় মনে রাখ্‌তে হবে যে, অভিনয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎসবের অঙ্গীভূত ছিল। অভিনয় জনসাধারণের মধ্যে যাত্রার আকারে অভিনীত হ'ত। 'যাত্রা' এই নামটী দিয়েই বেশ বোঝা যায়—যাত্রা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎসবের অঙ্গ ছিল। যাত্রা বল্‌লে কোন দেব-দেবীর উৎসব বোঝায়। জনসাধারণের মধ্যে আজও রামায়ণ-মহাভারতের দেব-দেবী বা নায়ক-নায়িকার আখ্যায়িকা থেকে অভিনয়ের আখ্যান-বস্তু (plot) সংগৃহীত হয়ে থাকে। রাজাদের দৃষ্টি অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হ'বার পর থেকে নাটকের যেমন উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হ'তে লাগ্‌ল, তেমনি নাটকের মধ্যে সংস্কৃত ভাষাও প্রবেশাধিকার লাভ করতে লাগ্‌ল। বসন্তোৎসব প্রভৃতি উপলক্ষে রাজপ্রাসাদে অভিনয় হ'তে লাগ্‌ল, আর রাজকবিরাও নাটক রচনা করতে লাগ্‌লেন। জনসাধারণের অভিনয় কিন্তু খোলা মাঠে যাত্রার আকারেই হ'ত।

অশোকের প্রথম পর্ব্বতলিপিতে ১ দেখা যায় 'সমাজ' শব্দের দুইটী অর্থ। গির্‌নারে এইরূপ পাঠ আছে—

১। হিতব্যম্ ন চ সমাজো কটব্যো বহুকম্
দোষম্ সমাজম্হি পসতি দেবনম্পিয়ো পিয়দসিরাজা
২। অস্তি পিতু একচা সমাজা সাধুমতা দেবানম্পিয়স

অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকার২ ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার সমাজ শব্দ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেচেন। ভাণ্ডারকার মহাশয় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধসাহিত্য৩ থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে' প্রমাণ করে' দিয়েচেন যে, সমাজের দুইটী অর্থ। উদ্ধৃত অশোকের লিপির প্রথম ছত্রে যে 'সমাজ' শব্দটী আছে, তার অর্থ থেকে বোঝা যায় যে, সমাজে প্রাণিহত্যা হ'ত, নিহত প্রাণীর মাংস খাওয়া হ'ত। অশোক এই সমাজকে নিন্দা করেচেন। দ্বিতীয় ছত্রে যে 'সমাজ' শব্দ আছে—সেই সমাজে নৃত্য, গীত ও অন্যান্য আমোদ লোকেরা পেত, আর অশোক এই সমাজকে সাধুসম্মত বলে' মনে করতেন। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় এই দ্বিতীয় অর্থটী সমর্থন করেচেন। তিনি দেখিয়েচেন যে, বাৎস্যায়নের কামসূত্রে৪ নাট্যাভিনয় অর্থে সমাজের উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়ন একে ধর্ম্মানুষ্ঠান বলে' বর্ণনা করেচেন।

বাৎস্যায়ন বলেন, পক্ষান্ত বা মাসান্ত দিনে তখনকার প্রথানুসারে সরস্বতী-মন্দিরের পূজারিরা সমাজের ব্যবস্থা করবেন। অন্য জায়গা থেকে অভিনেতারা এসে অভিনয় করবে। এই অভিনয়ের নাম ছিল—"প্রেক্ষণম্"। অভিনয়ের পরদিন মন্দির-সেবকেরা অভিনেতাদের অভিনন্দিত করতেন। তারপর দরকার হ'লে পুনরায় অভিনয় হ'ত, দর্শকদের ইচ্ছানুসারে অভিনয় বন্ধও করে' দেওয়া হ'ত।

বাৎস্যায়নের উক্তি থেকে প্রমাণিত হচ্চে যে, সমাজই একরূপ নাট্যাভিনয়। এই অভিনয়ের সঙ্গে ধর্ম্মের বিশেষ

১। Rock Edict I.

২। Indian Antiquary, 1913, pp 255-58.

৩। Ind. Ant. 1918 pp 221-223

৪। কামসূত্র, পৃঃ ৪৯-৫১ [Chowkhumba Sanskrit Series]

সম্পর্ক; কেননা, নাটক ও নাট্যশালার অধিষ্ঠাত্রী বাগীশ্বরী সরস্বতীর মন্দিরেই এই অভিনয় হ'ত।

বৌদ্ধদের জাতক থেকে জান্‌তে পারা যায়, সমাজ নাট্যাভিনয় অর্থেই ব্যবহৃত হ'ত। কণবের জাতক৫ পড়ে' এটুকু বেশ বুঝতে পারা যায় যে, সে সময় নটেদের এক একটা দল ছিল, আর তারা নানা গ্রামে, সহরে অভিনয় করত। এরা রঙ্গমঞ্চকে "সমাজ-মণ্ডল" বলত।

রামায়ণে (২।৬৭।১৫) নট ও নাটকের উল্লেখ আছে। ২।৬৯।৩ শ্লোকে আছে "নাটকানি অাহুঃ"। ২।১।২৭ শ্লোকে 'ব্যামিশ্রকেষু' মিশ্রিত ভাষায় লেখা নাটক বোঝায়। কীথ (B. Keith) সাহেব বলেন, রামায়ণের সময়ে নাটকাভিনয়ের কোন ইঙ্গিত নাই। কথাটা ভিত্তি-হীন বলেই মনে হয়। কেননা, রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে (৬৭।১৫) স্পষ্টই লেখা আছে—

"নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্ত্তকাঃ।
উৎসবৈশ্চ সমাজৈশ্চ বর্দ্ধন্তে রাষ্ট্রবর্দ্ধনাঃ।"

উৎসবে ও সমাজে অর্থাৎ নাট্যাভিনয়ে নটেরা আর নর্ত্তকেরা প্রহৃষ্ট হ'য়ে থাকে, কিন্তু অরাজক জনপদে তাদের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। নাট্যাভিনয়কে রাষ্ট্রবর্দ্ধন বলে' লোকে মনে করত। রাজারাও বোধ হয় লোকশিক্ষার্থে নাট্যশালার পোষণ করতেন।

বশিষ্ঠপুত্র পুলমায়ির ১৯শ রাজ্যাঙ্কে খোদিত নাসিক-গুহালিপিতে এবং সম্রাট্ খারবলের হাথীগুম্ফালিপিতে নাট্যাভিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। পুলমায়ি উৎসব-সমাজের দ্বারা প্রজাবৃন্দের প্রীতিবর্দ্ধন করেছিলেন। 'গন্ধব-বেদবুধ' রাজা খারবেল৬ তাঁর তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে রাজধানীর সকলকে উৎসব-সমাজ করে' আনন্দ দিয়েছিলেন।

৫। Fausboll, Jataka, Vol III, pp 61-2 (No 318)

৬। Journal of the Behar and Orissa Research Society, 1917 p 455

লেখক

শ্রীমনোমোহন বসু

যা কিছু লিখি সবই উত্তম, বিকায় বস্তা বস্তা,
ওজন দরেই পাবেন পথে একেবারেই সস্তা!
নভেল, নাটক, কাব্য এবং যা কিছু ইতিবৃত্ত
মাসিক, দৈনিক, সাপ্তাহিকে বাহির হয় নিত্য,
লেখার ঠেলায় সম্পাদক ত বেজায় রকম ক্লিষ্ট,
আঁৎকে ওঠেন পাঠক পাঠিকা—এমনি দুবাদৃষ্ট!
সমাজ সংস্কারক মোরা সব করি যে উল্টা,
আঙুল দিয়ে দেখিয়ে যে দিই মন্বাদির ভুলটা!
রিরংসা আর লালসায় নূতন লোভন চিত্র
সৃষ্টি করি কলম দিয়ে এমনি দেশের মিত্র!
ভয় করিনা সত্য বল্‌তে এমনি যুধিষ্ঠির,
নিন্দা-লজ্জা বিসর্জ্জিয়ে আছি কিন্তু বেশ স্থির!
গালি দিতে বেজায় পটু—না হই কভু ক্ষান্ত,
বঙ্গ ভাষার পিণ্ড দিই থাকিতেও তা জ্যান্ত!
মোদের মতন বোঝেনা যারা তারেই বলি মূর্খ
তাদের সহ বাক্যালাপটা করতে পাই কী দুঃখ।

আমরা মহা পণ্ডিত, একেবারে সব জান্তা,
অন্য কারও কথা আমরা, "কভি নেহি মান্তা!"
যা কিছু বলি, লিখি যা কিছু তা নহে কভু মন্দ
তবুও মূর্খ সমালোচকেরা সদাই করে যে দ্বন্দ্ব।
জোটেনা খেতে দুবেলা হায় দু'মুঠো পোড়া অন্ন—
এমনি মূর্খ হতভাগা দেশ, এমনি সেটা জঘন্য।
না জানে মোদের সম্মান, না গড়ে মোদের মূর্ত্তি
বত্রিশ-পাটী দন্ত বাহির করিয়া করে যে স্ফূর্ত্তি!
হা অভাগী বঙ্গভাষা কী তোর দুরাদৃষ্ট
মূর্খদিগের হস্তে প'ড়ে হচ্ছ বেজায় পিষ্ট!
আমরা থাকতে তোর এ দুঃখ নাই যে পারি সইতে,
ভাবছি রেগে অভিশাপ দেব ছিঁড়ে গাঁটবাঁধা পৈতে।
কী করব মা নাইক যে গায়ে এতটুকুনও শক্তি,
তাইত লাফাই, গলা ফাটাই, লেখায় দেখাই ভক্তি!
নমঃ নমঃ বঙ্গ ভাষা! ফাউণ্টেন পেন দিয়ে
একেবারে স্বর্গে তোমায় দেবই পাঠিয়ে॥

শ্রাবণ

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ কাব্যবিনোদ

শ্রাবণ কবে এলো আমার প্রাণে,
বুক্ যে আমার ভরে গেল
বাদল-ঝরা গানে।
শ্রাবনের বাজল বাঁশী,
বাঁধ সে ভাঙ্গার দিন সে আসি
ডাক্ দিযে সে গেল বলি
মাত্‌তে তুফানে।
উথলে পড়া ঢেউয়ের তালে
নাচল হৃদিতল,
আপনারে আপন মাঝে
লুকিয়ে রাখা আব কি সাজে,
সব বাঁধনের বাঁধ যে ভেঙ্গে
চল্‌ল ছুটে জল।
পিয়াসীর পিয়াস নাশি'
বেডাব যে এবার হাসি,
বিলাযে দিনু হাজার হাতে
আমার যা' সকল।
আমার মাঝে লুপ্ত হয়ে
ছিল গো যা'রা,
তা'দের পিয়াস আনল ডেকে
শ্রাবণ ধারা,

আজ সে তারা তরী খুলে
ভেসে বেড়ায় অকূল কূলে,
সবার সাধ যে মিট্‌ল আজি
বাঁধন হারা।
সকল জনে মুক্তি দিয়ে
মুক্ত যে আমি,
বাঁশী আমার বাজিয়ে বেড়াই
দিবস যামী;
বুকের বোঝা গেছে নেমে,
সব ভাবনা গেছে থেমে,
ফুটুক্ তা'রা যেমন খুসী—
যথা যে কামী।
শ্রাবণ আমার আন্‌ল ছুটী
লুটি' রাজ্যভার,
বুকের মাণিক ধূলায় ফেলে
এলাম আমি এলাম চলে,
লিপ্ত আমি নই কিছুতে
লুপ্ত অধিকার।

অসম্ভব

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

মুক্ত কেশের রেশমী ঢেউয়ে বুক তো দুল্‌লো গো
দীপ্ত চিকণ গোথ্‌রীতে মোর তৃপ্ত পরাণ ভুল্‌লো গো
মরু প্রাণের উৎস সুধার, সরু সোণার কঙ্কণে
কালো আঁখির জাগ্‌লো আলো, বিশ্বশোভার অঙ্কণে।

হার মানি ওই কণ্ঠহারে, ব'ল্‌চে সে "মোর সঙ্গ নে"
আল্‌তা পায়ের লাল, তা' করে লজ্জানত রঙ্গনে
চাঁদের করে ঠিক্‌রে পড়ে তোমার হাসির ফুল্‌ঝুরি
উঠ্‌লো তোমার কিরণধারে সুখসাগরের কূল পূরি।

খুসী তোমার মধুঋতুর ফুট্‌চে কুসুমপুঞ্জে গো
বাজ্‌চে নীতি শুন্‌চি তোমার গীতি ভ্রমরগুঞ্জে গো
সাঁঝ্ সকালের অস্ত উদয় কোন্ হেমে কে ঢাক্‌লো গো
গোধূলি কি তোমার পায়ের ও ধূলিটি মাখ্‌লো গো!

স্রোতস্বিনীর কুলুধ্বনি তোমার কথাই বল্‌চে যে
আঁখিতারার দীপটি তোমার সকল তারায় জ্বল্‌চে যে
তিন্ ভুবনের অঙ্গে পরা তোমার রূপের গয়না যে
আমায় তুমি রইবে ছেড়ে—হয়না, তা' আর হয়না যে।

চিত্র সমালোচনা

ভারতবর্ষ

সাপ পঞ্চমী ঃ—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষ অঙ্কিত, উদীয়মান ওরিয়্যান্ট্যাল হিসাবে চিত্রখানা খুব খারাপ হয় নাই। অঙ্কন প্রণালী যাই হউক চিত্রখানায় ভক্তিরস আছে সুতরাং পরিশ্রম অনেকটা সার্থক হইয়াছে।

তপোবন ঃ—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ অঙ্কিত। একঘেয়ে চিত্র। কেবল সময় ও রং এর অপব্যবহার। চোখের ড্রয়িং মুখের স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বদলায় এ জ্ঞানটা থাকা বিশেষ দরকার। প্রসাধন কার্য্যে যিনি সাহায্য করিতেছেন তাহার চোখ, শিক্ষার্থী শিল্পীও এরূপ ভাবে অঙ্কিত করে না। তুলির খোঁচা খাঁচা অধিক দিলেই যদি নিজকে পণ্ডিত মনে হয় সেটা স্বতন্ত্র কথা, তবে বিষয় বস্তুর উদ্দেশ্য ফুটিল কি না তাহা কে দেখিবে?

ওমর খৈয়াম ঃ—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত। এ চিত্রের নায়ক নায়িকা কি রসে ভরপুর তা বলা বড় শক্ত? যে চিত্র দেখিলে হাসিব কি কাঁদিব বুঝি না, তাহা অঙ্কণে ফল কি? এ সব শিল্পীর ভবিষ্যৎ বড় ভাল নয়। সময় আসিলে বুঝিতে পারিবে অসময়ে ওস্তাদ সাজিলে কি ফল।

নির্ব্বাসিতা ঃ—শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর পরামাণিক—নির্ব্বাসিতা হইয়াছে বটে, অনেকটা থিয়েটারের ভঙ্গীর মত, কয়েক মিনিটের জন্য। কটোর সাহায্যে একটী ভঙ্গী লইয়া তাহাকে নির্ব্বাসন দিবার চেষ্টা করিলেই কি সে সেই শাস্তি গ্রহণে রাজী হয়? চিত্র অঙ্কনের প্রাথমিক নিয়মগুলি পর্য্যন্ত শিল্পীর আয়ত্তের বাহিরে সুতরাং ভাব প্রকাশ করিবার অস্ত্র কোথায়? নির্ব্বাসনের চিহ্নমাত্রও নাই. সন্তানের সামান্য অসুস্থতাযও মাব মনে ইহা অপেক্ষা অধিক উদ্বেগ আসে।

পঙ্কদলী।

যষ্টিমধু

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

(প্রশ্ন)

বসন্ত কয় ও ভাই মধু
কেমন কথা কও
সময় সময় তুমিই আবার
যষ্টি নাকি হও?
নিত্য শুনি কিন্তু আবার
যায় না যে সংশয়
ভোম্‌রা যে হয় বেম্‌ড়া হবে
হয় না ত প্রত্যয়।

(উত্তর)

মন ভোম্‌রার রাজ্যে হলে
বন বরাহের উপদ্রব,
মধুকে হয় যষ্টি হ'তে
সময় গুণে সয়রে সব।
কোকিলকে হয় সাজ্‌তে ফিঙা
বরুণকে হয় বাইতে ডিঙ্গা,
বংশীধারী চক্র ধরেন
ভুলি মিলন মহোৎসব।
সিংহ পাবে শির পেতে কি
দুম্বা ভেড়ার চুঁস্ নিতে,
মুক্তা যাবে মুক্তি পেতে
উদ্‌বিড়ালে ঘুঁষ দিতে?
কর্‌তে পাপের নিবৃত্তি যে
দধিচী দেন অস্থি নিজে,
ত্বরিৎ তরল অগ্নি জ্বলে
শ্যামল শশী সমুদ্ভব।
পারিজাতের মাল্য যে হয়
দৈত্য গলে সর্পরে,
হৈমবতী হন যে কালী
দানব শোণিত খর্পরে।
নয় যে লোকের ভুল ছোটাতে
মৌমাছিকে হুল ফোটাতে।
মধু তোমার যষ্টি হ'বে
এটা কি ভাই অসম্ভব।

রেঙ্গুণে আর্ট থিয়েটার*

(প্রেরিত পত্র)

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ রায়চৌধুরী বি, এ লিখিতেছেন,—

"আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের একটী দল যখন রেঙ্গুণ-যাত্রা করেন তখন অনেকে এই সৎসাহসের প্রশংসাকল্পেও পরশ্রীকাতর নিন্দুকের দল আগে থাকতেই ছু'চারটী টিপ্পনী দিতে ক্রটী করেন নি। কেউ মা'র চেয়ে ম সীর মত বেশী দরদ দেখিয়ে বল্লেন "মগের মুলুকে গিয়ে তাঁবা যা ইচ্ছে তাই করতে পাবেন, কিন্তু বাংলার বাইরে বাঙ্গালীর অভিনয়ের নিন্দা ও খ্যাতি তাঁদের এই অভিযানের উপর অনেকখানি নির্ভর করছে বলেই এ কথা আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আর্ট থিয়েটার তাঁদের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সেখানে না নিয়ে খুবই অন্যায় করেছেন।" এক মহাপণ্ডিত লিখলেন "এই দল লইয়া যদি ষ্টার, বিলাত, সাইবিরীয়া, বা কামস্কাটকায় যায়, তাহা হইলে সশরীরে কলিকাতায় ফিরিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। রেঙ্গুণের অধিবাসীগণ ষ্টারের নাম শুনিয়াই যে অজ্ঞান হইবে, এমন ত মনে হয় না, যদি তাঁহারা ষ্টার যে সব অভিনেতা অভিনেত্রীদের নামে, নাম করিয়াছেন তাহাদের দেখিতে চাহেন তবেইত বিপদ।"

মঙ্গলবার দুপুরে, সম্প্রদায় রেঙ্গুণে পৌছুলেন। Wharfএ দেখলুম অসম্ভব ভীড়, প্রায় ৭০।৮০ জন বাঙ্গালী ফুলের মালা, ফুলের তোড়া ইত্যাদি নিয়ে ষ্টার সম্প্রদায়কে অভ্যর্থনা করবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রদায়কে নেবার জন্য ৮।১০ খানা মোটরকার উপস্থিত ছিল। সম্বর্দ্ধনার বহর দেখে আমি ত অবাক্, মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কল্লুম সম্প্রদায় যেন বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে ফিরতে পারেন।

প্রথম অভিনয় হল বৃহস্পতিবার ৯ই এপ্রিল। স্থান রেঙ্গুণ জুবিলী হল। এটী রেঙ্গুণের টাউন হল। প্রায় দু'হাজার লোক বসিবার সুবন্দোবস্ত আছে। প্রথম অভিনয় রাত্রে হলে তিলমাত্র স্থান ছিল না। দর্শক বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, বর্ম্মণ, সুর্ত্তি, চেটী, ভাটিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর। রেঙ্গুণের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন, জ্যোতিষচন্দ্র রায় মিঃ চো, ডাঃ প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় হলো "ইরাণের রাণী ও নেকনজরের"। দারার অংশে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখালেন। এঁর যেমন কণ্ঠস্বর, তেমনি চেহারা, তেমনি অঙ্গভঙ্গী। দর্শকবৃন্দ তাঁহার অভিনয়ে একান্ত মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। প্রশংসাসূচক করতালির আর অন্ত ছিল না। গুলরুখের ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালার অভিনয় হয়েছিল চমৎকার। তাঁহার কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীতের ঝঙ্কার শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রত্যেক গানটাই তাহাকে ৩।৪ বার করে গাইতে হয়েছিল, শ্রীমতী নিভাননীর রাণীর ভূমিকাও বেশ সুন্দর হয়েছিল। ইরাণের রাণীর পর অভিনয় হয়েছিল নেকনজরের। কাবাবের ভূমিকায় নীহারবালা যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেছেন, বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ে এমন সর্ব্বাঙ্গীণ কৃতিত্ব আমরা অনেক-দিন দেখিনি।

শুক্রবার অভিনীত হল আলিবাবা ও নেকনজর। কাশেমের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মরজিনার ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালার অভিনয় ও গান বড়ই সুন্দর হয়েছিল। শনিবারে অভিনীত হল পলিন আর আবুহোসেন। এ রাত্রে এক পলিনের ভূমিকা ছাড়া আর কোন ভূমিকাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়নি।

সোমবারে অভিনীত হল শিরীফরহাদ ও বাসন্তী। ফরহাদের অংশে দুর্গাদাসবাবু, হামজাদের ভূমিকায় রাধাচরণবাবু গুলবাহারের ভূমিকায় নীহারবালার এবং পরিজানের ভূমিকায় একটী নূতন অভিনেত্রীর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল।

জুবিলি হলে অভিনয়ের পর, চাররাত্রি সুনিয়াম হলে অভিনয় হোল। বাঙ্গালী দর্শকবৃন্দের অনুরোধে ষ্টার এই চার রাত্রি গীতিনাট্যের পরিবর্ত্তে সরলা, ভ্রমর, জয়দেব

---

* রঙ্গালয় সম্বন্ধে বাহিরের মতামত নবযুগে সাধারণতঃ প্রকাশিত হয় না, তবে রেঙ্গুণে বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের অভিনয় বলিয়া ও সে অভিনয় দেখিবার সুবিধা আমাদের ছিল না বলিয়া এই পত্র প্রকাশিত হইল। সম্পাদক।

ও সুদামার অভিনয় করলেন, গদাধর ও ব্রহ্মানন্দের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় নীলকমল ও সুদামার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য, সবলা, ভ্রমর ও শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালা, প্রমদা, রোহিণী, বিমলা ও সুমতির ভূমিকায় শ্রীমতী নিভাননী, শ্যামার ভূমিকায় শ্রীমতী রাজবালা ও ক্ষিরীর ভূমিকায় নূতন অভিনেত্রীটির অভিনয় বড়ই সুন্দর হয়েছিল। কয় রাত্রিতেই স্থানাভাবে অসংখ্য দর্শককে ফিরে যেতে হয়েছিল।

প্রবাসী বাঙালীদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কলিকাতা থেকে অহীন্দ্রবাবুকে রেঙ্গুণে আসতে হয়েছিল। জুবিলি হলে বুধ ও বৃহস্পতিবার ২২ ও ২৩শে এপ্রিল, কর্ণার্জ্জুন অভিনীত হল। কর্ণের ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবুর, অর্জ্জুনের ভূমিকায় দুর্গাদাস বাবুর, দুর্য্যোধনের ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রবাবুর, ভীমের ভূমিকায় ননীগোপাল বাবুর, পদ্মা ও দ্রৌপদীর ভূমিকায় শ্রীমতী নিভাননী, নিয়তি ও বিকর্ণের ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল, অসম্ভব রকম লোকসমাগম হয়েছিল।

বিদায়-অভিনয় রাত্রে, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত জে আর দাশ মহাশয়ের উপস্থিতিতে নির্ব্বাচিত দৃশ্যাবলী ও সুদামার অভিনয় হয়েছিল। এ রাত্রেও অসম্ভব ভীড় হয়েছিল। দারা, সাজাহান ও সেলুকাসের ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবুর, চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় দুর্গাদাসবাবুর, শ্রীকৃষ্ণ, নিয়তি, মরজিনা, গুলবাহার নাহেব ও হেলেনের ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালার বন্দিনী ও সুমতির ভূমিকায় শ্রীমতী নিভাননীর অভিনয় বড়ই সুন্দর হয়েছিল। এই অভিনয় রাত্রে এই কয়জন অভিনেতা ও অভিনেত্রী স্বর্ণ পদক পুরস্কার পেয়েছেন। সহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই একবাক্যে সম্প্রদায়ের সুখ্যাতি করলেন। এই রাত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থ (৩০০০৲ টাকারও উপর) রেঙ্গুণ রামকৃষ্ণ-মিশন হসপিটালে দান করে, আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ বিভিন্ন সমাজের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

আর্ট থিয়েটার সুখ্যাতির সঙ্গে রেঙ্গুণে অভিনয় করে সুযশ অর্জ্জন করে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করেছেন। শুনিলাম এখানে থাকতে থাকতেই তাহারা মৌলমিন, ম্যান্দালে, পেনাং ও সিঙ্গাপুরে যাবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, কিন্তু এখন সমুদ্রের অবস্থা ভাল নয় বলে সে সকল আহ্বান প্রত্যাখ্যান কর্ত্তে বাধ্য হয়েছেন।

রেঙ্গুণে গুজব যে এই সাফল্যে প্রণোদিত হয়ে, আর্ট থিয়েটার একটী স্থায়ী রঙ্গালয় নির্ম্মাণের জন্য জমী Lease নিয়েছেন এবং শীঘ্রই সেখানে নাকি তাঁহাদের রঙ্গালয় নির্ম্মিত হবে। ভগবান তাঁহাদের এই নূতন প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করুন।

মনোমোহন নাট্য-মন্দির ঃ— আগামী ২রা জ্যৈষ্ঠ 'জনা' অভিনয় আরম্ভ হইবে বলিয়া একটা কাণা-ঘুষা শুনা যাইতেছে, তবে যতক্ষণ অভিনয় না হয় ততক্ষণ সে সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন, কারণ ভাদুড়ী মহাশয় ব্যবসা করিতে বসিয়াও বলিয়া থাকেন 'আমি ব্যবসাদার নই' তাঁহার সম্বন্ধে হিসাব মত কিছু আন্দাজ করিয়া বলা চলে না। আমাদের মনে হয় তাঁহার অভিনয় নৈপুণ্যের সহিত ব্যবসাদারীর একটু খাদ মিশ্রিত থাকিলে তাঁহারও দর্শকদের উভয়পক্ষেরই সুবিধা হইত। আর্টথিয়েটারের সহিত 'জনা' লইয়া যে বিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়াছে—শুনিয়া আমরা বড় আনন্দিত হইলাম।

Printed & Published by Sachindra Nath Banerji at the HIMANI PRESS.
83, Durga Charan Mitter Street, Calcutta.

'একতারা'

ইণ্ডিয়ান একাডেমী অব আর্টের সৌজন্যে

প্রথমবর্ষ]　　২রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩২ সন। ইংরাজী ১৬ই মে　　[৪০শ সংখ্যা

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের একমাত্র সোপান

অস্পৃশ্যতার দাপট মাদ্রাজেই বেশী -কিন্তু তারা সেটা ছাড়তে চান না, কিন্তু বাঙ্গলা যে এ বিষয়ে খুব দ্রুত অগ্রসর হয়েছে তার প্রমাণ রাস্তার দুধারে চায়ের দোকানের নিত্য সংখ্যা বৃদ্ধি। সেই সনাতন বালতীতে কেমন সব জাতের এঁটো পেয়ালা ধোয়া হচ্ছে আর ব্রাহ্মণ থেকে সব জাত পাশাপাশি বসে চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন—এতেও যদি এ দেশে অস্পৃশ্যতা আছে, কেউ বলে আমরা নাচার—আর স্বাস্থ্যের উন্নতি এতে যে কত হচ্ছে সে কথাটা আর নাই বল্লুম।

ক'নে দেখা

শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায়

আজ ক'নে দেখা। ক'নের মা এতদিন কিছু ভাবনায় ছিলেন। ক'নের বিবাহ যোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে কিন্তু মনোমত পাত্র এতদিন মিলে নাই। আজ দুই দিন হইল তাঁহাদের অঞ্চলে একটী ছেলে আসিয়াছে। মেয়ের মা ছেলেটীকে দেখিয়াছেন। ছেলেটীকে দেখিয়া তাঁহার মনে ধরিয়াছে। এখন ছেলেটীর মেয়েটীকে দেখিয়া মনে ধরিলেই হয়।

আজ অপরাহ্নে মেয়ের মা ছেলেটীকে তাঁহাদের বাড়ীতে ডাকিয়া আনাইয়াছেন। মেয়ের মা প্রকৃতিদেবী পাকা গৃহিণী—কিসে একালের ছেলেদের মন ভুলে তাহা তিনি জানিতেন। ছেলেটীকে ডাকিয়া আনাইয়া তাহাকে স্বচ্ছন্দ-বন জাত সুস্বাদু বাদামের সরবৎ খাওয়াইয়াছেন। সরবৎ খাইয়া ছেলেটীর শরীর স্নিগ্ধ হইল। মেয়ের মা ইতিমধ্যে তাঁহার বড় মেয়ে সাগরকে ডাকিয়া বলিলেন "এখনও একটু বেলা আছে, এখনও ক'নে দেখাইবার সময় হয় নাই, যা ততক্ষণ ছেলেটীকে লইয়া একটু ভাল জায়গায় বসাইয়া একটু নিরিবিলি গল্পস্বল্প কর। আমরা ততক্ষণ ক'নে সাজাইয়া আনি।

সাগর বড় মুখরা মেয়ে। সে কথা কহিতে কহিতে ছেলেটীকে লইয়া গিয়া সিকতাময় তটে উপবেশন করাইল। অনন্ত বিস্তারী নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া ছেলেটীর হৃদয় বিপুল আনন্দে পরিপ্লুত হইল। ফেনিল নীল অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর তরঙ্গভঙ্গ প্রক্ষিপ্ত ফেনরেখা। স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদাম-গ্রথিত মাল্যের ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্তি সৈকতে ন্যস্ত হইতেছে—কানন-কুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। সাগর খুব জাঁক করিয়া ছেলেটীর সহিত গল্প জুড়িয়া দিল। সাগরের স্বর কখনও মৃদু, কখনও গম্ভীর—হাস্য কখনও ফেনপুঞ্জে উছলিয়া পড়িতেছিল। বনবধূরা উঁকি ঝুঁকি মারিয়া ভাবী বরকে দেখিতে ছিল। একটী নক্ষত্রবধ একবার উঁকি দিয়া—টিপি টিপি হাসিয়া আবার কোথায় লুকাইল। ছেলেটী সেই সিকতাময় আসনে বসিয়া অন্যমনে জলধি-শোভা দৃষ্টি করিতে লাগিল —পরে অন্যের অশ্রাব্য মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল—"আহা কি দেখিলাম, জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী—
তমাল তালীবনরাজি নীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মেয়ের মা পাকা গৃহিণী, তিনি উপযুক্ত স্থানেই ছেলেটীকে বসাইবার ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন! ছেলেটীর মন ভিজিতেছিল।

এদিকে ক'নে সাজাইবার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। সখী বনজ্যোৎস্না ক'নের চিবুক ধরিয়া বলিতেছেন—

"বলে—পদ্মপাণী, বদনখানি রেতে রাখে ঢেকে
ফুটায় কলি, জুটায় অলি, প্রাণপতিকে দেখে।
আবার বনের লতা, ছড়িয়ে পাতা, গাছের দিকে ধায়
নদীর জল, নামলে ঢল, সাগরেতে যায়।
ছি ছি সরমটুটে, কুমুদ ফুটে, চাঁদের আলো পেলে
বিয়ের ক'নে রাখতে নারি ফুলশয্যা গেলে।
মরি—একি জ্বালা, বিধির খেলা, হরিষে-বিষাদ
পরপরশে, সবাই বসে, ভাঙ্গে লাজের বাঁধ।"

"তুই কি লো একা তপস্বিনী থাকবি?"

মেয়েটী উত্তর করিল—"কেন কি তপস্যা করিতেছি?

বনজ্যোৎস্না দুই করে ক'নের কেশ-তরঙ্গ-মালা তুলিয়া কহিল—"তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবে না?

"বাঁধাব চুলের রাশ, পরাব চিকণ বাস
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।

কপালে সীঁথির ধার, কাঁকালেতে চন্দ্রহার
কাণে তোর দিব জোড়া দুল।
কুঙ্কুম চন্দন চুয়া, বাটা ভরে পান গুয়া
রাঙ্গা মুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোণার পুত্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে
দেখি ভাল লাগে কি না লাগে?"

কিন্তু মেয়েটী চুলের রাশ বাঁধিতে রাজি হইল না। এমন সময়ে মেয়ের মা আসিয়া তাড়া দিলেন—বলিলেন "কি লো! তোদের হোলো? এদিকে যে ক'নে দেখাইবার সময় হয়েছে—দেখছিস্ না? গোধূলির আলো কেমন সুন্দর রং ফলিয়েছে দেখেছিস্—এই আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণে আমার কপালিনীকে দেখাতে হবে। তবে ত মেয়ে পছন্দ হবে—চল, আর দেরী নয়, চল।" তখন সখী বাসন্তী আসিয়া বলিল—"আর তোদের ক'নে সাজাইতে হইবে না, চল্। আমি মেয়ের গায়ে যে আভরণ দিয়াছি, তাহাই পর্য্যাপ্ত হইবে,—এখন আয়।" মেয়ের মা প্রকৃতি দেবীর সমবয়স্কা অদৃষ্ট দেবীর হাতযশ ছিল, তিনি মেয়ের মায়ের ইচ্ছানুসারে মেয়েকে টানিয়া লইয়া ক'নে দেখাইতে চলিলেন।

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া এদিকে সাগর গল্প বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তথাপি ছেলেটী তন্ময় হইয়া সেখানে বসিয়াছিল। পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া সমুদ্রের কাল জলের উপর বসিল। তখন ছেলেটী নিজের অজ্ঞাতসারে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল কেন তাহা বলিতে পারি না—তখন তাহার মনে কোন্ অভূতপূর্ব্ব সুখের উদয় হইতেছিল তাহা কে বলিবে? গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিল। ফিরিবামাত্র দেখিল, অপূর্ব্বমূর্ত্তি। সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে, অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার—অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার তদগ্রে দেহরত্ন, যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছেনা—তথাপি মেঘবিচ্ছেদ-নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিলাস লোচনে কটাক্ষ, অতি স্নিগ্ধ, অতি স্থির; অতিগম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়ী; সে কটাক্ষ এই সাগর হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য, বাহুযুগলের বিমল-শ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্ত্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্র নিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুর জাল, পরস্পর সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকসিত হইয়াছিল, তাহা সেই গম্ভীর নাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।" ছেলেটী এক সমুদ্রকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইল, আর এক সমুদ্র তাহার সম্মুখীন হইল!

ক'নের রূপ দেখিয়া ছেলেটীর বাক্‌শক্তি রহিত হইয়াছিল—সে শুধু স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। মেয়েটীও প্রকৃতি দেবীর বড় আদরের মেয়ে—নিতান্ত সরলা——সেও অনিমিষ লোচনে বিশাল চক্ষুর স্থির দৃষ্টি ছেলেটীর মুখে ন্যস্ত করিয়া দিল। এইরূপে বহুক্ষণ দুইজনে চাহিয়া রহিল। ছেলেটীর ইচ্ছা মেয়েটীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করে। কিন্তু ছেলেটী বড় লাজুক, পারিল না। মেয়েটির সখীরা এই ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন রসিকা মেয়েটীর কাণে কাণে কি বলিল। মেয়েটী অতি সরলা বোধ হয়, যেমন শিক্ষা পাইল তেমনই বলিল। অতি মৃদুস্বরে বলিল "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?" ক'নের সখীটি রসিকা বটে। সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিলে সংসারারণ্যে পথিক মাত্রেরই পথ হারাইবার কথা বটে!

সেই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ছেলেটির হৃদয় বীণা বাজিয়া উঠিল! বিচিত্র হৃদয় যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না। কিন্তু একটি শব্দে, একটি রমণী কণ্ঠ-সম্ভূত-স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়! সকলই লয় হয়, সংসারযাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীত প্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। ছেলেটির কর্ণে এ ধ্বনি সেইরূপ বাজিল।

"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?" এ ধ্বনি ছেলেটির

কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল, বৃক্ষ পত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল, সাগর নাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল, সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী, রমণী সুন্দরী ধ্বনিও সুন্দর, হৃদয় তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় মিশিতে লাগিল।

ক'নের মা ও ক'নের সখীরা অনুভবে বুঝিলেন ছেলের ক'নে দেখিয়া পছন্দ হইয়াছে। তাঁহারা এইবার ধীরে ধীরে ক'নেকে লইয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

উনষাট বৎসর পূর্ব্বে ঘটকচূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসন্তান নবকুমারকে এইরূপে একটা ক'নে দেখাইয়াছিলেন। নবকুমারের মাতা এই কন্যাকে মহাসমাদরে পরে বধূরূপে বরণ করিয়া ঘরে তুলিয়াছিলেন। নবকুমারের ভাষা-জননীও সেইদিন এই কন্যাটীকে "চিরায়ুষ্মতী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সে আশীর্ব্বাদ বাণী নিষ্ফল হয় নাই। ইংলণ্ডীয় কবির "মিরন্দা", ভারতবর্ষীয় কবির "শকুন্তলা" ও বাঙ্গালী কবির "কপাল-কুণ্ডলা" জগতের চিত্রশালায় সমান আসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। নবকুমারের স্বজাতীয়েরাও এই "ক'নে দেখার" স্মৃতি কখনও ভুলিতে পারিবে না, মনস্তত্ত্বের যুগেও না, আর্টের আওতাতেও না, আধুনিক মাকালজাতীয় সাহিত্যের চাক্‌চিক্যেও না!

ভুল

শ্রীমুরারিমোহন দাস

আঁধার রাতেরে
ডেকে হেসে কয়
একটা উজল তারা
"বিস্ময়ে দেখ
দেখিছে জগৎ
আমার আলোক ধারা"।

"এক কথা শুধু—
ভুলো না'ক ভাই"—
কহিল আঁধার রাতি!
"আমারই মাঝে
তোমার গরিমা
তোমার উজল ভাতি!"

গল্প

মাধবী*

শ্রীসুধা দেবী
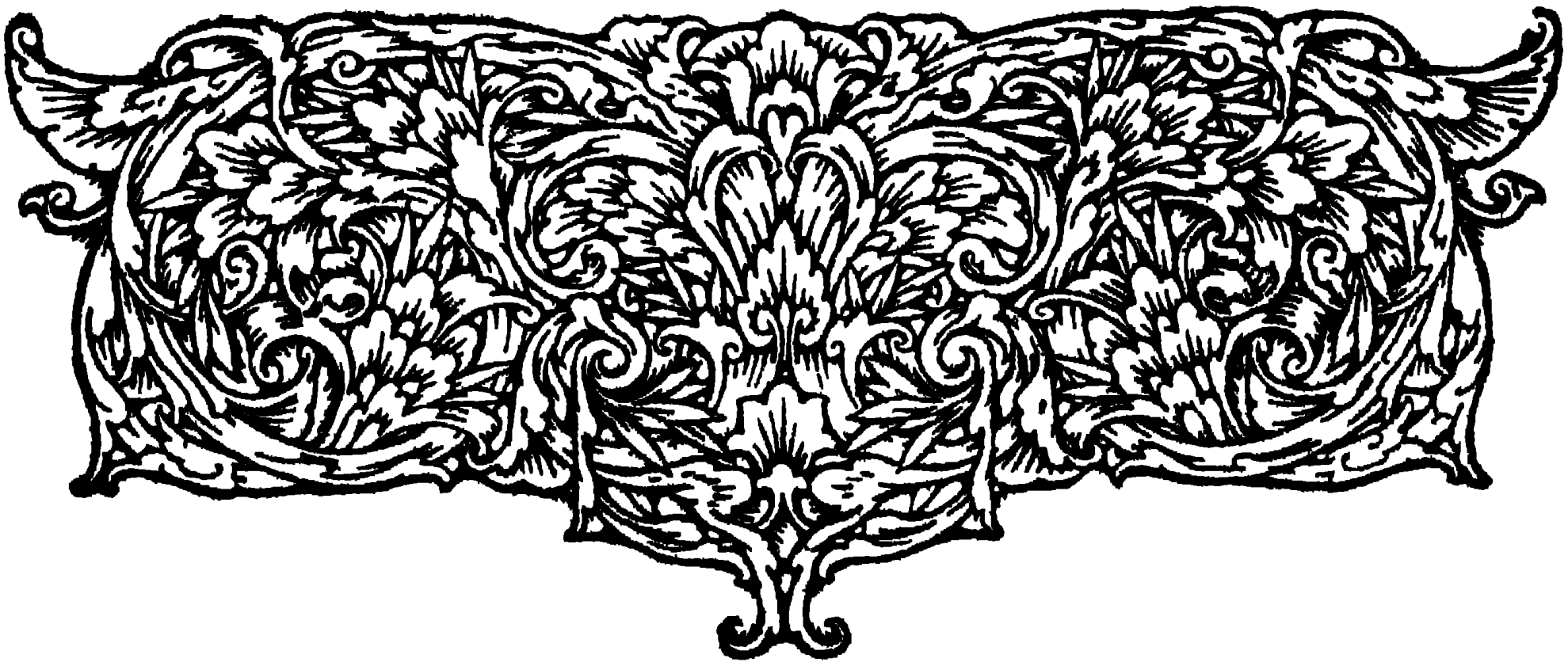
আমার বিয়ের ঠিক তিন দিন পরেই আমরা দুজনে মধুবাসর কর্তে এসেছিলুম গিরিডিতে। পাহাড়ের তলায় সুন্দর ছোট বাড়ীটি। এর কাছাকাছি আর বড় একটা বাড়ী ছিলনা। চারিদিকেই ছোট ছোট পাহাড় আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নীরবে। এ বাড়ীটা আমার দাদার কোন এক বন্ধুর, তিনি নিজে থেকে আমার এখানে কিছুদিন থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। গিরিডিতে আমার এই প্রথম আসা। এমন স্বভাব সুন্দর প্রকৃতি যদিও আমি অনেক দেখেছি তবুও আমার এস্থানটি বড্ড ভাল লাগলো। আর তাই আমাদের দু'জনের দিনও বেশ সুন্দর ভাবে কেটে যাচ্ছিল। রোজই আমরা দু'জনে সকালসন্ধ্যে, রাঙ্গা-মাটির পথ, আমাদের প্রথম মিলনের আবেশ ভরা প্রীতি গানে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলতুম। সেদিন হঠাৎ একাই পথে বেরিয়েছিলুম। অনেক দূরে এসে কাছে একটা বাড়ী দেখলাম তার গেটে লেখা রয়েছে "মাধবী-কুঞ্জ।" বাড়ীটি বড় সুন্দর। যেন বিশ্বের স্রষ্টা তাঁর তুলি দিয়ে যুগযুগান্তর ধরে এই ছবি খানি ধরার গায়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমার বড়ই ভাল লাগলো, তাই একমনে দাঁড়িয়ে বাড়ীটি দেখছিলাম, এমন সময় হঠাৎ দেখি একটি ছোট ফুলের কুঁড়ির মত ফুটফুটে মেয়ে একরাশ ফুল নিয়ে লাল কাঁকরের পথে খেলা করছে, ছুটে ছুটে প্রজাপতির পিছনে। তার সেই ফুলের মত মুখ-খানি হঠাৎ আমার প্রাণের মাঝে একটু নাড়া দিয়ে দিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার মন প্রাণ উঠলো দোদুল দোলায় দুলে—যেমন বীণার তার বেজে ওঠে। মনে হ'লো যেন এ মুখ কোথায় দেখেছি, যেন এ আমার বহু পরিচিত। কিন্তু কোথায় যে এরে দেখেছি তা ঠিক ভেবে উঠতে পারলুম না। এমন সময় মেয়েটী আমার দিকে তার মিষ্টি হাসিভরা মুখে চেয়ে বললে কাকে খুঁজছেন? মাকে? আসুন না মা ঐখানে আছেন বলেই সে আমার কাছে ছুটে এলো। তার কথায় আমি হেসে বললুম তোমরা এখানে কে কে আছ? সে বললে আমি থাকি, মা আর মামুবাবু। আরও অনেক লোক আছে, আসুন না মার সঙ্গে দেখা করবেন, বলে সে আমার হাতটি ধরলো তার কচি হাতদুটী দিয়ে। আমি তাকে কোলে তুলে তার সেই কচি মুখে চুমা দিয়ে বল্লুম "তোমার নামটি ত আমায় বল্লে না।" এবার মেয়েটী তার রাঙা ঠোঁটে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে বললে মা আমায় ছবি বলে, আর মামুবাবু বলে 'ও—র—ঘো'। বাড়ীর মধ্যে ঢুকতেই অর্ঘ্য চেঁচিয়ে ডাকলে "দেখ মা কে এসেছেন।" মেয়ের কথায় কে যেন একটী মিঠে সুরে

---

* গল্পটী সত্য। তবে বীণার মত মেয়ে এখনও বাঙলা দেশে হয়নি। দেবেনের মত পুরুষকে শিক্ষা দিতে ঐ রকম মেয়ের আবশ্যক; বোধ হয় তাদের আসবার সময়ও আগত।

বল্লে কে রে ছবি উপরে নিয়ে আয় ত দেখি—তারপরই হঠাৎ অনেক দিন পরে মাধবীকে দেখে আমি আনন্দে অধীর হয়ে বলে উঠলুম একি মাধবী তুই !

* * * *

মাধুবীর সঙ্গে আজ অনেক বছরের পর দেখা—প্রায় বছর সাতেক পরে। তার সঙ্গে যে এমন ভাবে আমার দেখা হবে তা আমি একদিনও ভাবিনি। ছেলেবেলায় পাশাপাশি বাড়ীতে থেকে একসঙ্গে একই স্কুলে পড়ে আমাদের অনেকদিন কেটে গিছল। তারপর বাবাও হঠাৎ একদিন কল্‌কাতা থেকে বদ্‌লি হয়ে গেলেন আর আর সেই থেকে তার সঙ্গে আমার দেখা নেই। মাধবী মধ্যে মধ্যে চিঠি দিত—ওঃ সে কত কথা। তারপর একদিন তার বিয়ের খবরও পেলাম। আমায় যাবার জন্যে তার কত অনুরোধ, আমার কিন্তু যাওয়া হয়নি, কেন যে তা ঠিক জানি না। তবে চিঠিতে সে আমায় তার বিয়ের সমস্ত খবর দিত। এমন কি তার স্বামীর প্রথম প্রেমভরা চিঠিখানিও আমায় পাঠিয়েছিল। তার পর একদিন সে হঠাৎ চিঠি বন্ধ করে দিল আর কোন খবর নেই। সেও আজ অনেকদিনের কথা, আজ হঠাৎ এমনি ভাবে দুজনে দুজনকে দেখে কত যে আনন্দ হ'ল তার ঠিক নেই। তাকে তামাসা করে বল্লুম কি রে মাধবী তোর শ্যামকে আমায় একবার দেখাবিনি। আমার কথায় তার মুখখানি যেন কিসের ব্যথায় একটু ব্যথিয়ে উঠলো। সে আমার কথা চাপা দিয়ে বললে "ভাই বীণা তোর স্বামীকে দেখাবি না ? আমি বল্লুম নিশ্চয়, কবে যাচ্ছিস বল্ ? মাধবী বল্লে যাবো একদিন। তারপর কথায় কথায় তার মুখে শুনলুম সে আজ দুবছর হ'ল এখানে একটা যক্ষ্মা-নিবাস খুলেছে। তার পিসীমার ছেলে নরেনদা এখানকার ডাক্তার। তারা দুজনে মিলে এখানে থেকে যক্ষ্মা রোগীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে। স্বামীর কথা সে যেন কেবলই লুকাতে চায় কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপর বল্‌লে সব শুন্‌তে চাস্, শুনবি ? আমি বল্‌লুম যদি ব্যথা পাস্ তবে বলে কাজ নেই। সে আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে একটা বাঁধান খাতা এনে আমায় দিয়ে বল্লে ভাই বীণা তুই আমার ছেলেবেলার বন্ধু, তোর কাছে আর কি লুকাবো বল ? এইটে আগাগোড়া পড়িস, এতেই আমার জীবনের সমস্ত কাহিনী লেখা আছে, পড়া শেষ হলে যদি তোর মনের কোণেও আমার উপর ঘৃণার রেখা ফুটে ওঠে তা হলে এখানা ফেলে দিস আর তা যদি না হয় তবে আমাকে ফেরত দিস্ ভাই এটা, এতেই তুই সব পাবি ?

আসার সময় মাধবীকে বলে এলুম কাল তোর সখাকে নিয়ে আসবো, মাধবী আমার কথায় একটু হেসে বললে হয়ত নাও আসতে পারিস। আমি সত্যি ক'রে আর্দ্ধেক মুখে চুমা খেয়ে চলে এলাম। বাড়ীর দরজার কাছে হঠাৎ অমা বললে মাসীমা আমি তোমার সঙ্গে যাবো। আমি তাকে বল্লুম আচ্ছা কাল নিয়ে যাব।

* * * *

খাওয়া দাওয়া সেরে ওপরে মাধবীর খাতা খানা পড়তে সুরু করে দিলুম—ধ'র স্বামী আমার একটা ইংরেজী নভেল নিয়ে ব্যস্ত।

উপরি উপরি সাত ছেলের পর আমি যখন মেয়ে হয়ে বাপ মায়ের কোলে এলাম তখন আমার আদরের সীমা ছিল না। বাড়ীর সকলের ইচ্ছে ছিল অনেক দিনের যে মায়ের আমার একটা মেয়ে হয়। তাই যখন আমি সংসারে এলুম তখন সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠল। বাবা ছিলেন মুনসেফ। আমার জীবনের ১৪বছর কেটেছিলো কলকাতায়। তারপর বাবা বদলি হয়ে হাজারিবাগে যান, আর এখানেই সেজদার এক বন্ধুর সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিক হ'ল। দেবেন বাবুর আপনার বল্‌তে শুধু এক মা ছিলেন, তাদের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না কিন্তু তা হলে কি হয় ছেলেটীকে বাবার বড় পছন্দ হয়েছিল। শুধু কি বাবার পছন্দে হল আমার বরাতে ছিল তাই না। ভাগ্যের লেখা কে মুছে দেব বল। কপালে আমার অনন্ত দুঃখ, তাই না বাবার তখন পছন্দ হয়েছিল। বিয়ের পর বাবা তাঁর পড়ার সমস্ত খরচ দিতেন। আই এস-সি পাশ ক'রবার পর স্বামীর আমার বিলাত যাবার ইচ্ছা হ'ল। একদিন তিনি রাতে আমায় ধরে বসলেন। পরের দিন বাবাকে সমস্ত বল্লুম। বাবা তখনি রাজী

হলেন। তারপর আমার বিয়ের দেড় বছর পরে স্বামী বিলাত গেলেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়্‌তে, আমার নরেনদাও সেই সঙ্গে ডাক্তারী পড়্‌তে যান। স্বামী যখন বিলাত যান, অর্ঘ্য তখন ছমাস পেটে।

প্রথম বছর তিনি বেশ ভাল ভাবেই সেখানে কাটিয়ে ছিলেন। প্রতি মেলেই আমায় চিঠি দিতেন, তার পর হঠাৎ ধীরে ধীরে চিঠি বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো নরেনদাকে আমি প্রায়ই চিঠি দিতাম তিনিও আমায় তার ঠিক মত উত্তর দিতেন, কিন্তু ওর কোন চিঠি আর পেতাম না, ভাবতাম হয়তো পড়ার জন্যে ব্যস্ত তাই বোধ হয় চিঠি দেবার সময় হয় না। এমনি ভাবে ছমাস কেটে গেল তারপর নরেনদা একদিন বাবাকে চিঠি লিখ্‌লেন "দেবেন এখানে বড্ড বাড়িয়ে উঠেছে। আজ কাল প্রায়ই বাড়ী আসে না যদিও বা আসে তাও সঠিক অবস্থায় নয়। আর তার পড়া শুনাও তেমন কিছু হচ্ছে না এবার পরীক্ষায় সে ফেল হয়েছে। প্রথমটা বাবা কিছু বল্লেন না, স্বামীকে আমার খুব শক্ত করে একটা চিঠি দিলেন। এরপরই নরেনদা ডাক্তারী পাশ দিয়ে দেশে ফিরে এলেন কিন্তু তিনি এলেন না। তিনি নাকি তখনও সেখানে থেকে পড়বেন। নরেনদার মুখে যা শুনলুম তাতে বড় ভয় হ'ল আমার। বাবা খুব রেগে গেলেন তারপর থেকেই তিনি তার খরচ পাঠানো ও বন্ধ করে দিলেন। ঠিক একটী বছর পরে এবার স্বামী আমায় চিঠি দিলেন যে তিনি টাকা অভাবে খেতে পাচ্ছেন না। না খেয়ে বোধ হয় তাঁকে বিদেশে মর্‌তে হবে। তিনি আরও লিখেছিলেন "মাধবী তুমিও কি আমার উপর বিরূপ। এখানে যদি আজ অনাহারে মরি তবে তুমি আমাদের ছবিকে কি বল্‌বে—যখন সে তোমায় বল্‌বে ই। মা আমার বাবা' কোথায়? তারপর যখন সে বড় হয়ে জানতে পার্‌বে তার বাবা অনাহারে বিদেশে মারা গেছে তখন তুমি তারে কি প্রবোধ দেবে?" চিঠি পেয়ে আমার বুকের দ্বারে কে যেন হাতুড়ীর আঘাত কর্ত্তে লাগলো। বুকের মাঝে এতদিন যে অভিমান জমা হয়ে ছিল আজ তা ধুয়ে মুছে গেল নিমিষে। হাজার হ'ক নারীর প্রাণতো। তিনি আমার স্বামী, ইহকাল পরকালের দেবতা। কি করি নিজের কিছু গহনা লুকিয়ে বিক্রী করে তাঁকে পাঠিয়ে দিলুম। তারপর মাস দুই তিনি আমায় বেশ ঠিক ঠিক চিঠি দিয়ে ছিলেন তাতে ছবির কথাই প্রায় বেশী থাকতো। শেষে আমায় একবার লিখ্‌লেন তাঁর চার হাজার টাকা দরকার। এখানে তিনি একটা কাজ পেয়েছেন সেই কাজ নিয়েই তিনি দেশে ফিরে আস্‌ছেন। টাকা অভাবে হয়ত বা তাঁর দেশে ফিরে আসা অসম্ভব হবে। কি করি ভবিষ্যতে সুখের আশায় এবার নিজের বলতে যা কিছু ছিল সমস্ত বিক্রি করে এমন কি মায়ের সিন্দুক থেকে লুকিয়ে টাকা নিয়ে তাঁকে টাকা পাঠিয়ে দিলুম কিন্তু হায় রে নারীর বুকে ভবিষ্যৎ সুখের আশা! আমার এতদিনের বুক-ভরা আশা ভরসা নিমিষে আষাঢ়ের জলভরা মেঘের বুকে বিজলী চমকের মত ক্ষণিক হেসেই মিলিয়ে গেল। স্বপনেও যার সুর একবারও আমার মনের তারে বাজেনি, আজ যেন সেই সুরই আমার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে উঠলো বেজে। তিন বছর পরে দেশে ফিরে এসে তিনি আমা-দের বাড়ীতে ওঠা ত দূরের কথা একদিন ও তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এলেন না। দাদারা তাঁকে ষ্টেশন থেকে আন্‌তে গিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে তিনি ভাল রকম কথাই বলেন নি। বড় আশা বুকে বেঁধে রেখেছিলুম কিন্তু হায় হায় আমার সমস্ত আশা ধূলায় লুটিয়ে গেল। তার আসার দুদিন পরে আমি নিজেই একদিন তার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেলাম ছবিকে নিয়ে। আমাকে দেখে বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন যেন চিনতেই পারলেন না—এমনিতর ভাব। আমি তখন ছবিকে তাঁর কাছে এগিয়ে দিয়ে বল্লুম একে হয়ত তুমি চিন্‌তে পার্‌ছ না এই আমাদের ছবি। এবার তিনি গম্ভীর হয়ে বল্লেন "তাই নাকি? আমি ভেবেছিলুম বোধহয় নরেন বাবুর মেয়ে। তার মতই ঠিক দেখতে হয়েছে।" তাঁর কথায় আমি হেসে বলেছিলুম "তুমি কি গো, তোমার কি একটু আটকায় না যা তা বল্‌তে।" কে জানতো যে আমার কলঙ্কের বোঝা আমার জন্যে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। আমার কথায় তিনি কোন কথা না বলেই তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেলেন শুধু যাবার

সময় আমার শাশুড়ীকে বলে গেলেন "মা ওদের যেতে বলো" এখানে যেন না থাকে।" কথাগুলো আমার বুকে তীরের মত এসে বাজলো। সেখানে আর দাঁড়াবার ক্ষমতা রইলো না আমার। ছবিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে সেখানে কিছুক্ষণ বসে রইলুম, পথে আসার সময় ছবি বল্লে "হাঁ মা বাবা তো আমায় কিছুটী বল্লে না কোলে নিলে না।" আমি তার মুখে চুমো দিয়ে বল্লুম "আজ আফিসে গেছেন। কাল থাবেন।"

এরপর একমাস পরে একদিন পাশের ঘর থেকে শুনলুম মা যেন বাবাকে বল্‌ছেন হ্যাঁ গা দেবেন কি মাধবীকে নিয়ে যাবেনা তার মতলব কি বলত? বাবা বেশ গম্ভীর ভাবে বল্লেন "কেন আমার মেয়ে কি জলে পড়ে আছে? সে বলেছে তার সুবিধা হলেই সে তার স্ত্রী মেয়ে নিয়ে যাবে।" যাক্ সেদিনকার কথা শুনে আমার প্রাণ আনন্দে নেচে উঠেছিল কিন্তু এত আনন্দ যে বলতে ছিল না। এর দুদিন পরে আমি আবার যেতেই তিনি বলে বসলেন "দেখ তুমি মিছামিছি আসা যাওয়া করছো আমি তোমায় নিতে পারবো না।" তাঁর কথা শুনে আমি কিছু বুঝতে পার্‌লুম না, আমার মাথার ভিতর যেন কি রকম হয়ে গেল। তারপর নিজে সামলে নিয়ে বল্লুম "তুমি যে কি বল আমি বুঝতে পারি না।" এবার তিনি বিদ্রূপের হাসি হেসে বল্লেন "তা আমার কথা বুঝতে পারবে কেন নরেন বাবুর কথা তো বেশ বুঝতে পার। তার কাছে বুঝি আর ঠাঁই হ'ল না? তা আমি তোমায় জায়গা দিতে পারি না। যাও আর আমায় রাগিয়ো না।" বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর আমি চুপ করে বসে রইলুম। চোখে আমার এক ফোঁটা জলও এলো না। তারপর আস্তে আস্তে উঠে এলুম ভাবলুম একি সত্যি না আমি স্বপ্ন দেখছি। বাড়ী যেতে মা বল্লেন "হ্যাঁ রে এরই মধ্যে চলে এলি।" আমি শুধু বল্লুম "কেউ বাড়ীতে ছিল না মা।"

* * * *

এর পর ফের একদিন তাঁর কাছে গেলুম। সেদিন রবিবার ছিল, বাড়ী ঢুকতেই আমার শাশুড়ী তাড়াতাড়ি এসে বল্লেন "তুমি আর কেন আস্‌ছ মা, দেবেন ত আর তোমায় নিতে পার্‌বে না, আর সত্যি কথা জেনে শুনে তোমায় আর কি করে ঘরে ঠাঁই দিই বল? তাই বল্‌ছি তুমি আর বাছা এসনা। শাশুড়ীর কথা গুলো আমার কাণে গরম শিশার মত পড়তে লাগলো ছবিকে বুকের মধ্যে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে যেমন তাঁর ঘরে ঢুকতে যাব অমনি তিনি হিংস্র ব্যাঘ্রের মত আমার সামনে ছুটে এসে বল্লেন "ফের তুমি জালাতে এসেছ। ভাল কথা বল্‌ছি তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও তা না হলে চাকর দিয়ে বার করে দোব।" আমার মাথার তখন ঠিক ছিলনা আমিও সমানে বল্লাম "কি অপরাধে।" হঠাৎ তিনি আমায় সজোরে একটা লাথি মেরে বল্লেন "তোমার অপরাধ যে কি তা আর বল্‌বো না তবে তুমি যে——?" সে লাথির ধাক্কা আমি সামলাতে পার্‌লুম না, ছবি আমার বুকের মধ্যে তাকে নিয়ে ঠিকরে দূরে পড়ে গেলুম আর সেও ভয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। চাকর বাকর সবাই ছুটে এল, নিজেকে তাড়াতাড়ি মাটী থেকে তুলে নিয়ে অর্ঘ্যকে বুকে চেপে বাড়ীতে ফিরে এলুম। এবার অর্ঘ্য আমার গলাটী জড়িয়ে ধরে বল্লে "মা বাবাটা বড্ড দুষ্টু, তুমি আর ওর কাছে যেও না।"

সেইদিন থেকে সমস্ত হিসাব নিকাশ চুকিয়ে দিয়ে আমি এই যক্ষ্মা-নিবাস খুলেছি। নরেনদা তার তার জীবন দিয়ে এদের চিকিৎসা করছে।" সমস্ত কিছুদিন পরে নরেনদা বল্লেন "মাধবী শুনেছিস্, দেবেনটা এত-দিন পরে এবার লুকিয়ে বিয়ে করেছে তাও আবার আমার এক বন্ধুর বোনকে। এর আগে জান্‌লে কি বিয়ে হতে দিতুম।"

* * * *

ব্যাস আর কিছু লেখা নেই। পড়া শেষ হতেই আমি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার স্বামীকে বল্লুম "আচ্ছা তুমি মাধবীকে চিনতে।" তিনি বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন "কই না মনে ত পড়ে না।" আমি কিন্তু নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলুম না, খাতা খানা সজোরে তার মুখের উপর ছুড়ে মেরে বল্লুম "কাপুরুষ লজ্জা করে না তোমার? একটা নিরীহ নারীর সারা জীবনটা মিছা কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে ব্যর্থ করে দিয়েছ। আবার দুদিন পরে হয়ত আমারও ঐ দশা করে দেবে" বলেই আমি ছুটে চলে গেলুম মাধবীর কাছে, মাধবীর বুকের উপর পড়ে বল্লুম "ভাই মাধবী তুই আমাকে তোর আশ্রমে একটু জায়গা দে। যে তোর সর্ব্বনাশ করেছিল সেই বর্ব্বরটাই আমাকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু আজ তার কাছ থেকে সরে এসেছি তোর কাছে।" এমন সময় নরেনদা ঘরে এসে আমাকে দেখে বল্লে "একি বীণা, তুমি এখানে।" মাধবীর চোখের জল তখন আমার মুখের উপর শ্রাবণের ধারার মত ঝরে পড়ছিল।
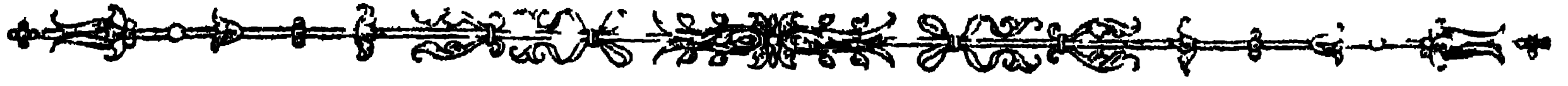
জেমসেদপুর সান্নিধ্যে

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ বৎসর পূর্ব্বে কয়জন ভেবেছিলেন যে পার্ব্বত্য ছোটনাগপুরের গভীর বনচ্ছায়ে স্নিগ্ধ স্বচ্ছ সুবর্ণরেখা তটে ভারতের বিজ্ঞান শিল্পোদ্যানের শ্রেষ্ঠ লীলা নিকেতন রূপে জেমসেদপুর আজ বিশ্ববিখ্যাত হ'য়ে এইস্থানে বিরাজ ক'রবে। গভীর অরণ্য আজ বর্দ্ধিষ্ণু লোকালয়। মানুষ সামাজিক জীব, তাই তার কতকগুলি জিনিষ অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাই আজ জেমসেদপুর নৃত্য পুলক গীতি মুখর। কঠোর দিনের কর্ম্ম অন্তে মানুষ আরও কিছু চায়—তার জীবনকে সাধনার পথে অগ্রসর করা তার অন্যতম প্রধান। সে পথের প্রধান সম্বল জ্ঞান—যা হ'তে তার আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক, —এক কথায় তার জাতীয় জীবনের স্ফুরণ স্পষ্ট প্রতীয়মান। সে জ্ঞানের ধারার জন্য মানুষকে অপেক্ষা করতে হয় সাহিত্যের দুয়ারে। তাই সাহিত্য মানুষের প্রাণ, জাতির প্রাণ, সমগ্র জগতের প্রাণ। যেখানেই সভ্যতার সমাবেশ, সাহিত্যের সমাবেশও সেখানে হ'বেই হবে।

সর্ব্বজাতি সমন্বিত হলেও জেমসেদপুর বাঙালী-প্রধান। বাংলার সাহিত্য আজ বিশ্বসভায় আদৃত। বাংলার ভাষা আজ চারিদিকে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়ে তুলছে। তার সুমধুর বাণীর ভাব-জ্যোছনায় বিশ্ব আজ প্লাবিত। যেখানে একজনও বাঙালী আছেন, সেখানে তো বটেই; পরন্তু বহু অ-বাঙালী স্থানও আজ বাংলা ভাষার অনুশীলনে ব্যাপৃত। সুতরাং আমাদের এই অবাঙালী প্রধান জেমসেদপুর যে বাংলা ভাষা অনুশীলনে মনোনিবেশ ক'রবে ইহা স্বতঃই স্বাভাবিক।

এই অনুশীলনের প্রবাহে এখানকার সাহিত্যসভা মাঝে মাঝে সাহিত্য রথীগণের শরণাপন্ন হন, এবং তাঁহারাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক এখানে এসে, এই পাহাড় ঘেরা সহরটীকে সাহিত্যের দুন্দুভিনাদে প্রতিধ্বনিত ক'রে তোলেন। সেদিন যখন এমনি কিছু উপলক্ষ্য ক'রে রায় বাহাদুর জলধর দাদা, চারুদা, ও বিদ্যাভূষণদা (শ্রীযুত চারুচন্দ্র মিত্র ও অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ) জেমসেদপুরে, এ দীনের কুটীরে, এখানকার সবাইকে নিয়ে মহা জটলা
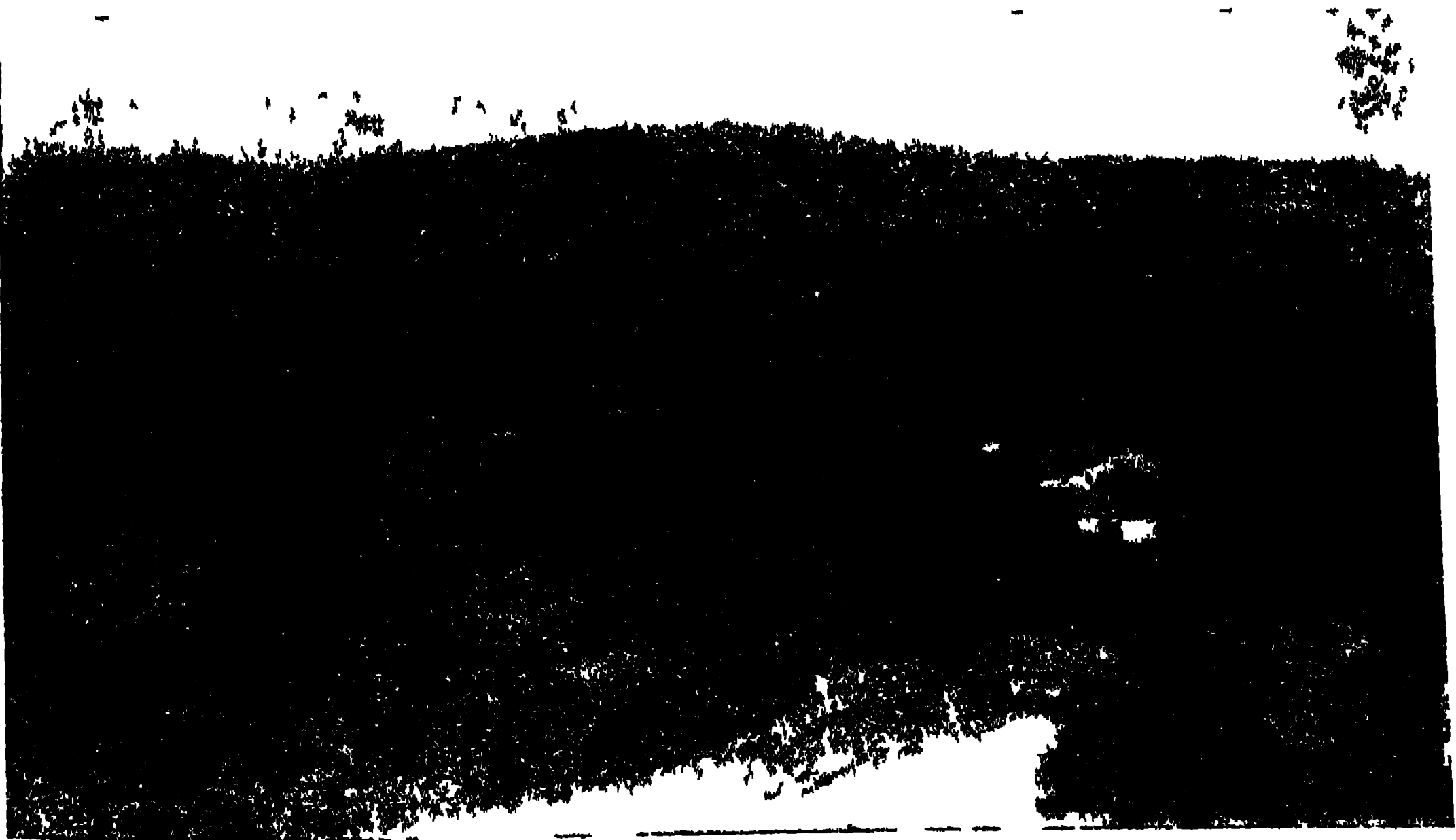
দলমা পাহাড়ের দৃশ্য। [মিসেস জোনসের গৃহীত আলোকচিত্র হইতে।

আরম্ভ করে দিয়েছেন তখন এখানকার কর্ম্মী পুরুষ সত্যেশদা (শ্রীযুত সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়) প্রস্তাব ক'বলেন যে সকলে মিলে "দলমায" যাওয়া যাক্। যেমন কথা তেমনি কাজ। অভিযানে সঙ্গীব অভাব হ'লোনা। হ'তেও পারে না, কাবণ অমন তিন মহাবথীব নাম শুনলে কোন্ কাপুরুষ আব যাওয়ার লোভসংবরণ ক'ববে?

দলমা যাত্রার জল্পনা

ঠিক হ'লো ভোব ৫৷৷-টায় আমাদেব মোটর রথ জলধরদাব পুত্র শ্রীমান্ অজয়কুমাবেব বাসা থেকে যাত্রা ক'রবে। আপনারা হয়তো মনে ক'রবেন—এখানে সেই মোটর। প্রকৃতির এমন সব প্রধান দানের সৌন্দর্য কি আর মোটর রথে উপভোগ করা যায়। ঠিক কথা দ্রুত গমন ছাড়া আব কিছু,—যথা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ, মোটব যানে সম্ভবপব নয়। তা ছাড়া মোট ভ্রমণ আমাদেব পক্ষে শোভনীয়ও নয়, ও "দলমা" ভ্রমে প্রযোজ্যও নয়। কারণ "দলমা" হচ্ছেন জেমসেদপুরে সমীপবর্ত্তী একটী প্রকাণ্ড পাহাড। প্রায় ৩৫০০ফুট উঁ অর্থাৎ দার্জ্জিলিংএর থরমাং নামক স্থানের প্রায় সমা উঁচু। আব আবহাওয়াও প্রায় ঠিক সেই বকম।

দলমাব পথে। [শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত।
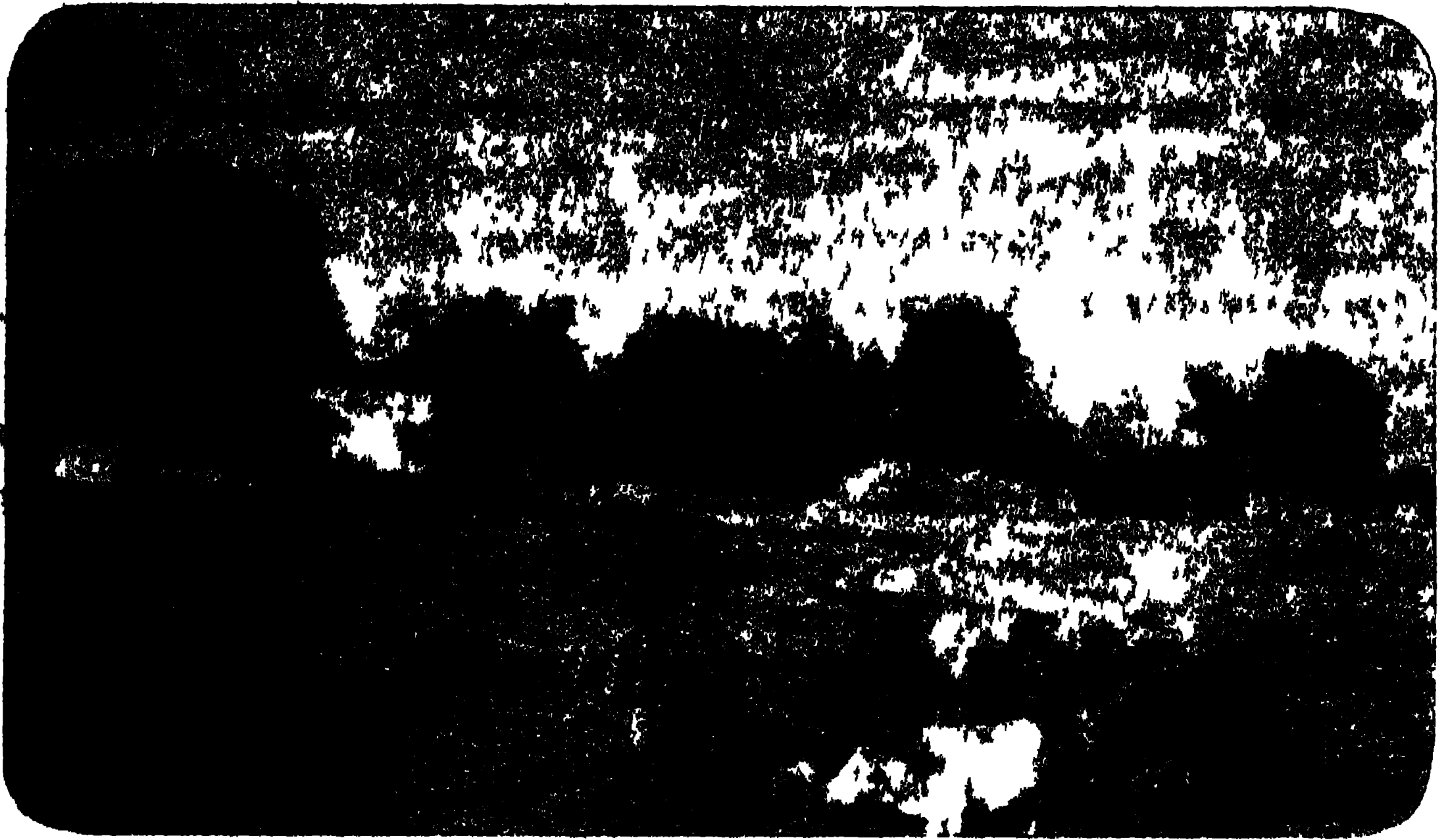
"দলমা" যেতে হ'লে আমাদেব এ সহব থেকে মাইল দু'আডাই বা তিনেক গিয়েই সুবর্ণবেখা পার হ'তে হয়। তারপব দু'একখানি এদেশীয় আদিম গ্রাম, মাঠ, জঙ্গল, পাহাড়েব পথ। মোট প্রায় মাইল ছয়েক দূরে বিরাট বপু প্রাচীন পাষাণ দলমা অতীতের কত প্রাচীন কাহিনী, কত নিদর্শন ও অতীত ও বর্ত্তমানের এই সন্ধিক্ষণের অনন্তভাব্য রাশি রাশি পরিবর্ত্তন তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে বেখে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান।

প্রথমে ব্যবস্থা হয়েছিল যে সুবর্ণবেখাব এদিকেব পথটুকু মোটবে গিয়ে ওপার থেকে জলধরদা গো-রথে ও আমরা পা-বথে অগ্রসর হব ও পাহাড়ের সানুদেশে পৌঁছ সবাই পায়েব উপর ভর ক'বে পাহাড়-চড়া আরম্ভ করবে কিন্তু দাদা শেষে বলে বসলেন "ওহে হিমালয়েব আমি এখন আর নেই, আমাকে বাদ দাও।" অনে যুক্তি-তর্কে তাঁর কথাই থাকলো। সুতরাং হিমাল অভিযানকারী জলধরদা আমাদেব এই দলমা-অভিযানে প্রকাণ্ড কৃতিত্বের একটু অংশও পেলেন না, সবই বরাত।

দলমার বাঘ ভালুক-হাতী-প্রমুখ বন্যজন্তুর একটও
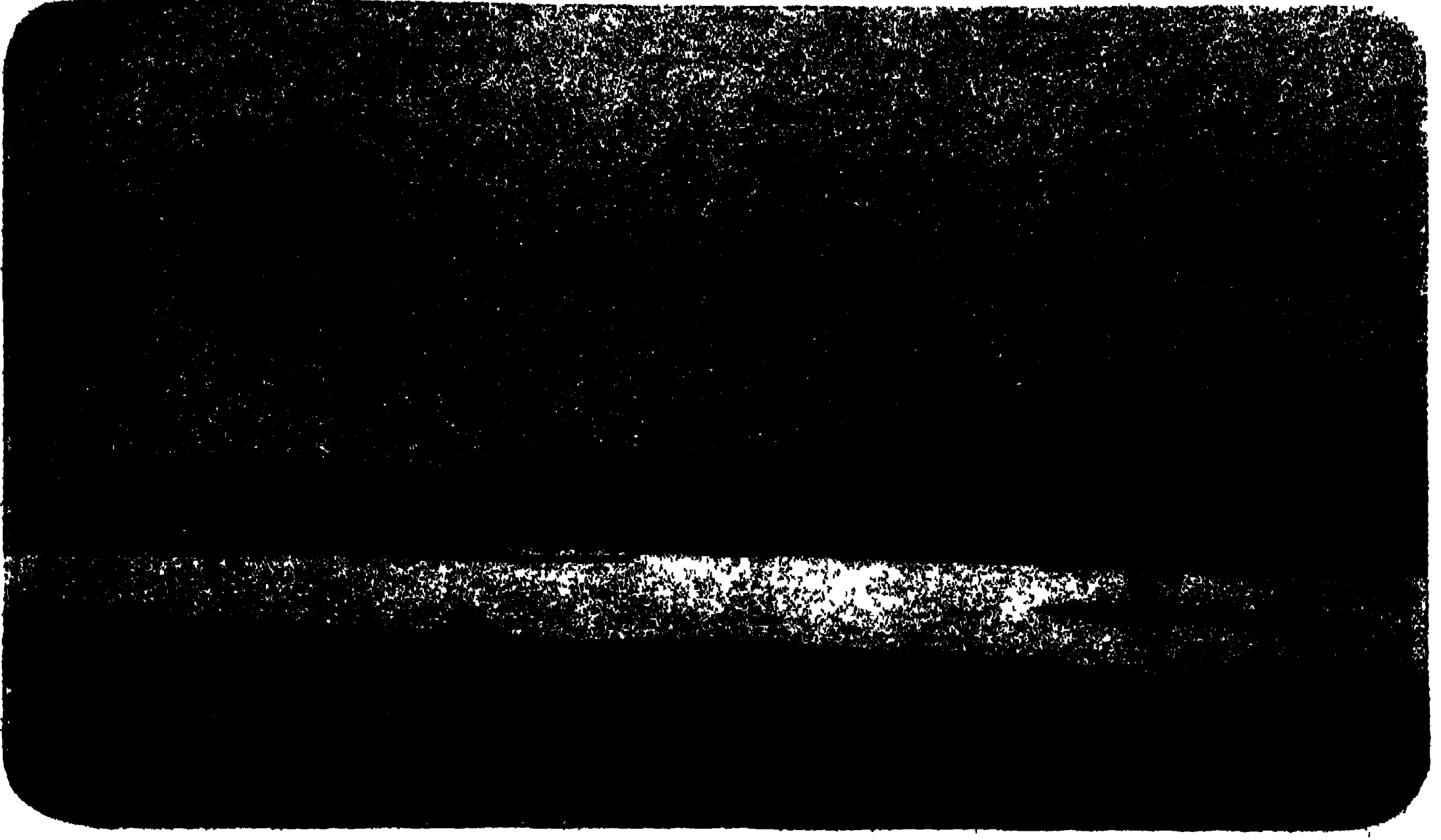
সুবর্ণরেখা হইতে দলমা [শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত।

অসম্ভব নাই, ময়ূর প্রভৃতি শিকারও অনেক। তাই একজন শিকারীর তল্লাস করা গেল, অনেক খোঁজ খবর ক'রে টেলিফোনের সাহায্যে সব রকম বন্দোবস্ত করে ঠিক হ'লো যে, তিনি সুবর্ণরেখাতটে আমাদের সঙ্গে অথবা সত্যেশদার বাসায় তাঁদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে পরে আমাদের সঙ্গ নেবেন।

সুবর্ণরেখার পরপারের শালের ডোঙ্গা [শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত।

সুবর্ণরেখার সাধারণ দৃশ্য [শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত।

পথের কথা

অভিযান তিনভাগে বিভক্ত হ'যে যাত্রা করলো। প্রথমদল মোটরে শ্রীমান অজয়কুমারের বাসা থেকে রওনা হ'লেন। তখন কেবল ভোর হচ্ছে। মোটরে আশ্রয় নিলেন প্রথম বিদ্যাভূষণ মহাশয়, তারপর চারুদা, তারপর বন্ধুবর স্থানীয় সতীশ দাস ও পরে এই অধম লেখক স্বয়ং। শীতের ভোর, ঠকঠকে কাঁপুনির সঙ্গে কনকনে হাওয়ায় মোটর ভোঁ ভোঁ করে ছুটতেই, টাটার কারখানার বিকট ভোঁ দুমিনিট ধরে বেজে জেমসেদপুরে প্রভাত ঘোষণা ক'রে ডিউটীওয়ালের মধ্যে সাজ সাজ সাড়া তুলে দিল। একদিন প্রভাত হতেই শ্যামের বাঁশীর আহ্বানে গোপিনীরা যে যেখানে থাকতো সে সেখানে থেকেই বাঁশীর আওয়াজ অনুমান করে ছুটে সেই বংশীবাদকের কাছে সমাগত হতো অথবা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বলতো "ওগো তোরা জানিস যদি, পথ বলে দে, আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে। মরিলো মরি।"—আর আজ টাটার বাঁশীর আহ্বানেও যেন তেমনি সব উদভ্রান্ত "পড়ি কি মরি।" তবে এইটুকু তফাৎ যে ডাকের পর কাকেও পথ বলে দিবার জন্য জিজ্ঞেস করতে হয় না—সে পথ এমনি—মুখস্ত হয়ে গিয়েছে—চোখ বেঁধে দিলেও তা ভুল হবার যো নেই। তেলকালের প্রাণীটীর মত চোখ বেঁধে একজন ফটোগ্রাফারের শরণ না লইলে আজ আপনাদিগকে এ দলমা কাহিনীর ব্যাখ্যা করা বোধ হয় অসম্ভব হতো। বাইরে মাত্র দুজন আসছেন দেখেই আন্দাজ করলাম যে শিকারী পুলিনবাবুর তাহলে কোন সন্ধান মেলেনি।

সামনে সুবর্ণরেখা—তখন গভীরা না হলেও, ক্ষীণকায়া নহে, পার হবার কোন নৌকাও দেখা গেল না। চারুদা ও বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভেবেই আকুল, পার হবেন কি ক'রে। আমরা সব অবশ্য পাড়াগেঁয়ে লোক কাযেই ভয়ের কোন কারণ বুঝতে পারলাম না, বিশেষ আবার পদ্মার ধারে জীবনের অধিকাংশ দিন কাটিয়ে এসেছি। কয়েকজন আদিম কোল জাতীয়া স্ত্রীলোক এমন সময়ে হেঁটে নদী পার হয়ে সহরাভিমুখে যাচ্ছিল। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, "কোনখানে পার হলে" উদ্দেশ্য আমরাও সেইখানে পার হব। একজন মিতিন উত্তর দিল উ—ঠিনে অর্থাৎ ঐখানে। এখন এদেশে পুরুষ মাত্রেই "মিতা" (অর্থাৎ বন্ধু) এবং স্ত্রীলোকমাত্রেই "মিতিন"। যেমন বাংলা মুলুকে কাহাকেও সম্ভাষণ
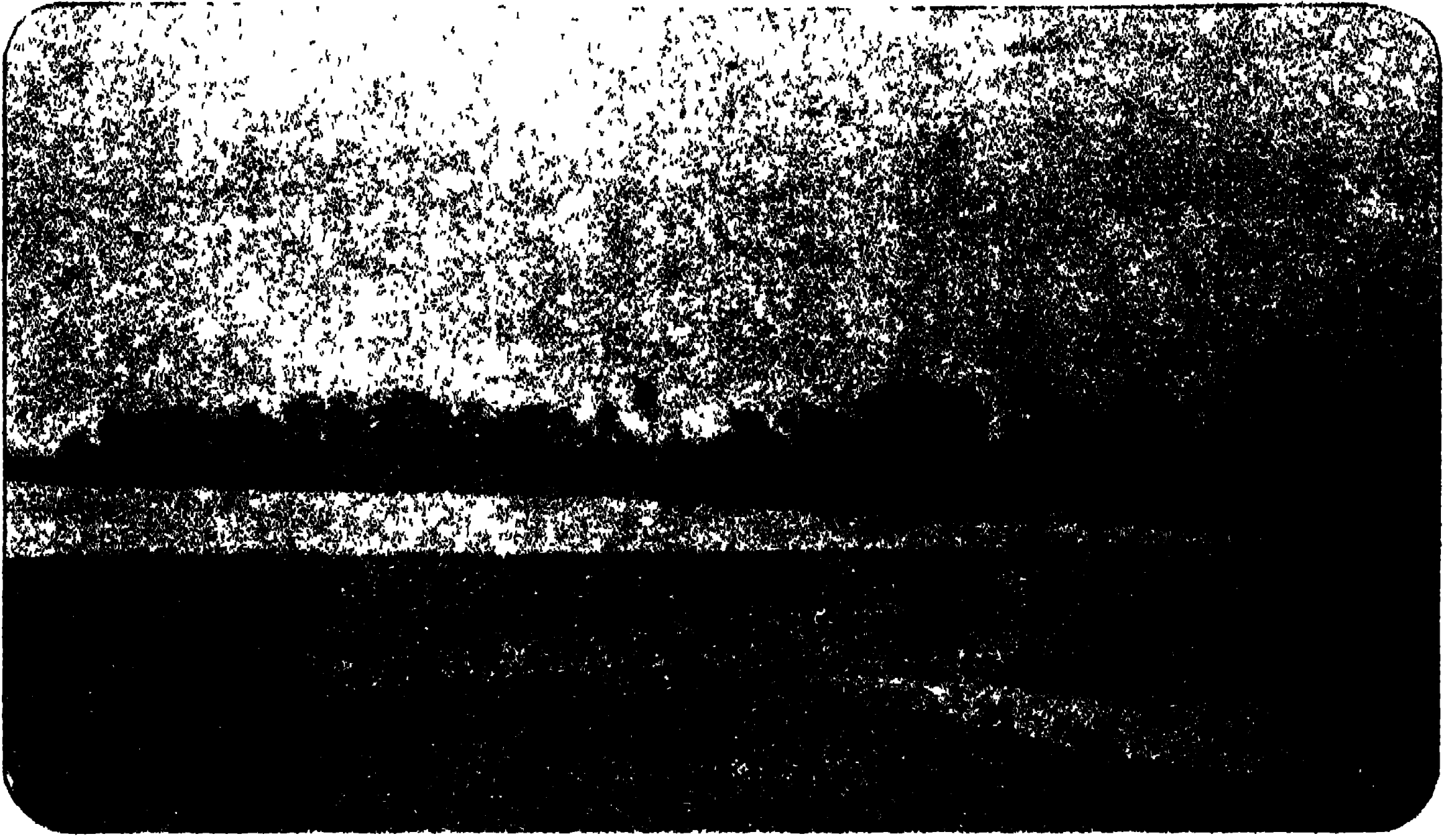
সুবর্ণরেখা বাঁধের একটী দৃশ্য [শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত।

করতে হলে সাধারণতঃ 'মশায়', কলিকাতায় সাধারণতঃ কাকেও সম্ভাষণ করতে হলে—'মশায়', 'কর্ত্তা, বাবা, বাছা,' ইত্যাদি, উত্তর 'বাহে' যথা "মুই আর কি কমু বাহে তোরাই কন" অথবা ··

"আগ (রাগ) করিয়া গ্যালেন বাহে একলা (টা) কথাতে,
তুই যদি না আসেন বাহে মুই যামু তোর বাসোতে
(বাসাতে)।"

আমরা জায়গাটা ঠিক করতে না পেরে আবার জিজ্ঞাসা করলাম 'কোন্ ঠিনে'। মিতিন 'উ' কথাটিকে আর একটু লম্বা করে বল্লে—উ ঠিনে। অর্থাৎ সে বলে খালাস, আমরা এখন বুঝে নিইগে কোন্খানে। চারুদার তখন প্রায় জলাতঙ্ক অবস্থা, তিনি খপ্ করে জিজ্ঞাসা করলেন—'জল কি বেশী হবে?'' মিতিন হেসে বল্লে—'জল কুথা তো, এতো টুকু হবেন' বলিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় উঠিয়ে দেখিয়ে দিল। চারুদার আতঙ্ক তখন আরও একটু বেশী। তিনি বল্লেন অ··ত। মিতিনরা সবাই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। অর্থাৎ কিনা—এরা সব বলে কি এইটুকু জলই অ···ত। একজন প্রকাশ্যে বল্ল—"এ ত টুক আর নাই হবেন। নদী···তো··· বটেন।" তারা বল্‌তে বল্‌তে চলে গেল, আমরাও খুব খানিকটা হেসে নিলাম। এমন সময় সত্যেশ দা'রা হাজির হয়ে আবার তাদের পাকড়াও করে জিজ্ঞাসা করলেন "জল কত রে?'' একজন মিতিন উত্তর দিল—"তর আর কি মিতা, গাড়ী···টা জলের উপর সে চালায় নিয়্যা যাবিক।

(ক্রমশঃ)
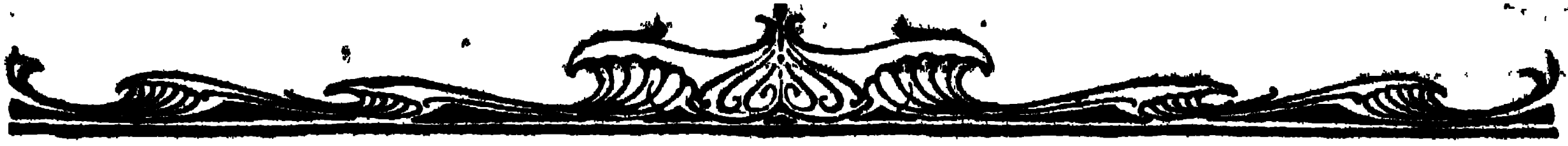
ভেজাল খাদ্য

শ্রীকমলহরি মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি নবযুগের সম্পাদক মহাশয় সহরে ভেজাল খাদ্যাদির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইয়াছি। বাস্তবিকই বঙ্গে অধুনা ভেজালের এতদূর চলন হইয়াছে যে অনেক দ্রব্যই এক্ষণে হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে ব্যবহার করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতায় হালফ্যাসনের বাবুভায়াদের কথা স্বতন্ত্র; কারণ তাঁহাদের "জাতির" কোনও বালাই নাই, সুতরাং জাতিপাতেরও আশঙ্কা নাই। অতিরিক্ত পাপ, বিলাসিতা ও ব্যভিচার পূর্ণ কলিকাতা সহর পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সুখ-শান্তি-পূর্ণ প্রকৃতির লীলানিকেতন সুদূর পল্লীগ্রামে গমন করিলে, এখনও বহু স্বধর্মানুরক্ত হিন্দু ও মুসলমান দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে হিন্দু মুসলমান একেবারে উৎসন্ন যায় নাই—এখনও তথায় হিন্দু ও মুসলমান ঈশ্বর আরাধনা না করিয়া জল গ্রহণ করে না—এখনও তথায় জাতিবিচার, খাদ্যাখাদ্য বিচার বর্ত্তমান আছে। সেই নিমিত্তই পল্লী-জননীর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সহরের বিলাস ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া বঙ্গীয় যুবক আর সহজে গ্রামে ফিরিয়া যাইতে চায় না।

বাঙ্গালীর খাদ্যের মধ্যে ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, ছানা, মাখন চিনি, আটা ময়দা ইত্যাদি দ্রব্যই প্রধান। এই সকল দ্রব্য আজকাল খাঁটী পাওয়া যায় না। যথোপযুক্ত মূল্য দিলেও অকৃত্রিম দ্রব্য পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। বাজারে ঘৃত ও তৈল বলিয়া যে জিনিষ বিক্রীত হইতেছে—তাহা কালকূট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাড়োয়ারী ভায়ারা সাধুচেতা, গঙ্গার ঘাটে হোম করিয়া হাজার হাজার টিন ঘৃত অগ্নিদেবকে উৎসর্গ করিয়া এক্ষণে পূর্ণ মাত্রায় তাহার প্রতিশোধ লইতেছেন। মিনারেল তৈল ও পাকড়া বীজের কল্যাণে বিনা খরচায় ডাক্তার বাবুদিগের দালালের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। এই ঘৃত ও তৈল হইতে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও নিত্য ব্যবহার্য্য নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে এবং বাঙ্গালী তাহা গলাধঃকরণ করিয়া ক্রমশঃ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, অজীর্ণ অম্ল, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি ব্যাধিগ্রস্থ হইতেছে এবং ৫০ বৎসরের ভিতরেই পৃথিবীর কাজ সারিয়া পরলোকে গমন করিতেছে। কলিকাতার মৃত্যু-তালিকা পাঠ করিয়া দেখুন, দেখিবেন যে অজীর্ণ রোগ হেতু বহু দুরারোগ্য ব্যাধি যথা রক্তপিত্ত, যক্ষা, ক্ষয়, হাঁপানী, অর্শ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হইয়া সহস্র সহস্র লোক প্রতিবৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। খাঁটি দুগ্ধের অভাবে ভেজাল দুগ্ধ পান করিয়া শত শত শিশু অকালে লিভার ও প্লীহাগ্রস্থ হইয়া শমন সদনে গমন করিতেছে। আর বিলাতী ফুডে কলিকাতার দোকান ভর্ত্তি হইয়া যাইতেছে। বাস্তবিকই ইহার কি কোন প্রতিকার নেই? দেশবন্ধু কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ণধার। তিনি প্রথমে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহার একটাও এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন বলিয়া তো মনে হয় না। সহর ও সহরতলী একেবারে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে এখনও সময় আছে, এখনও চেষ্টা করিলে এই ভেজাল সহজে বন্ধ করিতে পারা যায়। কলিকাতা এককালে ভারতের রাজধানী ছিল—কলিকাতায় বহু ধনকুবের বাস করেন —কলিকাতায় কর্ম্মবীরেরও অভাব নাই, আমরা এই কলিকাতার স্বাস্থ্যের কি কোনও উন্নতি দেখিতে পাইবার আশা করিতে পারিনা?

এই যে খুরজা ভাদোয়া পতিরাম মার্কা ঘৃত ইহাও একেবারে খাঁটী কি না সন্দেহ। বাজারের ঘৃত মাত্রেই বিশেষ অনিষ্টকর—একথা বলাই বাহুল্য। ঘৃত-ব্যবসায়ীগণ পয়সার লোভে বাঙ্গালীর ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিতেছে। কত মৃত গরু, ছাগল, শৃগাল, কুকুর, শূকর ও বিড়ালের চর্ব্বি ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃত-ব্যবসায়ীগণ আমাদের

স্বাস্থ্যহানি ও সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কলিকাতা ও সহরতলীর মিউনিসিপ্যালিটীর কল্যাণে আজকাল চর্ব্বি সহজেই সংগ্রহ হয়। কসাইখানার কোনও জিনিষই ফেলা যায় না। এমন কি গরুর রক্ত পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। এই রক্তে নানাবিধ সার প্রস্তুত করা হয়। বিজ্ঞানের উন্নতিতে আজ জগৎ উন্নত—এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে যখন আল্‌কাত্‌রা হইতে চিনি প্রস্তুত হয়—তখন কসাইখানার ছিট্‌ছাটই বা বাদ যাইবে কেন?

কেবল যে ঘৃতে মৃত জীবজন্তুর চর্ব্বি মিশ্রিত করা হয় এমন নহে। নেপালের জঙ্গল হইতে বড় বড় অজগর সর্প মারিয়া তাহাদের চর্ব্বি আমদানী করা হয় বলিয়াও একটা গুজব আছে। সাপের চর্ব্বি নাকি ঘৃতের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হয় এবং ঘৃতও ভাল দানাদার হয়, সুতরাং ইহা কতক পরিমাণে মিশ্রিত করিলে প্রচুর লাভ হইবারই কথা।

ব্যবসাদারের নিকট কিছুই পরিত্যক্ত হয় না। রেঙ্গুণে আজকাল নানাপ্রকার খনিজ তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলিকাতার দুইজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ ব্যবসায়ী এই তৈল আমদানী করিয়া থাকেন। এই সকল তৈলের রং প্রায়ই সাদা হয় এবং উহাতে কোনও প্রকার গন্ধ থাকে না। এই তৈল উল্টাডিঙ্গির তৈল-ব্যবসায়ীরা প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়া থাকে।

কলওয়ালারা এই প্রকার ভেজালের বড়ই পক্ষপাতী কারণ ইহাতে ব্যয় অল্প অথচ প্রচুর লাভ হয়। খনিজ তৈল এই প্রকারে সরিষা ও নারিকেল তৈলে এবং ঘৃতে মিশ্রিত হইতেছে। অনেক কেশ-তৈলও এই খনিজ তৈলে প্রস্তুত হয়। মাখনও বাদ যায় না। পচা কলা প্রভৃতি নানাবিধ ভেজাল মাখনে দেওয়া হয়।

ময়দা আটা প্রভৃতিতেও ভেজাল চলিতেছে। সাদা পাথর (Soap Stone) চূর্ণ আজকাল আটার প্রধান উপাদান। আমের আঁটির ভিতর একপ্রকার শ্বেতবর্ণের শস্য পাওয়া যায়। তাহা চূর্ণ করিয়া ময়দায় মিশ্রিত করা হয়। আঁটি অতি সহজেই এই ভেজাল ময়দা ও আটার সহিত মিশ্রিত হয়।

এখন কথা হইতেছে যে, খদ্দর প্রচলন করা যেমন আবশ্যক তেমনি খাদ্য বিভ্রাটের একটা মীমাংসা হওয়াও আশু আবশ্যক। আমরা জানি সুভাষ বাবু যখন চীফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন তখন তাঁহাকে এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল, বোধহয় এতদিনে তাহার নিকট হইতে আমরা অনেক কাজ পাইতে পারিতাম। মিউনিসিপ্যালিটীর মোটা বেতন প্রাপ্ত অনেক খাদ্য পরীক্ষক আছেন। কিন্তু তাঁহারা কি যথার্থই স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন? গবর্ণমেণ্টও এই বিষয়ে উদাসীন। কারণ ইংরাজের ঘৃত ও তৈলের দরকার হয় না, সুতরাং অনাবশ্যক বিষয়ে তাঁহারা মনোযোগ দেন না।

মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে যে বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও মাখন পাওয়া যায় বঙ্গদেশের কুত্রাপি ঐ প্রকার বিশুদ্ধ জিনিষ পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আমাদের কোন ইংরাজ বন্ধু সেদিন বলিতেছিলেন যে "এদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিবার শক্তি কি একেবারেই লোপ পাইয়াছে? নিজের ও পরিবার বর্গের অমূল্য জীবনের প্রতি তাহারা এত উদাসীন, যে তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। ধর্ম্মের নামে—ধর্ম্মরক্ষার্থ যাহারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে দ্বিধা বোধ করে না বলিয়া এতদিন আমার বিশ্বাস ছিল, এখন দেখিতেছি যে তাহারাই ধর্ম্মকে পদদলিত করিয়া নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে।"

পাঠক! দেখিলেন, একজন সহৃদয় ইংরাজ আমাদের উপর কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। মানব জন্ম শ্রেষ্ঠ ও দুর্লভ। ভগবান আপনার আদর্শ লইয়া মানব সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই দুর্লভ মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহারা মানবের কর্ত্তব্যকার্য্যে উদাসীন থাকে, তাহাদের উপর কি কখনও বিধাতার করুণা ও আশীষ বর্ষিত হয়!

বাস্তবিকই কি বাঙ্গালীর আর বাঁচিয়া থাকিবার দরকার নাই? বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া বাঙ্গালীর পৃথিবী-ব্যাপী খ্যাতি আছে—কিন্তু এই যে ভেজাল খাদ্য বাঙ্গালী মুখ বুঝিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে—ইহাতে কি বুঝিব বাঙ্গালীর ধর্ম্ম নাই—বিবেক নাই—হিতাহিত জ্ঞান ও নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার প্রবৃত্তি নাই—তাই জগতে সুস্থদেহে বাস করার পরিবর্ত্তে পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে অকাল মৃত্যুকে তাহারা বরণ করিয়া লইতেছে।

গো-রক্ষা

নিখিল ভারত গো-রক্ষণী সভার দায়িত্ব গ্রহণ আমার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে কিনা জানি না, তবে এইটুকু জানি যে, আমি উহা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভীত, কম্পিত-চিত্তে গ্রহণ করিয়াছি। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে ব্রতী হওয়ার মত উপযুক্ত সামর্থ্য আমার নাই বলিলেই হয়। তবে আমি এর গলদ কোথায় তা জানি এবং তাহার উপায়ও জানি কিন্তু আমার অভিপ্রেত উপায়কে কার্য্যে পরিণত করার মত সময় আমার নাই, জনবলও নাই।

গো-রক্ষার অর্থ আমার নিকট ব্যাপক, কেবলমাত্র গবাদির রক্ষণই নয় ইহার অর্থ জগতের যাবতীয় দুর্বল ও অসহায়ের রক্ষণ। তবে আপাততঃ ইহা প্রধানতঃ গো মহিষাদিকে নিষ্ঠুরতা ও হত্যা হইতে রক্ষা অর্থেই প্রযুক্ত হইবে। ভারতের ত্রিশকোটি লোকের গো-রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ এতৎসত্ত্বেও ভারতের গো-জাতি পীড়িত, অত্যাচারিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত, দেশের পক্ষে যেন দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ। অকালে দুগ্ধাভাব হেতু গাভীরা বধ্যভূমিতে নীত হয়, এ দৃষ্টান্ত কেবল এই দুর্ভাগা দেশেই দৃষ্ট হয়।

গো-রক্ষিণী সভা প্রতিষ্ঠা করিলেই এই সব অনাচার নিবারিত হয় না কারণ অধিকাংশ সভ্যই কার্য্যের সঠিক তাৎপর্য্য গ্রহণে অক্ষম। মুসলমানের সহিত বিরোধেও ইহার নিবৃত্তি নাই। গো-রক্ষার সহিত অর্থ-বিজ্ঞান ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, তাহার আলোচনা প্রথম আবশ্যক। যাহাতে গো-পালনে আর্থিক লাভ হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা প্রথম কর্ত্তব্য। ইহাতে যদি কৃতকার্য্য হইতে পারি আর সব স্বতঃই ইহার অনুবর্ত্তী হইবে। এ দরিদ্র দেশের গো-পালন যাহাতে আর্থিক ভার না হয়—তাহার উপায় করিতে অক্ষম হইল গো-হত্যা নিবারণ করা দুঃসাধ্য। সমস্যাটী স্থির চিত্তে সমাধানে অগ্রসর হওয়াই উচিত, উত্তেজনার সৃষ্টি করিলে তাহা নিষ্ফল হইবে সন্দেহ নাই।

যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ন্যায ও সত্যের উপর নয় তাহা অর্থশূন্য কল্পনামাত্র, নিশ্চিযতায় তাহার লয়। জ্ঞানই মুক্তি, গো ভক্তি যদি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তাহার ফল বিষময়। গোহত্যার পথ প্রশস্ত করার ইহা অপেক্ষা আর সহজ উপায় নাই। একজন মাত্র গো সমস্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা যাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে তাহা অনেক সভ্যদ্বারা হওয়া দুষ্কর। নিখিল ভারত সভার উদ্দেশ্য এইরূপ উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করা, যাহারা প্রাণপণে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিবে। এই কার্য্যের একজন তত্ত্বাবধায়ক ও কোষাধ্যক্ষ আবশ্যক। ইতিমধ্যে কার্য্য আরম্ভের জন্য উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী হইতে একটি অস্থায়ী কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি, একজন কোষাধ্যক্ষ ও একজন তত্ত্বাবধায়ক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—এই সমিতিকে ভারতের মুখপাত্রস্বরূপ বলিয়া গণ্য করা যায় না—উক্ত সমিতি তিনমাসের মধ্যে বারশত সভ্য সংগ্রহ করিবেন—সমস্ত প্রদেশেরই সভ্য আবশ্যক। যাঁহারা এবিষয়ে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক তাঁহার অস্থায়ী কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রেওয়া শঙ্কর জাভেরীর (জাভেরী-বাজার, বোম্বে) নিকট বাৎসরিক চাঁদা ৫৲ টাকা কিম্বা মাসিক ২০০০গজ চরকার সূতা প্রেরণ করুন।

ফরিদপুর

(নাটিকা)

স্বা-হীন অকর্ম্মা অঘাচাযা বর্ণিত ও শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ।

স্থান—ডেলিগেটদের বাসা বাটী।

কাল—বেলা ৮টা।

দেশোদ্ধারকারীগণ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) মা গো মা বঙ্গমাতা, তুমি আমাদের ক্ষমা কর মা, তোমার কাজে জীবন উৎসর্গ করিতেই আসিয়াছিলাম কিন্তু মা গো মা অন্তর্যামিনী, তুমিত সকলই জান মা, সকাল সন্ধ্যায় এক পেয়ালা চা ভিন্ন তোমার সন্তানদের যে প্রাণ বাহির হইয়া যায় মা। তুমি মা, তোমার কাছে অজানা কিছুই নাই মা, "চা' যে অনেক দিনের অভ্যাস জননী। ক্ষুধার জ্বালায় যখন আর কিছুই জোটে না মা, তখন এক পেয়ালা 'চা' হইলেই ক্ষুধা তৃষ্ণা জুড়াইয়া যায় মা। তুমি স্বর্ণপ্রসূ, সুজলা সুফলা শ্যামলা মা আমাদের, তবুও তোমার সন্তান আমরা কখনও পেট পুরিয়া জল, ফল কিছুই খাইতে পাই না, তাই ত সমস্ত দুঃখের, সর্ব্বশোক-হর, রোগহর, ক্ষুধাহর, "চা' অভ্যাস করিয়া লইতে হইয়াছে। তুমিত জান মা, তোমার সন্তানরা গালি-গালাজ, জুতার গুঁতা আর চা—এই তিনেই বাঁচিয়া আছে। মাগো, সেই চা,—বিভব, সম্পদ, ধন, মান, ঐশ্বর্য্য-অধিক যে চা—বেলা আট টা বাজিয়া গেল তবুও তাহা মিলিল না। বল মা সন্তান-বৎসলা জননী, তুমিই বল, আমরা দেশোদ্ধার করি কিরূপে? জানি তুমি ব্যথা পাইবে, তোমাকে উদ্ধার না করিয়াই বিদায় লইতেছি, ইহাতে তুমি প্রাণে দুঃখ পাইবে কিন্তু মাতা তুমিই বল, আপনি বাঁচলে তবেত তোমার দুঃখ দূর করিব। আজ যদি এইখানেই আমাদের জীবনান্ত ঘটে তবে তোমার যে দুর্গতি হাল, তাহা ত থাকিলই, উপরন্তু ভবিষ্যতেও আর কোনরূপ আশা ভরসাও যে থাকিবে না মা। তাই মা আমরা বুদ্ধি করিয়া এ বছরের মত বিদায় লইতেছি, আশীর্ব্বাদ কর মা, আগামী বর্ষে যেন তোমাকে উদ্ধার করিতে পারি। গোয়ালন্দে আবার দেখা হইবে মা। "বিদায় জননী!"

(আকাশ পথে বঙ্গমাতার আবির্ভাব)

বঙ্গমাতা। বাছারে! বেশী মোর কিছু নাই বলিবার।
পেয়েছ অনেক দুঃখ, শুনে ঝরে অশ্রুধার।
অভ্যর্থনা-সমিতি হেথা, অতীব দুর্মতি হায়—
অযতনে তো-সবারে দিলরে বিদায়।
এক অনুরোধ জননীর—পার যদি বাছনি—
বিষয় কমিটিতে থেকো, আজিকার যামিনী।
তারপর যথাখুসী সেথা যাও, কর বা না কর কাজ
কেহ নাই নিন্দিবে বৎস, কেহ নাহি দিবে লাজ।
গিয়ে গৃহে থাক সুখে ছেলে পুলে স্ত্রী লয়ে—
মায়েরে ভুল না, বাছা,
"মা মা" বলে ডেকে বক্তৃতা এ।

দেশোদ্ধারকারীগণ। প্রণমি চরণে মা,
শিরোধার্য্য আজ্ঞা তোর—
বক্তৃতা দিব, কলম চালিব নির্ব্বিঘ্নে
করিব—করিব মাতা দেশের উদ্ধার।

২

স্থান—সবজেক্টস কমিটি, রাত্রি আট টা।

কয়েকটি বীর পুঙ্গব। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ, মন দিয়া শুন সবে
বিপ্লব কার্য্যের নিন্দা করিতে না পাবে।
বোঝা গেছে কেবদানী যত ভীরু বৈষ্ণবের
এক্ষণে মোদের কার্য্য ব্রত দেশোদ্ধারের।
প্রশ্ন নাহি কর, নাহি হও সন্দিহান ভাই
পাঠাব ইংরেজ মোরা শমনের ঠাই।
নাহি ঢাল, তরওয়াল, ঘোড়া আর হাতী?
কিছু নাই প্রয়োজন, মোরা চাঁদ কেদারের নাতি
হাতে আছে নখ-শূল, বজ্র নাসিকায়,
নয়নে সাগর আছে, সদা বহে যায়।
শূলেতে করিয়া বিদ্ধ, দিব বজ্র ছাড়ি—
সাগরে জমাবে তারা উজানিয়া পাড়ি।

বলে দেরে সি-আর-এ, আর বল গান্ধীরে—
যা হবার হয়ে গেছে ছাড় এবে ফন্দী রে।
নদীয়ার বীর আমি, কবি বিদ্রোহীর,
প্রভায় আমার জলে সহরের নাট-মন্দির।
সাক্ষী করি যশ-দেবতারে, করি মোরা পণ
উদ্ধারিব দেশ বোমা দিয়ে Straight রণ।

কতিপয় বঙ্গচিহ্ন। জয়ধ্বনি কর সবে সুদিন আগত
এতদিনে দুঃখ শেষ, স্বাধীন ভারত।

(দেশবন্ধুর প্রবেশ)

দেশবন্ধু। "হিংসামূলক রাজদ্রোহিতার ভাব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেননা, এই উপায় প্রথমতঃ নীতি বিরোধী, দ্বিতীয়তঃ ইহাদ্বারা কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে না। ইহা নীতি-বিরোধী, কেননা, আমাদের জাতীয় প্রকৃতি জাতীয় সভ্যতার সহিত ইহার মিল নাই। ইহা দ্বারা কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে না, কারণ ইহা ধারণাই করা যাইতে পারে না যে, আজিকার দিনে এমন একটা সুনিয়ন্ত্রিত গবর্ণমেণ্টকে কয়েকটা বোমা ও রিভলভারের গুলিতে আমরা একেবারে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া দিব।"

পূর্ব্ব পরিচিত বীরপুঙ্গবগণ। বোমা রিভলভারে
কিছু নাই প্রয়োজন।
হস্তেতে রয়েছে শূল, নাসিকায় হুতাশন
ওহে দেশবন্ধু, নহ তুমি বন্ধু আর
তোমারে করিব ত্যাগ—এই কহে দিনু সার।
তোমরা দুটীতে মিলে করে দিলে ক্লীব সবে,
আমরা বুঝিব এবার—কীর্ত্তি মগ্ন রবে।

দেশবন্ধু। আমি আপনাদের বাক্য প্রণিধান করিতে অক্ষম। আপনারা শূল ও হুতাশন কি বলিতেছেন স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বীরপুঙ্গব। তবে শোন দেশবন্ধু, স্পষ্ট করিয়াই বলি। হাতে এই নখ দেখিতেছ? ইহাই শূল, ইংরেজদের দেহে এই শূল বিদ্ধ করিয়া দিব, আর নাসিকায় হুতাশন আছে জান ত? এমন গর্জ্জন ছাড়িব যে ইংরেজ থানা ডোবা পগার লঙ্ঘনপূর্ব্বক একেবারে সাগর শয়ন করিবেই করিবে।

দেশবন্ধু। যুক্তি বটে। কিন্তু মহাশয়গণ, তৎপূর্ব্বে আমি বিদায় লইতে চাই। কারণ আমার নখও নাই নিদ্রা ও অল্প,—গর্জ্জনও আমার নাই, সুতরাং আমি আপনাদের কোন কাজেই ত লাগিব না, আমাকে আপনারা বিদায় দিন।

বঙ্গচিহ্নগণ। (সোল্লাসে) Coward. Coward

দেশবন্ধু। উত্তম।

[সভা পরিত্যাগ

বীরপুঙ্গবগণ। ভাল হ'ল, আপদ ঘুচিল
মুক্তি-পথের বিঘ্ন যাহা ছিল।
কিন্তু ভ্রাতৃবৃন্দ, সমস্যা এক হল উপস্থিত,
কহি আমি খুলি সব, কর যাহা বুঝ হিত।
দেশবন্ধু যায় যদি গান্ধীও যাইবে চলে,
পুলিশ আসিয়া হেসে, মোদেরে ধরিবেক গলে।
জননীর তরে প্রাণ দিতে ডরিনাক আমি।
কিন্তু অগণিত সন্তানের জননী স্ত্রী আছে
আমি তার স্বামী।
এখনি বিধবা হবে, হয়ত করিবে বিবাহ পুনঃ
কলঙ্কে ভরিবে দেশ, যুক্তি ইহা নহে কদাচন।
উঁহারা থাকিলে দলে করিতাম যাহা খুসী মনে
লইত অবশ্য ঘাড়ে,বোঝা বুঝি করিত ইংরেজ সনে
এবে দেখি বিপদ-সমূহ,
বলি যাহা শ্রবণ করহ।
বন্ধুরে ফিরাইয়া আন, আরও গান্ধীজীকে,—
ইহাই আদর্শ যুক্তি Certified Logicএ।

অন্যবীরপুঙ্গবগণ। সুহৃত্তম, যুক্তি তব সারগর্ভ অতি
ইহা ভিন্ন নাই আর অন্য কোন গতি।

[আকাশ-পথে ক্রন্দনরতা বঙ্গমাতার আবির্ভাব)

বঙ্গমাতা। বাছা-সব, তোদেরই মুখ চেয়ে রেখেছিনু প্রাণ
এবে তোরাও করিলি ত্যাগ, হা মোর সন্তান।
এ ছার জীবনে আর নাই প্রয়োজন
অনল জ্বালিয়া তাহে দিব সমর্পণ।

বীর। শুন ওগো বঙ্গমাতা
সম্বর সম্বর শোক, জননী বঙ্গ
বছর কালের তরে দিনু রণে ভঙ্গ।

আজি হ'তে এক বর্ষ পরে শুভ নদীয়ায়
কাটিয়া সফেদ-শির উপহার দিব রাঙ্গা পায়।

বঙ্গ। বাছা, সেই আশে রাখিনু জীবন
কুলায় ফিরিয়া যাও—কর—ভাত ভক্ষণ।

কর নাসিকা গর্জ্জন, ভক্ষণ করিয়া কিছু জল
ঐ পুকুরেতে আছে যাহা—করে টলমল।

অনুবীরগণ। তথাস্তু।

৩

বাসাবাটী, রাত্রি—১টা।

বীর। ভাত নাহি, ডাল নাহি, নাহি তরকারী
খালি পেটে বুঝি হয় কাটাইতে শর্ব্বরী।
রে পাচক-অধম, সুখে নিদ্রামগ্ন তুই
লাঠিতে ভাঙ্গিয়া তোরে করিব রে দুই।
সোজা হয়ে দাঁড়া, মূঢ়, হরিনাম ডাক,
ভবের মেয়াদ তোর—ফুরাল বেবাক।

পাচক। করিয়াছি অপরাধ, অস্বীকার না করি
ফুরাইল ভাত ডাল আর তরকারী।
কিন্তু হে বীর, অহিংস তোমার মন্ত্র
গান্ধী গুরু তব
এতক্ষণ উচ্চারিয়া এলে জয় গুরু গান্ধী রব
এখনি তুলিছ লাঠি—এই কি হে তাঁর মন্ত্র?
অহিংস ব্যক্তির যোগ্য নহে নহে—ঐ যন্ত্র!

বীর। আরে আরে পাচক অধম
এটা নহে বক্তৃতার প্ল্যাটফরম।
সেথায় অহিংস প্রচার, হেথা নাহি তার সম্বন্ধ
আজিকে মারিয়া তোরে মিটাইব উদরের দ্বন্দ্ব!

পাচক। হে বীর-অতুল, এই কি হে উচিৎ তোমার?

বীর। বল্ ওরে বল্ দুরাচার
ইহা ছাড়া গতি কি বা আর।

পাচক। তবে বীর, রাখ বাক্য তিষ্ঠ ক্ষণকাল
হাতাটি পুড়াইয়া আনি হইতে হেঁশাল।
তার পর, যাহা প্রাণ চায়, করিও তাহাই,
হিংসা—অহিংসা যে বা খুসী—ভাই!
(প্রস্থান)

বীর। ভ্রাতৃবৃন্দ, করহ শয়ন সবে।
রক্তবর্ণ "হাতিকায়" যুদ্ধ না সম্ভবে।

৪

ষ্টেশন, টেণ। রাত্রি ৮—১২টা।

ডেলিগেটগাড়ী, একেবারে কলিকাতা যাইবে। গাড়ীর Capacity ৫৫, লোক উঠিয়াছে ২৫, দুইজন হিন্দুস্থানী ডেলিগেট আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া নিদ্রিত। দেশোদ্ধার করিয়া কয়েকজন বঙ্গ-বীরের প্রবেশ।

বঙ্গবীর। এই মেড়ুয়াবাদী আদমি, উঠ্‌কে বৈঠো, উঠ্‌কে বৈঠো। হামলোক ভি যায়েগা। জানতা নেহি, জলদি উঠো।

হিন্দুস্থানী। কাহে বাবুজী, বৈঠিয়ে না। যায়গা বহুত হ্যায় ত!

বঙ্গবীর। তোম্ হ্যায় বোল্‌নেসেই হ্যায়? উঠো, উঠো।

হিন্দুস্থানী। (নীরব)।

বঙ্গবীর। কেয়া? শুনতে নেহি পাতা? এই শালা মেড়ুয়াবাদীদের মত পাজী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই হ্যায়! আমি চেঁচামেচি করে মরতা হ্যায়, শালালোক·

হিন্দুস্থানী। এই বাবু গালি দেতা কেঁও?

বঙ্গবীর। কাহে নেই দেগা শালা? তোমলোগ শুতে রহেগা, আর হামলোগ সব বৈঠকে বৈঠকে যায়েগা? শালা ছাতু।

হিন্দুস্থানী। দেখিয়ে বাবু, মুখ সামারকে?…

বঙ্গবীর। কেয়া শালা ভুট্টা! মুখ সামারকে? জানতা নেহি, মারকে মুখ তোড় দেগা?

হিন্দুস্থানী। কেয়া? মারেগা? আপলোক মহাত্মা-জীকো শিষ্ হ্যায়? বহুৎ খু হ্যায় তো!

বঙ্গবীর। ফিন বাত! শালা [প্রহার]।

হিন্দুস্থানী। হাম ভি ডেলিগেট হ্যায় তুম হামকো মারা বাবু?—মারা?

বঙ্গবীর। মাবাই ত, দেখতা নেই। তব ফিণ মারি. দেখ। [প্রহার]।

বঙ্গবীরগণের উচ্চহাস্য

হিন্দুস্থানীদ্বয় সকাতরে দূরের ও অদূরের ভ্রাতাদের নিকট নিবেদন আবেদন করিয়া কোন উত্তর না পাইয়া, ছারপ্রাণ আর রাখিবে না সঙ্কল্প করিয়া ট্রেণ হইতে নামিয়া গাড়ীর তলায় শুইতে গেল; ইচ্ছা চাকায় প্রাণ দিবে। বঙ্গবীরগণ উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আকাশবাণী হইল—

হে মোর প্রিয় সন্তান বাঙ্গালার বীরগণ
মিলন-মন্ত্রের গায়ক তোমরা—
হও শতায়ু জীবন-ধন!

অপর কামরা

বসন্ত-সৈন্যদলের প্রবেশ। Compromising of খোল, ডালা, তরমুজ, তোরঙ্গ, বাক্স, পেঁটরা, ঝুড়ি, হাড়ী নারী।

আগে পাছে বডিগার্ড, ফ্যাস ফ্যাস শব্দে ঋতুরাজের প্রবেশ।

ঋতুরাজ। জায়গা ছাড়ো, জায়গা ছাড়ো, আমার সঙ্গে বসন্ত-দূতগণ রয়েছেন, জায়গা ছাড়ো।

সকলে সসম্ভ্রমে স্থান ছাড়িয়া দিল।

ঋতুরাজ। আরো ছাড়িতে হইবে, আমার জন্য আরো স্থান ছাড়িতে হইবে। অচিরে আমি পল্লী-সংগঠনে বাহির হইব, ফাণ্ড হইতে টাকা আদায় করিতে হইবে তজ্জন্য আমার নিরালায় গবেষণা করার প্রয়োজন, তোমরা সকলে উঠিয়া বস এবং দাঁড়াইয়া যাও, আমি বিছানা পাতিয়া মশারী খাটাইয়া শয়ন করি। [তথাকরণ] আর এক কথা, তোমরা সকলে চেঁচামেচি করিও না, বেশী কথা কহিও না। অল্প শব্দেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়, সুতরাং যে যেখানে আছ নীরবে থাক নচেৎ আমি পল্লী সংগঠন Scheme গড়িতে পারিব না, টাকার ফন্দীও ফসকাইয়া যাইবে। সকলে স্মরণ রাখিও।

সকলে নতমস্তকে স্মরণ রাখিল

বঙ্গমাতা ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন :—

তোমার মত বীর কর্মী [illegible]
নাহি রে নাহি [illegible], নাহি আর নয়।
লক্ষ্মী ব্যাঙ্কে [illegible] শীঘ্র, উদ্ধ বহু বাকি,
[illegible]
[illegible] আমি [illegible] অন্তর
[illegible]।

যবনিকা *

* স্বরাজ্য Creed সহি করা লোক ব্যতীত এই অনুপম ছন্দোবদ্ধ [illegible] নাটিকা কেহ অভিনয় করিতে পারিবেন না। শ্রী হীন অকর্মা [illegible] চাগোর নিষেধ আছে। অনুমত্যানুসারে— শ্রীবিজয়বল্লভ মজুমদার।

প্রার্থনা

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমায় তুমি রাখ প্রভু
রাখ সবার নীচে
যাত্রা আমার হউক সুরু
একা সবার পিছে।
চলব আমি তোমার সাথে
ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
কাঁপিয়ে পবন নাকিয়ে ভুবন
ফেলে যা সব মিছে
আমায় তুমি রাখ প্রভু
রাখ সবার নীচে।

চালাব নাথ আমায় আমি
তোমার সকল কাজে
মিশাব যে আমায় তব
চরণ ধূলির মাঝে
তোমার পথের যাত্রী আমি
ওগো আমার হৃদয় স্বামী,
মুছাব আজ আঁখির জলে
যা কিছু সব মিছে
আমায় তুমি রাখ প্রভু
রাখ সবার নীচে।
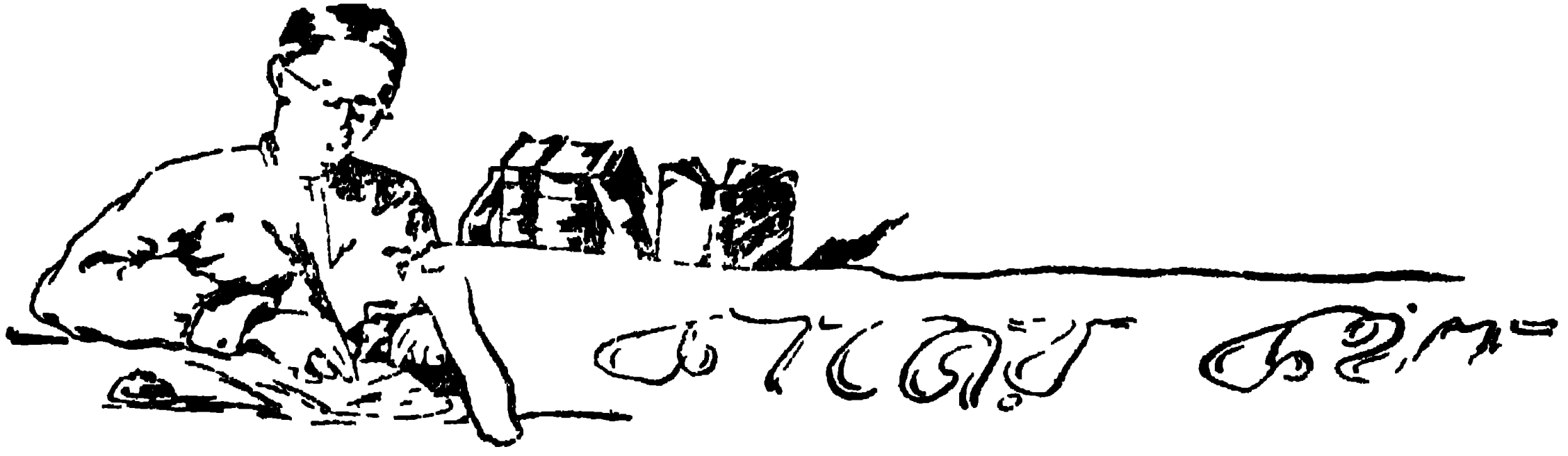
বর্ম্মায় নারীদের রাজনৈতিক আন্দোলন ঃ—সম্প্রতি রেঙ্গুন হাইকোর্টে মা থিন নাম্নী এক বর্ম্মাণ মহিলার বিচার হইয়া গেছে। একটী গুপ্ত সমিতিতে—যাহা সরকার হইতে বে আইনী বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিল—যোগদান করা এবং সতর্ক করিয়া দিবার পরও তাহার কার্য্য পদ্ধতি বিস্তার করিতে চেষ্টা করাই তাহার অপরাধ ছিল—ফলে তাহার কারাদণ্ড হইয়াছে। দণ্ডিত হইবার পরও তিনি মোটেই দমিয়া যান নাই। এমন কি বলিয়াছেন 'যে তিনি এ জীবনে তো ঐ সমিতির নীতি প্রচার করিবেনই উপরন্তু মরণের পর পরজন্মেও উক্ত প্রচার করিবেন—ইহার জন্য তাঁহাকে যদি ভূত হইতে হয় বা দানা হইতে হয় তাহাও স্বীকার।" কলিজার জোর আছে বটে। বর্ম্মা নারীরা স্বভাবতঃই নির্ভীক এবং অত্যন্ত কর্ম্মপটু সুতরাং তারা যদি রাজনীতির আসরে নামেন তাহলে মনে হয় যে, কিছুদিনের পূর্ব্বে বিলাতে যে সাফ্রাজেট আন্দোলন হইয়াছিল তাকেও এঁরা চাপা দিয়ে যেতে পারবেন।

"কোল মারবার গোঁসাই" ঃ—কলিকাতা কর্পোরেশন সম্প্রতি ইংলিশম্যান, ষ্টেটসম্যান, ফরওয়ার্ড প্রভৃতি পত্রে জমাট দুগ্ধ বিক্রয় সম্বন্ধে একটী ইস্তাহার জারী করিয়াছেন। বাজারে চা কফি প্রভৃতিতে ব্যবহার করিবার জন্য এক শ্রেণীর মাটা-তোলা জমাট দুগ্ধ বিক্রয় হয়। ১৯২৩ সালের মিউনিসিপ্যাল আইনের ৪১১ ধারা অনুসারে এই সমস্ত দুধের টীনের গায়ে ইংরাজী ও বাংলাতে এইরূপ জানান আবশ্যক যে ইহা মাটা তোলা দুধ এবং এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগকে খাওয়াইবার অযোগ্য। যে সকল আমদানীকারক বা বিক্রেতা এরূপভাবে না-লেখা দুধ বেচিবেন তাঁহাদের উক্ত আইনের ৭৮৮ ধারা অনুসারে ২০০ শত মুদ্রা জরিমানা করা হইবে, বেশ! প্রস্তাব ও উত্তম এবং সংকল্পও সাধু, কিন্তু এক্ষণে কথা হইতেছে যে প্রথম এই শ্রেণীর দুধ অশিক্ষিত দরিদ্রেরাই ছেলেপিলেদের খাওয়ায়, টিনে নোটীশ থাকিলেও কেবল সস্তা বলিয়াই তাহারা উহা খাওয়াইবে সুতরাং এই নোটিশের ফলে শিশু-মৃত্যু নিবারণ হ্রাস হইবে না, দ্বিতীয়—এই শ্রেণীর দুধ মুদীর দোকানেই বেশী বিক্রয় হয় প্রস্তুতকারক বা আমদানীকারক দুধের টীনে এই নোটীশ না দিলে, ঐ গরীব মুদীরাই মারা যাইবে, কারণ তাহারা এ বিজ্ঞাপনের কিছুই জানিতে পারিবে না যেহেতু কাগজ পড়িতে তাহারা অভ্যস্ত নহে—ফলে এই নিরীহ বেচারাদের ধরিয়া আনিয়া কর্পোরেশন মোটা টাকা রোজগার করিবেন। যদি কর্পোরেশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য শিশুদিগকে এই দুগ্ধ পান করিতে না দেওয়াই হয়, তবে তাঁহাদের উচিত ছিল কাষ্টম আফিসের সাহায্যে যে সকল দুধের টীনে এরূপ নোটীশ নাই সেগুলিকে হয় জেটীতেই নষ্ট করিয়া দেওয়া, নয় আমদানী কারকদের দ্বারা প্রত্যেক টীনে কাষ্টম আফিসেই ঐরূপ নোটীশ লিখাইয়া লওয়া—তা না করিয়া দরিদ্র অশিক্ষিত মুদীদের উপর এ নির্য্যাতনের ব্যবস্থা কেন? তাহারা নীরবে ফাইন দেয় এবং কোনরূপ প্রতিবাদ করিতে অসমর্থ বলিয়াই কি? তাঁহারা যদি এ সম্বন্ধে সহরের চতুর্দ্দিকে উত্তমরূপে ঢেঁড়া পিটিয়া দেন তাহাতে অশিক্ষিত দোকানদারও উহা বেচিবে না এবং অশিক্ষিত লোকেও উহা পয়সা সাশ্রয়ের জন্য কচি ছেলেদের খাওয়াইবে না, এসব সোজা উপায় অবলম্বন না করিয়া সরকারী পয়সা অপব্যয় করিয়া তাঁহারা কতকগুলি এমন কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন যাহাতে কাগজওলাদের পেট ভরান ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে না। আর একটা কথা খারাপ দুধ বন্ধ করিতে হইলে খাঁটী

দুধ সুলভ করা চাই—সেজন্য তাঁহারা কি করিয়াছেন? এখনও তাঁহাদের আইন-সঙ্গত "জলমিশ্রিত দুগ্ধ" নোটীশ-মারা পাত্রে গোয়ালারা সহরের সর্ব্বত্রই 'খাঁটী' দুধ বেচিয়া বেড়ায়। কেবল 'আইনে' আর 'ফাইনে' কোন স্থায়ী সুফল লাভ হয় না—তজ্জন্য আন্তরিক চেষ্টা চাই। কর্পোরেশন জনহিতকর কার্য্যে প্রকৃত আত্মনিয়োগ কতটুকু করিয়াছেন তাহা আজও সহরবাসীরা বুঝিতে পারে নাই। তাঁদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমাদের সেই প্রবাদটীর কথা মনে পড়ে "ভাত কাপড়ের খোঁজ নাই কীল মারবার গোঁসাই।"

খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঃ—বিলাতে খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়াছিল বলিয়া তাহা কমাইবার জন্য স্যার অক্ল্যাণ্ড গেডেসের সভাপতিত্বে একটী রয়েল কমিশন বসিয়াছিল সম্প্রতি উহার মন্তব্য-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে এইরূপ অনুরোধ করা হইয়াছে যে খাদ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটী স্থায়ী খাদ্য সমিতির অনুষ্ঠান করা উচিত। আমদানী গমের উপর বন্দর-শুল্ক (Port Charges) হ্রাস করা আবশ্যক এবং শৈত্যদ্বারা রক্ষিত আমদানী মাংসের পরিমাণ সম্বন্ধে সঠিক হিসাব নিয়মিত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। একটী আন্তর্জ্জাতিক সমবায় যে গম আটকাইয়া রাখিয়া উহার দাম বাড়াইতেছেন বলিয়া গুজব উঠিয়াছিল, অনুসন্ধানে উহা ভিত্তিহীন বলিয়া জানা গিয়াছে। মাংস বিক্রেতাগণের নাম রেজেষ্টারী (তালিকাভুক্ত) করান,আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক করা উচিত। মিউনিসিপ্যালিটী হইতে রুটী ও মাংসের দোকান তাঁহাদের নিজ খবরদারীতে রাখার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি অনেক নূতন নিয়মের ব্যবস্থা আছে। এ তো গেল বিলাতে, কিন্তু এ পোড়া দেশের জন্য কে কতটুকু করিয়াছে। অথচ এ দেশের লড়াইয়ের পূর্ব্বে ও বর্ত্তমানে খাদ্য-দ্রব্যাদির দরের যে পার্থক্য ঘটিয়াছে বিলাতে তাহার অর্দ্ধেকও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তথাপি সেখানে সাধারণের জন্য কত সুব্যবস্থা হইতেছে আর এখানে—বলিয়া আর কি হইবে। সকলেই দ্রব্যাদি কিনিবার সময় সবইতো বুঝিতে পারিতেছেন! সরকার না হয় উদাসীন থাক্‌তে পারেন কারণ সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন এমন বাড়িয়াছে যাহাতে এই বাড়ার আঁচ তাঁদের গায়ে না লাগিতে পারে কিন্তু মার্চ্চেণ্ট আফিসের কেরাণী যারা Time-scale পায় নাই বা লী-কমিশনের শান্তিজল যাহাদের শিরে পড়ে নাই, তাহাদের অবস্থা কেহ কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন। আমাদের দেশের প্রতিনিধি বলিয়া যাঁরা গর্ব্ব করেন সেই স্বরাজ্য-দলতো দেশের লোকের সাহায্যেই কর্পোরেশন অধিকার করিয়াছেন—তাঁহারা তাঁহাদের নির্ব্বাচকদের ঋণ কিরূপে শোধ করিতেছেন? তাঁরা কি এ সম্বন্ধে একটু অবহিত হতে পারেন না—তাঁরা ইচ্ছা কল্লেই অন্ততঃ সাধারণের কষ্টের কিছু লাঘবও তো কর্ত্তে পারেন কিন্তু তা করেছেন বা কর্ব্বেন এমনটা তো আকারে ইঙ্গিতে বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ-হাসপাতালে মফঃস্বলবাসীর বিশেষ সুবিধা ঃ—যাহারা কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা করাইতে অসমর্থ, অথচ শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকবৃন্দের সহায়তা লাভের জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত, তাঁহাদের জানান যাইতেছে যে, গত ছয় মাসের অধিককাল ৬৪নং বলরাম দের ষ্ট্রীটে বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠের একটী ইন্‌ডোর হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। এই হাসপাতালে ২টী বিভাগ আছে :—

শস্ত্রচিকিৎসা বিভাগে কাটাকুটি ও ঔষধাদি দ্বারা হাইড্রোসিল, কার্ব্বঙ্কল বিদ্রধি প্রভৃতি ও কায়চিকিৎসা বিভাগে ঔষধ, তৈল, ঘৃতাদি দ্বারা সকল রকম রোগেরই চিকিৎসা হয়। কালা জ্বরের চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। রোগীর শুশ্রূষা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা যথাসম্ভব বাড়ীর ন্যায় করা হইয়াছে। শাস্ত্রপীঠের অধ্যক্ষ কবিরাজ-শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় ও অন্যান্য বিখ্যাত চিকিৎসকবর্গ প্রয়োজন মত ও বিভাগ মত এখানে আসিয়া রোগী দেখিয়া থাকেন।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৩২—আলোচ্য সংখ্যায় দার্শনিক ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় "বেদ ও বিজ্ঞানের" পুনরালোচনা আরম্ভ করিলেন। বৈদিক আখ্যায়িকাগুলি আপাতঃ দৃষ্টিতে হেঁয়ালি বলিয়া বোধ হইলেও নব্যবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলির সহিত মিলাইয়া দেখিলে বা Metaphysicsএর সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করিলে, ঐ সকল আখ্যায়িকার অর্থ যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে—আলোচ্য প্রবন্ধে অধ্যাপক মহাশয় 'অদিতির' প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা দ্বারা তাহা বুঝাইয়াছেন। অনেকদিন হইতে অধ্যাপক মহাশয় ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞানের আলোক সাহায্যে বৈদিক আলোচনা করিয়া আর্য্য-ঋষিগণের গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শিতার পরিচয় দিয়া আর্য্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রতি আধুনিক শিক্ষিতগণের শ্রদ্ধাকর্ষণের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার সে চেষ্টা যে কিয়ৎপরিমাণে সফল হইয়াছে,তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এ সংখ্যার একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ডাঃ ভূপেন্দ্র-নাথ দত্ত রচিত 'নৃতত্ত্বে জাতি-নির্ণয়' পূর্ব্বসংখ্যায় ইহার কিয়দংশ প্রকাশিত হইলে আমরা "নব যুগে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। লেখক বর্ত্তমান সংখ্যায় বলিয়াছেন, পশ্চিম জার্ম্মাণীর অন্তর্গত নিয়াস্তার উপত্যকায় মনুষ্যের যে কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে কোন কোন নৃতত্ত্ববিদের মতে সেই কঙ্কালের অধিকারীগণই সর্ব্বপ্রথম মনুষ্যজাতি এবং তাহারা অষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণকায় আদিম-জাতির নিকট সম্পর্কীয় অনেকের মতে আর দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়জাতি এবং অষ্ট্রেলিয়ার উক্ত অসভ্যজাতি একই শাখাভুক্ত। ইহা দ্বারা ইহা সূচিত হয় না যে ভারত-বর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া একই মহাদেশের অংশ ছিল এবং পরে নৈসর্গিক উপদ্রবে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাগর ব্যবহিত হইয়া পড়িয়াছে। "শিকার" শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল রায়ের ছোটগল্প। লেখকের কল্পনা যেমন অদ্ভুত, গল্পের ঘটনাসংস্থানও তেমনি (Situation) অস্বাভাবিক। বাঙ্গালীর কুলবধূ—সুধা, স্বামীর অত্যাচার ও হৃদয়হীনতার জন্য তাহার প্রতি লেক্‌চার ঝাড়িতেছেন আবার মৃতপুত্রের পাশে দাঁড়াইয়া,তাঁহার রূপমুগ্ধ "বখাটে ছোকরা" বিপিনকে জারত্বে বরণ করিয়া লইতেছেন! দ্বিতীয় গল্প শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রক্তের টান"। গল্পটী পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। অধঃপাতের নিম্নস্তরে পতিত হইলেও মানব মনুষ্যত্ব বলিয়া জিনিষটা যে একেবারে হারায় না,গল্পের নায়ক হারুর চরিত্র আঁকিয়া লেখক তাহা সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। জুয়াচোর-গাটকাটা বদমায়েসদের আড্ডার বর্ণনায় সুধীরবাবু বেশ সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার লেখায় আর্টেরও পরিচয় পাইয়াছি যথেষ্ট। শ্রীগোপাল হালদার মহাশয়ের ছোট গল্প বা কথিকা "চিত্রশালায়" যে ছবিখানি আঁকিয়াছেন, তাহার অন্তরালে আর একখানি বিলাতী ছবি উঁকি মারিতেছে, লেখকের ভাষার ভঙ্গীতে পর্য্যন্ত ইংরাজী ছাপ্। খৃষ্টান তীর্থরাজ পাদোয়া অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের ভ্রমণ-কাহিনী, ইটালীর অন্তর্গত প্যাডোভা নগরীর দ্রষ্টব্য বিষয় এবং তথাকার নরনারীর জীবন-যাত্রা প্রণালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। শ্রীজননাথ মৌলবী সীতারামের বীরত্বের লীলাভূমি মহম্মদপুরের পরিচয় এই সংখ্যায় শেষ করিলেন। চারিখানি ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসের প্রত্যেকের কিয়দংশ ভারতবর্ষের স্থূল কলেবরের অনেকটা ব্যপিয়া আছে। "জয়দেব" শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত ভক্তকবির জীবনী ও কবিতার আলোচনা। মুখোপাধ্যায় মহাশয় আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র, যতদূর লিখিয়াছেন, বেশ হইয়াছে। তাঁহার সংগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা প্রশংসনীয়। প্রবন্ধের মধ্যে কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের "ব্যাণ্ডেল" উল্লেখ-যোগ্য ঐতিহাসিক রচনা, এবং হুগলী ও ব্যাণ্ডেলের ইতিকথায় পূর্ণ। প্রবন্ধটী উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। "নারী প্রসঙ্গে ইস্‌লাম" শীর্ষক প্রবন্ধে মুহম্মদ আবদুল্লা, মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এবং পরে, মহম্মদীয় সমাজের নারীর স্থান ও মর্য্যাদা বিষয় আলোচনা করিয়াছেন এবং কোরাণ ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া মুসলমান সমাজের নারীর অবস্থা সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্তমতের নিরসন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীন মুসলমান সমাজে নারীর স্থান যে কত উচ্চে, তাঁহারা যে পুরুষের সহিত সমান অধিকার পাইয়া আসিতেন তাহা প্রবন্ধ লেখক নানা প্রমাণ প্রয়োগে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

"যুদ্ধে বাঙ্গালী"—প্রবন্ধে লেখক ডাক্তার নিবারণচন্দ্র মিত্র গত মহাযুদ্ধে বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা কিরূপ সাহস ও কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরাও গর্ব্বভরে, লেখকের ভাষায়, বলি মেকলের তুলিকায় অঙ্কিত বাঙ্গালীর সে প্রতিকৃতি আজ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইতেছে; এবং তাহার স্থলে আর একটা নূতন মূর্ত্তি—যাহার বলিষ্ঠ দেহ, উন্নত বক্ষ, উদ্দাম তেজ, অসীম মনোবল—আবার পুরাকালের ন্যায় গম্ভীর অথচ দৃঢ়স্বরে বলিতেছে—বন্দেমাতরং।" এ মাসের ভারতবর্ষে সুপাঠ্য কবিতার বড়ই অভাব। অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের লিখিত "অকূলে" পড়িয়া, "Stick to the cow, man" এই ইংরাজী কথাটা মনে পড়িল। তাঁহার এ বিড়ম্বনা কেন? বন্দে আলি মিঞার "ফাঁকী" বিলকুল ফাঁকী—

"পথিকের কোন্ পথ ভোলা গীতি
সহসা তোমার আদরের ভীতি
সুদূরের পথে শান্তির ছোঁয়া এঁকে দিল মোর ভালে।

"আদরের ভীতি" পদার্থ-টা কি তাহা কবি আর কবির "প্রিয়াই" জানেন! "শান্তির ছোঁয়া" আঁকা খুব হিম্মতের কাজ, কবির প্রিয়া যদি তা আঁকিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্যই বাহবা দিতে হইবে। "সুদূরের পথে" শব্দের সার্থকতা কি ভাল বুঝিলাম না। "স্মরণে" কবিতাটীতে কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ বিরহী হৃদয়ের সংযত উচ্ছ্বাস, বিষণ্ণ ছবি, অন্তর্নিহিত পূত স্মৃতিটুকু নিপুণতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। "আমার বাড়ী" সুকবি মানকুমারী বসুর কবিতা; তবে ইহা তাঁহার লেখনীর উপযুক্ত হয় নাই। "নিখিল-প্রবাহ" বেশ চলিতেছে।

পুস্তক সমালোচনা

ঠকের মেলা—শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ, ডি, এল প্রণীত ও শিশির পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। ইহা মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত একখানি প্রহসন। ব্যক্তিবিশেষের বা সমাজ বিশেষের দোষ ও দুর্ব্বলতা গুলিকে হাস্যরসের মধ্যদিয়া অতিরঞ্জিতভাবে দেখাইয়া লোক-শিক্ষা-দানই যদি প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে গ্রন্থকারের চেষ্টা একান্ত ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রথমতঃ প্রহসনখানিতে অনাবিল হাস্যরসের একান্ত অভাব; দ্বিতীয়তঃ যে সমাজের চিত্র তিনি আঁকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহার অস্তিত্বের সম্ভাবনা এখনও আমাদের দেশে হয় নাই। তবে যদি ইহা ইঙ্গ-বঙ্গসমাজের চিত্র হয় তাহা হইলে সে সমাজের নৈতিক আবহাওয়া মারাত্মক রকমে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি কোন বিলাতী সামাজিক চিত্রকে নাট্যকার এদেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিব তাঁহার চিত্র নির্ব্বাচন দেশ-কালোপযোগী হয় নাই এবং তাঁহার প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

অমৃতলাল "বিবাহ-বিভ্রাটে" বরের পিতা, কনের বাপ, ঘটক, আধুনিক শিক্ষিত যুবক, বিলাত ফের্ত্তা বাঙ্গালী প্রভৃতির যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা কেমন স্বাভাবিক সজীব ও সুপরিচিত বলিয়া বোধ হয়। আর ডাক্তার নরেশচন্দ্রের ঠকের মেলার পাত্রপাত্রীগণ যেন এদেশেরই নহে—খাস বিলাতী গোরারা যেন ধুতিচাদর পরিয়া চলাফেরা করিতেছে। গ্রন্থকার উচ্চশিক্ষিত ও কৃতবিদ্য। তাঁহার লেখনী হইতে "পাপের ছাপ" "শান্তি" "ঠকের-মেলার" মত রচনা বাহির হইলে আমাদের সত্যই হতাশ হইতে হয়। "আর্টের" নামে সাহিত্যের রাজ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা একশ্রেণীর পাঠক সমর্থন করিবে বটে কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আর্টের জন্য মনুষ্য-সমাজ, না মনুষ্য-সমাজের জন্য আর্ট? রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও লোকশিক্ষার হিসাবে তাহার যে একটা মূল্য ও উপকারিতা আছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না।

Printed & Published by Sachindra Nath Banerji at the HIMANI PRESS.
83, Durga Charan Mitter Street, Calcutta.

রূপ-দক্ষ

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব আর্টের সৌজন্যে
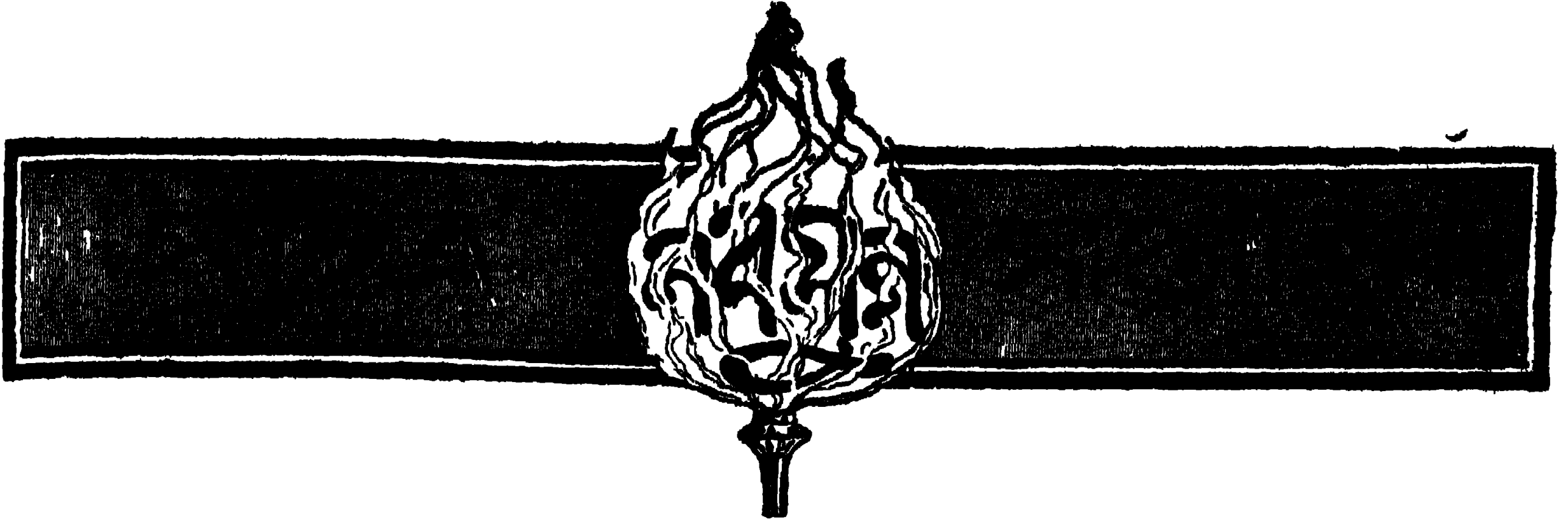
প্রথমবর্ষ]   ৯ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩২ সন। ইংরাজী ২৩শে মে   [৪১শ সংখ্যা

এ্যাডভাইস গ্র্যাটীশ

ডাক্তারবাবু আগন্তুক আসিবামাত্র হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিলেন ও টেবিলের উপরস্থ প্যাডে প্রেসক্রিপসন লিখিয়া দিলেন। আগন্তুক একটু থতমত খাইয়া বলিলেন আজ্ঞে ব্যায়রাম আমার তো নয়—আমাব পবিবাবের—ডাক্তাববাবু মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—আগে বলনি কেন? তা হোক্ ঐ ওষুধই হবে—যাও ওষুধ নাও গে। বেচারী বিনামূল্যে ব্যবস্থাব বহর দেখিয়া কি করিবে তাহাই ভাবিতে ছিল।

প্রাণের আবাদ

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

"এমন মানব জমি রইল পড়ে
আবাদ করলে ফলতো সোনা।"

একদিন বাংলার শ্যামল বনানীবেষ্টিত কুটীর হইতে এই সরল প্রাণের ব্যাকুল কামনাটুকু ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। এ যেন সারা বাংলার অন্তর্বেদনার অভিব্যঞ্জনা। কানন অভ্যন্তর হইতে আকুল উচ্ছ্বাসে গীত হইল—

'এমন মানব জমি রইল পড়ে
আবাদ করলে ফলতো সোনা।"

কৃষক হলচালনা করিতে করিতে শুনিল, শ্রমিক শ্রমের ব্যস্ততার মধ্যেও শুনিল, গৃহস্থ গৃহকর্ম্মে রত থাকিয়া শুনিল, ঐশ্বর্য্যবান বিলাসে মগ্ন থাকিয়া শ্রবণ করিল, যে যেমন অবস্থায় শুনিল সে সেই অবস্থাতেই চমকিত হইয়া উঠিল, চঞ্চল হইল—আত্মসম্বিৎ লাভ করিল,—ভাবিল তাই তো এমন অমূল্য মানব জীবনরূপ জমি অনাদরে, উপেক্ষায় বিস্মৃতির মোহে অকর্ষিত পড়িয়া থাকিবে? যাহাকে আবাদ করিলে সোনা ফলিত, পশু মানব হইত—মানব দেবতা হইত—দেবতা মহা দেবতায় উন্নীত হইতেন তাহা এমনি বিলাস-বিভ্রমে, স্বার্থে সঙ্কীর্ণতায়, এই প্রকার নীচ পাশবিক পরিচর্য্যায় অবহেলিত, পতিত রহিবে?

জাতি জাগিয়া উঠিল আত্মচৈতন্য পাইল, স্বপ্রতিষ্ঠ স্বরাট হইল।

একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আজও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহা কল্পনা নহে—বৃথা দর্প দম্ভ নহে।

যেকালে বাঙ্গালীর সাহিত্যবেদে এই আত্ম উদ্বোধনের সামমন্ত্র উদ্গীত হইয়াছিল, তখন মানবতার মহীয়ান শ্রীতে, মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের অরুণদ্যুতিতে বাংলা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালীর জীবন জমিগুলি সোনার ফসল ফলাইয়া বাংলার রাজলক্ষ্মীকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়াছিল।

সে দিনের কথা, বাঙ্গালীর—আজিকার আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর, মনে আছে কিনা জানি না, কিন্তু যখন বাংলার সাহিত্যবেদে ঐ মহান সঙ্গীত গীত হইত, তখন বাঙ্গালী জগতে বরেণ্য জাতি ছিল।

তখন বাঙ্গালী—তিব্বতে, চীনে, জাপানে, ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়াছে অলঙ্ঘ্য হিমালয় লঙ্ঘন করিয়াছে—অপার সমুদ্রে হেলায় পাড়ি দিয়াছে—সাত ডিঙ্গা সাজাইয়া লক্ষ্মীর বন্দরে বিকিকিনি করিয়া ফিরিয়াছে,—তখন বাঙ্গালী ন্যায়, নব্যস্মৃতি রচনা করিয়াছে। অদ্বৈত, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দের পুণ্যপ্রেমে জগৎকে ধন্য করিয়াছে, তখন বাঙ্গালীর ভীমবীর্য্য মগ ও বর্গীকে শাসন করিয়াছে, হেলায় লঙ্কা জয় করিয়াছে, ঘরে ঘরে দীপঙ্কর শীলভদ্র বাসুদেব রঘুনাথের জন্ম দিয়াছে। তখন বাঙ্গালী কি না করিয়াছে? একটা মহিমান্বিত জাতি যাহা করিতে পারে, তাহা সবই করিয়াছে।

সাহিত্য—জাতির আত্ম উদ্বোধক উহা মন্ত্র, উহা প্রণব স্বরূপ। সাহিত্যের স্মরণে মননে জপে উহার অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় মুক্তির সিদ্ধি হয়। সাহিত্য কেবল বিলাস নহে উপভোগের বস্তু নহে—সাহিত্য ব্রহ্মযজ্ঞ। সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া কেবল মনীষার স্ফূর্ত্তি হয় না, সাহিত্যের সাধনায় মানবতার উন্মেষ হয়, প্রসুপ্ত আত্মশক্তি জাগ্রত হয়। সেইজন্যই একদিন—যেদিন বাঙ্গালী বাঁচিয়াছিল—সেইদিন বাংলার ঋষি সাহিত্যিক উদাত্ত স্বরে গাহিয়াছিলেন—

"এমন মানব জমি রইল পড়ে
আবাদ করলে ফলতো সোনা।"

এ গানে চারুকলা নাই, মনোবিজ্ঞান নাই, কোন বিকট রসের সমাবেশ নাই। আছে শুধু সহজ সরল প্রাণের, মুমুক্ষু আত্মচৈতন্যের অকৃত্রিম আগ্রহ। এ সকলে বুঝিতে পারে, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, কৃষক,

আপামর সাধারণ সকলেই উপলব্ধি করিতে পারে। ইহাতে মনোবিজ্ঞান নাই আত্মজ্ঞান আছে, তাই সকলের চিত্তেই আঘাত দেয় আন্দোলিত করে উদ্বুদ্ধ করে। প্রত্যেকের অন্তরেই এই চেতনা উদ্রিক্ত করাইয়া দেয়—

"এমন মানব জমি রইল পড়ে"

কে যায় ওই? দুর্লঙ্ঘ্য হিমাদ্রী অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠের দুস্তর পথে। কে যায় ঐ কিশোর কুমার অচল অটল মহাব্রতধারী।—এখনো যাহার অধরে মাতৃদুগ্ধের সদ্যগন্ধ, এখনো যে বক্ষে রহিবারই নিধি, এখনো যাহার খেলার নেশা কাটিবার সময় হয় নাই, সেই স্নেহের দুলাল ঐ উত্তুঙ্গ হিমাচল অতিক্রম করিয়া কোথায় অজ্ঞাত যাত্রা করিল?

বাঙ্গালীর কি এই দিন আসে নাই? আট কোটী বাঙ্গালী কি অভিশাপগ্রস্ত, দাসত্বের বিষবহ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া শ্মশান বা লায় পড়িয়া নাই? বাঙ্গালী আজ খেলা করিবে? বিলাস বিভ্রমে মাতিয়া রহিবে? সাহিত্যে পশুত্বের সেবা করিবে? বাংলার সাহিত্য সাধক কি অসাধ্য সাধন করিয়া জাতির জীবন সঞ্জীবন মুক্তিধারা বৈকুণ্ঠের পথে যাত্রা করিবে? না সে কেবল লালসার সঙ্গীত গাহিবে, বিলাসের খেলা খেলিবে—মাতিয়া রহিবে হীন তুচ্ছ প্রমোদে? সে পতিত জাতিকে কি শুনাইবে না—

"এমন মানব জমি রইল পড়ে
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

সাহিত্যে ললিত কলার এখন সময় নাই। এখন মনুষ্যত্ব-হীন বাংলা জুড়িয়া মানবতার ও মানুষের আবাদ করিতে হইবে। সেই জন্য সাহিত্য এখন একটীমাত্র মন্ত্রই উচ্চারণ করিবে—

"এমন মানব জমি রইল পড়ে
আবাদ করলে ফলতো সোনা।"

চারুকলা রস মনোবিজ্ঞান থাক এখন, সাহিত্য সাধক! এখন এমন রস দাও, যাহাতে মনুষ্যত্বের উন্মেষ হয়, বীর্য্য বিভূতির পরিপুষ্টি হয়।

মনস্তত্ব? জাতির মন কোথায়? যাহাদের দেহমন আত্মা দাসত্বের পাষাণ চাপে নিষ্পিষ্ট, তাহাদের আবার মানসিকতা কি রহিতে পারে?

'চোরের মন পুঁই আঁদাড়ে' বলিয়া একটা প্রবাদ আছে, কথাটী পরম সত্য। চোরের মন যেমন পুঁই আঁদাড়ে থাকে, দাসের মনস্তত্বও তেমনি অধঃপতনের আবর্জনা স্তূপে ছড়াইয়া থাকে। সেই কারণে দাসের সাহিত্য রচনায় কেবল নীচতা, হীনতা, কাম কলুষতা, শুধু কাপুরুষতা পশুজনোচিত স্বার্থপরতাই ফুটিয়া ওঠে। যাহাদের মনই নাই তাহারা সাহিত্যে মনস্তত্ব দেখাইতে যায় কোন্ লজ্জায়? বাংলায় টলষ্টয় ম্যাজিনী ম্যাক্সুইনীর মত বীর্য্যবন্ত মন কই? বাঙ্গালায় প্রতাপ শিবজী গুরু-গোবিন্দের মত মহীয়ান কই? দাসের ক্লীব-চিত্ত লইয়া আর মনোবিজ্ঞান ফলাইয়া কাজ নাই।

বাংলায় মানুষ নাই—মনুষ্যত্ব নাই—শৌর্য্য বীর্য্য নাই, কেবল আট কোটী জাতি ভস্মীভূত অধঃপতনের শ্মশান প্রান্তরে পড়িয়া আছে। তাহাদের বাঁচাইতে হইবে—উদ্ধার করিতে হইবে—মরু-বাংলায় প্রাণের আবাদ করিতে হইবে।

সেইজন্য বাংলার নবীন সাহিত্যবেদ হইতে কেবল এই মন্ত্রই উদ্গীত হইতে থাকুক—

"এমন মানব জমি রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।"
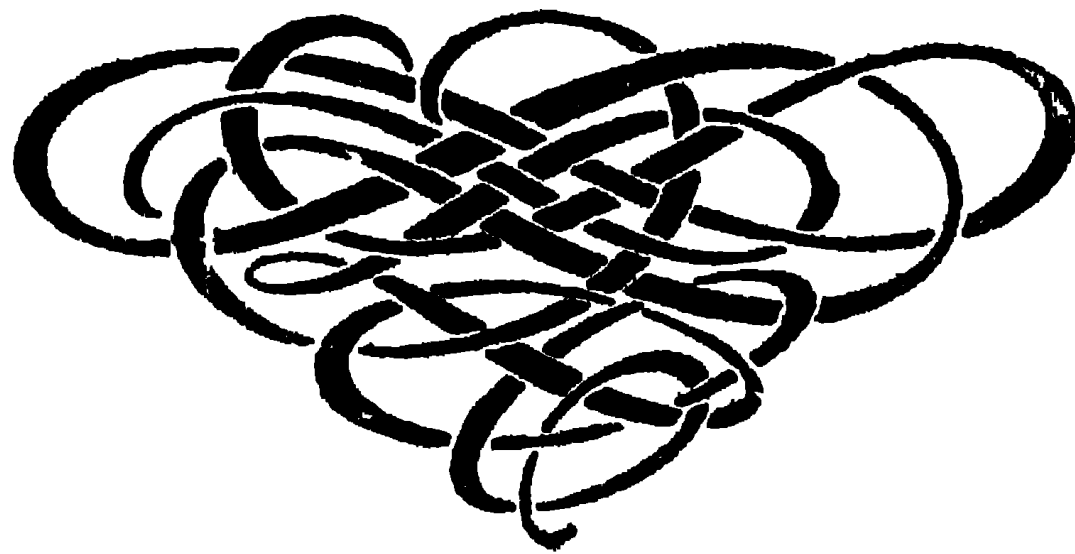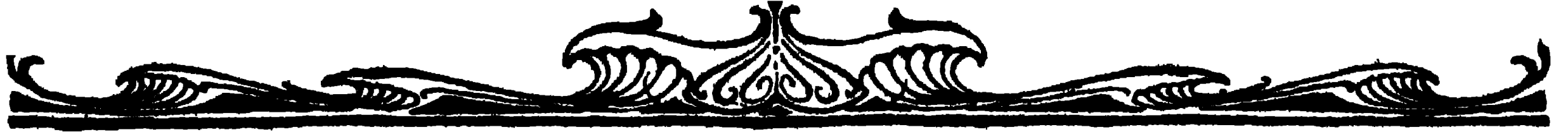
মুক্তির চেতনা

শ্রীপ্রভাসকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশ্বের ঐক্যতান সঙ্গীতের পরতে পরতে চিরদিন একই ভাবে বাজিতেছে——একটা সুমধুর রাগিণী। মানবের হৃদয় তন্ত্রীর সেটা মূল রাগিণী—অন্তরের প্রথম চেতনা—ভাষার প্রথম বাণী। সৃষ্টির সেই প্রথম দিনে—যেদিনে বিশ্বনিয়ন্তার কোমল হস্তের পুণ্য-স্পর্শে জাগ্রত ধরার প্রথম মানবের কর্ণে ধ্বনিত হ'য়েছিল—প্রথম পাখীর মধুর কাকলী সেদিন ধরার ঘনান্ধকার দূর ক'রেছিল—অনন্তকাল হতে গগনবিহারী ওই সূর্য্য তার সন্তানের হৃদয়ের অন্ধকার দূর ক'রেছিল—অন্তরের ওই চেতনা। তারপর অতীতের অনাদি অনন্ত কালগর্ভে কত শত বৎসর মিশিয়াছে কে জানে? কিন্তু সেদিনের বিশ্বে যাহা যাহা ছিল—আজিকার জগতেও তাহা আছে কিনা—তাহার প্রকৃত তথ্য কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সেদিনের প্রভাত সমীরণ কত শীতল—পাখীর প্রথম কাকলী কত মধুর—উষার রক্তিম গণ্ডে তরুণ অরুণের শুভ্র রাগ কতদূর উজ্জ্বল হইয়াছিল—তাহা কেহ জানে না—জানিতে চাহেও না। কিন্তু আপনা হইতেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বিশ্বের সেই প্রথম চেতনা—যাহা অতীতে আলো দিয়াছে আজও দিতেছে। প্রকৃতির বাঁধা নিয়মের মধ্যে পড়িয়া—বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ আদিপিতা হইতে বহু শতাব্দীপরে আজিকার তাঁহার এই ক্ষুদ্র সন্তানগণের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু বিন্দুমাত্রও প্রভেদ ঘটে নাই একস্থলে। তাঁহার হৃদয়ের যে স্থলে ওই মহীয়সী বাণী প্রতিনিয়তই ধ্বনিত হইত—আজিও তাহা সেই অংশে অম্লান রহিয়াছে। কারণ, তাহা মানব হৃদয়ের চিরন্তন বাণী।

মানবের আদিম অধিকার-ব্যাধি সকল দ্রব্যকেই ব্যাপিয়া আছে। কিন্তু এই শাশ্বত বাণী-পূর্ণ চৈতন্য মানবের অধিকার-ব্যাধির বহু উচ্চে। রাগিণী হ'লেও সুরের গণ্ডীর মধ্যে ইহাকে ধরা যায় না। কাজেই কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি বা শ্রেণী বিশেষের নির্দ্দিষ্ট অধিকার এই চেতনাকে সঙ্কীর্ণ কর্ত্তে পারেনি। আমি হিন্দু হই—মুসলমান হই—খৃষ্টান হই—আমি বাঙ্গালী হই—আমি ফরাসী হই—আমি রোমীয় হই—আমি যে হই না কেন, ইহা আমার হৃদয়ে আছে এবং চিরদিন থাকিবে। তবে কেমন অবস্থায় থাকিবে সেটা একটা সমস্যার কথা, কারণ হৃদয়ের চিরন্তন সম্পত্তি হলেও ইহার অবস্থার পরিবর্ত্তন আছে। ইহা কখন বা নিদ্রিত—কখন বা জাগ্রত। জাতির হৃদয়ে যতদিন এই চেতনা জাগ্রত থাকে, ততদিন জাতীয়ত্বের ভাণ্ডার সে জাতির গৌরবের কোন অভাব হয় না, কিন্তু চেতনা নিদ্রিত হ'লেই জাতির গৌরবের ভাণ্ডার শূন্য হয়।

সৃষ্টির প্রথম দিনে ভারতবর্ষও আলোকিত হ'য়ে উঠেছিল—ওই পরিপূর্ণ চেতনার মোহিনী তুলিকা স্পর্শে। কাজেই সেদিন ভারত ছিল—বিশ্বের জাতি সঙ্ঘে অমূল্য রত্ন। কিন্তু সহসা ভাণ্ডার নিঃস্ব হ'ল—ভারত আপনার অনেকদিনের গৌরব হারাল। তবে কি তার বাণী তাকে ত্যাগ ক'রে গেল? না,—তা—অসম্ভব, অন্তরের চেতনা অন্তরেই রইল বটে—তবে এতদিন ছিল সে জেগে, আজ পড়ল ঘুমিয়ে, কারণ অনেকদিন পর্য্যন্ত জাগ্রত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে—জাতি বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল। এখন, তার প্রয়োজন হ'ল, একটা আশ্রয়—একটু বিশ্রাম। তাই দীর্ঘকাল জাগরণের পর শয়ন মন্দিরের দ্বার সেই যে রুদ্ধ হ'ল আজও তা খুললো না। তার মুক্তির মন্ত্র, অনেকদিন পর্য্যন্ত আর জাতির কণ্ঠ হ'তে নিঃসৃত হ'ল না।

সুপ্তি "বিনাশিনী মহা চেতনা আজ সুপ্তি ঘোর আচ্ছন্ন। এখন উপায়? রূপকথা বল্লে "সোণার কাঠীর স্পর্শে তোমাদের চেতনাকে জাগিয়ে তোল—এই সোণার কাঠীর স্পর্শে আমার ঘুমন্ত রাজকন্যা একদিন জে'

ছিলেন।" কিন্তু হায়, আজ ত' আর সে রাজপুত্র নেই। সোণার কাঠীর সন্ধান যে জাতি আজই অনেকদিন হ'ল ভুলে গেছে, তার আজ কি সন্ধান কর্ব্বে? কিন্তু, অনেক সাধ্যসাধনার পর—অনিচ্ছার সহিত জাতি সোণার কাঠির সন্ধানে যাত্রা কর্লে। এদিকে শয়ন মন্দিরেও মুক্তিময়ী চেতনার টনক নড়িল। সোণার কাঠীর সঞ্জিবনী শক্তির পুলক স্পর্শে নিদ্রার ঘোর কাটিল। চক্ষু উন্মীলিত ক'রে চেতনা দেখলে—প্রভাত অনেকক্ষণ অতীত হ'য়েছে—জাগরণের বাঁশী অনেকক্ষণ বেজে গেছে—উষার স্নিগ্ধ কিরণ তপ্ত হ'য়ে উঠেছে—অলস জাতির অনাবশ্যক কর্ম্ম কোলাহলে পাখীর মধুর কাকলী অনেকক্ষণ হ'ল নীরব হ'য়েছে। আপনার ঘুমের আধিক্যে চেতনা লজ্জিত হ'ল। দীর্ঘকালের সঞ্চিত, চারিদিকের আবর্জ্জনা রাশি সরিয়ে চেতনা তাড়াতাড়ি দেশ ভ্রমণে বাহির হ'ল। যতই অগ্রসর হয় চেতনা ততই দেখে সবই নূতন। অতীতের এক পুরাতন দিনে তাকে অচৈতন্য ক'রেছিল নিদ্রা—আর আজ জাগ্রত ক'রেছে নূতন দিনের নূতন আলোক।

দুরারোগ্য ব্যাধির বিরামের পর—পথ্য বড় বেশী সহ্য হয় না। তাই, দীর্ঘকাল আলস্যের পর—সহসা অতিরিক্ত পরিশ্রম ভারতের ভাগ্যেও সহ্য হ'ল না। লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করে—বিজয় দুন্দুভির উচ্চ নিনাদে গগনের প্রতি স্তর ধ্বনিত ক'রে তোল্বার পূর্ব্বেই জাতি আবার নিদ্রিত হয়ে পড়্ল। সদ্য-প্রস্ফুটিত বিকচ নলিনী অকালে শুখাইল। গোধূলির লগ্ন না আসিতেই রাত্রি হইয়া গেল। দেখিয়া শুনিয়া সদ্য জাগরিতা-শান্তিময়ী চেতনা আবার সুপ্তির গভীরতম স্তরে লুকাইল। আবার কাহার সঞ্জিবনী মন্ত্রের কুহক-স্পর্শে চিণ্ময়ী মহামায়ীর যোগ-নিদ্রার অবসান ঘটিবে কে জানে?

আজ দেশ বিদেশ হইতে জাগরণের বাণী ভাসিয়া আসিতেছে। আমরাই কি শুধু ঘুমাইয়া থাকিব? আজ জগতের সুপ্ত চেতনা জাগিয়াছে। চারিদিকেই আজ কর্ম্ম কোলাহল—চারিদিকেই আজ নবযুগের বার্ত্তা। জীবন যুদ্ধের জন্য সৈনিকগণ আজ সর্ব্বত্রই প্রস্তুত। শুধু আমাদের ভাগ্যেই কি নবযুগ মধ্যপথে আসিয়া থামিয়া যাইবে? আমরাই কি শুধু জ্যোতির্ম্ময়ী চেতনাকে হারাইয়া—জড়পদার্থের ন্যায় নীরব থাকিব? জাগ্রত চেতনার মধ্য দিয়া নবযুগ-আমাদের শ্রবণে কি আশার, প্রেরণার মধুর সঙ্গীত ঢালিয়া দিবে না?

অন্তর্দ্ধান

(Scott)

শ্রীকালিদাস রায়

সে গেছে মিলায়ে শিখরে শিখরে
বন মর্ম্মরে সে আজি ফুটে,
মিলা'ল নিদাঘে নির্ঝরসম
পিয়াসায় যবে হৃদয় টুটে।
নির্ঝর পুনঃ লভিবে পরাণ
পেয়ে বরষণে বারির ধারা,
সেত আর ফিরে আসিবে না হায়
চির তরে সে যে হয়েছে হারা।
পক্ক যবের শীর্ষ গুলিরে
কাটে সুসময়ে কৃষকলোকে,
কাল কেটে লয় তরুণ হৃদয়
প্রিয়জনগণে ভাসায়ে শোকে।

ঝরায় শরতে হিম-বিষবায়
পল্লব যারা ঝরিতে চায়,
মাধবী উষার ফুলটি আমার
ঝরিল কীটের দশন ঘায়।
সঙ্কটে নিঃশঙ্ক সহায়
সমরে সব্যসাচীর মত,
গিরিপথে তুমি ধূমকেতু প্রায়
নিদ্রা তোমার গভীর কত?
গিরির গাত্রে নীহারের মত—
নদীর বক্ষে বিম্বসম,
উৎসধারায় ফেনিলোৎসব,
কোথা গেলে আজ হৃদয় মম?

গল্প

মুখোসের লড়াই

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক এম-এ, বি-এল,

১

অমন হিংস্রপ্রকৃতি বদ্‌রাগী লোক ব্রাহ্ম সমাজে আর ছিল না। পর পর দুইটী স্ত্রী তাব মধুব ব্যবহাবে মুগ্ধ হয়ে আত্মহত্যা কবেন। প্রথমা স্ত্রী ছিলেন ধনবতী, লক্ষ্মী বল্লেই হয়। দ্বিতীয়া স্ত্রী ছিলেন কলাবতী, সরস্বতী বল্লেও হয়। এখন তৃতীয় স্ত্রী রূপবতী, উর্ব্বশী বল্লেও হয়। কিন্তু পাত্রীর বাজার এবাব গবম আগুন বল্লেও বেশী বলা হয় না।

নিশীথবাবুর সন্দেহ হ'ল সকলে তাঁকে চিনে নিয়েছে। চড়া মেজাজ আরোও চড়ে গেল। আবব্যোপন্যাসের দৈত্যের মত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যে তার গলায় ববমাল্য দেবে—তাকে তত বেশী কবে অপমানের বোঝা বহিতে হবে। তিনি বাঘেব মত ওত পেতে রইলেন।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, কোন কুমাবীই তাঁর দিকে সদয় চক্ষে দেখেন না, সুন্দরী তো দূবেব কথা। তিনি প্রতি উৎসবে, প্রতি উপাসনায়, প্রতি আনন্দ ভোজে অগ্রণী হয়ে দাঁড়ান, কিন্তু কিছুতেই কাবো পাষাণ হিয়া গলে না।

কেন? লোকের মনে যদি একটা কোন বিশ্বাস হ'য়ে থাকে, কেন সে বিশ্বাস ঘোচে না? তিনি আয়নার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালেন, সব—পরিষ্কার হ'য়ে গেল। তাঁব—মনেব স্বরূপ মুখের ওপর ছাপা। কি ভয়ানক উগ্রমূর্ত্তি।

বড্ডই রাগ হ'ল—কিন্তু মুখের ছাপ ত ঘোচাতে হবে। তিনি আয়নাব সামনে দাঁড়িয়ে—কসরত করতে লাগলেন। দুপাশে কল্পিত স্ত্রীব মানসমূর্ত্তি রেখে তিনি ভ্রূভঙ্গীর বদলে মিষ্ট হাসির সঙ্গে মিষ্ট কথা বল্‌তে শিখলেন—কিন্তু অতি কষ্টে। বেশীক্ষণ এ ভাব বজায় রাখতে পারলেনা পুরো এক ঘণ্টা, তার বেশী তাঁর পক্ষে অসাধ্য।

এখন থেকে নিশীথবাবু কি সমাজ মন্দির কি পারিবারিক ভবন এক ঘণ্টার বেশি কোথাও থাকতেন না, কোনো প্রকার অছিলা ক'রে—উঠে পড়তেন। অনেকেরই তাক্ লেগে গেল, অনেকেই ভাবতে লাগলো—তবে কি নিশীথবাবুর স্বভাব বদ্‌লেছে। এর ফলে নিশীথবাবুর প্রতি ভদ্রতা বেড়ে গেল বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত—তার বেশী কারো সাহসে কুলোলো না।

হঠাৎ একদিন একটী অনূঢ়া যুবতীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। তাঁকে তিনি চিন্‌তেন না বটে—কিন্তু সুন্দরী এমন আর তিনি দেখেন নি। চুলগুলি যেন কাল বৈশেখের—দাঁতগুলি যেন গজমুক্তার—আর রং যেন দুধে আল্‌তা।

আশপাশের লোকদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কেউই তাকে দেখে নি, কেউই পরিচয় জানে না—তিনি আয়নার সাম্‌নে যাচ্ছেন ভেবে বুক ঠুকে যুবতীর কাছে গেলেন

দু'দণ্ডেই দুজনের মন প্রাণ এক হ'য়ে গেল। কিন্তু আর নয় —ঘড়ীতে একঘণ্টা হয়ে গিয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, যুবতী সাশ্রুনয়নে অনুরোধ করলে আর একটু থাকতে, কিন্তু তিনি শেফালির মত মিষ্ট হাসি হেসে যুবতীর হাত ধরে বল্লেন "আজকের মত ক্ষমা করুন।"

২

নিশীথবাবু তৃতীয়া পত্নী পেয়েছেন—সেই অনুপমা সুন্দরীকেই, তাঁর প্রাণের সুখ মিটেছে। প্রাপ্য বস্তু হস্তগত ক'রেই তিনি নিভয়ে তার নিজমূর্ত্তি ধারণ করলেন। সুন্দরী ব'লে পূর্ব্বের সঙ্গে কোন বৈষম্য ঘটতে দিলেন না।

নিশীথবাবু তারস্বরে—হাঁকলেন—"কই শুনছো?—বিয়ের আগে যা যা দিয়েছিলুম—প্রায় তিন হাজার টাকার জিনিষ তা সব কোথায়?—বাপের বাড়ী দিয়ে এসেছ নাকি?"

"যেখানেই দিয়ে আসি—তুমি ত আমাকে উপহার দিয়েছ—সে কথা আর তোল কেন?'

"বা'! তুলবোনা?—তোমাকে দিয়েছি আমারই থাকবে বলে।" আমাকে তেমনি কাঁচা ছেলে পেয়েছ? ভুরপুনের গায়ে বিঁধ চলবে না মণি। ভাল চাও কালই সব নিয়ে এস।'

"এমন ক'রে তুমি আমার সঙ্গে কথা বল্লে। ভাল মুখে চাইলে না কেন? তুমি কি সেই তুমি, যে একদিন আমার কাণে স্বর্গের অমৃত ঢেলেছিল' "

"হুঁ,—সেই—সেই, কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। ওসব কাব্য টাব্য তুলে রাখ—আস্পর্দ্ধা!—ওর জন্যে যবমাস দিয়ে—কথা গড়াতে হবে। ফের যদি কথা বলেছ কি একচড়—"

"চিনেছি—এখন চিনেছি, কিন্তু আগে চিনিনি। মনে হয়েছিল তোমার মুখে উষার শোভা, কণ্ঠে বীণার ঝঙ্কার—চক্ষে নন্দনের কোমলতা।—"

নন্দনের কোমলতা। কোমলতার ধার আমি ধারি না। আমি দেখাবো আমি নির্ভাজ পুরুষ। মেয়েলি নাম-গন্ধও আমার মধ্যে নেই।"

"তবে আমি কি দেখে ভুলেছিলুম।—"

"মুখোস্—মুখোস্—"

"বটে।—তুমিই শুধু মুখোস পরতে জান—না!—আর আমি মুখোস্ পরতে জানি না—নয়।—"

৩

স্ত্রীও কি তবে মুখোস্ পরেছে। নিশীথবাবুর রাত্রে নিদ্রা হ'ল না। আশ্চর্য্য। তবে কি সে তাঁকে ঠকাচ্ছে—আর এমন ঠকাচ্ছে যে তিনি ধরতেও পার্চ্ছেন না। না জানি সে কোন বিষয়ে তাঁকে ঠকাচ্ছে আর ঠকানোর ওজনই বা কত।

ভোরে উঠেই স্ত্রীর হাতে পায়ে ধরে—সাধ্য-সাধনা করতে লাগলেন, মুখোস্ কি তা ব'লবার জন্যে—অবশ্য তীব্র রাগের বুকনি দিয়ে। কিন্তু স্ত্রী শুধু একটু বাঁকা হাসি হাসলেন কোন উত্তর দিলেন না। শেষে নিশীথবাবুর নির্ব্বন্ধে প'ড়ে স্বীকার করলেন যে নিশীথবাবু যদি তাকে অগ্রিম আর একহাজার টাকা দেন—অন্যায় বাক্যের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ—এবং কখনো কোনদিন মুখোসের কথা কারো কাছে ব্যক্ত না করেন, তবে সে মুখোস্ খুলে তার পরদিন দেখাবে।—উৎকণ্ঠায় নিশীথ বাবুকে অগত্যা রাজী হতে হল।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই—নিশীথবাবু দেখলেন স্ত্রী আর তাঁর ঘরে নেই। প্রতিশ্রুত হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছেন। মর্ম্মযাতনায় অধীর হ'য়ে নিশীথ বাবু—রাগের সঙ্গে বাক্স, দেরাজ, আলমারী খুলতে লাগলেন। দেখলেন দুখানি ফটোগ্রাফ আর তারের মাঝখানে কতকগুলো রুজ পাউডার—পরচুল—আর পাথরের দাঁত।

ফটোগ্রাফের একখানা তার স্ত্রীর, আর একখানা একটী ভদ্র মহিলার এ মহিলাকে নিশীথবাবু অনেকদিন থেকেই চেনেন। বয়স ৪২।৪৩—মাথায় টাক-পড়া, দাঁত একদম পড়ে' গিয়েছে। গাল চুপসে গিয়েছে।—উঃ ফটোগ্রাফের থেকেও বোধ হয় কালো। হাতড়াতে হাতড়াতে দেরাজের মধ্যে একখানা চিঠিও পেলেন। চিঠিতে লেখা আছে—"আমি চল্লুম—কেন না থাকতে আসি নি।—আপনার স্বভাব আগে থেকেই আমি জানতুম,

জেনে শুনেই এসেছিলুম—কেন এসেছিলুম আপনি বুঝতে পারছেন।—মুখোস কে না পরে। মুখোসের জোরেই আমি কুড়ি বছর পিছিয়ে গিয়েছিলুম। কুশ্রী ব'লে যার বিয়ে হয়নি—মুখোসই তার চির-কুমারীত্বের আপ্‌শোষ ঘুচিয়েছে। আমি আপনারই যোগ্যা স্ত্রী, এই বিবেচনায় আপনাকে পতিত্বে বরণ করেছিলুম।—যদি ফিরে যেতে বলেন যাবো। না বলেন ত অনুগ্রহ করে' চিঠিখানা আর—মুখোস্ খোলা ছবিখানা পার্শেল করে পাঠিয়ে দেবেন। আমি আমার পিত্রালয়ে। আপনার শ্বশুরবাড়ীর সকলেই এ মুখোসের কথা জানেন। জানে না, বাইরের লোকেরা টাকা উদ্ধারের জন্যে তাদের—এ কথা জানানো বাঞ্ছনীয় মনে করেন,—কর্ব্বেন। কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হবে না বরং লজ্জাও পরিহাসের সম্ভাবনা। যা ভাল হয় কর্ব্বেন, মোটের উপর মুখোসে মুখোসে লড়াই ক'রে—আমিই বোধ হয় জিতেছি। এখন বলুন দেখি কার মুখোস সরেস?"

শ্রীমতি মৃণালিণী দেবী।

পুঃ—আপনার কাছে যদি যেতে হয়—মনে রাখবেন মুখোস দুইজনকেই পরে থাক্‌তে হবে। আপনিও খুল্‌তে পার্‌বেন না।—আমিও না।

ঝড়ো-হাওয়া

শ্রীঅপ্রকাশ মজুমদার

ওরে সর্ব্বনাশী ঝড়ো-হাওয়া
ভাসায়ে চলা তরী আমার বন্ধ হবে বাওয়া,
আকাশের ঐ ঈশান কোণে,
কাঁপছে বাতাস ঝড়ের গানে,
আসছে ছুটে সাগর পানে,
হবেনা আর, হবেনা মোর বাওয়া,
ওরে সর্ব্বনাশী ঝড়ো-হাওয়া।

২

আজি আমার মিলন রজনী,
সাগর পারের কোণ হ'তে ঐ আসছে সজনী
বধু আমার কালো রূপে,
সেজেছে আজ আকাশ বুকে,
ঝড়ো হাওয়ায় দুল্‌ছে সুখে,
লুটিয়ে-পড়া রাঙ্গা আচল খানি,
আজি আমার মিলন রজনী।

৩

ওগো আমার মিলন প্রেয়সী,
স্বপন পুরের ঘুম ভাঙ্গানো মানস রূপসী।
দীপ্ত তোমার বয়ান খানি,
এস সরম ঘোমটা টানি,
বাজাও আজি শেষ রাগিনী,
মাতায়ে তোল আজকে মিলন নিশি,
ওগো আমার মিলন প্রেয়সী।

৪

ওগো আমার অচিন পথের সঙ্গিনী,
কাল্‌বৈশাখীর বাদল ধারায় এস রঙ্গিনী।
ঝড়ো-হাওয়া রুদ্র সুরে—,
ভাসায়ে আন আজ বঁধুরে,
বসাব আজ গোপন পুরে,
ঝড়ের দোলায় দুল্‌বে মোদের সাধের তরণী,
ওগো আমার আচিন্ পথের সঙ্গিনী।

৫

সর্ব্বনাশী ঝড়ো-হাওয়া ওরে,
ভাসায়ে না হয় নিও তরী আজকে নিশি ভোরে।
আমোদ-দোলায় হর্ষে মাতি,
কাটাব আজ মিলন রাতি,
অশ্রুজলের আসন পাতি,
বধুরে তায় বসাব আজ, বিদায় জনম তরে,
সর্ব্বনাশী ঝড়ো-হাওয়া ওরে।

জেমসেদপুর সান্নিধ্যে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাইকেল ওয়ালারা সেইখানে একজনের কুটীরে সাইকেল কখানি রেখে দিলেন। তারাও বেশ সেলাম করে তা রেখে দিলে, কারণ সংবাদ [illegible]। এখানকার লোকজনেরা তাঁকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জানে কারণ তিনিই, যতকিছু জমি বিলি করেন অর্থাৎ তিনি সেঠো হাকিম ওরফে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দোবস্ত ওরফে Land office। [illegible] দ্বিতীয় সাইকেল ওয়ালা মণিবাবুকে না জেনে তাদের উপায় নেই। কারণ বাজারে তাদের আসতেই হয় আর মণিবাবু হচ্ছেন বাজার-সাহেব অর্থাৎ Market Superintendent

এইবার নদীপার হইতে আরম্ভ করা গেল [illegible] কনকনে জল যেন [illegible]। তারপর ঠিক [illegible] জায়গায় [illegible] না থাকায় বেশ [illegible], [illegible] পৌঁছেই সকলে লাঠি [illegible] মনে নিশ্চিন্ত হলেন। কারণ পাহাড়ে উঠতে হইলে লাঠির ভরই প্রধান সম্বল।

রসদ সমেত ঝুড়ি মাথায় এতগুলি কুলি বরকন্দাজ ও বাবুর Expedition, বন ও মাঠ সরগরম করে চলল। [illegible] একটী [illegible] রাস্তায় পড়লাম। রাস্তাটী নূতন, জেমসেদপুর থেকে রাঁচি যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। মানভূম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কর্ত্তৃক রাস্তাটী নির্ম্মিত, সুবর্ণরেখা পার হ'লেই মানভূম জেলা, কাজেই আমরা চলছি মানভূম জেলা দিয়ে। রাস্তাটি দলমা পার হয়ে আরও কিছুদূর গিয়ে চাইবাসা-রাঁচি রোডে গিয়ে মিশেছে। চাইবাসা-রাঁচি রোড আবার অন্যত্র মেদিনীপুর রোড, সম্বলপুর রোড, উড়িষ্যার আঙ্গুল রোড ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত। এই নূতন রাস্তাটী জেমসেদপুরের মোটর-বিহারীদের বড় আদরের, [illegible] এই পথে রাঁচি অবধি [illegible] যাওয়া আসা করেন। [illegible] জেমসেদপুরের লোককে আগে চাইবাসা চক্রধরপুর হয়ে মোটরে রাঁচি যেতে হ'ত। তাতে অনেক ঘুরতে হ'ত। এ রাস্তাটীতে অনেক সুবিধা। অত ঘুরতে হয় না। ১৫০ মাইলের

২ সুবর্ণরেখা তীরস্থ পম্প হাউসের পার্শ্ব দৃশ্য [illegible]

মধ্যেই "রাঁচি-প্রাপ্তি" ঘটে। বরাবর মোটরে আসতে হ'লে কিন্তু আমরা যে রাস্তায় এসেছি এ রাস্তায় এলে চলে না। তখন আসতে হবে জেমসেদপুর থেকে পম্প-হাউস রোড ধরে সুবর্ণরেখার পম্প-হাউস ঘাটে।

সুবর্ণরেখা

এইখানে টাটার প্রকাণ্ড পম্প-হাউস্ রাতদিন কলরব করে সহরের জন্য অহোরাত্র জলের বন্দোবস্ত করছে। এখানকার ব্যবস্থা তো আর কল্‌কাতার মত নয় যে, ১০টা বাজলেই জল বন্ধ। এখানে জলের কায ২৪ঘণ্টা। বিরাট কারখানার জলের প্রয়োজন সকল সময়। তার-পর প্রায় দেড়লক্ষ অধিবাসীর জলের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা এখান থেকেই হয়।

রেখেছেন। নদী বাঁধা শুনে অনেকে একটু আশ্চর্য্য বোধ করবেন। এপার থেকে ওপার অবধি প্রায় হাজার ফুট লম্বা সিমেণ্টের জমাট প্রাচীরে বাধা পাওয়ায় জল গভীর হয়ে আটকে থাকে। এ তো পুকুরে বদ্ধ জল নয় যে, জল প্রাচীরে এসে আটকে থাকবে। এখানে স্রোত বইছে, কাজেই জল সেখানে অনবরত জমছে প্রাচীর যতক্ষণ তা আটকে রাখতে পারে ততক্ষণই রাখছে। তার চেয়ে বেশী হলেই প্রাচীরের উপর দিয়ে তা বয়ে যাচ্ছে। তাই প্রাচীরের একদিকে অগাধ জল ও অন্যদিকে প্রায় শুষ্ক বালুকাময় গভীর খাদ। সেই উচ্চ প্রাচীর ছাপিয়ে যে জল নীচে এসে পড়ে তাই ক্ষীণ ভাবে বয়ে গিয়ে নদীর অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে।

সুবর্ণরেখা—সাধারণ দৃশ্য [শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত।

সুবর্ণরেখা ছোট নদী নয়। বর্ষার সময় ঘোর বিক্রমে তর্জ্জনগর্জ্জন করে ছুটে চলে। নদী এখানে প্রায় ১০০০ এক হাজার ফিট চওড়া। স্থানটী দেখতে বেশ সুন্দর। ওপারে কিছুদূরে বিপুলকায় গম্ভীর-মূর্ত্তি দলমা। নদী কুলুকুলু করে বয়ে এসে এখানে বাঁধা পড়েছে। বার মাস, বিশেষ দারুণ গ্রীষ্মেও যাতে যথেষ্ট জল পাওয়া যায় —এবং যাতে এতবড় প্রকাণ্ড সহর ও কারখানায় কোনরূপ অসুবিধা না হয় এজন্য কোম্পানি নদীকে এখানে বেঁধে

জলপ্রপাতের ন্যায় নদী স্থানে স্থানে প্রাচীর ছাপিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ছে। একদিকে অগাধ জল, আর এক দিকে প্রায় শুষ্ক কঙ্কালসার বালুকাময় খাদ, মধ্যে ব্যব-ধান কেবল মাত্র এক সুদৃঢ় প্রাচীর ; যেন জীবনের এদিক ওদিক—অদৃষ্টের ঘোর পরিহাস !

সুবর্ণরেখার উৎপত্তিস্থল রাঁচির পাহাড়ময় প্রদেশ। একটী সুন্দর প্রপাতই নদীটির উৎপত্তিস্থল,নাম হুড্রুপ্রপাত। জলপ্রপাত—বিশেষ আবার এমন জলপ্রপাত—যেখান থেকে

সুবর্ণরেখার বাঁধ ছাপাইয়া জল পড়িতেছে　　[শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত।

এতবড় একটা নদী বয়ে আসতে পারে—বাংলা দেশে নেই বল্লেই চলে। কাজেই হুড স্বভাবতঃই নয়নাভিরাম দৃশ্য মধ্যে পরিগণিত। সিংভূমের সদর চাইবাসার কাছেও ২।১টা ছোটখাটো প্রপাত আছে এবং সেগুলিও দৃশ্য হিসাবে অতি সুন্দর। পাহাড়ের উপর দিয়ে চারিদিকে জলধারা ছুটে যাচ্ছে। নানাপ্রকার গাছপালা বনফুল তাদের আরও বাড়িয়ে তুলছে। তাদের একটার নাম টণ্ট ও অপরটীর নাম লুপুংগুটু। বাস্তবিক পক্ষে এদের প্রপাত না বলে ঝরণা বলা যেতে পারে।

এখন মোটরে এলে পম্পহাউস-ঘাটে মোটর গাড়ী পার করতে হবে। নদীর উপর কোন পুল এখনো তৈরী হয় নি। অনেকদিন থেকেই কথা আছে যে টাটা
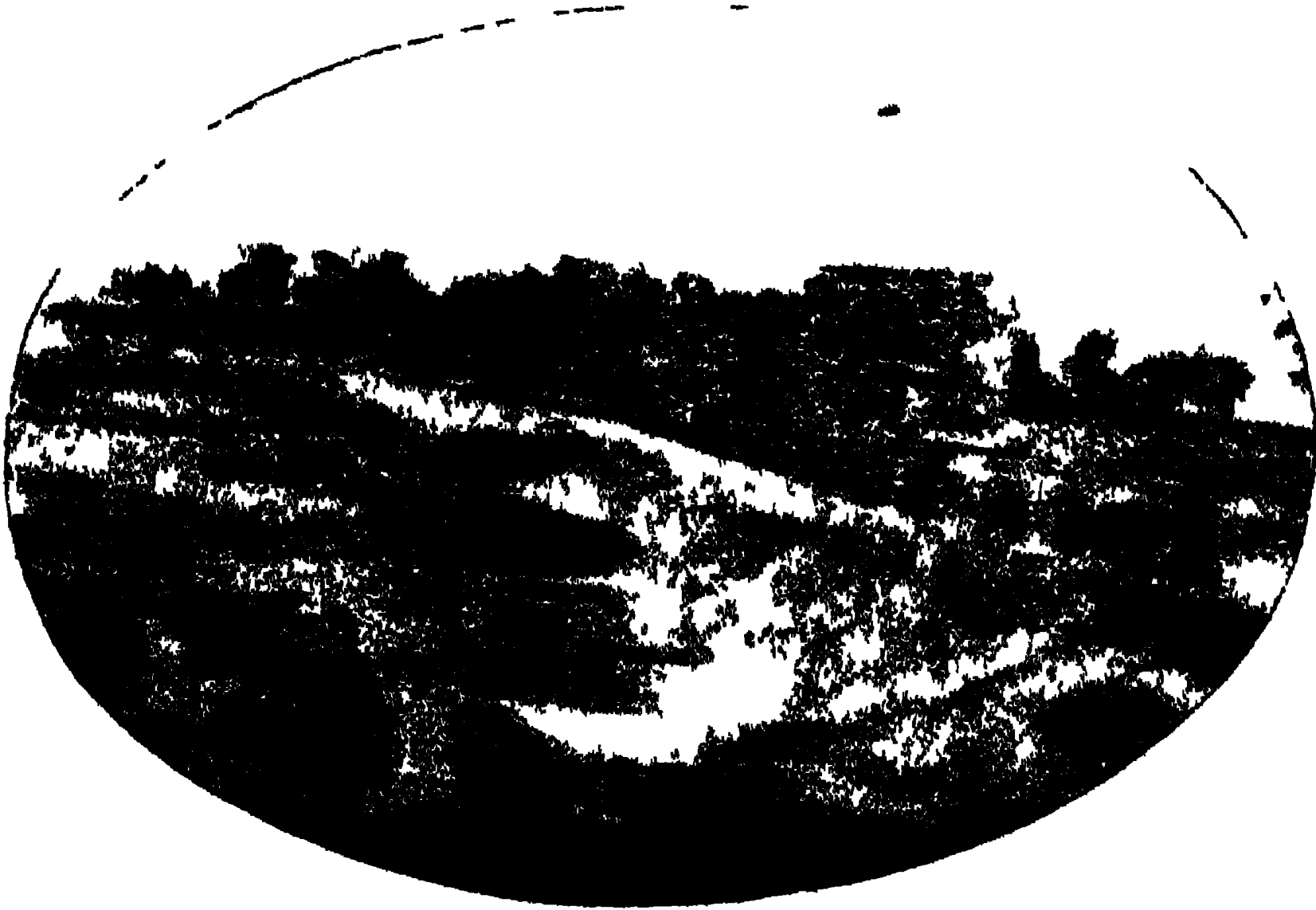
সুবর্ণরেখার বাঁধ—প্রাচীর ছাপাইয়া নীচে জল পড়িতেছে　　[শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত।

কোম্পানি প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটা পুল করে দেবেন কিন্তু কবে তা বাস্তবিক হবে তা বলা যায় না। তবে এ ব্যবস্থাও আছে যে, যতদিন না সেই পুল তৈরী হয় ততদিন খেয়ায় মটর পার হবার ব্যবস্থা থাকবে। তারও অবশ্য এখনও কোন ব্যবস্থা হয়নি। সুতরাং জল খুব কম থাকলে এখন কুলি লাগিয়ে ঠেলে পার করা যেতে পারে অথবা বাঁশে বেঁধে কুলির কাঁদে উঠেও গাড়ী পার হতে পারেন। তারপরই সেই নূতন পাকা রাস্তা যা রাঁচি পর্য্যন্ত গিয়েছে।

রাঁচির পথে

আমরা মাঠে ও বনপথে এসে এই রাস্তায় উঠলাম। যেখানে এসে পৌছিলাম তার একটা ছবি এইখানে দিলাম—ছবিখানি ফেরাবার পথে নিয়েছিলাম। তা থেকে বুঝতে পারবেন, দেখতে সে স্থানটী কেমন সুন্দর। রাস্তাটী এঁকে বেঁকে যেতে যেতে উঁচু হয়ে উঠেছে। দুপাশে দুটি পাহাড়। কাজেই স্থানটিও একটু উঁচু। সেই কারণেই রাস্তাটিকেও ক্রমশঃ উঁচু করতে হ'য়েছে। একদিকের পাহাড়ের গা কিছু-কিছু কেটে রাস্তাটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর একপাশে একটি নালায় পাহাড়ের গা বয়ে ঝরণার জল নেমে এসে বয়ে যাচ্ছে। স্থানটী অত্যন্ত নির্জ্জন। বাঘ-ভালুক অনেক আছে। ছাগলও গরুর ত কথাই নেই অনেক সময় মানুষ পর্য্যন্ত পাহাড়ের ওপর কাষ্ঠ-সংগ্রহে এসে এদের হাতে প্রাণ হারায়। প্রায় মাস কয়েক পূর্ব্বে এইস্থানে ৭জন লোক বাঘের কবলে প্রাণ হারিয়েছে। জেমসেদপুরের কয়েকজন সাহেব চেষ্টা করেও সেটাকে মারতে পারেন নি।

সে যাই হোক্ আমরা চলতে লাগলাম। হাতে সবার একখানি করে সুদীর্ঘ মারাত্মক লাঠিরূপ অস্ত্র, যা পাহাড়ে ওঠবার জন্য সুবর্ণরেখার তীরেই সংগ্রহ করেছিলাম। সত্যেশদাকে বলেছিলাম তাঁর বন্দুকটা সঙ্গে নিতে, তিনি রাজী হলেন না, বল্লেন যখন শিকারে যাচ্ছি না, সাহিত্যরথীদের সঙ্গে কেবলমাত্র দলমা দেখবার জন্য যাচ্ছি তখন ও আপদ কিছুতেই সঙ্গে নেওয়া হবে না। আমার কিন্তু কাযটা মোটেই ভাল ঠেকেনি তাই তার আগের রাত্রে প্রায় ১২টার সময় পুলিন বাবুর বাসায় গিয়ে তাঁকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাঁর বন্দুকটা ও ফটোক্যামেরা নিয়ে তাঁর আমাদের সঙ্গী হতে অনুরোধ করে এসেছিলাম। কিন্তু বেলা এখন প্রায় ৯টা, আর এই স্থান আমরা পার হচ্ছি তবুও তাঁর এখনো দেখা নাই। পাহাড় দুটীর নাম টোগো। জাপানী Admiral Togo কোনদিন এখানে শিবির সন্নিবেশ করেছিলেন কিনা তার অবশ্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দলমার পথে গিরীবর্ত্ম—রাঁচি রোড [শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত।

(ক্রমশঃ)

রোগের মূল কোথায়?

শ্রীমৎ লগুড়ানন্দ স্বামী

নব্যতন্ত্রের যুবকেরা আজকাল বাঙ্গালীর ঘরের বেচারা বিধবাদের উপর হঠাৎ সদয় হ'য়ে, তাদের একটা কূল-কিনেরা ক'রে' দেবার জন্য উঠে পড়ে' লেগেছে। আর সেকেলে বুড়োরা বিধবা-বিয়ের নাম শুনেই আঁত্‌কে উঠেছে—তারা বলে, ছোঁড়াগুলোকে এ আবার কি রোগে ধর্‌লো? বিধবারা সিঁথির সিঁদুর ঘুচিয়ে, হাতের শাঁখা খসিয়ে সাদা থান প'রে' একবেলা আধপেটা খেলে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়ে যাচ্ছে, তারা কোন হাঙ্গামা কর্‌ছে না, কারো কাছে petition দাখিল কর্‌ছে না, বুক ফেটে গেলেও মুখ ফুটে কথাটি পর্য্যন্ত বল্‌ছে না, অথচ নবীন নবীনারা তাদের জন্য এত লাফালাফি করে কেন? এ রোগের মূল কোথায়? এই নব্য যুবকদের বর পণের দাবীর জ্বালায় একেত লোকে আইবুড় মেয়েদের বিয়ে দিতেই অস্থির, তারপর যদি খরচপত্র ক'রে' বিধবা মেয়েদের বিয়ে দিতে হয়, তাহ'লে' ত একেবারে চক্ষু স্থির। বাঙ্গালীর বাড়ীতে ত টাকার গাছ পোতা নেই যে, ডাল ধরে নাড়া দিলেই ঝন্ ঝন্ ক'রে' টাকা পড়বে আর এই বেকার সমস্যার দিনে বেওয়ারিশ ছেলেগুলো 'কোঁচড়' ভ'রে সেই টাকা কুড়িয়ে নিয়ে পিটটান দেবে? রও বাপু! আগে আইবুড়ো মেয়েগুলো কোন রকমে পার হোক্, তার পর তোমরা নব্যবাবুর দল বিধবাগুলোকে নিয়ে যা হয় একটা কাণ্ডকারখানা ক'রে ফেলো, আমরা ততক্ষণে নিমতলার ঘাটে গিয়ে চোখ বুজিয়ে শুয়ে পড়্‌বো। কিন্তু বাবুদের সবুর সয়না। তারা বলে, দেরি কর্‌তে গেলে বিধবাদের বয়স কেটে যাবে, তখন সেই বুড়ো মাগী-গুলোকে বিয়ে কর্‌তে যাবে কে? এইখানেই ত রোগের মূল।

বুড়োরা নেহাৎ আনাড়ী কিনা তাই রোগের মূল ধর্‌তে পারে না। তারা বলে, হিঁদুর ছেলে হ'য়ে বিধবা-দের বিয়ে দিতে চায় কোন্ আক্কেলে কিন্তু তারা ভেবে দেখে না, নিজেরাই ছেলেদের মাথা খাচ্ছে। ছেলেরা হিঁদুর আঁতুড় ঘরে জন্ম নিচ্ছে বটে, কিন্তু তাদের লালন পালন কর্‌ছে, বিলেতের সাহেবেরা। ছেলেগুলো গোটা পাঁচ ছয় বছর হিঁদুর অন্দরে খেলা ধূলো ক'রে' চির-জীবনের মত হিন্দুত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ ক'রে' ঢুকে যাচ্ছে সাহেবদের ধর্ম্মশালায়। শৈশবে বর্ণ পরিচয় হ'তে না হ'তেই তারা শেখে ইংরাজি ভাষা, ভাবে ইংরাজের ভাব, চলে ইংরাজের চাল চলনে। শেষে ইংরাজের আফিসের দোরে চির জীবনের মত হাঁটু গেড়ে বসে। বাঙ্গালীর ছেলেরা জন্মে বাঙ্গালা দেশে বটে কিন্তু হাওয়া খায় ইংলণ্ডের। ছেলেরা যতই ইংরাজীনবীশ হয়, পাশের পর পাশ ক'রে' যায়, ছেলের বাবার ততই আহ্লাদ বেড়ে যায়। বড় পায়া পাবে বলে জলের মত টাকা খরচ ক'রে' ছেলেকে বিলেত পর্য্যন্ত পাঠিয়ে দেয়। ছেলে বিলেত গিয়ে দেখে সাহেবদের ঘরে অবিবাহিতাদের বিয়ে হয়—বিধবাদের বিয়ে হয়—সধবারাও মাঝে মাঝে মুখ বদলায়। তারপর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসে যদি সাহেবী কায়দায় আবদার ধ'রে' বসে, বিধবাদের বিয়ে দাও, তোমরা বুড়োর দল আপত্তি কর্‌লে চলবে কেন? তোমরা সেকেলে ধরণে শিখে রেখেছ, হিঁদুর ঘরের বিধবার বিয়ে হয় না, কিন্তু একেলে ধরণে শিক্ষিত বাবুরা সে কথা শুনবে কেন? তারা পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির নজির দেখাতে পারে, মেয়েরা মৌরসী সম্পত্তির মত একাধিক্রমে পাঁচ সাত বার (যতবার ইচ্ছা।) হস্তান্তরিত হচ্ছে, তোমাদের হিঁদুর ঘরের মেয়েরা কি গর্‌কায়েমী সম্পত্তি যে হস্তান্তর কর্‌তে গেলেই খাসদখল হ'য়ে সমাজের হাত ফস্‌কে যাবে? সব সমাজে মেয়েরা কায়েমী সম্পত্তি, হাত ফেরা হয়, দান খয়রাত চলে, কিন্তু হিঁদুর মেয়েরা সমাজে এত ছোট হ'য়ে থাক্‌বে এটা বাবুদের প্রাণে সহ্য হবে কেন? তারপর, তোমরা বুড়োর দল হাজার দশেক টাকার লোভে বাবুদের বিয়ে দেবার সময় উপস্থিত কর্‌বে একটা বারো তেরো বছরের ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে নাবালিকা। (বর্ত্তমানে মনুসংহিতার সাহেবী সংস্করণে গৌরীদানের ব্যবস্থা অশুদ্ধ, অন্যায় ও অত্যাচারমূলক) সেই নাবালিকার পাশে দাঁড়িয়ে তার ষোল বছরের একটা বিধবা বোন (বিধবা হ'লেও যৌবন ত সধবা বিধবা

মানে না।) নব্যবাবুর শুভদৃষ্টিটা তখন কার উপর আগে পড়ে বল ত?

বর্ত্তমানে বঙ্গ সাহিত্যরথীরা ভেবে দেখেছেন, বিধবা বিবাহ সমাজে চালাতে না পার্‌লে, অচিরে উপন্যাস রাজ্যে নায়িকার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হবে। হিঁদুর ঘরের মেয়েরা বারো বছর বয়স হ'তে না হ'তেই বিয়ের ফুল ফুটিয়ে শ্বশুরবাড়ীর রান্নাঘরের কোণে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। সেখান থেকে তাদের টেনে এনে উপন্যাসের নায়িকা করতে হ'লে পুলিশের হাতে পড়্‌বার ভয় আছে। কাজেই এতকাল ব্রাহ্ম খৃষ্টানদের ঘরের মেয়েদের নিয়ে সাহিত্যিকেরা উপন্যাসে প্রেমের বন্যা ছুটিয়েছিলেন কিন্তু মুষ্টিমেয় ব্রাহ্ম-খৃষ্টানের মেয়ে নিয়ে কতকাল নাড়াচাড়া চলে? বিশেষতঃ বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ভাষায় উপন্যাসরথীদের সংখ্যা বেজায় বেড়ে গেছে (বিয়ের উপহারের কৃপায় ও বটতলার সাহিত্য-মন্দিরের মারফতে)। সকল রথীই যদি বেচারা ব্রাহ্ম-খৃষ্টানের মেয়েদের হাত ধরে টানাটানি করে, তা'হলে ফৌজদারী সোপর্দ্দ হ'বার ভয় আছে, লাঠির চোটে মাথা ফেটেও যেতে পারে, কাজেই রথীরা তাদের পরমভক্ত নব্য বাবুদের পরামর্শ দিলেন, তোমরা সমাজে বিধবা বিবাহের আন্দোলন কর নতুবা আমাদের প্রাণান্ত উপস্থিত —বাঙ্গালা দেশে আর নায়িকা খুঁজে পাইনে। বিধবা নায়িকাদের বিয়ে দিতে না পার্‌লে উপন্যাস বিয়োগান্ত হ'য়ে যায়, এদিকে সাহিত্য-মন্দিরের কর্ত্তারা রথীদের উপর নোটীশ জারি করেছেন,বিয়োগান্ত উপন্যাসের কাপি-রাইট্ আর তাঁরা কিনবেন না, কেননা বিয়ের বাজারেই তাঁদের বই বিক্রী হয় অধিক (দপ্তরী ও ছবিওয়ালার কেরামতে আর পুস্তকের নামের চটকে—লেখকের লেখার গুণে নয়) বিয়োগান্ত উপন্যাস বিয়ের মেয়েকে উপহার দিলে শুভ বিবাহে অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। কাজেই উপন্যাস মিলনান্ত করা চাই। দু'একটী চতুর সাহিত্যরথী বাঙ্গলার ঘরের বিধবা নায়িকাকে বাঙ্গালায় মিলন না কর্‌তে পেরে জাহাজ ভাড়া দিয়ে আমেরিকা,চীন বা জাপানে নিয়ে গিয়ে মিলন করে' দিয়েছেন কিন্তু সব নায়কের ত জাহাজ ভাড়া দেবার ক্ষমতা নেই, কাজেই সাহিত্যরথী, অশ্বারোহী, ও পদাতিকেরা মহাফাঁপরে পড়' গেছেন। সেইজন্যই ত আজ বাঙ্গালা দেশে বণীর হাঙ্গামার মত বিধবা বিবাহের হাঙ্গামা উপস্থিত হয়েছে। এখন বুড়োরা বুঝ্‌তে পেরেছেন কি—এ রোগের মূল কোথায়?

নিবেদন

শ্রীসুধাংশুকুমার চক্রবর্ত্তী

১

আঘাত ভরা দানকে তোমার
আর করি না ভয়,
হৃদয় আমার জেনেছে আজ,
ওসব কিছু নয়।
জেনেছি আজ আঘাত মাঝে,
তোমার দয়া আছেই আছে,
আঘাত স'য়েই পাব তোমার
দয়ার পরিচয়॥

২

কোন্ দরদী বল্লে আমায়
"ওরে অসাবধান!
দেখিস্ যেন হয় না রে তাঁর
দানের অপমান।
নে তুলে তুই হরষভরে,
ব্যথার বাঁশি মাথায় ক'রে,
তাঁহার দেওয়া আঘাত এ যে
পরম সুখময়॥"

৩

জীবনতরী কর্‌বে আমায়
ব্যথার নদী পার,
বুকের বাণী তাই তো দয়াল,
করেছি আজ সার,
তাই আমারই আঁধার বুকে,
উজল প্রদীপ জ্বলে সুখে,
নিরাশ হিয়ায় এখনো তাই
জয়ের আশা রয়॥

কাজের কথা

বাণিজ্য বিস্তারে চলচ্চিত্রের প্রভাব ঃ—বিলাতের মর্ণিং পোষ্ট, একখানা খুব পুরাতন সংবাদ পত্র ; সম্প্রতি ইঁহার ঘ্রাণ-শক্তি খুব তীব্র হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে। ইনি সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে, এই যে চতুর্দ্দিকে বায়স্কোপে আমেরিকান ছবি দেখান হচ্ছে এতে বৃটিশজাতির ব্যবসাবাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে এবং আমেরিকানদের ব্যবসাবাণিজ্য খুব সহজেও নীরবে বিস্তৃত হচ্ছে—বিশেষতঃ প্রাচ্যে ইহার প্রভাব খুব প্রকট হইতেছে। এই সব ছবি দেখে প্রাচ্যদেশবাসীদের মনে একটা ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে যে আমেরিকান যা কিছু সবই খুব ভাল—আমেরিকান ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক-উপাদান, মোটর-গাড়ী, বেশভূষা, বিলাস দ্রব্য প্রভৃতি নিত্য তাদের চোখ সামনে পড়ছে এবং তা' থেকে তারা এই একমাত্র সত্য সংগ্রহ করে নিচ্ছে যে আরামে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ কর্ব্বার একমাত্র আদর্শ আমেরিকা। কথাটা ষোল আনা ঠিক না হ'লেও কতকটা বটে কিন্তু বেশী বড় কারণ হচ্ছে 'বৃটীশ মেড' জিনিসের দাম বেশী—বৃটীশ কথাটা জুড়ে সাধারণ জিনিসকে তাঁরা এত বেশী দামে বেচেন যে, এই আলোর যুগে লোকেরা নামের ধোঁকায় পড়ে বোকা বনে যেতে আর রাজী নয়। পৃথিবীর পণ্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাম সস্তা না কর্ত্তে পারলে খালি ভূয়ো 'বৃটিশমেড' নামে আর চলচে না—এটা মনে রাখতে পারলেই আর কোন অসুবিধা হবে না। বৃটীশ ফিল্মই বা আমেরিকান ছবির মত চলে না কেন? যাতে চলতে পারে সে ব্যবস্থা কর্ব্বার শক্তি যদি তাঁদের থাকতো, তা হলে কি আজ নাকে কাঁদতে হোত।

ছেলেখাবার যম ঃ—নবাবগঞ্জ থানার পুলিশ, ঢাকা কোর্টে একটী অত্যাশ্চর্য্য মানুষ ধরিয়া আনিয়াছেন। সে দেখিতে বিকৃতাকার। লোকটা বারোটি শিশু খাইযাছে বলিয়া প্রকাশ। ত্রয়োদশ শিশুটীকে খাইবার সময় লোকটা ধরা পড়ে!—কৃশ চেহারা লম্বা দাঁড়ি গোঁফযুক্ত এই শিশুভুক মানুষটাকে দেখিলে বাস্তবিক ভয় হয়!—একেই কি বলে "মিট্‌মিটে ডাইনী ছেলে খাবার যম?"

ধর্ম্মে ঔদাসীন্য ঃ—অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় মন্দির ও দেবালয় সংস্কারের অভাবে ধ্বংসোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। নিযমিত পূজা আরতির কোন ব্যবস্থা নাই। এইভাবে বহু দেবালয় ও মন্দির ধ্বংস প্রাপ্ত হইযা গিয়াছে!—কত গ্রামে এখন আর সন্ধ্যার সময় আরতির শঙ্খঘণ্টা রব শুনিতে পাওয়া যায় না—ধর্ম্মের অবনতি মানুষের মানসিক অবনতির পরিচায়ক। এ বিষয়ে হিন্দু জনসাধারণ ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এখন ধর্ম্মভাব প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে—ধনশালীদের ধন এখন মোটর, মেয়েমানুষ প্রভৃতি সভ্যতার উপাদান সংগ্রহে ব্যয়িত হয়—ধর্ম্মের জন্য হিন্দু আর তেমন আগ্রহান্বিত নয—কেন?

ফ্রান্সে নারীসমস্যা ঃ—ফ্রান্সে এক মহা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে! তথায় বর্ত্তমানে বিবাহযোগ্যা কুমারীর সংখ্যা বেশী। গত মহাসমরে ফ্রান্সে বহুলোক ক্ষয় হইয়াছে, বর্ত্তমানে দেশের লোকসংখ্যা বাড়াইতে ফ্রান্স এই যুবতীদিগের উপর নির্ভর করিতেছেন। বৈদেশিক পুরুষের সহিত বিবাহ দেওয়া, বহুবিবাহ প্রচলন করা প্রভৃতি কয়েকটী উপায়—কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব দেখিয়া সম্প্রতি নাকি স্থির হইয়াছে, যে ফরাসীকুমারীগণ তাঁহাদের যথেচ্ছা পুরুষ নির্ব্বাচন করিয়া

সন্তান উৎপাদন করাইবেন। গভর্ণমেণ্ট সেই সকল সন্তানের ভরণ পোষণ ও পালনের ভার গ্রহণ করিবেন। বাপের ঠিক না থাকাটা ফরাসীদেশে আর অগৌরবের ব্যাপার না হওয়াতে ফরাসী সতীত্ব মনুষ্যত্বের খুব প্রসারক হবে—তবে এর ফল কি হয় তা না দেখে এখনই আমরা এমন প্রস্তাবকে বাহবা দিতে পার্‌লুম না।

এম্ বি ডিগ্রীর অসম্মান ঃ—বিলাতের চিকিৎসা বিভাগের কর্ত্তারা নভেম্বর ১৯২৪এর পর কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-বি ডিগ্রিকে আর গণনার মধ্যে লইবেন না এরূপ স্থির করিয়াছেন। এখানে ধাত্রী বিদ্যা শিখাইবার পদ্ধতিতে নাকি অনেক ত্রুটী আছে এবং তাহা সংশোধন করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হয়েন নাই। এই লইয়া ডাক্তার মহলে বড় গোলযোগ পড়িয়াছে ষ্টেটসম্যানের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকালীন জনৈক প্রসিদ্ধ ডাক্তার নাকি বলিয়াছেন যে ১৮৮৬ অব্দের বৃটিশ মেডিক্যাল এ্যাক্ট অনুসারে তাঁহারা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রদত্ত উপাধিকে নামঞ্জুর করিতে পারেন না। শুনা যাইতেছে ইহার জের নাকি প্রিভিকাউন্সিল অবধি গড়াইবে আমরা বলি আপোষ করাই উচিত বিশেষতঃ স্যার আশুতোষের পরলোকগমনের পর, লড়িবার মত বুদ্ধি ও শক্তি সম্পন্ন লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আর নাই—তখন এসব জিনিষকে পর্ব্বত করে তোলা উচিত নয়।

আগামী ১৬ই ১৭ই জ্যৈষ্ঠ—জেমসেদপুর—বাণীভবনে সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্মিলন হইবে। সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রভূষণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এবং সঙ্গীত শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় সঙ্গীতার্ণব। প্রত্যহ বৈকাল ৫টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিত অভাবে প্রবন্ধ প্রেরণ একান্ত বাঞ্ছনীয়। নিম্নলিখিত ১১টী বিষয়ের মধ্যে যে কোন ৪টী প্রবন্ধ পুরস্কৃত হইবে। ১। জেম্-সেদপুরের ইতিহাস, ২। সিংভূমের ও ৩। বর্দ্ধমান জেলার ইতিহাস, ৫। হিন্দু সমাজের সংস্কার কিরূপ হওয়া উচিত ৫। বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, ৬। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য, ৭। মহামান্য টাটার সংক্ষিপ্ত জীবনী, ৮। বাঙ্গালীর স্বাবলম্বনের উপায়, ৯। সেকালের ও একালের বাঙ্গালা, ১০। স্বধর্ম্মানুরাগের উপকারিতা ১১। জগতে নারীর আসন।

জ্ঞানী সোলেমানের উক্তি

শ্রীবাঁশরীভূষণ মুখোপাধ্যায়

(ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ান)

সকল কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইও না, তাহা হইলে হয়তো কোন্ দিন শুনিবে যে তোমার ভৃত্য তোমাকে গালি দিতেছে।

যিনি ভৃত্যকে তাহার বাল্যকাল থেকে অতিরিক্ত আদর দিতে থাকেন, তিনি দেখিবেন যে, বড় হইলে সে তাঁহাকে অপমান করিবে।

যদি তুমি প্রভুর বিরাগভাজন হও, তাহা হইলে পদত্যাগ করিও না; কারণ পরে তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া তোমার গুরু অপরাধের জন্য ক্ষমাও পাইতে পার।

বিনয়ও নম্র উত্তর ক্রোধকে শান্ত করে।

বক্তৃতার আরম্ভ অপেক্ষা উপসংহারটী ভাল করিবে।

অলস লোকের পথ কণ্টকাকীর্ণ।

কার্য্য-তৎপর লোক রাজার নিকট সম্মান পাইবে; সে কখনও হীনাবস্থায় থাকিবে না।

যে পিতামাতার উপর অত্যাচার করিয়াও বলে যে, ইহা পাপ নয়, সে যমের সহচর।

জ্ঞানীপুত্র পিতার আনন্দ বর্দ্ধন করে; কিন্তু নির্ব্বোধ পুত্র মাতার কষ্টের কারণ।

ক্রোধন-স্বভাব লোকের সহিত বন্ধুতা করিও না।

যে বিবাদকারীকে তিরস্কার করে, সে নিজেই লাঞ্ছিত হয়; আর যে দুষ্ট লোককে ভৎর্সনা করে, তাঁহার কলঙ্ক রটিত হয়।

যে বিবাদের কথা কোন উল্লেখ না করে; সে (বন্ধু-বিচ্ছেদের পর) মিলনের পথমুক্ত করে, বিপদের—কারণের মীমাংসা চেষ্টা পুনর্মিলনের অন্তরায়।

মহাত্মা গান্ধীর

ইয়ং ইণ্ডিয়া

পত্রিকার সার সঙ্কলন

বাঙলা

প্রথমশ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণের নিন্দা—আমার প্রথমশ্রেণীর সেলুনে ভ্রমণ করিবার বন্দোবস্ত করার জন্য ফরিদপুর অভ্যর্থনা সমিতিই দায়ী। তাঁহাদের এই অযথা অর্থব্যয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তরে বলেন তাঁহারা আমার স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় এইরূপ করিয়াছেন; —কিন্তু আমার মনে হয় যদি আমাকে এইরূপ বিলাসের মাঝখানে ভ্রমণ করিতে হয় তবে সে ভ্রমণে কোন কার্য্যই সাধিত হইবে না; সাধারণের অনধিগম্য সিমলা শিখরে বসিয়া বড়লাট যেমন সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয় জয় (?) করিয়া সুশাসন করেন, আমিও যদি প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করি তবে তাহার অপেক্ষা বেশী কিছু করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। যখনই আমার মনে হয় যে আমি তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে অশক্ত তখনই আমি বুঝিতে পারি যে আর্ত্তের সেবারও সেই পরিমাণে আমি অনুপযুক্ত। যদি আমি কখনও তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ না করিতাম তবে দরিদ্রের ব্যথা যে কি বস্তু তাহা কখনও সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। আমার মনে হয় যে কেবল অসমর্থ অবস্থায় সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। যাঁহারা আমার যথার্থ বন্ধু তাঁহারা এই সীমা অতিক্রম করিতে আমাকে যেন প্রলুব্ধ না করেন; যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করা আমার পক্ষে অহিতকর মনে করিব তখন বুঝিব, ভ্রমণ করিয়া লোকসেবা করা আমার সাধ্যাতীত; কারণ তাহা ভগবানের ইচ্ছা নয় বুঝিতে হইবে। তিনি কখনও স্পষ্টভাবে কোন কোন কার্য্যে বাধা দেন না তবে ইঙ্গিতে জানাইয়া দেন। সেই ইঙ্গিত টুকু আমাকে বুঝিতেই হইবে। অভ্যর্থনা-সমিতির ব্যবস্থার বিপর্য্যয় করিতে আমি চাই না তবে আমার বন্ধুগণের প্রতি আমার সানুনয় অনুরোধ যে তাঁরা স্নেহের আতিশয্যে আমাকে যেন ব্যতিব্যস্ত করিয়া না তুলেন। সামঞ্জস্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যতদূর সাবধানতা সুশোভন হয় ততটুকু তাঁরা করুন আমার আপত্তি নাই কিন্তু ভগবানের উপরেও কতকটা নির্ভর করা উচিত—এইরূপ ভ্রমণ তাঁর যদি অভিপ্রেত না হয় তবে কাহারও সাধ্য নাই যে তাঁহার ইচ্ছা ঠেকাইয়া রাখে। উপরন্তু আমি নিজে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুব বেশী সতর্ক। এস্থলে ইহাও আমি বলিতে চাই যে আমার প্রতি আদর যত্ন ও স্নেহ প্রদর্শনে অন্য কোনও প্রদেশ এমন কি গুজরাটও বাঙ্গালার সমকক্ষ নয়—বাঙ্গলায় আসিলে মনে হয় না যে আমি আমন্ত্রিত বা অভ্যাগত—মনে হয় যে আমি তাঁহাদের অত্যন্ত আপনার!

উন্মাদ বাঙ্গালীঃ—বাঙ্গালীরা সত্যই উন্মাদ। দেশবন্ধু জাতীয় কার্য্যে তাঁর প্রাসাদের মত বাড়ী ট্রাষ্টিদের হাতে সঁপে দিয়েছেন। আমি জানি বাড়ীর উপর কিছু দেনা আছে কিন্তু তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর রাজার মত ব্যবসায় ফিরে এসে শীঘ্রই তা শোধ করতে পারতেন। সেই বাড়ীতে ঢোক্‌বার সময় আমি মনে দুঃখ অনুভব না করে এবং চোখের জল না ফেলে থাকতে পারিনি। দার্শনিকের মত আমি জানি যে এ বাড়ী ছেড়ে তিনি মায়ার বোঝা নামিয়ে দিয়েছেন কিন্তু সংসারের দিক

দিয়ে ভেবে দেখলে দেখা যায় যে লক্ষ লক্ষ লোকেই ঐ রকম দেনা-জড়ান বাড়ীতে অস্বস্তির মধ্যেও পরমানন্দে বাস কর্ত্তে চায়, সেইজন্যই সেই বাড়ীতে প্রবেশ কর্ব্বার সময়, সেই ঘরে—যে ঘরে কয়েকদিন পূর্ব্বে ভারতের এই গৌরবস্বরূপ সেবক বাস কর্ত্তেন—বাস কর্ত্তে গিয়ে আমি আত্মসম্বরণ করতে পারি নাই। কিন্তু এই তাঁর পাগলামীর শেষ নয়, তিনি অসুখে ভুগছেন, তিনি দুর্ব্বল, এমন কি তাঁর উঠতে বসতেও কষ্ট হয় তাঁর কণ্ঠস্বরে আর সে জোর নাই তবুও তাঁকে সভাপতিত্ব কর্ত্তে হচ্ছে—হাততালির লোভে নয়, দেশের প্রকৃত সেবা কর্ব্বার জন্য। তিনি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে বসেছিলেন। তাঁর বর্ত্তমান মতামত ও অবস্থা সম্বন্ধে যাঁরা কোন আবশ্যকতা বুঝতে চান না, তাঁদের সঙ্গে যুক্তি করবার জন্য—তাঁদের বোঝাবার জন্য।

বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি একাই পাগল নয়, তাঁরই মত আর একজন পাগল আছেন তিনি হচ্ছেন আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, খদ্দরের কথা বলবার সময় তিনি আত্মহারা হয়ে যান, কখন মঞ্চে পা ঠোকেন আরও কত কি করেন। বাঙলায় বল্‌তে বল্‌তে হয়ত মাঝে ইংরাজিতেই খানিকক্ষণ বলে ফেলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়ের ভাবে তিনি এত মগ্ন হয়ে যান, যে তিনি ভুলে যান যে বাঙ্গালীদেরই সামনে তিনি বলছেন। এতে যে কেউ কিছু মনে কর্ত্তে পারে তা তিনি গণনার মধ্যেও আনেন না। যারা তাঁকে জানেন তাঁরা তাঁকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলেই জানেন—তিনি বিজ্ঞান বিদ্যালয়কে প্রাণের মতই ভাল বাসেন, তাতে তিনি তাঁর আত্মা সমর্পণ পর্য্যন্ত করেছেন। কিন্তু তিনিও খদ্দর-পাগল। তিনি তাঁর ভালবাসাকে খদ্দর ও বিজ্ঞানকে ভাগাভাগি করে দিয়েছেন কিম্বা হয়ত তিনি খদ্দরকেও বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ফল ভাবেন। যাই হোক্ বিজ্ঞানবিদ্ হয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নাড়া চাড়া করে প্রকৃতির কাছ থেকে তার গুপ্তদান গ্রহণ কর্ব্বার চেষ্টা ছেড়ে চরকা চালান এক পাগল ছাড়া কেউ করতে পারে না। এ রকম অনেক ভাবোন্মাদ বাঙ্গালীদের মধ্যে আছেন, এ দুটী তাঁদেরই নমুনা, আমি আরও অনেক পাগলের কথা বল্‌তে পারি কিন্তু এই দুইজনের উদাহরণই বোধ হয় যথেষ্ট হবে।

বারাকপুরের প্রবীণ প্রাজ্ঞঃ—বারাকপুরে স্যার সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি শুনেছিলুম যে তিনি অসুস্থ এবং বার্দ্ধক্য বোধ হয় তাঁহার লৌহের মত দৃঢ় দেহযষ্টির উপর তার দৌর্ব্বল্য বিস্তার কর্চ্চে। আমি সেইজন্যই তাঁকে অভিবাদন কর্ত্তে যাবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলুম। আমার অনেক কার্য্য তিনি অনুমোদন করেন না জানি, তবুও বর্ত্তমান বাঙ্গলার গঠয়িতা ও ভারতীয় রাজনীতির প্রবর্ত্তক হিসাবে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা একটুও কম হয়নি। যেদিন শিক্ষিত ভারত তাঁর মুখের কথায় উঠত বসত, সে গৌরবময় দিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেইজন্যই তীর্থযাত্রার আনন্দ প্রাণে নিয়ে আমি বারাকপুরে গিছলাম। নদীর ধারেই তাঁর প্রাসাদতুল্য আবাস—আমি ভেবেছিলাম গিয়ে হয়ত তাঁকে শয্যাশায়ী দেখব কিন্তু গিয়ে দেখলাম তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যৌবনের আনন্দ-হাস্য ঠোঁটে নিয়ে আমায় অভ্যর্থনা করলেন। কথায় কথায় তিনি বল্লেন যে তাঁর স্মৃতি শক্তি এখনও বেশ প্রখর আছে এমন কি তিনি ছেলেবেলাকার কথাও সব মনে করে বল্‌তে পারেন। তাহার বয়স ৭৭ বৎসর হলেও মালবীজির মত তাঁর নিজের শক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তিনি বল্লেন যে আমি ৯১ বৎসর অবধি বাঁচবো ধরে নিয়েছি এবং ততদিন পর্য্যন্ত আমার উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি এমনিভাবে সতেজ রাখতে পারবো। আমি বাঙ্গালা ত্যাগ ক'রে যাবার পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ কর্ব্বার জন্য বোলে, বল্লেন—যদি আপনার বারাকপুরে আসবার সুবিধা না হয়, তাহলে আমিই আপনার কাছে যাব, কারণ আপনাকে কোন রকম অসুবিধায় ফেলাতে চাই না। তাঁরই এই অদ্ভুত জীবনী-শক্তির মূল হচ্ছে তাঁর নিয়মিত ভাবে জীবন যাপন করা। কোন কারণে রাত্রে তিনি কলিকাতায় থাকেন না—এবং এও বলা চলে যে বারাকপুরে যাবার শেষ গাড়ী ধর্ত্তে তিনি কখনই ভুল করেননি। তিনি বলেন যে কঠিন কাজের জন্য এবং ভারতের সেবার জন্য এই নিয়মিত ভাবে জীবন যাপন করা একান্ত আবশ্যক।

বালক

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন

আট বছরের ছেলে নীরু। সে যখন খুব ছেলেমানুষ তখন তার একবার ভারী অসুখ করেছিল। তার মা'র দেবদ্বিজে বড় ভক্তি ছিল; বিশেষ রোজগারের ভার আমার উপর থাকায়, তিনি ফস্ করে মা কালীকে একটা পাঁঠা মানসিক করেছিলেন। দেবতার দয়াতেই হোক বা ডাক্তারের কেরামতীতেই হোক নীরু আমার তার পর থেকেই আস্তে আস্তে সেরে উঠ্‌ল। কিন্তু আজ দি, কাল দি করে মা কালীর মানসিক পূজা আর দেওয়া হয়ে উঠল না। কারণ কালী মা তো আর হিন্দুস্থানী দ্বারবান তাগাদায় পাঠান না—যারা দুএকদিন হাঁটাহাঁটির পরই ভদ্রলোকের মনে ঘা দিয়া এমন কথা বলে যায় যাতে যেমন করে হোক তার টাকা তখনি দিতে ইচ্ছা করে।

প্রসাদের জন্য যাঁরা বিশেষ করে মা কালীকে গাঢ়ভক্তি করেন, এমন হিতৈষীরা বল্‌তে লাগলেন "ওহে কালীর কাছে মানসিকটা আর ফেলে রেখ না—জান তো মা আমাদের কাঁচা-খেকো দেবতা—আর অন্য ঠাকুরের কাছে যা চালাকি করো কিন্তু মাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না" সত্যই আমার ফাঁকি দেবার ইচ্ছে ছিল না এবং মাঝে মাঝে মাকে সেজন্য মনে মনে বলিয়া দিন নিতুম—এ মাসে মুদীর দোকানে দিতেই সব ফুরল। আর মাসে ডাক্তারের বিল, কয়লাওয়ালা গয়লার ফর্দ এইসব দেনাগুলি এমন পর্য্যায়ক্রমে সাজান থাকত, যাতে মাহিনার দিনেই জমা খরচের কাজ শেষ হয়ে যেত, তার পর যা করে হাওলাৎ বরাতে—গরীব কেরাণীর এর টুপি তার মাথায় আর তার টুপি এর মাথায় করে চালানোর বিদ্যাটা খুব জানা আছে তাই কোনরকমে তারা চালিয়ে নিতে পারে। মা অবশ্য দিন ফেলাগুলো মঞ্জুর কর্ত্তেন কিনা জানিনা তবে একদিকে সেই নেওয়া দিন যত নিকটবর্ত্তী হত ততই মনে মনে দেনার হিসাব আওড়ে নিয়ে আবার একটা লম্বা দিন নেবার মৎলব কর্ত্তুম—এতে মনে বেশ লজ্জাবোধ হত। সত্যই মনে হত যেন একটা ভালমানুষ পাওনাদার কড়া তাগাদা করে না বলেই সে যেন কিছু পায় না। যা হোক মনে মনে হেসে বল্‌লাম "পেসাদ পাবার আশা না থাক্‌লে বোধ হয় এতটা ভক্তি হ'ত না"।

আজ দিন পনেরো হলো একটা নিখুঁত পাঁঠা কেনা হ'য়েছে। পাঁঠাটা আমাদের উঠানেই বাঁধা থাক্‌ত। আমার এক প্রতিবেশী একদিন সকালে তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পাঁঠাটা কেমন হ'ল দেখ্‌তে এসেছিলেন। ছেলেটি বল্‌ল "বাবা ছাগলটা কি হবে" প্রতিবেশী অমনি জিভ্ কাটিয়া বলিলেন "ছি ছি, ওকথা মুখে আনতে নেই বাবা—ঠাকুরের জিনিষ"। তাঁর মুখ একথা বল্‌লেও তাঁর রসনা যে এক মধুর রসের ভবিষ্যৎ আস্বাদের আশায় আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাঁহার চক্ষের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে বুঝা যাইতেছিল। আজ সকাল বেলাই আমার ছোট ভাই হীরেন্ পাঁঠাটাকে কালী বাড়ীতে নিয়ে গেল। আমার বলিদান দেখিতে ভাল লাগ্‌ত না, তাই বারান্দায় বসে-ছিলুম। নীরুর সঙ্গে পাঁঠাটার এই কয় দিনে খুব ভাব হ'য়েছিল। সে রোজ তাকে কচি কচি ঘাস এনে খেতে দিত। আজ সকাল থেকে তাকে যেন একটু বিষণ্ণ বলে মনে হচ্ছিল। আজ আর তার সে হাসি-হাসি মুখ নাই। তার সেই গম্ভীর ভাব দেখে আমারও মনটা ভারী হয়ে উঠল। সে আজ আমার পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে কি জিজ্ঞাসা করবার জন্য ইতস্ততঃ করছে। আমি তাকে কাছে ডেকে, কপালে একটি চুমো দিলাম। এতেও তার বিষণ্ণ ভাব অপসারিত হল না, সে আমার মুখের দিকে ছল-ছল চোখে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে "বাবা কাকা বাবু পাঁঠাটাকে নিয়ে কোথায় গেলেন?" আমি বলিলাম "কালী বাড়ীতে" সে বলিল "কেন?" আমি বলিলাম "বলি দিতে" কথাটা বলিবার সময় মনটায় যেন হঠাৎ কিসের একটা খোঁচা লাগিল—মুখটা পাশের মত হইয়া গেল যেন একটু অন্য-মনস্ক হইয়া পড়িলাম। হঠাৎ নীরুর স্বর আমার কানে গেল "আচ্ছা বাবা! পাঁটাটা তখন কি মনে কর্চ্ছিল? সে ভাবছে যে রোজ তাকে যেমন বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয় আজও বুঝি তেমনি নিয়ে যাচ্ছে। তাই না বাবা?" আমি কি উত্তর দোব খুঁজে পেলাম না। ভাবিলাম বালকের মুখে আজ এ কি কঠিন প্রশ্ন? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার সামর্থ্য আমার নাই। পশুরাও পশুর সঙ্গে ছলনা করে না আর আমরা মানুষ হয়ে স্বার্থের বশে অম্লানবদনে তা করি, তবু আমরা ভাবি আমরা পশুদের চেয়ে কত বড়, কত বুদ্ধিমান।"

আমার নিরুত্তর মুখের পানে নীরু একদৃষ্টে চেয়েছিল—বোধ হয় ভাবছিল এত সোজা কথার উত্তর তার বাবার মাথায় যোগাচ্ছে না কেন?

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩২ ঃ—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লিখিত "গ্রামের কথা" এ মাসের বঙ্গবাণীর প্রথম প্রবন্ধ। লেখক আমাদের দেশের কৃষক কুলের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথা তুলিয়া তাহাদের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধানের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৃষকদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার দ্বারা অজ্ঞানতা দূর, সমবায়সমিতির পদ্ধতি (co oprative eicdit sociely) অনুসারে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন পূর্ব্বক মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা এবং সঙ্গে সঙ্গে কুসীদজীবি মহাজনের হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা, এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সাধন, এবং শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের চাকুরীর ও সহরবাসের মোহ কাটাইয়া পল্লীবাস ও কৃষিবৃত্তি অবলম্বন, :—লেখকের মতে এই কয়েকটী বিষয় কার্য্যে পরিণত করিলেই পল্লীসমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু প্রত্যেকটী কার্য্যে পরিণত করার পথে যে সমস্ত অন্তরায় আছে, লেখক সে সমস্ত দূরীকরণের উপায় নির্দ্দেশ করেন নাই। বাস্তবিক আলোচ্য সমস্যা এতদূর জটিল যে তাহার সুচারু সমাধান করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রজা ভূম্যাধিকারী বিষয়ক আইন,উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হয় এবং সহরের উন্নতির জন্য সরকার পক্ষ যেমন মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেছেন, পল্লীর উন্নতির জন্যও সরকারকে সেইরূপ মুক্তহস্ত হইতে হয়। নতুবা এ বিষয়ে শুধু কাগজে কলমে আলোচনায় কোন লাভ নাই।

"মহাত্মা গান্ধী ও বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ" প্রবন্ধে, লেখক শ্রীযুক্ত কলিঙ্গনাথ ঘোষ অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, জাতিভেদ, বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে মহাত্মাজীর মতামত উদ্ধৃত করিয়া এবং তৎসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর সহিত মহাত্মাজীর বাণীর ঐক্য কতখানি তাহা দেখাইয়াছেন। প্রবন্ধটী কালোপযোগী হইয়াছে। "জাতিভেদ—স্ব-দলে" অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের রচিত প্রবন্ধ, লেখক মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং এই পত্রিকার সম্পাদক। শুনিয়াছি পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার খ্যাতি আছে, কিন্তু তাঁহার এই জটিল দুর্ব্বোধ্য ইংরাজী তর্জ্জমার মত ভাষা তাঁহার খ্যাতির আদৌ উপযুক্ত নহে। এই তিনটী প্রবন্ধ ভিন্ন "বঙ্গবাণী"তে আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সন্ধান পাইলাম না। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র কাব্যতীর্থের "সংস্কৃত-ভাষা-বিজ্ঞান ও শব্দতত্ত্ব" প্রবন্ধে ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনা অতি অল্পই আছে। "জীবের নিত্যতা" প্রবন্ধে লেখক শ্রীনলিনী মোহন সান্যাল জীবনাধার প্রোটোপ্লাজম পদার্থের পরিচয় দিয়াছেন এবং প্রবন্ধের উপসংহারে বলিয়াছেন "জীবগণের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি বা জাতি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে জীব জগতের কিছু ক্ষতি হয় না। ব্যক্তি বা জাতির আকারের পরিবর্ত্তন পারে কিন্তু জীবনের নাশ হয় না। এক জীবন হইতে অন্য জীবন উৎপন্ন হইতেছে। যেমন এক দীপ শিখা হইতে অন্য দীপশিখা প্রজ্বলিত হয়, তেমনই সন্তান রূপে জীব নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়। অনাদিকাল হইতে জীবনের এমন একটী পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, যাহা চিরকাল অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।" এ আলোচনা নূতন নহে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাহার অনেক প্রবন্ধে জীবের অবিনাশিত্ব সম্বন্ধে এভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ধারাবাহিক রূপে তিনজন স্বর্গীয় পুরুষ সিংহের জীবনকথা প্রকাশিত হইতেছে,—লোকমান্য তিলক, বঙ্গশার্দ্দুল আশুতোষ এবং দেশহিতৈষী রামগোপাল ঘোষ। শেষোক্ত প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কর, সেকালের অনেক কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। পত্রিকান্তরে যখন সুন্দরীবাবুর "বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনাম্চা" বাহির হইত, তখন আমরা তাহা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতাম। আলোচ্য সংখ্যায় সুন্দরী বাবু উপরোক্ত শিরোনামা-যুক্ত প্রবন্ধে—সমাজ বিশেষ এবং আধুনিক যুগের "স্বামী" উপাধিধারী "গুরুজী" সম্প্রদায়ের উপর এক হাত লইয়াছেন। গুরুজীর চরিত্র তিনি যে কৃষ্ণবর্ণে আঁকিয়াছেন, তাহা সম্প্রদায় বিশেষের মনঃপীড়ার কারণ হইতে পারে। আমাদের মনে হয় সুন্দরীবাবু আলোচ্য প্রসঙ্গ ছাড়িয়া অবান্তর বিষয় আলোচনা না করিলেই ভাল করিতেন। "বঙ্গবাণী"ও যে তিনখানি বড় উপন্যাস ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া "ভারতবর্ষের" সহিত সমানে চলিবার চেষ্টা করিতেছেন, তন্মধ্যে সুবিখ্যাত

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত" পথের দাবী নিতান্ত "হোমিওপ্যাথিক ডোজে" পাঠকের এবং পত্রিকাধ্যক্ষের দাবী মিটাইতেছেন। এবার "বঙ্গবাণী"তে কবিতার পিণ্ডদান করিয়াছেন যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য—

পিণ্ডি কত চট্‌কাবে আর! ওই যে ডাকে চণ্ডিকা!
চাক্ ভাঙ্গা আজ মধুর সাথে পান করে লাল গুণ্ডিকা!

কবিবর লাল গুণ্ডিকা পান করিয়া নিশ্চয় এ কলম ধরিয়াছিলেন নইলে এমন তাণ্ডব নর্ত্তন আসিল কোথা হইতে!

কবি হুঙ্কারিছেন—"যুগের সাথে জোর দাপটে এগিয়ে চলো দিন-যামি।" "নাক-টেপা টিপি" ছেড়ে, "ছুট্‌তে হবে বন-বাদাড়ে-জঙ্গলে।"—বন-বাদাড়-জঙ্গল প্রীতি দেখিয়া কবির স্বরূপ জানিতে পারা গেল। কবি ভারতের ভবিষ্যৎ দিব্য-চক্ষে দেখিতে পাইয়া বলিতেছেন—

আর তো সেদিন সুদূর নহে সুখাশ বয় উচ্ছ্বাসে।
জগদ্বাসীর সিংহাসনে বস্‌বে ভারত উল্লাসে।

বাঁচা গেল। কিন্তু কথাটা ভাল বুঝা গেল না, "জগদ্বাসীর" সিংহাসনে ভারত কি করিয়া বসিবে। কিন্তু শেষে কবি উপায় বাংলাইয়াছেন—

"অধঃপাতে আর যেওনা বৈরাগ্যের সংযোগে।
বাঁচতে যদি চাও জগতে মাতো জীবন সম্ভোগে।
কাস্তি কনক তুচ্ছ নহে, লও বরি স্রক্ চন্দনে।
কাণ দিয়ো না। কাণ দিয়ো না "নেতি নেতি" ক্রন্দনে।

"ফুটনোটে সার্টিফিকেটে রহিয়াছে" মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনীর জন্য লিখিত। যদি এ কবিতা তথায় পঠিত হইয়া থাকে তবে সম্মিলনীর ঘোর দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। মোটের উপর "বঙ্গবাণী" তাহার উচ্চস্থান হইতে ক্রমশঃ অধোগমন করিতেছে। দেখিয়া আমরা সত্যই দুঃখিত হইয়াছি।

মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩২— গত দুই সংখ্যা হইতে এই পত্রিকার ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিতেছি। প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনে নিপুণতার পরিচয় পাইতেছি। কিন্তু আলোচ্য সংখ্যায় "অমিতাভ" প্রথমে স্থান কেন পাইল বুঝিলাম না। দুই-খানি প্রাচীন চিত্র এবং নিজ পুস্তকাগারে অধ্যাপক (যোগীন্দ্রনাথ) সমাদ্দারের চিত্র এই তিনখানি চিত্র একত্র গ্রথিত করিবার জন্যই কি এই স্কুলপাঠ্য পুস্তকোপযোগী "অমিতাভ" প্রবন্ধের অবতারণা? "মুসলমান যুগের মথুরা" বেশ হইতেছে। "অভিভাষণ" সম্পাদক মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের মুন্সীগঞ্জ সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত অভিভাষণের পুনর্মুদ্রণ। মহারাজের লেখার বিশেষত্ব এই যে, তাহা আজকালকার "ঠাকুরবাড়ী" ও "বীরবলী" ভাষার মিশ্রণজাত জগাখিচুড়ী নামীয় অপূর্ব্ব-স্বাদগন্ধহীন পদার্থ নহে। এ ভাষার মেরুদণ্ড আছে,—তাই ইহা সতেজ, গতি আছে,—তাই ইহা কখন মৃদুকল-নাদিনী কখন বা দূরাগত মেঘ-গর্জ্জনবৎ গম্ভীর কখন বা ষোড়শীর নূপুর-নিক্কণবৎ ঝঙ্কারময়ী। শব্দচয়নে অসাধারণ অধিকার থাকায় লেখক ভাবপ্রকাশে কুত্রাপি কষ্টকল্পনার আশ্রয় লয়েন নাই। এ অভিভাষণ সম্মিলনীর উপযুক্ত হইয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আর্টের ছদ্মনামে আধুনিক লেখকগণের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধকার সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। মহারাজের সাহিত্য-সাধনা জয়যুক্ত হউক। লোক-শিক্ষার উপায় শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ। লেখকের মতে লোকশিক্ষা ব্যতীত লোকমত গঠিত হইতে পারে না এবং লোকমত গঠিত না হইলে কি রাজনৈতিক সামাজিক কোন আন্দোলনই সফল হইতে পারে না। প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত যাত্রা কথকতা রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি পাঠ এবং পুস্তকাগার স্থাপন প্রভৃতি লোকশিক্ষার উপায় স্বরূপ লেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা সকলেরই জানা কথা। প্রবন্ধে নূতনত্বের মধ্যে বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি উষ্মাটুকু। "নিবেদন"—প্রত্নতত্ত্ববিৎ রমাপ্রসাদ চন্দ কর্ত্তৃক বিক্রমপুর সাহিত্যসম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে পঠিত প্রবন্ধ, বিক্রমপুরের অতীত-গৌরব-গাথা প্রবন্ধকার হৃদয় দিয়া লিখিয়াছেন। "ডাকাতি দমন" কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় লিখিত। কোম্পানীর রাজত্বের আমলে হুগলী জেলায় ডাকাত দমনের জন্য সরকার বাহাদুর কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার এবং সেইসঙ্গে তৎকালীন

ডাকাতদিগের যৎকিঞ্চিৎ পবিচয় এই প্রবন্ধে এবং গত সংখ্যায় প্রকাশিত অংশে আছে। প্রবন্ধটী কৌতূহলোদ্দীপক এবং উপভোগ্য হইয়াছে। আমবা বিলাতী "রবিন্‌হুড্" ও "বব্‌রয়েব" কাহিনী পড়িয়া এবং চলচ্চিত্রে দেখিয়া মুগ্ধ হই। কিন্তু আমাদের দেশেব "ববিন্‌হুড্" "রব্‌রয়েব" অপেক্ষা বোমাঞ্চকর ঘটনাপূর্ণ "রাধা," "বিশে" "গোলাম" "গুয়ে" প্রভৃতিব জীবনী আমরা জানিনা। এই সকল পুবাতন কাহিনীব উদ্ধার হইলে অনেক গল্প, উপন্যাস ও চলচ্চিত্রেব উপাদান পাওয়া যাইবে। "সামাজিক নব-সমস্যা"-পূর্ব্বানুবৃত্তি, শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লেখা, এসম্বন্ধে পূর্ব্বে আমবা মন্তব্যপ্রকাশ করিয়াছি। "বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে" আমবা আর একজন নবীনা মুসলমান লেখিকাব সন্ধান পাইলাম। সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলমান লেখিকা নাই বলিলেই হয়, সুতবাং লেখিকা মাহমুদা খাতুন ছিদ্দিকার আবির্ভাব আনন্দেব বিষয়। আমরা তাঁহাকে সাদরে এবং সসম্ভ্রমে সাহিত্য-মন্দিরে আহ্বান করিতেছি। লেখিকার ক্ষমতা আছে, তাঁহার ভাষা ও লিখনভঙ্গী প্রশংসনীয়। "শুকতারা" প্রসিদ্ধ লেখক মাণিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখিত বাঙ্গালীর বাসরঘরের একটী চিত্র, মন্দ হয় নাই। "সতী" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়েব একটী ছোট গল্প। বহুদিন পরে "দেশী ও বিলাতী"র লেখকের একটী ছোট গল্প পড়িলাম। এই গল্পের নায়ক বাঙ্গালী, নায়িকা ইংবাজ তরুণী, ঘটনাস্থল ইংলণ্ড। পাকা হাতের তুলিব টানে "সতী" চিত্র সুন্দব ফুটিয়াছে। গল্প পড়া শেষ হইলে সহানুভূতিব অশ্রুতে চক্ষু ভবিয়া উঠে। এ সংখ্যায় "মাসিক সাহিত্য সমালোচনা"ব বিশেষ উন্নতি দেখিলাম, কিন্তু পদ্ধতিটা (arrangement) সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হইল না।

চিত্র-সমালোচনা

বসুমতী—

কল্যাণীঃ—শ্রীযুক্ত হবেকৃষ্ণ সাহা অঙ্কিত। স্থবির পুত্তলিকাব মত এক রমণীকে অতি বিশ্রী ভঙ্গীতে দাঁড করাইয়া দিয়া নীচে একটা আকাশ পাতাল গোছেব কাব্যি আওড়ান হইয়াছে। ইহাতে কল্যাণের আছে কি? পটুয়াদেব হাতেরও এমন অনেক চিত্র পাওয়া যায় যাহা এদের চেয়ে উচ্চ আসনে বসিবাব যোগ্য। প্রথমেই এই চিত্র বসাইবাব পূর্ব্বে একটু চিন্তা করিয়া দেখা সম্পাদক মহাশয়ের কর্ত্তব্য ছিল। সাহা মহাশয়েব অঙ্কিত একটী চিত্রও আজ পর্য্যন্ত আমাদেব প্রাণে ঘা দিল না, অথচ সম্পাদক তাহা লম্বাই চওডাই বচনে আদিস্থানে সন্নিবিষ্ট কবিতে দ্বিধা করেন নাই।

বৃদ্ধ ফকিরঃ—এম দত্ত অঙ্কিত। আলোক চিত্রের সাহায্যে একটা ফকিবেব প্রতিকৃতি তুলিয়া দিলেই চিত্র হইল না। তবে ফটো ও পেইন্টিং এ তফাৎ থাকিত না। বৃদ্ধ কোথায় দাঁড়াইয়াছে কাহার কাছে হাত পাতিয়াছে কোথায় বা Back Ground—কোথায় বা Fore ground? প্রত্যেক ভিক্ষুকই শিল্পীর চক্ষে ভিক্ষুক নয়—যাহাব বর্ণে ভিক্ষুকত্ব লেখা আছে, অন্তর-বাহিবে শুধু দারিদ্র্যেব বাতাসহ প্রবাহিত হয় তাহাবেই ভিক্ষুক বলে। সবুজ রং এর অনেক বেগুন আছে তাহাকে শিল্পী বেগুন বলে না—।

প্রসাধনঃ—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক অঙ্কিত। উদীয়মান ভাস্কব হিসাবে প্রমথ বাবুব নাম আছে—কিন্তু এ চিত্রে তাহাব যশেব সিঁড়ির একটা ধাপ বাড়িবে না—আমবা তাহাকে আবও শক্তিব পবিচয় দিতে দেখিতে চাই।

প্রতীক্ষাঃ—শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জি অঙ্কিত। আজ অবধি যত ধাব কর্জ্জ কবা চিত্র শ্রীবসুমতী সংগ্রহ কবিয়াছেন এ চিত্র তাহাদেব সকলকে জব্দ করিয়াছে। আমবা অনেক গবেষণা করিয়া জানিতে পারিয়াছি এবং এ অতুলরূপ মবজগতে বড় একটা বিচরণ করে না, এ আমাদের সেই ছেলে বেলাকার দিদিমার মুখে শোনা প্রাচীন অশ্বথ গাছ, তেঁতুলগাছ বা বাঁশেব ঝাড়েব অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সময় রাত্রি দ্বিপ্রহর। তিথি কৃষ্ণ পক্ষ ও শনিবাব। আর কাব্য—একা পেলে ঘাড মট্‌কান এ আমদানী পরিণামে বড় লাভেব হইবে না শীঘ্রই বসুমতীর আসরে ওঝাব ভীড় হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিতেছি।
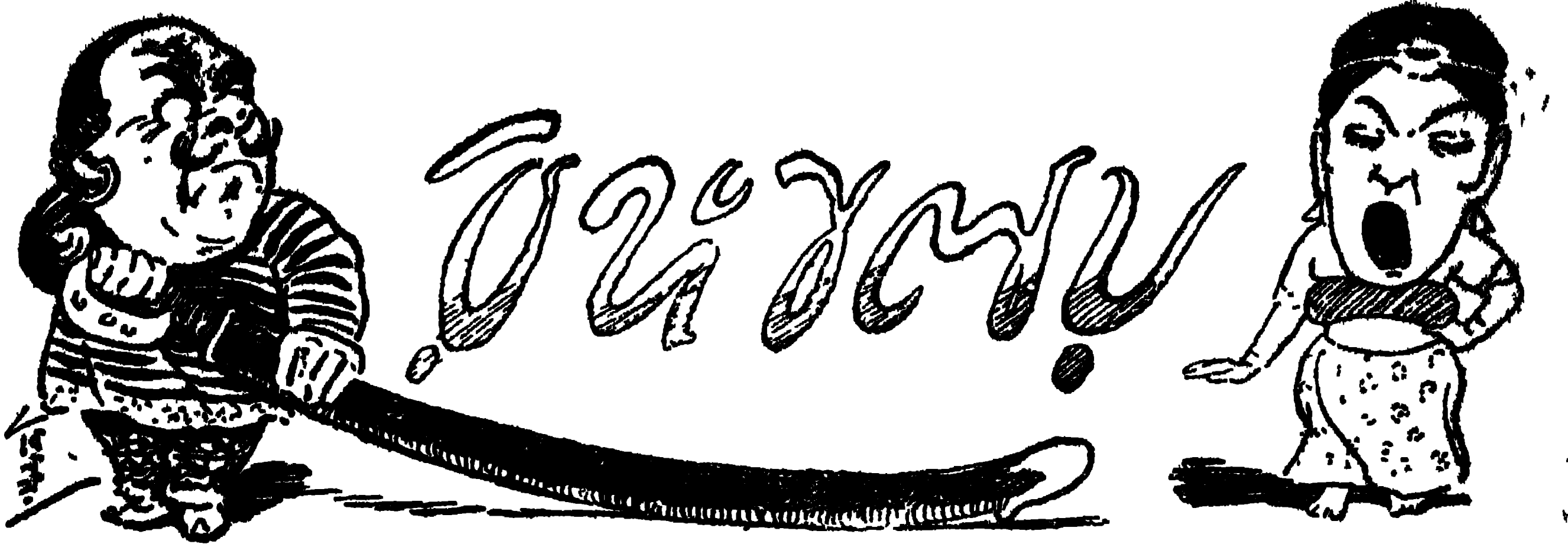
ষ্টার থিয়েটার—নানা কারণে আমরা ইহাঁদের 'বলিদান' নাটকের অভিনয় সমালোচনা এযাবৎ করিতে পারি নাই। আমরা যে রাত্রে অভিনয় দেখি, সে রাত্রে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় দুলালচাঁদের ভূমিকা অভিনয় করেন। একশ্রেণীর দর্শক তাঁহার রসিকতা খুব উপভোগ করিয়াছেন বুঝা গেল, কিন্তু আমরা তাঁহার অভিনয়ের সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না—দুলালচাঁদের চরিত্র ইহাতে ফুটে নাই। তিনকড়ি বাবু এ ভূমিকা এক নূতন ধরণে অভিনয় করিতেছেন শুনিলাম, এবং তাহাও বেশ হইতেছে তবে না দেখিয়া সে সম্বন্ধে স্পষ্ট মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের মনে হয় তিনকড়ি বাবুকে করুণাময়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ করাইয়া রূপচাঁদের ভূমিকা অপরেশবাবু গ্রহণ করিলে ও দানীবাবু বিখ্যাত 'দুলালচাঁদ' ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলে একটা উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখিবার সুযোগ দর্শকগণকে দেওয়া হইত। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব। রূপচাঁদের ভূমিকায় নরেশ বাবুর অভিনয় একেবারেই অচল—বেমানান ও প্রাণহীন হইয়াছে, নরেশ বাবুর প্রতিভা-প্রদীপ কি অকালে স্তিমিত হইতে চলিল? কর্ণার্জ্জুনে শকুনির পর আর তাঁহার উল্লেখযোগ্য কোন অভিনয়ই দেখিতে পাইলাম না কেন? করুণাময়ের অভিনয় স্থানে স্থানে উচ্চভাবের হইলেও উহার গতি সর্ব্বত্র ধারাবদ্ধ ছিল না। মোহিতের ভূমিকার অভিনয় বেমানান হওয়ার জন্য ভাল লাগে নাই। ইন্দুবাবুর কিশোরের অভিনয় বেশ সংযত ও সুন্দর হইয়াছিল। ছোটখাট ভূমিকার মধ্যে কালী ঘটক, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার ও ঘনশ্যাম প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রেমোমামার ভূমিকা চলনসই হইয়াছিল তবে অভিনেতার ক্ষমতা দেখিয়া বোধ হইল চেষ্টা করিলে তিনি এ ভূমিকা আরও উন্নতভাবে অভিনয় করিতে পারিতেন—স্ত্রীচরিত্রের মধ্যে সরস্বতী, মাতঙ্গিনী, কিরণ, হিরণ প্রভৃতি বিশেষরূপে প্রশংসনীয়, জোবীর গানগুলি সে রাত্রে ভাল হয় নাই, শ্রীযুক্তা আশ্চর্য্যময়ীর কাছে আমরা এর চেয়ে ভাল গানের আশা করিয়াছিলাম। ছোট খাট দোষ ত্রুটী সত্ত্বেও বলিদানের অভিনয় মোটের উপর ভালই হইয়াছিল, কারণ এর চেয়ে ভালভাবে বলিদান অভিনয় করিবার যোগ্যতা বর্ত্তমানে অন্য কোন সম্প্রদায়ের নাই বলিয়াই মনে হয়। এই শ্রেণীর শিক্ষাপ্রদ সামাজিক নাটক অভিনয় করিয়া আর্ট থিয়েটার কোম্পানী উপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বেশ একটু কাজ করিতেছেন এ কথা বলা চলে।

উর্ব্বশী—রেঙ্গুণে কয়েকখানি গীতিনাট্য অভিনয় করিয়া আসিয়া ষ্টার থিয়েটার এখানেও সপ্তাহের একটী রজনী গীতিনাট্য অভিনয় করিবেন এরূপ বোধ হয় মনস্থ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য ভালই বলিতে হইবে, কারণ এখন আর অন্য কোন থিয়েটারে গীতিনাট্যের অভিনয় হয় না। এসব বিষয়ে মিনার্ভা থিয়েটারই উদ্যোগী ছিলেন। অধুনা তাঁহাদের অভিনয় স্থগিত থাকায় ইহাঁরা নৃত্য-গীত-রস-পিপাসু দর্শকবৃন্দের মনের খোরাক যোগাইবার ব্যবস্থা করিয়া বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। আর সপ্তাহে পাঁচ রাত্রিই নাটক অভিনয় করা অভিনেতা অভিনেত্রীদের কাছে ক্রমশঃ একঘেয়ে লাগে, সেদিক দিয়াও গীতিনাট্য অভিনয় করার একটা সার্থকতা আছে। সম্প্রতি
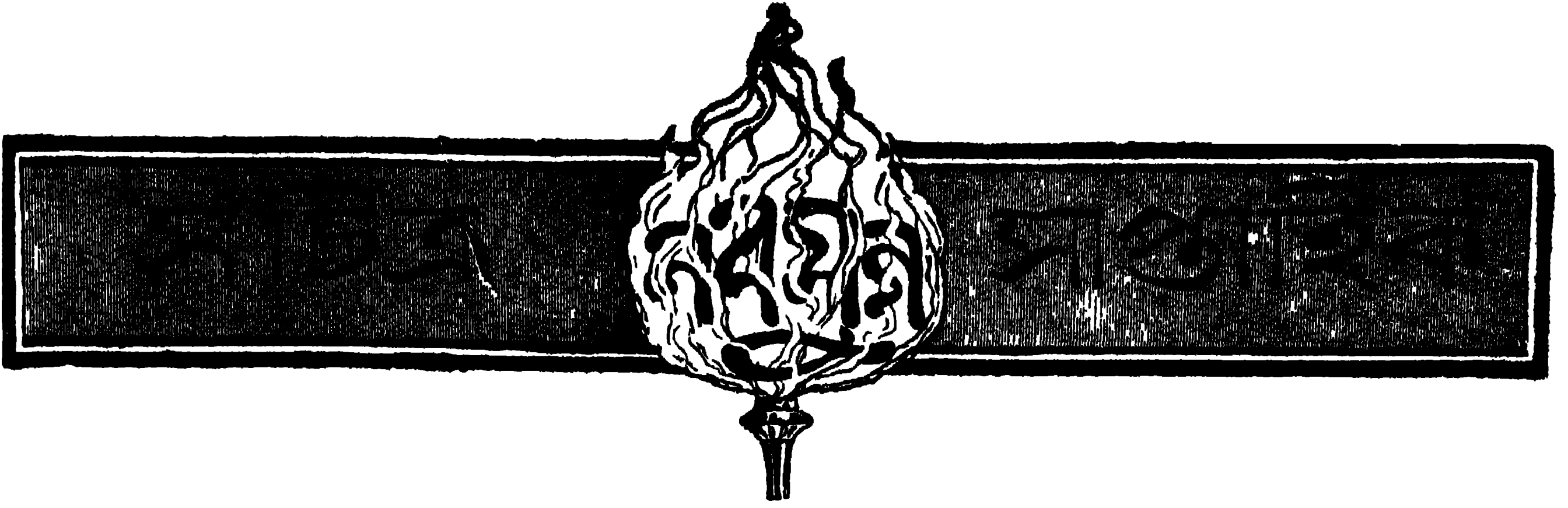
প্রথমবর্ষ] ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩২ সন। ইংরাজী ৩০শে মে [৪২শ সংখ্যা

বৈতালিক

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় ভারতী বিদ্যাভূষণ

[illegible] বঙ্গ [illegible] বন্দনে।
বন্দনে [illegible] চন্দন প[illegible] মালিকা [illegible]।
অন্ধ [illegible] মন্দির [illegible] বি[illegible]নন্দ বার,
সাজাবে অর্ঘ্য, সাম্নে স্বর্ণ প্রতিভার ছবি মহাত্মার।
এই ভেসে আসে গম্ভীর ভাষে তাহারি আকুল প্রার্থনা,
তবু কিরে তোর মোহ ঘুমঘোর ভাঙ্গিবেনা ? সহিবি লাঞ্ছনা
ধর্ম্ম যাহার মর্ম্মের সাথী, নাশি সংশয় শঙ্কারে,
সংধনে যার সত্য সুনীতি অতীতের গীতি ঝঙ্কারে—
[illegible] তরুণ উদার দৃশ্যে, আপনার ক্ষীণ নিঃশ্বাসে,
দিল যেত বলি দুঃখের দান বিশ্বহিতের বিশ্বাসে।
স্বার্থের সুখ শান্তি সাধনা সর্ব্ব কামনা বিস্মরি,
যাদেরি জন্য ত্যজিলে অন্ন ত্রিসপ্ত দিবা শর্ব্বরী।
উচ্চ আশার উচ্ছ্বাসে যাঁর স্বচ্ছ প্রেমের প্রস্রবণ,
উচ্ছাস ভরে স্বেচ্ছায় ত্যজে তুচ্ছ সুখের আস্বাদন।
বিঘ্ন বিবাদ বিরোধ বিষাদ বিদ্বেষ বিষ বর্জ্জনে,
দেখায়ে মুক্তি, তাঁহারি উক্তি ধ্বনিছে গভীর গর্জ্জনে —
একই মায়ের সন্তান তোরা কেন এ ভ্রান্তি অন্তরে ?
[illegible]বক্ষ হোক রে লক্ষ্য প্রীতি ও সখ্য দান তরে।

[illegible] আছে [illegible] দেবের [illegible] হাস্যাকাশ অঙ্গনে,
[illegible] শুভ [illegible] কলুষ মগন [illegible]বিসনে—তারি সঙ্গ নে।
কোথায় তৃপ্তি কোথায় শান্তি সংস[illegible] মরুপ্রান্তরে,
তার কৃপা বিনে কভু চিনিবিনে তোরা যে অন্ধ ভ্রান্ত রে!
যুদ্ধ? সে শুধু উদ্ধত চিতে ক্রুদ্ধ রোষের বাঞ্ছনা,
বুদ্ধিতে করে স্বার্থসিদ্ধি শুদ্ধি সাধনে বঞ্চনা।
ভক্তি যে অন্তরে বাড়ায় মুক্তির [illegible] সন্ধানে,
প্রেম শুধু ভরে স্ব[illegible]ভরে সাজায় ধরণী নন্দনে।
সেই প্রেম ভুলি, দেবতার ধূলি করি পদতলে দলিত,
হবে কি নির্ম্মম রাক্ষসসম ভ্রাতৃবিরোধ বাঞ্ছিত ?
ভুলে যা বিবাদ হাতে হাত বাঁধ, ভাইকে ভায়ের বক্ষে নে,
ভ্রাতৃভক্তি বিনা কে চিনিত মেঘনাদ জয়ী যে লক্ষ্মণে ?
সে স্মৃতির ধূলি মস্তকে তুলি, দাঁড়াবে হস্ত বিস্তারি,
দেবতা প্রসাদ নাশিবে বিষাদ সব অবসাদ নিস্তারি।
জাগালে কীর্ত্তি চি[illegible] বিশ্বের চোখে দৃশ্য হ'
আর্য্য গরিমা নির্জ্জীব হবে, নহে কি এ ব্যথা দুঃসহ ?
আত্ম কি পর সবারেই ধর বক্ষের মাঝে [illegible] রে,
আরতি শঙ্খ উঠুক বাজিয়া আবার এ ভারত মন্দিরে।

চিঠি

(মোপা সাঁ থেকে)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

"—কাজেই আপনি হয় ত ভাবছেন যে এই গুরুতর বিষয় নিয়ে হয় আমি নিতান্ত তাচ্ছিল্যভাবে আলোচনা করছি, না হয় একটা অতি বড় মিছেকথা খুব স্পষ্টভাবে বল্‌ছি।

সারাজীবনের ভেতর কোনও লোক যে কারও প্রেমে পড়তে নাও পারে, একথা আপনি হয়ত বিশ্বাসই করবেন না, তবুও আমি, একজন পুরুষ, আপনাকে বলছি যে জীবনে আমি কাউকে কখনও ভালবাসিনি।

এ কেমনে সম্ভব ? সত্যি আমি জানি না, ছেলেবেলা থেকে বিনা কারণে এ হৃদয়কে কখনও কোনদিকে বেশীদূর অগ্রসর হতে দিইনি, সুন্দরী স্ত্রীলোকের পায়ে সারা-জীবনের মত নিজেকে বিকিয়ে দেয়, এমন পাগলের মত কখনও কাউকে ভালও বাসিনি। আপনাদের স্ত্রী জাতির মধ্যে এমন একজনও নেই যে আমায় কাঁদাতে কিংবা পাগল করতে পারে। এ জীবনে নিদ্রাবিহীন রাত্রি কিংবা প্রাতঃকালে ক্ষুধার অভাব কখনও বোধ করিনি। আশা এবং অনুতাপ দুটোই আমার নিকট অজ্ঞাত ছিল। কারণ আমি কখনও প্রেমে পড়িনি।

অনেক সময় আমি নিজে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যেতাম যে আমার জীবনে এ কখনও ঘটল না কেন, এ সম্বন্ধে একমাত্র উত্তর দিতে পারি যে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমি অতি মাত্রায় কঠোর সমালোচক ছিলাম। আমার এ খোলাখুলি কথায় রাগ করবেন না……আপনি জানেন প্রত্যেক মানুষেরই একটা শারীরিক কিংবা আধ্যাত্মিক বিশেষত্ব আছে, আর সত্যি সত্যি কাউকে ভালবাসা, আপনি নিশ্চয় দেখ্‌তে পাবেন যে, যে ভালবাসে, ক্রমেই ঐ দুটো বিশেষত্ব তাঁর চরিত্রে মিশে গিয়ে ঐক্যস্থাপন করে। কিন্তু কচিৎ এ রকম ঘটতে দেখা যায়।

কারণ অনেক সময়েই দেখবেন, একজন স্ত্রীলোক দেখ্‌তে বেশ মনোমুগ্ধকর, কিন্তু শীলতায় তারা জঘন্য; আবার কেউ শীলতায় চমৎকার, কিন্তু তাঁদের দৈহিক সৌন্দর্য্যের এতটুকু ক্ষমতাও নেই যাতে কাউকে আকর্ষণ করতে পারে।

ভালবাস্‌তে গেলে আগে মানুষকে অন্ধ হতে হয়। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর দিয়ে তার ভালবাসায় পড়তে হবে। তাঁর দোষে তাঁকে চোখ্ বুজে থাক্‌তে হবে। কোনো গুরুতর বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারবে না। শুধু দিনরাত তাঁকে চুম্বন ও আদর করবে। তার যত সব নির্ব্বোধ খেয়াল ও অসম্ভব ধারণাগুলি যে সত্য সত্যই চমৎকার, একথা তাঁকে বিশ্বাস করাতে হবে বেশ, এরকম অন্ধ হতে আমি অক্ষম। আমি শুধু যেটা যে রকম আছে তেমি দেখ্‌ব, তার যেমন ইচ্ছে করব তেমন নয়।

তবু একবার, বহুদিন আগে, আমি বিশ্বাস করে ছিলাম, যে আমি প্রেমে পড়েছি।—শুধু এক ঘণ্টার জন্য, এক প্রেমপূর্ণ দিনে · ·কিন্তু আমার সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাকে ফাঁদে ফেল্‌তে সাহায্য করেছিল· আপনি সব ঘটনা শুনলে যে আমার সঙ্গে একমত হবেন, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

* * * *

একদিন বিকালে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত সাহসের কাজ তাঁর নিকট খুব প্রিয় ছিল। একদিন সে হঠাৎ আমার নিকট প্রস্তাব করে বস্‌ল, যে দুজনে নদীর উপর ডোঙ্গায় করে একটা রাত্রি কাটাতে হবে। · · বাড়ীতে রাত্রি জাগরণ করা আমার বেশ অভ্যাস ছিল, কিন্তু বাইরে—নদীর বুকে—উঁহু; তবু শুধু মজা দেখ্‌বার জন্য তাঁর প্রস্তাবে আমি রাজী হলাম।

জুন মাসের চমৎকার রাত্রি। চাঁদের আলো ও মৃদু

চিঠি

(মোপাসাঁ থেকে)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

"—কাজেই আপনি হয় ত ভাবছেন যে এই গুরুতর বিষয় নিয়ে হয় আমি নিতান্ত তাচ্ছিল্যভাবে আলোচনা করছি, না হয় একটা অতি বড় মিছেকথা খুব স্পষ্টভাবে বলছি।

সারাজীবনের ভেতর কোনও লোক যে কারও প্রেমে পড়তে নাও পারে, একথা আপনি হয়ত বিশ্বাসই করবেন না, তবুও আমি, একজন পুরুষ, আপনাকে বলছি যে জীবনে আমি কাউকে কখনও ভালবাসিনি।

এ কেমনে সম্ভব? সত্যি আমি জানি না, ছেলেবেলা থেকে বিনা কারণে এ হৃদয়কে কখনও কোনদিকে বেশীদূর অগ্রসর হতে দিইনি, সুন্দরী স্ত্রীলোকের পায়ে সারা জীবনের মত নিজেকে বিকিয়ে দেয়, এমন পাগলের মত কখনও কাউকে ভালও বাসিনি। আপনাদের স্ত্রী জাতির মধ্যে এমন একজনও নেই যে আমায় কাঁদাতে কিংবা পাগল করতে পারে। এ জীবনে নিদ্রাবিহীন রাত্রি কিংবা প্রাতঃকালে ক্ষুধার অভাব কখনও বোধ করিনি। আশা এবং অনুতাপ দুটোই আমার নিকট অজ্ঞাত ছিল। কারণ আমি কখনও প্রেমে পড়িনি।

অনেক সময় আমি নিজে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যেতাম যে আমার জীবনে এ কখনও ঘটল না কেন, এ সম্বন্ধে একমাত্র উত্তর দিতে পারি যে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমি অতি মাত্রায় কঠোর সমালোচক ছিলাম। আমার এ খোলাখুলি কথায় রাগ করবেন না আপনি জানেন প্রত্যেক মানুষেরই একটা শারীরিক কিংবা আধ্যাত্মিক বিশেষত্ব আছে, আর সত্যি সত্যি কাউকে ভালবাসা, আপনি নিশ্চয় দেখতে পাবেন যে, যে ভালবাসে, ক্রমেই ঐ দুটো বিশেষত্ব তাঁর চরিত্রে মিশে গিয়ে ঐক্যস্থাপন করে। কিন্তু কচিৎ এ রকম ঘটতে দেখা যায়।

কারণ অনেক সময়েই দেখবেন, একজন স্ত্রীলোক দেখতে বেশ মনোমুগ্ধকর, কিন্তু শীলতায় তাঁরা জঘন্য; আবার কেউ শীলতায় চমৎকার, কিন্তু তাঁদের দৈহিক সৌন্দর্য্যের এতটুকু ক্ষমতাও নেই যাতে কাউকে আকর্ষণ করতে পারে।

ভালবাসতে গেলে আগে মানুষকে অন্ধ হতে হয়। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর দিয়ে তাঁর ভালবাসায় পড়তে হবে। তাঁর দোষে তাঁকে চোখ বুজে থাকতে হবে। কোনো গুরুতর বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পাবে না। শুধু দিনরাত তাঁকে চুম্বন ও আদর করবে। তাঁর যত সব নির্ব্বোধ খেয়াল ও অসম্ভব ধারণা গুলি যে সত্য সত্যই চমৎকার, একথা তাঁকে বিশ্বাস করাতে হবে বেশ, এরকম অন্ধ হতে আমি অক্ষম। আমি শুধু যেটা যে রকম আছে তেমি দেখব, তাঁর যেমন ইচ্ছে করব তেমন নয়।

তবু একবার, বহুদিন আগে, আমি বিশ্বাস করেছিলাম, যে আমি প্রেমে পড়েছি।—শুধু এক ঘণ্টার জন্য, এক প্রেমপূর্ণ দিনে কিন্তু আমার সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাকে ফাঁদে ফেলতে সাহায্য করেছিল। আপনি সব ঘটনা শুনলে যে আমার সঙ্গে একমত হবেন, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

* * * *

একদিন বিকালে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত সাহসের কাজ তাঁর নিকট খুব প্রিয় ছিল। একদিন সে হঠাৎ আমার নিকট প্রস্তাব করে বসল, যে দুজনে নদীর উপর ডোঙায় করে একটা রাত্রি কাটাতে হবে। বাড়ীতে রাত্রি জাগরণ করা আমার বেশ অভ্যাস ছিল, কিন্তু বাইরে—নদীর বুকে—উঁহু, তবু শুধু মজা দেখবার জন্য তাঁর প্রস্তাবে আমি রাজী হলাম।

জুন মাসের চমৎকার রাত্রি। চাঁদের আলো ও মৃদু

উষ্ণ বাতাসে চারদিক ভরে গিয়েছে। রাত দশটায় আমরা রওনা হলাম। আমি একটু ইতস্ততঃ কর্চ্ছিলাম কিন্তু আমার সঙ্গিনী আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠ্‌ল। আমি ডোঙ্গায় বসে বৈঠাটি তুলে নিলাম। আমাদের যাত্রা সুরু হল। চারিদিকের দৃশ্যাবলী চমৎকার! নদীর মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপগুলি, সেখানে গাছে গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে নাইটিঙ্গেল পাখীরা গান কচ্ছে। আমরা স্রোতের মুখে ভেসে চল্‌লাম। নদীর তীরে কাদার উপর থেকে সব ব্যাঙগুলি চীৎকার কচ্ছে। নলবনের ভেতর দিয়ে বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ছে। ...রাতের সেই মৃদুস্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য আমাদের যেন অভিভূত করে ফেল্লে, আমার মনে হল, এম্নি নগ্নসৌন্দর্য্যের মাঝখানে সুন্দরী যুবতী রমণীর পাশে বসে থেকে জন্ম জন্ম কাটিয়ে দেওয়াও ভাল।

আমার সঙ্গিনীর সান্নিধ্যে, চাঁদের আলোর নেশায়, ভাবের উচ্ছ্বাসে এবং আকুলতায় আমার সমস্ত হৃদয় ভরে গিয়েছিল। সে বল্লে "কেন মিছে বৈঠে বাইছ। এস আমার কাছে এসে বস। নৌকা ভেসে যাক্।

আমি তাঁর কথা শুন্‌লাম। সে তখন আমায় যা বলত, আমি বোধ হয় তাই করতাম।

সে বল্লে "একটা কবিতা বল, আমি শুনি।" প্রথমে আমি অস্বীকার কর্‌লাম, সে জেদ করতে লাগল। তার হৃদয় যেন উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল—রাত্রির গভীরতা, চাঁদের আলো, নদীর কল্ কল্ ছল ছল, কাবোর মাদকতা, একজন পুরুষ তার পাশে বসে, এবং শুধু যেন তাঁকে উত্তেজিত করবার জন্তই আমি এই রকম একটি কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলাম যা শুধু এই ধরণের ভাব-প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করেই রচিত হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে দেখ্‌লাম, আমার ক্ষণিকীর প্রতিবাদের পরিবর্ত্তে সে তার ছোট্ট মাথাটি নেড়ে বিজ্ঞভাবে গুণ্ গুণ্ করে বল্লে "এটা কি সত্য!"

আমি অবাক্ হয়ে গেলাম! সত্যি রমণীমাত্রেরই চরিত্র দুর্জ্ঞেয়।

আমাদের ছোট্ট নৌকাখানা মৃদুমন্দ গতিতে কতকগুলি-ঘনপল্লব-বেষ্টিত উইলো গাছের কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করল।......আমি আমার বাহু দিয়ে তাঁর ক্ষীণ কটীদেশ জড়িয়ে ধরলাম; আমার লালসা-কম্পিত ঠোঁট দুটী তাঁর ঘাড়ের কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু সে হঠাৎ জোর করে আমায় ঠেলে দিয়ে বলে উঠ্‌ল "আঃ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! তুমি সব নষ্ট করতে যাচ্ছ।"

আমি জোর করে তার কাছ থেকে প্রতিদান পাবার জন্য আর একবার চেষ্টা কল্লাম, কিন্তু তিনি এম্‌নি দৃঢ় ভাবে একটা উইলো গাছের ডাল ধরে হুড়োহুড়ি আরম্ভ করলেন, যে আমার মনে হল নৌকাটা হয়ত উল্টে যাবে আর আমরা দুজনেই জলে পড়ে যাব।

সে বল্লে "জলে পড়ে গেলেই তোমার উপযুক্ত শাস্তি হয়! পুরুষেরা কি বিশ্রী জাত! তারা সব সময়েই এক একজনকে তার স্বপ্ন থেকে নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে জাগিয়ে দিতে চায়।"

তারপর সে শ্লেষের সঙ্গে বল্লে "এই মাত্র যে কবিতা তুমি আমার নিকট আবৃত্তি করছিলে তার কি হল?" সে ঠিক জায়গাতেই আঘাত করেছিল! আমি চুপ করে রইলাম।

সে বল্লে, "চল আর একটু এগোনো যাক্!"

তখন মনে হতে লাগ্‌ল যে ব্যাপারটা মোটেই ভাল হচ্ছে না। ভয় হল, হয় ত সমস্ত রাত্রিটাই এম্‌নিধারা নষ্ট হবে। আমার সঙ্গিনী বল্লে "তোমায় আমার নিকট একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।"

বল্লাম "কত্তে পারি—যদি তা পালন করা সাধ্যে কুলায়।"

"তবে প্রতিজ্ঞা কর, বেশ শান্তশিষ্ট হয়ে থাক্‌বে; —যতক্ষণ না আমি তোমায়...তোমায়...অনুমতি দিই..."

"কি?"

"আচ্ছা, আমি তোমায় এই নৌকার উপর আমার কাছে শুয়ে আকাশের তারার দিকে চেয়ে থাক্‌তে বলছি?—"

আমি দেখলাম ব্যাপারটা ক্রমেই পরিহাসের মত দাঁড়াচ্চে, কিন্তু উপায় কি! তাই উত্তর দিলাম "বেশ, তোমার যা ইচ্ছা।"

সে তখন খোলাখুলি ভাবে বল্লে "কিন্তু দ্যাখ, তুমি আমায় স্পর্শ করতে, চুম্বন করতে...কিংবা...কিংবা...অন্য কোন রকমেই বিরক্ত করতে পারবে না।"

"আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি।"

"যদি তুমি একটীবারও নড়ে উঠ, তা'হলেই কিন্তু আমি নৌকা উল্টে দেব।"

এ যে যাচ্ছেতাই—বিশ্রী! দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছি, নৌকার মৃদুমন্দ আন্দোলনে দেহের ছোঁয়াছুঁয়ি পরস্পরের উত্তপ্ত নিশ্বাসের আন্দোলন,অস্পষ্টভাবে আমার প্রাণে কিসের তরঙ্গ তুলছিল। অথচ··যাক্!—সেই মুহূর্ত্তে, জীবনে সেই প্রথমবার আমার কাউকে ভাল-বাস্‌তে ইচ্ছে হল—সমস্ত হৃদয় খুলে দিতে—আমার চিন্তা, আমার শরীর, আমার হৃদয়, আমার সমস্ত জীবন, আমার যা কিছু আছে সবই সেই যুবতীর পায়ে ঢেলে দিতে।—

সহসা আমার সঙ্গিনী যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবে বলে উঠল "আমরা কোথায়· আমরা কোথায় যাচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন আমরা পৃথিবী ছেড়ে চলেছি,··আঃ! কি চমৎকার! ওঃ তুমি যদি শুধু আমায় এতটুকু ভাল-বাস্‌তে!"

আমার বুকের স্পন্দন দ্রুততর হতে লাগল, আমি তাঁর কথার উত্তর দিতে পার্ল্লাম না। মনে হল যেন আমি তাঁকে ভালবাসি—সত্যি সত্যি ভালবাসি—কিন্তু তবু আমি আমার ভেতর লালসার কোন প্রবল তাড়না অনুভব কর্ল্লাম না। আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি—তাঁর কাছে—সেখানে—একেবারে শান্ত হয়ে গেছি. আর তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট!

আমরা সেইখানে সেইভাবে একটুও না নড়ে বহু—বহুক্ষণধরে শুয়ে রইলাম—পরস্পরের হাত ধরে আকাঙ্ক্ষা-পীড়িত সুমিষ্ট নীরব তার মাঝে! কোন্ অজ্ঞাত শক্তি আমাদের পরিচালনা কর্চ্ছিল, কোন স্নিগ্ধ সম্বন্ধ অলক্ষ্য-ভাবে আমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল—রহস্যময়, মধুর, আশ্চর্য্য! কি সে টান? কি সেই প্রেম?

রাত্রির বুক চিরে প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়ল।· প্রায় চারটে বাজে। ধপ্—করে ভোঙ্গাটা কিসে যেন ধাক্কা খেল ছোট্ট একটা দ্বীপ।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। সমস্ত আকাশটা লাল হয়ে গিয়েছে। একটা কমনীয় হরিদ্রাভ রক্তবর্ণের স্নিগ্ধতায় সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভরে গিয়েছে। নদী গাঢ় পাংশু বর্ণ ধারণ করেছে, আর তার কূলে কূলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যেন আগুন লেগে গেছে।

আমি আমার সঙ্গিনীর দিকে ঝুঁকে পড়লাম, তাঁকে এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের দৃশ্য উপভোগ করাবার জন্য ডাকৃতে, কিন্তু পারলাম না।—তাঁর সেই সৌন্দর্য্যের মাঝে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেল্লাম।··· প্রভাতের মত গোলাপী তাঁর রং··তাঁর গণ্ডস্থল তাঁর হাসি, তাঁর লজ্জা। সে যেন এক গোলাপের রাণী। আর সে সময় তাকে যেন আমার নিকট মূর্ত্তিমতী উষার মতই সুন্দর বোধ হচ্ছিল।

সে ধীরে ধীরে উঠল। তার কোমল ঠোঁট দুখানা আমার দিকে এগিয়ে এল, উচ্ছ্বসিত ভাবাতিশয্যে ও আনন্দে আমিও তার দিকে এগিয়ে গেলাম। এ চুম্বন যেন স্বর্গকে—যেন স্বপ্নকে, সত্যে পরিণত করে দিল।

সহসা সে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। হাস্‌তে হাস্‌তে সে নৌকার উপর গড়াগড়ি দিতে লাগল। বিস্মিত ভাবে তার পানে কতক্ষণ তাকাতেই সে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে "ও হেন্‌রী! তোমার মাথায় একটা আরসোলা।"

হায় নারী, এই জন্যই তুমি হাস্‌ছিলে! তাও এমন সময়ে, মনে হল, কে যেন আমার কপালে দারুণ একটা মুষ্ট্যাঘাত করল।—যেন আসন্ন প্রভাতের সমস্ত সৌন্দর্য্য নিবে গেল। আমার স্বপ্ন পৃথিবীর বুকে এসে পৌছল।

এই শেষ! এটা নেহাৎ ছেলেমী বা বোকামী যা ইচ্ছে মনে করতে পারেন। কিন্তু এ জিনিসটা একজনকে খুবই বিরক্ত করেছিল, আকর্ষণের জিনিস থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। সেই থেকে আর কখনও—কোনো মতেই আমি প্রেমে পড়িনি।"

এই চিঠিখানা একটি মৃতকল্প মুমূর্ষু লোকের নিকট কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল। লোকটা আত্মহত্যা করেছিল।

জেমসেদপুর সান্নিধ্যে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দলমা পাহাড়

কিছুক্ষণ পরে আমরা দলমার পাদমূলে একখানি ছোট গ্রামে এসে উপস্থিত হ'লাম। গ্রাম খানি এদেশীয় আদিম সম্প্রদায় দ্বারা অধ্যুসিত। তার নাম আসনবনি। শুনা যায় গ্রামখানি নাকি কোন এক সময়ে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত ছিল। বুনো হাতী, বাঘ, ভালুক ইত্যাদির অত্যধিক উৎপাতে ও জল সংগ্রহের অসুবিধার জন্য লোকজন ক্রমে নীচে এসে বাস করতে আরম্ভ করে। গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে ধানের ক্ষেত। পাহাড়ের ও'র শুধুই জঙ্গল, ছোটবড় অনেক গাছ, শাল, নিম, আমলকী, বেল ও মহুয়া ইত্যাদি। আবহাওয়া প্রায় খরসাং এর মত। গরম খুব বেশী হয় না, সুতরাং গ্রীষ্মকালে বেশ আরাম-দায়ক অথচ জেমসেদপুরে তখন 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়তে হয়—তাপমান যন্ত্রে ১২৬° পর্য্যন্ত দেখা যায়। আবহাওয়া এ রকম হলেও দলমায় কিন্তু দারুণ শীতেও বরফ পড়বার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। অনুমান ৩৬° পর্য্যন্ত শৈত্য পাওয়া গিয়াছে।

৯।১০ বৎসর আগে কথা হয় যে বাঙলার গ্রীষ্মকালীন রাজধানী যেমন দার্জ্জিলিং, বিহারের তেমনি দলমা রাজধানী হবে। এ উদ্দেশ্যে অনেক রকম কাযও সেখানে আরম্ভ হয়েছিল। টাটা-কোম্পানির একদল জরীপের কর্ম্মচারী দলমার উপর শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক কিছুকাল বাস করে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। পাহাড়টী মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর সম্পত্তি ও মানভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত। ছোটনাগপুর বিভাগের কমিসনার, মানভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট, ও মেদিনীপুরের জমিদারী কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ পাহাড়টী নানাভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাহার ফলে জানা যায় যে পাহাড়ের উপর গৃহনির্ম্মাণোপযোগী প্রায় হাজার বিঘা ভূমি পাওয়া যেতে পারে। তাতে ১৫০

সুবর্ণরেখায়—সূর্য্যাস্ত

[শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত]

সুবর্ণরেখায় আলোক চিত্র [শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত।

খানি বড় বাংলো ও ৫-খানি ছোট বাংলো প্রস্তুত হতে পারে।
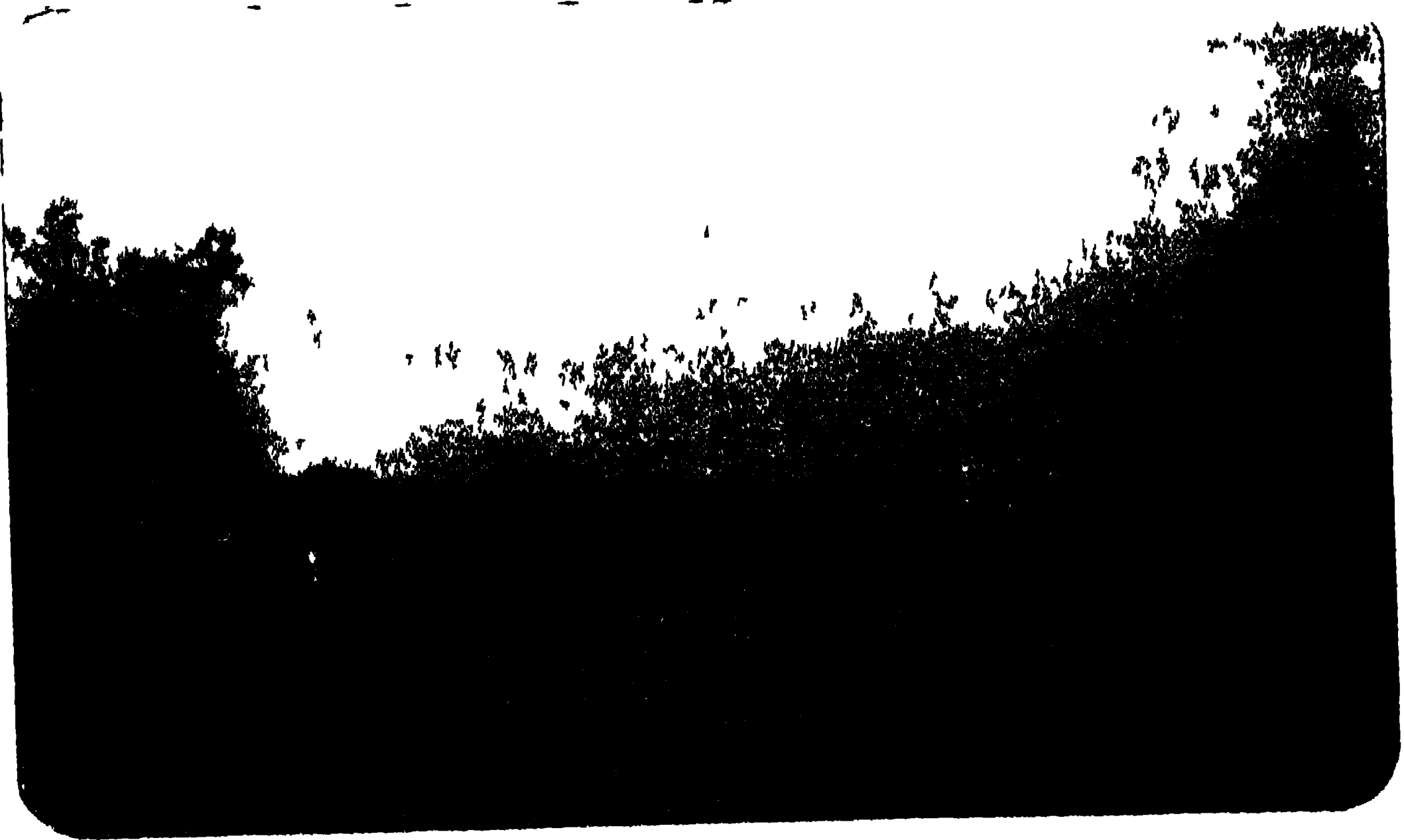
পাম্প-হাউস ঘাটের এপার থেকে একটি ছোট রেল লাইন এই ৫ মাইল পর্য্যন্ত চালাবার কথা ছিল। পাহাড়ের উপর জলকষ্টের সম্ভাবনা বুঝে পাহাড়ের নীচে এক উপত্যকায়, একটী বাঁধ তৈয়ারীরও ব্যবস্থা ছিল। অনেক আলোচনার পর এখানে রাজধানী বসানর ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়, তাই আনুসঙ্গিক সবকিছু জল্পনা কল্পনা আকাশকুসুমেই পর্য্যবসিত হয়। এককথায় —রাধাও নাচলো না বাইশ মণ তেলও পুড়লো না।

পথহীন পাহাড়ে ঘন বনচ্ছায়ে পথ চিনে শিখর দেশে আরোহণ করে "দলমা বাবা"কে দর্শন করা দুঃসাধ্য বোধে আমরা এক পথ প্রদর্শকের অন্বেষণ করতে লাগলাম। এই বিজন অরণ্যে প্রকাণ্ড পাহাড়ের শিখর দেশে এমন এক নিভৃত কোণে "দলমা বাবা" নামক শিবলিঙ্গের স্থাপন বাস্তবিকই এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

বেলা তখন প্রায় দশটা। শিকারী ফটোগ্রাফার মহাশয়ের এখনও দেখা নাই। আমরা হতাশভাবে সেখানে বিশ্রাম করে বসে পড়লাম। সন্তোষদা গেলেন গ্রামের প্রধান পাচিরামের খোঁজ করতে, যে সে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এ পাহাড়ের সর্ব্বত্র ভাব বিচিত্র। অনেক কষ্টে তাকে রাজি ক'রে সন্তোষ দাদা ফিরে এসে বললেন যে একঘণ্টার আগে সে আসতে পারবে না। সুতরাং ঐ সময়টুকু বসেই কাটাতে হবে। হঠাৎ সন্তোষদা লাফিয়ে উঠে বলেন ঐ যে পুলিন বাবু। বাস্তবিকই দেখি পুলিন বাবু ঘাড়ে বন্দুক রেখে ও কাঁধে ফটোক্যামেরা ঝুলিয়ে আসছেন। ইতিমধ্যে আমরা বেশ পরিশ্রান্ত বোধ করছিলাম, তাই একটু চায়ের যোগাড় হয় কিনা দেখতে লাগলাম। সারা গাঁ খুঁজেও গরম জল পাওয়া সম্ভবপর হলো না, কারণ তখনও কাহারও ঘরে আগুন জ্বলেনি। অগত্যা সে আশা ছাড়তে হল।

যাহোক যাত্রা আরম্ভ করা গেল। প্রথমে ভারী উৎসাহে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। ভাবলাম এই তো পাহাড়, এখনি গিয়ে উঠব। মিনিট দুই পরে বুঝতে পারলুম যে বেশ পরিশ্রম বোধ হচ্ছে। একটু পরেই হাঁপাতে আরম্ভ করলাম। তারপর যত উঠি কেবলই মনে হতে লাগলো, যে আর একটু, এর পরই

নিশ্চয়ই একটা সমতল যায়গা পাওয়া যাবে ও সেইখানে একটু হাঁপ্ ছেড়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু কোথায় কি— কেবল চড়াই। চড়াই এর পর চড়াই, যতই যাচ্ছি ততই দেখছি—সামনে আর একটা উঁচু। এমনি করে আমরা চলতে লাগলাম। মনে হতে লাগল, যেন সামনে একটু ফাঁকা সমতল স্থান পেলেই আমরা বেঁচে যাই। কারণ পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ ক'রে পর্য্যন্ত দৃষ্টি আমাদের কেবলই অবরুদ্ধ হয়ে চলেছে। প্রতি পদবিক্ষেপেই আমরা দেখছি সামনে আর এক স্তর উঁচু পাহাড় ও বন। এমনি ভাবে কণ্ঠাগত প্রাণ হয়ে মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম করে আমরা উঠতে লাগলাম। ক্ষুধাও এমন পেয়েছিল যে আর বল্‌তে পারি না। পাহাড়ে উঠতে এত ক্ষুধা পায় তা জানতাম না, নইলে পকেটে নিশ্চয়ই কিছু খাবার রাখতাম। আমি আর শিকারী পুলিনবাবু সকলের আগে। কারণ বন্দুক আমাদের কাছে। তার পরেই রসদবাহীদের দল। আমাদের নজর তখন কেবলই পিছনের দিকে, তাদের ঝুড়ির উপর। কিন্তু সত্যেশদার কড়া হুকুম "দলমা বাবার" দর্শন পাবার আগে কাহাকেও
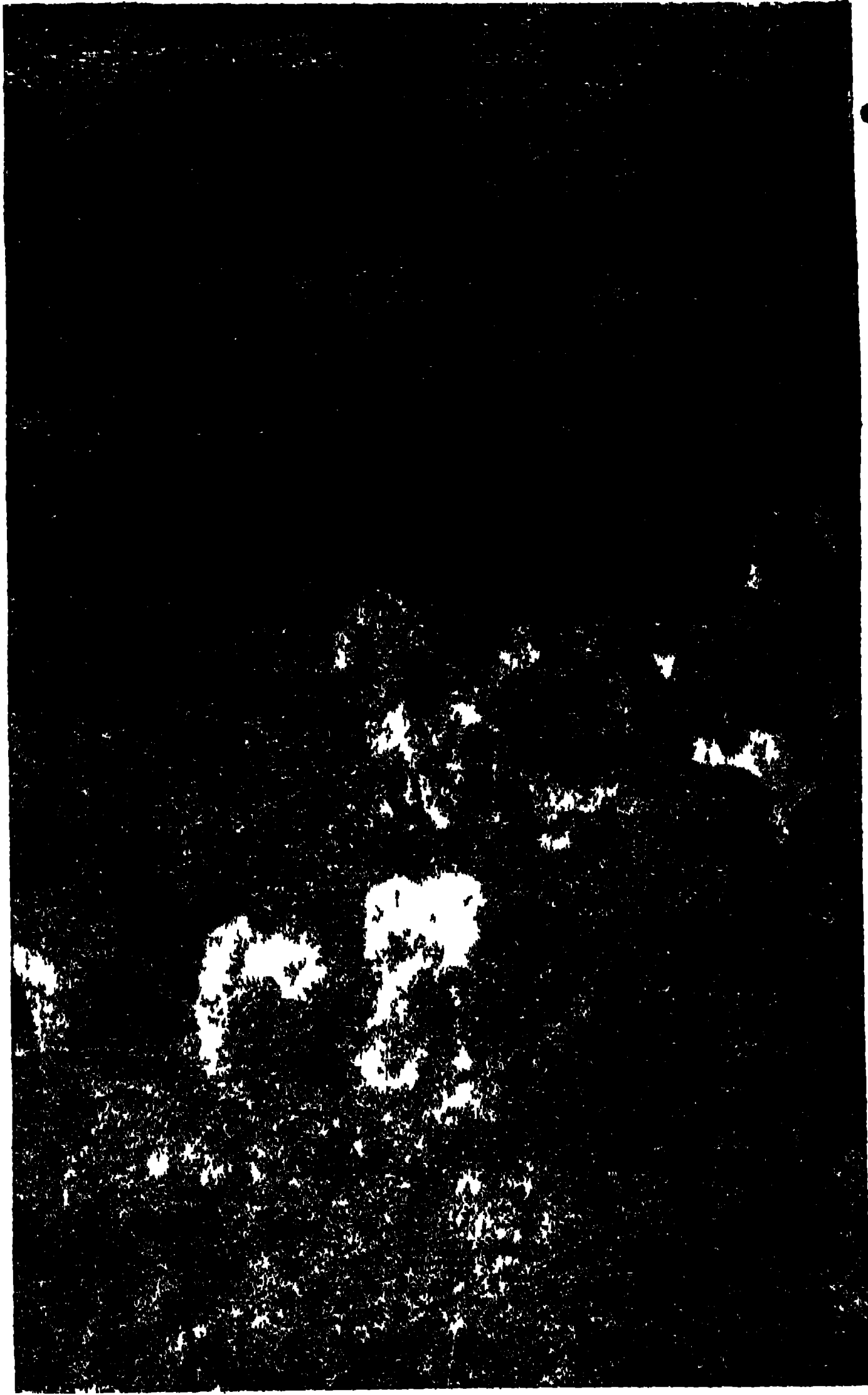
দলমা মহাদেওজীর গুহার সম্মুখে। [শ্রীপুলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহীত।

সুবর্ণরেখার সান্ধ্য প্রতিচ্ছবি। [র রাও গৃহীত।

জল পর্য্যন্ত খেতে দেওয়া হবে না। কারণ খেলে পরে পাহাড়ে ওঠাব বড় কষ্ট হবে।

কিন্তু আমাদের তখন এমন অবস্থা যে সত্যেশদার মতে চলা অসম্ভব হইয়া উঠিল, তাই অগত্যা চুরির চেষ্টায় মন দিলাম। যেভাবে পাহাড়ে উঠছিলাম তাতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নীচে, কারণ কেবলই চড়াই। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। পুলিনবাবু তাই সোডালেমনেডওয়ালাকে আগে যেতে দিলেন ও কারণ প্রদর্শন করলেন যে "আমরা পথ চিনিনে।" খাবার ওয়ালাকেও ঐ অজুহাতে এগিয়ে যেতে দিলেন ও সেই অবসরে ঝুড়ির ওপর থেকে কিছু নামিয়ে আনতেও ভুললেন না। এপক্ষে তাঁর সুবিধাও যথেষ্ট কারণ তিনি একটু অত্যধিক ঢেঙা, কল্‌কাতার আঁবওয়ালার ঝুড়ি থেকে পেছন দিক হতে আম-তুলে-নেওয়া "লম্বা বাবু।" চোরাই মালের সদ্ব্যবহারে তিনি যখন একাই মনোনিবেশ করলেন তখন 'গ্রেফতারের' ভয় দেখিয়ে অবশেষে সামান্য ভাগ পেলাম অধিকাংশ তিনিই সাবাড় করলেন। কিন্তু তাতে জঠরাগ্নি কিছুমাত্র কম হ'ল না—বরং যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল—ক্ষুধা আরও বেড়ে গেল। তেমন ক্ষুধা বোধ হয় জীবনে আর কখনও হয় নি। বুড়ো বয়সে আমাদের চুরি করে খাওয়া ধরা পড়তে অবশ্য দেরী হয়নি। মুখ নড়ছে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিদ্যাভূষণ মহাশয় হুস্ ক'রে নীচে থেকে মাথা উঁচু ক'রে একেবারে আমার নিকটে এসেই, অনুমানে সব বুঝতে পেরে বল্‌তে লাগলেন—"একি রীতি, একি রীতি।" আমরা অবশ্য অমনি অন্য কথার অবতারণা করে আসল ব্যাপার চাপা দিবার চেষ্টা কর্ল্লুম।

সুবর্ণরেখাতটে বালুকা পাহাড়। [শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত।

গল্প

ওয়েসিস্

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

সংসারে আমার এমন কোনও অভাব ছিল না যার জন্য আমাকে অর্থের জন্য মা, বাপ, ভাইবোনগুলিকে ছেড়ে, জন্মভূমির মায়াপাশ ছিন্ন করে সুদূর বসোরায় যেতে হয়েছিল। ইউরোপীয় মহা সমরের যে রুদ্রতায় সারা পৃথিবী একটা ভীষণ ভূমিকম্পে স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল, সেটা স্বচক্ষে দেখবার একটা প্রবল ইচ্ছা—দুর্দ্দমনীয় খেয়ালকে চাপতে না পেরে এতগুলো প্রতিকূল ইচ্ছার বিরুদ্ধে পা বাড়িয়েছিলাম।

ক্রমাগত গাড়ী, মোটর, রেল জাহাজে মাসাধিক কাল কাটিয়ে মনে মনে বসরাই গোলাপের ছবি আঁকতে আঁকতে যেদিন মরুরাজার দেশে পৌছিলাম, সেদিন আশ্চর্য্য হলাম দেখে—কোথায় বা বসরাই গোলাপ—আর কোথায় বা কি? এ বসরা গোলাপের রাজ্য বটে—কিন্তু এর চারদিকে ছাউনি, মানুষ আর রাশি রাশি কামান, বন্দুক, তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র দেখে খাকী পোষাকে ঢাকা থাকলেও—ডাল-ভাত-খেকো বাঙ্গালীর প্রাণ আতঙ্কে শিউরে উঠ্ল। কিন্তু মুক্তির আশা নেই—যূপকাষ্ঠে স্বইচ্ছায় গলা বাড়িয়ে দিয়েছি—উপায় নেই! ভীরু, দুর্ব্বল প্রাণকে—প্রাণপণ বলে দৃঢ় করে কর্ত্তব্যের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়লাম!

দুঃখের মধ্যেও—একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলাম—এখানে—এই সুদূর বিদেশে এসে—বাঙ্গালীর মূর্ত্তি দেখে! হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি যে বাঙ্গালীর অস্থি-মজ্জাগত হয়ে তাকে দিন দিন ক্ষয় করে তুলছে—সেই বাঙ্গালীকে—সেই সুদূর মরুরাজ্যে দেখলাম ভিন্ন মূর্ত্তিতে! কি খোলাপ্রাণ, কি উদারতা—কি জাতীয় সহানুভূতি!

পরিজনশূন্য প্রান্তরে যে দিন প্রথম পা দিতে শঙ্কিত-প্রাণে অধীর হয়ে উঠেছিলাম সেদিন দলে দলে আমার দেশের লোক, আমার স্বজাতিরা—এসে আলাপে আপ্যায়নে, স্নেহে ভালবাসায়—আমার সকল চিন্তা, সকল শঙ্কা ভুলিয়ে দিয়ে আমাকে আপনার করে নিল। সুদূর বিদেশে—জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে সেদিন আমার আপন জাতভাইকে যে মূর্ত্তিতে দেখেছিলাম, সে মূর্ত্তি কবে আমার দেশে, আমার ঘরে, আমার স্বজনদের দেখব?

আপনার জনের কাছ থেকে চলে এসে এখানেও—দাদা, ভাই, খুড়ো প্রভৃতির অভাব হল না। সুখ না থাকলেও শান্তি ছিল—স্বস্তি ছিল। অহোরাত্র কর্ম্মের ভেতর ডুবে থেকে প্রাণ যখন মুক্ত বাতাসের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত, তখন বন্ধুবান্ধব মিলে আশ-পাশের পল্লীগুলোয় বেড়াতে যেতাম। সে কি আনন্দ! পল্লীর শান্তিময় বক্ষে সে কি অবাধ বিহার! পল্লীর ঘাটে, মাঠে, বাটে যখন আরবী সুন্দরীদের কুসুম কলির মতন ফুটফুটে মুখ, চঞ্চল চক্ষু আমাদের উৎসুক দৃষ্টিপথে পড়ে লজ্জারুণ হয়ে—ঘোমটার আড়ালে অন্তর্হিত হত—তখন মনে—হত—কবি এদেরই এঁকেছেন তাঁর ভাবের তুলিতে

গোলাপ, কলির রং দিয়ে—এরাই বুঝি সেই বিশ্ববিশ্রুত বাদশাহী হারেমের বসোরাই গোলাপ।

এমনই করে আমাদের কর্ত্তব্য কঠোর জীবনের দিনগুলি হাসিকান্নার আলো-ছাওয়ার ভেতর দিয়ে চলে যেত। সহস্র অভাবের ভেতরে বাস করে ও অভাব বলে কোন জিনিষ অনুভব করবার অবসর আমাদের ছিল না। চারিদিকের কর্ম্মস্রোত—চারিদিকেব সতর্ক জাগরণ, আমাদেব সব ভুলিয়ে রেখেছিল, ক্লান্তি ছিল না—অবসাদ ছিল না। একটা কিসের মাদকতা—যেন আমাদের ভিতরকার মানুষটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

সে দিন রবিবার—ছুটি! অন্যান্য ছুটিব দিনেব মতন সে দিনও অবসর সময়টার সদ্ব্যবহার করতে কয়েকজন বন্ধু মিলে ছাউনিব অদূরবর্ত্তী এক পল্লীর উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। এই পল্লীতে একটা সুন্দর মসজিদ ছিল, তার চারদিকের মনোরম দৃশ্যাবলী বড়ই মনোমুগ্ধকর।

খোলামাঠের চারদিক তখন পশ্চিমে ঢলে-পড়া সূর্য্যদেবের রক্তিম কিরণছটায় অপূর্ব্ব শ্রীধাবণ কবেছিল। বাধা-নিষেধের বাইরে এসে দেশের ভাষায় প্রাণ-খোলা হাসিগল্পে প্রাণটাকে তাজা ক.ব নিতে সকলেবই ইচ্ছা হয়। আমরাও নানা রকম গল্পে গানে পল্লীপথ মুখরিত করে চলেছিলাম। মাঠ ছেড়ে গ্রামের ভেতব এসে পড়লাম, পথের দুধারে আরবীদের বাড়ী,—রাস্তার ওপব আরবী বালক-বালিকারা ছুটোছুটি কবে বেড়াচ্ছিল। তাদের সেই আনন্দময় হাসিখুসির ভেতব দিয়ে আমবা কিছুদুব অগ্রসর হয়ে চলেছি, হঠাৎ রাস্তাব পাশের একটা বাড়ীর দরজা খুলে এক আরবী রমণী বেরিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে ভাঙ্গা হিন্দী ও আরবী মেশানো এক অপূর্ব্ব ভাষায় বল্লেন "মনিব ঠাকুরুণ আপনাদেব সেলাম দিয়েছেন, যদি অনুগ্রহ কবে তাঁব সঙ্গে আপনারা দেখা করেন—তিনি বড়ই খুসি হবেন।

আরবী পাড়ার ভেতর এসে মনিব ঠাকুরুণের ডাকের কথা শুনে—আরব্যোপন্যাসের কথা মনে হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বেশ মনে পড়ল—এরা যে আরবী!

আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখের পানে চেয়ে কি করা কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করে উঠ্‌তে পারলাম না। বাড়ীখানা দেখে ভদ্রলোকের বাড়ী বলেই বোধ হচ্ছিল বটে—কিন্তু সাহস করে বাড়ীর ভেতর পা দেওয়া—বিশেষ মনিব-ঠাকুরুণের আহ্বানে—বড় সুবিধার বলেও মনে হচ্ছিল না। হাজার হলেও আমরা সেপাই—বাবুদের মধ্যে একজন সাহস করে বললেন,—"চলই না হে—দেখেই আসা যাক্ 'মনিবঠাকুরুণটিকে। খেয়ে ত আর ফেলবে না। আর পকেটেও গড়ের মাঠ—তবে আর আশঙ্কা কিসেব?"

মিলিটাবি আইনকানুনে যদিও স্ত্রীলোকের ছায়া মাড়ান নিষিদ্ধ তথাপি সে ক্ষেত্রে আইন বাঁচিয়ে চলতে পারলাম না। বন্ধুব কথায়—বুক বেঁধে সকলে বাড়ীব ভেতর প্রবেশ করলাম।

রমণী আমাদের একটা সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়ে রেখে, পর্দ্দা টেনে ভেতরে প্রবেশ কবল। আমবা স্পন্দিত চক্ষে মনিব ঠাকুরুণের অপেক্ষায় বসে রইলাম—নির্ব্বাক, নিস্পন্দ।

অল্পক্ষণ পরেই পূর্ব্বেব বমণী রেশমী পর্দ্দা ঠেলে পুনবায় এসে দেখা দিল,—তার পশ্চাতে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে বদন আবৃত কবে এক অপরূপ লাবণ্যময়ী সুন্দবী! আমবা সকলেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে বসে বইলাম, কারুর মুখেই কথা নেই। সুন্দরী—আমাদেব হাততুলে নমস্কাব কবে বাঙ্গালা ভাষায় বললেন, নমস্কার মহাশয়! আমাব বড়ই সৌভাগ্য যে আপনাবা দয়া করে এই গবীবখানায় পায়েব ধুলো দিয়েছেন।"

গাছ, মাটি, কিম্বা পাহাড় যদি কথা বলত, তা হলেও আমরা এতটা আশ্চর্য্য হতাম না—যতটা সেই আরবী সুন্দরীর সুধাকণ্ঠে খাঁটি বাঙ্গালা কথা আমাদের বিস্মিত করে তুলেছিল। সকলেই অবাক হয়ে সুন্দরীর মুখেব পানে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

সুন্দরী আমাদের অবস্থা দেখে মৃদুহাস্যে পুনবায় বললেন, "আ:ার মুখে বাঙ্গালা কথা শুনে তাজ্জব হয়ে গিয়েছেন না? সত্যই আশ্চর্য্যের কথা!"

আমরা কি জবাব দেব কিছুই খুঁজে না পেয়ে পূর্ব্বাবস্থাতেই বসে রইলাম। দাসীকে সরবৎ আনতে বলে একটা কেদারা টেনে নিয়ে আমাদের কিছুদূরে বসে সুন্দরী

বললেন, "ভয় নেই—আমি আপনাদেরই দেশের একজন।"

'আমাদের দেশের একজন' শুনে একটু যেন ভরসা হল, আমিই প্রথমে কথা কইলাম, বললাম,—আপনি যদি আমাদেরই দেশের একজন তা হলে আপনি এখানে কেন? তবে কি আপনি বাঙ্গালা দেশের মেয়ে—এখানে কি বিবাহ করেছেন?'

"না। আমার বাপ, মা, ভাই—সকলেই আরবী,—আমিই কেবল বাঙ্গালী।"

"তবে কি আপনি বাঙ্গলা দেশে জন্মেছিলেন? ছেলেবেলায় বাঙ্গলা দেশে ছিলেন?"

"না। আমি এইখানে—এই বাড়ীতেই জন্মেছিলাম। তার পরে কি করে বাঙ্গালী হলাম—সে এক ইতিহাস। থাক্ সে কথা—আপনারা সরবৎ খান।"

"তা খাচ্ছি—কিন্তু যদি আপত্তি না থাকে—তা হলে সে ইতিহাসটা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? আপনার মুখে বাঙ্গলা কথা শুনে, আবার আপনি আরবী মেয়ে শুনে—আমরা সত্যসত্যই বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেছি।

আমার কথা শুনে রমণী কয়েক মিনিট চোক বুজে চুপ করে বসে থাকলেন, তার পর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গান একখানা ছবির রেশমী কাপড়ের আবরণটা খুলে দিলেন। আমরা ছবির দিকে তাকিয়ে দেখলাম—এক শান্ত সৌম্য প্রাণময় মূর্ত্তি। রমণীও এক-দৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়েছিলেন। ক্ষণকাল পরে আবার কেদারার ওপর বসে বললেন, "ইনিই আমার স্বামী—একজন বাঙ্গালী—।

উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, উনি কি জীবিত আছেন?

"না। আজ পাঁচ বছর হল তিনি আমাদের ছেড়ে বেহেস্তে গিয়েছেন।" বলতে বলতে রমণীর স্বর গাঢ় হয়ে এল—চোখ ছল ছল করে উঠল।

রমণীর অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষু দেখে আমি বললাম, "যদি আপনার বলতে কষ্ট হয়—তবে বলে কাজ নেই—আপনার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করে বোধ হয় আপনার হৃদয়ে অন্যায় আঘাত করেছি— মার্জ্জনা করবেন। "ন বাবুজি—তাতে কি?—যে আঘাত সহ্য করে বেঁচে আছি—তার কাছে আর কোন আঘাতই আমায় আর বেশী বেদনা দিতে পারে না।"

রমণী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সিক্ত চক্ষু ওড়নায় মুছে পুনরায় বললেন, "আমি বাঙ্গালীকে বড় ভালবাসি—ভারী খাসা লোক তারা, আর বাঙ্গলা কথা বলতে এত ভালবাসি যে কথা কইবার লোক পাই না বলে, বাড়ীর ঘোড়া, গরু, কুকুর, বেড়াল এমনি গাছপালার সঙ্গে বসে বাঙ্গালা দেশের গল্প করি—বাঙ্গলা কথা শোনাই। আজ কাল অনেক বাঙ্গালী—মাঝে মাঝে এদিকে বেড়াতে আসেন দেখেছি, কিন্তু—তাঁরা সকলেই ইংরাজী কথা বলেন, ইচ্ছা হলেও—তাই সাহস করে তাঁদের ডাকতে পারি না। আপনাদের মুখে বাঙ্গলা কথা শুনে আপনাদের সঙ্গে কথা কইতে মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল—তাই না ডেকে থাকতে পারি নি। যদি দোষ থাকে মাপ করবেন।"

রমণীর কথার উত্তরে আমরা বললাম "না—না দোষ কি? আপনার মুখে বাঙ্গালা কথা শুনে আমরাও ভারী খুসী হয়েছি, অন্য দশীয়ের মুখে বাঙ্গালা কথা শুনতে আমরাও খুব ভালবাসি—আর আপনি যখন আমাদের দেশের কুলবধূ—তখন আমাদের অতি আপনার লোক।"

"হাঁ সেই সাহসেই আপনাদের ডেকেছি। আমার স্বামী দেশকে বড় ভালবাসতেন। যেবার বাঙ্গলা দেশে 'স্বদেশী' হয়েছিল, তিনি রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াতেন বলে তাঁর ছ'মাস জেল হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে মনের দুঃখে তিনি বিবাগী হয়ে মক্কায় চলে এসেছিলেন। কিন্তু দেশের কথা তিনি ভুলতে পারলেন না।—ধর্ম্ম তাঁকে ধরে রাখতে পারলে না—তিনি আবার দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন। ফেরবার পথে তিনি এই গ্রামের পীরের মসজীদে বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি অনেকটা ফকিরের মতন ছিলেন, তাই কারুর বাড়ীতে আশ্রয় নেন নি। সেই সময় ঐ মসজিদে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। তাঁর সরলতায়, তাঁর স্নেহমাখা কথায়, তাঁর সুন্দর তেজোময় মুখশ্রী দেখে মুগ্ধ হয়ে আমি তাঁকে নিজের অজ্ঞাতসারেই আত্মসমর্পণ করে ফেলেছিলাম। এখন আপনারা অবস্থা বুঝতে পারবেন,

তখন ফেরবার আর কোন উপায় ছিল না। মুখ ফুটে যেদিন তাঁকে মনের অতি গোপন কথা ব'ললাম, সেদিন তাঁর চোখ ফেটে ঝর্ ঝর্ করে জল ঝরে পড়েছিল—যেন মুক্তায় গাঁথা হার। সে হার বড় সাধ করে গলায় প'রলাম, অন্তরের কথা গোপন রাখতে পারলাম না—পিতাকে বললাম। আরবীর মেয়ে একজন অপরিচিত—বিদেশী ফকিরকে আত্মসমর্পণ করেছি শুনে, পিতা আত্মহারা হলেন, কিন্তু স্নেহময় পিতা আমার অপরাধ ক্ষমা করলেন। সব কথা শুনে তাঁর সঙ্গে বিবাহ দিতে স্বীকার হলেন বটে, কিন্তু—এক সর্ত্তে। আমি তাঁর একমাত্র কন্যা হলেও—তিনি আরবীর হৃদয় দমন করতে পারলেন না,—এই সর্ত্তে বিবাহ দিতে রাজী হলেন যে, কন্যা কখনও বাংলা মুলুকে যেতে পারবে না, এই আরব দেশেই তার স্বামীকে বাস করতে হবে, অবশ্য বাসোপযোগী সম্পত্তি পিতা কন্যাকে দিবেন।

স্বদেশপ্রেমিক স্বামী—এই হতভাগিনীর মুখ চেয়ে সেই কঠোর সর্ত্তে সম্মত হলেন, আমাদের বিবাহ হয়ে গেল।

বিবাহের পর আমাদের সুখের নেশায় বিভোর হয়ে ক'বছর কেটে গেল। সংসারের দুঃখ, কষ্ট, চিন্তা, ক্লেশ কিছুই আমাদের স্পর্শ করল না। এমনি সুখেই দিন কাটছিল; হঠাৎ একদিন স্বামীর ঘুমন্ত মুখের ওপর চিন্তার রেখাপাত দেখলাম, স্বপ্নঘোরে তাঁর মুখে শুনলাম—দেশের জন্য ব্যাকুলতা। পরদিন জাগ্রত অবস্থাতেও তাঁকে চঞ্চল দেখলাম, প্রাণ কেঁদে উঠল। একটা সামান্য নারী আমি, আমার মুখচেয়ে—আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য স্বামীর মনের গোপন ব্যথা জেনেও—প্রতিকার করতে পারব না? নিজের দুর্ব্বলতা মনে করতেই—আমার আরবী রক্ত হু হু করে মাথায় উঠে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললে। স্বামীকে দেশে ফিরে যেতে বললাম। আমাদের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্বামী বললেন, "তা হয় না। তোমার পিতা মুক্তি না দিলে আমি এক পাও নড়তে পারব না, কারণ—তোমাকে ফেলে যাওয়া—অসম্ভব।" স্বামীর কথার উত্তরে বললাম, "আমায় ফেলে যাবে কেন? আমিও তোমার সঙ্গে যাব,—আমিই কি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব!"

মন বাঁধলাম, ভবিষ্য[illegible] স্বদেশ সব ভুলে পিতা[illegible] আমাদের মুক্তি ভিক্ষা ক[illegible] কাকুতি-মিনতি, অনে[illegible] নরম করলাম, কিন্তু [illegible] আরবীর প্রাণ বড় কঠি[illegible] করিয়ে নিলেন,—স্বামী [illegible] নাম করতে পারবি ন[illegible] পিতা[illegible] পারব না। দেবতা [illegible] অঙ্গীকার করলাম। [illegible] মা[illegible] ভাই, ভগিনীদের অশ্রুজলের ভেতর দিয়ে স্বামীর [illegible] —বাংলা মুলুকে যাত্রা করলাম।

তার পর—স্বামীর [illegible] স্বামীর [illegible]-পরিজন আপনার করে নিয়ে [illegible] পেতে ব[illegible]। স্বামী উচ্চশিক্ষিত হয়েও কাজকর্ম কিছুই করতেন না। ঘরে বসে গরীব দুঃখীর সেবা করতেন—চিকিৎসা করতেন। তাঁর বড় ভায়েরা তাঁকে অন্য কোনও কাজকর্ম করতেও দিতেন না। স্বামী আমার দেশের ও দশের কল্যাণ সাধনাই জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম ভেবে নিজেই—মনের আনন্দে দিন কাটাতেন। অহোরাত্রি স্বামীকে চোখের সুমুখে কাছে কাছে পেয়ে—আমারও প্রাণ পরমানন্দে ভরে ছিল। বাড়ী শুদ্ধ লোকের আদরে আদরিণী হয়ে দিন কাটাতাম, একদিনও এতটুকু দুঃখ মনে প্রাণে অনুভব করিনি। হাসি, খেলা, আনন্দ, উৎসবের মধ্যে স্বামী সোহাগিনী হয়ে দশ বছর হাজির ছিলাম। কিন্তু কিস্মৎ—সবই এই অদৃষ্ট! এই পোড়া অদৃষ্টে অত সুখ বেশী দিন সইল না। স্বামীর দেশের মাটিতে এই অঙ্গ মাটি হবার আগেই খোদা আমার সুখের ঘরে সিঁদ কাটলেন।

সে বছর গ্রামের চারদিকে কলেরা রাক্ষসী তার লক্‌লকে জিব বার করে বাড়ী বাড়ী উজাড় করতে লাগল। যে পারল সে পালাল, যার সামর্থ্যে কুলিয়ে উঠ্‌ল না, সে খোদার উপর নির্ভর করে ভিটে কামড়ে পড়ে রইল।

দয়াল স্বামীর প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল। ওষুধের বাক্স নিয়ে

ঘরে ঘরে গিয়ে রোগীর চিকিৎসা, রোগীর পরিচর্য্যা করতে লাগলেন।

তার পর একদিন সন্ধ্যাবেলা কাল রোগ স্বামীকেও গ্রাস করে বসল। ধরে রাখবার চেষ্টার ক্রটী হল না। বাড়ী শুদ্ধ লোক জীবন তুচ্ছ করে মৃত্যুর সনে ভীষণ যুদ্ধ করেও তাঁকে আটকে রাখতে পারলাম না। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ মহাপ্রস্থান করলেন।

ছমাস বুক বেঁধে স্বামীর ঘরে পড়ে রইলাম, কিন্তু আর পারলাম না। পিতা, মাতা, ভাইবোনেদের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল, পিতাকে চিঠি দিলাম। ভাই গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমাদের সমাজে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। সবাই অনুরোধ ক'রলে আবার বিবাহ করতে। কিন্তু যার সারা দেহ, মন, আত্মা, স্বামীর সুখ-স্মৃতির স্পর্শে অহোরাত্র জাগরুক হয়ে আছে সে কি আর একজনকে ভালবাসতে পারে। আর সে এমন স্বামী বলতে বলতে রমণীর কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া এল। সতীর শ্রেষ্ঠ সুখ দুঃখের ইতিহাস শুনতে শুনতে আমাদের চোখের পাতাও শুক্‌না ছিল না। রমণী স্তব্ধ হতে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম অপলক দৃষ্টিতে সাধ্বী স্বামীর প্রতি-কৃতির দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ও অশ্রু-জলে গণ্ড প্লাবিত হচ্ছে! সেই মহিমময়ী মূর্ত্তির দিকে চেয়ে শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়ে পড়ল।

"বনের পাখী"

শ্রীমুরারিমোহন দাস

সে যে আমার—
　　অবাধ "বনের পাখী",
সবুজ পাতার মাঝে মাঝে
তাহার বনের সুরটা বাজে
উদাস ভাবে ভরে আছে
　　করুণ তাহার আঁখি,
আমার অবাধ—"বনের পাখী",
　　　　আমি তারে বাঁধ্‌ব না'ক
　　　　　　সোণার শিকলে,
　　　　সুর সাধানোর আশা আমার
　　　　　　যাক্‌ সে বিফলে,
কাঁপন তুলে ধীর বাতাসে,
গেয়ে উঠুক্‌ নীল আকাশে
সুরের ঢেউয়ে নাচিয়ে তুলুক্‌
　　হৃদয় থাকি থাকি!
আমার অবাধ—"বনের পাখী",
　　　　বনের কথা হাওয়ার কথা
　　　　　　গায় সে সঙ্গীতে

　　　　কি জানি সে আপন ভোলা
　　　　　　কিসের ইঙ্গিতে,
নাইবা কেউ মুগ্ধ চোখে
রইল চেয়ে তাহার মুখে,—
ঝর্ণা যাবে পাহাড় বেয়ে
　　উঠ্‌বে কেঁপে শাখী
গাইবে যখন অবাধ গান
　　অবাধ—"বনের পাখী"
　　　　মুখর সে গান বাজ্‌বে হোথা
　　　　　　নীরব আকাশে
　　　　সে সুর কোথা দিবে পাড়ি
　　　　　　দখিন বাতাসে—
পাহাড় পারে—পরীর দেশে
উছল—অবাধ যাবে ভেসে
পরীর রাণী পরিয়ে দেবে
　　একটী আলোর রাখী,
সে দিন আমার ধন্য হবে
　　অবাধ—'বনের পাখী'

পত্নী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা

(বিংশ শতাব্দীর আইন সঙ্গত)

সেলাই করিতে করিতে পত্নীর হাত হইতে ছুঁচ পড়িয়া গিয়াছে, তাই স্বামী এমন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া খুঁজিতেছেন যে বাড়ীতে অপর কেহ মারা গেলেও এতটা উদ্বেগ সৃষ্টি করিতে পারিত কি না সন্দেহ! স্বামীর অবস্থা দেখিয়া বলিলেন,—"থাক, থাক, আর খুঁজতে হ'বে না, পেয়েছি ছুঁচটা খুঁজে, আমার এই কাষটার ভিতর ছিল জড়িয়ে। আচ্ছা তোমার বড় কষ্ট হ'ল। জিনিষগুলি আবার গুছিয়ে রাখ আর কি হবে।"
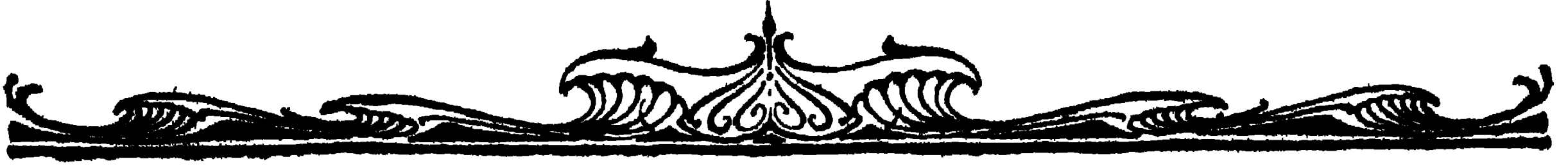
আমার কথা

[শ্রীধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ]

মেঘ করিয়া আসিয়াছে' গর্জ্জে শুধু বজ্র। আরতির সে শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনি আর আমি শুনিতে পাই না! দূর মাঠ পার হয়ে আর সে পবিত্র ধ্বনি আমার কাণে আসে না। আমি যেন কত দূরেই চলে এসেছি।

আমার হারাণো কথা পুরোণো খেলা—একে একে সব ধূলি মাটিতে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। খেলা ধূলা কার চিরকাল থাকে? আমারো নাই।

আমার মনের দুঃখে আমি কঙ্কালের কথা শুনিতে গিয়াছিলাম। কঙ্কাল আমায় বেশ দু'কথা শুনাইযা দিয়াছে। তার দোষ নাই, সে মনের আক্ষেপে বলে ফেলেছে—বলিতে গিয়ে শেষের দিকটায় যেন একটু বেহুঁস হয়ে পড়েছিল। আমি কিছু মনে করি নাই।

কঙ্কালিনী আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে কথা বলিতে বলেছে। আমি যদি না বলি তবে সেও কিছু বলিবে না—বলেছে। আমার কি বলিবার কোন কথা আছে—?

আমার আগের কথা সব ভাল মনে নাই। হারিয়ে গে'ছে—ভুলে গেছি। শুনাব বলে তো কোনদিন যত্ন করে রাখি নাই। তবু কিছু কিছু আগের কথা না বলিলে—যেন মনে হয়—আর এ জন্মে আমার কোন কথাই বলা হবেনা। জোড়াতাড়া দিয়ে কিছু তাকে বলিতেই হবে। আমি জানি—আমি কাশীরাম, যা বলিব—তাই তার কাছে মহাভারত হবে। পুণ্যবতীর মত তাই সে শুনিবে। কঙ্কালিনী আমার দরদী। আমার অতি অসম্ভব রকম খাপছাড়া কথা গুলির মধ্য থেকে সে এমন সব অর্থ টেনে বের করিবে—যা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কোন মল্লিনাথের সাধ্য নাই বুঝে, বা বুঝিয়ে দেয়। আমাকে কথা বলিতে হবে। কেননা—তার কথা শুনিতে আমার ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু তবু—আমার এমন আলস্য এসেছে যে না বলিতে হ'লেই যেন ভাল হ'তো। তা ত সে শুনিবে না। মেয়েমানুষ কবে কথা শুনে?

আমি কি বলিব—? আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। বে-আক্কেল বনে গেছি। দেখে দেখে চুলে পাক ধরে এল। এরা আমায় কি বুঝাতে চায়? ভাবে আমি কিছু বুঝি না। আমাতে আর কোন পদার্থ নেই। যত পদার্থ তা ঐ মেয়েমানুষের রূপে—আর তা কেনা হয় যা দিয়ে—ঐ রূপালী চাক্তিতে। সাদৃশ্য আছে বটে। মেয়ে মানুষের রূপ আর রূপিয়া। দুটোই ঝকঝকে—তকতকে—যেন মিছরীর ছুরী। আজব দুনিয়ার আসল ফাঁকি হচ্ছে এই দুটি। কঙ্কালিনীর রূপও নাই—কাজেই আমারও চাক্তির দরকার হয়না। মিলেছে ভাল।

আমি তারে রূপ দেই। সে রূপে যখন মন মজে—সেই রূপে আমি তখন তারে সাজাই। আমি কঙ্কালীর উপর রূপ দিয়ে—আঁখি মেলে তাই চেয়ে দেখি। আমার রূপের ধ্যানে আমি মসগুল হয়ে থাকি। সে যে এখন কাছে নাই। থাকিলে বলিতাম আমার সাকী! দে চিতার আগুনে তোর হাড়-গলান তরল এক পাত্র দে—ঐ মড়ার মাথার খুলিটা ভরে। এক চুমুক পান করে—গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই—বড় শুকিয়ে যায়। একটু তর-র হয়ে রঙ্গীন চোখে দুনিয়াটা একবার দেখি। সাদা চোখে ত ঢের দেখা গেল। সে আর বলে কাজ নেই। সবাই জানে, সবাই দেখে। সবাই ভুগে। দুঃখ এই—সবাই স্বর্গের আবহমান ধারা অব্যাহত রেখে গড্ডলিকা প্রবাহে পিপীলিকার মত বেশ আস্তে আস্তে জন্ম-মৃত্যুর পারাপার দিয়ে চলে যায়। যেন এক গর্ত্ত হতে এসে আর এক গর্ত্তে ঢুকে। কেউ থামে না। কেউ ভাবে না। কেউ বলে না—দেখে না। এ নয়-এ নয়-এ চাইনা। সবাই বলে চাই মেয়ে-মানুষের রূপ—আর তা কিনিবার জন্য চাই রূপার চাক্তি। যাতে মেয়েমানুষের রূপ বাড়ে তাই কর। যাতে এই চাক্তির বংশ বৃদ্ধি পায়—প্রাণান্ত করে যুদ্ধ করে—মানুষ হয়ে মানুষের টুঁটি চেপে ধরে—তাই কর—তাই কর।

না—সাকী নাই। আসিবে না। আজ আর কথা জমিবে না। সে যেন কোথায় গেছে। সে না হ'লে আমার কথা জমে না। যতদিন তার নিজের রূপ ছিল ততদিন আমি তার কাছ দিয়াও ঘেঁষি নাই। কথা বলা ত দূরের কথা। তার রূপ না থেকে ভালই হয়েছে। রূপের পূজা করেত দেখা গেছে। এবার কঙ্কালের খিস্‌মদ করে দেখি।

জগতে এসে ঘুরে ঘুরে দেখাটাই সব চেয়ে বড় কাজ। যেখানে সেখানে—যাকে তাকে যতটা পাবা যায়। এক এক চুমুক খেয়ে নিই—আর দেখে নিই। তার পরে একদিন ত আছেই। তোমারো আছে—আমারো আছে। আর যে বলে না নাই—তারো আছে। তার রূপেরও আছে। একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে নাকি। এর ঝোঁকটা সামলানোই হচ্ছে কেরদানী। সেই কবে একপাত্র টেনেছিলাম তার ঝোঁকটা চলছে যেন নদীর ঢেউয়ের মত—। আসছেই—আসছেই—আসুক। কত আসে দেখি।

হ্যাঁ—কি বলিতেছিলাম। দেখ—শুধু কথা শুনিতে নয়—কঙ্কালকে আমি আঘাত করতেও গিয়াছিলাম। কেমন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। আমার জ্ঞান ছিল না। তা সে কঙ্কাল কি না—যুত হ'লো না। আমার শুধু কঙ্কালে করাঘাতই সার হ'লো।

কঙ্কালে করাঘাত! কঙ্কালে করাঘাত! মানুষের মধ্যে সেটা জন্মেছিল সব চেয়ে সেরা—সে ঐ দুষ্কার্য্যে হাত দিয়েছিল। তা সেও বড় যুত করিয়া উঠিতে পারে নাই। আঘাত করিলেই প্রতিধ্বনি উঠে দুঃখ। যাতে আঘাত কর,—যেখানে আঘাত কর—যে রকমেই আঘাত কর—দেখিতে পাবে কঙ্কাল—আর তার মুখে প্রতিধ্বনি শুনিতে পাবে দুঃখ-দুঃখ-দুঃখ।

অচেতন এই আঘাতেই সচেতন হয়ে উঠেছিল। তা সে আঘাত বিশ্বকর্ম্মার হাতের চাপেই হোক, আর আমার ব্যোম-ভোলা নটরাজের পায়ের নাচের তালেই হোক—আঘাতেই সৃষ্টি। সৃষ্টিতে ছন্দ আছে—তাল আছে। বেতালা নয়। কেননা আমার নটরাজকে দস্তুর মত পয়সা দিয়ে নাচ শিখতে হয়েছিল। তার নাচের ছন্দটাও ত বড় কম ছিল না। কিন্তু আমি দেখি নেচে ফল হল কি। [illegible] ভাঙে। যা ভাঙে তাই [illegible] ভাঙব কি না? বড় মাতা[illegible] খেয়াল। কিছু না—আর এক [illegible] কর—সবাই পান কর। [illegible] তুলে নাচ—আর শেষে এক[illegible] হরি বোল্‌-বাস্‌। সব খত[illegible] না। সব নিভে যাবে। তার[illegible] লক্ষ্মীটি হয়ে ঘরে ঘরে [illegible] গিয়ে—পুন[illegible] সুপুত্রের মত সৃষ্টির কার্য্যে মনোনিবেশ কর [illegible]ভি-নিবেশ সহকারে, ত্রুটি না হয়।

দেখো বাবা—বৃষটাকে দেখো এ[illegible]। [illegible] গাছতলায় পড়ে ঝিমুচ্ছে। ও [illegible] নইলে এত ঝিমিয়ে জাবর কাটে কেন? [illegible]। চেতন, অচেতন, দেহী, বিদেহী, [illegible] যারা সবাই খাও তোমরা। এক এক পাত্র করে বাস্‌। তারপর ঝিমোও—নর্দ্দমায় গড়াও—রসাতলে যাও—জাবর কাট—যা খুসী কর। আমার কোন দুঃখ নাই। আমার দুঃখ হয়, যখন কেউ বলে যে খেয়োনা। এখানে কি এত কাজ বাবু যে খাবে না। এখানে ত ছুটি। আমি ভেবে পাইনা মিছে মিছি এখানে এরা এত খেটে মরে কেন! এর অর্থ কি? তুলে ফেলে দেও—এই সব ইট পাটখেল। ঘরামিদের সব মজুরি দিয়ে বিদেয় করে দাও। মাটীর বুক চিরে গর্ত্ত করে কোন লাভ নাই। ঐ দেখ—কঙ্কাল—আঘাত করতে চাও—কর। ঐ শুন বিদীর্ণ মাটীর বুক থেকে দূর শূন্যে প্রতিধ্বনি হাহাকার করে বলে বেড়াচ্ছে—ঐ কি আবার—একি শব্দ—তার নাম হচ্চে দুঃখ। বিশ্বাস কর না—আমার কথা। তা করিবে কেন! চাকুরির আর মেয়ে মানুষের কথা ভাবছো কি, না। ও রোগের ওষুধ নেই—দাদা—ও রোগের ওষুধ নাই। ওকে একেবারে —বুঝিলে কি না—গায়ের জোরে ঝেড়ে ফেলে না দিলে ও যায় না। ও যাবার নয়।

যাক—কঙ্কালিনীর জন্যেত আমার বয়েই গেছে। যেটাকে ধরা যাবে সেইটেই যখন কঙ্কাল—তখন হাতের কাছে—যেটাকে পাওয়া যাবে সেইটাকেই—এই এক চড়।

কিন্তু আঘাত করিতে গিয়ে আমার হাতেও কম লাগে না। এই জন্যই অনেক ভদ্রসন্তান আঘাত করে না। চুপ করে থাকে। নিরুপদ্রবে অহিংস অসহযোগ ব্রত উদ্‌যাপন করে। বেশ তারা শাস্ত্র মেনে চলে। তাদের বেশী কিছু হয় না। এই কিলটা—চড়টা—লাথিটা—গুলিটা দৈবাৎ, কখনো-সখনো ঘরের মেয়েদের টেনে নিয়ে এই একটু আধটু—বেশী কিছু নয়। অহিংসার মহিমায় তারা অনেকেই ভুলে যায়। আর সমীচীনও তাই। তোমাকে যখন কানমলা খেতেই হবে, তখন তোমার কর্ণ—রাম মলে কি শ্যাম মলে—তার খবরে দরকার কি বাপু?

অনেকটা দূর এসে পড়েছি। ছিল দিন অতি প্রত্যুষে উঠে আমি সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতাম। নিষ্পাপ নির্ম্মল ছিলাম আমি। আজো আমি পাপে বিশ্বাস করি না। দুর্গন্ধের বাষ্পও আমার কাছে আসিতে পারিত না। পৃথিবী ছিল—যৌবন ভারাক্রান্তা শস্য-শ্যামলা—সুন্দরী রমণী। আকাশ ছিল—দেবতার আশীর্ব্বাদ। জীবন ছিল মনুষ্যত্বের ধ্যান। কল্পনা ছিল—একটা পাহাড়-পর্ব্বত। হৃদয় ছিল ঐ প্রশান্ত মহাসাগরের মত উদার বিস্তৃত। কোথা থেকে এই বাসনা—এই মেঘ এই ঝড়—উঠে এল।

তথাপি আমি হেলি নাই, দুলি নাই—সমানে চলেছি। কঙ্কালিনী ঠিকই বলেছে। মনে ত করি সমানেই চলে যাব। সঙ্গে কেউ যেতে চাও! সাহস হয়,—পারো, এস।

বিরাগীর আত্মকথা

(ছোট গল্প)

আমি যা' বল্‌ব সেটা আমার নিজের কথা নয়,—একটা বিরাগীর আত্ম-কাহিনী। তারই মুখপাত্র হয়ে আজ বল্‌ছি,—

আমার চিরদিনটা এই রকমেই যায় নি, তোমার মত আমিও একদিন গৃহী ছিলাম। আমার বল্‌তে ঘরে শুধু ছিল আমার স্ত্রী,—কাঁচা সোণার মত রং ছিল তার। কিন্তু তার রূপ যৌবন আমার বৈরাগ্যের পথ বন্ধ কর্ত্তে পারেনি। তাই একদিন এই রকমই অন্ধকার রাত্রে তাকে একাকিনী ফেলে যেতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিনি। তখন একবারও মনে হয়নি সে সুন্দরী, যৌবন তার উদ্দাম-চাঞ্চল্যপূর্ণ, জগতে সে একাকিনী অসহায়া নারী সে! নিজের ধর্ম্মোন্মাদনায় মত্ত ছিলাম তখন আমি।

তারপর তিনটে বছর কেটে গেছে পথে পথে, দেশে বিদেশে। হঠাৎ একদিন কালিঘাটে দেখা হল তার সাথে। সে তখন দাঁড়িয়েছিল একটা পরপুরুষের কাঁধে মাথা দিয়ে। আমার দিকে চোখ পড়্‌তেই সে এগিয়ে এল আমার কাছে, আমায় হাত দেখাতে। আমি তার মুখে নিজের দৃষ্টি স্থির রেখে বল্লাম,—তোমার নাম কাজল, তোমার আগেকার স্বামীর নাম—, নাম আর বল্‌তে হল না। সে চীৎকার করে বলে উঠ্‌ল "তুমি!" তার চীৎকারে কতকগুলো লোক আমার চারিপাশে জমা হয়ে গেল। সে বেশ নির্ব্বিকার চিত্তে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বল্লে,—আমি নাকি তার হাত চেপে ধরেছিলাম, কি উদ্দেশ্য আমার ছিল তা' সে জানে না। তারপর আর কিছু মনে নাই। যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আমার সর্ব্বাঙ্গে একটা দারুণ ব্যথা জড়িয়ে ধরেছে,—বুঝ্‌তে পার্‌লাম ব্যথাটা প্রহারের। ভাব্‌লাম "এর জন্যে দায়ী কে? আমি, না সে? আমার গায়ের ভস্মগুলা যেন বিদ্রূপ করে বলে উঠ্‌ল "তুমি স্বেচ্ছায় মেখে নিছ্‌লে যে!"

"অজানা"

কাজের কথা

প্রবাসী ও দেশবন্ধু ঃ—দেশবন্ধুর অভিভাষণকে ব্যবচ্ছেদ করে প্রবাসী যে গরল তুলে চারিদিকে ছড়াবার চেষ্টা করেছেন, তাতে দেশবন্ধু দেশবাসীর চক্ষে এক চুলও নেমে যান নি—তবে এঁদের অধ্যবসায়কে তারিফ দিতে হবে। যে প্রবাসীর যুক্তি ও মত একদিন শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই পড়ে আনন্দ পেত, সেই প্রবাসীর লেখা পড়েই আজ আমরা মর্ম্মাহত। যুক্তি যে কিসের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে দেশত্যাগ করেছে, তা বুঝবার উপায় নাই। তবে কথাটা এই যে মতান্তর হলেই মনান্তর সৃষ্টি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় এবং যিনি কেবল গুণের জন্যই দেশবাসীর হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁর মর্য্যাদার লাঘব করা কলমের কর্ম্ম নয়। দেশের লোক তত বোকা আর নাই—তারা ছাপার লেখার অন্তরালে যে হৃদয় থাকে তাকেও অধ্যয়ন করে, চিনে ফেলে। ধোঁকাবাজীর দিন বাঙ্গালা থেকে চলে গেছে, এখন কাজ দেখাতে হবে, ত্যাগ কর্ত্তে শিখতে হবে, কেবল লম্বা চওড়া বচনে আর বিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে আর দেশবাসীর কাছে সম্মান পাওয়া যাবে না।

ফরওয়ার্ড বিদ্বেষ ঃ—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত একখানি ইস্তাহার সম্প্রতি ফরওয়ার্ডের বিজ্ঞাপনদাতাদের নিকট প্রেরিত হইতেছে। তাহাতে নানা ভণিতা করিয়া এই গুপ্ত ইস্তাহারজারীকারকগণ এইটুকু প্রমাণ করতে চান যে ফরওয়ার্ড কাগজ যে ত্রিশহাজার ছাপা হয় বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে সেটা মিথ্যা এবং ফরওয়ার্ডের প্রকৃত প্রচার নাকি উহার এক তৃতীয়াংশ। ফরওয়ার্ডের সত্য কত প্রচার তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার আমাদের প্রয়োজন নাই—কিন্তু এঁরা যে যুক্তি দিয়ে এ কথা গুলি বোঝাতে চেয়েছেন তা নেহাৎ বোকার মত এবং বোকা [illegible] হয় তুচারটী অহিংস ধর্ম্মে দীক্ষিত [illegible] অনুরক্ত ইংরাজী ও বাঙ্গলা দৈনিক [illegible] কারণ মালা তিলক মুণ্ডিতগুম্ফ ও দীর্ঘ শ্মশ্রুর [illegible] অনেক হিংস্রভাব ও বাহিরে অহিংস বলে [illegible] করা চলে। এঁরা ফরওয়ার্ড এক বছরে কত টাকার কাগজ কেনেন তা থেকে কত কাগজ কেনা যায় এবং [illegible] থেকে মোটামাটি কত [illegible] দৈনিক ছাপা [illegible] একটা আনুমানিক হিসাব করেছেন কিন্তু বিদ্যাবাগীশরা ভুল করেছেন ব্যবসাদারদের কাছে এটা হাজির করে যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়ে কারবার চালান, তারা এটুকু বোঝবার ক্ষমতা রাখেন যে যে কাগজ যত জনপ্রিয় তার বিজ্ঞাপনের ফল তত অধিক। সুতরাং সংখ্যার কম বেশীতে তাঁদের বিশেষ যায় আসে না—আর যদিই সত্য ফরওয়ার্ডের প্রচার ত্রিশ হাজার না হয়ে তার একতৃতীয়াংশই হয়—তাহলেও অপর কোন একখানা বাঙ্গালীচালিত ইংরাজী দৈনিকের প্রচার তার সঙ্গে সমান নয়—যাঁরা সব কাগজে বিজ্ঞাপন দেন, এমন একটী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ীর মত এইরূপ। ফলে ফরওয়ার্ডের এতে কোন ক্ষতি হবে না এবং ফরওয়ার্ড ছেড়ে কোন বিজ্ঞাপনদাতাই এই বকধার্ম্মিকদের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন না। পরশ্রীকাতরতা যে মানুষকে দেশের ও শত্রু করে ফেলে তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

অর্দ্ধেন্দু নাট্য-পাঠাগার ঃ—বিগত ১২ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার অর্দ্ধেন্দু নাট্য পাঠাগারে একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল, একখানি নাটক সভ্যগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হইবার ব্যবস্থা ও প্রাপ্ত অর্থ পাঠাগারের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করা। সাতজন

সভ্য লইয়া একটী কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচিত হইয়াছে তাঁহারাই অভিনয় সম্বন্ধে সমস্ত ভার গ্রহণ করিবেন। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের বিসর্জ্জন নাটক সর্ব্ব সম্মতি-ক্রমে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য পুস্তক নির্ব্বাচন ভালই হইয়াছে কারণ ইহা অবৈতনিক অভিনেতাদের বিশেষ উপযোগী এবং কাব্যরসামৃতে পরিপূর্ণ। নাট্য-রসিকগণ, স্বর্গীয় কবিকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখরের পবিত্র স্মৃতিকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য অভিনয় রজনীতে উপস্থিত হইয়া নিজেদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন এ আশা আমরা সর্ব্বাগ্রেই করিতেছি।

স্থান পরিবর্ত্তন ঃ—ফরিদপুরের সুবিখ্যাত ঋষি-কল্প কবিরাজ ৺কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয় কলিকাতায় ৮৮নং বলরাম দেব ষ্ট্রীটে থাকিয়া পঞ্চাশ বৎসরেরও উপর আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসা করিতেন। কলিকাতায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারে তাঁহার অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ছিল, অনেক-গুলি রাজবাড়ীরও তিনি পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। অধুনা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেন, কবিভূষণ মহাশয়ও তাঁহার পিতৃদেবের পদাঙ্কানুসরণে পৈতৃক ব্যবসায় চালাইতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার কার্য্যের বিস্তৃতি ঘটায় ঐ পুরাতন বাটী ত্যাগ করিয়া তিনি সেণ্ট্রাল এভেনিউয়ে (১২ বি সাগরধর লেন) উত্তরাংশে নবনির্ম্মিত আলোক ও বায়ু বহুল সুরম্য হর্ম্ম্যে তাঁহার কৈলাসচন্দ্র আয়ুর্ব্বেদভবন নামক চিকিৎসালয় স্থানান্তরিত করিয়াছেন। কলিকাতাবাসী জনসাধারণ, রোগী ও আত্মীয় স্বজনকে অতএব এই নতন ঠিকানায় পদার্পণ করিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিতেছেন। আমরা কবিরাজ মহাশয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

পল্লী-সংস্কার ঃ—আজকাল পল্লী-সংস্কারের জন্য সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে খুব আন্দোলন চলিতেছে দেখা যায়। কিন্তু কাজে কতটুকু 'সংস্কার' ঘটিয়াছে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না—কেন ? পল্লীর অবস্থাপন্ন লোকেরা নগরে থাকিতে ভালবাসে এবং দরিদ্র রায়তদের বুকের রক্তস্বরূপ খাজনা দেওয়া টাকা নানা বিলাস ব্যসনে ব্যয় করিয়া বড়মানুষী করে। এই ভাবে একবার নগরের সুখের আস্বাদন পাইয়া তাহারা আর তাহাদের গ্রামে ফিরিতে চাহে না। ইহা কি পল্লীর শ্রীহীনতার প্রধান কারণ নয় ! আমাদের দেশীয় রাজন্যবর্গও এইভাবে সমুদ্র পারে গিয়া দরিদ্র প্রজার কষ্টদত্ত অর্থ জলের মত খরচ করিতে দ্বিধা-বোধ করেন না। পাশ্চাত্যের মোহ এতই তাঁহাদিগকে অভিভূত করে যে, তাঁহারা নিজরাজ্যে আর ইচ্ছার সহিত ফিরিয়া আসিতে চাহেন না। এইভাবে দেশীয় রাজ্যগুলিও ক্রমে ক্রমে অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইতেছে। পল্লীগ্রামে বাস করে কতকগুলি নিরক্ষর দরিদ্রলোক—যাহারা সর্ব্বদাই ঋণভারে পীড়িত, অন্নাভাবে ক্লিষ্ট—তাহারা পল্লীর কি সংস্কার করিবে ? আর বাইরে থেকে দুএকটী কর্ম্মী গিয়েও—যে তাদের কিছু উন্নতি সহসা করে দিতে পারবেন তাও সম্ভব নয়, আগে পল্লীতে ফেরবার মত বিলাস-বাসনা-শূন্য মানুষ তৈরী হোক তারপরে পল্লী-সংস্কার সম্ভব হবে। মহানুভব ব্যক্তিদিগের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রকৃত মানুষ গঠনে তৎপর হওয়া ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই।

প্রাণঘাতী রন্ধনপাত্র ঃ—এক পয়সার মেটে হাড়ী বার পয়সায় বিকাইতেছে, আবার হাঁড়ীগুলি খুব তাড়াতাড়ি ভাঙ্গে—তাই ব্যয়সঙ্কোচ কর্ত্তে গিয়ে বাঙ্গালীকে আজ মাটীর হাড়ী ক্রমশঃ ছেড়ে পিতল, তামা, এলুমিনিয়মের বাসনে রাঁধাখাওয়া কর্ত্তে হচ্চে।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার কয়েকটী অবস্থাপন্ন পরিবারে এই ধাতুপাত্রে রন্ধন জন্য খাদ্য বিষাক্ত হইয়া দুর্ঘটনা ঘটিয়া অনেকগুলি লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তামার বা পিতলের হাঁড়ী ব্যবহার তত বেশী হয় না, কিন্তু বর্ত্তমানে বাজার চলিত এলুমিনিয়মের পাত্রাদিতে রন্ধনকার্য্য প্রভৃতি নির্ব্বাহ করাও যে কত বিপজ্জনক তাহা আলিপুরের গভর্ণমেণ্ট টেষ্ট হাউসে খোঁজ লইলেই সকলে জানিতে পারিবেন। সকল জাতীয় ধাতু ও খনিজ পদার্থ ঐ স্থানে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। ধাতুপাত্রে পক্ক খাদ্য আহারে অম্ল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের বৃদ্ধির সহায়তা করা হইয়া থাকে। রন্ধনাদি কার্য্যে মাটীর পাত্র ব্যবহার করাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। সুতরাং বাঙ্গালী যে ডিস্পেপসিয়ায় ভুগবে সেটা কি বেশী আশ্চর্য্য ? সকালে উঠেই কোঁৎ কোঁৎ করে খালি পেটে কতকটা চা নামীয় গরমজল গেলেন—তারপরে এই ধাতুপাত্রে ভেজাল তেল-ঘীতে রান্না, ভাত তরকারী খাওয়া—জল খাবারের লুচী তৈয়ার হয় china clay (একপ্রকার মাটী যা দিয়ে পুতুল তৈরী হয়) মেশান ময়দা আর হয় 'ভেজিটেবল' নামধারী বিলাতী ঘিএর মত দেখতে এক পদার্থ দিয়ে, নয় মাড়োয়ারী ভায়াদের চর্ব্বী মেশান ঘি দিয়ে—ডিস্পেপসিয়ার কোন অপরাধ তো দেখ্‌তে পাই না, জাত যে আজও বেঁচে আছে এটাই আশ্চয্য নয় কি ?

মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া

পত্রিকার সার সঙ্কলন
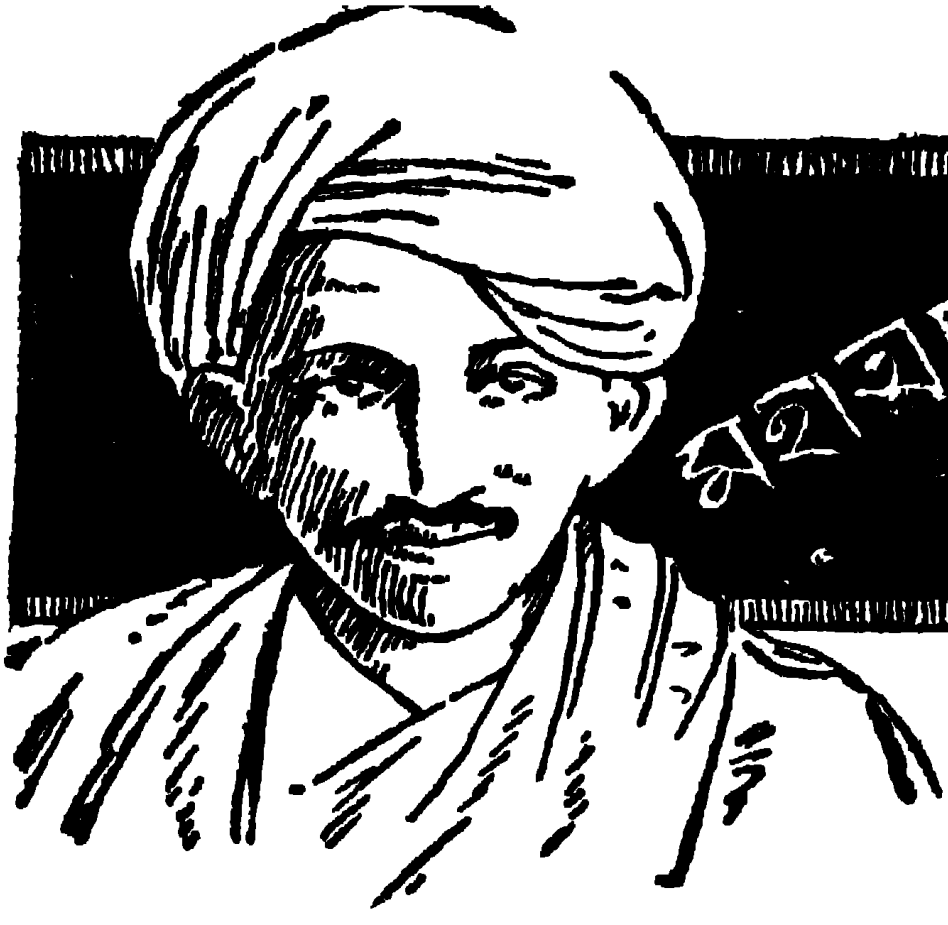
অধিকাংশ স্থলেই দেখি, যে সমস্ত অভিভাষণ আমাকে দেওয়া হয়, তাহা কেবল বিশেষণেই পরিপূর্ণ। সেই সমস্ত বিশেষণের আমি অযোগ্য বলিয়া তাহা কেবল আমাকে লজ্জা দেয়। আমি যদি নিজে সাবধান না থাকি, তবে এই অযোগ্য প্রশংসার আধিক্য আমার মতিভ্রম ঘটাইতে পারে। যে টুকু ভাল করি, তাহা উল্লেখ না করাই ভাল। স্তুতির মধ্যে অনুকরণই সর্ব্বাপেক্ষা অকপট ও অকৃত্রিম—তাই আমার গুণগ্রাহীদের প্রতি অনুরোধ যে, সত্যই যদি তাঁরা আমার কার্য্যের প্রশংসা করেন, তবে তাহারা আমার কার্য্যের অনুকরণ করিয়া যেন সহৃদয় তার পরিচয় দিন।

সকল অভিভাষণই যে প্রশংসাপত্র নহে, একটী ক্ষেত্রে তার পরিচয় পাইয়াছি—চাঁদপুরের অভিভাষণ-পত্র একটী সরল ও অকপট কার্য্যবিবরণী। নিম্নে ইহার কার্য্য-বিবরণী প্রকাশ করিলাম :—

১। কংগ্রেস সভ্য 'ক' শ্রেণী ১০ জন
খ শ্রেণী ৬৮ জন
মোট ৭৮ জন

২। চরকার সংখ্যা—২৪৫

৩। চরকার সাধারণ কার্য্যশক্তি—ঘণ্টায় ১০০ গজ—সর্ব্বোচ্চ শক্তি—ঘণ্টায় ৫০০ গজ।

৪। মাসিক উৎপন্ন সুতার পরিমাণ—১ মণ।

৫। হাতে কাটা ও অন্য সুতায় চালিত তাঁতের সংখ্যা সহস্রাধিক। সাতখানি মাত্র তাঁতে অমিশ্রিত খাদি উৎপন্ন হয়।

৬। মাসিক খাদি (অমিশ্রিত) উৎপত্তির পরিমাণ ২৫০ গজ মাত্র।

৭। খদ্দর ডিপোর সংখ্যা [illegible] মাত্র।

৮। মাসিক খাদি বিক্রয়—[illegible] টাকা।

৯। জাতীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ৮টী, ছাত্রের সংখ্যা মোট ১৬৭ টী।

১০। মাদকের ব্যবহার ১৯২২ সাল হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই সূত্রে আমাদের বলা কর্ত্তব্য,—দেশে ভীষণ দারিদ্র্য ও তন্নিবন্ধন অকাল মৃত্যুর প্রসার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে—তাহারা ঋণভারে প্রপীড়িত। জমাখরচ দেখিতে গেলে দেখি সকলেরই জমার ঘরে শূন্য পড়িয়াছে, এ অবস্থায় কুটীর শিল্প বাঁচিতে পারে না এই আর্থিক প্রলয়ের ফল যে কি হইবে তাহা ভাবিতেও আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

কার্য্যবিবরণীটিতে গৌরবের কিছুই নাই বটে, তবে নিরাশ হইবারও কিছুই নাই। আমরা প্রত্যেকে আমাদের সাধ্যানুসারে কার্য্য করিতে পারি—তার ভবিষ্যৎ ফলাফল আমাদের হাতে নয়। সাধ্যমত কার্য্য করিলে আমাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান অমলিন থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সচরাচর সাধ্যমত কার্য্য ত করিই না, যাহা করি তাহাও উদাসীন ভাবে, অনুৎসাহের সহিত করি—এবং অবশেষে ভাগ্যের উপর দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত হই।

আমাদের কার্য্যে বাধা ভয়ানক—অনেক সমস্যা এখনও অমীমাংসিত—সবগুলির একসঙ্গে বিহিত করা একজন বা বহুজনেরও সাধ্য নয়—এরূপ প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র, অকৃতকার্য্যতা ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল। এই বাধা আরও বেশী দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া উঠে আমরা প্রজার জাতি বলিয়া, তাহা যদি না হইত তবে অনেক বাধা স্বতঃই অপসারিত

হইত। স্বরাজ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই বাধা বিপত্তিগুলি অপসারণের চেষ্টা না করাও আবার স্বরাজপ্রাপ্তির পথে একটী বাধা—তাই বলি যিনি প্রধান প্রধান সমস্যার মীমাংসার সাহায্য করিবেন, তিনিই যথার্থ স্বদেশহিতৈষী।

চাঁদপুরের কর্ম্মীরা যদি যথার্থ তাহাদের সাধ্যমত কার্য্য করিয়া থাকেন তবে নিরাশ হইবার কোন কারণ দেখিনা; সময়ে ইহার সুফল আপনিই পরিস্ফুট হইবে। যাঁরা চারি আনা চাঁদা দিয়া ক্ষান্ত, সেইরূপ দশ হাজার সভ্য অপেক্ষা আমি ১০ জন মাত্র 'ক' শ্রেণীর কর্ম্মী সভ্যকে শ্রেষ্ঠ গণ্য করি।

এই দশজন যদি আন্তরিকতার সহিত কার্য্য করেন তবে অনতিবিলম্বে তাহারা দশের স্থলে শত হইবেন, তবে ধৈর্য্য চাই। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে সদস্যগণ প্রাণপণে কার্য্য করেন নাই—কারণ আমি অবগত হইয়াছি যে ১২০ জন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে ১০০ জন সুতা কাটিতে জানে কিন্তু ৫।৬ জন মাত্র নিয়মিতভাবে চরকা কাটে। যদি স্বেচ্ছাসেবকগণের চরকার উপর শ্রদ্ধা না থাকে তবে অপরের নিকট তাহা আশা করাও মূর্খতা। অভ্যর্থনা-সমিতির খুব সাবধান হইয়া স্বেচ্ছাসেবক মনোনীত করা উচিত ছিল; বিশ্বস্ত কর্ম্মীর অভাব থাকিলে তাহাদের স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা হ্রাস করা উচিত ছিল। স্বীকার করি স্বেচ্ছাসেবকগণ আমাকে অত্যন্ত যত্ন ও আদর করিয়াছেন আমার সন্তুষ্টির জন্য সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়াছেন—কিন্তু এইস্থলেই তাঁহারা মহাভ্রান্ত; তাঁহাদের জানা উচিত আমি নিজে তাঁহাদের সেবা লইবার জন্য আসি নাই তাঁহারা দেশের কেমন সেবা করেন তাহাই দেখিতে আসিয়াছি।

মাদক ব্যবহার বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বলিতে চাই যে,ইহা একটা স্বতন্ত্র বিভাগ করিয়া কতকগুলি কর্ম্মীর হস্তে তাহার ভার দেওয়া আবশ্যক। তাহাদের কার্য্য হইবে কেবল মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিবারণ করা। আমার মনে হয় সম্পূর্ণ-রূপে ইহা নিবারিত না হইলে এই পাপের হস্ত হইতে আর পরিত্রাণ নাই।

কুটীর শিল্প পুনর্জ্জীবিত করিবার একমাত্র উপায়—চরকার প্রচলন। প্রথমতঃ চরকার উপর কুটীর শিল্পের উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে—চরকাই শিল্পের উন্নতির সহায়তা করিতে সক্ষম—কিন্তু যিনি চরকায় আস্থাহীন—তিনি যে কোন শিল্পই অবলম্বন করুন না কেন, তিনি গ্রাম্য উন্নতির কেন্দ্রের বাহিরেই থাকিবেন—প্রকৃত কার্য্যের তাহাতে কোন সহায়তা হইবে না।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২—রাজ-দত্ত উপাধিভূষিত সম্পাদক জলধর দা, বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর মহোদয়ের অর্থনীতি সংক্রান্ত একটী অতি সাধারণ বক্তৃতার অনুবাদ এবারকার "ভারতবর্ষের" প্রথমেই স্থান দিয়া গাঢ় রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। পাটনা কলেজের "চাণক্য" সভার বার্ষিক অধিবেশনে এই বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।

অনুবাদক, অধ্যাপক সমদ্দার মহাশয় অনুবাদ মূলানুগত করিবার প্রয়াস করাতে স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত—"জনসাধারণের অবস্থা বলিলে সম্বন্ধ প্রকাশক আপেক্ষিক অবস্থা বুঝায় এবং তুলনাত্মক প্রক্রিয়া দ্বারাই আমরা ইহার অর্থ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারি।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা হইতে কয়েকটী নূতন তথ্য জানা গেল—(১নং) "মোগল যুগাপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ের (দেশের) অবস্থা বেশ ভাল" (২নং) যাহারা বলেন যে "ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্প অত্যন্ত উন্নতিশীল ছিল এবং ইংরাজ বণিকের স্বার্থান্বেষী কার্য্যদ্বারাই ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের কথা মিথ্যা।" Hamilton's State Relations with India. ভালকথা, বক্তার এই দুইটী সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অধ্যাপক সমদ্দার মহাশয় কি বলেন? এ সংখ্যায় আর একটী "অভিভাষণ" স্থান পাইয়াছে;—সেটী মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনীর বিজ্ঞাপন শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগীর মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতা। অধ্যাপক মহাশয়ের ভাষা বেশ শুদ্ধ এবং প্রাঞ্জল। অভিভাষণে

তিনি কয়েকটী সারবান কথাও বলিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় কেবল বিজ্ঞানের শুষ্ক "থিওরী" লইয়া নাড়াচাড়া করেন না? তিনি যে বিজ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া অর্থকরী বিদ্যায় পরিণত করিবার প্রয়াসী তাহা "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত "বিশ্বকর্ম্মার ইঙ্গিতেই" সপ্রমাণ। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন সাহা লিখিত "রয়েল সোসাইটী" শীর্ষক সচিত্র প্রবন্ধে উক্ত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, সভার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টির একটী ইতিহাস ও সভার সভ্যগণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তিন জন ভারতীয় এই সভার সভ্য হইতে পারিয়াছেন, স্বর্গীয় রামানুজ, আচায্য জগদীশ-চন্দ্র ও অধ্যাপক রমন্। আলোচ্য সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গে সুলেখক হরিহর শেঠ মহাশয় চন্দননগরের পাদ্রী জ্যোতির্ব্বিদ গোরণের শত বর্ষের (খৃঃ অঃ ১৭৩৬-১৮৪০) গ্রহণ গণনা ও তাঁহার সম্পাদিত প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধটী চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। "মান্দ্রাজ বন্দরে" শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, মান্দ্রাজের দর্শনীয় স্থানগুলির সচিত্র পরিচয় আছে মাত্র।"

"মনোবিদ্যা," ডাক্তার শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মনোবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ। লেখকের উপাধি দ্বারা প্রবন্ধের গুরুত্ব পরিমাপ করিতে যাইলে পাঠক নিশ্চয়ই হতাশ হইবেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধি-ধারীর নিকট আমরা বিশেষ কিছুর আশা করিয়া থাকি। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর "আত্মসমর্পণ" ভারতবর্ষের "মাতৃ-মঙ্গল" পরিচ্ছেদে কেন স্থান পাইল বুঝিলাম না। ছোট গল্পের মধ্যে শ্রীরেবা দেবী বিরচিত "কনে পছন্দ" তৃতীয় শ্রেণীর চলন-সই রচনা। "দাবী-হারা" শ্রীরাধারাণী দত্তের রচিত গল্প বা কাহিনী monologueএর আকারে লিখিত, অতি দীর্ঘত্বের জন্য ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়। "চাঁদের কলঙ্ক" শ্রীসুকুমার ভাদুড়ীর লিখিত আর একটী ছোট গল্প. লেখক শেষ-রক্ষা করিতে [illegible] সংখ্যা হইতে সুলেখিকা প্রসন্নম[illegible] চৌধুরীর) জীবনকথা [illegible] আমরা আগ্রহ সহকারে তাহা পাঠ করি[illegible]তেছি। আলোচ্য সংখ্যায় সুরচিত কবিতা এক[illegible] পাইলাম না—"কুলি মজুরের গান" শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটী কবিতা, কবি ইহাকে "কেরাস্" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। [illegible] কি গন্ধ তাহা চেনা যায় না—[illegible] এ কোরাস্ কু[illegible] মজুরেরা গাহিতে নিশ্চয়ই গলদঘর্ম্ম হইবে—দুই চারি লাইন উদ্ধৃত করিতেছি—

"এ ঐশ্বর্য্যময়ী এ পৃথ্বী এ কামধেনু পৃথ্বী দোহায় কে?
চিনেছ শুধুই ননী নবনীত, চেননা [illegible] জোগায় যে

*   *   *   *

মোরা মূর্খ নোংরা পাজী অসভ্য বেইমান্ ঠেঁটা বদ্মাইস।
ঘৃণ্য চোরের অগ্রগণ্য—বল্ তোরা সব যত পারিস্।

*   *   *   *

ডি, এল্ রায় তাঁহার "মন্দ্র" ও "আষাঢ়ে"তে যে ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা যদি যা-তা লেখকের আয়ত্তাধীন হইত তবে স্বর্গীয় কবির শূন্যস্থান অনেক দিন পূর্ব্বেই পূর্ণ হইয়া যাইত। "কাঁচের আর্জী" সু-কবি কুমুদ-রঞ্জন মল্লিকের একটী সুদীর্ঘ কবিতা। মল্লিক মহাশয় যে আর্জী দাখিল করিয়াছেন তাহার জবাব নাই। তাহার ওকালতী পণ্ডশ্রম হয় নাই, মক্কেল নিশ্চয়ই ডিক্রী পাইবে। লেখিকা রাধারাণী দত্তের রচিত "সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রকাশক" প্রবন্ধ হইতে যে বাদ-প্রতিবাদের ঝটিকা ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় উত্থিত হইয়াছিল এ সংখ্যায় তাহা থামিল, সম্পাদক মহাশয় "ইম্‌বংসম্" দিয়াছেন যে অতঃপর এ সম্বন্ধে আর প্রতিবাদ ছাপা হইবে না, সুতরাং শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

...লয়

...দুরের
...য়াছিলেন।
...অঞ্চলে খুব প্রতিষ্ঠা
...খুব বেশী রকম হইয়াছিল
... এখানে রবিবার তাঁহারা
...বা ভ্রমর অভিনয় করিয়াছিলেন।
...ভ্রমর' অভিনয় হইলে ক্ষতি কি? ভ্রমর
একটী জীবন্ত ছবি—যা কখন ম্লান হইবে
...রাং ভ্রমর দেখিবার মত দর্শকদর্শিকার এ অঞ্চলেও
...ব হইবে না বলিয়া মনে করি।

আর্ট থিয়েটার 'শ্রীকৃষ্ণ' নামক নূতন নাটকের প্লাকার্ড ...য়াছেন—নাট্যকার অপরেশবাবু। এই পৌরাণিক নাটকে প্রয়োগ-নৈপুণ্যের বিশিষ্টতা দেখিতে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করি। পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদও নাকি নাট্যমন্দিরের জন্য 'শ্রীকৃষ্ণ' নাটক রচনা করিয়াছেন। পুণ্ডরীক ও 'কর্ণ' অভিনয় হইবার পর যদি শ্রীকৃষ্ণ নাটক অভিনীত হয় তবে তাহার কথা এখন উত্থাপন না করাই ভাল।

নাট্য-মন্দিরে এবার সত্য সত্যই 'জনা' অভিনয় হইবে—তারিখও বাহির হইয়াছে অতএব আর আশঙ্কার কোন কারণ নাই। এঁদের জনায় প্রথম প্রাচীর-বিজ্ঞাপন (poster) খানি অনেক রঙের শ্রাদ্ধ হইলেও চিত্তাকর্ষক হয় নাই কিন্তু দ্বিতীয়খানি বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে, তবে 'জনা' নামের সহিত লেলিহান অগ্নি শিখার ভাবগত কি গূঢ় সম্পর্ক আছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। একমাত্র 'জনা'র ভূমিকা ব্যতীত এখনও অন্য কোন ভূমিকার পাত্র-পাত্রীদের নাম বিজ্ঞাপিত হয় নাই।

গত সপ্তাহের ফরওয়ার্ডে Stage and Screenএ শিশিরবাবুর জনা সম্বন্ধে খুব লেখা হইয়াছে—অভিনয় হইবার পর লিখিলেই ভাল হইত। ষ্টেটস্‌ম্যানের দেখাদেখি দেশীয় ইংরাজী দৈনিকগুলিও রবিবারে অতিকায়ত্ব লাভ করিয়াছে সুতরাং সেদিনের কাগজের অনেক স্থানই বেওয়ারিস্ হইয়া পড়ে। স্থান পূরণই কি এ সব প্রবন্ধের উদ্দে...

...সার্জ্জেন্ট একটি Night-bird জুটিয়াছে—এটি কি বেঙ্গলীর সেই পক্ষীটি যাঁহার নাটক সম্বন্ধে অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় একবার আমরা দিয়াছিলাম—তিনি যদি হন, তাহা হইলে বলিবার কিছু নাই—নতুবা ম্যাডান কোম্পানি, বায়স্কোপের এত কলম কলম বর্ণনা (তাহাও আবার তাঁহাদের বিজ্ঞাপনের ব্লক দিয়া চিত্র-শোভিত করা) অন্য পক্ষীর কর্ম্ম নয়; কারণ সব পক্ষী এত নির্লজ্জ হইতে পারে না। নিশাচর পক্ষীদের কিছুই বাধে না কারণ তাহারা গাঢ় নৈশ অন্ধকারের আবরণে বসিয়া মনোসাধে কর্কশ কণ্ঠ ছাড়িয়া গান ধরিতে অভ্যস্ত। সেদিন এই নিশাচর "Pampered youth" সম্বন্ধে যা মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা'পড়লে যাঁরা এ ছবি দেখেছেন তাঁদের অনেকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হবে; কারণ সত্য জিনিসটাকে কলমের খোঁচায় বদলান যায় না! এ চিত্রখানি ম্যাডান কোম্পানীর বাঙ্গালীর জীবন সম্বন্ধে ঘোর অজ্ঞতার পরিচায়ক বলিলেই ভাল হয়।

অভিনেতা অভিনেত্রীদের মাঝে মাঝে হাত ফেরা-ফেরি কর্ত্তে হয়—সেই রকম একটা সময় এসেছে বোধ হয়। আর্ট থিয়েটার হইতে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী আগামী ১লা আষাঢ় হইতে মিনার্ভায় যোগদান করিবেন —এ বন্দোবস্ত উভয় থিয়েটারের পক্ষে মঙ্গলজনক বলেই বোধ হয়। কোকিলকণ্ঠী শ্রীযুক্তা সুবাসিনী ও আর্ট থিয়েটার ছেড়ে এখন 'হায়েষ্ট বিডারের' জন্য অপেক্ষা কর্চ্ছেন। দেখা যাক কে তাঁকে নিতে পারে? মিনার্ভা সম্ভবতঃ তাঁদের এই পুরাতন অভিনেত্রীকে খুব উচ্চ মূল্যে নেবেন না—বিশেষতঃ সম্প্রতি তাঁরা যখন সুকণ্ঠী সুন্দরী আঙ্গুর-বালাকে নিযুক্ত করেছেন। ভাদুড়ী মহাশয়ের একজন সুগায়িকার আবশ্যক হতে পারে, সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলবে তাঁতে ও নূতন বেঙ্গল থিয়েটারে (লিমিটেড)।

নরেশ বাবুও নাট্যমন্দিরে যোগদান করেছেন বলে প্লাকার্ড পড়ে গেছে। সম্প্রতি ষ্টারে তিনি যে রকম অভিনয় কর্চ্ছিলেন তাতে তাঁর সম্বন্ধে আমরা একরকম হতাশই হয়েছিলাম তবে শিশির বাবুর কাছে এসে যদি তিনি অভিনয়ে আবার মনঃসংযোগ করেন ও আন্তরিকতার